CUL-H0 4247-2-R06349

বঙ্গশ্রী

নবম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(পৌষ, ১৩৪৮ হইতে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯)

②

ষাণ্মাসিক সূচী

(756.3
'0023)

সম্পাদক

শ্রীরসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড,
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

P16349

বঙ্গশ্রী

নবম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড] [পৌষ, ১৩৪৮—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪

[বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অতিথি (গল্প)	ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৮১
অমলিন প্রেম লবে না ? (কবিতা)	শ্রীবিবেকানন্দ পাল এম-এ,	৭৫
অর্ঘ্য (কবিতা)	শ্রীব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৫
অধীনতার মোহ (গল্প)	শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়	৩৬২
আইনের ফাঁকি (নাটিকা)	শ্রীভুবনমোহন সাহা	৪৮১
আদালত ও বীমা		১৪৩
ইংরাজী পত্র-সাহিত্যের দুই মহারথী (প্রবন্ধ)	শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র	১১২
ঈশ্বরগুপ্ত ও বাংলা কাব্য (প্রবন্ধ)	শ্রীভবপতি মৈত্র	৫০৭
ঊষা (কবিতা)	শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ	৫৩
একটী দিনের কথা (গল্প)	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু এম-এ,	৬০২
একটী রাতের ভুল (গল্প)	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু এম-এ,	২৪৮
এপার-ওপার (কবিতা)	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৭৯৪
এসো ব্রাহ্মণ (কবিতা)	শ্রীনকুলেশ্বর পাল	২৩০
ঋষি বঙ্কিম (কবিতা)	শ্রীনকুলেশ্বর পাল বি-এল,	৯৫
কবি কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার (প্রবন্ধ)	শ্রীভবপতি মৈত্র এম-এ,	৫০
কবি রজনীকান্ত (কবিতা)	শ্রীসুধীরচন্দ্র বাকচী	৪৯৪
কন্যাদায়ে বলিদান (প্রবন্ধ)	কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার	১১৬
করালবদনী কালী (কবিতা)	শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার, এট্-ল	৬৯৪
কে রচিবে ভবিষ্যৎ (কবিতা)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন	৩৮
কৃত্তিবাস (প্রবন্ধ)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	১১৫,১৯৭
খেলাঘর (গল্প)	শ্রীমতী পরিমলরাণী রায়	১৭৩
খেয়ালী (কবিতা)	শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য	৮৬০
গিরিশপ্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৭
গোবিন্দ দাস (প্রবন্ধ)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৭২৬
ছলনাময়ী (কবিতা)	শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩২৬
ছিন্ন-কোরক (সচিত্র কবিতা)	শ্রীমতী শোভা দেবী	৬৯৬
ছোটো ছেলেটা (নক্সা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১
জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস (সচিত্র প্রবন্ধ)	ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৪৯, ৩০১,৪৪৯,৫৯
জটিল (গল্প)	শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু	৭৫৪
ঝড়ের রাতে (গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার	৪৫
তর্কলহ (কবিতা)	শ্রীকানাই বসু	৩৮
তুমি কি শুনিবে শুধু (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৭২
তোমার চরণতলে (কবিতা)	শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	২১
দুলালের স্বপ্ন (উপন্যাস)	শ্রীরেবতীমোহন সেন	১৭,২৬৬,৩৬৬,৫৫০, ৭১৬,৮৫
দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে 'মা' (প্রবন্ধ)	শ্রীদেবেন্দ্র লাল রায়	১৬,২১১, ৫২
দীনবন্ধু ও নীলদর্পন (প্রবন্ধ)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৯
দেশের সেবা (উপন্যাস)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৩৭, ৩৮৩,৫৩৮,৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠ
দেশবিদেশের নৃত্য-কলা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	৪৬২
ংসলীলা (কবিতা)	শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়	৩৯৩
জুন দাস (প্রবন্ধ)	শ্রীকান্তীন্দুভূষণ রায়চৌধুরী	৪০২
াধব (গল্প)	শ্রীকানাইলাল বসু	৭০৭
বে কেবলম্ (গল্প)	শ্রীকানাইলাল বসু	১৭
লাহফিরাৎ (কবিতা)	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৫১৭
নববর্ষে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৪২০
পরেশনাথের পথে (ভ্রমন কাহিনী)	শ্রীশোভা দেবী	৬৫,২১৭,৩৫৮
পরিত্যক্ত (কবিতা)	শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	১১৪
ল্লীসংস্কার (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	২২৩
পত্র (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৩৫৭
প্রতিশোধ (গল্প)	শ্রীলতিকা সেনগুপ্তা	৩১৭
প্রলয় (কবিতা)	শ্রীধর্ম্মদাস কুণ্ডু	৫৪৫
প্রতিশোধ (গল্প)	ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৮৪০
ত্যাবর্ত্তন (নাটিকা)	শ্রীদেবেন্দ্রলাল রায়	৮৪৯
প্রায়শ্চিত্ত (গল্প)	শ্রীমোহিনী চৌধুরী	৭৭৩
পণ্ডিত-মূর্খের প্রতি (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৭৪৬
প্রেতের বন্ধন (গল্প)	শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯৫
পুস্তক পরিচয়		৫৭৩
ন্তুণ নাই (কবিতা)	শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য	৬৮৩
ন্ধন-মুক্তি (উপন্যাস)	শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ,	৫৪, ১৮৬, ৩৪৭, ৫১৩, ৬৫৭, ৭৮৬
বর্ষার কথা	ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,	৪১৬, ৫৬৬, ৬৮৬
ড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন (প্রবন্ধ)	শ্রীকালিদাস রায়,	৩৭৮
র্ত্তমান যুদ্ধের শিক্ষা (প্রবন্ধ)	শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য	২৯৭
র্ত্তমান যুদ্ধের বিপদ সঙ্কুলতা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি ? (প্রবন্ধ)	শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য	৫৭৭
ঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য (প্রবন্ধ)	শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়	৫৪৬, ৬৮৪, ৭৬৭
বর্ত্তমান সাহিত্য (প্রবন্ধ)	শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা,	৪৬৮, ৭২১
বাঙ্গালীর ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন (প্রবন্ধ)	শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী	৭৩
বাঙ্গালার কথা (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)	৺নিখিলনাথ রায়,	৮৭, ২৪৬
বাঙ্গালার প্রাচীন কীর্ত্তি (প্রবন্ধ)	শ্রীঅরবিন্দ দত্ত	৮১
বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব (প্রবন্ধ)	শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য	৩৮৯, ৬৪১
বাঙ্গালীর জীবন যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব (প্রবন্ধ)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক	৩৪১
বাঙ্গলা গান ও উমা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৬১৫
বাঙ্গালার বাইচ গান (প্রবন্ধ)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ	৭৬০
বিপজ্জনক খুনপ্রান্ত (রসগল্প)	শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়	৩৯৪
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা	শ্রীকানু	৫৩৪
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা		৭২১
বৃহত্তর বঙ্গ ও বর্ম্মণ জাতি (প্রবন্ধ)	শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য	১২৯, ১৬১
ব্রহ্মা নারদ সংবাদ (নাটিকা)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস	৬৫১
বোমার আতঙ্ক (গল্প)	শ্রীরাধাকিঙ্কর রায় চৌধুরী	৮১২
বংশধারা (গল্প)	শ্রীপরিমলরাণী রায়	৬২২
বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের অভিযান (প্রবন্ধ)	শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	৮৪৬
বাংলা ও হিন্দী গান (প্রবন্ধ)	শ্রীহরিপদ দত্ত	৩৬৯
ভক্তকবি রজনীকান্ত (প্রবন্ধ)	শ্রীনকুলেশ্বর পাল	৩০৫
ভারতের মুক্তি-তথা জগতের কল্যাণ		৭২২
ভারতের রাজনীতি (প্রবন্ধ)	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০৩
ভুল ভাঙ্গা (গল্প)	শ্রীলতিকা সেন গুপ্তা	৭৩৪
ভূমিকম্প সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	১২১
মধুসূদন দত্তের নাট্য প্রতিভা (প্রবন্ধ)	শ্রীনীহার দাশগুপ্তা	১৪
মহিম দা (গল্প)	শ্রীপরিমলরাণী রায়	৬০
ময়নামতীর চরে (কবিতা)	শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	২৬৫

মরণ (কবিতা) শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য ৩৪৬
মনের বাঘ (প্রবন্ধ) ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৭৫৪, ৮৫৬
মাটীর বাঁধন (গল্প) শ্রীঅরবিন্দ দত্ত ৬৯৮
মানুষ শরৎচন্দ্র (সচিত্র প্রবন্ধ) শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা ৭০৪
মায়াবিনী ছন্দা (গল্প) শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য ৩৭৩
মৃত নক্ষত্র (গল্প) শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন ৭৬৩
মহারাণা প্রতাপসিংহ (প্রবন্ধ) শ্রীবিপিন বিহারী দাশগুপ্ত ৫০০, ৭৭৯
যাযাবর (কবিতা) শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ৮৩৯
যাত্রা শেষ (কবিতা) শ্রীসুধাংশু সেন ৪০৯
যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ৫৭৭
যেতে হবে পারে (কবিতা) শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৩৫
রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা (প্রবন্ধ) শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী ২৩১
রবীন্দ্রসঙ্গমে (প্রবন্ধ) শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় ১৬৮
রাশিয়ার সাহিত্য (প্রবন্ধ) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী ২৫৮
রামপ্রসাদ (প্রবন্ধ) শ্রীকালিদাস রায়, ৫৫৮, ৬৬৭
রাজসিংহের ভূমিকা ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৩২, ২৭৩
রাষ্ট্রীয় রণাঙ্গণ র‍্যানালিষ্ট ৯০, ২৬৯
লণ্ডনতীর্থে (ভ্রমণ বৃত্তান্ত) শ্রীমতিলাল দাশ ৯৯, ২৫৫, ৫০৫
লাল সাড়ী (গল্প) শ্রীঅনন্তপ্রসাদ মজুমদার ৪৭
লাঞ্ছিতা (গল্প) ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৪৭১
লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীত (প্রবন্ধ) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ ৪৭৫
শতাব্দীর সম্মান (কবিতা) শ্রীপরিতোষ রায় ৬৩১
শেষ কথা (উপন্যাস) শ্রীসুধীরচন্দ্র ধর, ১৬৪, ৪১২
শোক (গল্প) শ্রীলতিকা সেনগুপ্তা ৬৩৭
শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র (প্রবন্ধ) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সত্যের মহাগান (কবিতা) শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ
সদাশয় গিরিশচন্দ্র (প্রবন্ধ) ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৩৫৫
সম্বর সম্বর মহাকাল (কবিতা) শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ৭৫
স্বপন (কবিতা) শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় ৮৪৫
সম্পাদকীয় ৫৮৩
সপার্ষদ গৌরাঙ্গদেব ও নাট্য-কলা (প্রবন্ধ) ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৩৯
সহধর্ম্মিণী (গল্প) শ্রীআশীষ গুপ্ত ৪০৪
সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা ১, ১৪৫, ২৮৯, ৪৩৩
সাগরিকা (কবিতা) শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৩৪০
সাহিত্যের নেশা (প্রবন্ধ) শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ৩২৭
সাহিত্যিক নারীচিত্রে নারীর স্থান (প্রবন্ধ) শ্রীরামশশী কর্ম্মকার ৪৮৯
সিঙ্গাপুর (সচিত্র প্রবন্ধ) শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ ৬৩২
সুরুচির অপমৃত্যু (গল্প) শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী ৬৪৮
হরিদাস ঘোটক (গল্প) শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ২০৩
হালসংসার (কবিতা) শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ৪১
হিটলার ও নাৎসীদল (সচিত্র প্রবন্ধ) ৮১৫
ক্ষণিকা (কবিতা) শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় ৪৮০

বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য
- [illegible] (কবিতা) ৩৪৬
- ফাল্গুন নাই (কবিতা) ৬৮৩
- খেয়ালী (কবিতা) ৮৬০

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
- তুমি কি শুনিবে শুধু (কবিতা) ৭২
- পত্র (কবিতা) ৩৫৭
- নব বর্ষে (কবিতা) ৪২০
- পণ্ডিত মূর্খের প্রতি (কবিতা) ৭৪৬

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত
- বাঙ্গালার প্রাচীনাকীর্ত্তি (প্রবন্ধ) ৮১
- মাটির বাঁধন (গল্প) ৬৯৮

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- ভারতের রাজনীতি (প্রবন্ধ) ১০৩

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য
- মায়াবিনী ছন্দা (গল্প) ৬৭৩

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ মজুমদার
- লাল শাড়ী (গল্প) ৪৭

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
- সাগরিকা (কবিতা) ৫৩০

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়
- হরিদাস ঘোটক (গল্প] ২০০

শ্রীআশীষ গুপ্ত
- সহধর্ম্মিণী (গল্প) ৪০৪

শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা
- বর্ত্তমান সাহিত্য (প্রবন্ধ) ৪১৮, ৭২১
- মানুষ শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ) ৭০৪

শ্রীকালিদাস রায়
- কৃত্তিবাস (প্রবন্ধ) ১১৫, ১৯৭
- গোবিন্দ দাস (প্রবন্ধ) ৭৯৬
- বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন (প্রবন্ধ) ৩৭৮
- রামপ্রসাদ (প্রবন্ধ) ৫৫৮, ৬৬৭

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ
- বন্ধন-মুক্তি (উপন্যাস) ৫৪, ১৮৬, ৩৪৭, ৩৬৭, ৫১০, ৭৮৬

শ্রীকানাই বসু
- তর্কলহ (কবিতা) ৩৮৮
- ননীমাধব (গল্প) ৭০৭
- নামৈব কেবলম্ (গল্প) ১৭

শ্রীকান্তীন্দুভূষণ রায়চৌধুরী
- নরোত্তম দাস (প্রবন্ধ) ৪০২

শ্রীকানু
- বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা (প্রবন্ধ) ৫৩৪

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
- শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র (প্রবন্ধ) ২১

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
- ময়নামতীর চরে [কবিতা] ২৫৪
- হাল-সংসার (কবিতা) ৪১৬

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী
- রাশিয়ার সাহিত্য (প্রবন্ধ) ২৫৮

শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ
- সত্যের মহাগান (কবিতা) ৭২২

শ্রীতারানাথ রায়চৌধুরী
- বাঙ্গালীর ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন (প্রবন্ধ) ৭৩

শ্রীদিলীপকুমার রায়
- নাহক্ফীয়াহ (কবিতা) ৫১৭
- বাংলা গান ও উমা (প্রবন্ধ) ৬১৫

শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র
- ইংরাজীপত্র-সাহিত্যে দুই মহারথী (প্রবন্ধ) ১১২

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী
- কে রচিবে ভবিষ্যৎ (কবিতা) ৩৮

শ্রীধর্ম্মদাস কুণ্ডু
- প্রলয় (কবিতা) ৫৪৫

শ্রীনকুলেশ্বর পাল
- ঋষি বঙ্কিম (কবিতা) ৯৫
- এস ব্রাহ্মণ (কবিতা) ২০০
- ভক্ত কবি রজনীকান্ত (প্রবন্ধ) ৩০৫

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
- মনের বাঘ (প্রবন্ধ) ৭৫৪, ৮৫৬
- নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র (প্রবন্ধ) ৩৫৫

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
যেতে হবে পারে (কবিতা) ২৩৫
৺নিখিলনাথ রায়
বাঙ্গালার কথা (প্রবন্ধ) ৮৭, ২৪৬
শ্রীনীহার দাশগুপ্তা
মধুসূদনদত্তের নাট্য-প্রতিভা (প্রবন্ধ) ১৪
শ্রীপরিমলরাণী রায়
খেলাঘর (গল্প) ১৭৩
মহিম দা' (গল্প) ৩০
বংশধারা (গল্প) ৩২২
শ্রীপরিতোষ রায়
শতাব্দীর সন্ধান (কবিতা) ৬৩১
শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়
অধীনতার মোহ (গল্প) ৩৬২
শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়
তোমার চরণতলে (কবিতা) ২১৬
স্বপন (কবিতা) ৮৫৪
ক্ষণিকা (কবিতা) ৪৮০
শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেতের বন্ধন (গল্প) ৪৯৯
শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত
মহারাণা প্রতাপসিংহ (প্রবন্ধ) ৭৭৯
শ্রীবিবেকানন্দ পাল
অমলিন প্রেম মোর লবে না ? (কবিতা) ৭৫
শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য
বাংলার জাতীয় জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব (প্রবন্ধ) ৩৮৯, ৬৪১
শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়
বিপজ্জনক খুল্লতাত (রসগল্প) ৩৯৪
শ্রীব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
অর্ঘ্য (কবিতা) ১৮৫
শ্রীভবপতি মৈত্র
ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা কাব্য (প্রবন্ধ) ৫০৭
কবি কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার (প্রবন্ধ) ৫০
শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী
রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা (প্রবন্ধ) ২৩১
শ্রীভুবনমোহন সাহা
আইনের ফাঁকি (-নাটিকা) ৪৮১
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস
ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ (নাটিকা) ৬৫১
শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
পরিত্যক্তা [কবিতা] ১১৪
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
পল্লীসংস্কার (প্রবন্ধ) ২২৩
শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়
প্রত্যাবর্ত্তন (নাটিকা) ৮৪৯
দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যে 'মা' (প্রবন্ধ) ৭৬, ২১১, ৫২০
শ্রীমোহিনী চৌধুরী
প্রায়শ্চিত্ত (গল্প) ৭৭৩
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
গিরিশ প্রসঙ্গ [প্রবন্ধ] ৭৪৭
দীনবন্ধু ও নীলদর্পণ [প্রবন্ধ] ৯৬
দেশের সেবা [উপন্যাস] ২৩৭, ৩৮৩, ৫৩৮, ৬৮০
শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন
মৃত-নক্ষত্র (গল্প) ৩৬১
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
ছোটো ছেলেটা (নক্সা) ১০৮
শ্রীরাধাকিঙ্কর রায়চৌধুরী
বোমার আতঙ্ক (গল্প) ৮১২
শ্রীমতী রাধারাণী দেবী
বাবাবর (কবিতা) ৮৩৯
শ্রীরামশশী কর্ম্মকার
সাহিত্যিক নারীচিত্রে দস্তার স্থান (প্রবন্ধ) ৪৮৯
শ্রীবামেন্দু দেশমুখ্য
বৃহত্তর বঙ্গ ও বর্ম্মণ জাতি (প্রবন্ধ) ১২১, ১৬১
শ্রীরেবতীমোহন সেন
দুলালের বধূ (উপন্যাস) ১০, ২৬৬, ৩৬৬, ৫৫০, ৭৬০, ৮৬১
শ্রীলতিকা সেনগুপ্তা
প্রতিশোধ [গল্প] ৩১৭
ভুলভাঙ্গা [গল্প] ৭৩৪
শোক [গল্প] ৬৩৭
শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার
কন্যাদায়ে বলিদান [প্রবন্ধ] ১২৬
ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
অতিথি [গল্প] ৮১
লাঞ্ছিতা [গল্প] ৪৭১
প্রতিশোধ [গল্প] ৮৪০

শ্রীশোভা দেবী
পরেশনাথের পথে [ভ্রমণ-কাহিনী] ৬৫, ২১৭, ৩৫৮
ছিন্ন কোরক [কবিতা] ৬৯০

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক
বাঙ্গালীর-জীবন যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব [প্রবন্ধ] ৫৪১

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু
জটিল [গল্প] ৭৫১

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়
ধ্বংসলীলা [কবিতা] ৩১৬
বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলাসাহিত্য [প্রবন্ধ] ১৪৬, ৩৮৪, ৫৬৭
রবীন্দ্র সঙ্গমে [প্রবন্ধ] ১৩৮

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বর্ত্তমান যুদ্ধের শিক্ষা ৮৯০
বর্ত্তমান যুদ্ধের বিপদসঙ্কুলতা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? ৫৭৭

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ছলনাময়ী [কবিতা] ৫২৬

শ্রীসুধীরচন্দ্র বাক্চী
কবি রজনীকান্ত [কবিতা] ৪৯৪

শ্রীসুধীরচন্দ্র ধর
শেষ কথা [উপন্যাস] ১৬৭, ৪১২

শ্রীসুধাংশু সেন
যাত্রা শেষে [কবিতা] ৪০৯

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস
করালবদনী কালী [কবিতা] ৩১৪
সমর সমর মহাকাল (কবিতা) ৭১৫

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ
দেশ-বিদেশের নৃত্যকলা [প্রবন্ধ] ৪৯২

ভূমিকম্প [সচিত্র প্রবন্ধ] ১২১
হিটলার ও নাৎসীদল [সচিত্র প্রবন্ধ] ৮১৬

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ
বাঙ্গালার বাইচ গান [প্রবন্ধ] ৪০
লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত [প্রবন্ধ] ৪৭৫

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার
ঝড়ের রাতে [গল্প] ৪৫৬

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু
একটি রাতের ভুল [গল্প] ২৪৮
একটি দিনের কথা [গল্প] ৬০২

শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ
ঊষা [কবিতা] ৫৩

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ
সিঙ্গাপুর [সচিত্র প্রবন্ধ] ৬০২

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস ১৪৯, ৩০১, ৪৪৯, ৫৯৩
বর্ম্মার কথা ৪১৬, ৫৩৬, ৬৮৬
রাজসিংহের ভূমিকা ১৩২, ২৭৩
সপার্ষদ গৌরাঙ্গদেব ও নাট্য-কলা ৩৯

শ্রীহেমন্ত সরকার
বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের অভিযান ৮৪৬

শ্রীহরিপদ দত্ত
বাংলা ও হিন্দী-গান [প্রবন্ধ] ৩৬৯

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা ভাদুড়ী
সুরুচীর অপমৃত্যু ৫৪৮

ন্যাশনালিষ্ট
রাষ্ট্রীয় রণাঙ্গণ ৯০, ২৫৯

চিত্র-সূচী

ত্রিবর্ণ

কাণামাছি — শিল্পী—শ্রীশচীন্দ্রভূষণ ধর
তৃপ্তি — " শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়
পল্লীর হাট — " শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
পার্ব্বত্য দৃশ্য — " শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
বিদায় অশ্রু — " শ্রীনিশানাথ মজুমদার
বিশ্রাম — " শ্রীশচীন্দ্রভূষণ ধর

দ্বিবর্ণ

ব্রতী — শিল্পী—কুমারী নীহারকণা ঘোষ
সাঁকো — " শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
সিঙ্গাপুরের দৃশ্যাবলী — " শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ

প্রবন্ধান্তর্গত চিত্রাবলী

ছিন্ন কোরক ... ৬৯৬
নীলিমা মুখার্জ্জী

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস ... ১৪৯, ৪৪৯, ৫৯৩
স্যার সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, অ্যানি বেশান্ট, মিঃ গান্ধী, লর্ড কার্জ্জন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, গ্ল্যাডষ্টোন।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, চিত্তরঞ্জন ও তিলক।
স্যার চন্দ্রাভরকর, ডিনসা ওয়াচা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড কার্জ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল এবং ডব্লিউ, সি ব্যানার্জ্জি।

পল্লী-সংস্কার ... ২২৩
ভাংগন, খেয়াঘাট, কচুরিপানা বোঝাই বিল।

দেশবিদেশের নৃত্য-কলা ... ৪৩২
শিব নটরাজ, নৃত্যের বেশে মুখোসধারী বৌদ্ধ লামার দল, বালি দ্বীপের নৃত্য, সিংহলের কান্দীনৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গী।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে 'মা' : ... ১৬, ৫২০
দ্বিজেন্দ্রলাল

পুস্তক পরিচয় : ... ৫৭৬
৺সুধীন্দ্র বসু

বর্মার কথা : ... ৪১৬, ৫৬৬, ৬৮৭
ছাতা ও চুরুট হস্তে বর্মী রমণী, ছাতা নির্ম্মাণ রত ; সুয়েডেগন পেগোডার মানবাকার বুদ্ধমূর্ত্তি ; ব্রহ্মনেতা ভিক্ষু উত্তম ; বর্ম্মায় কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ ; বর্মী প্রেমিক প্রেমিকা ; মিঃ পি, সি, সেন ; সপরিবারে মিঃ জে, আর দাশ ও মিঃ এস, আর দাস ; বাবু কুঞ্জবিহারী বন্দোপাধ্যায় ; ফুঙ্গী শিশুগণকে পাঠ দিতেছেন ; ভিক্ষা সংগ্রহে নির্গত ফুঙ্গীগণ, মন্দির সোপানে ফুঙ্গীগণ ; ফুঙ্গীদের থাকিবার স্থান ; রেঙ্গুনের গভর্ণমেন্ট হাউস ; মিকটিলার হ্রদ, প্যাগানের প্রসিদ্ধ আনন্দ পেগোডা, সুয়েডেগন পেগোডার দক্ষিণ তোরণ, প্যাগানের মন্দিরশ্রেণী, ব্রহ্ম কুমারীদ্বয়, পোয়ে নৃত্যরতা বালিকাগণ। লাসিও ষ্টেশন, ইরাবতী নদীবক্ষে ষ্টীমার, যমুনাদাস বিশ্রাম ভবন, ইরাবতী নদীর একাংশের দৃশ্য, রেঙ্গুন রেলষ্টেশনের প্রবেশ পথ, দ'ডির সেতু ও গেজেট গহ্বর, রেঙ্গুন সহরের একাংশ, মহাবোধী মন্দির, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, পণ্ডিত জওহরলাল, মৌলানা আজাদ, আনন্দ প্যাগোডা।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য : ... ৬৮
বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র : ... ৫৪৬
বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব : ... ৩৪১
রবীন্দ্রনাথ

বাংলা গান ও উমা : ... ৬১২
৺কুমারী উমা বসু

ভক্ত-কবি রজনীকান্ত : ... ৬০৫
কবি রজনীকান্ত, কান্ত কবির পল্লী-ভবন

ভারতের রাজনীতি
মিঃ হিউম, ওয়েডারবার্ণ, চিত্তরঞ্জন, স্যার সুরেন্দ্রনাথ, মিঃ গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র :
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ

সদাশিব গিরিশচন্দ্র :
গিরিশচন্দ্র

সাহিত্যের নেশা :
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, গোবিন্দদাস, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ সেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও স্বর্ণকুমারী

সাহিত্যিক নারী-চিত্র দত্তার স্থান : ... ৪
শরৎচন্দ্র

সিঙ্গাপুর :
প্রশস্ত রাজপথ, একটী দৃশ্য, কজওয়ে এবং কারিত রবার-সংগ্রহ।

রাশিয়ার সাহিত্য :
মাইকেল, দ রমন্টভ, আলেকজাণ্ডার পুস্কিন, টুর্গেনিভ, এণ্টন শেখভ ও ম্যাক্সিম গর্কী।

রাষ্ট্রীয় রণাঙ্গণ : ... ৯০, ২৬
মরুপথে সাঁজোয়া গাড়ী, ট্যাঙ্ক বাহিনীর অগভীর নদী অতিক্রম, পদাতিক বাহিনীর অগ্রগতি, কনভয়ের উপর বোমাবর্ষণ ও ইংলণ্ডের বোমারু বিমান।

হিটলার ও নাৎসীদল : ... ৮১
হের হিটলার, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, কার্ল মার্ক্স, হিণ্ডেনবার্গ ও হিটলার, হিটলারের জন্মভূমি পর্ব্বতবন্ধুর অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিনের রেল-ষ্টেশন, আটলিন হ্রদ, আলাস্কা, জার্ম্মানীর পিতৃস্বরূপ রাইন নদ, কলোনে রাইন নদের বক্ষে সুদৃশ্য সেতু, হিটলার ও মুসোলিনী, ব্রিগেড জেনারেল হের রোথেমের সহিত রাজনৈতিক আলোচনারত হিটলার, সিনিয়ার মুসোলিনী, ট্রট্স্কী।

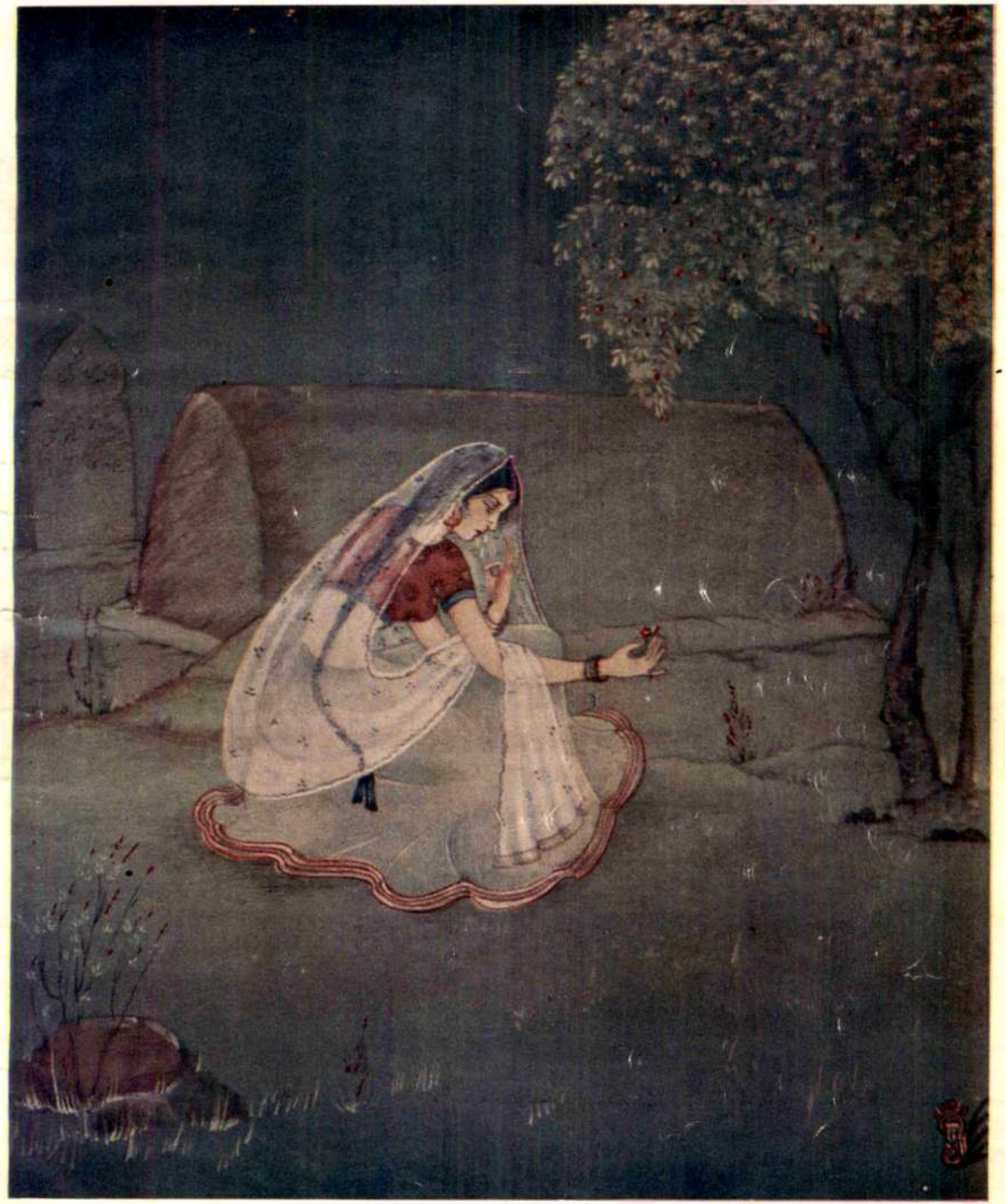

বিদায় অশ্রু

শিল্পী—শ্রীনিশানাথ মজুমদার

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

বঙ্গলক্ষ্মী

পৌষ—১৩৪৮।

৯ম বর্ষ—২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা

C
CE
LIB
UNIVERSI

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

ভারতের বর্ত্তমান কর্ম্মোদ্যম ও উহার ত্রুটি বিচ্যুতি

বিষয়টি আলোচনার পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, বর্ত্তমান নিবন্ধে ভারতের জনসাধারণের কর্ম্মোদ্যমের প্রসঙ্গে আমরা উহার উপরে কোনরূপ সামাজিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অর্থ প্রয়োগ করিতে চাহিতেছি না। আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য ভারতীয়-জনসাধারণের বর্ত্তমান রাজনীতিক কর্ম্মধারার বিচার ও বিশ্লেষণ করা। এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে জাতির এরূপ একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থা বিষদ পর্য্যালোচনা করিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগের সম্যক বুঝিতে হইবে যে, জনসাধারণের পক্ষে এই কর্ম্মোদ্যমের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, এবং দ্বিতীয়তঃ, ভারতের বর্ত্তমান প্রচলিত বিভিন্ন কর্ম্মধারার মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কোথায় এবং থাকিলে সে পার্থক্য কতটুকু?

ভারতীয় কর্ম্মোদ্যমের আদর্শ

প্রথমতঃ ইহার আদর্শ সম্বন্ধেই আলোচনা করা সঙ্গত। সকলেই অবগত আছেন—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ক দেশের সর্ব্ববিধ কর্ম্মোদ্যম বা কর্ম্মোদ্যোগের পরিচালনা করিয়া থাকেন দেশের সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি। এই সব প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ আদর্শও যেমন স্বতন্ত্র কর্ম্মপন্থাও সেরূপ বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন, শ্রেণী ও জাতি নির্ব্বিশেষে ইহাদের সকলেরই সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধানতম কর্ত্তব্য দেশের সর্ব্ববিধ দুঃখ ও অশান্তি মোচন করা। নতুবা প্রতিষ্ঠানগুলি যতই কার্য্যতৎপর হউক না কেন, ইহারা কিছুতেই জাতির বা জনগণের কল্যাণকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তবে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, জনহিতকর কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এমন কতকগুলি বিধিনিয়ম গঠন করা একান্ত কর্ত্তব্য, যেন পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মীগণ কোন্ ব্যাপারে কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, সে বিষয়ে অবহিত ও সচেতন হইতে পারে।

সাধারণ প্রতিষ্ঠান মাত্রেই সর্ব্বাবস্থায় কি ভাবে কাজ করিবে এবং কোন ভাবে কাজ করিবে না তাহা নির্ভর করে দেশের ও দেশবাসীর বর্ত্তমান অবস্থার উপরে। বস্তুতঃ এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই কর্ম্মীকে পদক্ষেপ করিতে হইবে। অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিবার অর্থ কি তাহা পাঠকের নিকট দুইটী ভিন্ন ভিন্ন দেশের অবস্থা উল্লেখ করিয়া আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছি। মনে করুন, কোন একটী দেশের কৃষি ও শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি এত প্রচুর ও ফলপ্রসু যে উপযুক্ত অনুশীলন হইলে উহা অত্যল্পকাল মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের অন্নাভাব বিদূরিত করিয়া সমগ্র মানব জাতির দুঃখ ও দুরবস্থার অবসান করিতে পারে। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে সেই দেশের যাহারা ভাগ্যবিধাতা, তাহারা বিদেশী ও অকর্ম্মণ্য হইয়াও স্বকীয় ক্ষমতা ও চালাকির জোরে যে উচ্চপদলাভে সমর্থ হইয়াছেন, সেই পদগর্ব্বেই তাহারা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ শাসকের কর্ত্তব্য হিসাবে এই শাসিত দেশের উক্ত অতুলনীয়

উৎপাদিকা শক্তি কাজে লাগাইবার বিন্দুমাত্র শক্তিও তাহাদের নাই। দুর্ভাগ্যের ইহাই শেষ নহে—আরও আছে। এই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন তাহারা বুদ্ধিজীবি বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু 'বুদ্ধি' যে কাহাকে বলে সেই সম্বন্ধেই তাহাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান বা ধারণাও নাই। ফলে এই দেশটীকে ক্রমেই সর্ব্বনাশের পথে আগাইয়া দিতেছে, অথচ বুঝিতে পারিতেছে না যে দেশ কতদুব সেই অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই দেশের চিত্রের পার্শ্বে-ই অন্যান্য দেশের চিত্রও স্মরণ করুন। সৃষ্টিকর্ত্তা এই সব দেশকেও ভূমি ও তাহার উৎপাদিকাশক্তি সম্বন্ধে বঞ্চিত করেন নাই বটে, কিন্তু এই অবদান এত পরিমিত ও অল্প যে উহা তাহাদের স্বদেশবাসীর অভাব দুব করিয়া এমন কিছু শস্য উদ্বৃত্ত করিতে পারে না যাহাতে জগতেব অন্যকোন দেশের অভাব মিটাইতে বিন্দুমাত্রও উহা সমর্থ! অতএব বলা বাহুল্য যে, যে প্রথমোক্ত (দেশ, যাহার অপরিমিত সমৃদ্ধশালিতা বিদ্যমান রহিয়াছে, আর দ্বিতীয়োক্ত দেশগুলি, যাহাদের. উৎপাদিকা শক্তি নিতান্তই স্বল্প) এই দুইএর প্রাকৃতিক সংস্থানই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আর এই বিভিন্নতার জন্যই প্রথমোক্ত দেশেব পক্ষে যে কার্য্য বাঞ্ছনীয়, অন্যান্য দেশের পক্ষে সেই কার্য্যই নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে যে দেশ স্বীয় অধঃপতন প্রতিরোধ করিয়া আত্মোন্নতি সম্বন্ধে প্রযত্ন সেই দেশ এবং ক্রমপতনোন্মুখ অবস্থায় সবেমাত্র সচেতন দেশ এতদুভয়ের কর্ম্মধারাও স্বতন্ত্র হওয়াই একান্ত বিধেয়। এই পার্থক্য উপলব্ধি যিনি করিতে সক্ষম তিনিই প্রকৃত চিন্তাশীল ও তত্ত্বজ্ঞ, আর যে পর্য্যন্ত উহা উপলব্ধি না হইবে, সমস্ত কার্য্যধারাই যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদেব উপরোক্ত পর্য্যবেক্ষণ অনুযায়ী আমরা একমাত্র ভারতবর্ষকেই কি কৃষি কি শিল্পে পূর্ব্ববর্ণিত প্রথম শ্রেণীর অপরিমিত সমৃদ্ধিশালী দেশরূপে পরিগণনা করি। বস্তুতঃ ভারতের উৎপাদিকাশক্তি এত বিরাট ও বিপুল যে এ বিষয়ে ইহার সহিত অন্য কোন দেশেরই কোনরূপ তুলনা চলিতে পাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্ত্তমানে এই বিপুল শক্তির যথোপযুক্ত অভিব্যক্তি ও ক্রমবৃদ্ধি হওয়া দূবে থাক্, ভারতীয় কৃষিশিল্প অনভিজ্ঞ বৃটিশ ও ভারতীয় শাসন পরিচালকবর্গের হস্তে ইহার ক্রমাবনতিই সাধিত হইতেছে। অথচ আমরা স্থির জানি অ'র নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করিলে দেখাও যাইবে যে, পৃথিবীর সকল দেশের উৎপাদনী শক্তির তুলনায়, ভারতের পরেও উৎপাদনে যে দেশ সমৃদ্ধতম উহারও উৎপাদন ক্ষমতা ভারতের উৎপাদনশক্তির দশমাংসেরও সমান নয়। সুতবাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অধুনা যে বিশ্বব্যাপী করাল অন্নাভাব উদ্ভব হইয়াছে তাহাব প্রতীকার একমাত্র ভাবতই কবিতে পারে অন্য কোন দেশ পারে না। তাই সেই গুরুভার ভারত স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া যদি নিশ্চেষ্ট থাকে অথবা অন্য কোন অক্ষম দেশের দুর্ব্বল স্কন্ধে (কারণ তাহারা নিজের অভাব ভিন্ন অন্য কাহারও অভাব পূর্ণ করিতে পারে না) ন্যস্ত করিতে চায় তবে, ভারতের যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এরূপ অপরাধ আমরা পাপ ভিন্ন অন্য কোন সংজ্ঞায়ই অভিহিত করিব না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক সংস্থানের স্বল্পতা হেতু ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশের পক্ষেই নিজেদের (নিজ দেশের) স্বার্থ চিন্তা ভিন্ন পরের জন্য বিচলিত হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়।

তাই বলিতে হয় যে, ভারতীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বতন্ত্র আদর্শ থাকা কর্ত্তব্য এবং তাহারা যদি ভিন্ন দেশের আদর্শ অনুকরণ করে তবে তাহারা নিতান্তই ভুল করিবে। অন্যান্য দেশ যেমন নিজ নিজ স্বার্থ ভিন্ন অপর কোন চিন্তাই করিতে পারে না, ভারতেব সেরূপ অবস্থা নয়, সমগ্র মানবজাতিব সেবাকার্য্যে ভাবতকে অগ্রসর হইতে হইবে। সুতবাং এাকর্য্য একা যেরূপ ভারতের, কর্ম্মপন্থাও সেরূপ ভাবতের অবস্থানুযায়ী একমেব দ্বিতীয়ম করিয়াই গঠন করিতে হইবে। কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, ভারত এতাবৎ স্বকীয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আদর্শের বিচ্যুতি ঘটাইয়া মোহান্ধের মত কেবল পরের অনুকরণ করিয়াই আসিয়াছে। এই জন্যই ভারতের অনুষ্ঠিত কার্য্য অদ্যবধি কেবল ব্যর্থতায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্য তাহা রক্ষা করিবার সময় আসিয়াছে।

নিম্নে আমরা সেই ব্যর্থতার কাহিনী লিপিবদ্ধ কবিতেছি। এই কাহিনীতে ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধেও অনেকখানি আভাস সূচিত হইবে।

প্রথমেই দেখি ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব গ্রহণে

অসমর্থ হইয়া হতভাগ্য ভারতবাসীর প্রতীচীর ভ্রান্ত কৃষিকার্য্যের অনুকৃতিতেই এই ব্যর্থতার প্রথম সূত্রপাত।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, আমাদের বেদ, উপনিষৎ এবং অন্যান্য দর্শনসমূহে শারীরিক গঠনানুযায়ী মৃত্তিকার বিভিন্ন গঠনতত্ত্বসমূহ সুনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, পূর্ব্বকালে এই বেদ নির্দ্দিষ্ট কৃষিবিজ্ঞান অনুসারে প্রধানতঃ ভারতের কৃষিকার্য্য অনুশীলিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ মৃত্তিকার বহুবিধ কৃত্রিম পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়ায় পূর্ব্বের সেই কৃষি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও কাঙ্খিত ফলাফল সম্ভব হয় না। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় উপযুক্ত ফললাভ করিতে হইলে প্রথমেই ভূমির কৃত্রিমতা বিদূরীত করিয়া উহার প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরুজ্জীবিত করা একান্ত আবশ্যক হইবে। অন্যথা অভিলাসিত সাফল্যের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত।

বস্তুতঃ সত্যিকার কৃষিবিজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝায় তাহা একমাত্র ভারতেই বিদ্যমান। অন্যান্য দেশের কৃষির উৎকর্ষের জন্য যাহা অবলম্বিত বা অনুসৃত হয় তাহা উৎকৃষ্ট কৃষিকার্য্য ও কৃষি প্রক্রিয়া বলিয়া সাধারণের নিকট গণ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহাকে সুসম্পূর্ণ বিজ্ঞান নামে কখনও অভিহিত করা চলে না। যথোপযুক্ত তাপ, আলো ও জলের সাহায্যে নরদেহে যে তত্ত্বানুসারে রোমরাজির জন্ম, ভারতের কৃষিবিজ্ঞানও অনুরূপ শরীরের সেই তত্ত্বানুযায়ী গঠিত। এই প্রাকৃতিক তত্ত্ব উপলব্ধি হইলেই দেখা যাইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন জমিতে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের উৎপাদন এবং একই শস্যের ভিন্নরূপ ফলপ্রসূতা খুবই সম্ভব। সর্ব্বাগ্রে কি উপায়ে এই প্রাকৃতিক তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের তাহাই দেখা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে!

ব্যর্থতার **দ্বিতীয় কারণ** শিল্প বাণিজ্য, অর্থনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের প্রামাণ্য তথ্যবিজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া ভারত কর্ত্তৃক পাশ্চাত্ত্যের অপরিণত ও ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ। প্রকৃত ভারতীয় ব্যাখ্যানুসারে শিল্প-বাণিজ্যাদি উপরোক্ত বিষয় সমূহের মূলতত্ত্ব এই যে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে শ্রমজীবিগণের জন্যই বুদ্ধিজীবিগণ কাজ করিবেন, এবং সেই জন্যই তাহাদের জীবনধারণের সার্থকতা, পরন্তু কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে অর্থনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, উহার মূলতত্ত্ব হইতেছে এই যে, বুদ্ধিজীবিগণের জন্য আত্মোৎসর্গই শ্রমজীবিদের জীবনধারণের একমাত্র উপযোগিতা, ভারতীয় ঋষিগণকৃত শিল্প ও বাণিজ্যপ্রথা এমন মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল যে উৎপাদনের ও উৎপাদিত দ্রব্যাদির সুনিয়ন্ত্রিত বণ্টনের ফলে মানবের অকল্যাণকর কোন বস্তুর প্রচলনই কখনও সম্ভব ছিল না। এই সঙ্গে সর্ব্বশ্রেণীর শ্রমজীবিদের মধ্যে সকল প্রকার উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য-বণ্টণের ব্যবস্থাও ভারতীয় ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণকর বস্তু, বড় একটা প্রস্তুতই হয় না; তদ্ভিন্ন প্রায় প্রত্যেক উৎপাদনই অন্ততঃ শতকরা ৯৫ পার্সেণ্ট এত মহার্ঘ যে, সাধারণ শ্রমিকের পক্ষে উহা ক্রয় করা সবিশেষ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

ব্যর্থতার **তৃতীয় কারণ** হইল এই যে, মোহবশতঃ, প্রাচীন ভারতের সত্যকার রাষ্ট্রনীতি অবহেলা করিয়া ভারতবাসী অধুনা পাশ্চাত্ত্যের ভ্রান্ত ও সংকীর্ণ রাজনীতিকেই গ্রহণ করিয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রনীতিতে অন্যায় ও দুর্নীতির বিন্দুমাত্রও প্রবেশাধিকার ছিল না। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ উক্ত নীতি সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দৈহিক তৎপরতা লাভ করতঃ পাপপ্রবৃত্তিকে সর্ব্বথা সংযত করিয়া রাগ-দ্বেষ বিমুক্ত হইয়া যাঁহারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে মানবকল্যাণের ব্রত পালন করিতে পারিবেন, একমাত্র তাঁহারাই দেশের আইনপ্রণয়ন ও শাসন-পরিচালনার অধিকার লাভ করিবেন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্ত্যের রাজনীতি—যাহাদের অধিকাংশই কপট, চরিত্রহীন, ঈশ্বর অবিশ্বাসী; শ্রমবিমুখ, অনভিজ্ঞ, স্বার্থপর, মৎলববাজ ও প্রবৃত্তির দাস,—সেইসব দুরাত্মাদের জন্যই পরিষদে অবাধ প্রবেশলাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে এবং ইহারাই আবার আজ শাসক ও আইনকর্ত্তা!

ব্যর্থতার **চতুর্থ কারণ** ভারতের উপযুক্ত শিক্ষালাভে বিমুখতা এবং প্রতীচীর ভ্রান্ত দুষ্ট শিক্ষাগ্রহণ। ভারতের শিক্ষার জন্য ভারতীয় ঋষিগণ যে শিক্ষার সন্ধান দিয়াছেন, উহা সকলের পক্ষেই কিছু সুগম নহে; তৎকালীন শিক্ষার্থীগণকে এ জন্য বিশেষ অনুশীলন করিতে হইত। এ জন্য সর্ব্বপ্রথম শিক্ষার্থীকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইত, দেহ, মন ও

বুদ্ধির বিশিষ্ট অনুষ্ঠানাবলী এবং উহাদের সত্যকার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে হইত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিকাশ ও অভিব্যক্তি এবং দেহ, মন ও বুদ্ধি এই তিনের পারস্পরিক সম্বন্ধ। এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান-অর্জ্জনে সমর্থ হইলেই শিক্ষার্থী অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন যে, পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত দেহ ও মনের উদ্দেশ্য বাসনা তৃপ্তি নহে, উহাদের মূল উদ্দেশ্য সুসঙ্গতরূপে নিজেদের গঠন ও বিকাশকে অব্যাহত রাখা। মানুষের বাসনা অসীম; যতই ইহাদের প্রশ্রয় দেওয়া যায়, ততই অসংযমের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া অনিষ্টকে অনিবার্য্য করিয়া তুলে। শিক্ষার্থী যদি 'দেহ ও মনের' এবম্বিধ অনুষ্ঠান ও সম্পর্ক, সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করিতে পারেন তবে তাঁহার পক্ষে 'বুদ্ধির' অনুষ্ঠান এবং দেহ মনের সহিত উহার সম্পর্ক উপলব্ধি করাও বিশেষ দুঃসাধ্য হইত না।

অতঃপরে শিক্ষার্থীকে প্রত্যেকটি জড় বস্তুর রাগ ও প্রয়োগের কার্য্যকারণ, সম্বন্ধে বিচার করিতে হইত। এই বিচারের ফলে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, মন, ও বুদ্ধির অটুট পরিপূর্ণতা লাভ করিত। অপরদিকে, ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির এই আদর্শের তুলনায় বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোচনা করা যাক; দেখা যাইবে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার নামে যাহা প্রচার হয়, উহার মূল প্রয়োগ হইল মিথ্যাভাষণে, অসত্য চিন্তায় এবং হীন কপটতা আচরণে। অবশ্য সত্য গোপন না করিলে এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, কিছু পরিমাণে অসত্যাচরণ ভিন্ন বর্ত্তমান জগতে বাস করা অসম্ভব কিন্তু তথাপি মনে রাখিতে হইবে, সেই অসত্যাচরণ পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিতের আচরিত অসত্যের ন্যায় কখনই অপরিমিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষায় শিক্ষার্থীর দেহ-মন-বুদ্ধিও পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না,কেননা মন ও বুদ্ধির অভিব্যক্তি ভিন্ন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা—কেবল দেহের বিকাশকেই সত্যকার বিকাশ বা অভিব্যক্তিরূপে গণ্য করিয়াছে। সত্য বটে, আধুনিক শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীগণ আধুনিক শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির গতিধারার একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে; কিন্তু যথার্থই বর্ত্তমানের এই শিল্প-বাণিজ্য-প্রথা মানবের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যানকর কি না, সে বিষয়ে অনুসন্ধান স্পৃহা আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে জাগায় কই?

আধুনিক শিক্ষার জঘণ্যতম কলঙ্ক হইল এই যে, যে বাসনা সামান্য ইন্ধন পাইলেই মানুষের দেহ-মন-বুদ্ধিকে সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া দেয়, আধুনিক শিক্ষা সেই বাসনার পরিতৃপ্তির স্পৃহাকেই সঞ্জীবিত করিয়া তুলে। ফলে স্বতই জাতির বুদ্ধিজীবি শ্রেণী নির্বুদ্ধি গড্ডালিকা প্রবাহে পরিণত হইতেছে।

সর্ব্বশেষে, ব্যর্থতার **পঞ্চম কারণ** এই যে, ভারতবাসী আজ ভারতীয় কর্ম্মযোগকে (service) উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্ত্যের কর্ম্মবৃত্তিকেই বরণ করিয়া লইয়াছে। ভারতীয় ঋষিগণ কৃত ভারতীয় কর্ম্মযোগের নির্দ্দেশ হইল এই যে, সমাজের প্রতিসভ্যকেই সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়া স্ব স্ব জীবিকা আহরণ করিয়া লইতে হইবে, কিন্তু বেতনভুক হইয়া নহে। সমাজের সকল সভ্য নিঃস্বার্থভাবে পরস্পরের সেবা করিতে সযত্ন থাকিবেন; কিন্তু সেবার ধারা এমন হইবে যাহাতে, প্রত্যেক সেবাপ্রাপ্ত সভ্য, সেই প্রাপ্তসেবার বিনিময়ে কিছু দান করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারেন। সমাজসভ্যগণের মধ্যে এই যে, পারস্পারিক নিঃস্বার্থ সেবা গ্রহণ এবং বিনিময়-দান, এই প্রথাতেই ভারতীয় ঋষিগণ ভারতীয় অর্থনীতির মূলসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্ত্যের কর্ম্মযোগের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সেখানে সর্ব্বতোভাবে দাস মনোবৃত্তি কলঙ্কিত প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ ও বেতন গ্রহণকেই কেবল প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই হীন দাস মনোবৃত্তির জন্যই আজ পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন জগৎ এক বিরাট দাস প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, অথচ মজার বিষয় এই যে, তথাকথিত দাস-প্রথার উচ্ছেদ করিয়াছে বলিয়া ইংলণ্ড নাকি সর্ব্বদাই গর্ব্বে উৎফুল্ল হয়!

আজ হইতে নয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস যদি বিস্তারিতভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তবে অবশ্যই দেখা যাইবে যে, এমন একদিন ছিল, যেদিন ভারতের কৃষিবিজ্ঞান, ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য, ভারতের পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন, ভারতের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও অর্থনীতি, ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ও কর্ম্মযোগ জগতের বরেণ্য হইয়া সমগ্র মানব জাতিকে সর্ব্বদুঃখ হইতে বিমুক্ত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। সেদিন,—ভারতীয় প্রতি জিনিষটি, প্রত্যেক অনুষ্ঠানই পৃথিবীর সর্ব্বত্র অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ও অভিবাদন লাভ করিত, আর সে

বিষয়ে ভারতীয় অ-ভারতীয় কাহারও মধ্যেই মতের কোন অনৈক্য ছিল না। সেদিন,—সর্ব্বজগতের দুঃখমোচন করিয়া ভারতীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী অবিমিশ্র সার্ব্বজনীন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তারপর কালক্রমে দুঃখ না পাওয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক এই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আর তত প্রবলভাবে অনুভূত হয় নাই, ফলে ক্রমে ক্রমে এই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিস্মৃত ও অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক সংস্থানের বহু পরিবর্ত্তন হেতু আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে দুঃখ ও দুর্দ্দশার প্রলয় ঘণীভূত হইয়াছে, সেই প্রলয়কে প্রশমিত করিবার জন্য পুনরায় প্রাচীন ভারতের সেই বিজ্ঞানের অনুশীলন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগৎ আজও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রকৃত সন্ধান পায় নাই, তাই এতাবৎ তাহারা শুধু অন্ধকারেই ইতস্ততঃ ঢিল ছুড়িয়া বেড়াইতেছে। কারণ পাশ্চাত্ত্য যে বিজ্ঞানের সাধনা করা হয়, সে বিজ্ঞান বিশুদ্ধও নহে কলঙ্কমুক্তও নহে।

বস্তুতঃ, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের এই অশুদ্ধি ও কলঙ্ক মানুষের অর্থ নৈতিক, নৈতিক, দৈহিক এবং সামাজিক জীবনের ধারাকে নিরন্তর বিপথেই চালিত করিতেছে, ঘরে ঘরে দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যের বীজ বপন করিতেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন কেবল বর্দ্ধিত করিয়াই যাইতেছে।

ভারতীয় জনসাধারণ যদি এক্ষণে তাহাদের সত্যকার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে যথার্থই উৎসুক হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও স্বদেশিকতা ত্যাগ করিয়া সমগ্র মানবজাতির জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এবং ভারতের সাধারণ লৌকিক প্রতিষ্ঠানগুলিও যদি এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অচিরেই সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ দূরীভূত হইয়া তাহাদের আশার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূরণ হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের কোন প্রতিষ্ঠানই উক্ত আদর্শ গ্রাহ্য করে না বলিয়াই ভারতের এরূপ প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই ভ্রান্তিপূর্ণ; তাই আমরা বলিয়াছি যে, এইসব প্রতিষ্ঠান মানুষের এতটুকু কল্যাণ সাধন না করিলে কেবলমানুষের অহিতের বোঝাকেই দুঃসহ করিয়া তুলে। সময় থাকিতে মনে রাখিবেন যে, মানব ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ধারণা করিতে পারিলে, জগতের হিত সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম হইলে এবং নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী কাজ সম্পন্ন হইলে ভারত যে আবার জগতের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভবিষ্যতের সত্যকার স্বরূপ

নরওয়েজান ষ্টোরটিংএর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ হ্যামব্রো সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধাবসানে ভবিষ্যতের শান্তি-সন্ধির পরিকল্পনার ভার পেশাদারী রাষ্ট্রনীতিকদের হস্তে অর্পণ না করিয়া সে ভার শিল্প-শ্রমিকসহ সমগ্র জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। সহযোগী ষ্টেটস্‌ম্যান মিঃ হ্যামব্রোর এই উক্তির আলোচনা করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলিয়াছেন,—বিগত ১৯১৪—১৮ সালেও মিত্রশক্তির রাজনীতিকগন ঈদৃশ মনোভাবই পোষণ করিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার ফল বিশেষ শুভ হয় নাই। উক্ত মন্তব্যেই সহযোগী ফ্রান্সের স্কন্ধে সংঘটিত সমুদয় বিপদের দায়িত্ব চাপাইয়া দিবার অদ্ভুত উৎসাহও বৃটীশ রাজনীতিকদের প্রদান করিয়াছেন; এবং মূলতঃ এই আশাই পোষণ করিয়াছেন যে, অতঃপরে বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার হস্তেই প্রশস্ততর সুব্যবস্থা ঘটিবে।

সহযোগীর ন্যায় আমরাও নিয়ত এই প্রত্যাশাই করি যে, বৃটেন ফ্রান্সের দুরদৃষ্টে যাহা হারাইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার সহায়তায় সেই হৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার করিবে। কিন্তু একমাত্র প্রত্যাশাই 'বঙ্গশ্রী'র কাছে বড় কথা নহে; এই প্রত্যাশার মূলে সম্ভাব্যতা আছে কতখানি সে বিচারের দায়িত্বও আমাদেরই। এই দায়িত্বের জন্যই আমাদিগকে নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে, এইবারেও বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতের সত্যকার স্বরূপ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবেন কি না। এখানে পাঠকগণের সম্যক্ অবগতির জন্য, "ভবিষ্যতের সত্যকার স্বরূপ"—এই কথাটির সুস্পষ্ট অর্থ ব্যক্ত করা উচিত। ইহার অর্থ—মানবজাতির সার্ব্বজনীন সমস্যাবলীর সর্ব্বাঙ্গীন ত্রুটিহীন মীমাংসা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সমস্যাগুলি কি? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গশ্রীতে বহুবার আলোচনা করিয়াছি, পুনর্ব্বার সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হইব না। সমস্যাগুলি প্রধানতঃ এই:—(ক) নিরীহ জনসাধারণ যেন ক্রমাগত দুঃখের

পর দুঃখের, অত্যাচারের পর অত্যাচারের পদভারে নিষ্পেষিত না হয়; (খ) এই যুদ্ধের পর ভবিষ্যতে অন্য কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইবার আশঙ্কা যেন মানবজাতির না থাকে। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতের যুদ্ধ যদি হয়, তবে ইহাপেক্ষাও ভয়ঙ্করতর হইবে; (গ) অর্থনীতি এবং বণ্টননীতির পূর্ব্বতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করতঃ এমনভাবে উহাদের সংস্কৃত করিতে হইবে যে, যেন উক্ত সংস্কৃত ব্যবস্থার ফলে জগৎবাসী একটি লোকও ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বস্তু লাভে এতটুকু বঞ্চিত না হয়। শুধু তাহাই নহে, তদুপরি যোগ্যব্যক্তি স্বকীয় যোগ্যতার পুরস্কারও যেন অর্জ্জন করিতে পাবে; (ঘ) ভবিষ্যতে মানবমণ্ডলী যাহাতে রোগাদির অনিশ্চিত ভয়াবহতা হইতে বিমুক্ত হইয়া সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পাবে, স্বাস্থ্যবিধির সেরূপ সংস্কার সাধন করিতে হইবে; (ঙ) কুশিক্ষার ফলে কোনক্রমেই জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, অসন্তুষ্টি ও অনৈক্যের করাল ছায়া যেন ঘনীভূত হইতে না পারে।

একদিকে দুর্ভাগ্যনিপিড়িত সমগ্র মানবজাতির এই সমস্যাবলী, অন্যদিকে জগতের একমাত্র কর্ণধার বৃটীশ কর্তৃপক্ষের বর্ত্তমান কার্য্য-কলাপ, এই দুইদিক পাশাপাশি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, গত মহাযুদ্ধের পরেও বৃটেন যেমন জগৎসমস্যার সমাধানে কৃতকার্য্য হয় নাই, এই যুদ্ধজয়ের পরেও সে কার্য্যে সেই পরিমাণেই ব্যর্থকাম হইবে। কারণ, বৃটীশ রাষ্ট্রভাগ্যবিধাতাগণ এপর্য্যন্ত বিগত যুদ্ধ-কালীন ভ্রান্ত শিক্ষা ও নীতির উপযুক্ত পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করতঃ জগতের সম্পূর্ণ আস্থা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। গতযুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভই ছিল তাঁহাদের অধিনায়কত্বের প্রথম উদ্দেশ্য; পরবর্ত্তী উদ্দেশ্য ছিল, ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা পৃথিবী হইতে চিরতরে লুপ্ত করিবার প্রতিকার প্রণয়ন। সংগ্রামে তাঁহারা সহায়তা পাইয়াছিলেন বিরাট, এবং যুদ্ধের বিজয়মাল্যের অধিকারীও তাঁহারই হইয়াছিলেন; কিন্তু সংগ্রামের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রতিপালিত হইয়াছিল কি? ভুক্তভোগী জাতি মাত্রই জানে যে এতটুকুও নহে। কালক্রমে আবার হতভাগ্য মানবজাতি যুদ্ধকবলিত হইয়াছে, কিন্তু এ যুদ্ধ পূর্ব্বের যুদ্ধের চেয়েও অধিকতর ভয়ঙ্কর, করাল ও অধিকতর নরঘাতক, অবশ্য বৃটেন এযুদ্ধেও পূর্ব্বের মতই দুষ্টের দমনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে—কিন্তু সংগ্রামের রীতি সেই পুরাতনেরই আশাহীন পুনরাবৃত্তি। অধিকন্তু মনে হইতেছে, অধুনা বৃটেনের সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য সংঘর্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করা, পরে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় শুভ পরিণতি ঘটিলে তবে সে মানব কল্যাণে সচেষ্ট হইতে পারিবে, —নচেৎ নহে।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য, বৃটীশ রাজনীতিকগণ যদি পূর্ব্বযুদ্ধেই তাঁহাদের স্বকৃত ভ্রান্তি অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন, তবে আজ কেন তাঁহারা তাহা সংশোধন না করিয়া সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন? যেই নীতির ফলে একদা তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছিল, সেই নীতির দ্বারাই তাঁহারা পুনরায় বিন্দুমাত্র সাফল্যের আশা করেন কি প্রকারে? এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে স্বতই আবার কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়,—সংঘর্ষের উৎস কোথায়? এবং বর্ত্তমান বিশ্ব-সংঘর্ষের মীমাংসাকল্পে শক্তিমান বৃটেনের ধুরন্ধর রাজনীতিকদের গৃহীত পন্থা প্রকৃত ফলপ্রদ কি না; না হইলে অটুট ও অবিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাঁহারা কোন্ নীতি অবলম্বন করিবেন?

আমরা একে একে উক্ত সমুদয় প্রশ্নেরই মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ, সাধারণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টি দিয়াই সংঘর্ষের উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একটি রজ্জুজাতীয় বস্তুকে দুই দিক হইতে ক্রমাগত আকর্ষণ করিলে বস্তুটির মধ্যবর্ত্তী উপাদানের সম্প্রসারণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এক সময় রজ্জুটি ছিন্ন হয়। এইরূপ কোন কঠিন পদার্থের সহিত অন্য এক কঠিন পদার্থের ক্রমাগত ঘর্ষণে উহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উজ্জীবিত হইয়া বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে। মানবজাতির পারস্পরিক বিরোধের কারণও অনেকটা এই ছিন্ন রজ্জু ও উজ্জীবিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গেরই সমধর্ম্মী। স্বার্থের সহিত স্বার্থের সংঘর্ষ, একই কাঙ্খিত বস্তুর জন্য সকল দিক হইতে সমান টানা-হেঁচড়া বা আকর্ষণ, এই সংঘর্ষ ও আকর্ষণ হইতেই মানব-বিরোধের প্রথম সূত্রপাত। সামান্য অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মানুষের সাধারণ কাঙ্খিত বস্তু হইল, অন্ন। হয়তো অন্যান্য আকাঙ্খায় মানুষের মধ্যে রুচির পার্থক্য আছে,

কিন্তু অন্নের আকাঙ্খায় মানুষ চিরকাল একরুচি, একমত। এই অন্নের অভাব ঘটিলেই স্বভাবতই সকল দিক হইতে আকর্ষণ প্রবল হইতে হইতে এক সার্ব্বজনীন সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এদিকে আন্তর্জ্জাতিক কমিশন আবার বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে সমুদয় উৎপন্ন খাদ্য উহার জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৪০ জনের উপযোগী। কাজেই যে খাদ্য ৪০ জনের, সে খাদ্য যদি ১০০ জন টানাটানি করে, তবে সংঘর্ষ তো অবশ্যম্ভাবী।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, এই টানাটানি, এই সংঘর্ষ ইহাদের প্রকৃত স্বরূপটি আধুনিক যুগের শিক্ষা ও বিজ্ঞান-এর চোখে আজও পর্য্যন্ত ধরা পড়িল না। এই কারণেই আধুনিক, তথাকথিত শিক্ষা-বিজ্ঞান, সর্ব্বজাগতিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া সংকীর্ণ স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। তাই আজিকার শিক্ষা—জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় রাজনীতি, জাতীয় স্বাস্থ্য প্রভৃতি সংকীর্ণ সংজ্ঞায় কলঙ্কিত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, এই সংকীর্ণ শিক্ষার জন্যই দিকে দিকে আজ সার্ব্বভৌমত্বের এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের তৃষ্ণা এতটা প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যদিকে সার্ব্বজনীন অন্নের সমস্যা তো আছেই। ফলে এই দুই বস্তুর সংঘর্ষণে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—পরে ইন্ধনপ্রাপ্ত এক বিরাট দাবানল সঞ্জীবিত হয়। আমাদের এই উপমা পাঠকগণের সম্যক বোধগম্য হইলে তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, অব্যাহত মানবীয় অস্তিত্বলাভের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে এই আকর্ষণ ও সংঘর্ষ হইতে বিমুক্ত হইতে হইবে; নতুবা কালক্রমে, সর্ব্বধ্বংসী দাবানল আমাদের সকলকেই ভস্মীভূত করিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সংগ্রামের কারণ দুইটি—প্রথম, প্রয়োজনীয় খাদ্যের ক্রমাভাব, দ্বিতীয়, শুভজীবনের প্রতিবন্ধক আমাদের ভ্রান্তশিক্ষা।

এখন দেখা যাউক, প্রবল বৃটীশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতাগণের অবলম্বিত সমরনীতি বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের কারণকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইবে কি না। কিছু পূর্ব্বে বর্ত্তমান জগতের পারস্পারিক আকর্ষণ ও সংঘর্ষের চিত্রে আমরা উপরোক্ত প্রশ্নের বিষদ আলোচনা করিয়াছি। এই চিত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, অধুনা কোন সমরনীতিই এই আকর্ষণ ও সংঘর্ষকে প্রশমিত করিবার অনুকূল নহে। অধিকন্তু মনে হয়, বুঝি বা এই যুদ্ধের প্রচণ্ড আকর্ষণে ক্রমে ক্রমে সকল দিক ছিন্ন হইয়া, সঞ্জীবিত দাবানলের শিখা সবকিছুকেই ধ্বংস করিবে। আগুন যতই পরিব্যাপ্ত হইবে, ততই মানবের অকল্যাণ।

অতএব, এই আগুনকে চিরনির্ব্বাপিত করিতে পারিলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। নতুবা বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষ যদি তাঁহাদের ভ্রান্তনীতির সাহায্যেই এই যুদ্ধানলকে সাময়িক ভাবে প্রশমিত করিয়া ভবিষ্যৎ গড়িতে চাহেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সেই ভুয়া ভবিষ্যতের স্বরূপ কখনই মানবের কাঙ্খিত ভবিষ্যতের অনুরূপ হইবে না।

তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রচলিত সমরনীতির দ্বারা সমস্যার সমাধান না হইলে বৃটীশ সার্ব্বভৌমত্বকে অটুট ও অবিচ্ছিন্ন রাখার যে দায়িত্ব,—কৃতজ্ঞ ও অনুগত প্রজা হিসাবে সে দায়িত্ব আমাদেরই। তাই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, কোনক্রমে আমাদিগকে ভুল না বুঝিয়া আমাদের প্রস্তাবের মধ্যে যে পথ প্রকৃষ্টতম তাঁহারা সর্ব্বদা যেন সেই পথেই চলিতে চেষ্টা করেন। অধিকন্তু, 'যুদ্ধই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়'—একথা আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিলে আমরাও কর্ত্তৃপক্ষকে সর্ব্বান্তকরণে অকুণ্ঠ সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিব।

বৃটেনের অখণ্ড সার্ব্বভৌমত্ব লাভের উপায়

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা প্রসঙ্গক্রমে যে বৃটীশ সার্ব্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহাকে নিছক আলঙ্কারিক বাক্য বা অতিশয়োক্তি মনে করিলে ভুল হইবে। আমাদের দৃঢ় ধারণা, যথার্থই, বর্ত্তমান সমস্যার করাল কবল হইতে বিমুক্ত করিয়া মানব সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে স্বয়ং একমাত্র বৃটীশ-সাম্রাজ্যকেই পৃথিবীর সার্ব্বভৌমত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তবে একথাও স্মরণ রাখা উচিত, প্রচলিত ভ্রান্তনীতির দ্বারা উহা কখনই সম্ভব হইবে না। এজন্য সর্ব্বপ্রথমে বৃটীশ রাজনীতিকগণকে বর্ত্তমান পরিস্থিতির নিম্নোক্ত অবশ্যবোধ্য প্রতিপাদ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে:

প্রথমেই দেখা যাউক, বর্ত্তমানের এই যে প্রলয়ঙ্কর সর্ব্ব-

ধ্বংসী সংঘর্ষ, এই সংঘর্ষের মূল কোথায় ? প্রশ্নের উত্তর খুব সুদূর প্রক্ষিপ্ত নহে ; ইতিপূর্ব্বেই বহুবার আমরা এই সমস্যার সম্যক আভাষ প্রদান করিয়াছি। একদিকে খাদ্যাভাব, অন্যদিকে দ্বন্দ্বকলহের প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, এই দুই আত্মঘাতী কারণেই বর্ত্তমান যুদ্ধের উদ্ভব। সুতরাং সমস্যার প্রতিবিধান করিতে হইলে বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষকে এই বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে সচেতন হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, কর্ত্তৃপক্ষের স্মরণ রাখিতে হইবে, যে-যুদ্ধ আজ সমগ্র পৃথিবীকেই গ্রাস করিতে বসিয়াছে, সেই যুদ্ধ মানবীয় স্বার্থের পারস্পারিক যুদ্ধেরই অন্য এক অভিন্ন বৃহত্তর রূপ। অতএব কর্ত্তৃপক্ষ যদি অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে অন্য এক বৃহত্তর অন্যায়কেই প্রশ্রয় দেন, তবে আর প্রার্থিত প্রতিবিধান লাভ সম্ভব হইবে কিরূপে ? বরঞ্চ এই অন্যায়ের ফলে প্রাণ-বিনাশের সংখ্যাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে অন্যায়ের সত্যকার প্রতিকার কি উপায়ে সম্ভব ? পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, মানবীয় স্বার্থের পারস্পারিক বিরোধের মূলেই প্রধানতঃ রহিয়াছে সার্ব্বজনীন খাদ্যাভাব। কাজেই বৃটীশ ভাগ্যবিধাতাগণ যদি তাঁহাদের **তৃতীয় কর্ত্তব্য** হিসাবে সর্ব্বাগ্রে এই খাদ্য সমস্যা মীমাংসা করিতে কৃতযত্ন হন তবেই অন্যায়ের সত্যকার প্রতিকার মিলিবার সম্ভাবনা। কি জার্ম্মান, কি ফরাসী, কি বৃটেন অথবা কি ভারতবাসী জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর প্রত্যেক অধিবাসী যেন তাহার ক্ষুধার ন্যূনতম (minimum) খোরাক লাভে এতটুক বঞ্চিত না হয়।

কিন্তু **চতুর্থ কথা** : স্মরণ রাখিতে হইবে, পৃথিবীব্যাপী এই যে বিপুল খাদ্যাভাব উহা রোধ করিবার জন্য যে উৎপাদন হইবে উহার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে, নচেৎ মাটির স্বভাবজ শক্তি ভিন্ন কৃত্রিম উর্ব্বরতা দ্বারা এই বিপুল উৎপাদন কদাপি সম্ভব হইবে না।

পঞ্চম কথা : খাদ্যোৎপাদনের দায়িত্ব ভারতকেই অর্পণ করিতে হইবে ; কারণ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতের মৃত্তিকাই পূর্ব্ববর্ণিত স্বাভাবিক শক্তির অধিকারী। বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইবে না ; অন্ততঃ, মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও ভারতের সোনার মাটিতে যে উর্ব্বরতা বিদ্যমান ছিল, সেই উর্ব্বরতাটুকুও যদি আজ ভারতের বুকে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয়, তাহা হইলেই ভারত জগতের সকলেরই ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইবে। এজন্য ভারতকে অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না।

ষষ্ঠতঃ, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, সমগ্র জগৎকে খাদ্য পরিবেষণের এই দায়িত্ব অকারণেই ভারত দাবী করে না। ভারতীয় ঋষিগণকৃত জ্যোতিষ ভূ-তত্ত্ব পাঠে আমরা সম্যক্ জানিতে পারি যে, চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে এক বিশিষ্ট দূরত্ব সহ এক বিশিষ্ট কোণে অবস্থিত বলিয়া আমাদের ভারতভূমি এক অন্যাসাধারণ উৎপাদিকাশক্তি অর্জ্জনের যথোপযুক্ত জল ও তাপ আহরণ করে। এই কারণেই ভারতবর্ষে মাত্র সাত বৎসরে যে উৎপাদন হইতে পারে, বহির্জ্জগতের সর্ব্বত্র সেই উৎপাদন ৭০ বৎসরেও সম্ভব নয়। এই কারণেই, একমাত্র ভারতবর্ষই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে মানবের খাদ্যসমস্যার প্রতিবিধান করিতে পারিবে।

উপরোক্ত ষষ্ঠবিধ অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রতিপাদ্যগুলি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইলে তৎপর বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ প্রধান সমস্যাগুলি হাতে লইবার উপযুক্ত হইবেন। প্রচলিত ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ যে পথে তাঁহাদের প্রার্থিত সাফল্য লাভ ঘটিবে সাধ্যমত আমরা সে পথেরও কিছু ইঙ্গিত দিতেছি।

পথের **প্রথম সোপান** 'যুদ্ধ' নামধারী বর্ত্তমানের নারকীয় হত্যাকাণ্ড চিরতরে রহিত করা। সে জন্য হিটলারের হস্তেও যদি পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব ভার তুলিয়া দিবার প্রয়োজন হয়, ন্যায় ও মানবতার জন্য সাময়িক ভাবে যে কর্ত্তৃত্ব হিটলারকেই অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু এই কর্ত্তৃত্ব লাভের সর্ত্ত থাকিবে যে, হিটলার এই সার্ব্বভৌমত্ব লাভের বিনিময়ে পৃথিবীর অপামর প্রত্যেকটি অধিবাসীকে তাহার জন্মগত স্বাধীনতা তিনটি পরিপূর্ণরূপে প্রত্যার্পণ করিবেন। অবশ্য, স্বাধীনতা বলিতে আমরা ইহার উপর কোন রাজনৈতিক অর্থ আরোপ করিতে চাহিতেছি না ; স্বাধীনতা বলিতে আমরা বলিতে চাই মুক্তি,—অভাব ও অনাহার হইতে, কুস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু হইতে, এবং মানসিক অশান্তি হইতে নিরুদ্বেগ নিরবিচ্ছিন্ন অবিমিশ্র মুক্তি। কিন্তু আমরা জানি, হিটলার মানবসমাজকে ঈদৃশ মুক্তিদানে অক্ষম, কেন না সমগ্র জগতের ক্ষুধার নিবৃত্তি

করিবে যে, সেই খাদ্য ভাণ্ডার ভারতবর্ষই হিটলারের অধিকার বহির্ভূত।

পক্ষান্তরে, ভারত বৃটেনের অধিকারভুক্ত। সুতরাং সমাধানের **দ্বিতীয় কর্ত্তব্য** হিসাবে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিবেন যে, হিটলার অপারগ হইল বলিয়া তাঁহারাই সর্ব্বজগতের খাদ্যাদি বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। বলা বাহুল্য, ভারতের সহায়তায় মাত্র সাত বৎসর কালের মধ্যেই তাঁহারা এ কার্য্যে সম্পূর্ণ সফলকাম হইবেন।

তৃতীয়তঃ, বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষকে অনতিবিলম্বেই নারকীয় সমর যাত্রা পরিত্যাগ করতঃ এখন হইতেই গঠনমূলক কার্য্যদ্বারা ভারতের স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, ভারতের স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই যে সকল পূর্ত্ত কার্য্যাদি দেশীয় নদ-নদীধারাসমূহের অবাধগতির বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সব সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, রেলপথ, সুদীর্ঘ রাজপথ, সেতুশ্রেণী এবং আধুনিক সহর ও শৈলাবাস প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

পঞ্চমতঃ, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চতুর্থ কর্ত্তব্যটি সুসম্পন্ন করিতে হইলে উপরোক্ত পূর্ত্ত-অনুষ্ঠান সমুদয়ের পরিচালকবর্গকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান করা একান্ত আবশ্যক। এ জন্য প্রয়োজন মত কিছুকালের জন্য নোট-প্রচলন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ষষ্টতঃ, অল্পকালের জন্য নোটের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইল ভেদনীতির অবসান করিয়া নিখিল ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করা। কেবল তাহাই নহে, কর্ত্তৃত্বে আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করিয়া সখ্যভাবে ভারতীয়দের উত্থাপিত প্রস্তাব-নির্দ্দেশাদিতে কর্ণপাতও করিতে হইবে।

সপ্তমতঃ, ইহার পর আবশ্যক,—চালান, যানবাহনাদির আমূল সংস্কার-সাধন। মনে রাখিতে হইবে,—পৃথিবীর খাদ্য পরিবেশন কার্য্যে এ কাজটিও মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু এ-কার্য্যে প্রচলিত পথ অবলম্বন করিলে কর্ত্তৃপক্ষ কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইবেন না। এ জন্য জলপথের প্রভূত সংস্কার সাধন করিয়া দ্রুতগামী বাষ্পপোত এবং অন্যান্য নৌকাদির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

অষ্টমতঃ; উক্ত মহান কর্ত্তব্য সম্পাদনে দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যের প্রেরণাকেই সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণ করিতে হইবে।

দুলালের-স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

[সাত]

মানুষ যে ভাবে কাজ ক'রবে মনে ক'রে কাজ করে, প্রায়ই দেখা যায় কাজটা ঠিক সেই ভাবে হয় না—ভগবান অন্য রকম বিধান করেন। একটা মোটর দুর্ঘটনায় প্যারীলালের সকল প্ল্যান্ উল্টে গেল। অজ্ঞানাবস্থায় মন্দিরা আনীত হ'ল নারীরক্ষাশ্রম-বাড়ীর সকলের পেছনের ঘরে সকল প্রকার গোলমালের বাইরে এবং তার শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত হ'ল একজন মধ্য বয়স্কা রমণী, নাম কমলা। মন্দিরার মুখখানা দেখেই তার প্রতি কমলার কেমন স্নেহের আকর্ষণ জন্মে গেল। প্যারীলালের ইচ্ছা ছিল না, ডাক্তার এনে লোক-জানাজানি করা হয়, কিন্তু কমলার তাড়নায়, বিশেষতঃ মন্দিরা আশ্রম-বাড়ীতে হঠাৎ মারা গেলে একটা ভয়ানক গোলমালের সৃষ্টি হ'তে পারে আশঙ্কায় প্যারীলাল তা না ক'রে পারলো না। আশ্রমের ডাক্তার ঘটনাচক্রে তখন উপস্থিত ছিলেন না ব'লে, একজন বাইরের ডাক্তারকেই আন্তে হ'ল। তিনি বিশেষ যত্নের সহিত মন্দিরার মাথার আঘাত পরীক্ষা ক'রে ব'ললেন, অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তারপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ও ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থাদি ক'রে, উপদেশ দিয়ে গেলেন রোগীকে খুব সাবধানে রাখবার জন্য।

এক সপ্তাহ কাল মন্দিরার জীবনের আশা ছিল না ব'ললেই হয়। তার পর অবস্থা ক্রমশঃ ভালোর দিকে যেতে থাকে। মা যেমন সন্তানের যত্ন করে, অপরিচিতা কমলা তেমনি বিনিদ্র চক্ষে অক্লান্ত শ্রমের সহিত মন্দিরার যত্ন ও পরিচর্য্যা কচ্ছিল। জ্ঞান লাভ ক'রে মন্দিরা যে দিন প্রথম কথা বল্তে সমর্থ হ'ল, সেই দিন কমলার আনন্দের পরিসীমা ছিল না, বিশেষতঃ মন্দিরা যখন তাকে 'দিদি' ব'লে সম্বোধন করলো।

কমলা এক সময়ে ভদ্র ঘরেরই কুলবধূ ছিল। অল্প বয়সে বিধবা হ'য়ে সে শ্বশুরালয়ের নির্ম্মম শাসনাধীনে ও বৈধব্যের কঠোরতার ভিতরে বাস ক'রতে থাকে। সেখানে এমন একটি প্রাণীও ছিল না যে তাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখে কিম্বা একটু স্নেহের স্বরে ওর সঙ্গে দু'টি কথা বলে। অসহনীয় নির্য্যাতনে নিপীড়িতা হ'য়ে তার জীবন যখন একান্ত দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছিল এবং অন্তরের ভিতরে একটা প্রবল বিদ্রোহ-ভাব পূর্ণতা লাভ ক'রেছিল, সেই অশুভ ক্ষণে প্যারীলাল তার সমক্ষে উপস্থিত হ'ল সকল প্রকার প্রলোভন নিয়ে। রূপ-যৌবনসম্পন্না স্নেহ-কাঙালিনী কমলা ভালো-মন্দ বিচার না ক'রে সেই প্রলোভনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্যারীলালের আসল প্রকৃতিটি তার জানা ছিল না কিন্তু তা জান্তে বেশী দেরীও হ'লনা। দু'টি মাস অতীত না হ'তেই সে বুঝতে পারলো, শ্বশুরালয়ের নির্য্যাতন থেকে তার মুক্তিলাভ হ'য়ে থাকলেও, বুভুক্ষু হৃদয়ের পরিতৃপ্তি কিম্বা দেহ-মনের সুখ-শান্তি কোনটাই তার মিলে নাই। এখন সে অনাদৃতা, উপেক্ষিতা এবং বল্তে গেলে সামান্য পরিচারিকা মাত্র। কমলা বুঝতে পেরেছে, এই পথের যাত্রীর পরিণাম এর চেয়ে ভালো হয় না এবং হ'তেও পারে না। মন্দিরার পবিত্রতা-মাখানো মুখখানা দেখেই সে প্রথমাবধি তার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিল এবং পরে মন্দিরার মুখে তার সমস্ত কাহিনী শুনে তাকে প্যারীলালের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'ল।

কমলা এই আশ্রমের সকল রহস্যই জান্তো এবং নিজের লাঞ্ছিত জীবনের কথা ভেবে অনেক দিন থেকেই প্যারীলালের উপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ প্রতীক্ষা কচ্ছিল। মন্দিরার সম্বন্ধে প্যারীলালের উদ্দেশ্য যে কত জঘন্য এবং সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে না পারলে মন্দিরার যে কি শোচনীয় পরিণাম হবে, তা ভেবে সে শিউরে উঠতো। বিশেষ বিবেচনা ক'রেই সে মন্দিরাকে এখানের সব কথা এখনো খুলে বলে নাই, কারণ ডাক্তারবাবু সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, তার বর্ত্তমান অবস্থায় কোনো প্রকার মানসিক উত্তেজনা হ'লেই তার জীবন বিপন্ন হ'য়ে পড়বে। ডাক্তারের এই উপদেশের বলেই মন্দিরার জ্ঞান হবার পর অবধি এ পর্য্যন্ত প্যারীলালকে তার সম্মুখে আস্তে কমলা বাধা দিয়ে আসচে।

প্যারীলাল প্রায় প্রতিদিনই মন্দিরার খবর নিতে আসে এবং তার কাছে যেতে চায় এবং প্রতিদিনই কমলার কাছ থেকে বাধা পায়। একদিন বেশী পীড়াপীড়ি করলে কমলা তাকে ব'লে,—"জানতাম, পাগলও নিজ স্বার্থটা বেশ বোঝে, কিন্তু আপনার কি ঐটুকু বোঝবারও ক্ষমতা নেই? ডাক্তারবাবু বার বার ব'লে গেচেন, কোনো রকমের উত্তেজনা হ'লেই সে হার্টফেল্ হ'য়ে মারা যাবে। মেয়েটা মারা গেলে আপনারা কোথায় দাঁড়াবেন, সেটাও কি ভাবতে পারেন না?"

"আমি বাঘ না ভাল্লুক যে আমায় দেখলেই তার হার্টফেল্ হ'তে থাকবে?"

"আপনি তার চেয়েও হিংস্র কিনা তা আপনিই সকলের চেয়ে ভালো জানেন।"

"মেয়েটাকে বুঝি এসব তত্ত্ব কথাই শেখাচ্চো?"

"সে রকম সদিচ্ছা থাকলে এই আড্ডা শুদ্ধ আপনাদের সবাইকে অনেক আগেই..."

"তা জানি কমলা। তুমি যে আমার অনিষ্ট করবে না তা জানি ব'লেই সকলের চেয়ে বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারটা তোমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। সে দিন পণ্ডিতজীর সঙ্গে তোমার এই কাজের কথা নিয়ে আলোচনা হ'য়েছিল এবং ঠিক হ'য়েচে, কাজটা ভালোয় ভালোয় হ'য়ে গেলে, তোমায় একটা দামী পুরস্কার দেওয়া হবে।"

মনের ভাব গোপন ক'রে কমলা হাসিমুখে বললো—"আপনাদের দয়াতেই তো বেঁচে আছি; কিন্তু পুরস্কারটা কি হবে জানতে পারি কি?"

"তোমার নিজ পছন্দ-সই কিছু দেওয়া হবে। তা ছাড়া, আমি একটা আলাদা বকসিস্ দেবো যদি..."

"অর্থাৎ?"

"যদি মন্দিরাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে আমার পক্ষপাতী ক'রে তুলতে পারো।"

"সে জন্ম ভাবতে হবেনা, কিন্তু আগে সে বেঁচে উঠুক হবে তো?"

"বাঁচবে বই কি। ডাক্তারবাবু ব'লেচেন, আর একটা মাস কেটে গেলে ভয়ের কারণ আর থাকবেনা।"

"তাতো বুঝলাম কিন্তু পণ্ডিতজীও যে ওৎপেতে আছেন, তার কি?"

কমলা চুপ ক'রে থাকে।

"আজ কাল পণ্ডিতজী দেখচি বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রেচেন। এদিকে নজর দিলে এবার আমার সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া বেঁধে যাবে।"

"ঝগড়া মানে শুধু কথা কাটাকাটি তো? তাতে খুব বেশি বাহাদুরী নেই।"

"কথা কাটাকাটি কি বলচো, মাথা কাটাকাটি পর্য্যন্ত হ'য়ে যাবে।"

"বলে কি, একটা মেয়ে মানুষের জন্ম এতোটা করতে পারবে?"

"পারি কিনা দেখতেই পাবে।"

"তা দেখবো; কিন্তু ঝগড়াই হোক বা মাথা কাটাকাটিই হোক, সে সব যেন বাইরের দিকেই হয়—আমাদের এ দিকটায় তার ধাক্কা যেন না-আসে। ভুলে যাবেন না, পণ্ডিতজীর মাথা বা জেদ কোনোটাই হাল্কা নয়।"

"প্যারীলালও যে হাল্কা চিজ নয়, লাহোর থেকে ফিরে এলেই পণ্ডিতজী তা বুঝতে পারবেন। সে যাক্, কিন্তু তাঁর আসবার আগে তোমায় যে কাজটা দিলাম তা হাঁসিল করা চাই।"

আশার আশ্বাস দিয়ে কমলা তাকে বিদেয় ক'রে দিলো।

অনাদৃতা হ'লেও কমলা এখনো প্যারীলালেরই আশ্রিতা। প্যারীলাল জানতো, তাড়িতা হ'লে কমলাকে একান্তই পথে দাঁড়াতে হবে এবং তা সে সইতে পারবে না। তা ছাড়া প্যারীলালের আরো জানা ছিল, কমলা হাতে থাকলে তাকে দিয়ে অনেক কাজ হাঁসিল করা চলবে, তাই সে কমলাকে এনে নারীরক্ষাশ্রমে মেট্রনের পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছে। উপেক্ষিতা কমলার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ব্যথার গভীরতা অনুভব করবার ক্ষমতা প্যারীলালের ছিল না। সে মনে ক'রতো, কমলা যখন উপেক্ষার অনুযোগ দ্বারা তাকে আর বিরক্ত করবার চেষ্টা ক'র্চ্ছে না, তখন সে তার বর্ত্তমান অবস্থায় নিশ্চয়ই তেমন অসন্তুষ্ট নয়। কমলা মুখ ফুটে কিছু ব'লতো না বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে উঠছিল। মন্দিরার

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই আকাঙ্ক্ষা সঙ্কল্পে পরিণত হ'য়েছিল। পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে প্যারীলালকে উত্তেজিত ক'রে তোলা কমলার সেই সঙ্কল্প সাধনেরই একটি প্রয়াস মাত্র।

[আট]

শীতকাল। একটু প্রথম রাত্রেই আহার শেষ ক'রে নিতাই বাগ্‌দি তার ঘরে ব'সে ছিলিম টান্‌ছিল। মন্দিরার নিরুদ্দেশের পর মনোরমা যখন দেহত্যাগ করলেন, নিতাইর মা তখন স্বজাতীয়া অপর একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে নিয়ে মনোরমার ঘরে রাত্রিকালে বাস করার বন্দোবস্ত করলো, এ ঘরে অনেক জিনিস-পত্র ছিল ব'লে। মুনিবের সম্পত্তির কোনো কিছু নষ্ট না হয় এইটিই ছিল নিতাই ও তার মায়ের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। পাছে চোর-ডাকাতের উপদ্রব হয় এই ভয়ে নিতাই রাত জেগে বাড়ী পাহারা দিতো। শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত নিতাই মনে করতো, মুনিবের জিনিস-পত্র মুনিবকে ঠিক্ ঠিক্ বুঝিয়ে দিতে না পারলে তার কর্ত্তব্যের হানি হবে, এবং দুলাল ফিরে এসে সমস্ত বুঝে নিলেই সে সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে। দুলালের প্রতি সে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছিল। তার কথা মনে হ'লেই নিতাইর চোখ সজল হ'য়ে উঠতো। আবার সেই সঙ্গে যখন মন্দিরার কথা ও তার মায়ের শোচনীয় মৃত্যুর কথা মনে হ'তো, তখন সে পাগলের মতো হ'য়ে পড়্‌'তো। এমন একটা নির্দ্দোষ পরিবারের উপর এতো অত্যাচার অবিচার কেন হ'ল? নিতাই এর কোনো মীমাংসাই খুঁজে পেতো না।

ছিলিম টান্‌তে টান্‌তে কতো সব কথাই তার মনে হচ্ছিল। এমন সময় তার ঘরের দরজায় কে যেন আস্তে আস্তে দু'টি ঘা দিলো। কোনো দুষ্ট লোক আসতে পারে সন্দেহে নিতাই আমনি দোর খুলে না দিয়ে প্রথমে ঘরের কোন্ থেকে তার মোটা লাঠিটা হাতে নিলো—তার পর দোরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলো, "কে?"

"আমি দুলাল, ভয় নেই, দোর খোলো।"

গলার স্বরে দুলালকে চিনতে পেরে নিতাই তখনই দোর খুলে দিলো। হারিকেন লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে নিতাই দেখে বিস্মিত হ'ল, এই ব্যক্তি তার মুনিবের কণ্ঠস্বর নিয়ে এলেও, তাঁর সেই পরিচিত সুন্দর চেহারা নিয়ে আসে নাই। নিতাইর অবস্থা উপলব্ধি ক'রে আগন্তুক বল্‌লো, "জেলে থাকলে লোকের চেহারা এই রকমই বদ্‌লে যায়। সেখানে কয়েদীদের ক্ষৌরির সুবিধে নেই তাই দাড়ি গোঁফ বেড়ে গিয়ে মানুষ দেখতে হ'য়ে যায় জানোয়ারের মতো।"

নিতাই এতোক্ষণে দুলালকে ঠিক চিন্‌তে পেরে হাতের লাঠি দূরে ফেলে দিয়ে তার পায়ের কাছে ভূমিষ্ট হ'য়ে একটা প্রণাম করলো এবং বল্‌লো,

"মাফ করো দুলাল-দা, আগে সত্যি ঠাওর কত্তে পারি নি; ঠিক তুমিই এয়েচো। চলো, তোমার ঘরে নিয়ে যাই তোমায়।"

নিতাইর হাত ধ'রে দুলাল বল্‌লো, "না ভাই, এখন ও ঘরে যাবো না—তোমার এই ঘরে ব'সে আগে সব কথা শুনে নি।"

নিতাই একখানা মোড়া এগিয়ে দিলে দুলাল তার উপর ব'সে পরে বল্‌লে,—"সন্ধ্যার পর গাঁয়ে পৌঁছেই একটু গোপন অনুসন্ধান ক'রে জান্‌তে পারলাম, মা বেঁচে নেই, মন্দিরাও নেই। শুনে মাথা ঘুরে গেল। সংসারে বাঁচবার যা কিছু আকর্ষণ আমার সে সব শেষ হ'য়ে গেচে। তবু জান্‌তে চাই, কি ক'রে এমন সর্ব্বনাশ হ'ল। কিছু গোপন না ক'রে তুমি যা জানো সব আমায় খুলে বলো—তোমার কাছে খাঁটি সত্য জান্‌তে পারবো ব'লেই তোমায় জিজ্ঞেস্ কচ্চি।"

দুলালের অনুরোধ বা আদেশ উপেক্ষা করা নিতাইর পক্ষে একান্তই অসম্ভব ছিল। অকস্মাৎ দুলালকে পেয়ে এতো শোক দুঃখের মধ্যেও সে একটা আনন্দ অনুভব করলো। কোনো কথা গোপন করা দূরের কথা, সকল কথা খুলে বল্‌বার জন্যই তার প্রাণ অনেক দিন থেকে ব্যাকুল হ'য়ে ছিল, সুতরাং দ্বিরুক্তি না ক'রে দুলালের জেল হবার পর থেকে সকল ঘটনা নিতাই একে একে ব'লে যেতে লাগলো। সে কোনো ঘটনা অতিরঞ্জিত করলো না এবং কিছু গোপনও করলো না। অশোকাব নিরুদ্দেশের পর তাব লেখা চিঠিতে যে সব কথা জানা গিয়েছে নিতাই তারও মোটামুটি আভাস দিলো কিন্তু সে না ব'লে পারলো না, মন্দিরার জলে ডুবে আত্মহত্যা করার সংবাদ সে আদৌ বিশ্বাস করতে পারেনি

এবং এখনো করে না। তার দৃঢ় ধারণা, মন্দিরাকে প্যারীলাল চুরি ক'রে নিয়েচে। ঐ চিঠিটা নিশ্চয়ই কোনোরকম ষড়যন্ত্রের ফল। তারপর দুলালের মায়ের শেষ অবস্থার কথা বল্‌তে গিয়ে নিতাই কেঁদে ফেল্‌লো ও বল্‌লো, তার সকলের চেয়ে বেশী দুঃখ এই যে শেষ মুহূর্ত্তে তাঁর মুখে এক ফোঁটা জল দেবারও কেউ নিকটে ছিল না।

দুলাল নীরবে সব শুনে গেল। তার চোখ জলভারাক্রান্ত হ'লেও বিপুল চেষ্টায় আবেগ সাম্‌লে নিয়ে সে শুধু একটা শুষ্ক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলো। তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নিতাইকে বল্‌লো।

"কবরেজ মশাইর কাছে হয়তো সেই চিঠিখানা আছে সেটা আমার দেখা দরকার। কিন্তু আমি তাঁর কাছে যেতে চাই না, আর আমি যে বাড়ী এসেচি একথাটাও প্রকাশ করতে চাইনা। তুমি এক কাজ করো, এক্ষুণি কবরেজ মশাইর কাছে যাও এবং গিয়ে বলো, তুমি এমন লোকের সন্ধান পেয়েচো যে ঐ চিঠিখানা পরীক্ষা ক'রে অশোকার খাঁটি সংবাদ হয়তো দিতে পারবে। কিন্তু তিনি যেন তোমার সঙ্গে এখানে না আসেন।"

নিতাই বের হ'য়ে গেলে দুলাল ঘরে ব'সে কিয়ৎক্ষণ অবাধে চোখের জল ফেল্‌লো। সে বুঝতে পারলো না কি অপরাধে ভগবান এই পরিবারের জন্য এতো দুর্গতি ও লাঞ্ছনার ব্যবস্থা ক'রে রেখেচেন। সে অন্তরের অন্তরে ভগবানের করুণাময়ত্বে ঘোর সন্দিহান হ'য়ে উঠলো।

কতক্ষণ পরে নিতাই ফিরে এসে দুলালের হাতে সেই চিঠিখানা দিলো। চিঠির প্রথম পৃষ্ঠা পাঠ শেষ না হ'তেই দুলালের দেহের ভিতর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ তরঙ্গায়িত হ'য়ে গেল। পাঠ শেষ হ'লে দুলাল উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞস করলো, "এর পরে আর কোনো চিঠি এসেচে কি?"

"না, ঐ একখানা চিঠির কথাই তো জানি।"

"গাঁয়ের লোক সবাই বুঝি এই চিঠির গল্পটা সত্যি ব'লে ধ'রে নিয়েচে?"

"হাঁ; নিয়েচে বই কি, কিন্তু মুই তা বিশ্বাস করিনি।"

"নিতাই, তুমিই ঠিক বুঝতে পেরেচো। এই চিঠি অশোকার তো নয়ই, আর এর একটি বর্ণও সত্যি নয়। মন্দিরা কখনো আত্মহত্যা করে নি, এ আমি জোর ক'রেই বল্‌তে পারি। পাছে তার ও অশোকার খোঁজের জন্য পুলিশে খবর দেওয়া হয়, সেই ভয়ে এই চিঠিখানা তৈরি ক'রে পাঠানো হ'য়েচে। এ সব যে প্যারীলালের দলের লোকের কাজ এতে কোনো সন্দেহই নেই। যে এমন সর্ব্বনাশ ক'রতে পারে ও করেচে, তাকে অম্‌নি ছেড়ে দেবো? অত্যাচারীর হাত থেকে মা বোন্‌কে যদি বাঁচাতে না পারি, তবে এ জীবনের কোন্ প্রয়োজন?"

নিতাই তার প্রশস্ত বক্ষ ফুলিয়ে বল্‌লো, "দুলাল-দা, মুই মুখ্যি মানুষ, ছোটো লোক বটে কিন্তু ধর্ম্মরক্ষার জন্যে জান্ দিতে পারি। তুমি বলো কি কর্ত্তে হবে, একবার হুকুম করো।"

দুলাল দাঁড়িয়ে উঠে নিতাইকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লো, "এইতো ভাই বীরের মতো, মানুষের মতো কথা। চল, ব'সে আগে একটা পরামর্শ ঠিক ক'রে নিই।"

তারপর দু'জনে ব'সে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'ল। অবশেষে দুলাল চ'লে যাবার জন্য উঠলে নিতাই তাড়াতাড়ি তার বাক্স থেকে দুই কুড়ি টাকা এনে দুলালের হাতে দিয়ে বললো, "খামারের ধান বেচে এই কটা টাকা পাওয়া গেছলো, বাকী ধান এখনো বেচা হয়নি, গোলায় মজুদ আছে। তোমার হুকুম হ'লে সেই ধান বেচে আরো তিন চার কুড়ি টাকা দিতে পারবো।"

টাকাগুলো গ্রহণ ক'রে দুলাল বল্‌লো, "এই টাকা নেবার আমার ইচ্ছে ছিল না, তবে উপস্থিত তার প্রয়োজন আছে ব'লেই নিলাম। সকলের আগে মার আত্মার কল্যাণের জন্য কালিঘাটে গিয়ে যা হো'ক একটু কিছু ক'রতে হবে। বাকী ধান বেচবার প্রয়োজন নেই, সে সব তোমাদের জন্য রইলো।"

নিতাই বাধা দিলে দুলাল বল্‌লো, "আমি এক্‌লা মানুষ অতো ধান দিয়ে কি করবো। তা অভাবে পড়লে কি ভাই তোমার কাছে চেয়ে নিতে পারবো না?" ব'লেই দুলাল বের হ'য়ে গেল।

নিতাইর একান্ত ইচ্ছা ছিল, দুলাল বাড়ীতেই থাকে কিন্তু যে কারণে দুলাল আত্মগোপন ক'রে অন্যত্র থাক্‌তে চায়, তা বুঝতে পেরে বিশেষ দুঃখ হ'লেও বেচারা তাতে বাধা দিতে পারলো না। দুলালের উপদেশ অনুসারে সে কারো কাছে প্রকাশ করলো না, দুলাল জেল থেকে বেরিয়ে এসেই একদিন বাড়ী এসেছিল, এমন কি তার মাকেও কিছু বল্‌লো না।

[ক্রমশঃ

মধুসূদন দত্তের নাট্য-প্রতিভা

শ্রীমতী নীহার দাশগুপ্তা বি, এ,

নাটক লিখিত হয় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে। কতকগুলি অভিনেতা রঙ্গমঞ্চের উপর ভাব ও কথোপকথনের দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। এই কারণে নাটকে বর্ণনা অপেক্ষা কার্য্যকলার প্রয়োজনীয়তা বেশী। ইংরেজী Drama শব্দ গ্রীক Dras শব্দ হইতে উৎপন্ন। Dras শব্দের অর্থ 'করা'—(to do)। নাটকে বাহিরের ঘটনা একান্তভাবে অপরিহার্য্য। সেক্সপীয়ার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ স্বগতোক্তির অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সেখানেও স্বগতোক্তির সঙ্গে বাহিরের ঘটনার সংযোগ খুব নিবিড় ও প্রত্যক্ষ।

সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য মানবজীবনের গভীরতম অনুভূতির অভিব্যক্তি দেওয়া। সুতরাং শুধু বাহিরের ঘটনা অবলম্বন করিয়া কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। বাহিরের ঘটনার অন্তরালে হৃদয়ের নানা প্রবৃত্তির সংঘর্ষ ও সম্মিলনের চিত্র আঁকা প্রয়োজন। নাটকে নানা পাত্র-পাত্রীর অবতারণা করা হইয়া থাকে। তাহারা দুই বিরুদ্ধ দলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একটি সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। আবার প্রধান পাত্র-পাত্রীদের হৃদয়ে নানা প্রবৃত্তির সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া নাট্যকার মানবজীবনের গূঢ় রহস্যের চিত্র আঁকেন।

মধুসূদন যখন নাটক লিখেন তখন বাংলা নাট্য-সাহিত্য সম্পূর্ণ রূপে অপরিণত। যে কোনও কারণেই হউক বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্য আজও সমৃদ্ধি লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, যে নাটকের মধ্যে এমন একটা প্রত্যক্ষতা আছে যাহা বাঙ্গালী প্রতিভার অনুকূল নহে।[১] মধুসূদনের নাটক তিনখানি (শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী) কোনও দিক্ দিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে না। "শর্ম্মিষ্ঠা" উপাখ্যান ভারতীয় "শর্ম্মিষ্ঠা" কিংবদন্তী হইতে গৃহীত। "পদ্মাবতী" নাটকের আখ্যানভাগ জুনো, মিনার্ভা ও ভিনাসের কলহ ঘটিত কিংবদন্তীর অনুকরণে রচিত। "কৃষ্ণকুমারী" নাটক একটী রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আখ্যায়িকার পরিকল্পনায় মধুসূদনের বিশেষ কোন মৌলিকতা নাই। অন্য কোন দিক্ দিয়াও নাটকগুলি শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে না। শুধু "কৃষ্ণকুমারী" নাটক বাঙ্গালার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক ও প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নাটক বলিয়া টেক্‌নিকের দিক্ দিয়া খানিকটা নূতনত্বের দাবী করিতে পারে। "শর্ম্মিষ্ঠা" মধুসূদনের প্রথম নাটক। ইহার আখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত। ঘটনার সন্নিবেশে মধুসূদনের কোন ত্রুটি হয় নাই। স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মনে করেন যে, "শর্ম্মিষ্ঠার" প্রতি দৈত্যরাজের দণ্ডাজ্ঞা একটী শ্রেষ্ঠ নাটকোচিত অংশ এবং ইহা বাদ দেওয়াতে "শর্ম্মিষ্ঠা"র অঙ্গহানি হইয়াছে। কিন্তু আমাদের তাহা মনে হয় না। একটীর পর একটী ঘটনা যে-ভাবে সাজানো হইয়াছে তাহাতে কাহিনীর অগ্রগতি কোথাও থামে নাই; কোথাও অনাবশ্যক ভাবে দ্রুত হয় নাই। এই আখ্যায়িকার কেবল একটী গুরুতর দোষ লক্ষিত হয়, শর্ম্মিষ্ঠার সঙ্গে রাজা যযাতির প্রণয়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তৃতীয় অঙ্কের শেষে। চতুর্থ অঙ্কের প্রথমে দেখিতে পাই যে, শর্ম্মিষ্ঠার তিনটী সন্তান জন্মিবার পরে দেবযানী রাজা ও শর্ম্মিষ্ঠার প্রণয়ের কথা সহসা জানিতে পারেন। ইহা সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস্য। "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকে আর একটী প্রধান দোষ এই যে নায়িকা শর্ম্মিষ্ঠা কোথাও প্রাধান্য পান নাই। তিনি সর্ব্বদাই দেবযানীর আড়ালে পড়িয়া রহিয়াছেন। পিতার আদেশে তিনি নীরবে দেবযানীর সেবা করিয়াছেন। যযাতির প্রতি তাঁহার যে প্রণয়-সঞ্চার হয় তাহাও অতিশয় ভীরু এবং নম্র। তিনি কোথাও নিজেকে পুরোভাবে স্থাপিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার নম্রতা, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, সঙ্কুচিত-নম্র প্রণয় সম্ভাষণ আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। কিন্তু নাটক বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের সংযোগ খুব ঘনিষ্ঠ নহে। নাটকটী তাঁহার নামানুসারে রচিত হইলেও তিনি কোথাও নায়িকার উপযুক্ত আসন পান নাই। তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে ঘটনাবলীর ঐক্য কোথাও গভীর নহে।

---

[১] রবীন্দ্রনাথের চিঠি "চলার পথে" চৈত্রমাস—১৩৪৫

এই নাটকের মধ্যে প্রধান চরিত্র দেবযানী ও তাঁহার পিতা শুক্রাচার্য্য। দেবযানীর চরিত্রের মধ্যে প্রেম, দ্বেষ ও হিংসার চরিত্র আঁকা হইয়াছে। কিন্তু এই তিনটি প্রবৃত্তির সংঘর্ষ ও সম্মিলনের চিত্র পরিস্ফুট হয় নাই। মনুষ্য চরিত্রের প্রধান গুণ ইহার অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্য ও নানা প্রবৃত্তির সন্নিবেশ। কিন্তু দেবযানীর মধ্যে দেখিতে পাই একটির পর একটি প্রবৃত্তি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আবার একটি প্রবৃত্তির অবসানে আর একটির প্রভাব প্রবল হইয়াছে। যখন যযাতির প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে তখন পূর্ব্ব-প্রণয়ের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহাকে স্বাভাবিক মনে করা যায় না। দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য্যের চরিত্রও বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাঁহার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। কিন্তু তিনি অতি সামান্য কারণে ক্রোধে অসংযত হইয়া পড়েন। অন্যান্য চরিত্রগুলি বিচার করিলেও এইরূপ অপরিণতির চিহ্ন দেখা যাইবে।

মধুসূদন হিন্দুধর্ম্মকে অনেকটা নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখিতে পারিয়াছেন। এই জন্য তিনি রাম অপেক্ষা রাবণকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। এইখানেও দেখিতে পাই সর্ব্বাপেক্ষা মধুরতম চিত্র দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ও তাহার শুভানুধ্যায়ী বকাসুর। বকাসুরের চরিত্র নাটকে প্রধান নহে এবং ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত হয় নাই কিন্তু এই চরিত্রটি অতিশয় মধুর ও চিত্তাকর্ষক।

"পদ্মাবতী" নাটক "শর্ম্মিষ্ঠা"র অব্যবহিত পরে রচিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার উপাখ্যান গ্রীকপুরাণের অনুকরণে রচিত। দেবদেবীগণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া আখ্যায়িকায় বহুল অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে আখ্যায়িকা রচনায় মধুসূদনের কোন মৌলিকতা নাই। শচী, মুরজা, রতি, ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী যথাক্রমে জুনো, মিনার্ভা, ভিনাস, প্যারিস ও হেলেনের অনুকরণে পরিকল্পিত। গ্রীক উপাখ্যানের সঙ্গে পার্থক্য এই যে মধুসূদনের নাটক বিষাদান্ত নহে। ট্রয় যুদ্ধের অবসানে হেলেন তাঁহার পূর্ব্বস্বামীর নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন, প্যারিস তাঁহাকে পায় নাই। কিন্তু ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলন চিরস্থায়ী হইয়াছে এবং মুরজা পদ্মাবতীর মধ্যে তাঁহার হারানো মেয়ে বিজয়ার সন্ধান পাইয়াছেন। ঘটনার সন্নিবেশে "পদ্মাবতী" "শর্ম্মিষ্ঠা" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে স্বর্গপুরীর ও মানুষের অসাধ্য কার্য্য-কলাপের বর্ণনা আছে, কিন্তু নাটকটি এরূপ সুগঠিত, একটির পর একটি স্তর এমন সহজভাবে আসিয়াছে যে, আমরা উপাখ্যানটিকে সহজেই গ্রহণ করিতে পারি। চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়া বিচার করিলেও "পদ্মাবতীকে" অতি উচ্চশ্রেণীর নাটক বলা যাইতে পারে না। ইহার অধিকাংশ চরিত্রই একটানা ভাবে আঁকা। পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের একত্র সমাবেশ নাটকের প্রধান গুণ, কিন্তু শচী, রতি, ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মধ্যে এই বৈচিত্র্য নাই। শুধু মুরজার মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সংঘর্ষের আভাস পাওয়া যায়। মুরজা শচীর সঙ্গে একযোগে ইন্দ্রনীলের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি শচীর ন্যায় প্রতিহিংসাপরায়ণা নহেন এবং পদ্মাবতীকে দেখিবামাত্রই অজ্ঞাতসারে তাঁহার সুপ্ত মাতৃত্ব জাগিয়া উঠিল। প্রতিহিংসা ও মাতৃস্নেহের সামঞ্জস্যের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রকৃত নাটকোচিত গুণের আভাস পাওয়া যায় এবং এইখানেই নাট্যকার মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

"কৃষ্ণকুমারী" নাটকের কাহিনী ঐতিহাসিক। ইহার মধ্যে কোনও অসম্ভব বা অপ্রাকৃত ঘটনা নাই। শুধু এক জায়গায় মধুসূদন ইতিহাসের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। রাজপুত কাহিনীতে আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণকুমারী বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এইখানে রাজা ভীমসিংহ ও বলেন্দ্র সিংহ কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকুমারী খড়্গের সাহায্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। এই পরিবর্ত্তন মধুসূদনের নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দেয় না। কৃষ্ণকুমারী স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন; তিনি নীরবে গোপনে সকল বিবাদের সমাধান করিবেন ইহাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত। দুই রাজভ্রাতা একত্র হইয়া নিরুপায় রাজকুমারীকে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র করিবেন এবং রাজকুমারীর মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে খেদোক্তি করিবেন—ইহা একেবারে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক না হইলেও সহজ ও সুন্দর নহে। মধুসূদন অতি নাটকীয় উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি দেওয়ার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই সংযম ও সাঙ্কেতিকতা নাট্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। মধুসূদন তাহা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

ঘটনার সন্নিবেশ এবং আখ্যায়িকার পরিকল্পনায় এই নাটকখানি পূর্ব্ববর্ত্তী নাটক দুইখানি অপেক্ষা আংশিকভাবে শ্রেষ্ঠ হইলেও "কৃষ্ণকুমারী" উচ্চশ্রেণীর নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ভীমসিংহ, বলেন্দ্রসিংহ এবং মানসিংহ রাজপুত বীরগণের প্রতিনিধিরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। ইঁহারা বীরত্বের প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু ইঁহাদের চরিত্র একটানা ভাবে আঁকা হইয়াছে। ইঁহাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট পরিস্ফুট হয় নাই। রাজা জগৎসিংহের চরিত্রে খানিকটা বৈচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি কামুক অথচ বীরোচিত গুণের অধিকারী। কিন্তু কেমন করিয়া এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য হইল তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হয় নাই। রাজা জগৎসিংহকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র বলিয়া মনে হয় না।

নায়িকা কৃষ্ণকুমারী কুসুমের মত কোমল। কিন্তু বিপদের সময় তিনি অসাধারণ সাহস, আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নায়িকা হইলেও যথোচিত প্রাধান্য পান নাই। নাটকের অধিকাংশ জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছেন জগৎসিংহ, মদনিকা প্রভৃতি। তাঁহার চরিত্রের খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেওয়া হয় নাই। বিশেষতঃ যে ভাবে মানসিংহের প্রতি তাঁহার প্রেম সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা নাটকোচিত বলিয়া মনে হয় না। অবরোধঅন্তরালবাসিনী হিন্দুকুমারীর পক্ষে প্রণয়াসক্তির অবকাশ খুব কম। সেইজন্য মধুসূদন এই অদ্ভুত চিত্র আঁকিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করিতে পারেন নাই।

বিলাসবতী, ধনদাস ও মদনিকা সম্পর্কিত আখ্যায়িকাটী খুব কৌতুকাবহ; বিশেষতঃ চতুরা মদনিকার বুদ্ধিমত্তার ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের চিত্র খুব উজ্জ্বল হইয়াছে। ক্ষিপ্রগতি, কৌশলময়ী, ছদ্মবেশিনী মদনিকা সেক্সপিয়ারের নায়িকাগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিলাসবতীর চরিত্রে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরও বিশেষ পরিচয় নাই। কিন্তু তাহাকে হৃদয়হীনা সাধারণ বারাঙ্গনা হিসাবে কল্পনা করা হয় নাই। মধুসূদন তাহাকে একান্ত অনুরক্ত প্রণয়িনীভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। পদস্খলিতা রমণীর প্রতি সহানুভূতি শ্রেষ্ঠ দান। মধুসূদনের বিলাসবতীতে শরৎচন্দ্রের নায়িকার ক্ষীণ পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

"শর্ম্মিষ্ঠা" ও "পদ্মাবতী" নাটকে দুঃখের কাহিনী আছে, কিন্তু ইহারা মিলনান্ত। "কৃষ্ণকুমারী" খাঁটি ট্রাজেডী।

ইহা ছাড়া মধুসূদন দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছেন। মধুসূদনের প্রতিভা নাট্যরচনায় চরম বিকাশ লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু তিনি যে সকল শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার প্রতিভার বহুমুখীনতার প্রমাণ করে। "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"তে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে দুই শ্রেণীর চরিত্রের উপর তীব্র কশাঘাত করা হইয়াছে। যে হিন্দুসমাজ বিচার ও বিবেককে বিসর্জ্জন দিয়া তুচ্ছ আচারকে প্রাধান্য দিয়াছে সেই সমাজে যে বহু কপটাচারী ধর্ম্মহীন লোক সৃষ্টি হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। পূর্ব্বে জমিদারসম্প্রদায় সনাতনধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন অলস, অশিক্ষিত ও প্রজাপীড়ক। এই শ্রেণীর একজন প্রতিনিধিকে কেন্দ্র করিয়া মধুসূদন তাঁহার "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" রচনা করিয়াছেন। কপট, কামুক জমিদারের চিত্র দুই একটী রেখার সাহায্যে তীব্র ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রহসনে বিস্তৃত বর্ণনা ও বিশ্লেষণের অবকাশ নাই। ইহা সত্ত্বেও অন্যান্য চিত্রগুলিও পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রহসনের উপসংহারে পুঁটীর মধ্যে ধর্ম্মবোধ জাগরণের যে আভাষ পাই তাহা অতিশয় সুসংযত হইয়াছে। ঘটনার সন্নিবেশ ও অদ্ভুত অবস্থার পরিকল্পনা এই প্রহসনটীকে অতিশয় চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের সংযোগ অতি সুকৌশলে রক্ষিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া একটী দৃশ্য পাঠকের চিত্তে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। ভক্তপ্রসাদ ধর্ম্মহীন কিন্তু আচারপরায়ণ। এই মিথ্যা আচার-নিষ্ঠা তাঁহার মনে মিথ্যা কুসংস্কার সৃষ্টি করিয়াছে। এইজন্য তিনি অতি সহজেই হানিফকে ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং বুড়ো শালিকের পরাজয়ও সম্পূর্ণ হইল।

"একেই কি বলে সভ্যতা"য় উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজের আরেকটী প্রান্ত চিত্রিত হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে সাহেবীয়ানার সঙ্গে যে সব অনাচার হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল, এই প্রহসনে তাহারই দীর্ঘ বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই প্রহসনটী "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"-এর মত সুন্দর নহে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় বাবাজীর উপস্থিতি, যুবতীদের গৃহিণীকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা, কর্ত্তামহাশয়ের ও কালীনাথের সাক্ষাৎ—এ সকল দৃশ্যে কৌতুকসৃষ্টি ও চরিত্রবিশ্লেষণের বিশেষ অবকাশ ছিল। কিন্তু একটী দৃশ্যও জমিয়া উঠে নাই। মধুসূদন তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন কিন্তু শিল্পকৌশলের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার এই ব্যঙ্গচিত্রকে সম্পূর্ণ বলা যায় না।

নামৈব কেবলম্

কানাইলাল বসু বি, এল

রবিবারের অপরাহ্ন।

উঠানের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে বেলঘরিয়ার গণেশ উকীল হাঁকিলেন, "কোথায় গেলে গো? ওপরে নাকি?" উপর হইতে সাড়া আসিল না, আসিল স্নানের ঘর হইতে। "এই যে আমি, কি হয়েছে?"

গণেশবাবু বদ্ধদ্বারকে বলিলেন, "তবেই হয়েছে। তুমি বুঝি কলে ঢুকেছ? তাইতো। তা চট্ করে এসো। মানে, জামাই এসেছে, বুঝলে? বড্ড তাড়াতাড়ি। একটু চা-টা করে দাও, এক্ষুনি চলে যাবে।"

তারপর কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে বিনু কোথায় গেলি? একটু জল চড়িয়ে দে মা চট্ করে। আর কিছু খাবার আনতে দে বংশীকে।"

"চট্ করে" বলিলেই পিতার জামাই-এর জন্য জলযোগ প্রস্তুত করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবে এমন নির্লজ্জা কন্যা বিনীতা নহে। গণেশবাবু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে কেটলি লইয়া রান্নাঘরের দিকে গেল। বৈঠকখানার যে জানালাটি বাড়ীর ভিতর দিকে আছে সেটা বন্ধ থাকিলেও তাহার পাশ দিয়া যাইবার সময় বিনীতার মাথা নীচু হইয়া আসিল।

তাহার বিবাহ বেশী দিন হয় নাই এবং এ বাড়ীর জামাতা শ্বশুরবাড়ী ঘন ঘন আসেন না। বিনীতা শেষ পত্র যাহা পাইয়াছে তাহাতে শীঘ্র আসিবার চেষ্টা করার বেশী আর কিছু আশার বাণী ছিল না।

মিনিট দশেক পরে গণেশবাবু ভাঁড়ার ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "একী করেছিস? এত খাবার আনিয়েছিস কেন রে?"

বিনীতা নত মস্তকে চায়ের কেটলীতে চামচ নাড়িতেছিল, নিরুত্তরে নাড়িতেই রহিল। ঘরের ভিতরে গৃহিণী বস্ত্র পরিবর্তন করিতেছিলেন, তাঁহার অদৃশ্য কণ্ঠ শোনা গেল, "বাজে ব'কো না বাবু। ও আনাতে যাবে তোমার জামাইয়ের জন্যে খাবার! আমি আনিয়েছি।"

"তা সে যেই আনাও, এত বেশী আনাবার দরকার কী ছিল?"

চাপা গলায় পূর্ণিমা দেবী ঝঙ্কার দিলেন, "তুমি চেঁচিও না অত, শুনতে পাবে। বেশী আবার কোথায় দেখলে? এর কমে দেওয়া যায়?"

অসহায় দৃষ্টিতে গণেশবাবু শালপাতার বৃহৎ ঠোঙার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ণিমা দেবী কন্যার পাশে আসিয়া উবু হইয়া বসিয়া কহিলেন, "যা বিনু তুই উপরে যা। বড় ঘরটা একটু গুছিয়ে রেখে কাপড়টা বদলে ফেল্। সেই নূতন ডুরেখানা পরিস। আমার আলমারীতে সামনেই আছে।"

বলিয়া অঞ্চলপ্রান্ত হইতে চাবির রিং খুলিয়া বিনীতার হাতে দিয়া নিজেই কাপ ডিস টানিয়া লইলেন। মন্থরপদে বিনীতা বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বিনীতা শুনিল পিতা মাতার আলাপ।

"ঐ হয়েছে হয়েছে। চট করে খাবারগুলো গুছিয়ে দাও। অনেক দূর যেতে হবে ওকে। তার ওপরে আবার ট্রেণের সময়।"

—"রাখো বাবু তোমার চট্ করে। তোমার চট্ করে শুনে কাজ করলে তো আমার চলবে না। রোজ তো আর তোমার বাড়ী খেতে আসছে না। আর এক্ষুনি যাবে বল্লেই যাবে? বিনু ঘরটা পোস্কের করে দিক, ওপোরে নিয়ে গিয়ে বসাও।"

পিতা কি বলিলেন তাহা বিনীতা শুনিতে পাইল না। ততক্ষণে সে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু মাতার উচ্চকণ্ঠ কাণে আসিল।

—"কী যে বকো তা বুঝি না। তোমার যত অনাসৃষ্টি কথা! উপরে নিয়ে যাবে না তো কি বাইরের ঘরের থেকে জল খাইয়ে বিদেয় করে দেবে নাকি?"

ক্ষিপ্রহস্তে গৃহসজ্জায় যথাসম্ভব পারিপাট্য আনিয়া

বিনীতা পাশের ঘরে গেল কাপড় বদলাইতে। আলমারী খুলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল। তারপর নিজ হাতে বোনা নূতন পশমের আসনখানি বাহির করিয়া বড়ঘরে ভাল চেয়ারখানিতে পাতিয়া দিয়া গেল। এই আসনটি সে একটী বিশেষ ব্যক্তির জন্যই বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা ইহা প্রথম ব্যবহৃত না হয়, এইজন্য এতদিন ইহাকে বাহির করা হয় নাই।

নূতন কাপড় পরিয়া দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখে স্নো ঘষিতে ঘষিতে বিনীতা আপন মনে হাসিয়া উঠিল। বাহিরের ঘরে নূতন জামাতার অভ্যর্থনা করিবার কল্পনা এক তাহার পিতার দ্বারাই সম্ভব। সাধ করিয়া কি মা এত রাগ করেন? এ কি তাঁহার আদালতের কোন বন্ধু আসিয়াছেন যে, বাহিরে বসিয়া একবাটি চা ও দুইটা মিষ্টান্ন খাইয়াই চলিয়া যাইবেন, ভিতরে আসিবার প্রয়োজন নাই।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ পাইয়া বিনীতা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। রুদ্ধদ্বার নির্জ্জনকক্ষে নববস্ত্রপরিহিতা বিনীতা লজ্জায় ঘামিয়া উঠিল; কিন্তু লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। বন্ধ দরজার একটি পাল্লা এক ইঞ্চি পরিমাণ খুলিয়া সেই ফাঁক টুকুতে একটি চোখ রাখিয়া সে দাঁড়াইল।

ঘরের সামনেই বারান্দা, সেই বারান্দা দিয়াই বড়ঘরে যাইবার পথ। কি কথা হইতেছিল কে জানে। গণেশ বাবুর কণ্ঠই কাণে আসিল, অপর পক্ষ সম্পূর্ণ নীরব। বিনীতা অধর উল্টাইয়া ভাবিল পুরুষ মানুষ কত ভণ্ডামিই জানে! প্রয়োজন হইলে সুশীল সুবোধ সাজিতে ইহাদের সমকক্ষ আর কেহ নাই।

ক্রমে চতুষ্পদ শব্দ ও কণ্ঠস্বর নিকটবর্ত্তী হইল এবং হাস্যবদন গণেশবাবু একচক্ষু বিনীতার দৃষ্টিরেখা ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। নির্নিমেষে বিনীতা চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরেই গণেশবাবুর 'জামাই' এক পলকের জন্য দেখা দিয়াই অদৃশ্য হইলেন।

এক পলকের দেখাই যথেষ্ট। সমস্ত হৃদয় মন একটী মাত্র চক্ষুতারকায় সন্নিবিষ্ট করিলে সে চক্ষু যাহা দেখে সহস্রআঁখি ইন্দ্রও তত দৃষ্টিশক্তি ধরে কি না সন্দেহ। কুরুরাজ-কুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষায় অর্জ্জুন নিশ্চয়ই এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অপর এক চক্ষুর সাহায্যেই লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন। বিনীতার একাগ্র এক চক্ষুতে এক পলকের দেখাই যথেষ্ট। তাহাতেই তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু তথাপি দুই চোখ দিয়া না দেখিলে কম্পমান হৃদয় মানে না। রুদ্ধশ্বাসে বিনীতা একটী কবাট খুলিয়া মাথা বাড়াইয়া দিল। গণেশ বাবুকে দেখা গেল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মুহূর্ত্তে ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখের ও দেহের এক পার্শ্ব মাত্র দৃষ্টি-গোচর হইল। দ্রুত মাথা টানিয়া লইয়া বিনীতা দ্বারে অর্গল লাগাইয়া দিল। ঘর্ম্মাক্ত দেহে তাহার শীত বোধ হইতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে নূতন শাড়ীর মায়া ভুলিয়া ধূলিসঙ্কুল পা-পোষের উপরেই সে বসিয়া পড়িল। ক্ষণপরেই পদশব্দে বুঝিল, বংশী ভৃত্য চা ও জল খাবার পরিবেশন করিয়া গেল।

* * *

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়াছে। গণেশবাবু বাড়ী নাই। অতিথিকে আগাইয়া দিতে গিয়াছেন। নীচে ভাঁড়ার ঘরের সামনে দাওয়ার উপর পূর্ণিমাদেবী বসিয়া আছেন। বিশ্বের গাম্ভীর্য্য তাঁহার মুখে মাখানো।

অতিথি বিদায়ের পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এইরূপ:—

সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া পূর্ণিমাদেবী সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ধনী সন্তান জামাতাকে সম্ভাষণ করিবার জন্য এবং অনুরোধ করিবার জন্যও বটে যাহাতে জামাতা রাত্রিবাস না হউক অন্ততঃ রাত্রি ভোজটা এইখানেই সারিয়া যান।

"আজ কি না গেলেই নয় বাবা? রাত্তিরে না হয় খাওয়া দাওয়াটা করে যেওখন। গরীব শ্বশুরের বাড়ী কতদিন পরে এলে—"

সন্ধ্যার অন্ধকারে দূর হইতে তাঁহার নজর চলে না, গণেশবাবুর পশ্চাদ্বর্ত্তী জামাতা একেবারে তাঁহার সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। কিন্তু সম্মুখীন হইবার পর সম্ভাষণ আর অগ্রসর হয় নাই। এ বয়সে এবং এই বাতপুষ্ট দেহে যতটা সম্ভব চঞ্চল চরণে পূর্ণিমা-

দেবী সরিয়া আসিয়াছিলেন। অতিথিসহ গণেশবাবু অপেক্ষা করেন নাই।

বিনীতা উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টি বড় ঘরের ভিতর নিবদ্ধ। ঘরের ভিতর অন্যান্য আসবাবের মধ্যে একটী ছোট টেবিল ও একখানি গদীমোড়া চেয়ার রহিয়াছে। টেবিলে শুভ্র আবরণীর উপর চায়ের কাপ ডিস, খাবারের রেকাবী, জলের গ্লাস ও পানের ডিবা। চেয়ারে একটী সুদৃশ্য নূতন পশমের আসন। আসনখানি বিপর্য্যস্ত, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ কি চূর্ণ পড়িয়া আছে, একধারে হরিদ্রাভ সিক্তদাগ,—বোধ করি চা পড়িয়া থাকিবে। শুভ্র পশমের উপর চায়ের কলঙ্ক কখনো মোচন করা যাইবে কি না সন্দেহ। উচ্ছিষ্ট আসনের পানে চাহিয়া চাহিয়া বিনীতার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তথাপি সে আসন হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না।

আরও কয়েক মিনিটের পর নীচে পরিচিত চটিজুতার শব্দ পাইয়া বিনীতার চমক ভাঙ্গিল। কখন যে চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছিল খেয়াল ছিল না। ত্বরিতে চোখ মুছিয়া ঘরের ভিতর হইতে আসনখানা আনিয়া উঠানে ফেলিয়া দিল। তারপর টেবিল পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

উঠানে দাঁড়াইয়া গণেশবাবু দেখিয়া নিরতিশয় বিস্ময় বোধ করিলেন। ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—

"আহা হা, নতুন আসন খানা কাদায় পড়ে গেল যে! ও বিনু, চট্ করে আয় মা।"

বিনীতা চট্ করিয়া বা ধীরে ধীরে কোন গতিতেই আসিল না। ঘরের ভিতর হইতে নির্ব্বিকার কণ্ঠে বলিল—

"হ্যাঁ, ওটা আমিই ফেলেছি। ওটা কাচতে হবে।"

গণেশ বাবু আসন খানি নিজেই উঠাইতে যাইতেছিলেন। দ্রব্যটী যে কন্যার কত প্রিয় ও যত্নের তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু বিনীতার উত্তর শুনিয়া আর অগ্রসর হইলেন না। সদ্য-প্রস্তুত পশমের আসন কাচিবার কি প্রয়োজন হইতে পারে তাহা তাঁহার মাথায় আসিল না।

কিছু বলিবার জন্যই হউক বা বিস্ময়ের আধিক্যেই হউক, গণেশ বাবু মুখ খুলিয়াছিলেন, কিন্তু বাক্য নির্গত হইল না অথবা হইয়া থাকিলেও তাহা শ্রুতি-গোচর হইল না। কারণ তৎপূর্ব্বেই পূর্ণিমা দেবী মুখ খুলিয়াছিলেন।

কেতাবী ভাষায় বলে—"বাক্যবাণ।" কিন্তু কেতাবের বাহিরের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারা জানেন, ওটা শব্দশাস্ত্রের অলঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের প্রেমের সংসার হইলে পতিব্রতা মধ্য-বয়স্কা পত্নীর মুখে প্রিয়তম নির্ব্বোধ পতির উদ্দেশে যে বাক্য শোভা পাইয়া থাকে, পূর্ণিমা দেবী তাহাই ব্যবহার করিলেন। তাহাতে গণেশ বাবুর অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই। কারণ বাক্য সত্যসত্যই বাণ নহে। কর্ণেই প্রবেশ করে, চর্ম্মে আঘাত করে না। মর্ম্ম দৃষ্টি গোচর হয় না, সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা দুরূহ।

* * *

সোমবারে আলিপুরের জজ আদালতে শ্বশুর জামাইয়ে সম্পর্কচ্ছেদ হইয়া গেল। আদালত বলিলে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা, হইল আদালতের লাইব্রেরী কক্ষে। দীর্ঘ টেবিলে স্বীয় অভ্যস্ত চেয়ারে বসিয়া গণেশ উকীল সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। অর্থাৎ একখানি সংবাদপত্র খুলিয়া, নিমীলিত-নয়নে, ইলেক্‌ট্রিক পাখা তাড়িত ও একশত ব্যক্তির নাসিকা শোধিত পবিত্র বায়ু সেবন করিতেছিলেন। যেমন জনাকীর্ণ সহরই আত্মগোপন করিবার প্রকৃষ্ট স্থান, তেমনি একটানা বিচিত্র কোলাহলের মধ্যেই তন্দ্রা উপভোগ করিবার চমৎকার সুবিধা আছে তাহা উকীল বাবুরা ও স্কুল মাষ্টার মহাশয়রা জানেন।

এমন সময়ে এক স্থূলোদর, চাপকান পরিহিত ভদ্রলোক আসিয়া গণেশ বাবুর বিপরীত দিকের চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। তারপর পকেট হইতে এলুমিনিয়ম-নির্ম্মিত একটী ফিল্মের কৌটা বাহির করিয়া তাহা হইতে বিরাট এক টিপ নস্য লইয়া দুইটী সুপ্রশস্ত নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। অর্দ্ধেক নস্য স্থানাভাবে ঝরিয়া পড়িল চাপকানের ও টেবিলের স্থানে স্থানে। নস্য বর্ণের একখানা রুমাল দিয়া নাক মুখ ঝাড়িয়া লইয়া ভদ্রলোক কহিলেন, "দিব্যি বাড়ীটি করেছ হে, ছোট হলেও চমৎকার ফাঁকার উপর। বুঝলে?"

বলিয়া এপাশে ওপাশে চাহিয়া ঈষৎ ঘাড় নাড়িলেন। কিন্তু কোন পাশ হইতেই এমন লক্ষণ দেখা গেল না যে তাঁহার মন্তব্য কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। দুই পাশে যে সকল উকীল বাবুরা তাস হাতে বা শুধু হাতে কলরব করিতেছিলেন তাঁহারা কলরব করিতেই রহিলেন।

ভদ্রলোক তখন দুই পাশ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন “কাল বাড়ী ফিরতে বড্ড রাত হয়ে গেল, বুঝলে শ্বশুর? তোমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে ট্রেন ধরেছি। কিন্তু ছেলের বাপটা একেবারে কশাই। শালা দর যা হেঁকেছে, বুঝলে,—কি হে শ্বশুর ঘুমুচ্ছ না কি?”

অভ্যাস মত তন্দ্রাজড়িত স্বরে গণেশ বাবু, কহিলেন “তা তো বটেই।” বলিয়া একবার চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ, কিসের কথা হচ্ছিল?”

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গণেশ বাবু পুনরায় চক্ষু মুদিলেন। নস্যাশী ভদ্রলোক বলিলেন, “বেশ এক ঘুম দিয়ে নিলে. কি বল?”

“না না ঘুমুবো কেন?” বলিয়া গণেশ বাবু নড়িয়া চড়িয়া ঘাড় সোজা করিয়া বসিলেন এবং সংবাদপত্রের পাতায় দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “মানে কাল রাত্তিরে ঘুম হয় নি বল্লেই হয়। তার ওপোর মেয়েটার জ্বর না কি হয়েছে বল্লে, রাত্তিরে কিছু খেলে না। তাই ভাবছি—”

ভাবনার ভারে তাঁহার মাথাটী পুনরায় বুকের উপর ঝুঁকিয়া আসিল।

“কিন্তু বাপটা যাই হোক, ছেলেটীকে দেখলুম মন্দ নয়। খাঁইটা যদি একটু কমে তা হলে মনে করছি ঐখানেই—কি বল শ্বশুর?”

সহসা গণেশ বাবুর স্মৃতি পূর্ণ জাগ্রত হইল। মাথা তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “এই চোপ, খবর্দ্দার বলছি।”

অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বিস্ফোরণে ভদ্রলোক চমকিত হইলেন। পিছনে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু আক্রমণের পাত্র কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন, “আরে স্বপ্ন দেখছ না কি হে? আফিংটা কমিয়ে ফেল, কমিয়ে ফেল। বুঝলে শ্বশুর?”

গণেশ বাবু পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, “ফের? ভালো হবে না বলছি জামা—ইয়ে—ওর নাম কি, দাশু!”

দাশরথী বাবুর বিস্ময় এবার তাঁহাকে অবাক করিয়া দিল। গণেশ উকীলের ক্রোধ তাঁহার নিকট যত বিস্ময়জনক ঠেকিল তদধিক রহস্যময় লাগিল তাঁহার মুখের ‘দাশু’ সম্বোধন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া দাশু উকীল কহিলেন, “আরে, হঠাৎ ক্ষেপে গেলে না কি? কি হল তোমার বল তো?”

সেই কয়েক মুহূর্ত্তে গণেশ বাবুর উত্তেজনা শীতল হইয়া আসিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সহজ সুরে কিন্তু গম্ভীর ভাবে তিনি বলিলেন,

“হয় নি কিছু। কিন্তু বয়েস হয়েছে, তোমারও বটে, আমারও বটে।”

দাশরথী বাবু বলিলেন, “তা তো হয়েছেই ভাই! কিন্তু আমি তো আর বয়েস ভাঁড়িয়ে চুলে কলপ দিয়ে বেড়াচ্ছি না। বয়েসের নিদর্শন শিরোধার্য্য করে রেখেছি, এই দেখ।”

বলিয়া দাশু বাবু আপন কেশ বিরল পাকা মাথাটীতে হাত বুলাইলেন। গণেশ বাবু সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বয়েস হয়েছে তা মানছ তো? তা হলে এখন থেকে মনে রেখো আমার নাম ‘গণেশ’, আর আমিও মনে রাখতে চেষ্টা করব তুমি ‘দাশু’। ছি-ছি-ছি-ছি!”

কাহাকে এই ধিক্কার তাহা দাশরথী উকীল বুঝিলেন না। কিন্তু সে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি বিস্ফারিত নেত্রে ভাবিতে লাগিলেন, গণেশের নাম গণেশ এবং তাঁহার নাম দাশু।

কথাটা বোধ করি তাঁহার শক্ত ঠেকিল। তাই মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চিন্তার আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,

“তোমার নাম গণেশ আর আমার নাম দাশু। কেন বল তো?”

এ প্রশ্ন করার তাঁহার প্রয়োজন ছিল। কবে যে তাঁহারা দুই বন্ধু পরস্পরের কাছে নাম হারাইয়া ‘শ্বশুর জামাই’য়ে পরিণত হইয়াছিলেন তাহা দাশু উকীলের মনে পড়ে না। এবং গত রাত্রে এক তরফা দাম্পত্য আলাপের মধ্যে বাক্যহীন গণেশ উকীলও শত চেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে পারেন নাই কি উপলক্ষে তিনি প্রথম দাশুকে ‘জামাই’ সম্বোধন করিয়াছিলেন। অবশ্যই তখন কন্যা জন্মগ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ তখন গৃহিণীও আসেন নাই। তাহার পর কত দীর্ঘকাল কাটিয়াছে। এই দীর্ঘ কালের অভ্যাসের ফলে গণেশ বাবুর এক বারও মনে হয় নাই যে বাহিরে যাহা কেবল নাম ছাড়া আর কিছুই নহে, অন্তঃপুরে বলিলে তাহাই কি বিষম অশোভন শুনিতে হয়, বিশেষতঃ যে অন্তঃপুরে সদ্য বিবাহিতা কন্যা বর্ত্তমান। ছি-ছি-ছি!

ব্যাপার শুনিয়া দাশরথী বাবুও দাঁতে জিভ কাটিলেন।

অতঃপর আদালতশুদ্ধ লোক সবিস্ময়ে শুনিল, দাশু উকীল বলিতেছেন, “বুঝলে গণেশ,” গণেশ উকীল বলিতেছেন—“কি বল হে, ইয়ে, ওর নাম কি, দাশু!”

P16349

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত এম, আর, এ, এস্

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে—অমুক কবি, অমুক লেখক, অমুক নাট্যকার, অমুক শিল্পী, অমুক ঐতিহাসিক, অমুক প্রত্নতাত্ত্বিক, অমুক বৈজ্ঞানিক, এমন কি অমুক ধর্ম্মাচার্য্য, ইঁহারা out of date অর্থাৎ অচল—আধুনিক বা সাময়িক নহে। এই কথা কেবল যে অর্ব্বাচীনেরা বলেন তাহা নহে, কোন কোন স্বনামখ্যাত বা অল্পখ্যাত ব্যক্তির মুখেও শোনা যায়—অর্ব্বাচীনেরাত গলাধঃকরণ করিবেনই। এই পর্য্যায়ে ঐ সকল ধুরন্ধরদিগের বিচারে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাদ যান নাই, কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ, এমন কি যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দও বাদ যান নাই। বাল্মিকী, ব্যাসের তো কথাই নাই। কালিদাস বোধ হয় স্থানই পাইবেন না। Homer, Virgil, Shakespeare, Milton, Dante—এমন কি আধুনিক Tennyson এবং চিত্রকলায় বা কলাশিল্পে Raphel ও বোধ হয় তাঁহাদের নিকট অচল। তাঁহাদিগের যুক্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে সকল কবি, লেখক, নাট্যকার শিল্পী প্রভৃতি লোকশিক্ষকেরা বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্রের সহিত সংযোগ না রাখিয়া তাঁহাদের রচনা বা অবদান সমাজকে দেন, তাহাতে সমাজের কিছুই আসিয়া যায় না। কথাটা যে একেবারে অযৌক্তিক ইহা আমাদের বক্তব্য নহে। তবে শ্রেষ্ঠ অবদানের শ্রেষ্ঠ সম্পদের উহাই যে মাপকাঠি নয়, তাহাই আমরা বলিতে চাই। যাহা সত্য, তাহা সনাত, নতাহা সার্ব্বভৌমিক ও তাহা সার্ব্বকালিক। অপ্রমাদী ঋষিগণ যে সকল তত্ত্ব দিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিনই অভ্রান্ত এবং তাহাই আদর্শরূপে সবকালেই গ্রাহ্য। যুগ-যুগান্তরব্যাপী সাধকদের মুখে একই সত্য যুগোপযোগীভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় গ্রথিত বা বর্ণিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'সব শেয়ালেরই এক রা', অর্থাৎ তাহাদের রব বা ধ্বনি এক, তাহারা 'কাকাহুয়া', 'কাকাহুয়া' বলে।' তাই যাহা সত্য, যাহা অবিনশ্বর, যাহা অপরিবর্ত্তনশীল তাহা চিরদিনই শাশ্বত। তাহা কি out of date হইতে পারে? তাহা কি অচল হয়?

এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা অহঃরহঃ লোক চক্ষুর গোচরে দৃশ্যমান, তাহা সত্য বটে কিন্তু সাময়িক; তাহা শাশ্বত নহে। উহা হইতে আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে—Idealise the real এবং সেই Ideal-টাই, সেই আদর্শটাই শাশ্বত। উহাকেই realise করিতে হইবে। অর্থাৎ Realise the Ideal.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

যাহাকে আমরা out of date বা অচল বলি, সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিতে হইবে তাঁহারা সেই সেই কালের বাস্তবের উলঙ্গ দিকটাই কি একমাত্র দেখাইয়া নিশ্চিত হইয়াছেন এবং পরবর্ত্তীকালে অপরাপর কেহ তৎকালীক উলঙ্গ দৃশ্য দেখানোর জন্যই কি পূর্ব্ববর্ত্তীরা out of date বা অচল হইলেন?

আমাদের কর্ত্তব্য কি? সর্ব্বসময়ই, সর্ব্বত্রই শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধান। কারণ, যাহা শাশ্বত সত্য তাহাই

শিব এবং তাহাই সুন্দর। কোন কোন তথাকথিত সমালোচক রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ এই সকল সহনীয় চরিত্রের পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন বা সমাবেশ দেখিতে বিরাগী। তাঁহারা চান, বর্ত্তমান যুগের মানুষদের মধ্যে যে সকল আদর্শ রহিয়াছে তাহাই কীর্ত্তন করিলে সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। প্রাচীনের উদ্বর্ত্তনে আবশ্যক নাই। প্রাচীন পুরুষোত্তমগণ out of date বা অচল। বর্ত্তমানের ধুরন্ধরগণের বিষয়ই সকলের উপভোগ্য হওয়া উচিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—আধুনিক তথাকথিত শ্রেষ্ঠ মানবগণ অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব্বোক্ত বিচারে অচল বা out of date হইবেন না কি ?

বর্ত্তমানের পুরুষোত্তমগণ মধ্যে যদি কেহ কেহ শাশ্বত সত্যের সন্ধান দিয়া যান, তাঁহারা নিশ্চিতই অচল বা out of date হইতে পারিবেন না। যে তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হয় তাহাই যুগে যুগে out of date হইয়া থাকে। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্য অপরিবর্ত্তনশীল, সার্ব্বভৌমিক ও শাশ্বত, তাহা যে সময়ই উক্ত হউক কখনও অচল হইবে না, কখনও out of date হইবে না।

গিরিশচন্দ্র

তথাকথিত বিচারাধীনে যে দুই চারিজন out of date বা অচল হইয়াছেন তাঁহাদের একজনের প্রসঙ্গ কিছু কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। তিনি মহাকবি গিরিশচন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মহাকবি গিরিশচন্দ্রের একদিনের আলাপের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করিতেছি।

গিরিশচন্দ্র—"মহাশয়, আপনি জানেন না আমি কে ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তুমি কে তাই বল না ?

গিরিশচন্দ্র—"আমি পাপী, তাপী, নরাধম! আমি যেখানে বসি সেখানকার মাটীর নীচে সাত হাত পর্য্যন্ত পাপের প্রভাব। আমার কি তুলনা আছে ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"গিরিশ, তাতে কি এসে গেল ? পতিতপাবন একজন আছেন, জান কি ? তবে তোমার ভয় কি ? তুমি ত' জান এবং সকলেই জানে—'চাঁদামামা সকলেরই মামা।' সে সাধুকে সাধন করবার সময় আলো দেয় এবং চোরকে চুরি করতেও আলো দেখায়। তবে সে ভাবনা তোমার কেন ? যে কালীয় সাপ বিষোদ্গার ক'রে লোক মারত, সেই সাপের মাথায় শ্রীচরণ দিয়া তাকেই শ্রীকৃষ্ণ দমন করেছিলেন বা তার বিষোদ্গার বন্ধ করেছিলেন। বিষও তাঁরই দেওয়া এবং তাঁকে দমন করা তাঁরই কাজ।"

গিরিশচন্দ্র—"তবে আমার মতন লোকও উদ্ধার পাবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—"নিশ্চয়ই পাবে। জগতে এমন কে পতিত আছে, যাকে পতিতপাবন উদ্ধার করতে পারেন না ? যে যতই পাপাত্মা, দুরাত্মা হোক না কেন, পাপ-তাপহরণ পতিতপাবনের আশ্রয় নিলে তাঁর সকল দোষ মুহূর্ত্তে অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালার মত দূর হয়ে যায়। তুমি নিজেকেই কর্ত্তা মনে করেছ, তাই তোমার অত ভয়। অজ্ঞানীরাই আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। (অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতিমন্যতে) একমাত্র তিনিই কর্ত্তা—তাঁর শরণ নাও, সব পাপ-তাপ দূরে যাবে।"

গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'কালাপাহাড়' নাটকের নানা চরিত্রে আপনাকে এঁকেছেন। তার মধ্যে একটা চিত্র 'বীরেশ্বর' ভূমিকার কতক অংশ আর শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের ছায়া নিয়ে তাঁহার অঙ্কিত চিন্তামণি চরিত্র।

উপরিউক্ত কথোপোকথন কালাপাহাড় নাটকে আমরা দেখিতে পাই :—

বীরেশ্বর—আমি কে জানেন ?

চিন্তামণি—যেই হও না কেন, চাঁদামামা সকলেরই মামা, ঈশ্বর সবারই ঈশ্বর ; তোমারও আমারও।

বীরেশ্বর—আমি ব্রহ্মদৈত্য, প্রেত, ভূত।

চিন্তামণি—ভূতনাথ আশ্রয় দেবেন !

বীরেশ্বর—শুন পরিচয়, জন্ম মম ব্রাহ্মণের
ঘরে কিন্তু অবিদ্যার বরে, করিলাম
অবিদ্যা অর্চ্চনা, ধন জন প্রতিষ্ঠার
নিয়ত কামনা মম, বাসনা-সাগর
উথলিল বালক হৃদয়ে ; বাসনার
মোহ-বশে, বালক বয়সে ব্রহ্মচর্য্য
আচরণ—কামের দমন আকিঞ্চণ
নহে—অবিরাম কাম তৃপ্তি অভিলাষ।
নিত্য যোগ-যাগ, দেব-অনুরাগ অষ্ট
সিদ্ধি আশা জাগে মনে মনে ; শবাসনে
বসিয়ে শ্মশানে, ধ্যানে মগ্ন কাপালিক
আসব-সেবন-পাত্র শবের কপাল ;
নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা, সতীত্ব-ভঞ্জন,
প্রবল ইন্দ্রিয় বলে নির্ভীক হৃদয় ;
পরম আরাধ্যা ত্যজি মহাবিদ্যা, দাস
অবিদ্যার, ঘুচিবে কি দাসত্ব শৃঙ্খল ?

চিন্তামণি—অভিমান কর পরিহার, চূর্ণ কর
বল অবিদ্যার, জেন সার অহঙ্কার
নরক দুস্তর। শক্তি কার ? মূলাধার
ভগবান—শক্তির আকর, ভাবে মুগ্ধ
নর শক্তিধর আপনারে ; জলধরে
বর্ষে বারিধারা, চলে প্রণালী বহিয়ে
জল, জল নহে প্রণালীর ; জেন স্থির,
শক্তি সেইমত। অনিবার্য্য ফলে কার্য্য
ঈশ্বর ইচ্ছায়, হয় মানব-নিচয়
ফলভোগী তায়—কর্ত্তা জানে আপনায়।
অহং অহং ত্যাজ বিচক্ষণ ! জপ—
'তুঁহু তুঁহু' 'নাহম্ নাহম্' ; পাশমুক্ত
হবে, হৃদপদ্মে বসিবেন শান্তিদেবী !

গিরিশচন্দ্রের মনের অবস্থা একসময়ে এরূপ সংশয়াপন্ন ছিল যে, তিনি কোন মানুষের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হবে এবং তাকে গুরুবলে বিশ্বাস করতে হবে—এরূপ ধারণাও তিনি করতে পারতেন না। তিনি এমন ব'লেছিলেন শোনা গিয়াছে যে, 'মানুষ আবার মানুষকে মন্ত্র দেবে কি ? মানুষকে গুরুপদে, নিজে মানুষ হয়ে, বরণ করব কি করে ? শুনেছি জগৎগুরু শিব। যদি 'বাবা তারকনাথ' কখনও কাছে এসে গুরুরূপে আমাকে দীক্ষা দেন তবেইত মন্ত্র লাভ হবে। নইলে সামান্য মানুষ আবার কি করবে ?'

স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁহার মনের এই অবস্থাটি একখানি স্বরূপ চিত্র। উক্ত কালাপাহাড় নাটকেই আমরা একস্থলে দেখিতে পাই। গুরু করণের উদ্দেশ্য—ঈশ্বর লাভ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই বিশ্বাসহীন এবং অনেকের বিশ্বাস থাকলেও সেটা 'নলিনী দলগত জলমতি তরলম্' অর্থাৎ টলটলায়মন অবস্থা। গিরিশচন্দ্রেরও সেই অবস্থা এক সময় ছিল। এই দুইটী সংশয়াত্মিকা অবস্থার চিত্র আমরা ঐ কালাপাহাড় নাটক হইতে নিয়ে দিতেছি :—

কালাপাহাড়—মহাশয় ! ঈশ্বর আছেন ?

চিন্তামণি—খুব আছে, সত্যি আছে, তিন সত্যি আছে। আর কিছু আছে কি না জানি না !

কালাপাহাড়—কোথায় ঈশ্বর ?

চিন্তামণি—ঐ তেঁতুলগাছে।

কালাপাহাড়—এ পাগল না কি ?

চিন্তামণি—কেন পছন্দ হল না ? আচ্ছা, ভালকরে বলছি তোমার কাছে অন্তরে অন্তরে সর্ব্বত্র ! এই যে, এই যে ! হৃদয়েশ্বর এই যে আমার হৃদয়ে !

কালাপাহাড়—কই, কোথায় ঈশ্বর ?

চিন্তামণি—ওঃ ! তাই তুমি বেজার হয়েছ, না ? তুমি ডেকেছ, আর কেন ধেয়ে আসেনি ; শোন, আমার কথা বিশ্বাস কর—তুমি যেমন ডেকেছ অমনি এসেছে, তুমি চিনতে পার নি !

কালপাহাড়—তুমি দেখেছ, তুমি চিনেছ ?

চিন্তামণি—হ্যাঁ। গুরু দেখিয়ে দিয়েছে আর চিনি নি ?

কালাপাহাড়—গুরু কে ?

চিন্তামণি—গুরু কে ! গুরু লাখ্ লাখ্ আছে, চালা মেলাই মুস্কিল।

কালাপাহাড়—আচ্ছা বল্‌তে পার, শাস্ত্র কি সত্য ?

চিন্তামণি—সব সত্য, সব সত্য, সব সত্য—গুরুর কৃপায় বোঝা সব যায় !

কালাপাহাড়—মহাশয় ! গুরু—কেমন তিনি ?

চিন্তামণি—ঘটক হে, ঘটক, জুটিয়ে দেয় !

কালাপাহাড়—কি বুঁঝব ?—সকলই অন্ধকার !

চিন্তামণি—তা ত সত্য, গুরু না আলো জ্বেলে দিলে কি করে দেখবে ?

ক্ষুদ্র নর ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝিবে কেমনে
উপদেশ বিনে, তত্ত্ব কিবা স্বর্গ মর্ত্ত্য
রসাতলে, বুদ্ধিবলে নির্ণয় না হয়,
সংশয় সংশয়—মন পরাজয় ক্লান্ত
অশান্ত কল্পনা ভ্রমে ব্যাকুল বাসনা—
ক্ষিপ্তপ্রায় মত্তচিত ধায়, নিরুপায়,
দৃষ্টি নাহি চলে মোহ ঘোর আবরণে।
গুরুপদ সার, অন্য নাহি আর ; তারে
দুস্তর পাথারে নরে, গুরু বিনে কেবা ?
কর গুরু পদাশ্রয়, নিশ্চয় সংশয়
যাবে দূরে ; ভবপারে গুরু কর্ণধার—
ঈশ্বর বিরাজমান নর কলেবরে !

কালাপাহাড়—হায় অন্ধ-বিশ্বাস আশ্রয়, যুক্তিশূন্য
অনুমান ! যাহে বিশ্বব্যাপী কহে নর
কলেবরে বিরাজিত মানিব কেমনে ?
গুরু, গুরু, কেবা গুরু, কোথায়, কোথায় ?
কি প্রত্যয় কথায় তাঁহার ? মম সম
ক্ষুদ্র নর, আবদ্ধ এ দেহের পিঞ্জরে,
জন্ম মৃত্যু মাঝে, দুঃখে সুখে দোলে কয়
দিন, ক্ষীণ তনু পলে পলে, জীবনের
তাপে হবে লীন, ভবে চিহ্নমাত্র নাহি
রবে, আর সীমাশূন্য বিস্তার বিস্তার,
বিপুল সংসার—লক্ষ্য শূন্য পন্থাহারা—
কাহারে বিশ্বাস ? চিন্তা, অহো, রুদ্ধ
হয় শ্বাস, ঘোর ত্রাস, বিনাশ সম্মুখে !"

চিন্তামণি—ক্ষুদ্র নর, গুরু তোমা সম ; গুরু কল্প -
তরু ভবে, ভীরু জনে অভয়-প্রদানে
আবির্ভাব ধরা মাঝে, দীন নর-সাজে
সমাজে বিরাজে, নামে হৃদি তন্ত্রী বাজে,
চরণ রাজিব রাজে লইল স্মরণ
মোহের বন্ধন খোলে, সুখ দুঃখ ভোলে,
তম বিনাশনে ভাতে নবীন নয়ন !
গুরুকৃপা যার, তার কিবা অগোচর ?
গুরুর কৃপায়, অনায়াসে ইষ্ট-বস্তু
পায়, পূর্ণ হয় আশ, দূরে যায় ত্রাস,
অবিশ্বাস-তম নাশ জ্ঞানের প্রভায়

ঈশ্বরে বিশ্বাস, গুরুবাদের উপর আস্থা স্থাপন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী আজকালকার অনেকেরই মনে একটা অন্ধ বিশ্বাসের প্রভাব মাত্র। অর্থাৎ তার্কিক মন সমস্ত ধারণাই চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা তর্কযুক্তি দিয়ে বুঝে নিতে চায়। কোন বিষয়ে বিশ্বাস করাটাকে অন্ধ-সংস্কারের আশ্রয় গ্রহণ মনে করে। এমন কি অপ্রমাদী ঋষিরা যে সকল শাস্ত্র রচনা করে গেছেন, সেগুলিকে অনুসরণ না করে তর্কযুক্তি বলে সেগুলি অন্ধ-সংস্কার বা জাতিগত ভ্রান্ত বিশ্বাস এইরূপ বিবেচিত হয়। মহাজ্ঞানী পণ্ডিতরাও শাস্ত্রে বিশ্বাসবান হলেও তর্কযুক্তির আশ্রয় নিয়ে অনেক সময় সেই শাস্ত্র

বাক্যেরই বা নির্দ্দেশেরই বিরুদ্ধ আস্থায় বিশ্বাসবান হন। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

'দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।'

মহামায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার প্রভাবে 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' হয়। কিন্তু শেষে সেই সেই অধিকারী পুরুষ তত্ত্ব-বস্তুর প্রকৃত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিজ নিজ ভ্রম সংশোধন করিয়া লয়েন। যুগাচার্য্য যতিরাজ শ্রীবিবেকানন্দজী মহারাজও 'তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে' পর্য্যন্ত হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ, সর্ব্ব সংশয়ের ছেদ না হওয়ায় শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিয়াও প্রথম জীবনে Iconoclast বা কালাপাহাড়ের মত অবস্থা সম্পন্ন ছিলেন—অন্ততঃ তাঁহার সহাধ্যায়ী উত্তরকালের দর্শনাচার্য্য মহামণিষী ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার বিষয়ে এইরূপ ধারণা করিয়াছিলেন। শ্রীবিবেকানন্দজী সেই অবস্থায় বলিয়াছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞান Intellectual asset বটে, কিন্তু উহা যে বাস্তব সত্য তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস হয় না। যতক্ষণ না এই ভবিষ্যৎ যুগাচার্য্য যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, ততদিন বহু শাস্ত্রালোচনা করিয়াও উহা যে অভ্রান্ত সত্য তাহা ঠিক ঠিক বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা সর্ব্বশক্তিমান পরম দয়াল শ্রীভগবান যে মানব দেহে অবতীর্ণ হন এবং বেদান্ত কথিত জীবন্মুক্ত পুরুষের যে অস্তিত্ব আছে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তাই ধর্ম্মাচার্য্যগণের সহিত আলাপকালে প্রত্যেককেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, 'মহাশয়, ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কি? তাঁহাকে দেখা যায় কি?" কোন আচার্য্যই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া সদুত্তর দিতে পারেন নাই। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবই বলিয়াছিলেন—'আমি ত' দেখিয়াছি বটে। নরেন, তোমাকেও দেখাতে পারি। যেমন এই জিনিষটা এখান থেকে নিয়ে তোমার হাতে দিতে পারি, তেমনি করে তোমাকে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়ে দিতে পারি।' তাই শ্রীবিবেকানন্দজী বলিয়াছিলেন, His (Sri Ramakrishna's) life was a commentary to the Upanishadic Texts'. গুরু-শিষ্যে প্রকৃতভাবে জানাজানির পর তাঁহার ঐ ভাব পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়, তাই একদিন শ্রীঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'আজ থেকে আপনি যা বলবেন তাই আমি মেনে নেব অর্থাৎ অভ্রান্ত সত্য বলে বিশ্বাস করব!' উত্তরকালে নিজ-শিষ্যা সিষ্টার নিবেদিতাকে এক সময় লিখিয়াছিলেন, Follow Him, that old man never failed. যদিও নিজ বাক্যের উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা শিষ্য স্থাপন করিতেছে শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'তা কেন করবি রে! তুই আমার প্রত্যেক কথা যাচিয়ে নিবি; যেমন হাঁড়ির দোকানে হাঁড়ি কিনতে গিয়ে লোকে হাঁড়ি বাজিয়ে নেয়!'

গিরিশচন্দ্রের জীবনেও ঠিক এইরূপ সংস্কার ছিল। তাই তিনি তাঁহার রচিত কালাপাহাড় নাটকে নিম্নলিখিত কথোপকথনটি দিয়াছেন :—

কালাপাহাড়—শাস্ত্রছটা, ব্যাখ্যা-ঘটা, বাক্যের বিন্যাস
হতাশ-হুতাশে করে মানবে নিক্ষেপ।
ক্ষুদ্র নর শমনের ডর নিরন্তর
হৃদে জাগে। আকুল এ অকুল পাথারে—
সন্দেহ-সাগরে দোলে দুরন্ত হিল্লোল;
এই আশ, তখনি নিরাশ—মহাত্রাসে
ভাসে জীবকুল। রোদনের ধারা বহে
অনিবার, কে রাখিবে দারুণ শঙ্কটে?
কোথা, কোথা দয়াল ঈশ্বর। জীবে কৃপা
কই তাঁর? অকুল এ দুরন্ত পাথার!

মুকুন্দ—বিশ্বাস সবার ভিত্তি জানিহ নিশ্চয়:
বৎস, ত্যজ ভয়, গুরু-পদাশ্রয় কর
সার, সূর্য্যোদয়ে যথা নাশে অন্ধকার,
তেমতি তোমার মোহ-তম হবে দূর,
গুরুবাক্যে দৃঢ়মতি রাখ মতিমান!

কালাপাহাড়—কেবা গুরু, কোথা তাঁর স্থান? মম সম
মানবে প্রত্যয় হায় কেমনে করিব!
কেমনে জানিব বাক্য মিথ্যা নহে তাঁর!
কথায় প্রত্যয় আর নাহি হয়, দেখে
শুনে মন নাহি মানে! কই ভগবান?
মানবে মমতা কোথা তাঁর? কি প্রমাণ
তিনি বিদ্যমান? মতিমান! কহ, জ্ঞান
যদি, নহে বাক্য—বাক্যে জন্মেছে ধিক্কার—
প্রমাণ, প্রমাণ—কই কোথা ভগবান!

সন্দিগ্ধচিত্ত শিষ্য গুরুবাক্যে ঠিক ঠিক আস্থা স্থাপন করতে পারে না। তাই সন্দেহ রেখে গুরুর কথায় ধীরে ধীরে অগ্রগামী হয়। তাই অনেক সময় গুরুর আদেশ যাচিয়ে নিতে চায়। শ্রীবিবেকানন্দ ও গিরিশচন্দ্রের জীবনে কোন কোন সময়ে সন্দেহ দোলায় তাঁদের মন অবস্থিত ছিল। তাই কালাপাহাড়রূপী গিরিশচন্দ্র বলিতেছেন :—

কালাপাহাড়—যা বলছ, তোমার কথা যদি সত্য হয়, তা হলে ভাল বটে।

চিন্তামণি—ভাল মন্দ কিছু বিচার করিয়া দেখেছ কি? দেখেছ? না, দিন পাঁচ ছয় চক্ষু বুজে বসেছিলে, গোলাম ব্যাটা আসেনি কেন?

কালাপাহাড়—গোলাম কে?

চিন্তামণি—ঐ ঈশ্বর।

কালাপাহাড়—একথা নিয়ে ব্যঙ্গ ক'রছেন।

চিন্তামণি—ব্যঙ্গ ক'রছে কে? আমি না তুমি? বলছ—'ঈশ্বর', আর দু'দিন চক্ষু বুঝে বসে দেখা পাওনি বলে, একেবারে জেনে ফেলেছ—শাস্ত্র মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা। বাবা বেকুবী হয় বটে, তুমিও বেকুব, আমিও বেকুব, কিন্তু তুমি কিছু চুটিয়ে বেকুবী করলে।

কালাপাহাড়—কি, তোমার মত অন্ধ-বিশ্বাস করতে বল?

চিন্তামণি—দেখ, এত রুকো না, একটু ঠাণ্ডা হও! একবার স্থির হ'য়ে তোমার বেকুবীটা বোঝ! আমায় বলছ অন্ধ-বিশ্বাস, আমি আলোর মাঝখানে ব'সে আছি, আর চোখওয়ালা অবিশ্বাস নিয়ে তুমি ভূতের মত অন্ধকারে ঘুরছ। আমার অন্ধ-বিশ্বাসে আমি জগৎ পরিপূর্ণ দেখছি! চোখওয়ালা অবিশ্বাস নিয়ে তুমি হাঁপিয়ে মরছ!

কালাপাহাড়—যুক্তিহীন কথায় যার প্রত্যয় হ'তে হয় হোক্! আমি কখনও প্রত্যয় ক'রব না।

চিন্তামণি—আহা হা, কি যুক্তির চোট্! যে বিশ্বাসে ভগবান পাওয়া যায়, সে বিশ্বাস কানা? তোমার মত ধানকানা না হ'লে আর কেউ বিশ্বাস করে না।

কালাপাহাড়—যাও, যাও, আর বাক্যব্যয়ে আবশ্যক নেই। যে কথার মাথা-মুণ্ড নেই, তা প্রত্যয় করব কি করে?

চিন্তামণি—বেশ ভাই! ঈশ্বর যে আছেন এই কথাটারই মাথা-মুণ্ড নেই, আর দুনিয়ার যত কথা আছে, সব দশমুণ্ড রাবণ! আচ্ছা যাবইত, তোমার ঠেঙ্গে দুটো মুণ্ডওয়ালা কথা জেনে যাই।

কালাপাহাড়—এই সূর্য্য উঠেছে, এই দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ!

চিন্তামণি—সত্যি?

কালাপাহাড়—সত্যি নয়? দেখতে পাচ্ছ না?

চিন্তামণি—কি করে জানব বল? কাল রাত্রে ঘুমিয়ে দেখেছিলাম—হাতী চ'ড়েছি, তারপর কোথায় বা হাতী, কোথায় বা কি!

কালাপাহাড়—তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, স্বপ্ন আর জাগা বোঝ না?

চিন্তামণি—না চক্ষুওয়ালা অবিশ্বাসে তা বোঝা যায় না। যখন স্বপ্ন দেখেছিলেম, তখন মনে করেছিলেম, সত্যি দেখ্‌ছি; এখনও মনে করছি, সত্যি দেখ্‌ছি! চক্ষুওয়ালা অবিশ্বাসে দেখলে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যে, বোঝা যায় না; তবে অন্ধ-বিশ্বাস করতে বল—সে এক আলাদা!

কালাপাহাড়—কি বলছ?

চিন্তামণি—দেখ, একটা কথা তোমায় বলি;—একজন ফকির ছিল, রোজ দিনের বেলা ভিক্ষা করত আর রাত্রে স্বপ্নে রোমের বাদ্‌শা হ'ত। জেগে যেমন আজ এ বাড়ী ভিক্ষা করলে, কাল সে বাড়ী ভিক্ষা করলে, স্বপ্নেও তেমনি আজ এর গর্দ্দান নিলে, কাল ওবে তালুক দিলে। বলতে পার—তার কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে? বলবে—এটা গল্প হ'তে পারে—কিন্তু চাঁদ, তুমিও যদি স্বপ্নে সূর্য্য দেখ, দেখে মিথ্যা বলতে পার, তা হ'লে বল, তোমার সে সূর্য্য মিথ্যা, এ সূর্য্য সত্য।

কালাপাহাড়—স্বপ্নে কি কখনও মনে হয় না যে, স্বপ্ন দেখছি?

চিন্তামণি—জেগেও কি কখনও মনে হয় না যে, মিছে দেখছি? দেখ, চোখওয়ালা অবিশ্বাসে বড় ফ্যাসাদে ফেলে দিলে।

এই কালাপাহাড়ের অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়া স্বনামখ্যাত ব্রাহ্ম-আচার্য্য এলাহাবাদ কলেজের অধ্যাপক

শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী মহাশয়, যিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চিকাগোর ধর্ম্ম মহামেলায় প্রতিনিধি রূপে গিয়াছিলেন, দর্শকের স্থান হইতেই তারস্বরে বলিয়া ওঠেন, গিরিশচন্দ্রের স্থান Stage নহে, ধর্ম্ম মন্দিরের Pulpit. স্বনামখ্যাত মনীষিবর ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ও এই অভিনয় দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, গিরিশের প্রতিভা বয়োধিক্যেও স্তিমিত হয় নাই, এখনও সতেজ আছে। আমি গিরিশের প্রতিভার অনুরাগী।

গিরিশচন্দ্রের নিকট অন্ধ বিশ্বাস, চোখওয়ালা অবিশ্বাস এবং বিশ্বাস যে কিরূপ তাহা উপরোক্ত চিত্রগুলি হইতে বেশ অনুমান করা যায়। যাঁহারা ভক্তের স্থির সিদ্ধান্তটাকে, যাহা প্রকৃত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, তাঁহারা হয় ত এই সকল সনাতন সিদ্ধান্তকে আমল দিবেন না। কিন্তু মহাতার্কিক ও মহামনিষী শ্রীবিবেকানন্দ ও গিরিশ কি ভাবে আপনাদের সন্দেহরাশির চিরদিনের মত অবসান করিয়া গুরুবাক্যে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের মহামূল্য অবদান হইতে আমরা জানিতে পারি। বহু বিশ্বাসের পর তর্ক, যুক্তির উপর বিশেষ বিচার সহায়ে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়, তাহাকে উপেক্ষা করা চ'লে কি? সহজেই কি এই জ্ঞান-ভক্তি সমন্বয় তত্ত্বাধিকারী মহামণিষীদ্বয় 'গুরু-পদ-ধারণ, আত্ম সমর্পণ' করিয়াছিলেন? জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস বলেই শ্রীরামকৃষ্ণরূপী মহাহ্রদে এই দুই মহানদের সম্মেলন হয়, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীবিবেকানন্দের জ্ঞান, ভক্তি যেমন বহু বিচারের পর বিশ্বাসের উপর স্থাপিত হয়, শ্রীগিরিশচন্দ্রের মহাতার্কিক সন্দেহ দোলায় দোদুলামান মনও বাহিরে প্রচ্ছন্না, অন্তরে অন্তঃশীলা ভক্তির প্রবাহিনী যুক্ত থাকিয়া সেইমত প্রকৃত বিশ্বাসের উপরই স্থাপিত। 'গুরু মিলে লাখে লাখ, চ্যালা মিলে না এক' এই তত্ত্ব কথা এখানে হামা খাইয়াছিল। শিষ্যের মত শিষ্য, এই দুই মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু-ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া জগতে অনন্য সাধারণ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীবিবেকানন্দের "গাই গীত শুনাতে তোমায়" নামক অন্তরের গভীরতম দেশ হইতে উত্থিত মর্ম্ম সঙ্গীতে শ্রীগুরুবাক্যে বিশ্বাস ও শ্রীগুরুতে অনন্য সাধারণ ভক্তি প্রদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীগিরিশের মহাদান 'বিল্বমঙ্গল চরিত' শ্রীবিবেকানন্দজী বহুবার পাঠ করিয়াছিলেন এবং একথাও প্রচার আছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, "গিরিশবাবুর বিল্বমঙ্গলের ন্যায় জ্ঞান-গ্রন্থ (অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদগ্রন্থ) আমি কোথাও কখনও পাঠ করি নাই।" 'ভক্তমাল' নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনীর কঙ্কাল মাত্র আছে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস-পূর্ণ সরস লেখনী উহাতে রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা লাগাইয়া উহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কলিকাতার টাউন হলে নাগরিকদের অনুষ্ঠিত মহতী গিরিশচন্দ্র-স্মৃতি সভায় বাগ্মিবর, জ্ঞানী ও ভক্ত, বঙ্গের অন্যতম রাষ্ট্রীয় নেতা (পরলোকগত) বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় গিরিশ-স্মৃতি-পূজা করিতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "গিরিশচন্দ্র নিজে বিল্বমঙ্গল ছিলেন; তাই তিনি বিল্বমঙ্গলের মহনীয় চরিত্র ঐরূপ দেদীপ্যমানভাবে নাটকে অঙ্কিত করিয়াছিলেন।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, গিরিশচন্দ্র আমাদের মত সাধারণ মানুষের ন্যায় সংসারের সাধারণ ধূলা কাদা গায় মাখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ধূলা কাদা মাখা যুক্ত দুই পাখাবিশিষ্ট গিরিশরূপী পাখী আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া যখন পক্ষদ্বয় ঝাড়িতে থাকেন তখন এ সংসারে স্বর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল। বারান্তরে গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার বিল্বমঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। উক্ত মহতী স্মৃতি-সভায় অধুনা পরলোকগত বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার অভিভাষণের প্রারম্ভেই গিরিশচন্দ্রের পরিচয় একটী কথাতেই দিয়াছিলেন এবং ঐ অনন্যসাধারণ বাক্যটী বিপুল শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ের অন্তস্থলে গিরিশচন্দ্রের পরিচয় খোদিত করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, আপনারা গিরিশচন্দ্রকে নট, নাট্যকার, নাট্যশালার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা বা অধ্যক্ষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখেন ও শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে ঐ সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াও আর এক শ্রেষ্ঠতরভাবে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা অর্পণ করি। সে কথাটী এই, "গিরিশচন্দ্র ক্ষ্যাপা মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে।" তাই না যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীগিরিশচন্দ্রের ভক্তি ও বিশ্বাস পাঁচসিকা পাঁচ আনা বলিয়া আনন্দ পাইতেন, যাহার দু'এক আনাও সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না। বক্ষ্যমান প্রবন্ধের লেখক স্বকর্ণে শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল,

বিবেকানন্দ গিরিশের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে কথোপকথন বা তর্ক-বিচার। শেষে গিরিশচন্দ্রের ভবন ত্যাগ কবিবার সময় সোপানপথে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, আমার গুরুর এমন শিষ্য অন্ততঃ একজন আছেন, যাঁহাকে বিশ্বাসের অটল পাহাড় হইতে কেহই নামাইতে পারিবে না। গিরিশের সহিত স্বামীজীর এই কথোপকথন স্বামীজী false talk পর্য্যায় অভিহিত কবেন। ভক্তবীরদ্বয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ এই false talk যাহা সাধারণেব নিকট গুরুতব সমস্যার আলোচনা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল তাহা পুরান কথিত গজ-কচ্ছপের যুদ্ধের সহিত একমাত্র তুলনীয় হইতে পারে। শ্রীস্বামীজী আমেরিকা হইতে এক পত্রে 'উদ্বোধন' সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতকে লেখেন, "আমাকে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনেক কাগজ পেন্সিল সঙ্গে দিয়েছ, আমি ভবঘুরে, কোথায় কখন আছি বা থাকি তার স্থিরতা নেই। শ্রীজগদম্বা যেখানে লইয়া যাইতেছেন সেইখানেই যাইতেছি, প্রবন্ধ লেখবার কি সময় আছেরে ভাই। এক কাজ কবিস্, পাড়ায় 'G. C.' আছেন (গিরিশচন্দ্রকে স্বামীজী G. C. নামেই অভিহিত করিতেন) তাঁর কাছে খাতা পেন্‌সিল নিয়ে ব'সবি। তিনি যা বলবেন তাই টুকে নিয়ে প্রবন্ধাকারে উদ্বোধনে ছাপ্‌বি! স্বামীজার শ্রীগুরুর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা থাকলেও মাত্র "গাই গীত শুনাতে তোমায়" নামক সঙ্গীতটীর উল্লেখ করিয়াছি। এখানে গিরিশচন্দ্রের গুরুভক্তি ও গুরুর প্রতি বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীগুরুব উদ্দেশে শ্রদ্ধা দান বা পূজা দান উপলক্ষ্যে রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' নামক কবিতার তিনটী stanza উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

'ভবে ভ্রান্ত, অশান্ত তরঙ্গে দোলে নর
অজ্ঞান আঁধারে
সত্য-তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অন্তর,
অসহায় বুদ্ধিবলে নারে;
তর্ক দ্বন্দ্ব শাস্ত্রের বিচারে—
সন্দেহ উদয় বারে বারে;
দিতে স্নিগ্ধ পদছায়া, ধরায় ধরেছ কায়া,
ঐক্য জ্ঞান প্রচাব সংসারে,
মিটে দ্বন্দ্ব, ঘুচে সন্দ বিশ্বাস সঞ্চারে।
কর্ম্মফলে ভ্রাম্যমান জন্ম-মৃত্যু মাঝে,
নহে নিবারণ,
দিয়ে স্থান ভগবান্ শ্রীচরণ রাজে
তার নরে কপাল মোচন!
নিরন্তর ত্রিতাপ দহন,
দণ্ড করে পশ্চাতে গমন;
কর্ম্মফল নিজ দেহে, সহিয়া অপার স্নেহে,
কর'দূব শমন-শাসন,
বার-ত্রাস, হর পাশ ত্রিতাপহরণ।
মোক্ষলুব্ধ হয় চিত্ত তোমার পবশে,
ভোগে তৃণ জ্ঞান,
প্রেম ভ্রমে কাম-বসে আর নাহি রসে,
দুঃখ সুখ নেহারে সমান;
ঠেলে পায় ধন-জন-মান,
আত্ম তত্ত্বে নিয়োজিত প্রাণ;
বিবেক হৃদয়ে ফোটে, বিষয় বন্ধন টোটে,
বৈবাগ্য-আলোক দৃশ্যমান,
আত্মা হেবে আপনারে—নহে অনুমান!

শ্রীগুরুদেবের সহিত জানাজানি হইবাব পব গিরিশচন্দ্র পূর্ণভাবে শ্রীবামকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পন করেন। প্রকাশ আছে, অহেতুক কৃপাসিন্ধু তাহার জন্য 'ব-কলমা' লইয়া গিরিশচন্দ্রকে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করাইয়াছিলেন। সেই সময় গিরিশচন্দ্র একদিন শ্রীবামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'নট ও নাট্যকারের কার্য্য করিয়া আর লাভ কি?' তাহাতে অপার কারুণিক এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষিকুল শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ বলেন, 'না রে না, ওটা ছাড়িস্ নি, ওটা রেখে দে; ওতে লোকশিক্ষা হবে।' তাই গিরিশচন্দ্র জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত নট ও নাট্যকারের জীবন অবলম্বন করিয়া গুরুআজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

কালাপাহাড় নাটক হইতে গুরু, ঈশ্বব, ভক্তি, বিশ্বাস এবং এই সকলের তত্ত্বকথা, যাহা কখনও অচল হইবে না, বারান্তরে উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা প্রথমে যে বিষয় উথাপন করিয়াছিলাম, অর্থাৎ মহাপতিত ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্ধার পায কি না এবং সাধু ও পাপী শ্রীভগবানের নিকট সমানভাবে কৃপা-পাত্র তাহা

এই গিরিশ প্রসঙ্গে এখানে বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব এবং শ্রীবিবেকানন্দ ও শ্রীগিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কি ভাবে কৃপার পাত্র ছিলেন তাহা উল্লেখ করিব। প্রবন্ধারম্ভেই উল্লিখিত হইয়াছে, 'শ্রীভগবান সাধুরও বটে, পাপীরও বটে।'

গিরিশচন্দ্র যখন অন্তর খুলিয়া নিজ স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নিজ গতি কি হইবে জিজ্ঞাসু হয়েন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনেক কথা বুঝাইয়া শেষে নিম্নোদ্ধৃত গল্পটী বলিয়া গিরিশকে অভয় দান করেন।

তুই আমার 'ছিপ ভাঙ্গা ছেলে'। কথাটা হচ্ছে এই, এক বড়লোকের দুটী পুত্র ছিল। একটী সুপণ্ডিত, এম, এ, পাশকরা, আর একটী ঠিক তার বিপরীত, দিনরাত যাত্রা থিয়েটার ক'রে বেড়ায়, মাত্র আহারের জন্য বাড়ীতে আসে। পাশকরা ছেলেটী বাপের অনুগামী, দিনরাত পিতার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকে, আর ছোট ছেলেটীর স্বরূপ এক কথায় যাকে বলে 'বিশ্ব-বখাটে'। একদিন কি জানি কেন সেই বড়লোকের ইচ্ছে হল যে, দুটী ছেলেকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে যাবেন। অতি আদর যত্ন জানাইয়া কোন রকমে ছোট ছেলেকে বাড়ীতে ডাকাইয়া অন্ততঃ একদিনের জন্যও বাগান বেড়াইবার প্রস্তাবে রাজী করিলেন, কারণ ছোট ছেলে ভয়ে বাপের কাছে আদৌ আসিত না। গাড়ী ক'রে দুই ছেলে নিয়ে বাগানে পৌছিবার পর বড়ছেলে বাপের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের সমস্ত গাছপালা, বাড়ী, ঘর-দোয়ার ও নানা বিষয়ে তদ্বির করতে লাগল। ছোট ছেলে একদৌড়ে তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে মালীর কাছ থেকে একগাছা ছিপ ও মাছ ধরবার সরঞ্জাম নিয়ে একেবারে পুকুরের পাড়ে গিয়ে ব'সল। অনেকক্ষণের পর জল খাবারের সময় বাপ ছোটছেলের খোঁজ নিলেন, বল্লেন, হতভাগা গেল কোথায়? জলখাবারের সময় উত্তীর্ণ হল, এখনও সে কাছে এল না একদিনের জন্য এখানে এসেও উৎপাত। তাকে ডেকে নিয়ে এস। বড়ভাই বার বার ডাকলেও সে এল না। শেষে বাড়ী ফেরবার সময় উপস্থিত হ'য়েছে দেখে, তার ওপর জল খাওয়া হ'লনা এজন্য অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে সেই পুকুরের ধারে গিয়ে ছোটছেলের হাতের ছিপ ভেঙ্গে দিয়ে বল্লেন, যথেষ্ট হ'য়েছে এখন বাড়ী চল, এখানেও সমানভাবে জ্বালালি। এই ব'লে হাত ধ'রে তাকে টেনে নিয়ে এসে উভয় ছেলেকে নিয়ে গাড়ী ক'রে বাড়ী ফিরলেন। গিরিশ, তুই আমার সেই ছিপ ভাঙ্গা ছেলে—ছোট ছেলে। আর নরেন আমার এম-এ পাশকরা বড় ছেলে। যাবার সময় তোকে আর নরেনকে একসঙ্গে এক গাড়ীতে নিয়ে যাব।"

অদ্য এই পর্য্যন্ত। জয় রাম কৃষ্ণ।

মহিম দা

শ্রীপরিমলরাণী রায়

গ্রামের মাঠ…

বৈকাল বেলায় পাঁচবন্ধুতে বাহির হইয়াছি বেড়াইতে…আমি, সুরিন, মঙ্গল, শান্তিরাম আর মহিমদা।

শীতকাল; মাঠ ভরিয়া কড়াইশুঁটীর ক্ষেত, রাই সরিষা আর কৃষ্ণতিল গাছ শীতের স্পর্শ পাইয়া সতেজে বাড়িয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট লাল, নীল, সাদা আর অজস্র হলুদ ফুলে মাঠের বুকে ঝলকানি উঠিযাছে বিচিত্র রঙের। দিনান্তের আবীর-রাঙা সূর্য্য অস্ত যাইতেছে আকাশের শেষ প্রান্তে; তাহারই একটু নিস্তেজ সোনালী রোদ ঝিল্‌মিল্ করিতেছে সুউচ্চ গাছগুলির মাথায় মাথায়।

পরিবেশটুকু চমৎকার! কিন্তু, মধুলীড়ের মত আমরা আসল জিনিষই আহরণ করিতে লাগিয়া গেলাম। ফুল বাদ দিয়া সযত্নে কড়াইশুঁটীই তুলিয়া কোঁচড ভর্ত্তি করিতে লাগিলাম।

মহিমদার চোখ দুইটি কিন্তু কি এক গভীর পুলকে নাচিতে লাগিল। আকাশ আর মাঠের আগাগোড়া বারবার তাকাইতে লাগিল।

তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, অস্তগামী সূর্য্যের সিঁদুর রাগে শস্য-শ্যামলা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর রাঙাইয়া—বাস্, এইখানেই তাহার উচ্ছ্বাসের ইতি হইয়া গেল। স্মৃতি-শক্তি তাহার অসীম দৈন্যে মাথা কুটিয়া মরিল। থপ্ করিয়া মহিমদা বসিয়া পড়িল। আকুলভাবে যেন মনের গহন কন্দরে তন্ন তন্ন করিয়া কি খুঁজিতে লাগিল।

কিন্তু ইহা তাহার কল্পনা প্রসূত নহে। সৌন্দর্য্যের রূপ আঁকিয়াছিল সাহিত্যিক; পাঠশালার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র যে কবে কোথায় কোন পাঠ্য-পুস্তকের পাতায় তাহাই পড়িয়া গভীর দাগ আঁকিয়া বসিয়াছিল তাহার মনে…তাহারই আবৃত্তি।

কি একটা শব্দ হইল কোথায়, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দেখিলাম, গ্রামছাড়া আমি বহু দূরে আমার বাসার বিছানায় শুইয়া আছি। গ্রাম, মটরক্ষেত, মহিমদা—সব মিথ্যা। বহুদিন আগেকার শৈশবলীলা ছাই-চাপা আগুনের মত ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল অন্তর্মনে; বাহ্যিক অবচেতনের সুযোগে তাহাই স্বপ্নরূপে স্মৃতির দুয়ারে ক্ষণকালের জন্য উঁকি দিয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে প্রাণটা যেন ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। কতকাল তাহাদের দেখি নাই; কত যুগ যুগান্ত যেন তাহাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি কোথায়?

ঘটনাচক্রে গ্রাম ছাড়িয়াছিলাম পনরো বৎসর আগে। কাজ-কর্ম্মের চাপে এই দীর্ঘকাল একটানাভাবে কলিকাতায়ই পড়িয়াছিলাম। ইচ্ছা থাকিলেও বাড়ী ফিরিবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। তেমন গরজও করি নাই। আমি ছাড়া গ্রামের বাড়ীতে আমার বলিয়া আর কেহ নাই। বাড়ী একটু ছিল—কাঁচা এবং খড়ের। লোক-ছাড়া সে বাড়ীও এতকাল প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। মাটীটুকুই শুধু পড়িয়া আছে। ইহারই বুকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই জন্যই বোধকরি মায়ের মত মমতায় সন্তানের আশা পথ চাহিয়া ঝড়-জল সহিয়া আজিও টিঁকিয়া আছে। তাহারই আকর্ষণ অনুভব করিলাম তীব্রভাবে, আর সেই সঙ্গে প্রথমেই মনে পড়িল আর একজনকে। পনরো বছরের স্মৃতির দুয়ারে অনেকে অনেক কিছু লইয়াই ভীড় করিয়া দাঁড়াইল কিন্তু, তাহাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম হইয়া ফুটিয়া উঠিল মহিমদা। চাঁদের পাশে তারার মত সেই সঙ্গে উপস্থিত হইল আরও দুই চারিজন।

বাল্যকালে প্রণয় ছিল তাহাদের সঙ্গে—সুরিন, মঙ্গল, শান্তিরাম আর মহিমদা। একান্ত অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু সব এবং দৌরাত্ম্যেরও সাথী। সকলের চেয়ে মহিমই ছিল বয়সে দুই তিন বছরের বড়। সে সম্মানটুকু তাহাকে দিতাম আমরা 'মহিমদা' বলিয়া। সকল দৌরাত্ম্য এবং অপকর্ম্মের গুরু ছিল সে; হাতে ধরিয়া আমাদের শিক্ষা দিত। তাহাকেও একবার দেখিবার জন্য প্রাণটা কেমন ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়াই একরকম ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

গ্রামের নিজস্ব রেলষ্টেসন নাই। যেখানটায় উঠানামা

করিতে হয় তাহার নাম ঝাউতলা। পনরো বৎসর পরে আবার সেই ঝাউতলা আসিয়া নামিলাম। প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু কাপড় চোপড় ভরা ছোট একটি সুটকেস হাতে আর একটি ছাতা

প্রথমেই পড়িল ঝাউতলার বুড়া শিবের মেলা। নামকরা যায়গা। কোনকালে কাহার দ্বারা এই বুড়াশিব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার ঠিক নাই। খোঁজ করিবার আবশ্যকও হয় না। দেবতা কিন্তু বহু পুরাতন ও জাগ্রত। অনেকে নাকি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তবে সেই প্রত্যক্ষদ্রষ্টাকেও পাওয়া মুস্কিল। তাহা হউক, ভয় এবং ভক্তির তাহাতে হ্রাস নাই। কাজেই, মানতশোধ আর ভোগের ব্যবস্থা চলে পুরাদমেই। সেই উপলক্ষে সমস্ত বৈশাখ মাসটা ভরিয়া প্রতি শনি মঙ্গলবারে জমকালো মেলা বসে; বহুবিধ অসংখ্য দোকান-পশারের সঙ্গে দর্শক এবং ক্রেতায় মিলিয়া লোক সমাগমও হয় বিস্তর।

আমরাও আসিতাম। পাঠশালা পলাইয়া আসিতে হইত। প্রথমেই গিয়া মহিমদা টানিয়া লইয়া যাইত জুয়ার আড্ডায়। জুয়ারী কালু সেখ ফেরেব্বাজ নামকরা জুয়ারী। বাবরী চুলের ঝাঁকড়া মাথা আর গুণ্ডার মত কালো কুচকুচে বিরাট দেহটা ঝাঁকাইয়া জুয়ার ছক পাতিয়া বসিয়া থাকিত পুকুরপাড়ের ঝাউগাছটির তলায়।

জুয়াখেলাটা ততখানি অন্যায় বলিয়া ভয় পাইতাম না, ভয় হইত বাড়ীর অভিভাবক বাপ মার শাসনের। একে তো পাঠশালা পালাইয়াছি; তারপর আবার কোনরকমে তাঁহাদের কানে যদি যায়, সর্ব্বনাশ! অকাতরে মহিমদাকে অনুরোধ করিতাম, দোহাই তোমার মহিম দা! ওসবে দরকার নেই; বাবা মা মারবে। আরে ধ্যেৎ, মৃদু তাড়া দিয়া মহিম দা বলিত, কুছ্ পরোয়া নেই; কারো টের পাবার জো আছে নাকি? ধর্ আর এক কিস্তি এই ঘরে। জোর করিয়া হাতখানা টানিয়া ছকের উপর পয়সা ধরাইয়া দিত—কিন্তু…

পাকাজুয়ারীর হাতে পড়িয়া খেলায় শুধু হারিয়াই যাইতাম। ভয়ঙ্কর রাগ হইত মহিদার উপর। উহার জন্য শেষ পয়সাটি যখন খোয়াইতাম, তখন আর সামলাইতে পারিতাম না। মহিমদাকে হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়াই—

ওদিকে আনন্দে কালু রাঙা দাঁত বাহির করিয়া ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিত, আর এক চা’ল খোকাবাবু! ইচ্ছা হইত একটি থাপ্পড়ে তাহার মুণ্ডটি পাত করিয়া দিই। মহিমদা কিন্তু রাগিত না। বরং হারিয়াও হাসিত। উল্টে সেই আমাদের টানিয়া লইয়া যাইত। নিরিবিলি একটা জায়গায় আসিয়া টাকার একটি থলি বাহির করিয়া দেখাইত। কালু জুয়ারীর থলী, মহিমদা খেলার সুযোগে সরাইয়াছে।

সকলেই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিতাম। চুরি…অ্যাঁ! মহিমদা কিন্তু ইহাতে অন্যায় বা অপকর্ম্মের গ্লানি গায়ে মাখিত না একটুও; বরং কৃতিত্বের গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়াই আমাদের পিট চাপড়াইয়া বলিত, যেমন জোচ্চোর, তেমন ঘা মেরেছি; শালা, খাও এখন কলা। একটু থামিয়া আবার বলিত, শালা কি সোজা ধড়ীবাজ? শুধু ঠকায়, সারাদিন ভোর মানুষগুলোকে কেবল ঠকাচ্ছে, ওর যাওয়াই মঙ্গল। আপশোষের সঙ্গে কালুর উপর ঝলকাইয়া উঠিত কেমনই একটা বিজাতীয় রাগ, আর প্রতারিত মানুষগুলির উপর একটু সহানুভূতিও…বোধ করি সমব্যবসায়ীসূত্রে।

সমস্ত দিন ভরিয়া মেলায় আরও কত রকমের দৌরাত্মই যে মহিমদা করিত! সকাল বেলায় সেই যে দুইটি ভাত খাইয়া বাহির হইত, সারাটা দিন আর ভাতের কথা, বাড়ীর কথা কিছুই যেন তাহার মনে হইত না। বাজার ভরিয়া টো-টো করিয়া ঘুরিত কিন্তু, তাহাতে ক্লান্তি বোধ করিত না একটুও; আরও স্ফূর্ত্তি হইত। মেলা হইতে কিছুতেই বাহির হইতে চাহিত না। সকলে মিলিয়া জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া বাহির হইতাম বৈকাল বেলায়। সেই মেলা। বাল্যলীলার মহাক্ষেত্র, অপকর্ম্মের সাথে আনন্দের উৎস… ভাবিতে ভাবিতে নিজের অজানিতেই আসিয়া পড়িলাম ঝাউতলায়। সেই ঝাউতলা…চাহিয়া দেখিলাম, গাছটি আজিও সগর্বে মাথা খাড়া করিয়া তেমনইভাবে দাঁড়াইয়া আছে যেন আমাদেরই সেদিনকার কার্য্যকলাপের ইতিহাস বহন করিয়া।

কিন্তু, তাহার তলায় সে জুয়ার আড্ডাটি আর নাই, সে কালু জুয়াড়ীও নাই! বোধ করি কোন্‌কালে মরিয়াই গিয়াছে এবং তাহারই সঙ্গে তাহার একান্ত একলার আড্ডাটিও অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন সেখানে যেন কাহারা

একটি সোডাওয়াটারের ফাউণ্টেন বসাইয়াছে। অবিরত তাহা হইতে নানারূপ মিশ্র একটা কর্কশ শব্দ উথিত হইতেছে এবং বোতলের মুখখোলার খটাখট্ একটানা বিকট আওয়াজে কাণ ঝালাপালা করিয়া অসহ্য বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত মেলা ভরিয়া মানুষের ঠাসাঠাসি, ঝামেলা, চীৎকার, গণ্ডগোল এবং বিশৃঙ্খলা···কিছুই আর ভাল লাগিল না। মেলাটার উপর মনের ভিতব বিতৃষ্ণায়ই বাড়িয়া উঠিল। বাড়ী আসিবার আনন্দটা আহত হইল এখানে আসিয়া এই প্রথম। গ্রামের মুখে রওনা হইলাম ভারাক্রান্ত মনে। আধমাইলটাক জমিদারের পাকারাস্তা, তাবপর আরম্ভ হইয়াছে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কাঁচা সড়ক; দুই মাইল বিস্তৃত মাঠেব বুক চিরিয়া এ-গ্রাম হইতে ও-গ্রামে গিয়া মিশিয়াছে। তাহারই মাঝখানে নন্দেশ্বরীর বিল।

বহুকাল মজিয়া গিয়াছে; অতীত গৌরবের চিহ্ন বহন করিয়া শুধু একটি খাদ পড়িয়া রহিয়াছে মাঠেব এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত। বাঁশের সাঁকো দিয়া বিলের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে পারাপারের রাস্তা; সাঁকোর নীচ দিয়া পশ্চিমমুখে বিল গিয়া বহুদূরে কোথায় নদীতে মিশিয়াছে।

এইখানে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলাম। বাল্যকালের কতদিনকার স্মৃতিমিশানো রহিয়াছে এই বিলের বুকে, বিশেষ করিয়া এই জায়গাটিতে, প্রতিদিন মেলা দেখিয়া যাইবার বেলায়।

পাঁচবন্ধু আসিয়া এইখানে বসিতাম। নদীর জোয়ারেব জল উঠিয়া আসিত বিলের খাদ বাহিয়া। এদিক ওদিক বিলের সীমান্ত পর্য্যন্ত ধানের ক্ষেত কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ এবং নিবিড় কৃষ্ণ অগভীর জলস্রোত বৈশাখের কচিধানের চারাগুলির শিষ্ ডুবাইয়া ঢেউ খেলিত; রাস্তার মাটী ক্রমে ঢালু হইয়া গিয়া মিশিয়াছে বিলের কিনারায়। বৈশাখের নূতন জলের ছোঁয়ায় গাঢ় সবুজ কচি দুর্ব্বাদলগুলি গজাইয়া উঠিয়াছে নিবিড় ঘন হইয়া, মহিমদা আসিয়াই তাহার উপর গড়াইয়া পড়িত। কচিঘাসের শীতল স্পর্শটুকু যেন নিঙড়াইয়া লইত সর্ব্ব অঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া; গভীর পরিতৃপ্তিতে তাহার চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া পড়িত, আঃ, কি আরাম! চোখ বুজিয়া বোধ করি বাহিরের এই তৃপ্তিটুকু পৌছাইয়া দিত প্রাণের পবলে। তারপর, সহসা পকেট হইতে বাহির করিত একটি সিগারেটের প্যাকেট, খুলিয়া প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া দিতে দিতে বলিত, নে ধরা, মজা ক'রে এখানে বসে দোমাই আগে;- মেলা হইতে সত্যকেনা, এক পয়সায় দশটা। অদ্ভুত ভঙ্গীতে মুখ দিয়া বিচিত্র রকমে ধোঁয়া ছাড়িতাম। বিড়ি তামাকের মত 'ছ্যাবলা' এবং সস্তা জিনিষ তো নয়? ইহা সিগারেট, খাঁটী বিলাতী জিনিষ। পথ-চলতি মানুষগুলিকে শুনাইয়া, ডেইলি আমার কতগুলো ক'রে সিগারেট লাগে জানিস্? জানিতাম, কিন্তু ভাঙিলাম না, সে আমাদের ঘরের কথা; বলিয়া উঠিতাম, যে রকম খরচাটা তোমার, তাতে এক প্যাকেট তো লাগেই। তারও বেশী রে. ঢের বেশী, সগর্ব্ব তাচ্ছিল্যে মানুষগুলির দিকে চাহিয়া বলিত। আস্তে জবাব দিতাম, সিগারেট না কচু খাই; আস্ত একটা বিড়িও জোটে না; গোড়া কুড়িয়ে খেতে খেতে তো 'জান' যায় বাবা—

ওদিকে ঈশাণ কোণের গা ঘেঁসিয়া কালবৈশাখীর মেঘ উঠিতে সুরু করিত।

ক্রমে জমিয়া জমিয়া কালো কুচ্‌কুচে হইয়া উঠিত যেন কাকের ডিম ছড়াইয়া দিত; মেঘের শীতলতা মাখিয়া ঝির্‌ঝির্ করিয়া হাওয়া বহিত; কালো মেঘের বুক চিরিয়া লিক্‌লিক্ করিয়া বিদ্যুৎ চমকাইত; আনন্দের সঙ্গে আমাদের বুক একটু কাঁপিয়াও উঠিত। মহিমদার মনে কিন্তু মেঘ বিদ্যুৎ ত্রাসের সঞ্চাব করিতে পারিত না, আনিত শুধু বিস্ময় আর মোহ; সেই জন্য মুগ্ধ চোখে চাহিয়া থাকিত।

বাড়ী যাইবার জন্য সকলে মিলিয়া তাহাকে তাগিদ দিতাম। সে উঠিত না কিছুতেই। কিসের এক অব্যাহত টানে বসিয়াই থাকিত। তাহাকে ছাড়িয়া আমরাও যাইতে পারিতাম না। বৈশাখের নূতন মেঘ গলিতে আরম্ভ করিত। মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটাগুলি শীলের কুঁচির মত গায়ে বিঁধিত। আমরা প্রায় দৌড় দিতাম। মেঠো হাওয়া আর নূতন বৃষ্টি লাগাইতে লাগাইতে মহিমদা ধীরে-সুস্থে পা বাড়াইত।

আজ আর সে জায়গা আমার মনে একটুও তৃপ্তি দিতে পারিল না। বরং তিক্ত ও বিস্বাদই বোধ হইল। সে মাধুর্য্য যেন এখান হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। নিতান্ত

গন্ধময় বস্তিবের নীরস রূঢ়তায় ঝলসাইয়া উঠিয়াছে একেবারে অথচ, সেদিনকার মত আজিও সব তেমনই রহিয়াছে কিন্তু, উপভোগের কোন কিছুই নাই যেন। বোধ করি আমারই সে প্রাণ নাই। আরও হাসি পাইল, সেদিনের সেই 'ছেলেমী'র কথা মনে করিয়া। আর লজ্জাও হইতে লাগিল, সেই সব ছ্যাবলামীর কথা ভাবিয়া। সেই সংবয়স্ক লোকগুলির সামনে সেই কচি বয়সে সিগারেট মুখে দিয়া টানা…ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, কি অভদ্রতা, চূড়ান্ত বখাটেপনা বলিয়াই সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম।

এ জায়গা ছাড়াইয়া খানিকটা আগাইতেই গ্রামে ঢুকিবার মুখ, পাশে সনাতন মণ্ডলের বাড়ী, একখানা মাত্র খড়ের কুঁড়ে, তাহার সঙ্গে একটু চালা খাটাইয়া রান্নার ব্যবস্থা। চালের সহস্র ছিদ্র দিয়া বৃষ্টির অজস্র জল কিছুতেই মানাইত না। আর পাকাটির সঙ্গে ছেঁড়া মাদুর ঝুলাইয়া দেওয়া বেড়ায় অন্দরের আবরু রাস্তা হইতে কোনমতেই রক্ষা হইত না।

সনাতন মজুরী খাটিয়া খাইত। পর পর দুই দিন খাটিয়া কিছু রোজগার করিত। একদিনেই আম, কাঁঠাল, আনারস, ইলিশ মাছ আর একটা কচ্ছপও কিনিয়া আনিয়া পরিপাটীরূপে আহার করিয়া তাহা নিঃশেষ করিত। যতক্ষণ ঘরে একটা দানা থাকিত, ততক্ষণ আর কাজে যাইত না। দুই একদিন উপবাসও করিত। পেটের তাত অসহ্য হইলে, তারপর আবার একদিন বাহির হইত। যেমন অপব্যয়ী, তেমনি কুঁড়ের বাদশা।

ছেলেবেলায় তাহারই বাড়ী আসিয়া লুকাইয়া তামাক খাইতাম। গাঁজা খাওয়ার কলিকায় সনাতন বেশ করিয়া তামাক সাজিয়া দিত।

আমরা সবাই হাতে খাইতাম এবং দম দিয়াই ঝাঁঝে মুখ বিকৃত করিয়া উঠিতাম, কাশির বেগে চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিত; জিব চুয়াইয়া লালাও ঝরিত। মহিমদা কিন্তু দম কষিত মরি বাঁচি করিয়া, কিছুই তাহার হইত না। পাহাড়ের মত বুক খাড়া করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া একটু অবহেলা দেখাইত। হুঁকা না হইলে তাহার চলিত না। শূদ্রের হুঁকায়, কায়েতের ছেলে—সনাতন কুণ্ঠার সঙ্গে আপত্তি জানাইত। মহিমদা মানিত না। হুঁকায় মুখ লাগাইয়াই দম করিয়া বলিত, "রেখে দে তোর জাতধর্ম, তুইও মানুষ, আমিও মানুষ; তা ছাড়া, তোদের মত ঠুনকো মাটীর হাঁড়ী নয়; কায়েতের জাত, নীরেট পাকা পোক্ত।"

সেই সনাতন মাটীর হাঁড়ীর মত ঠুনকো জাতিও বোধ করি বাঁচাইয়াই চলিয়া গিয়াছে। ঘর-দুয়ারও তাহার ধ্বংস হইয়া জঙ্গলে অস্তিত্ব হারাইয়াছে। ভিটার উপর নিবিড় লতাগুল্ম জট পাকাইয়া উঠিয়াছে। হয় তো, তাহার বংশধরেরা অন্য কোথাও উঠিয়া গিয়াছে। নয় তো নিষ্প্রদীপই হইয়াছে। ইহার অধিক আর কিছু তাহার সম্বন্ধে ভাবিবার বা জানিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। অদূরে দাঁড়াইয়া একটি ছেলে আমাকে দেখিতেছিল। বছর পনরো ষোল বয়স হইবে। নূতন লোক দেখিয়া বোধ করি কথা কহিতেও সাহস পাইতেছিল না। আমিও তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। কাহার অথবা কাহাদের ছেলে, কি নাম জানি না। গ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়ার সময় উহার জন্ম হইয়াছিল কি না, অথবা হইলেও এক-আধ বছরের ছেলেটিকে দেখিয়াছিলাম কি না, মনে পড়িল না। মনে পড়িবার কথাও নহে। তখন যাহাদের কচি শিশু দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহারা এখন কৈশোরের সীমায় পা দিয়াছে। তাহাদের দেহে এবং চেহারায় এখন আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। যাহাদের প্রৌঢ় এবং বার্দ্ধক্যের সীমায় দাঁড়াইয়া টলিতে দেখিয়া গিয়াছি, তাহারা তো কোন্ কালে সংসার হইতে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। শুধু মাঝামাঝির লোকগুলিই মাত্র এখনও টিঁকিয়া থাকা সম্ভব। আর হয় তো তাহাদের মন লইয়া দুরন্তভাবে নাড়া দিলে এই অভাগার স্মৃতির এক-আধ টুকরা ঝরিতেও পারে।

ছেলেটিকে কাছে ডাকিলাম। মঙ্গল ও শান্তিরামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে জানাইল, সে তাহাদের জানে। সামান্য কিছুদিন হইল মঙ্গল কোথায় যেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া ঘরজামাইরূপে বাস করিতেছে। শান্তিরাম গ্রামেই আছে।

শান্তিরামের বাড়ী আসিয়াই তাহার দেখা পাইলাম। আটহাতি একখানি ময়লা ধুতি হাঁটুর উপর তুলিয়া গরুর জাব না মাখিতেছে। দুই-একবার ইতস্ততঃ করিয়া আমাকে চিনিল। কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া অন্যান্য দুই-একটি

প্রশ্নও করিল। উত্তর দিতে দিতে তাহার কথা সমস্তই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। চোখের উপরই অবশ্য দেখিতেছিলাম দিন চলে বলিয়া মনে হইল না। কতকগুলি ছেলে মেয়ে, একটি পয়সা রোজগারেরও উপায় করিয়া উঠিতে পারে নাই। বড় কষ্টেই সংসারটি কোন রকমে চলিতেছে। শান্তিরাম তবু ঢাকিবার একটু চেষ্টা পাইল। জানাইল, যাহাই হউক, এক রকম চলিয়া যাইতেছে মন্দ নয় এবং এইটুকু বজায় রাখিবার জন্তই তাহার এখানে থাকিবার ও খাইবার জন্ম অনুরোধও করিল। কিন্তু তাহার মধ্যে তেমন যেন আগ্রহ বা ঐকান্তিকতার সাড়া পাইলাম না। অথচ, একদিন, যাক্, সে কথা আর ভাবিয়া ফল কি? সংসারের পদ্ধতিই বোধ করি এইরূপ। মনের ব্যথা মনেই চাপিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পরে যা হয়, হবে। সুরিনের সঙ্গে আগে দেখাটা ক'রে আসি।

দেখিলাম একমাত্র সুরিনই সুখে আছে। অ-ঋণী কি না জানি না, তবে অপ্রবাসী হইয়া ছেলে মেয়ে বউ লইয়া দিব্যি সচ্ছলতায় সংসারটি বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। বাহ্যিক দৃশ্যেই তাহার সে পরিচয় সুষ্ঠুরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতীতের স্বপ্নে বিভোর হওয়া দূরের কথা, সে সব প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। বর্ত্তমানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই দিন কাটাইতেছে পরম নিরুদ্বেগে।

আমি গিয়া হাঁক দিতেই বাহির হইল বটে; কিন্তু আদৌ চিনিতে পারিল না। চিরঅপরিচিতের মত ভদ্রতায় যথেষ্ট শালীনতা বজায় রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মশায়ের নাম, কোত্থেকে আসা হচ্ছে?…হাঃ, ভগবান! আমাকেও চিনতে পারলি নে? তুই যে অবাক ক'রলি? আমি রজনী…

রজনী! কোন্ রজনী? আপনার নিবাস?

অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধুর কাছে এইভাবে পরিচিত হইবার বিড়ম্বনায় দুঃখ এবং লজ্জা হইলেও বলিলাম, নিবাস তো এখেনেই ছিল, তুই একেবারেই ভুলে গেছিস? কি আর বলি তোকে…রজনী দাসের কথা মনে নেই?.. সেই যে তুই, মহিমদা, মঙ্গল, শান্তিরাম আর—

ওঃ!…এতক্ষণে সে চিনিয়া বলিল, ক'লকাতা থেকে আসছ বুঝি? কোথায় উঠেছ?

এখনও কোন্ নির্দ্দিষ্ট যায়গায় উঠি নাই। শান্তিরামের ওখানে সুটকেসটা রাখিয়া আসিয়াছি মাত্র। জানাইতেই বলিল, তা বেশ ক'রেছ। আর একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

বাল্যবন্ধু! আশা করিয়াছিলাম অনেক কিছু। কৈশোর জীবনের সেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবং ভালবাসার দাবী লইয়াই আসিয়াছিলাম। স্বার্থ খুঁজিতে আসি নাই, চাহিও নাই। তেমনই অনাবিল উচ্ছ্বাসে হৃদয় দুয়ার মুক্ত করিয়া বন্ধুদের সাথে হাসি-তামাসায়, গল্পে, কথায় উদ্দাম হইয়া—

কিন্তু ব্যথিত হইলাম। কিছু বলিলাম না। সে প্রবৃত্তিও রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, মহিম দা কোথায়?

মহিম? ঘৃণায় জ্রূজোড়া কুঁচকাইয়া উঠিল সুরিন। তাহার কথা আর মনুষ্য সমাজে বলিবার নহে। বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেওয়া দূরের কথা, কোন কালে যে জানা-শোনা ছিল, তাহাও স্বীকার করিতে নাকি তাহার ঘৃণা হয়। বলিল, সে মরেছে, গোল্লায় গেছে। চমকাইয়া উঠিতে উঠিতে সামলাইলাম। একেবারে মরে নাই তবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম, গোল্লায় গেল কি রকম?

নমঃশুদ্দুর পাড়ার রাধী মেয়েটা ছিল না? সেই যে সুন্দরী, বিধবা, নবীন মণ্ডলের পনোর ষোল বছরের বিধবা মেয়ে, তাকে নিয়ে সেই পাড়ায় গিয়ে বাস করছে।

অর্থাৎ, বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিয়ে করেছে নাকি তাকে?

নয়তো কি সাধে বলছি, গোল্লায় গেছে? শুদ্দুরের বিধবা, বয়সেও ওর চেয়ে বড়, স্বভাব চরিত্তিরও ভাল ছিল না। তবু হতভাগা—

বিস্ময়ে বাক রহিত হইতেছিলাম। অতি কষ্টে কাটাইয়া বাধা দিলাম; বলিলাম, কি করে সম্ভব হলো? যোগাযোগটাই বা করে দিল কে?

আবার কার এত মাথা ব্যথা পড়বে? নটা পণ্ডিতের বিধবার শুশ্রূষা করতে গিয়ে, যেখানেই ঘটে পটে গেল। থামিয়া একটু রসান দিয়া কহিল, রেড়ে পাঠশালাটি খুলেছিল কিন্তু পণ্ডিত! লেখাপড়াও শেখা যেত, আবার—কদর্য্য একটা ইঙ্গিত করিয়া সুরিন তাহার বক্তব্য শেষ করিল।

নটা পণ্ডিত যাহাই হউন, তাঁহার পাঠশালার এইরূপ গুণকীর্ত্তন তাঁহার অতি বড় শত্রু এবং বিদ্বেষীও কখনও করে নাই। আমার জীবনে অন্ততঃ এই প্রথম শুনিলাম।

নটবর আমাদের বহুকালের পণ্ডিত. শুধু আমাদের কেন, আমাদের তিন পুরুষের গুরু তিনি, অবশ্য এ গ্রামে তাঁহার বাড়ী নহে। আসল নামও নটবর নহে, অবিনাশ। এই অবিনাশ পণ্ডিতের এ গ্রামে আসা এবং পাঠশালা খোলার যেমন একটু ইতিহাস আছে, তেমনি আসল নাম লুপ্ত হইয়া নূতন নামাকরণের মধ্যেও বেশ একটু রস আছে।

সে বহুকাল আগেকার কথা, আমাদের প্রপিতামহদের আমলে। এ গ্রামে তখন পাঠশালার নামও ছিল না। সেই সময় অবিনাশ আসিয়াছিলেন ভিক্ষা করিতে। সঙ্গে তাঁহার একটি মেয়েলোক, দুই জনেরই অল্প বয়স কিন্তু, ছেঁড়া আর ময়লা কাপড়ে গা ঢাকিয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া বেড়াইলেই ভিক্ষুক হওয়া যায় না। যাহার যাহা বংশ পরিচয়, আপনিই তাহা ফুটিয়া বাহির হয়। তাঁহাদের দুই জনের রূপ আর চেহারা দেখিয়া গ্রামের লোকের বিস্ময় ও সন্দেহ জাগে। আসল পরিচয় পাইবার জন্য তাহারা বিস্তর পীড়াপীড়ি করেন।

অবিনাশ অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তিনি ভদ্রলোকেরই ছেলে এবং কুলীন ব্রাহ্মণ। কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র, নেহাৎ পেটের জ্বালায়ই তাঁহারা, মানে সঙ্গেরটি তাঁহার স্ত্রী…

তখনকার দিনে গ্রামের অতি বৃদ্ধ এবং সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন কৃষ্ণজীবন চৌধুরী। তিনি আর তাঁহাদের ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। কুলের বধূ লইয়া ভদ্রলোকের ছেলেকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিতে তাঁহার বাধিল। নিজেই উদ্যোগ করিয়া গ্রামে একটি পাঠশালা খুলিয়া দিলেন। সেই হইতে অবিনাশ গ্রামের পণ্ডিত হইয়া রহিয়া গেলেন।

সে সময়কার পড়ুয়া ছিলেন আমাদের ঠাকুরদা'রা। এই সময় আর এক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সহসা একদিন অবিনাশের আরও আসল পরিচয়টা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। মেয়েটি তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী নহেন। কোথাকার কোন্ নিঃসন্তান জমিদার, বংশ এবং জমিদারী রক্ষার জন্য চেহারা ও কুল দেখিয়া পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন এই অবিনাশকে। সেই বংশের বিধবা বধূ এই মেয়েটি। তাঁহারও বয়সকাল, দুই জনেই তাঁহারা বয়সের বিরহী সুতরাং মিলন হইতে দেরী লাগিল না। কিন্তু, প্রকাশ্য সংসারে অন্তরায় অনেক দেখিয়াই দুইজনে একদিন,—

কোথা হইতে কি করিয়া গ্রাম ভরিয়াই সংবাদটি রটিয়া গেল।

কৃষ্ণজীবন চাপিয়া দিলেন। সমাজের সকলেই তাঁহাদের হাতের ছোঁওয়া গলাধঃ করিয়া বসিয়াছিল। না চাপিয়াও উপায় ছিল না সেই জন্য। কিন্তু রঙ্গ করিয়া সেই হইতে অবিনাশ পণ্ডিতের নাম হইল নটবর। ক্রমে 'বর'টুকু বাদ পড়িয়া দাঁড়াইল শুধু নট এবং তাহা হইতেই নটা পণ্ডিত নামে খ্যাত হইয়া পড়িলেন। আমাদের বাপ জ্যাঠারা এবং আমরাও সেই নটা পণ্ডিতের ছাত্র।

স্বামী-স্ত্রীরূপেই তাঁহারা আজীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

পাঠশালার পাঠ ছাড়াইয়া আমি গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পর পণ্ডিতমশায় মারা যান। তাহার কিছুদিন পরই তাঁহার সেই স্ত্রী, তখন খুবই বৃদ্ধা, পড়েন কঠিন রোগে। পণ্ডিত মশায় তিন পুরুষের পণ্ডিত, গ্রামের বৃদ্ধ হইতে বালক পর্য্যন্ত তাঁহার ছাত্র এবং তিনি পুরুষমানুষ গ্রামের লোকে সেই জন্য তাঁহাকে মান্য করিত। সমাজে লইয়াও চলিয়াছে।

কিন্তু, তাঁহার মৃত্যুর পর চিরকাল আর তাহা টিকিতে পারে না। পণ্ডিতের বিধবাকে কেহ আর গুরুপত্নীর মর্য্যাদা দিতে রাজী হইল না। তাহা সম্ভবও নহে। বামুন কায়েতের সমাজ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং কাছেও ঘেঁসিল না। ঘরের মধ্যে পড়িয়াই রোগের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, দেখেই বা কে আর শুশ্রূষা করেই বা কে? জুটিয়া গেল ঐ ছুঁড়োটা, এও যেমনি, সেও তেমনি, সেই জন্যই বোধ করি দরদটা তাহারই উছলাইয়া উঠিল। আর অত পাপের ফলে শেষটায় শূদ্রের নষ্ট-চরিত্রা বিধবার হাতের জল খাইয়াই মরিতে হইল। ধর্ম্মটা আরাম করিয়া দেখিয়াই সুরিন বলিয়া উঠিল, আর ঐ বাপে তাড়ান মায়ে খেদান মহিম হতচ্ছাড়াটাও, রাধীর না হয় জাতধর্ম্ম নেই, ছুঁতে মিলতে আটকালো না—কিন্তু কায়েতের ছেলে হয়ে তুই কি না; একটু থামিয়া আবার

বলিল, নজর পড়েছিল, বেশ এমনি নিয়ে বাস করলেই পারতিস? বিয়ে করতে গেলি কেন?

অতি কষ্টে তাহাকে থামাইয়া সমস্ত খুঁটিনাটি সংবাদ লইলাম। তাইতো, শেষে কি না একটা নমঃশূদ্রের বিধবা মেয়েকে বিবাহ করিল। মহিমদার এই প্রকার অধঃপতনে, আমারও কিন্তু অন্তর বিতৃষ্ণায় ঝলসাইয়া উঠিল। ক্ষোভটাও এতই অসংযত হইয়া উঠিল যে, যাহারা বাধা দেওয়ার সময় ও সুযোগ পাইয়াও,তাহা অনায়াসে অবহেলা করিয়াছে, অধিকন্তু অসময়ে বন্ধুত্বের দরদ দেখাইতে, বিদ্রূপেরই অভিব্যক্তিতে, ইচ্ছা হইল বেশ কড়া কড়া দুই কথা তাহাদেরই শুনাইয়া দিই। কিন্তু, তাহা নিরর্থক বুঝিয়াই নিরস্ত রহিলাম। তাহা ছাড়া, ইহা তো মহিমদারই সহস্র বেপরোয়া অপকর্মের মধ্যে আর একটি। হয় তো ইহারও মধ্যে সে অন্যায় দেখিতে পায় নাই। বরং সৎসাহসের স্ফূর্তিতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল সম্ভবতঃ। তাহার আরই এইরূপ সৃষ্টিছাড়া।

মাঝে মাঝে সেই ছোট্ট বেলায় বন্ধু ক্ষোভের সঙ্গেই যে বলিয়া উঠিত, কি ভুলই হইয়াছে তাহার, এই মধ্যবিত্ত কায়েত বামুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া, কতবড় অপরাধই হইয়াছে তাহার, এই শিক্ষিত ভদ্র ঘরের ছেলে হইয়া। এই ভদ্রতা ভিতরের দৈন্য ঢাকা দেওয়ারই মিথ্যা অভিনয় বরং ইহাতে হীন প্রবৃত্তিই জাগায় এবং এই শিক্ষা, সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি পরিমার্জ্জিত করিবার নামান্তরে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া আকাঙ্ক্ষারই তীব্রতা বাড়ায়। অথচ, মিটাইবার উপায় নাই। অভাবের হাহাকার লাগিয়াই থাকে—

কাজেই, লেখাপড়া শিখিবার জন্য ধরা-বাঁধাভাবে, এই যে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া, কাপড় জামা জুতায় এই যে সর্বক্ষণ ভদ্র সাজিয়া থাকা, এ সব কিছুই তাহার ভালো লাগে না। কিছুতেই সে তৃপ্তি পায় না।

তাহার ভালো লাগে ঐ সব অভদ্র চাষাদের মত হইতে। উহাদেরই মত অমনি অশিক্ষিত মনে ছোট এবং সীমাবদ্ধ আকাঙ্ক্ষায় শান্তিতে দিন কাটাইতে; অমনিই সামান্য পাওয়ায় যথেষ্ট মনে করিয়া তৃপ্তি পাইতে। উহাদেরই মত অমনি মাঠে মাঠে খাটে, অক্লান্ত পরিশ্রমে; ঝড়, জল, রৌদ্র, বৃষ্টি গায়ে লাগাইয়া ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ফসল, মাঠের ধারে, কুড়ে বাঁধিয়া প্রতিঋতুতে, মাঠ ভরিয়া প্রকৃতির লীলাবিপর্য্যয় দেখে চাহিয়া চাহিয়া; আর নিজেরই পরিশ্রমলব্ধ নুন-ভাত অম্লান মুখে আহার করিয়া পায় গভীর তৃপ্তি কিন্তু তাহা আর এ জীবনে হইবার উপায় নাই।

উচ্ছ্বসিত আবেগ যেন সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িত ব্যর্থতার চরম মর্ম্মান্তিকতায়, ভাবিতাম, নিছক কল্পনা, নিতান্ত বাজে একটা হাল্কা সখ ছাড়া আর কিছুই নহে। অন্তরের সাথে ইহার একবিন্দু সংস্পর্শ নাই।

কিন্তু, ইহাই তাহার ঐকান্তিক কামনা; নতুবা সে আজ চাষার মধ্যে গিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া ঘর বাঁধিবে কেন?

মহিমদার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাটা আর তত্তখানি প্রবল ছিল না। একেবারে চাষাপাড়া...বাধ বাধ লাগিতেছিল। কত ভদ্রলোক এই পথে যাতায়াত করে। চাষার বারান্দায় বসিতে দেখিলে, বিশেষতঃ রাখীর ওখানে—ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ী ঢুকিলাম কিন্তু বারান্দায় উঠিলাম না। মহিমদাকে ডাকিলাম নীচে দাঁড়াইয়াই। মহিমদা বাড়ীতেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিল এবং আমার দিকে একটি নজর মাত্র তাকাইয়াই সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, রজনী যে? আয়, আয়...উঃ, কতকাল পরে, মনে পড়ল' আমাদের কথা?

আমাকে উত্তর দেওয়ার ফুরসুত দিল না। তৎক্ষণাৎ উঠানে নামিয়া একেবারে আমার কাঁধ দুইটি ধরিয়া সজোরে ঝাঁকা দিতে দিতে আবার বলিল, হ্যাঁরে, তোর মহিমদার ওপর দেখছি বিরূপ হ'সনি যে বড়? শুনেছিস তো সব? না শুনলেই বা এ পর্য্যন্ত খোঁজ ক'রে এলি কি করে? দেশে ঘরে থাকিস নে কিনা, সেই জন্যেই তোদের মন অন্যরকম। চল্‌ উপরে উঠে বসবি। এক রকম জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল, ঠিক যেন সেই ছেলেবেলাকার মত।

এতক্ষণের পুঞ্জীভূত ব্যথায় সহানুভূতির একটু আঁচ লাগিল। কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই মনের মধ্যে খচ করিয়া বিঁধিল, যে অপরাধে সকলের কাছে সে সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া আছে, প্রকারান্তরে তাহারই সমর্থনের চিহ্ন পাইয়া এত আদর নহে তো? কি জানি? মহিমদা আমার মনের খোঁজ পাইল

না। ডাক, হাঁক, চীৎকারে বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিল। কই গো, কোথায় গেলে? দেখে যাও, কে এসেছে। এসো, এসো, ওগো অনুরাধা,—

অনুরাধা! হ্যাঁগো, রাধার সঙ্গে 'অনু'টুকু আমিই জুড়ে দিয়েছি সখ ক'রে, অনুরাগ বাড়াবার জন্যে—

চমৎকার! নীচুজাতির মেয়ে কলঙ্কিতা, তাহাকে লইয়া ঘর করিবার কথা, তাহাদেরই সমাজে কাহারও নহে। আর ও কিনা সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদা দিতেও ভয় পায় নাই, গ্লানিও না। বরং আনন্দে, উদ্দীপনার উৎসাহেই মাতিয়া উঠিয়াছে একেবারে, অথচ—

ঘা না দিয়া কিছুতেই পারিয়া উঠিলাম না। ঘৃণার সঙ্গে শ্লেষ মিশাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু এরকম অধঃপাতে নামতে তোমার লজ্জা হ'লো না? শূদ্রের নষ্ট-চরিত্রা একটা মেয়েকে—

বাধা দিয়া মহিমদা বলিয়া উঠিল, চরিত্র তার ভাল কি-মন্দ, সেটা কেউ কখনও চোখে দেখেনি। মেয়েটা বরাবর একটু স্বাধীন প্রকৃতির ছিল, তাই নিয়েই শত্রুর যারা, তারাই ওর দুর্নাম রটিয়েছে—

দশজনের চোখে যেটা খারাপ বলে ঠেকেছে…

ভাল কথা। স্বীকার করি, লোকের রটনাই ঠিক; কিন্তু, তাতেই বা ক্ষতি কি? তারই বা অপরাধ এতে কিসে? ঐ ক'টি বয়সের বিধবাকে সমাজ সর্ব্বরকমে নিষ্পেষণ ক'রতে চায় কেন বলতে পারো? ওদেরও তো ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই আছে, অথচ সমাজ তা মিটাবার কি ব্যবস্থাটা ক'রেছে? কি শিক্ষা দিচ্ছে, কি উচ্চ আদর্শ চক্ষের সামনে ধ'রচে। কাজেই ও যদি কখনও কিছু ভুল ক'রে থাকে, তবে সে দোষ ওর নয় দশজনের আর সমাজের। এ ছাড়াও, এর স্বপক্ষে আরও একটা নজির আছে। সাময়িক একটু ভুল বা অন্যায়ের সুযোগ নিয়ে সারাজীবনের ওপর শাস্তি দেওয়া সঙ্গত কি? তাতে তার ভুল আর সংশোধনের সুযোগ হ'তো না। অধিকন্তু, তার জীবনটা আরও বিশ্রী, জঘন্য ও কলঙ্কের কালিতে ভ'রে যেতো, কি দুর্গতি হ'তো তার অদৃষ্টে? আর সেইটে হ'লেই বোধকরি তোমাদের পক্ষে—

কিন্তু এতই যদি দরদ তোমার, কায়েতের ঘরেও তো বিধবা ছিল!

ছিল কেন, আছেও। কিন্তু তাদের সঙ্গে এদের অনেক তফাৎ। এরা নিচু জাতের মেয়ে। এদের অহঙ্কার নেই, অভিমান নেই, ঘৃণা, গ্লানিও না। নইলে নটা পণ্ডিতের বিধবার শুশ্রূষা ক'রে অতখানি নোংরা ঘাঁটতে যেতো না। কি যে শুশ্রূষা করেছে, তুমি দেখলে স্তম্ভিত হ'তে। আর আমি ওকে বিয়ে ক'রেছি আমার গরজে নয়, ওকেই উদ্ধার ক'রেছি, এ ধারণা কোন কায়েতের বিধবার মধ্যে আমি পেতাম কি?

আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল। ভাবিলাম, এ সৃষ্টিছাড়া মহিমদা দশজনের মত নয়, তাই এরূপ মতিগতি। অনুরাধা ততক্ষণে আসিয়া পড়িল। লজ্জারক্তিম মুখে, মুচকি একটু হাসি; অথচ, কেমনই একটু সঙ্কোচের আড়ষ্টতায় পা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিল; আপনাকে আমি চিনি রজনী বাবু। অনেক দিনের দেখা, তবু মনে আছে। একটু থামিল, তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আপনারা আমাকে কি যে ভাবেন জানি না। ওঁকে এই রকম নামতে দিতে আমার যথেষ্ট আপত্তি ছিল। এখনও বলি, ফিরে গিয়ে তোমার নিজের সমাজ নিয়ে বাস করগে। কিন্তু, কিছুতেই শুনবেন না।

জন্ম জন্ম মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও যাহা পাইত না, তাহাই আয়ত্তে আনিয়া আবার ন্যাকামী! একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে সমাজ এবং জাতিচ্যুত করিয়া নিঃশংসয়ে অপরাধী করিলাম তাহাকেই। বিতৃষ্ণায় মন বিরূপ হইয়া উঠিল তাহারই উপর। মহিমদা কিন্তু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। বাল্যকালেরই সব কাহিনীর কথায়, সেই হারানো সুরের ঝঙ্কার উঠিতেছিল, তাহাতে নেহাৎ মন্দ লাগিবার কথা নহে আমার কাছে—

কিন্তু, পরিবেষ্টনীটুকুর উপরই দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে সমগ্র অন্তর দিয়া উপভোগ করিতে কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছিলাম না। ব্যগ্রভাবে বার বার হাতের ঘড়ীটার দিকে তাকাইতে লাগিলাম। মহিমদার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ওকি? এখনই উঠবার চেষ্টা পাচ্ছিস যে? সেটি হচ্ছে না! খাওয়া-দাওয়া ক'রে আজ এখানেই থাকতে হবে। অনেকদিন পরে পেয়েছি যখন, তখন এত শীগ্গীর কিছুতেই ছাড়ছিনে।

এতবড় দাবীও যেন সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণ করিতে পারিতেছিলাম না। নিস্পৃহভাবে জবাব দিলাম, সে যা হয়, হবে। সে জন্যে তোমায় ব্যস্ত হ'তে হবে না।

ওঃ, বুঝেছি, এখানে খেতে তোর আপত্তি কোথায়? ও না হয় শূদ্দুরের মেয়ে, ওর হাতের ছোঁওয়া খেলে জাত যাবে। কিন্তু, আমি তো কায়েত? বামুন-কায়েতের জাত কি মরে কখনো? তাছাড়া, তোদের ঐ সমাজে পুরুষের জাত তো কিছুতেই মরে না।

সে ভয় আমার সত্যই ছিল না। কিন্তু, জাতি মরিবার ভয় আর প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ দুইটি আলাদা জিনিষ। উঠিতে উঠিতে বলিলাম, খাওয়ার মধ্যে কি আছে? আর একদিন এসে তোমার এখানে নিশ্চয়ই খেয়ে যাব। আজ আমাকে যেতেই হবে। এই ট্রেনটা ধরাই চাই, মনে ক'রো না কিছু।

মহিমদা আর একটি কথাও বলিল না। যতক্ষণ আমাকে দেখা যায়, ক্ষুব্ধ নিস্পলক চোখে আমারই দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শান্তিরামের বাড়ী আর গেলাম না। একটি চাষার ছেলেকে কিছু পয়সা দিয়া সুটকেসটা আনাইয়া লইয়া আবার পথ ধরিলাম। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সেই কাঁচা সড়ক, নন্দেশ্বরীর বিল, সেই ঝাউতলা, সেই সমস্ত বাল্য-স্মৃতি বিজড়িত জায়গা, সেই মাঠ ঘাট, আজিও সে সকল ঠিক তেমনই রহিয়াছে, আর তাহাদের মাধুর্য্য সেই রূপ, রস এবং রঙ সার্থক করিয়া রাখিয়াছে একমাত্র মহিমদা, তাহারই প্রাণের মধ্য দিয়া—।

ভয়শঙ্কাশূন্য তেমনই বেপরোয়া অবহেলায় আজিও অভিযান চালাইয়া বেড়াইতেছে যতই বিরূপ হই তাহার উপর, তবু একথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। সেই সঙ্গে আপনা হইতেই মনটা যেন শ্রদ্ধায় তাহারই কাছে বরাবর নোয়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কার অপরাধ?

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন, বি.এ.

সুখে নয় সখি,
নিতান্ত গরজে আসি
স্বার্থ-পর আমি
তাই এত ভালো ভাষী।

শুনিলে যে ব্যথা পাবে, জানি,
অভিমান হবে তাও মানি,
তবু জেনে রাখো
মন নিতে আমি হাসি।

কাছে বসি—ক্ষুধায় কাতর,
পাব বলে করি যে আদর;
লুটে নিতে চাই
সোহাগ যে সর্ব্বনাশী।

ভয় হল, সত্য কথা শুনে?
ভয়ঙ্কর শঠ? আমি খুনে?
খুনের খেলা এ
পাগল সৃজন-বিলাসী।

রাগ কর? রবে না যে রাগ!
এবে রাগ পরে অনুরাগ,
নাহি তব সাধ?
অপরাধে নাহি ফাঁসী!

সত্য কথা—এত রূঢ় লাগে?
কার অপরাধ, বল আগে,
তুমি ভালোবাসো
তাই আমি ভালোবাসি।

সপার্ষদ গৌরাঙ্গদেব ও নাট্যকলা

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভারতে নাট্যকলার অবনতির আরম্ভ হয় মুসলমান প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে। ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া মুসলমান নৃপতিগণ নাট্যামোদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন না। মুসলমান কবিগণের গীতিকবিতা, ইসলামের প্রাচীন সভ্যতা, মহম্মদের অনুবর্ত্তীগণের একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্ম্ম ও নীতির বিরোধী না হইলেও, মুসলমান রাজাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে নাট্যকলা ক্রমশঃ অবনতির নিম্নতর সোপানে অবতরণ করিতে থাকে। কিন্তু তথাপি একথা গৌরবের সহিতই স্বীকার করিতে হইত যে, সেই দুর্দ্দিনেও ভারতীয় নাট্যকলার পূর্ণ গৌরব একমাত্র বাঙ্গালীই রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কারণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে নাট্যকলার অস্তিত্ব যখন প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, তখনও বাঙ্গালা দেশ তাহার পরাধীনতা সত্ত্বেও নাট্যরস পানে কখনও বিমুখ হয় নাই। বাঙ্গালার প্রথম নাটক—বেণীসংহার। বেণীসংহার বীররসপ্রধান নাটক বটে, কিন্তু এই নাটকখানি বাঙ্গালার তৎকালীন অবস্থা সূচিত করিতেছে। তবে ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গাধিপ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম। কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের আখ্যায়িকা অবলম্বনে ভট্টনারায়ণ সংস্কৃত ভাষায় "বেণীসংহার" নাটক রচনা করিয়া আদিশূরকে উপহার প্রদান করেন। মহাবীর ভীমসেন দুর্য্যোধনের রক্ত-রঞ্জিত হস্তে দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। এইজন্য নাটকের এইরূপ নামাকরণ করা হয়। 'মহাভারতে' বর্ণিত ঘটনাই এই নাটকের মূল হইলেও, উভয়গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়।

বাঙ্গালার দ্বিতীয় নাটক পরমভক্ত কেঁদুলির জয়দেবকৃত 'প্রসন্নরাঘব' নাটক। এই ভক্তিমূলক নাটক বেণীসংহারের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও স্বাধীন বাঙ্গালার ইহা এক অমূল্য সম্পদ। এই নাটক রচিত হইবার অব্যবহিত পরেই ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশ ভক্তরাজ লক্ষ্মণসেনের করচ্যুত হয়।

প্রেমের কবি চণ্ডীদাসের সময়ে কোনও নাটক ছিল না বটে, কিন্তু তৎপ্রণীত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" নাটকের উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের পদাবলী সঙ্গীতও বটে, আবার উহাতে নাট্যাভিনয়ের প্রাণবস্তুটীও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা একাধারে আবৃত্তি, ব্যাখ্যা, গান ও অভিনয়। বাস্তবিক, সঙ্গীতকলা ও নাট্যকলার অন্তরস্থিত সার বস্তুটী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে যেন মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত সখ্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

মাধুর্য্য বা শৃঙ্গার রসই চণ্ডীদাস এবং তৎসমসাময়িক মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রাণ। এই মাধুর্য্যের মুখ্য অবস্থা তিনটি—পূর্ব্বরাগ, মিলন এবং বিরহ। এই তিনটি লইয়াই প্রশ্ন, উত্তর এবং প্রত্যুত্তর এবং এই তিনটি মিলিত হইয়া নাট্যাভিনয়ের ন্যায় মূর্ত্তিমন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বাঙ্গালায় প্রচলিত ঝুমুর গান ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার পালাও ঝুমুরের পালার ন্যায় সাজান। সঙ্গীত দামোদরে ঝুমুরের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

প্রায়ঃ শৃঙ্গার বহুলা মাধ্বীক মধুরা মৃদু
একৈব ঝুমুরির্লোক বর্ণাদি নিয়মোজ্ঝিতা।

শৃঙ্গার রসপ্রধান, মাধ্বীকের ন্যায় মধুর এবং মৃদু, এবং বর্ণাদির বাঁধাধরা নিয়মহীন গানকে ঝুমুর নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও ঝুমুরের ন্যায় দুইদলের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া লইতে হয়। এই সম্বন্ধ দুইদলে দুইজন, তিনজন অথবা চারিজনের মধ্যেও হইতে পারে। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের অথবা উভয়ের মধ্যবর্ত্তিনী বড়াইর* সঙ্গে প্রশ্নোত্তর, মান-অভিমান,

---

* নারদ যেমন ভগবান ও ভক্তের মধ্যে মিলন সংঘটন করিতেন, রাধাকৃষ্ণের মিলনে বড়াইও তেমনি ছিলেন মধ্যবর্ত্তিনী।

ব্যঙ্গরহস্য ঝুমুরের পালারই অনুরূপ। এই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বা 'ঝুমুরে' যাত্রা, কবি, কীর্ত্তন সমস্তই একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালার নাট্যকলা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময়েই বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। তিনি স্বয়ং অভিনয়াদি, নবরস, রসজ্ঞ এবং নৃত্যকলা বিশারদ। কি অভিনয়ে কি নৃত্যে মহাপ্রভু এমন ভাবপ্রকাশ ও প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিতেন যে দর্শকগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিত। আর তাঁহারই অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালার ভক্তকবি ভক্তি-রসাশ্রিত অমর নাটক লিখিয়া বাঙ্গালীর নাট্যশক্তি সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর হইতেই বঙ্গবাসীর নিকট নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয় বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। গৌরাঙ্গদেবের পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত কবি ও নাট্যকার গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। বস্তুতঃ চৈতন্যদেব কেবল নূতন সরস ধর্ম্ম প্রচার করিয়াই বাঙ্গালায় প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করেন নাই; বলিতে কি, বাঙ্গালায় যাত্রা ও নাটকের পুনরুত্থান, বঙ্গভাষার অভ্যুত্থান, ভাবসম্পদের বৃদ্ধি, আদর্শের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ, উচ্চনীচে সমজ্ঞান, অহিংসা প্রভৃতি সমস্তের মূলেই ছিলেন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব। এইজন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিতেন, (মহাপ্রভু ব্যক্তি ন'ন, মহাপ্রভু একটা প্রকাণ্ড যুগ—epoch।)

গিরিশচন্দ্রও চৈতন্যলীলা নাটকে মহাপ্রভুর অভিনয় প্রীতির একটু আভাস দিয়াছেন—

২য় প্রতিবেশী—আচ্ছা নিমাই যাত্রা ছেড়ে দিল কেন? সে বেশ ছিল, রাধিকা সেজে গাইতো, বেশ গাইত।

১ম প্রতিবেশী—হাঁ, সে গোঁফ মুড়িয়ে গান করবার ধুম কি?

[চৈতন্যলীলা—৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র মহাপ্রভুর যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। "চৈতন্য ভাগবত" প্রণেতা বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, "মহাপ্রভু নিজ পার্ষদগণ ও বিশ্বাসপরায়ণ রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমক্ষে কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় করিতেন।" বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, তবে তখনও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। একদিন বুদ্ধিমন্ত খাঁকে অনুমতি করিলেন,

"চন্দ্রশেখরের বাড়ী অদ্য অভিনয় হইবে। তুমি অভিনেতাদের যথাযোগ্য সাজ সংগ্রহ করিয়া অভিনয়ের উপযুক্ত আয়োজন কর—

"শঙ্খ, কাঁচুলি, পাটশাড়ী, অলঙ্কার
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জা কর' সভাকার।"

চান্দোয়া খাটান হইল। হরিদাস কতোয়াল হইলেন, শ্রীবাসপণ্ডিত সাজিলেন নারদ, শ্রীরাম স্নাতক গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং রুক্মিণী, নিত্যানন্দ বড়াই, এবং অদ্বৈত অনেক ভক্তের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন।

প্রভু কহিলেন "অদ্য—

প্রকৃতি স্বরূপে নৃত্য হইবে আমার
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়—তার অধিকার।
সেই সে যাইবে আজি বাড়ীর ভিতরে
সেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥"

শ্রীবাস ও অদ্বৈত উত্তর করিলেন—

"প্রভু, আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।"

ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

"তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া করিব? তোমাদের চিন্তা নাই—

মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা
দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা।

তখন ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া প্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে আসিলেন এবং সকলেই নিজ নিজ সাজে সজ্জিত হইলেন। শচীদেবীও পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া সহ অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে আসিলেন। ক্রমে অভিনয় আরম্ভ হইবার সময় উপস্থিত হইল, মুকুন্দ আসিয়া নান্দীমুখ পাঠ করিলেন, তারপর সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া হরিদাস কতোয়াল বেশে রঙ্গভূমে প্রবেশ করিলেন—

মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস
মহাপাগ শোভে শিরে ধটী পরিধান।

হরিদাস কতোয়াল সাজিয়া দণ্ড হস্তে সভাস্থ সকলকে সাবধান করিতে লাগিলেন।

হরিদাস বোলে আমি বৈকুণ্ঠ কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল ॥

তারপর নারদের বেশে উল্লসিত ভাবে শ্রীবাস সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার—

মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব্ব-গা'য়।
বীণা কান্ধে কুশহস্তে চারিদিকে চা'য়।

শ্রীবাসের ভক্তিপূর্ণ বাক্যে সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সাক্ষাৎ নারদ ঋষি যেন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন—

"অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
"সেইরূপ, সেই বাক্য, সেই সে চরিত।"

বিস্মিতা শচীমাতাও তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া শ্রীবাস-পত্নী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এই নি পণ্ডিত ?"

এবং তাঁহার ভক্তিপূর্ণ ভাব দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে সজ্জাগৃহে প্রভু রুক্মিণীর বেশ পরিধান করিয়াই এরূপ ভাবাবিষ্ট হইলেন যে, নিজেই নিজকে চিনিতে পারিলেন না—

"আপনারে না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে
বিদর্ভের সুতা হেন আপনারে বাসে'।"

তারপর রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে সভায় প্রবেশ করিয়া,

রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর,
সময় উচিৎ গীত গায় অনুচর।

আর নিত্যানন্দ বৃদ্ধা বড়াইর বেশে—

বক্ক বক্ক করি হাঁটে প্রেমরসে ভাসে।

বস্তুতঃ, মহাপ্রভু নিজবেশে ও নিজভাবে এমন বিভোর হইয়াছিলেন যে, কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

বেশে কেহ লখিতে না পারে প্রভু সেই।

সকলে এত মুগ্ধ হইয়া অভিনয় দেখিতে ছিলেন যে, কখন যে রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই—

আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাই জানে।
হেনই সময়ে নিশ হৈল অবসানে ॥
"আনন্দে না জানে কেহো নিশি ভেল শেষ।"

অভিনয় শেষ হইলে সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রাত্রি প্রভাত হইয়া যাওয়ায় সকলেই মনক্ষুণ্ণ হইল। প্রভুও,

চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাহিয়া
ঘরেতে অইলা প্রভু আনন্দিত হইয়া।

✓চৈতন্যমঙ্গল

পরিষদবর্গসহ বাঙ্গালার মুকুটমণি দ্বারা অনুষ্ঠিত এই অভিনয় যেমনই বিস্ময়কর তেমনি আনন্দদায়ক। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে এই অভিনয় হইয়াছে। গৌরাঙ্গদেবের তখন বয়স মাত্র ২২ বৎসর।

সত্য বটে, নৃত্য ও গীতে চৈতন্যদেবের অসাধারণ অনুরাগ ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ। নীলাচলে (পুরীধামে) মহাপ্রভু একদিন যমেশ্বর টোঁটা যাইতেছিলেন। জনৈক দেবদাসী সুললিত কণ্ঠে গীতগোবিন্দের গান গাহিতেছিল। সেই সুমধুর সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করায় মহাপ্রভু ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং গায়ক স্ত্রী কি পুরুষ তাহা না ভাবিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন—

গুর্জ্জরী রাগ লঞা সুমধুর স্বরে,
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগমন হরে ॥
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ
স্ত্রী পুরুষ কেবা গায় না জানি বিশেষ ॥

গায়কের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু দ্রুত চলিতে লাগিলেন, গায়ে কাঁটা বিঁধিতে লাগিল তথাপি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। এই সময় কিঙ্কর গোবিন্দ বুঝাইয়া দিলেন, "প্রভু স্ত্রীলোক গাহিতেছে।" চৈতন্যদেবের চৈতন্য হইল, তিনি আবার ফিরিয়া চলিলেন, তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য গোবিন্দকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন, কারণ

"স্ত্রী পরশ হইলে আমার হইত মরণ।"

এই জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের প্রেরণাতেই বাঙ্গালার ভক্ত-কবি রূপগোস্বামী রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বলিত অপূর্ব্ব নাটক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে নাটক বাঙ্গলায় রচিত হয় নাই। উড়িষ্যায় তখন স্বাধীন হিন্দু রাজা, মুসলমান তখনও সেখানে কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই স্বাধীন ধর্ম্মক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের প্রভাবে নাটক ও নাট্যকলা অবাধে স্ফুরিত হওয়ার সুবিধা পাইয়াছিল। রায় রামানন্দও নাট্য-

কলার পরিপুষ্টি সাধনে কম সহায়তা করেন নাই। এখানে রায় রামানন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস লইবার পরে পুরীধামে যান ও অল্পদিন পরে তীর্থ পর্য্যটন মানসে দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। গোদাবরী নদীতীরে একদিন তিনি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন—

হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়।

তারপর উভয়ে উভয়কে দর্শন করিলেন, পরস্পর-পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, উভয়ের মধ্যে পরিচয় গাঢ় হইল। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কৃষ্ণকথা শুনিতে বাসনা জানাইলেন। রায় রামানন্দ দশদিন ধরিয়া মহাপ্রভুকে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন—

কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার,
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার।

নট যেমন সূত্রধার দ্বারা পরিচালিত হয়, আরোহী যেমন সারথির রথচালনায় বাহিত হয়, রায়ও তেমনি মহাপ্রভুর অনুপ্রেরণাতে তাঁহারই নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শ্রীরাধার লীলা ও প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন—

রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেই মত নাচাও সেই মত নাচিবার॥

রায় সাধ্যের নির্ণয়, স্বধর্ম্মাচরণ, কৃষ্ণে সর্ব্বস্ব অর্পণ, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি প্রেম পর্য্যন্ত বর্ণনা করিলেন, কিন্তু প্রভু কেবল বলিতে লাগিলেন…

"এহো বাহ্য আগে কহআর।"

অতঃপর রায় বলিলেন—

"কান্ত ভাব প্রেমসাধ্যসার॥"

কিন্তু অধিক আর বলিতে পারিলেন না, কেন না—

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥

আর সেই প্রেম—

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥

রায় অতি সহজ ভাবে প্রভুকে এই প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব বুঝাইলেন, যেন—

"ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ।"

অতঃপর রায় রামানন্দ বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত একত্রে বাস করেন। রায় রামানন্দ ছিলেন কায়স্থ কুলোদ্ভব। বর্ত্তমান যুগের নট ও নাট্যকার রামকৃষ্ণ লীলা সহচর গিরিশঘোষের সহিত তাঁহার অনেক নিকট সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। উভয়েই ছিলেন পণ্ডিত, জ্ঞানী ও ভক্ত, উভয়েই দেবদাসীর সহায়তায় কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিতেন। একদিন ভক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্র চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে গিয়াছিলেন। রামানন্দের গৃহে যাইয়া তাঁহার ভৃত্যের নিকট জানিতে পারিলেন, বাগানবাড়ীতে দেবদাসীদিগকে তিনি অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন —

দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্যগীতে নিপুণা বয়সে কিশোরী॥
তাঁহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃত-উদ্যানে।
নিজ নাটক গীতের গান শিখায় নর্ত্তনে॥

রামানন্দ কেবল নাট্যকার ছিলেন না, দেবদাসীদিগকে শিক্ষা দিয়া গৌরাঙ্গলীলা, কৃষ্ণলীলা অভিনয় করাইতেন—

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল.
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।

রায় রামানন্দ দেবদাসীদিগকে নৃত্যগীত শিখাইতেছেন শুনিয়া প্রদ্যুম্ন বিপ্র চলিয়া গেলেন এবং সমস্ত কথা বিরক্তির সহিত মহাপ্রভুর কাছে নিবেদন করিলেন। শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "রায় রামানন্দ সাধারণ পুরুষ নহেন। আমি সন্ন্যাসী হইয়াও প্রকৃতি দর্শন দূরে থাক, নাম শুনিলেই বিচলিত হইয়া পরি। প্রকৃতির নামে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। আর এই রায় রামানন্দ ঐশ্বর্য্য বা কাম্যবস্তুর কাছে একেবারে নির্ব্বিকার।

এক দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি।

স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গাম তার করায় শিক্ষণ॥
নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাষাণ সম,
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন॥

এক মাত্র রামানন্দই এইরূপ বিষম সঙ্কুল কার্য্যে অধিকারী। ভগবৎ শাস্ত্রই ইহার প্রমাণ—

"ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস"
চৈতন্যলীলা—অধস্ত্য লীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।

অতঃপর প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায়ের নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব শুনিয়া অশেষ জ্ঞান লাভ করিলেন। রায় রামানন্দই "জগন্নাথ বল্লভ" নামক সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, ভাবপরীক্ষা, রাধাভিসার, রাধামিলন প্রভৃতি লীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরীধামের রাজা প্রতাপ-রুদ্রের আদেশে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে এই নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করিত রামানন্দের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তা দেবদাসীগণ।

গৌরাঙ্গ-দ্বেষী ব্যক্তিরা ইহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ভাব পোষণ করিত, গিরিশচন্দ্র "নিমাই সন্ন্যাস" নাটকে (১ম ১গঃ) তাহার কতকটা আভাস প্রদান করিয়াছেন।—

১ম সভাসদ—দেখ, এই রামানন্দটা ভক্তবিটেল; ব্যাটা বাবরিতে বাহার দিয়ে হাতী চ'ড়ে ডঙ্কা বাজিয়ে "গৌর গৌর" করে।

২য় সভাসদগণ—আর তুমিও যেমন! ব্যাটা অতি নচ্ছার, বাগানে বেশ্যা নিয়ে দিবারাত্র প'ড়ে আছে, কারুর গা ধুইয়ে দিচ্ছে, কারুর চুল বেঁধে দিচ্ছে। ব্যাটা ভক্তির সাগর! রাজাটা খেপেছে রে, খেপেছে, এমন জগন্নাথ প্রভু থাকতে কিনা গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ!

নিমাই সন্ন্যাস ১ম অঃ ১ম গঃ

নাট্যানুরাগ থাকিলেও গৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার ভক্তগণের নিকট কিন্তু সিদ্ধান্ত বিরোধী (যুক্তিবিহীন বিচারযুক্ত) নাটক উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইত। একবার বঙ্গদেশীয় একজন ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেব সম্বন্ধে একখানা নাটক লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইবার জন্য ভগবান আচার্য্যের বাড়ী আসিয়া অবস্থান করিলেন। আচার্য্য ও কতিপয় বৈষ্ণব নাটকের রচনা শুনিয়া প্রশংসা করিলেন। অতঃপর আচার্য্য নাটকখানি যাহাতে মহাপ্রভুর সমক্ষে পঠিত হয় তজ্জন্য স্বরূপ দামোদরের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বরূপ ছিলেন মহাপ্রভুর সেন্সার (censor), তিনি অনুমোদন না করিলে কোন গ্রন্থই মহাপ্রভুর নিকট পঠিত হইত না। কারণ,

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ।

তাই, স্বরূপ উত্তর করিলেন, সকলেই নাটক লিখিতে পারে না—

"রস রসাভাস যার নাহি এ বিচার
ভক্তি সিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার;
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার
বিশেষ দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার।"

অন্ত্যলীলা—৫ম পরিচ্ছেদ

অনেক অনুরোধের পর স্বরূপ নাটক শুনিতে স্বীকার করিলেন। কবি প্রথমেই নান্দীশ্লোক পাঠ করিলেন—

"বিকচ কমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে,
কনক রুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ
প্রকৃতে জড়মশেষঃ চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ।

শ্লোক শুনিয়া সকলে প্রশংসা করিলে স্বরূপ কবিকে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কবি তখন শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন—

কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর
চৈতন্য গোসাঞি তাহা শরীরী মহাধীর
সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে।

শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া স্বরূপ অত্যন্ত দুঃখিত মনে সক্রোধে কবিকে বলিলেন—

আরে মূর্খ আপনারে কৈইলি সর্ব্বনাশ
দুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস।
পরমানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়॥

তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রকৃতকার্য।
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্ত স্বয়ং ভগবান
তাবে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবে দুর্গতি—
অ-তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার এই রীতি।
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ
দেহ দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপবাধ।
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ দেহী ভেদ
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥

বাস্তবিক, জগন্নাথদেব কি কেবল কাষ্ঠ-প্রস্তর পুত্তলি? জগন্নাথ যে সর্ব্বশক্তিমান—

জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্ম-স্বরূপ
কিন্তু ইঁহ দারুব্রহ্ম স্থাবর স্বরূপ।

অতঃপর স্বরূপের উপদেশে কবি চৈতন্ত ভক্তদের সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহাদেরই দয়ায় শ্রীচৈতন্তদেবের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক রসাভাস যুক্ত নাটক রচনা করা সামান্ত ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। চৈতন্তদেব রায় রামানন্দের নিকট-দশদিন দশরাত্রি ধরিয়া রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছিলেন প্রয়াগে (এলাহাবাদ) দশদিন ধরিয়া সেই কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব রূপগোস্বামীকে শিক্ষাদান করিলেন। মহাপ্রভুর শিক্ষায় প্রজ্ঞালাভ করিয়া রূপ গোস্বামী নাটক রচনার অধিকারী হইয়াছিলেন।

শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি-সঞ্চারিলা
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা।
মধ্যলীলা-উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভু রূপগোস্বামীকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং বারানসী যাত্রা করিলেন যে, তিনি বৃন্দাবন হইতে গৌড় দেশ হইয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে গমন করিবেন। রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সমন্বিত নাটক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন—

এসে প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন,
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হইল মন।

নাটকের নান্দী শ্লোক (মঙ্গলাচরণ) বৃন্দাবনে থাকিতেই রচনা করিয়াছিলেন। তারপর গৌড়ে আসিতে আসিতে নাটকের কথা ভাবিতে লাগিলেন এবং কড়চা করিয়া রাখিলেন। গৌড়ে পৌছিলে কনিষ্ঠ অনুপম গঙ্গালাভ করিল, রূপ গোস্বামী একাই নীলাচলে রওনা হইলেন। পথে উড়িষ্যাদেশের সত্যভামাপুরে রূপগোস্বামী স্বপ্নে দেখিলেন এক দিব্যরূপানারী তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন,

আমার নাটক পৃথক করহ রচন,
আমার কৃপাতে নাটকে হবে বিলক্ষণ।

রূপ গোস্বামী ব্রজলীলা বর্ণনা করিতেছিলেন, সত্যভামার আদেশ পাইয়া নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে মাথুর লীলা বর্ণনা করিয়া নাটক লিখিবেন-স্থির করিলেন। পুরীতে পৌছিয়া রূপ গোস্বামী হরিদাসের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং মহাপ্রভু তাহাকে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

একদিন প্রভু ভাবাবেশে রূপকে বলিলেন, "রূপ, আমার কৃষ্ণকে ব্রজের বাহির করিও না—

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না জান কাঁহাতে।

রূপ গোস্বামী তখন সত্যভামার স্বপ্নাদেশ এবং মহাপ্রভুর আদেশ একরূপ দেখিতে পাইয়া ব্রজ ও মথুরা লীলার জন্ত দুইখানি পৃথক নাটক রচনা করিলেন। নান্দীমুখ, প্রস্তাবনা ও বিষয় সংযোজন সমস্তই পৃথক্ পৃথক লিখিবেন স্থির করিলেন।

অতঃপর রথযাত্রার দিন মহাপ্রভুকে রথের অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যাইতে দেখিয়া রূপ গোস্বামী সেই নৃত্যে ও গানে মহাপ্রভুর যে ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহা অবলম্বন করিয়া শ্লোক রচনা করিলেন—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্র
মিলিতস্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং
তথাপ্যন্তঃ খেলমধুর মুরলী পঞ্চমজুষে।
মনো হে কালিন্দা পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি।

গোস্বামী তালপত্রে শ্লোক লিখিয়া ঘরের চালাতে রাখিলেন এবং সমুদ্র-স্নান করিতে রওনা হইলেন। এদিকে মহাপ্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপ গোস্বামীকে না দেখিয়া

নিজেই সেই তালপত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। শ্লোক পড়িয়াই মহাপ্রভুর ভাবাবেশ হইল। গোস্বামী স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—

গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে ?

অতঃপর মহাপ্রভুর আদেশে রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ও স্বরূপ প্রভৃতির সমক্ষে রূপ গোস্বামী বিদগ্ধ মাধব নাটকের নান্দী শ্লোক পাঠ করিলেন। অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত তিনি দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ করিলেন এবং রায় রামানন্দের অনুরোধে ইষ্টদেবের রূপবর্ণনা শুনাইলেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণাবতীর্ণঃ কলে
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

শুনিয়া প্রভু কহিলেন,

"এই অতি স্তুতি হৈল।"

রায় রামানন্দ অনেক প্রশ্ন করিয়া, শ্লোকাদি যথাযথ শুনিয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্রবদনে॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার।

এই নাটকে কৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন বিলাস, মদন লেখ, শ্রীরাধিকার সহিত মিলন, রাধাকর্ত্তৃক বেণু হরণ, রাধিকা প্রসাদন, শরদ্বার, বৃন্দাবনে মুরলী নিবসন প্রভৃতি লীলা বর্ণনায় এই নাটক পরিপূর্ণ। কাশীতীর্থে নানা দিগ্‌দেশাগত ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে গোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

এই নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন যদুনন্দন দাস (জন্ম ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ)। যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর "রাধাকৃষ্ণলীলারস কদম্ব"ও এই নাটক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার একটি পদ এখানে প্রদত্ত হইল—

সজনি। সই শুন গোরা অপরূপ গাথা
বরজ বধুর সঙ্গে বিলাস গোপন রঙ্গে
ভুবন ভাসিল সেই কথা॥

সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীতেই যে বাঙ্গালা নাটকের প্রচলন হইয়াছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যদুনন্দন দাস বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের" পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ নাটক না হইলেও নাটকীয় উপাদান ইহাতে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

"বিদগ্ধ মাধব" রচিত হইবার পর রূপ গোস্বামী "ললিত মাধব" নাটক রচনা করেন। এই নাটকও সপার্ষদ মহাপ্রভুর সমক্ষে পঠিত হইয়াছিল। শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,

"আমি শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে", লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিতে এবং রসশাস্ত্র নিরূপণ করিতে রূপ ও সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছি। রায় রামানন্দ বলিলেন—

ঈশ্বর তুমি যে চাহ তা করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে॥

অতঃপর রূপ গোস্বামী "দানকেলি" নামক আর একখানি একাঙ্ক নাটক ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। যমুনার পার ঘাটে 'দান' আদায়ের জন্য শ্রীরাধা এবং তাঁহার সহচরীবৃন্দকে অবরোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে কৌতুক ক্রীড়া করিয়াছিলেন তাহাই এই রূপক নাটকখানির বিষয়।

ইহার পর পরমানন্দ সেন রচিত "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটক সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইনি গৌরাঙ্গদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তিতে তুষ্ট হইয়া গৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে "কবিকর্ণপুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় কবিকর্ণপুর হইতে বহু শ্লোক চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই নাটকে কলি ও অধর্ম্মের অভিনয়, ভক্তি বৈরাগ্যাদির কথোপকথন এবং সপার্ষদ চৈতন্যদেবের লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই নাটকের পূর্ব্বে দেবতা বা অবতার রূপে চৈতন্যদেবের চরিতকথা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি পার্ষদগণ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে অবতার রূপে ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। ভক্ত কবিও তাঁহার রচিত নাটকে অবতার রূপেই তাঁহার গুরুর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে প্রেমদাস (পুরুষোত্তম মিশ্র) স্বপ্নে চৈতন্যদেবের দর্শন লাভ করেন এবং পদ্যে চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁহার রচিত "বংশী শিক্ষায়" তিনি লিখিয়াছেন,

শকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় রচিনু সুখেতে।

১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

এতদ্ব্যতীত বৈদ্য কবিরাজ বলরামদাশের 'প্রেম বিলাসে' আমরা আরও একখানি সংস্কৃত নাটকের পরিচয় প্রাপ্ত হই। প্রেম বিলাসে এইরূপ বর্ণিত আছে—

ঐছে শ্রীসন্তোষ দত্ত অনুমতি দিল
"সঙ্গীত মাধব" নাম নাটক বর্ণিল।
রাধাকৃষ্ণ পূর্ব্বরাগ অপূর্ব্ব তাহাতে
শুনিয়া সন্তোষ দত্ত পরমানন্দ চিতে

* * *

গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীসন্তোষ রায়ের রীতি
গীতব্যক্ত করিলেন মনে পাঞা প্রীতি।

এই সংস্কৃত নাটক "সঙ্গীত মাধব"এর রচয়িতা শ্রীগোবিন্দ দাস কবিরাজ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ, এবং ১৬১২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপরেই এই নাটক রচিত হওয়ার সম্ভাবনা। রাজা সন্তোষ দত্তই শ্রীখেতুরীর ষড়বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে মহাসমারোহের আয়োজন করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলীকে একত্র করিয়াছিলেন। "সঙ্গীত মাধব" নাটকে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে।

"ললিত মাধব" নাটকের বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল। বটতলা হইতে প্রকাশিত বলিয়া বঙ্গানুবাদখানির স্থানে স্থানে যথেষ্ট ভুল রহিয়া গিয়াছে। তথাপি ইহাতে রচয়িতার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর স্বরূপ গোস্বামী অনুমান ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। অনুবাদের ইতিহাস স্বরূপ গোস্বামীর কথাতেই এখানে বিবৃত করিলাম—

শ্রী ললিত মাধব নাটক করিল লক্ষ
স্বরূপ গোস্বামী হইতে হৈলা প্রকটম
সংস্কৃত গদ্য পদ্য নাট্য ভাষা তায়
অনায়াসে সর্ব্ব অর্থ বুঝা নাহি যায়।
অতএব গৌড় ভাষা করিবার তরে
বৈষ্ণব সকল যত্নে আদেশিলা লোরে। জোরে?
সেই কালে মাতা মোর গেল বৃন্দাবনে
সঙ্গে দরশনে যাব বাঞ্ছা ছিল মনে।
আপন দুর্দ্দৈব ক্রমে গমন নহিল
তাহাতেই মন বড় উদ্বিগ্ন হইল॥
বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া
দেখিতে লাগিল গ্রন্থ একান্তে বসিয়া
গ্রন্থার্থ করিতে মোর নাহি নিজ শক্তি
তা সভার আদেশে চঞ্চল হইল মতি।
কেমন বর্ণিব গ্রন্থ না জানি সন্ধান
অকস্মাৎ গোস্বামী শ্রীজগন্নাথ নাম।
আরে সম্মুখে দেখি হঠাৎ কহিলা
স্বরূপ তুমি এতদিন পড়িলা শুনিলা।
অতএব নাটকের করহ পয়ার
যাহা শুনি সুখ হয় আমা সবাকার।
তেঁহো সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ মোর সহোদর ভাই
তার আজ্ঞা হইল ইঁহাতে বল পাই।
নিজ ইষ্টদেব পাদপদ্ম ধ্যান করি
শ্রীরূপ গোস্বামী পদে প্রণতি আচরি।
যাব বংশে জন্ম সেই প্রভুর চরণ
স্মরণ করিল স্থির করি নিবেদন।

মহাপ্রভুর সময়ে নাটক ও অভিনয় যে প্রকৃষ্ট রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। মুসলমান রাজত্ব কালে নাট্যকলা তেমন উৎকৃষ্ট ভাবে বাঙ্গালায় স্ফূরিত না হইলেও সমসময়ে উড়িষ্যায় উহা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের পর হইতে ইংরেজ অভ্যুদয়ের কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় নাট্যকলা, যাত্রা, কবি, পাঁচালী, কীর্ত্তন ও কথকথার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। আর এই সকলেরই প্রবর্ত্তনা হয় চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া। সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে যে গৌরচন্দ্রিকা হয়, তাহাও শ্রীচৈতন্যদেবকে উপলক্ষ করিয়া। আমারা ভক্তিভাবে সেই মহাপুরুষের চরণারবিন্দে প্রণাম করি।

লাল শাড়ী

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ মজুমদার

খট্ করিয়া সুইচটা টিপিতেই ঘরময় আলো ছড়াইয়া পড়িল।

সুপ্রভা বিছানা ছাড়িয়া মেঝের উপর পায়চারী করিতে লাগিল। তাহার চোখে আজ ঘুম নাই। রাত্রি প্রায় তিনটা বাজে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও মুহূর্ত্তের জন্য চোখ দুইটা সে বুঁজিয়া রাখিতে পারে নাই, মাথা গরম হইয়া উঠে, চোখ জ্বালা করে। আজ তাহার কি হইল! কি সব বাজে চিন্তা তাহার মনে আসিতেছে, চিন্তা করিয়া লাভ কিছু নাই, তথাপি সে চিন্তা করিতেছে। এমন হয় কেন? পুরাতনকে মানুষ ভুলিয়া থাকিতে পারে না কেন?

হোষ্টেলের ছাত্রীরা সকলেই অঘোরে ঘুমাইতেছে চারিদিকের বাড়ীগুলি নিস্তব্ধ, রাস্তা-ঘাট নির্জ্জন সারা সহরটাই ঘুমে অচেতন। কেবল সুপ্রভার চোখেই ঘুম নাই।

সুপ্রভা ভাবিতেছে তাহার জীবনের কথা, তাহার চোখে ভাসিতেছে অতীতের ছবি। তাহার সেই সাধের বাল্যকাল, সে যেন পূর্ব্ব জন্মের কথা। তাহার কৈশোর, তাহার যৌবন—সব যেন রূপকথার মত অলীক। সারা জীবনটাই তাহার রূপকথার প্রকাণ্ড এক আখ্যায়িকা। রূপকথার রাজকন্যার মত সেও ঘুমাইয়াছিল। একদিন হঠাৎ কোথা হইতে এক রাজপুত্র আসিয়া সোনার কাঠি আর রূপার কাঠির পরশে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া দিল, সে জাগিয়া উঠিল। সেদিন সেই রাজপুত্রকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, সে যেন কতকালের পরিচিত। রাজপুত্রকে সে বরণ করিয়া লইল; কাহারা শাঁখ বাজাইল, সানাই বাজাইল, উলুধ্বনি করিল। রাজপুত্র হাসিয়া বলিল, তুমি আমার। তাহার সারাদেহে তখন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সোহাগ, শিহরণ, আনন্দ আর অভিমানের মধ্য দিয়া দিন বহিয়া চলিল। এমনই সময় হঠাৎ একদিন রাজপুত্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া তেপান্তরের মাঠ পার হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। যে যায় সে কি চিরকালের জন্যই চলিয়া যায়! সত্যই কি আর ফিরিয়া আসে না! আজ যেই সূর্য্য অস্ত গেল, সে তো কাল আবার ফিরিয়া আসিবে; তবে রাজপুত্র ফিরিয়া আসিল না কেন?……

*　　　*　　　*

সুপ্রভা বাথ-রুমে যাইয়া ভাল করিয়া মাথা ধুইল, চোখে জলের ঝাপটা দিল। তারপর ঘরে আসিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিল না।

পাশের বস্তিতে সাত মাসের ছেলে কাঁদিতেছে, আর তাহার মা তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে। সুপ্রভা সব শুনিতে পায়। আহা! কি সুন্দর ছেলেটি! কেমন টুকটুকে চেহারা, কি নিটোল স্বাস্থ্য! এমন দুই একটি ছেলের মা সেওতো হইতে পারিত।…না—না—না! সে এইসব কি ভাবিতেছে? মা হওয়ার অধিকার যে তাহার নাই, সে যে ডাইনী! তাহার নিশ্বাসে বিষ আছে। যাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল, সকলেই তো তাহার বিষাক্ত নিশ্বাসে ধ্বংস হইয়া গেল। উঃ! ডাইনী—ডাইনী—রাক্ষসী!

সুপ্রভা দুইহাতে নিজের মাথার চুলগুলি টানিতে আরম্ভ করিল।

বস্তির এই পরিবারটিকে দেখিলে তাহার হিংসা হয়। অতি ক্ষুদ্র পরিবার, স্বামী-স্ত্রী আর এই নবাগত সন্তানটি। স্বামীটি হয়ত কোন ফ্যাক্টরীতে বা অন্য কোথাও পনর-বিশ টাকা বেতনে চাকরি করে। কিন্তু কঠোর দারিদ্রের মধ্যে ইহাদের দিনগুলি কি নিবিড় আনন্দে কাটিয়া যায়। বাঁধনহারা প্রেমের মাঝে ইহারা সংসারের সব দুঃখ-দৈন্যের কথা ভুলিয়া রহিয়াছে। সুপ্রভা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, রোজ বিকালে স্বামীর আসিবার সময় হইলেই বউটি

তাহাদের ঘরের ক্ষুদ্র জানালার মধ্য দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকে; গলির মোড়ে স্বামীর দেখা পাইলেই উহার কালো মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বউটি তাহাদের ছোট উঠানের একপাশের তুলসী তলায় মাটীর প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়; গলায় আঁচল জড়াইয়া বার বার প্রণাম করে; অভীষ্ট দেবতার কাছে হয়ত স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনা করে।

সুপ্রভা আবার বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। জানালার কাছে যাইয়া বস্তির জনশূন্য অন্ধকার উঠানটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছোট ছেলেটির কান্না থামিয়া গিয়াছে, চারিদিক আবার নীরব। নিঝুম চাঁদহীন রাত্রির এই অসীম নীরবতা সুপ্রভার বুকে আগুন জ্বালাইয়া দিল। তাহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; শিরা-উপশিরায়, রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে শিহরণ জাগিল। উদ্দাম উন্মাদনায় সুপ্রভা অস্থির হইয়া উঠিল।

তিরিশবছর আগে পিছনে ফেলিয়া আসা দিনগুলি অনির্ব্বচনীয় মাদকতা লইয়া দেখা দিল। আজ জীবনের খেয়াপারে আসিয়া বহুদূরে বিলীয়মান অতীতের পানে চোখ ফিরাইতেই তাহার অন্তরাত্মা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অতীতের সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্ত্তগুলির দিকে একবার সে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু ঝাপসা দৃষ্টি বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। অর্দ্ধস্ফুট জ্যোৎস্নারাত্রিতে নদীর এ-পাড়ে থাকিয়া ও-পাড়ের জগৎটাকে যেমন অস্পষ্ট দেখা যায়, সুপ্রভার অতীত জীবনটাও তেমনই অস্পষ্ট রূপ লইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

টুকরা টুকরা অনেক কথাই অস্পষ্ট মনে পড়ে। অনেক ঘটনাই নির্জ্জীব সিনেমার ছবির মত সচল হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে চায়। মনে পড়ে, সেইদিনের কথা, যেদিন এগার বৎসরের বালিকা সুপ্রভা লালরঙের শাড়ী পরিয়া, সিঁথিতে সিন্দুরের বিন্দু আঁকিয়া অশ্রু-সজল চোখে পাল্কীতে যাইয়া উঠিয়াছিল, বাদামতলীর মাঠের মধ্যদিয়া স্পন্দিত বক্ষে স্বামীর অপরিচিত গৃহে যাত্রা করিয়াছিল। তারপর সুখ-স্বপ্নে মাধুর্য্যঘেরা কয়েকটা দিন কি করিয়াই যে কাটিয়া গেল, সেইসব কথা ভাবিতে গেলে বুকের ভিতরটা হাহাকার করিয়া উঠে। সুখ-স্বপ্ন কিন্তু চিরদিন রহিল না; সব ওলট-পালট হইয়া গেল। জীবনের মধুরতম মুহূর্ত্তগুলি ঝরিয়া পড়িল, অন্তরের নিবিড়তম প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হইয়া গেল। এক সন্ধ্যায় সুদূর বর্ম্মা হইতে তার আসিল, তাহার স্বামী মারা গিয়াছে। তখন সে তের বৎসরের বালিকা।

তাহার বাবা বলিলেন, মেয়ের আমি আবার বিয়ে দেব। মা বলিলেন, অমন ছিষ্টিছাড়া কথা ব'লনা গো। দরদ দেখাইতে আসিয়া পাড়ার লোকে বলাবলি করিল, মেয়েটার বরাত খারাপ; দুটো বছর না পেরুতেই—। সুপ্রভা কেবল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল। বালিকা হইলেও সেদিন সে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, স্বামীর প্রতি ভালবাসা কত গভীর; বুঝিতে পারিয়াছিল তাহার জীবনের এতবড় ক্ষতি অপরিশোধনীয়। ভাবিয়াছিল আত্মহত্যা করিবে, কিন্তু পারে নাই।

ইহার পর আত্মীয়-স্বজনের আগ্রহে এবং নিজের প্রয়োজনের তাগিদে সে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিল। বি-এ পাশ করিয়া এই স্কুলে মাষ্টারী করিতেছে; সেও পঁচিশ বৎসরের বেশী হইবে। এতকাল নিজেকে সে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে অন্তরের বেদনা ভুলিয়া থাকিবার জন্য। তাহারই চেষ্টায় মেয়েদের জন্য এই হোষ্টেল গড়িয়া উঠিয়াছে। আদর্শ নারীত্বের মহিমায় ছাত্রীদের জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা সে করিয়াছে; সফলতাও লাভ করিয়াছে যথেষ্ট। অনেক ছাত্রীই তাহার দেওয়া আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজেদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং তাহার আসন তুলিয়া দিয়াছে অনেক উচ্চে।

কিন্তু সুপ্রভার নিজের জীবনের শূন্য ভরিল না, শান্তি তাহার মিলিল না।

* * *

সুপ্রভা জানালার কাছ হইতে উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া আবার আলো জ্বালিল। কম্পিতহস্তে ট্রাঙ্ক খুলিয়া তিরিশ বৎসর আগে তুলিয়া রাখা কয়েকখানা শাড়ীর

মধ্য হইতে লালরঙের একখানা বেনারসী শাড়ী বাহির করিল, আর বাহির করিল ট্রাঙ্কের তলায় কাপড়ের ভাঁজের মধ্য হইতে স্বামীর একখানা ফটো। আঠার বৎসরের যুবক, বলিষ্ঠ দেহ, চোখে চশমা, মায়া লাগানো মুখের গঠন। সুপ্রভার চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, বুকের মাঝে এক অদ্ভুত স্পন্দন জাগিল। সারা দেহে রক্তের স্রোত উত্তাল হইয়া উঠিল। মজা নদীতে আজ বান ডাকিয়াছে, এই বান রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

উন্মাদিনী সুপ্রভা থান কাপড় ছাড়িয়া লাল শাড়ী পরিল; তারপর আলো নিভাইয়া স্বামীর ফটোখানা বুকে জড়াইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সুপ্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমের মাঝে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, আকাশ-জোড়া মেঘের মধ্য হইতে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া এক রাজপুত্র বাহির হইয়া আসিল। রাজপুত্রের মাথায় সোনার টোপর, চোখে সোনার চশমা, মুখে অদ্ভুত হাসি। সুপ্রভা তাহাকে চিনিতে পারিল, এ যে তাহারই স্বামী। ঘোড়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; রাজপুত্র বলিল, আমি এসেছি। সুপ্রভা কত কাঁদিল; বলিল, তুমি আমায় ছেড়ে আর যেয়ো না গো। রাজপুত্র বলিল, তোমাকে নিয়ে যেতেইত এসেছি। তুমি আমার পাশে এসে বস। পক্ষীরাজ ঘোড়া আমাদের কত সাগর প্রান্তরের উপর দিয়ে, কত পরীর রাজ্যের মধ্য দিয়ে মেঘনগরের শেষ সীমানায় যে মায়াপুরী আছে সেখানে নিয়ে যাবে। কি সুন্দর সে দেশ! শীগ্‌গির ওঠ সুপ্রভা।

সুপ্রভা উঠিতে যাইয়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ঘোরও কাটিয়া গেল। তাহার সারা দেহে ভীষণ কম্পন সুরু হইল।

অনেকক্ষণ মরার মত চুপচাপ পড়িয়া থাকিয়া যখন সে চোখ খুলিল, তখন সূর্য্যের সোনালী আলোতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে, রাস্তাঘাট মুখর হইয়া উঠিয়াছে, সারা সহর জাগিয়াছে।

সুপ্রভা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। রাজপুত্র নাই, আবার ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছে। হোষ্টেলের ছাত্রীরা সব দরজার কাছে আসিয়া ভীড় জমাইয়াছে, তাহাদের সকলের চোখেই বিস্ময়ের চাহনি। মেঝের উপর কতগুলি কাপড়-চোপড় ছড়ান; স্বামীর ফটোখানা খাটের পাশে মেঝের উপর পড়িয়া আছে।

আস্তে আস্তে গত রাত্রির কথা সব মনে পড়িল। পরণে তাহার লাল সাড়ী।...ছি-ছি-ছি, ছাত্রীগুলি কি-ই না ভাবিয়াছে। এই লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়?

অন্ধকার! অন্ধকার নামিয়া আসে না কেন? এখন ভীষণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে অন্ধকারের—গভীর ঘন বিরাট অন্ধকার; এমন অন্ধকার যাতে ডুবিয়া থাকা যায়, হারাইয়া যাওয়া যায়; নিজেকে নিঃশেষে মিশাইয়া দেওয়া যায়।.. সূর্য্য মরিয়া যায় না কেন? অন্ধকারের মরুপ্রান্তরে বিশ্বের আলোর বন্যা মিলাইয়া যায় না কেন? দুঃখ-বেদনা, লজ্জা-অপমান সব ভুলিয়া থাকিবার জন্য লোকে যেমন মদের নেশায় ডুবিয়া থাকে, সুপ্রভাও তেমনি ডুবিয়া থাকিতে চায় অন্ধকারের মাতালস্বতায়।

সুপ্রভার মাথার শিরাগুলি টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

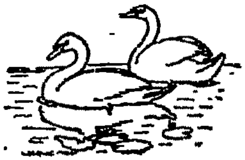

কবি কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

শ্রীভবপতি মৈত্র এম-এ

“কাক-জ্যোৎস্না”

কবি কুমুদরঞ্জনের “কাক-জ্যোৎস্না” কবিতায় একটী অভাবনীয় বিষয়ের কথা উত্থাপিত হইয়াছে। কবির অন্তর্নিহিত প্রীতি কিরূপে রূপান্তরিত হইয়া অন্য আধার গ্রহণ করিল, বাল্য সখী একপল্লীস্থ কোন ‘নেটিভ’ খ্রীষ্টান পাদরী-কন্যা সিল্‌ভিয়ার মৃত্যু অবলম্বনেই ইহা রচিত হইয়াছে। কবি বাল্যবয়সে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। মৃত্যুর পর তাহার কথা স্মরণ করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট অনুভব হয়। সংসারের শত পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতার আবর্ত্তনে তাহার মন অন্যত্র ন্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত হইলেও তাঁহার শৈশব-সখীর কথা লিখিতে ও বলিতে বেদনা ও যাতনা সহজেই আসিয়া পড়ে। ইংরাজ কবি Tennyson-এর In Memorium কাব্যগ্রন্থে কবি Arthur-এর সহিত পর্য্যটন, একত্র উপবেশন প্রভৃতি স্মরণ করিয়া অতীব দুঃখ বোধ করনে, তদ্রূপ কবি কুমুদরঞ্জনেরও আমরা দেখিতে পাই—

> “তাহার সহিত সে সুখ-ভ্রমণ
> স্মরি আজ ব্যথা পাই রে,
> মোরগ ফুলের বনের বেণী সে
> বড় প্রিয় ছিল তাই রে।

*

> ভরা গোলাপের বন দিযে দৌহে
> ভ্রমিতাম কত সন্ধ্যায়।
> হেরিতাম হায় সমাধির পায়
> দীপ দিত নিশি সন্ধ্যায়।”

খ্রীষ্টান-কন্যা অশেষ রূপগুণসম্পন্না, তাহার রূপ ও গুণ সৌরভ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি অতিশয়োক্তি করিয়া ফেলিলেও সুন্দরই হইয়াছে,

> আঙ্গিনার মাঝে ফুল বাগানেতে
> আনমনে যবে ঘুরতো,
> গোলাপ ফেলিয়া মৌমাছি দল
> চৌদিকে-তার উড়তো।”

কবিতাটী অত্যন্ত দুরূহ ও রহস্যপূর্ণ ব্যঞ্জনাজড়িত। কবিতাটী পড়িয়া মনে হয় যেন ইহা একরূপ কবির জীবনের ঘটনাবলীর সহিত সুসংশ্লিষ্ট। মনে হয় কবি তাহাকে স্বজাতীয় ব্যক্তির ন্যায় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ইহাতেই প্রমাণ হয়—

> সুসমাচারের কেতাবের মাঝে
> গঙ্গার স্তব হিন্দুর,
> গির্জ্জার ঘর ধবলিমা মাঝে
> সেই ছিল শুভ্র সিন্দুর।

যথাকালে সিল্‌ভিয়ার বিলাত হইতে আগত টেলর নামক যুবকের সহিত বিবাহ হইয়া গেল এবং নবদম্পতির একটী কন্যাও ভূমিষ্ট হইল। কিছুকাল পরে টেলর বিলাত প্রত্যাগমন করিলেন এবং সিল্‌ভিয়া আশান্বিত মনে সুখের স্বপ্ন দেখিয়া বর্ষত্রয় অতিক্রম করিবার পর টেলরের পুনরাগমন বিষয়ে নিরাশ হইলেন। ইহার মধ্যে দুঃখ তাহার বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। পিতার মৃত্যু হইল। সাংসারিক অভাব-অভিযোগ সকলই সে সহ্য করিতে বাধ্য হইল। কবির পত্নী গোপনে তাহার এই সকল অভাব মোচন করিতে লাগিলেন। তাহার পর একদিন গভীর রাত্রিতে ডাকাডাকির পর কবি সস্ত্রীক উঠিয়া তাঁহার দশবর্ষ ব্যাপী অদর্শনের পর বাল্য সখার গৃহে আগত হইলেন। কন্যাটীকে তাঁহার স্ত্রীর হস্তে অর্পণ করিয়া সিলভিয়া স্বীয় জীবনের দুঃখের কাতরোক্তি করিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করিতে করিতে মৃত্যু মুখে পতিত হইল। কবিতাটী অত্যন্ত গূঢ়াত্মবোধক। সিলভিয়ার প্রতি সাময়িক ব্যবধান থাকিলেও কবির বাল্যাবধি পবিত্র আকর্ষণ মনে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজের বিবাহ-বন্ধনের কঠোর রীতিনীতি থাকা সত্ত্বেও কবি নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। মানসিক স্বাধীনতাই প্রেমের প্রধান অঙ্গ। কবি ইহা যে কোন প্রকারে দেখাইয়াছেন।

> “শৈশব সখী অনাথিনী আজ
> সম্মুখে সাগর দুস্তর,
> মোর প্রিয়া তার সংবাদ লয়
> আমি যে কঠিন প্রস্তর।”

এই স্থলে আমরা দেখিতে পাই কবি তাঁহার প্রিয়জনের প্রতি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন স্বয়ং না করিতে পারিলেও পত্নীর দ্বারা সেই কার্য্য পরোক্ষভাবে সম্পাদিত করিতেছেন। কবি প্রস্তর হইয়াছেন লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী তাহার শুশ্রূষা ও অভাব-অভিযোগ দূরীকরণে সর্ব্বদা ব্যস্ত, ইহাও সিলভিয়ার প্রতি কবির সহানুভূতি ও গভীর আবর্ষণের পরিচায়ক। অলঙ্কার হিসাবে দেখিতে গেলে ইহাকে অপহ্নুতি বলিতে পারা যায়। সিলভিয়ার শেষ অভিব্যক্তিটী কবিতায় পদবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'পথিক গন্তব্য স্থল লক্ষ্য করিয়া নিমীলিত প্রায় চন্দ্রালোকযুক্ত রজনীতে যাত্রা করিয়া পরিশেষে যখন রজনীর শেষ দেখিতে না পায় তখনই তাহাকে কাক-জ্যোৎস্নায় যাত্রা বলিয়া থাকে।' ইহাতে বিবাহিত জীবনের অসম্পূর্ণতা, বিফলতা ও নৈরাশ্যই সূচিত হইয়াছে।

"আস্তে বলিল, জীবনে বড়ই
বেদনা পেলাম মর্ম্মে—
পেলেনাকো প্রেম চাতকিনী হায়
অথাই প্রেমের ধর্ম্মে।
জীবনের পথে করেছিনু বুঝি
কাক-জ্যোৎস্নায় যাত্রা,
প্রভাতের আলো কোথায় রহিল
মিলিল না তাহার বার্ত্তা॥
দিশেহারা হয়ে কণ্টক বনে
ভ্রমিয়া হ'য়েছি শ্রান্ত,
তৃষায় আমার হবে যে অনল
হৃদয় কি তাহা জানতো?
কন্তারে আমি তোমাদেরি করে
সপে দিয়ে যাই গো,
ধরমে করমে নামে ফিরে নিও
শ্যাম ছায়ে দিও ঠাঁই গো।"

কবিতাটীর অনেক রূপে অর্থ প্রতিতী জন্মায়। সিলভিয়ার অবলম্বিত খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উপর আস্থা যেন একটু চঞ্চল।

"পেলে নাকো প্রেম, চাতকিনী হায়
অথাই প্রেমের ধর্ম্মে।"

প্রেমের ধর্ম্ম—অর্থাৎ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম। "christianity is essentially a religion of Charity and love." অথাই—অর্থাৎ অতি গভীর। সিলভিয়ার শেষবাণীতে আমরা দেখিতে পাই তাহার যেন পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান। সেই জন্য তাহার শেষ অনুরোধ, তাহার কন্যাটীকে হিন্দু ধর্ম্মে পুনরায় দীক্ষিত করিয়া তাহাকে হিন্দু নাম প্রদান করিয়া হিন্দু বালিকা হিসাবে লালন-পালন করিতে। এখানে 'ফিরে নিও' কথাটীর উপর অনেক দূর নির্ভর করে। তাহার এই শেষ উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সিলভিয়ার পূর্ব্বতন জাতি হিন্দু এবং তাহার পূর্ব্ব-পুরুষ বঙ্গবাসী। কয়েক পুরুষ হইল তাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া বিভিন্ন সমাজ ও আচার আশ্রয় করিয়া পল্লীর এক পার্শ্বেই অবস্থান করিত। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এই ছত্রগুলিতে—

"পিতা গেল মারা ঘর যে পরের
থাকা চলিবে না আর তো,
বিপুল ধরণী অচেনা সকল
আর কেহ নাহি তার তো!"

ধর্ম্ম ও আচারে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাই সিলভিয়ার অন্তকালের বাণীর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতার শেষ কয় ছত্র অতি করুণ—

"ঢুলে পড়ে চাঁদ নিভে আসে আলো
জোছনায় কাঁপে উইলো
নিমীলিত প্রায় নয়নে কেবল
অশ্রু উজ্জ্বল রইলো।"

শুভ্রা লাবণ্যময়ী সিলভিয়ার অন্তিম সময়ের বর্ণনা কবি তাঁহার অপূর্ণ ভালবাসা—প্রথম জীবনে কবির সহিত মধ্য জীবনে ইংরাজ যুবকের সহিত বিচ্ছেদ ব্যথা যেন স্পষ্ট ভাবে প্রকটিত হইতেছে।

'প্রভাতের আলো কোথায় রহিল
মিলিল না তার বার্ত্তা।"

ইহাতে কবির সহিত তাঁহার ভালবাসার অপূর্ণতাও প্রমাণ হইতেছে। পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মে আগমনে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা কবির অন্য কবিতা "দাবী" হইতে দেখা যায়।

"প্রলোভনে ভয়ে যদি ত্যজে নিজ ধর্ম্ম।
অনুতাপে পরে যদি বিঁধে তার মর্ম্ম।
অনাচার করি যদি পরে হয় ক্ষুণ্ণ,
পুনঃ ফিরে আসা যদি ভাবে মনে পুণ্য,
করি হরিনাম ক'রে সব পাপ ক্ষয় সে :
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে।"

সিলভিয়ার শেষ ক্ষণে মুদিত চক্ষে ক্রুসেব উজ্জ্বলতা বর্ণন কবিরই ধার্ম্মিকতা ও আধ্যাত্মিক সাহসের পরিচয় দিতেছে।

"চিত্রকরের ভুল"

কবি কুমুদরঞ্জন কৃত "চিত্রকরের ভুল" নামক অপূর্ব্ব এবং অমর কবিতায় আমরা তাঁহাব কবিতা রচনাব ভঙ্গী দেখিয়া সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া যাই। ইহা প্রকৃত প্রথম শ্রেণীর কবিগণেরও অগ্রগণ্য শিল্পীগণেব রচনা-চাতুর্য্যযুক্ত। কবিতায় ভিতরে চিত্রকরের কারুকার্য্য বিগুমান। চিত্রকবের চিত্রাঙ্কণের ভিতরে কবিতা পরিস্ফুট হইয়াছে। অনেকটা যেন ইংরাজী Pre-raphelites. কবিগণেব কবিতার ন্যায়। কবি ও শিল্পী যেন একই ব্যক্তি। কবি কুমুদরঞ্জন চিত্রকরের প্রতি আদিষ্ট প্রতিচ্ছবি রচনায় তাঁহাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানসিক শক্তির বিকাশ করিয়াছেন। চিত্রকর যে চিত্র অঙ্কন কবেন ইহা তাহার চিত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। ইংবাজ কবি Hazlitt বলেন—"There is a pleasure in painting which none but the painter's know" চিত্রকর প্রথম যখন রাজার আদেশপ্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রেতে চন্দ্রোদয়ের ছবি অঙ্কিত করিল, তখন সভাসদ্গণ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিয়াছিলেন। ছবিটী এই যে—

> "অপূর্ব্ব এক মূর্ত্তি কিশোরীর
> হঠাৎ যেন পেয়ে বাহার দেখা,
> আঁচলখানি নিচ্চে গায়ে টানি
> অধরেতে জাগছে হাসির রেখা।"

সমুদ্রের এবং চন্দ্রের একত্র মিলনের চিত্র ইহা অপেক্ষা সুন্দর ভাবে অঙ্কন করা যায় না। কিশোরীর অচপল দৃষ্টি এবং আঁধারের প্রস্ফুটিত হাস্য চন্দ্রের দ্যোতক। সমুদ্রকে ধরিত্রীর উপরিস্থ অন্ধকারের আবরণ বলিয়া ধরা হইয়াছে। কন্যাটীর আহ্লাদকন্ধকে চন্দ্রোদয়ের সাদৃশ্য দেওয়া হইয়াছে।

> "চিত্র দেখি উঠলো সবাই হাসি
> শিল্পীরও হায়-অশ্রু এল ছেয়ে,
> সবাই হাসে বিদ্রূপেরি হাসি
> তারিফ শুধু দিলেন রাজার মেয়ে।"

রাজকুমারী ব্যতীত কেহই তাহার সুখ্যাতি করিল না। সভাসদ্গণের সহিত কবি বোধ হয় সাধারণ-বুদ্ধি পাঠক ও দর্শকগণকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাজকুমারীর এই বিচারের দ্বারাই অশেষ গুণসম্পন্নতার ও অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর রাজা তাঁহাকে দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকিতে দিলেম। চিত্রকর একখানি চিত্রাঙ্কণ করিলেন।

> "বালুর বেলায় কণ্টকেরি গাছে
> মলিন কোরক কাঁদছে শিশির মাখি,
> পুড়ছে দেহ খর রবির আঁচে
> কাছেই সাগর গর্জ্জে কিসের লাগি।"

এই স্থলে আমরা মরুভূমি ও সাগরের দৃশ্য পাশাপাশি দেখিতে পাই। ইহাতে ধনী ও দরিদ্রের চিত্র এক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজকুমারী একমাত্র তাঁহার প্রশংসা করিলেন সভার অপর কেহই সুখ্যাতি করিলেন না। চিত্রকরের এই দুই চিত্র অঙ্কনে অকৃতকার্য্যতা বুঝিয়া রাজা তাহাকে নির্গুণের ছবি আঁকিতে আদেশ করিলেন। ছবিটি এই—

> "মাঠের মাঝে একটী পলাশ গাছে
> ফুল ফুটেছে কাকগুলা দেয় গালি,
> বাসন্তী হাব আসি তাহার কাছে
> সিথাব পরাণ সাজানো বরণ ডালি।"

নির্গুণেব ছবির প্রধান দ্রষ্টব্য এই নির্গন্ধ কিংশুক, কুরূপ ও কর্কশ কণ্ঠ কাক সকল। কিন্তু এই স্থলে কবি দেখাইতেছেন যে, প্রকৃতি দেবী যিনি বাসন্তী সুষমার ডালি মাথায় লইয়া আসেন তাঁহার ললাট দেশে কিংশুক শোভা পায়—মানবের নিকট যাহা নিন্দনীয় প্রকৃতির নিকট তাহা আদরনীয়। এই স্থানে কুৎসিতাঙ্গ কাকগুলি নীরস, বিবেচনা হীন সভাসদ্গণকে বুঝাইতেছে। ইহাই হইতেছে ইহার ধ্বনি। শিল্পীর এবারও সভাসদ্গণের নিকট নিন্দা ও ঘৃণা লাভ হইল। কিন্তু রাজকুমারী ইহার সমাদর করিলেন। পরে তাহাকে দয়ার চিত্র অঙ্কন করিবার জন্য আদেশ করা হইলে, চিত্রকর ইহাতে একটু বিপন্ন বোধ করিলেন। কিন্তু চিত্রশিল্পী পরে যে আশ্চর্য্য-জনক সুন্দর কল্পনা চিত্রে নিবদ্ধ করিলেন তাহা বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল।

> "অনেক ভেবে অনেক দিবস পরে
> যত্ন ক'রে আঁকলে সে হায় কত,
> শিল্পী আছে চেয়ে চরণ পরে
> মূর্ত্তি দয়ার রাজ কুমারীর মত।"

এবার প্রশংসাবাদ আসিল সভাসদ্‌গণের নিকট হইতে। কিন্তু রাজকুমারী ইহাতে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলেন না।

"নিজের হাতে লিখে দিলেন তলে
দয়া নহে প্রেম যে ইহার নাম।"

রাজকুমারীর এইরূপ লিখিবার এবং শিল্পীর এইরূপ চিত্র আঁকিবার হেতু তাঁহাদের পরস্পর একাত্মতা। শিল্পী রাজকুমারীর প্রতি প্রীতি ও স্নেহের নিদর্শন একমাত্র চিত্রাঙ্কন ব্যতীত অন্য কোন রূপেই প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং এই যে করুণার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে আদিষ্ট ছিলেন—

"শিল্পী আছে চেয়ে চরণ
মূর্ত্তি দয়ার রাজকুমারীর মত।"

আমাদিগকে জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের সেই স্থল—

"স্মর গরলখণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্।
দেহি পদপল্লবমুদারম্॥"

স্মরণ করাইয়া দেয়। এই স্নেহ বা প্রীতির ভিতর রক্তমাংসের গন্ধ নাই। ইহা এক বিস্ময়কর স্বর্গীয় পদার্থ। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Higher intellectual love অথবা Platonic love বলে। এই স্থলে কবিতার পদবী "চিত্রকরের ভুল" বলিয়া লেখা হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে ইহা ভুল নহে, অথবা স্বেচ্ছাকৃত। কারণ, শিল্পী রাজকুমারী দ্বারা ইহার ধরা প্রার্থনা করেন। রাজকুমারী নিজেকে দয়াবতী বা দয়া গুণের উচ্চাধিকারিণী বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং তাঁহার উপর ঐ গুণ আরোপিত করিতে তিনি লজ্জিত বোধ করিলেন এবং উহা খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে "দয়া নহে প্রেম যে ইহার নাম," লিখিয়া দিলেন। ইহাতে তিনি চিত্র-শিল্পীর প্রকৃত মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিলেন। চিত্র-শিল্পীর দিক হইতে দেখিলে "সর্ব্বকান্তমাত্মানং পশ্যতি।" অথবা "তত্তস্তকিমপিদ্রবং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ।" তাঁহার ন্যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির নিকট রাজকুমারীর দয়ার মূর্ত্তি মিথ্যা নহে। রাজকুমারীর সমাজে আসন অনেক উচ্চে, শিল্পীর আসন অনেক নিম্নে সুতরাং এইরূপ উপায় ভিন্ন প্রণয় নিদর্শনের সুন্দর পথ পাওয়া যায় নাই।

ঊষা

শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ

ঊষার অরুণ আলো ধরণীরে দিল রাঙাইয়া
কোমল পরশে ঊষা জাগাইল ঘুম ভাঙাইয়া।
কাকলীর যাদুমন্ত্রে ফিরাইয়া আনিল চেতনা—
জগতের—অসমাপ্ত কর্ম্মরত জীবন-সাধনা।
অনাগত, অনারব্ধ, অঙ্কুরিত কত যে বাসনা,
সারা জীবনের তরে কর্ম্মসূচী ঊষার রচনা।
ঊষার প্রেরণা চিত্তে জাগাইছে নব নব আশা,
ঊষা কহে কাণে কাণে অনাগত জীবনের ভাষা।
তন্দ্রা-জড় হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে করি করাঘাত
ঊষা গায় আগমনী,—আসিতেছে নবীন প্রভাত।
ঊষার আলোকে হেরি অতীতের কত অন্ধকার—
ঊষারে বন্দনা বন্ধু, বন্দনা সে আমা সবাকার॥

বন্ধন-মুক্তি

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

(১১)

মাথা যখন ঠাণ্ডা হইল, সুকল্যাণী বেশ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। পরশু পার্টি। উর্ম্মি যদি খোলামনে হাসিখুসী ভাবে তাঁহার সহায়তা না করে, নিমন্ত্রিত অতিথিদের আদর-আপ্যায়নে উৎসাহ কিছু না দেখায়, তার যে সঙ্গীতই এই আনন্দমেলনের প্রধান আকর্ষণ হইবে বলিয়া তিনি ভরসা করিতেছেন, তাহাই যদি সে না করে অথবা করিলেও তেমন মন দিয়া না করে, তবে এই আয়োজন এবং ইহার জন্ত দু'হাতে তিনি যে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, সবই বৃথা হইবে। তখন কিছু আর কোনও রূপ তাড়নায় তাঁহার অভিপ্রায় মত চলিতে তাহাকে বাধ্য করিতে পারিবেন না। চমৎকার একখানি শাড়ী তাহার জন্ত তিনি খরিদ করিয়াছেন, শাড়ীর সঙ্গে মানায় একটি দামী ব্লাউজও তৈয়ারী করাইয়াছেন। যদি তাহা সে না পরে, অথবা তাঁহার আদেশে তখনকার মত একবার পরিলেও, সম্মেলনে আসিবার সময় তাঁহার অজ্ঞাতে তাহা ছাড়িয়া রাখিয়া যা তা একটা শাড়ী ও ব্লাউজ যেমন তেমন করিয়া পরিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, কি তখন করিতে পারিবেন? এমনও হইতে পারে, শিরঃপীড়া প্রভৃতি কোনও অসুস্থতার ছুঁতা করিয়া ঘরেই শুইয়া থাকিবে, সম্মেলনে উপস্থিতই হইবে না। হইলেও, ঐ রূপ কিছু একটা ছুঁতা দেখাইয়া একটু পরেই আবার, নিমন্ত্রিত সকলের আগমনে পার্টিটা জমিয়া উঠিবার আগেই বাহির, হইয়া যাইবে, ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়াই শুইয়া থাকিবে। তাই ত। এখন কি করা যায়? হঠাৎ অতি ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া এরূপ কঠোর তাড়না—পদাঘাত, কেশাকর্ষণ পর্য্যন্ত—হাঁ, বয়স্থা কন্যা—বোধ হয় কিছু বাড়াবাড়িই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্রোধের কারণ যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও ত উপেক্ষা করিবার মত নহে। এ ক্রোধ তাঁহার অসংযত চিত্তের আকস্মিক একটা অধীর উত্তেজনা নহে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধুচিত্তের বিরাগ জনিত উদ্দীপনা, সাধারণ anger মাত্র নহে, rightful resentment, indignation—অন্যায় দমনে সাধুসাধ্বী মানবমানবীকে যাহা শক্তি দান করে।

কিন্তু তবু ক্রোধ সম্বরণ উচ্চ একটি সুনীতি বলিয়াও আচার্যগণ উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাও সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, পাপকে ঘৃণা করিবে, পাপীকে ঘৃণা করিবে না। সুতরাং নিগ্রহের যোগ্য হইতেছে পাপ, পাপী নহে; তাঁহার কন্যা পাপী মাত্র, 'পাপ' নহে। সুতরাং নিগ্রহ না করিয়া মার্জ্জনাই তাহাকে করা উচিত ছিল। কিন্তু পাপীকে বাঁচাইয়া কেবল পাপকে যে ঘৃণা করিবেন, নিগ্রহে দমন করিবেন, কি প্রকারে তাহা সম্ভব হয়? পাপীর বাহিরে একটা পাপ ত ধরাছোঁয়ার মত একটা বস্তুরূপে কোথাও দেখা দেয় না। পাপ যে নিরাকার —অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়—তেমন নাকি—হা ধিক! এ কি তিনি ভাবিতেছেন! এমন একটা বিগর্হিত তুলনা কি করিয়া তাঁহার মনেই উঠিল! আঃ!—তা সে যাক! তুলনা অনাবশ্যক। ইহা ত একটা নিত্য সত্য যে পাপকে দেখা যায় না, ধরাছোঁয়া যায় না, পাপীকে আশ্রয় করিয়াই সে থাকে, পাপীর কর্ম্মেই আপনাকে প্রকাশ করে। সুতরাং পাপীর নিগ্রহ ব্যতীত পাপের নিগ্রহ সম্ভবই হয় না। পাপকে দমন করিতে হইলে নিগ্রহ পাপীকেই করিতে হইবে, অনুগ্রহে বরং আশ্রিত পাপ প্রশ্রয়ই পাইবে। তা সে যাহাই হউক, এদিককার অন্ত কতকগুলি বিবেচনায় তখনকার মত আপনাকে একটু সংযত রাখিয়া চলিতে পারিলেই ভাল হইত। অন্ততঃ দুইটা ধমক চমক দিয়াও ক্ষান্ত হইলে পারিতেন, পরে যা হয় প্রতিকারের চেষ্টা করা যাইত। আর কিছুই লাগিত না। ঐ বুড়ী যে সর্ব্বনাশটা করিতেছে, তাহার নিকট হইতে দূরে ওকে রাখিতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যাইত। কিন্তু ও পাপ কত দিন আর কলিকাতায় থাকিবে? অনেক দিন ত আসিয়াছে। পরের ঘাড়ে এত বড় একটা দায় ফেলিয়া রাখিয়াছে, মহীনেরই বা আক্কেল কি? এখন উদ্যোগী হইয়া দেশে উহাকে পাঠাইয়া দেওয়াই তার উচিত। যদি দেয়, ভাল, উর্ম্মির সন্তুষ্টির জন্ত আরও দুই একটা দিন না হয় ওখানে যাইতে 'এলাউ' তাহাকে করিতে পারেন। কিন্তু পরশু পার্টি—উর্ম্মি নিশ্চয়ই মনে মনে বড় চটিয়া রহিয়াছে। এক

মাত্র এই ভরসায় নরম কিছু হইতে পারে। এই কিন্তু ভরসা তাহাকে দেয় কে?—তিনি নিজে গিয়া এখনই কিছু আর এসব কথা তাহাকে বলিতে পারেন না। পারেন রুষ্ট ভাব বর্জ্জন করিয়া শান্ত সস্নেহ ব্যবহারে তার মনের দুঃখ যাহাতে শমিত হয়, তাহার একটা চেষ্টা করিতে। কিন্তু তাহারই বা কতটুকু অবসর এ সময়ের মধ্যে হইতে পারে? এক মহীন যদি কিছু পারে। পারিলে সেই পারিবে। ঊর্ম্মি তাঁর বড় বাধ্য; ভালও বাসে খুব; সে যখন যা কিছু বলে, যত সহজে আর আনন্দে তা সব করে। তাঁর কোনও কথা—অবহেলা না করিলেও—তেমন মনের সঙ্গে যেন মানিয়া চলিতে চাহে না। আবার তার সঙ্গে মন খুলিয়া যত হাসি-গল্প করে, তাঁর সঙ্গে তেমন কখনও করে না। অথচ তিনি মা, আর মহীন পিতা মাত্র! যাহা হউক, মহীনকেই বলিতে হইবে। তবে তিনিও সুযোগ মত চেষ্টার ত্রুটি কিছু করিবেন না।

ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চা খাইবার সময় প্রায় হইল। বাহির হইয়া অতি স্নিগ্ধ কোমল স্বরে ডাকিলেন, "ও ঊর্ম্মি!"

ঊর্ম্মি নীচেয় ছিল; বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, "কি মা?"

"চা খাবার সময় যে হ'ল।"

"হাঁ, এই ত তৈরী করছি!"

"তৈরী ক'রছিস্? বেশ। তা বড়ঘরটা খালি ক'রে ওধারে ঐ ছোট ঘরটায় যে চা খাবার যায়গা করা হ'য়েছে, সেইখেনে নিয়ে যাস্।"

"তাই যাব।"

"মহীন আছে ওখানে?"

"আছেন।"

"আচ্ছা, আমিও এই যাচ্ছি।"

স্বামী স্ত্রী কেবল দুজনেই একত্র বসিয়া চা খাইতেন। আর ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ পাকের ঘরের বারান্দায় চা-পানে বসিত, ইচ্ছামত হাসি-গল্প হৈ-রৈ করিত। সময়োচিত এরূপ স্ফূর্ত্তির উচ্ছ্বাস মাতার সম্মুখে তাহাদের উঠিতে চাহিত না, তাই তাঁহার শ্রুতির যথাসম্ভব বাহিরে ও দৃষ্টির অন্তরালে এই স্থানে বসিয়াই তাহারা খাবার খাইত, চা খাইত। ইহাই সাধারণ রীতি এই পরিবারে হইয়া গিয়াছিল। যদিও ঊর্ম্মি এখনও কখনও পিতার অনুরোধে তাঁহাদের কাছেই বসিত।

সুকল্যাণী কাণ খাড়া করিয়া ছিলেন। কিন্তু আজ ছেলেমেয়েদের স্ফূর্ত্তির তেমন কোনও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ঊর্ম্মির একটি কথা, মুখে এতটুকু হাসির শব্দ—কিছুই তাঁহার কাণে আসিল না। বসিয়া বসিয়া একটি নিশ্বাস তিনি ছাড়িলেন।

মহিন্দ্রনাথও নীরব। সুকল্যাণী কহিলেন, "হাঁ, একটা কথা—"

"কি, বল?"

"তোমার পিসীমাকে কদ্দিন আর এখানে রাখতে চাও?"

"রাখতে ত আমি চাইছি না, তিনি রয়েছেন, যাবার কথা কিছু বলছেন না। আমিও বলতে পারছি নি, তুমি দেশে ফিরে যাও।"

"শীগ্‌গিরই তাঁকে পাঠিয়ে দিতে পার না?"

"কি দরকার? থাকুন না তাঁর যদ্দিন খুসী। হুকুমই ত দিয়ে দিয়েছ ওরা কেউ তাঁর কাছে আর যেতেই পারবে না।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "তাই ত ভাবছি, অতটা জুলুম ঊর্ম্মির ওপর করা বোধ হয় ঠিক হবে না। মনটাও তার বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। সেটা আমি চাই নে। তবে বেশী দিন তাঁর এই পৌত্তলিক প্রভাবের ভেতর সে থাকে এটাও কোনও মতে বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। তাই ভাবছিলাম, তিনি যদি শীগ্‌গিরই দেশে ফিরে যান, আর দুই একটা দিন ওখানে যাওয়াটা অনুমোদন আমি করতে পারি।"

"দেখা যাক।"

"আর দেখ, ওবেলা আমি কিছু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছি। পরশু আবার পার্টিটা রয়েছে—"

"সেটা আগেই তোমার একটু হিসেব করে চলা উচিত ছিল। পার্টিটার 'সাক্সেস' (success) তুমি যা চাও, সেটা করাতে হবে ওকে দিয়ে। অথচ মার-ধর করে ওকেই বেঁধে দিলে দারুণ চটিয়ে, একদম মনভাঙ্গা ক'রে।"

"তা যদি এখন বলা যায় আর দুই একদিন গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে—এই ধর দেশে ফিরে যাবার আগে—"

"ব'লে দেখতে পার।"

"সেটা—তা দেখ, আমি পারব না। সকালে এই কাণ্ডটা হল—আবার এখুনি যেচে গিয়ে—"

"হুঁ।"

"হবে হাঁ, যদি অনুতাপের ভাব কিছু দেখাত; নিজে এসে কিছু বলত—"

"অনুতাপের কারণ তার কিছু হয় নি, যা হয়েছে তোমার।"

একটু ভ্রূকুটি সুকল্যাণীর ললাটে দেখা দিল। যাহা হউক, মনের বিরক্তিটা চাপিয়াই তিনি কহিলেন, "তা সে যাই বল, প্রতিবাদ আমি কিছু করতে চাইনে। পার্টিটার আয়োজন করেছি, সেটা যাতে বেশ সৌষ্ঠবে নির্ব্বাহ হয়, তা ত দেখতে হবে। নইলে পরিবারের সুনামই থাকবে না। আর সে লজ্জাটা যেমন আমার, তেমন তোমারও বটে। তোমার কথায় ও যত সহজে শান্ত হবে, নরম হয়ে চলবে, আমার কথায় তা হবে না। আর তেমন করে আমি বলতেও কিছু পারব না।"

"না; সেটা পারবেই না। আর যেসব ভূমিকা করে, যে ভঙ্গীতে বলবে, মনটা আরও বিগড়ে যাবে তার। আচ্ছা, দেখি, বলতে যা হয় আমিই বলব।"

চা পান হইল; মহীন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর নিভৃত এক গৃহে উর্ম্মিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উর্ম্মি আসিয়া কেমন একটা লজ্জায় যেন এতটুকু হইয়া এক পাশে দাঁড়াইল। অনেক স্থলেই দেখা যায়, অপরাধী অপেক্ষা অপরাধ-বিড়ম্বিত যে, সেই লোকের সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে লজ্জা পায় বেশী। কারণ এ বিড়ম্বনা তাহার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাকেই আঘাত করে। যাহা হউক, একটু হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "শুনেছি আমি সব উর্ম্মি। তোর মার সঙ্গে ঝগড়াও খুব করেছি। তা তুই খুব চটে গেছিস, নয়?"

উর্ম্মি উত্তর করিল, "না, না, চটিনি ঠিক। তবে দুঃখু হয়েছিল বড়। তা কি করব? জানতামই ত ধরা প'লে মার কাছে তাড়না খুবই খেতে হবে।"

"তা সে তাড়নারও ত একটা সীমা আছে। একদম মারধর গিয়ে তোকে করলেন।"

"তা কি হবে? অতটা রাগ হলে মাথা ঠিক ত কারও থাকে না। তা সে যাই করুন, সব সইতে পারতাম বাবা। কিন্তু—"

"কি?"

"দিদিমার কাছে যে আর যেতে পারব না—" চক্ষে উর্ম্মির জল আসিল।

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "তাও পারবি।"

"পারব? যেতে মা দেবেন?"

"দেবেন। রাজি হয়েছেন। তবে তোকে একটা কাজ করতে হবে উর্ম্মি।"

"কি বাবা?"

"এই পরশু এই পার্টিটা হচ্ছে কি না—"

"ও!" বলিয়া উর্ম্মি একটু হাসিল; হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা সে সব ঠিক হবে, বাবা, মা যেমনটি চান। বুঝলে? বলো তাঁকে—" বলিয়াই মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিন যথাসময়ে গৃহতলেই আস্তৃত একখানি গালিচার উপর পার্টির ভূমিকাস্বরূপ প্রার্থনাসভা আরম্ভ হইল। প্রবীনবয়স্ক ভদ্রলোক ও মহিলা নিমন্ত্রিত যাঁহারা হইয়াছিলেন, অনেকেই আসিয়া যোগদান করিলেন। উদ্বোধনসঙ্গীতটি কয়েকটি সঙ্গিনীসহ উর্ম্মিই করিল, বন্দোবস্তই এইরূপ হইয়াছিল। যুবকরাও কেহ কেহ আসিয়াছিল, কিন্তু "সকলেই" যে প্রাবস্তিক এই অনুষ্ঠানে আকৃষ্ট হইয়া আসিবে না, সুকল্যাণীও ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন; সুতরাং তেমন কোনও রূপ উৎকণ্ঠা তাঁহার দেখা গেল না, যদিও মুদ্রিতনয়নেও মধ্যে মধ্যে উৎকর্ণ হইয়া তিনি রহিতেছিলেন, যদি কাহারও কাহারও মোটরের শব্দ দ্বারদেশে হয়। কিছু কিছু তাহা হইতেছিলও বটে। এবং ঈষৎ চক্ষু খুলিয়াও তিনি দেখিতেছিলেন, নূতন কে কে আসিয়া সভায় বসিয়াছেন। ইহা ত মন্দিরের সাধারণ উপাসনা নয়, তাঁহারই গৃহে বিশেষ একটি অনুষ্ঠান। সুতরাং গৃহিণীরূপে অতিথির মর্য্যাদারক্ষায় এটা তাঁহাকে দেখিতেও হয়।

অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার প্রার্থনা ও ধর্ম্মীয় বক্তৃতা (sermon) যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সমাধা হইল। শেষ সঙ্গীতটি তখন উর্ম্মি একাই আরম্ভ করিল; বন্দোবস্ত এইরূপই হইয়াছিল, বাহিরে

তখন ভস্ ভস্ শব্দে একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল বেশ বড় একখানি মোটর এবং আরোহী বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনীয় কোনও অতিথি। ত্রস্ত উঠিয়া সুকল্যাণী বাহির হইলেন, দেখিলেন মিষ্টার ও মিসেস্ জে, মল্লিক। স্মিতমুখে ইঁহারা হাত বাড়াইয়া দিলেন। অতি স্মিতমুখে করমর্দ্দন ও স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া অশেষ আদরে কৃতকৃতার্থা সুকল্যাণী ইঁহাদিগকে গৃহমধ্যে আনিয়া বসাইলেন। গানটি শেষ হইল। অনেকেই উঠিয়া তখন এধারে ওধারে সজ্জিত চেয়ারে কৌচে গিয়া বসিলেন; মৃদু একটা কলরবও গৃহ ভরিয়া উঠিল। মিসেস মল্লিক কহিলেন, "কে গাইল ভাই সুকু? তোমার মেয়ে বুঝি?—বাঃ! খাসা গায় ত! তা ডাক না, ভাই, ওকে এদিকে একটুখানি?"

ত্বরা করিয়া গিয়া সুকল্যাণী উর্ম্মিকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন।

"এদের নমস্কার কর উর্ম্মি, ইনি আমার বন্ধু চিন্ময়ী মল্লিক, আর ইনি মিষ্টার জে, মল্লিক।"

উর্ম্মি নমস্কার করিল। মুগ্ধনেত্রে মল্লিকসাহেব একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "বাঃ! খাসা মেয়েটি ত। ব'স মা, ব'স, কাছে ব'স।" বলিয়া স্নেহে হাতখানি ধরিয়া পাশেই উর্ম্মিকে বসাইলেন।

সুকল্যাণী কহিলেন, "আপনারা তবে ওর সঙ্গে আলাপ করুন, অভ্যর্থনার ভার ওরই ওপর রইল। আমি আসছি একটু ঘুরে—ওঁরা সবাই এসেছেন—আসছেনও কেউ কেউ। এই যে উনিও এসেছেন, তবে আর কি?" বলিয়াই সুকল্যাণী ফিরিলেন, এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া সমাগত অতিথিবর্গের আপ্যায়নে মনোনিবেশ করিলেন। সেটাও ত তাঁহাকেই করিতে হইবে। অবশ্য মিষ্টার মোকাজ্জিও ছিলেন, তিনিও সময়োচিত শিষ্টালাপে সকলকে আপ্যায়ন করিতেছিলেন। তবু তিনি ত mistress of the house, দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁহারই বটে।

সঙ্গীত ও আবৃত্তির প্রয়োজনে একপাশে ছোট একটি মঞ্চ সাজান হইয়াছিল। প্রোগ্রামও একটি ছাপান হইয়াছিল। সুকল্যাণীর বিশিষ্ট একজন বন্ধু, কোনও স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, প্রোগ্রামটি সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উর্ম্মির ডাক পড়িল, সঙ্গীত আবৃত্তি আরম্ভ হইল, চা-খাবার ইত্যাদিও পরিবেষন করা হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আহার-পানও চলিতে লাগিল। সুকল্যাণী তখন আসিয়া একবার মল্লিকদম্পতির নিকটে বসিলেন।

চিন্ময়ী কহিলেন, "চমৎকার মেয়েটি তোমার ভাই। ওকে দেখে, ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারী খুসী উনি হ'য়েছেন।"

মিষ্টার মল্লিকও কহিলেন, "হাঁ, খাসা মেয়েটি আপনার। ভারী ভাল লাগল আমার। এমন একটি মেয়ে পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা।" বলিতে বলিতে চাপিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িলেন।

চিন্ময়ী কহিলেন, "কমলকে দেখছি না যে? এখনও আসেনি বুঝি?"

"না, দেখছি ত না এখনও। তা আসবে ত একটিবার?"

"বলেছিল ত আসবে। তা ওর বন্ধুদের কি একটা গীতাভিনয় হচ্ছে—তারা নাকি এসে বড্ড ধরে পড়েছিল—এড়াতে পারে নি। বলেছিল একটুখানি দেরী হ'তে পারে।"

"ও!"

ঈষৎ গম্ভীর ও বিষণ্ণ ভাবে সুকল্যাণী একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"তা আসবে—আসবে, আসবে বই কি? ব'লেছে যখন আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। আমিও অনেক ক'রে ব'লে দিয়েছিলাম, ওখানটা হ'য়ে যত শীগ্‌গির পারে যেন চ'লে আসে। তা ভাই, আমরা তবে এখন আসি?"

"এখুনি যাবে? কই, খেলেও ত না কিছু?"

"এই ত, চা কতকটা খেয়েছি আর আধখানা সন্দেশ। উনিও ত এক টুকরো কেক্ আর কয়েক সিপ (sip) চা খেলেন। ডিনারের কেবল আগে আর কোথাও উনি কিছু খান-টান না বড় এখন। বয়েসও হ'য়েছে—যখন তখন এটা ওটা খাওয়া সহ্যই হয় না। তা হ'লে—কিছু মনে করো না—উঠি ভাই এখন।"

"তা—উর্ম্মির একটি গান শুনবে না?"

"হাঁ, হাঁ—ভাল মনে করিয়েছ—শুনব বই কি, দেখি—(প্রোগ্রামটা দেখিয়া) হাঁ, এই যে next item-ই ওর একটা গান—'ঐ বুঝি বাঁশী বাজে।' হাঁ, হাঁ শুনতে হবে বই কি? কি বল গো? গানটা শুনেই যাওয়া যাক। এলাম—"

"হাঁ, এলাম—" বলিতে বলিতে একটু হাসিয়া সুকল্যাণীর দিকে চাহিয়া মল্লিক সাহেব কহিলেন "তা—ব'লতে কি মিসেস মোকার্জ্জি, এলাম—অবিশ্যি আপনার মানও রাখতে হয়—তবে বেশী আকর্ষণ এইটেই হ'য়েছিল, ওকে একটিবার দেখব, ওর দুটি গান শুনব। একটুখানি দেরী—তা হলই বা?"

অতি প্রীতপ্রফুল্ল হাসিমুখে সুকল্যাণী কহিলেন, "বড় আনন্দিত হ'লাম মিষ্টার মল্লিক। আমার মান—তা এই আকর্ষণটাই যে আপনাকে বেশী টেনেছে, এইটেই অতি বড় মান ব'লে আমি মাথায় তুলে নিচ্ছি।"

গানটি হইল। অতি পরিতৃপ্ত হইয়া মল্লিক-দম্পতি বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই গিয়া তাঁহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

কিন্তু কই, কমল ত এখনও আসে না। কোথায় আবার কাদের নাটকে গিয়া জুটিল? নাটক—গীতাভিনয়—সঙ্গে নৃত্যও অবশ্য আছে। এই বন্ধু কাহারা? আধুনিক নির্লজ্জা বালিকারাও বোধহয়—বোধহয় কেন—নিশ্চয় আছে। ইহাদের সঙ্গে এতটা familiarity—তবে কি না আজকাল এরূপ freedom ছেলেমেয়ে সবারই মধ্যে চলতি হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কোনও বাধা বড় মানিতেই চাহে না। বাধা কিছু দেয়ও না বড় কেহ। তা সে যাই হউক, নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, একটিবার কি আসিবে না? মাতাকেও নাকি বলিয়া গিয়াছে আসিবে। কিন্তু কখন আসিবে? এদিকে প্রোগ্রামও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। মহীন্দ্রনাথ তখনই আবার গৃহমধ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সুকল্যাণী অতি উৎসুক নেত্রে পথের দিকে চাহিয়া দ্বারেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। গাড়ীও ত কয়েকটা চলিয়া গেল। কিন্তু কই, একখানিও ত গৃহদ্বারে থামিল না। গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া অতি ক্ষুব্ধচিত্তে সুকল্যাণী গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রোগ্রামের উপসংহারে ছিল একটি কোরাস গান—
'জনগণমন-অধিনায়ক হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।'
সেটি আরম্ভ হইল। উর্ম্মি ও আরও কয়েকটি বালিকা মঞ্চে উঠিয়া গানটি আরম্ভ করিল। সুকল্যাণী অতি গভীর আর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। গানটি যেমন শেষ হইল, বাহিরে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। সুকল্যাণী আর উঠিলেন না। যারপরনাই অবসাদগ্রস্ত তিনি হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামীর দিকে একবার চাহিলেন। মহীন্দ্রনাথ দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

কমল তাঁহার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিল, পশ্চাতে গার্গী, লিলী, ফ্যানী, আত্রেয়ী ও মৈত্রেয়ী। কমল বলিতেছিল, "মাপ ক'রবেন, মিষ্টার মোখার্জ্জি—I am very sorry! বড্ড দেরী হয়ে গেছে আমার—but not yet too late I hope. এই যে মিসেস মোকার্জ্জি, good evening! extremely sorry to have been so late,—কি জানেন, আর একটা entertainment ছিল and I was pre-engaged, তাই—"

মুখে যথাসম্ভব মিষ্টহাসি তুলিয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "তা কি হবে—আর এক যায়গায় engagement ছিল—তবু আস্তে যে পেরেছ এতেই বড় সুখী হ'লাম। তোমার মা আর তোমার বাবাও এসেছিলেন।"

"এসেছিলেন? Ah! very glad to hear it! তা'হলে অপরাধটা আমার অনেকটা হালকা হ'য়েই গেছে। excuse বেশ করতে পারেন, কি বলেন?"

বাঃ! অতি ভদ্র ছেলেই ত বটে!—মুখ ভরিয়া সুকল্যাণীর মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, "কেন আর অত ক'রে ব'লছ কমল? চিন্ময়ীর ছেলে তুমি, যেন আমারই ছেলে। অপরাধ কিছু হ'লেই কি তা নিতে পারি? তোমার এই বিনয়, এই অনুতাপ প্রকাশ—এতে স্বয়ং ভগবানই যে সব অপরাধ মানুষের সদয় হ'য়ে ক্ষমা করেন। আর সামান্য মানবী আমি, তাঁর দাসী—মনে কিছু রাখতে পারি?—তা ব'সো, বাবা, বসো,"—বলিয়া স্নেহে হাতখানি ধরিয়া নিকটেই একখানি কৌচে নিয়া বসাইলেন।

"কই, উর্ম্মি কই?" বলিয়া মঞ্চের নিকটে উর্ম্মির দিকে চাহিলেন। লোকের ভীড় তখন অনেক কমিয়া গিয়াছিল। গার্গী প্রভৃতি সঙ্গিনীরা গৃহে প্রবেশ করিয়াই ফর্‌ফর্ করিয়া গিয়া উর্ম্মিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কলকল করিয়া প্রায় সমস্বরেই সকলে বলিতেছিল, "এই যে উর্ম্মি, ভাল আছ ত

ভাই ? কিছু মনে ক'রো না ভাই, বড্ড দেরী হ'য়ে গেল আমাদের—"

"ফাল্গুনী একটা মিউজিক্যাল প্লে আমাদের ছিল কিনা, তাই—"

"কমলদা'কেও ধ'রে নিয়েছিলাম, শেষ না হওয়া অবধি আর ছাড়িনে—"

"তিনি ত ছটফট্‌ ক'রছিলেন—এখানকার attraction-টাও খুব বড় ছিল কি না—"

"তা আমরা বল্লাম, সে হবে না। আমরাও যাব, নিয়ে যেতে হবে আমাদের—"

"তোমাদের প্রোগ্রাম বুঝি সব 'ফিনিশ' (finish) হ'য়ে গেছে ? জমজমা আর নেই, দেখলাম বেরিয়েই অনেকে যাচ্ছেন—"

"তাই ত, ভাবছিলাম তোমার দুটো গান শুনব—"

উর্ম্মি কহিল "ব'সো ভাই, ব'সো তোমরা। গান—সে দেখা যাবে। তবে প্রোগ্রামটা এই শেষে হ'য়ে গেল।"

সুকল্যাণীর গলা তখন উঠিল, "কই, উর্ম্মি কই ?"

"ঐ যে তোমার মা ডাকছেন, কমলদা'ও ওখানে বসে রয়েছেন। এস, ওদিকেই যাওয়া যাক।"

উর্ম্মির হাত ধরিয়া একরূপ তাহাকে টানিয়া লইয়াই সকলে গিয়া কমলের নিকটে দাঁড়াইল। একটু ভ্রূকুটি সুকল্যাণীর ললাটে দেখা দিল। মাগো, একি সব মেয়ে !

আত্রেয়ী কহিল, "এই যে উর্ম্মিকে ধ'রে এনেছি কমল'দা। ওদের প্রোগ্রামটা ত শেষ হ'য়ে গেছে। তা এলাম সবাই মিলে ছুটে, ওঁর একটি গান শুনব না ? আপনি বলুন না ? তবেই গাইবে।"

হাসিয়া কমল কহিল, "তা এমন treat-টা অন্যের জন্যে miss ক'রেছি, মিস মোকার্জ্জি যদি অনুগ্রহ করেন, we shall be very thankful !"

যাহা হউক, উর্ম্মির একটি অন্ততঃ গান কমলকে শুনাইবার একটা সুযোগ ভগবৎকৃপায় উপস্থিত হইল। অতি প্রীত হইয়াই সুকল্যাণী কহিলেন, "তা হ'লে যাও বরং উর্ম্মি—ওরা সবাই এত ক'রে বলেছে—ঐ প্রোগ্রামের একটি গান ঐ মঞ্চে দাঁড়িয়ে গিয়েই গাও। খুব ভাল লেগেছিল সবারই তোমার রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটা—'ঐ বুঝি বাঁশী বাজে'—"

তরুণীরা মুখ টিপিয়া, এ ওর গা ঠেলিয়া, কেহ বা অলক্ষ্যে একটু চোখ ঠারিয়াও মুচকী হাসিল। উর্ম্মি গিয়া মঞ্চে উঠিয়া গানটি গাহিল।

তারপর কিছু রিফ্রেশমেণ্ট গ্রহণ ও শিষ্ট আলাপ-আপ্যায়নের পর সঙ্গিনীদের লইয়া কমল বিদায় হইল। অন্যান্য সকলেই প্রায় তখন চলিয়া গিয়াছেন।

(১২)

শ্যামাসঙ্গীতখানি ঝি অগ্নিসাৎ করে নাই, লুকাইয়া তখন রাখিয়াছিল। কিন্তু কোনও ফাঁকে দিদিমণির হাতে লইয়া দিতেও ভরসা পাইল না। কি জানি যদি দৈবাৎ গিন্নীর চোখে পড়ে, সর্ব্বনাশ হইবে। বইখানিও নিজের হাতে ভাসিয়াই তিনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। ভস্মসাৎ যতক্ষণ না হয়, দুয়ারেই ঠাঁয় দাঁড়াইয়া থাকিবেন। আর দিয়াই কি হইবে ? ও বাড়ীতে যাওয়াই যে দিদিমণির মানা হইয়া গিয়াছে। বইখানি তাকেই বুড়ীদিদিঠাকুরাণীর হাতে দিয়া দিয়া আসিতে হইবে।

অনর্থক বিলম্ব আর না করিয়া সেই দিনই বৈকালে সে গেল ; বইখানি ভাগীরথীর হাতে দিয়া দিদিমণির লাঞ্ছনার সব কাহিনী সালঙ্কারে বর্ণনা করিল। তাহার মুখখানি চক্ষে একটিবার দেখিবার ভাগ্যও যে আর তাঁহার ঘটিবে না, বহু ক্ষোভ প্রকাশে ইহাও তাঁহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া আসিল।

বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া ভাগীরথী কতক্ষণ বসিয়া রহিলেন। আহা-হা ! এমন করিয়া অভাগী উর্ম্মিকে মারিয়াছে ! আহা ! বাছার কেমন যেন লাগিয়াছিল তখন ! মনে হইতে লাগিল, সে আঘাত যেন তাহারই অঙ্গে আসিয়া লাগিতেছে। লাথির পর লাথি মারিয়াছে—পায়ে যত জোর ছিল ! চুল ধরিয়া ঝাঁকাঝাঁকি করিয়াছে। দেয়ালে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া মাথা ঠুকিয়া দিয়াছে। কিল চড়ের ত কথাই নাই ! আহা-হা ! কত যেন সারাটা গায়ে মাথায় তাহা লাগিয়াছে। কেমন যেন বেদনা একটা বাছার গা-

মাথাভরা এখনও রহিয়াছে। আহা-হা ! মনে হইতে লাগিল, এখনই ছুটিয়া গিয়া উর্ম্মিকে বুকে জড়াইয়া ধরেন, বেদনাক্লিষ্ট আহত স্থানগুলিতে হাত বুলাইয়া দেন। কিন্তু যাইবার যে উপায় নাই। দুয়ারে পা দিতেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে ! মহীনকেও গ্রাহ্য করিবে না। গ্রাহ্য তাকে করেই না। করিলে কি উর্ম্মিকে এমন করিয়া ধরিয়া মারিতে পারিত ? মেয়েমানুষ—সোয়ামীকে গ্রাহ্যই করে না, এই বা কেমন ধর্ম্ম উহাদের ? সোয়ামী স্ত্রী নাকি সমান সমান উহারা বলে। তা সমান সমান হইলেও সমান সমান খাতির করিয়া ত দুজনকে দুজনের চলিতে হয়। কিন্তু মহীন ওর ভয়ে সারা—কত ওর মন যোগাইয়া চলে। আর ও একটা মানুষ বলিয়াও যেন তাকে গণনা করে না ! তা সে যাই হউক, তিনি যাইতে পারেন না, কিন্তু উর্ম্মি যদি একটিবার আসিত ! ঝি বলিয়া গেল, তাও মানা হইয়াছে। আর সে আসিবে না। মহীন কি আর এ মানা ঠেলিয়া তাকে পাঠাইতে পারিবে ? না, সে ধাতুরই ছেলে সে নয়। বড় নরম—বড় ভাল মানুষ। লোকে যে বলে, ভালমানুষের ভালাই এ পৃথিবীতে নাই, সবাই তাদের পাইয়া বসে। যত মন্দই সে তার তখন করুক ভাল মানুষটির মত চুপচাপ সহিয়াই সব যায়। নিজেরটা বুঝিয়া সে কখনও নিতে পারে না, কেবল ছাড়িয়া দিয়াই চলে। সংসার যারা করে, তাদের ভাল কিসে ইহাতে হইবে ?

তা সে যাই হউক, প্রাতর্ব্বাক্যে, ষাট, বাঁচিয়া থাক, বাছারা কয়টি মানুষ হইয়া উঠুক, ভাল ঘরে বরে উর্ম্মির বিবাহ হউক, তিনি যেন কানে শুনিয়াই যাইতে পারেন। ঠাকুর আছেন মাথার উপরে সব ভালমন্দের সাক্ষী। তিনি দেখিতেছেন; ভাল যে তার ভাল যে দিন হয় করিবেনই, মানুষ যাই ভাবুক, যাই বলুক।

কিন্তু হায়, সত্যই কি উর্ম্মির মুখখানি তিনি আর দেখিবেন না ? তার সেই হাসিভরা মিঠা মুখখানির মিঠা কথাগুলি একটিবার আর শুনিবেন না ? তাই যদি হয়, তবে কেন মিছা আর তিনি পরের বাড়ীতে এখানে পড়িয়া থাকিবেন ? হায়, কেন তিনি মরিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ? বুড়া বয়সে কেন আবার এই মায়ার জালে আসিয়া বাঁধা পড়িলেন। ছাড়িয়া যাইতে প্রাণটাই যে তাঁহার—ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। হায়, সঙ্গে সঙ্গে যদি একেবারে শেষই হইয়া যাইত ! কিন্তু তা কি যাইবে ? এত বড় ভাগ্য—মহাপাপিনী তিনি—পুণ্য এই গঙ্গাতীরে তাঁহার কখনও ঘটিবে ? আসিয়াছিলেন, উর্ম্মিকে পাইয়াছিলেন। যতখানি পাইয়াছিলেন, কেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন নাই ? কেন আবার শ্যামাসঙ্গীত তার কাছে শুনিতে চাহিয়াছিলেন, বইখানি তাহাকে দিয়াছিলেন ? বেশী চাহিয়াছিলেন, চাওয়ার মত পুণ্যের জোর তাঁহার ছিল না। বেশী লোভে যা পাইয়াছিলেন, তাও গেল। বইখানির দিকে তিনি চাহিলেন; ইচ্ছা হইল ছুঁড়িয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেন। না, না, ছি ! এ কি পাপ কথা ভাবিতেছেন। বইখানি যে মায়ের নামে ভরা—নামই-ত মা !—তুলিয়া বইখানি বুকে ও মাথায় ঠেকাইয়া চক্ষু বুজিয়া মনে মনে প্রণাম মন্ত্র স্মরণ করিলেন—

> "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
> শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
> সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
> গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
> শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
> সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥"

করিতে সম্মুখে পুস্তকখানি রাখিয়া মাথাটি তাহার উপরে চাপিয়া উবুড় হইয়া রহিলেন।

সেদিন গেল, পরদিনও গেল। বড় মনমরা হইয়াই ভাগীরথী রহিলেন। অতি উৎসুকভাবে ঘন ঘন পথের দিকেও চাহিতেছিলেন, যদি মহীন একটিবার আসে। কিন্তু অরুণের কাছেও শুনিয়াছিলেন, কি একটা উপাসনার-উৎসবের ঘটা হইবে,—তাই বোধ হয় আসিতে পারিতেছে না। হইয়া গেলে তারপর অবশ্য আসিবে। কিন্তু পোড়া মন যে ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছে না।

শনিবারের রাত্রিতে অরুণের নিকটে ঘটার কথা তিনি সব শুনিলেন। শুনিলেন, কত লোক আসিয়াছিল, উর্ম্মি কত অলঙ্কার পরিয়া ভাল কাপড়-চোপড়ে সাজিয়া কেমন মিঠা সব গান গাহিয়াছিল। আহা, কেমন যেন লক্ষ্মীপ্রতিমাখানির মতই তাহাকে দেখাইতেছিল ! আর তিনি তাঁহার পোড়া-চোখে একটিবার দেখিতে পাইলেন না। উর্ম্মি আসে যায়;

কিন্তু অমন সব অলঙ্কার পরিয়া, ভাল ভাল কাপড় পরিয়া ত কখনও আসে নাই। তার ঐ রূপ যে কেমন তাতে ফোটে, চক্ষে একটিবার দেখেন নাই, মুখের অমন মিঠা গান—একটিবার কানে শোনেন নাই। শ্যামা-সঙ্গীত একটি গাহিয়া শুনাইবে বলিয়াছিল,—আহা, কেমনই মিঠা যেন তাহা লাগিত! কিন্তু আর তা শোনা ভাগ্যে তাঁহার ঘটিবে না! তবু দেশে ফিরিবার আগে মুখখানিও যদি একটিবার দেখিতে পান! দেশেই এখন ফিরিয়া যাইবেন; বৃথা এখানে থাকিয়া আর কি হইবে?

"এই যে আয় মন্টু! বস্, বাবা বস। ভাল আছিস ত? ক'দিন মুখখানি দেখতে পাইনি।"

রবিবার, বেলা তখন প্রায় তিনটা, মহীন্দ্রনাথ পিসীমার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। ইচ্ছা ছিল, উর্ম্মিকেও সঙ্গে লইয়া আসেন। কিন্তু কথাটা পাড়িতেই সুকল্যাণী কহিলেন, "আগে গিয়ে ঠিক করে এস কবে তাঁকে দেশে পাঠাবে। তারপর যাবার আগে, সে যে দিন হয় একবার গিয়ে দেখা করে এলেই হবে।"

বিচি গলা হইতে নামিয়া গেলে যেমন আর লোকের গাবের ভয় থাকে না, পার্টিটায় উর্ম্মির আশানুরূপ সরল ব্যবহারে সুকল্যাণীর মনের অবস্থা কতকটা সেইরূপই হইয়াছিল। কিন্তু উর্ম্মির পক্ষে ত্রুটি কিছু না হউক, পার্টিটার success, (সফলতা) যে দিক হইতে যতটা মনের গুহ্য কোণে কামনা তিনি করিতেছিলেন, তাহাও হয় নাই। চিন্ময়ী ও তাঁহার স্বামীর ব্যবহার যতই প্রীতিকর ও আশাসূচক হউক, কমলের নিজের ব্যবহার তেমন কিছুই হয় নাই। আসিল একেবারে শেষভাগে, ভাঙ্গা আসরে। সঙ্গে আবার ঐ নির্লজ্জ মেয়েগুলি! আসিয়া কেবল একটু ভদ্রতা করিয়াই গেল—ঐ মেয়েগুলিকেই আবার সঙ্গে লইয়া। রাত্রি তখন সাড়ে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে! গৃহে কি ইহাদের অভিভাবকও কেহ নাই?

মনটা তাঁহার বিশেষ খুসী ছিল না, কেমন একটা রাগ-রাগ ভাবই ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া উঠিতেছিল। ঝালটা এই সুযোগটুকু পাইয়া স্বামীর উপরেই একবারে ঝাড়িয়া নিলেন।

পিসীমার এই অভিযোগের উত্তরে একটু হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "বল কি পিসীমা, এইত—হাঁ, তরশু বেরোস্পতি বারই একটা বার হ'য়ে গেলাম—অবশ্যি ব'সতে পারিনি বেশীক্ষণ—"

"হুঁ! সে ত এসেছিলি। তবে লম্বা এই ছুটো তিনটে দিন গেল—"

"কি ক'রব পিসীমা? বাড়ীতে বড় একটা ঝঞ্ঝাট এসে প'ল কিনা—"

"হাঁ, শুনলাম অরুণের ঠেঁয়ে। কি তোদের একটা 'পার্টি' না কিসের ঘটা হ'য়েছিল, সে ব'ল্লে। লোকজন মেলাই এসেছিল, উর্মি তারপর গয়না-গাটি সব প'রে দিব্যি সেজে এসে মেলাই গানটান করছিল—"

বলিতে বলিতে গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ভাগীরথী ত্যাগ করিলেন।

মনে দুঃখও হইল, মুখে আবার একটু হাসিও ফুটিল। সেই হাসিমুখেই মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "হাঁ, হ'য়েছিল একটা মজ্‌লিস্—যাকে আমরা 'পার্টি' বলি, পাটি নয়। ওসব হরদমই এখানে হয়ে থাকে। এই পাড়াগাঁয়ে যেমন নারায়ণসেবা, হরির লুঠ, শনির পুজো—এই সব হয়, কতকটা তেমনি আর কি? তবে এখানে সহুরে সব সাহেবী বাবুদের ঘরে কিনা; তাই কায়দাটা আলাদা। মনে একবার হ'য়েছিল, তোমাকে নিয়ে দেখাতে পারলে মন্দ হ'ত না।"

"ওমা! বলিস্ কি? সেকেলে একটা বুড়ো-হাবড়া মানুষ, আমি পারি তোদের ঐ মজ্‌লিসে গিয়ে বসতে? কত সব বড় বড় লোক নাকি এসেছিল।"

"এসেছিল তোমার ভাইপোর বাড়ীতে, আর তুমি পিসীমা। তবে জান ত সব—"

"তা কি ক'রবি বাবা? বৌমার মতিগতি হ'ল ঐ একরকম, তা কি জানিস্ বাবা, সংসারটা মেয়েমানুষের হাতেই থাকে। তারা যেটা চায় না, সেটা কেউ ক'রতেই পারে না। জোর জুলুম ক'রে ক'রতে গেলে কেবল অশান্তিই ঘটে।"

"হুঁ—!"

ভাগীরথী কহিলেন, "তা ভাবছিলাম কি বাবা, কদ্দিন হ'ল এসেছি, এখন দে বরং আমাকে দেশেই পাঠিয়ে।"

"এখুনি—যেতে চাও?"

বলিয়া মহীন্দ্রনাথ কেমন চমকিতদৃষ্টিতে পিসীমার মুখপানে চাহিলেন।

"হাঁ, দেশেই যাই ফিরে। এদ্দিন ত গেল। কি ক'রব আর এখানে থেকে?" বলিতে বলিতে একটি নিশ্বাস উঠিল।

"পরের বাড়ীতে, আছি, লজ্জা ও করে—"

কথাটা মহীন্দ্রনাথের প্রাণে গিয়া তীব্র একটা আঘাত দিল; চক্ষেও জল আসিল। কহিলেন, "বড় দুর্ভাগ্য আমার পিসীমা, নিজের বাড়ীতে দুদিনের তরে তোমাকে একটু ঠাঁই দিতে পারলাম না।"

"বালাই! বালাই! রাজার ভাগ্যি তোর, রাজা হ'য়ে থাক্, দুর্ভাগ্যি কিসে হ'ল? তোর বাড়ীতেই ত আছি। এখানে এটা ত বাসা-বাড়ী, ভাড়া ক'রে আছিস, ছেড়ে দিলেই গেল। আমি দু'চারটে দিন না হয় নাই গিয়ে রইলাম। খুব যত্ন ক'রেই ত আমাকে রেখেছিস্। এসেছিলাম, তোকে কদ্দিন দেখলাম, ওদের সবাইকে দেখলাম। গঙ্গা-স্নান হ'ল, মার দর্শন হ'ল, আরও কত কি দেখালি শোনালি। থেকে আর কি হবে? বাড়ী ঘর খালি প'ড়ে র'য়েছে—" বলিতে বলিতে আবার গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মহীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিলেন। এতদিন চাহেন নাই, আজ হঠাৎ চাহিতেছেন, অর্থ কি? নিশ্চয়ই বাড়ীতে যাহা ঘটিয়াছে, পিসীমা তাহা সব জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু কি প্রকারে জানিলেন? চক্ষে জল আসিল। মুখখানি মহীন্দ্রনাথ একটু ফিরাইয়া নিলেন। একটু কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "তাহ'লে—সত্যিই যেতে এখন চাও পিসীমা?"

"হাঁ, বাবা, দে আমাকে পাঠিয়ে। কিন্তু কার সঙ্গে পাঠাবি?"

"তাই ভাবছি, দেখি—"

"তা ভাবছিলাম কি মহীন, তুই নিজে আমাকে নিয়ে যেতে পারিস্ না? তবু একটি দিনের তরে বাড়ীতে আবার তোকে পেতাম—"

ভাগীরথী কাঁদিয়াই ফেলিলেন।

"এই দেখ! কেঁদোনা, কেঁদোনা পিসীমা! বেশ যাব, আমিই তোমাকে নিয়ে যাব, এই আসছে শনিবার। র'ববার দিনটা বাড়ীতে থেকে সন্ধ্যে বেলায় আবার ফিরে আসব।"

চক্ষু পুছিতে পুছিতে ভাগীরথী কহিলেন, "তাই তবে নিয়ে যাস, এ ক'টা দিন—সে যাবে যে ভাবে হয় কেটে যাবে। তা বাবা, যাবার আগে উর্মিকে আর ওদের সবাইকে দেখতে একটিবার পাব ত?"

চমকিয়া মহীন্দ্রনাথ চাহিলেন।

আবার চক্ষু পুছিতে পুছিতেই ভাগীরথী কহিলেন, "শুনেছি বাবা সব, তোদের ঝি এসেছিল, ঐ বইটে দিয়ে গেল। বৌমা নাকি উনুনের আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে তাকে দিয়েছিল। সে পোড়ায়নি, লুকিয়ে রেখেছিল, আমায় দিয়ে গেছে। সেই সব ব'লে গেল। বৌমা নাকি—" কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। ফুঁকাইয়া ভাগীরথী কাঁদিয়া উঠিলেন।

"এই দেখ! আবার কাঁদতে সুরু ক'রলে। পাবে, পাবে—দেখতে পাবে তাদের! একদিন কেন? যে ক'দিন বল আসবে। আর সবাই না পারুক, উর্মি আসবেই। আমি এসে খোঁজ নেব; যে দিন বল, পাঠিয়ে দেব।"

"না না, রোজ আসতে হবে না। সংসারে তোর অহরহ অশান্তি একটা ঘটাতে চাইনে। যাবার আগে একটি দিন আর তাদের দেখতে পেলেই বড় ভাগ্যি মনে ক'রব। কে জানে, ভাবতেও শিউরে উঠি বাবা—বৌমা যদি আবার উর্মিকে—"

"আঃ! ভারী জ্বালাতন ক'রে তুল্লে যে পিসীমা! তা হ'লে আমি উঠলাম—"

"না না, ব'স, ব'স! রাগ ক'রে যাসনি, কাঁদবনা আর। কি জানিস বাবা, বুড়োহাবড়া মানুষ—"

"হাঁ, বুড়োহাবড়া মানুষ! অনেক গুণ জানে বেশ টন্‌টনেও ত আছ। উর্মিকে ত একদম ভজিয়ে ফেলেছ যাদু ক'রে তোমার সব ঠাকুর দেবতার মন্তর তন্তরে। বৌমা তোমার এত চ'টে গিয়েছে সাধে? তারই ঘরে ব'সে সে গায় কিনা তোমাদের সেই পুরোণো পচা শ্যামাসঙ্গীত!"

হি-হি করিয়া ভাগীরথী হাসিয়া উঠিলেন।

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন "হাঁ, পেসাদ টেসাদ কিছু আছে? থাকে ত নিয়ে এস—খাই, না, থুড়ী, পাই। পেসাদ ত লোকে খায় না, পায়।"

হাসিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "হাঁ, তা রেখেছি দুটি। আজ রববার, অফিস ত নেই। তবু কেমন মনে হ'য়েছিল, বিকেলত'ক একটিবার আসবি।"

ঠাঁইপীড়ি করিয়া দিয়া ভাগীরথী 'প্রসাদ' যাহা ছিল, বাড়িয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন।

আহারান্তে আচমন করিয়া মহীন্দ্রনাথ আবার আসিয়া

কাছে বসিলেন। ভাগীরথী কহিলেন, "হাঁ, বাবা, একটা কথা কি ভাবছিলাম জানিস ?"

"অন্তর্যামী ত আর নই পিসীমা। মনে মনে কি ভাবছিলে, না বল্লে কি ক'রে জানব ?"

ভাগীরথী কহিলেন, "তোরা ত বেহ্মজ্ঞানী। তা ঊর্মিও ত বড় সড় হ'য়ে বেশ হ'য়ে উঠেছে, বিয়ের কথা কিছু ভাবিস ?"

"ভাবি বই কি, খুবই ভাবি। দিতে পারলে এখন বাঁচি। তবে একটি বর ত পছন্দসই চাই।"

"তা চাই, বই কি ? যার তার হাতে ত ফেলে দেওয়া যায় না। তবে বর—"

"চোখে প'ড়েছে তোমার কোথাও ?—ব'লেই ভেবে ফেলনা ?"

বলিয়া মহীন্দ্রনাথ মুচকী একটু হাসিলেন।

ভাগীরথী কহিলেন, "চোখে—তা এই ত এদের অরুণ র'য়েছে—"

"কিন্তু হিন্দু যে।"

"তা আছে হিন্দু আছে। তাই ব'লেই কি ওদের জাত গেছে ?"

"আমাদের ত গেছে। আর বেহ্মজ্ঞানী আমাদের কাছে ওদেরও গেছে।"

"তা ওদেরও একরকম বেহ্মজ্ঞানী ব'ল্লেই হয়। সহরে থাকে, জাতধর্ম্মের বিচের কিছু করে না, দেবতাবামুন মানে না ; ব্রতপুজো কখনও কিছু করে, এমন ত মনে হয় না।"

"বারমাসের গেরস্থালীতে যে ভাবেই চলুক, বিয়ের সময় সবই মানতে হবে, সব কিছুই ক'রতে হবে। তখন শালগ্রামও আসবে, বামুনও আসবে, ষষ্ঠীমার্কণ্ডের পুজো হবে, নান্দীমুখ হবে, যজ্ঞি হবে, মন্তর-টন্তরও পড়ান হবে, সবই হবে। আমাদের যে একদম ও সব মানা। বিয়ে হ'ক, শ্রাদ্ধ হক, নামটিও মুখে আনবার যো নেই।

"কি জানি বাবা, আমি ত বুঝি নি ওসব কিছু। তবে অরুণ সেদিন ব'লছিল, তোরা যে বেহ্মোকে ডাকিস 'বেহ্মা' নয়, 'বেহ্মোই' বটে, সে বেহ্মোকে হিন্দুরাও মানে। সেই নাকি সব ঠাকুরদেবতার উপরে মস্ত বড় ঠাকুর।"

"ঠিক কথা। তবে হিন্দু তোমরা সেই বড় ঠাকুরের নীচের আরও অনেক ঠাকুরঠাকরুণকে মান, পুজো-টুজোও তাদের সর্ব্বদা কর, আর আমরা একদম তাদের মানি না, পুজো-টুজোও কারও কিছু করি না। বলি ও সব মিথ্যে ঠাকুর, ওদের পুজো করাও পাপ।"

"কেন, মিথ্যে কেন হবে ? খুব বড় একজন ঠাকুরের নীচে ছোট মেলাই ঠাকুর কি থাকতে নেই ? আর ভক্তি ক'রে তাদের পুজো ক'রলে পাপই বা কিসে হবে ?"

"বাব্বাঃ ! ও সব কথার উত্তর ত আমার বুদ্ধিতে যোগাবে না পিসীমা। তবে কথা হ'চ্ছে কি জান ? ওরা মানে, মানতেও ওদের হবে, অন্ততঃ বিয়ে শ্রাদ্ধ এই সব ক্রিয়াকর্ম্মে। আর আমরা মানি না, এ সব ক্রিয়া-কর্ম্মে মানতেও পারব না, গরজ যত বড়ই হ'ক। আর ওরাও কোনও গরজে ছাড়তে কিছু পারবে না, যদি হিন্দু নামে হিন্দুসমাজে থাকতে চায়।"

ভাগীরথী কহিলেন, "হুঁ, তোরাও ঠাকুর দেবতার নামটি মুখে আনবি নি, আর ওরাও মন্তর প'ড়ে তাঁদের পুজো না ক'রে বিয়ে দিতে পারে না, সত্যি যদি, হিন্দু নাম নিয়ে হিন্দুর ভেতর থাকতে চায়। বেশ শক্ত একটা নট-ঘটিই বটে। তবে কি না, হ'লে বড় ভাল হ'ত। বড় ভাবও ওদের দু'টিতে দেখতে পাই। কত হাসি-গল্প দুজনে ব'সে করে। আবার ধর্ম্মের কথা, শাস্তরের কথা, ঠাকুরদেবতার কথা, পূজা-মন্তরের কথাও কত বলাবলি করে। ঊর্মি ত জানে না কিছু, কত কথাই সুধোয়। তা আমি কি ছাই তেমনি ক'রে বুঝিয়ে কিছু দিতে পারি ? অরুণ এসে যখন বসে, কেমন দিব্যি সব বুঝিয়ে দেয়। শাস্তরের বই, পুজোর বই, খুব প'ড়ে আজ কাল। আবার ঊর্মিও দেখেছি চেয়ে নিয়ে যায় তার ঠেঁয়ে এ-বই ও-বই প'ড়বে ব'লে।"

"হুঁ. দুজনকেই দেখছি সমান ভজিয়ে ফেলেছ তোমার এই পুজোমন্তরের ধর্ম্মে, যাকে আমরা বলি কুসংস্কার। অরুণের আটকাবে না কিছু, আটকাচ্ছে ঊর্ম্মির। মতি-গতি যা হ'য়ে উঠছে, তাতে ক'রে ব্রাহ্মসমাজে ও চ'লবে না। হিন্দুর ঘরে অরুণের মত কোন ছেলের হাতে দিতে পারলেই সুবিধে হ'ত।"

"হাঁ। তা ভাখ না, হয় কি না ?"

"খুব শক্ত। তবে—হাঁ, দেখি ভেবে। যদি কোনও

মতে সম্ভব হয়, ওদের হিন্দুস্থানীর কাছে অন্ততঃ একটি দিনের তরে মাথা নোয়াতে রাজি আছি। জানি, ঊর্ম্মি এতে সুখী হবে, ভালও ওব হবে। আর কি জান পিসীমা, এই তোমরা যাকে বেহ্মজ্ঞানী বল, ঘটনাচক্রে হ'য়ে প'ড়েছি। মনের এমন বাই কিছু ছিল না, গোঁড়ামীও কিছু নেই।”

“কিন্তু বউমা—”

“অতি কড়া বেহ্মজ্ঞানী, যেমন নাকি আজকাল বড় দেখাই যায় না। ভাঁটাও ওদের খাতে বেশ প'ড়ে এসেছে, যদিও আমার ঘরটিতে পুরো জোয়ারের বান এখনও ডেকে চ'লছে। আর তুমুল একটা ওলট-পালট ঝড় যা তায় উঠবে—কথাটা ফাঁস হ'লে—বাব্বাঃ! তা দেখি, যদি এমন ভাগ্যি কখনও ঘটে এসে, পথ যা হয় একটা ক'রে নেওয়া যাবে। আটকাবে না কিছু।”

“ঘটিয়ে তবে ফেল্ না?”

“এখুনি হ'তে পারে না পিসীমা। দেখি, ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, ঊর্ম্মি যদি সেই ভাগ্য নিয়েই এসে থাকে, সময়মত হবেই।”

“আহা! প্রাতঃবাক্যিতে তাই হ'ক। তবে দেশে চ'লে যাচ্ছ—তা ছাখ্, যদি ঐ বৈশেখে—”

“না, না, এত শীগগির—তা কে জানে কি হবে? কথাটা সবে এই মনে হ'ল—তুমিই বাতলে দিলে, ভেবে চিন্তে ত একটু দেখতে হবে, কি ক'রে কি হ'তে পারে। হয়ই যদি, যত শীগগির হয় ভাল। তা—তুমি কি—এই আশায় থেকে যেতে চাও বৈশেখ অবধি?”

“না রে পাগল! তাই কি ভাবছি? যদি হয়, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে, তখন আবার আসব। ন' মাসে ছ' মাসের পথ ত আর নয়।”

“আচ্ছা, তবে উঠি আজ পিসীমা। আসছে শনিবার যাবে। এর ভেতর গঙ্গাস্নান, কালীঘাট—যা ইচ্ছে হয়, অরুণকে ব'লো। এত বড় সহর—যদ্দূর পার, বেড়িয়ে নেও, এই কটা দিন দেখে শুনে। আচ্ছা, আসি তবে।”

“আয় বাবা।”

[ক্রমশঃ

পরেশনাথের পথে

শ্রীশোভা দেবী

রাঙামাটীর পথের সঙ্গে ছোট বেলা থেকেই আমার পরিচয়। প্রতিবৎসরই মন আমার সেই দিকেই ছুটে যেতে যায়। এবার পূজায় পরেশনাথ যাওয়া স্থির হল। হেমন্তের এক শিশিরসিক্ত প্রভাতে গত দিনের ৺বিজয়ার শুভ আশীর্ব্বাদী ফুল মাথায় ছুঁইয়ে অজানা সুন্দর পথে আমরা যাত্রা করলাম। মনের মাঝে সুরের ঝঙ্কার বাজ্‌ছিল—

অজানা কোন পথের মায়া
ভুলালো রে ভুলাল মোর মন।

সঙ্গে ছিলেন বাবা, ছোটকাকা, মঃ বাবু (আমার স্বামী) ও ছোট খুকু গৌরী এবং আমার এক ঠাকুরপো, তাঁর স্ত্রী আর আমার এক ছোট ঠাকুরঝি।

হাওড়া ষ্টেসনে বেলা ১-৩০ মিনিটে দিল্লী এক্সপ্রেস্ আমাদের নিয়ে ছাড়্‌লো। সারা পথই আমরা পরেশনাথের কল্পনায় বিভোর রইলাম। রাণীগঞ্জ থেকেই যেন বাঙ্গালার দৃশ্য বদলিয়ে এল, মাথায় পাগড়ীধারী লম্বা-চওড়া লোকগুলি ও অদূরবর্ত্তী সব ক'লিয়ারী পশ্চিমের রূপ এনে দিচ্ছিল। অজানা গন্তব্য পথ লক্ষ্য করে আমরা ক'জন ট্রেনের জান্‌লার ধারে বসেছিলাম। সন্ধ্যার পর একাদশীর চাঁদ দূরবর্ত্তী পাহাড়গুলির মাথার উপর জ্বল্‌ছিল; সেই আলো-ছায়া সমাচ্ছন্ন সুদূর পথটী কোনখানে শেষ হয়েছে তাই ভাব্‌ছিলাম।

গ্রাণ্ড কর্ড লাইনের ইশ্রী ষ্টেসনে আমরা যখন নামলাম তখন রাত্রি ৮॥০টা। দু'চারজন কুলী ও একজন ষ্টেসন মাষ্টার ব্যতীত ষ্টেসনে আর কেহই ছিল না। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল। ষ্টেসনে একখানি ট্যাক্সি নিয়ে হাজিসাহেব উপস্থিত ছিলেন; (এর পরিচয় পরে দেব) কিন্তু একখানি ট্যাক্সি দেখেই ত আমাদের চক্ষুস্থির! এতগুলি লগেজ-পত্র সমেত কেমন করে সকলে যাব! অবশেষে স্থির হল যে, দু'বারে যাওয়া হবে।

ইশ্রী ষ্টেসন থেকে চিরকী, আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেটা ১৪ মাইল, সেখানে আমাদের বাসা ঠিক ছিল। আর দেরী না করে মঃ বাবু আর ঠাকুরপো ছাড়া, আমরা অন্য সকলে, সঙ্গে কয়েকটী বেডিং নিয়ে, ট্যাক্সিতে উঠবার ব্যবস্থা করতে লাগ্‌লাম। ইতিমধ্যে মঃ বাবু হাজিসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইঁহা বাগ-আগ কুছ হ্যায়?" হাজিসাহেব বোধহয় উর্দ্দু শুনেই খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন; ঠাকুরপো বল্লেন, "শের, শের," তখন তিনি বল্লেন, "উত হামেসায় নিকাল্‌তা, আর ভাল্ (ভল্লুক), উত কুছ্ জিয়াদাই হ্যায়।" আমরা সকলে খুব হেসে উঠলাম। শীতের রাত্রে পাহাড়ে ঘেরা সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানটুকু হাসিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। দু'টী ভাই ও পাচক ব্রাহ্মণটীকে ষ্টেসনে রেখে আমরা আগে ট্যাক্সিতে চল্‌লাম। জ্যোৎস্নাস্নাত পাহাড়ের কোল ঘিরে অচিন পথে মোটর ছুটলো। আমরা অপরিসীম বিস্ময়ে শুধু চেয়ে রইলাম। দু সারি নিবিড় শালবন, পাহাড়ের ছোট ছোট শ্রেণী, সম্মুখে বিখ্যাত পরেশনাথ পর্ব্বত ও মধ্যে মধ্যে নির্ঝরিণীর মৃদুকলতানে মনের মাঝে এক অপূর্ব্ব দোল দিচ্ছিল। কবে কোন পাহাড় পথের যাত্রী এই আঁকা-বাঁকা রাঙা মাটির পথে যাত্রা করেছিল সুন্দরের সন্ধানে, তারই পায়ের ধ্বনি সকল যাত্রীর চরণে আজ বেজে উঠেছে, আজ তারই হাতের ইঙ্গিত বুঝি ঐ পরেশনাথের মাঝে লুকান, পরেশনাথের সেই বিরাট মৌন সৌন্দর্য্য, সেই মায়াময় গাম্ভীর্য্য প্রতিক্ষণই আমাদের টান্‌ছিল।

১৪ মাইল পথ কখন যে ফুরিয়ে এসেছে তা ঠিক বুঝতে পারিনি। চেয়ে দেখি, সামনে একখানি সুন্দর বাংলো। বারান্দায় একটী ভদ্রলোক (মুর্শিদাবাদ নিবাসী বাবু বিষ্ণুচরণ ঘোষ) দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি সপরিবারে আমাদের আগেই এখানে এসেছেন। এঁর উৎসাহেই আমাদের এখানে আসা। ইনি আমাদের বাসা, চাকর এবং আহারাদির জোগাড় সব ঠিক করে রেখেছিলেন। হাজিসাহেবের সাহায্যে ইনি সব বন্দোবস্ত আগে থেকেই করে রেখেছিলেন। অসময়ে অচেনা জায়গায় এসেও আমাদের কোন অসুবিধা

ভোগ কর্‌তে হয়নি। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম্‌, ট্যাক্সি আবার ছুট্‌লো তাঁদের আন্‌তে সেই ইস্রী।

বাংলোখানি একেবারে নূতন, তখনও নির্ম্মাণকাজ শেষ হয়নি কিছু বাকী ছিল। বেশ সুন্দর বাড়ীখানি। চারখানি শোবার ঘর, একটী রান্নাঘর ও একটী ছোট স্নানাগার; বাইরে ও ভিতরে বেশ বড় দুটী দালান আছে। বাড়ীর সব থেকে আমার ভাল লেগেছিল তার ছাদখানা। ছাদখানি যেমন বড় তেমনি সুন্দর। সেখান থেকে চারিদিকের দিগন্ত প্রসারিত দৃশ্য ও বিশেষতঃ, পরেশনাথের সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার লাগতো।

সেই রাত্রেই আমরা রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, এক হিন্দুস্থানী পাচকব্রাহ্মণ খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছে, পাশে তার এক কলসী রান্না ভাত ও সের দুই লাউ ও পেঁয়াজ মিশ্রিত ঘণ্ট। অচেনা দেশের এই অদ্ভুত তরকারি ও কলসীতে রান্না ভাত সে রাত্রে মন্দ লাগেনি। আমার ছোট ঠাকুরঝিটী ত দেখে হেসেই লুটোপুটি। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় মঃ বাবুরা এলেন। খাওয়ার পর সে রাত্রির মত আমরা বিশ্রাম নিলাম।

বিদেশে রাত পোহাল। চোখমেলে চেয়ে দেখি, সোনার আলোয় চারিদিক পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণ পরেশনাথ, পরিপূর্ণ জলস্থল আর যা কিছু সবই। মনের মাঝে গেয়ে উঠলো—

"আলোয় আলোয় মগ্ন করে হে
এলে আলোর আলো।"

নূতনের সন্ধানে এসে তারই অপূর্ব্ব সুষমায় চিত্ত ভরে উঠল।

সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে আমরা তিনটীতে আমাদের গৃহস্থালী পাত্‌তে বস্‌লাম। আমার জা তার ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে, হঠাৎ দেখি, ছোট্ট একটী ফুলদানী বের কর্‌ল; মেয়ের সখ বটে! এ জঙ্গলের মধ্যেও সেটী আনা হয়েছে।

সেদিন দুপুরে খাবার পর আমরা আবিষ্কারে চল্লাম—কোথায় কি আছে? আমাদের বাড়ীর বামপাশে দক্ষিণ দিকে ৩ মাইল দূরে পরেশনাথ। ডানপাশে বাড়ীর ঠিক নীচেই ছোট্ট একটী ঝরণা, পিছনে অনতিদূরে নিবিড় শালবন ও তারই মধ্যে মাইল দুই দূরে সীতা নদী প্রবাহিতা। বাড়ীর খুবই কাছে, পিছনে একটী ছোট পাহাড় আছে, যেটী ভারী ভাল লাগ্‌তো। সেখান থেকে পরেশনাথের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখা যেতো। পরে এখানে আমরা রোজই খাবার পরে বেড়াতে আসতাম। এই ছোট্ট পাহাড়টীর উপরে আমরা একদিন বসে আছি; সাম্‌নে বিশাল পরেশনাথ পর্য্যন্ত প্রসারিত শালবনের একটানা সবুজ, আকাশের নীলিমার নীচে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। দূরে পরেশনাথের পাদদেশে মধুবনের মন্দিরগুলির শুভ্র চূড়া, সে সবুজের মধ্য হতে মাথা তুলে আকাশের দিকে একটা আকাঙ্খা নিবেদন করে দিচ্ছে। আমাদের বস্‌বার স্থানটীর নীচেই নিকটে শালবনের মধ্যে লালপথ দিয়ে ২।৩টী সাঁওতাল বালক একপাল গরু ও মেষ নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা বাঁশের বাঁশী ছিল দেখে মঃ বাবু তাকে ডাকলেন। সে খানিকটা ইতস্ততঃ করে, পরে দুটী পয়সা পাবার প্রতিশ্রুতিতে উপরে উঠে এল ও সেই পাহাড়ের উপর একটী কনকচাঁপা গাছের তলায় বেঁকে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজিয়ে আমাদের শোনাল। প্রকৃতির কোলে ব'সে তার সে ভঙ্গিমা ও বাজনা লাগল বড়ই সুন্দর। বৃন্দাবনের তমালবনে ব্রজের সে ত্রিভঙ্গশ্যাম রাখাল বালকের যে ছবি আমাদের মানস পটেই আঁকা ছিল, এই শালবনে ছোট শৈল স্তূপটীর উপর গোপাল কৃষ্ণকায় এই সাঁওতাল বালকটীর ঐ ভঙ্গিমায় বাঁশী বাজানতে সেই ছবিটীই যেন আমাদের চোখের উপর পরিস্ফুট হয়ে উঠল। সেদিনকার মত আমরা সেই রাখালবালকের স্মৃতিটুকু নিয়ে বাড়ী ফির্‌লাম।

হাজিসাহেব হচ্ছেন আমাদের বাড়ীওয়ালা। ঠিক বাড়ীওয়ালা বল্লে একটু ভুল হবে কারণ, বাড়ীটী তাঁর জামাতাই তৈরী করেছিলেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ বাড়ীটী সম্পূর্ণ শেষ না হতেই তাঁর মৃত্যু হয়। হাজিসাহেব বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও খুবই কর্ম্মঠ। এই ষাট বৎসর বয়সে তাঁর উৎসাহ, শক্তি ও পরিশ্রম দেখলে সত্যিই অবাক্‌ হতে হয়। তিনি দু'বার হজ্জে গিয়ে হাজি নাম ধারণ করেছেন। তাঁর জন্য আমাদের কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি; সমস্ত জিনিষ পত্রই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেত। সকল সময়েই

তিনি প্রসন্ন বদনে আমাদের খোঁজ খবর নিতেন। আর একজন বন্ধুও আমরা পেয়েছিলাম, অচেনা পাহাড় দেশে এমন বন্ধু সচরাচর মেলে না। তিনি হচ্ছেন সেখানকার দারোগাবাবু, সেখানকার একমাত্র বাঙ্গালী বাসিন্দা। তাঁর সাথে এদের সকলেরই খুব আলাপ হয়েছিল; বিশেষতঃ ঠাকুরপোর ত কথাই নেই! এই শালবন ও জঙ্গলের দেশেও দারোগাবাবুর দৌলতেই ঠাকুরপোটীর হাতীতে চড়াও বাদ যায়নি। আমরা যখন চিরকীতে গেলাম তখন দারোগাবাবুর স্ত্রী সেখানে ছিলেন না, কাজেই তাঁর সাথে আলাপ করা আমাদের ঘ'টে উঠে নি চিরকী থেকে আমাদের চলে আসার দিনই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, সেই বিদায়ের ক্ষণটীতে তাঁর সাথে সামান্য পরিচয় হয়েছিল-মাত্র। আর যে ভদ্রলোকটীর কথা পূর্ব্বে বলেছি, তাঁদের বাসাও ছিল খুবই কাছে, আমরা প্রায় রোজই তাঁর স্ত্রীর সাথে গল্প ক'রে আসতাম; তাঁরাও প্রায়ই আমাদের সাথে বেড়াতে যেতেন। আমাদের বাড়ীর পাশেই হাজি সাহেবের বাড়ী; তাঁর মেয়েদের সাথেও আমাদের খুব আলাপ হ'ল। এঁর সংসারটী বেশ বড়, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতিনী নিয়ে বেশ আছেন। হাজি সাহেবের স্ত্রী বল্লেন, "যো কুছ আপলোক্ মাংতা সো বি হাম্ মিলায়ে দেগা" ইত্যাদি। তিনি তাঁর বৌদের ও মেয়েদের সকলেরই নাম বল্লেন। বৌদের নাম রাবেয়া, জোবেদা ও মেয়েদের নাম রোসেনারা, আয়েসা এবং আমিজান। আমরা নাম শুনে খুব খুসী হ'লাম।

একদিন আমরা পরেশনাথ পাহাড়ে উঠবার সঙ্কল্প ক'রে মধুবনের পথে চল্লাম। মধুবন আমাদের বাসা থেকে তিন মাইল দূর; সেখান থেকেই পাহাড় পথের যাত্রা সুরু। আমরা সকলেই খুব ভোরে উঠেছিলাম। পেটের ভাবনায় অস্থির ঠাকুরপোটী কি খাবার যে সঙ্গে নেওয়া হ'ল, সেই গবেষণাতেই ব্যস্ত ও এক কাপ গরম চাও যে পাহাড়ে চাই, তা জানাতেও সে ভোলে নি। শুধু তাই-ই নয়, এখন এত ভোরে কিছু না খেয়েই বা কি করে সে হাঁটবে? সত্যিই সে এক সমস্যা বটে! যাহাহোক্, আমাদের অতি তাড়াতাড়ির ভেতর এক এক কাপ চা ও কিছু খাবার খাওয়া হ'য়ে গেল।

আমাদের খাবার, চায়ের আসবাব ও অন্যান্য জিনিষ পত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং যাঁরা হাঁটতে অপারগ বা অনিচ্ছুক তাঁদের জন্য দুখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করা হ'য়েছিল। গরুর গাড়ীর গতি দেখে আমরা পদব্রজেই মধুবন অভিমুখ যাত্রা করলাম। বহুদূর পিছনে গরুর গাড়ী আসতে লাগলো। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোকটী ও তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। পথপ্রদর্শক রূপে আমাদের আগে আগে চল্লেন হাজি সাহেব। সে দিন আকাশ পরিষ্কার ছিল না কুয়াসায় অন্ধকার করেছিল।

পথের দৃশ্য অতি চমৎকার। রাঙামাটীর উঁচু নীচু পথ সাপের মত এঁকে বেঁকে চলেছে। পথের দুধারেই গভীর শালবন, যে দিকে দৃষ্টি যায় কেবল সবুজ পাতার মাতামাতি—পাহাড়ের কঠিন বুকে যেন সবুজের মহোৎসব! সামনেই গগনস্পর্শী পরেশনাথ তার বিশাল দেহ নিয়ে দণ্ডায়মান। জানি না কত যুগ যুগান্তর ধ'রে কিসের আশায় কোন দয়িতের প্রতীক্ষায় ধ্যানমগ্ন! যেন নীলাকাশ ভেদ ক'রে কোন অজানা রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন ক'রতে আজ বদ্ধপরিকর। পথে যেতে মনে হয়, পরেশনাথ এত কাছে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

আমরা মধুবনে এসে যখন পৌছিলাম তখন বেলা সাড়ে ন'টা। মধুবন পরেশনাথ পাহাড়ের মূলে অবস্থিত। এটি দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়দের তীর্থস্থান। মধুবন থেকে পরেশনাথ পাহাড়ে আরোহণ সুরু করতে হয়। প্রতি বছরই ভারতের নানা স্থান হ'তে জৈন যাত্রীরা এই তীর্থস্থানে এসে থাকেন। জৈনদের ২৪টী মন্দির এই স্থানে শোভা পাচ্ছে। একটী hot springও এখানে আছে। যখন রেলপথ বিস্তৃত হয়নি, তখন এই স্থান ইংরেজের অন্যতম স্বাস্থ্যাবাস ছিল এবং বাঙ্লার ছোটলাট সাহেব এই স্থানে এসে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম লাভ ক'রে যেতেন।

আমরা জৈনদের মন্দিরগুলি যত শীঘ্র পারা যায় দেখে, বাইরে এসে দেখি, কাকা পাহাড়ের নীচে ব'সে আছেন, পাশে তাঁর একরাশ আতার খোসা ছড়ান; আমাদের ব্যাপার বুঝতে কিছুই বাকী রইল না। সকলে হেসে উঠলাম। বাবা আবার এই সময়টুকুর মধ্যে কোথা থেকে

খুকুর জন্যে একঘটি গরম দুধ নিয়ে এলেন। আমরা কিন্তু সেই সুন্দর দুধ একটু ক'রে খেয়ে খুব স্ফুর্ত্তির সঙ্গে পরেশনাথ পাহাড়ে উঠতে সুরু ক'রলাম। আমার ছোট ঠাকুরঝি, আমার মা ও আমি সকলের আগে ও বেশ জোরের সঙ্গেই উঠতে লাগলাম। পাহাড় কেটে রাস্তা করা হ'য়েছে; পাহাড়ের গা দিয়ে এঁকে বেঁকে পথ চলেছে ঠিক গোল সিঁড়ির মতই; দু'পাশে নিবিড় শালবন তার মধ্যে উঁচু নীচু সুন্দর পথ,—এই পথে কত যাত্রীর পদরেণু মিশান আছে; পরেশনাথের একটু স্পর্শের জন্যে কতদিন থেকে, কত বিপদ তুচ্ছ করে যাত্রীরা চ'লেছে এই কঠিন পাহাড় পথে। পথের ছোট ছোট নুড়ীগুলিও যেন ব'লছিল—'তোমরাও চল, সেই গন্তব্য স্থানে পথ যেখানে শেষ করেছি, আমাদের এই অগণিত পাথরকণার জন্যই যে শুধু শিখরশীর্ষে পৌঁছে দেয়া।' আকাশে সূর্য্য নেই, আবছায়া মেঘের ম্লানিমায় বেলা আচ্ছন্ন। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু নিবিড় হ'তে নিবিড়তর বন আর আকাশের সাথে মিশে আছে পরেশনাথের মন্দির।

আমরা পরেশনাথের সামনের পাহাড় দিয়ে যাচ্ছিলাম অর্থাৎ এই রকম দু'টী পাহাড় লঙ্ঘন ক'রে তবে পরেশনাথে পৌঁছন যায়। এই সামনের পাহাড়টীই প্রায় এক মাইল উঁচু। ক্রমশই পরেশনাথের মন্দিরে যাবার আগ্রহ আমাদের লোপ পেতে লাগল। বেলা প্রায় ১১.টার সময় আমরা এই পাহাড়টীর ওপরে এলাম; সেই স্থানটী বেশ সমতল। ২।৩ ঘর সাঁওতাল সেখানে চাষ-আবাদ করে বাস করে। আমাদের দেখে তারা একটী দড়ির খাটিয়া এনে দিল; বাবা ও কাকা তার উপর বসলেন। কুলীর মাথায় আমাদের সতরঞ্চ ছিল; একটী পরিষ্কার জায়গা দেখে সতরঞ্চখানি বিছিয়ে নিয়ে আমরা ব'সলাম। সঙ্গে কিছু আতা ও খাবার নেওয়া হয়েছিল, সকলে বসে তার সদ্গতি করা গেল। ঠিক সেই সময়ে দেখি শ্রীযুক্তা সরলা দেবী একটী ডুলিতে সেই পথ দিয়ে পাহাড়ে উঠছেন। সরলা দেবীকে আমরা চিনিনে ভেবে একজন হিন্দুস্থানী (ইনিও পাহাড়ে উঠছিলেন) সরলা দেবীর পরিচয় দেবার মানসে আমাদের বল্লেন, "উ কলকত্তা আউলি হল্লাদেবী হ্যায়"—পরিচয় দেবার ভাষা বটে! আমরা শুনে সকলেই হেসে উঠলাম। এই হিন্দুস্থানীটীর সঙ্গে দু'জন মহিলা ছিলেন। তাঁদের একজন স্ফুর্ত্তি ও শক্তির সঙ্গেই পাহাড়ে উঠতে লাগলেন, অপর মহিলাটী কিছু ক্লান্ত হওয়ায় আমাদের নিকটেই বিশ্রাম করতে লাগলেন।

হাজিসাহেবকে পরেশনাথের মন্দির আর কতদূর জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বল্লেন, "হিঁয়া সে আউর ছে মাইল যানে হোগা, বহুত্ চড়াই হ্যায়; আউর একঠো বহুৎ আচ্ছি-জ্যাগা হ্যায়, উস্‌কো ফলিবাগ্ বোল্‌তা, যাস্‌তি দুর নেহি হোগা, দো মিল্ হোগা, আভি বো আপ্‌লোকা মর্জ্জি হ্যায় করিয়ে" ইত্যাদি। সকলেই তখন পরেশনাথ মন্দিরের দূরত্ব ও ফলিবাগের নাম শুনে কি করা যাবে এই সমস্যায় পড়লেন। আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোকটীর ও হাজিসাহেবের ইচ্ছা যে সকলে ফলিবাগেই যান অবশ্য তার একটু কারণও ছিল। প্রথমতঃ, পরেশনাথের মন্দির তখনও বহুদূরে, দ্বিতীয়তঃ, ফলিবাগ হচ্ছে উক্ত ভদ্রলোকটীর সম্বন্ধীর, কাজেই সেটী দেখার জন্যই তাঁর আগ্রহ। নানারকম ফল ফুলের গাছ ও চায়ের আবাদও সেখানে হয়। হাজিসাহেব ঐ বাগানেরই কর্ম্মচারী। আমরা বাইনাকুলার নিয়ে পরেশনাথের মন্দিরের দিকে তাকালাম—ওরে বাবা! এখনও "ছে মাইল চড়াই পথ!" তবে আর সেখানে গিয়ে কাজ নেই, এইরকম নানা কথার সুর তখন প্রায় সকলের মুখেই বের হতে লাগল তবে আমার ঠাকুরঝিটী একটু বিষণ্ন হল কারণ তার বরাবরই খুব ইচ্ছা ছিল পরেশনাথের মন্দিরে সে উঠবে; কিন্তু উপায় নেই, বেচারী ভোটে হেরে গেল। যুক্তি হল পাহাড় শীর্ষে মন্দিরে ত সবাই উঠে কিন্তু পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত এই ফলিবাগে আর ক'জন যায়?

আমরা সকলে ফলিবাগের পথে নূতন উদ্যমে যাত্রা করলাম। মধ্যে মধ্যে অন্ধকার স্যাঁত-সেতে পথ ধরে হাজিসাহেব আমাদের নিয়ে চল্লেন। বহুদূর হতে এক একটী ঝরণার পতনোচ্ছ্বাস শব্দ ভেসে আসতে লাগল, আমরা তারই আগ্রহে ছুটে চল্‌লাম। খানিকদূর গিয়ে দেখি সুন্দর একটী নির্ঝরিণী পরেশনাথের উপর হ'তে বেশ জোরের সাথে নেমে আসছে, শুনলাম ইনিই সীতানালা; সীতাই বটে! ভারী মনোরম বোধ হ'তে লাগল। চারিধারে ভীষণ জঙ্গল, সব নিস্তব্ধ, নিঝুম, অন্য কোন শব্দ নাই, কেবল এই স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী নির্ঝরিণীর কলোচ্ছ্বাস

প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনি তুলে ছুটে চলেছে। সেই ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে, ঐ পাহাড়ের কঠিন বুকে কোন যাদুকর যেন তাহার সোনার কাঠির স্পর্শে মুক্তাধারা ছুটিয়ে দিয়েছে; কত যুগ-যুগান্তর ধরে কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ঐ মুক্তাধারা তার গন্তব্যপথে, তার সুন্দরের সন্ধানে, তার জয়যাত্রার অভিযানে চলেছে,—কতদিন গেল, সে চলার ত বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই অবিরাম গতিই তার মুক্তি অভিযানের একমাত্র পাথেয়। বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যে তার পথে বাধা দেয়—তার অপ্রতিহত গতি রুদ্ধ করবে এমন সাধ্য কার—সে যে মুক্তি পাগল—সে যেন গেয়ে চলেছে—

> "ভাঙ্গরে হৃদয় ভাঙ্গরে বাধন
> সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন
> লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
> আঘাতের পর আঘাত কর—
> মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
> কিসের আঁধার কিসের পাষাণ
> উথলি যখন উঠেছে বাসনা
> জগতে তখন কিসের ডর!

আমরা বড় বড় পাথরের উপর বসে কাঁচের মত স্বচ্ছ টলটলে জলে পা ডুবিয়ে, ফুল পাতা ভাসিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলাম। আমার ছোট্ট খুকু গৌরীও কম যায় না। সেও ঝরণার মতই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও উদ্দাম। নানা গল্পে ও গানে সে আমাদের হাসিয়ে চ'লছিল। কখনও সে যাচ্ছিল পায়ে হেঁটে, কখনও দাদুদের কোলে, কখন বা মঃ বাবু ও তার ছোট পিসীর পৃষ্ঠে। কিছুক্ষণ খুব আনন্দে কাটবার পর, আমরা এমন এক রাস্তায় এসে পৌছিলাম যে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হল। ভীষণ জঙ্গল সমাকীর্ণ সরু পথ, একজনের বেশী দু'জন পাশাপাশি যেতে পারে না। পথের দু'ধারে মানুষপ্রমাণ খড়ের নিবিড় জঙ্গল। সরু পথটুকুও আবার ঘাসে ঢাকা, কোথায় যে পা পড়ছে, সাপের উপর বা গর্ত্তের ভিতর কিছুই বুঝবার উপায় নাই। আবার শুনলাম যে, পরেশনাথ পাহাড়ের যত বন্য পশুর রাজধানী হচ্ছে এই স্থান, ভয়ে আমাদের বুক দুরু দুরু করতে লাগল। আগে জানলে এমন জায়গায় কখন কি আসি? কোথায় বা পরেশনাথের মন্দির, কোথায় বা ঝরণার প্রাণ মাতান গান! তখন মনে হচ্ছিল, "যত হাসি তত কান্না"—এক এক জায়গায় পথ এত ভিজা ও পিছল যে তাহা বলার নয়। এই গভীর বনের ভিতর অনেক বুনো কলাগাছ দেখলাম, প্রায় ২।৩ তলা দালানের সমান উঁচু হবে। মনের অবস্থা তখন অন্যরকম হলেও এই গভীর বনের মধ্যেও আমি নানারকম বনফুল সংগ্রহ করতে ভুলিনি। আমরা (মেয়েরা) বলছিলাম, জীবনে এই রকম adventure না হলে কি আর জীবন! পিছন হতে বাবা বল্লেন, "রাখ্ তোদের adventure, সকলে মিলে প্রাণ নিয়ে এখন ভালয় ভালয় ফিরতে পারলে বাঁচি।" হাজিসাহেব আগে আগে যাচ্ছিলেন, তাঁর সাথে ছিলেন কাকা আর মঃ বাবু। তাঁরা আমাদের থেকে একটু দূরে ছিলেন, তাঁরা মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে "সোজা" "ডানদিকে" "বামদিকে" বলে আমাদের পথ নির্দ্দেশ করে দিচ্ছিলেন। কাকা একটু রাগান্বিত ভাবেই হাজিসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আউর কেতনা দূর হ্যায়, হাজিসাহেব?" তিনি উত্তর দিলেন, "যাস্তি দূর নেহি হ্যায়, আউর এক মিল, থোরা দূর।" কিন্তু ক্রমাগত চলার পরও হাজিসাহেবের "এক মিল্" আর যেন ফুরোয় না, সে পথের যেন আর শেষ নাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই তাঁর সেই একই উত্তর, "আউর এক মিল্"—বড় দুঃখেও আমাদের হাসি পাচ্ছিল।

যাক্, এমনি করে বহুক্ষণ চলার পর যখন ফলিবাগে পৌছান গেল তখন বেলা ১॥০টা। ফলিবাগ পরেশনাথ পাহাড়ের একপ্রান্তে অবস্থিত, মধুবন হতে প্রায় ৪ মাইল দূর হবে। খানিকটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা, উহার ভিতর কয়েকটা মাটীর ঘর আছে, তাতে জনকয়েক মালী থাকে। জায়গাটী দেখলে মনে হয় যেন অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে, সে রকম যত্ন ও তত্ত্বাবধান তাহার ভাগ্যে বহুদিন হয়নি। তবু ঐ পাহাড়ে বাগানটীর ভিতর নানা রকম ফল ফুলের গাছ আছে। ছোট এলাচ, বড় এলাচ, বাদাম, ন্যাসপাতি, কমলালেবু, পেঁপে, লাউ, কুমড়া, কলা, তেজপাত, ও পেয়ারা গাছ প্রভৃতি দেখে আমরা খুব খুসী হলাম। সেখানে তখন অনেক গোলাপ ও অজস্র গাঁদা ফুলও ফুটেছিল। মালীরা ফুলের সুন্দর তোড়া করে আমাদের এনে দিল।

এই প্রসঙ্গে ফলিবাগের সামান্য একটু ইতিহাস

বল্লে অবান্তর হবে না। বহুদিন আগে ফলি নামে এক সাহেব বিলাত থেকে এসে ঐ স্থানে খুব বড় বাগান করবেন বলে চাষ-আবাদ আরম্ভ করেছিলেন। কয়েক বৎসর চাষ-আবাদের পর তাঁর বহু অর্থ ব্যয় হয়, পরে ফলিসাহেবের হাত হতে ঐ বাগান অন্য এক সাহেব নেয়। এঁরই অধীনে বাগানের বর্ত্তমান মালিক হাজারিবাগ নিবাসী বাবু শ্রীশচন্দ্র সেনের পিতা ৺বাবু গোপালচন্দ্র সেন ম্যানেজার ছিলেন। এই সাহেবও বহু অর্থ ব্যয় করার পর, লাভবান না হওয়াতে তাঁর ম্যানেজার ৺বাবু গোপালচন্দ্র সেনকে ঐ বাগান দিয়ে যান। তখন থেকে এঁরাই এখন ফলিবাগের মালিক। ফলিসাহেব এই বাগানের প্রতিষ্ঠাতা বলে এই স্থানটীর নামকরণ হয়েছে ফলিবাগ। নামের স্বার্থকতা যথেষ্টই আছে, যাঁরা না জেনে ঐ বিপদসঙ্কুল স্থানে যান তাঁদের "ফলি" (folly)-ও কম নয়।

কোনরকমে ফলিবাগ পৌছিয়ে আমরা যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। বাগানের মালীরা উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিল। হাজিসাহেব বাগানের কমলালেবু, পেয়ারা, থোর, মোচা, কলা, পেঁপে এনে আমাদের উপহার দিলেন। ২।১ টী লেবু ছাড়া বেশীর ভাগ কমলালেবুই টক্ ছিল। শুনলাম, ঐ লেবু বাড়ীতে ৮।১০ দিন রেখে খেলে মিষ্টি লাগে। খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা তিন গিন্নী মিলে চা ও খাবার ভাগ করে সকলকে খেতে দিলাম, তখন দেহে যেন প্রাণ এল।

ফলিবাগ থেকে পরেশনাথের মন্দির খুব উঁচু বোধ হচ্ছিল। আমরা চারিদিক ঘুরে দেখতে লাগলাম। কাকা হঠাৎ বাইনাকুলার নিয়ে বল্লেন, "ঐ যে মধুপুর দেখা যাচ্ছে।" আমার এক ঠাকুর ঝি পূজার বন্ধে তখন মধুপুরে ছিল। তার বাড়ীতে, ঐ তার খোকা খেলা করছে বলে পরিহাস করতে লাগলেন। আমরা সকলেই বাইনাকুলার নিয়ে একবার সেই দিকেই তাকালাম। আমরাও নানা জনে নানা মন্তব্য প্রকাশ করলাম। কেউ বলেন, ঐ যে জ্যাঠামশায়, কেউ বলেন, দিলীপ রায়ের মামার বাড়ীর থেকে কে যেন বেড়িয়ে আসছে ইত্যাদি আরও কত কি! আমাদের সময় বেশ আমোদ-আহ্লাদেই কাটতে লাগল। সেখানকার bathroom-টী অতি চমৎকার। উপর থেকে সজোরে একটী ঝরণা নেমে আসছে, সেই ঝরণার স্রোতের ঠিক উপরে টিন ও তক্তা দিয়ে মাচার মত করা, চারিদিক টিন দিয়ে ঘেরা একটী ঘরের মতই, মাচার ঠিক মাঝখানে একটী গর্ত্ত, সেই গর্ত্তের নীচে দিয়েই ঝরণার জল, ঘোড়-দৌড়ের মত ছুটে চলেছে। কাজেই ময়লা ও আবর্জ্জনা পরিষ্কারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট দরখাস্ত পেশ বা কোন লোকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। সেখানে প্রকৃতি মানুষের কাজ নিজেই করে দেয়। এই অভিনব স্নানাগারটী আমাদের চমৎকৃত করেছিল।

এদিকে বেলাও আর নাই, ৩টা বাজে। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নামবার উদ্যোগ হতে লাগল। আকাশে মেঘ, টিপ্ টিপ্ করে জলও মাঝে মাঝে হচ্ছিল, তবে বেশীক্ষণ ধরে নয়। পিছনে মেঘঢাকা পরেশনাথের মন্দির বিরাট গাম্ভীর্য্যে প্রতীয়মান ধ্যানমগ্ন মহাতাপসের মত নীরবতায় মগ্ন। প্রকৃতির নব শোভার ছলনাময় রূপ যেন ঐ বিরাট বিশাল বক্ষকে উদ্বেলিত করতে পারে না। সৃষ্টি কাঁপিয়ে বজ্র ও পাষাণ বক্ষে চূর্ণ হয়ে যায়। শারদের পূর্ণচন্দ্র আপনি ফোটে, আপনি নিভে। ফাল্গুনের ফুলস্তবক আপনি ম্লান হয়ে ঝরে পরে ঐ পাষাণের কঠিন বুকে। এই নির্ব্বিকার পরেশনাথের স্পর্শ পেয়ে এ দেশের যা কিছু দৃশ্য শোভন ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। সম্মুখে দূরে ছবির মত সবুজ ক্ষেত, তার মাঝে বকশ্রেণীর মত মধুবনের শ্বেত পাথরের মন্দির ও চূড়াগুলি শোভা পাচ্ছে। আমরা আরও কিছুক্ষণ চারিদিক দেখে নিলাম; বিস্ময়, ভয় ও আনন্দে সবার মনে সে এক অভিনব সমাবেশ।

এবার ফিরবার পালা সুরু হল। হাজিসাহেব বল্লেন, এবার অন্যপথে নিয়ে যাব, তা হলে আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। আমরা তাহাতেই সম্মতি প্রদান করে তাঁরই পিছনে পিছনে নামতে লাগলাম। এ পথেও সেই অন্ধকারময় জঙ্গল আরম্ভ হল। থেকে থেকে গাছের ফাঁকে, যেখানে আকাশ দেখা যাচ্ছে, সেখানে একটু আলো হচ্ছে। এই জঙ্গলের মধ্যে অনেক বন্য জন্তুর চলাফেরার পদ চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গেল; আতঙ্কে প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠল। তার উপর আবার হাজিসাহেব রসিকতা করে, তাঁর ভাষায় বল্লেন, "যদি দেখতে চান ত বাঘ ভালুকও দেখিয়ে দিতে

পারি, তারা সব ঘুমুচ্ছে এখন, তাদের থাকবার স্থান সব আমি জানি"। আমরা আর তাতে মোটেই কৌতূহল প্রকাশ করলাম না, কতক্ষণে নিরাপদে ফিরবো শুধু এই চিন্তা নিয়ে সে বনপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। এবারেও যতদূর দেখা যায়, আবার সেই নিবিড় বনশ্রেণী মনে হয়, এত বন হয় কি করে! পাহাড়ের কঠিন বুকে ফল্গুর মত এত রস, এত সজীবতা আসে কোথা থেকে! প্রায় এক মাইল অল্পপথে নেমে আসার পর, ছোট একটী ঝরণা পার হবার সময়, আমাদের ডানদিকে জঙ্গলের ভিতর কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর আওয়াজ হ'ল। আমার জা ও আমি প্রথমেই ছিলাম, পিছনে বাবা, কাকা ও ঠাকুরপো আর কিছু আগে মঃ বাবু গৌরীকে পৃষ্ঠে বেঁধে চলছিলেন। ঠাকুরঝি তাঁর নিকটেই ছিল, আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোকটী ও হাজিসাহেব সঙ্গে ছিলেন, সেই শব্দ শুনে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কিসের আওয়াজ? বাবা ও কাকা বেশ ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "ও কিছু নয়, তবে তোমরা একটু শীগ্‌গীর চল।" আমরা তখন বুঝি নাই, পরে জেনেছিলাম, সেটা কোন বন্য জন্তুর আওয়াজ। সেদিন শুধু আওয়াজের পরিবর্তে ভাগ্যি ঐ আওয়াজের মালিকের সাথে পরিচয় হয় নি! একথা ভাবলে এখনও বুকের মাঝে যেন কেমন করে উঠে।

আমরা যে পথ দিয়া যাচ্ছিলাম সেটী একটী শুষ্ক ঝরণার গতি রেখা। বর্ষাকালে সে পথ নির্ঝরিণী নিজেই দখল করে নেয়। কিন্তু সে যে কি বন্ধুর কঠিন পথ, তা এই লেখনীতে বর্ণনা করতে অক্ষম। সমস্ত পথটী পাথর-কণা ও ছোট নুড়ীতে ঢাকা। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা পাহাড়ে উঠতে না পারার সম্ভাবনায় আমাদের জুতো মধুবনে রেখে এসেছিলাম। এখন সেই পাহাড়ের নুড়ীর উপর দিয়ে শুধু পায়ে চলতে হচ্ছিল—খানিকদূর গিয়ে পায়ে অসহ্য কষ্ট বোধ হইতে লাগল। শ্রীচরণ আর যেন চলতে চায় না। সব থেকে কষ্ট আমার জা বেচারীর, একে তার শরীর তত সবল নয়, চিরকাল কলিকাতাতেই থেকে এসেছে, তাতে আবার শুধু পা। তার মুখের পানে চেয়ে দেখি সারা মুখখানি নীল হয়ে গেছে। এক একটী পাথর কুচিতে আঘাত লাগে আর তার মুখে যেন রামধনুর রং খেলে। বাবা ও কাকা তার সঙ্গে, তাকে নিয়ে আস্তে আস্তে আসতে লাগলেন। আমি ও ঠাকুরঝি কোন রকমে নামতে লাগলাম। এক এক জায়গা ভয়ানক ঢালু, পা আপনিই জোরে নেমে আসে, সে সময় মনে হয়, জীবন যায় এবার বুঝি! কিন্তু এত দুঃখেও বিধাতা আমাদের একটুখানি আনন্দ দিতে কৃপণতা করেন নি। হঠাৎ চেয়ে দেখি, পরেশনাথের উপর হতে সীতা নদীর প্রপাত। আমাদের বাম পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল পরিপূর্ণ ভীষণ খাদ, তার ওপিঠে পরেশনাথের মধ্য হতে যেন সিঁড়ি করে সীতা নেমে আসছে! এ দৃশ্য জীবনে ভুলবার নয়। উচ্ছ্বসিত উদ্দাম জলরাশি প্রতি পাথরে পাথরে মুক্তা বৃষ্টি সৃষ্টি করছিল। দূর হতে সুবিস্তীর্ণ সবুজ বন-ভূমির গায়ে একটী সুদীর্ঘ শুভ্র রজতধারা বিশ্বশিল্পী যেন তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছেন।

আজ আমারা জীবন পরিপূর্ণ করে তাকে দেখলাম। কিন্তু কতকাল হ'তে এই অফুরন্ত জলস্রোতের সৌন্দর্য্য বয়ে চলেছে, কে তার লক্ষ্য রাখে! এই বিপদ-সঙ্কুল বন্ধুর পথের মাঝে হঠাৎ সীতার এই মধু আবির্ভাবে হৃদয় মন প্লাবিত হয়ে উঠল। প্রকৃতি যেন নিজের খেলায় মেতে গেছেন! কত যুগ হ'তে, কত লোক-চক্ষুর অন্তরালে কত ভোরের অস্ফুট আলোকে, সুপ্রভাতের ঘোষণায়, কত সন্ধ্যার আঁধারে, কত গহন গিরি কন্দরে, কত অসীম জলধির বুকে প্রতিক্ষণে নব মাধুর্য্য, নব সৌন্দর্য্য জন্মগ্রহণ করছে, কে তার খোঁজ রাখে! তাই জীবনের যাত্রাপথে প্রকৃতির এক একটী নূতন রূপ দেখলে আনন্দে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। নিভৃত গিরিকন্দরের এই চিরসঞ্চিত সৌন্দর্য্য আজ আমাদের পথশ্রান্তি ও বিপদের চিন্তাকে প্রভূত পরিমাণে লাঘব করে দিল।

বেলা পড়ে এসেছে। আমরা তখনও নামছি। আমাদের শরীর অবসন্ন ও ক্লান্ত, পা ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। বেলা যখন ৪॥ টা, হাজিসাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হল, মধুবন আর কতদূর? তিনি তাঁর চিরাভ্যস্ত উত্তর দিলেন "আউর এক মিল হ্যায়।" জীবনে এমন "এক মিলের" পাল্লায় আর কখনও পড়িনি। যাক, সেই অফুরন্ত "এক মিল" অবশেষে শেষ হয়ে এল। সমতল ক্ষেত্র এবং নব দূর্ব্বাদলের উপর চরণ ফেলে নবজীবন লাভ করলাম, কিছুক্ষণ পরেই মধুবনেই

পৌছিলাম। গরুর গাড়ীগুলি তৈরীই ছিল, আমরা সকলে উঠে বসলাম। শুধু মঃ বাবু, ঠাকুরপো ও হাজিসাহেব হেঁটে বাড়ী চল্লেন। বাড়ী যখন পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা ৭ টা। সকলের পরিশ্রান্ত কলেবর একটী শান্তির নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলো। মঃ বাবু তাঁর নিজের দেহের ক্লান্তি সত্ত্বেও বাবা, কাকা সকলকে সেবা করে তাঁদের ক্লান্তি দূর করে দিলেন।

পরদিন বাবা কর্ম্মস্থলে চলে গেলেন, তাঁর আর থাকবার উপায় ছিল না। আমরা তাঁকে অনেক করে ৺কালীপূজোর ছুটীতে আবার আসতে বললাম, তিনিও ফিরিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে গেলেন। তাঁর যাওয়ার পর আমাদের প্রথম ক'দিন খুব ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। [ক্রমশঃ

তুমি কি শুনিবে শুধু ?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

হৃদয়ের সিংহদ্বার গেছে ভেঙ্গে, তোরণের শীর্ষোপরি নাহি বাজে বীণা,
জীবনের সাধনার যজ্ঞশালা শূন্য রহে এ দুর্দ্দিনে ঋত্বিক বিহনে ;
অন্তরের অন্তঃপুরে শোনা যায় আর্ত্তনাদ,—জীবধাত্রী কাতর মলিনা !
সংসারের নদীকূলে অরণ্যের পথচারী সঙ্গীহীন বসিয়া বিজনে—
ভাবিতেছি এ সংসারে গেল কোথা শান্তি-সুখ ? কেন বিশ্বে পুঞ্জীভূত ব্যথা !
জীবিত-সংশয় জীব পদে পদে প্রতিহত, একে একে হারায়েছে সব।
বাঁচিবার কত আশা ! মৃত্যুপথে কত দুঃখ !—ওগো মোর নিষ্ঠুর দেবতা !
নিজ হাতে রচিয়াছ ধরণীরে,—ধরণীর দগ্ধবক্ষে এই আর্ত্তরব
তুমি কি শুনিবে শুধু ? কহিবেনা কোন কথা ! সান্ত্বনার নাহি দিবে বাণী ?
পাঞ্চজন্য শঙ্খ তব বাজিবে না ? আসিবে না আজিকার কুরুক্ষেত্র পথে !
পাপের প্রাধান্য হেরি, প্রাণ মোর এ-সঙ্কটে মাগে তব পাদপদ্মখানি ;
দুঃখের শর্ব্বরী আর পোহাবে কি ? শতদল ফুটিবে কি মম মনোরথে !
অতীতের তপোবনে আদর্শজীবন-স্মৃতি আজো মোরে করে আন্দোলিত,
সে যুগ ফিরেনা আর সেই সৌম্য বটচ্ছায়ে ধ্যান-মৌন নিভৃত সাধন।
পত্রের কুটির প্রান্তে শুচিস্মিতা আর্য্য দুহিতার সেই পুণ্যে আলোকিত
পবিত্র প্রাঙ্গণ, উপনিষদের গাথা, বেদমন্ত্র মধুচ্ছন্দে আলাপন
আনন্দের পূর্ণ প্রেমে ! এই ঘৃণ্য সাম্প্রতিক সভ্যতার সাথে পরিচয়
কেন হোলো জীবনে আমার ? বিকৃত ধিক্কৃত প্রাণে আর কত দুঃখ সয় !

বাঙ্গালীর ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য-স্থাপন

শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজা বীরমহার বংশে ১৬ জন রাজা মোট ৪০৫ বৎসর ৫ মাস ৩ দিন রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা আদিত্যকেতু, ইনি ২৩ বৎসর ১১ মাস ১৩ দিন রাজত্ব করেন। প্রয়াগের রাজা ধন্ধর এই আদিত্যকেতুকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা ধন্ধরের বংশে ৯ জন রাজা। ইঁহারা ৩৭৪ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন। রাজা রাজপাল ঐ বংশের শেষ রাজা। ইনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করার পরে সামন্তরাজ মহান্‌পাল রাজপালকে বিনাশ করিয়া সিংহাসন দখল করেন, ইনি মাত্র ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) হইতে আগমন করিয়া মহান্ পালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তাঁহাকে বিনাশ করিয়া সিংহাসন দখল করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ৯৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই সময় রাজা শালিবাহন ভারতবর্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। বীরত্বে এবং শৌর্য্যে রাজা শালিবাহন বিক্রমাদিত্য হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। শালিবাহনের প্রধান মন্ত্রী পৈঠনের যোগী রাজা সমুদ্র পাল বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন। রাজা সমুদ্র পালের বংশে ১৬ জন রাজা, ইঁহারা মোট ৩৭২ বৎসর ৪ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা বিক্রম পাল ২৪ বৎসর ১১ মাস ১৩ দিন রাজত্ব করার পরে পশ্চিম দেশ হইতে আগত বণিক জাতীয় মলুখচন্দ নামক এক ব্যক্তি রাজা বিক্রম পালকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে বিক্রম পাল নিহত হন, মলুখচন্দ ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন। মলুখচন্দের বংশে ১০ জন রাজা। রাণী পদ্মাবতী এই বংশের শেষ ব্যক্তি, ইনি মাত্র এক বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ইঁহার স্বামী গোবিন্দচন্দ্র ৩১ বৎসর ৭ মাস ১২ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাণী পদ্মাবতীর কোন সন্তান না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পরে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। মন্ত্রিগণ সকলেই ধার্ম্মিক এবং রাজভক্ত ছিলেন। তাঁহারা কাহাকে সিংহাসনে বসাইবেন এই বিষয়ে কোন স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে না পারায় সকলে পরামর্শ করিয়া হরিপ্রেম বৈরাগী নামক একজন সাধুকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন। এই সাধু ব্যক্তি মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে ৭ বৎসর ৫ মাস ১৬দিন রাজত্ব করেন। এই বংশে ৪ জন রাজা, সকলেই সাধু চরিত্র ছিলেন। ইঁহারা ৫০ বৎসর ২১ দিন রাজত্ব করেন। শেষ রাজা মহাবাহু ৩ বৎসর ৮ মাস ২৯ দিন রাজত্ব করার পরে রাজ্য ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনে গমন করেন, ফলে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন পুনরায় রাজশূন্য হয়। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশের রাজা আধীসেন সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়া রাজ্য দখল করেন। এই বংশে ১২ জন রাজা ১৫১ বৎসর ১১ মাস ২ দিন রাজত্ব করেন। রাজা আধীসেন ১৮ বৎসর ২ মাস ২১ দিন রাজত্বকরেন। এই বংশের শেষ রাজা দামোদর সেন ১১ বৎসর ৫ মাস ১৯ দিন রাজত্ব করেন। এইরূপ কথিত আছে, রাজা দামোদর সেন বড়ই অত্যাচারী ছিলেন এবং অমাত্যগণকে সর্ব্বদাই কষ্ট দিতেন। দামোদর সেনের অনৈক মন্ত্রী দীপসিংহ গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দামোদর সেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে দামোদর সেন নিহত হন এবং দীপসিংহ সিংহাসন দখল করেন। দীপসিংহের বংশে ৬ জন রাজা ১০৭ বৎসর ৬ মাস ১২ দিন রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা জীবন সিংহ ৮ বৎসর ১ দিন রাজত্ব করেন। এই জীবন সিংহ উত্তর দেশ জয় করিবার জন্য আপন সৈন্যগণকে প্রেরণ করার পরে বিরাটরাজ পৃথ্বীরাজ চোহান জীবন সিংহকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন। এই পৃথ্বীরাজের বংশধর যশপালের হস্ত হইতেই ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন চলিয়া যায় এবং সুলতান সাহাবুদ্দিন ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বাঙ্গালার আধীসেন ইন্দ্রপ্রস্থ দখল করেন আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে। ইনি বাঙ্গালার কোথায় রাজত্ব করিতেন

এবং বংশ পরিচয়াদি কিছুই জানা যায় না। বল্লাল সেন প্রভৃতি যে সকল রাজা বঙ্গরাজ্য শাসন করেন, ইনি সেই বংশের কি না তাহাও বলা যায় না। আধীসেন যে সেন বংশের রাজা এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যখন চিতোরে গমন করি, তখন বহু প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিয়াও ঐ রাজাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওবা যায় নাই। অনেকদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে এই বিষয়ের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণেই আমরা অনুসন্ধান বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারি নাই।

শ্রীনাথ দ্বার উত্তর ভারতের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং ভারতে প্রসিদ্ধ অনেকেই এই নাথ দ্বারের ইতিহাস জানেন। শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীনাথ দ্বার হইতে হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা ও মোহন চন্দ্রিকা নামক দুইখানি পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্র দুইখানিতে প্রাচীন ভারতীয় রাজগণেব উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি পত্র মেবাববাজ্য, উদয়পুব, চিতোরের রাজ-লাইব্রেরীতে এখনও পাওয়া যায়। এ সকল অন্বেষণের প্রয়োজন। ১৭৮২ বিক্রমসংবতের লিখিত একখানি প্রাচীন পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা ও মোহন চন্দ্রিকার সম্পাদক সংবত ১৯৩৯ সে মার্গশীর্ষের শুক্লপক্ষে উক্ত পত্রদ্বয় প্রকাশ করেন।

আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দজী উক্ত পাক্ষিক পত্রিকা দুইখানি নিজে অনুসন্ধান করিয়া ঐ পত্রের লিখিত ইতিহাস সংগ্রহ করেন এবং উহা প্রকাশ করেন। দয়ানন্দজী লিখিত সত্যার্থ প্রকাশের ১১ সমুল্লাসে এই ইতিহাস সম্বন্ধে ও রাজাদের নামাদির বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে।

বাঙ্গালার প্রাচীনতম ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে এই সকল ইতিহাসও সংগ্রহ করিতে হইবে। মুসলমানেরা ভারতে আগন্তুক জাতি এবং জগতে মুসলমান ধর্ম্মের বয়সও তেরশত বৎসরের বেশী হয় নাই। কিন্তু ইহারা ভারতে আগমন করিয়া ভারতের ইতিহাসকে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে এবং ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপেব ঐতিহাসিকগণের বিবরণও সব সময় বিশ্বাসযোগ্য নহে।

রাজা আধীসেন যখন ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন তখন মনে হয় বঙ্গদেশ খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ প্রথম বিজয়ীরূপে বাঙ্গালায় আগমন করে। তখন সেনবংশীয় রাজাগণই বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাজা লক্ষ্মণসেন তখন নবদ্বীপেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাহারও মতে রাজা লক্ষ্মণের অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের পুত্র তখন বাঙ্গলার রাজা। বক্তিয়ার খিলিজী বহু সৈন্যসহ নবদ্বীপ আক্রমণ করিলে সেস্থানে দীর্ঘকাল সমর হয় এবং রাজা লাক্ষণের মন্ত্রী পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতায় বাঙ্গালাব শেষ আর্য্য রাজার পতন হয়, ইহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আর্য্য রাজগণই রাজত্ব করিতেন।

রাজা শালিবাহনও যে বঙ্গদেশের একজন প্রাচীন রাজা ইহাও অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন। যশোহর জিলায় হরিণাকুণ্ড নামক স্থানের অদূরে শালিবাহনের গড় ও দুর্গেব যে ভগ্নাবশেষ দেখা যায় ঐ শালিবাহন কি বিক্রমাদিত্যের সময়ের রাজা তাহাও অনুমান করার প্রয়োজন আছে। রাজা শালিবাহনকেও বাঙ্গালী বলিয়াই অনুমান হয়।

মহাভারতীয় যুগের প্রাচীন বাঙ্গালা পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী স্থান এই বিস্তীর্ণ ভূভাগই বঙ্গরাজ্য। এই স্থানে বহু বীর্য্যশালী রাজাগণ রাজত্ব করিতেন। বাজা আধীসেনও এইরূপ একটী রাজবংশ যে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও আমি বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজকে প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই প্রবন্ধের লেখকও এই বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত আছেন।

উপসংহারে বঙ্গীয় রাজাগণের নাম ও কে কতদিন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব কবিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করি।

রাজাগণের নাম

রাজা	পুরুষ	বর্ষ	মাস	দিন
১। রাজা আধীসেন		১৮	৫	২১
২। বিলাব সেন		১২	৪	২

রাজা পুরুষ	বর্ষ	মাস	দিন
৩। কেশব সেন	১৫	৭	১২
৪। মাধব সেন	১২	৪	২
৫। ময়ুর সেন	২০	১১	২৭
৬। ভীম সেন	৫	১০	৯
৭। কল্যাণ সেন	৪	৮	২১
৮। হরি সেন	১২	০	১৫
৯। হেম সেন	৮	১১	২৫
১০। নারায়ণ সেন	২	২	২৯
১১। লক্ষ্মী সেন	২৬	১০	০
১২। দামোদর সেন	১১	৫	১৯

বাঙ্গালা এক সময়ে বীর ছিল, নানাদেশে অভিযান করিত, আজকালকার মত কাপুরুষ ছিল না, এই কথা প্রমাণ করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন ও সমাজ গঠন করা যাইতে পারে কি না সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এই প্রবন্ধের অবতারনা করিলাম। বাঙ্গালী সুধী সমাজকে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

অর্মলিন প্রেম মোর লবে না ?

শ্রীবিবেকানন্দ পান এম, এ

ফাগুনের মধুবায়, জ্যোৎস্নার বন্যায়
ভেসে যায় ধরণীর বক্ষ ;
কত ব্যথা গুঞ্জরে হৃদয়ের পঞ্জরে
হেরি' আজি শূন্য এ কক্ষ,
মনে পড়ে একদিন সকল ভাবনাহীন
এমনি মধুর এক রাত্রে,
লাজুক প্রণয় তার কেড়ে নিয়ে বার বার
রেখেছিনু হৃদয়ের পাত্রে।
মনে শুধু পড়ে আজ সেই চাওয়া সেই লাজ
না-বলে-জানানো কত কাহিনী ;
বলেছিল আঁখি তার "তোমারেই বার বার
খুঁজেছিনু আর কারে চাহিনি।"
একবার শুধু তাই মুখপানে চাহিয়াই
চিনিল সে আমি শুধু তারি যে,
একটি প্রণাম করে পাশে দাঁড়াইল সরে
বলিলাম "তুমিও আমারি যে।"
তারপরে সংসারে কাজে কাজে আপনারে
একেবারে করেছিনু মগ্ন,
করিনি আদর তার আঁখি-জলে বার বার
বয়ে গেছে মিলনের লগ্ন !
এ শুধু কাজের ঠাঁই হেথা প্রেম-খেলা নাই
মনে মনে নিয়েছিল বুঝিয়া,
একটি কথা না বলি অভিমানে গেল চলি'
তাই কি সে কিছু নাহি খুঁজিয়া ?

* * *

হেথায় আমার আজ ফুরায়েছে সব কাজ
ফুরায়েছে হেথাকার যত যা,
আজ আমি তারে চাই মনে শুধু পড়ে তাই
সেদিনের ব্যথা তার কত না !
ঐ তারাটির কাছে হয়তো সে রচিয়াছে
আজিকার বাসরের শয্যা,
বসে আছে এক পাশে হয়তো আমারি আশে
আজ বুঝি চোখে নাই লজ্জা।
দুটি চোখে জল নিয়ে আজ যদি বলি গিয়ে
—"ক্ষমা কর সেথাকার দৈন্য,
সেদিনের প্রেমে মোর ছিল শুধু নেশা ঘোর
তব কাছে তাই ছিনু মৌন!"
তবু সে প্রণাম করি আঁখি দুটি তুলি ধরি
তেমনি কি হেসে কথা কবে না ?
পারিনি যা দিতে হেথা ভুলে কি যাবেনা সেথা
অমলিন প্রেম মোর লবে না ?

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে "মা"

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

আদর্শবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল বা "দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে মা" যাঁহারা পাঠ করিবেন তাঁহাদের অনুগ্রহ করিয়া একটী বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে—লেখকের ব্যক্তিত্ব, পারিপার্শ্বিক ঘটনা, তাঁহার পারিবারিক জীবনের ঘটনা বিভিন্ন লেখকের উপর বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে—কতক লেখক আছেন যাঁহারা essentially objective—যাঁহারা নিজের রস-সৃষ্টিকে জীবনের কোন ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হইতে দেন নাই, যেমন, Shakespeare. কেহ কি ধারণা করিতে পারেন যে, যিনি হাস্যরসের অবতার সেই বিখ্যাত ফরাসী লেখক Moleeri-এর জীবন ছিল গভীরতম দুঃখের? Don Quixote আমরা পাঠ করি কিন্তু কখনও কি মনে হয় যে, এই বিখ্যাত পুস্তকের গ্রন্থকার Crovantes-এর জীবন ছিল এক গভীর বিয়োগান্ত নাটক। ইঁহাদের জীবনের সহিত সাহিত্যে রস সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নাই।

আবার কতক লেখক আছেন (যাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর) যাঁহারা essentially objective, তাঁহাদের লেখার সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করিতে হইলে লেখকের জীবনের ঘটনা ও চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মহাকবি দান্তে যাঁহাদের ঘৃণা করিতেন তাঁহাদের নরকে স্থান দিয়াছেন, যাঁহাদের খুবই শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন তাঁহাদের স্বর্গে স্থান দিয়াছেন। গেটের প্রায় প্রত্যেক কবিতাই এইরূপ জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভিক্টর হিউগোর, বোধ হয়, প্রত্যেক কবিতাই জীবনের কোন না কোন ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত। এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও মনিষী টলষ্টয়ের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিকে নিজের অপূর্ব্ব আত্মজীবনী বলিলেও কোন দোষ হয় না। এক বিখ্যাত সমালোচক টলষ্টয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, "Tolstoy's Titanic individuality stamps itself on whatever he writes. I do not know another writer whose works are more intimately bound up with the events of his life. Even in his wildest and boldest lights he does not draw on his imagination. His fiction is never distinct from reality. And it is always his own reality as evolved from his own experience, as reflected in his own moods."

এই কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা বিশ্লেষণের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইবে।

আশ্বিন মাসের বঙ্গশ্রীতে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মা'র প্রতি ভালবাসার দৃষ্টান্ত কিছু বিবৃত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায়ই দুঃখ করিতেন যে, জননীকে আজকাল পুত্রেরা সে রকম ভালবাসে না। মার কথা বলিতে বলিতে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইতেন, গান গাহিতে গাহিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "এই ভক্তি আমি মার কাছ থেকে পেয়েছি, মা বড় ভক্তিমতী ছিলেন, অদ্বৈত বংশের মেয়ে ছিলেন কি না।" সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র হওয়ার কারণে তিনি মায়ের বিশেষ আদরের পুত্র ছিলেন। একদিন গল্পস্থলে আমায় বলিয়াছিলেন, "আমার একদিন আশুদের বাড়ী থেকে (৺স্যার আশুতোষ চৌধুরীর পিতা ৺দুর্গাদাস চৌধুরী সেই সময়ে কৃষ্ণনগরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ও দেওয়ানজীর বিশেষ বন্ধু) আস্‌তে দেরী হয়ে গিয়েছে, মা সমগ্র বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছেন ও কাঁদছেন, তিনি রাঙ্গাদাকে (দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজ মদীয় পিতৃদেব ৺হরেন্দ্রলাল রায়) জিজ্ঞাসা করেছেন, দ্বিজু আস্‌ছে না কেন, তুই জানিস্?" রাঙ্গাদা জানতেন যে আমি বাড়ীর কম্পাউণ্ডে এসেছি, তবু দুষ্টুমী ক'রে বললেন, "কি জানি কোথায়! হয় তো রাস্তায় প'ড়ে ট'ড়ে গিয়ে থাক্‌বে।" মা ব্যাকুল হয়ে অন্য পুত্রদের জিজ্ঞাসা কল্লেন, তখন আমি এসে পড়েছি, মার কি আনন্দ!"

মার সঙ্গে যদি আমাদের তর্ক-বিতর্ক হইত, যদি সমান সমান ভাবে উত্তর দিতাম তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন ও বলিতেন, "মা মা, মার সঙ্গে তর্ক"—এই কথা বলিয়া তিনি Alexander the Great-এর এই গল্পটী বহুবার বলিতেন আমাদের, "দেখো, Alexander the Great যখন দিগ্বিজয়ে বের হন তাঁর মা Olympius-এর হাতে রাজ্যভার দিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর অধীনে Antipater-কে কাজ চালাতে ব'লেছিলেন। Phillip Antipater একজন বিখ্যাত General ছিলেন। আলেক্‌জান্দারের জননী সোজা নারী ন'ন, ভয়ানক তেজস্বিনী নারী। Antipater-কে ব'কে গালাগাল দিয়ে অস্থির করতেন আর ক্রমাগত Antipater চিঠি লিখছেন Alexander-কে মার নামে দোষারোপ করে—Alexander চিঠি সব ছিঁড়ে ফেলে হেঁসে বলতেন, "Antipater does not know that a drop of Alexander's mother's tears can sink the whole world—বুঝেছ"—।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের মায়ের প্রতি অসীম ভক্তি ও ভালবাসা কাব্যে নাটকে বিশেষ দৃষ্ট হয়।

বিলাতে যখন যুবক দ্বিজেন্দ্রলাল একাকী অধ্যয়ন করিতেছিলেন তখনও মার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। বিলাতে প্রকাশিত তাঁহার ইংরাজী কবিতার পুস্তক Lyrics of Ind-এ দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন—

"Some say, I'm cruel to have left
  My mother lone my loss to mourn,
But know they not how sore my heart
  For her doth oft in silence burn.
When Nature sleeps in Night's soft arms
  The Heavens with starry rapture glow,
Sad visions flit across my sight
  The dreams of days long long ago.
The stars I gaze at with whose beams
  I played, when I was but a spring
Then think of long departed years
  They back again those visions bring.
Then think I of my mother dear,
  Whom I left mourning years ago.
Then bursts my heart, I sob and weep
  And cry in muffled murmurs low."

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে প্রথম সীতা নাটকে তিনি রামচন্দ্রের কৌশল্যার প্রতি অসীম ভক্তি কি সুন্দরভাবে পাঠক ও দর্শকের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন, দেখুন—

(সীতা—দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশল্যা—বাছা রাম!

রাম—মা, মা, তুমি যে এখানে?

কৌশল্যা—যে দারুণ কথা শুনিলাম কাণে
কেমনে রহিব স্থির অন্তঃপুরে
প্রাণাধিক! তুই কি রাজবধূরে
রাজ্যের লক্ষ্মীরে দিবি বনবাস
একি সত্য বাছা?

রাম—সত্য মা।

কৌশল্যা—বিশ্বাস করিব এ কথা ? তুই ন্যায়বান
সে সে তোরে জানি আপনার
প্রাণ হতে ভালবাসে।
রাজার দুহিতা, রাজার গৃহিণী, অভাগিণী সীতা
মোর ঘরে এসে পায় নাই সুখ,
তার প্রতি শেষে তুইও বিমুখ ?
শোন বাছা রাম !

রাম—জননী, তুমিও —?

কৌশল্যা—রাম, কথা রাখ। প্রাণাধিক প্রিয়
বৎস কথা রাখ। নহিস্ অবোধ,
ছাড় এ সংকল্প, রাখ অনুরোধ।

রাম—তুমিও করো না অনুনয় মাতা
পারিব না তাহা রাখিতে।

কৌশল্যা—বিধাতা
সাক্ষী, আমি ইহা করিতে দিব না
জীবিত থাকিতে।

রাম—হায় বিড়ম্বনা—

কৌশল্যা—তুই ন্যায়বান, তুই ধর্ম্মনিষ্ঠ—

রাম—জানো না মা ইহা মহর্ষি বশিষ্ঠ আদেশ—

কৌশল্যা—হউক বশিষ্ঠ আদেশ
ইহার পালনে নাহি ধর্ম্মলেশ।
এ নহে উত্তম, ন্যায়পর কাজ।
এ কার্য্য হইতে দিব নাক আজ।

রাম—সত্য করিয়াছি—

কৌশল্যা—আমিও কি সত্য
করি নাই তোরে এ পাপ উন্মত্ত
আত্মঘাতী কাজ করিতে দিব না ?

রাম—মা, মা, স্থির হও কর বিবেচনা।

কৌশল্যা—করিয়াছি। ইহা দিব না করিতে
মাতৃআজ্ঞা চেয়ে তোর কি নীতিতে
গুরু আজ্ঞা বড় ? কে তোরে জঠরে
ধরেছিল রাম ? কে তোর অধরে
দিয়েছিল কথা ? স্নেহে বক্ষে ধরি
কে পালিয়াছিল দিবস শর্ব্বরী ?
গুরু না জননী ? একবার তরে
গুরুর আজ্ঞাটী উলঙ্ঘিতে হবে
মায়ের আজ্ঞায়। প্রথম ও শেষ
এ আমার ভিক্ষা গুরুর আদেশ
এর চেয়ে বড় ? দেখ, সীতা লাগি
মাতা তোর আমি ভিক্ষা মাগি।
—দিবিনে—

রাম—মা, মা, মা, কি করিলে আজ !
তুমি ভূমে, আর আমি মহারাজ
হয়ে বসে আছি নিজ সিংহাসনে ?
হারায়েছি জ্ঞান ? সজল নয়নে,
তুমি ভিক্ষা মাগো, আমি দিব না তা ?

(সিংহাসন হইতে নামিয়া মাতাকে উঠাইয়া

হউক তোমার ইচ্ছা পূর্ণ, মাতা।
তুমি পূজ্য মাতা, তুমি পদতলে,
মলিন ধূসর নয়নের জলে,
ভিক্ষা মাগো আমি উচ্চে বসি আর
বলিব, "দিব না ?" জননী আমার
সত্য ভঙ্গ হোক, ভস্ম হোক রাম ;
মা তোমার পূর্ণ হোক মনস্কাম।

কৌশল্যা—দীর্ঘজীবি হও প্রাণাধিক, আর
কি বলিব বৎস ! বৃদ্ধ কৌশল্যার
এই আশীর্ব্বাদ, এ অমূল্য রত্নে
রাখিস্ হৃদয়ে চিরদিন যত্নে

(প্রস্থান)

(দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা নাটকে রামের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ী ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের অপূর্ব্ব সম্পদ)

রাণা প্রতাপে যখন রাণা প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ মেহেরউন্নিসার প্রতি আসক্ত হন তখন রাণা প্রতাপ অমর সিংহকে গুলি করিতে যান, সেই গুলি প্রতাপ সিংহের স্ত্রী অমর সিংহের মাতা নিজের বক্ষে গ্রহণ করিয়া মৃত্যু বরণ করেন—

(রাণা প্রতাপ—পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)

মেহের—অমর, তুমি আবার সুরাপান করেছো—কি ব'লছো জানো না—

"জানি মেহেরউন্নিসা" এই বলিয়া অমর পুনরায় হাত ধরিল—

মেহের উচ্চস্বরে কহিলেন—"হাত ছাড়ো—"

"মেহেরউন্নিসা প্রেয়সী"—এই বলিয়া অমর মেহেরকে বক্ষের দিকে টানিলেন—

মেহের—অমর সিংহ হাত ছাড় (হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে করিতে) "এই কে আছ?"—

(এই সময়ে লক্ষ্মী ও প্রতাপ সিংহ এই স্থানে প্রবেশ করিলেন)

প্রতাপ—এই যে আমি আছি (পরে গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন) "অমরসিংহ।"

(অমর মেহেরের হাত ছড়িয়া দূরে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলেন)

প্রতাপ—অমর সিংহ—এ কি! আমি পূর্ব্বেই ভেবেছিলাম যার শৈশব এমন অলস, তার যৌবন উচ্ছৃঙ্খল হ'বেই হ'বে!—তবু আশ্রিতা রমণীর উপর এই অত্যাচার যে আমার পুত্রদ্বারা সম্ভব, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। কুলাঙ্গার! এর শাস্তি দিব! দাঁড়াও (বলিয়া পিস্তল বাহির করিলেন)

(অমর "পিতা" বলিয়া প্রতাপ সিংহের পদতলে পড়িলেন)

প্রতাপ—ভীরু! ক্ষত্রিয়ের মর্ত্তে ভয়, দাঁড়াও।

লক্ষ্মী দ্রুত আসিয়া প্রতাপের পদতলে পড়িলেন; কহিলেন, "মার্জ্জনা ক'রো নাথ—এ আমার দোষ—এতদিন আমি বুঝেও বুঝি নাই"—

প্রতাপ—এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। পুত্র ব'লে ক্ষমা কর্ব্ব না—

মেহের—ক্ষমা করুন রাণা—অমর সিংহ প্রকৃতিস্থ নহে। সে সুরাপান ক'রেছে—

প্রতাপ—সুরাপান!—অমর সিংহ—

অমর—ক্ষমা করুন পিতা—

প্রতাপ—ক্ষমা নাই—দাঁড়াও (এই বলিয়া প্রতাপ পিস্তল উঠাইলেন)

মেহের—পুত্র হত্যা কর্ব্বেন না রাণা—

(লক্ষ্মী পুত্রকে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন) "তবে পূর্ব্বে আমাকে বধ ক'রো"—

(প্রতাপের হস্তে পিস্তল আওয়াজ হইয়া গেল, লক্ষ্মী ভূপতিত হইলেন—)

মেহের—এ কি সর্ব্বনাশ!—মা—মা—(দৌড়িয়া গিয়া লক্ষ্মীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন—)

প্রতাপ—লক্ষ্মি! লক্ষ্মি!—

লক্ষ্ম—নাথ—অমর সিংহকে ক্ষমা ক'রো—আমি জীবনে একবার বিদ্রোহী হয়েছি—আমাকেও ক্ষমা ক'রো, মৃত্যুকালে চরণে স্থান দিও—(প্রতাপের চরণ ধরিয়া লক্ষ্মী ইহলোক ত্যাগ করিলেন)

প্রতাপ—মেহের—আমি কি করেছি জানো?—

(অমর সিংহ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—মেহের-উন্নিসা কাঁদিতেছিলেন)

প্রতাপ—জগদীশ্বর! আমি পূর্ব্ব জন্মে কি পাপ করেছিলাম! সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রনাই আমাকে সহিতে হবে! ও! চক্ষে অন্ধকার দেখছি

(অমরমিত্র ও যুবক দানীবাবুর রাণা প্রতাপের ভূমিকার অভিনয় আজিও মানস-মন্দিরে প্রোজ্জ্বল হইয়া আছে)

সোরাব রুস্তাম নাটকে সোরাবের মার প্রতি কি গভীর স্নেহ লক্ষিত হয়—

(সোরাব রুস্তাম—দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

(সোরাবের প্রবেশ)

সোরাব—এই যে মা, একাকিনী এখনও এখানে? কি ভাবিছ মা আমার?

অমিনা—না বৎস কিছু না!

সোরাব—না মা ব'ল, ব'ল! শুধু আজি নহে;
মা, আমি জানি না, কেন তুমি নিত্য হেন
বিষাদে লালন কর হৃদয় তোমার।
কি দুঃখ তোমার, বল।

অমিনা—কি দুঃখ তাহার
তুমি যার পুত্র বৎস!

সোরাব— তথাপি তথাপি—

কি হেতু মলিন তুমি—দেখিয়াছি আমি
সন্ধ্যাকাশ পানে তুমি চেয়ে চেয়ে রহ ;
পরে সূর্য্য অস্ত যায় ; পরে ছেয়ে আসে,
পশ্চিম আকাশে ছায়া ; সন্ধ্যা তারা উঠে ;
পরে ধীরে ধীরে আকাশ শিহরি
অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জে রোমাঞ্চিত হয় ;
তবু সেই চেয়ে আছ।—গভীর নিশিথে
গিয়াছি তোমার কক্ষে, তুমি নিদ্রাহীন,
উঠেছো চমকি কহি—"কে, বৎস সোরাব ?"
ভাবিতে ভাবিতে কভু চক্ষে জল কণা
দেখা দেয়, মুছে ফেলো তারে গান গাও—
যেন কিছু ঘটে নাই। সহসা আমারে
আগ্রহে চাপিয়া ধর বক্ষের উপরে
আমার সমস্ত মুখ নিষ্পেষিত কর
প্রগাঢ় চুম্বণে ; পরে কাঁদ, পরে হাঁস।
কি দুঃখ তোমার মাতা ! বল, বল আমি
সে দুঃখ করিব দূর।

অমিনা—সোরাব—সোরাব (সোরাবের গলদেশ ধরিয়া ক্রন্দন)

(বাল্য বয়সে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত এই নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। সোরাবের ভূমিকায় ৺দানী বাবুর অপূর্ব্ব অভিনয় ও ৺সুশীলাসুন্দরীর অমিনার অভিনয় অশ্রুসিক্ত নয়নে দেখিয়াছি। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রকেও দানীবাবুর অপূর্ব্ব অভিনয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। রুস্তমের ভূমিকায় ৺তারক পালিতের অভিনয় অপূর্ব্ব।)

[ক্রমশঃ

[ভ্রম সংশোধন—আশ্বিন মাসের প্রবন্ধে "আদর্শবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল"এ 'আর্য্যগাথা কবির ৯ বৎসর হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে লিখিত' না হইয়া '৯ হইতে ১৭ বৎসরের মধ্যে লিখিত' হইবে।—লেখক]

ত্রয়ী

শিল্পী—কুমারী নিহারকণা ঘোষ

অতিথি

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

"যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।" মাঘের শেষে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সে জন্য গ্রামের বালক বালিকারা গাহিল, "ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।" সন্ধ্যার পূর্বে বর্ষা হইয়া গিয়াছে। বেশ মিঠা মিঠা শীত নামিয়াছে। অন্ধকার নামিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য বধূরা সন্ধ্যার দীপ জ্বালাইয়া, শাঁখে ফুঁ দিয়া যে যার ঘরে প্রবেশ করিল।

সুবোধ তাহার মাটির প্রদীপের সম্মুখে মাদুর পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছিল। ঘরে তাহার আসবাবপত্র কিছুই নাই। থাকার মধ্যে আছে মাটির কলসী ও দুইখানি গেরুয়া কাপড়। সুবোধ বাল্যকাল হইতে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ফুল্লশ্রী গ্রামে আসিয়া পরিয়াছিল। তাহার সৌম্য, শান্ত চেহারা দেখিয়া এবং সৎ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গ্রামবাসীরা তাহাকে গ্রামের মধ্যে একটি ছোট কুটীর করিয়া দিয়াছেন। সুবোধও গ্রামবাসীদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বৎসর দুই যাবত এই গ্রামে বাস করিতেছে।

সুবোধের স্বভাব চরিত্র যে কেবল পবিত্র ছিল তাহা নয়, ইহা ছাড়াও তাহার মহৎ গুণ ছিল পরের সেবা করা। যেখানে অসুখ-বিসুখ ও বিপদ-আপদ হইত, ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সে তাহাদের সাহায্য করিত। এই মহৎ গুণের জন্য গ্রামের সকলেই তাহাকে যেমন ভালবাসিত, ভক্তিও করিত সেইরূপ।

সুবোধ গীতা পাঠ শেষ করিয়া বই বন্ধ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেই সম্মুখে এক অপরিচিতা সুন্দরী যুবতী দেখিয়া বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। পরক্ষণে তাহার মন বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। একে রাত্রি, তাহার উপর অসামান্যা সুন্দরী রমণী তাহার ঘরে। তাহার ঘরে কোন স্ত্রীলোকের প্রবেশ অধিকার ছিল না। সুবোধ বিরক্ত হইলেও সে ভাব গোপন করিয়া মধুর হাসিতে ঘর উজ্জ্বল করিয়া বলিল, "আপনি কি চান?"

যুবতী মৃদু হাসিতেছিল। সুবোধের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া যুবতী বলিল, "আমি অতিথি, আমায় আশ্রয় দাও।"

সুবোধ মনে ভাবিল, বোধ হয় কোন বিপন্না রমণী তাহার আশ্রয় চাহিতেছে। সে শান্ত ভাবে বলিল, "দেখুন, আমি সন্ন্যাসী, একা থাকি, কি ক'রে আপনাকে আ...।" ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনরায় বলিল, "চলুন! আপনাকে জমিদার বাবুর বাড়ীতে রেখে আসি।" সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

যুবতী হাসিয়া বলিল, "জমিদার বাড়ী! সেখানে ত সরস্বতী পূজার দিন থেকেই আছি। আজ তোমার এখানে থাকব বলেই না এসেছি। আমায় আশ্রয় দাও সন্ন্যাসী।"

যুবতীর কথা শ্রবণ করিয়া সুবোধ চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সরস্বতী পূজোপলক্ষে জমিদার নারায়ণ বাবু নাচাইবার জন্য কলিকাতা হইতে বাঈজী আনিয়াছেন। এই সকল কথা সে গ্রামের লোকদের নিকট হইতে শুনিয়াছে।

সুবোধকে চিন্তিত দেখিয়া যুবতী ভাবিল, সুবোধ তাহার প্রস্তাবে সম্মত আছে। সে আরও উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তোমার এমন সুন্দর যৌবন কেন এভাবে নষ্ট ক'রচো; এই মাটি তোমার শয্যা! আহার তোমার এক মুঠো আতপ চাল। যাকে রাজপ্রাসাদে মানায়, সে তুমি থাক ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে—হা অদৃষ্ট! তুমি হুকুম কর, আজ রাতে তোমার সঙ্গে থেকে নিজেকে ধন্য করি। তারপর চল তুমি আমার কুটীরে, সেখানে তুমি রাজপুত্রের মত থাকবে। শয়ন ক'রবে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায়। স্নান করবে গোলাপ জলে। শত শত দাস দাসী করবে তোমায় সেবা।"

একটী যুবতী স্ত্রীলোক এমন নির্লজ্জভাবে কথা বলিতে পারে, সুবোধ তাহা ভাবিতেই পারে না। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার মাথা নত হইয়া পড়িল। যুবতী থামিলে সে আস্তে আস্তে মাথা তুলিয়া পরুষ কণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ করুন। আপনি বেরিয়ে যান।"

যুবতী হাত দিয়া নিজের মাথা স্পর্শ করিয়া বলিল, "হা ভগবান! আমি কি যাবার জন্যে এসেছি! যে দিন তোমায় প্রথম দেখি তুমি খাল থেকে স্নান করে স্তোত্র প'ড়তে

প'ড়তে জমিদার বাবুর বাসায় গেলে, সেই দিন তোমার সুন্দর, শান্ত, সৌম্য চেহারা দেখে, চেহারায় কি যে আছে তা বলতে পারি নি, জমিদার বাবুর কাছ থেকে তোমার সব পরিচয় জেনে নিলাম। সে দিন থেকে রোজ ভোরে তোমায় দেখবার জন্যে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতুম। কতদিন তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবার কত চেষ্টা ক'রেচি ; কিন্তু তুমি এক মনে স্তোত্র পাঠ করে যেতে, একবারও ফিরে তাকাতে না। আজ আর থাকতে না পেরে তোমার কাছে পালিয়ে এসেচি। আমার রূপ, যৌবন, ধন, দৌলত আজ তোমার হাতে তুলে দিলুম। আমায় অবহেলা ক'রো না। কত রাজা, মহারাজা আমার কৃপা পাবার জন্য লালায়িত। সেই কমলাবাইজী, আমি তোমার দ্বারে ভিখারী হ'য়ে এসেচি। বল, দেবে আমায় আশ্রয় ?" এই বলিয়া যুবতী সুবোধের কম্পিত দেহ ধরিতে হাত প্রসারিত করিল।

সুবোধ চমকিয়া উঠিল, একটু সরিয়া দাঁড়াইল। সে নিজেকে সংযত করিয়া ধীর শান্ত ভাবে বলিল, "আমি সন্ন্যাসী, আমার এ কথা শোনাও পাপ। আপনি এই মুহূর্ত্তে এই স্থান ত্যাগ করুন। তা না হ'লে আমি বাধ্য হ'য়ে লোক ডাকব।"

এই কথা শুনিয়া কমলার বুক চিরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে তাহার চপলতাকে সংযত করিয়া বলিল, "থাক! তোমাকে আর লোক ডাকতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি। তোমাকে আর বিরক্ত ক'রব না।" কমলার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এমন সময় জমিদার নারায়ণ বাবু দলবল সহ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কমলার চোখে তখনও জল ঝড়িতেছিল। নারায়ণবাবু একবার আড়চোখে কমলার পানে আর একবার সুবোধের পানে চাহিলেন। মন তাঁহার ঈর্ষায় দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। তিনি কমলাকে বলিলেন, "ব্যাপার কি বলত ? আসরে গেলেনা যে ?"

কমলা চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। সুবোধের কথা তাহার কানে বাজিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, ইহার অহঙ্কার ভাঙ্গিতে হইবে। সে নারায়ণবাবুর পানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "এর জন্যে দেরী হ'য়ে গেল। কখন থেকে বলচি, যাই, জমিদারবাবু রাগ ক'রবেন, কিন্তু উনি ত ছাড়তেই নারাজ। আপনি বলছিলেন, বড় সাধু! এইবার বুঝে নিন ইনি কত বড় সাধু!" এই বলিয়া সে সুবোধের পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

মানুষ যে এত বড় মিথ্যা কথা বলিতে পারে সুবোধের তাহা জানা ছিল না। সে মাথা তুলিয়া সকলের মুখের পানে চাহিল। তাহার মনে হইল, সকলেই যেন তাহার পানে চাহিয়া মুখ চাপিয়া হাসিতেছে। তাহার মন ঘৃণায় ভরিয়া গেল। এই কথার প্রতিবাদ করিতেও তাহার ইচ্ছা হইল না।

কমলার কথা শুনিয়া সকলেই ক্রুদ্ধ হইল। সুবোধের আরও একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া নারায়ণবাবু বলিলেন, "তোমায় ভালমানুষ বলেই আমরা জানতুম। তোমার মন যে এত নীচ তা জানলে, তোমায় এখানে স্থান দিতুম না। তুমি একটি ভণ্ড। তোমাকে আর বিশ্বাস নেই। কবে কোন ঘরের বউ-ঝি ধ'রে ফ্যাসাদ বাঁধাবে।"

সুবোধের একবার ইচ্ছা হইল বলে, সে এ পর্য্যন্ত এমন কি অপরাধ করিয়াছে। এতদিন সে সাধুই ছিল, হঠাৎ কমলার জন্যই সে অসাধু হইয়া গেল। যে নিজেই অসৎ চরিত্রের লোক সেই কিনা আজ তাহাকে অসৎ বলিতেছে, হায় রে জগৎ! কিন্তু একথা সে বলিবে কাহাকে। কেই বা তাহার কথা শুনিবে।

নারায়ণবাবুর পানে চাহিয়া কমলা বলিল, "আপনি ত এঁর সম্বন্ধে কত সুখ্যাতি করেচেন। এই অল্প বয়েসে এত বড় সাধু বড় হয় না। আমি সেই বিশ্বাসেই না এখানে এসেচিলাম।"

রাগে নারায়ণবাবুর সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, বলিলেন, "আমি কি ক'রে বুঝব এর পেটে পেটে এত শয়তানি আছে ?"

নারায়ণবাবুর একজন মোসাহেব বলিল, "এঁকে আর বিশ্বাস ক'রে রাখা যায় না হুজুর।"

নারায়ণবাবু যেন কথা পাইয়া বসিলেন, বলিলেন, "ঠিক কথাই বলেচ। শোনো সুবোধ, তুমি আজ এই মুহূর্ত্তে আমার গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবে। যদি না যাও তা হ'লে দারোয়ান দিয়ে চাবুক দিয়ে পার ক'রে দেব।" ইহারপর কমলার

পানে চাহিয়া বলিল, "চল এখন যাই। এখানে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে ইচ্ছে করচে না।"

নারায়ণবাবুর রায় শুনিয়া কমলা চমকিয়া উঠিল। তাহার কথায় সুবোধ এত বড় শাস্তি পাইবে কমলা তাহা ভাবিতেই পারে নাই। তাহার মন অনুশোচনায় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। নিজের বোকামির জন্য নিজের গাল চাপড়াইতে ইচ্ছা করিতেছিল। কিন্তু এখন আর তাহার হাত নাই। যে ঢিল ছুড়িয়াছে তাহা আর ঘুরিয়া আসিবে না। নারায়ণবাবুর কথায় চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা যান, আমি আসচি।"

এই কথা নারায়ণবাবুর ভাল লাগিল না, কিন্তু কমলাকে রাগাইতেও সাহস পাইলেন না। তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, "সে তোমার ইচ্ছে; কিন্তু দেরী ক'রো না।" বলিয়া তিনি দলবল সহ চলিয়া গেলেন।

জমিদার চলিয়া গেলে, সুবোধ তাহার লোটা, কম্বল ও কয়েকখানা বই লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

কমলা এতক্ষণ নীরবে সব দেখিতেছিল। সুবোধ চলিয়া যায় দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "যেওনা, দাঁড়াও।"

সুবোধ দাঁড়াইল কিন্তু ফিরিল না। সে বুঝিল, কমলা কাঁদিতেছে।

কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সত্যিই যাচ্ছো?"

সুবোধ উত্তর দিল না। চলিতে লাগিল।

কমলা সুবোধের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "তুমি যাবে তা আমি জানি। তুমি যে কঠিন লোক। কিন্তু আমায় ব'লে যাও তুমি কেন মিছিমিছি এই অপমান নিজের ঘাড়ে ক'রে নিলে। সত্যি কথা বল্লেই ত"—,সে আর কথা বলিতে পারিল না, কে যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে।

সুবোধের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, "কোনই লাভ হ'তো না। সন্ন্যাসীর আবার অপমান কি? সত্যই ত সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। সেজন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না।"

কমলা আশ্চর্য হইয়া গেল। যে লোক তাহার জন্য অপমানিত, লাঞ্ছিত; গৃহহীন, সেই কিনা তাহাকে ক্ষমা করিয়া গেল। কমলার মনে হইল, সে কি করিয়াছে! কাহাকে সে বশ করিতে, অপমান করিতে গিয়াছে! একি রক্ত মাংসের গড়া মানুষ। তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া বলিল, "আমি তোমার শিষ্য হবো; আমায় সঙ্গে ক'রে নাও।"

সুবোধ ততক্ষণে দরজার নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চাতে না ফিরিয়া উত্তর করিল, "না। আপনার পথ ও আমার পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন, আপনার পথ দেখুন।"

দুঃখে কমলার স্বর আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কোন প্রকারে নিজেকে জোর করিয়া বলিল, "আবার দেখা হবে ত?"

সুবোধ সেই সময় ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে বলিল, "সময় হ'লেই দেখা পাবেন।"

বাহিরে জমাটবাঁধা অন্ধকার, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। উত্তরের হাওয়া হু-হু করিয়া বহিতেছে। সুবোধ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল।

কমলা ছুটিয়া দরজার নিকট আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে, ব'লে যাও। আমি কি ক'রলে এ কাজ হ'তে মুক্ত হব?"

অনেক দূর হইতে ক্ষীণস্বর বাতাসে ভাসিয়া আসিল, "মানুষের সেবা করুন।"

আর কিছুই শোনা গেল না কেবল বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আসিয়া তাহার কানে থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, "মানুষের সেবা করুন।"

* * *

কয়েক বৎসর পরে।

শীত শেষ হইয়া গিয়াছে। চৈত্রের মাঝামাঝি গণেশপুর ও আশে-পাশের গ্রামে ভীষণ কলেরা দেখা দিয়াছে। এমন ঘর নাই, যেঘরে দুই একটি লোক কলেরায় না ভুগিতেছে। যাহাদের পয়সা আছে, তাহারা কলেরার ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতেছে। যাহারা অর্থাভাবে গ্রামের মায়া ছাড়িতে পারিতেছে না, তাহারা মরিতেছে। সেবা করিবার লোক নাই। ঘরে ঘরে লোক মরিয়া রহিয়াছে। ভয়ে কেহ দাহ করিতে আসিতেছে না। প্রাচীনেরা বলেন, "একশ বছরের মধ্যে এমন মহামারি কেউ দেখে নি, শোনে নি।" মাতার সম্মুখে পুত্র

মরিল, স্বামীর সম্মুখে স্ত্রী। কাহারও কাহারও ঘরে সকলেই কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ কাহাকেও সাহায্য করিতে পারিতেছে না। দেখিতে দেখিতে গ্রাম কয়েকখানি শ্মশানে পরিণত হইল। শিয়াল, কুকুর ও শকুনের মহোৎসব লাগিল। অনেকের ঘরে শৃগাল প্রবেশ করিয়া মৃত, অর্দ্ধমৃত লোক টানিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলিতেছে, বাধা দিবার লোক নাই। প্রকাণ্ড শ্মশানপুরীর মত গ্রাম কয়খানি খাঁ-খাঁ করিতেছে।

কোথাও সাড়া নাই, শব্দ নাই। দিনের বেলাও লোক কেহ বাহির হয় না। পথ-ঘাট অপরিচ্ছন্ন। গ্রামের খালে, ডোবায় মৃতদেহ অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে কেবল শৃগাল কুকুরের বিরাট শব্দ। হাট-বাজার বন্ধ। নির্জ্জন পল্লী। যাহারা গ্রামে রহিয়াছে, তাহারা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া থাকে। রাত্রিতে শত অনুরোধেও কেহ সাড়া দেয় না।

এইরূপ পরিত্যক্ত শূন্য পল্লীতে একটি সুন্দর সৌম্য প্রকৃতির যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সম্বলের মধ্যে লোটা, কম্বল ও ঔষধের বাক্স। সে গ্রামে আসিয়া গ্রামবাসীদের সাহস প্রদান করিতে লাগিল। যে সব রুগী মল-মূত্রের মধ্যে পড়িয়া ছিল তাহাদের নিজ হাতে সব পরিষ্কার করিয়া দিল। কাহারও মুখে জল ও ঔষধ দিতে লাগিল। সে একাই একশত হইয়া উঠিল। যে সমস্ত শব কেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিত না সে একাই সেই শবদেহ বহন করিয়া নদীতে ফেলিয়া আসিত। রুগীদের মল, মূত্র আগুনে পোড়াইয়া দিত। এই প্রকারে তিন চারি দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সে গ্রামের চেহারা একটু আয়ত্বাধীনে আনিল। তাহার অক্লান্ত সেবা দেখিয়া গ্রামবাসীদের মনে সাহসের সঞ্চার হইল। এখন একজন, দুইজন করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল।

এমনি এক দিন রাত্রে যুবক সংবাদ পাইল, পার্শ্বের গ্রামের লোকেরা ঔষধাভাবে সব মরিতেছে। সেদিন রাত্রে গ্রামবাসীদের অজস্র উপদেশ ও সাহস দিয়া সে পার্শ্বের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। সময় মত আহার নাই, নিদ্রা নাই, অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া যুবক চলিয়াছে। সেদিন চৈত্রের সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না রাত্রি। আকাশে চাঁদ হাসিতেছে। বাতাস আকুল হইয়া উঠিয়া লুটোপটি করিতেছে। কোকিল গাছের ডালে বসিয়া কু-হু রবে ডাকিতেছে। পথের দুই ধারে আম্রশাখায় মুকুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার গন্ধে পথ-ঘাট আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে।

জন-মানব শূন্য ধূলা বালির কাঁচা পথ দিয়া যুবক আপন মনে চলিতেছে। চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, ভয় নাই। আঁকা বাঁকা নদীর পথ দিয়া কখনও বা মাঠের অস্পষ্ট আলের উপর দিয়া যুবক নিজ মনে গান গাহিয়া চলিল। এই ভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যুবক গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌছিল। এক দল শৃগাল সজীব মানুষের সাড়া পাইয়া একটু দূরে পলাইয়া গেল। তাহারা এতক্ষণ একটি মৃত বালকের দেহ লইয়া ভক্ষণ করিতেছিল। যুবক সে দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সে বালকের মৃত দেহের পাশ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। আশে পাশের ঝোপ ডোবা হইতে মৃত দেহের পচা দুর্গন্ধ থাকিয়া থাকিয়া যুবকের নাকে প্রবেশ করিতে লাগিল। সে দেখিল, গ্রামের কুকুরগুলি অনাহারে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বৃথাই খাদ্যের অন্বেষণ করিতেছে। গ্রামের অবস্থা দেখিয়া যুবকের চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া এক গৃহস্থের কুটীরের দ্বারে আঘাত করিল। বহুক্ষণ আঘাতের পর কোন সাড়া না পাইয়া যুবক ফিরিতে উদ্যোগ করিল।

এমন সময় একটি তের চৌদ্দ বৎসরের বালক ঘর হইতে চোরের মত বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আপনি ডাকছিলেন?"

যুবক বলিল, "হ্যাঁ, আজকের রাতের জন্যে একটু আশ্রয় চাই।"

বালকটি তাহাকে ইসারায় একটু দূরে লইয়া গিয়া বলিল, "বাবা বড্ড ভীতু লোক, কাউকে আশ্রয় দেন না। চলুন আপনাকে মার ওখানে রেখে আসি। তিনি নিশ্চয়ই থাকতে দেবেন। তিনি বড্ড দয়ালু।"

ছেলেটীর ব্যবহারে যুবকটি হাসিয়া বলিল, "তোমার মা বুঝি আলাদা থাকেন।"

বালক আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "আমার মা এখানেই আছেন।"

যুবকটি হাসিয়া বলিল, "তবে ব'ললে, মার ওখানে আমায় নিয়ে যাবে।"

বালকটি বলিল, "সে ত আমাদের সাধুমা। আমরা সবাই তাঁকে মা বলে ডাকি। চলুন, আর দেরী ক'রবেন না।"

যুবকটি বলিল, "তুমি এত রাত্তিরে যাবে, তোমার বাবা রাগ করবেন না?"

বালকের মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বলিল, "ক'রলেই বা, আমি ত আর অন্যায় কিছু করচি না। মা বলেন, পরের উপকার ক'রলে ভগবান তার উপর সদয় হন। কি বলেন স্যর?"

বালকের সরল কথা-বার্ত্তায় যুবকের মনে আনন্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে যে রমণীর যাদুস্পর্শে এই ছেলেটীর মন পরব্রতে লিপ্ত হইয়াছে তাহার উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। দুই জনে চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে যুবক বলিল, "তোমার সাধুমা এখানেই কি বরাবর থাকেন?"

বালক উত্তর করিল, "না। তিনি কয়েক বছর হয় এখানে এসেচেন। বাবা কি বলেন জানেন স্যর? বাবা বলেন, মা যদি এই গ্রামে না আসতেন, তা হ'লে গরীব কেউ বাঁচত না। তিনি গরীবের বাপ, মা।

বালকটীর নির্ভীক কথা বার্ত্তায় যুবকের বেশ ভাল লাগিতেছিল, বলিল, "তিনি গরীবের জন্যে কি করেন?"

মায়ের কথা বলিতে পারিলে বালকটি আর কিছুই চায় না। যুবকের কথা শুনিয়া বলিল, "মা কি না করেন! গ্রামে যত গরীব আছে, তাদের খেতে-পরতে দেন। তার বদলে তাদের দিয়ে তাঁত চালান, চরখা কাটান, লেখা পড়া শিক্ষা দেন। কারও অসুখ বিসুখ হ'লে মা তাদের সেবা শুশ্রূষা করেন। এমন মা কি কোথায় দেখেচেন। সবাই বলেন, মা আমাদের অন্নপূর্ণা দেবী।"

এই গ্রামে এমন একটি মহৎ প্রাণ রমণী আছেন, যুবক তাহা আশা করতে পারে নাই। সে বলিল, "এই মহামারীতেও তোমরা মার কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছ?"

বালকটি বিস্ময়ে যুবকের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "মাই ত সব ক'রচেন। এই বিপদের সময় মাই ত' সকলকে রক্ষা ক'রচেন। এই যে আমরা বেঁচে আছি, সে ত' মায়ের কৃপায়। তিনি স্বয়ং মা ভগবতী দেবী।" এই বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া মার উদ্দেশে প্রণাম করিল।

কথায় কথায় তাহারা মার কুটীরের নিকট আসিয়া পড়িল। বালকটি বলিল, "এই ত মার ঘর। আপনি যান, আমি চল্লুম।"

যুবক বলিল, "এই রাতে একা যাবে কি ক'রে। ভোরে যেও।"

বালক বলিল, "মা বলেন, ভয় ব'লে জগতে কিছু নেই, ও সব মনের বিকার। আচ্ছা, চল্লুম স্যর।" বলিয়া বাড়ীর দিকে দৌড় দিল।

বালকটীকে যতক্ষণ দেখা গেল, যুবক সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বালকটি অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে সে কুটীরের দিকে চলিল। চন্দ্র তখন পূর্ব্ব গগণে অস্ত গিয়াছে। গ্রামটীকে অন্ধকারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। যুবক সেই কুটীরের দ্বারে করাঘাত করিল। একবার, দুইবার, তিনবার করাঘাত করিতে ঘরের ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি?"

যুবক বলিল, "দোর খোলুন, আমি একজন সন্ন্যাসী, আপনার অতিথি।"

এক যুবতী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহার হাতের আলোর শিখা যুবতীর মুখে পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সেদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া যুবক বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "এ কি, কমলা! আপনি, আপনি এখানে!"

কমলার মুখ খুসীতে ভরিয়া গেল, বলিল, "ভিতরে এস সন্ন্যাসী।"

যুবক ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার লোটা, কম্বল ও ঔষধের বাক্সটা একধারে রাখিয়া দিয়া নিজেই একটা ভাঙ্গা টুল টানিয়া লইয়া তাহার উপর বসিয়া বলিল, "ব্যাপার কি বলুন তো, এমন বেশই বা কেন?"

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তার আগে তোমায় একটা প্রণাম করে নি।" এই বলিয়া সে গলায় আঁচল দিয়া সুবোধকে প্রণাম করিল তারপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তুমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছ, না?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "হবারই কথা বটে। কিন্তু হ'তুম তাই, যদি না পথে তোমার বিষয় না শুনতুম। কিন্তু

তখন ধরতে পারি নি, সেই বিখ্যাত কমলা বাইজী হ'চ্ছে সাধুমা !" বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "এর মধ্যেই সব শুনেচ। কিন্তু যা কিছু পেয়েছি সবই তো তোমার জন্যে।"

সুবোধ শুধু হাসিল কোন উত্তর করিল না। কমলা বলিয়া চলিল, "মনে পড়ে সে দিনের কথা, যেদিন তুমি আমায় অবহেলা ক'রে চ'লে যাও। সেই দিনই আমি ম'রেছি। আমারি মনে বড় অহঙ্কার ছিল, আমার মত সুন্দরীর আবেদন কোন পুরুষই ফেলতে পারে না, এ জীবনে তা কোন দিনও হয় নি। প্রথম ধাক্কা খেলুম তোমার কাছে। তখন তোমার ওপর রাগ হ'ল। জমিদার বাবুকে দিয়া তোমায় অপমান করলুম। কিন্তু তাতেই আমার কাল হ'ল। তুমি সকলকে তুচ্ছ ক'রে চ'লে গেলে। তখন বুঝলুম, তুমি এমন এক জিনিষের অধিকারী যার কাছে মান, অপমান, ধন, দৌলত, রূপ, যৌবন কিছুই নয়। সেই কথা ভেবেই তোমায় চেঁচিয়ে ব'ললুম, আমার কি গতি হবে ? তুমি দয়ালু, আমায় ব'ল্লে, "মানুষের সেবা কর'।" সেই থেকেই আমার এই পরিবর্ত্তন।"

শুনিয়া সুবোধ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কোন কথারই জবাব দিল না।

কমলা বলিয়া চলিল, "সেদিন তোমার কাছে অতিথি হ'য়ে গিয়েছিলুম। সেদিন তুমি আমার ছল ধ'রে ফেল্লে, আমায় আশ্রয় দিলে না। আজ ভগবান্ তোমায় অতিথি রূপে পাইয়ে দিয়েছেন। ভয় হয়, আজো তোমাকে হারাবো। কঠিন মানুষ তুমি।" কমলার চোখ বহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সুবোধ হাসিল, কি মধুর হাসি ! মানুষের হাসি যে এত মধুর হইতে পারে কমলা ইহা প্রথম দেখিল। সে বলিল, "সেদিন তুমি ছিলে বিখ্যাত সুন্দরী কমলা বাইজী, তাই তুমি আশ্রয় পাও নি ; কিন্তু আজ তুমি আর বাইজী নও ; সেবাপরায়ণা নারী, মা। আর তো তোমারি ভয় নেই। তুমি তাড়ালেও তো আমি যাব না কমলা।"

কমলা কাপড়ের অঞ্চল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, "হা ভগবান ! তোমায় তাড়াব আমি ! তুমি যে আমার গুরু সুবোধ।"

কমলাকে বাধা দিয়া সুবোধ বলিল, "তুমি কি কেবল বক্ বক্ ক'রবে কমলা। এদিকে যে ক্ষিধেয় আমার নাড়ী পর্য্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে।"

শুনিয়া কমলা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "তাই তো, আমার হুঁস নেই। এমনি পোড়া মন, নিজের সুখে নিজেই বিভোর। তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি তোমার জন্যে এখনি দুধ গরম ক'রে আনচি।" সে আর দাঁড়াইল না, দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

বাঙ্গালার কথা

৺ নিখিলনাথ রায়

বাঙ্গালার অন্নপূর্ণা

তোমরা অন্নপূর্ণার কথা অবশ্য জান। যিনি জগৎকে অন্নদান করিয়া থাকেন, তিনিই মাতা অন্নপূর্ণা। কাশীতে এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে আমাদের বাঙ্গালায় এক অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার নাম রাণীভবানী। ভবানী নাটোররাজ রামকান্তের পত্নী। তোমরা শুনিয়াছ, রাজা রামজীবনের সহিত রাজসাহীর জমিদারীর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। রামজীবনের পুত্র কালিকাপ্রসাদ রামকৃষ্ণকে দত্তক বা পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবানী অল্প বয়সে বিধবা হন। নাটোর রাজবংশের দেওয়ান বর্ত্তমান দিঘাপাতিয়া রাজবংশের আদি পুরুষ দয়ারামের যত্নে রাজসাহী জমিদারীর যারপরনাই উন্নতি হইয়াছিল। রাণীভবানী দয়ারামের পরামর্শেই চলিতেন। এরূপ শুনা যায় যে, এক সময়ে রাণীভবানীর জমিদারী হইতে ১॥ কোটী টাকার কর আদায় হইত। তাহার মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকা নবাব সরকারে রাজস্ব দেওয়া হইত। অবশিষ্ট ৮০ লক্ষ তিনি নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন।

রাণীভবানীর দানের সীমা পরিসীমা ছিল না। তিনি যে কত লোককে অন্নদান, বস্ত্রদান, ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। সে কালে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, যে ব্রাহ্মণ রাণীভবানীর ব্রহ্মত্তর পান নাই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইত না। রোগীর চিকিৎসার জন্য তিনি কবিরাজ ও হাকিম নিযুক্ত করিতেন। এমন কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গেরও আহারের ব্যবস্থা ছিল। ভবানী হিন্দু বিধবার কঠোর ব্রত পালনে আপনাকে নিযুক্ত রাখিতেন। রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে উঠিয়া জপাদি করিতেন। প্রত্যুষে পূজার জন্য স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া স্নান করিতে যাইতেন। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি পূজা কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। তাহার পর স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পরিবারবর্গের আহারের ব্যবস্থার পর নিজে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। বৈকালে পুরাণ কথা শ্রবণ, বিষয় কর্ম্মের ব্যবস্থা এবং রাত্রিতেও জপাদি করিতেন।

কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানসকল তাঁহার পুণ্য কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কাশীতে তিনি ভবানীশ্বর নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেখানে এক অন্নসত্রেরও ব্যবস্থা করেন। আজিও তথায় অনেকে অন্ন পাইয়া থাকে। কাশীতে আরও অনেক মন্দির নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। ধর্ম্মশালা স্থাপন, পঞ্চক্রোশী পথনির্ম্মাণ প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান করেন। গয়াতেও তাঁহার অনেক কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভবানী শেষজীবনে মুর্শিদাবাদের বড়নগরে থাকিতেন। সেখানেও তাঁহার অনেক কীর্ত্তি আছে। বড়নগরেও তিনি ভবানীশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল মন্দির আজিও দাঁড়াইয়া আছে। ভবানীর প্রতিষ্ঠিত রাজ রাজেশ্বরীর মন্দির আজিও বিদ্যমান আছে। সেখান হইতে অন্ন বিতরণ হয়। বড়নগরে ভবানীর কন্যা তারার স্থাপিত এক গোপাল মূর্ত্তি আছে। বড়নগরে বাঙ্গালা ঘরের অনেক মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নানাপ্রকার মূর্ত্তির ছাঁচের ইষ্টক দিয়া সে সকল মন্দির নির্ম্মিত। বাঙ্গলার স্থপিত বা গৃহ-নির্ম্মাণ বিদ্যার যে একটী নূতন ধারা আছে, এই সকল মন্দিরে তাহা দেখা দিয়া থাকে। বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানেও এই ধারায় মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

রাণী ভবানী বড়নগর ও তাঁহার নিকটস্থ অন্যান্য দেবালয়ের জন্য লক্ষ টাকার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। নাটোর প্রভৃতি স্থানেও তাঁহার অনেক কীর্ত্তি আছে। বাঙ্গালার অনেক স্থানেই তাঁহার পুণ্য কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দান ও পুণ্য কার্য্যে তিনি ৫০ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। রাজসাহীর জমিদারী তাঁহার দত্তকপুত্র রাজা রামকৃষ্ণের হাতে দিয়া তিনি সামান্য মাত্র বৃত্তিতে জীবন যাপন করিতেন। যিনি এককালে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, শেষ জীবনে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে ইংরেজ সরকারের নিকট হাত পাতিতে হইয়াছিল। দানেই তাঁহার সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছিল। সেই বাঙ্গালার অন্নপূর্ণা প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট যে প্রাতঃস্মরণীয়া তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার বিক্রমাদিত্য

তোমরা রাজা বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার নবরত্নের কথা অবশ্যই জান। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও এক বিক্রমাদিত্য ছিলেন। তাঁহার সভাতেও অনেক রত্ন থাকিতেন। কৃষ্ণনগরের রাজা যে কৃষ্ণচন্দ্রের কথা তোমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছ, তাঁহাকে বাঙ্গালার বিক্রমাদিত্য বলা হয়। অন্যদিকে তিনি যাহাই হউন না, বিদ্যার উৎসাহ দানে ও ব্রাহ্মণ রক্ষায় তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভবানন্দ মজুমদারের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা রঘুরামের পুত্র। রঘুরাম রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন সে কথা তোমরা শুনিয়াছ। রঘুরামের ন্যায় কৃষ্ণচন্দ্রও অস্ত্র ধরিতে পারিতেন। তিনি এক বিস্তৃত জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে চৌরাশীটি পরগণা ছিল। উত্তরে, মুর্শিদাবাদ হইতে দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

> "রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
> পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥
> দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
> পূর্ব্ব সীমা ধূল্যাপুর বড় গাঙ্গপার॥"

তাঁহার দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের চেষ্টায় রাজ্যে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র আবার চারি সমাজের অধিপতি ছিলেন।

> "নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
> কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তমতি॥

কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত, ফারসী প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিদ্যায় অনুরাগ থাকায় তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মকার্য্যেও তাঁহার মতি ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয় ও অগ্নিহোত্র নামে দুইটী যজ্ঞ করিয়া বাজপেয়ী ও অগ্নিহোত্রী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। মীরকাশীম তাঁহাকে মুঙ্গের দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখায় তিনি দুর্গোৎসবের সময় উপস্থিত থাকিতে না পারায় তাঁহার বাটীতে দুর্গা পূজা বন্ধ হয়। পরে তিনি তাহার পরিবর্ত্তে জগদ্ধাত্রী পূজার অনুষ্ঠান করেন এবং তদবধি জগদ্ধাত্রীপূজা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় বলিয়া শুনা গিয়া থাকে। অনেক মন্দিরাদিও কৃষ্ণচন্দ্রের ধর্ম্মকার্য্যের পরিচয় দিতেছে। তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যে মতি দেখিয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ কৃষ্ণচন্দ্রকে 'ধর্ম্মচন্দ্র' উপাধি দিয়াছিলেন।

> "দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।
> ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥"

রাজস্ব দিতে না পারায় সময়ে সময়ে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি যে তাঁহার অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃতপণ্ডিত ও বাঙ্গলা কবিদিগকে আদর করিয়া তাঁহাদিগের বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর ন্যায় কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধেও কথা প্রচলিত আছে যে, যে ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর পান নাই তিনি ব্রাহ্মণই নহেন। বাঙ্গালার কবিদিগকে তিনি ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করায় তিনি তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, কালিদাস সিদ্ধান্ত, গদাধর তর্কালঙ্কার প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন। গোপাল ভাঁড়, হাস্যার্ণব প্রভৃতি কৌতুকপ্রিয় লোকও তাঁহার সভায় থাকিয়া

সকলকে আনন্দিত করিয়া তুলিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাদের সকলকেই প্রতিপালন করিতেন। এই সময়ে শ্রীকান্ত, কমলাকান্ত, বলরাম ও শঙ্কর নামে চারিজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আসিতেন। রাজা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। এইরূপ কথিত আছে যে, এই চারিজন পণ্ডিত যেখানে থাকিতেন, সেখানে সরস্বতীও পরাভূত হইতেন।

> "শ্রীকান্ত কমলাকান্ত বলরাম আর।
> শঙ্করের কাছে বাণী নাহি যেন পার॥"

শ্রীকান্তের বিক্রমপুরে, কমলাকান্তের ২৪ পরগণার পুড়ায়, বলরামের হালিসহরে ও শঙ্করের নবদ্বীপে নিবাস ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মানও করিতেন। এইরূপ বিদ্যানুরাগে তিনি বিক্রমাদিত্যের ন্যায়ই হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শিবনিবাস নামক স্থানে কৃষ্ণচন্দ্র অনেক সৌধাদি করিয়া তাহাকে কাশীতুল্য করিয়াছিলেন। কাশীর জ্ঞানবাপীর তিনি সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

> "তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান।
> কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সোপান॥
> বিগ্রহ ব্রহ্মাণ্যদেব মূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
> নিবাস করিবে শিব নিবাস করিয়া॥"

তাঁহার সময়ে কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ নানাবিধ মূর্ত্তিগঠনে, শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ বস্ত্র বয়ণের যারপরনাই উন্নতি করিয়াছিল ; রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহই তাহার প্রধান কারণ। সকল বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরাগ ও উৎসাহ দেখিয়া কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

> "কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥"

ইংরেজদের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষরূপ পরিচয় থাকায় ক্লাইভ তাঁহাকে পাঁচটী কামান উপহার দিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাদশাহের নিকট হইতে 'মহারাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি আনাইয়া তাঁহাকে ভূষিত করেন।

> "ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।
> রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাঁহারি বর্ণনে॥"

[ক্রমশঃ

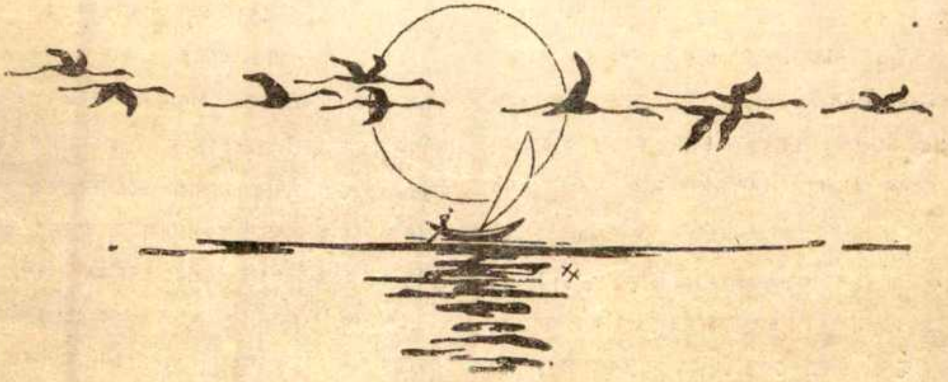

রাষ্ট্রীয় রণাঙ্গন

য়্যানালিষ্ট

ভারত হইতে লণ্ডন, বার্লিন, মস্কো, অথবা টোকিওর দূরত্ব নিতান্ত অল্প অথবা উপেক্ষার নয়, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতা সুদূর দেশগুলির মধ্যে যে নৈকট্য আনয়ন করিয়াছে তাহার ফলে বার্লিন অথবা মস্কো হইতে বহুদূরে থাকিয়াও ভারতবর্ষ আজ ইয়োরোপের কুরুক্ষেত্রের নির্লিপ্ত দর্শক থাকিতে অক্ষম। ১৯৩৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর ইয়োরোপে যে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়, প্রায় পাঁচ মাস পূর্ব্বে এক অন্ধকার রজনীতে তাহার নূতন অঙ্ক সুরু হইয়াছে।

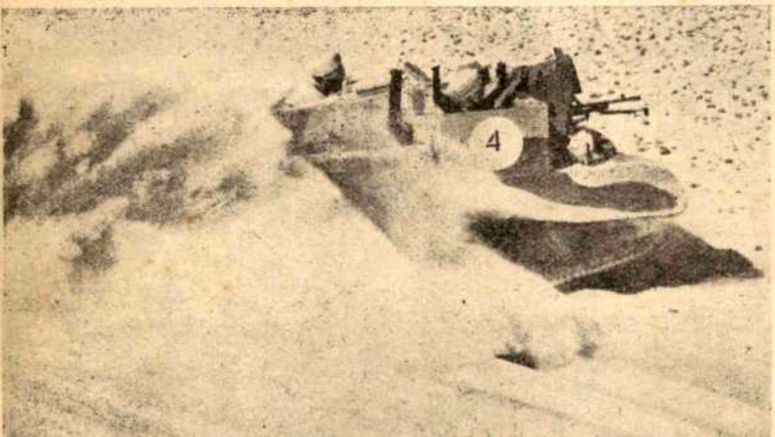

মরুপথে সাঁজোয়া গাড়ী

ইয়োরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে একের পর এক পদানত করিয়া যে নিষ্ঠুর নাৎসী স্বৈরাচার এক স্বপ্রতিষ্ঠিত জাতিকে পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যে বর্ব্বর অভিযান আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে কেবল যুযুধান দেশগুলি নহে সমগ্র বিশ্বই আতঙ্কগ্রস্ত। এই যুদ্ধের সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব এবং একান্ত নিরীহ পরাধীন ভারতবর্ষ পর্যন্ত কতখানি জড়িত তাহা হিসাব করিবার পূর্ব্বে রুশিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগলিক অবস্থান, নাৎসী সমর পদ্ধতি, উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশ প্রণালী ও রুশিয়ার বাধা দানের কৌশল বিশেষভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

লেনিনগ্রাড, মস্কো, রষ্টোভ এবং কার্চ্চ, এই চারিটি স্থান বর্ত্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লেনিনগ্রাডকে জার্ম্মানী ছয় সপ্তাহের উপর অবরোধ করিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও উহা এখনও অধিকার করিতে পারে নাই। লেনিনগ্রাডের ভৌগলিক অবস্থানই ইহার প্রধান কারণ। লেনিনগ্রাডের চারিদিকে প্রধানতঃ জলাভূমি এবং অরণ্য অঞ্চল। এতদ্ব্যতীত বাল্টিক হইতে লেনিনগ্রাডের পথে রহিয়াছে ক্রোনষ্টাড্ দুর্গ। তদুপরি স্থল, বিমান এবং বাল্টিক নৌ-বাহিনীর সহযোগীতা লাভ লেনিনগ্রাডের আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। কিন্তু মস্কোর চারিদিকে সমতল ভূমি। তদুপরি সমগ্র রুশিয়ায় মাকড়সার জালের মত যে রেলপথ পাতা রহিয়াছে সেইগুলি সব আসিয়া মিলিয়াছে মস্কোতে। ফলে শত্রুর পক্ষে মস্কোর দিকে বিভিন্ন পথ ধরিয়া অগ্রসর হওয়া যেমন অধিকতর সহজ, রুশদের পক্ষে প্রতিরোধ করিবার শক্তিকে এখানে সংহত করাও সেইরূপ অধিকতর প্রয়োজন। আর রষ্টোভ শিল্পপ্রধান অঞ্চল এবং কার্চ্চে রুশিয়ার আত্মরক্ষার কোন সুদৃঢ় ব্যবস্থা নাই।

উত্তরে লেনিনগ্রাড হইতে দক্ষিণে রষ্টোভ এবং ক্রিমিয়া পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ রণক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনজন সমর নায়কের অধীনে যুদ্ধ পরিচালিত হইতেছে। লেনিনগ্রাড হইতে মস্কোর উত্তর পশ্চিম পর্য্যন্ত মার্শাল ভরোশিলফের সৈন্য, মস্কোর দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণে জেনারেল জুকোভের বাহিনী, এবং দক্ষিণ রণক্ষেত্রে রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ রণনীতি বিশারদ মার্শাল টিমোসেঙ্কোর (বুদেনীকে অপসৃত করিয়া) সৈন্যদল শত্রু সৈন্যদের বাধা দানে রত। এই তিন অধিনায়কের সহিত স্বীয় শক্তি পরীক্ষার্থে যথাক্রমে মার্শাল ফন্ লীব, মার্শাল ফন্ বোক, এবং মার্শাল রুন্ডষ্টেড স্ব স্ব বাহিনী লইয়া অগ্রসর।

মার্শাল বোকের বাহিনী মধ্য রণক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব পার্শ্বে ওরেল অধিকার করিয়া টুলা, মধ্যাংশ স্মোলেন্স্ক ও ব্রিয়ানস্ক ভেদ করিয়া ভিয়াজমা ও কালুগা, এবং পশ্চিম বাহিনীর একাংশ রাজেভ দখল করিয়া কালিনিন্ পর্য্যন্ত অগ্রসর। মার্শাল ফন্ লীবের বাহিনী লেনিনগ্রাড-ভলোদগা রেল পথের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং দক্ষিণে নাৎসী বাহিনী রষ্টোভ ও কার্চ্চ অধিকারের দাবী করিয়াছে। মস্কো এবং লেনিনগ্রাড উভয় অঞ্চলেই যুদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিলেও জার্ম্মানী এখনও কোনটি দখল করিতে পারে নাই, দক্ষিণ রণক্ষেত্রেও নাৎসী বাহিনী ককেসাসের আকাঙ্খিত অঞ্চলগুলিতে পৌছিতে এখনও সমর্থন হয় নাই।

জার্ম্মানীর সমর পদ্ধতি যাহারা দীর্ঘ দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, হঠাৎ জার্ম্মানী রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া আজ একাধিক রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়া বসিল কেন? 'শ্লিফ্যান প্ল্যান' অনুসরণে বিরত হওয়া, একই সঙ্গে একাধিক রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করাই যে বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয়ের প্রধান কারণ, হিটলার তাহা বিস্মৃত হন নাই। সেই জন্যই আমরা দেখিয়াছি বর্ত্তমান যুদ্ধে হিটলার একটির পর একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বীয় শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হইয়াও তিনি এক সঙ্গে একাধিক রণাঙ্গণে যুদ্ধ বাধাইয়া বসেন নাই। তবে আজ রুশিয়ার ন্যায় প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া নাৎসী সৈন্য বিভিন্ন রণাঙ্গনের সৃষ্টি করিল কেন? ইহার প্রধান কারণ, রুশিয়ার শক্তি সম্বন্ধে হিটলার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন। হিটলারের আশা ছিল শীতের প্রারম্ভেই রুশিয়ার যুদ্ধ শেষ করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু পর পর তিনটি বিদ্যুৎগতি আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর হিটলার স্বীয় ভুল বুঝিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, নাৎসী বাহিনীর লেনিনগ্রাড অভিমুখে অগ্রসর হইবার কালেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া রুশ সৈন্যগণ পশ্চাদবর্ত্তী ঘাঁটিতে শত্রু সৈন্যকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোথাও নূতন বাহিনী অথবা সমরোপকরণ আনীত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ট্যাঙ্ক ও রণসম্ভার অতি শীঘ্র প্রেরণের জন্য মঃ মেইস্কি বৃটেনের নিকট যে করুণ আবেদন জানান তাহাতেই রুশিয়ার আভ্যন্তরীন অবস্থা বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। হিটলার উপলব্ধি করেন, এক সঙ্গে রুশিয়াকে বিভিন্ন কেন্দ্রে আঘাত করিলে উপযুক্ত সৈন্য ও সমরোপকরণের অভাবে তাহাকে বিব্রত করা সম্ভব। এতদ্ব্যতীত দারুণ শীতে যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইবার পূর্ব্বেই রুশিয়ার কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র অধিকার করা প্রয়োজন। ইহাতে যেমন রুশ সৈন্যগণের মধ্যে নৈতিক অবনতি আসা সম্ভব, তেমনই সমগ্র শীতকাল অধিকৃত শিল্পকেন্দ্রে সংগঠনী কার্য্যে ব্যয় করাও বিশেষ লাভের বিষয়। তৈল ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধিশালী ককেসাসের অঞ্চল যে জার্ম্মানীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন এ কথা হিটলার বিশেষরূপেই পরিজ্ঞাত এবং সেই উদ্দেশ্যেই ককেসাসের দ্বারদেশ রষ্টোভ ও প্রবেশ পথ কার্চ্চ দখলে যত্নবান। তদুপরি রষ্টোভ হইতে জার্ম্মান সাঁড়াশী বাহিনীর একটি বাহু যদি অষ্ট্রাখান দখল করিতে পারে তাহা হইলে রুশিয়ার একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র যেমন জার্ম্মানীর অধিকারে আসিবে, ককেসাস অঞ্চলে নাৎসী সৈন্যদের বাধা দানে রত রুশ সৈন্যদের তেমনই মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব হইবে।

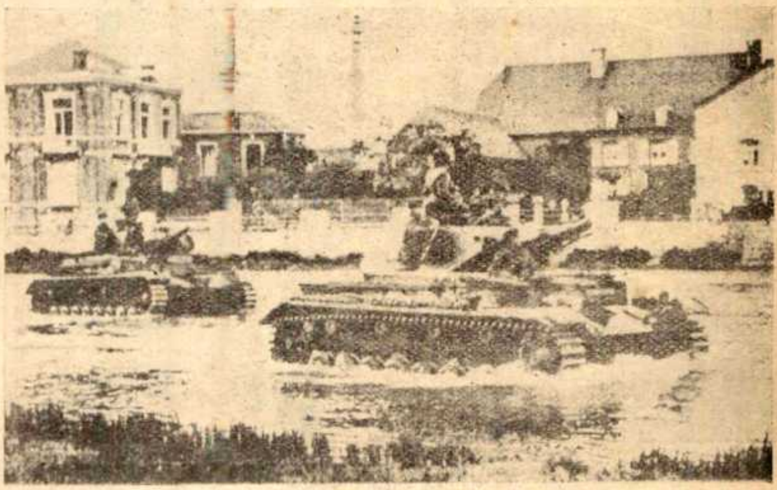
ট্যাঙ্ক বাহিনীর অগভীর নদী অতিক্রম

জার্ম্মানীকে বাধা দানের উদ্দেশ্যে রুশিয়া যখন সর্ব্বস্বপণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন মিত্রশক্তি বৃটেন কেন যে জার্ম্মানীকে অপর কোন কেন্দ্রে আক্রমণ করিতেছে না, এ সম্বন্ধে অনেকেই নানা চিন্তা ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি বৃটেন উত্তর আফ্রিকায় প্রবল আক্রমণ সুরু করিয়াছে। গত ১৮ই নভেম্বর প্রাতে বৃটেন ও তাহার উপনিবেশ সমূহের সম্মিলিত বাহিনী সল্লামের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ সমুদ্রতীর হইতে দক্ষিণে জারাবাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে অভিযান আরম্ভ করে। ৯০ মাইলেরও অধিক দীর্ঘ রণাঙ্গণে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বৃটিশবাহিনী প্রথম দিনেই ৫০ মাইল অগ্রসর হয়। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতার মতে লিবিয়ার এই অভিযানের দ্বারা বৃটেন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই অভিযানে রুশিয়া কতখানি উপকৃত হইবে তাহা এখনও নিঃসন্দেহে বলা চলে না। জার্ম্মানীর ক্ষতির পরিমাণও এইযুদ্ধে প্রচুর হইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। লিবিয়ার এই স্থানগুলি শিল্পকেন্দ্র নয়, মরুভূমি অঞ্চল মাত্র। সুতরাং এই অঞ্চলের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মূল্য সামান্য। মুসোলিনী যখন এই অঞ্চলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলা হইত—মুসোলিনী মরুভূমি কুড়াইতেছেন, Mussolini is collecting deserts! তদুপরি, এই অঞ্চলেই বৃটিশবাহিনীকে পূর্ব্বে আর একবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। লিবিয়ার ন্যায় অঞ্চলে দুইবার সৈন্য ও সমরোপকরণ ক্ষয় উপযুক্ত অনুপাতে লাভজনক হইবে কি না তাহাও সন্দেহ। এতদ্ব্যতীত, আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সময় এখন আর নাই, বিশেষ রুশিয়ার বাহিরে। সম্প্রতি রুশিয়ায় যে প্রচণ্ড শীত পড়িতেছে তাহাতে লেনিন্‌গ্রাড অথবা মস্কো অভিযানের তীব্রতা যথেষ্ট হ্রাস পাইতে বাধ্য, এবং জার্ম্মানী এই সময়ে অন্য দিকে মনঃসংযোগ করিতে একান্ত অক্ষম নয়। বরং আমাদের ধারণা, জার্ম্মানী এখন ককেসাস ও কৃষ্ণসাগরের তীরে অধিক মনোনিবেশ করিবে। তাহা হইলে জেনারেল ওয়াভেল যেমন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না, স্যার ক্যানিংহামের পক্ষেও সেইরূপ আফ্রিকায় অখণ্ড মনোযোগে যুদ্ধ পরিচালন সম্ভবপর হইবে না। তবে, উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব পুনরায় বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এতদ্ব্যতীত, মধ্য প্রাচীর এই অভিযানের দ্বারা বৃটেন যে রুশিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লিপ্ত হইল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পদাতিক বাহিনীর অগ্রগতি

জার্ম্মানীর ককেসাস অভিযানের ফল যেমন সুদূরপ্রসারী, ভারতের পক্ষেও তাহা তেমনই আশঙ্কাজনক। উত্তর রুশিয়া অপেক্ষা ককেসাস অঞ্চলে শীতের তীব্রতা কম। ফলে অত্যধিক শীতে উত্তর রুশিয়ার নাৎসী বাহিনী যখন নিষ্ক্রিয় থাকিবে, হিটলারের পক্ষে তখন ককেসাসের দিকে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ ককেসাসের তৈল ও খনিজপদার্থে সমৃদ্ধ অঞ্চল হস্তগত করিতে পারিলে একদিকে যেমন তাহা রুশিয়ার পক্ষে মারাত্মক আঘাত হইবে, দীর্ঘকাল রণক্ষেত্রে প্রচুর ক্ষতি সহ্য করিবার পর জার্ম্মানীর পক্ষে উহা পুনরায় নূতন করিয়া যুদ্ধ চালাইবার সুবিধা প্রদান করিবে। ককেসাসের দ্বারদেশ রষ্টোভে জার্ম্মানী কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু নাৎসী বাহিনী যদি অষ্ট্রাখান দখল করিতে পারে তাহা হইলে রণনীতির দিক দিয়া

জার্ম্মানী বিশেষ সাফল্য লাভ করিবে। কারণ অষ্ট্রাখান রুশিয়ার একটি শিল্পকেন্দ্র। ইহাকে হস্তগত করিতে পারিলে জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক সুবিধা যথেষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, রুশিয়ার প্রধান সৈন্যদলের সহিত ককেসাসে যুদ্ধরত রুশসেনাদলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা সহজসাধ্য হইবে। তৃতীয়তঃ, জার্ম্মান অগ্রগতির কথা। মধ্যরণাঙ্গণে জার্ম্মানী সমতল প্রান্তরে রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু ককেসাসের পার্ব্বত্য অঞ্চলে অগ্রগতি অত সহজসাধ্য নয়। কৃষ্ণসাগরের তীর দিয়া যে পথ আছে তাহাও অতি সঙ্কীর্ণ এবং দুর্গম। একমাত্র কাস্পিয়ান হ্রদের তীর দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই সঙ্কীর্ণ পথে গমনাগমন সম্ভব। কিন্তু এই পথ ধরিয়া অভিযান পরিচালনার ইচ্ছা থাকিলে প্রথমে অষ্ট্রাখান দখল করা প্রয়োজন। তাহার পর কাস্পিয়ানের রুশ নৌবহরের শক্তিকেও খর্ব্ব করা আবশ্যক। ইহার পর আছে শীত। এদিকে বাটুমের তৈল হস্তগত করিতে হইলে কৃষ্ণসাগরের রুশ বাহিনীর সহিত শক্তি পরীক্ষা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তদুপরি জার্ম্মান রণপদ্ধতি অনুযায়ী সাঁড়াশীর আকারে সৈন্য পরিচালনা করিতে হইলে কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীরেও স্বীয় ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়োজন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে প্রথমে তুরস্কের সহিত একটা বুঝাপড়া করা আবশ্যক। সম্প্রতি বুলগেরিয়ায় প্রচুর সমরোপকরণ ও সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উপেক্ষা করিবার নয়। কিন্তু নাৎসীবাহিনী যদি বাটুম এবং কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে সাফল্য লাভ করে তাহা হইলে ইরাণে প্রবেশ তাহার পক্ষে সহজ হয়। যদি নাৎসীবাহিনীর আর একটী শাখা কাস্পিয়ানের তীর দিয়া বাকু অভিমুখে অগ্রসর হয় তাহা হইলে ইরাণ উত্তর-পূর্ব্ব এবং উত্তর-পশ্চিম উভয় দিক দিয়া আক্রমনের সম্মুখীন হইবে। এই ধরণের বিপদের আশঙ্কা করিয়াই যে বৃটিশ ও সোভিয়েট বাহিনী পূর্ব্ব হইতেই ইরাণে স্বীয় প্রতিষ্ঠা প্রতিপন্ন করিয়া বসিয়া আছে ইহা নিঃসন্দেহ। কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারতের দেশ রক্ষা সমন্বয় সচিব মিঃ উইলিয়ম্‌সের উত্তরে জানা গিয়াছে যে, ভারতের নিকটবর্ত্তী চক্রশক্তি নিয়ন্ত্রিত অথবা অধিকৃত সহর ১৮৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু নাৎসী বিমান আড়াই হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে বোমারু বিমান সাহায্যে বোমা নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম। কাজেই জার্ম্মানী যদি ককেসাসের তৈলখনি অভিমুখে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হয় তাহা হইলে তাহারা ভারতের দ্বারদেশে পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই জেনারেল ওয়াভেলকে সক্রিয় প্রতিরোধে অগ্রসর হইতে হইবে। বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুদ্ধের যুগে শত্রুকে যত দূরে বাধা প্রদান করা যায় ততই সুবিধা। ইহাতে এক পক্ষে যেমন শত্রুকে প্রকৃত লক্ষ্য স্থল হইতে বহুদূরে বাধা-প্রদান করিয়া তাহার শক্তি ক্ষয় করিতে পারা যায়, সুবিধা মত তেমনই খানিকটা পশ্চাৎ হটিতেও পারা যায়; অধিকন্তু, প্রকৃত রণক্ষেত্রের ধ্বংস সাধন হইতে দেশকে রক্ষা করা চলে। বর্ত্তমান যন্ত্র সভ্যতার যুগে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দুই হাজার মাইল দূরে থাকিয়াও ভারতবাসী যুদ্ধের ভয়াবহতা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। শুধু নিষ্প্রদীপ অথবা আলোক নিয়ন্ত্রণ নয়, জীবন ধারণের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও আজ তাহার পক্ষে সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। দরিদ্র ভারতবাসী শান্তির সময়েই অন্নবস্ত্রের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পায় না, এখন তাহা সংগ্রহ করা রীতিমত সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। তদুপরি ভারতকে যুদ্ধের জন্য প্রতিদিন ব্যয় করিতে হইবে পনের লক্ষ টাকা। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ প্রতি

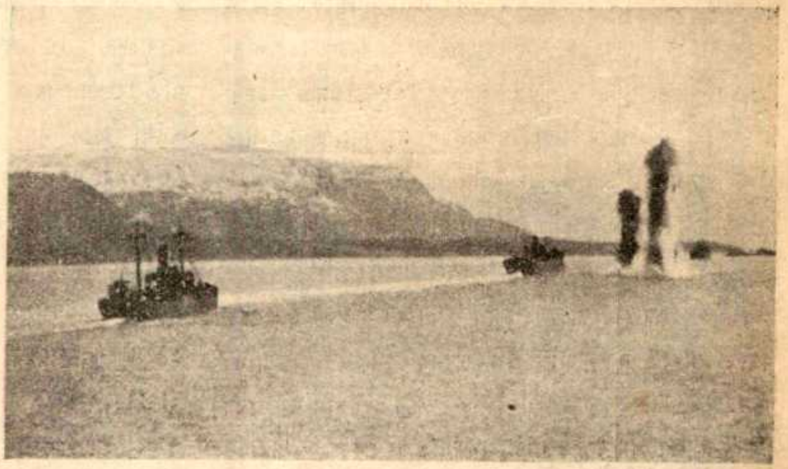

কনভয়ের উপর বোমাবর্ষণ

বৎসরই বেশ মোটা টাকাই ব্যয় করে, যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্বের কাহিনীও আমাদিগকে শোনান হয়, অথচ মজার কথা এই, যখনই দেশ রক্ষাবাহিনী গঠনের জন্য ভারতীয় সৈন্যদল গঠনের দাবী জানান হয় তখনই ভারতবাসী শোনে— ভারতীয়েরা যুদ্ধের জানে কি?

মধ্য ইয়োরোপের যুদ্ধ তীব্রতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর প্রাচীতেও ঝটিকা আসন্ন হইয়া উঠিল।

কর্ণেল নক্সের ভাষায়—সমগ্র সুদূর প্রাচীতে বারুদের এক প্রকাণ্ড পিপা আসন্ন বিস্ফোরণের সম্মুখীন, এই সম্ভাবিত বিস্ফোরণের শব্দ সুদূর য়্যাটলান্টিকের পারেও শোনা যাইবে। কয়েক দিন পূর্ব্বে জাপ মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পূর্ব্ব এশিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন, চীনের ব্যাপারে একটা সুব্যবস্থা এবং পূর্ব্ব এশিয়ায় একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল প্রতিষ্ঠাই নবগঠিত জাপ মন্ত্রীসভার নীতি। কিন্তু যত সহজে নীতিটী প্রচার করা হইয়াছে, কার্য্যে পরিণত করার পথে তদাপেক্ষা বিঘ্ন রহিয়াছে প্রচুর। 'চীনের সহিত সুব্যবস্থা' কথাটা শুনিতে মন্দ নয়; কিন্তু চীনের ব্যাপারে জাপানের পক্ষে ব্যবস্থা 'সু' হইতে পারে কি ভাবে। চীন-জাপানের যুদ্ধ আজ শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নাই, জাপানের মান, অপমানের প্রশ্নও ইহার সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে। চীনের যুদ্ধ সে আজ এক কথায় ত্যাগ করিতে পারে না। সেইজন্য সুব্যবস্থার নিমিত্ত চীন-ব্রহ্ম রাজপথের উপরেও লক্ষ্য নিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন আজ জাপান উপলব্ধি করিয়াছে। জাপান জানে, বর্ত্তমানে রুশিয়ার পক্ষে চীনকে সাহায্য প্রদান করা সম্ভব নয়, বৃটেন এবং আমেরিকাই তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু এই সাহায্য প্রেরণের পথ ঐ চীন-ব্রহ্ম রাজপথের উপর দিয়া। সুতরাং ঐ পথটি বন্ধ অথবা নষ্ট করিতে পারিলেই বাহির হইতে সাহায্যে বঞ্চিত চীনকে কঠোর আঘাত প্রদান তাহার পক্ষে সহজতর হইবে। জাপানের এই অভিসন্ধিতে চীনের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হইবার কারণ আছে বটে, তবে বৃটিশ এবং মার্কিন সরকারও জাপানের এই দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার মূলে বাধা প্রদান করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। কারণ, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র জানে যে, জাপানকে অনন্যমনা হইয়া অপর কোন অভিযানে অবতীর্ণ হইবার পথে বাধা প্রদান করিতে হইলে চীনের সংগ্রামে তাহাকে লিপ্ত করিয়া রাখা প্রয়োজন। চীন-জাপান যুদ্ধের স্থায়িত্বের উপর বৃটিশ ও মার্কিন স্বার্থ আজ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল।

এদিকে জাপান ও ইয়োরোপের যুদ্ধ এক বিশেষ অবস্থায় না আসা পর্য্যন্ত যুদ্ধে নামিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। জাপানের দ্বিতীয় নীতি কার্য্যকরী করিতে হইলে বৃটিশ ও মার্কিন স্বার্থের সহিত যে তাহার সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য ইহা জাপান জানে। সেই জন্যই জাপ মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন, মূল নীতির টীকা ও বিশ্লেষণ এবং বারংবার সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উল্লেখ আমাদের নিকট অপরিচিত নয়। মধ্য ইউরোপের যুদ্ধের গতি বিশেষ স্পষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত জাপান কাহাকেও ঘাটাইতে ভরসা রাখে না। মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে সে প্রচুর সৈন্য, ট্যাঙ্ক এবং রণসম্ভার পাঠাইয়াছে, ইন্দো-চীনের সহিত চুক্তি অনুযায়ী ৪৫ হাজার সৈন্য তথায় রাখার পরেও সেখানে আরও সৈন্য প্রেরিত হইতেছে, ব্লাডিভোষ্টক পথে রুশিয়াকে সাহায্য প্রেরণ চলিবে না বলিয়া আমেরিকাকে সে হুমকী প্রদান করিয়াছে, অথচ মার্কিনের সহিত আলোচনা তাহার আজও শেষ হইল না। কয়েক দিন পূর্ব্বে মিঃ কুরুসুকে বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু সংবাদে প্রকাশ কর্ণেল নক্সের সহিত আলোচনায় আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি, বিশেষ সুদূর প্রাচী সম্বন্ধে, যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন মীমাংসায় আসা সম্ভবপর হয় নাই। মার্কিন শক্তিকে নিরপেক্ষ রাখিতে পারিলে সাইবেরিয়ার দিকে সে মনোযোগ প্রদান করিতে পারে। মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে তেত্রিশ ডিভিসন সৈন্য পাঠাইয়া যুক্তরাষ্ট্রকে সে বুঝাইতে চাহে যে, প্রাচ্য ব্যাপারে আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকিলে এবং জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখিলে প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিনস্বার্থে সে আঘাত দিতে অনিচ্ছুক। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কূটনৈতিক চালও চালিয়াছে। মিঃ কুরুসু যে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসিয়া আলোচনা চালাইতেছেন, ঠিক সেই সময়েই জাপ ডায়েট মন্ত্রীদের বক্তৃতায় আমেরিকার বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করা হইতেছে। এ দিকে থাই-ইন্দোচীন সীমান্তে একদল সৈন্য সীমান্ত

লঙ্ঘন করিয়া থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করায় একটা ক্ষুদ্র সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া থাইল্যাণ্ডের 'শ্রীকরুণ' পত্রিকায় প্রকাশ। এই সংবাদে অনেকেই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষ রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ উইলিয়মসের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, কলিকাতা হইতে জাপান অধিকৃত অথবা নিয়ন্ত্রিত নিকটতম বিমান ঘাটি ৯৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। তাহার পর জাপান অনেক দিন ধরিয়াই স্নায়ু যুদ্ধ চালাইয়া আসিয়াছে, কাজেই যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাকে নামিয়া পড়িতে দেখিবার আশঙ্কা অনেকেই করিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তাহার প্রকৃত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে এখনও কিছুদিন দেরী আছে। থাই-ইন্দোচীন সঙ্ঘর্ষ লইয়া বিশেষ চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। ইহা জাপানের একটা কূটনৈতিক চাল মাত্র। এই সংঘর্ষের সংবাদে বৃটেন এবং আমেরিকা কি মনোভাব অবলম্বন করে, ভারত এবং ব্রহ্ম সরকার এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন কি না, এবং যে কোন মুহূর্ত্তে বৃটিশ ও মার্কিন সহযোগীরা সুদূর প্রাচীতে সম্ভব কি না তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই জাপানের এই কূটনৈতিক চাল। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এতদিন ধরিয়া স্নায়ু যুদ্ধ চালাইবার ও সৈন্যদের মহড়া দিবার পর জাপান যদি স্বীয় নীতি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে তাহার পক্ষে যুদ্ধ জড়াইয়া পড়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। †

---

† লেখকের এই প্রবন্ধ রচিত হওয়ার পর যে জাপান ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

—সম্পাদক, বঙ্গশ্রী।

ঋষি বঙ্কিম

শ্রীনকুলেশ্বর পাল বি, এ

ওগো ঋষি! কোন পুণ্যক্ষণে জনম লভিয়াছিলে
সুজলা সুফলা বঙ্গ-জননীর কোলে।
কোন্ শুভ-দিনে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি
কণ্ঠে তব দিয়েছিল বাণী;
সমুদ্র মন্থন করি—কি সুধা আনিয়াছিলে
মন্ত্র সঞ্জীবনী।
অমর বারতা বিশ্বে এনেদিল সে কোন স্পন্দন;
সঞ্চারিয়া প্রাণহীন দেহে ওগো প্রাণের স্ফুরণ।
বিশ্বের সকল হিয়া একপ্রাণ একমন দিয়া
উঠিল নাচিয়া;
অত্যাচার—অবিচার অন্যায়ের কুঠার আঘাত
চরণে দলিয়া।
মোহাচ্ছন্ন সন্তানেরে দীনা-হীনা মাতৃমূর্ত্তি
দেখালে সবারে;
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী মাতা অসুর-দলনী
শক্তিহীনা আজি অত্যাচারে।
সন্তান চেনে না মা'কে আজি তাই এ দুর্গতি
দুর্গতিহবার;
সন্তান জানিলে পুনঃ—জাগিবে জননী
নিধন করিবে পুনঃ অসুর ধরার।
ঋষিকবি! কোন্ মন্ত্র বলে
জ্বেলেছিলে হোমানল শিখা;
বিশকোটী সন্তানের ললাটে পরালে
জয় দৃপ্ত-টীকা।
সন্তানে চেনালে মাকে, ত্যাগের অনল শিখা
জ্বালিয়ে সবার অন্তর মাঝে,
বিশ্বের সে শুভ দিনে বোধন করিয়া মাকে
সন্তান জাগিল শক্তি তেজে।
সমুদ্র মন্থন করি সুধাভাণ্ড এ বিশ্বে আনিলে
অমৃতের ঋষি
আজো তাই গাহে জয়গান বিশ্বের দুয়ারে
হের দিশি দিশি।

দীনবন্ধু ও নীলদর্পণ

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম বাঙ্গলা সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। তাঁহার প্রণীত "নীলদর্পণ" নাটক জগদ্বিখ্যাত। এই নাটকখানির প্রথম মুদ্রণ ও প্রকাশ এবং অভিনয়ও ঢাকা সহরেই সকলের আগে হইয়াছিল। "নীলদর্পণ" নাটক সম্পর্কে "Indian Stage" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ-প্রণেতা ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন :—

"The performance of the 'Nildarpaṇa Nātak' was a memorable incident in the history and development of the Bengali stage. The honour of frequently staging the drama and thereby exposing to the public high handedness of the oppressive Indigo planters belonged, however, to the "East Bengal Stage", 'Pūrvavanga-Rangabhūmi' of Dacca, which greatly helped the cause of national agitation that shook then the province of Bengal from one end to the other."*

"নীলদর্পণ" নাটকের প্রথম সংস্করণ ১৭৮২ শকে (ইং ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ) ২রা আশ্বিন তারিখ, শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক বাঙ্গলা বাজার, ঢাকা প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল হেমেন্দ্র বাবু এইরূপ লিখিয়াছেন।

"নীলদর্পণ" অভিনয় প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন :—

"Now Dacca, the place of birth of this famous drama, gave quite a befitting representation of this epoch-making play, and its modes and sentiments at once took the country by storm. The 'Harkarā' speaks both about the drama and its performance :

"Our native friends entertain themselves with occasional theatrical performances and the 'Nildarpaṇa' was acted on one of these occasions."

"নীলদর্পণ"-এর প্রথম সংস্করণ ঢাকা প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া হেমেন্দ্রবাবু উল্লেখ করিয়াছেন।* কিন্তু "ঢাকাপ্রকাশ"-এর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী বি-এ মহাশয় "ঢাকাপ্রকাশ"-এর জীবন-কথা লিখিতে যাইয়া লিখিয়াছেন : –

"ঢাকা জেলার সদর উপবিভাগান্তর্গত তেঁতুলঝোড়া গ্রামবাসী স্বনামখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, ধামরাই গ্রামবাসী বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার ও পরবর্ত্তী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক এবং বিক্রমপুরান্তর্গত রাঢ়িখাল গ্রামবাসী বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশের পিতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ও যত্নের ফলেই, বিগত ১২৬৬ সনে ইং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, তৎকালে প্রচলিত হস্তচালিত একটি মুদ্রাযন্ত্র (চিলা প্রেস) ও অক্ষরাদি আনীত হইয়া "বাঙ্গালা-যন্ত্র" নামে ঢাকা নগরীর বাবুরবাজারস্থিত পুলের নিকটবর্ত্তী এক দোতলা বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম সাময়িক পত্র "মাসিক মনোরঞ্জিকা" প্রকাশিত হইতে থাকে। "সদ্ভাবশতক"-এর স্বনামধন্য গ্রন্থকার সুকবি ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার "মনোরঞ্জিকা"র সম্পাদক ৺মহেশচন্দ্র গঙ্গাপাধ্যায় প্রকাশক, এবং "নির্ব্বাসিতা-সীতা" কাব্যের প্রণেতা কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্র মুদ্রাকর ছিলেন। ইহার অল্পকাল পর হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় "কবিতাকুসুমাবলী" নামে একখানি পদ্য পত্রিকা প্রচার করেন। মজুমদার ও মিত্র উভয় কবির কবিতাই ইহাতে প্রকাশিত হইত। কিন্তু এই উভয় পত্রিকাই বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। ১২৬৭ সনের শেষার্দ্ধে নীলকরের অত্যাচার সম্বন্ধে পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে মতভেদ হওয়াতে "মাসিকমনোরঞ্জিকা" উঠিয়া

---

* The Indian Stage vol. II. pp. 91-94.

* The first edition of the book shows that the date of publication was 2nd Āśvin. 1782 (Śaka Era), printed by Ramchandra Bhowmik at Bangla Bazar Dacca Press. Indian Stage vol. II. pp. 92.

যায় এবং তাহার কিছুদিন পরই "কবিতাকুসুমাবলী"র প্রচারও বন্ধ হয়।

বাঙ্গালা-যন্ত্রের চিলা প্রেসটিই ঢাকায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র, এবং এই বাঙ্গালাযন্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ "নীলদর্পণ" নাটক প্রথম মুদ্রিত হয়। "নীলদর্পণ"-এর স্বনামখ্যাত গ্রন্থকার ৺দীনবন্ধু মিত্র তখন পোষ্ট অফিস বিভাগের কর্ম্মোপলক্ষে ঢাকাতেই ছিলেন। বাঙ্গালা যন্ত্রের সেই চিলা প্রেসটি আজও "ঢাকাপ্রকাশ" আফিসে ঢাকার গৌরব চিহ্ন স্বরূপ সুরক্ষিত আছে।"

স্বর্গত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের জীবন-চরিতে লিখিত আছে যে, "ব্রজসুন্দর ধর্ম্ম, শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন এবং রামরাম বসু, ভগবানচন্দ্র বসু (ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসুর পিতা) প্রভৃতির সহায়তায় ঢাকায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন। কোন্ সনে ইহা স্থাপিত হয় তাহা বলা যায় না, তবে সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বেই ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, আরমাণিটোলার বাড়ীতে বহুকাল এই যন্ত্রটির কার্য্যালয় ছিল। এই যন্ত্র হইতেই "ঢাকাপ্রকাশ" নামে প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেকালে "ঢাকাপ্রকাশ" পত্রিকা ঢাকায় এক নবযুগের সৃষ্টি করে।"*

এই নব প্রতিষ্ঠাপিত যন্ত্রের নাম ছিল "বাঙ্গালা যন্ত্র।" কাজেই ঢাকাপ্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল অর্থে ঢাকার কোনও মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল এই অর্থ কিনা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি 'নলীদর্পণের' প্রথম সংস্করণের বই দেখি নাই। কাজেই এসম্বন্ধে ঠিক্ কোন কথা বলিতে পারি না। তবে 'ঢাকা প্রকাশ' সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'নীল দর্শন' এবং তদ্‌কথিত মোকদ্দমা শীর্ষক প্রবন্ধেও লিখিত আছে, "কিয়ৎকাল অতীত হইল এখানকার বাঙ্গালা-যন্ত্রে নীল-দর্পণ নামক যে একখানি নাটক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ।"

'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার প্রথম ভাগ, ২২ সংখ্যা ২৫শে শ্রাবণ শুক্রবার ১২৬৮ সাল, ইং ৮ই আগষ্ট ১৮৬১ সালে প্রকাশিত 'নীল-দর্পণ এবং এতদ্‌কথিত মোকদ্দমা শীর্ষক প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। এই প্রবন্ধে 'নীল-দর্পণ' সম্বন্ধে সমালোচনাও আছে।

"নীল-দর্পণ এবং তদ্‌কথিত মোকদ্দমা" দেশের আচার ব্যবহার এবং প্রপীড়িত প্রজাগণের অবস্থা শোধন, স্বেচ্ছাচারী রাজার এবং অন্যান্য অত্যাচারীদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ প্রভৃতি নাটক সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নাটক প্রণেতা মাত্রেই ঐ মহান উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া নাটক প্রনয়ণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কবিত্বশক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা রাজ্য মধ্যে যখন যে কোন কু-রীতি, অন্যায়াচরণ দেখিয়াছেন, তাহাই সুললিত নাটক ছন্দে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে যত্ন পাইয়াছেন। প্রকাশ, রঙ্গভূম্যাদিতে ঐ সকল নাটকের অভিনয় হইলে লোকে নাটক বর্ণিত বিষয়টির অনিষ্টকারিত্ব সুন্দর মত অবগত হইয়া তন্নিবারণে যত্নবান হইয়াছে। তাঁহাদিগের তাদৃশ যত্নবত্তা পরিণামে রাজ্যের গরীয়সী মঙ্গল বিধায়িনী হইয়া উঠিয়াছে। এস্থলে এবম্বিধ নাটক প্রণেতাদিগকে রাজ্যের পরম হিতেচ্ছু অদ্বিতীয় বান্ধব বলিয়া নির্দ্দেশ করা বিশুদ্ধ যুক্তির নিতান্ত অনুমোদিত সন্দেহ নাই।"

"আমাদিগের দেশের সংস্কৃত নাটক কর্ত্তারা নাটক প্রণয়ণের পূর্ব্বোল্লিখিত দেশহিতকর উদ্দেশ্যের প্রতি বড় দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন না। স্ব স্ব অলৌকিক কবিত্বচ্ছটা বিভাসিত করিয়া জগৎ মুগ্ধ করাই তাঁহাদিগের নাটক প্রণয়ণের লক্ষ্য ছিল। দেশের আচার ব্যবহার প্রভৃতি সংশোধনে তাঁহারা তত সাভিনিবেশ ছিলেন না। তাঁহাদিগের প্রণীত সরস আদিরসাত্মক নাটক নাটিকাই তাহার প্রমাণ স্থল। কিন্তু এদেশের বর্ত্তমান সময়ের নাটক কর্ত্তাদিগের কোন কোন ব্যক্তিকে ইংলণ্ডীয় প্রাচীন নাটক প্রণেতাদিগের অনুসরণ করিতে দেখা যায়। যদ্যপি আধুনিক এই সকল নাটক প্রণেতাদিগের শক্তি অতি যৎসামান্য, কিন্তু উদ্দেশ্যের মহত্ব নিবন্ধন ইঁহারা অবশ্যই ভূরি ধন্যবাদের যোগ্য সন্দেহ নাই।"

"কিয়ৎকাল অতীত হইল এখানকার বাঙ্গালা যন্ত্রে নীল-দর্পণ নামক যে একখান নাটক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও উদ্দেশ্য অতি মহৎ। উক্ত নাটকে বিশেষ কোন রচনা চাতুর্য্য অথবা চমৎকারিত্ব কিছুই প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু নাটক

---

*স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র

কথিত বিষয়টি সম্পূর্ণ যথাযথরূপ বর্ণিত হইয়াছে। নীল সংক্রান্ত অত্যাচার বর্ণন করাই নাটক কর্ত্তার উদ্দেশ্য, তাহাতে তিনি সিদ্ধকামও হইয়াছেন।" এদেশীয় প্রজাগণ নীলকর কর্ত্তৃক কি প্রকার প্রপীড়িত এবং বিপদাপন্ন হইয়া থাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকশূন্য স্বার্থপর নীলকরেরা প্রজাগণের প্রতি কত প্রকার অত্যাচার করে, নীল সম্বন্ধে প্রজাগণের অন্তঃকরণে অধুনা কিরূপ ভাবোদয় হইয়াছে, নীল-দর্পণ পাঠে এই সকল বিষয়ের অবগতি হইতে বড় অবশেষ থাকে না। এ অংশে নীলদর্পণের নামের অন্বর্থতা সম্পাদন হইয়াছে। প্রকৃত পরিষ্কৃত দর্পণে লোকে যে প্রকার আকারগত দোষগুণ সবিশেষ অবলোকন করিতে পারে, পাঠকেরা নীলদর্পণ পাঠেও সেইরূপ নীলপ্রধান প্রদেশাদির অবস্থাগত উৎকর্ষাপকর্ষ প্রত্যক্ষ করিতে অনায়াসে সমর্থ হইতে পারেন।"

প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন, তৎকালীন "ঢাকা প্রকাশ" সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

আমরা দেখিতে পাইলাম যে, "নীলদর্পণ" যখন প্রথম মুদ্রিত হয় তখন উহা "বাঙ্গালা যন্ত্রে" মুদ্রিত হইয়াছিল। 'ঢাকা প্রেস' নাম কোথাও নাই।

৪ঠা আশ্বিন ১২৬৮; ইংরাজী ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের "ঢাকা প্রকাশে" নিম্নলিখিত কয়েকটি সংবাদ "নীল দর্পণ" সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নীল দর্পণ

সোমপ্রকাশ সম্পাদক লিখেন, "মার্সমান সাহেব নীল দর্পণের বিষয় লিখিয়াছেন, যদিও ইহার (নীল দর্পণের) অনুবাদে দোষ আছে, কিন্তু ইহা দেখিয়া পুস্তকলেখকের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহার বিপক্ষে যাহা বলা হইয়াছে, আমরা তাহার কোন উপযুক্ত কারণ দেখিতেছি না। লঙ সাহেব আপনার ভূমিকার নিমিত্ত দায়ী বটেন, কিন্তু তন্মধ্যে অন্যায় করা হয় নাই। এতদ্বারা নীল দর্পণের বিষয় ইংলণ্ডের লোকের যেরূপ অভিপ্রায় তাহা জানা যাইতেছে।"

উক্ত সম্পাদক লিখেন :—টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক বলেন, বোম্বাইর "সমাচার দর্পণ" সম্পাদক তথায় নীলদর্পণ অভিনয়ের সমুদয় উদ্যোগ করিয়াছেন। তজ্জন্য উক্ত টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক ও স্বয়ং নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ আদ্যোপান্ত প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।" উত্তম সঙ্কল্প।

সজ্জন-রঞ্জন পাঠে অবগতি হইল, বোম্বাইর সমাচার দর্পণ সম্পাদক "নীল দর্পণ" নাটক গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বোম্বাইতেও কোন ওবেলসের ভয় নাই।

এক সময়ে "নীলদর্পণ" নাটক শুধু বাঙ্গলাদেশে নয় বাঙ্গালার বাহিরেও যে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এই বিভিন্ন সংবাদ পত্রের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। আমার দীনবন্ধুর "নীল দর্পণ" ও অন্যান্য নাটক সম্বন্ধে সেকালের সংবাদ পত্রের মতামত সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

নীলদর্পণ নাটক "বাঙ্গালা যন্ত্রে"ই যে মুদ্রিত হয়, তাহা পুস্তকের প্রথম সংস্করণেই উল্লিখিত আছে, যথা, ঢাকা শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত, শকাব্দা ১৭৮২।২রা আশ্বিন।" অতএব এই বিষয়ে কোন গোলমাল নাই।

"ইণ্ডিয়ান ষ্টেজে" ঢাকা প্রেস বলিয়া নাই, ঢাকা স্থিত বাঙ্গলা বাজার প্রেস বলিয়াই আছে। লিখিত আছে—"The first edition of the book, shows that the date of publication was 2nd Aswin 1782 Saka Era, Printed by Ram Chandra Bhowmic at Banglabazar, Dacca. প্রেসটির নাম "বাঙ্গালা বাজার প্রেস্" নয় "বাঙ্গালা প্রেস্"। ইণ্ডিয়ান ষ্টেজে এই ত্রুটীটী সংশোধিত হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার নিশ্চয়ই দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা করিবেন। বাঙ্গালা প্রেস্ বাস্তবিকই বাঙ্গালা বাজারে অবস্থিত ছিল না।

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় নীলদর্পণ কোন্ প্রেসে মুদ্রিত হয়, এই সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। "নীল দর্পণ" নাটক যে ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, আর এই জন্য আমাদের অধিক দূর যাইবারও প্রয়োজন নাই। প্রথম সংস্করণের নীলদর্পণের প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে "ঢাকা শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত; শকাব্দা ১৭৮২।২ আশ্বিন।"

ইণ্ডিয়ান ষ্টেজের গ্রন্থকার তারিখ এবং মুদ্রাযন্ত্রের নাম প্রথম সংস্করণের এই মুখপৃষ্ঠায় লিখিত সন্ধান হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।* তিনি লিখিয়াছেন, The first edition of the Book shows that the date of publication was 2nd Aswani 1782 Saka Era, printed by Ram Chandra Bhowmic at Banglabazar, Dacca Press.

উক্ত গ্রন্থকার নীলদর্পন ঢাকা প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়াই লিখিয়াছেন। তবে প্রেসটীর নাম বাঙ্গালা প্রেস, বাঙ্গালা বাজার প্রেস নয়। বাঙ্গালা বাজারে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয় গ্রন্থকার মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেসটী বাঙ্গালা বাজারে ছিল না। তাই ইণ্ডিয়ান ষ্টেজের "ঢাকা, বাঙ্গালা প্রেসের" স্থলে "ঢাকা বাঙ্গালা বাজার প্রেস" লিখায় নিশ্চয়ই ভুল হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম গ্রন্থকার অন্য সংস্করণে এই ত্রুটী সংশোধন করিবেন এবং এই ভুল প্রদর্শনের জন্য যোগেন্দ্রবাবুর নিকট তিনি কৃতজ্ঞ।

সম্পাদক, বঙ্গশ্রী

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একখানি উপন্যাস ধারাবাহিক ক্রমে বাহির হইবে।

সম্পাদক, বঙ্গশ্রী

[redacted]

শ্রীমতিলাল দাশ

২৪শে আগষ্ট, সোমবার। গ্রিগুলের ওখানে মুনসেনের থেয়ার-ফিল্ডারের এবং হামবুর্গের হেলেনক্রিয়ার চিঠি পাইলাম। ওখান হইতে গ্রেস্ ইনে চলিলাম। তাহারা বিশেষ সুবিধা দিবার ভরসা দিল না। ওখান হইতে হাঁটিয়া ঘোরের ওখানে চলিলাম। সেখান হইতে পোলকের ওখানে গেলাম। তাহার আফিস অল্ডউইনের নিকট। পোলক আলাপী, তিনি তাহাদের আফিসে এবং প্রিভিকাউন্সিলে কাজকর্ম যাহা হয় তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিবেন বলিলেন। বলিলাম, ব্যারিষ্টারী পড়িব আপনি অল্প তন্নায় একজন ব্যারিষ্টার খুঁজিয়া দিন। পোলক হাসিলেন বলিলেন, "না সেটা ঠিক হবে না। ওদের যে নির্দ্ধারিত ফি, তাহার কাম দিলে যে অসাধুতা হবে।"

সাধুতার ও অসাধুতার পরিমাপ এত সহজ নয়। সে নিয়া তর্ক করিলাম না। আজ আর্য্যভবন ত্যাগ করিয়া পুনরায় ৪৮নং বেলসাইজ স্কোয়ারে আসিলাম। ফরাসী মণিষী জুলস ব্লকের একখানি চিঠি পাইলাম। ফরাসীরা ইংরাজী জানিলেও ইংরাজীতে চিঠি লেখে না, তাই তাহার ফরাসী চিঠি পড়িবার জন্য মিঃ কটলের শরণাপন্ন হইলাম। ভদ্রলোক যে সামান্য বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলেন না। সামান্যভাবে মর্ম্মানুবাদ বুঝাইয়া দিলেন।

ব্যারিষ্টারী পড়িব কি না তাহা লইয়া উতলা হইয়া উঠিয়াছি। বহু অর্থ ধ্বংস করিয়া এবং দুই বৎসর কাটাইয়া ডিগ্রি লইবার দিকে মন সরিতেছে না। আবার কেবল তীর্থ ভ্রমণের মত বিদেশ দেখিয়া ফিরিলেও আত্মীয় স্বজন সুখী হইবে না, এই দোটানায় পড়িয়া মানসিক অশান্তি ভোগ করিয়া চলিয়াছি।

২৫শে আগষ্ট, মঙ্গলবার। গ্রিগুলের ওখানে গৌড়ীয় মঠের সচ্চিদানন্দের চিঠি পাইলাম। আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে চাহিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করিবার সুবিধা হইবে না। এখান হইতে নিউংটন সেসান্‌স কোর্টে গেলাম। এদের ব্যবহার খুব ভাল লাগিল। মার্লবরো ষ্ট্রীটে টাইরলের যে মোকদ্দমা দেখিয়াছিলাম, আজ তাহার বিচার হইল। সাজা হইল, সত্যই শাস্তি হইবার মোকদ্দমা।

অন্য একটি মোকদ্দমাতে আসামীর বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ ছিল, চুরি করা এবং চোরাই মাল রাখিবার। চুরির যথোপযুক্ত প্রমাণ ছিল না, কাজেই জুরীরা সে অভিযোগে খালাস দেওয়া ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু চোরাই মাল রাখিবার অপরাধে তাহার দণ্ড হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু চুরি সন্দেহের সুযোগ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে মুক্তি দিল।

আমি একজন জাষ্টিস অব দি পিসের সঙ্গে জজের পাশেই বসিয়াছিলাম। জাষ্টিস অব দি পিস্ মহাশয়ের নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি বলিলেন, "জুরীদের নিকট সুবিচার পাওয়ার সম্ভাবনা কম, ওরা সহসা শাস্তি দিতে চায় না।" অনেকের মতে অবশ্য জুরীর বিচার বৃটিশ বিচার ব্যবস্থায় জুরীপ্রথার মূল্য অনেক। জুরীর বিচারে অনেক ভুল হয়, কিন্তু তথাপি সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে শাস্তির ব্যবস্থা মোটের উপর ভালই বলিতে হইবে। দণ্ড সমাজ-রক্ষণের যন্ত্র, সেই সামাজিক নিরাপত্তার পরিচালনে সাধারণ বুদ্ধির উপর আশ্রয় বাঞ্ছনীয়।

২৬শে আগষ্ট, বুধবার। আজ পুনরায় ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট দেখিলাম। বহু বিস্তৃত বৃটিশ সাম্রাজ্যের শিল্পকলার আভাস পাইলাম। এখান হইতে সূচী-শিল্পের রাজকীয় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলাম। বিশেষ কিছু নয়, তবে পদ্ধতি সুন্দর মনে হইল। তারপর রেডিও অলিম্পিয়ায় গেলাম। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যৎসামান্য, তাই বিশেষ ভাল লাগিল না। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পসৃষ্টির উদ্ভব ও পরিণতির একটা ধারণা করা যায়। ৬ পেনি দিয়া আমার নিজের রচিত একটি কবিতা রেকর্ড করাইয়া লইলাম। একখানি ছোট টিনের পাতে আমার স্বর অঙ্কিত হইল। ইহা গ্রামোফোনে চড়াইলে বেশ সুন্দর ভাবে বাজিবে।

কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাব প্রবাসীর হৃদয় দেশের নীড়ে রহিয়াছে, সুদূর হইতে তাই সে স্বজনদের কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া শুভসম্ভাষণ জানাইতেছে।

টেলিভিসনের একটী প্রদর্শনী ছিল। কেমন করিয়া দর্শকের সম্মুখে মানুষের ছবি পড়িবে তাহাই দেখাইতেছিল। যুরোপের এই সদাজাগ্রত প্রচেষ্টাই তাহার মহত্ত্বের মূল। বিধাতার দানকে স্বীকার করিয়া ভক্তিগদ্‌গদ্‌চিত্তে শ্রদ্ধার হোম করিবার আকাঙ্খা তাহার নয়। সে খোদার উপর খোদকারী করিতে চায়। বিশ্বামিত্রের মত সে পৃথিবীকে নূতন করিয়া শ্রী ও সুষমা-মণ্ডিত করিতে চায়।

Exactly true

এখানে রেডিও থিয়েটারের আয়োজন ছিল, কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহা ছাড়া সময় অতিক্রান্ত হইলে বাসায় ডিনার মিলিবে না, তাই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিলাম। বাড়ীর চিঠি পাইলাম, বাড়ীর সকলে ব্যারিষ্টারী পড়িতে নিষেধ জানাইয়াছেন।

২৭শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার। সকালে জৈনের ওখানে গেলাম। সে প্রত্যহ উপাসনা করে, তাহার জন্য অনেক দেরী হইল। পথে অনেক ঘুরিয়া লণ্ডন মিউজিয়ামে আসিলাম। রোমান আমলের নৌকার ভগ্নাবশেষ, লণ্ডনের বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডের আলোকিত ছবি ও সেকালের বন্দীশালার সত্যকার ছবি, সেকালের রাজরাজড়ার ছবি বেশ চমৎকার লাগিল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া ভারতীয় রেঁস্তরা কোহিনুরে লাঞ্চ খাইলাম। ২½ শিলিং লাগিল, দাম অত্যন্ত বেশী মনে হইল। তবে রেঁস্তরা পিকাডেলী অঞ্চলে ভারত প্রত্যাগত ইংরেজেরা আসেন। এখান হইতে Crystal Palace দেখিতে চলিলাম। তখন একটি প্রদর্শনী চলিতেছিল। সার জোসেফ প্যাক্সটা ইহার পরিকল্পনা করেন। ইহার হলঘরটি ১৬০০ ফুট লম্বা। প্রদর্শনীর আয়োজন হৃদয়ে রেখাপাত করিবার মত নয়। উত্তরে একটী গম্বুজ আছে, তাহাতে সেকালের একটী আরোহ আছে। ৬ পেনি দিয়া তাহাই চড়িয়া গম্বুজশীর্ষে গেলাম। ইহার উপর দাঁড়াইলে ৮টি কাউন্টির দৃশ্য দেখা যায়।

সন্ধ্যার পর বাজী পোড়ানো হইল। নানারকমের নানাবিধ বাজী। হাউই বাজীর নানাপ্রকার রং ও ছবির নৈপুণ্য দেখাইল। চরকী ও তুবড়ী বহুবিধ ছিল। বাজী দিয়া আবিসিনিয়ার যুদ্ধ দেখাইল। আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিল একটী অ্যাম্বুলান্স মোটর গাড়ী ও পুলিশম্যানের ছবি। মনে হয় যেন সত্যকার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। নির্জ্জন পথ দিয়া ইলেক্‌ট্রিক রেল ষ্টেসনে ফিরিলাম। তাহারপর অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিলাম। জৈনের মধ্যে শিশুসুলভ সারল্য আছে. সে সারাপথ আনন্দের কলধ্বনি করিয়া চলিল।

২৮শে আগষ্ট, শুক্রবার। ডেলি মিরর কিনিযা পড়িতে পড়িতে চলিলাম। জ্যোতিষের প্রতি প্রীতি মানুষের স্বাভাবিক। এই কাগজে প্রতিদিন এইরূপ একটী প্যারাগ্রাফ থাকে। পড়িলাম—"It is a pleasant day and you may find that you have to deal with people who are just and understanding" এই দৈববাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিল।

লণ্ডন কমিটি কাউন্সিলে মিঃ র‍্যাণ্ডালের সহিত আলাপ হইল। তিনি ক্লার্কের সহকারী। অত্যন্ত চমৎকার লোক, আলাপী ও শিক্ষিত। তিনি তাহাদের সমস্ত বিভাগের কাজ কর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। সমস্ত দেখিবার মত কথা দিতে সঙ্গে করিয়া ঘুরাইয়া আনিলেন। আমি ইহাদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং জন-স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের খবর চাহিলাম। মিঃ র‍্যাণ্ডাল আমাকে ডাক্তার ব্রোয়েরিকের নিকট নিয়া গেলেন। ডাক্তার বুড়া মানুষ, আমার সহিত অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। আমাকে উহাঁদের হাঁসপাতাল দেখিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

লণ্ডন কাউন্টি হল পঞ্চম জর্জ্জ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে উদ্বোধন করেন। র‍্যাল্ফ নট ইহার পরিকল্পনা করেন, স্থাপত্য রীতি ইংলিশ রেনাসাঁ যুগের, ইহার পরিষদ-গৃহ দেখিবার মত। দক্ষিণ ও উত্তরে কতিপয় ভাল গৃহশ্রেণীতে নানা কর্ম্মচারীদের আফিস ঘর। ইংরাজেরা এই বাড়ীর খুব প্রশংসা করেন। কিন্তু আমার চক্ষে ইহা তেমন সুন্দর বলিয়া মনে হয় নাই। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল পৌরশাসনের প্রধান বিভাগ। ইহাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করা হয়। যুদ্ধের পর বাড়ীর অভাব বাড়িয়া যায়। তখন শ্রমিকদিগের বাসোপযোগী স্থানের অত্যন্ত অভাব অনুভূত হয়। এসেক্স

কাউন্টির বিকর্নট্রি নামক স্থানে ইহারা একটী নূতন নগরের পত্তন করিয়াছে। সেখানে লক্ষাধিক লোকের বাসস্থান গঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্থানে স্থানে ছোট বড় বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সভা শ্রমিকপল্লীর সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্ন করিতেছে। পরিষ্কৃত, আনন্দময় গৃহ মানুষকে শান্ত ও মধুর করে। নাগরিক জীবনে মানুষ এই স্নেহের নীড় পায় না। তাই পৌরসভার এই কাজ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

লণ্ডনের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লণ্ডনের শতকরা নব্বই জন শিশু বিদ্যাভ্যাস করে। এই শিক্ষাকে হৃদ্য ও আনন্দময় করিবার বিশেষ চেষ্টায় ছেলেদের ভ্রমণ দল লইয়া মাঝে মাঝে চিত্তাকর্ষক বা ঐতিহাসিক স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। রেডিও রাখিয়া ছেলেদের গান প্রভৃতি শোনানো হয়। গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাইয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া দুই কোটী পুস্তকের একটী ভ্রাম্যমান পাঠাগারের বই ছেলেদের আনন্দ ও জ্ঞান দেয়। ছেলেদের উপযোগী ছায়া-ছবি দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদের ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও বিশেষ চমৎকার। ইহাতে শ্রেণী গড়িবার সময় যাহাতে মেধাবী ও জড়বুদ্ধি ছাত্র একত্র হইয়া গণ্ডগোল না বাধে সে বিষয়ে নূতন নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে।

মাধ্যমিক বিদ্যায়তনে ছেলেরা কর্ম্মজীবনে যাহাতে অন্ন পায়, সেই জন্য শর্টহ্যাণ্ড, ড্রয়িং, কাঠের কাজ, সূচী-শিল্প, হিসাব শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু ছাত্রদের পাঠ দিয়াই ইহারা ক্ষান্ত হন না। জড়বুদ্ধি ছেলেরা যাহাতে মানুষ হয় তাহার আয়োজন আছে। ছেলেরা যাহাতে যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার পায় তজ্জন্য তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয়। এমন কি অনেককে কডলিভার তেল খাইতে দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া পিতৃমাতৃহীন, স্বজনহীন ছাত্রদের পরিপালনের জন্য পৌরসভার ব্যবস্থা আমাদের দেশে অনুকৃত হওয়া উচিত। পাঁচ হাজার অবৈতনিক কর্ম্মী লইয়া ছাত্রদের যত্ন লইবার একটী সভা আছে। ডাক্তার দিয়া ছেলেদের রোগ নিবাকরণের আয়োজনও হইয়াছে।

টেক্‌নিকাল স্কুল বর্ত্তমান জীবনের শিল্পানুরাগ সহায়তা করে। দক্ষ কারিকর সব এই সব পাঠাগারে তাহাদের জ্ঞানের ও কৌশলের পরিপুষ্টি লাভ করে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লণ্ডনের হাঁসপাতালগুলি অধিকাংশই বে-সরকারী ভাবে পরিচালিত হইত। পৌরসভার অধীনে আসিয়া ইহাদিগকে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত করা হইতেছে।

যাহাতে নাগরিকগণ মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ ও ক্রীড়া করিতে পারেন, তাহার জন্য লণ্ডনের পার্কগুলি পৌরসভা সুন্দর ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতায় হাইড পার্কের মত সুবৃহৎ মুক্তস্থান নাই। গড়েরমাঠকে ঠিক পার্ক বলা চলে না। কলিকাতায় প্যারি বা লণ্ডনের মত সুবৃহৎ উদ্যান-অবনা নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। পৌরসভার নানাবিধ কাজের খানিক পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি।

কলিকাতা কর্পোরেশন লণ্ডনের এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে অনেক অনুপ্রেরণা পাইতে পারেন।

এখান হইতে আলাহামব্রাতে ম্যাজিক দেখিলাম। অত্যদ্ভুত খেলা দেখাইল। একটী বিস্ময়কর খেলা দেখাইল। একটী যুবতীকে একটা বাক্সে পুরিল; অন্য একটী বাক্স থাকিল ছাদে, খানিক পরে দেখা গেল তরুণী ছাদের বাক্সে। কি করিয়া যে এত ক্ষিপ্রগতিতে গমন করিল তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। কতকগুলি ভৌতিক ক্রীড়াও দেখাইল। খুব ভাল লাগিল।

২৯শে আগষ্ট, শনিবার। বৃটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনা করিয়া হরিহর দাদার সহিত রাসেল স্কোয়ারে চা খাইলাম। এটী একটী আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান। নানা দেশের ছাত্রেরা এখানে ভিড় করে, ভারতীয়েরা এখানে খুব আমল পায়। দত্তের ওখানে সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। শ্রীযুক্ত দত্ত অতিশয় অমায়িক ও সজ্জন। তিনি অন্য তিনটী বাঙ্গালী ছেলেকে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন। ইহাদের আলাপ ব্যবহারে কৃষ্টির বিশেষ পরিচয় পাইলাম না। পশ্চিমে আসিয়া নূতন জ্ঞান ও সভ্যতা শিখিয়া তাহারা একটা বড় কিছু করিবে এই ভাব তাহাদের মধ্যে দেখিলাম না।

ইহাদের দেখিয়া একটা কথা মনে পড়িল। আমাদের দেশে বহু অভিভাবক অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাদের পুত্র প্রভৃতিকে বিলাতে পাঠাইয়া থাকেন। ছেলেরা যদি মেধাবী না হয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য এত অধিক অর্থব্যয়-

অন্যায়। যুরোপে আসিয়া ভ্রমণ করিয়া অনেক শিখিবার ও জানিবার আছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। আমাদের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে দল পাকাইয়া সময় কাটাইয়া দেয়। সদাজাগ্রত কৌতূহল লইয়া ইহারা যুরোপের মর্ম্মধারা জানিবার জন্য তপস্যা করে না। কাজেই ইহাদের বহুজনে জীবন্ত অভিশাপ হইয়া দেশে ফেরে এবং আত্মীয়-স্বজনেব মর্ম্মপীড়া দেয়।

দত্ত নানা বিষয় আলাপ করিলেন। উহার ছোটছেলের বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। সে পিতাকে প্রশ্ন করিল— 'Daddi when do the sea start? দত্ত উত্তর দিলেন, It starts nowhere. পুনবায় শিশুপুত্র জিজ্ঞাসা করিল, —When does it end. উত্তর—It ends no where. ছেলে আকাশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, পিতা অনুরূপ উত্তব দিলেন, তখন পুত্র বলিল, "A thing which does not begin, has no end. দার্শনিক মৌলিকতা।

যদিও সাগরের অসীমতার ভাব লইয়া যে উত্তব তাহা ঠিক নহে, আকাশের সম্বন্ধে ঠিক, তথাপি এই প্রশ্নোত্তরে শিশুর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ধরা পড়ে।

অনেক রাত্রিতে বাসায় ফিরিলাম। বাঙ্গালী ছাত্র তিনটী অনেকদূর এক সঙ্গে আসিলেন। দুঃখ হইল, ইহারা মনের মধ্যে একটুও ছাপ রাখিতে পারিলেন না।

৩০শে আগষ্ট, রবিবার। শুকিলের সঙ্গে প্রাতবাশে আলাপ হইল। সে M. Ed. পড়িতে আসিয়াছে। কিন্তু কথার ঠিক নাই, বলিল, দুজনে একসঙ্গে মুক্ত আকাশের তলে অভিনয় দেখিতে রিজেন্ট পার্কে যাইবে, কিন্তু সময়মত অন্য কাজে চলিয়া গেল কাজেই আমি একাকীই দেখিতে চলিলাম।

রিজেন্ট পার্ক সুবিস্তৃত ময়দান। চতুর্থ জর্জ্জের খেয়ালে ইহার উদ্ভব, ন্যাশ ইহার পরিকল্পয়িতা। ইহার চতুষ্কোণদিয়া বহির্বৃত্ত নাম দিয়া প্রায় দুইমাইল চওড়া রাস্তা গিয়াছে, অন্তর্বৃত্তের মধ্য দিয়া ফুলের বাগান অবস্থিত। তাহার মধ্যেই মুক্ত রঙ্গমঞ্চ। এখানে নিদাঘ ঋতুতে সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয় হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ অভিনয় ছিল না।

এখান হইতে বাহিব হইয়া মাদাম সিনেমা গৃহে সিনেমা দেখিতে চলিলাম। সেখানেও বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া পার্কের চারিধার ঘুড়িয়া বেড়াইলাম। উদ্যানটীর নাম কুইনমেরীর উদ্যান। খানিকক্ষণ ক্রিকেট খেলা দেখিলাম।

ইংরাজেরা মুক্ত উদ্যানকে উপভোগ করিতে পারে। দলে দলে লোক আসিতেছে। কেহ পার্কের মধ্যের বাঁকা ঝিলে নৌকা লইয়া ঘুরিতেছে, কেহ খেলা করিতেছে, কেহ বেড়াইতেছে, কেহ ছুটিতেছে, কেহ পড়িতেছে। চমৎকার ছবি! বৈরাগ্য সাধনের মন্ত্র নয়, পরিপূর্ণ সম্ভোগের উচ্ছল আনন্দ।

এখান হইতে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিলাম। অচেনা পথে ঘুরিয়া লণ্ডনের সত্যকার পরিচয় লইবার চেষ্টা করিলাম।

৩১শে আগষ্ট, সোমবাব। সকালে উঠিয়া কাউন্টি কাউন্সিলের চিঠি নিয়া হ্যাম্পষ্টেড টাউন হলে চলিলাম। ডাঃ ওডারশ খুব যত্ন করিয়া তাহার কাজকর্ম্ম দেখাইলেন। তারপর তাঁহার শ্রমিকদের জন্য যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাই দেখাইবার জন্য ডাঃ হিলকে অনুরোধ করিলেন। ডাঃ হিল একটী মোটরে করিয়া আমাকে West Craft নামক স্থানে লইয়া গেলেন। ডাঃ হিল বেশ আলাপী, অনেক বিষয়ে আলাপ হইল। দু'টি বাড়ী দেখিলাম। একটীতে একটী মেয়ে থাকে, তার দু'টি ছেলেমেয়ে, এখন এই বাড়ীতে তাহাদের চলিতেছে। ডাঃ হিল বলিলেন, "একটা প্রবলেম, ছেলেমেয়ে আসে, কাজেই বাড়ী নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হয়।"

"ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে" বোধ হয় সেদিন আব থাকিবে না, কিন্তু জন্মশাসনের দিনেও জন্ম নিয়ন্ত্রণ এমন ভাবে চলে না যাহাতে তাহাদেব মাত্রা টাউন হলের পরিমিত স্থান ছাড়াইবে না। অপরটিতে থাকে একটি যক্ষ্মারোগী ও তাহার স্ত্রী। স্ত্রীটি ভাল পিয়ানো বাজায়, পিয়ানো বাজাইয়া সে ৫০ পাউণ্ড পুবস্কার পাইয়াছে। স্বামী বোগী বলিয়া স্ত্রী কাজ করিতে পাবে না। পতিব্রতার মত সে স্বামীর সেবা কবিয়া চলিয়াছে। সকলেই বলিল, তাহারা এই সব বাড়ীতে বেশ সুখেই আছে। বাড়ীগুলিব পরিকল্পনা মন্দ নয়। সম্মুখে ছোট একটী পুষ্পোদ্যান, পিছনে একটু সব্জী বাগান। সেখান হইতে ইহাদের দন্তাগার দেখিতে চলিলাম। দন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাটি দেখিলাম। অতি সাধারণ ব্যবস্থা। ডাঃ হিলকে ধন্যবাদ জানাইয়া লেষ্টার স্কোয়ারে গেলাম।

সেখানে আমার ফটো তুলিলাম। তাহার পব ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে গিয়া অনেকক্ষণ পড়াশুনা করিলাম।

[ক্রমশঃ

ভারতের রাজনীতি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বহুকাল পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলায় রাষ্ট্রিয় সভায় ৺আশুতোষ চৌধুরী বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, "পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই।" কথাটা কাহারও ভাল লাগে নাই। তারপর হ'তে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু আন্দোলন হইয়া গেল, বহু নেতার আবির্ভাব হইল এবং তিরোভাবও হইল, ভারত রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্রসর হইল কতদূর—আজ তাহার হিসাব-নিকাশের বোধ হয় সময় হইয়াছে।

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয় বোম্বাইয়ের কংগ্রেসে। সে কংগ্রেসের প্রবর্ত্তক ছিলেন দুইটী উদারনৈতিক ইংরাজ পরলোকগত হিউম ও ওয়েডার বার্ণ সাহেব এবং তাঁহাদের সহযোগী ছিলেন কতিপয় বিলাতফেরৎ ভারতবাসী। তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তখন ভারতবাসী মনে করিত ভারতে ইংরাজের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ভগবদিচ্ছাপ্রসূত, সুতরাং ভারতের কল্যাণার্থেই হইয়াছে।

ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসী তখন ইংরাজের সহিত সহযোগিতা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে সম্মানিত হইয়া প্রতিষ্ঠাবান্ হইতেছিল। তখন বাঙ্গালী ভারতের সকল প্রদেশেই প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া প্রাদেশিক উন্নতি বিধানে রত ছিল। বিহার-উড়িষ্যা তখন বাংলার সহিত সম্মিলিত প্রদেশ—যুক্তপ্রদেশও তখন বাঙ্গালীর দ্বারা শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছিল, কারণ, বাঙ্গালীই প্রথম হইতেই ইংরাজের শিক্ষা দীক্ষা লইয়া ভারতে ইংরাজের সহযোগী হইয়াছিল। ব্যবসা ক্ষেত্রেও বাঙ্গালী তখন ইংরাজের সহযোগিতায় ধনী হইতেছিল। যত বড় বড় ইংরাজ ব্যবসায়ীদের মুৎসুদ্দি ছিল বাঙ্গালী। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত যাহারা হয় নাই, তাহারাই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। মুসলমান জাতি ইংরাজের শিক্ষা সানন্দে ও সাগ্রহে তখন গ্রহণ না করায় সকল ক্ষেত্রেই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়া গেল। ক্রমশঃ সকল প্রদেশেই হিন্দুগণ এবং ভারতীয় খৃষ্টান পার্শী সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করিল। সে প্রাধান্যের মূলে ছিল ইংরাজের কূট রাজনীতি।

ইংরাজের শিক্ষা এমনই ভাবে দেওয়া হইল যে, তাহাতে শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রই ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হইল। যে শিক্ষাই লাভ করুক না কেন অন্নের জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে যাইতেই হইবে ইংরাজের দ্বারে। তাঁহাদের অনুগ্রহ ভিন্ন শিক্ষিত ভারতবাসী নিরুপায়। কিন্তু এমনই তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালী এবং রাজনৈতিক চাতুর্য্য যে, সেই পরমুখাপেক্ষিত্বের বিড়ম্বনাতেই শিক্ষিত সম্প্রদায় গৌরবান্বিত বোধ করিল। ইংরাজী যাঁহারা শিখিলেন না—সংস্কৃত পার্শী পণ্ডিতগণ মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন।

মিঃ হিউম

ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরাজ বণিক ক্রমশঃ ভারতবর্ষের ধন শোষণের এমনই ব্যবস্থা করিল যে, শিক্ষিত ও ধনী ভারতবাসী সে শোষনের সহযোগী হইয়া আপনাদের ধনবৃদ্ধির সুবিধা করিয়া লইল সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশের দারিদ্র্যের কারণ হইল। এইভাবে ভারতবাসী আত্মহারা হইয়া ইংরাজের রাজনীতির প্রভাবে বুঝিতেই পারিল না যে, কেমন করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খল তাহাদের কণ্ঠে আরও দৃঢ় এবং কঠিনতর হইয়া উঠিতেছিল।

ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ রাজনীতির চিন্তার উদ্রেক হইল। জগতের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকায় স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রভৃতি দ্বারা শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে চিন্তা আরম্ভ হইল এবং কংগ্রেস সেই চিন্তার পশ্চাতে কর্ম্ম সূচনা করিল। রুশ-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয় ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার আশা জাগাইল !

ওয়েডার বার্ণ

প্রথম, ইংরাজের ন্যায়পরায়ণতার উপর শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকায় তাহারা আবেদন-নিবেদন দ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধির এবং প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া রাজনৈতিক কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের রাজনীতি তাহাদের এ চেষ্টাকে উৎসাহ দান করিল সত্য, কিন্তু বিশেষ ফলপ্রসূ করিল না। ইংরাজ-সরকারের অন্যায় আচরণে ক্রমশঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল সত্য, কিন্তু তাহাদের সে অসন্তোষের ফলে কোন প্রকার রাজনৈতিক কার্য্যের উৎপত্তি হইল না। আবেদন-নিবেদনই হইল ভারতের রাজনীতির ভিত্তি।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জ্জন করিলেন বঙ্গ-বিভাগ, তার অন্তর্নিহিত কারণ ছিল, বাঙ্গালীর রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া দেওয়া। সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী ক্রমশঃ ঐক্যে আবদ্ধ হইয়া পাছে রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন প্রকারে শক্তিমান্ হইয়া সমগ্র ভারতে আন্দোলনের সৃষ্টি করে, সেই ভয়ে বাঙ্গালীকে বিভক্ত করিয়া দুর্ব্বল করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। বাঙ্গালায় তখন ৺সুরেন্দ্র নাথ নেতা। তার পূর্ব্ব হতেই বাঙ্গালায় সাহিত্যে, কাব্যে, গানে দেশপ্রীতি দেশসেবার পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইতেছিল এবং বাঙ্গালীই সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রিয় গুরুর পদ অধিকার করিয়াছিল। বাঙ্গালা আজ যাহা বলে, সমগ্র ভারত কাল তাহা করিতে প্রস্তুত হয়—এই পরিস্থিতি তখন। তখন বাগ্মিতায় শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালার বক্তৃতার বন্যায় ভাসে নাই এমন লোকই ভারতে ছিল না।

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল বিলাতী পণ্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী পণ্যগ্রহণ। আবেদন-নিবেদন প্রথা ঐ আন্দোলনের দ্বারা বন্ধ হইল এবং সরাসরি কোন কার্য্যের দ্বারা ইংরাজ সরকারের ক্ষতিজনক আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই আন্দোলন বাংলার আন্দোলন বলিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটি ইহা গ্রহণ করে নাই এবং না করিলেও এই আন্দোলনের প্রভাব হইতে কোন প্রদেশই রক্ষা পায় নাই। এ আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্পের উন্নতির চিন্তা ও চেষ্টা আরম্ভ হইল। ইংরাজ সরকার এ আন্দোলনকে অপ্রীতির দৃষ্টিতে দেখায় এবং অনাচার-অত্যাচার করিতে বাধ্য হওয়ায় এ আন্দোলন তীব্র করিয়া তুলিল এবং ইহারই ফলে বাঙ্গালায় অগ্নিযুগ আসিল। বাঙ্গালী স্বাধীনতার নামে, জন্মভূমির নামে হাসিতে হাসিতে ফাঁসির মঞ্চে যখন উঠিল—সমগ্র ভারতে কেন, সমগ্র বিশ্বে এক সাড়া আনিয়া দিল। ক্রমশঃ এই আন্দোলন তীব্র হইতে তীব্রতর হওয়ায় অত্যাচারের মাত্রা যেমন বাড়িল, বঙ্গভঙ্গ রোধ করিবারও সুযোগ আসিল। কিন্তু সে সুযোগে বাঙ্গালার অঙ্গ হইতে বিহার এবং উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন হইল। তখন নেতৃবৃন্দ আপনাদের আন্দোলনের সাফল্যে এ ক্ষতির মাত্রা বুঝিতে চাহেন নাই এবং বঙ্গ যে ভগ্নই রহিয়া গেল, তাহাও তাহারা আনন্দে অভিভূত হইয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন না। স্বদেশী আন্দোলন হ্রাস পাইল, সে উৎসাহ-উন্মাদনা কমিয়া গেল। ফলে বাঙ্গালার মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা হইয়াছিল তাহা রদ হইল সত্য কিন্তু বাঙ্গালায় যে আর দুইটী অংশ ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আজ প্রাদেশিকতার বিষধর সর্প ফণা তুলিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ পাইল। বাঙ্গলায় এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। সুরেন্দ্রনাথের পর তাঁর নামই

উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের উভয়ের সহকর্ম্মীদের মধ্যে আজ প্রায় সকলেই গতায়ুঃ, যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা প্রায়ই এখন রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া আছেন।

শ্রীঅরবিন্দ যোগাভ্যাস করিতে চলিয়া গেলেন। বাল গঙ্গাধর তিলক স্বর্গে গেলেন, লালা লাজপত রায়ও স্বর্গস্থ হইলেন, নেতা রহিল না। ১৯০৫ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বিপ্লবীদের যুগ। তাহারা শুধু ভাঙ্গিবার জন্য ব্যস্ত, গড়িবার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। ১৯১৪ সালে আসিল ইউরোপের ক্ষেত্রে মহাসংগ্রাম। সে সংগ্রামের জন্য লোক সংগ্রহ করিলেন গান্ধিজী, সে সংগ্রামের জন্য পরিশ্রম করিলেন বাঙ্গালার নেতা, উপনেতার দল! জার্ম্মানীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বিফলমনোরথ হইল বিপ্লবীর দল! প্রায় হাজার আড়াই বা তিন হাজার বঙ্গ-যুবক কারারুদ্ধ হইল। ১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৮ সাল বাঙ্গালায় রাজনীতি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল। কেহ কাহারও সহিত রাজনীতির কথা কহিতে সাহস করিত না, বিপ্লবীদলের কাহাকেও দেখিলে বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে বন্ধু বিমুখ হইয়া চলিয়া যাইত। আত্মীয়-স্বজন সঙ্গ পরিত্যাগ করিত, পুলিশের ভয় তখন সাধারণ লোককে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

যুদ্ধ শেষ হইল। ইংরাজ জয়ী হইয়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করিবে বলিয়া ভারতবাসী বহু আশা পোষণ করিয়াছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিল, যাহারা রাজনৈতিক কারণে অজ্ঞাতবাসে ছিল, তাহাদেরও মুক্তি দিল, কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না।

পরাধীন জাতির রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য যদি বিজেতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে উন্নতি কোন মতেই হইতে পারে না। বিজেতা তাহার স্বস্ত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিজিতকে স্বাধীনতা দান করিবার দৃষ্টান্ত বিশ্বমানবের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা যায় নাই। সুতরাং ইংরাজের পক্ষ লইয়া ভারতবাসী ধনে-প্রাণে মরিয়াও সে অধিকার অর্জ্জন করে নাই। তাই স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের পরিবর্ত্তে আসিল সংস্কার, যাহা দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন মূলতঃ বিন্দুমাত্রও ঘটিল না—কেবল তিনকড়ি হইতে পাঁচ কড়ি হইল!

তিনকড়ি ছিল বাবুদের মাঝী। গঙ্গাগর্ভে একদিন নৌকায় বসিয়া বাবু প্রমাদ গণিলেন। বৃষ্টি, ঝড়, তুফান আরম্ভ হইল, চক্ষের সম্মুখে দুই তিনখানি নৌকা ডুবিল দেখিয়া বাবু কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে বলিলেন, "তিনু বাবা, আজ যদি নিরাপদে নৌকা লইয়া ঘরে ফিরিতে পার, তাহা হইলে এমনই পারিতোষিক বা বকসিস্ দিব, যাহা চিরকাল তোমার বংশধরেরা ভোগ-দখল করিবে।" তিনকড়ি দক্ষ মাঝি, কোনক্রমে বাবুকে বাঁচাইয়া বাড়ী আনিল। কিন্তু দিনের পর দিন যায় বাবুর স্বীকৃত বকশিস্ আর মিলে না। তিনু মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দেয়। বাবু বলেন, "এমন বকশিস কি এত সহজে দেওয়া যায়, কল্পনা কর।" দুই পূজা কাটিয়া গেল, তৃতীয় পূজার নবমীর দিন তিনু আসিয়া বকশিস চাহিল। বাবু পরিষদবর্গকে ডাকিয়া দরবার করিয়া তিনুর মাঝিগিরির বাহাদুরীর কথা সকলকে বক্তৃতা করিয়া শুনাইয়া বলিলেন, "আজ তিনুকে যে বকশিস্ দিব তাহা তাহার বংশধরেরা বংশপরম্পরায় স্মরণ করিয়া ভোগ দখল করিবে।"

-চিত্তরঞ্জন

সভাসদ্ পারিষদগণ বাবুর মুখের দিকে তাকান ও ভাবেন, তিনে বেটার ভাগ্য খুলিল, হয় ত জমিদারি দেবেন বা টাকার ছালা দেবেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাবু বলিলেন, "আমি তিনকড়িকে আজ হইতে পাঁচকড়ি নামে ডাকিব এবং সকলে তাহাকে আজ হইতে পাঁচকড়ি বলিয়া ডাকিবে।" সভাসদ্গণ ধন্য ধন্য করিল, তিনু হতভম্ব হইয়া ভাবিল, এ কি হইল !

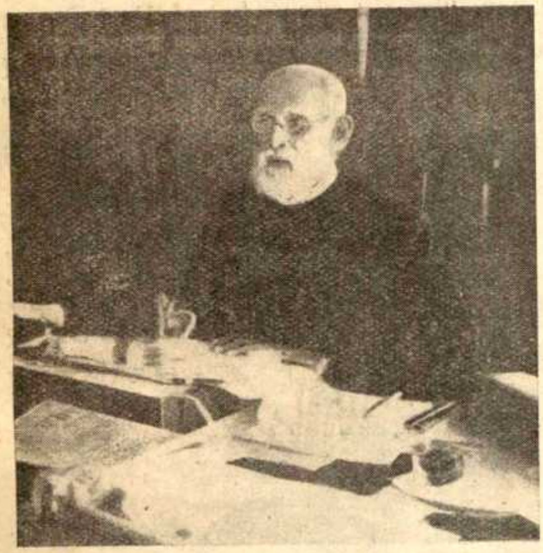

স্যার সুরেন্দ্রনাথ

যুদ্ধের পর ভারতবাসীর যে আশা ছিল যে একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা হইবে, সে আশা পরিপূর্ণ হইল না বরং চূর্ণ হইল, পাইল তাঁহারা "জালিয়ান্ওয়ালাবাগ।" দেশের মধ্যে মহাক্ষোভ এবং অপমানের গ্লানির উদ্রেক হইল। আরম্ভ হইল নূতন আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী, যিনি যুদ্ধের জন্য রংরুট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি নেতৃত্ব লইয়া তাঁহার প্রথম সত্যাগ্রহ ও চরখার আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। পুরাতন নেতারা ক্ষেত্রে নাই, সুতরাং তাঁহার সহায় হইলেন নূতন নেতার দল—৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ৺পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ৺শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার, রাজাগোপালাচারি, বল্লভভাই প্যাটেল। এ নেতৃত্বে ভারতে এক অভিনব জাগরণ হইল সত্য, কিন্তু যে পন্থা অবলম্বন করিয়া এ আন্দোলন চলিল, তাহার ফলে আজ শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ নানা মতে বিচ্ছিন্ন হইল। রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ কোন ঐক্য নাই, প্রত্যেক কর্ম্মী আজ ভিন্ন মতাবলম্বী। কংগ্রেস এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক—দেশময় চলিল চরখা এবং প্রচারিত হইল অহিংস অসহযোগ সত্যাগ্রহ। চৌরিচৌরায় হইল হিংসার লীলা, মহাত্মার অহিংস আন্দোলন হইল বন্ধ। অহিংসা ভিন্ন আর কোন কথাই নেতার স্বীকার্য্য নহে। ১৯২০ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত এই ভাবেই রাজনীতি পরিচালিত হইল। ১৯৩০ সালে পুনর্ব্বার সেই অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইল, খুব ঘটা করিয়া আরউইন-গান্ধী চুক্তি হইল ! সাধারণতঃ, মানুষ ভাবিল খুব জয় হইল। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী উপনীত হইলেন, বক্তৃতার ঘটা এবং সম্মানের চূড়ান্ত চলিল। স্বয়ং রাজা সম্রাট্ মহাত্মার সহিত করমর্দ্দন করিলেন, ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই লর্ড ওয়েলিংডনের করমর্দ্দনের পরই কর্ণমর্দ্দনের পালা আরম্ভ হইল।

এইভাবে ভারতের রাজনীতি আজ গতিহীন পঙ্গু অবস্থায় উপনীত। কংগ্রেসের মধ্যে ভীষণ ষড়যন্ত্র, দলাদলি। কংগ্রেস আজ আত্ম-কলহের এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। যে কংগ্রেসের নামে সমগ্র ভারতবাসী গৌরব অনুভব করিত, যে কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতিতে ইংরাজ-রাজের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত, সেই কংগ্রেস আজ কাহারও সম্মান লাভ করে না। নিখিল ভারত কংগ্রেস আজ মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসে পরিণত হইয়াছে ! কংগ্রেসের মধ্যে আজ দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারাও আজ বিভিন্ন। কেহ কাহারও সহিত মিলিতে পারে না। আজ রাজনীতিক্ষেত্রে কেহ মুশোলিনীর, কেহ হিটলারের, কেহ ষ্ট্যালিনের স্তাবক, এই লইয়াই আজ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নানা মতবাদ।

তাহার উপরে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-প্রসূত যে মতভেদ, যে দ্বন্দ্ব দ্বেষ আজ ভারতকে বিধ্বস্ত করিতেছে, ইহার নিবারণের কোন উপায় কেহ দেখিতে পাইতেছে না। একদিকে মহাত্মা অহিংসা দ্বারা যদি স্বাধীনতা না হয়, তিনি স্বাধীনতা চাহেন না ! অপরদিকে জিন্না সাহেব পাকিস্থান না হইলে ভারতের স্বাধীনতা চাহেন না, বীর সভরকারও হিন্দুস্থান না হইলে ভারতের স্বাধীনতা চাহেন না ! আর যাঁহারা মধ্যপন্থী, ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবেন না, তাঁহারা চাহেন ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব বজায় রাখিয়া ভারতবাসীরা সুখে-স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকুক। এই অবস্থায় ভারতের রাজনীতি কি ?

আজ ঘরে ঘরে তর্ক উঠিয়াছে—জার্ম্মানী আসিলে হয় ত ভাল হয়, ইংরাজ চলিয়া যাক। কেহ বলিবে, রুশের রাজনীতি ভারতে প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়। ইংরেজ-রাজ রুশের সহিত আজ মৈত্রী করিয়াছে, সুতরাং ভারতবাসীর উচিত রুশের সাহায়তা করা এবং তাহাতে ইংরাজের এ যুদ্ধে সহায়তা করা। মহাত্মা কংগ্রেসকে বলিয়াছেন, এ যুদ্ধে কোনপ্রকার সহায়তা না করিতে। এ অবস্থায় সত্যই কি স্বীকার করিতে হয় না যে, ৺আশুতোষ যে, 'পরাধীন জাতীর রাজনীতি নাই' বলিয়া বলিয়াছিলেন; তাহা সত্য !!

পরাধীন জাতির রাজা নাই, রাজ্য নাই, রাষ্ট্র নাই, সুতরাং রাজনীতি নাই। রাজনীতি নাই বলিলে রাজনৈতিক দলের উপর অন্যায় করা হইবে জানিয়াও আজ বলিতে হয়, আমাদের রাজনীতি নাই, আমরা অপরের রাজনীতি অনুকরণ করি মাত্র। আমরা ইংরাজের রাজনীতি, ফরাসীর রাজনীতি, রুশের রাজনীতি, জার্ম্মানীর রাজনীতি লইয়া দলাদলি সৃষ্টি করি। অথচ কেমন করিয়া আমরা ভারতবর্ষকে ঐক্য স্থাপিত করিতে পারি, কেমন করিয়া আমরা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া ঐক্যবদ্ধ হই, কেমন করিয়া নিজেদের মধ্যে স্বতন্ত্রতার প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারত সমাজের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করিতে পারি, আমাদের সকল বিচ্ছিন্নতার কারণ দূর করিতে পারি, ইহাই হওয়া উচিত আমাদের 'দেশনীতি', যাহা দ্বারা আমরা প্রকৃত স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারি।

মিঃ গান্ধী

পণ্ডিত জওহরলাল

এই অবস্থায় গতানুগতিকতায় আর চলিবে না। ভারতবাসীকে বৈদেশিক রাজনীতির কচকচিতে মজিলে চলিবে না। ভারতবাসীকে ভারতের নিজস্ব নীতি আবিষ্কার করিয়া আবার ভারতের নিজের দাবী জানাইতে হইবে। ভারত হইয়া পড়িয়াছে বহির্ম্মুখী, হইতে হইবে অন্তর্ম্মুখী—ফাসিজম্, নাৎসিজম্, ইম্পিরিয়ালিজম্, ষ্টালিনিজম্, ক্যাপিট্যালিজম্ ভুলিয়া ভারতবাসীকে ইণ্ডিয়ানিজম্, হিউম্যানিজম্ জাগাইতে হইবে।

ছোটো ছেলেটা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

[নক্সা]

হাতে বিস্তর কাজ। কয়েকদিন হ’লো বাড়ীটার রং ফেরানো হ’য়েছে ; এখনো চতুর্দ্দিকে ছড়ানো খোয়া-চুণ-বালি। রাবিশগুলোকে পথের ওপর ঢেলে দেয়া হ’য়েছে, বর্ষায় না হ’লে কাদা জ’মে পিছল হ’য়ে ওঠে, ছেলেপিলেরা কখন আছাড় খেয়ে পড়ে।

জিনিষগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে আছে। কলিফেরাবার সময় এ-ঘরের জিনিষ ও-ঘরে সরানো হ’য়েছে, সেগুলো যথাস্থানে রাখা বিশেষ দরকার। বৃষ্টির জল-নামা-নালাগুলো বাঁকা ক’রে লাগিয়েছে। কয়েকদিন প্রজাদের বাড়ী যেতে হ’য়েছিল, এরই ফাঁকে এ দুর্ঘটনা হ’য়েছে। চৈত্রের মাঝামাঝি, তামাদির সময়। একটু তাগাদা না দিলে তাদের কাছ থেকে একটি পয়সাও আদায় হবার উপায় নেই। অথচ বাড়ীতে এমনি অবস্থা !

আকাশটা মেঘ্‌লা ক’রে আছে। বাইরের তক্তপোষ আর টেবিলটা দালানে তোলা দরকার ; কাঁসারিপাড়ার বিধুকে না ডাকলে চ’লবে না।

ও দিকে ছোটো ছেলেটার দেখা নেই। সকাল থেকে আমারি চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বারণ ক’রেছি অনেক, ধম্‌কেছি, তাতেও তার পায়ে পায়ে ঘোরা আর প্রশ্নের শেষ হয়নি। শেষে বাধ্য হ’য়ে কাণে পাক দিতে হ’য়েছে একটি। তারপর সেই যে কোথায় পালালো আর দেখতে পাচ্ছি না। চেয়ার একটা সরাতে গিয়ে পায়া ঠুকে গেছে ওর মাথায়। খানিকটা ফুলে গিয়েছে। তখন অতো দেখবার সময় হয়নি ; কাজের ফাঁকে মনে হ’য়েছে, গেলো কোথায় ?

ওর মাও ব্যস্ত। বড় ছেলের ইস্কুলের ভাত, কোলের মেয়েটার চেঁচামেচি আর বায়না তাকে ভীষণ ব্যতিব্যস্ত ক’রে রাখে। আজ তার ওপরে আমার সঙ্গে শত কাজে আটকা। সেও বিশেষ খোঁজ রাখে না। সকালে ওর দাদার সঙ্গে খেয়েছে কয়েকখানা বাসি রুটি আর খানিকটা দুধ-পালো। ওর মা জানালো, খোকা এসেছে আর মাঝে মাঝে কল্‌সীর মধ্যে হাত ডুবিয়ে ওর ছোটো গেলাসটায় ক’রে জল খেয়ে গেছে। দূর থেকে ঐটুকু খবরই সে রাখে।

দুটো বাজে। স্নান-আহার শেষ করা দরকার, অথচ বিধুটা এখনো এলোনা ! ক্লান্তি লাগছে। একা মানুষ, আর কতোই বা পেরে উঠি !

আকাশ মুখ ভার ক’রে আছে, কখন যে ভ্যাঁ ক’রে কেঁদে ফ্যালে বলা যায় না। ধানগুলো আজও রোদে দেয়া হ’লো না। অস্থানেই প’ড়ে রইলো !

কে ডাকলো, কর্ত্তা আছেন নাকি ?

সাড়া দিয়ে বাইরে এলাম। চাটুয্যেদের লোক, সঙ্গে এসেছে তাদের ওভারসিয়ার।

আঁধি-পুকুরটা কাটানো হ’চ্ছে, তার সঙ্গে গিয়ে এখন সীমানাটা ঠিক ক’রতে হবে। হাতে কাজ আছে ব’লে তাদের অনেক ঠেকিয়ে রেখেছি। আজ তাদের সঙ্গে যেতে হবেই—কথা দিয়েছি।

তবু ব’ললাম, কাল হয় না হারাণ ? আজ ভারী ব্যস্ত। সে ব’ললে, এজ্ঞে দাঁড়িয়ে থেকে একটু দেখে না দিলে যে হয় না ! আকাশের অবস্থা তো দেখতেছেন, কখন কি হয়…

ওদের গরজ, নিজেরো কম নয় যদিও ; কাজেই যেতে হ’লো। ভাবছিলুম ছোটো ছেলেটার খোঁজে বেরোবো, তা আর হ’লো না !

* * *

প্রকাণ্ড দীঘি। কিছুদিন আগেও কচুরিপানা আর মাদার-বন্থার বন ছিল। বড় বড় মাছ আর অজগরে ছিলো বোঝাই। এই সব জঙ্গল সাফ্‌ ক’রবার লোক অন্য গ্রাম থেকে আনাতে হ’য়েছে, এ গ্রামের কেউ সাহস করেনি প্রথমে। এটার নাম ছিলো বিজয়সিংহের দীঘি। প্রবাদ হ’লো, মানসিংহ একে পাঠিয়েছিলেন যশোরের প্রতাপাদিত্যকে এই দিক্‌ দিয়ে আক্রমণ ক’রতে। এখানে একটা ছাউনি পড়ে। জঙ্গল কেটে পরিষ্কার ক’রে তাঁবু

গড়া হ'লো। সৈন্যদের জলের অভাব মেটাবার জন্যে এই দীঘি তিনি কাটিয়েছিলেন। তার অনেক অংশই ভরাট হ'য়ে ওপরের জমির সঙ্গে সমান হ'য়ে গেছে। তবু যা আছে, দশখানা গ্রাম খুঁজলেও এমনটি মিলবে না।

পশ্চিম পাড়েই চক্রবর্ত্তীদের কালীমন্দির। এর প্রতিষ্ঠাতা গিরিপ্রভু প্রায় দেড়শো বছর আগেকার লোক। তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। ছেলেবেলায় মাকে ত্যাগ ক'রে এই ব্রাহ্মণসন্তান গিয়েছিলেন হিমালয়ে কালীর তপস্যা ক'রতে। অনেক কৃচ্ছ্রসাধন ক'রেও ইষ্টলাভ হয় নি। দৈববাণী হ'য়েছিল, "নির্ব্বোধ, নিজের মাকে অসন্তুষ্ট ক'রে এসেছিস্ মা'র কৃপা চাইতে? আগে তাঁর অনুমতি নে।" গিরিঠাকুর ফিরে আসেন মায়ের আদেশ নেবার জন্যে। তাঁর মা ছেলের মনের বাসনা জানতে পেরে তাঁকে শক্তি-সাধনায় অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধগিরি এই কালী স্থাপন করেন।

সেই দেড়শো বছরের মাটির ঠাকুর আজও তেমনি আছে। একালে শুধু একবার রঙ্ ফেরানো হ'য়েছে। সিদ্ধগিরির বংশধরেরা আজও আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোথায় যেন ঘুণ ধ'রেছে। সে শিক্ষা-দীক্ষা সব গেছে। একে একে কয়েকটি ঘর-ই বংশহীন হ'তে চ'ললো। অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাধি আর ব্যাভিচার পুণ্যভূমির ওপর ফেলেছে মৃত্যুর ছায়া। দীঘির দু'পাড় জুড়ে তাদের কয়েকঘর আজও বর্ত্তমান আছে।

দীঘি গেছে চাটুয্যেদের হাতে, তারাই এর সংস্কার ক'রবে।

বুড়োদের মুখে শুনি, তারাও একে পরিষ্কার দেখেছে। এর মধ্যে তখন ঢেউ ছুটতো। চারকোণে ফুটতো রক্তকুমুদ আর শ্বেত পদ্ম। দীঘির ওপর দিয়ে মন্দিরের চূড়ায় যখন চাঁদ উঠতো তখনকার সেই দৃশ্যটুকু চোখ বুঁজলে আজও তাঁদের চোখে ভাসে। চাটুয্যেদের যেখানে গোয়াল, ঢেঁকিঘর সেখানেও তখন জল ছিল অগাধ। কেমন ক'রে তা বুঁজে আঁধি পুকুরে পরিণত হ'য়েছে তা আর কেউ ব'লতে পারে না।

মেয়েরা বলে, পূর্ণিমার রাতে দীঘির জলে সোনার নাও আর পবনের বৈঠে ভাসতে দেখা যেতো। আজ যে তারা কোথায় গেলো সে খবরে আর কারো দরকার নেই।

ওভারসিয়ারের সঙ্গে মাপ-জোপ করতে সন্ধে হ'য়ে এলো। নক্সায় হাঙ্গামাও কম ছিল না। কাজ একরকম চুকিয়ে বাড়ীর পথ ধরলাম।

আবছা আঁধারের মধ্য দিয়ে চলেছি। দুধারেই গভীর বাগান মাঝখানের সরু পথগুলি এঁকে বেঁকে গ্রামের বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। চারদিকে সুপুরি আর নারকেল গাছ। অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে; এমন চীৎকার জুড়েছে ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলি যে কানে তালা লেগে যায়।

ছেলেটার খবর করা আর হলো না। বার বার করে তার কথাই মনে হয়েছে। স্নানের সময় তাকে দেখিনি, খাবার সময়েও এসে সঙ্গে বসেনি। ওর মায় হাত থেকে পানের কৌটো ও-ই রোজ এনে দেয়। নিত্যকার সাধারণ এই ব্যাপারগুলো কেমন নির্ব্বিবাদে ভুলেছিলাম! বয়েস হলে মানুষের এম্নি ভুলই হয়!

তাড়াতাড়ি চলতে লাগলুম। আকাশ ফেটে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের এম্নি আলো ঠিক্‌রে প'ড়ছে যে চোখ ধেঁধে যায়। হাওয়ার বেগও যেন বেড়ে উঠলো। গাছের পাতায় জাগলো শরশরাণি। পাখীগুলো অশ্রান্ত চীৎকার করে চলেছে।

বাড়ী ফিরে দেখি, খোকা বিছানায় আছে। আস্তে একটু ডাকলুম, কোনো সাড়া পেলাম না। সারাদিনের ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা যেন ভুলে গেলাম। নীচু হ'য়ে ওর গালে আলগোছে একটি চুমু দিলুম। মনে হ'লো, অবশ চোখের পাতাগুলো যেন একটু কেঁপে উঠলো। ঘুমের ব্যাঘাত হবে মনে ক'রে চলে গেলাম। আলোটাকে দিলাম কমিয়ে।

ওর মা ছিল রান্নাঘরে, আমার আসার খবর সে পায়নি। সেখানে একটা পিঁড়ি টেনে ব'সে পড়লুম।

ছোট্ট আমাদের সংসার, স্বামী-স্ত্রী আর তিনটি ছেলে-মেয়ে। স্ত্রী এম্নি সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীর বউয়ের মতোই গোবেচারা। রান্না, ছেলে-মেয়ে-স্বামী এছাড়া যে বিরাট দুনিয়ায় আর কিছু আছে তা সে জানেও না বা জানতে চায়ও না। খবর কাগজের পাতা চোখের সাম্‌নে খুলে ধরলেই তার নাকি ভীষণ ঘুম পায়। অন্যান্য নাটক-উপন্যাস তো দেখতেই পারে না—ওগুলো নাকি সব ন্যাকামি! রামায়ণ-মহাভারতের কোনো ধার সে ধারে না। তবে রয়ানি বা মঙ্গলগান, পাঁচালি, পুঁথি আর যাত্রা এগুলো শুনতে

পারে রাতের পর রাত জেগে। ওর শাস্ত্রজ্ঞান এসব থেকেই সংগ্রহ করা; সে জ্ঞান অত্যন্ত নির্ম্মম, অতি মুখরা।

বলে, দেখো বেহুলা মহাদেবকে তুষ্ট ক'রেছিলেন। কিন্তু তোমায় তুষ্ট ক'রতে পারে এমন লোক ভূ-ভারতে জন্মায়নি।

বলি, বেহুলা তো প্রাচ্য নাচ জানতো চমৎকার; তার নাচের ক্লাসটায় একবার যোগ দিয়ে দেখলে পারো!

চক্ষুর মধ্য দিয়ে শাসন ছুটে আসে। চুপ করি।

মেয়েদের কেমন দোষ, দু'একটি ছেলেমেয়ে হ'লেই মনে করে খুব বুড়ী হ'য়ে গেছে, 'কোনো কিছু শিখবার নাকি তাদের আর বয়েস আছে!' শিখবার বয়েস তাদের কখনো হয় নি, হয় তো ছিলই না। তাই ওরা আজন্ম সংসারী। ওরা 'মুখ্যু মানুষ', শিখতে ব'ললেই চক্ষু ভৎর্সনা করে, ছেলেমেয়েদের সামনে সেটা যে লজ্জার! অথচ বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের জন্মগত নির্ব্বুদ্ধিতা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

এ সব নিয়েই তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রছিলুম। ছোটো ছেলেটা দেখি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। টল্‌ছে, বোধ হয় ঘুমের চোখ।

ওর মা ব'লে উঠলো, উঠেচো? এসো, তাহ'লে খেয়েই নাও।

ব'সলো ছেলেকে খাওয়াতে। আমি উঠলাম। বিভুর পড়ার কাছে গিয়ে একটু বসি। সে ছবি আঁকছে না আঁক ক'ষছে তার কিছু বোঝাবার উপায় নেই। তারপর একটা সুতো হাতে কি ক'রতে যেন লণ্ঠনটা নিয়ে উঠে গেলো।

বাঁচলাম। লম্বা হ'য়ে প'ড়লাম। কতক্ষণ আমার এই ভাবে কেটেছে বুঝলাম না; কিন্তু শুনতে পেলাম কে যেন ব'লছে, খেলোনা, একটা ভাতও মুখে দিলে না। সারাদিন কেবল জল খাওয়া আর রোদে ঘোরা হ'য়েছে। তখনি জানি একটা না একটা কিছু না এনে ছাড়বে না।…সর দেখি, খোকার বিছানায় এসে আবার তুমি শুলে কেন? আর বাপু না খেয়ে ঘুমোতে হবে না। আমি কাউকে ডাকতে পারবো না। ডাকতে হলেই তো কীল-চড়-ঘুঁষি খেতে হবে? সর, ওঠো দেখি।

এতক্ষণে বুঝলাম, কথাগুলো আমাকেই উদ্দেশ্য ক'রে বলা হ'য়েছে। তাইতো খোকার জায়গাটাতেই শুয়ে প'ড়েছি!

বলি, একটু চিন্তা ক'রচি, সারাদিন তো আর তোমাদের জ্বালায় সময় পাই নে?

বলে, যাক চিন্তেটা খেয়ে দেয়ে একটু পরেই ক'রো, তাহ'লে আর ব্যাঘাত হবে না।

কাজেই উঠতে হ'লো। তর্ক বৃথা। স্ত্রীলোকের সঙ্গে আবার কি তর্ক ক'রবো? চিন্তার এরা বোঝেই বা কি! শাস্ত্রেই আছে ওদের বুদ্ধি হয় না, মিথ্যে নয়!

ছেলেটাকে শুইয়ে ও গেল আমার খাবার জোগাড় ক'রতে। বুঝলাম, এবারে একেবারেই উঠতে হবে। নিরুপায় হ'য়ে খোকার দিকে তাকালাম। নজরে প'ড়লো ওর লাল চোখ দুটো। জিজ্ঞেসা ক'রলুম, হ্যাঁরে, তোর চোখ অমন লাল হ'লো কি ক'রে?

কথা ওর জড়িয়ে গেছে, বলতে পারে না। মুখ দিয়ে শুধু আওয়াজ বেরোলো, বা…আ…বা…

বলি, কিরে, কি হ'য়েচে? চীৎকার ক'রে উঠলাম, এ দিকে শুনে যাও তো, খোকাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

কি হ'য়েচে? বলে সে ছুটে এলো। মুখে ওর শঙ্কার ছায়া। খোকাকে তুলে কোলে নিলো।

মা…আ…মা—খোকা ডাকে।

কি বাবা? ওর মা উত্তর দেয়, কিন্তু খোকা আর কথা ব'লতে পারে না। জিহ্বায় এসেছে জড়তা, চোখ তো তেমনি লাল। ব্যস্ত হ'য়ে বলে, যাও না একবার রমণী ডাক্তারেব বাড়ী।

বলি, কি হ'লো ব্যাপারটা না বুঝে আগেই ডাক্তারের বাড়ী যাবো? মাথা দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে, জল দিয়ে বেশ ক'রে ধুয়ে দাও, মাথায় রক্ত উঠেছে বোধ হয়।

বেশ ক'রে জল ঢালা হ'লো মাথায়, কিন্তু হ'লো না কিছুই। যেমন ছিল তেমনই প'ড়ে রইলো খোকা। ওর মা'র চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল বেয়ে প'ড়ছে। নিজের মনেও ধিক্কার এলো। সারাদিন এমনি কাজই ক'রলুম যে ছেলেটার খবর ক'রবার সময় হয় নি! ওগুলো আজই না গোছালে হ'তো কি! এতোদিন প'ড়েছিল না হয় আরো কিছুদিন প'ড়েই থাকতো। বৃষ্টিতে ক্ষতি হবার মতো আছে কি বাইরে? বিধু তো এলোই না আজ!

যাক্ গে, সে কথা ভেবে এখন আর কি হবে!

দেরী করা উচিৎ নয়। তাড়াতাড়িই একটা কিছু করা দরকার। ওদিকে বৃষ্টিও এলো ব'লে। ছুটলুম রমণীর বাড়ী। খোকা ওকে ডাকে, ডাক্তার দাদু। কথাটার মানে ও বোধ হয় জানে না তাই রক্ষে, নইলে তার কাছেই হয়তো যেতে চাইতো না।

ভাগ্য ভাল। বৃষ্টি দেখে রমণী এই মাত্র বাড়ী ফিরেছে। ব্যাপার সব ব'ললুম। সে রাজী হ'লো আসতে, কিন্তু দেরী হ'লো কিছু।

তাকে নিয়ে যখন বাড়ী এসে পৌছলাম, তখন বেশ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো, আর তেমনি বাতাস। দেখি, পাড়ার আরো দু'চারটি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এসেছেন। বোধহয় বিন্দুই তার মা'র আদেশে তাঁদের খবর দিয়েছে। ছোটকাকা, দীনবন্ধু ঠাকুর, ও-পাড়ার বিশ্বেশ্বর জ্যাঠা ও জ্যাঠাইমা, কাঁসারি পাড়ার নিতাই অবধি এসে জুটেছে। কাকা একটু ঝাড়-ফুঁ জানেন, দীনু ঠাকুর চাল-পড়া ডাব-পড়া দেয়, জ্যাঠা কোনো কবিরাজের বাড়ীর ভাড়াটে ছিলেন ত'ই আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান তর্কের অতীত। নিতাই সাপের ও ভূতের রোজা। বুঝলাম কেন এদের ডাকা হ'য়েছে। আমরা আসার পূর্ব্বে অনেকেই তাঁর বিদ্যে জাহির ক'রবার চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয় নি। একজন এসে দেখেছেন ব্যবস্থা ক'রেছেন, সফল হন নি আর একজনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তখন নিতাই ভূত নামাচ্ছিল। অকথ্য গাল'গালি আর চীৎকারে খোকার অবসন্ন চোখের পাতা-গুলোও মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিলো।

রমণীকে দেখে সবাই আশ্বস্ত হ'লেন। সবাই মিলে পরামর্শ আরম্ভ ক'রলেন, হয়েছে কি। এম্নি অবশ কেমন ক'রে হ'তে পারে।

রমণী আমায় জিজ্ঞেসা ক'রলো, ও ক'রেছে কি সারাদিন ব'লতে পারো?

অনুতপ্ত স্বরে ব'ললাম, সারাদিন ভাই আজ আর দেখবার সময় পাইনি।...

ওর মা জ্যাঠাইমাকে দিয়ে বলালো, সারাদিন একরকম খেলেই বেড়িয়েছে। সাধারণত ও খেলে জলটল নিয়ে। প্রায়ই ওপাশের কাঁঠাল গাছের ঝরা গুটি কুড়িয়ে আনে, নয় তো ইঁটের টুক্‌রো চটা সিমেণ্টের কুচি এই সব সংগ্রহ করে। খেলার সাথী তিনুর মেয়েটা।

ওর আবোল-তাবোল কাটা কাটা কথা, চক্ষু লাল ইত্যাদি দেখে ডাক্তার ব'ললো, কিছু খেয়েছে-টেয়েছে নাকি?—বুক পেট পিঠ সমস্ত পরীক্ষা ক'রেও কিছু মেলে না, অথচ নাড়ীর গতি খুব ক্ষীণ।

ডাক্তার আবার ব'ললো, কিছু খেয়েছে নিশ্চয়। ওকে বমি করাতে হবে।

আরম্ভ হ'লো বমি করাবার চেষ্টা। আঁষ-জল থেকে আরম্ভ ক'রে যতো রকম প্রক্রিয়া তখন সম্ভব সবটাই দেখা হ'লো। তার পর এক সময়ে খোকা হুড়্ হুড়্ ক'রে বমি ক'রতে লাগলো। সে কি বমি! ঐটুকু ছেলে পনেরো মিনিট ধ'রে অনর্গল বমি ক'রে চ'লেছে। ছোট্ট শরীর ওর বেঁকে কুঁচকে কদাকার হ'য়ে উঠলো। আমি ধৈর্য্যহীন হ'য়ে প'ড়ছিলাম। কিন্তু ওর মা শক্ত; কঠিন হাতে বুকের মধ্যে চেপে গলায় আঙুল দিয়ে সে ছেলেকে বমি করাতে লাগলো।

বেরলো এগারটা ধুতরোর বিচি। রমণী ব'ললো, এর জন্যেই অমন ক'রছিল। ঘুমিয়ে পড়ে নি তাই রক্ষে। তাহ'লে তোমরা বুঝতেও পারতে না। আর যদি এর একটা গোটা বিচি চিবিয়ে খেতো তাহ'লেও এতক্ষণে আর ওকে বেঁচে থাকতে হ'তো না।

ধুতরোর বিচি চুষতে বেশ মিষ্টি লাগে। ছেলেমানুষ চুষে চুষে একে একে এগারোটা বিচি খেয়ে ফেলেছে। আর খেয়েছে জল। নিজের ওপর রাগ হ'লো, এই গাছগুলোকে আমি কেন সাবাড় করি নি। খুড়ীমার মেয়ে ধুতরোর ফুল দিয়ে রোজ শিবপুজো করে। তারই অনুরোধে চারপাশে এগুলো জঙ্গল ক'রে ফেলেছে। শিবপুজো ক'রলে শিব সন্তুষ্ট হন আর শিবের মত বর হয়। শিব তার ওপর কতটা সন্তুষ্ট হ'য়েছেন জানি না; কিন্তু খোকাকে শিব পেতে ব'সেছিলেন এটুকু বুঝতে অসুবিধে একটুও হয় নি।

ইংরাজী পত্র-সাহিত্যের দুই মহারথী

শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র

ইংরাজী সাহিত্যের খ্যাতনামা কবিদের মধ্যে উইলিয়ম্ কাউপার্ অন্যতম। সাহিত্য আলোচনায় তাঁহার কবিতার উৎকর্ষের সহিত তাঁহার পত্রাবলীর উৎকর্ষের তুলনা করা হয়, কিন্তু আমি তো বলি সেই সব পত্রাবলীর গুণের-মাপ-কাঠিতে সেই সব কবিতার তুলনা হওয়া উচিত। কাউপারের পত্র পাঠ করিতে আমার খুবই ভাল লাগে। ল্যাম্ব্ ও অ্যাডিসন্ ইংরাজী গদ্য-সাহিত্যের নামজাদা লেখক; তাঁহাদের প্রবন্ধের মতনই কাউপারের পত্র ইংরাজী গদ্য-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ্। ইংরাজী ভাষায় আমার দখল অতীব সাধারণ, কিন্তু তবুও কাউপারের পত্রাবলী আমার খুব ভাল লাগে—ইহাই এই পত্রগুলির সব চেয়ে বড় গুণ।

আন্‌উইন্ জায়া ছিলেন অকৃতদার কাউপারের বন্ধুপত্নী ও আশ্রয়দাত্রী এবং বান্ধবী ও গৃহসঙ্গিনী। কবি তাঁহাকে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেন,—তাঁহাকে ‘মেরী’ বলিতেন; কবির প্রতি মেরীর দরদ ছিল অসীম। কবি বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত ছিলেন এবং একাধিকবার উন্মাদ-রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার জীবনী আদৌ হৈ-চৈয়ের জীবনী নহে। তিনি মেরীর তত্ত্বাবধানে জীবন কাটাইতেন। চিঠি লেখাটাই ছিল বিষাদবায়ু-রোগীটীর একটা প্রধান কায। এই চিঠিগুলি কখনও ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত হইবে, ইংরাজী সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে, ইহা কাউপার কখনও ভাবেন নাই। তিনি পত্র লিখিতেন, কারণ পত্র লেখার প্রয়োজন তিনি অনুভব করিতেন; যাঁহাদিগকে তিনি পত্র লিখিতেন তাঁহাদের প্রতি তিনি অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারা দূরে থাকিলেও তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে তাঁহার মন চাহিত। এই কারণে কাউপারের পত্রাবলীতে পোষাকী ধরণ আদৌ নাই। তিনি চিন্তা করিয়া পত্র লিখিতেন না, নিজ প্রয়োজনমত তিনি তাঁহার বক্তব্য পত্রস্থ করিতেন। এই সব পত্র পুস্তক আকারে পরে প্রকাশিত হইবে, কত লোক পাঠ করিবেন, এই সব পত্র-রচনা সম্বন্ধে কে কি বলিবেন, এই সব কথা কাউপারের মনে উদিত হয় নাই; সুতরাং তাঁহার পত্রাবলীর সরলতা লোকদেখান নহে, আর সেই কারণে পত্রাবলীর ভাষাও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

কাউপার্ প্রয়োজনবোধে পত্র লিখিতেন, অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া চিঠি লিখিতেন; তাঁহার পত্রাবলীর মূলে এই স্বভাবজ প্রেরণা ছিল। কিন্তু তাঁহার কবিতার মূলে ঈদৃশ কোন প্রেরণা ছিল না, ইহা কবি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন; ইংরাজী ১৭৮১ সালের ৯ই মে তারিখে জোসেফ্ হিল্‌কে কবি এক পত্র লেখেন, সেই পত্রে তিনি বলিয়াছেন—‘যখন আমি কোন কায খুঁজে পাই না, তখন আমি চিন্তা করি, আর পদ্যে চিন্তা করতেই আমি পটু। তাই, যে সময় কবিতা-কুসুম ফোটে না, সেই সময় আমার কবিত্ব বিকশিত হোয়ে আমার গলায় হৈমন্ত মালা পরিয়ে দেয়। এই বিষয়ে সমসাময়িক কবিরা ও আমি সমতুল্য নই। যখন আকাশে-বাতাসে চারিদিকে আনন্দ খেলে বেড়ায়, যখন প্রাণে স্ফূর্ত্তি নেচে ওঠে, তখন তাঁরা কবিতা লেখেন; আর যখন লরেল্‌পাতায় তুষারবিন্দু ঝুলে থাকে, যখন কোন বুদ্ধিমান্ লোক কাল পাখীর ডাক শোনবার আশা করেন না, তখন আমি ছন্দের বাঁধুনী বাঁধি।” লেডি অসটিন্ একদিন একটা মজার গল্প বলেন, আর কবি সেইটাকে ‘জন্ গিল্‌পিন্’ নামক হাস্য-রসময় কবিতায় গাঁথিয়া ফেলেন। ‘দি সোফা’ নামক কবিতা কাউপারের আর একটী সুপরিচিত রচনা। এই কবিতাটী উক্ত মহিলারই অনুরোধে রচিত হইয়াছিল, এই কারণে কবি নিজেই কবিতাটীর নামকরণ করিয়া গিয়াছেন ‘দি টাস্ক্’ অর্থাৎ হুকুম তামিল বা কর্ত্তব্য সম্পাদন। কবিতাটীর প্রথম কলিতে কবি প্রথমেই বলিয়াছেন—‘সোফার গান গাইছি এবার,’—কলির শেষে বলিয়াছেন—‘যদিও ইহা তুচ্ছ বিষয়, তবুও মহান গর্ব্বের কথা। রমণী বলেছে, গাহ এই গান।’

কিন্তু তাঁহার পত্রাবলী সময় অতিবাহিত করিবার জন্য লিখিত হয় নাই, অথবা বান্ধবীর হুকুম তামিল করিবার জন্য রচিত হয় নাই। কবি তাঁহার পত্রাবলীতে নিজ জীবনের কত কথাই না লিখিয়া গেছেন—বোধ হয়, সব কথাই লিখিয়া

য়েছেন। লতা-কুঞ্জের কাঁচের ঘরের আর রান্নাঘরের শার্শির কাঁচ কাটিবার জন্য কাঁচ-কাটা পেন্সিল্ চাহিতেছেন—মিল্টনের কবিতা সম্বন্ধে জন্‌সনের সমালোচনার আলোচনা করিতেছেন, পুস পালিয়েছে, আর তাকে কেমন কোরে ধরে আনা হয়েছে, এই কাহিনী বলিতেছেন, নীতি উপদেশ দিতেছেন—নিজের কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইবে, এই সুসংবাদ পাঠাইতেছেন, বাগানের কুঞ্জ-গৃহটী কেমন পরিপাটি ভাবে বৈঠকখানায় পরিণত করেছেন আর সেখানে কেমন আনন্দে অবসর কাটাচ্ছেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন; আবার কোন চিঠিতে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আলোচনায় রত হইয়াছেন। স্তুতি, নিন্দা, সুখ-দুঃখের কথা, পরামর্শ দান, পরামর্শ গ্রহণ টাকাকড়ির কথা, ঠাট্টা-তামাসা, রোগের কাহিনী, জন্মদিনের আনন্দ, সব কিছুরই খোঁজ তাঁহার পত্রাবলীতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য দলাদলির কথাও তিনি বাদ দেন নাই, বিবাদ ও সম্প্রীতির কথা লিখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। একটা ডেস্ক্ তাঁহার জন্য আনীত হইয়াছে, এই সংবাদটুকুন তিনি আনন্দের সহিত পত্রস্থ করিয়াছেন এবং তৎপূর্ব্বে বইয়ের তাড়ার উপর কাগজ রাখিয়া তিনি কেমন স্বচ্ছন্দে লিখন কার্য্য করিতেন, তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন।

কবির মাতুল কন্যা বড্হাম্ জায়া কবিকে কবির পরলোকগতা জননীর প্রতিকৃতি উপহার দেন। সেই প্রতিকৃতি পাইয়া কবি তাঁহার ভগ্নীকে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি বলিয়াছেন, 'যে ফুল শুকিয়ে গেছে, বৃন্তচ্যুত হয়েছে ভেবেছিলাম, সে ফুল দেখছি এখনও ফুটে রয়েছে; ইহা তোমার কাছ থেকে পাওয়া, তোমার কাছ থেকে জানা, সেই জন্য আমার আনন্দটা আরও বেশী। তুমি যখন ছোট্ট ছিলে তখন আমার বড় আদরের ছিলে, এখন তো আর ছোটটী নও, কিন্তু তাই বোলে তোমার প্রতি আমার স্নেহ বিন্দুমাত্র কমে নি। যাদের সঙ্গে আমার মায়ের সম্বন্ধ আছে, তাদের সকলকেই আমি ভালবাসি; তুমি তাঁর ভাইয়ের মেয়ে—এক পর্য্যায় তফাৎ, সেই জন্য তোমাকে ভালবাসি, আর তোমার নিজের জন্য তোমাকে আরও বেশী ভালবাসি। তুমি যে ছবিটা আমাকে উপহার পাঠিয়েছ, ওর চেয়ে আর অন্য কোন জিনিষ আমার কাছে বেশী প্রিয় হোত না। পরশু রাত্রে আমি ছবিখানি পেয়েছি; ছবিখানি দেখে আমার বুক কেঁপে উঠল, সত্যিকার মানুষটী দেখা দিলে আমার অবস্থা যেমন হোত। আমি ছবিটীকে চুম্বন করলাম (ইহাই ইংরাজী প্রথা)। শয়নের পূর্ব্ব—রাত্রে, যেখানে আমার শেষ নজর পড়ে সেইখানে আমি ছবিটীকে টাঙিয়ে রেখেছি, অবশ্য সকালে উঠেই সেইখানে আমার প্রথম নজর পড়ে। আমার ছয় বছর বয়সের সময় মা পরলোক গমন করেন, কিন্তু তবুও তাঁকে আমার বেশ মনে আছে, ছবিটী ঠিক হয়েছে, একথা আমি সঠিক বলতে পারি। মায়ের কাছ থেকে যে, কত আদর পেয়েছি, তা' আমার সব মনে পড়েছে; তাঁর স্মৃতিটুকুন্ আমার কাছে এত মধুর হোয়ে আছে যে, আমি বাক্যে প্রকাশ করতে পারছি না। আমার রক্তে কাউপার্-বংশের ধারা অপেক্ষা ডনি-বংশের (কবির মাতুল বংশ) ধারা প্রবল; যদিও আমি দু'টো ধারাকেই ভাল বলি, এবং আমার নিজস্ব ধারাটা আমার কাছে—নানা কারণে—সব চেয়ে ভাল, তবুও তোমাদের দিকে আমি বড্ড বেশী ঝুঁকে পড়ি। শৈশবে আমি না কি মায়ের মতন দেখতে ছিলাম; আর আমার স্বভাবের কথাটা, এই আটান্ন বছর বয়সে, ভাল ভাবেই বিচার কোরে বলতে পারি যে, সেটা অনেকটা আমার মা আর তোমার ঠাকুর, আমার পরলোকগত মাতুলের স্বভাবের মতন। মাতুলের কড়া মেজাজ, এবং জননী ও মাতুল, বোলব কি না বুঝতে পারছি না, নিজের সুখ্যাতি করতে চাই না, কিন্তু তোমার কাছে সঙ্কোচ নেই, সেই জন্য বলছি, তাঁদের দুই জনের ভদ্র স্বভাব আমি পেয়েছি। আর একটা কথা ডনি-বংশের পূর্ব্বপুরুষ সেণ্টপলের ডিন মহাশয়ের মতন আমি কবিতা রচনা করি এবং আমার মনে হয়—সকল দিক্ থেকে আমি ডনি বংশের মতন, আসল কথা—আমি যেমনতরই হই না কেন, আমি তোমাদের সকলকেই ভালবাসি।'

কাউপারের কবিতাবলীর সুখ্যাতি সকল ইংরেজ সমালোচকগণ করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ কাউপারের পত্রাবলীর অধিক সুখ্যাতি করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন, একটা কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কাউপার যদি খ্যাতনামা কবি না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পত্রাবলী প্রকাশিত হইত না। আমি প্রথমেই বলিয়াছি, ইহাই হইল

কাউপারের পত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য, জনসমক্ষে প্রকাশিত হইবে, এই আশা বা উদ্দেশ্য লইয়া পত্রগুলি লিখিত হয় নাই।

কাউপারের জন্ম ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর, এবং অ্যালেক্জান্দার্ পোপ জন্মগ্রহণ করেন, ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে, কিন্তু, কাউপারের পত্রাবলীর আলোচনায় পোপের নাম স্বতই মনে আসে, কারণ ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে পোপও ছিলেন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি, এবং পত্র-সাহিত্যে তিনি ছিলেন কাউপারের ঠিক বিপরীত। পোপ কৃত্রিম পত্র রচনা করিয়াছিলেন—বন্ধু-বান্ধবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আসল পত্রের স্থানে তৈয়ারী পত্র চালাইয়াছিলেন। আসল পত্রের রচনার অংশ ও তারিখ অন্তের অজানিত ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পোপ এ হেন পত্রাবলী কৌশলে কার্ল্ নামে এক অপযশস্বী পুস্তক-ব্যবসায়ীর দ্বারা প্রকাশ করাইয়াছিলেন এবং পরে নিজেও উহার আর একটী সংস্করণ বাজারে বাহির করিয়াছিলেন। পোপের জীবনকালেই কেহ কেহ এই বিষয়ে সন্দেহমূলক দুই এক কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু পরে ডিলক্ ও এল্উইন্ তাঁহাদের সপ্রমাণ আলোচনার দ্বারা পোপের এই জঘন্য আচরণ লোকসমাজে ব্যক্ত করিয়া দেন। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণামূলক ব্যাপারে পোপ একাধিকবার লিপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পত্রাবলীর ব্যাপারটা সে সকলের চরম। পোপের পত্রাবলীর ব্যাপারটা একটা লজ্জার ব্যাপার, কিন্তু ইংরেজ সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ইহার জন্য পোপকে পুরাপুরি কলঙ্কী করা যায় না, কারণ পোপের যুগে ইংলণ্ডে এই রকম একটা ব্যাপার এমন কিছু অঘটন ঘটনা নয়; এই সম্বন্ধে কোন কথা বলা বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে শোভা পায় না, কারণ বর্ত্তমান লেখক লর্ড মেকলে নহেন এবং ইংরেজও বাঙালী নহেন।

পরিত্যক্তা

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

খুঁজিয়া বেড়ানু নদী-তীরে তীরে কতদিন বালুচরে,
কভু কাশবনে, কভু বনছায়ে, মিলিল না তবু তারে।
কেতকী কুসুমে ভরা বনতল উজাড়ি দেখিনু সবি,
পথপাশে রহি ক্ষণিক দাঁড়ায়, যেন প্রাণহীন ছবি।
শুধানু ডাকিয়া আকুল হিয়ায় দখিণের সমীরণে,
কোন্ পথে গেছে প্রিয় কহ মোর, কিছু আছে কিগো মনে?
সুতায় সুতায় চম্পা চামেলি শুকায়ে যেতেছে ওগো,
তবু কি কেবলি নয়নের পর রবে চির-মায়ামৃগ?
প্রদীপ দূরের দেবালয় মাঝে, হ'য়ে আসে নিভু নিভু,
রজনী পোহায় বিরহ-দুঃখে, ধরা দিলে নাকো তবু।
কুন্তল খসি চুমে ভূমিতল, হই যেন দিশেহারা,
নীরব নিশায় জাগি ওঠে ধীরে সুদূরের শুকতারা।
নিথর নয়নে তারি পানে চাহি, ভাবি যেন চিনি চিনি,
একদিন এই লেগেছিলো ভালো নূপুরের রিনিঝিনি।
একদিন তাই বেসেছিলে ভালো, নিবিড় প্রেমের ডোরে
পলকে পলকে নবীন পুলকে তাই বেঁধেছিলে মোরে।
সেইদিন তব সহিত না প্রাণে ক্ষণিক বিরহ-ব্যথা,
বুঝেছি সে ছিলো শুধু অভিনয়, প্রেমের পুরাণো কথা।
পালাইলে তাই বাঁধন ছিঁড়িয়া, ওগো মম মনচোর,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হই আমি নিশি হ'য়ে এলো ভোর।

কৃত্তিবাস

শ্রীকালিদাস রায়

কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই রামায়ণই আমরা পাই না, এ কথা সকলেই জানেন। তিনি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়া একখানি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। পরে নূতন নূতন গল্প রামায়ণের মধ্যে ঢুকিয়াছে—বিশেষতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর সমস্ত রামায়ণখানি বৈষ্ণব ভাবের তুলসীপত্রে সুবাসিত হইয়া পড়িয়াছে এবং হরিভক্তি মূলক অনেক উপাখ্যান উহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রাক্ষসদের মধ্যে বিষ্ণু-ভক্তির আতিশয্য থাকিবার কথা নয়; আর্য্য রামায়ণে নাই, কৃত্তিবাসের পুঁথিতেও ছিল না। এইগুলি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব রামায়ণ-রচয়িতাদের সৃষ্টি। দেশে বৈষ্ণব ভাবের বন্যা বহিয়া যাওয়ার পর জনসাধারণের চাহিদাতেই ঐরূপ উপাখ্যান রচিত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী রামায়ণ-রচয়িতাদের রচিত কোন্ কোন্ অংশ কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং কৃত্তিবাসের রচনারও কোন্ কোন্ অংশ পরবর্ত্তী রচয়িতারা গ্রহণ করিয়াছেন এ বিষয়ে এখনও সূক্ষ্মরূপে গবেষণা হয় নাই।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাব ও ভাষার অনুসরণেই পরবর্ত্তী রামায়ণ-প্রণেতারা স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা একমাত্র বাল্মীকিকেই আশ্রয় করেন নাই। তাঁহারা জৈন রামায়ণ, অধ্যাত্ম পুরাণ, তুলসীদাসের রামায়ণ ইত্যাদি হইতেও কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেনের রামায়ণ, কবিচন্দ্রের রামায়ণ, জগৎরামের রামায়ণ, শিবচন্দ্র সেনের সারদামঙ্গল ইত্যাদি বহু রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। অমৃতকুণ্ডা গ্রামের নিত্যানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ কবি একখানি রামায়ণ রচনা করিয়া অদ্ভুতাচার্য্য আখ্যা প্রাপ্ত হ'ন। ইনি সীতাকে কালীর অবতার বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সম্প্রতি ঢাকা হইতে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদিকাণ্ডের একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন—তাহাতে অদ্ভুতাচার্য্যের বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের ভাবার্থ—"অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গে পঠিত হইত, কৃত্তিবাসের প্রতিপত্তি ছিল দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে। অনেক স্থলে দুই রামায়ণের একটা মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এইরূপ সঙ্কর পাঠের পুঁথিই পরিমার্জ্জিত করিয়া শ্রীরামপুরের মিশনারীরা মুদ্রিত করিয়াছিল। তাহাই কৃত্তিবাসের নামে বর্ত্তমান সময়ে চলিতেছে। কৃত্তিবাসের তুলনায় অদ্ভুতের রচনা তরলতর ও চটুলতর। কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ ও রামলীলা-মূলক সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য ও নাট্য হইতে তাঁহার বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্ভুত মূল উপাখ্যানের বাহিরের অনেক সরস, চিত্তাকর্ষক জনপ্রিয় উপাখ্যান রামায়ণের মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রচনায় কোন অঙ্গে দৈন্যও নাই, আতিশয্যও নাই—অদ্ভুতের রামায়ণে আবেগোচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি আছে এবং পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্যের দৈন্য আছে। কৃত্তিবাসের কল্পিত চরিত্রগুলি অনেকটা মূল রামায়ণের সঙ্গে সুসমঞ্জস, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের চরিত্রগুলি মূল ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাঁহারা পুরাদস্তুর বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী চরিত্রের হৃদয়বত্তা, আবেগাকুলতা, ভাববিহ্বলতা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতাও সেগুলিকে আশ্রয় করিয়াছে। কাব্যরসের দিক হইতে বিচার করিলে অদ্ভুত অনেকাংশে কৃত্তিবাসকে পরাভূত করিয়াছেন।"

রঘুনন্দন গোস্বামী কৃত রামরসায়ন একখানি উৎকৃষ্ট রামায়ণ। গোস্বামী প্রভুর রচনা, অতএব ইহা বৈষ্ণব ভাবে অতিরঞ্জিত এবং বহুস্থলে ইহাতে ভাগবতের ছায়াপাত হইয়াছে। কৃত্তিবাস বা অদ্ভুতের রামায়ণের মত এই রামায়ণ তেমন প্রাঞ্জল নয়। কবি শোকের দৃশ্যগুলিকে তাঁহার রামায়ণ হইতে বাদ দিয়াছেন। বৈষ্ণব হইয়া পাঠকের মনে কষ্ট দিবেন কি করিয়া!

সপ্তদশ শতাব্দীতে রামানন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি এক অদ্ভুত রামায়ণ লেখেন—তাঁহার পরিচয় আমরা দীনেশ বাবুর মারফতে প্রাপ্ত হই। ইনি নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার

বলিয়া জাহির করিতেন—পুরীর জগন্নাথ দেবকে বুদ্ধদেবেরই দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি বলিয়া তিনি প্রচার করিতেন। মুসলমানগণ এই মন্দির ও মূর্ত্তির অবমাননা করিয়াছিল এবং বৈষ্ণবগণ উঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করে, সেজন্য এই 'নবীন বুদ্ধদেবের' ক্রোধ ঐ দুই সমাজের উপর। রামচন্দ্রকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রামায়ণে মুসলমান ও বৈষ্ণবদের প্রতি দারুণ উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি বিলীয়মান বৌদ্ধসমাজের একজন নেতা ছিলেন। তাঁহার রামায়ণে কবিত্বের তুলনায় আস্ফালনই খুব বেশী।

এই যে বহু নূতন নূতন রামায়ণ রচিত হইয়াছিল ইহারা সব গেল কোথায়? অনেকগুলির রচনা কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে অপকৃষ্টও নয়—শুধু কৃত্তিবাসের রামায়ণই চলিল এবং অপরের যাহা কিছু ভাল তাহা কৃত্তিবাসের নামেই চলিয়া গেল। ইহার কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ বোধ হয়—কৃত্তিবাস বঙ্গদেশের সভ্যতম-হিন্দুজনবহুল অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রামায়ণকে বাঁচাইয়া রাখিবার লোকের কোন দিন অভাব হয় নাই। বাল্মীকির রামায়ণের সহিত অধিকাংশ স্থলে সাদৃশ্য থাকার জন্য শিক্ষিত লোকেরা এবং অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া অশিক্ষিত লোকেরা কৃত্তিবাসের রামায়ণই ভালবাসিত। অশিক্ষিত লোকেরা রামায়ণ শোনে বটে, কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা না বাঁচাইলে এবং না পড়িয়া শুনাইলে তাহারা কি করিয়া এ সৌভাগ্য লাভ করিবে? যে অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী ছিল, কৃত্তিবাস সেই অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার রামায়ণ সেই অঞ্চলে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল।

কৃত্তিবাস নিজেই আত্মপরিচয় লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রাচীন পুঁথি হইতেই পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়—কৃত্তিবাসের কোন পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পৌত্র মুরারি ওঝা তাঁহার পৌত্র কৃত্তিবাস। ইনি নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি তৎকালীন গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার আদেশে ইনি রামায়ণ রচনা করেন। এই গৌড়েশ্বর কে তাহা জানা যায় না তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হন—বিশেষজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। আত্মচরিত হইতে এই জানা যায় যে, তিনি কোন ঐহিক লাভের আশায় গৌড়েশ্বরের সভায় শ্লোক পাঠ করেন নাই। রামায়ণ রচনার জন্য কোন বৃত্তিও তিনি গ্রহণ করেন নাই। 'গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।' এজন্যই গৌড়েশ্বরের সভায় আপনার কবি কৃতিত্ব দেখানোর প্রয়োজন হইয়াছিল।

পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথা গৌরব মাত্র সার॥

ইহা হইতে বুঝা যায় কবির যাহা শ্রেষ্ঠ কাম্য অর্থাৎ গৌরব, তাহা ছাড়া কৃত্তিবাসের কিছুই প্রার্থনীয় ছিল না।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের 'খোল নলিচা' দুই-ই বদলাইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণ কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রজ সন্তান—আজকাল অনেকের ইহাই অভিমত। কিন্তু একথাও খুব জোর করিয়া বলা যায় না। ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ইহাকে ঢালিয়া সাজিয়াছেন। নূতন নূতন প্রসঙ্গ যে উহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং অনেক অংশ বর্জ্জিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু মূল উপাখ্যানটি বজায় না থাকিবে কেন? ভাষা যদি বদলাইয়া থাকে তবে বহিরঙ্গেরই বদল হইয়াছে। যাঁহার রামায়ণের এত নাম, এত প্রচার, তাঁহার রচনা কিছুই থাকিবে না, ইহা ভাবিবার কি কারণ আছে? যাহাই হউক, নানা প্রকার প্রক্ষেপ সত্ত্বেও বর্ত্তমানে প্রচলিত রামায়ণের মূল উপাখ্যানটিকে কৃত্তিবাসের বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রনাথ বসুর কথায় বলা যাইতে পারে—"ভগীরথ সমানীত স্রোতের পূর্ব্ববারি এক্ষণে কণামাত্র না থাকিলেও ভাগীরথী যেমন পূজিত, কৃত্তিবাস-প্রণীত রামায়ণের পংক্তিমাত্র না থাকিলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ সেইরূপ সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে।"

সাহিত্য-পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের কতকটা ও উত্তরাকাণ্ড সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাকে খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ঢাকার ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত আদিকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রচলিত সংস্করণের উপাখ্যানগুলি মোটামুটি মিলে, কিন্তু ভাষা মিলে না। এই ভাষার অমিল শুধু পংক্তিগত নয়, মনে হয় পরে উপাখ্যানগুলি অর্ব্বাচীন যুগের ভাষায় পুনর্লিখিত হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণের তুলনায় ভট্টশালী মহাশয়ের সংস্করণে বাল্মীকির অনুসৃতি নিকটতর বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রারম্ভ বাল্মীকির রামায়ণের মতই। রত্নাকরের কাহিনী নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা ইহাতে আছে। বিশ্বামিত্র, সৌদাস, অম্বরীষ, শুনঃশেফের কাহিনী মূল রামায়ণের মত সুবিস্তৃত না হইলেও ইহাতে আছে। বাল্মীকির রামায়ণে নাই, প্রচলিত রামায়ণে নাই এমন দুই একটি নিবন্ধও ইহাতে আছে যেমন—রাবণ ও তাহার ভ্রাতা ভগিনীদের জন্ম-কথা। বানরগণের জন্ম প্রচলিত রামায়ণের আদিকাণ্ডেই আছে, ইহাতে নাই। মূল রামায়ণে ও পরিষৎ প্রকাশিত রামায়ণে এ সমস্ত উত্তরাকাণ্ডের অন্তর্গত। প্রচলিত রামায়ণে চন্দ্রবংশের রাজাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার পরে দশরথের কথা আছে। এই রামায়ণে এ বিষয়ে বাল্মীকিকেই অনুসরণ করা হইয়াছে। এই সংস্করণে আর্য্য রামায়ণের মত অযোধ্যা বর্ণনা আছে কিন্তু তাহার সহিত মূলের কোন মিল নাই। এই বর্ণনা বাঙ্গালার অন্যান্য কাব্যের নগর বর্ণনারই প্রতিধ্বনি।

প্রচলিত রামায়ণের তুলনায় ভট্টশালী-সম্পাদিত প্রাচীন রামায়ণে সুমিত্রা প্রসঙ্গ অনেকটুকু স্থান অধিকার করিয়াছে। সুমিত্রার বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার গর্ভধারণ পর্য্যন্ত বেশ একটি কাহিনী ইহাতে আছে। প্রচলিত রামায়ণে ঐ প্রসঙ্গ সংক্ষেপেই বিবৃত হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে বেদবতীর সীতারূপে জন্মগ্রহণের কথা অতি সংক্ষেপে এবং ইহার সঙ্গে উর্ব্বশীর কথা ও জনকের ব্রহ্মচর্য্য-হানির কথা আছে। এই রামায়ণে উর্ব্বশী প্রসঙ্গ নাই, রাবণ-ধর্ষিতা বেদবতী পুড়িয়া মরিলে চিতায় একটি অগ্নিপুত্তলা থাকিয়া গেল। রাবণ সিন্দুকে পূরিয়া উহা সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিল। তাহাই ভাসিতে ভাসিতে কূলে ঠেকিয়া সমুদ্রের চড়ায় নিহিত ছিল। জনকের হলের মুখে ঐ সিন্দুকটি উঠিল। মূল রামায়ণে এসব কিছুই নাই। কেবল হলমুখে মৃত্তিকা হইতে সীতার উত্থানের কথা আছে। বেদবতীর উপাখ্যান মূল রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে আছে।

আসল রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে যে সকল কথা সংক্ষেপে আছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা বিস্তৃত করিয়া বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। উত্তরা কাণ্ডে যে সকল কাহিনী বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের পুঁথির রামায়ণে পয়ার পংক্তিগুলিতে মাত্রার সংখ্যার বেশি কম আছে—প্রচলিত রামায়ণে সেগুলিকে চৌদ্দ মাত্রায় পরিণত করা হইয়াছে। আসল রামায়ণে খাঁটি বাংলা শব্দের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়—প্রচলিত রামায়ণে সেগুলির বদলে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে বহু স্থলে রসান দেওয়া হইয়াছে এবং রঙ্গরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কবিত্বের দিক হইতে অনেকস্থল যে তাহাতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হয়। আবার অনেক স্থল অতিরিক্ত কুরুচি-বিড়ম্বিত হওয়ায় কৃত্তিবাসের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যে আমরা দেখিতে পাই—এক পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠা ধরিয়া নামের তালিকা। কৃত্তিবাস সেকালের প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন। প্রচলিত সংস্করণে নামের তালিকাগুলি বর্জ্জিত হইয়াছে।

পরিষদের রামায়ণে সংজ্ঞাবাচক নামগুলির বিকৃত বানান দৃষ্ট হয়। যেমন—কার্ত্তিকবীর্য্য (কার্ত্তবীর্য্য), জরাসিন্ধু (জরাসন্ধ) হরিহয় (হৈহয়) ঋষ্যমুথ (ঋষ্যমূক) মেঘবান্ (মঘবান্) কৃত্তিবাসের আসল রামায়ণের ভাষা অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য। যেমন—লেঙ্গে ডাবুশ মারে কাণ্ড চিয়াড়ি। পারা মাদল ভেরু, দোসরি কাহাল। হাত কুড়াইলেক রাজা নিকলিল পানি। বিহঙ্গে বিহঙ্গে বার সাণ্ডাইল ভিতরে। গাহল ধৌলল পড়িল চিলচণ্ডা জাতি। কৃত্তিবাসের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ নগরে অপরিচিত হইয়া গিয়াছে—আমাদের পল্লী অঞ্চলে আজিও চলে। যেমন—রা কাড়া, হাঁকার, গোহারি, বিহান, ঝিল (চিতা), কাঁকতলা, থাম্বা, ডাল, রাঁড়, অথান্তরে, জুয়ায়, ডাগর, পাতিল, পাখলানো।

বাঙ্গালী কৃত্তিবাস—দেব, দানব, রাক্ষস, বানর যাহাদের কথাই বলুন না কেন, ভোজনের কথাটা কোথাও ভুলেন নাই। মধুদৈত্যের গৃহে রাবণ কুম্ভিনসীর পাক-করা ভাত-ডাল না খাইয়া বল পাইতেছে না। পাতালে বলির গৃহে খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রাবণ দাসীদের দেওয়া

এ'টো ভাত খাইয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। ইন্দ্রের মহিষী শচীর গর্ভাবস্থায় পরমান্ন চাই। 'পরমান্নে সম্ভাবনা জানে দেবগণ। সেই পরমান্ন শচী করিল ভক্ষণ।'

ঋষি গৌতম অহল্যার স্বামী হিসাবে ব্রহ্মার জামাতা। তিনি ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন—ব্রহ্মা তখন "ব্রহ্মাণীরে বলে ঝাট করহ রন্ধন। জামাতারে নানা দ্রব্য করাও ভক্ষণ।" হিমালয়-গৃহে নারদের সঙ্গে শিব আহারে বসিয়াছেন—নারদ বলিতেছেন, "পিষ্টক পরমান্ন আনি আর তাহাতে দেহ ভাত। দধি দুগ্ধ ঘৃত দিতে না করিও হেলা। ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দেহ মর্ত্তমান কলা।" বানরদেরও ফলমূলে চলিতেছে না। "অঞ্জনা রন্ধন কৈল পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। চারি বীর মহা সুখে কহিল ভোজন।" অগস্ত্য, ভরদ্বাজ, জমদগ্নি ইত্যাদি মুনির আশ্রমের আতিথ্যে ভোজনেরই বড়াবাড়ি। রামসীতা অযোধ্যায় অশোক-কাননে নর্ম্মবিলাসে জীবন যাপন করিতেছেন—"লক্ষ্মীরূপা সীতা তথা করেন রন্ধন। পায়স, পিষ্টক, অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।" লবকুশ অযোধ্যায় রামায়ণ গান করিতে আসিয়াছেন—কৃত্তিবাস তাহাদিগকেও রন্ধন হইতে অব্যাহতি দেন নাই। "স্নান করি আইলা ভাই দুইজন। মায়ে সোঙরিয়া দোঁহে চড়াইল রন্ধন। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত সুবর্ণের থালে। ভোজন করিয়া দোঁহে হইল সুশীতলে।"

কৃত্তিবাসের নিজস্ব ভাষা কিরূপ ছিল, ঢাকাই সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলে কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

(ক) রাত্রিদিন বাঞা গিঞা পাইল তপোবন।
আশ্রম নিকটে বাসা কৈল ততক্ষণ ॥

(খ) বুড়ী বেশ্যা বোলে এখন নহে গীত নাচন।

(গ) বিভাণ্ডক শাপিঞা পাছে করে সর্ব্বনাশ॥

(ঘ) বসিঞাছেন ঋষ্যশৃঙ্গ বেদ উচ্চারিতে।
বেশ্যা সব দেখিয়া মুনি উঠিলা আস্তে ব্যেস্তে।

(ঙ) আগু বাঢ়াঞা জোড় হাতে করিছেন বিনয়।
কোথা হৈতে আয় তোমরা কোন রূপ হয়॥

(চ) বুঢ়ি বেশ্যা বুলিতে লাগিলা হাস্য-অভিলাষে।
আমি সব মুনি ভ্রমি নানা দেশে দেশে॥

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দ্বারা সুসংস্কৃত ও সংক্ষেপে সম্পাদিত এবং পরে বটতলার মোহনচাঁদ শাল কর্ত্তৃক নিয়োজিত পণ্ডিতগণের দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত পুস্তক বুঝায়।

পরিষৎ প্রকাশিত রামায়ণও প্রচলিত রামায়ণের ভাষার সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্যের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিই—

পরিষদের রামায়ণ—

পূর্ব্বজন্মে ছিল কুঁজী ইন্দ্রের অপ্সরা।
রামের বনবাস হেতু নাম মন্থরা॥
কেকয়ীর চেড়ী সে ভরতের ধাত্রীমাতা।
রাম সীতার দুঃখ হেতু সৃজিল বিধাতা॥
বিভা কালে দশরথ দান পাইল চেড়ী।
রাম রাজা হব বলি করে ধড়ফড়ি॥
আকৃতি প্রকৃতি কুচ্ছিত দেখি তারে।
সব নষ্ট হয় কুঁজী থাকে যার ঘরে॥
যেমতে মরিব রাবণ ধাতা তাহা জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে ডেঁই সে কারণে॥

প্রচলিত রামায়ণ—

পূর্ব্বজন্মে ছিল দুন্দুভি নামে অপ্সরা।
জন্মিল সে কুঁজী হবে নামেতে মন্থরা॥
কৈকেয়ীর চেড়ী ভরতের ধাত্রীমাতা।
রামের দুঃখের লাগি সৃজিল বিধাতা॥
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী।
রাম রাজা হন দেখি করে ধড়ফড়ি॥
আকৃতি প্রকৃতিতে কুৎসিতা দেখি তারে।
সর্ব্বনাশ করে কুঁজী থাকে যার ঘরে॥
মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে সেই সে কারণে॥

পরিষৎ—

কি ব্যথা হইল প্রিয়ে তোমার শরীরে।
বৈদ্য আনিয়া দড় করিব তোমারে॥
কোন কার্য্য লাগি তুমি কর অভিমান।
যে বর মাগিবে তুমি তাই দিব দান॥
এত শুনি কৈকয়ী রাজার পাদ্য আশ।
পূর্ব্বকথা রাজার ঠাঞি করিল প্রকাশ।
ব্যাধি পীড়া হঞা নাঞি পাঞাছি অপমান।
আগে সত্য কর রাজা পিছে মাগি দান॥
কেকয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাঞি জানে।
সত্য করিল রাজা স্ত্রীয়ের বচনে॥

মায়াপাশ স্রালে যেন বনে মৃগী ঠেকে।
প্রমাদ পড়িল রাজা পাছু নাহি দেখে॥
রাজা কন্ কেকয়ী তুমি কি বলিবি বল।
দুই সত্য করি আমি ইথে নাহি ছল॥
যে বর মাগিবে তুমি তাই দিব দান।
আছুক অন্যের দায় দিতে পারি প্রাণ॥

প্রচলিত—

ব্যাধি পীড়া হয় যদি তোমার শরীরে।
বৈদ্য আনি সুস্থ করি বলহ আমারে॥
কোন কার্য্যে কৈকেয়ী কর অভিমান।
আজ্ঞা কর তাহা তোমা করি আজি দান॥
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পাব আশ।
পূর্ব্বকথা তার আগে করিল প্রকাশ॥
রোগ পীড়া নাহি মোর পাই অপমান।
আগে সত্য কর তবে পিছে মাগি দান॥
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে।
সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে।
মহাপাশ লাগি যেন বনে মৃগ ঠেকে।
প্রমাদ পাড়িবে রাজা পাছু নাহি দেখে॥
ভূপতি বলেন প্রিয়ে নিজ কথা বল।
সত্য করি যদ্যপি তোমারে করি ছল॥
যেই দ্রব্য চাহ তুমি তাহা দিব দান।
আছুক অন্যের কার্য্য দিতে পারি প্রাণ॥

পরিষৎ—

আর যত রাজকুমার তাহা নাহি গণি।
দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিৎ ত্রিভুবনে জানি।
ইন্দ্রজিতের ডরে কেহ নহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনিঞা কুম্ভকর্ণের শরীর॥
মাথা কাটিলে না মরে বৈরী না ধরে টান।
হেন বীর থাকিতে কৈলে ইন্দ্রজিতের বাখান॥
কোন তপ করিলেন কাহার পাইলেক বর।
সভা থাকিতে বাখান কেন রাবণ কোঙর॥

প্রচলিত—

মারিল এসব বীর যাহা নাহি গণি।
ইন্দ্রজিতে মারিল যে তাহার বাখানি॥
রাবণ ভ্রাতার ভয়ে কেহ নহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনি কুম্ভকর্ণের শরীর॥
কাটিলে না মরে সে না ধরে দেহ টান।
কুম্ভকর্ণ এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান॥
দশমুণ্ড কাটিয়া পাইয়াছিল বর।
তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর॥

পরিষৎ—

কুম্ভকর্ণ তপ করিল অগ্নি চারি পাশে।
গ্রীষ্ম কালে মাথার উপর সূর্য্য আকাশে।
বর্ষা কালে কুম্ভকর্ণ থাকে একাসনে।
বরিষণের পানিতে বিরতি রাত্রি দিনে॥
শীত কালে থাকে রাত্রে পানির ভিতর।
হেন তপ করিল দশ সহস্র বৎসর॥
দশ সহস্র বৎসর তপ কৈল রাক্ষস বিভীষণ।
গন্ধর্ব্ব গীত গায় দেব করে পুষ্পবরিষণ॥

প্রচলিত—

গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশে।
উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে॥
বরিষাতে চারি মাস থাকে অনশনে।
শিলা বরিষণ ধারা সহে রাত্রি দিনে॥
শীতকালে স্নিগ্ধ জলে থাকে নিরন্তর।
এই রূপে তপ করে নিযুত বৎসর॥
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবরিষণ॥

পরিষৎ—

ইন্দ্র ময়ূর হৈলা কুবের কেকলাস।
যম কাক হৈলা বরুণ হৈলা হাঁস॥
মরুত রাজা যজ্ঞ করে বেড়িঞা লোকে।
সংগ্রাম দেহ সংগ্রাম দেহ রাবণ রাজা ডাকে॥
মরুত বলে আমি তোমা নাহি জানি।
পরিচয় দেহ যেন আমি চিহ্নি—

* * *

পূর্ব্বে ময়ূর ছিল নীল আকার।
ইন্দ্রের বরে সহস্র লোচন হইল তাহার॥

প্রচলিত—

ইন্দ্র হ'ন ময়ূর কুবের কাঁকলাস।
যম কাকরূপ হ'ন বরুণ সে হাঁস॥

যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাসুখে।
রণং দেহি বলি রাবণ মরুত্তেরে ডাকে ॥
মরুত্ত বলেন আমি তোমারে না চিনি।
পরিচয় দেহ আগে তবে আমি জিনি ॥

* * *

পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার।
ইন্দ্র বরে সহস্র লোচন হৈলতার ॥

এই সকল প্রচলিত পাঠ জয়গোপালী পাঠও নয়, ইহাকে মোহন চাঁদী পাঠ বলা যাইতে পারে। জয়গোপালের পাঠকে মোহন চাঁদ পণ্ডিতদের সাহায্যে কালোপযোগী করাইয়াছেন। জয়গোপালী পাঠে ছিল—

পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেন বালী।
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামকে পাড়ে গালি ॥

ইহার মোহনচাঁদী পাঠ হইয়াছে—

রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালী।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি ॥

তুলসীদাসের রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পার্থক্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি। প্রধান প্রভেদ—তুলসীদাসের মতে—রাবণ ছায়া সীতা হরণ করিয়াছিল—আসল সীতা অগ্নির মধ্যেই রহিয়া গেলেন। অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে ছায়া-সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলেন। তখন প্রকৃত সীতা অগ্নি হইতে বহির্গত হইলেন। এইভাবে তিনি সীতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ভক্ত কবির পক্ষে সাক্ষাৎ নারায়ণী সীতার অবমাননার বর্ণনা করা অসম্ভব। জয়ন্ত কাকের উপাখ্যানে তুলসীদাস লিখিয়াছেন,—কাক চঞ্চুদ্বারা সীতার চরণ বিদারণ করিল। বাল্মীকি স্তনের কথা লিখিয়াছেন, ভক্ত ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন।

দুই গ্রন্থের উপাখ্যানাংশে মোটামুটি মিল আছে। বালকাণ্ডের প্রথমাংশে ও উত্তরা কাণ্ডে খুব বেশী অমিল। তুলসীদাসের বালকাণ্ডের প্রথমাংশে হরপার্ব্বতী লীলা অনেকটুকু স্থান জুড়িয়া আছে। প্রতাপভানু রাজা ও স্বায়ম্ভুব শতরূপার কাহিনী আছে। প্রতাপভানু ব্রহ্মশাপে রাবণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। স্বায়ম্ভুব মনু তপস্যার দ্বারা দশরথ হইয়া বিষ্ণুকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন।

উত্তরাকাণ্ড সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রামের রাজ্যাভিষেক, রাম রাজ্যের মহিমা, ভূষণ্ডী কাকের বিবরণ ও নানা প্রকার তত্ত্বকথায় তুলসীদাসের রামায়ণ সমাপ্ত হইয়াছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ, লবকুশের যুদ্ধ, শূদ্রক বধ, লবণ বধ, লক্ষ্মণ বর্জ্জন অগস্ত্যের বিবৃত রাবণাদির কাহিনী ইত্যাদি হিন্দী রামায়ণে কিছুই নাই। এ সকলের বদলে বহু নৈতিক উপদেশ ও তত্ত্বকথা আছে। মাঝে মাঝে শ্রীরামের স্তব আছে। নারদ, সনক, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিগণ শ্রীরামের স্তব করিতেছেন। সীতা-বর্জ্জনের কথাই নাই। ছায়া সীতা গেল লঙ্কাপুরে কায়া-সীতা কেন বর্জ্জিত হইবে? সীতা বর্জ্জন-ও সীতার অবমাননা। ভক্ত কবি সে কথা লিখিতে পারেন না।

তুলসীদাস বালী বা তারার মুখেও রামচন্দ্রের উদ্দেশে একটি কটু কথাও বসান নাই। তিনি আপন উপাস্য দেবতার উদ্দেশে শত্রুর মারফতেও ভক্তিবিরোধী কথা বলিতে চান নাই। তুলসীদাসের রামায়ণে কোথাও অশ্লীলতা বা কুরুচি নাই। ইহার সর্ব্বত্রই কেবল রামের গুণগান—কেবল মিত্রের মুখে নয়, শত্রুরও মুখে। ইহা ধর্ম্মগ্রন্থের মত। আবার এক হিসাবে ইহা কাব্যাংশেও চমৎকার। এমন ছন্দোবৈচিত্র্য ও ভাষার পরিপাট্য কৃত্তিবাসে নাই। তবে কৃত্তিবাসে যেরূপ মনের হৃদয়ের মাধুরী বৈচিত্র্য আছে, তুলসীদাসে তাহা নাই। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে অনেক স্থলে মানব রূপেই দেখিয়াছেন—তুলসীদাস সর্ব্বত্রই রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন।

কৃত্তিবাস অনেক স্থলে সংস্কৃত কাব্যনাট্যের শ্লোকের অনুবাদ করিয়া ভাষাকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের ভাষাকে অনলঙ্কৃত ভাষা বলা যাইতে পারে। তবে সুলভ শ্রেণীর উপমা উৎপেক্ষা মাঝে মাঝে যে নাই তাহা নয়! মেঘ, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, গঙ্গাধারা এই গুলিই তাঁহার উপমার অবলম্বন। স্থলে স্থলে একটু-আধটু বৈচিত্র্য আছে। যেমন—

সীতা মার দেহখানি দেখিলাম ক্ষীণ।
অলসের বিদ্যা যথা ক্ষীণ দিন দিন।

[ক্রমশঃ

বিজ্ঞান জগৎ

ভূমিকম্প

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

আকস্মিক বলিয়াই ভূমিকম্প অন্যান্য বিপদ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর বিবেচিত হয়। অন্যান্য দুর্ঘটনার আগমন-বার্ত্তা আমরা নানাপ্রকার নিদর্শন দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারি, কিন্তু ভূমিকম্প সহসা আসিয়া আমাদের জীবনযাত্রার ভিতর বিপুল বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয়, মাত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে মানুষের শত সাধের সুন্দর সৌধসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, অনেককে অকস্মাৎ অকালে কালের কোলে তুলিয়া দেয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা প্রভৃতি কোন বিপদই এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আবির্ভূত হয় না। সময়ে সময়ে বন্যা সহসা আসে বটে কিন্তু অবিশ্রান্ত বর্ষণ প্রভৃতি উহারও কয়েকটি কারণ আমরা পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ভূমিকম্প কোন প্রকার পূর্ব্বাভাস না দিয়াই অকস্মাৎ আসিয়া মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর প্রচণ্ড খণ্ডপ্রলয় অভিনয় করে! বিহার ও কোয়েটার ভীষণ ভূমিকম্পের হৃদয়বিদারক দৃশ্যাবলীর বেদনা-বিজড়িত স্মৃতি অনেকের চক্ষে অশ্রু এবং অন্তরে আতঙ্ক আজিও জাগাইয়া তুলে। স্বল্পকাল পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত তুরস্কের ভূমিকম্প প্রিয়বিরহাতুর ও গৃহহারা নরনারীর জন্য সুতীব্র সমবেদনা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া সকলের হৃদয়ে জাগ্রত করিয়াছিল।

মানুষের মনে স্বতঃই জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়—কেন এমন ঘটে? যাহাকে আমরা চিরস্থিরা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত অন্তরে বাস করি, সেই পল্লীপ্রান্তরপূর্ণা পর্ব্বতকান্তার-কুন্তলা জীবধাত্রী ধরিত্রী সহসা কম্পিত হইয়া এমন তাণ্ডব কাণ্ড ঘটাইয়া তুলে কেন? আনন্দময়ী সুন্দরী বসুন্ধরা অকস্মাৎ প্রলয়ছন্দে স্পন্দিতা হইয়া নির্ভরশীল নরনারীবৃন্দকে এমন নিরানন্দ করিয়া তুলে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে মাতৃরূপা এই পৃথিবীর প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। আমরা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারি, এই ধরিত্রী আদৌ স্থিরা নহেন, ইনি চিরচঞ্চলা, শুধু সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অবিশ্রান্ত আবর্ত্তিত হইতেছেন বলিয়াই ইনি চঞ্চলা তাহা নহে, ইঁহার বিরাট বক্ষে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন-প্রবাহ প্রতিনিয়ত বহিয়া যাইতেছে! আমরা মানস-মোহিনী মেদিনীমাতার যে মূর্ত্তি আজ দেখিতেছি, সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাহা ছিল না। যেখানে আজ পর্ব্বত-রাজ হিমাদ্রি তুষারশুভ্র তুঙ্গশৃঙ্গশ্রেণী ঊর্দ্ধে তুলিয়া সৌন্দর্য্য সমুদ্রের অম্বরচুম্বী স্তম্ভিত তরঙ্গরাজির মত দাঁড়াইয়া, সেখানে একদিন সত্য সত্যই সুগভীর বারিধির কম্বুনাদী অম্বুরাশি নৃত্য করিত। ইহার সাক্ষীস্বরূপ বারিধিবক্ষোবাসী প্রাণীদের প্রস্তরীভূত পঞ্জর হিমাদ্রিক্রোড়ে আজিও বিরাজিত। সম্ভবতঃ ভূকম্পনের ফলেই অতলস্পর্শ সমুদ্র তুষারশুভ্রশীর্ষ অভ্রভেদী হিমাদ্রিতে পরিণত। পূর্ব্বে যথায় জনপূর্ণ মহাদেশ বিদ্যমান ছিল, এখন সেখানে জলপূর্ণ মহাসমুদ্র, ইহা কবির কল্পনা নহে, বৈজ্ঞানিকের বাণী। পরিবর্ত্তন-প্রবণতাই পৃথিবীর প্রকৃতি। ভূমিকম্প পৃথিবীর এই প্রবল পরিবর্ত্তন-প্রবণতা বা চিরন্তন চঞ্চলতার বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সঙ্ঘটিত কতিপয় ভীষণ ভূমিকম্প পৃথিবীর বর্ত্তমান আকৃতির অন্যতম কারণ বলিয়া বৈজ্ঞানিক মনে করেন।

আমরা এই বর্ত্তুলাকার বসুন্ধরার বুকের উপর বাস

করি। ইহার তিমিরময় তলদেশে কি ঘটিতেছে তাহা আমরা জানি না বলিলেও চলে। অথচ ভূমিকম্পের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরভাগের রহস্য ভেদ করিতে হইবে। যাঁহারা জীবধাত্রীর জন্মকাহিনী জানেন তাঁহারা ইহা অবগত আছেন, এক সময় এই পৃথিবী জ্যোতির্ম্ময় সবিতৃমণ্ডলের অঙ্গীভূত ছিল। পরে ইহা সৌর-জগতের পিতৃস্বরূপ ঐ বিশ্ববরেণ্য বহ্নিচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গ্রহরূপে উহার চতুর্দ্দিকে অহরহঃ আবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্র হইবার পর পৃথিবীর উর্দ্ধাংশ ক্রমশঃ শীতল হইয়া প্রাণিপুঞ্জের অবস্থানের উপযোগী হইলেও ইহার গভীরতর অভ্যন্তরভাগে আদিম অগ্নি ও উত্তাপ এখনও বিদ্যমান থাকাই স্বাভাবিক। এই আদিম অগ্নিই মধ্যে মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসরূপে উর্দ্ধে আগমন করিয়া পৃথিবীর অঙ্গে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম যে-অন্তর্নিহিত শক্তির অভিব্যক্তি, ভূমিকম্পকেও সেই শক্তির প্রকাশ বলা চলে।

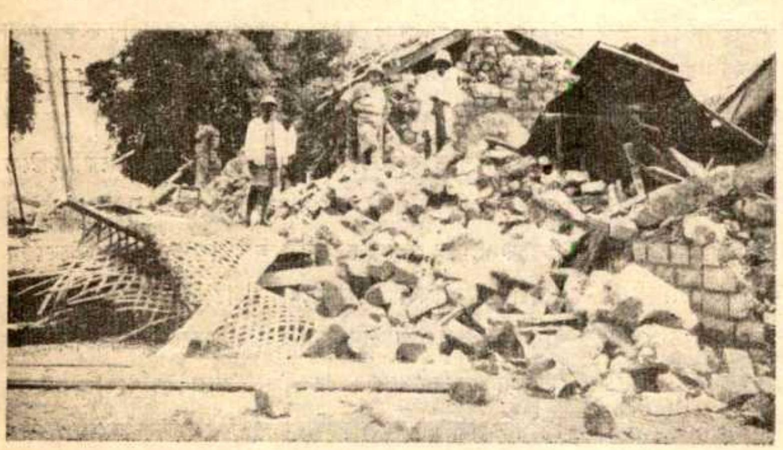

বেলুচিস্থানের ভূমিকম্পে পানির ষ্টেসনের দৃশ্য (এন্ ডব্লিউ রেলওয়ে)

যে সকল জ্বলন্ত ধাতুপদার্থ সূর্য্যে বিরাজিত, পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাহাদের বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে। উল্কাপাতের কথা সকলেই জানেন। মীটিওরাইট বা উল্কা প্রস্তর নামক পদার্থে ইহারা প্রস্তুত। এরূপ উল্কা আছে, যাহারা পূর্ব্বে পৃথিবীরই অংশ ছিল, পরে চন্দ্র পৃথিবী হইতে পৃথক হইয়া উপগ্রহরূপে পরিণত হইবার সময় ইহারাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীণল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে উল্কা-প্রস্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। মীটিওরাইট বা উল্কাপ্রস্তর দুই প্রকার, এরোলাইট ও সাইডেরাইট। "এরোলাইট মীটিওরাইট" প্রস্তরপ্রধান পদার্থ। একজাতীয় প্রস্তর ইহার প্রধান উপাদান। তবে পৃথিবীর তলদেশের শিলাসমূহের সহিত যে সকল ধাতুপদার্থ বর্ত্তমান, তাহারাও ইহাতে রহিয়াছে 'সাইডেরাইট মীটিওরাইট'গুলি বিশ্লেষণ করিলে উহার ভিতর প্রধান উপাদানরূপে এক প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। এই ধাতুকে নিকেল ও লৌহের সম্মেলন বলা চলে। পৃথিবীর উর্দ্ধাংশে অবস্থিত সাধারণ শিলাসমূহ অপেক্ষা এরোলাইট-গুলির ঘনত্ব কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও ইহার তলদেশের স্তর-বিশেষে এই জাতীয় প্রস্তর বিরাজিত বলিয়া বৈজ্ঞানিকবর্গের বিশ্বাস। পৃথিবীর উর্দ্ধস্থ প্রস্তরসমূহের কোনটির ঘনত্ব ৩.৪ অপেক্ষা অধিক নহে, অথচ সমগ্রভাবে ধরিলে পৃথিবীর ঘন প্রায় ৫.৫। সুতরাং ভূগর্ভের অভ্যন্তর ভাগে এরূপ পদার্থ অবশ্যই অবস্থিত, যাহার ঘনত্ব উর্দ্ধস্থ ভূস্তরের প্রস্তরপুঞ্জ অপেক্ষা অধিক। ইহা না হইলে সৌর ও চান্দ্র আকর্ষণে বসুন্ধরার বক্ষে বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হইত।

ভূ-তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে বুঝিয়াছেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তরবিশেষ বেসল্ট নামক আগ্নেয় প্রকৃতির প্রস্তরে প্রস্তুত। আগ্নেয়-গিরির গর্ভ হইতে উদ্গত লাভা-প্রবাহরূপে এই বেসল্ট অনেক সময় বাহিরে আসিয়া থাকে। ভূ-তত্ত্ববেত্তাদিগের মতে বেসল্টের তলদেশে এরোলাইটের সহিত সাদৃশ্যশালী শিলার স্তর অবস্থিত। বৈজ্ঞানিকবর্গের বিশ্বাস বেসল্টজাতীয় প্রস্তরের গভীরতা প্রায় বিশ মাইল-ব্যাপী। সুতরাং এরোলাইটজাতীয় প্রস্তর বহু নিম্নে রহিয়াছে সন্দেহ নাই। ওলিভাইন নামক একপ্রকার গুরু ধাতু এই জাতীয় প্রস্তরের ভিতর বহু পরিমাণে বিদ্যমান। এই প্রস্তর-স্তরের তলদেশে যে বস্তুর স্তর অবস্থিত, তাহার সহিত সাইডেরাইট জাতীয় মীটিওরাইটের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং এই বস্তুটিকে নিকেল ও লৌহের সংমিশ্রণ বলা চলে। ভূগর্ভের গভীরতর অভ্যন্তরভাগে এই ধাতুপদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় বিরাজিত বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের অনুমান। সাইডে-

রাইট মীটিওরাইটের প্রধান উপাদান নিকেল ও লৌহের সম্মেলনস্বরূপ এই ধাতু পৃথিবীর কোন স্থানে খনিজ পদার্থরূপে নিষ্কাশিত হইতে দেখা যায় নাই। এই অপ্রাপ্তিকে বৈজ্ঞানিকবর্গের ঐরূপ অনুমানের হেতু বলা চলে। এই ধাতুর একটি বৈশিষ্ট্য, ইহা রেডিওয়্যাকৃটিভ নহে অর্থাৎ ইহা অস্বচ্ছ পদার্থ-ভেদকারী আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করে না। পণ্ডিতগণ ইহাও অনুমান করেন, এইরূপ আলোকরেখা-কিরণকারী ধাতুপদার্থ ভূগর্ভের ৪৫ মাইল নিম্নবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। সুতরাং সাইডেরাইটের সমধর্ম্মী নিকেলযুক্ত লৌহ ভূগর্ভের অভ্যন্তরভাগে ৪৫ মাইল অপেক্ষাও নিম্নতর অংশে অবস্থিত। এই নিকেল লৌহের স্বাভাবিক ঘনত্ব ৮ হইলেও প্রচণ্ড চাপের জন্য তথায় উহার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়া ১২ হইয়াছে। অতিশয় উত্তাপের জন্য ইহা তথায় দ্রবীভূত অবস্থায় অবস্থিত।

ভূগর্ভের সুদূর অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই চলে। খনিসমূহের মধ্যে যেগুলি গভীরতম, তাহাদের গভীরতা ৮ হাজার ফিটের অধিক হইবে না এবং মানুষ ১৪ হাজার ফিটের অধিক গর্ত্ত বা গহ্বর খনন করিয়াছে কি না সে বিষয়ে আমারা সন্দেহ আছে। তবে এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, যতই নিম্নে নামা যাইবে ততই অধিকতর উত্তাপ অনুভূত হইবে। প্রত্যেক ৫০ ফিটে ১ ডিগ্রি (ফারেন হিট) করিয়া উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আগ্নেয় গিরির গর্ভ হইতে লাভানামক দ্রবীভূত পদার্থ নির্গত হইবার কথা সকলেই জানেন। ইহা ভূগর্ভের বহু মাইল নিম্ন হইতে বাহির হইয়া যখন পৃথিবীর উর্দ্ধস্তরে পৌছায় তখনও ইহার উত্তাপ ১ হাজার ডিগ্রি থাকে। ইহা হইতে অনুমান করা চলে, ভূগর্ভের অভ্যন্তরে অবস্থান করিবার কালে ইহার উত্তাপ কিরূপ ভীষণ ছিল।

ভূমিকম্পের প্রধান কারণ ভূগর্ভের অভ্যন্তরে অবস্থিত, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। পৃথিবীর প্রবল পরিবর্ত্তন প্রবণতার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৃষ্টি ও তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর উর্দ্ধ স্তরে যে পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হয় তাহার সঙ্গেও ভূমিকম্পের সম্পর্ক আছে। ঐরূপ কারণে পর্ব্বতশ্রেণীর গাত্র ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া থাকে এবং গাত্রস্থ কোন কোন অংশ স্খলিত হইয়া পদতলে প্রসারিত উপত্যকায় বা প্রান্তরে পতিত হয়। এইরূপে ভূখণ্ডের ভার বিষয়ক যে অসাম্য বা বিভিন্নতা জন্মায় তাহাকে ভূমিকম্পের অন্যতম হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে। ইহাতে পর্ব্বতপুঞ্জের পদতলে প্রসারিত স্থানগুলিতে এক প্রকার চাপ অবশ্যই সৃষ্ট হয়। এই সকল স্থানের নিম্নবর্ত্তী ভূগর্ভস্থ অংশবিশেষে ফাটলাদি কোন ভঙ্গ বা ত্রুটি থাকিলে এই ভার বা চাপ তথায় কম্পনের সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। ভূমিকম্পের কারণ ভূগর্ভস্থ এই ভঙ্গ বা ত্রুটি ফল্ট আখ্যায় অভিহিত হয়। ইহাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, পর্ব্বতশ্রেণীর সহিত ভূমিকম্পের একপ্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান।

কোয়েটার ভূমিকম্পে গৃহহারা নর-নারী

আমরা পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দুইটি বিরাট পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাই। একটি ইউরোপ ও এসিয়ার দক্ষিণাংশে দণ্ডায়মান এবং অপরটি প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাট বক্ষ ব্যাপিয়া বিরাজিত। আমরা প্রথমটির ভিতর পীরিনিস্,আল্পস্, আপেনাইন্স, বলকান্স, ককেসাস, তাওরাস প্রভৃতি গিরিশ্রেণীকে দেখিতে পাই। পরে ইহা পারস্য দেশ, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়া পর্ব্বতরাজ হিমাদ্রিতে পরিণতি পাইয়াছে এবং অবশেষে ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া মালয় উপদ্বীপে

উপনীত হইবার পর পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে বিরাজিত অপর পর্ব্বতশ্রেণীটির অধিকাংশ আগ্নেয়-গিরি বলিয়া উহারা "গার্ডল-অফ-ফায়ার" বা অগ্নি-চক্র আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই আগ্নেয়-গিরিশ্রেণী জাপান পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইউরোপ ও এসিয়ার দক্ষিণাংশে দণ্ডায়মান পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা খুবই অল্প। ইউরোপের মধ্যে শুধু ইতালীতে ও গ্রীসে এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভিতর বঙ্গোপসাগরের দুই একটি দ্বীপেও বিশেষ করিয়া মালয় দ্বীপপুঞ্জে আগ্নেয়গিরি বিরাজিত।

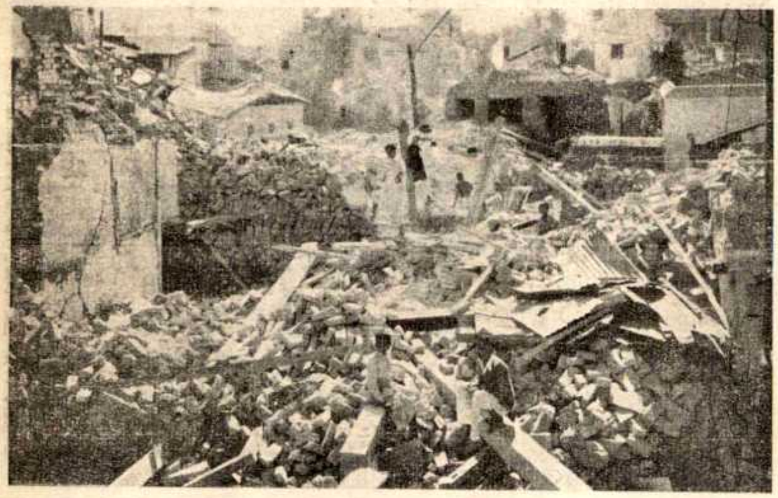
ভূমিকম্পের পর মজঃফরপুর

এই পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয় প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছিল না, পরে গড়িয়া উঠিয়াছে। আগ্নেয়গিরির সহিত ভূমিকম্পের বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন না। তবে একই কারণ হইতে উভয়ে উৎপন্ন সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। স্থান বিশেষে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে ভূমিকম্প সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, ইহাও সত্য। সময়ে সময়ে এইরূপ ভূমিকম্পও ভীষণ হয় বটে কিন্তু সাধারণতঃ ইহা স্বল্প-পরিসর স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সম্ভবতঃ অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের ফলে ভূগর্ভস্থ গহ্বর-গুলির উর্দ্ধস্থ স্তর সহসা ধ্বসিয়া পড়ায় এইরূপ ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে। ভূগর্ভ হইতে সবেগে বাষ্পরাশি বিনির্গত হওয়ার জন্যও এইরূপ ভূমিকম্প সঙ্ঘটিত হইতে পারে। আমরা যে দুইটি পর্ব্বতশ্রেণীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি সকল ভূমিকম্প উহাদিগের পার্শ্বস্থ প্রদেশে সঙ্ঘটিত না হইলেও পৃথিবীর অধিকাংশ এবং ভীষণতম ভূমিকম্পগুলি ইহাদের নিকটেই ঘটিয়াছে। বিহারের ভূমিকম্পের সহিত হিমাদ্রির এবং স্বল্পকালপূর্ব্বে সঙ্ঘটিত তুরস্কের ভূমিকম্পের সহিত বল্কান পর্ব্বতপুঞ্জের কতখানি সম্পর্ক তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। বেলুচিস্থানের পর্ব্বতশ্রেণীর, হিমাদ্রির এবং আসাম ও ব্রহ্মদেশের শৈলমালার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রসারিত স্থানগুলিকে ভারতবর্ষের ভূমিকম্প-প্রবণ প্রদেশ বলিয়া অভিহিত করা চলে। পূর্ব্বে এই প্রদেশ বারিধি-বক্ষে বিরাজিত ছিল বলিয়া বৈজ্ঞানিকবর্গের বিশ্বাস। সুতরাং, অপেক্ষাকৃত নব-জাত বলিয়া ইহার দৃঢ়তা অল্প। অথচ হিমাদ্রির উত্তর পার্শ্বস্থ প্রদেশ এবং সমুদ্র-মেখলা উপদ্বীপাকার দাক্ষিণাত্য উভয়েই অতি প্রাচীন সুতরাং সুদৃঢ় প্রকৃতির ভূখণ্ড। উভয় সুদৃঢ় ভূখণ্ডের প্রচণ্ড চাপে মধ্যবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত নবজাত অদৃঢ় প্রদেশের যে অবস্থা হয় তাহাতে ঐ প্রদেশের অংশবিশেষে সময়ে সময়ে ভীষণ ভূমিকম্প সঙ্ঘটিত হওয়া অসম্ভব হয় না।

আমরা পূর্ব্বে ভূমিকম্পের কারণ-স্বরূপ 'ফল্ট' আখ্যায় অভিহিত ভূগর্ভস্থ গহ্বরাদি ভঙ্গ বা ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছি। বেলুচিস্থান হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিকম্প-প্রবণ প্রদেশে যত ফল্ট আছে তত আর কোথাও নাই। অনেকের মতে হিমাচলের দক্ষিণপার্শ্বে রাওলপিণ্ডি হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত প্রসারিত ভূভাগে অবস্থিত ফল্টটি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই ভূখণ্ডে হিমাচলের অন্তর্গত উত্তরস্থ প্রাচীনতর পর্ব্বতশ্রেণী দক্ষিণস্থ অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন শিবালিক শৈলমালার উপর যে ভার বা চাপ প্রয়োগ করে তাহার ফলে উহার স্থানে স্থানে ভীষণ ভূমিকম্প সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। হিমাচলের পশ্চিমাংশে অবস্থিত কাংরা উপত্যকায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছিল এইরূপ চাপকেই তাহার হেতু বলিয়া মনে করা হয়। অবশ্য ফল্ট বা ভূগর্ভে গহ্বরাদি না থাকিলে শুধু চাপের জন্য

ভূমিকম্প হইতে পারে না। অন্যদিকে চাপ না থাকিলে শুধু ফল্টের জন্যও ভূমিকম্প হয় না। কোন কোন ফল্ট ভূতল বা উর্দ্ধস্থ ভূস্তর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যেথানে ভূমিকম্পের কারণস্বরূপ কোন ফল্ট দৃষ্টিগোচর হয় না, সেথানে জানিতে হইবে উহা বহু নিম্নে রহিয়াছে। ভূতত্ত্ববেত্তাদের মতে ফল্ট দেখা যাক আর না যাক্, অধিকাংশ ভূমিকম্প ভূগর্ভের বহু নিম্নবর্ত্তী প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। ভূমিকম্প সাধারণতঃ একমাইল হইতে ৪০ মাইল পর্য্যন্ত নিম্নবর্ত্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করে। কোন কোন ভূমিকম্প আরও নিম্নে জন্মায় বটে, কিন্তু সাড়ে তিন শত মাইলের অধিক নিম্নে কেহই জন্মে না বলিয়া পণ্ডিতগণের অনুমান।

আমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, হিমালয়ের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্ত হইতে দুইটি শাখা-শৈল-শ্রেণী সহসা নির্গত ও সমকোণাকারে অগ্রসর হইয়া একদিকে আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্ত্তী এবং অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত ও বেলুচিস্থানের বক্ষস্থিত পর্ব্বতপুঞ্জরূপে পরিণতি পাইয়াছে। যেথানে খাস হিমালয়ের বিশাল শরীর হইতে এই সকল শাখা-শৈলমালা বাহির হইয়া অকস্মাৎ অন্যদিকে অগ্রসর হইয়াছে তথায় প্রায়ই ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে। এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের স্থানে ভূমিকম্প হওয়া আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নহে। এই জন্যই আসামে প্রায়ই ভূমিকম্প হইতে দেখা যায়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আসামের রাজধানী শিলং এবং উহার পার্শ্বে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমঙ্গলে ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ধুবড়ীতে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহার কারণ এই স্থানেই অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে শিলংএর ভূমিকম্প বিশেষ ভীষণ হইয়াছিল। স্বল্পকাল পূর্ব্বেও শিলং-এ সামান্য রকমের ভূমিকম্প সঙ্ঘটিত হওয়ার কথা সংবাদপত্র-পাঠকমাত্রই অবগত আছেন।

বেলুচিস্থানের পর্ব্বতপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত কোয়েটা নগরের চতুর্দ্দিকে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩ বার ভূমিকম্প সঙ্ঘটিত হইয়াছে। এই ভূমিকম্পগুলির প্রায় প্রত্যেকটির দ্বারাই অল্পবিস্তর অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত ভূমিকম্পটিই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ হইয়াছিল। বেলুচিস্থানের ভূমিকম্পগুলির বৈশিষ্ট্য ভীষণ হইলেও ইহাদের প্রভাব দূরপ্রসারিত নহে। এইরূপ হইবার হেতু, যে কারণ (ফল্ট) হইতে ইহারা জন্মিয়াছে তাহা ভূগর্ভের বহু নিম্নে বিরাজিত নহে, অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধাংশে অবস্থিত। এই জাতীয় অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ব্রহ্মদেশে ইরাবতী উপত্যকার পূর্ব্বপার্শ্বে যে বৃহৎ ফল্ট আছে উহাও উল্লেখযোগ্য। এই উপত্যকা প্রাচীন পর্ব্বতপুঞ্জপূর্ণ শান রাজ্যসমূহকে মধ্য বর্ম্মার অপেক্ষাকৃত আধুনিক শৈলশ্রেণী হইতে পৃথক্ করিতেছে। ভারতের উত্তরাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশ প্রাচীনতর ও দৃঢ়তর এ বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং দক্ষিণ ভারত ভূমিকম্পের দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত অনেক নিরাপদ। দাক্ষিণাত্যে অতি অল্পসংখ্যক এবং সামান্য রকমের ভূমিকম্পই হইতে দেখা যায়। শুধু ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বেলারীতে যে কম্পন অনুভূত হইয়াছিল, তাহাকে বেগবান্ বলা চলে।

ভূমিকম্পের পর মুঙ্গেরের বাজারের দৃশ্য

ভূমিকম্পের কম্পন উৎপত্তিস্থান হইতে তরঙ্গাকারে বিসর্পিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভূমিকম্পই দুই প্রকার তরঙ্গ উৎপন্ন করে। একপ্রকার তরঙ্গ লম্বালম্বি ভাবে বিস্তৃত হয়। ইহাতে পদার্থের কণা বা অণুগুলি শব্দতরঙ্গের

মত ইতস্ততঃ স্পন্দিত হইতে হইতে প্রসারিত হয়। কম্পনের অপর প্রকার প্রবাহ আড়া-আড়ি ভাবে অগ্রসর হয়। ইহাতে পদার্থের অণুগুলি আলোক-তরঙ্গের ন্যায় সমকোণাকারে কম্পিত হইয়া থাকে। এই সকল তরঙ্গ ভূমিকম্পের উৎপত্তি-স্থল হইতে বিস্তারের স্থানের দিকে অতিবেগে অগ্রসর হয়। একপ্রকার তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে চার মাইল এবং অপরটি প্রতি সেকেণ্ডে আড়াই মাইল বেগে আগাইয়া যায়। পৃথিবীর ঊর্দ্ধস্থ স্তরে পৌঁছিলে ইহাদিগের বেগ সেকেণ্ডে দুই মাইল হয়। সীস্‌মোগ্রাফ নামক যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের কম্পন বা গতির পরিমাণ জানা যায়। প্রত্যেক ভূমিকম্পেই প্রধান কম্পনের পূর্ব্বে কতকগুলি স্বল্পকালস্থায়ী সামান্য কম্পন ভূমিকারূপে ঘটিতে দেখা যায়। এই ভূমিকারূপী সামান্য ভূমিকম্পগুলি এত অল্পক্ষণ থাকে যে, প্রতি সেকেণ্ডে এইরূপ কম্পন পাঁচ বা ছয় বার ঘটাও অসম্ভব নহে।

প্রধান ভূমিকম্পগুলি সাধারণতঃ এক হইতে আড়াই সেকেণ্ড পর্যান্ত স্থায়ী হয়। অবশ্য বিশেষ ভীষণ ভূমিকম্পগুলিতে কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশীক্ষণ থাকিতে দেখা যায়। তবে অনেক সময় বিপন্ন ব্যক্তিগণ ভূমিকম্পকে অধিকক্ষণ স্থায়ী বলিয়া কল্পনা করে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত আসামের ভীষণ ভূমিকম্প আড়াই মিনিট ছিল। বিশ্ব-বিখ্যাত বিহার ভূমিকম্প তিন মিনিট এবং কোয়েটার কম্পন মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড স্থায়ী হইয়াছিল। ভূমিকারূপী কম্পনগুলির মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্রধান ভূমিকম্পটি ঘটিয়া থাকে বলিয়া কাহারও সতর্ক হওয়া সম্ভব হয় না। ভূমিকম্প রাত্রিতে বা অতিপ্রত্যূষে ঘটিলে অধিক লোকক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। রাত্রি তিনটার সময় কোয়েটায় ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল বলিয়াই অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী হইলেও উহার পরিণাম অতদূর ভয়াবহ হইয়াছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাংরা উপত্যকায় যে ভূমিকম্প হয় উহা প্রাতঃকালে ৬টা ১০ মিনিটের সময় সঙ্ঘটিত হয়। ইহাতে আসাম ও বিহার অপেক্ষা অধিক লোকক্ষয় হইয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত আসামের ভূমিকম্প এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত বিহার ভূমিকম্প উভয়েই অপরাহ্ণে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বিহারের ভূমিকম্পের ভীষণতা এবং বিস্তার অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। এই ভূমিকম্প নিবিড় নিশাথে বা অতি প্রত্যূষে হইলে পরিণাম আরও ভয়াবহ হইবে সন্দেহ নাই।

যেমন প্রধান ভূমিকম্পের পূর্ব্বে উপক্রমণিকারূপে কতকগুলি সামান্য কম্পন ঘটিয়া থাকে, তেমনই ভীষণ ভূমিকম্পগুলির পরেও অপেক্ষাকৃত অল্পবেগের কতিপয় কম্পন কিছুকাল পর্যান্ত ঘটা স্বাভাবিক। অবশ্য এইরূপ কম্পনের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসে এবং ইহাদের ঘটিবার ব্যবধানও ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইয়া পড়ে। আমরা আসামে সঙ্ঘটিত যে ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহা ঘটিবার পর ঐ প্রদেশের ভূমি বহুদিন পর্য্যন্ত বার বার কম্পিত হইয়াছিল। এই কম্পনের সংখ্যা সহস্রাধিক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ পরবর্ত্তী কম্পনও অনিষ্টকর হইয়া থাকে। বিশেষ, প্রধান ভূমিকম্পে বিপন্ন ব্যক্তিবর্গের অন্তরে ইহারা একপ্রকার আশঙ্কা বা আতঙ্ক জাগাইয়া তুলা অসম্ভব নহে। তবে একই স্থানে একাধিক ভয়াবহ ভূমিকম্প প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায় না। পরবর্ত্তী ভূমিকম্পগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প অনিষ্টকর হওয়াই স্বাভাবিক। বিহারের লোকক্ষয়কর লোমহর্ষণ বিখ্যাত ভূমিকম্পটির পর এই প্রদেশের নানাস্থানে বিশেষ উত্তর-বিহারে সামান্য রকমের কম্পন বার বার অনুভূত হইয়াছিল। একাধিক ভীষণ ভূমিকম্প একই স্থানে ঘটে না বলিয়াছি, কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না, তাহা নহে। জাপানের রাজধানী টোকিও নগরে ভয়াবহ ভূমিকম্প দুইবার ঘটিয়াছিল।

সময়ে সময়ে পরস্পর অদূরবর্ত্তী কেন্দ্র হইতে বিসর্পিত হইয়া মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে যুগ্ম-ভূমিকম্প সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাংরা উপত্যকায় যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহা এইজাতীয়। ভূমিকম্পের গতিকে বিচিত্র ও বিস্ময়কর বলা চলে। সময়ে সময়ে কম্পনের প্রবাহ বা প্রভাব বহুদূরে গমন করিয়া তথায় প্রকাশ পায়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আসামের শ্রীমঙ্গলে যে ভূমিকম্প সঙ্ঘটিত হয়, তাহার প্রভাবে সুদূর দক্ষিণে বিরাজিত মাদ্রাজ এবং বঙ্গোপসাগরের অংশবিশেষে আকিয়াব বন্দরের পুরোভাগে কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। শ্রীমঙ্গলে ভূমিকম্প হইবার চার মিনিট পরে মাদ্রাজ কম্পন অনুভূত হয়। সুতরাং নৈসর্গিক নিয়মানুযায়ী এই কম্পনের প্রবাহ প্রতি মিনিটে ১ শত ৩৮ মাইল হিসাবে ভ্রমণ করিয়াছিল। বিখ্যাত বিহার-ভূমিকম্পের প্রভাবে

দক্ষিণাপথের মালাবার উপকূলে এবং নিম্ন-ব্রহ্মের অন্তর্গত মূলামন নামক নগরের নিকটে ভূমিকম্প হইয়াছিল।

মানুষ অনুভব করুক বা না করুক, প্রত্যেক ভূমিকম্পের প্রবাহ দূরপ্রসারী হইয়া থাকে। কম্পের তীব্রতা, উৎপত্তি-স্থলের গভীরতা, ভূস্তরে অবস্থিত মৃত্তিকা বা প্রস্তরের প্রকৃতি (যাহার ভিতর দিয়া কম্পন বা ভাইব্রেশান ভ্রমণ করে) অনুসারে এই বিস্তারের তারতম্য হইয়া থাকে। অতিশয় সূক্ষ্ম বা মৃদু বলিয়া যেখানে মানুষের পক্ষে কম্পন অনুভব করা সম্ভব হয় না, সেখানেও সীসমোগ্রাফ নামক যন্ত্রের নিকট এই কম্পনকে ধরা দিতে হয়। ভূমিকম্প বিশেষ বেগবিশিষ্ট হইলে পৃথিবীর প্রত্যেক অংশের সীসমোগ্রাফে তাহার প্রভাব বা প্রবাহের প্রতিচ্ছবি পতিত হইবে বলিলে ভুল হয় না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আসাম-ভূমিকম্প ১৭ লক্ষ ৫ হাজার বর্গমাইল, বিহার ভূমিকম্প ১৯ লক্ষ বর্গমাইল এবং পরবর্ত্তী কোয়েটা-ভূমিকম্প ৩ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী ভূভাগে অনুভূত হইয়াছিল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ক্যারলিনার রাজধানী চার্সটন নামক স্থানে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাকেই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুদূর-প্রসারী কম্পন বলিয়া মনে করা ইহার প্রভাব ২৮ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপিয়া অনুভূত হইয়াছিল। এই ভূমিকম্প এইরূপ সুদূরব্যাপী হইলেও ইহাকে তীব্রতম বা ভীমতম ভূকম্পন বলা যায় না। অনেকে মনে করেন, এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর অনুভূতি-সম্পন্ন সম্প্রদায়দিগের বাস বলিয়াই এইরূপ হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকবর্গের বিশ্বাস, প্রত্যেক ভূমিকম্পের স্পন্দনগুলি ভূগর্ভস্থ উৎপত্তিস্থল হইতে সমভাবে সকল দিকে বিসর্পিত হয়। কতকগুলি ভূমিকম্পের জন্ম-স্থান ভূগর্ভের গভীরতর অংশে কতকগুলির উৎপত্তি-স্থল অপেক্ষাকৃত অগভীর অংশে অবস্থিত। যাহাদের জন্মস্থান অপেক্ষাকৃত উপরে অবস্থিত, সেইরূপ ভূমিকম্প ভূতলে তীব্রভাবে অনুভূত হইলেও তাহাদের প্রভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। বেলুচিস্থানের কম্পনগুলি এইরূপ প্রকৃতির। ভূমিকম্পের স্পন্দনপ্রবাহ বালুকা ও কর্দ্দম অপেক্ষা প্রস্তরপুঞ্জের ভিতর দিয়া বেগে অগ্রসর হইতে পারে বটে, কিন্তু দৃঢ়তা অল্প বলিয়া প্রথমোক্ত পদার্থগুলির উপর গঠিত নগর ও গ্রামগুলির ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা অধিক। এই জন্যই বিহার ভূমিকম্পে সূক্ষ্ম বালুকা ও সুকোমল পঙ্কের উপর অবস্থিত (উত্তর-বিহারের) স্থানগুলি নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়াছিল, অথচ প্রস্তর-স্তরের উপর বিরাজিত ছোটনাগপুর বিভাগে কম্পন অনুভূত হইলেও ক্ষতির পরিমাণ অতি কম।

ভূমিকম্পের আন্তর্জ্জাতিক তালিকানুসারে বৎসরে যত ভূমিকম্প সমগ্র পৃথিবীতে সঙ্ঘটিত হয়, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। ইহাদের অধিকাংশ মৃদুভাবাপন্ন। পৃথিবীতে বৎসরে চার বা পাঁচটি ভয়াবহ বা অত্যন্ত অনিষ্টকর ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ভূমিকম্পের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বাড়িয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বসমেত ৪ শত ২৩টি ভূমিকম্প হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতক পর্য্যন্ত যত ভূমিকম্প ঘটিয়াছে এই সংখ্যাকে তাহাদের প্রায় ২৫ গুণ বলা চলে। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হওয়া এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ কিনা তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। তবে ইহাও হইতে পারে পূর্ব্বেও ভূমিকম্প এইরূপ সংখ্যাতেই ঘটিত বটে, কিন্তু এখন রেল, টেলিগ্রাফ, সংবাদপত্র প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদের খবর যেমন সকলে জানিতে পারে, তখন জানিবার সেরূপ সুযোগ ছিল না বলিয়া বহু ভূমিকম্পের কথা অপরের অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত। পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে জানা গিয়াছে, গ্রীষ্ম অপেক্ষা শীতকালে অধিক ভূমিকম্প হয়। সকলেই জানেন, ব্যারোমিটারের দ্বারা বায়ুর চাপের পরিমাণ জানা যায়। সমগ্র বৎসরের মধ্যে যে সময়টা ব্যারোমিটারে বায়ুর চাপ সর্ব্বাধিক বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, সেই সময়েই ভূমিকম্পও অপেক্ষাকৃত অধিক সঙ্ঘটিত হইতে দেখা যায়।

ভয়াবহ বা বিশেষ বেগবান্ ভূমিকম্পগুলিতে ভূস্তর নানাপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশে পর্ব্বত-পার্শ্ব ধ্বসিয়া পড়ায় যে ধূলিরাশি উত্থিত হয়, তাহা দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত নরনারীর পক্ষে নবজাত আগ্নেয়গিরি হইতে ধূমরাশি নির্গত হইতেছে বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। কোয়েটার ভূমিকম্পের পর অনেকে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়া বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছিল। কোয়েটার ভূমিকম্পের ফলে চারিদিকে লাইমষ্টোনে গঠিত পাহাড় হইতে বহু অংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। বিহার ভূমিকম্পে নেপালের বহুশত মাইলব্যাপী স্থানের পর্ব্বত-পার্শ্ব সমূহ খসিয়া পড়িয়া

উপত্যকার বুকে স্তূপীকৃত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে ভূমিকম্পের কারণ স্বরূপ 'ফল্টে'র কথা কহিয়াছি। যে ফল্টের জন্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্থানে ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল উহার আকার অনেকটা সোজা অথচ ধ্বসিয়া পড়া রাস্তার মত। পরে এই প্রদেশে যতবার ভূমিকম্প হইয়াছে ততবারই এই ফল্টের বুকে নূতন নূতন ফাটল বা গহ্বর উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। আসাম ভূমিকম্পের কারণ "চেদ্‌বাং" ফল্ট পাহাড়ের আকারে একটি নদীর তীরে তীরে প্রায় ১২ মাইল ব্যাপিয়া বিরাজিত। স্থানে স্থানে ইহার উচ্চতা ৩৫ ফিট। এই ফল্টটি কোন কোন জায়গায় নদীর পার্শ্বে বাঁধের ন্যায় হইয়াছে এবং অংশবিশেষে নদীটিকে প্রপাতে পরিণত হইতে সহায়তা করিয়াছে।

ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় উচ্চ স্থান নিম্ন হইয়া যায় এবং নিম্নস্থান উচ্চ হইয়া পড়ে। আসামে ভূমিকম্পের ফলে এই প্রদেশের বহু স্থানে এইরূপ প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হইয়াছে। বিহার ভূমিকম্পের পরিণামস্বরূপে বহু বর্গমাইল ব্যাপী ভূমি ১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। এই ভূমিকম্পে উত্তর বিহারে পলিপূর্ণ কোমল মৃত্তিকার বহু অংশে ফাটল উৎপন্ন হইয়াছে। কম্পনের তরঙ্গ এই ভূমির ভিতর দিয়া ভ্রমণ করিবার সময় ইহাকে পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ভূমির এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই এই ফাটলগুলি জন্মিয়াছে। স্থানে স্থানে এই সকল ফাটল হইতে ভূগর্ভস্থ বারি বেগে নির্গত হইয়াছে। অংশবিশেষে জলের সহিত বালুকা ও কর্দ্দম ভূগর্ভ হইতে সজোরে বহির্গত হইয়াছে। আসাম ও বিহার উভয় প্রদেশেই ভূমিকম্পের ফলে বিস্তীর্ণ স্থান এইরূপে বালুকাবৃত হওয়ার কথা আমরা জানি। এই বালুকারাশির গভীরতা কোন কোন স্থানে কয়েক ইঞ্চি এবং কোন কোন জায়গায় কয়েক ফিট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী মাঘ সংখ্যা হইতে ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস' পুনরায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক।

বৃহত্তর বঙ্গ ও বর্ম্মণজাতি

শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য

ইংরাজেরা দেশ-জয় করিয়া নানান ঔপনিবেশিক অঞ্চলে তাঁহাদের ভাষা ও ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সাহিত্য চালু করিয়াছেন। ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলির ইহাতে যথেষ্ট লাভও হইয়াছে, ক্ষতিও হইয়াছে; কিন্তু ইংরাজদের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় নাই, বরঞ্চ লাভই হইয়াছে। ভাষা এবং সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি বহু অংশে তাহাদের আত্মপ্রসারণের উপর নির্ভর করে। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের কথাই ধরা যাউক। এই ভাষা-সাহিত্য পৃথিবীতে প্রায় সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আপনার দেশের গণ্ডীর ভিতর নিজেকে আবদ্ধ রাখে নাই বলিয়া সে নিজেকে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বহু দেশের উপর দিয়া বহুকাল ধরিয়া ইংরাজী ভাষা-সাহিত্যের নদী চলিয়াছে এবং চলিবে। সে নদীর জলে সাঁতার কাটাও যায়, আবার ঘড়ায় বহিয়া ইহার জল ঘরেও আনা যায়। ইহাকেই বলে সাহিত্যের দিগ্বিজয়। এখানে রক্তাক্ত ইতিহাস নাই। একটি জাতি অন্যজাতির করপুটে তৃষ্ণার জল ঢালিতেছে। এখানে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই আনন্দিত।

আমাদের প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। ধরা যাউক পালি ভাষার কথা। ভারতবর্ষে অধুনা এই ভাষা অচল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এককালে এই ভাষার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম্ম এই দেশের সীমানা ডিঙাইয়া তিব্বতে, চীনে গিয়াছিল। অতএব আজি যদিও শত শত বৎসর পরে পালি ভাষা এই দেশে অচল, তথাপি সিংহলে এই ভাষা এখনো জীবন্ত। বাঙ্গালীরা এখন পালিকে প্রায় মুাজিয়াম-ভুক্ত ভাষা করিয়া লইয়াছে, কিন্তু সিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পালিতে এখনও কথা কহিয়া থাকেন।

সুতরাং এই কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে যে, ভাষা-সাহিত্যের প্রসারণ জাতির উন্নতির একটী লক্ষণ। এই জাতিকে বাঁচিতে হইলে, অথবা জাতির মানসিক উন্নতিকে চিহ্নিত করিতে হইলে, কিংবা জাতির সাহিত্যের কল্পতরুকে দীর্ঘজীবন বর দিতে চাহিলে, ভাষা-সাহিত্যকে প্রসারিত করিতে হইবে। এই প্রসারণ-ব্যাপারে জাতির আপ্রাণ চেষ্টার প্রয়োজন। সুতরাং, অধুনা যে প্রস্তাব উঠিয়াছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রসারিত করিতে হইবে, তাহার মূল্য একান্ত অনস্বীকার্য্য। রাষ্ট্রভাষা নিরূপিত হইবার সমস্যার দিক দিয়া দেখিলে কিংবা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতার দিক দিয়া দেখিলে কিংবা জাতিকে বাঁচাইতে হইলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা আশু প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালী ছাড়া অন্য কেহ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবে না। সুতরাং বাঙ্গালীকেই অগ্রসর হইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ইতিহাস গড়িতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমের স্বদেশিকতা বাঙ্গালীর আদর্শ। বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথম তিনি "মৃণালিনী"তে সপ্তদশ পাঠান অশ্বারোহীর বাঙ্গালা জয়ের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। ১২৮৭ সনের 'বঙ্গদর্শনে', ১২৯৯ সনের 'প্রচারে' 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতিতে তিনি বাঙ্গালীর কলঙ্কময় ইতিহাস যুক্তি দিয়া মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার।" বঙ্কিম 'আনন্দমঠ' লিখিয়াছেন এবং 'রাজসিংহ' লিখিয়াছেন। আমার বক্তব্য হইল এই যে, বঙ্কিম সাহিত্যের আগে ইতিহাস গড়িতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিম আপনার সাহিত্যিক প্রতিভার অনেকখানি উৎসর্গ করিয়া সাহিত্যের মন্দির রক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'সোমনাথ' মন্দির প্রসিদ্ধ। এতো সুন্দর মন্দির এককালে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। লুণ্ঠিত হইবার মূলে ছিল মন্দিররক্ষকদের অক্ষমতা। বাংলা সাহিত্যের এমনিতর একটি মন্দিরের জীর্ণতা সেদিন বঙ্কিমের চোখে ধরা পড়িয়াছিল এবং এই জন্যই সাহিত্য গড়িবার আগে ইতিহাস গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। তবু তো বঙ্কিম সাহিত্যিক এবং সেইজন্যই তাঁহার প্রতিভা সাহিত্যকেও একেবারে অস্বীকার করে নাই।

আমরা বাংলা সাহিত্যের একটি মন্দির কল্পনা করিয়াছি। ইট-পাথর ও সুরকীর বাঁধানো দেওয়ালের ভিতর জাগ্রত দেবতা রহিয়াছেন। এখন একদল লোকের বরাবরই

প্রয়োজন পড়িতেছে দেখিতেছি। মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে প্রথমতঃ মিস্ত্রীর প্রয়োজন এবং শেষতঃ জাগ্রত দেবতার মহিমা প্রচারের জন্য লোকের প্রয়োজন। হিন্দুর তন্ত্রে, হিন্দুর পুরাণে বহুকাল এইভাবে নানান পীঠস্থান এবং নানান দেবদেবীর মহিমা প্রচারিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যেও এইরূপ প্রচার অনবরত চলিয়াছে। খ্রীষ্টান পাদ্রীরাও এইরূপে নানানস্থানে গিয়া আপন আপন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। মহারাজ অশোকও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহুদেশে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন।

এই প্রকার প্রচারকে আধুনিক ভাষায় প্রোপাগাণ্ডা বলা চলে। সাহিত্যের প্রচারেও সেইরূপ কিছু লোকের প্রয়োজন। ইহাদের কাজের মূল্য অনেক। ইহারা সাহিত্যের মন্দির রক্ষক, ইহারা একটি ভাষাকে দীর্ঘজীবন দিবার মহৎ উদ্দেশ্যে ব্রতী হইলেন। যদি নিঃস্বার্থভাবে ইহারা ভাষা ও সাহিত্যের দরদী হইয়া প্রচার কার্য্য করেন, তবে ইহারাই উপহারস্বরূপ রাজার হাতে শিরোপা পাইবার উপযুক্ত লোক।

বাঙ্গালাদেশের লোকসংখ্যা বড় কম নয়। ইউরোপের দিকে চাহিলে দেখিবেন, আয়তনে ছোট, লোকসংখ্যায় কম বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সাহিত্যে অনেক অগ্রসর হইয়াছে। নরওয়ের কথাই ধরা যাউক। সাহিত্যে ইহারা কম উন্নত নন্। কিন্তু লোকসংখ্যা কতো কম ইহাদের। আসলে আমাদের অগ্রসর হইবার যথার্থ সময় আসিয়াছে।

বাঙ্গালাদেশে শিক্ষিতের শতকরা হার বড় অল্প। এতো অল্প যে, এই বৃহৎ অশিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলার সাহিত্য ও কৃষ্টিকে পিছনে টানিয়া জাতির অগ্রগমনের পথে বাঁধা সৃষ্টি করিতেছেন। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যে বাংলাসাহিত্যের জলস্রোত নিরুদ্ধ। সেই বৈবস্বতমনুর উপাখ্যানের কথা মনে পড়ে। ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া ছলনা করিতেছেন। পাত্র যতো বড় হইতেছে, ততো তিনিও বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতেছেন। ইংরাজী-সাহিত্য সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িয়া নিজের মধ্যে নব নব সৃষ্টির উৎসাহ আবিষ্কার করিয়াছে। তাইতো সে এতো বড়, এতো মহৎ।

বঙ্গভাষা মাগধি অপভ্রংশ হইতে জাত। মাগধি অপভ্রংশ পূর্ব্বভারতে তিনটি আধুনিক ভাষার জন্ম দিয়াছে। বাংলা, উড়িয়া এবং অসমীয়া—এই তিনটি ভাষা একবৃন্তের তিনটি ফুল। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছেন, এককালে অর্থাৎ অপভ্রংশের আগের যুগে এই তিনদেশে ভাবের আদান প্রদানে ভাষা কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করিত না। এখনও যে তেমন করে, এরূপ নয়। তবুও তো ভাষা স্বতন্ত্র হইয়াছে। বর্ণমালা হিসাবে অসমীয়া ও বাংলা মোটামুটি একই। উড়িয়া বর্ণমালা একটু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লেখা। উৎকলের লোকেরা এককালে বাংলাভাষায় পুঁথি লিখিয়াছেন। চৈতন্যদেবের ধর্ম্মপ্রচারে উৎকলবাসীরাও অংশ নিয়াছে। মিথিলার বিদ্যাপতিকে আমরা আমাদের বলিয়াই স্বীকার করি। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে অসমীয়া ও বাংলাভাষায় তেমন ভেদাভেদ ছিলই না। অনন্তকন্দলির রামায়ণ এবং নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ এখনও উভয় দেশ বিনা আয়াসেই পড়িয়া বুঝিতে পারেন। তিনদেশ হইতে তিনজন সমকালেই ব্রজবুলিতে কাব্য লিখিতে সুরু করেন। উড়িষ্যার রামানন্দ রায়, বাংলার যশোরাজ খাঁ, এবং আসামের শঙ্করদেব—ইঁহারা নিজ নিজ দেশের প্রথম ব্রজবুলি লেখক। শ্রীচৈতন্য পূর্ব্বভারতকে একধর্ম্মেই মাতাইয়া তুলিলেন। প্রাচ্যসীমান্তে সুদূর মণিপুরে আজও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ম্লান হয় নাই। সুতরাং বুঝিতেই পারা যাইতেছে যে বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং সভ্যতার সঙ্গে এতোগুলি প্রদেশ জড়িত। কিন্তু অধুনা রাষ্ট্রনৈতিক কারণে প্রদেশ-বিভক্তির পর বাংলাভাষা ও সাহিত্য তেমন নিজেকে স্বচ্ছন্দভাবে ছড়াইয়া দিতে পারিতেছে না এবং পরিণামে ক্ষতিই স্বীকার করিতেছে। অতএব এই জন্যই প্রচারের প্রয়োজন। ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারকের দরকার।

প্রচারকার্য্য অনেকরূপে হয়। দেশে দেশে বসবাস করিয়াও প্রচার চলে। আর্য্যেরা দেশ হইতে দেশান্তরী হইয়া এককালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আসিয়া ঘর বাঁধিলেন। তাহাদের সেই সভ্যতার আমরা এখন উত্তরাধিকারী। অবশ্য, আমি বলিতে চাইনা যে, প্রচারকেরা যাযাবর জীবন বরণ করিয়া লইবেন। এদিকে অনবরতই তো দেখিতেছি, পদ্মা বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া লইল, কেহ ঝগড়া করিয়া বাড়ী ছাড়িল, কেহ চাকরী-ব্যপদেশে বিদেশী হইল। এই অবস্থায়ই তো অন্যত্র বসতি করিবার

সুবিধা। যেখানে একটি পরিবার গিয়া বসতি করিতেছে, সেখানেও আপনা আপনি খানিকটা প্রচারকার্য্য হইতেছে। আসলে প্রচারটাকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করিলে কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যের অনুবাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। সাহিত্য বলিতে শুধু রস-সাহিত্যই আমি এখানে বলিতেছি না। রস-সাহিত্য বুঝিবার মতো জাতিই পৃথিবীতে মুষ্টিমেয়। উচ্চস্তরের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থকেও তাহারা বুঝিবে না। সুতরাং যে দেশের লোক সাহিত্যের যে স্তরের উপযোগী, তাহাদের সেই প্রকার সাহিত্য দিতে হইবে। শিলং-এর খাসিয়ারা ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে পারে। ইহাদের চিঠিপত্রে রোমান্ বর্ণমালা ব্যবহার করে। অর্থাৎ, ইহারা এই প্রকার অক্ষর-লিখনেই দীক্ষিত হইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যের তেমন কিছু, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত খাসিয়া ছাড়া, কেহই বড়ো জানে না। এইকথা তো সত্য যে, সাহিত্যের রসগ্রহণ করার ক্ষমতা একটি জাতির অনেক বৎসরের কালচারের নিদর্শন। একটি অসভ্য নাগা কিংবা দফলা জাতি কেহ ভালো সাহিত্যিক হইতেই পারে না। সাহিত্যের ভিতর জাতির মানসিক উন্নতির প্রকৃতি ও ছায়া পড়ে। বিংশ শতাব্দীতে বাস করিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়াছি।

আসাম প্রদেশকে ভাষার যাদুঘর বলা হয়। এই দেশে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন ভাষা বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ জাতিরই সাহিত্য বলিয়া কিছু নাই। মানচিত্র নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবেন, আসামের মস্তকের দিকে হিমালয়ের শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত, মধ্যভাগে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ অরণ্য শায়িত। গারো পাহাড়, খাসিয়া পাহাড়, অধিবাসীদিগকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া বহু ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। সমতল স্থান অল্প বলিয়া লোকসংখ্যাও কম।

মোটামুটি গারো, নাগা প্রভৃতি জাতিরা অসভ্য। ইহাদের জেলার প্রধান সহরে হয়তো দু'একজন শিক্ষিত লোক পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বেশীর ভাগ অরণ্যচারী এবং সভ্যজগতের সংস্পর্শ পায় নাই। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়, ইহারা তেমন হিংস্র নয়। এখনো ইহাদের প্রধান সহরে বাংলা স্কুল খুলিয়া ভাষা ও ব্যাকরণ শিখাইবার ঐকান্তিক চেষ্টা করিলে কাজ হইতে পারে। অবশ্য এই প্রকার কিছু কিছু কাজ রামকৃষ্ণ মিশন এবং হিন্দু মিশনের ব্রতীরা করিতেছেন, শুনিতেছি; কিন্তু এখনও তেমন ফলপ্রদ হয় নাই বলিয়াই মনে করি। ইহাদিগকে সাহিত্য বুঝাইতে হইবে একথা বলিতেছি না। ইহাদিগকে ভাষা ও ব্যাকরণ শিখাইবার কথাই বলিতেছি। এই উদ্দেশ্যে কতো দীর্ঘ বছর ব্যয়িত হইবে, কে জানে; কিন্তু ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া অন্ধকার গুহায় আলোক ফেলার প্রয়োজন।

আমাদের মণিপুর রাজ্যকে অনেকে গন্ধর্ব্বদেশ বলিয়া মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" নাট্য এই মণিপুর রাজকন্যাকেই লইয়া লিখিত। সত্যসত্য এই মনিপুরই গন্ধর্ব্বরাজ্য ছিল কি, না, তাহা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। তবে মণিপুর রমণীদের নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি এবং মণিপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যকেও আমরা সম্ভ্রমের চোখে দেখি। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল আধুনিক সহরের প্রথায় সজ্জিত? মণিপুরীদের রুচিবোধ সূক্ষ্ম এবং বেশভূষার পারিপাট্যে ইহারা জাতীয় মর্য্যাদা মানিয়া চলে। কিন্তু তবু দুঃখ হয়—আধুনিক জগতে সাহিত্য বলিতে ইহারা কি দিতে পারিল? এক কথায় সাহিত্য বলিয়া তাহাদের নিজস্ব এমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। এই জাতির দ্বারে আধুনিক বাংলা সাহিত্য পৌছাইলে, বাঙ্গালীর ভাষা পৌছাইয়া দিলে কাজের মতই কাজ হইবে। মণিপুরীরা সাধারণতঃ গৌড়িয় বৈষ্ণবধর্ম্ম মানিয়া চলে এবং গৌড়জনের প্রতিও তেমন ঘৃণার ভাব পোষণ করেন না। ইম্ফলের স্কুলগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। সহরের মণিপুরীরা আধুনিক শিক্ষাই পাইয়া থাকেন।

বাংলাভাষার প্রতি বাঙ্গালীমাত্রেরই দরদ আন্তরিক হওয়া উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময়ে বাংলায় এম-এ পরীক্ষা দেওয়া চলিত না। অধুনা তাহা হইয়াছে। কিন্তু এইখানেই থামিলে চলিবে কেন? দর্শন এবং ইতিহাসে ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে এম্-এ পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। স্বীকার করি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে এম্-এ ডিগ্রী পর্য্যন্ত প্রস্তুত হওয়ার মতো উপযুক্ত পুস্তক বাংলা ভাষায় নাই, কিন্তু প্রস্তুত করিবার তো প্রয়োজন। ঢিমে-তেতালায় না-চলিয়া তাড়াতাড়িই চলা উচিত। [ক্রমশঃ

রাজসিংহের ভূমিকা

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত

(৬)

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য; আমরা হিন্দু মুসলমান মিলনের খুবই পক্ষপাতী, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করিয়া নয়। গত অর্দ্ধশতাব্দি হইতে অনেক লেখক যাহার যে চরিত্র, তাহাকে সেইভাবে চিত্রিত না করিয়া অমূলক ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমানের মিলন সংঘটন করিবার প্রয়াসে অদুরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু বঙ্কিম সেরূপ করেন নাই। To call a spade a spade-ই ছিল বঙ্কিমের একমাত্র নীতি। এই নীতি অনুসরণ করিতেন বলিয়া, অন্যায়ভাবে তিনি মুসলমানদ্বেষী বলিয়া নিন্দিত হইলেও এবং সে নিন্দায় অনেক স্বজাতি-দ্বেষী অনেক হিন্দুও যোগদান করিলেও, বঙ্কিম যে প্রকৃতভাবে হিন্দু মুসলমানের প্রতি সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ভারতবাসীর মধ্যে বঙ্কিম অপেক্ষা অধিকতর হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না। "সীতারাম" গ্রন্থ সমালোচনায় এই হিন্দু-মুসলমান মিলন তত্ত্ব বিষদভাবে আমরা আলোচনা করিয়াছি। মুসলমান চাঁদশা ফকিরই যে সীতারামের প্রধান উপদেশক, বঙ্কিম তাহা দেখাইয়াছেন এবং তাঁহারই উপদেশে নূতন আদর্শরাজ্যের নামকরণ হইয়াছিল "মহম্মদনগর"। বঙ্কিম প্রমাণ কবিয়াছেন :—"হিন্দু-মুসলমানের ঈশ্বর বা আল্লা এক, আর হিন্দুকেও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার মুসলমানকেও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। এই হিন্দু মুসলমানের দেশে, যে ব্যক্তি হিন্দু মুসলমানে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিবে সে ঘোরতর পাপগ্রস্থ হইবে। প্রজায় প্রজায় বিচ্ছেদ পাপ।"

সীতারামে হিন্দু মুসলমানে মিলন তত্ত্ব প্রকাশিত হইবার ৮।৯ বৎসব পরে বঙ্কিম তাঁহার শেষ রচনা "রাজসিংহ" উপন্যাসের উপসংহারেও এই ভাব হইতে একটুও বিচ্যুত হন নাই। বঙ্কিম লিখিয়াছেন—

"গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানে কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থেব উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য যোগ্য ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দুব অপেক্ষা রাজকীয়গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিলেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট।"

এই সমদর্শিতায় বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবের খাঁটি ঐতিহাসিক চরিত্র সমুপস্থিত করিয়াছেন বটে, মোগল বাদশাহ কন্যাগণের অনাচার উল্লেখ করিতেও ত্রুটী কবেন নাই সত্য, কিন্তু জেবউন্নিসার অনুতাপ ও স্বার্থশূন্যতায় তাঁহাকেও আবাব গরীয়সী চরিত্রে পরিণত করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই সমদর্শিতায় বীর মোবারক চরিত্রও কম শ্লাঘনীয় করিয়া তিনি চিত্রিত করেন নাই। মুসলমান বীরও যে পরোপকার, কৃতজ্ঞতাবোধ এবং নীতিরক্ষায় হিন্দুর অপেক্ষা ন্যূন নহেন, 'রাজসিংহে' তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যথাসময়ে আমরা তাহা পাঠকের কাছে উপস্থিত করিব।

এইবারে আমরা রাজসিংহের 'যোধপুরী বাঈ' সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিব। স্যার যদুনাথ এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

"ঔরঙ্গজেব বাদশাহ কোন যোধপুর কন্যাকে বিবাহ করেন নাই; তাঁহার একমাত্র হিন্দুপত্নীর নাম "নবাববাঈ," কাশ্মীর সহরের রাজাউর শহরের ক্ষুদ্র রাজার কন্যা। নবাববাঈকে মুসলমান করিয়া তাহার পর ঔবঙ্গজেবেব সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। সুতরাং বঙ্কিমের উক্তি "ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম—যোধপুর রাজকন্যা—ঐতিহাসিক ভুল।"

বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহে যোধপুরী বেগমকে ঐতিহাসিক চরিত্র কখনও বলেন নাই। সুতরাং এখানে সেই প্রসঙ্গে তর্ক করাই অনাবশ্যক (irrelevant)। সমগ্র বিষয়টী আলোচনা না করিয়া উপন্যাসের অন্য চরিত্র লইয়া মতামত করিয়া স্যার যদুনাথ বঙ্কিমের প্রতি অবিচার করিয়াছেন।

নবাববাঈ যে হিন্দুরাজকন্যা তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। বঙ্কিম নবাববাঈ নাম না দিয়া যোধপুরীবেগম নাম রাখিয়াছেন—বোধ হয় উদিপুরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য অথবা সকলের বুঝিবার জন্য, অথবা নবাববাঈ নামটাতে একটু মুসলমানী গন্ধ আছে বলিয়া। তবে এই বেগম যে হিন্দু আচার রক্ষা করিয়াছিলেন—(এবং যে হিন্দু আচার রক্ষা করায় উপন্যাসের ঘটনা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে)—সেই ঘটনা ইতিহাস-অনুমোদিত।

এই বেগমই ছিলেন মহম্মদ, মজম ও আর একটী কন্যার গর্ভধারিণী। মহম্মদ পিতৃরোষে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হন, আর ঔরঙ্গজেবকে যে ভগ্নী রোশেনারা সিংহাসনারোহণে বিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন—তিনিও এক সময়ে মজমের দাবী ব্যর্থ করিবার প্রয়াসে আজমকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য মহম্মদ ও মজমের জননীর মঙ্গলার্থ মসজীদে গিয়া নমাজ পড়েন নাই, হিন্দু দেবদেবীরই পূজা করিয়াছিলেন। মণুচী বলেন—

"Mohomed and Mozzom were the sons of one mother, a Rajput by race, who offered sacrifice to idols that Sultan Mozzom her son might be King, seeing that the eldest was a captive." II: 57.

এই অবস্থায় নবাববাঈ যে সর্ব্বদা বাদশাহার অন্তঃপুরেও হিন্দু আচার ব্যবহারাদিই মানিয়া চলিতেন ও আপন প্রকোষ্ঠে দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই দেখিতেছি বঙ্কিমের যোধপুরীবেগমের ইতিহাসে যিনি কাশ্মীরের রাজাউরির রাজকন্যা পরে নবাব বাঈ) আচার ব্যবহারটুকু পর্য্যন্ত ইতিহাস-অনুমোদিত।

উদীপুরী খৃষ্টান ছিলেন, আর তাহার পানাশক্তিও অতি প্রবল ছিল। সম্রাট যদি মুসলমান ধর্ম্মে অত্যধিক অনুরাগী হইয়াও এক বেগমকে বিধর্ম্ম ও অনাচার নিরত হইতে কোন আপত্তি করিতে না পারেন, তবে প্রধান বেগমকে তাহার ধর্ম্ম ও আচার পালনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবারও কোনও কারণ নাই।

আবার দেখিতেছি যোধপুরীবাঈর সব কথাগুলিই মণুচীর ইতিহাসে আছে। রোশেনারা এই বেগমের (নবাব বাঈ) প্রতি বিশেষ ঈর্ষাপরায়ণা ছিলেন এই জন্যই বোধ হয় তাহার পুত্রের দাবী উপেক্ষা করিয়া শিশু আজমকে রোশেনারা বেগম রাজতক্তে বসাইতে চাহিয়াছিলেন। রোশেনারার চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া রাজ্যে গোলমালের আশঙ্কায় এই বেগম রোশেনারাকে তাহা বলিতে গেলে তিনি চুলে ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। (মণুচী)—বঙ্কিমচন্দ্র সেই উপাখ্যানটি নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছে—

যোধপুরীবেগম দেবী নাম্নী পরিচারিকাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "একদিকে শিবাজী, আরদিকে যদি রাজসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয়দিন টিকিবে ?"

দেবী—"এমন কথা বলিও না। দিল্লীর তক্ত আপনার ছেলের জন্য আছে। আপনার ছেলের সিংহাসন ভাঙ্গিবার পরামর্শ আপনি দিতেছেন ?"

বেগম—এমন ভরসা করি না যে, আমার ছেলে এ তক্তে বসিবে। যতদিন রাক্ষসী জেব-উন্নিসা আর ডাকিনী উদিপুরী বাঁচিবে, ততদিন সে ভরসা করি না। একবার সে ভরসা করিয়া, রোশেনারার কাছে বড় মার খাইয়াছিলাম। আজিও মুখ চোখে সে সব দাগ অধমের চিহ্ন আছে।

এইটুকু বলিয়া যোধকুমারী একটু কাঁদিলেন। তারপর বলিলেন—

"সেসব কথায় কাজ নাই। তুমি আমার সকল মতলব বুঝিবে না—বুঝিয়াই বা কি হইবে ? যাহা বলি তাই করিও। রাজকুমারীকে রাজসিংহের শরণ লইতে বলিও, রাজসিংহ রাজকুমারীকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। বলিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তিনি রাণার মহিষী হউন। মহিষী হইলে যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, "উদীপুরী তাঁর তামাকু সাজিবে—রোশেনারা তাঁকে পাখার বাতাস করিবে।"

এইখানে বঙ্কিমের একটু ঐতিহাসিক ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়। যোধপুরীবাঈ ও রোশেনারার নাম যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা anacronism.

যোধপুরীবেগম উক্ত কথা বলিতেছিলেন ১৬৭৯-৮০ সালে কিন্তু রোশেনারা বেগম দেহত্যাগ করেন ১৬৭১, অতএব তখন রোশেনারার কথা আসিতেই পারে না।

আমরা বঙ্কিমের ভুল কোথাও পাই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ তাঁহার ন্যায় সতর্ক লেখক বড় কম। এইখানে এই ত্রুটীটুকু যে দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহাতে আমরা বিস্মিত। বোধ হয় কবিকল্পনায় উদিপুরীর সহিত এখানে তাহার নাম করিয়াছেন।

তবে এ ত্রুটীও স্যার যদুনাথের চক্ষে কেন পড়ে নাই, আমরা উহাতে বড়ই বিস্মিত হইলাম।

রোশেনারার কথাও যেমন ঐতিহাসিক আর দুইজনের পক্ষেও সেইরূপ সত্য। জেব উন্নিসা ভ্রাতা আকবরের সিংহাসন প্রাপ্তির পক্ষে ছিলেন, এই জন্যই নাকি পরে বন্দী হইয়াছিলেন। উদিপুরীও তাহার গর্ভজাত পুত্র কামবক্সের তক্ত লাভে অভিলাষ করিতেন। কিন্তু কামবক্স বিদ্রোহী হইলেও উদিপুরী বন্দী হয়েন নাই।

আর একটী কথা—

আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান সকলেই হিন্দু পত্নীগণকে হিন্দু আচারে থাকিতে আপত্তি করিতেন না। ঔরঙ্গজেবের বিবাহ দিতে গিয়া সম্রাট সাজাহান হিন্দু কন্যাকে মুসলমান করাইয়া গৃহে নিবেন, তাঁবেদার ঐতিহাসিকগণের এই কথাটা যেন কিরূপ হেঁয়ালী বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ সাজাহান বাদশাহ অত্যন্ত হিন্দু প্রক্ষপাতী ছিলেন।

এই যোধপুরী বেগম সম্বন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"তিনি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের ঘরে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াও তাঁহার সুখ ছিল না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পুরী মধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানী রাখিতেন। হিন্দু পরিচারিকা দ্বারা তিনি সেবিতা হইতেন, হিন্দুর পাক ভিন্ন ভোজন করিতেন না,—এমন কি, ঔরঙ্গজেবের পুরী মধ্যে হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। বিখ্যাত দেবদ্বেষী ঔরঙ্গজেব যে এতটা সহ্য করিতেন ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঔরঙ্গজেব তাহাকেও একটু অনুগ্রহ করিতেন।"

কথাগুলি ইতিহাসের দিক্ দিয়া অসত্য নয়।

অতএব, কেবল নবাববাড়ী স্থলে যোধপুরীবেগম এই নামটীর পক্ষে ত্রুটী থাকিলেও তাঁহার সম্বন্ধে উপন্যাসে যে যে উক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী কথায়ই ঐতিহাসিক সত্য রহিয়াছে।

পাঠকের স্মরণ আছে যে, গত বারে আমরা জেব উন্নিসার কথা বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছি। এবার আর একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব। উপন্যাসে আছে জেব উন্নেসা মবারকের সহিত কাজীর নিকটে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আবার পিতৃ শিবিরে উপস্থিত হইলে, বাদশাহ বলেন—

"তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর নাই, বুঝিতে পারিতেছি। এক্ষণে তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম। কিন্তু সাবধান, বিবাহের কথা প্রকাশ না পায়—"

কিন্তু মবারককে আর নিকটে রাখিলেন না। ছল করিয়া দুই হাজারের মনসবদার করিয়া আকবরের সহায়তায় রাজপুতনায় পাঠাইয়া দিলেন। মবারক বুঝিলেন তাহার মৃত্যু একান্ত আসন্ন ও সুনিশ্চিত। যাইবার পূর্ব্বে জেব উন্নিসাকে মোবারক দুঃখের সহিত বলিয়া যান—

"তোমাকে আবার পাইয়াছি, কিন্তু দুঃখ এই যে এই সুখ দশদিন ভোগ করিতে পারিলাম না।"

জেব উন্নিসা—কেন, কে বাধা দিবে? বাদশাহ?

মবারক—সে সন্দেহও আছে। কিন্তু বাদশাহের কথা এখন বলিতেছি না। আমি কাল যুদ্ধে যাইব।…

জেব উন্নিসা সজল নয়নে বলিল, "ঈশ্বর অবশ্য করিবেন যে, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিবে। তুমি আমার কাছে না আসিলে আমি মরিব।"

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মবারক বলিল, "ইয়া আল্লা! আমাকে মরিতেই হইবে।"

জেব উন্নিসা তখন অতি কাতর স্বরে বলিল, "তবে আমাকেও।"

অতঃপরে যুদ্ধের পর জেব উন্নিসা শুনিল, মবারক যুদ্ধে মরিয়াছে। তখন সে বেশভূষা দূরে নিক্ষেপ করিল। উদয় সাগরের প্রস্তর-কঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিল।

বঙ্কিমচন্দ্র জেব উন্নিসার পরিণতি এই ভাবে সাধন করিয়া জেবউন্নিসাকে গরীয়সী নারী চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জেবউন্নিসা ঐতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু মবারকের সহিত তাহার প্রেম সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক নহে। তবে উর্দ্দু সাহিত্যিকগণ বলেন প্রেমঘটিত ব্যাপারে জেব

উন্নিসার প্রতি ঔরঙ্গজেব ক্ষুব্ধ হন। যদি তাহা সত্য হয় তবে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে যে অবস্থায় আনিয়াছেন তাহাতে উহা একেবারে অনৈতিহাসিক বলা যায় না। কিন্তু স্যার যদুনাথ বলেন, আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে, জেবউন্নিসা সেই বিরোধের সমর্থনে যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ঔরঙ্গজেবের হস্তগত হওয়ায় তিনি জেব উন্নিসাকে গোয়ালিয়র দুর্গে আজীবন বন্দী করিয়া রাখেন।

অতএব দেখিতেছি যে, ঔরঙ্গজেব রাজনীতি-বিশেষজ্ঞা কন্যা জেবউন্নিসাকে প্রেম ঘটিত ব্যাপারে কি বিদ্রোহের জন্য বন্দী করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ঔরঙ্গজেবের কথায় তাহার মনোগত ভাব বুঝাও কঠিন। কিন্তু যাহাই হউক্ না কেন, কোন ক্ষেত্রেই জেবউন্নিসার চরিত্র-মলিনত্ব প্রাপ্ত হয় না। মবারক ও জেবউন্নিসার কাল্পনিক কাহিনী যদি প্রকৃতই সত্য হইয়া থাকে, তবে তাহাতে জেবউন্নিসার চরিত্রে কোন দোষ স্পর্শে না। আর আকবরের সঙ্গে বিদ্রোহের সহায়কারিণী হইলেও তাহাতেও জেবউন্নিসা চরিত্রে দোষ হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জেবউন্নিসা রাজ্য শাসন সম্বন্ধে সম্রাটকে অনেক বিষয়ে সহায়তা করিতেন। সুতরাং ঔরঙ্গজেবের সব ব্যাপারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিবার তাহার সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছিল। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে, ঔরঙ্গজেবের আত্মঘাতী নীতিতে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য। তাহার প্রথম কারণ রাজপুত বীরগণ সকলেই সম্রাটের কার্য্যে ক্ষুব্ধ; তাহাদের অধিকাংশই বিদ্রোহী। রাজপুতগণের সৌহার্দ্দ ও সহযোগিতায় সম্রাট আকবর যে সাম্রাজ্য গঠন ও বিস্তৃত করিয়াছিলেন, সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সাজাহান যে সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাহার পিতা ঔরঙ্গজেবের হস্তে তাহা যাইতে বসিয়াছে।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি জেবউন্নেসা তাই নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন যে, একমাত্র আকবরই সেই সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সক্ষম। আকবর যে নির্দ্দোষ ছিল তাহা নয়, তাঁহার উদ্ধত প্রকৃতি ও বিলাস পরায়ণতা প্রধান দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত বটে, কিন্তু সে সাহসী ছিল ও বস্তুতই অমায়িক ব্যবহারে রাজপুতগণের শ্রদ্ধার্জ্জন করিয়াছিল। আর উপকারীর প্রতি কখনও সে কৃতঘ্নতা দেখায় নাই। রাজসিংহ ও দুর্গাদাস তাহাকে বলিয়াছিলেন :—

"আপনার পিতা মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস্ করিতে দৃঢ় সংকল্প। রাজপুতদের সাহায্যে আপনার পূর্ব্ব পিতৃগণ এই সাম্রাজ্য গড়িয়াছিলেন। আপনি যদি নিজবংশপরায় সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, তবে রাঠোর এবং শিশোদিয়া এই দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু জাতির সমস্ত বীরগণ আপনাকে সমর্থন করিবে, তাহাদের নেতা হইয়া যুদ্ধ করিয়া আওরংজীবের রাজ মুকুট কাড়িয়া লইয়া অতি সহজেই আপনি নিজে বাদশাহ হইতে পারিবেন।"*

আকবর তাঁহাদের সহিত যোগদান করিবার পরে তাহাদের সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ করেন নাই। তাঁহার সারল্যে মুগ্ধ হইয়া দুর্গাদাস তাহাকে মহারাষ্ট্রে পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল। সেখানেও দুর্গাদাসের পরামর্শ ব্যতিরেকে সে একপদও অগ্রসর হয় নাই। পিতার প্রলোভন বাক্যে কখনও বশীভূত হইয়া আবার সুলতান মহম্মদের অদৃষ্টও বরণ করিয়া লয় নাই। ইহাতেও তাহার পরিণত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পিতাকে যে পত্রখানি লেখেন তাহাতেও তাহার দূরদর্শিতা অনুমিত হয়। আকবর পিতাকে লিখিতেছে—"আমার এই বিদ্রোহের পথে পথ-প্রদর্শক আপনি···

"আজ তিন বৎসর ধরিয়া হিন্দুস্থানের বাদশাহ স্বয়ং, তাহার সম্ভ্রান্ত পুত্রগন, নামজাদা উজীরগণ এবং উচ্চ ওমরাহগণ রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হতভম্ব হইয়াছে, এখনও কোন ফল লাভ করে নাই। আর কেনইবা এমন না হইবে? যেহেতু আপনার রাজত্বকালে মন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতা নাই, ওমরাহদের উপর বিশ্বাস নাই। সৈন্যগণ দরিদ্র, লেখকশ্রেণী বেকার, বণিকেরা পুঁজিহীন এবং রায়ৎগণ পদদলিত। দাক্ষিণাত্যের মত প্রশস্ত এবং ভূতলে স্বর্গ স্বরূপ দেশ পাহাড় ও মরুভূমির মত বিশিষ্ট ও উজাড় হইয়া গিয়াছে।···হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর দুই বিপদ পড়িয়াছে—সহরে সহরে জিজিয়া আদায় আর আর মাঠে মাঠে শত্রুদের প্রাধান্য।···আপনার সমস্ত সাম্রাজ্যের শাসনভার এবং রাজনৈতিক পরামর্শ দানের কাজ কাহার হাতে দিয়াছেন?

---

* যদুনাথের রাজসিংহের ভূমিকা

শ্রমিক লোক, নীচ লোক, পাজি, জোলা, তাঁতী, সাবান ফেরীওয়ালা দর্জ্জি—এই শ্রেণীর সব কর্ম্মচারী হইয়াছে। তাহারা প্রতারণার চোগা বগলে করিয়া, শয়তানের ফাঁস অর্থাৎ জপের মালা হাতে লইয়া, কতকগুলি কোরাণী প্রচলিত বাণী ও নীতি উপদেশ জিহ্বাতে আওড়াইতে থাকে; আর আপনি এই সব লোককে জেব্রিল ও আস্‌রফিলের মত সহরে বন্ধু ও উপদেষ্টা বলিয়া মনে করিয়া নিজকে সম্পূর্ণরূপে ইহাদের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। এই সব জুয়াচোরেরা এই সুযোগে নমুনা দেখায় গম আর মাল দিবার সময় দেয় যব, পর্ব্বতকে বলে ঘাস আর ঘাসকে দেখায় পাহাড় বলিয়া।

"যখন আমি এই সব দুরবস্থা দেখিলাম এবং আপনার চরিত্র সংশোধন হইবার কোন সম্ভবনা নাই বুঝিলাম তখন রাজকীয় আত্মসম্মান আমাকে বাধ্য করিল যে আমি নিজেই হিন্দুস্থানের মুলুককে অত্যাচার ও অশান্তির খড় কাঁটা হইতে সাফ করিয়া দিই। কি সুখের বিষয় হইবে যদি ভগবান আপনাকে এমন সুবুদ্ধি দেন যে আপনি রাজ্যভার আপনার এই অধমতম পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া এবং স্বয়ং পুণ্যতীর্থ দুইটীর (মক্কা ও মদিনার) যাত্রী হইয়া, এই ব্যবহার দ্বারা জগৎকে নিজ গুণগান করিতে ইচ্ছা করেন।

"আপনি এ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন রাজ্য ও দুনিয়ার বস্তু লাভ করিতে যাহা স্বপ্ন অপেক্ষাও অধিক অস্থায়ী। এখন সময় আসিয়াছে আপনার পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য; আপনি যৌবনকালে এই নশ্বর ইহজগতের প্রলোভনে নিজ পিতা ও ভ্রাতাগণের সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করুন।"

উপরোক্ত অনুবাদ আমরা স্যার যদুনাথ হইতেই লইয়াছি।

যাহা হউক, এই পত্রে আকবরের সাহস, তেজস্বিতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কথা হইতে পারে যে আকবর নিজ স্বার্থের জন্য এই স্থলে চিঠি লিখিয়া থাকিতে পারে। পারে বটে, কিন্তু আকবর তাহা করে নাই। আকবরের চরিত্রই ছিল সরল এবং বিশ্বাস ঘাতকতারূপ দুরপনেয় দোষ কখনও তাহার চরিত্র স্পর্শ করে নাই। রাজপুতগণ তাহার চরিত্রে কখনও ব্যথিত হয় নাই। তবে একবার হইয়াছিল তাহা ঔরংজীবের কপট নীতিতে—তাহার চরিত্রের জন্য নহে।

এই অবস্থায় জেবউন্নিসা আকবরের প্রতি সহানুভূতি পরবশ হইয়া সা নেওয়াজখাঁর দৌহিত্রীর মতই কাজ করিয়াছিল। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে আজমীরের যুদ্ধে সা নেওয়াজ নিজের জামতার বিরুদ্ধেও উদার হৃদয় দারা সেঁকোর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহতও হন। স্বভাবের নিয়মই এই যে পিতা বা স্বামী অন্যায় বা অধর্ম্ম করিলে কতদিন তাহা সহ্য করিতে পারা যায়? তাই ন্যায়-পরায়ণা মোগল কুমারী ঔরঙ্গজেবের পোষকতা করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবের স্ত্রীকে দিয়াও এই কথা বলাইয়াছেন। যোধপুরী বেগম মনে মনে বলিতেছে:—

"হে ভগবান আমাকে রক্ষা কর! এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দু নাম লোপ পাইবে।"

জেবউন্নিসারও মনে মনে এইরূপ ভাব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বন্দী অবস্থায়ও বুদ্ধিমতী জেবউন্নিসা ধর্ম্মহীন পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থিনী হন নাই।

পিতাকে বন্দী করিয়াও ঔরঙ্গজেব সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিতেন যদি তিনি জাতি নির্ব্বিশেষে সমগ্র প্রজাবর্গকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। সাজাহানও পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, সহোদর খসরুর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, সহোদর শাহরিয়ারকে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি প্রজাবর্গ তাঁহাকে ভালবাসিত, কারণ তিনি অপত্য-নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে শাসন করিতেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব পুত্রসম অসংখ্য প্রজার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিতেন। তাঁহার প্রজা হিন্দুও ছিল মুসলমানও ছিল, একের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া অন্যের প্রতি পীড়ন ও ভয়ানক অত্যাচার রাজার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। ঔরঙ্গজেব সেইরূপ অত্যাচার করিয়া ঘোরতর পাপ করিয়াছেন। রাজার দোষে রাজ্যনাশ। বিরাট মোগল সাম্রাজ্য ঔরঙ্গজেবের এই দুরপনেয় পাপেই বিনষ্ট হইয়াছিল। তাই বঙ্কিম লিখিয়াছেন—

"ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল।"

বঙ্কিমের প্রধান গুণ ছিল যে, তিনি কখনও কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে খুসী করিবার জন্য কোন অসত্য কথা লিখিতেন না। তাই তিনি হিন্দুকেও রেহাই দেন নাই,

মুসলমানকেও দেন নাই। আবার যেমন হিন্দু চরিত্রের গুণ প্রকাশ করিয়াছেন, মুসলমান চরিত্রেরও সমভাবে গুণ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখকের মনে হয়, আয়েসা চরিত্রের মত এরূপ দুর্লভ চরিত্র বাঙ্গলা সাহিত্যেই বিরল। ওসমান, মবারক, দরিয়াও কম শ্লাঘনীয় হয় নাই। ঔরঙ্গজেবকেও তিনি বুদ্ধিমান, কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রাজকীয়গুণে গুণবান বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বঙ্কিমের জেবউন্নিসাও পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় ও বিলাস পরায়ণা থাকিলেও পরে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া খুবই প্রকৃষ্ট চরিত্রে পরিণত হইয়াছিল। চাঁদশা ফকিরের মত এরূপ মহৎ চরিত্র নরকুলে দুর্লভ। তাই বঙ্কিমের কথা সমর্থন করিয়া আমরাও বলিতেছি—

"অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে, হিন্দু হৌক মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ।"

তাই ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন যে, ঔরঙ্গজেব বস্তুতঃই ধর্ম্মশূন্য ছিলেন। এই চরিত্র যে তিনি ইচ্ছা করিয়া আঁকিয়াছেন তাহা নয়। রাজসিংহ চরিত্র অঙ্কণ করিতে হইলে ঔরঙ্গজেব চরিত্রের আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং তাহা ইতিহাসোক্ত না করিয়া অযথা স্তুতিবাদ করিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। অনেকে মনে করেন বহু মুসলমান ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতী। তাই ঔরঙ্গজেবকে মহৎ চরিত্রে পরিণত করিলে মুসলমানগণ খুসী হইবে। অযথা বা অতিশয়োক্তি করিয়া খুসী করার অর্থ—ভয়। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, ভয় বা ভ্রুকুটিতে প্রকৃত মিলন হয় না। সত্যিকার মিলন হয় প্রেমবন্ধনে। বিশেষতঃ ইতিহাস সত্য না হইলে স্থায়ী হয় না। সত্য ঘটনা উল্লেখে বরং হিন্দু মুসলমানের ভ্রম সংশোধিত হওয়া সম্ভব। স্যার ওয়াল্টার স্কট ও সেক্সপিয়ারের নাটক দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবকে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন,

"উভয়েই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি; উভয়েই ঐশ্বর্য্যে, সেনাবলে, গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উভয়েই শ্রমশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী এবং প্রজাপীড়ক। এইজন্য উভয়েই আপন আপন সাম্রাজ্য ধ্বংশের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন—উভয়েই ক্ষুদ্র শত্রুদ্বারা পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন; ফিলিপ ইংরেজ (তখন ক্ষুদ্র জাতি) ও ওলন্দাজের দ্বারা, ঔরঙ্গজেব মারহাট্টা ও রাজপুতের দ্বারা।"

স্যার যদুনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাজসিংহের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া এই সমস্ত কথার কোনরূপ সত্যতা বিচার বা নিরূপণ না করিয়া নূতন একজন ধর্ম্মান্ধ ওম্মায়াদ খলিফার চরিত্রের সহিত তাঁহাকে তুলনা করিয়াছেন। তিনি যাহাই করুন, বঙ্কিমের উক্তি সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া তিনি বঙ্কিম এবং তাঁহার চিত্রিত চরিত্র উভয়ের উপরই অবিচার করিয়াছেন, অমর্য্যাদা দেখাইয়াছেন।

অনেক সাহিত্য-রথী উপন্যাস ও নাটকে ঔরঙ্গজেবের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ মহাশয়গণের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র "মাধবী কঙ্কণ" লেখেন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, "জীবন-প্রভাত" লেখেন তাহার এক বৎসর পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। উভয় পুস্তকেই স্বদেশ প্রেমের অনেক কথা আছে। যদিচ রমেশচন্দ্র বঙ্কিম বাবুর নিকটেই প্রথম উপন্যাস লিখিবার অনুপ্রেরণা পান, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে তিনিই সর্ব্বাগ্রে লেখেন। "মাধবী কঙ্কণে" সাজাহানের পীড়া, ভ্রাতৃবিরোধ ও ঔরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণের কথা আছে। আর "জীবনপ্রভাতে" ঔরঙ্গজেব যে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না এবং ক্রূর প্রকৃতি থাকা নিবন্ধন শিবাজীকে ঘোরতর শত্রুরূপে পরিণত করিয়াছিলেন সেই কথা আছে। এইখানে একটা প্রধান কথা হইতেছে, এই ভ্রাতৃবিরোধে যদুনাথ ঔরঙ্গজেবকে কতটা দায়ী করিয়াছেন। যদি প্রধান প্রধান কথাগুলি ইতিহাসোক্ত না হয়, যদি "আলমগীর নামার" মতই তিনি ঔরঙ্গজেবের প্রত্যেক কার্য্য সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে স্যার যদুনাথকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনটী কাহিনীর উল্লেখ করিব :—

সকলেই জানেন, দিল্লীর মোগল সম্রাট সাজাহান বাদশাহ প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিবার পরে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাই

পিতার নামে শাসন কার্য্য-পরিচালনা করিতেন। সাজাহান দারার প্রতি খুবই স্নেহ প্রদর্শন্- করিতেন। আব সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা বেগম সহোদর দাদাকে সব কার্য্যেই সহায়তা করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাহানারা খুবই মহীয়সী রমণী ছিলেন। লাহোর, কাবুল ও কান্দাহার প্রভৃতি রাজ্যের শাসনভারও দারার হস্তে ন্যস্ত ছিল, তবে তিনি প্রতিনিধির সহায়তায় তাহা পরিচালনা করিতেন। কেননা অধিকাংশ সময়ই দারাকে পিতার কাছে থাকিতে হইত। দ্বিতীয় পুত্র সুজার উপরে ছিল বাঙ্গালা দেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার। সুজা উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ও সাহসী ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু অত্যধিক বিলাস-পরায়ণ ছিলেন।

ঔরঙ্গজেব ছিলেন বুদ্ধিমান, তেজস্বী, সাহসী ও শ্রমশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয়- গুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ক্রুব এবং সন্দেহযুক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি তিনি অত্যন্ত অসদৃশ ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার পাপেই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ- হয়। ইঁহার হস্তে ছিল দাক্ষিণাত্যেব ভার।

মোরাদ ছিল গুজরাটের শাসন কর্ত্তা। সত্য বটে, মোরাদ খুবই নির্ভীক ও যুদ্ধপরায়ণ ছিল কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ছিল বড় অল্প, অত্যধিক মদ্যাশক্তি ও বিলাসপরায়ণতায়ই তাঁহার পরিণাম এত শোচনীয় হয়।

পীড়াহেতু সম্রাট কিছুদিন উপর (ঝরোখা) হইতে প্রজাবর্গকে দর্শন দান দিতে না পারায় প্রজাগণের মধ্যে দুষ্টলোকের ষড়যন্ত্রে রাষ্ট্র হইল যে, তিনি আর ইহসংসারে নাই। দারা বহু চেষ্টা কবিয়াও সেই কোলাহল দমন করিতে পারেন নাই। এই সংবাদ পাইয়াই অন্যান্য তিন ভাই সিংহাসন লাভ করিতে অগ্রসব হইতে লাগিল। দারার উপরেই তাঁহাদের যত বোষ; কেন না দারাকে সম্রাট খুব স্নেহ করেন এবং তিনি রাজপ্রতিনিধি সুতরাং সকলের বিশ্বাস যে, তিনিই সম্রাট হইবেন। সুজা রাজমহলে আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। মোবারদও গুজরাটে আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ঔরঙ্গজেব আসিয়া মোরাদের সঙ্গে যোগদান করেন। নর্ম্মদা তীরে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের স্থান ছিল ধারপাত এবং ১৬৫৮ সালের এপ্রিলে এই যুদ্ধ হয়।

এই সন্ধিস্থলেই ঔরঙ্গজেবের চরিত্র প্রতিভাত হয়। বাহিরে ঔরঙ্গজেব ফকিরের পোষাক পরিয়া থাকিতেন এবং লোক চক্ষে ফকির বলিয়া প্রতিভাত হইতেন। এখন জিজ্ঞাস্য, এই যে ঔবঙ্গজেব কি প্রকৃতই ফকির ছিলেন, না ফকিরীর ভাণ করিতেন। যদি তিনি প্রকৃতই ফকিরী করিতেন, তবে যে তিনি আদর্শ সম্রাট হইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যদি তিনি ফকিরীব ভাণ করিতেন, তবে বঙ্কিম যে ভাষায় তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ কবিয়াছিলেন, তাঁহার কথাই একেবারে খাঁটি সত্য। এই বিষয়ে দেখিতে হইবে যে, ইতিহাস কি বলে। সেই ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, বিভিন্ন স্থানের পর্য্যটকগণ এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়াই স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত "মাধবী কঙ্কণে" এই ভাবে লিখিয়াছেন—

"আজি আরংজীব ও মোরাদ দুই ভ্রাতর সাক্ষাৎ হইয়াছে, কালি যুদ্ধ হইবে। জয় জয় নাদে দেশ পরিপূর্ণ হইতেছে। পট্যবস্ত্রমণ্ডিত উৎকৃষ্ট দীপালোকশোভিত একটি প্রশান্ত শিবিবে দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিয়াছেন, চারিদিকে জগদ্বিমোহিনী নর্ত্তকী ও গায়ীকাগণ নৃত্য-গীতাদি করিয়া রাজপুত্রদ্বয়ের মনোরঞ্জন করিতেছে। মোবাদের প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষস্থল, বীর আকৃতি ও অকপট হৃদয়; আরংজীবের ললাট কুঞ্চিত, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও তীব্র, মন সর্ব্বদাই সংস্র চিন্তায় অভিভূত।

"তথাপি আরংজীব কি সুন্দর সরল হাসিই হাসিতেছেন, কি সম্মান সহকারে মোরাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, যেন ভ্রাতাকে দেখিযা তিনি আর আনন্দ রাখিতে পাবিতেছেন না, যেন ভ্রাতার কার্য্যসাধন অপেক্ষা তাঁহার জন্য আমোদ বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যই নহে। ভোজন সাঙ্গ হইল, ভৃত্যেরা ফল ও মদিরা লইয়া আসিল। গায়িকাগণ পুনবায় সপ্তস্বরে গান আরম্ভ করিল, শিবির আমোদিত হইল। কেশে হীরকের সহিত কটাক্ষ দৃষ্টির জ্যোতি মিশিয়া যাইতে লাগিল, সুললিত গানের সহিত সুমিষ্ট হাস্যধ্বনি মিশিয়া যাইতে লাগিল, মোবাদ একেবারে বিমোহিত হইলেন। অবশেষে আরংজীবের ইঙ্গিতে নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল।

"আরংজীব সুবর্ণপাত্রে মদিবা ঢালিয়া মোরদের হস্তে দিয়া বলিলেন, আজি সেবায় আপনাকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছি, আজি আমার জীবন সার্থক।

মোরাদ। আরংজীব, আপনার স্থায় অমায়িক ভ্রাতা আমি পাইব না। একটু মদিরা আপনার জন্য লউন।

আরংজীব। ক্ষমা করুন, আপনি জানেন আমার জীবনে সুখের বাঞ্ছা নাই, হৃদয়ে বড় মানস আছে, আপনার মত বীর পুরুষকে পিতৃসিংহাসনে একবার দেখিব, ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় ইচ্ছা নাই। পৈগাম্বর যদি এই এয়াদা সফল করেন, তাহা হইলে সন্তুষ্ট মনে ফকিরী গ্রহণ করিয়া মক্কায় যাইব। এই বলিয়া আরংজীব আর এক পাত্র মদিরা দিলেন।

মোরাদ। আরংজীব আপনি যথার্থই ধার্ম্মিক, তাহা না হইলে আমার জন্য আপনি এরূপ যত্ন করিবেন কেন?

আরংজীব। কাহার জন্য করিব? তৈমুরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার উপযুক্ত আর কে আছে? সুজা বিলাসপ্রিয় ও ভীরু, সুজা তৈমুরের সিংহাসন কলঙ্কিত করিবে? আত্মাভিমানী মূর্খ কাফের দারা তৈমুরের সিংহাসন কলুষিত করিবে? তাহা অপেক্ষা পুনরায় হিন্দুস্থান কাফেরদিগের হস্তে যাউক, তৈমুরের নাম বিলুপ্ত হউক, ইহাদের জন্য আমি যুদ্ধ করিব না, যাঁহার সাহস অপরিসীম, যাঁহার যশোরাশিতে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছে, যিনি মোগল সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ, যিনি মোগল কুলের কুলতিলকস্বরূপ, তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিব। আমি আপনার সম্মুখে আপনার সুখ্যাতি করিতে চাহি না, কিন্তু যখন আমি আপনাকে দেখি, আমার যথার্থই বোধ হয় যেন আপনার উদার ললাটে 'সম্রাট' শব্দ খোদিত রহিয়াছে, আপনার বিশাল বক্ষস্থল ও দীর্ঘ বাহু 'যোদ্ধা' শব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে, আমার জীবন ধন্য যে এইরূপ বীরপুরুষের কার্য্যসাধনে আমি লিপ্ত হইয়াছি।"

এই বলিয়া আরংজীব সুবর্ণ পাত্র আর একবার মদে পরিপূর্ণ করিলেন।

মোরাদ। আরংজীব, আমি যথার্থই আপনার বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম, কালই যুদ্ধ হইবে, সৈন্য সকল প্রস্তুত আছে?

আরংজীব। আমি তিন চারি দিন হইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ে আমি এখন অপরিপক্ক, একাকী সাহস হয় না। আপনি নিকটে থাকিলে আমার যেন বোধ হয় আমি পর্ব্বতপার্শ্বে আছি, আমার সাহস দ্বিগুণ হয়।

মোরাদ এইরূপ আত্মাভিমানী ছিলেন যে প্রবঞ্চনা এবং চাটুবাক্যও তাঁহার সত্য বলিয়া জ্ঞান হইত, বিশেষতঃ এক্ষণে অধিক মদিরা সেবনে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। আরংজীবের প্রশংসাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"ভ্রাতঃ! আপনি কালে রণপণ্ডিত হইবেন, এক্ষণে আমার উপর কিছুদিন নির্ভর করুন। আর আমি জগতে কাহারও উপর নির্ভর করি না, কেবল আমার সাহস ও এই অসির উপর ভরসা করি।"

এই বলিয়া মোরাদ অসি নিষ্কোষিত করিলেন; দীপালোকে অসি ঝাক্ ঝক্ করিয়া উঠিল, পুনরায় অসি কোষে রাখিতে গেলেন কিন্তু অতিশয় মদিরা সেবনে দৃষ্টি স্থির ছিল না, অসি মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। আরংজীব হাস্য সংবরণ করিয়া আর এক পাত্র মদিরা দিলেন, মোরাদ তাহাও শেষ করিলেন।

আরংজীব বলিলেন, ভ্রাতঃ! তবে বিদায় হই, রণক্ষেত্রে আবার আপনার দর্শন পাইব।

মোরাদ। যাও, আরংজীব যাও, আমি আপনার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম, আইস আলিঙ্গন করি।

মোরাদ আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন, কিন্তু অধিক মদিরা সেবন বশতঃ ভূমিতে ঢলিয়া পড়িলেন।

আরংজীবের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, ভ্রাতাকে যে সহাস্য মুখ দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তিত হইল। মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল, ললাটে দুই তিনটি ভীষণ রেখা অঙ্কিত হইল, নিঃশব্দে সেই শিবির মধ্যে পদসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে এক একবার হঠাৎ দণ্ডায়মান হন, স্থির দৃষ্টিতে এক একবার দেখেন, যেন সম্মুখে কোন দ্রব্য দেখিতে পাইতেছেন, আবার পদসঞ্চারণ করিতে থাকেন। এক একবার মুখে ঈষৎ হাস্য লক্ষিত হয়, আবার বদনমণ্ডল কঠোরভাব ধারণ করে, ললাট কুঞ্চিত হয়।"

রমেশচন্দ্র এইখানে ঔরঙ্গজেব ও মোরাদ উভয়ের চরিত্র প্রকৃষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক ঔরঙ্গজেবের এই কথাটি মনে রাখিবেন—

"আপনার মত বীরপুরুষকে পিতৃসিংহাসনে একবার দেখিব, ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় ইচ্ছা নাই। পৈগাম্বর যদি এই এয়াদা সফল করেন, তাহা হইলে সন্তুষ্টমনে ফকিরী গ্রহণ করিয়া মক্কায় যাইব।"

ঔরংজেব যদি এই কথা বলিয়া থাকেন তবে তিনি ভণ্ড ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না।

প্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ও তাঁহার সাজাহান নাটকে ঔরঙ্গজেবকে বুদ্ধিমান্, কৌশলী, শঠ ও ভণ্ডভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, ঔরঙ্গজেবের এইরূপ চরিত্রই কি ইতিহাস মূলক? আমরা সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাই ঔরঙ্গজেবের প্রকৃত চরিত্র। মানুচী ঔরঙ্গজেবকে বাল্যাবধি শঠ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি বলেন, "সাজাহান বাদশাহ বরাবর মনে করিতেন, ঔরঙ্গজেব হইতেই মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইবে, তিনি তাই তাহাকে white serpent বলিয়া সর্ব্বদা মনে করিতেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে মানুচীর একার কথাই গ্রহণীয় নয়, কেননা মানুচী দারার অধীনে প্রথমে Artillery man ভাবে কাজ করিতেন।

তবে বার্ণিয়ার ঔরঙ্গজেবের অধীনে কাজ করিতেন। তিনি বলেন—

"ঔরঙ্গজেব সত্যিকার ধার্ম্মিক ছিলেন না, কিন্তু ধর্ম্মের ভাণ করিতেন। সর্ব্বদা প্রবঞ্চনামূলক কথায় সকলের মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন।"

নিরপেক্ষ Tavernierও এই কথাই বলেন—

...that he would have no pretension to the empire, renounce the world and lead the life of a Dervish.

এই তো গেল নিরপেক্ষ লোকের কথা! আচ্ছা দেখা যাউক ঔরঙ্গজেবের পক্ষীয় লোকই বা কি বলেন। আমরা এখানে খাপি খাঁর কথাই উদ্ধৃত করিতেছি—

"I have not the slightest liking for or wish to take part in the Government of this deceitful and unstable world, my only desire is that I may make the pilgrimage to the temple of God—But whatever course you have resolved upon in opposition to the good for nothing and unjust conduct of your disgraceful brother (biradari be—Shukoh) you may consider me your sincere friend and ally. Our revered father is still alive and I think we brothers should devote ourselves to his service……"

ফকির হইবেন বলিয়া যদি তিনি নির্ব্বোধ মোরাদকে সর্ব্বদা বুঝাইয়া থাকেন আর ইহাই যদি স্বপক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় সকলের বর্ণিত চিত্র হয়, তবে স্যার যদুনাথ কেন এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করিতেছেন না। তিনি বলেন—

"আমি একথা বিশ্বাস করি না যে, ঔরঙ্গজেব ফকিরের ভাণ করিতেন।"

পাঠক, এখানে উপলব্ধি করিবেন যে, স্যার যদুনাথ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ এমন কি খাপিখাঁকেও অতিক্রম করিয়া (out heroding the herod) এখন একটি নূতন theory উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঔরঙ্গজেব ও মোরাদের সঙ্গে নাকি হিন্দুস্থান সম্বন্ধে বাটোয়ারা হইয়াছিল যে, ঔরঙ্গজেব হইবেন দিল্লীশ্বর আর মোরাদ শাসন করিবেন কাবুল, কান্দাহার, পঞ্চনদ ও গুজরাট প্রদেশ। এই কথা খাপি খাঁতে নাই, এমন কি "আলমগীর নামা"তেও নাই। স্যার যদুনাথ কোথায় দুই একটা ঔরঙ্গজেবের প্রশংসাবাদ পাইয়া একেবারে উহাই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করিয়া পুরাতন সমস্ত ইতিহাসই নাকচ করিয়া দিয়াছেন। যদি স্যার যদুনাথ অসাধারণ পণ্ডিত না হইতেন তবে এইরূপ ভাবে লোককে বিভ্রান্ত করায় বিশেষ দোষ বা ক্ষতি হইত না। কিন্তু তাহার পাণ্ডিত্যের দরুণই সরকারী ইতিহাস নির্ভরিত তাঁহার রচনা বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিকে আক্রমণ করিবার জন্য মুসলমানদের পক্ষে একটা প্রধান শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ, না জানিলেও তাঁহার Pringle Kennedy, ঈশ্বরী প্রসাদ, প্রভৃতি পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করিয়াই আধুনিক ঐতিহাসিক Vincent Smith, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতিও এই বাটোয়ারা কাহিনী ইতিহাসে বলবৎ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্নতাত্ত্বিকের গুণে ভণ্ড ঔরঙ্গজেব হইয়াছেন ন্যায়নিষ্ঠ ঔরঙ্গজেব। অন্যত্র ইনিই আবার পীর ভাবে যে চিত্রিত হইয়াছেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে বলিয়াছেন, কপটাচারী, আত্মমাত্রহিতৈষী, ও ধর্ম্মশূন্য স্যার যদুনাথ তাহাকেই বলেন, "Hero free from any vice"

এ ক্ষেত্রেও পাঠক দেখিবেন, ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ এতদুভয়ের ধারণা কত বিপরীতমুখী। আর ইহাও স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, মুসলমানগণ একজন ধর্ম্মশূন্য সম্রাটকে 'হে ধার্ম্মিক পীর' বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন সেই বিভ্রান্ত মতবাদে হিন্দু স্যার যদুনাথ কিরূপ ইন্ধন জোগাইয়া দিয়াছেন।

ইতিহাসকে মর্য্যাদা করিলে আমরা আরও দেখিতে পাইব যে, দারা বস্তুতই ধার্ম্মিক, বিজয়ী এবং পিতৃভক্ত ছিলেন। যখন সাজাহান বাদশাহ পীড়িত, পুত্রগণ সিংহাসন লাভে ষড়যন্ত্রপরায়ণ, তখন পিতা দারাকে কতবার বলিয়াছেন—

"দারা, তুমি রাজ্যের ওমরাহ, মন্ত্রীগণকে সম্মিলিত কর, আমি সকলের সম্মুখে তোমাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিই।"

কিন্তু নির্লোভ দারা বরাবরই ক্রন্দনের ভাবে উত্তর দেন—

"না, পিতা, আমি সাম্রাজ্য চাইনা, আপনি বাঁচিয়া উঠুন, আমি আপনার দাস হইয়া সাম্রাজ্যের সেবা করিব।"

পিতা যতদিন পীড়িত ছিলেন দারা তাঁহার কাছে ছিলেন। দারা পিতার শয্যার পার্শ্বে মেঝেতে বিছানায় শুইয়া থাকিতেন। তাঁহার ধর্ম্মমতের কথা এখানে কিছু না বলাই ভাল, কারণ তাহাতে মতদ্বৈধ হইতে পারে। তবে যে ধর্ম্মমত উদার হওয়ার জন্য সম্রাট আকবর "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"—সর্ব্বজন প্রিয়, আর সেই ভাব রক্ষার জন্য দারা আজ কাফের, বলির পোষ্য পশু! *

প্রথম যুদ্ধ হয় নর্ম্মদাতীরে, আর সেখানে দারার সৈন্য পরাজিত হয় সেনাপতি কাসেমের বিশ্বাসঘাতকতায়।

নর্ম্মদার যুদ্ধের পর প্রধান যুদ্ধ হয় শ্যামগড়ে—আগ্রার ৮ মাইল পূর্ব্ব দিকে। একদিকে পিতার সিংহাসন অধিকারের লোভে ঔরঙ্গজেব ও মোরাদ—অন্য দিকে পিতৃ সিংহাসন রক্ষার্থ রাজ প্রতিনিধি দারা, আর তাঁহাকে সহায়তা করিতেছিল তাঁহার বীরপুত্র সিপার, সেনাপতি রুস্তম ও খলিলুল্লা খাঁ। অসংখ্য রাজপুত দারার সহায়কারী কিন্তু সোলেমান সেকো তখনও সুজার সহিত গোলযোগ মিটাইয়া পিতার সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন নাই। সোলেমান একজন প্রকৃষ্ট যোদ্ধা ও খুব সাহসী বীর ছিলেন। সাজাহান বরাবর বলিতেন—

"দারা, সোলেমান না আসা পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইও না।"

কিন্তু ঔরঙ্গজেব তখন আগ্রার দরজায়, দারার অগ্রসর না হইয়া আর গত্যন্তর ছিল না।

ভীষণ যুদ্ধ হইল। রাজপুতগণ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দারার পক্ষে যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধ করিয়া রুস্তম খাঁ বীরশয্যায় শয়ান হইলেন। কিন্তু দারার ভ্রূক্ষেপ নাই, সে এমন অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, জয় একেবারে করায়ত্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা বরাবর ঔরঙ্গজেবের সহায়।

মীরজুম্লা, কাসেম খাঁ, শায়েস্তা খাঁ ইতিপূর্ব্বেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এবারে বিশ্বাসঘাতকতা করিল দারারই দক্ষিণহস্ত খলিলুল্লা খাঁ। দারা এই শ্যামনগরের যুদ্ধে যখন অকুতোভয়ে কেবল শত্রু নিহত করিতেছিল, বিজয়লক্ষ্মী যখন তাঁহার প্রায় করতলগত, এমন সময় মীরজাফর যেমন—

"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ
কর অস্ত্র সংবরণ
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।

বলিয়া নবাব সৈন্য ছত্রভঙ্গ করিয়া ক্লাইভকে জয়ী করিয়াছিল, এখানেও দারার সেনাপতি খলিলুল্লা খাঁ তাড়াতাড়ি দারাকে আসিয়া বলে যে—

"শাহজাদা, অদূরে ঐ ঔরঙ্গজেব, শীঘ্র হাতী হইতে নামিয়া আসুন। আপনি ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলে যুদ্ধের জয়লাভ এখনি নির্দ্ধারিত হইবে।"

তাড়াতাড়িতে দারা সেই কথা শুনিয়া যেই ঘোড়ায় চড়িলেন, অমনি ভাগ্যফল অন্যদিকে প্রধাবিত হইল। হাতীর হাওদায় দারাকে না দেখিয়া সৈন্যবর্গ দারা নিহত হইয়াছে মনে করিল এবং অচিরে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। দুর্ভাগ্য দারার জয়াশা চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

এখন এই যে খলিলুল্লা খাঁ ও তাহার বিশ্বাসঘাতকতার কথা বিদেশী পর্য্যটকগণ নির্ভীক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আজ স্যার যদুনাথ বলেন, এগুলি মানুচী ও বার্ণিয়ারের বাজার গুজব! বাজারগুজব উঠে যে ঘটনা লোকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখে না, লোকের কথায় বিশ্বাস করে যে জিনিষ

---

* আকবর ফতেপুর সিক্রীতে প্রতি শুক্রবার হিন্দু শাস্ত্র, মুসলমান মৌলভী, খ্রীষ্টান পাদ্রী ও বৌদ্ধ ফুঙ্গীদের তর্কালোচনায় যোগদান করিতেন। আইনী আকবরীতে আছে—

"His Majesty Akbar firmly believed in the truth of the Christian religion and willing to spread the doctrine of Jesus ordered Prince Morad, second son, to take a few lessons in Christianity by way of consciousness."

Aini Akbari

সহস্র সহস্র লোক প্রত্যক্ষ করে সে সম্বন্ধে। কিন্তু যাহা সত্য তাহাই লোকে প্রকাশ হয়, সুতরাং সেকথা কখনও বাজার গুজব বলিয়া কিছুতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ, মানুচী তখন যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন আর বার্ণিয়ারও ঔরঙ্গজেবের পক্ষে নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। এই খলিলুল্লার কথা প্রিঙ্গল কেনেডী, ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেও, স্যার যদুনাথ বলেন—

"খলিলুল্লাব ব্যাপারটা আগাগোড়াই gossip, গুজব মাত্র।"

পাঠকই বলুন, যাহারা দেখিয়াছে তাহাদের কথা gossip, না যিনি ঔবঙ্গজেবেব ইঙ্গিতে লিখিয়াছেন তাহার কথা gossip। একদিকে তিনজন তিন স্থানের প্রত্যক্ষদর্শী নিরপেক্ষ ব্যক্তি—যাঁহাদেব কথার সঙ্গে ঈশ্বর দাসের কথাও মিলিয়া গিয়াছে। আর একদিকে ঔরঙ্গজেবের বেতন্‌ভোগী তাঁবেদার প্রদত্ত ইতিহাস। আর এই শেয়োক্ত ইতিহাসই স্যার যদুনাথের অবলম্বন।

অতঃপরে সুজার সঙ্গে যখন খাঁজোয়াতে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ হয়, সেখানেও বীরত্বে সুজা দুর্দ্ধর্ষ হইলেও আলিবর্দ্দি খাঁনের বিশ্বাসঘাতকতায় এখানেও শ্যামগড় যুদ্ধের পুনরাভিনয় হয়। সুজা হাতী হইতে নামিয়া পড়ায় যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাও স্যার যদুনাথ বিশ্বাস বরেন নাই। প্রথম ভাগের ইতিহাস রাজসিংহের বিষয়ীভূত নয় বলিয়া বঙ্কিম তাহা দেন নাই। তবে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—

"রোশেনারা পিতৃদ্বেষিণী ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া তাহার রাজ্য অপহরণে ঔবঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রোশেনারা তাহার প্রধান সহায়। ঔরঙ্গজেবও রোশেনারাব বড় বাধ্য ছিলেন। ...দারাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তবে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন। দারাকে পরাস্ত করিয়া ঔরঙ্গজেব প্রথমে তাহাকে বন্দী করিয়া পরে বধ করেন। দারাকে বধ করিয়া নবাধম ঔরঙ্গজেব এক আশ্চর্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল...।"

সেই প্রসঙ্গেব কথা পাঠককে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বাপর কয়টী ঘটনায় ঔরঙ্গজেব শঠতা ও প্রতারণার সহায়তায় যে বিজয়লক্ষ্মী অঙ্কশায়িণী করিয়াছেন, ইতিহাসের সহায়তায় তাহা প্রমাণিত হওয়ায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন না করিয়া পারিতেছি না। বঙ্কিমচন্দ্র যে ঔরঙ্গজেবকে "ধূর্ত্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক" প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন তাহা খুবই ইতিহাস অনুমোদিত। আর স্যার যদুনাথ যে তাঁহাকে কেবল bigot ধর্ম্মোন্ধ বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহা মোটেই সত্য নয়। ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি মাত্রেই যে সরল এবং সরলতা ঔরঙ্গজেবের সীমানার মধ্যেও যে উকি মারিতেও সাহস করিত না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আগামীবারে রাজসিংহের অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং এ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত অন্যান্য সমালোচকগণ কি বলিয়াছেন তাহাও আলোচনা করিব।

* * *

শতাব্দী ঃ কাব্যগ্রন্থ। শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী। সংহতি পাব্লিশিং হাউস, ৭ নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য—আট আনা মাত্র।

তরুণ কবি রণজিৎকুমার সেন বাংলাসাহিত্যে নবাগত নয়; ইতিপূর্ব্বেই সাময়িক বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। 'শতাব্দী' তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ইতিমধ্যেই যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় কবি সাবলীল ছন্দ ও সুষ্ঠু শব্দ বিন্যাসে কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, রণজিৎকুমার তাহাদের অন্যতম। বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সবচাইতে যে বস্তুটি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—তাহা কবির জাতীয়তা বোধ। যেমন—

এলো নব যুগ…নব শতাব্দী ধরণীর বুকে আজি
তরুণ বাঙালী এখনো ঘুমাবে কিগো?
তোরণে তোরণে জাগৃহী রবে উঠিয়াছে বাঁশী বাজি,
সোনালী স্বপন এখনো কি ভাঙেনিকো?

নব্য বাঙ্গালাব নব জাগরণেব পথে 'শতাব্দী' পাঠে বাঙ্গালী যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

এতদ্ব্যতীত ছাপা ও প্রচ্ছদপট মনোরম

আদালত ও বীমা

(১) নীতি-বিগর্হিত চুক্তি

সম্প্রতি প্রিভি কাউন্সিল হইতে এমন একটী নজির বাহির হইয়াছে যে, তাহাতে অনেক দলিলাদির পূর্ব্ব মূল্য একেবারে অসাড় হইয়া যাইবার কথা। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি যে, ফৌজদারী মোকদ্দমা মিটমাট হইবার সময় পূর্ব্ব পাওনা টাকার জন্ত উভয় পক্ষে দলিলাদি সম্পাদিত হয়, আর অনেক সময়েই সেই সমস্ত দলিল মর্গেজ বিষয়ক। প্রিভি কাউন্সিলের নজিরে সেই সমস্ত দলিলের আর কোন মূল্য নাই।

নজিরটী বাহির হয় ভবানীপুর ব্যাঙ্কের একটী মোকদ্দমা উপলক্ষে। স্বর্গীয় কালিদাস রায় চৌধুরী বারুইপুরের এক জন জমিদার ও আলিপুরের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। ইনি ভবানীপুর ব্যাঙ্কের আইনের পরামর্শদাতা রূপে কাজ করিতে করিতে অনেক টাকা অতিরিক্ত ভাবে উঠাইয়া লয়েন (overdrew)। নানা কারণে তাঁহার ও তাঁহার আত্মীয়গণের নামে আলিপুর ফৌজদারী আদালতে দণ্ডবিধি আইনের ৪২০ ধারা (প্রবঞ্চনা) ৪০৮ ও ৪০৬ (বিশ্বাসভঙ্গ) ১২০ বি (ষড়যন্ত্র) ধারানুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। মোকদ্দমার শুনানীর সময় মোকদ্দমাটী নিম্নলিখিত সর্ত্তে ব্যাঙ্ক উঠাইয়া লয়েন—

(১) বিবাদী কালিদাস বাবু প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হইবে,

(২) কালিদাস বাবুর স্ত্রী দুর্গেশনন্দিনী দাসী সম্পত্তি মর্গেজ রাখিয়া ৩০ হাজার টাকা কর্জ্জ করিবেন,

(৩) কালিদাস বাবুর নিকট ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ব্যাঙ্কের পাওনা সাব্যস্ত হয়,

(৪) দুর্গেশনন্দিনী দাসী ঐ ৩০ হাজার দিয়া ঋণের পরিমাণ কতকাংশে হ্রাস করিবেন।

এই মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হয় ১৯২৫ সালে, এবং ক্রমে ঐ ৩০ হাজার টাকা সুদে আসলে অনেক বাড়িয়া যায় ও ব্যাঙ্ক মোকদ্দমা করিয়া সবজজের নিকট ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়। আপীলে হাইকোর্টের বিচারপতি মেসার্স নছিম আলী ও হেণ্ডার্সন সাহেব সবজজের রায় নাকচ করিয়া দিয়া বলেন, এইরূপে দলিল হইলে তাহা চুক্তি আইনের ২৩ ধারানুসারে দুর্নীতিমূলক (opposed to morality) বলিয়া অবৈধ। কেন না ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী হইয়া ভয়ে ভয়ে যে কথা লিখিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে চুক্তি (Contract) সিদ্ধ হয় না।

প্রিভি কাউন্সিলও হাইকোর্টের রায় বহাল রাখিয়াছেন।

আমাদের মনে হয়, হাইকোর্ট ও প্রিভিকাউন্সিল অতিরিক্ত ভাবে ইংলিস 'ল'-(English Law)-এর সহায়তা লইয়াছেন। ব্যাঙ্কের নিকট অপর পক্ষ যে বিশেষ ভাবে ঋণী ছিল তাহা তাহারাই পূর্ব্বেই কাগজ-পত্রে স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং সেই ঋণের জন্ত দলিল সম্পাদনে নীতি লঙ্ঘন করা (immoral) অথবা opposed to public policy হয় না।

যাঁহারা এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপার জানিতে চাহেন, দয়া করিয়া 46 Calcutta Weekly Notes page 1, পাঠ করিবেন।

(২) বীমার স্বার্থ (Insurable Interest)

সম্প্রতি লাহোর হাইকোর্টে বীমা সম্বন্ধে যে একটী নজির বাহির হইয়াছে, বীমা সম্পর্কীয় প্রত্যেক ব্যক্তি ও বীমা কোম্পানীগুলির তাহা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

ডাক্তার মণিশঙ্কর পাণ্ডে এলায়েন্স ষ্টাটগার্ড কোম্পানীর কাছে তাহার সহোদর গৌরীশঙ্কর পাণ্ডেকে দিয়া একটী ২০০০০৲ বীমা করাইয়া লয়। গৌরীশঙ্কর তাহার ডাক্তার ভ্রাতার সঙ্গে থাকিয়া কম্পাউণ্ডারের কাজ করিত। এই কাজের জন্ত সে খোরাক পোষাক পাইত। তাহার কিছু মহাজনী কারবারও ছিল। বীমা হয় ১৯৩২ সালের ২৬শে অক্টোবর। বীমার পরেই ডিসেম্বর মাসে গৌরীশঙ্কর তাহার ভ্রাতা ডাঃ মণিশঙ্করের নামে বীমাখানা assign (দানপত্র) করিয়া দেয়। বীমাকারী গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হয় ১৯৩৩, ২৪ জুলাই। অতঃপরে ডাক্তার মণিশঙ্কর টাকা চাহিয়া পাঠাইলে কোম্পানী বীমা নাকচ করিবার দাবীতে মোকদ্দমা উপস্থিত

করে। মুন্সেফ ও সবজজ উভয়েই কোম্পানীর পক্ষে রায় দেন এবং হাইকোর্টও সেই রায় বহাল করিয়া মন্তব্য করে যে, এই ক্ষেত্রে ডাক্তারের দাবী গ্রাহ্য নয়, কেন না ডাক্তারের তাঁহার সহোদরের জীবন সম্বন্ধে কোন বীমার স্বার্থ ছিল না। The doctor had no insurable interest in the life of his compounder brother. এবং যদি বীমার ঐরূপ স্বার্থ না থাকে তবে সেই বীমা বীমা নয়, উহা জুয়া খেলার নামান্তর মাত্র—wagering contract.

ইংলিশ বিধান আশ্রয় করিয়াই হাকিম মন্তব্য করিয়াছেন যে :—

"No insurance shall be made by any person or persons on the life or lives of any person or persons or on any other event or events whatsoever, where in the person or persons for whose use, benefit or on whose account such policy or policies shall be made, shall have no interest or by way of gaming or wagering."

Section 1, Insurance Act of 1774.

ইতিপূর্ব্বে (Bombay High Court) বোম্বাই হাইকোর্টও (23 Bom 191) আলামী বনাম Positive Government Security Life Insurance Co মোকদ্দমায় এইরূপ রায়ই দিয়াছিলেন। আলামীর স্বামীর আফিসে মেহবুব বিবির স্বামী কাজ করিত। মেহবুব বিবির নামে ২৫ হাজার টাকার বীমা হয়। সপ্তাহেক পরে মেহবুব বিবি আলামীর নামে বীমা assign করিয়া দেয়। একমাস পরে মেহবুব বিবি স্বর্গগত হয়। প্রমাণ হয় যে, মেহবুব বিবি তাহার নিজের হিতের জন্ত বীমা করে নাই বলিয়া উহা জুয়া খেলার নামান্তর মাত্র, সুতরাং উহা নাকচ হইবার যোগ্য।

সম্প্রতি যশোহরের সবজজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশ মহাশয়ও এই কারণে আছিবদ্দি সেখের মোকদ্দমায় নিউষ্টেট অব ইণ্ডিয়ার স্বপক্ষে রায় দিয়াছেন।

সুতরাং, বীমা যাহাকে assign করা (দানকরা) হয়, তাহার উক্ত জীবনে স্বার্থ আছে কিনা ইহা দেখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এবং সকলেরই assignment করিবার সময় এই বিষয়ে সাবহিত হওয়া উচিৎ।

(৬) মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ,

১১নং ক্লাইভ্ রো, কলিকাতা

মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৪০ সালের বাৎসরিক বিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

যে সমস্ত ভারতীয় কোম্পানী এত অল্প সময় মধ্যে আশাতীত উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী তাঁহাদের অন্যতম। বস্তুতঃ দশ বৎসর মধ্যে কোন দেশী বা বিদেশী কোম্পানীই স্বীয় অর্থে এরূপ বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া আফিস পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার কর্ম্মকর্ত্তাগণকে আমরা সানন্দে অভিনন্দন করিতেছি।

গত ডিসেম্বর মাসে কোম্পানীর সঞ্চিত অর্থের পরিমাণই ছিল প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা। ১৯৩৯ সালে ছিল ১৭ লক্ষের উপরে আর ১৯৩৮ এ ছিল ১৪ লক্ষ টাকা। এই তিন বৎসরে সঞ্চিত অর্থের ক্রমিক বৃদ্ধিতে কোন ব্যক্তিই বিস্মিত না হইয়া পারে না। যে বৎসর প্রথম কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসরই ১৭ হাজার টাকার একটি ফণ্ড দেখিয়া আমরা সকলেই ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম।

গত বৎসর (১৯৪০) এই যুদ্ধের বাজারেও ৭১ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে বীমাপত্র (পলিসি) বিক্রীত হয়। আর তাহা যে কিরূপ কম খরচে নির্ব্বাহিত হয় নিম্নলিখিত খরচের অনুপাত লক্ষ্য হইলেই পাঠকের বিশেষ ধারণা হইবে।—

কোম্পানী পরিচালনার খরচের অনুপাত—

১৯৪০ সালে	শতকরা	৩৪,৬
১৯৩৯ ...	...	৩৪,৯
১৯৩৮ ...	...	৪৪,৭
১৯৩৭ ...	...	৫৮,০

এ দিকে আবার বাতিল বীমার সংখ্যাও ক্রমেই কম হইয়া আসিতেছে। আলোচ্য বৎসরে বাতিল বীমার সংখ্যা শতকরা ১১.৯, পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ১২.৩, তার পূর্ব্বে ১২.৮। অর্থাৎ লক্ষটাকার কাজে প্রায় ৯০ হাজার টাকার বীমা সচল থাকা বড় সহজ কথা নহে।

গতবৎসরে যে সমস্ত দাবীর টাকা শোধ করা হয় তাহাও প্রায় একলক্ষ ষাটহাজার টাকা। ১৯৩৯-এ দাবীর টাকা দেওয়া হয় প্রায় লক্ষটাকা, ১৯৩৮-এ হয় বৎসর ৮৫ হাজার টাকা।

দাবীর টাকা পরিশোধ করিতে কোম্পানীর তৎপরতা খুবই প্রশংসার্হ।

আলোচ্য বৎসরে যে ২২ লক্ষ টাকার ফণ্ডের কথা বলিয়াছি তন্মধ্যে ৬ লক্ষ টাকাই কোম্পানীর কাগজে, প্রায় ৪ লক্ষ টাকা বীমাপত্রের উপরে ঋণদান ও সাড়ে তিন লক্ষটাকা কলিকাতা সম্পত্তির মর্গেজে ও অবশিষ্ট অন্যান্ত নিরাপদ জমানতে খাটানো হইতেছে। কোম্পানীর বাড়ীর মূল্যও হইবে প্রায় সোয়াতিনলক্ষ টাকা।

আরও আনন্দের বিষয় এই যে, সুবিবেচিত উপায়ে টাকা খাটানো হয় বলিয়া এই দুর্দ্দিনের বাজারেও উদ্বৃত্ত টাকার সুদই শতকড়া ৪ টাকার উর্দ্ধে লাভ হইতেছে।

আমরা কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি ও ভরসা করি বাঙ্গালীর খাঁটি প্রতিষ্টানটী ক্রমে সমগ্র ভারতে অবিসম্বাদী প্রাধান্ত অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।

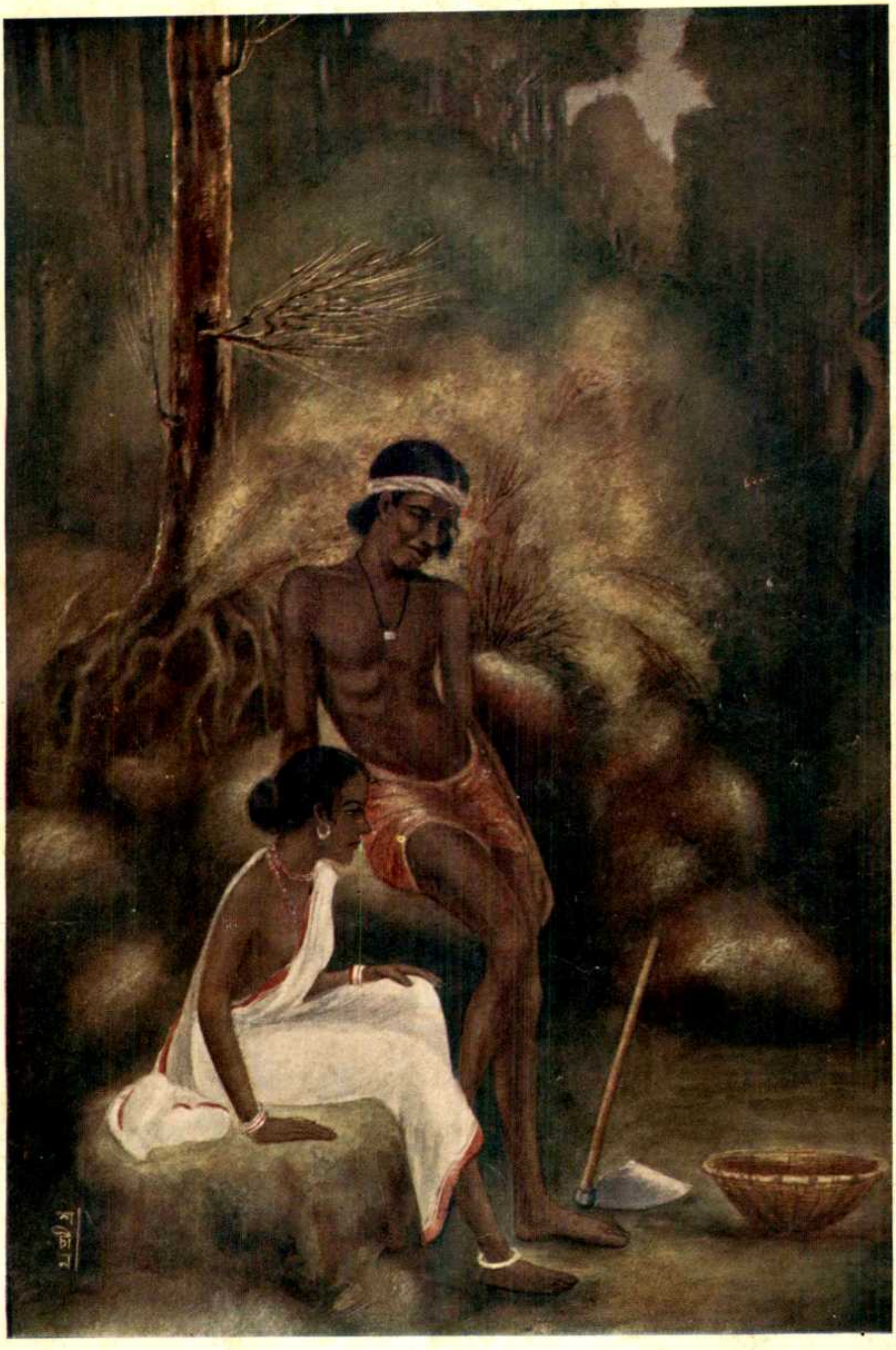

বিশ্রাম

শিল্পী—শ্রীশচীন্দ্রভূষণ ধর

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

মাঘ—১৩৪৮

৯ম বর্ষ—২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

বিশ্ব-বিধান

লণ্ডনের 'ডেলি হেরাল্ডের' সহিত বিশেষ এক পত্রালোচনা কালে সম্প্রতি পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে কার্য্যতঃ যোগদান না করিলেও আধুনিক কর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা তাঁহারা (অর্থাৎ কংগ্রেসীগণ) স্থির অনুধাবন করিয়াছেন যে, স্বাধীনতা এবং স্বাধীন গণসম্প্রদায়ের সহযোগিতার ভিত্তিতে সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত না হইলে, শোষন-নীতির প্রতিবিধানার্থে এবং সর্ব্বমানবের কল্যাণে প্রাকৃতিক সংস্থানের ব্যবহারার্থে বর্ত্তমান অর্থনীতির আমুল পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে, এবং জাতিসমূহ নিরস্ত্র হইয়া পরস্পর সশস্ত্র যুদ্ধ হইতে বিরত না হইলে, বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজয়মাল্য লাভ ঘটিলেও সে মাল্যের কোনও মূল্য রহিবে না, উপরন্তু ইহা দ্বারা দুঃখের বোঝা অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিবে।

পণ্ডিতজী অনেকটা সত্য কথাই বলিয়াছেন। আমরা সকলেই জানি, বর্ত্তমানের যুদ্ধ ও শোষণ-জনিত দুরবস্থাই মানবের আসল দুরবস্থা নহে; এই দুরবস্থার মূলে রহিয়াছে মানবের অর্থনৈতিক দুঃখ এবং ভ্রান্ত শিক্ষা। অতীতে এমন একদিন ছিল যখন কোন দেশের ভূমিই স্ব স্ব দেশবাসীকে ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযোগী খাদ্যদানে কুণ্ঠিত হইত না, ফলে শোষণের প্রবৃত্তি কাহারও কখনও অনুভূত হয় নাই। কিন্তু কালক্রমে, ভূমির এই প্রাচুর্য্যের কিঞ্চিত হ্রাস দৃষ্ট হওয়ায় মানুষ স্ব-প্রবর্ত্তিত ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে যন্ত্রের দাসত্ব গ্রহণ করে। কেবল তাহাই নহে, লালসার দুষ্ট প্রবৃত্তিকে সংযত না করিয়া ভ্রান্ত মানব পরস্পর অপরের ঘরে স্বীয় শিল্পের প্রসারতার জন্য লোলুপ হইয়া উঠে। ফলে পরিণতি ঘটে অত্যন্ত ভয়াবহ; কারণ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সুবিধার জন্য কোন এক জাতি সুবিস্তৃত উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমগ্র জগতের ঈর্ষার পাত্র হইয়াছে এবং এই ঈর্ষার জন্যই ঈদৃশ যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্ভব।

অতএব, যুদ্ধ ও শোষনের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে হইলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে সর্ব্বাগ্রে মাটির হৃত-উৎপাদিকা শক্তির পুনরুদ্ধার এবং আধুনিক ভ্রান্ত শিক্ষার আমূল সংশোধন সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে সকলের আগে; নতুবা পৃথিবীও কোনদিন নিরস্ত্র হইবে না এবং শোষণনীতি ও যুদ্ধও জগতে সর্ব্বদাই অব্যাহত থাকিবে।

আধুনিক শ্রম-শিল্প-ব্যবস্থার পরিণতি

কিছুদিন পূর্ব্বে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, অধুনা ভারতে যে সব বড় বড় শিল্প-প্রধান সহর গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই সব সহরের অধিবাসীদের মধ্যে মত্ততা, বে-আইনী কার্য্য-কলাপ, জুয়া, গণিকাবৃত্তি প্রভৃতি কদর্য্যতা অত্যন্ত প্রবল। এই কদর্য্যতা ও পাপের বিষ-বাষ্প হইতে এই সহরগুলিকে মুক্ত করিতে হইলে, এগুলিকে ক্ষুদ্রতর অনেকগুলি সহর ও গ্রামে ভাগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

স্পষ্টতই বুঝা যায়, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় প্রধান-সমস্যাটি ইচ্ছা করিয়াই অতি তৎপরতার সহিত এড়াইয়া গিয়াছেন;

কারণ, আধুনিক শ্রম-শিল্প-ব্যবস্থার তিনি একজন একনিষ্ঠ উপাসক। তাই তিনি স্বয়ং বিশ্বাস করেন এবং সাধারণকেও বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছেন যে, মত্ততা, বে-আইনী কার্য্যাদি প্রভৃতি আধুনিক যুগের শ্রম-শিল্প হইতে উদ্ভূত নহে, একটি বিশেষ স্থানে উহার সংখ্যাধিক্যেরই ফলে উক্ত নাগরিক কদর্য্যতার আবির্ভাব হইয়াছে,—কাজেই এই সংখ্যাধিক্যের হ্রাস হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

কিন্তু প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার না করিয়া যথার্থই উহাকে মানিয়া লইতে হইলে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক যুগের শ্রম শিল্প এবং উহার অবশ্য পরিণতি—উক্ত নাগরিক কদর্য্যতা প্রভৃতি একই সূত্রে অবিচ্ছেদ্য রূপে গ্রথিত। কাজেই একের প্রতিকার ভিন্ন অপরটির প্রতিবিধান কখনই সম্ভব নহে।

সুতরাং, সমস্যার যথার্থ সমাধান সাধন করিতে হইলে, প্রধানতঃ উক্ত আত্মঘাতী শ্রমশিল্পের প্রতি ভ্রান্ত গোঁড়ামী ত্যাগ করিয়া দেশীয় উটজ-শিল্পের প্রসারতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ভারতের অতীত দিনের সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ, যেটুকু আজও অবশিষ্ট আছে সেইটুকুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই অধ্যাপক মহাশয় আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

অহিংসা ও সত্যাগ্রহের সংজ্ঞা

গত ১৩ই ডিসেম্বর মিঃ সি রাজাগোপালাচারী লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে পঠিত একটি অভিভাষণে 'অহিংসা ও সত্যগ্রহে'র সংজ্ঞা সম্বন্ধে স্বীয় অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ধারণামত তিনি সত্যাগ্রহের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে বিরক্ত করা নহে, প্রতিপক্ষের অন্তরের পরিবর্ত্তন সাধন করা। অহিংসার নীতিও, তাঁহার মতে, সবিশেষ চূড়ান্ত কোনরূপ নীতি নহে,—প্রয়োজন হইলে অবস্থা-বিশেষে এই নীতিকেও লঘু ও নাতি-প্রখর করা যাইতে পারে।

এপর্য্যন্ত এদেশে আমরা বহু সত্যাগ্রহ আন্দোলন অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই দেখিয়াছি, প্রতিপক্ষ অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলনের ফলে নিরন্তরই ব্যতিব্যস্ত ও তিক্ত-বিরক্ত হইয়াছেন, অথচ ইহার ফলে, গভর্ণমেণ্ট-পরিচালকবর্গের অন্তরে এতটুকুও পরিবর্ত্তনের ছোঁয়াচ লাগে নাই। কাজেই এবিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারির উক্তি যে নিতান্তই অযৌক্তিক, ইহা সহজেই অনুমেয়।

আর, অহিংসারও যে ব্যাখ্যা শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী প্রদান করিয়াছেন উহাকেও নিতান্ত অবিবেচক উক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করা সহজ নহে। অহিংসার লঘুকরণ বা উহার সীমানির্দ্দেশ **কার্য্যতঃ** করা দূরে থাক্, সত্যকার অহিংসাপন্থীর **মনেও** এই চিন্তার উদয় অসম্ভব। অহিংসা চিরদিনই অবস্থানির্ব্বিশেষে চূড়ান্ত এবং অপরিসীম। প্রকৃত অহিংসাব্রতীর সংস্পর্শে হিংসাবাদী মানব, এমন কি বনের পশুও হিংসাবৃত্তি বিস্মৃত হয়। বস্তুতঃ যে সকল নেতৃবৃন্দ মনে করিয়া থাকেন যে, প্রয়োজন হইলে অহিংসা নীতি লঘু করা চলে অথবা ব্যক্তি ও সম্পত্তি রক্ষাকল্পে প্রয়োজনমত হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিলে অহিংসার অবমাননা হয় না,—আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, সেই সব সৌখীন নেতৃবৃন্দ 'অহিংসা'র পবিত্র নীতি এতটুকুও বুঝিতে সক্ষম হয়েন নাই। তথাকথিত অহিংসাব্রতীরাও পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ!

মিঃ গান্ধি

ভারতের সমর-প্রচেষ্টা

কিছুদিন হইতে বৃটীশ রাষ্ট্রনীতিক এবং সাংবাদিকমহল ভারতে অধিকতর পরিমাণে সমর-প্রচেষ্টা প্রচলিত হওয়ার যে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে বহু উচ্ছসিত প্রশংসা ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছেন। এতদুভয়ের মধ্যে সাংবাদিক মহল আবার এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, ভারতকে আংশিক স্বরাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান করিয়া ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে শান্ত

করিতে পারিলে নাকি অচিরেই ভারতে সমরোৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিবে—অর্থাৎ ভারতকে সামান্য ডাল-ভাতের সংস্থান করিয়া দিলেই এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় বৃটেন ভারতের পরে বৃহত্তর সুবিধা গ্রহণ করিয়া লইতে সক্ষম হইবে। স্পষ্টতই বুঝা যায় বৃটিশ সাংবাদিক মহলের এই প্রস্তাবে আসল কথা হইল এই যে, বর্ত্তমানে ভারতের পক্ষে সমর-প্রচেষ্টার সমস্যাটাই হইল মুখ্যতম সমস্যা ;—প্রয়োজন হইলে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কলহমান ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে শান্ত করিলেও করা যাইতে পারে।

সম্ভবতঃ, বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিক এবং সাংবাদিক মহল ভারতের সমর প্রচেষ্টার প্রস্তাব করিয়া বিশেষ কার্য্যকরী প্রস্তাবই উত্থাপন করিয়াছেন। তথাপি, বৃটিশ রাজনীতিক ও সাংবাদিকগণের সহিত এস্থানে আমরা তিনটী বিষয় আলোচনা করিতে চাই। প্রথমতঃ, আমরা পরীক্ষা করিয়া লইতে চাই যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে স্বদেশে ব্যাপক সমর-প্রচেষ্টা চালু করিয়া ভারত সত্যই বৃটেনকে বৃহত্তর সাহায্য দানে সমর্থ কিনা ; দ্বিতীয়তঃ, সমর্থ হইলে, সেই সামার্থ্য কতটুকু ; তৃতীয়তঃ, যথার্থই যে শ্রেণীর সমর-প্রচেষ্টা ভারতে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণরূপে হওয়া সম্ভব, সেই সমর-প্রচেষ্টা ভারতের বর্ত্তমান নেতৃকুলের অবস্থিতি সত্ত্বেও অবলম্বিত হওয়া সম্ভব কি না। একে একে আমরা এই প্রশ্নত্রয়ের আলোচনা করিতেছি ঃ

সর্ব্বাগ্রে প্রথম প্রশ্নই গ্রহণ করা যাক ঃ **বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে স্বদেশে ব্যাপক সমর-প্রচেষ্টা চালু করিয়া ভারত সত্যই বৃটেনকে বৃহত্তম সাহায্যদানে সমর্থ কি না ?**

আমরা সকলেই জানি, বৃটিশ-সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই সমর প্রচেষ্টার জন্য যেরূপ কার্য্যসূচি অবলম্বিত হইতেছে ভারতেও সেই একই সমর-প্রচেষ্টার অনুশীলন হইতেছে, অর্থাৎ (ক) যুদ্ধের জন্য অর্থ, (খ) সমর-বাহিনী, (গ) সমর-উৎপাদনও (ঘ) সামরিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বৃদ্ধি করণের সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা অনুসৃত হইতেছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়,—ভারতকেও বৃটিশ সমর-সচিবগণ অন্যান্য দেশের গড্ডালিকা শ্রেণীতেই পঙ্‌ক্তিভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গশ্রীর নিয়মিত পাঠকগণ অবশ্যই একথা স্থির জানেন যে, চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে এক বিশিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত বলিয়া ভারতের উৎপাদনক্ষমতা পৃথিবীর সর্ব্বাধিক। এই কারণে ভারতের স্থান অন্য কাহারও সহিত একশ্রেণীভূক্ত হইতে পারে না—ভারত একক এবং অনন্যসাধারণ।

পক্ষান্তরে, বঙ্গশ্রীর পাঠকগণ এই কথাও অবশ্যই জানেন যে, বর্ত্তমানের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্ভব হয় প্রধানতঃ দুইটি কারণ হইতে ঃ এক, জগৎব্যাপী অন্নাভাব, ও প্রত্যেক জগৎবাসীর ন্যূণতম প্রয়োজনলাভের অন্তরায় ; দ্বিতীয়, দ্বন্দ্ব-কলহের কু-প্রবৃত্তিকে দমন করিবার উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। এই দুই কারণ-শূণ্যতার জন্যই অনাহারী, দুর্দ্দশাক্লিষ্ট এবং প্রবৃত্তিতাড়িত মানব পরস্পর আত্মঘাতি হানাহানিতে মাতিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর এই দুই অভাব মোচনের প্রচেষ্টাই হইল এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী সমর-প্রচেষ্টা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, জগতের এই অভাব মোচনের দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে ? ইতিপূর্ব্বেই আমরা এ প্রশ্নের যথাসাধ্য বিস্তৃত উত্তর দিয়াছি। বহুশতাব্দী হইতে ভারতের অনন্যসাধারণ উৎপাদন-ক্ষমতা কালের বিপর্য্যয়ে লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণকৃত ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞানের নির্দ্দেশ অনুসারে আজিও যদি ভারতের সেই হৃত উৎপাদিকা শক্তি ভারতের মাটিতে ফিরাইয়া আনা যায়, তবে অনতিকাল-মধ্যেই ভারত শত্রু-মিত্র নির্ব্বিচারে সকলের ক্ষুধার অন্ন যোগাইতে সক্ষম হইবে। এতদ্ভিন্ন ভারতের দেবকল্প প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের দর্শন-শাস্ত্রাদিতে চরিত্রগঠনের বহুবিধ সুনির্দ্দিষ্ট অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক ভ্রান্ত শিক্ষাদানপদ্ধতি সেই অনুশাসন গ্রহণ করিলে অচিরেই ভাবী নাগরিক ও প্রধান যাঁহারা সেইসব শিক্ষার্থীগণ দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তিকে সর্ব্বথা সংযত করিতে পারিবেন। এখনও যদি ভারতকে এই নূতন আলোকে দেখিয়া বৃটেনের সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিককর্ত্তাগণ ভারতের হৃত স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি, ঋষিগণকৃত ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞান, শিক্ষাদান প্রভৃতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে কৃতযত্ন হয়েন, তবে তাঁহারা অচিরেই পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান করিয়া কেবল বর্ত্তমান যুদ্ধের জয়মাল্যই লাভ করিবেন না, আগামী যুদ্ধের সকল সম্ভাবনাকেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিতে কৃতকার্য্য হইবেন।

কিন্তু পৃথিবীর দুর্ভাগ্য, ভারত সম্বন্ধে কোন সত্যকার আলো বৃটিশ ভাগ্যবিধাতাগণের চক্ষে আজিও পতিত হইল না। এই কারণেই আমরা সাঙ্কশ্ক হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম,

তথাকথিত আধুনিক সমর-প্রচেষ্টার দ্বারা ভারত সত্যই বৃটেনকে বৃহত্তম সাহায্যদানে সমর্থ হইবে কি না? প্রশ্নের জবাব আপনি মিলিল; দেখা গেল, যথার্থ সক্ষম হইলেও বৃটেন ভারতের নিকট যে শ্রেণীর সাহায্য চাহিয়াছে, সেই শ্রেণীর সাহায্য বৃটেনের বৃহত্তম জয়ের পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিতকর।

আমাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা,—**অধুনা ভারতের সমর প্রচেষ্টার নামে যাহা অনুশীলিত হইতেছে, তাহা যুদ্ধজয়ের পক্ষে বৃটেনকে কতখানি সাহায্য করিবে?**

এ প্রশ্নের জবাব আমরা প্রথমোক্ত আলোচনাতেই অনেকটা দিয়াছি। যে চতুর্ব্বিধ উপায়ে ভারতবর্ষ যুদ্ধোপকরণ বৃদ্ধি করিতেছে, সেই উপায়ে যুদ্ধকে আরও অধিক পরিমাণে মারাত্মক করিয়া তোলা যাইতে পারে, কিন্তু উহার চিরন্তন প্রতিবিধান কখনও সম্ভব হইবে না। এক অন্যায়ের প্রতিবিধান অন্য এক অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলেই লাভ করা সম্ভব নহে, অন্যায়ের মূল যাহা, উহাকেই সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হয়। আজ হয়তো অপেক্ষাকৃত কোন শক্তিমান দেশ স্বীয় শক্তিবলে দুর্ব্বলতর কোন দেশকে পরাজিত করিল—এবং যুদ্ধের করালতার একটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল; কিন্তু এই জয়-পরাজয় সাধিত নিষ্পত্তি চিরন্তন নিষ্পত্তি নয়—এ নিষ্পত্তি সাময়িক। কারণ কালই অথবা পরশ্ব প্রতিহিংসাপরায়ণ পরাজিত জাতিটী বিজয়ীর বিরুদ্ধে আবার আপন অস্ত্র উত্তোলন করিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাময়িক নহে—যুদ্ধের চিরন্তন নিষ্পত্তিই পৃথিবীর কাম্য। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যুদ্ধের এই চিরন্তন নিষ্পত্তি সাধন যুদ্ধের হত্যালীলা দ্বারা কখনই সম্ভব হইবে না, ইহার উচ্ছেদকল্পে পরস্পরকে আঘাত করিবার মানবের যে হীন প্রবৃত্তি সেই প্রবৃত্তিকে এবং এই আঘাত করিবার প্রবৃত্তির মূলে যে সমস্যা—পৃথিবীব্যাপী অন্ন-সমস্যা ও শিক্ষা সমস্যা—সেই সমস্যারই সমাধান করিতে হইবে সকলের পূর্ব্বে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তথাকথিত আধুনিক সমর-প্রচেষ্টার দ্বারা সেই বাঞ্ছিত সমাধান এতটুকুও সাধিত হইবে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম, ভারতের সহায়তায় চিরন্তন জয়লাভে যথার্থ সক্ষম হইলেও, বর্ত্তমান ব্যর্থ সমর-প্রচেষ্টার অনুশীলনের জন্য সেই চিরন্তন জয়লাভের সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা তৃতীয় প্রশ্নের আলোচনা করিব,—**যথার্থই যে শ্রেণীর সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমর-প্রচেষ্টার অনুশীলন ভারতে হইতে পারে, সেই সমর-প্রচেষ্টা ভারতের বর্ত্তমান বিবদমান নেতৃকুলের অবস্থিতি স্বত্ত্বেও অবলম্বিত হওয়া সম্ভব কি না?**

অনেকের ধারণা, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের পারস্পরিক কলহ এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পোষিত বৈরীভাব পরিত্যাগ না করিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। এই ধারণা নিতান্তই অযৌক্তিক। সত্যকার কর্ম্মের প্রেরণা থাকিলে—নেতৃবৃন্দের কোনরূপ হস্তক্ষেপ ভিন্নও সাফল্য লাভ হইবে। অবশ্য আমরা এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না যে ভারতের নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক কলহজাত বিঘ্ন বিদ্যমান না থাকিলে সমাধান আরও সহজতর হইত। কিন্তু ভারতের তথা সমগ্র পৃথিবীর দুর্ভাগ্য, বর্ত্তমানের তথাকথিত নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকেই জনসাধারণের প্রকৃত দুর্ভাগ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই তাঁহাদের কেহই কখনও দুর্ভাগ্যের প্রতিকারের আসল পথ খুঁজিয়া পান না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, সমস্যা জনসাধারণেরই, নেতৃবৃন্দের নহে—কাজেই সমস্যার সমাধানের জন্য জনসাধারণের সহায়তাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

এখন অনুসন্ধান করা যাক্—কি কি উপায়ে ভারতের হৃত স্বাভাবিক উর্ব্বরতার পুনরুদ্ধার করা যায়। এই প্রসঙ্গের আলোচনায় পূর্ব্বেও আমরা যেমন বলিয়াছি এখনও তেমনই বলিতেছি যে, ভারতের স্বাভাবিক উর্ব্বরতা পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম, ভারতীয় নদ-নদী প্রভৃতি জলধারার ব্যাঘাতকারী রেলপথ, সেতুশ্রেণী, বৃহৎ সহর, বৃহৎ শৈলাবাস প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া নদ-নদীর স্বাভাবিক গতিকে স্বচ্ছন্দ করিতে হইবে। আমদানি-রপ্তানি ও যাতায়াত প্রভৃতির জন্য যথেচ্ছ জলযানের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রথমে এই সব ভাঙ্গাগড়া কাযের জন্য বহু পুঁজিদারদের বিপুল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কাজেই যেই সব পুঁজিদার এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাঁহাদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান করিতে হইবে। এ জন্য মুদ্রা-প্রচলনের সাময়িক-বৃদ্ধি প্রয়োজন।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে এই সমস্ত কার্য্যই জনসাধারণের সহায়তায় স্বয়ং গভর্ণমেণ্টের করণীয়। অবশ্য দেশীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তা পাইলে কার্য্যটি সহজতর ও সুন্দরতর হইবে। কিন্তু আসল কথা হইল—কর্ম্মের সত্যকার প্রেরণা ও উৎসাহ।

বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যদি আজও এই প্রকৃত কর্ম্মপ্রেরণা ও উৎসাহে মণ্ডিত হইয়া ও আমাদের বক্তব্যের যথার্থ বিষয়বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ভারতে প্রকৃত সমর প্রচেষ্টা অনুশীলিত হইবার ব্যবস্থা স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হন তবে নিশ্চয়ই অনতিকাল মধ্যে তাঁহারা চিরস্থায়ী জয়লাভ করতঃ সর্ব্ব-জগতের সার্ব্বভৌমত্ব অর্জ্জন করিবেন এবং সমগ্র পৃথিবী সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(দশ)

দেখিতে দেখিতে আমরা ১৮৯৭ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনও ছাড়িয়া আসিয়াছি। যদিচ প্রথম দশ বৎসরের ইতিহাসে কংগ্রেস ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল বটে, এবং স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি কয়েকটী মামুলী প্রস্তাব ব্যতীত অপর বিশেষ কোন কাজ হয় নাই সত্য, কিন্তু এ কথা সুনিশ্চিত যে, কংগ্রেসের শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। আর কংগ্রেসের এই ত্রয়োদশ বৎসরে (১৮৯৭ সালে) পীড়ন-নীতি যতই প্রবলভাবে অনুসৃত হইতে থাকে, কংগ্রেসের সংহতি-শক্তিও ততই বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ পূর্ব্বে যে ইংরেজ ভারতবাসীগণকে খুবই বিশ্বাস করিত, ক্রমে সেই বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসে এবং ক্রমে উহা সন্দেহে পরিণত হয়। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বিশ্বাসী ‘ক্রীতদাস’ যদি কখনও বুঝিতে পারে যে বস্তুতঃ সে ভৃত্য নয়, তাহারও আত্মমর্য্যাদা আছে, তাহার অধিকার হইতে সে বঞ্চিত, তবে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে যদি সে চায়, তাহা হইলে প্রভুর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার এবং আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিবার কথাই বটে। এইখানেও সেই অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল। ইংরাজের সহিত ভারতবাসীর পরস্পর সৌজন্য ও ব্যবহারে এইখানেই আঘাত লাগিল। পূর্ব্বে ইংরাজ ভারতবাসীকে বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় জ্ঞান করিত, কিন্তু এখন তাহা করিতে পারিল না।

১৮৯৪ সালে লর্ড ল্যান্‌সডাউন স্বদেশ চলিয়া গেলেন এবং লর্ড এলগিন আসিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। তিনি ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়েই ঘটনাস্রোতে এই আত্মমর্য্যাদা ক্রমেই আঘাত পাইতে পাইতে মাথা চাঁড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। ইনি লোক হিসাবে যে সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন তাহা নয় বটে, কিন্তু ইনি বড় দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন। ইনি একেবারে আমলাতন্ত্রের ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ করাল বদনা রাক্ষসীর মত ভারতবাসীকে গ্রাস করিতে যখন উদ্যত, ইংরাজ কর্ম্মচারীর অনাচারও তখন বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। ইংরাজ যেমন ভারতবাসীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছিল, ভারতবাসীও মনে করিল সেই কল্যাণকর ইংরাজশাসন অন্তর্হিত হইয়া পীড়ন ও পক্ষপাত-দুষ্টির প্রবেশ পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। এই ভাব-বিপ্লব ভারতবাসীর পক্ষেও যেমন ক্ষতিকর, ইংরাজেরও কম ক্ষতিকারক হয় নাই।

বোম্বাইতে প্রেস-সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়, আর যাহার কতক বিবরণ আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দিয়াছি, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ এতই রুষ্ট হইয়া পড়েন যে, অচিরে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং বক্তৃতার স্বচ্ছন্দতা অনেকাংশে অপসারিত হয়। রাজদ্রোহ আইনের তীব্রতার কথা আমরা তিলকের মোকদ্দমা রচনা কালে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ এই মোকদ্দমায় ভারতীয় জনসাধারণের মন অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া উঠে, আর ইংলণ্ডেও সেই অশান্তির রোল কম প্রবল হয় নাই। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ২০শে জুলাই (১৮৯৮) লণ্ডনের এক সভায় এই Sedition আইনের উল্লেখে স্পষ্টই বলেন যে, গত দুই বৎসরে ইংরাজ শাসনের প্রতি ভারতীয়গণের পূর্ব্ব বিশ্বাস যেরূপ শিথিল হইয়াছে, গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় তাহা কখনও হয় নাই—

> It is with deep regret that I have to say that I can hardly remember any time—my memory goes back to the time of the mutiny—when the confidence of the people of India in the justice and fair play of English rulers was so much shaken as it has been within the last two years.

বস্তুতঃ যে আইনের বিচার পূর্ব্বে জজ ও জুরীর আদালত ব্যতীত অন্য কোথাও হইত না, আর আজ এই আইন অনুসারে পুলিশের কর্ত্তা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জুরীর সহায়তা ভিন্নই হইতে পারে! এই রাজদ্রোহ আইন সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আরও তারস্বরে বলেন যে, স্বাধীন অভিমত প্রকাশ বন্ধ করিলেই বরং গুরুতর রাজদ্রোহ হইয়া থাকে—

> "There was no better way of creating sedition than by suppressing free discussion, newspapers and meetings."

দ্বিতীয়তঃ, অন্তরীণে আবদ্ধ নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে ১৮ মাস বিনা বিচারে আবদ্ধ রাখিয়াও মুক্তিদান করা হয় নাই। তাহাদিগের মুক্তি না দেওয়ার কারণ নাকি উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে জেলে রাখিয়া একটী ষড়যন্ত্রের আবিষ্কার করা হইবে! Pigott case-এও এইরূপ হইয়াছিল। আর disaffection-এর অর্থও পাঠক কার্ত্তিকের বঙ্গশ্রীতে পাইবেন (want of affection.)

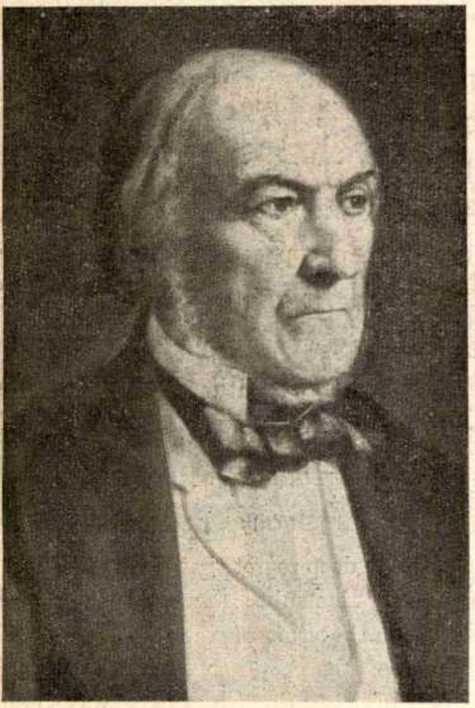

গ্ল্যাডষ্টোন

কেবল যে আইনের কঠোরতা বর্দ্ধিত করিয়াই ভারতবাসীর প্রাণে বিষম আঘাত করা হইয়াছে তাহা নয়, শিক্ষা বিভাগেও ঘোরতর বৈষম্য প্রদর্শিত হয়। ১৮৫৮ সালে মহারাণীর ঘোষণায় ব্যক্ত করা হয় যে, ভারতবাসীগণ ইউরোপীয়দের সহিত সমভাবে চাকুরীতে অধিকার লাভ করিবেন। বস্তুতঃ ১৮৬৮ হইতে এই চাকুরীতে এই open door policy-ই সংরক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার দশ বৎসর মধ্যেই এই ভাবের একটু পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদ ভারতীয়গণকে প্রদত্ত করা হইত বটে, কিন্তু তাহাদের বেতন শ্বেতাঙ্গগণের সমান হইত না—এক তৃতীয়াংশ কম হইত। কিন্তু ১৮৯৬ সালে নভেম্বর মাসে যে "Reorganisation of Higher Educational Services of the country" হয়, তাহাতে ভারতীয়গণের বেতন তো অর্দ্ধেক হ্রাস হইলই তদুপরি অনেক উচ্চ চাকুরীলাভে তাহারা বঞ্চিত হইল। এবং Indian Educational Service-এ প্রবেশাধিকার খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটিল।

এই বৈষম্যে শিক্ষিত ভারতীয়গণের মধ্যে অশান্তির বীজ রোপিত হইল। তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ এই যে, শিক্ষা দীক্ষায় কোন অংশে ন্যূন না হইয়াও, বিলাতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিশ্ববিস্থালয়ের শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়াও, কেন তাঁহারা অন্তরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইবেন? এই পক্ষপাতিত্ব বর্ণ ও জাতিমূলক মনে করিয়াই তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হয় ১৮৯৭ সালে—যে বৎসরে ভারতীয়গণ মহারাণীর শাসনের হীরক জুবিলীতে যোগদান করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছিল।

কেবল যে উচ্চ চাকুরীতেই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হয় তাহা নয়, কেরাণীগিরি, চাকুরী এবং রেলওয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারেও ইউরোপীয় ও ইউরোপীয়ানদেরই নিয়োগ অধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হয় এবং ইহাদের উদ্ধত ও অশিষ্ট ব্যবহারে জনসাধারণ অতিমাত্রায় অসম্মানিত হইতে থাকায় অসন্তোষের কারণ ক্রমেই বাড়িয়া যায়।

ঠিক এই জুবিলীর বৎসরেই বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ভারতীয়গণের রুড়্‌কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের অধিকার লোপ করা হয়। Natives of pure Asiatic descent whose parents or guardians are domiciled in Bengal, Madras and Bombay are excluded. প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইল খাঁটি ভারতীয় ছাত্রগণের জন্য কিন্তু সংমিশ্রিত শোনিত সম্ভূত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণের জন্য কখনও রুদ্ধ হয় নাই। যদিচ ডাক্তার অ্যানি বেসান্ত শঙ্কর জাতির প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় রহস্যের অবতারণায় বিস্মিত হন নাই—

"It is quaisnt to notice that Asiatics of impurer descent were not excluded. To give privileges to illegitimacy is peculiar to the Government of India !"

আমরা কিন্তু এইরূপ আদেশে খুবই বিস্মিত হইয়াছিলাম। অত্যল্প কাল মধ্যে বোম্বাই হইতে Bombay Presidency Association, কলিকাতা হইতে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রমুখ অন্যান্য সঙ্ঘ ইহার প্রতিবাদ করিল বটে, কিন্তু উপর হইতে কোন সদুত্তর পায় নাই।

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থাও বড়ই বৈষম্যময় হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী সেখানে ব্যারিষ্টারী করিতেন কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি ক্রীতদাসের অপেক্ষাও অধিক হেয় ও ঘৃণ্য আচরণ করিতে দেখিয়া তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করেন এবং ঐ নীতির উচ্ছেদকল্পে বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠেন। তাহাদের প্রতি যে কিরূপ অমানুষিক অনাচার প্রদর্শিত হইত, পাঠক নিম্নের কয়েকটী ব্যাপারেই তাহা বুঝিতে পারিবেন—

(১) ১৮৯৪ সালে ন্যাটালে (Natal) ভারত অধিবাসী-গণ ভোটাধিকারে চ্যুত হয়।

(২) ১৮৯৭ সালে একটি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় যে, হয় তাহারা জিজিয়ার মত একটি Poll Tax দিবে, নয়তো চিরকাল অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

(৩) আইনের নিগড় তাহাদের উপরেই পড়িবে, শ্বেতকায়দিগের উপরে নয়। স্তার হ্যারী এসকম্বি (Sir Harry Escombe) স্পষ্টই বলেন—

No Government dreamt of applying the law to Europeans....The object, however, was to deal with Asiatics.

(৪) ট্রান্সভেয়ালে তাহাদের বাসের জন্য কদর্য্য স্থান নির্দ্ধারিত হয়। এই সমস্ত স্থানে মল ও আবর্জ্জনাদি নিক্ষিপ্ত হইত।

(৫) কোন কোন অধিনিবাসে (colony) ভারতীয়গণ ফুটপাত দিয়া যাতায়াত করিতে পারিত না, তাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চড়িতে পারিত না, কিম্বা রাত্রি ৯টার পরে বাহিরে থাকিতেও পারিত না, আর পাশ ব্যতীত কোথাও যাওয়ার অধিকার তাহাদের ছিল না।

ভারতসচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন ইহাদিগকে অসভ্যের জাতি (a nation of savages) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং শ্বেতাঙ্গগণের জল সরবরাহ করা ও রন্ধন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ভিন্ন (Hewers of wood and drawers of water to the domineering white population in the Colonies) আর কোন মার্জ্জিত ভাষায়ই নাকি ইহাঁরা অভিহিত হইবার উপযোগী নহে!

কেবল যে শিক্ষা ও আইন সংক্রান্ত গোলযোগই উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নহে। চারিদিকে পিউনিটিভ পুলিশের প্রবর্ত্তন হইতে লাগিল, আর তজ্জন্য খরচ বহন করিতে হইল দরিদ্র অধিবাসীবৃন্দের। প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ ব্যাপারে আরও আরও যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়া লোকের মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিলে প্রবন্ধ খুবই দীর্ঘায়তন হইয়া যাইবে। কিন্তু কলিকাতা নগরীতে এই সময় যে অসন্তোষ পুঞ্জীকৃত হইতেছিল সে সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা নিতান্তই আবশ্যক। এই অসন্তোষ হয় মিউনিসিপ্যাল ব্যাপারে—'ম্যাকেঞ্জি বিল' উপলক্ষে।

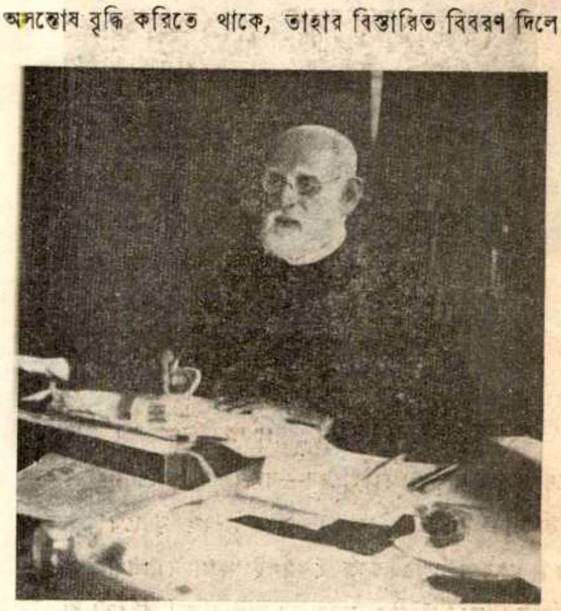

স্তার সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি

বোধ হয় সকলেই জানেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম সূত্রপাত হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। লর্ড এলগিন মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত ব্যাপার জাষ্টিস্ অব দি পিস্ যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের হাতে ন্যস্ত করেন। ইঁহাদের মধ্যেই একজন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেন, এবং সকলে মিলিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। স্বভাবতঃই এইরূপ পরিচালনায় করদাতাগণের

কোনও কার্য্যভার থাকিত না। ১২৯ জন জষ্টিস্ অব দি পিস্ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সরকারী, বেসরকারীদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গই বেশী।

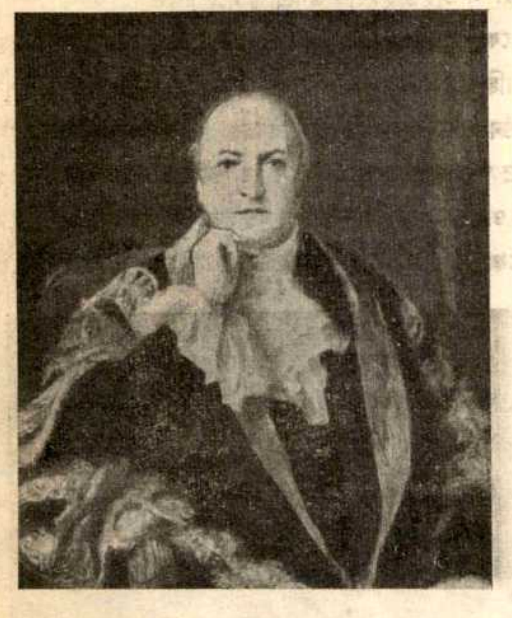

লর্ড কার্জন

তৎপরে প্রথম নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া করদাতাগণের প্রতি কর্ত্তৃত্ব ভার দেন—বাঙ্গালার তৎকালীন শাসন-কর্ত্তা স্যার রিচার্ড টেম্পল। ইহা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয়। অবশ্য স্যার জর্জ্জ কেম্বলই নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তন করিতেন, তবে তাঁহার সময় হয় নাই বলিয়া পরবর্ত্তী ছোটলাট কর্ত্তৃক উহা অনুষ্ঠিত হয়। লর্ড নর্থব্রুক তখন গভর্ণর জেনারেল। এই সময় হইতে কমিশনার নির্ব্বাচিত হইতেন। একজন চেয়ারম্যান গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া শাসন কার্য্য সম্পাদন করিতেন বটে, কিন্তু এই নির্ব্বাচিত কমিশনারগণই ডেপুটী চেয়ারম্যান, কালেক্টার ও লাইসেন্স অফিসার ইত্যাদি মনোনীত করিতেন, বাজেট্ আলোচনা করিতে পারিতেন এবং কর্পোরেশন শাসনযন্ত্রের গলদ দেখাইতেও পশ্চাদ্পদ হইতেন না। ফলে করদাতাগণের কর্ত্তৃত্ব তাহাদের নির্ব্বাচিত কমিশনারগণের মারফতই সম্পাদিত হইত। ইহাই চার আইন (Act. iv of 1876)* বরং ১৮৮৮ সালে এই নির্ব্বাচন প্রথা আইনের আরও সংশোধিত বিধান হয় (Act. II B. C. of 1888) এবং ১৮৮৯ সালের মার্চ্চ হইতে এই প্রথায়ই নির্ব্বাচন কার্য্য সমাধা হয়। সেই সময় শতকরা ৪৩ জন ভোট দিয়াছিল।

স্যার রিচার্ড টেম্পলের পরে স্যার এস্‌লি ইডেন ১৮৭৭-৮২, স্যার রিভার্স টমসন ১৮৮২-৮৭, স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলি ১৮৮৭-৯০, এবং স্যার চার্লস ইলিয়ট ১৮৯০-৯৫ প্রমুখ কয়জন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরই এই প্রথার প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু ইহার দিকে প্রথম শ্যেন-দৃষ্টি পড়ে ছোটলাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির।

বোম্বাই ও পুনায় প্লেগ এবং অপরাপর ঘটনাদির পরে কলিকাতা কর্পোরেশন ও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার (officialise) জন্য Sir Alexendar Mackenzie ব্যগ্র হইয়া উঠেন। তিনি এক প্রকাশ্য সভায় কমিশনারগণের প্রতি অশিষ্টোক্তি বর্ষণ করেন এবং একটী বিল উপস্থিত করিয়া কমিশনারগণের যাবতীয় ক্ষমতা অপসারণ করেন। এই বিল অনুসারে চেয়ারম্যানের সহায়তার জন্য ১২ জন সভ্য লইয়া একটী জেনারেল কমিটী (কার্য্যকরী-সঙ্ঘ) গঠিত হয়। এই ১২ জনের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যই যদি নির্ব্বাচিত হইতেন তবে কোন কথা উঠিত না, কিন্তু ইহার ৮ জনই হইলেন সরকার পক্ষান্তর্গত (official)। ৪ জন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া এবং চারিজন ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রদায় (Trade ও Commerce) হইতে আসিয়া এই আট জন শ্বেতাঙ্গ ও সরকারী সভ্য নির্ব্বাচিত চারিজনকে প্রতিপদে নাজেহাল করিতে পারিত। Bengal Chamber of

---

*স্যার ষ্টুয়ার্ট জন্ এই বিল উপস্থিত করেন এবং স্যার রিচার্ড টেম্পল লিখিয়া পাঠান—

Not withstanding the high character borne by the justices and the good services rendered by them during the many years, it was felt that the Corporation did not sufficiently represent various classes in the community who by their growing wealth, their increasing claims to consideration, were entitled to a definite voice in the management of the city. I therefore deemed it my duty to propose to the legislature a new municipal constitution and a Corporation to consist of 72 Counsellors of whom two thirds to be elected and one third to be appointed by Government....

Commerce ও Trades Association এর সাহেবগণ ভারতীয়গণের প্রতি গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী অপেক্ষাও অধিকতর বিরূপ, তাই ফলে, নির্ব্বাচিত সভ্যগণের সমস্ত ক্ষমতাই সংহরিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে এই সব সাহেবগণ কর্পোরেশনের সভায় প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন বা ঔদাসীন্য দেখাইতেন, কিন্তু এখন তাহাদিগকে সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য ৩২ টাকা করিয়া ফি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই 'বিলে' নির্ব্বাচন প্রথার মূলে গভীর কুঠারঘাত করা হয় এবং এই বিলই 'ম্যাকেঞ্জি বিল' নামে খ্যাত হয়।

এই বিল উপলক্ষে সমগ্র কলিকাতায় চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে এবং উপর্য্যুপরি নানাস্থানে সভাসমিতিতে* দেশবাসীর ক্ষুব্ধভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠে। এই সমস্ত সভায় উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার, তালুকদার, ব্যবসাদার ও পণ্যবিক্রেতা সমভাবে হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করিয়া তীব্র অশান্তি প্রকট করিতে কোনরূপ দ্বিধা করে না। বিলটী পাশ হইয়া আইনে পরিণত হয় বটে কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর মধ্যে ভাব-বিপ্লব ক্রমেই প্রসার ও বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিল।

১৮৯৮ সালে ম্যাকেঞ্জি সাহেব বিলের প্রবর্ত্তনা করেন বটে কিন্তু উহা আইনে পরিণত হয়, তৎপরবর্ত্তী ছোটলাট স্তার জন উড্‌বার্ণের শাসন সময়ে। ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উহা তাঁহার কাউন্সিল হইতে পাস হয় এবং ১৯০০ সালের মার্চ্চ হইতে উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। স্তার জনের হৃদয়ে সহানুভূতি ও কোমলতার ভাব কোনরূপে ন্যূন না হইলেও, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তার কার্য্য বিলোপ করিতে বিন্দুমাত্রও অঙ্গুলী সঞ্চালন করেন নাই। উপরন্তু দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন যে, "যাঁহারা ম্যাকেঞ্জি বিলের সমর্থন করিতে চাহেন না তাঁহারা স্বায়ত্ব শাসনের (Local Self-Government) এই আইনের ঘোরতর বিরোধী।"

স্তার রমেশচন্দ্র

অশ্বিনীকুমার দত্ত

সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে কাউন্সিল হইতে আইনটী পাস হইলেই ২৮ জন কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করেন। যাঁহারা পদত্যাগ করেন তন্মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ সেন, রাধাচরণ পাল, শ্রীনাথ দত্ত, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ রায়, কুমার মন্মথনাথ মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নাথ মল্লিক, ডাক্তার রামময় দত্ত প্রভৃতি পদত্যাগ করেন নাই, ভবানীপুরের করদাতাগণ একযোগে প্রিয়নাথবাবুর পদত্যাগ দাবী করিয়া সভায় প্রস্তাব পাশ করেন। ডাক্তার রামময় দত্তও প্রথমে সহি করিলেও পরে সেই পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। এই ২৮ জনকেই. নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় 'সাবাস আঠাস' নামে অভিনন্দিত

---

* টাউনহলের সভা হয় ১৮৯৮ সালের ৩১শে আগষ্ট এবং শোভাবাজার রাজবাটীর রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস রচনা করেন।* আমরা এখানে শেষ গানটীর কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

দেবী রাজ, বিনোদ সদাশয়
কান্তি জ্যোতি অমৃত অক্ষয়
মন্মথ, মোহিনী, যোগী, তারণ সুরেন দাশ
লালবিহারী, মণিলাল, হিরু, রাধাচরণ পাল,
কাটাইয়ে জোরে জোরে কাটালেন পাশ।
দেখে ধরণ সুরেন রায়, সঙ্গে সঙ্গে দিলেন সায়
তবে অসময় রামময় পাশ দিয়ে তাস;
রঙ্গের খেলায় ভ্যালা পেলেন উপহাস॥

অ্যানি বেশান্ত

এই রামময়বাবুকে "সাবাস আঠাস"'র ছেলেরা টিট্‌কারী দিয়া বলিতেছে—

"ডাক্তার ভায়া, ডাক্তার ভায়া, আছ কি ভাই ঘরে,
তোমার মুখটী দেখে বুকটি ফাটে প্রাণটি কেমন করে?
চড়ে গাড়ী বাড়ী বাড়ী টিপতে গিয়ে নাড়ী
গেছলে কেন কমিশন নিতে তাড়াতাড়ি?"

আর স্ত্রীও বলিতেছেন, "বটে বটে, ঢলাঢলি বাজারে উঠেছে! ঘরে তো নাপতিনী ধিক্কার দিয়ে গেল, বিমলি ঝিও কি বল্‌ছিল! এখন ছেলেরা হাততালি দিচ্ছে। এমন কীর্ত্তি করে এসেছ?"

রসময়—"তা আর কি করবো? ভবানীবাবু অত জেদ করলেন। তাঁর কথা কি ঠেলতে পারি। চিঠিখানা একরকম—"

এই রসময় বাবুই ডাক্তার রামময় আর ভবানীবাবু ভবানীপুরের কমিশনার প্রিয়নাথ মল্লিক।

এই 'ম্যাকেঞ্জি বিলে' স্বায়ত্তশাসনের মূলে যে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা ভারতবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়া বিষম ব্যথিত হইয়া উঠে।

এই ম্যাকেঞ্জি বিল যে কেবল স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি ও স্যার জন উড্‌বার্ণেরই কার্য্য তাহা নহে। ইহাতে White-Hall-এরও ইঙ্গিত থাকা খুবই সম্ভব। ঘটনা পরম্পরা দেখিয়াও তাহাই মনে হয়। ১৮৯৭ সাল জুবলি বৎসর হইয়াও ভীষণ বৎসরে পরিণত হয় আর ভারত সচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিলটন পার্লামেণ্টে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিয়া উঠেন, "ইংরাজ এখন ভারতভূমে বারুদের স্তূপের উপর বসিতে বাধ্য হইয়াছে—The British in India were sitting on gun powder all the time." এই উক্তির পরেই স্বায়ত্ত্বশাসনের বিলোপ।

এই ম্যাকেঞ্জি বিল লইয়া সুরেন্দ্রনাথ তখন অবিশ্রান্ত খাটিতেন। তিনি তখন কাউন্সিল এবং কর্পোরেশন উভয় প্রতিষ্ঠানেরই সভ্য ছিলেন। Council এ তিনি অপূর্ব্ব বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহাতে Sir Edward Baker (পরবর্ত্তী গভর্ণর)ও শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে প্রকাশ করেন যে, "এইরূপ তর্কশক্তি (debate) West Minister এর পর আর আমি কখনও শুনি নাই।" তবে সমস্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেন বাবু নলিনীবিহারী সরকার। কর্পোরেশনের কাজে এমন অভিজ্ঞ ব্যাক্তি তখন খুব কম ছিল। সমস্ত কাগজ পত্র বিষয় ব্যাপার সর্ব্বদাই মিঃ সরকারের নখদর্পণে থাকিত। যখন বিল পাশ হইয়া যায়, সুরেন্দ্রনাথ পূজার ছুটিতে সিমুলতলায় নিজের বাড়ী গিয়া খুব দুঃখিত মনে বলিয়াছিলেন, "রাজনীতির আন্দোলন ছাড়িয়া দিব, এবার গীতা পড়িব, পলিটিক্যাল এজিটেসনে কিছু হইবে না।" কিন্তু পরে আসিয়াই আবার কাজে লাগিয়া যান। কংগ্রেস ১৮৯৯ সালের অধিবেশনে লক্ষ্ণৌ সহরে এই স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া তিনি যে বক্তৃতা দেন সেরূপ বক্তৃতা আজকাল

---

*২৩শে সেপ্টেম্বর এই প্রহসন ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়, এবং উপর্য্যুপরি ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত প্রতি শনিবার পরিবেশিত হইতে থাকে।

দিনেও জাতীয়বাদী কংগ্রেস নেতারাও বলিতে পারেন কি ন সন্দেহ। জাতীয় আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের অসামান্য অবদান দেশবাসী সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ রাখিবে। সকলেই জানেন কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বায়ত্ব শাসনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা মন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনিই করিয়াছিলেন (১৯২৩)। এই সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও 'সাবাস আঠাশে' উল্লেখ আছে। রসময় ভবানীকে বলিতেছে,

তবে কি আপনি রেজিগনেশনের এগেনষ্ট?

ভবানী—The thousand times ও তোমার হরেন বাঁড়ুয্যে, কমল সরকারদের পেট্রিয়টিজমের ভিতর আমি নেই; এই তো ছেড়ে দিচ্ছ, তার পর দেখে নিও তোমার নিজের গলির দুর্দ্দশা, এখন রেড্ রোড়ের মতন চক্ চক্ করছে, তখন যত রাজ্যের মরা কুকুর বেড়াল তোমার দোরে ফেলে যাবে!

এই কমল সরকারই বাবু নলিনবিহারী সরকার আর হরেন বাঁড়ুয্যে জনপ্রিয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সমস্ত কাউন্সিলার সভ্যগণ বেশ খাটিয়াছিলেন তাহাদের জন্যও "সাবাস আঠাসে" প্রশংসাবাদ আছে—

"বেঁচে থাক কালীনাথ, আছে বটে আছে বাত,
হাত না তুলে পাতে শুড়ুলে ছেড়ে কমিশনী চাষ—
চারিদিকে যশের গন্ধ বন্দনীয় সুরেন বন্দ্যো
কৌন্সিলে করিবে দ্বন্দ্ব, বিলটি যাতে না হয় পাশ।

পশুপতি বসু, ভূপেন বসু, জানকীনাথ রায়, নলিন সরকার, মৌলবী সামসুল হুদা প্রভৃতি অনেকের কথাই আছে। তবে রাজা বিনয় কৃষ্ণ এ-সময়ে যেরূপ সাহস দেখান ও সকলের রেজিগণেশন বহাল রাখিবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেন, তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসাবাদ আছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণের কার্য্যে লাক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি রমেশচন্দ্র মহাশয়ও তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করেন।

কলিকাতায় যেমন বেতনভোগী চেয়ারম্যান Paid Chairman, খাপর্দে যাহার নাম দিয়াছিলেন Servant Master), Bombay City Improvement Trust এও একজন কমিশনারকে বেতন ভোগী করিয়া (Master Servant) সেখানে কলিকাতার অনুরূপ ব্যবস্থাই চালান হয়।

এই সমস্ত অনাচার ও জঞ্জালের কথাই মাদ্রাজ কংগ্রেসে আলোচিত হয়। আর সভাপতি স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক সংযমের সুরে ওজস্বিনী ভাষায় তেজস্বিতা পূর্ণ কণ্ঠে ইংরাজ সরকারকে এই পীড়ন নীতি অনুসরণ হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ দিয়া বলেন—

‘Give up co-oercion and find the path of safety, of honour of mutual advantage and the truest and the most abiding glory in going forward in fearless confidence trusting the people extending the bonds of freedom not forging new fetters but gradually removing those that exist not taking away but adding to the rights of the people helping on the cause of India's regeneration with the passionate longing and the loving ardour that come from the consciousness of a duty and solemn responsibility from on high. The educated classes of India are the friends and not foes of England her natural and necessary allies in the great work that lies before her.”

"আপনারা পীড়নের নীতি বর্জ্জন করুন। শাসনের এই ঘৃণ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথ নিরাপদ ও সম্মানজনক, যে পথে পরস্পরে বিশ্বাস উৎপাদিত হয়, কেবল সুবিধাই করিয়া দেয়, সেই স্থায়ী ও গৌরবময়-পথ অনুসরণ করুন। যে পথ স্বাধীনতার সীমা বিস্তৃত করিয়া জনসাধারণের প্রতি নিরুদ্বেগ বিশ্বাস জন্মায়, জনসাধারণকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে, যে পথ শৃঙ্খলের গ্রন্থি না আঁটিয়া ক্রমশঃ উহা ছিন্ন করিয়া দেয়, যে পথ স্বর্গের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে উদ্ভূত, যে পথ আবেগময়ী ব্যাকুলতা ও উৎসাহ সহকারে ভারতের পুনর্জ্জাগরণ কল্পে ভারতবাসীর হস্ত হইতে অধিকার কাড়িয়া না লইয়া উপরন্তু ভারতীয় জনসাধারণকে বৃহত্তর অধিকার দানেই উদ্বুদ্ধ করিবে—আপনারা দমন নীতি পরিত্যাগ করিয়া সেই গৌরবোজ্জ্বল পথেরই সন্ধান করুন—নিশ্চয় জানিবেন, ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংলণ্ডের শত্রু নহে, পক্ষান্তরে যে মহান কর্ত্তব্য আজ ইংলণ্ডের সম্মুখীন ইংলণ্ডবাসীর সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের অকৃত্রিম ও অপরিহার্য্য বান্ধব।"

কিন্তু হায়, অবিশ্বাসই এখন শাসন কর্ত্তাদের মূলমন্ত্র।

সভাপতি মহাশয় একজন বিচক্ষণ স্থির মস্তিষ্ক লোকের পত্রের কয়েকটী ছত্র পাঠ করেন। লেখক লিখিয়াছেন—

"Are you a friend to British Rule! Try your best to induce the authorities to withdraw the suicidal policy of Government. If you are an enemy, well, my advice is to keep quiet and let things take their course.

অতঃপরে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আনন্দমোহন জলদগম্ভীর স্বরে বলেন—

Are we to march backwards into the methods of despotism, to the weapons of coercion, to the policy of distrust? Or are we to march onwards in the path which was traced out by those noble Englishmen who have been the founders, the consolidators, the saviours of the empire, the path which leads to the advancing and not to rending freedom, to greater trust in the people, to rights enlarged and not to concessions withdrawn?

"এইরূপে আমরা কি পশ্চাৎ হটিয়া স্বেচ্ছাচারিতার নীতি, অবিশ্বাসের পন্থা ও পীড়নের দংশন বিবরে পা বাড়াইয়া দিব—না, যাঁর পাদক্ষেপে যে পথ অনুসরণ করিয়া মহিমময় ইংলণ্ডবাসীগণ ব্রিটিস সাম্রাজ্যের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, যে পথে অগ্রসর হইয়া তাহারা সাম্রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, সুশাসনে তাহা রক্ষা করিতেছেন, যে পথ পশ্চাদানুগমন নহে, যাহা ক্রমাগ্রসারী স্বাধীনতারই নির্দ্দেশ দান করে, যে পথে জনসাধারণের প্রতি মহত্তর বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা হয়—যে পথে বৃহত্তর অধিকারের সন্ধান দেয়, প্রত্যাহার করে না,—সেই মহান পথই অবলম্বন করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইব?"

এই অভিভাষণকে অমৃতবাজার পত্রিকা (1st Jn. 1899) Whining বলিয়া আখ্যা দেন। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ অভিযোগ ন্যায়নিষ্ঠ হয় নাই। ১৮৭৬ সালের ঘটনা অমৃতবাজার পত্রিকা তখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

এবারেও বাঙ্গালার প্রতিনিধিবর্গ জাহাজে চড়িয়া মান্দ্রাজ যান। S. S. Bancoora-তে চড়িয়া নেতৃবৃন্দ ২৩শে ডিসেম্বর রওনা হন এবং ২৯শে মান্দ্রাজ পঁহুছেন, একসঙ্গে সভাপতি আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ ব্যানার্জ্জি, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, গুরুপ্রসাদ সেন, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি অনেকে যান। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা খুব সারগর্ভ হইয়াছিল এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, যে বক্তৃতার শেষ অংশের Peroration না কি finest oratory বলা যাইতে পারে আমাদেরও মনে হয় নিম্নলিখিত কথাগুলি সর্ব্বযুগে সব মনকেই স্পন্দিত করিবে—

Here we, my friends, the trumpet call of duty resounding to us amidst the stirting scenes, the moving enthusiasm, the thrilling sights of this great gathering. Yes, the call sounds clear but let our hearts gather the strength to respond to that call and to be true to her, our common mother, the land of our birth to be true and faithful to the light that is within us and to every noble impulse that stirs within us. And may we, as we return to our homes, to the spheres of our daily life, carry a little more of the living love to our country, than when we came, a little more of the earnest longing to be good and true and useful before the day closeth and our life's work is done.

পাঠকের অবগতির জন্য অধিবেশনের প্রস্তাবগুলির একটু সারাংশ দিলাম:—

(১-৩) W. E. Gladstone, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সর্দ্দার দয়াল সিংহের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

(৪) গত অধিবেশনের আপত্তি সত্ত্বেও সিডিসন আইন পাশ হওয়ায় বিক্ষোভ—

(৭) Establishment of Secret Press Committees in certain parts of India is highly objectionable and inconsistent with the spirit of British Administration.

(৯) Disapproval of the reactionary policy of Government with regard to Local Self-Government recently inaugurated by the introduction of the Calcutta Municipal Bill in the Bengal Legislative Council and the creation of Bombay City Improvement Trust without adequate popular representation.

(১২) Congress deplores the invidious and humiliating distinctions made between Indian and European settlers in South Africa, a prominent instance of which is afforded by the recent decision of the Transvaal High Court restricting

Indians to locations and appeals to Her Majesty's Government and the Government of India to guard the interests of Indian settlers and to relieve them of the disabilities imposed on them.

লণ্ডনের সংবাদ পত্র সঙ্ঘের প্রতিনিধি Mr. Chambers, (W. A) উপস্থিত ছিলেন। তথাকথিত প্রেস সেনসরসিপ সম্বন্ধে অষ্টম প্রস্তাবটী উপস্থিত করিয়া তিনি বলেন—"গুপ্ত প্রেস কমিটী' স্থাপনে আমি এতই বিস্মিত হইয়াছি যে এরূপ ব্যবস্থা কোন ইংলণ্ডবাসী সমর্থন করিতে পারে না। ইংরাজ-শাসিত দেশে এরূপ হইতে পারে তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না!" তিনি বলেন "সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করিবার জন্য বোম্বাই প্রদেশের কোন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন সম্পাদকের নিকট একখানি পত্রাঘাত করেন। বিলাতে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণের নিকট উক্ত প্রবন্ধ ও পত্রখানি পাঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং আমি তাহা দেখিবার সুযোগ পাইয়া লণ্ডনের একখানি বিশিষ্ট সংবাদ পত্র সম্পাদকের নিকট লইয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করি। সম্পাদক মহাশয় কাগজ দুখানি পড়িয়া প্রবন্ধটীকে নির্দ্দোষ এবং চিঠিখানি 'আসুরিক' (Monstrous) বলিয়া আখ্যা দেন। আমি তাঁহাকে স্পষ্টই বলি, দেখুন আমাদের দেশের লোকই এইরূপ অযথা ব্যবহার করিয়া জাতির মুখে কলঙ্ক কালি লেপন করিতেছে। অথচ জার্ম্মানী ও রুশিয়াকে আমরা দোষ দিয়া থাকি—"

"This is the sort of thing that is taking place, not in Russia, not in Germany, but in a country for whose Government you and I are responsible."

এই কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন ভারতের শাসন কর্ত্তারূপে মনোনীত হন। কার্জ্জন সাহেব খুব লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতেন এবং ভারত সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে অনেক কথা বাহির হইত। এই সমস্ত কথায় ভারতের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি সূচিত হইত।*

এই কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া একটী প্রস্তাব পাশ (৫ম) হয়। ৩০শে ডিসেম্বর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে যেন বেণ্টিঙ্ক, ক্যানিং এবং রীপণের সহিত তাঁহার নামও সমস্বরে ঝঙ্কৃত হইতে পারে—

অভিভাষণের পূর্ব্বেই ২৯শে ডিসেম্বর সভাপতি আনন্দমোহন বাবু ভারতবন্ধু গ্লাডষ্টোনের নামের সহিত তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া গদ্‌গদভাবে বলেন—

There is no higher wish I can express to him for him than that when the time comes to step down from his exalted office, he may carry with him from the people of the country, some portion of that blessing and that love that have followed Mr. Gladstone on quitting the scene of his earthly labours, from many, nations and many lands—that he may find a place in their hearts by the justice and righteousness of his rule and reign there, when the external emblems and pomp of power, how temporary after all—will have been laid aside.

---

* ১৮৯৮ সালের, ২৮শে অক্টোবর ভাইসরয়ের নিয়োগ পত্র পাইবার পরে লণ্ডনের একটী পুরাতন Etonians-দের সভায় বক্তৃতা দেন (at the Cafe Monico) লর্ড Rosebery সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এইখানে বলেন—

...Thirdly, Viceroy's duty is to recognize that though relatively far advanced in the scale of civilisation compared with the time of Lord Wellesley or even Lord Canning, India is still but ill-equipped with the material and industrial and educational resources which are so necessary to her career, and so to work that she may, by slow but sure degrees, expand to the full measure of her growth. And lastly, it is to preserve intact and secure, either from internal convulsion or external inroad, the boundaries of that great and Imperial dominion.

প্রাকৃতিক শিক্ষা এবং শিল্প সম্পর্কে ভারত এখন অতি হীন এবং ইহার জন্য ভারত ধীর অথচ স্থির পাদক্ষেপে যেন তাহার এই অকিঞ্চিৎকর সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে, এবং সাম্রাজ্যের এই বিরাট উপনিবেশটীর সীমারেখা যেন সর্ব্বপ্রকার আভ্যন্তরীণ অশান্তি এবং বাহিরের আঘাত হইতে সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত ও অক্ষত থাকে, ভাইসরয়ের তাহা দেখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

Again at the Royal Societies' club in St. Jone's Street, Lord Curzon says:

Whether the period of five years is a long enough time for him to do his work whether in that period he can make any lasting impression upon the tremendous problems that come before him or upon the vast populations committed to his care, is a question which I shall be better able to answer five years hence than now.

পাঁচ বৎসর সময় রাজপ্রতিনিধির কর্ত্তব্য সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট কিনা অথবা এই পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে যে সকল ভীষণ সমস্যা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে সেই সব সমস্যার উপর এবং তাহার অভিভাবকত্বাধীন বিরাট জনসাধারণের মনে তিনি কোন স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া আসিতে সফলকাম হইবেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর বরং পাঁচ বৎসর পরেই আমি দিতে সক্ষম হইব—এখন নয়।

লর্ড কার্জ্জনও পরদিন (৩১শে ডিসেম্বর) বোম্বাই হইতে উত্তর দেন—

"আপনাদের (Cordial message of welcome) আন্তারিক শুভাগমন-মূলক বার্ত্তায় আমি অত্যন্ত বিগলিত। আমি আশাকরি আমার প্রতি নিয়োজিতকর্ম্মভার শেষ করিয়া আমি যখন পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করিব, তখন আমার কার্য্য দেখিয়া সকলে যেন অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় যে, আমি ইংলণ্ডের পরেই আমার বাঞ্ছিত দেশ ভারতভূমির জন্য, অকিঞ্চিৎকর হইলেও, অন্ততঃ কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছি—

Some one present at my arrival may testify that during my time I have done something, if it even be but little for this land which, next to my own country is nearest to my heart.

হায়, কে জানিত যে সাত বৎসর যাইতে না যাইতেই ১৯০৫ সালের বারানসী ধামের কংগ্রেসে এই কার্জ্জন সম্বন্ধেই সেই অধিবেশনের সভাপতি পরলোকগত গোখেল মহোদয় বলিতে দ্বিধা করেন নাই যে, ঔরঙ্গজেবের পর হইতে এ পর্য্যন্ত এত নিকৃষ্ট শাসনকর্ত্তার ইতিপূর্ব্বে কখনও ভারত শাসন করেন নাই—

Curzon's rule had been the worst India had suffered since that of Aurongzeb.

এই দুইটী বৎসর ১৮৯৭, ১৮৯৮ এমনই দুর্ব্বৎসর যে মিসেস বেশান্তও তাহার How India wrought for her freedom পুস্তকে ইহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন—

The clouds were gathering on the political horizon, co-ercion was showing its hideous face, ensuring the growth of secret conspiracy and alienating from the Government which confessed its weakness by employing it, all that was best and noblest in the land.

কিন্তু একদিকে যেমন মেঘ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, অন্ধকার আসিয়া গগন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, অবিশ্বাস ও সন্দেহ ভারতীয় মন নিষ্পেষিত করিতেছিল, অপরদিকে আবার উষার আলোকে ভারতাকাশে এক নবজ্যোতি আবির্ভূত হইয়া সকলের মনে আশা ও আলোর সঞ্চার করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। বস্তুতঃ প্লেগ, মহামারী, দমন নীতি, অবিশ্বাস, অনাচার যখন সমগ্র ভারতের বক্ষ নিষ্পেষিত করিয়া ইহাকে চকিত, চঞ্চল ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছিল, বাঙ্গালী যুবক এক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে পাইয়া নবপন্থার সন্ধান পাইল, নূতন আলোক উদ্ভাসিত দেখিল, আর সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এই সন্ন্যাসীই বাঙ্গালীর নরেন্দ্রনাথ—ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ।

নরেন্দ্রনাথ আসিলেন ১৮৯৭সালে আমেরিকা ধর্ম্মসম্মিলনে জগৎ জয় করিয়া। আর পর বৎসরই ভারতে আসিলেন লর্ড কার্জ্জন। লর্ড কার্জ্জন বহু দিন আরও রহিলেন আর নরেন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থান করেন ১৯০২ সালে। এই পাঁচ বৎসরে তিনি এমন মন্ত্রে ভারতীয় যুবকগণকে উদ্বোধিত করেন যে, পরে যুব-আন্দোলন ভারতের প্রধান কার্য্যকরী আন্দোলনে পরিণত হয়। অতঃপরে ভারতে এমন একটী শক্তির উদ্বোধন হইল যে বাঙ্গলার যুব সম্প্রদায়ের নিকটে লর্ড কার্জ্জনের দমন-নীতিও অসাড় হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ এই সময় হইতে কেবল ধর্ম্ম জীবনে নয়—জাতিগঠনে, সমাজ সেবায়, শিক্ষার-প্রসারে, সকল দিকেই দেশে যেন নূতন বন্যা প্রবাহিত হইল।

বাঙ্গালীহৃদয়ও প্রস্তুত ছিল, ঋষি বঙ্কিম, কবি হেমচন্দ্র, নাট্যকার গিরিশ যে সাহিত্যের ধারায় জাতির সঞ্জীবনী রসের উদ্ভব ও সঞ্চার করিয়াছেন, নবীন, যোগেন্দ্র জাতি গঠনে যে সহায়—পবনের পথ করিয়া দিয়াছেন, কেশবচন্দ্র, শশধর, কৃষ্ণপ্রসন্ন যে ধর্ম্মের ভিত্তি প্রোথিত করিয়াছেন, তাহাতে

---

* ৩০শে ডিসেম্বর (১৮৯৮) লর্ড কার্জ্জন বোম্বাই পহুঁছেন এবং মিউনিসিপালিটী হইতে একটী অভিনন্দন প্রাপ্ত হন।

বাঙ্গালার জমি যে পূর্ব্ব হইতেই উর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছিল
তাহাতে আর বিচিত্র কি ?
তাই বাঙ্গালী গাহিল—

সপ্তকোটি কলকণ্ঠে কলকল
নিনাদ করালম্
দ্বিসপ্ত-কোটিভুজৈর্ধৃতখর করবালম্
কে বলে মা তুমি অবলে ?

[ক্রমশঃ

সীতারাম রায় ও বক্তার খাঁ

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম এ, ব্যারিষ্টার এট্ ল

[গাথা]

উদয়শিখরে সূর্য্যের মত অযুত রশ্মিধাম
ক্লৈব্য ত্যাজিয়া উন্নত শিরে জেগেছিল সীতারাম।
নিখিলবঙ্গ আজো সম্ভ্রমে স্মরণে জানায় নতি,
সকল ধর্ম্মে সকল বর্ণে গড়েছিল সংহতি।

মধুমতী নদী কুলুকুলু ধায় ভূষণার কূল ছুঁয়ে,
যেথায় ধানের পরশের লোভে আকাশ পড়েছে নুয়ে।
হিন্দু মুসলমানেরা যেথায় কৃষিকাজ করে সুখে,
সহজে বিকাশে সুস্থ মনের প্রসন্ন হাসি মুখে।

ভেদাভেদ তাঁর ছিল না হিঁদুতে রূপে ঢালী, রামরূপ,
বক্তার তাঁর ছিল সেনাপতি, রায় সীতারাম ভূপ !
দিল্লীরে মাথা নোয়ায়নি তাঁর স্বাধীন বাঙ্গালী বীর,
এই বাংলায় বাঙ্গালীর ছেলে তুলেছিল উঁচু শির।

সেদিন রজনী তমসামগ্ন ঢাকা হ'তে ফেরে রায়,
মন্ত্রণাদাতা মুনিরাম ছিল তাঁরি সাথে সেই নায়।
"নলদী"নামক পরগণা পেয়ে নবাবের জায়গীর,
ফিরিতেছিলেন ভূষণায় রাজা সীতারাম রায় বীর।

তরণীতে সুখে নিদ্রামগন ছিলেন নিশীথে রাজা,
তীরে তরুলতা দেখা নাহি যায় কালী দিয়ে যেন মাজা।
মধুমতী নদী শুধু জেগেছিল—যেন এক ফালি চাঁদ,
সহসা কিসের ওঠে কোলাহল ভাঙ্গিয়াছে বুঝি বাঁধ।

বাঁধ নয়, নয় জল-কল্লোল—আল্লা হো আকবর,
দূর হতে ভেসে আসে তীরবেগে বহু কণ্ঠের স্বর।
জ্বলিয়া উঠিল সহসা অনল, মশালের আনাগোনা,
তীব্রকণ্ঠে নরনারীদের চিৎকার যায় শোনা।

শিথিল দণ্ড পারেনা রাখিতে প্রজারে শান্তিকোলে।
মাঝিরা কহিল, "ডাকাত পড়েছে মনে হয় কোলাহলে।"
"নৌকা ভিড়াও", হাঁকিল রায়জী, মুনিরাম কহে, "রহো,
বিপদের মুখে কেন ঝাঁপ দিবে?" রায় কহে, "অসি লহো।"

ছোটে সীতারাম সাথে রামরূপ দ্বাদশটি সৈনিক,
কাদাপথ ভেঙ্গে চলে গ্রামমুখে তুরন্ত নির্ভিক।
হলো লাঠালাঠি হলো হাতাহাতি হলো ভারী সংগ্রাম
"জয় কালী" কহে বীর সেনানীরা, হাঁকে বীর সীতারাম।

"আল্লা হো আকবর" রবে মাতে নিশীথে দস্যুদল,
এই ধন্ ধন্ এই শন্ শন্—রঞ্জিত ধরাতল।
রায়ের অসিতে অগ্নির শিখা দস্যুপতির অসি
সাপের মতন আঁকিয়া বাঁকিয়া সরোষে উঠিছে শ্বাসি'।

সীতারাম কহে, "আর কত দেরী, আর ও বুঝিবে বলো?"
"জয় নয় ক্ষয়" কহিল দস্যু ধরা করে টলোমলো।
"তুচ্ছ কারণে অমূল্য প্রাণ দিবে কি বিসর্জ্জন?"
"তুচ্ছ এ নহে এ মোর বৃত্তি প্রাণ করিয়াছি পণ।"

"মহত্তর কি কিছু নাই আর, কেন এ দস্যুবেশ?"
কহে সীতারাম, দস্যু কহিল, "পরাধীন এই দেশ—
স্বাধীনতা সাথে সবি গেছে চলি, উচ্চ কিছুই নাই।"
"সাবাস্ সাবাস্", কহে সীতারাম, "এস মোর বুকে ভাই,

তোমার নিপুণ রণদক্ষতা সাহস শৌর্য্য নিয়া
এস হে দস্যু বন্ধু আমার, বুকের রক্ত দিয়া
গড়িয়া তুলিব নূতন করিয়া স্বাধীন বঙ্গভূমি,"
অসি ফেলি বীর বক্তার তাঁর করতল নিল চুমি।

বৃহত্তর বঙ্গ ও বর্ম্মণজাতি

শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার আমি কাছাড় জেলার বর্ম্মণজাতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই জাতি তিব্বতী-বর্ম্মণ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। কোন এককালে এই বর্ম্মণ (কচারী), গারো, নাগা, লুসাই এমনকি মণিপুরীও এক জাতিভুক্ত ছিল। এখন ইহারা কালক্রমে বিভিন্ন জাতীয় হইয়াছেন। উপর্যুক্ত জাতিগুলির চেহারায় অল্প অল্প সাদৃশ্য মিলে। সেই চোখ ছোট, নাক মোটা। অবশ্য ইহাদের সকলের মধ্যে মণিপুরী জাতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি বেশী পাইয়াছে, এবং ইহার কারণের মূলেও বোধ হয় রহিয়াছে তাহাদের বহুযুগ-ব্যাপী রুচি ও সৌন্দর্য্যানুশীলনের ফল।

এই বর্ম্মণজাতির গৌরবময় একটি ইতিহাস আছে এবং এই ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গালীরা জড়িত। বর্ম্মণেরা বলেন, তাহারা ভীম, হিড়িম্বার সুযোগ্য পুত্র ঘটোৎকচেরই বংশধর। বর্ম্মণেরা তাহাদিগকে হৈড়িম্ব বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকেন। বর্ম্মণদের এতোকাল পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন। প্রায় শতাধিক বৎসর ধরিয়া ইহাদের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর ইহাদের মধ্যে আর কেহ রাজত্ব করে নাই।

বাঙ্গালীরা এই বর্ম্মণদের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত রাজাদের দীক্ষাগুরু ও পুরোহিত ছিলেন। সুতরাং দোল, দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া এবং বিবাহ সমস্তই বাঙ্গালী পুরোহিতের উপদেশ মত সম্পন্ন হইত। ইহাদের জন্য বাঙ্গালী পুরোহিতেরাই শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন।

আসাম প্রদেশের নিম্নভাগে শ্রীহট্ট ও কাছার জেলা অবস্থিত। এই উভয় জেলার অধিবাসীরা বেশীর ভাগই বাঙ্গালী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে এই দুই জেলাই বোধ হয় বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল। অধুনা ইহারা আসাম প্রদেশের অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলেও কৃষ্টিগত উত্তরাধিকারসূত্রে এই উভয় জেলার অধিবাসীরা বাঙ্গালীই।

বর্ম্মণদের প্রাচীন ইতিহাস গৌরবময়। রাজত্বস্থাপন এবং নানান যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া ইহারা জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। ইহাদের ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইলে শ্রীমণিচরণ বর্ম্মণের ‘হৈড়িম্ব-ভাষাপ্রবেশ’ পুস্তকের ভূমিকা আপনারা পড়িতে পারেন। এই বর্ম্মণ রাজারা কাশী, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিতেন। মুদ্রা, শঙ্খ ও সৌধগাত্রে সংস্কৃত-লিপিতে দেবদেবীর নাম খোদাই করাইতেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থও এই রাজারা পড়িতেন এবং সংস্কৃতে কেহ কেহ লিখিতে অভ্যাস করিতেন।

আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না, যতদূর সম্ভব ১৩১৮ কি ১৩১৯ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, এই বর্ম্মণ রাজাদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেন। ঐ পত্রিকায় তিনি কয়েকটি ফটোও ছাপাইয়াছেন।

বর্ম্মণ রাজাদের রাজধানীর বহুচিহ্ন মিলে ডিমাপুরে, মাইবংএ, এবং খাসপুরে। ইহাদের সময়ের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক তেমন বিশেষ এখনো মিলে নাই। তবে বহু মুদ্রা, অনুশাসন লিপি, শঙ্খ প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। অদ্যাপি কাছাড় জেলায় স্থানে স্থানে বড় বড় দীঘি এবং মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। এই জেলায় এখনো প্রাচীন লোকের মুখে এক একটি দীঘি ও মন্দির লইয়া নানান কিংবদন্তী শুনা যায়। রাজাদের রাজকন্যাকে লইয়া কত সুন্দর গল্প! কোন্ দীঘিতে সোপান বাহিয়া নামিবার সময় রাজকন্যার হাত হইতে পূজার বাসন খসিয়া পড়িল, কোন্ পূজা মন্দিরে রাজকন্যা সারারাত দুয়ার বন্ধ করিয়া দেবতার সামনে বসিয়া কাঁদিলেন। এখন আর হৈড়িম্বদের মধ্যে রাজা নাই। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ইহার কিছুকাল পরেই এক আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ইহার পর হৈড়িম্বদের মধ্যে আর কেহ রাজা বলিয়া নির্ব্বাচিত হন নাই। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের সেই গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়া এখনো দরদী বংশধরেরা বেদনায় অভিভূত হয়।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ বর্ম্মণ বাজার নামোল্লেখ করিতেছি। ইহারা আপন রাজত্বকালকে চিহ্নিত ও নিজেকে স্মরণায় করিবার জন্য নানান উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই উপায়গুলির মধ্যেই ইহাদের সংস্কৃতি ও রুচিবোধ ধরা পড়ে।

(১) মাইবাং সিংহদ্বারস্থিত প্রস্তরলিপিতে বাজা মেঘনারায়ণের নাম মিলে (১৪৯৪শক)
(২) রাজা য.শানারায়ণের নাম মিলে রৌপ্য মুদ্রায় (১৫০৫ শক)
(৩) রাজা বীরদর্পেব নাম মিলে খোদিত শঙ্খে (১৫৯৩ শক)
(৪) নারদীয় পুবাণের অনুলিপিতে রাজা সুরদর্পের নাম (১৬২২ শক)
(৫) মাইবাং প্রস্তর মন্দিরে খোদিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম (১৬৪৩ শক)
(৬) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৬৯৫-১৭৩৫ শক)*
(৭) রাজা গোবিন্দচন্দ্র।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত সন্ধি করেন এবং কিছুকাল নিরাপদে রাজত্ব করিয়া আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীরা এই বর্ম্মণ সংস্কৃতির সহিত অনেকাংশে জড়িত। তাহাই প্রমাণ করিতেছি। বর্ম্মণ রাজারা সংস্কৃত গ্রন্থতো পড়েতেনই—নিজেরাও সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন। ইহাদের দণ্ডবিধি বড় কঠোর ছিল। সম্প্রতি 'হেড়িম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি' নামধেয় একখানি বইও ছাপা হইয়াছে। এই দণ্ডবিধি মূলতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রকেই অনুসরণ করিতেছে।

রাজা রামচন্দ্রধ্বজনারায়ণ বাংলা গীত রচনা করিয়াছেন। রাজা সুরদর্পও বাংলা গীত রচনা করিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও বাংলা গীত রচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত রাজাদের গীতের এক একটি নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। গীত রচয়িতা প্রথম রাজার রাজত্বের সন, তারিখ এখনো পাই নাই। দ্বিতীয় রাজা সুরদর্প সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। একটী গীতের নমুনা দিতেছি।

দীনদয়াময়ী নাম তোমার ॥ ধু।
শুনিয়া ভরসা বড় হইয়াছে আমার॥
পুজা, জপ, তপ কিছু নাহিক আমার।
তবে যদি কর কৃপা মহিমা তোমার॥
আমি ত কুমতি অতি গতি নাই আর।
ভরসা করিয়াছি কেবল শ্রীচরণ তোমার॥
প্রণতি করিয়া বলে সুরদর্প রায়।
আজ্ঞা কর মুণ্ড দিয়া ভজি রাঙ্গা পায়॥

বর্ম্মণ রাজারা শাক্ত ছিলেন। ইহারা চণ্ডীর উপাসক ছিলেন, শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের আগে তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রনারায়ণ মণিপুর রাজকন্যা ইন্দুপ্রভার পাণি গ্রহণ করিয়া শ্বশুরের অনুরোধে শাক্তধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বর্ম্মণেরা অনেকে বিশ্বাস করে তাহাদের ইষ্টদেবীকে পরিত্যাগ করায়ই হেড়িম্ব রাজ্যের পতন হইয়াছে। যাহা হউক, বর্ম্মণেরা তদবধি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

উপর্যুক্ত গীতটি সম্বন্ধে এখনো আলোচনা শেষ হয় নাই। বর্ম্মণদের যে রাজমালা অর্থাৎ রাজার নামের তালিকা আছে, তাহা নির্ভুল বোধ হয় নয়। বর্ম্মণদের ইতিহাসে পাই রাজা মকরধ্বজনারায়ণের পুত্র তাম্রধ্বজ মাইবাংএ প্রথমে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাম্রধ্বজের পুত্র সুরদর্প, মণিচরণ বর্ম্মণের পুস্তকের মতে, ১৬২২ শকে জীবিত ছিলেন। সুরদর্প তাম্রধ্বজ হইতে দ্বিতীয় পুরুষ, সুতরাং তাম্রধ্বজ না হয় ইহার পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর আগেই মাইবাং প্রথমে আসিয়াছিলেন কিন্তু এতো বৎসব আগে (১৪৯৪ শক) মাইবাং এর সিংহদ্বারে মেঘনাবায়ণের নাম কিরূপে মিলে। অবশ্য হইতে পারে যে, ইহাব নাম পূর্ব্বপুরুষ হিসাবে লিখিত হইয়া শক-চিহ্নিত হইয়াছিল।

সুরদর্পের নাম ১৬২২ শকের নারদীয় পুরাণে পাওয়া গিয়াছে, মণিচরণ বর্ম্মণ লিখিয়াছেন। কিন্তু ভুবনেশ্বর বাচস্পতির নারদীয় রসামৃত রচিত হয় ১৬৫২ শকে।

'হরিধ্বনি কর গ্রন্থ হৈল সমাপন।
ষোলশত বায়ান্ন শকেতে হৈল লিখন॥

---

* শ্রীমণিচরণ বর্ম্মনের 'হেড়িম্ব-ভাষা প্রবেশ' দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে হেড়িম্ব ভাষার ব্যাকরণের উপরও যথেষ্ট আলোচনা আছে।

তাম্রধ্বজ মহারাজ ছিলা মহাভাগ।
সর্ব্বলোকে যারে করে সদা অনুরাগ॥
তানপুত্র রাজা সুরদর্প মহাশয়।
চন্দ্রপ্রভা নামে দেবী তান মাতা হয়॥
কবি ব্যচম্পতি তান কাব্য অনুসারে।
শ্রীনারদী রসামৃত রচিলা পয়ারে॥[1]

যাহা হউক, সন, তারিখ লইয়া তত বিবাদ জমাইবার প্রয়োজন নাই।

মোটামুটি সুরদর্পকে প্রশংসা করিতেই হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙ্গালাদেশে যে কবিগাহনা, মালসী বা শ্যামাসঙ্গীত প্রচলিত ছিল, তাহারই একটি ঢঙ্ এই গীতে রহিয়াছে। আপাততঃ এই গীত লইয়া অন্যান্য বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম না। শুধু এই কথা স্বীকার করিতে হয় যে, অ-বাঙ্গালী হইয়া তিনি যুগোপযোগী গান বাংলায় লিখিতে পারিলেন। ইহার মূলে সেই বাঙালী সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রভাব এবং বর্ম্মণরাজাদের বিদ্যোৎসাহিতা।

শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রও গীত লিখিয়াছেন বাংলায়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার পর গোবিন্দচন্দ্র খেদ করিয়াছেন।

*

বসিয়া রহিলে কিনা সুখে   রাম নাম বলনা মুখে
অন্তকালে কি বলিবে পাছে।
শমন পুছিলে বাত,   কি বোল বলিবে তাত,
তাহে তোমার বন্ধু কেবা আছে॥
গোবিন্দচন্দ্র পরাধীন,   এ রসে হইয়া হীন,
রাম নাম মুখে নাইছে বোল।
হরি প্রেমের বানে   কেননা ডুবিলাম
ধিক মোর জনম বিফল॥

গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বর্ম্মণদের গৌরবের দিন অবসান হইয়াছে। বর্ম্মণেরা বাঙ্গালী কবিকে, বাঙ্গালী পণ্ডিতকে সম্মান দিয়াছিল। বাঙ্গালীর সভ্যতা ও কৃষ্টি বর্ম্মণেরা গ্রহণ করিয়াছিল। আজো রাজ্যহীন বর্ম্মণেরা বাঙ্গালীকে ভালবাসে। বাঙ্গালীর সহিত একই বিদ্যামন্দিরে শিক্ষালাভ করে।

অবশ্য উচ্চ শিক্ষিতদের সংখ্যা বর্ম্মণদের মধ্যে অল্প। ইংরাজী শিক্ষার আলোক এখনও সমগ্র জাতির উপর পড়ে নাই। তবু ইহারা প্রায় সকলেই বাংলা জানে এবং বাংলা বলিলে বুঝে। কিন্তু ইহারা বাংলা ভাষা বুঝিলেও অধিকাংশ বর্ম্মণেরাই বাংলা সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে অক্ষম। মুষ্টিমেয় উচ্চ শিক্ষিতদের কথা আলাদা। ইহারা আচারে-ব্যবহারে নম্র। পুরুষেরা স্বাবলম্বী ও পরিশ্রমী। পরিধেয় কাপড় মেয়েরাই ঘরে সাধারণতঃ বুণিয়া লয়। কুমারী মেয়েরা অত্যন্ত লাজুক, বাঙ্গালীর সামনে বাহির হইতে চায় না। ইহাদের গ্রামে গ্রামেই মাইনর স্কুল না হউক, পাঠশালা আছে। সেখানে বর্ম্মণ ছেলে মেয়েরা বাংলা শিখিয়া লয়। বিবাহে অথবা উৎসব উপলক্ষ্যে অথবা মনের আনন্দে তাহারা যে গান গায়, তাহা বাংলা গানই। অধুনা সিনেমার গানও সুদূর পাহাড়তলীর বর্ম্মণ পল্লীতে গিয়া পৌছাইয়াছে। বাংলা অক্ষরের সহিতই তাহাদের পরিচয় এবং চিঠিপত্র বাংলাতেই লিখে। আমার স্মরণ হইতেছে, বছর দুই আগে একবার বর্ম্মণ পল্লীতে বন্ধুবর ডাক্তার পরেশ চক্রবর্ত্তীর সহিত বেড়াইতে গিয়াছি। সন্ধ্যার সময় পাহাড়ী নদীর ধারে দেখিলাম একটি মেয়ে ঘাসের উপর উপুর হইয়া কি পড়িতেছে। বিশেষ কিছু নয়, বইখানি রূপকথা জাতীয় ছোটদের গল্পের বই। কিন্তু মেয়েটি সারাদিন পরিশ্রম করিয়া সময় পায় নাই। বিকালে নদীতে জল ভরিতে আসিয়া একটু ফাঁকা অবসরে বইখানি তাড়াতাড়ি পড়িয়া লইতেছে।

উপসংহারে, এই জাতিটির কথা আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি। প্রচারের ফলে এই বর্ম্মণ জাতি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর আর কিছু না হউক, সম্পদ হিসাবে সে একখানি উন্নত সাহিত্যের অধিকারী, এবং এই সাহিত্যের জোরেই সে সর্ব্বত্র অপরাজেয় রহিবে।

---

[1] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীসুকুমার সেন।

শেষ কথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র ধর

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যৌবনের অতৃপ্ত বাসনা লইয়া অব্যক্ত বেদনার যখন কেবল দীর্ঘশ্বাসই সম্বল হইয়া উঠে, তখন মৃত্যুর দিন যে ক্রমশঃই দ্রুত ঘনাইয়া আসিবে, তাহাতে হাসিবার বা কাঁদিবাব কিছুই নাই। নির্ম্মম বাস্তব—তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করা বাতুলতা। অন্তরের শান্তি যখন নির্ব্বাসিত হয়, মুখের হাসি একটা বিশেষ রূপ ধরে--অন্ধকারে বিজলি চমকের মত ক্ষণিকের সেই হাসি। হাসির স্বাভাবিক আস্বাদ তাহাতে নাই।

তেমনি একটু হাসি হাসিয়া অবনী উত্তর করিল, "সেকথা আর আজ তুলচো কেন, পরিমল? দিদির মৃত্যু হ'য়েচে অনেক দিন; সম্পত্তির আমার কি প্রয়োজন বলোতো?"

নিঃসঙ্গ বেকার পল্লী-জীবন যে কত দুর্ব্বহ পরিমল তাহা জানে, তবুও বুড়ো শয়তান নীরোদ ঘোষের এই ফন্দীকে সে কিছুতেই জয় লাভ করিতে দিবে না। দিদির কথায় অবনী উত্তেজিত হইয়া উঠে; বন্ধু পরিমল তাই দিদির কথাটি দিয়াই কথাটা পাড়িতে চেষ্টা করিল, "পিসিমার কাছে শুনেচি ঐ বুড়ো শয়তানই সম্পত্তির লোভে তোমার দিদিকে হত্যা ক'রেচে। তুমি তখন খুবই ছোটো, তোমাকে নাকি তোমার মামীমা ছেলের মতোই পালন করেন, এ মামীমা নয় তোমার আগের মামীমা।"

অবনী এসব কথা বহুবার শুনিয়াছে, কিন্তু ইহার কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা বুঝিতে পারে না।

''সম্পত্তির উপর দাবী আমার যখন নেই, তখন মামাব বিরুদ্ধে আর আমি দাঁড়াতে চাই নে।''

"কিন্তু তোমার বাবার সম্পত্তিও ওর মধ্যে আছে। মুদীদোকান করেও নেহাৎ কম সম্পত্তি ক'রেছিলেন না। তোমার জীবনের অনেক সময় এখনও প'ড়ে আছে; তোমার সম্পত্তির প্রয়োজন আছে বই কি? তুমি দাঁড়াও, গ্রামের সকলেই আমরা তোমার পক্ষে সাক্ষী দেবো।"

"একার জন্যে সংসারে বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই, ভাই; দিদি থাকলেও না হয় ছিল এক কথা।"

পরিমলের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। অবনী আজ আর কিছুতেই উত্তেজিত হয় না। দুই একবার "হোপ্‌লেস্, হোপ্‌লেস্" বলিয়া উঠিয়া পবে।

অবনী বসিয়া ভাবিতে থাকে, তাহার জীবনের একটানা দুঃখের কথা। দূর সম্পর্কে মামা, মায়া তাহার থাকিবেই বা কেন? মুহুরীগিরি কবিয়া জীবন ভরিয়া সে কেবল অপরের সর্ব্বনাশই করিয়াছে, তাহার প্রাণে দয়া থাকিবে কেন? কিন্তু মৃত মামীমার স্মৃতি মনে পড়ায় তাঁহার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম কবে। তাঁহার স্নেহেই বোধহয় একদিন এই শয়তানের বাড়ীতেও পিতৃমাতৃহীন হইয়া স্থান পাইয়াছিল। দিদির স্মৃতি তাহার কিছুই নাই, সে তখন অতি ছোট। তাব শুধু মনে আছে, দিদি যখন প্রথম শ্বশুর বাড়ী যায়, তাহার বাবা দোকানের মাচার উপর বসিয়া কি কান্নাটাই না কাঁদিয়াছিলেন! সে তখন বাবাব কোলের কাছে চুপটী করিয়া বসিয়াছিল। তারপর আর একদিনের কথা তাহার মনে পড়ে, তার দিদি যখন একখানা সাদাকাপড় পড়িয়া বাবার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। তার বাবা সেদিন আছাড় খাইয়া কি কান্নাই না কাঁদিয়াছিল। সবই তাহার ফ্যাকাশে স্মৃতি। তারপব একদিন দিদির হাত ধরিয়া এই মামার বাড়ীতে আসে। সেদিন বাবার কথা বলিতে সবাই তাহাকে বলিয়াছিলেন, "বাবা ওপারে বাজার ক'রতে গিয়েছেন।"

অবনী আর ভাবে না, তাহার দুচোখ বাহিয়া জল নামিয়া আসে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

একটু একটু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তপ্ত পিচের রাস্তা একটু একটু ভিজিয়াছে। রাস্তার উপর যেন ভুষির আগুন জ্বলিয়াছে, ধোঁয়া উঠিয়া গরম বোধ হইতেছে, অথচ আগুনের চিহ্নও নাই। চৌরঙ্গীর ক্রেস্‌কোর ধারে আসিয়া একখানা মোটর দাঁড়াইল। লোকজন ও মোটর চলাচল এই সময়েই বোধ হয় একটু কম।

মোটর হইতে নামিল একজন বাঙ্গালীসাহেব। সঙ্গে

তাহার একজন বাঙ্গালীমেম্। ফুটপাথের উপর হাত ধরাধরি করিয়া চলিল।

সাহেব বলিলেন, "মিস্ রায়, আপনার মত পেলে এ কথাটা আমি আপনার বাবার কাছে হয় তো একবার ব'লে দেখতে পারি। কি বলুন ?"

রেবা রায় একটুখানি স্মিত হাসে, কোনই উত্তর দেয় না। সাহেব বলিয়া চলে, "Too shy, আধুনিক society girl-দের এতটা shyness আমি পছন্দ করি না।"

রেবা এতক্ষণে উত্তর দেয়, "মিষ্টার দত্ত, আপনাদের সমাজের লোক আমি নই, কাজেই আমার টেষ্ট্, আপনার টেষ্ট্ এক হওয়া একটু শক্ত।"

দত্ত সাহেব বাধা দেয়, "That matters little… আসুন!" দুজনে 'ফ্রেসকোতে' ঢুকিয়া পড়ে। বয় সেলাম ঠুকিয়া সাম্নে আসিয়া দাঁড়ায়।

মেনু দেখিয়া খাবারের অর্ডার হয়।

"আবার এখানে এলেন কেন, মিষ্টার দত্ত ? বাড়ী গিয়েই খাওয়া চ'লতো ; দশ পনেরো মিনিটের বেশী হয় তো বাড়ী পৌছুতে লাগত না ? পয়সা-কড়ির উপর মায়া হওয়া দরকার। এই তো for nothing সকাল থেকে এ-ধার সে-ধার ঘুরে পেট্রোল পুড়িয়ে এলেন।"

"কার জন্মে রাখবো রেবা ?"

রেবার মুখ লাল হইয়া উঠিল। ইহার পূর্ব্বে কোন দিনই দত্ত রেবাকে নাম ধরিয়া ডাকে নাই। প্রথমতঃ উত্তর দিতে একটু বাধিল, তারপর কষ্টে সঙ্কোচ কাটাইয়া একটুখানি চাতুর্য্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "মিষ্টার দত্ত, আমার নামটাকে এত ছোট ক'রে ফেললেন কেন ?"

"Pardon Please"।

"Oh no, must have compensation."

"Well, কি চান ? ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি আছি।"

"অসম্ভব। এ ক্ষতিটা অতো সহজে পূরণ হয় না।"

খাবার আসিল। দত্ত প্লেটটা রেবার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, "ভাল, আগে দেহের ক্ষতিপূরণ করো। তারপর দেখা যাবে।"

ইহার পর দুইজনেই চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে সাহেব বলে, "By the by একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, তোমাদের কার সঙ্গে একটা মাম্লা চ'লছিল, তার কি হলো ?"

রেবার মুখখানা ম্লান হইয়া গেল। দত্তের এসব লক্ষ্য করিবার শক্তি নাই। দত্ত বলিয়া চলিল, "কেস্‌টা মিটে গেছে ?"

"হাঁ, তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই টাকাটা শোধ ক'রে দিয়েছেন। আমরা ধারণাও ক'রতে পারি নি এত সহজে দশ হাজার টাকা তিনি শোধ ক'রতে পারবেন।"

"উনি মানে ?"

"অশোক সেন। New Bengal Flour Mills-এর Managing Director."

"ও!"

খাওয়া শেষ করিয়া মিষ্টার দত্ত সিগারেট ধরাইল।

"যাক্ সে সব কথা। তা হ'লে কালই কথাটা নিয়ে আপনার বাবার কাছে approach করি। কি বলুন ?"

"না। সে বোধ হয় সম্ভব হবে না, মিষ্টার দত্ত। বাবা আধুনিক হ'লেও orthodox হিন্দু।"

মিষ্টার দত্ত বিস্মিত হইলেন। ইহা তিনি আশা করিতে পারেন নাই। রেবাও পূর্ব্বে ইহার কিছুই আভাষ দেয় নাই! রেবাকে স্ত্রী করিবার আশায় দত্ত এই কয় মাসেই প্রায় হাজার টাকার উপর উড়াইয়াছে। গ্যাস কোম্পানীর ডাক্তারী, সামান্য ২০০৲ টাকা মাহিনা পান। তাহাকে যে খরচের দিকটা ভাবিয়া চলিতে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তবু এই আশাটার পিছনে দত্ত কতো পয়সাই না খরচ করিয়াছে!

রেবার উত্তরে দত্তের প্রাণে আঘাত লাগিল, কিন্তু রেবার সে কথা ভাবিবার সময় কোথায় ? রেবা এই জাতীয় পুরুষদের চিরকালই ঘৃণা করে। তাঁহাদের নাচাইতে ভালবাসে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"অশোক! তোমাকে উপদেশ দেবার মত সঙ্কল্প আমার নেই!" বীরেনবাবু বলিয়া চলিলেন, "তবে জীবনের অনেকগুলো আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে চ'লে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি, তা'রই খানিকটা তোমাকে শোনাব।"

"বলুন !" অশোক সম্মতি জানাইল।

ঢং ঢং ঢং ঢং—রাত আটটা বাজিল।

বীরেনবাবু ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আটটা বাজে। অনেক কথা,—শুনবার মত সময় হবে কি তোমার ?"

"আজ আমার বিশেষ কোনও কাজ নেই। তবে এক ভদ্রলোক হয়তো দেখা ক'রতে আসতে পারেন ; বিমলের একজন মক্কেল।"

"তা, এমন জরুরী কিছু নয় তো ?"

অশোক মাথা নাড়িয়া জানায়—"না।"

বীরেনবাবু বলিতে থাকেন—

"সমাজ ও সভ্যতার বড় বড় বুলি আমি আওড়াব না। তবে একটা কথা তোমাকে আজ ব'লবার বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লেই মনে হয়।"

অশোক একমনে শুনিতে থাকে। সুলতা ঘরে ঢুকিয়া বাধা দেয়, "বাবা তোমাকে চা দেবো ?"

"না, আমার চা চাই না মা। তবে অশোকের হয় তো দরকার হবে।"

"না, বাবা, উনি তো আর চা খান না।"

বীরেনবাবু বিশেষ আশ্চর্য্য হইল না। যে দিনরাত্রি মদে বিভোর হইয়া থাকিত সে যদি একদিনে মদ ছাড়িতে পারে, কেউ চায়ের নেশা ত্যাগ করিয়াছে শুনিলে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

"অশোকবাবু, মা আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রলেন, আজ রাত্রে এখান থেকেই খেয়ে যাবেন।"

বীরেনবাবুও এই কথাটাই ভাবিতেছিলেন, "অশোক, আজ রাত্রে এখানেই খাবে।" মেয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার কোন বিশেষ কাজ আছে কি মা ?"

"কাজ নেই ! বল কি বাবা। চাকরটার অসুখ ক'রেচে, ঝিটাও আসেনি, মার সঙ্গে সব কাজই আজ আমায় করতে হবে।"

সুলতা পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া যায়। অশোক খানিকটা সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলে, "বলুন, বীরেনবাবু কি বলছিলেন ?" বীরেনবাবু বলিতে থাকেন—

"মনটাকে সংযত রাখা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এই শাসনের মাত্রা যখন ম্যানিয়া হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন মনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নষ্ট হ'য়ে যায়। পথে চ'লতে চ'লতে সুসজ্জিতা যুবতীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া যুবকমনের স্বাভাবিক অবস্থা। এতে লজ্জার কিছু নাই। বাহিরের দৃষ্টিশক্তিকে বাধা দিয়ে অনেক সময় অন্তরে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শাড়ীর আঁচলের ভ্রান্তি আর জীবনে কোনো দিনই কটিয়া উঠিতে চায় না।"

অশোক বাধা দেয়, বলে, "আপনার এ মতটা বড় অস্পষ্ট। বাইরের প্রভাব মনের ওপর ততক্ষণই রাজত্ব ক'রতে পারে যতক্ষণ অন্তরের দৃষ্টি সংযত না হয়।"

"যেমন মাতৃবৎ পরদারেষু, লোষ্ট্রবৎ পরদ্রব্যেষু ! এই সব বাঁধাবুলির কথাই হয় তো তুমি ব'লতে চাও ?"

অশোক মাথা নাড়ে, কোনই উত্তর দেয় না।

"এসবের দাম শুধু ব্যবহারিক জীবনে কিন্তু মানসরাজ্যে এদের বিশেষ কিছু দাম নেই, বাইরের আইনকানুন দিয়ে মনকে শাসন করা যায় না। তবে মুনি ঋষিদের কথা স্বতন্ত্র। আমি মুনি ঋষি কোনোটাই নই, তাঁদের মনের কথা জানাও আমার সম্ভব নয়। সুন্দরের উপাসক নয়ন। বাইরে থেকে তারা অন্তরে বিচারের প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেয়। তুমি হয় তো ভাবছো, আমি এ সব কথা ব'লছি কেন ?"

বীরেনবাবু কিছুক্ষণ থামেন, অশোকও উত্তর দেয় না। বীরেনবাবু আবার বলিতে থাকেন—

"অশোক, আমি জীবনে একটা মস্ত ভুল ক'রেছি। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়তো আরও অনেক দিন ক'রতে হবে। ভুল কিনা এখনো ঠিক বুঝি নে, কিন্তু সমাজ যাকে ভুল ব'লবে, সমাজের শাসনে তাকে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ভোগ ক'রতেই হবে।

"সে আজ বিশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন নাদী গ্রামে একটা স্কুলের মাষ্টার। গ্রামের সকলেই ভালবাসে, মাষ্টার হিসাবে সুনামও যথেষ্ট ছিল। নীরোদ ঘোষ উকিলের মুহুরী লোকটা পাকা শয়তান।"

অশোক নামটা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "এ লোকটার সঙ্গেই আমার আজ রাত্রে দেখা হবার কথা ছিল, এই লোকটাই বিমলের মক্কেল।"

বীরেনবাবুর মুখে একরাশ বিস্ময় জমিয়া উঠিল।

বলিলেন, "শয়তানটা এখনও মরে নি? লোকটাকে একবার আমার এখানে আনতে পার?

অশোক আনিবার সম্মতি জানায়।

বীরেনবাবু আবার বলিতে থাকেন, "এই লোকটাই সুলতার মায়ের দূর সম্পর্কে মামা। পিতৃ-মাতৃহীন বালবিধবা, চার বছর বয়সেই একটী ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এর আশ্রয় নেয়। পাঁচ বছর কেটে যায়। এদের সমস্ত সম্পত্তি একে একে এরই দখলে আসে। নরপিশাচটা গ্রামের জমিদারের ছেলের কাছ থেকে গোপনে টাকা খেয়ে সুলতার মা'কে সরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে। কথাটা আমি জানতে পারি। সেই দিন রাত্রেই উপায়ান্তর না দেখে ওকে রক্ষা করবার জন্তে পালিয়ে কল্‌কাতায় চলে আসি।

"তারপর স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে আমাদের অনেকদিন কাটে। তারপর একদিন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সমস্ত সংযমের বাঁধ আমাদের ভেঙ্গে যায়। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজও চ'লছে।"

বীরেনবাবু খানিকটা থামিয়া যায়। অশোক নির্ব্বাক পুতুলের মত বসিয়া থাকে। বীরেনবাবু আবার বলিতে থাকেন, "অশোক, লজ্জা ক'রবার সময় আমার আজ নয়; তুমিও অনুরূপ একটা ভুলের প্রস্তাব ক'রেছ। আমার স্বার্থ তাতে সম্পূর্ণই; কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্তে তোমার জীবনটা নিয়ে খেলা ক'রবার প্রবৃত্তি আমার নেই। এবার তোমার বিচার বুদ্ধির ওপর সমস্তই নির্ভর ক'রলাম।"

উভয়েই যখন নীরব, সুলতার মা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

"অশোকবাবু, এবার আপনাদের খাবার জায়গা করে দি, কেমন? রাত যে অনেক হ'ল, প্রায় দশটা।"

সকলেই ঘড়ির দিকে তাকাইল। অশোক কোনই উত্তর দিল না। উত্তর দিলেন বীরেনবাবু, "হ্যাঁ, আর দেরী ক'রে দরকার কি? চল অশোক।" বীরেনবাবু উঠিয়া পড়েন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নীলিমার বিবাহ হইয়াছে, স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। এক জাতীয় মেয়ে আছে, যাহাদের মনটা কর্ত্তব্যের অনুরোধে বেশ খাপ খাইয়া চলিতে পারে। স্পষ্টতা তাহাদের মধ্যে কোথাও নাই, বিকারগ্রস্তও তাহারা হয় না। বিবাহের আগে হয়তো একজনকে মনে মনে স্বামীরূপে ভালবাসে, ভক্তিকরে—কোথাও তাহার প্রকাশ নাই। বিবাহের পরেও "যা পাবার নয়, তা পাই নেই" এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া বেশ শক্ত করিয়া তোলে। মনের কোথাও যে কখনও কখনও এক আধটা খোঁচা না খায় তাহা নহে, তবে সেটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। ভাব প্রবণতায় ইহারা গলিয়া পরে না; ইহারাই হয় সংসারে পাকা গিন্নী। নীলিমা অজিতকুমারের সংসারে পাকা গিন্নী হইয়া বসিয়াছে। অশোক 'বাবু' না হইয়া এখন 'দাদা' হইয়াছে

"তা অশোকদা, একবার তো আর আসবে না, বোনকে বে দিয়েই রক্ষা পেয়েচো।"

অশোক প্রতিবাদ করে—

"তুমিই কোন মনে রেখেচো, একবারও তো অন্ততঃ অজিতকে নিয়ে যেতে পার?"

"পারি অশোকদা, তুমি রাগ করো না। কিন্তু যে দেবতাটীর নাম ক'রলে, ও কি রকম দেবতা জানো না তো!"

অজিত হাসিতে হাসিতে বাধা দেয়—

"কেন, কালই সন্ধ্যেবেলা বলছিলাম না চল একবার অশোকদা'দের ওখান থেকে বেড়িয়ে আসি?"

নীলিমা রাগিয়া উঠে—

"বেশ, তারপর? আমি নিষেধ করেছিলাম? সত্যবাদী যা হোক তুমি। জান অশোকদা, উনি বলেন কি, বড়লোকের বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ না পেলে যেতে নেই।"

অশোক হাসিতে হাসিতে উত্তর দেয়—

"তা তো সত্যি কথাই, জামাই মানুষ, নিমন্ত্রণটা আমাদেরই করা উচিত। বেশ সামনের রবিবার নিমন্ত্রণ রইল, যাওয়া চাই।"

অজিত সিগারেটে টান দিয়া উত্তর দেয়, "আশাকবাবু, Thanks দিন আপনার বোনকে, নিমন্ত্রণ আদায় করবার পাকা ফন্দী জানে।"

নীলিমা হাসিতে হাসিতে উত্তর দেয়—

"বেশ মশায়, খরচ করবার ফন্দীটাও তা'হলে দেখিয়ে দি। অশোকদা'কে একবার নিমন্ত্রণ ক'রে দাও দেখিনি, কালও তো তোমার ছুটী আছে, বেশ আমোদ করা যাবে?"

অশোক নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ফিরিয়া আসে।

[ক্রমশঃ

রবীন্দ্র-সঙ্গমে

শ্রীশ্যামরত্ন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল; এড্‌ভোকেট

রবীন্দ্রনাথকে বহুবার দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, কিন্তু একবার মাত্র সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়। তখন বঙ্গভঙ্গের প্রবল আন্দোলনে বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাবাবেগে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। সে কি এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা! দেশের সর্ব্বত্র এক নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। বঙ্গবাসী বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে না, মিলনের জন্য ঐরূপ গভীর ঔৎসুক্য ও অনুরাগ আর কখনও দেখা যায় নাই। বিদেশী পণ্যদ্রব্য পরিহার করিয়া সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প এই সময়ে যেরূপ দৃঢ়তার সহিত প্রত্যেকের মনে জাগ্রত হইয়াছিল ও তদনুসারে সকলে কার্য্য করিতে ব্রতী হইয়াছিল, সেইরূপ আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির লেখা ও বক্তৃতা, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণের গান ও কবিতা, ভূস্বামী হইতে দরিদ্র কৃষক পর্য্যন্ত সর্ব্বস্তরের সমুদয় জনগণের সহানুভূতি, এই আন্দোলনের প্রাণ-সঞ্চার করিয়া ইহাকে সফল করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ কেবল গান ও কবিতা লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি দেশবাসীকে উদ্বোধিত করিয়া পথ নির্দ্দেশের জন্য দুইটি সুললিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেন। প্রথমটি, "স্বদেশী-সমাজ" এবং দ্বিতীয়টি, "অবস্থা ও ব্যবস্থা"। এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি কলিকাতা টাউন হলে একটি বিরাট সভায় পঠিত হয়, এবং "আমার, সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" তাঁহার এই জনপ্রিয় গানটি ঐ সভায় গীত হয়। সভায় এরূপ জনসমাগম হইয়াছিল যে, বিস্তৃত টাউন হলে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। একথা বলা বাহুল্য উহার মধ্যে ছাত্রগণেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। ঐ সভায় আমরা কয়েকজন বন্ধু একত্রে গিয়াছিলাম।

এই সম্পর্কে একটি ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের আগমনের পূর্ব্বে তাঁহার ব্যবহারের জন্য টেবিলের উপর একটি কাচের গ্লাসে জল রাখা হয়। কিন্তু কয়েকটি যুবক ছাত্র ইহাতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে ঐ বিদেশী কাচের গ্লাসটি অপসারিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দরওয়ানের ঘর হইতে অপরিষ্কৃত একটা পিতলের গ্লাস সংগ্রহ করিয়া জল রাখিতে হয়। বিদেশী কোন জিনিষেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না, তখন ছাত্রদের অনেকের মনে এইরূপ একটা ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই সভার কয়েকদিন পরে আমরা তিন বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ লাভ করি। উক্ত সাক্ষাতের সহিত উল্লিখিত ঘটনার কিছু যোগ আছে বলিয়া উহার উল্লেখ কবিলাম। উল্লিখিত টাউন হল সভার কয়েকদিন পরে ১৯০৫ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে "ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতি"র পক্ষ হইতে আমি, "বিচিত্রা" সম্পাদক বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাই। ভবানীপুরে আমাদের একটি সাহিত্য-অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বেলা আন্দাজ ৩টার সময় আমরা ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হই এবং একটুক্‌রা কাগজে "ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতি"র সম্পাদক লিখিয়া দরওয়ানের মারফৎ রবিবাবুব নিকট পাঠাইয়া দিই। অবিলম্বেই আমাদের ডাক পড়ে।

চারিদিক চাহিয়া দেখিলে ঠাকুববাড়ী একটি প্রকাণ্ড পুবী বলিয়া মনে হয়। পথ প্রদর্শক আমাদের লইয়া চলিল, এবং রবীন্দ্রনাথ যে কক্ষে ছিলেন, তাহার দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আমাদের পৌছাইয়া দিল। তেতলাব সর্ব্বপার্শ্বের একটি কক্ষে আমরা প্রবেশ করিলাম। আমবা রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন কবিলে, তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহার খাটের উপর আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং সহাস্যমুখে বলিলেন, "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমার এই চিঠিখানা লেখা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহার পরেই আপনাদের সহিত কথা হইবে।" খাটের নিকটে একটি চেয়ারে বসিয়া, সন্নিহিত টেবিলের উপর তিনি ঐ চিঠিখানি লিখিতেছিলেন।

এই অবসরে কক্ষটি একবার দেখিয়া লইলাম। কক্ষটি অনতিপ্রশস্ত ও আড়ম্বরহীন। চেয়ারের সম্মুখস্থ টেবিলে নানাবিধ পুস্তক সজ্জিত রহিয়াছে। তাঁহার বসিবার আসনের ঠিক সম্মুখভাগে তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি ফটো, তাহার একটু দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার সহধর্ম্মিনীর আর একখানি ফটো। ছোট হইলেও দুইখানি ফটোই বেশ সুন্দর। টেবিলের উপর সর্ব্ব দ্রব্যই যে সুশৃঙ্খলরূপে সুসজ্জিত ছিল, এরূপ বলা চলে না, তবে উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় কবির পরিচয় যেন তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার খাটখানিও সাধারণ ভাবে নির্ম্মিত খাট হইতে স্বতন্ত্র। এই বিভিন্নতার একটি কারণও আছে। খাটের দুই পার্শ্বের মধ্যবর্ত্তী কিয়দংশ বাদ রাখিয়া, খাটের সর্ব্বত্র উচ্চ ও নিম্ন দুই প্রস্থ তক্তা দিয়া সেলফে পরিণত করা হইয়াছে। উহাতে কোথাও বা দৈনিক ও মাসিকপত্র কোথাও বা তাঁহার প্রিয় ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থরাজি। মনে হইল যেন সেগুলি তাঁহার শয্যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইহা তাঁহার অধ্যয়নানুরাগের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

পত্র লেখা শেষ হইলে তিনি চেয়ার হইতে নামিয়া খাটের উপর আসিয়া আমাদের সম্মুখে বসিলেন। উপেন্দ্রনাথ প্রথমেই আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন, "শারীরিক অসুস্থতার জন্য শীঘ্রই আমাকে গিরিডি যেতে হবে সুতরাং শীঘ্র আপনাদের অনুরোধ রক্ষা ক'রবার সম্ভাবনা নাই, তবে গিরিডি হ'তে ফিরে আপনাদের সহিত মিলবার ইচ্ছা রইল।" তারপর একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, "দেখুন, একটা কাজ করবেন, হৈ-চৈ করে বড়সভার আয়োজন করবেন না। কেবল আপনাদের সভ্যদের নিয়ে যেন সে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে আপনাদের সাথে খোলাখুলি ভাবে মনের কথা আলোচনা ক'রতে পারব।"

রবীন্দ্রনাথের অতি সন্নিকটে আমরা পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া বসিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহার চেহারার পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারিলাম। ক্রমাগত কয়েকটি শোকের আঘাত ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁহার দেবোপম সুন্দর কান্তি যেন একটু বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, মুখশ্রীতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বার্দ্ধক্যের ছায়া যেন একটু অধিকার করিয়াছে। প্রতিভাদীপ্ত বিশাল নয়ন দুটি একটু হীনপ্রভ বোধ হইলেও মুখমণ্ডল হইতে একটি শান্ত স্তব্ধ ভাব করুণায় স্নিগ্ধ হইয়া বিশ্ব-প্রেমের বার্ত্তা বহিয়া আনিতেছে।

এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে একটা ভ্রমাত্মক ধারণা বিদ্যমান ছিল যে আতিশয্যের গর্ব্ব রবীন্দ্রনাথ ও তাহাদের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক, সে দিন আমরা স্পষ্টরূপে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল তিনি আমাদের সহিত নানারূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে আমাদের মনে হইল, যে তিনি আমাদের যেন কত কালের পরিচিত বন্ধু। অত বড় প্রতিভাবান কবি, অত বড় বিত্তশালী মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি যে ভাবে আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, তাহাতে একবারও সে কথা আমাদের মনে উদিত হইল না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বের পরিচয়। মনে হইল, দূর হইতে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লোকে কত ভুল ও অবিচার করে, কিন্তু একবার যদি তাহারা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসিত তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ভ্রান্ত মত পোষণের জন্য অনুতপ্ত হইত, সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই "স্বদেশী-সমাজ" সম্বন্ধে পৃথ্বীশবাবুর প্রতিবাদ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "অপরের নিকট ভিক্ষায় কখনও শক্তি লাভ হয় না। ভিক্ষায় কোন গৌরব নাই। পরবশ দুঃখ ও আত্মবশ সুখ এ কথা শৈশবে "নীতিপাঠ" "কথামালা" প্রভৃতি পুস্তকে পড়েছি। এ কথা এত সহজ, যে এর জন্য পুস্তক পাঠে শিক্ষা লাভের আবশ্যক হয় না। ইহার প্রতিবাদ যে কি ক'রে হতে পারে, তা' আমার বুদ্ধির অগম্য, এমন কি কল্পনারও অতীত।"

তারপর রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, পৃথীশ বাবু সুপ্রসিদ্ধ মিল সাহেবের ও অন্যান্য বড় বড় গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, State ও People পরস্পরের অবলম্বন, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না। কিন্তু এ সব স্বাধীন দেশ সম্বন্ধে খাটে, যেখানে রাজশক্তি বা President-এর ক্ষমতা প্রজাদিগের সমবেত ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হন। দেশের মঙ্গলই যেখানে উভয়ের কাম্য, সেখানে State

ও People একযোগে কার্য্য করে। কিন্তু আমাদের হতভাগ্য দেশের অবস্থা যে সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে State ও People-এর স্বার্থ পরস্পরের প্রতিকূল। পৃথ্বীশবাবুর গোড়ায় গলদ, তাই তিনি এই ভুল করিয়া বসিয়াছেন। লর্ড কার্জ্জন স্পষ্টই এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, বাঙ্গালাদেশ দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাখিতে পারিলে বহুবর্ষের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা যাইবে। আমাদের মধ্যে ঐক্যভাব এবং দেশানুরাগের প্রবলতা যাহাদের চক্ষুশূল, আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থান দেখিয়া যাহাদের নিদারুণ মনঃপীড়ার কারণ হয়, তাহার প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াও যদি আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া নিজেদের সহিত ছলনা করি, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশার জন্য যে আমরাই দায়ী হইব, এ কথা বলা বাহুল্য। সুতরাং আমাদের সহিত State-এর সম্বন্ধ কোথায়?

ইহার পর, রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার টাউন হলে পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সমাজের উচ্চস্তরের সহিত নিম্নস্তরের যদি সংযোগ না ঘটে, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যদি সমবেদনার বন্ধন না থাকে, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতি দূরে থাকুক জাতীয়তার বিকাশই হইতে পারে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় মুষ্টিমেয়, জনসাধারণই প্রকৃতপক্ষে জাতির মেরুদণ্ড। সুতরাং, জনসাধারণকে বাদ দিয়া স্বদেশের কোন আন্দোলনই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, লর্ড কার্জ্জন কিছুকাল পূর্ব্বে যখন ময়মনসিংহে যান, তখন জনসাধারণের মধ্যে নবজাগরণের সাড়া উপলব্ধি করিয়া চঞ্চল ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন, এবং নিজের জীবন বিপন্ন হইতে পারে এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করেন।

এই সময়ে পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার আসেন। তিনি "বঙ্গদর্শন" নব পর্য্যায় বাহির করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন উহার সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রিকা সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা শেষ হইলে, শৈলেশবাবু বিদায় গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ পুনরায় তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। তিনি বলেন যে, এতকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় আমরা জনসাধারণকে পৃথক্ রাখিয়া রাজনীতি আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলাম, তাহার ফল যে কি হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। আমাদের শত আবেদন ও নিবেদন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। "স্বদেশী আন্দোলন" আমাদের উভয় দলের মধ্যে মিলনের পথ দেখাইয়া দিয়াছে। ইংরাজ বণিকজাতি, স্বার্থে আঘাত না পড়িলে তাহাদের চৈতন্য হওয়া সম্ভব নহে। স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহারের অনুরাগ ইহার পূর্ব্বে যে একেবারে ছিল না তাহা নহে, তবে উহা অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আমরা স্বদেশী আন্দোলনের বহুকাল পূর্ব্বে "ভারত ভাণ্ডার" নামে একটি স্বদেশী দ্রব্যের কারবার চিৎপুরে স্থাপিত করি। তখন স্বদেশী আন্দোলন একেবারেই ছিল না। এই কারবার বেশী দিন টিকে নাই। অনেক টাকা লোকসান হয়। তাহা হইলেও ইহা দ্বারা যে কোন কাজ হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। স্বদেশের জন্য পূর্ব্বে যাঁহারা এইরূপ ছোট খাট চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টার কি কোন ফল হয় নাই? কাজ কখনও একেবারে নিষ্ফল হয় না। কাজ ছোট হউক, বড় হউক ফল অবশ্যম্ভাবী। সকল সময়ে আমরা প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে না পাইলেও, প্রচ্ছন্নভাবেও ফলের ক্রিয়া চলিতে থাকে। আজকাল স্বদেশীর আন্দোলন যেরূপ প্রবলাকারে বন্যার ন্যায় দেশ প্লাবিত করিতেছে, মনে করিবেন না যে, সহসা একদিনে তাহার অভ্যুদয়। ধীরে ধীরে লোক চক্ষুর অন্তরালে ইহার উপাদান ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইতেছিল। বীজ যখন ভূগর্ভে থাকে, কে তখন দেখিতে পায়? সেই বীজই কালক্রমে অঙ্কুরিত, শাখাপল্লবে সুশোভিত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়।

তৎপরে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ম্যানচেষ্টার হইতে আমদানী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় এ দেশে বহু কাপড়ের কল স্থাপিত করা আবশ্যক কি না এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা বলিবার অধিকারী, কিন্তু আমার মনে হয় যে, মিল স্থাপন না করিয়া যদি বহুল পরিমাণে জাপানী বা অন্যদেশীয় উন্নতপ্রকার হাণ্ডলুম আনাইয়া দেশের চাহিদা মিটান সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই উহার পক্ষপাতী। মনে করুন, একজন তাঁতি সারাদিন তাঁতে একখানা কাপড় তৈয়ারী করে, কিন্তু যদি ঐরূপ উচ্চশ্রেণীর তাঁতের সাহায্যে ৩।৪ খানা

কাপড় উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের সর্ব্বত্র ঐরূপ তাঁত প্রচলিত হইলে, কাপড়ের সংখ্যা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। আর একটি বিশেষ কারণে আমি আমাদের দেশে কল স্থাপনের বিরোধী। অনেক পুস্তকে আমি Manufacturing towns-এর বিষয় পড়িয়াছি। সেখানে বহু নর-নারী একত্রে মিলিয়া যন্ত্রের ন্যায় কাজ করে, উহাতে তাহাদের মানসিক বৃত্তি সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। তাহাদের অবাধ সংমিশ্রণে যে নৈতিক অবনতি (Corruption) ঘটে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে সত্যই শিহরিয়া উঠিতে হয়। সেই ভয়েই আমাদের সমাজে যাহাতে ঐরূপ পাপ প্রবেশ না করে, তজ্জন্য এদেশে কল স্থাপনের বিরুদ্ধে আমার এত অনিচ্ছা।

আবার দেখুন, আমাদের দেশের তাঁতিদের মধ্যে যে একটি (Ideal homelife) আদর্শ পারিবারিক জীবন বর্ত্তমান আছে, তাহারও সর্ব্বনাশ হয়। তাহাদের কাজকর্ম্মের মধ্যে সেই আদর্শের সন্ধান আমরা পাই। তাঁতি তাঁত বুনছে, তার স্ত্রী ও মেয়ে তাকে কাজে সাহায্য কচ্ছে। এ দৃশ্যটা বড় সুন্দর, এ আদর্শ খর্ব্ব করবার আমার মোটেই ইচ্ছা হয় না। তবে আমাদের দেশে কল স্থাপিত না হইলে, যদি একেবারেই চলা অসম্ভব হয়; তখন আর উপায় কি?

তারপর রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, এতক্ষণ ধরিয়া আপনাদের সহিত দেশসম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনা হইল, এইবার আপনাদের 'সাহিত্য-সমিতি' সম্বন্ধে কিছু আলাপ আলোচনা করা যাউক।

রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্য-সমিতি" কি কি কার্য্য করে জানিতে চাহিলে, উপেন্দ্রনাথ বলেন যে, নিয়মিত প্রবন্ধ পাঠ ও তাহার আলোচনা, মধ্যে মধ্যে বিশেষ অধিবেশনে বড় বড় সাহিত্য-রথীদের আহ্বান, বাংলা সাহিত্যে ছাত্রদের অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকদিগকে পুরস্কার ও মেডেল দিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহাতে বলেন, যে ভাবে আপনাদের কার্য্য চলে, তাহা মোটামুটি মন্দ নয়, তবে উহা বাঁধাধরা নিয়মে একটা Routine-এর মত। উহাতে বিশেষ একটা কাজ হয় না। দেশের একটা স্থায়ী মঙ্গলজনক কাজ আপনাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যেমন ধরুন, বাংলাভাষায় একখানা ভাল অভিধানের অভাব। আপনারা যদি আপনাদের সভ্যদের এক এক জনকে এক একটা শব্দের অর্থ শিখিবার ভার দেন, এবং নিষ্ঠার সহিত যদি এই কার্য্য সাধিত হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এই সুবৃহৎ কার্য্যটি সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। তখন আপনাদের সমবেত ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে, বঙ্গ-সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব মোচন হইবে। আমি আর একদিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। ইংরাজী ও সংস্কৃতে যে সকল সুপ্রসিদ্ধ Classical literature আছে, আপনাদের সভ্যেরা যদি ক্রমে ক্রমে সেগুলি বাংলা অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন, তবে তদ্বারা বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধনের অনেক সহায়তা হয়। অনেকের ধারণা অনুবাদ কাজটা গৌরবের নয়, উহাতে মৌলিকতার প্রয়োজন হয় না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ভিন্ন ভাষা হইতে মাতৃভাষায় মূল গ্রন্থের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং তাহার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া অনুবাদ বড় সহজ কাজ নয়। যাঁহারা এ কার্য্যে ব্রতী তাঁহারা জানেন, এ কার্য্য কিরূপ কঠিন ও শ্রমসাধ্য। ইহাতে গৌরবও আছেই এবং মৌলিকতার শক্তিও অনেক স্থলে প্রয়োগ করিতে হয়। যে দুইটি কাজের কথা আপনাদিগকে বলিলাম উহাই যে আপনাদের করিতে হইবে এরূপ কথা বলিতেছি না। আপনাদের শক্তি, সুবিধা ও সময়ক্ষেপ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজ করিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে উল্লিখিত টাউনহল মিটিংএর ঘটনাটির বিষয় উল্লেখ করিলাম, এবং বলিলাম, এটা যেন একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "না না, ঐটাই স্বাভাবিক, যখন ভাবের আতিশয্য হয়, তখন ঐরূপই ঘটিয়া থাকে। আমরা একেবারে চুপচাপ ও নিশ্চেষ্ট ছিলাম, এখন যে কার্য্যে আমাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা জেগেছে, মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেও সেটা আশার কথা।"

"সোনার বাংলা" গানটির উল্লেখ করিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অয়ি ভুবনমনমোহিনী" গানটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রিয় হইলেও সাধারণলোক ইহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য সম্যকরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু 'সোনার বাংলা' গানটি উভয় সম্প্রদায়ের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ গিরিডি হইতে ফিরিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবার পুনরায় প্রতিশ্রুতি দিলেন। যথারীতি অভিবাদনান্তে সহাস্যমুখে আমরা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম, তিনিও স্নিগ্ধহাস্যে আমাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সহিত জীবনে যেরূপ একবার সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল, সেইরূপ একবার তাঁহার সহিত পত্র আদান-প্রদানেরও সুযোগ ঘটিয়াছিল,এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের সমিতির ১৩২৩ সালের নববর্ষ উৎসবে সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখি, ১৩২২ সালের চৈত্র মাসের শেষভাগে। তখন আমি সমিতির সম্পাদক ছিলাম। তখন আমাদের দেশে ১লা জানুয়ারী ইংরাজী নববর্ষের উৎসবে খুব ধুমধাম হইত। আমাদের জাতীয়ভাব তখন সুপ্ত ছিল, তাই আমরা সেই উৎসবে মাতিয়া উঠিতাম। মনে পড়ে মিউনিসিপাল মার্কেট হইতে নানাবিধ রঙ্গীন কার্ড কিনিয়া প্রীতি-উপহারের ছড়াছড়ি, গাঁদাফুলের মালায় বাড়ী সাজাইবার আগ্রহ, গঙ্গাবক্ষে পান্‌সিতে বিলাসী বাবুদের গীত-বাদ্য সমন্বিত আমোদ-প্রমোদের লীলা-লহরী। ঐ দিবসে সাহেবদের বাড়ীতে মনস্তুষ্টির জন্য বড় বড় ভেট্‌কি মাছ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কমলালেবু প্রভৃতির সওগাত আসিত। এখনও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীদেব পক্ষে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ক্রমে ক্রমে আমাদের মন স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে ফিরিতে থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে বাংলা নববর্ষেব প্রথম দিনে দোকানীদের হালখাতায় উৎসবের কিছু নমুনা পাওয়া যাইত, এতদ্ব্যতীত আর বড় কিছু দেখিতে পাওয়া যাইত না। এই বিসদৃশ বৈষম্য আমাদের পীড়াদায়ক হয়। তজ্জন্য "ভবানীপুর সাহিত্য সমিতি" কর্ত্তৃক ১৩১৩ সাল হইতে বাংলা নববর্ষ-উৎসবের সূচনা। প্রতিবৎসর আমরা ১লা বৈশাখ তারিখে পুষ্প পল্লবে, গন্ধমাল্য, কবিতা-সঙ্গীতে নববর্ষের আবাহন করিতে থাকি। তদুপলক্ষে প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীদের আমন্ত্রণ করা হইত এবং তাঁহারাও সানন্দে ইহাতে যোগ দিয়া আমাদের উৎসাহিত করিতেন।

আমার পূর্ব্বোক্ত পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। তবে সে চিঠিব মর্ম্ম আমার মনে আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে, ১লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনে নববর্ষের উৎসব হইয়া থাকে, সেজন্য আমাদের অনুবোধ রক্ষিত হইবার উপায় না থাকায় তিনি দুঃখ প্রকাশ কবেন। ঐ চিঠিখানি খামে আসে। চিঠিখানির উপরদিকে বামভাগে একটি ইংরাজী মটো থাকে। আমি উহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া দ্বিতীয়বার পত্রে রবীন্দ্রনাথকে অনুযোগ করিয়া জানাই যে, সংস্কৃত ভাষায় অনেক সুন্দর সুন্দর মটো আছে তাহার একটি কিম্বা, তিনি ইচ্ছা করিলে বাংলায়ও সুন্দর মটো রচনা কবিয়া ব্যবহার করিতে পারিতেন, তবে ইংরাজী মটো কেন? বলা বাহুল্য জাতীয়ভাব তখন আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছিল।

এই পত্রের উত্তব রবীন্দ্রনাথ পোষ্টকার্ডে লিখেন। সেখান আমার নিকটে আছে। সে চিঠীখানির আদ্যোপান্ত অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

আমি অল্পদিনের মধ্যে বিদেশে যাইতেছি অতএব ভবানীপুর সাহিত্য সমিতিতে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হইবে না।

আমার পত্রের কোণে যে ইংরাজী বাক্যটি দেখিয়াছেন, তাহা আমার রচনা নহে। আমার পিতামহ বিলাতে মহারাণীর নিকট হইতে যে সম্মানচিহ্ন লাভ কবিয়াছিলেন তাহারই মধ্যে ঐ বাক্যটি আছে। আমি এই চিহ্ন প্রায়ই ব্যবহার করি না, সম্ভবত বিধি অনুসারে আমার ব্যবহারের অধিকারও নাই। হঠাৎ কাগজেব অভাব ঘটাতেই সেই চিহ্নিত কাগজ ব্যবহার কবিয়াছিলাম, ক্ষমা করিবেন।
ইতি—৯ই বৈশাখ, ১৩২৩ সাল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই আমার দুইদিক হইতেই রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শ ও পরিচয়।

খেলাঘর

শ্রীপরিমলরাণী রায়

মরণের ডাক আসিয়াছে মৃত্যুঞ্জয়ের কাণে। কাণের কোনে মুখ লইয়া কে যেন চুপি চুপি কহে, বৃথা চেষ্টা মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারবি নে। কেউ কোনকালে পারে নি, পারবেও না। তৈরী হ'য়ে নে এই বেলা—বেদমন্ত্রের মত দৃঢ় এবং গম্ভীর সে ডাকের শব্দ, অন্তরের কোন্ নিবিড় তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া যেন নিরন্তর মৃত্যুঞ্জয়ের কাণের কাছে ধ্বনিত হইতে থাকে; বাহিরের বাতাসে তাহার এতটুকু সাড়াও পৌঁছায় না।

হিমশীতল সে ডাকের স্পর্শ, মৃত্যুঞ্জয়ের সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া বুক কাঁপাইয়া তোলে। দম বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম করে। মৃত্যু! জীবন-দীপের চিরনির্ব্বাণ আসিতেছে তাঁহার। পৃথিবী, সংসার, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ এবং বাঁধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে। কাহাকেও আর দেখা যাইবে না; কাহারও সঙ্গে মেলামেশা করিবার উপায় রহিবে না; সংসারের এই যে এত আমোদ প্রমোদ, এত আশা আকাঙ্খা, কিছুই আর তাঁহার পুরিবে না। সমস্ত অতৃপ্ত রাখিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এ জীবনের মত সকল খেলা তাঁহার ফুরাইয়া যাইবে। এই যে স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের উপর নিবিড় মমতা, যাহাদের মুহূর্ত্তের জন্য চোখের আড়াল করিতে ইচ্ছা হয় না; যাহাদের একটু কষ্ট দেখিলে প্রাণে হাহাকার উঠে, তাহারা সকলেই পড়িয়া রহিবে। কেহ এবং কিছুই তাঁহার সঙ্গে যাইবে না। সকল ছাড়িয়া শুধু একলা তাঁহাকেই চলিয়া যাইতে হইবে। উঃ! কি দুর্ব্বল, কতখানি অসহায় তিনি? বাঁচিয়া থাকিবার দুর্ণিবার লিপ্সা, অথচ বাঁচা হইবে না। মরিতে হইবেই। কিন্তু তাহার পর?

মৃত্যুর পরে তিনি কোথায় যাইবেন? মৃত্যুর পরেকার অজানিত রহস্য যে কি ভীষণ! কতখানি ভয়াবহ! তাহারই কাল্পনিক দৃশ্যের চিন্তায় মৃত্যুঞ্জয়ের দেহের সবটুকু রক্ত যেন জমিয়া বরফের মত চাঙড়া বাঁধিয়া যায়। বটতলার পটে আঁকা ছবিগুলি অতিমাত্রায় বীভৎস মূর্ত্তি ধরিয়া চোখের সামনে যেন ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া উঠে, যমদূতগুলির কি বিশ্রী বিকটাকার চেহারা, দুষমনের মত ভীষণ, পাথরের মত নিকষ কালো, দৈত্য দানবের মত পেশী-বহুল সুদৃঢ় বিরাট দেহ, মাথায় দুইটি করিয়া ধারালো শিঙ, ভাঁটার মত গোলাকার চোখ দিয়া যেন নির্ম্মম হিংস্রতা ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, আর জীবন্ত মানুষগুলি লইয়া কি ভীষণ তাণ্ডবলীলাই না তাহারা করিতেছে! হাত-পা বাঁধিয়া মাথায় করাত চালাইয়া ফাঁড়িতেছে; ঊর্দ্ধদিকে পা দিয়া ঘানি গাছের মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া টাটকা রক্তের ঢেউ বহাইয়া দিতেছে; কোন হতভাগ্যকে বা টানিয়া আনিয়া ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ের মধ্যে ঠাসিয়া দিতেছে।

মৃত্যুর পরে যমপুরীতে পাপীদের শাস্তিবিধানের কি বীভৎস ব্যবস্থাই চলিতেছে! আর তাহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই পলে পলে ভীষণ এবং অব্যক্ত যন্ত্রণায় দাপাদাপি করিতেছে। মরিবার যো তাহাদের নাই। একবার তো মরিয়াই আসিয়াছে। আর তাহারা মরিবে না। অনন্তকাল ধরিয়া জীবন্ত থাকিয়াই এই শাস্তি চলিতে থাকিবে তাহাদের উপর দিয়া। মুখে টু শব্দ করিবারও উপায় নাই। লৌহ-দণ্ডের প্রচণ্ড ঘায়ে সেই মুহূর্ত্তে তাহা হইলে কাঁচা মাথাগুলি ছেঁচিয়া—উঃ! চিন্তা করিতেও প্রাণ আঁৎকাইয়া উঠে; মরিতে ভয় হয়; তথাপি, মরিতে হইবে। কিছুতেই, কোনমতেই মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

বাপ মা নাম রাখিয়াছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। এই মরণকেই ফাঁকি দিয়া তাঁহাদের অঞ্চলনিধি যুগযুগান্তর ধরিয়া জলজ্বল করিয়া জ্বলিবে, এই আশায়ই বোধ করি। কিন্তু, হায়রে, বৃথা চেষ্টা মানুষের! মৃত্যুঞ্জয় নামটাও যেন উপহাসের অতি ক্রূর এবং বিকট হাসি হাসিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে স্মরণ করাইয়া দিল তাঁহার মরণের শাশ্বত কথাটি।

সত্যই মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর আর বেশী দেরী নাই। একটি একটি করিয়া সুদীর্ঘ পাঁচটি যুগ তাঁহার জীবনের উপর দিয়া কোন ফাঁকে তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। জরাজীর্ণ দেহ জীবনের শেষ ধাপে আসিয়া পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি টাল খাইতে যতটুকু দেরী। কিন্তু,

মৃত্যুঞ্জয় তো সেই মৃত্যুঞ্জয়ই আছেন! অথচ, দিনে দিনে, পলে পলে তাঁহার দেহ মনে কত বড একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে তাঁহার সম্পূর্ণ অগোচরে। মুহূর্ত্তের জন্যে তাঁহার হৃদয়দ্বারে এই পরিবর্ত্তনের এতটুকুও সাড়া জাগিতে দেয় নাই। সংসারে মায়ায় মত্ত হইয়া তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, মৃত্যু একদিন আসিবেই। তাঁহাকে মরিতেই হইবে। সংসার তাহার রূপ, রস, রঙ দিয়া যতই মাতাল করুক, নেশা ছুটাইতেই হইবে। সোনার শিকলের এ বাঁধন কাটাইতেই হইবে। কিন্তু, সেদিন এত শীঘ্র এবং অতর্কিতে আসিয়া সাড়া দিবে, এ চিন্তাটা সুদীর্ঘ জীবনে ভাবিবার অবকাশ কখনও হয় নাই। সুদীর্ঘ জীবনের অজস্র দিনগুলি যেন মরালের মত ধব্‌ধবে পাখা মেলিয়াই কোন্‌ ফাঁক দিয়া দিগন্তের আড়ালে উড়িয়া পলাইয়াছে।

*　　*　　*

ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি গভীর হইয়া উঠিয়াছে। শুক্লা একাদশীর চাঁদ আকাশের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্নার গলিত রূপালী ধারার ঢেউ বহিয়া যাইতেছে রাতের নিস্তব্ধ গা ধোয়াইয়া।

দাওয়ার সামনে ছোট এক টুকরা উঠান। ঝকঝকে পরিষ্কার, চাঁদের আলোয় সূচ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এমনই। উঠানের কোনের দিকে একটি শিউলী ফুলের গাছ।

আকাশের অসংখ্য তারার মত প্রথম শরতে তাহাতে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। ভোরের আশায় তাহারা মিট্‌ মিট্‌ করিয়া যেন চোখ চাহিতে সুরু করিয়াছে। শরতের স্নিগ্ধ শিশির টুপ টুপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে শিউলীতলায় কচি দুর্ব্বাঘাসের শ্যামলিমার গা মাখিয়া। তাহারই বুক চিরিয়া মাথার সিঁথীর মত সরু একফালি পায়ে-চলা পথ। হয় তো লক্ষ লোকের পায়ের স্পর্শ উহার গায়ে লাগিয়া সাদা করিয়া তুলিয়াছে।

বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ঘুমাইতেছে পরম নির্ভাবনায়। ছেলে, বউ, নাতি, নাতনী সকলেই গাঢ় ঘুমে অচেতন। অনন্ত নিশ্চিন্ততায় তাহাদের ভরা বুকের নিঃশ্বাসের শব্দ বাহিরে মৃত্যুঞ্জয়ের কাণে আসিয়া লাগিতেছে। মৃত্যুর তাহাদের আজও ঢের দেরী। সম্মুখে অফুরন্ত জীবন, যতদূর দৃষ্টি চলে সুদীর্ঘ জীবনের সুখ-শান্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, সব জড়াইয়া একটা সুনিবিড় প্রশান্তি রাত্রির কালো আকাশের গায়ে ফুটিয়া-উঠা ছায়া পথের মত, সুউজ্জ্বল একটানা রেখা আঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে কোন অসীমের মাঝে, তাহার হিসাব নাই। কি প্রচুর তৃপ্তি ঝরিয়া পড়িতেছে তাহাদের ঐ ঘুমের নিঃশ্বাসে।

আর মৃত্যুঞ্জয়? কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি নাই, খেয়ালও নাই। আজিকার এই বার্দ্ধক্যের জরাজীর্ণ নীরস প্রাণে আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই, উদ্দীপনা নাই।

দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সেই যে সন্ধ্যার সময় তিনি দাওয়ায় বসিয়াছেন, আর এতটুকু নড়িয়া বসিবারও সামর্থ্য হয় নাই। বার্দ্ধক্যের চিরসাথী লাঠিখানা পাশে কাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আগুনের মালসার আগুন কোনকালে নিভিয়া আসিয়াছে। হুঁকাটি কোন ফাঁকে কাত হইয়া নির্জ্জলা হইয়া গড়াইতেছে। এ সব চাহিয়া দেখিবার মত ফুরসুৎ বা মনের অবস্থা তাঁহার নাই। হতাশ হৃদয়ে মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতেছিলেন, ইহারই মধ্যে জীবনের যাট যাটটি বৎসর কাটিয়া গেল! শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন প্রৌঢ়কালও যেন ঝড়ো হাওয়ার মত দুরন্ত বেগে শেষ হইয়া বার্দ্ধক্যের শেষ দশায় আসিয়া উপস্থিত হইল!

সে সব কয়দিনের কথা? বাপ-মার নিবিড় স্নেহের মৃত্যুঞ্জয়। আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসায় ভরা ঘরের একমাত্র দুলাল তিনি। এই তো সেদিনকার কথা এ সব। রাধাগঞ্জের জমিদার কাছারীতে তাঁহার বাপ কাজ করিতেন। এখান হইতে তিন মাইল দূরে। কার্য্যান্তে দৈনিক তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন এবং সকাল বেলায় দুইটি আহার করিয়া লাঠি চাদর আর ছাতাটি লইয়া কাছারীর উদ্দেশ্যে রওনা হইতেন। গ্রামের জঙ্গল ঘেরা পথটুকু পার হইয়া ছেলেদের ডাংগুলী খেলিবার ছায়াশীতল আমতলা। তাহাও ছাড়াইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাপের সাথে সাথে যাইতেন এবং গ্রামের বালকদের চিবুড়ী খেলিবার মাঠ পর্য্যন্ত যাইয়া পরম স্নেহে তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বাবা বলিতেন, বাড়ী ফিরিয়া যাইতে।

মৃত্যুঞ্জয় ফরমাজ করিতেন, ঘুড়ী আর লাটাইয়ের—লালঘুড়ী। মৃত্যুঞ্জয়কে আশ্বাস দিয়া বার বার সাবধান করিয়া

দিতেন, সে যেন জলে জঙ্গলে যায় না, গাছে চড়ে না, সব সময় যেন তাঁহার মায়ের কাছে থাকে। আচ্ছা। খোকার প্রতিশ্রুতিতে তিনি যেন অনেকখানি আশ্বস্ত হইতেন এবং মাঠের আইলের পায়ে-চলা সরু পথ বাহিয়া নির্ভাবনায় পা চালাইতেন।

মৃত্যুঞ্জয় একটু পিছন ফিরিয়া ছাতরান' বটগাছটির ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং দিগন্ত প্রসারী মাঠের সীমান্ত পর্য্যন্ত পথের দিকে দৃষ্টি দিয়া তাকাইয়া থাকিতেন। ওপারের ঘন গাছ-পালার আড়ালে বাপের মূর্ত্তি যখন নিশ্চিহ্নরূপে মিলাইয়া যাইত, সেই সময় তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। তারপর—

প্রতিটি মুহূর্ত্ত মৃত্যুঞ্জয়ের ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটিত—ঘুড়ী আর লাটাই। সারা বিকাল ভরিয়া সে আজ ঘুড়ী উড়াইবে। সকলের সাথে পাল্লা দিয়া সুতা ছাড়িবে। মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনার ঘুড়ী তখনই লেজ নাড়িয়া উড়িতে সুরু করিয়া দিত। ফাঁকা মাঠ, প্রকাণ্ড উঁচু, দুরন্ত বাতাস—

এ পারের কোলে দাঁড়াইয়া মৃত্যুঞ্জয় ঘুড়ীর সুতা ক্রমাগতই ছাড়িবে। হাওয়ার বেগে তাহার ঘুড়ী ওপারের কোলে একেবারে মেঘের গায়ে গিয়া ঠেকিবে উপরে, আরও উপরে উঠিয়া যাইবে, মেঘ ছাড়াইয়াও—

আকাশ ছোয় প্রায়, শকুনী, চিল হারিয়া যায়, অনন্ত প্রসারী আকাশের 'উই' নীল গায়ে মৃত্যুঞ্জয়ের ঘুড়ী রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে, আঃ! আহ্লাদে মায়ের কাছে গিয়া মৃত্যুঞ্জয় বলে, আজ আমি কোথাও যাব না মা। কেবল তোমার কাছে চুপ ক'রে ব'সে থাকবো। বাবা তা হ'লে ঘুড়ী এনে দেবে, কেমন, অ্যাঁ মা—

হ্যাঁ, তাই থেকো। কোথাও যেও না, তাহ'লে ঘুড়ী দেবে। আমি রান্না করি; তুমি ব'সে ব'সে দেখ, লক্ষ্মীটি—সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া মা বলেন।

রান্না বান্না শেষ হইয়া যায়। খাওয়া দাওয়ার পাট মিটিয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু সত্যিই দুষ্টামি করিতে যায় না। দুপুর বেলায় মায়ের কোল ঘেঁসিয়া শুইয়া পড়ে—আধ ঘণ্টা, কি বড় জোর ঘণ্টাখানেক, নিতান্ত শান্ত ছেলেটির মত টিকিয়া থাকে। তারপরই তাহার বুকে যেন হাঁপ ধরিয়া আসে। হাত পা গুটাইয়া এই ভাবে চুপটি করিয়া পড়িয়া থাকিতে জ্বালা ধরিয়া যায়। ভয়ানক ছট্‌ফট্‌ আরম্ভ হয়। চোখ মিট্‌ মিট্‌ করিয়া চায়, মায়ের চোখ ঘুমের ঘোরে বুজিয়া আসে, নাকের নিঃশ্বাস শব্দ সুরু করে—

মৃত্যুন্, হেই মৃত্যুঞ্জয়! জানলায় উকি মারিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কে ডাকে—জয়ন্ত, মৃত্যুঞ্জয় চাহিয়া দেখে। নিঃসাড়ে বাঁ হাতখানির পাতা এবং পাঁচটি আঙুল বিস্তার করিয়া ইঙ্গিতে জানায়—চুপ্। মায়ের কোল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে সন্তর্পণে। নিঃশব্দে জানলার গোড়ায় আসিয়া চুপি চুপি কয়, না ভাই, আমি যাব না। বাবা এলে মা ব'লে দেবে। বাবা বকবে। তুই যা।

ধ্যেৎ, মৃদু তাড়া দিয়া জয়ন্ত বলে, শ্রীমন্ত আর কেশব রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

ভারী একটা মজা আছে রে, শীগ্‌গীর চ'লে আয়, আয়। জয়ন্তর হাতছানির আকর্ষণ আর কাটান যায় না। বাপের কথা যদিচ মনটা একটু দাবাইয়া দিতে থাকে, তাহাও কাটাইয়া উঠে। বাপ আসিবার আগেই সে ফিরিয়া আসিবে। তাহা হইলে আর—ব'লে, তোরা ঐ পথে গিয়ে দাঁড়া; আমি আসছি। জয়ন্ত পা বাড়াইয়া বলে, দেরী করিস নে যেন, শীগ্‌গির আসিস।

এই আমি এলাম ব'লে। মৃত্যুঞ্জয় মায়ের দিকে তাকায়। তারপর সুড় সুড় করিয়া দরজাটা পার হইয়া একছুটে একেবারে—

জয়ন্ত, কেশব, শ্রীমন্ত আর মৃত্যুঞ্জয়, চারি বন্ধু; নিবিড় ভালবাসা, দুর্ব্বার দুই জোড়া মূর্ত্তিমান দৌরাত্ম্য! আসিয়া হাজির হয় তাহারা মুখুজ্জোদের লিচু বাগানের পাশে। ফলন্ত গাছটি অজস্র পাকা লিচুর ভারে একেবারে মাটীর সাথে নোয়াইয়া পড়ে; লিচুগুলির রঙ পাকিয়া লাল টক্‌টক্‌ করে। মজঃফরপুরের কলমের গাছ। খোসা ছাড়াইলেই ফিন্‌কি দিয়া রস গড়ায়। জিহ্বার পড়ন্ত লালা চাটিয়া জয়ন্ত বলে, দেখ ছিরে, আমি, কেশব আর মৃত্যুন রইলাম এদিকে। তুই যা উইদিকে, একেবারে ঝোপ জঙ্গলের ধারে, সেই যে তোকে ব'লেছিলাম, ঠিক কায়দা করা চাই কিন্তু।

আচ্ছা, ছাগলটা থাকলে হয়?

নিশ্চয়ই আছে। রোজই থাকে। যা যা, আর দেরী করিস নে. আমরা চট্‌পট্‌ কাজ সেরে নি।

তারপর, মৃত্যুঞ্জয় ও কেশবকে উদ্দেশ করিয়া বলে, তুই এইখেনে থাক কেশব। পেচ্ছাব কচ্ছিস তো পেচ্ছাবই কচ্ছিস ; কিন্তু নজর রাখিস। লোকজন দেখলেই খুক্ ক'রে কাশি দিস। চল মৃত্যুন্! তুই তলায় দাঁড়াবি—

কাঁটা তারের বেড়া লাফাইতে শুকনা পাতায় মৃত্যুঞ্জয়ের পা লাগিয়া খস্ খস্ শব্দ হইয়া উঠে। তাহার কাঁধ ধরিয়া বেজায় জোরে একটা ঠাসা দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া জয়ন্ত বলে, হেই, আস্তে ; পা টিপে, মুখুজ্জে টের পাবে। ঘুমোয় নি কিন্তু—

'হুঁ' বলিয়া মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইতেই, বাড়ীর সীমানার অপর প্রান্ত হইতে ছাগলটা ভ্যাঁ, ভ্যাঁ করিয়া করুণ কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গেই দীননাথ মুখুজ্জেও ধড়্‌ফড়্ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়েন এবং বাড়ীর চাকর, ছেলে-মেয়ে, গৃহিনী, যে যেখানে থাকে, তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠেন, ওরে ও লক্ষ্মীছাড়া হাড়হাবাতে আলসের দল, এগো এগো, শীগ্‌গির এগো, ছাগলাটাকে শেয়ালে নিল বুঝি।

দুধলো ছাগলটি, দুই বেলাই একটু করিয়া দুধ যোগায়। বৃদ্ধ বয়সে দীননাথ কবিরাজী মতে ঐ ছাগলাস্থ দুগ্ধটুকুর জোরেই বোধ করি আজিও টিকিয়া আছেন। সেই ছাগলটি, আহা হা—গেল রে গেল, ওরে ও পাজী নচ্ছার হতভাগার দল, গুটীক গুটীক গিলিস, আর দু'পর হ'লেই আলসের মত পড়ে পড়ে ঘুমোস। ছাগলটাও আগলাতে পারিস নে? কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া দীননাথ তাঁহার মোটা বাঁশের লাঠিখানা লইয়া একলাই ছাগল আগলাইতে ছুটিয়া যান। ছাগলটি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হয় এবং তাহার সকরুণ আর্ত্তনাদ যেন ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতে যাইতে অস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। শিয়ালে বোধ করি কামড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়াই যাইতেছে। উঃ! মুখুজ্জে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করেন।

ছেলে-মেয়ে চাকর গিন্নী, তাহারাও ততক্ষণে মুখুজ্জের পিছনে পিছনে ছোটে। বাড়ীর সেই প্রান্তে দারুণ একটা হট্টগোল লাগিয়া যায়। এ প্রান্ত কিন্তু একদম খালি হইয়া খাঁ খাঁ করিতে থাকে। মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া সগর্ব্বে জয়ন্ত বলিয়া উঠে, বাস! শ্রীমন্তর বাহাদুরি আছে কিন্তু—

মৃত্যুঞ্জয় তলায় দাঁড়ায়। ডাল পাতাশুদ্ধ জয়ন্ত কাঁচা-পাকায় উজাড় করিয়া নীচেয় ফেলে। কোঁচড় ভর্ত্তি হইয়া গেলে মৃত্যুঞ্জয় বলে—বাস্, আর না। নেমে আয়।

ইস্! একটি গাছে থাকতে? ডাল-পাতা, শিকড় কিচ্ছু রাখবো না। সাবাড় ক'রে ছাড়বো আজ! বেপরোয়া অবহেলার জন্য দীননাথের উপর যেন কেমনই একটা বিজাতীয় রাগ ঝলকাইয়া উঠে জয়ন্তর। পরক্ষণেই অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠে, একটি লিচু, একটি কাঁচা লিচুও যদি হাতে ক'রে দিয়ে থাকে কাউকে।

না, গ্রামের একটি বালককেও একটি কাঁচা লিচু হাতে করিয়া দিতে দীননাথকে কেহ দেখে নাই কোনদিন। লিচুর বউল হইতে যে গাছটির উপর অহরহ তীর্য্যক দৃষ্টি রাখিতে সুরু করিতেন, আর সেই লিচু একটি একটি করিয়া পাকিয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার স্বস্তি থাকিত না। দিনে রাতে চোখের পাতা পর্য্যন্ত বুজিতে পারিতেন না। অত বড় বুড়ো মানুষ, ব্যাধি অবসাদ এবং ক্লান্তিতে প্রায় অচল এবং নিষ্ক্রিয়, তবু চোখে ঘুম নাই। চাহিয়াই জানালার ধারে বিছানায় পড়িয়া শুধু গড়াগড়ি করিতেন। ঘুমাইবার সাহস হইত না। এত কষ্ট করিয়া গ্রামের ছেলেদের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে লিচুগুলি সামলাইতে হইত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজেরও ভোগে লাগিত না। গাছ চুক্তিতে বিক্রয় করিয়া দিতেন ব্যাপারীদের কাছে। একদিন আসিয়া তাহারা সকলের সামনে চোখের উপরই—

সোজা আপশোষের কথা ইহা? অনেকদিনের জমা আপশোষ! প্রাণ ভরিয়া মিটাইয়া রাস্তায় আসিয়া জয়ন্ত বলে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, খাও এখন কলা—দিগ্বিজয়ী বীর যেন অবলীলাক্রমে শত্রুপক্ষের মাথা ফাটাইয়া পরম নিশ্চিন্তে সদর্পে অন্যত্র অভিযান চালাইল।

এমনই করিয়া কত মুখুজ্জে, কত বাঁড়ুয্যের পিছনে যে তাঁহারা কত লাগিয়াছেন! আর শুধু লিচুই নহে, আনারস কাঁটাল, জাম ইস্তক এবং সযত্নে ও সঙ্গোপনে রোপিত কলমের চারার ল্যাংড়া, ফজলী আম—কোনটারই রসাস্বাদন করিতে বাকি রাখিতেন না।

ছাগল যাহার না থাকিত, সে ভয় পাইত ভূত, প্রেত,

অগত্যা চোর ছ্যাঁচোড়ের। তাঁহাদের দৌরাত্ম্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জো কিন্তু কাহারও ছিল না।

এসব তো গেল একরকম। ইহা ছাড়া, আরও কত কিই যে করিয়াছেন? কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা তিনি ভাবিবেন? এই তো এই শরৎকালেই প্রতিবার পূজার সময়টিতে জমকালো পূজা হইত রাধাগঞ্জের জমিদার বাড়ীতে। মৃত্যুঞ্জয়দের এ অঞ্চল অবধি নিমন্ত্রণ হইত। চারিদিক হইতে হাজার হাজার লোক নিমন্ত্রণে আসিত। পূজার সময়টাতে প্রায়ই থাকিত বর্ষা। এ গ্রাম আর ও গ্রামের মাঝখানকার বিলটি জলে ডুবু ডুবু করিত। নিমন্ত্রণে যাইতে হইত নৌকায় চড়িয়া বুড়া, যুবা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত নৌকা ভরিয়া বাবুদের বাড়ীর কোলে গিয়া নৌকা লাগাইত।

প্রকাণ্ড বাড়ী ভরিয়া যেন আনন্দের হাট বসিত। বাজী-বাজনা পুতুল নাচ, অহরহ লাগিয়াই থাকিত। তাহা ছাড়া, সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া দশমী পর্য্যন্ত চারি রাত্রি একটানা যাত্রার ধুম—বায়না হইত কলিকাতার সবচেয়ে বড় নামজাদা দল। পুরী জম জম করিত সর্ব্বদার জন্যই—

এখন অবশ্য সে সব কিছুই নাই। আগেকার সে জাঁকজমক যেন উপকথার মত অদ্ভুত বলিয়াই ঠেকে। কালের গতিতে আর ক্রমাগত বংশবৃদ্ধিতেই সে বিশাল জমিদারী এখন ধ্বংস-প্রায় হইয়া আসিয়াছে। পূজা-অর্চ্চনা হয় বটে, কিন্তু নাচ গান যাত্রা আর আসে না। টিম টিম করিয়া চাকরাণভোগী বাজনাদারেরা তাহাদের কর্ত্তব্যের সাথে কোন রকমে রীতি রক্ষা করিয়া যায়। সাবেক আমলের সমস্ত আনন্দ কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, সমস্ত ঔজ্জ্বল্য নিভিয়া আসিয়াছে। অতবড় প্রকাণ্ড বাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গ মাখিয়া যেন কেমনই একটা হতশ্রীর ম্লানিমায় বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যাত্রা-ভাঙ্গা আসরের জমির মত নিঝুম নিস্তব্ধতায় থমথম করিতেছে। মরণ কাঠির স্পর্শে কে যেন ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। আগেকার কোন কিছুই নাই আর। আছে শুধু আভিজাত্যের নিরর্থক খানিক অহঙ্কার, রক্ত মজ্জায় মিশিয়া—থাক্—

যাত্রা শুনিবার একটা নেশা তাঁহাদের ভূতের মত পাইয়া বসিত। বিকাল বেলা হইতেই চারি বন্ধুর কাণাকাণি চলিত ঝাঁড়ে আবডালে। মা কিন্তু মতলবটা আঁচ করিয়া বলিতেন, খবরদার খোকা, গানটান শুনতে যেয়ো না যেন। যে হিম পড়ছে, কাত্তিকে ঠাণ্ডা কখ্‌খনো লাগিও না কখ্‌খনো না। নিষেধের কঠোরতার চেয়ে উৎকণ্ঠা আকুলতাই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিত।

তা উঠুক, কত লোকেই তো আসে। বাপের জন্য ভয় নাই। পূজার কয়দিন ধরিয়া তিনি তো জমিদার বাড়ীতেই থাকেন। যে ভীড়, আর রাত্রিকাল, চিনিবার জো আছে নাকি? অতঃপর, চারি বন্ধু তাঁহারা খানিক রাত্রে—

পলাইয়া যাইতে হইত। কত চাষীর ডোঙ্গা ডোবান থাকিত জলের তলে। খুঁজিয়া পাতিয়া তাহা হইতেই গোটা দুই চুরি করিয়া তাঁহারা বিলের বুকে পাড়ি জমাইতেন।

বিল ভরিয়া কালো জলের রাশি থই-থই করিত। অন্ধকারের ছায়া পড়িয়া আরও কালো কচ্‌কচে করিয়া তুলিত; কাণাভুলোর ভয় ছিল বিলে। মানুষ ভুলাইয়া তাহারা নাকি জলের তলে ঠাসিয়া মারিয়া ফেলিত। আলেয়ার আলো অর্থাৎ ভূতের গালে আগুন হামেশাই যেখানে সেখানে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ দপ্‌ করিয়া নিভিয়া যাইত। জলের উপর দিয়া দুই একটা কালোসাপও সাঁই সাঁই করিয়া ছুটিয়া পলাইত। হয়তো হেলে ঢোড়া বোড়াই হইবে, বিষ নাই ওসবে তেমন ভয়ও ছিল না।

যাত্রার আসরের চারিপাশ জুড়িয়া কত সব খাবারের দোকান; রাশ করিয়া সাজাইয়া রাখা। কিন্তু পয়সা নাই। নাঃ, একটি আধলা কেহ বেশী করিয়া আনে নাই। সব কুড়াইয়া চারিজনের কাছে চারিটি পয়সা মাত্র সম্বল। তিন পয়সার বিড়ি আর এক পয়সার দেশলাই। ইহা না হইলে তো সারারাত জাগিয়া যাত্রা শোনাই চলিবে না। অথচ, ঐ খাবার, ওদিকে চাহিলেই জিব চুয়াইয়া রস গড়ায়।

জয়ন্ত আশ্বাস দিয়া দোকানীকে গিয়া বলিত, নোটের ভাঙ্গানী আছে? দশ টাকার নোট। তবে আর কি হবে? ইচ্ছে ছিল কিছু খাবার খেতে; বাড়ীতেও কিছু নিয়ে যেতাম। কথায় যেন একটু আপশোষের সুর।

খদ্দের ভাল; অনেক বিক্রয়ের আশা করে দোকানী। বলে, তা নিয়ে যাও না খোকাবাবু। ভাঙ্গানী হ'য়ে পড়বে'খন।

বেশ, চারিবন্ধুর খাবার মত অনেক রকমের প্রচুর খাবার একটা শালপাতার ঠোঙ্গায় লইয়া যাইবার সময় জয়ন্ত দোকানীকে বলিয়া যায়, বড় দেখে দুটো হাড়ীতে ভর্ত্তি ক'রে রাখ বাড়ীর জন্যে। তোমার জিম্মায়, যাত্রা ভাঙ্গলে নিয়ে যাব। আর সেই সময় নোটের ভাঙ্গানী দিও।

চেহারা ভাল, জামা কাপড়ও পরিষ্কার, ভদ্রলোকের ছেলে। দোকানী স্বীকৃত হ'য়ে বলে, তা বেশ, বেশ খোকাবাবু! তাই নিও। আমি হাঁড়ী ভ'রেই রাখবো, ভাল ক'রে বেঁধে-ছেঁদে। বিক্রয়ের একটা মহাসুযোগ পাইয়াই বোধ করি সে খুশী হইয়া ওঠে। তিন পোয়ায় এক সের, নেহাৎ ছেলে মানুষ তো?

আর কেউ নিয়ে না পালায়, লক্ষ্য রেখো, সাবধান। জয়ন্ত ভীড়ে মিশিয়া যায়, একটা নিরিবিলি জায়গা দেখিয়া মজা করিয়া খাইতে খাইতে শ্রীমন্ত, কেশব আর মৃত্যুঞ্জয় বলে, হ্যাঁরে জয়ন্ত, সত্যি দাম দিবি নে বে? ফাঁকি দিবি?

ইস্! ভারি তো দায় প'ড়েছে দাম দিতে? সে ভরা হাঁড়িও দোকানীর ঘরে পড়িয়া রয় মুখ বাঁধা অবস্থাই। তাহার মালিকের সন্ধান সে বোধ হয় তাহার জীবন ভরিয়াও আর পায় নাই।

এত করিয়াও কিন্তু তাহাতে অন্যায় বা অপকর্ম্মের সঙ্কোচ বোধ হইত না। বরং কৃতিত্বের গর্ব্বে ও আত্মপ্রসাদে মন প্রাণ যেন আরও কাঁপাইয়া-উঠিত। কি দিনই যে ছিল!

সে সব দিন আজ কোথায়? সেই খেলাঘর, মৃত্যুঞ্জয় তখনও ভাবিতেছিলেন, আর তাঁহার সেই সব খেলার সঙ্গীরা এবং সমবয়সীরাই বা এখন কোথায়? কোন্ অজানা দেশের গভীর অন্ধকার তলদেশে নিশ্চিহ্ন হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। কোন্ কালে তাঁহার সঙ্গ এড়াইয়া তাঁহারা একে একে সরিয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুর মুহূর্ত্তে মাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের বুকে তাহাদের জন্য একবার দোলা লাগিয়াছে। পরক্ষণেই সংসার তাহার সহস্র রূপ, রস, গন্ধ দিয়া তাঁহার প্রাণটাকে নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে। যাঁহারা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহার প্রাণ হইতে নিঃশেষেই নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কথা ভাবিয়া দেখিবার ফুরসুৎ বা ইচ্ছাও তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে হয় নাই। তাঁহাদের সহিত খেলা করিয়াছেন কয় দিনই বা? এইতো যেন সে দিন, বছর হিসাব করিলে যতই হউক মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতে কিন্তু সেদিনের ঘটা ঘটনার মতই জল জল করিয়া ফুটিয়া উঠিল, জয়ন্ত, কেশব আর শ্রীমন্ত, তাঁহার খেলার সঙ্গী, সমবয়সীরা সব।

কত কাণ্ডই যে তাঁহাদের সঙ্গে করিয়াছেন! কত দৌরাত্ম্যেরই সঙ্গী ছিল তাঁহারা! ছোটবেলার এমনই আরও কত কথা, স্মৃতি ছন্নছাড়াভাবে ভীড় করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের মনে উদয় হইতে লাগিল। বহুদিন আগে এই সমস্ত এই জীবনেই তো ঘটিয়া গিয়াছে! কিন্তু, তখনকার বাস্তবতার চেয়ে আজ যেন সেই সব চিন্তা করিতেও প্রাণে এক অপূর্ব্ব পুলকের ঢেউ উছলাইয়া উঠিল। ছোটবেলার অফুরন্ত কাহিনীগুলি বায়স্কোপের রঙিন চিত্রের মতই অপরূপ রূপ সৌন্দর্য্য লইয়া হু হু করিয়া মনের পটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে যুগযুগান্তরের পিছন পানে ফিরিয়া যাইবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় প্রাণে যেন আকুল হইয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। একবার—মাত্র একটিবার যদি মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাল্যলীলার সেই মধুরতম দিনগুলি ফিরিয়া আসিত! এই বয়স, এই বার্দ্ধক্যের সহজাত নিষ্ক্রিয় অবসাদ এবং সংসারের মায়া মোহ, সকলই জলাঞ্জলী দিয়াও যদি—

এই অর্থ, বিত্ত, প্রতিষ্ঠা সম্ভ্রম, সবই নিশ্চিহ্ন হইয়া চুকিয়া গিয়াও যদি তিনি হিসাব করা দিন কয়টি ফিরিয়া পাইতেন।

ভোরের সাড়ায় তখন কাকপাখী ডাকিয়া উঠিয়াছে; চাঁদের আলো অনেক্ষণ নিভিয়া গিয়াছে; বাড়ীর সকলেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের নাতী নাতনীরাও ইহারই মধ্যে কলরব করিয়া খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। জয়ন্ত, কেশব, শ্রীমন্ত। পাড়া হইতে তাঁহাদেরও নাতী নাতনীরা মৃত্যুঞ্জয়ের উঠানে তাঁহারই সামনে আসিয়া ভীড় করিয়া খেলিতে সুরু করিয়া দিয়াছে, দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি, গণ্ডগোলের হাট বসাইয়া দিয়াছে যেন। বুভুক্ষু মৃত্যুঞ্জয়! নির্নিমেষ চোখে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চোখ আর ফিরাইতে পারিলেন না। সরল শিশুগুলি! সংসারের এতটুকু তাপও উহাদের গায়ে লাগে নাই; ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, বাস্তব সংসারের রূঢ়তার এতটুকু অনুভূতিও হয় নাই। ভবিষ্যতের কোন আতঙ্ক আজও উহাদের গায়ে লাগে নাই, প্রাণভরা অফুরন্ত আনন্দ,

প্রচুর আশা বাসনা, একটানা যোয়ারের মত টলমল করিয়া বুক ছাপাইয়া পড়িতেছে। কি সুন্দর, চমৎকার, আঃ, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণে রঙ ধরিয়া আসিল, বিভোর। হঠাৎ একেবারে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। দেহ মনে তিনি যে আজ বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত, ইহা তাঁহার একদম ভুল হইয়া গেল। জীবনের তিনকাল শেষ হইয়া তিনি যে আজ মরণ পথে পা বাড়াইয়াছেন, সে যেন তিনি নহেন। ঐ বালকগুলির সাথে তাহাদেরই একজন হইয়া খেলা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ যেন অসহ্য অস্থিরতায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল।

মৃত্যুঞ্জয় উঠিলেন। তাহাদের সঙ্গে ছুটাছুটী করিবার কি প্রচণ্ড আগ্রহ লইয়াই না তাহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেনও। তাহারা কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা যেন কেমন একরকম হইয়া গেল। এত যে আনন্দ তাহাদের নিমেষে দমিয়া গেল। সকলেই সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে বারবার মৃত্যুঞ্জয়কে এবং তাঁহার হাতের লাঠিখানির দিকে তাকাইয়া তাঁহার সান্নিধ্য এড়াইবার জন্যই বোধকরি তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল।

কেমনই একটা সঙ্কোচের কাঁটা মৃত্যুঞ্জয়েরও মনটা খাবাইয়া দিতে লাগিল, কেহ দেখিয়া না ফেলে; কাহারও কাছে ধরা পড়িতে না হয়। তাহা ছাড়া, সারারাত্রির বিনিদ্র দুশ্চিন্তায় দেহও যেন অসাড় হইয়া পড়িতেছে। পা আর উঠিতে চাহিতেছে না। এতটুকু বল নাই, হাত পা গভীর অবসাদে খিল লাগিয়া আসিতেছে। উঃ! ডানাভাঙ্গা পাখীর উড়িবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মত একান্ত নিঃসহায়তায় মৃত্যুঞ্জয়ের বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

হায়রে সেদিন! আজিকার এই দিনের সাথে পাহাড়ের মত দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তাহার। এ জীবনে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। মাথা খুঁড়িয়া বুক চাপড়াইয়া মরিলেও না। সেই দিন, জীবনের সেই পরম মধুর দিনগুলির সাথে এ জন্মে আর দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। হায়, হায়, হারাইয়া যাওয়া সেদিনের নাগাল না পাওয়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের বুকখানা গভীর ক্ষোভে ও বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল। সমস্ত অন্তর ফাটিয়া আর্ত্তনাদ উঠিয়া আসিতে চাহিতেছিল।

দুরন্ত হতাশায় মৃত্যুঞ্জয় সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

বুর্জ্জোয়া মেয়ে

An up to date

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সময়ের সাথে ছন্দ মিলায়ে ঘড়ির কাঁটাটী চলে,
খাঁচার ভিতর বন্দীপাখীর থেমেছে কূজন রব;
পিয়ানোয় তব সিম্‌ফনি জাগে নীলাভ শেডের তলে,
সিঁড়ির উপরে সাজায়েছ বেশ বিদেশী ফুলের টব;
বাতায়ন হ'তে দেখা যায় 'লনে' ঘন সবুজের মায়া,
ম্যাগনোলিয়ার পাতাগুলি দোলে মন্দ মধুর বায়ে;
বিজলী বাতির আলোকের পাশে পড়েছে গাছের ছায়া,
পিচ্‌ঢালা পথ এঁকে বেঁকে এসে মিশেছে প্রাসাদ গায়ে;

রূপ-মহলের আসবাবে রহে বিলাসী মনের রুচি,
'নিউড' চিত্র ফটো বাষ্টেতে ঘরগুলি যাদুঘর ;
সন্ধ্যাবেলায় স্নিগ্ধনিরালা গন্ধমদির বুঝি,
রূপ-যৌবন-সোহাগ প্রদীপে আলোকিত অন্তর ;
সিনেমায় তব পড়ে আছে মন,—ভুলে গেছ সংসার,
গৃহলক্ষ্মীর মঙ্গলরূপ হেরি না আননে তব ;
লাল পেড়ে শাড়ী পরি' পাকশালে যেতে চাহো নাহি আর,
নভেল-বিদুষী মনোহরণের প্রয়াস করিছ নব ;

খান্‌সামা এসে রান্নাঘরের নিয়েছে সকল কাজ,
হেজ্‌লিন আর হিমানী মাখিয়া হইয়াছ রূপবতী ;
রুজ পাউডার লিপ্‌ষ্টিকের বাহার খুলেছে আজ,
পাতলা শাড়ী ও টাইট ব্লাউজে দেখালে দেহের জ্যোতি ;
স্বামীর বন্ধু সহচর তব,—বন্ধুও জোটে বেশ,
হাই হিল জুতো পরিয়া চলেছ চায়ের নিমন্ত্রণে ;
চলে কক্‌টেল, বলডান্‌সেও হয় না মোটেই ক্লেশ,
অবগুণ্ঠন ভুলে গেছ তুমি লালসার নর্ত্তনে ;

অতিকায় দেহ এলায়ে ঝিমায় উগ্র কুকুরগুলো,
প্রচুর ভোজ্য রাত্রি-দিবস ওদের উদরে যায় ;
ওদের অঙ্গে নাহিক একটু রাস্তা ঘাটের ধুলো,
ভাগ্য ওরাই পেয়েছে সত্য তোমাদের মমতায় ;
সোণালী রঙের প্রজাপতি সম শোভিছ প্রাসাদ পরে,
প্রাসাদের তলে ফুটপাথে বসি' ভিখারিণী মেয়ে রয় ;
কি বুঝিবে তুমি বুর্জ্জোয়া মেয়ে অশ্রু কোথায় ঝরে,
বাসি পচা ভাত আধপেটা খেয়ে দুঃখ কত না সয় ;

পথের ধূলায় লভেছে জনম,—পথেই হারাবে প্রাণ,
তোমার মোটর সন্ধ্যা-সকালে ঘেঁসে যায় ওর কোন ;
কোনদিন ওরে একটি পয়সা করনি ভুলিয়া দান,
তোমারে হেরিয়া কি যেন কি কথা ওর মনে দেয় দোল ;
তোমার ভবন-বিলাস ভোজের এঁটো পাতাগুলি নিয়ে,
চেটে চেটে ওর রসনা তৃপ্তি' হোলো বসে ফুটপাথে ;
ওরে কোনদিন আহ্বান করে' একমুঠো ভাত দিয়ে,
করনি যতন,—দুঃখ রহিল গভীর বেদনা সাথে ;

শ্মশানের যত কাঁথা ও মাদুর কুড়ায়ে নিয়েছে বালা,
ছিন্ন বসন কোনমতে পরি' সরম ঢাকিছে তার ;
ভগ্ন হৃদয়ে' অহরহ জ্বলে বিসুবিয়সের জ্বালা,
বুর্জ্জোয়া মেয়ে ! চেয়ে দেখ ওর যায় না মনের ভার ;
তোমার ঘরের কুকুরের চেয়ে ওর কি মূল্য নাই ?
তোমার মতই হয়েছে মানুষ,—ওরে বাসো নাই ভালো ;
হায় বুর্জ্জোয়া ! তোমার প্রাসাদ এই পাপে হবে ছাই,
সেদিন আসিছে, কেমনে জ্বালায়ে রাখিবে সুখের আলো !

সত্যযুগের রাজপথে শোনো কালের ডঙ্ক ধ্বনি,
বুর্জ্জোয়া মেয়ে ! থামাও তোমার বেঠোফেন সিম্ফনি।

বাঙ্গালার প্রাচীন কীর্ত্তি

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

বাঙ্গালা অতি প্রাচীন দেশ। বেদ-এ এই দেশের উল্লেখ আছে। মহাভারত হইতে পাই, চন্দ্রবংশীয় বলীরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামক পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র ছিল। এই পঞ্চ-পুত্রের নামে পাঁচটি রাজ্য স্থাপিত হয়। বাঙ্গালাদেশ তাহার একটি। বঙ্গ নামক পুত্রই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রাচীন দেশের অন্ধ-কোঠায় কত বড় বড় নক্ষত্র, কত কঠিন সাধনা, কত রোমাঞ্চকর শৌর্য্য-বীর্য্যের আখ্যান, রাজনীতি, সমাজনীতি, মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার কাহিনী, কত কিম্বদন্তী লোকচক্ষুর অন্তরালে নিগড়বদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে, আজিও তাহার সকলক্ষেত্রে আলোক-সম্পাত হয় নাই। তাই বাঙ্গালার যোগ্য ইতিহাস আজিও গড়িয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু ইহারই অন্তর্নিহিত কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রাণশক্তি বাঙ্গালীকে আজিও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যে দেশের লোক অতীতকে না জানে, অপরকে জানাইতে না পারে তাহার নিজের পরিচয় কতটুকু বা? নিজে সে যতই বড় হউক না কেন অতীতকে ছাড়িলে জাতি হিসাবে তাহার আত্ম-পরিচয়ের মধ্যে এমন কিছু বাকী থাকিয়া যায় যাহা তাহাকে সিদ্ধপীঠমূলে উপস্থিত হইতে দেয় না।

অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে পারিলেই মানুষ নিজের স্বাধীন ছন্দে নিজের শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। মহাভারতীয় যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ১৩৩৮ হইতে ১৫৩৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ আড়াইশত বৎসরকাল বাঙ্গালাদেশ স্বাধীন ছিল। কাজেই সুখ-সম্পদও এইকালে বৃদ্ধি পায়। এই সময় বাঙ্গালার পরাক্রান্ত নৃপতিরা এবং অন্যান্য ধার্ম্মিক, বিজ্ঞ ও বীর্য্যবান সন্তানগণ যে সকল কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন শুধু তাহাই বাঙ্গালার শৌর্য্য-বীর্য্য, জ্ঞান-বুদ্ধি, দয়া-ধর্ম্ম এবং জাতীয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। দুঃখের বিষয়, সে সকল উদ্ঘাটিত করিবার জন্য আজ হাতড়াইয়া ফিরিতে হইতেছে। সমসাময়িক মনীষী ব্যক্তিরা আদর ও গৌরববুদ্ধি বশে চোতা কাগজেও এ সকলের একরকম কিছুই টুকিয়া রাখিয়া যান নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বাঙ্গালীকে সচেতন হইতে হইবে। শুধু অতীতকে খুঁজিয়া বাহির করিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানকেও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, অন্যথায় আমরা নিজেরা যেমন হতাশ হইয়াছি ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকেও সেইরূপ হতাশ করিব।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, "ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দু'একজন হতভাগ্য আছে পিতৃপিতামহের নাম জানে না এবং এমন দু'একটি হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী। যে জাতির পূর্ব্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষায় চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা করে। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখনও মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখনও মানুষের কাজ হয় না।"

কালের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে বাঙ্গালার প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের অধিকাংশের আজ চিহ্নমাত্র নাই। যেগুলি আছে তাহাও রক্ষা করিবার বিধি ব্যবস্থার অভাবে 'যাই' 'যাই' করিতেছে। প্রাচীন গৌরবের এই সকল বিলুপ্ত কাহিনী বাঙ্গালীকে আজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐ সকলই মানুষের প্রাণশক্তি জাগাইবার একমাত্র আনন্দময় উৎস। ঐ সকল যোগসূত্রই পরবর্ত্তীকে গড়িয়া তুলিতে রস যোগাইবে। জাতীর অতীত কীর্ত্তিকলাপের গোপন পরিতৃপ্তিই জাতিকে ব্যক্ত হইবার পথ করিয়া দেয়।

বাঙ্গালাদেশে পাঁচটি বিভাগ আছে, যথা:—প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, বর্দ্ধমান বিভাগ, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ।

বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও মহকুমা।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

কলিকাতা—বাঙ্গালার রাজধানী। ইহা বহুকাল যাবৎ সমগ্র ভারতের রাজধানী ছিল।

২৪ পরগণা—আলিপুর সদর, শিয়ালদহ, বারাকপুর, বসিরহাট; বারাসত, ডায়মণ্ডহারবার।
নদীয়া— নদীয়া সদর, রাণাঘাট, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর।
মুর্শিদাবাদ—বহরমপুর, লালবাগ, কান্দি, জঙ্গীপুর।
যশোহর—যশোহর সদর, বনগাঁ, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল।
খুলনা—খুলনা সদর; বাগেরহাট, সাতক্ষীরা।

বৰ্দ্ধমান বিভাগ

বৰ্দ্ধমান—কালনা, কাটোয়া, আসানসোল।
বীরভূম—সিউড়ি, রামপুরহাট।
বাঁকুড়া—বিষ্ণুপুর।
মেদিনীপুর—মেদিনীপুর সদর, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম।
হুগলী—চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, আরামবাগ।
হাওড়া—হাওড়া সদর, উলুবেড়িয়া।

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা—ঢাকা সদর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ।
ময়মনসিংহ—ময়মনসিংহ সদর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ।
ফরিদপুর—ফরিদপুর সদর, মাদারীপুর, গোয়ালন্দ, গোপালগঞ্জ।
বাখরগঞ্জ—বরিশাল, পটুয়াখালি, পিরোজপুর, ভোলা।

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম—চট্টগ্রাম সদর, কক্সবাজার।
পাৰ্ব্বত্য-চট্টগ্রাম—পাৰ্ব্বত্য-চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি।
নোয়াখালি—নোয়াখালী সদর, ফেণী।
ত্রিপুরা—কুমিল্লা সদর, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

রাজসাহী বিভাগ

রাজসাহী—রাজসাহী সদর (রামপুর বোয়ালিয়া) নাটোর নওগাঁও।
দিনাজপুর—দিনাজপুর সদর, বালুরঘাট, ঠাকুরগাঁও।
জলপাইগুড়ি—জলপাইগুড়ি সদর, আলিপুরদুয়ার।
রংপুর—রংপুর সদর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা।
বগুড়া—বগুড়া।
পাবনা—পাবনা সদর, সিরাজগঞ্জ, সাজাদপুর।
মালদহ—ইংরেজবাজার।
দার্জ্জিলিং—শিলিগুড়ি, কার্শিয়ং, কালিম্পং।

সাধারণতঃ লোকে আবার দিক্ অনুযায়ী (১) দক্ষিণবঙ্গ (২) মধ্যবঙ্গ (৩) পূৰ্ব্ববঙ্গ (৪) উত্তরবঙ্গ (৫) পশ্চিমবঙ্গ, এইরূপ নাম দিয়া বাঙ্গালার বিভাগ করিয়া থাকেন। খুলনা, কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও বাখরগঞ্জ জেলা নিম্নবঙ্গের মধ্যে; নদীয়া, যশোহর ও মুর্শিদাবাদ জেলা মধ্যবঙ্গের মধ্যে; ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও পাৰ্ব্বত্য-চট্টগ্রাম পূৰ্ব্ববঙ্গের মধ্যে; রাজসাহী, মালদহ, পাবনা, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং উত্তরবঙ্গের মধ্যে এবং বৰ্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ধরা যায়। এই বিস্তৃত ভূভাগের প্রায় সৰ্ব্বত্রই অতীত কীৰ্ত্তি-কলাপের কিছু না কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন অদ্যাপিও বৰ্ত্তমান আছে; কতক কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, কতক বা অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

নিম্নবঙ্গ

খুলনা

প্রথমতঃ, নিম্নবঙ্গের কথা বলিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটি বনের কথাও বলিতে হইবে। ভাগীরথীর পলিতে চরের সৃষ্টি করিয়া যে সকল ভূভাগ ডাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে তন্মধ্যে সুন্দরবন অন্যতম। ইহা সমুদ্রকূলবর্ত্তী এবং বঙ্গদেশের দক্ষিণসীমায় অবস্থিত, ভাগীরথীর মোহনা হইতে মেঘনার মোহনা পর্য্যন্ত প্রায় ৬৫২৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত। তন্মধ্যে ২৬৮৮ বর্গমাইল খুলনায়, ২৯৪১ বর্গমাইল ২৪ পরগণায় এবং ৮৯৭ বর্গমাইল বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। এই বনের উত্তরে ২৪ পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলা; পূৰ্ব্বে মেঘনা; পশ্চিমে হুগলী নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

খুলনার অন্তর্গত বনভাগ এক্ষণে দাকোপ, কালীগঞ্জ, শ্যামনগর, রামপাল, মরেলগঞ্জ ও স্বরূপখোলা থানার অধীন।

বনে 'সুন্দরী' নামক বৃক্ষের আধিক্য বলিয়া ইহার নাম সুন্দর বন হইয়াছে। এই বৃক্ষের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা দৃঢ় ও স্থায়ী। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জাহাজ ও ডিঙ্গা সকলের নিম্নভাগ এই বৃক্ষের দ্বারা এবং 'গাঁয়ো' নামক বৃক্ষের তক্তায় পাটাতন প্রস্তুত হইত। নবাব শায়েস্তা খাঁ প্রতাপের খুলনা জেলাস্থিত ঈশ্বরীপুরের (যশোরের) কারখানা হইতে উক্ত বৃক্ষ সকলের দ্বারা জাহাজাদি নির্ম্মাণ করাইয়া লইতেন।

এই বন পশুর, কেওড়া, গরাণ, ধোন্দল, বাইন ও গর্জ্জন প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। ইহাদের গুঁড়ি খুব দীর্ঘ। পত্রগুচ্ছে বনভাগ যেন চন্দ্রাতপ দ্বারা আবৃত। সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না এমনই নিবিড়-ঘন। ইহা ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর প্রিয় নিবাস। এখানকার ব্যাঘ্র যে কিরূপ ভীষণাকৃতি-বিশিষ্ট তাহা "সুন্দর বনের বাঘ" এই প্রচলিত কথার দ্বারা সুব্যক্ত। এখানে হরিণ শিশু লাফাইয়া ছুটিয়া তৃণগুল্ম মথিত করিয়া খেলিয়া বেড়ায়। কদাচিৎ কোথাও দু'একজন ধ্যানরত সংসার ত্যাগী যোগী সন্ন্যাসীও পরিদৃষ্ট হয়। কাঠুরিয়ারা মাঝে মাঝে এখানে কাষ্ঠ আহরণে আইসে, তাহা ছাড়া আর জন-মানব দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে ইহার যে সকল অংশ হাসিল হইয়াছে তথায় চাষ-আবাদ চলিতেছে এবং বসতি স্থাপিত হইয়াছে।

এই বিরাট বনভাগের প্রায় সমগ্র স্থান জুড়িয়া মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তিকলাপে পরিপূর্ণ। ঐ সকল বিভিন্ন প্রকারের ধ্বংস-চিহ্ন অদ্যাপিও লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। বনের কোন কোন অংশ এমন দুর্ভেদ্য এবং সর্প-ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু সমাকুল যে, ঐ সকল অঞ্চলে ঐ বিরাট পুরুষের আরও কি সকল আশ্চর্য্য কীর্ত্তি-নিদর্শন বর্ত্তমান আছে তাহা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। পর্য্যটকেরা এই বনভূমিতে প্রবেশ করিলে আশ্চর্য্য হইয়া কোথাও দেখিবেন, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও প্রাচীরাদির ধ্বংসাবশেষ, কোথাও ভূলুণ্ঠিত দুর্গ পরিখাদির চিহ্ন, কোথাও বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী, বাঁধাঘাট, ইষ্টকস্তূপ, কোথাও নদীতীরবর্ত্তী জাহাজ নির্ম্মাণের সুবৃহৎ কারখানা ডক ইত্যাদির অবশেষ; কোথাও হাতীশালা, অশ্বশাল প্রভৃতির বিরাট শ্মশান-ক্ষেত্র আর বিস্ময়বিমূঢ়-চিত্তে ভাবিবেন, কাহার জীবনব্যাপী সাধনার এ ফল? আজি কোথায় সে? সে কি এই বিরাট শ্মশান-ক্ষেত্রের চাঁদের আলোয়, ফুলের গন্ধে, নদীর তরঙ্গে, নির্জ্জনে, অলক্ষ্যে নিজের জীবন বাঁচাইয়া রাখিয়া অন্তর্ভেদী এক সূক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য সবল কোন কর্ম্মপন্থা উদ্ভাবনায় আত্মস্থ আছে?

মহারাজা প্রতাপাদিত্যই সেই ব্যক্তি এবং খুলনা, যশোহর এবং ২৪ পরগণা এই তিন জেলার ঈশ্বরীপুর (যশোর) নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইনি বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ ভূঁইয়ারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই ক্ষণজন্মা বীরপুরুষের অসির ঝঞ্ঝনায় দিল্লীর বাদশাহের সিংহাসন একদিন টলমল করিয়া উঠিয়াছিল এবং ইঁহার বিরুদ্ধ শক্তি মোগল সেনাপতিদিগের রক্তে কপোতাক্ষীর জল লাল হইয়া গিয়াছিল।

বাঙ্গালার নবাব সুলেমান করবাণীর রাজত্বকালের মধ্যে (১৫০৩—১৫৭২) রামচন্দ্র নামক পূর্ব্ব বঙ্গীয় একজন কায়স্থ গৌড়ে আগমন করেন। ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামক তাঁহার তিন পুত্র সঙ্গে ছিল। রামচন্দ্র গৌড়ে আসিয়া রাজ সরকারের অধীনে রাজস্ব বিভাগের চাকরী প্রাপ্ত হন এবং কণিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ প্রধান কানুনগো পদে উন্নীত হন। সুলেমান করবাণীর পর তাঁহার পুত্র দায়ুদ খাঁ বাঙ্গালার নবাব হইলে ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি (বা শ্রীধর) এবং গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। এইরূপে শ্রীহরি রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি ও প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন এবং জানকীবল্লভ বসন্তরায় নামে প্রধান রাজস্ব সচিবের পদে উন্নীত হন।

কালক্রমে দায়ুদ খাঁ আকবর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে বাদশাহ বিদ্রোহ দমনের জন্য গৌড়ে সেনা পাঠাইয়া দেন। তখন দায়ুদখাঁ নিজের সমস্ত ধনরত্ন বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহা কোনও নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার আদেশ দিয়া নিজরাজ্য হইতে পলায়ন করেন।

তখন তাঁহারা দুই ভ্রাতা যতটা সম্ভব ধনরত্ন লইয়া সুন্দরবনের মধ্যে যমুনা নদীর তীরে যশোর নামক স্থানে এক বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় ঐসকল ধনরত্ন রক্ষা করেন। এই যশোর—জেলা যশোহর নহে। বাঙ্গালার শাসন

সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র গৌড় হইতে যশোবে স্থানান্তবিত হয়। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে গৌড় বিজয়ের পর রাজা তোডবমল্ল বিক্রমাদিত্য ও বসন্তবায়কে ঐ সমস্ত প্রত্যর্পণের জন্য খবর পাঠান। তাঁহারা এই কড়ারে উহাতে স্বীকৃত হন যে, তাঁহারা যেখানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন তাহা দায়ুদর্খার দান এবং উহা, তাঁহাদের রাজস্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত দুইভ্রাতা একযোগে যশোরে রাজত্ব করিতে থাকেন।

বিক্রমাদিত্যের প্রতাপাদিত্য নামক পুত্র সম্বন্ধে জনৈক দৈবজ্ঞ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তিনি পিতাকে রাজ্যাচুত করিয়া রাজা হইবেন। অল্প বয়স হইতেই প্রতাপাদিত্যের যোগ্যতা, গুণাবলী ও উচ্চাকাঙ্খা দেখিয়া বিক্রমাদিতের সত্যই ভয় হইল যে, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা ত সামান্য কথা, তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয় কণিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তবায়কেও প্রতাপ হত্যা করিবে। এই সমস্ত সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া বিক্রমাদিত্য বসন্তরায়ের অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহাকে দিয়াই প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন; ইহাতে পিতৃব্যের প্রতি প্রতাপেব মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে যশোর হইতে সরাইবার একমাত্র কারণ, বর্ত্তমানে যশোরে নিজপ্রভুত্ব বৃদ্ধি করা এবং ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের ছেলেরাই যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

আগ্রায় যাইয়া প্রতাপ নিজ রাজপুত্রজনোচিত সৌষ্ঠব, চাল-চলন ও বুদ্ধিপ্রভাবে সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হন এবং অল্পদিন মধ্যেই রাজা উপাধি এবং পিতৃরাজ্য শাসনের সনন্দ লাভ করেন। আগ্রা হইতে যশোরে ফিরিয়া আসিয়া প্রতাপ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করতঃ ধুমধাটে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর প্রতাপেব হস্তে দিন দিন রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। সহরের উপযোগী বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও নূতন নূতন রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ দ্বারা তিনি এই বন প্রদেশকে অভিনব রূপ দান এবং প্রজার মঙ্গলের জন্য অসংখ্য মন্দির, পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য রক্ষার জন্য দুর্গাদি নির্ম্মাণ, সৈন্য সমাবেশ, নৌ-শক্তির সুব্যবস্থা প্রভৃতি, একজন রাজার পক্ষে যাহা কিছু করিবার সমস্তই তিনি সম্পাদন করেন।

ক্রমশঃ তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের সহিত প্রতি যুদ্ধেই জয়ী হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত দেশ জয় করিয়া নিজেব রাজ্যসীমা বহুদুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত কবেন। পরিশেষে, তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন। তাঁহার ক্ষমতা তখন এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তিনি দিল্লী হইতে তাঁহাব বিরুদ্ধে প্রেরিত বাইশ জন সেনাপতিকে একে একে পরাজিত কবেন।

কিন্তু এই পরাক্রান্ত নৃপতিরও একদিন পতন ঘটিল। প্রতাপ যশোরেশ্বরী দেবীর বরপুত্র ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। যুদ্ধকালে দেবী স্বয়ং অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার সেনাপতিত্ব করিতেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার ‘অন্নদামঙ্গল’ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

তিনি দেবীর এরূপ ভক্ত ছিলেন যে, সর্ব্বক্ষণই তাঁহাকে চোখের সম্মুখে রাখিতে পারা যায় একারণ দববার গৃহ হইতে মন্দির দ্বার পর্য্যন্ত সোজা এক রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দেবী কর্ত্তৃক তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতি সদয় বটে কিন্তু নারীর অমর্য্যাদা তিনি সহ্য করিবেন না। স্ত্রীলোকের দুঃখদাতা হইলে সেই-ই হইবে তাঁহার কাল। ঘটিলও তাহাই। এক সময়ে কোন ঝাড়ুদার রমণী তাঁহার সমক্ষে সভাগৃহ ঝাট্ দেওয়ায় তাহার দুঃসাহসের জন্য তিনি তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কবেন। পরক্ষণে তিনি দেখিলেন তাঁহার মধ্যমা কন্যা তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। প্রকাশ্য দববার গৃহে যুবতী কন্যার আগমনে প্রতাপ মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন তিনি তন্মুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিলেন, "যাও, তুমি চিরকালের জন্যই দূর হও।"

দরবার শেষে অন্দরে প্রবেশ করিয়া তিনি রাণীর নিকট এই অন্যায় কার্য্যের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। রাণী বলিলেন,

"কন্যা সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, সে কেন দরবার গৃহে যাইবে?"

রাজার মনে তখন সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ যশোরেশ্বরীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে চলিয়া আসিলেন। স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন, পাষাণপ্রতিমা দক্ষিণ দিক হইতে পশ্চিম দিকে মুখ ঘুরাইয়া লইয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, স্বয়ং দেবীই কন্যার ছদ্মবেশে দরবার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইহার পর হইতেই প্রতাপের পতন আরম্ভ হইল। তিনি তাঁহার পিতৃব্য বসন্ত রায় এবং তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকেও ইহারপর হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কেবলমাত্র একটি শিশুকে কোনও রূপে কচুবনে লুকাইয়া রক্ষা করা হয়। একারণ ঐ শিশু পরে কচুরায় নামে পরিচিত হন।

কিন্তু শুধু যশোরেশ্বরীর বিরূপতা নয়, দেশের লোকের বিশ্বাসঘাতকতাও প্রতাপের পতনের এক প্রধান কারণ। ভবানন্দ মজুমদার নামক জনৈক অমাত্য অতঃপর কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হন। বাদশাহ কচুরায়ের মুখে তাঁহার পিতৃহত্যা ও ভ্রাতৃহত্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মানসিংহের উপর প্রতাপাদিত্যের শাস্তি বিধানের আদেশ দেন। ভবানন্দ মজুমদার অতঃপর দেশে ফিরিয়া সুন্দরবনের মধ্যস্থ এক গুপ্তপথ দিয়া মানসিংহ ও বাদশাহের সৈন্যগণকে লইয়া সরাসরি একেবারে রাজধানীর অভ্যন্তরভাগে সহসা আসিয়া প্রবিষ্ট হন। এইরূপে মানসিংহ বিনা বাধায় রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পারায় প্রতাপকে তিনি সহজে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লী পাঠাইয়া দিতে সমর্থ হন। কিন্তু এই স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া পথিমধ্যে (বারাণসীধামে) অঙ্গুরীয়কে রক্ষিত বিষ সেবন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ভবানন্দ স্বীয় কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ একটি জায়গীর প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ ভবানন্দের রাজবংশ বলিয়া বিদিত।

[ক্রমশঃ

অর্ঘ্য

শ্রীব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ললিত কবিতা ছন্দে রচি মহাগান,
ধন্য করি মাতৃভাষা করিলে প্রয়াণ।
তোমারে জানাব ভক্তি নাহি হেন ভাষা,
যতই করিনু স্তুতি নাহি মিটে আশা।
ছাড়ায়ে সঙ্কীর্ণ সীমা উঠিলে উপরে,
ছড়ালে আপন ছটা এ বিশ্বমাঝারে।
সত্যসেবী মহাব্রতী সিদ্ধ 'সাধনা'য়,
রবীন্দ্র! তোমার কাছে রবি লজ্জা পায়।
অমর ভাবুক কবি সেবক মায়ের,
স্থাপিলে বিশ্বের মাঝে আসন ভায়ের।
দিব্যকান্তি স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্নেহ পারাবার,
মধুর বচনে পূর্ণ সুধার আধার।
বিশ্বপ্রেমে প্রেমী তুমি মানব প্রধান,
পরকে আপন করি বাড়াইলে মান।
হে বিরাট, হে মহান্, ওহে ভাগ্যবান্,
তোমার মহিমা ভাবি হই মহীয়ান্।

বন্ধন-মুক্তি

শ্রীকালিপ্রসন্ন দাশ

বার

পিসীমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া মহীন্দ্রনাথ যখন বাহির হইলেন, বেলা তখন পড়িয়াছে। নিকটবর্ত্তী এক পার্কে কতক্ষণ বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন, একটি টেবিলের কাছে বসিয়া উর্ম্মি একগাদি কাগজ লইয়া কি লিখিতেছে।

"কি রে উর্ম্মি; ও কি লিখছিস্ ব'সে?—মন্দিরে আজ যাস্ নি যে? তোর মা—"

"এই যে বাবা, এস। মা মন্দিরে গেছেন, আমাকে নিয়ে গেলেন না।"

বলিতে বলিতে ত্রস্ত কাগজগুলি উবুড় করিয়া রাখিয়া উর্ম্মি উঠিয়া দাঁড়াইল।

"নিয়ে গেলেন না! কেন রে? তা ওকি লিখছিস্ ব'সে তুই এক গাদা কাগজ নিয়ে?"

মহীন্দ্রনাথ টেবিলটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। কাগজের উপরে হাত চাপা দিয়া উর্ম্মি কহিল, "থাক্, ও আর তোমার দেখে কি হবে?" বলিয়া মুচকী একটু হাসিল।

"দেখিই না কি লিখছিস্? নিশ্চয়ই ঠাকুর দেবতাদের পূজো-টুজোর কথা কিছু। মা বাড়ীতে নেই—খাসা ফাঁকটা পেয়েছিস্" হাত সরাইয়া মহীন্দ্রনাথ কাগজগুলি উল্টাইয়া ফেলিলেন।

"কি সর্ব্বনাশ! কেবলই যে 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্'—কাগজ ভরা—পাতার পর পাতা—এ কি রে উর্ম্মি?"

একটু হাসিয়া উর্ম্মি উত্তর করিল, "আমার শাস্তি।"

"শাস্তি! সে কি রে? কেন, কি ক'রেছিলি আবার? লুকিয়ে আবার শ্যামাসঙ্গীত-টঙ্গীত কিছু গাইছিলি না কি?"

"না, শ্যামাসঙ্গীত-টঙ্গীত কিছু গাই নি?"

"তবে? কি ক'রেছিলে যে এই রকম একটা 'টাস্ক' (task) তোকে দিয়ে গেছেন, দুষ্টু ছেলেদের স্কুলে আটকে রেখে মাষ্টার মশাই'রা যেমন task দিতেন আগে?"

"কি হ'য়েছিল জান? তোমার বই-টইগুলো সব ওঘরে গাদা করা ছিল কি না, মা ব'লেছিলেন, আলমারীতে সব আবার সাজিয়ে রাখতে। তা ওর ভেতর সাধন-রহস্য, চণ্ডী, গীতা, ভাগবত এ গুলোও ছিল কি না—তুমি আমার জন্যে নিয়ে এসেছিলে—"

"ও! তাই বুঝি হঠাৎ এসে ধ'রে ফেলেছেন?"

"গুছিয়ে ত সব রেখেছিলাম সাবধানে। তা কি মনে হ'ল—'সাধন-রহস্য' বইটা খুলে একটা যায়গা দেখছিলাম। দেখতে দেখতে কেমন আনমনা হ'য়ে গেলাম—হিসেবই ছিল না যে মন্দিরে যাবার সময় হ'য়ে এল, মা এক্ষুণি নীচেয় এসে আমাকে ডাকবেন।"

"ও! তাই বুঝি এসে হঠাৎ ধ'রে ফেলে এই শাস্তি তোকে দিয়ে গেছেন?"

"হাঁ, ব'ল্লেন, মন্দিরে আজ আর যেতে হবে না। ঐ 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' কথাটা হাজার বার এইখানে ব'সে লেখ। আমি এসে দেখতে চাই লেখা কদ্দুর হ'য়েছে, আর হ'লে তবে আজ খেতে পাবে।"

"গালাগালও খুব দিয়েছেন? আর মার ধর—"

"না, তা কিছু আজ করেন নি। গালাগালও এমন কিছু দেন নি, এই যা একটু মৃদু ভৎর্সনা—তবে খুবই অসন্তুষ্ট হ'য়ে। আর মনে মনে খুবই রাগ হ'য়েছিল, চোখ মুখও লাল হ'য়ে উঠেছিল।"

"হুঁ! তা কখন ফিরবেন তোর মা? সময়—"

বলিয়া ঘড়ীর দিকে চাহিলেন। উর্ম্মিও ঘড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, "সময় ত প্রায় হ'য়ে এল। তবে ব'লছিলেন কিছু দেরী হ'তে পাবে।"

"দেরী! দেরী আবার কেন? কোথায় যাবেন আবার?"

"যাবেন না আর কোথাও? তবে—" বলিতে বলিতে উর্ম্মি একটু হাসিল।

"তবে—কি আবার? হাসছিস যে বড়?"

"ব'লছিলেন—এই—এই ব'লছিলেন হাসি চাপিতে

চাপিতে) প্রার্থনার পর সবাই বেরিয়ে গেলে বেদীর কাছে একলাটি নিরেলা ব'সে—বিশেষ প্রার্থনা একটা ক'রবেন।"

হা-হা করিয়া মহীন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন।

"কেন রে? তোর এই পাপমতি যাতে দূর হয়—তাই?"

"সম্ভব। তবে মুখে সেটা ত বলেন নি।"

"হুঁ। একদিকে ঘরে তোর এই কৃচ্ছ্রসাধনা আর এক দিকে মন্দিরে বেদীমূলে তাঁর সেই নিভৃত প্রার্থনা—পাপমতিটা তা হ'লে দেখছি রাতারাতিই বা তোর দূর হ'য়ে যায়।"

একটু হাসিয়া উর্ম্মি উত্তর করিল, "পাপমতিই যদি হয়, যাতে ক'রেই হ'ক, যত শীগ্‌গির যায় ভাল নয় কি?"

"নিশ্চয়ই। তুইও বাঁচিস, আমিও বাঁচি। নইলে ঘরের একটু শান্তিতে তিষ্ঠোনই ভার হবে দেখছি।"

"তা—তুমি যদি বল বাবা—"

একটি নিশ্বাস চাপিয়া উর্ম্মি পিতার মুখপানে চাহিল।

"পাগল। তা-ও কি ব'লতে পারি? তোর এই 'পাপমতির'ই পরিণতি কদ্দূর গিয়ে কি দাঁড়ায় আর কোন্ ভাগ্যেই বা তোকে নিয়ে তা দাঁড় করায়, তাই যে আমি দেখতে চাই। আর সেই ভাগ্য—" বলিতে বলিতে হঠাৎ মহীন্দ্র কেমন আনমনা হইয়া উঠিলেন; গম্ভীর ভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। উর্ম্মি আবার লিখিতে আরম্ভ করিল। উঠিয়া গিয়া মহীন্দ্রনাথ বইএর আলমারীটা খুলিলেন।

"আরে, গেল যা! সে বইগুলো কোথায় গেল রে!"

মুখ তুলিয়া উর্ম্মি চাহিল।

"বইগুলো—ও, সেইগুলো? মা সব নিয়ে গেছেন।"

"নিয়ে গেছেন! কি সর্ব্বনাশ! নিয়ে আবার উনুনে গিয়ে ফেলে দেন নি ত?"

"না—সোজা দুম্‌দাম্ উপরেই উঠে গেলেন দেখলাম বইগুলি নিয়ে। তোমার বই—হয় ত উপরে নিয়ে কোথাও রেখে দিয়েছেন—পুড়িয়ে ফেলবেন না।"

"ভারী জ্বালা হ'ল দেখছি! ভাবছিলাম একটুখানি প'ড়ব—"

"কত বই ত আছে—"

"আর কিছু ভাল লাগবে না এখন। তা তুই কি ঐ 'ব্রহ্মকৃপা'ই ব'সে কেবল মক্সো ক'রবি এখন?"

"কি করি বাবা? মা ব'লে গেলেন—"

"কর তবে।"

বলিয়া এক ধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

"উর্ম্মিমালা!"

সুকল্যাণী আসিয়া ডাকিলেন। কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইলেও, কিছু করুণা-কোমল। মন্দিরে নিভৃত বেদীমূলে বসিয়া ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিয়া এই মাত্র তিনি আসিতেছেন। বাল্যাবধি এই উপদেশ সদাসর্ব্বদা শুনিয়াছেন, করুণাময়ের করুণা চাহিলে করুণা মানুষকে আগে করিতে হয়; যে তা না পারে, করুণা সে পায় না। সেই ভাবেই মনটাকে প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু করুণা-কোমল যতই হউক, সহসা গৃহপ্রত্যাগতা মাতার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে উর্ম্মি চমকিয়া উঠিল। মহীন্দ্রনাথ ঝিমাইতেছেন, তিনিও একটু চমকিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। কন্যার নিকটে আসিয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "লেখাটা তোমার শেষ হ'য়েছে উর্ম্মিমালা?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাগজগুলির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে উর্ম্মি উত্তর করিল, "এখনও হয় নি। লিখছি—"

"কতক্ষণ আর হবে?"

"ঘণ্টা দুই আরও লাগতে পারে।"

"আচ্ছা; তবে যাও এখন, উপরে তোমার প'ড়বার ঘরে ব'সে গিয়ে লেখ। লেখাটা শেষ হ'লে তবে খেতে পাবে। খৃষ্টান ইংরেজদের ঘরে অপরাধী সন্তানদের দণ্ড-স্বরূপ মায়েরা মাত্র রুটি আর জলের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। তোমারও মাত্র নুনভাতের ব্যবস্থা হওয়া আজ উচিত। কিন্তু অতটা কঠোর আমি হ'তে চাই নে। সবই খেতে পাবে—কেবল দুধটা আজ পাবে না। আশা করি, এই ত্যাগটুকু সন্তুষ্ট কৃতজ্ঞ চিত্তেই স্বীকার ক'রবে। যাও, এখন উপরে যাও। তোমার খাবার—বামুন ঠাকুরকে ব'লব তোমার ঘরে নিয়ে চাপা দিয়ে রাখবে।"

নীরবে উর্ম্মি কাগজগুলি গুছাইয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল। সুকল্যাণীও একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিলেন। মহীন্দ্রনাথ ডাকিলেন, "শোন।"

"কি, বল।"

সুকল্যাণী ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। অপরাধিনী কন্যার পক্ষেই

ভগবানের করুণা প্রার্থনা তিনি করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শনের যে কারণ ছিল, স্বামীর প্রতি তাহা ছিল না। আবার অপরাধীও তিনি বেশী। মুখখানি আবার কঠোর ভাব ধারণ করিল, ললাটে একটু ভ্রূকুটিও দেখা দিল।

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "খাবার ব্যবস্থা যা ক'রেছ ক'রতে পার; এক রাত্তির একটুখানি দুধ না খেলে ম'রে যাবে না। আর অত রাত্তিরে ঠাণ্ডা দুধটা না খাওয়াই বরং ভাল। কিন্তু এই যে একটা বিশ্রী 'টাস্ক' (task) তাকে দিয়েছ—"

"বিশ্রী! 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' অশেষ মহিমাময় পবিত্র এই আধ্যাত্মিক বচন—তার সংস্পৃষ্ট যে কাজ তার সম্বন্ধে 'বিশ্রী' এই বিশেষণটা উচ্চারণ ক'রলে! কি আর ব'লব? করুণাময় তোমাকে করুণা করুন।"

বলিয়া করজোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে উপরের দিকে চাহিলেন।

একটু হাসি মহীন্দ্রনাথের মুখে ফুটিল, কহিলেন, "করুণা আমি প্রার্থনা ক'রছি—তোমাকে আগে তিনি করুন। কারণ এই রচনটিকে কঠোর একটা শাস্তির বিধানে এনে বিষবৎ ক'রে তুলেছ তুমি ঊর্ম্মির কাছে।"

"শাস্তির বিধান ঠিক নয়, পাপস্খালনের ব্রত। কঠোরতাই ব্রতের প্রাণ।"

"ব্রত লোকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তার কঠোরতাও স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করে। কারও হুকুমে বাধ্য হ'য়ে যা ক'রতে হয়, সেটা ব্রত নয়, শাস্তিই বটে!"

সুকল্যাণী কহিলেন, "কোনও তর্ক তোমার সঙ্গে ক'রতে চাই নে। ভাল যা মনে ক'রেছি, তাই ক'রেছি।"

বলিয়াই সুকল্যাণী ফিরিলেন। মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "কিন্তু আমার বইগুলি যে নিয়ে গিয়েছ, তাও ভাল মনে ক'রেছ?"

"করেছি।"

"কিন্তু আমি ভাল মনে ক'রছি না। আর অতটা অধিকারও আমার উপরে তোমার আছে ব'লে ত মনে হয় না।"

সুকল্যাণী একটু ভ্রূকুটি করিলেন।

"সেগুলোও কি নিয়ে উনুনের আগুনে ফেলে দিয়েছ?"

ভ্রূকুটি কুটিলতর হইল।

"না, সরিয়ে নিয়ে উপরে রেখে দিয়েছি।"

"আমি ফেরত চাই সেগুলো।"

"বেশ, পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ঊর্ম্মিকে প'ড়তে দিতে পারবে না।"

"এমন কোনও কড়ার আমি ক'রতে পারি না। তার পিতা আমি, প'ড়বার যোগ্য ব'লে যদি মনে করি, যা সে প'ড়তে চায়, প'ড়তে আমি দেব।"

"আমিও মা, প'ড়বার অযোগ্য ব'লে যদি মনে করি, চাইলেও তা প'ড়তে আমি দেব না।"

"হুঁ!—আচ্ছা, দেখা যাক্। এখন বইগুলো ত আমাকে পাঠিয়ে দাও।"

"দিচ্ছি। তবে এটাও আমি দেখ্‌ব কি ক'রে আমার অমতে এসব বই সে এ বাড়ীতে কোথাও ব'সে পড়ে।"

বলিয়াই দুব্‌দাব্‌ করিয়া সুকল্যাণী গিয়া উপরে উঠিলেন। বইগুলি নিজেই আনিয়া ঠাস করিয়া টেবিলের উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গেলেন।

নীচের বসিবার গৃহে গিয়া এরূপ কোনও বই পড়া দূরে থাক, নিভৃতে কোনওরূপ আলাপ আলোচনা পিতার সঙ্গে করিতে পারে, পরদিন হইতে এমন অবসরই ঊর্ম্মি পাইত না। যখনই কোনও কাজে ঊর্ম্মি যাইত, সঙ্গে সঙ্গে সুকল্যাণী গিয়া উপস্থিত হইতেন। যতক্ষণ সে থাকিত, গম্ভীর ভাবে চুপ-চাপ বসিয়া থাকিতেন। সন্ধ্যার পরই অবসর বেশী হইত, ঊর্ম্মি কখনও বসিয়া পড়িত, কখনও বা হাসি-গল্প করিত, কি কোনও কথার আলোচনা করিত। কিন্তু সুকল্যাণী যেভাবে নীরব কড়া পাহারায় গিয়া বসিয়া থাকিতেন তাহাতে ইঁহাদেরও মুখের কথা বন্ধ হইয়া যাইত; অতি অস্বস্তিই দুইজনে বোধ করিতেন। দুই একখানা বই মহীন্দ্রনাথ কখনও খুলিয়া বসিতেন, কিন্তু ভাল লাগিত না, তখনই আবার বন্ধ করিয়া ফেলিয়া রাখিতেন। ঊর্ম্মিও শেষে নিরুপায় হইয়া উঠিয়া আসিত। সুকল্যাণী তখন স্বামীকে নিষ্কৃতি দিয়া বাহির হইয়া আসিতেন। গভীর রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়া পড়িবে বলিয়া দুই তিন দিন পরে একদিন কোনও ফাঁকে একখানা বই আনিয়া ঊর্ম্মি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এরূপ একটা সম্ভাবনার কথা সুকল্যাণীও ভাবিয়াছিলেন,—যেমন ঊর্ম্মির ঘরে আলো দেখিলেন, অমনই গিয়া গৃহে উপস্থিত

হইলেন, তিরস্কার কিছু করিলেন না;—"বইখানি আমাকে দেও উর্ম্মিমালা"—ধীরস্বরে মাত্র এই একটি কথা বলিয়া বইখানি লইয়া আসিলেন। পরের দিন সকালে স্বামী গিয়া যখন নীচের ঘরে বসিলেন, বইখানি লইয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন, "এই বইটা উর্ম্মির কাছে কাল রাত্রিরে পেয়েছি," এই মাত্র বলিয়াই চলিয়া আসিলেন।

কোনও তর্কবিতর্ক কি ভৎ’সনা স্বামীকে কি কন্যাকে কখনও করিতেন না; সংকল্পে হারিয়াছিলেন, ক্রোধ সংবরণ করিয়াই রাখিতেন; কিন্তু সর্ব্বদা এইরূপ নীরব বাধা, নীরব লাঞ্ছনা, সময়ে সময়ে অতি উচ্চরব মৌখিক গঞ্জনা, এমন কি দৈহিক তাড়না অপেক্ষাও অধিক দুঃসহ হইয়া উঠে। ইঁহাদেরও তাহাই হইল।

তিন চার দিন এই ভাবে গেল। পিতা ও কন্যা মন খুলিয়া দুইটি কথা বলিবার একটু অবসর পাইলেন না। খোলা মনে কোনও কথাই কেহ বড় বলিতেন না। অন্য ছেলেমেয়েরাও কেমন চুপচাপ হইয়া গেল, নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই একটি কথা মাত্র তাহারা চাপাস্বরে এ ওকে বলিত। গৃহই হইয়া উঠিল যেন নীরব নির্জ্জন একটা প্রেত-পুরী।

কিন্তু দিনের পর দিন এই রকম একটা কড়া পাহারায় ঘরে বসিয়া থাকা দীর্ঘকাল কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। বাহিরে কোন না কোনও জরুরী কাজের তাগিদও আসিয়া পড়ে। সেদিন পার্টিটা হইয়া গেল। চিন্ময়ী ও তাঁহার স্বামী যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, ইহা একটি শুভ লক্ষণ বটে। উর্ম্মিকে নিকটে ডাকিয়া যেরূপ ব্যবহার তাঁহারা করিয়া গেলেন, কথাবার্ত্তা যেরূপ বলিলেন, আগ্রহে তাহার গানটি শুনিয়া যেরূপ প্রীত হইয়া গেলেন, সবই বিশেষ আশার কথা। তবে কেবল তাঁহাদের ইচ্ছায় ত কাজ কিছু হইবে না; কমলের ইচ্ছা আগে চাই। কিন্তু তাহার ব্যবহারটায় এমন কিছুই বুঝা গেল না যে উর্ম্মির প্রতি মনের একটা টান তাহার পড়িয়াছে, যাহাকে প্রেমের মত কিছু একটা বলা যাইতে পারে। এমনও হইতে পারে সেরূপ কোনও টান দেখাইবারই অবসর সে পায় নাই। মেয়েগুলো উর্ম্মিকে একরূপ আড়াল করিয়াই তখন দাঁড়াইয়াছিল। তবে উর্ম্মিকে দেখিয়াছে ত। তার ঐ কাপড়ে আর অলঙ্কারে সত্যই বড় সুন্দর সেদিন তাহাকে দেখাইতেছিল। আর ঐ গানটি—তাও বড় মিঠাই গাহিয়াছিল। ঐ মেয়েগুলার চেহারা আর তাদের গলার গান—উর্ম্মির তুলনায় কি? তা সে যাহাই হউক, গৃহে পিতামাতার সঙ্গে কমলের নিশ্চয়ই কিছু কথাবার্ত্তা এ সম্বন্ধে হইয়াছে। কি হইয়াছে, কোনও আশার আভাস তাহাতে পাওয়া যায় কি না, জানিবার জন্য অতি বড় একটা উৎকণ্ঠায়—এই অশান্তির মধ্যে তিনি ছটফট করিতেছিলেন। —তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ হে মঙ্গলময় স্বামী—সুপরিচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের এই প্রথম চরণটি সর্ব্বদাই তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিতেন, গুণ গুণ স্বরে গানও অনেক সময় করিতেন। কিন্তু এই জপ-যজ্ঞের বলেও সেই মঙ্গলময় স্বামীর ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না—কেহই বড় পারে না।—‘তোমার ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা’ মুখে যে যতই বলুক, মনে মনে যতই আওরাক, সেই মনের তল হইতে সকলেরই ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে, ‘আমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা’।

যাহা হউক, তাঁহার এক বন্ধু সুব্রতা সেন আগের দিন বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কথায় কথায় সুকল্যাণী জানিতে পারিলেন, চিন্ময়ী আজ বৈকালে তাঁহার গৃহে বেড়াইতে আসিবেন। সুব্রতা ইহাও বলিলেন, "তা তুমিও যেও না ভাই? তিন জনায় ব’সে নিরেলা খানিকক্ষণ গল্প-সল্প ক’রব। তারপর চা খেয়ে আসবে।" অতি আনন্দেই সুকল্যাণী বন্ধুর এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

বাহিরে তিনি যখন যাইবেন, স্বামীর গৃহে ফিরিবার সময় হইবে। কন্যার সঙ্গে নিভৃত আলাপের লম্বা একটা সুযোগ স্বামী পাইবেন। কিন্তু ইহাতে এমন কিছু একটি উদ্বেগ তাঁহার হইল না। এই যে বাধার সৃষ্টি তিনি করিতেছিলেন, প্রয়োজন বোধে তত নয়, যত নাকি জিদের বশে। আর জিদের বশে এতটা বাড়াবাড়ি করিবার ফলে গৃহে যে অবস্থাটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেটাও তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুখকর হইতেছিল না। কাজকর্ম্মে অনেক অসুবিধাও বোধ করিতেছিলেন। ইহাও বুঝিতেছিলেন, এরূপ একটা ব্যবহার দিনের পর দিন এভাবে চালান যায় না, সঙ্গতও হয় না। উর্ম্মির মনটা কিছু বিগড়াইয়াছে, পিতার সঙ্গেও প্রশ্রয় পাইতেছে। তা ঐ বুড়ী বিদায় হইতেছে; সাবধানতাও

যতদূর সম্ভব তিনি অবলম্বন করিয়া চলিবেন। আবার এদিকে এই বিবাহ সম্বন্ধটা যদি স্থির হইয়া যায়, তবে ত সব আপদই চুকিয়া গেল।

তের

মহীন্দ্রনাথ আফিস হইতে ফিরিয়া শুনিলেন, সুকল্যাণী গৃহে নাই, কোনও বন্ধুর গৃহে বেড়াইতে গিয়াছেন; বিলম্বও কিছু হইতে পারে। মহীন্দ্রনাথ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কাপড়চোপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া নীচেয় গিয়া বসিলেন। উর্ম্মিকে বলিয়া গেলেন, 'আমায় চা খাবার-টাবার নীচেয় নিয়ে যাস্ উর্ম্মি।'

খাবার দিয়া উর্ম্মি নিকটেই বসিল।

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "ব'ল দিকি উর্ম্মি কি করা যায় এখন? একদম অতিষ্ঠ হ'য়েই যে উঠলাম। ঘর হ'য়ে উঠেছে যেন solitary prison cell (নির্জ্জন কারাকক্ষ)। পাগল হ'য়ে যাব যে?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া উর্ম্মি কহিল, "কি ক'রব বল? বড় দুঃখই পাচ্ছি, বাবা, তোমার এতবড় একটা অশান্তির কারণ হ'লাম।"

"পাগল? দুঃখ বরং এই বড় আমার যে তোকে এই অত্যাচার থেকে রক্ষাই আমি ক'রতে পারছিনি।"

"কি ক'রবে বাবা? মার ঐ একরকম ধাত।"

"রেখে দে তোর ধাত? তা সে ধাত যা আছে তাঁর আছে। আর সবাই কেবলই তাঁর এই ঝাঁজ কাহাতক কত সইতে পারে বল্!"

"দেখ, দিদিমা ত দেশে ফিরে যাচ্ছেন—"

"যাচ্ছেন তাঁর জীর্ণ দেহটাকে নিয়ে। কিন্তু তাঁর তাজা মনটা যে তোর মন ভ'রে রেখে যাচ্ছেন, তার কি হবে?"

একটু হাসিয়া উর্ম্মি কহিল, "তা, আছে যা মনের ভেতরেই আছে, ভেতরেই লুকোন থাকবে। বাইরে যদি সেটা বেরিয়ে না প'ড়ে, প'ড়তে যদি না দিই—"

"তাও কি সম্ভব উর্ম্মি? অতবড় একটা মন মনের ভেতরে তোর এসে পড়েছে। তার কাজ সে ক'রবেই। পাগল ক'রে তোকে তুলবে। কি ক'রে বেঁধে রাখবি?"

"খুব শক্ত। দেখি, তবু এইটুকু যদি পারি, ও সব বই আর প'ড়ব না, প'ড়তে চাইবও না। কিন্তু—"

বলিতে বলিতে উর্ম্মি কাঁদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

"না না, সে হ'তেই পাবে না উর্ম্মি। কাঁদিস নি, কাঁদিস নি—"

বলিতে বলিতে নিজের আসনখানি উর্ম্মির কাছে টানিয়া আনিয়া স্নেহে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া মহীন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, "কিছু ভাবিস নি, প'ড়তে চাস্, তুই পড়বি? যে ক'রে হয় বন্দোবস্ত একটা ক'রে দেব আমি। ঘরে না পারি, বাইরে কোনও লাইব্রেরীতে কি ভাল কোনও টোলের পণ্ডিতের কাছে—"

চক্ষু পুছিয়া উর্ম্মি কহিল, "না, অত কিছু ক'রতে হবে না তোমায়। মা জানতে পারবেন, অশান্তি আরও বাড়বে। তার চাইতে—হাঁ, এক কাজ ক'রো বরং। তুমি প'ড়ো তাতে ত মা বাধা কিছু দেবেন না। অরুণবাবুও অনেক বই প'ড়েন, তাঁর চেয়ে চেয়ে এনো যা তিনি প'ড়তে বলেন, প'ড়ে রেখো; যখন ফাঁক পাই, তোমার কাছে এসে ব'সব, তুমি আমাকে সব ব'লো। মনে যে সব কথা ওঠে, তোমাকে জানাব, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিও।"

"হুঁ। আচ্ছা, তাই তবে হবে। এখন ফাঁক পেলে হয়।"

"তা পাব। সত্যি ক'দিন আর এমনি পাহারা দিয়ে মা চ'লতে পারবেন? এই ত আজ বেরিয়ে গেলেন; তাক্তও হ'য়ে উঠেছেন বড়। তারপর ঘরে তেমন সুবিধে না হয়, বেড়াতেও ত বেরোও, সঙ্গে ক'রে এক একদিন আমায় নিয়ে যাবে।"

একটুখানি বিরাগবক্র মুখে মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "কেমনই লাগে উর্ম্মি! একটা লুকোচুরী খেলতে হবে ভয়ে ভয়ে, যেন কত বড়ই একটা অন্যায় আমরা ক'রছি! এত বড় একটা জুলুম তোর ওপর কেন উনি ক'রতে পারিবেন?"

"তা কি হবে বাবা? আমি মেয়ে তিনি মা।"

"মেয়ে চিরকালই এতটুকু মেয়েটি কেবল থাকে না, দুর্গাপ্রতিমার দুধারে ছোট্ট ছোট্ট দুটি পুতুল লক্ষ্মীসরস্বতীর মত। ঐ লক্ষ্মীসরস্বতীও আলাদা দু'জন দেবতা, পূরো দখলে আলাদা আলাদা পূজোও পেয়ে থাকেন দুর্গাঠাকরুণটির মত। তেমনি মেয়েও বড় হয়, বিয়ে হ'য়ে স্বামীর ঘরে যায়, মা তখন কে? যেমন মেয়ে তেমনি সমান অধিকারে আর একজন নারীই বটে।"

উর্ম্মি একটু হাসিল, উত্তরে কিছু বলিল না। কি ভাবিতে ভাবিতে মহীন্দ্রনাথ শেষে কহিলেন, "তোর ওপর এই জুলুম, আর তাই এড়াবার তরে এই যে লুকোচুরী খেলা—কিছুই আমার ভাল লাগছে না। একদম এসব চুকিয়ে একটা কিনারা ক'রে ফেলতে চাই। সেটা সম্ভব হ'ত যদি তোর নারীত্বের অধিকারে তোকে বসাতে পারতাম।

"নারীত্বের অধিকারে—"

"হাঁ, যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ তোকে দিয়ে, যাতে তুই আর মায়ের শাসনাধীন মেয়ে থাকবি না, স্বামীর সহধর্ম্মিনী গৃহিণী হবি।"

"বি-বা-হ।"

কেমন যেন ভয়ে উর্ম্মি শিহরিয়া উঠিল, সংত্রস্ত দৃষ্টিতে পিতার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "ওরে না না, যা ভাবছিস্ তা নয়। তোর মা যে বরটি বেছেছেন আর যে জাল ফেলেছেন তাকে বাঁধবার আশায়—না না, সে হতেই পারে না। ঐ বাঁদরের গলায় আমার এ মুক্তোর মালা প্রাণ থাকতে আমি দেব না, জালে যদি সে বাঁধাও পড়ে। তবে সহজে এ জালে বাঁধা পড়বার ছেলেও সে নয়। পড়ে যদি পড়বে আর কারও অনেক বড় অনেক কুটিল জালে, জালও তেমন মেলাই পড়েছে।"

একটি স্বস্তির নিশ্বাস উর্ম্মি ফেলিল। মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "আমি ভাবছিলাম, হৃদয়বান্ উদার সাধুস্বভাবের কোনও ছেলে—যে স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মের আর জ্ঞানের অনুসন্ধানে তোর সহায় হবে, বাধা কিছু দেবে না, সত্যই ঠিক সহধার্ম্মিণী যার তুই হতে পারবি।"

লজ্জায় আরক্ত মুখখানি উর্ম্মির আর এক দিকে ফিরাইয়া নিল; নিকটেই টেবিলে একখানি বই ছিল তার পাতা খুঁটিতে লাগিল। মহীন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, "জানা শুনা কোনও ব্রাহ্মপরিবারে এমন ছেলে, কই, চোখে পড়ছে না। তবে উদার কোনও হিন্দুপরিবারে চেষ্টা করলে যে তোকে না দিতে পারি তা নয়।"

উর্ম্মি আরও নত হইয়া পুস্তকখানি খুঁটিতে লাগিল। উদার এই হিন্দু পরিবারের পাত্র যে কার কথা পিতা ভাবিতেছেন, স্পষ্ট নাম করিয়া না বলিলেও বুঝিতে তার বাকী রহিল না।

"তা কি বলিস্ মা?"

নতমুখেই মৃদু অথচ ধীর দৃঢ় স্বরে উর্ম্মি উত্তর করিল, "না বাবা, এখন ওসব কথা থাক।"

"কেন, থাকবে কেন? বিবাহের সময় তোর হয়েছে। তোর মাও চেষ্টা একটা করছেন। তা আমিও যদি এমন কোনও ঘরে এমন পাত্র একটি পাই, আর তারা যদি রাজী হয়—"

উর্ম্মি তখন একটু হাসিয়াই ফেলিল। কহিল, "মার সঙ্গে মস্ত একটা লড়াই বেধে যাবে যে তোমার।"

"সে লড়াই আমার, আমি দেখব। তোকে ভাবতে হবে না কিছু।"

কি ভাবিতে ভাবিতে উর্ম্মি তখন কহিল, "কিন্তু তুমি তা কি করে দেবে বাবা?"

"কেন; বাধা কি?"

"বিয়ে ত যার যার ধর্ম্মমতে হয়। এক ধর্ম্মে এক সমাজে তুমি আছ। দিতে হলে—"

"হাঁ, তাদের মতেই দিতে হবে; আমাদের এ মত চলবে না। এটা কিছু প্রশংসা করতে পারি না যে আমার মেয়ের সঙ্গে ছেলে বিয়ে দিবে বলে তারা এসে ব্রাহ্ম হবে।"

"তুমিই বা তবে হিন্দু হয়ে কি করে গিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবে?"

"সেটা আমার কথা উর্ম্মি। যুক্তি মানলে এ সমাজে আমার জাত যাবে না। যে সমাজ যে কোনও ব্যক্তিকে দীক্ষা দিয়ে তার ভেতর গ্রহণ করতে পাবে, সে সমাজ কাউকে একেবারে ত্যাগ করতে পারে না। আজ করলেও কাল আবার গ্রহণ করতেই হবে। তবে কিছু কাল অসুবিধা কিছু ভুগতে হবে, নানা গঞ্জনার কথাও লোকের শুনতে হবে। তা হয় হবে, হাসি মুখেই সেটা উপেক্ষা করে চলতে পার।"

"কিন্তু মা—"

"কি করবেন? ধরে কিছু শূলে চড়াতেও আমাকে পারবে না, ফাঁসি কাঠেও ঝোলাতে পারবেন না। তবে ঘরে তুমুল হুলুস্থুল একটা ঝড়ঝঞ্ঝা—তা তোকে পার করে দিতে পারলে সেটা—তা কি জানিস মা—বোবার শত্রু নাই—আপনিই শেষে ঠাণ্ডা হয়ে সব আসবে।"

উর্ম্মি একটুখানি কি ভাবিয়া শেষে কহিল, "কিন্তু বড় ভয়

পাই বাবা, মনটাও এগোয় না। কিছুই ত ঠিক বুঝতে এখনও পারছি নি। নূতন একটা আকাঙ্ক্ষা মনে জেগেছে, নূতন তত্ত্ব একটা বুঝবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তোমার মেয়ে আমি তোমার ঘরে এত বড় হয়ে উঠেছি। কে জানে বাবা এত দিনের এই সংস্কার যদি না বদলে যায়? নূতনটা যদি গ্রহণ করতে নাই পারি? যেখানে যাব, তাদের সঙ্গে যদি মানিয়ে চলতে না পারি? আর একটা সংসারে গিয়ে আবার তাদের একটা অশান্তির কারণ হব? না বাবা, সেটা বোধ হয় ঠিক হবে না।"

"তা হলে—"

"এখন থাক বাবা। যাক আরও কিছুদিন। মনটা ভাল করে বুঝে নিই, মনের গতিটা কোন দিকে যায় দেখি। তারপর যদি—যদি যেমন বলছ এমন কেউ আমাকে নেন, বেশ দিয়ে দিও, যাব। কিন্তু এখুনি না, বড় ভয় পাই বাবা। তবে তোমার বড় অশান্তি হচ্ছে। কিন্তু কি করবে বাবা? আমি যে তোমার মেয়ে—"

"আমার কথা কি ভাবছি উর্ম্মি? ভাবছি তোর কথা।"

"কিচ্ছু ভেবো না বাবা,—যদ্দূর পারি বুঝেই চলব, মা যাতে বিরক্ত না হন। তবে তুমি কিন্তু আমাকে—সে হ'ক না কিছু লুকোচুরি খেলা—কাজ এমন অন্যায় ত কিছু নয়—আমাকে শেখাবে যা জানতে আমি চাই। তার একটা পথ যদি পাই, মা যাই করুন না, সব সইতে আমি পারব।"

"আচ্ছা তাই তবে হবে—আপাততঃ। তবে যেতেও তোকে হবে, দিয়েও তোকে দেব আমি যেথায় ভাবছি।"

চৌদ্দ

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পিতায় ও কন্যায় নিভৃত এই সংলাপের সুযোগ ঘটিল। শনিবার সন্ধ্যায় ভাগীরথী দেশে ফিরিয়া যাইবেন। শুক্রবার সকালেই মহীন্দ্রনাথ সুকল্যাণীকে তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সুকল্যাণী কহিলেন, "তা বেশ, যেতে পারে আজ বিকেলে সবাই ওরা।"

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "উর্ম্মি চায় নিরেলায় একটুকাল বসে তাঁর সঙ্গে দুটো কথাবার্ত্তা বলে।"

একটু ভ্রূকুটি সুকল্যাণীর ললাটে দেখা দিল, মুখখানিও কেমন আঁধার হইয়া উঠিল। কিন্তু কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "তা—থাক্ তবে ও একাই আজ। ওরা বরং কাল গিয়ে দেখা করে আসবে।"

বৈকালে উর্ম্মি গেল; হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ভাগীরথী দুটি হাত বাড়াইয়া বুকে তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন। উর্ম্মিও কাঁদিয়া তাঁহার গলাটি দুইহাতে জড়াইয়া ধরিল।

"আয় আয় দিদি! ক'দ্দিন যে মুখখানি দেখিনি—আর কাল ত দেশেই ফিরে যাচ্ছি। আবার কবে আসব, কবে যে তোদের মুখ আবার চোখে দেখব! দেখতেই আর পাব কিনা কে জানে। বুড়ো হয়েছি, কবে ডাক আসবে, কবে মা দয়া ক'রে কোলে তুলে নেবেন—"

গলাটি ছাড়িয়া দিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে একটু হাসিমুখেই উর্ম্মি কহিল, "না দিদিমা, দোহাই তোমার, সে দয়া এখুনি চেও না। কেবল তোমাকে পেয়েছি, পেয়েও পাচ্ছিনি; আশা মিটল না, এখুনি যেন হারাই না।"

সাশ্রুনয়না ভাগীরথীও একটি নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে হাসিয়া ফেলিলেন; কহিলেন, "লোকে বলে, দিদি, মহামায়ার মায়া—বড় শক্ত তার বাঁধন। দেবতা নিজে এসে হাত ধরে ডাকলেও ছিঁড়ে তা কেউ যেতে পারে না। ছিঁড়ে যে নিয়ে যায়, চোখের জল ফেলেই যায়। আমি আবাগী এতকাল একলাই ত ঐ থালি পুরীতে পড়ে ছিলাম। ভাবতাম এখন যেতে পারলেই হ'ত। কিন্তু কি বুদ্ধি হ'ল, মহীন একটি দিন গেল, অমনি ছুটে এলাম এখানে তার সঙ্গে। এমন বাঁধনেই তোরা বেঁধে ফেলেছিস্ দিদি, ছিঁড়ে সত্যি যেতে চাই কই? তা ক'দিনই বা আর আছে? যেতে এখন হবেই। সেই যাবার আগে আর একটিবার তোদের দেখতে পাই, এই দয়াটুকু যেন মা করেন, তাতেই কৃতার্থ হব।"

"ওসব কথা এখন থাক দিদিমা। তা আমি বলছিলাম কি, দেশে আবার ফিরে যাচ্ছ তুমি কেন? এইখেনেই থেকে যাও না? বাবা পাকা একটা বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন, আলাদা কোনও যায়গায় ভাল লোক একজন রেখে দেবেন—"

মাথা নাড়িয়া ভাগীরথী কহিলেন, "না দিদি; থেকে আর কি হবে? তোদের ত দেখতে পাব না! কাছে থেকে কেবল মন পুড়্নিই সার হবে। তার চাইতে দেশেই ফিরে

যাচ্ছি—যাই। এই আজ তুই এয়েছিস্—চ'লে যাব, তোর বাবা ব'লেছিল পাঠিয়ে দেবে। তা কি জানিস্, তবু ভরসা পাইনি তুই আস্‌তে পারবি। সবই আমি শুনেছি ঊর্ম্মি—সেই বই যে তোকে দিয়েছিলাম, কি কাণ্ডটাই না তাই নিয়ে হ'ল। কত মার-ধরও তুই খেলি—"

বস্ত্রাঞ্চলে ভাগীরথী অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন।

হাসিয়া ঊর্ম্মি কহিল, "থাক ওসব কথা দিদিমা। সে যা হবার একদিন হয়ে গেছে, চুকে গেছে, আর ওসব কিছু হবে না। তবে হাঁ, তুমি এখানে থাকলেও—দেখাশুনো—কচিৎ কখনও হ'তে পারে। কিন্তু এমন ধাব:, যখন ইচ্ছে, হবে না। তবে বাবার একটা মজা কি জান? এমনি যখন-তখন সব কাজে মার ইচ্ছায় বাধা কিছু দেন না। তবে উচিত যা মনে করেন শক্ত হ'য়ে যদি ধরেন, সেটা ছাড়েন না, মা হাজার কোন ঝড় বৃষ্টি করুন না।"

"তাইত দিদি, থাকা আমার মোটেই ভাল হবে না। থাকলে, আমারও ইচ্ছে হবে, তোদের ও ইচ্ছে হবে, আর মহীনও পাঠাতে চাইবে, আর তাতে ক'রে তোমাদের সংসারে কেবল একটা অশান্তিরই সৃষ্টি হবে।"

"কিছু হবে। তা-হ'লই বা? চুপ করে সয়ে যেতে আমরা বেশ পারব।"

"কাজ কি দিদি অত সব জ্বালায়? যাচ্ছি ফিরেই চ'লে যাই।" বলিতে বলিতে গভীর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"কিন্তু দুঃখও ত পাচ্ছ।"

"তা পাচ্ছি, কি করব দিদি? দুঃখের কপাল আমার—এত সুখ কি ক'রে হবে? এই যা পেলাম, সেই যে মায়ের বড় দয়া! তবে—"

"কি দিদিমা?"

"যাচ্ছি, কবে আবার আসব জানি না—আসাই আর ঘটবে কিনা তা জানি না। এক যদি তোর বিয়ে খাওয়া হয়, মহীন তখন আনে—"

হাসিয়া ঊর্ম্মি কহিল, "যদি হয়, তখন আসবে বই কি? তোমার আশীর্ব্বাদ ছাড়া বিয়েই আমি করব না। তখন আসবে, কনে সাজিয়ে কপালে টিপ পরিয়ে আমাকে দেবে—"

"পাগল! আমি কি তাই পারি? ওসবকিছু যে করতেও নেই আমার—বিধবা—"

"ওসব সধবাবিধবার কুসংস্কার আমাদের সব ব্রাহ্ম পরিবারে কেউ মানে না। আর তুমি এই দিদিমা আমার যদি এসে তখন কনে সাজিয়ে আমাকে দেও, ভাল বই মন্দ কিছু আমার হবে না।"

হাসিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "তা তোর ফুলই আগে ফুটুক, তখন দেখা যাবে, যদি বেঁচে থাকি, আর আস্‌তেই পারি।"

"থাক্‌বে থাক্‌বে,—থাক্‌তেই যে হবে। নইলে আমার ফুলই ফুটবে না।"

"তা তোর সে কনে সাজান রূপটি যদি চোখে দেখতে পাই—সত্যি বলছি ঊর্মি—বেঁচে থাক্‌তেই আমি চাই। শুন্‌লাম সেদিন তোদের বাড়ীতে কি ঘটা হয়েছিল, কত লোক এয়েছিল আর তুই তোর সব গয়নাগাটি প'রে দিব্যি কাপড়-চোপড়ে সেজে বেড়িয়েছিলি। শুনে অবধি পুড়ে পুড়ে মরছি, আহা, যদি চোখে একটিবার দেখতে পেতাম। আবার কত নাকি মিষ্টি গান গেয়েছিলি—সবাই ধন্যি ধন্যি করেছিল—"

"কি করব দিদিমা? তুমি ত আর যেতে পারলে না, আর নেমন্তন্ন ক'রে নেয়ই বা কে তোমাকে? পুতুল পুজো কর, ও বাড়ীতেই যে অনজাত তুমি—ঢুকতেই পার না। তবে কালই চলে যাচ্ছ গায়নাগাটি আব পোষাকী সাড়ী প'রে কবে আর তোমাকে রূপ দেখিয়ে যাব বল? তবে হাঁ, একটা গান—সে যেমনই গাই—"

"হাঁ, একটা শ্যামাসঙ্গীত শোনাবি বলেছিলি—বইটা নিয়ে গেলি—কি না কাণ্ড তা নিয়ে হ'য়ে গেল—"

"সে যা হবার হ'য়ে গেছে। এ বাড়ীতে আর সে সব কিছু হবে না। তা যদি বল গেয়ে তোমাকে শোনাতে পারি, সেই গানটাই।"

"গেয়ে শোনাবি? আহা, তবে শোনা দিদি, শোনা! জন্মের মত কান আমার সার্থক ক'রে যাই!"

একটু কাল নীরব থাকিয়া চক্ষু দুটি বুজিয়া ঊর্ম্মি কি

ভাবিল। তারপর যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া এই গানটি গাহিল,—

(সিন্ধু)

"শ্মশানে শবশিবের বুকে
শ্যামা মা ওই দাঁড়িয়েছে,
মায়ের রাঙা পায়ে বিল্বদলে
রক্তজবা কে দিয়েছে।
সীমন্তে সিন্দুরশোভা
রক্ত চন্দন রক্ত জবা
এলোকেশে থোপা থোপা
আ মরি কে পরিয়েছে।
কার গাঁথা ওই অপরাজিতার
মোহনমালা সুনীল শোভায়
রুধির চর্চ্চিত বুকে
মুণ্ডমালায় ওই দুলিছে।
নরকর-কাঞ্চী ঘিরে
রক্তকমল থরে থরে
কটি পরে কিঙ্কিনী যে
ভ্রমর গাঁজে ওই বাজিছে।
বিকট দশন লোলরসনা
অসি মুণ্ডে বিভীষণা—
আবার বরাভয় করে ওই
মায়ের চোখে মা হাসিছে।

যুক্তকরা ভাগীরথীর নিমীলিত নয়নদুটি হইতে ঝরে ঝরে অশ্রু ঝরিল; উর্ম্মির নয়নদুটিও অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে গেল। চক্ষু পুছিতে পুছিতে ভাগীরথী কহিলেন, "আহা, কি গানই শুনলাম, আর ত শুনতে পাব না। মনে মনে কেবল পুড়েই মরব। তাই ভাবছি উর্মি, কেন ম'রতে এখানে এসেছিলাম। দেশে ছিলাম, বেশ ছিলাম, পুজো-আহ্নিক জপ-তপ ক'রতাম, দিনগুলো এক রকম কেটে যেত। এসে ত কেবল জ্বালা বাড়িয়েই গেলাম।"

"না না দিদিমা, অমন কথা বলো না। জ্বালা? কিসের জ্বালা তোমার? কি এমন জ্বালা! এই গান! কি আর এই একটা গান! তোমার মনভরে রাতদিন যে শ্যামা-সঙ্গীতের সুর বাজছে, তার কাছে এ গান কি? তাতেই তোমার মন ভরপুর হ'য়ে থাকবে, এ গানের কথা ভুলিয়ে রাখবে। এসেছিলে, কত বড় যে একটা মঙ্গল আমার হ'য়েছে, সে আর ব'লতে পারি না দিদিমা। অন্ধ হ'য়ে ছোট একটা গণ্ডীর ভেতরে বাঁধা ছিলাম, নূতন দৃষ্টি দিয়ে সে বাঁধন থেকে তুমি আমাকে মুক্ত ক'রেছ, এর চাইতে বড় কাজ কেউ আমার কখনও ক'রতে পারে নি। তোমাদের একটা বইতে সেদিন প'ড়ছিলাম—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

"ও ত গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র।"

"হাঁ, তাই বটে। অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ যে, জ্ঞানের অঞ্জন শলাকায় তার চক্ষু যিনি খুলে দেন তিনিই গুরু। দিদিমা, সেই শ্লোক প'ড়ে আমার কি মনে হ'য়েছিল জান?"

"কিলো? গুরু ক'রে কারও কাছে মন্তর নিবি নাকি, তা বিয়েই আগে হ'ক।"

উর্ম্মি কহিল, "মন্তর পাইনি, গুরু পেয়েছি। বিয়ে সে যখন হয় হবে, না হয় না হবে। কিন্তু সেই গুরুর কাছে মন্তর কি ঐ রকম একটা কিছু চাই, যার আশ্রয় ধ'রে দাঁড়াতে পারি, দারুণ যে একটা ক্ষুধা মনে জেগেছে তার খোরাক কিছু নাই। বই-টই প'ড়ে সেটা মেটাবার চেষ্টা কিছু করতাম। কিন্তু তাও আর সুবিধে হবে না। মা বড় বাদী। তাই ঐ রকম একটা মন্তর-টন্তর কিছু বড় দরকার আমার হ'য়ে প'ড়েছে দিদিমা।"

"কেলো? কাকে এমন গুরু পেলি?"

"তোমাকে! তুমিই আমার গুরু দিদিমা! মন্তর দেবে?"

"ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! দূর হ' আবাগী? অমন পাপ কথা মুখে আনতে আছে?"

"পাপ কথা? পাপ কথা কি দিদিমা? সত্যি ব'লছি, তুমিই আমার গুরু। অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমার চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় খুলে দিয়েছ তুমি। তাই ব'লছি, মনের কথাই ব'লছি, তুমিই আমার গুরু।"

"পাগল হয়েছে মেয়ে! নইলে এমন কথাও মুখে আনে? আমায় ব'লে কি না গুরু! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! পাগল আর কাকে বলে?"

"পাগল ! হাঁ, বাঁধা চ'লতি পথ ছেড়ে নূতন আলোয় নূতন পথ দেখে তাই যদি কেউ ধরে, তাকে লোকে পাগলই বলে। কিন্তু পাগল সত্যি সে, না যারা তাকে পাগল বলে তারা, সেটা ঠিক করে কে বলবে ? তা ধর পাগলই হয়েছি। এই পাগলা বাইটা আমার মিটিয়েই না হয় দেও দিদিমা ?"

ভাগীরথী কহিলেন, "বলিস্ কি উমি ? আমি কি করে তা মেটাব ? মন্তরের আমি কি জানি ? আর তোর বিয়ে হয় নি, সোয়ামীর অনুমতি পাস্ নি—"

"তাই বলে কি এই ক্ষুধা নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে দিদিমা ? তাও কি কেউ পারে ? বিয়ে না হ'ক, বয়েস ত কম হয় নি। কি জান দিদিমা মনটা আমার বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছে। মা যত তাড়না করছেন, যত জোর করে টেনে রাখতে চাইছেন,—ততই মনটা আমার ছটফট করে নূতন এই পথের দিকে ছুটে যেতে চাইছে। অবিশ্যি ঠিক বুঝতে এখনও পারছি নি বরাবর এ পথে চ'লতে পারব কি না। তবে দেখতে চাই, সাধনার একটা অবলম্বন যদি পাই, সেইটে ধ'রে দেখতে চাই, চ'লতে পারি কি না, কতদূর পারি। বিয়ের কথা ব'লছ ? কি বুঝে কাকে বিয়ে করব দিদিমা ? সে যা চাইবে তা যদি না দিতে পারি ? সেও যদি আবার উল্টো এক পথে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চায় ? বাবাও বিয়ের কথা বলছিলেন, আমি রাজী হয় নি। মনের প্রবৃত্তি আমার ঠিক কোন্ পথে চলে, কোন সাধনায় কিসে স্থির হয়, তৃপ্তি একটা পাই, সেটা ঠিক না বুঝে বিয়ে কাউকে আমি ক'রতেই পারি না। এই একটা পথ সামনে পেয়েছি, মনে এক একবার হয় এই-ই আমার পথ। কিন্তু তবু এর মন্ত্র পেয়ে তার সাধনায় বুঝে নিতে চাই, সত্যি এই আমার পথ কি না।"

কথাগুলির মর্ম্ম ভাগীরথী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না। একটু কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "কি জানিস্ উর্ম্মি, সোয়ামীর ধর্ম্মই হ'ল মেয়ে মানুষের ধর্ম্ম—"

"না, তা জানি না, সেটা ঠিক বুঝতেও পারছি নি। হ'তে পারে, ছেলে বেলায় কারও হাতে দিলে, তার মনমতই মনটা মেয়ে মানুষের গ'ড়ে ওঠে। কিন্তু আমার তা হয় নি। এখন আর হ'তেও পারে না। নিজের একটা ধর্ম্ম আমার চাই, সাধনার একটা ভূমিতে নিজেরই আমাকে মনটাকে বসাতে হবে। বিয়ে যদি ক'রতেই হয়, সেটা ভাবব তার পরে না হয় ক্ষতি নেই। নিজের একটা ধর্ম্ম নিজেকেই আঁকড়ে ধ'রতে হবে এখন আমাকে।"

ভাগীরথী কহিলেন, "তোর সব কথা আমি ভাল বুঝতে পারছি নি উমি,—তা কি ক'রতে চাস তুই ?"

উর্ম্মি উত্তর করিল, "একটা কিছু উপায় আমাকে ব'লে দেও—কত ত পূজো, বার-ব্রত, জপ-তপ কর। শাস্ত্রে পণ্ডিত না হও ভক্তির সাধনা অনেক ক'রেছ, অনেক তার এগিয়েছ। সেই ভক্তির সাধনা ক'রতে পারি, এমন একটা কিছু মন্তর, আর সেই মন্তর ধ'রে একটা কিছু কর্ম্মের পথ আমায় ব'লে দেও। দেখি, কিছু ক'রতে পারি কি না।"

"হুঁ।—তা কুমারীরাও শুনেছি শিবপূজো ক'রতে পারে। আর সেটা মেয়েমানুষ আমরাও ব'লে দিতে পারি।"

উর্ম্মি একটু হাসিয়া কহিল, "কেবল তা কেন দিদিমা ? এই ত সেদিন প'ড়ছিলাম, স্ত্রী-গুরুর কাছেও সবাই মন্তর নিতে পারে। ফল নাকি তাতে আরও বেশী।"

"ওমা, তিনি হ'লেন দেবতা, থাকেন মাথায় সহস্রারে মহাপদ্মে—"

"হাঁ, গুরুকে মাথায় সহস্রারে মহাপদ্মেই—না কি তার কেবল নীচে একটা শ্বেতপদ্মে ধ্যান করতে হয়। সেই না কি গুরুর স্থান। তা, তিনি হ'লেন গুরু বুদ্ধি কি গুরুর তত্ত্বমূর্ত্তি। তা সে যাই হ'ক; মানুষ মানুষকেই গুরু বলে মানে, তাঁর কাছেই মন্তর শেখে, সাধনা শেখে।"

"তাই ত সবাই করে থাকে। মাথায় যিনি থাকেন, তাঁকেই গুরুর ভেতর দেখতে হয়।"

"সেটা যেমন পুরুষ গুরুতে, তেমনি মেয়ে গুরুতেও দেখতে হয়। কেন, মেয়ে গুরুতে মন্তর দেয়, তা কি দেখনি কখনও ?"

"দেখিনি। তবে—হাঁ, শুনেছি বটে। হাঁ, মনে প'ড়েছে। মার কাছে শুনেছিলাম,—অনেক দিনের কথা কিনা মনে ছিল না, তা একদিন কি কথায় কথায় ব'লে-ছিলেন, তাঁর মামা বাড়ীতে, কে কে তাঁদের গুরুঠাকুরুণের কাছে মন্তর নিয়েছিলেন। গুরু ছিলেন নিঃসন্তান—শেষে

বিবাগী হ'য়ে যান। আর ঠাকুরুণটিরও নাকি পুজো, মন্তর, জপ-তপে বেশ জ্ঞান ছিল।"

"নেও ঘুচল ত মনের ধাঁধা। তা হলে তুমিই আমার গুরুঠাকরুণ হও।"

"ওলো আবাগী, আমি কি সেই যুগ্যির একটা মানুষ? হাঁ, শিবপুজো নাকি সোজা,—সবাই করতে পারে, সবাই ব'লে দিতে পারে—তা তুই কি পুজো করতে পারবি তোদের বাড়ীতে।"

"পুজো—কি ঐ শিব গড়িয়ে ফুল, জল,বেলপাতা নিয়ে? না, দিদিমা, সে হবে না। তা ও সব ঘটা ছাড়া মনে মনে চুপচাপ কিছু করা যায় না?"

"তা যাবে না কেন? ধ্যান ধারণা, মানস পুজো, মন্তর জপ—এই সবই ত হ'ল আসল কাজ। আর ঐ যে ফুল, জল নিয়ে পুজো, সে হ'ল বাহ্যিক পুজো—বাইরের একটা ধ'রবার লক্ষ্যি—নইলে মন বসে না, তাই। শুনেছি, শাস্তরে নাকি আছে, ওগুলো অধম পুজো—অধমেরও অধম। তবু পুজো ত বটে।"

"ও বাবা!—কেবল অধম নয়, অধমেরও অধম?—তা তোমরা সবাই ত এই অধমেরও অধম পুজো নিয়েই কেবল আছ।"

"কি করব দিদি, মানুষ যে আমরা অধমেরও অধম।

"তা সে যাই হ'ও, মনে মনে কি ক'রতে পারি আমায় ব'লে দিতে পার?"

"তোরা ত কত বই-টই পড়িস, শিবের ধ্যানটা শিখে নিস। মনে মনে সেই ধ্যান প'ড়ে ভক্তি ক'রে তাঁকে ভাবিস্, আর এই মন্তরটা জপ করিস্।"

বলিয়া উর্ম্মির কাণের কাছে মুখ নিয়া শিবমন্ত্রটি উচ্চারণ করিলেন। মন্ত্রটীতে এমন বড় তত্ত্বরহস্য যে কিছু আছে, তা নয়। কিন্তু ভাগীরথীর মুখে ভক্তিতে উচ্চারিত সেই মন্ত্র যেমন কাণে গেল, সমস্ত দেহ উর্ম্মির অননুভূতপূর্ব্ব একটা রোমাঞ্চকর আনন্দপ্রবাহে শিহরিয়া উঠিল। মন্ত্রদাত্রীর চরণে প্রণিপাত করিয়া উর্ম্মি কহিল, "আশীর্ব্বাদ কর দিদিমা, এই মন্ত্র আমার সার্থক হ'ক।"

উর্ম্মিকে আলিঙ্গন করিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "মহাদেব মনোবাঞ্ছা তোর পূর্ণ করুন উর্মি। আর শোন্, এই মন্তর প'ড়ে দুবেলা মহাদেবকে প্রণাম ক'রবি—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

শুনেছি ভগবতী উমা মহাদেবকে পতি পাবেন ব'লে যে আরাধনা করেন, স্তব ক'রে এই মন্তর ব'লে তাকে প্রণাম ক'রেছিলেন। তুইও করিস, মহাদেবের মত পতি পাবি। ওলো, মেয়ে জন্মে তার বড় ভাগ্যি আর কিছু নেই।"

[ক্রমশঃ

কৃত্তিবাস

শ্রীকালিদাস রায়

দুই

বাঙ্গালা রামায়ণের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। ইহাতে বার বার অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। যে দুর্ঘটনা ঘটিবে, পূর্ব্বে তাহার একটা করিয়া স্বপ্ন যোজিত হইয়াছে। যে যাত্রার কুফল হইবে—সে যাত্রার প্রারম্ভে কতকগুলি দুর্লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে। যাহা পরে ঘটিবে তাহা কাহারও না কাহারও অভিশাপের ফলেই ঘটিতেছে—এইরূপ দেখানো হইয়াছে। মূল রামায়ণে এ সমস্ত একেবারে নাই তাহা নহে। কৃত্তিবাস এইগুলির সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। যেমন তারার অভিশাপ—মন্দোদরীর অভিশাপ—মূলে নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাব বাঙ্গালা রামায়ণে কিছু বেশি। বাঙ্গালা দেশের অনেক কুসংস্কারের কথাও বাঙ্গালা রামায়ণে ঢুকিয়াছে—যেমন বাসি বিবাহের দিনে দশরথের পত্নীসম্ভাষণের ফলে সুমিত্রার দুর্ভাগ্য, অবিবাহিতা অবস্থায় কোন বালিকার রজঃস্বলা হওয়ার জন্য অঙ্গরাজ্যে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি ইত্যাদি।

বাঙ্গালা রামায়ণে প্রাকৃতিক আবেষ্টনী বর্জ্জিত হইয়াছে। এই আবেষ্টনীর পট-পরিবর্ত্তনে দেশকালের যে নির্দ্দিষ্ট পবিচয় মূল রামায়ণে আছে, বাঙ্গালা রামায়ণে তাহা পাওয়া যায় না। তাহাতে মনে হয়, সমস্ত ঘটনাই যেন বাঙ্গালা দেশেই ঘটিয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী ও পটভূমিকা যে কবিত্ব সৃষ্টির সহায়তা করে, চরিত্রচিত্রগুলি পরিস্ফুট করিতে সহায়তা কবে, বাঙ্গালী কবি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। প্রকৃতির সহিত মানব-জীবনের, মানব-চরিত্রের ও মানব-হৃদয়ের যে সুগভীর যোগ মূল রামায়ণে দেখা যায়, বাঙ্গালা রামায়ণে তাহা নাই। ঋতুতে ঋতুতে মানুষের বেদনারও রঙ বদলায়—একথা বাঙ্গালী কবিরা যে বুঝিতেন না তাহা নয়, সে জন্য তাঁহারা বারমাস্যা রচনার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। রামায়ণের কবি সে দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর পান নাই। মূল রামায়ণে শীত, বর্ষা ও শরৎ এই তিন ঋতুতে বেদনার কিরূপ রূপান্তর ঘটে তাহা অতি বিশদ করিয়াই দেখানো হইয়াছে।

বাল্মীকির রামচন্দ্র আদর্শ মানুষ-পুরুষোত্তম, তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ এ কথা তাঁহার মনেই থাকিত না। বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বিদ্বান্, মহাবলাক্রান্ত, মহাত্মা, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন? তাহার উত্তরে নারদ রামের নাম করিয়াছিলেন। অগস্ত্য নানা উপাখ্যান বিবৃত করিয়া রামচন্দ্রকে উত্তরাকাণ্ডে বুঝাইয়া দিলেন, তিনি স্বয়ং ভগবান।

কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র গোড়া হইতেই ভক্তবৎসল ভগবান। তাঁহাকে একথা মুহুর্মুহুঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি বৈরীও রণক্ষেত্রে সে কথা তাঁহাকে স্তবস্তুতির দ্বারা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের চরিত্রের দৃঢ়তা ও রুক্ষতাকে অনেকটা কোমলায়িত করিয়া আনিয়াছেন।

বাল্মীকির সীতা তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়বালা, কৃত্তিবাসের সীতা চিরদুঃখিনী বঙ্গবধূ।

কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ করেন নাই, বিষয়-বস্তুর অবিকল অনুসরণ করেন নাই, উপাখ্যানটিকে মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন, অনেক আখ্যানকে আগে পিছে বসাইয়া লইয়াছেন, কোন আখ্যানকে অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন, কোনটিকে অতিবিস্তরে বিবৃত করিয়াছেন, বাল্মীকির অনেক আখ্যান-অংশ বর্জ্জন করিয়াছেন, নূতন নূতন গল্প সংযোজন করিয়াছেন। ফলে এ গ্রন্থকে নূতন সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। তপোবনবাসী বাল্মীকির রামায়ণের বাঙ্গালার চালাঘরে যেন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। মনে হয়, এই রামায়ণী কথা বাঙ্গালার মাটি চিরিয়া সীতা দেবীর মত জন্ম লাভ করিয়াছে। তাপসী বেদবতী যেন হলের মুখে মাটি হইতে সীতারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে।

বাঙ্গালার আবহাওয়া, ফলফুল, ঘর-দ্বার, বেশভূষা, ভক্ষ্য-ভোজ্য, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-আমোদ, রীতি-নীতি, নারী প্রকৃতি এ সমস্ত ওতপ্রোত ভাবে এই রামায়ণের মধ্যে অনুস্যূত—ফলে ইহা বাঙ্গালারই নিজস্ব সম্পদ।

কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের দার্শনিক অংশ, তত্ত্বমূলক বাদানুবাদের অংশ, বিচার-বিশ্লেষণের অংশ ও সর্ব্ববিধ আলঙ্কারিকতা বাদ দিয়াছেন। কেবল কাঠামোটিই লইয়াছেন। এই কাঠামো অবলম্বন করিয়া তিনি বাঙ্গালার মাটি দিয়া প্রতিমা গড়িয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণী কথা চিন্ময়ী নয়, শিলাময়ী নয়, ধাতুময়ী নয়, দারুময়ীও নয়, মৃন্ময়ী।

এই রামায়ণের অনেকাংশ শিশুচিত্ত-রঞ্জনের জন্য লিখিত। কৃত্তিবাসের সময়ে বাঙ্গালী জাতির চিত্তটা অনেকটা যেন শিশুচিত্তের মত সরল, কল্পনাপ্রবণ ও কৌতূহলী ছিল। সে চিত্তের বিশ্বাস করিবার শক্তিও ছিল যেমন অগাধ, যে কোন সত্যাসত্য প্রাকৃত-অপ্রাকৃত কাহিনী হইতে আনন্দ পাইবার শক্তিও ছিল তেমনি অপরিসীম।

তাহাদের কাছে পৃথিবীটা খুব বড় ছিল না। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সব ছিল একটি দেশেরই অন্তর্গত—ত্রিলোকের মধ্যে যাতায়াতের কাল্পনিক পথটাও বিশেষ দুর্গম ছিল না। দেবাসুর যক্ষ রক্ষঃ অপ্সরা কিন্নর পশু পক্ষী দৈত্য দানব সমস্তই তাহাদের মনে একই গোষ্ঠীর জীব ছিল। এক মহাজাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি থাকে—ইহাও যেন তেমনি। সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রীতি-নীতি সকলেরই এক এবং আত্মপ্রকাশের ভাষা হইতে তাহারা কাহাকেও বঞ্চিত করিত না। দেশ ও কালের দূরত্ব তাহাদের কল্পনা-প্রবণ চিত্তে লোপ পাইয়াছিল। কখনও তাহারা এ-দূরত্ব লৌকিক পরিমাপের সাহায্যে মাপে নাই। তাহাদের কল্পনার মতই যক্ষ, রক্ষ, নর, পশু, প্রাণী সকলেই ছিল কামচারী ও কামরূপ। কোন আকৃতি কোন আয়তনই তাহাদের কাছে অসম্ভব ছিল না। বহু বুঝাইতে তাহারা যে কোন সংখ্যা ব্যবহার করিতে পারিত। বহুদিন তপস্যা বলিতে তাহারা বুঝিত দশহাজার বৎসর তপস্যা, বহুদিন রাজত্ব বলিতে বুঝিত পাঁচ হাজার বৎসর রাজত্ব, বহুক্রোশ বলিতে তাহারা বুঝিত লক্ষ যোজন, বহুলোক বলিতে বুঝিত বিশ কোটি লোক। সূর্য্য চন্দ্র ছিল—ঘরের অতিথির মত। অক্ষুণ্ণ যৌবন, অলৌকিক রূপ-লাবণ্য, কুবেরের সম্পদ্—এ সব এত দুর্লভ ছিল না। অসম্ভব হইতে আনন্দ লাভের কোন বাধাই ছিল না।

এইরূপ পাঠক পাইয়াছিলেন বলিয়া কৃত্তিবাস এই ধরণের রামায়ণ লিখিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার রামায়ণ এত লোকবল্লভ হইয়াছিল। এখনও যে আমরা আনন্দ পাই তাহা শুধু উপাখ্যান ভাগের জন্য নয়—এ রামায়ণ হাতে করিয়া আমরা আমাদের বিস্মৃতপ্রায় শিশুচিত্তকে আগেই উদ্বোধন করিয়া লই বলিয়া।

কৃত্তিবাস রামায়ণের চরিত্রগুলিকে আমাদের কাছে জীবন্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহারা দেশকালের দূরত্ব বিলোপ করিয়া আমাদের ঘরের মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাস চরিত্রগুলির পৌরাণিকতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে ঐতিহাসিকতা, ঐতিহাসিকতা কেন—প্রত্যক্ষ বাস্তবতা দান করিয়াছেন। ইহা সম্ভব হইয়াছে—কবি আমাদের নিজেদের চিরন্তন সুখ-দুঃখ, চিন্তা-অনুভূতি, বৃত্তিপ্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন এবং আমাদের মুখের বাণীই তাহাদের মুখে বসাইয়াছেন বলিয়া। জীবন্ত মানুষের বাণীই চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

রামভক্তি প্রচার কৃত্তিবাসের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ভক্তি তিনি ভক্তের সাহায্যেও যেমন প্রচার করিয়াছেন—মহা বৈরীর মুখ দিয়াও তেমনি প্রচার করিয়াছেন। রামচন্দ্রও যে স্বয়ং ভগবান একথা আমাদিগকে একমুহূর্ত্তও ভুলিতে দেন নাই। তাহার ফলে তাঁহার প্রসঙ্গের কোন কথাই আমাদের কাছে অসম্ভব হইতে পারে নাই। *

রাবণবধ করিবার জন্যই ভগবান অবতীর্ণ, পাছে একথা মনে না থাকে, সেজন্য মাঝে মাঝে দেবতাদের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করিতে হইয়াছে। রামের জীবনে দুর্ঘটনা না ঘটিলে রাবণ বধ হইবে না—দেবতারা দুর্ঘটনা ঘটাইবার জন্য ব্যস্ত। ফলে রামের সকল শত্রুই একটি বিরাট মঙ্গলময়ী পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

---

* রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—রামায়ণের আদি কবি গার্হস্থ্য-প্রধান হিন্দু-সমাজের যত কিছু ধর্ম্ম, রামকে তাহারই অবতার বলিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-রক্ষকরূপে অবশেষে রাজারূপে বাল্মীকির রাম লোকপূজ্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। আদি কবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তখন যদিচ রামের চরিত্রে অতি প্রাকৃত মিশিয়াছিল, তবু তিনি মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অতিপ্রাকৃতকে একজায়গায় স্থান দিলে তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে ক্রমেই বাড়িয়াই চলে। এমনি করিয়া রাম ক্রমে দেবতার পদবী অধিকার করিলেন। তখন রামায়ণের মূল সুরটার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন প্রবেশ করিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"রামকে দেবতা বলিলেই তিনি যে-সকল কঠিন কাজ করিয়াছিলেন তাহার দুঃসাধ্যতা চলিয়া যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়ান্ করিবার জন্য সেগুলির বর্ণনা যথেষ্ট হয় না। তখন যেভাবের দিক দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয়বস্তু হয়, কাজেই সেই ভাবটাই প্রবল হইল। এই ভাবটি ভক্তবৎসলতা। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন, বনের পশু-বানরগণকে তিনি প্রেম দিয়া ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাঁহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত, রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার হাতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।"

রামের জন্য ও সীতার জন্য আমরা যত অশ্রুপাতই করি—রামের মহাশত্রুর উপরও আমাদের রাগ করিবার উপায় নাই।

কৈকেয়ী তাই বলিতেছেন—

"বনে গেলে দেবতার কার্য্য সিদ্ধি লাগি।
আমারে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী।"

ইহা ছাড়া, বাঙ্গালীর মজ্জাগত অদৃষ্টবাদ আছে। সবই যখন নিয়তির লীলা। স্বয়ং ভগবানও এই নিয়তির হাত হইতে নিস্তার পাইতেছেন না। রাগ করিবে কাহার উপর? অশ্রুপাত ছাড়া আর উপায় কি?

চিরদুঃখী জাতি স্বয়ং ভগবানেরও দারুণ দুঃখ ক্লেশ, অপরাজেয় মহাবীরেরও পতন, স্বয়ং লক্ষ্মীরও ভিখারী বেশ। রাজকন্যা, রাজমহিষী, রাজবধূরও দারুণ যাতনা-পীড়ন ইত্যাদির কথা শুনিয়া সান্ত্বনাই পাইয়াছে। এমন কি মহা-মহা-তপস্বীরও পদস্খলনের কাহিনী শুনিয়া নির্বেদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। নিজেরা আশ্বস্ত হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা লক্ষ্য করি—কলহ, গালাগালি ভোজনলুব্ধতা, স্বর্ণলোভ ও নারীপীড়ন—এই কয়টি বিশেষ প্রবল। জাতির রুচিপ্রবৃত্তির চাহিদাতেই এইগুলি প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। কৃত্তিবাসের কাব্যে এইগুলি সম্বন্ধে ব্যত্যয় হয় নাই। যেখানে কলহ ও গালাগালির প্রয়োজন হইয়াছে, কৃত্তিবাস সেখানে খুবই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কাব্য এসকল ক্ষেত্রে খুবই জোরালো হইয়াছে ভোজনের চিত্রগুলিও ভোজনলুব্ধ জাতির প্রীতিকরই হইয়াছে। সমগ্র কাব্যে যেরূপ সোনার ছড়াছড়ি—সেরূপ অন্য কাব্যে দেখা যায় না। আর নারী-পীড়নের ত কথাই নাই।

আর একটি অঙ্গ অশ্লীলতা। রামায়ণে অশ্লীলতা স্বাভাবিক ভাবে আসিবার কথা নয়। মূল উপাখ্যানে কোথাও অশ্লীলতার অবসর নাই। ইহাও পাঠক-সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যই প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মূল রামায়ণে যে যে উপাখ্যানে অশ্লীলতা নাই, কৃত্তিবাস সে সে অংশে অশ্লীলতার সৃষ্টি করিয়াছেন, মূল রামায়ণে যেখানে অশ্লীল কথা ঐতিহাসিক ঔদাসীন্যের সহিত বিবৃত হইয়াছে, কৃত্তিবাস তাহাকে রসালো ও ঘোরালো করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মূল রামায়ণে সংস্কৃত ভাষায় যাহা কুরুচিকর ছিল না, তাহা আমাদের গ্রাম্য সহজ সরল ভাষায় কুরুচিকর হইয়া পড়িয়াছে। অলঙ্কৃত ভাষা ব্যবহার না করিয়া সরল ভাষায় লিখিতে গেলে এ বিপদ আছেই।*

বাঙ্গালী চরিত্র কবি বিশেষরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কি চায় তাহা জানিতেন, তাই তিনি বাঙ্গালীর পক্ষে মুখরোচক অনেক নব নব নিবন্ধ ইহাতে যোগ দিয়াছেন—নানা পুরাণ হইতেও তদুপযোগী উপাদান আহরণ করিয়াছেন এবং আটচালাভরা বাঙ্গালী শ্রোতাদের যাহা রোচনীয় হইবে না, তাহাবাদ দিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই শ্রেণীর লোক আছে; এমন ভাবে গ্রন্থখানি উপন্যস্ত হইয়াছে, যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের লোকের অপ্রীতিকর হইবার কথা নয়। বাঙ্গালা রামায়ণ প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পাঠ্য হইতে পারিয়াছে; চৈতন্য-ভাগবত তাহা হয় নাই, শিরায়ন তাহা হয় নাই।

বাঙ্গালায় যদি কোন মহাকাব্য থাকে, তবে তাহা এই কৃত্তিবাসের তথাকথিত রামায়ণ। আমি মহাকাব্য বলিতে গ্রীক বা সংস্কৃত আলঙ্কারিকের সংজ্ঞা অনুসরণ করিতেছি না। ইহাতে একটি মহাদেশের, মহাজাতির, মহাপুরুষের, মহীয়সী মহিলার ও মহাবীরের জীবনকাহিনী বাণীরূপ লাভ করিয়াছে

---

* কৃত্তিবাসের প্রাচীন পুঁথিতে অশ্লীলতা ছিল ঢের বেশী—মুদ্রিত রামায়ণে অনেক কমিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী—ঢাকাই সংস্করণে দ্রষ্টব্য।

বলিয়া ইহাকে মহাকাব্য বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"মূল আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বাল্মীকির হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালা সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।"

রামায়ণে যত যুদ্ধবিগ্রহই থাকুক, যত ঘটনা—জটিলতাই থাকুক, যত জ্ঞান-ভক্তির কথাই থাকুক, মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিই ইহাতে প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। প্রেম, স্নেহ, মৈত্রী, ভক্তি, দাস্য, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সমগ্র কাব্যখানিকে পুষ্পিত ও পল্লবিত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত ঘটনা অসত্য হইতে পারে, এগুলি অসত্য নয়। নিজস্ব চিরন্তনতা ও সার্ব্বজনীনতা এই গুলিকে পরম সত্য করিয়া রাখিয়াছে। কবি বলিয়াছেন, রাবণের চিতা আজিও জ্বলিতেছে—এ চিতার সমিধ কি? দশরথের হাহাকার, সীতার আর্ত্তনাদ, রামের প্রেমোন্মাদ, লক্ষ্মণের নেত্রজ্বালা, ভরতের তপশ্চটা, সুগ্রীব-বিভীষণের আকিঞ্চন, হনুমানের অন্তর্গূঢ় বেদনা—সমস্ত মিলাইয়া এই চিতার সৃষ্টি করিয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ এদেশের লোককে শুধু আনন্দ দেয় নাই, ইহা লোকশিক্ষার একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠানের কাজ করিয়াছে। বাঙ্গালী জনসাধারণ ইহা হইতে গার্হস্থ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি লাভ করিয়াছে এবং সত্যনিষ্ঠতার দীক্ষা লাভ করিয়াছে। কৃত্তিবাস রামায়ণের চরিত্রগুলি জীবন্ত সত্য রূপে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে। ইহা আমাদের দেশের ভাষারও পুষ্টি সাধন করিয়াছে, ভাব-প্রকাশের বহু ব্যঞ্জনাময় সঙ্কেত আমরা এই রামায়ণ হইতে পাইয়াছি, তাই কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে বহু লক্ষ্যার্থক বাক্যগুচ্ছের সৃষ্টি। কালনেমির লঙ্কা ভাগ, রাবণের চিতা, কাঠবিড়ালীর সাগরবন্ধন, ঘরের শত্রু বিভীষণ, বানরের গলায় মুক্তামালা, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে, দেবর লক্ষ্মণ, ধনুর্ভঙ্গ পণ, মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ, রাম-রাজত্ব, লঙ্কাকাণ্ড, ব্রহ্মাস্ত্র, ধর লক্ষ্মণ, ফল ধর, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস (রাবণ), রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা, একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর, শাপে বর, রাবণের চিতা, গন্ধমাদন ইত্যাদি বহু লক্ষ্যার্থক পদগুচ্ছ আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতেই আমাদের দেশে বহু কাব্য, নাটক, কবিতা, গান ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথও এই রামায়ণকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। মাইকেল তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় কৃত্তিবাসের কাছেই ঋণী। তিনি কৃত্তিবাসের উদ্দেশ্যে একটি সনেট রচনা করিয়া সে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যা' একটি চমৎকার কবিতা। অহল্যার পাষাণে পরিণতি বাল্মীকির রামায়ণে নাই, কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে। রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাস হইতেই এই কবিতার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতার মূলসূত্র কৃত্তিবাস হইতেই আহৃত বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে জলে ও শস্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়া যেমন আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল যোগাইয়া আসিয়াছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত তেমনি করিয়া চিরদিন আমাদের মনের অন্নপানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থ না থাকিলে আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কিরূপ শুষ্কতা ও চিরদুর্ভিক্ষ বিরাজ করিত, তাহা আজ আমাদের কল্পনা করাও কঠিন।"

কৃত্তিবাসের পয়ারের কি রূপ ছিল দেখাইতে হইলে পুঁথির পাঠ হইতেই দেখাইতে হয়।

৮+৬—এ-তে-ক ব-লি-য়া রা-জা | গে-ল-অ-ন্তঃ-পু-রী।
হে-ন-কা-লে থাই-যা আই-ল | সু-মি-ত্রা সু-ন্দ-রী।
উ-ভা ল-ড়ে আই-ল দে-বীর | ব-হে ঘ-ন শ্বা-স।
কি-বা দ্র-ব্য থাই-তে রা-জা | ক-রে-ন আ-শা-স।
স্বা-মীর অ-প্রি-য় না-রীর জী | ব-নে নাই-ক কাজ।
সু-মি-ত্রা-র বা-ক্যে দুই-না | রী-এ পাই-ল লাজ।

লক্ষ্য করিতে হইবে, অধিকাংশ স্থলে এক একটি পদাংশ (Syllable) কে মাত্রা ধরা হইয়াছে। অই, উই ইত্যাদিকে ঐকার, ঔকারের মত এক একটি দীর্ঘস্বর ধরা হইয়াছে। মীর্, বীর্, ইত্যাদিকে একমাত্রা ধরা হইয়াছে। এই প্রথা প্রাচীন পয়ারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসৃত হইয়াছিল। পয়ারের এই পদ্ধতি হইতেই পদাংশমাত্রিক পয়ার বা ছড়ার ছন্দের

সৃষ্টি হইয়াছে। আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ড হইতে দেওয়া যাইতে পারে।

দুই-বা-লক্ গীত গা-য়ে যে-ন | অ-মৃ-তে-র ক-ণা।
স-প্ত-স্ব-রে গী-ত গা-য়ে | বা-জে ম-ধু-বীণা।
দ-শ-র-থের্ ম-রণ গা-রে | রা-মের্ ব-ন-বা-স।
গী-ত শু-নি লো-ক স-ব | ছা-ড়ু-য়ে নি-শ্বা-স॥

এখানে দুই, লক, গীত, থের, রণ, মের—এইগুলিকে পদাংশ (Syllable) ধরিয়া এক মাত্রায় ধরা হইয়াছে। অবশ্য সব ক্ষেত্রে এ নিয়ম রক্ষা হয় নাই। যেখানে সে নিয়ম রক্ষা হয় নাই, সেখানে হসন্ত বর্ণকে স্বরান্ত করিয়া পড়া হইত, যেমন ‘অমৃতে রো’ ‘গীতো শুনি লোকো সবো ছাড়য়ে নিশ্বাস’ এইরূপ আবৃত্তি করা হইত।

এইবার কৃত্তিবাস যাহাকে লাচাড়ি বলিয়াছেন, সে ছন্দের একটু পরিচয় দিই—

বাছা, আর না জাহিহ তপোবনে।
জানিআ শুনিয়া মুনি পণে দিলেন সে মেলানি
মথে বসি থাক দুই জনে।
পূর্ব্বে বিষ্ণু আরাধিআ পৃথিবীতে জনমিআ
বাড়িলাঙ জনকের ঘরে
পিতা বড় নিদারুণ বিষম করিল পণ
হরধনু ভাঙ্গিবার তরে।

ইহা সম্পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদী। আর এক প্রকার লাচাড়ি পুঁথির পাঠে দৃষ্ট হয়, তাহা ৮ মাত্রার পর্ব্ব ও ৭ মাত্রার পর্ব্বের মিশ্রণ।

এহেন পুরীকে আর | কবেবা আসিব আর | শূন্য হইল পুরী | খান
নৃপতি দশরথ | মদনে উন্মত্ত | কেকয়ে দিলেন বর | দান।

ইহাকে দীর্ঘ ত্রিপদীতে আনিতে হইলে লিখিতে হয়—

এহেন পুরীকে আর | কবে বা আসিব আর | শূন্য হৈল ছই পুরী | খান
নরপতি দশরথ | মদনে উন্মত্ত চিত | কেকয়ে দিলেন বর | দান।

ইহাকে ৭ মাত্রার চর্চ্চরীতে পরিণত করিলে লিখিতে হয়।

এহেন পুরী আর | আসিব কবে আর | শূন্য হ'ল পুরী | খান
নৃপতি দশরথ | মদনে উন্মত্ত | কেকয়ে দিল বর | দান।

প্রচলিত রামায়ণে লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, পয়ার ইত্যাদি নির্দ্দোষ। জয়গোপাল পণ্ডিত ইহার মধ্যে মাল-ঝাঁপ ছন্দও ঢুকাইয়াছেন।

ভগ্নপাত্র। বায়ুপুত্র। সিন্ধু তরিবারে। করি লীলা। বাড়াইলা। আপন কায়ারে

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালী জাতির জীবনগঠনে কি সহায়তা করিয়াছে—তাহা কবিতার ছন্দেই বলি—

বাংলার বাল্মীকি কবি দেবীর আদেশ লভি
শুভক্ষণে কবে নাহি জানি,
সীতার নয়ন জলে বসিয়া অশোকতলে
লিখেছিলে রামায়ণ খানি।
তালপত্রে সেই লেখা সে ত অশ্রুজল-রেখা,
অনল অক্ষরে আজ জ্বলে
বাংলার ঘরে ঘরে তার তাপে সুধা ক্ষরে
পাষাণ হৃদয়ও তাব গলে।
জানকীর আঁখিনীর গৃহে গৃহে গৃহিণীর
ক্ষণে ক্ষণে তিতায় বসন,
তাহার পায়ের কাছে নতশিরে আজ্ঞা যাচে
শত শত দেবর লক্ষ্মণ।
কাঙ্গালের-তুচ্ছ পুঁজি তাই নিয়ে যোঝাযুঝি
ভায়ে ভায়ে তুচ্ছ তা'ত নয়,
হে কবি তোমার গান গলায় তাদের প্রাণ
আঁখি জল দ্বন্দ্ব করে জয়।
শাশুড়ী তোমার গানে বধূরেও বক্ষে টানে
ভুলে যায় অবলা পীড়ন,
স্মরিয়া সীতার কথা ভুলে যায় সব ব্যথা
গৃহে গৃহে অভাগিনীগণ।
কি মহিমা রচনায় উদয়ন-কথা আর
কহে নাক গ্রামবৃদ্ধদল,
তাহাদের চারি পাশে যুবা শিশু কেন আসে
তব বাণী তাদের সম্বল।
পশারী পশরা শিরে থমকি দাঁড়ায় ফিরে
শুনে যদি রামায়ণ পাঠ,
গুহকের ভাগ্য স্মরে দুই চোখে ধারা ঝরে
ভুলে যায় বেচাকেনা, হাট।
বঞ্চক মুরারিশীল ছাড়ে না যে একতিল
মেকি দিতে তারও হাত কাঁপে,
পাপ করি দিন কাটে সাঁঝে রামায়ণ পাঠে,
রাতে শুযে মরে অনুতাপে।
শিখাইলে কী যে সত্য গ্রামে গ্রামে ভাঁড়ু দত্ত
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ভুলে যায়,
কৃপণ তোমার গানে ভিক্ষুকে ডাকিয়া আনে,
বক্ষদেরও হৃদয় গলায়।

দিনে হাটে হট্টগোল, কাড়াকাড়ি ডামাডোল
সন্ধ্যায় সকলি চুপচাপ,
লঙ্কাকাণ্ড শেষ করি উত্তরা কাণ্ডটি পড়ি,
দোকানী দোকানে দেয় ঝাঁপ।
বৈকালে বটের ছায় সুর করি নিতি গায়
দা-ঠাকুর কাহিনী সীতার,
কৃষকেরা দলে দলে ভাসিয়া নয়ন জলে
একই কথা শুনে বার বার।
তব বাণী মধুচ্ছন্দা নন্দিত করেছে সন্ধ্যা
স্নিগ্ধ শান্ত গ্রামের দিবস,
জরাজীর্ণ গ্রন্থখানি কি সুধা তাতে না জানি,
শুষ্ক দৈন্যে করেছে সরস।
মোদকের খই চুড় তব গীতি সুমধুর
আরো যেন মিঠা ক'রে তুলে,
তব গ্রন্থখানি ছাড়ি উঠে যায় বারবারই
দাম নিতে মুদী যায় ভুলে।
জমিদার ঘরে ঘরে প্রজা নির্য্যাতন করে
তব পুঁথি পড়ে মাত্র তার,
প্রজারঞ্জনের সুর লাগে তার সুমধুর
গ'লে যায় তার করভার।
রাজা রাণী রাজভ্রাতা রাজার নন্দিনী মাতা
দৈবদণ্ড তাহাদেরই কত,
একথা যতই স্মরে বৈরাগ্যে হৃদয় ভরে
দুঃখী ভুলে নিজ দুঃখশত।
অসংযত রসনায় যে ভ্রম করিল হায়
অযোধ্যার নির্ব্বোধ প্রজারা,
আজি বঙ্গ ঘরে ঘরে তার প্রায়শ্চিত্ত করে
চক্ষে ঝরে সরযূর ধারা।
সপ্তকাণ্ড দীপ ভাতি দিয়া তুমি সারা রাতি
ভারতীর করিলে আরতি,
সেই দীপ হ'তে আজি জ্বলে লক্ষ দীপবাজি
তোমা তারা জানায় প্রণতি।
আর কারে নাহি জানি মানি শুধু তব বাণী
শুনিয়াছি বাল্মীকির নাম,
তব চিত্তভূমে কবি নূতন জনম লভি
অবতীর্ণ বঙ্গে পুন রাম।
এ রাম মোদেরি মত বুঝেছে কেঁদেছে কত
অদৃষ্টেরে দিয়েছে ধিক্কার,
এ রাম মোদেরি মত করিয়াছে ভক্তিনত
নীলপদ্মে পূজা অধিকার।
এ রামে আপন জানি বক্ষে লইয়াছি টানি
দুঃখে তাঁর হয়েছি অধীর,
লক্ষ্মণের সাথে সাথে অবিরল অশ্রুপাতে
পম্পাহ্রদে বাড়ায়েছি নীর।
রাম নারায়ণ নিজে সীতাদেবী মা লক্ষ্মী যে
এ কথা ত পড়েনাক মনে,
হৃদয় শোণিত ছানি সীতার প্রতিমাখানি
গড়ি মোরা যজ্ঞ সমাপনে।
তুমি রস গঙ্গা হতে আনিলে নূতন স্রোতে
আগে আগে দেখাইয়া পথ,
নবরস-ভাগীরথী উদ্বেল তাহার গতি,
তুমি তার নব ভগীরথ।
সে প্রবাহ অনাবিল ভাসাইল খালবিল
একাকার গোষ্পদ পল্বল,
সে ধারার দুই কূলে লতাতৃণে শস্যফুলে
ফলিতেছে সোনার ফসল।
বধূরা গাগরী ভরে নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,
তৃষা তৃপ্ত করে সেই বারি,
করি তায় নিত্যস্নান জুড়ায় তাপিত প্রাণ
'জয় রাম' গায় নরনারী।
সেই রসধারা বাহি জয় সীতারাম গাহি
ভেসে যায় কত 'মধুকর',
লঙ্কায় বাণিজ্য তরে যুগে যুগে যাত্রা করে
ধনপতি চাঁদসদাগর।
শত শাখা-প্রশাখায় সে ধারা বহিয়া যায়
বিস্নাবিত অশ্রুর তুফানে,
এহো বাহ্য নহে শেষ, চলে যায় নিরুদ্দেশ
শেষ ধারা অনন্তের পানে।

হরিদাস ঘোটক

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিবার পর হরিদাস হাতমুখ ধুইয়া জপে বসিয়াছিল।

জপ করিতে করিতে, খোলা দরজার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু উচ্চ গলায় কহিল, "নেড়া, পড়তে বোস্‌না রে। খালি খেলা নিয়ে থাকলে ত চলবে না। মুখ্যু হ'য়ে থাকলে, দুমুঠো ভাতও যে বরাতে জুটবে না।"

পুনরায় হরিদাসের চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হইল এবং মনে-মনে জপ চলিতে লাগিল।

মিনিট দুইতিন পরে চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাতেই কহিল—সম্ভবতঃ স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কহিল, "ওগো, আমার গামছাখানায় একটু সাবান ঘসে দিও ত, বড্ড তেল ধ'রেচে।

পুনরায় জপ।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী হৃদয়বালা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "দেখ, অত ক'রে ব'লে দেয়া হ'ল ত; কিন্তু সেই চারখানা সিঙ্গাড়া আর দু'খানা ছানার গজা দিয়েচে।"

এবার একেবারেই ধ্যানভঙ্গ হইল। ক্রোধে হরিদাস আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। হৃদয়বালার হস্তধৃত খাবারের ঠোঙ্গার ভিতর নিরীক্ষণ করিয়া কহিল "তিনখানা গজা দেয় নি। দাঁড়াও…ব্যাটার ভারি……" বলিয়া খড়ম খট্‌ খট্‌ করিতে করিতে এবং রাগে গর্‌ গর্‌ করিতে করিতে হরিদাস বাটী হইতে বহির্গত হইয়া রাস্তায় আসিল।

ও-দিক্‌কার ফুটপাথে ঠিক সামনেই ছিল, 'জয়নারায়ণ মিষ্টান্নভাণ্ডার।' তাহারই সম্মুখে আসিয়া হরিদাস ক্রোধ-কম্পিত স্বরে হাঁকিল, "রাজু!"

ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া রাজু কহিল, "কি ব'লচেন ঠাকুর মশাই?"

"বলচি যে, তোর আচরণটা কি! তিনখানা গজা দিতে ব'লে দিলুম, সেই দু'খানা দিয়িছিস্‌!"

বিনয়-নম্র স্বরে রাজু নিবেদন করিল, "রোজ দু' আনার বেশী দিতে গেলে আমার কিছুই থাকে না, ঠাকুর মশাই। আমায় আপনি মাপ ক'রবেন। অবিশ্যি, আজ আপনি না হয় আর একখানা গজা নিয়ে যান, কিন্তু…" বলিতে বলিতে রাজু একখানা ছানার গজা লইয়া হরিদাসের হাতে দিতে গেল।

হরিদাস তাহা রাজুর হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া সজোরে রাস্তার মধ্যে নিক্ষেপ করিল, কহিল, "আমাকে কি তুই ভিক্ষের দান দিচ্ছিস্‌? তোর…"

"রাগ ক'চ্চেন কেন? আপনি বুঝে দেখুন…"

"আমি ভাল ক'রেই বুঝে দেখবো। তোর মত অনেক ময়রা আমার পায়ের তলায় এসে লোটাবে"—বলিয়া যেমন রুদ্রমূর্ত্তিতে হরিদাস আসিয়াছিল, তেমনি রুদ্রমূর্ত্তিতে চলিয়া গেল।

ইতিহাসটা বলি :—

শ্রীযুক্ত হরিদাস চক্রবর্ত্তী—ওরফে হরিদাস ঘটক—কলিকাতার দিগ্বিজয়ী ঘটক। বাঙ্গলার যত বড় বড় ঘর—রাজা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদার—তার একচেটিয়া অধিকার। সময়ে-অসময়ে, স্থানে-অস্থানে, পাত্রে-অপাত্রে মিলনের নেশা জমাইয়া, বিয়ের রঙীন ফুল ফুটাইতে তাহার কর্ম্মকুশলতা অতুলনীয় এবং অদ্ভুত। তাহার কার্য্যে কি-একটা শক্তি, তাহার কথায় কি-একটা আকর্ষণী আছে, যাহাতে শুধু রুই-কাতলা নয়, সামান্ত চুনো-পুঁটি-বাটাও তাহার চারে সতত আকৃষ্ট হয়। তবে হরিদাস সে-সব চুনো-পুঁটির দিকে বড়-একটা তাকায় না; কারণ, তাহার মোটা ফী যোগাইতে প্রায় তাহাদের সাধ্যে কুলায় না।

সামান্ত অবস্থা হইতে হরিদাস ঘটকালী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। যদিচ তাহার শুষ্ক শীর্ণ দেহে মাংসের গাঁদি লাগে নাই, বা উদরপ্রদেশে ভুঁড়ি নামে নাই, কিন্তু তাহার ব্যবসায়ের উন্নতি দ্বারা হরিদাস দেশে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছে; স্ত্রী হৃদয়বালার অঙ্গও অনেক ভরি সোনায় অলঙ্কৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

দেশে বাড়ী, বাগান, বিষয়-সম্পত্তি করিলেও, ব্যবসায় চালাইবার জন্ত হরিদাস সস্ত্রীক ও সপুত্র প্রায় বার মাস কলিকাতায় ভাড়া-বাড়ীতে কাটায় এবং প্রত্যহ প্রাতে 'জপ'

করে, এবং অপাস্তে চারি পয়সা মূল্যের চারিখানা সিঙ্গাড়া ও চারি পয়সার দুইটা ছানার গজার সহিত চা পান করিয়া কাজে মনোনিবেশ করে। তাহার এই প্রাত্যহিক জল-খাবারের ব্যয় তাহাকে পকেট হইতে করিতে হয় না ; ইহা 'জয়নারায়ণ মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার' হইতে 'কমিশন' স্বরূপ আসে। হরিদাসের সুপারিশে বিবাহ-বাড়ী হইতে 'জয়নারায়ণ মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার' কিছু কিছু দই-মিষ্টান্নের বায়না পায়। কমিশনটা সেই বাবদই। হরিদাস দাবী করে আরো কিছু বেশী ; কিন্তু 'জয়নারায়ণ' প্রত্যহ দুই আনার বেশী দিতে চায় না। তাহারা বলে যে, হরিদাসের মারফৎ যে 'অর্ডার' তাহারা পায়, তাহাতে বছরে ৬০।৭০ টাকার বেশী লাভ থাকে না, সুতরাং ঐ দুই আনার বেশী তাহারা দিতে পারে না।

নেড়া হরিদাসের ছোট ছেলে। নেড়ার মাথায় কেশের অপ্রাচুর্য্য ছিল না ; প্রচুর কেশ। তবে তাহার কেশের প্রচুরতা নাসিকায় আসিয়া সাম্যভাব ঘটাইয়াছিল ; অর্থাৎ নাকটা একটু বেশী রকম খাঁদা। নেড়ার বাঁ চোখটাও ঈষৎ টেরা। তবে সেই চক্ষুটারই দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। দূরে থাকিয়া তাহার সেই টেরা চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা যখন সে দেখে যে হরিদাস একটি একটি করিয়া চারিখানা সিঙ্গাড়া মুখগহ্বরে প্রবেশ করণানন্তর একখানি গজা হস্তে লইয়া ভক্ষণোদ্যত, তখন সে আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া ছুটিয়া হরিদাসের সম্মুখে দাঁড়ায় ও লোলুপ দৃষ্টিতে গজাখানির দিকে চাহিয়া থাকে। সুতরাং আধখানি গজা ভাঙ্গিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হরিদাস নেড়াকে দিতে বাধ্য হয়। তাই "জয়নারায়ণ মিষ্টান্নভাণ্ডারে" দুইখানি গজার স্থলে তিনখানির দাবী আসে এবং সে দাবী আজ সুস্পষ্টভাবে এইরূপে যখন প্রত্যাখ্যাত হইল, তখন হরিদাস ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া জয়নারায়ণ মিষ্টান্নের মুণ্ডপাত করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিয়া অগত্যা সেই চারিখানা সিঙ্গাড়া ও দুইখানা গজা লইয়া হরিদাস তাহার সদ্ব্যবহারে মনোযোগ দিল। ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণে নেড়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল এবং হরিদাস অর্দ্ধখানি গজা তাহার হাতে দিতে না দিতেই সে তাহা মুখে পুরিয়া, লাট্টু ও নেত্তি লইয়া, নাচিতে নাচিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

জলযোগান্তে হরিদাস হুঁকা হাতে, পান চিবাইতে চিবাইতে বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিল এবং তামাকুর ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে স্থির করিয়া ফেলিল যে, তাহার মক্কেলদের কোন অর্ডারই আর 'জয়নারায়ণ'কে দেওয়া হইবে না ; তৎপরিবর্ত্তে চৌমাথার ওই নূতন দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অতঃপর একটা দীর্ঘ 'সুখ-টান্'-এর কুণ্ডলিত ধূম ছাড়িয়া হরিদাস হাঁকিল—"নেড়া!"

নেড়ার পরিবর্ত্তে দেখা দিল—নন্দলাল। নন্দলাল সবিনয় নমস্কারান্তে হরিদাসের সামনেকার হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারখানাতে আসন গ্রহণ করিল।

* * *

নন্দলাল কহিল, "এর আগে ৫।৭টি মেয়ে আমি দেখেছি, কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখে—"

"ভারি পছন্দ হ'য়ে গেছে। তা তো হ'বারই কথা। রং ফর্সা না হ'লেও, মেয়েটির গড়ন-পেটন আর লক্ষণ খুবই ভাল। কিন্তু হ'চ্চে যে, আপনাকে দেবে কি? বয়স আপনার যে বড্ড বেশী হ'য়ে গেছে। ওরা গরীব বটে ; তা' ব'লে ১৭।১৮ বছরের মেয়ে কি ৪০ বছরের পাত্রের হাতে দিতে রাজী হবে?"

"আপনি একটু চেষ্টা ক'রলেই হবে। আর বয়স ত আমার অত হয়নি। ১৩১৩ সালের ফাল্গুন মাসে আমার জন্ম। সুতরাং—এই ৩৪ বছর আট···"

বাধা দিয়া হরিদাস কহিল—"ও চৌত্রিশ চল্লিশ—একই। তা ছাড়া আপনার মাথার চুল যে আধা-আধি সব পেকে গেছে। সুতরাং—বুঝলেন না?"

নন্দলাল বেশ-একটু মুশ্‌ড়াইয়া গেল এবং সুবিধামত কিছু বলিতে না পারিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ শব্দে বুদ্ধির গোড়ায় তামাকের ধোঁয়া দিবার পর, হরিদাস কহিল—"পাঁচশোটি টাকা যদি আমার 'দক্ষিণা'র ব্যবস্থা ক'রতে পারেন, তা হ'লে একবার বেয়ে-চেয়ে দেখি।"

আশা-উৎফুল্ল স্বরে নন্দলাল কহিল, "অত পেরে উঠবো না চক্কোত্তিমশাই ; যা' বলি'চ, ঐ আড়াইশোটি টাকা··"

"আরে তিনশো ত আমার 'অর্ডিনারী ফী'। এর ভেতর খাটুনি আছে যথেষ্ট। পাঁচশোর কমে কিছুতেই হবে না।"

অতঃপর উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তার পর নন্দলাল ঐ পাঁচশোতেই রাজী হইল এবং এই স্থির হইল যে, আগামী কল্য বায়না স্বরূপ পঞ্চাশ, পাকা-দেখার দিন দুইশো এবং বিয়ের দিন যাত্রার আগেই আড়াইশো দিতে হইবে।

হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে নন্দলাল চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে নন্দলাল আসিয়া এক প্রীতিপূর্ণ দীর্ঘ নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশটি মুদ্রা যখন হরিদাসের হস্তে প্রদান করিল, তখন হরিদাস প্রফুল্লভাবে কহিল, "বসুন সুরেন বাবু।"

নন্দলাল মনে মনে একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "চক্কোত্তিমশাই আজ এতই অন্তমনস্ক যে, নামটাও আমার ভুলে গেলেন!"

"ভুলিনি নন্দলাল বাবু; তবে আজ থেকে আপনাকে সুরেনবাবু হতে হ'বে। বসুন; আমি আসচি।" বলিয়া হরিদাস ভিতরে চলিয়া গেল এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরিয়া একখানা কাগজ নন্দলালের হাতে দিয়া কহিল, "মুখুজ্জো যেমন আছেন, তেমনি থাকবেন, তবে নন্দলালের বদলে সুরেন্দ্রনাথ হতে হ'বে।"

নন্দলাল কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিল, উহা সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি নামে কোন একজনের ম্যাট্রিকপাশের ইউনিভার্সিটী সার্টিফিকেট। নন্দ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "কি ব্যাপার বলুন ত?"

অল্প একটু হাসিয়া হরিদাস কহিল, "আপনিই সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি; আপনারই ম্যাট্রিকপাশের এই সার্টিফিকেট। বুঝলেন না? অর্থাৎ ১৯৩১ সালে ম্যাট্রিকপাশের সময় আপনার বয়স ছিল ১৬ বছর ৭ মাস; সুতরাং এখন আপনার বয়স এই ধরুন গিয়ে—২৭ বছর। তবে চুলগুলো আপনার বাতিকে পেকেচে।"

নন্দলাল বিস্মিতও হইল যত, মনে মনে প্রফুল্লও তত হইল। কহিল, "তা হ'লে আমার…"

"আর কোন চিন্তার দরকার নেই। এই মাসের ভেতরেই আমি শুভ যোগাযোগ সম্পূর্ণ ক'রে দোবো। আজই আমি গিয়ে কথা পাড়বো। তবে, পাকা-দেখার দিন দু'শো টাকার যোগাড় ক'রে রাখবেন; তা' না হ'লে কিন্তু সব ভেস্তে যাবে।"—একটুখানি থামিয়া পুনরায় হরিদাস কহিল, "আচ্ছা নন্দলাল—থুড়িঃ—সুরেনবাবু! একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। এক বিধবা বুড়ো পিসি ছাড়া সংসারে ত' আর কেউই নেই। তা' এই চল্লিশ বছর বয়স্ পর্য্যন্ত…"

"আজ্ঞে চল্লিশ আমার হয় নি, এই ৩৪ বছর আট…"

"যাই হোক্, বলি—চল্লিশেরই কোঠা ত' বটে! তা' এতদিন বিয়ে না ক'রে ক'চ্ছিলেন কি?"

ইহার উত্তর নন্দলালের কিছু দিবার ছিল না। থাকিলেও, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া তাহা বলা যায় না। কেমন করিয়া সে বলিবে যে, কান্তি বাঁড়ুয্যের ছোট মেয়ে ননীবালা তাহাকে দ'য়ে মজাইয়া দিয়াছে! প্রথম যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে ননীকে তাহার হৃদয় জুড়িয়া স্থান দিয়াছিল। ও-পক্ষ হইতে আশা ভরসা পাইয়া সে সফলতার অপেক্ষায় দীর্ঘ দিন ধরিয়া মনে মনে স্বর্ণের জাল বুনিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সে জাল যে শেষ পর্য্যন্ত হঠাৎ নির্দ্দয়ভাবে ছিন্ন ভিন্ন…

নন্দলাল নীরবেই বসিয়া রহিল। ও-কথার কি-ই বা উত্তর দিবে? ননীবালাকে দীর্ঘদিনের অবসরে সে অনেকটা ভুলিয়াছে। যে সামান্ত একটু রেখা স্মৃতির পটে আবছা আঁকা আছে, তাহা এই সুরবালাকে পাইলেই একেবারে মুছিয়া যাইবে। তাহার যে মন একদিন ননীময় হইয়া ননীর পিছনে পিছনে সদা-সর্ব্বদা ছুটাছুটি করিত, আজ তাহার সেই মন সুরবালাময়। ননীকে না-পাওয়ার আঘাত সে সহ্য করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু সুরবালাকে না পাইলে সংসার ত্যাগ করিয়া সে সন্ন্যাসী হইবে।

নন্দলালের জন্ত আজ ভিতর হইতে এক পেয়ালা চা আসিল। হরিদাস কহিল, "চা খান, সুরেনবাবু।"

নন্দলাল চায়ের বাটী হাতে করিয়া চায়ে চুমুক দিতে লাগিল।

* * *

মাঘ মাস। এবার কলিকাতায় তেমন শীত পড়ে নাই। শুধু এই কয়দিন হইল এক পশলা বৃষ্টি হইয়া বেশ কন্‌কনে

শীত পড়িয়াছে। বেঙ্গল টাইমের কল্যাণে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় প্রতি গৃহে অফিসারদের অফিস যাইবার জন্য তাড়া-হুড়া পড়িয়া গিয়াছে। মহা-অফিসার হরিদাসের সে-সব বালাই নাই। হরিদাস নিত্যকার ‘জপ’ এবং জল-যোগান্তে বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে অতি আরামে ধুমপান করিতেছিল।

যুদ্ধের মরশুমে খবরের কাগজের ‘হকাব’দের মধ্যে ছুটা-ছুটি পড়িয়া গিয়াছে। একটি ছোক্‌রা ‘হকার’ হাঁকিয়া যাইতেছিল—‘রুষ যুদ্ধের নতুন খবর! টেৌ-লি-গা-রা-ফ্‌!’ হরিদাস তাহাকে ডাকিয়া একখানা কাগজ কিনিল। যুদ্ধের সংবাদটা হরিদাসের রোজ একবার পড়া চাই-ই।

তামাকের ধেঁায়া ছাড়িতে ছাড়িতে হরিদাস কাগজের সমস্ত সংবাদগুলির উপর চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিল আর মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আজ এই সময়ে নন্দলালের আসিবার কথা আছে। প্রায় দুই মাস হইতে চলিল, তাহার অসীম কর্ম্মদক্ষতার গুণে সুরবালা ও নন্দলালের শুভ-মিলন সংঘটিত হইয়াছে। চুক্তির প্রায় সব টাকাই নন্দ হরিদাসকে ঠিক ঠিক সময়ে দিয়াছে, অথবা হবিদাস ঠিক ঠিক সময়ে নন্দলালের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইয়াছে। মাত্র পঞ্চাশটি টাকা নন্দলালেব দিতে বাকী আছে। ঐ টাকা লইয়া আজ তাহার আসিবার কথা।

ভিতরের দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া হৃদয়বালা মুখ বাড়াইল; কহিল, “এখনো বেরোও নি?”

“বেরুবো। নন্দর জন্যে ব’সে আছি।”

“নন্দ? ওঃ! সেই যার চল্লিশ বছর বয়স, ১৭ বছরের মেয়েব সঙ্গে বে দিইয়েছ? এ রকম কাজ আর ক’বো না। জান্‌লে? এতে পাপ হয়।”

“পাপ হয় ব’লেই ত’ এই বিয়েটা ঘটিয়ে প্রাচিত্তিব ক’রে ফেল্লুম।—বুঝ্‌তে পাল্লে না বোধ হয়? সেই যে সারদা চৌধুরীর ২৩ বছবের মেয়ের সঙ্গে জনাইয়ের সেই ২২ বছরের ছেলের বিয়ের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলুম, নন্দলালের ব্যাপারে তার প্রাচিত্তির ক’র্‌লুম। তাতে পাত্রের চেয়ে পাত্রী ছিল বড়; এটাতে পাত্রীর চেয়ে পাত্র—বড় ছাড়িয়ে হ’ল অতীব বড়। অর্থাৎ কি না একেবারে যা’কে বলে বৃদ্ধ। সুতরাং শোধবোধ! দেখ হৃদয়, পাপ পুণ্য ব’লে কিছু আমি …সরে যাও—সরে যাও! আমার ল্যাণ্ডোলাল ঐ আস্‌চে!”

হৃদয়বালা চকিতে দরজা ভেজাইয়া অন্তর্দ্ধান হইল।

নন্দলাল প্রফুল্ল অন্তরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হরিদাসকে নমস্কার করিল। হরিদাস প্রতিনমস্কার করিয়া কহিল, “আপনার অপেক্ষাতেই ব’সে আছি। শ’খানেক টাকার জন্যে আজ ভারি আটকেচে; টাকাটা এনেচেন ত’?”

উত্তর দানের পরিবর্ত্তে নন্দলাল পকেট হইতে দশ টাকার ৫ খানি নোট বাহির করিয়া হরিদাসের হস্তে প্রদান করিল।

হরিদাস কহিল, “আপনাকে দেখে মনে হচ্চে, দাম্পত্য-জীবন বেশ আরামে-আনন্দেই কাটচে। ভাল কথা নন্দবাবু, একটা কথা ব’ল্‌তে আপনাকে ভুলে গেছি। সকল বিয়েতেই পাত্রপক্ষ থেকে আমার স্ত্রীকে কোন-কিছু একটা উপহার দেয়। ঐ ময়নাগড়ের চৌধুরীদের বিয়েতে ছ’ ভরির এক ছড়া হার দিলে; মল্লিকরা আষাঢ় মাসে আড়াই শো টাকা দামের বেনারসী সাড়ী দিলে; ভবানীপুরের বি. সি. বাঁড়ুয্যের ভাইপোর বিয়েতে…

“চক্কোত্তি মশাই, আপনার স্ত্রীকে দোবো, এ আর বেশী কথা কি। তবে অবস্থা ত তেমন নয়। মনে করুন, ও পক্ষ থেকে ত কিছুই পেলুম না। তার ওপর আপনাকে পাঁচ শ দিতে হ’ল। যৎসামান্য একটু…”

বাধা দিয়া হরিদাস কহিল—“আহা হা, বলে—‘দিও কিঞ্চিৎ, না কোরো বঞ্চিত।’ অবস্থানুসারে যা আপনার সাধ্যের মধ্যে ঘটে উঠবে, তাই দেবেন। মানে হ’চ্চে, আপনাদের শুভ যোগাযোগটা যে এত ক’রে ঘটিয়ে দিলুম, এর একটা স্মরণ-চিহ্ন আর কি! আপনি পনর টাকা দামের একটা আংটি কি একজোড়া কানপাশা দিলেও তাই আদরের উপহার হবে।”

বলা বাহুল্য, এদিনেও নন্দলালের জন্য এক কাপ চা এবং তৎসহ দুইটি মিষ্টান্ন আসিল। এবং একথাও বলা বাহুল্য যে দশ-বারো-দিনেব মধ্যেই হরিদাসের গহনার বাক্সে একটি আধভরি ওজনের গিনি সোনার পাথর-বসানো আংটি নন্দলালের কাছ হইতে আসিয়া স্থানলাভ করিল।

* * *

বাগবাজারের বিখ্যাত বাঁড়ুয্যে বাবুদেব প্রাসাদতুল্য বাটীর

উপরের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া হরিদাস ও মেজবাবুর কথোপকথন হইতেছিল। হরিদাসের পার্শ্বে শূন্য চায়ের কাপ-ডিস্, ও তাহার পার্শ্বে একখানি বড় রেকাবী পড়িয়া ছিল, তাহাও শূন্য। রেকাবীখানাতে অনেকগুলি মাছি বসিয়া ভুক্তাবশিষ্ট মিষ্টান্নাদির রসোপভোগ করিতেছিল। একটি উদ্গার তুলিবার সঙ্গে-সঙ্গে, সিগারেট ধরাইয়া হরিদাস কহিল "পাঁচশো'য় হবে না মেজবাবু, একটু ভালরকম বকৃশিসের ব্যবস্থা ক'রতে হবে; অন্ততঃ হাজার। মনে ভেবে দেখুন, কাজ বড় সোজা নয়। আপনি হাজার আমায় 'য়্যাডভান্স' ক'রবেন, আমি যেমন ক'রেই হোক লাগিয়ে দোবোই। আর—না-ই যদি পারি ত আপনার টাকা ফেরত দোবো।"

মেজবাবু কোন উত্তর না দিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চিন্তা করিলেন। তারপর সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "হরিদাস বাবু, আপনাকে হাজার টাকাই দক্ষিণা দোবো, কিন্তু লাগাতে পারবেন ত ঠিক?

"না পারলে আর ব'লবো কেন বলুন।"

মেজবাবু মনে-মনে লাভ-লোকসান খতাইতে লাগিলেন। এইখানেই শুভকাজ যদি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সব দিক দিয়াই শুভ। এ ব্যাপারে মস্তবড় যে অন্তরায় রহিয়াছে যাহাতে হাজার টাকা ঘটক বিদায়,—ধরিতে গেলে কিছুই নয়, কারণ—

কারণটা বিশদভাবে এইখানে বলা দরকার।

বৌবাজারের সুদীন মুখুজ্জ্যের একটিমাত্র ছেলে। ছেলেটি এবারে এম, এ, পড়িতেছে। দেখিতে শুনিতে সুন্দর। সুদিনবাবুর কলিকাতায় খান সতের-আঠার বাড়ী; সুন্দরবনে ছোট-খাটো জমিদারীও আছে। এখানে মেয়ের বিয়ে দিতে পারিলে, ভবিষ্যতে সমস্ত সম্পত্তিটাই চাই কি নিজেদের তত্ত্বাবধানে আসিতে পারে। আর মেয়ে ত সর্ব্বাংশে সুখী হইবেই। তার অন্তরায়—মস্ত বড়। সুদিনবাবু গোঁড়া হিন্দু। ছেলে-মেয়ের ঠিকুজির ভাল মিল চাই। তা না হইলে, তিনি স্বর্গরাজ্যের বিনিময়েও কোথাও পুত্রের বিয়ে দিবেন না। হরিদাস তাহার অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতার গুণে, ছেলেটির ঠিকুজি হইতে তাহার জন্ম-তারিখ, লগ্ন, নক্ষত্র, রাশিচক্র প্রভৃতি আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত টুকিয়া আনিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, মেয়ের রাশিচক্র প্রভৃতির সঙ্গে উহা কিছুতেই মিলে না। অথচ মেজবাবুর বিশেষ ঝোঁক এইখানেই যাহাতে শুভকাজ সম্পন্ন হয়। মেজবাবু হরিদাসের শক্তিকে ভাল-রূপেই জানেন। তিনি জানেন যে, হরিদাস সকল অসম্ভবকেই সম্ভব করিতে এবং সম্ভবকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে সিদ্ধহস্ত এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং তাহার হাজার টাকার ঘটকালীর দাবীতে সহজেই সম্মত হইলেন।

হরিদাস কহিল, "হাজার টাকাটা কিন্তু 'নেট' (nett)। গাড়ীভাড়া আর এদিক সেদিকেও কিছু ব্যয়-বরাদ্দ আছে; সেটা আলাদা দিতে হবে।"

"সেটা কত আন্দাজ হবে?"

"সেটা আর কত হবে। শত্‌খানেক।"

মেজবাবু তাহাতেও রাজী হইলেন।

প্রফুল্লচিত্তে মতলব ভাঁজিতে ভাঁজিতে হরিদাস গৃহে ফিরিয়া দেখিল, তাহার এক পুরাতন মক্কেল মহেন্দ্রবাবু তাহারই অপেক্ষায় বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছেন এবং মেধাবী পুত্র নেড়া, খান-কয়েক বইয়ের সঙ্গে সেলেট্ লইয়া একাগ্রমনে তদুপরি ভূতের ছবি আঁকিতেছে। হরিদাসকে দেখিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি সেলেটখানা উল্টাইয়া রাখিল এবং পাশের বইখানা খুলিয়া পড়া সুরু করিয়া দিল—"একদিন গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়……"

হরিদাস মহেন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে! খবর কি? মেয়ে-জামাই ভাল আছে ত?"

একটু ঢোঁক গিলিয়া মহেন্দ্রবাবু কহিলেন, "একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব হরিদাসবাবু। আচ্ছা, জামাইটির ত জানা যাচ্ছে—'থাইসিস্'! জেনে-শুনে আপনি আমার এমন সর্ব্বনাশটা করলেন!"

যেন মহাবিস্ময়ে হরিদাস কহিল, "থাইসিস্!—টি, বি,?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; আপনি কি বলতে চান আপনি কিছু জানতেন না?"

"কি করে জানব বলুন। আমি ঘটক, ঘটকালী করি। শুধুই করা নয়—বাঙ্গালা দেশের যত সব বড় বড় ঘরেরই কাজ করি। আমি ত আর ডাক্তার নই, সুতরাং কার টি, বি, কার ইউ, বি, কার সি, বি—সে সব জানবো কেমন কোরে।"—হরিদাসের কথাগুলির বেশ একটু ঝাঁঝ ছিল।

মহেন্দ্রবাবু কহিলেন, "ডাক্তার আপনি নন্ বটে, কিন্তু

ডাক্তারের মতই তখন আপনি মত প্রকাশ করেছিলেন কি না যে, ছেলেটি একটু রোগা হ'লেও স্বাস্থ্য খুবই ভাল ; এ পর্য্যন্ত কোন রোগ-টোগে ভোগে নি,—নীরোগ শরীর ?"

"হাঁ্যা, তা বলেছিলাম। তাই আমি জানতুম। আপনি ছেলেকে তখন ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা ক'রে নিলেই পারতেন।"

"পারতুম ; কিন্তু আমি আপনার কথাই বিশ্বাস করেছিলুম। আমি জানতুম না যে আপনি মানুষের আকারে এমন…"

মৃদু মৃদু কুটিল হাসির সহিত হরিদাস কহিল, "এমন নর-পিশাচ !—এই ত ? তা আমার কাছে না এলেই পারতেন। আমি বড-বড় ঘরে কাজ করি ; আপনার মত……। তা এখন দয়া ক'রে—আসুন, আমি এখন বিশেষ ব্যস্ত আছি। —নমস্কার।" বলিয়া ভিতরের দরজা ঠেলিয়া হরিদাস চলিয়া গেল।

রাগে, দুঃখে, অপমানে মহেন্দ্রবাবু শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ভিতরে গিয়া হরিদাস হৃদয়বালাকে কহিল, "শীগ্ গির একটু চা কোরে দাও দেখি ; আর একছিলিম তামাক।" বাহিরের দরজায় কড়া নড়িয়া উঠিল। হরিদাস বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিল, জুয়েলার্স দত্ত ব্রাদার্সের কালী দত্ত।

"কি সংবাদ কালীবাবু ?"

"এদিকে একটা তাগাদায় এসেছিলুম, তাই একবার দেখা করতে এলুম। কই আমাদের দোকানে আর পায়ের ধুলো-টুলো দেন না যে বড় ?

সহাস্যমুখে হরিদাস কহিল, "ধুলো জমলেই গিয়ে দিয়ে আসব। খুব সম্ভব একটা বড় কাজ লাগবে। অন্ততঃ হাজার পাঁচেকের অর্ডার। এটাও যদি বাঁধতে পারি, তাহ'লে পাঁচ ভরির একছড়া—ঐ কি বলে, ফাঁস হার এবার পেয়ামী দিতে হবে। গিন্নীর ভারি সখ হ'য়েছে ঐ একটা ফাঁস হারের।"

অতঃপর আরও দু'একটি কথাবার্ত্তার পর কালীবাবু প্রফুল্লচিত্তে উঠিয়া গেলেন এবং হরিদাসও গুন্ গুন্ করিয়া হরিনাম গান করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া আসিল।

* * *

কালীঘাটের আদি-গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটা এঁদো গলির ভিতর গদাধর শিরোমণির খাপ্ রার চাল-ওয়ালা ছিটে-বেড়ার ঘর। শিরোমণিমহাশয় বরিশাল জেলার লোক ; কিন্তু এখানকার বাস তাঁহার বহুদিনের। দু'চার ঘর শিষ্য-যজমান আছে ; তাহাদের লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠীপূজা, ব্রত, বিয়ে-পৈতা উপলক্ষ্যে পৌরোহিত্য করিয়া তাঁহার দিন গুজরাণ হয়। এ ছাড়া ঠিকুজী-কোষ্ঠী প্রস্তুত, কোষ্ঠী-বিচার. গ্রহ-ফাঁড়া রিষ্টি প্রভৃতি কাটানো কাজেও কিছু কিছু উপায় হয়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শিরোমণি মহাশয়ের বাহিরের দিকের ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে হরিদাস ও শিরোমণি মুখো মুখী বসিয়া। মেজের একপাশে মিটমিট করিয়া একটি হারিকেন জ্বলিতেছে। বাতিটা একটু বাড়াইয়া দিয়া শিরোমণি কহিল, "দশ টাকায় এ কাজ হয় না হরিদাসবাবু। যাই হোক, কাজ আমি ক'রে দিলাম, এখন বিচার আপনার কাছে।"

হরিদাসের হস্তে সগুলিখিত অথচ দেখিতে পুরাতনের ন্যায় একখানা ঠিকুজী ছিল। তৎপ্রতি একবার চাহিয়া হরিদাস কহিল, "নতুন তৈরী বলে ধরতে পারবে না ত ?"

"কেমন ক'রে ? এর আগে আরও ত দু'একবার আপনাকে ক'রে দিয়েছি। বিশ বছরের পুরাণ কাগজ ; পোকায় খাওয়া। লেখাটা টাটকা হ'লেও দ্রব্য ও কার্য্যগুণে, বহুকালের লেখা বলেই মালুম হবে। সুতরাং…"

"আচ্ছা, ছেলের ঠিকুজীর সঙ্গে এখন রাজ-যোটক হবে ত ?"

"নির্ঘাত।"

"মেয়ের বয়স বুঝি কিছু কমাতে হোল ?"

"মাস ছয় ; নইলে যে রাজ-যোটক হয় না। তাইত বলছি, পরিশ্রম করতে হ'য়েছে যথেষ্ট। আর গোটা-পাঁচেক টাকা…"

আর দুইটি টাকা পকেট হইতে বাহির করিয়া হরিদাস কহিল, "এই বারো টাকাই নিন্ তাহ'লে। এতেই খুসী হ'ন। একবারের ত' আর কাজ নয়।"—বলিয়া হরিদাস সযত্নে ঠিকুজীখানি পকেট-জাত করিয়া এবং শিরোমণি মহাশয়কে নমস্কার জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

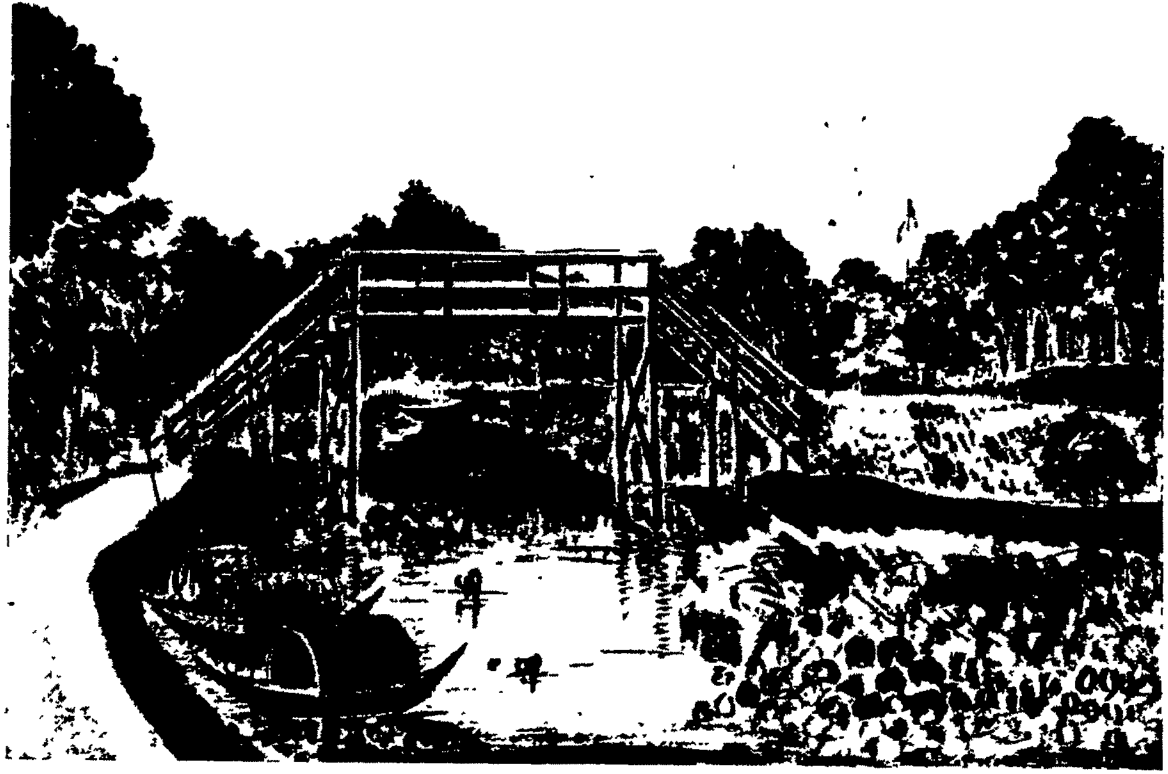

সাঁকো

শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

* * *

পুরাতন বর্ষ হাসি-অশ্রু, আনন্দ-নিরানন্দ, সুখ-দুঃখের সঙ্গে বিদায় লইয়াছে। সকলের অন্তরে নূতন আশা ও আনন্দের স্বর্ণজাল বুনিতে বুনিতে নববর্ষ নূতন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দেখা দিয়াছে। নব-বৈশাখের এক শুভদিনে শুভক্ষণে বৌবাজারের সুদীন বাবুর পুত্র ও মেজবাবুর কন্যার উদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুতকর্ম্মা হরিদাস ঘটকের ক্রিয়া-নৈপুণ্যে, পাত্র-পাত্রীর এই মিলন 'রাজ-যোটক' হইয়াছে।

হরিদাসের কিন্তু কাজের অন্ত নাই; এক কাজ শেষ হয়, শতেক কাজ আসে। বর্ত্তমানে সোনাদীঘির বাবুদের বাড়ী তাহার যাতায়াতের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সোনাদীঘির বাবুদের পটলডাঙ্গায় মস্ত বাড়ী, প্রকাণ্ড ফটক। সেই ফটক পার হইয়া, হরিদাস দ্বিতলের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই সঞ্জীববাবু কহিলেন, "আপনার আসার অপেক্ষাই কচ্ছিলাম। কি সংবাদ বলুন।"

রূপা-বাঁধানো ছড়ি ও ছাতাটা দেয়ালে ঠেসাইয়া রাখিতে রাখিতে হরিদাস কহিল, "সব বলচি। বড্ড টায়ার্ড' হ'য়ে পড়েচি, একটু চা-য়ের ব্যবস্থা করুন আগে।"

সঞ্জীববাবু তখনি ভৃত্যকে ডাকিয়া হরিদাসের জন্য মিষ্টান্নাদি জলখাবার ও চা আনিতে হুকুম করিলেন।

সঞ্জীববাবুর সিগারেট্ কেস্ হইতে একটা সিগারেট্ ধরাইয়া হরিদাস কহিল, "বুধবার ওঁরা মেয়ে দেখতে চান।"

"এই বুধবার! তা হোলে কি করা যায় বলুন দেখি?

"করা-করি আর কি! এসে দেখে যাক্ না। হরিদাস শর্ম্মা যখন রয়েচে, তখন আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বিয়ে এইখানে ঠিকই ঘটিয়ে দেবো।"

সঞ্জীববাবুর মেয়েটি খুবই সুন্দর, কিন্তু খোঁড়া। ছেলেবেলা সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া বাঁ-পা'টা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং মেয়েটিকে খোঁড়াইয়া চলিতে হয়। এই খোঁড়া মেয়েটিকে হরিদাস ভবানীপুরের বিখ্যাত উকীল অজয়বাবুর গৃহে 'পার' করিবার জন্য জোড়-জোড় চালাইতেছে। এ জন্য সে একটা মোটা বক্শিসের লোভ পাইয়াছে। প্রথমটা এই ব্যাপার লইয়া হরিদাস খুব চিন্তা করিয়াছিল। মেয়ে যে খোঁড়া তাহা এখন কোনরকমে চাপা দিলেও, বিয়ের পর আর চাপা থাকিবে না। পাকা পাঁচীলের বট-অশত্থ গাছের বীচি হইতে যেমন একদিন-না-একদিন চুণ-সুরকি-বালি-সিমেণ্ট ভেদ করিয়া গাছ বাহির হইয়া পড়ে তেমনি মেয়েটির খোঁড়া পা-খানাও বিবাহের পরদিনই অজয়বাবুর সংসারে আত্মপ্রকাশ করিবে। সুতরাং অজয়বাবুর গৃহে ভবিষ্যতে তাহার কাজ-কারবার আর চলিবে না। কিন্তু বিয়ের উপযোগী আর কোন ছেলে মেয়েও ও-বাড়ীতে নাই। এই সব চিন্তা করিয়া হরিদাস এ কাজে নামিয়াছে। হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই।

হরিদাস কহিল, "সঞ্জীববাবু, বুধবার ওরা বেলা ন'টার মধ্যেই মেয়ে দেখতে আসবে। ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত যা করবার সে সব আমি ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছি; আপনি আর মাথা ঘামাবেন না।"

অতঃপর নানাবিধ মিষ্টান্নপূর্ণ থালাখানি খালি করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে হরিদাস গৃহে ফিরিল।

* * *

বুধবার বেলা নয়টা।

ভবানীপুর হইতে মেয়ে দেখিতে ইঁহারা সব আসিয়াছেন। মেয়ে এখনো দেখানো হয় নাই। হঠাৎ একটা বিপদ ঘটিয়াছে। মেয়েটি মুখ ধুইতে গিয়া বাথ্-রুমে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে; তাহাতে বাঁ-পা'খানাতে বিষম চোট্ লাগিয়াছে। হরিদাস তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছে। ডাক্তারবাবু ঔষধপত্র দিয়া পায়ে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দিলেন এবং সকলের সমক্ষে সঞ্জীববাবুকে বলিয়া গেলেন, "আঘাতটা খুব বেশী লেগেচে; তবে হাড় ভাঙে নি। ব্যাণ্ডেজ যেন খোলা না হয়, ঐতেই সেরে যাবে এখন।"

পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায়, অন্দরের দালানে আরাম-কেদারায় যেখানে মেয়েটি বসিয়াছিল, সেইখানে অজয়বাবুকে সাদর অভ্যর্থনার সহিত আনা হইল। তিনি মেয়েটির গায়ের রং, মুখাবয়ব, কেশের প্রাচুর্য্য, অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং লক্ষণাদি দেখিয়া প্রীত হইলেন। কন্যা তাঁহার খুবই পছন্দ হইল। সঙ্গে অজয়বাবুর গুরুদেব আসিয়াছেন। তাঁর অমতে অজয়-

কোন কাজই করেন না। তিনি একজন সাধক শ্রেণীর লোক। উত্তরীয়-বস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, ছাতার কাপড় ও জুতার ক্যাম্বিস্ পর্য্যন্ত গেরুয়ায় ছোপানো, মায় টাকা-পয়সা রাখিবার থলিটি পর্য্যন্ত। তিনিও মেয়েটির হস্ত-রেখা ও লক্ষণাদি পরীক্ষা করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। গুরুদেব শ্যামবাজারে থাকেন। হরিদাস তাঁহার বাসা জানে; কারণ সম্প্রতি সে দেড়শত টাকার নোট লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সে দিন উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন বাঁধা হইয়া গিয়াছিল, যাহার ফলে হরিদাস প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিল যে, এই বিবাহের পর দিনই হরিদাস তাঁহার 'শ্রীচরণতলে আরও একশত' টাকা প্রণামী দিয়া যাইবে।

পরদিনই অজয়বাবু সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার গুরুদেবের ইচ্ছা, এই মাসেরই ১৯শে তারিখে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়। কারণ এ বৎসরের মধ্যে ঐ দিনটি অতিমাত্রায় শুভ এবং শ্রেষ্ঠ।

গুরুদেবের ইচ্ছা, সুতরাং তাহার আর নড়্-চড়্ নাই। পূর্ণোদ্যমে বিবাহের তোড়-জোড় চলিতে লাগিল। দেনা পাওনার মিট্‌মাট্, পাকা দেখা, সবই তাড়াতাড়ি হইয়া গেল। মেয়েটির পা-ও অনেকটা সারিয়া আসিয়াছে। ব্যথা নাই বলিলেই হয়; তবে চলিতে গেলে সামান্য একটু খোঁড়াতে হয়। ডাক্তার বলিয়াছে ৫।৭ দিনের মধ্যে ও-দোষটুকুও যাইবে। কিন্তু যথাদিনে যথাক্ষণে বিবাহ হইয়া গেলেও ও-দোষটুকু আর গেল না। এমন কি বিবাহের পর দীর্ঘ তিনমাস গত হইয়া গেলেও দোষটুকু পূর্ব্ববৎ রহিয়াই গেল, তখন উকীল অজয়বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ 'জেরা' করিবার শক্তিদ্বারা মেয়েটির মুখ হইতেই সকল তত্ত্ব অবগত হইলেন। হরিদাসই যে এই ঠকামীর প্রধান খেলোয়াড় তাহা তখন সকলেই বুঝিতে পারিল।

বুঝিতে যখন পারিল, তখন অজয়বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয় খানিক কি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা।" এই 'আচ্ছা'র বিস্তৃত টীকা-টিপ্পনী যে কি হ'তে পাবে, তাহা তখন কেহ অনুমান করিতে পারিল না।

বিজয়ের ছিল 'জিম্‌ন্যাষ্টিক্'-এর আখড়া। সেই ছিল দলপতি। দেহে ও মনে অসীম শক্তি। তাহার ঐ 'আচ্ছা' বলিবার মাসখানেক পরে সকলে শুনিল যে, কালীঘাটে গদাধর শিরোমণির বাসায় যাইবার সেই নির্জ্জন ও অন্ধকার গলির পথে হরিদাসকে দু'একজন দুর্বৃত্ত মিলিয়া বিষম প্রহারের দ্বারা তাহার ডা'ন পা'খানা একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং তাহাকে হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু হরিদাসের পা সারিল না; সারিবার কোন আশাই নাই। তাহার দেশ-জোড়া 'বিজ্‌নেস্' একেবারে চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল। তাহার এই কাজে খুবই ঘোরা-ঘুরি করিবার দরকার হয়, কিন্তু তাহার খোঁড়া-পায়ে তাহা একেবারে অসম্ভব। হরিদাস একটা লাঠি ভর করিয়া সামনের ফুট্-পাথটুকুতে কোনরকমে পাইচারী করিতে পারে।

সকলেই বাংলার এই অদ্ভুত কর্ম্মী, "অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঘটক-চূড়ামণি"র জন্য সবিশেষ দুঃখিত। সেই দুঃখ সকলের চরমে উঠে; যখন তাহার লাঠি হস্তে খোঁড়াইয়া পাইচারীর সময় দুষ্ট ছেলের দল "হরিদাস ঘোটক—হরিদাস ঘোটক" বলিয়া চীৎকার করে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটে—

"ঘোড়া—ল্যাং ল্যাং ল্যাং।
খোঁড়া মেয়ের বে' দিলি, তাই—
ভাঙ্গলো যে তোর ঠ্যাং"

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে "মা"

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

সাজাহান

দ্বিজেন্দ্রলালের অমর নাটক সাজাহানে বৃদ্ধ সম্রাট যে মাতৃহারা পুত্রকন্যাদের গভীর দুঃখে সর্ব্বদাই সচেতন, তাহা বিশেষ দৃষ্ট হয়। সাজাহানের প্রথম অঙ্ক; প্রথম দৃশ্যে :

জাহানারা—কখন না—এ হ'তে পারে না পিতা—প্রজা রাজার উপর খড়্গ তুলেছে, সে খড়্গ তার নিজের স্কন্ধে পড়ুক্।

সাজাহান—সে কি জাহানারা, তারা আমার পুত্র!

জাহানারা—হোক্ পুত্র—কি যায় আসে, পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহেরই অধিকারী—পুত্রকে পিতার শাসনও কর্ত্তে হবে।

সাজাহান—আমার হৃদয় কেবল এক শাসন জানে—সে স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্র-কন্যারা আমার, তাদের কোন্ প্রাণে শাসন কর্ব্ব জাহানারা? ঐ চেয়ে দেখ্—ঐ স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিঃশ্বাস—ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—তারপর বলিস্ তাদের শাসন কর্ত্তে।

দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

রাজপুতনার মরুভূমির প্রান্তপ্রদেশ

দারা—না, আর দেখতে পারি না—আমি আজ ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ নেবো! …আমি মর্ব্ব! কিন্তু তার আগে তোদের মেরে মর্ব্ব…(ছুরিকা বাহির করিলেন)।

সিপার—মাকে মেরো না, আমায় মারো—

নাদিরা—না না আমায় আগে মারো—আমার চক্ষের সম্মুখে বাছার বুকে ছুরি দিতে পার্ব্বে না, আমায় আগে মারো—

দারা—একি দয়াময়! এ আবার মাঝে মাঝে কি দেখাও! অন্ধকারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এ কি আলোকের উচ্ছ্বাস! ঈশ্বর! দয়াময়! তোমার রচনা এমন সুন্দর কিন্তু এমন নিষ্ঠুর! এই মায়ের আর ছেলের পরস্পরকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য এই কান্না, অথচ কেউ কেউকে রক্ষা কর্ত্তে পাচ্ছে না। এত প্রবল কিন্তু এত দুর্ব্বল, এত উচ্চ কিন্তু এত নীচে পড়ে। এ যে আকাশের একখানা মাণিক ছিটকে এসে পড়েছে। এ যে স্বর্গ আর নরক এক সঙ্গে, এ কি প্রহেলিকা! দয়াময়—

সিপার—বাবা, বাবা—জল উঃ (পড়িয়া গেল)।

নাদিরা—বাছা আমার (তাহাকে গিয়া ক্রোড়ে নিলেন)।

দারা—এই আবার সেই নরক—না—না—না এ আলোক ভ্রান্তি! এ শয়তানী, এ ছল; অন্ধকার কতো গাঢ় তাই দেখবার জন্য এ জলন্ত অঙ্গার খণ্ড। কিছু না আমি তোমাদের বধ করে মর্ব্ব—(জহরতের দিকে চাহিয়া) ওটা ঘুমোচ্ছে, ওটাকেও মার্ব্ব। তারপরে তোমাদের মৃতদেহগুলি জড়িয়ে আমি মর্ব্ব, এসো একে একে (নাদিরাকে মারিবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন)।

সিপার—মেরো না, মেরো না—

দারা—(সিপারকে এক হাতে দূরে রাখিয়া নাদিরাকে ছুরি মারিতে উদ্যত) তবে—

নাদিরা—মর্ব্বার আগে আমাদের একবার প্রার্থনা কর্ত্তে দাও—

দারা—প্রার্থনা! কার কাছে—? ঈশ্বরের কাছে? ঈশ্বর নাই—সব ভণ্ডামো, ধাপ্পাবাজী! ঈশ্বর নাই—অ্যাঁ—কে—কে—কে বল্লে, কে বল্লে ঈশ্বর আছেন। আছেন? ভালো, কর প্রার্থনা—

নাদিরা—আয় বাছা, মরবার আগে একবার প্রার্থনা করি।

(উভয়ে জানু পাতিয়া বসিলেন—চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন)

নাদিরা—দয়াময়! বড় দুঃখে আজ তোমায় ডাক্‌ছি প্রভু—দুঃখ দিয়েছো দিয়েছো, তুমি যা দাও মাথা পেতে নেবো—তবু, তবু মর্ব্বার সময় যদি পুত্র-কন্যা আর স্বামীকে সুখী দেখে মর্ত্তে পার্ত্তাম।

(দারার কম্পিত হস্ত হইতে ছুরী পড়িয়া গেল—দেখিতে দেখিতে সহসা জানু পাতিয়া বসিলেন)।

দারা—ঈশ্বর, রাজাধিরাজ তুমি আছো। তুমি না থাকো ত এমন একটা বিশ্ব জগতকে চালাচ্ছে কে? কোথা থেকে এ নিয়ম এলো? কোথা থেকে সে নিয়ম এলো, যার বলে এমন পবিত্র জিনিষ দুটি জগতে প্রস্ফুটিত হয়েছে—মা আর ছেলে। ঈশ্বর! তোমাকে অনেকবার স্মরণ করেছি; কিন্তু এমন দুঃখে এমন দীনভাবে এমন কাতরহৃদয়ে আর কখন ডাকিনি—দয়াময় রক্ষা করো—

(৺তারক পালিত ও শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর দারার ভূমিকায় অভিনয় অপূর্ব্ব)

সাজাহান—পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য

আগ্রার সাজাহানের প্রাসাদ-কক্ষ, কাল—রাত্রি,
বাহিরে ঝটিকা, বৃষ্টি, বজ্র ও বিদ্যুৎ

সাজাহান—কার সাধ্য দারাকে হত্যা করে—আমি সম্রাট সাজাহান, আমি স্বয়ং তাকে পাহারা দিচ্ছি। কার সাধ্য? ঔরংজীব—তুচ্ছ, আমি যদি চোখ রাঙ্গাই, ঔরংজীব ভয়ে কাঁপবে—আমি যদি বলি ঝড় উঠুক তো ঝড় ওঠে—যদি বলি বাজ পড়ুক—বাজ পড়ে (মেঘ গর্জ্জন)।

সাজাহান—মেরেছে-মেরেছে, ঐ রক্ত ছুটে বেরোচ্ছে। ঘর ভেসে গেল; দেখি (ছুটিয়া গিয়া দারার কল্পিত রক্তে হস্ত দুখানি মাখিয়া) এখনও গরম—ধোঁয়া উঠ্‌ছে—

জাহানারা—বাবা, এতো রাত্রি হয়েছে, এখনও শোন নি—

সাজাহান—ঔরংজেব! আমার পানে চেয়ে হাসছে? হাসছো, না? দুরাত্মা—তোমার শাস্তি দিব, দাঁড়া ঘাতক, হাত জোড় করে দাঁড়া! কি! ক্ষমা চাচ্ছিস, ক্ষমা—ক্ষমা নাই, আমার পুত্র ব'লে ক্ষমা করব ভেবেছিস, না তোকে তুষানলে দগ্ধ করব, আজ্ঞা দিলাম যাও, নিয়ে যাও—

জাহানারা—বাবা, শোন গে যান।

জহরৎ—আসুন দাদা আমার (হাত ধরিলেন)।

সাজাহান—কে কে মমতাজ! তুমি ওর হয়ে ক্ষমা চাচ্ছ? না, আমি ক্ষমা কর্ব্ব না মমতাজ, আমি বিচার করেছি ও যে দারাকে মেরেছে—(এই স্থলের করুণ মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় বঙ্গের বিখ্যাত অভিনেতা ত্রয় শিশির কুমার, অহীন্দ্র ও নির্ম্মলেন্দুর সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয়ে বড়ই করুণ)

হায়! কল্পনায় উন্মাদ অবস্থায় ঔরংজেবকে শাস্তি দিতেও সম্রাটের প্রিয়তমা সাম্রাজ্ঞী, ঔরংজেবের জননী, মমতাজকে দেখিতেছেন,—মা মানস মন্দিরে আসিয়া সাজাহানের নিকট পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছেন।

সাজাহান—পঞ্চম অঙ্ক, শেষ দৃশ্য

জাহানারা—পিতা, দারার হত্যাকারীকে ক্ষমা—

সাজাহান—চুপ জাহানারা! এ সময়ে আমার সুখে আর ঘা দিস্ নে, তাদের তো আর ফিরে পাব না—সাত বৎসর দুঃখে কাটিয়েছি, এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলেছি। শোকে উন্মাদ হয়ে গিয়েছি দেখছিস তো। একদিন সুখী হতে দে। তুই ও ঔরংজীবকে ক্ষমা কর মা। ঔরংজীব, জাহানারার ক্ষমা চাও।

ঔরংজীব—আমাকে ক্ষমা ক'রো ভগ্নী।

জাহানারা—চাইতে পাচ্ছ? পিতার মত আমার স্থবিরত্ব হয় নি। রাজদস্যু! ঘাতক! শঠ!

সাজাহান—তোরই মত মাতৃহারা জাহানারা—তোরই মত বেচারী! ক্ষমা কর। ওর মা যদি এখন বেঁচে থাকতো, সে কি করতো জাহানারা? তার সেই মায়ের ব্যথা সে যে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছে—কি জাহানারা? তবু নিস্তব্ধ! চেয়ে দেখ, এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে—দেখ সে কি স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ ঐ আকাশের দিকে—দেখ, সে কি গাঢ়, চেয়ে দেখ ঐ কুঞ্জবনের দিকে, দেখ; সে কি সুন্দর, আর চেয়ে দেখ মা, ঐ প্রস্তরী-ভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপে আপ্লুত বিয়োগের অমর-কাহিনী, ঐ স্থির মৌন নিষ্পলক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ, সে কি করুণ, তাদের দিকে চেয়ে ঔরংজেবকে ক্ষমা কর। (বিখ্যাত কবিতার পুস্তক "মন্ত্র"তে অমরকবিতা "তাজমহল" দ্রষ্টব্য)।

(লেখক সাজাহানের ভূমিকা অভিনয়ে এই স্থলে যোগ করিয়াছিলেন, "কি মা, তবু নিস্তব্ধ, তৎপরে অশ্রুসিক্ত নয়নে "মমতাজ" বলিয়া জাহানারার গাল চাপড়াইয়া পরে শুধু "মমতাজ" বলিয়া পুনর্ব্বার ঔরংজেবের গাল সাদরে চাপড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে "মমতাজ" বলিয়াছিলেন)

এর অর্থ এই যে, জাহানারা, দারা, ঔরংজেব সকলেই মমতাজের পুত্র, মমতাজ তাহাদেরই জননী, কাহাকে শাস্তি দিবেন, কাহার বিচার করিবেন, সকলেই মাতৃহারা, সাজাহান ও জাহানারা ঔরংজেবকে ক্ষমা করিলেও মহরৎ ক্ষমা করে নাই তাহা কবি দেখাইয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্ত নাটক কেহ কেহ দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া বিবেচনা করেন, অধ্যাপক ও বিখ্যাত সাহিত্যিক ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহোদয় বঙ্গবাসী কলেজে ইংরাজী অনার্স ক্লাসে সেক্সপিয়ারের নাটক সম্বন্ধে পাঠ দিতে প্রায়ই বলিতেন, "D. L. Roy's Chanakya can be compared with any best creation of Shakspeare"

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে "মা" সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল যে আদর্শ প্রতিভার যাদুদণ্ডে যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সে চিত্র বঙ্গদেশে আজ জাতির উন্নতিকল্পে বিশেষ প্রয়োজন, মা যেন নাটক ও সাহিত্য হইতে বর্জ্জিত হইতে বসিয়াছেন, কি পরিতাপের বিষয়। প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে যে স্থলে মহারাজ নন্দ মুরাকে নির্য্যাতন করিতেছেন সেই দৃশ্য হইতে উদ্ধৃত হইল—

নন্দ—এখনও ব'লো চন্দ্রগুপ্ত কোথায়, নহিলে—

(মুক্ত তরবারি হস্তে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ)

চন্দ্রগুপ্ত—এই চন্দ্রগুপ্ত তোমার সম্মুখে। অধম (বাচালকে পদাঘাতে ভূপতিত করিয়া) মা, তোমার এই অপমান চন্দ্রগুপ্ত জীবিত থাকতে।

মুরা—বৎস আমার, (চন্দ্রগুপ্তের গলদেশ জড়াইলেন)

চন্দ্রগুপ্ত—ভীরু! পাষণ্ড! কাপুরুষ! এর প্রতিফল পাবে! এসো মা— (মুরার সহিত প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান—সেতু পার্শ্বে অরণ্য, কাল- সন্ধ্যা

কাত্যায়ন—ঐ যে চন্দ্রগুপ্ত আসছে—

চাণক্য—(সাগ্রহে) কৈ? (করতালি দিয়া) ঐ যে! এখনও আশা আছে। কাত্যায়ন! যাও তুমি সৈন্যদের আশ্বাস দাও। বল চন্দ্রগুপ্ত আসছে, পালায় নি। যাও, শীঘ্র যাও, দ্বিরুক্তি কোরো না।

(কাত্যায়নের প্রস্থান)

চাণক্য—চিন্তা নাই! কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। মুরা, মুরা—

(মুরার প্রবেশ)

মুরা—কি গুরুদেব!

চাণক্য—এখানে দাঁড়াও, (মুরা দাঁড়াইলেন) কাঁদতে জানো নারী?

মুরা—সে কি!

চাণক্য—ঐ চন্দ্রগুপ্ত আসছে, তোমায় কাঁদতে হবে।

মুরা—পুত্র! পুত্র (অগ্রসর হওন)

চাণক্য—খবর্দ্দার! এখন স্নেহ নয়, তিক্ত ভৎর্সনা, উষ্ণ অশ্রুজল, পুত্রের উপর মাতার অভিমান-অভিনয় করতে হবে—প্রস্তুত?

(ধীরে ধীরে তরবারি হস্তে নতমুখে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ)

চাণক্য—এই যে চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধে জয়লাভ করে এসেছে মুরা, তাকে তোমার বক্ষে নাও। বীরপুত্র তোমার—উৎসব ক'রো।

চন্দ্রগুপ্ত—না গুরুদেব! আমি জয়লাভ ক'রে আসি নি।

চাণক্য—সে কি—তবে!

চন্দ্রগুপ্ত—আমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে এসেছি।

চাণক্য—সে কি! অসম্ভব! মুরার পুত্র যুদ্ধে জয়লাভ করে, কিংবা প্রাণ দেয়, পালায় না—

মুরা—পালিয়ে এসেছো, স্থির চিত্তে এ কথা ব'লছো চন্দ্রগুপ্ত! পালিয়ে এসেছো, মরতে পার নি? ভীরু—

চাণক্য—না, এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য। যাও, যুদ্ধ ক'রো চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত—পারব না—

চাণক্য—কি পারবে না?

চন্দ্রগুপ্ত—ভাইয়ের গায়ে অস্ত্রাঘাত ক'রতে।

মুরা—কাপুরুষ—

চন্দ্রগুপ্ত—কাপুরুষ নই—ভাই—

চাণক্য—যে ভাই তোমাকে নির্ব্বাসিত করেছে—

চন্দ্রগুপ্ত—তবু সে ভাই।

মুরা—যে ভাই তোমার মাতাকে অপমান করেছে—কি নীরব রৈলে যে ?

চাণক্য—যা'র রাজত্ব দৌরাত্ম্যের নামান্তর মাত্র।

চন্দ্রগুপ্ত—গুরুদেব, ভ্রাতৃবিরোধে কি আপনি আজ্ঞা দেন ?

চাণক্য—হাঁ, ধর্ম্মযুদ্ধে। কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি ব'লেছিলেন—

চন্দ্রগুপ্ত—মার্জ্জনা কর্ব্বেন গুরুদেব—শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি আমার হৃদয় স্পর্শ করে না।

চাণক্য—(স্ব-পদদাপে) এই পাপেই তো আর্য্যাবর্ত্ত গেল। চন্দ্রগুপ্ত, গীতার মাহাত্ম্য তুমি কি বুঝ্‌বে—শাস্ত্র-চর্চ্চা ব্রাহ্মণের অধিকার—

চন্দ্রগুপ্ত—ব্রাহ্মণের অধিকার ব্রাহ্মণ ভোগ করুন। আমায় বিদায় দিন।

*

মুরা—চন্দ্রগুপ্ত! সত্যই কি আমার পুত্র তুমি—যে নন্দ—

চন্দ্রগুপ্ত—তাকে মার্জ্জনা ক'রো মা—!

মুরা—মার্জ্জনা! সর্ব্বাঙ্গে দিবারাত্রি শত বৃশ্চিকের দংশনের জ্বালাকে শীতল করতে পারে এক নন্দের রক্ত।

চন্দ্রগুপ্ত—মা, শৈশবে কতো তার সঙ্গে খেলা ক'রেছি··· তার মাথার উপর খড়্গ উঠাতে আমার পিতৃরক্ত হৃৎপিণ্ডে লাফিয়ে উঠে পিঞ্জরের দ্বারে সবলে আঘাত ক'রে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, "সাবধান চন্দ্রগুপ্ত, ও ভাই, মগধের সাম্রাজ্য কি ভাইয়ের চেয়ে ব'ড়ো ?"

মুরা—নন্দ তোমার ভাই, কিন্তু সে আমার কে ?

চন্দ্রগুপ্ত—নন্দ তোমার পুত্র। মা, গর্ভে ধারণ না কল্লে কি পুত্র হয় না ? নন্দের মাতার মৃত্যুর পর তার মাতৃস্বরূপিণী হ'য়ে তুমি তাকে মানুষ ক'রো নি ? স্তন্যপান করাও নি ? বুকে করে ঘুম পাড়াও নি ?

মুরা—সেই জন্যই তো ক্ষমা কর্ত্তে পারি না। সে সব কথা নন্দ ভুলে যেতে পারে, আমি পারি না! যখন অধম বাচাল আমার কেশাকর্ষণ কল্লে! আর নন্দ শূদ্রাণী মা ব'লে ব্যঙ্গ কল্লে—তখন কি ব'লবো পুত্র, ওঃ! তোমার কাছে মাতার অপমান কি কিছুই নয় ? মা তোমার কেউ নয় ?

চাণক্য—এক মাতৃগর্ভে জন্ম ব'লেই ভায়ের সঙ্গে, সম্বন্ধ না ? মায়ের চেয়ে ভাই বড় ? জগতে এই প্রথম হ'ল যে, সন্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয় না। (মুরাকে) কাঁদো অভাগিনী নারী! এই তোমার পুত্র! মা চিনে না! জানে না সে যে, জগতে যত পবিত্র জিনিষ আছে, মায়ের কাছে কেউ নয়—

চন্দ্রগুপ্ত—তা জানি গুরুদেব।

চাণক্য—না, জানো না! নহিলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে ?

মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ, এক প্রাণ, এক মন, এক নিশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগ-নিদ্রায় অভিভূত ছিল—তারপর পৃথক হয়ে এলো অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত; মা যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে নিভৃতে বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরী করে তোমায় পান করিয়েছিল। সে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশীষ চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে তোমার দুঃখ নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য সে প্রাণ দিতে পারে; যার স্বচ্ছ স্নেহ-মন্দাকিনী এই উত্তপ্ত মরুভূমিতে শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছে; মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানব জীবনে প্রভাত-সূর্য্যের মত কিরণ দেয়, বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না উন্মুক্ত উদার কম্পিত আগ্রহে দু'হাতে আপনাকে বিলাতে চায়—এ সেই মা।

চন্দ্রগুপ্ত—গুরুদেব! রক্ষা করুন, আমায় ভ্রাতৃবিরোধে উত্তেজিত কর্ব্বেন না।

মুরা—চন্দ্রগুপ্ত! এতদিনে বুঝলাম যে, আমি তোমার কেউ নই! নন্দ ক্ষত্রিয়, তুমি ক্ষত্রিয়কুমার। নন্দই তোমার ভাই! আমি শূদ্রাণী! আমি তোমায় গর্ভে ধারণ করেছিলাম মাত্র। আমি কে ? আমি তোমার মা নই।

চন্দ্রগুপ্ত—পুত্রের উপর এতো নিষ্ঠুর হ'তে পারো মা—! তুমি আমার মা নও—? তুমি আমার ধর্ম্ম; তুমি আমার সাধনা, তুমি আমার ঈশ্বরী। তোমার আজ্ঞা আমার কাছে দৈববাণী।

মুর—তাই যদি সত্য হয়, তবে যুদ্ধে অগ্রসর হও—কি ! তথাপি নীরব ! চন্দ্রগুপ্ত (স্তব্ধস্বরে) আমি তোমার মা, তোমার অপমানিত, প্রপীড়িত, পদাহত মা । এই আমার আজ্ঞা ! এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি ।

চন্দ্রগুপ্ত—তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা । আর দ্বিধা নাই । তোমার আজ্ঞাই এই প্রশ্নসঙ্কুল কুটিল জগতে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক্ । আমি যেন তোমাকেই জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে পার্শ্বে ভ্রূক্ষেপ না করে সংসার সমুদ্রে তরী বেয়ে চ'লে যাই । মা আশীর্ব্বাদ ক'রো । এই মুহূর্ত্তে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি ।

মুর—এই তো আমার পুত্র ।

চাণক্য—এই তো আমার শিষ্য…

এই স্থলে দ্বিজেন্দ্রলাল চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রের মধ্যে আদর্শ পুত্র ও আদর্শ ভ্রাতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষা পূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্তকে সর্ব্বগুণান্বিত নায়করূপে সৃষ্টি করিয়া পুস্তকের নামকরণ করিয়াছিলেন ।

(চাণক্য কোন সময়েই মুরার সাহায্য ব্যতীত নন্দকে হত্যা করা বা কোন প্রকার শাস্তি দিতে সমর্থ হয়েন নাই, সুতরাং, চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের হস্তে ক্রীড়নক ছিলেন না । চন্দ্রগুপ্তের অসীম মাতৃভক্তির সাহায্য লইয়া নন্দের প্রতি প্রতিহিংসা পূর্ণ করিয়াছেন কিরূপে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ।)

তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য

চাণক্য—এখন বধ কর (নন্দ আর্ত্তনাদ করিলেন) ।

(বেগে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ)

চন্দ্রকেতু—সাবধান অস্ত্র নামাও ব্রাহ্মণ ।

চাণক্য—কেন চন্দ্রকেতু ।

চন্দ্রকেতু—রাজ-আজ্ঞা ।

*

কাত্যায়ন অস্ত্র উঠাইতে যাইলে চন্দ্রকেতু কহিলেন "সাবধান ! এর জন্য যদি ব্রহ্মহত্যা হয় ত দ্বিধা কর্ব্ব না ।"

(মন্দির হইতে মুরার প্রবেশ)

মুরা—আর যদি নারীহত্যা হয় ।

চন্দ্রকেতু—মা, আপনি ?

মুর—হ্যাঁ আমি । আমার আজ্ঞা বধ ক'রো ।

*

চন্দ্রকেতু—কিন্তু মা, এ রাজাজ্ঞা ।

মুরা—এ রাজমাতার আজ্ঞা । আমি দাসী, গণিকা হ'লেও মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জননী, আমার আজ্ঞা বধ ক'রো ।

চন্দ্রকেতু—এইখানে আমার পরাজয়……(মুরার পদতলে তরবারি রাখিলেন) ।

চাণক্য—বধ করো কাত্যায়ন ।

*

(চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ)

চন্দ্রগুপ্ত—(নন্দের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া) এ কি ?

মুর—এরা নন্দকে বধ করেছে…ওঃ কি করেছি ! কি করেছি ! বৎস চন্দ্রগুপ্ত ।

চন্দ্রগুপ্ত—কে বধ করেছে ?

কাত্যায়ণ—আমি ।

চন্দ্রগুপ্ত—কার আজ্ঞায় ?

মুরা—আমার আজ্ঞায়…

*

চন্দ্রগুপ্ত—ব্রাহ্মণ তুমি রাজাজ্ঞা অবহেলা ক'রেছো ।

কাত্যায়ন—করেছি ।

চন্দ্রগুপ্ত—ব্রাহ্মণ অবধ্য । তোমাকে আমি রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত কল্লাম… ।

*

চন্দ্রগুপ্ত—চন্দ্রকেতু ।

চন্দ্রকেতু—মহারাজ, যদি জগতের কোটি বীর রাজাজ্ঞার বিপক্ষে শাণিত মুক্ত তরবারি নিয়ে দাঁড়াত, চন্দ্রকেতু রাজাজ্ঞা পালনে প্রাণ দিত । কিন্তু নারীর কাছে আমি শিশুর চেয়ে দুর্ব্বল ।

চন্দ্রগুপ্ত—আর মা—

মুরা—আমার অপরাধের শাস্তি দাও বৎস ।

চন্দ্রগুপ্ত—(নতজানু হইয়া) তোমার অপরাধ মা—মার অপরাধ সন্তানের কাছে ? তুমি আমার কাছে চিরদিনই মা—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

সিংহাসনারূঢ় চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেন। পার্শ্বে অমাত্যবর্গ ও দেহরক্ষীগণ।

(মুরার প্রবেশ)

মুরা—মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক। (চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেন সিংহাসন হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন)

মুরা—সেই "শূদ্রাণী মা" সম্বোধনে আজ এ সমুচিত উত্তর হোল। সেই শূদ্রাণীর পুত্র আজ ভুবনবিজয়ী ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত—আর সেই মাতার নামে এই রাজবংশের নাম হ'ক্ "মৌর্য্যবংশ"—

(বিলাতে সেক্সপিয়ারের নাটকে হ্যাম্‌লেট বা লিয়ার-এর চরিত্রে যেরূপ বিভিন্ন প্রতিভাশালী নট বিভিন্ন ভাবে অভিনয় করিয়া নিজেদের প্রতিভা পরিস্ফুট করিয়াছেন, বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চেও শিশিরকুমার, নির্ম্মলেন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিভাশালী নট নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—লেখকও বহুবার চাণক্যের ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছেন)

আগামী সংখ্যায় 'পরপারে' ও 'ভীষ্ম' হইতে "মা" সম্বন্ধে উক্তি আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করা হইবে।

তোমার চরণতলে

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

তোমার চরণতলে এ প্রার্থনা মোর ভগবান,
দুঃখে যারা উৎপীড়িত দুঃস্থ তব দরিদ্র সন্তান
বরষার অবিশ্রাম বারিধারা উপেক্ষিয়া খেটে
হৃদয়শোণিতে যারা স্বর্ণ শস্য ফলাইছে মাঠে
তাহাদের অন্নবস্ত্র মাথা গুঁজিবার মত স্থান
দিয়ো দীনবন্ধু ভগবান।

মনুষ্য জনম লভি' যারা সব বর্ব্বরের মত
বিজ্ঞানের দান ল'য়ে অপব্যয় করে অবিরত
সুমতি তাদের দাও ফিরাইয়া ধ্বংস ঘূর্ণী হতে
লয়ে এসো প্রাণোজ্জ্বল সুশান্তির অমৃতের স্রোতে
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা তব মুহূর্ত্তেকে কর অবসান
হে মোর দয়াল ভগবান।

আসিবে বলিয়া গে'ছো এসো প্রভু এসো মূর্ত্তি ধরি'
দুর্জ্জনেরে সংহারিয়া ভক্তজনে আলিঙ্গন করি।
প্রতিভার বীজ কত দারিদ্র্যের দুষ্ট কীটরাশি
নষ্ট করি দেয়, প্রভু, হাস্যাননে দেখা দাও আসি।
অন্যায়ের করো প্রতিকার, আর্ত্তজনে করো-করো ত্রাণ
করুণা-আধার ভগবান।

পরেশনাথের পথে

শ্রীশোভা দেবী

আমরা যে জায়গাটীতে ছিলাম তার নাম চিরকী। চিরকী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহা গিরিডি হ'তে ১৫ মাইল এবং গ্রাণ্ডকর্ড লাইনের ইশ্রী ষ্টেসন হ'তে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ছোটনাগপুর প্লেটোর উচ্চতা এই স্থান হ'তেই আরম্ভ হয়েছে। আমাদের বাংলো থেকে ১ মাইল দূরে পিরটার ডাকবাংলোর কাছে গিরিডি-হাজারীবাগ রাস্তা একটী পাহাড় পেঁচিয়া পেঁচিয়া উপরে উঠিয়াছে। এখানকার লোকেরা সে স্থানটীকে 'জিলীপিতলা' বলে। এখানকার থানাটী আমাদের বাসার একেবারে সম্মুখে। থানার পাশেই একটী ছোট পোষ্ট-আফিস। থানার সাম্‌নে দিয়েই গিরিডি-হাজারীবাগ যাবার রাস্তা চলে গেছে। ঐ রাস্তার অপর পারে, পোষ্ট আফিসের ঠিক সামনে, পরেশনাথ গমনাভিলাষী যাত্রীগণের থাকার জন্য একটী নূতন ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হয়েছে। এখানে মুদিখানার ২।১টী ছোট দোকান আছে, তাতেও আবার সব জিনিষ সব সময় মেলে না। স্থানটীর লোকসংখ্যা খুবই কম, বেশীর ভাগই হিন্দুস্থানী ও সাঁওতাল; কয়েকঘর মুসলমানও আছে। থানার দারোগাবাবু ব্যতীত আর দ্বিতীয় বাঙ্গালী এখানে নাই। এখানে সপ্তাহে একবার করে হাট হয়; হাট আমাদের বাড়ীর ঠিক সামনেই খোলা একটী মাঠের উপর প্রতি বৃহস্পতিবারে বসে। প্রথম যে দিন হাট হয়, সে দিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি, প্রায় ৩০।৪০ খানি গো-যানে মাঠ পরিপূর্ণ। এ যেন সেই আলাউদ্দিনের প্রদীপ-ঘসা যাদুর মত। আমরা এসে অবধিই চারিদিক ভীষণ নির্জ্জনতা বোধ কচ্ছিলাম, কিন্তু এ আবার কি! যাক্, তার ঘণ্টাখানেক পরেই গো-যানের ভিতর হ'তে নানা পণ্যদ্রব্যাদি বের হয়ে মাঠ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কাকার প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়েছিলেন মঃ বাবু; তিনি এসে আমাদের বল্লেন, "সাতদিনের মত সমস্ত জিনিষ কিন্‌তে হবে, তোমরা ঠিক করে ফর্দ্দ করে দাও, কারণ; আগামী বৃহস্পতিবার হাটের আগে আর কোন জিনিষ পাওয়া যাবে না।" কথা শুনে আমাদের ত চক্ষুস্থির! যাই হোক্, আমরা একটি ফর্দ্দ করে দিলাম। সেইখানি সেক্রেটারী মহাশয় দেখে শুনে কেটে ছেঁটে খাস দরবারে পেশ করলেন, তারপর কেনাকাটা আরম্ভ হল। আমরাও মধ্যে মধ্যে হাট দেখতে যেতাম। বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট মাঠটী লোকে পূর্ণ হয়ে উঠতো। পাহাড়তলীর এই ছোট বুকখানির মধ্যে এতগুলি লোক কোথায় আছে; এক সমস্যার বিষয় বলে মনে হ'ত, বেশীর ভাগই সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ, অবশ্য এখান থেকে ১৪।১৫ মাইল দূরবর্ত্তী গিরিডি ও ডুমরী থেকে নানা দোকানদার ও ব্যাপারীরা হাটে জিনিষ ক্রয় বিক্রয় কর্‌তে আস্‌ত। হাটে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসই পাওয়া যেত। তবে আলু প্রতি হাটে পাওয়া যেত না আর যা আস্‌তো তাও ২।১ সেরের বেশী নয়। মাংস কোনদিনই পাওয়া যায় না, ছোট ছোট মাছ কচিৎ কখনও হাটের দিনে মিলে। হাটে ২।১ খানি বাসনের দোকান জোলার কাপড়ের দোকান, লোহার, মাটীর জিনিষ, ঘি, ময়দা তরীতরকারী, দই, চিড়ে, মুড়ি ইত্যাদি এসে থাকে। মোটের উপর, সরল সহজ আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রার পক্ষে হাটটী মন্দ নয়। সেখানে আজও একটী জিনিষ পাওয়া যান, খাঁটি গাওয়া ঘি, আর দুধ টাকায় দশ সের পাওয়া যেত। মেওয়া, আতা যথেষ্ট মিল্‌ত, তার সাহায্যে ঠাকুরপোর জন্য পায়েস রান্নাটী প্রায় রোজই হ'ত। সন্ধ্যার সময় হাটে আর একটী দেখার জিনিষ হয়, হাটিয়ারা সারি সারি উনুন জ্বেলে রান্না করে, তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করে গো-যানে স্বস্থানে প্রস্থান করে। পরদিন সকালে উঠে দেখি, ভোজবাজীর মত সব অন্তর্হিত, শূন্যমাঠ আবার শূন্যমূর্ত্তি ধারণ করেছে।

দিনকতক পর আমরা একদিন, আমাদের বাড়ীর পিছনে এক মাইল দূরে সীতানদী দর্শনে চল্‌লাম; সে দিকটাও বড় নির্জ্জন বনপথ। লালমাটীর পথ দু'হাতের বেশী চওড়া নয়, আর দু' পাশে নিবিড় শালবনের শ্রেণী। একটু ভয়ও করতে লাগল, কি জানি কোন সময় ''হায়েনা'' বা 'জিরাদা'র

দর্শনই বা মেলে*। কিছুদূর যাবার পরই নদীর ডাক শোনা যেতে লাগল; পরেশনাথ পাহাড় হতে নেমে সীতা নদী এখানে অনেকটা নীচে এসে পড়েছে। আমরা খানিকপর নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম। গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে-ভারী সুন্দর এই নদীটী। প্রায় ২০।২৫ হাত চওড়া, জায়গায় জায়গায় জল গভীর ও কম; খুব বড় বড় পাথর নদীগর্ভে অবস্থিত, নদীর স্রোত তাতে ধাক্কা খেয়ে গম্ভীর গর্জ্জনে ছুটে চলেছে। তারই স্রোতের মুখে একটী জায়গায় সাঁওতালরা বাঁশ ও কঞ্চি দিয়ে মাছ ধরার কৌশল প্রস্তুত করে রেখেছে। আমরা খণ্ড খণ্ড পাথরের উপর দিয়ে জল ডিঙ্গিয়ে চল্‌তে লাগলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ! জনমানবের কোন চিহ্ন নাই; শুধু সীতার কল্লোলে মুখরিত সকালবেলাটীতে এই পার্ব্বত্য তটিনীর বুকের মাঝ থেকে তার বাতাসে দোলা-গতির মুখর গর্জ্জন, শুন্‌তে ভারী ভাল লাগছিল। আবার আস্‌বো-সীতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিন আমরা বাসায় ফিরে এলাম।

ক'দিন থেকেই গিরিডিতে উশ্রী প্রপাত দেখতে যাবার জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল। অবশেষে একদিন যাওয়া স্থির হ'ল। দারোগা বাবুর সৌজন্যে একখানি বড় মোটর গাড়ী পেয়েছিলাম। যদিও আমাদের বাংলোর ঠিক সম্মুখের রাস্তা দিয়েই হাজারীবাগ, গিরিডি, ধানবাদ, গোমো প্রভৃতি যাবার মোটর সার্ভিস যাতায়াত করে, কিন্তু তা হলেও কোন মোটর রিজার্ভ করার দরকার হ'লে এই বন-জঙ্গলের দেশে তা সময় মত পাওয়া খুবই কঠিন। এসব দেশে দারোগা বাবুদের অখণ্ড প্রতিপত্তি, প্রতি বাস-ড্রাইভারকেই ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় প্রতিবারই থানায় হাজিরা দিয়ে যেতে হবে, অন্যথায় আইন অমান্যের বিপদ।

আমরা তিন গিন্নী মিলে গিরিডি যাবার উদ্যোগ করতে লাগলাম; বেলা ১০টার মধ্যেই রওনা হওয়া চাই। যত শীঘ্র পারা যায় খাওয়া দাওয়া শেষ করা হল ও উশ্রীতে উদর ভর্ত্তি না থাক্‌লে বিশ্রী লাগবে, সেই আশঙ্কায় সন্দেশ ও লুচি ইত্যাদি তৈরী করে সঙ্গে নেওয়া হল। তারপর বাড়ী পাহারা দিবার জন্য ঠাকুর ও আর দুটী চাকর নানকুয়া ও পুযুয়াকে রেখে শ্রীহরি স্মরণ করে আমরা যাত্রা করলাম।

পার্ব্বত্য পথে মোটর ছুটল। পিছনে মায়াময় পরেশনাথ, সম্মুখে লালমাটীর উঁচুনীচু চমৎকার পথ কোন্ সুদূর লক্ষ্যে ছুটেছে। দুই পাশে কখনও কখনও স্বর্ণে মিশান শস্যশীর্ষগুলি বাতাসে দুলছে। ছোট ছোট ঝরণাগুলি এদিক ওদিক দিয়ে ছুটে চলেছে। একটানা সৌন্দর্য্যময় পথ পরেশনাথের কোল হ'তে বের হয়ে কোন অসীমের সাথে মিশে গেছে। আমরা সকলে এক অভূত-পূর্ব্ব আনন্দে সেই পথের পানে চেয়ে রইলাম। পথে যাবার সময় কখনও নীচু থেকে উপরে উঠছি, মনে হচ্ছে যেন ঐ প্রান্তে কোন অতলে গিয়ে পৌঁছাব; পরক্ষণেই আবার মনে হয় বুঝি পাহাড়ে উঠছি। রাঙামাটীর পথের মায়া আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে,—যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তার গতি, উঁচু আর নীচু, বসন্তের চির উৎসবে যেন সারাপথ লালে লাল।

বাতাসের মতই দ্রুতবেগে আমাদের মোটর যাচ্ছিল। তার দ্রুতগতিতে আমাদের নাক, কান, চোখ জ্বালা কচ্ছিল। 'মিটারে' দেখলাম গতি কখনও কখনও ঘণ্টায় ৫৫ মাইল। মনে হল আমরা যেন ঝড়ের সাথী। এ সব দেশে রাস্তাও যেমন সুন্দর, মোটরও ছুটে তেমনি; শুনতে পাই ভারতবর্ষের মধ্যে ছোটনাগপুর প্রদেশের মোটর চলার রাস্তা সব থেকে ভাল। এক একটা মোড় ঘুরবার সময় সত্যই বড় ভয় কচ্ছিল এবং ভালও যে কতখানি লাগছিল তা কি বোল্‌ব! দেখতে দেখতে বরাকর ব্রিজের উপর এলাম। এই ব্রিজের উপর হ'তে বরাকর নদীর দৃশ্যটী অতুলনীয়। যতদূর চোখ যায় পাথরের ভিতর দিয়ে জলস্রোত অক্লান্ত আবেগে ছুটে চলেছে; তার কলস্বর ও তটভূমির সৌন্দর্য্যে সমস্ত চিত্তকে আপনি তার দিকে টেনে নেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে, আমাদের সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করার সুবিধা হল না। আমরা নিমেষে তাকে ছেড়ে এলাম। দেখতে দেখতে দূরে গিরিডির ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী কয়লার খাদের বড় বড় কলের ধোঁয়া উঠছে দেখতে পেলাম, ষ্টেসনের কিছু আগে কয়েকটী ছোট ছোট পাহাড় মালার মত ঘিরে আছে, তারই কোল

---

* মঃ বাবুর সহিত প্রথম দিন ইশ্রী ষ্টেসনে হাজি সাহেবের কথা হ'বার পর আমরা বাঘকে "হামেসা" ও ভালুককে 'জিয়াদা' বলতাম।

ঘেঁসে পথ গেছে—আমরা সেই পথ দিয়ে গিরিডির ভিতর চল্‌লাম।

গিরিডি থেকে উশ্রী প্রপাত ৭।৮ মাইল দূর হবে। আমরা ৭ মাইল গিয়ে মোটর থেকে নামলাম, আর এক মাইল বনপথ হেঁটে যেতে হয়। সেই স্থানটীতে মনে হচ্ছিল আবার যেন আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে ফিরে এলাম। বহুদূরে বিশাল পরেশনাথ নীল আকাশের গায়ে ছায়ার মত মিশে গেছে, আর ছোট ছোট পাহাড়শ্রেণী দুর্গের মত চরিদিক ঘিরে আছে। বনানীর অপরিমিত পথরেখা ধরে আমরা উশ্রী দর্শনে চল্‌লাম। অনেক বনফুল দেখে তা সংগ্রহ করার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পারলাম না।

এখানে পথ প্রদর্শক হাজি সাহেব ছিলেন না; আমাদের পথ প্রদর্শক হ'বার এবং ও অন্যান্য জিনিষপত্র ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্য একটি কুলী করা হয়েছিল। প্রায় আধ মাইলের কিছু বেশী যাবার পর উশ্রী প্রপাতের শব্দ শোনা গেল। আমরা বেশ তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগলাম। বনপথ হঠাৎ শেষ হতেই বিপুল বিস্ময়ে দেখি ত্রিধারা উশ্রী।

প্রপাতটী ভীষণ গর্জ্জন করে একটী পাহার হ'তে অন্য একটী পাহাড়ে পড়ছে। উচ্চতায় খুব বেশী না হলেও প্রায় ৩০।৪০ ফিট হবে। কাকা বল্লেন, "বর্ষায় ত্রিধারা এক সম্মিলনে যোগ দেয়, সে দৃশ্য অতুলনীয়।" আমরা বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে বহুদূর বেড়াতে লাগলাম। রবিরশ্মির কর সজ্জাতে মুখরা উশ্রী বড় সুন্দর লাগছিল। মনে হল, কোথায় ছিলে ওগো চন্দনবর্ণা উন্মাদিনী জলরাশি! মহাসাগরের ডাক কবে তোমায় মুক্তির আহ্বান জানিয়েছিল? ওগো গিরিকন্দর প্রবাহিনী, আলোর অর্ঘ্য কবে তোমায় অভিনন্দিত করেছিল? এই উদ্ভিন্না বারি-যৌবন দেখে কবে কোন্ কবি তোমার নাম রেখেছিল উশ্রী! শ্রী যে তোমার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে হিয়ার প্রতি পরতে পরতে ফুটে পড়ছে। বুঝি কোন ঝঞ্ঝার রাত্রে, কোন দিবস-সন্ধ্যার সম্মিলনে, আলো আঁধার মিশান অস্ফুট প্রত্যুষে, দিবসের উজ্জ্বলতায়, কোন যাদুকরের সোনার কাঠির স্পর্শে এই অসীম অমৃতধারার পাষান আগল মুক্ত হয়েছিল! তাই বুঝি এসেছ তোমার ঊর্ম্মিমুখর জলধারায় আজ মা'টীর অভিষেকে।

আমরা উশ্রী প্রপাতের মুখে যাব বলে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলাম। ঐ পাহাড়টীর প্রস্তরখণ্ডগুলিও সুন্দর, শুনলাম অনেক দামী পাথরও নাকি এখানে পাওয়া যায়। পাথরের এক একটি খণ্ডে পা রেখে, আমরা উপরে উঠছিলাম, তারই ফাঁকে ফাঁকে পতনশীল উশ্রীর জলরাশি খুব জোরে বইছিল। অনেকদূর পাহাড়ের উপর দিয়ে যাবার পর উশ্রী যেখানে শতধারে ছড়িয়ে পড়েছে সেইখানে এসে সকলে বস্‌লাম। প্রস্তরে প্রস্তরে ধাক্কা খেয়ে সেখানে উশ্রী কামান গর্জ্জন করছিল। আমরা পাহাড়ের উপর পা ছড়িয়ে বসে, মধ্যে মধ্যে জলে পা ডুবুচ্ছিলাম। স্রোতে পা দিতেই মনে হল তীব্র স্রোত এক নিমেষে আমাদেরও তার বক্ষে টেনে নেবে। সেখান থেকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল জলরাশি আর পাথরের স্তর। কি অপূর্ব্ব এই সৃষ্টি বিধাতার! এই পাষাণস্তূপের গুহায় মাঝে কত শত শত নদনদীর জন্মই তিনি দিয়েছেন—আরও কত জন্ম নেবে তা কল্পনার অতীত।

আমরা প্রপাতটির ঠিক উপরে উঠেছিলাম—অপর পাহাড় হ'তে জলধারা ছুটে এসে মহাশব্দে নীচের পাহাড়ে পড়ছে, তারপর সেই পাহাড়ের বুকে ঢেউএর পর ঢেউ তুলে, বহুদূরে শালবনের কোন গহন বুকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। উশ্রীর সেই ত্রিধারার নীচেকার জল, পাকচক্রের মত ভীষণ ঘুরছে ও ফুল্‌ছে এবং সেই কল্লোল বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছে। সমগ্র স্থানটি মুখরা উশ্রীর গর্জ্জনে ও প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে আছে।

আমরা এই জায়গাটিতে অনেকক্ষণ বসে, আস্তে আস্তে আবার নেমে এলাম। সেদিন মধুপুর থেকে আরও ২।১টি ভদ্র পরিবার উশ্রীতে বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁদের সাথে আমাদের আলাপ হল। উশ্রী প্রপাতের সম্মুখেই একটি পরিষ্কার জায়গায় বসে আমাদের চা ও খাবার খাওয়া হল। বহুদূর ফিরে যেতে হবে, কাজেই খুব ইচ্ছা সত্ত্বেও, উশ্রীর শ্রী দেখার লোভ আমাদের সম্বরণ করতে হল।

বনপথ দিয়ে আবার চলা সুরু হল। পিছনে উশ্রীর গর্জ্জন বাতাসে ভেসে আসতে লাগল; খানিকদূর এসে বনের ফাঁক দিয়ে উশ্রীর আবার দর্শন পেলাম। পাহাড়ের উপর দিয়ে সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে উদ্দাম স্রোত ছুটে চলেছে তার সুন্দরের সন্ধানে।

বনপথের শেষে গিয়ে আবার মোটরে উঠলাম।

গিরিডিতে এসে কাকা বল্লেন, "চল, ২৫ বৎসর আগে যে বাড়ীতে আমরা ছিলাম, তোমাদের দেখিয়ে আনি।" গিরিডির শেষ প্রান্তে উশ্রী যেখানে শান্তভাবে প্রবাহিতা, সেইখানে একখানি সুন্দর বাড়ী দেখলাম। এইখানে কাকা ছিলেন, তখন এখানে এত ঘন ঘন বাড়ী হয় নি, তখন কাকীমা বেঁচে ছিলেন, তিনি আজ পরলোকে!

গিরিডি খুব বড় না হলেও, সহরটী মন্দ নয়। আজকাল রাস্তাঘাটে ইলেকট্রীক্ আলো হয়েছে। ২৫ বৎসর আগেকার গিরিডি ও এখনকার গিরিডিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। গিরিডির বাজার ছোটর মধ্যে বেশ সাজান। আমরা কিছু বাজার করে বেলা প্রায় ৫টায় মোটরে উঠলাম।

আবার সেই লালমাটীর ঢেউ-খেলান পাহাড়-পথে মোটর ছুটল। মোটরের গতি কিন্তু আগের মতই, বেশী বই কম নয়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়ে তুলছিল। চক্ষের পলকে বরাকর ব্রিজে এলাম। পাহাড় ও শালবনের কোণ দিয়ে বরাকর নদী উদ্বেল হয়ে বয়ে চলেছে। ধূসর প্রস্তররাশির উপর দিয়া অস্ত রবির রক্তরশ্মি পড়ে নদীর জলে চুমকী জ্বলছিল, ঠিক যেন একখানি ছবি! তখন আসন্ন সন্ধ্যা, দূরে পরেশনাথকে ঢেকে ফেলছিল, রাঙা রবির কিরণ-রঞ্জিত আঁচলে; ফুলের মত দিকে দিকে তারা আকাশে ফুটে উঠল। কূলহারা পথ ধরে ছুটেছি বনানীর কোন গহন অন্ধকারে; আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বাসায় পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা ৬টা।

চিরকীর অনেক জায়গা আমরা আবিষ্কার করেছিলাম। আঁকা বাঁকা ক্ষেতের পাশ দিয়ে অনেক সাঁওতাল মাঝিদের পাড়ায় প্রবেশ করতাম এবং তাদের সঙ্গে আমাদের আধ বাংলা আধ হিন্দী ভাষায় আলাপ হত। পূর্ব্বোক্ত জিলিপী-তলায় আমরা প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। এই রসভরা নামটী বাস্তবিকই রসে ভরা; স্থানটী পুরাতন হতে জানত না। বড় রাস্তার উপর, মাইল খানেক দূরে একটী ডাক বাংলো আছে। বেশ ছোট্ট সুন্দর বাংলোখানি ভিতরে অনেক আসবাব দিয়ে সাজান। এরই সম্মুখের রাস্তাটী থেকে জিলিপাতলা অবধি পিচ ঢালা; বাংলোর ৩০।৪০ হাত পরে জিলিপীতলা আরম্ভ। রাস্তাটী পাহাড় কেটে জিলিপীর প্যাঁচের মত পাকিয়ে পাকিয়ে ঢালু হয়ে, ঠিক সাপের মত এঁকে বেঁকে গিরিডির দিকে নেমে গেছে। এই প্যাঁচের এক একটী মোড়ে দাঁড়ালেই বেশ বোঝা যায়, আমরা কত উচু থেকে নীচের দিকে নেমে চলেছি। এক পাশে পাহাড়, যদিও খুব বড় নয়, আর একপাশে প্রায় ২০০।৩০০ ফিট খাদ। পিছনে বহুদূরে পাহাড়-শ্রেণী এবং তারই কোলে শ্যামল শস্যের উত্তরীয় বিছান। কি সুন্দর এই পথ, লতার মত পাহাড়ের বুকে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে, জিলিপী তলার বাঁধটী প্রায় আধ মাইল হবে। সেখানে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরবার সময় পথের মাঝে সন্ধ্যা হয়ে যেত; পশ্চিমের আকাশে লালের একটা সমুজ্জ্বল রেখা টেনে সূর্য্য তখন পরপারে যেতেন; খানিক পরে সেই প্রদীপ্ত লালের ললাটে নীল আকাশের কোলে, সমুজ্জ্বল একটী সন্ধ্যাতারা দেখা দিত আরতির দীপশিখাটীর মত। কখনও কখনও পরেশনাথের শিখরে অর্দ্ধচন্দ্রের দেখাও পেতাম, মৃদু জ্যোৎস্না-বিচ্ছুরিত দেবাদিদেবের ভালে অর্দ্ধেন্দু মৌলীর মত।

একদিন দুপুর বেলা কাকার সাথে আমরা বেড়াতে গেলাম। ইচ্ছা ছিল আমাদের বাড়ীর পিছনে সেই ছোট্ট পাহাড়ের উপর গিয়ে একটু গল্প করব,—এই পাহাড়ে যাবার পথে একটা খোলা মাঠের মধ্যে একটী ছোট স্কুল আছে। পথে যেতে দেখি, ঐ স্কুলঘরের দরজা খোলা, আমরা তখন স্কুলের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। কৌতুকোজ্জ্বল নয়নে ১৪।১৫ জন ছেলে মেয়ে দরজা ঘিরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল; মাষ্টার ম'শায় তাঁর চেয়ারখানি এনে বাইরে পেতে দিলেন। আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম কিন্তু তাদের বই খুলেই আমাদের চক্ষু স্থির! এ যে দেখছি দেবনাগরী। তবু অনেক কসরৎ করে একটু আধটু জিজ্ঞাসা করে আমরা তাদের আমাদের বাড়ী যেতে বললাম। কাকা মাষ্টার মহাশয়ের পরিচয় নিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। স্কুলের ছোট একটী মেয়ে, নাম তার ভগবতীয়া। তাকে আমাদের ভারী ভাল লাগত, এমনি মিষ্টি তার মুখখানি। তাকে নিয়ে আমাদের অনেক আলোচনা হত, তাকে দেখে মনে হত এ যেন ছবিতে আঁকা সেই বৃন্দাবনের রাধিকা, এমনি আরও কত কি! আমরা তাদের বাড়ী যেতাম মাঠের উপর দিয়ে, ঝরণার জলে পা ভিজিয়ে আর সবুজ

ক্ষেতের বাতাসে দোলা স্বর্ণমণ্ডিত শীর্ষগুলির ঝুঁকে পড়া সরু রাস্তা দিয়ে ; ফিরবার পথে আমাদের হাতে থাকত একরাশ শিশিরে ভেজা তরুলতা ফুল আর লাউ কুমড়া প্রভৃতি সবজী।

একদিন কাকা বল্লেন, চল, আজ হীরামনের বাড়ী যাওয়া যাক। হীরামন হচ্ছে চিরকীর একমাত্র নাপিত, যাকে বলে 'সবে ধন নীলমণি' সেখানে আর দ্বিতীয় নাপিত নাই। আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যে ঝরণাটী গেছে তারই পরপারে কিছুদূরে তার বাড়ী। একদিন সকালের প্রাতরাশ শেষ করে তার বাড়ী খুঁজতে চললাম। সকলেই গল্প করতে করতে চলেছি ; ছোট্ট ঝরণাটী পার হবার সময় হঠাৎ ধপাস করে একটা শব্দ হল। ফিরে দেখি, আমাদেরই একজন পাথরে পা পিছলিয়ে একেবারে ঝরণার জলে। আমরা সকলে খুব হেসে উঠলাম, কিন্তু বেচারীর এ দশা দেখলে দুঃখে পাষাণও বিগলিত হয়। একে এই পাহাড়ে শীত ও ঝরণার কনকনে ঠাণ্ডা জল, তার উপর সকলের হাসির ফোয়ারা! শীতের কাঁপুনীতে, লজ্জায়, ক্ষোভে মুখখানি তার রক্তরাঙা হয়ে উঠল। কে যেন ঐ সুন্দর মুখখানিতে আবিরের ছোপ মাখিয়ে দিয়েছে। আমাদের সঙ্গে গায়ের চাদর ছিল, সেইটী গায়ে জড়িয়ে আমাদের হাসি-ঠাট্টার মধ্যে পড়ে সেও হেসে চল্‌তে আরম্ভ করল। অনেক শস্যক্ষেত্র, অনেক ছোট ছোট সাঁওতাল কুঠি পার হয়ে হীরামন নাপিতের বাড়ীর দর্শন পেলাম। হীরামন ত ভারী খুসী : শশব্যস্তে তার শোবার যতগুলি খাটিয়া ছিল, একে একে বাইরে এনে বাড়ীর অঙ্গিনায় গাছতলায় আমাদের বসতে দিল। এখান থেকে পরেশনাথের দৃশ্য অতি চমৎকার, তখন বেলা প্রায় দশটা, উজ্জ্বল সৌরকরে তার বিরাট আয়তন উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিচ্ছিল। হীরামন-পরিবারবর্গের সাথে আমাদের আলাপ পরিচয় হল। তার দুই ছেলের বৌ এসে আমাদের চরণে প্রণাম করল, প্রণামের ভঙ্গিমাটী ভারী সুন্দর। সকল দেহ ভূলুণ্ঠিত করে, শাড়ির আঁচলে আস্তে আস্তে পায়ের ধূলা নিয়ে কপালে, মুখে, বুকে দিল। এই প্রণামের সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে দুই বৌকে দু'টী টাকা দিয়ে আমরা মুখ দেখলাম, তাতে তারা মহাখুসী। হীরামন তখন তার নিজ বাগান থেকে এক গোছা বরবটী, কুমড়ার ডাটা, সন্দোয়া একঘটি দুধ নিয়ে আমাদের সম্মান জানাল। হীরামনের উপঢৌকন বহন করে আমরা বাসায় ফিরলাম।

আমাদের বাসার দু'মাইল দূরে পশ্চিম দিকে আর একটি ছোট পাহাড় ছিল। সেখানে একদিন আমরা বেড়াতে গেলাম। পথে যেতে যেতে এই পার্ব্বত্যস্থানে একটী জলার মধ্যে রক্তকুমুদ ফুটে রয়েছে দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় আমাদের চিত্ত সত্যি সত্যিই এই লাল কুসুমপুঞ্জের সাথে নৃত্য করে উঠল। মঃ বাবু কাহাকেও ছেড়ে কথা কন্ না। একটী সাঁওতাল বালককে পয়সা দিয়ে তার দ্বারা অনেকগুলি ফুল তুলিয়া আনলেন। সেইগুলিই সে দিন আমাদের ফুলদানীর উপাদান হয়েছিল ও আমাদের টেবিলে সারাদিন আনন্দ দিয়েছিল।

চিরকীতে আর একটী দেখবার জিনিষ আছে, সেটী একটী spring. কিন্তু এর একটু নূতনত্ব আছে। একদিন সকলে মিলে সেখানে বেড়াতে গেলাম। কয়েকটী সাঁওতালবাড়ীর পাশ দিয়ে এক ধানের ক্ষেতে এসে পৌঁছলাম কিন্তু কোথাও জল দেখা গেল না। গলা পর্য্যন্ত উঁচু ধানের পাশ দিয়ে খানিক দূর গিয়ে দেখি, সেই ধানের ক্ষেতের ভিতর খানিকটা জায়গায় একটী বড় গাছের গুঁড়ি বসান, তার ভিতরটা খোঁদল করে চেঁচে প্রকাণ্ড বাটীর মত করা হয়েছে। সবটাই জলে পরিপূর্ণ, ঐ জল অফুরন্ত। ঐ কাষ্ঠের বাটীর তলা হ'তে অনবরত জল উঠে তার পূর্ণতা বজায় রেখেছে। এ যেন সেই ব্রতকথার রাজকুমারীর মন্ত্রপূত ছোট্ট জলপাত্র ; রাজা খেলেন, মন্ত্রী খেলেন, হাতী, ঘোড়া, সিপাই, সান্ত্রী সকলে খেল, তবু জল আর ফুরায় না। এই কাষ্ঠের বাটীটীও সমগ্র চিরকী গ্রামখানির তৃষ্ণা নিবারণ করেও সকল সময় ঠিক একরকমই থাকে।

[ক্রমশঃ

সত্যের মহা-গান

শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ

মরণ যজ্ঞ সুরু হয়ে গ্যাছে ওই !
মারণ ক্রিয়ায় মত্ত ভোগীর দল,
চলে দলে দলে মারিতে মরিতে সব,
রক্ত-কণিকা বিষে বিষে চঞ্চল !!
আকাশে বাতাসে
প্রতি নিশ্বাসে—
—আগুনের কোলাহল !
পৃথিবীর বুক লাল হয়ে গ্যাছে
জ্বলে গ্যাছে আঁখি জল !!

দয়ার বিলাপ সাহারায় আজ
দাঁড়ায়েছে মাথা তুলি !
তপ্ত বালির ক্রূর তরঙ্গে
তীব্র তুফানগুলি,—
করে চিৎকার
কহে বার বার—
দয়া মায়া আর সত্যের বুকে
জোরে জোরে পদাঘাৎ,
দেবতার বুকে করিয়াছে যারা
ছলনা-ছুরিকা-ঘাৎ !
আধ্ মড়াদের জ্বালায়ে পোড়ায়ে
কাড়িয়া মুখের গ্রাস,
গড়িয়াছে যারা পিশুন-হাসিতে
নিজের বিলাস বাস,
প্রতি ইঁটে তার বারুদের হাসি
গড়িয়াছে নিজ হাতে !
পরকে মারিতে নিজের অগ্নি
নিজেরে পোড়াবে তাতে !!
লেগে যাবে দাঁত দাঁতে !!!

* * *

শান্তির বেশে মঙ্গল শিব
এসেছিলো একদিন—
ধ্বংস-দেবতা হইয়া আবার
মঙ্গল সেই ফিরাইতে তার
হীন্‌দের ওই দীন কোষে দিতে
জেগেছে হইয়া হীন্ !

* * *

আকাশের পাখী
শ্যামল মাটির
পুষ্পিত তরুলতা
শেষ নিঃশাসের
কালে কয়ে যায়—
শুনে যারে শেষ কথা,—
বিংশ শতাব্দীর
পশুর চেয়েও মানুষ ঘৃণ্য
মানুষই সর্ব্বনেশে !—
বাইরে সে 'আলো-চাঁদ'
শত চাঁদ-বসা হীরক-মালা,
ভেতরে গোখ্‌রো বেশে !!

মৌন কঠিন পাথরে
ছলনা কোথায় ?—
পাওয়া যায় তবু প্রাণ !
কিন্তু মানুষ ?
কোথায় সে হুঁস !
মানুষের বেশে মানুষের চলা ?
এই যুগে হায়
শুধু মানুষের ভান !!
নাহিবে পরিত্রাণ !
আমি এই কবি
দেখি সেই ছবি,—
ধরণীর
জননীর
মুখ মেঘ-মাখা ম্লান !!
ক্ষণে ক্ষণে ওই থেকে থেকে সে যে
ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস !
আশীষ তাঁহার অভিশাপ হয়ে
গড়ে সু-সর্ব্বনাশ !!

সত্যের অপমান
সহিতে পারে নি, পারে না পৃথিবী
আনে তাই অবসান !......
আপনার অবসান—
আপনি আনিয়া বাঁচিতে বাঁচাতে,
নূতন হইয়া জাগিতে জাগাতে
সৃষ্টির হাতে সৃষ্টির বুকে
হানিছে মৃত্যু-বান !
নরমেধে আজ শোনে এই কবি
সত্যের মহা-গান !!

পল্লী-সংস্কার

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

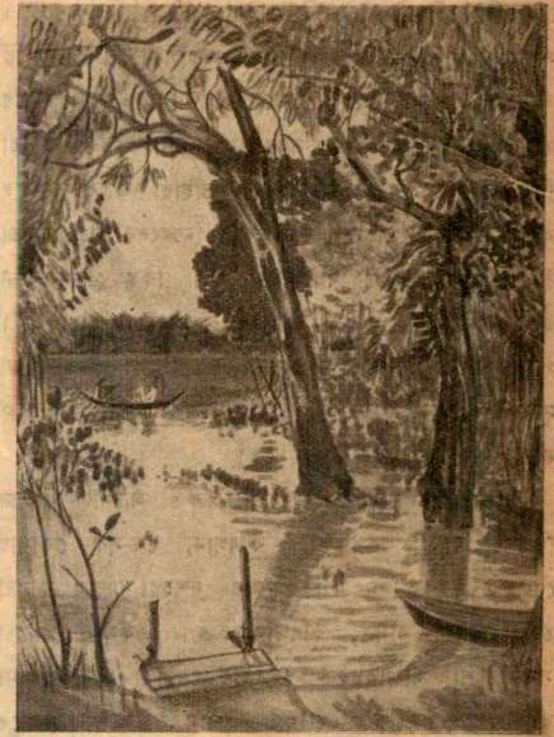

দেশের নায়কগণ ভাবিতেছেন গ্রামের উন্নতি কিসে হয়, তাই আধুনিক চিন্তাধারার মতো একটা কথা অনেক শোনা যায়, Back to the village—গ্রামে ফিরিয়া যাও। চিন্তা-নায়কগণ তো উপদেশ দিয়াই খালাস—আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে। গ্রামে কেহ ফিরিয়া আসিতেছে কি? বরং দিন দিন দেখিতে পাই, গ্রামের লোকেরাই ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া সহরে গিয়া বাস করিতেছে। সহর স্ফাত হইয়া উঠিতেছে। বিক্রমপুর সম্বন্ধে এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। অন্য জেলার কথা জানি না, কিন্তু বিক্রমপুরে এ সমস্যাটা গুরুতর। কলিকাতার উপকণ্ঠের বিস্তৃতিতে দেখিতে পাই, বিক্রমপুরের অনেক সন্তান দ্বিতল, ত্রিতল প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া কলিকাতারই স্থায়ী বাসিন্দারূপে গণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা অধিকাংশই অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ চাকুরে। তাঁহাদের আজীবনের সঞ্চিত অর্থ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়াছেন। এক সময় ছিল, যখন পেন্সনপ্রাপ্ত চাকুরেরা গ্রামেই আসিয়া শেষ জীবনের বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতেন। পদ্মার ভাঙনেও বিক্রমপুরের বহু পরিবার গৃহহীন হইয়াছেন, তাঁহারা আর দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করেন নাই, একেবারে নগরবাসী হইয়া পড়িয়াছেন।

ছাপাপুস্তকে নয়া নয়া চিন্তা বেশ লাগে, কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করাই মুস্কিল। অধুনা নাগরিক সভ্যতার দিনে, কি করিয়া গ্রামের দিকে মুখ ফেরান যাইতে পারে, সেটাই চিন্তার বিষয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি শুধু শিক্ষিত লোকদের কথা, অর্থাৎ চাকুরেদের কথা। তা ছাড়া গ্রামে আরো তো নানা শ্রেণীর লোক আছে, যারা কোন কারুকর্ম্ম করিয়া, কায়িক পরিশ্রম করিয়া, গ্রামের বাজারে কোনো দোকান খুলিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে; তাহাদের অবস্থা কিরূপ? তাহাদেরও এক গতি—অর্থাৎ নগরমুখো গতি। যাঁহারা চাকুরে তাঁহারা সহজেই গ্রামের মায়া কাটাইয়া ফেলেন। বিদেশে চাকুরীর জন্য থাকিতে থাকিতে পল্লীর জন্য যে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকিতে পারে, তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। বিদেশে গমন করার পর হয় ত বারকয়েক পূজার ছুটীতে

পৈতৃকগৃহে পদার্পণ করেন, অবশেষে একদিন দেখা যায় পল্লীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়া যায়, জনশূন্য গৃহের চালগুলি ভিটীর উপর হুমড়ি খাইয়া পড়ে। বিক্রমপুরে এ সব বাড়ী ছাড়াবাড়ী নামে পরিচিত। কলিকাতায় দেখিয়াছি আমাদের গ্রামের ধোপা, জেলে, গোয়ালা, ইত্যাদি অর্থের তল্লাসে আসিয়াছে। এক সময় তাহারা গ্রামে খাইয়া পরিয়া ছিল। গ্রামের চাহিদা মিটাইয়াই তাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত; এখন তাহারা কর্ম্মহীন। নিজেদের গৃহ ছাড়িয়া ইহারা সহজে বাহিরে যাইতে চায় না। কিন্তু গ্রামে যখন জীবিকানির্ব্বাহ অচল হইয়া ওঠে, বাহিরে যাইতে বাধ্য হয়। পল্লীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না বাড়াইতে পারিলে পল্লীর সমস্যা দূর হইবে কেমন করিয়া? উৎসব-মুখরিত পল্লীর স্বাভাবিক জীবন কি করিয়া ফিরিয়া আসিবে?

বাল্যকালে পল্লীতে দেখিয়াছি, কত আমোদ-আহ্লাদ ছিল; যাত্রা, কথকতা, কবিগান, সে-সব কোথায় গেল এখন? দু'দিন কার্ত্তিকপূজার দশহরা ধুমধাম করিয়া হইত, মেলা বসিত, কবিগান হইত। একমাস ধরিয়া সমস্ত বৈশাখ মাসে হইত গলুইয়ার মেলা। দোকানসমূহ রঙীন কাগজের ফুলে থাকিত সাজান; উজ্জ্বল আলোকে মেলাভূমি আনন্দের বার্ত্তা দিত। ভোর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত লোকের ভীড়, একমাস ধরিয়া কত বেচা-কেনা হইত, কত পণ্য আসিত, টাকাকড়ির কত লেন-দেন হইত। গ্রামের যেন তখন একটা প্রাচুর্য্য ছিল, লোকদের স্ফূর্ত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল, সব কোথায় গেল?

পল্লীজননীর গুণ গাহিলে এবং এই সমস্যার বিচার নিছক আদর্শবাদের দিক হইতে দেখিলে, বর্ত্তমান পল্লী-সমস্যার সমাধান কিছুতেই হইবে না। চাঁদের আলো, আম্রকাননের ছায়া, এ-সব কথা বলিলে মানুষের মন ভিজিবে না। কালের গতি সম্মুখপানে, তাহার মোড় ফেরান যাইতে পারে না। মানুষের মন এখন নগরের দিকে। নগরের আরাম-সুখের প্রতি সকলে আকৃষ্ট। গ্রাম্যজীবনের নানা অসুবিধার সঙ্গে এখন সে কিছুতেই খাপ খাইয়া চলিতে পারে না।

ততঃ কিম্? চাই অর্থ, চাই স্বাস্থ্য, চাই শিক্ষা, চাই আনন্দ। নগরকে টানিয়া আনিতে হইবে গ্রামে; নগরের কিছু সুবিধা, কিছু আরামের ব্যবস্থা করিতে হইবে গ্রামে। পথ-ঘাটের সুবিধা করিয়া, যানবাহনাদির ব্যবস্থা করিয়া নগরের দূরত্ব ঘুচাইতে হইবে। প্রত্যেক মফস্বল সহরে ছোট-খাট ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থা করিয়া ছোট খাট factory বা কল স্থাপন করিয়া, গ্রামে ধনাগমনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ হইলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা গ্রামে থাকিয়াই এ সব প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী হইতে পারে। এই ব্যবস্থা নগরের অস্বাস্থ্যকর পঙ্কিল বস্তি নামক জিনিষটী গড়িতে দিবে না।

বড় সহরে, বন্দরে, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত না হইয়া যত ছড়াইয়া পড়ে ততই মঙ্গল। একটা বড় কল-কারখানা না গড়িয়া তাহা নানাস্থানে খণ্ডাকারে ছড়াইয়া দেওয়া অর্থনীতি এবং জাতীয় স্বাস্থ্যের দিক হইতে শুভ। সমস্ত দেশের রক্ত শোষণ করিয়া নগরে পুঞ্জীভূত করা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। বিক্রমপুরের গ্রামগুলি নদী-খাল-পরিবৃত দেশ; গ্রাম হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে গ্রামে পণ্য বহন করিয়া লওয়ার খুবই সুবিধা। ছোট ছোট ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠার এখানে যথেষ্ট সুযোগ আছে।

এসব গেল অল্প মূলধনে ছোট খাট কল-কারখানা পরিচালনা করার কথা। কিন্তু গ্রামে যে সকল কারু-শিল্পী দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে, তার ব্যবস্থা কি? কুম্ভকার, কর্ম্মকার, তাঁতি, সূত্রধর প্রভৃতি গ্রামে থাকিয়াই পুরুষানুক্রমে পৈতৃক ব্যবসা চালাইতেছে, বর্ত্তমানে অনেকেরই দুরবস্থা। দুইটি কারণ; প্রথম মূলধনের অভাব, দ্বিতীয় পণ্যের বাজারের অভাব। অর্থনীতিবিশারদগণের বড় বড় মুখরোচক scheme ছাপান পুস্তক হইতে বাহির হইয়া কামারের হাপর বা তাঁতির তাঁত স্পর্শ করে না।

আমি একবার গ্রামের কারু-শিল্পীদের তথ্য সংগ্রহে মন দিয়াছিলাম। Economic survey of the Village এ ধরণের একটা কিছু লেখার বাসনা ছিল।

ধরা যাউক, কর্ম্মকারদের কথা। আমাদের গ্রামে ১০।১১ ঘর কর্ম্মকার আছে, তাহারা লোহার কাজ করিয়া থাকে। গ্রামের প্রয়োজনীয় দা, কুড়াল, কোদাল, পেরেক ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া থাকে। এক সময় ইহাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। ২০।২৫ বছর আগের কথা মনে পড়ে,

বাজারে অক্ষয় কর্ম্মকারের দোকানে ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাজ চলিত ; সর্ব্বক্ষণ হাতুড়ীর ঠকাঠক্ শব্দ শুনিতে পাইতাম। আমি জানি, কলিকাতায় এবং বিদেশে আমাদের দেশের যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা সেখানকার জিনিষ না কিনিয়া অক্ষয় কর্ম্মকারের তৈয়ারী, হাত দা, বঁটী দা, নারকেল-কোরানী প্রভৃতি কিনিতেন।

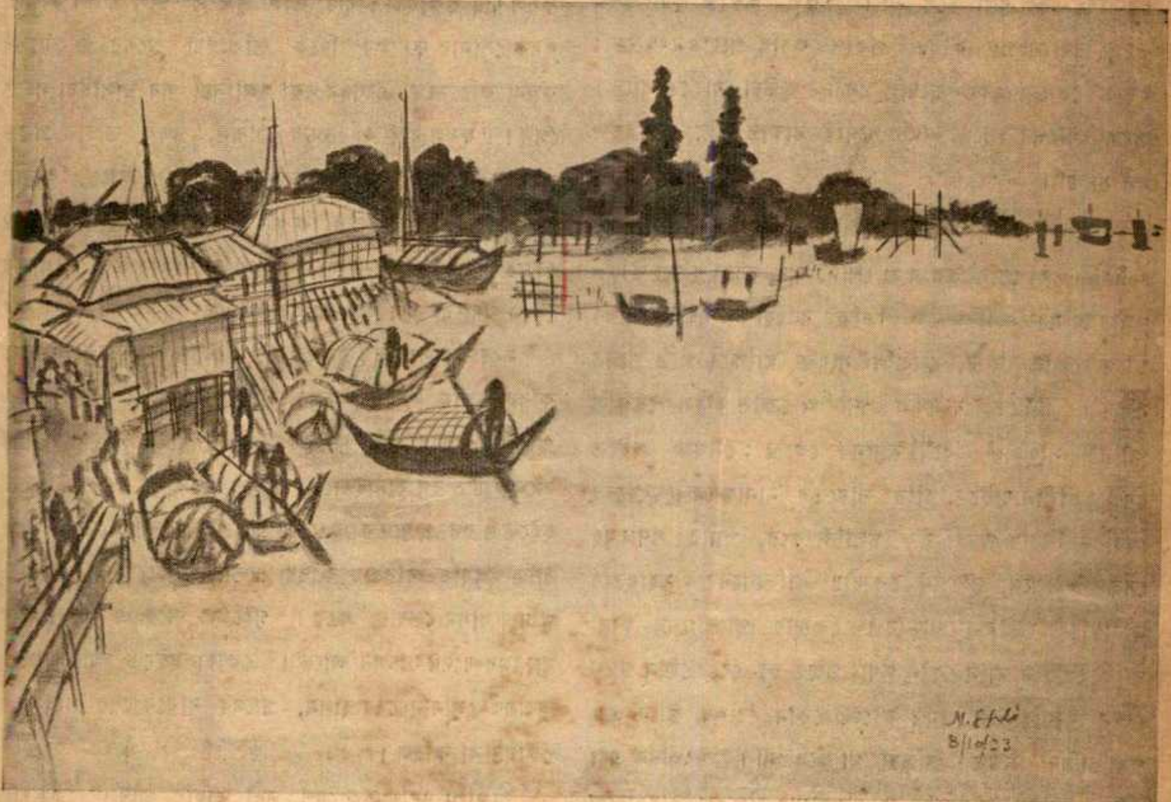

আমাদের গ্রামে মোটে এক ঘর কুম্ভকার আছে, তাহারা সারা বছর দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে ; তাহারা হাঁড়ী, কলসী প্রভৃতি তৈয়ার করে না। বড় খাল বা নদীর ধারে যে সব কুম্ভকারদের বাড়ী তাহাদের এ সব তৈয়ার করার সুবিধা। ঢাকা জেলার কুম্ভকাররা এ সব কাজে সুদক্ষ। কলিকাতার রাস্তায় দেখিয়াছি, ঢাকার কুম্ভকার মাথায় ঝাঁকা করিয়া সুদৃশ্য কলসী, কুঁজো, বৈয়ম প্রভৃতি ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে। একদিন দশ পয়সা দিয়া পাথরের মত কালো রংয়ের একটি ছোট কলসী কিনিলাম ; সুন্দর গঠন, ড্রইংরুমে ফুলদানী হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কুম্ভকার গর্ব্বের সহিত বলিল, সাহেবদের নিকট সে এই কলসী এক টাকা দামে বিক্রী করিয়া থাকে। এসব দ্রব্য glazed করিয়া বিক্রী করিলে অধিক মুনাফা হইতে পারে। বিক্রমপুরে পটারি ওয়ার্কস করার সুযোগ আছে। গ্রামের সুদক্ষ কারিগরদের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, আর পটারির উপযুক্ত এঁটেল মাটির অভাব হইবে না।

শ্রীনিকেতনে ছোট একটি পটারি-ওয়ার্কস দেখিয়াছি, সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে। বিক্রমপুরে কুটীর শিল্প হিসাবে এরূপ পটারি ওয়ার্কস চলিতে পারে।

কোথাও কোথাও যে লুপ্ত গ্রাম্যশিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয় নাই, তাহা নহে। বিক্রমপুরের কাগজ-শিল্প প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। ইহা এখন বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালার বাহিরে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালাতে এবং বাঙ্গালার বাহিরে এখানকার কাগজীদের ডাক পড়িয়াছে কাগজ তৈয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য। বাঙ্গালার বাহির হইতে গ্রামে

(আউটসাহী) কাগজশিল্প শিক্ষা করার জন্য লোক আসিয়াছে। হাতে তৈয়ারী কাগজ-শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ একজন আমেরিকানও এ গ্রামে আসিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের কাগজীদের সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে যে কোন কাজ হয় নাই, এরূপ বলা চলে না। এরূপ অন্যান্য কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে; হয় ত' কোনো একটা সুযোগ একদিন জুটিয়া যাইতে পারে। সুদক্ষ কারিগর আছে, অথচ পণ্যের বাজার নাই, এই হইল মূল সমস্যা।

ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে আজকাল সব সময়ই যে-সব scheme বা প্ল্যান এর কথা শোনা যায়, তাহা হওয়া উচিত পল্লীর এ সব কারিগরকে ভিত্তি করিয়া। নগরে থাকা উচিত কোন কেন্দ্র, সেগুলি সংযুক্ত থাকিবে প্রতি পল্লীর সহিত। পল্লীতে যে-সকল পণ্য অবিক্রীত রহিল সেগুলি আসিয়া সংগৃহীত হইবে নগরের কেন্দ্রে; সেখান হইতে সে সব চালান যাইতে পারে ভারতের নানাস্থানে। দেহের শিরা-উপশিরায় যেরূপ রক্ত চলাচল করে, পল্লীর পণ্যসমূহ সেরূপ জলপথে, স্থলপথে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িবে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের জানা থাকিবে কোন্ স্থানে কোন্ পণ্য প্রস্তুত হয় এবং কোন্ স্থানে কোন্ পণ্যের প্রয়োজন; কাজেই কোন বিশেষ স্থানে এক পণ্য চাহিদা অভাবে পড়িয়া থাকিবে না। উৎপাদন এবং চাহিদা সমানতালে চলিয়া কারুশিল্পীদের পৈতৃক ব্যবসায়কে জিয়াইয়া রাখিয়া বহু পরিবারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে। এরূপ কোন ব্যবস্থা সম্ভব হইলে নগরমুখো গতিকে কিয়ৎ পরিমাণে গ্রামের দিকে ফেরান সম্ভব হইবে।

কৃষি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ভারতীয়দের সম্বন্ধে একটি উক্তি আছে, A nation living in the villages ভারতীয় জাতির এই গ্রামের বনিয়াদ হইল কৃষক। ভারতীয় কৃষকের সমস্যা এত গুরুতর এবং জটিল যে, এ বিষয়ে কিছু সমাধান করা নিতান্ত দুরূহ। সমস্যা যেন সমুদ্রসদৃশ, ভাবনা করিয়াও হালে যেন পানি পাওয়া যায় না। গ্রামবাসী অধিকাংশই কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; কাজেই গ্রামের স্বাচ্ছন্দ্য যে অনেকটা কৃষকের স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নির্ভর করে, সন্দেহ নাই। কৃষক তাহার কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতে পারে না, প্রকৃতি অথবা ভাগ্যের হাতে কৃষক ক্রীড়নক মাত্র। কৃষক তাহার কার্য্য সম্বন্ধে যতই অভিজ্ঞ এবং পরিশ্রমী হউক না কেন, সে কিছুতেই তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারে না। অনাবৃষ্টিতে ফসল যায় শুকাইয়া; যদি ভাল বৃষ্টিতে ভাল ফসল জন্মিল, কৃষক সোনার ফসলের দিকে তাকাইয়া সুখের ভবিষ্যতের কল্পনা করিতেছে, একদিন বন্যা আসিয়া সব ভাসাইয়া লইয়া গেল। ফসল যদি বা প্রচুর জন্মিল, কৃষক তাহার প্রকৃত মূল্য পাইল না। আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর কি?' এখন পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত সচল ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, জগতের কোন পণ্য বা কৃষিজাত বস্তু বিশ্লিষ্ট এবং একক নহে।

নব্বই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ গ্রামের গুরুদাস সূত্রধরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বারকোশের ব্যবসায় কেমন চলিতেছে। গুরুদাস সূতার বড় কারিগর, যৌবনকালে নিজের হাতে অনেক উচ্চ রথ বানাইয়াছে, তাহার গুণপনার জন্য অন্য জেলা হইতেও রথ প্রস্তুতের জন্য ডাক পড়িয়াছে। ভোর হইতে রাত্রি অবধি পরিশ্রম করিয়া সূতাররা কাঁঠাল বা আমকাঠ খুদিয়া বাসন তৈয়ার করে। গৃহস্থের ঘরে এ সব কাঠের বাসনের যথেষ্ট প্রচলন আছে। কোথা হইতে আসিল সস্তা কুৎসিৎ এলুমিনিয়মের বাসন, গ্রামের বারকোশের ব্যবসাকে কোনঠাসা করিল।

বাঙ্গালা নদীমাতৃক দেশ, নদী তাহার প্রাণ। কিছুকাল যাবৎ নদী-নিয়ন্ত্রণের কথা শোনা যাইতেছে। বাঙ্গালার সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি এই নদী নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করিতেছে। বাঁকুড়া ও বীরভূমের কৃষকগণ যখন জলাভাবে হাহাকার করিতেছে, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়িয়াছে সমগ্র জেলার উপর অনাবৃষ্টির জন্য, পূর্ব্ববঙ্গ তখন ভাসিয়া যাইতেছে বন্যায়। প্রকৃতির এই নির্ম্মম পরিহাস! মূঢ় মানব শুধু কপালে করাঘাত করিয়া সব নীরবে অবলোকন করিতেছে মাত্র।

কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ফসল বৃদ্ধির কথা কেউ কেউ আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার প্রধান প্রতিবন্ধক, আমাদের দেশে কৃষকের জমি খণ্ডাকারে। মান্ধাতার আমল হইতে এক ভাবেই চাষ চলিয়া আসিতেছে

বলিয়া, উৎপাদন বেশী তো হইতেছে না, বরং ক্রমে ক্রমে জমির অপকর্ষণের জন্য ফসলের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে। ইহা হইল জমির উপর দস্যুবৃত্তি। এই বিষয়ে এল, কে, এল্মহারস্ট সাহেব Robbery of the soil নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ বহু পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন। আমরা জমি হইতে গ্রহণ করিতেছি কিন্তু তাহাকে কিছু ফিরাইয়া দিতেছি না। ইউরোপে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করার জন্য ফসলের পরিমাণ অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। গৃহস্থের শতভাগে বিভক্ত জমির একীকরণ না হইলে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা সম্ভব নহে। আধুনিক রাশিয়া কৃষিক্ষেত্রের একীকরণ বিষয়ে অপূর্ব্ব সফলতা দেখাইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রের এই একীকরণ collectivisation নামে পরিচিত। আমরা এই ব্যাপারকে কল্পনায়ও স্থান দিতে পারি না।

উৎপন্ন কৃষির মূল্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত, যাহাতে অস্বাভাবিক রকমে ওঠাপড়া না করে। চাই চাহিদা অনুসারে জিনিষ উৎপন্ন করা। প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষের উৎপাদন হইয়া থাকিলে মূল্যের অস্বাভাবিক তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বাণিজ্যের এই ব্যালান্স রাখার জন্য, আমেরিকার খবরে অনেক সময় বিপর্য্যয় ঘটিতে দেখা যায়। গাড়ী বোঝাই করিয়া অতিরিক্ত দুধ নদীতে আনিয়া ঢালিতেছে, পর্ব্বতপ্রমাণ গম আগুন লাগাইয়া পোড়াইতেছে। সে সময় হয়ত চীনে ও ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, লোকেরা অন্নাভাবে মরিতেছে।

বাঙ্গালাদেশে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়, তৎসত্ত্বেও আমাদের নির্ভর করিতে হয়, রেঙ্গুনের চাউলের উপর। তাহার কারণ, আমাদের ধান-চাউল বাইরে যায় চালান ; দেশের চাহিদা মিটাইয়া উদ্বৃত্ত শস্য শুধু বাহিরে চালান হওয়া উচিত। আমদানি-রপ্তানির উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ বা control নাই। দেশের চাহিদা, রপ্তানি এবং উৎপাদন

সমভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে দেশে কখনও অন্নাভাব হইতে পারে না।

সম্প্রতি পাটচাষের উপর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা শুভ হইয়াছে। পাটচাষের লাভ-ক্ষতিটা দাঁড়াইয়াছিল জুয়াখেলার ন্যায়; একমণের দাম ৩৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা হইয়াছে। ইউরোপীয় বণিকদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করার জন্য পাট ব্যবসায় উৎপাদনকারীর হাতে ছিল না। স্কটল্যাণ্ডের চাহিদা অনুসারে এবং সাহেবদের দাম ফেলার উপর নির্ভর করিয়াছে পাটব্যবসায়। দেশের ভিতরেই যাহাতে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি হয় তাহারও চেষ্টা সম্প্রতি চলিতেছে। পাটের সুদৃশ্য রঙীন সতরঞ্চি, বেড-কভার, দরজার পরদা প্রভৃতি পাট হইতে প্রস্তুত হইতেছে। গৃহ শিল্প হিসাবেও এসব তাঁতে বোনা চলিতেছে।

আর একটা কাজে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট হইতে পারে। কাগজ প্রস্তুত করিতে মণ্ডহিসাবে (paper pulp) পাটের ব্যবহার চলিতে পারে। কিন্তু অল্প পরিমাণ পাটই একাজে লাগিয়া থাকে। বিক্রমপুরে বৎসর ৭।৮ শত রিম কাগজ হইয়া থাকে,তাহাতে অনুমানিক ২৫মণ পাটের প্রয়োজন হয়। এখানে কাগজের ছাঁট ও পাট দুই-ই একসঙ্গে মণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মুর্শিদাবাদে (মহাদেব নগর) শুধু পাটের মণ্ডে কাগজ তৈয়ার হইয়া থাকে, এখানে আনুমানিক বাৎসরিক ৯০ রিম কাগজে ২৫মণ পাটের প্রয়োজন হয়। হাওড়াতে যে হাতে তৈয়ারী কাগজ প্রস্তুত হয়, মণ্ডের জন্য শুধু সেখানে কাগজের ছাঁটের প্রয়োজন হয়। চট্টগ্রামে অল্প কিছু শনের কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রাশিয়ার ইকনমিক প্ল্যান সম্বন্ধে এক রাশিয়ান লেখকের এক পুস্তক পড়িয়াছিলাম। আজকাল সবকিছুতেই শোনা যায় একটা কথা "প্ল্যান"। প্ল্যান ছাড়া রাশিয়ার কিছু চলে না। পণ্য উৎপাদন, কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন, সব কিছুই প্ল্যান ছাড়া চলে না। রাষ্ট্র হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ আছে বলিয়া চাহিদার অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্ব হইতেই প্রয়োজন অনুসারে সব কিছুর হিসাব করা থাকে এবং সে অনুসারে পণ্য বা কৃষির উৎপাদন হইয়া থাকে। আমেরিকায় এ রকম প্ল্যান অনুসারে কাজ হয় না। সেখানে পুঁজিপতিদের হাতে ব্যবসা বলিয়া একের সঙ্গে অন্যের প্রতিযোগিতার জন্য কোনও সম্মিলিত প্ল্যান সম্ভব হয় না। লেখক একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়া জিনিষটা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ক, খ, গ ইত্যাদি আমেরিকার বিভিন্ন সহরের ক্রোড়পতি। তাহাদের অনেক টাকা অকেজো পড়িয়া আছে। প্রত্যেকেরই গুপ্তচর আমেরিকার বাজার অনুশীলন করিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতেছে কি করিয়া টাকা খাটাইলে অধিক মুনাফা থাকিবে। 'ক'য়ের চর দেখিল, বৎসর খানেক বাদে ১ কোটি টুপির দরকার হইবে, এটাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক ব্যবসা। 'ক' গোপনে প্রকাণ্ড বড় টুপির ফ্যাক্টরি খুলিয়া বসিল, তাড়াতাড়ি নিযুতের উপর আরো কিছু শূন্য বাড়াইয়া দিবে। 'খ'ও গোপনে টুপির খবর জানিয়াছে, সে আর এক সহরে, আর এক ফ্যাক্টরি ফাঁদিয়া বসিল। এমনি করিয়া 'ক' হইতে 'ঙ' পর্য্যন্ত সকলেই টুপির ফ্যাক্টরি করিয়া বসিয়াছে, রাতারাতি একটা কিছু করিয়া ফেলার জন্য কেহ কাহাকেও জানে না। কিন্তু বৎসরান্তে টুপি যখন বাজারে বাহির হইল, সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিল, দেখিল এক কোটির যায়গায় ৫ কোটি টুপি বাজারে উপস্থিত।

যাক, ও সব বড় বড় প্ল্যান লইয়া আমাদের আপাততঃ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। গ্রামের বর্ত্তমান সমস্যা এখন এই বড় বড় প্ল্যান নয়। ছোটখাট দু'চারটা কথার অবতারণা করিতেছি।

আমাদের চেষ্টার মধ্যে আছে দৈন্য, শুধু কপালের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি। প্রত্যহ আমরা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া থাকি। এই কর্ম্ম অভ্যাসগত হইলেও, ইহার ভিতর একটি অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও শ্রী আছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, পল্লীবধূ যতই ধুপদীপ জ্বালাইয়া লক্ষ্মীর আরাধনা করুক না, উদ্যমহীনের কখনও লক্ষ্মীলাভ হয় না। আমাদের অন্তরে-বাহিরে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে উদ্দেশ্যহীনতা ও আলস্য। কোন কর্ম্মের উল্লেখ হইলেই হয়ত সকলে বলিবে, যে দিনকাল পড়িয়াছে, কি করা যায়! দিনকাল যে, কিরূপ পড়িয়াছে, তাহা তো সকলেই জানে, তাই বলিয়া কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, দেবতার অনুগ্রহে আকাশ হইতে একদিন সৌভাগ্যের অবতরণ হইবে?

মনে মনে কত সময় কল্পনা করি, প্রতি গৃহস্থের বাড়ীগুলি ফুলে-ফলে, শাক-সব্জীতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, গৃহের চতুর্দ্দিকে

দেখা যাইবে, একটি শান্ত লক্ষ্মীশ্রী। এসকল কৃষি যে শুধু, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া প্রীতিপ্রদ হইবে তাহা নহে, ফল-মূল শাক-সব্জি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য্যের কাজ দিবে। কিন্তু আমাদের ঘর-বাড়ীর চতুর্দ্দিকে কি দেখি, আবর্জ্জনা আর আগাছা। একটু যে কষ্ট করিয়া, লাউ কুমড়া, শশারঝাকা করিবে তাহারও যেন উৎসাহের অভাব লক্ষিত হয়।

গ্রামের একটা জিনিষ আমার কাছে অর্থশূন্য ঠেকে, প্রতি গ্রামেই কতগুলি করিয়া ছাড়াবাড়ী দেখা যায়. যাহা ভট্টাচার্য্যের ভিটা, সেনের ভিটা ইত্যাদি নামে পরিচিত। ২৫।৩০ বছর ধরিয়া হয় ত' খালি জমি পড়িয়া আছে; গৃহস্বামী গ্রামত্যাগ করিয়াছেন, দিনাজপুর, বগুড়াতে ঘরবাড়ী করিয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বসবাস করিবার বনিয়াদ তৈয়ার করিয়াছেন। স্বগ্রামে পৈত্রিক ভিটা তাঁহার নিজের কাজে আসিলই না, অন্য কারো কাজেও লাগিতেছে না; আমি ইহা অনুচিত মনে করি। তুমি জমির মালিক, তুমি নিজে যদি ইহার কোন রকম ব্যবহার না কর, তবে ইহা বিক্রী করিয়া দেওয়া উচিত, বা কোন রকমে কাজে খাটান উচিত। যখন আমাদের অন্নাভাব রহিয়াছে, তখন- এক-টুকরা জমিও অব্যবহার্য্য হইয়া থাকা উচিত নহে। ইহা শুধু অর্থনৈতিক নয়, নৈতিক দিক হইতেও অনুচিত।

আমি যে মন্তব্য করিলাম, তাহাব পাল্টা তর্কও করা চলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিবেন, আমি জমি ব্যবহার করি আর না করি, তাতে তোমার কি হে বাপু, ও আমার পৈত্রিক ভিটা, ও আমি ছাড়িব কেন? তুমি তোমাব সিন্ধুকে বিশ হাজার টাকা জমাইয়া বসিয়া আছ; তুমি এ টাকাটা ব্যবসায়ে খাটাও না কেন? পরহিতে অথবা নিজের ভোগেই এর সদ্গতি কর না কেন? উত্তর হইবে, আমার টাকা খরচ করি, সিন্ধুকে গচ্ছিত রাখি, বা জলে ফেলিয়া দেই, তাতে তোমার কি? আমার মতের পক্ষে, বিপক্ষে অনেক আলোচনা চলিতে পারে; এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি না।

বাঙ্গালীর একটা প্রধান খাদ্য মাছ, গ্রামে তাও দেখি ক্রমে ক্রমে দুর্ঘট হইতেছে। গ্রামবাসীদের ইহাতে অসুবিধা তো হইতেছেই, বহুসংখ্যক মৎস্যজীবি যে, নিজেদেব জাতীয় ব্যবসায় নির্ভর করিত, তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যে মাছ বিক্রী করিতে পারে না তাহা নহে, বাঙ্গালীর অর্থাভাব হইলেও মাছ খাওয়ার পয়সার অভাব হয় না। মৎস্যজীবিদের দুর্দ্দশার কারণ, পূর্ব্বে যে পরিমাণ মৎস্যের আমদানি হইত, এখন আর তাহা হয় না। কারণ হইল, পুকুরগুলি মজিয়া গিয়াছে এবং খালগুলি কচুরীতে ভরা; মৎস্য ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। মৎস্যের ব্যবসা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। মৎস্যজীবিরা এবং গ্রামবাসীরাও যৌথভাবে পুকুর, খাল, বিল কাটাইয়া, কচুরী সাফ করিয়া মৎস্যেব চাষ করিতে পারে। মজা পুকুরগুলির সংস্কার হইলে যে, শুধু মৎস্য-ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে তাহা নহে, জলের অভাবও মিটিবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা লাভও হইতে পারে, পুকুরের মাটী দিয়া যে চার পাড় বাঁধান হইবে, সেখানে কিছু কৃষিও হইতে পারিবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় ভাত-কাপড়। অন্ন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি, এবাব বস্ত্র-সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলিব। বস্ত্রের কথা উঠিলেই কেহ বলিবে, বড় বড় কল-কারখানা কর, গ্রামের তাঁত, চরকায় কিছু হইবে না। অপর পক্ষ বলিবে, চরকা চালাও, চরকাই আমাদের সকল অভাব দূর করিবে, কল-কারখানা আমাদের দুর্দ্দশা আনিবে। আমি বলি, মাঝামাঝি একটা রফা করা যাউক্। যাহারা চরকা চালাইয়া নিজেদের কাপড় বুনিয়া নিতে চায়, তাহারা চরকা চালাক। অন্যেরা মিলের সূতায় বোনা তাঁতের কাপড় পরুক। Weaving Mill না করিয়া বহুল পরিমাণে করা উচিত Spinning Mill, যেখানে শুধু সূতা তৈয়ার হইবে। গ্রামের তাঁতিরা সে সূতায় কাপড় বুনিবে। তাঁতে বোনা কাপড় খুব টেকসই হইবে এবং নিয়মিত সূতার যোগান পাইলে, উন্নত ধরণের তাঁত Weaving Mill-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে। All India Spinners Association-এর আসাম-বাঙ্গালা শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী M. Sc সম্প্রতি 'How to help the Handloom Industry নামক পুস্তিকায় এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে সূতার জোগান না পাইয়া গ্রামের তাঁতিদের

ভিতর হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে ; তাহাদের অন্নাভাব। দেশের Spining Mill হইতে সুতার জোগান পাইলে, আজ তাহাদের এই দশা হইত না।

আমার এ আলোচনা হইল শুধু অর্থনৈতিক দিক হইতে। মানুষের প্রথম বাঁচার প্রয়োজন। বাঁচিতে পারিলে, তারপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির তাগিদ আসিবে।

দেহটাকে কোন রকমে টিকাইয়া রাখার নাম প্রকৃত বাঁচা নহে। মনুষ্যত্বের সকল মর্য্যাদা লইয়া মানুষের বাঁচিতে হইবে, ভিক্ষায় কাহাকেও বাঁচান যায় না, তাহা মৃত্যুরই সামিল। সকল মানুষের ভিতর চাই আত্মপ্রত্যয়। গ্রামের ভিতর যেন সেই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। নিজের উপর বিশ্বাসবান্ হইলে সকল প্রকার উন্নতি হইতে থাকিবে। অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এসব বিষয়েই গ্রামে বন্দোবস্ত থাকিলে নগরমুখো গতিকে কিয়ৎ পরিমাণে গ্রামের দিকে ফেরান সম্ভব হইবে ; তখনই গ্রামের সংস্কার প্রকৃত ভাবে সুরু হইবে।

কবির ভাষায় উপসংহারে বলি—

কবি, তবে উঠে এসো— যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।

এস ব্রাহ্মণ

শ্রীনকুলেশ্বর পাল বি, এল্,

এস ব্রাহ্মণ যুগ পুরোহিত ! লুপ্ত শক্তি বক্ষে নিয়ে।
জাগাও চেতনা শব সাধনায় অমৃত ঢালি গরল পিয়ে।
আবার জাগাও ধরণীর বুকে মহা সাধনার হোমের শিখা ;
নিখিল বিশ্ব কল্যাণ লাগি ললাটে পর হে রক্ত টীকা,
কোথায় দধিচী জগতের হিতে নিজের বুকের অস্থি দিল ;
কোথা ব্রাহ্মণ দেবতার রূপে চির দারিদ্র বরিয়া নিল।
করুণা যে তুমি বিলায়ে গিয়েছ, চাহ নাই কারো করুণাকণা ;
মৃত্যুরে তুমি তুচ্ছ ক'রেছ, কালনাগিনীর ক্রুদ্ধ ফণা।

পতিত হইল সমাজের বুকে দান নিল ব'লে অগ্রদানী,
আজ কেন বল দেহি দেহি রব কীর্ত্তির বুকে কুঠার হানি।
ব্রাহ্মণ তুমি ঝেড়ে ফেলে দাও মহাস্বার্থের ভিক্ষা ঝুলি ;
মহা সাধনার ত্যাগের মন্ত্র আবার বক্ষে নাও হে তুলি।
কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ কভু জন্মে নহে ;
জগতের চির কল্যাণ লাগি উপবিত তার কণ্ঠে বহে,
এস ব্রাহ্মণ হোমের অনলে সকল স্বার্থ আহুতি দিয়া ;
ধন্য হউক ভক্তের সখা ভৃগুপদ চিন্ বক্ষে নিয়া।

ব্রাহ্মণ আজি কোথায় লুকাল অতুল যে তব শক্তি ছিল ;
গণ্ডূষে যেথা গঙ্গার বারি এক লহমায় শুষিয়া নিল।
অগ্নি কোথায় ব্রাহ্মণ তব, নয়নে জ্বালাও বহ্নিকণা ;
লক্ লক্ লক্ জ্বলুক আবার বাড়বাগ্নির হাজার ফণা।

অসুরের করে ধরা নিপীড়িতা জাগো ভার্গব অগ্নি হোতা ;
ক্ষত্রিয়বাহু বলহীন আজি, বলদাতা জামদগ্নি কোথা।
এস ব্রাহ্মণ ফাল্গুনীগুরু, এস হে দ্রোণাচার্য্য আজি ;
নিয়ে এস তব অক্ষয় তূণ ভরিয়া অমোঘ অস্ত্ররাজি।

কোথা দুর্ব্বাসা আজি এস তুমি অনলগর্ভ ভ্রূকুটি নিয়া ;
বিশ্বামিত্র জ্বালাও আবার অগ্নিকুণ্ড আহুতি দিয়া।
এস বশিষ্ঠ মহাতপোধন ব্রাহ্মণকুল মুকুটমণি ;
ত্যাগ সংযম ধৈর্য্য ও ক্ষমা, বক্ষে লইয়া স্নেহের খনি।
কোথা চাণক্য রাজনীতিবিদ্ কোথায় তোমার সে কূটনীতি ;
মৌর্য্য রাজ্য গড়েছিল যাহা বিশ্বের বুকে অমর গীতি।
ব্রাহ্মণ তুমি রাজ্য গড়েছ রাজ্যলিপ্সা ছিল না কভু ;
তাই ছিলে তুমি জগত পূজ্য সমাজের গুরু সবার প্রভু।

কোথায় চলেছ ব্রাহ্মণ তুমি মহাপতনের অন্ধকূপে ;
কি ছবি আঁকিলে সমাজের বুকে মরণ নেশার ধ্বংসস্তূপে।
যজ্ঞসূত্র নামধরি শুধু বৃথাই বহিছ সূত্র গলে ;
পার যদি এস ফিরাতে আবার লুপ্ত কীর্ত্তি ধরণীতলে।
গুণহীন তাই হেলার পাত্র কেন হেটমুখে রহিবে ভবে ;
ব্রাহ্মণ হও আবার বরিয়া মাথায় মুকুট করিয়া লবে।
এস ব্রাহ্মণ বহাও আবার পূত জাহ্নবী করুণাধারা ;
চেতনা জাগাও ভারতের বুকে ভেঙ্গে দাও তার স্বপ্নকারা।

রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা

শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী এম-এ

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সংবাদ প্রচারার্থে সংবাদপত্রগুলির যে বিশেষ সংখ্যা বাহির হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ৩০শে জুলাই* মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার শেষ কবিতাটি রচনা করেন এইরূপ খবর ছিল। দেখিয়া একটু বিস্ময় লাগিল মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন কবি মৃত্যু সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন এমন কথা আমার জানা ছিল না। মনে পড়িল ব্রাউনিং-এর কথা; তাঁহার Prosice মৃত্যুর অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লেখা, Tennyson-এর Crossing the Bar ও মৃত্যু সময়ের বেশি কাছাকাছি নয়। কবিতাটি সম্বন্ধে তাই বিশেষ ঔৎসুক্যের সঞ্চার হইল। কবে প্রকাশিত হইবে তাহারই ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রহিলাম।

অবশ্য পরিপূর্ণ জীবনের মাঝখানে বসিয়া মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথাই বলিয়াছেন। আর জীবনের ক্রোড় হইতেই বোধ হয় মৃত্যুকে সত্যকারের মৃত্যুরূপে দেখা যায়। হারাইবার আশঙ্কার মধ্যে পাওয়ার এবং পাওয়ার অনুভূতির মধ্যে হারানোর অনুভূতিই গভীরতম। মনে পড়িল জীবনের মধ্যে থাকিয়া মরণের এই গভীরতম অনুভূতির মধ্য হইতেও কবি একদিন লিখিয়াছিলেন,—

এমন একান্ত করে চাওয়া—
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া—
সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল,
নহিলে নিখিল
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতোকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্প সম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

ইহার মধ্যে অবশ্য খুব আশ্বাসের কিছু নাই। জীবনের মত মৃত্যুকেও একটা নিষ্ঠুর সত্য বলিয়া কবির মনে হইয়াছে, অথচ মৃত্যু জীবনের অভাব (negation)। এ যদি সত্য হয় তবে দু'দিনের জন্য জীবন সৃষ্টি করিয়া কি স্নেহময়ী বসুন্ধরাকে শুধু প্রবঞ্চিতই করা হয় না? এতবড় প্রবঞ্চনার ভার লইয়া কি তাহার পক্ষে ফলে ফুলে হাসিয়া ওঠা সম্ভব হইত? কবির মন বলিতেছে, না। তাহা হইলে এতদিনে বিশ্বের সমস্ত আলো নিষ্প্রভ হইয়া ঝরিয়া পড়িত। সুতরাং মৃত্যু জীবনের অভাব হইতে পারে না। জীবনের সঙ্গে তাহার কোনখানে কোন মিল নিশ্চয়ই আছে।

নিউ ইয়র্কে ১৯২০ সালে সাংবাদিকদের নিকটও তিনি পরলোক সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

> "এই পর্য্যন্ত আমরা জানি যে, পরলোকে মঙ্গল হইবে, তাহা না হইলে সর্ব্বচরাচরের একমাত্র গতি মৃত্যু যে অতি ভীষণ হইত। মৃত্যু সত্ত্বেও জীবনপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার আনন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই আছে।…"

অবশ্য আত্মার অমরতার এ অকাট্য প্রমাণ নহে, কিন্তু কবির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট—এমন কি যান্ত্রিক প্রমাণের মতই নিশ্চয়াত্মক। তাই এডিসনের (Edison) সঙ্কলিত আর্থিক যন্ত্র সম্বন্ধে তিনি ঐ বিবৃতিতেই বলিতে পারিয়াছিলেন,

> "মৃত্যুর পর অসীম জীবনধারায় আমি বিশ্বাস করি এবং তাহা প্রমাণের জন্য আমার কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে না"

প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখিত রবীন্দ্রজীবনী,
২য় খণ্ড—পৃষ্ঠা—১৯১

কিন্তু যন্ত্রের প্রয়োজন না থাকিলেও এই শ্রেণীর যুক্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহার নৈশ্চিত্য কি সম্ভব? "নৈবেদ্যে"ও তাই শুনিতে পাই,

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে—
উঠিতেছি ক্ষণে ক্ষণে কাঁপি থর থরে।

---

* পরে বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে এই সংবাদের প্রতিবাদ করা হয় যে কবিতাটি ২৯শে জুলাই লিখিত। অস্ত্রোপচারের পরে আর কবি কিছু রচনা করিতে পারেন নাই। ৩০শে অস্ত্রোপচার হইয়াছিল।

সংসারে বিদায় দিতে আঁখি ছলছলি,
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি’
দুইভুজে। ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম মুহূর্ত্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্ব্বে ? মৃত্যুর প্রভাবে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মত ? জীবন আমার—
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে তখনি ভালবাসিব নিশ্চয়।
স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,—
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায়, গিয়ে স্তনান্তরে।

অবশ্য বিশ্বাস এখানে আর একটু গভীর। কিন্তু ইহাও বিশ্বাসমাত্রই। ভক্তের বিশ্বাস। যিনি ভগবানকে গীতি-নৈবেদ্যে উপাসনা করিতেছেন তাঁহার। কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের আর বেশী নিঃসন্দেহ হওয়া কি সম্ভব ? সাধু-সন্ন্যাসীদের বাদ দিলে বোধ হয় না। আর কবির পক্ষে সাধারণ মানুষ হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথ তাই এখানে তাঁহার কবি নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমাদের,

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই,
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাটায়
নিত্য বহে, নদীর ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে আসা কত কী যে, ভুলে যাওয়া কত রাশি রাশি,
লাভ ক্ষতি কান্না হাসি ;

রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিবা চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহ মিলন গ্রন্থি খুলিবা খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।

কোন সত্যিকারেব কবিই কোনদিন ধর্ম্মশাস্ত্রলব্ধ সর্ব্বোচ্চ নৈশ্চিত্যকে কাব্যে রূপ দিতে চেষ্টা করেন না। তাঁহারা নিজেদের অনুভূতিলব্ধ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের নৈশ্চিত্যকেই আপন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিশ্বের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। টেনিসন্ এবং ব্রাউনিংও তাহাই করিয়াছেন। তাঁহারা খৃষ্টীয় অমরতার গুণগান না করিয়া অমরতার ব্যক্তিগত স্বীয় উপলব্ধ আভাবকেই আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের ভিত্তির চেয়ে দৃঢ়তর নহে। টেনিসনের আশা —“I shall see my pilot face to face when I have crossed the Bar.” ব্রাউনিং-এব আশা—“O thou soul of my soul ! I shall clasp thee again.” রবীন্দ্রনাথেরও আশা, এই জীবন অবসানে অপর একটী জীবন তিনি কোথাও পাইবেনই।

যাহা হউক, মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত বিচার কবা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা তাঁহার শেষ কবিতাটির কথাই ভাবিব।

অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বদিন ২৯শে জুলাই সন্ধ্যায় কবি যে কবিতাটী রচনা করেন তাহা মৃত্যু সম্বন্ধে নহে। আনন্দবাজার পত্রিকা নাম না দিয়া, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড “On Death” বলিয়া এবং প্রবাসী “মৃত্যু” নাম দিয়া কবিতাটী প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাটীর ‘মৃত্যু’ নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া কি না, বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ দয়া করিয়া এ বিষয় জানাইলে জনসাধারণ উপকৃত হইবে।* খুব সম্ভব উহা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নহে। কবি নিজের চিন্তাকে চিনিতেন, এইরূপ অসঙ্গত নামকরণ তিনি কিছুতেই করিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ না কি কবিতাটী মুখে মুখে রচনা করিয়া গিয়াছেন, আর অপর এক ব্যক্তি উহা লিখিয়া লইয়াছেন। সম্ভবতঃ এই লেখক অথবা কবির লেখার যাঁহারা স্বত্বাধিকারী তাহাদের কেহ নাম পরে জুড়িয়া দিয়া থাকিবেন।

---

* আমার অনুমান সত্য হইয়াছে। ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী স্বীকার করিলেন যে কবিতাটীর নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নহে। তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র (যিনি কবির dictation হইতে কবিতাটী লিখিয়া লইয়াছেন) উহা দিয়া থাকিবেন। তবে হয তো কবি উহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাপারটী সম্বন্ধে দ্বিগুণ নিঃসন্দেহ হইবার জন্য অনুসন্ধান করিবেন বলিয়াছেন এবং সেজন্য কয়েকদিন সময লইয়াছেন। তাঁহার নিঃসন্দেহ সংবাদ পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই প্রবন্ধটী ছাপিতে দেওয়া হইল, তাই সমস্ত ব্যাপারটীর উল্লেখ করিলাম।

আমাদের এ অনুমান সত্য হইলে নামকরণ করিবার সময়ে একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে,
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভাব, ত্রাসের বিকট ভঙ্গীতে,
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।
যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহকে,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা,
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ-শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

কবিতাটী ধীর ভাবে পাঠ করিলে এবং ইহার রচনার ইতিহাস লক্ষ্য করিলে কল্পনা করিতে একটুও কষ্ট হয় না যে, কবিতাটী কি সম্বন্ধে লেখা। অবশ্য রচনার ইতিহাসটা এ ব্যাপারে অপরিহার্য্য নহে। তবে তাহা কবিতার পাঠ-লব্ধ অর্থকে নিশ্চিততর করিতে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকলেরই চিন্তাধারা Laws of Association দ্বারা সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারেন না। তাই আমাদের মনে হয় ব্যাপারটা এইরূপ। কিছুদিন হইতেই অস্ত্রোপচারের একটা প্রস্তাব চলিতেছিল। কবি তাহা জানিতেন। সেই অস্ত্রোপচার যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহার মন যে ততই উক্ত বিষয় লইয়া বেশী চিন্তিত হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। তিনি এসময়ে যে অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা এমন কি হাস্য-কৌতুক ফষ্টি-নষ্টিও করিয়াছেন, তাহা এই দুশ্চিন্তা এড়াইবারই প্রয়াস মাত্র। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, দুর্ব্বল শরীরে অস্ত্রোপচারের কথা চিন্তা করিয়া কবি একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুর শঙ্কা নয়, যন্ত্রণার। এই কষ্ট তিনি সহিতে পারিবেন কি না। তারপর একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া তিনি চিন্তা করিলেন, অস্ত্রোপচার এক সময়ে হইয়া যাইবেই, তিনি ঠিকই সহিবেন। তবে কেন এখন মিথ্যা ভয় পাইতেছেন। তখন মনে পড়িল, এ ভয় পাওয়া তো আজ নূতন নয়। শিশুকাল হইতে এমনি চলিতেছে। এই তো জীবনের মায়া। মানুষের কি না সহে? তবু দুঃখকে তাহার এত ভয়? আসলে অবশ্য দুঃখটা সত্য নয়। ওটা শুধু দুঃখের পরিহাস, ছলনামূর্ত্তি। ওর মুখের ভয়ের মুখোস—কষ্টের বিকৃত ভাব, ত্রাসের বিকট ভঙ্গীর সহিত জড়িত—একেবারে মিথ্যা। তবু সমস্ত জীবন ভরিয়া এই মিথ্যা ভয়ের রাজত্ব। একটির পর একটি আসিতেছে, সিনেমার ছবির মত। কিন্তু সিনেমার ছবির মতই সবগুলিই মিথ্যা। পর্দ্দার উপরে হাত দিলে পর্দ্দা ছাড়া আর কিছুই হাতে ঠেকিবে না। "ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি।" জরা-মৃত্যু নয়, মৃত্যুর শিল্প,* নিপুণ নিখুঁত। অন্ধকারের বুকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। স্পষ্ট দেখা যায় না, তাই ভয়। যখন দেখা যায়—তখন আর ভয় থাকে না।

সমগ্র কবিতাটীতে শেষ লাইন ছাড়া আর মৃত্যুর নামও নাই। কবি লিখিবার সময় মৃত্যুর কথা ভাবিতেও ছিলেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন অন্যান্য বারের মত এবারেও বিপদ কাটাইয়া উঠিবেন। মৃত্যুকে হয় ত তিনি মোটেই ভয় করেন নাই, পাইয়াছিলেন অস্ত্রোপচারের কষ্টকে। সে কষ্ট সহিতে পারিবেন ভাবিয়া তাঁহার একটু আনন্দ হইয়াছিল, যাহা এই অন্তিম মুহূর্ত্তেও গানে ফুটিয়া উঠিল।

কবিতাটি পড়িয়া এই অতিসঙ্গত ও সহজ ব্যাখ্যাই সকলের মনে আসা উচিত। কিন্তু কয়েকজনের আসে নাই, আর তাহাদের অনুসরণে সমস্ত দেশশুদ্ধ লোকেরই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। এ ঘোর একদিন কাটিয়া যাইবেই। কিন্তু ততদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলাম না, তাই এ প্রবন্ধ লেখা। অবশ্য পণ্ডিতেরা বলিবেন, নামে কিছু আসে যায় না। তবে গোময়কে অমৃত বলিলে সাধারণ লোকেরা প্রতারিত হইবেন না—এমন কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

---

* মৃত্যুর শিল্প—ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার সময়ে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—কবিতাটীর 'মৃত্যুর শিল্প' নাম দেওয়া যায় কি না। আমি তাড়াতাড়ি হুঁ বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলাম তাহা যায় না। মৃত্যুর শিল্প নাম দিলে মৃত্যুকে যে পরিমাণ প্রাধান্য দেওয়া হয়, কবিতাটী পড়িলে দেখা যায় ইহাতে কবি তাহাকে সেই পরিমাণ প্রাধান্য দেন নাই। সুতরাং "দুঃখের পরিহাস"ই ইহার একমাত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাম হইতে পারে। অবশ্য কবির কথায়। অন্যেরা এর চেয়ে ভাল কিছু পারেন কি না আমি সে বিষয়ে কিছু বলিতেছি না।

কবিতাটীর এই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় যাঁহারা এখনও সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের জন্ত রবীন্দ্রনাথের আর একটী কবিতার উল্লেখ করিব। মৃত্যুঞ্জয়। (পরিশেষ—১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৯) প্রবাসীতে যখন এই কবিতাটী প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ইহার অর্থ লইয়া খুব হৈ-চৈ পড়িয়াছিল। অবশ্য অর্থটা তেমন ঘোরাল নয়, যেমন ঘোরাল আমাদের বুদ্ধিটা। এই কবিতাটীর বিষয়-বস্তু ও শেষ কবিতাটীর বিষয়-বস্তু এক। শুধু মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার ইতিহাস আমরা জানি না, অথবা সে ইতিহাসটা কবির অস্ত্রোপচারের মত এমন সুনির্দ্দিষ্ট একটা ঘটনা নাও হইতে পারে। ওটা সাধারণ। কবিতাটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক।

দূর হতে ভেবেছিনু মনে
দুর্জ্জয়, নির্দ্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।

দুঃখকে দূর হইতে মনে হইয়াছিল দুর্জ্জয়, নির্দ্দয়, বিভীষিকাময় দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে তাহার লেলিহান শিখা জ্বলিতেছে। ইহার পর তিনি দুঃখের রূপ বর্ণনা করিতেছেন। ভয়, রুদ্রমূর্ত্তি তাহার। শেষ কবিতাটীর মত শুধু কষ্টের বিকৃত ভাব, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী সমূহই কবি দেখিতেছেন না। Personification-টা এখানে আর একটু বেশি স্পষ্ট। তাহার (দুঃখের)

দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘপানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।

দুঃখের হাতে শুধু শেল নয়, তাহার সঙ্গে ঝড়ের মেঘের বজ্রের সংযোগ হইয়াছে। ঝড় সাংঘাতিক। তাই কবি ভয়ে ভয়ে দুঃখের সম্মুখে আসিলেন। তাঁহার বুক কাঁপিতেছে।

ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরু দুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।

কিন্তু দুঃখ তাহার ভয়ের মূর্ত্তি সংবরণ করিল না। সে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করিয়া কবির মুখপানে চাহিল। মনে হইল যেন প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরি তাহার অগ্ন্যুদ্গারে এখনি কবিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,

আর বিলম্বও বেশী হইল না।

নামিল আঘাত।

সে আঘাতে কবির পঞ্জর কাঁপিয়া উঠিল। আহত বক্ষে হাত চাপিয়া যাহাতে কপালের ভোগটুকু যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে কবি বলিয়া উঠিলেন, আরও কিছু বাকি আছে কি না।

পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে—
শুধালেম, "আরো কিছু আছে নাকি,
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত?

বাকি ছিল। সে আঘাতও নামিয়া আসিল।

নামিল আঘাত।

কিন্তু সেই শেষ বজ্রপাতেও কবি স্থির রহিলেন। দেখিলেন, যত ভয় তিনি পাইয়াছিলেন, আসলে ব্যাপারটা তত ভীষণ নয়। তখন তাঁহার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন।

এই মাত্র? আর কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়।

তারপর তিনি এই ভয় ভাঙ্গার দার্শনিক ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, ভয় দূরে ছিল বলিয়াই তিনি তাহাকে অযথা বড় বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু যখন কবিকে আঘাত করিল তখন সে কবির আপন ভূমিতে নামিয়া আসিল। কবি দেখিলেন যে তত বড় নয়। কবির চোখে সে ছোট হইয়া গেল। তাহার নিকট কবির ক্ষুদ্রতার লজ্জা ঘুচিয়া গেল।

যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে নিয়েছিনু গণি।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে—গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।

দুঃখের সঙ্গে বোঝাপড়া এইখানে শেষ। শেষ কবিতাটীও এইটুকুই। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ইহার পরেও চারিটী লাইন আছে। প্রকৃত পক্ষে সেইটুকুই মৃত্যুঞ্জয়। এ পর্য্যন্ত শুধু দুঃখঞ্জয়।

মৃত্যুর এখনও আছে অনেক বাকি। কিন্তু কবি জানেন দুঃখ মৃত্যুর মত বড় নয়। মৃত্যু খুবই বড়। কিন্তু তাঁহার মনে মনে আশা—এমন একদিন আসিবে যেদিন তিনি

দেখিবেন তিনি দুঃখের মত মৃত্যুর চেয়েও বড় । সেইদিন তিনি হইবেন মৃত্যুঞ্জয় । সে কথা তিনি সেদিন বিশ্বের সম্মুখে ঘোষণা করিয়া যাইবেন । "মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদেরি মত ।" কিন্তু সেদিন এখনও নহে । তাই তিনি দুঃখকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

যতো বড়ো হও
তুমি তো মৃত্যুর মতো বড়ো নও ।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে ॥

মৃত্যু দুঃখের চেয়ে বড়—কবি মৃত্যুর চেয়ে বড়—সুতরাং তিনি দুঃখের চেয়ে অনেক বড় । যে মৃত্যুঞ্জয়, দুঃখে তাহার ভয় কি ? মৃত্যুঞ্জয়ের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয় ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতাটী মৃত্যু সম্বন্ধে লেখা নয় । উহার তাই 'মৃত্যু' নাম দেওয়া যাইতে পারে না । নামের যদি একান্ত প্রয়োজনই হয় তবে ঐ কবিতাটির দশম চরণ হইতে ইহার "দুঃখের পরিহাস" এই নাম দেওয়া যাইতে পারে । কবির ভক্তগণ বিচার করিবেন ।

যেতে হবে পারে

সাহিত্যভূষণ শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

যেতে হবে পারে,
দিনান্তের প্রান্ত হতে সূর্য্যাস্তের রক্তরশ্মি
ডাকিছে আমারে ।
উদয় শিখর হতে,
যে পথিক যাত্রা সুরু করেছিল জীবনের পথে—
সে পথিক মোর মাঝে নাই :
ধরণীর কর্ম্মক্লান্ত সন্ধ্যার আড়ালে
আজি তার ঠাঁই ।

সে যখন ছিল :
মাঠে মাঠে শ্যাম শষ্প যৌবনের মত্তকায়া নিয়ে
ধরণীর-বুকে মিশাইল ;
স্রোতস্বতী মর্ম্মরিয়া আনন্দের নবীন সংগীতে
বয়ে যেত-সাগরের জলে
অশান্ত কল্লোলে ।

বিহংগের মুগ্ধ কণ্ঠ ত্যবে
শুনাইত জীবনের চিরন্তন আনন্দের গান
ভৈরবীর সুরে বারে বারে ।
বিধাতার সৃষ্টি মাঝে যা কিছু সুন্দর দান
সবই ছিল তার,
আজিকার যাত্রা শেষে সব স্বপ্ন হয়েছে নিষ্ফল
ছিঁড়ে গেছে কল্পনার তার ।
বিহগ আজিও গাহে,
আজিও গগন প্রান্তে রঙিন ইন্দ্রের ধনু
মুগ্ধ ধরণীর পানে চাহে ;
নিস্তব্ধ রাতের শেষে বসন্তের জোছনাধার
স্বপন মায়ায়,
প্রেয়সীর নিদ্রাতুর মদির আঁখির পানে
আজো ফিরে চায় ।
তবু কেন সে দিনের কথা,
পথ মাঝে ফেলে আসা রঙিন দিবসগুলি
অন্তরে জাগায় শুধু ব্যথা ।
নাই, মোর আজ কিছু নাই—
যা কিছু সঞ্চিত ধন আয়ুর তরঙ্গ দোলে
বিলায়ে দিয়েছি ঠাঁই ঠাঁই
জীবনের সিন্ধুতটে রিক্ত আজি তাই ।
স্মরণের আবরণে শুধু
ঢাকিয়া রাখিতে চাহি প্রভাতের অবিশ্রান্ত
আনন্দের তিক্ততার মধু ।
সে স্মৃতি জাগায় শুধু ব্যথা,
হারানো বাঁশীর গান কিছুই দেয় না মোরে
শুধু গাহে বেদনার গাথা ।
সে বাঁশী জাগিছে আজি পূরবীর সকরুণ সুরে,—
'রে প্রান্তিক যেতে হবে দূরে, বহুদূরে
পথপ্রান্তে ফেলে দিয়ে দুর্বিসহ জীবনের বোঝা
সম্মুখেতে চল আজি সোজা ।
চাহিস না পিছনের পানে ।
আজিকার অস্তাচল প্রান্ত হতে খসা
দিনান্তের স্বপ্নভরা গানে
ঢেলে দিয়ে প্রাণ,
ভুলে যারে দুদিনের পৃথিবীর গান ।
মুছে ফেল সব স্মৃতি তপ্ত অশ্রুধারে
যেতে হবে পারে ।*

(রজ্জব হইতে)

* প্রাণের জীবন্ত শাস্ত্র পাঠ কর হিন্দু মুসলমান,
এ নিখিল বিশ্বজুড়ে এই শাস্ত্রে পাবে একই জ্ঞান ।
কাগজের মৃত লিপিকার পাঠক রয়েছে শত শত
হে রজ্জব পড়ে দেখ প্রাণময় বেদ আছে কত ?

দেশের সেবা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এক

রেলের যাত্রী

পূজার ছুটি। শিয়ালদহ ষ্টেসনে ভয়ানক ভীড়। রেল কোম্পানী কয়েকখানি স্পেশাল ট্রেন দিয়াও যাত্রীদের সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সুব্রত সপ্তমীপূজার দিন গাড়ী ও জাহাজে ভীড় কম হইবে মনে করিয়া একখানি মধ্যম শ্রেণীর যাতায়াতী ভাড়ার টিকেট কিনিয়া বিক্রমপুর তারপাশা যাইতেছিল। সে ভীড়ের ঠেলা সাম্‌লাইয়া কোন রকমে গোয়ালন্দগামী মিক্স্‌ড ট্রেণের একটি কামরায় বেশ জায়গা করিয়া লইয়া এবং বিছানাটি বিছাইয়া একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। এ গাড়ীখানা বরাবর ফরিদপুর দিয়া যাইবে, কাজেই তাহার সতর্ক থাকিতে হইবে, যাহাতে রাজবাড়ী ষ্টেসনে সহজভাবে গাড়ী বদলাইতে পারে। সে এমন সতর্ক যে, অনেক সময়ই গন্তব্যস্থান ছাড়াইয়াও অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে ঘুমের ঘোরে।

গাড়ী ছাড়িবার মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। সে ঘণ্টাটিও পড়িয়া গিয়াছে। সুব্রত মনে মনে ভাবিতেছিল, গাড়ী ছাড়িলেই রক্ষা পাওয়া যায়। তবে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া পা ছড়াইয়া শুইতে পারিবে। গাড়ীতে বসিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ফেরীওয়ালারা বাহিরে ও গাড়ীর ভিতরে আসিয়া চীৎকার করিতেছিল, ঔষধ, বই, এমন কি চটিজুতার পর্য্যন্ত গুণ বর্ণনা করিয়া। সে মনে মনে চটিলেও শান্তভাবে এইবার প্রতীক্ষা করিতেছিল কখন বাঁশীর আওয়াজ করিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিবে।

শেষ ঘণ্টা পড়িয়াছে, এমন সময় দেখা গেল একটি সুবেশা ও সুশ্রী তরুণীকে তাহাদের গাড়ীর দরজার হাতল ধরিয়া টানাটানি করিতে। সুব্রত বুঝিতে পারিল কি বিপদেই না এই তরুণী পড়িয়াছে, তাই সে মুহূর্ত্তমধ্যে লাফ-দিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া জিনিষ-পত্রসহ তাহাকে গাড়ীতে তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। কুলি ভাড়ার দাবী করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মনিব্যাগ হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুড়িয়া ফেলিল। এ সময়ে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

তরুণী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সামনের আসনটিতে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতেছিল। চুলগুলি বিস্রস্তভাবে মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল এবং কপালে ও গণ্ডে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছিল। এদিকে গাড়ী চলিবার সঙ্গে সঙ্গেই জানালার ভিতর দিয়া বাতাস ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের ক্লান্তি দূর করিয়া দিতেছিল।

তরুণী এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বলিবারই অবসর পায় নাই। এইবার সে মুখ তুলিয়া সুব্রতের দিকে চাহিয়া কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ।"

সুব্রত কহিল, "এ আর এমন কি কাজ করেছি যে আপনি আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে ফেল্‌লেন।"

"কি মুস্কিলেই পড়েছিলুম। আপনি যদি এগিয়ে না আস্‌তেন তাহ'লে গাড়ীতে উঠা দূরে থাক্‌, একেবারে রেলে কাটা পড়তুম—উঃ মাগো।"

সুব্রত বলিল, "সেজন্য এখন আর দুঃখ করবেন না। এইবার দেখুন, গণে বেছে নিন্‌, সব মালপত্র উঠলো কি না! তারপর নিজেই সুটকেসটির কাছে গিয়া কহিল, দেখুন ত', এইটি আপনার কি না?"

তরুণী মাথা নাড়িয়া কহিল, হুঁ!

"এই বিছানাটা, এই টিফিন-ক্যারিয়ারটি, এই সব ঠিক্ ত!"

"Thanks! সব ঠিক আছে।"

"তা'হলে এবার বিছানাটা পেতে দিই। বেশ আরাম করে বসুন। প্রথম আশঙ্কাটা ত' কেটে গেছে।" এই বলিয়া নিজেই হল্ডঅলটি খুলিয়া বেঞ্চের উপর বিছানাটি বেশ নিপুণ হস্তে পাতিয়া দিল। তরুণী প্রশংসমান চক্ষে তাহার কাজ দেখিতেছিল। "বিছানা পেতে দিলেন, তারপর নামবার সময়ও ত হাঙ্গামা বড় কম হবে না এই বাঁধা-ছাঁদায়!"

"সে ভাবনা না ভাবলেও পারেন। আচ্ছা আপনি কতদূর যাচ্ছেন ?"

"আমি যাব তারপাশা বলে একটা ষ্টেসন আছে সেইখানে। কোন দিন যাইনি ওদিকে, তবু যাচ্ছি।"

"কেন বলুন ত ?"

তরুণী হাসিয়া কহিল, "দেশের সেবার !"

"মানে ?"

"মানে অতি সহজ।"

"কি রকম ?"

"কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ জানেন ?"

সুব্রত ক্ষুব্ধ হইয় কহিল, "জানি না ! আশ্চর্য্য কথা। আমি তার একজন মস্তবড় সভ্য। সে অনেক দিন থেকে। আর এই যে যাচ্ছি তাও ত' দেশ-হিতৈষণা ব্রতের টানে।"

"বটে ! তবে আমি কোন কথা বল্‌বার আগে আপনিই বলুন না কেন যাচ্ছেন ?"

"না না, আপনিই বলুন না। শুনে নিয়ে ভেবে চিন্তে বলবো। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের কথাগুলি ঠিকভাবে যেন বলা হচ্ছে না। পরস্পরের পরিচয়টা জেনে নেওয়া ভাল। আমি পুরুষ মানুষ, প্রথমে নাম, ধাম, বিদ্যা, বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তারপরে আপনার কাছে শুনবো আপনার কথা, যদি এটিকেটে না বাধে !"

"ঠিক কথা।"

সুব্রত কহিল, "আমার নাম সুব্রত রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ। নিবাস বাঙ্গালার কোনও জেলার অখ্যাত পল্লীতে। আজ দু'বৎসর এম, এ পাশ করে, ল' পড়ছি, আর ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যরূপে পল্লীর শ্রীবৃদ্ধির উদ্যোগ ক'রছি। ইন্‌ষ্টিটিউটে এবার দেশের বড় বড় লোকেরা মিলে ঠিক করলেন পল্লী-সংস্কার করতে হবে, কি দিয়ে না Mass Education-এর মধ্য দিয়ে, এক সময়ে তখন আমরা জন্মাইনি, আমার বাবা-কাকাদের যৌবনে তাঁরা সংস্কারকদের সঙ্গে সঙ্গে আওড়াতেন,—

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

আর এখন হয়েছে সংস্কারকদের বাণী,

লেখা পড়া না শিখিলে সকল বাঙ্গালী,
আমরা রহিব সব অজ্ঞান বাঙ্গালী।

"তাই জনশিক্ষা অভিজানে চলেছি বিক্রমপুর অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে জনশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে। আমিও এই যাচ্ছি প্রথম এই অভিযানে !"

তরুণী হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ রায়, দেখছি আপনারও অভিযান একই রকমের। তবে আমি একটা কথা বলি, আমি আপনাকে Post Graduate Class-এ অনেক বার দেখেছি। মেয়েদের মুখে আত্মপরিচয়টা শোভন হয় না। তবে বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।

আমি মিস্ সুচিত্রা ব্যানার্জি। এম, এ পাশ করে ভাবছি কি করবো। তাই আমিও ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পাদক মিঃ এস্, এন, ভট্টাচার্য্যের আহ্বানে জেগে উঠলাম। ভাবলাম, কলকাতার সঙ্গে আমাদের শিক্ষা, চলাফেরা ও ক্লাব, পার্টির যে পরিচয় তাত' দেশের সত্যিকার পরিচয় নয়। তাই আপনারা নারীসমাজকে যে ভাবে আপনাদের পায়ের তলায় নিষ্পেষিত করে তুলেছেন তা দূর করবো, এই পণ করে বেরিয়ে পড়েছি, কণ্ঠে আমার জেগে আছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অভয় মন্ত্র,

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

তাই চলছি গ্রামেব দিকে। এই সুটকেস্‌টির ভিতরে রয়েছে অনেক পুঁথি-পত্র, পোষ্টার, ছবি। আমার কাজ হবে পল্লীর নিরক্ষর বিধবা, বিবাহিতা, অবিবাহিতা, প্রৌঢ়া সকলকে লেখা পড়া শিখানো। আর কুটিরশিল্পের দিক দিয়ে নানারকমের আন্দোলন ও শিক্ষার উপায় করা।"

সুব্রত হাসিয়া কহিল, "তা হলে আমরা এক পথেরই যাত্রী।"

সুচিত্রা হাসিল।

এমন সময় গাড়ী রাণাঘাট আসিয়া থামিল। রাত্রি তেমন বেশী হয় নাই। যাত্রীর ভীড়, হৈ চৈ চীৎকার তাহাদের এই আলোচনাকে ব্যাহত করিয়া তুলিয়াছিল।

সুব্রত বলিল, "আপনি চা খাবেন ?"

"না না, অতটা ব্যস্ত হবেন না।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সুব্রত চায়ের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।" দুইজনে চা পান করিয়া যেন একটু সোয়াস্তি অনুভব করিল।

সুব্রত কহিল, "আপনার এ গাড়ীতে যেতে একটু অসুবিধা হবে, আপনার জন্য কি মেয়েদের গাড়ী খোঁজ করবো ?"

সুচিত্রা কপালে হাত দু'খানি ঠেকাইয়া কহিল, "রক্ষে করুন। আপনি বুঝি ভেবেছেন মিঃ রায়, আমি সেদিক দিয়ে কিছু ত্রুটি করে এসেছি। মোটেই নয়। যে গাড়ীতে যাই, সে গাড়ীতে ঢুকতেই দেখি ভয়ানক ভীড়, তারপর মেয়েরা তাড়া করে বলে, ওমা, তোমার কি চোখ নেই নাকি ? দেখতে পাচ্ছ না এ গাড়ীতে আমাদের বসবার জায়গা নেই। এ রকম তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে হয়রাণ হয়ে পড়েছিলুম। ভাগ্যিস্ আপনি দয়া করে তুলে নিলেন, নইলে হয়েছিল আর কি ?"

গাড়ীখানি একরকম খালিই ছিল। দুইটি ছোট পরিবার দুই দিকের দুইখানি বেঞ্চে বিছানা পাতিয়া শুইয়াছিল। একজন প্রৌঢ়া বিধবা উৎসুকভাবে তাহাদের দুইজনের কথা শুনিতেছিল। দুই বছরের একটি ছোট মেয়ে প্রৌঢ়ার কোলের কাছে আসিয়া বলিতেছিল, দিদা, "আমায় লজেন দাও না।"

মেয়ের বাপ বেঞ্চের এক পাশে বসিয়া চুরুট টানিতেছিলেন। তিনি মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "টুবলু এদিকে এস।" টুবলু ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, "না-না যাব না দিদা, উঃ দিদা।"

দিদা সেই প্রৌঢ়া মহিলা নাতনীটিকে কোলের কাছে টানিয়া আনিলেন এবং ভৎসনার সুরে কহিলেন, "তোমরা বাবু শাসন একটু কম করো। ভারী ত একটা লজেন্স।"

পুত্রবধূ কোলের শিশুটিকে খাওয়াইবার আয়োজন করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া কহিলেন, "মা তার নাৎনীটিকে তার বায়না পেলে একেবারে এতটুকু থেকেই অবাধ্য করে তুলেছেন।"

প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত। আমি ত' আর বেশী দিন ওদের কাছে থাকবো না, তোমরা ওকে মানুষ করো।"

বৌ হাসিল। বৌটির মুখখানি বড় সুন্দর। হাসিভরা মুখখানি। আর মেয়ে টুনু ও কোলের শিশু ছেলেটিও ফুটফুটে।

সুচিত্রা পরম কৌতূহলের সহিত তাহাদের কথা শুনিতেছিল এবং নিজের বিছানা ছাড়িয়া প্রৌঢ়া মহিলার কাছে গিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথা যাবেন মা ?"

প্রৌঢ়া হাসিয়া কহিলেন, "আজ আট বছর পরে দেশে যাচ্ছি। এলাহাবাদে থাকি কি না। এইবার ছেলে বদলি হয়ে কলকাতা এসেছে, তাই দেশে যাচ্ছি এদের নিয়ে।" তারপর ছেলের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "এই একটী মাত্র ছেলে, আমি একে দু'বছরের কোলে করে বিধবা হয়েছিলুম। কি করে যে ওকে মানুষ করেছি কি আর বলবো মা !"

বৌ হাসিয়া কহিল, "বুঝলে দিদি, মার ঐ এক কথা। ছেলেকে ছেড়ে একদিনও কোথা থাকতে ওঁর মন সরে না।"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "কেন রে ? দেখবো এই টুবলু আর তোর কোলের বাচ্চাটাকে ছেড়ে ক'দিন বাপের বাড়ী গিয়ে থাকতে পারিস্।"

বৌটি মুক্তার মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া উঠিল। এদিকে টুবলুও তার দিদা বা ঠাকুরমার কোলে আরামে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

বৌটি সুচিত্রার প্রায় সমবয়সী হইবে। সে ইঙ্গিতে সুচিত্রাকে তাহার পাশে গিয়া বসিতে বলিল।

সুচিত্রা তাহার কাছে গিয়া বসিয়া কহিল, "একেবারে জুজুবুড়ি হয়ে বসেছ যে ভাই। মুখের ঘোমটাটা একটু সরাও।"

বৌটি চুপি চুপি স্বামীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "উনি ওসব পছন্দ করেন না। নিজে লেখাপড়া শিখে, বিলেত বেড়িয়ে এসেও ঐ ওঁর স্বভাব।"

সুচিত্রা হাসিয়া কহিল, "আশ্চর্য্য ত !"

তারপর বৌটি কহিল, "আমি তোমাদের আলাপ শুনে বুঝেছি তোমরা দু'জনেই যাচ্ছ দেশের কাজে। খুব ভাল কথা ভাই। তুমি লেখাপড়া শিখে, যারা লেখাপড়া জানে না তাদের শিখাতে চাইছ, এ খুব ভাল। আমার বাবা আমাদের লেখাপড়া শিখাতে কতই না যত্ন করেছেন। তার ফলে আমরা সব বোনই কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছি।"

সুচিত্রা কহিল, "তুমি কি পর্য্যন্ত পড়েছ ?"

"আমি আই, এ পাশ করেছিলুম। তার পরেই বিয়ে হল।"

"উনি কি করেন?"

"এঞ্জিনিয়ার।"

"এখন কোথায় যাবে?"

"ঢাকা। ঢাকা হয়ে শেষে যাব গ্রামে—আমাদের বাড়ীতে।"

"তোমার নাম কি ভাই?"

"বীণা।"

"বাঃ দিব্যি নামটি ত! তাহলে দিনরাতই ঝঙ্কার উঠছে।" উভয়েই হাসিল।

গাড়ী ভীষণ ঘট-ঘট-ঘট শব্দ করিয়া ছুটিতেছিল। বাহিরে গভীর কালো অন্ধকার। আকাশের কোন কোন জায়গায় আশ্বিনের এই শেষ দিকেও কালো মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। দু'একটি তারা দেখা যাইতেছিল।

বীণার ছেলে ও মেয়ে দু'জনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বীণার স্বামীটি সুশ্রী এবং বয়সও ত্রিশের অল্প কিছু উপরে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরা। গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ চেহারা। মুখে চরিত্রবলের একটা দৃঢ়তর ছাপ লাগিয়া আছে। নাম তার অরুণ। অরুণবাবু কিন্তু কোণে বসিয়া চুরুট টানিতেছিলেন, আর গভীর মনোনিবেশে একখানি মোটা বড় বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিলেন। সুচিত্রার নজর সেদিকেও পড়িয়াছিল। সে কহিল, "বীণা ভাই, বরটী ত তোমার খুব মনোযোগী ছাত্র!"

বীণা মৃদুহাস্য করিয়া কহিল, "আর, ওঁর একটা খেয়াল ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়া। বোধ হয় কোন্ চোর-ডাকাত বা খুন-জখমের গল্প পড়ছেন! নইলে ভাই গাড়ীর এমন দোলনীর মধ্যে কেউ বই পড়তে পারে, না ঘুমুতে পারে?"

সুচিত্রার হঠাৎ বেঞ্চের বিপরীত দিকে নজর পড়াতে সে দেখিল সুব্রত দিব্য চোখ বুজিয়া আছে। সুব্রতের বলিষ্ঠ সুন্দর দেহটি সাদা ধবধবে বিছানার উপর লীলায়িত ভঙ্গীতে পড়িয়া আছে। চোখে চশমা পরাই রহিয়াছে। খবরের কাগজখানি বেঞ্চের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। মাথার কাছে কয়েকখানি বই ছড়ানো।

সুচিত্রারও সারাদিন ঘোরাফেরা করিয়া দেহে যথেষ্ট পরিমাণেই ক্লান্তি ছিল। তাহারও চোখ দুইটি মুদিয়া আসিতেছিল। বীণার অবস্থাও সেইরকমেরই। এমন সময়ে প্রৌঢ়া মহিলাটি সুচিত্রাকে ডাকিলেন।

সুচিত্রা তাঁহার পাশে গিয়া বসিতেই তিনি আদর করিয়া তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন, "তোমাদের দেখলে আমার ভারী আনন্দ হয়।"

সুচিত্রা মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "কেন বলুন ত?"

"দেখ মা, আমি প্রায় ষাট বছরের কাছাকাছি এলুম, ছেলেবেলা গ্রামে মানুষ হয়েছি। বাবা মা থাকতেন আসামের এক বনে; তিনি বন বিভাগে কাজ করতেন কিনা। তাই আমার এক জ্যেঠাইমার কাছে আমি মানুষ হয়েছি। অজ-পাড়াগাঁ, না ছিল পাঠশালা, না ছিল স্কুল। তারপর কুলীন বামুনের মেয়ে লেখাপড়া শেখা একটা মস্তবড় পাপ বলে গাঁয়ের সকলে মনে করতেন। কিন্তু আমার জ্যাঠাইমা ছিলেন ভিন্ন ধরণের। আমার জ্যেঠামশাই গ্রামে বেশ বড় পণ্ডিত ছিলেন, বুড়ো হয়েই মারা যান। আমরা যখন জ্যেঠাইমার কাছে ছিলুম, তখন তাঁর বয়স ছিল ষাটের কিছু উপরে, কিন্তু কি শক্ত মানুষই না ছিলেন। রাত থাকতে উঠে সব কাজ করতেন। আর রাত্তিরে আমাদের ভাই বোনকে কোলের কাছে আগলে নিয়ে বসে ক, খ, গ, ঘ শিখাতেন।—জ্যেঠাইমা বলতেন, আমার বাবা, আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন রে ভুবন, আমি তোদের এ সংসারে এসে ভুলে গেছি সব। তাঁর বাবা ছিলেন টোলের পণ্ডিত, উপাধি ছিল তাঁর তর্কভূষণ। তিনি নাকি বলতেন, ছেলে মেয়েদের সমান ভাবে শিক্ষা দিতে হয়, নইলে যে ঘোরতর পাপ হবে। মেয়েরা হচ্ছে আদ্যাশক্তির অংশ। তাদের মুখ্যু করে রেখে জাতিকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখা সমান। যে জাত মেয়েদের মানুষ করতে জানে না, তাদের অন্ধকূপে পুরে রাখতে চায়, তারা কোন দিন কি বড় হতে পারে? সেই জ্যেঠাইমার কাছে কত যে সংস্কৃত শ্লোক শিখেছি, তা আর কি বলব! আর কত যে গল্প বলতেন, সে আর কি বলবো। আজ ক'বৎসর হল তাঁর কাশী লাভ হয়েছে।"

সুচিত্রা ভুবনময়ীর কথাগুলি পরম আগ্রহের সহিত শুনিল। ভুবনময়ী যে এককালে খুবই সুন্দরী ছিলেন, এখনও

তাঁহার দেহে তাহার অভাব ঘটে নাই। গৌরবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী, উজ্জ্বল বড় বড় দুইটি চোখ, সূক্ষ্ম নাসা, মাথার চুলগুলি এখনও কাঁচা, ছোট ছোট করিয়া ছাটা।

সুচিত্রা কহিল, "আপনাদের সেকালের কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগছে।"

বাইরে তখন মেঘ গর্জ্জন করিতেছিল, আর বৃষ্টিও বেশ জোরে নামিয়াছিল।" মাঝে মাঝে তার ঝাপটা আসিয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া ছিটকাইয়া গায়ে লাগিতেছিল। সুচিত্রা জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

ভুবনময়ী বলিলেন, "দেখছো মা, দেশের যেন সবই বদলে যাচ্ছে। শরৎকাল, লোক কোথায় পূজার ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছে আমোদ করতে কিন্তু গ্রামে গিয়ে কি মুস্কিলই না তাদের হবে! জল, কাদা, তারপর বর্ষাও এবার শেষ দিক্‌টায় হয়েছে বলে শুনেছি আমার দেওরের চিঠিতে। তিনি গ্রামেই থাকেন কি না!" সুচিত্রার দিকে চাহিয়া ভুবনময়ী কহিলেন, "তুমি কি কখনও গ্রামে গিয়েছ?"

"না।"

"কোন গ্রামেই না?"

"আমি কলকাতায়ই বরাবর মানুষ হয়েছি। কলকাতার বাইরে গ্রাম বলতে এই বালি, উত্তরপাড়া, এ সব গিয়েছি।

আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে যাও নি?

না।

তোমাদের বাড়ী কি কলকাতা সহরেই না কি?

সুচিত্রা কহিল, আগে নদীয়া জেলায় ছিল। এখন বরাবর কলকাতাতেই আছি। বাবা জেলা-জজ ছিলেন, এখন পেন্সান পাচ্ছেন, রাসবিহারী এভেনিউতে বাড়ী করেছেন।"

"তোমার ক'টি ভাই বোন্?"

"আমার বড় দুই ভাই আছেন, ছোট এক ভাই। আর আমি মাত্র এক বোন্। দাদাদের একজন ডেপুটি, আর একজন মুন্সেফ। তাঁরা সব বিদেশেই থাকেন। বৌদিদিরাও সঙ্গেই থাকেন।"

"তোমার কি মা বিয়ে হয়েছে?"

সুচিত্রার মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কপোলের দুই পাশ দিয়া বিস্রস্ত চূর্ণ কুন্তলের দুইটি গুচ্ছ দুলিতেছিল। গাড়ী চলিতেছে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া; নীরব পল্লী, খাল বিল, নদী, নালা অতিক্রম করিয়া। বৃষ্টির ঝাপটা আসিয়া জানালার গায়ে আঘাত করিতেছে। বীণা ছোট শিশুটিকে বুকের কাছে শোয়াইয়া চোখ দুইটি মুদিয়া আছে। বীণার স্বামী বুকের উপর বইখানি রাখিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছেন।

গাড়ীখানির অপরদিক জুড়িয়া অন্য একজন ভদ্রলোক প্রচুর মালপত্রের আড়ালে সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে জড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার নাক ডাকিতেছে যেন প্রলয়ের মেঘ-গর্জ্জন। সুব্রতেরও সাড়া নাই। গাড়ীর আলোর জ্যোতিঃও যেন নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। শুধু সুচিত্রা আর ভুবনময়ীর মধ্যে কথা চলিতেছিল—অশ্রান্তভাবে। ঘড়ীতে তখন একটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে।

সুচিত্রা মাথা তুলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "সেকথা এখনও ভাবিনি।"

সে মনে মনে ভুবনময়ীর প্রতি একটু অপ্রসন্ন হইতেছিল। কিন্তু ভুবনময়ীর সুমিষ্ট স্বরের সহিত এমনি একটি মধুর স্নেহের করুণ ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, তাহার মনের মধ্যের বিরক্তির ভাব স্থায়ী হয় নাই, বরং সে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও সব প্রশ্নেরই সুস্পষ্ট উত্তর দিতেছিল।

"ভাবনি মা! তুমি না ভাবতে পার, কিন্তু তোমার বাবা, মা ত ভাবছেন নিশ্চয়ই।"

সুচিত্রা ভুবনময়ীর দিকে মুখখানি তুলিয়া কহিল, আমার মা নাই। আমার বয়স যখন সবে এক বৎসর, তখনই মা মারা যান। মাকে আমি দেখি নি, দেখবার সুযোগও আমার হয় নি।

ভুবনময়ী বলিলেন, "আহা বাছা!"

সুচিত্রার প্রাণের মধ্যে আহা বাছা! কথাটির মধ্যে ভুবনময়ীর অন্তরের বেদনা ও স্নেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছিল, সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "দেখুন, আমি মাকে শুধু ছবির ভিতর উপলব্ধি করেছি। আমার মা খুবই সুন্দরী ছিলেন।"

"তা তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি মা। তুমি মনে মনে আমার এসব কথায় কি ক্ষুণ্ণ হচ্ছ, তা বুঝতে পাচ্ছি, কিছু মনে করো না মা। আমরা সেকেলে মানুষ, তাই যার

সঙ্গে আলাপ করি সে আলাপের মধ্য দিয়ে সত্যিকার পরিচয়ই পেতে চাই।"

সুচিত্রার মন হইতে অপ্রসন্ন ভাবটা এতক্ষণে চলিয়া গিয়াছিল। ভুবনময়ীর মিষ্টি কথায় ও মধুর ব্যবহারে তাহার মন এই অল্প পরিচয়ের ভিতরেই যেন তাহাকে আপনারই একজন বলিয়া মনে হইতেছিল। তাই সুচিত্রা বলিতে লাগিল, মা মারা যাবার একমাস পরেই বাবা আবার বিয়ে করেছেন, কিন্তু বিমাতা আমাদের ভাই-বোন্‌দের ভার নিতে রাজী হলেন না—আমরা মানুষ হয়েছি আমার বড় মাসীমার কাছে। মাসীমা ছিলেন নিঃসন্তান। মেসোমশাই ছিলেন একটা বড় কয়লার খনির মালিক। তিনি আমাদের ভাইদের ও আমাকে লেখাপড়া সব শিখিয়েছেন বোর্ডিংয়ে রেখে। বাবাও সাহায্য করেন নি এমন নয়, তবে তিনি বড় একটা পেরে উঠেন না। ছোট মার একটি ছেলে হয়েছে কিনা—সেটি এবার ম্যাট্রিক পাশ দিয়েছে। তাই আপনাকে বলেছি, আমরা তিন, দু'ভাই আর আমি এক বোন্‌। আমার এই ছোট ভাইটির নাম সুরজিৎ।

এ ছেলেটি কে সুচিত্রা?

ইনি ইউনিভার্সিটিতে পোষ্টগ্রাজুয়েটে পড়তেন। আমাদের আগে এম-এ পাশ করে ল' পড়ছেন। আমরা কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের তরফ হতে গ্রামে গণশিক্ষা আন্দোলনের কাজে যাচ্ছি। গাড়ীতেই আজ আলাপ হল। জানেন ত আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৯০ জন থাকেন গ্রামে আব ১০ জন থাকেন সহরে, কাজেই গ্রামের উন্নতি করতেই হবে, তাই গ্রামে যাচ্ছি।

ভুবনময়ী সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু পারবে ত?

কেন পারব না। ইউরোপ ও আমেরিকা, আর সব স্বাধীন দেশের তরুণ-তরুণীরাই ত দেশের কাজ করে। আমাদের যদি সে সাহস এ যুগেও না আসে তবে আবার মানুষ হব কবে বলুন ত!

তা' না সে ত খুবই সত্যি, কিন্তু জান, আমাদের দেশের পুরুষেরা এমন কি মেয়েরা পর্য্যন্ত, অন্ততঃ গ্রামের কথা বলছি, তোমাদের এ কাজে উৎসাহ দিবেন তা ত মনে হয় না। আমি ভাবছি তোমার মেসোমশাই ও মাসীমা আর দাদারা কি করে তোমায় একা ছেড়ে দিলেন। বাবা কি কিছু বলেন নি?

ইনষ্টিটিউট থেকে যখন ছেলে-মেয়েদের আহ্বান করা হলো, কে কে যাবে গ্রামের সেবায় গণশিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে, তখন আমি ও আমার বন্ধু কয়েকটি মেয়ে যাব বলে ঠিক করলুম কিন্তু কাজের বেলা মাত্র আমরা দু'জন যাচ্ছি। সে বোধ হয় ডাকগাড়ীতে যাবে। বাবা বেশ উৎসাহই দিয়েছেন, মেসোমশাই ত খুবই উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, আপনার দেশকে ভাল করে দেখে নেওয়া ভাল। লেখাপড়া শিখেছ, সাহস চাই বই কি? তোমাদের এ কাজ সার্থক হউক মা! আমাদের জীবন ত কেটে গেছে—অন্ধকারের মধ্য দিয়ে।

জানেন, বিবেকানন্দ যে কথাটি বলে গিয়েছেন সে কথাটি আমাদের জপমালা করে রাখতে হবে—"ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন কচ্ছে, তার কারণ মূর্খতা; আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি আর দু'পা দিয়ে দলিয়েছি। মনে কর কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা map, camera, globe ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তা হলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না?" আমরা যে মঙ্গল করবো বলেই বেরিয়েছি। দরিদ্র, মূর্খ, নারীদের কল্যাণ আমাদের করতেই হবে, সব মেয়েরাই যদি বিয়ে করে সংসার আগলায়, তবে দেশের সেবা করবে কে? আমি পণ করেছি বিয়ে করবো না, দেশের কাজে আপনাকে বিলিয়ে দেব, যেমন একদিন দিয়েছিলেন আমাদেরই দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা! মনে করুন না সঙ্ঘমিত্রার কথা, মহারাজা অশোকের মত সম্রাটের মেয়ে হয়েও সে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছিল ধর্ম্মের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য।

ভুবনময়ী শান্তভাবে সব কথা শুনিলেন। তারপর ধীরভাবে বলিলেন, "তোমার এ মনের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

গাড়ী এমন সময় পোড়াদহ ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল। জলে ভিজিয়া একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা লট-বহর লইয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। তাহাদের হাঁক ডাক কুলিদের সঙ্গে ভাড়া লইয়া গোল বাধিয়া গেল ভুবনময়ী বলিলেন,

"এইবার তোমার বিছানায় গিয়ে গাটা একটু এলিয়ে দাও। তাই ত, তোমাকে একটু ঘুমুতেও দিলাম না।" সুচিত্রা নিজের বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। ভুবনময়ীও একটু শুইলেন।

রাত্রিশেষে সুব্রতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। একজন লোক গাড়ীর দরজার সম্মুখে প্রচুর পরিমাণে লট-বহর রাখিয়া তাহার উপর বসিয়া নিশ্চিন্তমনে একটা বিড়ি টানিতেছিল। সুব্রত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,"বল্‌তে পারেন রাজবাড়ী ষ্টেসন আর কতদূর ?"

ভদ্রলোক সুব্রতের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি কি এইমাত্র ঘুমিয়ে উঠ্‌লেন নাকি ?"

সুব্রত চটিয়া গেল, "হঁা একটু ঘুমিয়েছিলাম বৈ কি। তাতে কি হয়েছে ?"

"হয়নি কিছুই, আর একটু ঘুমুলেই ফরিদপুরে গিয়ে পৌছুতেন। রাজবাড়ী এইবারই দাঁড়াবে। আমারও সেখানেই নামতে হবে কিনা! দেখছেন ত একপাল ছেলে-পুলে আর জীবন্ত লাগেজ নিয়ে যাচ্ছি।"

সুব্রত দেখিল, সুচিত্রা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কি মুস্কিল, মেয়েদের এমনই বুদ্ধি বটে। সময় অসময় নেই! সে ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিল, "মিস্ ব্যানার্জ্জি !"

সুচিত্রা শুইয়াই উত্তর দিল, "কি, মিঃ রায়।"

সুব্রত কহিল, "এইবার রাজবাড়ীর কাছাকাছি এসেছি! আপানার নিদ্রার ব্যাঘাতও করলুম তাই apology চাইছি।"

সুচিত্রা উঠিতে উঠিতে কহিল, "আপনি ব্যাঘাত করলেন বটে, কিন্তু আমি ত করি নি, মশাইদের প্রতি কিন্তু নিদ্রা-দেবীর অপার স্নেহ, মুহূর্ত্তমাত্রেই কোলে টেনে নেন!"

"আপনিই বা কম যান কোথায় ?"

"তা সত্যি।"

ইতিমধ্যে সুচিত্রা উঠিয়া পড়িয়াছিল।

সুব্রত তাড়াতাড়ি করিয়া দুইজনের বিছানাপত্র বাঁধিয়া ঠিক করিয়া লইলেন। এমন সময় গাড়ী আসিয়া রাজবাড়ী দাঁড়াইল। গোয়ালন্দগামী ঐ গাড়ীর আর একটি কামরায় তারা নিরাপদে উঠিয়া পড়িল। তাহারা যখন গোয়ালন্দ পৌছিল, তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল নীল। অরুণের গোলাপী আভা সবেমাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রশান্ত পদ্মার প্রশস্ত বক্ষে অনেকগুলি ষ্টীমার, নৌকা যাতায়াত করিতেছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ মধুর পদ্মা-সিক্ত বায়ু সকল যাত্রীদের অনিদ্রা-শ্রান্ত দেহের উপর স্নেহের স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছিল। তীরে নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জগামী ষ্টীমারগুলি ভোঁ ভোঁ শব্দে যাত্রিগণকে আহ্বান করিতেছিল, ওগো এস, দ্রুত চলে এস।

সুচিত্রা ও সুব্রত গাড়ী হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সুব্রত কুলির সঙ্গে দরদস্তুর করিতেছে এমন সময় আর একখানি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল কুন্তলা, সে সুচিত্রাকে দেখিয়া কহিল,"আমিও মেলে আসিনি, যায়গা পাব না বলে, তোকে ত কোথাও খুজে পেলুম না।" তারপর সুব্রতকে দেখাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "এ রত্নটির সন্ধান পেলি কোথায় ? এরি মধ্যে এতটা বশ করেছিস্!"

সুচিত্রা মৃদু হাসিল, কোন কথা কহিল না।

ভুবনময়ীকেও তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতিনী সহকারে অগ্রসর হইতে দেখা গেল।

ভুবনময়ী কহিলেন, "আমাদের ঢাকার বাসার ঠিকানায় পত্র দিও কিন্তু মা। আমার ছেলের নাম দিয়ে ডাকঘর উয়ারি লিখলেই চিঠি পাব।" সুচিত্রা নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বীণা মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আবার কবে দেখা হবে কে জানে!

সুব্রত কহিল, "চলুন একটু তাড়াতাড়ি করে। দেখি যদি Special ষ্টীমারটা ধরা যায় আপনার যেতে খুব সুবিধে হবে।"

কুন্তলা তাহাদের পিছনেই আসিতেছিল, সে মৃদুস্বরে গাহিল—

ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম এ ছেলেখেলা,
মধুরে বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।

[ক্রমশঃ

বাঙ্গালার কথা

৺নিখিল নাথ রায়

প্রসাদ ও ভারত

এই সময়ে দুইজন বঙ্গকবি দেশমধ্যে আনন্দের ধারা ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। তার মধ্যে একজন রামপ্রসাদ সেন ও আর একজন ভারতচন্দ্র রায়। দুইজনই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। কিন্তু রামপ্রসাদ স্থায়ীভাবে কৃষ্ণনগরে থাকিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে রাজসভায় আসিতেন। রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও কবিরঞ্জন উপাধি দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ হালিসহরে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ নিজ বংশ-পরিচয় এইরূপে দিয়াছেন,—

"সেইবংশ সম্ভূত ধীর সর্ব্বগুণযুত
ছিল যত কত মহাশয়।
অনতির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদগ্রজ বলরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥"

রামপ্রসাদ অত্যন্ত কালীভক্ত ছিলেন। তাঁহার কবিতায় ও গানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবিকার জন্য তিনি কলিকাতায় ধনশালী ব্যক্তি দুর্গাচরণ মিত্রের বাটীতে মুহুরী-গিরি কার্য্যে নিযুক্ত হন। সে কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিত না। রামপ্রসাদ মধ্যে মধ্যে হিসাবের খাতায় শ্যামা বিষয়ের গান লিখিয়া রাখিতেন। মিত্র মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মচারী তাহা দেখিয়া প্রভুকে জানাইলে, তিনি সে সকল গান দেখিয়া মুগ্ধ হন। "আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি" গানটী মিত্র মহাশয়ের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি রামপ্রসাদকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়া ৩০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কলিকাতা দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট আজিও গুণগ্রাহী মিত্র মহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাঁহার যে বাটীতে বসিয়া রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিতেন, বহরমপুরের দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন সে বাটী ক্রয় করিয়া তাহার দেওয়ানবাটী নাম দিয়াছিলেন।

চাকুরী ছাড়িয়া রামপ্রসাদ স্বগ্রামে বসিয়া গীত ও কবিতা রচনা করিতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পরিচয় পাইয়া, রামপ্রসাদকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণনগরে বাস করিতে সম্মত হন নাই। মধ্যে মধ্যে রাজসভায় যাইতেন। এইরূপ শুনা যায় যে, একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুর্শিদাবাদে গিয়া তিনি গঙ্গাবক্ষে নৌকায় বসিয়া ভক্তিভাবে গান গাহিতেছিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা সেই সময় নৌকায় চড়িয়া সেখান দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার গান শুনিতে পান এবং তাঁহাকে নিজ নৌকায় লইয়া গিয়া গান গাহিতে বলেন। রামপ্রসাদ হিন্দী গান ধরিলে নবাব তাহা নিষেধ করিয়া নৌকায় তিনি স্বরচিত যে গান গাহিতেছিলেন, তাহাই গাহিতে আদেশ দেন। রামপ্রসাদ তখন তাঁহার স্বরচিত গান গাহিয়া নবাবকে মুগ্ধ করিয়া তুলেন। কিন্তু এ নবাব সিরাজদ্দৌলা না হইয়া আলিবর্দ্দী হওয়াই সম্ভব। রামপ্রসাদের গানের সুর নূতন রকমের। তাঁহার গান বাঙ্গালার ধনীর গৃহ হইতে দরিদ্রের কুটীরে পর্য্যন্ত আজিও শুনিতে পাওয়া যায়। কি সহরে কি পল্লীতে, সর্ব্বত্রই তাঁহার গান সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। তাঁহার গানকে বাঙ্গলার জাতীয় সঙ্গীত বলা যাইতে পারে। গানেই রামপ্রসাদ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন উচ্চদরের সাধক ছিলেন। তাই তাঁহার গানগুলিতে উচ্চভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এমন ভক্তিভাবের সঙ্গীত বিরল বলিয়াই বোধ হয়। রামপ্রসাদের গানে প্রসাদ বা রামপ্রসাদ নামের ভণিতা দেখা যায়। কোন কোন কবিতায় কবিরঞ্জন ভণিতাও আছে। আজু গোঁসাই নামে একজন বৈষ্ণব কবির সহিত তাঁহার কবিতায় ও গানের লড়াই হইত। রামপ্রসাদ কালী-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন নামে পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বংশের কেহ কেহ জীবিত আছেন। হালিসহরে রামপ্রসাদের বাস্তু-ভিটা

দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে কালীপূজার সময় মেলা বসিয়া থাকে।

ভারতচন্দ্রও এই সময়ে তাঁহার কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রণীত অন্নদামঙ্গল তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। প্রথমে তিনি সত্যনারায়ণ পাঁচালী লিখিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল। হুগলী জেলার ভুরসুট পরগণার পেঁড়ো গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া শুনা যায়। এক্ষণে হাবড়ার নিকট পেঁড়ো গ্রামে তাঁহার জন্মস্থানের নির্দ্দেশ হইতেছে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মুখোপাধ্যায় বংশে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ভারতচন্দ্র নিজে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখুটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥"

নরেন্দ্র রায় একজন জমিদার ছিলেন, বর্দ্ধমানের রাণীর কোপে পড়িয়া তিনি জমিদারী-চ্যুত হন। শেষে সামান্য কিছু পাইলেও ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের অবস্থা মন্দ হইতে আরম্ভ হয়।

ভারতচন্দ্র বাল্যকালে দেবানন্দপুরের মুন্সীদের বাটীতে থাকিয়া সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন। তাহার পর বাটী ফিরিয়া গিয়া কিছুদিন বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিয়া অবশেষে দেশপর্য্যটনে বাহির হন। চন্দননগর ফরাসডাঙ্গায় দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে গমন করিলে, চৌধুরীমহাশয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। রাজা ভারতচন্দ্রকে মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া আপনার সভাকবি নিযুক্ত করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কৃষ্ণনগর রাজসভায় বসিয়াই ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

"আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥"

এই রায়-গুণাকর উপাধি কৃষ্ণচন্দ্রই ভারতচন্দ্রকে প্রদান করেন। অন্নদামঙ্গলে শিব-দুর্গা, অন্নপূর্ণার বর্ণনা ব্যতীত ভবানন্দ মজুমদার, মানসিংহ ও প্রতাপ আদিত্যেরও কথা আছে। অন্নদামঙ্গল পাঁচালীর ন্যায় গীত হইত। নীলমণি কণ্ঠাভরণ ইহার প্রথম গায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

"গীত গাই নীলমণি কণ্ঠ-আভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥"

অন্নদামঙ্গল এক কালে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সকলে আগ্রহ সহকারে পাঠ করিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মূলাজোড় প্রভৃতি স্থানে ভারতচন্দ্রকে অনেক নিষ্কর-ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। সে কালে ভারতচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া অভিহিত হইতেন, তাঁহার কবিতা যেমন সরল তেমনি রসপূর্ণ। সেই জন্য সকলে তাহার যারপরনাই আদর করিত। অনেক দিন ধরিয়া বাঙ্গালা কবিতায় ভারতচন্দ্রের যুগ চলিয়াছিল।

কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণ

মীরজাফরের পর যাঁহারা মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা নামে মাত্র নবাব হন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কোনই ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইয়া উঠেন। মীরজাফরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নজমউদ্দৌলা নবাব হইয়াছিলেন। নবাবী পাওয়ার জন্য তাঁহাকেও অনেক অর্থ দিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহার দেওয়ান বা নায়েবসুবা হইলেন। ইহার পরেই ক্লাইভ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময় মুর্শিদাবাদে ও দিল্লীতে মুসলমান রাজত্বের অবসান হইয়া আসিতেছিল। মুর্শিদাবাদের নবাব যেরূপ ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, দিল্লীর বাদশাহেরও সেইরূপ কোন ক্ষমতা ছিল না। মহারাষ্ট্রীয়গণ ও অন্যান্য অনেকে নূতন নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্যকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তুলেন। দিল্লীর বাদশাহ সামান্য মাত্র ভূ-ভাগের অধীশ্বর ছিলেন। আমরা যে কালের কথা বলিতেছি; সেই সময়ে শাহ আলম দিল্লীর বাদশাহ নামে পরিচিত হইতেছিলেন।

চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া ও বাঙ্গলার নবাবের কিছুমাত্র ক্ষমতা না থাকায়, ক্লাইভের মনেও রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। অবশ্য কোম্পানীর মনে অনেক দিন হইতেই যে এ আশঙ্কা জাগিতেছিল, তোমরা তাহা শুনিয়াছ। এক্ষণে সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া ক্লাইভ তাহার

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্লাইভ-প্রথমে একেবারে বাঙ্গালা রাজ্য অধিকার না করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা হস্তগত করার অভিপ্রায় করিলেন। প্রথমে তিনি বাদশাহকে কিছু কর দিয়া বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব সংগ্রহের ভার লইতে ইচ্ছা করেন। বাদশাহ শাহ-আলম সে সময়ে এলাহাবাদে ছিলেন। ক্লাইভ বাদশাহের নিকট গিয়া বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানীর প্রস্তাব করিলে, বাদশাহ ইংরেজদিগের ক্ষমতা দিন দিন বাড়িতেছে দেখিয়া ক্লাইভের প্রস্তাবে সম্মত হন। তিনি বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর গ্রহণে কোম্পানীকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান বা রাজস্ব সংগ্রহের ভার প্রদান করেন। বাদশাহ ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে ইংরাজেরা অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সকল স্থানের মধ্যে বাদশাহকে কড়া ও এলাহাবাদ প্রদেশ ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে আর অযোধ্যা অধিকার করার চেষ্টা হইল না, অযোধ্যা প্রদেশ তাঁহারই অধিকারে থাকিল। যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ কোম্পানীকে অযোধ্যার নবাবের কতক টাকা দণ্ড লাগিল। এদিকে নবাব নজমউদ্দৌলার সহিতও এইরূপ সর্ত্ত হইল যে, তিনি কিছু কম ৫৪ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন আর চোর, ডাকাত, অন্যান্য অপরাধীদের বিচার করিতে পারিবেন। শাসন বা ফৌজদারী বিচারের কার্য্যভার তাঁহারই হস্তে ছিল। কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহ ও সৈন্যরক্ষার ভার কোম্পানীই গ্রহণ করিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ কোম্পানীর পক্ষ হইতে নায়েব দেওয়ানও নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অধীনে দেশীয় তহশীলদারগণ রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। এইরূপে নবাব নাজিম খাঁ শাসনকর্ত্তা আর কোম্পানী দেওয়ান বা রাজস্ব আদায়কারী হওয়ায়, বাঙ্গালায় দ্বৈত-শাসন বা দুই সরকারের প্রবর্ত্তন হইল। মুর্শিদাবাদের মতিঝিলের প্রাসাদে নবাব নজমউদ্দৌলার পাশে বসিয়া দেওয়ান কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে ক্লাইভ প্রথম পুণ্যাহ বা রাজস্ব আদায় আরম্ভ করিলেন।

ছিয়াত্তরে মন্বন্তর

কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের কয়েক বৎসর পরে এদেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাঙ্গলা ১১৭৬ সালে তাহার আরম্ভ বলিয়া তাহাকে ছিয়াত্তরে মন্বন্তর বলে। এরূপ দারুণ দুর্ভিক্ষের কথা আর কখনও শুনা যায় নাই। পূর্ব্ব বৎসরে শস্য ভাল না হওয়ায় চাউলের দাম বাড়িয়া যায়, কিন্তু ৭৬ সালে ভালরূপ বৃষ্টি না হওয়ায় ক্ষেতসকল ধূ-ধূ করিতে থাকে। ভাদুই ধান্য কিছু হইয়াছিল, কিন্তু আমন ধান্য ও চৈতালী কিছু মাত্র হয় নাই। তাহাতে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। এই বৎসরেই দুর্ভিক্ষের সূচনা। ৭৭ সালের প্রথম হইতে দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। অন্নকষ্টের জন্য দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। লোক সকল মরিতে আরম্ভ করিল। কৃষকেরা গরু, বাছুর, লাঙ্গল সমস্তই বিক্রয় করিতে লাগিল। বীজ ধান যাহা ছিল খাইয়া ফেলিল। ক্রমে তাহাদের পুত্র কন্যার বিক্রয় আরম্ভ হইল, শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু কোন ক্রেতা জুটিল না। অন্নাভাবে গাছের পাতা, মাঠের ঘাস তাহারা খাইতে লাগিল। অবশেষে মরা মানুষের মাংস পর্য্যন্তও খাইতে ছাড়িল না।

> "পতি-পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে,
> মরে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে।"

দিন রাত্রি জীর্ণ শীর্ণ রোগগ্রস্ত কঙ্কালসার লোকে বড় বড় সহর ছাইয়া ফেলিল। মাতার চীৎকারে, সন্তানের কাতর স্বরে, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে, পাষাণের হৃদয়ও বিগলিত হইয়া পড়িল। সেই সময় আবার প্রবল বসন্তরোগও দেখা দিল। মুর্শিদাবাদ সহরে তাহার লীলা ভীষণ হইয়া উঠিল। নবাব সৈফউদ্দৌল ও তাঁহার অন্তঃপুরের অনেকে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। নজমউদ্দৌলার পর তাঁহার ভ্রাতা সৈফউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের নবাব হইয়াছিলেন। পথে ঘাটে মৃত ও মুমূর্ষুতে গলাগলি করিয়া পড়িয়া রহিল। শৃগাল, কুকুর, শকুনি, গৃধিনীতে চীৎকার করিতে করিতে তাহাদিগকে টানাটানি করিতে লাগিল। তাহাদের সে চীৎকার শুনিয়া লোকের মনে যারপর নাই আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সেই স্তূপাকার মৃতদেহ শৃগাল কুকুরে ভক্ষণ করিয়া শেষ করিতে পারিল না।

যেখানে টাকায় ৮ মণ বা ৫।৬ মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছে, সেখানে এই মন্বন্তরের সময় ১০ সেরে নামিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৩ সেরে দাঁড়াইয়াছিল। অনেক সরকারী কর্ম্মচারী চাউল একচেটিয়া করিয়া রাখায় তাহার দাম বাড়িয়া গিয়াছিল।

নায়েব, সুবা ও নায়েব দেওয়ান, মহম্মদ রেজা খাঁ এবং তাহার অনুচরবর্গ চাউল একচেটিয়া করিয়া রাখায় রেজাখাঁকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কলিকাতার দরবারে তাঁহার বিচার হইয়াছিল। সে বিচারে অবশেষে রেজা খাঁ অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। রেজা খাঁর অত্যাচার সম্বন্ধে এইরূপ কবিতা প্রচলিত আছে:

> "দেশের সমস্ত মাল কিনিয়া বাজারে,
> দেশ ছারখারে গেল রেজাখাঁর তরে।
> একচেটে ব্যবসায় দাম খরতর,
> ছিয়াত্তরে মন্বন্তর হল ভয়ঙ্কর॥"

কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে কতক চাউল চালানও দিয়াছিলেন। টাকায় ৩ সের চাউল হইলেও গরীব লোকে তাহা কিনিতে পারে নাই, কারণ, তাহাদের হাতে একটি মাত্রও পয়সা ছিল না। নবাব, কোম্পানী ও অন্যান্য লোকে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ সামান্য মাত্র। তাহাতে অনেকেই মরণের পথ হইতে ফিরিতে পারে নাই। এই দুঃসময়ে কোম্পানীর রাজস্ব আদায় সমানভাবেই চলিতেছিল। ৭৬ সাল অপেক্ষা ৭৭ সালের ভয়ানক দুর্দ্দিনে অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস হইয়াছিল ও এক তৃতীয়াংশ ভূমি পতিত পড়িয়াছিল। দুই পুরুষে ইহার অভাব পূরণ হয় নাই। পতিত স্থানসমূহে ব্যাঘ্র ও বন্য হস্তীর আবাসভূমি হওয়ায় তাহাদের অত্যাচারে অবশিষ্ট গ্রামবাসীরা উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। এই মন্বন্তরে কৃষককুল ধ্বংস হইয়া যায়। সাধারণ গৃহস্থেরা পথের ভিখারী হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার তালুকদারেরা দারিদ্র্যের শেষ সীমায় গিয়া দাঁড়ায়। আর বর্দ্ধমান, রাজসাহী, দিনাজপুর, নদীয়া প্রভৃতির রাজারা এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন যে, বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা সে ক্ষতির পূরণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালার কৃষক, মধ্যবিত্ত, আভিজাত সম্প্রদায় সকল শ্রেণীর মধ্যেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশ আর-এক উৎপাতে সন্ত্রাসিত হইয়া উঠে। মন্বন্তরের পূর্ব্ব হইতে তাহার সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর ইহা ভীষণ আকার ধারণ করে। সে সময়ে এদেশে দুই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শাসনকার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছিল না। দেওয়ান কোম্পানী রাজস্ব সংগ্রহেই ব্যস্ত, অবশ্য তাঁহারা সৈন্য রক্ষাও করিতেন। কিন্তু যাহার হস্তে শাসনভার ছিল, সেই নবাব নাজিম যে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে কথা তোমরা জানিয়াছ। সৈফউদ্দৌলার পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মোবারক উদ্দৌলা নবাব হন। তিনি আবার নাবালক ছিলেন, তাঁহার বিমাতা মণিবেগম তাঁহার অভিভাবিকা হন। কাজেই শাসনকর্ত্তার অবস্থা কিরূপ তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। এ সময় ক্লাইভ সাহেবও বিলাত চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে দুই একজন গবর্ণর হওয়ার পর ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর নিযুক্ত হন। এইরূপ নানাপ্রকার গোলযোগের সময় বাঙ্গালার উত্তর ও পশ্চিম প্রান্ত ব্যাপিয়া এক ভয়াবহ বিপ্লব উপস্থিত হয়। ক্রমে ক্রমে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

তোমরা দেখিয়া থাকিবে কোন কোন সন্ন্যাসীর দল হাতী, ঘোড়া, উট প্রভৃতি লইয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রে তীর্থ যাত্রা করিয়া থাকে। সেইরূপ সন্ন্যাসীরা ঐ সময় হিমালয়প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া রংপুর, দিনাজপুর দিয়া বীরভূম বিষ্ণুপুরের পথে জগন্নাথের দিকে যাইত। যদিও তাহাদের বেশভূষা সন্ন্যাসীর ন্যায়ই থাকিত ও তাহারা তীর্থযাত্রা করিত, কিন্তু সুযোগ পাইলে তাহারা লুঠ-পাট করিতে ছাড়িত না। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পর দেশে রাজ্যশাসনের অবস্থা দেখিয়া তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। উত্তর বঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ পর্য্যন্ত তাহারা গ্রামে গ্রামে টাকা-কড়ি ধান চাউল লুঠ-পাট করিয়া ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দুর্ভিক্ষে অবসন্ন লোকদিগকে আরও অবসন্ন করিয়া তুলিল। ক্রমে ইহাদের দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মন্বন্তরে যাহাদের অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছিল; সেই কৃষককুল—এমন কি, দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারগণ ইহাদের সহিত যোগ দিয়া দেশমধ্যে দস্যুতা করিতে আরম্ভ করিল। দিন দিন ডাকাতের দল এত বাড়িয়া গেল যে, তাহাদিগকে নিবারণ করা কঠিন হইয়া

উঠিল। তাহারা গ্রামবাসীর যথাসর্ব্বস্ব ত লুটিয়া লইতেছিলই, শেষে কোম্পানীর খাজনার চালান পর্য্যন্ত লুটিতে আরম্ভ করিল।

কোম্পানী তখন তাহাদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম তাহাদিগকে পারিয়া উঠিলেন না। সন্ন্যাসীদের সন্ধান লোকে বলিয়া দিত না, ইহাতে পাপ হইবে মনে করিত। সে যাহা হউক, ইংরাজের সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ আরম্ভও হইল। রংপুরের নিকট ইংরেজ-সেনাপতি টমাস তাহাদের হস্তে নিহত হইলেন। এডওয়ার্ডস নামে আর একজন সেনাপতিরও টমাসের ন্যায় দশা ঘটিল। তখন চারিদিক হইতে ইংরেজসৈন্য তাহাদিগকে দমন করিতে ধাবিত হইল। বহু বৎসর পরে তবে ইংরেজরা এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ডাকাতী নিবারণ করিয়া দেশে শান্তিস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রদেশে এই ডাকাতদিগের উৎপাত বড়ই বাড়িয়াছিল। দেবীচৌধুরাণী, ভবানীপাঠক মজনুশা প্রভৃতির নামে উত্তরবঙ্গের লোকেরা শিহরিয়া উঠিত। বীরভূম, বিষ্ণুপুরেও বহুদিন পর্য্যন্ত ডাকাতি চলিয়াছিল। বীরভূমের মুসলমান রাজাদের রাজধানী রাজনগরে প্রবেশ করিয়া ডাকাতেরা তাহা লুণ্ঠন করিয়া লয়। রাজারা তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহ রাজস্ব অনাদায়ে কিছুদিন কারাগারে ছিলেন, একজন সাহেব-কর্ম্মচারী কোম্পানীর পক্ষ হইতে রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত হন। তাহাতে বিষ্ণুপুর প্রদেশের লোকেরা ডাকাতদিগের সহিত যোগ দিয়া রাজস্ব আদায় বন্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে সর্ব্বত্রই ডাকাতির ধুম পড়িয়া যায়। এমন কি, কলিকাতাতেও তাহার কিছু কিছু অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বহু বৎসর ধরিয়া এইরূপ ডাকাতি চলিতে থাকায় দেশের লোকে যারপরনাই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে কোম্পানীর রাজস্বেরও ক্ষতি হইয়াছিল।

নূতন রাজ্যবিধি

তোমরা শুনিয়াছ, এ সময়ে দেশে সুশাসনের ব্যবস্থা ছিল না, কাজেই বিচারাদিও সুচারুরূপে হইত না। মুসলমান আমলে নিজামত, দেওয়ানী, কাজী ও ফৌজদারী আদালতে বিচার হইত। কিন্তু এ সময়ে বিচারের নামগন্ধও ছিল না। ওয়ারেণ হেষ্টিংস গভর্ণর হইয়া রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা দেওয়ানী অর্থাৎ বিষয়-সম্পত্তির বিবাদ সম্বন্ধে বিচার করিতেন। আর কাজী মুফতীদের উপর ফৌজদারী অর্থাৎ চুরি, ডাকাতী, দাঙ্গাহাঙ্গামা মারপিট প্রভৃতির বিচার দেওয়া হয়। এই সকল মোকদ্দমার আপীল বা পুনর্ব্বিচারের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত স্থাপিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদে উঠিয়া যায়। মহম্মদ রেজা খাঁ তাহার বিচারপতি নিযুক্ত হন। পরে আবার সদর নিজামত আদালত কলিকাতায় উঠাইয়া আনা হয়। এইরূপে ওয়ারেণ হেষ্টিংস নবাব নাজিমের হস্ত হইতে নিজেরাই শাসনভার গ্রহণ করেন।

কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের অযথা প্রভুত্ব ও অত্যাচার দিন দিন বাড়িতে থাকায় বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট সভা তাহার অনুসন্ধানের জন্য একটি গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতি তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিলে বিলাত হইতে এদেশের নূতন রাজ্যবিধির প্রবর্ত্তন হয়। তাহাতে বাঙ্গলার গবর্ণর সমস্ত ভারতবর্ষের কর্ত্তা হইয়া গবর্ণর জেনারেল নামে অভিহিত হন। তাঁহার সাহায্যের জন্য চারিজন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সদস্যদের মধ্যে একজন এদেশে ছিলেন। আর তিন জন বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসই ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। আর বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য বিশেষতঃ নিজ কলিকাতার বিচারের জন্য কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়। তাহাতে এক জন চীফ জাষ্টিস্ বা প্রধান জজ ও আরও তিনজন জজ নিযুক্ত হন। যিনি প্রথমে প্রধান জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার নাম স্যর ইলাইজা ইম্পে। ইম্পে ও অন্যান্য তিন জন জজ বিলাত হইতেই নিযুক্ত হইয়া আসেন। মফঃস্বলের বিচারের জন্য যে সকল আদালত বা পুনর্ব্বিচারের জন্য সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত, যেমন ছিল সেইরূপই থাকে। কলিকাতায় বিলাতের আইন অনুসারে বিচার চলিত। হিন্দু মুসলমানদের নিজ নিজ শাস্ত্রানুসারে বিচারের ব্যবস্থা হয়। এইরূপে এদেশের শাসন ও বিচারের সুব্যবস্থা করার চেষ্টা হইয়াছিল। নূতন রাজ্যবিধির পর বিলাতের মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট হইতে প্রধান মন্ত্রী পিটের ভারত-সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। তাহাতে একটি তত্ত্বাবধায়ক সমিতি গঠিত হইয়া ভারতশাসনের ব্যবস্থা করার ভার গ্রহণ করেন।

একটী রাতের ভুল

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু এম, এ

সে সুন্দরীও নয়, কুরূপাও নয়, তবু কলেজ সুদ্ধ ছেলে যেন একেবারে পলাসেনের জন্যে পাগল। যে সাড়ীই সে পরুক, যেমন করেই খোঁপা বাঁধুক, তাতেই তাকে মানাত সব মেয়েগুলির চেয়ে চমৎকার। মেয়েরা জ্বলে যেত ক্ষোভে, ছেলেরা গল্‌তে আরম্ভ ক'রল লোভে। মোটকথা, পলাসেন সবাইকে করে তুলল অস্থির। টাগ-অব-ওয়ারের মোটা কাছিটার দু'দিকে দু'দলে ধ'রে মেয়ে আর পুরুষে ত' অনেক দিন থেকেই চল্‌ছে টানাটানি। এখেলা ত' নূতন নয়। কিন্তু ছোট্ট একখানি ষ্টীম লঞ্চের পিছনে সারবন্দি গাধাবোটের মত এক পাল ছেলে যখন ভেসে যেতে লাগল ঐ একটী মেয়ের টানে, তখন সে মেয়েটীকে ব'ল্‌তেই হবে অসাধারণ।

পুরুষের চিত্তজয়ের কৌশল সে জান্‌ত অনেক রকম, সামান্য মাছ ধরতেই কত চার, কত টোপ ফেল্‌তে হয়। শিকার গেঁথে তোলার চেয়ে খেলাতেই তার ভাল লাগত অনেক বেশী। এলোমেলো বাতাসের মত তার মনটা ছিল বেপরোয়া, কখন যে কোনদিকে বইবে সে বাতাস তা যার মন সেও টের পেত না নিজেই। মুখের ভাব বদ্‌লাত তার নিমেষে, শরতের আকাশের মত সে মুখখানিকে যেন ঠিক বিশ্বাস করা যেত না। কারো কারো প্রতি তার ব্যবহার যেন অত্যন্ত গায়ে-পড়া, কারো উপর বা খাঁড়া-ধরা, আবার কারো কারো জন্যে সে যেন জ্যান্তে-মরা, এমনি নানাভাবের নানামুখ সে দেখাত কলেজের ছেলেদের যখন তখন যেমন খুসী, পাকা অভিনেত্রীর মত। সাগরের মত তার অন্তর ছিল চির-রহস্যে ঢাকা, বোঝা যেত না তার অন্ধি-সন্ধি। ডুবো চুম্বকের পাহাড়ের মত তার গোপন আক্রমণ ছিল সাংঘাতিক। বিপদের আকর্ষণ চিরকালই ক'রেছে পুরুষকে উত্তেজিত। পুরুষের এই স্বাভাবিক বৃত্তির বশে ছেলেরা পলাসেনের আসা-যাওয়ার পথে, ক্লাসের দোর গোড়ায় ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে কত অসাধ্য সাধন ক'রত তার দৃষ্টিটাকে একটু বাঁকা-ভাবে আকর্ষণ করবার জন্যে, কিন্তু কোন দিনই ভ্রূক্ষেপ না ক'রে এই দাম্ভিকা মেয়েটী এতগুলি ছেলের মধ্য দিয়ে আপনার পথ ক'রে নিতে নিতে বেশ নির্ভীক ভাবেই গট্‌মট্‌ ক'রে হেঁটে যেত, পুরুষ ব'লে তাদের এতটুকু সংকোচ না করে। তাদের পৌরুষের এই অপমানে ছেলের দল মহা ক্ষাপ্পা হ'য়ে উঠে, আঙ্গুর ফল টকের মত যা-তা সব মন-গড়া মিথ্যে রটাতে সুরু ক'রলো পলাসেনের নামে। যথা—

"ও একটা ঘুঘু-মেয়ে। ওর প্রেমিক নাকি এতগুলি যে, তাদের সংখ্যা ও-আঙ্গুলের হিসেবের মধ্যেই আসে না।"

তবু এই পলাসেনের জন্যেই যেন তাদের কলেজ সুদ্ধ ছেলের সবারই একসঙ্গে মাথাব্যথা। এমনি আশা-নিরাশার নাগর-দোলায় দোল খেতে খেতে গরমের লম্বা ছুটীটা চুপি চুপি কখন যেন এসে মেরে ব'সলো একটা মস্ত ঢেলা একেবারে মৌচাকে। চমক্‌-ভাঙ্গা মধুলোভীর দল উড়ে গেল, পড়ে রইল শুধু নির্ব্বান্ধবা শূন্য-কলেজ-বাড়ীটা, ফাঁকা চাকের মত অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে।

তারপর, কলেজ ফের যখন খুল্‌ল, ছেলেরা লক্ষ্য করলে মেয়েরা সবাই এসেছে, কেবল পলাসেনই ক'রেছে কোথায় অন্তর্ধান। ছেলেদের মধ্যে একদল আছে যাদের কাজ হচ্ছে—কোন মেয়ে কত নম্বর বাসে চ'ড়ে কলেজে আসা যাওয়া করে, কে কোন বইয়ের দোকান থেকে বই কেনে, কে কোন এসেন্স ব্যবহার ক'রতে ভালবাসে, কোন রেঁস্তরায় কে কখন চা খেতে আসে, কাকে কবে কখন কোন সিনেমায় দেখা যায় এই সব তথ্য সংগ্রহ করা থেকে আরম্ভ ক'রে, মেয়েদের বাড়ীর ঠিকানা, তাদের অভিভাবকদের নাম, কার ক'জন টিউটার, কার কার ক'টী বয়-ফ্রেণ্ড, তাদের প্রত্যেকের-মেস বা বাসার ঠিকানা, এ সব যেন তাদের ঠোঁটের আগায়। এই দলের পাণ্ডাগোছের একটী ছেলে মুখখানিকে তার কাঁদুনে বাঁদরের মত করুণ ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রে একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ব'ল্‌লে—

"শুনে সবাই দুঃখিত হবে, এতদিন পরে পলাসেন আমাদের সবার মায়া কাটিয়ে গেল—।"

"কেন ? কি হ'ল তার—?"

"বেচারী মারা গেছে—।"

"অ্যাঁ ! কবে ? কবে ?"

"এই ছুটীর ভেতরই একদিন—।"

"বলিস্ কি ! কি হ'য়েছিল ?"

"সেই যাচ্ছে তাই রোগ, যা সব মেয়েকেই ধরে—।"

"কি, বল্‌তো ?"

"যাকে সোজা কথায় আমরা বলি মরণ, মেয়েরা একটু ঘুরিয়ে বলে বিয়ে।" ব্যাপারটা তখন সবাই বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠল।

"পলাসেনের বিয়ে হ'য়ে গেল তাহ'লে, তা কি রকম হ'ল শুনি ?"

"দস্তুর মত যাকে বলে লাভ-ম্যারেজ—।"

"লাভ-ম্যারেজ ! কার সঙ্গে ?"

"সুরঞ্জন—।"

সুরঞ্জন সিংহ সিংহ-হাটির জমিদার বংশের একমাত্র সন্তান। কলেজ হোষ্টেলে থেকে লেখাপড়া ক'রত, পড়াশুনায় সে খুব ভালছেলে। যে সময়টারভরে বন্ধুরা তাদের সব সহ-পাঠিনীদের রূপের সমালোচনায় মেতে থাকত, সে সময়টাতে সুরঞ্জনকে দেখা যেত কলেজের লাইব্রেরীর একটা কোণে একগাদা বই খাতা-পত্তরের মাঝে ডুবে থাকতে। ছেলেরা তাকে দিত টিট্‌কিরী, মেয়েরা ব'ল্‌তো হেসে কুণোব্যাঙ। কিন্তু কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষায় যখন সে সব বিষয়ে প্রথম হ'য়ে সবার উপরে টেক্কা দিলে, তখন সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো এই কুণোব্যাঙের উপর। এমন কি মেয়েরাও লাইব্রেরী ঘরের পাশ দিয়ে সোজা যেতে যেতে একটু বাঁকা-চোখে চাইতে সুরু ক'রে দিলে তার দিকে।

গরমের ছুটীর বন্ধে সুরঞ্জন বেড়াতে গেছলো পুরীর সমুদ্র তীরে। নীল সাগরের ঢেউ ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে বিশাল বালির তৃষিত বুকে। এই এলো এই চ'লে গেল কোথায়, আবার তখুনি ছুটে ফিরে আসে—ঢেউয়ের পরে ঢেউ। সুরঞ্জন বালির উপর বুক দিয়ে শুয়ে শুয়ে দেখছিল এই ঢেউয়ের খেলা। হঠাৎ কে ব'লে উঠল—

"ঢেউ গুণছেন বুঝি একা-একা ব'সে ?"

মেয়েলী গলা শুনে সুরঞ্জন চম্‌কে ফিরে দেখে, সামনে পলা, সবে স্নান সেরে উঠেছে। ভিজে নীলসাড়ীটা যেন তার শরীরের কোমল অঙ্গের খাঁজে খাঁজে লেপটে রয়েছে, জল ঝরছে তখনও। সুরঞ্জনের বুকের রক্ত সাগরের ঢেউয়ের মত লাফিয়ে উঠল। পলা তার ভিজে ঝাঁকড়া চুলের রাশ বুকের ওপর থেকে দু'হাতে পিঠের দিকে ঠেলে সরাতে সর'তে হেসে ব'ল্‌লে—

"চিনতেই বোধ হয় পারলেন না আমায় ঠিক ক'রে ?"

"আপনি পলাসেন তো ?"

মুক্তার মত দাঁতগুলি বের ক'রে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল পলা,—এই হলো তাদের প্রথম পরিচয়।

সেই পরিচয় তাদের দিনের পর দিন ক্রমে গভীর হ'তে গভীরতর হ'য়ে উঠল খুব শীগ্‌গিরই। সুরঞ্জন লিখ্‌ল বাবাকে,—"পালাসেনকে আপনার পুত্রবধূ ক'রব, অনুমতি চাচ্ছি।"

বাবা লিখে পাঠালেন—"করো ; তবে আমাদের মুখ দেখো না আর।" তারপর যেমন হয়ে থাকে। বাবা টাকা পাঠান দিলেন বন্ধ ক'রে। ছেলেও বাপের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়ে বিয়ে ক'রে বসল এই পলাসেনকেই।

...কিন্তু ফুলের মালা শুকুতে সময় লাগে না। নূতন সংসার গড়তে গিয়ে তাদের দু'জনেই দেখলে, কত চোখের জল আর আত্মত্যাগে এর এক একখানি ইট গাঁথা। সে কঠোর তপস্যা সুরঞ্জনের ছিল। পলাকে সুখী ক'রতে সে কোন দুঃখকেই দুঃখ বলে মনে ক'রলে না। আপিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, আবার রাত্রিতে ছিল তার টিউসানী। পলা ক'রত রান্না-বাড়া, ঘর-সংসারের কাজ মুখ বুজে। এমনি ক'রে অভাবের-বোঝাই-দেওয়া গরুর গাড়িটা যেন তারা টেনে চ'লছিল দু'টিতে একঘেঁয়ে বাঁধাপথে। হাঁফিয়ে উঠে পলার মন। এমন সময় কোলে এলো তার একটী মেয়ে। পলা উঠল বিষিয়ে বিরক্তিতে, ভাল করে চেয়েই দেখলে না সে মেয়েটার পানে।

একদিন আপিস্ থেকে ফিরে বাড়ীতে এসে সুরঞ্জন দেখ্‌লে—মেয়েটী কাঁথা থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে খুব ট্যাঁ-ট্যাঁ ক'রছে। পলার খোঁজ ক'রে জানতে পারলে, সে পাশেরবাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে সিনেমায় না কোথায়

গেছে বুঝি। সেদিন রাত্রে পলা বাড়ী ফিরতেই সুরঞ্জন তাকে খুব ক'রলে বকা-বকি। ফলে তার পরদিন সকালে উঠে পলাকে আর বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষকালে তার পরণের কাপড়, মাথার সুগন্ধীতেলের শিশি পাওয়া গেল, বাড়ীর কাছেই গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির উপর। সুরঞ্জনের ইচ্ছে হ'ল, সেও ছুটে গিয়ে ঐ গঙ্গারজলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার জীবনটাকেও এমনি ক'রে শেষ ক'রে ফেলে; কিন্তু পারল না কেবল তার ছোট মেয়েটার মুখের পানে চেয়ে।

তারপর পাঁচটা বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে তার বাবা গেছেন মারা। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি এখন সুরঞ্জনের হাতে। সে ক'লকাতা সহরের উপর মস্ত এক বাড়ী ক'রে তাতে বাস ক'রছে। অনেকে তাকে বলে, "বিয়ে কর ফের।" সে হেসে বলে, "আবার।" তার সে হাসি দেখলে অতিবড় পাষণ্ডের বাচাল মুখও হ'য়ে যেত বোবা। সুরঞ্জন ফুলেরগাছ আর বই নিয়ে নিজের দুঃখ ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। মেয়েটা তার বাবার কাছে কাছেই থাকে, কাছছাড়া হ'তে চায় না কিছুতেই। বাবা যখন বাগানের ফুলগাছে নিজহাতে জল দেয়, ছোট মেয়েটা তার খেলাঘরের ছোট বালতিটাতে জল নিয়ে ছুটে যায় সাহায্য করতে তার বাবাকে। যখন সুরঞ্জন পড়তে বসে, মেয়েটা খেলনা সাজিয়ে বসে তার বাবার পায়ের কাছে খেলতে। বাবাকে খেতে বসিয়ে তার পাশে নিজের ছোট থালাটা সাজিয়ে মেয়েটা তবে খেতে বসে। কে যে তাকে শেখালো এসব সুরঞ্জন বুঝতে পারে না কিছুই। এমনি করে সুরঞ্জনের ছোট্ট মেয়েটা তার বাবার খালি বুকটাকে যেন একাই ভরাট করে রাখত অনেকখানি। সুরঞ্জন তবু মেয়েটীর নাম রাখলো—বাদল। কেন? তা সেই জানে।

সেদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বরাবরের অভ্যাস মত সুরঞ্জন একখানা বই হাতে নিয়ে পড়ছিল খুব মন দিয়ে—'যে মানুষ মরে গেছে তার আত্মার সঙ্গে আবার কি দেখা হয়, সে কি আবার ফিরে আসে?' এমন সময় খেলা ফেলে বাদল হঠাৎ কেঁদে উঠল ডুকরে। বই রেখে তখুনি সুরঞ্জন মেয়েকে বুকে তুলে আদর ক'রে চুমু খেয়ে বললে, —"কি হয়েছে বাদল? কাঁদছ কেন মা?" বাদল কিছুই বলে না, কেবল কাঁদে। শেষে অনেক কষ্টে বাবার গলা দুখানি তার ছোট হাতে জড়িয়ে ধরে বাদল বললে, "আমার মা নেই কেন বাবা,, সবার কেমন মা আছে।"

সুরঞ্জনের চোখে জল ভরে এল, সে কষ্টে আপনাকে সামলে বললে—

"কে বললে তোমার মা নেই বাদল?"

"রুনুদের বাড়ী খেলতে গেছলুম, ওরা বললে—।" কোন রকমে কথা ক'টা বলে ফেলে বাদল বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে লাগল। টস্ টস্ করে দু'টো বড় বড় ফোঁটা বেরিয়ে এল সুরঞ্জনের গাল বেয়ে। বাদল বায়না ধরলে "মা, মা" করে। সুরঞ্জনের হৃৎপিণ্ডটা ধরে কে যেন নাড়া দিতে লাগল। তখুনি ড্রয়ার খুলে পলার একখানি ফটো সুরঞ্জন বার করলে, তারপর মেয়ের হাতে সেখানি দিতে দিতে ধরা গলায় তাকে ভোলাবার জন্তে বললে, "এই তোমার মা।"

ছবিখানি হাতে নিয়ে বাদল আব্দারের সুরে বললে, "ছবির মা নয়, রুণুর মার মতন মা।"

নিরুপায় সুরঞ্জন, কোন উপায়ই সে খুঁজে পায় না। বাদলকে নিয়ে বেরিয়ে গেল মোটরে করে। মার্কেটে গিয়ে বাদলকে কিনে দিলে কত খেলনা, কত রকমের পুতুল। ফেরবার পথে রংয়ের দোকান থেকে সুরঞ্জন কিনে ফেললে রং, তুলি, ক্যানভাস, ছবি আঁকবার সব সরঞ্জাম। তার হ'য়েছে খেয়াল পলার একখানি জীবন্ত ছবি আঁকবে সে নিজে হাতে।

এ বিদ্যে তার জানা ছিল, নূতন নয়। কাজ তার খুব দ্রুতই এগুতে লাগল সমাপ্তির দিকে। কেবল পলার ঠোঁটের হাসি যেন বাসি ঠেকল সুরঞ্জনের, এ হাসি তো সে চায় না, যে হাসি তার মনে দিনরাত জেগে রয়েছে, সে হাসি ফুটছে না কেন তার তুলির ছোঁওয়ায়? সুরঞ্জন ছবির নেশায় যেন মাতাল হয়ে উঠল। একটা বনাতের পর্দ্দা ঢাকা দেওয়া থাকত ছবিখানির ওপর। তার ইচ্ছে ছিল বাদলকে লুকিয়ে তার মায়ের ছবিখানিকে শেষ করে হঠাৎ তাকে তাক্ লাগিয়ে দেবে একদিন। তাই সুরঞ্জন দিনের বেলায় ছবি আঁকত না, গভীর রাত্তিরে আলো জ্বেলে সে ক'রত তার গোপন সাধনা। রাতের পর রাত চলে যায়, সুরঞ্জন

রংয়ের তুলি হাতে ক'রে ছবির পানে চেয়ে থাকে, চেষ্টা করে বার বার, আবার মোছে, আবার আঁকে তখুনি, তার মনের হাসি ছবির ঠোঁট দু'খানিতে ফুটে ওঠে না যেন কিছুতেই। রাত কোথা দিয়ে কখন চলে যায়। ছবির সামনে পর্দ্দা টেনে দেয়, ঘুমন্ত বাদলের কচি মুখখানির পানে চায়, চোখের কোণে আসে একটী ফোঁটা জল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়ের গালে খায় চুমো অতি সন্তর্পণে, তারপর স্থরঞ্জন বিছানায় গিয়ে শোয়, নিভে যায় ঘরের সব আলো। দেহে অবসাদ ক্লান্তির বোঝা, অন্তরে জ্বলে ওঠে অতৃপ্তির আগুন।

…আজ সেইদিন, যেদিন হয়েছিল তার পালার সঙ্গে মালা বদল! বাগানের সেরা সেরা ফুল এনে স্থরঞ্জন পলার ছবিখানিকে সাজিয়েছে মনের মত করে। তার এই নীরব পূজা, এই দুর্ব্বলতা পাছে কেউ দেখে ফেলে, জানতে পারে, তাই সবই স্থরঞ্জনের ছিল লোকের দৃষ্টির আড়ালে পর্দ্দা ঢাকা। আজও ব্যবস্থা অন্য রকম হয় নি কোন। ঘড়িতে রাত বারটা বেজে গেল নিশুতি রাত। সবাই ঘুমুচ্ছে অকাতরে। স্থরঞ্জন ছবির সামনে বড় আলোটা জ্বেলে দিলে, ঘরখানি ভ'রে গেল যেন দিনের আলোয়। তারপর ছবির পর্দ্দাটী আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে, ছবির কাছে এসে ব'সল স্থরঞ্জন রংয়ের তুলিটী হাতে নিয়ে। তার লুব্ধ চোখদু'টী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল তার ছবির প্রিয়তমার পানে। কতক্ষণ যে সে অমনি ভাবে চেয়ে ছিল তা সে নিজেও জানে না। হঠাৎ যুঁইফুলের গন্ধ তার নাকে এল, সব ফুলের গন্ধ ছাপিয়ে যুঁইফুলের এই মিঠে গন্ধ কোথা থেকে আসছে এমন করে। স্থরঞ্জনের মনে পড়ল—তার বিয়ের সেই মধুর রাত্রিটার কথা। শুভ-দৃষ্টির সময় সেই মালা বদল, সেই চোখে চোখে চাওয়া, মনে মনে মন দেওয়া-নেওয়া, সেই মধুর ক্ষণে স্থরঞ্জন পরিয়েছিল রজনী-গন্ধার একছড়া গোড়ে মালা পলার গলায়, পলা পরিয়েছিল তাকে গলা থেকে এক ছড়া যুঁইয়ের মালা। সেই যুঁইয়ের মন-মাতান, স্বপ্ন-জাগান মিষ্টি গন্ধ আবার এলো কোথা থেকে? সে তো যুঁইফুল আনেনি আজ, এ যে তার সেই মালার গন্ধ। স্থরঞ্জন ভাবতে লাগল কত কথা, ভাবতে ভাবতে তার মাথা উঠল কেমন করে। স্থরঞ্জন দু'হাতে মুখ ঢেকে চোখ বুজে ভাবতে লাগল, এ তার মনের ভুল নিশ্চয়ই।

হঠাৎ তার মনে হোল কে যেন নিঃশব্দে খোলা দরজাটা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে ঢুকলো। হাওয়ার মত ভেসে এসে তার সামনে যেন দাঁড়াল সে। স্থরঞ্জন স্বপ্নাবিষ্টের মত বল্‌লে, "কে?"

কে যেন উত্তর দিলে—"আমি।"

স্থরঞ্জন চমকে উঠে বসল খাড়া হয়ে। চেয়ে দেখে, —কই, কেউ তো কোথাও নেই! একি হলো! কোথায় গেল? সে ত ঘুমোয় নি, জেগেই ত' বসেছিল এতক্ষণ! সে ঘরে এল চুপি চুপি, সামনে এসে দাঁড়াল, কথা কইলে, আর চোখ চাইতেই সে কি উড়ে গেল ভূতের মত! স্থরঞ্জনের সারা দেহটা বরফের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে কেঁপে উঠল ঠক্ ঠক্ ক'রে। ঘরের বাতাস কার নিশ্বাসে যেন ভারী হ'য়ে উঠে থম্ থম্ ক'রেছে মনে হ'লো। স্থরঞ্জনের গা ছম্ ছম্ ক'রতে লাগল। সে স্পষ্ট অনুভব ক'রলে, দেখা না গেলেও, এ ঘরে সে একা নেই; আরো একজন যেন কে আছে? কে সে? টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে না পেয়ে স্থরঞ্জন চীৎকার ক'রে উঠলো, "কে?" গলা যেন কে তার চেপে ধ'রেছে, স্বর আর বেরুল না, সে আবার বলতে চেষ্টা ক'রলে—"কে?"

একটা স্বর ভেসে এল—"চিনতে পারছ না, আমি।"

এ গলা, এ স্বর ত' তার খুব পরিচিত! স্থরঞ্জনের গায়ের রোম খাড়া হ'য়ে উঠল—ভয়ে না আনন্দে তা ঠিক বুঝতে পারলে না, তবু সাহসে ভর ক'রে বল্‌লে—

"দেখা না দিলে চিনব কি করে, দেখা দাও, কাছে এস—"

"যে আলো—তোমার কাছে যেতে লজ্জা করে।"

"নিবিয়ে দেব আলোটা তবে—?"

"দাও।"

স্থরঞ্জন বড় আলোটার সুইচ্‌টা টিপে দিলে।

"ও আলোটা রাখলে কেন?"

"ওটাও নিবিয়ে দিতে হবে?

"কেন, আজকের দিনটী কি তোমার মনে নেই—?"

"আজকের দিনের স্মৃতি চিরকাল আমার মনে গাঁথা হ'য়ে আছে।"

"কেন?"

"এই দিনে আমার হয়েছিল বিয়ে।"

"সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আকাশে, নয় ?"

"হ্যাঁ, তুমি জান্‌লে কেমন করে ?"

"সেখানে সেদিন আমিও ছিলুম উপস্থিত।"

"কে তুমি ?"

"বল্‌ছি, আলোটা নিবিয়ে দাও আগে।"

সুরঞ্জন আর একটী কথা না ক'য়ে তখুনি আলোটা নিবিয়ে দিলে। প্রথমটা মনে হ'ল অন্ধকার হ'য়ে গেল সব, তারপরেই দেখা গেল এক ঝলক্ চাঁদের আলো খোলা জান্‌লাটার মধ্যে দিয়ে ছবিটার উপর লুটিয়ে পড়েছে। একি! এ ছবি, না জীবন্ত প্রতিমা! ঐ তো যুঁইয়ের গোছে হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে যেন! তবে কি আবার দেখা হয়! মরা-মানুষ কি এতদিন পরে আবার ফিরে আসে ? এত দিনকার সাধনা সফল হ'ল! পলা এসেছে! সুরঞ্জন্ অধীর আগ্রহে ব'ল্‌লে—

"পলা, তুমি কি সত্যিই এসেছ তা' হ'লে ?"

"এসেছি।"

"এতদিনে কি আমার ডাক তোমার কাছে গিয়ে পৌছুল ?"

"বল্‌ছি। কথার ভীড়ে গলা আমার আট্‌কে যাচ্ছে, একটু সময় দাও।"

"অমন ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না, কাছে এসে ব'স আমার কাছে।"

"তোমার কাছে যাবার আমার শক্তি নেই।"

"কেন ?"

"তোমায় আমায় মাঝে দূরত্বের ব্যবধান যে অনেকখানি বেশী।"

"তবু সব কিছুকে তুচ্ছ ক'রে ত' তুমি এসেছ আমার কাছে পলা।"

"কেন তুমি আমায় অমন ক'রে বারে বারে ডাক বল ত' ?"

"অসন্তুষ্ট হও ?"

"আমার অপরাধের বোঝা আর এমন ক'রে বাড়িয়ে তুল' না।"

"কেন, কি করলুম আমি তোমার ?"

"এমন ক'রে ফুলের প্রেমাঞ্জলি কারে তুমি দাও বল ত' রোজ রোজ ?"

"আমারি দেবীকে।"

"তোমার দেবীর এই মিথ্যা অভিনয় ক'রে, তোমার সত্যিকারের প্রেমের পূজা নিতে যে আর পারছি না আমি এমন ক'রে। ওগো, আর যে আমি সহ্য ক'র্‌তে পারছি না কিছুতেই, বুক যে আমার ফেটে যাচ্ছে।"

"অমন ক'রছ কেন তুমি পলা ? কি হ'য়েছে ?"

"ভেঙে, চুরে, ছিঁড়ে খান্ খান্ ক'রে, লাথি মেরে দূর ক'রে দিতে পাবো ?"

"কাকে পলা ?"

"ঐ ছবিটাকে।"

"কেন, ছবিটার কি দোষ হ'ল ?"

"মরা ভেবে ফুল দিচ্ছ যাকে, আজ যদি সে এসে বলে, 'আমি মরি নি, এখনও বেঁচে আছি', তাকে কি তখনও তুমি এমনি ফুল দিয়ে পূজো ক'রবে ?"

"পলা বেঁচে আছে! এখনও ?"

"নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'রবার জন্তে এখনও বেঁচে আছি।"

সুরঞ্জনের মনে হোলো তার চোখের সামনে যে দেবীমূর্ত্তি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, তার যেন রূপ বদ্‌লাতে লাগল; সেই সুন্দর দেহের অঙ্গে অঙ্গে এখন যেন ব্যাভিচার, অত্যাচার, চরম-দুর্দ্দশার অসংখ্য ছবি ফুটে উঠছে একটীর পর একটী ক'রে—কি ভীষণ, কি বীভৎস! টস্ টস্ কোরে সুরঞ্জনের কপাল দিয়ে ঠাণ্ডা ঘাম গড়িয়ে পড়ল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পলা বল্‌লে—

"আমার রূপ দেখে শিউরে উঠছো, না ? ভাবছো সে চেহারা এম্‌নি হ'ল কেমন ক'রে ? তবে শুন্‌বে আমার রূপান্তরের ইতিহাস ? সেই আমি কেমন ক'রে আজ এম্‌নি হ'য়েছি—শুন্‌বে সেই কথা ?"

"তোমার দুঃখের ইতিহাসে আমার ব্যথার বোঝাটাই কেবল বেড়ে যাবে শুধু, কোন লাভই ত' হবে না তাতে।"

"আমার বুকের বোঝাটা হাল্কা ক'রতে দাও একটু। বাধা দিও না আর আমায়। শোন আমার দুঃখের ইতিহাসটা মন দিয়ে, তারপর ঠিক ক'রো ছবিখানা রাখবে, না টান মেরে ফেলে দেবে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে।"

"এই কথা ত' বল্‌বে তুমি পলা; যে আমাকে তুমি ভালবাস্‌তে পার নি কোন দিন, অসহ্য লাগছিল আমার সঙ্গে একত্র বাস। ওদেশ হলে এ অবস্থায় বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ নিয়ে আবার নূতন সংসার পাত্‌তে পারে, সমাজে মাথা হেঁট হয় না তাদের। এখানে সে সুবিধা নেই, তাই কেউ ক'রে আত্মহত্যা, কেউ ক'রে গৃহত্যাগ। আমি জানি, এ ছাড়া আর তোমার কোন পথই ছিল না খোলা।"

"পাঁচ বছর আগে পৃথিবীটাকে মনে হ'ত হাসি-গান-নাচে ভরা যেন অফুরন্ত আমোদ-আহ্লাদের বিরামহীন একটা প্রকাণ্ড মেলা। জীবনটাকে মনে ক'রতুম, এ বুঝি নাগর-দোলায় চ'ড়ে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে কেবলই সুখের দোল খাওয়া। ভাববার ছিল না অবসর। চারিদিকে দেখতুম ঐশ্বর্য্য-বিলাসের রঙিন আলোয় রোশনাইয়ের ঘটা চলেছে পথে, আর আমার ঘরেই কেবল দুঃখের কাঁদন। অসন্তোষের কাল-বৈশাখী জমে উঠলো আমার বুকে। গয়না, সাড়ী, মোটর-গাড়ীর প্রলোভনের ঐক্যতান বাজতে লাগল আমার দুই কাণে। ভুলিয়ে দিলে আমার সব—আমার বাড়ী, আমার ঘর—ঘূর্ণি-হাওয়ার ঝড়ে সেই কালরাত্তিরে ঘর ছেড়ে প্রথম পা বাড়ালুম ভুল পথে। সবই আমার শিক্ষার ফল, আর তখন ওঁৎপেতে বসেছিল নেকড়ে বাঘের পাল আমার দেহটাকে লক্ষ্য ক'রে। আমি পড়লুম তাদের জালে ধরা। খেও-খেয়ি, কাড়া-কাড়ি চ'লল আমায় নিয়ে। কশাইয়ের দোকানের সামনে বড় বড় জিব বার ক'রে কুকুরগুলো যেমন ব'সে থাকে কখন এক টুকরো মাংস পাবে এই আশায়, তেমনি আমাকে ঘিরে ব'সে থাকত এরা নির্লজ্জের মত।"

পলা আর যেন একটি কথাও বলতে পারলে না—নিজের জীবনের চরম দুর্দ্দশার কথাগুলো মনে ক'রে। কান্নায় তার গলা যেন আপনি বন্ধ হ'য়ে গেল।

তারপরেই তার বুকের সমস্ত ব্যথা-বেদনা যেন তার চোখ দু'টীকে ফাটিয়ে ঝরে পড়লো ঝর ঝর করে। সুরঞ্জনের বুকের কোন্ একটা গোপন কোণ থেকে, তার হৃদয়টাকে যেন নিংড়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস। আগ্নেয় গিরির জ্বলন্ত উৎপাত তার বুকে, মুখে, পাথরের মূর্ত্তি স্থির নীরবতা উঠল ফুটে, কথা সেও কইতে পারলে না কোন। চোখের জল মুছে, বন্দুকের গুলি-খাওয়া বাঘিনীর মত নিষ্ফল আক্রোশে পলা যেন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো—

"শাস্তি কি শুধু আমিই পাবো, আর যারা আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ক'রলো আমার চরম সর্ব্বনাশ এমনি ক'রে, তাদের বুঝি হয় না কোন অপরাধ? আমি মেয়ে মানুষ ব'লে কলঙ্কের বোঝা সারা জীবন ব'য়ে বেড়াতে হবে আমাকে, আর যারা তুলে দিয়ে এই কলঙ্কের প্রকাণ্ড বোঝাটা আমার মাথায়, নিজেরা দাঁড়াল স'রে, তারাই হবে সাধু। এরা মেয়েদের প্রলোভন দেখায়, ঘরের বার ক'রে আনে, তারপর তাদের চরম সর্ব্বনাশ ক'রে বিচার ক'রতে বসে সাধুর-মুখোস প'রে। এরাই জগৎকে শুনিয়ে বলে, আগুনে-পোড়া-লাল-লোহার ছ্যাঁকা এই মেয়েগুলোর কপালে দিয়ে ওদের চিরকালের জন্যে দেগে দাও কলঙ্কিনী ব'লে।"

শুনতে শুনতে সুরঞ্জনের যেন কোন সাড়াই ছিল না, সে যেন ভাবতে ভাবতে কোন অতলের তলে তলিয়ে গেছে। সেখানে মনে হ'তে লাগল যেন সবই সমান—ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, অমৃত-বিষ—মিশে যেন একাকার হ'য়ে গেছে সব। সেই আলো-ছায়ার মাঝে দাঁড়িয়ে তারই কলঙ্কিনী, অপরাধিনী, কুলত্যাগিনী স্ত্রী। উচ্ছৃঙ্খল পুরুষের শেকল-ছেঁড়া ক্ষ্যাপা পশুটা পৃথিবীর যেখানে যত নারীর উপর ক'রেছে লোম-হর্ষণ, অকথ্য-অত্যাচার, সেই লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা; অত্যাচারে জর্জ্জরিতা মুমূর্ষ নারীদের সবার রক্ত-মাখা-দুর্দ্দশার মূক-বেদনা যেন আজ ফুটে উঠেছে পলার চোখে, মুখে, সকল শরীরে মূর্ত্তি ধ'রে। তাকে দেখে সুরঞ্জনের বুকের ভেতর ঘৃণা, অপমান, ভীষণ প্রতিহিংসার কালসাপ গর্জ্জে উঠল না ফণা তুলে, তার বদলে চোখে এল তার সমবেদনার এক ফোঁটা জল। পলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বলতে আরম্ভ ক'রল তার অশ্রু-মাখা জীবনের অতি সত্য তিক্ত-অভিজ্ঞতা—

"সুখের ঘোর কেটে গেল দু'দিনেই। ভুল ক'রেছি বুঝতে পারলুম। বাড়ীতে ফেরবার পথ নেই তখন, সব দোরার বন্ধ হ'য়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। যে সুখের আশায় ঘর ছেড়েছিলুম, তার দাম যে আমার গায়ের এক এক ফোঁটা রক্ত দিয়ে আমায় এমনি ক'রে শোধ করতে

হ'বে রোজ রোজ, তা জানতুম না। এমনি ক'রে নিজেকে নিজেই ক'রেছি অপমান। এ ছাড়া আর আমায় অন্য কোন উপায় রাখে নি তারা। তাদের কাছে শিখলুম, তাদেরই প্রতারণা ক'রতে। আমি দেখলুম এদের একজনও কেউ চায় না আমায়, সবাই চায় আমার এই দেহটাকে আমারও সে দেখান ভালবাসা বাড়ত ক'মত তাদের নোটের তাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কত লোক এল, গেল—কত লোক দেখলুম। কত গণ্য-মাণ্য লোক, যাদের আমি শ্রদ্ধা ক'রতুম, ভক্তি ক'রতুম, তাঁদেরও অনেককে যখন দেখলুম আমার জুতার বোতাম খুলতে সব হুমড়ি খেয়ে প'ড়েছেন, তখন আত্মপ্রসাদের চেয়ে মনে ব্যথাই বেজেছে ঢের বেশী। এরা নিজেরাও নামল, আমাকেও ঠেলে দিলে অনেকখানিক, নরকের তলায় গিয়ে ঠেকলুম শেষে। বিষে ভ'রে গেল সমস্ত শরীর, নরকের আগুনে পুড়তে লাগল আমার অন্তরাত্মা। আধ-মরা দেহটার উপর শকুনের পাল ঠোকরাতে আরম্ভ ক'রল। রক্তে রাঙা হ'য়ে উঠল আমার মুক্তির পথ। চোখের জল হোলো সুরু। আপনার লোকের মুখ দেখবার জন্যে প্রাণ উঠল কেঁদে। আমি কলঙ্কিনী, কে আসবে আমার ঘরে? কার কাছেই বা গিয়ে দাঁড়াব এ মুখ নিয়ে। অনুশোচনার আগুন জ্বলতে লাগল আমার বুকে। ওঃ! কি ক'রেছি আমি, একটা রাতের ভুলে। আমার সোনার বাড়ী, সোণার ঘর থাকতে আজ আমি পথে পথে। আমার দেবতার মত স্বামী, দেবকন্যার মত মেয়ে, সব আছে, কেবল আমিই নেই! প্রাণ কাঁদত। এমনি সময় ভগবান একদিন তোমাকে নিয়ে এলেন আমার কাছে—"

"তোমার কাছে! কোথায়? কবে পলা?"

"সেই রংয়ের দোকানে, যেদিন গেছলে তুমি, মেয়েটা ছিল তোমার সঙ্গে। তাকে দেখে প্রাণটা যেন আমার আন্‌চান্ ক'রতে লাগল, ইচ্ছে হ'ল বুকে নিই টেনে। ভরসা হ'ল না—পাছে তুমি দেখে ফেল। লুকিয়ে রইলুম আলমারীর আড়ালে। তারপর তুমি গিয়ে উঠলে মোটরে, আমিও ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলুম তোমার পেছনে। তোমার বাড়ী এলুম চিনে। তারপর রাস্তার ওপারে তোমার ঘরের সামনের ঐ তিন তালা বাড়ীটার একটা ফ্ল্যাট নিলুম ভাড়া। জানলা দিয়ে লুকিয়ে দেখতুম তোমাদের। দেখেছি, আমার ছবির সামনে ব'সে তুমি কত ফুল কত রাত্তিরে সাজিয়েছ, চোখের জলে আমার বুক গেছে ভেসে। আজ আর থাকতে পারলুম না—এসে প'ড়েছি, মাপ ক'র।"

"তুমি কি জান না পলা, আমার দরজা তোমার জন্যে সেইদিন থেকে খোলা আছে ঠিক তেমনি। আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে এখনও তোমাকে আমি ঠিক তেমনি ক'রেই চাই পেতে বুকে।"

"সে অধিকার আমি হারিয়েছি আজ। শুধু এইটুকু দয়া ক'র, আমার মেয়েটাকে দেখাও একটিবার।"

"ঐ যে বিছনায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে আমার—এদিকে এগিয়ে এস পলা।"

পলা খাটের কাছে গেল। শাদা দুধের মতন কোমল বিছানা ধবধব ক'রছে, তারই এক পাশে ছোট একটি বিছানায় বাদল ঘুমুচ্ছে অকাতরে। মেয়েটার মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে তৃষিত চোখে চেয়ে রইল পলা, যেন সে মুখখানি দেখে তার আর আশা মিটতে চাইছে না। পলার চোখ দিয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা তার শুকনো গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সুরঞ্জনের মনে হ'ল, এ মুখখানি শিশির ধোয়া-পদ্মের চেয়েও যেন সুন্দর বেশী, নারীর সমস্ত সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, পবিত্রতা যেন ফুটে উঠেছে এই মায়ের মুখখানিকে ঘিরে। সুরঞ্জনের চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ল, আনন্দে যেন তার গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে গেল, কিছুক্ষণ চেষ্টা ক'রে ব'ললে—

"ওকে কোলে নাও পলা?"

"না, ঘুম ভেঙ্গে যাবে ওর।"

"তবে একটী চুমো খাও ওকে।"

"না, না, এই ঠোঁটে আমার বিষ আছে, আমি পারব না, পারব না।"

"সরে যেও না পলা, তুমি ওর মা, কোন অকল্যাণ হবে না ওর, এস পলা।"

সুরঞ্জন দু'হাত বাড়াল পলাকে বুকে নেবার জন্যে, কিন্তু দেখল কোথায় কে, কেউ সেখানে নেই। যূঁইয়ের গন্ধে তখনও ঘরখানি আছে ভরে। সে পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল পলার ছবিটার দিকে চেয়ে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া তার উষ্ণ কপালের ওপর যেন কার একখানি ঠাণ্ডা হাতের পরশ বুলিয়ে দিলে। গাছে গাছে পাখীরা গেয়ে উঠল গান। দূরে কোন মন্দিরে প্রভাত আরতির ঘণ্টা-কাঁসর বেজে উঠল। আলো উঠল ফুটে। সুরঞ্জন তখনও সেই ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল—'একি দেখলুম! সত্যি?—না স্বপ্ন? কিন্তু তার পায়ের কাছে এখনও যে ঐ যূঁইয়ের গোড়ে রয়েছে প'ড়ে। তবে স্বপ্ন নয়, এ সব সত্যি?'

বাদল বিছানা থেকে নেমে ছুটে এসে ফুল দিয়ে সাজানো পলার প্রকাণ্ড ছবিটাকে দেখে, সত্যি অবাক হ'য়ে সুরঞ্জনের একখানি হাত ধরে ব'ললে, "বাবা, এ কে?"

চোখের জল মুছে সুরঞ্জন ব'ললে, "তোমার মা, নমো করো।"

কি আশ্চর্য্য! যে হাসি সুরঞ্জন চাইছিল এতদিন ধ'রে ছবির ঠোঁটে, সেই হাসি আজ ফুটে উঠলো ভোরের আলোয়।

লণ্ডন-তীর্থে

শ্রীমতিলাল দাশ

১লা সেপ্টেম্বর। আজ সকালে পণ্ডিত ঋষিরামের সহিত আলাপ হইল। তিনি আর্য্যমিশনের লোক। লণ্ডনে যে হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম আলোচনার জন্য তিনি আসিয়াছেন। ভদ্রলোক নিরহঙ্কার, পড়াশুনাও বেশ আছে, জ্যোতি আছে জ্বালা নাই। আজ হাঁটিতে হাঁটিতে হ্যাম্পষ্টেডের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিলাম। উন্মুক্ত তৃণভূমি, মাঝে মাঝে দু'একটি বনস্পতি সহরের মাঝে একটা মায়ার কাজল পরাইয়া দেয়। তারপর ইহাদের Social Welfare Centre দেখিতে চলিলাম। মিস্ সেডওয়েল ইহাদের সমস্ত ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখাইলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মাতৃত্ব এবং শিশুকল্যাণ আইন অনুসারে লণ্ডনের মেট্রোপলিটান বুরোগুলি এই কাজের পরিচালনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানে যে সব মেয়েরা আছেন ও যে সব ধাত্রী ও শুশ্রূষাকারিণী আছেন, তাঁহাদের সুশৃঙ্খল কাজ আমাকে প্রীত করিল।

বাসায় ফিরিয়া ঋষিরামের সঙ্গে আলাপ হইল। উনি এক খণ্ড গীতা উপহার দিলেন। গীতাখানি সযত্নে রাখিয়াছি। যখনই তাহা পড়ি, তখন ঋষিকল্প এই বন্ধুর প্রীতির স্মৃতিতে ধন্য হইয়া উঠি। পণ্ডিতের নিকট হইতে দয়ানন্দের গ্রন্থাবলী লইয়া পড়িতেছি। আর্য্যসমাজ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অধিক ছিল না, এই সব পুস্তক হইতে আর্য্যসমাজের প্রাণধারার পরিচয় পাইলাম। দয়ানন্দের যে বীর্য্য পাঞ্জাবে একদিন নবজীবনের বাণী ফোটাইয়াছিল, তাঁহার লেখার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তির সন্ধান করিতে লাগিলাম।

২রা সেপ্টেম্বর। বৃটিশ মিউজিয়ামে আজ অনেকক্ষণ পড়াশুনা করিলাম। গুন্থারের 'য়ুরোপের অন্তরে' নামক বইখানি পড়িয়া শেষ করিলাম। এই বইখানির প্রচার খুব। লেখক একজন সাংবাদিক, তাহার ভাষায় বিমোহিনী শক্তি আছে, লঘু, তরল অথচ ঐশ্বর্য্যময় ভাষা লেখককে মুগ্ধ করিয়া রাখে। তাহার উপর য়ুরোপে যাহারা শক্তিমান্ যাহাদের অঙ্গুলি হেলনে পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক লীলা ঘটিতেছে, তাহাদের চরিত্রবিশ্লেষণ আছে। তাহাদের সহিত সংলাপের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। পুস্তকটী তাই 'গরম চিংড়ে ভাজার মত' মুখরোচক হইয়া উঠিয়াছে। হরিহর দাদা লাঞ্চ খাওয়ালেন। তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ হইল। শরীরটা আজ ভাল লাগিতেছিল না। স্কটল্যাণ্ডে যাইব, তাই তাহার সন্ধান করিতে ইউষ্টন ষ্টেসনে চলিলাম। ইউষ্টন ষ্টেসন হইতে বৈদ্যুতিক গাড়ী হ্যাম্পষ্টেড ওয়েম্বলি, প্রভৃতিস্থানে গিয়াছে। তাহা ছাড়া ইহা লণ্ডন, মিড ল্যাণ্ড এবং স্কটিশ রেলওয়ের কেন্দ্রস্থান। এই স্থান হইতেই পৃথিবীর প্রথম যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচল হয়। ইউষ্টন হইতে হেলিহেড দিয়া আয়র্ল্যাণ্ডে যাওয়া যায়। গ্লাসগো ও এডিনবরা পর্য্যন্ত এই লাইন গিয়াছে। এখানে সুবিধা হইল না। ইহাদের আফিসে গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে বলিল।

বাসায় ফিরিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলাম। নূতন পথে চলিবার স্বপ্ন জাগিতেছে। চিত্তে সেই বিনতি পাইলাম, যাহা উপরের আশীর্ব্বাদ কামনা করে। দম্ভকে ত্যাগ করিয়া যাহা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমন্ত হইয়া উঠিতে চাহে। নব যাত্রার পথকে তিনিই কল্যাণময় করুন।

৩রা সেপ্টেম্বর। সকালে উঠিয়া থিয়োজফিষ্টদের ইউনিয়ন লজে গেলাম। মিস্ বেসউইল বেশ চমৎকার লোক। তাঁর সঙ্গে আলাপে খুসী হইতে হয়। সাধারণতঃ অনূঢ়া মিস্ মুখরা হন, কিন্তু আমার এই বান্ধবীর শালীনতা ও স্নেহপরায়ণতা সত্যই অপূর্ব্ব। মিসেস্ ম্যাকেঞ্জি আরিয়ান্ পথের জন্য যে প্রবন্ধ দিয়াছিলাম তাহা ফেরৎ দিলেন। তাহাতে একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম। মিসেস্ ম্যাকেঞ্জির আলাপে রসধারা নাই। তিনি একটু রুক্ষা, নারীহৃদয়ের যে স্বচ্ছ ও সহজ মমতা তাহাকে স্নিগ্ধ করে, মিসেস্ ম্যাকেঞ্জির নিকট সেই লঘুতা নাই। তাঁহার মুখে অনমনীয় পৌরুষের দৃঢ়তা।

এখান হইতে Wallace Collection দেখিতে চলিলাম। ইহা হার্টফোর্ড ভবনে অবস্থিত। হার্টফোর্ডের মার্কুইসগণের সঞ্চিত চিত্র ও শিল্পদ্রব্যাদি সার রিচার্ড ওয়ালেস বিপুলভাবে

রক্ষিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর লেডি ওয়ালেস ইহা জাতিকে দান করেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই সংগ্রহশালা উদ্বোধিত হয়। চিত্রশালায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী চিত্রকরদের মূল্যবান্ ছবি আছে। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইয়ের রাজত্ব সময়ের আসবাবপত্রের সংগ্রহও অনুপম। যে প্রোসিলেনের বাসন-পত্রাদি আছে, এক রাজপরিবারে ছাড়া তাহার তুলনা অন্য কোথাও মেলে না। নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহও দর্শককে তৃপ্ত করে।

তাহার পর সেণ্ট প্যানক্রাস ষ্টেসনে গেলাম। সেখান হইতে L. M. S. আফিসে গিয়া টিকিট প্রভৃতির কথা বলিয়া প্যানক্রাস হাঁসপাতালে গেলাম। ডাঃ কোল্ডহ্যাম চমৎকার লোক। আমাকে সঙ্গে করিয়া সমস্ত বিভাগ ঘুরিয়া দেখাইলেন। তন্ন তন্ন করিয়া সব বুঝাইয়া দিলেন এক্সরে যন্ত্রে আমার হাতের ছবি দেখিলাম। তারপর ইহাদের আশ্রয়-হাঁসপাতাল দেখিলাম। স্থবির ও বন্ধুহীন সেখানে আশ্রয় ও আহার পায়। নিরন্নের জন্য এই যে আয়োজন ইহা আমাকে চমৎকৃত করিল। ইহাদের যে আহার দেওয়া হইতেছে, তাহা অশ্রদ্ধায় দত্ত নহে। বৈকালিক চাপানের ব্যবস্থা দেখিলাম। খাওয়ার ব্যবস্থাটি চমৎকার। লণ্ডনে কেউ নিরন্ন ও নিরাহার থাকিবে না, তাহার জন্য এই সব প্রতিষ্ঠান। অবশ্য কর্ম্মক্ষমকে ভিক্ষা ওরা দেয় না। ভিক্ষা করা এবং ভিক্ষা চাওয়া ওখানে আইনতঃ অপরাধ।

রোগীদের পয়সা দিতে হয়, কিন্তু তাহার হার অবস্থানুযায়ী, কিন্তু ডাক্তার জানে না যে, কে কি রকম পয়সা দিয়াছে, সবাই সমান যত্ন পায়।

ইহাদের হাঁসপাতালের সহিত আমাদের দেশের হাঁসপাতালের তুলনা করিলে যে জিনিষটি চোখে পড়ে সেটি এই, এখানে ডাক্তার রোগীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, সত্যকার সেবা করেন। আমাদের দেশের ডাক্তার রোগীকে করুণার চক্ষে দেখেন—তাহার যত্ন লওয়া দিনগত পাপ ক্ষয় মনে করেন। হাঁসপাতালের সহিত যাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, তাহারা এই রূঢ় দাম্ভিকতা দেখিয়া কাতর হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে জনমতের মূল্য নাই বলিয়াই এইরূপ অন্যায় অত্যাচার চলে।

মেট্রন মিস্ ড্যাডে বর্ষীয়সী মহিলা—আমাকে বৈকালিক চাপান করিতে অনুরোধ করিলেন।

হাঁসপাতালের ছাদে আমরা বসিলাম। ডাক্তার বেশীক্ষণ বসিতে পারিলেন না, অল্পক্ষণ পরে বিদায় নিলেন। মিঃ মর্টন নামক একজন মিশনারি আসিলেন। ইনি ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের ডিন এবং মিস ড্যাডের আত্মীয়।

আলাপ চলিল। মিঃ মর্টন প্রশ্ন করিলেন, "য়ুরোপ কেমন লাগল ?" বলিলাম, "য়ুরোপের কর্ম্মচাঞ্চল্য আমায় ভাল লেগেছে, কিন্তু মনে হয় এই চাঞ্চল্যের বেগ না বাড়িয়ে শান্তি ও তৃপ্তির প্রসারে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।"

মিস্ ড্যাডে বলিলেন, "ভারতবর্ষের কাছ থেকে কি এ-বিষয়ে কিছু শিখতে পারি ?"

বলিলাম, "পারেন বই কি, ভারতবর্ষ প্রাচীনতম সভ্যতার অধিকারী—আর সেই সভ্যতার স্রোত আজও অব্যাহত হয়ে চলেছে। ভারতবর্ষ পেয়েছে দুঃখ, পেয়েছে অশান্তি, কিন্তু তবু এই দাবদাহ নিরর্থক যায় নি—ভারতবর্ষ সমস্ত বিপ্লবের মাঝ দিয়ে এক শিক্ষাই প্রচার করেছে।"

মিঃ মর্টন বলিলেন—"কি সে শিক্ষা ?"

"সে শিক্ষা আত্মদর্শনের, আপনারা যাকে বলেন Self-realization অথচ যাকে সম্পূর্ণভাবে অনুভব ক'রতে পারেন না।"

মিস্ ড্যাডে বলিলেন—"আপনি আর একদিন আসবেন, আপনার কাছ থেকে ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনের কথা শুনব।"

আমি আমার ঠিকানা দিলাম।

মিস্ ড্যাডে আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই খুব প্রেমিকা ?"

হাসিলাম, বলিলাম, "আপনারা যাকে প্রেম বলেন, সে প্রেম আমরা জানি না, বিবাহের পূর্ব্বে তাকে আমি দেখি নি, তিনিও আমায় দেখেন নি, তথাপি ঘর ক'রে চলেছি—"

মিস্ ড্যাডে বলিলেন, "এ নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য কথা বলছেন—"

"এর একটুও কল্পিত নয়, আমাদের গৃহ-জীবনে মাধুর্য্য নেই, রস নেই একথা বলছি নে, কিন্তু সে রসধারার উৎস অনুরূপ—সে প্রীতি পরস্পরকে চাইবার মধ্যে নয়—"

মিঃ মর্টন বলিলেন, "তবে আপনাদের মিলনের রজ্জু, কি?"

"বলা মুস্কিল, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, ব্রত এইসব প্রেরণা দেয়, কিংবা হয়ত নর ও নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ বিবাহিত দম্পতীকে সম্মিলিত রাখে—"

"আপনাদের বুঝি বিবাহবিচ্ছেদ নেই—"

বলিলাম, "না, আমাদের ঋষিরা বিবাহকে চুক্তি বলেন নি, বলেছেন সংস্কার, ওটা মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে একটা ধাপ—"

"তা হোক, কিন্তু সভ্যতার প্রগতি চুক্তির প্রসারে—আপনাদের প্রথা মধ্যযুগের, বর্ত্তমানে এটা অচল।"

মিঃ মর্টনের কথা বুঝিলাম। Status এবং Contract এই দুটি নিয়া যে সব গবেষণা হইয়াছে তাহা জানিতাম। বলিলাম, "কোন্‌টি বর্ব্বরতা, কোন্‌টি প্রগতি এত সহজে তা বলা চলে না।"

মিস্ ড্যাডে আমার আস্পর্দ্ধায় খুসি হইলেন, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

আমি বলিলাম—"সে প্রশ্নের উত্তর আপনারাই দেবেন, আপনাদের দেশে ঘরে ঘরে যে গৃহদাহের আগুন, সে আগুনের ছোঁয়াচ আপনাদের নিশ্চয়ই লেগেছে—"

উভয়ে খানিক চুপ করিলেন। মিঃ মর্টন বলিলেন, "কিন্তু যাই বলুন, আপনাদের সমাজজীবনে যে ভেদ রয়েছে সেটা সমর্থনযোগ্য নয়।"

আমি বলিলাম, "তা নয়, কিন্তু ভেদের একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে, সেটা আপনারা জানেন না?"

বলিলাম, "আপনাদের ইতিহাস ধ্বংসের ইতিহাস, বিজয়ীর জয়যাত্রার রথচক্রতলে বিজিত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ বিদেশীকে কোল দিয়ে আপন ক'রে নিয়েছে—তার সমাজব্যবস্থায় একটা স্থান দিয়েছে, এটা সর্ব্বত্র ভাল হয়েছে একথা বলিনে—কিন্তু সেই ব্যবস্থা আন্তরিক এবং শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত, একথা যদি স্মরণ না করি তবে অতীতের প্রতি আমাদের কৃতঘ্নতা জানানো হবে—"

ডিন বলিলেন, "আমরা মাঝে মাঝে বক্তৃতার আয়োজন করি, আপনি যদি একদিন—"

বলিলাম, "স্বচ্ছন্দে, যেদিন বলবেন সেদিনই যাবো, ভারতবর্ষকে আপনারা কেবল একতরফা দেখেন—দোতরফা দেখতে শেখা উচিত। ভারতীয় পণ্ডিতদের বই বড় একটা সাধারণে পড়ে না, জানে না, কাজেই এখানকার জনসাধারণ ভারতবিষয়ে একান্ত অজ্ঞ।"

মিস ড্যাডেকে ধন্যবাদ জানাইয়া সন্ধ্যার পরে গৃহে ফিরিলাম।

[ক্রমশঃ

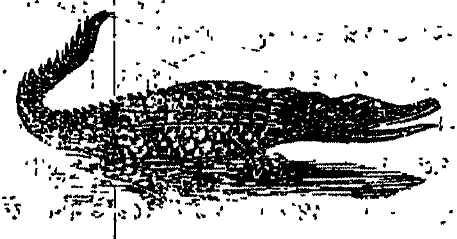

রাশিয়ার সাহিত্য

শ্রীজিতেন্দ্র নাগ চৌধুরী

রুশ-সাহিত্যের নবজন্ম হ'ল নিকোলাস গোগল এবং আলেকজেণ্ডার পুস্কিনের অভ্যুদয়ে। পুস্কিন পড়লেন পদ্য-সাহিত্য নিয়ে, গোগল্ পড়লেন গদ্য-সাহিত্য নিয়ে। রাশিয়ার সাহিত্য বলতে যা ছিল এই দুটী মনীষীর পূর্ব্বে, সে না থাকবারই মত। বিশেষণ প্রয়োগের ঠেলায় এবং বহির্দেশীয় ভাষার প্রভাবে সহজ সরল এবং মৌলিক ভাব থেকে বঞ্চিত ছিল এত বড় দেশের-সাহিত্য। লিখিত ভাষা বা সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিন, উচ্চতম সুধীসমাজেও যে ভাষা ব্যবহৃত হ'ত তার মধ্যে জার্ম্মান, ফরাসী বা ইংরেজী শব্দ বহু ঢুকে পড়েছিল এবং ব'লতে কি, ফরাসী ও জার্ম্মান কথা ব্যবহারে যেন বাহাদুরী ছিল—যেমন আমাদের নকলনবীশ দেশী সাহেবদের ইংরাজী শব্দ বাংলা কথার মধ্যে ব্যবহার করা বা ইংরাজী বকুনী চালান দেখি।

পুস্কিন ও গোগল্ এই রুশ মহামানব বন্ধুদ্বয় মিলে রাশিয়ার সাহিত্যের সংস্কারে মন দিলেন। ১৮৩০—৫০ খৃঃ অব্দের মধ্যে—জলসেচনের অভাবে বৃক্ষ যেমন শুষ্ক হয়ে যায়, ফুল ফোটে না, ফল হয় না—কুসংস্কারাচ্ছন্ন রুশ-সমাজে, সাহিত্যেও প্রাণবস্তুর অভাব হবার উপক্রম হয়েছিল। পুস্কিন আর গোগল্ তাতে প্রাণ দিলেন। গোগল্ উক্রেণের লোক—ধমনীতে কসাক্ রক্ত বিদ্যমান হ'লেও উত্তেজনাপূর্ণ কসাক জীবন ত্যাগ করে যৌবনে সাহিত্যেব সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং রুশ-সাহিত্যে কয়েকখানি মূল্যবান উপন্যাস ও লেখা দিয়ে গেছেন, যার তুলনা হয় না। সে সময় একজন কসাক্ (Cossack) উক্রেনবাসীর নিকট থেকে এমনি ধারা লেখা বের হওয়া একটা বিস্ময়ের ব্যাপার হয়েছিল।

সরলচেতাঃ অথচ রুক্ষ দুর্দ্ধর্ষ কসাক্ জাতির গল্প—কসাক্ জীবনের আন্তরিকতা অথচ আদিম অল্পবুদ্ধির পরিচয় পাই আমরা প্রথম নিকোলাস গোগলের টারাস বাল্বা (Taras Bulba) বইতে। তারপর অনেক পরে কাউন্ট টলষ্টয় The Cossacks (কসাক্‌স) লিখেছিলেন। গোগল্ যে ভাষা রুশেব সাহিত্যে খাড়া করে গিয়েছিলেন, আজও সেই ভাষাই চলে আসছে, তবে সব ভাষার মতই আধুনিক ধারায় কথিত শব্দের প্রচলন। গোগলের সবচেয়ে নামকরা বই ডেড্ সোল্‌স্ (Dead Souls)—ডন্ কুইক্‌সোট বা পিক-উইক্ পেপার শ্রেণীর একখানি বিখ্যাত উপন্যাস—যা রাশিয়ার সুধীমহলে তিনচার পুরুষ ধরে সমাদরে পঠিত হচ্ছে। এটী লেখা ১৮৪২ সালে, একশত বৎসর পূর্ব্বে।

পুস্কিন জন্মেছিলেন ১৭৯৯ সালে গোগলের ১০ বৎসর পূর্ব্বে এবং বেঁচে ছিলেন মাত্র ৩৮ বৎসর, অথচ তারই মধ্যে রুশ-সাহিত্যে যথেষ্ট দান করে গিয়েছিলেন। ২১ বৎসর বয়সেই তিনি Ode to Liberty বলে স্বাদেশিকতা পরিচায়ক স্বাধীনতার গান লিখে অত্যাচারী জারশাসিত রুশ-সমাজে প্রেরণা দেন অধীনতাবন্ধন ঘুচাবার আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু শাসকসম্প্রদায় তাঁকে রাশিয়ার দক্ষিণে নির্ব্বাসন-পরোয়ানায় মস্কো, সেণ্টপিটার্সবার্গ (লেনিনগ্রাড) থেকে বহিষ্কৃত করে দেন। এর ফলে কবি পুস্কিন হয়ে উঠেছিলেন ঘোর স্বদেশী এবং স্বাধীনতাকামী। তিনি লুকিয়ে বিপ্লবীদলের সঙ্গে মিশতে লাগলেন। কিন্তু কবির প্রতিভারও সঙ্গে সঙ্গে উন্মেষ হল দক্ষিণ রাশিয়ার ককেসাস্ পর্ব্বতমালার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য-সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনে। এইখানেই তিনি লর্ড বাইরণের কবিতার প্রতি অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং বায়রণের ধারানুবর্ত্তী The Captive of Caucasus 'ককেসাসের বন্দী' বলে একটী বড় কবিতা লেখেন ১৮২২ সালে। এই কবিতায় সারকাশীয় একটী বালিকার কোন এক রুশকর্ম্মচারীর প্রতি প্রেমকে ভিত্তি করে কবি সুন্দর ভাবে উচ্ছ্বাসপূর্ণ একটী গল্প লিখে গেছেন। আমি কবিতার ভক্ত নই, এই বই পড়বার সৌভাগ্যও হয় নাই, তবে পুস্কিনের জীবনীতে এরূপ প্রকাশ আছে, তাই লিপিবদ্ধ করলাম।

বিপ্লবীদলে 'ধরল' ভাঙ্গন—পুস্কিন পড়লেন ধরা, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মস্কোয় আনীত হয়ে কালে জারের শত্রু থেকে মিত্র হন এবং পুনরায় একজন মন্ত্রী হন। এই সময় তিনি গদ্য-সাহিত্যেও নাম করেন কয়েকটি লেখায়। তাঁর সবচেয়ে ভাল লেখা (গদ্য) উপন্যাস ক্যাপ্টেনের মেয়ে (The Captain's Daughter)। এই বইখানি রুশ-সাহিত্যের একটী

অমূল্য সম্পদ, পরবর্ত্তী লেখকদের কাছে এটা আমাদের 'গোরা'র মত। ১৮৩১ সাল থেকে পুস্কিন গদ্যে গল্প লিখে রুশ-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেন। গোগলের মত পুস্কিনের লেখাও রাশিয়ার নব-সাহিত্যের প্রথম পর্য্যায়ের উত্তম পুস্তক। পুস্কিনের নাম কিন্তু ছোট ছোট লিরিক্ কবিতায়; রুশ-সাহিত্যে এমন মধুর এবং সুন্দর লেখা তাঁর পূর্ব্বে ছিল না। তাঁর বড় বড় কবিতা বা কাব্যগ্রন্থগুলি নাটকীয়, যেমন আমাদের নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলি বা জার্ম্মানীর ফাউষ্ট (Faust)।

মাইকেল লারমণ্টভ্

যৌবনের শেষ বয়সে তিনি গদ্যে ভাল ভাল উপন্যাস লিখে আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় স্বদেশের সাহিত্যের সংস্কার এবং উন্নতি সাধন করতে থাকেন, কিন্তু প্রেমিক কবির আয়ু ফুরিয়ে এসেছিল, বেশীদূর এগোতে পারেন নি। ১৮৩৭ সাল ডুয়েল লড়তে গিয়ে প্রাণ হারান।

পুস্কিনের পরেই রুশ-সাহিত্যক্ষেত্রে আর একজন খুব বড় কবির আবির্ভাব ঘটে, তিনি মাইকেল লারমণ্টভ্ (Micheal Lermontov)। ১৮১৪ সালে জন্ম মস্কো সহরেই, বেশ বড় ঘরে, যাঁদের রক্তে স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডী কবিত্ব বর্ত্তমান ছিল। লারমণ্টভও স্বল্লায়ু ছিলেন। তাঁর কবি-প্রতিভা তাঁর জীবিতাবস্থায় রুশজাতি উপলব্ধি করিতে পারে নি। পড়াশুনা করে ১৮ বৎসর বয়সে সেনা-শিক্ষা লাভ করতে ঢুকে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই একজন কর্ম্মচারী হয়ে উঠলেন। যুবক লারমণ্টভ পুস্কিনের মৃত্যুতে তাঁর নিজের দুঃখ এবং সারা রুশজাতির বিক্ষোভ, রোষ বা অনুশোচনা প্রকাশ করতে গিয়ে জারকে উদ্দেশ্য করে 'কবি পুস্কিনের মৃত্যুর বিষয়' বলে একটি দারুণ কবিতা লেখেন। এই কবিতাটিতে কবির মনীষার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও সরকারী পক্ষ থেকে তাঁকে তৎক্ষণাৎ বন্দী করে কোর্টমার্শাল করে ককেসাস্ অঞ্চলে নির্ব্বাসিত করা হয়। ককেসাসের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং মানবজীবনের (সাধারণ বা দুঃস্থ) এক একটি ছবি দেখে গোটাকয়েক কবিতা যা কবি লারমণ্টভ লিখেছিলেন, তার মত সুন্দর কবিতা রুশ-সাহিত্যে বোধ করি আজও হয় নি। লারমণ্টভ মরে যাবার কত পরে সেই সব কবিতা লোকে সমাদর করে পড়ছে। কবি মাত্র একখানি কবিতার বই মারা যাবার এক বৎসর পূর্ব্বে ছাপিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। কত বই ছাপাতে পারতেন, কত মিষ্ট কবিতা লিখতে পারতেন বেঁচে থাকলে। আমাদের কবি সত্যেন দত্তর কথা মনে হয়। লারমণ্টভের কবিতা, এই সেদিন বল্লেও হয়, ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মানী, ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হলে কবির যে কত বড় রোম্যাণ্টিক প্রতিভা ছিল তা উপলব্ধি করা যায়।

গোগলের (ঔপন্যাসিক নিকোলাস গোগল্) পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে দু'টি তরুণ সাহিত্যিক টুর্গেনেভ এবং ডষ্টয়েভ্স্কি রাশিয়ার সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করেছিলেন। টুর্গেনিভ অবশ্য মাঝে লোকের সমালোচনার ঠেলায় পড়েছিলেন। কিন্তু আজ সোভিয়েট রাশিয়ায় ছোট গল্পের এত সুনামের পশ্চাতে সেই টুর্গেনিভের ছোট গল্পেরই প্রভাব বিশেষ বিদ্যমান। শুধু রাশিয়া কেন, য়ুরোপের বহু জায়গাতেই অমন সুন্দর ছোট গল্প ঐসময় খুব কমই লেখা হত। ব্যাক্ ওয়াটারের মত গল্প অতি অল্পই দেখা যায়।

আলেকজেণ্ডার পুস্কিন

আইভ্যান টুর্গেনিভ ওরেলে জন্ম গ্রহণ করেন (১৮১৮) এবং মস্কো ও সেন্টপিটার্সবার্গেই উচ্চশিক্ষা পান। তারপর চলে যান জার্ম্মানীতে। সেখানেই শিক্ষানবীশি সাহিত্যিক রুশ-যুবক-দলে এসে রুশ-সাহিত্যের কাল্‌চার করেন।

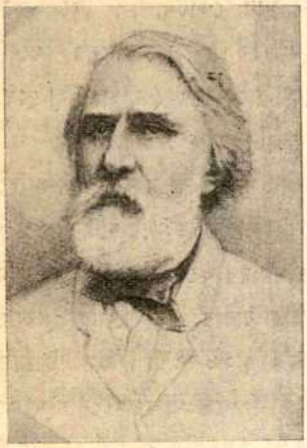

টুর্গেনিভ

মজ্জায় ছিল সাহিত্যপ্রীতি, তাই টুর্গেনিভ ভাল সিভিল সার্ভিস (সরকারী চাকরী) পরিত্যাগ করে শেষে রুশভাষা ও রুশ-সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন বার্লিন থেকে ফিরে এসে। প্রথম বই দুইখানি অতি সুন্দর হয়েছিল কিন্তু দেশের লোকের কারও তখন ভাল লাগেনি, তিনি তীব্র সমালোচনার জ্বালায় দেশ ত্যাগ করে চলে যান। দেশে বসে লিখেছিলেন Rudin—রুডিন এবং Fathers and Sons—পিতা-পুত্র। দেশের বাহিরে এসে লিখলেন Smoke ধূম্র এবং ভার্জ্জিন সয়েল। ভার্জ্জিন সয়েল্—Virgin Soil লেখা হয় ১৮৭৭ সালে। স্বদেশবাসীর মুখ বন্ধ হল এবং এই উচ্চ ধরণের লেখায় সকলেই তাঁকে আবার ভালবাসতে লাগল, সমসাময়িক লেখকমণ্ডলী যারা হিংসায় সদলে তাঁর বিরুদ্ধে লেগেছিল, তারাও টুর্গেনিভের প্রতিভার কাছে ম্লান হয়ে গেল। প্রবীণ বয়সে তিনি দেশে ফিরে এলেন এবং এলেন যেন বিজয়ী বীর, কারণ, তাঁর অমর লেখায় স্বদেশবাসীর চিত্ত জয় করেছিলেন তিনি।

টুর্গেনিভের লেখা রুশ-সাহিত্যে বা লেখ্য-সাহিত্যে বাস্তবতা এবং তার সঙ্গে মিষ্ট মধুর কবিত্বের অল্প মিশ্রণ এসেছিল। আর সেই সময়কার লেখকের টেষ্ট অনুযায়ী ভাষাকে প্রাঞ্জল অথচ স্বাভাবিক মিষ্টতাপূর্ণ হতে আইভ্যান টুর্গেনিভের গল্প বা উপন্যাস যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। তার ছোট ছোট গল্প লেখার মধ্যে বা ভার্জ্জিন্ সয়েল্ বা পিতা-পুত্র প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম রুশ-সাহিত্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আমরা পাই, যেমন শরৎচন্দ্রের লেখায় পাই।

থিয়োডোর ডষ্টয়েভস্কি একটু সিরিয়াস ঔপন্যাসিক, কারণ, তিনি প্রথমে বছর তিনেক ছিলেন সেনাবিভাগের কর্ম্মচারী, Military Officer, কিন্তু গল্প লেখার মনীষা চাপা থাক্‌বে কেন—ছেড়েছুড়ে দিয়ে নভেল লিখতে লেগে গেলেন। ১৮৪৫ সালে তিনি প্রথম Poor Folk, দরিদ্রলোক, প্রকাশ করেন। তারপরে প্রকাশিত হয় দি ডাবল Double. দেশের সুধীসমাজ পছন্দ করলেন না, তাঁরা দ্বিতীয় উপন্যাসটির তীব্র সমালোচনা করতে লাগলেন। ডষ্টয়েভস্কিও ক্ষেপে উঠলেন। টুর্গেনিভের সাহিত্য সহজ ও সরল, লোকে তাই পছন্দ করছিল, তাঁরা (টুর্গেনিভও দলে ছিলেন) ওঁর লেখার কদর না করাতে ডষ্টয়েভস্কি এঁদের সঙ্গে ঝগড়া করতে লেগে গেলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর ৩।৪ বৎসর জেল হয়ে গেল। অনেকদিন পরে লেনিনগ্রাডে ফিরে 'দি হাউস অব ডেথ' (মৃতের বাড়ী) লিখে প্রকাশ করলেন। তাতে তাঁর বন্দী জীবনের রুশ-জেলের জীবন যাপনের গল্প এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করলেন যে, সকলেই চমৎকৃত হল এবং তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেতে আরম্ভ করল।

ডষ্টয়েভস্কির অতি প্রসিদ্ধ বই 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট' Crime & Punishment বাহির হয় ১৮৬৬ সালে। রাশিয়ায় জাতীয় জীবনের তখনকার দিনের দুঃখ-কষ্ট ও সামাজিক অনুশাসন এমন গভীর ভাবে বই-এর পাতায় এঁকে, আগে কেউ দেখান নি, পরে অবশ্য আলেকজাণ্ডার কুপ্রিন ভালভাবেই দেখিয়েছেন। পরের পর্য্যায় বিশদ্‌ভাবে তাঁর সম্বন্ধে বলব। ডষ্টয়েভস্কি, মানুষের স্বাধীনতা যে সব চেয়ে বড়, যুগধর্ম্ম মেনে চলা এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা (ঈশ্বরে ভক্তি মানবজীবনের ধর্ম্ম) এই সব মত প্রচার তাঁর লেখায় এবং কার্য্যে দেখিয়ে গেছেন। রুশ-সাহিত্য আজ শুধু তাঁর কয়েকখানি অমর পুস্তকাবলীতে অলঙ্কৃত নহে—এক সময়ে প্রবীণ বয়সে ১৮৭০ নাগাদ তিনি একখানি পত্রিকা চালাতেন, তিনি তাতে রাশিয়ার সাহিত্য ও সমাজের উন্নতির জন্য

যথেষ্ট চেষ্টা করে যান। রুশ সাহিত্যে তাঁর প্রভাব কতটা ছিল, সে সম্বন্ধে একজন ইংরাজ বলে গেছেন—His influence on Russian Literature was greatest between 1895—1915."

আর একখানি ভাল বই The Brother Karamazov (১৮৮০) ব্রাদার কারমাজোভ লিখে ১৮৮১ সালে ডষ্টয়েভস্কি মারা যান। কিন্তু তাঁর অপূর্ব্ব লেখনীপ্রসূত ভাষার জন্যে তাঁর অবর্ত্তমানে রুশ-সাহিত্যে একটা গভীরতা অথচ বাস্তব ধারা প্রবেশ করে। ১৮৯৫ সাল থেকে ডষ্টয়েভস্কির ভাষা রুশ-সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে, যেহেতু তখনই তাঁর মনীষা রুশবাসী ঠিক উপলব্ধি করতে পারে। জীবিত অবস্থায় কেবল একটা section (লোকসমাজের অংশ) তাঁকে ভালবাসত। আর অর্থের অনটনে তাঁর সুনাম ও প্রচার ভাগ্যে ঘটে নি—ফাঁকীদার পাবলিশারদের হাতে পড়ে পয়সার কষ্টই পেতে হয়েছিল। রাশিয়ার বাহিরে ১৯০৫ সাল থেকে (অনুবাদ হবার পর থেকে) ডষ্টয়েভস্কির লেখার ভয়ানক কদর হতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশ-সাহিত্যে আর একটী রত্ন ছিলেন Ostrovsky, অষ্ট্রভস্কি, যিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে রাশিয়ার নাট্যমহলে অভিনয় ও রঙ্গমহলে তাঁর সুন্দর সুন্দর নাটকের জন্য পূজিত হয়েছিলেন। রুশ নাট্য-সাহিত্যে তাঁর দাম কম নয়। এক সময়ে অর্থাৎ তাঁর পূর্ব্বে গোগল প্রভৃতির নাটক খুব প্লে হ'ত। কিন্তু অষ্ট্রভস্কি ছিলেন সত্যকার নাট্য-সাহিত্যের স্রষ্টা, তাঁরই প্রভাব শেকভের নাটকে আমরা পরবর্ত্তী যুগে দেখতে পাই। জন্মেছিলেন ১৮২৩ সালে মস্কোর এক সহরতলীতে—কোন সওদাগরী বাবুর ঘরে, আইন পড়তে পড়তে অষ্ট্রভস্কির থিয়েটার-প্রীতি এবং উত্তরকালে নাট্য-সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ, তাঁকে করে তুলল একজন যশস্বী নাটকলেখক এবং কবি।

এণ্টন শেখভ

ম্যাক্সিম গর্কী

একটী উকিলের অফিসে চাকুরী করতে করতে ২৫ বৎসর বয়সে "ফ্যামিলি হ্যাপিনেস" বলে ব্যবসায়ীদের পারিবারিক জীবন নিয়ে একটী ভারী সুন্দর নাটক লিখেছিলেন। কয়েকটী লেখা বেরোবার পর ১৮৪৭ সালে সাহিত্য-সমালোচকরা বললেন, "হ্যাঁ, রুশ-সাহিত্যে একটী নূতন তারকার আবির্ভাব হচ্ছে দেখছি"—The birth of a new star in Russian literature'—Shevirer. Poor Bride (গরীব কনে) Keep within your Circle (নিজেদের দলের মধ্যেই থেকো), Dark Days (দুর্দ্দিন) ও The storm (ঝড়) এই কয়েকখানি বই রুশ-সাহিত্যের সম্পদ। কি সুন্দর এই লেখা নাটকগুলি আর কত সহস্র রাত্রি মস্কো, পিটারস বার্গপ্রভৃতির নাট্যশালায় অভিনয় হয়ে গেছে মানুষের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন রূপকে চিত্রাঙ্কিত করে। মস্কো থিয়েটারে Warriors (যোদ্ধা) ও মেরী ষ্টুয়ার্ট অতি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয় কিন্তু তার অল্পদিন পরে ১৮৮৬ সালে Ostrovsky মারা যান। তাঁর Storm (ঝড়) আর The Forest (অরণ্য) এই দুটী হ'ল সব চেয়ে সুন্দর লেখা—১৮৫৯ ও ১৮৭১ সালে লিখিত। উপরোক্ত বইগুলি লিখে এবং রাশিয়ায় অভিনীত হয়ে রুশ নাট্য-সাহিত্যের এবং রুশ আধুনিক নাটকের ভিত্তি গঠন করে গেছলেন অষ্ট্রভস্কি।

(২)

পুস্কিন, গোগল হতে আরম্ভ করে অষ্ট্রভস্কি পর্য্যন্ত, বলতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, রাশিয়ার সাহিত্যাকাশে প্রতিভাবান লেখকতারকার দীপ্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এঁদের পর রুশ-সাহিত্যে আর একটী ধারার অনুবর্ত্তন ক'রলেন মনীষী টল্‌ষ্টয়। রাশিয়ার সাহিত্যে ঠিক গোগলের মতই টল্‌ষ্টয় বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছিলেন। তার শ্রীবৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশে ঋষি টলষ্টয়ের দান রুশ-ভাষা, সাহিত্য, কলা, সমাজ ও কৃষ্টি প্রভৃতির ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায়। ধনী ঘরের সন্তান কাউণ্ট টলষ্টয় রাশিয়ার সাধারণ লোকের, সমাজের এবং সাধারণ মনস্তত্ত্ব এবং আকাঙ্ক্ষার সজীব ছবি যা এঁকে গেছেন, তা তাঁর পূর্ব্বে এত বাস্তবভাবে কেউ আঁকতে পারেনি। পঙ্গু, সংরক্ষণশীল রুশসমাজ ও জার শাসনতন্ত্রের কত যে গলদ, তার ইতিকথা নূতন এক মার্জ্জিত ভাষার ভিতর দিয়ে টলষ্টয় আমাদের কাছে ধরেছেন। গরীব চাষাভূষাদের অবস্থা নিরক্ষরতা, মূর্খতা, তাদের সারল্যের সুবিধা নিয়ে জারের exploitation (শোষণ), তারই গল্প লিখে এবং তা দূর হ'বার উপায় নির্দ্ধারণ করে তিনি আজ সকল দেশে পূজ্য।

আধুনিক রুশ-সাহিত্যের গুরু বলতে গেলে টলষ্টয়। শেকভ্‌, আন্দ্রেয়েভ, গর্কি, কুপরিন, বিউনিন, (Bunin) সোলোগাব (Sologub), শোলোকোভ্‌ (Sholokhov) প্রভৃতি লেখকরা টলষ্টয়ের ধারাই অনুসরণ করে চলেছেন। টলষ্টয় জন্মেছিলেন ১৮২৮ সালে উচ্চ ও বিত্তশালী বংশে। কিছুদিনের জন্য প্রথম যৌবনে সেনাবিভাগের অফিসার ছিলেন, কিন্তু জারের আমলে প্রজাদের পীড়ন, দুঃখ, কষ্ট এবং তাদের উপর অত্যাচার, অনাচার দেখে এই মহামানবের অন্তঃকরণ সহানুভূতিতে কেঁদে উঠেছিল। তারই বিরুদ্ধে ব'লবার জন্য টলষ্টয় কলম ধরেছিলেন এবং মাত্র ২৪ বৎসর বয়সেই (১৮৫৪ সালে) চাইল্ড হুড্‌ (Childhood, শিক্ষাকাল) প্রকাশ করেন এবং ক্রিমিয়াতে ক্যাম্প-এ বসে লেখেন সেভাষ্টপোল (Sevastopol Fails)। এই বই লিখে রুশ সাহিত্যে টলষ্টয় যশ অর্জ্জন ক'রলেন। ১৮৬৩৬-৪ সালে তাঁর নামকরা বই 'যুদ্ধ এবং শান্তি' War and Peace ও 'অ্যানা ক্যারেনিনা' Anna Karenina প্রকাশিত হয়। কসাক্‌স্, রিশারেক্‌সান প্রভৃতি ভাল বই রাশিয়ার সাহিত্যকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে।

টলষ্টয় শুধু লেখক বা ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তিনি একজন দেশহিতৈষী সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিতুল্য লোক ছিলেন। প্রগতিশীল মতবাদের সব সময়েই তিনি থাকতেন পুরোভাগে। আমাদের দেশে এক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয়। কাউণ্ট টলষ্টয় যদিও ভূস্বামী ছিলেন কিন্তু প্রজাদের দুঃখকষ্ট কখনও দিতেন না, বরঞ্চ তাদের জীবনকে লেখনীর সাহায্যে সমাজ ও শাসনকর্ত্তাদের সামনে ধরে রাশিয়ার কৃষকদের উন্নতিবিধানের জন্য বহু কথা বলেছেন। শেষ বয়সে এত ধার্ম্মিক হয়ে যান যে, তাঁকে ঋষি টলষ্টয় বলা হয়। টলষ্টয়ের সম্বন্ধে অল্প বলা কখনই সমীচীন হয় না, কারণ, তিনি একজন মহাপুরুষ এবং সাহিত্য-সম্রাট কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশদভাবে বলার চেয়ে ভবিষ্যতে পৃথক প্রবন্ধে বলাই সমীচীন মনে করি।

অ্যাষ্টনশেকভ, ম্যাক্সিম্ গর্কি, আলেকজাণ্ডার কুপ্রিন, আইভান বুনিন প্রভৃতি আধুনিক রুশ সাহিত্যের স্রষ্টারা গোগল ও টলষ্টয়ের প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন নি। টলষ্টয়ের আদর্শবাদ (idealism) এবং গোগলের বাস্তববাদ (realism) এ দুই-ই এঁরা অল্পবিস্তর গ্রহণ করেছেন। শেকভ মূলতঃ নাট্যসাহিত্যের পূজারী, তাঁর বহু সাধারণ লেখাও আছে। শেকভের একাঙ্ক নাটক জগদ্বিখ্যাত, অথচ তাঁর নাটক যে, ষ্টেজে প্লে হবে এবং সফলকাম হবে, জমবে, সে ভাবের নয়, অথচ রুশ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার মত লেখা। পরে অবশ্য তাঁর নাটকের নূতন টেকনিক্, লোকের ভাল লাগতে লাগল এবং শেকভের বই প্লে হওয়া চলতে লাগল। তাঁর পূর্ব্বে টুর্গেনিভের, অষ্ট্রভস্কির, গেটের বা সেক্সপিয়ারের বই খুব অভিনীত হত কিন্তু নূতনত্বের জন্য এবং শেকভের (satire) হাস্য-রসের জন্য নাটক খুব চলতে লাগল। অ্যাণ্টন শেকভ্‌ জন্মগ্রহণ করেন সম্ভবতঃ ১৮৬০ খৃঃঅব্দে। টলষ্টয়ের লেখার পর থেকে ১৮৯০ পর্য্যন্ত রাশিয়ার সাহিত্যে যেন ভাটা পড়েছিল। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশবৎসর ও এই শতাব্দীর গোড়া থেকে রাশিয়ার সাহিত্য বিশেষ উন্নত এবং বড় বড় নাটকের ও ঔপন্যাসিকের লেখায় শোভিত হয়।

নাটকের দিক দিয়ে শেকভ্ কি ভাষায়, কি চরিত্রাঙ্কনে, নূতনত্বের সঞ্চার করলেন—গল্প লিখেও রুশ-সাহিত্যের সম্পদ বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর গল্প বা নাটকে কতকগুলি আদর্শ স্ত্রীচরিত্র আমাদের বড্ড ভাল লাগে। শেকভের মৃত্যু হয় ১৯০৪ সালে। তাব পাঁচ বৎসর পরে The little Demon 'দি লিট্‌ল ডেমন্' বলে একটী উপন্যাস বেরোয়—তার লেখক থিয়োডোর সোলোগাব। ডস্টোভস্কির পর এরকম বই বহুদিন রুশ-সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নি। উপন্যাস হিসাবে এটি রাশিয়ার কথাসাহিত্যে একখানি শ্রেষ্ঠ বই। বহুদিন ধরে জারের শাসনে পীড়িত রাশিয়ার সমাজে এবং রাজনীতি-বিদ্রোহে মার্কস্‌বাদ দেখা দিল—সাহিত্যেও এই নূতন প্রেরণার কথা লিপিবদ্ধ হল। এই নূতন লেখকদলের অগ্রণী ছিলেন ম্যাক্সিম্ গর্কি (জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক)। তাঁব এপাশে কুপ্রিন ওপাশে ব্যুনিন সামনে ভক্ত আঁদ্রোয়েভ্। ব্যুনিন শেকভের মত পেসিমিষ্ট ছিলেন। তাঁর নামকরা সুন্দর বই The Village 'পল্লীগ্রাম' এবং সুখোডাল (১৯২২) রাশিয়ার জাতীয় জীবনেব আত্মশক্তির ক্ষয় ও কৃষ্টির অভাব কিরকম সাধারণ লোকের চাষাভূষা ও বুর্জোয়াদের নষ্ট কবেছে তারই দুঃখময় চিত্র তিনি এঁকেছেন। ব্যুনিন (Ivan Burin, 1870) যে সব বই লিখেছেন তার মধ্যে ইংরাজিতে অনূদিত Well of Days, Grammar of Love আমাদের খুবই ভাল লাগে সহজ সরল মার্জ্জিত ভাষার জন্য।

আইভ্যান ব্যুনিনের নাম বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেল ১৯৩৩ সালে, যে বৎসর তিনি নোবেল প্রাইজ পান। রাশিয়ার কথাসাহিত্যে ব্যুনিনের নাম টুর্গেনিভের পরেই। কবি আইভ্যান-এর উপন্যাসগুলি তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর অনেকগুলি ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং আমরাও ১৯৩৩-৩৪ থেকেই ওঁর Village, Well of Days, Grammar of Love প্রভৃতি পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদগুলির সহিত পরিচিত হই। ব্যুনিনের ছোটগল্পগুলিও এত সুন্দর এবং মনস্তত্ত্বপূর্ণ যে, আধুনিকতায় প্রায় ইটালীর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত গ্র্যাৎসিয়া দেলেদ্দা বা লুইগি পিরাণ্ডেলোর (Pirandello) মত।

আইভ্যান অ্যালোক্সিভিচ ব্যুনিন মনে-প্রাণে কবি, যদিও আমরা তাঁর উপন্যাসগুলিতেই পরিচিত। তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পল্লীসৌন্দর্য্যের আবেষ্টনে মানুষ হয়ে ভাল ভাল কবিতা লিখেছিলেন, সেগুলি রাশিয়ার সাহিত্যে আজ মূল্যবান্ সম্পদ। সারা রাশিয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কাব সাহিত্যক্ষেত্রে পুস্কিন-প্রাইজ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ফরাসী দেশেব Madam Borary, লেখক Gustav Flauhest এর মত ব্যুনিন রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

গর্কীর সম্বন্ধে বিশ্বকোষ ঠিকই বলেছে, 'In literature the meteoric appearance of Maxim Gorki (1868-1936) was the greatest event'—রুশ সাহিত্যে গর্কীর আবির্ভাব একটা মস্ত ঘটনা। ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। [illegible] বৎসর এই মহামনীষী রাশিয়ার জাতীয় জীবনে বিরাজ করেছিলেন। নূতন মতবাদ বল্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে যোগ দিয়ে সোভিয়েট সাহিত্যের বহু উন্নতি তিনি সাধন করেন। তাঁর 'মাদার' 'মা' পড়েনি এমন লোক কম। পুরাতন দিনে ও গত মহাযুদ্ধের সময় গর্কী কত গল্প লিখেছেন, আবার সোভিয়েট যুগেও কত ভাল লেখা লিখলেন। 'The transition between the pre and past-revolutionary periods is represented by Maxim Gorky'. তাঁর Outcasts জাতিচ্যুত Tales of two Countries (দুই দেশের গল্প) চেল্‌কাস্ প্রভৃতি বিদ্রোহের আগে লেখা।

গর্কীর জীবন বড় রোম্যাণ্টিক—সাধারণ গরীব গৃহস্থের ছেলে; (Cobbler) মুচীর ঘরে কাজ শিখত, তারপর একজন নক্সা-আঁকিয়ের কাছে কাজ শিখত, পরে এল এক পাঁউরুটীর দোকানে কাজ করতে। কিন্তু প্রতিভা চাপা থাক্‌বে কেন! ১৮৮৬ সালে দেখা গেল গর্কী একটী ভ্রাম্যমান অপেরা-পার্টিতে কোরাস গায়ক হয়ে পয়সা রোজগার করছেন। শোষক জারের আমলে বেকার গর্কী বিফলমনোরথ হয়ে আত্মহত্যা করতে গেলেন, কোন কারণে করা হল না। দিন কতক কেরাণীগিরি জুটল। ভাগ্যজোরে তারপর একেবারে রেলওয়ে ওয়ার্কশপে (কারখানায়) চাকরী পেলেন। এই সময়ে (১৮৯২ সালে) তাঁর প্রথম গল্প বেরোয়। কিন্তু ১৯০৫ সালে রাজনৈতিক গণ্ডগোলে জেলে যেতে হয় গর্কীকে। বলশেভিষ্ট দলীভূত হয়ে কমবেড় গর্কীর লেখা ও সুনাম জগতে

ছড়িয়ে পড়ে। অত্যাচার-জর্জ্জরিত স্বাধীনতা ও সুস্থ জীবনকামী রাশিয়ার অধিবাসীর মনের কথা এবং তাদের বিদ্রোহাচরণ ও মুক্তিপ্রচেষ্টার ছবি এঁকে গর্কী চিরস্মরণীয় হয়েছেন। আজ দেশের নাম হয়েছে তাঁর নামে। সোভিয়েট-সাহিত্য বলে তিনি এক পুস্তক লিখেছেন।

গর্কীর মত রাশিয়ার সমাজের নিম্নতম পর্য্যায়ের লোকদের (underworld) জীবন ধারণ বা যাপনের চিত্র এঁকে কুপ্রিন এক বিস্ময়কর ব্যাপার করেছিলেন। তাঁর মত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ভাষার মধ্য দিয়ে মেথর, মুদ্দফরাস, জুয়াচোর, মাতাল, বেশ্যা প্রভৃতির জীবন লেখনীতে ব্যক্ত করে অত উঁচুদরের বড় উপন্যাস পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকেরা খুব কমই লিখেছেন।

"Yamathe Pit" তাঁর অন্যতম নামকরা বই, রাশিয়ার (তৎকালীন) বারাঙ্গণাদের জীবন, তাদের মন্দ ও ভাল দিক, তাদের সুখ, দুঃখ, তারা সমাজকে কি ভাবে নষ্ট করে অথচ কিরূপ অসহায় ও দুর্ব্বল—এই সব দেখিয়ে লিখেছেন এই বই। কুপরিন এই বই-এর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "They do write···but it is all either a lie or theatrical effects for children of tender years,···they write about detectives lawyers···sensual ladies, baitones ete etc···But these people are rublish, their life is not life. 'অন্য সব লেখকরা, উপন্যাসিকরা সাধারণ লোকের বা উকিল, ডাক্তার, ব্যবসাদার, গোয়েন্দা, বিলাসীমেয়েদের বিষয় গল্প লেখেন—কিন্তু এদের জীবনে কি আছে? বলবার কি ঘাত-প্রতিঘাত আছে?—এই সব বারাঙ্গণা বা উপেক্ষিত শ্রেণীর লোকের জীবনে কত কি ঘটনা ঘটে, তাদের জীবনের খবর কে রাখে বা কে লেখে। এইরূপ মনোভাব পোষণ করে, কুপ্রিন প্রথম 'ডুয়েল' বলে একটী বই লিখে রাশিয়ায় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করেন এবং খ্যাতিও অর্জ্জন করেন প্রথম। 'ডুয়েল' ও 'ইয়ামার' মত বই প্রকাশ একটা বিস্ময়কর ঘটনা রুশ-সাহিত্য ও সমাজে। ডুয়েলে তিনি সৈনিক জীবনের দুর্নীতির পরিচয় দিয়ে তাদের জীবনকে এমনভাবে চিত্রাঙ্কিত করেছেন। এইরূপ তাঁর Swamp ও Ditoh বই দু'টী উপেক্ষিত সমাজের অধস্তন ধাপে অধিষ্ঠিত লোকদের নিয়ে বা এমন এমন বিষয়বস্তু যা উপন্যাসিকরা কখনও গ্রহণ করেন না, কুপ্রিন সেই সমস্ত নিয়েই নভেল লিখতেন। আর ভাষা যতদূর আধুনিক হতে হয়, সহজ, সরল, প্রাঞ্জল এবং মধুর। কুপ্রিনের বই ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ পর্য্যন্ত রাশিয়ার পাঠকসমাজকে খুব মুগ্ধ করে। গত মহাযুদ্ধে রাশিয়ার সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরঞ্চ কুপ্রিন, গর্কী, বুনিন, গর্কী এবং অলিম্পিজ ও আঁদ্রেয়েভের লেখা ও নিয়মিত সেবায় উন্নতি লাভ করেছিল। ১৯১৭ সালে বলশেভিক্ বিদ্রোহে কুপ্রিন ওদের দলে যোগ না দিয়ে চলে গেলেন ফ্রান্সে। সেখানে বসে বসে বই লিখতেন। বহুদিন পরে ১৯৩৭ সালে রাশিয়াতে ফিরে আসেন এবং সকলেই তাঁকে খুব সমাদরে গ্রহণ করে কিন্তু দেশের মাটী যে তাঁর কেনা ছিল—১৯৩৮ সালেই স্বদেশে মারা যান।

রাশিয়ার অন্যতম সাহিত্যিক আঁদ্রেয়েভ কুপ্রিনের চেয়ে এক বৎসরের ছোট। তিনিও বলশেভিষ্টদের মতবাদে সায় না দিতে পেরে পালিয়ে যান ফিনল্যাণ্ডে। দুঃস্থ পরিবারে জন্ম, তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। The Grandslum তাঁর খুব ভাল বই (১৯০৬) আর 'লাইফ্ Life বইতে রিপোর্টার আঁদ্রেয়েভ নাম করেন। ঐ সময় (১৯০৭—১৫) 'মানুষের জীবন' Life of Man, 'কিং হাঙ্গার', 'আনাথেমা প্রভৃতি কয়েকটি সুন্দর নাটক লিখেছিলেন। আঁদ্রায়েভের ছোট গল্পেও রাশিয়ার সাহিত্য গর্ব্ব করতে পারে। ফিনল্যাণ্ডে শেষ বয়সে এস, ও, এস, এবং সোয়ানসন এই বই দুইখানি লিখে আঁদ্রেয়েভ রাশিয়ার সাহিত্যকে অমর করে গেছেন। ফিন্‌ল্যাণ্ডে ১৯১৯ সালে আঁদ্রায়েভ মারা যান। পূর্ব্বোক্ত দুটী সাহিত্যিকের মত বর্ত্তমানে অন্যতম রুশ সাহিত্যিক অ্যালেক্সিস্ টলষ্টয় রাশিয়া ছেড়ে চলে যান, তারপর ফিরে আসেন ১৯২৪ সালে। তিনি একজন আধুনিক রুশ-সাহিত্যের খুব লোকপ্রিয় লেখক। Alexis Tolstoi (b. 1882) is the most popular and lively of these writers, the master of an admirable narrative manner free from anykind of sophistiness. রাশিয়াতে ইঁহার খুব সুখ্যাতি। এখন তিনি একজন সোভিয়েট কাউন্সিলের সভ্য। আইভ্যান্ গঞ্চারোভ

(Oblomov প্রণেতা) এবং মাইকেল সোলোকোভ্ বর্ত্তমান রুশ সাহিত্যের মধ্যমণি। সোলোকোভ্ (Sholokhov) একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাসিক। তাঁর 'Virgin Soil Upturned', 'And Quiet flows the Don', The Don flows Home to Sea' প্রভৃতি ধারাবাহিক উপন্যাসগুলি পড়ে ভারী মুগ্ধ হচ্ছি। এ সব বই খুব ভালো লেখা। ডন নদীর ধারে ধারে সরলমতি কসাক্‌দের জীবন এমন বাস্তবভাবে এঁকে যাচ্ছেন সোলোখোভ যে পড়তে পড়তে সিগ্রিড উণ্ডশেট (নরওয়ের নোবেল্ হোল্ডার) বা সুইডিস্ লেখিকা সেল্মা লাগেরলফের প্রাঞ্জল ভাষার কথা মনে হয়। এত আধুনিক লেখা যে, পড়লে মনে হয়, রাশিয়ার সাহিত্য পৃথিবীর অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেমন আধুনিক অথচ সাধারণের প্রিয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সোলোখোভ ভাষাটা মনে হয়, বুনিন, কুপ্রিন এ'দের মতই আরম্ভ করেছিলেন—ঠিক গর্কীর মত নয় এবং তাকে যেন আরও সমৃদ্ধিশালী অথচ সহজ করে ফেলেছেন। যাঁরা টলষ্টয়ের কসাক্‌স্ পড়েছেন তাঁদের মাইকেল সোলোখোভের ডন্ (Kist) পড়তে বলি—বেশ বড় গ্রন্থ চারটে বইয়ে বোল্গার জাঁ ক্রিস্তফ বা উণ্ডশেটের ক্রিস্টিন ল্যাভ্রান্সডেবের মত খণ্ডে খণ্ডে লেখা।

ময়নামতীর চরে

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ময়নামতীর চর
পড়ন্ত রোদে ঝিমাইছে, কটি অগাছা বুকের পর।
তারি মাঝে ঐ বুড়ো বটগাছ যেন পটে ছবি আঁকা,
কত সে কাহিনী বক্ষে তাহার রহিয়াছে পড়ে ঢাকা।
হোথা যে শুষ্ক উঁচু টিপি হয়ে ভিটা দুইচারি জাগে,
"ডাকাত মারির ভিটা" নাম নাকি শুনিয়াছি বহু আগে।
একদিন বড় ছিল তাহাদের নিঠুর অত্যাচার,
পথে যারে পেত লুণ্ঠন করি টাকা-কড়ি নিত তার।

আর সে অসির ধারে
কত যে লোকের নাশিয়াছে প্রাণ কেবা তা'র খোঁজ করে।
তারা চলে গেছে ভিটা মাটি শুধু সাক্ষী স্বরূপ আছে,
পুরাণো দিনের স্মৃতিগুলি শুধু ঘুরে ফেরে চারিপাশে।
কোথা গরু বাঁধা খুঁটিসাথে। দূরে ধান কাটা হ'ল শেষ,
কে যেন কহিছে কাহারে কেবল হাত উঁচাইয়া বেশ,
ফসল ফলেনি জমিতে বিশেষ, যাহা বা ফলিয়াছিল,
বৃষ্টি-সাপ্টে প্রায় তাহা তার সকলি ঝরায়ে দিল।

একা প্রাণী হ'য়ে তাই
কি যে সে করে এ দুর্ব্বৎসরে ভেবে কূল-নাহি পাই,
আকুল হৃদয়ে চোখের ধারায় আবার কহিছে থাকি'
জোত্‌দার-আসি খাজনার দায়ে তাগাদা দিয়াছে ডাকি
কহিয়াছে যেন এই মাসেতেই সেই কথা মনে থাকে,
নতুবা সকল ঘরদোর তার যাবে নিলামের ডাকে।
সেই দুঃখের কাহিনী বাতাসে ছড়াইয়া চরময়,
নিমেষের মাঝে করিয়া তুলিছে শুধু যে দুঃখময়।

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

নয়

অকস্মাৎ পিছনের দিক থেকে আক্রান্ত হ'য়ে অশোকা আত্ম-রক্ষার কোনো চেষ্টাই ক'রতে পারলো না, এমন কি চেঁচাতেও পারলো না। দুর্বৃত্তেরা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভিতর এক খণ্ড কাপড় গুঁজে দিয়ে রুমাল দ্বারা প্রথমতঃ তার মুখ এবং তারপর পা ও অবশেষে দু'টি হাত পিছনের দিকে শক্ত ক'রে বেঁধে ফেললো। তার চেঁচাবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা হ'ল। তারপর তারা তাকে তুলে রাস্তা পর্য্যন্ত নিয়ে গেল এবং তখনই সেখানে অবস্থিত এক মোটর গাড়ীর ভিতরে তাকে ঠেলে দিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দিলো। সেই মুহূর্ত্তে গাড়ী তাকে নিয়ে তীর বেগে ছুটে চললো। কে বা কারা, কেন এবং কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে, অশোকা কিছুই অনুমান করতে পারলো না। কষ্টের সহিত মাথা উঁচু ক'রে সে দেখলো, গাড়ীতে শুধু সে ও চালক ভিন্ন অপর কেউ নেই। কিয়ৎক্ষণ পর আবার মাথা তুলে চালকের দিকে একটু বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত ক'রে সে চিনতে পারলো, এই ব্যক্তি আম-বাগানে বোল্‌তার চাক্ অন্বেষণকারী সেই ধূর্ত্ত বদমায়েস যাকে দুলাল প্যারীলালের সহচর গণেশ ব'লে উল্লেখ ক'রেছিল। অশোকার ইচ্ছা হচ্ছিল, তখনই এক লাথি মেরে লোকটাকে গাড়ী থেকে ফেলে দেয়, কিন্তু তার হাত-পা শক্ত ক'রে বাঁধা ছিল ব'লে সেই ইচ্ছাটাকে কার্য্যে পরিণত ক'রবার সুবিধা তার হ'লনা। নিজেকে বন্ধন-মুক্ত ক'রবার জন্য শক্তিসাধ্য চেষ্টা ক'রে যখন সে বিফলকাম হ'ল, তখন তার চুপ ক'রে প'ড়ে থাকা ভিন্ন অন্য পন্থা রইলো না। গণেশ চালকের স্থান থেকে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকে দেখছিল কিন্তু কিছু বলে নি।

ক্রমাগত দু'ঘণ্টা চলার পর গাড়ী অবশেষে একটি ছোট পাকা বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। গণেশ তাড়াতাড়ি নেমে অশোকার কাছে এসে তার হাত, পা ও মুখের বাঁধন ইত্যাদি খুলে দিলো ও বললো—

"এখন ভাল মানুষটির মতো নাবো দেখি, চেঁচামেচি ক'রোনা, ক'রলেও কোনো ফল হবে না, কারণ সবাই জানে এ বাড়ীতে একটা পাগ্‌লি মেয়ে আস্‌চে।"

গণেশ যে বেশ পাকারকমের ষড়্‌যন্ত্রকারী, এই একটি কথায় তার পরিষ্কার ইঙ্গিত পেয়ে অশোকা মুহূর্ত্তে তার কর্ম্মপদ্ধতি ঠিক ক'রে নিলো। সে বুঝতে পারলো, চতুরতা অবলম্বন ভিন্ন এমন দুষ্ট লোকের কবল থেকে মুক্তিলাভের অন্য উপায় নেই। তাই বিশেষ আপত্তি না ক'রে সে আস্তে আস্তে গাড়ী থেকে নামলো। গণেশ তখন বাড়ীটার দিকে একটা টর্চ্চ বাতির আলো ফেলে অশোকাকে এগিয়ে যেতে বললো। অশোকা বুঝলো, এই বাড়ীতেই তাকে বন্দিনী অবস্থায় থাকতে হবে। সে আরো বুঝলো, এখন পালাবার চেষ্টা একান্তই বৃথা হবে। তাই নীরবে গণেশের নির্দ্দেশানুযায়ী ঐ বাড়ীর একটা কামরায় সে প্রবেশ করলো। দেখলো, কামরাটি একরকম আস্‌বাব-পত্র শূন্য ও খুব সেঁত সেঁতে—এক পাশে একটি ছোট জীর্ণ টেবিল ও মাত্র একখানা চেয়ার এবং অপর প্রান্তে পুরাতন এক খাটের উপর অপরিচ্ছন্ন বিছানা। ঘরের এক কোণে একটা হ্যারিকেন বাতি মিট মিট জ্বল্‌ছিল।

গণেশ বললো, "আপাততঃ এইটিই তোমার থাকার ঘর। তোমার বোধ করি, খাওয়া হয় নি। একটু বিশ্রাম করো, আমি খাবার নিয়ে আসচি।"

ঘরের দরজা বাহির দিক থেকে তালাবন্ধ ক'রে গণেশ চ'লে গেল।

মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে অশোকা সেই ঘরের দোর জানালাগুলি পরীক্ষা করতে লাগলো এবং পরীক্ষান্তে বুঝতে পারলো, ও সব ভেঙে পালানো তার শক্তির অতীত। খাটের পার্শ্বস্থিত দেয়ালে অপর একটা দোর ছিল। দেখলো; ঐ দোর অপর দিক থেকে বন্ধ সুতরাং যে কোনো লোক সেই দিক থেকে এই ঘরে প্রবেশ করতে পারে। দোরের কবাট ঈষৎ ফাঁক ক'রে ওদিকে কি আছে দেখতে চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হ'ল না। টেবিলের

উপর একখানা রেলওয়ে টাইম্ টেবল্, কয়েক টুক্রো বাজে কাগজ ও একটা পেন্‌সিল ছিল। অশোক সেগুলি যথা-সম্ভব পরীক্ষা ক'রে এমন কিছু পেলো না যা থেকে ঐ স্থানের নাম, ঠিকানা বা অন্য কোনো তথ্য জানা যেতে পারে। তখন হতাশ হ'য়ে সে মেঝের উপর ব'সে পড়লো ও দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো কি ক'রে এই স্থান থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কোনো পন্থাই আবিষ্কৃত হ'ল না। এমন সময় হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো টেবিলের নীচে মেজের এক কোণায় পড়া এক টুক্রো সাদা কাগজের উপর। অশোকা চট ক'রে ঐ কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়ে বাতির সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখলো, ঐ টুক্রো কাগজখানা একটা পুরাতন খামের একটুখানি অংশ এবং তার উপরে লেখা র'য়েচে, "G. Ghoshal, Nari Rakshasram, Chandernagar," অশোকা ধ'রে নিলো, "G. Ghoshal" সম্ভবতঃ গণেশ ঘোষাল কিন্তু নারীরক্ষাশ্রম, চন্দননগর কোথায়? তবে কি এই বাড়ীটাই 'নারীরক্ষাশ্রম' এবং এই স্থানই চন্দননগর? "নারীরক্ষাশ্রম" এতো ছোট বাড়ী হবে কেন? আশ্রমের লোকজনই বা কোথায়? এ যেন একটা জনহীন ভূতের বাড়ী। তার চিন্তাধারায় বাধা দিয়ে তখনই দ্বারদেশে খট্ খট্ শব্দ হ'ল এবং পর মুহূর্ত্তে দোর খুলে গণেশ ও তার পশ্চাতে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ ক'রলো। এ স্ত্রীলোকটির এক হাতে ছিল খাবার সমেত একটি থালা ও অপর হাতে এক গ্লাস জল। টেবিলের উপর সে সব রেখে স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে গেল। তখন গণেশ বললো—

"খাবার এসেচে, খেয়ে নাও। আজ তাড়াতাড়ি কোনো ভালো বন্দোবস্ত ক'রতে পারা যায় নি, কাল সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তোমাকে একটু কষ্ট দিয়ে আনতে হ'য়েচে, সে জন্য দুঃখিত।"

অশোকা এ পর্য্যন্ত চুপ ক'রেই ছিল, কোনো কথা বলে নি, কিন্তু এখন আর নীরব থাকা সঙ্গত বোধ ক'রলো না। সে ধীরে অথচ দৃঢ়স্বরে ব'ললো—

"ইচ্ছা পূর্ব্বক কষ্ট দিয়ে পরে সে জন্য কপট দুঃখ-প্রকাশের অভিনয় করার কোনো সার্থকতা আছে কি?"

"কে বললে, এটা কপট দুঃখ-প্রকাশের অভিনয়?"

"কারো বলবার প্রয়োজন করে না, এই অবশ হাত-পা গুলো দু'ঘণ্টা ধ'রে ক্রমাগত তা ব'লে আসচে। কিন্তু জিজ্ঞেস ক'রতে পারি কি, আমাকে এ রকম ভাবে চুরি ক'রে আনবার উদ্দেশ্য কি?"

"চোর কেন চুরি করে তার ব্যাখ্যা একান্তই অনাবশ্যক। চোরাই মাল হয় সে নিজে রাখে, অবিশ্যি রাখবার যোগ্য হ'লে, নয় তো ভালো খদ্দের জুটলে বেচে ফেলে।"

"ঘোষাল মশায়ের পেশাটি তা হ'লে অতি উঁচু দরের বল্‌তে হবে।"

গণেশ বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললো, "তুমি দেখচি আমার নামের পদবীর খবরটাও রাখো।"

"একটু একটু রাখি বই কি। হয় তো আরো এমন সব খবর আমার জানা থাকতে পারে যা না-জানা থাকলেই প্যারীলাল-গণেশ কোম্পানীর পক্ষে মঙ্গলজনক হ'তো।"

"বেশ তো ভয় দেখাতে শিখেচো। ও সব ফাঁকা কথায় গণেশ ঘোষাল ভয় পায় না। তা যাক্, এখন এই খাবারটুকু খেয়ে একটু সুস্থ হ'য়ে নাও। তোমার সাহস ও টন্‌টনে বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে পাচ্ছি না, আর সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে আমার খুব ভালোই লাগচে।"

"তার মানে, ভালো খদ্দের জুটলেও আমায় ছেড়ে দেওয়া হবে না, এই তো?"

"এতো কষ্ট ক'রে এনে সহজে তোমায় ছেড়ে দেবো এমন দুর্ব্বুদ্ধি আমার আদৌ নেই। এখানে তুমি যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে থাকতে পারো তার সব রকম ব্যবস্থা ক'রে দেবো।"

"সে তো পরের কথা। আপাততঃ আমার মাথার বেদনাটা কি ক'রে সারবে তাই ভাবছি। একটা রুমাল দিয়ে মাথাটা বাঁধতে পারলে বেদনাটা হয় তো কমতো।"

গণেশ তার পকেট থেকে তখনই একটা রুমাল বের ক'রে অশোকার হাতে দিলো। অশোকা ঐ রুমাল দিয়ে মাথা বাঁধতে বাঁধতে ব'ললো, "আপনাকে একদিন অকারণে আম-বাগানে দেখে কিছু অপ্রিয় কথা ব'লেছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, আপনার ব্যবহার তেমন খারাপ নয়।"

গণেশ খুসী হ'য়ে বললো, "আর একটু জানা-শুনা হ'লে বুঝতে পারবে, অপ্রিয় না ব'লে প্রিয় কথা বলবার জন্যেই তোমার আগ্রহ হবে।"

"তা হয় তো হবে কিন্তু বাড়ীতে বাবা আর পিসিমাকে কি ব'লে বোঝানো যাবে ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছি না।"

"সে জন্য ভাবতে হবে না, আমি সে ব্যবস্থা আগেই ক'রে রেখেচি। আগু থেকেই ভেবে-চিন্তে একখানা চিঠি লিখে রেখেছিলাম, তোমায় নিয়ে আসবার সময় পথে সেই চিঠি ডাকে দিয়ে এসেচি। ঐ চিঠি পেয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হবেন। যাক্, এখন খেয়ে নাও, নচেৎ সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে যে।"

"পুরুষ মানুষের সামনে খাবার অভ্যেস আমার নেই।"

"আচ্ছা, আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ খেয়ে নাও।"

অশোকা যে অতো সহজে তার বশীভূত হবে গণেশ তা কখনো ভাবতে পারে নি। এই আশাতীত সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হ'য়ে সে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে দোর আগলে বাইরে প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলো, দরজার কবাট ভেজিয়ে রাখলো কিন্তু তালা বন্ধ করলো না।

ঘরের ভিতরে থাকা কালে গণেশ টেবিলের পার্শ্বস্থ চেয়ারে ব'সে কথা বলছিল ও একটা সিগারেট ধরিয়ে মাঝে মাঝে টান দিচ্ছিল। সিগারেট ধরাবার দেশলাই বাক্সটি টেবিলের উপরেই প'ড়েছিল। অশোকা তাড়াতাড়ি ঐ বাক্সটা হাতে তুলে নিলো, তারপর হারিকেন লণ্ঠনটা এনে তার তেল ভরবার ছিপিটা খুলে ফেললো এবং অবশেষে আস্তে আস্তে ঐ হারিকেন বাতিটা বিছানার কাছে নিয়ে গদি ও বালিশের উপর খানিকটা কেরোসিন তেল ঢেলে দিলো। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়া মাত্র সে আবার টেবিলের কাছে ফিরে এসে এক খণ্ড সাদা কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখলো—

"ভাবিয়া দেখিলাম, আমার বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র—তাই গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে চলিলাম।

পাগলি মেয়ে।"

কাগজখানা টেবিলের উপর রেখে সে আবার বিছানার কাছে গেল এবং একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে সেটা কেরোসিন-সিক্ত গদির উপর ফেলে দিলো। মুহূর্ত্তে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠলো, বালিশ ও গদি হ'তে প্রায় একই সঙ্গে আগুনের শিখা লেলিহান হ'য়ে বের হ'ল। অশোকা তখন 'আগুন', 'আগুন' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো। চিৎকার শুনে গণেশ ব্যস্ত হ'য়ে ঘরের ভিতর ছুটে এলো। অশোকা ভয়-ব্যাকুলতার সহিত বললো, "শীগ্‌গির জল ঢেলে দিন, নাহ'লে সব পুড়ে ছার-খার হবে।"

আর কিছু সামনে না পেয়ে গণেশ জলপূর্ণ গ্লাসটা নিয়ে বিছানার দিকে গেল। এই সুযোগে অশোকা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দোর বন্ধ ক'রে দিলো ও মুহূর্ত্তে তার মাথায় বাঁধা রুমালটা খুলে সেই রুমাল দিয়ে দরজার বাইরের দিকের কড়া ও তালা শক্ত ক'রে বেঁধে ফেললো। পর মুহূর্ত্তে সে অন্ধকারময় অপরিচিত রাস্তা ধ'রে দ্রুত পলায়ন ক'রল।

[ক্রমশঃ

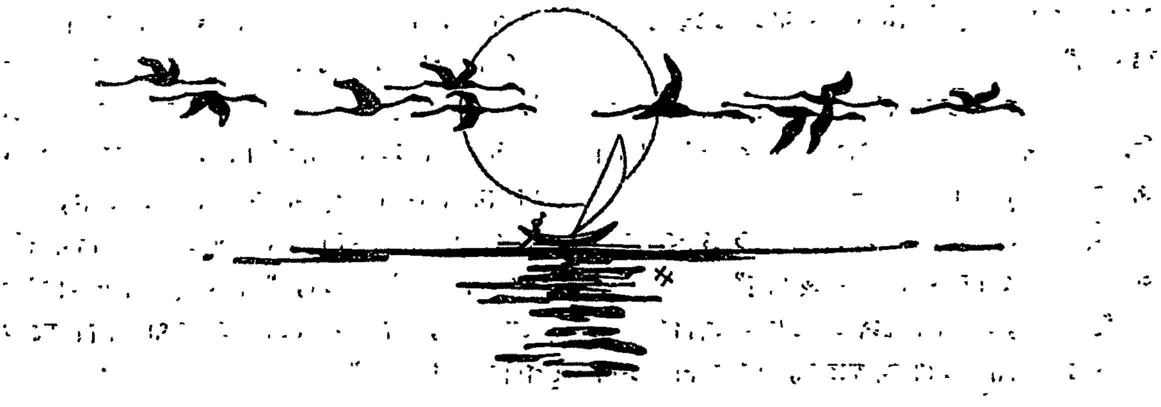

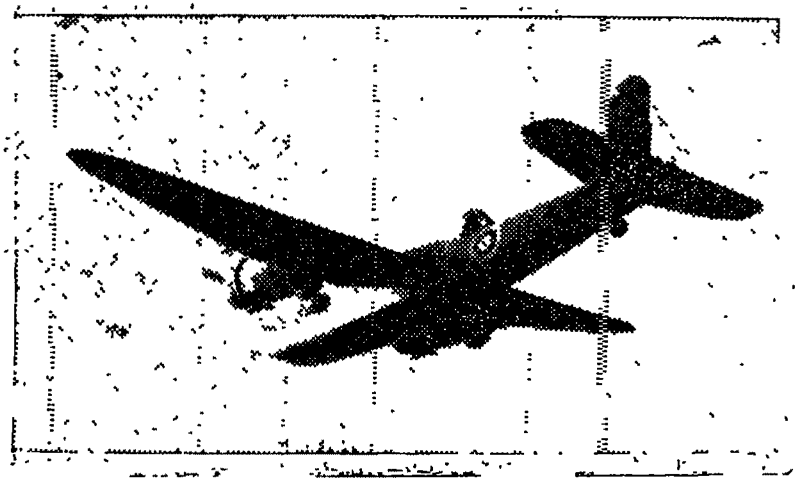

রাষ্ট্রীয় রণাঙ্গন

য়্যানালিষ্ট

বিগত তিন সপ্তাহ হইতে শান্তিহারা প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে বিক্ষোভের আলোড়ন জাগিয়াছে—গত ৭ই ডিসেম্বর জাপান আক্রমণ সুরু করিয়াছে। ‘বঙ্গশ্রী’র গত সংখ্যায় আমরা বলিয়াছিলাম যে, অতি শীঘ্রই জাপানের যুদ্ধে জড়াইয়া পড়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যুদ্ধের গতি পর্য্যবেক্ষণান্তে আমাদের এই সুচিন্তিত অভিমত সফল হইয়াছে। জাপানের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ কুরুসু যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিলেন তাহা যে শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য, এই ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। বস্তুতঃ, জাপ-মার্কিন আলোচনা যে শেষ পর্য্যন্ত বিফল হইবে, ইহা বুঝিবার জন্য যথেষ্ট চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি ব্যয়ের প্রয়োজন করে না। মার্কিন সরকার জানাইয়াছিলেন যে, জাপান যদি চীন ও ইন্দোচীন হইতে সৈন্য অপসারণ করে এবং ভবিষ্যতে অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা হইলে আমেরিকার সহিত জাপানের স্বাভাবিক বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে। আমেরিকার পক্ষে এই দাবী আদৌ অসঙ্গত নয়। কারণ, জাপান দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করিলে একদিকে যেমন চীনের সহিত আমেরিকার যোগাযোগ রক্ষণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে, অপর পক্ষে তেমনই মালয়ের সহিত তাহার বাণিজ্য-সম্পর্কও নির্ব্বিঘ্ন রাখা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। কিন্তু আমেরিকার পক্ষে এই দাবী যতই সঙ্গত হউক না কেন; জাপানের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা আত্মহত্যারই নামান্তর। কারণ, চীনের যুদ্ধের সহিত জাপানের আজ মান সম্ভ্রম-জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের উপর স্বীয় সাম্রাজ্যবিস্তারের যে স্বপ্ন জাপান দীর্ঘকাল ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট অবসর। ইয়োরোপের যুদ্ধ ক্রমশঃ জটিল অবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জাপান জানাইয়া দিয়াছিল যে, স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে ইহাই তাহার সুবর্ণ সুযোগ। প্রবল প্রতিবাসী রুশিয়া আজ দুর্দ্ধর্ষ নাৎসীদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত, বৃটেনও ইয়োরোপের যুদ্ধে বিশেষভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে, অ্যামেরিকা অ্যাটলাণ্টিকে জার্ম্মানীর সহিত অ-ঘোষিত নৌসংগ্রামে ব্যাপৃত; এদিকে সমগ্র চীনের উপকূলেও জাপান যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইন্দোচীনে তাহার সৈন্যসমাবেশ সমাপ্ত, তদুপরি মার্কিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী নৌবহরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইতে এখনও বিলম্ব আছে। সুতরাং স্বীয় অভিযান পরিচালনার ও চীনের যুদ্ধে নষ্ট গৌরব উদ্ধারের ইহাই অনুকূল সময়। এতদ্ব্যতীত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বীয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকাকেও ইত্যবসরে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। চীনের কোন কোন অংশ জাপানের কুক্ষিগত হওয়ায় সেখানে মার্কিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়াছে, এবার যদি মালয়, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং

তদুপরি ব্রহ্মদেশে সে স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন আমেরিকাকে প্রভূত পরিমাণে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্ভব হইবে, অপর পক্ষে তেমনই রবার, চাউল, বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য এবং কাঁচা মাল জাপানের হাতে আসিবে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দিক দিয়া বিচার করিলে এতখানি সুযোগ-সুবিধার একত্র সমাবেশ জাপানের এই অভিযান যে বিশেষ শুভলগ্নে আরম্ভ হইয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আমেরিকার সহিত আলোচনা যে নিজেকে যুদ্ধে প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য কাল-হরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ।

এক্সিস্‌-শক্তির সহযোগী জাপান যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে বর্ব্বর নাৎসী নায়কদের ন্যায় যেমন আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, নাৎসী অভিযানের অনুকরণে সে অভিযান পরিচালিত করিয়াছে তেমনই ব্যাপকভাবে এবং বিদ্যুৎগতিতে। রুশ-রণাঙ্গনের দেড় হাজার মাইল দৈর্ঘ্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের রণক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ছয় হাজার মাইলেরও অধিক। তবে নৌ-যুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা যেমন কঠিন, তেমনই স্থলবাহিনীর ন্যায় সকল ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করিবার প্রয়োজন থাকে না। অভিযান আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, ওয়েক, মিডওয়ে দ্বীপপুঞ্জ, গুয়াম, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সিঙ্গাপুর এবং হংকং একসঙ্গে আক্রান্ত হইয়াছে, এবং স্থলপথে থাইল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া জাপ-বাহিনী চীন-ব্রহ্ম পথের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। অতর্কিত আক্রমণে আক্রমণকারী কতকগুলি প্রাথমিক সুবিধা লাভ করে, জাপানও সেই সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। প্রথম আক্রমণে পার্ল-পোতাশ্রয়কে সে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। সানফ্রান্সিস্কো হইতে ম্যানিলা এবং সিঙ্গাপুরের পথে পার্ল-পোতাশ্রয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। সিঙ্গাপুর অভিমুখী জাহাজ সকল প্রায় আড়াই হাজার মাইল আসিয়া পার্ল পোতাশ্রয়ে কয়লা গ্রহণ করে। ইহার পরে পথিমধ্যস্থ ওয়েক এবং গুয়াম দ্বীপও জাপান অধিকার করিয়াছে। ফিলিপাইনে জাপান প্যারাসুট করিয়া সৈন্য নামাইয়াছে। লক্ষাধিক জাপ সৈন্য ফিলিপাইনে অবতরণ করিয়াছে। ম্যানিলা উন্মুক্ত সহর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। পেনাংও বৃটিশবাহিনী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। বৃটিশ উত্তর বোর্ণিওতেও জাপান সাফল্য লাভ করিয়াছে। এখানকার বিমানকেন্দ্র জাপান অধিকার করিয়াছে। তদুপরি এখানে যে তৈলখনি আছে, তাহাও হস্তগত করার ফলে জাপান বিশেষ উপকৃত হইবে। ব্রহ্মদেশ অভিমুখে অগ্রগমনরত জাপবাহিনীর চাপে বৃটিশবাহিনীকর্ত্তৃক ভিক্টোরিয়া-পয়েণ্ট পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে জাপ-স্থল-বাহিনী সিঙ্গাপুর হইতে দুইশত মাইলের কিঞ্চিদধিক দূরে আছে। সম্প্রতি হংকং-এর আত্মসমর্পণে সিঙ্গাপুর ক্ষতিগ্রস্ত হইল। অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটির সহিত সে আজ বিচ্ছিন্ন-সংযোগ। অপরপক্ষে জাপ নৌ-বাহিনীও সরাসরি জাপান হইতে সিঙ্গাপুরে সংযোগ-রক্ষায় সক্ষম হইল। তবে সিঙ্গাপুরকে যে অতি সহজে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না, তাহা জাপান জানে। সেই জন্য জাপান সিঙ্গাপুর দখল অপেক্ষা তাহাকে অবরোধ করিতেই অধিক প্রয়াসী। সিঙ্গাপুরকে যদি বহির্জগত হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে সিঙ্গাপুর যে বিশেষভাবে বিপন্ন হইবে, জাপ কর্ত্তৃপক্ষ বোধ হয় এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই উক্ত অঞ্চলে অবরোধ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য সচেষ্ট।

কিন্তু জাপান হইতে সমগ্র চীনের উপকূল ধরিয়া, টেনাসেরিয়াম; মালয় এবং সিঙ্গাপুর হইয়া বোর্ণিওর মাথার উপর দিয়া হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত জাপান যে রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে তাহার পরিকল্পনা কতদূর সফল হইবে এবং তাহার দুর্ব্বল কেন্দ্রগুলি কোথায় ইহাই বিচার্য্য। জাপান অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ বিস্তৃত অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেও প্রতি-আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যুদ্ধ আক্রমণাত্মক হইতে আত্মরক্ষামূলক হইয়া পড়িতে বাধ্য এবং এইখানেই জাপানের দুর্ব্বলতা। জাপান জানে, সিঙ্গাপুরকে সকল দিক হইতে সংযোগহীন করিতে হইলে ভারতমহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরেও স্বীয় ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়োজন। রেঙ্গুনের উপর সে বোমা বর্ষণ করিয়াছে। কলিকাতার উপর বোমা বর্ষণের আশঙ্কাও অনেকে করিতেছেন। বাস্তবিক, ব্রহ্মদেশ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়াই আমরা এখনও যুদ্ধকে ভারতের বাহিরে বলিতে পারিতেছি। কিন্তু রেঙ্গুন ও কলিকাতায় বোমা বর্ষণের মধ্যে পার্থক্য আছে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কলিকাতার সংযোগ

বিচ্ছিন্ন করিতে হইলে তাহার উপর বোমা বর্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু কলিকাতায় নিয়মিত বিমান আক্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিবার আছে। প্রথম, কলিকাতা হইতে জাপ বিমানঘাঁটিগুলির দূরত্ব; দ্বিতীয়, জাপানের সঞ্চিত পেট্রোলের পরিমাণ ও তাহা ব্যয়ের ক্ষমতা; তৃতীয়তঃ, সাম্প্রতিক খাতাখাভ। আমরা জানি, জার্ম্মানীর ক্রীট দখলের সময় বৃটিশ বিমান মিত্রশক্তিকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে নাই। ফ্রান্সের উপকূল হইতে ৪৫০ মাইল দূরে বিসমার্ক আক্রান্ত এবং নিমজ্জিত হইলে জার্ম্মান বিমান তাহাকে সাহায্যের জন্য যাইতে পারে নাই। তবে আট নয় শত মাইল দূরবর্ত্তী বিমান ঘাঁটি হইতে আসিয়া বোমা বর্ষণের দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে। কিন্তু নিয়মিতভাবে বোমা বর্ষণ এতদূর হইতে বিশেষ ক্ষতিকর। জাপান যদি ব্রহ্মদেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করিয়া সেখানে ঘাঁটি স্থাপন ও পেট্রোল হস্তগত করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য ভারতের বিপদ বৰ্দ্ধিত হইবে। আমাদের মনে হয়, জাপান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষ পোর্টব্লেয়ার দ্বীপে মনোনিবেশ করিতে পারে। এই স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিতে পারিলে যেমন বঙ্গোপসাগরে প্রাধান্য স্থাপন করা জাপানের পক্ষে সম্ভব, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে বিমান আক্রমণও তেমনই অধিকতর সহজ। কিন্তু জাপানের দুর্ব্বলতা যে কোথায়, আমরা পূর্ব্বেই সে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি।

ফ্রান্সের উপকূল হইতে জার্ম্মানী য়্যাটলাণ্টিকে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে পারে, কারণ, পিছন হইতে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ; কিন্তু চীনের উপকূল হইতে জাপানের সমুদ্রাভিমুখে সমর-পরিচালনা অত সহজ নয়; কারণ তাহার পিছনে আছে শত্রু। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নৌ-বাহিনীর পক্ষে বিরাট রণক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ সংযোগ রক্ষা করা দুরূহ। আমেরিকা হইতে যদি এক নৌবহর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জাভিমুখে প্রেরিত হয় তাহা হইলে জাপানের পক্ষে সেখানে প্রবল প্রতিরোধ প্রদান করা বিশেষ আয়াসসাধ্য। তদুপরি অষ্ট্রেলিয়া ঘুরিয়া অপর এক নৌবহর সিঙ্গাপুর এবং ফিলিপাইন অভিমুখে অগ্রসর হইলে জাপ অধিকৃত অঞ্চলগুলি স্বতঃই বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইয়া যাইবে। মালয়, ফিলিপাইন এবং বোর্ণিওস্থিত বৃটিশ বাহিনী তখন পাল্টা আক্রমণের সুবিধা পাইবে। এদিকে পিছনে সিঙ্গাপুর এবং সম্মুখে মার্কিন নৌবহরে বিচ্ছিন্ন-সংযোগে জাপ নৌবাহিনী যে বিশেষ বিপন্ন হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। পোর্টব্লেয়ারে ঘাঁটি স্থাপনেও ঐ একই অসুবিধা। সিঙ্গাপুর যতদিন আপন প্রাধান্য রক্ষা করিতে সক্ষম, ততদিন বৃটিশ নৌ ও বিমান বহরের আক্রমণে যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার পতন ঘটিবার সম্ভাবনা।

তবে প্রশান্ত মহাসাগরের এই যুদ্ধের সহিত ইয়োরোপের যুদ্ধের গতিও পরিবর্ত্তিত হইবার বিশেষ সম্ভবনা রহিয়াছে। রুশিয়ায় প্রচণ্ড শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থাও যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা সুস্পষ্ট। উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ-রণাঙ্গন—সর্ব্বত্রই জার্ম্মানবাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতেছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ইহা নাকি জার্ম্মানীর সমর-কৌশলের অঙ্গ। কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। এক বিশাল রণক্ষেত্রের বিরাট বাহিনীকে সুশৃঙ্খলার সহিত বিজিত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া পিছাইয়া লইয়া যাওয়া কি সহজ? বাহিনীর বিভিন্ন অংশের যোগাযোগ, সরবরাহ ব্যবস্থা, সংবাদ আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত প্রভৃতি ইহাতে যথেষ্ট ব্যাহত হইতে পারে। তাহার পর, নাৎসী সৈন্য পিছাইয়া যাইলে রুশ-বাহিনী কি সেই সুযোগ পরিত্যাগ করিবে? এতদ্ব্যতীত, জার্ম্মান সৈন্য কতদূর পিছাইবে এবং যাইবে কোথায়? রুশগণ প্রত্যেকটি গ্রাম পরিত্যাগের পূর্ব্বে সেখানে অগ্নিসংযোগে সমুদয় ভস্মীভূত করিয়াছে, সুতরাং জার্ম্মান সৈন্য ঘাঁটি স্থাপন করিবে কোন্ খানে? আশ্রয় এবং খাদ্যাদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা সেখানে কোথায়? এতদুপরি রুশ গরিলাসৈন্য আছে। কাজেই, জার্ম্মানীর এই পশ্চাদপসরণ রণকৌশল নয়, রুশিয়ার সামরিক সাফল্য, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

সম্প্রতি জার্ম্মাণীর প্রধান সেনাপতি ফণ ব্রাউচিসকে অপসারিত করিয়া হিটলার স্বয়ং নাৎসী সমর বিভাগের সকল কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষ কোন গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলে সমর-পরিষদে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। সুতরাং ফণ ব্রাউচিসের অপসারণ যে নাৎসী সমর-বিভাগের অন্তর্দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই সকল লক্ষ্য করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, জার্ম্মাণী আসন্ন পরাজয়ের সম্মুখীন। জার্ম্মাণী রুশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি এখনও পরিত্যাগ করে নাই। মস্কো-লেলিনগ্রাডের মধ্যে বর্ত্তমানে সংযোগ স্থাপিত হইলেও নাৎসী

সৈন্ত লেলিনগ্রাড্ অথবা মস্কোর অবরোধ পবিত্যাগ করে নাই। সেবাস্তেপোলেও জার্ম্মাণগণ প্রবল আক্রমণ পবিচালনা করিতেছে। আগামী বসন্তে রুশিয়ার উপর আবাব তীব্র অভিযান পরিচালিত হইবে বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান শীতে রুশ-রণাঙ্গন হইতে অপসৃত সেনাদল করিবে কি? এই প্রচণ্ড শীতে হিটলার ককেশাস অভিমুখে অভিযান পরিচালনার পূর্ব্বে দ্বিতীয়বার চিন্তা করিবেন বলিয়াই আমাদের ধারণা। ককেশাসে অভিযান পবিচালনায় বাধা কোথায় এবং কি, প্রবন্ধেব কলেবর বৃদ্ধিব আশঙ্কায় আমরা সে আলোচনা এখানে করিলাম না। তবে জার্ম্মাণীর পক্ষে বর্ত্তমানে দুইটি পথ উন্মুক্ত। প্রথম, তুরস্কের সহিত একটা বুঝাপড়া কবিয়া লইয়া তুরস্কের মধ্য দিয়া সৈন্ত পরিচালনা করিয়া দক্ষিণ ককেশাসে উপনীত হওয়া। এইখানে সাঁড়াশীর আকারে জার্ম্মাণ বাহিনীর একটি বাহু বাটুমের তৈলখনির দিকে এবং অপর বাহু ইরাণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

অপরটি হইতেছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। ভূমধ্যসাগরের উত্তব তীরে ফ্রান্স ও স্পেনের উপকূলে জার্ম্মাণী পূর্ব্বেই সৈন্ত সন্নিবেশ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সিসিলি এবং ক্রীট দ্বীপেও জার্ম্মাণ সৈন্ত আছে। ভূমধ্যসাগরস্থ ইটালী-অধিকৃত দ্বীপগুলির সাহায্য এবং সহযোগিতা হইতে সে বঞ্চিত হইবে না। ভূমধ্যসাগবের দক্ষিণ উপকূলে উত্তর আফ্রিকায় জেনারেল রোমেলের পরিচালনায় জার্ম্মাণ সৈন্ত বর্ত্তমানে যুদ্ধ করিতেছে। সম্প্রতি বৃটিশ বাহিনী উত্তব আফ্রিকায় বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। ডের্ণা এবং বেনঘাজি বৃটিশ হস্তে আসিয়াছে। জার্ম্মাণী এই সময় ভূমধ্যসাগরেব উপকূলস্থ ফরাসী অধিকৃত বিজার্টা, ওরাণ, য়্যালজিয়ার্থ, এমন কি ডাকার পর্য্যন্ত দাবী করিতে পারে। ফরাসী নৌবহরকেও স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার দাবী করা তাহারপক্ষে অসম্ভব নয়। তবে নৌবহর দাবী করিবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ডাকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে য়্যাটলান্টিকে তাহার সাবমেরিণের তৎপরতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ, মিশরের মধ্য দিয়া অভিযান চালাইয়া সে সুয়েজ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার জন্ত সচেষ্ট হইতে পারে। এই পরিকল্পনা সফল হইলে একদিকে যেমন ভূমধ্যসাগর নাৎসীহ্রদে পরিণত হইবে, সুয়েজ হইতে পশ্চিম ভারতের দ্বারে আসাও তাহার পক্ষে তেমনই সহজ হইয়া দাঁড়াইবে। এতদ্ব্যতীত এই অভিযান সফল হইলে সুদূর প্রাচী অভিমুখী বৃটিশ রণতরীকে উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া আসিতে হইবে। তাহা ছাড়া, প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের বিরুদ্ধে নিযুক্ত থাকায় য়্যাটলান্টিকে মার্কিন সাহায্য বৃটেনের নিকট পূর্ব্বের ন্তায় প্রেরিত হইবে না বলিয়া জার্ম্মাণী আশা করে। সুতরাং বর্ত্তমান শীতে জার্ম্মাণী উক্ত দুইটি পরিকল্পনার যে কোনটি অথবা দুইটিই কার্য্যকরী করিতে সচেষ্ট হইতে পারে।

জার্ম্মাণীর এই আসন্ন অভিযান কোন পথে আসিবে, এবং তাহার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, সেই সকল বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যেই মিঃ চার্চ্চিল রুজভেল্টের সহিত আলোচনা করিতে ওয়াশিংটনে গমন করিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রণক্ষেত্রকে সংহত করা ও তাহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পন্থা আবিষ্কারই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। এই আলোচনায় রুশিয়া, চীন, এবং ডোমিনিয়নগুলিকেও আহ্বান করা হইবে। একথা মনে রাখা প্রয়োজন, প্রশান্ত মহাসাগবের ও ইয়োরোপের রণস্থল দুইটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পৃথক্ যুদ্ধক্ষেত্র নহে—তাহারা একই নাটকের দুই বিভিন্ন দৃশ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের গতি যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে জাপানের প্রতি রুশিয়ার মনোভাবের উপর। জাপান যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিয়াছে যে, রুশিয়ার সহিত তাহার পূর্ব্ব সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে। জাপান জানে ব্লাদিভষ্টক হইতে টোকিওর দূরত্ব যথেষ্ট নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় না, এবং রুশিয়ার সহিত তাহার সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইলে নিজের ঘর সামলাইবার প্রয়োজন হইবে সর্ব্বাগ্রে। তবে রুশিয়া বর্ত্তমানে জাপান সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করে নাই। জাপানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবাব পূর্ব্বে রুশিয়াকে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন, দুর্দ্ধর্ষ নাৎসীবাহিনীকে ঠেকাইবাব ভার আজ সে-ই গ্রহণ করিয়াছে। অদূর বসন্তকালীন অভিযানে বাধা দিবার নিমিত্ত তাহার সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমানে যুদ্ধে বিশেষভাবে জড়িত হওয়ায় তাহাদের নিকট হইতে কতখানি সাহায্য সে পাইতে পারে, তাহাও ভাবিবার কথা। প্রতিবেশী জাপানকে নির্বীর্য্য করিতে অনিচ্ছা হইবার কোন কারণ তাহার নাই, তবে দুইটি রণাঙ্গনে একত্র যুদ্ধ-পরিচালনার সুব্যবস্থা এবং সুনিশ্চিত সাফল্যের আশা না থাকিলে ও তদুপরি বৃটিশ ও মার্কিন সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে রুশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে এত শীঘ্র যুদ্ধ ঘোষণা করিবে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। ওয়াশিংটনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের সম্মিলিত আলোচনায় এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, এবং এই আলোচনার সাফল্যের উপব যুদ্ধের গতি বিশেষ নির্ভর করিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের ফলে ইয়োরোপেব যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইবার যেরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে, জাপানের প্রতি রুশিয়ার মনোভাবের উপরও প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের গতি সেইরূপ নির্ভরশীল।

রাজসিংহের ভূমিকা

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(৭)

আমরা গত ছয় সংখ্যায় বিশদ্‌ভাবে দেখাইয়াছি যে, স্যার যদুনাথ বঙ্কিমের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহের "ভূমিকায়" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কিরূপ অন্যায় দোষ আরোপ করিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ এই বিষয়গুলিই রাজসিংহ উপন্যাসের প্রধান :—

(১) চঞ্চল কুমারীর রাণার নিকট পত্র প্রেরণ ও তাঁহার উদ্ধার,
(২) ক্রোধবশতঃ বাদশাহের জিজিয়া কর স্থাপন,
(৩) রাজসিংহের উহা প্রদান করিতে অসম্মতি,
(৪) ঔরঙ্গজেবের নিকট রাজসিংহের পত্র প্রেরণ,
(৫) যুদ্ধযাত্রা ও উদিপুরীর বাদশাহ-সহ আগমন,
(৬) প্রথমাভিযানেই বাদশাহের বেগমসহ বন্দী হওয়া,
(৭) জেব উন্নেসার চরিত্র বিচার (যাহার অবলম্বনে জেব উন্নেসার সহিত মোবারকের প্রণয়ের রোমাঞ্চে উৎপত্তি),
(৮) সন্ধি,
(৯) রাজসিংহের প্রাসাদ হইতে চলিয়া যাইবার পর বাদশাহের আবার যুদ্ধোদ্যম ও পরাজয়,
(১০) ভীমসিংহের গুজরাটের সর্ব্বত্র জয়, কিন্তু হত্যা-দমনে রাজসিংহের আদেশ,
(১১) অতঃপরে আকবরের রাজপুতদের সহিত যোগদান,
(১২) সন্ধি,
(১৩) আকবরের দাক্ষিণাত্য গমন ও বাদশাহের অবশিষ্ট জীবন দাক্ষিণাত্যে বাস,
(১৪) রাজপুতনায় নিরুপদ্রব।

আমরা দেখাইয়াছি, এক নম্বরের দ্বিতীয় অংশ ব্যতীত সমস্ত বিষয়েই স্যার যদুনাথ বলেন, বঙ্কিমের উক্তি ঐতিহাসিক ভুল। আমরা আর এখন বারম্বার পুনরুক্তি করিব না। আমরা দেখাইয়াছি যে, তাঁবেদার প্রণীত ইতিহাস অবলম্বন ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের বর্ণিত বিবরণ উপেক্ষা করিয়া স্যার যদুনাথই ভুল করিয়াছেন। ইহার পরে খোল ও নইচা বদলাইয়া রাজসিংহের কথা যদুনাথ কথঞ্চিতভাবে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা বঙ্কিমের রাজসিংহ নয়, একজন সামান্য সেনাপতির কাহিনী মাত্র। ইতিহাস অনুমোদিত রাজসিংহের মহত্ত্ব প্রকাশ না করিয়া রাজসিংহের কথা বলিতে প্রয়াস করিয়া তিনি সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা তো দেখাইয়াছেনই, পরন্তু অতিমাত্রায় মুসলমান-প্রীতিতেও পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত সমালোচক 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় দিয়াছেন অদ্য তাঁহাদের সম্বন্ধেই কিছু বলিব। গতবারে সেইরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলাম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে, জেব উন্নেসার অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়া বঙ্কিমের সৃষ্টিচাতুর্য্য দেখাইয়াছেন ও যেরূপ অপূর্ব্ব ভাষায় নিজের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অতঃপরে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থ "দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রে" রাজসিংহের সামান্য পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

"দেখিতে পাই, বঙ্কিম-সাহিত্যে অনভিজ্ঞেরা সম্প্রতি একটা ধূয়া তুলিয়াছেন যে, বঙ্কিম নাকি মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন। এ অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। সত্যবটে, 'মৃণালিনী' 'আনন্দ মঠ', 'সীতারাম' বিশেষতঃ 'রাজসিংহ' উপন্যাসে কোন কোন মুসলমান রাজা ও রাজপুরুষদিগকে তিনি আখ্যান বস্তুর যাথার্থ্য ও ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু সে চিত্রণ আদৌ বিদ্বেষ-মূলক নহে।"

হীরেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে, বঙ্কিম স্বদেশ প্রীতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত পোষণ করিতেন—

"পর সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহাকেও আপনার সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য"—।

অতঃপরে হীরেন্দ্রনাথ (১) "রাজসিংহের উপসংহারে বঙ্কিমের নিজের কথা" ও (২) 'বঙ্গশ্রী' হইতে উদ্ধৃত সীতারাম

ও চাঁদশা ফকিরের উক্তি ('প্রচার' হইতে গৃহীত) উদ্ধৃত করিয়া স্বকীয় উন্নত বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার "দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রে" যে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও প্রকৃষ্ট সমালোচনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, 'বঙ্গশ্রী' ইতিপূর্ব্বে তাহার কতক পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালার প্রধান বিদ্বজ্জন-সঙ্ঘ (সাহিত্য পরিষদ) আজ আর তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত হয় না। আজীবন সাহিত্য সেবা করিয়া ও বহুবার সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া যিনি শিক্ষিত মণ্ডলীর অবিমিশ্র শ্রদ্ধার্জ্জন করিয়াছেন, তিনি আজ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সভাপতির আসনে নাই, আছেন একজন ইংরাজী সাহিত্যে ও ইতিহাসে অগাধ পণ্ডিত (কিন্তু বাংলা ভাষার একজন সাধারণ অধ্যাপক ভিন্ন আর কিছুই নহেন), ইহাপেক্ষা আর অধিক পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? লোকে এক ভাষায় পণ্ডিত হইলেই অন্যভাষায় পণ্ডিত হয় না। আজ দলাদলিতে অসম্ভবও সম্ভবে দাঁড়াইয়াছে। হীরেন্দ্র বাবু হয় তো স্বাভাবিক সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া উত্তর করিবেন, "আমার শরীর ভাল নয়, আমি স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছি।" কিন্তু দেখিতে পাই, বার্দ্ধক্যানশক্ত প্রফুল্লচন্দ্রকে তো তিনিই বারবার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি পদে বরণ করিয়া সহকারী সভাপতিরূপে নিজেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। যে মহত্ত্ব তিনি স্তার প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যাপারে দেখাইয়াছেন, এখানেও কি তাহা হইতে পারিত না? বাঙ্গালা আজ নিতান্তই মৃত। নতুবা একদিন যেখানে হরপ্রসাদ, হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাংলা ভাষার অসাধারণ পণ্ডিতগণ নেতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন আজ তাহা একজন ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপকের পরিচালনায় চলিতেছে, কেন না পরিষদের কোন কোন কর্ম্মসচিব নাকি ইতিহাস-গবেষণায় স্তার যদুনাথকে গুরুর মত দেখিয়া থাকেন, ইহাপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? যাক্, সে অনুশোচনায় আমাদের আবশ্যক নাই, আমরা এখন প্রস্তাবিত বিষয়েরই আলোচনা করিব।

রাজসিংহ সম্বন্ধে আর দুইজন বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। একজন রায় সাহেব অক্ষয় কুমার দত্ত গুপ্ত, আর একজন পণ্ডিত প্রবর ডাক্তার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এচ ডি। ইনি 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে যতটুকু লিখিয়াছেন, আমাদের মত অল্প বুদ্ধি লোকের তাহা বুঝিতে বেশ কষ্ট হয়। অনেক চেষ্টা করিয়াও—এক কথা বারবার বলিয়াও—সব সময়ে প্রকৃতভাবে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন কি না বলা সুকঠিন।

যেমন, (১) "ইতিহাসকে dramatic বা নাটকীয় উপযোগিতা মণ্ডিত করিবার জন্য তাহার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রসকে ঘনীভূত করিয়া তুলিতে পারে।

(২) "পারিবারিক জীবনে যাহা সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—বিবাহ—এই বিদ্যুৎদগ্নিগর্ভ আকাশের তলে তাহার এক মুহূর্ত্তেই সমাধান হইতেছে।"

ইত্যাদি কথাগুলি শুনিতে বেশ বটে, কিন্তু প্রকৃতই দুর্ব্বোধ্য। তবে কয়েকটী কথা বেশ প্রণিধানযোগ্য।

বঙ্কিমের রাজসিংহ সম্বন্ধে মূলতঃ তিনি বলিতেছেন :—

(১) "বঙ্কিম যুদ্ধের ফলাদি স্থূল ঘটনা অবিকৃত রাখিয়াছেন—"

(২) "বঙ্কিমের ঐতিহাসিক বিবেক বা সত্যনিষ্ঠা যে ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকদের অপেক্ষা কম এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই।"

(৩) "রাজসিংহে ইতিহাসই প্রধান বিষয়; ব্যক্তিগত জীবন সমস্যা ইতিহাসের অনুবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র।"

(৪) "আখ্যায়িকা হিসাবে রাজসিংহ অতুলনীয় এবং ইহার গঠন কৌশলও অনবদ্য।"

ইত্যাদি বিষয়ে লেখক উৎকৃষ্ট বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষা ভাল, এবং রচয়িতার সংযত আলোচনা প্রশংসনীয় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সময় সময় মৌলিকতা বড় কম পরিলক্ষিত হয়।

একস্থানে ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"স্থানে স্থানে মুসলমানের বিরুদ্ধে একটু অযথা তীব্র সমালোচনা, একটু অসঙ্গত ও অশোভন বিদ্বেষ উদ্গীরণ ভিন্ন অন্য কোথাও এই উদ্দেশ্য (রাজপুতদের বাহুবল প্রতিপাদন) পরিস্ফুট হয় নাই।"

এইখানে হীরেন্দ্রনাথের কথা পাঠকবর্গকে স্মরণ করিতে বলি, "বঙ্কিম সাহিত্যে অনভিজ্ঞেরা সম্প্রতি একটা ধুয়া

তুলিয়াছেন যে বঙ্কিম নাকি মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন।” আমাদেরও প্রতীতি হইতেছে যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিম সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে অধিগত না করিয়া কেবল উহা ভাসা ভাসা দেখিয়াছেন। যিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সমদর্শী ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অসংযত উক্তি করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বিজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই তাহা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। সমালোচকগণের উপর আমাদের বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ না করিয়া অনেক জিনিষ নাড়াচাড়া করিয়া যেন পল্লব গ্রাহিতার পরিচয় না দেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ যে দয়া করিয়া তিনি দেখাইবেন কি যে “রাজসিংহের” কোন্ কোন্ স্থানে মুসলমানের বিরুদ্ধে অযথা তীব্র সমালোচনা এবং অসঙ্গত অশোভন বিদ্বেষ উদ্গীরণ রহিয়াছে? মফঃস্বলে তিনি কোন কোন কলেজে অধ্যাপকতা করিবার সময়ে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাহাতে সময় সময় নিজের নিরপেক্ষতাও তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইয়াছে। মুসলমানের স্বপক্ষে বঙ্কিমের প্রতি উপরোক্ত অশোভন উক্তির প্রয়োগও সেই অভিজ্ঞতার সহিত সংস্রব যুক্ত কি না তাহা কে বলিতে পারে?

তিনি লিখিয়াছেন, “জেবউন্নেসা দৃশ্যের ন্যায় দুই চারিটী দৃশ্য ছাড়া উপন্যাসোচিত গুণ খুব বেশী নাই। চরিত্র বিশ্লেষণ যদি উপন্যাসের প্রাণ হয়, তবে রাজসিংহে তাহার অবসর অপেক্ষাকৃত কম। ইতিহাসের প্রবল স্রোতে চরিত্রের বিশেষত্ব ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।”

এই কথাগুলির সহিত আমরা সম্পূর্ণ ভিন্নমত, আমরা আগামীবারে রাজসিংহের চরিত্রাবলীর সমালোচনা করিয়া এই উক্তির প্রতিবাদ করিব।

লেখক লিখিয়াছেন, “স্থানে স্থানে দুই একটী দৃশ্য অসম্ভবতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে, দরিয়ার মোগল অশ্বারোহীর ছদ্মবেশ, মাণিকলালের ঐন্দ্রজালিক চতুরতা রোমান্সের পক্ষেও ঠিক সম্ভব হয় না।”

এই উক্তিরও আমরা প্রতিবাদ করিব। তবে উভয়টীই মতামতের কথা। সকলের একমত হওয়া সম্ভব নয়।

তবে যে মৌলিকতার অভাবের কথা আমরা বলিতেছিলাম তাহা দেখিতে পাই প্রধানতঃ জেবউন্নেসা চরিত্রালোচনায়। এখানে নূতন কিছু না দিয়া রবীন্দ্রনাথকেই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন। এমন কি স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের ভাষাও তাহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—“ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে।”

ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—“ইতিহাসের প্রবল স্রোতে।”

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “আরামের সুখশয্যা চিতাশয্যার মত তাহাকে দগ্ধ করিল, তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখ সম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া অভিষেক করিল। তারপর আর সুখ পাইল না। কিন্তু আসল সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল জেবউন্নেসা সম্রাট প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতিতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত জগৎ বাসিনী রমণী—”

ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন “এই নবজাগ্রত প্রেম তাহাকে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য হইতে নির্ম্মমভাবে টানিয়া আনিয়া একান্ত রিক্ততার মাঝে দাঁড় করাইয়াছে তাহার সর্ব্ব অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাহাকে প্রেমের অতিদীনা ও অনুতপ্তা-পূজারিণীতে পরিণত করিয়াছে। তাহার সাহজাদীত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে সাধারণ মানবীর সমতলভূমিতে আনিয়া অধিষ্ঠিত করিয়াছে।

তিনি লিখিয়াছেন—

সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য হইতে নির্ম্মমভাবে টানিয়া আনিয়া একান্ত রিক্ততার মাঝে দাঁড় করাইয়াছে।

আর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া অভিষেক করিল। ইত্যাদি

এইরূপ অনেক কথা লিখিতে পারা যায় যে রবীন্দ্রনাথের ভাবে চিন্তা করিতে করিতে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ততঃ এই উপন্যাস খানি সমালোচনায় তিনি বিশেষ মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই।

আর একটী কথা বলা প্রয়োজন যে নিতান্ত নগণ্য আধুনিক একাধিক ঔপন্যাসিকের সমালোচনা করিতে

তাঁহাকে বরাবরই যত্নশীল দেখা গিয়াছে কিন্তু প্রসিদ্ধ লেখকের অনেক উপন্যাস তাঁহার সমালোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ যে কয়খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন—এমন কি অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক উপন্যাস “চন্দ্রা”র আলোচনা পর্য্যন্ত দূরে থাকুক, নামোল্লেখ পর্য্যন্ত তিনি করেন নাই। ইহা কি গিরিশচন্দ্রের উপন্যাস রচনার অক্ষমতা, না, লেখকের পরিচয়াভাব, ইহার বিচার পাঠকের উপর নির্ভর করাই বিধেয়।

এইবারে আমরা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয় কৃত সমালোচনার উল্লেখ করিব। দত্ত মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস ও প্রবন্ধের যেরূপ সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন আর যে সহজ ও সাবলীল ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহার যুক্তি, চিন্তাশীলতা, ভাবগাম্ভীর্য্য এবং বিশ্লেষণ শক্তি যে খুবই উন্নত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তিনি রাজসিংহের ইতিহাসের দিকটা না দেখাইয়া পারিবারিক এবং মনস্তত্ত্ব বিষয়ক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আলোচনা করিয়াছেন। আর বর্ত্তমান নিবন্ধ একমাত্র ঐতিহাসিক দিক অবলম্বন করিয়াই রচিত। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইতিহাস আলোচনা না করিলেও, তিনি যে বিষয়ে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

“ইহা কি অনুমানযোগ্য নয় যে, কালক্রমে কোন ঐতিহাসিক অভিনব গবেষণা বলে সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত করিয়া দিবেন যে, রূপনগরের রাজকুমারীর চিঠিখানি প্রকৃতপক্ষে রাজপুত চারণগণের কল্পনা মাত্র, উদিপুরীর রাজপুতহস্তে পতন এমন কি রাজপুতনায় ঔরঙ্গজেবের পরাজয় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কাল্পনিক বৃত্তান্ত, অথবা ঐ পরাজয়ের কথা সত্য হইলেও হিন্দুর বাহুবল বা রণকৌশল উহার কারণ নহে, অথবা ঐ ঘটনার মূলে অন্য এমন কারণ ছিল যাহা রাজসিংহের বা হিন্দুদিগের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয় নহে? তখন “রাজসিংহের” মূল্য কি থাকিবে? ঐতিহাসিকগণ কি এখনই টডের রাজস্থানকে কাব্যমাত্র বলিতে আরম্ভ করেন নাই? আর অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন কি? শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের “ঔরঙ্গজীব” নামক ইংরাজী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে রাজপুতগণের সহিত ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধের যে বিবরণ প্রদত্ত তাহা টড্ বা অর্ম্মি কাহারও প্রদত্ত বিবরণের সঙ্গে মিলে না।”

অক্ষয়বাবুর অনুমান ঠিকই হইয়াছে। স্যার-যদুনাথ টডের গবেষণামূলক কাহিনী চারণের উক্তি বলিয়াই উপেক্ষা করিয়াছেন। এবং তিনি যে যুদ্ধের বিবরণ দিয়াছেন তাহা টড্ ও অর্ম্মি উক্ত ইতিহাস বিরোধী। টডকে তিনি যেমন রাজপুতগণের চারণ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, তাঁহাকেও এক সময় অনেক সমালোচক অকারণে যশকীর্ত্তনকারী বলিয়া অভিহিত করিতে পারে, হয়তো বা পূর্ব্বকালীন বাদশাহ প্রদত্ত খেতাব বর্ষণ করিতেও দ্বিধা করিবে না, কিন্তু ১৭৫৭—১৭৭৮ সালের অর্ম্মি এবং ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক মাণুচীকে উড়াইয়া দিলে ইতিহাসই উড়াইয়া দিতে হয়। আজ তাই কর্ত্তব্যানুরোধে শিক্ষাগুরুর অতিশয়োক্তির প্রতিবাদ কল্পে লেখনী ধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। বঙ্কিমের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস সত্যাশ্রয়েই লিখিত, কোন তথাকথিত ইতিহাস বিশারদের সাধ্য নাই যে তিনি তাহা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইবেন।

তবে অক্ষয়কুমারের উক্তি ও ঠিক যে এই সব বিষয়ে মতদ্বৈধ হইলেও বঙ্কিমের চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ হইতে পারে না। তাই তাঁহার সহিত আমরা এক যে “কোন্ ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা গর্ব্বিতা জেবউন্নেসার অশ্রুধৌত বেদনাকাহিনীর যাথার্থ্যকে অন্যথা প্রতিপন্ন করিতে পারে?”

যদিও সময় সময় ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা কাব্যের সত্য “স্থিরতর, গম্ভীরতর, ও ব্যাপকতর,” তথাপি যে ইতিহাস সত্য, শাশ্বত এবং যাহা জাতিগঠনের আদর্শ, তাহাও যে সর্ব্বপ্রকার কাব্য ও সর্ব্ববিধ রস অতিক্রম করিয়া নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

রায়সাহেব অক্ষয়কুমার আরও দুই একটী বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। যেমন বর্ণিয়ার গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক Archibald Constable উদীপুরীকে উদয়পুর রাজবংশ সম্ভূতা মনে করিয়া ভুলবশতঃ লিখিয়াছেন—

"উদয়পুরে রাজবংশ যে গর্ব্ব করেন যে, তাঁহারা মুসলমানের সঙ্গে কখনও বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই, সে গর্ব্বের মূল্য কি ?"

রায়সাহেব আরও দেখাইয়াছেন যে, টডের কথা "Is a Rajputni pure in blood to be the wife of the monkey faced barbarian" ? বঙ্কিম এই কথাগুলি অনুবাদ করিয়া তাঁহার উপন্যাসজাত করেন নাই। ইহাতে বঙ্কিমের রুচি ও শুচিতাই প্রমাণিত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "রাজসিংহের ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ—উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কিনা জানি না, নায়িকা জেবউন্নেসা। বিধাতাপুরুষ কিরূপে নায়ক হইলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই, তবে সব কার্য্যের মূলেই বিধাতাপুরুষ এই হিসাবে অবশ্য তাঁহাকে নায়ক বলা যাইতে পারে। অক্ষয়কুমার যে জেবউন্নেসার বিবাহ ব্যাপারে টেনিসন হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—

Cursed be the social wants that sin
against the strength of youth
Cursed be the social lies that wrap
us from the living truth
Cursed be the sickly forms that err
from honest Nature's rule
Cursed be the gold that gilds
the straigten'd forehead of the fool !
—Locksley Hall.

ইহা গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, তাঁহার এই কথার অর্থ আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না "নবাবকের প্রতি ঔরঙ্গজেবের আচরণে সমর্থন যোগ্য কোনও ধর্ম্ম নাই।" কারণ বঙ্কিমচন্দ্র যে ঔরঙ্গজেবকে মূলতঃই ধর্ম্মশূন্য করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, রায় সাহেব নিশ্চয়ই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয়ের "বঙ্কিমচন্দ্র" পুস্তকখানি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকে নিজের কোন পরিচয় না দিলেও আমরা জানি তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত খ্যাতনামা অধ্যাপক—এম-এ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস। পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, উহাতে গ্রন্থকার অনেকস্থানে বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, আর তাঁহার ভাষাটী বড়ই সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। পুস্তকখানি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-পরিষদ্-সংস্করণের-সম্পাদকদ্বয় কর্ত্তৃক তাহা উল্লিখিত হয় নাই; তাহাতে আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

ডাঃ সেনগুপ্তের পুস্তকখানি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আমাদের উল্লেখ করিতে হইবে। সম্প্রতি "রাজসিংহ" সম্বন্ধেই তাঁহার মতামত আলোচনা করিব। তিনি বলিয়াছেন,—

"আজকাল কোন কোন লেখক ঔরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন এবং যে সকল কার্য্য নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত তাহাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবকে পরধর্ম্ম অসহিষ্ণু কপট চরিত্র বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন এবং সেই জন্যই একজন সত্যনিষ্ঠ সংযতাত্মা ধর্ম্মভীরু বাদশাহ চরিত্র এইরূপ বিকৃত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অপবাদ যে কিরূপ অমূলক তাহা প্রমান করা খুবই সহজ। তবু ইহার একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ছিলেন না। তিনি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন এবং প্রচলিত ইতিহাস বিকৃত না করিলেই তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার থাকে না। অর্ম্মি, টড, মানুচী—ইহারা ভারতবাসী নহেন। সুতরাং ইহাদের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে তাঁহার দৃষ্টি পক্ষপাত দোষদুষ্ট হইবে না, তিনি এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। এল্‌ফিনষ্টোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ নানা সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করিয়া যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহাতে ঔরঙ্গজেবের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহাতেও পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতা বা প্রজাবাৎসল্যের পরিচয় নাই বলিলেই চলে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছেন এইরূপ অভিযোগ আনা সঙ্গত হইবে না। সমসাময়িক ইতিহাস তাঁহার উপন্যাস অপেক্ষা অধিক প্রশংসমান নহে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকদিগের সহিত তুলনা করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উদারতাই প্রমাণিত হয়।..."

কোন্ কোন্ লেখক অন্যায় ভাবে ঔরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন তাহার উল্লেখ না থাকিলেও মূলতঃ

আমরা ডাঃ সেনগুপ্তের উপরোক্ত উক্তির সহিত একমত। কিন্তু অতঃপরে দেখিতে পাই তিনি সম্পূর্ণরূপে স্যার যদুনাথ কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। ডাঃ সেনগুপ্ত সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, ইতিহাস তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন না করিলেও দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু না দেখিয়া কেবল স্যার যদুনাথকে নির্ভর করিয়া যে সমস্ত উক্তি তিনি করিয়াছেন তাহা কিছুতেই সমর্থন যোগ্য নয়, এবং তাঁহার ন্যায় উদীয়মান সমালোচকের লেখনীতে তাহা বাহির না হইলেই আমাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"মোটের উপর 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ—

(১) মূলঘটনা ও প্রধান চরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা তাঁহাকে পদে পদে ঐতিহাসিক সত্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ঔরঙ্গজেব অনুদার "ধর্ম্মশূন্য" হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও ক্ষমতার অভাব ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার মত ক্ষমতাশালী নৃপতি খুব কমই দেখা যায়। তাহার দৃষ্টির প্রসার ছিল না, কিন্তু সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে তিনি অনন্য সাধারণ তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন এক স্ত্রী বুদ্ধি চালিত, শিথিল-শাসন, অক্ষম কামুক কাপুরুষের চরিত্র। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজেব প্রত্যেক ব্যাপারে নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন এবং তাহার পুত্রকন্যা বা ভগিনীর মধ্যে কেহ তাঁহার নির্দ্দেশের অন্যথাচরণ করিলে তিনি সমুচিত দণ্ড দিতে বিরত হইতেন না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, অতি সহজে জেবউন্নেসা বা উদীপুরী তাহাকে চালিত করিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, জেবউন্নেসা একজন প্রধান politician, মোগল সাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল একপ্রকার তাঁহার হাতে, অথচ রাজপুত যুদ্ধকালে জেবউন্নেসা আকবরের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং তিনি বিশবৎসর কারাগারে থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইরূপ কল্পনা ইতিহাসের বিকৃতি সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসে অগ্রাহ্য।

(২) "নির্ম্মলকুমারী ও ঔরঙ্গজেব সংবাদও ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার বিরোধী। ঔরঙ্গজেব অতিশয় মিতাচারী ছিলেন। তিনি চারি বার বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার চারি বেগম কখনও একসময়ে একসঙ্গে তাঁহার কাছে থাকে নাই। রাজত্বের শেষার্দ্ধে উদীপুরী বেগমই তাঁহার একমাত্র সহচরী ছিলেন। কিন্তু এই উপন্যাসে নির্ম্মলকুমারী ঔরঙ্গজেবকে যত অপমানই করুক বাদশাহ তাহার "বশীভূত" হইয়াছেন। ঔরঙ্গজেব কখনও কোনও নারীর কটাক্ষে মোহিত হইয়া তাহার দ্বারা চালিত হইবেন উহা উপন্যাসেও বিশ্বাস করা শক্ত। নির্ম্মলকুমারীর সঙ্গে বাদশাহের যে কথোপকথন হইয়াছে তাহতে দেখি নির্ম্মলের বাক্‌পটুতার কাছে বাদশাহ প্রতিপদে হার মানিতেছেন। মনে হয় নির্ম্মলের প্রত্যুত্তরগুলি পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা ছিল এবং সেই প্রত্যুত্তরের তীক্ষ্ণতা যাহাতে সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে সেই জন্য বাদশাহের কথাগুলিকে যথাসম্ভব দুর্ব্বল ও তাৎপর্য্যহীন করা হইয়াছে।

(৩) রঙমহালের ব্যভিচার, অনাচার, সরাবের সমারোহের এবং নর্ত্তক নর্ত্তকীর কলকোলাহলের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা ঔরঙ্গজেবের বংশধর জাহাঙ্গীর শাহের রাজত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

(৪) আর একটী ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। তিনি চতুর্দ্দিক হইতে ঔরঙ্গজেবের অক্ষমতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ঔরঙ্গজেব শুধু যে বাহিরের শত্রুর কাছেই পরাজিত হইয়াছেন তাহা নহে, পৌত্তলিকতার শত্রু হইয়া নিজের রঙমহালে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম হিন্দু আচার হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতেন। ঔরঙ্গজেব বিখ্যাত দেবদ্বেষী, তিনি এইরূপ কাজে অনুমতি দিলে তাঁহার স্ত্রৈণতাই প্রমাণিত হয়। নির্ম্মলকুমারী যোধপুরী বেগমের আশ্রয়ে থাকিয়া বাদশাহের কাছে হিন্দু রমণীর গৌরব সম্পর্কে অনায়াসে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া নিস্তার পাইবে ইহাও সম্ভব বা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এইখানেও বুড়ার উপর কন্দর্পের অত্যাচার হইয়াছিল এই ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন।

(৫) "যোধপুরী বেগমের যে চিত্র বঙ্কিম আঁকিয়াছেন ইতিহাস তাহা সমর্থন করে না। তিনি কাশ্মিরী রাজপুত্রের

কন্যা ছিলেন বটে কিন্তু তিনি মুসলমানী। তাহার নাম প্রথমে ছিল রহমতুন্নেসা এবং পরে ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে নবাব বাঈ আখ্যা দিয়াছিলেন।

(৬) "যুদ্ধাদি বর্ণনায়ও বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে নাই। প্রথমতঃ তিনি মেবার যুদ্ধকে অতিশয় বড় করিয়া দেখিয়াছেন। রাজপুত যুদ্ধের মূল কারণ যোধপুরের শিশু কুমার অজিতসিংহ এবং উহার প্রধান নায়ক দুর্গাদাস রাঠোর। এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল মাড়বারে এবং শেষ হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে অজিত সিংহকে আশ্রয় দিয়া এবং জিজিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে যাইয়া রাণা রাজসিংহ এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েন, এবং প্রভূত বিক্রমের পরিচয় দেন। বঙ্কিমচন্দ্র টডের বর্ণনায় প্রভাবান্বিত হইয়া মেবারকে মাড়বার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। মারাঠার সঙ্গে রাজপুতের মিলন তাঁহার উপন্যাসে খুব স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। কোন একজন হিন্দুকে বড় করিতে যাইয়া তিনি সমগ্র হিন্দুস্থানকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন।

(৭) "যুদ্ধের ফল যাহা লিখিয়াছেন তাহা অসত্য ও অবিশ্বাস্য। এবং এই জাতীয় বর্ণনায় রাজপুতের গৌরব বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

(৮) "রন্ধ্রপথে ঔরংজেবকে আবদ্ধ করার কথা বঙ্কিমচন্দ্র অর্ম্ম ও মনুচীর গ্রন্থে পাইয়াছিলেন এবং তিনি ইহাকে তাহার উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের চরিত্র ও যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে যে ধারণা আমরা ইতিহাসে পাই তাহার সঙ্গে এই পরাজয়ের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বেমানান হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বটে কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের নিকট হইতে আমরা উচ্চাঙ্গের কল্পনা দাবী করিতে পারি। তিনি যদি ঔরংজেবের চরিত্রের যথাযথ পরিকল্পনা করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি এই সকল রাজপুত কাহিনীর অসম্ভাব্যতা সহজেই অনুধাবন করিতে পারিতেন। মনে রাখিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের আমলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন এই গল্প অগ্রাহ্য করিয়াছেন।"

"সকল দিক হইতে বিচার করিলেই দেখা যায় ঔরঙ্গজেবের চিত্রে এবং রাজপুত যুদ্ধের কাহিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের দাবী মিটাইতে পারেন নাই; ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশ রূপকথার মত মনে হয়।"

আমরা বিস্তৃতভাবে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের যুক্তিগুলি উদ্ধৃত করিলাম, কেননা তিনি একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। এবং যেহেতু স্বভাবতঃ ছাত্রগণ তাঁহার কথা যুক্তি বিচার না করিয়াও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন, তাই আমরা তাঁহার সমগ্র কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া একটি একটি করিয়া উত্তর দেওয়াই সঙ্গত বোধ করিতেছি। তবে এই সমস্ত কথার উত্তর আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। পাছে পুনরুক্তি হয়, তাই দুই একটা কথায়ই শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের যুক্তিগুলির উত্তর দিতে প্রয়াস পাইব—

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মনুচি এবং অর্ম্মি একাধিক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং দেখিতেছি যে তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ তিনি প্রতিবাদ না করিয়া মানিয়াই লইয়াছেন। আমরাও তাই সমস্ত কথাগুলি মনুচী ও অর্ম্মি হইতেই উত্তর দিব, টড হইতে দিব না। কারণ টডের উপর স্যার যদুনাথের মত তাঁহারও বিশেষ শ্রদ্ধা নাই।

মনুচী ও অর্ম্মি বলেন, "ঔরংজেব বেগমসহ বন্দী হন, এবং মেবারের গিরিবর্ত্ম ও পর্ব্বতমালা রাণার সৈন্যকে এমন সুবিধা প্রদান করে আর রাণার রণ-কৌশল ও ব্যূহ প্রণালী এমন প্রশংসনীয় হয় যে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন।"

"রাজসিংহ কর্ত্তৃক রন্ধ্রপথে ঔরংজেবকে আবদ্ধ করার কথা" শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মানিতে আপত্তি না করিলেও ঔরঙ্গজেবের "পরাজয়ের কাহিনী" মানিতে আপত্তি হওয়ার কারণ কি? সন্ধির কথাও তো মনুচীই বলিয়াছেন, এবং এই বিষয়ে তিনিও দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করেন। সুতরাং ঔরঙ্গজেবের অতোটা লাঞ্ছনা হইলে সন্ধি সম্বন্ধেই বা কাহিনীটা বেমানান হইয়া পড়িবে কেন? শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত স্যার যদুনাথকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু স্যার যদুনাথ যে মাসীরী আলমগীরী ও খাফি খাঁন হইতে ইতিহাস লইয়াছেন তিনি তাহা সন্ধান নিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি? আর এই বাদশাহের তাঁবেদার বর্ণিত ইতিহাস যে একদেশদর্শী ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য নয় তাহা কেবল বঙ্কিমচন্দ্রই বলেন নাই, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণও শতমুখে বলিয়াছেন। এলফিনষ্টোনও

এইখানে কয়েকটী ছত্রে খাপিখাঁনকেই অনুসরণ করিয়াছেন। এলফিনষ্টোন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজপুত যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিও ভ্রান্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতেছি যে তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ "জিজিয়া কর ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয় এবং যশোবন্ত সিংহ তখন জীবিত ছিলেন" উক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। মেসার্স আর্ভিন. বল্ এখানে এলফিনষ্টোনের ভ্রান্তি দেখাইয়াছেন। স্যার যদুনাথের পুস্তকানুসারেও এলফিনষ্টোনের উক্তি ভ্রমাত্মক। অন্ততঃ এই বিষয়ে এলফিনষ্টোনের স্বপক্ষে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য প্রমাণ পাইবেন না। প্রমাণ যাচাই না করিয়া কাহাকেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করা অত্যুক্তি। আর সব দিক বিচার না করিয়া একজনের প্রদত্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া অপর আর একজনকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিবার প্রয়াস বিচারশূন্য ব্যক্তি দ্বারাই সম্ভব, ডাঃ সেনগুপ্তের ন্যায় বিচারে শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা নয়। সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে বঙ্কিমচন্দ্র কোন হিন্দু ঐতিহাসিক অথবা মুসলমানদের বিবরণ গ্রহণ না করিয়া যে প্রত্যক্ষদর্শী নিরপেক্ষ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বিবরণ দিয়াছেন তাহা ভালই করিয়াছেন। ডাঃ সেনগুপ্তও নিজে স্বীকার করেন যে, "প্রচলিত ইতিহাস বিকৃত না করিলেই কিছু বলিবার থাকে না। অর্ম্মি, টড্ মনুচী—ভারতবাসী নহেন—ইহাদের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিলে দৃষ্টি পক্ষপাত-দুষ্ট হয় না।" বঙ্কিম ইহাদের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত বিষয় বিচার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া বঙ্কিমের ইতিহাসের ব্যর্থতা সাব্যস্ত করিবার পূর্ব্বে একবার ঐ সমস্ত কাহিনী ভাল করিয়া পড়িয়া নিলে এই সমস্ত বিষয়ই আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। তিনি দেখিতে পাইতেন যে মনুচী অর্ম্মি উভয়েই মেবার-যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। কারণ ইতিহাসের উহা একটী অতি প্রধান বিষয়। আমি বিস্তৃত ভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় উহার উল্লেখ করিয়াছি।

জেবউন্নেসা যে একজন প্রধান politician এ বিষয়ে ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক Pringle Kennedy বলিয়াছেন যে মোগল সাম্রাজ্যের অনেক কাজ জেবউন্নেসা এবং উদীপুরী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত।

> Other womem of the harem whose names are mentioned as having influenced affairs are Fakrunnessa the eldest daughter of Aurongzeb and Udepuri. —Vol II. P. 86.

এই জেব উন্নেসার চরিত্রাদি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লাক্ষ্ণৌ ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই, (উহা 'রাজসিংহের' বাহির হইবার পরে সকলের গোচরে আসে), মনুচী হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গশ্রীতে দেখাইয়াছি যে ফকরুন্নেসা নামে ঔরঙ্গজেবের কোনও কন্যা ছিল না, ইনিই জেব উন্নেসা। আর তাহার চরিত্র সম্বন্ধে মনুচী একটী দীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন। অর্ম্মিও বলেন যে ইনিই শিবাজীর বীরত্বব্যঞ্জক চেহারায় মুগ্ধ হইয়া পিতার নিকটে তাহার মুক্তির জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন—সুতরাং বঙ্কিম এই সমস্ত কথা প্রবাদের ন্যায় ব্যক্ত করেন নাই। প্রমাণ ভিন্ন তিনি কোন কথা বলেন নাই। মণুচী একজন খাঁটি ঐতিহাসিক সুতরাং ঐ উক্তি (উহা নিছক কল্পনা নয়) ইতিহাসের বিকৃতি নয়। উহা ইতিহাসেরই অঙ্গ মাত্র।

বঙ্কিম ঔরঙ্গজেবের গুণ প্রকাশ করিতেও কার্পণ্য করেন নাই। তিনি ঔরঙ্গজেবকে "ঐশ্বর্য্যে, সেনাবলে গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চে" বলিয়াছেন। বঙ্কিম ঔরঙ্গজেবকে "বুদ্ধিমান, কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রাজগুণে গুণবান" বলিয়া তাহাকে পরিচিত করিয়াছেন কিন্তু কি কারণে ঔরঙ্গজেব আপনার জগৎ প্রার্থিত সাম্রাজ্য একেবারে ধ্বংশ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন তাহাও বর্ণনা করিতে কার্পণ্য করেন নাই। উহা বর্ণনায় যদি সত্য বলিয়া থাকেন তবে গুণ, আর যদি অসত্যের উপর জোর দিয়া থাকেন তবে তাহা দোষ। এখন দেখিতে হইবে বঙ্কিম কোন অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন কি না।

সুবোধ বাবু নির্ম্মল ও উদীপুরীর কথার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"ঔরঙ্গজেব কোনও নারীর কটাক্ষে মোহিত হইয়া তাহার দ্বারা চালিত হইবেন, তাহা উপন্যাসেও বিশ্বাস করা শক্ত"—

নির্ম্মলকুমারী কাল্পনিক চরিত্র, কিন্তু উদীপুরী ঐতিহাসিক। তাই উদিপুরীর কথাই আগে বলিব।

দারার মৃত্যু ঘটাইবার পরে ঔরঙ্গজেব জ্যেষ্ঠের উপপত্নী (concubine) উদীপুরীকে বেগমের আসনে উপবিষ্ট করান। ইনি অতিশয় রূপবতী ছিলেন। ঔরঙ্গজেব নিজে মদ্যপান করিতেন না, সরাবে তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল, কিন্তু উদীপুরীর অত্যধিক মদ্যপান তাঁহার জ্ঞাতসারেই হইত। তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াই কামবক্সের অসংখ্য অপরাধ ঔরঙ্গজেব মার্জ্জনা করেন (যদিচ সেই অপরাধে অন্যান্য পুত্রগণকে বন্দী করিয়াছিলেন), এমন কি স্যার যদুনাথের কথায় উদীপুরীর চরিত্রের অন্যান্য চাঞ্চল্যজনিত ব্যাপারও তিনি গায় মাখিতেন না, (যে ব্যাপারে একজন ধর্ম্মানুরাগী মুসলমানের প্রাণে বিষম ব্যথা না লাগিয়া পারে না)। under the spell of her beauty he pardoned the many faults of Kambuksh and overlooked her freaks of nature which must have shocked so pious a muslim. —Sarkar's History Page 64. Vl. I.

সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপার হইতে ঔরঙ্গজেবকে স্ত্রৈণ বলিলে দোষ হয় কি ?

এইবার নির্ম্মলের কথা বলিব। বাদশাহের কাছে তাঁহার কথা মিষ্ট লাগিত, ক্রমে নির্ম্মলকুমারী ঔরঙ্গজেবের নিকট আদরের বস্তু হইয়া উঠিল। যে আদরের বস্তু, তাহার কথাই ভাল লাগে। আদরের বস্তু মাত্রেরই সাতখুন মাপ; তাই তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতাও নিস্তার পাইতে পারে। কিন্তু কৌশলী বাদশাহের ইহাতে দুর্ব্বলতা প্রকাশ না পাইয়া বরং তীক্ষ্ণবুদ্ধিই প্রকটিত হয়। এই কথোপকথনের তাৎপর্য্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দিয়াছেন—

'নির্ম্মলকুমারী ঔরঙ্গজেবের নিকট ক্রমশঃ আদরের বস্তু হইয়া উঠিলেন। ইহার মধ্যে কন্দর্প ঠাকুরের কোন কারসাজি ছিল না; কাজটা শয়তানের। ঔরঙ্গজেব প্রত্যহ অবসরমত, সুখের ও আয়েসের সময়ে, "রূপনগরী নাজনীকে" ডাকিয়া কথোপকথন করিতেন। কথোপকথনের প্রধান উদ্দেশ্য রাজসিংহের অবস্থা ঘটিত সংবাদ লওয়া। তবে চতুর চূড়ামণি ঔরঙ্গজেব এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন যে হঠাৎ কেহ বুঝিতে না পারে যে তিনি যুদ্ধকালে ব্যবহার্য্য সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন।"

ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র কি ঔরঙ্গজেবের বুদ্ধিরই পরিচয় দেন নাই ? তাঁহার কূটনীতির প্রশংসা করেন নাই ? এতদ্ব্যতীত নির্ম্মলকুমারীকে দিয়া ঔরঙ্গজেবের আরও প্রয়োজন ছিল। চঞ্চলকুমারীকে রাজসিংহের হাত হইতে কাড়িয়া আনিতে পারিলেও সে হয়ত প্রাণত্যাগ করিবে। তাই ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন—

"কিন্তু এই বাঁদীটাকে যদি হস্তগত করিতে পারি, বশীভূত করিতে করিতে পারি, তবে ইহা দ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া আনিতে পারিব না ? এ বাঁদীটা কি বশীভূত হইবে না ? আমি দিল্লীর বাদশাহ, আমি একটা বাঁদীকে বশীভূত করিতে পারিব না ? না পারি তবে আমার বাদশাহী না-মোনাসেফ"। তাই ঔরঙ্গজেব নির্ম্মলের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করিতেন। নির্ম্মল যাহা বলিতেন তাহা হইত, যাহা চাহিতেন তাহা পাইতেন; কেবল বাহির হইতে পাইতেন না। এই সব বিষয়েই ঔরঙ্গজেবের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, তাহাতে কন্দর্পের কারসাজি ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে বাদশাহের কৌশল ও বুদ্ধিরই প্রশংসা করিয়াছেন। আর এই বুদ্ধিকৌশল দেখাইবার জন্যই তিনি বাদশাহের কথাগুলিতে সব সময়েই ঝাঁজ দেন নাই; কথাগুলি নিশ্চয়ই "দুর্ব্বল ও তাৎপর্য্যহীন" নয়, তবে বড়ই সন্তর্পণে ও সযত্নে প্রয়োগ করা হইয়াছে।" ইহাতেই বঙ্কিমের অদ্ভুত শিল্পকৌশল প্রকটিত হয়।

এইভাবে রূপবতী যুবতী সহায়হীনা নির্ম্মলকে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রাখিলেও বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবের অসংযমের কোন পরিচয় দেন নাই। ইহাতেই তো ঔরঙ্গজেবের চরিত্রোৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। তবে দীর্ঘদিন একত্র আলাপ-সংলাপনাদির পরে নির্ম্মল চলিয়া যাইতে তাহার মনে যে বিষাদ উপস্থিত হইল তাহা খুবই কলা সম্মত। বঙ্কিম বলিতেছেন—

"বুড়ার উপর যতটুকু কন্দর্পের অত্যাচার হইতে পারে বোধ হয় তাহা হইয়াছিল (বঙ্কিম নিশ্চিত নহেন তাই বলিয়াছেন "বোধ হয়") । ঔরঙ্গজেব প্রেমান্ধের মত বিচ্ছেদে শোকে শোকাকুল না হইয়া একটু বিষণ্ণ হইলেন মাত্র। ঔরঙ্গজেব মার্ক আণ্টনি বা অগ্নিবর্ণ ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য কখন পাষাণও হয় না।" এই বর্ণনায় চরিত্র সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কি শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হইতেছে না ?

এতাধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে একেবারে কামনাহীন ব্যক্তি কে আছে, আর বাদশাহও তখন পর্য্যন্ত শক্তই ছিলেন, গলিত নখদন্ত হন নাই। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে, কোনখানেই চরিত্র সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। বঙ্কিম ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছুই করেন নাই, বরং তাঁহাকে সাধারণ মানুষ করিয়াই গড়িয়াছেন। কিন্তু সেনগুপ্ত যে বলেন তাঁহার চার বেগম কখনও একসঙ্গে তাহার কাছে থাকে নাই,—এরূপ উক্তি ইতিহাসে নাই।* আর তিনি যে কখনও কোন নারীর কটাক্ষে মোহিত হইয়া কখনও চালিত হন নাই, এরূপ উক্তিও ইতিহাসে পাই নাই। সতর্ক বাদশাহ রঙমহালে কি করিতেন, না করিতেন, তাহা কাহাকেও জানিতে দেন নাই, সুতরাং তাহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা উচিত নয়, তবে 'কখনও' কথায় আমরা আপত্তি করি, কারণ স্যার যদুনাথই অনুরূপ লিখিয়াছেন।†

যোধপুরী বেগম সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বঙ্কিম তাহাকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে অঙ্কণ করেন নাই। কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই যে তাহার চিত্রও ইতিহাস হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বলেন 'তাহাকে হিন্দুর আচারে থাকিতে দিলে নাকি বাদশাহের স্ত্রৈণতাই প্রমাণিত হয়।' উদিপুরীর ব্যাপারে তিনি যে স্ত্রৈণই ছিলেন তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। যোধপুরীর ব্যাপারেও তাহা হইতে পারে না, এরূপ মনে হইবার কারন কি? আর তাঁহার দেবভক্তি কি ইতিহাস-অনুমোদিত নয়? দৃষ্টান্তস্বরূপে বলি যে, শাহজাদা আজম, মজম অপেক্ষা বয়সে ছোট, কিন্তু রোশেনারা বেগম আজমের সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে মজমের মাতা (বঙ্কিমের যোধপুরী বাঈ—কিন্তু আসলে নবাব বাঈ) মস্‌জিদে গিয়া নমাজ পড়েন নাই, হিন্দু দেবদেবীরই পূজা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান মানুচী বলেন "She offered sacrifice to idols that Mozom might be King." সুতরাং দেখিতেছি বঙ্কিম যে নবাব বাঈর দেবভক্তি ব্যাপারে ঔরঙ্গজেবকে সহনশীল করিয়াছেন—হৌক তাহাতে স্ত্রৈণতা প্রমাণিত,—তাহা নিরপেক্ষ ইতিহাস সমর্থিত।

অতএব দেখিতেছি বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবকে কতকটা স্ত্রৈণ (কিন্তু স্ত্রীবুদ্ধিচালিত নয়) করিয়া চিত্রিত করিলেও 'অক্ষম, কামুক ও কাপুরুষ করিয়া কখনও চিত্রিত করেন নাই,' বরং তাঁহার অনন্য সাধারণ তীক্ষ্ণতা, সংযমশক্তি, পরিশ্রমক্ষমতা ও কর্ম্ম-দক্ষতাই ছত্রে ছত্রে প্রমাণ করিয়াছেন। বঙ্কিম নিজেই বলিয়াছেন 'ঔরঙ্গজেবের রাজকীয় অনেক গুণ ছিল, কিন্তু পতন হয় ধর্ম্মহীনতার জন্য। সেনগুপ্তও তাহা যে স্বীকার করেন নাই, তাহা নয়, বরং তিনি বলেন "বঙ্কিম যে বলিয়াছেন ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য তাহা তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল ইহাতে তাঁহার দৃষ্টির সঙ্গে

---

* Anecdotes of Aurangzeb : ঔরঙ্গজেব দক্ষিণাপথ শাসনকালে আওরঙ্গাবাদ যাইবার পথে তাহার মাতুল খলিল খাঁর বাড়ীতে মামী হীরা বাঈকে (মামীর সপত্নী) দেখিবার জন্য বারহনপুরে যান। সংবাদ না দিয়াই বাদশাহজাদা গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া যান। হীরাবাঈ তখন গাছের নীচে একটী শাখা ধরিয়া গুণ গুণ স্বরে গান গাহিতেছিল, আর মামীকে দেখিয়াই ঔরঙ্গজেব অজ্ঞানের মত হইবার ভাণ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। মামী তাহাকে বুকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও শোকাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ৩।৪ দণ্ড অতীত হইলে ঔরঙ্গজেব পুনরায় চৈতন্য ফিরাইয়া পান। মামী বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "কি রোগ তোমার, পূর্ব্বে কি কখনো এরূপ আক্রমণ হয়েছিল?" কোন কথার উত্তর শাহাজাদা দেন নাই, পরে দ্বিপ্রহর রাত্রে বাকশক্তি ফিরিয়া পাইয়া বলেন, "রোগের কথা বললে কি ওষুধ দিবে?"

মামী উত্তর করে "ওষুধের কথা জিজ্ঞেস কচ্ছ? আমি তোমার জন্য প্রাণও দিতে পারি। কিন্তু ও মিনসে বড় খুনে, একথা জানলে তোমাকে খুন করবে, আমাকেও খুন করবে। তাকে কোন কথা বলো না।"

পরদিন প্রাতে ঔরঙ্গজেব তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ ঔরঙ্গজেবের দাসী ছত্তরবাঈকে বদলী দিয়া মামীকে ঔরঙ্গজেবের হাতে আনিয়া দেন।

স্যার যদুনাথ বলেন, হীরাবাঈ পত্নী ছিল না, মীরখলিল খাঁর উপপত্নী মাত্র।

স্যার যদুনাথ লিখিয়াছেন, ঔরঙ্গজেব নাকি মামী প্রদত্ত সরাব প্রায় পান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু মামী পরে তাহা পান করিতে দেন নাই।

Vide Sir Jadunaths History of Aurongzeb Vol I, Page 65-68.

* ঔরঙ্গজেব একসঙ্গে একাধিক পত্নীর সহিত বাস করিতেন না, ইহাও অর্থহীন।

দিলরাজ বাণু বেগমের কন্যা ১৬৩৮,১৫ ফেব্রুয়ারী, নবাব বাঈর পুত্র মহম্মদ ১৯ ডিসেম্বর ১৬৩৯ জন্মগ্রহণ করে। দিলরাজের কন্যা Zinutunnessa 5th. Oct. 1643 নবাব বাঈর পুত্র মজম 4th. Oct. 1643 জন্মগ্রহণ করেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকের দৃষ্টির মৌলিক সাদৃশ্য আছে, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের মতের উদারতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ও প্রমাণ।” ডাঃ সেনগুপ্ত ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মশূন্যতা সম্বন্ধে অস্বীকার করেন নাই। বঙ্কিম বলেন, অন্যান্য সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও এই ধর্ম্মহীনতার জন্যই তাহার পতন হইয়াছিল।

ডাঃ সেনগুপ্ত বলেন, “বঙ্কিম মেবারকে মারবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন···কোন একজন হিন্দুকে বড় করিতে যাইয়া তিনি সমগ্র হিন্দুস্থানকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন।”

মিঃ সেনগুপ্ত বোধ হয় কালের নিরূপণ বিষয়ে লক্ষ্য করেন নাই। মাড়োয়ারের উপর ঔরঙ্গজেবের প্রধূমমান ক্রোধ তাহার প্রাণে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। কিন্তু রাণী শিশু কুমারকে লইয়া পিতৃগৃহ মেবারে আশ্রয় লইয়াছেন সুতরাং ক্রোধ আসিয়া মেবারের উপরেই পড়ে। ইতিপূর্ব্বেই রাণা ঔরঙ্গজেবের মুখের গ্রাস চঞ্চলকুমারীকে কাড়িয়া আনিয়া তাহার ক্রোধানল জ্বালিয়া দিয়াছিলেন; পুনরায় জিজিয়া দিতে অস্বীকার করিয়া একখানি তেজস্বিতাপূর্ণ পত্র লিখিয়া সে অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাই যুদ্ধ হয় প্রথম মেবারে। এবং এই যুদ্ধ, অর্শ্মি এবং মন্দুচী হইতে বঙ্কিম দীর্ঘতর করিয়া রচনা করেন নাই। পরে পরাস্ত হইবার পরে আকবর যখন মাড়বারে যায়, সেইখানে সে যুদ্ধ মেবার হইতে মাড়বারে ছড়াইয়া পড়ে। সেখানেও কিছু না করিতে পারিয়া ঔরঙ্গজেব আকবরের অনুসরণার্থ দাক্ষিণাত্যে যান এবং জীবনে আর দিল্লী কি আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। এখানে বঙ্কিম অন্য কাহারও সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই তাহা নয় যেটুকু দরকার তাহাই বলিয়াছেন। মেবার ও রাজসিংহ দরকার তাহাই লিখিয়াছেন। দুর্গাদাস বা মাড়বার দরকার নয় বলিয়া তাহা লেখেন নাই। মন্দুচী এবং অর্শ্মিও মেবার যুদ্ধের বিবরণ আগে বিস্তৃতভাবে প্রদান করিয়া; পরে মাড়বারে গিয়াছেন। বঙ্কিমের মাড়বারে যাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ রাজসিংহ-ঘটিত বিষয় বিশেষের বর্ণনাই তাঁহার লক্ষ্যীভূত ছিল, মাড়বার বা দুর্গাদাসের সম্বন্ধে নয়। তবে দুর্গাদাস সম্বন্ধেও কথাপ্রসঙ্গে যে কিছু বলেন নাই তাহা নয়। তাই লিখিয়াছেন—

“চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণের পর যাহা ঘটিল তাহাতে ইতিহাস বেত্তারই অধিকার, উপন্যাস লেখকের সে সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আবার স্বয়ং ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আজিম আসিয়া ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন···মোগল এমন শিক্ষা আর কখনও পায় নাই।”

কথাটা খুবই ঠিক। ঔরঙ্গজেব ইহার পরেও ঊর্দ্ধ পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং তিনি কেবল মেবারের অভিযান নয়, দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়া দিল্লী, আজমীর কি মেবারে আসিবারই সুযোগ আর কখনও জীবনে হয় নাই।

অতএব দেখিতেছি, সেনগুপ্তের মন্তব্য “রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে” নিতান্তই যুক্তিহীন। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা তাঁহাকে ঐতিহাসিক সত্য হইতে কখনও বিচ্যুত করে নাই, বরং একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ঘটনা সমাবেশ ও চরিত্র সৃষ্টির গুণে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে অপ্রাকৃত চরিত্রও ঐতিহাসিক চরিত্রের সহিত এমনই খাপ খাইয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যেটুকু অনৈতিহাসিক বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন তাহাও ইতিহাসমূলক চরিত্র বলিয়াই মনে হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রাজধানীর ব্যভিচার, অনাচার ও নবাবের সমারোহের কথাও এতবার বলিয়াছি যে, আর তাহার পুনরুক্তি করিয়া পাঠকের বিতৃষ্ণা জন্মাইতে চাহি না।

আর একটী বিষয়ে ডাঃ সেনগুপ্ত বড়ই ভুল করিয়াছেন। মেবার যুদ্ধকালে জেবউন্নেসা বন্দী ছিলেন না, তাহার পরে ছিলেন। ১৬৭৯ সালের অক্টোবর হইতে মেবারের যুদ্ধ আরম্ভ হয়—আর জেবউন্নেসা বন্দী হন ইহার দুই তিন বৎসর পরে। কালের নিরূপণ না করিয়া এই সম্বন্ধে লেখা ভাল হয় নাই। কারণ পূর্ব্বে বিশ্বাস ভাজন থাকিলেও বিদ্রোহী ভ্রাতাকে সমর্থন করিয়া বিশ্বাস হারাইয়া ফেলা মোটেই অস্বাভাবিক বা অনৈতিহাসিক নয়। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সম্বন্ধে জেবউন্নেসার ছিল—just cause. এই সম্বন্ধে “ধর্ম্মতত্ত্ব” হইতে বঙ্কিমের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

গুরু—যে মনুষ্য রাজা, মনুষ্যকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু।

তাই আমেরিকার কংগ্রেস ও বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ভক্তির পাত্র।

শিষ্য—তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা ঔরঙ্গজেবের ন্যায় একটা নরাধমের। বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে?

গুরু—কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্ত্তব্য।

'বঙ্কিম ঐতিহাসিক ছিলেন না', ডাক্তার সেনগুপ্তের এই কথাও নিতান্তই অর্থহীন। 'ঐতিহাসিক' শব্দের অর্থ যদি নিরপেক্ষভাবে ঘটনা পর্য্যালোচনা হয়, তবে তাঁহার ন্যায় ঐতিহাসিক খুব কমই ছিলেন। স্যার যদুনাথও স্বীকার করিয়াছেন যে, বঙ্কিম রাজপুত কবিদের বিবরণ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার ন্যায়-বিচারশক্তিরই প্রমাণ দিয়াছেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্কিম ইতিহাসই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জানিতেন। তিনি ১৮৮৮ সালে আলিপুরে বদলী হন, তৎপরে আর কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। মহাপ্রস্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (১৮৯৪) তিনি মেটকাফ্ হল হইতে বহু ইতিহাসের বহি আনিয়া পড়িতেন। এই সব পড়িয়াই মৃত্যুর ৬ মাস পূর্ব্বে "রাজসিংহ" প্রকাশ করেন, এবং ইহাকে একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া অভিহিত করেন। বঙ্কিম সম্পূর্ণভাবে তৈয়ার না হইয়া কোন কথা বলিতেন না, তাই টড্ হইতে নিয়াও পূর্ব্ব সংস্করণকে 'ক্ষুদ্র কথা' ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই, এবং তাঁহার মতে দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায় আসে না। সুতরাং আবশ্যকীয় যাবতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ণ করিয়া যে উপন্যাস লিখিয়াছেন সেই রাজসিংহের ব্যাপারে বঙ্কিমকে ইতিহাসজ্ঞ বা ঐতিহাসিক বলিব না তো কাহাকে ইতিহাসজ্ঞ বলিব? (ক্রমশঃ

বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাস

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়।

"বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি উপন্যাসে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপাদানগুলির প্রয়োগে তিনি Shakespeare-কেই অনুসরণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সত্যকে যথাযথ রক্ষা করিয়া Shakespeare নাটক রচনা করেন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রও উপন্যাস রচনা করেন নাই। তাহা করিলে বঙ্কিমের উপন্যাস ইতিহাসের পুস্তকই হইত, সাহিত্য হইত না। বঙ্কিমচন্দ্র Realistic উপন্যাস রচনা করেন নাই। তিনি যে উপন্যাসগুলি রচনা করিয়াছেন, সেগুলি Idealistic কিংবা Romance. এই Romance সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন দেশ ও কালের দূরত্ব।

Distance lends enchantment to the view,
Decks the mountain with azure hue.

যে দূরত্ব বন্ধুর, রূঢ়, কর্কশ, বিশৃঙ্খল পর্ব্বতগাত্রকে মেঘলোকের মেদুরতা, স্নিগ্ধতা ও স্বপ্নমাধুর্য্য দান করে সেই দূরত্বই আখ্যানবস্তুকেও স্বপ্নের মাধুর্য্য ও শোভনতায় মণ্ডিত করে। এই স্বপ্ন-মাধুর্য্যই Romance-এর প্রাণ। এই স্বপ্নমাধুর্য্যের জন্যই বঙ্কিম অতীত কালের দিকে কল্পনাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কোন কোন উপন্যাসে বঙ্গদেশ হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশের আবেষ্টনীর সন্ধান করিয়াছেন। ইতিহাসকে উপন্যাসের উপকরণ ও উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করিবার ইহাই কারণ।

"স্বপ্ন-মাধুর্য্য ছাড়া বঙ্কিম ইতিহাস হইতে আরও দুইটি অঙ্গ লাভ করিয়াছেন। একটি অঙ্গ—চরিত্র। পুরাণকাররা যে সকল জ্বলন্ত চরিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, দেশের কবি ও নাট্যকারগণ সেই সকল চরিত্র আশ্রয় করিয়া কাব্য ও নাট্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণাঙ্গ, সুপরিকল্পিত 'চরিত্র' পাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাস রচনায় যে চরিত্রগুলি পাইয়াছেন—সেগুলি বিধাতার সৃষ্টি। বিধাতার সকল সৃষ্টিকেই কল্পনা দিয়া পূর্ণাঙ্গ করিয়া লইতে হয়। ইতিহাসে বঙ্কিম চরিত্রগুলির কাঠামো পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার অলৌকিক সৃষ্টিকল্পনার সাহায্যে সেগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া লইয়াছেন। বিধাতা ও শিল্পী উভয়ের সহযোগিতায় যে চরিত্রগুলি রচিত হইয়াছে, সেগুলি প্রকৃত ঐতিহাসিক চরিত্র ও কল্পনার চরিত্র দুই-এর চেয়েও অধিকতর

জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস নরনারীর বহিরঙ্গের জীবনের কথাই বলে, তাহাদের মনের বার্ত্তা বলে না। উপন্যাসে কেবল বহিরঙ্গের জীবনের কথা বলিলে চলে না, মনের বার্ত্তাও জানাইতে হয়, মনোবৃত্তিগুলির সংগ্রামের ইতিহাসও দিতে হয়। কাজেই বঙ্কিমকে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে নূতন করিয়া গড়িতে হইয়াছে। ইতিহাস হইতে একটি চরিত্র যখন উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন চরিত্রগুলি দুই ভাবে উন্মেষিত হইতে পারে। কোন চরিত্র বিশেষের পক্ষে যেরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—সে সকল কাজ করা সম্পূর্ণ তাহার পক্ষে সুসমঞ্জস—যে ভাবে স্বকীয় আদর্শ অনুসারে তাহার পক্ষে চলা সম্ভব—ঠিক সেই ভাবেই উপন্যাসের ক্ষেত্রে সে অগ্রসর হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিল্পীর কল্পনা ইতিহাসেরই অনুগামী। আর এক ভাবে চরিত্রটি অগ্রসর হইতে পারে—সে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শিল্পীর সম্পূর্ণ শাসনাধীন হইয়া অগ্রসর হইতে পারে অর্থাৎ শিল্পী নিজেরই আদর্শ ও জীবন-ব্রতকে তাহার জীবনে সঞ্চারিত করিতে পারেন। শিল্পীর নিজেরই কোন মহত্তর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য চরিত্রটি নিয়োজিত হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি প্রধানতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে। প্রধানতঃ বলিলাম এই জন্য রাজসিংহ উপন্যাসে তিনি প্রথম শ্রেণীর পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ইতিহাস হইতে অনেকটা দূরে চলিয়া গিয়াছে।

"বঙ্কিম ইতিহাস হইতে আর একটি অঙ্গ পাইয়াছেন—তাহা দূরবর্ত্তী দেশ ও কালের পরিবেষ্টনী। এই পরিবেষ্টনীর জন্য তাঁহাকে কল্পনার সহিত অনুমান-বৃত্তির প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক পরিবেষ্টনী সৃষ্টিতে।

ফলে, বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বহিরঙ্গের দিক্ হইতে ইতিহাস হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরঙ্গের দিক্ হইতে ইতিহাসের মতই পরম সত্য। অতীত কালের ঘটনাপরম্পরার ধারা তিনি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেন নাই বটে, কিন্তু সেকালের আবেষ্টনী ও জীবনযাত্রা, সেকালের নরনারীর চিন্তা, আদর্শ, অনুভূতি, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি, রীতি প্রকৃতি ইত্যাদির যথাযথ ইতিহাস আমরা উপন্যাসগুলির মধ্যে পাই। এ হিসাবে দেখিতে গেলে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি এ দেশের অন্তর্জীবনের যথাযথ ইতিহাস। এমন কি, তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলিও বঙ্গদেশের একাধিক শতাব্দীর সামাজিক জীবনের ইতিহাস। যাঁহারা দেশের অন্তর্জীবনের ইতিহাসকে প্রাধান্য দান করেন, তাঁহারা বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি হইতে একাধারে সাহিত্যের রস ও ইতিহাসের জ্ঞান লাভ করিবেন।

যে পরিবেষ্টনী সৃষ্টির দ্বারা বঙ্কিম মৃত ইতিহাসকে নূতন করিয়া গড়িয়া জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার উপাদান তিনি শুধু ইতিহাস হইতেই পান নাই। ঐতিহ্য, জনপ্রবাদ, সাহিত্য, সামাজিক জীবন ইত্যাদি বহু ক্ষেত্র হইতে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতিবৃদ্ধ আত্মীয় আত্মীয়ার মুখ হইতেও অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে তিনি যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহার অবাধ কল্পনা-শক্তি এবং অনুমানের কৃতিত্ব। অনুমান-শক্তির বলে তিনি সকল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন।

"বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ দেশপ্রীতিও তাঁহাকে ঐতিহাসিক আখ্যান বস্তুগ্রহণে প্রণোদিত করিয়াছিল। দেশের গৌরব ও অগৌরব সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও অভিজ্ঞতা এবং দেশের প্রতি দরদ ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া তিনি পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। দেশের প্রতি বঙ্কিমের মমতা ও স্বজাতিবাৎসল্য দুইভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্য দিয়া ফুটিয়াছে। দেশের যাহা কিছু গৌরব—জাতির যাহা উচ্চতম সংস্কৃতি—দেশের মহাপুরুষগণের স্বপ্ন—দেশের সাধকগণের সাধনার আদর্শ তিনি এইগুলির মধ্য দিয়া প্রচার করিয়াছেন? এ বিষয়ে যাহা অসত্যের ধূলি ধূমে আচ্ছন্ন ছিল তাহাকে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। কিন্তু দেশের গৌরবের স্বপ্নেই তিনি বিভোর হইতে পারেন নাই; তাঁহার দেশ ও জাতি যে অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত এই বাস্তব সত্যকে তিনি কি করিয়া স্বপ্ন দিয়া ঢাকিবেন? যে মহাপাপ যে দুর্ব্বলতা যে হীনতা, নীচতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্ব্বুদ্ধির জন্য দেশ অধঃপাতে গিয়াছে ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে সেগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং দেশের দুর্গতি ও দুর্গতির জন্য ক্রুদ্ধ

অভিমানে স্বজাতিকে ধিক্কার দিয়াছেন এবং হাহাকার করিয়াছেন।"

* * *

কালিদাস রায়ের "আহরণী"

শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ, কাব্যতীর্থ,
পুরাণতীর্থ, বেদতার্থ।

কবিকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, কবির কাব্যসাধনার বৈশিষ্ট্য ও বাণীর কথা বুঝিতে হইলে এই শ্রেণীর চয়নিকা গ্রন্থের প্রয়োজন আছে। ভূমিকায় সম্পাদকগণ বলিয়াছেন, "নানাকারণে কেবলমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিকেই একত্র করার সুবিধা হইল না।" কালিদাসবাবুর যে সকল কবিতা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে তাহার অনেকগুলিই ইহাতে পাইলাম না বটে, কিন্তু যেগুলিকে পাইলাম তাহাতেই তাঁহার সমগ্র কাব্যগ্রন্থগুলিকে মনোযোগ সহকারে পড়িবার আগ্রহ জন্মে।

ব্রজবেণুর কবির ব্রজকবিতা ৭টি পাইতেছি ব্রজকথা পর্য্যায়ে। এই কয়টি কবিতা পড়িলেই ব্রজবেণু পড়িতে আগ্রহ জন্মে। লোকে কালিদাসবাবুর অন্ধকার বৃন্দাবনের প্রশংসা করে। আমরা দেখিতেছি, উহার চেয়ে ঢের ভাল কবিতা এই চয়নেই রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ—'লুকোচুরির' নাম করা যাইতে পারে। লুকোচুরির কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করি—

হ্রদের সলিলে ডুবিয়া ভাবিলি এইবার বুঝি যাব হারি
জলে ডুব দেওয়া নূতন তোর কি সহচারী?
দেরী হ'লে তুই উঁকি দিস্ আধ আঁখি মেলি
ফোট ফোট নীল কুমুদকলিতে ধ'রে ফেলি
রাঙা পাণি দুটি বশ ত মানে না, করে কেলি
জাগে যে মৃণালে কমল কলিকা সারি সারি
ঢেউয়ের নাচন নটবর তোর গোপন নটন অনুকারী।
শেষে ঘরে ঘরে হৃদয়ে হৃদয়ে লুকাতে লাগিলি ননীচোরা
গৃহকোণগুলি খুঁজিতে কি বাদ দিব মোরা?
প্রিয়ার প্রণয়ে প্রতিবিম্বিত তোর প্রীতি
সখার সখ্যে শুনি তোর দূর বেণু-গীতি
চিনিবে শিশুর চারু চাপল্যে নিতি নিতি
নিষেধ মানে না গোপন কথাটি কয় ওরা।
কায়াত লুকাস্, ছায়াটি লুকাতে পারিস না যেরে ননীচোরা।

এ সকল পংক্তিতে আলঙ্কারিকতার অন্তরালে একটি তত্ত্বকেই কবি রসে বিগলিত করিতে পারিয়াছেন। আবার 'উভয় সঙ্কটে'...

কারো গায়ে যদি বাণ নাহি ছুড়ে কালা
সারা বরষেও যায়নাক তার সে অবহেলার জ্বালা।

এই দুই পংক্তিতে সমগ্র ব্রজলীলাটুকু ঘনীভূত হইয়া আছে। চিত্রকথা পর্য্যায়ের কবিতাগুলি 'তীর্থেরপথে' ও 'লালাবাবুর দীক্ষা' কবিতা দুইটি সুন্দর। রঙ্গব্যঙ্গ পর্য্যায়ের 'ছত্রবিয়োগে', 'গুরু চাই' ও 'বনেদী ঘরের ছেলে'—এই কবিতা তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাগুলিতে তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গরস নিহিত আছে। শক্তিমান সাহিত্যিকগণ সাহিত্য সাধনা ভুলিয়া পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি করেন, এই ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করিয়া কবি সিজুবনের সরস্বতী লিখিয়াছেন—তাহার ১ম দুই ছত্র—

মনসা সিজুর কুঞ্জে জননি এসেছ কমল কানন ছাড়ি
মানসী দেবতা মনসা হয়েছে বীণাটিতে শুধু চিনিতে পারি।

আর একটি পংক্তি—

শ্রীপঞ্চমী কি নাগপঞ্চমী বলিয়া পাঁজিতে হইল জারি।

ভারতভারতী পর্য্যায়ের কবিতাগুলিতেই কবির বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য। এইগুলিতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম্মসাহিত্য শিক্ষা—এককথায় সমস্ত কালচার কবি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছেন—এইগুলির রচনাভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির অনুকৃতি নহে। কবি সর্ব্বত্র সাফল্য লাভ করিয়াছেন একথা বলিতে পারি না—তবে নূতন ভঙ্গিতে নূতন উপাদান লইয়া রচিত এই কবিতাগুলি বাঙ্গালাদেশের কাব্যজনতায় ডুবিয়া যাইবে না। এইগুলির সৃষ্টি চমৎকারিতা, দেশাত্মবোধ ও দেশীয় শিক্ষাসংস্কারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এইগুলির রসাভিজাত্য সাধারণ পাঠকের কাছে হয় তো শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিবে না—কিন্তু বিদ্বৎসমাজ ও রসিকসমাজ কিছুতেই এইগুলিকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। এইগুলির পরিচয় দিতে হইলে একটি প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখিতে হয়, আমি কেবল কিছু কিছু নিদর্শন দিয়া যাইব।—

তব কূলে আজি মম কল্পনা হেথা হতে ছুটে অস্তলোকে
ঘন চিতাধূম আবছায়া ফাঁকে মহাপথ জাগে আমার চোখে।

পিতা পিতামহ পরিজন সহ সবে এই পথে গিয়াছে চলি,
শত শত পানি দেয হাতছানি ডাকে আয় আয় আয় রে বলি।
অনাবিষ্কৃত পথ রহস্য ভয়ে নিরাশায় আকুল করে,
তব আশ্বাস শীত নিশ্বাস ললাটের স্বেদবিন্দু হরে।
রুদ্ধ নয়নে হেরিতেছি আজি সজ্জিত মোর আপন চিতা
অনলে এ তনু আহুতি স'পিতে আহুত স্বজন বন্ধু মিতা।
উঠে অবিরল হরি হরিবোল রোদনের রোল আমায় ঘিরে
যাক্ মা সে কথা—কত না চিন্তা উঠে মনে আজ তোমার তীরে।
(সুরধুনী)

কি সংশয়ে উদ্বেলিত সিন্ধুর তরলচিত্ত, কোন্ ভাবাবেগে ?
সেই আদিকাল হতে কেবলি করিছে প্রশ্ন শুধু মেঘে মেঘে
উত্তরে বসিয়া তুমি প্রেরিছ নদীর স্রোতে সদুত্তর যত—
অটল গম্ভীর স্থির নিঃসংশয় শান্ত ধীর আচার্য্যের মত।
যুগ যুগ হতে চলে এই প্রশ্নোত্তর লীলা, প্রশ্ন না ফুরায়
সিন্ধুর মনের দ্বিধা দ্বন্দ্বের অশান্তি ক্ষুধা তবু না জুড়ায়।
কোন্ সেই মূল তথ্য যারে জেনে ধ্রুবসত্য তুমি অবিচল,
ক্ষুব্ধ সিন্ধু নাহি জেনে জাগে তার ভ্রান্ত মনে প্রশ্নই কেবল।
(হিমাদ্রি)

দারুমালিকার ছলে কঙ্কাল শৃঙ্খলে ভক্ত শ্রীকণ্ঠের শাসনে,
করিয়াছ বঞ্চিত সংযম কুণ্ঠিত হরিনাম বিন বৃথা ভাষণে।
(তুলসী)

তীর্থঙ্কর জিন পদরেণু করিল না ও বুকে সুরভি রেণু সৃষ্টি
ভজোরাগ হরিকণ—হেয়ে গেল বুদ্ধের সত্ত্ববিমল প্রেম দৃষ্টি,
নিমাইএর অশ্রুও নিষ্ঠুর বুকে তব খুঁজিতে নারিল মধু গন্ধ
গেল বৃথা গুঞ্জরি ভক্তের মধুকরী, কবিদের প্রেম গীতিছন্দ।
শুভ্র সুরভি হবে পূণ্য পরাগে কবে, পাবে মধুবৃন্তের রন্ধ্রে,
সে শুভদিনের লাগি বসে আছি কবে জবা তোমাতে পুজিব
শ্যামচন্দ্রে। (জবা)

এই পর্য্যায়ে সোম, ইন্দ্র, শঙ্খ ইত্যাদি অনবদ্য রচনা।

কাব্যকণা পর্য্যায়ের কবিতাগুলি সবই Epigrammatic, বিশুদ্ধ Epigram নয়, অনেকগুলিতেই Lyrical touch আছে। যেমন, তুলসী দূর্ব্বা, তীর্থ। দূর্ব্বা যখন বলিতেছে—

তৃণান্বিত দাস্য আমি, কাড়িয়া লবোনা মোর সেবা অধিকার
পাষাণবিগ্রহ পায নিগ্রহের বেদিকায় হব শুষ্ক মৃত
জীবনময়ীর গায়ে অক্ষয় যৌবন সম আমি রোমাঞ্চিত।

তখন Lyrical intensity Epigrammetic ছাঁদকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

স্মৃতিকথ পর্য্যায়ে—চিত্তবিয়োগে চমৎকার রচনা। কবি দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—

তোমার জেত রণে আজি কাঁদছে নারী পুত্রগণ
সুজাতারা অন্ন নিয়ে করছে তোমায় অন্বেষণ।
মোদের মনের দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার সিংহাসন
শূন্য আজি। বসবে কেথা ? পারবে ছুঁতে অন্যজন।
তোমার খড়ম পূজ্য পরম সকল অর্ঘ্য করুক জয়
ঐ পাদুকা তন্ত্র শাসন চলুক এখন বঙ্গময়।
হাজার হাজার শিখণ্ডীর আজ বিনিময়েও যদিই পাই
ভীষ্ণ, তোমায় বিশ্বমানব-রণাঙ্গণে আবার চাই।"

কবি দেশবন্ধুব 'চিন্তাঘন কর্ম্মনিবিড়' জীবনকে লক্ষ জীবনের সমান বলিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।

অল্পে তোমার অল্পায়ু কয় আয়ুষ্কালেও নওক হীন
মোদের যাহা একটি বরষ তোমার তাহা একটি দিন।
এম্নি তোমার চিন্তাঘন কর্ম্ম নিবিড় দণ্ড পল
এক জীবনেই পেলাম মোরা লাখ জীবনের বাঁচার ফল।
জীবনই নয পেঁচার জীবন খাঁচার জীবন লাখ বছর
শ্বাস গ্রহণই জীবন যদি হাপর তবে প্রায অমর।
দশকোটি দিন শূন্য হলে যোগেও শেষে শূন্য হয়,
তেমন জীবন একটি তোমার মরণ পলের তুল্য নয়।

সামাজিক পর্য্যায়ে কবি সমাজের অনাচার ও অবিচারগুলিকে কশাঘাত করিয়াছেন। কাব্য হিসাবে এইগুলির বিশেষ মূল্য নাই—এগুলির ভাষা খুব শাণিত হইলেও এগুলি Journalism এর গণ্ডীতে পড়ে।

পল্লীচিত্র—রচনায় কবি সিদ্ধহস্ত। পর্ণপুটের পল্লী কবিতাগুলির জন্য এক সময় কবি পল্লী-কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কৃষাণীর ব্যথা, পল্লীবালার ব্যথা ইত্যাদি কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ।

গার্হস্থ্য চিত্র পর্য্যায়ে বৌদিদি একটি প্রথম শ্রেণীব কবিতা।

তোমার চরণে দেবরের শিরে মধুর মিলন স্তবে,
উভয় পরশে উভয়ই পাবন স্বর্গীয় গৌরবে '
তব চরণেরে ধন্য করেছে দেবরের কেশগুলি
ধন্য করেছে দেবরের শির তোমার চরণধুলি।
যুগে যুগে তুমি ভরতে পড়িছ ঘরে ঘরে লক্ষণে
তোমার লাগিয়া ধরিতেছে জটা তাহারা ভবনে বনে।

এই পর্য্যায়ের 'বন্ধ্যার খেদ' একটি চমৎকার কবিতা। বন্ধ্যার মুখে কবি বসাইয়াছেন—

আমার নারী-জীবনচূড়ায় বাজল নাক ডঙ্কা রে
শূন্য আমার ময়ূর-সিংহাসন;
হলো না হায় গৃহে আমার ঝিনুক বাটীর ঝঙ্কারে
বাল গোপালের সোহাগ আমন্ত্রণ ॥

এই পর্য্যায়ের অধিকাংশ কবিতা বাৎসল্যরসে স্নিগ্ধ। গৃহজীবনের মাধুর্য্য ফুটাইতে এক কবি যতীন্দ্রমোহন ছাড়া বর্ত্তমান কবিদের কেহই পারেন না।

পৌরাণিক পর্য্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে দুর্ব্বাসা, রাজর্ষি ভরত, একলব্য, মেনকা, বজ্র ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতা। এই শ্রেণীর কবিতাগুলি পর্ণপুটের ধ্রুব, প্রহ্লাদ, মথুরার দূত ইত্যাদি কবিতার মত পৌরাণিক কাহিনীর Symbolical বা Spiritual Interpretation. বজ্র একটি Symbolical কবিতা—কবি বজ্রকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

মঙ্গলার হাতে খড্গ মঙ্গলের হস্তে তুমি শূল,
আপনারে বৃত্র ভাবি বজ্র, তোমা নিত্য করি ভুল।

স্বভাবধর্ম্ম ও অন্ধকার তত্ত্বমূলক কবিতা। অন্ধকার কবিতার শেষ চারি চরণ—

ধ্যানরূপে ঘনাইয়া এস ভরি দুটি আঁখিপাত,
তুমি বিনা লভিব না এ শ্মশানে শম্ভুর সাক্ষাৎ।
হারাবে বিশ্বের আলো পথভ্রমে হ'ব না শঙ্কিত
শঙ্করের অট্টহাস্যে মনোমার্গ হবে আলোকিত।

মন্দিরে না সিন্ধুনীরে—কবিতায় কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মন্দিরে কি সিন্ধুনীরে কোথায় আছ জগন্নাথ? শেষে দুইয়েতেই তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

মানব তোমায় চামর ঢুলায়, দানব ঢুলায় ঝঞ্ঝাবাত,
দারুব্রহ্ম বারিব্রহ্ম তোমায় করি প্রণিপাত।

প্রেমাত্মক পর্য্যায়ের বাসর স্মৃতি ও নীরে স্মৃতি রসগর্ভ কবিতা।

নিসর্গচিত্র—ঋতুসংহার ও কুমারসম্ভব সাঙ্গরূপকমূলক কবিতা মাধুর্য্যের সহিত চাতুর্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়। কবি ছয়টী ঋতুকে ষড়ানন জননী উমার জীবনের ছয়টী দশার সহিত কৌশলে উপমিত করিয়া রসসৃষ্টি করিয়াছেন। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' কবিতায় কবিগুরুর অনুসরণে রূপ-লোক হইতে ভাব-লোকে যাত্রা করিয়াছেন। বসন্ত বিদায় কবিতাটি ব্যঞ্জনার সাহায্যে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে।

গোলাপী কেশর ঝরে রাখি বৃন্তে জামরুল গুটী,
বেলাশেষে খেলা শেষ ছক্কেছকে গড়াগড়ি ঘুঁটী।

রূপাত্মক পর্য্যায়ে টবের গাছ চমৎকার কবিতা।

গীতিমালা পর্য্যায়ে কবি ছন্দের বৈচিত্র্য ও ললিতপদ বিন্যাসের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

ভাষান্তরী পর্য্যায়ে অন্য ভাষার কবিতাগুলিকে পুনর্জন্ম দান করিয়াছেন—মৌলিক রচনা বলিয়াই মনে হয়। শেষ পর্য্যায়ে সনেট। সনেটগুলি রসঘন। আহরণীর বহু কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ।

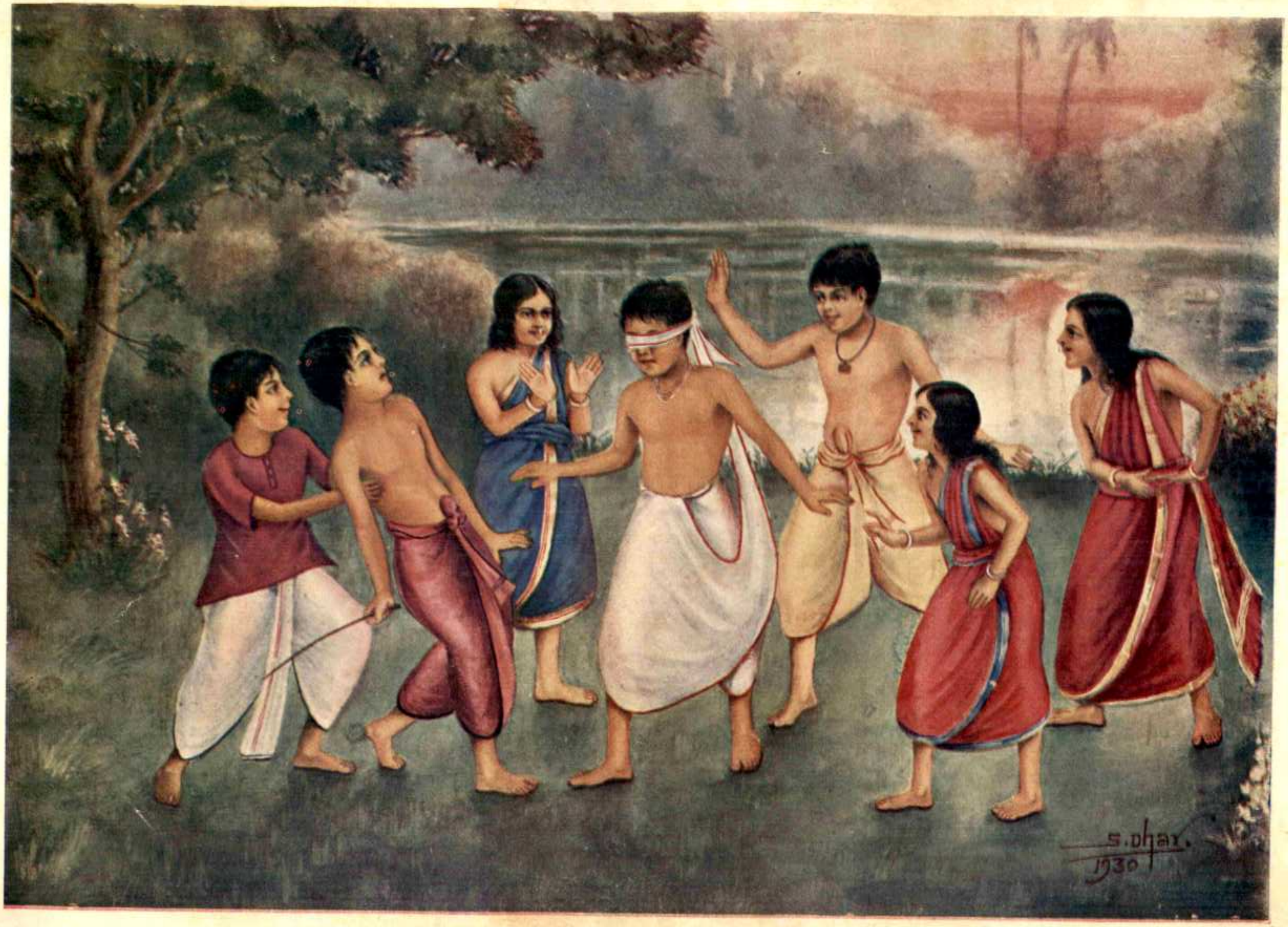

কাণামাছি

শিল্পী—শ্রীশচীন্দ্রভূষণ ধর

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY.

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

বঙ্গশ্রী

ফাল্গুন—১৩৪৮

৯ম বর্ষ—২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

রাজনৈতিক স্বাধীনতাকামীগণ কি জনসাধারণের সমর্থনযোগ্য ?

এই প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে ভারতীয় জনসাধারণ বলিতে কি বুঝায় ? সকলেই জানেন যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দুই শ্রেণীর লোক বিদ্যমান। প্রত্যেক দেশ প্রদেশে অনুসন্ধান করুন, জেলা বা গ্রামে ঘুরিয়া আসুন, এমন কি প্রতিগৃহও পর্য্যবেক্ষণ করুন, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবেন যে, এই দুই শ্রেণীর লোকই বিচরণ করিতেছে। প্রথম পক্ষ মুষ্টিমেয়, কিন্তু তাহারাই অপর সাধারণকে পরিচালনা করিয়া থাকেন, আর দ্বিতীয় পক্ষ সাধারণ জনমণ্ডলী—ইহারা সেই মুষ্টিমেয় লোকের নির্দ্দেশে পরিচালিত হন। আমরা প্রথম পক্ষকে 'নেতৃগোষ্ঠি' আর দ্বিতীয় পক্ষকে 'গণ-গোষ্ঠি' বা 'জনসাধারণ' বলিয়া অভিহিত করিব।

সকলেই অবগত আছেন, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, যে উপায়েই হউক না কেন স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতেই হইবে—এই আকুল আগ্রহ বহুদিন হইতে জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছেন। আর ইহাও সহজে অনুমেয় যে, ভারতভাগ্যবিধাতা হইতে পারিলেই, এই সমস্ত নেতৃবৃন্দ যে ক্ষমতা অর্জ্জন করিবেন তাহাতে তাহারা তাহাদের প্রবৃত্তিও অবাধে চরিতার্থ করিতে পারিবেন। তথাপি একথা আমরা মানিতে প্রস্তুত আছি যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার তাহাদের আকুল আগ্রহ সমর্থন না করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণই খুঁজিয়া পাই না। তবে এই প্রশ্নই আমাদের মানসপটে বারম্বার উদিত হয় ভারতের যে জনসাধারণ—মন্ত্রীপদ প্রাপ্তির ক্ষীণ আশাও যাহারা কোনও দিন হৃদয়ে পোষণ করে না, পরিষদ সদস্যপদ লাভের ক্ষণিক স্বপ্নও যাহাদিগকে প্রলোভিত করে না, কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট বা কোন সরকারী উচ্চপদ লাভের মোহে যাহারা বিভ্রান্ত হয় না—সেই নির্লোভ জনসাধারণ এই নেতৃবৃন্দ আকাঙ্ক্ষিত তথাকথিত স্বাধীনতা দ্বারা কি উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইবে ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, ভারতীয় জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা কি কি বস্তু অধিক প্রয়োজনীয় এবং তাহারা কামনাই বা কি করে ? সরকারী কোন পদ বা উচ্চবেতনভুক্ত কোন চাকুরী যে নয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে, তাহাদের কাম্যবস্তু কি ? একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তাহাদের কি কি অভাব ? সর্ব্বত্রই আপনি সোজা, সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন ভাষায় একই উত্তর পাইবেন—ওগো আমরা মান চাহি না, যশ চাহি না, ঐশ্বর্য্য চাহি না—তোমাদের পদগৌরব লইয়া তোমরাই সুখে থাক, আমরা চাই বাঁচিয়া থাকিতে। তাহারা আকুল প্রাণে একই প্রার্থনা করিবে, আমরা চাই অন্নবস্ত্র, আমরা চাই দৈহিক সুখ-স্বাস্থ্য, দাও আমাদের মানসিক শক্তি। দাও, দাও ইহাই আমাদের দাও, আমরা আর কিছু চাহি না।

সুতরাং দেখিতে পাইবেন যে, জনসাধারণ যদি ভারতীয় নেতৃগোষ্ঠির শাসনাধীন ব্যবস্থায় উক্ত ত্রিবিধ কাম্যপদার্থ

অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্য, দৈহিক সুস্থতা এবং মানসিক সন্তুষ্টি লাভ করিবার আশা প্রাপ্ত হয়, অন্ততঃ যদি ব্রিটিশ শাসনের ব্যবস্থার অনুপাতে অধিক পরিমাণে নেতৃবৃন্দের নিকটে লাভ করিতে পারিবে বলিয়া জানিতে পারে, তবেই এই অগণিত বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠি নেতৃবৃন্দের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহারাও এই নেতাদেরই প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইবে। নতুবা তাহাদের সহায়তা লাভের আশা দুরাশা—মরীচিকায়ই পর্য্যবসিত হইবে।

ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, তাহারা এই নেতৃবৃন্দকে আজ যদি প্রশ্ন করিতে চায় যে, "আচ্ছা, মহানুভব নেতৃবৃন্দ, আপনারা যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হন অথবা অন্ততঃ কোন কোন স্থানে শাসনযন্ত্র যদি অপ্রতিহত ভাবে আপনাদেব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে আমাদের এই ত্রিবিধ অভাব নিবারণের জন্য আপনারা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন? জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মনে অন্ততঃ একবার এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে কি যে, শাসিত জনসাধারণেব অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিতে, দৈহিক স্বাস্থ্যেব উন্নতি বিধান করিতে এবং আমাদের প্রাণে মানসিক শান্তি ফিরাইয়া আনিতে আপনারা কিরূপ কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবেন?" তখন এই বাক্‌সর্ব্বস্ব নেতৃবৃন্দ কি উত্তব দিবেন? স্পষ্টই কি এই জনসাধারণের মনে প্রতীয়মান হইবে না যে, "হায়, আমাদের দুঃখ দূব করিবার জন্য যে উপায় এতদিন ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ করিয়াছেন—যে ঔদাসীন্যে আমরা দুর্দ্দশার চরম সীমায় আজ উপনীত হইয়াছি, আমাদের তথাকথিত এই ভাগ্য নিয়ন্তৃগণের বিদ্যাও তদপেক্ষা একটুও বেশী নহে, এমন কি আমাদের অভাব দূর করিবার পক্ষে কার্য্যকারিতাও সেই শাসকগণের অপেক্ষা ইহাদের কোন অংশেই অধিক নাই।" আর কি উত্তর হইতে পারে? যতদিন পর্য্যন্ত নেতৃবৃন্দ সেই অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের কোন উপায় বিধানই না করিতে পাবিবেন ততদিন পর্য্যন্ত এই অভাবগ্রস্ত জনসাধারণ কিসের লোভে নেতৃগোষ্ঠির পশ্চাতে ছুটিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত বৃথা দ্বন্দ্বকলহে লিপ্ত হইবে? আর, কি আশায়ই এই বাক্সুখর অকর্ম্মণ্য ও অযোগ্য নেতৃবৃন্দ পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়া আপন শক্তি, সময় ও অর্থের অপব্যহার করিবে?

পাঠকবর্গকে আমরা অবহিত করিতে চাই যে, আমরা স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্রও অস্বীকার করিতে চাই না। এমন কি বিনা দ্বিধায় নিঃসন্দেহে বলিতে চাই যে, স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রাণে কাহারও অপেক্ষা কম জাগরিত হয় নাই। আমরা মনে করি যে এই অভাবক্লিষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিপন্ন জনসাধারণের হিত-সাধনার্থ স্বাধীনতার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্যই এই যে, স্বাধীনতা দ্বারা যদি নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের পূর্ব্ববর্ণিত একান্ত প্রয়োজনীয় ত্রিবিধ কাম্যবস্তুর কোন প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতেই তাহারা যদি সক্ষম না হন, তবে এই বুভুক্ষিত, রোগ-ক্লান্ত, অসন্তোষচিত্ত জনসাধারণের নিকট নেতৃবৃন্দের তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য কি? বরঞ্চ আমাদের অনুমানই কি স্বাভাবিক নহে যে, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির একনিষ্ঠ অনুসেবক, মস্তিষ্কবিহীন তথাকথিত এই নেতৃগোষ্ঠির হস্তে গণগোষ্ঠিব দুঃখের বোঝা আবও ভারী এবং দুর্ব্বহই হইয়া উঠিবে? তাহারা বে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে?

অবশ্য একথা অবিসম্বাদী সত্য যে, সুযোগ্য, কর্ম্মনিষ্ঠ ও বুদ্ধিকুশল নেতৃবৃন্দের পরিচালনা ভিন্ন স্বল্প বুদ্ধি শ্রমনিষ্ঠ নিরীহ জনসাধারণ নিতান্তই অসহায়। কিন্তু সেই নেতৃবৃন্দ কাহারা? জিজ্ঞাসা করি জনসাধারণেব দুঃখ, দৈন্য, দুর্দ্দশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, অকর্ম্মণ্য বাক্সুখব 'নেতা' নামধাবী আমাদের তথাকথিত ভাগ্য-নিয়ন্তৃগণের প্রকৃত পরিচালকের আসন গ্রহণ করিবার কি অধিকার বা কি যোগ্যতা আছে? না—নাই, এতটুকু সামর্থ্যও তাহাদের নাই; এই ত্রিবিধ উপায় বিধানকল্পে পাঠশালার শিক্ষার্থীগণের ন্যায় এবিষয়ে তাহাদের কোন চিন্তাধারা বা পরিকল্পনাও নাই। যাহারা পদগৌরব এবং ক্ষমতা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহাদের সে সামর্থ্য থাকিবেই বা কিরূপে? তাই বলি, দেশবাসীগণ অবহিত হউন, সময় থাকিতে এই সব ময়ূরপুচ্ছ তথাকথিত নেতৃবৃন্দের সংস্রব পরিত্যাগ করুন। নতুবা আপনাদের দুর্দ্দশা ক্রমে বাড়িয়া আপনাদিগকে যে ধ্বংসের মুখেই নিক্ষেপ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তাই, আজ আমরা জনসাধারণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—আজ সময় আসিয়াছে, তাহাবা অনুসন্ধান করিয়া

দেখুন যে, বর্ত্তমান এই পরিস্থিতিতে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচন করিতে গণগোষ্ঠির প্রত্যেকের অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক অসুস্থতা দূরীকরণ এবং মানসিক সুখশান্তি প্রবর্ত্তিত করিতে মহাত্মা গান্ধীই বলুন, পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দ্দার প্যাটেল, বীর সাভারকারই বলুন বা ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ, মহম্মদ জিন্না সাহেব, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রভৃতিদের কথাই স্মরণ করিয়া দেখিবেন যে, এই দিক্‌পাল নেতাগণ এই ত্রিবিধ অভাবের এতাবৎ কি কি কার্য্যকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন? ধীর, নিখুঁত ও নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, আধুনিক কালের ব্রিটিশ পার্লামেন্টনিয়োজিত ভাইসরয় (রাজপ্রতিনিধি) বা গভর্ণরগণ অপেক্ষা ইঁহাদের উৎসাহ, কর্ম্মকুশলতা বা সামর্থ্য বিন্দুমাত্রও অধিক নহে, উভয়েই সমান।

আজ দেশের চরম দুরবস্থা—আমাদের দুর্দ্দশাও এত লেশহীন যে, লেলিহান করাল ধ্বংশ-রাক্ষস মুখব্যাদান করিয়া, গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। জনসাধারণ ভ্রাতৃগণ, আপনারা কি সময় থাকিতে অবহিত হইবেন না?

ভারতে লৌকিক সৈন্য-বাহিনী কি গ্রহণযোগ্য?

লক্ষ্য করিলাম, ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে এক বিকৃত মস্তিষ্কের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। রুশীয় নীতির অন্ধ-অনুকরণ-বশতঃ এই বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিটি প্রস্তাব করিতেছেন যে, অবিলম্বে ভারতে দেশবাসীগণকে লইয়া একটি সৈন্যবাহিনী (people's army) গঠন করা হৌক্। বিপদ কেবল ইহাই নহে, ইহার উপর এই বিকার-প্রাপ্ত প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য যদি উদ্যোগী হয় তবে কয়েকটি সম্প্রদায় আবার উহা সমর্থন করিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতবাসীর পক্ষে এইরূপ সৈন্য-বাহিনী গঠন বিশেষ অনুকূল হইবে কি? যাহারা এই বিষয়ে উদ্যোগী তাহাদের উপদেশ সমগ্র ভারতবাসী গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে কি?

আমরা তাহা মনে করিতে পারি না।

অর্থনৈতিক অভাব, শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক অশান্তি—এই যে ত্রিবিধ শোচনীয় দুরবস্থা ভারতবাসীর সম্মুখীন, ইহা মোচনের সর্ব্বপ্রকার উপায় নির্দ্ধারণ কার্য্যই হইল ভারতবাসীর সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ সমস্যা। একমাত্র এই সমস্যার মীমাংসা কার্য্যেই ভারতীয় গণগোষ্ঠিকে আমরা ব্যাপৃত থাকিতে অনুরোধ করি।

আমাদের এই প্রস্তাবকে খণ্ডন করিয়া কেহ হয়ত উদাহরণ দিবেন যে, কেন জার্ম্মানী, জাপান, ইটালী, রাশিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশগুলিতে ত এইরূপ সৈন্যবাহিনী (people's army) গঠিত হইয়াছে। গঠিত হইয়াছে সত্যকথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে, এই সকল তথাকথিত স্বাধীন দেশসমূহের জনসাধারণের উক্ত ত্রিবিধ সমস্যার (অর্থ-নৈতিক দুর্গতি, শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক অশান্তি) এতাবৎ কোন সুরাহা হয় নাই। সৈন্যবাহিনী অথবা অস্ত্রসজ্জার দ্বারাই যদি জনসাধারণের পক্ষে অর্থ-নৈতিক প্রাচুর্য্য, দৈহিক সুস্থতা এবং মানসিক সুখ-শান্তি প্রভৃতি লাভ করা সম্ভব হইত তবে বহু পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত তথাকথিত স্বাধীন দেশগুলিতেও সর্ব্বপ্রকার দুরূহ সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই উক্ত দেশসমুহের সাধারণ অধিবাসীগণ অসহনীয় দুর্গতির মধ্যে কালাতিপাত করিতেছে।

জনসাধারণের উক্ত ত্রিবিধ সমস্যার সত্যকার সমাধান হইবে কি ভাবে, বর্ত্তমান নিবন্ধে অবশ্য আমরা সে বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমরা করিতে চাই না, তবে আধুনিক পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতাগণকে আমরা শুধু এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, তাঁহারা সদলবলে বিশ্বব্যাপী যে নারকীয় ধ্বংস-বিভীষিকার অবতারণা করিয়াছেন, গণগোষ্ঠির সমুদয় সমস্যার যথার্থ সমাধানের পথ এই ভ্রান্ত, ভীষণ ও সর্ব্বগ্রাসী পথের চেয়ে অনেক শান্তিপূর্ণ। এই পথের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতস্বরূপ এইটুকু বলিতেছি যে, সর্ব্বপ্রথমে ইহার জন্য ভূমির হৃত স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে, দ্বন্দ্বকলহের কুপ্রবৃত্তি দমনমূলক যোগ্যতর শিক্ষা অর্জ্জন করিতে হইবে এবং সর্ব্বশেষে যে সকল অধার্ম্মিক নেতৃগোষ্ঠি অন্যায়ভাবে মানুষের জীবন লইয়া

ছিনিমিনি খেলিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে না, জনসাধারণের তাহাদিগকে ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিবার সাহস সঞ্চয় করিতে হইবে।

আমাদের 'রুশীয়' মার্কা বন্ধুটি অকারণ প্রলাপ বাক্যে সময়ক্ষেপ না করিয়া আমাদের এই সকল কথায় কর্ণপাত করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ও দ্বিধাহীনচিত্তে আমাদের কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইবেন কি?

ইহাই কি ভারতের রক্ষাকার্য্য?

কিছুদিন হইতে দেখিতেছি, আসন্ন অজ্ঞাত বোমার আতঙ্কে নিরীহ সহরবাসীগণের কাহাকেও চাকুরীস্থলে নির্ব্বান্ধব হইয়া অবস্থান করিতে হইতেছে; উপরওয়ালাদের হুকুমে প্রাতঃকালে অত্যন্ত অসময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া আপিসে ছুটিতে হইতেছে, আর যে স্থানে তাহাদিগকে অফিস-কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়, সে স্থানও আলো-বায়ু-হীন এক অন্ধকূপ বিশেষ; বোমার বিস্ফোরক টুক্রা নিবারণের অজুহাতেই না কি কর্ত্তৃপক্ষ এই নারকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। নিরুপায় নাগরিকদিগের দুর্দ্দশার ইহাই শেষ নহে। ইহার উপরও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রসমূহ তাঁহারা এত উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতেছেন যে, তাহাদিগকে দৈনন্দিন প্রয়োজনকে বাধ্য হইয়া অর্দ্ধেকে নামাইয়া আনিতে হইয়াছে। প্রবেশপত্র বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, লোকের দুর্দ্দশার অবধি নাই, তাহাদের মনে সোয়াস্তি নাই। এক কথায় এই ব্যবস্থা আমাদের দৈনন্দিন জীবন সর্ব্বপ্রকারেই কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।

জানিতে চাই, এই সকল বীভৎস কাণ্ডকারখানা কি কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের 'রক্ষাকার্য্য বলিয়া অভিহিত করিতেছেন এবং সগর্ব্বে প্রচার করিতেছেন যে, একমাত্র তাঁহারাই ভারতকে সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখিতে সক্ষম? ইহাই যদি ভারত-রক্ষার নমুনা হয় তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে এই আচরণ অপেক্ষা বৃহত্তর লজ্জাকর বিষয় আর কিছুই নাই।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতরক্ষা কল্পে এই ঘৃণিত লুকাচুরি ভিন্ন কি উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষের জানা নাই? বৃটীশ শাসনব্যবস্থায় খুঁজিতে ইহার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা যদি না থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার জন্য ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ অন্যের সাহায্যই বা গ্রহণ করে না কেন? তাহাদের উচিত বিজ্ঞাপন দিয়াই হউক, নামজোরেই খুঁজিয়াই হউক, তাহাদিগকে এমন সব লোক আনয়ন করা দরকার যাঁহারা কাহারও কোন অসুবিধা না করিয়া ভারত রক্ষা বিধানের ব্যবস্থা পরিকল্পনা করিতে সমর্থ হইবেন। আর তাহাও যদি না পারেন তবে তাঁহাদের উচিত, যে দায়িত্ব গ্রহণের তাঁহারা অনুপযুক্ত, সেই দায়িত্ব গ্রহণের দায় পরিত্যাগ করা। কিন্তু মজার কথা এই যে, ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের এই ঔচিত্যানুচিত্যবোধ সম্বন্ধেও এতটুকু সজাগ নহেন। দায়িত্বজ্ঞানের প্রাথমিক বিধিগুলি পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে কার্য্যক্ষম না হইয়াই তাঁহারা নিজেদেরকে সর্ব্বগুণাধার ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলিয়া জাহির করিতে চাহেন।

কিন্তু কেবল ভারতবর্ষস্থ ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষেরই বা দোষ কি? স্বয়ং চার্চ্চিল মহোদয়েরই যদি অন্তরে এতটুকু মনুষ্যত্ব বিদ্যমান থাকিত, তবে তিনি নিজেই কি নিশ্চিৎ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেন না যে, বিরাট ব্রিটীশ সাম্রাজ্য-তরীর কর্ণধার হইবার যোগ্যতা তাঁহার একবিন্দুও নাই? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উপলব্ধি তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই তিনি যাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত সেই 'ভোট অব কনফিডেন্স' লাভে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ এই নবলব্ধ 'ভোট অব কনফিডেন্সে'র গর্ব্বে তিনি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু একটা কথা আমরা চার্চ্চিল মহোদয়কে স্মরণ রাখিতে বলি যে, এই তুচ্ছ পার্লামেণ্টারি সমর্থনের উপরেও মহত্তর এক ভোট আছে। এই ভোটই সর্ব্বত্র ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এই ভোট স্বীয় দলের সংখ্যাধিক সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয় না, কাহারও হাসি কান্নার উপরে নির্ভর করে না; ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় পাপ ও পুণ্যের ভিত্তিতে, এই ভোটই যথার্থ ভোট। আমরা নিশ্চিত জানি, এই নৈতিক 'ভোট' চার্চ্চিলের বিরুদ্ধে এবং ভ্রান্ত ব্রিটিশ জনসাধারণেরও যদি পাপ-পুণ্যের নীতির সর্ব্ববিধ অনুশাসন সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞতা থাকিত তবে তাহারা কখনই চার্চ্চিলকে প্রধান মন্ত্রীপদে পুনর্ম্মনোনীত করিত না।

ব্রিটীশ সাম্রাজ্য চিরকাল অটুট থাকুক, ইহাই আমাদের

সর্ব্বান্তঃকরণের কামনা; কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে আশঙ্কা হয় যে, অবিলম্বে হৃদয়হীন এই বৃদ্ধটাকে ব্রিটীশগণ প্রধান মন্ত্রীত্ব হইতে অপসৃত না করিলে, এবং ব্রিটীশ রাজ্যশাসনের নীতি পাপ-পুণ্যের অনুশাসন অনুসারে পরিচালিত না হইলে বুঝি বা আমাদের এই অকপট প্রার্থনাও কালক্রমে ব্যর্থ হইবে।

শুনিতে পাই, বৃটেনের জনসাধারণ প্রায়শঃই বল্‌ডুইন ও চেম্বারলেনের শাসনের সমালোচনায় পঞ্চমুখ। হয় ত জনসাধারণ এতদুভয় প্রধানমন্ত্রী প্রবর্ত্তিত কয়েকটি নীতি ও ব্যবস্থায় কখনো কখনো অবনমিত বোধ করিয়াছেন। কিন্তু একথা বোধ করি ব্রিটীশ জনসাধারণ স্থির জানেন যে, এক্ষণে চার্চ্চিলের মন্ত্রীত্বাধীনে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য যেরূপ অধঃপতনের মুখে নামিয়া আসিতেছে, বল্‌ডুইন ও চেম্বারলেনের মন্ত্রীত্বকালে নিশ্চয়ই সেইরূপ আঘাত ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের গাত্রে কদাপি হয় নাই, এমন কি তাহাদের সময়ে কখনও সাম্রাজ্যের কোনরূপ ধ্বংস বা পতনের সম্ভাবনাও ছিল কি না সন্দেহ।

আশা করি, অচীরেই ব্রিটীশ জনসাধারণ সময় থাকিতে থাকিতেই এই ভ্রান্ত নেতৃগোষ্ঠি বর্জ্জন করিয়া যোগ্যতর পরিচালনা মনোনয়ন করিবেন।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও ভারতবাসীর কর্ত্তব্য

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, 'ভারতবাসীর কর্ত্তব্য' বলিতে আমরা গবর্ণমেণ্ট বা তথাকথিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে বসি নাই, ভারতবাসী বলিতে আমরা ভারতের আপামর প্রাকৃত জনসমাজকেই ইঙ্গিত করিতেছি। বর্ত্তমানে যে সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি আবির্ভূত হইয়াছে; ইহার মধ্যে বিপন্ন ভারতীয় গণগোষ্ঠি কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিবে সেই বিষয়েই আমরা কিছু বলিবার উদ্যোগ করিয়াছি।

সকলেই অবগত আছেন, বহুদিন যাবৎ ভারতের প্রায় প্রত্যেক গৃহ ও পরিবারই আর্থিক দুর্গতি, দৈহিক অসুস্থতা এবং নিরতিশয় মানসিক অশান্তির মধ্যে কালাতিপাত করিতেছে। অথচ ইতিহাসের নজীর দিয়া একথা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করা যায় যে, এককালে ভারতবাসী উক্ত ত্রিবিধ দুর্গতি বা অশান্তি কখনও বিন্দুমাত্রও অনুভব করিত না। এই সময়ের কিছুকাল পরে অবশ্য ভারতে এমন একটা সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যখন, ভারতীয় গণগোষ্ঠি অর্থনৈতিক দুর্গতি, শারীরিক অসুস্থতা এবং মানসিক অশান্তির দ্বারা কখনও কখনও সাময়িকভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু তখনকার এই হীন অবস্থা চিরকালের জন্য ভারতবাসীর বুকে চাপিয়া বসে নাই। এইরূপ অবস্থা অল্প কিছুদিন থাকিত, সামান্য কাল থাকিয়াই আবার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইত, প্রচুর খাদ্যসম্ভার আবার মিলিয়া যাইত। কিন্তু অবশেষে ভারতবর্ষে যখন হইতে এই অভিশপ্ত বর্ত্তমান যুগের আরম্ভ, তখন হইতেই দুঃখ-দুর্দ্দশা, অস্বাস্থ্য ও অশান্তির গুরুভার ভারতবাসীর বুকের উপরে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে; আর যেন এই ভার অপসারণের কোন উপায়ই নাই।

বহুবর্ষ হইতেই এই দুর্দ্দশাপীড়িত অবস্থা ভারতে সমাসীন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, একমাত্র এই নির্দ্দিষ্ট দুরবস্থাকেই আমরা বিশেষরূপে 'বর্ত্তমান পরিস্থিতি' বলিয়া অভিহিত করিতেছি। অবশ্য ভারতের পক্ষে যে ইহাই সর্ব্ব-বৃহৎ সমস্যা এবং গভর্ণমেণ্ট ও নেতৃবৃন্দের যে এই সমস্যার সমাধান করাই হইল সর্ব্বপ্রথম ও প্রধানতম কর্ত্তব্য একথা কোনক্রমে অস্বীকার করে চলে না। কিন্তু এই সমস্যার পরেও আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের জন্য যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, এই আলোচনায় আমরা উহাকেই বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত করিব। এই আলোচনায় প্রথমতঃ আমরা অনুসন্ধান করিব, বর্ত্তমানের যুদ্ধে ভারতের সম্ভাবিত ক্ষতির পরিমাণ কতখানি? দ্বিতীয়তঃ দেখিব, বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতিকে ভারতবাসী কি উপায়ে নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে?

সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে আমাদের মনে হয় যে, এখন হইতেই সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, ভারতবাসীর সম্মুখে শীঘ্রই খাদ্যদ্রব্য (আটা, চাউল) ও বস্ত্রাদির এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। অনেকে হয় ত এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন যে, এখন হইতে যথেষ্ট টাকাপয়সা সঞ্চিত রাখিলেই পরে তাঁহারা এই সম্ভাবিত অভাব অনুভব করিবেন না, সেই সঞ্চিত টাকার জোরেই অভাব দূর করিবেন। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস

তাহাদের এই ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক, ইহাতে সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিতান্তই অভাব। কেন না, এখন হইতেই অবস্থার যে পূর্ব্বাভাষ সূচিত হইতেছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অচিরেই খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদির মূল্য তিনগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই মূল্য-বৃদ্ধির কারণ কি? জনসাধারণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, একদল স্বার্থান্বেষী মৎলববাজ মহাজন অত্যধিক লোভনীয় মূল্যের বিনিময়ে জনসাধারণের নিকট হইতে সমস্ত ভূমিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইতেছে। কিন্তু জনসাধারণের কর্ত্তব্য: এই লোভ সর্ব্বতোভাবে সম্বরণ করা। কেননা অধিক মূল্যের বিনিময়ে ক্রমাগত নিজেদের মুখের গ্রাস পরের হাতে তুলিয়া দিতে থাকিলে উক্ত সম্ভাবিত খাদ্য-বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। স্ব স্ব পারিবারিক কর্ত্তব্যের প্রেরণায় একমাত্র এই একটি বিষয়েই যদি জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইতে পারেন, তবেই তাহারা অনেকাংশে আসন্ন দুর্ভিক্ষের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা না করা খুবই নির্ব্বুদ্ধিতা।

কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে যে প্রতিষ্ঠানে নেতৃগণ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে চায়, নেতৃগোষ্ঠির পরিচালনায় সেইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণ যদি যোগদান করেন তাহা হইলে অবিলম্বে তাহারা দেখিতে পাইবেন যে, গভর্ণমেণ্টই নৈতিক অধিকারের তাগিদে সর্ব্বপ্রকার ঘাটতিকরণ বন্ধ করিয়া দিবেন। কেননা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রয়োজন অনুভূত হইলেই গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত সর্ব্ববিধ পণ্য ক্রয় করিবার সর্ব্বতোভাবে ন্যায্য অধিকারী।

কিন্তু ইহা ত গেল অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের কথা। ইহার উপর যুদ্ধকালে শাসন সম্বন্ধীয় বিপর্য্যয় ঘটিবারও অশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। শত্রুপক্ষ যথার্থ-ই এদেশ আক্রমণ করিলে; দেশের পুলিশ-বিভাগে যে কোন সময়ে বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু সর্ব্বথা মনে রাখিতে হইবে, জনসমাজের মনে যেন কখনও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হয়। গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই এই সম্ভাবিত বিশৃঙ্খলা-পূর্ণ পরিস্থিতিতে যাহাতে আইন ও শৃঙ্খলা অটুট থাকে সেজন্য কোন 'জন-ত্রাণ প্রতিষ্ঠান' (protective agencies) নিয়োগ করিবেন। জনসাধারণ যেন এইসব ত্রাণ-প্রতিষ্ঠানাদির প্রস্তাব-উপদেশাবলী যথাসম্ভব অনুসরণ করিতে কৃতযত্ন হন। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কোনক্রমেই এই সব প্রতিষ্ঠানের উপরে আমাদের বিশ্বাস ও আস্থার পরিমাণ যেন মাত্রাধিক না হয়। কেননা প্রায়ই এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ ক্ষেত্রেই অজ্ঞ ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি লইয়াই গঠিত হয়; এবং অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, ইহাদের সদস্যবৃন্দ সত্যকার করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য জনসাধারণের স্ব স্ব বোধশক্তির উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করা উচিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল অনভিজ্ঞ নেতাগণ নগর ত্যাগের (ইভেকুয়েশন) পরামর্শ দেন, এবং প্রকারান্তরে নগরবাসীর জীবনোপায়ের ব্যবস্থা একরকম বন্ধই করিতে বলেন এরূপ নেতৃবৃন্দের অজ্ঞতার কথা ভাবিলে আমরা বিস্মিতই হইয়া যাই।

বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ভয় যে ভারতের যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ঘটনাস্রোত সম্প্রতি যেরূপ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে স্বতঃই মনে হয়, ভারতের বহিরাক্রমণ না ঘটিবার সম্ভাবনাই অত্যন্ত অধিক। আমাদের মনে হয়, শতকরা নব্বই ভাগই আক্রমণের সম্ভাবনা কম। আর যদিবা ভারতবর্ষ আক্রান্তই হয়, তাহা হইলেই কি কেবল সম্পূর্ণ অপসারণের (ইভেকুয়েশনের) দ্বারাই সে আক্রমণ নিবারিত হইবে? আমরা জানি, এতাবৎকাল যতগুলি রাজ্য বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, আক্রমণকালে তাহাদের কেহই এই ইভেকুয়েশনের দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ করে নাই। কেন না 'ইভেকুয়েশন' শব্দটির মূল অর্থই এক প্রকার বিশৃঙ্খলা; ইহাতেও বিপর্য্যয়ের অবস্থাই সূচিত হইয়া থাকে। এবং এখানেও বিশৃঙ্খলা যে বাড়িয়াই যাইবে তাহাতে বিচিত্র কি? বস্তুতঃ এরূপ কার্য্য কেবল অসার ও দুর্ব্বল মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক; যথার্থ বিচক্ষণ মানুষের সুবুদ্ধির পরিচয় ইহাতে বিন্দুমাত্র নাই।

কিন্তু এই অর্থ-নৈতিক বিপর্য্যয় এবং শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলার চেয়েও যে বৃহত্তর বিপদ ভারতের সম্মুখীন হইতেছে সেই বিপদ ভারতের স্বাধীনতা। একথা শুনিয়াই যেন

কেহ বিস্মিত না হন। আমরা স্বাধীনতার বিরোধী নহি। আমরা আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভবিষ্যতে কিরূপ অবস্থা হইবে না হইবে তাহা কেহ সঠিকরূপে নিরূপিত করিতে পারে না; আমরাও পারিব না। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি ও বুদ্ধির শক্তি যতটুকু, তাহা হইতে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিণামস্বরূপ ভারতে স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী। সম্ভবতঃ নেতৃবৃন্দ স্বভাবতঃই আত্মগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন যে, বুঝি বা তাহাদের প্রচেষ্টার ফল হিসাবেই ভারত স্বাধীন হইবে। কিন্তু প্রত্যুতপক্ষে, এই স্বাধীনতা কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির গুণে আবির্ভূত হইবে না! ইহার আবির্ভাব ঘটিবে কাল ও ঘটনা-চক্রের অমোঘ নিয়মানুসারে। তাই আমরা বলিতে চাই যে, সহসা একযোগে অহেতুক উৎফুল্ল বা অত্যধিক আশান্বিত হইয়া উঠিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই!

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন আমাদের ভুল বুঝিয়া বসেন না যে, আমরা এই সকল কথা বলিতে পবিত্র স্বাধীনতাকেই শ্লেষ-ইঙ্গিত করিতেছি। পক্ষান্তরে স্বাধীনতা আমাদেরও সকল সাধনার ধন, এবং ইহার রক্ষার জন্য স্বাধীনতার বেদীমূলে আমরাও সর্ব্বপ্রকারে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সমস্যা হইতেছে যে, বর্ত্তমানের এই সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই যদি আমরা আমাদের ভারতের স্বাধীনতা বা স্বরাজ্য প্রাপ্ত হই, তা'হইলে আমাদের কর্ত্তব্য কি? অবশ্যই এই অবস্থায় আমাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য হইবে এই স্বরাজ্যের রাজ্য পরিচালনভার যোগ্যতর হস্তে অর্পণ করা। কিন্তু যোগ্যতর ব্যক্তিদের নামে কালক্রমে যদি ভারতের বর্ত্তমান শাসক সম্প্রদায় এবং আইনজ্ঞ, চিকিৎসক ও শিক্ষাব্রতীরাই অর্থাৎ ভারতের তথাকথিত বর্ত্তমান নেতৃগোষ্ঠিই স্বাধীন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন—তাহা হইলে অবস্থার এতটুকুও ব্যতিক্রম না হইয়া কেবল বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি করিবে।

অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমরা আমাদের এই স্বদেশবাসী নেতৃবৃন্দের নামোল্লেখ মাত্রেই শিহরিয়া উঠি কেন? দেশের শাসনভার গ্রহণ করিলে যথার্থই তাঁহাদের হস্তে দেশের এমন কি ক্ষতি সাধিত হইবে? এই প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব ইতিপূর্ব্বেও আমরা দিয়াছি এবং বক্তব্য সহজতর করিবার জন্য এক্ষণেও বলিতেছি যে, এতবৎ বহু চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়াও আমরা এমন একজন নেতারও সন্ধান পাই নাই যিনি ভারতবাসীর পূর্ব্ববর্ণিত ত্রিবিধ সমস্যার (আর্থিক দুর্গতি ও দৈহিক-অসুস্থতা এবং মানসিক অশান্তি) বিন্দুমাত্রও সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন বা করিতে পারেন। আমরা সকলেই গণগোষ্ঠির অংশ, আমরা সকলে এব গণগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত; গণগোষ্ঠিই আমাদের সকলকে লালন পালন করে—সুতরাং আমরা গণগোষ্ঠিরই সৃষ্ট জীব। আমাদের গৃহ, আমাদের আত্মা, আমাদের সম্পদ—সমস্ত কিছুই গণগোষ্ঠিরই সম্পদ। কে এই গণগোষ্ঠির শাসনভার বহন করিবে সে-কথা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক নহি; কিন্তু আমাদের পরমাত্মীয় এই গণগোষ্ঠির প্রত্যেকে কি উপায়ে আর্থিক প্রাচুর্য্য, দৈহিক সুস্থতা ও সর্ব্বাঙ্গীন মানসিক সুখ-শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে, সে কথা জানিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই ব্যাকুল। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের নেতা বলিয়া নিজেদের যাঁহারা সততই জাহির করেন, বর্ত্তমান ভারতের সেই পরিষদসদস্য সম্প্রদায়, আইনজীবি ও চিকিৎসকমণ্ডলী, শিক্ষাব্রতী এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাপমারা দিকপাল শিক্ষিতেরা এমন কোন উপায় জানেন না, যদ্দ্বারা আমাদের ভারতীয় জনসমাজের উক্ত ত্রিবিধ সমস্যার কোনরূপ কার্য্যকরী সমাধান হওয়া সম্ভব। অথচ পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই নেতৃগোষ্ঠি নামধারীরা এই সহজ কথাটুকু পর্য্যন্ত অবগত নহেন যে, তাঁহারা এবিষয়ে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞতার অন্ধকারেই বিচরণ করিতেছেন এবং পাশ্চত্ত্যের ভ্রান্তিদুষ্ট বিজ্ঞান-সভ্যতার দ্বারাও কখনও ভারতীয় জনসাধারণের উক্ত সমস্যাবলীর মীমাংসা সম্ভব হইবে না। কেবল তাহাই নহে, এই অকর্ম্মণ্য নেতৃকুল আবার তাহাদের স্বীয় কূপমণ্ডুকতার (coterieর) বহির্ভূত কোন ব্যক্তির প্রস্তাবাদিতেও কর্ণপাত করিতে নারাজ সেই প্রস্তাব যতই অভিজ্ঞতামূলক এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধি-প্রণোদিতই হউক না কেন।

পক্ষান্তরে আমরা এমন কয়েকজন বৈদেশিক রাজনীতিকের পরিচয় জানি, যাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, ভারতবাসীর পক্ষে উপরোক্ত ত্রিবিধ সমস্যার আশু সমাধান অবশ্য প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, এই সকল বৈদেশিকগণ এই

কথাও অকপটে মানিয়া লহেন যে, তাঁহারা এই সমস্যা সমাধানের সত্যকার পথ অবগত নহেন; এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সভ্যতা এই সমস্যার ফলপ্রদ মীমাংসা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই আমাদের আশা হয়, সম্ভবতঃ এই অকপট ও উৎসাহী বৈদেশিকদের শাসনব্যবস্থাতেই আমাদের জনসাধারণের সর্ব্ববিধ দুঃখ-দুর্ভোগের অবসান হইবে।

কিন্তু আমরা স্থির জানি, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ইহা হইবার নহে। কারণ পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ কালচক্রের অমোঘ নিয়মানুসারে স্বায়ত্ত্বশাসন লাভ করিবে এবং এই স্বায়ত্ত্বশাসন-নির্ব্বাহের ভার গিয়া পড়িবে আমাদের তথাকথিত অদূরদর্শী ও অকর্ম্মণ্য নেতৃবৃন্দের হস্তে। ফলে, স্বভাবতঃই জনসাধারণের দুঃখের বোঝা আরও দুঃসহতর হইয়া উঠিবে।

জানি না, আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ, এই সমস্যা-সমাধান বিষয়ে আমাদের তরফ হইতে কোন প্রস্তাবে কেহ কর্ণপাত করিবেন কি না, তথাপি আমরা এ-বিষয়ে কর্ম্মপদ্ধতির নির্দ্দেশ দিতেছি, কারণ আমরা স্থির জানি, এক সময় আমাদের এই প্রস্তাব দেশবাসী শুনিতে চাহিবেই চাহিবে।

আমাদের এই প্রস্তাবিত কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে ভারতবাসীকে সর্ব্বপ্রথম একতাবদ্ধ হইয়া দুইটি বিভিন্নতর পরিষদ গঠন করিতে হইবে; প্রথমটি হইবে ‘সাধারণ গণগোষ্ঠি-পরিষদ’; (People's Common Council) দ্বিতীয়টি ‘বুদ্ধিজীবি-পরিষদ’ (People's Intellectual Council).

‘সাধারণ গণগোষ্ঠি পরিষদের’ প্রধান কর্ত্তব্য হইবে সমস্ত জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে কার্য্যকরী ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। কিন্তু এ-বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও জাতির সর্ব্ববিধ অর্থনৈতিক দুর্গতির মোচন না হওয়া পর্য্যন্ত স্বদেশের এই সমস্যার কোনই ফলপ্রসূ মীমাংসা সম্ভব হইবে না। এ-বিষয়টি অর্থনীতির একটি স্বতঃসিদ্ধ সূত্র। সুতরাং ‘ভারতীয় সাধারণ গণগোষ্ঠি পরিষদে’ এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আর, ‘বুদ্ধিজীবি পরিষদের’ প্রধান কর্ত্তব্য হইবে সমগ্র মানবসমাজের দৈহিক সুস্থতা ও মানসিক সুখশান্তির প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবি-পরিষদেরও মনে রাখিতে হইবে যে, উক্ত সমস্যাদ্বয়কে সর্ব্বজাগতিক রূপে গ্রহণ না করিলে ইহাদের সমাধানলাভও কদাপি সম্ভবপর হইবে না।

কিন্তু পাকাপাকি ভাবে কার্য্যে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে জনসাধারণকে আরও কতিপয় প্রাথমিক তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে, এবং এই নবগঠিত পরিষদে মনোনীত হইবার পক্ষে কে যোগ্য এবং কে অযোগ্য ইহা নির্ভুলরূপে নিরূপিত করিতে হইবে। আর একটি কথা জনসাধারণ যেন বিস্মৃত না হন যে, এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা কোন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি যেন প্রবেশাধিকার লাভ না করেন। কারণ জনসাধারণের সমস্যাবলীর সমাধান-কার্য্যের মূলেই যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্যক্ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেই জ্ঞানের প্রাথমিক বর্ণমালার সঙ্গেও বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত শিক্ষিতদের বিন্দুমাত্র পরিচয় ঘটে নাই।

যাহা হৌক্ পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে এখানেই আমরা আমাদের আলোচনা আজিকার মত শেষ করিতেছি। ভবিষ্যতে আবার এ-বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা রহিল।

বর্ত্তমান যুদ্ধের শিক্ষা

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছে। মানুষের মধ্যে কেহ বা এই যুদ্ধ তাহার চোখের সম্মুখে দেখিতেছে, আবার কেহ বা উহা তাহার মানসনেত্রে দেখিতেছে।

জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় শিখিবার বিষয় বিদ্যমান থাকে, ইহা বলাই বাহুল্য। যে মানুষ তাহার জীবনের যত অধিক ঘটনা তাহার যত অধিক শিক্ষায় লাগাইতে পারে সে ততবড় সাধক। যাহাতে মানুষ তাহার জীবনের প্রত্যেক নিমেষের প্রত্যেক ঘটনা শিক্ষা ও সাধনার কার্য্যে লাগাইতে পারে তাহার সহায়তার জন্ত ভারতীয় ঋষিগণ "কাল", "মহাকাল" ও "কালীর পূজা"র ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমাদের হিন্দুসমাজের প্রায় প্রত্যেক ঘরে "কাল", "মহাকাল," "কালী" প্রভৃতি কথা অহরহঃ বাজিয়া থাকে, কিন্তু ঐ কথাগুলি তলাইয়া বুঝিবার মত লোক বড়ই বিরল।

মানুষ ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, প্রত্যেকের জীবন কতকগুলি নিমেষের সমষ্টি। "নিমেষ" অথবা "মুহূর্ত্ত" 'কালে'রই পরিমাপক। বাস্তবভাবে "কাল" অথবা "মহাকালে"র পূজা করিতে হইলে নিমেষের অথবা প্রতিমুহূর্ত্তের পূজা করিতে হয়। এই পূজায় ফুল-বিল্বপত্রের প্রয়োজন হয় না। ইহাতে প্রয়োজন হয় বিশেষভাবে বিকশিত মানস-দৃষ্টি। মানুষের জীবনের প্রত্যেক নিমেষে যে বিশেষ বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইতেছে তাহা সকলের বুঝিবার যোগ্য না হইলেও প্রত্যেক নিমেষে যে বিশেষ বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

প্রত্যেক নিমেষে উন্মুক্ত প্রকৃতিতে যে বিশেষ বিশেষ রূপের উদ্ভব হইতেছে এবং কি করিয়া প্রত্যূষের স্নিগ্ধ স্বচ্ছ রূপ, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ডতায় ও সন্ধ্যার জরা-স্নিগ্ধতায় পরিণত হইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্ত যে সাধনা করা হয়—তাহার নাম "কালের পূজা।" কালের প্রত্যেক নিমেষের তারতম্যতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অন্তরের কার্য্যে যে তারতম্য আপনা হইতেই অতি সুশৃঙ্খলিত ভাবে বিকশিত হয়, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্ত যে চেষ্টা করা হয়—সেই চেষ্টার নাম "মহাকালের পূজা"। মহাকালের কার্য্যবশতঃ জীবের সামর্থ্যে ও প্রবৃত্তিতে যে প্রভেদ শৃঙ্খলিতভাবে আপনা হইতেই বিকাশ-প্রাপ্ত হয় সেই শৃঙ্খলা উপলব্ধি করিবার নাম "মা জগদম্বা" অথবা "কালীর পূজা।"

কলিতে "৺কালীর পূজা" না করিতে জানিলে অথবা না করিলে কলিনাশন-সামর্থ্য অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না।

বর্ত্তমান কালের প্রত্যেক নিমেষগুলি সর্ব্বব্যাপী যুদ্ধের জন্ত যে রূপ ধারণ করিয়াছে, উহার জন্য মানুষের অন্তরে স্বতঃই যে ভাবধারার উদ্ভব হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামর্থ্যে শৃঙ্খলিতভাবে যে উত্তেজনা ও হতাশার সৃষ্টি হইতেছে—তাহা যদি মানুষ নিখুঁতভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিত, তাহা হইলে আপনা হইতেই তাহার কাল, মহাকাল ও কালীর পূজা করা হইত।

আমাদের মন উপরোক্ত পূজার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছে। এই পূজার উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে অর্থাৎ বর্ত্তমান যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হইতে কি কি শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা আমরা লিখিতে বসিয়াছি। যাঁহারা কালের, অথবা মহাকালের অথবা কালীর পূজায় সুদক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারেন তাঁহারা কোনরূপ রাগে অথবা দ্বেষে বিচলিত না হইয়া দশ-মহাবিদ্যার আদি বিদ্যার প্রভাবে অতি নিখুঁত ভাবে প্রত্যেক ঘটনাটিকে অঙ্কিত করিবার ও তাহা হইতে যে শিক্ষা লাভ করিতে হয় তাহা বিশ্লেষণ করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া থাকেন। পাঠকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা আদর্শ-পূজারী নহি এবং উপরোক্ত সুদক্ষতাও আমরা অর্জ্জন করিতে পারি নাই। মনের তাড়নায় অন্তরে কতকগুলি কথার উদ্ভব হইয়াছে,—সেই কথাগুলি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব।

প্রথম কথা—জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ। ইহাই ত' বর্ত্তমানের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মানুষ জন্মে তাহার জনক ও জননীর প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ লইয়া। অনুরাগ ও আকর্ষণের বৃদ্ধিতেই শিশুর বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ। দ্বন্দ্ব ও কলহে মানুষের ক্ষয় ও বিনাশ। দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তির সর্ব্বাধিক বিকাশের নাম যুদ্ধ। দ্বন্দ্ব ও কলহে যে মানুষের ক্ষয় ও বিনাশ অবধারিত, ইহা সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনিক সত্য। কাষেই প্রথম প্রশ্ন—এই সর্ব্বহারক ও সর্ব্বনাশক যুদ্ধে মানুষের প্রবৃত্তি কেন ধাবিত হয়? পাঠক, যদি সাধকের চক্ষু ও বুদ্ধি লইয়া অন্বেষণ করিতে পারেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, চারিদিকে অভাবের তাড়না উপস্থিত না হইলে কখনও মানুষের মনে দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় না। অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শান্তির অভাব ও মনকে সংযত করিবার মত শিক্ষার অভাব উপস্থিত হইলে মানুষ তাহার হিতাহিত জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলে এবং তখনই তাহার দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি নৃশংসভাবে জাগরণ লাভ করে।

কাষেই, জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের দিকে তাকাইলে সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে হয় এই যে, জগতেব সর্ব্বত্র অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শান্তির অভাব ও মনকে সংযত করিবার উপযোগী শিক্ষার অভাব দাউ দাউ করিয়া প্রজ্জলিত হইয়াছে। আরও বুঝিতে হয় এই যে, যদি কাহারও প্রাণে জগতে শান্তি স্থাপন করিবার ডাক উত্থিত হয় তাহা হইলে তাঁহাকে যে সংগঠনে জগতের প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শান্তির অভাব ও মনকে সংযত করিবার উপযোগী শিক্ষার অভাব বিদূরিত হইতে পারে সেই সংগঠনের অন্বেষণ করিতে হইবে। শুধু একজনের, অথবা একটা পরিবারের, অথবা একটা গ্রামের, অথবা একটা জিলার, অথবা একটা জাতির, অথবা একটা ধর্ম্মাবলম্বীর, অথবা কোন একটা সংগঠনবিশেষের অভাবের কথা ভাবিলে চলিবে না। শুধু অর্থাভাবের কথা, অথবা শিক্ষাভাবের কথা, অথবা স্বাস্থ্যাভাবের কথা, অথবা শান্তির অভাবের কথা ভাবিলে চলিবে না। যাহাতে যুগপৎ প্রত্যেক অভাবটীর তাড়না হইতে শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক মানুষটী সর্ব্বতোভাবে অব্যাহতি যুগপৎ লাভ করিতে পারে, তদুপযোগী সংগঠন মানুষকে আবিষ্কার করিতে হইবে। ইহা ছাড়া শান্তি স্থাপন করিবার অন্য কোন উপায় নাই। ঘুষি মারিয়া অথবা কৌশলের দ্বারা একপক্ষ যখন অপর পক্ষকে জয় করে, তখন সাময়িক ভাবে যুদ্ধের নিবৃত্তি হয় বটে কিন্তু ঐ নিবৃত্তিতে কখনও সর্ব্বতোভাবের শান্তি স্থাপিত হয় না। কারণ, বিজিতের মনে অশান্তি থাকিয়া যায়। উহাতে যুদ্ধেব নিবৃত্তিও স্থায়ীভাবে হয় না। বিজিত সুবিধা পাইলেই আবার বিজয়ীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া থাকে। ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ ও ইংরাজ পক্ষে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমাদিগের উপরোক্ত কথার উদাহরণ।

১৯১৮ সালে ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ সাময়িকভাবে স্থগিত হইয়াছিল বটে কিন্তু উহা স্থায়ীভাবে স্থগিত হয় নাই। যদি স্থায়ীভাবে ঐ যুদ্ধ অবসান লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে ১৯৩৯ সালে পুনরায় ইংরাজকে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইত না। ১৯১৮ সালে সাময়িকভাবে মহাযুদ্ধ স্থগিত হইয়াছিল বটে কিন্তু উহাতে কোন পক্ষেরই শান্তিলাভ করা সম্ভব হয় নাই। পরবর্ত্তী বাণিজ্য-প্রতিযোগিতা, শুল্ক-যুদ্ধ ও অস্ত্র-শস্ত্রের আয়োজন উপরোক্ত কথার প্রমাণ।

দ্বিতীয় কথা—সমরোপকরণের বৃদ্ধি দ্বারা যুদ্ধ-বিজয় ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা। ইহাও বর্ত্তমানের আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যে দিকে কাণ ফেরান যাইবে সেই দিকেই শুনা যায় এক কথা, যথা :—সৈন্যসংখ্যা বাড়াও, গোলা-গুলি ও বোমার উৎপত্তি বৃদ্ধি কর, বিমান-পোত বাড়াও, ট্যাঙ্ক প্রস্তুত কর, লরির সংখ্যা বাড়াও, যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা বাড়াও ইত্যাদি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্ম্মানী, ইটালীর সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা। এমন কি, ভারতবর্ষের শান্তিপ্রয়াসী রাজাগোপাল আচারিয়া, পণ্ডিত জহরলাল, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও তাঁহাদের অনুচরবর্গের মুখেও মুখ্যতঃ ঐ কথার প্রতিধ্বনিই শুনা যাইতেছে।

প্রত্যেক দেশের নেতৃবৃন্দ যেরূপ-ভাবের যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইবার উপদেশ-বাণী ছড়াইতেছেন, তাহাতে যে যুদ্ধের স্থায়ী নিবৃত্তি এবং প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না, পরন্তু প্রকৃত শান্তি স্থাপিত করিবার যে উপায় মাত্র একটী, যথা—যাহাতে যুগপৎ প্রত্যেক অভাবের তাড়না হইতে শত্রু-মিত্রনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক-মানুষটী সর্ব্বতোভাবে অব্যাহতি যুগপৎ লাভ করিতে পারে, তদুপযোগী

ভাবে সমগ্র মানবসমাজকে সংগঠিত করা—ইহা আমরা আগে দেখাইয়াছি।

এক কথায়—বর্ত্তমান মানবসমাজের নেতৃবৃন্দ মুখে শান্তি-প্রয়াসী বটে কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারাই প্রকৃত শান্তি স্থাপনের বিরোধিতা করিতেছেন এবং মানবসমাজ তাঁহাদিগের দ্বারা বিপথে চালিত হইয়া অশান্তির দহনে দগ্ধ হইতেছে। নিরপরাধ রমণী ও শিশু পর্য্যন্ত উপরোক্ত অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতেছে না।

উপরোক্ত বাস্তব সত্য লক্ষ্য করিলে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে যে,—কেন এইরূপ হয়?

শান্তি-প্রয়াসী হইয়াও সমস্ত দেশের নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের শিক্ষিত অনুচর-বর্গ কার্য্যতঃ কেন প্রকৃত শান্তি স্থাপনের বিরোধিতা করিতেছেন তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার একমাত্র কারণ জগতের শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষাবিভাগ দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং ঐ দুষ্ট শিক্ষায় শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের প্রাণ যাহা চাহে—তাহা লাভ করিতে হয় কোন্ উপায়ে—তদ্বিষয়ে পরিজ্ঞাত নহেন।

কাযেই শিক্ষাভিমানীরা যাহাতে তাঁহাদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সন্দেহের চোখে দেখিতে বাধ্য হন, সাধারণ মানুষকে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে এবং উহাদিগকে আরও মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শান্তির অভাব ও প্রকৃত শিক্ষাভাব হইতে সর্ব্বসাধারণকে রক্ষা করিতে হইলে যে সংগঠন-প্রণালী উদ্ভাবন করিতে হইবে—তাহার জন্য আজকালকার শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। উহার জন্য তথাকথিত অশিক্ষিত জনসাধারণকে তৎপর হইতে হইবে এবং তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সদসৎ বিচার-শক্তির দ্বারা ঐ সংগঠন-প্রণালী আবিষ্কার করিতে হইবে। এক কথায় জনসাধারণকে তাঁহাদিগের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের আদর্শ, আইন ও নিয়মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, অথচ ঐ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা চলিবে না।

প্রচলিত আইন ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থা যতই দুষ্ট হউক না কেন, যতদিন পর্য্যন্ত উহার পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ আইন ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থা জনসাধারণকে মানিয়া চলিতে হইবে এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, দেশে বিন্দুমাত্রও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে অবহিত হইয়া ঐ দুষ্ট আইন ও শৃঙ্খলা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

তৃতীয় কথা—ইংলণ্ডের পরাজয়। যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হয় না, যাহার গাণিতিক বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, বাণিজ্য-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান জগতের প্রত্যেক দেশের অনুকরণ-যোগ্য হইয়াছিল, যাহার শিষ্যত্ব ও সৌখ্যত্ব লাভ করিতে পারিলে জগতের প্রত্যেক দেশ গৌরবানুভব করিত—তাহার বিরুদ্ধে জার্ম্মানী, জাপান ও ইটালী অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন এবং এমন কি সম্মুখ-সমরে ইংলণ্ড পরাজয় লাভ করিতেছে। এই বাস্তব সত্য লক্ষ্য করিলে স্বতঃই প্রশ্ন আইসে যে, নগণ্য জার্ম্মানী, জাপান ও ইটালী এতবড় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার সাহস পায় কোথা হইতে, এবং ইংলণ্ডই বা তাহাদিগের বিরুদ্ধে পরাজিত হয় কেন?

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" অথবা "কর্ম্মানুসারে ফল লাভ হইয়া থাকে" এই নিয়মকে ভিত্তি করিয়া উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যে সংগঠনে মানবসমাজের প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শান্তির অভাব বিদূরিত হইতে পারে সেই সংগঠনের অনুসন্ধান না করিয়া অথবা সেই সংগঠন যাহাতে প্রত্যেক দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা না করিয়া যাহাতে কেবলমাত্র কোন সম্প্রদায় বিশেষের অথবা কোন জাতিবিশেষের অথবা কোন সাম্রাজ্যবিশেষের অর্থাভাবাদি দূর হইতে পারে তাহার সংগঠনে প্রবৃত্ত হইলে কোন সম্প্রদায় অথবা জাতির অথবা সাম্রাজ্যের অর্থাভাবাদি বিদূরিত হয় না এবং কোন সাম্রাজ্যও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ইংলণ্ডের যতকিছু বিজ্ঞান জগতের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটীতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কি উপায়ে প্রসার লাভ করিবে, ইংলণ্ডের অধিবাসীরা কি উপায়ে অর্থাভাবাদি হইতে রক্ষা পাইবে তাহার চিন্তা আছে বটে কিন্তু কি উপায়ে মানবসমাজের প্রত্যেকে অর্থাভাবাদির হাত হইতে রক্ষা পাইবে তাহার কোন চিন্তা নাই। ইংলণ্ডের এই বিজ্ঞান-প্রদর্শিত সংগঠনের ফলে প্রত্যেক দেশেই অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব কিছু-

দিন হইতে বাড়িয়া আসিতেছে এবং অবশেষে নগণ্য জার্ম্মান, জাপান ও ইটালী পর্য্যন্ত মরিয়া হইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে সাহসী হইয়াছে। আমাদিগের বিশ্বাস, এখনও যগ্যপি ব্রিটেনের কর্ণধারগণ নিজেদের বিজ্ঞান-প্রদর্শিত পন্থায় যে যে ভ্রম-প্রমাদ রহিয়াছে তদ্বিষয়ে অবহিত হইয়া বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রণালীর পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং যে সংগঠনে মানব-সমাজের প্রত্যেকের যুগপৎ অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হইতে পারে, সেই সংগঠন সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রবর্ত্তিত করেন এবং ঐ সংগঠন যাহাতে জগতের অপরাপর দেশ গ্রহণ করে তাহার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এখনও ব্রিটেন পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং তাহার সাম্রাজ্য এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। গত পঞ্চাশ বৎসর হইতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যাহা ঘটিয়া আসিতেছে—তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে বলিতে হয়, ব্রিটেনের পক্ষে উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইবে না। উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে ব্রিটিশ জনসাধারণকে তজ্জন্য অবহিত হইতে হইবে এবং তাঁহাদিগের শিক্ষিত নেতৃমণ্ডলী যাহাতে অবসর গ্রহণ করেন, অথবা আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের কার্য্যপন্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বাধ্য হন, তাহা করিতে হইবে। ব্রিটিশ জনসাধারণ যেরূপ ভাল মানুষ, তাহাতে তাঁহাদিগের পক্ষে অনতিবিলম্বে এইরূপ কঠোরতা অবলম্বন করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না।

ব্রিটেন নগণ্য জাপান ও জার্ম্মানীর হস্তে পরাজয় লাভ করে কেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, যুদ্ধজয়ের প্রধান উপকরণ সৈন্যগণের পর-প্রাণতা অথবা দেশ-প্রাণতা এবং জয়-লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। পরকে আপন করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন ইংলণ্ড তাহার সাম্রাজ্যের কুত্রাপিও এবং এমন কি, তাহার নিজের দেশেও ঐ শিক্ষা বিতরণ করে নাই। শিক্ষা-পদ্ধতি কিরূপ হইলে মানুষ পরকে আপন করিতে পারে এবং পরের জন্য অথবা দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে তাহা ইংলণ্ডের জানা আছে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে। ফলে ইংলণ্ডের কোন সৈন্যই কোন যুদ্ধে জয় লাভের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখাইতে পারিতেছে না এবং সর্ব্বত্রই সাফল্যমণ্ডিত পশ্চাদপসরণের নিপুণতা (strategy of successful retreat) দেখাইতেছে।

ইংলণ্ডের শিক্ষা ও বিজ্ঞান যে কতদূর দুষ্টতাপরিপূর্ণ তাহা ইংলণ্ডের পরাজয় হইতে জনসাধারণকে বুঝিয়া লইতে হইবে এবং ঐ বিজ্ঞান ও শিক্ষা যাহাতে কোন দেশে প্রসার লাভ না করে এবং উহা যাহাতে সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত হয়,—তজ্জন্য জনসাধারণকে চেষ্টা করিতে হইবে। ভগবান্ ইংলণ্ডকে রক্ষা করুন!

বর্ত্তমান যুদ্ধের শিক্ষা অনেক। মহাভারতের মত গ্রন্থ লিখিলেও উহার আলোচনার সমাপ্তি হয় না। বারান্তরে আবার এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

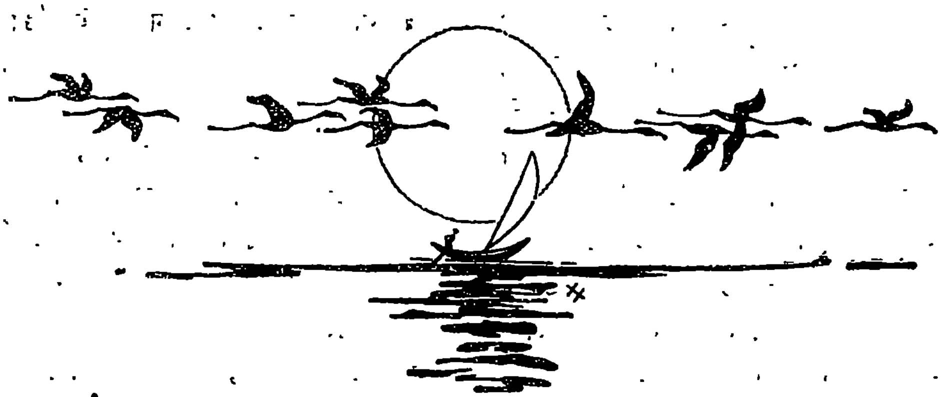

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

এগার

পঞ্চদশ কংগ্রেসের অধিবেশন হয় লক্ষ্ণৌ সহরে এবং বাঙ্গালার মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রমেশচন্দ্র কেবল যে গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন তাহাই নহে, তিনি বিশেষ বিজ্ঞ ও বিদ্বান ছিলেন। ইনি কেবল বেদের বঙ্গানুবাদই করেন নাই, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তত্ত্বও লিখিয়া গিয়াছেন,কেবল অনুসন্ধাননিরত প্রত্নতাত্ত্বিকই ছিলেন না, বাঙ্গালা ভাষায় 'বঙ্গবিজেতা' 'মাধবী কঙ্কণ' 'জীবন প্রভাত' 'জীবন সন্ধ্যা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং 'সংসার' ও 'সমাজ' সামাজিক উপন্যাসও লিখিয়া গিয়াছেন আর মাধবী কঙ্কণ, জীবনপ্রভাত প্রভৃতি উপন্যাসে কেবল খাঁটি ইতিহাসই নাই, জাতীয়তা সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। তবে একথা ঠিক যে, বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহাকে সাহিত্যে অনুপ্রেরণা দেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন বংশীলাল সিংহ। লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালের প্রথম বৎসরেই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাই রমেশ দত্ত মহাশয় দুঃখ করিয়া বলেন, লর্ড কার্জ্জনের অভিসন্ধি বোধ হয় খারাপ নয়, কিন্তু ভারতীয় মনোভাব তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া অনেক কথা বলেন। তিনি মনে করেন লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের কারণ নয়। তিনি বলেন, "অত্যধিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও জার্ম্মানী ও বিলাতে দুর্ভিক্ষ হয় না। আমাদের দেশের কৃষককুল মিতব্যয়ী কিন্তু তাহাদের খাওয়ার অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই; তাই তাহারা খুব অতিরিক্ত সুদে ঋণ করিতে বাধ্য হয়। আর অর্থাভাবই বা না হইবে কেন—তাহাদের হস্ত-শিল্প বাজারে বিকায় না, বিদেশী সস্তা পণ্যে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। দেশের মেরুদণ্ড এই কৃষককুল আজ অন্তঃসারশূন্য। বিপুল সৈন্যের ব্যয়ভার তাহাদিগকেই বহন করিতে হয়, কত প্রকার শুল্ক তাহাদিগকে দিতে হয়! ভারতের ভূমি-রাজস্বের পরিমাণও খুবই অধিক। এই সমস্ত কারণে দুর্ভিক্ষ সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে।"

তাঁহার বক্তৃতায় বাগ্মীর উত্তেজনা ছিল না, কিন্তু উহা বিশেষ সারগর্ভ হইয়াছিল। তাহাতে সর্ব্বত্র আশার সুর ছিল।

এ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কংগ্রেসের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। এই অধিবেশনের পূর্ব্বেও বালান্দবাগ (লক্ষ্ণৌ) মুসলমানদের এক সভা হইয়া (৪ঠা ডিসেম্বর) তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা হয়। রাজা আমীর হোসেন খাঁ সেখানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে লক্ষ্ণৌর কংগ্রেস অধিবেশনে মুসলমান ভ্রাতৃগণেরও বিশেষ উৎসাহই পরিলক্ষিত হয় এবং ৩০০ মুসলমান প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত

লর্ড কার্জ্জন ভারতবর্ষে আসিয়া ১৮৯৯ সালে অনেক স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। কাশ্মীর, দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ

রাজপুতনা, বারাণসী, পাটনা প্রভৃতি অনেক স্থানে তিনি দরবার করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। ইনি যে একজন খুব কর্ম্মক্ষম, উদ্যমপরায়ণ, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান শাসনকর্ত্তারূপে পরিগণিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয়গণের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি দেখাইতে কখনও তিনি পারেন নাই।

লক্ষৌ কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের' প্রস্তাবটী উত্থাপিত করিয়া যে বক্তৃতা দেন, তাহাতেও এই কথা বিশেষ ওজস্বিনী ভাষায় বলেন—

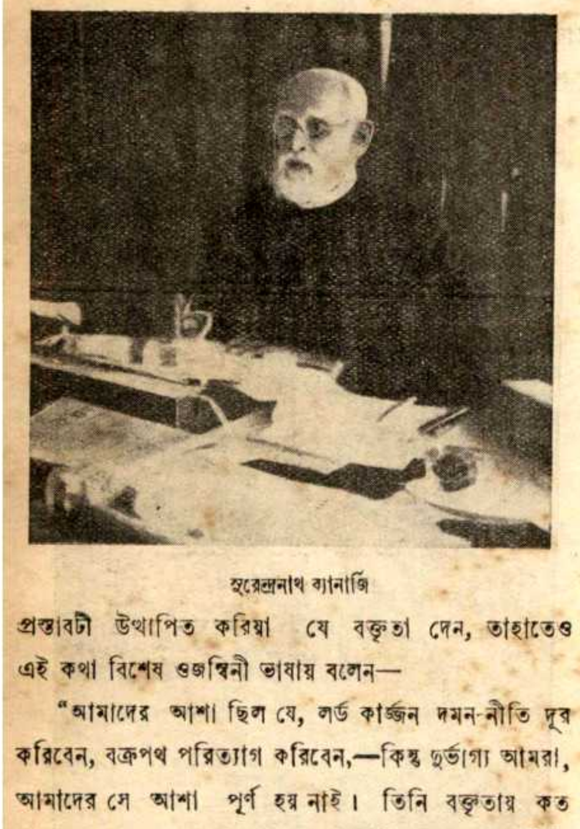

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

"আমাদের আশা ছিল যে, লর্ড কার্জ্জন দমন-নীতি দূর করিবেন, বক্রপথ পরিত্যাগ করিবেন,—কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা, আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি বক্তৃতায় কত আশার কথা বলেন, তাহা কত সহানুভূতি-মাখা, আর নীতি তাহার কত বিপথগামী, অনুদার ব্রিটিশ ন্যায়-নীতি-বিরোধী।"

"His speech how noble, how generous, how sympathetic, the policy how narrow, how illiberal,how un-English."

"বস্তুতঃ লর্ড কার্জ্জনের কার্য্যে আমরা যে এত নিরাশ হইব, তাহা কখনও ভাবি নাই।

"We can not bring ourselves obtelieve that a ruler so sympathetic in his utterances, so generous, so large-hearted in his views, so keenly appreciative of the situation will countenance a policy opposed to the best tradition of British rule, repugnant to all that is highest, noblest and truest in British statesmanship."

সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "আমরা কি বিশ্বাসযোগ্য নই ? আমরা সত্য কথা বলি, প্রকৃত পন্থানুসারে সদুপদেশ দেই। আমরা অধিক রাজভক্তিপরায়ণ, না, খয়েরখাঁরা অধিক রাজভক্তিপরায়ণ ?"

Sir, who are the men who are bitterly disloyal —the men who say ditto to every measure of government or who in season and out of season sing the praise of Government ?

সংস্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী করা হয়—

VII. This Congress expresses its disapproval of the reactionary policy subversive of Local Self-government evidenced by the passing of the Calcutta Municipal Act* and by the introduction into the Legislative Council of Bombay of a similar measure which will have the effect of seriously jeopardising the principles of local self interests.

অতঃপরে সংস্কার-প্রয়াস ও বিদ্রোহের পার্থক্য বুঝাইয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলেন,

"Sir, in these days I am perfectly sure the greatest bulworks of all the Governments be they indigenous or be they foreign, is the contentment, the gratitude and the affection of the people. How is the affection of the people to be won except by the removal of grievances and how are the people to remove their grievances except by the adoption of constitutional means or the adoption of revolutionary measure. We are the friends of Reform because we are the enemies of the Revolution. We have make our choice, let our enemies make theirs. Do they wish to belong to our camp or do they wish to the camp of Revolutions ? There is no intermediate step between Reform and Revolution. For you must enlist yourselves under the banner of Reform or you must take your place behind the standard of Revolt and Revolution.

---

*পূর্ব্বেই বলিয়াছি "Mackenzie Bill" ১৮৯৯, সালের সেপ্টেম্বর মাসেই আইনে পরিণত হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বংশীলাল ও সম্পাদক গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মার পরিশ্রম ও যত্নে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্যই সাফল্যমণ্ডিত হয়। এবার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা স্যার এণ্টনী ম্যাক্‌ডনেল কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে বেশ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাঁহারই সহায়তায় কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান সঙ্কুলনে কোন অসুবিধা হয় নাই।

১৮৯৯ সালে বাঙ্গালায় ও বিহারে প্লেগের প্রকোপ থাকে, তাই কলিকাতা ও হাওড়ার প্রতিনিধিগণের জন্য গোমতীর অপর তীরে সহর হইতে অনেক দূরে পুরানিয়া নামক গ্রামের নিকটে মাঠের মধ্যে তাঁবু করিয়া বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সেখানে যেমন শীত, তেমনি মাছির উপদ্রব! তাহাদের বড় কষ্ট হয়।

কংগ্রেস-মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল শাহমিনার ময়দানে। এবারকার মণ্ডপ খুব বৃহদাকার ও মনোহর করিয়া তৈয়ার করা হয়। সিংহদ্বারও খুব সুন্দর হয়। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বাঙ্গালী চন্দ্রমোহন রায়। প্রায় ৭৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন।

তন্মধ্যে N. W. P. & Oudh হইতে ৬০৩, বাঙ্গলা হইতে ৫৭ জন প্রতিনিধি আসিয়াছিল।

সভাপতি মহাশয় যখন তাঁহার অভিভাষণ শেষ করিলেন, সংবাদ আসিল যে নাথু ভ্রাতৃদ্বয় মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই সংবাদ তিনি ঘোষণা করা মাত্রই সেই বিরাট মণ্ডপে যে তুমুল হর্ষধ্বনি হয় তাহাতে যথেষ্ট আবেগের সঞ্চার হইয়াছিল। এইরূপ মুহুর্মুহুঃ হর্ষনিনাদ ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে ১৯১৯ সালের অমৃতসরস্থ কংগ্রেস-মণ্ডপ আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও ডাক্তার কিচলুর মুক্তিতে মুখরিত হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌ অধিবেশনেই কংগ্রেসের গঠনপ্রণালী (Constitution) প্রথমে নিরূপিত হয়।

উদ্দেশ্য—বৈধ উপায়ে ভারতবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও স্বার্থ প্রসার—

"To promote by constitutional means, the interests and well-being of the people of the Indian Empire."

১৯২১ সালে Interests-এর জায়গায় 'স্বরাজ' বসান হয় এবং ১৯৩৫ সালে স্বাধীনতার উপায় উল্লিখিত হয় legitimate and peacful means (শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্যভাবে)। Constitutional সব সময়েই আইন সঙ্গত হইবে আর Legitimate-এর অর্থ ন্যায্যভাবে এবং তাহা সব সময়ে যে আইন সঙ্গত হইবে তাহা নয়। বস্তুতঃ ১৯২১ হইতে আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সেবকগণ যেরূপ স্বেচ্ছাসেবক গঠন করিয়া কারাবরণ করিয়াছে তাহাতে Legitimateকে 'বৈধ' বলিয়া কিছুতেই অনুবাদ করা চলে না। কংগ্রেসের "বৈধ" অনুবাদটী নিতান্তই ভুল। ইহা হইবে "ন্যায্য" বা "ন্যায়সঙ্গত"।

লর্ড কার্জ্জন

ইহার পূর্ব্বে ১৯০৮ সালে যে Constitution হয় সেকথা যথাসময়ে বলিব।

কংগ্রেসের সমস্ত কাজ চালাইবার জন্য ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস নামে একটী কমিটী থাকা ঠিক হয়। (Indian Congress Committee) আজকাল তাহারই নাম অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী।

কংগ্রেসের প্রতিনিধির নির্ব্বাচন হইতে রাজনীতিক সভা অথবা সাধারণ সভায় এবং তাহা প্রকাশ্য সভায় করিতে হইবে।

"Delegates are to be elected by political associations or other bodies and by public meetings."

ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস-কমিটীর ৪৫ জন সভ্য থাকিবে, তন্মধ্যে ২৬ জন বিভিন্ন প্রদেশের ডেলিগেট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। এই ২৬ জন নিম্নলিখিত ভাবে বাছাই হইবে—

এই কমিটীর অন্ততঃ তিনবার অধিবেশন হইবে, এবং ইহাই নিয়ম-কানুন গঠন করিবেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী করিবেন প্রাদেশিক সম্মেলন এবং প্রাদেশিক কমিটী ডিষ্ট্রীক্ট কমিটি গঠন দ্বারা জিলায় জিলায় কার্য্য প্রসার করিবেন। বিলাতে একটী ব্রিটিশ কংগ্রেস-কমিটী থাকিবে। তাহার কংগ্রেসের একজন বেতনভোগী সেক্রেটারী থাকিবে। আফিসের খরচ বৎসরে ৫০০০৲, তাহা গত এবং আগামী অভ্যর্থনা সভা ভাগাভাগি করিয়া দিবেন।

ফিরোজ শা মেটা

ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে ৪৫ জন সভ্য থাকিবে। তন্মধ্যে অন্যান্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক ৪০ জন নির্ব্বাচিত হইবেন, আর যদি কোন প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী না থাকে, তবে সেই প্রদেশস্থ উপস্থিত ডেলিগেট্ দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে, ইহাদের কার্য্যকাল এক অধিবেশন হইতে পরবর্ত্তী অধিবেশন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

Its affairs shall be managed by a committee styled the Indian Congress Committee consisting of 45 members elected by the Congress, 40 of whom shall be elected upon the recommendations of the different Congress Committees, by the delegates of the respective provinces in Congress assembled in the manner herein below laid down, that is to say—

Bengal including Assam 8

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র বসু, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অম্বিকা মজুমদার, জানকী ঘোষাল, অশ্বিনী দত্ত, আনন্দমোহন বসু, দীপনারায়ণ সিংহ।

Bombay including Sind 8

ওয়াচা, রুদ্রভারকার ইত্যাদি।

Madras 8

সি, বিজারাঘবাচারী, শঙ্কর নায়ার, জি, সুব্রহ্মণ্যায়ার ইত্যাদি।

N. W. P. and Oudh 6

বিশ্বম্ভর নাথ, গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, বিশেননারায়ণ দর, মদনমোহন মালবীয়, হাফিজ আবদুর রহমান ইত্যাদি।

Punjab 4

লালা হরকিষণলাল ইত্যাদি।

Berar 3

জি, এস, খাপর্দ্দে ইত্যাদি।

Central Provinces 3

এই চল্লিশ ভিন্ন আরও পাঁচজন যে সাধারণ সভ্য (General members) ছিলেন—তন্মধ্যে বাঙ্গলার ৩ জন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, অপর দুইজন মাধোলকার ও ফিরোজ শা মেটা।

এবারও হিউম সাহেবই জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন এবং ওয়াচা হন জয়েণ্ট সেক্রেটারী।

[ক্রমশঃ

ভক্ত-কবি রজনীকান্ত

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি, এল

বাঙ্গালা দেশে রজনীকান্তের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। তবে একান্তই যদি নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। একদিন যাঁহার অমর সঙ্গীতে বাঙ্গালা দেশ হাসিয়াছে, কাঁদিয়াছে, দেশ মাতৃকার পূজাবেদী মূলে বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়া অঞ্জলি প্রদান করিয়াছে, আজ বাঙ্গালা দেশ সেই কবিকে ভুলিতে বসিয়াছে, তাঁহার মন্ত্র সঞ্জিবনী তুল্য অমৃতময় সঙ্গীতকে ভুলিতে বসিয়াছে। বড়ই দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, কান্ত কবির স্মৃতি-সভায় তাঁহার রচিত সঙ্গীত গাহিতে পারে এমন সঙ্গীতজ্ঞই খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। এই আত্ম-বিস্মৃত জাতির নিকট হইতে কবির স্বর্গগত আত্মা ইহা অপেক্ষা আর কি আশা করিতে পারেন! রজনীকান্তের সঙ্গীত আধুনিক সঙ্গীতের মত ভাবহীন কতকগুলি ভাষার সমন্বয় ছিল না, রজনীকান্তের সঙ্গীত ছিল প্রাণস্পর্শী ; ভাব, ভাষা ও সুরে প্রাণ মন মোহিত করিয়া নিজেকে ভুলাইয়া দিত।

এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার কোলে পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী নামক এক পল্লীতে প্রাতঃস্মরণীয় সেন বংশে ১২৭২।১১ই শ্রাবণ তারিখে তাঁহার আবির্ভাব হয় এবং ১৩১৭।২৮শে ভাদ্র তারিখে বঙ্গজননীর অঞ্চলনিধি কাব্য ভারতীর দীপ্ত দেউল আঁধার করিয়া দেশবাসীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া মেডিক্যাল-কলেজ হাঁসপাতালে ইহলীলা সংবরণ করেন। সেদিন বঙ্গভারতীর এক মহাদুর্দ্দিন বলিতে হইবে। তাহা না হইলে রজনীকান্তের মত বর পুত্রকে কেন অকালে হারাইতে হইবে। মা ত' সুসন্তান হারাইল, দেশবাসী প্রাণের জাগ্রত কবিকে হারাইল, কাব্য নিকুঞ্জের মধুর পিককণ্ঠ চিরতরে নীরব হইল।

কান্ত কবির জীবনী আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। আত্ম-বিস্মৃত জাতির সম্মুখে কান্ত কবির চির-হাস্য বিজড়িত শান্ত, সৌম্য, স্নিগ্ধ মূর্ত্তিখানি একবার ধরিবার প্রয়াস পাইব।

কবি রজনীকান্ত

রজনীকান্তের রচিত 'বাণী' 'কল্যাণী' 'অভয়া' 'আনন্দময়ী' 'অমৃত' 'বিশ্রাম' ও 'সদ্ভাব কুসুম' এই কয়েকখানি গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাইব, রজনীকান্ত ভগবৎ প্রেমের অতল সাগরে ডুবিয়া গিয়া নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আবার দেখিতে পাইব, কান্ত কবি দুঃখিনী বঙ্গ-জননীর অশ্রু দেখিয়া নিজে কাঁদিয়াছেন, দেশবাসীকে কাঁদাইয়াছেন, বঙ্গ জননীর অশ্রু মোচনের জন্য ভাই ভাই এক হইয়া বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রজনীকান্ত সাধন তলে ডুবিয়া থাকিলেও সমাজের দুষ্ট ক্ষত যাহা সমাজের বুকে বিষ ঢালিয়া দিতেছে তাহাও কবির চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। তিনি প্রয়োজন মত সমাজের বুকে উপযুক্ত কশাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কান্ত কবির হাস্য-রসাত্মক কবিতা অমৃতের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বর্গীয় কবির এই সমুদয় ভাবধারা একে একে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার অক্ষম

লেখনী কতদূর কৃতকার্য্য হইবে বলিতে পারি না। কবির স্বর্গগত আত্মা আমার এই কার্য্যে সহায় হউন !

দেশ প্রেমিক চারণ-কবি রজনীকান্ত

রজনীকান্তের মত সহজ সরল ভাষায় এমন করিয়া প্রাণের কথা কেহই বলিতে পারে নাই। রজনীকান্তের ভাব, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ-স্বতন্ত্র। কখনও তাহা পূতঃ ধারার মত সাবলীল গতিতে কুলুকুলুস্বরে ছুটিয়াছে, কখনও উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের বিচিমালা ভঙ্গের মত জলদ মন্দ্র ধ্বনিতে দু'কূল প্লাবিত করিয়াছে। রজনীকান্ত ছিলেন সত্যিকারের স্বদেশ প্রেমিক, দেশ-মাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক। তিনি সমগ্র দেশের সমতুল মাতৃ-মূর্ত্তির যে ছবি তাঁহার সঙ্গীতে আঁকিয়া তুলিয়াছিলেন তাহাতে সমগ্রদেশ মায়ের পূজায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেশকে জাগাইয়াছিলেন, দেশবাসীকে মাতৃ যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাণীর উদ্বোধন সঙ্গীতে কবি গাহিয়াছেন,

"ভারত-কাব্য নিকুঞ্জে
জাগ সুমঙ্গলময়ি মা !
মুঞ্জরি তরু পিক গাহি
করুক প্রচারিত মহিমা।
তুলে লহ, নীরব বীণা, গীতহীনা
অতি দীনা ;
হের ভারত চিরদুঃখ শয়ন বিলীনা ;

*

জাগিবে রাতুল চরণ তলে
যত, লুপ্ত পুরাতন গরিমা।

তিনি "দুঃখ শয়ন বিলীনা" ভারতের ছবি দেশবাসীর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি দুঃখিনী দেশ মাতৃকাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, বাণীর প্রথম সঙ্গীতে দেশের অবস্থা আরও স্পষ্টতর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,

"সেথা আমি কি গাহিব গান ?
যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম ঝঙ্কারে
কাঁপিত দূর বিমান।

*

যেথা আলোড়ি চন্দ্রালোক শারদ ;
করি হরি গুন গান নারদ ;
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন
টলাইত ভগবান।

*

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র ;
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র ;
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ
আর কি আছে সে প্রাণ ?

ভারতের সে মন্ত্র নাই, ভারতের সে সাধনা নাই, ভারতের সে প্রাণ নাই, ভারতের সে কণ্ঠ নাই, তাই বড় দুঃখেই কবি গাহিয়াছেন,

"সেথা আমি কি গাহিব গান"

ভারতের লুপ্ত কীর্ত্তির কথা বলিতে বলিতেই আবার কবি গাহিয়া উঠিলেন—

"জ্যোতিষ দরশণ বেদ গণিত কবিতা
শোভে কোমল কোলেরে ;
শুভ্র রজত গিরি কিরণ বিকীরণে
অন্ধ নয়ন যুগ খোলেরে।

কবি নিম্নের কবিতায় ভারতমাতার রূপ বর্ণনা করিয়া সন্তানকে জাগাইয়াছেন,

"তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা ;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত মণি রঞ্জিত নভো নীলাঞ্চলা
সৌম্য মধুর দিব্যাঙ্গনা শান্ত কুশল দরশা।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ উদ্ভাসিত গঙ্গা ;
নৃত্যে পুলক-গীতি মুখর কলুষ হরা তরঙ্গা ;

*

ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ কুসুম গন্ধ বহিয়া ;
আর্য্য গরিমা কীর্ত্তি-কাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া ;

*

ঐ হের স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব গগনে ;
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি ডাকিছে সুপ্তি মগনে।
নিদ্রালস নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে ?
জাগাও বিশ্ব পুলক পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।"

'জন্ম-ভূমি' শীর্ষক কবিতায় কবি মাতৃভূমির রূপ বর্ণনা করিয়া সন্তানকে মায়ের চরণে বুকের তপ্ত রক্ত অর্ঘ্য দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন,—

"জয় জয় জনমভূমি জননী !
যাঁর, স্তন্য সুধাময় শোনিত ধমনী ;

*

উজ্জ্বল কানন হীরক মুক্তা
মণিময় হার বিভূষণ যুক্তা ;
শ্যামল শস্য পুষ্প ফল পূরিত
সকল দেশ জয় মুকুট মণি !

*

জননী তুল্য তব কে মর জগতে?
কোটি কণ্ঠে কহ "জয় মা বরদে!"
দীর্ণ বক্ষ হ'তে তপ্ত রক্ত তুলি
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি।

জননী জন্মভূমি তুল্য আর জগতে কে আছে? যাঁর অফুরন্ত স্তন্যসুধা পান করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। যাঁর স্নেহ নীড়ের শীতল ছায়ায় :দুঃখ তাপ-দগ্ধ দেহ-মন জুড়াইতেছি।

'ভারত-ভূমি' শীর্ষক কবিতায় কবি ভারতের গৌরবময় কীর্ত্তি কাহিনী গাহিয়াছেন এবং তাঁহার বীর সন্তানগণের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান ভারতের অশ্রুসিক্ত-নয়ন যুগলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছেন,

শ্যামল শস্য ভরা;
(চির) শান্তি বিরাজিত পুণ্যময়ী

যমুনা সরস্বতী গঙ্গা বিরাজিত।
রাম যুধিষ্ঠির ভূপ অলঙ্কৃত,
অর্জ্জুন ভীষ্ম শরাসন টঙ্কৃত
বীর প্রতাপে চরাচর শঙ্কিত

*

ওই সুদূরে সে নীর নিধি
যার, তীরে হের দুখ দগ্ধ হৃদি!
কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি!

বঙ্গ জননীর বন্দনায় কবি গাহিয়াছেন,—

নমো নমো নমো জননী বঙ্গ!
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য।
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি;
চুম্বে চরণতল নিরবধি;
মধ্যে পূত জাহ্নবী জল
ধৌত শ্যাম ক্ষেত্র সঙ্ঘ।

স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশ-মাতৃকার দুর্দ্দশা দেখিয়া কবি কাঁদিয়াছেন এবং দেশকে জাগাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি জননী জন্মভূমির ম্রিয়মান মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য, ভারতের লুপ্ত গরিমা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে আহ্বান করিয়াছেন। তারপর বাঙ্গালার সে এক ঘোর দুর্দ্দিনে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হইল। আত্ম-বিস্মৃত নিদ্রিত জাতির ঘুম ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। যে দেশ সমগ্র পৃথিবীর মুখে ক্ষুধায় অন্ন তুলিয়া দিতেছে, যে জাতি যুগ যুগ ধরিয়া সভ্যতার আলোক জগতে বিলাইয়া গিয়াছে, এক দিন যে জাতি সমুদ্রের পারে নগ্ন জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিক্ষা দিয়াছে, আজ সেই জাতিকে নিরন্ন ও পর মুখাপেক্ষী হইয়া লজ্জা নিবারণের জন্য সমুদ্রের পারে তাকাইয়া থাকিতে হয়। হায়, দুরদৃষ্ট! বাঙ্গালীর ধন, মান, প্রাণ, সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালী বিলাতীর মোহে নিজ বৈশিষ্ট্য ও পূর্ব্ব গৌরব ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে। তাই চারণ কবি রজনীকান্ত সুদৃঢ় কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন,

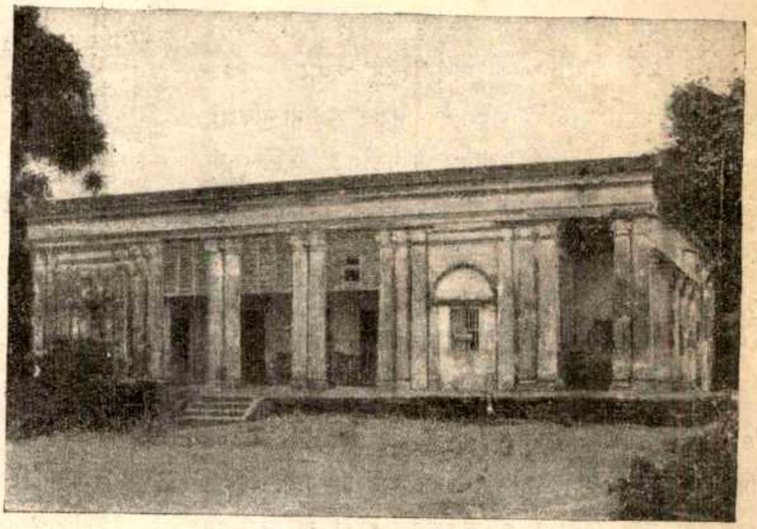

কান্ত কবির পল্লীভবন

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই!
দীন দুঃখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সূতার সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।

ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু, তাই বেচে কাচ সাবান মোজা
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।

বাঙ্গালার আকাশ, বাতাস এই সঞ্জীবনী সঙ্গীতের সুর লহরীতে মাতিয়া উঠিল। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, ধনী-গরীব, ছোট-বড়, পণ্ডিত-মূর্খ, সকলেরই প্রাণে সাড়া পড়িয়া গেল। সন্তান দেশমাতৃকাকে চিনিয়া লইল। এই অমর সঙ্গীতের ভাব ভাষা অতি সহজ ও সরল। অগ্নি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের পর এতবড় জাতীয় সঙ্গীত আর সৃষ্টি হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে পণ্ডিত অর্থ বুঝিয়া সম্ভ্রমে মাথা নোয়াইল, অ-পণ্ডিত অর্থ না বুঝিয়াই সর্ব্বশক্তিরূপিণী দেশ-মাতৃকার চরণতলে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিল। আর, কান্তকবির এই জাতীয় সঙ্গীতে দেশ-মাতৃকার সন্তান মাকে চিনিল, নিজেদের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিল। তাই ভাই ভাই এক হইয়া মায়ের অশ্রু মোচন করিবার জন্য বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

সমগ্র দেশ তখন নিজের আত্ম-সম্মান ভুলিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পূর্ব্ব গৌরবময় কীর্ত্তি-কাহিনী ভুলিয়া নিজেদের শক্তির দিকে অচেতন হইয়া বিলাতীর মোহে ডুবিয়া যাইতেছিল। দেশবাসী ক্লীব, বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছিল। দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। এক কথায় দেশবাসী বিলাতী কায়দায় বাবু বনিয়া যাইতেছিল। ঢাকাই মস্‌লিনের স্মৃতি ভুলিয়া গিয়া, দেশের বস্ত্র-শিল্পের দুঃখের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়া দেশবাসী ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাসায়ারের দিকে লজ্জা নিবারণের জন্য লজ্জাহীন লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। সেই ঘোর দুর্দ্দিনে কবি আত্ম-বিস্মৃত জাতির লুপ্ত চেতনা ফিরাইয়া আনিবার জন্য নিজের শক্তির দিকে জাগ্রত হইবার জন্য গাহিয়া উঠিলেন,—

"নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট
তবু, আছ সাত কোটি ভাই জেগে উঠ।

*

নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে ;
আমরা, রব কি উপোসী ঘরে শুয়ে ?

*

ঘরের দিয়ে আমরা পরের মেঙ্গে,
কিন্‌ব না ঠুন্‌কো কাচ, যায় যে ভেঙ্গে।
থাক্‌লে, গরীব হয়ে, ভাইরে গরীব চালে
তাতে হবে নাকো মান খাটো"

কবি বলিতেছেন—আমরা গরীব হইতে পারি, ছোট হইতে পারি, তবুও আমরা সাত কোটি ভাই যদি জাগিয়া উঠি, তবে সে শক্তিকে রোধ করে কার সাধ্য ? এমনিতর প্রাণের দরদ মাখা সঙ্গীত আর কোন জাতির ইতিহাসে আছে কি না সন্দেহ।

নিজের দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে রজনীকান্তের কবি হৃদয় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি গাহিয়া উঠিলেন—

"তাই ভালো মোদের, মায়ের ঘরের শুধু ভাত;
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চা'লে কাজ নাই, সে বড় অপমান ,
মোটা হ'ক সে সোনা মোদের, মায়ের ক্ষেতের ধান।"

এ জাতি আর কতদিন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া পর অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া লজ্জানত মুখে চাহিয়া থাকিবে ? চারণ কবি রজনীকান্তের আহ্বানে কি কেহই সাড়া দিবে না ?

রজনীকান্ত দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে মিলন-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন,

"আয় ছুটে আয় হিন্দু মুসলমান
ঐ দেখ ঝরছে মায়ের দুনয়ন।

*

আজ এক ক'রে দে সন্ধ্যা নমাজ
মিশিয়ে দে আজ বেদ কোরাণ।"

কান্ত কবির এই মিলনের আহ্বান হিন্দু মুসলমানের প্রাণের দ্বারে পৌঁছিয়াছে কি ?

সমাজ-সংস্কারক রজনীকান্ত

সমাজের অধঃপতনে রজনীকান্ত অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। যে জাতি একদিন শিক্ষা-দীক্ষায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেই জাতি যে এমনি করিয়া নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস ভুলিয়া যাইতে পারে ইহা প্রকৃতই বিস্ময়ের

বিষয়। বিলাতী আদব-কায়দায় দেশ তখন একেবারেই আপন সত্ত্বা ভুলিয়া গিয়াছিল। নিজেদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি এমন কি নিজ ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছিল। সমাজের এই ব্যবস্থা দেখিয়া রজনীকান্ত বিদ্রূপের বাণে সমাজ-বক্ষে 'শক্তিশেল' হানিয়া সমাজকে জাগ্রত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কান্তকবি "বরের দর" ও "বেহায়া বেহাই" শীর্ষক কবিতায় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা আরও স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়াছেন। যে দেশে পেট ভরিয়া দুই মুঠা ক্ষুধার অন্ন জোটে না, সেই দেশে কন্যাদায়ে বিব্রত কন্যার পিতার ভিটা-মাটি উচ্ছন্ন যায় ইহা অপেক্ষা সমাজের আর কি শোচনীয় দুর্দ্দশা হইতে পারে? তাই কবি বরের পিতার মুখ দিয়া একটী ফর্দ্দ দাখিল করিয়াছেন—

নগদে চাই তিনটী হাজার,
তাইতে আবার গিন্নী বেজার।

*

তোমার কাছে চক্ষু লজ্জা লাগে যে বিষম।
পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,
হয় না কমে বলে 'গিরিশ'
কাজেই সেটা, হাঁ হাঁ, বেশী বলা অকারণ।

এক কথায়, বরের পিতা অন্নপ্রাশনের খরচা সমেত ছেলের বিবাহ দিয়া উঠাইয়া লইতে চান।

গিন্নি বলেন বিউটি ফুটে রূপ লাবণ্য ফুটে,
একশ ভরি হ'লেই হ'বে একটী সেট্ উত্তম।

*

বেনে অলঙ্কার দেখে নিন্দে করে না লোকে,
তা; তোমার মেয়ে তোমার জামাই
আমার কি ভাই? দু'দিন বাদে মুদব দু'নয়ন।
দিও যাতায়াতের খরচ,
না হয় কিছু হবে করজ।

*

আবার আস্‌বে কুলীন দল, তাদের চাই বিলিতি জল,
কি ক'রব ভাই, দেশের আজকাল এমনি চালচলন,
কেবল চক্ষুলজ্জায় বাধ বাধ ঠেক্‌ছে যে কেমন।

*

যদি দিতেন একটা পাশ, তবে লাগিয়ে দিতাম ত্রাস,
ফেল ছেলে তাই এত কম পণ
এতেই তোমার উঠ্‌ল কম্পন?
দেশের দশা হেরে কান্ত করে অশ্রু বরিষণ।

কবি বিবাহের পূর্ব্বে বরের পিতার ফর্দ্দ পেশ করিয়াছেন। ইহার পর বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে বিবাহের পরবর্ত্তী অধ্যায় নব-বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আর একটি ফর্দ্দ পেশ। এইবার কুটুম্বিতার আদর-আপ্যায়নের পরিবর্ত্তে কন্যার পিতা পায় লাঞ্ছন। কবি "বেহায়া বেহাই" শীর্ষক কবিতায় তারই একটী নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন।

কুটুম্বিতার স্থলে বউ দেব না ব'লে
বেশী কথাকশি ভাল নয়,
বউমাটি দিনে রেতে কাঁদেন নাইতে খেতে
আহা! বালিকা, তার কষ্ট নয়!
তবে কি না ভাই তুলে যখন কথা,
দায়ে প'ড়ে একটু দিতে হচ্ছে ব্যথা।

*

তোমার মতন জোচ্চোর বদমায়েস বাটপাড়
দমবাজ এ দুনিয়ায় দেখিনিকো আর।

*

(তোমার) খাটে পুডিং দেয়া তোষক গদি খাটো,
টেবিল চেয়ার হাল্কা, তক্তপোষটী ছোট।

*

এখানকার সমাজে বের করি না লাজে
পাছে কাণমলা খেতে হয়।
এসব তো ধরি নে হ'ক্‌গে যেমন তেমন,
বাছার চেন ছড়াটি, হয়নি মনের মতন,
হীরের আংটী কোথা? ঝুটো মতি দেয়া!
বিলিতি জোচ্চুরি কোথায় শিখ্‌লে ভায়া?

*

নগদটাতে ও রকম ফেরি আছে ভাই,
হাজারে দু'তিনটা মেকি দেখ্‌তে পাই।

*

বাপ-বেটীরই দেখ্‌ছি সাধা চ'খের জল,
মনে ক'রলেই ধারা বহে অবিরল,
(তোমার) মায়া কান্নায় বেশী আসে যায় না আমার,
বেশ বুঝেছি তুমি ছদ্মবেশী চামার,

*

শুনে কান্ত অবাক হয়।

"সমাজ" শীর্ষক কবিতায় কবি সমাজের হৃদয়বিদারক ছবি আরও সুনিপুন হস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন,

তোরা ঘরের পানে তাকা
এটা কফ্‌ ভরা রুমালের মত বাইরে একটু আতর মাখা।

*

অথর্ব্ব বুড়োর সনে সাত বছরের ক'নে,
বিয়ে দেয় নিঠুর বাপে, হাতিয়ে কিছু টাকা।

*

না যেতে বাসি বিয়ে মেয়ের যায় সব ফুরিয়ে
মোছে কপালের সিঁদুর, ভাঙ্গে হাতের শাঁখা,
মিলে সব শাস্ত্রীবর্গ হেসে করান বৃষোৎসর্গ,
মেয়েটির একাদশীর সুব্যবস্থা করেন পাকা।

*

(আবার) বাইরে ব'সে নব্য হিন্দু,
গণ্ডূষ কচ্ছেন মগুসিন্ধু,
ধর্ম্মে-বিশ্বাস নাই এক বিন্দু
শুধু কৌলিক বজায় রাখা।

পাশ্চাত্ত্য ভাবে অনুভাবিত হইয়া তখনকার বাঙ্গলার যুবকগণের কিরূপ অধঃপতন হইয়াছিল তাহাই কবি নিম্ন কবিতায় আঁকিয়াছেন,—

ছুত্তোর, বড় দেক্ সেক্ লাগে
দেশের কপালে মার ছু'শ ঝ্যাটা।

*

মায়ের উপর চটা বউকে বলেন ভাই
টেড়ির পাথ্‌না মাথে, চোখে চশমা আঁটা।
মায়ের যত্ন কেবল শুয়োমতাড়া পাবেন
Old idiot বাপ্‌টা ব'সে খাবেন,
গিন্নী? হ্যাঁ-হ্যাঁ, ব'সে মোসাহেরা লবেন
কোমল করে সব্জি বাঁটনা বাঁটা।
কলা মুলো খেকো মুনি গুলো ভ্রান্ত,
করে গেছেন যত fallocious সিদ্ধান্ত,
ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ নিতান্ত
একান্ত foolery পৌত্তলিকতাটা।

'পুত্রের উত্তর' কবিতায় কান্ত কবি পিতার উপর নব্য পুত্রের কিরূপ ভক্তি শ্রদ্ধার মাত্রা তাহাই দেখাইয়াছেন। পিতা শিক্ষিত নহেন বলিয়া শিক্ষাভিমানী পুত্র তার পিতার পরিচয়টুকু পর্যান্ত গোপন করিতে ব্যস্ত।

কোন্ ভাষায় লিখেছ চিঠি;
সাপ্, ব্যাঙ্, গিরগিটি ধ'রে খেতে চায়।

*

তোমার মতন মুকুখু বাবা,
গেঁ গেঁয়ে প্রকাণ্ড হাবা! তার কাণ্ডজ্ঞান কোথায়?

*

তোমার চিঠির জ্বালায় জ্বলে মরি,
একটা কথা, পায়ে ধরি গো, পাইনে মুখ দেখায়,
তোমার বৌমার কাছে একটু একটু প'ড়লে ভাল হয়।

*

সে যে রাখাল ভাল, বড় বড় গরু সে চরায়।
কান্ত বলে এ মহীতে
আর কি পারে তার সহিতে? কখন বা ব'সে যায়;
কি বিষম বিলাতী হাওয়া এল এ-দেশটায়।

যে সময়ের রচনা আলোচনা করিতেছি তখনকার সমাজে এখনকার মত ultra modern আধুনিকা ও প্রগতির আমদানী না হইলেও তখনকার অবস্থা দেখিয়াই ভবিষ্যতের দূরদৃষ্টি দিয়া রজনীকান্ত নারী-জগতের মাতৃমূর্ত্তির স্থলে বিলাসিতা প্রিয় 'নব-নারীর' মূর্ত্তি, যাহা সমাজের বুকে ভবিষ্যতে আবির্ভাব হইবে, তাহাই নিপুন তুলিতে আঁকিয়াছেন। 'যে দেশের নারী বিশ্ব-বরেণ্যা' সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর যে দেশে জন্ম, সে দেশের নারী পাশ্চাত্ত্যের বিলাস-তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিয়া কেমনতর অকর্ম্মণ্য ও পুতুল সাজিতে পারে কবি তাহাই দেখাইয়াছেন।

জেনে রেখ তারা নারী এল
ভবের কি কাজ সাধিতে।

*

পরিতে পার্শি সাড়ী শিমলাই বোম্বাই বারানসী গো।
পরিতে সোনা ও হীরের গহনা গাঁথা যাহে তারা শশা গে।

*

না হয় আমরা ভালবাসিব না,
করিতে আসেনি ছি ছি দাসীপনা,
খাইতে আসেনি তোদের বকুনি কিম্বা
হেঁসেলে রাঁধিতে।

আবার "কেরাণী জীবন" কবিতায় কবি বেদনার তুলি দিয়া তার ব্যথার ছবি প্রাণের দরদ দিয়া আঁকিয়াছেন। একে নিদারুণ দারিদ্র্য তুষানলের মত অহোরাত্র দগ্ধ করিতেছে, তার উপর অফিসে বড় বাবুর এবং গৃহে গৃহিণীর লাঞ্ছনা বাঙ্গালার মধ্যবিত্তের জীবন অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

এমন কি শিক্ষা দীক্ষার জন্য নিজ পুত্রকে শাসন করিবার মত স্বাধীনতাটুকু তার নাই।

টাকাটা ভাঙ্গালে দুদণ্ডের বেশী
পয়সা বাক্সে থাকে না।
মাসের দোস্‌রা মুদি ও কাপুড়ে
আধ্‌লাটি বাকি রাখে না।

ছেলেটি লেখাপড়া করিতেছে। কিন্তু শাসন করিবার উপায় নাই।

বিদ্যুৎবেগে মুখের সামনে নাড়িয়া কোমল হস্ত,
বলে 'আ মরি বিদ্যায় তুমি নিজেও পণ্ডিত মস্ত!
তোমারি তো ছেলে, গাধার পুত্র বৃহস্পতি হবে নাকি গো,
তোমার বাপ্‌কে ফাঁকি দিয়াছিলে ও দেয় তোমারে ফাঁকি গো।'

ত্যাগ, সংযম, ক্ষমা প্রভৃতি সৎগুণের আধার ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাই ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ও বিশ্ব-বরেণ্য ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের মহাপতনে রজনীকান্ত ব্যথিত হৃদয়ে ব্রাহ্মণের পতনের ছবি "পতিত ব্রাহ্মণ" শীর্ষক কবিতায় অঙ্কিত করিয়াছেন।

"আমরা ব্রাহ্মণ ব'লে নোয়াব না মাথা কে আছে এমন হিন্দু?
আমাদেরই কোন পূর্ব্ব-পুরুষ গিলে ফেলেছিল সিন্ধু।
বাবা এখনো গলায় রেখেছি ঝুলিয়ে অমন ধবল পৈতে,
তোমরা মোদের সম্মান করিবে, এ কথা কি আবার কৈতে?
আগেকার মত মুখ দিয়ে আর বেরোয় না বটে আগুন,
কিন্তু কথার দাপটে এ দুনিয়া মারি, সাহস থাকেতো লাগুন।
যদিও এখন অভিশাপ দিয়ে কত্তে পারিনে ভস্ম,
হাওয়াই তর্কে গিরি উড়ে যায়, তোমরা আবার কস্য?

*

পৌরহিত্য ক'রে থাকি আর, করি মোরা গুরুগিরি হে,
নরক হইতে দু'হাত তুলিয়া দেখাই স্বর্গের সিঁড়ি হে।

*

যদিও ক'রেছি চটির দোকান, ঠেলেছি বেড়ি ও হাতাটা,
(কিন্তু) টিকিটিসুদ্ধ বজায় রেখেছি মহর্ষি ব্যাসের মাথাটা।
মদটা আস্‌টা খাই মাঝে মাঝে প'ড়েও থাকি গো থানাতে,
ব্রাহ্মণ ব'লে চিনতে না পেরে, ধ'রেও নে যান থানাতে।
যদিও ভুলেছি সন্ধ্যা ও গায়ত্রী,—জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা,
(কিন্তু) ব্রাহ্মণত্ব কোথা যাবে?
টুক্ ক'রে ঢুকে চাচার হোটেলে খাই নিষিদ্ধ পক্ষী,
(আর) ভোরে উঠিয়া গীতা নিয়ে বসি বাবা বলে ছেলে লক্ষ্মী।

আমরা হ'চ্ছি জেতের কর্ত্তা—আমাদের জাত নিবি-কে?
স্বার্থের পাকা বেদীর উপরে গলা টিপে মারি বিবেকে।
বাবা এখনো ঝুলছে ব্রহ্মণ্যদেবের Leyden Jar এ পৈতে,
তোমরা মোদের সম্মান করিবে, এ কথা আবার কৈতে?

পুরোহিত ছিলেন সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ এবং প্রকৃত সত্যের দ্রষ্টা। পুরবাসীর হিত-সাধন করিতেন বলিয়াই তাঁহারা পুরোহিত নামে খ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পুরোহিতের কোন প্রকার শাস্ত্রকারের বা শিক্ষা দীক্ষার বালাই নাই। তাই পুরোহিতের পতনের ছবি কবি সমাজের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

"আমাদের ব্যবসা পৌরহিত্য,
আমরা অতীব সরল চিত্ত,
চিত যাহা করি জানেন গোসাঞী
হরি যজমান বিত্ত।
আমাদের রুজি এ পৈতে গাছি,
রোজ যত্নে সাবানে কাচি,
আর তালতলা চটি পেন্‌সেন দিয়ে
ঠন্‌ঠনে নিয়ে আছি।

*

যদিও, ছুঁইনি সংস্কৃত কেতাব,
তবু 'স্মৃতি শিরোমণি' খেতাব,
কিন্তু কিছু যে জানিনে, বলে কোন জেড়ে?
মুখের এম্‌নি প্রতাপ।

*

মোদের ব্যবসা বিধবা দলে,
এই পৈতে টিকির বলে
দক্ষিণে, ভোজনে বেড়ে যুত আর
মন্ত্র যা বলি চলে।
মা সকল বামুন খাইয়ে খুসী,
আর আমরাই ভোজনে চুকি?
এই কথা অবশি পরস্মৈপদী
লুচি পান্‌তোয়া ঠুকি।

সমাজের কোন দোষ ত্রুটীই কবির দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। তখন সমাজে এমনিতর বিলাতী ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল যে, নিজেদের নাম পর্য্যন্ত বিলাতী কায়দায় না রাখিলে মান সম্মান বজায় থাকিত না। তাই কবি "উঠে

পড়ে লাগ” শীর্ষক কবিতায় তখনকার বিলাতী নকল নবীশ সমাজের উপর শ্লেষের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন।

“তোরা যা কিছু একটু হ!
Ray কি Sinha কি Doss কি Shanne
কি Dutt কি Dwarkin, Shaw,

‘জেনে রাখ’ শীর্ষক কবিতায় কবি বর্ত্তমান সমাজের কতকগুলি পরিচয় নিপুন হস্তে দিয়াছেন, যাহা বিশেষ প্রনিধানযোগ্য।

“মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যে পুরো পাঁচ হাত লম্বা,
সাধু সেই যে পরের টাকা নিয়ে, দেখায় অষ্টরম্ভা।
সেই মহাশয়, সংগোপনে যে মদটা আসটা টানে,
নিষ্ঠাবান যে, কুক্কুট মাংসের মধুর আস্বাদ জানে।
সেই কপালে, বিয়ে ক’রে যে পায় বিশ হাজার পণ,
নারী মধ্যে সেই সুখী, যার কত্তে হয় না রন্ধন।
ভদ্র সেই, যার ফরসা ধুতি, ফুটফুটে যার জামা,
দেশ-হিতৈষী সেই যার পায়ে ডসনের বিনামা।
মদ খেয়ে না ভুলে থাকতে হয়, সেই আদত বিচ্ছেদ,
কালো কিতে ধারণ আছে যার, তারেই বলি খেদ।
বেহুস হ’য়ে জেনে পড়ে রয়, অতি সম্ভ্রান্ত,
সাদা কালোর ভেদ না রাখে, সে হাকিম কি ভ্রান্ত!
সট সাইটেড্ চশমা নিলেই বুঝবে ছোক্‌রা ভাল,
বাপকে বলে যে ‘ইডিয়ট্‌,’ তার গুণে বংশ আলো।

“জাতীয় উন্নতি” শীর্ষক কবিতায় দেশের প্রতি এবং দেশের নেতাগণের প্রতিও বিদ্রূপ কটাক্ষপাত করিতে কবি ক্ষান্ত হন নাই। যাহার যাহা দোষ ক্রুটী দেখিয়াছেন, তিনি নির্ভয়ে তাহাই দেশের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

“হয় নি কি ধারণা, বুঝিতে পার না
ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে।
যে হেতু যে গুলি রুচিত না আগে
এখন সেগুলি রুচ্‌ছে।

*

যেহেতু বুঝেছি, বিস্কুট কেমন মধুর
কুক্কুট অস্থি কেমন স্বাদু,
ক্রমে মদিরায় যায় যার মতি
কেমনে সে হয় সাধু।

*

চাকুরী দেবে বল্লে চরণতলে শুই
আর ঘৃণা করি গরীব তুচ্ছে।
যেহেতু আমরা হ্যাটে টিকি ঢাকি
সদা জামা রাখি শরীরে,
‘শ্যান্ট্‌পো’ বলি শান্তিপুরকে
‘হ্যারি’ বলি ডাকি হরিরে।
যেহেতু আমরা ছেড়েছি একান্ত,
কীটদষ্ট বাতুলতা বেদ বেদান্ত,
অস্থিমজ্জা সাহেবী দৃষ্টান্ত,
দেখ না অমুক বাঁড়ুয্যে।

*

যেহেতু আমরা নেশা করি
কিন্তু প্রাইভেট ক্যারেক্টর দেখ না,
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে রেখে
আর কিছু মনে রেখো না।
বাপ্‌কে করি ঘৃণা মাকে দেই না অন্ন
বাইরের আবরণটা রাখি পরিচ্ছন্ন।
কোট পেণ্টালুনে ঢাকি কৃষ্ণবর্ণ,
যেন দাঁড়-কাক ময়ূর পুচ্ছে।

ভক্তিহীন পূজা-পার্ব্বণের বাহিরের জাঁক-জমকের উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

“অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ এল, এল মূর্খ পুজক,
পুরুত সঙ্গে টিকি এল, বিশুদ্ধাচার সূচক,
রেশমী নামাবলী এল নিষ্ঠাবত্তার সাক্ষী,
“ইদং ধুপ” এবংপ্রকার এল শুদ্ধ বাক্যি।

*

কলসী বাটী থালা এল, পুরোহিতের প্রাপ্য
যজমানের বাপান্ত এল ছিল যেটা যাপ্য।
খোলাই করা পৈতে এল, গঙ্গা-মাটির ফোঁটা,
‘কারণ’ কত্তে whisky এল, আর ক বোতল সোডা।
ঢোল এল, সানাই এল, মস্ত মস্ত ঢাক,
পুষ্প বিল্বপত্র এল, কাঁসর, ঘণ্টা শাঁখ।
যাত্রা, খেমটা, টপ্ এল, আর এল কবির ঢোল,
কেবল ‘একটা জিনিষ’ এল না তাই দেখে গণ্ডগোল।”

হাস্য রসিক রজনীকান্ত হাসির রোলে বঙ্গদেশকে মাতাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হাসির সঙ্গে যে বুকফাটা আর্ত্তনাদ অন্তর্নিহিত ছিল তাহা বাঙ্গালা দেশ বুঝিল কৈ? যদি বুঝিত, তাহা হইলে কান্ত কবির তিরোধানের পর এমনি করিয়া বাঙ্গালা দেশ তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারিত না। কান্ত কবির হাসি গানের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে বাঙ্গালা আবার সোণার বাঙ্গালায় পরিণত হইত। কে জানে, এ জাতির উপর বিধাতার কেন এ অভিশাপ। রস-রচনার ভিতর দিয়া

কান্ত কবি হাকিম, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার কাহাকেও ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার সব সময়ই ইচ্ছা ছিল আমূল সংস্কার। অনেকে হয় তো রজনীকান্তের রস-রচনার ভিতর কেবল অফুরন্ত হাসির ফোয়ারাই দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে কবির বুকের বেদনা মুখর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করেন নাই। তাই আমি রজনীকান্তের রচনাকে 'হাস্য-রসিক রজনীকান্ত' বলিয়া কোন পৃথক বিভাগ করিলাম না। তিনি হাকিমকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ ব্যতীত তাহার ব্যক্তিগত কোন স্বাধীনতা নাই তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহারা কবির সহিত একমত হইবেন।

"খালাসটা বেশী হ'লে ;
উঠেন কর্ত্তাটি ভারি জ্বলে ?
আর শাস্তি ভিন্ন Promotion নাই
কানে কানে দেন ব'লে।

তিনি নিজে ছিলেন উকিল, তথাপিও উকিলের বিষয় লিখিতে তাঁহার স্বাধীন লেখনী ক্ষান্ত হয় নাই।

"দেখ আমরা জজের Pleader
যত Public movement এ leader,
আর Conscience to us is a
marketable thing (which)
We sell to highest bidder.

মোক্তারকে লক্ষ্য করিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

পরি চাপকান তলে ধুতি—
যেন যাত্রার বৃন্দে দূতী।
দুটো ইংরাজী কথাও জানি
শুধু ভুলেছি grammer খানি,
এই 'I goes' he come' 'they eats' গেরোয়
ক'রে খুব টানাটানি।

পাশ করা ডাক্তারকে উদ্দেশ করিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

রোগটা বুঝি বা না বুঝি,
আগে দর্শনী ট্যাকে গুঁজি।
দেখ stethoscope আর thermometer
আমাদের প্রধান পুঁজি।

"তোমার ছেলে অক্কা পেলে
আমার আর কি তাতে।
কিন্তু অষুধের Billটা আসবেই আসবে
প্রত্যেক সন্ধ্যা প্রাতে।
আমরা পরের গায়ে ছুরি চালাই
অতি ভয়ঙ্কর রেটে,
আর ঐ operation ব্যাপার আমরা
ক'রেছি একচেটে।

ইহার উপর medical, certificate-এর উল্লেখ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং রং ফলাইয়াছেন তাহার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

"অতি রুগ্ন দেহ
আমার চিকিৎসার নীচে আছেন,
এঁর ব্যারাম ভারি শক্ত, ইনি
হাই তোলেন আর হাঁচেন।"

বাঙ্গালার তরুণদলকে লক্ষ্য করিয়া কবি গভীর বেদনায় লিখিয়াছেন,—

"এখন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চশ্‌মা ধ'রেছে ;
আর টেড়ি নইলে চুলের গোড়ায়
যায় না মলয় হাওয়া ;
আর রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন
হয় না যাদুর খাওয়া।
চব্বিশ ঘণ্টা চুরুট ভিন্ন প্রাণ ক'রে আই ঢাই ;
আর এক পেয়ালা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই।"

অনেকের মতে রজনীকান্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস-রচনা হ'চ্ছে তাঁহার "উদরিক", কিন্তু আমার মনে হয় কবি এ লেখাটাও শুধু মানুষকে হাসাইবার জন্যেই লেখেন নাই। তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এই কর্ম্মবিমুখ জাতির অলসতা ও জড়তা দূর করা। কবি এই কবিতায় বলিয়াছেন, মানুষ কর্ম্ম না করিলে কিছুতেই তার ফল পাইতে পারে না। ভগবান আমাদিগকে শুধু দানই করিয়া যাইবেন, আর আমরা যুগ যুগ তাহাই হাতে পাতিয়া গ্রহণ করিব, ইহা হইতেই পারে না। ফল চাহিলে মানুষকে কর্ম্ম করিতেই হইবে।

"যদি কুমড়োর মত চালে ধ'রে র'ত
পানতোয়া শত শত,

আর সবুযের মত হ'ত মিহিদানা
বুঁদিয়া বুটের মত।
যদি তালের মত হতো ছানাবড়া
ধানের মতন চ'সি,
আর তরমুজ যদি রসগোল্লা হ'ত
দেখে প্রাণ হ'ত খুসি।
যেমন সরোবর মাঝে কমলের বনে
শত শত পদ্ম পাতা—
তেমনি, ক্ষীর সরসীতে শত শত লুচি
যদি রেখে দিত ধাতা।

তিনি এই কবিতায় কর্ম্মবিমুখ পরমুখাপেক্ষী বাঙ্গালীকে স্বাবলম্বী হইতে বলিয়াছেন। ইহা কি রজনীকান্তের হাস্য-কবিতা? ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে বাঙ্গালা দেশ ধন্য হইয়া যাইত।

ভক্ত কবি রজনীকান্ত

ভগবৎ প্রেমের অফুরন্ত মন্দাকিনী ধারা লইয়া ভগীরথরূপে রজনীকান্ত বাঙ্গালার বুকে দেখা দিয়াছিলেন; যখন তিনি প্রেম অশ্রুমাখা গদগদকণ্ঠে ভগবৎ সঙ্গীত গাহিয়া চলিতেন, তখন তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেন। তাঁহার প্রেম ও ভক্তিমাখা অধ্যাত্ম সঙ্গীতের তুলনা হয় না। তিনি প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আকুল কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন,—

"ওই বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু
দেখাও চির তব আলোক লোক।
ওপারে সবই ভাল, কেবল সুখ আলো
এপারে সবই ব্যথা আঁধার শোক

*

পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে সুধা
তোমারি কাছে আছে শান্তি সুখ-সুধা;"

সেই সুখ-সুধার অনুসন্ধান করিতে করিতে কবি নিজকে একেবারেই বিলাইয়া গাহিয়া উঠিলেন,—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।
তোমারি দুনয়নে তোমারি শোকবারি
তোমারি ব্যাকুলতা—তোমারই হাহারব।"

এবার কবি সুখ-দুঃখের পারে গিয়া পৌছিয়াছেন। এমনি করিয়া তাঁহার চরণে প্রাণ মন ঢালিয়া না দিলে ভগবৎ কৃপা লাভ হয়?

পৃথিবীর বুকে মানুষ প্রতিনিয়ত কেবল মরুভূমির মিথ্যা মায়ায় ঘুরিয়া মরিতেছে। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

"মাগো, আমার সকলি ভ্রান্তি,
মিথ্যা জগতে মিথ্যা মমতা
হেথা কেবলি পিয়াসা—কেবলি শ্রান্তি।

কবি নিজকে একান্ত অসহায় ভাবিয়া আকুলকণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

"কোলের ছেলে ধুলো ঝেড়ে, তুলে নে মা কোলে।
ফেলিস্ নে মা ধুলো কাদা মেখেছি ব'লে।"

এমনি করিয়া যদি একান্ত প্রাণে মা মা বলিয়া ভক্ত ডাকিয়া উঠে, তাহা হইলে মা কি কোলে না তুলিয়া নীরব থাকিতে পারে? ভক্ত কবি জগৎমাতার উদ্দেশ্যে গাহিয়াছেন,—

"(মাগো) এ পাতকী যদি ডুবে যায়;
অন্ধকার চির মরণ সিন্ধু নীরে—
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায়।"

রজনীকান্ত মিলনের লাগি আকুল হইয়া গাহিয়াছেন,—

"কেড়ে লহ নয়নের আলো, পাপ নয়ন কর অন্ধ;
চির যবনিকা প'ড়ে যাক্ হে, নিভে যাক্ রবি তারা চন্দ্র।"

কিন্তু মনের আঁধার যায় কৈ? মায়ার বাধন কাটে কৈ? তাই তিনি বিহ্বল চিত্তে অধীর হইয়া গাহিয়াছেন,—

"এত আলো বিশ্ব মাঝে মুক্ত ক'রে দিলে ঢালি,
তবে কোন অপরাধে হরি, ঘোচে না মনের কালি।"

তাই নিরুপায় হইয়া এই ভব-বন্ধন কাটিয়া দিবার জন্য অশরণের শরণ লইয়াছেন,—

"ধীরে ধীরে টেনে লহ তোমা পানে;
(আমি) আপনি হারায়ে আছি মোহ মদিরা পানে

§

ওহে মায়া-মোহ হারি। নিগড় ভাঙ্গিতে নারি;
নিরুপায় বন্দী ডাকে, অধীর আকুল প্রাণে।"

যেমনি আকুল প্রাণে মাকে ডাকা, অমনি মা মায়ার বন্ধন কাটিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন।

"ওমা এই যে নিয়েছ কোলে;
আগে খুব ক'রে মোরে মেরে ধ'রে
শেষে 'আয় যাদু বাছা' ব'লে।"

বেলা ফুরাইয়া যাইতেছে। সন্ধ্যার আধার ঘনাইয়া আসিতেছে তাই অবোধ মনকে কবি বলিতেছেন,—

"বেলা যে ফুরায়ে যায় খেলা কি ভাঙ্গে না হায়
অবোধ-জীবন পথ-যাত্রী।
কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায় ?
সকলি হারিলি হায় তবু খেলা না ফুরায়
অবোধ জীবন পথ যাত্রী।

মিছা খেলায় মজিয়া সারাদিন হেলায় কাটাইয়াও মায়ের কোলে মা মা বলিয়া ছুটিয়া আসিলে মা দু'বাহু বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লন। তাই কবি এই পৃথিবীর মায়ের সঙ্গে চিন্ময়ী মায়ের তুলনা করিয়া গাহিয়াছেন,—

"মা, আমি যেমন তোর মন্দ ছেলে ;
আমায় ঝাঁটা মেরে খেদিয়ে দিত
এ পৃথিবীর বাপ মা হ'লে।

তাই মায়ের পাগল ছেলে আকুল হইয়া কাঁদিয়া বলিয়াছেন,—

"আমায় পাগল করবি কবে ?
'মা মা' বলতে অবিরত ধারে দুনয়নে ধারা বহে।"

মৃত্যুর ভয়াবহ মূর্ত্তি-স্মরণ করিয়া কবি গাহিয়াছেন, —

"ঐ ভৈরবে বাজিছে বিকট ভয়াবহ
গর্জ্জনে মরণ বিষাণ !
হা, হা, কি বধির—নিদ্রিত রে চিত্ত
মুদ্রিত অলস নয়ান"

মৃত্যুর বিভীষিকা মনে উদয় হওয়ামাত্রই অপার করুণাসিন্ধু দয়াময় তাঁহার করুণার ধারা লইয়া শিয়রে উপস্থিত হইলেন। অমনি ভীত ত্রস্ত কবি গাহিয়া উঠিলেন,—

"আজি, জীবন মরণ মন্দিরে !
প্রভু কোথা ছিলে ? আহা দেখা দিলে
এই জীর্ণ হৃদয় মন্দিরে।"

মায়ের রূপ নয়নপটে ফুটিয়া উঠিল। অমনি কবি বিহ্বল কণ্ঠে গাহিলেন,—

"স্নেহ বিহ্বল-করুণা-ছল-ছল
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে।
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা—
এনেছে অশরণ লাগিরে।"

যখন কান্ত কবি তাঁহার ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠে গাহিতেন,—

"কতদূরে আর প্রভু প্রেম পারাবার ?
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার ?"

তখন অনন্ত প্রেমের মন্দাকিনী ধারা কবির দু'নয়নে বহিয়া যাইত। রজনীকান্ত ! ধন্য তোমার সাধনা, ধন্য তোমার অপূর্ব্ব সঙ্গীত !

রজনীকান্ত ভাববিলাসী কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন আগুনে পোড়া নিখাদ সোনা। তাই তাঁহার কাব্যপ্রতিভা মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট ছিল। তিনি প্রাণের আবেগে গাহিয়াছেন,—

"পাতকী বলিয়া কিগো পায়ে ঠেলা ভাল হয় ?
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয় ?

তখনই কবি তাঁহার ভুল বুঝিলেন,—করুণাময় পাতকী বলিয়া পায়ে ঠেলেন না। তিনি করুণার অমৃতে ভক্ত-হৃদয় সিক্ত করিয়া দেন,

"তব, করুণামৃত পারাবারে কেন ডুবালে দয়াময় ?
এ অযোগ্য অধমেরে, মলিনেরে, কেন এত দয়া হয়।"

কান্ত কবি ছিলেন একান্ত বিশ্বাসী। তাই তিনি আকুল কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন,—

"কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
কত আশা করে বসে আছি পাব,
জীবনে না হয় মরণে !

*

তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই তুমি আছ তার।

এই বিশ্বাস লইয়াই তিনি "তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া" যাইবার জন্য আকুল আগ্রহে শেষ খেয়ার আশায় উদগ্র চিত্তে বসিয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন।

বাহিরের চক্ষু থাকিতে ভগবৎ দর্শন হয় না। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

"তারে দেখ্‌বি যদি নয়ন ভরে
এ দুটো চোখ কররে কাণা
যদি শুন্‌বি রে তার মধুর বুলি
বাহিরের কাণে আঙুল দেনা।"

প্রেম সিন্ধুর অতল তলে খুঁজিলেই একমাত্র পরশমণি পাওয়া যায়। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

"তারে ধর্‌বি কেমন ক'রে ?
সে কোথা রইল, ও তুই রইলি কোথায় প'ড়ে।

*

ও তুই ডুব্‌লি নারে সাগর জলে,
যার তলায় পরশ মাণিক জ্বলে।

সুখ-দুঃখের তরঙ্গে পড়িয়া ডুবু ডুবু দেহতরণীর দোদুল দোলায় দিশেহারা রজনীকান্ত কখনও গাহিয়াছেন—

"ধ'রে তোল কোথা আছ কে আমার !
একি বিভীষিকাময় অন্ধকার !"

আধুনিক জ্ঞানাভিমানী বৈজ্ঞানিকের দিকে লক্ষ্য করিয়া কবি গাহিয়াছেন,—

"ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে
ও সে কটা কেনর জবাব লিখে"

আবার বর্ত্তমান ঐহিক সুখলিপ্সু মতবাদকে লক্ষ্য করিয়া তিনি গাহিয়াছেন,—

"তুই কি খুঁজে দেখেছিস্ তাকে ?
যে প্রত্যহ তোর খোরাক পোষাক
পাঠিয়ে দিচ্ছে তাকে"

রজনীকান্ত লীলা-কীর্ত্তন করিবার জন্ম ভগবানের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছেন,—

"কোটি নয়ন দেহ, কোটি শ্রবণ প্রভু
দেহ মোরে কোটি সুকণ্ঠ।
হেরিতে মোহন ছবি, শুনিতে সে সঙ্গীত
তুলিতে তোমারি যশরোল।"

এত আকুল হইয়া রজনীকান্ত কোটি কণ্ঠ চাহিলেন, আর ভগবান তাঁহার পিক কণ্ঠ নীরব করিয়া দিলেন, এ লীলাময়ের কোন্ লীলা ?

রজনীকান্ত হাঁসপাতালে মৃত্যুশয্যায়। ওপারের আহ্বান তাঁহার কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কণ্ঠ নীরব, দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় তিনি রাত্রি কাটাইতেছেন। কিন্তু এই বেদনা, রজনীকান্ত স্নেহের দান বলিয়াই হাসিমুখে অবিচলিত হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কাব্য-সাধনা একাগ্র চিত্তেই চলিতেছিল। মৃত্যু-ভীতি তাঁহার কবিত্বকে নষ্ট করিতে পারে নাই, তাঁহার কবি-প্রতিভা আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার এইরূপ অসহ্য দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যেও নীলকণ্ঠ হলাহল পান করিয়া দেশের সম্মুখে অমৃত পরিবেশন করিলেন। সে অমৃত পান করিয়া সমগ্র দেশ ধন্ম হইয়া গেল। তাই ইতিপূর্ব্বেই আমি লিখিয়াছি; রজনীকান্ত ভাব-বিলাসী কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন আগুনে পোড়া পাকা সোনা। তাই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও কাব্য-সুধা সমভাবেই বিশ্ব-জনার সম্মুখে পরিবেশন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আকুল আগ্রহে জীবন সন্ধ্যায় শেষ খেয়ার দিকে তাকাইয়া অশ্রুসিক্ত কম্পিত হস্তে লিখিতেছেন,—

"মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা
তৃপ্ত করিবে কে ?
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া
ঊর্দ্ধে ধরিবে কে ?"

১৩১৭ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ হাঁসপাতালে কান্ত কবিকে দেখিবার জন্ম যান। সে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। রজনীকান্ত অশ্রু সজল চক্ষে রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়া জানাইলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার যাত্রা সফল হয়।" সেই দিন রজনীকান্ত নিম্নের গানটী লিখিয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার পাঠাইয়া দেন,—

"আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল ক'রেছ
গর্ব্ব করিতে চুর ;
ভাবিতাম "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,
তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে
বেদনা ছিল প্রচুর।
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব্ব করিতে চুর।"

যখন কান্ত কবি বেদনায় আকুল হইয়া পড়িতেন, তখন তিনি ব্যথাহারীকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেন। রজনীকান্তের শেষের ডাক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তদীয় সাধ্বী পত্নী বুক-ফাটা আকুল ক্রন্দনে বলিয়া উঠিলেন; "আমাদের ফেলিয়া তুমি কোথায় যাচ্ছ ?" অমনি অকম্পিত হস্তে রজনীকান্ত উত্তর লিখিলেন, "আমাকে দয়াল ডাকছে, তাই আমি যাচ্ছি।" রজনীকান্তের এই শেষ লেখা।

অত বড় নির্ভরশীল ভক্ত না হইলে কি মৃত্যুর কূলে দাঁড়াইয়া শান্ত-স্নিগ্ধ-ধ্যান-সমাহিত চিত্তে ঐহিক ব্যাধির সমস্ত যন্ত্রনা "দয়ালের দান" বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে ? রাম প্রসাদের পরে রজনীকান্তের মত এমন ভক্ত-কবিকে বক্ষে ধারণ করিয়া বাঙ্গালাদেশ ধন্ম হইয়াছে।

প্রতিশোধ

শ্রীলতিকা সেনগুপ্তা

এক

১৪৮১ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী। স্পেনের সেভিল নগরের প্রান্তবর্ত্তী এক সমৃদ্ধ পল্লীর নিভৃত পথে দ্বিপ্রহর রাত্রির গভীর অন্ধকারে চোরের মত পা ফেলে কালো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে অগ্রসর হচ্ছিল ঐ নগরেরই এক অভিজাত বংশীয় খৃষ্টানযুবক ডন্ রড্রিগো-ডিকার্ণাডো। সমস্ত শহরের উপর কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে, মিশমিশে কালো পোষাকে রড্রিগো-কে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দেখাতে লাগলো ডাকাতের মত। দীর্ঘ তার দেহের কাঠামো, আর প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠছিল গভীর সন্তর্পণ। ধীর সতর্ক পদক্ষেপে যুবক অবশেষে থাম্‌লো এসে এক প্রাসাদতুল্য বাটীর সাম্‌নে, তারপর এদিক ওদিক চেয়ে যখন সে দেখলো কেউ কোথাও নেই, সমস্ত নীরব, তখন সে ত্বরিতে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে নিঃশব্দে নেমে পড়লো ভিতরের উদ্যান-প্রাঙ্গণে। আবার সন্তর্পণে প্রাঙ্গণ অতিক্রম ক'রে যুবক দাঁড়ালো এসে বাটীর দ্বিতলস্থিত এক বারান্দার নিম্নদেশে এবং তারপর একটা দড়ির মই-এর সাহায্যে অনায়াসে উঠে পড়লো ঐ বারান্দায়।

বারান্দার সম্মুখবর্ত্তী কামরার রুদ্ধদ্বারের কবাটে বার-কয়েক ঘা দিয়ে রড্রিগো ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকলো, "ইসারেলা, ইসাবেলা।" একটু পরেই দোর খুলে সন্ত্রস্তভাবে এসে দাঁড়ালো নাইট-গাউন পরা এক অনুপম সুন্দরী তরুণী। যুবককে দেখে তরুণীর চোখে-মুখে যে আতঙ্ক ফুটে উঠলো, রড্রিগো তা লক্ষ্য করতে পারলো না।

ভীতিমিশ্রিত কণ্ঠে ইসাবেলা বললো, "কি দুঃসাহস তোমার। এত গভীর রাতে এভাবে এখানে আসা তোমার ভারী…"

—"অন্যায় হয়েছে, তা জানি, কিন্তু তোমার চিঠিতে যখন জানলাম তোমার বাবা আজ বাড়ী থাকবেন না, তখন দু'দণ্ড ব'সে তোমার সঙ্গে নিরিবিলি গল্প-সল্প করার এই যে সুযোগ তা কিছুতেই ছাড়তে পারলাম না, তাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে এসে পড়েছি। যদি মনে করো, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনার অযোগ্য, তা হ'লে এক্ষুনি চ'লে যাচ্ছি।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ইসাবেলা বল্‌লো, "কাজটা যে কত বড় অন্যায়, সেটা কি নিজে বুঝতে পারছো না? পথে তোমায় কেউ দেখেনি তো?"

"খুব সম্ভব কেউ দেখেনি।"

"তবে এসো এই বস্‌বার ঘরে।"

দুই

ধন-কুবের হ'য়েও ইহুদী জাতি ইউরোপীয় সমাজে চিরকাল পতিত, ঘৃণিত ও নির্য্যাতিত-এবং তাদের নির্য্যাতনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। খৃষ্টীয় পনেরো শতাব্দীতেও নানা রকম আইনের চাপে তাদের দমিয়ে রেখেছিল স্পেনের অভিজাত সম্প্রদায়। তারা বাস করতে বাধ্য হ'ত নগরের এক প্রান্তে সম্পূর্ণ প্রাচীর-ঘেরা স্বতন্ত্র পল্লীতে। রাত্রিকালে ঐ প্রাচীরের বাইবে যাওয়া তাদের নিষিদ্ধ ছিল,—দিবা ভাগেও বাইরে দশের মধ্যে তাদের চিনে নেবার জন্য লাল কাপড়ের চাকতি লাগাতে হ'ত তাদের পোষাকের উপরে। এসব ছাড়াও আরও অনেক রকম বাধা ও অক্ষমতায় তারা নিত্য নিপীড়িত হ'ত। মোটের উপর, সকল প্রকার হীনতা ও দাসত্বের ছাপ নিয়েই তাদের-জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হ'ত। নির্য্যাতন যখন একান্ত অসহ্য হ'য়ে উঠলো, তখন তাদের অনেকে নিরুপায় হ'য়ে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করলো এবং এই নব-দীক্ষিত ইহুদী সম্প্রদায় "নূতন খৃষ্টান" নামে পরিচিত হ'লো। কিন্তু খৃষ্টান হ'য়েও তারা আদিম খৃষ্টানদের কাছে সন্দেহভাজন হ'য়েই রইলো। ইসাবেলা এই "নূতন খৃষ্টান" দলভুক্ত প্রসিদ্ধ ধনী ডিয়োগো-ডি-সুশানের একমাত্র সন্তান।

ইউরোপে তখন রোমান্-ক্যাথলিকদের প্রভুত্ব। ধর্ম্মগুরু পোপ সর্ব্বেসর্ব্বা। প্রচলিত ধর্ম্মমতে অবিশ্বাসীদের দণ্ড বিধানের জন্য তাঁর আদেশে ১৪৮০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে সেভিল নগরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'ইনকুইজিসন' বা বিচারালয় এবং বিচারক নির্ব্বাচিত হ'লেন স্পেনের কার্ডিনাল

ও বিশপ ফ্রে-ট্রমান-ডি-টর্কেয়োমেডা। এই দু'জনের নির্দ্ধারিত বিচারই হ'ত চরম। অবিশ্বাসীদের জন্য অতি কঠোর ও নিষ্ঠুর দণ্ডের বিধান ছিল। বিচারে 'অবিশ্বাসী' প্রমাণিত হ'লে অপরাধীর আত্মার মুক্তির ব্যবস্থা হ'ত তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত ক'রে।

ইনকুইজিসানের প্রতিষ্ঠা নূতন খৃষ্টান দলে ভীষণ আতঙ্ক ও প্রবল আলোড়ন এনে দিল। প্রাণভয়ে অবিলম্বে তারা হাজারে হাজারে শহর ত্যাগ ক'রে কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী ডিউকের জমিদারীতে আশ্রয় গ্রহণ করলো। ইনকুইজিসানের বিচারকদের কানে এ খবর পৌছুতে বিলম্ব হ'ল না। ২রা জানুয়ারী তারিখে স্পেনের ডিউকদের উপর পরোয়ানা জারি হ'ল, তাঁরা যেন পলাতক নূতন খৃষ্টানদের পনেরোদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার ক'রে সেভিলের জেলখানায় বিচারের জন্য পাঠিয়ে দেন এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। পলাতকদের আশ্রয়দাতাদের সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হল; ধর্ম্ম-বিদ্বেষীদের আশ্রয়দানও একটা পাপ, সুতরাং আইনের চোখে তাঁরাও দোষী এবং এ অপরাধে তাঁদেরও দণ্ডিত হ'তে হবে।

ডন্ রড্রিগো এই পরোয়ানার খবরে অত্যন্ত শঙ্কিত হ'ল। রড্রিগো খাঁটি খৃষ্টান, কেষ্টিলের অভিজাত বংশে তার জন্ম। ইহুদী কন্যা ইসাবেলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার খবর ইনকুইজিসানের গোচরে গেলে তার প্রতিফল কি হবে সে জানতো। তাই তার শঙ্কা, আর ইসাবেলার সঙ্গে গোপনে দেখা করার প্রয়াস।

রড্রিগো-কে ড্রয়িং রুমের একটি আসনে উপবেশন ক'রতে দিয়ে ইসাবেলা তার কাছে এনে দিল এক গ্লাস প্রসিদ্ধ মালাগো-মদিরা। মদিরার পাত্রটি হাতে নিয়ে রড্রিগো তাতে একটু একটু চুমুক দিতে লাগলো বটে কিন্তু তার পলকবিহীন চোখ দু'টি পান করতে লাগলো ইসাবেলার অতুলনীয় রূপ-মাধুরী। ঐ কামরার প্রাচীর-গাত্রে লম্বমান ছিল বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুশোভন পর্দ্দা, মেজের আস্তীর্ণ ছিল পারস্য দেশের বহু মূল্যবান্ গালিচা এবং মধ্যস্থলে টেবিলের উপর জ্বলছিল সুগন্ধি তৈলপূর্ণ একটা বড় বাতি। মালাগোর মদিরা, তৈলের সুবাস ও ইসাবেলার সৌন্দর্য্য, এই তিনটি জিনিষ যুবক রড্রিগো-কে পাগল ক'রে তুললো। তখন সে ভুলে গেল, ইসাবেলা ইহুদী-মেয়ে, আর তার নিজের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে সম্ভ্রান্ত কেষ্টিলিয়ান বংশের অনাবিল খৃষ্টান রক্ত। এতদিন সে ইসাবেলার সঙ্গে যে মিথ্যা ভালবাসার খেলা খেলেছে, এই রাতে সে সব ভুলে গেল এবং সত্য সত্যই সংকল্প করলো, প্রেমের ছলনাকে আর প্রশ্রয় দেবে না। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় রড্রিগো ব'লে উঠলো, "ইসাবেলা, তুমি কবে আমায় বিয়ে করবে?"

ইসাবেলা জান্তো না রড্রিগোর ভালবাসা প্রদর্শনটা ছিল শুধুই অভিনয়, আর জান্তো না তার চরিত্রহীনতার কথা। তাই সে সরল মনে উত্তর করলো, "এর জবাব পেতে হ'লে বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।"

"তোমার বাবা তো কালই ফিরছেন, তখন তাঁর মত নেওয়া যাবে, কি বলো?"

ঠিক সেই সময়ে দু'জনেই একসঙ্গে চম্‌কে উঠলো একতলার একটা দোর খোলার শব্দে। ইসাবেলা তাড়াতাড়ি দরজার ফাঁকদিয়ে কানপেতে শোনবার চেষ্টা করলো। ও কি! সিঁড়ি বেয়ে যে বিস্তর লোক উঠছে কি বলাবলি ক'রে, আবার তার মধ্যে তার পিতার কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট। ইসাবেলার সমস্ত মুখ থেকে কে যেন রক্ত শুষে নিল। সে কাঁপতে কাঁপতে রড্রিগোর কাছে এসে বল্‌লো, "সর্ব্বনাশ, বাবার গলার স্বর শোনলাম, আর ওঁরা সবাই উপরে আস্‌চেন—এ ঘরেই, হাঁ এঘরেই আসচেন, এখন উপায়?"

কেষ্টিলের অভিজাত বংশীয় বীরবরের মুখমণ্ডল থেকে মুহূর্ত্তে উবে গেল সমস্ত শোণিত, আর চোখের ভিতর থেকে ফুটে বেরুলো দারুণ আতঙ্ক। এই গভীর রাতে তাকে এখানে দেখতে পেলে ডিয়োগো-ডি-সুশান তার কি ব্যবস্থা করবেন, এ সম্বন্ধে রড্রিগোর মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নারী জাতির মর্য্যাদাকে কত বড় মনে করে, তা সে ভালরকমই জান্‌তো। রড্রিগো কল্পনা-নেত্রে তখনই যেন দেখতে পেল, ঐ ঘরের মেজের ওপর দিয়ে অজস্র ব'য়ে যাচ্ছে তার বিশুদ্ধ ক্রিশ্চিয়ান শোণিত। স্পেনের আভিজাত্যাভিমানী যুবক ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো, দারুণ লজ্জা, ঘোরতর অপমান ও আসন্ন মৃত্যুর কঠোরতার কথা ভেবে। তার মুখ থেকে ইসাবেলার প্রশ্নের জবাব বেরুলো না। ইসাবেলা

জবাবের প্রতীক্ষা না ক'রেই তার হাত ধ'রে তাকে তাড়াতাড়ি ঠেলে নিয়ে গেল ঐ ঘরের এক কোণে অবস্থিত পর্দ্দার আড়াল করা এক খোপের ভিতর। তারপর রড্রিগোর কোট, টুপি এবং তার উপস্থিতি পরিজ্ঞাপক যা কিছু ছিল সে সমস্ত কুড়িয়ে নিয়ে সে নিজে ঐ খোপের ভিতরই আশ্রয় নিল। পর্দ্দাটা ভালো ক'রে টেনে দিয়ে তারা সেখানে চুপ ক'রে ব'সে রইলো নির্জ্জীব কাঠের মত।

পরমুহূর্ত্তেই সেই ঘরের প্রবেশদ্বারের কাছে উপস্থিত হ'ল জনকয়েক লোক। ইসাবেলার পিতা ডিয়োগো-ডি-সুশান বল্‌লেন, "এইটি আমার মেয়ের বসবার ঘর, এখানে কেউ আসে না, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি নীচে গিয়ে অন্য বন্ধুদের নিয়ে আসছি।"

তার কিছুক্ষণ পর জনকুড়ি লোক নিয়ে ডিয়োগো-ডি-সুশান ঐ ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ অনেক কথা হ'ল, তারপর সমস্ত নীরব। অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ধ্বনিত হয়ে উঠলো ডিয়োগোর গম্ভীর কণ্ঠস্বর,—"বন্ধুগণ, আপনারা জানেন আজ আমরা কেন মিলিত হয়েছি। আমাদের নূতন খৃষ্টান মণ্ডলীর সামনে যে সাংঘাতিক বিপদ উপস্থিত, তা থেকে কি ক'রে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে আজই তার উপায় ঠিক করতে হবে। ইনকুইজিসনের পরোয়ানা থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, আমাদের ভয়ের কারণ কত বেশী। বলা অনাবশ্যক, বিচারালয় থেকে আমরা ন্যায় বিচার পাবো না, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়েও তাদের কঠোর আইনের কবলে পড়বো। এই সম্পূর্ণ বিবেকহীন স্বার্থপর বিচারকদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে। আপনারা সকলেই ধনী ও বিশ্বাসভাজন —আমাদের সম্প্রদায়ের সকলেই আপনাদের আদেশানুযায়ী চল্‌বে। এই দারুণ সঙ্কটে যদি প্রয়োজন হয়, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করতেও আমরা দ্বিধা বোধ করবো না। আমরা যদি একতাবদ্ধ ও স্থির-প্রতিজ্ঞ হই, তা হ'লে নিশ্চয়ই এই অত্যাচারী বিচারকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবো।"

খোপের ভিতরে লুক্কায়িত রড্রিগোর সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত ও মাংসপেশী সটান হয়ে উঠলো এই ভীষণ রাজদ্রোহকর ও ধর্ম্ম-বিরোধী বক্তৃতা শুনে। ক্রোধে তার চোখ-মুখ থেকে যেন আগুন বেরুতে লাগলো। কিন্তু সে তখন শুধু চোরের মত অবস্থিত থেকে ষড়যন্ত্রকারীদের গুপ্ত-মন্ত্রণার সকল কথাই শুনতে পেয়েছে। এই অবস্থায় তাকে সেখানে দেখতে পাওয়া গেলে তার মৃত্যু সম্পূর্ণ অবধারিত। ইসাবেলা অবস্থার ভীষণতা উপলব্ধি করে ভয়ে রড্রিগোর বাহু আঁকড়ে ধরলো। অবস্থা আরো সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়ালো ডিয়োগোর বক্তৃতার পর যখন উত্তেজিত কণ্ঠে জ্বালাময়ী বাণীতে ঐ বক্তৃতার প্রশংসা ও সমর্থন করে আরও কয়েকজন নেতা উপস্থিত ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ করলেন। এঁদের বেশীর ভাগ নেতাই ছিলেন সেভিলের শ্রেষ্ঠ ধনী সম্প্রদায় এবং জনকয়েক রাজ-কর্ম্মচারীও ছিলেন। বক্তৃতার শেষে স্থির হ'ল, প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র ও লোক সংগ্রহ করবেন।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বক্ষণে ডিয়োগো বললেন, "তিনি আজ সেভিল থেকে অনুপস্থিত, এ কথাই সকলে জানে, সুতরাং এই সুযোগে তিনি সকল ব্যবস্থা ক'রে রাখবেন।"

তারপর ডিয়োগো তাঁর দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাড়ীতে আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। ইসাবেলা ও রড্রিগোর আর লুকিয়ে থাকবার প্রয়োজন রইলো না। তারা পর্দ্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ভয়-কাতর ও বিশুষ্ক মুখে। ধরা পড়লে তার কি ভীষণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হ'ত তাই ভেবে আতঙ্কগ্রস্ত রড্রিগোর দন্তপাটী তখনও ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। অবশেষে যখন সে দেখলো উপস্থিত বিপদটা কেটে গিয়েছে, তখন সে হাঁপ ছেড়ে ব'লে উঠলো, "কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা!"

—"বিশ্বাসঘাতকতা? তুমি কি পাগল? কৈ, এখানে ত' বিশ্বাসঘাতকতার কিছু হয় নি?"

"হয় নি মানে? ধর্ম্ম বিরোধী ও রাজদ্রোহকর অনেক কথাই ত' শুনেছি।"

"না রড্রিগো, রাজদ্রোহকর কিছুই শোনো নি। তুমি শুনেছ ধর্ম্মের পবিত্র আচ্ছাদনের অন্তরালে যে সব অত্যাচার ও অন্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার প্রতিকারকল্পে কি করা যায় সে সম্বন্ধে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকের আলোচনা।"

গভীর অবজ্ঞার সুরে রড্রিগো বললো, "তা তুমি তো ওকথা বলবেই, কারণ তুমি সেই কলঙ্কিত ইহুদী বংশেই

জন্মেছ, কিন্তু আমি খাঁটি খৃষ্টান, তোমার কোন ফাঁকিতে ভুলবো না। এরা এখানে ধর্ম্মাধিকরণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, ইহুদীদের এ কাজটা কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়?"

"এঁদের একজনও ইহুদী নন, সবাই খৃষ্টান এবং তাঁদের ভেতর কয়েকজন ধর্ম্মযাজকও আছেন, আর…"

"হুঁ, সব নূতন-খৃষ্টানের দল। সাংসারিক সুখ-সুবিধা লাভের জন্য এরূপ ধর্ম্মান্তর-গ্রহণটা শুধুই ফাঁকি—এতে আমাদের পবিত্র ধর্ম্মকে অপবিত্র করা হয়েছে। খৃষ্টধর্ম্মের কৃত্রিম পোষাক প'রেও এরা ইহুদীই থাকবে এবং চির-অভিশপ্ত হ'য়েই থাকবে। আজ এ বাড়ীতে ঢুকে যে অপরাধ করেছি, ভগবান যেন আমার সে অপরাধ ক্ষমা করেন। তবু তাঁরই ইচ্ছায় আজ এদের এসব ষড়যন্ত্রের কথা এভাবে শুনতে পেলাম। এখানে আর মুহূর্ত্তকালও থাকা উচিত নয়।"

বলেই চরম বিরক্তির ভাব দেখিয়ে রড্রিগো বেরুবার জন্য দরজার কাছে অগ্রসর হ'ল। ইসাবেলা চট্ করে তার হাত ধ'রে ফেলে তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় যাচ্ছ?"

ইসাবেলার চোখে রড্রিগো দেখলো শুধু আতঙ্কের ছাপ, ইহুদীজাতির প্রতি কঠোর অবমাননা প্রদর্শনের ফলে যে তার ভালবাসা বিদ্বেষে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে, তা সে লক্ষ্য ক'রতে পারলো না। রড্রিগো শুধু বললো, "কোথায় যাচ্ছি? নিজের কর্ত্তব্য করতে যাচ্ছি।"

ঐ একটি বাক্য থেকেই ইসাবেলা সব বুঝে নিল। সে তৎক্ষণাৎ রড্রিগোর কোমরের খাপ থেকে চক্ চকে ছোরাটা বার ক'রে নিয়ে দরজা ও রড্রিগোর মাঝখানে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো।

ইসাবেলার চোখে আগুনের ফুল্‌কি, "দাঁড়াও তুমি, এগুতে চেষ্টা করলেই এই ছোরার আঘাত করব মনে রেখো। তার আগে আমার কথা শোনো।"

ইসাবেলার হাতের শাণিত অস্ত্রের আঘাতের ভয়ে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি রড্রিগোর স্বধর্ম্মনিষ্ঠার বিপুল উৎসাহ মুহূর্ত্তে গেল বিলীন হ'য়ে। সম্ভ্রান্ত কেষ্টিলিয়ান বংশের এই অপদার্থকেই ইসাবেলা তার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ঢেলে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। ঘৃণা ও আত্মগ্লানিতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগলো। হায়, তারই নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে সে আজ তার পিতার জীবন ঘোরতর বিপন্ন করে ফেলেছে। সে ধীরে ধীরে বল্‌লো,

"রড্রিগো, তুমি বোধ হয় ভাল ক'রে ভেবে দেখনি, এসব কথা প্রকাশ ক'রে দিলে বাবার সর্ব্বনাশ হবে।"

"খাঁটি খৃষ্টান হিসেবে এ আমার কর্ত্তব্য কাজ।"

"তা হতে পারে কিন্তু তোমার ভালবাসার দিক থেকেও একটা কর্ত্তব্য থাক্‌তে পারে না কি?"

"ধর্ম্মের কাছে অন্য কোন কর্ত্তব্যই দাঁড়াতে পারে না।"

"বেশ, একটু স্থিরভাবে ভেবে দেখ। আজ যে ভাবে তুমি এখানে এসেছো, আর যে অবস্থায় সব শুন্‌তে পেয়েছো তাতে তোমার আমার দু'জনেরই অপরাধ হয়েছে। তুমি কি এরূপ অন্যায়ভাবে যা শুনতে পেয়েছ, তার সুযোগ নিয়ে আমার বাবার সর্ব্বনাশ করতে চাও?"

"তবে কি আমি আমার বিবেকের প্রতি অন্যায় করবো?"

"আমি বলছি, তোমার তাই করতে হবে। শুধু এই নয়, তোমার সঙ্গে আরও একটু কথা আছে।"

ইসাবেলা নিজের গলা থেকে একটা সুন্দর সোনার হারের সঙ্গে গাঁথা মণিমুক্তাখচিত ছোট একটা ক্রুশ বার করে রড্রিগোকে বললো, "এই পবিত্র ক্রুশটি লও এবং এইটি হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলো, আজ যা শুনেছ তার একটি বর্ণও কাউকে বলবে না। যদি এই প্রতিজ্ঞা করতে রাজী না হও, তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও রড্রিগো। তোমার গোপনে আসার খবর আমি এখুনি রাষ্ট্র করে দিচ্ছি, চাকররা এসে তার উপযুক্ত শাস্তি দিক্। বলো প্রতিজ্ঞা করবে, না তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো? দেরী করো না, সময় বয়ে যাচ্ছে। এই শেষবার বলছি, প্রতিজ্ঞা করবে কি না বলো।"

উপায়ান্তর না দেখে রড্রিগো ক্রুশ হাতে নিয়ে ইসাবেলার নির্দ্দেশ মত প্রতিজ্ঞার কথাগুলো আবৃত্তি করলো। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ রড্রিগোকে ইসাবেলা তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তার ছোরা তাকে ফিরিয়ে দিল এবং তাকে বেরিয়ে যাবারও অনুমতি দিল।

ওরা জানুয়ারী। ভোরের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিয়োগো-ডি-সুশান ও তাঁর বন্ধুবর্গ গ্রেপ্তার হ'লেন। খবরটা ছ'ড়াতে মোটেই দেরী হ'ল না। ইসাবেলা প্রত্যুষেই গোলমাল শুনে বুঝতে পারলো বিপদের কথা—

চলচ্চিত্রের মত তার চোখে ভে'সে উঠলো রড্রিগোর প্রতিহিংসাভরা মুখ,—পরক্ষণেই আবার মনে হ'ল তার প্রতিজ্ঞার কথা। না, এ হ'তেই পারে না, রড্রিগো কখনই বিশ্বাসভঙ্গ করে নি। কিন্তু এ কি ক'রে সম্ভব যে ডিয়েগো ও তাঁর বন্ধুদের যাঁরা পূর্ব্বরাত্রিতে ডিয়েগোর গৃহে উপস্থিত ছিলেন, বেছে বেছে শুধু তাঁরাই গ্রেপ্তার হ'লেন? তবে কি রড্রিগোরই এই কাজ? সন্দেহ-দোলায় দুলতে লাগলো ইসাবেলা। হঠাৎ কি ভেবে সে তখনই তার শিবিকায় উঠে বসলো এবং ধর্ম্মযাজকের মঠে নিয়ে যাবার জন্য বাহকদের আদেশ ক'রল। সেখানে পৌঁছে মঠের অধ্যক্ষ ফ্রে-আলন্সো-ডি-ওজেদা ও ইনকুইজিসানের প্রধান বিচারক ফ্রে-টমাস-ডি-টর্কেয়োমেডার সঙ্গে তার দেখার সুযোগ ঘটলো।

প্রধান বিচারক ইসাবেলাকে দেখে শান্তস্বরে বললেন, "বাছা, তুমি অবিশ্বাসী ডিয়েগো-ডি-সুশনের মেয়ে? ঈশ্বর তোমার সহায় হোন্—তিনি তোমায় শক্তি দিন যেন সামনের পরীক্ষায় তুমি স্থির থাকতে পারো। কি তোমার প্রয়োজন বল?"

"ধর্ম্মপিতা, আমি এসেছি আপনার দয়া প্রার্থনা করতে।"

"বাছা, প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিজে ভগবানের কৃপা-ভিখারী হ'য়ে কৃপা প্রদর্শনে কি কার্পণ্য করতে পারি?"

"আমি আমার পিতার জন্য দয়া ভিক্ষা চাচ্ছি।"

"আমিও মনে ক'রেছি তোমার এখানে আসবার কারণ তাই। তোমার পিতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ। তবে যদি তিনি সত্যই নিরপরাধ হ'ন, বিচারকালে তা প্রকাশ পাবেই। অপরাধী হ'লে তার বিচারফল কি, তা ত জানো। সেই প্রায়শ্চিত্তদ্বারা তাঁর আত্মার মুক্তিলাভের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে।"

এই বাক্যের শেষাংশ শুনে ইসাবেলার বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো, কারণ সে জানতো, পাপের প্রায়শ্চিত্তকল্পে বিচারকেরা যে পারমার্থিক অনুকম্পার ব্যবস্থা করেন, তাতে দৈহিক যাতনা ও ইহলোকের সুখ-দুঃখের বিষয় মোটেই বিবেচনা করা হয় না।

সে বললো, "আমার বাবা তো ধর্ম্মবিরোধী কোনো কাজ করেন নি।"

ওজেদা কঠোর কণ্ঠে বললেন; "তুমি কি তা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারো? মনে রাখবে, খৃষ্টান হিসাবে তোমার যা কর্ত্তব্য তা কন্যার কর্ত্তব্যের অনেক উপরে।"

ইসাবেলার একবার ইচ্ছা হ'ল জিজ্ঞেস করে, কে অভিযোগ এনেছে কিন্তু সোজাসুজি প্রশ্ন করলে অভিযোক্তার নাম কিছুতেই জানতে পারা যাবে না বুঝতে পেরে একটু চতুরতা অবলম্বন ক'রে বললো, "আমি বেশ ভালো ক'রেই জানি, আমার বাবা 'নূতন খৃষ্টান' হ'লেও অভিযোক্তার চাইতে অনেক বেশী ধার্ম্মিক ও খাঁটি খৃষ্টান।"

"আমি তা বিশ্বাস করতে পারছি না। শুধু কর্ত্তব্যবোধেই অভিযোগকারী এই অভিযোগ উপস্থিত ক'রেছেন, আর যে অপরাধজনক অবস্থায় তিনি এ বিষয় জানতে পেরেছেন, তাও অকপটে প্রকাশ ক'রেছেন।"

এই কথা শুনে ইসাবেলার ইচ্ছা হ'ল চীৎকার ক'রে কেঁদে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে অভিযোক্তার পরিচয় আরো স্পষ্টতরভাবে জানবার জন্য সে বললো, "ডন্ রড্রিগো নিজে এসব স্বীকার ক'রেছে?"

ওজেদা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন কিন্তু পরক্ষণেই সতর্ক হ'য়ে বললেন, "ডন্-রড্রিগো? কৈ তার কথা তো কিছু হয় নি?"

ওজেদা মাথা নেড়ে ইসাবেলার কথারই সমর্থন ক'রেছিলেন, এখন এই প্রশ্নে তা ঢাকতে পারবেন কেন? ইসাবেলা স্পষ্ট বুঝতে পারলো, অভিযোক্তা রড্রিগো ছাড়া আর কেউ নয় এবং আরও বুঝতে পারলো, নিজের নৈতিক দুর্ব্বলতা ও কর্ত্তব্যহীনতার জন্যই সে তার পিতার সর্ব্বনাশ ক'রে ব'সেছে। এই উপলব্ধি তাকে একান্ত অভিভূত করে ফেললো। আবার তখনই তার হৃদয়ে জেগে উঠলো প্রতিশোধ নিবার প্রবল প্রেরণা, "হ্যাঁ, চাই প্রতিশোধ। কন্যার কর্ত্তব্য, তাতে প্রাণ যদি মূল্যরূপে ধরতে হয়, তাতেও সে পিছু হটবে না। দাঁতে দাঁত চেপে ইসাবেলা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—

"তিনি তাঁর নিজের অপরাধও স্বীকার করেছেন? আর তাঁর এত সাহস যে নিজেকে ইহুদীধর্ম্মে বিশ্বাসী বলতেও তিনি শঙ্কা বোধ করলেন না?"

"ইহুদীধর্ম্মে বিশ্বাসী ডন্‌-রড্রিগো? অসম্ভব কথা।"

"কেন? আপনিই তো বললেন, তিনি তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছেন।"

"হাঁ, করেছেন, তবে এ বিষয়ে নয়।"

"ও বুঝেছি, অপরাধ স্বীকার করতে গিয়েও তিনি সব কথা প্রকাশ করেন নি। তাঁর স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস দেখেই তো আমি তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হই নি। এই কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে পাছে তাঁর নিজের বিপদ ঘটে, তাই প্রতিশোধ নিবার আকাঙ্ক্ষায়ই যে তিনি এই অভিযোগ এনেছেন, একথাও বোধ হয় স্বীকার করেন নি?"

গভীর অবিশ্বাস ও বিস্ময়ে ওজেদা ইসাবেলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন টর্কেয়োমেড বললেন,—

"তুমি বলতে চাও, ডন্‌-রড্রিগো ইহুদী ধর্ম্মে বিশ্বাসী? এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য কথা।"

"তা আপনারা বিশ্বাস না করতে পারেন, কিন্তু আমি এমন প্রমাণ দিতে পারি, যা কিছুতেই বিশ্বাস না করে পারবেন না।"

"তা হ'লে তোমাকে তা প্রমাণ করতেই হবে। মনে রাখবে, এ তোমার পবিত্র কর্ত্তব্য, নয় তো ধর্ম্মবিদ্বেষীর সহায়তাকারিণী হিসাবে তোমারও ভোগ করতে হবে আইনের চরম শাস্তি।"

প্রমাণ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইসাবেলা ঘরে ফিরবার জন্য তার শিবিকায় চড়ে রওনা হ'ল। শিবিকায় বসে শুধুই তার মনে হতে লাগলো, বেঁচে থাকার সকল সুখ-শান্তি তার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে—নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে পিতার যে সর্ব্বনাশ সে করে ফেলেছে, এখন কি ক'রে তার প্রতিশোধ লওয়া যেতে পারে—এই হ'ল তার একমাত্র চিন্তা। আল্‌কাজারের নিকট দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ অদূরে দেখা গেল রড্রিগোকে। ইসাবেলা অমনি বালক-ভৃত্য পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলো।

ইসাবেলার আহ্বানে রড্রিগো যথেষ্ট বিস্মিত হল। রাজদ্রোহিতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির কন্যার সঙ্গে প্রকাশ্যে এরূপ দেখা করা বাঞ্ছনীয় না হলেও রড্রিগো শুধু কৌতূহলবশে ইসাবেলার শিবিকার কাছে উপস্থিত হল। ইসাবেলা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে তাকে অভ্যর্থনা করে গভীর বিষাদের সহিত বললো, "রড্রিগো, আমাদের ভীষণ বিপদ,—তুমি শুনেছ বাবার কথা?" ইসাবেলার মুখে বা চোখের দৃষ্টিতে ভালবাসা ও বিষাদের চিহ্ন ছাড়া রড্রিগো আর কিছু দেখতে পেল না। তাহ'লে ইসাবেলা তাকে আদৌ সন্দেহ করে নি। ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে রড্রিগো উত্তর দিল,

"হাঁ, শুনেছি ঘণ্টাখানেক আগে…তোমাকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ রড্রিগো। আমি বেশ বুঝতে পারছি, বাবা যাঁদের খুবই বিশ্বাস ক'রতেন তাঁদের মধ্যেই কেউ এই অভিযোগ এনেছেন। হায়, এখন আমার কি উপায় হবে? বাবাই যে আমার একমাত্র বন্ধু ছিলেন।"

"তোমার একমাত্র বন্ধু? কেন, ইসাবেলা তোমার বন্ধুত্ব দাবী করবার মতো আর কেউ কি নেই?" দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে ইসাবেলা বললো, "হ্যাঁ ছিল, কিন্তু গত রাত্তে যা ঘটেছে…তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাচ্ছি। আমি তখন ভয়ে চিন্তায় একেবারে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর অপরাধের গুরুত্ব বোঝবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যে তোমার ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য এটুকুও বোঝবার মতো আমার বুদ্ধি ছিল না। তবুও তোমার দ্বারা যে এ কাজ হয় নি, এটাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।"

এ ভাবে কথা বলতে বলতে তারা এগিয়ে চললো। ইসাবেলার বাড়ীর সামনে শিবিকা এলে রড্রিগো ইসাবেলাকে হাত ধরে নামিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। ইসাবেলা তাতে বাধা দিয়ে বললো,—

"না রড্রিগো, আজ নয়। তোমার কাছে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। এর পরে একদিন তুমি এলে সত্যেই আমি সান্ত্বনা পাবো, সেই বিশেষ সময় এলেই তোমায় জানাবো, অবশ্য তুমি যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করে থাকো।"

"তোমার অপরাধ? কৈ, তাতো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি যে গভীর পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছ, সে জন্য আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি, বরং আমিই চাই তোমার ক্ষমা।"

"রড্রিগো, তুমি অতি মহৎ ও সজ্জন। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

এর পরে রড্রিগোর আর থাকা চলে না—সে যথারীতি বিদায় নিয়ে চলে গেল। ইসাবেলা এখন তাকে ভাল মতেই চিনতে পেরেছে—রড্রিগোর স্বরূপ তার কাছে এখন অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু রড্রিগোর মনের ভাব হল সম্পূর্ণ বিপরীত, সে তৃপ্তি লাভ করলো এই ভেবে যে, এই ব্যাপারে ইসাবেলা তাকে মোটেই সন্দেহ করে নি। দু'দিন পরে ইসাবেলার একখানা চিঠি এসে তাকে অপরিসীম আনন্দে নাচিয়ে তুললো। অনেক ভেবে-চিন্তে ইসাবেলা লিখেছে,—

"রড্রিগো, তোমার সঙ্গে এখনই একটা দরকারী কথা আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। আমার বাবার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার ফলে তাঁকে যদি দণ্ডিত হতে হয়, তা হ'লে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে এবং ধর্ম্ম-দ্রোহীর কন্যা বলে আমাকে ঐ সম্পত্তির একটি কপর্দ্দকও দেওয়া হবে না। অবশ্য, আমি আমার নিজের জন্য ভাবছি না—ভাবছি শুধু তোমার জন্য। এ অবস্থায়ও আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা যদি এখনও তোমার থাকে, তাহ'লে তোমার কাছে আমার যেতে হবে সম্পূর্ণ কপর্দ্দকহীন হয়ে—এ আমি মোটেই ইচ্ছা করি না। বিচারকেরা ধর্ম্ম-দ্রোহীর কন্যাকে তার পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন বটে কিন্তু তাঁরা কেষ্টিলের অভিজাত-বংশীয় কোন ভদ্রলোকের পত্নীর ন্যায্য সম্পত্তি নিশ্চয়ই কেড়ে নেবেন না। এর অধিক লিখতে চাই না। বিষয়টা একটু ভেবে দেখো এবং তোমার হৃদয় যা চায় সে অনুসারেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করো। আগামী কাল এখানে এলে বিশেষ সুখী হব'।—ইসাবেলা।"

ইসাবেলার লিখিত বিষয়ে রড্রিগোর ভেবে দেখ্‌বার কিছুই ছিল না। ইসাবেলার পিতার অগাধ সম্পত্তি। বিচার-ফলে যে জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে তাঁর মরতে হবে, এতে কোনো সন্দেহই ছিল না। এই অতুল সম্পত্তি রড্রিগো অনায়াসেই পেতে পারে ইসাবেলাকে বিয়ে ক'রে; কিন্তু বিয়েটা হওয়া চাই দণ্ডাদেশের পূর্ব্বে। ইসাবেলার প্রস্তাবের ভিতর তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে রড্রিগো মনে মনে তার প্রশংসা ত' ক'রলই, উপরন্তু তার নিজের এরূপ চূড়ান্ত সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে তখনই ইসাবেলাকে লিখে জানিয়ে দিল তার হৃদয়ের গভীর ও অফুরন্ত ভালবাসা এবং আরও জানিয়ে দিল, পরদিনই সে ইসাবেলার বাড়ীতে যাবে বিয়ে করবার জন্য।

চার

পরদিন ইসাবেলা তার পিতার প্রাসাদের সবচেয়ে সুন্দর কামরায় রড্রিগোকে অভ্যর্থনা ক'রে বসালো। সে নিজে ত' সেজেছিল মনোমোহিনী ভূষায়,—তার বুকের ওপর ঝুল্‌ছিল স্বচ্ছ হীরকমালায় গাঁথা একটি বহু মূল্যবান্ হার এবং মাথার কুণ্ডল আবেষ্টন ক'রে শোভা পাচ্ছিল একছড়া সমুদ্রজ মুক্তার মালা। ইসাবেলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য মহার্ঘ বেশ-ভূষায় শতগুণ বেড়ে গিয়ে তাকে প্রকাণ্ড লোভনীয় ক'রে তুলেছিল। সেই রূপে রড্রিগোর চোখ ঝল্‌সে গেল এবং এই রমণীরত্ন লাভের পূর্ণ সম্ভাবনায় তার চিত্ত পরিতৃপ্তিতে ভরপূর হ'য়ে উঠলো। তখন নিজেকে আর সাম্‌লাতে না পেরে ইসাবেলাকে বাহুপাশে আবদ্ধ ক'রে ব'লে উঠলো, "ইসাবেলা. আমার উজ্জ্বল রত্ন—আমার পত্নী আমাদের দু'জনকে যিনি আজ এক ক'রবেন সেই পুরোহিত কোথায়?"

ইসাবেলার আয়ত চোখদু'টি গভীর প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টিতে রড্রিগোর দিকে তাকালো এবং তারপর রড্রিগোর বুকের ওপর মাথাটি রেখে সে তার বিম্বাধরে একটুখানি মুচকি হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্‌লো, "রড্রিগো, এত সব ব্যাপার হ'য়ে গেল, তবুও তুমি আমায় ভালবাসো?"

উত্তেজনায় রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে রড্রিগো আকুলভাবে ব'লে উঠলো, "তোমায় ভালবাসি আমার প্রাণের চাইতে, এমন কি মুক্তির চাইতেও বেশী।"

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে ও পূর্ণ পরিতৃপ্তির ভাব দেখিয়ে ইসাবেলা রড্রিগোর বুকের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে যেন সেখানে আশ্রয় খুঁজতে লাগলো—তারপর বললো, "রড্রিগো, আমার প্রতি তোমার ভালবাসা যে সত্যি এত গভীর তা অনুভব ক'রে কি অপরিসীম আনন্দই পাচ্ছি। তবু সেটা একটু পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই।"

"বেশ, বলো সেই পরীক্ষা কি?"

"আমি চাই, আমাদের এই বিয়ের বন্ধনটা এমন দৃঢ় হোক যা মৃত্যু ছাড়া কিছুতেই যেন না টুটে।"

"বাঃ, আমিও তো তাই চাচ্ছি।"

"তা হ'লে শোনো। আমি খৃষ্টান হয়েছি বটে কিন্তু আমার সমস্ত দেহের শিরায় শিরায় র'য়েছে ইহুদী-রক্ত। সুতরাং আমার বিয়েটা এমন ভাবে নিষ্পন্ন হওয়া চাই যাতে আমার বাবাও সন্তুষ্ট হ'তে পারেন।"

"তুমি কি বলতে চাও ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।"

"আমি বলতে চাই, খৃষ্টধর্ম্মানুযায়ী খৃষ্টান পুরোহিত দিয়ে তো আমাদের বিয়ে হবেই, কিন্তু তার আগে হোক ইহুদী-রীতি অনুসারে ইহুদী-শাস্ত্রজ্ঞ দিয়ে।"

ইসাবেলা বুঝতে পারলো রড্রিগোর যে বাহুবন্ধন তাকে ধ'রে রেখেছিল তা যেন শিথিল হ'য়ে পড়ছে। সে আবার বল্‌তে লাগলো, "রড্রিগো, তুমি যদি প্রকৃতই আমায় ভালবাসো—সত্যি আমায় চাও,—তা হ'লে আমার এই সামান্য সর্ত্তটুকু মেনে নিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। তোমায় শপথ ক'রে বল্‌ছি, আমাদের বিয়ের পরে আমার মুখ থেকে কখনও বেরুবে না যে আমি ইহুদী বংশের মেয়ে।"

রড্রিগোর মুখের বর্ণ পাংশু হ'য়ে উঠলো,—ঠোঁট কাঁপতে লাগলো এবং কপোলে ঘামের বিন্দু দেখা দিল। সে ব'লল, "সর্ব্বনাশ, এ কি রকম সর্ত্তের কথা বলছো? এ যে ভয়ানক অধর্ম্মের কাজ।"

রড্রিগোকে দূরে ঠেলে দিয়ে ইসাবেলা বললো, "এটা তুমি অধর্ম্মের কাজ মনে করছো? আমার প্রতি এত ভালবাসা দেখাচ্ছিলে—কিন্তু আমি যখন আমার সর্ব্বস্ব তোমায় দিতে যাচ্ছি, সেই সময় আমার জন্য তুমি এই সামান্য ত্যাগটুকুও করতে পারো না? উপরন্তু আমার পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মের অবমাননা করতেও দ্বিধা বোধ করলে না? তোমার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ক'রেছিলাম, তা না হ'লে আজ এখানে আসবার জন্য কখনও তোমায় বল্‌তাম না। তোমার আর মুহূর্ত্তকালও এখানে থাকা উচিত নয়।"

নানাভাবে বিচলিত হ'য়ে রড্রিগো এক রকম হতভম্ব হ'য়ে গেল। সে ইসাবেলাকে আবার বৃথাই বোঝাতে চেষ্টা ক'রল। ইসাবেলার প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করা খৃষ্টান রড্রিগোর পক্ষে যথার্থই অধর্ম্মের কাজ হ'ত। কিন্তু রড্রিগো ছিল তখন অতুল সম্পত্তি ও অতুলনীয়া রূপসী রমণীরত্ন লাভের স্বপ্নে বিভোর। তার পক্ষে এই লোভ পরিহার করা একান্তই অসম্ভব ছিল। ইসাবেলার সর্ত্তানুযায়ী বিয়েতে যদি ভয়ের কারণ না থাক্‌তো, তা হ'লে রড্রিগো ধর্ম্মসংক্রান্ত খুঁটিনাটি নিয়ে কোনও আপত্তিই তুলতো না। সে বললো, "ইসাবেলা, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, আমাদের খৃষ্টীয় চার্চ্চ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে—আমি ইহুদী ধর্ম্মানুযায়ী বিয়ে ক'রতে ইচ্ছা ক'রেছি, তা হ'লে আমার বিরুদ্ধে ধর্ম্মদ্রোহিতার অপরাধ প্রমাণ হ'য়ে যাবে এবং বিচারে আমাকে মরতে হবে আগুনে পুড়ে।"

"এই যদি তোমার আপত্তির একমাত্র কারণ হয়, তা হ'লে জিজ্ঞেস্ করি, তোমার বিরুদ্ধে কে সাক্ষ্য দিতে যাবে? যে ইহুদী পুরোহিত আমাদের বিয়ে দেবেন, তিনি তাঁর নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই এর একটি বর্ণও কাউকে বল্‌তে যাবেন না।"

"তাঁর সম্বন্ধে তা হ'লে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা যায়?"

"নিশ্চয়।"

রড্রিগো আশ্বস্ত হ'ল। তখন ইসাবেলার নিজের আগ্রহই যেন হঠাৎ কমে গেল। রড্রিগো অস্থির হ'য়ে ইহুদী পুরোহিতকে ডেকে আন্‌বার জন্য বার বার বল্‌তে লাগলো।

অবশেষে ইসাবেলা উঠে রড্রিগোকে তার সেই বস্‌বার ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে আর কেউ ছিল না দেখে রড্রিগো জিজ্ঞেস্ করলো, "কৈ, তোমার ইহুদী পুরোহিত কোথায়?"

"তুমি এখনও সত্য সত্যই যদি ইহুদী পুরোহিত দিয়েই বিয়ের কাজ করাতে চাও, তবে তাঁকে খবর দিয়ে আনাবো এখন।"

"সত্য সত্যই চাই বই কি। আমার কথায় কি এখনও সন্দেহ করছো?"

"না, সন্দেহ করছি না, তবে আমি চাই না, কেউ এ রকম মনে করে যে, আমিই তোমাকে তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ রকম কাজে সম্মত করিয়েছি। তুমি মুক্ত কণ্ঠে বলো যে এটা তোমার সম্পূর্ণ নিজেরই ইচ্ছা যে, ইহুদী রীতি অনুসারে আমাদের বিয়ে হো'ক।"

শুভকার্য্যে বৃথা বিলম্ব রড্রিগোর ভাল লাগছিল না। কোন রকমে বিয়ের কাজটা সম্পন্ন হ'লেই অতুল ঐশ্বর্য্য তার হস্তগত হবে, এই লোভের মোহে সে স্থির কণ্ঠে বল্‌লো "তা-তো বটেই, আমি স্পষ্ট বল্‌ছি, এ আমার সম্পূর্ণ নিজের

ইচ্ছা যে, আমাদের বিয়ে ইহুদীধর্ম্মানুযায়ী হো'ক, কিন্তু তোমার ইহুদী পুরোহিত কোথায় ?"

ঐ প্রশ্ন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কামরার প্রান্তবর্ত্তী ছোট খোপের পর্দ্দাটা নড়ে যাবার শব্দ হ'ল। সেই শব্দ শুনে রড্রিগো ব'লে উঠলো,

"ওঃ, তিনি বুঝি ওইখানে ?……" বলেই রড্রিগো হঠাৎ পেছনে সরে দাঁড়ালো এবং যেন অকস্মাৎ গুরু আঘাত পেয়ে দু'হাত তুলে কাঁপতে লাগলো। পর্দ্দার আড়াল থেকে তখন বেরিয়ে এলেন ইহুদী পুরোহিতের বদলে সম্পূর্ণ কালো পোষাকে সমস্ত দেহ ও মুখ ঢাকা এক ব্যক্তি—তাঁর পশ্চাতে আরও দু'জন লোক।

ইনকুইজিসানের বিচারকের পোষাক দেখে রড্রিগো, ভীত, চকিত ও একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল। এরূপ অভাবনীয় ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হ'ল, তা তার ধারণায় এলো না।

বিচারক তাঁর মুখের কালো আচ্ছাদন খুলে ফেলে যখন সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন দেখা গেল—ইনি ফ্রে-টমাস্-ডি-টর্কেয়োমেডা। তিনি সস্নেহ কণ্ঠে রড্রিগোকে সম্বোধন ক'রে বললেন,

"বাছা, তোমার সম্বন্ধে এরূপ সংবাদ এসেছিল যে, তুমি ইহুদীধর্ম্মে বিশ্বাসী। কিন্তু তুমি যে বংশের লোক সেই বংশের কারো সম্বন্ধে এরকম কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই, তাই চেয়েছিলাম আমার নিজের চক্ষু-কর্ণের প্রমাণ। হায় হতভাগা; কার দুষ্ট প্ররোচনায় তুমি এমন বিপথগামী হ'য়েছ ?"

রড্রিগোর ভীতি তখন দারুণ ক্রোধে পরিণত হ'য়ে গিয়েছে। হাতের আঙ্গুল দিয়ে ইসাবেলাকে দেখিয়ে সে ব'লে উঠলো,

"এই দুষ্টা স্ত্রীলোক আমায় বাধ্য ক'রে এই ফাঁদে ফেলেছে। আমার সর্ব্বনাশের উদ্দেশ্যেই সে এই ফাঁদ পেতেছিল।"

"এটা যে ফাঁদ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে আমারই সম্মতিক্রমে এই ফাঁদের ব্যবস্থা ক'রেছে—তোমার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য। তোমার হৃদয় যদি ধর্ম্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান্ থাকতো, তা হ'লে তুমি কখনো এরূপ ফাঁদে পড়তে না এবং পরিত্রাতার নিকট মুহূর্ত্তের জন্যও অবিশ্বাসী হ'তে না।"

"ধর্ম্ম-পিতা, শুনুন, আমি অনুনয় করে বল্‌ছি, আমার কথা শুনুন।"

রড্রিগো নতজানু হ'য়ে করজোড়ে প্রার্থনা করতে লাগলো—

"বাছা, তোমার কথা নিশ্চয়ই শোনা হবে আমাদের বিচারকেরা কাউকে তার স্বপক্ষের উক্তি না শুনে দণ্ডিত করেন না। তোমার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা আমি অনেক দিন হ'ল শুনেছি এবং শুনে যথেষ্ট দুঃখানুভব করেছি, কিন্তু তুমি যে অবশেষে ইহুদী ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হবে এবং ঐ ধর্ম্মের অনুমোদিত প্রণালীতে বিবাহের অপবিত্র বন্ধনে নিজকে আবদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে, তা কল্পনায়ও আনতে পারিনি। যাই হো'ক, এখন তুমি পরিত্রাতার আশীর্ব্বাদের জন্য প্রার্থনা কর এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে দৈহিক কষ্টের ব্যবস্থা আছে, তার জন্য প্রস্তুত হও,—যেন তোমার আত্মা প্রকৃতই অনুতপ্ত হয়,—তবেই ভগবানের দয়ায় তুমি মুক্তির অধিকারী হ'তে পারবে। আমিও তোমার জন্য প্রার্থনা করবো। এর বেশী আমার আর কিছু করবার নেই। ওহে, একে নিয়ে যাও এখান থেকে।" বক্তার অনুচর দু'জন রড্রিগোকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল।

পাঁচ

১৪৮১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সেভিল নগরবাসীরা সর্ব্বপ্রথম দেখলো ইনকুইজিসানে দণ্ডিত লোকদের সম্পর্কিত শোভাযাত্রা। দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ডিয়োগো-ডি-সুশন ও তাঁর সঙ্গীয় ষড়যন্ত্রকারীরা,—আর ছিল ডন্-রড্রিগো-ডি-কার্ণাডো। ইনকুইজিসনের সবুজরঙের ক্রুশবাহীদলের পুরোভাগে ছিলেন একজন ডমিনিকান্ ধর্ম্মযাজক, তাঁর পশ্চাতে সেণ্টপিটার-দি-মার্টার সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক, তারপর ইনকুইজিসনের কর্ম্মচারীদল এবং সকলের পেছনে পীতবর্ণের ঢিলা জামা পরা দণ্ডিত ব্যক্তিরা নগ্নপদে মোমবাতি হাতে নিয়ে। সশস্ত্র সৈনিক-পরিবৃত এই শোভাযাত্রা শহরের সমস্ত রাস্তা ঘুরে অবশেষে গির্জ্জায় উপস্থিত হ'ল। সেখানে উপাসনা ও ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতার

পর অপরাধীদের নেওয়া হ'ল নগরের বাইরে টাব্লাডার ময়দানে। তাদের অভ্যর্থনার জন্য সেখানে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হ'য়েই ছিল।

এর পর ইসাবেলা আশ্রয় নিল এক সন্ন্যাসিনীদের মঠে, কিন্তু সেখানে তার শান্তি মিল্‌লো না,—তাই সে বেরিয়ে এল আবার সংসারক্ষেত্রে অবাধ জীবনযাত্রায় অতীতের শোক-দুঃখ ভুলে থাক্‌বার ভরসায়। কিন্তু যে শান্তি সে খুঁজছিল, তা সে পেতে পারতো শুধু মৃত্যুতে।

ইসাবেলা নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে তার উইলে একটা অদ্ভুত অনুজ্ঞা রেখে গিয়েছিল, যেন মৃত্যুর পর তার মাথাটা তার পিতার প্রাসাদের দ্বারদেশে ঝুলিয়ে বাধা হয়। প্রায় ৪০০ বৎসর পরে নেপোলিয়নের সৈন্যদল যখন স্পেনে এসে ইনকুইজিসনের গৃহাদি ধ্বংস ক'রে দেয়, তখনও ইসাবেলার মাংসহীন মুণ্ড সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, এরকম প্রবাদ।

ইনকুইজিসনের বিরুদ্ধে ঐ ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে ভস্মীভূত হয়েছিল। ইসাবেলা তার অপদার্থ প্রণয়ীর যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তার পিতার নৃশংস মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, ঠিক ঐরূপ বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়েই সে তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছিল।*

---

*র‍্যাফেল স্যাবাটিনি রচিত ঐতিহাসিক সন্দর্ভ অবলম্বনে লিখিত।

ছলনাময়ী

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ময়নামতীর চরে —
তোমায় আমায় দেখা হ'ল সখী বালু-বেলাতট পরে।
কতদূর হ'তে এসেছিলে তুমি, কতদূর হ'তে আমি,
প্রিয়তমা বলে ডেকেছিনু তোমা, তুমি বলেছিলে স্বামী!
মনে আছে মোর, সূর্য্য তখন অস্ত গিয়েছে সবে
দ্বিধা বিজড়িত কণ্ঠে কহিলে—"মালাখানি মোর লবে?"
গোধূলি বেলার মলিন মাধুরী দেখিনু তোমার মুখে,
বিজয়মাল্য পরিয়া গলায় তোমারে ধরিনু বুকে।
আকাশে তখন ফুটিয়া উঠিছে দু'টি কি একটি তারা,
সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া চলিনু তোমাতে আত্মহারা,
দ্বিতীয়ার চাঁদ পূর্ব্ব গগনে কেবল দিতেছে দেখা,
তখন কে জানে বিধাতা লিখিছে এ হেন ভাগ্য লেখা।

আজি সখী তুমি চিনিতে পার না, দূর হ'তে চেয়ে থাক,
পৃথিবীরে তুমি চিনিতে পার নি,—আমারেও জান নাক,
তোমার নয়নে বিস্ময়মাখা, আমি কি অপরিচিত?
মনের কপাট খুলিল না যেন সন্দেহ-আকুলিত।
তুমি জান নাক আপনার মন, তাই এ বিড়ম্বনা
হায় হতভাগী, আপনারে কেন এ হেন প্রবঞ্চনা,
তোমারে কাঁদায়ে নিশিদিনমান আমারে এড়ায়ে চলে
বাসনার ঢেউ উদ্বেল যদি হৃদয়-সিন্ধু তলে।
আপনার কথা অনেক বলেছি, আর কিছু বলিব না,
ভালবাসা ব'লে মনের প্রবোধে মোরে আর ছলিব না।
এমনি নীরব কতদিন আর থাকিবে ছলনাময়ী?
এ ভালবাসার কিছু নাই দাম, মিথ্যা সে হ'ল জয়ী?

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাহিত্যের নেশা

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ-এস্-এস্,
এফ-আর-ই-এস্

প্রবন্ধটির নামকরণ ঠিক হইল না। "সাহিত্য সেবায় নেশা" বা সংক্ষেপে "সাহিতিক নেশা" নামকরণ করিলেই অধিকতর সঙ্গত ও সমীচীন হইত। এই নেশায় প্রকাশ্যভাবে বা অপ্রকাশ্যভাবে অনেকেরই (এমন কি বিশ্বালয়ের ছাত্রদেরও) অল্প বিস্তর আসক্তি আছে, সুতরাং স্বল্পাবসরে এবং দ্রুতগতিতে রচিত এই প্রবন্ধটিতে আমার অক্ষমতাবশতঃ বক্তব্য বিষয়টি সুপরিস্ফুট না হইলেও, আশা করি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাদ্বারা আমায় অস্পষ্ট ও অব্যক্ত কথাগুলি পাঠকগণের নিকট সুস্পষ্ট বোধ হইবে। এক্ষণে বাহুল্য না করিয়া সাহিত্যিক নেশার প্রকৃতি ও স্বরূপ স্বম্বন্ধে দুই চারিটী কথা নিবেদন করিতে অগ্রসর হইব।

জগতে যত প্রকার নেশা আছে তন্মধ্যে, বোধ হয়, সাহিত্য-সেবার নেশার ন্যায় ভয়ঙ্করী নেশা আর নাই! অন্যান্য নেশায় মানুষের দেহের, কিয়ৎপরিমাণে হয় ত' মনের এবং অনেকস্থলে পরিবারের অপকার সাধন করে, কিন্তু সাহিতিক-নেশার অপকারিতার সহিত তাহার অপকারিতা তুলনীয় নহে। ভুক্তভোগী সাহিতিকগণ সহজে তাঁহাদের সন্তানগণকে সাহিত্যিকের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইতে চাহেন না। লর্ড বায়রণ একস্থানে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গময়ী ভাষায় লিখিয়াছেন, "যদি আমি কাহাকেও পত্নীত্বে বরণ করি, এবং যদি তাঁহার কোন পুত্র হয় (যাহারই ঔরসে হউক না কেন), তাহা হইলে আমি সেই পুত্রকে অ-কবি করিয়া মানুষ করিব, তাহাকে ব্যবহারাজীব করিব, কিম্বা ডাকাতি করিতে বলিব। কিন্তু যদি সে সাহিত্য-সেবা করে তাহা হইলে তাহার সহিত আমি সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিব এবং তাহাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিব।" উইলিয়ম হ্যাজলিটকে কোনও বন্ধু একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র কি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে? উত্তরে তিনি বলেন, "ভগবান রক্ষা করুন! সে যেন কস্মিন্‌কালে এ পথে না পদার্পণ করে।" বাঙ্গালার সাহিতিকগণও তাঁহাদের সন্তানগণকে সাহিত্য ব্যবসায়ী করিতে সচরাচর পরাঙ্মুখ।

এ নেশা একবার ধরিলে আর অব্যাহতি নাই। তবে এ নেশায় মানুষ আসক্ত হয় কেন? সংসারে যদ্দ্বারা সুখ, শান্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, সেই সর্ব্বজনকাম্য অর্থ উপার্জ্জন করা সাহিতিকগণের লক্ষ্য নহে। পক্ষান্তরে, সাহিত্যসেবার নেশার জন্য অনেকে স্বেচ্ছায় ভীষণ দারিদ্র্য দশায় পতিত হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেকে এই নেশা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলে হয়ত যথেষ্ট সাংসারিক উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন। কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

> "হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
> যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে।"

দ্বিজেন্দ্রলালও ইহার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিয়াছেন,

> "হায় মা! যাহারা তোমার ভক্ত নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত!"

কিন্তু ইহার অর্থ ইহা নয় যে, ভারতীর সেবকরা এত

অপদার্থ যে তাহাদের অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা আছে, শুধু এক অতৃপ্তিজনক নেশা তাঁহাদিগকে এক মরীচিকার পশ্চাতে অনর্থক ধাবমান করায়। কবি হেমচন্দ্র হাইকোর্টে প্রথম শ্রেণীর উকিল ছিলেন, যখন তাঁহার অসাধারণ প্রসার ও প্রতিপত্তি, যখন অমৃতলালের ভাষায় হেমচন্দ্র "হপ্তায় হাজার দিত ব্যাঙ্কের খাতায়," যখন তাঁহার হাইকোর্টের বিচারপতির জুডিসিয়াল পদে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তখন তিনি এই সাহিত্য-নেশার অধীন হইয়া স্বেচ্ছায় কমলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত

আচার্য্য কৃষ্ণকমল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন,—

"বৃত্র সংহার সুরু হইলে তাঁহার ওকালতীতে শৈথিল্য পড়িয়া গেল। আমি জানি, তাঁহাকে তিন শত টাকা ফী দিয়া আলিপুর লইয়া যাইবার জন্ত মক্কেল আসিয়া তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইতে পারিল না, হেমবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া রহিলেন। দেবী সরস্বতীর মন্দিরে অনেকে অর্ঘ্য আনিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন সত্য, কিন্তু এমন একাগ্র উপাসনা আর দেখিয়াছ কি? তাঁহার মাসিক আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।"

শেষ বয়সে অন্ধাবস্থায় কবি যখন আক্ষেপ করিয়াছিলেন, "ধন নাই, বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই?"—তখন তিনি কি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাহিত্যের নেশায় অভিভূত হইয়া তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা তাঁহারই স্বেচ্ছাকৃত?

ধনী পিতার আদরের দুলাল, অসামান্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাত্রাবস্থাতেই অন্যান্য নেশা অপেক্ষা সাহিত্যের নেশার অধিকতর আসক্ত হইয়াছিলেন এবং নিজের স্বাস্থ্য ও পারিবারিক সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে "ভুঞ্জি বহু দুঃখ সংসার-কারাতে" তাঁহার পরিণাম কি হইল তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কবি নবীনচন্দ্র বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন:

"দিয়াছিল যেই রত্ন ভারতী তোমায়, অপার্থিব ধন!
রাজ্য বিনিময়ে আহা, কেহ নাহি পায় তাহা,
দাতব্যচিকিৎসালয়ে তোমার মরণ?"

পুনশ্চ বঙ্গমাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন:

"কি বলিব হায়! অযতনে অনাদরে, বঙ্গকবি-কুলেশ্বরে
ভিক্ষুকের বেশে মাতা দিয়াছ বিদায়।"

বাঙ্গালা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা মণীষী অক্ষয়কুমার দত্ত যখন মাত্র ৬০৲ মাসিক বেতনে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক ছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগে নবপ্রবর্ত্তিত ১৫০৲ বেতনের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের পদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের নেশায় বিভোর অক্ষয়কুমার সেই পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার সাহিত্যনিষ্ঠার অপূর্ব্ব পরিচয় তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান রাখিয়া গিয়াছেন। কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী আজীবন সারদার অর্চ্চনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং কখনও বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন:

"দুই গতি আছে এই কুটিল সংসারে; হয় তুমি তোষামোদ দিয়া বলিদান,
পড়গে কোমর বেঁধে টাকার বাজারে, নয় ব'সে ঘরে পরে হও অপমান।
হা ধিক, হা ধিক! আমি সব না কখন, অপদার্থ অসারের মুখ বেঁকা লাথি,
করে প্রিয় পরিবার করুক ক্রন্দন শুনে যদি ফেটে যায় ফেটে যাক ছাতি।
অয়ি সরস্বতি দেবি! ছেলেবেলা থেকে তব অনুরক্ত ভক্ত আমি চিরকাল,
ভুলিব না কমলার কামরূপ দেখে, ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল।

এবং সত্য সত্যই কমলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন:

"যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগীজন তপোবন-স্থলে!"

সাহিত্য যাঁহাদের উপজীবিকা ছিল না, যাঁহারা সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা হয় ত' সাহিত্যের এই মহাপকারক নেশায় অভিভূত না হইলে, তাঁহাদের প্রতিভা বলে উচ্চতর পদ ও সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীচরণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রভৃতির নাম মনে পড়ে। ইঁহারা কি ইঁহাদের প্রতিভার উপযুক্ত পুরস্কার সরকারের নিকট পাইয়াছিলেন? সাহিত্যের নেশাই যে তাঁহাদের কর্ম্মজীবনে উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল এরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। রমেশ দত্ত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ইংরাজ-প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে ইংরাজী সাহিত্যের জ্ঞানেই পরাজিত করিয়াছিলেন। অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনারের পদ হইতে তিনি অকালে অবসর গ্রহণ করিলেন কেবল সাহিত্যের নেশায়। চাকুরীতে থাকিলে তিনি স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের পূর্ব্বেই প্রথম বাঙ্গালী স্থায়ী কমিশনার বোর্ডের মেম্বর, শাসনপরিষদের সদস্য এবং সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের কৌন্সিলের সদস্যপদ লাভ করিতে পারিতেন। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অর্থোপার্জ্জন বা বৈষয়িক উন্নতিসাধন সাহিত্যিক নেশাগ্রস্তগণের লক্ষ্যও নহে, লভ্যও নহে। পক্ষান্তরে, অনেকস্থলেই সাহিত্যের নেশা তাঁহাদিগকে ঘোর দুরবস্থায় পাতিত করে এবং পরিবারবর্গের দুঃখ ও অশান্তির কারণ হয়।

এইবার দেখা যাউক ঐশ্বর্য্যলাভ না ঘটলেও সামাজিক প্রতিপত্তি বা পারিবারিক শ্রদ্ধালাভের জন্য লোকে সাহিত্যের নেশায় মাতিয়া উঠে কিনা।

সমাজে সাহিত্যিকগণের স্থান কোথায়? কুটীরবাসী সাহিত্যিক, যিনি আজীবন দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করিয়া সাহিত্য-সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার ধনী প্রতিবেশীর গৃহে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইলেন। নিমন্ত্রণকর্ত্তা হয়ত পাটের দালালী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, অথচ সাহিত্যের কোন ধার ধারেন না। বন্ধুকে তিনি মৃদু হাসিয়া "সাহিত্যিক" বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন। সে মৃদু হাসির অর্থ কি?—এ লোকটি একটি উন্মাদ। ইঁহার স্ত্রী পুত্রাদি অভাবের তাড়নায় অস্থির, ইঁহার অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা সত্ত্বেও ইনি সাহিত্যের নেশায় সমস্ত ভুলিয়া আছেন। উজ্জ্বল তাড়িতালোকিত প্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষে দীন সাহিত্যিক যেন কাঙ্গালের মত। সম্মান হয় ত' দেয় লোকে, কিন্তু তাহা উপহাসের মত শুনায়। সেখানে তাঁহাকে ঠিক খাপ খায় না। তাঁহার কুটীরের ক্ষুদ্র কক্ষে মৃৎপ্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে তাঁহাকে বেশী মানায়। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সমাজেও অনেক সময়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে অভ্যস্ত সাহিত্যিক গ্রন্থরচনার দ্বারা যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, কথোপকথনে তাহা ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকেন। তিনি যেন বর্ত্তমান সময়ের সামাজিক জীব নহেন, দেশ-বিদেশের পরলোকনিবাসী সাহিত্যিকগণই যেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সঙ্গী।

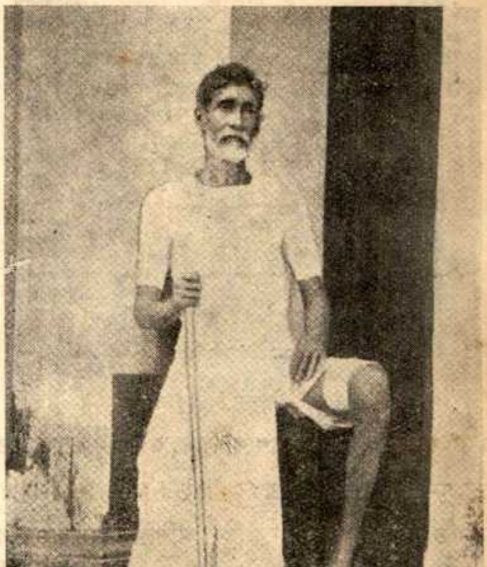

গোবিন্দ দাস

নিজগৃহেই বা সাহিত্যিকের স্থান কোথায়? তিনি যেন এক স্বতন্ত্র জীব। পারিবারিক মিলনক্ষেত্রেও তিনি যেন খাপছাড়া। সকলে যেখানে তরল হাস্যালাপে মগ্ন, সেখানে তিনি উপস্থিত হইলেই যেন পরিবারস্থ সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, হাস্যালাপ বন্ধ হইয়া যায়। এমন কি, শিশুরাও তাঁহার সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিতে উপদিষ্ট হয়। শিশুগণকে

তাহাদের মাতা তাঁহার পাঠকক্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন, যদিও অবোধ শিশু বুঝে না এবং প্রশ্ন করে,

বাবার ঘরে আমি খেলতে গেলে, তুমি আমায় বল দুষ্টু ছেলে!
বকো আমায় গোল করলে পরে—"দেখ্‌ছিস্ নে লিখ্‌চে বাবা ঘরে।
বল্‌ত সত্যি বল্, লিখে কি হয় ফল!"

যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ

সত্যসত্যই 'লিখে কি হয় ফল?' সুসাহিত্যিকের সহধর্ম্মিণী হয় ত' বাহিরে স্বামীর প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য গর্ব্বে স্ফীতা হন, কিন্তু যখন তাঁহার স্মরণ পথে সমুদিত হয় যে, কত অর্দ্ধশিক্ষিত এমন কি অশিক্ষিত ব্যক্তিও বৈষয়িক উন্নতি লাভ করিয়া পরিবারবর্গকে সুখে-স্বাচ্ছন্দে রাখিয়াছে অথচ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইয়াও কি এক নেশায় আসক্ত হইয়া তাঁহার স্বামী পরিবারবর্গের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং অর্থোপার্জ্জনে অমনোযোগী; তখন তাঁহার মনে কি গর্ব্বের পরিবর্ত্তে দুঃখ, অশান্তি ও অসন্তোষের উদয় হয় না? আত্মীয় স্বজনগণ সাহিত্যিকদের সহিত পত্রালাপ পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে করেন না। গ্রন্থ প্রকাশকগণের বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হইয়া আমাকেও কেহ কেহ সাহিত্যিক বলিয়া মনে করিয়াছেন। ফলে, তাঁহারা পত্রব্যবহার একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে ইংরাজীতে দুই ছত্র লিখেন। এইরূপ একজন আত্মীয়ের কন্যাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "বাবা বলেন, তিনি সাহিত্যিক, তাঁহাকে বাংলায় লিখতে ভয় করে।" আমি যেন [illegible] বিদ্যালয়ের পরীক্ষকের ন্যায় ভয়াবহ জীব।

সাহিত্যের নেশায় বিভোর হইয়া অর্থ, সামাজিক প্রতিপত্তি, গার্হস্থ্য সুখ ও শান্তি প্রভৃতি কাম্য বিষয় বিসর্জ্জন দেন সাহিত্যিকরা—কি যশের জন্য? কিন্তু এ যশ ত অনিশ্চিত। উহার জন্য অন্ধ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, নৈরাশ্যের বেদনা সহ্য করিতে হয় না। সাহিত্য-যশ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃত কার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশকালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী; তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখনও ভস্মাচ্ছন্ন, কখনও প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।"

সকলে ত' যশোলাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদের যশোলাভ ঘটিল না তাঁহারাও কি এ যশের মোহ বা সাহিত্যের নেশা ত্যাগ করিতে পারেন? গ্রন্থের অনাদর হইয়াছে তবুও কি পরবর্ত্তী গ্রন্থ লিখিতে কেহ বিরক্ত হইয়াছেন? অনেকে এমন বিষয় লইয়া জীবনাতিপাত করিয়াছেন যে, সে বিষয়ের পাঠক সংখ্যা নগণ্য এবং জনাদর লাভ বা বিস্তৃতখ্যাতিলাভ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্যই নহে। অথচ, এই নেশার জন্য তাঁহারা প্রভূত অর্থ ও সময়, অমূল্য স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি নষ্ট করিতে কাতর নহেন। কেহ কেহ মনে করেন সামসাময়িক পাঠকসমাজে তাঁহার গ্রন্থের সমাদর না ঘটিলেও ভবিষ্যতে পাঠকগণ তাঁহার সাহিত্যিক অবদানের মূল্য বুঝিবে। রজনীকান্ত গুপ্ত মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের ৫ম খণ্ড সম্পূর্ণ করেন। মৃত্যুর পর সুযশঃ কীর্ত্তন শুনিয়া কি পরলোক প্রস্থিত আত্মা আনন্দলাভ করিয়াছে! অনিশ্চিত যশের জন্য সাহিত্যিকগণকে অল্প মূল্য দিতে হয় না। অক্ষয়কুমার দত্তের

কথা স্মরণ করুন। যখন তিনি মস্তিষ্কের পীড়ায় শোচনীয়ভাবে আক্রান্ত এবং চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ মানসিক বিশ্রাম লইতে উপদিষ্ট, তখনও তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব গবেষণা-প্রসূত গ্রন্থ উপাসক সম্প্রদায়ের উত্তরাংশ লিখিতে বিরত হন নাই। কি ভাবে উহা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি গ্রন্থভূমিকায় স্বয়ং এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"শরীরের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় এতদূর চলিল, তাহা কি বলিব? না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থশ্রবণ কোনরূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্যেই আমি সমর্থ নই। ইহার কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত মাত্রেই মানসিক কষ্ট হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় এ ভাগের কি রচনা, তাহার প্রতি একটিবারও নেত্র-পাত করিতে পারি নাই। অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ়-ভাব-সমন্বিত চিন্তা-প্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ক্ষয় করিতেছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া, অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশ্যে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে চিন্তা-স্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদায় এবং যাহা কিছু অন্যরূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ মস্তকমধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারিকে বা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে, যানবাহন দ্বারা দূরস্থিত বন্ধু-বিশেষের সমীপে গমনপূর্ব্বক লিখিতে অনুরোধ করি। যাহার যত্বর্ণত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, অপার্য্যমানে কখন কখন এরূপ অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। অর্দ্ধরাত্রেও নিদ্রাকাতর কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া কতবার কত বিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া সে রজনীতে নিদ্রার সম্ভাবনা থাকিত না। মনোমধ্যে এরূপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, এবং যে পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভব হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা-নিবারণ উদ্দেশ্যেই লিপিবদ্ধ করাইতে হইয়াছে এবং ইহাতেই অতীব অল্পে অল্পে পুস্তকখানি একরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। কোন বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ উদ্দেশ্যে কোন গ্রন্থার্থ অবগত হইবার প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতে হয়। তাহাই কি যে সে দিনে ও যে সে সময়ে শুনিতে পারি? না সমুচিত মনঃসংযোগ করিতেই সমর্থ হই? শরীরের অবস্থানুসারে দিন-বিশেষে ও সময় বিশেষে ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে হইয়াছে। এইরূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পংক্তি, কখন দুই চারি পংক্তি, কখন দুই চারিটি বা দুই একটি শব্দমাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়। সেই সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সমুদায় বাক্য যে প্রথমে যথাস্থানে পর পর লিখিত হয়, পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না। কোন্ বাক্যটি কোন্ স্থানে, বা কোন বাক্যের পর বিনিবেশিত হইবে, উক্তরূপে লিপিবদ্ধ করাইবার সময় তাহা কিছুই স্থির থাকে না। যে সমুদায় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা হয়, সেই দিনই বিভ্রাট। পূর্ব্বোক্তরূপে, শরীরের অবস্থানুসারে দিন বিশেষে ও সময়-বিশেষ সেবন ও অন্য অন্য নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া বহু কষ্টে সেটি কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বাস্তবিক অক্ষয়কুমার মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার রুগ্ন দেহ ও মনে অক্ষয়কুমার দত্তের এই অপূর্ব্ব সাহিত্য সাধনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন,—

চণ্ডীচরণ সেন

"আপনারা অধ্যবসায়ে পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘন, স্পর্শজ্ঞানে অন্ধের বর্ণপরীক্ষা, মানসবলে অশক্তজানু মানবের অশ্বারোহণে নিপুণতা প্রভৃতি অনেক অলৌকিক সাধনার কথা শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু এরূপ পীড়িতমস্তিষ্ক মানবের এরূপ মস্তিষ্ক ব্যায়াম আর কখন শুনিয়াছেন কি ?"

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ "সোমপ্রকাশ" সম্পাদনের জন্য কিরূপ পরিশ্রম করিতেন, তাঁহার ভাগিনেয় আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাহা লিখিয়া গিয়াছেন :

"রাত্রি এগারটার সময় শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে দেখিয়াছি তিনি কার্য্যে মগ্ন আছেন, রাত্রি চারিটার সময়ে উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্য্যে মগ্ন আছেন। আমার বয়সের মধ্যে প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সকলপ্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে বিরত হইবার জন্য চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও এ নেশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ফলে অকালে সাহিত্য সেবা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বন্ধুবর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুপণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেকে রক্তের অত্যাধিক চাপে ভুগিয়াও চিকিৎসকের আদেশ অমান্য করিয়া সাহিত্য-সেবায় কিছুদিন কাটাইয়া অকাল-মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনেকেই মনে মনে যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। ইহা যেমন হৃদয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে তেমনই তাঁহাদের মানসিক অশান্তি, অবসাদ ও যন্ত্রণারও কারণ হয়। যিনি প্রথম গ্রন্থ রচনা করিলেন তাঁহার সর্ব্বদাই ভয় কি ভাবে পাঠক ও সমালোচকগণ উহার অভ্যর্থনা করিবে। যদি বহুদিনের পরিশ্রম-সঞ্জাত গ্রন্থখানির সাদর অভ্যর্থনা না ঘটে, যদি সমালোচকের নিন্দা ও বিদ্রূপবাণ লেখকের প্রতি বর্ষিত হয় তাহা হইলে তিনি দুঃখে ও নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়েন। যদি উহা সাদরে অভ্যর্থিত হয় তাহা হইলেও উদ্বেগের সীমা নাই,—নূতন যশোমুকুট তাঁহাকে অধিকার করিতে হইবে নতুবা তিনি সাহিত্য-জগতে মৃত বলিয়া গণ্য হইবেন। আর যদি পরবর্ত্তী গ্রন্থখানি তাঁহার পূর্ব্ব যশঃ ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয় ? সাহিত্য যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সাহিত্যিককে আজীবন সাহিত্য-সেবা করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি উৎকণ্ঠা ভোগ করেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ-বিরতির পর তাঁহার যশঃ আর অনিশ্চিত থাকে না। হলদীঘাট যুদ্ধে বীরত্ব রাণা প্রতাপসিংহকে অমরত্ব দান করিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিকের যশঃ অনিশ্চিত এবং উহা সর্ব্ববাদিসম্মত বা চিরন্তন নহে। তাঁহাকে কেবল যুদ্ধের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত নহে, আজীবন উৎকণ্ঠার মধ্যে কালাতিপাত করিতে হয়। যাঁহার যশোমুকুটময়ূখে আজ সাহিত্যাকাশ জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহারও ভয় ও সঙ্কোচ যে ইদানীন্তনকালে বা ভবিষ্যতে তাঁহার রচনা হয় ত সমাদৃত হইতেছে না বা হইবে না। উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহার কবিপ্রতিভা অনেকের মতে অতুলনীয়, আত্মশক্তিতে যাঁহার বিশ্বাস অটল ছিল, সেই মধুসূদনই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন :—

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল' তোর সাগরের তীরে ?
ফেন চূড় জল-রাশি আসি ফিরে ফিরে,
মুছিবে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?

এবং যে জাতীয় মহাকবির উদ্দীপনাময়ী বাণী তাঁহার সুপ্ত

দেশবাসীর প্রাণে নবজীবনের চেতনা আনিয়াছিল সেই হেমচন্দ্রও জীবন-সায়াহ্নে আক্ষেপ করিয়াছেন :

"কমলা ঠেলিলা পায়,
রোষ কৈল সারদায়,
শুষ্ক আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল।"

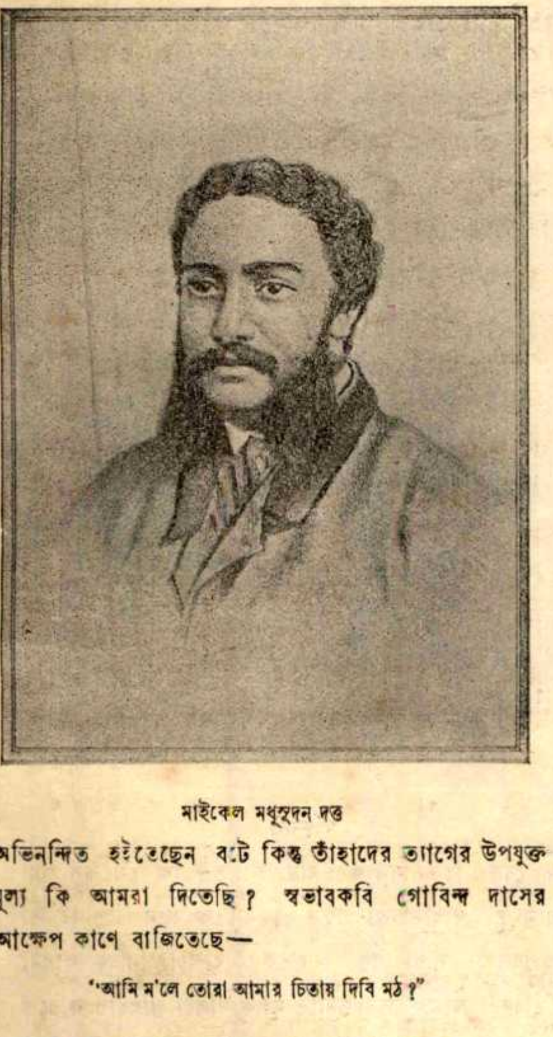

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আজকাল দুই চারিজন সাহিত্যসেবক প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দিত হইতেছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের ত্যাগের উপযুক্ত মূল্য কি আমরা দিতেছি? স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের আক্ষেপ কাণে বাজিতেছে—

"আমি ম'লে তোরা আমার চিতায় দিবি মঠ?"

যাঁহার সঙ্গীতে একদিন বঙ্গবাসী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে সেই সুকণ্ঠ কবি রজনীকান্ত সেন হাসপাতালে অন্তিম শয্যায় লিখিয়াছেন,

"ভাবিতাম' আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"—

কিন্তু তাহার কি পুরস্কার পাইয়াছিলেন? তবু অভিমান দেশবাসীর উপর নহে, ভগবানের উপর,—

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ—গর্ব্ব করিতে থুব,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য সকলি করেছ চুর।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এককালে যে যশঃ অর্জ্জন করা যায়, কালে তাহা বিলীন হইবার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা আছে। আবার এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে, যেখানে জীবিতকালে যশোলাভ ঘটে নাই, মৃত্যুর পর তাহা ঘটিয়াছে। সাহিত্যের নেশায় বিভোর অনেক লেখক জীবিতকালে সমাদর লাভ করিলেও তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস এরূপ প্রবল যে, তাঁহারা আশা করেন ভবিষ্যতে তাঁহাদের রাজা সমাদৃত হইবে। সাহিত্যক্ষেত্রে যশোলাভকে সাহিত্যিকগণ এত কি স্থান দিয়াছেন যে, কমলার অনেক বরপুত্র অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যলব্ধ সম্মান ও গৌরব সত্ত্বেও সাহিত্যিক সম্মান লাভের জন্য উৎসুক হন। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাব চন্দ্র বাহাদুর সহস্রাধিক ভক্তি ও প্রীতিরসাশ্রিত সঙ্গীত রচনাদ্বারা এবং মহাভারত রামায়ণাদি পুরাণগ্রন্থ সম্পাদন দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে সুযশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুরও বহু কবিতাগ্রন্থ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিছেন। বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে তিনি যে রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন, অনেকের হয়ত এখনও তাহা স্মরণ পথে দেদীপ্যমান আছে। কমলার অন্যান্য বরপুত্রগণ তাঁহার এ প্রস্তাব কার্য্যতঃ সমর্থন করিলে অনেকেই নিশ্চিন্ত হইয়া সাহিত্যিক নেশায় আসক্ত হইতে পারেন। রাজা স্যর রাধাকান্তদেব, রাজাকালীকৃষ্ণ দেব, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি বহু ধনী সাহিত্যযশঃ অর্জ্জনের জন্য অকাতরে অর্থ, সময়, শক্তি ও স্বাস্থ্য সানন্দে ব্যয় করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে আমি কোন পত্রে "বাণীর মন্দিরে কমলার বরসন্তান" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি।

কিন্তু প্রচ্ছন্ন যশোলিপ্সা কোনও সাহিত্যিক প্রকাশ করেন না। তাঁহারা বলিবেন, "এসেছি কি হেথা যশের কাঙ্গালী, কথা গেঁথে শুধু নিতে করতালি?" তাঁহারা

বলিবেন তাঁহাদের মহৎ ব্রত আছে, সুকঠিন কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা বড়াল কবির সহিত সমস্বরে বলেন—

''আমরা স্বপনে মাতি, জগতে সরগে গাঁথি, গায়ি নিত্য নব গান
কখন সাগর তীরে কখন ভূধর শীরে —কোথাও নাহিক স্থান!
আমরা জানি না ছল' মানিনা পাশব বল, নাহি চাহি ধনজন;
লয়ে সুখহীন সুখ, লয়ে দুখহীন দুখ সহি কত অনশন?
আমরা চাহি না কিছু, কাল পড়ে' রয় পিছু ধরণী লুটায় পায়;
আমাদের অনুরাগে জগতে মানব জাগে—চিরদেব-মহিমায়!
আমরা জীবন গড়ি, মরণে মধুর করি, নিরাশায় দেই আশা;
শিশুরে হৃদয়ে টানি, রমণীরে দেবী মানি, যুবজনে ভালবাসা।
পীড়িতের লাগি 'যুঝি, পতিতের ব্যথা বুঝি সচেতন রাখি দেশ;
আমরা দেশের প্রাণ, প্রীতি, স্মৃতি, ধ্যান, জ্ঞান; আমরা আদি ও শেষ।

সাহিত্যিকরা তাঁহাদের প্রতিভা-প্রেরিত বাণী শুনাইবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু এই বাণী প্রকাশ করিতেও তাঁহাদিগকে অল্প যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। প্রসূতি সন্তান প্রসবের সময় অবর্ণনীয় দৈহিক কষ্ট সহ্য করেন কিন্তু নবজাত সন্তান সুখ সন্দর্শনের আশায় তাঁহার মন তাদৃশ বিষাদাক্রান্ত হয় না। কিন্তু কবি তাঁহার প্রতিভা প্রেরিত বাণী যতক্ষণ না মনোমতভাবে প্রকাশ করিতে পারেন ততক্ষণ তাঁহার মানসিক উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও পরিশ্রমের অন্ত নাই। সুনিদ্রা তাঁহাকে ত্যাগ করে, মনের সকল আনন্দ যেন তিরোহিত হইয়া যায়। কখন প্রেরণা আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। কবি হেমচন্দ্র কবি পত্নীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ;—

''বড় জ্বালাতন কর জেগে সারা রাতি,
কালি ফেলে, কাগজ ছিড়ে, পুড়িয়ে মোমের বাতি।"

তাঁহার প্রসিদ্ধ ভারত-সঙ্গীত রচনার ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিই :—

"ভারত-সঙ্গীত রচনার পূর্ব্বে কয়েকদিন ধরিয়া হেমচন্দ্রের বন্ধুগণ লক্ষ্য করিলেন, হেমচন্দ্র অতিশয় বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক। বিষাদের কারণ কি, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। বাহিরে প্রকৃতি দেবীর অবস্থাও হেমচন্দ্রের হৃদয়ের অনুরূপ। কয়দিন ধরিয়া আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন, বায়ু বহিতেছে না, চারিদিক যেন স্তব্ধ। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বায়ু বহিতে লাগিল, আকাশ হইতে বারিধারা পতিত হইয়া ধরাতল সুস্নিগ্ধ করিল। হেমচন্দ্রের বিষাদের ভাবও অকস্মাৎ বিদূরিত হইল, তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল। তিনি কাগজ পেন্সিল লইয়া এক বৈঠকে সমগ্র ভারত সঙ্গীতটি লিখিয়া ফেলিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত রচনা সম্বন্ধেও অনুরূপ গল্প প্রচলিত আছে। সাহিত্যের নেশার ফলে মস্তিষ্কের অত্যধিক পরিশ্রম এবং তাহার পর যে অবসাদ থাকে তাহা অবর্ণনীয়! এখন বুঝুন, এ নেশা কেন করেন? অর্থ, মান, শান্তি, যশঃ, স্বাস্থ্য সকলই যাহাতে ক্ষুন্ন হয়, তাহা করেন কেন? কেহ কেহ বলিবেন, লোকহিতের জন্য, কিম্বা আনন্দ বিতরনের জন্য এই আত্মত্যাগ। এ কথা বলিয়া অবশ্য সাহিত্যিকরা গর্ব্ব করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের দ্বারা যেরূপ হিতসাধন করা যায়, অহিতও কি সেইরূপ করা যায় না? স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত রাজনীতিক অনেক রচনাই ত' রাজপুরুষগণ সাধারণের অহিতকর বলিয়া নিষিদ্ধ করেন, নীতিবিদ্‌রা অনেক রচনা দুর্নীতি মূলক বলিয়া পরিহার করিতে উপদেশ দেন, সমাজপতিরা অনেক রচনা সমাজধ্বংসী বলিয়া আপত্তি করেন। যাহারা নেশা করেন তাঁহারা ত' বলিবেনই ইহা আনন্দবর্দ্ধক এবং আদৌ অপকারী নহে। তাঁহারা বলিবেন যাহা কিছু মহৎ, সাহিত্যই তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে। কিন্তু প্রতাপসিংহ বা রাজসিংহ, আকবর

স্বর্ণকুমারী

বা নেপোলিয়ন বা শিবাজী ইঁহারা সাহিত্যরসিক ছিলেন না এবং সাহিত্য হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা কে বলিবে ?

মাদক নিবারণী সভার ন্যায় সাহিত্যের নেশা রহিত করিবার জন্য আন্দোলন করা উচিত নহে কি ? ইহার মত অপকারী নেশা ত দেখিতে পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্ট অনেকটা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে নীরব। তিনি অহিফেন সেবন রহিত করিতে তৎপর কিন্তু আমার বোধ হয় অহিফেনের নেশা নিক্রিয় অহিংসা সাধনায় সহায়তা করিতে পারে। এ বিষয়ে কমলাকান্তের বংশধরগণের আন্দোলন করা উচিত।

কিন্তু যাঁহারা এ নেশায় আসক্ত তাঁহারা উহা পরিহার করিতে পারিবেন না এবং আমার যুক্তি অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন, বুঝিতে পারিতেছি। তাঁহারা নেশায় মশগুল হইয়া কবি বিহারীলালের ন্যায় সেই সারদার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির ধ্যান করিবেন ও বলিবেন, "তুমিই মনের তৃপ্তি, তুমি নয়নের দীপ্তি, তোমা হারা হলে আমি প্রাণ হারা হই।" কিন্তু সে তৃপ্তি আস্বাদনের পূর্ব্বে কত অতৃপ্তিই না ভোগ করিতে হয়, সারদা-বিরহের যন্ত্রণা সারদা-মঙ্গলের কবি জ্বালাময়ী ভাষায় তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সে অপূর্ব্ব দীপ্তি সেই "অন্ধকারের উৎস হতে উৎসরিত আলো,' কত সাধনায় নয়নে প্রতিভাত হয়, অসাড় হৃদয়ে সে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় কত বিরল প্রাপ্ত অবসরে ! দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলিতে গেলে যাঁহারা যথার্থ সাহিত্যের নেশায় বিভোর তাঁহারা অর্থ চাহেন না, চাহেন তাঁহাদের সেই চির-আরাধ্যা দেবীর প্রসন্ন দৃষ্টি :—

"জননি বঙ্গ ভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল-কমল চরণে স্থান !
নয়নে বহেছে নয়নের ধারা, জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর জ্বালায় পিইয়া তোমার বচন-সুধা ;
মরুভূমে সম যখন তৃষ্ণায়, আমাদের মা গো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মা গো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।"

বাণীর বরপুত্রী স্বর্ণকুমারীও তাই বলিয়াছেন—

ওগো কমল-আসনা, রঙ্গিনী বীণাপাণি !
আমি কাহারেও আর জানিনা ভারতি
তোমারেই শুধু জানি।
ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা
জানিনা প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা।—
তোমারই গর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
আমি জানিনা ত তাহা ভাল কি মন্দ,
বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ,
শুধু প্রীতিপূরিত পরমানন্দ
তোমার চরণে দানি।
আমি না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি
চাহি না মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারি অমৃত-বাণী।

অর্থ, সামাজিক প্রতিপত্তি, পারিবারিক সুখ-শান্তি, যশঃ সমস্ত উপেক্ষা করত যিনি সাহিত্যের নেশায় উন্মত্ত হইয়া দারিদ্র্য, দীনতা, পারিবারিক দুঃখ ও অশান্তি এবং নিন্দা বরণ করিয়া এক দুর্ল্লভ মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান তাঁহার নেশার প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম কি ? এ নেশায় কি সুখ জানি না, তথাপি সাহিত্যরসিকগণের নিকট সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মানসী প্রতিমার প্রভাব অপূর্ব্ব। তাই হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

এ হেন প্রভাব যার, প্রসাদ লভিতে তার, কি দুঃখ এ জগতের
ভুলিতে না পারি !
প্রতিদিন কল্পনারে, পাই যদি পূজিবারে, নিরানন্দ মাতৃভূমি
চিরানন্দ করি।

হেমচন্দ্রের অনুজ সুকবি ঈশানচন্দ্রও বাণীর উদ্দেশে বলিয়াছেন—

"জীবনের সব সাধ করি বিসর্জ্জন
তোমার চরণ মাত্র করেছি সম্বল !
ঐশ্বর্য্যের শিরোদেশে পদাঘাত করি
ভিক্ষুকের বেশে আজ সাধক তোমার।
এইরূপে এই ভাবে এমনি আনন্দে
চিরদিন পারি যেন পূজিতে, জননি
তোমার চরণ যুগ, ভোগের লালসা
প্রীতিপূর্ণ চক্ষে মম নাহি জাগে যেন।
নির্লিপ্ত হইয়া যেন হেন নিরুদ্বেগে
তব সাধনায় মম থাকে চির মতি।"

আর সারদার ভক্ত-কবি বিহারীলাল প্রার্থনা করিয়াছেন—

"যেন মা ও পদ পরশি পরশি
হরষে আমার জীবন বয় !
মা তোমার রাঙা চরণ দুখানি
ধরিলে থাকে না মরণ-ভয় !
কলিকালে সব দেবতা নিদ্রিত,
কেবল জাগ্রত তুমি,
আলো করে আজ লাবণ্য কিরণে
পবিত্র স্বরগ-ভূমি !"

পুনশ্চ,—

অয়ি অয়ি সরস্বতী !
তব পাদপদ্মে মতি
নির্ম্মলা অচলা হয়ে থাকে যেন চিরদিন !
সেই বিজয়ার দিনে
বাজায়ে প্রাণের বীণে,
ভরি ভরি দুনয়ন
তার এই শুভানন
দেখিতে দেখিতে হই কালের সাগরে লীন !

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

দশ

অপরাহ্ণ চারটায় বেণ্ডেল লোকেল প্যাসেঞ্জার ট্রেন্ হাওড়া ষ্টেশন-রোডের আঁধার থেকে বেরিয়ে যখন বাইরের অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর আলোকে এলো, তখন তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উপবিষ্ট খদ্দর-পরা এবং ধোঁয়া রঙের চশমাধারী একজন যাত্রী তার হাতের ভাঁজ করা দৈনিক সংবাদপত্রখানা খুলে পড়তে আরম্ভ ক'রল। কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটি সংবাদের উপর তার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হ'ল। সংবাদটি ছিল এই—

রহস্য-জনক ডাকাতি

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

বৰ্দ্ধমান ৩-১২-২০

"বিগত মঙ্গলবার রাত্রিতে হরিরামপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুত মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে এক অদ্ভুত রকমের ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। গভীর রাত্রে কালরং এর মুখোস্-পরা ৮।১০ জন ডাকাত জলন্ত মশাল, লাঠি-সড়কি, রাম-দা প্রভৃতি হাতে সদর দরজার পার্শ্বস্থিত প্রাচীর টপকাইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। দারোয়ানেরা বাধা দিতে চেষ্টা করিলে ডাকাতেরা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া বাঁধিয়া ফেলে ও চিৎকার করিলে কাটিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। তারপর দুই জন ডাকাতকে তাহাদের পাহারায় রাখিয়া বাকী ডাকাতেরা সর্দ্দারের ইঙ্গিত ক্রমে প্রথমতঃ কাচারি ঘর ও তারপর দ্বিতলের উপরিস্থিত মতিবাবুর প্রাইভেট আপিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া যাবতীয় কাগজ-পত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করে। অবশেষে সর্দ্দারের হুইসেল্ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলে মশাল নিভাইয়া সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া যায়। ডাকাতরা চলিয়া গেলে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হয় যে দুইজন দারোয়ানের জিভ্ টানিয়া মশালদ্বারা পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের চেঁচামেচি বন্ধ করিবার জন্য ডাকাতেরা তাহাদের মুখ বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে। কোনও মূল্যবান দলিল বা তদ্রূপ কিছু সংগ্রহ করাই এই ডাকাতির মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। ডাকাতদের এখনও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

উক্ত সংবাদের শেষাংশ পড়বার সময় যাত্রীর মুখমণ্ডলে একটু বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো এবং অন্য কেউ তা লক্ষ্য করবার পূর্ব্বেই সেই ভাবটা আবার বিলীন হ'য়ে গেল। এক ইঞ্চি মোটা একখানা লাঠি ও ঐ খবরের কাগজখানা ছাড়া ঐ যাত্রীর সঙ্গে আর কিছু ছিল না।

ঠিক সন্ধ্যার সময় ট্রেন চন্দননগর ষ্টেশনে পৌঁছিল। যাত্রী এখানে নেমে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে স্থানীয় "নারী রক্ষাশ্রমে" যাবার জন্য ড্রাইভারকে আদেশ ক'রলো।

আশ্রমবাড়ীর গেটের সম্মুখে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াবামাত্র দারোয়ান তাড়াতাড়ি উঠে আরোহীর উদ্দেশ্যে সসম্ভ্রমে একটি সেলাম ঠুক্‌লো এবং আরোহী জরুরি কাজে আশ্রমের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন জেনে তখনি তাঁকে আপিস ঘরে নিয়ে বসতে দিলো। দারোয়ান মারফতে ভাড়া পাঠিয়ে ট্যাক্সি বিদায় ক'রে দেওয়া হ'ল।

আসন গ্রহণ ক'রে আগন্তুক দেখলো, কক্ষটির আয়তন সাধারণ আপিস ঘরেরই মতো এবং আসবাবপত্রও তদনুরূপ। টেলিফোন, টাইপ-রাইটার, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, ক্লক্ ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় কোনো আসবাবেরই অভাব নেই। ভারতবর্ষের একখানা বড় ওয়াল-ম্যাপ ঘড়ির নীচে টাঙ্গানো। ঘরে তিনটি দরজা ও পাঁচটা জানালা। আগন্তুক এই সব একে একে লক্ষ্য কচ্ছিল, এমন সময় পাশের ঘর থেকে বাসন্তীরং এর থান ধুতি ও জামা পরা মুণ্ডিত মস্তক এক প্রৌঢ় সেই ঘরে প্রবেশ ক'রলেন। তাঁকে দেখে আগন্তুক দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার জানালে, তিনি প্রতিনমস্কারান্তে আগন্তুককে বসতে ব'ললেন এবং নিজেও আসন গ্রহণ ক'রলেন।

কোন ভণিতা না ক'রে আগন্তুক বললো,

"আমি এসেছি একটি মেয়ের সন্ধানে। মেয়েটি বয়স্কা ও কুমারী এবং বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। এক জায়গায় তার বিয়ের কথাবার্ত্তা সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল কিন্তু মেয়ের তাতে মত ছিল না। একদিন সে কাউকে কিছু না ব'লে বাড়ী ছেড়ে কোথায় যে চ'লে গেছে আজ পর্য্যন্ত অনেক খোঁজাখুজিতেও জানতে পারা যায় নি। বাপ-মা এখন একরকম হতাশ হ'য়ে প'ড়েচেন এবং সন্দেহ কচ্ছেন, হয় তো সে কোথাও নাম ভাড়িয়ে আত্ম-গোপন ক'রে আছে, কেন না সমাজের ভয়ে ঘরে ফিরে যাবার পথ তার বন্ধ। আপনাদের আশ্রমে অনেক হারানো, কুড়োনো, নানা শ্রেণীর মেয়ে থাকবার সম্ভাবনা জেনে, একবার এখানে ঐ মেয়েটির খোঁজ ক'রবার জন্যে তার বাপ-মা আমায় পাঠিয়েছেন। পাওয়া গেলে, এই আশ্রমের সাহায্যকল্পে কিছু দানকরার প্রতিশ্রুতি আছে।"

মুণ্ডিত-মস্তক সেক্রেটারি হঠাৎ কিছু না ব'লে আগন্তুকের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞেস ক'রলেন, "মেয়েটার নাম বল্‌তে পারেন?"

"হাঁ, শান্তি চৌধুরী।"

"এই নামে ত' কেউ এখানে নেই, আপনি ঝুটা খপর পেয়েচেন!"

"আপনি ভুল বুঝবেন না, আমি কোন খবর পেয়ে আসি নি যে ঐ মেয়েটি এখানেই আছে। আমি শুধু জান্‌তে চাই, অন্য নাম ও পরিচয় দিয়ে সে এখানে লুকিয়ে আছে কি না।"

"আমরা নিজেরা তা জানে না, কেমন ক'রে বলবো আপনাকে?"

"আপনাদের কিছু ব'লতে হবে না। আমি একটিবার যদি আশ্রমের মেয়েদের দেখতে পাই, তবেই বুঝতে পারবো সে এদের ভেতর আছে কি না। দেখবার সুযোগটা আমায় দিন, এইটুকুই আমার নিবেদন।"

"আপনি একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে ব'লবেন, ওই আপনার ছান্তি চৌধ্‌রি আছে, আর আম্‌রা মেয়েটাকে অম্‌নি আপনার হাতে ছেড়ে দেবো, এতো বোকা লোক পেয়েচেন আমাদের? আপনার প্রমাণ থাকে তো পুলিশ নিয়ে আসুন না।"

"পুলিশ আনবার কথা কেন ব'লচেন? আমি জুচ্চোরি বা গোয়েন্দাগিরি ক'রতে আসি নি এখানে।"

"না, বড্ড ভালো মানুষগিরি কত্তে এয়েচেন।" ব্যঙ্গভাবে কথাটি ব'লে পাশের কামরা থেকে প্যারীলাল হঠাৎ এই ঘরে প্রবেশ ক'রলো ও সেক্রেটারিকে সম্বোধন ক'রে বললো—

"পণ্ডিতজী, একে আপনি চেনেন না। জানলার ফাঁক দিয়ে এর লম্বা দাড়ি-গোঁফ দেখে প্রথমতঃ আমারও ধাঁ-ধা লেগেছিল লোকটাকে চিন্‌তে না পেরে, কিন্তু পরে একটু বিশেষ লক্ষ্য ক'রে চিনে ফেলেচি, এ হচ্চে হরিরামপুরের জেল-ফেরতা দাগী চোর দুলাল। প্যারীলালের চোখে ধুলো দেওয়া বাবা খেলা নয়। ও সব চালাকি চলবে না। ব্যাটার বজ্জাতি দেখো, বাবু সেজে আবার চেয়ার ঠেসে ব'সেচেন। ওঠ্‌ ব্যাটা চোর ঐ চেয়ার ছেড়ে।"

ব'লেই প্যারীলাল আগন্তুকের মাথায় সজোরে এক ঘুঁসি বসিয়ে দিলো। ঘুঁসির আঘাতে মাথার পরচুলা এক দিকে কাৎ হ'য়ে প'ড়লো। পণ্ডিতজী তা লক্ষ্য ক'রে ব্যস্তভাবে প্যারীলালকে বললেন,

"বিলকুল ঝুটা আদ্‌মি হ্যায়, উস্কো দাড়িভি নক্‌লি হোনে সক্‌তা। নিকালো বদ্‌মাস্‌কো জুতি মারকে।"

প্যারীলাল বাস্তবিকই পায়ের জুতো খুলে মারবার জন্য উদ্যত হ'ল কিন্তু ইত্যবসরে আগন্তুক চট ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে চেয়ারখানা এক পাশে সরিয়ে মারলো এক লাথি প্যারীলালের হাঁটুতে। প্যারীলাল সেই আঘাত সামলাতে না পেরে সুমুখের দিকে উপুড় হ'য়ে পড়লো। পর মুহূর্ত্তে তুমুল কাণ্ড বেঁধে গেল। আগন্তুক তার আল্‌গা দাড়ি-গোঁফ ও পরচুলা ফেলে দিয়ে মুণ্ডিত-কেশ দুলালরূপে পণ্ডিতজীর সহিত লড়াইএ প্রবৃত্ত হ'ল। প্যারীলাল উপুড় হ'য়ে প'ড়ে যাওয়া মাত্র পণ্ডিতজী দুলালের লাঠিখানা নিয়ে তাকে আক্রমণ ক'রলেন কিন্তু দুলাল চোখের পলকে সেই লাঠি ছিনিয়ে নিল, তারপর আরম্ভ হ'ল দু'জনে তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি। পণ্ডিতজী শক্তিশালী হ'লেও কুস্তিগীর দুলালের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। দুলাল দু'তিনটি ঘুঁষি মেরেই তাঁকে দূরে ছুঁড়ে ফেল্‌লো। সেই আঘাতে একটা ছোট

টেবিল তার উপরিস্থিত কাচের গ্লাস ও অন্যান্য জিনিস-পত্র সমেত ঝন্ ঝন্ শব্দে প'ড়ে ভেঙে গেল এবং পণ্ডিতজীও সেখানে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন। ইত্যবসরে প্যারীলাল উঠে পিছনের দিক থেকে দুলালকে আক্রমণ ক'রল। দুলাল মুহূর্ত্তে ঘুরে শত্রুর সম্মুখীন হ'ল, তখন তার চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা ঠিক্‌রিয়ে পড়ছিল। সে আত্মসংযম ক'রতে না পেরে তখন ব'লে উঠলো, "আমি তোমারই সন্ধানে-বেরিয়েছিলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ যে সহজেই তোমায় পেয়েচি। তোমার মতো দুঃশাসনের বুকের রক্ত-পান ভিন্ন ভীমের প্রাণে শান্তি আসবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে দুলালের বজ্রমুষ্টি প্যারীলালের নাকের উপর ভীষণ ভাবে পড়লো। নাকে হাত দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে প্যারীলাল প'ড়ে গেল পিছনের দিকে এবং মুহূর্ত্তে তার নাক-মুখ রক্তে রঞ্জিত হ'য়ে উঠলো। দুলাল তাকে ঐ অবস্থায় দেখে আর দ্বিতীয়বার আঘাত করলো না, হাত সংযত ক'রল কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই পিছন থেকে চার পাঁচ জন লোক তাকে আক্রমণ ক'রল। আক্রমণকারীরা ছিল আশ্রমেরই দারোয়ান ও ভৃত্যের দল। অপরিসীম সাহসের সঙ্গে দুলাল লড়াই ক'রে তাদের প্রায় হটিয়ে দিয়েছিল, এম্‌নি সময় তাদের একজন দুলালের মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত ক'রল একটা লাঠি দিয়ে। দুলালের মাথা কেটে রক্ত বেরুলো এবং সে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হ'য়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লো।

জ্ঞান-সঞ্চার হ'লে দুলাল চোখ মেলে চেয়ে দেখলো সে এক অন্ধকার ঘরের মেজেয় প'ড়ে আছে, মাথা তখনও ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছে এবং হাত দিয়ে বুঝলো মাথার পিছন দিকের একটা স্থান ফুলে উঠেচে এবং তার পার্শ্বের কতক অংশে রক্তের মতো কিছু যেন জমাট বেঁধে র'য়েচে। কিয়ৎক্ষণ পরে তার বোধ হ'ল, ঘরের দেয়ালের একটা ফাঁক দিয়ে যেন বাইরের আলো দেখা যাচ্ছে। তখন সে আস্তে আস্তে উঠে সেই স্থানটা পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পারলো, ওখানে একটা জানালা আছে এবং তারই বন্ধ কবাটের ফাঁক দিয়ে বাইরের ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। কবাটজোড়া অল্প চেষ্টাতেই খুলে গেল। তখন ঘরে অধিকতর আলো প্রবেশ ক'রল। দুলাল দেখলো, জানালায় শক্ত গরাদ র'য়েচে এবং ঘরের একমাত্র দরজা বাইরের দিক থেকে বন্ধ, সুতরাং ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার কোনো সহজ পন্থা নেই। গরাদ ধ'রে যথেষ্ট টানাটানিতেও যখন কোনো ফল হ'ল না, দুলাল তখন নিরাশ হ'য়ে ব'সে পড়লো ও অন্য উপায়ের চিন্তা ক'রতে লাগলো! এই ভাবে কতক্ষণ কাটলো দুলালের খেয়াল ছিল না। হঠাৎ জানালার নিকট দু'বার আস্তে আস্তে খট্ খট্ শব্দ হ'ল। দুলাল চট ক'রে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দেখে বিস্মিত হ'ল, জানালার পাশে ঝোলা জামা-পরা পাগড়ি মাথায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ব্যক্তি তখন মৃদু স্বরে তাকে বললো, "গরাদের ভিতর দিয়ে একটা লোহার ডাণ্ডা ঘরের ভিতরে ফেলে দেওয়া হ'য়েচে, ঐটে দিয়ে গরাদ ভেঙে শীগ্‌গির পালিয়ে যান, নয় তো ভয়ানক বিপদ ঘটবে।" এই কথা কয়টি ব'লেই লোকটি দ্রুত চ'লে গেল। দুলাল তার মুখাকৃতি ভালো ক'রে দেখতে পায় নি, তবে তার মনে হ'ল, লোকটি সম্ভবতঃ অল্প-বয়স্ক।

বিপদের ভয়ে ভীত না হ'লেও দুলাল নিরর্থক জীবন বিপন্ন ক'রতে তখনও প্রস্তুত ছিল না, কারণ এখনও মন্দিরার উদ্ধার হয় নি। বিলম্ব না ক'রে সে তখনই লোহার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে তার সাহায্যে পাঁচ মিনিটের চেষ্টায় একটা গরাদ বাঁকিয়ে ফেললো। আর এক মিনিটে গরাদটা স্থানচ্যুত হ'ল, কিন্তু তখনও গরাদের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হ'ল না। আরো দুমিনিটের চেষ্টায় সে আর একটা গরাদ খুলে ফেললো। এতক্ষণে তার শ্রম সার্থক হ'ল, মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে সে তখনই জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। যে স্থানটায় দুলাল নামলো, সেটা একটা ক্ষুদ্র গলির মতো মনে হ'ল। নির্ব্বিঘ্নে বেরিয়ে আসতে পেরে তার মনে আবার আশা ও সাহস বেড়ে গেল কিন্তু যে ব্যক্তি লোহার ডাণ্ডা এনে দিয়ে তার উদ্ধারের সাহায্য ক'রল সে কে এবং কোথায় গেল? দুলালের উদ্ধারের জন্য ঐ ব্যক্তির আগ্রহেরই বা হেতু কি? দুলাল এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পেল না শুধু বুঝলো, এখানে অন্ততঃ এমন একজন লোক আছে যে তার মঙ্গল কামনা করে। তার দুঃখ হ'ল, ঐ উপকারী বন্ধুকে চিনে রাখার সুযোগ ঘটলো না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি অতো তাড়াতাড়ি চ'লে গেল কেন? সম্ভবতঃ সেখানে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে আশ্রমের

লোকেরা তাকে সন্দেহ করতে পারতো এবং তাহ’লে দুলালের উদ্ধারের চেষ্টা বিফল হ’য়ে যেতো। সে ব্যক্তি যে-ই হোক, দুলাল মনে মনে তাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালো। এখন সে কোন দিক্ দিয়ে গেলে নিরাপদ হ’তে পারবে তা ঠিক করতে না পেরে, দেয়ালের ছায়ার আড়াল ধ’রে গলির মোড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হ’ল। সেখানে পৌঁছেই সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো পার্শ্ববর্ত্তী এক ঘর থেকে মন্দিরার নাম উচ্চারিত হ’তে শুনে। সে শুনলো একব্যক্তি ব’লছে,

“মন্দিরা তো এখন এক রকম ভালো হ’য়ে গেছে, ওকে আর এখানে রাখা যাবে না, দূরে পাঠিয়ে দেবো।”

আর একজন ব’ললো,

“বেশ আমিই কলকাতায় নিয়ে যাবো তাকে।”

“তুমি নিয়ে যাবে কেন?”

“আমার দরকার আছে।”

“ওরকম দরকার আমারও থাকতে পারে।”

গলার স্বরে পণ্ডিতজী ও প্যারীলালকে চিনতে পেরে দুলাল মুহূর্ত্তে অবস্থাটা উপলব্ধি ক’রে নিলো। প্যারীলাল একটু উগ্রকণ্ঠে বললো—

“আপনার অত্যাচার অনেক স’য়ে এসেচি কিন্তু আর সইবো না। সব জায়গাতেই আপনি ভাগ বসাবেন, তা আর চ’লবে না।”

পণ্ডিতজী ব্যঙ্গ ভাবে ব’ললেন, “বটে, তোমার ভয়ে হামার এখোন পালাতে হবে দেখ্‌চি।”

“পালাতে হবে নিশ্চয়ই যদিও আমার ভয়ে নন। দুলাল এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই একটা বড় রকমের গোলমাল বাঁধাবে, সেটা ভুলে যাবেন না। ক’দিন আর তাকে আটকে রাখা চলবে?”

“হামি তোমারা মাফিক বেয়াকুব আদ্‌মি নই, উস্কো আটক করকে রাখবো। আওর পোওয়া ঘণ্টা বাদ……

কথায় বাধা দিয়ে প্যারীলাল বললো, “সে কি, এতো শীগ্‌গিরই তাকে ছেড়ে দেবেন? তবেই হ’য়েচে, রাত ভোর না হ’তেই দেখবেন সে পুলিশ নিয়ে এসেচে।”

“আসে তো আসবে, হামার কুছু ভয় নেই, ভয় পাচ্ছো তো তুমি।”

“আপনার এত সাহস হচ্চে কিসের জোরে? তলে তলে কোনো ফন্দি এঁটেচেন না কি?”

“ফন্দি টন্দি হামি কিছু জানে না, তবে এটা হ’তে পারে না কি যে দুলাল ছুট্যা পেয়ে যেতে যেতে এক্কেবারে রেল লাইনের ওপর প’ড়ে যাবে, আর তখুনি একটা ট্রেন এসে accident ক’রে ফেলবে।”

“চমৎকার ফন্দি! শত্রুর সম্পূর্ণ নিপাতই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মন্দিরার উপর আপনি লোভ ক’রবেন না।”

“মন্দিরা, মন্দিরা কোরে তুমি তো এম দম পাগলা ব’নে গেচো। শোনো হামি মন্দিরাকো চায় না। কলকাতায় একঠো মাড়োয়ারি gentleman পাঁচ হাজার রূপেয়া নিয়ে আসবে মঙ্গলবার সাঁঝকা বখত। ইস্‌কো আধা আড়াই হাজার রূপেয়া তোমারা Cash মিলে যাবে, লেকেন রাত বারো বাজে মন্দিরাকো উন্‌কো boatমে চড়া দেনে পড়ে গা। বাস্ আওর কুছ ক’রতে হবে না।”

“আড়াই হাজার! তা টাকার এখন খুব টানাটানি যাচ্ছে কিন্তু তাকে বাগালেন কি ক’রে? মন্দিরাকে না দেখেই এতো টাকা দিতে রাজী হ’ল?”

“না দেখে টাকা দেবে অমন বোকা আদ্‌মি কোই আছে?”

“কবে, কোথায় এবং কি ক’রে সে দেখলে? আমি তো কিচ্ছু জানি না।”

“তুমি হোথায় ছিলে না, জানবে কি ক’রে? কমলাকো কিছু বখসিস দিয়ে বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে দেখিয়েচি।”

“তা বেশ ক’রেচেন, কিন্তু নৌকায় উঠাবার সময় মন্দিরা নিশ্চয় গোলমাল ক’রবে, তখন কি হবে?”

“সে জন্য ভাবতে হবে না, কমলা সব ঠিক করকে রাখা হায়। রূপচাঁদ ছে অমন কাজ নেই হোনে সক্‌তা, নেই।”

“তা টাকাটা ঠিক পাওয়া যাবে তো?”

“পাওয়া যাবে না তো হামি ঝুটা বাদ্ বলচি? অভি চলো, দেরী মৎ করো। দুলালকো accident ঠিক টাইমমে হোনা চাই।”

দুলাল বুঝলো, এখনই তার খোঁজে লোক ছুটোছুটি ক’রতে আরম্ভ করবে, তখন ধরা পড়লে তার কপালে রেলওয়ে accident অনিবার্য্য! অনাহার, অনিদ্রা ও মাথার আঘাতে

তার দেহ দুর্ব্বল, এই অবস্থায় লড়াই ক'রে আত্ম-রক্ষার প্রয়াস একান্তই বৃথা হবে। একটু খানি এগিয়ে গিয়ে দুলাল দেখলো, এই পথে পালাতে গেলেই সে পড়বে আশ্রমের লোক-জনের ঠিক সামনে—আবার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হ'লেও আবার সেই কারা-কক্ষের পাশ দিয়েই যেতে হবে, সেটা আরও বিপজ্জনক। হঠাৎ তার চোখে পড়লো, একটা বড় পেঁপে গাছ এই সরু গলিরই পার্শ্বস্থ দেয়ালের গা ঘেঁষে উঠেচে। দুলাল তাড়াতাড়ি ঐ গাছ বেয়ে দেয়ালের মাথায় উঠলো এবং পরক্ষণেই আস্তে আস্তে লাফিয়ে পড়লো অপর দিকের জমির উপর। তলায় ঘাস ছিল ব'লে জোরে শব্দ হ'ল না। যেখানটায় দুলাল নামলো, সেটা ছিল আশ্রম-বাড়ীরই সংলগ্ন কিন্তু সম্পর্ক বর্জ্জিত একটা বাগান বাড়ীর পশ্চাদ্দেশ। দুলাল চুপি চুপি বাগানের ভিতর দিয়ে অনেকটা দুর চ'লে গেল এবং অবশেষে বাংলো ধরণের একটা বাড়ী ও তার অনতি দূরে লম্বা একটা টালির শেড তার চোখে পড়লো। একটা বাদুড় তখন তার ডানার শব্দে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে যেতেই দুলাল চম্‌কে উঠে থমকে দাঁড়ালো। তখন তার বোধ হ'ল, কতোগুলো লোকের পায়ের দুপ দাপ শব্দ যেন হাওয়ায় ব'য়ে আস্‌চে। টালির শেড্‌টা শূন্য দেখে সে তাড়াতাড়ি তার ভিতর ঢুকে পড়লো এবং গভীর আঁধারময় এক কোণে ব'সে আত্ম-রক্ষার উপায় চিন্তা ক'রতে লাগলো।

[ক্রমশঃ

সাগরিকা

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাগর দোলায় দুলিছে সাগর বালা
মুক্ত কবরী বাধা বন্ধন হারা।
আদিম পিপাসা সৃষ্টির আদি জ্বালা,
ঘিরিয়া রয়েছে পাষাণ মাটির কারা।
ওরে মাটি ওরে মায়াময়ী মৃত্তিকা,…
ক্ষণিকের লাগি খুলে দে আগলখানি ;
ললাটে জ্বলিছে মুক্তি অরুণ টীকা,
কল কল্লোলে কাঁপিছে মুখর বাণী।
মুক্তি পাগল চঞ্চলা সাগরিকা,
তরঙ্গ অসি মুক্ত করিয়া আসে।
পশ্চাতে লয়ে জীবনের বিভীষিকা ;
ঊর্দ্ধ গগন ভরিয়া অট্টহাসে।
ফেন হিল্লোল যুগযুগান্ত ধরে,
সংগ্রাম করে ভীষণ দুর্ণিবার।
বন্ধনময় মাটির শিকল পরে,
কঠিন আঘাত হানিছে বারম্বার।
ক্ষুব্ধ সাগর মত্ত আজিও রণে,
মুক্তির লাগি কঠিন মাটির সনে !

বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক এম-এ, বি-টি

এক

রবীন্দ্রনাথ আশী বছরেরও অধিক বাঁচিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকালের বেশীর ভাগই তিনি আমাদের বাঙ্গালাদেশেই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মূল রচনার প্রায় সমস্তই বাংলা ভাষায় লেখা। প্রায় ষাট বছর যাবৎ বাঙ্গালী তাঁহার লেখা পড়িয়াছে। বাঙ্গালার শতকরা মাত্র দুইজন লোক রবীন্দ্রনাথের রচনার ভাষা পড়িবার মত শিক্ষিত। তাঁহাদের মধ্যেও আবার অনেকেই রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়েন নাই। আসলে শিক্ষিত সমাজের মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ সত্য সত্য রবীন্দ্র-রচনা পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই আবার রবীন্দ্রনাথের-গদ্য রচনা বেশী পড়েন নাই, শুধু তাঁহার কাব্য কিছু কিছু পড়িয়াছেন, রবীন্দ্র-রচনার পাঠক-পাঠিকাদের অধিকাংশেরই দৌড় 'চয়নিকা' বা 'সঞ্চয়িতা' পর্যান্ত।

অতএব রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালার কয়েকজন সাহিত্যিক মাত্র প্রকৃত শোক করিবার অধিকারী। কিন্তু তাঁহাদেরও শোক করিবার কোন হেতু নাই, কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট খোরাক রাখিয়া গিয়াছেন। যে কোন একজন সাহিত্যিক তাঁহার সারা জীবন ধরিয়া রবীন্দ্র-রচনা অধ্যয়ন করিতে পারিবেন, অধ্যয়ন করিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারিবেন না। তথাপি সাহিত্যিকগণ রবীন্দ্রনাথের জন্য শোক করিতেছেন এই বলিয়া যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে একজন পরম আত্মীয়ের মতো ছিলেন,—তাঁহাদের গুরু ছিলেন। গুরুর মৃত্যুতে বিচ্ছেদ-বেদনার অনুভব স্বাভাবিক। বাঙ্গালার এই সাহিত্যিকগণই রবীন্দ্রনাথকে মনে রাখিবেন। এ যুগের সাহিত্যিকগণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিবেন; রবীন্দ্র-রচনার সহিত সেই সব গ্রন্থ পড়িয়া ভবিষ্যতের সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের গভীরতর পরিচয় পাইবেন, তাঁহারাও তখন আবার প্রবলতর উৎসাহে রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়ন করিবেন। এই ভাবে সাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্র-স্মৃতি প্রবাহিণী হইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শুধু কয়েকজন সাহিত্যিক ছাড়া দেশের জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথকে ভুলিয়া যাইবে কি না।

বাঙ্গালী ব্যাস-বাল্মীকিকে মনে রাখিয়াছে। তাহার কারণ শুধু এই নয় যে, তাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের কাছে সাহিত্যিক-পাঠ্য গ্রন্থ মাত্র নয়। এই দুই মহাকাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্র যেন জীবন্ত হইয়া দেশের সমাজের মধ্যে চলা-ফেরা করে। আমরা ঘরে ঘরে যেন রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, বিভীষণ, ভীমার্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, বিদুর, শকুনি, কর্ণ, সীতা, সরমা, দ্রৌপদীর প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাই। প্রতিদিনের কথাবার্ত্তার মধ্যে ইঁহাদের কাহাকেও না কাহাকেও একবার স্মরণ করি। ভারতবর্ষীয় মানব-জীবনের এই আদর্শগুলি বাঁচিয়া আছে বলিয়া ব্যাস-বাল্মীকিও এখনও বাঁচিয়া আছেন। আবার কোন প্রকার সাহিত্য রচনা না করিয়াও বাঙ্গালার

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীচৈতন্য এখনও বাঁচিয়া আছেন। শ্রীচৈতন্য একটী ধর্ম্ম-তত্ত্বকে নিজের জীবন-ভঙ্গীর মধ্যে বিকশিত করিয়াছিলেন, এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সাহায্যে সেই ভঙ্গীটি জনগণের মধ্যে প্রচারিত করিয়া যান। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণকে নূতন ভাবে সৃষ্টি করেন, এবং শ্রীরাধা যেন তাঁহার নিজের একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। শ্রীরাধাকৃষ্ণকে তিনি নিজের সাধন-প্রণালীর দ্বারা মানুষের হৃদয়ে একটি অতি সহজ সম্বন্ধে স্থাপিত করিয়া দেন। এই সম্বন্ধের ভিত্তি সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রীতি,-সহজ ইহার সুর। তাই কোন প্রকার কৃচ্ছ্র-সাধন বা কঠোর যোগাভ্যাস না করিয়াই ভক্তি-প্রবণ বাঙ্গালী শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি ও অনুশীলন করিতে পারিয়াছিল, এবং সেই জন্যই বাঙ্গালী শ্রীচৈতন্যকে মনে রাখিয়াছে। ভক্ত বাঙ্গালী দিনান্তে একবারও হরিনামের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্মরণ করে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিও বাঙ্গালার জনসাধারণের মনে অক্ষয়ভাবে জাগ্রত থাকিবার জন্য এই প্রকার কোন কারণের উপর নির্ভর করে কি না দেখিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ব্যাস-বাল্মীকির মতো ভারতীয় সমাজের আদর্শ প্রতিফলিত করিয়া কতকগুলি জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়া যান নাই। তাঁহার সৃষ্ট 'গোরা', 'সন্দীপ' বা 'অমিত রায়' বাঙ্গালীগৃহের প্রতিদিনের সাধারণ কথা-বার্ত্তার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। তাহাদের কোন প্রকার স্মৃতি বহন না করিয়াই, অর্থাৎ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিয়াই আমাদের জীবন যাত্রার দিনগুলি নির্ব্বিবাদে কাটিয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ যে সব লোকোত্তরণী বা মিস্‌টিক্ ভাবের কবিতা লিখিয়াছেন, সেগুলির পাঠকের সংখ্যা বড় কম, কারণ, খুব কম লোকেই সেগুলি বুঝিতে পারে। জনসাধারণ ত' সেগুলিকে মনে রাখিবেই না, বরং উচ্চতর সাহিত্য-সাধনার মধ্যেও সেগুলি কালক্রমে খৃষ্টান মিস্‌টিক্ লেখকদের রচনার দশাপ্রাপ্ত হইবে—এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে। তারপর, রবীন্দ্রনাথ 'উর্ব্বশী', 'বলাকা', 'শা-জাহান' প্রভৃতি যে-সব ভাব-কল্পনার ঐশ্বর্য্যময়ী কবিতা রচনা করিয়াছেন, সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক-গণ এবং সাহিত্যামোদীর দল বরাবর অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু অল্প-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে ইহারা তেমন ব্যাপকভাবে আদৃত হইবে না। তাহা ছাড়া আসন্ন সাম্যবাদ-সাহিত্য, ফ্যাসিস্তবাদ-সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামের নূতন গণ-সাহিত্যের প্রবল ঝড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা জনসাধারণের হৃদয় হইতে উধাও হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে।

অতএব দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে যে সাহিত্য দিয়া গিয়াছেন, জনসাধারণের চিত্ত-স্তর হইতে অনেক উর্দ্ধে তাহার আসন ;—সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িবে না।

একটি দেশবিশেষে, একটি জাতিবিশেষের মধ্যে ভাবাত্মক বিশ্বপ্রেম বা উদার আন্তর্জ্জাতিকতার আদর ততটা নাই, যতটা আছে একটি বস্তুতন্ত্র সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের! রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রদর্শন এ-দেশের জীবন-সমস্যায় কোন মীমাংসা আনিতে পারে নাই, পারিবেও না। বাঙ্গালীজাতি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শকে নিজেদের কর্ম্মধারায় কখনও প্রতিষ্ঠিত করিবে না,—ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষাশ্রম বিশ্বভারতী স্থাপন করেন একটি বিশ্ব-মিলনের আদর্শে। কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ বলিয়াই ঐ শিক্ষাশ্রমটিও যতটা বড় হওয়া উচিত ছিল, ততটা হইতে পারে নাই। ভারতের প্রাচীন আদর্শকে এ-যুগে টানিয়া আনাও এই ব্যর্থতার আর এক কারণ। যে হেতু, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রাচীন তপোবন-রীতির সহিত কোন প্রকার রফা করিতে রাজী নয়। বিশ্বভারতীকে যদি বাঁচিতে হয় ত' ইহাকে বোধ করি কালোপযোগী একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াই বাঁচিতে হইবে। তাহাতে এ-দেশের শিক্ষাবিস্তারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দান বলিয়া আর কিছু থাকিবে না।

বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিতের সংখ্যা যে-দিন বাড়িবে, যে-দিন পরাধীনতা ঘুচিবে, অন্নসমস্যার যাহা হউক একটা মীমাংসা ঘটিবে,—সে-দিন বাঙ্গালী রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়নের অবকাশ পাইবে। তৎপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গদ্য-সাহিত্য শুধু কয়েকজন বিদ্যাভিজাতের চিত্তগৃহের বহুমূল্য সজ্জাবস্তু হইয়াই থাকিবে। অবশ্য সাহিত্যের পক্ষে এই সৌভাগ্যই

লোভনীয়,—জনগণের দৈনন্দিন উক্তির ছড়া-পাঁচালী-প্রবাদ-বাক্যে পরিণতি লাভ করা খুব বেশী গৌরব-জনক নয়।

কিন্তু, সাহিত্য ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে এমন কিছু দিয়া গিয়াছেন যাহা জাতির পক্ষে এক অতি বৃহৎ কল্যাণের বস্তু। তাঁহার এই দান ব্যাস-বাল্মিকী-শঙ্কর-চৈতন্যের দানের অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নয়। বরং বাঙ্গালীজাতির ভবিষ্যৎ বিচারে তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে বস্তুটি কি ? সে বস্তুটি রবীন্দ্রনাথের গান।

দুই

রবীন্দ্রনাথ গানকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। গানের একটি নূতন রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রাচীন রাগ-রাগিণীর যে-সব মূর্ত্তির পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটি একটি অপার্থিব জটিল দুর্ব্বোধ্যতার প্রতিমূর্ত্তি, এবং তাহাদের ধ্বনি-রূপের মধ্যে যতই ভাব-শিল্পের বিজ্ঞান-বিকাশ থাকুক না কেন, আমাদের স্বাভাবিক জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে তাহার কোন নিবিড় সংযোগ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের যদি একটি মূর্ত্তি পরিকল্পনা করা যায়, ত' তাহা হইবে বাঙ্গালী ঘরের একটি স্বচ্ছন্দচারিণী কিশোরী, সে কিশোরী বাতায়ন-পথে সুদূরের পানে নয়ন মেলিয়া গগনের ঘনঘটার দৃশ্যে তন্ময় হইয়া আছে, অথবা শরতের নদীতীরে দাঁড়াইয়া কাশের গুচ্ছ হাতে ধরিয়া প্রভাতের সোণালী রোদ গায়ে মাখিতেছে, অথবা গৃহাঙ্গণের ধূলা-বালু মাখিয়া অকারণ আনন্দেই হাসিয়া উঠিতেছে,—তোমার যেমন খুসী তাহাকে আঁকিয়া লইতে পার। মোটকথা, সে আমাদের বাঙ্গালী জীবনের একটি সরলা সঙ্গিনীর ছবি, অতিশয় পরিচিত এবং প্রিয়।

রবীন্দ্রনাথের গান বাঙ্গালীজীবনের সহজ আনন্দের অভিব্যক্তি, সহজ তা'র সুর ও ভাষা। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে যুগান্তর আনিয়াছেন না বলিয়া, বলিব—তাঁহার সঙ্গীত বাঙ্গালীর জন্মান্তর আনিয়াছে। যে আনন্দ বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভিতর উন্মনা হইয়া ছিল, যাহাকে বাঙ্গালী সহজভাবে খুঁজিয়া পাইত না, রবীন্দ্রনাথের গান তাহাকে একটি স্বচ্ছ, সঙ্গত, সুষমাময় মূর্ত্তিতে আমাদের প্রতিদিনের সহচরীরূপে ধরিয়া দিয়া গেল। এ গান যেন বাঙ্গালীর নববধূ,—তাহার সহজ প্রেমের মধু নিয়া আসিল বাঙ্গালীর ঘর ভরিয়া দিতে,—সমগ্র জীবনের লীলাসঙ্গিনীরূপে।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা অত্যন্ত সরল। তাঁহার অনেক গান দুর্ব্বোধ্য, ইহা অরসিকের কথা। আঙুরের ভিটামিন্-তত্ত্ব দুরূহ হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে খাইতে মধুর, ইহাই আঙুরের পরম সত্য। তেমনই রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় যে সরল অর্থটি সহজে প্রকাশ পায়, তাহাই তাহার সব চেয়ে বড় অর্থ। তাঁহার বেশীর ভাগ গানেই একটা সুন্দর ছবি আছে,—গানের ভাষা পড়িবা মাত্র তাহা মনে স্বচ্ছন্দভাবে ভাসিয়া উঠে। দুই একটা মাত্র উদাহরণ দিই :

"মেঘের কোলে কোলে যায় যে চ'লে বকের পাঁতি
ওরা ঘর-ছাড়া মোর মনের কথা যায় যেন রে গাঁথি গাঁথি।

—

''লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া,
দেখি নাই কভু দেখি নাই ওগো এমন তরণী বাওয়া।"

—

"আর নাইরে বেলা নামলো ছায়া ধরণীতে।
এখন চল্‌রে ঘাটে কলসখানি ভ'রে নিতে॥"

—

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।
কূলে একা ব'সে আছি নাহি ভরসা॥"

এই সকল গানের গূঢ় অর্থ বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লইয়া মাথা ঘামাইব কেন ? গানের চরণগুলি পড়িবামাত্র আমাদের মনের সম্মুখে যে এক-একটি শান্ত স্নিগ্ধ ছবি ভাসিয়া উঠে, তাহার মাধুর্য্যেই ত' মন ভ'রিয়া যায়। ছবিগুলি প্রকৃতির পটে ভাবের রঙে আঁকা,—কিছু স্পষ্ট, কিছু বা অস্পষ্ট। তবু ঐ গানগুলি শুনিবামাত্র মন যেন সহসা তা'র হাতের কাজ ভুলিয়া, তা'র চারিপাশের জনতা ছাড়িয়া কোথায় কোন্ নিভৃত নিলয়ের সঙ্গোপনে বসিয়া একটি অতি ক্ষুদ্র রস-বুদ্বুদের পানে ক্ষণেকের জন্যও বিভোর হইয়া চাহিয়া থাকে। আমাদের জীবনের যে-সব সূক্ষ্ম অনুভূতির ছবি আমরা আঁকিতে জানিতাম না, আমাদের হইয়া কবি তাহাদের ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন! প্রকৃতির যে-সব ছোট্ট বা অস্ফুট ছবি আমরা দেখিতে জানিতাম না, কবি সেই সব ছবি আমাদের চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধ'রিয়াছেন,—তাঁহার সরল ভাষার

একটি দু'টি লঘু মৃদু টানে। এই ছবিগুলিই ত' কবির গানের পরম সত্য।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা যেমন সরল, সুরও তেমনি সহজ। তাল-মান, রাগ-রাগিণী না জানিয়াও যে সুর অনায়াসে গাওয়া যায়, কবি সেই সুরগুলি বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের জীবনের এক একটি আকুল মুহূর্ত্তের ক্ষণিক ভাবটুকু একটু মধুরতর কণ্ঠে প্রকাশ করিতে গেলে আপনা হইতেই যে সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে,—রবীন্দ্রনাথ সেই সুরেই গান গাহিয়াছেন। তাই তাঁহার গান এত প্রিয়, আমাদের সকল সময় সকল কাজে তার এত আদর।

ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেরই ঘরে আজ রবিঠাকুরের গান গাওয়া হয়। বিদ্যালয়ের বালক-বালিকা হইতে চাষী মজুর পর্য্যন্ত সকলেই রবীন্দ্রনাথের গান গায়। কংগ্রেসের বিশাল সম্মেলনে, সাধারণ জনসভায়, উৎসবে, ক্রিয়াকাণ্ডে, আসরে, বাসরে সর্ব্বত্রই রবীন্দ্রনাথের গান। বাঙ্গালীর যত রকম সামাজিক অনুষ্ঠান কল্পনা করিতে পারা যায়, তা'র সকলখানেই 'বিশ্বকবি'র গান না হইলে চলে না,—এ-গান যেন বাঙ্গালী জীবনের সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির অন্তর্গত বেদনার আবেদন নিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। এই গানের মাধুর্য্যে যেমন আমাদের হৃদয়ের প্রকাশ পরিপূর্ণ হইয়াছে, তেমনই আমাদের জীবনের কর্ম্মপথগুলিও এক অনাবিল শালীন সৌন্দর্য্যে সুশোভন হইয়া উঠিয়াছে। পথপ্রান্তের কণ্টকগুলিও আজ পেলব পুষ্পের স্নিগ্ধ কোমলতায় রমণীয় হইয়া গিয়াছে।

আটচল্লিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাবো করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
তা'র পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।"

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কবির বাসনা সফল হইয়াছে। সত্যই আজ আমাদের বাসগৃহখানি আরও আপনার হইয়াছে, আমরা বাঙ্গালী-জীবনকে ভালবাসিয়াছি, বাঙ্গালী জাতিকে ভালবাসিয়াছি। অভাব-অভিযোগ-বিড়ম্বিত বাঙ্গালী জাতির এত বড় সৌভাগ্য আর কোনদিন হয় নাই। আজ বাঙ্গালী তাহার দৈনন্দিন জীবনের আত্মীয়-বান্ধবকে নূতন ভাবে লাভ করিয়াছে, তাহার দারিদ্র্যের সংসারেও এক অভিনব মধুর রসের আস্বাদ পাইয়াছে,—তাহার দেশের জল-মাটিতে, আকাশ-বাতাসে এক অপরূপ পবিত্র সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছে, এক কথায় বাঙ্গালী তাহার দেশ ও জাতিকে চিনিয়াছে ও ভালবাসিয়াছে। গানের ভিতর দিয়া এত বড় একটা সূক্ষ্ম জাতীয়তার রসাল অনুভূতি সমগ্র জাতির হৃদয়ে স্পন্দিত করিয়া তোলা পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব, অনির্ব্বচনীয়। ইংরাজী ভাষায় আমরা এই জাতীয়তাবোধকে Idyllic Nationalism আখ্যা দিতে পারি। এই নিগূঢ় জাতীয়তার প্রকাশের মধ্যে কোন প্রকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডের আয়োজন নাই, কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের তূর্য্যনিনাদ নাই;—ইহার অনুভূতিও খুব স্পষ্ট নয়, তথাপি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে ইহার মৃদুমন্দ স্পন্দন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রসতরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সে তরঙ্গ-পরম্পরার যোগসূত্র অনুসরণ করিয়া আজ বাঙ্গালী আবিষ্কার করিয়াছে তাহার বঙ্গভূমির আলয়ে আলয়ে এক সহৃদয়, সমানুভূতিক, রসপ্রবণ অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি।

এই বাঙ্গালীজাতির স্বদেশ-জননীকেও রবীন্দ্রনাথ এক নূতন মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বন্দেমাতরম্' গানে দেশ-মাতার একটি ঐশ্বর্য্যশালিনী শক্তি-মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বঙ্গ-জননী সত্যিকারের মা, সন্তানবৎসলা স্নেহময়ী, মাধুর্য্যময়ী। শারদ-প্রভাতে আমরা তাঁহার যে 'মধুর মূরতি' দেখিতে পাই, সে মূর্ত্তি আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হরা মাতা অন্নপূর্ণার। দীর্ঘ প্রবাসের পর গ্রামে ফিরিয়া বাঙ্গালী তাহার এই মাকে দেখিয়া কি গভীর আনন্দেই না বলিয়া উঠে—

'নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।'

এই মধুর-মূর্ত্তি সুন্দরী বঙ্গভূমির সন্তানগুলির হৃদয়েও যে একটি স্বাভাবিক মধুরতা আছে, তাহা আজ রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে সুরে জাগিয়া জাগিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, সমগ্র জাতির মধ্যে অনুব্যাপ্ত হইয়াছে।

এই রস-স্নাত জাতির মূর্ত্তি আজ শুধু বাঙ্গালীর মার্জ্জিত রূপেই শোভমান নয়, দীনতম অশিক্ষিত বাঙ্গালীর সকল কদভ্যাস ও কুসংস্কারের মধ্যেও তাহার রঙীন আভা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাই, অশিক্ষিত বর্ব্বর পল্লীবাসীর যে-গান আগে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রহেলিকা অথবা দেহ-তত্ত্বের নগ্নতাকে কেন্দ্র করিয়া হাটে-বাটে কোলাহল করিয়া ফিরিত, সেও আজ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সুর পাইয়া একটি শান্ত ও সরল প্রকৃতি ও হৃদয়প্রীতির সহজ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। আজ দেশের চাষা-ভূষারাও আর অশ্লীল ভাষায় আদি রসাত্মক গান বা মনসার ঝাপান গাহিতে পছন্দ করে না, তাহারা ভুল-চুক করিয়াও রবিঠাকুরের গান গায়। এবং কে জানে, এই গান গাহিতে গাহিতে ঐ অসভ্য মূর্খ চাষাটিও আজ মাঠে-বাটে, খালে-বিলে, ঝোপে-ঝাড়ে এক নূতন প্রকৃতির সন্ধান পায় নাই? কে বলিতে পারে, ঐসব খড়োঘরের কাদামাখা দাওয়ায় বসিয়া আজ কৃষক যুবক-যুবতীও পরস্পরের আননে-নয়নে এই গানের ভাষায় এক নূতনতর হৃদয়-ভাষা শুনিতে শিখে নাই?

তিন

রবীন্দ্রনাথ আমাদের গান দিয়াছেন, আর গানের সঙ্গে দিয়াছেন আনন্দোৎসবের মনোহরণ অনুষ্ঠান। বাঙ্গালায় প্রচলিত প্রধান অনুষ্ঠান কেবল কতকগুলি পূজা ও পার্ব্বণ। এইসব পূজা-পার্ব্বণই এদেশের একঘেয়ে ক্লিষ্ট-করুণ জীবন-যাত্রার মধ্যে যাহা কিছু বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে। পূজার ব্যাপারগুলি একটু অলৌকিক। নৈবেদ্য-বেষ্টিত দেবতার সম্মুখে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, কাঁসর-ঘণ্টার সচকিত তীক্ষ্ণধ্বনি, ধূপ-ধূম-স্তিমিত প্রদীপশিখার ক্ষীণ শিহরণ, এই সমস্ত মিলিয়া একটি অপার্থিবতার আয়োজন, আর তাহারই মধ্যে কয়েকটি ভীরু প্রাণী কিঞ্চিৎ ধর্ম্মের সংকোচ ও প্রচুর পুণ্যের লোভ ধারণ করিয়া এক অজ্ঞাত স্বর্গের দুয়ারে জানু পাতিয়া বসিয়া রহে। ধর্ম্মসিদ্ধির এই প্রশস্ত আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে আনন্দের স্থান বড়ই সংকীর্ণ। শুধু প্রসাদ-প্রত্যাশী বালক বালিকার রসনার ফাঁকে ফাঁকে একটা বিশীর্ণ আনন্দ তা'র প্রবেশ-পথের ক্ষীণরেখা টানিয়া লয়। আমাদের পার্ব্বণগুলিরও অধিকাংশ কোন একটি পূজাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। তফাৎ এই যে, পার্ব্বণগুলিতে ভোজনাঙ্ক একটু বিস্তৃততর, শাকান্নভোজী দরিদ্র-জীবনের উদরের শূন্যতা তাহাতে একটু বেশী রকম হাঁ করিয়া উঠে। বিবাহ ব্যতীত আমাদের সামাজিক সুখানুষ্ঠানও বেশী নাই। কিন্তু সেদিনও দেখিয়াছি, দেনা-পাওনা কষাকষি, বরযাত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য সাধাসাধি, লোক ঠকাইবার প্রশ্নোত্তর কলহ, ভোজন-পর্ব্বের গো-গ্রাস বণ্টন, বাসরঘরে জামাতার কর্ণ মর্দ্দন ও উৎকট রসিকতা প্রভৃতির সংমিশ্রণে বিবাহ-রাত্রিটি একটি নিদারুণ বীভৎস রসের অবতারণা করিয়াছে। বিবাহের পর এই একটি রাত্রির কথা স্মরণ করিয়াই কত শত দম্পতী হয় ত' বহুদিন পর্য্যন্ত আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে, আর ভাবিয়াছে, এদেশে প্রেমের মিলন-কুঞ্জে যাইবার পথটি এত নোংরা, বিশ্রী, দুর্গন্ধময় কেন! আজ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমাদের জীবনের এই পঙ্কিল স্থলগুলি ধীরে ধীরে স্বচ্ছ শুচি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

আজ বাঙ্গালীর রুচি বদলাইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই বাঙ্গালী এখন অশুচি ও অসুন্দরকে তাহার জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিতেছে। এখন একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়াও আমরা দেখিতে পাই, ফুল-লতা-পাতা দিয়া বিবাহ-মণ্ডপ সাজানো হইয়াছে, চারিদিকে একটি স্নিগ্ধ পারিপাট্যের ছাপ। বরযাত্রীরা আর কোলাহল করে না, স্মিত মুখে বসিয়া রবিঠাকুরের গান গায়; বাসরঘরে আর অশ্লীল রসিকতা নাই, মেয়েরা রবিঠাকুরের গান গাহিয়া নবদম্পতীকে আহ্বান করিয়া লয়। নব বরও রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সে আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহার জীবনের নিবিড়তম সুখের দিনটাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে, নববধূ তাহার সংস্কার-বশীভূত লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহার স্বামীর আনন্দরাগে রবীন্দ্রনাথের সুর বুলাইয়া আর একটু রঙের মায়া আঁকিয়া দেয়।

শুধু বিবাহ নয়, আজ বাঙ্গালীর সকল অনুষ্ঠানে, সকল শুভ কর্ম্মেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কুসুম-কোরকে মধুর মতো জমিয়া আছে। যে-কোন সভায়, আসরে, যে-কোন পূজা-পার্ব্বণের রূপ সজ্জায় নূতন রঙের আভা! রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বর্ষামঙ্গল'; 'শারদোৎসব' বা অনুরূপ উৎসবের মণ্ডপটি যে সৌন্দর্য্য-সজ্জায় মণ্ডিত করিতেন, তাহারই

প্রতিবিম্ব আমরা দেখিতে পাই আমাদের যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে। এখন সরস্বতী পূজা হইতে শারদীয়া দুর্গাপূজা পর্য্যন্ত, জন্মতিথি উৎসব হইতে মাঘোৎসব পর্য্যন্ত—প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যে নূতন সৌন্দর্য্য-শৃঙ্খলা দেখা যায়—তাহা রবীন্দ্রনাথের দান, আর প্রত্যেক উৎসবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথের গান।

এমনিভাবেই বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক কর্ম্ম-প্রাঙ্গণে যে সৌন্দর্য্য-কলার নূতন শিল্প রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। তিনি বাঙ্গালীর পুরাতন উৎসবগুলিকে নূতন ভূষণে সাজাইয়া দিয়াছেন, বাঙ্গালীর জীবন-গতিতে একটি নূতন ভঙ্গী দান করিয়া গিয়াছেন। একটি সমগ্র জাতিকে, একটি বিশাল মনুষ্য-সমাজকে এইভাবে পুরাতনের জীর্ণবেদী হইতে টানিয়া তুলিয়া এক নূতন স্বর্গে যিনি পৌঁছাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার সৃষ্টি-শক্তি অনন্ত। তিনি শুধু সাহিত্য-স্রষ্টা নহেন, তিনি জীবন-স্রষ্টা। এক স্থবির অচল দেবতার জটাজাল হইতে মুক্ত করিয়া সভ্যতার গঙ্গা-ধারাকে জীবনের মধ্যে নামাইয়া আনিতে যে বিপুল শক্তি ও সাধনার আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথের সেই শক্তি-সাধনা ছিল।

মরণ

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য

তুমি আসবে যেদিন দুয়ারে মোব
ওগো আমার মরণ
কণ্ঠে তোমার দুলিয়ে মালা
করব তোমায় বরণ
ওগো আমার মরণ।
সেদিন, চাইব না আর পিছন ফিরে
হারিয়ে যাওয়া দিনের পানে
তোমায় পূজায় থাকব মেতে
অপূর্ব্ব এক ছন্দে গানে
তুমি আসবে যেদিন কুটিরে মোর
করতে আমায় হরণ
ওগো আমার মরণ।

ওগো যেদিন তোমার বীণার ধ্বনি
হৃদয় মাঝে উঠবে বাজি
সেদিন রিক্ত হয়ে মুক্তি লব
সাজিয়ে তোমার অরূপ সাজি
এই ধরণীর আনন্দ আর
করব না গো স্মরণ
ওগো আমার মরণ।
কবে, বিজয় রথে উড়িয়ে নিশান
স্বপ্ন সম আসবে ছুটে ?
মোর কোষাগারের রতনগুলি
দু’হাত দিয়ে নেবে লুটে

আমার হৃদয় মাঝে রাখবে কবে
তোমার দু’টী চরণ ?
ওগো আমার মরণ ?

বন্ধন-মুক্তি

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

ষোল

বন্ধু সুব্রতা সেনের গৃহে চিন্ময়ী মল্লিকের সঙ্গে সুকল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল, আলাপও অনেক হইল। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই সেদিন উর্ম্মিকে বড় ভাল লাগিয়াছিল এবং বড় একটা আগ্রহও হইয়াছিল বধূরূপে তাহাকে গৃহে আনেন। কমলের মতিগতি ও চাল-চলন যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহা যে কেবল প্রীতিকর তাঁহাদের পক্ষে হইতেছিল না তাহা নয়, বেশ একটু উদ্বিগ্নও তাঁহারা হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার ঐ কতকগুলি মেয়ে তাহার ঘাড়ে আসিয়া যেন চাপিয়া বসিয়াছে; কে কবে কোন্ চালে ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাদের ঘাড়েই আসিয়া চাপিবে! ইহারাও শীলতার সকল সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, কমলও বড় বেশী প্রশ্রয় তাহাদের দিতেছে। ইহাও তাঁহারা শুনিতে পান, প্রত্যহই প্রায় সন্ধ্যায় ইহাদের কাহাকে না কাহাকেও লইয়া সে বাহির হয়, সিনেমায় রেস্তরাঁয় ঘুরিয়া বেড়ায়। রূপে গুণে উর্ম্মির তুলনা বড় মেলে না, মোবার্জ্জি পরিবারটিও অতি শিষ্ট ও সদাচারপরায়ণ একটি ব্রাহ্ম পরিবার। এই পরিবারের এইরূপ একটি কন্যার প্রতি যদি কমল আকৃষ্ট হয়, আর বিবাহ তাহাকে করে, তবেই ইহাদের এই নাগপাশ হইতে সে মুক্ত হইতে পারে। তারপর সংযতশীলা শিষ্টচরিত্রা স্ত্রীর প্রভাবে আচার-ব্যবহারের অত্যধিক অশিষ্টতা তাহার ক্রমে সংযত হইয়া আসিবে, এরূপ আশাও করা যায়। তাই যেমন সুকল্যাণী, তেমন ইঁহারাও চাহিতেছিলেন, যদি এই সম্বন্ধটা ঘটে। তবে সব নির্ভর করিতেছে কমলের নিজের ইচ্ছার উপরে। সে ইচ্ছা তার হইবে, যদি উর্ম্মির প্রতি তেমন একটা আকর্ষণ তাহার জন্মে। সেরূপ কোনও আকর্ষণ এখনও কিছু জন্মিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের মনে হয় না; তবে জন্মিতে পারে, যদি উভয়ের মধ্যে দেখাশুনার সুযোগ একটু ঘন ঘন ঘটান যায়। দুই দিন দুইটি পার্টিতে মাত্র দু'জনের দেখা হইয়াছে, কিন্তু এ সব পার্টিতে মনখোলা একটু নিরালা আলাপের সুবিধা হয় না, আর উর্ম্মিও এমন ধাতুর মেয়ে নয় যে, অগ্রসর হইয়া গিয়া বিশেষ ভাবে বাঞ্ছনীয় কোনও যুবার দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস কিছু করিবে। তবে গৃহে সাধারণ দৈনিক জীবনের মধ্যে এইরূপ অবসর মধ্যে মধ্যে যদি কিছু করিয়া দেওয়া যায়। দুই বন্ধুতে নিভৃত আলাপ কিছুক্ষণ হইল। তারপর চিন্ময়ী কহিলেন, "তা দেখ ভাই, তুমি এখুনি পার না—এই একটা পার্টি তোমার ঘরে সেদিন হ'য়ে গেল—আমি বরং একদিন চা খেতে তোমাদের নেমন্তন্ন করি। উর্ম্মিকে নিয়ে আসবে, কমলও থাক্‌বে, কাছাকাছি ভাবে একটু আলাপ-সালাপের সুবিধে দু'জনের হবে। তারপর তুমিও একদিন পাল্টা একটা নেমন্তন্ন করো। এই রকম দুটো চারটে দিন যদি দেখাশুনো হয়, কমলের মনটা যে একটু না টেনেছে তা নয়, আরও টান্‌বে,—তখন আমাদের আর কিছুই করতে হবে না। কমল নিজেই তোমার ওখানে যাবে, গল্প-টল্প করবে, গান শুন্‌বে,—হয় ত বা একদিন বেড়াতেই ওকে পাঠালে ওর সঙ্গে—অবশ্যি যদি সে যায় আর তোমার আপত্তি কিছু না থাকে। কেনই বা থাকবে? এ সব ত' হামেসাই আজকাল হচ্ছে, নইলে ছেলেমেয়েদের বাঁধাই যায় না। আবার একটা রকম হয়েছে কি জান? তুমি ত' খবর টবর এ সব কিছু রাখ না—ছেলেরা চায় কেবলই মেয়েদের সঙ্গে মজলিস ক'রে বেড়ায়। মজলিসী মেয়েও আবার ঢের হ'য়ে পড়েছে। মা বাবারাও ছেড়ে দিচ্ছে, রাখতেও পারে না আটকে। কাজেই ভদ্র চালের ভাল মেয়ে কারও দিকে কোনও ছেলেকে টান্‌তে হ'লে এই সবই এখন করতে হয়, উপায় আর নেই। তা সে এখন পরের কথা। সুরুই করা যাক্ না এই কৌশলটা ধ'রে, কি বল?"

একটু হাসিয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "তা মন্দ কি? খোলা ভাবে এ দেশে ছেলেমেয়েরা ত' আর বাইরে বেড়ায় না, অথচ বিবাহের পূর্ব্বে প্রেমসঞ্চারের আর প্রেমের পাত্রপাত্রী বেছে নেবার অবসরও একটা দিতে হবে। নইলে কেবল পিতামাতার নির্ব্বাচনে বিবাহ—তাকে ঠিক বিবাহই বলা চলে না। আর সে অবসর এই ভাবেই এদের ঘটতে পারে।"

"আচ্ছা বেশ, তা হ'লে ধর এই রবিবার বিকেলে—"

সুকল্যাণী কহিলেন, "রববার ত' সুবিধে হবে না ভাই, মন্দিরে যেতে হবে।"

"ও, সে যে তোমার মস্ত একটা বাধা—মনেই ছিল না। তবে একটা ছুটির দিন—হাঁ, এই মঙ্গলবারে ছুটি আছে—তা হ'লে সেই দিনই ঠিক করা যাক্, কি বল?"

"বেশ, তাই ঠিক রইল। চিঠি একটা পাঠিও, আমি যাব ঊর্ম্মিকে নিয়ে।"

"তারপর তোমার বাড়ীতে একদিন—সে আমাদের যাবার দরকার কিছু নেই—কেবল কমল গেলে হবে, আর সেইটেই বরং ভাল হবে। তা কবে—"

"ছুটি আর শীগ্‌গির দেখ্‌ছি না। তবে ধর—শনিবার সন্ধ্যেয়—কমলের অবসর হবে ত'?"

"তা হবে, অবসর করিয়ে নেওয়া যাবে। ঐ মঙ্গলবারেই যখন আস্‌বে অমনি ব'লে যেও। আমাদেরও ব'লো, নইলে ভাল দেখাবে না। তারপর একটা ছুঁতোটুতো দেখিয়ে আমরা যাব না, কেবল তাকেই পাঠিয়ে দেব।—হাঁ, তোমার সঙ্গে, মহীন বাবুকেও আস্‌তে ব'লব?"

একটু হাসিয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "না, তার দরকার কিছু নেই। উনি আবার ঐ এক ধাতুর মানুষ, হয় ত ওরা ছুটিতে নিরেলা একটু কথাবার্ত্তা বল্‌বার অবসরই পাবে না।"

"আচ্ছা, থাক্ তবে। কেবল তোমাকে আর ঊর্ম্মিকেই ব'লে পাঠাব।"

রবিবারেই সুকল্যাণীকে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া চিন্ময়ী কমলকে ডাকিয়া কহিলেন, "পরশু ত তোমার ছুটী আছে কমল?"

"হাঁ, কেন বল ত?"

"এই ব'লছিলাম কি বিকেলে আর কোনও এনগেজমেণ্ট (engagement) কোথাও ক'রো না। আমি ছোট একটু টি-পার্টির (tea party) বন্দোবস্ত করেছি। বন্ধু কেউ কেউ আস্‌বেন, তুমি থাক্‌লে ভাল হয়।"

"বিকেলে—but what's the hour?"

"এই চারটেয়। ছুটীর দিন—তখনও ত' তুমি বেরোও না।"

"না! Well, no objection to stay at home the afternoon to please you. But mind, only the afternoon. I would want to be off, say, by seven. Could I?"

"তা খুব পারবে। কতক্ষণ আর হবে? বেশী লোক ত কাউকে বলছি না, আর formal কোনও programme'ও নেই কোনও entertaiment এর।"

"কাকে কাকে ব'লছ তবে?"

"বেশী আর কাউকে নয়। এই আমার বন্ধু সুকল্যাণী মোকার্জ্জি, তার মেয়ে ঊর্ম্মি—"

কমল হাসিয়া উঠিল।

"O, I see your trick! you match-making mammas! A plot already to trap me! eh!"

"না না, সে কি কথা, সে কি কথা! এই ত সেদিন তাদের বাড়ীতে ঐ পার্টিটায় গেলাম—সেই ছেলেবেলার বন্ধু—মনে হ'ল বাড়ীতে তাদের ডেকে চা-টা কিছু খাওয়াই, গল্প-সল্প খানিকটা করি—সেদিন ত তার ফুরসুৎ কিছু হ'ল না। তারপর—তা সত্যি ব'লতে কি কমল—ঐ মেয়েটিকেও বড্ড ভাল লাগল সেদিন। মনে হয়েছিল বাড়ীতে তাকে একদিন আনব, নিরেলা একটু আলাপ টালাপ ক'রব, দু'টো গান তার ভাল ক'রে শুনব—"

"ও, তা হ'লে বল তোমার 'গেষ্ট' (guest) সেদিন কেবল তারাই and that will best serve the purpose, you have in view. Well, you see, I have hit the mark and caught you, and no use dodging about, ha! ha! ha!"

একটু অপ্রস্তুত হইয়াই মাতা তখন কহিলেন, "তা কি জান কমল, অমন মেয়েটি—আমাদের খুবই ভাল লেগেছে—একেবারে আপন ক'রে নিতে পারলে খুবই সুখী হব। তবে তোমার সঙ্গে ত' দেখাশুনোর সুবিধে তেমন হয় না। তা সেটা যদি মাঝে মাঝে এই ভাবে হয় আর বুঝতে পার তোমার মনের মত সে হ'তে পারে, আর তাতে ক'রে শেষে ভালও যদি তাকে বাসতে পার—"

"But you know, my dearest mammy, that Cupid's blind and love's very freaky. It does't wait for one to be found what you call মনের মত। When a fellow falls in love, he falls more often at unweares than being fully aware of the suitability of the person concerned and before any considered judgment of the pros and cons of the whole situation and of the desirability of the relations that may follow and all such things. আমেরিকায় এই রকম falling in love and marrying-ও যখন তখন ঘটছে আবার ডিভোর্স ও দু'দিন বাদে হচ্ছে for incompatibility of temper."

মাতা কহিলেন, "তা হয় ও সব দেশে। তবে কিনা আমরা এদেশে—"

"হাঁ, ঠিক ব'লেছ। আমরা এদেশে অতটা go ahead ways adopt ক'রে উঠতে পারিনি। আমরা—মানে এই ধর progressive young fellows তবু যেটুকু পেরেছি, তোমরা older people তা পার নি ; বরং বেশ একটু পেছন-টানা—reactionary-ই হ'য়ে উঠছ। এই ত daddy সে দিন ব'লছিল জ্যোতির্বিদের কথা ! বলে, ওটাও নাকি একটা science—হাঃ হাঃ হাঃ ! আবার এই ধর তোমরা—plotting match-making. But you ought to know those Victorious days of match-making mammas are long gone by. Modern সব girls and boys—well, they don't need any such help from mammies, aunties and old grannies. They go about freely, freely love and marry when they feel they must."

মাতা আর বরদাস্তই করিতে পারিতেছিলেন না। বলিয়া উঠিলেন "হাঁ, দেখ কমল, অত সব কথা ও ভাবে আমাদের সামনে ব'লতে নেই আমি তোমার মা, ধর না হয় reactionary-ই আছি, তা আমাদের কি ভাল লাগে না লাগে তার খাতিরও ত' একটু ক'রতে হয়—"

"O, I beg your pardon dearest Ma ! Really I didn't mean to be discourteous and offensive in my talk. I thought—I thought I could freely let out what I think about these matters, even to you, my parents, who are the best of friends I have in the world as yet, and the relation between parents and grown up children should be one of open and cordial friendship than otherwise."

"সেত বটেই, সেত বটেই। আমরাও ত সেই ভাবে বরাবর চ'লেছি। একটা দূর দূর ভাব, অস্বাভাবিক একটা সম্ভ্রম সঙ্কোচের আড়াল রেখে কখনও চলিনি। তবে কিনা—তা সে যাক, এখন এই যা কথা হচ্ছিল—"

"তা বেশ। After-noon tea-party-তে ওদের ডেকেছ, আমিও থাকব and shall be glad to do it to oblige you. আর তা সত্যি বলতে কি, দুদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে—I found the girl very interesting I shall be very glad really to cultivate further acquaintance with her. And if love comes out of it, as it sometimes does come, inspite of all its freakishness, I shall be nothing loth to give full and free reins to it and plunge headlong into where-ever it leads me, a haven of bliss or abyss of hell-fire ! There, dear ma, let's shake hands and forgive and forget. Ha ! ha ! ha !"

বলিয়া কমল মাতার হাত ধরিয়া বেশ জোরে ঝাঁকিয়া দিল। মাতার মুখেও তখন প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"আচ্ছা, তা'হলে উঠি এখন। বেরোতে হবে একবার। মঙ্গলবার বেলা চারটে ত' ? হাঁ, ঠিক মনে রাখব। Good bye !"

বলিয়া কমল বাহির হইয়া গেল।

সতের

চিন্ময়ী তাঁহার গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আসিবার সময় প্রায় হইল ; চিন্ময়ী আসিয়া হল ঘরে দাঁড়াইলেন। কমলও হাসিমুখে আসিয়া মাতার পাশে দাঁড়াইল, পরিধানে কোঁচান মিহি ধুতি, গায়ে গিলাকরা পাঞ্জাবী, ধুতির ফুল কোঁচা পায়ের নীচে গৃহতলে লুটাইতেছে। মাতার মুখ ভরিয়া হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"Now a that's dear mother, you look so pleased ! কি বল ? Quiet decent and fit for the occasion ! Ain't I ?"

মাতাও পুত্রের হাত ধরিয়া ঝাঁকিয়া কহিলেন, "To be sure you are, darling, and very very pleased

I am ! এতটা accommodate তুমি আপনাকে করতে পারবে ভাবি নি। A happy augury indeed! Is't not dear ?

হাসিয়া কমল কহিল, May be 't's and may be 'tisn't All I can say is that I want really to please you and to please them too."

"It has pleased me as never has anything before for many years and it will please them too, to be sure! তবে কিনা—তারা হয় ত' এটাকে something out of the way ব'লে মনেই করবে না। কারণ আজকাল এই সব occasion এ আমাদের সব ছেলেদের বাঙ্গালী পোষাকে বেরোন unusul কিছু নয়। তা সে যাই হক, দেখে তারা খুসী হবে এটা ঠিক। একটা dress suitই বরং বেখাপ্পা লাগত। তা এখন decent ধুতি জামা পরে বেরিয়েছ, ব্যবহারটাও তেমনি মানানসই হবে ভরসা করতে পারি ?

"দেখি, ভাবছি ত'। But I fear I shall be very ackward, for to tell you the truth, I am not very accustomed to the society of the girls of the type, I was not when at home—I mean in England, nor have been here. Already I have been feeling a bit nervous. But you will buck me up, if you notice am failing.

"পাগল! nervous কেন হবে? nervous বরং তাদেরই একটু হবার কথা—এই বাড়ীতে আসছে। ও সব কিছু ভেবো না। Freely তাদের receive করবে, হাসিগল্প করবে। তবে কি জান, আমাদের সঙ্গে ঘরে যতটা freely কথাবার্ত্তা বল, অতটা কিছু করো না। Brahmo freedom এর idealটা যাই হউক, সাধারণ গৃহস্থ পবিবারের লোকেরা অনেকটা এ দেশের আদবকায়দা মেনেই চলে। Contact এ অনেকের সঙ্গই ত' আসি। অনেক হিন্দুপরিবার modern way-তে যতটা এগিয়ে এসে পড়েছে, গৃহস্থ ব্রাহ্ম বহু পরিবার এখনও তা পারে নি। ব্রাহ্ম মেয়েদের চাইতে, দেখতে পাই, enlightened আর stylish হিন্দু পরিবাবের মেয়েরা অনেক বেশী free and forward।"

"হুঁ! আবার শুনেছি তোমার এই বন্ধু মিসেস মোকার্জ্জি নাকি বড় বেশী পিউরিটানী ভঙ্গীর লোক।"

"তা আছে। কড়া একটা 'পিউরিটানিজম্'ই ছিল এক সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজে সাধারণ ব্যবহারের নীতি।—ঢিলে অনেকটা হ'য়ে প'ড়েছে এখন; তবে সুকল্যাণী এখনও তার পরিবারে ওটা বজায় রেখে চ'লতে চাইছে।"

"But the girl—I hope she will be a bit more free and rational and not a hide-bound puritanic prude after the model of the mother. Such a girl I don't feel I can go on with."

"না না, আজকালকার মেয়ে, তাও কি হ'তে পারে?"

"Say, on further acquaintauce, when our intimacy grows, if I want to take her out to a cinema or for a drive to the lakes—"

"তা দেখ, একটু মেলামেশা আগে হ'ক, যদি তোমার তাকে এমন ভালই লাগে আর তার মাও বুঝতে পারে ভালই তাকে বেসেছ—এ যে গাড়ী আস্‌ছে, এস।"

বলিয়া চিন্ময়ী পুত্রকে লইয়া গাড়ী বারান্দার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আসুন মিসেস্ মোকার্জ্জি—গুড ইভ নিং! গুড ইভ্‌নিং মিস্ মোকার্জ্জি!"

বলিতে বলিতে হাত ধরিয়া কমল উভয়কে গাড়ী হইতে নামাইল। মাতা চিন্ময়ীও সময়োপযোগী সম্ভাষণে উভয়কে আপ্যায়িত করিয়া পুত্রকে কহিলেন, "ওসব distant formality আর কেন কমল? সুকল্যাণী আমার বাল্যবন্ধু—ওকে, হাঁ, মাসীমা ব'লেই ডাকতে পার—তাই সবাই ডাকে আজকাল।—আর ঊর্ম্মি—"

হাসিয়া কমল কহিল, "হাঁ, উনি যদি মাসীমা হন, তাহ'লে মিস্ মোকার্জ্জি ত আমার কাজন্ (cousin)—নাম ধরেই ডাকতে পারি! কি বল তবে ঊর্ম্মি, you accept this relationship and be a real dear cousin to me in our intercourse ?"

বলিয়া ঊর্ম্মির হাতখানি চাপিয়া ধরিল। হাতে একটু টান দিয়া সলজ্জ নতমুখে ঈষৎ একটু হাসিয়া ঊর্ম্মি কহিল, "তা আপনি বয়সে অনেক বড়, দাদার মত, নাম ধ'রে খুবই

ডাকতে পারেন। আমিও বোনটির মত কেন ব্যবহার ক'রব না?"

হাসিয়া কমল কহিল, "কিন্তু ওসব দূর দূর ভাবের 'আপনি টাপনি' চ'লবে না,—if you really take me as a cousin—as I have done. 'তুমি' 'তোমার' ব'লবে, আর ঠিক 'কমল' না বল্‌তে পার, 'কমলদা' অন্ততঃ বলতেই হবে। Well, all that will come by and by when we shall know each other better. তা হ'লে এস, এখন ঘরে এস,—and I must claim the right of leading you to the reception."

বলিয়াই ইঙ্গ-কায়দায় হাতখানি বাড়াইয়া বাহুতে উর্ম্মির বাহু জড়াইয়া ধরিল। কায়দাটা উর্ম্মির অবিদিত ছিল না। কিন্তু এদেশে কখনও ইহা সে দেখে নাই, এবং হঠাৎ এরূপ একটা ব্যবহার প্রত্যাশাও করে নাই। সমস্ত শরীর যেন তার কাঁটা দিয়া উঠিল। কিন্তু কি করিবে? আপত্তি আর চলে না। অতি সঙ্কুচিত ভাবে কমলের বাহুলগ্না হইয়াই সে গৃহ মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। কমলের নির্দ্দিষ্ট আসনের দিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া একটু দূরে মাতার আসনের নিকটে একখানি আসনে গিয়া বসিল।

সুকল্যাণী কহিলেন, "কই, মিষ্টার মল্লিককে দেখছি না যে? তিনি—"

"বাড়ীতে নেই। একটু আগে বেরিয়ে গেলেন, কি একটা কোম্পানীর ডাইরেক্টরের মিটিং আছে—হয়ত এসেই পড়বেন তোমরা থাক্‌তে থাক্‌তে।"

কমল বলিয়া উঠিল, "O, never mind his absence মাসীমা! Business is business you know. তিনি নেই, তবে আমি ত' আছি to take his place and I am your own dear nephew—হা-হা-হা! আর আপনি আজ এখানে আমার মার গেষ্ট (guest), বাবার নন।—And I, my mother's son, am certainly in a better position to receive you here than he could be, were he at home."

কথায় কথায় এত ইংরেজী বুকনি খুব ভাল লাগিতেছিল না; তবে কি না ইহাদের ঘরোয়া কায়দাই-বোধ হয় এই।—যাহা হউক, মুখে যতদূর সাধ্য মিষ্ট হাসি ফুটাইয়া সুকল্যাণী উত্তর করিলেন, "না না, জরুরী কাজে তিনি বেরিয়েছেন, থাক্‌তে পারেন নি, কি হ'য়েছে তায়? তুমি র'য়েছ তাঁর ছেলে—এর ওপর আর কথা আছে কি? আর তোমার মা আমার বন্ধু, বন্ধুভাবে একদিন বাড়ীতে ডেকেছেন বেড়াতে এসেছি। ধর, তোমাকেও যদি তেমন জরুরী কাজের ডাকে বাইরে যেতে হ'ত, তাতেই বা কি ত্রুটি হ'ত? আমরা এসেছি, গল্প-সল্প খানিকটা করতাম, চা খেয়ে খেয়ে ফিরে যেতাম। তবে তোমাকে যে পেলাম, এটা খুবই একটা আনন্দের কথা হ'য়েছে। সেই শেষ কবে তোমাকে একটা বিবাহের সভায় দেখেছিলাম, তারপর এত বড় তুমি হ'য়েছ, বিলেত টিলেত ঘুরে এসেছ, মুখোমুখি বসে দুটো কথা বলবার অবসর আর হয় নি। সেই সেদিন আমাদের ওখানে গেলে—একে ত' অত লোকের ভিড়—তারপর তুমি গেলেও অনেক পরে—রাত হ'য়ে গিয়েছিল অনেক—"

"হাঁ, ভারী অন্যায় হ'য়ে গিয়েছিল আমার মাসীমা।—তবে pre-engaged ছিলাম জানেন তো? কিছুতেই ওরা ছাড়লে না। নইলে এমন entertainment-টাও miss করি? But I shall make it up to-day, and talk and talk and talk till you are thoroughly bored and tired out and sigh for relief. ঐ কি একটা কথা আছে না এ দেশে—হাঁ—ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি লাগে—হাঃ হাঃ হাঃ!"

মাতারা উভয়েই হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। উর্ম্মির মুখেও চাপা একটু হাসি ফুটিল।

কমল কহিল, "তা আমি যে আনন্দটা miss সেদিন ক'রেছি, সেটাও কিন্তু make up ক'রে দিতে হবে। কিন্তু উর্ম্মির যেন কেমন একটা ভার ভার ভাব দেখা যাচ্ছে! Why, she should feel quiet free and at home here. কেন পারছ না উর্ম্মি? এ-যে তোমার মাসীমার বাড়ী। আর আমি? আমি তো তোমার cousin—a newly found cousin and should be doubly welcome! Why so silent and glum-like? Really it distresses me. I hope I have not been any way wanting in courtesy to you? তবে হাঁ, বকে যাচ্ছি মেলাই—আর একলা আমিই।"

একটু হাসিয়া উর্ম্মি তখন কহিল, "তাই.ত একটি কথা বলবারই ফুরসুৎ পাচ্ছি না।"

"হাঃ হাঃ হাঃ! Rightly hit, cousin dear! হাঃ হাঃ হাঃ! Why, you are a real wit and that's very hopeful and we shall be very happy when we grow more and more intimate—quite cousin-like. তা সে যাক্, এখন যা বলছিলাম, আমার shortcoming সেদিন যা-ই হয়ে থাক, I am making it up with vengeance. You too must make up what I missed—কি বলেন মাসীমা? I know I am boring you. তবে এটা ঠিক বলছি, I shall never feel would—rather be enchantingly delighted more and more and feel wafted higher and higher, say, up to the seventh heaven, if she goes on singing and singing till very late in the evening. Why, she sings like a siren! তা হ'লে কি বল, উর্ম্মি, এখন স্তবে—সুর ক'রে দেও with ঐ বুঝি বাঁশী বাজে'—আঃ!"

বলিতে বলিতে কেমন একটা ভাববিভোর ভঙ্গীতে চেয়ারে গা ছাড়িয়া মাথাটি হেলাইয়া দিয়া চক্ষু দুটি কমল মুদ্রিত করিল।

চিন্ময়ী কহিলেন, "এস উর্ম্মি, এই যে অর্গানটি র'য়েছে, এস, ব'সে গানটি কর। সত্যি ব'লতে কি মা, তোমার গান সেদিন ভারী মিঠে লেগেছিল। নিরেলায় দুটি গান তোমার ভাল ক'রে শুনব, তাই আজ কেবল তোমাদেরই এখানে ক্লেশ দিয়ে এনেছি, আর কাউকে ডাকিই নি।"

বলিয়া উর্ম্মিকে লইয়া অর্গানটির কাছে বসাইয়া দিলেন, উর্ম্মি গানটি গাহিল। চিন্ময়ী কহিলেন, "বাঃ, সত্যি কি মিষ্টি গলা!—আর সুরে কি মিঠে ঝঙ্কার! সত্যি ব'লতে কি সুকু, তোমার মেয়েটি একেবারে যেন একটি nightingle; গাও মা গাও, আর একটি গাও। ঐ যে 'রাজা ও রাণীতে' ঐ গানটির পরে সখীর আর একটি গান আছে, 'যদি আসে তবে কেন যেতে চায়'—জানা আছে?"

"আছে।" বলিয়া উর্ম্মি সেই গানটিও গাইল।

বেয়ারা আসিয়া তখন জানাইল, মিসেস পি গাঙ্গুলী ও মিস্ গাঙ্গুলী আসিয়াছেন।

"কে? মিসেস পি গাঙ্গুলী আর মিস্—ও তার মেয়ে গার্গী?"

একটু ভ্রূকুটি চিন্ময়ীর ললাটে দেখা দিল। কমলও চমকিয়া চাহিল। চিন্ময়ী কহিলেন, "এসেছেন,—বেশ, আসতে বল ভেতরে।"

মাতা ও কন্যা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"আসুন মিসেস্ গাঙ্গুলী, নমস্কার, বসুন। এস গার্গী, ব'স। ভাল ত' সব?"

মিসেস্ গাঙ্গুলী ক্ষিপ্র খর দৃষ্টিতে এদিক ওদিক একবার চাহিয়া দেখিলেন। দুইজন অতিথি, আবার একটি টেবিলে চায়ের আয়োজন সহ কেক, রুটি, ফল, মিষ্ট ইত্যাদি সব খাবার প্লেটে প্লেটে সজ্জিত, খানসামা একটু আগেই সব রাখিয়া গিয়াছিল। গার্গীর ভ্রূকুটিকুটিল মুখখানি অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল। মিসেস্ গাঙ্গুলীও আঁধার মুখে একটু অপ্রস্তুত ভাব দেখাইয়া কহিলেন, "নমস্কার মিসেস্ মল্লিক! হঠাৎ অসময়ে এসে প'ড়ে আপনাদের disturb ক'রলাম, ক্ষমা ক'রবেন। জানতাম না, আপনাদের একটা প্রাইভেট টি-পার্টি হ'চ্ছে—"

"পার্টি আর কি, এই এঁরা এসেছেন—"

"তা কি জানেন, এসেছিলাম এদিকে এক বন্ধুর বাড়ীতে। কাছেই আপনার বাড়ী—ভাবলাম, যাই একটিবার দেখা ক'রে। গার্গীও ব'লছিল, আজ ছুটীর দিন, কমলদা হয় ত বাড়ীতেই আছেন, তাকেও একেবারে নিয়ে যাব সঙ্গে ক'রে, সন্ধ্যে বেলা চা'টা খেয়ে আসবে"—বলিতে বলিতে সুকল্যাণীর দিকে আঁধার একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। চাপা আবেগে কণ্ঠস্বরও শেষের দিকে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

কৈফিয়ৎ যাহা দিলেন, কতকটা সত্য। এদিকে কোনও বন্ধুর বাড়ীতে ইঁহারা বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। এ কথাটাও গার্গীর মনে হইতেছিল, কমলদার সঙ্গে একটিবার দেখা করিয়া গেলে মন্দ হয় না। ফিরিবার পথে মল্লিকদের বাড়ীর নিকটেই যখন আসিয়াছেন, উর্ম্মির গান কানে গেল। গার্গী বলিয়া উঠিল, "শুনছ মা, উর্ম্মি গাইছে! এই রোক্কো!"

ড্রাইভার গাড়ী থামাইল।

"অাঁ! তাই ত! মল্লিকদের বাড়ী না এটা?"

"হাঁ।"

"বটে! চল্, দেখি ত!"—বলিয়াই মাতা ও কন্যা দ্রুত গাড়ী হইতে নামিয়া সোজা গিয়া বাড়ীতে ঢুকিলেন।

যাহা হউক, মিসেস্ গাঙ্গুলীর এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া চিন্ময়ী কহিলেন, "বসুন, বসুন—মিসেস্ গাঙ্গুলী। এসেছেন, তা acquaitance (পরিচিত লোক) আপনারা, বেড়াতে এসেছিলেন এদিকে—আসতেই পারেন। চেনাশুনো লোকের বাড়ীতে সবাই এমন আসে যায়, নোটিস কেউ দেয় না আগে। পার্টি আর কি? তবে সুকল্যাণী আমার অনেক দিনের বন্ধু কি না—এক সঙ্গে দু'জনে প'ড়তাম,—ব'লে পাঠিয়েছিলাম, বেড়াতে এস আজ উর্ম্মিকে নিয়ে—"

"ও! আজ আবার ছুটীর দিন, কমলও বাড়ীতে থাক্‌বে! নমস্কার মিসেস্ মোকার্জ্জি!—তা জানতাম না যে আপনারা এমন intimate বন্ধু দু'জনে। যাওয়া আসা আগে ত বড় লক্ষ্য করি নি। তবে সেদিন শুনলাম, আপনারা মোকার্জ্জিদের পার্টিতে গিয়েছিলেন, পর পরই আজ আবার আপনাদের বাড়ীতে মিসেস্ মোকার্জ্জি, মিস্ মোকার্জ্জি!"

"বসুন! বসুন। একটু শান্ত হ'ন। বুঝতেই পারছি নি, এসেছেন বেড়াতে এখানে, এঁদের দেখে এতটা agitated কেন আপনি হ'চ্ছেন? আপনি গার্গীকে নিয়ে যেমন এসেছেন, উনিও উর্ম্মিকে নিয়ে ত' তেমনি আসতে পারেন।

"Agitated! হাঃ-হাঃ-হাঃ! Agitated কেন হ'ব? কোনও কারণ তার নেই। (বলিয়া বসিতে বসিতে) তবে হাঁ, ওঁদের দেখে একটু বিস্মিত হ'য়েছিলাম বটে! বেড়াতে আসা—হাঁ, তা সবার বাড়ীতেই সবাই আসতে পারে বই কি? তবে কি না, এটা হ'চ্ছিল একটা পার্টি. কেবল টি-পার্টি নয়, মিউজিক পার্টিও বটে। আর সে পার্টিতে কেবল ওঁরাই দু'টি, আর মিউজিকটা কেবল উর্ম্মিমালার গান! তবে কি না সে গায় ভাল, আর শুনে কমলও খুব charmed হবে।"

চিন্ময়ী ভ্রূকুটি করিলেন। একটু কঠোর স্বরেই তখন কহিলেন, "তা হবেই ত! উর্ম্মির গানে সবাই charmed হয়। তা এ আমার বাড়ী, কমল আমার ছেলে, উর্ম্মির মা আমার বন্ধু, উর্ম্মি আমার সেই বন্ধুর কন্যা। আমি ওঁদের যখন ইচ্ছা বাড়ীতে invite ক'রতে পারি, টি-পার্টি দিতে পারি, গান শুনতে পারি, কমলকেও শোনাতে পারি। আপনি এসেছেন—very welcome. কিন্তু আমার বাড়ীতে আমি কি ক'রছি না ক'রছি, তা নিয়ে এ সব টিপ্পনী ক'রবার অধিকার বোধ হয় আপনার নেই। নিজেই ভেবে দেখতে পারেন সাধারণ ভদ্রতার সীমা আপনি লঙ্ঘন ক'রছেন কি না।"

"মাফ ক'রবেন মিসেস্ মল্লিক। আপনার বাড়ীতে আপনি যা ইচ্ছে অবিশ্যি ক'রতে পারেন, বাইরের একটা লোক আমার পক্ষে তা নিয়ে কোনও কথা বলা এসে যে উচিত নয়, এটা বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে। তবে হঠাৎ এসে প'ড়েছি, আর এসে যা দেখলাম, সেটা—সেটা—একটা অভাবনীয় ব্যাপার, যাতে ক'রে এমন একটা চমক লাগল আমার, যে ঠিক ওজন রেখে হয় ত' কথা ব'লতে পারি নে। But I meant no offence to you!"

"You! বেশ জোর দিয়েই কথাটা ব'ল্লেন! Offenceটা তবে কাকে দিতে চেয়েছেন? আমার এই বন্ধুকে—যিনি আমার নিমন্ত্রণে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়েছেন?"

"Offence যদি তিনি নেন, নাচার। তবে এটা বেশ একটু বিস্ময়ের কারণ নয় কি যে, অতি বড় একজন সাধ্বী ব্রাহ্মিকা, আদর্শ সুনীতিবাদিনী ব'লে সুপরিচিতা এই মিসেস্ মোকার্জ্জি—তিনিও বাছা বাছা লোককে মেয়ের গান শোনাবার জন্ত বাড়ীতে পার্টি দিচ্ছেন, বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েকে নিয়ে গান শুনিয়ে বেড়াচ্ছেন—presumably with some purpose in view—"

সুকল্যাণীর মুখ অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল। উর্ম্মি লজ্জায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। রক্তচক্ষু তুলিয়া চিন্ময়ী কহিলেন, "মিসেস্ গাঙ্গুলী, আপনি আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত আমার এই বন্ধুকে অতি হীন ভাবে অপমান ক'রছেন! আর এটা আপনি ক'রছেন—purely out of malice—আর সে malice-এর secretটাও as clear as day. You are—you are, I cannot help feeling, really an intruder in my house and a rude and vulgar intruder for the matter of that! I shall be under the painful necessity of treating you as such, unless —unless—"

গার্গী বলিয়া উঠিল, "এস না মা? এর পর কি চাও, বেয়ারা ডেকে ঘাড় ধ'রে উনি তোমাকে বের ক'রে দেবেন?"

বলিয়া মাতার হাত ধরিয়া টান দিল, মাতা তখন রাগে ক্ষোভে থর থর কাঁপিতে ছিলেন। পড়িতে পড়িতে কোনও মতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কমলের দিকে একটি অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গার্গী কহিল, "কমল দা—I mean Mr. Mallik—এর পর আমাদের কোনও বন্ধুত্বের সম্বন্ধ আর থাকতেই পারে না। সে বন্ধুত্বের কোনও valueও আপনার কাছে এখন কিছু থাকবে না জানি। But I don't care! তবে ঊর্ম্মি এটা ক্রমে বুঝবে, how you want to play fast and loose with all sorts of girls. And she, too, will discard your friendship one day! এস মা!"

বলিয়া হিড় হিড় করিয়া মাতাকে টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সকলেই স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ হো-হো করিয়া কমল হাসিয়া উঠিল। কহিল, "There goes a saying that women are cats. And they show that some at least really are. You too, mother, have been a bit cattish. Haven't you?

"Yes, I have been. But when cats come and quarrel, they must be met catlike!"

ঊর্ম্মি উঠিয়া তখন মাতার কাছে গিয়া চুপি চুপি কহিল, "চল মা, এখন বাড়ীতে যাই।"

মুখ ঘুরাইয়া চিন্ময়ী চাহিলেন। সুকল্যাণী লজ্জায়, ঘৃণায় একেবারে মুসড়াইয়া পড়িয়া কৌচের পিঠে মুখখানি চাপিয়া বসিয়া ছিলেন। উঠিয়া কাছে গিয়া কহিলেন, "যাবে! এখুনি যাবে। খেলেও ত না কিছু? সুকু! কি হ'য়েছে? কেন অমনধারা মনভাঙ্গা হ'য়ে প'ড়েছ? শেয়াল কুকুরে এসে ঢের অমন ঘেঁউ ঘেঁউ করে, এঁটো পাতা নিয়ে কামড়া কামড়ি করে—গ্রাহ্যও কেউ তা করে? বাড়ীর উৎসব অনুষ্ঠান কেউ বন্ধ তার ভয়ে রাখে? উঠে ভাল হ'য়ে ব'সো। হাঁ! না, সে হবে না ঊর্ম্মি। এখুনি যেতে পারবে না। চা-টা খাও। তারপর হাঁ, আরও দু'টো গান তোমার শোনাও—"

আনত মুখে ঊর্ম্মি কহিল, "আজ আর পারব না মাসী মা। গান—সে দয়া ক'রে একদিন যাবেন আমাদের বাড়ীতে—যতক্ষণ বলেন, যত গান জানি গেয়ে আপনাকে শোনাব।"

"কিন্তু—না খেয়ে ত যেতে পারবে না মা।"

"না, তা আর কি ক'রে যাব?"

"আচ্ছা, এস তবে। ওঠ সুকু, এস। এস কমল।"

সকলে গিয়া খাবার টেবিলে বসিলেন। ঘণ্টার শব্দ পাইয়া খানসামা আসিল। আহার পান আরম্ভ হইল। চিন্ময়ী যতই চেষ্টা করুন, আসরটা আর তেমন জমিল না। মুখে কথাই কাহারও আর বড় ফুটিল না।

সুকল্যাণী শেষে কহিলেন, "আজ, তবে এখন আসি চিন্ময়ী।"

"এস। কি আর ক'রব? হাঁ, কমল! গাড়ীটা নিয়ে তুমি নিজে ওদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এস।"

"তাই যাব মা। আসুন মাসীমা, এস ঊর্ম্মি।"

গাড়ী প্রস্তুতই ছিল। সকলে বাহির হইলেন। সাদরে ঊর্ম্মির চিবুক স্পর্শ করিয়া মুখে একটু চুমা খাইয়া চিন্ময়ী নিজে তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

[ক্রমশঃ

সদাশয় গিরিশচন্দ্র

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

পুরুষের মধ্যে যেমন উত্তম পুরুষটাই মানুষের সবচেয়ে প্রিয়, কালের মধ্যে তেমনি অতীত কালটাই বুঝি তার সবচেয়ে মধুর। বর্ত্তমান তার নানা বাধা-বিপত্তি বিঘ্ন বিপদ দিয়ে এমন ক'রে ঘিরে রাখে যে, তার সুখ-সুবিধাগুলো প্রায় চোখেই পড়বার অবসরই পায় না, ভবিষ্যৎ তার রঙিন স্বপ্ন নিয়ে মনের কোণে মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারলেও তার অন্ধকার গুহার বাঘ-ভাল্লুকগুলোর ভয়াবহ চিত্র কল্পনার চোখে ভাসিয়ে তুলে মনকে সদা ভীত সদা শঙ্কিত ক'রে রাখে। কিন্তু অতীত, তার সুখের দিনের ত কথাই নেই, দুখের দিনগুলোরও সমস্ত অশ্রু-সজল বেদনা মুছে ফেলে এমন সুন্দর সুঠাম মসৃণ ক'রে তাকে চোখের সম্মুখে এনে ধরে যে, কল্পনা-বিলাসী মানুষ অতীতের কথা শুনতে অতীত দিনের-সুখদুঃখের কাহিনী স্মৃতিপটে আঁকতে বড়ো ভালবাসে। আহা সে কতদিনের কথা, কতদিনের চিত্র, বাস্তব জগতে হাজার কাঁদলেও আর তাকে ফিরিয়ে পাব না। কেন না—সে আমি আর নেই, বাগবাজারের সে নিভৃত পল্লীটিও আর সে নেই—"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্"—হ'য়ে গেছে। যাঁর কথায় এত কথা উঠলো সেই মহাপুরুষও কতকাল আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু চিত্রটী আমি উজ্জ্বল ভাস্বর চোখের সম্মুখে দেখছি।

সম্ভবতঃ ১৩১৫ সাল, নিবেদিতা লেনে গিরিশচন্দ্রের বাড়ীর ঠিক পশ্চিম গায়ে বেশ পরিচ্ছন্ন একটী মেটে বাড়ী। বাড়ীটীতে তৎকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক-পূজা-নিরত তেজঃপুঞ্জ-কলেবর এক সদ্ব্রাহ্মণ বাস করতেন, এখানে একটী টোলও ছিল। আমি তখন ১২।১৩ বছরের বালক, এই টোলের নিম্নতম পাঠের ছাত্র ছিলাম। সেবারে সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষার একটী প্রশ্ন নিয়ে ঐ পরীক্ষার্থী ছাত্রদের এবং অধ্যাপক মহাশয়গণের মধ্যেও একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছিল। প্রশ্নটি ছিল এই,—"সন্ধি-সমাসয়োঃ কো ভেদঃ? অর্থাৎ সন্ধি ও সমাসের মধ্যে প্রভেদ কি?" চাঞ্চল্যের কারণ এই, সমাস ছেলেদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত নয়,—তবু অমন প্রশ্ন তাদের কেন দেওয়া হয়। অধ্যাপকমহাশয় মন্তব্য করেন, প্রতিবাদ করা অবশ্য দরকার। কিন্তু করে কে? টোলের ছাত্র বড় বড় কাব্য-নাটকের পড়ুয়া আমরা, বাংলা পড়া বা বাংলা লেখা, "beneath our dignity" এমন অবস্থায় বাংলা কাগজে প্রতিবাদ লিখবে কে? হাত বদলে বদলে বালক হলেও ভার এ হতভাগ্যের উপরই এসে পড়ল। একটু ভীত এবং

বিস্মিত হ'লাম, বুঝলাম, তিরস্কারের পর প্রকাশ্যে বন্ধ হ'লেও আমার লুকিয়ে লুকিয়ে মাইকেল পড়া অধ্যাপক মহাশয়ের দৃষ্টি এড়ায় নি। যা হোক, একটা লিখে তো খাড়া করলাম, কোন রকমে ডোবা তো পার হ'লাম, কিন্তু একি? এবারকার আদেশ একেবারে সমুদ্র-মন্থনের কি না, লেখাটা গিরিশবাবুকে দেখিয়ে নিয়ে এস। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। টোলের অধ্যাপক ছাত্রদের কাছে বাহাদুরি ক'রে "হ-য-ব-র-ল" যা হোক একটা লিখেছি, এটা নিয়ে

গিরিশবাবুর কাছে যাব আমি কোন সাহসে? কিন্তু উপায় কি? আমাদের পূর্ব্বতনেরা গুরুর আদেশেই "অর্কপত্র" খেয়ে অন্ধ হ'য়েছিলেন, কেউ আলের উপর শুয়ে জল নিবারণের চেষ্টা দেখেছিলেন, আমি না হয়, বড় জোর একটা ধমকি খাব, তার বেশী তো আর কিছু নয়। বেলা ৯টা বুকে সাহস বেঁধে দুর্গা দুর্গা ব'লেই রওনা হ'লাম, পাশেই-বাড়ী, এক্ষুনি পৌঁছে যাব। যাব-বটে, কিন্তু পা আর সরে না, এক পা এগোই ত দু'পা পেছোই, এ যেন সেই "শশকস্তু বারঃ সমায়াতঃ"।

যা হোক, বোসপাড়া ঘুরে সিড়ি বেয়ে গিয়ে তো উঠলাম তাঁর সেই ওপরের খোলা ছাদে। ঘরে প্রবেশ ক'রতেই পুরুষসিংহের দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। মনে হ'ল, হ্যাঁ সিংহদৃষ্টি বটে—বুঝি আমার অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখে নিলেন। বুক কেঁপে উঠল, অন্তর বিভ্রান্ত হ'ল। ভাবলাম ধমকিটা বুঝি এখনি খাই।

কিন্তু না, আপাদমস্তক ভাল করে আমার দেখে নিয়ে প্রসন্ন মুখে হাতের ইসারায় বল্লেন "বস"। সাহস পেলাম, আশ্বস্ত হলাম। বুঝলাম—

অধৃষ্যশ্চাধিগম্যশ্চ
যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।"

দেরী হল না একটুও, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসতে হল না, কাল এস, পরশু এস, একটা সোমবার বা রবিবারে এস, তার কিছুই হল না, একটু বাদেই প্রসন্ন মুখে বল্লেন, "কি তোমার?"

ভয়ে শঙ্কিত মনে কম্পিত হাতে লেখাটা ধরে, পরীক্ষার কথা, প্রশ্নের কথা, প্রতিবাদের কথা অধ্যাপকমহাশয়ের আদেশে অজ্ঞ অনভিজ্ঞ একেবারে অক্ষম আমি আমার পাগলামোর কথা বলে, এটা তাঁকে একবার দেখে দিতে অনুরোধ ক'রলাম।

পাঠক, আজকের দিনে খড়ম পায় কাপড়ের খুঁট গায় ক্ষীণকায় ১২।১৩ বছরের অজ্ঞাতকুলশীল একটী ছেলে গিরিশ বাবুর মত প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিকের কাছে তার লেখা নিয়ে দেখাবার স্পর্দ্ধা যদি করে, কি ব্যবহার সে আশা ক'রতে পারে?

আর গিরিশচন্দ্র কি করলেন জানেন? একটু কিন্তু নেই, মুখ চোখে একটু বিরক্তির ভাব নেই, "বড় ব্যস্ত আছি,' কিম্বা "আমার কাছে কেন?" অথবা মুচকি হেসে, "এরি ভেতরে সাহিত্যিক বনে গেছ?" ইত্যাদি কিছুই না, শুধু বল্লেন, "আচ্ছা রেখে যাও, কাল এই সময় আর একবার এস।"

বালকের মন তাঁর মহত্ত্ব কিছুই বুঝলাম না, মুখে কৃতজ্ঞতা জানাবার সাহস বা ভাষা না থাকলেও অন্তরে অন্তরেও এক মুহূর্ত্তের জন্ম কৃতজ্ঞ হলাম না। লোকে মিছি মিছি কত রাজা উজীর মারে, আমার এত বড়ো মারটা, এমন বাহাদুরীটা কেউ দেখলে না, এ জন্তেই দুঃখ হ'তে লাগল।

ফিরে আসবার পথে এক নূতন দুশ্চিন্তা মনকে অধিকার করে বসল, নিলেন তো যদি সবটাই আগাগোড়া কেটে বাদ দিয়ে দেন, টোলের ছেলেদের কাছে কেমন করে মুখ দেখাবো!

যা হোক, নানা ভাবনার মধ্যে রাত কাটলো। ৯টার সময় আবার গিয়ে উপস্থিত। ভাবছিলাম, কত কাজ ওঁর, এর ভেতর নিশ্চয়ই সময় করে উঠতে পারেন নি; বলবেন, "না বাপু, তোমারটা আজ হয় নি, কাল এস।"

কিন্তু কিছু না—

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখক অবিনাশ বাবুকে ইঙ্গিত করা, আর আমার লেখা বেরিয়ে আসা, দেখি একটি জায়গা লাল কালী দিয়ে কেটে বাদ দিয়েছেন, আর সমস্ত প্রবন্ধ থেকে একটা মাত্র কথায় লাল-বন্ধনী দিয়েছেন, বাদ বাকীটায় একটুও রেখাপাত করেন নি। হতভাগ্য আমি অহঙ্কারেই বুকটা ভরে উঠলো, কৃতজ্ঞতায় নয়।

হ্যাঁ, বন্ধনীটানা কথাটা ছিল "মর্ম্মন্তুদ"। তখন পর্য্যন্ত "বিধ্বরুস্তিলেষু তুদঃ" কৃৎপ্রকরণের এই সূত্রটা আমার পড়া হয় নি, কাজেই বিধুন্তুদ (রাহু), অরুন্তুদ (মর্ম্মপীড়ক) এবং তিলন্তুদ (তৈল-ব্যবসায়ী)। আর কোন 'ন্তুদ' যে হয় না, তা আমার জানা ছিল না। ফিরে এলে অবশ্য অধ্যাপক মহাশয় গিরিশ বাবুর অত্যন্ত সুখ্যাতি করতে লাগলেন। তাঁরা সংস্কৃতের অধ্যাপক হলেও যে-ভুলটা তাঁদের নজরে পড়ে নি বাংলানবীশ হয়েও মহাকবি তা অনায়াসেই ধরে ফেলেছেন।

লেখাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, অতুলকে একবার দেখিয়ে দাও আইনের খুঁটিনাটী যদি কিছু থাকে।

অতুল তাঁর কনিষ্ঠ। বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ হাইকোর্টের উকিল ছিলেন।

যে আশঙ্কা নিয়ে গিরিশচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলাম এবং যে ভয় প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া সম্ভব, অতুলবাবুর কাছে তা পেলাম। মুখ বিস্তৃত করে এক ভয়ানক ধমক দিয়ে তিনি বল্লেন, আমি ও-সব পারি নে।

বাপরে! আর সেখানে দাঁড়ায়? খড়মটী পায় দিয়ে টুক টুক ক'রে মহাপুরুষের কাছে আবার এসে বল্লাম, অতুলবাবু ব'কে দিলেন। "হুঃ হুঃ হুঃ"—করে এক প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, ঐ দাও গিয়ে—ঠিক হবে।

ঠিকই হ'ল—হিতবাদী অতি সুন্দর ভাবে ছেপে বার ক'হলে।

হায়! আজ কোথায় তিনি—কোথায় অকৃতজ্ঞ এ নরাধম—যদি একটীবার বলতে পারতাম, একবার জানিয়ে দিতে পারতাম, তাঁর সে উদারতা, দেবতার মত তাঁর সে মহত্ত্ব অধমের মনে কতখানি রেখাপাত ক'রে রেখেছে।

পত্র

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মনে উদ্বেগ গিরিশৃঙ্গের মেঘেরি মতন রহে,
কখন রচিবে হৃদয়ে প্রপাত কহিতে পারে কি কেহ!
পাষাণের বাধা ঠেলে দিয়ে যদি তুষারের ঢল্ বহে,
কেমনে রহিবে মায়া-মমতায় সাজানো প্রাণের গেহ!
মোর জীবনের পাথেয় হয়েছে তোমাদের ভালবাসা,
অন্তর দিয়ে মম অন্তর নিয়েছ হরণ করি'।
যেদিন আমার ফুরাবে জীবন, সেদিন শেষের আশা—
পূরণ করিবে এসে কি হেথায় স্মরণ স্তম্ভ গড়ি!

ধূ ধূ করে মাঠ, হু হু করে মন—কি করি পাই না ঠিক,
ভবিষ্যতের করিনাক আশা শুনিয়া ভাঙার গান।
নব দিবসের সূর্য্য খুজিয়া পাবে কি পূর্ব্ব-দিক?
সহরের পথ শূন্য নীরব, পল্লীতে নাহি প্রাণ।
অনাগত দিন অন্তরালেই ধোঁয়া হয়ে বুঝি রয়,
মানুষের যত কল্পনা তারে বৃথাই খুঁজিছে সদা;
আশাভরসার ভয় ভাবনার কত কথা লোকে কয়,
বিস্মিত হয়ে' শুনে যাই নিয়ে মনের বিহ্বলতা।

এই নিরালায় হারানু আমারে কারে যেন খুঁজে খুঁজে,
দিন-কল্লোলে মুখরিত নহে মর্ম্মের স্বস্তিতট।

সংস্কার সীমা-রেখাগুলি মোর নিভৃতে যায় মুছে,
তুমি যদি এসে শুনাতে রূপসী সুমধুর ছায়ানট!

এসেছি আজিকে ছায়া-ঘেরা ঘন নারিকেল বীথিতলে,
বসিয়া এখন মিহিজামে তুমি আঁকিছ হয়ত ছবি!

ভাষার অতীত কিনারায় তব ভাবের প্রদীপ জ্বলে,
সহরের মায়া ছিন্ন করিয়া চলে গেছ বান্ধবি!

শীতের বাতাস বয়ে যায় ধীরে আমারি আঙিনা দিয়া,
বাঁশের বাঁশীর সুরের নেশায় তরু দেয় করতালি।
গাঁয়ের আকাশ নেমে আসে কাছে প্রাণের কুসুম নিয়া,
ধূলায় ধূসর ছেলেমেয়ে সব সাজায় খেলার ডালি।
হর্ষবিভোল তরু কিশলয় হৃদয় ব্যাকুল করে'
কত কথা কহে, শুনি বসে একা, নাহি মোর কোন কাজ।
হাটের পথিক দল বেঁধে যায় মাঠের পথটী ধরে'
আলোর নাচন পাতায় পাতায় মনকে মাতায় আজ।

মাটির প্রদীপ জ্বালিয়া বিরলে বসে রহি' ঘরে একা,
দুখের রজনী পোহাবে কখন ভাবি নির্জ্জনে তাই!
হয়তো একটু লভিব শান্তি যদি পাই তব দেখা,—
নাহি কোন ঠাঁই এগাঁয়ে আমার, মানুষ কোথায় পাই!
বক্র-কুটিল পল্লী জীবনে যায়নি আঁধার ঘোর,
রাতের আঁধারে পথহারা কাঁদে আলোকের পিপাসায়।
সাত্‌পুরুষের ভিটাতে আবার ফিরিতে হয়েছে মোর,
কেন যে ফিরেছি, কেমনে কহিব বুকভাঙা নিরাশায়!

যাদের লাগিয়া একদা প্রবাসে গেঁথেছি মাল্য কিছু,
তাহারা ভুলিয়া আসে না বারেক আমার ঘরের দোরে;

স্বার্থের পথে ঘুরেছিল যারা পরবাসে মোর পিছু,
গাঁয়ে এসে হেরি কোনমতে তারা চিনিতে চাহে না মোরে।

ভেবেছিনু তারা অতি সমাদরে শুধাবে—কেমন আছি!
শুধাবে জীবন যাত্রা-পথের মঙ্গল-সমাচার;

ভেবেছিনু মোর মনের গহনে ফুটাবে কুসুমরাজি,
হায়রে, অলীক স্বপন রচিয়া আশা করি আজ কার!

পরেশনাথের পথে

শ্রীশোভা দেবী

তিন

একদিন কাকা বল্লেন, "আজ তোমাদের একটা নূতন জায়গায় নিয়ে যাব।" সে দিন হাটবার ছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই বেলা দু'টো বেজে গেল, আমরা একটু পরেই যাত্রা করলাম। ডাক বাংলো ছেড়ে বড় রাস্তার বাম দিকে সবুজ শস্য ক্ষেত্রের মধ্যদিয়ে খানিক দূর গিয়ে একটী চমৎকার জায়গায় এসে আমরা পৌছিলাম। কাকা তখন সকলকে বল্লেন, "এটা হচ্ছে আমার বাড়ী করার জায়গা, এখানে বাড়ী হলে কেমন হয়?"

এই জায়গা নির্ব্বাচন ও বাড়ী করার জল্পনা-কল্পনা কাকা আগে কাউকে কিছু বলেন নি। এই জায়গাটীতে আসার পর সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। সকলেই উৎসাহের সাথে, বাড়ী কোন দিকে হলে ভাল হয়, কোন দিকটার দৃশ্য ভাল ইত্যাদি নানারকম গভীর গবেষণায় নিমগ্ন হলেন। বাস্তবিক জায়গাটী এত সুন্দর তা বলার নয়। যে দিকে তাকান যায় সেই দিকই নয়নানন্দকর। দক্ষিণে অনতিদূরে পরেশনাথ, আর দুই দিকে উত্তর ও পশ্চিমে দৃষ্টির সীমাবদ্ধ পৃথিবীর বহুদূর নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে ঘেরা, সম্মুখে পূর্ব্বদিকে সেই উচ্চভূমি হতে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ ও বন গিরিডি প্রান্ত অবধি খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার বুকে সকাল সন্ধ্যার আলো ছায়ায় কত চিত্রই কত ভাবে অঙ্কিত হতে থাকে। বহুদূরে এই অবাধ দৃষ্টি বিস্তৃতির প্রান্তে গিরিডির নিকটবর্ত্তী কল গুলির চোঙ্ থেকে কাল ধোঁয়ার রাশি অস্পষ্ট রেখার মত দেখা যাচ্ছিল। একটু পরে সেখানে আলো জ্বলে উঠলো, তারার মালার মত সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে; পরেশনাথের ভালে দেখা দিল অংশুমালী। চতুর্দ্দিক ব্যাপী এক গভীর স্তব্ধতা, সে স্তব্ধতা ভয় আনে না, আনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও বিস্ময়; আঁধারের যবনিকা তখন দিবসের আলোকে আস্তে আস্তে ঢেকে দিল। এই জায়গাটী একটী ছোট্ট পাহাড়ের উপর ও সমতল। প্রায় ১৫০।২০০ গজ দূরে, নীচে দিয়ে গিরিডি যাবার রাঙামাটীর পথ চলে গেছে; দুই পাশে তার সোনালি ক্ষেত, তারপরই পাহাড়ের শ্রেণী। জায়গাটীর পিছন দিকে একটী ছোট্ট সাঁওতাল পল্লী আছে। আমরা সকলে প্রায়ই এখানে বেড়াতে আসতাম।

প্রবাসের দিনগুলি এমনিই আনন্দে কেটে যেতে লাগলো। ক'দিনই বা এসেছি, কিন্তু এরই মধ্যে পরেশনাথের মায়া আমাদের জড়িয়ে ফেল্‌লো। আমাদের বাংলোর পাশের ঝরণাটীতে দুপুর বেলা যেতাম ও ঝরণার বুকে বড় একখানি পাথরের উপর সতরঞ্চি বিছিয়ে লুডো ও তাস খেল্‌তাম; কখনও কখনও শুধু গল্পও হ'ত। চারিপাশে জল, তারই কলভাষা আমাদের সাথে তার পরিচয় দেবার জন্য যেন বল্‌তো,—

তোমাদের ভালবেসেছি
কত পুরাতন, কত যে নূতন
সে গাথা গাহিতে এসেছি।

আমাদের ফিরে আসার কিছুদিন পূর্ব্ব হতে আমাদের বাড়ী বেশ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। মধুপুর থেকে বড়দা'রা এসেছিলেন ও চিরকীতে মাছ তরকারী ইত্যাদি পাওয়া যায় না শুনে খুব বড় বড় কতকগুলি রুই মাছ, ফুলকপি, আলু ও সন্দেশ যথেষ্ট পরিমানে সঙ্গে এনেছিলেন। এগুলি আমাদের অন্য প্রকারেও কাজে লেগেছিল। আমাদের বাঙ্গালাদেশ থেকে একদল যুবক সাইকেলে মুর্শিদাবাদ থেকে বেড়াতে বাহির হয়েছিলেন; তাঁহারা বরাবর সাইকেলে গিরিডি হয়ে পরেশনাথে যাচ্ছিলেন। গিরিডিতে আগের রাত্রে তাঁদের খাওয়া হয় নি, মঃ বাবু তাঁদের ২।১ জনের নিকট পরিচিত। থানায় এসে তাঁহারা মঃ বাবুর সন্ধান পেয়ে আমাদের অতিথি হ'লেন আমরা আমাদের কুটীরস্থিত সামান্য আহার্য্য তাঁদের দিয়ে ধন্য হলাম।

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার আগের দিন, ভাইদের কপালে ফোঁটা দেবার জন্যে আমার মধুপুরের ঠাকুরঝি এসে হাজির। সঙ্গে তাঁর ছেলে মেয়েরাও ছিল। পাহাড়ে, বনজঙ্গলের দেশ বলে ভাইদের জন্য নানাদ্রব্য পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড একটী বাসকেট্ আন্‌তেও ঠাকুরঝি ভোলে নি। ঐ সময় নঃ বাবুর একটী বন্ধু পরেশনাথ পাহাড়ে উঠবার সঙ্কল্প নিয়ে আমাদের ওখানে

এসেছিলেন। তারপর দিন বাবা ফের দেওয়ালীর ছুটীতে এলেন; তাঁর সাথেও খাবার জিনিষে পরিপূর্ণ একটা চুপ্‌ড়ি। বলাবাহুল্য এসব গুলিতে আমাদের প্রবাসের পেট-পূজোটা বেশ ভালরকম চলেছিল। তাছাড়া মধুপুর থেকে ঠাকুরঝি আসতে আমাদের বেড়ানটা আবার নূতন করে আরম্ভ করেছিল।

দেওয়ালীর দিন আবার পরেশনাথ পাহাড়ের উপর মন্দিরে উঠ্‌বার আলোচনা আরম্ভ হল—কে কে পাহাড়পথের যাত্রী হবে? আমার ছোট ঠাকুরঝির খুব ইচ্ছা যে সেও ঐ বন্ধুর পথের যাত্রী হয়; কিন্তু কাকার সে রকম ইচ্ছা না থাকাতে, বেচারী মুখখানি গম্ভীর করে সারাদিন রইল, আর আমরা তাকে প্রসন্ন করার চেষ্টায় সারাদিন তার পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগলাম।

মঃ বাবু তার বন্ধু ও ভাইদের নিয়ে, দেওয়ালীর দিন ভোর বেলা পাহাড়পথে যাত্রা করলেন—আবার পথ প্রদর্শক হলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী হাজি সাহেব। তবে আমরা পাহাড়ে সে দিন না যেতে পেলেও, আমাদের সমস্ত দিন মন্দ কাটেনি। থানার ঠিক সামনেই দারোগাবাবুর উদ্যানে একখানি কালী-পূজার আয়োজন হয়েছিল। তিনি ছিলেন কর্ম্মকর্ত্তা। পূজার ও থানার সামনে খোলা জায়গাটীর চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে-ঘিরে তাতে লাল, নীল কাগজের মালা, ফুল ও নিশান দিয়ে সাজান হয়েছিল। দেওয়ালী উৎসবের জন্য ঐ থানার প্রতি চৌকীদারের উপর এক এক ভাঁর বেড়ির তেল দেবার আদেশ হ'য়েছিল। দারোগাবাবুর কল্যাণে বহু সাঁওতাল (স্ত্রী ও পুরুষ) ও ঢাকীর দল জড় হয়ে রকমারী নৃত্য-গীতে আসর সরগরম করে রেখেছিল অষ্ট প্রহর। নাচ গানের উৎসবে যোগ দিতে ঐ অঞ্চলের কোন সাঁওতাল বাকী ছিল না। বহু ঢাক বাজনা শুনেছি কিন্তু এমন চমৎকার বাজনা কখনও শুনি নি; তাদের বেশ-ভূষারই বা কি বাহার! রঙিন পা-জামা, কুর্ত্তা, মাথায় পাগড়ী, তাতে বিচিত্র ঝালর ঝুলছে, পায়ে ঝুমুরের পায়-জোড়, কোমরে ঝুমুরের থোকার মালা ঝুন্‌ ঝুম্‌ করছে; বাজনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিশ্রান্ত তাল রেখে নেচে চলেছে। সেই বাজনার তালে তালে বহু সাঁওতাল ও থানার চৌকীদাররা নাচতে আরম্ভ করলো; কত রকমেরই নৃত্য তার ঠিক নেই। তার মধ্যে একটা নৃত্য দেখলাম যা জীবনে কখনও দেখি নি—নাম War dance, ঐ নৃত্যের ভঙ্গিমায় যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহভেদ, শত্রুহত্যা, যুদ্ধজয় ইত্যাদি প্রকাশ হ'তে লাগলো। যুদ্ধনৃত্যের-ভঙ্গিমা দেখলে মনের মাঝে এক অপূর্ব্ব আনন্দ দোল্‌ দিয়ে যায়। মনে হয়, আমাদের দেশের কত সুন্দর জিনিষই না অনন্ত অবহেলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ধূলায় ধূসরিত হচ্ছে; আর্টের দিক দিয়েও এ নৃত্যের মূল্য বড় কম নয়। আমার মনে হয়, এই-ই আমাদের জাতীয় নৃত্য হওয়া উচিত। পরের মিছে নকল না করে, আমাদের নিজস্ব যে-সব অমূল্য রত্ন অবহেলায়, অনাদরে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, আমরা যদি আমাদের বিগত গৌরবের সেই হারান রত্নগুলিকে তাদের ধূলা ঝেড়ে আবার সগৌরবে তাদের নিজ নিজ আসনে বসাতে পারি তা হ'লে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নূতন উদ্দীপনা, নূতন প্রাণ আসবে। ঐ যুদ্ধনৃত্য একবার দেখলে মনের মাঝে এমন একটা ছাপ রেখে যায়, যা জীবনে মুছে যাবার নয়।

একটী সাঁওতাল যুবক, রং তার কষ্টিপাথরের মত কাল, চেহারা যেন কাফ্রী, অন্য সকলকে lead কচ্ছিল। তাদের নৃত্য দেখে খুসী হয়ে সেই কাফ্রীকেও (কাকার দেওয়া নাম) প্রধান ঢাকীকে আমরা বক্‌সিস্‌ না দিয়ে থাকতে পারলাম না। সন্ধ্যাবেলা শুনে এলাম যাত্রা হবে এবং সাঁওতাল মেয়েরা নাচবে। এ-দিকে রাত বেশী হয়ে গেল তখনও পরেশনাথ পাহাড়ের যাত্রীরা বাড়ী ফিরলেন না, আমাদের সকলেরই একটু ভাবনা হ'ল; এমন সময় দারোগাবাবু মধুবনে দেওয়ালী উৎসব দেখতে যাব কি না জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন।

আমরা bus-এ উঠছি, এমন সময় পাহাড় পথের যাত্রীরা ফিরে এলেন। তাঁরা এবারে পরেশনাথের উচ্চতম শিখরে উঠে এবং মন্দিরে জৈন দেবতা মূর্ত্তি দর্শন করে ও যাহা সকলের ভাগ্যে হয় না, মন্দিরের প্রাঙ্গনে বসে, সেই মুক্ত নভতলে গরম প্রসাদ ভক্ষণ করে ফিরে এলেন। শুধু আমাদের এই তিনটি দুর্ব্বল প্রাণীর ভাগ্যেই সে পর্ব্বত শিখরস্থিত দেব দর্শনের সুযোগ আর ঘটে উঠল না। আমরা দেবতার সে উচ্চ পাদপীঠের তলদেশে থেকেই তাঁহাকে সে দিন নমস্কার করে ফিরেছিলাম এবং আজও আবার এই

অমাবস্যার রাত্রিতে তাঁহাকে আমাদের প্রাণের নিবেদন জানাতে চলেছি।

মঃ বাবুরা ঠিক সময়েই ফিরিয়াছেন, ভালই হল। উৎসবের উন্মাদনা এমনি যে মঃ বাবু ও তাঁর সঙ্গীরা ক্লান্তি বোধ না করে ফের সকলে মিলে একখানি বাস বোঝাই হয়ে মধুবনে দেওয়ালী উৎসব দেখতে চল্লেন। শীতের শিশির সিক্ত প্রভাতেই সে দিন পরেশনাথ পাহাড়ে উঠেছিলাম কিন্তু আজ অমাবস্যার এই সূচীভেদ্য অন্ধকার রাত্রে পরেশনাথের কোলে এসে তার মহান ও ভীষণরূপ দেখে মনের মাঝে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সমন্বয় হল। মধুবনের জৈনমন্দিরগুলিতে খুব বেশী আলো দেওয়া না হলেও অনেক ঝাড় লণ্ঠনে, আরতির ধূপ-ধুনা ও ফুল-চন্দনে চারিদিক উৎসবময় করে তুলেছিল। জৈনভক্ত এই স্থানে মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি সুন্দর একাগ্রতার সহিত, সুউচ্চ পর্ব্বতোপরি দেবতাকে আরতি করতে লাগলেন, তাহা দেখে আমরা মুগ্ধ হ'লাম। মন্দিরে তাঁহাদের স্তববাণী শুনে প্রীত হলাম। দারোগাবাবু আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বল্লেন, "জৈনদের প্রকৃত উৎসব আর ছ মাস পর থেকে আরম্ভ হবে; প্রতি বৎসরই সেই উৎসবের সময় ভারতের নানা দেশ থেকে বহু সহস্র সহস্র জৈন যাত্রীরা আসেন।" পূর্ব্বেই বলেছি, মধুবন দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। আমরা জৈন মন্দিরগুলি বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম। মন্দিরগুলির ভিতরে ব্রঞ্জের, স্ফটিকের ও শ্বেতমার্ব্বেল পাথরের পার্শ্বনাথ, মহাবীর প্রভৃতির নানাবিধ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আবার দেওয়ালী উৎসব দেখতে গেলাম। থানার সামনে লোকে লোকারণ্য; যত সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ তাদের বিচিত্র বেশে উৎসবে যোগ দিতে এসেছে। দুই তিন সারি সাঁওতাল মেয়ে, দুই তিন দলে বিভক্ত হয়ে নৃত্য সুরু করে দিয়েছে; পুরুষেরা তালে তালে নানা অঙ্গভঙ্গীতে মাদল বাজাচ্ছে। মেয়েরা গায়ে ঘেঁসাঘেসি করে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নীল সাগরের ঢেউয়ের মত দুলে দুলে নাচছে। তাদের মাথার খোঁপা পরিপাটি করে বাঁধা, তাতে গ্যাঁদা ফুল গোঁজা; পরস্পরের হাতের ভিতর দিয়ে হাতগুলি নাচের অনুরূপ দোলাচ্ছে। তাদের এই আড়ম্বরহীন পরণ পরিচ্ছদ, সুন্দর স্বাস্থ্য ও আনন্দ দেখলে মনে হয় এরাই সজীব মানুষ। সভ্যতার গণ্ডীর মধ্যে পড়ে বেশীর ভাগ মানুষের জীবন আজ প্রাণহীন। এরা তা নয়; পরেশনাথের কোলে, বনস্পতির ছায়ায় প্রকৃতির সাথে এরা মানুষ হয়ে উঠছে, তাই ভব্যতার কোন ধার ধারে না। রোগের কোন যন্ত্রণা জানে না—মুক্ত পাখীর মতই যেন এরা স্বাধীন। দেওয়ালীর পরদিন বিকালে আবার গান বাজনা ও উৎসব সুরু হল। মেলা বসেছে; খাবারের দোকান ও ঘোড়ার নাগর দোলা এসেছে। মধুপুরের ঠাকুরঝির ছেলেরা তাতে ঘুরপাক খেয়ে ভারী খুসী। তারা ঠাকুরঝিকে রেখে, তাদের কাকার সাথে মধুপুরে চলে গেল। তাদের কাকাও ক'দিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন ও আমাদের আনন্দটা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে এল; এখান থেকে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী পালগঞ্জের রাজকুমার মেলা দেখতে এসেছিলেন। পূর্ব্বেই বলেছি, মঃ বাবু কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না, তাঁর মোটরখানি আমরা বেড়াবার জন্য চেয়ে নিলাম। আমরা মেলার সেই হৈ-চৈ ছেড়ে, পরেশনাথের দিকে নির্জ্জন পথে অনেক দূর অবধি বেড়িয়ে এলাম। ফিরবার সময় দেখি, মেলার সব নৃত্য গীতের দল, বাজনাসহ দেওয়ালীর প্রতিমাখানি আমাদের ঐ পথেই একটা ঝরণা-নদীতে বিসর্জ্জন দিতে এসেছে। নিস্তব্ধ নির্জ্জন শালবনের মধ্যে সানাইতে কি করুণ সুর বেজে উঠেছে। বিসর্জ্জন হয়ে গেল; সমুদয় জনস্রোত নীরবে বাড়ী ফিরতে লাগলো। বিসর্জ্জনের পর বাজনার মধ্যে কেমন একটা বিষাদের সুর ধ্বনিত হতে লাগলো। সোনার বাঙ্গালার সে বিজয়ার করুণ একটা ভাব ও সুর সুদুর এই শালবনের মধ্যেও কে যেন এনে দিল। আমরা মোটর থেকে নেমে বিজয়ার সে নীরব শোভাযাত্রার সঙ্গে ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ী ফিরলাম।

তারপর দিন মহাসমারোহে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা দিয়ে, ঠাকুরঝি মধুপুর চলে গেল। একে একে আমাদের সকল অতিথিই যেতে সুরু করলেন; কিছুদিন প্রাণভরে সকলে মিলে আনন্দ উপভোগ করার পর হঠাৎ যেন চিরকী ত্যাগের বিদায় ব্যথা ভাল করেই জেগে উঠলো। পরেশনাথের কোলে মুখরিত এই আনন্দের দিনগুলি আমাদের

জীবন-খাতার পাতায় স্মৃতির কালিতে লেখা রইল। কোথা দিয়ে যে এই নির্জ্জন জনমানবহীন ভীষণ শালবনে ঘেরা পাহাড়ে দেশে; আমাদের দিনগুলি, ঐ পাহাড় নিসৃত ঝরণার স্রোতের মতই কেটে গেল, তা টের পাইনি।

ফিরে আসার দিন আসন্নপ্রায়। আবার গোছান সুরু হল—ঠিক হল এবার ইস্ত্রী দিয়ে না গিয়ে, মোটরে গোমো ষ্টেসনে গিয়ে ট্রেণ ধরতে হবে। গোমো ষ্টেসন ওখান থেকে ৪০ মাইল দূর, মোটরে যেতে হবে। ঐ পথেই ৩০ মাইল দূরে তোপচাঁচি নামে যে জায়গা আছে, সেটী দেখার জন্যই আমাদের এই motor পথে যাত্রার আয়োজন। তোপচাঁচিতে পনেশনাথ পাহাড়পুঞ্জের পূর্ব্বপ্রান্তে একটী নদীর মুখে বাঁধ দিয়া রাখা হয়েছে; নদীটীর তিন দিকেই পাহাড়। পাহাড় থেকে যে স্থানে সমতল ভূমিতে নদীটী নেমে আসছে সেখানে ৮০ ফিট উঁচু একটী ব্রিজের আকারে বাঁধ দিয়া তাহাকে একটি প্রকাণ্ড হ্রদরূপে পরিণত করা হয়েছে। এই হ্রদের জল থেকে ঝড়িয়া coal-field সমূহের জল সরবরাহ হয়। পরিমিত পরিমাণের অধিক জল বৃদ্ধি হলে তাহা বাহির হয়ে যাবার রাস্তা আছে। এই বাঁধটী ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার একটী চরম উৎকর্ষ। এই বাঁধটীর দ্বারা এই উঁচুতে তিনদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত যে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে, তাহা জগতের একটী অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের আধার। ইহার আয়তনও কম নয়; ৭ মাইল ইহার ব্যাস। এই ৭ মাইল হ্রদটীকে ঘিরিয়া পাহাড়ের কোল দিয়া মোটরের রাস্তা; মোটরে হ্রদটীকে প্রদক্ষিণ করে বেশ উপভোগ করা যায়। আমরা এ সৌন্দর্য্যের প্রলোভন ত্যাগ করতে না পেরেই এই পথে আসা স্থির করলাম ও মোটরে তোপচাঁচি দেখে গোমোতে এসে ট্রেণ ধরলাম। হাজি সাহেব আগে থেকেই ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন।

বিদায়ের অস্ফুট উষা আমাদের জানিয়ে গেল—গা তোল। পরেশনাথ তার কি মোহিনী মায়ার স্পর্শ-ই না আমাদের হৃদয়ে মনে বুলিয়ে দিয়েছে—কিন্তু উপায় কি?

"সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে—".

বেলা ১০টায় মোটর আসার কথা। হাজি সাহেবের স্ত্রী এবং তাঁর মেয়ে ও বৌদের সঙ্গে দেখা করে এলাম। তাঁরা উর্দ্দুতে অনেক কথা বল্লেন—"আপনাদের জন্য মন কেমন করবে, আবার কবে আসবেন, ইত্যাদি।" আমরাও তার যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এলাম। দু'খানি বেশ বড় ও নূতন মোটর দারোগাবাবু আমাদের যাবার জন্য ঠিক করে দিয়েছিলেন; যথাসময়ে খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা মোটরের অপেক্ষায় রইলাম। সেই দিন বেলা ১০টার সময় দারোগাবাবুর স্ত্রী সেখানে এলেন। তখনই আমরা তার সাথে একটু আলাপ করে তাঁকে আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে মোটরে এসে উঠলাম। মোটর ছুটলো।

পরেশনাথের প্রতি ধূলা কণাটীর সথেও এই ক'টী দিনে আমরা বড় পরিচিত হয়েছিলাম। তাই আমাদের বিদায়-ব্যথা আজ ঝরণার কলধ্বনিতে শস্যক্ষেত্রের শ্যামবক্ষে আমাদের শান্তি কুটীরে, রাঙামাটীর চোখ জুড়ান পথে, শালবনের ছায়ায় যেন ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যেন আজ—

"যাবার বেলায় পিছু ডাকে।"

আর পরেশনাথও আমাদের পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে যেন সামনে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বকবির ভাষায় যেন বলছে,

"তোমারে যেতে নাহি দিব।"

আমাদের মুগ্ধ মৌন হৃদয় বলছিল—হে বিরাট অচলায়তন! তোমার কোলে জীবনের যে ক'টী শুভ মুহূর্ত্ত কাটিয়ে গেলাম, আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে তা চিরনূতন হয়ে জেগে থাকবে। তোমার এই সবুজের চিরমহোৎসবে আবার যোগদান করার সৌভাগ্য হবে কি না জানি না, তোমার পুণ্যতোয়া সীতার গীত মুখরিত তীরে আবার বেগবে কি না বলতে পারি না, তোমার দুর্গম পথের পথিক হলে বিস্ময় ও আনন্দের ভিখারী হব কি না জানি না তবু তোমায় ভুলব না কোন দিনই। আজ তোমায় বিদায়-ব্যথায় মৌন অভিষেকে সিক্ত করে চলেছি। আর যদি কোন দিন তোমার দুর্গম রাঙাপথের পথিক নাই হই তবুও হে মহান, হে প্রদীপ্ত; আমাদের অন্তরে চির দীপ্যমান হয়ে থাকবে চির দিন—আজ যাবার বেলায় আমাদের বিদায় অভিবাদন গ্রহণ কর।

অধীনতার মোহ

শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

Brilliant boy, Good scholar ইত্যাদি খ্যাতি কোনও দিন পাইলাম না, আজকাল প্রায়ই এই কথাগুলি বয়ঃকনিষ্ঠদিগের নামের অগ্রে সংযুক্ত দেখিয়া মনে মনে তাহাই ভাবি।

নিতান্ত শিশুকাল হইতে সাবডিভিসনের স্কুলে বাবার হাকিমত্বের খাতিরে বাঁধাগত মুখস্থ করিয়া কোনরূপে পাশ করিয়া গিয়াছি মাত্র, তাও নিতান্তই পাশ। উপরিউক্ত বিশেষণগুলি নামের অগ্রে কোনও দিন ব্যবহৃত হইতে শুনি নাই, তবে অন্ত কি কি গুণবাচক বিশেষণ ব্যবহার হইত কিম্বা হইত কি-না, তাহা এখন লজ্জিতবদনে অনুমান করিয়া থাকি। তবে মা স্নেহবশতঃ বলিয়া থাকেন যে, ছোটবেলায় নাকি নিতান্ত ভাল মানুষ ছিলাম।

একটি স্কুলঘটিত বাল্যঘটনা আমার স্মরণ আছে—সেটির উল্লেখ করিতেছি, আশা আছে যে, সেই সময়কার বাল্য-সহপাঠিগণের চক্ষে ইহা পড়িলেও নিতান্তই আমার জীবনের ঘটনা বলিয়া তাহারা নাও মনে করিতে পারে। ঘটনাটি এই: এখনকার ক্লাস সেভেন তখনকার ফোর্থ ক্লাসে উঠিয়া অকস্মাৎ শুনিলাম ইংরাজীতে Essay লিখিতে হইবে। শুনিয়া মস্তকে প্রায় বজ্রাঘাত হইল। সে কেমন করিয়া লিখিব? ইংরাজীতে? স্বরচিত? ওরে বাবারে! ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী আসিলাম। বাবা তখন বেতিয়ায় পোষ্টেড। বাড়ী আসিয়াই দেখি দাদা আইনের বই খুলিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। তাঁহার তখন 'ল' দিবার অভিপ্রায় ছিল বোধ হয়। স্কুল হইতে ফিরিয়াই তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা দাদা, গরুর essay কি করে লিখব?

দাদা বলিয়া দিলেন, ও আর কি, এই রকম করে আরম্ভ করবি The cow is a domestic animal, তারপর গরুর বর্ণনা দিয়ে গড় গড় করে লিখে যাবি, বুঝলি?

এই গড় গড়টি নিতান্ত সহজ না হইলেও বলিলাম, বুঝিলাম। পরে ক্লাসে সৌভাগ্যবশতঃ গরুর essay লিখিতে দিল। তাহা লিখিলাম। সভয়ে খাতা দিয়া কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষুতে রক্তিমা না দেখিয়া ভবিষ্যৎ essay সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। তখন হইতে নির্ব্বিঘ্নে কুকুর, বিড়াল, সকল essay একরকম লিখিতেছিলাম।

কিন্তু হায়রে! অদৃষ্টে বিপদ যেন তাক করিয়া থাকে—কখন সে মানুষকে আক্রমন করিবে। আর এতো আমি ছেলে-মানুষ।

আর একদিন essay লিখিবার ক্লাসে সিংহের essay লিখিলাম The lion is a domestic animal. ইহার পর মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষু ও মুখের ভঙ্গিমা সহজেই অনুমেয়। মার খাই কম, সে বোধ হয় মুন্সেফের পুত্র বলিয়া।

এইবারে আমার পরবর্ত্তী জীবনের বিশেষত্বটুকু এই যে, ম্যাট্রিক, আই-এ এবং বি-এর গণ্ডি পার হইয়া আসিয়াছি একরকম করিয়া। এবং পিতার হাকিমীত্বের ইনফ্লুয়েন্স ইউনিভার্সিটিতে আমাকে সাহায্য করে নাই বলিয়াই মনে হয়।

অতঃপর আইন পড়িতে এখানে আসিয়াছি। অবশ্য আইন পড়িবার প্রধান কারণ এই যে, সাবজজ্ পিতার কল্যাণে জুডিসিয়াল সার্ভিস্ হয়ত' মিলিতেও পারে।

দাদা এইখানেই সেক্রেটারিয়েটে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আছেন। আইন পাশ তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় নাই এবং দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার ভাল মাহিয়ানায় এই চাকুরীটা হইয়া গিয়াছে। বৌদি ও ছেলে মেয়েরা এখানেই আছে। সেই জন্ত হোষ্টেলে না থাকিয়া আমি দাদার বাড়িতে আসিয়া উঠিলাম।

দুই

কলেজে এ্যাডমিশন্ লইয়া আইনের পুস্তকগুলি কিনিয়া প্রথমে পড়াশুনা অল্পসল্প আরম্ভ করিলাম। পাশ করিতে হইবে ত'। কিন্তু সহরবাসী স্মার্ট বন্ধুগণ সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেছে, "পাগল নাকি? এখন পড়া কিসের? বই ছুঁবি সেই পরীক্ষার পোনের দিন আগে। বি-এ পাশের জন্তে পড়ার কষ্ট অর্থাৎ গায়ের ব্যথাটা সারিয়ে নিতে হবে তো। এখন খালি আড্ডা, গান, গল্প, সিনেমা, ফটোতোলা এই

সব।" উপদেশটি অবশ্য চিত্তাকর্ষক। তবুও কাঁচুমাচু মুখে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "কিন্তু প্রফেসার উত্তর না পেলে অসন্তুষ্ট হবেন না ?

উচ্চ অট্টহাসির রোলে সঙ্কুচিত হইয়া গেলাম। মন্তব্য পাশ হইল, "প্রাপ্তবয়স্ক শিশু।" সমীর বামপদের জুতার গোড়ালীতে ভর দিয়া একপাক ঘুরিয় একটা ইংরাজী সুর ট্রা-লা-লা করিয়া একবার ভাঁজিয়া আঙ্গুলের টোকায় সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, Never speak like that my boy. সোজা জবাব দেবে, স্যার, Earthquake-এ আমার বাড়ী damaged এবং বইগুলো হয়ত' এখনও debris এর তলায় রয়েছে।

শিশির প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিল. What an idea. বলা বাহুল্য সালটা ছিল ১৯৩৫।

গ্রাম্য অপবাদের ভয়েও কতকটা এবং নূতন ষ্টাইল শিখিতেছি তাহার উন্মাদনাবশতঃও খানিকটা উহাদের উপদেশ মত চলিতেছি। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সহরটা প্রায় দেখা হইয়া গেল। তাহারপর দিনগুলি বড়ই দীর্ঘ বোধ হয়। খানিকটা পড়ার বই ঘাঁটিয়া এবং অধিকাংশ সময় নভেল পড়িয়া দিনগুলি কাটিতেছে। সকালে কলেজে ঘুরিয়া আসিয়া স্নানাহার সারিয়া নভেল হস্তে শয্যাগ্রহণ করি এবং পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ি।

সেদিন ঘড়ির শব্দে নিদ্রা টুটিয়া গেল, চাহিয়া দেখি তিনটা। পশ্চিমের এই ভীষণ গরমে ৬টা ৬॥ টার আগে বাড়ী হইতে বেরুনো অসম্ভব। উঠিয়া পড়িয়া ঘুমের চোখে জল দিয়া, ফ্যানটা চালাইয়া জানালার পাশে ইজিচেয়ারটায় বসিলাম।

খোকা ঘুমাইয়া আছে, বাড়ীটি তাই স্তব্ধ। বৌদিও নিদ্রামগ্না। এই স্থলে বলিয়া রাখি বৌদি ঘুমাইতে বড় ভালবাসেন, দিবানিদ্রা তাঁহার চাইই। তাঁহার দৈহিক পরিধিবৃদ্ধির কারণ ঘুম—একথা বলা সত্ত্বেও বৌদির দুশ্চিন্তা যে কিছুমাত্র হয় নাই, তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই বুঝা যায়। একবার নাকি খোকা দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কোন্ জন্তু সবচেয়ে বেশী ঘুমায় ?"

দাদা বিরক্ত হইয়া জবাব দিয়াছিলেন, "তোর মা।"

পাশের বাড়ীর কোলাহল কিন্তু পুরাদমে আরম্ভ হইয়াছে। ওই বাড়ীর গৃহিণীর কণ্ঠস্বর বেশ উঁচুতেই ধ্বনিত হইতেছে, "ওরে রামা, উনুনে আগুন দিতে বল, ওঁর আসবার সময় হল যে।"

উত্তর আসিল বিকৃত বাংলায়, "বলেসি মায়জী।"

"তবে বাবাজীকে বল আটা বের করে মাখুক এবার। নীরু যাতো মা চাবিটা দিয়ে আয় বাবাজীকে, ভাঁড়ার খুলে আটা বের করুক।"

সম্ভবতঃ নীরুই কহিল, "ওমা আজ ডালপুরী করতে বল।"

টুকরা টুকরা কথাগুলি কানে আসিতেছে। আমার ঘরের এই জানালাটি খুলিলে ওঁদের বাড়ীর সমগ্র উঠান, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দাটা পুরা দেখা যায়।

পাশের বাড়ীখানি একটি উকিলের বাড়ী। ভদ্রলোক হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করেন। নামটি ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়। গৃহিণী, কর্ত্তা ও পুত্র-কন্যায় মিলিয়া পরিবারটির সংখ্যা ৮।৯ জন হইবেন। জন তিনেক ভৃত্য, পাচক ব্রাহ্মণ এবং বাড়ীর ধরণ-ধারণ দেখিয়া মনে হয় ভদ্রলোকের প্র্যাক্‌টিস্ ভাল। তবে, উকিলস্য অবস্থাং উকিলং ন জানাতি তো কুতঃ আমরা।

আসিয়া পর্য্যন্ত এই বাড়িখানি চোখে পড়িতেছে। না পড়িয়া উপায় নাই, কারণ পূবদিক দিয়া হাওয়া-আসে বলিয়া ইজিচেয়ারখানি জানালার পাশে রাখা আছে, অতএব খোলা জানালার পাশে বসিলেই ইহাদের গৃহস্থালির অনেকখানি অংশই চোখে পড়ে।

প্রথম প্রথম জানালা খুলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতাম। কিন্তু বৌদি বলিলেন যে, না খুলিবার কারণ নাই ; কারণ উহাদের অর্থাৎ বৌদি এবং বৌদির বন্ধু ত্রিলোচনবাবুর স্ত্রীর চোখে আমি নাকি নিতান্তই ছেলেমানুষ, কাজেই লজ্জা করাটা নিতান্তই অহেতুক এবং গরমে পচিয়া মরিব আমিই। শেষ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি লজ্জা ছাড়িয়া জানালা খুলিতে আরম্ভ করি এবং দেখি বৌদির কথাই ঠিক, ত্রিলোচন বাবুর স্ত্রী লজ্জা ত' দূরের কথা, আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না, হয়ত' বৌদির ছোট দেবর বলিয়া।

দুপুরের দিকে ইজিচেয়ারে আসিয়া বসিয়া থাকি অনেক সময়, কাজেই ইহাদের বৈকালিক প্রারম্ভটা প্রায়ই আমার চোখে পড়ে।

গৃহকর্ত্তা চারটা নাগাদ কোর্ট হইতে ফেরেন। তাঁহার জলযোগের আয়োজন-নিমিত্ত তিনটা হইতেই এই গৃহের কর্ম্ম-ব্যস্ততা সুরু হয়।

গৃহিণী উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বারান্দার একপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিয়া সংসার পরিচালনা সুরু করেন, অর্থাৎ রাঁধুণী রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত হয় এবং অন্যান্য ভৃত্যগণ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আরম্ভ করে।

ছেলেমেয়েরা আসিয়া খাবার-তাগিদ দেয় ও বকুনী খায়। ছোটটি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে।

এই সময় আমার চোখে পড়ে উঁহাদের পুরাতন ভৃত্য রামাকে। সংসারের সকল কর্ম্মের মূল ধরিয়া আছে সে। বাবাজীকে আটা মাখিয়া দিতেছে। গৃহিণীকে কুটনার সরঞ্জাম আনিয়া গুছাইয়া দিতেছে। অন্যান্য ভৃত্যদের আঙ্গিনা ধুইতে আদেশ দিতেছে। বাহিরের ঘর পরিষ্কার হইল কিনা, এক্ষুনি বাবু আসিবেন, তদারক করিতেছে। খোকাকে ভুলাইতেছে।

উপর হইতে কেহ কোন জিনিষ চাহিলে দৌড়াইয়া পৌঁছাইয়া দিতেছে।

গৃহিণীকে এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া দিল।

খাদ্য প্রস্তুত হইলে সকলকে ভাগ করিয়া দিল। এমনি নানাকর্ম্ম, যেন চরকীর মত সে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সকালে বাজার করিতে যাইবে। রাত্রে গৃহকর্ত্তার সেবা সম্পন্ন করিয়া তবে বোধ হয় তাহার ছুটি মিলে। খাসা চাকরটি।

প্রায়ই তাহার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া বৌদির বাড়ীর চাকরগণের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখি। ইহার কাছে তাহারা একেবারে অপদার্থ। কথা বলিলে বুঝিতে পারে না, হাঁ করিয়া খালি চাহিয়া থাকে। আর বৌদি বুঝাইতে না পারিয়া অধিকাংশ কাজ আপন হাতে করিয়া লয়েন।

বলিলে বলেন, "আর শেখাতে পারিনে বাবা ও বক-বকানির চেয়ে নিজে করে নেওয়া ঢের ভাল।"

আমি বৌদিকে বলি, ওদের বাড়ীর রামাকে দেখ, কেমন কাজ করে। তুমি শেখাতে পার না?

বৌদি বলিলেন, ও বহুকালের চাকর, ওর কথাই আলাদা। তবে হঠাৎ কি একটা মনে হওয়ায় বলিয়া উঠিলেন, ওর কাজই দেখেছ, গুণতো জান না। একটি কথা বললেই রাগ, আবার মাঝে মাঝে এমন উধাও হয় যে, আর পাত্তাই মেলে না। তখন গিন্নির সব হাঁপা সামলাতে হয়।

আমিও উত্তর দিলাম কিন্তু বারমাস ত' তোমার গিন্নির হ্যাঁপা ওই সামলায়।

বৌদি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, তা বটে।

তিন

পাতলা, একহারা, মসৃণ, কোমল, কালো ওই ছোকরা-চাকরটা কি দৌড়াদৌড়ি না করে। উহার আলস্যহীন কর্ম্ম-দক্ষতা আমাকে বিস্মিত করিতেছিল, সম্প্রতি মুগ্ধ করিয়াছে। মুগ্ধ হইবার কারণটা বলিয়াই ফেলি।

সেদিন আমি বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম, নস্যিটা কাকে দিয়ে আনাই। আপনি লইয়া আসিব ভাবিয়া এবং ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি কিন্তু পথের উপর খর রৌদ্রের আধিক্য দেখিয়া নামিতে সাহস করিতে ছিলাম না। কারণ মাথাটি বরাবর একটু দোবস্ত আছে। রৌদ্র জল কোনও জিনিষ বরদাস্ত হয় না, অল্পেই মাথা ধরিয়া যায়। মাথা ধরিলেই বমি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। ভারি upset করিয়া দেয়। কাজেই—এমন সময় দেখি, রামাও বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ব্যস্তভাবে চলিয়াছে, সম্মুখে আসিয়া পড়িতে প্রশ্ন করিলাম, কাঁহা যাতা হায় রামা? 'জী' বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া এক লম্বা- সেলাম দিয়া বলিল, "গাড়ী বোলানে যাতা হায় হুজুর, মালিক কন্‌সালটেসন মে যায়েঙ্গে।" Consultation! এ নির্ঘাত আমার "র" নস্যি আনিতে পারিবে সুগন্ধি নস্যি আনিয়া ভুল করিবে না।

বৌদির চাকরটা কনসালটেসান উচ্চারণই করিতে পারিবে না, মানে ত' দূরে থাক। কাজেই তাহাদের কাছে 'র' এবং পরিমল এক হইয়া যায়। এসব চিন্তা ক্ষণিকের ভিতর শেষ হইয়া গেল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "হামরা একটো কাম সকোগে রামা?"

সোৎসাহে সে বলিয়া উঠিল, "জী হুজুর বলিয়ে।"

তৎক্ষণাৎ পয়সা ও নাম দুই বলিয়া দিলাম।

যথাসময়ে আনিয়া দিল। দামও এদিক ওদিক হইল না। লোকটা বাস্তবিক ভাল, চোরও নয় মনে হচ্ছে। ওদের কপাল ভাল। একেই বলে Good servant।

চার

দেখিতে দেখিতে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। পড়াশুনা ডেব্রিজের তলায় চালান দিয়া, পরের হইয়া প্রক্সি দিয়া ল' কলেজের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আড্ডা দিয়া সময় কাটিতেছিল মন্দ নয়।

মধ্যে অবশ্য একবার অপ্রতিভ হইয়াছিলাম একটু। নিত্য কাঁহাতক মিথ্যাকথা কহা যায়। সপ্তাহে একবার প্রশ্ন করিলেও উত্তর মেলে না। অবশেষে একদিন প্রফেসার ভগবতী সহায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, নিতান্ত অবান্তর প্রশ্ন, তোমার দাদার নাম কৃষ্ণগোপাল ব্যানার্জ্জি, নয় কি?—Your brother's name is Krishnagopal Banerji, is'nt it?

মনে মনে শিহরিয়া মুখে জবাব দিলাম, Yes Sir.

তুমি তাঁর কাছেই থাক?—Do you live with him?

Yes Sir.

এই পর্য্যন্ত কথোপকথন হইলেও আমার মনে হইয়াছিল, ইহারই নাম বোধ হয়, "সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।" অর্থাৎ তোমার দাদা অফিস করেন অক্ষত দেহে, এবং অক্ষত বাড়ীতে আছেন, তবে তোমার বইগুলি সমাধিস্থ হইল কেমন করিয়া।

দুঃখের বিষয় স্মার্ট বন্ধুগণ বিশেষ সাহায্য করে নাই এ বিষয়ে। ইহার পর হইতে ল'বুকগুলি একটু নাড়াচাড়া করি এবং প্রশ্নের জবাব দিতে প্রয়াস পাই।

দিন কাটিতেছে। হঠাৎ ভাগলপুর হইতে মার পত্র আসিল, শীঘ্র ভাগলপুরে যাইতে হইবে এবং তাঁহাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া আসিতে হইবে।

মাকে লইয়া কলিকাতায় গেলাম। ছোট বোনটি বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, তাহারই বিহাহের চেষ্টার জন্য, মা তাহাদের লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আজ ফিরিব, কাল ফিরিব করিয়া কলিকাতায় দিন পনের রহিয়া গেলাম।

দুই চারি জায়গা হইতে নীতাকে দেখিতে আসিতেছে। ঘটকেরা মহাউৎসাহে পাত্রের পিতা ও বন্ধুগণকে আনিয়া হাজির করিতেছে। একটি নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইতেছিল।

পাত্রী দেখিবার প্রথায় এত রকম বিশেষ বিভাগ আছে তাহা জানিতাম না। কত দূর সে পড়িয়াছে, নৃত্যকলা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আছে কি না, কোন্ কোন্ শিল্পকর্ম্মে সে নিপুণা ইত্যাদি প্রশ্ন পাত্রের বন্ধুরা করেন। আবার পিতারা আসিয়া রন্ধন, গৃহকর্ম্মের নিপুণতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন এবং পুত্রেরা আসিয়া নৃত্য, সঙ্গীত ও বিদ্যা সম্বন্ধে খোঁজ খবর লন। এ এক মহাসমস্যা। ১৬।১৭ কিম্বা বড়জোর ১৮ বৎসর বয়স, ইহার মধ্যে এতগুলি বিষয়ে পারদর্শিনী হইতে হইলে বিশেষ প্রতিভাশালিনী হওয়া প্রয়োজন। সেটা একটা বড় কথা, এবং মোটামুটি যাহা ধারণা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে মনে হয়, বিবাহের পূর্ব্বে যত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা থাকুক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত বিবাহিতা নারীর নিকট সংসার চাহে সু-গৃহিণীত্ব ও সুমিষ্ট স্বভাব।

যাহা হউক, পাত্রী দেখানো এবং পণ-সমস্যা এক বিরাট ব্যাপার। ক্রমে ক্রমে এটা বুঝিতে পারিলাম যে, কন্যা দেখা গৌণ ব্যাপার, মুখ্য হইতেছে পণ-মীমাংসা।

পাত্রী দেখিবার পূর্ব্বে তাঁহারা জানিয়া লন, পিতার অবস্থার কথা, তৎপর পাত্রী দেখেন।

আর একটি বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম যে আধুনিক যুবারা বিবাহের পূর্ব্বে পিতা মাতার বিশেষ বাধ্য হ'ন। পিতা যত অসম্ভব পণ চাহিয়া বসুন না কেন এই সব শিক্ষিত যুবাগুলি পিতার এই নির্লজ্জতায় বিন্দুমাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন না, নিঃস্পৃহচিত্তে ভাবিতে থাকেন—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম ইত্যাদি।

হয় ত' ভাবেন দুই এক মাস পিতাকে ভক্তি করিয়া যদি অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভ হইয়া যায় তো মন্দ কি।

নীতা মেয়েটা ছোট বেলায় ভারী স্মার্ট ছিল। স্কুলে তাহার পড়াশুনা, খেলা-ধূলায় সে নাম-পুরা বর্ব্বয়ঃ ছিল। কবিতা, গান, আবৃত্তি ত' মুখে লাগিয়াই থাকিত। সেই বিবাহের নামেই যেন সলজ্জা সঙ্কুচিতা লজ্জাবতীলতা হইয়া গিয়াছে। তাহার চিরন্তনী বাঙ্গালিনীভাব দেখিয়া রাগ ধরে। বলি, ছোট বেলায় যে অত গলা ফাটিয়ে চেঁচাতিস,

নারীরে আপনভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার।

কিম্বা মায়ের কাছে শোনা সেই কবিতাটা

চাইনে আমি এম-এ বি-এ,
কিনিতে হয় যা টাকা দিয়ে।

ছাগল গরু ভেড়ার মত
ছেলের হাটে গিয়ে।
বাবা থাকুক আমার বিয়ে॥

সেগুলো ওই ডাক্তার ছেলের বাবা কিম্বা ওই ইঞ্জিনিয়ার ছেলের কাকাদের শোনাতে পারিস না, যারা বাবার ঘাড় ভেঙ্গে দশ হাজার নগদ নেবার জন্য ওৎ পেতে রয়েছে। তোরও বুঝি সড় আছে ওদের সঙ্গে ?

নীতা মুখ নীচু করিয়া হাসে।

অন্য মনে ভাবি, সে কথা বলা বুঝি আমারই ভুল। ছোট বেলা থেকে কোন্ শিক্ষা দিয়ে তাহাদের বড় করা হইয়াছে ? কোনো কথা বলিবার লিবার্টি না দিয়ে আজ এ প্রত্যাশা করিলে চলিবে কেন ?

পাঁচ

প্রায় ১৭।১৮ দিন বাদে ফিরিলাম।

বৌদি ত' উৎসুক হইয়া আছেন নীতার বিবাহে যাইবার জন্য।

বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই প্রথম প্রশ্ন করিলেন, "কি হল ঠাকুর পো, ঠিক হয়ে গেল ?" জবাব দিলাম, "সে এখন অনেক দেরী। বিয়ে-ফিয়ে হবে না।"

বৌদি প্রশ্ন কবিলেন, কেন ?

বলিলাম, "তোমাদের যুগ বহুকাল গত হয়েছে এখন। এত বদলে গেছে যে ওই সাবজেক্টটা তোমায় বোঝাতে গেলে তোমার দিবানিদ্রা একেবারে মাটি হবে, তার চেয়ে অল্প অল্প করে তোমায় লেকচার দেবো, তার পারিশ্রমিক স্বরূপ তুমি আমায় এক পেয়ালা করে সে সময় চা দেবে বুঝলে ?"

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, তথাস্তু।

পূজা সন্নিকট। বর্ষা কমিয়াছে, তবে ভাদ্রের গুমোট অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

খোকন ত' ফ্যান ছাড়া ঘুমাইতেই চাহে না। আমাদের অবস্থাও প্রায় তাই। চব্বিশ ঘণ্টাই পাখা চলিলে ভাল হয়। দাদা হতাশভাবে মধ্যে মধ্যে মিটারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বৌদির তর্জ্জন,—"তা বলে মানুষগুলো ত' আর মরে যেতে পারে না।" শুনিয়া থামিয়া যান।

পৌছিয়াছি দিন দুই হইল। আজকের দুপুরটা কিন্তু অসহ্য লাগিতেছে। বিছানা যেন ফুটিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া ফ্যান খুলিয়া দিলাম। হাতে ছিল একখানা বই, মাঝামাঝি আসিয়াছি, কাজেই আবার তাহাতে মনঃসংযোগ করিলাম।

ও বাড়ীর কর্ম্মব্যস্ততা সুরু হইয়া গিয়াছে, অভ্যস্ত কাণে তাহার আওয়াজ আসিলেও অভিনিবেশ ভঙ্গ হইতেছিল না।

হঠাৎ মনে হইল উহাদের কর্ম্মের ধারা যে সুরে চলিত, আজ যেন তাহার ছন্দ পতন ঘটিয়াছে। কারণ আকুল স্বরে গৃহিণী মাঝে মাঝে নীরুকে ডাকিতেছেন, কেন ? বই রাখিয়া জানালা দিয়া তাকাইলাম।

ঠাকুর আটা মাখিতে ব্যস্ত। গৃহিণী বঁটি, ডালা, খোকা ইত্যাদি লইয়া কুটনা কুটিতে বসিয়া দুরন্ত খোকাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, না হইতেছে কুটনা কোটা, না পারিতেছেন ছেলে সামলাইতে। অদূরে একটা চাকর দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কাছে খোকা যাইবে না, এবং যাইতেছে না বলিয়া খোকা এবং চাকর দু'জনকে ত্রিলোচন বাবুর স্ত্রী বকিতেছেন, আর কাজ অগ্রসর হইতেছে না বলিয়া নীরুকে ডাকিতেছেন। গরমে ঘামে খোকার দাজ্জালপানায় ভদ্রমহিলা প্রায় বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

একটি চাকর আসিয়া জানাইল, নীরু দিদি স্কুল হইতে এখনও ফেরে নাই। গৃহিণী বলিলেন, ওমা কি হবে, নীরু এখনও আসে নি ? ওদিকে উনি তো এসে পড়লেন বলে। ও ঠাকুর, তুমি বাপু দুটো ভাজা তাহলে কুটে নাও। নাও, শীগ্ গির কর বাপু। আমি আর পারি নে।

ঠাকুর অসহায় চোখে একবার আটার তাল দেখিল ও কুটনার ডালা দেখিল, কোন্‌টা অগ্রে সামলাইবে ?

ব্যাপার দেখিতেই গুরুতর। কিন্তু ইহাদের সংসারের মেনস্প্রীংটি কোথায় গেল ? এত বিপর্য্যয় দেখিয়াও সে আসিতেছে না, অসুখ করিল নাকি ?

বৌদিকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিলাম। কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছি।

আসন্ন সন্ধ্যা। আকাশে মেঘের চিহ্ন বিশেষ নাই, আজ বৃষ্টি হইবে না হয় ত'। বেড়াইতে বাহির হইব ভাবিতেছি খোকা দেখিয়া ধরিল, কাকা আমি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব।

হিরণ আসিয়াছিল সাইকেলে, সে বলিল, "তাহলে চল্ খোকাকে নিয়ে, আমি ফিরব যখন সাইকেল নিয়ে যাব।"

বাড়ীতে সাইকেল রহিল। হিরণ, আমি ও খোকা হাঁটিয়া চলিলাম।

পার্কের নিকটবর্ত্তী হইতে খোকা বলিল, "বাগানে চল কাকা, গান শুনবো।" বাগানে রেডিও বাজিতেছিল। আজ খোকার ইচ্ছায় আসা, খোকার মতানুযায়ী চলিতে হইবে। ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখি, অদূরে কয়েকটা হিন্দুস্থানী বসিয়া তাস খেলিতেছে এবং খুব সোরগোল উঠিয়াছে ; হয় ত' জিতিবার মত অবস্থা। আর একটু অগ্রসর হইতে চোখে পড়িল একটি পরিচিত মুখ।

রামা নয় ? সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, হাঁ রামাই ত' ? অসময়ে কাজ ছাড়িয়া সে এখানে কেন ?

আপন অজ্ঞাতেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম, মুখ হইতেও কতকটা অজ্ঞাতসারে বাহির হইল, "রামা।"

ডাকটা কিন্তু তাহার কর্ণে পৌছিয়াছিল, ঘাড় ফিরাইয়া সে এইদিকে তাকাইয়া আমাকে দেখিল।

দেখিলাম, মুখে তাহাব কর্ম্মব্যস্ততার গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে লঘু আনন্দভরা হাসি। আশ্চর্য্য লাগিতেছে।

আসিবে কি আসিবে না ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে দ্বিধাভরে উঠিয়া আসিল। কি ভাবিয়াছিল কে জানে, কিন্তু চলনে তাহার ফুটিয়া উঠিল একবোখা ভঙ্গী।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুম হিয়া কাহে ই বখত মে ?

বকিতেছি না বলিয়া হয় ত' আশ্বস্ত হইল এবং হয় ত' লজ্জাও বোধ করিল। নত মুখে জবাব দিল, বাবু নোকরী হাম ছোড় দিয়া।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম, কাহে ? উনলোক সে কুছ গড়বড় হুয়া ?

উত্তরে সে জানাইল, থোড়া কুছ তো বলিন্ হ্যায়, বাকী উসমে কুছ নেহি। বলিয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, বাবুজী কাম আমি আর করবো না ও পরের বাড়ীর চাকরী আর ভাল লাগছে না, এবার আমি কোন স্বাধীন কাজ করবো, পরের এক্তিয়ারে (কবল) আর যাব না।

সৎ ইচ্ছা! আমি চুপ করিয়া রহিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন কি করছিস ?

বলিল, কিছুই না। এখন মাহিনার টাকা হাতে সামান্য আছে তাহাই লইয়া বেড়াইতেছে, পরে বাকী মাহিনার টাকা চাহিয়া আনিবা ইচ্ছা আছে, কোনও একটা ব্যবসা আরম্ভ করিবার।

তাই আজ অসময়ে তাহাকে এইস্থলে দেখিলাম স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তিভরা হাসি-মুখ। জীবনটা ছুটিব মধ্য দিয়া উপভোগ করিতেছে কয়েকটা দিন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, ত্রিলোচন বাবুর স্ত্রীর বৈকালিক অবস্থা। সকল সমস্তার সমাধান হইয়া গেল।

মনে মনে ভাবিলাম, রামাতো দাসত্ব ছাড়িল কিন্তু উহার প্রভুদের চলিবে কেমন করিয়া ? সকালের চা হইতে সুরু করিয়া সংসারের সকল কর্ম্মের শেষে বাবুব পা টিপিয়া চুল টানিয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া ঘর-দুয়ার বন্ধ করিয়া আলো নিভাইয়া তবে যাহার অবকাশ মিলে, বৎসরের পর বৎসর আপনার দৈহিক সকল আরামপ্রিয়তা বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুদের নিশ্চিন্ততার সপ্তমস্বর্গে যে রাখিয়াছে, সে হঠাৎ সরিয়া আসিলে তাঁহাদের কি হইবে ?

পথ চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলাম। হিরণ জিজ্ঞাসা করিল, লোকটা কে হে ? বললাম, পাশের বাড়ীর চাকর।

"লোকটা কাজ ছেড়ে দিয়েছে বুঝি" ?

বলিলাম, হাঁ। মনে মনে বলিলাম তাঁহাদের অকূলে ছেড়ে দিয়েছে।

চাকরটা বুঝি খুব কাজের লোক ? হিরণ প্রশ্ন করিল।

বলিলাম, হাঁ, এককথায় একেবারে গিন্নী।

ছয়

তাহার পর মাসখানেক কি কয়েকদিন তাহা সঠিক মনে নাই, হঠাৎ শুনিলাম উহাদের বাড়ীতে রামার গলার আওয়াজ।

বিস্মিত হইলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, না সম্ভব নয় অন্য চাকর হয় ত'। কারণ, প্রায়ই জানালায় জানালায় বৌদিতে এবং ত্রিলোচন বাবুব স্ত্রীতে আলাপ হয়, প্রায় ঘণ্টাকাল কি দুইঘণ্টাব্যাপী। ঘরে থাকিলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদের আলাপ কানে আসে।

রামার অন্তর্দ্ধানের পর হইতে ত্রিলোচন বাবুর স্ত্রীর আলাপের অধিকাংশ অংশটা হইতেছে রামার বিষয়ে।

তাহাতেই শুনিয়াছি যে, ত্রিলোচন বাবুর স্ত্রী বলিতেছেন, এমন একটা হারামজাদা চাকর কস্মিন্‌কালেও দেখা যায় না। একটা কথা বললে চলে যাবে, এত তেজ! কিই বা এমন কাজ সংসারে? আবার এসে যদি থাকতে চায়, তবে কিছুতেই রাখব না। এ একেবারে নির্দ্ধারিত সত্যি, ইত্যাদি।

বৌদিও তাহাতে পূর্ণ সম্মতি দিয়াছেন, বলিয়াছেন, এমন খামখেয়ালী চাকর রাখতে নেই, ইত্যাদি।

কাজেই সেই রামা হঠাৎ আসিয়া অবলীলাক্রমে চাকরীতে বাহাল হইয়া যাইবে, তাহা কখনও সম্ভব নয়। কাজেই নিশ্চিন্ত রহিলাম। ও অন্য চাকরের গলার আওয়াজ।

আবার চেঁচাইয়া কাহাকে কি বলিতেছে। অবিকল রামার কণ্ঠস্বর। আশ্চর্য্য! গত কয়েকমাসে তাহার স্বরের সহিত পরিচিত হইয়া গিয়াছি।

কৌতূহল অসম্বরণীয় হইল, উঠিয়া গিয়া জানালা খুলিতেই চোখে পড়িল পূর্ব্বের মতই বিপুল বিক্রমে রামা জল ঢালিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে এবং অন্য চাকরদিগকে ফরমাস করিতেছে।

আর ত্রিলোচন বাবুর পত্নী বেশ প্রসন্ন মনে একটা পিঁড়ির উপর বসিয়া সব কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন।

দেখিতেছিলাম। হঠাৎ আমার সহিত চোখ মিলিয়া যাইতেই সলজ্জ হাসিয়া রামা মুখটা নীচু করিল।

জানালা ভেজাইয়া দিলাম।

সাত

তাহার পরদিন রাস্তায় রামার সহিত দেখা হইল।

বৈকালবেলা খোকার প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া তাহাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কবে থেকে নোকরী সুরু করিল?

হাসিমুখে মাথা নীচু করিয়া অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গীতে জবাব দিল, পরশু সে বাবু।

তাহারপর কতকটা যেন কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বলিল, "কি করি বাবু, নোকরী না করলে চলে না। দু'দিন রিক্সা হেঁকে দেখলাম, পয়সা আছে বটে, তবে মেহন্নৎ বেশী, রোজ পাব কিনা ঠিক নেই, তার উপর জল, ঝড়, রোদ, বিষ্টি, এ সবতো আছেই। এ বাড়াভাত, বাঁধা মাহিনায় সুবিস্তা অনেক বেশী। আর নোকরী যখন করবই, তখন এ বাড়ীতে মায়া পড়ে গেছে, এখানে করাই ভাল। নূতন বাড়ীতে কেন যাই?"

ভাবিলাম, সত্যই তো…

আট

এই রামার ঘটনার সহিত মিল আছে কি না ঠিক জানি না, তবে সেদিন পর পর দুইটা দৃশ্য মনে পড়িয়াছিল।

একটি—বহুদিন পূর্ব্বে একদিন রাস্তায় দেখিয়াছিলাম একটি ভাড়াটে গাড়ীর (চলতি ভাষায় যাহার নাম ছ্যাকরা গাড়ী) শীর্ণ ঘোড়া চলিতে চলিতে হঠাৎ চলিবার অসম্মতি জানাইয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল; হয় ত' দুর্ব্বল শরীরে আর বহিতেছিল না অথবা কি হইয়াছিল তাহা কে জানে। কিন্তু গাড়োয়ান তাহা বোঝে না, সে চাবুক চালাইল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় হঠাৎ যেন ঘোড়াটা ক্ষেপিয়া গেল, বাঁকিয়া চুরিয়া বাঁধন ছিড়িয়া, রাস্তার মাঝে দৌড়িল। তখন কি তাহার উন্মত্ত গতিভঙ্গী, কি তাহার অসম্ভব দ্রুতগতি। গাড়োয়ানটা ধরিতে আর পারে না। ঘোড়াটার শীর্ণদেহে যেন যৌবনের বল আসিয়াছে, গতিভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহারই উদ্দামতা।'

অনেক চেষ্টার পর তাহাকে ধরিয়া তাহার অনিচ্ছুক গতিভঙ্গী সংযত করিয়া গাড়োয়ান তাহাকে আস্তাবলে লইয়া গেল, তাহার অন্য সঙ্গী গাড়ী টানিয়া লইয়া গেল। পথিক একজনের প্রশ্নের উত্তরে গাড়োয়ান বলিয়াছিল, "আজ আর ওকে গাড়ীতে যুতবো না বাবু। খোলা ছোটার স্বাদ পেয়েছে, আবার ছুটতে চাইবে, গাড়ী উল্টে দেবে। একদিন দানা-পাণি কম হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক যাবে, হাঙ্গামা করবে না।

আরও ছোটবেলাকার ঘটনা দ্বিতীয়টা—আমাদের বাড়ীতে পোষা টিয়াপাখী ছিল। একদিন দাদার অসাবধানতায় খাঁচার দরজা খোলা পাইয়া সকলের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া পালায়। সকলেই অর্থাৎ বড়রা দাদাকে তিরস্কার ও হায় হায় করিতে থাকেন।

"আহা! এতকালের পোষা জিনিষটা গো, কেমন ছিল, দিলে উড়িয়ে।" দাদাতো অপ্রস্তুত।

রাত্রে হঠাৎ ঝটপটানী শুনিয়া কাকীমা বাহিরে আসেন এবং দেখেন পাখীটা কখন ফিরিয়া আসিয়াছে, অন্ধকারে খাঁচার নিকট উপস্থিত হইয়া পাখা ঝাপটাইতেছে। তাহার চিরপরিচিত দাঁড়টির জন্য বোধ হয়। কাকীমা তাহাকে ধরিয়া খাঁচায় রাখিয়া আহ্লাদে বলিয়াছিলেন, "আহা হবে না, ভাতের মায়া কাটাতে পারেনি, আবার ফিরে এসেছে।"

বাংলা ও হিন্দী গান

শ্রীহরিপদ দত্ত

গত ভাদ্র ও তৎপরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বয়ের পাঠকগণ বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমি আধুনিক বাংলা গানের বিরোধী। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, আধুনিক-গান রচয়িতাগণকে নিরুৎসাহ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সেইরূপ এবারেও বলি যে, আধুনিক বাংলা গান যাঁহারা গাহিয়া থাকেন তাঁহাদের উৎসাহ ভঙ্গ করাও আমার উদ্দেশ্য বহির্ভূত। যে গান অন্ততঃ কতিপয় শ্রোতারও মনোরঞ্জন করে, তাহা গাহিব না কেন? থিয়েটারের গান যে সকল সুরে গীত হয়, তাহাদের অধিকাংশই ভংগা বা মিশ্রিত। তাই বলিয়া থিয়েটারের গান শ্রুতিমধুর হয় না সাধারণ শ্রোতৃবর্গ এ কথা বলিবেন না। অবশ্য সঙ্গীতশিক্ষাপ্রাপ্ত গায়ক বা সঙ্গীতজ্ঞ সমঝদার শ্রোতা সেরূপ গানের আদর করিবেন না। কিন্তু কয়জন শ্রোতা প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ? কয়জন শ্রোতা সুরের সূক্ষ্মতা দূরে থাকুক, স্থূলভাবই উপলব্ধি করেন? কয়জন শ্রোতা সুরের ও লয়ের জাতিভেদ বা প্রকারের ভেদ বা আকারের ভেদ বুঝিতে পারেন? কয়জন শ্রোতাই বা গানের সুর লয় সম্বন্ধীয় ভ্রম-প্রমাদ বুঝিতে বা বুঝাইতে সমর্থ? ওস্তাদী গানের আসরে কয়জন সমঝদার-শ্রোতার সমাগম হয়? বহু সংখ্যক শ্রোতা থিয়েটারের গান ও আধুনিক বাংলা গান শুনিয়া যে আনন্দ লাভ করেন, ওস্তাদী গানে তাহা করেন না। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, তাঁহারা ওস্তাদী গানের ভাষা বা ভাষাগত অর্থ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা বলিবেন, যদি সুর উপভোগ করাই অভিপ্রেত হয়, যন্ত্রসঙ্গীত শ্রবণেই ত সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য ভাষায় গান শুনিবার প্রয়োজন কি? এ কথা নিতান্ত অযথার্থ নয়, কারণ, সুর, লয় ও ভাষা এই তিনটিই বোধগম্য না হইলে গান শুনিয়া পূর্ণানন্দ-লাভ অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। আধুনিক বাংলা গানের গায়কবৃন্দের, অন্ততঃ অধিকাংশ গায়কের, সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী লয়ের অভাব। বোধ করি, তাঁহারা তালের পরাধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন না, কাজেই "তালতলা দিয়াও যান না।" থিয়েটারের গানে এ ত্রুটি বড় লক্ষিত হয় না।

এই প্রবন্ধগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য না হইলেও, মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলাভাষায় ওস্তাদী গানের প্রচলন। একজনের দ্বারা সে উদ্দেশ্যের সাধন সম্ভবপর নয়। সাধারণের, বিশেষতঃ সুরশিল্পিগণের সহায়তা এবং শিক্ষার্থিগণের সমবায় ব্যতীত ইহা অসম্ভব। প্রথম প্রথম এই সহানুভূতি দুষ্প্রাপ্য হইবে, সমবায় ও সহায়তার ত কথাই নাই। যখনই কোন নূতন সত্য বা তথ্য কিম্বা নূতন রীতি বা পদ্ধতি আবিষ্কৃত এবং তাঁহার প্রচার বা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়, তখন জনসাধারণ তাহার বিরোধী হইয়া উঠে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আবিষ্কারের কোন কথা নাই, কিন্তু প্রস্তাবিত রীতি বা পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত নূতন।

যদি হিন্দীভাষায় ওস্তাদী গান রচিত হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় পারিবে না কেন? বঙ্গভাষার সৃষ্টিকার্য্য অদ্যাপি সমাপ্ত হয় নাই; দিন দিন নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোজনায় উহার কলেবরের পুষ্টিসাধন হইতেছে। তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায়ও বঙ্গভাষা নিঃস্ব নহে। বিকৃতির কথা না ধরিলেও, হিন্দীগানের, বিশেষতঃ, ওস্তাদী হিন্দী গানের ভাষা ও ভাব সাধারণতঃ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নয়, পরন্তু, কবিতা হিসাবে তাহার স্থান অনুচ্চ। সুর ও লয়ের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হইলে ভাব ও রসের দিকে স্বভাবতঃ দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কবিতায় প্রযোজ্য ছন্দসূত্রের ত কথাই নাই

প্রচলিত হিন্দীগানের অধিকাংশের রচয়িতা প্রাচীন ওস্তাদগণ। তানসেন, গোপাল নায়ক ও বৈজু বাউরার নাম অনেক গানে সন্নিবিষ্ট আছে এবং তাঁহারাই যে, সে সকল গান রচনা করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন কোন গানে রাজা রাজড়ার নামও রচয়িতা হিসাবে সন্নিবিষ্ট আছে। তাঁহারা স্বয়ং সেগুলি রচনা করিয়াছিলেন কি না ইহার অনুকূল বা

প্রতিকূল উভয়বিধ প্রমাণ দুর্লভ। এমনও হইতে পারে যে, তাঁহাদের সভাস্থ বেতনভোগী ওস্তাদগণ সেই গানগুলির রচনা করিয়া তাহাতে স্ব স্ব প্রভুর নাম সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এমনও হইতে পারে যে, রাজার লেখনীপ্রসূত গান ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া ওস্তাদ তাহাতে সুর ও লয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন। সেকালে রাজসভায় যেমন সভাপণ্ডিত থাকিতেন, সেইরূপ ওস্তাদ গায়ক ও বাদক নিযুক্ত থাকিতেন। বস্তুতঃ ওস্তাদগণই অধিকসংখ্যক উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের রচয়িতা এবং তাঁহারা সুর ও লয়ের প্রাধান্য ও মাধুর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া ভাষা ও ভাবকে উপেক্ষা করিয়াছেন। বাঙ্গালী ওস্তাদগণ সুর ও লয়ে মজিয়া থাকেন, গানের ভাষা বা অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করেন না। ভাষা না বুঝিলে তাহার উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতার বিচার করা যায় না। "অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন।"

বাঙ্গালীর ভাষা বিষয়ে "কাণ"ও বিচারশক্তি এবং ভাব ও রস সম্বন্ধে চিত্তবৃত্তি প্রাচীন "কীর্ত্তন" গানের প্রভাবে তীব্র ও মার্জ্জিত। অবশ্য এখানে গানের ভাষার কথাই বলিতেছি। সেইজন্য বাঙ্গালী শ্রোতা গানের ভাষায় ও ভাবে আকৃষ্ট হয়েন। কীর্ত্তন-গান তালের সীমায় আবদ্ধ হইলেও, সুরসংযোজন বিষয়ে উহাতে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবি রচিত "কীর্ত্তনে" ভাষার সম্পদ ও ভাব ও রসের বিকাশ প্রচুরপরিমাণে বর্ত্তমান। "কীর্ত্তন" যেমন সাধারণ শ্রোতার চিত্ত হরণ করে, অন্য কোন গান সে পরিমাণে করে না। যতদিন বাঙ্গালীর ও বাংলা ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, কীর্ত্তন-গানের প্রচলন ততদিন অব্যাহত থাকিবে। "কীর্ত্তন" প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক, সুতরাং ধর্ম্মমূলক। এদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের সম্প্রদায় বিভিন্ন হইলেও এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে মূলগত পার্থক্য থাকিলেও, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই সকল দেবতার প্রতি ভক্তিমান। শাক্তের গৃহেও বিষ্ণুর পূজা হয় এবং বৈষ্ণবের গৃহেও শক্তির পূজা হইয়া থাকে। নিরবচ্ছিন্ন শাক্ত বা নিরবচ্ছিন্ন বৈষ্ণব কিম্বা বিষ্ণু বিদ্বেষী শাক্ত বা শাক্ত বিদ্বেষী বৈষ্ণব বাঙ্গালীর মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু বাঙ্গালী কেন, সমগ্র হিন্দু সমাজেই এইরূপ। "টিকীতে রাধাকিষণ" বলিলে যাহারা বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহারা যে প্রকৃত রাধা-কৃষ্ণবিদ্বেষী এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। অনেকে রাধা-কৃষ্ণের নাম শুনিতে চাহেন বলিয়া এবং মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিলে অপরে "খেপাইবে" বলিয়া এইরূপ মৌখিক বিরক্তি প্রকাশ করেন। হয়ত, অনেক অবান্তর কথা বলিলাম, কিন্তু, এই "অবান্তর" প্রসঙ্গের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, "কীর্ত্তন" চিরজীবী। আধুনিক বাংলা গান যেরূপ আকারে চলিতেছে তাহাও যে কতক কতক চলিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদী গানের রূপে বাংলা গানও চলুক না কেন। ইহার প্রচলন বিষয়ে কোন ন্যায়সঙ্গত আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহার জন্য বাঙ্গালী সঙ্গীত-শিক্ষকগণের যে সহায়তার প্রয়োজন, সে বিষয়ে যদি তাঁহারা কৃপণতা করেন, তাহা হইলে ওস্তাদী বাংলা গানের প্রবর্ত্তন ও প্রচলন দুরূহ হইবে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কেবলমাত্র স্বরলিপির সাহায্যে ওস্তাদী গান আয়ত্ত হয় না, শিক্ষকের প্রয়োজন। গানের রূপ বা ছবি ওস্তাদের মুখে শুনিয়া, বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

বলা বাহুল্য, শিক্ষার্থিগণের সমবায় ব্যতীত এ উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। শিক্ষার্থী না থাকিলে শিক্ষক শিখাইবেন কাহাকে? কেহই যদি প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে রচিত গান অথবা আদৌ বাংলা গান শিখিতে না চাহেন, তাহা হইলে আমাদের অরণ্যে রোদনই সার হইবে। ভাদ্র সংখ্যায় এ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশের পরে শিক্ষার্থিগণের নিকট হইতে কিছু সাড়া পাওয়া যাইবে এইরূপ আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু অদ্যাপি কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। হয়ত, প্রবন্ধটি কোন সঙ্গীত শিক্ষার্থীর দৃষ্টিপথে পড়ে নাই বা দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই কিম্বা যাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন অথবা এরূপ প্রবন্ধের পাঠক "বঙ্গশ্রী"-র নাই। পরন্তু, যে-দেশের লোক সাধারণতঃ সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি ধার করিয়া পড়েন, পত্রিকাদি তাঁহাদের হস্তে বিলম্বেই উপস্থিত হয়। একটা নূতন রীতি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে লোকে যথেষ্ট আলোচনাও করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এ চেষ্টা সহজে ছাড়িব না। অবশেষে "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষ" এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব।

রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও গত

যুগের কোন কোন বাঙ্গালী গায়ক বাংলা ভাষায় ভজন গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরলোকগত রাম দত্ত ইঁহাদের অন্যতম। কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার রচিত "তনয়ে তার তারিণি", "বারে বারে যে দুখ দিয়েছ" প্রভৃতি দুই চারিটি গানের বিস্তৃতভাবে প্রচলন হইয়াছিল। কতকগুলি খাঁটী সুরের 'ব্রহ্মসঙ্গীত'-ও সাধারণো প্রচলিত ছিল। কিন্তু, সে সকল গানের যুগ চলিয়া গিয়াছে, সে-সকল খাঁটী সুরের গান এখন চাপা পড়িয়া গিয়াছে। দুই চারিজন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ ভিন্ন কোন আধুনিক গায়কের কণ্ঠে তাহাদের স্থান হয় না। পূর্ব্বে গানের আসরে অনেক শ্রোতা শ্যামাবিষয়ক গান শুনিতে চাহিতেন এবং রীতিবিরুদ্ধ হইলেও কেহ কেহ এইরূপ গানের ফরমাস করিতেন। অধুনা সে-শ্রেণীর শ্রোতাও বিরল। "আধুনিক" গানের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিমূলক ভজন গানের প্রসার লুপ্তপ্রায়। "আধুনিক" গানের অধিকাংশই আদিরসাত্মক একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

অনেকদিন পূর্ব্বে দুই একখানি বাংলা খেয়ালও শুনিতে পাওয়া যাইত। "বিরহজ্বালা আর কত সহিব" ইহাদের অন্যতম। বহুদিন শুনিতে না পাওয়ায় এগুলি ক্রমশঃ স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হইয়াছে। নিধুবাবুর ও শ্রীধর কথকের টপ্পাও আজকাল বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। গোপালে উড়ের টপ্পা আসর হইতে প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে সমাজের কোন ক্ষতি হয় নাই, কারণ সে টপ্পাগুলিকে আদৌ সুরুচিসঙ্গত বলা যায় না।

মধ্যে এমন একটা যুগ আসিয়াছিল যখন তরুণ সম্প্রদায় ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গান শুনিতেও চাহিতেন না। সৌভাগ্যবশতঃ সে যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন music conference-এ অনেক যুবককে প্রবেশিকা পত্র নিজের অর্থে ক্রয় করিয়া উপস্থিত হইতে দেখা যায়। অনেক যুবক-যুবতী ও বালক-বালিকা ইদানীং ওস্তাদের নিকট উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছেন। Classical সঙ্গীতের দিকে অনেকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। সেই জন্যই প্রস্তাবিত নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন ও প্রচলন বিষয়ে চেষ্টা করিতে সাহসী হইয়াছি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধেও ওস্তাদী হিন্দী গানের অনুকরণে রচিত কয়েকটি গান সন্নিবিষ্ট হইল :—

ভূপালী—চৌতাল

শুধ মুদ্রা শুধ বাণী শুধ সুর-সঙ্গত সো
শুধ তাল শুধ তান গাওয়ত গুণিজন।
আরোহী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী
ধরণ মুরণ গতে ভেদন উলট পালট তাল তান॥
সপ্ত সুর তিন গ্রাম সাঁচ আলাপ কর
প্রথম সুর ধ্যানে-ধর শ্রীরামে সমধ্যান—
তানসেন কহে প্রভু কর ওয়াকে তুঁহি জ্ঞানী
যো গাওয়ত তিথি নিকি তান করত সম্পূরণ॥

*

পরমাত্মা পরমেশ দীনজন-বন্ধু, হরে
নামে ভব দূর তাপ ধ্যানে পাপ-বিমোচন।
দানব বিনাশন বিশ্বের রক্ষণে
পাপের আলেখ্য কবি রচিত, বিলোপে জগত পাপ হীন॥
দণ্ড দান পাপে শ্রেয় নীতি যেমন হেরি
অপাপ জনে তথা সুখ বিতর হে বিচারি—
তব ধ্যানে রত প্রভু পাপ-চিন্তা ত্যজি যেবা
যে ন্যায়পর সদা জীবে কর তাহারে শান্তিদান॥

ভূপালী—ধামার

বাজত ডফ বীণা মৃদঙ্গ আওর সুর
সঙ্গত সো সব গুণিগণ মিলে হোরী।
যায়সি যায় কি মাত আয়সি লে তান উপরত
বাত ফিরে যায়সি মিলে হোরী॥
লাল পিচকারী মেরে ঝুমে খেলে
হাসত ডোলত আবির—
যায়সে সো মত আবির কুম কুম
গুলালে মারত জোরী॥

*

রমণী বেশে কে কেলিকুঞ্জ দুয়ার পানে
মন্থর গমনে আসে-হেরি বিদেশিনী।
কবরী চূড়ার মত বাঁধা হেরি শির পুরোভাগে
দুটি কাণে চমকে দুটি মণি॥
হাসি-ভুলনয়নে ভরি' উঠে যেন
কমল আনন উছলি—
কানু এ রমণী জলদে মনে গণি
লুকায়িত দিন মণি॥

পুরিয়া—আড়াঠেকা

মুখর কলায়ে গাওয়ে সুর মিলাওয়া
বিহর বকাশ পিয়া পিয়ারা।
যুগ যুগ জীও সাহেবাজামাকো জীওয়ল তারা ॥

*

লুকা'য়ে কোকিলা কুলায় মাঝে কুহুতানে
গাহিছে মুখরি চুত কাননে।
যেন মধুমাস-মধুর বিকাশ চৈতালী গানে ॥

আড়ানা—একতালা

সুন্দর নাগরিয়া পিয়ারা
চমকে চপলা চখন নয়ন
ঘুর ঘুর মুর মুর ফিরে মুসে কানি বাণী—আনি আনি।
লটকে চলন মুকুতা ঝুটন
ভ্রূকুটী কুটিল তিলক ঝলক
হলকানি কুণ্ডল কপালিনী আনি আনি ॥

*

অঞ্চল উড়াইয়া পবনে
মরাল গমনে সুষমা প্লাবনে
কেগো তুমি কারে যাও ভেটিবারে সুভাষিনি—কহ শুনি।
ললিত অধরে চাপিছ দশন
প্রবাল-উরসে মুকুতা শোভন
আলু থালু কুন্তল খেদযুত তনুখানি ॥

"শুধ মুদ্রা"-প্রমুখ গানের 'শুধ' কথাটি 'শুদ্ধ' শব্দের অপভ্রংশ ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। হয়ত, রচয়িতা 'শুদ্ধ' শব্দই ব্যবহার করিয়াছিলেন, গায়কগণ গাহিবার পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া উহাকে ক্রমশঃ 'শুধ'শব্দে পরিণত করিয়াছেন। রচনাকালে কোন্ কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল এখন তাহা জানিবার উপায় নাই। এইরূপ অপভ্রংশ অনেক হিন্দী গানে সঙ্ঘটিত হইয়াছে এবং এইরূপেই হিন্দী গানের ভাষা বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা যে সকল গানকে ধ্রুপদশ্রেণীভুক্ত করিয়াছি তাহার অধিকাংশ এরূপ ভাষায় রচিত যাহা অধিকাংশ বাঙ্গালীর বোধগম্য। দুই একটি দুর্বোধ্য হিন্দী কথার সন্নিবেশে স্থানে স্থানে কোন কোন গানের অর্থবোধ ক্লেশসাধ্য হইয়াছে। হয়ত, সেই কয়েকটি হিন্দী কথা পূর্ব্ব-ব্যবহৃত কথার বিকৃত আকার, নচেৎ তাহার অর্থবোধ হইতে পারিত। যাহাতে এরূপ বিকৃত বা দুর্বোধ্য হিন্দী কথার প্রয়োগ হয় নাই দৃষ্টান্তস্বরূপ সেইরূপ একটি গান উদ্ধৃত করিলাম—

ইমনকল্যাণ—সুরফাক্তা

শঙ্কর শিব পিনাকী গঙ্গাধর ভেকধর
বামদেব ঈশ্বর ডমরুধর।
ভস্মে অঙ্গ শোভিত ভুজঙ্গ ভাল চন্দ্র
শৃঙ্গি ফুকত হায় ভোলা দিগম্বর ॥
তিলক ললাটে গয়ে রুণ্ডমালা ত্রিনয়ন বরদাতা
গৌরীসঙ্গ ত্রিশূলধর—
পশুপতি বিশ্বনাথ মৃত্যুঞ্জয় জপ মহাদেব নাম হর হর ॥

ভগবানের নামসংযুক্ত এরূপ অনেক গান হিন্দীভাষায় আছে। তবে উদ্ধৃত গানটি বহু পরিচিত।

গানে যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট কথা থাকিলেই যে তাহা গাহিবার পক্ষে অসুবিধাজনক তাহা নয়, কারণ প্রচলিত হিন্দী গানে, বিশেষতঃ, হিন্দী ধ্রুপদে যুক্তাক্ষর সম্বলিত শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে উপর্য্যুপরি যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট থাকিলে নিঃসন্দেহ গাহিতে অসুবিধা হয়। "কলিন্দনন্দিনিতটে ননন্দ নন্দনন্দন" এইরূপ একটি চরণ কোন গানে থাকিলে তাহাতে মীড় ও গমক সংযোগের উপায় থাকে না, অন্তর্ব্বর্ত্তী তালের স্থান হয় না এবং বাট বা উপেজ অসম্ভব হইয়া উঠে।

যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দে সুরযোজনা করিবার সময় গায়ককে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের স্বরবর্ণের স্পষ্ট ও দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হয়। যেমন 'নন্দ'-কে "ন-অন্দ"-এ রূপান্তরিত করিতে হয়; 'অন্ত'-কে 'অ-অন্ত' রূপে উচ্চারণ করিতে হয়। কিন্তু কোন শব্দে একাধিক যুক্তাক্ষর থাকিলে সে-উপায় অবলম্বনেও যথেষ্ট অসুবিধা থাকিয়া যায়; যেমন অত্যন্ত, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধার্থ; এইরূপ শব্দ থাকিলে গানের প্রবাহ (flow) প্রতিহত হয়, মোলায়েম করিয়া গাহিতে পারা যায় না। উপায়ান্তর থাকিলে গায়কগণ যুক্তাক্ষরের স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে চাহেন না। সেইজন্য তাঁহারা "শুদ্ধ"-কে "শুধ"-রূপে গাহেন। শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে এরূপ পরিণতি হয়ত, হিন্দীগানে সম্ভব হইতে পারে, বাংলায় বড় চলে না। "অর্পণ"-কে "অরপণ" রূপে কবিতায় ও গানে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু "অপণ"-এ রূপান্তরিত করিলে তাহা অর্থহীন হইবে। পরন্তু, গানে তিন অক্ষরবিশিষ্ট যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ অধিকতর দুরূহ ও শ্রুতিকটু, যেমন মন্ত্র, মন্ত্র, অস্ত্র। যদি ওস্তাদ বা সুরশিল্পিগণ কিঞ্চিৎ মস্তিষ্ক চালনা ও পরিশ্রম স্বীকার করেন, তাঁহারা অনেক বাংলা গানকে, রাগ রাগিনী ও লয়ের ব্যত্যয় না করিয়া, উচ্চাঙ্গের গানে পরিণত করিতে পারেন। বারান্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মায়াবিনী-ছন্দা

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

ছন্দা সেন, একহারা লম্বা মেয়েটি, চোখ দু'টি তার টানাটানা, দেহভঙ্গিতে মিষ্টি লিরিকের ছন্দ, কয়েকটিমাত্র দিনের মধ্যেই সারা পল্লীর অধিবাসীকে সচকিত করে তুলেছে। তাকে হঠাৎ উপযাচিত হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে দেখে বিস্মিত হলুম।

শীতের একটি মলিন সন্ধ্যা, তায় অজস্র ধারায় আবার বর্ষণ সুরু হয়েছে।

ট্রাম থেকে নামতেই ছন্দা তার লেডীস্ ছাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

বল্লে, "আসুন ওই গাড়ীবারান্দায় একটু অপেক্ষা করা যাক্, বিশ্রী বর্ষা নেমেছে।"

তার ভদ্র ব্যবহারে আপ্যায়িত হয়ে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলুম। খানিকটা চুপ-চাপ থাকার পর ছন্দাই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, "আপনার বাড়ীটা বুঝি আমাদের ফ্ল্যাটের পেছন দিকে?"

সংক্ষেপে উত্তর দিলুম, "হ্যাঁ।"

"পাড়ার অনেকের সঙ্গেই আলাপ হোল, রাস্তা আর বাড়ীগুলো দেখে যেমন Impression হয়েছিল লোকগুলো সম্বন্ধে কিন্তু—"

"খুব নিরাশ হয়ে পড়লেন, না?"

"Exactly, কেমন করে আপনি ধরলেন বলুন তো?"

"আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। আমিও বেশ প্রাণ খুলে মিশতে পারি নে।"

"কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আপনার পাড়া তো দেখি খুব সজাগ।"

"আপনার সম্বন্ধেও তো আমি শুনি তাই।"

"তাই না কি? আমার ধারণা কিন্তু ঠিক উল্‌টো। এরই মধ্যে অনেক বেনামী চিঠিপত্র পেয়েছি, সমাজ শৃঙ্খল-নীতি উপদেশও এসেছে।"

ছন্দার কথায় ঔৎসুক্য গেল বেড়ে, "কি রকম?"

"সে কিন্তু ভারি মজার ব্যাপার। আমার বাড়ীতে এত পুরুষ লোকের ভিড় কেন, এতগুলো গাড়ী আসে কেন, কেমন করে আমার দিন চলে, এত নিত্য নূতন ডিজাইনের সাড়ী আসে কোত্থেকে, সে সকল তথ্যেরই বিশ্লেষণ আছে। অথচ মজা এমনি আমার বাড়ীতে সন্ধ্যার আসরে চায়ের লোভটুকু এইসব হিতকামীদের বড় কম নয়।"

রাস্তা দিয়ে একটি ফিটন যাচ্ছিল, ছন্দা তাকে ডাক্‌লে।

এই, ডোভার লেন।

আমাকে আহ্বান জানিয়ে সে বল্লে, "উঠে আসুন মনোজবাবু, এ বৃষ্টি আর থাম্‌বে না।

ছন্দার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলুম না।

আমি প্রশ্ন করলুম, "কিন্তু হঠাৎ আমার সম্বন্ধে তাঁদের মুখে আপনি কি শুনলেন?"

ছন্দা হেসে উত্তর দিলে, "আপনার কত গুণের কথা। আপনার সাহিত্যিক প্রতিভা, অভিনয় কৃতিত্ব এমনি কত, কিন্তু আপনার এমন বিরাগ কেন বলুন তো?"

"না, বৈরাগ্য কিছু এমন নেই, কিন্তু আন্তরিকতাও তেমন কিছু করতে পারি নে, কোথায় যেন একটু তফাৎ আছে, হয় ত, প্রকৃতিগত। আমার প্রকৃতি আবার একটু ভিন্ন রকমের।"

কথাবার্ত্তার মাঝে ফিটন এসে ছন্দাদের বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়ালো।

গাড়ীভাড়া দিতে গেলে ছন্দা ভয়ানক আপত্তি জানালে, "না, তা কিছুতেই হবে না, আপনি আমার অতিথি।"

গাড়ীভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ছন্দা আমাকে নিয়ে তার ঘরে গেল।

বল্লে, "বৃষ্টির দিনে একটু চা মন্দ লাগবে না আশা করি।" বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বল্লুম, "নিশ্চয়ই নয়। বরং আমিই প্রস্তাব করবো ভাবছিলুম।"

ছন্দা দেহগতিতে এক অপূর্ব্ব ছন্দের গুঞ্জনধ্বনি তুলে ভেতরে চলে গেল।

"আপনি একটু বসুন মনোজবাবু, আমি এক্ষুনি আসছি।"

ঘরের ভেতর তাকিয়ে দেখলুম, আসবাব পত্রের কোন

বাহুল্য নেই, কিন্তু ঘরের সব জায়গাতেই একটা বিলাসের এবং সুরুচির স্পর্শ আছে।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এ কেমন করে সম্ভব, একজন সুশিক্ষিতা স্মার্ট তরুণীর পক্ষে আমার সম্বন্ধে এতখানি সচেতন হওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে?

ওধারে ছোট্ট টেবিলটার'পর দেখলুম পাশাপাশি দু'খানি ছবি ছন্দা এবং আর একটি তরুণ, স্মিতহাসির রেখায় ঔজ্জ্বল্যে উভয়েই প্রাণবান।

হঠাৎ যেন চাবুক খেলুম।

কে এই ছেলেটি? ছন্দার প্রেমাস্পদ নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার তাতে কি যায় আসে?

ছন্দা ঘরে ঢুক্‌লো।

কমলালেবু রংএর একখানা হাল্‌কা শাড়ীতে দেহলাবণ্য তার আরও রূপায়িত হয়ে উঠেছে। মিষ্টি এক ঝলক গন্ধও ঘরখানিতে ছড়িয়ে পড়ে আবেষ্টনীকে আরও স্নিগ্ধ করে তুল্‌লে।

মিষ্টি হাসিতে আপ্যায়িত করে বল্‌লে, "কিছু মনে করবেন না মনোজবাবু, আমি একটু দেরী করে ফেলেছি। বাইরে থেকে এসে বাথরুমে গা ধুয়ে না এলে আমি বেশ স্বস্তি পাই নে। আপনি একলাটি বসে ছিলেন ভারি বিশ্রী ঠেকছিল বোধ হয়?

"না, না, তাতে আর কি? একলা থাকা অভ্যাস আমার অনেক দিনের, বরঞ্চ তাতে আমি ভালই থাকি।"

"আপনি কবি কি না তাই, নির্জ্জনতাই আপনাদের কাব্য সাধনার বিলাস।"

ছন্দার কথায় মুগ্ধ হলুম। চমৎকার তার কথা বলার ভঙ্গি।

"আমি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত, একলা আমি একেবারেই থাকতে পারি নে। এই দেখুন না, আলাপ নেই, পরিচয় নেই, রাস্তা থেকেই ধরে আনলুম আপনাকে।"

"হ্যাঁ, আমিও তাই বিস্মিত হয়ে উঠ্‌ছি।"

ছন্দা বল্‌লে, "আপনি কিন্তু আমার অপরিচিত নন। আপনার লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় অতি ঘনিষ্টতর, আমি আপনার লেখার অন্ধ ভক্ত।"

"ভক্ত হওয়া ভালো, কিন্তু অন্ধ ভক্ত হওয়া ভাল নয়, তাতে বিচারশক্তি থাকে না।"

ছন্দা বল্‌লে, "সাহিত্য নিয়ে আমার ডিসেক্‌সন ভাল লাগে না মনোজবাবু। সাহিত্য হচ্ছে হৃদয়বাদের কথা, তার বিচার হচ্ছে হৃদয়ের অনুভূতি দিয়েই।"

ছন্দার কথায় চমৎকৃত হলুম।

একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় একটি তরুণীর স্তুতিবাদ যুক্তিহীন এবং অর্থহীন কিংবা অন্তরহীন হলেও ভাল লাগে।

চাকর একটি ট্রেতে করে চা, কেক্ আর ডিম্ সিদ্ধ নিয়ে এলো। আমি বল্‌লুম, "এ সব কি মিস্ সেন?"

ছন্দা হেসে উত্তর দিলে, প্রথম বন্ধুত্বের মিষ্টি নিদর্শন!

বল্‌লুম, "একটু তো নয়, এ যে বিলক্ষণ! চায়েতেও তো মিষ্টি দেওয়া আছে।"

"তার চেয়ে বলুন না কেন অন্তরেও তো মিষ্টিভাব আছে!"

আমি বল্‌লুম, "ভাল কথা বল্‌তে পারি বলে আমার একটু অহঙ্কার ছিল মিস্-সেন; কিন্তু আপনার কাছে সে গর্ব্ব আমার আর রইলো না।"

বাইরে কলিং বেলের শব্দ শোনা গেল।

বেয়ারা এসে একটি ছোট্ট কার্ড দিলে।

ছন্দা বল্‌লে, "বল্‌গে আজ তাঁর শরীর খারাপ, আজ আর দেখা হবে না।" বেয়ারা চলে গেল।

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, "সে কি মিস্ সেন, হয় তো তার কোন গুরুতর প্রয়োজন ছিল।"

"I am tired of it মনোজবাবু। সত্যি বল্‌ছি, এই সব সভ্য নাগরিকরাই আমাকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌লে। গুরুতর প্রয়োজনটা কি জানেন? এক্ষুনি শোনাতেন কোন শাড়ীটা পরলে আমাকে বেশী মানায়, কোন রং-এ আমাকে বেশী match করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ কি বেশীক্ষণ ভালো লাগে?"

গুরুতর সমস্যা! মেয়েদের মনের এদিকটার সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই।

ছন্দা বল্‌লে, "আজ আর কেউ নয়, আমাদের বন্ধুত্বের মাঝে আজ আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নয়।"

ছন্দার কথায় আমি একটু কেঁপে উঠ্‌লুম। জীবনে কোন মেয়ের কাছ থেকে এমনতর কথা কখনও শুনি নি।

অনেক গল্প গুজব আলাপ পরিচয়ের মাঝে সেদিনের সন্ধ্যাটিকে অতিবাহিত করলুম ছন্দার সঙ্গে।

মেয়েটি সম্বন্ধে অনেক কথাই পাড়ায় শুনেছি। তার দ্বার প্রান্তে বহু গাড়ী বহু যুবককেই দিনের পর দিন দেখেছি, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে তার অন্তরের যে ঐশ্বর্য্যের দিক্ দেখে এলুম তাতে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না।

ছন্দার সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতায় পাড়ার অনেকের মনেই ঈর্ষ্যার আগুন জ্বলে উঠ্‌লো।

প্রকাশ্যে অনেকেই অনেক রকম মন্তব্য প্রকাশ করলেন আর অর্থব্যয়ের দিকে সজাগ থাকতে উপদেশ দিলেন।

আমার কিন্তু ছন্দাকে ভাল লাগে।

তার কথা বলার ভঙ্গি, মিষ্টি গলার গান, মিষ্টি সরস অকুণ্ঠিত ব্যবহার, তার ছন্দায়িত দেহলাবণ্য, তার মাঝে একটা বিশেষ মোহ আছে, যা পুরুষকে সহজেই আকর্ষণ করে। তার মাঝে বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে।

সেদিন আমার ঘরে আকস্মিক ভাবে ছন্দা প্রবেশ করলেন। তার আগমনে আমি একটু লজ্জিত হয়ে উঠলুম, বিশেষ করে আমার বাড়ীর পর্দ্দা প্রথা এবং আমার ঘরের দৈন্য যেন আমার চোখে নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়ে উঠ্‌লো।

ছন্দা বল্‌লে, "আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলুম।"

তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বেতের মোড়াটা এগিয়ে দিলুম।

ছন্দা তাতে উপবেশন করে বল্‌লে, "আচ্ছা যে জীবন জানেন না তা নিয়ে লিখতে যান কেন বলুন তো?"

আমি বল্‌লুম, "কি, হোল কি?"

"এ মাসের "বাণীতে" প্রকাশিত আপনার "জটিল" গল্পটার কথা বল্‌ছি। আপনি যে এত সংস্কারবাদী আগে তা জানতুম না।"

"যে পরিস্থিতিতে বসবাস করি, আজীবন যাকে আদর্শ বলে মেনে এলুম তাকে আজ হঠাৎ শিক্ষার অহঙ্কারে কেমন করে একেবারে বিনাশ করি বলুন তো?"

ছন্দা বল্‌লে, "তবে আর শিক্ষার শিক্ষাত্ব কোথায়? সংস্কারই যদি বড় হয় তবে যুক্তি, বিচারবুদ্ধি, intellect এ সবের কোন মানেই নেই।"

"কিন্তু শুধু কি সংস্কারের আদর্শই রূপ পেয়েছে গল্পটিতে? আধুনিক মেয়েদের জীবনের সমস্যা সত্যই কি আজ জটীল হয়ে ওঠে নি?"

"হ্যাঁ, আধুনিক মেয়েদের জীবন আজ জটীল বলেই আজ তারা প্রকৃত জীবনের আস্বাদ পাচ্ছে। শুধু মাটির প্রতিমার মতন তারা জড় নয়, তাদের আজ প্রাণ সম্পদ আছে, রক্ত-মাংসের অস্তিত্বকে আজ তারা উপলব্ধি করতে পারছে। গল্পটিতে নিছক আপনি মেয়েদের গালাগাল দিয়েছেন এবং সংস্কার বশতঃ একটা আদর্শ শুধু প্রচার করতে চেয়েছেন।"

নিজের দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করলুম। ছন্দার কথাগুলি একেবারে মিথ্যে নয়।

চা, জলযোগ আর টুকি টাকি আলাপ-আলাপনের পর ছন্দা বিদায় নিলে।

যাবার সময় বললে, "আপনি আমার ওখানে যান না কেন মনোজবাবু? আপনার সঙ্গে আলাপ করতে সত্যিই আমার ভাল লাগে।"

আর একদিন।

ছন্দার ঘরে সেদিন সান্ধ্য-চায়ের মজলিশে বহু তরুণের ভীড়। আমি প্রবেশ করতেই ছন্দা অভ্যর্থনা জানালে এবং আর সকলকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে বললে, "মনোজবাবুর সঙ্গে আমার একটা খুব জরুরী কাজ আছে, এক্ষুনি আমি একটু ব্যস্ত থাকবো, আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।"

বিষণ্ণ মনে তাঁরা উঠে চলে গেলেন।

আমি বিস্মিত সুরে বললাম, "এ রকম করলে মিস্ সেন আপনার এখানে আমার আর আসা চলে না কিন্তু, ওঁরা কি মনে করলেন বলুন তো?

"করলেই বা, তাতে আপনার ক্ষতিটা কি?"

"ক্ষতি কিছুই নেই, কিন্তু অসামাজিক তো।"

"ওদের মাঝখানে আপনার স্থান নয় মনোজবাবু, আপনি স্বতন্ত্র।"

"এমনি করে বলবেন না মিস্ সেন।"

ছন্দা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, "কেন বলুন তো? এ কিন্তু আমার অন্তরের সত্য।"

আমি উত্তর দিলুম, "হ্যাঁ, তাই ভয় হয় আমি হয় ত' সে স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা রাখতে পারবো না।"

ছন্দা বললে, "আমার কিন্তু সে বিশ্বাস আছে আপনার 'পর।"

ছন্দা প্রশ্ন করলে, "নূতন কি লিখলেন?"

"একটা কবিতা লিখেছি,—সনেট্‌ একটা।

"পড়ুন না, দাঁড়ান আগে কবিতা পাঠের পরিস্থিতি করে নিই।" ছন্দা ঘরের আলোটাকে পাল্‌টে দিলে। সাদা আলোর পরিবর্ত্তে ঘরখানিতে ছড়িয়ে পড়লো মৃদু নীল আলোক-শোভা।

ছন্দার রুচি জ্ঞানের তারিফ করি।

কবিতা পাঠ শেষ হলে ছন্দা বলে, "চমৎকার-Simply grand. সত্যি মনোজবাবু কবিতায় ভারি মিষ্টি হাত আপনার। আচ্ছা আপনাকে একটা অনুরোধ জানাবো, আমার বন্ধুত্বের দাবী দিয়ে। দেবেন আমায় একটা উপহার?"

আমি বিস্মিত সুরে প্রশ্ন করলুম, "কি? সাধ্যাতীত না হলে নিশ্চয়ই দেবো।

"একটি কবিতা উপহার? আমার খাতায় নিজের হাতে লিখে দিতে হবে কিন্তু এবং সে কবিতা শুধু আমার-শুধু আমারই।"

ছন্দার এ কথার অর্থ কি?

আমি কিন্তু অভিভূত হয়ে পড়লুম। বললুম, "আপনার এ অনুরোধ আমি রাখবো মিস্ সেন, তবে আজ নয়। সেদিন যেদিন হবে আমি নিজে এসে আপনার খাতায় কবিতা লিখে দিয়ে যাবো।"

ছন্দা কোন কথা না বলে শুধু মাথা নীচু করে ছিল।

হঠাৎ একদিন সকালে শুনলুম, ছন্দার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের রহস্যময় খবর। ছন্দা চলে গেছে ও বাড়ি ছেড়ে।

যে ফ্ল্যাটটিতে সে থাকতো, সেটা একটা ব্যারাক বাড়ি। শুনেছিলুম, এখানে সে একলা থেকে পড়াশুনো করতো। পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক গ্রামে তার বৃদ্ধ পিতা থাকতেন।

ছন্দার জীবনের বহু রহস্যই প্রকাশ পেলো তার অন্তর্দ্ধানের পর। পড়াশুনা সে ছেড়ে দিয়েছিলো, বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্কও আর তার বড় ছিল না। অর্থ অনাটন তার ছিল না, কোথায় একটা চাকরিও নাকি সে করতো। তার ভক্ত-সংখ্যার অভাব আধুনিক যুগের বড় লোকের ছেলেদের মধ্যে বড় কম ছিল না এবং তাদেরই কার সঙ্গে একদিন রাত্রে সে কোথায় চলে গেছে তার খবর কেউই জানে না।

পাড়ার প্রবীন অধিবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন—আপদ গেছে! এই সব মায়াবিনীরা তরুণ-ছেলেদের মাথা খাবার যম।

আমি কিন্তু ব্যথা পেলুম।

ছন্দার অন্তরের যে উজ্জ্বল দিক্‌টার পরিচয় আমি লাভ করেছিলুম, তাতে মুগ্ধ না-হয়ে থাকা যায় না।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে।

ছন্দার আর কোন খবর রাখি না। ছন্দার কথা জীবনের কোলাহলে হয় ত-বা ভুলেই গেছলুম।

সেদিন অফিসের গুরুতর পরিশ্রমের পর এক কাপ কফির সঙ্গে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নেবো বলে 'চাঙ্‌ওয়াতে' ঢুকেছিলুম।

বার হবার পথে শুনলুম, একটি কেবিনের মাঝে উন্মত্ত প্রলাপের পাশে একটি পরিচিত নারী কণ্ঠস্বর।

পর্দ্দা সরিয়ে বয় সে কক্ষে প্রবেশ করার সময় দেখলুম, তিন চারজন মাতাল যুবকের মাঝে ছন্দা সেন!

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম।

পায়ের নীচের পৃথিবী হঠাৎ যেন কেঁপে উঠলো। আমাকে দেখেই ছন্দা ওদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এলো, "হ্যালো সাহিত্যিক মনোজ রায়, An age after.

কণ্ঠস্বর তার বিকৃতির মাঝে কেমন যেন জড়িয়ে আসে। আমার হাতখানা ধরে সে কেবিনের ভেতর নিয়ে চললো, "You like to have a drink?"

না, ধন্যবাদ, অভ্যস্ত নই!

আশ-পাশের তরুণ যুবকেরা জড়িত কণ্ঠে বলে উঠ্‌লো, "তুমি আবার কোন্ গগনের চাঁদ বাবা, উড়ে এসে জুড়ে বসেছো?"

ছন্দা গর্জ্জন করে উঠ্‌লো, "Shut up! জানো ইনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক!"

আমি বললুম, "সে পরিচয়ের কি কোন মূল্য আছে এখানে মিস্ সেন?"

"Not Miss, Say Mrs," একটি তরুণ জড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো। ছন্দা বললে, "না, সে পরিচয়ে দরকার নেই, সে বন্ধন থেকেও মুক্ত আজ। আজই কোর্ট থেকে আইনগত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

আমি বিরক্তি প্রকাশ করলুম, "কিন্তু সে সব কথায় আমার দরকার কি বলুন, অত্যন্ত Personal affair.

This is the friction of modernism মনোজবাবু, আধুনিক যুগের সাহিত্যিক আপনি, জানবেন না আমাদের কথা, দেখবেন না আমাদের জীবনের tragedy ?"

ছন্দার চোখে দেখি দু'ফোঁটা অশ্রুজল! তার দেহবল্লরী ঘিরে যে কালো শিল্কের শাড়ীখানি পরিবেষ্টিত হয়েছে, তাতে যেন কত যুগের অভিশপ্ত কালিমা মাখান রয়েছে। ছন্দার সেই টানা টানা কালো চোখ দু'টি বসে গেছে, গালের কাছে জেগে উঠেছে কয়েকটি নীল শিরার সুস্পষ্ট চিহ্ন। দেহতনুতে নেমেছে গাঢ় ক্লান্তির জর্জ্জরতা।

তবুও ছন্দা তেমনি ভাবে চোখ দু'টি টেনে মিনতির সুরে আমাকে বললে, "দিলেন না ত' মনোজবাবু একটা কবিতা লিখে আমার খাতায় যে কবিতা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব!"

ছন্দা তেমনি সুরেই কথা বলে, যে সুর একদিন আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল।

আজও যেন আবার মোহ জাগে, ছন্দাকে বুঝি আবার তেমনি করেই ভাল লাগে।

অকস্মাৎ আদর্শবাদের দংশন জ্বালা অনুভব করি, এ পরিস্থিতি এ পরিস্থিতি অসহ্য!

আমি নীরব নিস্তব্ধ! চাঙওয়াতে আজ না এলেই যেন ছিলো ভাল! মিনতির সুরে বললুম, "মিস সেন, আমাকে রেহাই দিন আজ সত্যি আমার একটা বিশেষ জরুরী দরকার আছে।"

ছন্দা বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলো, "ও আপনার বুঝি আবার সংস্কার আছে! কিন্তু আমরা যে বাঁচতে চাই মনোজ বাবু পৃথিবীর হাওয়া, বাতাস, আলো, গন্ধ, গান, রূপ-রস এ সবই উপভোগ করতে চাই!"

কিন্তু এই কি বাঁচা? এতো আত্মহত্যা, আত্মপ্রবঞ্চণা। আনন্দের নামে এ যে বিভীষিকা, জীবনের নামে এ যে মৃত্যু!

There are many things unknown in heaven and earth Horatio! একজন তরুণ অট্টহাসি হাসিল!

ছন্দা ভ্রুকুঞ্চিত করে ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা টেনে এনে বললে, "একদিন যাবেন আমার আস্তানায় মনোজ বাবু E-87, Flat নম্বর—প্রীতি ম্যানসন, রসারোড।"

সম্মতি জানিয়ে আমি বার হয়ে এলুম।

বাড়ী ফিরলুম যখন তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। মনের মাঝে ছন্দার রহস্য ভীড় জমিয়ে তুলেছে। মাথাটাও অসহ্য ধরেছে যেন!

ঘরে ঢুকে দেখি স্ত্রী সুলতা আমার খাবার নিয়ে বসে আছে। "কি গো এত রাত হলো যে?"

"অফিসে ভয়ানক কাজ ছিল আজ। আমি আজ আর খাবো না তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো।"

"কেন গো কি হোল তোমার? অসুখ বিসুখ—"

"না তোমার উৎকণ্ঠার কারণ নেই, মথাটা ধরেছে বড্ড।"

"মাথার আর অপরাধ কি, যে হাড় ভাঙ্গা খাটনি? তুমি শুয়ে পড় মাথাটায় একটু ওডিকলোন লাগিয়ে পাখার বাতাস করি।"

"না, না, কিছু দরকার নেই। তুমি খেয়ে নাও অনেক রাত হয়ে গেছে।"

সুলতা মৃদু তিরস্কারের সুরে বললে, "বেশী কথা বলো না তুমি খেলে না শরীর খারাপ আর আমি সাত সকালে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়বো!"

সুলতার কথায় মুগ্ধ হলুম। সুলতা—সুলতা হচ্ছে মূর্ত্তিমতী সেবা, বিধাতার আশীর্ব্বাদ!

সুলতার সেবা স্পর্শে কখন না জানি তন্দ্রা এসে গেছে।

ঘুম যখন ভাঙলো রাত্রি তখন গভীরতর।

দেখলুম, আমার শয্যার একাংশে সহধর্ম্মিণী সুলতাকে—ঘুমন্ত মুখ খানিতে প্রশান্তির মধুর স্পর্শ রয়েছে জেগে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

শ্রীকালিদাস রায়

এই গ্রন্থের মূল কাহিনী,—দ্বাদশবর্ষবয়স্কা "তীনভুবনজন-মোহিনী শিরিষ-কুসুমকোঁঅলী অদভূত কনকপুতলী" রাধাচন্দ্রাবলীর রূপের কথা বড়ায়ির মুখে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত মিলিত হইতে চাহিলেন। তিনি বড়ায়ির মারফতে তাম্বূল পাঠাইয়া আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। বড়ায়ি কৃষ্ণের হাতে রাধাকে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল। রাধার মনে এখনো কন্দর্পভাব জাগে নাই। তাহা ছাড়া সে আইহনের পত্নী, তাহার সতীধর্ম্মের সংস্কার জন্মিয়াছে। রাধা শ্রীকৃষ্ণের অসৎ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল।

মথুরার হাটে দধিদুগ্ধবিক্রয়ের জন্য গোপবধূরা পশারা সাজাইয়া যাতায়াত করে। রাধাকেও মথুরার হাটে যাইতে হইল। বড়ায়ি চলিল অভিভাবিকা হইয়া। শ্রীকৃষ্ণ যে পথে অপেক্ষা করিতেছেন বড়ায়ি সেই পথ দিয়া রাধাকে লইয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ দানী কাণ্ডারী ইত্যাদি সাজিয়া রাধাকে পীড়ন করিয়া তাহার প্রেম আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাধা কিছুতেই বশ মানিবে না। সে রাঢ়দেশী গ্রাম্য বালিকার ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল, ভয় দেখাইল, ধর্ম্মের দোহাই দিল, সম্বন্ধ-বিরোধের কথার উল্লেখ করিল, রাজা কংসের দরবারে নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইল এবং কত কাকুতি-মিনতি করিল।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রত্যেক কথার জবাব দিতে লাগিলেন, প্রহারের ভয় দেখাইলেন, তিনি নিজে যে স্বয়ং গোলোকপতি বিষ্ণু, কংসবধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ভূভার হরণের জন্য যে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনি যে রাখাল মাত্র নহেন, তিনি যে নন্দ-যশোদার সন্তান নহেন—বসুদেব-দৈবকীর সন্তান—এই সব কথা বলিয়া আত্মসমর্থন করিতে লাগিলেন। রাধা কিছুতেই সম্মত হইল না। তারপর শ্রীকৃষ্ণ করিলেন বলপ্রয়োগ। বড়ায়ি এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল—হাহাকার করা ছাড়া রাধার আর কোন উপায় থাকিল না। এই ভাবে নানা ছলে শ্রীকৃষ্ণ জোর করিয়া রাধার সতীধর্ম্মের মর্য্যাদাহানি করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাধার অন্তরে কন্দর্পভাব উন্মেষিত হইল। বড়ায়ির কাজ শেষ হইল, আর বলপ্রয়োগ করিতে হইল না। রাধাই শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। যখন রাধা শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তখন একদিন সুখসুপ্ত রাধাকে কুঞ্জবনে ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাত্রা করিলেন। রাধা হাহাকার করিতে লাগিলেন। এই Tragedy-ই কাব্যের উপজীব্য।

সৎসাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়—ইহা আদিরসের কাব্যও হয় নাই, প্রকৃত রতিভাবকে রসে উত্তীর্ণ করিবার প্রয়াস এ কাব্যে দেখা যায় না। বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, গ্রাম্য ভাষাপ্রয়োগ ও বর্বরোচিত আচরণের সমাবেশে পদে পদে রসাভাস ঘটিয়াছে।

বৈষ্ণব ভাবাদর্শের দিক হইতেও রসাভাস ঘটিয়াছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বা দেবত্বের কথা বারবার বলানো হইয়াছে। যেটুকু মাধুর্য্য আছে, তাহার সহিত ঐশ্বর্য্যের মিশ্রণ লীলারসকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

রসের দিক হইতে সে জন্য অনেকেই ইহার সমর্থন করেন না। তবে ইহার লৌকিক ও আধ্যাত্মিক Interpretation দেওয়া যাইতে পারে। লৌকিকভাবের ব্যাখ্যা এই —গোড়াতেই কবি বলিয়াছেন—লক্ষ্মী রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন নরবিগ্রহধারী বিষ্ণুর প্রীতি-রস আস্বাদনের জন্য। এ কথা রাধা ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভুলেন নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রাধানুরাগ পরদারাভিমর্ষণ নয়—নিজ জায়ার কাছ হইতেই প্রাক্তন অনুরাগ আকর্ষণ।

তারপর বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে যাহা হয় ইহা তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ দেশে বালিকার সহিত চিরদিন যুবকের বিবাহ হইয়া থাকে। বালিকার হৃদয়ে কন্দর্পভাব জাগাইয়া তুলিবার ভার স্বামীই গ্রহণ করে, বালিকা বধূর হৃদয়-মন্থনেই তাহাকে প্রেম-সুধার উদ্ধার করিতে হয়—কঠোর পীড়নে তাহার জীবন-অরণিতে লালসার বহ্নিকে জাগাইতে হয়। কিছুদিন ধরিয়া বালিকার জীবনে দারুণ

পরীক্ষা চলিতে থাকে, বালিকার বর্ষীয়সী আত্মীয়ারা বড়াইর মতই সহায়তা করে, আর অন্তরালে দাঁড়াইয়া হাসে। কোন পক্ষ হইতেই দয়া মমতার কথাই নাই। তারপর কি হয়, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় অনেক ক্ষেত্রেই রাধার জীবনের মত পরিণামে Tragedyও ঘটে। বঙ্গের ঘরে ঘরে যাহা হয়, কবি তাহাই রাধাশ্যামের মারফতে অত্যন্ত স্থূলভাবেই এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন।

আর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই,—ভগবান যাহাকে অহৈতুকী কৃপা করেন, তাহাকে নানা দুঃখ দিয়া, নানা পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া, নানাভাবে পীড়ন করিয়া, তাহাকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া আপনার করিয়া লন। বড়ায়ি যেন গুরুর স্থলাভিষিক্ত। ভক্তের মনে অনুরাগের সঞ্চার হইলে ভগবান কৃপাহস্ত অপসারণ করেন, তখন ভক্ত হাহাকার করে। তখন তাহার প্রকৃত তপস্যার আরম্ভ হয়—সেই তপস্যার বলে ভক্ত ভগবানকে চিরদিনের মত লাভ করে।

বঙ্গদেশের মঙ্গলকাব্যের মূল তথ্যের আলোকেও ইহার একটা Interpretation দেওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় দেবতারা জোর করিয়া নানারূপে পীড়ন ও পরীক্ষা করিয়া পূজা-বিমুখ নরনারীর কাছ হইতে পূজা আদায় করিতেছে। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের রূপকে কি তাহাই ব্যক্ত হয় নাই?

পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডের মধ্যেও একটা আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত আবিষ্কার করা যায়। দানখণ্ডে ভগবান ভক্ত-জীবনের আধ্যাত্মিক শুল্ক দাবী করিতেছেন। গীতায় ভগবানে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ ও ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণের কথা তো ইহাই।

নৌকাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ ভব-নদীর কাণ্ডারী। ভারখণ্ডে ভগবানই ভক্তের ভারবাহী। ভক্ত ইহসংসারের সকল ভার শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত। গীতার 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' এই উক্তির সহিত ভারবহনের সম্পর্ক আছে। ছত্র খণ্ডে ভগবান্ তাঁহার কৃপাচ্ছায়ায় ভক্তকে যে চিরদিন রক্ষা করেন এই কথারই ব্যঞ্জনা। এই হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। এই কাব্যে মঙ্গলকাব্যের সূত্রপাত হইল বলিতে হয়।

মঙ্গলকাব্যের না হউক, পদাবলী-সাহিত্যের সূত্রপাত যে এখান হইতে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তন পূর্ব্ব হইতে পদাবলী সাহিত্যের একটা আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। বৃন্দাবনখণ্ড না হউক—রাধাবিরহের দ্রবীভাব, আকূতি ও আকুলতাই পদাবলী-সাহিত্যে উচ্চতর পরিণতি লাভ করিয়াছে। যে বংশীর ধ্বনিতে বঙ্গদেশ পাগল হইয়াছে তাহার প্রথম সুর যে পদে তাহা এই—

কে না বাঁসি বায় বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁসি বায় বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁসির শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।
পাখী নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী।
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে কবি ঋতুরঙ্গ-পটভূমিকার সহিত তাঁহার কাব্যের চিত্রগুলির বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

কৃষ্ণ রাধার জন্য প্রথম ব্যাকুল হইলেন বসন্তে। গ্রীষ্মে রাধাকে ভুলাইতে কৃষ্ণ দানী সাজিলেন। গ্রীষ্মকাল তপ্তপথের পসারিণীকে তরুতলে আমন্ত্রণ করিবার সময়। বর্ষা আসিল, যমুনা কূলে-কূলে ভরা, নৌকা ছাড়া পার হওয়া যায় না। কৃষ্ণ ঘাটদানী সাজিলেন। বর্ষার উত্তাল তরঙ্গপরে কাণ্ডারী শ্রীকৃষ্ণ আর সরলা ভয়চকিতা আভীরবালা আরোহিণী। বর্ষা গেল, শরৎ আসিল। যমুনা তরিতে আর তরীর প্রয়োজন নাই। শরতের উত্তপ্ত রৌদ্র 'সিরীষ কুসুমকোঁঅলীকে' কাতর করিয়া তুলিল—কৃষ্ণ রাধার মাথায় ধরিলেন ছাতা। ভারী সাজিয়া বাঁকে করিয়া রাধার পসার বহিলেন। বসন্তে বৃন্দাবনের বন ফুলে ফুলে ভরিয়া গেল—কৃষ্ণের বংশীরবের আমন্ত্রণে রাধা বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করিলেন। আবার গ্রীষ্ম,—জলকেলির সময়। জল ছাড়িয়া উঠিতে মন যায় না—বসনের কথা মনেই থাকে না। রাধার বসন চুরি গেল—শ্রীকৃষ্ণ সাজিলেন চোর। আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল—রাধা আর দ্বাদশী নয়, চতুর্দ্দশী! মদনমোহন মদনও বসন্তের সহায়তায় রাধাকে পঞ্চবাণে আহত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কাজ সমাপ্ত হইল—রাধার হৃদয়ে অনঙ্গের লীলা চলিতে লাগিল।

বসন্ত ফুরাইল—তপন অকরুণ হইল, শ্রীকৃষ্ণ অকরুণ হইলেন —মথুরায় পলাইলেন। চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল— রাধার অন্তরেও বিরহের আগুন জ্বলিল।

নবনীদল কোঁঅলী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাধা সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়া গজমোতির সাতেসরী হার গলায়, নেতের আঁচল দিয়া ঢাকা দধিদুগ্ধের পশারা মাথায় করিয়া মথুরার হাটে যাইতেন। সোনার ভাঁড়ে দুধ, রূপার ভাঁড়ে দধি লইয়া বড় আয়ীর সঙ্গে নিতাই বেচিতে যাইতেন। অদ্ভুত বটে! আইহন ছিলেন মস্তবড় ধনী, তাঁহার কিশোরী বধূ গ্রাম হইতে নগরের হাটে দই-দুধ বেচিয়া কড়ি আনিলে তবে তাহার অন্ন জুটিত! এ কেমন কথা! বলা বাহুল্য, এটা মাটির বৃন্দাবন নয়—ঘোষপাড়ার গোয়ালদের জনপদ নয়। এটা ভাব-বৃন্দাবন—এখানে সবই সম্ভব। যে বৃন্দাবনে রাজার ছেলে হইয়া সোনার নূপুর পায়, সোনার পাঁচনি হাতে কানু দুপুর রৌদ্রে মাঠে মাঠে গোরু চরায় সে বৃন্দাবনে বড়র বহুআরী বড়র ঝি হইয়া রাধা দই-দুধ বেচিতে হাটে যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ইহা ত' ভাববৃন্দাবনের কথা গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আচরণ এবং কৃষ্ণ-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি বিদ্যাপতির বা গোবিন্দদাসের বৃন্দাবন হইতে আমাদিগকে একেবারে গোয়ালপাড়ায় লইয়া যায়। রাধাসুন্দরী বড়ায়ীর গালে চড় মারিয়া প্রথমেই আমাদের ভাবের স্বপ্ন ঘুচাইয়া দিয়াছেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের গোয়ারতমি, কথায় কথায় মারের ভয় দেখানো, শ্যালী-সম্বোধন ও রাধাপীড়ন আমাদের মনকে আর ভাববৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইতে দেয় না। বৃন্দাবনখণ্ডে আসিয়া আবার আমরা স্বপ্নলোকে ফিরিয়া আসি, কিন্তু তখনও গ্রন্থের রসাভাস মনে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে।

(শ্রীচৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-সাহিত্যে রসের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা দৃষ্ট হয়।) সেই রসাদর্শে আমাদের মন পূর্ব্ব হইতে আবিষ্ট; তাই বোধ হয় অস্বস্তি অনুভব করি। সে যুগের পাঠকদের মনে নিশ্চয়ই কোন বিক্ষোভ জন্মিত না। Realism ও Idealism এর এই অদ্ভুত সংমিশ্রণকে তাহারা উপভোগ করিতে পারিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রস উপভোগ করিতে হইলে আমাদিগকেও সংস্কারমুক্ত মনে চৈতন্যপূর্ব্ব যুগের কল্পনালোকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমরা উপভোগ করিতে পারি আর না পারি, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লোকেরা যে উপভোগ করিত তাহার প্রমাণ আছে। রূপ সনাতন ইহার আদর করিতেন। শ্রীচৈতন্যের কথা ছাড়িয়া দিই, তিনি সমস্তকেই আপন মনের মাধুরী দিয়া মনের মত করিয়া লইতেন। আর হয় ত' তিনি কেবল রাধাবিরহের পদগুলিই উপভোগ করিতেন।

স্বাভাবিকতার দিক হইতে কাব্যখানির মূল আখ্যায়িকার দোষ ধরা কঠিন।)

দুগ্ধ দধি ঘোলের পশারার মত গোপপল্লীর এই কাব্যখানির নায়িকা চন্দ্রাবলী রাধা—খাঁটি গোয়ালার মেয়ে। অঙ্গে সে নবনীদল কোঁয়লী, কিন্তু মনে তেজস্বিনী কম নয়। কাহ্নাইএর ফুল তাম্বুল রাধা বড়ায়িএর মুখের উপর ফেলিয়া দিয়া রাধা তাহার গালে এক চড় বসাইয়া দিল। বলিল—

দারুনী বুড়ী তোর বাপেত নাহি লাজ।
তে কারণে মোক বলসি হেন কাজ॥
আর যবেঁ বোল মোরে হেন পরিহাস।
আবসি করিবোঁ তবেঁ তোমার বিনাশ॥

বড়ায়িএর প্রস্তাব শুনিয়া রাধার অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল।

যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ।

বড়ায়ি বলিল—

যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিল হও মুকুতি॥
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলে
হয়ে বিষ্ণুপুরে স্থিতি॥

রাধার তেজস্বী উত্তর—

ধিক যাউ নারীর জীবন
দহে পসু তার পতি॥
পর পুরুষের নেহাএ যাহার
বিষ্ণুপুরে হএ স্থিতি॥

তিনি নিজে স্বয়ং ভগবান, দেবকীজঠরে কংস বধের জন্য অবতীর্ণ, কত বার অবতীর্ণ হইয়া তিনি কত অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, যশোদা তাঁহার জননী নন, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া কাহ্নাই রাধাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন। বৃন্দাবনেও তিনি কত অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন—সেকথাও স্মরণ করাইয়া দিলেন—রাধা তাহাতে একেবারেই ভয় পাইল না। কাহ্নাই রাধাকে মারিয়া ফেলার ভয়ও দেখাইলেন—তাহাতেও

রাধা বিচলিত হইল না। রাধা সতীধর্ম্মকে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া জানিত—সে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাধা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে এবং সম্বন্ধে সে মাতুলানী, তাহার প্রতি লালসা অত্যন্ত অধর্ম্মসূচক ও অশোভন রাধা বার বার এই কথা কাহ্নাইকে শুনাইয়াছে। বারো বছরের বালিকা একাকিনী অসহায়া অবস্থাতেও কামোন্মত্ত কৃষ্ণের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিয়াছে। তারপর রাধার যে পরিণতি তাহা সরলা গোপবালিকার পক্ষে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের গোবিন্দ, বৃন্দাবনের রসলীলা উপভোগ করিতে জন্মেন নাই—কংসবধের জন্য অবতীর্ণ। এ গোবিন্দ রীতিমত গোঁয়ার-গোবিন্দ। গোপপল্লীতে প্রতিপালিত হইয়া অমার্জ্জিত চরিত্রের সবলকায় কিশোর। এই গোপপল্লী সেই ভাব-যমুনার তীরে বিদগ্ধ আভীরপল্লী নয়—এ যেন বাঙ্গালার ভাগীরথীতীরের সভ্যতাবর্জ্জিত গোপপল্লী। রাধা বড়ায়িকে ভাগীরথী কূলে গোবিন্দকে খুঁজিতে বলিয়াছিলেন—সেটা অসঙ্গত কথা নয়। প্রথম যৌবনের উদ্দীপ্ত লালসা তৃপ্তির জন্য এই যুবক উদ্‌গ্রীব, প্রেমের মর্য্যাদা সে বুঝে না। সে নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, দাম্ভিক, প্রতিহিংসাপরায়ণ। রাধা তাহার ফুল তাম্বুল উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়া তাহার অহমিকায় আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহার স্বভাবসুলভ ঔদ্ধত্য ও প্রতিহিংসা যেন তাহার লালসাকে প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল। হিংস্র ব্যাঘ্র যেমন দীনপ্রাণা হরিণীকে আক্রমণ করে—সেই ভাবে এই শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জন বনপথে অসহায়া সাশ্রুনয়না বালিকা রাধাকে আক্রমণ করিতেছে।

দীনা বালিকার কাছে সে কেবল নিজের বলবীর্য্যের আস্ফালন করিতেছে—সতীধর্ম্মকে উড়াইয়া দিতেছে, পরদারগমনকে পুরাণের উপাখ্যান তুলিয়া সমর্থন করিতেছে। সে মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, ছল করিয়া মহাদানী সাজিতেছে, কাণ্ডারী সাজিতেছে, মাঝ যমুনায় নৌকা ডুবাইয়া নিজের ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থ করিতেছে, রাধার জীবন লইয়া সে বিড়াল যেমন ইঁদুর লইয়া খেলা করে—তেমনি করিয়া খেলা করিতেছে, রাধার দেহের উপর অত্যাচারের ত কথাই নাই, বার বার তাহার জীবন-সংশয় পর্য্যন্ত হইতেছে। এই শ্রীকৃষ্ণ সাধ করিয়া আবার রাধাব দধিদুগ্ধের ভার বহন করিতেছে, তাহার মাথায় ছাতা ধরিতেছে। আবার রোষ প্রকাশের সময় বলিতেছে, "আমাকে দিয়ে সে ভার বইয়েছে, ছাতা ধরিয়েছে, তাকে আমি ক্ষমা করব না।" শ্রীকৃষ্ণ ভালবাসেন মনে করিয়া সরলা রাধা একবার মান করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মামুলী বচনে একবার মানভঙ্গের চেষ্টা করিয়া শেষে উগ্রমূর্ত্তি ধরিলেন, বৃন্দাবনের ফলফুল ভাঙ্গার মিথ্যা দোষারোপ দিয়া রাধাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন। ক্ষণিক মিলনের পর কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করিয়া লুকাইলেন।

রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে পাগলিনী, তখন এই শ্রীকৃষ্ণই আবার সাধু সাজিয়া বলিলেন, "আমি পরস্ত্রী গ্রহণ করিতে পারি না, তুমি মাতুলানী। এবে সে জানিল হৈল কলি-অবতার। সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহে জার। আমি এখন যোগ অভ্যাস করিতেছি, আমি এখন জিতেন্দ্রিয়।" এ সব কথা নিদারুণ ব্যঙ্গ।

অনেক সাধাসাধির পর বড়ায়িএর অনুরোধে কৃষ্ণের দয়া হইল। কৃষ্ণের উরুতে মাথা রাখিয়া রাধা ঘুমাইয়া পড়িল। সেই সুযোগে কৃষ্ণ মথুরায় পলায়ন করিল। লম্পট বঁধু ফাঁকি দিল। রাধা হাহাকার করিতে লাগিল, বড়ায়ি তাহার দুঃখ দেখিতে না পারিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া রাধার দুঃখের কথা বলিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "রাধার আচরণ আমি ভুলিব না—তাহার মুখের কথা বড়ই কড়া কড়া, সে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, আমার অপমান করিয়াছে। তাহাকে আমি আর চাই না। আমার এখানে গুরুতর কাজ আছে। কংসবধ করিতে হইবে।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম যৌবনের প্রচণ্ড লালসার তৃপ্তির জন্য রাধাকে প্রয়োজন হইয়াছিল। এখন লালসা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, আর তাহাকে প্রয়োজন নাই। একটা অজুহাত দেখাইয়া রাধার প্রতি কৃষ্ণ অক্লেশে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলেন। উৎসব-নিশীথের উপভুক্ত মালতী-মালার ন্যায় শ্রীমতী বৃন্দাবনে হাহাকার করিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কি আসে যায়?

এই শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিকলাপের যদি একটা রূপকার্থ কল্পনা না করা যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কি গতি হইবে?

তারপর রাধিকার দুর্দ্দশার কথা বলিয়া কবি গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। বসন্তকাল আসিল, রাধাব তাপ ও অনুতাপ

দুই-ই দেখা দিল। কেন কাল ঘুম ঘুমাইলাম, কেন কৃষ্ণের ফুল-তাম্বুলের অসম্মান করিয়াছিলাম। শ্রীমতী বলেন, সাগর-সঙ্গমে গিয়া গায়ের মাংস কাটিয়া ভোজ দিব, আর জন্মে যেন এ বিচ্ছেদ হয় না। শ্রীমতী স্বপ্ন দেখিলেন, "প্রথম প্রহরে কৃষ্ণ চুম্বন করিলেন, দ্বিতীয় প্রহরে তিনি আত্মসমর্পণ চাহিলেন; আমি অনুমতি দিলাম না, তৃতীয় প্রহরে আমার চিত্ত চঞ্চল হইল।"

চউঠ পহর কাণ
করিল অধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে
ভাগিল আমার নিঁদে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।

এই স্বপ্নই সমস্ত কাব্য-খানির মর্ম্মকথা।

রাধার আক্ষেপের ক্ষতে বড়ায়ি নুনের ছিটা দিয়া বলিল—

কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলেঁা মোর হাথে।
সে তাম্বুল রাধা তো ভাঁগিলি মোর মাথে॥
এবেঁ ঘুস্ ঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন।
পোঁটলি বান্ধিআঁ রাখ নহলী যৌবন॥

ইহার উত্তরে শ্রীমতী যাহা বলিলেন তাহা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মান রাখিয়াছে।

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই অসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ-মুকুতার হার।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ সিঁথের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥
দারুনী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণ দান।
আপনার দৈব দোষে হারায়িলেঁা কাহ্ন॥
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরি হইবোঁ দেশান্তর॥
যবে কাহ্ন না মিলিহেঁ করমের ফলে।
হাথে তুলিআঁ মো খাইবোঁ গরলে।

এই কথাই ত পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা বিভিন্ন ভাষায় ও ছন্দে বারবার বলিয়াছেন। বিদ্যাপতিও এই কথাই বলিয়াছেন (শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর, তোড়হ গজমতি-হার রে—ইত্যাদি)।

একে একে সব কথা মনে পড়িতেছে, আর শ্রীমতীর অনুতাপ জ্বালা 'ঘসির আগুন দহদহ দহ জ্বলে।' প্রত্যেকটি ত্রুটীর জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন—আমি তখন নিতান্ত শিশুমতি ছিলাম—তোমার মহিমা বুঝি নাই।

পানফুল না লইলো যাইলো তোর দুতী,
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমূরতি।
আর যত দুখ দিলো কদম্বের তলে,
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জানিলো ভোলে।
বারে বারে যত তোক বুইলোঁ অহঙ্কারে,
সেহ দোষ খণ্ড মোর দেব গদাধরে।
যেবা কিছু দুখ দিলো পার হৈতে নাএ,
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরে তোর পাএ
আর দুখ দিলো তোক বহাইলোঁ ভার,
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আমার।
অনাথী নারীর কত থাকে অভিমান,
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ।

রাধা-বিরহ শেষ হইয়াছে, শ্রীরাধার বারমাস্যা গানে।

বাংলা সাহিত্যে বারমাস্যা রচনার পদ্ধতি এখান হইতে প্রবর্ত্তিত।

দেশের সেবা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দুই

ডুবছে নাও ডুবাইয়া যাও ওরে রসিক নাইয়া,
ভাঙা নাও যে বাইতে পারে তারে বলি নাইয়া।

—সুধারায় বাউল

গোয়ালন্দ গাড়ী পৌঁছিলে রেলযাত্রীদের মধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। কে আগে কুলির মাথায় মোট তুলিয়া ষ্টীমারে যাইয়া আরামে বসিবার স্থানটুকু সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবে—ইহাই হয় তাহাদের ভাবনা। তাই যাত্রীদের মুখে শোনা যায়—এই মুটে, এই কুলি, জলদি জলদি ইধার আও, আমার মাল বহুৎ নেই ভাইয়া। তারপর চলিতে থাকে কুলির সঙ্গে পয়সার হাঁকাহাঁকি! তাহাদের রেট বাঁধা থাকিলেও বক্‌শিসের দাবীটা কিছুতেই কমে না।

সুচিত্রাকে এই হাঙ্গামা পোহাইতে হয় নাই। তাহার হইয়া সুব্রতই সব করিয়াছে। যদিও সে অনেকখানি সাহস করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, এক রাত্রির যাত্রা-শেষে গোয়ালন্দ আসিয়াই সে বুঝিতে পারিল—কলিকাতার সহিত বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের কত প্রভেদ। এখান-কার দৃশ্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ। দুইদিকে মাঠ, মাঠ কাটিয়া মাটি উঁচু করিয়া রেলের সব কোয়াটারগুলি তৈয়ারী হইয়াছে। খড়ের ছাউনি ঘরগুলিতে বাঁশ ও খাপড়ার বেড়া। সুচিত্রার কাছে অদ্ভুত লাগিতেছিল। রেলে বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের মধ্যে যে পরিমাণ অধৈর্য্য অশিষ্টতা ও স্বার্থপরতার নিদর্শন পাওয়া যায় সে বিষয়েও তার বিশেষ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। জাতির পরিচয় ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায়।

দুই দিকের দুইটি ছোট গেটের দরজায় টিকেট-কালেক্টার দাঁড়াইয়া আছেন, টিকেট লইতেছেন, কুলির মাথার উপরকার মালের উপরও নজর রাখিতেছেন। কখনও বা হুমকি দিতেছেন ওজনের জন্য। অনেক সময় চতুর কুলিরা বক্‌শিসের লোভে এমন ভাবে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যায় যে, সুচতুর টিকেট-কলেক্টাররাও হার মানেন—হয় ত’ বা বখরাটাও তাঁহাদের আছে।

ষ্টীমারে উঠিবার পথটুকু ঢালু হইয়া জেটিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। উঁচু নদীর পাড় কাটিয়া পথটি তৈয়ার করা হইয়াছে। রাস্তার উপর দুইদিকে মিঠাইয়ের দোকান। গরম লুচি, তরকারি ও মিষ্টির বাহবা লইয়া তাহারা যাত্রী-দিগকে আহ্বান করিতেছে। কোন যাত্রী চা পান করিতেছে, কেহ মিষ্টি সংগ্রহ করিতেছে, কেহ বা ওখানেই খাওয়া সুরু করিয়া দিয়াছে।

পদ্মার বিস্তৃত বুকে প্রভাত-সূর্য্যের গোলাপী আভায় অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। ষ্টীমারের বাঁশী বাজিতেছে। সুচিত্রার কাছে এইসব একেবারে নূতন। কুন্তলা নিজের মনে কত কি বলিতেছিল, তাহার মুখে ছিল প্রফুল্ল হাসিটি। সুচিত্রার মনে তখন জাগিতেছিল নূতন দেশের নূতন ছবি। সে যেন কাহার আকর্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ভাবেই চলিতেছিল। হঠাৎ কুন্তলার সোল্লাস চীৎকারে তাহার বিমুগ্ধ ভাব দূর হইয়া গেল, সে চাহিয়া দেখিল কুন্তলা একটি বলিষ্ঠ সুন্দর যুবকের দিকে চাহিয়া বলিতেছে, "এই যে ছোড়দা ? তোমায় ত’ প্লাটফর্ম্মে দেখলুম না। কখন এলে ?"

ওদিকে সুব্রত তাহাদের দুইজনারই মালপত্র নিয়া ষ্টীমারের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

কুন্তলার দিকে চাহিয়া যুবকটি কহিল, "তোদের সেই অস্পষ্ট আলো-আঁধারের ভিতর খুঁজে বেড়ানোর চেয়ে একেবারে ঘাঁটি আগলে দাঁড়িয়ে আছি। এপথ ছাড়া ত আর ষ্টীমারে উঠবার পথ নেই।

তখন ষ্টীমারের বাঁশী ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘন ঘন বাজিতেছিল। আর আকাশের গায়ের লাল আভা আরও দীপ্তিমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইবার সূর্য্যদেব দেখা দিবেন, তারই প্রথম উপক্রম।

সুচিত্রার দিকে চাহিয়া কুন্তলা কহিল, "এই আমার দাদা ত্রিবিক্রম মুখোপাধ্যায়। বুঝলি সুচিত্রা, দাদার নামটি সার্থক—দাদার বিক্রম তিনদিকেই সমান, পড়াশুনায় very good boy ছিলেন। লাঠি খেলায়, দৌড়ে ঝাঁপে, সাঁতরাতে, গাছে চড়তে, এমনকি আমাদের পিঠে দু’ ঘা বসিয়ে দিতে—

এখনকার কথা বলছি না সুচিত্রা, ছেলেবেলা দাদা আমার পিঠের উপর সামান্য ছুতোনাতা ধরে কি বিক্রমই না দেখিয়েছেন, এখন অবশ্য দিব্যি ভাল মানুষ হয়েছেন। আচ্ছা ছোড়দা, আমার চিঠি সময়মত পেয়েছিলে ত' ?"

ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিল, "তা না হলে আর এখানে এলাম কি করে ?"

কুন্তলা কহিল, "দেখলে ত' ছোড়দা, তুমি সত্যি বল, আমার ঘটে কিছু বুদ্ধি কম কি না। নইলে এমন প্রশ্নও করি।" তারপর সুচিত্রাকে দেখাইয়া কহিল, "এই আমার বন্ধু, সুচিত্রা ব্যানার্জ্জি এম, এ। বড়লোকের মেয়ে, মস্তবড় পণ্ডিত, এম-এ-তে বুঝলে, একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট, আমার মত কোনরকমে পাশকরা মেয়ে নয়, তারপর দেখতেই পাচ্ছ, সৌন্দর্য্যে ইনি জুলিয়েটকেও হার মানান।"

সুচিত্রা কহিল, "আপনি কুন্তলার কোন কথা বিশ্বাস করবেন না ত্রিবিক্রমবাবু, ও মাঝে মাঝে কবিতা লেখে কি না, তাই বাড়িয়ে বলার ঝোঁক একটু বেশী। নমস্কার।"

সুচিত্রা কথা বলিবার সময় একবার ত্রিবিক্রমের দিকে মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিয়া লইল। ত্রিবিক্রম দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয়ফুটের কাছাকাছি। রঙ খুব ফর্সা, মাথার চুল কোঁকড়ান এবং একটু বড়, গায়ে সাদা ধবধবে খদ্দরের পাঞ্জাবী, পরণে খদ্দরের ধুতি, কাঁধে একটা খদ্দরের চাদর জড়ান। হাতে একখানি লাঠি। হাড়ে মাসে জড়িত সুঠাম শরীর। নাসিকাটি বেশ সরু, চোখ দুটি বেশ বড় আর মনে হয় যেন চোখও হাসিতেছে। যৌবনের উজ্জ্বল প্রসন্ন দীপ্তি এই যুবকের সারা শরীরের উপর একটা হিল্লোল তুলিয়া বহিয়া গিয়াছে।

ত্রিবিক্রম বিনীতভাবে সুচিত্রাকে নমস্কার করিয়া কহিল, "চলুন, এবার জাহাজে উঠা যাক্। পূজোর ছুটি কি না, তাই ষ্টীমার-কোম্পানী কয়েকখানি 'স্পেশাল' দিয়াছে, আজ মাত্র একখানা স্পেশাল যাবে, সেখানা ঢাকা মেলের আগে ছাড়বে।" এই বলিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কহিল, "কোন ভাবনা নেইরে কুন্তলা, ষ্টীমারে তোদের জায়গা ঠিক করে বিছানা পেতে রেখে এসেছি। অজিত সেখানে আছে।"

টিকেট-কালেক্টার টিকেট পরীক্ষা করিতে করিতে কহিল, "কখন এলে ভাই ত্রিবিক্রম ? ওঃ! তোমার বোনকে নিতে এসেছিলে বুঝি ? বেশ লোক যা হ'ক একবার মাধবীর সঙ্গে দেখাও করলে না, সে ত' তার ত্রিবিক্রম দাদার গল্প বলে বলে আমার কান ঝালাপালা করে দেয়। স্পেশালে চলে যাও, তারপাশা ঠিক ন'টা সাড়ে ন'টার ভিতর পৌঁছে যাবে।"

ত্রিবিক্রম কহিল, "সতীশ, মাধবীকে আবার এলে বলবো, তোর ত্রিবিক্রম দাদার সুখ্যাতি কিন্তু সতীশের ভাল লাগে না।"

সতীশ হাসিয়া কহিল, "তবেই হয়েছে, একেবারে আশ্রম-পীড়ার সৃষ্টি হবে। যাক আর দেরী করো না। এস কিন্তু দাদা, বলে রাখবো।"

ত্রিবিক্রম সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে স্পেশাল ষ্টীমার 'আমুর' উপরে গিয়া উঠিল। সিড়ির সম্মুখেই সুব্রত দাঁড়াইয়াছিল একটু চকিত চঞ্চলভাবে। সুচিত্রার খোঁজ সে কয়েকবার ষ্টীমারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত করিতেছিল, এইবার সুচিত্রাকে দেখিয়া কহিল, "আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন বলুন ত' ? আমি সারা জাহাজ খুঁজে হয়রাণ। একটু ব্যস্তও হয়ে পড়েছিলুম।"

কুন্তলা সুচিত্রার হইয়া কহিল, "Thank you Sir! সুচিত্রার জন্য আর ব্যস্ত হবার দরকার আপনার হবে না সুব্রতবাবু! আমাদের সঙ্গে শেয়ালদা ওর দেখা না হওয়ায়ই বড় মুস্কিল হয়েছিল বেচারীর। আপনি যে ওকে গোয়ালন্দ পৌঁছে দিয়েছেন, সেজন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কি বলিস্ সুচিত্রা।"

সুব্রত যাইতে যাইতে বলিল, "তাই ত! ষ্টীমারের অবস্থা দেখছেন ত' ?"

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী
বাক্স পেটারায় গেছে সকল ভরি—

তবু ঐ মধ্যমশ্রেণীরূপী অদ্ভুত পিঁজরার ভিতরে একটু স্থান করেছি, চলুন।"

ত্রিবিক্রম কোন কথা না বলিয়া সুচিত্রা ও কুন্তলাকে লইয়া আসিল ডেকের এক পাশে, সেখানে বেশ প্রশস্ত সুন্দর ধব-ধবে বিছানা পাতা ছিল। আর পনেরো ষোল বছরের একটি ছেলে তাহাতে বসিয়া ছিল, সে ত্রিবিক্রম ও সুচিত্রাকে দেখিয়া একেবারে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং পরে প্রণাম করিয়া কহিল, "দাদা, এত দেরী হল যে ?"

ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিল, "সে explanation তোকে নাই বা দিলাম রে টুনু।" অজিতের ডাক নাম টুনু।

সুব্রতও কুন্তলার সহিত গল্প করিতে করিতে ধীরে ধীরে আসিতেছিল।

কুন্তলা কহিল, "আমাদের কাজের জন্য ভাবতে হবে না। ছোড়দাই সব help করবেন। ইনি খাঁটি স খলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীবিক্রমপুরী! বুঝলেন মিঃ রায়, একেবারে সব্যসাচী।"

সুব্রত ও ত্রিবিক্রমের পরিচয় হইয়া গেল কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই। তরুণদের অমনি হয়। সুব্রত কহিল, "এইবার মালপত্রগুলো নিয়ে আসি। এখানে কি কুলি মিলিবে, এই খালাসীদের কাকেও—?"

টুনু কহিল, "কেন স্যার! কুলি কেন স্যার? আমি টুনু মল্ল থাকতে আবার কুলি কেন?" ত্রিবিক্রম সুব্রতের দিকে চাহিয়া কহিল, "টুনু পারবে। ওর লিকলিকে চেহারা দেখে অবিশ্বাস করবেন না।" সুব্রতের সঙ্গে টুনু অগ্রসর হইল এবং অতি সহজে মালগুলি আনিয়া হাজির করিল।

এইবার সকলে হাত-মুখ ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে আসিয়া বিছানায় বসিল।

সুচিত্রা বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। ষ্টীমার কখন ছাড়িয়াছে তাহা সে ঠিক পায় নাই। বাহিরের দৃশ্য তাহার কাছে এক স্বপ্নের রাজ্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। সূর্য্যের উজ্জ্বল দীপ্তিতে চারিদিক সমুজ্জ্বল। পদ্মার রূপার মত স্বচ্ছ সাদা জলে সোনালি আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জেলে ডিঙিগুলি সার বাঁধিয়া মাছ ধরিতেছে। কাক ও গাঙ-চিল সমানভাবে আকাশে উড়িতেছে। এখানকার আকাশ ও কলিকাতার আকাশে কত প্রভেদ! এ আকাশ অনন্ত বিস্তৃত! গাঢ় নীল। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়, মন শান্তিতে ভরিয়া উঠে। প্রভাতের শান্ত শীতল বাতাস বহিতেছে। জাহাজ সম্মুখে নৌকা দেখিলে বাঁশী বাজাইতেছে ভোঁ ভোঁ! পারে কোথাও কাশফুলের বন। বাতাসে কাশফুল দুলিতেছে। মনে হইতেছে যেন তাহারা শারদশ্রীকে চামর বীজন করিতেছে।

কুন্তলা কহিল, "কেমন লাগছে ভাই আমাদের দেশ! এখনও দেশে পৌঁছি নাই, এই পথ, এই পদ্মানদী, এই জেলে-ডিঙি, এই আকাশ, এই কাশফুল, লোকজন! বল না ভাই সুচিত্রা কেমন?" কুন্তলার প্রাণ স্বদেশ-প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে এক নিঃশ্বাসে অনেক কথাই বলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় বাধা দিল ত্রিবিক্রম!

"একটু জলযোগ করুন মিস্ ব্যানার্জ্জি! সেই কত বেলায় গিয়ে ভাত খাবেন।"

টুনু একটা ঝুড়ি হইতে চা, হালুয়া, নারকেলের মিঠাই, সন্দেশ ও রসগোল্লা প্লেটে সাজাইয়া আনিয়া হাজির করিল।

সুচিত্রা প্লেট হইতে মিষ্টান্ন মুখে তুলিয়া কহিল, "আপনি দেখছি ত্রিবিক্রম বাবু, গৃহস্থালিতেও সুনিপুণ।"

কুন্তলা ভ্রাতার প্রশংসাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "শুধু কি তাই, জানিস্ নে বুঝি, দাদা রান্নাতেও একেবারে নল রাজা!"

সুচিত্রা হাসিয়া কহিল, "কি করে জানবো ভাই? পরখ ক'রবার ত' সুযোগ হয় নি!

ত্রিবিক্রম গম্ভীর ভাবে বলিল, "কুন্তলা, তুই আর মানুষ হলি নি, সেই ছেলেবেলাকার মতই তোর চপল চঞ্চল ভাবটি এখনও দূর হয় নি। এত কথাও বলতে পারিস্!"

সুব্রত তাহাদের দুই জনের কথা শুনিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছিল।

পদ্মা ক্রমশঃই প্রশস্ত হইয়া আসিতেছে। দুই একটা ষ্টীমার গোয়ালন্দের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোনটি বা চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জের দিকে। পদ্মার পারে গ্রামের পর গ্রাম। দূরে গ্রামের গাছপালাগুলি ঘনঘোর সবুজ শ্রীতে শোভা পাইতেছে। এদিকে ষ্টীমারের ডেকের উপর জনতা। এখানে-ওখানে সুটকেশ, ট্রাঙ্ক, বিছানার ব্যাণ্ডেল। ইহার মধ্যেই কেহ লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। কেহ শুইয়া নভেল পড়িতেছে। চায়ের দোকানে ভীড় জমিয়াছে। জাহাজের বাটলার ক'লকাতার কলেজে পড়ুয়া বাবুদের চা, ডিম ও টোষ্ট জোগাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক ঘণ্টার সামান্য পথটুকুর মধ্যেও ক্ষুধার জ্বালা দূর করিবার জন্য কারি রাইসের অর্ডারও অনেকে দিয়াছে।

এদিকে ইহাদের কয়েকজনের গল্পও বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। কুন্তলা অভ্রান্ত ভাবে কথা কহিতেছিল তাহাদের Eural uplift-এর plan সম্বন্ধে তাদের ছোট

দাদার কাছে। ত্রিবিক্রম শুনিতেছিল, উত্তর সে বড় একটা দিতেছিল না।

কুন্তলা সহসা বলিয়া উঠিল, "মা কেমন আছেন দাদা ?"

ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিল, "যারা দেশজননীর সেবা করে, তারা কি মায়ের খবর রাখে রে ? তোদের মাথায় ইউরোপ, এশিয়ার সব পল্লী-উন্নয়নের কল্পনার কাছে কি আমাদের কোন কথা মানাবে ? হাঁ; তবু ভাল এতক্ষণ পরে তোর মায়ের কথা মনে পড়েছে। জানিস্, মা আজ দু'দিন থেকে আমায় তাড়া দিচ্ছেন, তোকে গোয়ালন্দ থেকে নিয়ে আসতে। আর বাবা। তাঁর ভাবনা হচ্ছে তোমার এই মাননীয়া অতিথিটির জন্তে, আমরা একেবারে গেঁয়ো লোক কি না, পাছে অযত্ন হয়।"

সুচিত্রা কহিল, "আপনারা কি যে মনে করেন আমাদের। কি বলেন মিঃ রায়।"

সুব্রত বলিল, "যাই বলুন মিস্ ব্যানার্জ্জি, আমার ভাবনা হয়েছে, যদি কিছু করে না যেতে পারি তবে ক'লকাতায় মুখ দেখাবো কেমন করে!"

কুন্তলা অমনি উত্তর করিল, "কিছু ভাবনা করবেন না, আমার ছোড় দা, জানেন—যে সে লোক নন, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ডি-এস্-সি, ডাঃ মেঘনাদ সাহার ছাত্র। ইনি পণ করেছেন, গ্রামের উন্নতি করবেন আর বিজ্ঞানের চর্চ্চা করবেন। কিন্তু বাবা দাদাকে কি বলেন জানেন ?"

সুব্রত কহিল, "না।"

কুন্তলা বলিল, "বলেন, দাদা শুধু ঘুমের চর্চ্চা করেন। নইলে কে এমন চুপ করে একটা গ্রামের মধ্যে বসে থাকতে পারে বলুন ত ?"

সুচিত্রা ও সুব্রত উভয়ে কৌতূহলভরে ত্রিবিক্রমের দিকে চাহিল। এই খদ্দরের কাপড়জামা-পরা মানুষটি কি না একটা ডি-এস্-সি। পণ্ডিত লোক। আশ্চর্য্য ত। ত্রিবিক্রমের কিন্তু ইহাদের কোন কথার দিকে লক্ষ্যই ছিল না। টুনুর সহিত বিছানার এক পাশে সরিয়া কথা বলিতেছিল।

"হাঁ রে টুনু"

"কি দাদা।"

"তুই সব মাল নামাবার ব্যবস্থা করবি। আর রান্নাটাও চটপট করে সেরে ফেলবি কিন্তু।"

টুনু সোল্লাসে কহিল, "হুঁ। আমি ত' সব যোগাড় করে রেখেই এসেছি দাদা।" ত্রিবিক্রম তারপাশাতেই একখানি বড় নৌকা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

কুন্তলা তখন কবিতা আওড়াইতেছিল,—

হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা কতশত বার।
এক দিন জনহীন তোমার পুলিনে
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি' পশ্চিমের সূর্য্য অস্তমান্
তোমায় স'পিয়াছিনু আমার পরাণ।

এমন সময় জাহাজ আসিয়া দাঁড়াইল ভাগ্যকুল। ষ্টেসনের অল্প দূরে ভাগ্যকুলের কুণ্ডুবাবুদের বাড়ী সব দেখা যাইতেছিল। একটি খাল চলিয়া গিয়াছে উত্তর দিকে। ডিঙি নৌকাগুলির মাঝিরা ভাড়ার জন্ত ভীড় করিয়া ছিল—যাত্রীদের নানা প্রশ্নে বিব্রত করিতেছিল, "আইগ্যা কই যাইবেন ? হাসাড়া না যোলঘর ? বেশী লইমু না, আইজ্ঞে বারো আনা লইমু।"

ছোট নৌকার মধ্যে ময়রা-ঘোষেরা সন্দেশ ও রসগোল্লা লইয়া গোয়ালারা ফেরি করিতেছিল। "আইজ্ঞা, ছয় আনা সের রসগোল্লা।" যাত্রীরা সব মনের আনন্দে মিষ্টি ও দুধ কিনিতেছিল। সুচিত্রার কাছে সবই বড় মধুর মনে হইতেছিল। তাহার মনে এই মুক্ত প্রকৃতির আবেষ্টনের মধ্যে জাগিতেছিল একটা নবীন কর্ম্ম-প্রেরণা। কলিকাতার মহিলা সভা-সমিতির কাল্পনিক দেশ প্রীতির অভিনয় অপেক্ষা প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া যে কত বড় মহত্ত্ব ও সাহসিকতার কাজ, সে কাজে যে সে আপনাকে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে তাহাতেই পাইতেছিল সে মনের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রীতি ও আনন্দ। নদীর দৃশ্য এখন বদলাইয়া গিয়াছে। দক্ষিণে বিরাট বিস্তার। আর এদিকে উত্তর পাড়-ভাঙানি কূল। এখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। এখনও মাঠে জল আছে। ধানের সবুজ শোভায় নয়ন জুড়াইয়া যায়। কোথাও কোন কৃষকের গোয়ালঘরে জল ঢুকিয়াছে। কোনও বাড়ী পদ্মার বুকে পড়ো পড়ো অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। ছেলে মেয়েরা নির্ভীক ভাবে পাড়ে দাঁড়াইয়া জাহাজ দেখিতেছে।

বেলা ৯॥০টায় ষ্টীমার তারপাশা আসিয়া পৌঁছিল। সারা পথে তাহাদের গল্প-গুজব তেমন জমাট বাঁধিতে পারে নাই, কেন না সুব্রত ও সুচিত্রা দুই জনের কাছেই এ নূতন দেশ। তাহারা বাহিরের শোভা দেখিতে দেখিতেই পথ চলিয়াছে। একটী ফ্ল্যাটের উপর ষ্টেসন। টুনুর ব্যবস্থাগুণে সকলেই অতি সহজে নামিয়া পড়িল।

এইবার সুব্রতের যাত্রাপথ হইল ভিন্ন দিকে। কলমা গ্রাম হইতে তাহাকে লইবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মী আসিয়াছিল। সুব্রত সকলের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় কহিল, "নমস্কার মিস্ ব্যানার্জ্জি! ফিরবার সময় আবার এক সঙ্গেই ফিরবার ব্যবস্থা করা যাবে। কি বলেন?"

কুন্তলা গম্ভীর ভাবে কহিল—

"আর বারে সেই তীরে সে সন্ধ্যা বেলায়,
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায়!"

দুই দিকে দুই নৌকা চলিল। এমন করিয়াই মানুষের জীবন-স্রোত নানা বিভিন্ন দিকে বহিয়া যায়।

তারপাশা হইতে নানা বিভিন্ন গ্রামের দিকে যাত্রীবোঝাই ডিঙ্গি নৌকা সব যাইতেছিল। ত্রিবিক্রমের নৌকার মধ্যে ত্রিবিক্রম, সুচিত্রা ও কুন্তলা। গ্রামের উন্নতি সম্পর্কে নানা কথার আলোচনা চলিতেছিল। টুনু ব্যস্ত ছিল রান্নাবাড়ার কাজে। আর মাঝে মাঝে শুনাইতেছিল মাঝিদের হাঁক ডাক—"যার যার ডাইনে ভাই যার যার বায়ে।"

ত্রিবিক্রমের দিকে চাহিয়া সুচিত্রা কহিল—"আপনি এত লেখাপড়া শিখে শেষটায় একেবারে গ্রামের কাজে লেগে গেলেন? আপনার কাজ কেমন চলছে?"

কুন্তলা কহিল, "দেখবে এখন দাদার কাণ্ড। আর ঘণ্টা চার যেতে দাও। যত সব ঋষি-মুচির সব ছেলে জড় করে খুলেছেন পাঠশালা!—আরও কত কি?"

ত্রিবিক্রম কহিল, "কোন কাজে আপনাকে বিলিয়ে না দিলে চলে না! আর জানেন আপনারা গ্রামের অবস্থা! চোখে দেখলেই সব বুঝবেন বক্তৃতায় ও কাজে অনেক অনেক তফাৎ! সহরে বাস করে যাঁরা গ্রামের উন্নতি করেন, তাঁরা জানেন না যে গ্রামের লোকেরা স্ত্রী ও পুরুষ কি অসহায় জীবন যাপন করে। নিজেদের ভালমন্দও নিজেরা ভাল করে বুঝতে পারে না, বুঝাতে গেলেও বোঝে না, বলুন ত' সে কি ভীষণ বিপদ! আমাকে কত যে যুদ্ধ করতে হচ্চে ক্রমশঃ তার আভাষ পাবেন। একটা নিগূঢ় সত্য কথা এই যে, বাঙ্গালী দেশকে প্রকৃত প্রাণের দরদ দিয়ে ভালবাসতে জানে না। বেশী বুদ্ধিমান্ জাত বলে আপনার স্বার্থটাকেই বড় করে দেখে—এমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য! আপনার পরিবারকে নিয়েই যারা জগৎ-সৃষ্টি করতে চায় তারা বড় কাজ কি করে করবে? সে বুঝবার শক্তি আমার নেই। তবু জানেন আমি দিন রাত খাটছি। কি করি না খেটে?"

সুচিত্রা কহিল, "আপনার কি উচিত ত্রিবিক্রমবাবু, গ্রামে বসে থেকে energy নষ্ট করা। গ্রামের বাইরে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র রয়েছে আপনার। Scienceর দিক্ দিয়ে কত গবেষণা করতে পারেন আপনি! দেশ যে তাই চায় আপনার কাছে।"

ত্রিবিক্রম একটু অপ্রসন্ন ভাবে সুচিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হলে খুব ভাল হবে মিস্ ব্যানার্জ্জি! কারা দেখবে এদের। যদি আমরা আমাদের এই দরিদ্র ভাই বোন্দের দিকে না লক্ষ্য করি তবে—" কথা বলিতে যাইয়া ত্রিবিক্রমের চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।"

কুন্তলা কহিল, "জান না ভাই সুচিত্রা, দাদাকে কেউ তার ভুল বোঝাতে পারে না। বেশী বলতে গেলে বলেন, বামুনের ছেলে, যদি তোরা খেতে না দিস্ যজমানী করে খাবো! এমন বীরপুরুষ! গ্রাম-গ্রাম ঐ এক কথা মুখে লেগে আছে।"

ত্রিবিক্রম বলিল, "আমি যদি গ্রাম ছেড়ে চলে যাই, আপনার অর্থ, মান, যশঃ নিয়েই শুধু বিব্রত থাকি, তবে কি স্বার্থপরতা হবে না মিস্ ব্যানার্জ্জি? ভাল কথা, তবে আপনারাই বা গ্রামে এলেন কেন? এ কি একটা সৌখিন কাজ! আর পত্রিকায় নাম ছাপা হবে বলে? পনেরো দিন বড় জোর একমাসে আপনি ১০।১৫টি গ্রাম ঘুরে পল্লীর কল্যাণ কতটা করবেন শুনি? কি বুঝবেন, কি জানবেন বলুন তো।"

সুচিত্রা কহিল, "সে কথা সত্য। তবু একটা প্রেরণা জাগিয়ে দিতে পারব তো? বীণার তারে আঘাত দিলে তার ঝঙ্কার অনেক সময় থাকে?"

"থাকে? তাই নাকি! তারপর একেবারে তার ছিঁড়ে যায়-সুরের কোন রেশ থাকে না, কেমন?"

"তা বোধ হয়।"

"কিন্তু জানেন—আমাদের দেশের সুধারায় বাউলের একটি গান আছে,

ডুবছে নাও ডুবাইয়া যাও ওরে রসিক নাইয়া,
ভাঙা নাও যে বাইতে পারে তারে বলি নাইয়া।

আমি ভাঙা নায়ের নেয়ে, বুঝলেন মিস্ ব্যানার্জ্জি। আমি ভাঙা নাও বেয়ে চল্‌বো।"

সুচিত্রা হাসিল।

[ক্রমশঃ

তর্কলহ

শ্রীকানাই বসু, বি-এল

"না গো বন্ধু, তাও নয়,
এতবার বোঝালুম, তবুও গেল না সংশয়?
সূক্ষ্ম হতে বড় হলেই সেটাকে তোমরা বল স্থূল,
বোঝোনা কিছুই, মিছে তর্ক কর ভুল।
আবার বোঝাই তবে শোনো—"

"আমাকে বোঝাবে তুমি? বোঝ্‌বার রয়েছে এখনো
ঢের বাকি তোমারই নিজের।
স্থূল আর সূক্ষ্মের জের
মেটাবার ইচ্ছে যদি থাকে,
মনে করে দিও হে আমাকে
কাল কিম্বা পরশু, সন্ধ্যে কি সকালে,
এখন সময় নেই। মিছি মিছি নাহক্ বকালে।"

"আরে দূর, যাও কোথা? বোসো ভাই বোসো।
এতই কিসের তাড়া? কথাটা মীমাংসা হোক রোসো—
এখনো বুঝতে কার বাকী,
তোমার না আমার। ওসব চালাকি
চলে কি এখানে ভাই? ভেঙে দেব সব জারি জুরি।
প্রমাণ রয়েছে ভূরি ভূরি
সূক্ষ্ম ও স্থূলের তত্ত্বে, মানে কিনা স্থূল সূক্ষ্মতায়—
আচ্ছা থাক্, কাজ কিবা অতই কথায়,
জবাব দাও তো দেখি চাঁদ,
বস্তু কাকে বলে?—হুঁবাবা, এইবার ঘটেছে প্রমাদ!
বল না গো বস্তু বলে কাকে? বস্তু আর ভাব,
দুয়েব প্রধান কোন্? জানি আমি কী দেবে জবাব।
বলবে তো ভাব বড়? হেঁ হেঁ, তাতো জানি।
হরে, নরে, রামা, শ্যামা, সব বুদ্ধিমানই
ঐ কথাই বলে। বুঝলুম তোমারও কথাতে—"

"বুঝেছ তোমার মাথা, একফোঁটা বস্তু নেই যাতে!
কে বলেছে ভাব বড়?
বুদ্ধির ঢেঁকি তুমি! আছ শুধু কথাতেই দড়ো।
যাই দেখি, এ ট্রেণটাও গেল বুঝি—"

"আরে রও, তাহলে বস্তুই বড়? তাই নয় বল সোজাসুজি
বোঝা যাক্ বুদ্ধির বহর। আচ্ছা দাদা, তাই যদি হবে,
হাঃ হাঃ হাঃ, বস্তুই তোমার মতে আগে হল তবে?"

"কী জ্বালা! আমি কি বলেছি বস্তু আগে?
সাধে কি আর জ্বলে উঠি রাগে?
দাঁত বার করে এত হাসি বা কিসের?
যেও দিকি আমাদের দেশে, এখনো পিসের
বড় বড় তিন আলমারী
ঠাসা আছে মোটা মোটা বই সারি সারি।"

"পিসে? যদিই থাকেন পিসে, থাকে বই দুই চারখান্
বস্তু তত্ত্বের তাতেই বা কি হল প্রমাণ?"

"আমার আপন পিসে—আরে আহাম্মুক্,
তাকে বলিস "যদি"? এত বড় মুখ?
ভুলে গেছ ভদ্রতার লেশ?
মর্‌গে যা, তোর সঙ্গে এই আজ শেষ।"

"চল্লে যে? কোথা যাও? ট্রেণতো সেই দশটার পর।"
"থাক্ ট্রেণ হেঁটে যাব। হাত ছাড়, সর্।"

"সত্যিই চল্লে নাকি? তা হলে কি সূক্ষ্ম আর স্থূল—"
"তোমার শুষ্টির মাথা! রাস্কেল! ফুল্!"

বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব

শ্রীবীরেন্দ্র মোহন আচার্য্য

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম সাধনার মর্ম্মকথা সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিছু কিছু আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য এই প্রেমধর্ম্মের অন্তর্নিহিত যে রসবস্তু, তাহার কথা আমি বলিতেছি না। যাহা অন্তরের ধন, রসের সামগ্রী, বাগ্‌বিস্তার করিয়া তাহার সন্ধান করিতে যাওয়া বাতুলতা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের রস-সাধনা ইক্ষুখণ্ড চর্ব্বণ করিয়া রস গ্রহণের মত, যতই চর্ব্বণ করা যায় অনুপম মাধুর্য্য রসে রসনা ততই রসাপ্লুত হইয়া উঠে, অন্তরের ভোক্তা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-মধুর রস উপভোগে বিভোর হইয়া থাকে। সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব সেই প্রেম-ইক্ষু মর্দ্দন করিয়া বাঙ্গালার আপামর জনসাধারণকে গাগরী ভরিয়া বিতরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার শুষ্কমরুতে অমৃতের তরঙ্গ তুলিয়াছেন।

বিশ্বম্ভর গাছ তার কাণ্ডারি গদাধর।
নিত্যানন্দ জাটি তার ফিরে নিরন্তর॥
অভিরাম সারঙ্গ তায় বলদ এক জুড়ি।
চালায় সরকার ঠাকুর হাতে প্রেমনড়ি॥
গুণবাক্য গায়েন বায়েন আর সব ফিরে।
হরিনাম ইক্ষুরস দরদরাইতে পড়ে॥
যে পায় সে খায় রস কেহ না আলয়।
যত ভক্ত খায় তবু পেট না ভরয়॥
গৌরীদাস পণ্ডিত হৈল রসের ভাণ্ডারী।
বিনিমূলে দেয় রস গাগরী গাগরী।
পাগিয়া শেখর তাহে রসের কাঙ্গাল।
মাগিয়া যাচিয়া শালে খায় সর্ব্বকাল॥

এই অপূর্ব্ব রসঘন ইক্ষুদণ্ডের বাহ্যরূপের শুষ্ক বর্ণনায় তাহার সত্যকার পরিচয় কি করিয়া দিব? সেই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে সে-ই মজিয়াছে, যে পায় নাই তাহাকে, কথার জাল বুনিয়া রসের সন্ধান কে দিবে?

তবু ইহার আর একটা দিক আছে। এই অনির্ব্বচনীয় রসের উল্লাসে সাধকের সর্ব্ব মনপ্রাণ যখন পরিপ্লুত হইয়া যায় তখন তাঁহার সেই আনন্দঘন পরিতৃপ্তির একটা বাহ্য স্ফুরণ দেশের বিভিন্ন স্তরে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। ভগবান্ তথাগতের সকরুণ পরশ এমনি করিয়া দুই সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সাহিত্যে, স্থাপত্যে, শিল্পে, দার্শনিক চিন্তাধারায় ভারতে নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমাদের মহাপ্রভুও তেমনি,

গোলক-গোকুল বৈভব লইয়া
আইলা পরশ-মণি।

পরশমণির পুণ্য-পরশে সমাজের প্রত্যেক স্তরে দেশের চিন্তাধারার প্রত্যেক প্রবাহে এই প্রেমধর্ম্মের সংস্কৃতিগত প্রভাব অমোঘ শক্তিতে কার্য্য করিতে লাগিল। দেশের চিরাচরিত সমাজমূলে নদীয়ার এই প্রেমসাধনা কি যে মর্ম্মান্তিক আঘাত হানিয়া নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছিল পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। (সমাজের বিভিন্ন স্তরে সমাজ-ব্যবস্থার পুনর্গঠন, ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী আনয়ন, বাংলা সাহিত্যের [illegible] পুষ্টিকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অলৌকিক প্রত্যক্ষ দানের কথা কাহারও অবিদিত নাই।) কিন্তু আরও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, পরোক্ষভাবেও এই প্রেমধর্ম্মের প্রভাব বাঙ্গালার বর্ত্তমান সংস্কৃতির মূলে কতখানি কার্য্যকরী রহিয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র চিন্তাধারার মূলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের বিভিন্ন স্তরের চিন্তাধারার বিভিন্নতা আপাতদৃষ্টিতে যতই ব্যাপক বলিয়া মনে হউক না কেন, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাদের প্রত্যেকের ভিতরেই এই প্রেমধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়াই বাঙ্গালী মরমীজনের বিচিত্র অনুভূতি ও চিন্তাধারা প্রবাহিত। সুতরাং প্রথমেই সাহিত্যের কথা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। বলাই বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের একটা সুবৃহৎ ও গৌরবময় অংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকগণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ধন্য

হইয়াছে। বৈষ্ণবযুগেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন ও সাহিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার মত ইহার দৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা, ইহা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। প্রেম-কাব্য ও রস-সাহিত্যের দিক দিয়া বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর তুল্য অপরূপ সামগ্রী পৃথিবীর সাহিত্যেও অধিক নাই। কিন্তু এই অনবদ্য রস-সাহিত্য নিছক সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই রচিত হয় নাই। বৈষ্ণব সাধকগণ মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেম রসে অভিষিক্ত হইয়া যে অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় রসাস্বাদে মজিয়াছিলেন তাহারই স্বতোৎসারিত সাত্ত্বিক অনুভূতি ছন্দে ছন্দে রূপায়িত হইয়া এই অপরূপ পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা তাঁহাদের সাহিত্যের সাধনা নহে, সাধনার সাহিত্য। সাধকগণের এই স্বর্গীয় প্রেম সাধনা স্পর্শমণির মত যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে তাহাকেই খাঁটি সোনা করিয়াছে।

পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে
পরশ-ছোয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা॥

সমাজের বিভিন্নস্তরে উচ্চ-নীচ পণ্ডিত-মূর্খ নির্ব্বিশেষে প্রেমের পরশমণি স্পর্শে ধন্য হইয়াছে। "অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়া" কর্ম্মকার তাহার হাতুড়ী ফেলিয়া লেখনী ধরিয়াছে, বিদ্যাভিমানী মহাপণ্ডিত তাহার শুষ্ক জ্ঞানের গৌরব সলজ্জে পরিহার করিয়া প্রেমের পদাবলী রচনায় অন্তরের আর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে। এমি করিয়া দেশের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ পরশ যে অঘটন ঘটাইয়া গিয়াছে তাহা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু পরোক্ষ ভাবেও যে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম দেশের সর্ব্ববিধ চিন্তাধারার মূলে কতখানি কার্য্যকরী রহিয়াছে তাহা আজিও সম্পূর্ণ আলোচিত হয় নাই।

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। বিকৃত বৌদ্ধতান্ত্রিকতায় ও 'হীনযান' 'সহজযান' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অপভ্রংশ প্রথায় বাঙ্গালার ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্র তখন কণ্টকিত। বৃন্দাবন দাস এই সময়ের আধ্যাত্মিক দৈন্যের কথা লিখিয়াছেন—

প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার।
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে রাত্রি জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ পূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥—চৈঃ ভাঃ

বিগ্রহাদি সেবা বা বৈধী পূজা-অর্চ্চনার অভাব তখন ছিল না, কিন্তু ভক্তি-প্রাধান্য তখন স্বীকৃত হইত না। পঞ্চোপাসকী বৈধী মার্গ হইতে রাগমার্গীয় সেবার শ্রেষ্ঠত্ব-বুদ্ধি দূরে থাক, তাহার অনুভূতিও ছিল না তখন দেশে।

বাঙ্গালার এই শোচনীয় আত্মিক দৈন্যের সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। তারপর বিধাতার আশীর্ব্বাদে মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ে দেশে সর্ব্বাঙ্গীণভাবেই নব জাগরণ সুরু হইল। শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা এখানে আমি বলিতেছি না, দেশের সমগ্র চিন্তাধারাই ইহার পর হইতে অপূর্ব্ব প্রেমের রসে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্প্রদায়গত প্রথার বাহ্যিক ও আনুষঙ্গিক রীতিনীতি বাদ দিয়া দেখিলে ইহার মূল কথা হইল প্রেম। পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন ও প্রেমের পরাকাষ্ঠাই তাহাদের সাধনা।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি॥
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখমে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনু
গতি যে নাহিক মোর॥

ইহা শুধু রাধার আর্ত্তি নহে, বৈষ্ণব সাধকগণের প্রাণের আর্ত্তি। প্রেম সাধনার ইহাই চরমোৎকর্ষ। ভগবানকে সাংসারিক সুখ-দুঃখের নিয়ামক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া মন্দিরের ধূপ-ধুনার অন্তরালে দূরে সরাইয়া না রাখিয়া আপনার একান্ত প্রিয়তম প্রেমাস্পদ বলিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে। এই ভালবাসায় স্বার্থ নাই, আত্মবোধ নাই। আমার মিলনে প্রিয়তমের আনন্দ তাই ত' আমার প্রেমের চরম মূল্য।

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহ প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥—চৈঃ চঃ

এই অতীন্দ্রিয় আত্মসমাহিত প্রেমসাধনাই বৈষ্ণব সাধকগণের।

আরাধ্য-দেবতাতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি না করিয়া একান্ত আপনার জন হিসাবে সেবা করিবার আনন্দই একমাত্র পরমকাম্য। বৈষ্ণব সাধনার ইহাই মর্ম্মকথা। পিতা, মাতা, কন্যা বা জায়ারূপে তিনি সতত আমাদের স্বাভাবিক প্রেমকে আকর্ষণ করিতেছেন।

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন
তার প্রেম-বশ আমি না হই অধীন
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে
তাঁরে সে সে-ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন,
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা-শুদ্ধ-সখ্যে-করে-স্কন্ধে-আরোহণ।
"তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥"
প্রিয়া যদি মান-করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥—চৈঃ চঃ

ইহাই রাগানুগা পরমা ভক্তি। এমনি করিয়াই তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করেন ও সেবা করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়া চৈতন্যোত্তর যুগের শক্তি-সাধকগণও আরাধ্যাদেবীকে ভীতি-সম্ভ্রম-বিজড়িত বৈধী ভক্তিভাবে না দেখিয়া মাতৃবৎসল ব্যাকুল সন্তানের ক্রন্দনে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন।

মা আমায় ঘুরাবি কত?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়
ছ'টা কলুর অনুগত॥
'মা' শব্দ মমতাযুত
কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি, ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা
আমি কি ছাড়া জগত॥
কুপুত্র অনেক হয় মা
কুমাতা নয় কখন তো
রামপ্রসাদের এই আশা মা
অন্তে থাকি পদানত॥

কিম্বা

মরি গো এই মন দুঃখে
ওমা, মা বিনে দুঃখ বলব কাকে।
এ কি অসম্ভব কথা
শুনে বা কি বলবে লোকে।
ঐ যে, মা যার জগদীশ্বরী
তার ছেলে মরে পেটের দুখে
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে
পাহাড় মারলে আমার বুকে
ওমা, মায়ের মত কাজ করেছ—
ঘোষিবে জগতে লোকে।
—ইত্যাদি

এমনিভাবে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে যে এতখানি প্রাণের ভালবাসা ব্যক্ত হইয়াছে, ভক্তের আকুল আকাঙ্ক্ষা যে দিব্যরাগে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বকথিত বৈষ্ণব প্রভাবই তাহার একমাত্র কারণ। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রেমের আদান-প্রদান মূলক মধুর লীলা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেরই নিজস্ব সামগ্রী, এবং বাঙ্গালার সমুদয় চিন্তাধারার মূলেই তাহা ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে, যাহাকে সর্ব্বপ্রাণ দিয়া একান্তই আমার বলিয়া জানি, কেবলমাত্র তাহারই উপর আমরা মান-অভিমান করিতে পারি; ও ঈশ্বর-বুদ্ধি করিলে আর তা সম্ভব হয় না।

ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি ওসব জঞ্জাল।
তোমার কানুরে মোর শতেক নমস্কার॥
অমল কুলেতে কালী যেমত দিয়াছি গো
তেমনি পাইনু পুরস্কার
গুরুজন তেয়াগিনু লাজে তিলাঞ্জলি দিনু
তেজিনু গৃহের সুখ-সাধ।
সখি দোষ দিব কারে এতেকে না পাইনু তারে
বিধাতা সাধিলে তাহে বাদ॥
যত্ন করি রোপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সিঁচি আঁখি-জলে।
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
অমিয়া-বিরিখে বিষ ফলে।
বংশীবদন দাস ছাড়ি নিদারুণ আশ
তেজহ দারুণ অভিমান।
তোমা বিনা সেই কানু ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষীণ তনু
দাবানলে দহে যেন প্রাণ॥

শক্তি-সাধকগণও মার অবিচারে অভিমান করিয়া বলেন,

মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী।
ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বলে আর কোলে যাব না।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে।
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে
মা মলে কি ছেলে বাঁচে না।

শ্রীরাধা এমনি অভিমান করিয়াই বলিয়াছিলেন, 'কালবরণ আর হেরব না সজনী—'

মা যশোদার প্রেম বাৎসল্য-রসের পরাকাষ্ঠা। ইহা লাভ করিতে কত সাধনা, কত ঐকান্তিকতা, কত আত্ম-সমাহিত দিব্য প্রেমের প্রয়োজন হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম প্রেমের ঐকান্তিকতায় ধরা দিয়াছেন অসহায় শিশুরূপে। ছেলের জন্য মায়ের সে কত আশা-আনন্দ, উদ্বেগ-আশঙ্কা।

রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে।
বামে-বসাইয়া শ্যামে দক্ষিণে বসাই রামে
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥
ক্ষীর ননী ছানা সর আনিয়াছে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মহাসুখে
নিরখয়ে চাঁদমুখ পানে॥
জ্বালিয়া রতন বাতি করে সবে আরতি
হরষিত যশোমতি মাই।
কহে বলরাম দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে
দু'হু রূপের বলিহারী যাই॥

এই বাৎসল্য-রসেরই স্বতন্ত্র ধারা আমরা পাই বাঙ্গালার নিজস্ব জিনিষ আগমনীর পদাবলীতে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া চণ্ডিকাদেবী বাঙ্গালীর সন্তানবৎসল স্নেহার্ত্ত কোল শীতল করিয়াছেন কন্যারূপে। স্নেহের পুত্তলী কিশোরী কন্যাকে পিতামাতার স্নেহচ্ছায়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্বশুরালয়ে প্রেরণ বাঙ্গালীর ঘরে একটা চিরন্তন বেদনার কাহিনী। জগজ্জননী মহামায়াকে তেমনই সন্তানবুদ্ধি করিয়াই আমরা আর্ত্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করি—বৎসরের তিনটি দিনের জন্য।

গিরি হে গিরিশপুরে দ্রুত যাও।
বড় ব্যাকুল পরাণী, উমা পরাণ নন্দিনী
হর-ঘরণী ঘরেতে মিলাও।
সংবৎসর হল গত সময় হল আগত
ওষ্ঠাগত প্রাণে বাঁচিনে বাঁচাও।
শৈল যাও হে শৈল যাও—
মেয়ে এনে অঙ্গনে দুঃখিনীর
দুর্গতি ঘুচাও।

অথবা

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো।—ইত্যাদি

ভক্তির উপরেও প্রেমের এই যে প্রাধান্য, বাঙ্গালার চিন্তাধারায় ইহাই বৈষ্ণব সাধকগণের বিজয়বৈজয়ন্তী।

ইহা ছাড়াও সারী, বাউল, যাত্রা, পাঁচালী, ঢপ প্রভৃতি বাঙ্গালার গণ-সাহিত্যও সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণবভাবে বিভাবিত, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা বর্ণনায় মুখর। নিখিল রসামৃতসিন্ধু ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নায়ক করিয়া কত শত সঙ্গীত যে বাঙ্গালার অশিক্ষিত জনগণের কণ্ঠে উৎসারিত হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। রাধাকৃষ্ণের অপরূপ প্রেমবৈচিত্র্যই বাঙ্গালার গণ-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। তাই বাঙ্গালার সার্থক প্রবাদ 'কানু ছাড়া গীত নাই' বাঙ্গালার জনচিত্তকে বৈষ্ণব সাধকগণের প্রেমসাধনা সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই শিক্ষিত অশিক্ষিত কণ্ঠ মিলাইয়া যেখানেই প্রাণের কথা বলিতে চাহিয়াছে, সেইখানেই এই গৌড়ীয় প্রেম-সাধনার তত্ত্ববস্তুকে নানাভাবে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রেম বিনে কি সে ধন মিলে।
জগৎ সৃষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে।
জ্ঞান আলোকে দেখবে যদি
প্রেমের তৈল দাওরে ঢেলে।
আছে ঘরের মধ্যে পরম-নিধি
কোল আঁধারে ঘুরে মলে।
প্রেমে হাসায় প্রেমে কাঁদায়
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে।
এ সব প্রেমের রাজ্য, প্রেমে কার্য্য
প্রেম আছে সকলের মূলে
প্রাণ ছাড় ত প্রেম ছেড় না
প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে,
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন
ধরা পড়েন প্রেমের জালে।

[ক্রমশঃ

ধ্বংস-লীলা

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

ঈশানের চারিধারে, ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জীভূত মেঘ,
মসীময় অন্ধকারে, ছেয়ে গেল দিক্ দিগন্তর।
সহসা উঠিল ঝড়, কি দুর্ব্বার তীব্র তার বেগ,
দৈত্যসম এল ছু'টি ঝাপাইয়া বিশ্ব-চরাচর।

ভগ্নশাখা মহীরুহ, হেথা হোথা রয়েছে পড়িয়া,
নদীস্রোতে ঘূর্ণি উঠে, কত শত তরণী ডোবায়।
উত্তাল তরঙ্গ তুলি, পারাবার উঠে গর্জ্জিয়া,
প্রলয়ের নৃত্য যেন, সৃষ্টিধ্বংস হবে কি ত্বরায়?

এরি প্রতিচ্ছায়া হেরি, অন্তরীক্ষে কিবা জলে স্থলে,
লোভের লালসা-বহ্নি, জ্বলিতেছে দাউ দাউ করি।
পতঙ্গের মত নর, ছুটে গিয়া মরে তার তলে,
নির্ব্বিকার রুদ্রদেব, লক্ষ লক্ষ কত প্রাণ হরি।

মানব বলিয়া গর্ব্ব সাজে না সাজে না আর তব,
দানব সাজিয়া আজ করিতেছ একি অভিনয়?
পশুত্ব জাগ্রত হ'য়ে ধরিল কি রূপ অভিনব,
লজ্জিত বনের পশু, সভ্যতার একি পরিচয়!

হে বিধাতা নাহি বুঝি লীলা তব রহস্য দুর্জ্জেয়,
অশুভ মূহুর্ত্তে শুভ, চিরদিন করিছ প্রকাশ।
দগ্ধ করি মানবেরে, শিক্ষা দেও কিবা তার শ্রেয়,
পরিণামে হবে জয়ী, হে মানব হয়ো না হতাশ।

বিপজ্জনক-খুল্লতাত

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

খুড়ো লিখিয়াছেন :

'বাবাজীবন, বহুদিন যাবত তোমার মুখচন্দ্র না দেখায় আমি বিশেষ···তাছাড়া ৺পূজায় পাড়াগাঁয়ে কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদাদি নাই বিধায়···' ইত্যাদি।

অর্থাৎ আগামীকল্য তিনি এখানে আসিতেছেন। পড়িয়া কান্না পাইতে লাগিল। পুরুষপুঙ্গব না হইলে অনায়াসে কাঁদিতে পারিতাম। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

বছরের মধ্যে খুড়ো বারমাসই গ্রামে বাস করেন কিন্তু মাঝে মাঝে দুই একবার তাঁর সহরে শুভ (?) আবির্ভাব ঘটে। আসিয়া আমারই মেসে উঠেন। গ্রাম্য সম্পর্কে খুড়ো, বয়স চল্লিশোর্দ্ধ, কিন্তু মনটি সহরে আসিলেই, চলতি কথায় যাকে বলে 'চ্যাংড়া' তাহাই বনিয়া যায়। যে কয়বারই তিনি পদার্পণ করিয়াছেন একটা না একটা মারাত্মক রকমের রসিকতা করিতে গিয়া বেচারা-আমাকে প্রায় তথাকথিত কাঁদাইয়া গিয়াছেন। যে ধরণের বিপদে তিনি আমাকে শুদ্ধ জড়ান, তাহা যে মানুষের জীবনে একেবারেই দুর্ঘট এমন কথা বলিয়া নিজেকে আর নির্লজ্জ মিথ্যুক প্রমাণ করিব না। তবে সে সব ঘটনা জীবনে, রাজ ভাষায় যাকে বলে few and far between-ই আসিয়া থাকে কিন্তু দগ্ধ কপাল আমাকেই কি না তাহা বছরের মধ্যে দুই তিনবার করিয়া পোহাইতে হইত। যদি তিনি তাঁর দৌরাত্ম্য মেসের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতেন তাহা হইলে উদ্বিগ্নতার এতটা কারণই থাকিত না, কিন্তু তাহা তো হইবার নহে। তাঁর কার্য্য-কলাপ রাস্তায়, জনতার মাঝখানে, দিনের আলোকে যে অবস্থায় তিনি আমাকে ফেলিতেন তাকে বিশুদ্ধ বাংলায় বোধ হয় 'গুরুতর পরিস্থিতি'ই বলিয়া থাকে।

গতবারের কথাটাই বলিব, বিচার আপনাদের হাতেই রহিল।

সেইবারও তিনি আমার মেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একটী সুটকেশ, গলাবন্ধ কোটটি, লাঠি, ছাতা ও ক্যাম্বিসের জুতাটী, মানে পরণে সেই গ্রাম্য পোষাকই। কিন্তু এখানে আসিলেই তাঁর মন ঝট্ করিয়া বছর কুড়ি নামিয়া আসে সুতরাং তাঁর পোষাক আমার না হইলেও আমার পরিচ্ছদ তাঁর হয়। ভারতীয় পোষাক নহে। নিজ প্রয়োজনের খাতিরেই দুই জোড়া সুট তৈয়ারী করাইতে হইয়াছিল, তারই একটী খুড়োর গায়ে উঠে। সেই বিশাল উরুতট আমার ক্লিষ্ট-দেহ-লতা-মার্কা প্যাণ্টে যে কি ভাবে প্রবেশ লাভ করে তাহা দেখিবার বস্তু। সুতা ইলাষ্টিক নহে বলিয়াই আমার বুকের ধড়ফড়ানি কমে না, কখন ফস্ করিয়া শব্দ শুনি, আর দেখি যে, কোটটির পৃষ্ঠদেশ এবং প্যাণ্টটির নিতম্বপ্রদেশ ফাঁসিয়া গিয়াছে। সোনায় সোহাগা হয়, যখন সেই আঁটাসাঁটা কোটের পকেটে অর্দ্ধ-দৃশ্যমান অবস্থায় ষ্টেথিস্কোপটি ঝুলিয়া থাকে। বলিতে ভুলিয়াছি, খুড়ো গ্রামে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটী চুরুটে রামটান দিয়া খুড়ো কহিলেন, "বিউটিফুল বিকেল, কি বল?"

সেই কণ্ঠস্বর! এই কথার পরেই যাহা হয় তাহা আমি বহুবার উপভোগ না করিলেও ভোগ করিয়াছি। কহিলাম, "হ্যাঁ, চমৎকার বিকেল।" খুড়ো পুনরাবৃত্তি করিয়া উঠিলেন, "আর বসে থাকা মূর্খামী। চল, অভিযানে বেরিয়ে পড়া যাক।"

চুপ করিয়াই রহিলাম।

"কিন্তু বলে রাখছি বাবাজীবন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পিত করতে হবে আমার কাছে। দেখো, তোমায় ঠিক আমি চালিয়ে নিয়ে যাব।"

চটাতে সাহস করি না তাঁকে। দুই দশ মাইলের মধ্যে গাঁয়ে ডাক্তার নাই। ছেলেপিলে সহ বাস। যেরকম লোক, শেষ পর্য্যন্ত যদি···যাক।

তবুও সাহস করিয়াই কহিলাম, "কিন্তু বলে রাখছি, ডগ্‌বেসে আমি আর যাচ্ছি না।"

"নির্ভয়ে যাক, সে ভয় নেই।"

"মনে আছে, গতবার পঞ্চাশটাকা জরিমানা দিয়ে তিন মাসের জেল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন?"

“প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করো বৎস। চলো আজ একটা পুণ্য তীর্থ দেখে আসি।”

“পুণ্যতীর্থ!”

“হ্যাঁ বৎস, আমার বাল্যবাসস্থান, এই নগরীরই উপকণ্ঠে।”

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সহরের বাহিরে যাইবার যে সুবুদ্ধি হইয়াছে সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। একবাক্যে রাজী হইয়া গেলাম।

“এই তো গুড্ বয়,” খুড়ো কহিলেন, “যদিও এখন আর ওখানে আমাদের বাড়ীঘর নেই—কতশত নূতন লোক এসে হয় ত’ বাস করছে। তাহলে তৈরী হ’য়ে নাও।”

বাস হইতে নামিয়াও প্রায় আধ মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়। রাস্তার দুই পাশে কাঁচা নর্দ্দমা, মাঝে মাঝে পুকুর, ছোট ছোট বাড়ী, অধিকাংশই একতলা। চলিতে লাগিলাম। গ্রীষ্মের প্রথম, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, যে কোন মুহূর্ত্তেই বৃষ্টি আসিতে পারে, এবং সঙ্গে ওয়াটার প্রুফ বা ছাতা কিছুই আনি নাই ভুলে। অন্য সময় হইলে মন ভীষণ খিঁচড়াইয়া যাইত কিন্তু এখন মন আমার প্রফুল্লই ছিল যেহেতু গতবার খুড়ো ডগ্-রেসে প্রথম দশ মিনিটের মধ্যেই পুলিশের হাতে পড়িয়াছিলেন অথচ এবার এখনও ঠাণ্ডাই আছেন। তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু হায়—যাক্, আগে বিলাপ না করিয়া ঘটনাটাই শুনাই—

মনে মনে আঁচিয়াছিলাম, বাড়ী ফিরাইয়া খাওয়া দাওয়ার পর কোনমতে বিছানায় শোয়াইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত। কাল প্রত্যূষে উঠিয়া তো পুনরায় দেশাভিমুখেই রওনা হইবেন। প্রতিবারই খুড়ীর strict order থাকে, একটি রাত্রি মাত্র খুড়ীবিহীন অবস্থায় খুড়ো কাটাইতে পারেন, ইহার একচুল এদিক ওদিক হইলে খুড়োর মাথার চুলও স্থানচ্যুত হইবার আশঙ্কা। ঐ একটি লোকই ত্রিসংসারে আছেন, যিনি এই খুড়োকে মানে গিয়ে—যাক ফ্যামিলী সিক্রেট্ না বলাই ভাল। তাই এবার বোধ হয় বিপদ ঘটিল না ভাবিয়াছিলাম এবং ভাবিয়া বোধ হয় বিপদমুক্তির একটু হাসিও হাসিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! সেদিনকার মত সেই আমার মুখকমলের শেষ হাসি।

আধ ঘণ্টা যাবত খুড়ো স্থানটি ঘুরিল এবং অনবরত এক একটি যায়গা দেখাইয়া কহিতে লাগিল, কোথায় তাহাদের বাড়ী ছিল, কোথায় ছিল পায়খানা, কোন্‌স্থানের এক তেঁতুল গাছে বাঁধিয়া তাহাকে দুষ্টামীর জন্য বেদম প্রহার খাইতে হইয়াছিল, কোন্ স্থানে প্রথম ধূমপানাভ্যাস করিতে তিনি যান—ইত্যাদি। তারপর একটা বাংলোপ্যাটার্ণের বাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়ান গেল। সামনের দেয়ালে মার্বেল-ফলকে লেখা ‘কাদম্বিনী লজ’।

“ঠিক এই যায়গাই বোধ হয়, যদি আমি ভুল না করে থাকি,” খুড়ো একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত কহিলেন, হ্যাঁ ঠিক এই যায়গাটাই হবে, প্রায় ত্রিশ বছর আগে, আমি তখন—আরে আরে এই খেলে যা।”

শেষ কথাটা তাঁর মুখ দিয়া নির্গত হইল আচমকা মুষল ধারে বৃষ্টির জন্য। হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া জল নামিয়া আসিল। আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমরা দুইজন গিয়া সামনের ছোট ফুল বাগান পার হইয়া সেই ‘কাদম্বিনী লজ’এর বারান্দায় উপস্থিত হইলাম। জানালার ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতরটা দেখা গেল, কেহ নাই, বোধ হয় উহা বৈঠকখানা।

বারান্দাটাকেও নিরাপদ আশ্রয় বলা যায় না, কেন না মাথা বাঁচিলেও বৃষ্টির ছাঁট এমন আসিতেছিল যে, কিছুক্ষণের মধ্যে ঘর ও বাহিরের পরিণতি সমান হইবার আশঙ্কাই বেশী ছিল।

খুড়ো মুহূর্ত্তমধ্যে কড়া নাড়িয়া উঠিল; আমি হা হা করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই একটি চাকর দরজাটি খুলিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

“এইটিই কি ‘কাদম্বিনী লজ’?” খুড়ো প্রশ্ন করিলেন।

“আজ্ঞে হাঁ।”

“বাবুরা কেউ বাড়ীতে আছেন?”

“আজ্ঞে না, তিনি আফিসে।”

“অ—যাক তাহালে আমাদের বসতে হবে,” খুড়ো কহিলেন “আমি হলাম গিয়ে ডাক্তার বোস আর এই আমার কম্পাউণ্ডার নার্স।”

ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে কম্পাউণ্ডারও রুগী বাড়ী যাতায়াত করে কি না সে প্রশ্ন চাকরটীর মনে উদয় হইল কি না ভগবান জানেন। সে কহিল, “আপনি বুঝি বাবুর জন্যে এসেছেন।”

“হাঁ,”

"কই আমাকে তো কিছু বলেন নি।"

বলেন নি বুঝি, খুড়ো কহিলেন, ভারী অন্যায় না জানানো !

"বাবুর যে অসুখ তাও ত' জানি না। তা'ছাড়া, গিন্নী মা ত' এখন এখানে নেই।

"সে কি! বাড়ীতে তা'হলে কে আছে এখন ?"

"একা আমিই।"

"তা বেশ। আমরা বাবুর জন্যে অপেক্ষা করছি। ক'টায় ফেরেন তিনি ?

"সন্ধ্যার সময়।"

"তা' বেশ, আমরা বসছি ততক্ষণ।" বলিয়া খুড়ো হল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, উপায়হীন আমিও পিছনে পিছনে গরুচোরের মত প্রবেশ করিলাম।

"আপনারা তা'হলে বসুন, আমি একটু ঘুরে আসছি।"

"বেশ, অনায়াসে।" খুড়ো একটী কৌচে বসিয়া পড়িলেন। চাকর চলিয়া গেল ছাতা হস্তে ; হয় ত' তার কোন আড্ডাস্থান থাকিবে।

ঘরটী আধুনিক সাজে সজ্জিত।

"দেখলে ত' বৎস, কি সুন্দর যায়গায় আসা গেল"। খুড়ো কহিয়া উঠিলেন, "একটু বুদ্ধি খরচ, একটু মিষ্টি কথা, ব্যস্, আমরা নিরাপদে আরামে এখানে বসে। ভিজবার কোন ভয় নেই; সর্দ্দি-কাশির ভয় নেই। এই জন্যেই বলি, তুমি আমার কথা মত চল, দেখবে কক্ষনো কোন অসুবিধায় পড়বে না।"

"না না," ভীত-আমি কহিলাম, "এখানে আর থেকে কাজ নেই।"

খুড়ো চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "তা'হলে কি তুমি বাইরে গিয়ে ভিজতে চাও নাকি হে, মাই ডিয়ার ল্যাড, তুমি জান না এই ঠাণ্ডা কি ভীষণ। আজ আসবার সময় তোমার খুড়ীর সঙ্গে আমার এক কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে। তিনি কিছুতেই আসতে দেবেন না, বলেন, এ সময় নাকি স্থান পরিবর্ত্তন বিপজ্জনক। কিন্তু বৎস, এ শর্ম্মা একবার গোঁ ধরলে কারুর পিতার সাধ্য নাই যে আটকায়—চলে এলাম জোর করেই, মায়া প্রপঞ্চ ফ্রপঞ্চ বাবাজী আমি মানি না, আর এ দুনিয়ায় কাউকে কেয়ারও করি না। পাঁচশো বার বলে দিয়েছে 'সাবধানে থেকো'। এর ভেতর আমি যদি গিয়ে সর্দ্দি-কাশি নিয়ে উপস্থিত হই—তা'হলে তিনি আর আমায় আস্ত রাখবেন হে। ছিঃ ! পাগলামী করো না।"

হা হতোস্মি !

আইনের কথা ছাড়িয়া দিলেও এমনিতেই আমার বিরক্তি লাগিতেছিল ; কিন্তু উপায় নাই। তবুও কহিলাম, "ধরুন, বাড়ীর মালিক যদি এখন এসে পড়ে ?"

কথাগুলি শেষ না হতেই বাহিরে শব্দ হইল, "মনমোহন বাবু আছেন ?"

ভীষণ আঁৎকাইয়া উঠিয়া আমি কহিলাম, ঐ !!

"আঃ, অতো ঘাবড়ে যেও না বাবাজী", খুড়ো কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া কহিলেন, "ভয় পাবার তো কোন কারণ দেখি না। তা'ছাড়া মালিক তো কিছুতেই নয়। তুমি একবার মুখ বাড়িয়ে দেখো দিকিন্ বাছাধনটী কে ?"

দেখিলাম, কহিলাম, "ফরসা ছিপ-ছিপে একটী যুবক।"

"যাও, শুনে এসো—ছেলেটি কি চায় ?"

"আপনিই যান, আমি পারব না।"

প্রাণ-জল করা হাসি হাসিয়া খুড়ো কহিলেন, "তবে চল আমরা দু'জনেই যাই।"

দু'জনেই গেলাম। দরজা খুলিতেই ছেলেটী বিনীত নমস্কারে বলিল, "মনমোহন বাবু বাড়ী আছেন ?"

সঙ্গে সঙ্গেই আমি কহিলাম, না।

ছিঃ, খুড়ো আমার দিকে ফিরিয়া বাধা দিলেন, "বোকার মত কথা বলো না। এই তো আমি বাড়ীতেই আছি।" তারপর ছেলেটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমিই মনমোহন বাবু, এই আমার ছেলে শ্রীমান্ সুরেন্দ্র।"

আমি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, অনেকটা বাজ-পোড়া মরার মত।"

"তোমার নামটি ?"

"কনক মিত্র"

"কি বললে ?"

"আজ্ঞে কনকবিকাশ মিত্র।"

"কনক বি-কা-শ, তাই বলো, শুধু কনক শুনে ত' মনে হয়েছিল মানে গিয়ে—তা বেশ খুসীই হলাম। বেশ ভিতরে এসো কনকবিকাশ।"

পুনরায় ভিতরে চলিয়া আসিলাম। বুঝিলাম, আজ অদৃষ্টে একটি প্রহারযোগ আছে।

ছেলেটি একটি চেয়ারে বসিয়া কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়াই কহিল, "নীলিমা এসেছে এখানে?"

"এসেছে নাকি সে সুরেন?" খুড়ো আমাকে জিজ্ঞাসা করিল।

না ত'। আমি উত্তর করিলাম।

"সে আমাকে লিখেছে যে, আজ বিকেলে এখানে থাকবে।"

তাহলে নিশ্চয়ই আসবে। খুড়ো স্পষ্ট উত্তর করিল।

"নীলিমাকে বোধ হয় আপনারা কখনো দেখেন নি। সে বলছিল, আপনাদের সঙ্গে নাকি তাদের কি একটু মনোমালিন্য আছে।"

"সে কিছু না, সে কিছু না।" খুড়োর কণ্ঠ নির্ব্বিকার।

"নীলিমা সরকার, আপনার, মানে আপনার স্ত্রীর বোন-ঝি নীলিমা।"

"একই কথা, একই। আমার স্ত্রীরও যা আমারও তা। আমরা তো সমান অংশীদারই বটে। হে-হে-হে।" বলিয়া টানিয়া টানিয়া খুড়ো হাসিতে লাগিলেন।

ছেলেটী নিঃসঙ্কোচে কহিল, "নীলিমাকে আমি বিয়ে করতে চাই।"

"অতি উত্তম কথা", অতি উদার কণ্ঠে খুড়ো রায় দিলেন।

"কিন্তু ওরা যে রাজী নয়।"

"ওঁরা কারা?"

"নীলিমার বাবা আর মা। এমন কি নীলিমার কাকারাও রাজী নন। তাঁরা ভাবেন, আমি নাকি সু-পাত্র নই, মানে উপযুক্ত নই।"

"আজ কালকার ছেলেদের নৈতিক চরিত্র খুব ভাল নয় হে।"

"সে শ্রেণীর ছেলে আমি নই স্যার। ওরা বড্ডো বদরাগী।"

বদরাগী! খুড়ো যেন বিস্মিত হইলেন, তাঁরা কি জমিদার?

"না, জমিদার তো নয়ই।"

"তবে, তবে কেন তারা মেজাজ দেখায়", খুড়ো যেন রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, ভাবটা এই, কেবলমাত্র জমিদারদেরই অধিকার আছে মেজাজ দেখাবার। জমিদাররা জন্মগত বদরাগী।

"তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারও হয়েছিল আমি একদিন", ছেলেটী কাঁচু-মাচু হইয়া কহিল, "আমি একদিন গোবিন্দ বাবু মানে নীলিমার বাবার সঙ্গে আলাপ করতে করতে কি কথায় কথায় স্যার একটা বিচ্ছিরি ওয়ার্ড মুখ থেকে ফস্‌কে যায়, তাতেই মুস্কিল হলো। তিনি রেগে গেলেন। সত্যি বলছি আপনাকে, সেটা মোটেই আমার স্বেচ্ছাকৃত না, মানে গিয়ে slip of tounge।

"কথাটা কি?"

"বলে ফেলেছিলাম old fool! তার জন্য আমি এখন অনুতপ্ত স্যার, তাতেই কি না—"

হঠাৎ ছেলেটি জানালার বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল, কহিয়া উঠিল, "ঐ যে নীলিমা এসে গেছে। এই রে, গোবিন্দবাবু, মাসীমা, ওঁরাও আসছেন যে। এই খেয়েছে, ওঁরা যে আসবেন এ তো আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।"

আমার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল পেটের মধ্যে যেন মোচড় খাইতেছে। দৌড়াইয়া পলাইবার মত শক্তিও পায়ে নাই। আ মলো, পা কাঁপে কেন?

তুমি কি ওদের দেখা দিতে চাও না।

"না মনমোহনবাবু", ছেলেটি কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল।

"তাহ'লে ঐ আলমারীটার পিছনে লুকিয়ে থাক্‌গে।"

কনকবিকাশ তাহাই করিল। বাহিরে আবার কড়া নাড়ার শব্দ। আর একবার খুড়ো আমাকে দরজার কাছে লইয়া গেলেন। আমি প্রায় কাঁদিয়াই কহিলাম, "দোহাই খুড়ো, ওদের আর বাড়ীর ভেতর ঢুকিয়ে কাজ নেই।"

"সে কি হে", খুড়ো ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, "আমার বাড়ী, আমার ঘর—সবার জন্যেই উন্মুক্ত। তুমি এক কাজ কর, ঐ কোণের চেয়ারটায় চুপটি করে বসে থাকো দিকিন, যেন চাকরীর উমেদার—হ্যাঁ যাও।"

আমি এমনিতেও গিয়াছি, অমনিতেও গিয়াছি এস্পার ওস্পার ভাব নিয়া চেয়ারে গিয়া বসিলাম।

উহারা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মধ্য-বয়সী এক ভদ্রলোক ও একজন ঐ বয়সী ভদ্র মহিলা, আর একটী আঠার উনিশ বছর বয়সের তরুণী।

ভদ্রলোকের চোখে পুরু-কাঁচের চশমা, পরণে সুট। মহিলাটিও যথাসম্ভব আধুনিক সাজে সজ্জিতা। আড়চোখে

একবার মেয়েটীকে দেখিলাম, মুখটী বেশ সপ্রতিভ। সবুজ রঙেব একটি শাড়ী পরণে, গোলাপী ব্লাউজ। কানের ঝুমকো দুইটা এত বড় যে প্রথমেই নজরে পড়ে—চোখ দুটী ভাষা ও স্বপ্নময়; রঙ বেশ গৌর। মোটমাট, তাকে দেখিয়া আমার মত অ-কবি লোকেরও মনে হইল যেন ডালনিকের পার্শ্বে একটী কাশ্মীরি কাঠগোলাপ (মাপ করবেন, কাশ্মীরি গোলাপ, লাল কি বেগুনে হয় তা আমার জানা নাই, তবে আর পাঁচ জনের মত শোনা কথা আমিও কহিলাম)।

সবাই উপবেশন করিল। মহিলাটি প্রথমে কথা কহিলেন।

"নমস্কার চৌধুরী মশায়! আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছেন না। আমি হ'লাম কাদম্বিনীর পিসতুত ছোট বোন সরমা। এই আমার স্বামী মিঃ সরকার। আব এই আমার মেয়ে নীলিমা। কাদম্বিনীকে তো দেখছি না?"

"দুঃখিত। সে ত' পুরী গেছে", খুড়ো বলিলেন।

"যাচ্চলে, আমার দুর্ভাগ্য, দেখা হ'ল না।" মহিলাটী কহিলেন, "আপনাকে বোধ হয় এই প্রথম দেখলাম।"

আমারও দুর্ভাগ্য, সস্মিত হাসিতে খুড়োর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মহিলাটির দৃষ্টি হঠাৎ আমার দিকে পড়িল, কহিলেন, "এটি কে?"

"এ একটী দুঃস্থ ছোকরা। চাকরী চাকরী করে প্রায়ই এসে জ্বালায়", খুড়ো কহিলেন।

"কতগুলো কথা ছিল আপনার সঙ্গে—কিন্তু ওর সামনে—" মহিলাটি ইতস্ততঃ করিলেন।

"আরে না, না, অনায়াসে বলতে পার সরমা। ছোকরা একেবারে কালা। কানের কাছে ঢাক না পেটালে কিচ্ছু শোনে না।" বলিয়া খুড়ো আমার দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ইঙ্গিত করিলেন—ভাবটা, হাঁ করে মেয়েটীর দিকে চেয়ে থেকো না।

লজ্জিত হইয়া মুখ ঘুরাইলাম।

"কি কথা বল?"

"কাদম্বিনী—" মহিলাটী দুঃখের সঙ্গে কহিতে লাগিলেন—"তার বিয়ের সময় আমায় একটা নেমন্তন্ন করবার দরকারও মনে করলো না। তাই, সত্যি বলতে কি, আমার রাগ হয়ে যায়, আমিও আর দেখাশোনা বা খবরাখবর নিই নি। কিন্তু এখন দেখছি শত হলেও বোন ত'—আত্মীয়দের উপর অভিমান করে থাকা বোকামী।"

"অতি সত্য কথা।"

"তাই এতদিনের অপরাধের জন্ম আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি চৌধুরী মশাই।"

"ছি ছি সরমা ও কথা ব'লো না", খুড়ো জলের মত কহিয়া গেলেন—"ক্ষমা! ক্ষমা চাইবার কি আছে এতে। let by gones be by gones. এখন কাজের কথাটা বল?"

"বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি। আপনার এখানে আমি নীলিমাকে কয়েকদিনের জন্ম রেখে যেতে চাই, যতদিন না ওর একটা বিয়ের ঠিক করতে পারি। নীলিমা এখানে এক হোষ্টেলে থেকে বি, এ পড়ে। বলতে লজ্জা হচ্ছে আমার, (বলিয়া একবার নীলিমার দিকে বিষদৃষ্টি হানিলেন) মেয়ে এর ভেতর এক কেলেঙ্কারী করে বসেছেন।"

"কেলেঙ্কারী"! খুড়োর চোখ সঙ্গে সঙ্গে কপালে।

বেশ সপ্রতিভ ভাবেই নীলিমা উত্তর করিল, "কেলেঙ্কারী তাকে বলে না মা।"

আমি গোবিন্দদাসবৎ দেখিতে এবং শুনিতে আসিয়াছি, তাই চুপচাপ স্থাণুর মত বসিয়া দেখিতে এবং শুনিতে লাগিলাম।

"তা ছাড়া আবার কি", মহিলাটি খুড়োর দিকে পুনরায় চাহিয়া কহিলেন, "জানেন চৌধুরী মশায়, কাল আমি আর ইনি এখানে এসে ওর হোষ্টেলে উঠে কি দেখলাম জানেন?"

"কেলেঙ্কারী বুঝি?"

"Exactly! আমি হাঁ হয়ে গেলাম দেখে, কনকবিকাশ নামে এক ছোকরা, যাকে আমরা অতি অল্পই চিনি এবং জানি, ওর কাছে এক পত্র দিয়েছে—তিনি না কি ওকে বিয়ে না করলে এ জীবন ত্যাগ করবেন। আরো কত সব রাবিশ যে তার মধ্যে রয়েছে তা আমি বলতে পারব না। এও বুঝলাম যে মেয়েরও তাতে সম্পূর্ণ মত রয়েছে। আমার মেয়েকে দিতে হবে কিনা স্থানীয় এক operator-এর কাছে।"

"কিসের অপারেটার?" বিজ্ঞকণ্ঠে খুড়োর প্রশ্ন হইল।

"সিনেমা-অপারেটার!"

"বাঃ, এতো অতি উত্তম কাজ," খুড়ো হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, "operating কাজটা কি খারাপ কাজ হল সরমা ? ওকি যার তার কম্ম। আমায় খুন করলেও ত' আমি অপারেট করতে পারব না। ক'জন এ কাজ পারে বল ত' ? পারে একাজ তোমাদের হাইকোর্টের কোন জজ, পারে মহাত্মা গান্ধী কিম্বা মাদ্রাজের গভর্ণার ?"

মহিলাটির মুখের দিকে চাওয়া গেল না। এত ভয়েও আমার দম ফাটিয়া হাসি আসিতে চাহিল।

ভদ্রলোকটি আসা অবধি এখন পর্য্যন্ত দুই একটী সিস্টেমেটিক্ কাসি ছাড়া কোন বাক্য ব্যয় করেন নাই। এতক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে যা মনে হইল তা বলিতে গেলে—নিজের গায়েও লাগে বলিয়াই 'স্ত্রৈণ' কথাটা উচ্চারণ করিলাম না। তবে তাঁহাদের মধ্যে কে স্বামী কে স্ত্রী বোঝা কঠিন মনে হইতেছিল।

"বাজে কথা রাখুন," মহিলাটি প্রায় ধমকের সুরেই কহিলেন, "আমার আত্মীয়-স্বজনেরা শুনলে কি বলবে, যে আমার মেয়েকে একটা নীচু ষ্ট্যাটাসের লোকের হাতে দিয়েছি। বিশেষ করে নীলিমার কাকারা।"

"নিশ্চয়ই"! এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখনিঃসৃত একটী বাক্য শ্রুত হইল।

"যার কোন চালচুলো, সোসাইটি কিছু নেই, তাকেই কিনা করতে হবে আমার জামাই।" মহিলাটি কহিলেন।

আর একটী বাক্যামৃত ভদ্রলোকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, "কারুর কাছে আর মুখ দেখাতে পারব মনে করেন ?"

নীলিমার দিকে দেখিলাম—সেই কাঠগোলাপ কাঠ হইয়া বসিয়া আছে কিন্তু কহিল, "আমি তোমাদের পাঁচশোবার বলেছি না যে, কনক এখন কেবল দায়ে পড়েই সিনেমা অপারেটিং করছে, কিছুদিনের মধ্যেই সে—"

"অন্য কিছু অপারেট করবে বুঝি ?" খুড়োকে থামান পিতার অসাধ্য।

মেয়েটী খুড়োর মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপর কহিল, "কনকের উচ্চ আদর্শ আছে, ইচ্ছা, উদ্যম সবই আছে। সে অদূর ভবিষ্যতে আর এরকম থাকবে না।"

ঠিক এই মুহূর্ত্তেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। আলমারীর পিছন হইতে শ্রীমান কনকবিকাশ হঠাৎ বাহিরে আসিয়া ঠিক ফুপাঁইয়া কাঁদিলে যেরকম আওয়াজ হয় সেই কণ্ঠে ডাকিল, "নীলিমা!"

"তুমি ? কনক এখানে!" নীলিমা আসিয়া কনকের প্রায় বুকের কাছে দাঁড়াইয়া তার হাত ধরিল।

মহিলাটি ভূত দেখিলেও এতটা চমকাইতেন না। খানিকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত থাকিয়া পরে যেন রাগে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, "এতটুকু লজ্জাও কি নেই নীলিমা ?"

"You ought to be ashamed, my dear girl!" পিতার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

"ছি ছি ছি," মহিলাটি আর কিছু কহিতে পারিলেন না।

"তোমার বাবাকে যে old full বলে তাকে তুমি বিয়ে করবে ?" পিতা কহিলেন।

"সেজন্য কনক ক্ষমা চাইবে।" নীলিমার উত্তর শোনা গেল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমি একশোবার ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত আছি।" কনকবিকাশ প্রায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়ে আর কি, "যা বলেছি তার জন্য আমি অনুতপ্ত। আর কক্ষনো বলব না।"

"কনকবিকাশ"! মহিলাটি বজ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "ওসব বাজে কথা রাখো। তুমি কি বলেছ না বলেছ তার জন্যে হচ্ছে না। আমার কথা হচ্ছে—"

"জানি. জানি মাসীমা", কনকবিকাশ কথার মাঝখানেই কহিয়া উঠিল, "আপনার আত্মীয়-স্বজন, নীলিমার কাকারা কি ভাববেন—এই ত' ? তাঁদের সঙ্গে আমার তফাৎ এই যে, তাঁদের টাকা আছে আমার নেই। কিন্তু কি করে তাঁরা টাকা জমিয়েছেন জানেন কি ?"

"মানে তুমি কি বলতে চাও ?"

"থাক্, সেকথা আর নাই বা বললাম্।"

"অর্থাৎ শোন সরমা",—খুড়ো মাঝখান হইতে কহিয়া উঠিলেন—"ও ঠিকই বলেছে। নীলিমার কাকারা যে কি প্রকারে টাকা জমিয়েছে তা আমার জানা আছে। লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে টাকা জমান যে কত পাশবিক, তা তোমাকে বোঝান অসম্ভব।"

আমার অবস্থাটা পাঠকরা একবার দয়া করিয়া অনুধাবন করিবেন। খুড়ো যাদের চেনা দূরের কথা—নামও শোনে নাই,

তাদের সম্বন্ধে কি সব বার্তা বলিতেছে এবং পাতকী আমি কিনা বসিয়া বসিয়া তাহাই শুনিতে বাধ্য হইতেছি। হায় রে—

"না, তারা কারুর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গে নি।"

"তুমি তাহলে জান না সরমা! পাঁচশো টাকার হ্যাণ্ড-নোট লিখিয়ে দেড়শো টাকা ধার দেওয়া—এই ত', এই ভাবেই ত' তার টাকা হয়েছে?"

—"মিথ্যে কথা, তিনি একজন স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার।"

"বাইরে! বাইরে সে ব্যারিষ্টার", খুড়ো অনায়াসে অজ্ঞাত ব্যক্তির সম্বন্ধে ভলের মত মন্তব্য করিতে লাগিলেন, "ভিতরের খবর জানি আমি, a merciless money-lender!"

"কক্ষনো হতে পারে না। I know him very well" ভদ্রলোকও পাইপের ফাঁকে প্রতিবাদ করিলেন।

"কি সর্ব্বনাশ, এ কথা ত' আমি শুনিনি," নীলিমাও বলিল।

"তুমি কি করে জানবে মা", অতি অমায়িক ভাবে খুড়ো বলিয়া উঠিলেন, "তুমি তো ছেলেমানুষ। জানে ঐ কনক-বিকাশ।"

অবাক হইয়া দেখিলাম কনকবিকাশও অবলীলাক্রমে তাহা সমর্থন করিয়া গেল।

মহিলাটির অবস্থা বলিবার নহে, রাগে তিনি যে কোন মুহূর্ত্তেই ফটাস্ শব্দে ফাটিয়া যাইতে পারেন এইরকম ভাব। ভালভাবে খুড়োর দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিলেন না।

"একটা কথাও সত্য নয়", মহিলাটি কহিলেন, "আপনার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে চৌধুরী মশায়।"

"আরও কত কিছু আছে যা না বলাই ভাল। উঃ তাদের কীর্ত্তিকলাপ numerous," খুড়ো কহিলেন, "তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে ফেলো। দেখবে এর প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। আমাদের মত ঘরে কনকবিকাশের মত সুপাত্র ছাড়া মুর্খামী—Technical কাজ, একি চাট্টিখানি কথা। উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।"

"আমিও তাই মনে করি!" নীলিমা কহিল।

"তুই ও এ'র কথা বিশ্বাস করিস্?" মহিলাটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল।

"নিশ্চয়ই, প্রত্যেকটা কথা সত্যি।"

"আমারও তাই মত"—কনকবিকাশ প্রতিধ্বনি করিল।

মহিলাটী গুম হইয়া রহিলেন, খানিকক্ষণ, তারপর খুড়োর দিকে প্রজ্জ্বলিত দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, "যদিও কাদম্বিনীকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখতে পারতাম না, তবু আপনার মত তার স্বামী হবে—এ আশঙ্কা আমি স্বপ্নেও করি নি।"

"স্বামী"! খুড়ো যেন কিরকম ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলেন, "এ ধারণা তোমায় কে দিলে যে কাদম্বিনীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে?"

সবলে যেন কাঠ হইয়া গেল। বলে কি লোকটা।

"আপনি আমাদের সমস্তই জানেন"—কনকবিকাশ মিনতির স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমাদের যাতে বিয়ে হয় তার ব্যবস্থা আপনার করে দিতেই হবে।"

"আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম", খুড়ো নিজেকে সাম-লাইয়া লইয়াছেন, কহিলেন, "কিন্তু সরমা চুপ না করলে কি করতে পারি বল?"

"আমার কাজটাকে তুমি নীচু মনে কর না তো নীলিমা?"

"তুমি যে কোন কাজ করলেও আমি তোমারই"—ইত্যাদি।

"ধন্যবাদ।"

দেখিবার মত দৃশ্য হইতে লাগিল। যেন পঞ্চাঙ্ক নাটক দেখিতেছি। কিন্তু আমাদের পরিণামে যে কি হইবে, সে কথা ভাবিবার মত সাহস এখনও সঞ্চয় করিতে পারিলাম না।

"টাকা-পয়সা আমিও জমাতে পারব।" কনকবিকাশ বলিল।

"আমারও তাই বিশ্বাস" নীলিমা কহিল।

"আমি যদি পাঁচ হাজার টাকা পাই এখন, তাহলে আমার মাথায় যে স্কীম্ আছে তাতে অজস্র টাকার মালিক হ'তে খুব বেশী দিন লাগবে না।"

"রেস না কি হে!" খুড়োর মুখ তো বন্ধ হইবার নহে।

"সে টাকাই বা তুমি কোথায় পাচ্ছ শুনি।" প্রায় ঠাট্টার সুরেই মহিলাটি কহিয়া উঠিলেন।

"তাও বটে! কোথায় পাবে সে টাকা।" ভদ্রলোকও কণ্ঠ মিলাইলেন।

"সে জন্যে তুমি ভেবো না সরমা", খুড়ো আমাকে

স্তম্ভিত করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "আমার অবস্থা ভগবান এখনও এমন করেন নি যে দু'চার দশ হাজার টাকা একটী ছেলের উন্নতির জন্য না দিতে পারি।"

কেবল কনকবিকাশের মুখের অবস্থাই যে গদ গদ হইলে তাহা নহে, সমস্ত ঘরটা যেন আনন্দ ও বিস্ময়ে দোল খাইতে লাগিল।

আর পারিলাম না—এর পরেই হাসপাতাল ও অবশেষে ফৌজদারী কোর্ট হইয়া শ্রীঘরে যাইবার পথ ক্রমে পরিষ্কৃত হইতেছে দেখিয়া, মরিয়া হইয়াই উঠিয়া পড়িলাম। দাঁড়াইয়া কহিলাম, "চৌধুরী মশায়, আমি এখন উঠি। কিন্তু একটা কথা ছিল, যদি একটু বাইরে—"

খুড়ো হয় ত' বুঝিলেন, ইসারায় কহিলেন, চল—(কারণ আমি ওখানে কালা বলিয়াই পরিচিত)।

ফট্ করিয়া কনকবিকাশ কহিল, "আপনি না বলেছিলেন ইনি আপনার ছেলে সুরেন্দ্র।"

ঘাবড়াইবার পাত্র খুড়ো নন, কহিলেন, "আমার ছেলে হ'লে কি আর এমনি প্যাঁচামুখো হ'তো হে! (আমার মুখের অবস্থা পাঠকরাই লক্ষ্য করুন) তুমি শুনতে ভুল করেছ; একে আমি ছেলের মতই দেখি,—এই হয় তো বলেছিলাম।"

নীলিমা কহিল, "আপনার মত মহৎ লোক আমি আর দেখি নি মেসোমশায়"।

কনক কহিল, "আপনার ঋণ এ জন্মে আর শোধ করতে পারব না।"

খুড়ো স্মিতহাস্যে উভয়েরই পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, "না না কিছু বলতে হবে না, এ তো কর্ত্তব্য, তোমাদের অমূল্য জীবন সার্থক হউক, এই তো কামনা।"

মহিলা ও ভদ্রলোকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "One minute তোমরা বস। আমি এক্ষুনি আসছি।"

বাহিরে আসিয়া প্রায় কাঁদিয়াই কহিলাম, "এখনও খুড়ো পালাই চলো। না হলে তুমিও বাঁচবে না, আমিও বাঁচবো না। বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত হয়ে গেছে।"

খুড়ো হাসিলেন, "তুমি একদম নারভাস্। আবে কার under-এ আছ খেয়াল আছে। এমন সদ্গুরু পাবে না বৎস।"

অতিকষ্টে তাহাকে গেটের বাহিরে লইয়া আসিলাম।

এমন সময় এক ভদ্রলোক মোটা সোটা গোলগাল চেহারা, উক্ত 'কাদম্বিনী লজ'-এ ঢুকিতে যাইবেন, খুড়ো বলিয়া উঠিলেন, "নমস্কার"।

ভদ্রলোক ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন—নমস্কার!

"আপনার নামই কি মনমোহন বাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আপনার তো—"

"চিনতে পারবেন কি করে বলুন। আমি এখানে নূতন এসেছি। ঐ যে বাড়ীটা দেখছেন নূতন, ঐটেই আমার বাড়ী। আমার নাম পঞ্চানন মল্লিক, আর এটি আমার শ্যালক বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।"

আমি জিভের উপর দাঁত চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"একটা কথা না বললে পাড়াপড়শী হিসেবে অন্যায় হবে। আপনার বাড়ীতে কয়েকটা লোককে সন্দেহজনকভাবে ঢুকতে দেখলাম। চেহারা গুণ্ডা প্রকৃতির।"

"আমার বাড়ীতে—"ভদ্রলোক আঁৎকাইয়া উঠিলেন।

"হ্যাঁ, আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই জানালা বন্ধ করে ভিতরে পালিয়ে গেল।" খুড়ো কহিলেন, "দিনকাল যা খারাপ পড়েছে মশাই, চোর ডাকাত—

এ্যা—ভদ্রলোক প্রায় বসিয়াই পড়েন আর কি. "তাহলে কি হবে মিঃ মল্লিক?"

"ঘাবড়াবেন না মনমোহনবাবু, ইংরেজের রাজত্বে চালাকী করবার জো নেই। তবে খালিহাতে ঢুকবেন না যেন, কি জানি, ওদের হাতে যদি অস্ত্র-টস্ত্র কিছু—তারচে' থানায় একটা খবর দিয়ে পুলিশ সঙ্গে করে যা হয় একটা করুন।"

হঠাৎ খুড়ো ঘড়ির দিকে চাহিয়া—"Oh I see ছ'টা বেজে গেছে পৌণে সাতটায় ট্রেণ। আচ্ছা, নমস্কার,পরে দেখা হবে। আমরা আবার Next Train-এ বাইরে যাচ্ছি বিশেষ কাজে। আর দাঁড়াবেন না, চট্ করে থানায় চলে যান।"

ভদ্রলোক কম্পিতপদে থানার দিকে গেল।

আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উভয়ে উঠিয়া বসিলাম। খুড়ো হাসিলেন, সেই সর্ব্বনেশে হাসি, গা আমার জ্বলিয়া গেল। সমস্ত শিরা-উপশিরা এতক্ষণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ছিল।

এই হইল গতবারের কাহিনী!

সুতরাং আপনারাই বিচার করুন, এবার পূজায়. তিনি এখানে আসিলে আমি কি করিব?

প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবারও তো উপায় নাই।

নরোত্তম দাস

শ্রীকান্তীন্দুভূষণ রায় চৌধুরী
এম, এ ; ডিব, লিব ; কাব্যতীর্থ

"সনাতন রূপকৃত,   গ্রন্থ ভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব,   যুগল উজ্জল রস,
পরমানন্দ সুখসার॥
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন,   বিষয়রসে উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান।
যোগদান ব্রত,   আদি ভয়ে ভাগবত,
রোয়ত করম গেয়ান॥"

ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া গোবিন্দ দাস উপরোক্ত পদগুলি গাহিয়াছেন। নরোত্তম্ ঠাকুরের রচিত গ্রন্থ ও পদাবলীব সম্যক্ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। কেবলমাত্র তাঁহার পদাবলীর সাহিত্যিক মূল্যেব আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

ঠাকুর মহাশয় ছিলেন ভাব-ভক্তিমার্গের একজন একনিষ্ঠ সাধক। সুতরাং ভাবে বিভোর হইয়া তিনি শুধু ভক্তি রাজ্যের সুরলহরীই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে অন্যান্য পদকর্ত্তাগণের সহিত তাঁহার কিছু পার্থক্য আছে। "যুগল উজ্জল রস" ও "পরমানন্দ সুখসাগব"ই তাঁহার পদাবলীর মুখ্য বিষয়-বস্তু হইলেও তিনি মানুষেব মধ্যেই যেন সেই "উজ্জল রস" ও "সুখসাগরে"র বিকাশ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। লোকনাথ গোস্বামীব প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তির মধ্যে আমরা চণ্ডীদাসের—

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে   মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

পদেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তাঁহার পরমার্থিক শ্রেয়োলাভের পথে মনুষ্যেব সত্যকেই তিনি পরম প্রিয় বিষয় বলিয়া গণ্য করিতেন।

"পুনঃ কি এমন হব,   রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এ জনম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক,   রামচন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি যাও সেও ভাল॥"

*

"আচার্য্য শ্রীনিবাস,   রামচন্দ্র মোর দাস,
পুনঃ নাকি মিলিবে আমারে॥"

*

"দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥"

এই সকল পদে নরোত্তমের বন্ধুপ্রীতি তথা মানবপ্রীতি অতি সুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। তিনি ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া "শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, বিষয় রসে উনমত" থাকিলেও এই বন্ধু প্রীতির আকর্ষণ হইতে কোন কালেই সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

বৈষ্ণব সাধন-রাজ্যে যে সূক্ষ্ম স্তরবিভাগ বর্ত্তমান, সে বিষয়ে ঠাকুর মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। রসের প্রায় সকল প্রকার বিভেদের বিষয়ে তাঁহার পদাবলী থাকিলেও "বিপ্রলব্ধা" "প্রবাস," "মথুব" প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে রচিত তাঁহার পদগুলি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ কবে। ইহাব কারণ, এই রসগুলি তিনি নিজের অন্তর দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই জন্য এ গুলির প্রকাশ এত প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধরয়ে তুয়া দরশক লাগি॥"

*

"বন্ধুর সঙ্কেতে আমি,   এ বেশ বনালু গো,
সকলি বিফল ভেল মোর,।
না জানি বন্ধুরে মোর,   কেবা লইয়া গেল গো,
এ বাদ সাধিল জানি কোর॥"

*

সদয় হইয়া বিধি,   মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার।
দারুণ বিধির নাট,   ভাঙ্গিল প্রেমের নাট,
তিল মাত্র না রাখিল তার॥"

এই সকল পদে রাধা-হৃদয়ের বিয়োগ-ব্যথার সুর ধ্বনিত হইলেও, এই গুলির মধ্যেই যেন আমরা নরোত্তমের নিজ হৃদয়ের বন্ধুবিরহের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার "বৈষ্ণব-কবিতা"র এই মানবীয় প্রেমের মধ্যেই ভগবৎপ্রেমের বা ভগবৎপ্রেমের মধ্যেই মানবীয় প্রেমের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছেন—

"সত্য করে' কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত?"

*

এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে?

মানুষ নিজের অন্তরে যাহা উপলব্ধি না করে, সাহিত্যে তাহার প্রকাশ করে। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ অনেক সময় শাস্ত্রবাক্যের বা মহাজনবাক্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস লইয়া তাঁহাদের পদে সেইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। নরোত্তম ঠাকুরের পদে আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। মানুষের দোষ, ত্রুটী, মানুষের দুর্ব্বলতা, সর্ব্বোপরি মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, এই গুলিকে তিনি সহজ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন ও সেই ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতির বিরহে তিনি সাধারণ মানুষের মতই অকৃত্রিম ভাবে শোক করিয়াছেন। এই দুর্ব্বলতা যে শাস্ত্রোক্ত মহাজনোচিত নহে, এ কথা ক্ষণেকের জন্যও তিনি মনে স্থান দেন নাই। তিনি মানুষকে এত প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়া এবং মানুষের দুর্ব্বলতাকে এত সহজভাবে ভাবিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার "প্রার্থনা" পদাবলী বৈষ্ণবসাহিত্য-জগতে এক অতুলনীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার "প্রার্থনা"র শব্দগুলি সত্যই যেন "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করে।

"করঙ্গ কৌপীন লইয়া, ছেঁড়া কাঁথা গায় দিয়া,
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
হরি-অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥

*

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন।"

এই সকল প্রার্থনার পদে মানব হৃদয়ে যে চির-উদাসীন বাস করে, তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাইলেও, আবার সেই "প্রার্থনা"রই পদান্তরে বন্ধুবিরহের ধ্বনি শুনিতে পাই—

"বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হৃদিমাঝে দিল দারুণ বেথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিলা, সেহো সঙ্গ ছাড়ি গেল,
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥"

এই সকল বৈষ্ণব পদে তাঁর মানবহৃদয়ের অকৃত্রিম রূপ স্বচ্ছভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যে সকল বৈষ্ণব মহাজনের রচনার দ্বারা বৈষ্ণব-সাহিত্য পরিপুষ্ট, নরোত্তম তাঁহাদের মধ্যে যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, প্রার্থনা, হাটপত্তন, দেহ কড়চা, স্মরণ মঙ্গল, সূর্য্যমণি, উপাসনা পটল, চন্দ্রমণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার দ্বারা তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্যের সমধিক পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পদাবলী ছন্দ ও রসের মাধুর্য্যে অতি উচ্চস্তরের হইলেও তাঁহার যে বৈশিষ্ট্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহা হইতেছে তাঁহার মানবপ্রীতি।

সেই জন্যই বোধ হয় বৈষ্ণব-জগতে ঠাকুর মহাশয়ের এত সম্মান। তাঁহাকে বৈষ্ণবেরা নিত্যানন্দ জ্ঞান করিতেন—

"নিত্যানন্দ ছিলা যেই নরোত্তম হৈলা সেই,
শ্রীচৈতন্য হইলা শ্রীনিবাস।"

সহধর্ম্মিণী

শ্রীআশীষ গুপ্ত

ওই যে খড়িকা-কাঠির ন্যায় কৃশকায়া অষ্টপুত্রকন্যামাতৃকা ধূসরবর্ণা তথাকথিত নারীরত্নটি, উহার পতিভক্তি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ওরূপ স্বামীভাগ্য অদ্যাবধি কোন স্ত্রীলোকের হয় নাই, একথা সকলের নিকট রাজকুমারী দিবা-রাত্র বলিয়া বেড়ায়।

তা কথাটা এমন কিছু মিথ্যাও নয়। অবশ্য রাজকুমারী অনেক প্রহার পরিপাক করিয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য সে নিজে কলরবও কিছু কম করে নাই। সদানন্দ "তবে রে" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিবামাত্র রাজকুমারী পরিত্রাহি চীৎকার সুরু করে, "ওরে বাবা রে, মেরে ফেল্‌লে রে, মরে গেলুম রে!" শুধু যে এই আত্মরক্ষার ভাষাই সে ব্যবহার করে তা নয়, আক্রমণাত্মক বাক্যও তাহার বদনকৌমুদী হইতে অল্প পরিমাণে নির্গত হয় না, এবং তাহাদের কোনটাই সদানন্দর কর্ণে সুধাবর্ষণ করে না।

কিন্তু দাম্পত্যকলহ কোন্‌ সংসারে নাই? 'দম্পতি' শব্দটির গঠনকৌশল দেখিলেই ত' মনের মধ্যে একটি ক্ষীণ আশঙ্কা জাগে যে, ইহার ভিতরে 'দ্বন্দ্ব' যেন কোথায় আত্মগোপন করিয়া আছে। অতএব সদানন্দ রাজকুমারীর সংসারে কলহটা অবান্তর, এবং এই কলহ না থাকিলে রাজকুমারীর পতিভক্তির মধ্যে বিস্ময়ের কিছু থাকিত না।

বিমুগ্ধ উল্লাসের সহিত রাজকুমারী বলে, "মুখটা অম্‌নিতর বটে, কিন্তু মনটি বড় ভালো, আর ফর্সা জামাটি গায়ে দিয়ে যখন বেরোয় তখন মনে হয় যেন রাজপুত্তুরটি।"

রাজকুমারীর ভাগ্যে যে রাজপুত্র জুটিবে ইহা ত' চিরন্তন বিধি, অতএব একথা রাজকুমারী বলিতে পারে বটে!

রাজকুমারী বলে, "ঘরের ভিতরে আমি একটু হেনস্থা করি সত্যি, কিন্তু বাইরে যত জজ্‌ ব্যারেষ্টরের সঙ্গে ওর ভাব! কল্‌কাতার যত রাজা মহারাজা ওর একেবারে—"

বলিয়া রাজকুমারী দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া হাতের আঙ্গুল পাঁচটা গুঁজ করিতে করিতে চোখমুখের এক বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া বলে, "একেবারে এই মুঠোর মধ্যে।"

মুহূর্ত্তকাল পরে বিষণ্ণ সুরে বলে, "পাড়ার লোকে কিন্তু সে কথা বুঝ্‌ল না—"

কিন্তু পাড়ার লোকেরা যে একেবারে কিছুই বোঝে নাই তাহাও সত্য নয়। সদানন্দর একতলা বাড়ীটি পাড়ার লোকের অর্থেই প্রতিষ্ঠিত,—প্রথম দিক্‌কার ইঁট বাহির করা কুশ্রী বাড়ীটা যে চূণবালি সহযোগে ক্রমশঃ সভ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাও কেবল পল্লীবাসীদের সহায়তায়। অথচ সদানন্দর গৃহ কোন সাধারণ পুস্তকাগার নহে, কোন সভ্য অথবা অতিথিভবন নহে, এমন কি সদানন্দর মৃত্যুর পর তাহার সম্বন্ধে পল্লীবাসীর মনোভাব ঠিক যে কেমনটি হইবে সেকথা কিছুটা জানা থাকিলেও আপাততঃ ওই ভবনখানি সদানন্দ-স্মৃতিমন্দিরও নহে! তবুও উহা পাড়ার লোকের অর্থেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব সদানন্দর মূল্য প্রতিবেশীরা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে।

দক্ষিণ কলিকাতার এক নূতন রাজপথের দুই পাশ দিয়া শাখা-প্রশাখাস্বরূপ যেসব ছোট, বড়, মাঝারি রাস্তা একটুখানি ভিতর দিকে অগ্রসর হইয়া কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ পল্লীর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন এবং জনবহুল এক পল্লীতে সদানন্দ-রাজকুমারী বাস করে। প্রতিবেশীদের নিকট তাহারা "চাঁদাদম্পতি" এবং তাহাদের বাসভবন "বারোয়ারী গৃহ" নামে পরিচিত। নিজেদের এ খ্যাতির কথা যে তাহাদের অজ্ঞাত তা নয়, কিন্তু বুদ্ধিমানের ন্যায় এ বিষয়ে তাহারা অজ্ঞতার ভাণ করে এবং শত্রুধ্বংসের জন্য মনে মনে মতলব পাকাইতে থাকে।

সহরের এ অংশটা নূতন গড়িয়া উঠিতেছে। রাজপথগুলি সুপ্রশস্ত, আশপাশের গৃহগুলিতে রুচির নিদর্শন থাক আর না থাক ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য পরিস্ফুট। এদিকে যখন সবে মাত্র নূতন রাস্তা বাহির হইতেছিল, তখনই কাহার কাছ হইতে কিছু টাকা ধার করিয়া সদানন্দ খানিকটা জমি কিনিয়াছিল এবং একতলা একখানি ছোট বাড়ীও তুলিয়াছিল ওই টাকা হইতেই। বাড়ী না বলিয়া তাহাকে পাখীর খাঁচা

বলিলেই ঠিক হয়,—দু'খানি ছোট ঘর, পুরানো লোহা এবং পোকা-খাওয়া কাঠের কড়ি বরগা, কাঠের গরাদে দেওয়া খড়খড়িবিহীন জানালার চৌকাঠ, পুরাতন বাড়ো, ভাঙ্গা জীর্ণ জানালা এবং সমশ্রীসম্পন্ন আলকাতরাবিভূষিত দরজা। দেয়ালের ইঁটগুলা সর্ব্বত্র বাঁকাচোরা অবস্থায় মুখ বিকৃতি করিয়া আছে, বালিকাজের সৌষ্ঠবে তাহারা ঢাকা পড়ে নাই। যেখানে সেখানে চট, যত্রতত্র দর্ম্মার আবরণ, এধারে ওধারে সচ্ছিদ্র মরিচাধরা করগেটেড টিনের আচ্ছাদন—সমস্ত বাড়ীটার পিছনে একটা অসুন্দর মনোবৃত্তির অস্তিত্ব সুপরিস্ফুট। দরজার পিছন হইতে মুখ বাহির করিয়া সেই মনোবৃত্তি যেন পথিক-সাধারণকে ব্যঙ্গ করিতে থাকে। তা করুক, সদানন্দ তাহার ঋণ প্রায় পরিশোধ করিয়া আনিয়াছে, বাহিরের দেয়ালে বালিকাজও আরম্ভ হইয়া গেছে, দর্ম্মাগুলাও স্থানচ্যুত হইতে সুরু করিয়াছে। একতলার 'পরে দু'তলা আর এবারকার বারোয়ারীতে হইয়া উঠিল না,—পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার সূত্রপাত হইতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই পল্লীর প্রথম অধিবাসী বলিয়া নবাগতেরা সদানন্দকে একটু খাতির করিত। সদানন্দ কহিল, "আমরা সব নূতন বাড়ীঘর করছি; একটু সবাই মিলে ঠাকুরদেবতার নাম কর্‌লে মন্দ হয় না—"

একবাক্যে সকলেই সম্মত হইলেন।

সদানন্দ কোথা হইতে যে কতকগুলি উৎসাহী বেকার স্থূলবুদ্ধি যুবককে সংগ্রহ করিয়া আনিল তাহা কেহ বলিতে পারিল না,—কিছু কিছু পাড়া হইতে জড় করিল, বাকী কয়েকটাকে অন্ত কোথা হইতে জোগাড় করিয়া লইল। থিয়েটার, বায়স্কোপ, যাত্রা, সঙ্গীত, কাঙ্গালী-ভোজন ইত্যাদির দীর্ঘ তালিকা বাড়ী বাড়ী এবং কাছাকাছি সকল স্থানে বিতরিত হইল। সেটা কোন পূজাপার্ব্বণের সময় নয়, কিন্তু থিয়েটার-বায়স্কোপের পুচ্ছস্বরূপ কোন ঠাকুরদেবতার নাম না করিলে চাঁদা সংগ্রহের হেতুটা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সেই জন্ত সদানন্দ স্থির করিল, তিনঠাকুরের পূজা কোন তারিখের অপেক্ষা করে না, অতএব এবার তাঁহাদেরই পূজা হইবে। প্রচারপত্রেও বিবিধ আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠানের সালঙ্কার ঘোষণার পর কাগজের সর্ব্বনিম্নে ছাপাখানার ক্ষুদ্রতম অক্ষরে তিনঠাকুরের নাম শোভা পাইতে লাগিল। সদানন্দ একাই একশ' হইয়া চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

নবনির্ম্মিত গৃহের অধিবাসীরা পরস্পরকে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের জন্ত ব্যগ্র ছিলেন, সকলের সহিত পরিচয় অল্পদিনের, কেহই কাহারও ভিতরের সংবাদ অবগত নহেন, সুতরাং ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর একেবারে বিফলে নাও যাইতে পারে। কাজেই চাঁদা উঠিতে লাগিল অপ্রত্যাশিত রকমের। পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসীরাও উৎসবতালিকার দৈর্ঘ্যে এবং বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া অর্থদানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে একদিন মুখুয্যেদের খালি মাঠে তিনঠাকুরের মূর্ত্তি আসিল। দুইপাশে দুইখানা এবং পিছনে একখানা দর্ম্মা দিয়া একটি ঘর তৈরী হইয়াছে, উপরে দুইখানা ভাঙ্গা টিনের সাহায্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে সূর্য্যের উত্তাপ এবং প্রাবৃটের ধারাবর্ষণ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। গরুবাছুর যাহাতে না ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে তাহার জন্ত দুইখানা বাঁশ আড়াআড়িভাবে ঠাকুরের সম্মুখে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। সদানন্দ তাহার নিজের বাড়ী হইতে দর্ম্মা জোগাইল, রান্নাঘরের চালা হইতে টিন খুলিয়া দিল, অথচ পাইপয়সাটি লইল না।

সেদিন উন্মুক্ত গগনতলে খানকয়েক ছিন্নবিচ্ছিন্ন শতরঞ্চি বিছাইয়া সদানন্দ কৃষ্ণকীর্ত্তনের আয়োজন করিল, গলবস্ত্র হইয়া সকলকে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "সকলে আস্‌বেন কিন্তু,—একদিন নয়, দু'দিন নয়, এ মোচ্ছব পাঁচ দিন চালাব আমরা।"

মাথায় মুকুট, হাতে চামর, রাসভনিন্দিত কণ্ঠ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের কেষ্ট ঠাকুরটির সহিত দৈনিক আট টাকা হিসাবে বন্দোবস্ত হইয়াছিল এবং পাইকারী হিসাবে রফা হইয়াছিল পাঁচ দিনে ছত্রিশ টাকায়।

ব্যবস্থা ও আয়োজনের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হইয়া এই পাঁচ দিন আর কেহ আসিল না, কোথা হইতে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর নরনারীকে সদানন্দর দলের যুবকেরা শ্রোতারূপে সংগ্রহ করিয়া আনিল। হুঁকা হাতে করিয়া সদানন্দ তাহার অনুচরবর্গের সহিত মাঠ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইল এবং রাজকুমারী করিল ভলান্টিয়ারী। সে একটা ছেঁড়া কাপড়ের উপরে কালি দিয়া মোটা মোটা করিয়া লিখিল, 'স্বেচ্ছাসেবক-

বাহিনীনেত্রী' এবং সেইটা সেফ্‌টিপিন দিয়া কাঁধের কাছে আঁটিয়া লইয়া ওই ধূসরবর্ণা নারী এগারোটি নিম্নজাতীয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে দীপ্তগৌরবে পাদচারণা করিয়া উৎসবের শৃঙ্খলা অটুট এবং স্বামীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিল।

পাঁচ দিন পরে পাড়ার লোকেরা সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ম'শাই, আপনার অত সব আমোদ-প্রমোদের কি হল?"

লজ্জিত মুখ করিয়া সদানন্দ কহিল, "এত চেষ্টা করেও টাকা তুলতে পারলুম না স্তার, আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন ত' কি পরিশ্রমটা এর জন্তে করেছি! যা উঠেছিল, তা ঠাকুর সেবাতেই চলে গেল, আর পাঁচ দিন ধ'রে কেষ্ট কেত্তনে—"

মাটির মূর্ত্তির ভিতরটায় যে কি হইতেছিল সঠিক জানা গেল না। বাহিরে কিন্তু তিন ঠাকুর নির্ব্বিকার রহিলেন। সদানন্দের কষ্টার্জ্জিত অর্থের কত অংশে ক্রীত দ্রব্যসামগ্রী যে গলাধঃকরণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে না দিলেন কোন প্রমাণ, না করিলেন কোন প্রতিবাদ।

পল্লীবাসীরা পরস্পরের মুখের পানে তাকাইয়া নিদারুণ বিস্ময়ে প্রথমে নির্ব্বাক হইয়া রহিল, অবশেষে তাহাদের কণ্ঠস্বর হইতে শ্লেষের সুর প্রথমে উদারায় সুরু হইয়া যখন মুদারায় চড়িবার উপক্রম করিতেছে, তখন সদানন্দ এবং তাহার দলস্থিত যুবকবর্গ ইংরেজী বাংলা মিশাইয়া অ্যাকাউণ্ট, অডিট্, চেক, ডেবিট, ক্রেডিট, বাকী বকেয়া ইত্যাদি বলিয়া একদিন দল বাঁধিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, বিরক্ত পল্লীবাসীদের মধ্যে কেহ আর তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করিল না। সদানন্দ কয়েক দিন গা ঢাকা দিয়া বাজার, দোকান এবং অফিস করিবার পরে অবশেষে বুক ফুলাইয়া সদর রাস্তা দিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

তিন ঠাকুরের ঘরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে গরুবাছুর আশ্রয় লাভ করিতে লাগিল। ভাঙা দর্মা বৃষ্টিতে ভিজিয়া পচিয়া গেল। উপরকার টিন পড়িয়া গেল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বৃষ্টিতে স্নান করিতে লাগিলেন। রৌদ্রে শুকাইয়া খটখটে হইয়া উঠিলেন, সদানন্দ আর তাঁহাদের সন্ধান লইল না।

অমিতব্যয়ী ব্যক্তির স্থায় চাঁদার পয়সা তাঁহারা যদি পূর্ব্বেই অত বেশী করিয়া না খাইয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের একটা গতি হইত। নিজেদের বেহিসাবী ঔদরিকতার জন্ত এখন ত' তাঁহাদের পস্তাইতেই হইবে। ইহাই সদানন্দর অভিমত।

অবশেষে তিন ঠাকুব এক দিন বিগলিত হইলেন। ভক্তের আহ্বানে নয়, নভস্তলের ধারাবর্ষণে। ভিতরকার খড় বাহির হইয়া পড়িল।

এমনি করিয়া সদানন্দর হাতে তাঁহাদের সদ্গতি হইল!

তা সদানন্দ লাভ করিল মন্দ নয়। বারো শ' টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল, সকলকে কিছু কিছু দিয়া থুইয়া পূজা এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনের খরচ বাদ দিয়া তাহার অংশে প্রায় ন' শ' টাকা ছিল। যে সব পাওনাদারদের টাকা না দিলে ফ্যাসাদে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, তাহারা বহুকাল পরে এইবার সদানন্দর আচরণে খুসী হইয়া গেল।

এই চাঁদাসংগ্রহের ব্যাপারে রাজকুমারীর কৃতিত্ব সামান্ত নয়। সে যে স্বহস্তে প্রস্তুত ব্যাজ আঁটিয়া ভলাণ্টিয়ারীই করিল তাহাই নয়, রসদও সে বড় কম সংগ্রহ করে নাই।

সদরের ভার লইল সদানন্দ, অন্দরের দায়িত্ব রাজকুমারীর। রাস্তার কোণে রায়েদের বাড়ী গিয়া রাজকুমারী প্রথমেই তাহার শ্বাশুড়ীর অত্যাচারের কাহিনী ফাঁদিল, রায়গিন্নীকে কহিল, "দেখছি ত' মা তোমায়, বউদের ওপর কি টান! এ যে পেটের মেয়ের চাইতেও বেশী—বলাবলি করি আমরা সবাই—শাউড়ী হ'তে হয় ত এমনি! ন' জন্ম তপস্তা করলে তবে এমন শাউড়ী মেলে! আর আমার বরাতে? বোলো না মা। শাউড়ীর কথা আমার বুকের মধ্যে এইখানটায় জ্বলছে। সে সব কাউকে বলবার নয়। আসবে শুনছি না কি শাঁকচুন্নীটা শীগ্‌গিরই এখানে, এবার দেব খুস্তী পুড়িয়ে বুড়ীর পিঠে ছেকা, এখন নিজেই বুড়ো হ'তে চললুম, আর ভয় করি! দিন রাত প্রার্থনা করি মা, আসছে জন্মে যেন তোমার ঘরের বউ হ'তে পারি—"

শুনিয়া রায়গৃহিণীর সর্ব্বশরীর অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিল। রাজকুমারী কহিল, "পাড়ার এই বারোয়ারীপুজো মা, তোমার ছেলে ত' খেটে খেটে ম'ল। চিরকাল ওইরকম। তোমার নাতিও হ'য়েছে তেমনি। ওই যে আমার হরিদাস, ধর্ম্মেকর্ম্মে ভারী মন, ঠাকুর-দেবতার কথা একবার শুধু বললে হয়, গলবস্ত্র হ'য়ে তখুনি প্রণাম করবে। আমি তাই বলি, ভগবান, ওদের বাপ-ব্যাটার তুমি মুক্তি করে দিয়ো!"

শুনিয়া রায়গৃহিণীর পুত্রবধূরা স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

রাজকুমারী কহিল, "বারোয়ারী পূজোর চাঁদা চাইতে এসেছিলুম মা তোমার কাছে। তোমার ছেলে বললে, যা দিনকাল পড়েছে দশ টাকার বেশী কারও দেওয়া সম্ভব নয়। নিজে দিয়েছে কিন্তু কুড়ি টাকা। ছা পোষা মানুষ, কিন্তু ঠাকুর দেবতার নামে যেন কি। ভিক্ষে করেও টাকা দেবে। আমি বললুম, "মার আমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দেখো কুড়ি টাকার কম আমি কিছুতেই আনব না—" বলিয়া রাজকুমারী হাসিতে লাগিল, "ঠিক বলিনি মা ?"

রায়গৃহিণী কহিলেন, "দেখি কত দিতে পারি, আপনি একটু বসুন।" বলিয়া উঠিয়া গেলেন। রাজকুমারীর মুখ কিন্তু অশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল। কন্যা ও বধূদের অধিকাংশই সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া রাজকুমারী তাহার স্বামী পুত্র কন্যা এবং নিজের গুণব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

"তোমাদের ভাশুর, বুঝলে বড়বউ, যা ইংরিজীটাই কইতে পারে। সমস্ত দিন যেন মুখ দিয়ে তুবড়ি ফুটছে। হেসে আর বাঁচিনে, বলি, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ আমরা আমাদের কাছে ওসব বলা কেন, বেণা বনে মুক্তো ছড়িয়ে আর লাভ কি ? ওসব বলগে তোমার সাহেব-সুবো বন্ধুদের কাছে। যেখানে যাবে কাজ উদ্ধার না করে ফিরবে না, সবার কাছে ওর সমান খাতির। ছেলেটার ইস্কুলের মাইনে বাকী পড়ল সেবার আট মাসের, গেল তোমাদের ভাশুর হেড মাষ্টারের কাছে, বললে 'টাকা দিতে পারব না, এই ক'টা মাসের মাইনে মাপ করতে হবে।' মাষ্টার প্রথমে স্পষ্ট বলে দিলে 'হবে না', তারপর থেকে রোজ সকালে যায় মাষ্টারের বাড়ী, দুপুরে যায় ইস্কুলে, বিকেলে যায় আবার বাড়ীতে। গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত জোড় করে বসে থাকে, দেখা হলেই বলে, ওই টাকা ক'টা দিতে পারব না, মাপ করতে হবে, আর ছেলেটাকে করে দিতে হ'বে ফিরি। প্রথমে মাষ্টার ত' কিছুতেই রাজী হল না, বললে হাফ-ফিরি করে দিয়েছি ত'গোড়া থেকেই, একেবারে ফিরি করতে পারব না। কিন্তু শেষে সাত দিন পরে রাগ করে বললে, 'আপনি ত' মশাই আচ্ছা ছিনে জোঁক!' বলে মাইনে মাফ করে ফিরি করে দিলে—"বলিয়া রাজকুমারী উজ্জ্বল মুখে সকলের দিকে চাহিতে লাগিল।

শুনিয়া রায় গৃহের কন্যা ও বধূরা বিহ্বলভাবে পরস্পরের মুখের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

রায় গৃহিণী ফিরিয়া আসিলেন, দশটাকার একখানা নোট রাজকুমারীর হাতে দিয়া বলিলেন, "এর বেশী আর হল না—"

রাজকুমারী যেন চাঁদা আদায় করিতে আসে নাই, ও যেন বহুবার প্রত্যাখ্যাত অতিসহিষ্ণু মহাজন এমনিতর খর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ঠাকুর দেবতাকে দিতে 'কিন্তু' করতে নেই মা—" বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজকুমারী সদানন্দকে ভালবাসে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে যে স্ত্রী নিয়ত তাহার পতিদেবতার পার্শ্বে অবস্থান করে রাজকুমারী তেমনিতর স্ত্রী। কিন্তু তাহার প্রতি সদানন্দর মনোভাব বেশ জটিল, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, গ্রহণ, বর্জ্জন, নিঃস্পৃহতা ও অধিকার বোধের মধ্যে সে মনোভাব অবিরাম পাক খাইয়া ফেরে।

বিবাহের সময়েও রাজকুমারীর নাসিকা বর্ত্তমানের ন্যায় সমতল, ওষ্ঠাধর সুপুষ্ট, গাত্রবর্ণ ঘনকৃষ্ণ ছিল, অতএব সেদিক দিয়া তাহার খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু বিবাহের সময় রাজকুমারীর একটা গুরুত্ব ছিল, সেই গুরুত্বই বর্ত্তমানে আর নাই। প্রচুর প্রহারের দ্বারা বপুষ্মতী রাজকুমারীকে সদানন্দ তৃণখণ্ডে রূপান্তরিত করিয়াছে। কিন্তু তবু রাজকুমারী সদানন্দর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বলে, "মার ধর মাঝে মাঝে করে বটে, কিন্তু মনটা বড় ভাল।"

সদানন্দর দিক হইতে কিন্তু রাজকুমারীর সম্বন্ধে একটা গুরুতর আশঙ্কা আছে। তাহার বিশ্বাস সমস্ত পৃথিবী তাহার রূপসী পত্নীটিকে লইয়া উধাও হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে! এতবড় অপমানও পৃথিবীকে সদানন্দ করিতে পারে। প্রেম যে অন্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, রাজকুমারীর সম্বন্ধে এতবড় কথা কেমন করিয়া যে সদানন্দ ভাবিতে পারিল!

সদানন্দ অফিসে যাওয়ার সময় প্রায়ই রাজকুমারীকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া তালাচাবি দিয়া চলিয়া যায়। সে যে কি ভাবিয়াছে, তাহা সে-ই জানে!

সেদিন বাড়ীতে রাজমিস্ত্রী লাগিয়াছে। একজন মিস্ত্রী

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া কাজ করিতেছিল; রাজকুমারীকে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে দেখিয়া সে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে সদানন্দ একেবারে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকুমারীর ঘাড় ধরিয়া রাজমিস্ত্রীর সম্মুখে টানিয়া আনিয়া কহিল, "একেবারে গা ঘেঁসে যাও যে, একে নিকে করবে নাকি গো মিস্ত্রীসাহেব ?"

মিস্ত্রীটার যেন আর লজ্জার পরিসীমা রহিল না। ভদ্র-নামধারী কেহ যে এমন কথা বলিতে পারে এমন ধারণা তাহার ইতিপূর্ব্বে ছিল না। সে বারংবার বলিতে লাগিল, "ছিঃ ছিঃ বাবু, মাঠাকরুণ উঠছেন দেখে আমি ত' সরে দাঁড়ালুম—"

রাজকুমারী কিন্তু ভারী খুসী। তাহাকেও লোকে 'নিকা' করিতে চাহিতে পারে সদানন্দর মুখের এমনতর স্তুতিবাক্যে রাজকুমারীর আর আত্মপ্রসাদের সীমা নাই। সুন্দরীদের সম্বন্ধে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে গ্রীবাভঙ্গী কথাটা আছে। এই অষ্টপুত্রকন্যামাতৃকা খড়িকা কাঠির ন্যায় কৃশকায়া পতিভক্তি-পরায়ণা নারীও গ্রীবাভঙ্গী করিল, চোখমুখ টানিয়া কপট ক্রোধের সহিত তির্য্যক্ দৃষ্টিতে সদানন্দকে বলিল, "ম্-ম্যা—"

সেদিন সামান্য একটা ব্যাপার লইয়া তুমুল কলহ হইয়া গেল। ফলে যাহা হয় তাহাই হইল, স্ত্রীর নিকট সদানন্দ আর একবার তাহার দৈহিক শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিল এবং উত্তরে রাজকুমারীর আর গালিগালাজের অবধি রহিল না।

সদানন্দ বাড়ীর বাহির হইয়া গেলে চোখের জল মুছিয়া রাজকুমারী তাহার কন্যার কাছে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, "আমার ছোটবেলার কথা জানিস পটলী, কত সম্বন্ধ যে আমার আসত। কম করে' আমার বিয়ের কথা হ'য়েছিল একশ' জায়গায়।"

রাজকুমারীর চোখে যেন ঘোর লাগিয়াছে, ওর দৃষ্টি অন্তর্মুখী, ওর স্মৃতি মন্থর, কণ্ঠ তন্দ্রালু। অতিশয় ধীরে ধীরে রাজকুমারী কহিতে লাগিল, "জানিস পটলী, ওই যে বড় ডাক্তার, বিলেত ফেরত হেমন্ত মুখুয্যে, ওর সঙ্গেও আমার সম্বন্ধ এসেছিল, ও আবার আমার মাসীর দেওরপো হয় কিনা,—ডাকত আমায় 'মুট্কী' বলে';—একটু মোটা ছিলুম কিনা—বুঝলি পটলী ?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে পটলী তাহার মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"ওই যে ব্যারিষ্টার যতীন গাঙ্গুলী, ওর সঙ্গেও একবার আমার বিয়ের কথা হয়েছিল,—আর সীতারামপুরের জমিদারের ছেলে হরিশ চাটুয্যে, একবার সম্বন্ধ এসেছিল তার সঙ্গে আমার বিয়েব,—জমিদার বাড়ীর বউ, জানিস পটলী, কি মজা।"

রাজকুমারীর কুৎসিৎ মুখখানা খুসীতে চক্চক্ করিতে লাগিল।

পটলীর বয়স হইয়াছে, তাহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে তাই আজ পাঁচ বছর, তাছাড়া তাহার বুদ্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ, অতএব এসব আলোচনায় সে সাধারণতঃ সাড়ম্বরে যোগ দিয়া থাকে, কিন্তু কি ভাবিয়া সে এখন চুপ করিয়া রহিল।

রাজকুমারী কহিল, "তোর মা চিরকালই কিছু এমন ছিল না, বুঝলি পটলী। ভালো ঘর, ভালো বরে পড়লে দেখতিস্ পটলী তোর এই মাই কি যে হ'তে পারত! দেমাকের কথা নয়, এত লোক দেখলুম সংসারে। আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধি ত' কারও দেখলুম না—"

পটলীর যেন আজ কি হইয়াছে, কিছুতেই সে কথা কহিবে না।

"তোর বাবার কথা,—তুই বলেই বল্ছি, অন্যের কাছে কি বল্বো! বাইরের কেউ বল্তে আসুক দেখি, সতীসাধ্বী মেয়েমানুষ আমরা খ্যাংড়া মেরে মুখ ভেঙ্গে দেব না? ধর তোর বাবার কথা, এতকাল ত' ঘর ক'রে এলুম, আমি ছাড়া আর কাহারও সাধ্যি ছিল ওই বুনো ষাঁড় নিয়ে সংসার করে? বড় বড় সম্বন্ধ চুলোয় গেল, পড়লুম শেষকালে এই জানোয়ারটার হাতে! বুঝলি পটলী, জমিদারবাড়ী হ'লে পায়ের উপর পা দিয়ে, কি মজা।"

রাজকুমারীর চোখমুখ পুনরায় খুসীতে জ্বল জ্বল করিতে লাগিল।

রাজকুমারীর শাশুড়ী আসিয়া পৌছিল। বৃদ্ধাকে দেখলে তার যে আত্মহত্যার মতলব আছে সে কথা বুঝিতে পারা

যায় না, তবুও যে সে কেন তাহার পঁয়ষট্টি বছরের কাঁচা মাথাটা এই বাঘের মুখে দিতে আসিল তাহা বুঝিয়া উঠা দায়।

রাজকুমারী তাহার কথা রাখিল, খুন্তী পোড়াইয়া বুড়ীর পিঠে ছেঁকা দিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার হাতে শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীর নিগ্রহ যে ঘটিল অশেষ, ইহা ধ্রুব।

একদিন বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে পোঁটলাপুঁটলী বাঁধিতে লাগিল, সে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু আর এই শয়তান পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দর্শন করিবে না।

চোখ পাকাইয়া রাজকুমারী কহিল, “নারকোলের মালাগুলি খবরদার নিয়ে যেও না বল্‌ছি, আমি বলে’ শুকিয়ে রেখেছি উনুনে আঁচ দেবার জন্যে—”

বুড়ীও কম নয়, বাঘিনীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, “নারকোল আনলুম আমি দেশ থেকে, আর মালা হ’ল তোমার—চালাকী!”

কিন্তু শেষ অবধি বুড়ী রহিয়াই গেল এবং কিছুদিন পরে পুত্র, পুত্রবধূ, এবং নাতী-নাতনীদের চাঁদপানা মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে তাকাইতে মহানন্দে মরিয়া গেল। কিন্তু রাজকুমারীকে সে যে কতবড় দাগা দিয়া গেল, তাহা যদি বুড়ী আর একটুক্ষণ বাঁচিয়া থাকিয়া মিটমিট করিয়াও চাহিয়া দেখিত।

রাজকুমারী বারান্দায় পা ছড়াইয়া সারা কলিকাতা সহর কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, “ওগো মাগো, আমাদের অনাথ করে’ কোথায় চলে’ গেলে গো—”

সে আর্ত্তনাদে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

বাড়ীর ঠিকা ঝি হরিমতী আসিয়া রাজকুমারীর শোকে সান্ত্বনা দিতে বসিল, “কেঁদে আর কি কর্‌বে মা? বাবা মা কি কারও চিরদিন থাকে মা? স্বগ্‌গে গেছেন, তিনি স্বগ্‌গে গেছেন, ভাগ্যিমান্ তিনি, তোমাদের সবাইকে রেখে স্বগ্‌গে গেছেন, কিন্তু তোমাদের ভাসিয়ে গেলেন। আহা সোনার হাট, তোমার মতন ছেলের বউ, কি সেবা, কি যত্ন। আহা ভাগ্যিমান্ মুনিষ্যি!”

রাজকুমারী অশ্রান্তভাবে গর্জ্জন করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হরিমতী ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাকের পরে রাখা হাঁসের ডিম তিনটা সংগ্রহ করিল, মুসুরডালের ঠোঙ্গাটা হাতে ঝুলাইল, নিজের মনেই বলিতে বলিতে বাহির হইল, “হাঁসের ডিম, মুসুরডাল অশুচের ঘরে-কে-ই বা খাবে? নষ্ট হয়ে যাবে,—রিলিয়ে দিই গে মেথরাণীকে—”

রাজকুমারী কাঁদিতে লাগিল, “ওগো মাগো, কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাকব গো? ওলো পটলী, ডিমগুলো হরিমতী নিয়ে গেল লো! মাগো কি অপরাধ করেছিনু তোমার ছিচরণে! হরিমতী মুসুর ডালও নিলে বুঝি লো—”

পটলী ছুটিয়া আসিয়া হরিমতীর হাত হইতে ডিম এবং মুসুর ডাল ছিনাইয়া রাখিল।

হরিমতী কিন্তু রাজকুমারীর এবংবিধ আচরণে ও পটলীর সাহসে স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুধু যে তাহার চার মাসের মাহিনা বাকী তাহাই নহে, রাজকুমারীর শোকে এমনতর সহানুভূতি প্রকাশ করার পরেও এরূপ ব্যবহার নিশ্চয়ই হরিমতী তাহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করে নাই। নিমেষমাত্র হতভম্ব হইয়া থাকিয়া সে গালিগালাজ আরম্ভ করিল, “ভালো, বলে জিনিষগুলো ফেলে দিয়ে ঘরদোর সোক্ত করছিনু কি না, তাইতেই আমি হনু চোর! হাত থেকে ছিনিয়ে রাখা হ’ল! শাউড়ীটাকে মেরে ফেললে কে? জানি নে যেন আমি কিছু? মুখ বুজে চুপ ক’রে আছি কি না, তাই! আবার চীৎকার করে পাড়ার লোককে শুনিয়ে মড়াকান্না কাঁদা হচ্ছে! হাতে কুট হবে পটলী তোর, ওলাউঠা হ’য়ে মরবি মা-বেটিতে। চার মাসের মাইনে বাকী, আবার চোখ-রাঙ্গানি! বিষ নেই এক ফোঁটা, কুলোপানা চক্কর। এক আধলার মুরোদ নেই, আবার ঝি রাখবার সখ! আজ পাইপয়সা অবধি আদায় ক’রে ছাড়ব, নইলে কৈবত্তর মেয়ে নই আমি—”

রাজকুমারী ও পটলী হরিমতীর এমনতর আকস্মিক উত্তাপে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। তাহারা যেন অনেকটা হরিমতীর গালাগালি শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল এমন সময়ে সদানন্দ বাড়ী ফিরিল। শ্মশান হইতে গৃহে ফিরিয়াই হরিমতীকে এরূপ ভাবে চীৎকার করিতে দেখিয়া সদানন্দ উঠানে থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর সেও চেঁচাইতে সুরু করিল, “বেরো হারামজাদি, বেরো বলছি শীগগির বাড়ী থেকে, নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব—”

বলিয়া সে হরিমতীর ঘাড় ধরিয়া ধাক্কা দিয়া বাড়ীর

বাহির করিয়া দিল। হরিমতী মুখ থুবড়াইয়া পড়িতে পড়িতে কোন প্রকারে সামলাইয়া লইয়া বহুবিধ অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে করিতে ক্রোধভরে প্রস্থান করিল।

তারকনাথ নামে যে পুরুষটিকে অবলম্বন করিয়া হরিমতী বর্ত্তমানে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার নেশার খরচ হরিমতীকেই জোগাইতে হয়। হরিমতীর ঝিগিরির মাহিয়ানা কোন বাড়ীতে বাকী পড়িলে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তারকনাথের নেশার কিছুটা টান পড়ে। অতএব সদানন্দর গৃহে হরিমতীর পাওনা টাকার বিষয় তারকনাথ অবগত ছিল। উত্তেজিত হরিমতী বাড়ী ফিরিয়া দেখিল যে, তারকনাথ তাহার অল্প কিছু পূর্ব্বে গৃহে ফিরিয়াছে। পয়সার অভাবে নেশাটা অর্দ্ধেক জমিয়াছে, পুরাপুরি হয় নাই। আধপাগলা কুকুরের ন্যায় তারকনাথের তখন দংশনোদ্যত অবস্থা। হরিমতী সদানন্দ-গৃহে তাহার দুর্গতির কথা সালঙ্কারে তারকনাথের কাছে বর্ণনা করিল। শুনিয়া তারকনাথ উত্তেজিত হইয়া কোমর বাঁধিয়া সদানন্দর মস্তক দেহবিচ্যুত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তারকনাথ আসিয়া মালকোঁচা মারিয়া সদানন্দের গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল, গলা ফাটাইয়া গর্জ্জন কবিতে লাগিল, "আয় শালা 'বারোয়ারী', তোর ইস্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে আয়—"

তাহাদের বস্তীর আরও কয়েকটা চুলে-বাগ্‌দীর ছেলেকে তারকনাথ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে, হরিমতীও অবশ্য সে দলে আছে।

সদানন্দ তাহার একতলার সদর দরজা বন্ধ করিয়া দোতালার ঘরের রাস্তার দিকের জানলায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মাতৃশোক বিস্মৃত হইয়া তারকনাথ-হরিমতীর অপেক্ষাও কদর্য্য ভাষায় মুখ-খিস্তি করিতেছিল। তারকনাথও রাস্তায় দাঁড়াইয়া অর্দ্ধমত্ত অবস্থায় একখানা বড় থান ইট লইয়া, "শালা বাবোয়ারী" ও তাহার 'ইস্ত্রী'র মাথা ফাটাইবে বলিয়া বাহ্বাস্ফোট করিতেছিল।

পাড়ার ভদ্রলোকেরা অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সদানন্দর পবে প্রসন্ন না হওয়ার হেতু তাঁহাদের প্রায় সকলেরই ছিল, কিন্তু পাড়ার মধ্যে এমনতর একটা কদর্য্য কোলাহল তাঁহাদের নিজেদেরই লজ্জার ব্যাপার বলিয়া তাঁহারা মনে করিলেন। মহেন্দ্রবাবু সদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "একবার নীচে আসুন ত' সদানন্দবাবু, দেখি সব শুনে আমরা যদি একটা মিটমাট করে দিতে পারি।"

তারকনাথকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তুমি বেশী ওস্তাদী ক'রো না বাপু, মুস্কিলে পড়বে। তোমার যা বলবার আছে সদানন্দবাবু আসুন তাঁর সাক্ষাতেই বলবে, আমরা পাঁচজন ভদ্রলোক এখানে উপস্থিত আছি, শুনে একটা বিহিত করব—"

পুনরায় সদানন্দকে ডাক দিয়া বলিলেন, "বেরিয়ে আসুন সদানন্দ বাবু, আমরা আছি, আপনার কোন ভয় নেই।"

শুনিয়া সদানন্দ বীর দর্পে বাহির হইয়া আসিল, পিছনে পিছনে আসিল রাজকুমারী।

মহেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে ব্যাপাবটা বলুন ত' সদানন্দ বাবু?"

হাত পা নাড়িয়া সদানন্দ আরম্ভ করিল, "ওই হারামজাদী হরিমতীব চুরি আজ হাতে হাতে ধরা পড়েছে, হারামজাদী সেই রাগে—"

তারকনাথ মহেন্দ্র বাবুর ধমক খাইয়া এতক্ষণ একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ অগ্রসর হইয়া তাহার হাতের থান ইঁটখানা ধাঁ করিয়া সদানন্দকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল। কিন্তু রাজকুমারীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল তারকনাথ ও হরিমতীর দিকে, তারকনাথকে সহসা অগ্রসর হইতে দেখিয়াই সে চীৎকার করিয়া সদানন্দর সম্মুখে আসিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। তারকনাথের সদানন্দ-উদ্দিষ্ট প্রস্তর আসিয়া লাগিল রাজকুমারীর কপালে, তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ করিয়া বাজকুমাবী পড়িয়া গেল। তারকনাথ ইঁট ছুড়িয়াই পালাইবাব চেষ্টায় ছিল, মহেন্দ্রনাথ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, অন্যান্য ভদ্রলোকেরা তারকনাথকে বেশ ভালো করিয়া উত্তম-মধ্যম দিয়া ওদিকে সরাইয়া লইয়া গেলেন।

রাজকুমারীর বাঁ চোখের ভ্রূর উপর হইতে কপালটা প্রায় দু'ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া গভীর ক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে সেই মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া সদানন্দর বাহিরের ঘরের চৌকির উপরে আনিয়া শোয়াইয়া দিলেন। সদানন্দ কিন্তু প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল,

মনে হইল যেন. ব্যাপার দেখিয়া তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে।

ঘণ্টা দশেক পরে রাজকুমারীর জ্ঞান হইল, কিন্তু কি যে তাহার হইয়াছে এবং কেমন করিয়া তাহা হইয়াছে সে সকল কথা সে কিছুই মনে করিতে পারিল না। পটলী কাছেই বসিয়া ছিল, একটু একটু করিয়া সে সকল ঘটনা বিবৃত করিল, শুনিয়া গম্ভীর মুখে উত্তেজিত কণ্ঠে রাজকুমারী বলিল, "সতীলক্ষ্মী মেয়ে মানুষ আমরা, জানিস পটলী, হক না আমার সোয়ামী জানোয়ার, কারও সাধ্যি আছে আমি বেঁচে থাকতে তার গায়ে হাত দেয়!"

শুনিয়া পটলী বিস্মিত হইয়া গেল।

সদানন্দ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। রাজকুমারী তখন তাহার "সতীলক্ষ্মী মেয়েমানুষ" সংক্রান্ত বক্তৃতার অহঙ্কারে টল টল করিতেছে। সদানন্দকে ডাকিয়া স্নিগ্ধ-মন্থর কণ্ঠে সে কহিল, "দেখ, তুমি কিন্তু মিস্ত্রী-ফিস্ত্রীর সঙ্গে নিকের কথা রঙ্গ করেও আর কোনদিন বলো না। আর সতীলক্ষ্মী মেয়েমানুষ আমরা, ওসব কথা কানে শুনলেও পাপ হয়—"

পটলীর মত সদানন্দও এবার বিস্মিত হইয়া গেল। কিন্তু কন্যার মত চুপ করিয়া না থাকিয়া রাজকুমারীর মুখের দিকে বোকার মত তাকাইয়া সে শুধু কহিল, "আচ্ছা—"

হাল-সংসার

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

শরত শেষে শীতের আভাস প্রথম যেদিন এলো
গিন্নি তখন বল্‌লে ডেকে বাড়িয়ে তাহার মুলো,
রাঙুর জামা কিন্‌তে হবে,
কানুর আছে—সেটাই রবে,
না হয় তারও অল্পদামী, বুঝে যা' হয় করো;
বাসুর বেলায় চল্‌বে না তা' ব্যাপার একটা ধরো।

ওদিক্ হ'তে ঝিয়ের তাড়া আসচে দিবস রাত—
বাবু এবার আমার প্রতি করো দৃষ্টিপাত।
চাকর? সে ত লেগেই আছে
চল্‌তে ফির্‌তে আগে পাছে,
মাইনেটা তার চাই যে কালি' নয়ত বিপদ হবে
বউয়ের মুখের মিষ্টি মধুর গালি শুন্‌তে হবে।

বড়ই বিপদ এমনি কত বেড়্‌ল যে নাগপাশ,
কিযে করি, কিনা-করি ভেবে জাগায় ত্রাস।
বলি তবু মুচকী হেঁসে
তুমিই কি বাদ যাবে শেষে?
বলল অমনি হেঁসে হ'য়ে আহ্লাদে আটখান,
আমায় দিয়ো একটা কিছু যা' চায় তোমার প্রাণ।

বলি আমি পয়সা কোথায়? যুদ্ধে সবি' চড়া,
শুনেই তখন গিন্নি আমার হ'লেন ত' মনমরা।
দুখের কথা কইব কি আর
সবার চেয়ে সেই যে বাড়ার
খাবে না ও নেবেনা কিছু, করবে না আর কাজ,
পয়সা যাহার হায়রে সবার সে-ই দুনিয়ায় আজ!

শেষ কথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র ধর

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মোকদ্দমার রায় বাহির হইয়াছে। নীরোদ ঘোষের ছয় মাস কারাদণ্ড ও নগদে ২০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

মানুষ নিজের হাতেই নিজের মরণাস্ত্র গড়িয়া তোলে। অন্যায়ের বেদীর উপর দাঁড়াইয়া যখন সে জয়োল্লাসে মত্ত হয়, জানিতেও পারে না ধ্বংসের দামামা একদিন তাহারই পাণ্ডুস্মৃতির সম্মুখে বাজিয়া উঠিবে। অনেক সময় বিদায়ের উপরই প্রতিষ্ঠার ভিত্তি গড়িয়া ওঠে। অবনীর বিদায়ের পূর্ব ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল। কারাগারের দরজায় দাঁড়াইয়া আজ বৃদ্ধ নীরোদ ঘোষ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বলিলেন, "অবনী, ভুল যখন মানুষের ভাঙে, তার পিছনে জড়িয়ে থাকে একটা লজ্জা। সেই লজ্জাতেই পরাজিত শত্রুও বিক্রম প্রকাশ করে। কিন্তু আমার সে লজ্জা আজ আর নাই; আমার কারাবাসের দিনটা আর একটু বাড়িয়ে দিতে পার? তা' হ'লে বোধ হয় একটু শান্তি পাই, আজীবন অর্থের মধ্যে থেকেও শান্তি পাই নাই, কিন্তু এই শাস্তির মধ্যে আমার শান্তি—নিজেকে লুকাইয়া চলিবার প্রবৃত্তি আজ আর নাই। আত্মগোপনের প্রবৃত্তির মধ্যে যে কত বড় শাস্তি তা' আজ বুঝেছি।"

অবনী নিরুত্তরে সব কথাই শুনিতেছিল। বৃদ্ধ খানিকটা থামিয়া বলিয়া চলিলেন—

"জানি, আমার সঙ্গে কথা বলিতে বোধ হয় তোমার ঘৃণা বোধ হইতেছে; সবই বোধ হয় শুনিয়াছ; ক্ষমা চাইবার অধিকার আমার নাই; আমি কারাগারে এসেছি মৃত্যুর জন্য, বাঁচিবার জন্য নয়। সবই রইল, পার ত' আমায় ক্ষমা করিও।"

বৃদ্ধের দু' চোখ বহিয়া তখনও দরদর করিয়া জল পড়িতেছিল, অবনীমোহনের চোখও শুষ্ক ছিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"না অশোকবাবু! ডাক্তার ডাকিয়া কাজ নাই," অণিমা অশোকের হাতখানা বুকে তুলিয়া লইল। বুকের ভিতর তখনও দ্রুত স্পন্দন চলিতেছিল।

"উঃ" অণিমা পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিল। দু' চোখ বাহিয়া জল পড়িয়া গণ্ডস্থল ভিজিয়া যাইতেছিল। অশোক ওডিকোলনের জলে-ভিজান ন্যাকড়াটা নিংড়াইয়া দু'চোখ মুছাইয়া দিল—

"কথা বলো না, অণিমা, জ্বর যে বড় বেশী।"

"আজ না বলেল আর কবে বলবো, অশোক বাবু?"

লাল টকটকে দুই চোখ ডাগর করিয়া অণিমা অশোকের মুখের দিকে তাকাইল।

"বাবা কোথায় অশোক বাবু?"

"এক্ষুনি আসছেন…"

অশোকের আর বলা হইল না; বিমল ডাক্তার সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিল।

অশোক টেলিগ্রাম পাইয়া আজই ভোরের গাড়ীতে আসিয়া রংপুরে পৌছিয়াছে। নারীর প্রেমের দাম অশোক কোন দিনই বোঝে নাই। অণিমা সর্ব্বস্ব বিলাইয়া অশোককে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন দিনই অশোকের কাছে প্রেম নিবেদন ক'রবার বল সঞ্চয় ক'রতে পারে নাই। অণিমার ধারণা, প্রেম যেখানে সত্য, সেখানে প্রকাশের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেদিন শুনিল অশোক সুলতাকে বিয়ে করেছে, সেদিন থেকেই দুরন্ত পরিশ্রম ক'রতে থাকে নিজেকে ভুলবার জন্য। বিনা পয়সায় নিজের বাড়ীতে গরীব মেয়েদের পড়াইত, গান শিখাইত। ঝি-চাকর ছাড়াইয়া বাকী সময়টুকু ঘরের কাজ করিয়া কাটাইয়া দিত। পিতা বাধা দিত, অণিমা শুনিত না—"মেয়েদের কাজ যদি মেয়েরা না করে, ভাড়া করা ঝি-চাকর দিয়ে সংসার চালানোর মধ্যে 'অ্যারোষ্ট্রক্রেসী' থাকতে পারে, প্রকৃত শান্তি নেই বাবা!" অণিমা উত্তর দেয়।

পিতা কন্যাকে চিনিতেন,—মনের কোথায় ব্যথা জানিতেন, তাই আর বাধা দিতেন না।

ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হইল। ডাক্তার বাহির হইয়া আসিলেন, সঙ্গে আসিল বিমল।

বিমল প্রশ্ন করিল, "কেমন দেখলেন, ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তার ম্লানমুখে উত্তর করে, "Both the lungs are affected, তবে খুব serious না, খুব ভালো nursing হ'লে হয় ত' সেরে উঠতেও পারেন। শরীরের উপর খুবই অত্যাচারের ফল ব'লেই মনে হয়।"

বিমল উত্তর দেয়, "অত্যধিক খাটুনীর ফল; মেয়েদের নিয়ে আর স্কুলটা নিয়ে খুবই খাটতেন।"

ডাক্তার দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়।

"নমস্কার।"

ডাক্তার প্রতিনমস্কার দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসে।

*

"অশোকবাবু! ডাক্তার কি বললেন?"

অশোক একটু ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দেয়, "বললেন, ভাল হ'য়ে যাবে। Pluracy case, একটু সময় লাগবে। Lungs-এ জল জমেছে; কালই tap করা হ'বে?

অণিমার পাণ্ডু মুখের উপর একটা আভাহীন হাসিরেখা ফুটিয়া ওঠে।

"অশোকবাবু, যে ক'টা দিন বেঁচে থাকি, আমার কাছ থেকে যাবেন না—এ আমার অনুরোধ। আজ এ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কোন্ কথা আর গোপন রাখবো না।"

অণিমা হাঁপাইতে থাকে, আর বলিতে পারি না। "থাক্ অণিমা, এখন থাক্! আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না।"

অণিমা আবার খুক্ খুক্ করিয়া কাশিয়া উঠে। পাশ ফিরিয়া শুইয়া অশোকের কোলের উপর শীর্ণ হাত দু'খানা তুলিয়া দেয়। আবার বলিতে থাকে,—

"অশোকবাবু! মুখে প্রকাশ না ক'রলেই কি আর ভালবাসা জিনিষটা বোঝান যায় না?" অণিমা উত্তরের আশায় অশোকের মুখের দিকে তাকায়।

"যা হ'য়েছে, আমায় তা'র জন্ম ক্ষমা করো অণিমা। অনেক মেয়ের সাথে যারা মেশে, তা'রা কারও সত্যিকার ভালবাসা বুঝবার মত ক্ষমতা বোধ হয় হারিয়ে ফেলে।" অশোকের দু'চোখ বহিয়া জল নামিল, অশোক কান্নাটাকে মনের দুর্ব্বলতা মনে করিত, কিন্তু আজ বুঝিতে পারিয়াছে কান্নার মধ্যেও সরলতা আছে।

"ও কি অশোক বাবু? কান্নাটাকে না আপনি দুর্ব্বলতা বলে ঘৃণা করতেন?"

"আজ আর করি না, অণিমা।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

যেখানে মানুষের হাত নাই, সেখানে মানুষের অশ্রুজল নিষ্ফল। ভাবিয়াও যেখানে কূল পাওয়া যায় না মানুষ সেখানেই হয় তন্ময়, হাসেও না কাঁদেও না। কেবল ভাবে, এ-ভাবনার আরম্ভ নাই সমাপ্তিও নাই, আছে কেবল একটানা ভাবনা। এ যেন বিশাল অপার সমুদ্রের মধ্যে আত্মাহুতি দিয়া তৃণ ধরিয়া বাঁচিবার প্রচেষ্টা। অশোকের বৃদ্ধা পিসিমা এই প্রচেষ্টা করিতে করিতে দিন দিন মরণের মুখে ঝিমাইয়া পড়িতেছেন।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া বুড়ি কেবল ভাবেন, এ কি হইল! যেখানে ছিল একদিন কোলাহল, হাসি, কান্না, উচ্ছলতা, শতজনের আনা-গোনা, সেখানে আজ নাই কিছুই। বংশের দুলাল—বাপের আদরের দুলাল অশোক, সে আজ ধর্ম্মচ্যুত। বংশের প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। বুড়ি ভাবে, সেই অতীতের সেনের বাড়ীর বিরাট দুর্গোৎসবের কথা ও শ্যামার্চ্চনার কথা, দেওয়ালীর বাজি পোড়ার কথা। বুড়ির চোখ শুকাইয়া গিয়াছে জল আসে না, আসে কেবল দীর্ঘনিশ্বাস।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আজ কয়েকমাস হইতে চলিল, অশোক ও সুলতার বিয়ে হয়েছে; অশোককে সুলতা কোন দিনই এত বিমর্ষ দেখে নাই। কাজের মধ্যে যেন অশোকের একটা নূতন নেশা জাগিয়াছে। দিন রাত Flour Mills-এর কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকে; পূর্ব্বের মত আর সুলতার সহিত প্রাণ ঢালিয়া কথা বলে না—সবটাই যেন রুটিন বাঁধা কাজ। সুলতা স্বামীর এ অবজ্ঞা সহ্য করিতে পারে না। অনেক সময় আপন মনে একা বসিয়া কাঁদে, সঙ্গীবিহীন সমস্ত দিনটা যেন আর কাটিয়া উঠিতে চায় না। রাত্রি প্রায় এগারটা বারটায় স্বামী

ঘরে ফেরে, সুলতা কোনদিন ঘুমাইয়া পরে; কোনদিন বা জাগিয়া থাকে। আজ ইচ্ছা করিয়াই জাগিয়া আছে, জানিবে অশোকের প্রাণে বেদনা কোথায় ?

সুলতার সব সময় আজকাল মনে হয়, নেশার ঘোরে, হয়ত' অশোক তা'কে বিয়ে করেছে, সুখী আদৌ হয় নাই। অশোক সত্যবাদী ও স্পষ্টবাদী, সুলতা তা জানে। সুলতার ভয় হয় সত্যই এই উত্তরই যদি স্বামীর কাছ থেকে শুনতে হয় ! সে তা কেমন করিয়া সহ্য ক'রবে ? সুলতা ইচ্ছা করিয়াই স্বামীকে বেদনার কারণ জিজ্ঞাসা করে না।

বারটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী এমন সময় অশোক ঘরে ঢুকল—

"সুলতা, আজ যে এখনও ঘুমোওনি ?"

"আমি ঘুমোলেই বুঝি তুমি বাঁচ ?"

সুলতা অভিমান করে।

অশোক অগ্রসর হইয়া সুলতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লয়, "সুলতা, অভিমান করো না লক্ষ্মীটি ! বড় কাজের তাড়ায় দেরী হ'য়ে যায়, কি করবো বলতো ? নূতন মিল, সবই আমার উপর নির্ভর করে।"

সুলতা বাধা দেয়।

"সত্য কথা বল, আমি জানি তুমি মিথ্যা কথা বল না, আমার বিশ্বাস ভেঙ্গো না। তুমি রংপুর থেকে ফিরে অবধিই কেমন যেন আনমনা হ'য়ে আছ। কেন ব'ল না !"

অশোক সুলতাকে আরও বুকের মধ্যে টানিয়া লয়, "সুলতা তোমার কাছে মিথ্যাকথা আমি কখনই বলি না। আমি শতচেষ্টা করেও একটা জিনিষ ভুলতে পাচ্ছি না,—অণিমার শেষ কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না।"

সুলতা স্বামীকে চেনে, বিশ্বাস করে ; স্বামীর বেদনায় দুঃখ পায় কিন্তু সন্দেহ তার প্রাণে জাগে না।

"অণিমা কে ? তোমায় খুব ভালবাসতো বুঝি ?" সুলতা মুচকি হাসিয়া ফেলে।

"খুবই ভালবাসতো ; কিন্তু তা'র ভালবাসা বুঝবার মত শক্তি আমার ছিল না ; যখন বুঝলাম তখন সে মৃত্যুর চৌকাঠে পা দিয়াছে—আমাদের প্রেম স্নেহের নাগালের বাইরে। কিন্তু তা'র শেষ কথাটা আজও ভুলতে পারছি না—"

সুলতা প্রশ্ন করিল "মরণের আগে তোমায় কি বলে গেল ?"

"ব'ললে কি জান ?"

সুলতা স্বামীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। অশোক ব'লতে থাকে "ব'ললে—'নারীর প্রেম নিয়ে খেলা করতে গিয়ে, পুরুষ নিজের প্রেমের স্বার্থকতা কক্ষণই বুঝতে পারে না।"

একোবিংশ পরিচ্ছেদ

পিসিমা কাশী থেকে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁ'র সম্বলের মধ্যে আছে লোলচর্ম্মাবৃত জীর্ণ হাড় ক'খানা আর বুকজোড়া উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। অশোক আসিয়া পিসিমার পায়ের ধূলা লইল। পিসিমা অশোককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"দীর্ঘজীবি হও"। অশোক শুধু একবার পিসিমার জরাজীর্ণ দেহের প্রতি চাহিয়া একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল, কোন কথাই বলিল না। পিসিমা বলিলেন, "চেহারাটা এমন জিরজিরে হয়েছে কেন বাবা ?"

অশোক একটুখানি ম্লান হাসিয়া উত্তর করিল, "কই পিসিমা কিছুই হয় নি ত', বেশ ভালই আছি।"

পিসিমা একটু হাসিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে হাসিতে হাসির মাধুর্য্য নাই ; কান্নার চেয়েও বেশী করুণ সে হাসি। শুধু যেন বৃদ্ধার সেই হাসিটুকুই অশোককে বলিয়া দিতে চায়—"ওরে জাগ্রত বাঙ্গালার অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল যুবক ! প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে যাওয়া যে কত বীভৎস, কত মিথ্যা আজ বোঝ।" পিসিমা শুধু হাসিয়াই চুপ করিলেন, কিছু বলিলেন না।

অশোক বলিল, "পিসিমা, আমি মনে করেছিলাম তুমি আর ফিরে এসে আমার মুখ দেখবে না।"

পিসিমার কণ্ঠ ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, কান্না বিজড়িত সুরে উত্তর দিলেন, "ষাট্ বালাই ; অমন কথা বলিস্‌নে তুই অশোক। কেন, তুই কি অপরাধ করেছিল যে তোর মুখ দেখবো না। সুলতাকে বে' ক'রেছিস এই ত' অপরাধ ?"

অশোক অধোবদনে মৌন হইয়া রহিল। পিসিমা বলিয়া চলিলেন, "অশোক, আমি জেনেছি সুলতা বীরেনবাবুর পালিতা কন্যা, সুলতার উপর আমার কোন অভিমানই নেই বাবা।" বৃদ্ধা যেন সহসা বাগ্মী হইয়া উঠিলেন। একটুখানি থামিয়া আবার বলিলেন—"আশোক, আজ বাঙ্গালার সম্মুখে যে সময়, অন্নচিন্তাক্লিষ্ট বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে প্রেমের সাধনা বাঙ্গালীর সাধনা নয়। জাতির যুবতী মেয়েগুলিকে ঘরের বাইরে স্বাধীনতার নামে টেনে এনে যে বীভৎসতা করছে, তার জন্য দায়ী বাঙ্গালার প্রগতির কর্ণধারগণ, শিক্ষার নামে যারা ভ্রান্ত-সম্মানের ধারণা জাগিয়ে দিচ্ছে শত শত কৃতী যুবকের বুকে। তাদের ধ্বংসের কামনাই আমার সবচেয়ে বড় কামনা বাবা।"

অশোক ডাকিল, "পিসিমা।"

পিসিমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "থাম্ অশোক, তুই যা' বলবি তা' আমি জানি, তুই নাম করবি ঐ মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী আর বসু ব্রাদার্স প্রভৃতির, গুণগান করবি তাদের 'লীডার' সেজে ছদ্মবেশী ভণ্ডামী যাদের

বিশেষত্ব, যে শিক্ষা মানুষকে আত্মরক্ষা ক'রতে শিক্ষা দেয় না, আফিম্ খোরের মত বিরাটত্বের স্বপ্ন দেখ্‌তে শেখায় সে শিক্ষার ধ্বংসই আমার কামনা। জাতির যুবকদের যারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ক'রে তুলেছে, বহির্মুখী ক'রেছে, যারা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং-এর ঢেরা পিটিয়ে বেড়ায়, তারা উচ্ছন্নে যাক্। কো-এডুকেশন—ন্যাকাপনা, জাতিকে সাঁতার না শিখিয়ে সাঁতারুর বাহাদুরী দেখাতে যাঁরা আহ্বান করে, তাঁরা দেশের কণ্টক, তাঁরা ধ্বংস হোক্।"

পিসিমা অতিমাত্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। অশোক সহসা পিসিমার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "পিসিমা তুমি থামো, আমি আজ বুঝেছি পিসিমা, আমায় ক্ষমা কর, পিসিমা।"

পিসিমা যেন আর থামিবেন না,—তাঁর জীবনের পুঞ্জীভূত সমস্ত বেদনাভরা কথার পাহাড় যেন এক নিশ্বাসে ঢালিয়া দিতে চান –"অশোক, ক্ষমা আমি তোকে করবো, তোর মত হতভাগ্য, হতভাগিনীদেরও ক্ষমা করবো; ক্ষমা করবো না শুধু সেই হতভাগ্য ও হতভাগিনীদের, পিতামাতা ও অভিভাবক অভিভাবিকাদের, যারা যুবতী মেয়ের সাধারণ লজ্জা, আর যুবকের সাধারণ ভয়কে জয় ক'রবার সুযোগ দিয়ে কামনার ইন্ধন জুগিয়ে জাতিকে মৃত্যুর পথে নিয়ে চলেছে, ক্ষমা করবো না তাদের; উচ্চকণ্ঠে জাতির মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে তাদের ধ্বংস কামনা করবো; আমিও তাদের একজন অশোক, নিজের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ফিরে এসেছি, তোকে যদি প্রথম থেকেই আমি বাধা দিতুম, তাহলে তোর জীবন এমনি দুঃখময় হয়ে উঠতো না। আমি জীবনের শেষ চৌকাঠে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলবো— "মেয়ে ও পুরুষের কর্ম্মের এক মঞ্চ নয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষ বুভুক্ষ সভ্যতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু দেহ ও অন্তরের ক্ষুধা তাদের কোন দিনই মিটবে না, এই আমার শেষ কথা।"

পিসিমা হাঁপাইতে লাগিলেন, এমন সময় ঘরে ঢুকিল সুলতা ও রেবা। রেবার বিবাহিত জীবনে অশোকের বাড়ী এই প্রথম আবির্ভাব। সুলতা ও রেবার এই আকস্মিক আবির্ভাবে অশোক বিস্ময়াবিষ্ট হইল; কিন্তু কোনই কথা বলিল না। রেবা অগ্রসর হইয়া প্রথমে পিসিমার তারপর অশোকের পায়ের ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "অশোকদা, খুবইআশ্চর্য্য হচ্ছো, না? ভাবছো গর্ব্বিতা রেবা মস্তক অবনত করে পায়ের ধুলা নিতে শিখিল কবে?"

অশোক দেখিল রেবার কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বেশ-ভূষায়, আচার-ব্যবহারে সবদিক দিয়া। খাঁটী বাঙ্গালী ঘরের গৃহবধূর সাজে রেবাকে অশোকের আজ এক নূতন ভাবে ভাল লাগল; মৃদুকণ্ঠে অশোক ব'লল, "রেবা, একদিন তোমার ঐ 'দাদা' সম্বোধনে কত না লজ্জা বোধ ক'রতাম, কিন্তু আজ কি আনন্দই হচ্ছে তোমার মুখে ঐ ডাকটী শুনে। আমার বোন নাই রেবা, তুমি আমার সেই শূন্য স্থান পূর্ণ কর, বোন।"

রেবা গদ্ গদ্ কণ্ঠে ব'লল, "দাদা, সুলতাদির কাছে যদি ক্ষমা না পাই, আমার সমস্ত জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

রেবার সুন্দর মুখের উপর ভাসমান টলটলে দুটো চোখ বাহিয়া কয়েক ফোটা জল নামিয়া আসিল। সুলতা অগ্রসর হইয়া রেবার হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই, নারীর আদর্শ সংসারকে সাজান, ধ্বংস করা নয়। আমরা প্রগতির মোহে সেই সংসার ছেড়ে অনেক দূরে সরে এসে পুরুষের মনে বাসনার ইন্ধন জাগিয়ে পুরুষের কর্ম্ম-ক্ষমতা খর্ব্ব ক'রে তাকে পঙ্গু ক'রে তুলেছি। ক্ষমার কথা কেন বলছ ভাই? ভেবে দেখো আজও নিজেকে ক্ষমা করতে পার নি হয় ত'। মুখে ক্ষমার অভিনয় করলেই ক্ষমা করা হয় না ভাই। যে দিন নিজের মনের কাছে নিজে ক্ষমা পাবে, সে দিনই পাবে সত্যিকারের ক্ষমা।" সুলতা থামিল।

রেবা বলিল,—

"নারী সমিতি, নারী-সঙ্ঘ এ সব গঠন আজ আমাদের বড় কাজ নয়, ঘরে থেকে পুরুষকে বাহিরে কর্ম্ম করার শক্তি দানই বড় কাজ। বাহিরে তাদের সঙ্গে মিশে তাদের কর্ম্মপথে বাধা সৃষ্টি ক'রে জাতির উন্নতি হবে না, ঘরে ফিরে সন্তান গঠন করতে হবে। এই আমাদের শেষ কথা।"

সুলতা হাসিতে হাসিতে বাধা দিল, "শেষের পরেও শেষ থাকে—চিতায় জল ঢেলে হাড়ী ভাঙ্গা; ইউরোপে আজ সেই হাড়ী ভাঙ্গার শব্দ উঠেছে, পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের ভুলে যেতে হবে, এই আমার শেষ কথা।"

পিসিমা এতক্ষণ বেশ বিশ্রাম করিয়া লইয়াছেন এইবার হাসিতে হাসিতে ব'ললেন, "চল অশোক, বুড়ী পিসি যে এতক্ষণ কাশীর বিশ্বনাথের প্রসাদ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এটা সবাইকে বেটে দেবো, এই হলো আমার শেষ কথা।"

সবাই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

শেষ

বর্ম্মার কথা

নিম্নলিখিত কয়খানি পত্র বর্ম্মার প্রধান এড্‌ভোকেট হাউস্ অব রিপ্রেজেন্‌টেটিভ্-এর মেম্বর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয়কে লিখিত হইয়াছে।

কলিকাতা ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

প্রিয়তম ভূপেন্দ্র!

বর্ম্মার অবস্থা যতই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে, তোমাদের জন্যও ততই চিন্তিত হইয়া পড়িতেছি। আমাদের শঙ্কাকুল অবস্থা পত্র লিখিয়া ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। তুফানের মা অবশ্য প্রায়ই তোমাদের কাছে পত্র লিখিতে বলেন, দুই একখানি লিখিয়াছিও, কিন্তু পত্র যে তোমার কাছে গিয়া পঁহুছিবে, এরূপ আশা নিতান্তই কম। আর পত্রে তোমারও বা কি উপকারে আসিতে পারি, দূর হইতে কি উপদেশই বা দেওয়া যায়? ভগবানের উপরে নির্ভর করিয়া থাকাই ভাল, তাই চুপ করিয়া আছি। বর্ম্মা হইতে যে-সমস্ত লোক আসেন, তাঁহাদের নিকট তোমাদের খবর পাই। অনেক লোকের সঙ্গে কথা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, এখন পর্য্যন্ত তোমরা সবাই নিরাপদেই আছ। ভগবান্ তোমাদের সমস্ত আপদ দূর করুন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

হায়, আজ বর্ম্মার অবস্থা কি হইয়া উঠিয়াছে! রোজ রোজ বিকট বজ্রনির্ঘোষ-ধ্বনি, অবিরত বোমাবর্ষণ, অসম্ভব আতঙ্ক, পলায়ন, অপসারণ, সহস্র অসুবিধা এবং তদুপরি রাশি রাশি শবদেহ! কল্পনা করিতেও হৃৎকম্প হয়। অধিবাসীদের অবস্থার কথা ভাবিলেই শিহরিয়া উঠি। যদি পূর্ব্বে কখনও ঐ সমস্ত স্থানে না যাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এতটা চিন্তা বা শঙ্কা হইত না।

সেই ১৯২৩-এর কথা, তোমার নিশ্চয়ই বেশ মনে আছে।

তুমি জান সে-বারে আমি লোয়ার বর্ম্মায়, রেঙ্গুন, মৌলমীন, বেসিন ও হেনজাডায়ই প্রায় দুই মাস ছিলাম, তন্মধ্যে রেঙ্গুন ও মৌলমীনেই বেশী। হেনজাডা একটু ভিতরের দিকে, বোধ হয় সেখানে ততটা ভয় নাই। কিন্তু আজ রেঙ্গুনের ও মৌলমীনের অবস্থা তো বর্ণনাতীত! ভয় হইতেছে সর্ব্বদা বেসিনের জন্য; কারণ তোমরা আছ, রবি আছে, রবির ছেলে আছে, হেমেন্দ্র আছে! তোমাদের ঐ বেসিন বাতিঘরটাই পাছে বা শত্রু-বিমান ডাকিয়া আনে।* যদিও এই বাতিঘর হইতে তোমার বেসিনের বাড়ী প্রায় একশত মাইল হইবে, তথাপি যেন কেন ভয় হয়।

ছাতা ও সিগার হস্তে ব্রহ্মরমণী

তোমার মনে আছে সেবারে আমি যখন বর্ম্মা যাই, দেশবন্ধু তখন স্বরাজ পার্টির কাজে বিশেষ ব্যাপৃত। আমি তখন সাংসারিক খরচ নির্ব্বাহের কতকটা উপায় করিবার জন্য একটি ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর শাখা বর্ম্মায় প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্পে তথায় যাই। রেঙ্গুনে প্রায় একমাস থাকিয়া প্রথমেই মৌলমীনে উপস্থিত হই। আর এই মৌলমীনই আজ এত বিব্রত। বর্ম্মায় প্রথমেই আমি শ্রীমান ফণিভূষণ

---

* বেসিন বাতি-ঘর রেঙ্গুন যাওয়ার সময় দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হইতে ডায়মণ্ড দ্বীপ ১৪ মাইল দূর, বেসিন নদীর মোহনা ৮ মাইল, আর এই মোহানা হইতে বেসিন নগর ৭০ মাইল হইবে।

সেন এডভোকেটের বাসায় উঠিয়াছিলাম। সেখানে ৩।৪ দিন থাকিয়া একটী মেসে যাই। মেসের সকলেই ঢাকা ও ময়মনসিংহবাসী। অনেকেই গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করিতেন।

ছাতা নির্ম্মাণরত

কিন্তু সেখানে বেশী দিন থাকিতে পারিলাম না। যিনি অধ্যক্ষ, তিনি হাইকোর্টের অনুবাদ-বিভাগে কাজ করিতেন। ৩।৪ দিন থাকিয়া বুঝিলাম আমি যে দেশবন্ধুর একজন শিষ্য ও সহকর্ম্মী, জেলের ফেরত, তাহাতে তাঁহার সরকারী কর্ম্মে বিঘ্ন আসিতে পারে। দুই একদিন মধ্যেই একখানা বাসা দেখিলাম, উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে লেকের সন্নিকটে, বাড়ীর মালিক মনসা গাঙ্গুলী মহাশয়ও সপরিবারে সেই বাড়ীর অপর পার্শ্বে থাকিতেন। ইনি তখন কর্পোরেশনে কাজ করিতেন। ক্রমে বড় রকমের একটি চাকুরীও পান। ইনি, তাঁহার পত্নী, ছেলেমেয়ে সেই প্রবাসেও আমাকে এত যত্ন করিতেন যে, দেশে ফিরিয়া এখনও তাঁহাদের সৌজন্যের কথা ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু, হায়! মনসাবাবু আর ইহ জগতে নাই। গত২৩শে তারিখের বোমাবর্ষণে তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইনি পেন্‌সন্‌ লইয়া সহরে ফ্রেজার ষ্ট্রীটে একখানি দোকান করিয়াছিলেন। বোমাবর্ষণের সময় দোকানেই তিনি কাজ করিতেছিলেন। রেঙ্গুনের সংবাদ ভীষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু মনসাবাবুর ন্যায় বান্ধবের মৃত্যুতে আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথায় কাতর হইয়াছি। ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

মনসাবাবুর বাড়ীতে কয়েক দিন থাকিয়া মৌলমীন রওনা হই। একখানি সেকেণ্ড ক্লাস টিকেট করিয়া রাত্রি ৯টার সময় ট্রেণে উঠি আর ভোর সাতটায় মার্ত্তাবান আসিয়া পৌঁছছি। মার্ত্তাবান সেলুইন নদীর পশ্চিম পারে, পূর্ব্ব তীরে মৌলমীন, মার্ত্তাবান হইতে একখানি লঞ্চে করিয়া মৌলমীনে যাইতে হয়। আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছিতে পারা যায়। নদীর দৃশ্য বড় চমৎকার, ইহা উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া মার্ত্তাবান উপসাগরে পড়িয়াছে। কোন কোন স্থানে নদীটা বর্ম্মা ও শ্যামরাজ্যকে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। আজ শুনিতেছি, জাপানীরা নাকি সেলুইন নদী দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। আর স্থানে স্থানে নাকি মিত্র-সৈন্যের সহিত তাহাদের যুদ্ধও হইয়াছে, পান হইতে বিমান পথে রেঙ্গুণ একশত মাইল। ইতিপূর্ব্বেই জাপানীরা মৌলমীন অধিকার করিয়া বিমানঘাটিটা হাতে পাইয়াছে। মৌলমীন অধিকার করার ফলে তাহাদের বিমানাক্রমণের গতি যে আরও বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শুনিতেছি মার্ত্তাবান সহরও না কি পরিত্যক্ত হইতেছে। তাহা হইলে চার্চ্চিল সাহেবের কথাই ঠিক যে, আরও ভীতি-মূলক সংবাদের জন্য আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে? মার্ত্তাবান পাইলে রেঙ্গুন, মান্দালয়, প্রোম ও লাসিয়া পর্য্যন্ত রেলপথও তাহাদের হস্তগত হইবে। এই লাসিয়া হইতেই বর্ম্মারোড দিয়া চীনে যাইতে হয়। লাসিয়া রেঙ্গুন হইতে পাঁচ শত মাইল। ভয় যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। একমাত্র ভরসা ভগবান্।

মৌলমীনে আমি ৺হরিপদ রায় ও মহেন্দ্র পালের আরতে উঠি। ইঁহারা উভয়ে খুবই সজ্জন ভদ্রলোক ছিলেন। মৌলমীনে ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত জ্বরে আমি বড় কষ্ট পাই। কিন্তু বিদেশে হরিপদবাবু ও মহেন্দ্রবাবুর যত্নে কোন কষ্ট হয় নাই। জুলাই মাসেও রোজ বড় বড় কই মাছ আনাইয়া আমার খাওয়ার ব্যবস্থা তাঁহারা করিতেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অবনীরঞ্জন দাশগুপ্ত ও উক্ত ভদ্রলোকদ্বয় তখন একটী

কাঠের ব্যবসা (Timber business) করিতেন। কাঠ (সেগুণ-ই প্রধানতঃ) মৌলমীনের প্রধান ও অমূল্য সম্পদ।

ব্রহ্মনেতা ভিক্ষু উত্তমা

এ-দেশবাসী অনেকে কাঠের ব্যবসা করিয়া বিস্তর অর্থার্জ্জন করিয়াছেন। হরিপদবাবুকে যেরূপ খাটিতে দেখিতাম, তাহাতে তাঁহারাও যে খুব ভালই করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না। অনেক দিন তাঁহাদের সকলের খবর জানি না কিন্তু কর্ম্মক্ষম হরিপদবাবু যে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন সে খবর পাইয়াছি। তাঁহার ২।৩টি ছোট মেয়ে ছিল, দেখিতে তাঁহারা ছিল যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী।

ওলফ্রাকও মৌলমীনের আর একটী সম্পদ। ধান তো আছেই। এ সম্বন্ধে পরে বলিব।

মৌলমীনে আমার পূর্ব্ব পরিচিত ধীরেন্দ্র নন্দীও কাঠের (Timber) ব্যবসা করিতেন। ইনিও বিশেষ পরিশ্রমী ছিলেন। ঢাকার পুলিনদাস প্রভৃতির ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় আমাদের একজন সহযোগী উকিল ছিলেন ৺বিভুচরণ গুহ ঠাকুরতা। ক্রমে ইনি খুব পসার করিয়াছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ বিভুবাবুর একটী কন্যার সঙ্গে পরিণীত হন। তাই আমাদের মধ্যে আত্মীয়তা আরও ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল। যেদিন নব্য বিবাহিত ধীরেন্দ্রনাথ মৌলমীনে প্রীতিভোজনে বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়িত করেন সেদিনই জ্বর আমায় ভীষণ আক্রমণ করে। আমার অসামর্থ্য বন্ধুজনগণকে যে খুবই পীড়া দিয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করিয়া আমারও কষ্ট হইয়াছিল। ধীরেন্দ্রনাথ আর ইহসংসারে নাই। তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাহার শোকসন্তপ্ত পিতার আশ্রয়স্থল বধূমাতাও খুল্লতাতের (রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী) সঙ্গে আমেরিকায় গিয়া আশ্রমবাসিনী হইয়াছিলেন। ধীরেন্দ্র, অবনী বাবু প্রভৃতি ৫।৬ জন আমরা মৌলমীনে প্রায়ই পূর্ব্ব সীমানায় একটী পাহাড়ের উপর যাইতাম। দেখিতাম পূর্ব্বদিকে শ্যামরাজ্যের পাহাড় এবং পাহাড়-গাত্রস্থ বৃক্ষরাজি ধূ-ধূ করিতেছে। এই শ্যাম আজ শত্রুরাজ্য। যে পাহাড়ে আমরা উঠিতাম সেখানকার পর্ব্বত-গহ্বরে একটী মন্দির ও শিবমূর্ত্তিও দেখিয়াছিলাম। উহার সিঁড়িগুলিও বড় সুন্দর ছিল।

শ্বয়েডেগন পেগোডার মানবাকার বুদ্ধমূর্ত্তি

মৌলমীনে মঙ্গ টুই নামে একজন নামকরা উকীলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে

তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল। কথায় কথায় আমি স্বরাজপার্টির প্রোগ্রাম বলিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা অসহযোগী—আপনাদের কর্ম্মধারায় কি সহযোগিতা প্রমাণিত হয় নি? আমি বলি যে, আমরা যদি কাউন্‌সিলে গভর্ণমেণ্টদলকে (Treasury Benches) ভোটে পরাজিত করিতে পারি, তবে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একমাত্র certify করা ছাড়া কোন কাজই সম্ভব হইবে না। তাই দেখুন গভর্ণমেণ্ট আমাদের রিফর্ম্ম আর কি দিয়াছে? রিফর্ম্ম অর্থ তো আমাদের শাসনাধিকার। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি একত্র শাসনেই রাজকার্য্য চালান, তবে রিফর্ম্ম থাকার ফল ভিন্ন আর কি?

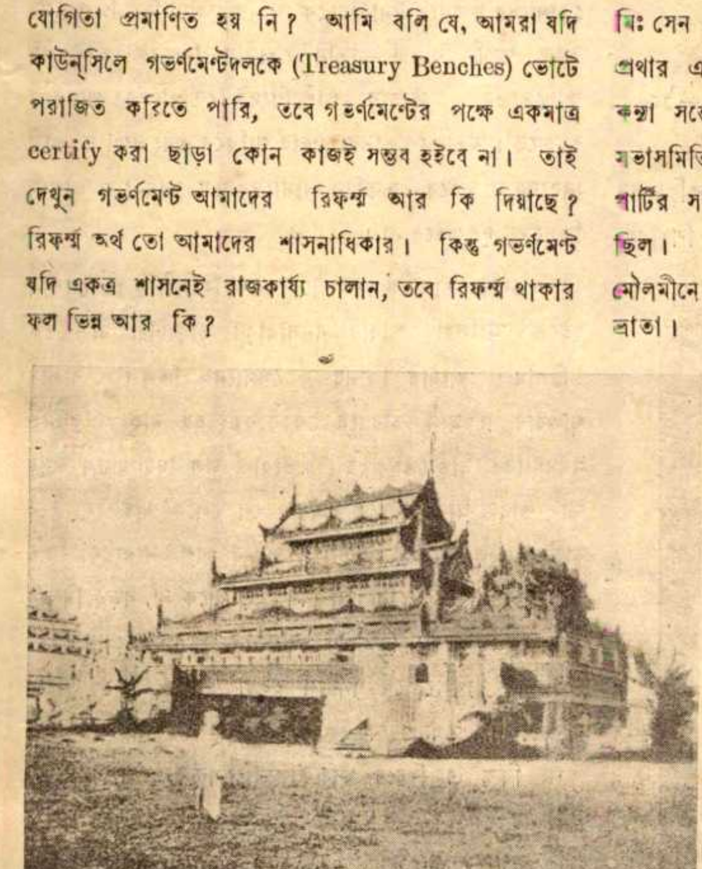

বর্ম্মায় কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ

বলা বাহুল্য দেশবন্ধুর মত্‌ই আমি আওড়াইয়াছিলাম। আর ইনি বেশ তাহা গ্রহণও করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর মতের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় আমি খুব আনন্দিত হই।

মঙ্গ টুই তারপর তোমাদের কাউন্‌সিলে বা হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্‌এর মধ্যে আসিয়াছিল কি না তোমরাই বলিতে পার। তবে আমি তাঁহার মধ্যে কিছু বিজ্ঞতার প্রমাণ পাইয়াছিলাম।

মৌলমীনে ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বেশ পসার করিয়াছিলেন। অসুখের সময় ইনিই আমায় দেখিতেন, কিন্তু কোন ফি গ্রহণ করেন নাই। ষ্টেসনের মাষ্টার মহাশয়ও বাঙ্গালী ছিলেন।

মৌলমীনের জজ-আদালতে একদিন গিয়াছিলাম। দেখিলাম অনেক স্ত্রীলোকও কোর্টে সমাগত হইয়াছিলেন। দেখিলাম এখানেও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসার হইয়াছে। কোর্টে মিঃ সেন নামে একজন উকীল ডিফেন্‌সে ছিলেন। জুরী-প্রথার এখানেও প্রসার দেখিয়াছিলাম। এই মিঃ সেনের কন্যা সন্তোষকুমারী কলিকাতায় আমাদের স্বরাজপার্টিতে সভাসমিতিতে বেশ ভাল বক্তৃতা করিতেন। বর্ম্মী জুরীদিগকে পার্টির সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেও আমার নজরে আসিয়াছিল। তেলিরবাগের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ও মৌলমীনে ওকালতি করিতেন। ইনি অবনীবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনিও আজ ইহ সংসারে নাই।

মৌলমীনে একটী Saw Mill ছিল, ইহার সত্বাধিকারী কলিকাতার শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল রায়। এই মিলটী বনোয়ারী বাবু পূর্ব্বেই বিক্রী করিয়া দিয়াছিলেন।

ভালকথা, এই মৌলমীনেই না ভোলানাথের দ্বীপান্তর হইয়াছিল? তোমার "সাগর-বক্ষে"তে পড়িয়াছি আন্দামানের ন্যায় পূর্ব্বে মৌলমীন অঞ্চলেও দ্বীপান্তর হইত। কি চমৎকার তোমার এই বইখানি? তুমিই লিখিয়াছ এই ভোলানাথ বেসিন বাড়িঘর তৈয়ার করিতে খুব দক্ষতা দেখাইয়ছিল?

মৌলমিনের কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘর কি সুন্দর, আর এই দারুময় ঘরগুলির কারুকার্য্যই বা কত চমৎকার! বর্ম্মীরা আশ্চর্য্য শিল্পীও বটেন। যাক আজ আর এইসব বর্ণনা মোটেই ভাল লাগে না। হায়, মৌলমিন সহর হইতে সমস্ত সেনানিবাসও সরিয়া গিয়াছে, সহরটী এখন জাপানীদের হাতে আসিয়াছে ইহাতে বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছি। টেভয়, মার্ত্তই পূর্ব্বেই গিয়াছে। টেভয় ও মৌলমীনে শত্রুদের বিমানঘাঁটি হইয়াছে, ইহা বড়ই আশঙ্কার কথা। মৌলমীনের ঠিক পশ্চিমেই তো সমুদ্রের অপর পারে আমাদের মান্দ্রাজ সহর! সেদিন পর্য্যন্তও তো বর্ম্মা ভারতেরই একাংশ ছিল। পাঁচবৎসর না হইল বর্ম্মা প্রদেশ এখন ভারত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন

হইয়াছে। দেখিতেছি যুদ্ধ সত্য সত্যই আমাদের গৃহদ্বারে আসিয়া ভীষণ গর্জ্জন আরম্ভ করিয়াছে। হায়, কবে ইহা শান্ত হইবে ?

দ্বিতীয় পত্র

৮ই ফেব্রুয়ারী—১৯৪২

প্রিয়তমেষু—

বর্ম্মী প্রেমিক প্রেমিকা

অদ্য কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়া যে রেঙ্গুনের লোমহর্ষণকারী সংবাদ পাইলাম, তাহাতে শিহরিয়া উঠিয়াছি। ইঁহারা কয়জনই বীমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে রেঙ্গুণে কাজ করিতেন। শ্রীযুক্ত খগেন গাঙ্গুলীর (মেট্রপলিটান) নিকটে ইতিপূর্ব্বেই ২৩শে ডিসেম্বরের কথা শুনিয়াছি। তিনি জানিতেন, তুমি সপরিবারে বেসিনে নিরাপদে আছ। অদ্য এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়ার মিঃ সেনগুপ্তের কাছে শুনিলাম, যেদিন (২৩শে ডিসেম্বর) ভীষণ বোমাবর্ষণ হয়, সেদিন তুমি তোমার এক সহোদরের সহিত রেঙ্গুনে ছিলে, আর যখন বিস্ফোরণে অসংখ্য লোক ভূপাতিত হইতে থাকে, তুমি তখন 'মাতৃভাণ্ডারে' আশ্রয় নিয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছ। তোমারই নিকটে নাকি বহুলোক মারা গিয়াছে। ভগবানকে শতসহস্রবার প্রাণের নিবেদন জ্ঞাপন করিতেছি যে তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। তোমার মা বোধ হয় জীবদ্দশায় নিশ্চয়ই তোমাদের কল্যাণে ৺নারায়ণকে অনেক তুলসী দিয়া গিয়াছেন। আজ স্বর্গে বসিয়া তিনি তোমায় নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদেই তোমাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। যতদিন তোমরা বর্ম্মায় থাকিবে এবং বর্ম্মা যতকাল নিরাপদ না হইবে, ততদিন আমাদের ভয়, ভাবনা ও আশঙ্কা কিছুতেই দূর হইবে না।

গতবার তোমাকে মৌলমীনের কথা লিখিয়াছি। সেখান হইতে আসিয়া আবার মনসাবাবুর ভাড়াটীয়া বাড়ীতেই উঠিলাম। আমার জিনিষপত্র সেখানেই ছিল। বাসায় খাওয়ার ও স্নান করিবার কোন কষ্টই হয় নাই। রন্ধনও মনসাবাবুর বাড়ীতেই হয়। ভারীও জল দিয়া যায়। খুব ভাল করিয়া স্নান করিতে ইচ্ছা হইলে 'লেকে' যাইতাম, তবে বাড়ীর জলেই যথেষ্ট হইত। লেকটী বেশ মনোরম কিন্তু দুপ্রহরের সময় ইহার আকর্ষণ বড় থাকে না, বড়ই নির্জ্জন মনে হয়। তখন (১৯২৩) শুনিলাম, অনেক প্রেমিক বা প্রেমিকা ব্যর্থ প্রেমে নিরাশ হইয়া লেকের জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তখনও কলিকাতায় লেক্ হয় নাই। তবে আজ কিন্তু এ বিষয়ে কলিকাতার লেক্ও প্রতিযোগিতায় রেঙ্গুনের লেকের বড় পেছনে যায় না। দেখিতেছি এরূপ মৃত্যু ক্রমেই সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে। অবাধগতি, কো-এডুকেশন, ব্যর্থপ্রেম—ক্রমেই যেন যত সমাজে প্রসার লাভ করিতেছে। কিন্তু আমরা কত দূর ? যাক্ আজ যে ভীষণ ব্যাপারে আমরা বিপর্য্যস্ত, তাহা বলিতে বসিয়া এইগুলির পরিণাম বরং না-ই অনুশোচনা করিলাম।

ওঃ, এখনও রেঙ্গুনের ভারতীয়গণ যে সাংঘাতিক অবস্থায় পড়িয়াছে ভাবিতে শিহরিয়া উঠি। আচ্ছা ভূপেন্দ্র, তোমার বর্ম্মা যাওয়ার ইতিহাস তোমার বোধ হয় মনে আছে। আমার জীবন-পাঞ্জির সহিত ইহার একটু সম্বন্ধ নাই কি ? বোধ হয় আছে। তুমি তো ১৯০১ সালে বি, এ, পাশ করিয়া ফেলিলে। কিন্তু আমি সেবারে সফলকাম হইতে পারিলাম না। বাবা তখন স্বর্গগত, সংসার আমার স্কন্ধে ; কিন্তু মঙ্গলময় ভগবান সর্ব্বদাই যেন আমাকে হাত ধরিয়া

চালাইতেছেন। সেবারে প্লেগের জন্য আমাদের পাটনার ছাত্রগণের পরীক্ষা-কেন্দ্র পাটনা হইতে ভাগলপুর স্থানান্তরিত হইয়াছে। আমি বিজ্ঞান পরীক্ষা খারাপ দিয়া সারারাত্রি ভাবিতে ভাবিতে পরদিন অনেক বেলায় উঠিয়াছিলাম। উঠিয়াই দেখি বাঁকীপুর এঙ্গিলো সংস্কৃত স্কুলের হেডমাষ্টার বিপিন বসু একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছেন আমি ২০৲ বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছি। দুঃখ আনন্দে পরিণত, অঙ্ক পরীক্ষা দিয়াই পাটনা চলিয়া আসিলাম। একবৎসর সমানে শিক্ষকতা করিয়া ও বি, এ-র পাঠ্য পড়িয়া তৈয়ার হইয়া পুনরায় ১৯০২ সালেতে পাশ হই। সংসারও নির্ব্বাহ হইয়াছে পাশও করিয়াছি, আনন্দের সীমা রহিল না। অচিরেই শুনিলাম রেঙ্গুন হাইকোর্টে হিন্দুস্থানী Interpretor ১৫০৲ বেতনে পদ খালী হইয়াছে। আমার কুমুদ দাদা (Mr. K. N. Sen Gupta, Bar-at-Law) মিঃ জে, আর দাশকে লিখিলেন আর মিঃ এস, আর, দাশ (পরে Advocate General)কে দিয়া রেঙ্গুনের বিখ্যাত এড্ভোকেট পি, সি, সেনকে চিঠি লেখাইলেন। তোমার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন এই পদটি আমার লাভ হয়। শীত পড়িতে পড়িতে তুমি লিখিলে "The month of November has set in with new hopes and aspirations" কাজটী আমার হইল না, কিন্তু তখন হইতেই তোমার হৃদয়ে বর্ম্মা যাওয়ার আগ্রহ অঙ্কুরিত হইল।

তারপরে তুমি শিক্ষকতা করিতে করিতে বেসিন হইতে এড্ভোকেটসিপ ও বর্ম্মীভাষায় পরীক্ষা দিয়া এড্ভোকেট হইলে। তুমি বেশ পসার করিয়াছ, ভাইদের মানুষ করিতেছ, বাড়ী করিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে মাষ্টারী অবস্থায় তোমার শ্যালক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে সেখানে নিয়াছ। তিনি খুব খ্যাতনামা উকীল হইয়া ৩,৪ হাজার টাকা রোজগার করিতেছেন। অথচ তুমি উকীল হইয়া তাহার কাছে কিছু প্রত্যাশা না করিয়া স্বাবলম্বনেই উন্নতি করিতেছ—এই সবই তোমার জীবনে হইয়াছে। বহুদিন দেখাও হয় নাই। ইহাই এবার বর্ম্মা যাওয়ার ছিল আমার অন্যতম কারণ।

ঐ যে মিঃ পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের কথা বলিলাম, তিনিইতো বর্ম্মার ছিলেন প্রধান লোক। কিন্তু আমি যখন রেঙ্গুণে যাই, তখন তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহার ছেলে Mr. S, N. Sen ছিলেন তখন এড্ভোকেট। অবশ্য হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র Mr. A. N. Sen বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টে জজিয়তি করিতেছেন। দাশ-পরিবারের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।

ব্রহ্মের বাঙ্গালী নেতা মিঃ পি, সি, সেন, এড্ভোকেট

মিঃ জে, আর, দাশ তাঁহার এক কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, ইনিও হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। আর মিঃ সেনের প্রথমা কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন মিঃ এস্, আর, দাশ (পরে বাঙ্গালার এড্ভোকেট জেনারেল ও ভারত গভর্ণমেণ্টের 'ল' মেম্বর)।

দাশ সাহেব (Mr. J. R. Das) তখন ব্যারিষ্টারীতে খুব পসার করিয়াছিলেন। ইনি স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাশের পুত্র। তাঁহার ব্যবহার ছিল অতীব মনোহর। আজ তোমাকে প্রায়ই মেম্বর হিসাবে কাউনসিলে আসিতে হয়। কিন্তু তখন তুমি ক্বচিৎ রেঙ্গুনে আসিতে। তবে আমি দেখিয়াছি ইংরাজ, বাঙ্গালী, গুজরাটী, সুর্ত্তি, মান্দ্রাজী ও বর্ম্মীগণের সার্ব্বজনীন শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন তখন এই মিঃ যতীশচন্দ্র দাশ। দেশবন্ধু দাশের কেবল জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা নহেন।—সহোদরাপেক্ষাও উভয়ে পরস্পর স্নেহাবদ্ধ। দেশবন্ধুই তাঁহার

কাছে আমাকে চিঠি দিয়াছিলেন। ইনি আমাকে খুব সাদরে গ্রহণ করিয়া সকলের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন। রেঙ্গুনবাসীদের চেষ্টায় আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমার আহ্বান হইয়াছিল। আমি ইংরাজীতে প্রায় ঘণ্টাখানেক বলিয়াছিলাম। রেডিও হলে বক্তৃতা হয়। সভায় মান্দ্রাজীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন। বাঙ্গালী সমাজের অন্যতম নেতা বাবু কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হইয়া আমার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। এই সবই হয় যতীশরঞ্জনের সৌজন্যে। কেবল আমি নই, সকলকেই নাকি তিনি এরূপ যত্ন করিতেন।

সেবারে রেঙ্গুনে দেখিলাম বাঙ্গালীদিগের একটী ক্লাব ছিল। উহার নাম ছিল "বেঙ্গল্ একাডেমী।' আজ উহার অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না। শুনিলাম প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র অনেকদিন বর্ম্মাতে বাস করিয়াছিলেন। সেই মনস্বী পুরুষের সাহিত্যের সাধনার সহিত বর্ম্মাদেশেরও যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে তাহা দেখিয়া বর্ম্মার উপরে আরও শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। শরৎবাবু তাঁহার গ্রন্থে বর্ম্মাদেশকে একেবারে ভুলিয়া যান নাই। 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনীতে' বর্ম্মার অনেক কথা, জাহাজের কথা আছে, জাহাজযাত্রীর সম্বন্ধেও কথা আছে, তদুপরি অভয়া ও রোহিণীর আখ্যান এই গ্রন্থকে আরও আকর্ষণীয় করিয়াছে। 'চরিত্রহীনে'ও বর্ম্মার জাহাজে কিরণময়ী ও দিবাকরের একত্রে খাওয়ার ও একত্রে বর্ম্মায় থাকার কথা আছে।

সপরিবারে মিঃ জে, আর, দাশ ও মিঃ এস, আর, দাশ

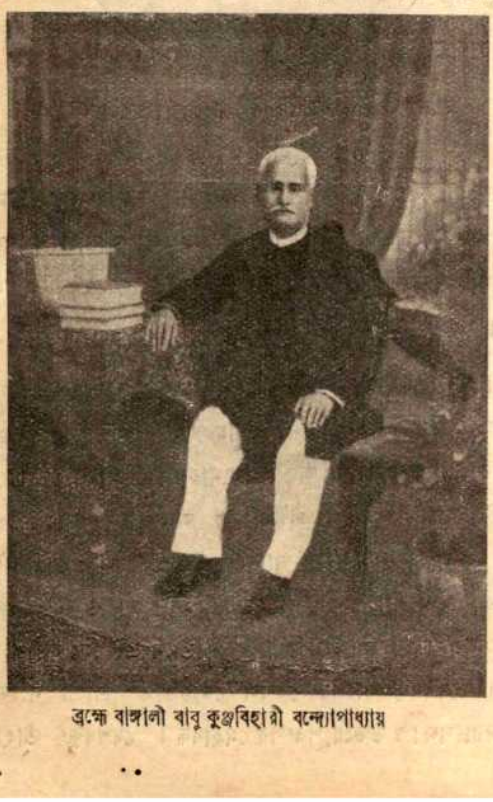

ব্রহ্মে বাঙ্গালী বাবু কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

'পথের শেষে' বইতে সব্যসাচীর বর্ম্মায়ও যে একটী কর্ম্মকেন্দ্র ছিল তাহা তিনি লিখিয়াছেন।

শরৎবাবু মোহিনী ও অভয়ার থাকার স্থান ও কিরণময়ী ও দিবাকরের বেঁটে বাড়ীওয়ালীর বাড়ীর বাসাঘর সম্বন্ধে রেঙ্গুনের মলিন পল্লীর সহিতই আমাদিগকে পরিচিত করাইয়াছেন। শুনিলাম, শরৎবাবু নিজেও এইরূপ অখ্যাত পল্লীতে কিছুদিন বাস করিতেন। বোধহয় সহায়হীন স্থানে অর্থাভাব প্রযুক্তই ঐরূপ হীন সংস্রবে তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু পঙ্কিলের সংস্রবে উদ্ভূত হইলেও নলিনী সর্ব্বজন-মনোহারী, সর্ব্বজন-প্রিয়; সমগ্র সমাজাদৃত। আজ শরৎচন্দ্র যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার অতি আদরের সম্পদ।

কেবল আদরের নয়, শরৎচন্দ্রের অতুল প্রতিভায় বাঙ্গলা-সাহিত্য যে কতদুর সমৃদ্ধ হইয়াছে ও গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমি কৌতুহল বশতঃ ঐ সমস্ত পল্লী দর্শনেও ক্রটী করি নাই।

তখন দেখিয়াছিলাম রেঙ্গুনে একটী দুর্গবাড়ী আছে, আর শেখরনগরের বাবু হেমেন্দ্রনাথ রায় তাহার তত্ত্বাবধান করেন। হেমেন্দ্রবাবু এখন জীবিত আছেন কি? কেমন আছেন? তিনি বড় চাকুরী করিতেন।

১৯২৩ এর কথা। তখনই দেখিয়াছিলাম স্ত্রীলোকদের কেবল স্বাধীনতাই নাই, তাহাদের শিক্ষাও আছে। বর্ম্মায় এইটী দেখিয়াছিলাম বড় সুন্দর জিনিষ। স্ত্রী-শিক্ষার বড় প্রসার; কিন্তু সে শিক্ষা হইত বর্ম্মী ভাষায়। 'ফুঙ্গীচকে' বিনা বেতনে শিক্ষাদান হইত। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে ফুঙ্গী বলে। অনাবৃত কেশমুণ্ডিত মস্তকে ও হলদে রঙ্গের বস্ত্রে ইহাদিগকে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসীর মতই মনে হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কাপড়ের রং মেটে, ইহাদের হলদে রং। বৌদ্ধ মঠকেই (monastery)] ফুঙ্গীচক বলে। এইখানে সাধুরা মেয়েদিগকে পড়াইতেন। এই জন্যই স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার বড় বেশী হইত।

ফুঙ্গী শিষ্যগণকে পাঠ দিতেছেন

আজ শুনিতেছি ফুঙ্গীচকে পড়িবার সুবিধা অপহৃত হইয়াছে। কে করিয়াছে, কেন এরূপ হইয়াছে, তোমরা প্রতিনিধিবর্গ কেন ইহার প্রতিকার করিতে পারিলে না, তাহা তোমরাই বলিতে পার। কিন্তু একথা কি ঠিক নয় যে, কোন বিধি-নিষেধই স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে বাধা প্রদান করিতে পারে নাই? পূর্ব্বে ফুঙ্গীচকে যাহা হইত, আজ কাল ইংরাজী বিদ্যালয়ে তাহা হইতেছে। আমারও মনে হয়, শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা হইতে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা সেখানে অত্যন্ত অধিক। তবে শিক্ষার অনুরূপ চরিত্র গঠন হইতেছে কি না, তাহা তোমরাই বলিতে পার।

তখন দেখিতাম স্ত্রীলোকদের গায়ে জ্যাকেট থাকিত, তাহারা লুঙ্গি পরিত এবং চুল বাঁধিয়া চূড়ার মত করিয়া মাথার উপরে রাখিয়া দিত। ইহাদের দেখিতাম সিল্কের কাপড়ের দিকে বড়ই অনুরাগ। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত এবং পায়ে স্যাণ্ডেল পরিত। হাতে আংটীও থাকিত। এখনও কি এরূপ আছে? একটী জিনিষ দেখিতাম সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধির আশায় ইহারা মুখে পাউডার বা কোন রং মাখিত না। তানাখা মাখিত। তোমাকে আর বেশী বলিব কি তানাখা একরকম গাছের কাঠ হইতেই হয়। উহার কাঠ ঘসিলেই এক রকম জিনিষ বাহির হয় উহা মুখে দিলে নাকি রং বেশ পরিষ্কার থাকে ও ত্বক্ স্বচ্ছ হয়। এ বিষয়ে তুমি কি কিছু গবেষণা করিয়াছ? তানাখা আমাদের দেশের চন্দনের ন্যায় কাঠ নয় কি?

কিন্তু ইহারা দৈনন্দিন ও নানাবিধ শিল্পকার্য্যে বড় সুদক্ষা। বর্ম্মী ছাতা তৈয়ারী করিতে, চুরুট বানাইতে অন্যান্য গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে ইহাদের তুলনায় অন্য দেশের মেয়েরা বোধ হয় নিম্নে।

পুরুষেরও পোষাক কতকটা মেয়েদেরই মত। তবে আগে পুরুষদের মাথায় দীর্ঘ কেশ থাকিত, এখন কাটিয়া ফেলে, ইহারাও লুঙ্গি পরে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মাথায় রুমালের মত কাপড় জড়াইয়া রাখে। ইহাদের স্যাণ্ডেল

কতকটা খড়মের মত। তুমি তুফানকে কি সুন্দর একটী লুঙ্গি দিয়াছিলে!

একদিন—একদিন কেন ৩।৪ দিন সোয়েডেগন পেগোডায় যাই। পেগোডা অর্থই বৌদ্ধ মন্দির। আর স্বর্ণময় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে সোয়েডেগন। আবার কেহ কেহ বলেন রেঙ্গুনের পূর্ব্বে নাকি নাম ছিল ডেগন। তাই রেঙ্গুনের মন্দিরকে বলে সোয়েডেগন পেগোডা।

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশের অনেক লোক যে পূর্ব্বে বর্ম্মী পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-রমণী লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, এরূপ ব্যাপার এখন বোধ হয় কমিয়া গিয়াছে। শরৎবাবু 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনীতে' লিখিয়াছেন যে, একটী বর্ম্মী রমণী তাহার বাঙ্গালী স্বামী রঙ্গপুর যাইবে বলিয়া শোকে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। অসম্ভব নয়—কেননা বর্ম্মী স্ত্রীলোকরা মনে করে না যে, ঐ ব্যক্তি তাহার স্বামী নয়, অথচ অপরপক্ষ উক্ত সঙ্গিনীকে স্ত্রী বলিয়া কিছুতেই নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারে না। তবে অভয়ার কদাকার চট্টগ্রামবাসী স্বামী বর্ম্মী পরিবার লইয়া এতই মাতিয়াছিল যে নিজের স্ত্রী অভয়াকে সর্ব্বাঙ্গে বেত্রাঘাতে রক্তপাত করিয়া দিতেও দ্বিধা করে নাই। কোন দেশের সকল রমণীই হৃদয়হীনা নহে, ইহারাও বিদেশী স্বামীকে যে ভালবাসিতে পারে না তাহা নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে ইহাদের লোভ ও অর্থগৃধ্নুতা বড় বেশী, তাহা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার না করিয়া পারিবে না। সেদেশে বিশেষ তীক্ষ্ণধী বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচিত ছিলেন এরূপ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ব্রহ্মপরিবার মৃত্যুকালেও সর্ব্বস্ব কিরূপে একরকম কাড়িয়াই নিয়াছিল, এদিকে স্বামী শুশ্রূষায় সর্ব্বদা ঔদাসীন্যই দেখাইত, এরূপ সত্যঘটনাও তো তুমিই আমায় বিবৃত করিয়াছ। এই দৃষ্টান্তেও কি আমাদের বর্ম্মপ্রবাসী দেশবাসীরা সচেতন হইবে না?

কথায় কথায় অনেক দূর চলিয়া গিয়াছি, অথচ প্রধান দেবমন্দির সুয়েডেগন পেগোডা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। এখন দেখিয়াছিলাম কি বৃহদায়তন মন্দির, কি সুন্দর দেবতা (ফায়া) কি বহুমূল্য কারুকার্য্য! বহুদূর হইতে এই মন্দিরের অভ্রভেদী চূড়াটী দৃষ্টিগোচর হইত। এই চূড়ার উপরে আবার নানারূপ কারুকার্য্য শোভিত একটী সোণার ছাতা দেখিয়াছি। এই ছাতাটীর জন্য মান্দালয় রাজা মিন্দনকে নাকি ১৮১৭ খৃঃ সাড়ে ছয়লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বর্ম্মার এই স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য পৃথিবীরই অন্যতম আশ্চর্য্য সম্পদ। প্রভাতের সূর্য্য-রশ্মিতে, অস্তাচলগামী তপনের লোহিতাভায়, আর রজনীর অসংখ্য দীপাবলীর তড়িতালোকে মন্দিরের যে অপরূপ দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা তোমাকে আর কি বলিব। যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে বুঝান অসম্ভব।

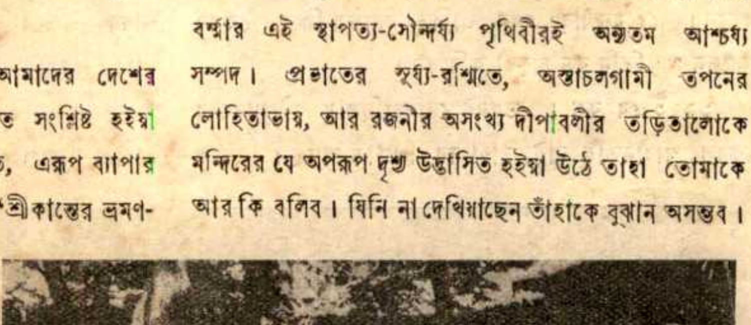

ভিক্ষা সংগ্রহে নির্গত ফুঙ্গীগণ

মন্দিরের সম্মুখে বুদ্ধদেবের বিশালকায় মূর্ত্তি যোগাভিভূত বেদীর উপরে যোগাসনে বসিয়া যেন শিষ্যবর্গকে কর্ম্ম ও নির্ব্বাণ সম্বন্ধে মধুর উপদেশ দিতেছেন। কি বৃহৎকায় এই ফায়া বুদ্ধমূর্ত্তিটী। উচ্চেই উহা প্রায় ১৮হাত হইবে। অনেক ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে ফায়ার সম্মুখে নতজানু হইয়া স্তবপাঠ করিতে শুনিয়াছি। সে অস্ফুটধ্বনি কর্ণে আনন্দবর্ষণ করিত। মন্দিরের উপরতলায়ও উঠিয়াছিলাম। সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। আমরা প্রথমেই যখন মন্দিরে প্রবেশ করি অসংখ্য ব্রহ্মরমণী দোকান সাজাইয়া ফুলদীপ ও পাখা কেনা-বেচা করিতেছে। রমণীরা ফায়ার নামে ফুল বেচিতেছে, হাসিয়া কথা হইতেছে, পথিককে দোকানে ডাকিয়া লইতেছে, পাখা ও বাতি সরবরাহ করিতেছে—যেন রূপের হাট বসিয়াছে। খর্ব্বাকৃতি, খর্ব্বনাসা, পরিষ্কার পরিচ্ছদাবৃত রমণীগণের ব্যবহার কি

ভদ্র! এক এক দোকানে জুতা রাখিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। দাবীও খুব বেশী নয়। ভূপেন্দ্র, আজ প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, ফায়া ও প্যাগোডা দেখিয়া আসিয়াছি। যেন চোখে লাগিয়া রহিয়াছে। কিন্তু শুনিলাম শত্রুপক্ষ নাকি বোমাবর্ষণে মন্দিরটীর সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। মন্দিরগাত্র অপবিত্র করিয়াছে! বর্ম্মীরাও বৌদ্ধ, জাপানীরাও বৌদ্ধ, কিন্তু এই বৌদ্ধ-মন্দির ভাঙ্গিতে কি তাহাদের প্রাণে একটুও বাজিল না?

মন্দির-সোপানে ফুঙ্গীগণ

তুমি তো জান, ফুঙ্গীরা কিরূপ নিষ্ঠার সহিত জীবন যাপন করিয়া শিক্ষা ও ধর্ম্মকার্য্যে জীবনাতিবাহিত করে। তাহারা থাকেও খুব সাদাসিধা বাড়ীতে। ইহারা পূর্ব্বে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিত।

১৯৩৫ সালে তুমি এখানে আসিয়া যখন থাক, এবং তুমি ও আমি এক সঙ্গে অনেক দিন বাস করি, এখানকার 'লেকে' বেড়াইতে বেড়াইতে বৌদ্ধ-আশ্রমবাটীতে গিয়াছিলাম। সেখানে ভিক্ষু উত্তমের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ইনি স্বরাজ-সংগ্রামে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন। ইঁহাকে কংগ্রেসের সভায় অনেকবার দেখিয়াছি। ভিক্ষু উত্তমের সঙ্গে দেখা হইতেই তোমার সঙ্গে ইনি বেশ সম্ভ্রমের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসও ছিল, কাউন্সিলে তাঁহার দেশের অনেক বিষয়ে তোমাকে দিয়া কাজ করাইতে পারিবেন।

আমি যখন বর্ম্মা যাই তখন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিয়াছিলাম। ১৯২১ সালে যখন ইহার জেল হয়, তখন ইনি দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতার এমন শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, যে ব্রহ্মবাসী ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাকে জেলের আদেশ করেন, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া নাকি রাস্তার সমস্ত স্ত্রীলোক পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিছন ফিরিয়া দাঁড়ানটা এইখানে খুব অসম্মানের চিহ্ন। আমাদের দেশে যে কালাফিতা দেখান হয়, তাহাতেও নাকি এতটা অশ্রদ্ধা করা হয় না। রেঙ্গুনে কিছুদিন থাকিবার পরে প্রসিদ্ধ স্বদেশনেতা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'রেঙ্গুণ মেলের' সম্পাদক হইয়া আসেন। পূর্ব্বে ছিলেন সদানন্দ। ইনিও আমার পূর্ব্বপরিচিত। নৃপেনবাবু আসায় তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই আলাপ ব্যবহার করিতে পত্রিকা আফিসে যাইতাম। তিনি একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। কেনিয়াতে ভারতীয়গণকে কিরূপ নিগ্রহ করা হইত, এই বিষয়ে একটী সভা হইয়াছিল। যতদূর মনে হয় তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 'রেঙ্গুন মেলের' ম্যানেজার মিঃ আয়ারের সঙ্গেও আমার বেশ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। 'রেঙ্গুন ডেইলীনিউস' নামেও আর একখানি দৈনিক কাগজ ছিল। মিঃ বেদমূর্ত্তি ছিলেন ইহার সম্পাদক। ইঁহার সঙ্গেও বেশ পরিচিত হইয়াছিলাম। 'রেঙ্গুন টাইমস' নামেও আর একখানি কাগজ ছিল। আজকালকার সংবাদপত্রাদি সম্বন্ধে বিশেষ অবগত নহি। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে জানাইবা। মণি আয়ার নামক একব্যক্তি বেদমূর্ত্তির নামে Defamation Case আনিয়াছিল। পরে শুনিয়াছিলাম, মোকদ্দমাটী আপোষে মিটিয়া গিয়াছে। এই মণি আয়ারের একটী মোকদ্দমার কথা Law Report এ উঠিয়াছিল।

ফুঙ্গীচক (ফুঙ্গীদের থাকিবার স্থান)

তখন রেঙ্গুণের যে ষ্ট্রাণ্ডরোড, লুইস ষ্ট্রীট, ফ্রাজার রোড, মার্চ্চেন্ট ষ্ট্রীট কয়েকটী রাস্তা ছিল, ইহা ছাড়া ১, ২, ৩ করিয়া প্রায় দেড় শত ষ্ট্রীট ছিল। সহরটী মাঝে মাঝে বেশ পরিষ্কার

ছিল। ইউরোপীয় সার্জ্জেণ্টের পরিচালনায় কিন্তু ট্রাফিক যাতায়াতের তখন যেরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল, এরূপ কলিকাতায়ও তখন বড় দেখা যাইত না। এখন বোধ হয় কোন ট্রাফিকই নাই। ষ্ট্রাণ্ড রোড ও লুইস ষ্ট্রীটে খুবই বোমা পড়িয়াছে।

জুলজিক্যাল গার্ডেনে তখন আমাদেরই দেশস্থ ডাঃ রাই মোহন সেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ইনি পরে রায় বাহাদুর হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র ডাঃ সেন বীমার আবেদনকারীদের পরীক্ষা করিতেন।

রেঙ্গুণের গভর্ণমেণ্ট-হাউসটী তখন বড় সুন্দর দেখাইত। জানি না, আক্রমণকারীদের সন্ধান হইতে ইহা পরিত্রাণ পাইয়াছে কিনা।

একদিন রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়াছিলাম, স্বামী শ্যামানন্দের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তথায় তাঁহাদের হাসপাতালটী অতি চমৎকার ছিল। এই বিশ বৎসরে নিশ্চয়ই আরও কত উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু বোমার আক্রমণ হইতে হাসপাতালটী রক্ষা পায় নাই। শুনিয়াছিলাম সেনা-বিভাগের কোন সাহেব নাকি বিমানযোগে উপর হইতে দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন "তোমাদের হাসপাতালটী মিলিটারী ব্যারাকের মত দেখায়, উহার স্থান পরিবর্ত্তন করা বিশেষ দরকার।" তাই নাকি হাসপাতালের সরঞ্জাম ও রোগীদের দূরে সরান হইয়াছিল। কথাটী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনেকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। সেদিন শুনিলাম শ্যামানন্দজী কলিকাতা আসিয়াছেন ও ডাক্তার সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

আজও শুনিলাম রেঙ্গুণে বোমাবর্ষণ হইতেছে। মনে হয় এখনও কাণে বাজিতেছে। তোমাদের জন্যই সর্ব্বদা চিন্তিত। জগদীশ্বর নিশ্চয়ই তোমাদিগকে নিরাপদে রাখিবেন। আজ আসি।

শ্রীহেমেন্দ্র

তৃতীয় পত্র

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২

প্রিয়তমেষু—

আজও রেঙ্গুনের খবরে অত্যন্ত আশঙ্কা করিতেছি। রেঙ্গুন হইতে বেসিন আর কতদূর? সেবার (১৯২৩ সালে) রেঙ্গুন হইতে ষ্টীমারযোগে যে বেসিনে যাই, তাহা তোমার মনে আছে। ইরাবতীবক্ষে ষ্টীমার যাত্রা কি মধুর। নদীর জল মধুর, সারি সারি লোকের চেহারা মধুর। দেখিলাম নদীতে অসংখ্য নৌকার চলাচল আছে এবং নদীতীরে শস্যক্ষেত্রে চাষীরা কাজ করিতেছে। তাহারা বলিষ্ঠ এবং স্ত্রী-পুরুষে জমিতে কর্ষণ কার্য্য করিয়া থাকে। হাঁ, মৌলমীনের যেমন কাষ্ঠসম্পদ, লোয়ার বর্ম্মার অন্যান্য স্থানেও ধানের প্রাচুর্য্যে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। বর্ম্মার চাউলে পূর্ব্বে ভারতের অন্নাভাব দুঃখ নিবারিত হইত, যে চাউল পূর্ব্বে বর্ম্মা চাউল বলিয়া আমরা উপেক্ষা করিতাম। রেঙ্গুনে চাউলের ভাত দেখিয়াছি অতি সরু ও উপাদেয়। অবশ্য সেখানকার সব চাউলই আতপ। উষ্ণা চাউল সেখানে দেখি নাই। চাউলের কথা বলিতে একটী কথা বেশ মনে হইতেছে। আমি বর্ম্মায় শুনিয়াছিলাম, জামাল নামক সুরাটের একজন ধনী মুসলমান সমস্ত ইউরোপীয় ফার্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া একাই চাউলের কারবার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বেশীদিন

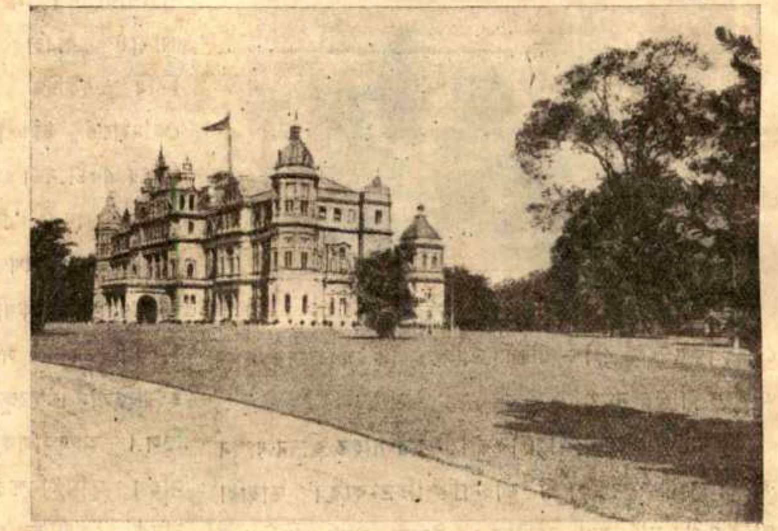

রেঙ্গুনের গভর্ণমেণ্ট হাউস

জামাল প্রতিযোগীতে করিতে পারেন নাই। অবশেষে একেবারে নাজেহাল হইয়া যান।

যখন মীয়াংমীয়ায় আসি, তুমি যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এড্‌ভোকেটের কথা বলিতে, তাঁহার কথা মনে পড়িল। হেমবাবু তোমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড, আমার নয়। কারণ তিনি যখন এফ্‌, এ ক্লাসে আসিয়া তোমার সঙ্গে পড়িয়াছিলেন আমি সে সময়ে বাঁকীপুরে। প্রতি ষ্টেসনেই দেখিলাম কলা এবং অন্যান্য ফল নিয়া আসিত, ঠিক আমাদের দেশের ষ্টীমার-ষ্টেসনগুলির মত।

রেঙ্গুন হইতে বৈকালে ৪টার সময় রওনা হইয়া পরদিন সকালে আসিয়া বেসিনে পৌছি। আমার কেবিনের নিকটই কয়েকটী বর্ম্মী মেয়ে উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন খুব সুন্দরী ছিল। দেখিলাম, অন্য আর একটী কেবিনের একটী বর্ম্মী যুবকের সঙ্গে সেই মেয়েটীর খুব ভাব হইল। ভোরে উঠিয়া দেখি বড় মেয়ে দুইটী ডেকে বসিয়া আছে, আর কেবিনের দরজা বন্ধ। কতকক্ষণ বাদে উভয়ে বাহির হয়। শোনা কথা অনেকটা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু ইহা আমার প্রত্যক্ষ দেখা। এরূপ আচরণ আমাদের সমাজে চলে না। বর্ম্মীদের মধ্যেও সর্ব্বত্র প্রচলিত বলিয়া মনে হয় না। পরে তোমার সঙ্গে যখন বেসিনের সিনেমায় যাই, এই মেয়ে কয়টীকে সেখানেও দেখিয়াছিলাম।

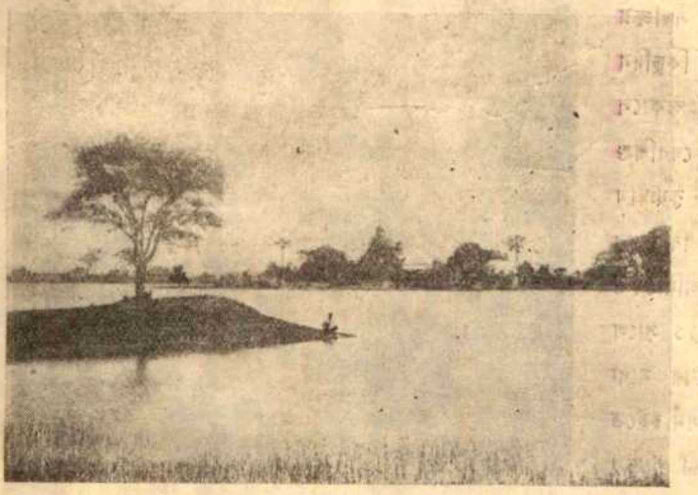
মিক্‌টিলার হ্রদ

বেসিনে তোমার বাসায় তোমার স্ত্রী এত আদর-আপ্যায়ন করিয়াছিলেন যে, ৭।৮ দিন তোমার ওখানে যেরূপ আনন্দে ছিলাম তাহা এখনও ভুলিতে পারি না। ১৯০১ সালে তোমার বিবাহ হয়, ১৯০২ ডিসেম্বরে আমি তোমাদের বাড়ী গিয়া ২।৩ দিন ছিলাম। তখন ইনি আমার সঙ্গে কথা বলেন নাই, আমিও কথা বলাইতে চেষ্টা করি নাই। এবার নিঃসঙ্কোচে কথা বলিলেন, তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চেহারা দেখিয়া আমারও খুব শ্রদ্ধা হইল। তখন রবি ছিল ঢাকায়। কিন্তু বড় খোকা, সমরেন্দ্র, জ্যোতি, আম্রা, তবু সকলেই সেখানে ছিল। উহারা আমার গল্প শুনিতে খুব ভালবাসিত।

ইন্দিরা কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার ছোট ভায়রা শ্রীযুক্ত ভূপতি নাগের বাসায় সঙ্গতিমত কলিকাতায় যাইবার জন্য আসিয়াছিল। আমি ফিরিয়া যাইবার পরে ইন্দিরার কলিকাতার অভিভাবক আমিই ছিলাম। জ্যেঠা-মহাশয়কে পাইলে ইন্দিরার ভারী আনন্দ হইত। আজিও তাহার সেরূপ আনন্দ সমভাবেই আছে। ইন্দিরা আমাকে তাহার কয়েকটী সহপাঠিনী এবং অনেক বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিয়াছিল। তন্মধ্যে স্নেহলতা মেয়েটীকে এখনও মনে আছে। তাহার স্বামী একজন অধ্যাপক, সেও আমাদিগকে খুব সম্মান করিয়া থাকে। স্নেহলতাকে বরাবরই তুমি মেয়ের মত দেখিতে। ক্রমে জ্যোতি এবং আম্রা আসিয়া ইন্দিরার সহিত ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ যোগদান করে। জ্যোতির চেহারা পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। জ্যোতির চেহারাটী প্রাচীন গ্রীসের মেয়েদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'বলিদানের' করুণাময় বলিয়াছিল "মেয়েগুলোকে দেখতুম আর মনে হ'ত এরা রাজার ঘরে জন্মালে শোভা পেত।" এ বিষয়ে তুমিও রাজসুখ পাইয়াছ। আম্রার মত এরূপ তীক্ষ্ণধী মেয়েও খুবই কম। জ্যোতি কলিকাতায় সর্ব্বদা আমাদের খোঁজ-খবর নেয়। ঠিক তেমি সরল নিরহঙ্কারী সাদাসিদে মেয়ে।

হাঁ, ইন্দিরার আর একটী বন্ধু শৈবালিনী বি,এ, পাশ করে এবং বরাবর অঙ্কে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থা হয়। শৈবালিনী এখনও আমাকে জ্যেঠামহাশয় বলিয়াই ডাকে ও শ্রদ্ধা করে।

শ্রীমান্ তবু তখন শিশু ছিল, এখন বি, এ, পাশ করিয়া চাকুরী করিতেছে। রবিও ওকালতি করিয়া খুব ভাল পসার করিয়াছে। যাঁর পিতা ও মাতুল উভয়েই ধীশক্তিশালী, তাহার বুদ্ধি তো আপনা আপনিই খোলে। রবির বধূ রমাও বড় চমৎকার মেয়ে। তুমি ছেলে-মেয়েদের বিষয়ে এখন একরকম নিশ্চিন্ত হইয়াছ। তোমার সহোদর হেমেন্দ্র তখন সেখানে ছিল না বটে, কিন্তু পরে যখনই দেখা হইয়াছে, বরাবর জ্যেষ্ঠসহোদরের সম্মান তাঁহার কাছে পাই। ধনবধূও আমাদিগকে খুব আপন ভাবে। প্রদীপ কেমন আছে? তাহার খবর লিখিবা।

একটা গভীর শোক তখন তোমাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমি যখন যাই তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধীরা আগুনে পুড়িয়া অকালে শুকাইয়া যায়। শৈশবে উহার চেহারা দেখিয়া দেবশিশু বলিয়া মনে হইত। যেমন সুন্দর চক্ষু, তেমনি কৃষ্ণদাম কেশরাশি। এই শোক তোমাদের মুখে একটা বিষাদের কালিমা লেপিয়া দিয়াছিল। সুধীরার শোক আমাকেও অভিভূত করিয়াছিল। আমারও বড় ছেলে ১৯১১ সালে পাঁচ বৎসর বয়সে আগুনে পুড়িয়া পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বেসিন হইতে আসিবার পরে পরপর তোমার দুইটী ছেলে ঝরিয়া পড়ে। সমরের উৎসাহ-দীপ্ত মুখখানা এখনও মনে হয়। থাক, পূর্ব্ব কথা তুলিয়া তোমাদের মনে আর কষ্ট দিতে চাই না।

বেসিনে অনেক লোকের সঙ্গে তুমি আমাকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলা। কিন্তু Dr. Sanci Po-র কথা বেশ মনে পড়ে। ইনি তোমারই কথায় প্রায়ই আমার নিকট হইতে রোগীদের দেওয়ার জন্য মকরধ্বজ নিতেন, ইনি 'কেরেন' সম্প্রদায়ের। ব্যবহার ইঁহার বড়ই চমৎকার ছিল। মিঃ প্রমথ চৌধুরীর বাড়ীতেও একদিন তুমি নিয়া গিয়াছিলা।

বেসিন হইতে ষ্টীমার যোগেই হেনজেডা যাই। একজন ব্রহ্মদেশীয় প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমি আলাপ করাইয়া দিয়াছিলা। ইনি পোষ্টঅফিসের ইন্স্পেক্টার ছিলেন এবং রাস্তায় খুব আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্নব্যঞ্জনাদি আমায়ও কিছু দিয়াছিলেন। বর্ম্মীরা খুবই অতিথি সৎকার করিতে ভাল বাসেন।

কয়েকটি বর্ম্মীরমণী ষ্টীমারে যাইতেছিল। কথাপ্রসঙ্গে কিছু পয়সা চাহিয়া বলিল, "বাবু পয়সা : খামে মসিবু—খাই নাই পয়সা দিন!

প্যাগানের প্রসিদ্ধ আনন্দ পেগোডা

বর্ম্মাতে এই সময়ে মেঙ্গোষ্টীন বলিয়া একটী ফল পাওয়া যাইত। ইহা আমাদের দেশের বিলাতী গাবের চেয়েও অধিক সুস্বাদু। খাইতে বড় ভাল লাগিত; সুমিষ্ট আনারসও পাওয়া যাইত। আর সেই সময় মান্দালয়ের আম খুব আসিত। এই আম বেশ সুস্বাদু।

হেনজেডায় আসিয়া সতীশচন্দ্র রায়ের বাসায় উঠি। ইনি আমাদের সেই সমপাঠী বন্ধু সতীশ। বেচারা ডাক্তারী করে কিন্তু একেবারে বধির হইয়া পড়িয়াছে। খুব আদর-যত্ন করিয়াছিল, কিন্তু বিপত্নীক, পরের হাতে তাঁহাকে খাইতে হইত। একটী কম্পাউণ্ডার ছিল হিন্দুস্থানী লালা—তার স্ত্রী বর্ম্মিণী। ইনি রন্ধনাদি করিয়া সতীশকে ও আমাকে দেন। খাওয়া আর মুখে রুচিল না—কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারিলাম না। একটু রসিকতা করিয়া বর্ম্মিণীকে বলিলাম—

না শিরে?

বর্ম্মিণী—শিরে অর্থাৎ মাছ আছে? ইনি আছে বলিয়া কিছু আনিয়া দিলেন। সম্মতিব্যঞ্জক মাথা যে ঝুকাইলেন,

তাহা আমাদেরই মেয়েদের ন্যায় বোধ হইল। বুঝিলাম, ইনি আনন্দিত হইলেন যে মাছ তৈয়ারী হইয়াছে ভাল।

সতীশ সেদিন মিঃ সেন, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও মিঃ শিশিরকুমার লাহিড়ীর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়াছিল।

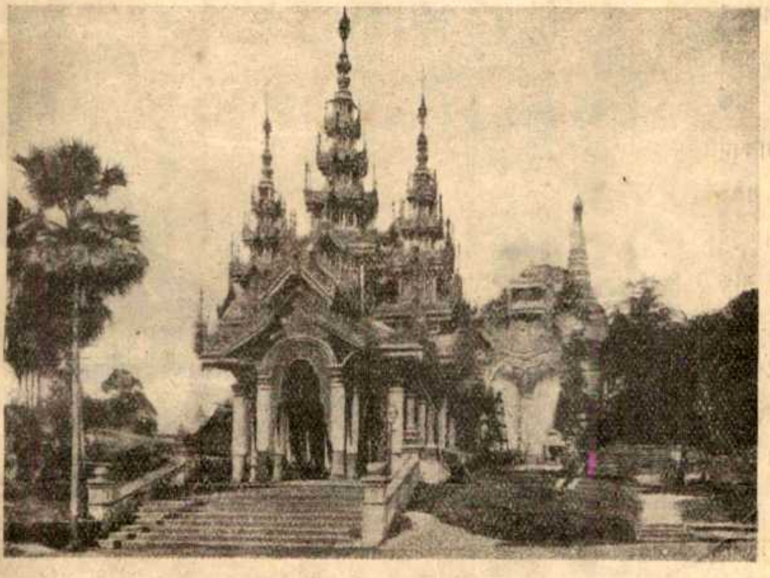

শ্বয়েডেগন পেগোডার দক্ষিণ দিকের তোরণ।

তিনজনই ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এডভোকেট। সুরেন বাবু এবং শিশির বাবু উভয়েই বর্ম্মা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। শিশির বাবু এখন রাসবিহারী এভিনিউতে বাড়ী করিয়া থাকেন আর সুরেন বাবু কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর ইহজগতে নাই। ইহারা সকলেই তোমার বিশেষ বন্ধু। সুরেন বাবু বড় চমৎকার লোক ছিলেন। তাঁর ছেলে খোকার সঙ্গে দেখা হয়। সতীশ তোমাকে বড় ভালবাসিত, ঢাকায় তোমার দেখা শুনা সে করিত বলিয়া বেশ গর্ব্বানুভবও করিত। হায় এই বন্ধুবৎসল সহপাঠী আর ইহজগতে নাই। ইন্দিরা আমায় বলিয়াছিল, তাঁহার ছেলেটী নাকি বেশ ভাল হইয়াছে।

হেনজেডা হইতে নদী পার হইয়া অপর ষ্টেশনে আসিয়া রেঙ্গুনে চলিয়া আসি। কিছুদিন থাকিয়া মান্দালয় চলিয়া যাই। আজ এই সংবদে বড়ই ব্যাথিত হইয়াছি।

তোমার হেমেন্দ্র।

চতুর্থ পত্র

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

প্রিয়তমেষু,

এবার রেঙ্গুন হইতে যখন মান্দালয় যাই, অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। রেঙ্গুন হইতে মান্দালয় উত্তর দিকে ৩৮৬ মাইল দূরে। রেঙ্গুন, বেসিন প্রভৃতি লোয়ার বর্ম্মায়। আর মান্দালয়, মিংজাম, মিকটিলা, সুয়েবো, ভামো প্রভৃতি স্থান অপার বর্ম্মায়। নিম্নদিকের স্থানগুলি জলা, আর উপর দিকের জমি শুষ্ক। এই সমস্ত স্থানের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত ভাল।

মান্দালয়ে তখন আমার তিনজন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। ময়মনসিংহে আমি বিক্রমপুরের প্রমথ নাথ বসু এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত ললিত মিত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম। ইঁহারা সেখানে ওকালতি করিতেন। ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উভয়ে এক সঙ্গে বর্ম্মা চলিয়া আসিয়া মান্দালয়ে প্র্যাক্‌টিস্ করেন। উভয়ে ভাল পসার করিয়াছিলেন, ললিতবাবু গভর্ণমেন্ট সংক্রান্ত মোকদ্দমাও পাইতেন। প্রমথবাবুর বাসায় উঠি এবং তিনি খুবই আদর-যত্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীমান্ ক্ষিতীশ চন্দ্র সান্ন্যাল রাজবাড়ীতে (গোয়ালন্দ) আমার কাছে পড়িত। আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিল। ক্ষিতীশও বেশ পসার করিয়াছে।

মান্দালয় হইতেই রাজা থিবো ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিতাড়িত হন। কিন্তু থিবোর কথা বলিবার পূর্ব্বে বর্ম্মার সম্পূর্ণ ইতিহাসটি দেওয়াই কর্ত্তব্য। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে যে বৎসর বাঙ্গালায় স্বদেশভক্ত ক্লাইভ ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠা করেন, আলাম্পায়া সেই বৎসর সেলুইন নদীতীরস্থ মার্ত্তাবান হইতে তেলেইঙ্গদিগের ও শ্যামবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন ও রেঙ্গুন সহরটি স্থাপন করেন। কিন্তু সংঘর্ষের সুবিধা গ্রহণ করিয়াই ইংরাজ ক্রমে শক্তিশালী

হইয়া উঠে। কিন্তু আলাম্পোরা ইংরাজের উপরে বড়ই অসন্তুষ্ট ছিলেন। শত্রুকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করিয়াছে—এই সন্দেহে আলাম্পোরা নেগ্রাই ইংরাজীকুঠী ভূমিসাৎ ও জনকয়েক ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিধন সাধন করেন। এই বিবাদ অনেক দিন পর্য্যন্ত চলে। অবশেষে আলম্পোরার বংশধর রাজা বাজিদপায়ার সময় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম বর্ম্মযুদ্ধে যে এক সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজ আসাম, আরাকান মার্ত্তাবান ও এককোটি টাকা পাইয়াই সন্তুষ্ট হন। ব্রহ্ম-সেনাপতি বান্দুলা এই যুদ্ধে খুব সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সন্ধি সত্ত্বেও বিবাদ ক্রমেই বাড়িয়া যায় এবং লর্ড ড্যালহৌসী ১৮৫২ সালে নিম্নব্রহ্মের রেঙ্গুন, প্রোম, পেগু অধিকার করিয়া সেখানে ইংরাজ শাসন স্থাপন ও বাণিজ্যের প্রসার করেন। ইহা দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ।

তৃতীয় ও শেষ যুদ্ধ হয় রাজ থিবোর সময়ে। লর্ড ডাফরিণের সন্দেহ হয় যে, থিবো ফরাসীয়দের সহিত প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। ইংরাজদের তখন বার্ম্মায় একটি বম্বে-বার্ম্মা ট্রেডিং কোম্পানী ছিল। সেগুণ কাঠ কাটিয়া ইঁহারা চালান দিয়া খুব লাভ করিতেন। থিবোর সন্দেহ হয় যে তাহারা চুক্তির অধিক কাঠ কাটিয়াছে, তাই তিনি ২৩ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করেন। ইহাতে যুদ্ধ হয় এবং লর্ড ডাফরিণ উত্তর-বর্ম্মা ভরতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। হইা হয় ১৮৮৮ সালে।

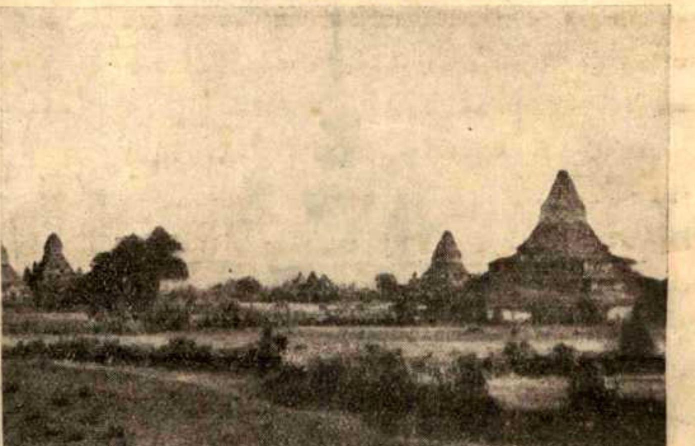

প্যাগানের মন্দিরশ্রেণী

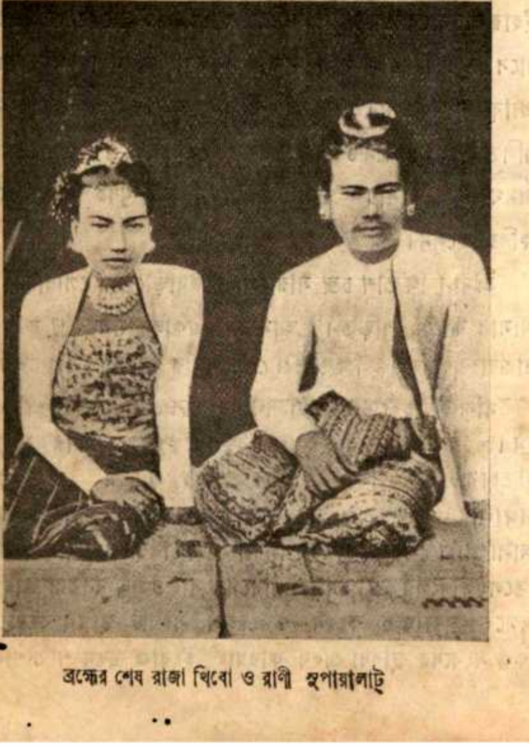

ব্রহ্মের শেষ রাজা থিবো ও রাণী সুপায়ালাট্

১৮৯৭ সালে লর্ড এলগিন সমগ্র বর্ম্মাদেশকে একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে আনেন।

থিবো ও তাঁহার মহিষী সুপায়ালাট অতঃপরে ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ রত্নগিরি সহরে নির্ব্বাসিত হন। এই সুপায়ালাট স্বামীর রাজ্যপ্রাপ্তির সময় ১৮৭৮ সালে বহু আত্মীয়-স্বজনের বিনাশ সাধন করাইয়াছিলেন। রাজকার্য্যে থিবো তাঁহার হাতের ক্রীড়নক ছিল।

মান্দালয়তে গিয়া সর্ব্বাগ্রে রাজধানী দেখিতে গেলাম। রাজধানী সহরের বাহিরে, কিন্তু প্রাচীর বেষ্টিত এবং প্রাচীরের চারিদিকে গভীর জলের পরিখা সেই বেষ্ঠনটিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। গৌড়ের রাজধানীতেও এইরূপ পরিখা দেখিয়াছি। প্রাসাদের সব ঘর-বারান্দাই কাষ্ঠনির্ম্মিত কিন্তু তাহা কি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত। মিন্দন-মিন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে একজন ইঞ্জিনিয়ার আনাইয়া ইহা নিজ নামে তৈয়ারী করান। ইহার পূর্ব্বে রাজধানী ছিল আভা, তার পূর্ব্বে ছিল অমরাপুরে। রাজধানী দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।

মান্দালয়তে বড় সুন্দর সুন্দর বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-মন্দির আছে।

এখানকার বাজারে দেখিয়াছি স্ত্রীলোকেরাই জিনিষপত্র বিক্রী করে।

মান্দালয়ের অপর পারে সোওবো। এইস্থানের ঘণ্টাটী বড় চমৎকার। প্রমথবাবুর বাড়ীতে তিনি খুব আদর করিতেন। তিনি খুব চমৎকার লোক ছিলেন। কিন্তু বড় অকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ইরাবতী নদী বাহিয়াই ষ্টীমার যোগে মিঞ্জাম যাই। মিঞ্জামে বন্ধুবর বঙ্কিম গুহ সহ আলিপুরে একসঙ্গে প্রাক্‌টিস্ করি। আমার সঙ্গে খুব সদ্ভাব ছিল। বঙ্কিমবাবু হোমিওপ্যাথিক জানিত। সেই ১৯১২ সালের কথা, তুফান কলিকাতা আসিয়াই পেটের অসুখে বড় ভুগিতেছিল, বঙ্কিমের ঔষধেই সারিয়া উঠে। বর্ম্মা আসিয়া খুব ভাল প্রাক্‌টিস্ জমাইয়াছিল। আমি যখন যাই, তখন সে মিঞ্জাম ও মিক্‌টিলা দুইটি জিলারই সরকারী উকিল ছিল। মিঞ্জামএ খুব যত্ন করে, কিন্তু সেখানে একদিনও থাকিতে পারিলাম না।

রাত্রিতে বঙ্কিমের একজন মক্কেল আসিয়াছিল। মক্কেলটি প্যাগানবাসী। এই প্যাগানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি আছে। মক্কেলটি খুব বিশ্বাসী এবং স্থানীয় ব্যাপারাদিতে খুব অভিজ্ঞ জানিতে পারিয়া আমি তাহার সঙ্গে সেই তীর্থস্থান দেখিতে ব্যগ্র হই। বঙ্কিমের বাড়ীর সকলেরই আগ্রহ ছিল, আমি কয়েক দিন সেখানে থাকি। কিন্তু এই সুযোগটি ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। সকালে ইরাবতী নদী দিয়া প্যাগানে আসিলাম। এতদিন থাকিয়া তোমরা কেহই প্যাগান দেখ নাই, আর আমি একবারেই প্যাগান দেখিয়া আসিব, তোমাদের উপরেও জিতিয়াছি। আহা কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! প্যাগানের বাড়ীঘর দেখিলাম, কারুকার্য্য দেখিলাম, শিল্পাদির পরিচয় পাইলাম এবং সর্ব্বোপরি অসংখ্য দেবমন্দির দেখিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া গেল। কি সুন্দর দৃশ্য ধীরগামিনী স্নিগ্ধসলিলা ইরাবতী কুলকুল স্বরে বহিয়া যাইতেছে, আর সেই দেবমন্দিরগুলি ইরাবতীগাত্রে উদ্ভাসিত হইয়া কি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছে। মন্দিরই বা কত, কারুকার্য্যই বা কি সুন্দর এবং স্থানেরই বা কি প্রভাব। এখানকার আনন্দ পেগোডা কি সুন্দর! একটী মন্দির দেখিলাম, ঠিক যেন বুদ্ধগয়ার মন্দিরটীই এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের শিল্পের কথা না বলিলে প্যাগানের কথাই কিছু বলা হইবে না। আগামীবারে তোমাকে সব কথা বলিব।

একটি উকিল-গিন্নীর অনুরোধে পোয়ে নাচ দেখিতে গেলাম। বৎসরে ২ বার পর্ব্বোপলক্ষে বর্ম্মীমেয়েরা নাচে। এই নাচকেই বলে পোয়ে নৃত্য, বড় সুন্দর নাচ। বর্ম্মী অভিনয়ও দেখিয়াছি, সে কথা পরে বলিব।

প্যাগান হইতে মিক্‌টিলা যাই। বঙ্কিম সেখানে মিক্‌টিলা হ্রদ দেখায়, হ্রদটি বড় সুন্দর। হায়, বঙ্কিমও অকালে ছাড়িয়া গিয়াছে!

ব্রহ্ম কুমারীদ্বয়

আজ শুনিলাম, মার্ত্তাবানে ভয়ঙ্কর বোমাবর্ষণ হইতেছে। মার্ত্তাবানে যদি জাপানীরা যাইতে পারে, তবে তো রেঙ্গুনও তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। সেলুইন নদী পার হইলেই মুস্কিল। বড়ই আশঙ্কা হইতেছে। দেখি কি হয়। অবশ্য পত্র দিও। আমি বড়ই চিন্তায় রহিলাম।

পুনশ্চঃ,—তোমার নিকট পত্র শেষ করিবার সময় এইমাত্র শুনিলাম যে, মার্ত্তাবান নাকি জাপানীদের হাতে। সেলুইন নদী পার হইলে, শত্রুগণ অবিলম্বে রেঙ্গুনের দিকে যাইবে। মাঝে সিটাং নদী। কিন্তু তাহা সেলুইন অপেক্ষা অনেক কম প্রশস্ত।

বড়ই দুঃসময় আসিয়া পড়িল। বর্ম্মা নিতে পারিলে চীনের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। চীন ভারত হইতে সাহায্য পাইবে না এবং জাপানীদের বর্ম্মার পেট্রল নিতে পারিলে খুব সুবিধা হইবে। তুমি তো জানো ইনান জাঙ্গেই তেলের অসংখ্য খনি আছে। এই পেট্রল বর্ম্মার অন্যতম সম্পদ। বর্ম্মা গেলে আমাদেরই বিপদ। জাপানীরা ভারতও আক্রমণ করিতে পারে। ইংরাজের সঙ্গে আমরা প্রায় দুইশত বৎসর রহিলাম। যদিচ আমরা শিক্ষা বা স্বাধিকার লাভে সুবিধা পাই নাই, তথাপি ইংরাজ সুসভ্য জাতি! আমাদের অন্নাভাব—আমাদের কেন, জগতেরই অন্নাভাব ভারতবর্ষকে হাতে রাখিয়া এক ইংরাজই দূর করিতে পারে। কিন্তু এখনও ইংরাজের সে সুবুদ্ধি হইবে কি? সিঙ্গাপুরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, বর্ম্মার-সম্মুখেও সমূহ বিপদ, এখনও ইংরাজের উচিত সচেতন হওয়া। ইংরাজ ভারতকে হাতে রাখিয়া ভারতের সহায়তায় সমগ্র জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত, কিন্তু করিল না—ইহাতে জগতেরই যে ক্ষোভের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। আজ এই পর্য্যন্ত—শ্রীহেমেন্দ্র

'পোয়ে' নৃত্যরতা বালিকাগণ

পুনশ্চ—ক্রমেই ভয়াবহ সংবাদ শুনিতেছি। সিঙ্গাপুরের পতন নাকি আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তবে একথা ঠিক যে জেনারেল আত্মসমর্পণ করিলে বুদ্ধিমানের কাজই করিবেন। নতুবা ঐ দ্বীপ হইতে কেহ বাহির হইতে পারিবে না, আর সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। সিঙ্গাপুরের পতনে দুঃখিত হইব কিন্তু আত্মসমর্পণ করিলে জেনারেলের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারিব না।

মালয় উপদ্বীপ জাপান সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায়, সেলুইন নদীর পূর্ব্বতীর হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে সুমাত্রার উত্তর দিক পর্য্যন্ত ব্রিটিশ হস্তচ্যুত হইতে বসিয়াছে। আবার শুনিলাম জাপ-সৈন্য থেটনের দিকে আসিতেছে। থেটন যদি তাহারা অধিকার করিতে পারে তবে সিটাং নদী পার হইলে রেঙ্গুন আসিতে তাহাদের বেশী কষ্ট হইবে না। তবে ব্রিটিশ সৈন্য নিশ্চয়ই বড়রকমের একটা বাধা দিবে। আজ ব্রিটিশ মন্ত্রীগণ কি ভ্রান্ত পথেই চলিতেছেন। তাহাদের কি উচিত ছিল না ভারতীয়-গণের সম্পূর্ণ সহায়তা করিবার ব্যবস্থা করা।

কি প্রকারে ভারতই একা এই মানবকুল ধ্বংসমূলক যুদ্ধের বিরতি সাধন করে ইহা তাহারা এখনও কেন তলাইয়া দেখিতেছে না ইহা বুঝিতেছি না। তুমি নিশ্চয়ই "বঙ্গশ্রী" পড়। ইহাতে যুদ্ধের কিসে শেষ হয় এসব সম্বন্ধে বড় যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ সব কথা আছে। কিন্তু এসব সৎকথা শুনে কে? আপৎকালে বুদ্ধিভ্রংস হয়। এখনও যদি চার্চ্চিল মহোদয়ের সুবুদ্ধি হয় তবে ভারতবর্ষ রক্ষা পায়, ইংলণ্ড রক্ষা পায়, ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি রক্ষা পায়, ইংলণ্ডের বন্ধু ও শত্রু সকলেই রক্ষা পায়, কিন্তু কে শুনিবে আমাদের কথা। তোমার—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

লেখকের 'রাজসিংহের ভূমিকা' আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক—বঙ্গশ্রী।

ভ্রম সংশোধন

'সাহিত্যের নেশা' প্রবন্ধে ৩২৭ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের তৃতীয় লাইনে সর্ব্বজন কার্য্য না হইয়া সর্ব্বজন কাম্য; ৩২৮ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের :৬ লাইনে উদ্দেশ্য না হইয়া উদ্দেশ; ৩৩০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের অষ্টম লাইনে অন্ধ না হইয়া অন্ন; ২৩ লাইনে বিরক্ত না হইয়া বিরত; ৩৩১ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমের ১১ লাইনে কি রচনার স্থলে কি রচনা, কি শোধন, কি মুদ্রাঙ্কণ যে কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে; দ্বিতীয় কলমের সর্ব্বশেষের দিকে সময় বিশেষের স্থলে সময় বিশেষের তদর্থ-ঔষধ বিশেষ; ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের তৃতীয় লাইনে খুব না হইয়া চুর; চতুর্থ লাইনে চুর না হইয়া দুর; নবম লাইনে লাভের স্থলে লাভ না; ১১ লাইনে বাজার স্থলে রচনা; ৩৩৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের ১৪ লাইনে ভুলতে না হইয়া ভুগিতে; ৩০ লাইনে পয়সি পয়সি না হইয়া পরসি পরসি; ৩৬ লাইনে আজ না হইয়া আছ, এবং ১ম কলমের ৩৯ লাইনে গর্ব্বের স্থলে পর্ব্ব হইবে।

পল্লীর হাট [শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

বঙ্গশ্রী

চৈত্র—১৩৪৮

৯ম বর্ষ—২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

প্রজাকুলের প্রাণ ও ধনসম্পত্তি বিপন্ন না করিয়াও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার উপায়

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাহাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত না হয় তজ্জন্য ব্রিটেনের মন্ত্রীসভা যে প্রকৃতই খুব আগ্রহশীল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই তাঁহাদের সেই আগ্রহের মূলে আন্তরিকতা কতটুকু। বস্তুতঃ কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিবেন, এ সম্বন্ধে কোন মন্ত্রী প্রকৃতভাবে কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি না, এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে। স্পষ্টত বুঝা যায় যে, সাম্রাজ্যের দ্রব্যসম্ভার ও ইহার বিরাট প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে ইহাদের এতই উচ্চ ধারণা যে ইহারা মনে করেন যে বর্ত্তমান মহাসমর যতই দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক না কেন শত্রুর অপেক্ষা বহুদিন পর্য্যন্ত ইহারা সেই সম্পদের সহায়তায় বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন। বস্তুতঃই ইহারা মনে করেন যে, অপেক্ষাকৃত দারিদ্রতর শক্রুব সমস্ত পুঁজি ও খাদ্যসম্ভার অচিরেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, খাদ্যাভাবে তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, যুদ্ধেব আর কোন হাঙ্গামা থাকিবে না। আর তাহারা সেই সম্পদের প্রাচুর্য্যে অক্ষতাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিবে, আর বিজয়লক্ষ্মী নিঃসন্দেহভাবে অচিরেই তাহাদেরই অঙ্কশায়িনী হইবে। সাধারণক্ষেত্রে ব্রিটিশমন্ত্রীসভার এবম্বিধ দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রমাত্মক না হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু এবারকার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটা বিষয় তাহাদের দৃষ্টি একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধ-বিগ্রহগুলি অপেক্ষা অরাতিপক্ষ এবার অনেক বেশী পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী। কিছুদিন যাবৎ শত্রুপক্ষ যে আশাতীত সাফল্য সহকারে ব্রিটিশাধিকৃত বহুস্থান করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দেখা যাইতেছে যে, অন্যান্যবারের ন্যায় এবারের যুদ্ধেও কেবল ধৈর্য্য-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেই জয়লাভ সম্ভব হইবে না।

আর বিগত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধেও যে মিত্র শক্তি কেবল মাত্র সাম্রাজ্যের বিরাট সমৃদ্ধি ও ধৈর্য্যনীতির বলেই, জার্ম্মানীকে পবাভূত করিয়া সম্মানজনক সন্ধিব সর্ত্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ কবিবারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। এই ধাবণাব সঙ্গত যৌক্তিকতা থাকিলে বিগত যুদ্ধের পর হইতে জার্ম্মানী কখনই ব্রিটেন অপেক্ষা এত অধিকতর শক্তি অর্জ্জনে সক্ষম হইত না। অতএব সহজেই বুঝাযায়, বর্ত্তমানে যে ভ্রান্ত-নীতি ব্রিটেনে অনুসৃত হইতেছে, জাতির আশু আত্মবক্ষার জন্য এখন সেই ভ্রান্তিমূলক নীতির সর্ব্বপ্রকার সংশোধন পক্ষে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সময় থাকিতে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা এখনও যদি এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হয়েন, তবে ব্রিটিশ জনসাধাবণের বুঝিতে হইবে যে, ব্রিটেনের ভাগ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মন্ত্রীসভায় এখন আর নাই, কাজে কাজেই বর্ত্তমানের অকর্ম্মণ্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনতিবিলম্বে বিতাড়িত করাই একান্ত বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বর্ত্তমানের ভ্রান্ত নীতিকে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিয়া বৃটেন কোন্ নীতিকে আশ্রয় করিবে? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেকার ইতিহাসের আলোচনা করিতে চাই। সকলেই বোধ করি অবগত আছেন যে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ব্রিটেনবাসীগণের পূর্ব্বপুরুষগণ, যেমন স্বদেশীয় অস্তিত্ব রক্ষা সম্বন্ধে সম্যক সচেতন ছিলেন, সমগ্র জগতের অস্তিত্ব রক্ষার মহান প্রেরণায়ও তেমনি তাঁহারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষদের এই মহান প্রেরণা ও আদর্শের বলেই ইংরাজ জাতি আজ বিশ্বব্যাপী এতবড় এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। কিন্তু পৃথিবীর চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান শতকে ইংরাজগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের সেই মহান আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে বসিয়াছেন। তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন যে, শত্রুপক্ষের ন্যায় তাঁহারা সাম্রাজ্যহীন নয়, শত্রুপক্ষের ন্যায় মানবসমাজের প্রতি নির্দ্দয় ও দায়িত্বশূন্য হওয়ার অধিকার তাঁহাদের নাই। মানবজাতির হিতার্থ মহান্ কর্ত্তব্য তাঁহাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের দায়িত্ব যেমন বিরাট, কর্ত্তব্যও সেইরূপ সুমহান। তাঁহাদের ও শত্রুপক্ষের মধ্যে এই ঘোরতর বৈষম্য। সুতরাং শত্রুপক্ষের ন্যায় অমানুষিক ভাবে মানবজাতির জীবন নিয়া ছিনিমিনি খেলাও তাঁহাদের পক্ষে নৈতিক অপরাধ। কিন্তু শোচনীয় পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা স্বীয় মূঢ়তা বশতঃ এই অপরাধকেই জয়মাল্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

তাই আজ এই প্রশ্নই বারম্বার আমাদের মনে উদিত হইতেছে যে, এই অপরাধের খণ্ডন হইবে কি উপায়ে? আরও প্রশ্ন আসে যে অযথা প্রজাকুলের প্রাণ ও সম্পত্তি বিপন্ন না করিয়াও কি উপায়ে আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই সংকটকালে ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে?

আমাদের মতে, এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইলে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাকে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধে নিষ্পত্তি কেবলমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের বলেই লাভ হয় না, অপেক্ষাকৃত কুশলী পক্ষই রাজনৈতিক সন্ধির প্রস্তাবদ্বারা সংগ্রামের নিষ্পত্তি করিয়া জয়ের আসল সারটুকু অধিকার করিয়া লন। এতাবৎ শত্রুপক্ষ যে ব্রিটিশ অধিকৃত স্থানসমূহ অধিকার করিয়া হইতেছে, তাহা শত্রুপক্ষের আস্ত্রিক শক্তিমত্তার পরিচায়ক। ব্রিটেনেরা সেই শক্তির সম্মুখে পরাভূত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটেনই সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠতর রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রণালীর বলে জয়ী হইবে। সেজন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাকে সর্ব্বপ্রথম **"সর্ব্বতম সংশোধিত ব্যবস্থা নববিধান"** প্রণয়নের দায়িত্বব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা সম্মুখ সংগ্রামে জগতের কোন কিছু লাভ হইবে বলিয়া আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এই দায়িত্ব অবহেলা করিয়া যদি ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলী স্বীয় ভুয়া আত্মাভিমানের মোহে কেবলমাত্র ধৈর্য্যনীতিরই পোষণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি যে সাম্রাজ্য রক্ষা তো দূরের কথা, এই অন্ধ মূঢ়তা বশতঃ শেষ পর্য্যন্ত হয় তো যুদ্ধ জয়ের সর্ব্বশেষ আশাটুকুও একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এমন দিন ছিল যখন ব্রিটিশগণ আত্মরক্ষার আদর্শের সহিত সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্ব রক্ষার আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। পণ্ডিতাভিমানী শিক্ষিত ব্রিটিশ মন্ত্রী যাহাই কেন গলাবাজী করিয়া বলুন না, একথা অবিসম্বাদী সত্য যে, ব্রিটেনের বাহিরে আজ ব্রিটিশ প্রজাকুলের প্রত্যেকেই আর্থিক অভাব, কুস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তির অভিশাপে জর্জ্জরিত। কেবল তাহাই নহে, স্বয়ং ব্রিটেনবাসীগণও আজ আর তাঁহাদের অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বগামীদের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন নহে।

কিন্তু এই ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই নহে কি?

সুতরাং এই শোচনীয় ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্যকে এড়াইতে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য 'ধৈর্য্যনীতির' পরিপোষক উক্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন অকর্ম্মণ্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে সর্ব্বপ্রথমে অপসারিত করা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীকে অপসৃত করিয়া কাহাদের হস্তে 'মন্ত্রীসভার' ভার সমর্পিত হইবে? সকলেই তো জানেন যে, ব্রিটেনের বর্ত্তমান পরিচালকগোষ্ঠি অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ভাগ্য নিয়ন্ত্রকগণের ন্যায় যোগ্য নহেন। পক্ষান্তরে একথাও বোধ করি সকলেই অবগত আছেন যে, ব্রিটেনের বাহিরেও ব্রিটেনের বহু বান্ধব আছেন যাঁহারা এই বিশাল পতনোন্মুখ সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব সবিশেষ যোগ্যতা সহকারে

বহন করিতে সক্ষম। ডোমিনিয়নগুলি সহ সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তরের পরিচয় আমরা সঠিক জানি না, তাই আমরা বলিতে পারিব না যে, ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের মধ্যে যোগ্যতর ব্যক্তি খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব কি না তবে ভারতবাসী বলিয়া এই কথা আমরা দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিতে পারি যে, ভারতের তথাকথিত নেতৃগোষ্ঠির মধ্যে এরূপ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া না গেলেও, অবহেলিত জনসমাজের মধ্যে এরূপ ব্যক্তির নিতান্ত অভাব ঘটিবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আজও অবজ্ঞাত জনসমাজের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা সমগ্র মানব সমাজের আর্থিক দুর্গতি, অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তি মোচনের কার্য্যকারী ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিতে সক্ষম। ব্রিটিশ জনসাধারণ ত' সাগ্রহে তাঁহাদের সাহায্য করিলে—অচিরেই তাঁহারা জনতার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইবেন।

তাই আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থা হইতে আশু অব্যাহতি লাভের জন্য অবিলম্বে এই সকল অখ্যাত অথচ অকপট কর্ম্মীর পক্ষেই একান্তভাবে নির্ভরশীল হওয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণতার পরিচয় হইবে। 'বঙ্গশ্রী'র নিয়মিত পাঠক সম্প্রদায় নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া আসিয়াছি যে, ভারতের মুক্তিতেই সর্ব্বজগতের মুক্তি, ভারতের অভাব, অস্বাস্থ্য ও অশান্তির মোচন হইলেই সর্ব্বজগতের অভাব, অস্বাস্থ্য ও সর্ব্বপ্রকার অশান্তির অবসান হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রোড়াশ্রিত ভারতের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ এই অভিশাপ মোচন করিতে সক্ষম হইবেন না,—এই সমস্তাব প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে একমাত্র ঐ পূর্ব্বোক্ত অখ্যাত ও অকপট কর্ম্মীর সহায়তায়ই। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন উক্ত কর্ম্মীর কার্য্যে ও ব্যবস্থায় ভারতীয় এবং ব্রিটিশ জনসাধারণের এবং বিশেষতঃ এতদুভয় দেশের নেতৃগোষ্ঠির অবিচলিত বিশ্বাস। সুতরাং ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাকে এখনই সময় থাকিতে থাকিতে সকল আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া উক্ত কর্ম্মীদলের হস্তে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার সর্ব্বপ্রকার নিঃসর্ত্ত দায়িত্ব অর্পণ করতঃ একেবারে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের রাষ্ট্রব্যাপার হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলে, ব্রিটেনের কি স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে? অবশ্য বিশ্বজনীন স্বার্থের প্রশ্নই যেখানে মুখ্য, সেখানে একক স্বার্থের প্রশ্ন উল্লেখই ন্যায়সঙ্গত নহে। তবু আমরা বৃটেনকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, সকলের সমস্তাব মীমাংসা হইয়া গেলেও বৃটেন অন্যান্য সকলের অপেক্ষা বৃহত্তর সুবিধা ভোগ করিবে। কেন না প্রকৃত পরিচালকের হস্তে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ভার সমর্পণ করিলে, উক্ত পরিচালক বা পরিচালকগোষ্ঠি সর্ব্বজগতের সমাধানে ব্রতী থাকিলেও ব্রিটেনকে পূর্ব্বেরই ন্যায় কাঁচামাল গ্রহণ এবং অবাধ বাণিজ্য-চালাইবার নিঃসর্ত্ত অধিকার দিতেও নৈতিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিবেন। কাজেই ভারতকে হারাইয়াও তখন ব্রিটেনের যথার্থ ক্ষতির সম্ভাবনা কিছু থাকিবে না। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যদি ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ভারতের তথাকথিত নেতৃস্থানীয় বক্তিদের অর্থাৎ সার তেজবাহাদুর সপ্রু অথবা গান্ধীজী বা জওহরলাল, কিম্বা সাভাবকর বা জিন্না প্রভৃতির হস্তে অর্পণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চিত বলা যায় যে, বৃটেনের এই হঠকারিতার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদ আরও ভয়ঙ্কররূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। কেন না, প্রথমতঃ এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভারতের সত্যকার কৃষি-শিক্ষা-বাণিজ্যের উন্নতিবিধান কিসে হয় তাহা ত' জানেনই না, তদুপরি ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অপেক্ষাও অধিকতর শঠ, দ্বৈতপন্থী, ঈশ্বর-বিরোধী এবং আত্মশ্লাঘাপরায়ণ। অতএব ইহাদের হস্তে ব্রিটেন বা ভারতের কাহারই যে কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না সেকথা বলাই বাহুল্য।

ব্রিটেন উপরোক্ত অর্থনৈতিক দিক ব্যতীত আরও একদিক দিয়াও স্বাধিকারপ্রাপ্ত ভারতের নিকট উপকৃত হইবে। সেদিক কূট-সমর-নীতির দিক্।

সকলেই জানেন যে, ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করাই অক্ষশক্তির উদ্দেশ্য। তাহারা নিশ্চয়ই মনে করিতেছে যে, যদি কোনরূপে ভারত অধিকার করা যায়, অথবা ভারতকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করা যায়, তবেই তাহাদের কার্য্যোদ্ধার হইবে। এই জন্যই জাপান ও জার্ম্মানী উভয়েই 'ভারত কেবলমাত্র ভারতীয়দের জন্য' স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের জন্য এই আন্দোলনকে সমর্থন করে। কাজেই ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যদি

এখনই স্বেচ্ছায় ভারতকে স্বাধিকার অর্পণ করেন, তাহা হইলে নিরস্ত্র ভারতবর্ষকে আঘাত করিতে অক্ষশক্তি আর নৈতিক যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবারও কোন প্রয়োজনও ব্রিটেন কর্ত্তৃক অনুভূত হইবে না। কিন্তু ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের পরও অক্ষশক্তি যদি অন্যথা করিয়া নিরস্ত্র ভারতবর্ষকেই আক্রমণ করিয়া বসে, তাহা হইলে শীঘ্রই জগৎবাসীর চক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মের এক নবতর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। নিরস্ত্র হইলেও বিনা অপরাধেই ভারতবর্ষ যদি আক্রান্ত বা আহত হয় তাহা হইলে জগৎ সেই প্রাকৃতিক সংঘটন দেখিয়া চকিত, চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া উঠিবে যে এক অদ্ভুত অলৌকিক শক্তির প্রভাবে ভারতবাসী এই কূটনীতিপরায়ণ অক্ষশক্তির অপেক্ষা সহস্র গুণ প্রচণ্ড ও দুর্ব্বার হইয়া তাহার সম্মুখীন হইয়াছে ও তাহাকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছে কেবল বেতনের লোভে, যুদ্ধে তাহাদের মধ্যে কোন উচ্চ-প্রেরণা নাই। 'বেতনের বিনিময়ে কাজ'—বৃটেনের নীতি অনুসারে ইহা দোষনীয় না হইতে পারে, কিন্তু আমাদের হিসাবে তাহা নয়। যে পর্য্যন্ত ভারত শৃঙ্খলমুক্ত না হয়, অক্ষশক্তি ভাবিতে পারে যে, তাহাদের যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ই ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন। কিন্তু আজ যদি ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া যায় এবং তৎসত্ত্বেও এই নিরস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে অক্ষশক্তি অস্ত্রধারণ করে, তবে ভারতীয় সৈন্যগণের তাহাদের দেশরক্ষার জন্যই অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইবে—কিন্তু তাহা আর বেতনের লোভে নয়, তাহারা যুদ্ধ করিবে উচ্চ-প্রেরণায় মনপ্রাণ সমর্পণে। তখন আর অক্ষশক্তির বলিবার কোন অজুহাত থাকিবে না যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্যই তাহারা যুদ্ধ করিতেছে। তখনও যুদ্ধ করিলে তাঁহাদের ফাঁকি ধরা পড়িয়া যাইবে। তাই বলি যদি আজ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বস্তুতঃই সুবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভারতকে স্বাধীন করিয়া দেয় তবে চল্লিশ কোটি ভারতীয় জনসাধারণের মনোভাব ও সংগঠনের ব্যাপারে এক বিরাট অমানুষী পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। ভারতীয় শক্তি দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে আর সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা ও অজেয় শক্তি স্বতঃই শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। ভারতের ব্যাপারে এইরূপ সমাধান হইলেই জোঁকের মুখে চূণের ন্যায় অক্ষশক্তির ক্ষিপ্রতা কমিয়া যাইবে, তাহাদের নৈতিক বল হ্রাস প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহারা নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িবে। তখন আর মধ্যপ্রাচ্যে অথবা পৃথিবীর যে কোন স্থানে ইংলেণ্ডের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে তাহাদের কোন শক্তি থাকিবে না। ইহাকেই বলি আমরা দুর্ব্বার নৈতিক শক্তি আর ইহা প্রকৃতই তোজবাজীর ন্যায় কাজ করিবে।

কিন্তু ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ কি আমাদের এই সৎ-পরামর্শে কর্ণপাত করিবেন না। আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ, তাঁহারা একবার আমাদের কথাগুলি ভাবিয়া দেখুন—আমাদের সঙ্গে আলোচনা করুন, নিশ্চিত বলিতেছি আমরা আমাদের উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম-পদ্ধতি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইতে অথবা কার্য্যের সময় তাঁহাদিগকে সৎপরামর্শ, সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করিতে কখনও পশ্চাদপদ হইব না, কেবল তাহাই নহে, ইহাতে আমরা সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিব না। ভগবান্ কি তাঁহাদিগকে সেই সুবুদ্ধিটুকু দিবেন না।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও ভারতবাসীর কর্ত্তব্য

পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাতেই এই প্রসঙ্গের আলোচনাকালে আমরা বলিয়াছিলাম যে, ভারতবাসীর কর্ত্তব্য বলিতে আমরা ভারত-সরকারের কোনরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিতে বসি নাই, ভারতবাসী বলিতে আমরা ভারতের আপামর সাধারণ গণগোষ্ঠিকেই আহ্বান করিতেছি। বর্ত্তমান-যুদ্ধের পেষণে ভারতের আকাশে যে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে, সেই দুর্যোগ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই আমরা এই আপামর গণগোষ্ঠিকে যথাসাধ্য সতর্ক করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

এই প্রয়াসের প্রেরণায় আমরা বুঝিয়াছি যে, নিম্নলিখিত সমস্যা ত্রই বর্ত্তমানের আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের ফলে শোচনীয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে :—

(১) অন্নবস্ত্রের দুর্ভিক্ষ,
(২) সাধারণ জীবিকা-জীবনের বিশৃঙ্খলা,
(৩) ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা,

পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যার আলোচনাতেই আমরা দেখাইয়াছি যে, সম্ভাবিত আসন্ন দুর্যোগের মধ্যে অন্নবস্ত্রের দুর্ভিক্ষ ও জীবিকা-জীবনের বিশৃঙ্খলা হইতে বাঁচিতে হইলে জনসাধারণের কর্ত্তব্য কি? এবং ইহাও বলিয়াছি যে, ‘রাজনৈতিক স্বাধীনতা’ বস্তুটি নেতৃগোষ্ঠির পরম কাম্যবস্তু হইলেও নিরন্ন, স্বাস্থ্যহীন ও মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভারতীয় গণগোষ্ঠির নিকট ইহার মূল্য এক কপর্দ্দকও নহে। আমাদের জনসাধারণ চায় ক্ষুধার নিবৃত্তি, কুস্বাস্থ্যরূপ অভিশাপের মোচন আর মনের প্রশান্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের নেতৃগোষ্ঠি নামে অভিহিত যাঁহারা, তাঁহারা ভিন্ন জনসাধারণের এই ত্রিবিধ অভাবের এতটুকু মীমাংসা সাধনে সক্ষম নহেন। কেবল তাহাই নহে, এই অর্ব্বাচীন নেতৃমণ্ডলী তাহাদের স্বীয় অক্ষমতা সম্বন্ধেও বিন্দুমাত্র সচেতন নহেন। এতদ্ব্যতীত, আধুনিক যুগের ভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞান এবং সভ্যতাও যে এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না, বিশেষত আমাদের তথাকথিত নেতৃগোষ্ঠির সেই জ্ঞানই বা কতটুকু?

অনেকে হয় ত’ বলিবেন, কেন, আমাদের দেশের প্রার্থিত স্বাধীনতা লাভের পর, নানপ্রকার আইন-কানুন প্রণয়ন করিয়াও জনসাধারণের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অভাবের (আর্থিক অভাব, কুস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তি) মীমাংসা করিতে পারেন! কিন্তু আমাদের ধারণা, প্রকৃতপক্ষে সেই সামর্থ্যের অধিকারী বড় কেহ নাই। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাধানের সত্যকার পথের সন্ধান তাঁহারা জানেন না। তাই মনে হয়, বুঝি বিদেশী ব্রিটিশ শাসনের অপেক্ষা আমাদের নেতৃবৃন্দের শাসন-ব্যবস্থায় ভারতের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে। কেন না, কার্য্যতঃ ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকগণ শত বিকৃতবুদ্ধি হইলেও আমাদের স্বজাতীয় আত্মাভিমানী নেতৃগোষ্ঠি অপেক্ষা তাঁহারা যে অনেক বেশী "খেলোয়াড়ী-মনোভাবাপন্ন," একথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য।

কোন কোন স্বপ্নবাদী উদারচেতা ব্যক্তি সম্ভবতঃ ভারতীয় নেতৃগোষ্ঠির বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ সুনজরে দেখিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, অজ্ঞই হোক আর অক্ষমই হোক—ক্রমান্বয় ব্যর্থতা ও ভুলের মধ্য দিয়াই কালক্রমে ভারতের নেতৃমণ্ডলীও একদিন না একদিন সত্যকার পথ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া পাইবেন। সেইদিন ভারতের সকল সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু এই স্বপ্নবাদীদের আমরা এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, এই যুক্তি ন্যায়ের যুক্তি নহে—ইহা দৈবের নিদর্শন। ক্রমাগত ভুল করিয়া গেলেই যে একদিন সাফল্যের জয়মাল্য কণ্ঠে শোভা পাইবে, এই ব্যাখ্যার মধ্যে কোন যুক্তিযুক্ততা নাই। এই ব্যাখ্যার মধ্যে যুক্তি ও সত্য থাকিলে, ব্রিটিশ শাসকগণও ইতিমধ্যে আত্মশুদ্ধি করিতে সক্ষম হইতেন এবং আজও এই চরমতম দুর্ভাগ্যের ভিতরে তাঁহারা তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য আগাইয়া দিতেন না।

দেশের শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দায়িত্ববোধের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু অর্জ্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই জ্ঞানকে অবহেলা করিয়া দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার দুঃসাহস করিলে দেশের চরম আত্মঘাতী দুর্ভাগ্যই আত্মপ্রকাশ করিবে।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, আজ শাসকবর্গের দায়িত্ববোধের এই প্রাথমিক জ্ঞানের অভাবে সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়াই এই দুর্ভাগ্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ আমরা জানি না আমাদের প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিগণই এই জ্ঞানের চাবিকাঠিটির সন্ধান জ্ঞাত ছিলেন। আর আধুনিক যুগের ভারতীয়বৃন্দ সে চাবিকাঠির সন্ধান জানে না। শতাব্দীর পর শতাব্দীর চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্যগণ এই জ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়াও সত্যকার পথ খুজিয়া পান নাই বটে, তবু তাঁহারা যে পথ লইয়াছেন, সেই পথ নির্ভুল না হইলেও বিধিবদ্ধ। কিন্তু আধুনিক ভারতের নেতৃকুল পশ্চিমের সেই ভ্রান্ত অথচ বিধিবদ্ধ পথেরও কোন হদিশ এ পর্য্যন্ত পান নাই। অনেকে হয় তো মনে করিতে পারেন যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আমরা অহেতুক বিদ্বেষ পোষণ করিতেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একথা সত্য নহে। বস্তুতঃ আমাদের একমাত্র কামনা, গান্ধিজী ও তাঁহার অনুগামীবৃন্দ যেন অচিরেই তাঁহাদের স্বীয় ত্রুটী-বিচ্যুতি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন! অনেকদিন হইতে আমরা সাগ্রহে ভারতীয় নেতৃগোষ্ঠির বক্তৃতা, মতাবলী ও কর্ম্মধারা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের এই চেষ্টা কোনদিনই ফলপ্রসূ হয় নাই। তাঁহারা প্রায় সকলেই দেশবাসীকে হতাশ করিয়াছেন। তথাপি, স্বীকার করিতে বাধা নাই, এই বিপুল হতাশার মধ্যেও, তবু গান্ধিজী ও—

জওহরলালেব মধ্যে আমরা কিঞ্চিৎ আশার আলোকস্ফুরণ দেখিতে পাইয়াছিলাম—কেননা অন্যান্য প্রত্যেকটি তথাকথিত নেতার তুলনায় এতদুভয়ের প্রকৃত নেতৃজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গি ও ঘটনার বিশ্লেষণী ক্ষমতা অধিকতর উদার ভারতবর্ষ ছিল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে, সংকীর্ণ-দৃষ্টি জনসমাজ উপরোক্ত নেতৃদ্বয়ের এতদুভয়ের অহং জ্ঞানের অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়া তাঁহাদের উক্ত দৃষ্টি ও বিশ্লেষণেব প্রসারতা অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এই প্রশ্রয়ের পরিবর্ত্তে জনসমাজ যদি ইঁহাদের মনের অন্তর্দ্দশনের প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে কালক্রমে আমরা সম্ভবতঃ গান্ধিজী ও জওহরলালের ভিতবে সত্যকার নেতৃজনোচিত গুণাবলীর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু এই সম্ভাবনা আজ একান্তই দূরীভূত। আজ যদি ইহাদেবও হস্তে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা অর্পিত হয় তবে আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে দেশের অমঙ্গল বরং ঘনাইয়াই আসিবে।

স্বায়ত্বশাসনপ্রাপ্ত ভারতের পক্ষে যে বিপদ সংঘটিত হইতে পারে, তাহা এড়াইবার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যার আলোচনায় আমরা দেশবাসীকে প্রথমে ঐক্যবদ্ধ হইয়া নূতন করিয়া দুইটি বিভিন্নতর পরিষদ গৃহ গঠন করিবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, একটি 'সাধারণ' গণ-গোষ্ঠি পরিষদ' (People's Common Council) দ্বিতীয়টি 'বুদ্ধিজীবি-পরিষদ' (People's Iutellectual Council).

'সাধারণ গণগোষ্ঠি পরিষদের' প্রধান কর্ত্তব্য হইবে সমস্ত জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে কার্য্যকরী ব্যবস্থা প্রণয়ণ করা, আর, 'বুদ্ধিজীবি-পরিষদের' প্রধান কর্ত্তব্য হইবে সমগ্র মানব সমাজের দৈহিক অসুস্থতা, অকাল-মৃত্যু, এবং সর্ব্বপ্রকার মানসিক অশান্তির অবসান করা।

কিন্তু এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, এই পরিষদ গৃহদ্বয় জনসাধারণ নিজেদের মধ্য হইতে নিরপেক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া গঠন করিয়া লইবেন। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালিমা লিপ্ত কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করিলে, এই পরিষদের লৌকিক মর্য্যাদা ও আদর্শ সমস্ত ক্ষুণ্ণ হইবে। দেশবাসীর অগ্রগতি আবার কিছুকালের জন্য পিছাইয়া পড়িবে। দেশের সমুদয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবাধ প্রসারতা বৃদ্ধি পাইলে, সুতরাং যাহাতে আবার সেই প্রাচীন যুগের মত ভারতেব কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য সর্ব্বজগতের বরনীয় হইতে পারে তাহারই জন্য পথ খুজিতে হইবে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই পথের সন্ধান দিতে পারে একমাত্র তাঁহারাই যাঁহাদের সহিত উক্ত কৃষি-শিল্প বাণিজ্যের সম্পর্কে প্রাণের সম্বন্ধ, নাড়ীর সহিত অবিচ্ছেদ্য একাঙ্গতা; যাহারা কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যকে জীবনের প্রধান ও প্রথম উপজীবিকাপক্ষে ব্যবহার করে। নতুবা পুঁথি পড়া ভ্রান্ত শিক্ষা এই পথের কতটুকু খোঁজ রাখে?

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার সাহায্যে যাহারা কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের তথ্য অর্জ্জন করিয়া স্বকীয় ভূয়া অভিজ্ঞতা প্রচার করিতে উৎসুক, তাহাদের প্রত্যেকেই কিন্তু উক্ত তথ্যের ব্যবহারিক দিকটা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অজ্ঞ। এই তথ্যের শিক্ষক বা অধ্যাপক যাঁহারা এবং এই তথ্যের পুঁথি রচনা করেন যাঁহারা; প্রত্যুত পক্ষে তাঁহারাও কেহই তাঁহাদের এই স্ব-কল্পিত তথ্যকে 'ব্যবহাররূপ' কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া দেখেন না। কাজেই স্বতই তাহাদের এই পুথিগত জ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত একটা ফাঁকা কল্পনা বিলাসেই পর্য্যবসিত হয়। সত্যকার কার্য্যক্ষেত্রে আর ইহার কোন মূল্য নিরূপিত হয় না। পক্ষান্তরে এই তথ্য যাঁহাদের পক্ষে জীবিকার উপকরণ, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য তাঁহাদের নিকট সবিশেষ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হিসাবেই প্রতিভাত হয়।

এইরূপ, জনসমাজের কুস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তির সমাধানের জন্যও উপরোক্ত ব্যবহারিক বিধি-নির্দ্দেশকেই অনুকরণ করিতে হইবে, অর্থাৎ মাতৃজঠরে মানবদেহের গঠন এবং মানবদেহের স্বাভাবিক পার্থিব অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানী তাঁহারাই জনসাধারণের স্বাস্থ্য-সমস্যার প্রতিবিধান করিবেন এবং যাঁহারা রাগ-দ্বেষহীন, দ্বন্দ্ব, কলহ, অনাশক্ত স্থিতধী তাহারাই মানুষের মানসিক শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জনসমাজের সমস্যাবলীর সমাধান সাধনের ব্রত যে-প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রকারে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপমারা ভ্রান্ত ও অকর্ম্মণ্য লোকগুলির সংস্পর্শ-মুক্ত করিতে হইবে।

নতুবা জনসাধারণের মুক্তির-দুয়ার কোনদিনই আর উন্মুক্ত হইবে না।

এইবার আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব, উক্ত 'সাধারণ গণ-গোষ্ঠী পরিষদ' (People's Common Council) এবং 'বুদ্ধিনীতি পরিষদে'র গঠন-কার্য্য কোনভাবে সম্পন্ন করিবেন। কিছু পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, জনসাধারণ নিজেদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া এই 'পরিষদ' গঠন করিবেন। কেন না তথাকথিত বর্ত্তমান নেতৃগোষ্ঠিকে পরিষদে গ্রহণ করিলে এই পরিষদের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে বই বৃদ্ধি পাইবে না।

প্রথম নির্ব্বাচন হইবে গ্রামে। গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাদেরই একজন বিচক্ষণ এবং বিশেষতঃ দেশের কৃষি-শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিবেশীকে গ্রামের প্রতিনিধি রূপে নির্ব্বাচিত করিবেন। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি যেন তাঁহার প্রস্তাব ও চিন্তিত বিষয়কে হিন্দী বা ইংরাজিতে সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। এই প্রথায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ আবার স্ব স্ব জেলার ভিতর এক কেন্দ্রীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়া বিধিমত জেলা-প্রতিনিধিবৃন্দকেও নির্ব্বাচিত করিবেন। তৎপরে এই জেলা-প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক কেন্দ্রীয় অধিবেশন আহ্বান করিবেন। এই আহুত কেন্দ্রীয় অধিবেশনকেই 'সাধারণ গণ-গোষ্ঠি পরিষদ' নামে অভিহিত করা হইবে, এবং ইহার সদস্যমণ্ডলীও 'সাধারণ গণগোষ্ঠি পরিষদের সদস্য' এই নামে সম্মানিত হইবেন। সদস্যমণ্ডলীকে তৎপরে নিজেদের মধ্য হইতে বারজন 'কার্য্যনির্ব্বাহ সমিতির' সভ্য মনোনীত করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহ সমিতি আবার নিজেদের একজনকে 'অস্থায়ী সভাপতি' এবং একজন 'অস্থায়ী সহ সভাপতি' নির্ব্বাচিত করিবেন।

অতঃপরে এই বিধি-বিধানানুসারে গঠিত সমগ্র কার্য্য-নির্ব্বাহ সমিতি—পরিষদের একজন 'স্থায়ী সভাপতি' মনোনয়নের নিমিত্ত এমন এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিবেন যিনি স্বপ্রবর্ত্তিত কর্ম্মপ্রণালীর সাহায্যে দেশের আপামর জনসাধারণকে, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্য, অনাবিল স্বাস্থ্য ও নিরুদ্বেগ মানসিক সুখ-শান্তির পথ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইবেন; যিনি নিজরায়ে সমগ্র দেশের সমুদয় গ্রাম্য প্রতিনিধি মণ্ডলীকে আহ্বান করতঃ নিজ অসীম ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ প্রতিনিধিদেরও বুঝাইতে সক্ষম হইবেন যে, তিনি যথার্থই দেশবাসীর প্রার্থিত ত্রিবিধ সমস্যার সমাধান করিতে কৃতকার্য্য হইবেন। পরিষদ-গৃহ যে সর্ব্বগুণাধার ব্যক্তিকে এই ভাবে মনোনীত করিবে, সেই অসীম-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই হইবেন 'কার্য্যনির্ব্বাহ সমিতির' 'স্থায়ী সভাপতি'। সমগ্র দেশ এই স্থায়ী সভাপতির নির্দ্দেশ অনুসরণ করিবে। 'বুদ্ধিজীবি পরিষদ' গঠনের দায়িত্বও উক্ত 'স্থায়ী সভাপতি' মহাশয়ই গ্রহণ করিবেন।

দেশবাসীগণ নিশ্চয়ই বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিবেন, এইরূপ সর্ব্বাগুণাধার ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগের স্থবির-ধর্ম্মী ভারতবাসীর মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করা কি সম্ভব হইবে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমরা জ্ঞাত নহি। তবে আমরা নৈরাশ্যবাদী নহি। তাই আমরা মনে করি, আজই সেই মহাপুরুষকে খুঁজিয়া না পাইলেও ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করিলে একদিন তিনি সেই ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রেরণ করিবেন। আমরা সেই মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষায়ই উন্মুখ হইয়া রহিয়াছি।

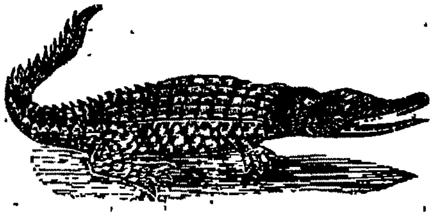

বর্ত্তমান সাহিত্য

শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা

প্রবন্ধ-সাহিত্য—সরস করিয়া প্রকাশ করিতে না পারিলে প্রবন্ধ যে সাহিত্যেব গৌরব লাভ করে না, তাহা গত শতাব্দীর সাহিত্যিকরাও অনুভব করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ত' কথাই নাই—তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তর প্রবন্ধ-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার ইত্যাদি বঙ্কিমের সমসাময়িক সাহিত্যিকগণও সরস করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে চেষ্টা করিতেন। তারপর রবীন্দ্রনাথে এই সাহিত্য চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে রামেন্দ্র সুন্দর, জগদানন্দ রায়, বলেন্দ্রনাথ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল ইত্যাদি স্বর্গত মনীষীগণ যতদূর সম্ভব চিত্তাবর্ষক করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতেন। ইঁহারা কেহই কবি ছিলেন না—রবীন্দ্রনাথের রসমাধুর্য্য ইঁহাদের রচনায় ছিল না সত্য, কিন্তু ইঁহাদের পরিচ্ছন্ন রচনারীতির মধ্যে যে সজীবতা ও স্বচ্ছন্দতা ছিল তাহারও একটা রস ছিল। ২৫ বৎসর আগেও সবুজপত্র পত্রিকা চিন্তাশীলতাব দিক হইতে না হউক, রচনা শৈলীর সরসতার দিক হইতে প্রবন্ধ-সাহিত্যের পুষ্টির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে প্রবন্ধ-সাহিত্যের বড়ই অভাব হইয়াছে। যাঁহারা সরস করিয়া বলিতে পারেন, তাঁহাদের হয় ত' বলিবার কিছুই নাই। যাঁহাদের বলিবার বহু কথা আছে, তাঁহারা সবস করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না। একাধারে আর্টিষ্ট ও চিন্তাশীল যিনি তাঁহার কাছেই এ সাহিত্য আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু সে শ্রেণীর লোক বড়ই বিরল। দুই একটি সরস প্রবন্ধ যাহা চোখে পড়ে, তাহা সাহিত্যিকদেরই রচনা—বড় বড় ডিগ্রিধারী বিদ্বানদের রচনা নয়। তাঁহারা খাটিয়া খুটিয়া ইংরাজিতে একটা Thesis লিখিয়াই কর্ত্তব্য সমাধা করেন। তাহাতেই ঋষি ঋণেব পরিশোধ হইল। মনে করেন তাঁহাদের অনেকেই বাংলায় কোন প্রবন্ধই লেখেন না। দুই এক জন যাহা লেখেন, তাহা সম্পূর্ণ Academical কাহারও কাহারও রচনা শুধু ফিরিস্তি, তালিকা, Statistics Catalouging অথবা আঠাকাঁচির কাজ।

বর্ত্তমান সাহিত্যের অভিভাবকেরা যখন প্রবন্ধ লেখেন তখন ফতোয়া ও পরোয়ানা জারি করেন, Message দেন, বিচারক হইয়া গম্ভীর ভঙ্গীতে রায় দেন, যুক্তি শৃঙ্খলার ধার ধারেন না, বক্তব্য যাহা কিছু তাহা আত্মঘোষণা ও আস্ফালনে পর্য্যবসিত হয়। ইংরাজি পুঁথিপড়া বিদ্যার অপরিপাচিত অধ্যয়নের অস্বাভাবিক পরিণতি এই শ্রেণীর লেখকদের রচনা, যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমন অস্বস্তিকর।

সাহিত্য-সভার অভিভাষণগুলিতে চিন্তাশীলতা দেখা যায় না—সেগুলি হয় মামুলি ধরণের, বৈচিত্র্যহীন। ভাষাতত্ত্ব, কৃষিবিদ্যা, বেদান্ত, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলিকেও সাহিত্য ও তাহাদের লেখকদেরও সাহিত্যিক বলিয়া সম্মানিত করা হয়।

সমস্যামূলক প্রবন্ধ যে একেবারে রচিত হয় না তাহা নয়, তাহাতে সমস্যার ব্যাখ্যান থাকে এবং বহু মনীষীর মতামত উৎফলিত হয়—কিন্তু সিদ্ধান্ত, মীমাংসা বা সমাধানের চেষ্টা থাকে না। কেবল শক্তির অভাব নয়—জাতীয় কল্যাণ সাধনেব যে বাস্তবিক ব্যাকুলতা সমস্যার সমাধানে প্রণোদিত করে দেশে তাহারও অভাব ঘটিয়াছে। এই অভাব বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই মুহুর্মুহুঃ মনে পড়ায়। প্রবন্ধ-সাহিত্যেও জীবনের অপরোক্ষ সত্যানুভূতি ও গূঢ়-রহস্য-বোধের ও criticism of life-এর প্রয়োজনীয়তা আছে, গ্রন্থাহৃত বিষয়ের পুনরাবৃত্তিই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নয়।

দেশে সমালোচন সাহিত্যের বড়ই দারিদ্র্য। রবীন্দ্রনাথ appreciation-কেও creation করিয়া তুলিয়াছিলেন। সকল রসোপভোগের ন্যায় সাহিত্যের রসোপভোগকেও নব সাহিত্যে পরিণত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পর আমরা সে শ্রেণীর সাহিত্য আর পাই নাই।

যুক্তিমূলক বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনাও এক প্রকার সাহিত্য। সে সাহিত্যই বা কই? ঐ নামে যাহা চলে তাহা ভক্তের যুক্তিহীন অহেতুক উচ্ছ্বাস মাত্র। ইদানীং সাহিত্য সমালোচনার দুই একখানি পুস্তক

প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলি পড়িয়া মনে হয়, এই দিকে কোন কোন অধ্যাপক ও সাহিত্যিকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। Matthew Arnold বলিয়াছিলেন—একটা বড় Creative age এর পর একটা Critical age আসে। সে হিসাবে আদর্শ সমালোচন সাহিত্য কি এখন প্রত্যাশা করিতে পারি? Matthew Arnold-এর কথা যদি সত্য হয় তবে রবীন্দ্রনাথের Creative age-এর পর একটা Critical age আসিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

রসতত্ত্ব বা অলঙ্কারসম্বন্ধীয় পুস্তক এ দেশে পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। তরুণ সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে উদাসীন। প্রবীণ সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাব্যজিজ্ঞাসা ও প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের কাব্যবিচার এ বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা। জীবনচরিতও যে সরস সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাহার পথ দেখাইয়াছেন বিদ্যাসাগর নামক গ্রন্থে। এ দিকে কেহই আর চেষ্টা করেন নাই। ভ্রমণ বৃত্তান্ত যে সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে তাহাও বিশ্বপর্য্যটক রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। ইদানীং দুই একজন তরুণ সাহিত্যিক সে দিকে কিছু চেষ্টা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের ভাষা—আমরা খাঁটি বাংলায় কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বাংলা বাক্যের মধ্যে বহু ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিয়া ভাব প্রকাশ করি। কিন্তু গোটা ইংরাজি বাক্যের বাংলা তর্জ্জমা করিয়া কথা বলি না। বাংলা বাক্যের নিজস্ব প্রকৃতিটা মুখের মিশ্র ভাষায় নষ্ট হয় না। বর্ত্তমান সাহিত্যের ভাষা ক্রমে সেই প্রকৃতি হারাইয়া ইংরাজির তর্জ্জমা করা বাংলা হইয়া পড়িতেছে। লেখকেরা ইংরাজিতে ভাবিয়া মনে মনে তাহার তর্জ্জমা করিয়া বাংলা লিখিতেছেন। স্বধর্ম্মভ্রষ্ট এই ভাষাকে আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া মনে হয় না, তবু আমরা বুঝি কারণ, আমরা ইংরাজি জানি। কিন্তু ইহাই কি স্বাভাবিক? এই কি আমাদের জাতীয় ভাষা? ইংরাজির ভাব আমরা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতেছি, ভাষাটাও কি বাংলা হরপে ইংরাজি হইবে?

ইংরাজির তর্জ্জমা করা এই বাংলা পুনরায় ইংরাজিতে তর্জ্জমা করিলেও অনেক সময় বুঝা যায় না। তাহার কারণ, বাংলা তর্জ্জমাটাই অনেক সময় ঠিক হয় না। অসম্যক অনুবাদের প্রত্যানুবাদ উদ্দিষ্ট হইতে দূরে লইয়া যায়।

তত্ত্বমূলক ও সমস্যামূলক প্রবন্ধের ভাষা অনেক সময় এমনই আড়ষ্ট হয়, লেখক কি বলিতে চাহেন তাহা বোঝা যায় না। ইংরাজি দুরূহ পুস্তক পড়িয়াও বোঝা যায় অথচ বাংলা বোঝা যায় না দেখিয়া দুঃখ হয়। লেখকের নিজের মনেই বক্তব্য বিষয়টি বা ভাবটি হয় ত স্পষ্ট নয়, নয় ত বাংলায় ভাবটির ঠিকমত তর্জ্জমা হয় নাই। পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে না পারা অক্ষমতা ছাড়া আর কি? বিষয়ের দুরূহতা অথবা ভাবের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মতার জন্য অনেক সময় বক্তব্য বিশদ হয় না, এ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন। কিন্তু যাহা দুইটি বাক্যে বিশদ হয় না তাহাকে দশ১০টি বাক্যে বিশদ করা ত চলে। সেদিন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিতেছিলেন—"আপনারা রসতত্ত্ব, বীক্ষণশাস্ত্র ও দর্শনের প্রবন্ধও গল্প উপন্যাসের ভাষায় শুনিতে চান; তাহা কি সম্ভব?" গল্প উপন্যাসের ভাষায় চাহি না বটে, কিন্তু বিশদ, স্বচ্ছ ও সরস পরিচ্ছন্ন ভাষায় চাই।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাষা অনেকটা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচিত ও দার্শনিক পরিভাষা সংস্কৃত দর্শন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সাহিত্য সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য লেখকগণ স্বরচিত শব্দসঙ্কেত প্রয়োগ করেন। একই শব্দসঙ্কেত সকলেই ব্যবহার করেন না, আবার একই লেখক একই ভাবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দসঙ্কেত ব্যবহার করেন। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের রচিত সঙ্কেত যথাযথ হয় না। ব্র্যাকেটের মধ্যে ইংরাজি শব্দ দেওয়া না থাকিলে লেখকের বক্তব্য বুঝা যায় না। শব্দ সঙ্কেতগুলি লেখকের স্বরচিতই হউক আর অন্যত্র হইতে আহৃতই হউক, প্রবন্ধের প্রারম্ভে বা মধ্যে তাহাদের সংজ্ঞা বিবৃতি করিয়া দেওয়া উচিত। অনেক লেখক এই শ্রেণীর বিশিষ্টার্থক শব্দ সঙ্কেতের কারণে অকারণে মুহুর্মুহুঃ প্রয়োগ করিয়া যাহাতে প্রবন্ধটিকে গহন ও ভাব-গম্ভীর বলিয়া প্রতীত হয়, তাহারই চেষ্টা করেন। পড়িয়া মনে হয়, বক্তব্যকে বিশদ করিয়া বলা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, পাণ্ডিত্যের মায়া সৃষ্টিই উদ্দেশ্য।

কেবল প্রবন্ধের ভাষা নয়, আজকালকার গল্প উপন্যাসের

ভাষাও ইংরাজির তর্জ্জমার মত শোনায়। গল্প উপন্যাসে আমাদের সমাজের প্রাকৃত ও লৌকিক জীবনেরই কথা থাকে। যে বাঙ্গালী সাহেব হইয়া গিয়াছে সেও বাঙ্গালী সমাজের ঘরের কথা ইংরাজিতে ভাবে না। তবে এই অস্বাভাবিক ভাষা গল্প উপন্যাসে কেন? আমরা যখন কোন তত্ত্ব বা গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ বা আলোচনা করি, তখনই ইংরাজি ঢঙের কথাবার্ত্তা ব্যবহার করি, কিন্তু সাধারণ আলাপে আমরা কখনও ঐ ঢঙে কথা বলি না। কিন্তু আজকালকার গল্প উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর কথাও ঐ ঢঙের হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সমাজের সাধারণ নর-নারীর মত কথা বলে না, কেমন যেন ঘুর পেঁচ দিয়া বাংলা বাক্যভঙ্গীকে বিকৃত করিয়া কথা বলে। অমিত রায় শ্রেণীর চরিত্রের মুখে হয়ত' বেমানান হয় না। খাঁটি বাঙ্গালী-সমাজে জাত ও প্রতিপালিত মানুষের মুখে ইহা অস্বাভাবিক শুনায়। ভাষার অস্বাভাবিকতা সমস্ত চরিত্রটাকেই প্রাণহীন করিয়া তোলে। যাহারা কথা-সাহিত্যকে Realistic কবিতে চায়, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারাই এই দোষ বেশী করে। ভাষার অস্বাভাবিকতা সমস্ত Realism সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত vitality নষ্ট করিয়া দেয়।

বিজাতীয় ঢঙের বাগ্বিন্যাস ও অযথা অলস নীরস বক্রোক্তির মুহুর্মুহু ব্যবহার ছাড়া আরও নানা প্রকার কৃত্রিমতা কথাসাহিত্যের ভাষার মধ্যে ঢুকিয়াছে। সেগুলিকে Mannerism বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না, সে সব রীতিমত অশিষ্টতা, অস্বচ্ছুতা; যেমন ক্লান্তিকর—তেমনই অশোভন। এ ভাষা ন্যাকামি আর জ্যাঠামিতে ভরা। পড়িলে প্রকৃতিস্থ সুস্থ মস্তিষ্কের রচনা বলিয়াই মনে হয় না।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্য, অর্দ্ধোচ্চারিত অসম্যক অপূর্ণাঙ্গ বাক্য, টেলিগ্রাফি ভাষসঙ্কোচ অযথা ক্রিয়াপদের বিলোপ, ডট ও ড্যাশের ছড়াছড়ি, অযথা এক কথার পুনরুক্তি, বিশেষ্য-পদের পর বিশেষণ প্রয়োগ, অযথা অলস বিশেষণ প্রয়োগ, ছেদ বিন্যাসের বিশৃঙ্খলা, সমান ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উপমা প্রয়োগ, অযথা বিলাতী সাহিত্যের reference, ইচ্ছামত অর্থে শব্দের অপপ্রয়োগ, ব্যাকরণ দুষ্টি, অসমর্থ পদে সমাসবন্ধন ইত্যাদির ফলে কথা-সাহিত্যের যে অদ্ভুত রূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। কথা সাহিত্য ভাবপ্রকাশের যথাযথ ভাষা হারাইয়া অতিরিক্ত বাচাল হইয়া উঠিতেছে, বুকের ভাষা হারাইয়া তাহার মুখের ভাষা বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। বাচালকে কেহই সহ্য করে না। একদিকে পল্লীজীবন হইতে বিচ্ছেদ, অন্য দিকে সংস্কৃত জ্ঞানের অভাব এই বিকৃতির কারণ। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, তরুণ রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ভাষাকে কঠোর সাধনায় গড়িয়া গেলেন, তাহার এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া দুঃখ হয়।

সকল ভাষার বাক্যে পদ বিন্যাসের নির্দ্দিষ্ট একটা ক্রম আছে। এই ক্রম রক্ষা করিয়া চলার যে শৃঙ্খলা তাহাকে কোন দেশের সাহিত্যিকরা শৃঙ্খল মনে করেন না। বাঙ্গালা ভাষারও বাক্যে ও পদ সন্নিবেশের একটা নির্দ্দিষ্ট ক্রম আছে—এই ক্রম সাহিত্যরথীরা সকলেই মানিয়া আসিয়াছেন—বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে বিশেষতঃ কথা-সাহিত্যে এই ক্রমের ব্যতিক্রম ঘটানোই উৎকৃষ্ট রচনারীতি বলিয়া মনে করা হইতেছে। কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে এই ক্রমের পরিবর্ত্তন ঘটানো হইতেছে না—লেখক আপন খেয়াল মত পদবিন্যাস করেন। জোর দেওয়ার জন্য, বিশিষ্ট কোন ভাবদ্যোতনার জন্য অথবা কাকুর সহায়তার জন্য বাক্যের পদ পরম্পরার পবিবর্ত্তন করার প্রথা বরাবরই চলিয়া আসিতেছে কিন্তু অকারণে পদক্রম বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ভাষাকে অস্বাভাবিক ও অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতেছে।

ইদানীং অধিকাংশ উপন্যাস চল্‌তি ভাষাতেই লিখিত হয়। যাঁহারা মার্জ্জিত ভাষায় লেখেন তাঁহারা পাত্রপাত্রীর মুখের কথাগুলি চল্‌তি ভাষাতেই প্রকাশ করেন। তাহাতে লেখকের নিজের ভাষা ও পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকায় রচনার গঠনে একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। চল্‌তি ভাষাতে আগাগোড়া লেখাতেও কোন দোষ নাই। চলতি ভাষায় লেখা বড়ই শক্ত—অনেকের চল্‌তি ভাষায় লেখার সম্পূর্ণ অধিকারই নাই। বাল্যাবধি মার্জ্জিত ভাষার রচনাই লেখকগণ স্কুল কলেজে পড়িয়াছেন, ফলে সে ভাষা সকলেরই মোটামুটি আয়ত্তই থাকে। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের আদর্শ চল্‌তি ভাষা অনেকেরই আয়ত্ত নয়। বলা বাহুল্য, নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের ভাষা আদর্শ চল্‌তি ভাষা নয়, নাগরিক উচ্চ শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষাও খাঁটি চল্‌তি ভাষা নয়, তাহার কারণ তাহাদেব মুখের

ভাষার প্রায় অর্দ্ধেক শব্দ ইংরাজি। কোন জেলা বিশেষের পল্লীবাসীদের মুখের কথাও আদর্শ চল্‌তি ভাষা নয়।

ইংরাজি বুকুনি বাদ দিয়া বঙ্গের অমুগঙ্গ অঞ্চলের ভদ্রসম্প্রদায় যে ভাষায় কথা বলেন তাহাই আদর্শ চল্‌তি ভাষা। অনেক লেখকের এইরূপ চল্‌তি ভাষা শোনার সুযোগই হয় নাই। কাজেই সম্পূর্ণ আয়ত্তও হয় নাই। তাঁহাদের লেখাতে সে-কথার প্রমাণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ ইডিয়ম প্রয়োগের কথাই ধরা যাক। চল্‌তি ভাষার প্রধান শক্তি ও সম্বল ইডিয়ম। মার্জ্জিত ভাষা এই ইডিয়মের সুযোগ-হইতে অনেকটা বঞ্চিত হয়। চল্‌তি ভাষা এই ইডিয়মগুলির পূরা সুবিধা লাভ করিতে পারে। আমাদের চল্‌তি ভাষা এই ইডিয়মে পরিপূর্ণ। ইডিয়মের অপপ্রয়োগ ও অপ্রয়োগ হইতে বুঝা যায়, অনেক লেখকের বাঙ্গালার আদর্শ চল্‌তি ভাষা আয়ত্ত নয়—চল্‌তি ভাষার সুলেখক হইতে গেলে এই ভাষা অন্যান্য ভাষার মত শিখিয়া লওয়া উচিত।

আজকালকার কবিতা লেখকদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন পন্থী তাঁহাদের কবিতায় বৈশিষ্ট্য না থাকুক—ভাষার অপব্যবহার নাই। নূতনপন্থী কবিদের কবিতায় ইংরাজী, সংস্কৃত, গ্রাম্য বাংলা ও পার্শি শব্দের নির্ব্বিচারে প্রয়োগ দেখা যায়। কবিদের নিজের রচিত শব্দের সংখ্যাও খুব বেশী—সে সকল শব্দের অর্থ আমরা বুঝি না—কবিরা আপন আপন মনোমত অর্থেও বহু শব্দ প্রয়োগ করেন; তাঁহাদের মনের অর্থ কখনও অনুমানে বোঝা যায়, কখনও যায় না। বিনা প্রয়োজনে শব্দের সমারোহ-সৃষ্টির জন্য অনেক কথাই ব্যবহার করেন। ইহা ছাড়া abstraction-এর ছড়াছড়ি। বহু কবিতা পড়িয়া আমাদের মনে সুস্পষ্ট কোন ধারণাই হয় না—চিত্রের কথা দূর থাকুক মনে একটা রেখাপাতও এমন কি ছায়াপাতও হয় না।

জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে এই বাঙ্গালী জাতির উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে কিনা এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। যে জাতির মধ্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছেন—সে জাতির সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা নাই তাহা কি করিয়া বলি। তবে যে জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় ক্রমে উন্নত হইতেছে সে জাতির জাতীয় সাহিত্য ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে কেন?

ইহার প্রধান কারণ বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষায় এ জাতি আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়াছে। বিজাতীয় ভাবে এ দেশ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা এ দেশে না আসিলে হয়ত কোন সাহিত্যেরই সৃষ্টি হইত না। যে শিক্ষা এ দেশে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে সেই শিক্ষাই এ দেশের সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতাও অপহরণ করিয়াছে।

বিদেশী শিক্ষাদীক্ষা এ দেশের জাতীয় জীবনের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাকে তরঙ্গায়িত ও আলোড়িত করিয়াছিল, তাহার সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়াছিল তাহার লুপ্ত শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। বাহিরের তাড়না বাহিরের প্রভাব জাতির চিত্তকে অন্তর্মুখী করিয়াছিল—জাতি তাহাতে নিজের প্রচ্ছন্ন আত্মশক্তিকে সাহিত্যে রূপ দান করিতে পারিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত সেই শক্তির ক্রিয়া চলিয়াছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ইউরোপের Cultural Conquest সম্পূর্ণ হইয়াছে। যে বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ করিয়া সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রণোদিত করিয়াছিল ক্রমে তাহা আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিল—আমরা বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করিলাম। এই জাতি যদি বিজেতা জাতির শিক্ষা সভ্যতার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রেরণা লাভ করিয়া—আঘাত লাভ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে নিজের স্বাভাবিক বিশিষ্ট পথে চালিত করিত—তাহা হইলে তাহার সাহিত্যের এই দুর্গতি হইত না। জাতীয় ভাবধারা গত শতাব্দীর ভগীরথগণের পরিখাত পথ হইতে বিপথে চালিত হইয়া আজ সমগ্র দেশে দারুণ অস্বাস্থ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। গত শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় জীবনে যে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল আজি বিপথে চালিত হইয়া তাহা সে তরঙ্গ হারাইয়াছে। আজিকার নিস্তরঙ্গ জাতীয় জীবনে ইউরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যের যে প্রতিবিম্ব পড়িতেছে তাহাকেই আমরা আসল জিনিষ মনে করিয়া আস্ফালন করিতেছি।

আমরা মুখে বলি আমাদের জাতি-দেহে নবজীবন সঞ্চার হইয়াছে। জাতিদেহ যদি জীবন্ত—তবে তাহার চারিপাশে এত দুর্গন্ধ কেন? দেহ প্রাণহীন হইলে তাহাকে বাহির

হইতে সমাগত বহু জীব ও জীবাণু আশ্রয় করে। এই জীবময় দেহকে যে হিসাবে জীবন্ত বলা হয়—আমাদের জাতি-দেহ সেই হিসাবে জীবন্ত।

সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক জীবনে ইউরোপের সহিত এ দেশের কোন মিল নাই। অথচ ইউরোপীয়-জীবনের প্রত্যেক সমস্যা, প্রত্যেক মতবাদ, প্রত্যেক তত্ত্বতথ্য, প্রত্যেক ভাবাদর্শকে আমরা সাহিত্যে ও সামাজিক জীবনে প্রশ্রয় ও আশ্রয় দিতেছি। অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে পড়িয়া তাহাদের মতবাদগুলি কি বীভৎস ও বিকৃত মূর্ত্তিই না পরিগ্রহ করিতেছে! ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিতেছি—মনুষ্যত্ববাদের নামে আমরা শূদ্রত্বকেই প্রাধান্য দিতেছি—বিশ্বজনীনতার দোহাই দিয়া জাতীয়তাকে বিসর্জ্জন দিতেছি। সাম্যবাদের অর্থ আমরা বুঝিয়াছি—যাহারা উচ্চে আছে তাহাদের নামাইয়া অনুন্নতদের সমকক্ষ করা। পশ্চিমের বস্তু-সর্ব্বস্ব ভোগমত্ত রজোদৃপ্ত সভ্যতা আমাদিগকে এমনি অভিভূত করিয়াছে যে আমাদের সত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি ও ব্রাহ্মণ্য শুচিতা উৎসর্গ করিয়াছি।

জবাফুলের সন্নিকটে স্ফটিকখণ্ডের ন্যায় আমাদের জাতীয় মন বিজাতীয়ভাবে আরক্ত হইয়া গিয়াছে। যে সাহিত্য এই মনের অভিব্যক্তি তাহা যেমন অসত্য, তেমনি অস্বাভাবিক, তেমনি নির্জ্জীব। জাতির মূল ধাতুর সহিত যে মনোভাবের কোন স্বাভাবিক মিল, সংযোগ বা সামঞ্জস্য নাই তাহা রস সৃষ্টির অনুকূল নয়। মাটির রস তরুলতার জীবনের মধ্য দিয়া যে ফুল ফুটায় তাহার মর্য্যাদা ফুলের অনুকরণে রচিত রঙিন কাগজ বা মোমের ফুল পাইতে পারে না।

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় সমাজে একটা আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন ইউরোপের সাহিত্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সে সাহিত্যের অনুকরণেও এ দেশে এক শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইয়াছে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আমাদের দেশের অর্থনীতিক ব্যাপারে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল সত্য, কিন্তু সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে তাহার কোন প্রভাব সম্পাত হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ঐরূপ সাহিত্যের এ দেশে কোন সার্থকতা নাই। এ শ্রেণীর সাহিত্য সম্পূর্ণ বিজাতীয় ও অসত্য। পরগাছা কখনও গাছের মর্য্যাদা বা আখ্যা লাভ করিতে পারে না।

গত শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় জীবনে যে বৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল—তাহা আর নাই। জাতীয় জীবনে নব বৈচিত্র্যও কিছু ঘটে নাই। জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্য বা আলোড়ন না থাকিলে ক্রমে তাহা অসাড় হইয়া পড়ে। একটানা একঘেয়ে জীবনে অনুকরণ করিবার শক্তি থাকিতে পারে, নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার শক্তি থাকে না। জাতীয় প্রাণকে সবলে নাড়া দিয়া সজাগ করিয়া দিতে পারে এমন কিছুই এ যুগে ঘটে নাই। কেহ কেহ স্বরাজ্য আন্দোলনের কথা বলিতে পারেন। এই আন্দোলন জাতির সুপ্ত চৈতন্য ও প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা জাতির অন্তর হইতে জন্মে নাই—বাহিরের আঘাতে ইহার সৃষ্টি—স্বভাবতই ইহা কালধর্ম্মে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে—আবার বাহিরের আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যতটা কোলাহলময় ততটা চিন্তাঘন বা কর্ম্মঘন নয়—জাতির মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত ইহা পৌঁছায় নাই।

এই আন্দোলন সাধারণতঃ বিজাতীয়ভাবে কেবল বিদেশীয় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইয়াছে। বিজাতীয় সভ্যতা, পশ্চিমের রাজসিকতা, জড়বাদ, ভোগ সর্ব্বস্বতা, পাশ্চাত্ত্য আত্মসর্ব্বস্ব ভাবাদর্শ ও নবাঙ্কুরিত মতবাদগুলির বিরুদ্ধে নয়। পশ্চিমের আড়ম্বরময় বস্তু সর্ব্বস্ব যে culture আমাদের জাতীয় নিজস্ব culture কে কবলিত করিতেছে তাহার বিরুদ্ধেও নয়। বাঙালী জাতি আত্মনিগ্রহ নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা সমস্তই সহ্য করিয়াছে কিন্তু তাহার স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগ্রৎ হয় নাই, তাহার আবিষ্কারিকা শক্তি বা সৃজনী শক্তি উন্মেষিত হয় নাই—ভাঙিবার প্রবৃত্তি তাহার জন্মিয়াছে—কিন্তু ভাঙিয়া গড়ার ক্ষমতা তাহার জন্মে নাই।

আমাদের যুবকগণ অনেক প্রকারে আত্মত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এই আত্মত্যাগের কি যে লক্ষ্য, কি যে উদ্দেশ্য তাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন স্পষ্ট জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না। এক লক্ষ্যে দেশের লোক কখনও সম্মিলিত হইতে পারে নাই। শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাহারা দাঁড়াইয়াছে,

কিন্তু জাতীয় জীবনে যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু অকল্যাণ কর, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে নাই, যাহা কিছু সত্য যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু স্থায্য তাহার জন্ত কোন নির্য্যাতন সহ্য করে নাই। বাহির হইতে তাহারা লাভের প্রত্যাশা করিয়াছে, কিন্তু ভিতরের সংস্কার করে নাই, দেশের মর্ম্মস্থল হইতে যাহা পাওয়া যাইতে পারিত তাহার সন্ধানও করে নাই।

কয়েক বৎসরের আন্দোলনের পর আমরা দেখিতেছি, বিজাতীয় ভাবে ও চালচলনে দেশের বহিরন্তঃপুর ভরিয়া গিয়াছে, স্বাধীনতা লাভের আগ্রহের নামে সর্ব্বত্রই আজ উচ্ছৃঙ্খলতাই দৃষ্ট হয়। আমাদের শিক্ষায়তনে, সমাজে পারিবারিক জীবনে সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা। জাতীয় উন্নতির কামনা বিজাতীয় ভোগ সর্ব্বস্ব জীবন যাত্রার প্রতি লোভে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্তই আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

গতশতাব্দীতে যাহারা বিজাতীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাঁহারা একটি স্বতন্ত্র সমাজের লোক ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের কোন যোগ ছিল না। স্বরাজ আন্দোলন এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যে বেষ্টনী ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালী-সাহেবদের খদ্দরের অন্তরালে বিলাতীয় মনটি ঠিকই থাকিয়া গিয়াছে। তাহাদের মনের বিজাতীয় আদর্শ টা এখন সমগ্র শিক্ষিত সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সমাজে যে আজ সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহা বাঙ্গালীর নিজস্ব সাহিত্য নয়—বাঙ্গালী জীবনের অন্তঃস্থলের অভিব্যক্তি নয়। সে জন্ত ইহা অসত্য ও নির্জীব। এই দুর্দ্দিনে দুই একজন মাত্র কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী যেমন করিয়া আঁচলের আড়ালে তুলসী তলের দীপটিকে বায়ুপ্রবাহ হইতে রক্ষা করেন সেইভাবে আমাদের নিজস্ব জাতীয় আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্য না থাকিলেও জাতির স্বাভাবিক ও প্রকৃতিস্থ শক্তিতে এ যুগে যতটুকু সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারিত অনুকূল অবস্থা, ব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার অভাবে তাহাও হয় নাই। দেশে সৎসাহিত্যের যাহাতে সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রচার হয়, সে জন্ত দেশের পক্ষ হইতে যে চেষ্টা চলিতে পারিত তাহাও হয় নাই। সমাজের ভাগ্য বিধাতাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম তাঁহাদের কাছে সাহিত্য অপেক্ষা পাটের মূল্য ঢের বেশী। দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সাহিত্যসংসদ্, পাঠকসম্প্রদায়, গ্রন্থ-প্রকাশকগণ, যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যগুরু সকলেই কিছু-না-কিছু আনুকূল্য দান করিলে দেশে সৎ-সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে। জাতীয় জীবনের আত্মাভিব্যক্তির ব্যাকুলতা ছাড়া অন্ত কিছু সাহিত্যিক প্রতিভার সৃষ্টি করিতে পারে না, কিন্তু যাহার মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা অঙ্কুরিত অবস্থায় আছে, তাহার উন্মেষ সাধনে দেশের লোক উৎসাহ, পরিচালনা, প্রেরণা, প্রবর্ত্তনা দান করিতে পারে। দুঃখের বিষয় এ দেশে তাহা পাওয়া ত' যায়ই না বরং এ দেশের লোক নানাভাবে বাধাই দিয়াছে। দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থকরী ও জীবিকার্জ্জনী বিদ্যা শিখাইবার জন্ত পরিকল্পিত ও পরিচালিত। সাহিত্যও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পাঠ্যসূচিতে স্থান পাইয়াছে কিন্তু সাহিত্যের পাঠনায় সাহিত্যের মর্ম্ম অপেক্ষা সাহিত্যের চর্ম্মের দিকেই তাহাদের দৃষ্টি বেশী। ভাষা ও ভূষার দিকে যতটা দৃষ্টি তাহার রসের দিকে ততটা নয়। পরীক্ষার প্রকৃতি এবং পঠন পাঠনার পদ্ধতি দেখিলেই বুঝা যায়।

পরীক্ষাসর্ব্বস্ব শিক্ষায় পরীক্ষার আদর্শও অনেকাংশে অনুন্নত হইয়া-পড়িয়াছে। সেই সঙ্গে পঠন পাঠনার আদর্শও নামিয়া গিয়াছে। পরীক্ষার তাড়নায় শিক্ষার্থিগণ সাহিত্যের পুস্তিকা অপেক্ষা তাহার বোধিকার উপর জোর দেয় বেশী। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কোন বাধাই দেয় না। বাঙ্গালা সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কোন লাভ হয় নাই, বিন্দুমাত্র মর্য্যাদাও তাহার বাড়ে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকৃষ্টতম নিদর্শনগুলি প্রায়ই ছাত্রগণের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হয় না এবং ইহার পঠন-পাঠনা ও পরীক্ষার আদর্শ অত্যন্ত অনুন্নত।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞান, কৃষিবিদ্যা, ইতিহাস, ভূবিদ্যা সম্বন্ধীয় নিবন্ধে ভারাক্রান্ত সাহিত্যের সংকলন পুস্তকগুলি দেখিলেই আমাদের শিক্ষাবিভাগের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এইরূপ স্থলে এই শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ লেখকগণ যেমন সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে পারেন না, অন্যদিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তেমনি রসদীক্ষা লাভ

করেন না। তাঁহাদের সাহিত্য-বিচারশক্তি উন্মেষিত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধারণ ভদ্রসম্প্রদায়ই সাহিত্যের সম্পাদক ও পৃষ্ঠপোষক। ইঁহাদের রসতৃষ্ণা মিটাইবার জন্যই সাহিত্য। ইহাদের রসজ্ঞতার উপরই সাহিত্য সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। রসজ্ঞতায় উদরান্নের সংস্থান হয় না। কাজেই চেষ্টা করিয়া কেহই বড় ইহা অর্জ্জন করে না। যে বস্তুতান্ত্রিক ভোগ লক্ষ্য নীরস শিক্ষা লেখকদিগকে আদর্শভ্রষ্ট করিতেছে, তাহাই শিক্ষিত পাঠকসম্প্রদায়কে সাহিত্যের প্রতি বিরক্ত করিয়া তুলিতেছে। সাহিত্যের আনন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বেশভূষা-ধারণের আনন্দ, উৎকৃষ্ট যান আরোহণের আনন্দ যাহাদের কাছে ঢের বেশী বড়, তাহারা সাহিত্য পাঠে শক্তি ক্ষয় না করিয়া যাহাতে মোটর কিনিবার সঙ্গতি হয় তাহারই চেষ্টা করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? দেশে সৎসাহিত্যের যে সৃষ্টি হইতেছে না, তাহার একটি কারণ এই তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের সাহিত্য-বিরাগ ও রসজ্ঞতার অভাব।

এতদিন ধরিয়া দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের পঠন পাঠনা হইতেছে অথচ আজিও শিক্ষিত সমাজ এমন কি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ একটা পদ্য ও একটা প্রকৃত কবিতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারেন না। শুধু তাহাই নয়, আমাদের শিক্ষিত সমাজ একজন সাহিত্যিকের চেয়ে সাহিত্যের একজন হিসাবরক্ষক, তদারককারী, ও ফুলপঞ্জীকারকে ঢের বেশী মর্য্যাদা দান করেন। যে মর্য্যাদাটুকু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে লাভ করিলে সাহিত্যিকের আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস ও নির্ভর বাড়িতে পারিত সৃজনীশক্তি সমুৎসাহিত হইতে পারিত সাহিত্যিকরা তাহাও পান না।

সকল দেশে যেমন রসজ্ঞসংসদ থাকে এ দেশে তাহা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। এ দেশে দু'চারিটি তথাকথিত সাহিত্য সংসদ যাহা আছে তাহা রসজ্ঞ বিদগ্ধজন লইয়া গঠিত নয়, যাহারা চাঁদা দিতে পারে এমন লোক লইয়াই গঠিত। ঐরূপ সংসদ হইতে সাহিত্যিকগণ কোন প্রকার আনুকূল্য লাভ করেন না। সাধারণতঃ তাঁহারা মৃত সাহিত্যিকদের শ্রাদ্ধতর্পণাদি করেন অথবা সাহিত্যের কঙ্কাল লইয়া গবেষণা করেন। এগুলির সহিত মা সরস্বতীর সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তাঁহাদের অধিনায়কত্ব করেন লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা। তাঁহারা যাহা কিছু বাংলায় লেখা ও ছাপা হয় তাহাকেই সাহিত্য আখ্যা দেন। তাঁহাদের কাছে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, দর্শন দার্শনিক সাহিত্য, সংবাদপত্রের রিপোর্ট সাংবাদিক সাহিত্য। এইরূপ সাময়িক পত্রগুলি সৎসাহিত্য সৃষ্টির প্রণোদনা দান করিতে পারে। সাময়িক পত্রের পরিচালকগণ যদি সাহিত্য-রসজ্ঞ কিম্বা সাহিত্য স্রষ্টা হন তাহা হইলে তাঁহারা দেশে সাহিত্যের একটা উচ্চ আদর্শ প্রবর্ত্তন ও প্রচার করিতে পারেন, লেখকদের মনে সৎসাহিত্য সৃষ্টির আগ্রহ উন্মেষিত করিতে পারেন, সাহিত্যক্ষেত্রে শাসন ও পরিচালনার কাজ করিতে পারেন, কু-সাহিত্যের প্রসার রোধ করিতে পারেন, সৎসাহিত্যের প্রচারের সহায়তা করিতে পারেন, সুসাহিত্যিকের আবিষ্কার করিতে পারেন, যাহার দ্বারা যে শ্রেণীর সাহিত্যের রচনা সম্ভব হইতে পারে তাঁহাকে তাহাই রচনা করিতে প্রণোদিত করেন। এই শ্রেণীর সাময়িক পত্রকে অবলম্বন করিয়া এক একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী ও পরিবেষ্টনী গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহার দ্বারা সৎসাহিত্য সৃষ্টির যথেষ্ট আনুকূল্য হইতে পারে। বঙ্গদর্শন, ভারতী, বালক ও প্রবাসী এক সময় এই কাজ করিয়াছিল। সাময়িকপত্রের এখন আর সে দিন নাই, মাসিক পত্রগুলি এখন ক্রমে গ্রন্থ-বণিকদের ও অরসিক অসাহিত্যিক মূলধনীদের হাতে পড়িয়া গিয়াছে। সাপ্তাহিকগুলি টকি থিয়েটার বায়োস্কোপওয়ালাদের তাঁবেদারি করিতেছে। অল্পশিক্ষিত মহিলা ও স্কুল কলেজের ছাত্ররাই এখন সাময়িক পত্রের পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা। যেমন পাঠক-পাঠিকা লেখাও তেমনি ছাপিতে হয়। সাময়িক পত্রগুলিতে সৎপ্রবন্ধ ও কবিতার স্থান ক্রমেই শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। প্রবন্ধ পত্রিকার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধির জন্য। অতএব নামজাদা পণ্ডিতের গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হয় এবং কবিতা নির্ব্বাচিত হয় পাদপূরণের জন্য। সে জন্য বিচারের প্রয়োজন হয় না। ইহা ছাড়া কতকগুলি চিত্র বহুল রিপোর্ট প্রবন্ধ বলিয়া চালানো হয়। অপাঠ্য কুপাঠ্য গল্পেই কাগজগুলি বোঝাই। আজকালকার সাময়িক পত্র সৎসাহিত্য সৃষ্টির কোন সহায়তাই করে না।

সাময়িকপত্রসেবীদের ন্যায় প্রকাশকগণও সাহিত্য সৃষ্টির সহায়তা করিতে পারেন। অন্যান্য দেশে শুনিতে পাই প্রকাশকরাই চেষ্টা করিয়া সদ্‌গ্রন্থ লেখান—লোকরুচি

তাঁহারাই পরিবর্ত্তন করান, তাঁহারা লোকরুচির দাসত্ব করেন না। সমালোচকদের মারফতেই লেখকগণ বিশেষতঃ নবীন লেখকগণ সৎসাহিত্যের আদর্শ লাভ করেন। দুঃখের বিষয় এ দেশে সমালোচনার কোন পাঠই নাই।

দরিদ্র দেশে সাহিত্যের পুষ্টি হওয়া কঠিন। এ দেশে যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের অনেকেরই জীবিকা-অর্জ্জনেই অধিকাংশ শক্তি, সামর্থ্য, মনোযোগ ও সময় ব্যয়িত হয়। সাহিত্যকে জীবনের ব্রত করিয়া তুলিবার সুযোগ তাঁহাদের হয় না। আর যাঁহারা সাহিত্যকে উপজীবিকা করিতে বাধ্য হন, উদরান্নের জন্য তাঁহাদিগকে লোকের মন যোগাইয়া অবিশ্রান্ত কলম চালাইতে গেলে, চিন্তা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও গ্রন্থাদি পাঠ করিবার শক্তি সঞ্চয় করিবার অবসর থাকে না? শক্তিমান্ সাহিত্যিকদেরও তাই অপাঠ্য কুপাঠ্য অনেক কিছু লিখিতে হয়, ক্রমে সৎসাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। প্রকাশকরা এদেশে লোকরুচির দাসত্ব করিয়া থাকে। সাহিত্যের অর্থ তাহারা বুঝে অপাঠ্য কুপাঠ্য গল্প উপন্যাস। যাহারা কেনে তাহারাও তাহাই চায়। সবই তারে তারে গাঁথা। সৎসাহিত্যের গ্রন্থ তাহারা প্রকাশ করিতে চায় না, স্বতই লেখকের মনে সৎসাহিত্যের গ্রন্থ লিখিতে আগ্রহ হয় না, যাঁহাদের অন্তরের প্রেরণা অসাধারণ তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাঁহাদের অন্তরে সৎসাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, তাঁহারাও বাধ্য হইয়া প্রকাশকের চাহিদা মিটাইতে বাধ্য হ'ন। প্রকাশকের অভাবে অনেক রচনা গ্রন্থাকার লাভ করে না। তাহাদের মধ্যে কত উৎকৃষ্ট সাহিত্য লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যাইতেছে কি না তাহাই বা কে জানে? প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে একথা অন্ততঃ বলা যায়।

রসজ্ঞ সম্প্রদায় সাহিত্য উপভোগ করেন, সমালোচক সম্প্রদায় শুধু উপভোগ করেন না, রচনা কেন উপভোগ্য হইয়াছে তাহাও বলেন। রসাদর্শের বিচারে কোন রচনা সাহিত্য হইয়া উঠে নাই এবং কেন হয় নাই তাহাও বলেন। ইঁহারা মুখেই বলেন না, ছাপার অক্ষরে মতামত প্রকাশ করেন। এই সমালোচনা যদি যুক্তি সঙ্গত ও রসাদর্শ সম্মত হয়, তাহা হইলে এক দিকে যেমন সৎসাহিত্য সৃষ্টি প্রণোদিত হয়, অন্যদিকে তেমনি অপকৃষ্ট রচনার প্রসার-হ্রাস হয়। লেখকগণ যেমন তাঁহাদের রচনায় পরিচালনা লাভ করেন, তেমনি তাঁহাদের লেখনী শাসিত ও সংযত হয়। যাহাদিগকে উদরান্নের জন্য প্রাণপাত করিতে হয় না—অথচ যাহাদের সাহিত্য রচনার শক্তি আছে—এমন সাহিত্যসেবীরাও সাহিত্য রচনা করিতে পারেন না; তাহার জন্য দায়ী এ যুগের ভোগ-লোলুপতা। ভোগসর্ব্বস্ব আদর্শ নাগরিক জীবন যাপনের লোভে তাঁহারা সাহিত্যকে জীবনের ব্রত করিয়া তুলিতে পারেন না। সাহিত্য সাধনা একটা তপস্যা—কঠোর আত্মসংযম ও যথেষ্ট আত্মোৎসর্গ ব্যতীত এ সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায় না। যে যুগের চারিদিকে তপোভঙ্গের আয়োজন সে যুগে সাহিত্য সাধনা অত্যন্ত কঠিন। একদিকে ইন্দ্রিয়ার্থের ভোগ অন্য দিকে সাহিত্য সাধনার যোগ চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে—এ-ক্ষেত্রে ভোগেরই জয় হয়। বলিষ্ঠ জাতির লোকের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা—দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে সুযোগ থাকিলে ভোগে আত্মবিসর্জ্জনই স্বাভাবিক।

সাহিত্যসাধনার জন্য বিদ্যার্জ্জনেরও প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু বিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য যে শক্তির অপচয় হয় তাহার আর পূরণ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণের নিকট আমরা সাহিত্যের দিক হইতে কিছুই পাই না। তাহারা ডিগ্রির পর ডিগ্রি বাড়াইবার জন্যই সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন। ইহাও একপ্রকার তপস্যা, কিন্তু এ-তপস্যা ভোগবতী তীরে—সরস্বতী তীরে নয়। তাঁহাদের জীবনে বিদ্যার সহিত সুন্দরের মিলন হয় না। সৃজনীশক্তি কিছু থাকিলেও ডিগ্রি-শৈলের দুরারোহ পথেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এদিকে যে সকল তরুণের চরিত্রবল আছে—আত্মত্যাগ করিবার শক্তি আছে—তাহারা কল্পিত জাতীয় সৌভাগ্যের স্বপ্নে মুগ্ধ হইয়া লোক সমাজ হইতে বাহিরে জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ কাটাইতে বাধ্য হয়। দেশের তারুণ্যের শ্রেষ্ঠাংশই যদি বাদ গেল—তবে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিবে কাহারা?

দেশের রাজনীতির অতিরিক্ত প্রতিপত্তিও সাহিত্যের কম ক্ষতি করে নাই। দেশের লোকের মন যেমন সাহিত্য হইতে বিকৃষ্ট হইয়া রাজনীতিতে নিবদ্ধ হইয়াছে—বহু সাহিত্যিক তেমনি সাহিত্য সাধনা ছাড়িয়া রাজনীতিতে মাতিয়াছেন—

আবার কেহ কেহ সাহিত্যের মধ্যে রাজনীতি ঢুকাইয়া সাহিত্যকে নষ্টও করিয়াছেন।

পল্লীজীবন হইতে বিচ্ছেদের ফলে দেশের প্রাণের সহিত বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের যোগসূত্র ছিন্ন হইতেছে, তাহাতে একদিকে যেমন ভাষা unidiomatic ও anglicised হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যে vitality কমিয়া যাইতেছে। যে কয়জন লেখকের জীবন পল্লী প্রকৃতির অঙ্কে পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং পল্লী অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গালা দেশের সহিত যাহাদের প্রাণের যোগ আছে—তাহারাই সাহিত্যে কিছু দিতেছেন।

দেশে বিদেশীয় ক্রীড়া-কৌতুকের অতিরিক্ত প্রসার ও সিনেমা টকির অতিরিক্ত প্রতিপত্তি সাহিত্য-সেবার একটি অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। এই গুলিতে লোকে অনায়াস লভ্য লঘু-চটুল আনন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়—তাহাদের আনন্দ তৃষ্ণা মিটিয়া যায়—সাহিত্যের আনন্দ লাভের আর আগ্রহ থাকে না।

অপাংহি তৃপ্তায় ন বারিধারা।
স্বাদু সুগন্ধি স্বদতে তুষারা॥

ইহাতে সাহিত্যের উপভোক্তার সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। লেখকদেরও রসসৃষ্টির আনন্দের চেয়ে এই শ্রেণীর লঘু তরল আনন্দ স্পৃহণীয় হইয়া উঠিতেছে।

সাহিত্যিকদের মধ্যে দলাদলি দ্বেষাদ্বেষি ও পরস্পরকে অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিবার চেষ্টাতেও সাহিত্যের ক্ষতি অল্প হয় নাই।

ভ্রান্ত আদর্শ, ভ্রান্ত জীবন তত্ত্ব ও অন্ধ অনুকরণও সাহিত্যের দুর্গতির জন্য দায়ী। ইংরাজি সাহিত্যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দাবী ও গণশক্তি রাজত্ব করিতেছে, সৌন্দর্য্যের বদলে শক্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, রসসৃষ্টি অপেক্ষা সত্যপ্রচারই কবিধর্ম্মে অধিকতর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, যাহা কিছু Ramantic যাহা কিছু Conventional তাহার বিরুদ্ধে অভিযান চলিয়াছে, জীবন ও সাহিত্যের প্রত্যেক ধারণা, প্রত্যেক আদর্শ, প্রত্যেক তথ্যের নূতন করিয়া মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছে, বর্ত্তমান ইংরাজি সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকগণ সকলেই Challengers and preachers. মোটের উপর ইংরাজি সাহিত্যে একটা Experimental Stage চলিয়াছে।

ইংরাজি পুস্তকের মারফতে ইংরাজি সাহিত্যের যুগধর্ম্ম আমাদের সাহিত্য ও সমাজকে আক্রমণ করিতেছে। আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সহিত ইহার কোন মিল নাই। মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। যাহা স্বাভাবিক অপরিহার্য্য ক্রম অনুসারে ইংলণ্ডে আসিয়াছে, তাহার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? এ দেশের মাটিতে যাহার মূল নাই এ দেশে তাহার মূল্যও নাই, আমাদের জাতীয় জীবনে যাহার আশ্রয় ও অবলম্বন নাই, তাহা লইয়া কোন সৃষ্টিই চলে না।

এই সত্যটি আমাদের লেখকগণ না বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের শক্তিসামর্থ্যের অপব্যয় করিতেছেন। দেশের ভিতর ও বাহির দুই দিক হইতে এত অন্তরায় উপস্থিত হইলে কি করিয়া সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হইবে?

নাগপাশ

শ্রীসুদীপ্তকুমার ভট্টাচার্য্য

আকাশ বাতাস মেঘ ফুকারিছে যেন,
ধরণীর ধূলিকণা ফেলে দীর্ঘশ্বাস;
শান্তির নামে এত বিশৃঙ্খলা কেন?
মানব জীবন লয়ে এ কি পরিহাস!
লোলুপ সভ্যতা ঐ মেলিয়াছে শিখা,
দিক্ হ'তে দিগন্তরে গর্জ্জে অবিরত,
বিষণ্ণ অম্বর বুকে শোক-চিহ্ন লিখা;
উচ্ছ্বাস উঠিছে শুধু হাহাকার শত।
তাণ্ডবের নৃত্যতালে জ্বলেছে অনল,
নাগিনীর তপ্তশ্বাসে ভরেছে বাতাস;
পুড়ে যায় মানবের ফুলের ফসল,
আবর্ত্তের ঝঞ্ঝাবাতে রুদ্ধ হয় শ্বাস।
মূঢ় নর অর্ব্বাচীন পরম আদরে,
বর্ব্বর সভ্যতার মায়াজাল পরে।

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

বার

যে যুব সম্প্রদায়ের কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, এবার সে সম্বন্ধে কিছু বিবৃত করিব।

নরেন্দ্রনাথ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেদান্ত শিক্ষাই দিতেন না—মহাপ্রাণবান্ মানুষ ছিলেন তিনি—জীবে শিব জ্ঞান করিয়া লোক সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। জীবন গঠনে যে ভাবগুলি দরকার (Posters ideals) যুবকদিগকে তিনি তাহা শিখাইতে লাগিলেন, আর ভুলভ্রান্তি না দেখিয়াও মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া বঙ্গযুবকগণকে শিখাইতে লাগিলেন—

"বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো তোমরা মানুষ, বিশ্বাস করো তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম, বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম।"

নরেন্দ্রনাথের কথায় বাঙ্গালী যুবক জাগিতে লাগিল, চেতনা পাইল আর বিশ্বাস করিল যে, তাঁহার শক্তি অসীম। বঙ্গযুবক এখন নরসেবায় গা ঢালিয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন, কর্ম্মশিক্ষা দিলেন, প্রেমে সকলকে বশীভূত করিলেন। নরেন্দ্রনাথও রামকৃষ্ণদেবের উপযুক্ত শিষ্যই ছিলেন—রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচার করেন, "যত মত তত পথ"। সকলেই তাঁহার কাছে সরল উপদেশ পাইত, তাঁহার পদতলে বসিয়া শ্রান্তি অপনোদন করিত। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

কভু রোষান্বিত হন, জনক জননী
সহোদর পর,
ভয়ঙ্করী বিকম্পিতা কভু বা ধরণী
শয্যাগৃহে সর্পের বিবর
প্রেমহীন পত্নীর অন্তর।
ধনে হয় পুত্র প্রাণহর,
স্নেহ মায়া পাশরিয়া, দুষ্ট কন্যা দহে হিয়া
শত্রু প্রায় স্বজন প্রথর।
অবিশ্বাসী পুত্র সম পালিতে কিঙ্কর।
ভাবান্তর নাহি মাত্র, তব করুণায়
হে দীন-শরণ
মাগে বা না মাগে কৃপা বিলাও ধরায়
বরিষার বারি বরিষণ
বিধবার ধনাপহরণ
জীবহিংসা চরিত্রস্খলন
ত্যজি কন্যাপুত্র নারী পাপাশক্ত অত্যাচারী
লোকত্যজ্য ঘৃণিত জীবন
তব দ্বার মুক্ত তার পতিত পাবন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

এই প্রেম লইয়াই পরমহংসদেব আপামর সাধারণ বশ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথও এই প্রেমেই বশ হইয়াছিলেন। যৌবনে নরেন্দ্রনাথ চঞ্চল হইয়া সব ধর্ম্মনেতাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মহাশয়, আপনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি?"

কোথাও তিনি এই কথার উত্তর পান নাই। এমন কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাকে তৃপ্তি দান করিতে পারেন নাই। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের কাছে ইহার উত্তর পান।

নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত গুরুর প্রকৃত শিষ্যই হইয়াছিলেন। তিনি আপামর সাধারণে প্রচার করেন 'ভারত অমর'—India can not be killed—আর তাঁহার অন্তর্ধানের পর হইতেই (১৯০২) ভারত শুধু ধর্ম্মজীবনে নয়—কর্ম্মজীবনেও ধর্ম্মে-কর্ম্মে, শিক্ষায়, জাতীয়তায়, সর্ব্বজাতি সম্মিলনে সর্ব্বধর্ম্মসঙ্ঘে নূতনের সন্ধান পাইলেন। বস্তুতঃ ১৮৯৭ হইতে ১৯০২ পর্য্যন্ত বিবেকানন্দেরই যুগ বলিতে হইবে। জাতীয়তাই বল, (Nationalism) প্রেমধর্ম্মেই বল, দেশপ্রাণতাই বল, (Socialism), বিবেকানন্দই নূতন ভারতের প্রবর্ত্তক!

সদনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিতে হইলে সকলকে বিবেকানন্দ তিনটী বিষয়ে লক্ষ্য করিতে বলিতেন—

If you wish to do good to your country, whenever it be, three things are necessary. The first is to feel. Do you really feel for your brothers? Do you really feel how much misery there is in the world, how much ignorance and superstition? Do you really feel that men are your brothers? Does this idea fill your whole being? Does it run in your very blood? Does it tingle in your veins? Does it course through every nerve and filament of your body? Are you full of that idea of sympathy? If you are, that is only the first step.

প্রথম লক্ষ্য তোমার বোধশক্তি। এই যে তোমার অসংখ্য ভ্রাতৃবৃন্দ, কুসংস্কার আচ্ছন্ন অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত—তাহাদের অভিযোগ, অভাব, দুঃখদৈন্য তা কি তোমার অন্তরে বিঁধে, তুমি কি প্রাণে প্রাণে অনুভব কর যে তাহারা প্রকৃতই অতি দীন? তাহাদের জন্য তোমার হৃদয়ে কি ভালবাসা আছে, তোমার শিরায় শিরায় তাদের অভাব কি তোমায় জর্জ্জরিত করে, তুমি সত্যই অনুভব কর? যদি তোমার এই অবস্থা আসিয়া থাকে, ইহারই নাম বলিব ব্যাকুলতা।

তুমি ঐ অভাবমোচনের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইয়াছ কি না। তাহা অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়াই তোমার পরবর্ত্তী কার্য্য হইবে।

You must next ask yourself whether or not you have found out a remedy.

তৃতীয়তঃ তোমাকে দেখিতে হইবে তোমার উদ্দেশ্য কি পরহিত সাধন না স্বার্থান্বেষণমূলক?

Are you sure that you are not excluded by greed of gold, by thirst for money or love of power?

গিরিশচন্দ্র

উচ্চ আশ উন্নতি প্রয়াস
আছে কি গোপনে ধরি
স্বদেশবৎসল ভাব
আধিপত্য লিপ্সা কিম্বা ভারতের হিত
চালিত অন্তর তব?

তারপর আপনার পরহিত সাধনে আপনি কি সর্ব্বস্বার্পণ করিতে পারেন? যিনি পারেন তিনি সর্ব্বত্যাগী, আর তাঁহার দ্বারা বিরাট কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা হইলেই—

Then indeed you are a reformer, you are a teacher, a master and we ought to meet at your feet, short of this you are not for the reverence.

নরেন্দ্রনাথের কাছে বঙ্গযুবকগণের সর্ব্বদাই ছিল মুক্ত-দ্বার। কর্ম্মেচ্ছু যুবকগণকে তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়া কার্য্যে উদ্দীপ্ত করিতে লাগিলেন। বঙ্গযুবকগণ এক নব আলোকে উদ্ভাসিত হইলেন। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে বঙ্গযুবক ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইল।

নরেন্দ্রনাথ রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন না বটে, কিন্তু সেবাধর্ম্মের মধ্য দিয়া এমন স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, বঙ্গযুবক তাঁহারই সেবাধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া স্বদেশিকতার প্রথম ধাপ অভ্যাস করিতে লাগিলেন ও গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

Are you really sure that you can stand by your ideals, and work on even when the whole world seeks to crush you? Are you sure that you are not misled, that you know and desire and will perform your duty and that alone you can even if your life be at stake?

বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ তখন একটী জাতীয় সম্পদ। গিরিশ ঘোষ উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা, নিজেই তিনি নাট্যকার ও নটশ্রেষ্ঠ। রঙ্গমঞ্চের সহায়তায় তিনি জাতীয়তা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতারূপে গুরু ও শিষ্যের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। ১৯০০ সালে গিরিশ বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম লইয়া পুরাতন "প্রচার" অবলম্বনে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যই যে ভারতের মঙ্গল তাহা ঘোষণা করিয়া যান। সীতারামের বীরত্ব, শ্রীর বীরাঙ্গণার তেজস্বিতা এবং চাঁদশাফকিরের হিন্দু মুসলমানে সমদর্শিতা রঙ্গমঞ্চে বঙ্গযুবককে প্রভাবান্বিত করিল। এই শুভ মুহূর্ত্তে আবার গিরিশ রঙ্গমঞ্চের সহায়তায় বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকট করিয়া ভ্রান্তি নাটকের অভিনয় করেন (১৯০২, জুলাই)।

ভ্রান্তির রঙ্গলালই এই প্রকৃষ্ট সেবা-ধর্ম্মব্রত কর্ম্মী বাঙ্গালী যুবকের আদর্শ। বিবেকানন্দ যেমন বলিতেন, "চাই একদল শক্তিশালী যুবাপুরুষ, তাদের দৃঢ় মাংসপেশী, কর্ম্মঠ দেহ, হৃদয় উন্নত, প্রফুল্ল অন্তঃকরণ, বন্ধনমুক্ত প্রাণ।" রঙ্গলালের শক্তির পরিচয়েও উদয়নারায়ণের মুখে পাওয়া যায়—

এখনি স্বচক্ষে আমি করেছি দর্শন
নিরস্ত্র একাকী
পঞ্চজন অস্ত্রধারী করেছে দমন
বহুকষ্টে ধরেছে তোমায়।

এই স্বদেশ ভক্ত (কেন না জননী জন্মভূমির কার্য্যে তিনি তৃণের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে পারেন) কর্ম্মীর প্রকৃত পরিচয় বীরাঙ্গনা গঙ্গার মুখে পাওয়া যায়। গঙ্গা বলিতেছে—

"পড়াশুনাও কর, বাবুয়ানাও কর, ইয়ারকিও দাও, চিকিৎসাপত্রও ক'রে থাক, যে থাও করোনি খবর পেয়েছি, মেয়ে মানুষের কাছেও যাও না। আজ ক' বছরের কথা, আমি ঠাকুরতলায় সন্দি গর্ম্মি হ'য়ে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ি, বেশ্যা ব'লে ঘৃণা ক'রে কেউ মুখে একটু জল দিলে না, তুমি তুলে এনে তোমার বাড়ীতে নিয়ে এসে আপনি নীচেয় শুয়ে নিজের বিছানায় জায়গা দিলে। যে যত্ন ক'রলে ভালবাসার লোকও সে রকম করে না, তারপর যখন ভাল হয়ে আমি বাড়ী যাই, তুমি যেন আমায় চেনই না।"

স্বামী বিবেকানন্দ

কিন্তু এরূপ কার্য্য সাপ নিয়া খেলা বই কিছুই নয়। যে সে ইহা পারে না। যে ব্যক্তি আত্মাভিমান বর্জ্জন করিয়া পরের জন্য আপনাকে বলি দিতে সমর্থ, আর কামক্রোধাদি রিপুবর্গ যাহার আয়ত্তাধীন সেই পারে। আর তাহার সাহস ও শক্তিও অসাধারণ। তাই নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ স্বয়ং যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"আচ্ছা ফকির, তোমরা মন্‌মে এত্তা বল ক্যায়সে?

তোমরা এত্তা জোর ক্যায়সে ? তোমার নবাবকো নেহি মানো ?”

রঙ্গলাল উত্তর করিতেছেন—

“নবাব সাহেব, ভারী সোজা আবার ভারী শক্ত, আমি যদি আপনার জন্ম বাঁচতেম, তা হ’লে তোমারই মত আমার প্রাণে দরদ হ’তো। মরতে চাইতেম না। কিন্তু আমার মনে কি হয় জান ? যে মরবার সময় পর্য্যন্ত যদি হাত উঠে তা হ’লে একটা পরের কাজ ক’রে যাব, আমি পরের জন্ম বেঁচে আছি, এক মরণ ভয় গেলেই সব ভয় গেল।”

বস্তুতঃ, কি নর-সেবায়, কি স্বদেশ-ব্রতে, কি ধর্ম্মাচরণে মৃত্যুভয় গেলেই মানুষের প্রাণে অজেয় শক্তি সঞ্চারিত হয়। কাপুরুষের প্রাণে কোন বিষয়েই দৃঢ়তা স্থায়ী হয় না, মৃত্যুভয় থাকিলে আত্মত্যাগও সম্ভব নয়।

রঙ্গলালও গঙ্গাকে বলিতেছে—

“পরের দায় মাথায় নিলে আপনার দায়ে নিশ্চিন্ত হবে। অতোটা ঘোর থাকবে না।”

আর এই পরকার্য্যে প্রকৃত সেবাধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ধর্ম্ম বা মুক্তি কোন কামনাই করেন না—তাই রঙ্গলাল বলিতেছে—

“যে ধর্ম্মের জন্ম পরের কাজ করে, সে আপনাকে বিলোতে পারে না, সে ব্যাটার মনে ধোকা আছে, মরতে ভয় আছে। সে ব্যাটা ভাঁচে কি জানেন ? পারে যদি ম’রে একটা কিছু আমোদ ক’রবে, বেহস্ত যাবে, স্বর্গে যাবে, বৈকুণ্ঠে যাবে, খুব আমোদে থাকবে। আমি ওসবের অতো তোয়াক্কা রাখিনে। খিদে পেলে খেলেম, ঘুম পেলে ঘুমুলেম—”

রঙ্গলালের প্রকৃত চরিত্র বুঝাইবার জন্ম নিম্নলিখিত কয়েকটা কথা উপহার প্রদান করিব।

গঙ্গা বলিতেছে—আচ্ছা তোমার পরের জন্ম মাথাব্যথা কেন ? তুমি তো ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাই মানো। এইতো মায়ের সামনে একবার মাথাটাও নোয়ালে না।

রঙ্গলাল। মার কোলে ছেলে থাকে, ক’বার প্রণাম করে বল ? ক’বার স্তবস্তুতি করে ? ক’বার বলে, তুমি হ্যান, তুমি ত্যান ? ক্ষিদে পেলে, দরকার হ’লে এসে এসে মার পায়ে যে মাথা খোঁড়ে না, তাতে কি মা বেজার হয় ? তবে সৎমা হ’লে নানা কথা কইতে হয় বটে। বলতে হয়, মা গো, জননী গো, আর মনে হয়, সর্ব্বনাশী গো, কখন কি ত্রুটি হবে গো, অমনি ঘাড় ভাঙ্গবে গো ; তাই মুখে বলতে হয়, তুমি জননী গো, তুমি কি না পার গো !

গঙ্গা। তবে তুমি মাকে মান ?

ভগিনী নিবেদিতা

রঙ্গলাল। অমন পাথুরে মাকে মানি না মানি তাতে বড় এসে যায় না ; দেখ না, এক পোড়র মুখ নিয়ে প’ড়ে আছেন, না হয়, জিব বের করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বলি, থাক মা, বিল্বপত্রের গাদায়, টিকিদাস ভট্‌চাযি্যর মুখে “চিড়িং চাড়াং ফিড়িং ফাড়াং” শোনো।

গঙ্গা। তুমি নাস্তিক নাকি ?

রঙ্গলাল। আমি নাস্তিক ! যে আমায় নাস্তিক বলে সেই নাস্তিক ; আমি অমন অন্ধকারে তীরন্দাজী করি না ! আমার দেবতা প্রত্যক্ষ ! আমার দেবতা

কথা কয়, আমার দেবতার প্রাণ আছে, আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়। আমার দেবতা পরম সুন্দর!

গঙ্গা। কে তোমার দেবতা শুনি?

রঙ্গলাল। মানুষ আমার দেবতা! যারে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান বলে—ভগবানের অংশ। শাস্ত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক আছে, এ কথার তর্কবিতর্ক নাই। আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ; যার সেবা করলে প্রাণকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না—ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, যে দেবতাপূজায় কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্কবিতর্ক নাই। দেখ বিবিজান, একবার মানুষের সেবা করে দেখ, প্রাণ তর্ হয়ে যাবে। এই তো ঢং ঢাং করে রোজগার করেছ, মনে মনে একবারও ওঠে, যতই মনকে চাপা দাও যে কাজ করাটা বড় ভাল কাজ হয় নাই। কিন্তু আমার দেবতার পূজা যদি করো, তাহ'লে মনে করবে, টাকা রোজগার করেছ সার্থক, ঠিকঠাক দেবতার পূজায় লেগেছে।

গঙ্গা। আমি ঠিক ঠাওরেছি, তুমি নাস্তিক।

রঙ্গলাল। কেন বিবি, বোঝ। বড় বড় টিকিদাস ভট্‌চাযিকে জিজ্ঞাসা করো, বলতে হবে, সকল মানুষেই মা আছেন; বড় বড় মোল্লা মানবে, খোদার অংশে সবাকার জান; পাদ্রীতে বলচে, ভগবান ফু ঝেড়ে মানুষ তৈয়ারী করেছেন; তাহ'লে আর আমি নাস্তিক কি ক'রে বল? "মা সর্ব্বময়ী-মা সর্ব্বময়ী" বলে পূজা দিয়ে গেল, মুখে বল্লেন, সর্ব্বভূতে মা আছেন, আর জীবজন্তু দূরে থাকুক, মানুষের বুকেই ছুরী দেন। একশ' টাকা ধার দিয়ে পাঁচশ' টাকা আদায় করে নিয়ে, তারপর তারে কয়েদ দিলে; ক্ষিদেয় একটা হাঁ-হাঁ করছে, আপনি পেট ঠাণ্ডা করে দরওয়ানকে বল্লে, "নিকাল দেও।" কিন্তু প্রতি হাতবল আছে, 'মা ব্রহ্মময়ি, তুমি সর্ব্বভূতে আছ'। তার মা বলা তাতেই থাক, অমন মা আমি বলতে চাই নে। তিনি কৈলাস প্রাপ্ত হোন, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হোন, তাতে আমার হিংসা নাই। মার কাছে আমার প্রার্থনা, তুমিও আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন দু' একটা ভুকো মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপছে, তাকে একখান কম্বল দিতে পারি, তাহলেই আমি চরিতার্থ হবো।

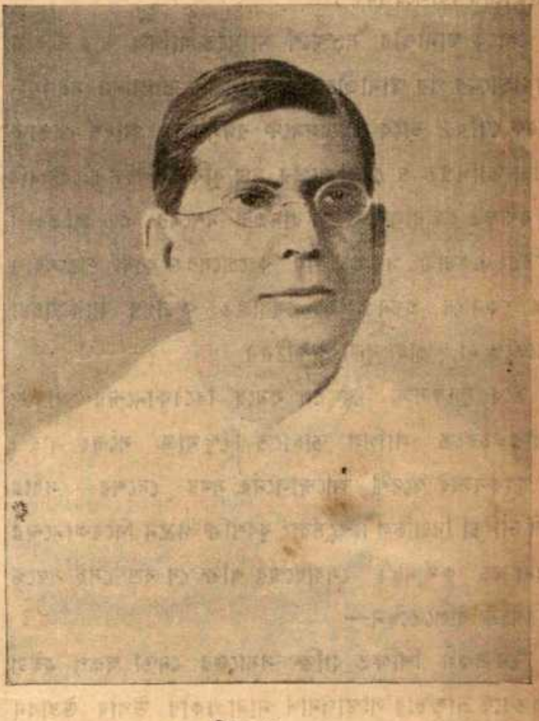

চিত্তরঞ্জন

গঙ্গা। ঠাকুর দেবতা মান না, তুমি নরকে যাবে।

রঙ্গলাল। মানি বই কি? আচ্ছা দেখ একদিন একজনকে, খুব ক্ষিদে পেয়েছে, চারটি খেতে দিও, খুব তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দিও, খেয়ে ব্যাটারা 'আঃ' করবে, শুনে যে তোমার সুখ হবে। কোন ব্যাটার চৌদ্দপুরুষে কল্পনার স্বর্গ সৃষ্টি করে, এত সুখ সৃষ্টি করতে পারে নাই।

এই নর-সেবায় রঙ্গলাল সামাজিক খুঁটিনাটি বাধানিষেধের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই চিকিৎসাকালীন নবাবের গৃহে মুসলমান প্রদত্ত অন্নভোজনেও দোষ না ধরিয়া নবাবকে উত্তর দিতেছেন, "খানা খেয়ে যদি হিন্দু মুসলমান হয়, তা হ'লে আপনি হিন্দু হয়েছেন, আপনার অসুখের সময় আমি গাঁদালের ঝোল রেঁধে খাইয়েছি।"

এই যে স্বাধীন, সুচতুর, স্বদেশভক্ত, বলিষ্ঠ, ভোগে-বীতশ্রদ্ধ, কামকাঞ্চনত্যাগী ও জাতিবিদ্বেষশূন্য চরিত্র গিরিশচন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন সবই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে। স্বামীজী প্রায়ই বলিতেন, "পরহিতায় সর্ব্বস্ব অর্পণ, এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস, ইচ্ছা হয় মঠফট সব বিক্রী ক'রে এই সব দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই।"

লোকে স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিতে লাগিল আর তাঁহার মহাপ্রস্থানের পর স্বামীজীকে না দেখিয়াও ত্যাগনিষ্ঠ সন্ন্যাসীদিগকে দেখিয়া ভাবে ও রঙ্গমঞ্চে রঙ্গলালের আদর্শ প্রত্যক্ষ করিয়া ত্যাগব্রত ও সেবা-ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া লইল। সেবায় সব বশীভূত হয় বলিয়া আজ রামকৃষ্ণ মিশনের এত প্রতিভা। জাতির একমাত্র গণপ্রতিষ্ঠান কংগ্রেসেরও কার্য্য পরসেবা। কিন্তু কেন যে এখনও এই সেবাব্রত কর্ম্মীগণ আঁকড়াইয়া ধরিতেছে না, তাহা বুঝা সুকঠিন।

তবে যুবকসঙ্ঘ যে সে সময়ে বিবেকানন্দের আদর্শে তৈয়ার হইতে লাগিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই যুবকসঙ্ঘই স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল। সুতরাং যুবশক্তি গঠনে বিবেকানন্দের সাধনা বড় কম নয়। সেবাধর্ম্মের শক্তি যে বড় সেই সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলিতেছেন—

"যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের নেতা স্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, তাহারা বুঝিবেন যে, সেই মহৎকার্য্য এই সকল সেবাব্রতধারী বালক ও যুবকগণের দ্বারাই সুসম্পন্ন হওয়া একমাত্র সম্ভব। মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, পার্শি, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী বিবিধ জাতি ইহাদের অদ্ভুত সেবা-দৃষ্টে পরস্পর জাতীয় বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবে। সেবাশ্রমভুক্ত সেবাগ্রাহিগণ যে জাতিরই হোক, সেবাশ্রমে আসিয়া বুঝিবেন যে, এই সকল বালকদের তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব নাই, কারণ সেবা ও সেবকদের ভিতর বর্ণগত, জাতিগত এবং ধর্ম্মগত প্রভেদ থাকিলেও ইহারা তাহাদিগকে সমভাবে সেবা করে। তাঁহারা নিশ্চয় অবাক হইয়া ভাবিবেন, ইঁহারা কারা? ইঁহারা কোন ধর্ম্মাবলম্বী। যে ধর্ম্মাবলম্বীই হোক আর যাহারা সেবা গ্রহণ করিতেছেন তাহাদের মতে ইঁহাদের ধর্ম্ম ভ্রান্তধর্ম্মই হৌক, কিন্তু এ বালকেরা যে তাহাদের ধর্ম্মের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এ কথা তাহাদের বুঝিতে হইবে নিশ্চয়। কারণ তাহাদের মতেও ত' নর-সেবা প্রধান ধর্ম্ম। প্রেমের অদ্ভুত প্রভাবে প্রেম দৃষ্টে প্রেম লাভ হয় এই অদ্ভুত সেবায় সেবকের প্রেমদৃষ্টে যিনি সেবা পাইতেছেন তাহারও হৃদয়ে ঐ রূপের প্রেমের উদ্দীপনা হইবে নিশ্চয়। তাহার জাতিগত, ধর্ম্মগত বিদ্বেষ উচ্চ দৃষ্টান্তে মলিন হইবে। সেবাগ্রাহীরা সুস্থ শরীরে সেবাশ্রম হইতে ফিরিয়া এই উচ্চাশয় যুবকবৃন্দের পরিচয় নিজ সমাজ মধ্যে প্রচার করিবেন এবং তাহা সেই সমাজে যিনি যিনি শুনিবেন তাঁহাদের বিদ্বেষ ভাবে আঘাত লাগিবে। বিদ্বেষ-শূন্যতাই একতার মূল।" —গিরিশচন্দ্রের স্বামী বিবেকানন্দ প্রবন্ধ।

তিলক

স্বদেশ-প্রাণতা ও দেশ সেবাব্রতে বাঙ্গালী যুবকের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ আদর্শ ঋষি। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইয়া বলেন—

"ঐ দেখ, আমাদের মা, দিগভূজা নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যা বিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী সরস্বতী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয় কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—উহাকে প্রণাম কর, স্মরণ কর, বন্দনা কর 'বন্দে মাতরম'।"

আর বিবেকানন্দ বলিলেন, "দেশবাসীর জন্ম অনুভব কর, কি উপায়ে কার্য্য করিব, চিন্তা করিয়া পথ খুঁজিয়া বাহির কর, আর সেই পথে কর্ম্মধারা প্রবাহিত করিয়া সর্ব্বস্ব অর্পণ কর।"

দুই মহাপুরুষের শক্তিতে আবার নূতন বাঙ্গালা গড়িয়া উঠিল। বাঙ্গালী মানুষ হইতে শিখিল।

অতঃপরে যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, বাঙ্গালী যুবক মাতৃভূমির পূজায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতেও দ্বিধা করিল না, অর্দ্ধোদয় যোগের সময় সেবায় আপামর সাধারণ নরনারীকে সেবায় বশীভূত করিল, মাতৃভূমির সেবায় আত্মবলিদানে অগ্রসর হইল। জাতীয়তা উদ্দীপনায় ভগিনী নিবেদিতার স্থানও খুব উচ্চে। এখানে একটু পরিচয় দিব।

১৯০১ সালে মিস্ মার্গারেট নবোল (Noble) Miss Cristiana সহ Esplanade-এর সন্নিকটে এক নম্বর ডেকার লেনের তেতলায় আসিয়া থাকেন। ইনি একজন আইরিশ রমণী এবং নিহিলিষ্ট ছিলেন। ১৯০০ ও ১৯০১ সালে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র হালদারের সহায়তায় প্রমথ রায়, মিঃ পি. মিত্র চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়া ইনিও স্বদেশানুরাগ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। এই সময় ওকাকুরাও জাপান হইতে এদেশে আসিয়া মিস্ নবোলের সহিত পরিচিত হন। ওকাকুরা প্রশ্ন করিয়া করিয়া লোকের মনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার একটা ছায়া প্রতিবিম্বিত করিতেন। লোকের মনে তিনি ছিলেন Asiatic Federation-এর ঘোর পক্ষপাতী তাই এসিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের মধ্যে নিজের মত প্রচার করিয়া ছিলেন। তাঁহার কথায়ও বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ নেতৃবৃন্দ দেশের কথা আরও ভাবিতে শিখিল আর ভগিনী নিবেদিতা হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার পরেও প্রচার করিতে লাগিলেন—

"আমাদের নেতা ও কর্ম্মিগণের চাই গভীরতর সাধনা। চাই ভগবানের সহিত অধিকতর অপরোক্ষ আত্মিক যোগ—যিনি আমাদের আন্দোলনের গুরু ও পরিচালক; চাই অন্তর হইতে আভ্যন্তরিক আত্মোন্নতি···অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ইহা উপলব্ধি করিয়াছি। অবিশুদ্ধ অবনৈতিক ইউরোপীয় উদ্দীপনা দ্বারা আমরা জয়লাভ করিতে পারিব না। ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ভারতের সাধনা, তপস্যা, জ্ঞান ও শক্তিই কেবল মাত্র আমাদিগকে স্বাধীন ও মহান্ করিতে পারে।···যে যোগী সেই একমাত্র রাজনৈতিক নেতার পশ্চাতে দাঁড়াইবে, অথবা তাহার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিবে রামদাসকে শিবাজীর একই শরীরে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ম্যাজিনীকে ক্যাভোরের সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে। বুদ্ধি ও ধর্ম্ম, শক্তি ও পবিত্রতা হইতে বিচ্যুতি হয় ত' ইউরোপীয় বিপ্লব সম্ভব করিতে পারে, কিন্তু ইউরোপীয় শক্তি দ্বারা আমরা জয়লাভ করিতে পারিব না।

Our leaders and our followers both require a deeper Sadhona a more direct communion with the Divine Guru and captain of our movement an inward uplifting, grandeur and more impeteus force behind thought and deed. It has been driven home to us by experience that not in the strength of a low immoralised European enthusiasm shall we conquer Indians. It is the spirituality of India, the Sadhona of India, Tapasya, Jnanam, Sakti that must make us free and great...It is the Yogin who must stand behind the political leader or manifest within him, Ramdas must be born in one body with Shivaji, Mazzine with Cavour. The divorce of intellect and spirit, strength and purity may help a European revolution but by a European strength we shall not conquer.'

নিবেদিতা তাই বলেন—

"দক্ষিণেশ্বরে যে কার্য্যের সূচনা হইয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইতে অনেক দেরী—অনেকে তাহা বুঝিয়াও উঠেন নাই। যে জ্ঞান ও সাধনা বিবেকানন্দ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার অঙ্কুর মাত্র উদ্গত হইতেছে।"

গত কার্ত্তিক সংখ্যায় আমরা পুণায় প্লেগ, মহামতি তিলকের মোকর্দ্দমা ও রাজদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। ইহা ১৮৯৭ সালের কথা। বোম্বাই ও পুণার ঘটনাবলীতে মহারাষ্ট্র খুবই বিচলিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাঙ্গালার জমিও পূর্ব্ব হইতেই যে তৈয়ার ছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ইহার পর হইতে বাঙ্গলাদেশে চারিদিক হইতে এমন আলোড়ন উপস্থিত হয় যে, ১৯০৫ সালে বাঙ্গালার অঙ্গচ্ছেদ কেবল বাঙ্গালীকেই নবজাগ্রত জাতি বলিয়া পরিচিত করিয়া দেয় নাই, পরন্তু তখন যে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষই বিকম্পিত হইয়া উঠে। এই কয়বৎসরের কাহিনী না পড়িলে বাঙ্গালার ইতিহাস এবং জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম হইবে না। তাই এই সময় হইতে সুরাট কংগ্রেস পর্য্যন্ত (১৯০৭, ডিসেম্বর) পূর্ব্বাপর ঘটনা ও তৎকালীন অবস্থা আমরা কয়েক সংখ্যায় বিবৃত করিতে চাই।

ঝড়ের রাতে

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

দীননাথ ভাত চড়াইয়া স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নান করিতে বেশী বিলম্ব করে নাই। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, হাঁড়ি ভরিয়া গিয়াছে ফেনে এবং ফেন গড়াইয়া পড়ায় উনুন প্রায় নিভিয়া গিয়াছে।

দীননাথ ভিজা কাপড়টা একপাশে রাখিয়া হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলিয়া ফেলিল এবং চেলা কাঠগুলি উনুনে ঠেলিয়া দিল। শুক্‌না কাঠ মুহূর্ত্ত পরে আবার দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"কি গো ঘটক ঠাকুর, এ অ-বেলায় অত ঘটা করে কি রান্না করচ?"

কুসুমের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দীননাথ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আগুনের আঁচে যেন নয়, এমনি যেন ফর্সা মুখখানি একটু আরক্ত হইয়া উঠিল।

দীননাথ উৎসাহ সহকারে বলিল, "বস কুসুম। তোদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেচে? দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বস!"

কুসুম বসিল না, বসিবার মত কিছু আশেপাশে নাইও। চৌকাঠে একটু হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া কুসুম বলিল, "সে কি আর আজ—অনেকক্ষণ। মা হয় ত' এখন রাত্রের রান্নার তোড়জোড় সুরু করবে।"

দীননাথ একটু নিরর্থক হাসি হাসিয়া বলিল, "একটু কাজে বেরিয়েছিলুম, ফিরতে দেরী হয়ে গেল।"

"তোমার কাজ, সে ত' ঘরে খেয়ে বনের মোষ তাড়ান। অত বীরত্বের সঙ্গে কি রাঁধচ?"

দীননাথ হাসিয়া জবাব দিল, "অনেক—অনেক রেঁধেচি। মাংস, পোলাও, কোর্মা, ঝাল কত কি। সেদ্ধ, শাক ও চচ্চড়ি আজ নিষিদ্ধ।"

"পাত পেতে বস্‌ব না কি? অনেক দিন নেমন্তন্ন খাই নি। তুমি ছাই বিয়ে করচ না যে ঠেসে একবার খাব।"

"আগে নিজের বিয়ের খাওয়াটাই হজম করে নে।"

"তুমি যার বিয়ের ঘটক তার কি—"

"থামলি কেন, তার কি?"

"আরে ও-দিকে যে ভাত পড়ে যাচ্ছে।"

দীননাথ হাঁড়িটা উনুন হইতে নামাইয়া ফেন গলাইতে বসিল। রোজই সে ফেন গলায়, কিন্তু আজ কুসুম সম্মুখে থাকায় কিংবা অন্যমনস্কতার জন্যই ঠিক্ ঠিক মত ফেন নিঙড়াইতে পারিল না। গরম ফেন হাতের উপর পড়িয়া গেল। দীননাথ 'উঃ' করিয়া মৃদু কাতরধ্বনি করিল।

কুসুম ছেলে মানুষের মত উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

দীননাথ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "এ দুপুর বেলায় অমন চেঁচাস নি। আমার হাত পুড়ে গেল, আর তুই হাসচিস্!"

দীননাথ রাগিয়া যাওয়ায় কুসুম পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

দীননাথ ফেন আর নিঙড়াইল না, হাঁড়িটা সোজা করিয়া রাখিয়া দিল, বলিল, "এ মাথাফাটা রদ্দুরে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ফিরলুম, তেষ্টায় বুকের ছাতি ফাটচে, ক্ষুধায় পেটে যেন হুল ফুটচে, আর তুই খিল্ খিল্ করে হাসচিস্। তাড়াতাড়ির জন্যেই ত' এমন হল, নয় ত' আমি তোকে ঢের রান্না শেখাতে পারি।—আচ্ছা, আমিও পাব তোকে; দেখা যাবে তখন।"

"দোহাই ঘটকঠাকুর, ক্রোধ সম্বর। তুমি রাগ করলে যে এ গাঁয়ের অনূঢ়া মেয়েরা অকূলে পড়বে গো।"

"ঠাট্টা করচিস?"

"মোটেই না। আজ দু'বছর ধরে তুমি আমার জন্য পাত্র ঠিক করচ। কুসুম কৌতুকের হাসি চাপিয়া তাড়াতাড়ি কোমরে আঁচল জড়াইয়া ভাতের ফেন গালিতে বসিল।

"দু'বছর ধরে চেষ্টা করচি সত্যি কিন্তু তোর যোগ্য বর না পেলে যার তার হাতে আমি অন্তত তোকে দিতে পারব না কুসুম।"

"লোকে তাই বলে কিন্তু।"

"লোকে বলে!" দীননাথ রাগত স্বরে বলিল, "লোকে যা বলে তাই তুই বিশ্বাস করবি! আমার চেয়ে লোকের কথাই বড় হয়ে গেল।"

কুসুম ঢাকনা খুলিয়া হাঁড়িটা ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে বলিল, "ও মা, এ চারটি ভাতে কার কি হবে গো, কতখানি চাল লাগে তা'ও জান না?"

দীননাথ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তাই ত', এ কি আর পুরুষ মানুষের কাজ !"

"সে তুমি যে কি কাজের মানুষ তা' আমি বুঝেচি। এদ্দিন ধরে বেকার বসে আছ একটা কাজ জুটাতে পারলে না। হাত পা' পুড়ে আধপেটা খেয়ে আর কত দিন চলবে।"

"তোর বিয়েটা দিয়েই একেবারে শহরে চলে যাব এবং রোজগারে না হতে পারলে আর দেশে মুখ দেখাব না।"

"এখনই যাও না কেন। চেষ্টা না করলে তোমায় কে কাজ দেবে বল। তোমাকেও ত' বিয়ে করে দশজনের মত সংসার চালাতে হবে ; না, বিনা মাইনে আপ খোরাকিতে পরহিতকর কার্য্য করে কুড়ের বাদশা নাম নিলেই চলবে। লোকে যে দুর্নাম করে তা' কি তোমার লাগে না ? বেকার পুরুষ মানুষকে কেউ শ্রদ্ধা করতে পারে না।"

দীননাথ কুসুমকে ভুল বুঝিয়া অপমান বোধ করিল এবং আহত স্বরে বলিল, "কুসুম তুইও—"

দীননাথ কথা শেষ করিতে পারিল না। কুসুম বলিতে চাহিল, আমিও। তুমি গরীব, তুমি বেকার, তোমার লোকে দুর্নাম করে, এতে যে আমি কত দুঃখ পাই তা' কি তুমি বুঝতে পার না। আমি যে চাই, তোমায় মানুষের মত মানুষ হতে দেখতে, আমি চাই তোমার সম্মান, তোমার গৌরব, তোমার সুখ ও সম্পদ।

কুসুম পুরুষ নয়—নারী। তাই সে আত্মসংযম করিতে পারিল, আপনাকে গোপন করিয়া বলিল, "নাও এবার খেতে বস, বেলা যে গড়িয়ে গেল।"

দীননাথ খাইতে বসিল। গরম ভাত, ভলোধুঁয়ায় দীননাথের মুখখানি ছাইয়া গেল। কুসুম একখানি পত্রিকা টানিয়া লইয়া বলিল, "ভীষণ গরম, আমি হাওয়া করে দিচ্ছি।

দীননাথ ব্যস্তভাবে বলিল, যাক্ যাক, অত আরাম করে খেয়ে আমার কাজ নেই, পেট ভরবে না।"

কুসুম অভিমানভরে পত্রিকা রাখিয়া দিল।

দীননাথ বলিল, "রাগ করলি ? যা, তোর শ্বশুর বাড়ীতে যখন বেড়াতে যাব তখন খুব হাওয়া করিস, তখন ত' আর আলুভাতে খাব না।"

"না, ঘটক বিদায় খাওয়াটা ত' খাওয়াতে হবেই।"

দীননাথ রাগ করিল না, হাসিয়া উঠিল।

দীননাথের বাড়ীর পাশেই কুসুমদের বাড়ী, একেবারে লাগালাগি।

দীননাথের দুইটি মাত্র চালাঘর ; ছোট একফালি উঠান। ঘর-দোর ও উঠানে ঝাঁটা পড়ে না। ইতস্ততঃ আবর্জ্জনা জমিয়াছে। ঘরগুলি সংস্কারের অভাবে একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ। দীননাথের আপন বলিতে কেহ নাই, সংসারে সে একাই অবশিষ্ট রহিয়াছে। সামান্য পৈতৃক জমি ও ভিটাটী মাত্র তাহার সম্বল। অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে এমন কোন শিক্ষা সে লাভ করিতে পারে নাই। ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে পারে নাই।

কুসুমদের অবস্থা খুব সচ্ছল না হইলেও মন্দ নয়। জমি-জমা কিছু আছে এবং কুসুমের বাবা রমেশ দে স্থানীয় জমিদারীতে কাজ করে। বেতন যদিও বিশেষ কিছু পায় না, উপরি পাওনাতে মন্দ রোজগার হয় না।

কুসুমের মা কাদম্বিনী দেবী মধ্যাহ্ন ভোজনের পর স-কন্যা নিদ্রা যাইতেছিলেন। দিনে সুনিদ্রার অভ্যাস নাই, কারণ, বাড়ীর দুই ধারে তরিতরকারির বাগিচা রহিয়াছে। পাড়ার গরু, ছাগল, পাঠার উৎপাতে একটুক্ষণ নিশ্চিন্তে চোখের পাতা বুজিবার উপায় নাই।

কাদম্বিনী দেবীর একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল, কিসের একটু শব্দ হইতেই জাগিয়া উঠিলেন এবং পাশ ফিরিতে ফিরিতে বলিলেন, "কুসমি, যা'ত মা, চৌধুরী বাড়ীর গরুটা বোধ হয় কুমড়োর···ওমা, কোথায় গেল, ও কুসুম।"

কাদম্বিনী দেবী বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং দরজাটিকে লক্ষ্য করিয়াই যেন বলিলেন, "না চঞ্চল মেয়েটিকে নিয়ে আর পারি নে। চোখের পাতাটি বুজেচি আর অমনি গাছোল মেয়ে মাথাফাটা রোদে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েচেন।"

কাদম্বিনী দেবী যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন কুসুম কি একটা কথার পৃষ্ঠে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিয়াছে।

কাদম্বিনী দেবী ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "কুসমি।"

"যাই মা।"

"এদিকে আয়।"

কুসুম জননীর ক্রোধ বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল এবং কাদম্বিনী দেবীকে কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া চটুল লীলাহাস্যে বলিয়া উঠিল, “মা তুমি ত দীনুদাকে খুব কাজের লোক বল, আর উনি সামান্য ভাতের ফেন গলাতে গিয়ে হাত পুড়ে একাকার।”

কাদম্বিনী দেবী মোটেই হাসিলেন না, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, “বুড়ী ধাড়ী হয়েছিস, তবু একটু বুদ্ধি সুদ্ধি হল না। খিল খিল করে হাসছিলি কোন্ আক্কেলে—একটু লজ্জা সরমও নেই!”

“তাতে কি হয়েচে! দীনুদার সঙ্গেই ত কথা কইছিলুম।”

“দীনুদার সঙ্গে কথা কইছিলি বলে আর একটা সময় গময় নেই। যখন তখন একা একা গিয়ে এমনি হাসবি পোড়ারমুখী।”

“দীনুদা তোমার কোলেই মানুষ হয়েছে। ওর মা যখন মারা যায় তখন ও দু’বছরেরও ছিল না। আমি ওকে তোমার মত পর মনে করতে পারি নে।”

কুসুম অভিমানে নাক, মুখ, ঠোঁট, চোখ ফুলাইয়া সবেগে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

মেয়ের অভিমানে কাদম্বিনী দেবীর রাগ জল হইয়া গেল, একটু অনুরোধের সুরে বলিলেন, “রাগ করেছিস কুসুম। আগে মা হ’ তখন বুঝতে পারবি—জেনে শুনে কত অন্যায় কত পীড়ন করতে হয়। সমাজে থাকতে গেলে অনেক কিছু মানতে হয়, অনেক কিছু সইতে হয় মা।”

কুসুম কোন জবাব দিল না। বিছানায় শুইয়া জোর করিয়া চোখ বুজিল।

কাদম্বিনী দেবী দীননাথকে দেখিতে আসিলেন। ঘরে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, “হারে দীনু, হাত নাকি পুড়েছিস দেখি!”

“তেমন কিছু নয় কাকীমা। কুসুম বুঝি বাড়িয়ে বলেছে।”

“কি রেঁধেছিস—ওমা শুধু আলু ভাত। বস বাবা, ঘরে কিছু মাঠা আছে, এনে দিচ্ছি।”

কাদম্বিনী দেবী মেয়েকে মাঠার বাটিটি লইয়া আসিবার জন্য ডাকিলেন কিন্তু কুসুমের কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। মেয়ের অভিমানে কাদম্বিনী দেবী মনে মনে একটু হাসিয়া নিজেই উঠিয়া গেলেন।

কাদম্বিনী দেবীর ফিরিতে বেশী দেরী হইল না। এক বাটি মাঠা, একটা বিঁচি কলা ও কিছু ঝোলা গুড় লইয়া আসিয়া বলিলেন, “গরমে মাঠা বড় উপকারী বাবা। পেটও ভাল থাকে, শরীরও ঠাণ্ডা হয়।”

দীননাথ বলিল, “কাকীমা, উত্তরপাড়ার পাত্রটির কথা বলেছিলুম না। খবর দিয়েছে, ওরা রোব্বার কুসুমকে দেখতে আসবে।”

“কতজনই ত’ দেখতে এল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টেকে কৈ।”

“বিয়েটা ত’ আর সহজ নয়। কুসুমকে ত’ যার তার হাতে দিতে পারি নে।”

“আর বাছাবাছি নয় বাবা, যার সঙ্গে হয় গছিয়ে দাও। মেয়ে যেন বয়সের চেয়ে চেহারায় দ্বিগুণ বাড়ছে। মেয়ের দিকে যে আর তাকান যায় না।”

“এবার ঠিক হয়ে যাবে, বলে রাখলুম, না হলে তখন বল। এদের অবস্থা ভাল, দাবীদাওয়াও বেশী নেই, কুসুমের মত বাড়ন্ত গড়নের মেয়েই চায়।”

“পছন্দ হলে বাঁচি। তোর চেষ্টার ত’ ত্রুট নেই, কি ক’রব, অদৃষ্ট!

“মজুরপুরের পাত্রটি এখনও হাত ছাড়া হয় নি। হয় ত’ শেষ পর্য্যন্ত রাজি হবে। আমি বলে রাখচি, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠির মধ্যে শুভকাজ শেষ করবই।”

“তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। আর জন্মে তুমি আমার পেটের ছেলে ছিলে; তুমি আমাদের যে কত উপকার—”

দীননাথ বিনীত ভাবে বলিল, “এ আমার কর্ত্তব্য!”

স্নেহের আতিশয্যে কাদম্বিনী দেবী আশীর্ব্বাদ করিলেন, “শতায়ু হও বাবা, প্রার্থনা করি, ধনে জনে সুখী হও।”

দীননাথ মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

দীননাথ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। একে একে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাস গেল, শ্রাবণ মাসও চলিয়াছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন পাত্রই টিকিল না। উত্তরপাড়ার পাত্রটি যখন অনেক দূর অগ্রসর

হইয়া সামান্ত ওজরে পিছাইয়া গেল তখন কাদম্বিনী দেবী একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

কুসুমের বিবাহের জন্ত দীননাথের সুপ্রচেষ্টাকে গ্রামের লোক প্রীতির চোখে দেখিতে পারিল না। সন্দেহটা এতদিন চাপা ছিল, ক্রমে প্রকাশ পাইল। রমেশ এবং কাদম্বিনী দেবী যে একেবারে কিছুই জানিতেন না, তাহা নয়; কিন্তু কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতেন না। তাঁহারা দীননাথকে ভালবাসেন এবং দীননাথের চেষ্টায় কন্তাদায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া বড় আশা করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের মনে কোন খারাপ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু একে একে সকল আশা নির্মূল হওয়ায় সন্দেহের বিষাক্ত বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল।

সেদিন কাচারিতে কুসুমের বিবাহের কথা প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল। জমিদারবাবু রমেশকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "দীনে ছোকরা দেবে পাত্র যোগাড় করে, তুমি কি ক্ষেপেচ রমেশ। ওসব ওর চালবাজি। কুসুমের যাতে বিয়ে না হয় সেজন্ত ও নিজেই দুর্নাম রটিয়ে বিয়েতে ভাঙ্গানি দেয়। কি হে রায়, মজুরপুরের সেই যে পাত্রটির বাবা কি বলেছিল?"

রায় বলিল, "বলবে আর কি, সে ত' সববাই জানে। রমেশকেও বলিহারি দিই, এত বড় মেয়ে হয়েচে তবু একটু হুঁস নেই, দীনে হারামজাদার সঙ্গে যখন তখন মিশতে দেয়।"

জমিদারবাবু গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে বলিলেন, "এখনও সাবধান হও রমেশ, কুমারী মেয়ের নামে বিশ্রী দুর্নাম ভয়ানক ব্যাপার, সারাজীবন ভুগতে হবে।"

রমেশ কোন কথার জবাব দেয় নাই। একঘর লোকের সম্মুখে সে লজ্জায়, অপমানে, রাগে ও দুঃখে যেন মরিয়া গিয়াছিল।

রমেশ সাধাসিধে মানুষ, সহজে সে রাগে না। কিন্তু একবার রাগিলে সে ভয়ঙ্কর। কাচারি হইতে ফিরিয়া রমেশ যেন তোপের মত ফাটিয়া পড়িল। স্ত্রীকে সম্মুখে পাইয়া বলিল, "কখনও যদি দীনে হারামজাদা আমার বাড়ীতে ঢোকে তবে হাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেব বলে রাখছি। হারামজাদা, পাজি, নচ্ছার।"

"কেন, হঠাৎ আবার কি হল?"

রমেশ স্ত্রীকে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "কেন! তোমাদের জন্যই ত' আজ মনুষ্যসমাজে মুখ দেখান দায় হয়ে পড়েছে।"

কুসুম চেঁচামেচি শুনিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল, কিন্তু রমেশের কথা শুনিয়া ঢুকিতে আর সাহস পাইল না, দরজার আড়ালে ভয়ে লুকাইল।

রমেশ বলিয়া চলিল, "তোমার গুণধর কন্যার জন্যে আজ কাচারিতে ঘর ভরতি লোকের সামনে যা নয় তাই শুনতে হল। তোমার আস্কারা পেয়েই ত' এমন হয়েছে। ইস, উনি আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক করে দিয়ে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দেবেন।"

"কিন্তু—"

রমেশ বাধা দিয়া বলিল, "আর কিন্তু টিন্তু নেই। ও পাজী এত নিমকহারাম যে নিজেই বিয়েতে ভাঙ্গানি দেয়। ওর কীর্ত্তিকলাপের প্রমাণ আছে।"

"দীনু বিয়েতে ভাঙ্গানি দেবে! এ কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে পারব না।"

কাদম্বিনী দেবীর প্রতিবাদ শুনিয়া কুসুমের অন্তর যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহার মন বারবার বলিয়া উঠিল, এ হতেই পারে না। লোকের শত্রুতা!

রমেশ বলিল, "শোন, দীনে যেন আর কুসুমের বিয়ের ব্যাপারে মাথা গলাতে না আসে, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। তোমার মেয়েকে সাবধান করে দিও। ফের যদি ওর সঙ্গে কথা কয় তবে রক্ষা থাকবে না।"

কুসুমকে আর বলিতে হইল না। আড়াল হইতে সে সকল কথাই শুনিয়াছে আর লজ্জা, অপমান ও দুঃখে সে মরিয়া যাইতে চাহিয়াছে। গ্রাম্য কাণাঘুসা সে শুনিতে পাইয়া নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলিয়া পুড়িয়াছে, কোন প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু পিতার কথা শুনিয়া মনে হইল, এর পূর্ব্বে তাহার মরণ ছিল শ্রেয়ঃ।

নানা অশান্তিতে কাদম্বিনী দেবীর মেজাজ স্বাভাবিক নাই। সাংসারিক সামান্ত ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্ত ভীষণ রাগিয়া যান। কুসুম কোন অন্তায় করে নাই, অথচ ছোট একটী স্বাভাবিক ভুলের জন্ত কাদম্বিনী দেবী অন্তায় ভাবে ভর্ৎসনা

করিয়া, ক্রোধের তীব্রতা প্রচণ্ডতম করিবার জন্ম বাহির হইয়া গেলেন।

কুসুম জানে সে কোন অন্যায় করে নাই। পূর্ব্বে এমন হইলে সে প্রতিবাদ করিত, জননীর ভুল সংশোধন করিয়া দিত। কিন্তু এখন সে কোন কথাই বলিতে পারে না, সাধারণ নারীর মত শুধু কাঁদিতেই পারে।

অকস্মাৎ দীননাথের সাড়া পাইয়া কুসুম চমকিয়া উঠিল! চোখের জল এখনও শুকায় নাই, উদ্ধত চাপা কান্না এখনও বুক তোলপাড় করিয়া দিয়া যাইতেছে। খালি বাড়ী। কুসুম ভয়ে জড়সড় হইয়া বিছানার এক কোণে অন্ধকারে লুকাইয়া রহিতে চেষ্টা করিল।

কুসুম ভাবিয়াছিল, দীননাথ তাহাকে দেখিতে পাইবে না এবং কাহারও কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু গেল না। তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই দীননাথ বলিল, "কাকীমা কোথায় রে কুসুম ?"

কুসুম ভীত কণ্ঠে বলিল, "মা বাড়ী নেই, চৌধুরীদের বাড়ীর দিকে গেচেন।"

কুসুমের আচরণে ও কথায় দীননাথ বিস্মিত হইল কিন্তু চলিয়া গেল না। দীননাথ কুসুমের দিকে এক পলক তাকাইয়া বিছানার কোণে বসিল। কুসুমের মুখখানি ভাল দেখা গেল না।

দীননাথ ডাকিল, "কুসুম।"

কুসুম কোন জবাব দিল না।

দীননাথ বলিল, "কি হয়েচে কুসুম, কাকীমা বকেচেন — কেন রে ?"

কুসুম বলিল, "তুমি এখন যাও দীনুদা, মার ফিরতে ঠিক নেই।"

"জরুরী কথা আছে, একটু বসে যাই।"

কুসুম দৃঢ় স্বরে বলিল, "না তুমি যাও, যাও দীনুদা।"

দীননাথ গেল না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কুসুম তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল এবং বলিল, "তোমার কি মান-অপমান জ্ঞান নেই।"

"কুসুম!"

"তুমি যাও। আর কখনও এ বাড়ীতে এসো না।"

দীননাথ উঠিয়া পড়িল এবং কুসুমের অবনত মুখের দিকে তাকাইয়া একটি চাপা নিঃশ্বাস চাপিয়া যাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, "বেশ তাই হবে। তুই যে আঘাত দিয়েছিস, যে অপমান করেছিস, তাই আমি গৌরবের সঙ্গে নিলুম।"

কুসুম মুহূর্ত্তের জন্য একবার দীননাথের করুণ মুখখানির দিকে তাকাইল। দীননাথকে অপমান করিয়া সে নিজেও আহত হইল কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া লইল। কুসুম অতি কষ্টে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

দীননাথ চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিল। কুসুমকে পশ্চাৎ দিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া আহত হইল। দীননাথ আর অগ্রসর হইল না, দূর হইতে বলিল, "তোর কাছে এ ব্যবহার আশা করিনি কুসুম। যাক সে কথা, কাকীমাকে বলিস, চাঁদপুরেরর পাত্রটি বিয়েতে একমত সম্মত হয়েচে, পরশু ওরা আসবে। যাক্, তোকে বলতে হবে না, আমিই চৌধুরীদের বাড়ী যাচ্ছি।"

কুসুম ফিরিয়া দাঁড়াইল। শ্লেষ দিয়া বলিল, "চৌধুরীদের বাড়ী যাবে আমার বিয়ের খবর নিয়ে। লজ্জা-সরম কি একেবারে গিয়েচে। এ নিয়ে ক'টা সম্বন্ধ আনলে! ছিঃ! ছিঃ! তোমার নয় মান-সম্মান বোধ নেই কিন্তু কোন স্পর্দ্ধায় তুমি এর মধ্যে আমায় জড়াও।"

"কুসুম—"

কুসুম ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল, "তোমার আমি কি ক্ষতি করেচি যে তুমি আমার এত বড় শত্রুতা করচ। একটি কুমারী মেয়ের মান, ইজ্জৎ, জীবন নিয়ে তুমি অভিনয় করচ।"

দীননাথ মাথা নত করিয়া সকল ভৎর্সনা, অপমান সহিয়া গেল, কোন জবাব দিল না, দিতে চেষ্টাও করিল না। অপরাধীর মত মাথা নত করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

দীননাথের চোখ হইতে যে টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইতেছিল কুসুম তাহা দেখিতে পায় নাই, কখনও জানিতে পাইবেও না। কুসুম একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। হঠাৎ তাহার চোখ দুইটি বুজিয়া আসিল এবং মাত্র দুই ফোঁটা অশ্রু চিবুক বাহিয়া পড়িয়া গেল।

শেষ পর্য্যন্ত দীননাথের চেষ্টাতেই কুসুমের বিবাহ হইল। এই দুর্দ্দিনে এমন সুপাত্র যোগাড় করায় দীননাথের অতি বড়

শত্রুও প্রশংসা না করিয়া পারিল না। দীননাথ প্রশংসা চায় না, কেমন যেন এক প্রেরণা, ভাবোন্মাদনা পাইয়াছে যাহাতে সে কলের ন্যায় কেবল কাজ করিয়াই চলিয়াছে। ঝড়-বৃষ্টি নাই, বিশ্রাম নাই, স্নান খাওয়া নাই সে শুধু খাটিয়াই চলিয়াছে।

দুই দিনের মধ্যে দীননাথ চার পাঁচ ঘণ্টার বেশী ঘুমাইতে পারে নাই। বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের অতিথিদের খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া দীননাথ যখন একটু বিশ্রাম করিবার জন্য বড় ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল, তখন আর রাত্রি বেশী নাই, বিবাহবাড়ীর কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, উজ্জ্বল আলোক ম্লান হইয়া গিয়াছে।

দীননাথ একটি খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে হইল সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া যেন ক্লান্তি নামিয়াছে। চোখের পাতায় এত ভারী ঘুম আসিয়াছে যে আর সে কখন জোর করিয়াও চোখের পাতাগুলি খুলিতে পারিবে না।

"দীনুদা"—!

দীননাথ কুসুমের আহ্বান শুনিয়া চমকিয়া উঠিল।

কুসুম বলিল, "তুমি এখনও কাপড় চোপড় ছাড় নি, খাও নি? আমি তোমায় কতবার খবর পাঠিয়েচি, এক গ্লাস সরবৎ খেয়ে যেতেও সময় পাও নি!"

দীননাথ মৃদু হাসি হাসিল, কোন জবাব দিল না।

কুসুম দীননাথের হাত ধরিয়া বলিল, "না আর বস না, রাত্রি আর নেই। না, উঠ। আমি তোমার খাওয়ার জোগাড় করচি, তুমি চট করে হাত-মুখ ধুয়ে এস।"

কুসুমের পরশে ও অনুরোধে দীননাথের আহত-জড় অন্তর জাগিয়া উঠিল।

আকাশে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। শত শত শুভ্র তারা নীলাকাশে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দীননাথ কুসুমের দিকে তাকাইতে পারিতেছে না। তাহার শুভ্র অঙ্গে লাল অগ্নিশিখার মত বেনারসী সাড়ী, কণ্ঠে মালা, ললাটে চন্দনের আলিম্পনা, স্ফীত খোঁপায় ফুলের তোড়া। দীননাথ আকাশের কোমল দীপ্তির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল। আলোর ঝলকানি সে সহ্য করিতে পারিতেছে না।

কুসুম জোর দিয়া বলিল, "উঠ!"

"এ অ-বেলায় কিছু খাব না, তুই ঘরে যা, ধীরেন একা রয়েচে।"

কুসুম দীননাথের হাত ধরিয়া টান দিয়া বলিল, "না তা' হবে না, উঠ তুমি নইলে আমি ঘরে যাব না। চল আমি তোমায় সরবৎ করে দিচ্চি। উঠ!"

দীননাথ ভীষণ ক্লান্ত। সহসা যেন কেমন তাহার পরিবর্ত্তন আসিল। কুসুমের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কুসুম!"

কুসুম চমকিয়া উঠিল। হাতটা তাহার কাঁপিতে লাগিল, বুকের স্পন্দন যেন শুনা যায়।

দীননাথ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ভয় পাসনে কুসুম, যে ঘর আমি নিজের হাতে রচনা করে দিয়েচি তা আমি ভেঙ্গে ফেলব না।"

দীননাথ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আজ শেষ দিন, পরে কে কোথায় থাকব কে জানে? আমি অপরাধী, আমায় ক্ষমা করিস কুসুম।"

"অপরাধী! কেন, কেন? না, না ও সব বাজে কথা তুল না। আমি তোমায় সেদিন অপমান করেছিলুম। উল্টো ক্ষমা চেয়ে আমার অপরাধ বাড়িও না দীনুদা।"

"সত্যই আমি অপরাধী। আমি তোর বিয়ে নিয়ে এত দিন খেলা করেচি। আর কে কি করেচে জানিনে, তবে আমিও তোর বিয়েতে ভাঙ্গানি দিয়েচি। ক্ষমা কর বোন!"

"এ মিথ্যে কথা।"

মিথ্যে নয় "সত্যি!"

"সত্যি; কিন্তু কেন, কেন? আমার বিয়েতে ভাঙ্গানি দিয়ে তোমার লাভ কি। তুমি—" কুসুম আর বলিতে পারিল না, ভয়ে তাহার কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া গেল।

"কেন? আমি এর জবাব দিতে পারচি নি কুসুম।"

কুসুম আর প্রশ্ন করিল না। তাহার মনে হইল দীননাথ সত্য কথাই স্বীকার করিয়াছে। তাহার অন্তরের যেন উহাতে সহানুভূতি ছিল।

দীননাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। কুসুম কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার দেহ অবসন্ন, খুঁটিটি ধরিয়া নির্জীবের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

দীননাথ বলিল, "আমি তোকে জীবনে সুখী হতে দেখতে চাই। ভগবানের নিকট তাই প্রার্থনা করব কুসুম।"

"দীনুদা!"

দীননাথ আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না।

কুসুম আবার ডাকিল, "দীনুদা, শোন, দাঁড়াও একটু!"

ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে।

কুমড়ো গাছের মাচার নীচে বিশ্রী অন্ধকার যেন ভয়াবহ হইয়া উঠিল। দীননাথ দ্রুত সেই আঁধারে মিশিয়া গেল।

বাসর ঘরের ঘিয়ের প্রদীপটা এখনও জ্বলিতেছে, প্রবল ঝড়ের ঝাপ্টায় দীপশিখাটি শুধু বারকয়েক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

দেশ-বিদেশের নৃত্য-কলা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

শিব নটরাজ

আদিম মানব নিসর্গের নিকট হইতেই নৃত্যকলা সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা করিয়া থাকিবে। বিরাট বারিধি বিশাল বীচি-বাহু বিস্তৃত করিয়া নৃত্য করে। উন্মাদিনী ঝঞ্চা নাচিলে উত্তাল তরঙ্গমালা উত্তোলিত করিয়া নদ-নদীও নাচে। বাতাস বহিলে বৃক্ষে-বৃক্ষে পত্রপুঞ্জ, প্রান্তরে শ্যামল তৃণদল নাচিয়া উঠে। মৃগাদি পশুর পাল বন-তলে, পাখীরা গাছে-গাছে, প্রজাপতিরা পুষ্পে পুষ্পে নৃত্য করে। ভাব-নেত্রে দেখিলে মনে হইবে অনন্ত আকাশে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রও অবিরাম নৃত্য করিতেছে। সেই জন্যই কবি কহেন, 'ছন্দে উঠে শশী রবি, ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়।' বিশ্ব-চরাচরের বুকে চিরকাল চলিয়াছে জীবন-মৃত্যুর বিচিত্র নৃত্যলীলা। মানুষ স্বভাবতঃই নৃত্যানুরাগী। তাহার উপর যাঁহারা পরমেশ্বরকে 'নটরাজ' ও 'নটবর' কল্পনা করিয়া অর্চ্চনা করেন তাঁহাদের পক্ষে নৃত্যকলার বিশেষ অনুশীলন আরও স্বাভাবিক। আমরা প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নৃত্য-শিল্পের বিস্ময়কর উৎকর্ষ দেখিতে পাই। নটরাজ ও নটবরের উপাসনা সেই উৎকর্ষেরই পরিচয় প্রদান করে। উভয় মূর্ত্তিই ভাবসম্পদশালী ভারতবাসীর অপূর্ব্ব পরিকল্পনা। ভাব-বিভোর শঙ্কর নটরাজ মূর্ত্তিতে নৃত্য করেন এবং তাঁহার সেই নৃত্যের তালে-তালে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সম্পাদিত হয়। নটরাজের একপ্রকার নৃত্যকে সৃষ্টি-নৃত্য (Cosmic Dance) বলা চলে। তাঁহার এই নয়নাভিরাম নৃত্যে পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর প্রীতিভরে মিলিত হইয়া এই বিস্ময়কর বিচিত্র বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করে। আর একপ্রকার নৃত্যকে তাণ্ডব প্রলয়-নৃত্য (Chaotic Dance) বলিলে ভুল হয় না। ক্রুদ্ধ রুদ্র যখন ধ্বংস-বিষাণ বাজাইয়া এই ভৈরব-নৃত্যে মত্ত হন তখন পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া মহাকালে প্রলয়-ঝঞ্চা প্রবাহিত করে। নটবর কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষে যেমন অপূর্ব্ব কবিত্বের প্রবাহ বহিয়াছে, তেমনই তাহার অধ্যাত্ম-সাধনাও অতুলনীয় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধকগণ যে রাস-লীলার ভিতর অধ্যাত্মতত্ত্বের পূর্ণোৎকর্ষ দর্শন করিয়াছেন তাহা একপ্রকার নৃত্য এ বিষয়ে সংশয় নাই।

ধর্ম্মের সহিত নৃত্যের সম্পর্ক শুধু ভারতবর্ষেই নহে, অন্যান্য দেশেও দেখা যায়। আমরা বিদেশীয় নৃত্যের কথা বলিবার সময় সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় নৃত্য এবং তাহার পুনরাবির্ভাব বা পুনরভ্যুদয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা কহিবার ইচ্ছা। ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া নৃত্য এবং শিল্পানুশীলন হিসাবে নৃত্য, উভয়ের পার্থক্য নিতান্ত অল্প নহে। তবে ধর্ম্মভাবাত্মক নৃত্যেও নৃত্যনীতির অনুযায়ী ছন্দ বা তাল থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গের দ্বারা বঙ্গদেশে ধর্ম্মভাবাত্মক নৃত্য বিস্ময়কর বিকাশ বা বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। কীর্ত্তনের করুণ সুর এবং কীর্ত্তনানুগ এই নৃত্যকে

ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর প্রগাঢ় প্রতিভার বিশিষ্ট সৃষ্টি বলা চলে। মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের সহিত নৃত্যের এরূপ নিবিড় সম্পর্ক আমরা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখিতে পাই না।

শুধু শিল্প হিসাবেও নৃত্য ভারতবর্ষে অপূর্ব্ব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহ পাঠ করিলে এবং মন্দিরাবলী ও গুহাগৃহসমূহের গাত্রে উৎকীর্ণ ও অঙ্কিত বিচিত্র চিত্রগুলি দেখিলে সে বিষয়ে আমাদের লেশমাত্রও সংশয় থাকে না। অজন্তা ও ইলোরা প্রভৃতি গুহাগুলির প্রাচীর-চিত্রাবলীর ভিতর প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলার বৈচিত্র্য বিশেষভাবে অভিব্যক্ত রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ও প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ নাট্য-বিদ্যাবিশারদ ভরত মুনি প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র'। 'নট' হইতেই 'নাট্য' 'নাটক' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি, সুতরাং 'নাট্যবিদ্যা নৃত্য-মূলক। ভরত ঋষির আর একখানি পুস্তকেও নৃত্য-শিল্প সম্পর্কীয় আলোচনা আছে। ইহার নাম অভিনয়-দর্পণ। এই দুইখানি গ্রন্থে নানাপ্রকার নৃত্য এবং তাহাদের বিভিন্ন বিচিত্র ভাব-ভঙ্গী সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। ভারতীয় নৃত্যের ভিতর বিস্ময়কর বৈচিত্র্য বিদ্যমান। সভ্যতাশূন্য সম্প্রদায়দিগের নৃত্যের ন্যায় ইহা সরল ও সহজ নহে। ইহার অন্তর্নিহিত ভাবগুলি যেমন গভীর ভাবানুগ, ভঙ্গীগুলিও তেমনই জটিল। ইহা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে প্রখর প্রতিভার প্রয়োজন। ইহাতে চাই ধ্যানমগ্ন সাধকের ন্যায় অসাধারণ একাগ্রতা।

ভারতীয় নৃত্য বিভিন্ন রসকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠে। প্রত্যেক রসের পৃথক্ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং এই দেশের সাধারণ নৃত্য-শিল্পও ধর্ম্মসংস্পর্শ-শূন্য নহে। যেমন ভারতে প্রত্যেক রাগ বা রাগিণীর মূর্ত্তি কল্পিত আছে তেমনই ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যের আশ্রয় রস-গুলিকেও বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। শান্ত রস শুভ্রবর্ণ এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারায়ণ। শৃঙ্গার রস শ্যাম-সুন্দর এবং ইহার দেবতা বিষ্ণু। রক্তবর্ণ রৌদ্র রসের দেবতা রুদ্র। স্বর্ণবর্ণ বীররসের দেবতা শিবানুচর প্রমথগণ। করুণ রস ধূসরাভ এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। অদ্ভুত রসের দেবতা ব্রহ্মা এবং ইহার বর্ণ বাসন্তী বা কমলালেবুর ন্যায়। ভয়ানক রস কৃষ্ণকায় এবং ইহার দেবতা কাল। নৃত্যকালে নানাপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা এই সকল রসকে প্রকাশ করিতে হয়। এই সকল অঙ্গ-ভঙ্গীর নাম মুদ্রা। রসগুলিকে বিভিন্নভাবের প্রকাশ বা উচ্ছ্বাস বলা চলে। স্থায়ীভাব নয় প্রকার,—সাম, রতি, ক্রোধ, উৎসাহ, জুগুপ্সা, হাস, শোক, বিস্ময় ও ভয়। ইহা ছাড়া তেত্রিশ প্রকার সঞ্চারী ভাব রহিয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য কিরূপ বৈচিত্র্য-পূর্ণ। ইহা একদিকে যেমন জটিল জালের ন্যায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্যদিকে তেমনই সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত একটি অখণ্ড বিরাট বস্তু বা ব্যাপার। মানবচিত্তের সর্ব্বপ্রকার ভাব নৃত্যে প্রকাশ করা নৃত্যকলার বিস্ময়কর বিকাশের বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত করে।

নৃত্যের বেশে মুখোশধারী বৌদ্ধ-লামার দল, এই নৃত্যকে ডেভিল-ড্যান্স বলা হয়

মধ্যে প্রাচীন ভারতের অন্যান্য শিল্পের ন্যায় নৃত্যকলাও প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিলে ভুল হয় না। শিক্ষিত সমাজ নৃত্যকে শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন না। যাহার অনুশীলন সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহে অনুরাগের সহিত অনুষ্ঠিত হইত কালক্রমে,তাহা নিম্নশ্রেণীর নট-নটীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া তাহার মহিমা বা মর্য্যাদা হারাইয়াছিল বলিলে অন্যায় হয় না। ভারতীয় নৃত্য যে উচ্চাঙ্গের শিল্প, ইহার ভিতর দিয়া গভীর ভাবসমূহ সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে—এই সত্য ভারতবাসী যখন প্রায়ই ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন যাঁহারা ইহাকে পুনরায় পূর্ব্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সঙ্গীতসম্রাট বিশ্বকবি স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালক-বালিকাগণের মধ্যে ভারতীয় নৃত্যের চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করেন। ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের সহিত কবির নিবিড় সম্পর্ক সর্ব্বজনবিদিত। বঙ্গের মধ্যে ত্রিপুরা এবং আসামের মধ্যে মণিপুর রাজ্য নৃত্য-শিল্পানুশীলনের জন্ম চিরপ্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের শিক্ষার্থিগণকে শিখাইবার জন্ম শুধু যে ত্রিপুরা হইতে নৃত্যনিপুণ শিক্ষক আনাইয়াছিলেন তাহা নহে, তথায় সুদূর গুর্জ্জরদেশের লোক-নৃত্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা এবং মণিপুর উভয় রাজ্যেই শ্রীচৈতন্মপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব প্রসারিত রহিয়াছে। এই দুই রাজ্যেই আমরা প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক নৃত্যই প্রচলিত দেখি। এই রাজ্যদ্বয়ের পরম-বৈষ্ণব নৃপগণ শুধু যে নৃত্য-শিল্পের অত্যন্ত অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক তাহা নহে, নৃপবংশীয় বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীরাও নৃত্যকলা শিক্ষা করেন। ত্রিপুরা এবং মণিপুরের প্রধান নৃত্য ‘রাস-লীলা’ অভিজাত-সমাজের বালক-বালিকারা নিয়মিতভাবে আগ্রহের সহিত পেশাদার নৃত্য-শিক্ষকদের নিকট শিখিয়া থাকে। গুর্জ্জরবাসীরা পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রবল প্রবাহকে প্রতিহত করিয়া প্রাচীন লোক-নৃত্যগুলিকে যে ভাবে আজিও জীবিত রাখিয়াছে তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য আশ্রমে প্রবর্ত্তিত করার পর হইতে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি ইহার দিকে আকৃষ্ট হয় বলিলে অন্যায় হয় না। গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পক্ষে ভারতীয় নৃত্যের অন্তর্নিহিত শিল্প-সৌন্দর্য্য সত্বর ও সহজে উপলব্ধি করা স্বাভাবিক সন্দেহ নাই।

বালি-দ্বীপের নৃত্য

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের সৌন্দর্য্য পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ করেন একজন রুশীয় নর্ত্তকী। ইঁহার নাম এনা প্যাভলোভা। ইনি ভারত-ভ্রমণে আসিলে অজন্তাদি গুহাগৃহের প্রাচীর-চিত্রাবলীর ভিতর প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের যে চিত্তাকর্ষক বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখেন, তাহাতে উহার সৌন্দর্য্য ইউরোপীয়দিগকে দেখাইবার জন্ম তাঁহার অত্যন্ত ব্যগ্রতা ও আগ্রহ জন্মে। তিনি ইউরোপে ফিরিয়া এবং ইংলণ্ডে গমন করিয়া স্যর উইলিয়ম রদনেষ্টিনকে একজন উপযুক্ত সহকারী খুজিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। অবশ্য প্যাভলোভা ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের জন্মই সহযোগী খুঁজিতেছিলেন। স্যর উইলিয়ম উদয়শঙ্করকে (বর্ত্তমানের বিশ্ব-বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী) সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহার নাম প্যাভলোভাকে বলেন। উদয়শঙ্কর তৎকালে লণ্ডনের ‘রয়েল কলেজ অব্ আর্ট’-এর ছাত্র ছিলেন। প্রতিভাশালিনী প্যাভলোভাই উদয়শঙ্করের নৃত্যসম্পর্কীয় প্রখর প্রতিভার পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হন বলিলে ভুল হয় না। পাশ্চাত্য নৃত্য-শিল্পীদের মধ্যে প্যাভলোভার পর যিনি প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া উহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন তাঁহার নাম রুথ সেণ্ট-ডেনিস। এই শক্তিশালিনী চিন্তাশীলা নর্ত্তকী ভারতের প্রাচীন নৃত্যের শুধু বহিরঙ্গ নয়, উহার অন্তর্নিহিত গভীর ভাবটিও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য শিল্পীরা ভারতের ক্লাসিকাল বা পৌরাণিক নৃত্য

যতই আয়ত্ত করুন, সেই নৃত্য-তত্ত্ব ভারতীয় শিল্পী যত বুঝিবে ততখানি তাহাদের পক্ষে বুঝা কখনও সম্ভব নহে। ইহার কারণ, যে রসরাজি ও ভাবসমূহকে আশ্রয় করিয়া ভারতীয় নৃত্য বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা সেই ভারতীয় শিল্পীর শোণিত বা সত্তার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। সুতরাং উদয়শঙ্করের পক্ষে সাধনা-বলে স্বদেশের ক্লাসিকাল নৃত্য আয়ত্ত করা প্যাভলোভা ও সেণ্ট ডেনিস অপেক্ষা অবশ্যই সহজ হইয়াছিল। তবে এ বিষয়েও লেশমাত্রও সংশয় নাই যে, উদয়শঙ্করকেও কঠোর সাধনার সাহায্যে এই নৃত্যের অন্তরঙ্গ (রস ও ভাব) এবং বহিরঙ্গ (মুদ্রা) ব্যাপারগুলিকে করায়ত্ত করিতে হইয়াছে। প্রথম প্রথম প্যাভলোভার সহকারী রূপে তিনি নৃত্যাভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বারা নিজস্ব নর্ত্তক ও গায়কদল গঠিত হয়। কিছুদিন কলিকাতায় অভিনয় দেখাইয়া ইনি প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করেন। সর্ব্বত্রই ইনি যে বিস্ময়কর সমাদর লাভ করেন, তাহাতে বুঝা যায়, ভারতের প্রাচীন নৃত্য-কলার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য পাশ্চাত্ত্য জাতিদিগকেও চমৎকৃত করিয়াছে। তিনি কয়েক বৎসর পরে পুনরায় ভারত পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার ভাবগভীর অভিনয়ের ভিতর ভারতবাসী স্বদেশের পৌরাণিক বা পুরাতন নৃত্যের নেত্রতর্পণ নূতন অভিব্যক্তি দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইল। তাঁহার নৃত্যাভিনয়সমূহের ভিতর 'শিব-পার্ব্বতী নৃত্য-দ্বন্দ্ব'কে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র বলা চলে। ইহাতে প্রাচীন নাট্য-শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বপ্রকার রসেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে উদয়শঙ্কর নটরাজ শঙ্কররূপে প্রথমে শান্তরসাত্মক নৃত্য প্রদর্শন করেন। অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত তিনি নানাপ্রকার বিচিত্র ভঙ্গী বা মুদ্রার দ্বারা ফুটাইয়া তুলেন যোগীবর শঙ্করের ধ্যান বা একাগ্রতার ভাব। ব্রহ্মসমাহিত শঙ্করকে নৃত্যের ভঙ্গীতে অঙ্কিত করা নৃত্য-শিল্পের অপূর্ব্ব পরিণতি সন্দেহ নাই। তারপর শঙ্কর একে একে অন্যান্য রসের নৃত্য প্রদর্শন করিয়া শেষকালে বীভৎস রসে মত্ত হইয়া নৃত্য করিলে শঙ্করী (যিনি এতক্ষণ নৃত্যে শিবকে অনুসরণ করিয়াছিলেন) ঘৃণাভরে আর নাচিতে অসম্মত হন। সুতরাং নৃত্য-দ্বন্দ্বে শঙ্করেরই জয় ঘটে। এই সকল ধর্ম্মমূলক পৌরাণিক নৃত্য ছাড়া নানাপ্রকার লোক-নৃত্যেও উদয়শঙ্কর অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। দক্ষিণ-ভারতের 'কথাকলি' নামক লোক-নৃত্যের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। এই নৃত্যেও উদয়শঙ্কর দক্ষতা দেখান। ইহাতে প্রধানতঃ রামায়ণী কথাকে নৃত্যাভিনয়ের ভিতর দিয়া প্রচার করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। উদয়শঙ্করের প্রসিদ্ধ 'লঙ্কাদহন' এই নৃত্যের অন্তর্গত।

সিংহলের কান্দী-নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গী (নৃত্য-শিক্ষক বৃদ্ধ সর্দ্দার)

নটশেখর উদয়শঙ্করের পদাঙ্ক অনুবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানে অনেকেই পৌরাণিক নৃত্য-কলা আয়ত্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ উহা নানা দেশে প্রদর্শন করিয়াও যশস্বী হইয়াছেন। এ বিষয়ে নৃত্যনিপুণা মেনকাদেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইনি মিসেস লীলা সোখে আখ্যায় অভিহিত। ইঁহার স্বামীর নাম লেফটেনাণ্ট কর্ণেল সোখে। অনেকে উদয়শঙ্করের সহিত মেনকার তুলনা করেন। উভয়ের পৌরাণিক নৃত্যাভিনয় বিশ্লেষণ করিলে আমাদের মনে হয়, প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রোক্ত ভাব ও রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশগুলি মেনকাদেবী উদয়শঙ্করের ন্যায় আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তবে এ বিষয়ের সংশয় নাই যে, মেনকাদেবীর

নৃত্যাভিনয়ের ভিতর সাধারণ শিল্প-সৌন্দর্য্যের অসাধারণ বিকাশ দেখা যায়। মেনকাদেবীর অভিনীত পৌরাণিক নৃত্যাবলীর মধ্যে 'লক্ষ্মীর জন্ম' এবং 'কৃষ্ণ-লীলা' বিশেষ প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। 'লক্ষ্মীর জন্ম' মধ্যভারতের অমরাবতী নামক নগরের প্রাচীন ভাস্কর্য্যকীর্ত্তি হইতে গৃহীত। শেষোক্ত নৃত্যের অবলম্বন প্রাচীন রাজপুত-চিত্র। উদয়শঙ্কর এবং মেনকাদেবী উভয়ের নৃত্য করিবার প্রণালীর পার্থক্য থাকিলেও তাঁহারা উভয়েই ভারতের প্রাচীন নৃত্য প্রচার সম্পর্কে প্রাণপণ প্রযত্ন প্রয়োগ করিয়া আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। মেনকাদেবী কিছুদিন পূর্ব্বে বার্লিন অলিম্পিয়াদে ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করিয়া ইহার আন্তর্জ্জাতিক আদর আরও বাড়াইয়াছেন।

বঙ্গদেশের প্রাচীন লোক-নৃত্যগুলিকে পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য যাঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিবার উপযুক্ত। এ বিষয়ে ইঁহাকে পথ-প্রদর্শক বলিলেও ভুল হয় না। ভারতীয় নৃত্য পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবার ইতিহাসে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও উদয়শঙ্করের প্রচেষ্টা এই সময়েই আরম্ভ হয়। দত্ত মহাশয়ও এই খৃষ্টাব্দেই বঙ্গের মৃতপ্রায় লোক-নৃত্যগুলিকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় প্রাচীন লোক-নৃত্য পুনঃ প্রচলনের আন্দোলন (ব্রতচারী আন্দোলন) দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। রায়বেশী, ঢালী ও কাঠী এই তিনটিকে প্রাচীন বঙ্গের সামরিক নৃত্য বলা চলে। বাঙ্গালায় 'রায়বাঁশ' নামক একপ্রকার উৎকৃষ্ট বাঁশ উৎপন্ন হয়। 'রায়বাঁশ' বলিলে বাঁশের রাজা বুঝায়। নানাপ্রকার অস্ত্র ও অস্ত্রের বাঁট এই বাঁশ হইতে প্রস্তুত হইত। রায়বেশী নামক পদাতিক সৈন্যদলের দ্বারা সেই সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের পূর্ব্বে শক্তির অভিব্যক্তিরূপে এবং উৎসাহিত হইবার জন্য নানাপ্রকার নৃত্যে মত্ত হওয়ার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। পরে বাঙ্গালা হইতে সংগ্রাম ও সৈন্যদল দুই-ই বিলোপ পাইয়াছে, কিন্তু সেই সামরিক নৃত্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। বঙ্গের রায়বেশী সৈন্যদল এক সময় বল ও কৌশলের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ইহারা প্রাচীন কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, এমন কি, সুদূর গুর্জ্জরেও গমন করিয়াছিল বলিয়া আমরা জানিতে পারি। রাজা মানসিংহ এবং লর্ড ক্লাইভের বাহিনীতে রায়বেশী সৈন্য থাকার কথা জানা যায়। অন্যতম সামরিক নৃত্য 'ঢালী' ঢাল হস্তে লইয়া নাচিবার নিয়ম। বঙ্গের বিখ্যাতনামা রাজা প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের সৈন্যসজ্ঘের ভিতর 'ঢালী' সৈন্যদল বিদ্যমান ছিল। ঢালী সৈন্যদল গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের বংশধরগণের দ্বারা এই সামরিক নৃত্য আজিও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'কাঠি' নৃত্য কাঠি বা যষ্ঠি হস্তে নাচিতে হয়। এই সকল সামরিক নৃত্য ছাড়া কয়েক প্রকার সাধারণ লোক-নৃত্যও বঙ্গে প্রচলিত আছে। ধর্ম্মাত্মক নৃত্যসমূহের মধ্যে কীর্ত্তন ছাড়া নেড়ানেড়ী নামক সম্প্রদায়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত বাউল নামক একপ্রকার নৃত্যও দৃষ্ট হয়। এই জাতীয় বৈষ্ণবদিগকে বাউলও বলা হয় বলিয়া এইরূপ নাম। ইহাদের নৃত্যের সহিত গোপীযন্ত্র বা গান্‌্গুবাগুব বাজে। কীর্ত্তন ও রামপ্রসাদী সুরের ন্যায় বাউলের সুরও বাঙ্গালার বিশিষ্ট সম্পদ্‌।

সাঁওতাল প্রভৃতি পার্ব্বত্য ও আরণ্য জাতিরা অত্যন্ত নৃত্যপ্রিয়। পরস্পর হাত ধরা ধরি করিয়া সাঁওতাল তরুণ-তরুণীরা (রাসনৃত্যের ভঙ্গীতে) মাদলের তালে এবং ঝুমুর জাতীয় সঙ্গীতের সুরে নৃত্য করে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'ঝুমুর-নাচ' আখ্যায় অভিহিত করা হয়। মুণ্ডা, ওরাঁও প্রভৃতি ছোটনাগপুরের অন্যান্য পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ও এই ধরণের নাচ নাচে। যাঁহারা শিলং গিয়াছেন, তাঁহারা খাসিয়া নৃত্য দেখিয়া থাকিবেন। মণিপুর অঞ্চলে যাইলে মণিপুরী তরুণ-তরুণীদের রাস-নৃত্যের মাধুর্য্য যেমন মন মুগ্ধ করে, তেমনই নাগাদিগের ভৈরব রণ-নৃত্য দর্শকদিগের অন্তরে রৌদ্ররস সঞ্চারিত করিয়া থাকে। কুকী, কাচীন প্রভৃতি অন্যান্য আসামী অসভ্য সম্প্রদায়ের নৃত্যানুরাগের পরিচয় আমরা পদে পদে পাইয়া থাকি।

দক্ষিণ ভারতের লোক-নৃত্যগুলিও কতিপয় তরুণ শিল্পীর দ্বারা পুনরায় প্রচার লাভ করিতেছে। ইহাদের অন্যতম নৃত্যশিল্পী গোপীনাথ রাগিণী দেবী নামে খ্যাতা এক মার্কিনী মহিলার সহযোগীরূপে নৃত্যাভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহারা মালাবারের কথাকলি নৃত্যের প্রতি সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে প্রবল প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিতেছেন।

তবে এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, ভারতের প্রাচীন নৃত্যের অন্তর্নিহিত ভাবধারা উদয়শঙ্কর ও মেনকা দেবী যেরূপ গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, গোপীনাথ ও রাগিণী দেবীর পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে প্রচলিত কোন কোন নৃত্যের সহিত দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার সহিত এই দেশের নৃত্যশিল্পের প্রভাবও এক সময় মালয় দ্বীপপুঞ্জে প্রসারিত হইয়াছিল। সিংহলের ‘কান্দী-নৃত্য’ বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। এই দ্বীপের প্রাচীন রাজধানী ও কৃষ্টি-কেন্দ্রসমূহের অন্যতম কান্দী নগর। এই জাতীয় নৃত্য-কলার কেন্দ্রস্থল বলিয়া ইহা এই আখ্যা লাভ করিয়াছে। এই চিত্ত-চমৎকারী নাচের প্রচুর প্রশংসা পাশ্চাত্ত্য পর্য্যটকবর্গের মুখেও শোনা যায়। কতিপয় সিংহলী নৃত্য দক্ষিণ ভারতেও দৃষ্ট হয়। আবার দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য সিংহলেও দেখা যায়। জীব-জন্তুর মুখাকৃতির সহিত সাদৃশ্যশালী মুখোস পরিয়া ভূটান, সিকিম, তিব্বত ও লাদকের লামাগণ যে অদ্ভুত নৃত্যাভিনয় দেখায় তাহা অনেক সময় বীভৎস রসের পরিচয় প্রদান করে। যাঁহারা দার্জিলিঙে গিয়াছেন তাঁহারা তথাকার লেপচা-লামাদের দ্বারা এইরূপ নৃত্য অভিনীত হইতে দেখিয়া থাকিবেন। সাহেবরা ইহাকে ডেভিল-ড্যান্স বলিয়া থাকেন। বালি দ্বীপের নর্ত্তকরাও বিকটাকৃতি মুখোস পরিয়া নৃত্য করে।

প্রশান্ত মহাসাগরের একান্ত অসভ্যজাতি-অধ্যুষিত অসংখ্য দ্বীপ আছে। এক প্রকার নৃত্য-কলা এই সকল দ্বীপেও দেখা যায়। অবশ্য সেই শিল্প বিকাশ বা পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। নাচিবার সময় নৃত্যোচিত সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরার প্রথা সকল দেশেই আছে। ইউরোপের মধ্যে বল্কান রাষ্ট্রসমূহের নর্ত্তকদের পরিচ্ছদ বর্ণবৈচিত্র্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য বলিলে ভুল হয় না। হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের বর্ণ-বৈচিত্র্য, বেশ-ভূষা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। পূর্ব্বোক্ত দ্বীপাবলীর বর্ব্বর অধিবাসীরা নানা প্রকার বৃক্ষশাখা বেশ-ভূষারূপে ব্যবহার করে। তাহারা শৃঙ্গের অনুকরণে বৃক্ষশাখা মাথায় বাঁধে এবং হাতের কব্জি ও পায়ের গোঁড়ালিতেও উহা (অলঙ্কার রূপে) সংলগ্ন করে। যাহারা যৎকিঞ্চিৎ সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা নৃত্যকালে নানারঙের মাদুলি পরে এবং কাণে ফুল গুঁজিয়া রাখে। নৃত্যকারীরা সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় এবং দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে পা ফেলিয়া কখন আগাইয়া যায়, কখন পিছাইয়া আসে। ইহারা নৃত্যকালে মৃদুস্বরে গান করে ও হাততালি দেয় এবং মধ্যে মধ্যে বক্ষস্থল ও ঊরুদেশ চাপড়ায়। তাহারা প্রথমে যে দিকে মুখ ফিরাইয়া নাচে বরাবর সেই দিকেই থাকে না, বার বার দিক পরিবর্ত্তন করে এবং নৃত্য-গীতির গতিকে ক্রমশঃ দ্রুততর করিয়া অবশেষে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় উপনীত হইয়া হৃৎকম্পকর ভয়াবহ চীৎকারের সহিত নৃত্য সমাপ্ত করে। শুনা যায়, ইহাদের নৃত্যের নামকরণ হইয়াছে একজন দুর্দ্দান্ত দস্যুর নাম হইতে এবং ডাকাতীর সময় ডাকাতরা যেরূপ ভাব-ভঙ্গী প্রদর্শন করে, ইহাদের নৃত্যও নাকি তাহারই অনুকরণ। নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী মাউলিদের কেনু-নৃত্যকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উপর দিয়া কেনু বা নৌকা অগ্রসর হইবার দৃশ্য ও তৎকালীন শব্দ-সমূহের অদ্ভুত অনুকরণ বলা চলে। জাপানে নৃত্য অতিশয় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই দেশের নৃত্যের উৎপত্তি সম্পর্কীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলিও বিশেষ বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক। জাপানের শিণ্টো নামক জনপ্রিয় প্রাচীন ধর্ম্মমতের সহিত নৃত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্য এই মতাবলম্বী মন্দিরসমূহে নৃত্যচর্চ্চার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণ ভারতের দেবদাসীদের ন্যায় নিবেদিত-জীবন নর্ত্তকীদলও নানাদেশে দেখা যাইত। জাপানের গেইশারা বর্ত্তমানে পেশাদার সাধারণ নর্ত্তকীতে রূপান্তরিত হইলেও আমাদের বিশ্বাস, আদিতে তাহারাও অনেকটা দেবদাসীদের মতই ছিল।

ধর্ম্মাত্মক নৃত্য অন্যান্য দেশেও প্রচলিত। রোম্যানদের নিকট নৃত্য সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মাত্মক ব্যাপারই ছিল। শুধু আমোদ বা চিত্ত-বিনোদনের জন্য নৃত্যের অনুষ্ঠান তাহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল। তবে এই নিষেধাত্মক বিধি সত্ত্বেও ‘সখের নাচ’ তাহাদের ভিতর ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরের মন্দির-সমূহে সঙ্গীতের ন্যায় নিয়মিত নৃত্যানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা থাকিত। দেবদাসীদের মত নর্ত্তকী মন্দিরে-মন্দিরে নৃত্য করিত। নৃত্য-গীত প্রাচীন গ্রীকদেরও দেবার্চ্চনার অঙ্গীভূত ছিল। ইউরোপের পৌরাণিক বা ক্লাসিকাল নৃত্যের

প্রবর্ত্তক গ্রীকরাই। প্রাচীন ইহুদীরাও নৃত্যকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিত। বাইবেলে বর্ণিত আছে, ভক্ত রাজা ডেভিড বা দাউদ "আর্ক অফ গডে"র চতুর্দ্দিকে সদলে নৃত্য করিয়াছিলেন। ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া নৃত্য আদিম খৃষ্টীয় চার্চ্চেও প্রচলিত ছিল। আদিম খৃষ্টীয়ানরা আমাদের কীর্ত্তনের ন্যায় উপাসনা-সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে একত্র নৃত্য করিত। এখন যাহাকে 'খৃষ্টমাস্ ক্যারলস' বলা হয়, উহা আদিতে নৃত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। পরে নৃত্য করিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। তবে ইউরোপের কোন কোন অংশে খৃষ্টীয় পর্ব্ববিশেষে নৃত্য করিবার নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে। ইস্লাম ধর্ম্মের নীতি অনুসারে নৃত্য-গীতাদি ধর্ম্ম-সাধনার সহায়ক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তবে 'দরবেশ' নামক ইসলামীয় সম্প্রদায়ের ভিতর নৃত্য উপাসনার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। সময়ে সময়ে ইহারা ধর্ম্মভাবের প্রেরণায় নৃত্য করিতে করিতে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া উন্মত্তবৎ ব্যবহার করে। অবশেষে নৈসর্গিক নিয়মে (প্রতিক্রিয়া রূপে) সেই অত্যন্ত উত্তেজনা অতিশয় অবসাদ বা পরিশ্রান্তিতে পরিণত হয়। এই উপাসক সম্প্রদায়কে 'নৃত্যকারী দরবেশ' আখ্যায় অভিহিত করা হয়। উত্তর-আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও ধর্ম্মাত্মক নৃত্য প্রচলিত আছে। সূর্য্য-পূজার সময় তাহাদের দ্বারা 'সূর্য্য-নৃত্য' অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই নৃত্য শুধু বিচিত্র নয়, বর্ব্বরোচিতও বটে। নৃত্যকারীরা প্রথমে নির্নিমেষ নেত্রে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে এবং তারপর অস্ত্রাদির দ্বারা নিজ নিজ দেহে আঘাত করিয়া উহাকে ক্ষতবিক্ষত করে। উত্তর-আমেরিকার অধিবাসী কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে 'র‍্যাটল স্নেক' নামক আমেরিকাসুলভ বিষাক্ত সর্প দন্তে লইয়া নৃত্য করিবার অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। প্রধানতঃ 'হপি' নামক সম্প্রদায়ের ভিতরেই এইরূপ বীভৎস নৃত্য দৃষ্ট হয়।

মন্ত্র-তন্ত্র বা স্তব-স্তুতির ন্যায় নৃত্যের দ্বারা দেবতাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা নানা দেশে দৃষ্ট হয়। মধ্য আফ্রিকার অসভ্য আদিবাসীদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কতকটা পুরোহিত এবং কতকটা মন্ত্রশক্তিশালী যাদুকর। বৃষ্টি না হইলে ইহারা দেবতাদিগকে বৃষ্টি দানে বাধ্য করিবার জন্য একপ্রকার নৃত্য করিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের সময় উত্তর-আমেরিকায় মান্দান নামক রেড-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য এক রকম নৃত্যের আশ্রয় লয়। তাহাদের বিশ্বাস এই নৃত্যের মন্ত্র-শক্তির মত একপ্রকার নিগূঢ় শক্তি সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতা আছে। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের আদিবাসী কেল্‌টিকদিগের পুরোহিত ড্রুইদগণও নৃত্যের নিগূঢ় শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

সামরিক নৃত্যের প্রচলন পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক অংশেই দেখা যায়। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্ব্বে নৃত্য করিয়া উৎসাহ ও উত্তেজনা সঞ্চার করিবার অথবা শৃঙ্খলা শিক্ষার প্রথা কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে বিরাজিত দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী কোন কোন জাতির ভিতর যুদ্ধের রিহার্সালরূপে নাচিবার নিয়ম আজিও দৃষ্ট হয়। নৃত্য-নীতির বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে কঠোর দণ্ড ভোগ করিবার ব্যবস্থা আছে। উত্তর আমেরিকাবাসী রেডইণ্ডিয়ানদিগের 'ওয়ার-ড্যান্স' বা যুদ্ধ-নৃত্যগুলি যেমন অদ্ভুত তেমনই ভয়াবহ। পক্ষীর পালকে ভূষিত বিচিত্র পরিচ্ছদ পরার জন্য নৃত্যকারীদিগকে অত্যন্ত অদ্ভুত দেখায়। শরীরে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত করিয়া নৃত্যকরার প্রথাও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত। পূর্ব্বে শত্রুর মাথার খুলি লইয়া এইজাতীয় নৃত্য করা হইত। আফ্রিকার জুলু নামক জাতির যুদ্ধ-নৃত্যও অত্যন্ত উত্তেজনাজনক ও রুদ্র ভাবাপন্ন। ইহাদের 'কার্মাগনোল' নামক রণ-নৃত্য ফরাসী-দের ন্যায় সুসভ্য পাশ্চাত্ত্য জাতিও অনুকরণ করিয়া ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবের সময় ব্যবহার করিয়াছিল। ইটালীর নেপল্‌স্ নামক নগরে দুই প্রকার জুলু-যুদ্ধ-নৃত্য আজিও অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

ফ্রান্স এবং স্পেনের মধ্যস্থলে অবস্থিত পীরিনিস নামক পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্বে 'বাস্ক' আখ্যায় অভিহিত পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। অনেকে মনে করেন বৃটন নামক কেল্‌টিক জাতির পূর্ব্বে ইংলণ্ডে আইবেরিয়ান্ নামক যে অনার্য্য সম্প্রদায় বাস করিত বাস্করা তাহাদেরই জাতি। ফরাসী বা স্পেনিয়ার্ডদের সংস্পর্শে ইহারা সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্বের বর্ব্বর-সম্প্রদায়সুলভ নানাপ্রকার নৃত্য তাহাদের ভিতর এখনও

প্রচলিত আছে। একপ্রকার বিচিত্র নৃত্যে প্রত্যেক নৃত্যকারী পৃথক পৃথক প্রাণীর প্রতীক বলিয়া কল্পিত হয়। কৃষিকার্য্য ও বয়ন-বিদ্যার সহিত এই নৃত্যের সম্পর্ক আছে। যাহারা যুদ্ধ-নৃত্যে যোগ দেয় তাহারা শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করে কিন্তু যাহারা নৃত্যের সহিত সঙ্গত করে সেই (ব্যাণ্ড-বাদ্যের) বাদকদল কালো কোট গায় দেয়। ইহাদের যুদ্ধ-নৃত্য অনেকটা স্কচ্‌দের সোর্ড-ড্যান্স বা তরবারী-নৃত্যের মত। ফ্রান্সে 'গ্যাভোট' নামক দরবারী নৃত্য আছে। পূর্ব্বে ইহা বৃটনীর অধিবাসী বৃটনদের লোক-নৃত্য ছিল। পরে ফরাসী রাজদরবার এবং সৌখীন অভিজাতসমাজ ইহা সাগ্রহে গ্রহণ করে।

বুলগেরিয়ায় 'হোরো' আখ্যায় অভিহিত লোক-নৃত্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই নৃত্যে অনেকগুলি নরনারী একত্রে হাত ধরাধরি করিয়া চক্রাকারে নাচে। সময়ে সময়ে দেখা যায়, গ্রামের সকল অধিবাসী একসঙ্গে নাচিতেছে। নৃত্যকারী ধীরপাদক্ষেপে অগ্রসর হয় এবং ফ্লুট জাতীয় বাঁশী এবং গায়দা নামক বুলগেরিয়ান ব্যাক-পাইপ বাজে। বাঁশীর সুরের সহিত এইরূপ চক্রাকার নৃত্য আমাদের দেশের রাস নৃত্যের কথা স্মৃতি-পথে জাগ্রত করে। এইরূপ নৃত্য প্রত্যেক বল্কান রাষ্ট্রেই দৃষ্ট হয়। তবে রাষ্ট্রভেদে নামের বিভিন্নতা আছে। মন্টিনেগ্রোতে ইহা 'কোলো' আখ্যায় অভিহিত হয়। বুলগেরিয়ানদিগের ব্যবহৃত 'হোরো' নাম গ্রীক 'কোরস' শব্দ হইতে সম্ভূত। এই শব্দের মৌলিক অর্থ নৃত্য। রুমানিয়ানদিগের একপ্রকার লোক-নৃত্য 'হোরা' আখ্যায় অভিহিত। ইহা অনেকটা বুলগেরিয়ান হোরোর অনুরূপ। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে একত্র ইহাতে যোগ দেয়। ইহা ছাড়া 'স্ত-ব্রাউ' ও 'কালুসারি' নামক দুইপ্রকার লোক-নৃত্যও রুম্যানিয়ায় জনপ্রিয়। দুইটিতেই শুধু পুরুষেরা যোগ দিতে পারে। কালুসারি প্রাচীন রোম্যান নৃত্যের অবশেষ। ইহা রুম্যানিয়ায় তরুণদলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যকারী তরুণরা সুবেশে সজ্জিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গ্রাম বা নগরের গৃহে গৃহে নৃত্যের ভঙ্গীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের দীর্ঘ প্রান্তবিশিষ্ট গার্টারগুলির সহিত ছোট ছোট ঘণ্টা সংলগ্ন থাকে। পাদক্ষেপের সময় উহারা শব্দ করে।

ইটালীর একটি জনপ্রিয় নৃত্যের নাম টারানটেলা। ইহার জন্ম নেপলস নগরে। এই নৃত্য মৃদু-মন্দ ছন্দে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ দ্রুততর তালে চলিতে থাকে। টারানটেলা নামটির উৎপত্তির ইতিহাস অদ্ভুত। টারানটুলা একপ্রকার বিষাক্ত মাকড়সা। এই মাকড়সার কামড়াইলে যন্ত্রণায় বা বিষের প্রভাবে দষ্ট ব্যক্তি নৃত্য করে বলিয়া এই নামের উদ্ভব হইয়াছে। অনেকের মতে, দ্রুততালে নৃত্য করিলে শরীরে যে উত্তাপ উদ্ভূত হয়, তাহা এই জাতীয় মাকড়সার বিষকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম বলিয়াই এই আখ্যার জন্ম। আমাদের বিশ্বাস, এই নৃত্য এবং বিচিত্র ধারণা দুইই আফ্রিকার কোন বর্ব্বর জাতি হইতে প্রাপ্ত। নেপলসবাসীদের দ্বারা জুলুদিগের সামরিক নৃত্য অনুকরণ করার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রুশরাও নৃত্যপ্রিয় জাতি। রুশীয় নৃত্য ইউরোপের অন্যান্য দেশের নৃত্য হইতে কিছু স্বতন্ত্র। সম্ভবতঃ প্রাচ্য-প্রভাব রুশীয় নৃত্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। রুশীয় নৃত্য-প্রতিভা এ্যানা প্যাভ্‌লোভার ভিতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'ব্যালেট' জাতীয় নৃত্যের শিল্প রুশরা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। সাধারণতঃ নাট্যাভিনয়ের সহিত এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ভঙ্গীতে ভূমিতলে বসিয়া নৃত্যকলা প্রদর্শন রুশীয় নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

স্কচ্ ও আইরিশরা বৃটেনের আদিম অধিবাসী কেলটিকদিগের বংশধর। সুতরাং কোন কোন প্রাচীন কেলটিক নৃত্য তাহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক। স্কটল্যাণ্ডের 'রীল' নামক নৃত্য সম্পূর্ণরূপে কেলটিক সে বিষয়ে সংশয় নাই। স্কচ্‌দিগের অন্যান্য অধিকাংশ নৃত্যে ফরাসী প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাগপাইপ বাজাইয়া নৃত্য করিবার প্রথা স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ড উভয় দেশে দেখা যায়। আমাদের বিশ্বাস ইহা প্রাচীন কেলটিক প্রথার অবশেষ। স্কটিশ তরবারী-নৃত্যকে গ্রীক ও রোমান সামরিক নৃত্যের অবশেষ বলিয়া অনেকের ধারণা। 'জীগ' নৃত্যের প্রচলন ইউরোপের বিভিন্ন জাতির ভিতর থাকিলেও ইহা আইরিশদিগের জাতীয় নৃত্যের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মহাকবি সেক্সপীয়রের সময় একপ্রকার নৃত্যশীল ছন্দ বা কবিতাকেও জীগ বলা হইত।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডের গ্রাম্য জীবনে নৃত্যের বিশেষ প্রভাব

প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে সেই নৃত্যানুরাগ নানাকারণে হ্রাস হইয়া পড়ে। পঞ্চদশশতককে এই দেশের নৃত্য-শিল্পের পুনরাবির্ভাব-যুগ বলা চলে। পিউরিটান সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত কঠোর নিষেধাত্মক বিধি সত্ত্বেও এই সময় সকলের চিত্ত লোক-নৃত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কতকগুলি বিলাতী নৃত্য চতুষ্কাকারে, কতকগুলি চক্রাকারে দাঁড়াইয়া নাচিতে হয়। একপ্রকার নৃত্যের নাম স্তর রজার স্ত কভার্লি। এডিসন সম্পাদিত স্পেক্টেটর পত্রিকা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা এই নামের সহিত অপরিচিত নহেন। টুডর বংশের শাসন সময়ে নানারকম লোক-নৃত্য ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল। কুবান্টে, ব্রল ও গালিয়ার্দ্দ এই সময়ে প্রচলিত তিনটি নৃত্যের নাম। তৎকালে জীগ নৃত্যও চলিত। তৃতীয় এডওয়ার্ডের শাসন কাল পর্য্যন্ত 'মরিস নৃত্য' নামক কয়েক প্রকার নৃত্যের বিশেষ প্রচলন ছিল। মে মাসে অনুষ্ঠিত মে-ডে নামক উৎসবের সময় এই নৃত্য নাচিবার প্রথা বহুদিন ধরিয়া প্রবর্ত্তিত ছিল। নৃত্যকারীদের মধ্যে কেহ (দস্যুদলপতি) রবিন হুড্ কেহ তাহার প্রণয়িনী মেড মেরিয়ান সাজিয়া নাচিত। স্কটের আইভানোর পাঠকরা উভয় চরিত্রের সহিত পরিচিত। নগর হইতে দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামাঞ্চলে মরিস-নৃত্য এখনও জীবিত রহিয়াছে। মরিস একটি মাত্র নৃত্যের নাম নয়, কয়েকটি নৃত্যের সমষ্টি এই নামে অভিহিত। মূর জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া এইরূপ নাম।

বল-নৃত্যের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। বল-রুমে যে সকল নৃত্য চলে তাহারাই বল-নৃত্য। এই সকল নৃত্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত। প্যাভেন নামক বল-নৃত্য স্পেনীয়দিগের নিকট হইতে, কোয়াড্রিল, মিনুয়েট ও গ্যাভোট ফরাসীদিগের নিকট হইতে, এবং পোল্কা ও স্কটিশচে মধ্য ইউরোপবাসীর নিকট হইতে প্রাপ্ত। কোয়ান্টো, কোটিলন ও ল্যান্সার্স ও বল-নৃত্যের অন্তর্গত। বল-নৃত্যের মধ্যে একসময় মিনুয়েটই সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল। ওয়াল্জ-নৃত্য চতুর্দ্দশশতকে মধ্য-ইউরোপ হইতে আসিয়া অষ্টাদশ-শতকে ইংলণ্ডের অন্ততম প্রধান লোক-নৃত্যের স্থান অধিকার করে। গ্যালপ নৃত্য জার্ম্মানী হইতে আসিয়া বিশেষ প্রভাব প্রসারিত করে। বর্ত্তমান যুগে বল-নৃত্যগুলিই ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। কতকগুলি নৃত্যকে বিভিন্ন দেশের জাতীয় নৃত্য বলা চলে। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য আদিবাসীদের করোবরি, ইকুয়োয়ি সম্প্রদায়ের কর্ণ বা শস্য নৃত্য, হাওয়াইন দ্বীপবাসীদের হুলা, স্পেনীয়দের বোলেরো, ইংরেজদের হর্ণপাইপ, স্কচদের রীল, হাইল্যাণ্ডারদের ফ্লিং এবং আইরিশদিগের জিগ এবং পেরুবাসীর কুয়েকা জাতীয়নৃত্য। আমেরিকা প্রবাসী নিগ্রোদের জাতীয় নৃত্যের নাম কেক ড্যান্স বা পিষ্টক-নাচ।

প্রাচীন স্পার্টানরা নৃত্যকে উৎকৃষ্ট ব্যায়াম মনে করিয়া উহার অনুশীলন উৎসাহের সহিত করিত। প্রাচীন স্পার্টায় প্রচলিত আইন অনুসারে বালক-বালিকার বয়স পাঁচ বৎসরের বেশী হইলে তাহার পক্ষে নৃত্য অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য ছিল। নৃত্যকে তথায় সামরিক শিক্ষার অঙ্গীভূত বলিয়াও বিবেচনা করা হইত। আফ্রিকার কোন কোন অংশের আদিবাসীদের ভিতরেও এই ধরণের নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে। একটি নির্দ্দিষ্ট বয়সে প্রত্যেক বালককেই নৃত্য-কলা শিক্ষা করিতে হয়। নৃত্যে ব্যায়ামের কার্য্য সুন্দররূপে সাধিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমাদের দেশের রায়বেশী প্রভৃতি সামরিক নৃত্য দেখিলেও বুঝা যায়, শরীর সঞ্চালনের দ্বারা শক্তি সঞ্চয় ইহাদের অন্ততম উদ্দেশ্য।

লাঞ্ছিতা

ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

"ডাক্তারবাবু।"

ডাক্তারবাবু পুরীর সরকারী হাসপাতালে কাজ করেন। ছোট সংসার, স্ত্রী ও কন্যা। মাহিনা বাদেও প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ আছে। মোট কথায় বেশ আছেন।

রথ শেষ হয়ে গেছে। ঝড়ের পর গাছ-পালাগুলি যেমন নেতিয়ে পড়ে, রথের পর পুরী সহরটি সেইরূপ নেতিয়ে পড়েছে। ডাক্তারবাবুর হাতে বড় কাজকর্ম্ম নেই। কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরে ডিউটি দিয়ে যাচ্ছেন।

ডাক্তারবাবু বসে বসে কি যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ ডাক্ শুনে চম্‌কে উঠলেন। পিছন ফিরে দেখলেন পাণ্ডার এক ছড়িদার দাঁড়িয়ে রয়েছে, বল্লে, "কিরে? কি চাস্?"

ছড়িদার শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিলে, "জলদি চলুন বাবু। এক ভদ্রলোকের কলেরা হয়েছে।"

ডাক্তারবাবুর মন খুশীতে ভরে গেল। সে ভাব গোপন করে গম্ভীর মুখে বল্লে; "বেশ, চল।"

রিক্‌শ ডাকা হোল। দুইজনে এসে বালুসাই উপস্থিত হলো;

ছোট ঘর। মেজের উপর বিছানা। একটি যুবক তার উপর ছট্‌ফট্ করছে, আর তার মুখের পানে চেয়ে একটি যুবতী নীরবে কাঁদছে। ডাক্তারের সাড়া পেয়ে, সে মুখ তুলে চাইলো। ভারী সুন্দর মুখ, দেখলেই মায়া হয়। ডাক্তারবাবু এগিয়ে আসতে সে একটু সরে দাঁড়াল।

ডাক্তারবাবু যুবকটিকে পরীক্ষা করলেন। শেষ অবস্থা, ঘণ্টা দুই মধ্যে হয় ত' শেষ হয়ে যাবে। তবুও বাঁচাবার জন্ম প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করছেন। পরে হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বউটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে নীরবে ডাক্তারের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়াতে, সে এসে তার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে কেঁদে উঠলো। ডাক্তারবাবু সভয়ে দুই পা পেছনে সরে দাঁড়ালেন।

বউটি কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, "আপনি আমার ধর্ম্মের বাপ, আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন। আপনার যা প্রাপ্য এই নিন।" কথা শেষ করে, সে তার হাতের সোণার রুলী খুলতে যাচ্ছিল।

ডাক্তারবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন, "ওকি ছেলেমানুষি হচ্ছে। রেখে দিন ও সব।"

বউটি কাতর নয়নে ডাক্তারবাবুর পানে চেয়ে রইল। পরে শান্ত কণ্ঠে বল্লে, "আমার আর ত' কিছু নেই ডাক্তারবাবু।"

পুরীতে হামেসা এইরূপ ঘটনা হয়ে থাকে; তাই ডাক্তারবাবু বল্লেন, "সে জন্য ভাবনা কি? বাড়ী গিয়েই পাঠিয়ে দিবেন।" বল্লে তিনি বাহিরে এসে ছড়িদারকে চুপি চুপি বল্লেন, "ওর বাড়ীতে একটা টেলী করে দাও। রোগীর অবস্থা ভাল নয়।" তিনি ছড়িদারকে উপদেশ দিয়ে সরে পড়বার উপক্রম করলেন। এমন সময় বউটি এসে বল্লে, "আপনার যাওয়া হবে না ডাক্তারবাবু। রোগীর শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে থাকতেই হবে। এই বিপদে আপনি ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নেই।"

ডাক্তারবাবু বউটির অবস্থার কথা চিন্তা করে বাধ্য হয়ে থেকে গেলেন। রাত্রি দশটায় রোগী তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। বউটি তাহার স্বামীর বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো। সে কি কান্না! এমন নিদারুণ বুকফাটা কান্না ডাক্তারবাবু কোন দিন দেখেন নাই। থেকে থেকে তাঁর নিজেরই কান্না আসছিল। শবদাহের ব্যবস্থা করে দিয়ে ডাক্তারবাবু যখন বাড়ী ফিরলেন, রাত তখন ১১টা।

ডাক্তারবাবু গাড়ীতে বসে বসে বউটির দুরবস্থার কথা ভাবছিলেন। শরীর ক্লান্ত, কথা কইবার পর্য্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছিল না। কোন প্রকারে গাড়ীভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাসায় প্রবেশ করলো।

কমলা বোধ হয় ডাক্তারবাবুর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। হয় ত' বা মনে মনে রেগেও ছিল। ডাক্তারবাবুকে আসতে

দেখে সে ঝঙ্কারের সহিত বল্লে, “কেমন ধারা ডাক্তারী করা। সেই কখন রোগী দেখতে গেছ, আর এলে এই।”

ডাক্তারবাবু শুষ্ককণ্ঠে বল্লে, “কেন ছড়িদারকে ত’ তোমার নিকট পাঠিয়েছিলুম, সে কিছু বলেনি।”

কমলা মুখ নেড়ে বল্লে, “তবেই আমার মাথা কিনেছ।”

ডাক্তারবাবু বল্লেন, “কি করি বল? ও কিছুতেই আমায় ছাড়তে চাইলে না। যা বিপদ—”

কমলার রাগ তাতে বেড়েই গেল, কমলো না, বল্লে, “কেন হাসপাতালেই ত’ দিলে পারতে। দেখেছ, সুন্দরী বউ—”

ডাক্তারবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন, “ছিঃ ছিঃ কি যে বল।”

কমলা তাচ্ছিল্যের সহিত জবাব দিলে, “যা বলছি ঠিকই বলছি।”

ডাক্তারবাবু দেখলেন কমলাকে বুঝানো বৃথা। কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপমান হওয়া, সে কমলাকে এড়িয়ে চাঁকরটাকে ডাকলেন, “বেণু, স্নানের জল দিয়ে যাও।”

পরদিন হাসপাতালে যাবার পূর্ব্বে ডাক্তারবাবু মনে ভাবলেন, ‘যাই বউটিকে একবার দেখে আসি।’ কিন্তু গত রাত্রে স্ত্রীর কথা স্মরণ হওয়াতে, ডাক্তারবাবু সেই ইচ্ছাকে চেপে গেলেন।

* * *

অনেক দিন হয়ে গেছে। বউটির কথা ডাক্তাববাবু ভুলে গেছেন। মনে থাকবার কথাও নয়। প্রায়ই কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আজ বৈকালে কাজ নেই, বসিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করছিল না। ডাক্তারবাবু ভাবলেন, ‘যাই একবার সমুদ্রের পার হ’তে ঘুরে আসি।’ অনেক দিন হলো সে বড় সে দিক পানে যায় নাই। এখানে এসে যে সমুদ্র আছে, তাহা সে ভুলেই গেছে। অথচ কত দূর দেশ হ’তে কতশত লোক এই সমুদ্রের হাওয়া খেতে এসে কত টাকাই-না ব্যয় করে যায়। ধিক্কারে ডাক্তারবাবুর মন ভরে গেল। অথচ সমুদ্র এখান থেকে কতটুকই বা দূর। আজ সে সমুদ্রে যাবে বলে উঠে দাঁড়ালেন।

এমন সময় একটি সুন্দরী যুবতী এসে তার সম্মুখে দাঁড়ালো। সুন্দর ছিপছিপে গড়ন, সুন্দর কালো কালো চুলগুলি বাতাসে উড়ে উড়ে তার মুখে-চোখে পড়ছে। পরণে সাদা থান কাপড়। দেখে ডাক্তারবাবুর মনে দুঃখ হোল। এমন সুন্দর মেয়েটির বরাতে ভগবানের একি নির্ম্মম পরিহাস! ডাক্তারবাবু চুপ করে মেয়েটির মুখের পানে চেয়ে রইলো। তার মনে হলো, এই মুখ সে যেন কোথায় দেখেছে।

ডাক্তারবাবুকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে, যুবতীটি প্রথমে নিজেই কথা বল্লে, “আমায় চিনতে পারলেন, ডাক্তারবাবু!”

ডাক্তারবাবু সংক্ষিপ্ত ভাবে উত্তর দিলেন, “না! কিন্তু মনে হয়, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি।”

যুবতী মৃদু হেসে বল্লে, “দেখেছেন বই কি। আমি স্বর্ণ, আমার স্বামীর চিকিৎসা করতে বালুসাই—”

আর ব’লতে হলো না। ডাক্তারবাবু বালুসাই এই যুবতীর স্বামীকেই দেখিতে গিয়েছিলেন। যার জন্য কমলার নিকট বকুনি খেয়ে আর তাহার খবর পর্য্যন্ত নেন নি। ডাক্তারবাবু বিস্ময়ের সহিত বলে উঠলো, “ও আপনি! বসুন, বসুন দাড়িয়ে কেন?” ডাক্তারবাবু একখানি চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিলেন। স্বর্ণ বসে পড়লো। ডাক্তারবাবু পুনরায় প্রশ্ন করলেন, “কবে এলেন।” তার ধারণা ছিল, স্বর্ণ তার শ্বশুর বাড়ীতে চলে গিয়েছে।

স্বর্ণ তার ডাগর চোখ দু’টি ডাক্তারবাবুর পানে তুলে ধরলো। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, “আমি ত’ যাই নি ডাক্তারবাবু। সেই থেকে ত’ এখানে আছি।”

ডাক্তারবাবু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, বল্লেন, “যান নি মানে? আপনার শ্বশুর আপনাকে একা ছেড়ে দিলেন।”

স্বর্ণ ফ্যাল ফ্যাল করে ডাক্তার বাবুর পানে চেয়ে রইল। ডাক্তার বাবু বলেই চল্লেন, “এ আপনার ভারী অন্যায়, বিদেশে, এ বয়সে একা একা থাকতে আছে। আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই।”

ডাক্তারবাবুর এত বড় কথাতেও স্বর্ণ কোন উত্তর করলো না। সে যেমন নীরবে বসেছিল সেই ভাবেই বসে রইল। ডাক্তারবাবু ইহা লক্ষ্য করে একটু লজ্জিত হ’লেন। স্বর্ণকে এত কথা বলবার তাঁর কি অধিকার আছে। তাই সে স্বরটা যথাসম্ভব নরম করে বল্লেন, “থাকগে ওসব কথা। আপনার কি প্রয়োজন তাই বলুন।”

ডাক্তার বাবু তার কথা শেষ করে ভাল করে চেয়ে দেখলেন, স্বর্ণের চোখে মুক্তোর মতন জল টল টল করছে।

ডাক্তার বাবু অনুতপ্ত সুরে বল্লেন, "আমার কথায় আপনি এত ব্যথা পাবেন জানলে আমি কখনো একথা তুলতুম না। আপনি আমায় মাফ করুন।"

স্বর্ণ আঁচল দিয়ে তার চোখ দুটি মুছে ফেল্ল। পরে বল্লে, "না। না। আপনার কথায় রাগ করিনি। আপনি দুঃসময়ে আমার যে সাহায্য করছেন, এমন আর কেউ করে নি।"

ডাক্তারবাবু লজ্জিত হয়ে উঠলেন, "থাক ও ওসব পুরাতন কথা। আপনি কি জন্য এসেছেন শুনি।"

স্বর্ণ একে একে তার দুঃখের কাহিনী বলে গেল। তাহাদের বিবাহ হয় নাই। তারা এসেছিল জগন্নাথ দেবের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা নিতে। তারপর ক'লকাতায় গিয়ে কোন একটা আশ্রমে উঠে হিন্দুমতে বিয়ে করবে। ইহাই তার মৃত স্বামীর ইচ্ছা ছিল। যদিও তাদের বিয়ে হয় নাই, তবুও সে মনে মনে তাকেই তার স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছে। শ্বশুর তাকে আশ্রয় দিক আর না দিক সে যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন সে সেই বংশের পুত্রবধূ বলে দাবী করবে।

ডাক্তারবাবু চুপ করে সবই শুনছিল। স্বর্ণ পুনরায় বল্লে, "শ্বশুরের নিকট আশ্রয় চেয়েছিলুম। তিনি দিলেন না। বাড়ী যাবার স্থান বন্ধ। আমার যা কিছু সম্বল ছিল তাই দিয়ে এতদিন কোনপ্রকারে চালিয়ে নিয়েছি। আর ত' চলে না। তা ছাড়া আমায় নিঃসহায় পেয়ে কতকগুলো দুষ্ট লোক, আমাকে অনবরত বিরক্ত করছে। এখন তাদের অত্যাচার দিন দিন বেড়ে চলছে। এখন একা থাকতেও সাহস হচ্ছে না।"

ডাক্তার বাবু কেবল মুখ বুজে সব কথা শুনে যাচ্ছিলেন। কোন কথারই তিনি উত্তর দিলেন না।

স্বর্ণ বোধ হয় পূর্ব্ব হতেই সব ভেবে চিন্তে এসেছিল। তাই বল্লে, "আপনাকে ধর্ম্মের বাপ ডেকেছি। আপনার বাসায়ই থাকব, কাজ করব, তার বদলে একবেলা দুটি খেতে দিবেন। কেমন পারবেন ত?" বলে ডাক্তার বাবুর মুখের পানে চেয়ে রইল।

ডাক্তার বাবু অনেক ভেবে চিন্তে বল্লে, "কাল এসো এ কথার জবাব পাবে।" বলে উঠে দাঁড়ালেন। স্বর্ণ নমস্কার করে চলে গেল।

ডাক্তার বাবু সব কথা কমলাকে খুলে বল্লেন। কমলা ত' শুনে রেগে আগুন। ডাক্তার বাবুকে সে রাত্রে যত পারে শক্ত শক্ত কথা শুনিয়ে দিলে। তারপর ঘরে দরজা বন্ধ করে সারারাত কেঁদে কাটালো।

পরদিন যথাসময় স্বর্ণ এসে উপস্থিত হ'ল। ডাক্তার বাবু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে পরে ধীরে ধীরে বল্লেন, "চল, তোমায় আমার এক বন্ধুর বাসায় রেখে আসি। সে তোমায় মেয়ের মতন দেখবেন।"

স্বর্ণ কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলো, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "বেশ। চলুন। আপনি যা বলবেন আমি তাতেই রাজী আছি।"

ডাক্তার বাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। স্বর্ণ যে এত সহজে রাজী হবে সে আশা সে করে নাই। সে স্বর্ণকে সঙ্গে করে নিয়ে তার বন্ধুর বাসায় রেখে এলো।

ডাক্তারবাবু প্রত্যহ বন্ধুর নিকট হতে স্বর্ণের খোঁজ-খবর নিতেন। কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে কোনদিন স্বর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সাহস করেন নি।

অনেকদিন বাদে একদিন ডাক্তারবাবু তার বন্ধুর মুখে শুনলেন, স্বর্ণ নাই, সে পালিয়েছে। বন্ধু সেদিন হেসে বল্লে, "সে কি ঘরে থাকবার মেয়ে যে ঘর দিলেই ঘরে থাকবে? শুধু তোমার খাতিরে ওকে রাখতে রাজী হয়েছিলুম।"

শুনে ডাক্তার বাবুর লজ্জা হ'ল এবং স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস করতে নেই ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা বন্ধুকে শুনিয়ে দিলেন। বন্ধু শুধু হাসলো, কোন উত্তর করলো না।

* * *

কয়েক বছর কেটে গেছে। সংসারের কত ঘাত-প্রতিঘাতে সকলেই জর্জ্জরিত। ডাক্তারবাবুও জর্জ্জরিত হয়ে উঠলেন। পুরীর একঘেয়ে জীবন তার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এমন সময় ডাক্তারবাবুর বড় মেয়েটির মৃত্যু হ'ল। কমলা আরও বেশী চঞ্চল হয়ে পড়লো। কেবল

দিনরাত কান্না। ডাক্তারবাবুর মনেও শান্তি নেই, কেবলি মনে হ'ত সে নেই! সে নেই!

ডাক্তারবাবু ঠিক করলেন পুরী ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও যাবেন। অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর ভাগ্যক্রমে বরিশালের হাসপাতালে বদলী হয়ে গেলেন। নিজের দেশে এসে কমলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

ডাক্তারবাবু হাসপাতালের বিদায়ী ডাক্তারের নিকট হতে কাজ-কর্ম্ম বুঝে নিয়ে দ্বিপ্রহরে বাসায় ফিরবার মুখে হল-ঘরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটী নার্স তার সম্মুখ দিয়ে আসছিল। অন্যমনস্ক ভাবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠে ডাক এলো, "ডাক্তারবাবু না?"

ডাক্তারবাবু থমকিয়ে দাঁড়ালেন। নার্সটি হাসতে হাসতে নিকটে এসে ডাক্তার বাবুকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

ডাক্তার বাবুর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল "স্বর্ণ যে! তুমি এখানে।"

স্বর্ণ হেসে উত্তর কল্লে, "হাঁ আমি, আমার পোষাক দেখেই বুঝতে পারছেন আমি নার্স। যাক্‌গে, আপনার খবর কি? হঠাৎ পুরী ছেড়ে এখানেই বা কেন? বাড়ীর সব ভাল ত? বউ, খুকী এরা সব ভাল ত?"

ডাক্তার বাবু মৃদু হেসে বল্লেন, "বদলী হয়ে এসেছি। বাড়ীর সব ভাল নয়, বড় মেয়েটি গেল বছর গত হয়েছে।"

শুনে স্বর্ণ খুব দুঃখ প্রকাশ কল্লে। ডাক্তার বাবু পুনরায় প্রশ্ন কল্লেন, "তোমার খবর কি? পুরী হ'তেই বা কাউকে না জানিয়ে এলে কেন? লোকে কত কি বদনাম তোমার নামে—"

স্বর্ণের চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। ডাক্তার বাবুকে বাধা দিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে, "লোকে কি বলে শুনি।"

ডাক্তার বাবু তাচ্ছিল্যের সহিত বল্লে, "সে শুনে তোমার লাভ নেই, মিছামিছি মনে দুঃখ পাবে।"

স্বর্ণ একটু হেসে বল্লে, "থাক! আমি ওসব শুনতে চাইনে, কিন্তু আমি কেন পুরী ছাড়লুম শুনবেন?"

ডাক্তারবাবু বল্লেন, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে ত' আমার শুনতে কোন আপত্তি নেই।"

স্বর্ণ বল্লে, "বেশ! ওখানে চলুন। আপনাকে কোন কথা বলতে আমার আপত্তি নেই।" দুজনে এসে ঘরে বসলো।

স্বর্ণ একে একে সব ঘটনা বলতে আরম্ভ করলো,— "আপনি যে বন্ধুর বাসায় আমাকে রেখে এসেছিলেন, সে হলো এক নম্বরের পাকা বদমা'স। সে আমায় অসহায় দেখে প্রথম প্রথম নানান্ প্রকার প্রলোভন দেখাত। যখন দেখলে তাতে কোন কাজ হলো না, তখন সুরু হলো তার অত্যাচার। সেখানে টিক্‌তে না পেরে ক'লকাতায় পালিয়ে আসি। একবার ভাবলুম, আপনার ওখানে যাই, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মনে হলো, আপনাকে মিছামিছি কষ্ট দেওয়া। সেজন্য আপনার সঙ্গে দেখা করলুম না।"

ডাক্তারবাবু বল্লেন, "কলকাতায় তো তোমার পরিচিত কেউ নেই, কোথায় উঠলে?"

স্বর্ণ মৃদু হেসে বল্লে, "শ্বশুরের ঠিকানা জানা ছিল, সোজা সেখানে এসে উঠলুম।"

ডাক্তারবাবু বল্লে, "তিনি তোমায় আশ্রয় দিলেন?"

স্বর্ণ বল্লে, "না! শ্বশুর ম'শায় আমায় দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলেন। আমার হাত দু'টী ধরে বলে উঠলেন, "দেখ মা, আমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করি, এ অবস্থায় তোম আশ্রয় দিলে কেউ আমার বাড়ীতে হাড়ি ফে আসবে না।"

আমি ভেবে বললুম, "বেশ! আমাকে কোন আশ্রমে পাঠিয়ে দিন। সে-খানে আমি যাতে সদ্ভাবে জীবন যাপন করতে পারি, তার ব্যবস্থা করে দিন।"

ডাক্তারবাবু বল্লেন, "বাড়ীতে বাপ-মার ওখানে গেলেই হতো।"

স্বর্ণ একটু হেসে বল্লে, "আপনি মনে করেন, আমি সে-চেষ্টা করিনি, কিন্তু তারাও ঠিক ঐ ভয়ে আমায় থাকতে দিলে না।"

ডাক্তারবাবু বল্লেন, "তারপর কি হলো?"

স্বর্ণ বল্লে, "বৈকালে শ্বশুর ম'শায় এসে আমায় বল্লেন, "চল তোমায় এক মঠে রেখে আসি, সেখানকার মোহন্ত আমার পরিচিত লোক, তোমায় ভালভাবে রাখবেন।"

বৈকালে আমরা এক মঠে এলাম। মঠের বৃদ্ধ অধ্যক্ষ আমাদের আদর করে বসালেন। শ্বশুর ম'শায় আমার ঘটনা সমস্ত মহারাজের নিকট বলে গেলেন। শুনে অধ্যক্ষ অনেক দুঃখ করলেন। তারপর বল্লেন, "বেশ! ওকে রেখে যাও। এখানে আরো কয়েকটি মহিলা আছে, ও তাদের সঙ্গে থাকবে। ধ্যান করবে, পূজো করবে, এ-সব নিয়ে থাকলেই, আস্তে আস্তে মনের বিকার কেটে যাবে।" শ্বশুর ম'শায় বল্লেন, "বেশ! ওকে আপনার হাতে দিলুম। আপনি ওকে পিতার মতন পালন করুন।" বলে তিনি চলে গেলেন। আমি মঠেই থেকে গেলুম।"

ডাক্তারবাবু বল্লেন, "মোহন্ত মহারাজ বুঝি আপনাকে নার্সিং শিক্ষা দিয়ে এখানে ভর্ত্তি করে দিয়েছেন।"

স্বর্ণ বল্লে, "না! বলছি সব, ধৈর্য্য ধরে শুনুন।" বলে সে পুনরায় বলতে আরম্ভ ক'রল, "মঠে আছি, আমার উপর পূজার ফুল তোলার ভার পড়েছে। রোজ ফুল তুলে আনি, ধ্যান করি, কীর্ত্তন শুনি। মনও আমার এই নূতন স্বাদ পেয়ে বেশ আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মোহন্ত মহারাজের পুরাণের অশ্লীল ব্যাখ্যা শুনে মনে মনে মহারাজের উপর বিতৃষ্ণা হতো কিন্তু বৃদ্ধ বলে সে-ভাব বেশীক্ষণ মনে পোষণ করতুম না।"

ডাক্তারবাবু বল্লেন, "মোহন্তরা কিন্তু—র—ও—"

স্বর্ণ ধমক দিয়া বল্লে, "থামুন! রস ভঙ্গ করবেন না।"

ডাক্তারবাবু বল্লেন, "না, এই আমি চুপ করলুম, আর কিছু তোমায় বলবো না।"

স্বর্ণ বল্লে; "এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল। একদিন রাত্রে আমি আমার শোবার ঘরে ঘুমিয়ে আছি, গভীর রাত্রি, চারিদিক অন্ধকার, নিস্তব্ধতায় ঝিম্ ঝিম্ করছে। এমন সময় একটি মেয়ে এসে, আমায় তুলে দিয়ে বল্লে, "মহারাজ ডাকছেন। আমি চোখ রগড়িয়ে উঠে বসলুম।"

"তারপর।"

"বলছি, আমি মেয়েটির সঙ্গে মোহন্তমহারাজের ঘরে এসে প্রবেশ করলুম। দেখে বিস্মিত হলুম, কয়েকটি যুবতী মহারাজের পদসেবা করছে, তখন কিন্তু মোহন্তের উপর আমার খারাপ ধারণা হয় নাই। মহারাজ আমায় দেখে, ইঙ্গিতে কাছে বসতে আদেশ দিলেন। আমি তাঁর নিকটে বসলুম। মহারাজ নূতন করে আমাকে আমার পূর্ব্ব ইতিহাস একে একে প্রশ্ন কর্ত্তে লাগলেন। আমি নির্ভয়ে সব বলে যেতে লাগলুম। দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে কখন যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, তা বলতে পারি নি হঠাৎ একটা প্রবল আকর্ষণে চমকিয়ে উঠলুম। কিয়ৎক্ষণের জন্য আমি হতবাক্ হয়ে গেলুম। মহারাজের বিষাক্ত ঠোঁটের স্পর্শে আমার ঠোঁট জলে যাচ্ছিল। যখন চেতনা ফিরে এলো তখন আমি প্রবল বেগে মহারাজের গালে চড় মেরে উঠে পড়লুম। মেয়েরা সব নিকটেই ছিল। মহারাজকে চড় মারতে তারা রুখে এলো। মহারাজ তাদের নিষেধ করলেন।"

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলেন। এবার সে উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "তথাপি আপনি সেইখানে এতদিন ছিলেন।"

স্বর্ণ একটু হেসে বল্লে, "না, তার পরদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে যাই। পথে এক পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁকে আমার বিপদের কথা খুলে বল্লুম। তিনি আমায় আশ্রয় দেন। তিনি আমাকে নার্সিং বিদ্যা শিখিয়ে এখানে ভর্ত্তি করে দেন।"

ডাক্তারবাবু বল্লেন, "আশা করি সেখানে ভালই—"

স্বর্ণ বাধা দিয়ে বল্লে, "নিশ্চয়! তারা আপনাদের মত পশু নয়। সেখানে খারাপ হবার যথেষ্ট পথ আছে, কিন্তু যারা পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করতে চায়; তাদের যথেষ্ট উপায় আছে।"

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বল্লেন, "আমাদের মধ্যেও যথেষ্ট ভাল লোক আছে, যা আপনি পান নি।"

স্বর্ণ গম্ভীর হয়ে বল্লে, "হ্যাঁ! খুব পেয়েছি। আপনাদের মধ্যে যারা সৎ লোক, তারা হচ্ছে আপনার শ্রেণীর ভীরু, কাপুরুষ ও অক্ষম। আর সব আপনার বন্ধু ও মোহন্ত-মহারাজের দলের।"

ডাক্তারবাবু আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। কে যেন তাঁর মাথাটা নীচে ঠেলে দিল। যখন সে মাথা তুলে চাইলো, তখন দেখলো, স্বর্ণ নেই। সে চলে গেছে।

লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ, এ

বাঙ্গালাভূমির গণ-জীবনের সহিত পরিচিত হইতে হইলে বঙ্গভূমির ভাবধারা, রূপধারা, ছন্দধারার অন্তঃপ্রকৃতিকে চিনিতে হইবে। বাঙ্গালাভূমির গণ-জীবনের বিজয় ও সুপ্রতিষ্ঠা লাভ হইবে সেদিন, যেদিন বাঙ্গালার মানুষ বাঙ্গালার ছন্দধারার পরিচয়-সাধনায় অগ্রযুক্ত হইবে। বাঙ্গালার গণ-জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে বাঙ্গালার ভাষা ও সংস্কৃতিকে অখণ্ড ও অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত করিতে হইবে।

কবি জয়দেবের সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত অভিজাত সাহিত্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বাঙ্গালা পদগুলি লোক-সঙ্গীত হইলেও, অনেকটা উন্নত স্তরের। সুতরাং এই সাহিত্যের পূর্ব্বে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপ কি প্রকার ছিল, তাহা প্রণিধানযোগ্য। উহা আবিষ্কার করিতে হইলে লোক-সাহিত্যের ভিতর অনুসন্ধান করিতে হইবে। উন্নত সাহিত্যের ভিতর এই রূপ মিলিবে না। বৌদ্ধপ্রভাবে যখন বাঙ্গালাদেশ পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল; তখন উন্নত শ্রেণীরা বা নগরবাসীরা নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধযুগে আমাদের দেশে পল্লীবাসীরা এবং অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশের লৌকিক সাহিত্য সংরক্ষণ করিতেছিল। বৌদ্ধযুগে আমাদের দেশের সাহিত্যের লৌকিক অংশ পল্লী-সাহিত্যের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল। এই সাহিত্যের প্রসার বা সম্পদ লাভ ঘটে নাই,— উহা সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তখনকার নাগরিক প্রভাব হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রহিল। ইহাই লোক-সাহিত্য। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত 'রূপকথা', 'ব্রতকথা'; 'ক্রীড়া-গীতি' প্রভৃতি পল্লী গীতিগুলি হইতেছে প্রাচীন লোক-সাহিত্যের নিদর্শন। 'ডাকের বচন' ও 'খনার বচন' শ্রেণীর ছড়া-গীতিগুলিও প্রাচীন লোক-সাহিত্যের নিদর্শন। লোক-সাহিত্যের বাউল গানগুলিও প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বাউল গানগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধভাব প্রচ্ছন্নভাবে জীবন্ত আছে।

এই লোক-সাহিত্যের ভিতর জাতির আদি ভা-শিক্ষাধারার অবিমিশ্রিত রূপ দৃষ্ট হয়। ইহা গ্রন্থ পুঁথিতে স্থান পায় নাই—ইহা লোক-পরম্পরা আসিতেছে।

এই যে লোক-সাহিত্যের কথা বলা হইল, ইহা শুধু ভাষা, সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রেই মূল্যবান নহে। এই পল্লী-সাহিত্যের মধ্যে আমরা বহু শতাব্দীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় জানিতে পারি। প্রাচীন সংস্কৃতি বা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় আমরা যদি শুধু উন্নত স্তরের সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহাতে আমরা সত্যকার ইতিবৃত্তি পাইতে পারিব না। কারণ, উন্নত স্তরের সাহিত্যে সাধারণতঃ অভিজাতশ্রেণীর সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা লিপিবদ্ধ হয়। সেখানে সাধারণ লোক ও তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সংস্কৃতির কথা স্থান পায় না।

গ্রামে গ্রামে যে সব মঙ্গলগান গীত হইত, তন্মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব মঙ্গল-কাব্যের উৎপত্তি কোন্ সময়ে ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মঙ্গলকাব্যের প্রাধান্য যুগ। সুতরাং, ষোড়শ শতকের বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহা এদেশে প্রচলিত ছিল, বলা যায়। মঙ্গল গানগুলির উপর বিরাট সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রভাব দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালার সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের যাবতীয় উপাদান লইয়া মঙ্গল গানগুলি রচিত হইয়াছে। মঙ্গল-কাব্যে নায়ক নায়িকারা সব গ্রাম্য, অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক। কালকেতু শুধু সুন্দর পুরুষ নয়, সে গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক। সমাজের ইতর স্তর হইতে ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইসব মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের সুর বর্ত্তমান। প্রাচীনকাল হইতেই পুর-মহিলারা পরিবারের সন্তান-সন্ততির, বিষয়-সম্পত্তির উন্নতি কামনা করিয়া মঙ্গল অনুষ্ঠান করিতেন। এই উপলক্ষে

স্ত্রীরা মঙ্গলগান করিতেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এখনও সঙ্গীত গাহিবার রীতি দৃষ্ট হয়। এই সব মঙ্গল-গীতি হইতেই যে মঙ্গল-কাব্যের উৎপত্তি, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যহিতে পারে। আমাদের দেশের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে স্ত্রী-আচার কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠানেই দেখা যায়। পূর্ব্বে স্ত্রীলোক ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক সংস্কৃত ভাষায় অধিকারী ছিল না। এইজন্য স্ত্রীলোকেরা কোনও লৌকিক বা পল্লীদেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই মঙ্গল-কাব্যের জন্ম দিয়াছেন।

লোক-সাহিত্যের 'কবিওয়ালা' সঙ্গীতগুলিও বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের অরাজকতার যুগে যখন বাংলা সাহিত্য বিপন্ন হইল, তখন নাগরিক সাহিত্যের সৃষ্টি প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। এই যুগের নাগরিক সাহিত্যের প্রধান নিদর্শনই হইতেছে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। কিন্তু বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে তখন সাহিত্য রচনা রুদ্ধ হয় নাই। গ্রাম্য কবিওয়ালারা সেদিন গান বাঁধিয়া বাঙ্গালা কাব্যকে জিয়াইয়া রাখেন। এই সব কবিওয়ালাদের মধ্যে দাশরথি রায় ও রামনিধির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অনাদর ও অবহেলা সহ্য করিয়া অদ্যাপি বহু লোক-সঙ্গীত বর্ত্তমান। বাঙ্গালার পল্লীকুটীরই লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীতের আলোচনা-কেন্দ্র। পল্লীবাসী অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ই উহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা। বাঙ্গালাদেশের পল্লীঅঞ্চলে যে সব লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বাউল, বারমাসী, সারি ও মেয়েলীছড়া গানগুলির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে এই লোক-সঙ্গীতগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বাউল গান

বাউল সাধনার প্রধান অঙ্গই হইতেছে দেহতত্ত্বমূলক ভাবময় সঙ্গীত আলোচনা। বাউল সাধনার অন্তর্গত গানগুলি স্থানবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। সাধারণতঃ এই গানগুলি "বাউল" গান নামে পরিচিত হইলেও, উত্তরবঙ্গে এই শ্রেণীর কতকগুলি গান "সাঁই" গান নামে সুপরিচিত। পূর্ব্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের কতকগুলি স্থানে বাউল গানগুলি "মুরসিদা" বা "দরবেশী" গান নামে সুপরিচিত। বাউল, সাঁই, মুরসিদা গানগুলি মূলতঃ এক ও অভিন্ন এবং এইগুলি প্রধানতঃ গুরুবাদী সঙ্গীত।

এককালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাউল গান আলোচনা করিয়া যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষা অর্জ্জন কবিতে পারিতেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজের উপেক্ষায় এইগুলি বিলয়প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সঙ্গীত আলোচনায় নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের দিক দিয়া অথবা সরলতা ও পবিত্রভাব আদর্শ প্রচারের দিক দিয়া বাউল গান সংরক্ষণের একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে। বাউল-গুরু এই সব সঙ্গীতের সাধনায় তন্ময় হইয়া যান। বাউল একতারা বা আনন্দলহরীর তানে সুর মিলাইয়া পারমার্থিক গানগুলি ভাবের আবেশে গাহিতে থাকেন। তাঁহার সেবাদাসী আনন্দলহরীর তালে তালে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন।

এখানে পশ্চিমবঙ্গের একটি ভাবমূলক বাউল গান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

মন তুমি কারে ভাবছ বৈসে।
কর গুরু-সাধন এখনও রিপু আছে বশে॥
দেহেতে ছয় কুজনা দেয় তোরে মন্ত্রণা
ভুলেও গুরু বল না হৈয়ে তাদের বশে।
সাধ আগে গুরু জনায়ে
তাঁরে কৃপা হৈলে ভয় আছে আর কিসে॥
সে ধন সহজে কি মিলে কখন।
দেখ বাঞ্ছা-কল্পতরু সে ধন।
এক মনে ভাবে যে জন
লভ্য হয় তার অনায়াসে।
গুরু হয় অন্তের দর্পণ
তারে যতনে ডাকিলে মিলে অবশেষে॥

এই গানটিতে বলা হইতেছে যে, গুরুই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের আধার। গুরু-ভজনায় এবং গুরুর নিকট পরম তত্ত্ব অর্জ্জনে আত্মাকে ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধগামী করা যায় এবং চরমমুক্তি ও নির্ব্বাণ লাভ করা যায়।

রাজসাহী জেলা হইতে সংগৃহীত একটি মুর্শিদা গানে গুরু-ভক্তি ও গুরুপ্রেমের কথা কিরূপে বর্ণিত হইয়াছে, দেখুন :—

সভায় তাহার একটা বৈশিষ্ট্যময় মূল্য আছে। মনসাপূজা বা দুর্গোৎসব উপলক্ষে এখনও রাজসাহী, দিনাজপুর, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে নদীতে নদীতে বাঁইচ-প্রতিযোগিতা হয়। বাঁইচের সময়ে যে সব সারি-গান গীত হয়, তাহাদের ভিতর নায়ক নায়িকার বিরহ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব।

উত্তর-বঙ্গের একটি বাঁইচের সারিতে পাইয়াছি :—

সখি চল্ জলকে চল্
বাজে কার মোহন বাঁশী
মোর পরাণ বড় চঞ্চলে চলে।
যমুনার তীরে কদম্বেরি ডালে
নাম ধর‍্যা বাজে বাঁশী
রাধা রাধা বৈলে॥

কুল মজায়ু লাজ ত্যাজিনু
ঐ বাঁশীর লাগি।
ঐ বাঁশীর লাগ্যা হইলাম
শ্যাম-পীরিতের দাগী॥
না জানি বাঁশী জানে কি যাদু সোনা।
কেবল রাধা নামে বাজে বাঁশী
আর কিছু জানে না॥

মধ্য-বাঙ্গালার একটি বাঁইচের সারিতে পাইয়াছি :—

আর কালার সাথে প্রেম কইরা
মোর সুখ হইল না কোন কালে।
সমুদ্দুরের জলের ঢেউএ মনের জ্বালা
জ্বলে লো সই॥

সে জ্বালা সমুদ্দুরে ঝাঁপ দিলে কি সারে?
আমরা নারী অবলা সয় না জ্বালা
ঘরে নাই মোর প্রাণের পতি।
আমরা যুঁতি জাতি আর মালতী বঁধু সই॥

ও বঁধু ফুল গাঁইথাছি নানান্ জাতি।
এ ফুল কার গলে দিব প্রাণ জুড়াব
কোথায় যাইয়া পাব প্রাণের পতি॥

এই বিরহগীতিকাগুলিতে পল্লীর নায়ক-নায়িকার প্রাণের প্রেম, ভালবাসা, আন্তরিকতা, অন্তর হইতে অপূর্ব্বভাবে বিকশিত হইয়াছে। এই গীতিকাগুলির ছন্দঃকলা লালিত্যপূর্ণ। পল্লীগাথায় নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলা ছন্দঃসুষমায় ভরপুর।

মেয়েলী ছড়া

বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলের মা-বোনেরা অবকাশ সময়ে নানা ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকেন। এই জাতীয় ছড়া-গীতিকে "মেয়েলী ছড়া" নামে অভিহিত করা যায়। মেয়েলী ছড়াগুলির ভিতর দিয়া গ্রাম্য জীবনের বিভিন্ন দিকের ছবি চিত্রিত হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই সব ছড়া শুনিয়া প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ পায়।

এখানে উত্তর-বঙ্গ হইতে সংগৃহীত দুইটি মেয়েলী ছড়া উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(১)

অন্নপূর্ণা দুধের সর
কেমনে যাবে পরের ঘর।
পরের বেটা মারল চড়
কাঁদতে কাঁদতে খুলুর ঘর॥
"ও খুলু, তোর পাও ধরি,
থুয়ে আয় মায়ের বাড়ী।"
মায়ে দিল সিঁথি পাটি
বাপে দিল শাড়ী।
ভাইয়ে দিল হুড়কা লাঠি
তাড়ায়ে দিল স্বামীর বাটী।

(২)

ঘুঘু মৈল ঝালের পিঠলি খায়্যা।
সেই ঘুঘুকে নিয়া গেল দিবনগর দিয়া॥
দিবনগরের দুইটা মেয়ে জলে নেমেছে।
ঝাড়াছিনি চুল গাছি মটর বেঁধেছে॥
পরণে আছে উল্টা শাড়ী মেঘ যোগ্যাছে।
যাব আমি আপন শ্বশুর-বাড়ী
জোর শিঙ্গা বাজে।
দুই দুয়ারে দুটি বউ লক্ষ্মী পূজা করে।
দুই দুয়ারে দুটি কবুতর মক্ মক্ করে॥
বাপ হৈয়ে কাপড় দেয় পাথা ঢাকিয়া।
মা হৈয়ে জল দেয় ষষ্ঠী সাজিয়া॥

লোক-সঙ্গীতগুলি সরস, সহজ, সুললিত ভাষায় প্রকাশিত। পল্লীকবির ভাষায় কোনও কাঠিন্য ও কর্কশতা নাই—ভাষার ধারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রবাহিত, ভাবধারা সহজ ও সুস্পষ্ট কথায় ব্যক্ত। লোক-সঙ্গীতগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে—ভাষার স্বাধীনতায় ও ভাবের মাধুর্য্যে। পল্লীর

কবি কোনও কাহিনী, কোনও ভাব বা কোনও বৈচিত্র্য বর্ণনা করিতেন এমন ভাষায়—যাহা নিরক্ষর লোকও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কবি একটি কঠিন অবোধ্য ভাবকে এমন সরলভাবে বুঝাইতেন যে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। পল্লীর কবি শ্রোতার মনের উপর আধিপত্য করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পল্লীকবির বর্ণনায় শ্রোতারা কখনও হাসিত, কখনও কাঁদিত। হাসি-কান্নার মাঝ দিয়া শ্রোতা যে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিত, তাহা অন্য কিছুতেই সে পাইত না।

অশিক্ষিত হইলেও পল্লীকবি স্বভাব-কবি। আমাদের মনে হয় বাঙ্গালার প্রকৃতিই তাঁহাদিগকে এইরূপ দুর্ল্লভ কবিত্ব-শক্তি দান করিয়াছিল। তাঁহাদের ভাষা নির্ঝরিণীর মত মুক্ত-প্রাণ, কোথাও বাধাবিঘ্ন মানে নাই। উপমাগুলিও অতুলনীয়।

আধুনিককালে গ্রাম্য গীতির প্রসার প্রায় সর্ব্বত্রই হ্রাস পাইতেছে। ইহার কারণ আবিষ্কার করিতে গিয়া কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, অন্ন-সমস্যাই ইহার প্রধান কারণ। রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যের মধ্যেও সঙ্গীতের সুর আনন্দের বার্ত্তা আনিয়া দেয়। সুতরাং জাতির দারিদ্র্যকেই গ্রাম্য-গীতির প্রসারের অন্তরায় মনে করা যায় না। আসল কথা হইল, শিক্ষিত বাঙ্গালী নরনারী লোক-সঙ্গীতের মূল্য ভুলিয়া যাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার মোহে শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধিকাংশই স্বদেশের সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানগুলিকে অবহেলা ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। এইজন্য বাঙ্গালার লোক-সঙ্গীত শিক্ষিতদের অনাদরে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

গ্রাম্য-গীতির আসরে সঙ্গীতের দ্বারা দল-গঠনের প্রচেষ্টা ছিল। আমাদেরই অবহেলায় তাহা বিনষ্ট হইতেছে। আমাদের গাজন, দোল, দুর্গোৎসব, মহরম প্রভৃতি অনুষ্ঠান-গুলির ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার অনেক গৌরবের জিনিষ অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। এই সমস্ত উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি, বাউল, জারি প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতের চর্চ্চা হইতে পারিত। আবার বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে যাহাতে লোক-সাহিত্যের আলোচনা হয়, তাহার জন্য দেশের পাল-পার্ব্বণগুলির পুনঃ প্রবর্ত্তন আবশ্যক। বাঙ্গালীর জীবনে লোক-সঙ্গীতের আসরের মত সার্ব্বজনীন মিলনের স্থান আর নাই। লোক-সঙ্গীতের আসরের প্রসার যাহাতে অতীতের মতই বর্ত্তমান থাকে, তদ্বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

ক্ষণিকা

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

ক্ষণিকের তরে,
যৌবন বসন্ত আসি দেখা দিল মোর গৃহদ্বারে।
হৃদয় কমল তার মধুর দিনের পত্রদল
খুলেছিলো গন্ধভরা শুভ্র স্বচ্ছ আলোকে উজ্জ্বল।
দিকে দিকে প্রিয়তম ভ্রমরেরে পাঠালো আহ্বান
আকুল হৃদয় স্পন্দমান
আশা-পথে চাহে বারে বারে,
ক্ষণে শুধু ক্ষণিকেরই তরে।

ক্ষণিকের সব
এই বাদ বিসংবাদ বিলাপের ধারা নিত্য নব,
প্রেম, মান-অভিমান হাসি অশ্রু বুদ্বুদের মত,
কাল সমুদ্রের বুকে ফুটে আর টুটে অবিরত।
এ জীবনই ক্ষণিকের ; তবু এর মাঝে চিরস্থায়ী
ঝরে তব স্নেহ জ্যোতির্ম্ময়ী,
নিত্য হেরি অকৃপণ দানে,
পুরাতনে নবরূপে পূর্ণ করি আনে।

আইনের ফাঁকি

শ্রীভুবনমোহন সাহা

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বৈঠকখানা ; কাল—প্রভাত

উমা—এমনি ক’রে কদিন চলবে। বসে না থেকে একটা চাকুরী-বাকুরীর সন্ধান দেখ না। দিনরাত পাওনাদারের তাগাদায় মানুষের প্রাণ বাঁচে ?

নিরঞ্জন—কি করব উমা, বল না। তুমি মনে করেছ সন্ধান আমি কচ্ছি না, কিন্তু চাকুরী না পেলে কি করি ? সেদিন গিলেণ্ডার্সের বড় সাহেবের সঙ্গে ইণ্টারভিউ দিয়ে এলাম, সাহেব বল্লে—বাবু, যুদ্ধ না থামলে তোমার জন্য কিছু ক’রতে পার্ব্ব না।

উমা—এই দুর্দ্দিনে শুধু দালালির উপর ভরসা ক’রে কি সংসার চালান সম্ভব ? কেন সেই কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া ক’রতে গেলে। সেই চাকুরীটা থাকলে ত’ আর আমাদের এই দুরবস্থায় পড়তে হ’ত না।

নিরঞ্জন—তোমার এসব কথা শুনলেই আমার মেজাজ ঠিক থাকে না। একটু ত্রুটী হ’লেই যেখানে ড্যাম, রাস্কেল, নন্‌সেন্স শুনতে হবে—সেখানে নির্ব্বিবাদে এসব হজম ক’রে গোলামী ক’রতে হবে ! তুমি কি মনে কর মানুষের সেল্‌ফ-রেস্পেক্ট বলে কিছু নেই !

উমা—আত্মসম্মান বোধ যদি তোমার এতই বেশী হয়ে থাকে, তা হ’লে দেনা করে এমন সাহেবী ষ্টাইলে থাকবার দরকার কি ? পাওনাদারের এত তাগাদাই বা সহ্য করবার কি দরকার ? কাজ কি এত টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া নেবার ; দরকার কি বামুন চাকরের ? রেডিও, টেলিফোন তুলে দাও না।

নিরঞ্জন—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না উমা, এসব ঠাট আছে বলেই লোকের কাছে এখনও ধার পাওয়া যায়।

উমা—বেশ, তা যেন বুঝলাম। কিন্তু আজ যে ভাঁড়ে মা ভবানী—উদরান্নের কি ব্যবস্থা হবে ?

নিরঞ্জন—উমা, তোমার মনের বল এতটুকু নেই ; একবেলা ঘরে খাবার নেই, তাতেই মুষড়ে পড়ছ। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বাড়ীটা বিক্রী করাতে পারলে দালালি আসবে দশ হাজার টাকা। সব ঠিক, মাসখানেক সবুর কর না। এই টাকাটা হাতে এলেই একটা জায়গা কিনে ফেলব। তারপর ল্যান্সডাউন রোডের মরগেজের কাজটা হলেই একটা বাড়ী করে ফেলব—তাহ’লে বাড়ীভাড়ার তাগাদা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

উমা—চাকুরী যাবার পর থেকে আজ পাঁচ বছর কেটে গেল—কাজ ত’ তোমার হ’তে দেখছি না, শুধু লাখ লাখই শুনে এলাম। ভরসা ত’ দেখতে পাচ্ছি শুধু হ্যাণ্ডনোট কাটা। খাবই বা তুমি কি করে যোগাড় কর !

নিরঞ্জন—বুঝলে উমারাণী ক’লকাতার সহরে টাকা আনবার ফিকির জানা চাই। এ এমন পবিত্র সহর যে ভেকেতেই ভিক মিলে। গঙ্গার ধারে ত’ দেখেছ ভিখিরীর মেলা বসে যায়। এরা কি কম পয়সা উপায় করে ! সেদিন একটা ভিখিরীকে জিজ্ঞাসা করলুম,—তোমার মাসে কত রোজগার হয় ? সে চুপি চুপি বল্লে,—বাবু বলবেন না ত’ কাউকে, গড়ে রোজ দুটু’ টাকা বেকসুর। আর পাঁচ হাজার টাকা সুদি আছে, আজ বিশ বছর এ কাজ কচ্ছি। বাবু ক’লকাতার সহরে ধূলোমাটিতে পয়সা। শুধু উপায়ের কৌশল জানা চাই।

উমা—এমন ফিকির করে কদ্দিন চলবে ?

(উমার প্রস্থান)

(বাড়ীওয়ালা কমলবাবুর প্রবেশ)

কমল—কি ম’শায় ভাড়া-টাড়া দেবেন, না মতলব এঁটেছেন কি ?

নিরঞ্জন—নমস্কার কমলবাবু, হ্যাঁ আপনি স্বয়ং একেবারে !

কমল—না এসে উপায় কি ? সরকারকে একবছর ভাড়াচ্ছেন ; আপনার সঙ্গে আর কোন ভদ্রতা নেই। ছ’শ টাকা বাকী ফেলেছেন—টাকা দেবেন কি না বলুন—আমি আজ আপনার কোন ওজর শুনব না।

নিরঞ্জন—দেখুন কমল বাবু, এতদিনই যখন গেল,—তখন আর একটা মাস অপেক্ষা করুন, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কাজটা হ'লে এককালীন সবটাকা চুকিয়ে দেব। বিশ্বাস না হয় আপনাকে অগ্রিম ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের চেক দিয়ে দিচ্ছি।

কমল—ম'শায় লজ্জা হয় না আপনার? আবার চেকের নাম করছেন! অমন নক্সাওয়ালা কাগজে ত' অনেকবার সই করে দিয়েছেন। বিধাতার সৃষ্টির অপরূপ দান আপনারা। হাজতে না দিতে পারলে আপনাকে শায়েস্তা করা যাবে না, তারই ব্যবস্থা দেখিগে। (প্রস্থানোদ্যত)

নিরঞ্জন—অত চটছেন কেন কমলবাবু, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কাজের কথাটা। এই দেখুন—সেলারের অথরিটি লেটার (authority letter)। (ডেস্ক হইতে authority letter বাহির করিয়া দেখান) আপনি মনে কচ্ছেন—আমি ধাপ্পা দিচ্ছি। ধাপ্পা দেবার লোক আমি নই, আমার সব কাগজে কলমে।

(ফুটফুটে কিশোরী মেয়ে আরতির চা হস্তে প্রবেশ)

নিরঞ্জন—আগে কমলবাবুকে দাও। এইটি আমার বড় মেয়ে কমলবাবু। কমলবাবুকে নমস্কার কর মা।

(কমলবাবুকে আরতির নমস্কার করা ও কমলবাবুর প্রতিনমস্কার)

কমল—কই এতদিন ত দেখিনি। (চেহারায় আকৃষ্ট হইয়া কমলবাবু পুনঃ পুনঃ তাকাইতে লাগিলেন)

নিরঞ্জন—এতদিন লক্ষ্ণৌতে ওর মামার কাছে ছিল। ক'দিন হয় মাত্র এসেছে। নাচে, গানে, বাঙ্গালা দেশে ওর সমকক্ষ কেউ আছে কি না সন্দেহ।

কমল—বটে! তা যেমন চেহারা তেমন গুণ না থাকলে মানাবে কেন?

নিরঞ্জন—আরতি! কমলবাবুকে তোমার সাপুড়ে নৃত্যটা দেখিয়ে দাও না।

আরতি—হারমোনিয়ম না হ'লে—

নিরঞ্জন—আচ্ছা বিনা হারমোনিয়মেই দেখিয়ে দাও না।

(আরতির সঙ্গীতসহকারে নৃত্য প্রদর্শন)

কমল—বাঃ-বাঃ-চমৎকার নিরঞ্জনবাবু!! হারমোনিয়মটা আনতে বলুন না।

নিরঞ্জন—হারমোনিয়মের একটা অভাব আছে।

কমল—সে কি কথা!—এই নাও গা—তাগাদায় বেরিয়ে বাড়ীভাড়া আজ পঞ্চাশটাকা পেয়েছি—আর পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি, হারমোনিয়ম একটা আজই কিনে দিবেন—বুঝলেন? (টাকা প্রদান) বাড়ীবিক্রীর কাজটা হলে এই টাকাটা ফিরিয়ে দিতে ভুলবেন না যেন।

নিরঞ্জন—নিশ্চয়ই—ফিরিয়ে দেব। আপনার মত লোকের কথা ভুলতে পারি! এক্ষুণি আমার ডাইরীতে নোট করে নিচ্ছি, বলুন ত একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি, বুঝলেন আমার সব কাগজে কলমে, একদম পাকা কাজ।

কমল—হ্যাণ্ডনোট দিতে ত' আপনি সিদ্ধহস্ত—যাক ওসব কিছু ক'রতে হবে না, এখন আসি তা' হলে—

(আরতির দিকে আর একবার তাকাইয়া প্রস্থান)

(উমার প্রবেশ)

উমা—কি—এখানে বসে থাকলেই পেট ভরবে?

নিরঞ্জন—তুমি বড় নারভাস, একটা ভানুমতীর খেল দেখবে? চক্ষু বুজ, (উমার চক্ষু মুদ্রন) আয় টাকা আয় টাকা। খোল চক্ষু (চক্ষু খুলিল) এই দেখ পঞ্চাশটাকা এসে গেল।

উমা—সেকি! তুমি কি যাদু জান নাকি?

(মহেন্দ্র দুধওয়ালার প্রবেশ)

মহেন্দ্র—বাবু! আজ টাকা দিতেই হবে।

নিরঞ্জন—আর কয়েকটা দিন সবুর কর মহেন্দ্র—বাড়ীটা বিক্রী হলে—

মহেন্দ্র—আটমাসে আশীটাকার উপর দুধের দাম বাকী ফেলেছেন—এখনও সবুর করতে বলছেন। নাঃ—সোজাপথে আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় হবে না।

(মহেন্দ্রর প্রস্থান)

উমা—এমন করে লাঞ্ছনা সয়ে কদিন চালাবে। একজন যেতে না যেতে আর একজন পাওনাদার এসে হাজির। পাওনাদারের তাগাদায় মানুষের প্রাণ বাঁচে?

নিরঞ্জন—কি করবে উমা! দুঃসময়ে সাহসে ভর করে চলতে হয়। এখন যদি দুর্ব্বলতায় নেতিয়ে পড়, তাহলে নিজের অস্তিত্ব রাখাই ভার হবে।

(আরতি ও উমার প্রস্থান)

কাবুলী—(নেপথ্যে) নিরাবাবু বাড়ী হ্যায়?

(লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাবুলীর প্রবেশ)

এ ক্যায়া বাত তুম সুদ বি দেগা নেই রূপিয়া বি দেগা নেই। আজ তুমকো নেই ছোড়েঙ্গে। লাঠীসে আদায় কর লেগা।

নিরঞ্জন—নুরমহম্মদ ! তোমহারা মেজাজ আজ এত্না বিগড়গিয়া কাহে ! কেত্না হুয়া হিসাব কুচ হ্যায় !

কাবুলী—হিসাবমে ক্যায়া হ্যায়—পান্স রূপিয়া মে দেড়হাজার রূপিয়াসে জাদা হো গিয়া। তুম আসল নেই দেনে সকে সুদ দে দেও—নেইত খত বদল দে দেও।

নিরঞ্জন—জরুর খত বদল কর দেগা। সব কাগজ কলম মে রহেনেসে আচ্ছা হোগা।

কাবুলী—কাল জরুর আয়গা (কাবুলীর প্রস্থান)

(উমার প্রবেশ)

উমা—রঘুকে কোথায় পাঠালে ? এখনও ফিরছে না—

(নেপথ্যে)—নিরঞ্জনবাবু হ্যায়—

উমা—উঃ—একটু দাঁড়াবার যো আছে—ছারপোকার মত কে বুঝি আবার জ্বালাতে এল—মরণ আর কি ! এত তাগাদায় প্রাণ বাঁচে। (বেগে উমার প্রস্থান)

(মূলচাঁদ মাড়োয়ারীর প্রবেশ)

নিরঞ্জন—মূলচাঁদবাবু ! আজ ত' আপনার আসবার কথা ছিল না।

মূলচাঁদ—বাত ঠিক হ্যায়। হামি শুনলাম, আপলোক ইনসলভেন্সি লেনেকা মতলব কিয়া হ্যায়।

নিরঞ্জন—আপনি ভুল শুনেছেন। ঐ সামান্য দেনার জন্য খরচ করে ইন্‌সলভেন্সি নিতে যাব—যাকে বলে বাংলা কথায় দেউলিয়া খাতায় নাম লেখান। আপনার টাকা না দিতে পারলেও দেউলিয়া খাতায় কখনও নাম লেখাব না। এই সামান্য চার পাঁচহাজার টাকার জন্য বদনাম কিনব ? যা আমার চৌদ্দ পুরুষে কেউ—

মূলচাঁদ—ওত ঠিক বাত হ্যায়, বাবুজি, এ-ত ভদ্দর আদমিকা কাম নেই হ্যায়। তব—হামার টাকার কি ব্যবস্থা কোরছেন ?

নিরঞ্জন—ঘাবরাইয়ে মাৎ মূলচাঁদবাবু ! ক্লাইভ ষ্ট্রীটকা কামঠো হোনে দিজিয়ে। আপনার সব টাকা দিয়ে দেব।

মূলচাঁদ—হুবরসসে ও বাত শুনতা হ্যায়—নালিশ না কর্লে আপনার কাছে থেকে রূপেয়া আদায় হোবে না। ও রাস্তামে চলনেসে ঠিক হোগা। (মূলচাঁদের প্রস্থান)

(উমার প্রবেশ)

উমা—মহাজন মহল বিদায় হল কি ?—না আরও কেউ পায়ের ধুলো দিতে আসবে। কটা বেজেছে একবার ঘড়িতে নজর পড়েছে ?

নিরঞ্জন—উঃ—বারটা। আমাকে খেয়েদেয়ে এক্ষুণি এটর্নি অফিসে যেতে হবে—সেই ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কাজটার জন্য, সত্যিই উমা আর পারছি না। দেশের কত লোক আমারই মত দেনার জ্বালায় ছটফট কচ্ছে—কিন্তু আশ্চর্য্য ! গভর্ণমেন্টের এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই নাই। একটা আইন করে যে এইসব সুদখোর রক্তশোষকের শ্বাসরোধ করবে, তার কোন লক্ষণই দেখছি না।

উমা—দেখবে একদিন আসবে—যখন সুদখোরের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে—চোখ রাঙানি থেমে যাবে।

(রঘুর প্রবেশ)

নিরঞ্জন—একটা চিঠি ফেলতে তোর এত সময় গেল।

রঘু—বাবু, আজ কিছু টাকা দিন না—

নিরঞ্জন—তুইও সময় বুঝে তাগাদা আরম্ভ করলি।

রঘু—বাবু, একবছরের মাইনে বাকি, ঘর যেতে হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ। সময়—অপরাহ্ন

ত্রিলোচন—দেনায় মাথার চুলগাছা পর্য্যন্ত বাঁধা পড়েছে। ঘরে স্ত্রী রোগশয্যায় শায়িতা। ডাক্তার ডাকতে হবে। মাসের শেষ, হাতে একটী পয়সা নেই। ধার আর কত করব ! ষাটটাকা মাইনে—পনরটাকা মাসে কাবুলীর সুদ গুণতে চলে যায়। পাঁচমাসে ষাট টাকা বাড়ীভাড়া বাকী। ছেলেমেয়ের স্কুলের মাইনে, লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম। পাওনাদারের তাগাদায় বাড়ীতে ঢুকবার যো নেই

(একখানা বই হাতে গদাইর প্রবেশ)

গদাই—কিরে ত্রিলোচন ! ভাল আছিস ত' ? রাস্তায় দাঁড়িয়ে অত কি ভাবছিস—চিন্তায় চিন্তায় যে তোর গালদুখানা ভেঙ্গে পড়েছে দেখছি।

ত্রিলোচন—পাওনাদারের তাগাদায় আর ধরাধামে তিষ্ঠুতে পাচ্ছি না ভাই—রাস্তাঘাটে, অফিসে, বাড়ীতে তাগাদাব চোটে অস্থির। স্ত্রীর অসুখ, ডাক্তার ডাকতে হবে—হাতে একটী পয়সা নেই। সুদ গুণতে গুণতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত।

গদাই—কেন! ক্রেডিট সোসাইটী থেকে বা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স পলিসি রেখে নিতে পারিস।

ত্রিলোচন—সব নেওয়া শোধ। তুই যদি এসময়ে কিছু দিস ভাই—

গদাই—আমারও ভাই তথৈবচ। একশ টাকা মাইনে পাই—হাজার টাকা ধার করে বসে আছি। যাট টাকা মাসে সুদ দিতেই চলে যায়।

ত্রিলোচন—একা লোক—তোর এত ধার হ'ল কিসে!

গদাই—ধর—এই রেস, ক্লাস, থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদি ইত্যাদি।

(ফিরিওয়ালার নূতন মহাজনী আইন হাতে প্রবেশ)

ফিরিওয়ালা—চাই নূতন মহাজনী আইন! চারপয়সা দাম। সুদ আসল থেকে বেশী দিতে হবে না। বিশবছবের কিস্তিতে টাকা শোধ। বার্ষিক সুদ দশটাকার বেশী নয়। রাস্তাঘাটে তাগাদায় জরিমানা—!

গদাই—(খুব ঔৎসুক্যের সহিত) এই হকার—দেখিত একখানা। (পাঠ করিয়া) ত্রিলোচন! আর ভয় নেই,—বেঁচে গেছি। পাওনাদারের সঙ্গে এবার আইন দেখিয়ে কথা বলব। বিশবছর বসে টাকা শোধ করব। (পাঠ করিয়া) পাওনাদারের কাছে হিসাব চেয়ে পাঠাব—না দিলে আমরা উল্টো নালিশ করব—বাঃ—বাঃ—কি মজাদার আইন!!

ফিরিওয়ালা—বাবু পয়সা?

গদাই—ও-হো-হো ভুলেই গেছি,—তোব পয়সাটা দেওয়া হয় নি। (পয়সা দেওন ও ফেরিওয়ালার প্রস্থান)

ত্রিলোচন—কিন্তু ভাই, কাবুলী বেটারা ত' এই আইন-কানুনের ধার ধারবে না। সকালে ঘুম থেকে উঠিতে না উঠিতেই দেখবে লাঠিহাতে ভীষণাকৃতি যমদুত দোর গোড়ায় এসে হাজির। কে যে ওদের বাঙ্গালাদেশে আসবার ছাড়পত্র দিয়েছিল। ম্যালেরিয়াব মত দেনার দায়ে দেশটাকে জর্জ্জরিত করে ফেলেছে!

গদাই—আর তোমাদের স্বদেশী কাবুলীওয়ালারা কি কম যান? একশত ধার দিয়ে দু'শ লিখে নেবেন—সুদ দিলে ওয়াশিল দিতে দিবে না। শয়তান রক্তপিশাচের দল! জোঁকের মত আমাদের রক্তগুলো শুষে নিয়েছে—এখন ত' এনিমিক হবার অবস্থায় এসে পড়েছি!

(কাবুলীওয়ালার প্রবেশ)

কাবুলী—এই ত্রিলোবাবু! সুদ ত' আজ তুমকো দেনেই পড়েগা, রূপিয়া নেই দেনেসে আজ তুমকো নেই ছোড়েঙ্গা।

(লাঠীর দ্বারা মাটীতে সজোরে আঘাত)

গদাই—এই এছা বাত মাত বলো।

কাবুলী—তুম্ কোন্ হ্যায় বাবু।

গদাই—আইন দেখা হ্যায়, আভি তুমকো পুলিশমে পাকাড় দেগা।

কাবুলী—তোমারামাফিক বহুৎ আদমি হামলোককো আইন দেখলায়া হ্যায়।

(হ্যাটকোট পরিহিত নিরঞ্জনের প্রবেশ)

গদাই—দেখুন ত' স্যার! এ বেটা কি গাধা! আইনের কথা বললে শুনবে না!

নিরঞ্জন—ক্যায়া হুয়া হ্যায় মহম্মদ?

(ফেরিওয়ালার প্রবেশ)

ফেরিওয়ালা—চাই নূতন মহাজনী আইন, চারপয়সা দাম। বিশবছরে টাকা শোধ, শতকরা দশ টাকার বেশী সুদ দিতে হবে না। আসলের বেশী সুদ নাই। যেখানে সেখানে তাগাদা ক'রলে জরিমানা—

নিরঞ্জন—কি হে ছোকরা! দেখি একখানা।

(নিরঞ্জনের পুস্তক খরিদ ও ফেরিওয়ালার প্রস্থান)

(নিরঞ্জনের তন্ময় হইয়া পুস্তক পাঠে রত)

গদাই—অত কি দেখছেন স্যার? শুনুন—আমাদেব বিংশ শতাব্দীর সাইলকরূপা সুদখোঁকো ছারপোকাদের এবার মাথায় লাঠী পড়েছে।

নিরঞ্জন—অর্থাৎ আপনি বলতে চান—ছারপোকা ধ্বংসের নূতন ঔষধ বেরিয়েছে।

গদাই—হাঁ স্যার! যাকে বলা যেতে পারে বাগ-কিলার-ফ্লিট।

নিরঞ্জন—মহম্মদ! এ ভদ্রলোক ত' ঠিকই বলেছেন,—এ গভর্ণমেণ্টের আইন—এ অমান্ত করবে কি করে?

কাবুলী—আচ্ছা, হাম দেখেগা কোর্টমে।

(রক্তবর্ণ চক্ষু করিয়া লাঠী পুনঃ পুনঃ সজোড়ে আঘাত করিতে করিতে প্রস্থান)

নিরঞ্জন—ম'শায় বাঁচা গেল! এখন রাত্রে একটু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে বাঁচব। তাগাদার চোটে প্রাণ একেবারে ব্রহ্মতালুতে আসবার উপক্রম হয়েছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মশায় বাড়ী ভাড়ার ব্যবস্থাও এ আইনে আছে ত'? দেখেছেন কি?

গদাই—নিশ্চয়ই, তা না থেকেই পারে না।

নিরঞ্জন—থ্যাঙ্ক ইউ, আসুন (গদাইর করমর্দ্দন করিয়া) ওঃ—কি সুখবরটাই না দিলেন আজ—বাড়ীভাড়ার তাগাদা—! বাপ—বাঁচা গেল!

(দেনদার সমিতির মিছিল সহকারে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ)

কোথায় আছ সুদের মহাজন!
টাকা দিয়ে টাকা দোহন
মজার ব্যবসা এ কেমন!
জোঁকের মত রক্তচুষে
সুদের সুদ নিয়ে ক'ষে
চক্রবৃদ্ধি ভুঁড়ি পুষ্টি চলবে কতক্ষণ!
মহাজনী আইনের চাবুক,
চিমসে দিল লাল চিবুক
ভেঙ্গে দিল আরামের মৌরসী উপার্জ্জন॥
(হায়! কোথায় আজ সুদের মহাজন!)
ঐ সাইলক গোষ্ঠী কাবুলী মশায়—
রক্তলাঠি তার মৌন ভাষায়,
কাতরভাবে মিনতি জানায়—
যা দিবি সুদ দে না ভাই
চুপি চুপি চলে যাই,
আইনের ফাঁদে আটকে গেলে
পাব কি আর দু আনা সুদ মাসিক টাকায়?
মোদের কষ্ট তাতে হবে বিলক্ষণ।
(হায়! কোথায় আজ সুদের মহাজন!)

নিরঞ্জন—বেশ, বেশ ম'শায়রা আপনারাই দেনদারদের মুক্তি আনতে পারবেন। দলবদ্ধ হ'য়ে কাজ না করলে আর কোন কাজে উন্নতি হয়? এই নিন (কার্ড দিয়া), কাল আমার বাড়ীতে আসবেন। আমিও আপনাদের সমিতির সভ্য হব।

জনৈকদেনদার—আমাদের সভাপতির আসন খালি আছে। আপনাকেই আমাদের যোগ্যতর সভাপতি কর্ব্ব।

গদাই—নিরঞ্জনবাবু, আমরাও সভ্য হয়ে দেনদারের দলপুষ্টি করব। (গান গাইতে গাইতে সমিতির প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নিরঞ্জনের বাটী। কাল—রাত্রি

নিরঞ্জন—(মহাজনী আইনের বই পড়িতে পড়িতে প্রবেশ করিয়া) গিন্নি, ও গিন্নি, কোথায় গেলে, এস না শীগ্‌গীর এবারকার মত রেহাই পেয়ে গেছি। আর ভাবতে হবে না।

(উমার প্রবেশ)

উমা—ব্যাপার কি? আজ যে বড্ড উল্লাস। কারুর মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু…

নিরঞ্জন—তোমার যে কি বিশ্রী ধারণা আমি সব সময়েই বুঝি ধার করে বেড়াই?

উমা—তবে এত মশগুল ভাব কেন?

নিরঞ্জন—আরে গিন্নি! শুন, শুন, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। নূতন আইন—নূতন আইন—কোন ব্যাটার সাধ্যি আছে আর নিরঞ্জনের বাড়ী এসে তাগাদা করে? মহাজন বেটারা এলে হয়—সব সায়েস্তা করব এবার।

উমা—বলই না, আবার ত' মহাজনদের আসবার সময় হল।

নিরঞ্জন—মহাজন! আসুক না—স্পষ্ট আদালত দেখিয়ে দেব।

উমা—টাকা ত' না দিয়ে পারবে না।

নিরঞ্জন—বিশ বছর কিস্তিতে টাকা শোধ—তারপর কেউ যদি বার বার তাগাদা কর্ত্তে আসে, সেরেপ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একখানা দরখাস্ত—সব ঠাণ্ডা। লাঠি ঘুরিয়ে চোখ রাঙিয়ে আর আদায় হচ্ছে না।

উমা—সব দেনার জন্যই কি এই নিয়ম, বাড়ীভাড়ার…?

নিরঞ্জন—বাড়ীভাড়া ত' বটেই—ঝি, চাকর, গোয়ালা, মুদী সব—সব।

(নেপথ্যে)—নিরঞ্জনবাবু—

উমা—ঐ এসেছে জ্বালাতে। (উমার প্রস্থান)

(মাড়োয়ারীর প্রবেশ)

মাড়োয়ারী—কি খবর—রুপিয়া কা কুচ বন্দবস্ত হুয়া?

নিরঞ্জন—(মুখে চুরুট লাগাইয়া খবরের কাগজ পাঠে রত)—যখন পাবার হয় পাবেন।

মাড়োয়ারী—কি বোলছেন, টাকা দেবেন না? কতদিন আউর সবুর কোরবে।

নিরঞ্জন—না পারেন কোর্টে যান।

মাড়োয়ারী—আপনি চোখ রাঙাচ্ছেন।

নিরঞ্জন—নূতন মহাজনী আইন দেখেছেন,—বেঁচে থাকলে টাকা বিশ বছরে শোধ ক'রব।

মাড়োয়ারী—আচ্ছা দেখেগা ক্যাসা আদায় হোতা হায়।

(মাড়োয়ারীব প্রস্থান)

(মুদীর প্রবেশ)

মুদী—বাবু, চারশো টাকা জমে গেছে, আমি আর ধারে খাওয়াতে পারব না।

নিরঞ্জন—বেশ ভাল কথা—তুমি যদি নাই দাও—তা হলে অন্ত আর একজনের কাছে ধারের ব্যবস্থা করতে হবে।

মুদী—আমার টাকা শোধ করে দিন।

নিরঞ্জন—যখন হবে তখন পাবে।

মুদী—আর ঘুরতে পারব না, দেবেন কিনা বলুন?

নিরঞ্জন—ঘুরতে না পার কোর্টে যাও—নূতন আইন দেখেছ, বিশ বছরের কিস্তিতে টাকা শোধ।

মুদী—বলেন কি ম'শায়! এক বছর ধারে খাইয়ে বিশ বছরে টাকা আদায়!

নিরঞ্জন—আজ্ঞে হাঁ।

মুদী—(বিস্ময়ে) তা হ'লে!

নিরঞ্জন—তা হ'লে আবার কি? যাও—এখন ভ্যান্ ভ্যান্ করো না।

(খবরের কাগজওয়ালার প্রবেশ)

কাগজওয়ালা—বাবু, আমাব আট মাসের খবরের কাগজের দাম বাকী পড়ে গেছে। আজ দিয়ে দিন না,—কাল দেশে যাব।

নিরঞ্জন—আমি কি যেতে বারণ কচ্ছি?

কাগজওয়ালা—টাকা?

নিরঞ্জন—টাকা আবার কি—নূতন আইনের খবর রাখ, বিশ বছর, বিশ বছর—

কাগজওয়ালা—সে কি আইন! তা হলে পাবার কোন আশাই নাই!

মুদী—চল ভাই, উকিলকে জিজ্ঞেস করে দেখিগে।

(মুদী ও কাগজওয়ালার প্রস্থান)

(গোয়ালার প্রবেশ)

গোয়ালা—বাবু, আজ আমি কোন কথা শুনব না, টাকা দিতেই হবে।

নিরঞ্জন—যখন পাবার হয় পাবে।

গোয়ালা—লজ্জা হয় না আপনার, দুধ খেয়ে দাম না দিতে?

নিরঞ্জন—খবরদার! নূতন আইন দেখেছ? বিশ বছরেব কিস্তিতে টাকা শোধ। এখানে বেশী বাড়াবাড়ি কর ত' পুলিশে ধরিয়ে দেব।

গোয়ালা—আইন-টাইন বুঝি না, আমার নাম মহেন্দ্র গোয়ালা। গলায় গামছা দিয়ে আদায় কর্ত্তে মহেন্দ্র জানে।

নিরঞ্জন—চুপরাও, মুখ সামলে কথা বল।

গোয়ালা—কী! দেখ, মহেন্দ্র গোয়ালা আদায় কর্ত্তে জানে কি না। (নিরঞ্জনের গলায় গামছা দিয়া টানাটানি)

নিরঞ্জন—পুলিশ, পুলিশ (ফোন ধরিয়া) বড়বাজার ৩৯৭ হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, নো রেসপন্স!

(চীৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া উমার প্রবেশ)

উমা—ছিঃ, এ কি মহেন্দ্র, তুমি ক্ষেপে গেলে নাকি!

(মহেন্দ্রর গামছা ছাড়িয়া দেওন)

গোয়ালা—দেখছিলুম, কোর্ট ছাড়া টাকা আদায় হয় কি না।

নিরঞ্জন—(জোরে) হ্যালো—হ্যালো, বড়বাজার ৩৯৭, এত চীৎকারেও কনেকসন পাচ্ছি না!

উমা—চেঁচালে কি হবে। গত মাসের বিলের টাকা দেওয়া হয় নি, কনেকসন কেটে দিয়ে গেছে। মহেন্দ্র এখন যাও, পরে এসে টাকা নিয়ে যেও। (মহেন্দ্রর প্রস্থান)

তোমার জন্তেই সময় মত আইনটা হয়েছে বটে, তা হলেও একটু রয়ে সয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

নিরঞ্জন—টেলিফোনের কনেকসনটাই পেলাম না, তাহ'লে বেটাকে দেখিয়ে দিতুম। এ আইন শুধু কি আমার জন্য তুমি মনে করছ? আমার মত এমন যোগভ্রষ্ট পুরুষ অনেক আছেন, যা'রা স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জলে মুক্ত হবার জন্যে বসে আছেন।

চতুর্থ দৃশ্য

নিরঞ্জনের বাটী ; কাল—অপরাহ্ণ

(নিরঞ্জন ও উমার প্রবেশ)

নিরঞ্জন—উমা, কই কমলবাবু ত' আর বাড়ীভাড়ার তাগাদায় আসছে না। নূতন আইন দেখে ভয় পেয়ে গেছে। সরকারকে সেদিন রাস্তায় দেখা হতে যা বলে দিয়েছি, সে আর এ বাড়ীর ধুলো মাড়াতে সাহস করবে না। নূতন আইন কি,—যেন গোঁখুড়ো সাপ!

উমা—ভাল করে দেখেছ কি। বাড়ীভাড়া যদি এ আইনে না পড়ে তা হ'লে। একজন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখ না।

নিরঞ্জন—কি বলছ তুমি পড়বে না। পড়তেই হবে, যদিই না পড়ে—ফাঁক একটা বের করব নিশ্চয়ই। বাড়ীভাড়া শীগ্‌গির দিচ্ছি না, জেনে রোখো। বিশ বছর কিস্তি, কিস্তি—কিস্তি—কিস্তিমাৎ।

(দেনদার সমিতির "কোথায় আজ সুদের মহাজন" গান গাইতে গাইতে প্রবেশ)

(উমার প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ বাদে গান থামিয়া গেল)

নিরঞ্জন—আসুন, আসুন। আজ দেশের সমস্ত দেনদারের মুক্তি চাই। মুক্তি চাই-মুক্তি চাই। দেনার চাপে যারা শ্বাস ফেলতে কষ্টবোধ ক'রছেন, তারা আজ হাঁপ ছেড়ে বাঁচুন। দেশের ঋণভারপ্রপীড়িত শত শত মুখে আজ হাসি ফুটুক। কঙ্কালসার দেহে আজ শক্তি আসুক। মিটিং করে সর্ব্বত্র এই আইনের মাহাত্ম্য প্রচার করব—ধন্য গভর্ণমেণ্ট! এই আইনে বাড়ীওয়ালাদের মুখ শুকিয়ে গেছে, সুদখোর মহাজনেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। তাতে আমাদের কি? আমরা চাই বাঁচতে, মুক্তি-মুক্তি-মুক্তি। ওঃ বাড়ী-ভাড়ার তাগাদায় কি না কষ্ট পাচ্ছিলুম!

জনৈক দেনদার—তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে বাড়ীভাড়া এ আইনে পড়ে কি না।

নিরঞ্জন—ম'শায় এইখানা ভাল করে দেখুন গে, প—ড় না—

(সিল ওয়ারেণ্ট লইয়া পেয়াদা ও সরকার ইত্যাদির প্রবেশ)

পেয়াদা—ম'শায় আপনার কি কি মাল আছে, দেখিয়ে দিন। বাড়ীভাড়ার জন্য সিল করতে এসেছি।

নিরঞ্জন—সে কি ম'শায়—সাবধান জিনিষে হাত দিবেন না, নূতন আইন দেখেছেন?

পেয়াদা—নূতন আইনে যা থাকে আদালতে গিয়ে দেখাবেন, আমার কাজ আমায় কর্ত্তে দিন।

নিরঞ্জন—নূতন মহাজনী আইনে ডিক্রি হবে-বিশ বছর কিস্তি হবে, কিস্তি খেলাপ হলে, তবে সিলের কথা উঠতে পারে।

পেয়াদা—ম'শায়, আমরা আদালতের লোক, আমাদের আইন দেখাচ্ছেন? বাড়ীভাড়া নূতন আইনে পড়ে না।

সরকার—ওঁর কথা শুনছেন কি পেয়াদা সাহেব, আপনি সিল করে ফেলুন।

নিরঞ্জন—কি বল্লেন ম'শায়! বাড়ীভাড়া নূতন আইনে পড়ে না! আরতি, আরতি, আমার নতুন আইনের বইখানা,—কি ম'শায়রা (দেনদারদের প্রতি) আপনারা কিছু বলছেন না কেন—আদালতের পেয়াদা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? সেক্সনটা বলুন না কেন?

আরতির প্রবেশ

আরতি—বাবা বই ত' বাড়ীর ভিতরে নেই, আপনার কাছেই আছে।

(নিরঞ্জন টেবিলের দেরাজ হইতে বই বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল)

(কমলবাবুর প্রবেশ)

নিরঞ্জন—বাড়ীভাড়ার দরুণ কোন সেক্সন নাই! বলেন কি! তা হলে ত' শীঘ্রই এই আইনের এমেণ্ডমেণ্ট (Amendment) হওয়া দরকার। বাড়ীভাড়া এতবড় একটা ইম্পরটেণ্ট আইটেম তাই বাদ!

কমল—কি নিরঞ্জন বাবু, আইনের ফাঁক খুজছেন নাকি?

সবাইকে ফাঁকে ফেলেছেন বটে—কিন্তু বাড়ীভাড়া না দিয়া উপায় নেই।

নিরঞ্জন—তাইত! তাইত! এটা কি রকম হল! আমাদের গভর্ণমেণ্টের ধড়ে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে! বাবা, এতগুলি সেক্সন করলে তার ভিতরে বাড়ীভাড়াটা এক জায়গায় ঢুকিয়ে দিলে না কেন!

কমল—গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বুঝা পড়া করবেন পরে; এখন আমার টাকা দেবেন—না, মালপত্র সিল করে যাব।

নিরঞ্জন—কমলবাবু, আপনি শেষটায় আমার উপর এতটা নির্দ্দয় হবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। একটা নোটীশ পর্য্যন্ত না দিয়ে—

কমল—তা—কি করব বলুন। অনেকগুলি টাকা বাকী ফেলে দিলেন—তারপর আপনি নাকি সবাইর সঙ্গে নূতন আইন দেখিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। আমার সরকারকেও সেদিন এমনি ধারা আইনের ভয় দেখিয়েছেন। পেয়াদা সাহেব, সিল করে ফেলুন—আর দেরী করবেন না।

(পেয়াদা মাল সিল করিতে উদ্যত)

নিরঞ্জন—ম'শায়, সিল করে কি করবেন? সব ত' হায়ার পারচেজ সিস্‌টেমে (hire-purchase system) খরিদ করা।

কমল—তাই নাকি! না—না—সরকার, বডিওয়ারেণ্ট করে জেল না খাটাতে পারলে এ সব লোকের শিক্ষা হবে না। যাও তারই ব্যবস্থা দেখগে।

সরকার—এ রামঘুঘু, বাবা রামঘুঘু, ফাঁকির ফন্দি সব জানে। (সরকার ও পেয়াদা ইত্যাদির প্রস্থান)

কমল—কই, আমার হারমোনিয়মের টাকাটা দিয়ে দিন? না—সে টাকাও উদরায় নমঃ করেছেন।

নিরঞ্জন—আরতি—আরতি—হারমোনিয়মটা।

(আরতির প্রবেশ)

আরতি—কি বাবা।

কমল—এস, মা এস, ভাল আছ ত' হারমোনিয়মটা কিনেছ?

আরতি—নমস্কার! বাড়ীভাড়ার জন্য আপনি যেমন অগ্নিশর্ম্মা হয়েছেন, এতে আপনার সঙ্গে কথা বলতেই ত' ভয় লাগে।

নিরঞ্জন—আরতিকে আপনার—পছন্দ হয়েছে না, কমল বাবু?

কমল—কেন বলুন ত? কিছু মতলব—

নিরঞ্জন—এই বলছিলুম কি—এই (ইতস্ততঃ করিয়া) আরতিকে বৌমা করে নিলে হয় না! তা'হলে উভয় কুলই রক্ষা পায়।

কমল—অর্থাৎ আপনি বাড়ীভাড়া না দিয়েই পারেন।

নিরঞ্জন—ঠিক তা নয়—তবে, তবে আপনি—বেয়াই মানুষ ওটা কি চাইতে পারবেন।

কমল—আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারি না—! বেয়াইমশায় এইটিই আপনার আইনের মস্তবড় ফাঁকি। এতক্ষণ এই ফাঁকই খুজছিলেন, বেশ বেশ—বহুত আচ্ছা।

নিরঞ্জন—তা'হলে সময় ক্ষেপ করে লাভ কি? শুভস্য শীঘ্রম্। শুভদিনটা আজই ঠিক করে ফেলা যাক।

(স্বগতঃ) বলা যায় না বাবা, লোকের মন—বদলাতে কতক্ষণ।

কমল—না—না, ওর জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কমলমুখুয্যে যখন নিজে কথা দিয়েছে, ও আর নড়চড় হবার জো নেই।

নিরঞ্জন—তা হলে নিশ্চিন্তি।

(স্বগতঃ) বেটা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি! নিরঞ্জনকে আইনের ফাঁদে ফেলবে, তেমন বেটা এখনও জন্মায়নি—সাতবার চিটিং কেসের আসামী, কিন্তু বেকাদায় পড়িনি। (প্রকাশ্যে) চলুন, আপনার বেয়ান ঠাকুরুণকে একবার শুভসংবাদটা দিয়ে আসি।

যবনিকা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাহিত্যিক নারী-চিত্রে দত্তার স্থান

শ্রীরামশশী কর্ম্মকার এম্-এ, বিদ্যাবিনোদ

শরৎবাবুর 'দত্তা' একখানি বই-এর মত বই ;—একথা বহু শিক্ষিতের মুখে শুনিয়াছি। সুবোধবাবু তো বলিয়াই বসিয়াছেন—'শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু 'দত্তা'র উৎকর্ষ সম্বন্ধে প্রায় সবাই একমত।'

আপাতদৃষ্টিতে সুবোধবাবুর কথায় সত্য বই মিথ্যার আভাস পাওয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু চরিত্রাঙ্কনের দিক্ দিয়াই শরতের বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালীর জীবনে এক নূতন আলোকসম্পাত হইয়াছে শরৎচন্দ্রের উদয়ে, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই ; কেবল বলিয়াছেন, —রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে ইহার উন্মেষ দেখা গিয়াছিল। তবুও শরৎ-ই এই নূতনত্বের সব কৃতিত্বটা ভোগ করিয়াছেন ; কারণ রবীন্দ্র উন্মেষ দেখাইয়াই মুখ লুকাইয়াছেন, তাঁহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রভাবটা বুঝি লুপ্ত হইতে পারে নাই। আর শরৎচন্দ্রের পরিপূর্ণ প্রভা বিকাশ পাইয়া কমলের মত কামিনীকেও চমৎকারকারিণী করিয়া তুলিয়াছে ! অবশ্য সে চন্দ্রালোকে মানবের উন্মাদরোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, না অজ্ঞানান্ধকার কিছুমাত্র বিদূরিত হইয়াছে, তাহা লইয়া একটা মীমাংসায় আসিবার আজও সময় আসিয়াছে কি না বলিতে পারি না। যে নারীজাতির অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শরৎচন্দ্র বহু বহু নারীচরিত্র 'Heroic' ধরণে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কয়জনকে তিনি গৌরবের আসনে বসাইয়া সুখী করিয়াছেন ? প্রগতির পরাকাষ্ঠার কি ভীষণ পরিণতিই না অচলা দেখাইয়াছে ! প্রগতিবাদের শক্তিমান্ Advocate স্বয়ং যখন প্রগতিবাদের এই কু-পরিণাম সাব্যস্ত করিলেন, তখন আর কি কথা !

কিন্তু সেকথা লইয়া আজ আর পাঠকবর্গকে চঞ্চল করিতে চাই না ; সে-নীতিবাদের বিরুদ্ধে বহু লেখক লেখনী ধারণ করিয়া ইতিপূর্ব্বেই পাঠকসমাজে পরিচিত হইয়াছেন। আজ আমি শরৎচন্দ্রের নারীচিত্রগুলির একটু তুলনামূলক আলোচনায় পাঠকদের সহযোগ চাহিতেছি।

বিজয়াকে মুমূর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায় প্রথম। তাহাকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া বেশ বুঝা গেল, সে একজন অশিক্ষিতা বালিকামাত্র নহে। তাহার পিতৃ-শ্রদ্ধার প্রাথর্য্য ভেদ করিয়া নিজের ব্যক্তিত্বের ঝাঁঝ বেশ প্রকাশ পাইতেছে। মুমূর্ষু পিতাও তাঁহার 'সুশিক্ষিতা তেজস্বিনী কন্যাকে চিনিতেন', আজ ঝাঁজও পাইলেন। বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞ পিতা তাঁহার আদেশ আরও দূরপ্রসারী করিতে ইচ্ছা করিয়াও করিলেন না। পিতার প্রতি শ্রদ্ধা বিজয়ার ছিল না, এ-কথা বলা চলে না ; কিন্তু সে শ্রদ্ধার পরিধি পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মৃত্যুপথযাত্রী পিতা যখন বলিলেন—'একটি অনুরোধ (আদেশ নয়, অনুরোধ !) করি মা, জগদীশ যাই-ই করুক—সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু !…তার একটি ছেলে আছে।…বাপের দোষে তাকে নিরাশ্রয় করিস্ নে মা, এই আমার শেষ অনুরোধ।'—তখন তাঁহাকে স্তোকবাক্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি দেখাইয়া নীরব করিতে তৎকালেও তাহার কিছুমাত্র বাধে নাই। পিতার

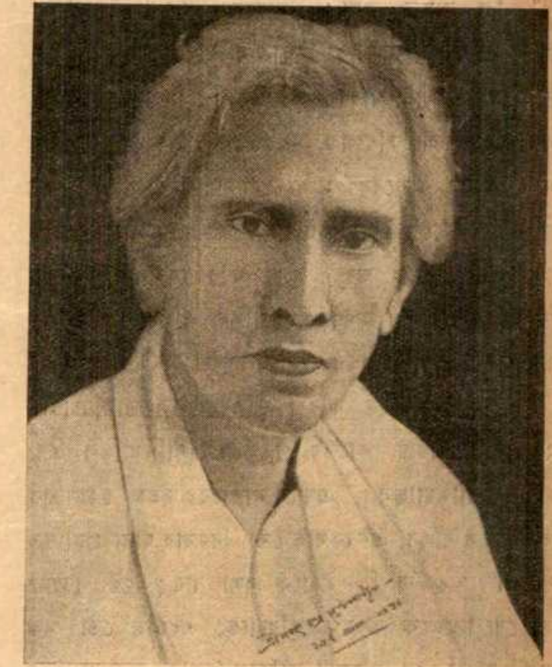

শরৎচন্দ্র

শেষ আদেশ নয়, অনুরোধ রক্ষা করিতে বিজয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল, ভবিষ্যতে মনের মধ্যে পিতার কথা দুই চার বার আলোচনাও করিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রাধান্য রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি অচিরে চলিয়া গিয়াছিল। বিলাসের মুখে জগদীশের মত্তাবস্থায় ছাদ হইতে পড়িয়া মরার সংবাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের সুনীতি স্মরণ করিয়া বিজয়া দুর্ভাগ্য পিতৃসখার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ওষ্ঠ বিকৃত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না।’ মহা-ধার্ম্মিক বিলাসবিহারী যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ লোককে আশ্রয় দিলে ভগবানের চরণে অপরাধ করা হয়’, তখন সে-ধর্ম্মভাবের বন্যায় পিতার কথা ভাসিয়া গেল।

একজন সমালোচক বলিয়াছেন, “দত্তা’য় বাহিরের শক্তির তাড়না খুব গৌণ, মুখ্য জিনিষ হইতেছে বিজয়ার মনের দ্বন্দ্ব।” কি অদ্ভুত কথা! নরেন্দ্রের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া মন্দির স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত যদি বিজয়ার স্বাধীন মত হইত, তবে এ-কথাই স্বীকার করিতাম। কিন্তু তাহা নহে। পিতার সহিত তর্ক করিলেও, নরেন্দ্রকে গৃহছাড়া করিবার সংকল্প বিজয়ার অন্তরের মধ্যে বেদনা দিতেছিল, কিন্তু জোর করিয়া নিজের ইচ্ছা পরিচালন করিবার সাহস তাহার নাই। এটা লেখক স্বয়ং লক্ষ্য করিয়াছেন। বিলাসের প্রতি বিজয়ার প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়া বলা দুষ্কর। অথচ বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিজয়াকে Octopus-এর মত জড়াইয়া নিষ্পেষিত করিয়া তুলিয়াছিল। রাসবিহারীর এবং বিলাসবিহারীর হাতের পুতুল সে সাজিয়াছিল এবং অকারণেই সাজিয়াছিল! এখানে নারীত্বের সহজ দুর্ব্বলতার দোহাই দিলে বলিব, এই কথাই তো বিজয়ার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব কি ইহাকে বলা যায়? দুষ্ট পুরুষের হাতে সে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে, এইটাই তো মস্ত দোষ। অবশ্য সে অবস্থায় পড়িলে কোন বেটাছেলেও আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত কি না, এরূপ প্রশ্ন উঠিলে সে প্রশ্নকে নামঞ্জুর করিতে হইবে; কারণ সে-ক্ষেত্রে দুর্ব্বলতা প্রদর্শককে পুরুষ বলিব না, কাপুরুষ বলিব—ক্লীব বলিব। বিরাট পাঠানশক্তির বিরুদ্ধে একা জগৎসিংহ লড়িয়াছিল, পরাজিত হইয়াছিল, বন্দী হইয়াছিল, তবুও সে পুরুষসিংহ হইয়া আয়েষার ন্যায় বীরললনার হৃদয় অধিকারে সমর্থ হইয়াছিল। বলবানের নিকট দুর্ব্বলের পরাজয় সুনিশ্চিত। অসংখ্য গুণ্ডার আক্রমণে জনৈক গৃহস্থের ধনহানি এমন কি প্রাণহানিও অপরিহার্য্য হইতে পারে; কিন্তু গুণ্ডার ভীতিমাত্র উপলক্ষ্য করিয়া গৃহত্যাগ পুরুষের কার্য্য নয়। দুর্ব্বলতা কাপুরুষতার নামান্তরমাত্র। পুরুষের পক্ষে আত্মমর্য্যাদা ত্যাগ নিন্দনীয় হইলে, নারীর পক্ষেও কি তাহাই নহে। অন্ততঃ, নব্যতন্ত্রে কি নারীর মর্য্যাদা পুরুষের মর্য্যাদা স্পর্দ্ধী নয়? অতএব নিজের মত চালাইবার ক্ষেত্রেও যদি বিজয়া সঙ্কোচবোধ করে, তবে বলিব তাহা অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল নয়, বস্তুতঃ বাহ্য-শক্তির প্রভাব। আমার মনে হয় বাহ্য-শক্তির প্রভাব ‘দত্তা’ উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে দেখান হইয়াছে। বোধ হয়, প্রবল বাহ্য-শক্তির প্রভাবে পড়িয়া তেজস্বী ব্যক্তিও যে দুর্ব্বলের ন্যায় নুইয়া পড়ে, ইহার সুন্দর চিত্র অঙ্কনই ছিল শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য।

বিজয়া ‘তেজস্বিনী’ বলিয়া পিতাও জানিয়া গিয়াছেন। গ্রামে আসিবার কয়েক মাস পরেই বিলাসের পিতার হুকুম নাকচ করিয়া পূর্ণ গাঙ্গুলীর দুর্গোৎসবে বাজনার প্রথা অব্যাহত রাখিবার পরামর্শ দিয়া বিজয়া তাহার সহজ তেজস্বিতা দেখাইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সে বাহিরের শক্তির স্রোতে ভাসিয়া যায় এবং নিজকে অসহায় মনে করিয়াই সে এরূপ করে। নতুবা স্নেহপ্রবীণ দয়ালবাবুর সান্নিধ্য ঘটিলেই বিজয়ার আচরণে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত; এমন কি একদিন বিলাসবাবুকেও ভৃত্যের আসনে বসাইয়া দিবার সাহসও সে দেখাইতে পারিয়াছিল। কিন্তু দয়ালবাবুর সহৃদয়তায় বিজয়া যথার্থ সহায়তার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে নিজকে ছাড়িয়া দেয়। তাই দেখা যায়, ক্রমে বিজয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী সমস্ত ঘটনাই স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, সে সব ‘পারা’ আকস্মিক না হইলেও, শক্তিমানের পারা হয় নাই উন্মাদগ্রস্তের পারা হইয়াছে। জঘন্য অবসাদ ক্রমে বিজয়ার মনকে সম্পূর্ণ অসাড় করিয়া দিয়াছে। অসন্তুষ্ট বিলাসের গায়ে পড়িয়া তোষামুদি করিয়া সন্তোষবিধানের চেষ্টা সে করিয়াছিল। কিন্তু এ সব কোন্ দ্বন্দ্ব মীমাংসার প্রয়োজনে দরকার হইয়াছিল? দেখা যাক।

পিতার মুখে নরেন্দ্রের নাম ও সম্বন্ধের কথা শুনিয়া বিজয়া তৎকালে অস্বীকার করিলেও, হয়ত তাহার অবচেতন

মনে একটা ছায়া অজ্ঞাতে পড়িয়াছিল। সেইজন্যই সেই অপরিচিত যুবককে প্রথম দর্শন হইতে পুনঃপুনঃ দেখিবার ও তৎসঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ করিবার জন্য বিজয়ার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। 'নদীতীরের অস্বাস্থ্যকর বাতাস তাহাকে সজোরে টান দিয়া' লইয়া যাইত। এমন হইল যে, এই অপরিচিত লোকটির নিকট তাহার বিশেষ পরিচিত বিলাসও পাতালে নামিয়া পড়িল। নরেন সেদিন বিজয়ার বাড়ী হইতে 'চলিয়া গেলে যতক্ষণ দেখা গেল বিজয়া অপলকচক্ষে চাহিয়া রহিল। তারপরে ফিরিয়া আসিয়া সুমুখের চৌকিটার উপর বসিয়া পড়িল; কথনো বা তাহার মনে হইতে লাগিল, যতদূর দৃষ্টি যায় সব যেন খালি হইয়া গেছে, কিছুতেই যেন কোনদিন তাহার প্রয়োজন ছিল না, কিছুই তাহার মরণকাল পর্য্যন্ত কোন কাজেই লাগিবে না।' ইহা যে গভীর প্রেমসঞ্চারের লক্ষণ তাহা অস্বীকার করা যায় না। অসুখের দিনে জ্বরের প্রকোপে নরেনডাক্তারকে একেবারে শয্যার উপর বসাইয়া ডাক্তারের হাতখানা নিজের বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া বিজয়া নিজের অন্তরের নরেন্দ্রোন্মুখতা সম্পূর্ণ প্রকট করিয়াছে। জ্বরের প্রকোপে অজ্ঞানকৃত সে কর্ম্মের নিরর্থকতা প্রমাণ করিতে বিস্তর প্রয়াস বৃদ্ধ রাসবিহারী এবং স্বয়ং ডাক্তারও পাইয়াছিলেন; কিন্তু এমনি অসতর্ক মুহূর্ত্তেই ত' হৃদয়ের সত্য কথা বাহির হইয়া পড়ে। বিজয়ার নরেন্দ্র-প্রীতি আর তর্কের বিষয় নয়। তথাপি সেই প্রিয়তম ডাক্তারকে নিজের চক্ষের সম্মুখে বিলাসকর্ত্তৃক নিতান্ত অপমানিত দেখিয়াও বিজয়া বিলাসের মতটা প্রবল করিয়া রাখিল, বিলাসেরই ইচ্ছায় এবং তাহারই বিরক্তির ভয়ে বিজয়া বিলাসকৃত ক্ষতে ক্ষার ক্ষেপ করিয়া ডাক্তারকে বিদায় করিয়া দিল। ইহা কি অন্তর্দ্বন্দ্বের লক্ষণ, না সম্পূর্ণ বাহ্যপ্রভাবের ফল?

সে দিন নরেন্দ্র ডাক্তার সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বিজয়ার মনে জাগে নাই, তাহা নিশ্চিত। তাহার হৃদয়ের বাঞ্ছিত-জন নিঃসন্দেহে অবধারিত হইয়াছে। অবশ্য 'এক সময়ে সে যে নিজেই বিলাসকে পছন্দ করিয়াছিল এবং তাহারই সহিত একযোগে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নরেন্দ্রের সর্ব্বনাশ কামনা করিয়াছিল।' বিলাসের ধর্ম্মোৎসাহ বিজয়াকে কতকটা তাহার পক্ষপাতী করিয়াছিল। পূর্ব্বেও একদিন বিলাসের আগমনসংবাদে বিজয়ার মুখে আরক্ত আভা ফুটিয়াছিল; তদ্দৃষ্টে মুমূর্ষু পিতার অন্তরে বেদনাও হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞান হওয়া অবধি যাহার সংসর্গ, যাহার কথা নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যাহার সঙ্গিনী হইবার কথাটা পর্য্যন্ত ধ্রুব সত্য বলিয়া জানাও গিয়াছিল, তাহার প্রতি বিজয়ার যে সত্যিকার প্রেমসঞ্চার হয় নাই, তাহা ত' নিশ্চিত। প্রায় প্রত্যহ নির্জ্জনে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা হওয়া সত্ত্বেও একটিও প্রেমসূচক বাক্য, এমন কি ইঙ্গিতও লক্ষিত হয় নাই। বিলাস ত' বহু চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু বিজয়ার হৃদয়ে যথার্থ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে নাই। অপছন্দ-না-করার এবং প্রেম-দান-করার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। একটা প্রয়োজনকৃত, অপরটা স্বভাব-প্রণোদিত। কিন্তু কেন পারে নাই? এইরূপ একটা প্রশ্ন উঠিলে উত্তরে বলিতে হইবে,—অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী প্রকৃতির ইচ্ছা। স্বামী-স্ত্রীর আত্মিক একত্বের কথাটা নাই তুলিলাম। বন্দী জগৎসিংহের শুশ্রূষাপরায়ণা নবাব-নন্দিনীর উপর ওসমান যেরূপ প্রবল ও প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের ভাবী সম্বন্ধের কথ উভয়েরই অজানা থাকা অসম্ভব। কিন্তু সেই বীর, ধীর ও রাজভক্ত ওসমানের প্রতি আয়েষার প্রেমসঞ্চার ত' হয় নাই। অথচ জগৎসিংহের চরণে আত্মভোলা প্রেমনিবেদন আয়েষার হৃদয়ের প্রেমময়ত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। নবকুমারের প্রেম-নিবেদন বোধ হয় প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছে, কিন্তু যাহার নিকট প্রেম-নিবেদন করা হইল, সে-কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে কোন আলোড়ন পর্য্যন্ত হইয়াছে কি না বুঝা গেল না। বিজয়ার পক্ষেও তেমনি ঘটিয়াছিল। বিলাসের প্রতি তাহার প্রেম জন্মে নাই। কিন্তু প্রেম না জন্মিলেও প্রয়োজনবশে বিজয়া বিলাসকে পছন্দ করিয়াছিল। বিলাস তাহার পিতার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সদ্ধর্ম্মের উপর তাহার টানও খুব। অতএব এই দাঁড়ায় যে, বিজয়া প্রেমের ও প্রয়োজনের মধ্যে নিজের হৃদয়ে একটা দ্বন্দ্ব ঘটাইয়াছিল। নব্য রস-সাহিত্যে প্রয়োজন-প্রাধান্যই ঘোষিত হইয়াছে। অভয়াদিদি এই দ্বন্দ্বের একটা মীমাংসার পথ দেখাইয়া দিদির সম্মান পাইয়াছে। হতভাগিনী কিরণময়ী অকৃতকার্য্য হইয়া না পাইল সুখ, না পাইল আদর্শ স্থাপনের

খ্যাতি। শিবানী ওরফে কমল প্রেমকে প্রয়োজনেরই নামান্তর করিয়া, এবং প্রয়োজনই মানুষের পরমার্থ নির্দ্দেশ দিয়া ভবিষ্যদ্‌বংশীয়াদের জন্য বেদ রচনা করিয়াছে। সেই দ্বন্দ্বের আভাস লেখক বিজয়ার মনেও জাগাইয়াছেন। মনে হয়, বিজয়ার এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির কাছে ধরা পড়িয়াছে, তাহা তাহাকে কলঙ্কিতই করিয়াছে। আদর্শের অভাবে যেখানে সেখানে এইরূপ পতন ঘটাই স্বাভাবিক। অনুরূপা দেবীর ‘বাগ্‌দত্তা’ কমলার পক্ষে অসঙ্কোচে মণীশের অভিমুখী হওয়া এবং দুইদিন যাইতে না যাইতে শচীকান্তের অঙ্কলক্ষ্মী হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হয় নাই, কারণ কমলাকে লেখিকা একটি (সোণার) পুতুলের অধিক মর্য্যাদা দেন নাই। নারীদিগকে আহ্বান করিয়া একটা কথা বলা হইতেছে, ‘নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া তোল।’ কলেজের ছাত্রীদের এই উপদেশ দানকালে উপদেষ্টা কি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—out of nothing, something is to be done,—কিছু নাই’র থেকে কিছু আছে’র সৃষ্টি করিতে হইবে ; অথবা বেণরাজার মৃতদেহ মন্থন করিয়া একটা নিষ্কলুষ বস্তুর আবিষ্কার করিতে হইবে ? চা বাগানের কুলীকামিনীর illegitimate মেয়ে প্রচুর চা পান করিতে করিতে যে নীতি উদ্ভাবন করিয়াছে তাহাকেই অবলম্বন ও অনুসরণ করিতে হইবে, অথবা ভারতীয় ত্যাগানুপ্রাণিত, ঋষিজনানুশাসিত সংস্কৃতির ধারাকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষারূপ ফিল্‌টার দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে ? নব্য বঙ্গের ঋষি বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—তাঁহার ‘পাশ্চাত্ত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে ; তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও ভারত সমাজের মূলগতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্ত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে।’ (বর্ত্তমান ভারত p. 50) তাই বলি বিজয়া এত শিক্ষালাভ করিয়াও বলিষ্ঠ হৃদয়বান্ পিতার আদর্শ ত্যাগ করিয়া প্রবঞ্চিত হইয়াছে, বিপন্ন হইয়াছে।

বিজয়ার দুর্ব্বলতা দেখিয়া ‘পল্লীসমাজে’র রমার কথা মনে পড়ে। একদিকে তেজস্বিতা, অপর দিকে হীন দুর্ব্বলতা। ভাল করিবার প্রবৃত্তি পাপের সংসর্গে প্রতিহত। রমা পাপিষ্ঠ বেনীর হাতের পুতুল—মিথ্যা সমাজভয়ে জড়োসড়, অথচ সময়বিশেষে, বোধ হয় উত্তেজনাবশে, সমাজকেও অঙ্গুলি প্রদর্শনে সমর্থ। উভয়ের মধ্যেই বৈষয়িক জ্ঞান অটুট ; বিষয়ের জন্য পিতৃবাক্য দূরের কথা, হৃদয়ের কথাও অগ্রাহ্য হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, রমা সমাজভয়ে রমেশের সহিত বিষয় লইয়া বিরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই মতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে, স্বীকার করিতে হয় যে, রমা মস্ত বড় ভুল করিয়াছিল বেনীকে সমাজের নেতা বিবেচনা করিয়া। প্রথম হইতে দেখা যায়, বেনীদাদার প্রভাব রমার উপর খুব বেশী। কিন্তু কেন ? এই প্রশ্ন যদি সমাজের পক্ষ হইতে আর কেহ তুলিয়া দেয়, তাহা হইলে হরলালের হাতে রোহিণীর অবস্থার ন্যায় দুরবস্থায় পতিত না হইলেও ত’ রমার দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। সুতরাং রমাকেও শিক্ষিতা অভিজ্ঞতায় পূর্ণা করিয়া সৃষ্টি করিয়াও লেখক তাহাকেও বিজয়ার ন্যায় বাঙ্গালীর অবলা,—দুর্ব্বলতায় ভরা নারীই করিয়া ফেলিয়াছেন। দত্তাও সে স্বভাব অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। পল্লীর বাস যখন একবার তাহার পক্ষে কারাবাসের সমতুল বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, তখনও সে কলিকাতায় পলাইয়া যাইবার সাহস করিতে পারে নাই। অচলা,—সেও পরিবর্ত্তিত সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল ; সে-সমাজে নারীর মর্য্যাদার গরিমা আছে ; কই তবুও ত’ তাহার মধ্যে পুরুষাতিশায়িনী শক্তির খোঁজ মিলে না ? নারীকে, এমন কি পতিতাকেও একটা বিরাট মর্যাদা দিবার জন্য যিনি লেখনী ধারণ করিলেন, তাঁহারই অঙ্কিত নারী-চিত্রে সেই তথাকথিত সনাতন অবলাত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর ন্যায় এতবড় স্বাধীনা নারীও এ সংস্কার অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিল না। নারীর এই পরাশ্রিতা বৃত্তির উচ্ছেদসাধন করিতে গিয়াও নিশ্চয়ই লেখক অজ্ঞাতে—সংস্কারবশে তাহাকে সমর্থন করিয়া ফেলিয়াছেন। লেখক সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার এই ত্রুটি ; সেই ত্রুটি সুদে-আসলে সংশোধন করিবার জন্যই বুঝি কমলের কল্পনা।

রমার সঙ্গে দত্তার আর একটি বিষয়ে খুব মিল আছে। প্রিয় অতিথিকে সযত্নে আহার করান ব্যাপারে উভয়ে সমান। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, শরৎচন্দ্রের আধুনিক-ভাবাপন্ন মেয়েদের মধ্যেও এই প্রাচীন আর্য্য-রীতিটা প্রবলভাবে কাজ করিয়াছে। ‘শেষ প্রশ্নে’র কমলের মত অপকৃষ্ট কামিনীও অপরকে খাওয়াইতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। রমার সঙ্গে

বিজয়ার এ বিষয়ে একটু গভীরতর রকমের মিলের অভাব পাই। ডাক্তার নরেন্দ্রকে বাড়ীতে ডাকিয়া নিকটে বসাইয়া গল্প-গুজব করিতে করিতে আহার করানোর মধ্যে বিজয়ার নবজাত প্রেমের যে পরিতৃপ্তি ঘটিতেছিল, রাসবিহারীর প্রবীণ চক্ষু তা যদি লক্ষ্য করিয়া থাকে ত' ভুল তাঁহার হয় নাই। তারকেশ্বরের বাড়ীতে রমেশকে পথ হইতে ডাকিয়া আনাইয়া সাম্নে বসাইয়া খাওয়ানোর মধ্যে যদি কেহ তাহার আবাল্য-সঞ্চিত গুপ্তপ্রেমের প্রভাব অস্বীকার করেন, তবে বলিব তাঁহার এ পুস্তকপাঠ বৃথা হইয়াছে। আবাল্য-সঞ্জাত প্রেম কোন কারণেই সমূলে উৎপাটিত হয় না। এই সত্যটা দেখানই আধুনিক কথা-সাহিত্যের বিশেষতঃ শরৎ-সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলে এতগুলো প্রেমতত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস লিখিত হইল কি জন্য? সে তত্ত্বের বীজ বঙ্কিমচন্দ্রের মতিবিবির পাষণ-কঠিন হৃদয়ের তলে অঙ্কুরিত হইলেও, তাকে প্রস্ফুট করিয়া, সুন্দর করিয়া প্রকাশ করার কৃতিত্ব শরৎ-চন্দ্রের। পিয়ারী বাইজী ত' ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছে। পার্ব্বতী পতিপরায়ণা জমিদার-গৃহিণী হইয়াও শৈশব-সহচরের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। 'রাঙ্গাবৌ'র স্বামী বিশ্ব-পতির বাল্যসহচরী নন্দা পতিপ্রেমে আকণ্ঠ নিমগ্না হইয়াও শৈশব-সঞ্জাত প্রেমবহ্নির তাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, আত্মাহুতি দিল। রাসবিহারীবাবু বিজয়ার নরেন্দ্রপ্রীতি কুৎসিৎভাবে বর্ণনা করিলেও এবং আর্য্যনীতি-অনুসারে রমার রমেশ-প্রীতি সমাজ ও সদাচার-বিগর্হিত হইলেও, আসলে এক প্রাকৃতিক নিয়ম সম্মত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রসিদ্ধ লোক-সাহিত্যে বুঝাইয়াছেন, প্রেমতত্ত্বটা নীতি-শাস্ত্রের বাহিরের কোঠা।

স্বীকার করি, বিলাসকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেও বিজয়ার হৃদয়ে স্পর্শদোষ ঘটে নাই। হৃদয় বিলাসকে চায় নাই, প্রয়োজন চাহিয়াছিল। বিজয়ার হৃদয় ডাক্তার নরেন্দ্রের দিকে উন্মুখী হইয়াছিল; নরেন্দ্রের উদাসীন সঙ্গও বিজয়ার নিকট অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইত। ক্রমশঃ এমন হইয়াছিল—'শুধু বিলাস কেন, এত বড় পৃথিবীর এত কোটি লোকের মধ্যে কেবল একটিমাত্র লোক ছাড়া অন্য কেহ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে ভাবিলেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় ও লজ্জায় এবং সমস্ত অন্তঃকরণ কি একটা গভীর পাপের ভয়ে ত্রস্ত, সশঙ্কিত হইয়া উঠে।' এতটা গভীর প্রেম সত্ত্বেও বিজয়ার চিত্তের দোলায়মানতা কি উপযুক্ত হইয়াছে? চুম্বক-মণির ন্যায় বিজয়ার চিত্ত একটা দিক্ নির্ণয় করিতে পারিল না! শরৎচন্দ্র সমাজের দোষে কত যুবক-যুবতীর প্রেমের ব্যর্থতা দেখাইয়া সমাজকে যদি অপরাধী করিয়া থাকেন ত' ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু নরেন্দ্রের উপর হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামি চাপাইয়া বিজয়ার ত' আত্মপক্ষে কোন সমর্থন হইবে না? নরেন্দ্র ত' স্বাধীন এবং স্বাধীনমতাবলম্বী বলিয়া বিজয়ার অজ্ঞাত নাই। নরেন্দ্রের দিক্ হইতে কোন আপত্তির আশঙ্কা করিয়া বিজয়ার প্রেম যদি কেন্দ্রীভূত হইতে না পারিতেছিল, তাহা হইলে বলিব, এ কি জাতীয় প্রেম?

বিজয়ার এই প্রেমপ্রবন্ধ Psychology-র কোন্ ধারা অনুসারে সমর্থিত, বলা কঠিন। স্থায়ী প্রেম অর্থাৎ প্রকৃত প্রেম ত' magnetic attractionএর মত অকস্মাৎ ঘটে, কিন্তু চিরস্থায়ী হয়। কে না জানে Duke of Kelinworth ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের (Elizabeth) হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল? কিন্তু তেজস্বিনী রাজরাজেশ্বরী যে-মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমাস্পদ তাঁহার ঐকান্তিক প্রেমের অযোগ্য, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখান নাই,—বলিষ্ঠ হৃদয়ের একনিষ্ঠতার মর্য্যাদা তিনি চিরকুমারী থাকিয়া রক্ষা করিয়াছেন এবং নারীর মর্য্যাদা বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এ স্থলে 'প্রতারক' উপন্যাসের উপনায়িকা (?) ইংরাজকন্যার কথা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিজয়া এত বড় জমিদারের সুশিক্ষিতা এবং আলোকপ্রাপ্তা কন্যা নিজের পথ খুঁজিয়া পাইল না, 'শ্যাম রাখি, না কুল রাখি'-অবস্থায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইল। কি মূর্খের মত যুক্তিই শেষ দিনে সে করিয়াছে! বিলাসই সব চেয়ে ভাল. এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে বিজয়ার চরিত্র যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং সুবিধাবাদী (opportunist) সে নিজেকে দেখাইয়া ফেলিয়াছে।

বিজয়ার এই দুরবস্থা দেখিয়া অচলাকে মনে পড়ে। মন চায় এক, দেহ চায় আর। বিজয়াও দেহের প্রাধান্য স্বীকার করিল। অচলা দেহের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গৃহদাহ

ঘটাইল। কে জানে বিজয়া ও অচলা একই জীবনের দুই অধ্যায় কি না? দুইজনই দোলায়মানমতিত্বের প্রতীক।

আবার অচলার ব্রাহ্ম পিতার সহিত বিজয়ার ব্রাহ্ম-মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত দয়ালবাবুর সাদৃশ্য প্রচুর; যদিও একজনের ঔদাসীন্য অচলাকে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিবার সুযোগ দিয়াছিল, অপরের সতর্ক ও সদয় দৃষ্টি বিজয়াকে প্রবল উদ্বেগের স্রোত হইতে রক্ষা করিয়াছে। বিজয়াকে যে ভাবে বিলাসবিহারীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নবেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে, তাহাতে বিজয়ার যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তিত্বও ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। দত্তাকে শ্রেষ্ঠ নারীচিত্রের মধ্যে গণনা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

কবি রজনীকান্ত

শ্রীসুধীরচন্দ্র বাগ্‌চী বি-এ

বঙ্গমায়ের স্নেহের যে দান মাথায় তুলিয়া নিতে
সে-দিনেব গানে তুলেছিলে তান বাঙ্‌লার সারা চিতে।
বাঙ্‌লার দুঃখে বাঙ্গালীর মুখে সঙ্গীত দিলে আনি
বাঙ্‌লার মন তোমারি বাণীতে লভিল আপন বাণী।
সে-দিনের ঐ জাগরণ দিনে গেয়েছ যে গান তুমি
গেয়েছে বাঙ্গালী অনুরাগ ঢালি' সারাটি বঙ্গভূমি।
দরদী বন্ধু হে কবি কান্ত, দরদ ঢালিয়া গানে
জাগালে পরাণ দেখি অভিযান নব জাগরণ পানে।
অভিযান সে যে হয়নিত সারা আরো আছে তাব বাকি
জোগাতে প্রেরণা কোথা তুমি আজ হে কবি আড়ালে থাকি!
তোমারি সে-গান আজো নহে ম্লান তুমি আজি বহুদূর
হিয়া-বীণে তব সঙ্গীত নব কোথা নব নব সুর!
কোথা বা গানের মোহন চেতনা এ-দিনে তুমি যে নাই
আজিও গড়িতে জাতীয় জীবন হে কবি, তোমারে চাই।

কবিতা তোমার মেলেছে ধরিয়া যা'কিছু সত্যবাণী
মিথ্যারে হানি' শিক্ষা বিলালে গড়িতে সমাজখানি।
'বেহায়া বেয়াই' রচিয়া দেখালে নিলাজ দাবীর মাঝে
সমাজের এক রুগ্ন মূরতি প্রকট হইয়া রাজে।
এমনি হাসির রসেতে মিশায়ে প্রহসন রচি' কত
সমাজে দেখালে স্বার্থে জড়িত অবিচার শত শত।
ধর্ম্মের নামে বিভেদ দেখিয়া মরমে বেদনা লভি'
হে কবি, ফোটালে সঙ্গীতে তব মিলনের নব ছবি।

দরদী বন্ধু, হে কবি কান্ত ধর্ম্মেরে নিলে চিনি'
হিন্দুব যিনি দুনিয়ার খোদ ইস্‌লামে খোদা তিনি।
দবদীয়া কবি মিনতি জানালে গাহি' মিলনের গান
'এক ক'রে দাও সন্ধ্যা-নমাজ হিন্দু-মুসলমান'।
উদার তোমার ভাবনা আজিকে ভাবিছে ভারতবাসী
গাবে না ত' হায় আজি পুনরায়, হে কবি মরতে আসি'।

সাধক-হৃদয়ে লভেছিলে জ্ঞান স্বরগের বুঝি আলো
এই দুনিযার মালিকেরে তুমি বেসেছিলে কত ভালো।
রোগের কুটিল কঠিন পরশে টলেনি হৃদয় তব
জগৎ-পিতার চরণে দিয়াছ অর্ঘ্য রচিয়া নব।
পুত্রশোকেব অনল দহনে পোড়েনি হৃদয়খানি
সঙ্গীত ঢালি নিবালে সে শোক 'লীলাময়' লীলা জানি।
রামপ্রসাদের বাউল সুরের যা'কিছু সাধনা বাণী
তুলসীদাসের সাধনার গীতি হয়েছে অমর জানি;
তেমনি তোমার সাধক-হৃদয়ে গেয়েছিলে গান যত
মুগ্ধ করেছে, হে কবি কান্ত, বঙ্গের হিয়া শত।

কত না অশ্রু ঝ'রে মিশে যায় কঠিন ধরার বুকে
কত না হৃদয় তিলে তিলে পোড়ে চির-জনমের দুঃখে।
কত না জীবন অকালে ঝরিছে কাঁদায়ে বন্ধুজনে
কত ব্যথা কত দুঃখ শত শত ভরে ওঠে মনে মনে।
দরদী তোমার লেখনী ত' আর চলে না তাদের তরে
নীরব তোমার কণ্ঠ আজিকে তিরিশ বছর ধরে॥

প্রেতের বন্ধন

[সত্য ঘটনা]

শ্রীবিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যপ্রদেশে নাগপুর সহরের প্রান্তভাগে বাঙ্গালীদের যে কয়েকখানি বাড়ী আছে, তাহার মধ্যে সুদীর্ঘ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ যে ত্রিতল বাড়ীটি সহজেই পথযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তাহার অধিকারী একজন বিখ্যাত উকিল। ওকালতি ব্যবসায়ের প্রারম্ভেই ভাগ্যলক্ষ্মী যখন তাঁহার স্বর্ণকমল হইতে এক একটি পাঁপড়ী খসাইয়া শরৎবাবুকে দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন সমস্ত সহরের মধ্যে বাঙ্গালীসমাজে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পর ভাড়াবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া উকিলবাবু এই ত্রিতল বাড়ীটী নির্ম্মাণ করান, পার্শ্ববর্ত্তী প্রচুর জায়গা ক্রয় করিয়া নানাবিধ ফুলের গাছে ঢাকিয়া ফেলেন, ভিতরে প্রশস্ত সবুজ মাঠ গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিতে থাকে। সে আজ প্রায় পনর বৎসর আগেকার কথা।

এই বাড়ীতে কিছুদিন মা ও ছোট ভাই বাস করিয়াছিল। নিজে বিবাহ করিবেন না ইহাই শরৎবাবুর সঙ্কল্প, সুতরাং ছোট ভাই-এর বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু মানুষের মন মানুষ নিজেও জানে না। যখন প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স হইল তখন উকিলবাবুর জীবনে কোথায় একটা ফাঁক দেখা যাইতে লাগিল। কাজে উৎসাহ আসে না, সহজেই বিরক্ত হন, রাগের মাথায় যে কথাবার্ত্তা এক এক সময় বলিয়া ফেলেন তাহাতে মান মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না, ছোট ভাই এবং তাহার স্ত্রী যেন অনধিকার প্রবেশ করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত হয়। সংসার কোথাও বেসুরো হইয়া গিয়াছে পদে পদে ধরা পড়ে।

যে বয়সে সাধারণ বাঙ্গালী ঘোরতর সংসারী হইয়া পড়ে, ছেলের স্কুল, মেয়ের বিবাহ, নিজের ডিস্পেপ্সিয়া প্রভৃতির চিন্তায় মন যখন ঘোলাটে হইয়া উঠে, সেই বয়সে চল্লিশ বৎসরের শরৎবাবু বলিষ্ঠ দেহ ও রঙ্গীন মন লইয়া একদিন বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বিবাহ করিয়া নাগপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বৌ-ভাতের দিন কি ধূমধাম! বন্ধুবান্ধবের আনন্দধ্বনিতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত পাড়া প্রতিধ্বনিত হইল, এমন কি বৃদ্ধ সিনিয়র উকিল অনিলবাবু গেঁটে-বাতে প্রচুর পরিমাণে প্রলেপ লাগাইয়া নবপরিণীতা বধূর সম্মুখে ইংরাজী কায়দায় দুই এক পা নাচিয়া কি একটা রসিকতা করিলেন, কাশীর ধমকে তাহা চাপা পড়িলেও, সেই অশ্রুত বাণীর মাধুর্য্যে সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

বিবাহের পর একমাস অতীত না হইতেই শরৎবাবুর ছোট ভাই বাঙ্গালাদেশের এক সহরে মাষ্টারি যোগাড় করিয়া নিজ স্ত্রী ও মাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। প্রকাণ্ড বাড়ীতে উকিলবাবু কিছুদিন একলা কাটাইয়া অবশেষে স্ত্রীকে বাপের বাড়ী হইতে আনিলেন। নূতন সংসার নূতন রকমে চলিতে লাগিল। বাড়ীতে শাশুড়ি, ননদ, ভাসুর, দেবর কাহারও জঞ্জাল নাই, সুতরাং নবপরিণীতা বধূকে চাপা হাসি অথবা টুকরো কথার জোড়াতাড়া দিয়া গুরুজনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয় না, যত বড় বাড়ী তত বড় গলায় কথা ও হাসিতে বাড়ী সর্ব্বদাই মুখরিত হইয়া থাকে।

বধূর নাম রমা, বয়স কুড়িরও বেশী বলিয়া মনে হয়। তন্বী এবং দীর্ঘাঙ্গী, রং খুব ফর্সা কিন্তু কতকটা ফ্যাকাসে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এমন সুন্দর সম্মিলন যে, সমগ্র দেহটী লইয়া বেশ একটা সৌন্দর্য্য সহজেই চোখে পড়ে। একটু ফ্যাকাসে রং না হইলে অপূর্ব্ব সুন্দরী বলা যাইত। এদিকে তাহার আত্ম-সৌন্দর্য্যবোধও বড় কম ছিল না। সর্ব্বদাই শরীরের ঝাড়া-মোছা চলিত, স্নো, পাউডার ত' আছেই, তাহার উপর রঙ্গীন কাপড়, আবার উপর্য্যুপরি দুই দিন এক রং নয়। বধূর পিতা সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, তিনি মেয়েকে মোটামুটি দুই একখানি গহনা দিয়াছিলেন, কিন্তু ধনী স্বামীর ঐশ্বর্য্যের উচ্ছ্বাসে বধূর দেহের উপর দিয়া সর্ব্বদাই কনক-রতনের বিজলী খেলিয়া যাইত। স্বামীস্ত্রীর বয়সের পার্থক্য নূতন সংসারে কোথাও গ্লানির সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে হইত না।

তিন বৎসর এইভাবে কাটিবার পর যখন জীবনের রঙ্গীন পর্দ্দাগুলি অপরিস্ফুট একবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল তখনও

চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কোন শিশু আসিয়া সংসারের আকর্ষণ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিল না। সেই পাউডার ও রঙ্গীন কাপড়, অপরাহ্নকালে বৃদ্ধ কোচম্যানের সেই একঘেয়ে ডাক, রাত্রিতে একবার সমস্তদিনের অর্জ্জিত টাকা গুনিয়া হিসাব করা, অবশেষে শয্যাকক্ষে তিন বৎসরব্যাপী সহস্রাধিক রজনীর দশসহস্রবার পুনরাবৃত্ত কথার আর একবার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। অবরুদ্ধ স্নেহের উৎস ভিতরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, বাহির হইবার পথ নাই। অনেকগুলি দামী কুকুর আসিল। তাহাদের বিছানা, মশারী, রুচিকর খাবার বন্দোবস্ত করিতে দিনের অনেক সময় কাটিতে লাগিল। নূতন যখন কোন ছোট কুকুর আসে তখন তাহার আদরের সীমা থাকে না। সে কোলে ওঠে, ঈর্ষ্যান্বিত অন্য কুকুরগুলির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রথম প্রথম সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়, সে অসুস্থ হইলে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থার জন্য বাড়ীর চাকরদের ছুটাছুটি অপরিমিত ভাবে বাড়িয়া যায়। তবু জীবনে নূতন রং ধরে না, দুদিনের উৎসাহ দু'দিনেই মিলাইয়া যায়। একটি শিশুর অভাবে অর্থের মাদকতা নষ্ট হইতেছিল, শয্যা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, ম্লানায়মান রূপের উজ্জ্বলতা কোথায় ঢাকা পড়িতেছিল, তবু চারখানি বাহু সবলে সুখকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিত। প্রাণের গান হারাইয়া বাঁশীর ভিতর সুর খোঁজাখুঁজি বাড়িয়া চলিয়াছিল!

এইরূপে "বাহিরে যখন হাসির ছটা ভিতরে শুধু অশ্রুজল", তখন একদিনের তুচ্ছ ঘটনায় শরৎবাবুর বিবাহিত জীবনের সমস্ত ওলটপালট হইয়া গেল। সেদিন অভ্যাসমত উভয়েই বিকালবেলা সহরের ভিতর দিয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া আসিলেন। সহরের লোকে দেখিল প্রতিদিনের মত দুইজনে গাড়ীতে বসিয়া আছেন, খোলা গাড়ী দ্রুতবেগে রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, উভয়েরই বেশভূষার পারিপাট্য সেই তিন বৎসর পূর্ব্বেকার মত, কোথাও একটি রেখা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, অথচ মুখে আনন্দের চিহ্নমাত্র নাই, উভয়েই নির্ব্বাক্, দূরাগত অস্পষ্ট দুঃখের প্রতি যেন উভয়েরই দৃষ্টি নিবদ্ধ। তার পর কি তুচ্ছ বিষয় লইয়া সন্ধ্যাবেলা বচসা হইল, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান এত বাড়িল যে সে রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়াও কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কাছাকাছি শরীর দুইটির মন অনেক দূরে পড়িয়া থাকিল। পরের দিনও মেঘ কাটিল না, দু'জনে দূরে দূরে ফিরিলেন, চারিটী চক্ষুর একবারও মিলন হইল না। শরৎ বাবু ভাত খাইয়া কাছারি চলিয়া গেলেন।

বিকালবেলা কাছারি হইতে ফিরিয়া শরৎবাবুর মনে হইল বাড়ীটা যেন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ। চাকরগুলির সাড়াশব্দ নাই, কুকুরগুলি বাড়ীতে আছে বলিয়াই মনে হয় না, সিঁড়ির উপর হইতে নামিবার কোমল পদধ্বনি শোনা যায় না, বহুদিনের পরিচিত কঙ্কণে চঞ্চল আগ্রহের ঝঙ্কার কোথাও প্রতিধ্বনিত হইতেছে না। একটা দুঃসহ বেদনার ভারে বাড়ীটা যেন মূর্চ্ছিত। শরৎবাবু বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলেন।

হঠাৎ দুধপোড়ার মত গন্ধ নাকে গেল। এইরূপ দুধ-পোড়ার জন্য পূর্ব্বে আরও ২।৩ দিন তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার সেই অসাবধানতা! রাগের সঙ্গে সঙ্গেই সব অবসাদ কোথায় চলিয়া গেল, তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া দ্রুতবেগে বাহিরে আসিলেন। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন তাহার "মাইজী" শরীর খারাপ বলিয়া উপরে শয়ন করিয়া আছেন। দ্বিতলের সিড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে পোড়াগন্ধ বেশী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শরৎবাবু শয়নকক্ষে রমাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, ডাকিতে ডাকিতে তিনতলায় উঠিতে লাগিলেন, সেখানেও সেই কটু গন্ধ—অত্যন্ত তীব্র। কিন্তু তিনতলায় নির্জ্জন কক্ষ ভিতর হইতে বন্ধ। শরৎবাবুর বুকটা কুৎসিৎ আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। পাশের জানালার কাঁচের সার্শি ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার ভিতর দিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শরৎবাবু দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী রমা মেঝের উপর লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছে, পেটের নিম্নভাগ পরিবেষ্টন করিয়া দুই একটি ক্ষীণ অগ্নিশিখা ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে, পা দুইটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার রাশিতে-পরিণত। উকিলবাবুর উন্মত্ত চীৎকারে বাড়ীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, চাকর, কোচম্যান ও মুহুরীর দৌড়াদৌড়ি এবং কুকুরগুলির যুগপৎ ডাকাডাকিতে চারিদিক সচকিত হইয়া উঠিল।

দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া শরৎবাবু দেখিলেন, রমা মৃত—কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছে। একজন চাকর

জল আনিয়া শেষের অগ্নিশিখাগুলি নির্ব্বাপিত করিল। শরীরের উপরিভাগ সম্পুর্ণ অক্ষয়, মাথার চুল একগাছিও পুড়িয়া যায় নাই। স্তিমিত অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুদ্বয় ঈষৎ রক্তাভ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু তাহাতে জমিয়া আছে। মৃতদেহের ২।৩ হাত দূরে একটি খালি কেরোসিনের বোতল ও একবাক্স দেশলাই। পুড়িবার সময় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিবার কোন চিহ্ন নাই। শরীরে অগ্নিপ্রদান করিবামাত্রই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে হইল।

আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোক, উকিল, পুলিশ, ডাক্তারে বাড়ী পরিপূর্ণ হইল। কতলোক ঘোরাঘুরি করিতেছে, তথাপি কোলাহল নাই। কেবল জুতার মৃদুশব্দ, চাপাগলায় কথা। শয়নকক্ষে ছোট টেবিলের উপর স্বামীকে লেখা রমার একখানি চিঠি পাওয়া গেল। সুন্দর অক্ষরগুলিতে মনের উত্তেজনার লেশমাত্র চিহ্ন নাই, কেবল চিঠির শেষের দিকে একটিমাত্র কথা চোখের জল পড়িয়া প্রায় পুছিয়া গিয়াছে। সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে আত্মহত্যার কোন কারণ নাই, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নাই, একটা ইস্পাতের মত দৃঢ় মনোভাব তাহার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। 'চলিলাম' কথাটি তিনবার লেখা আছে। শেষভাগে শরৎবাবুকে দুইটি অনুরোধ শান্ত ও সংযত ভাষায় করা হইয়াছে। ছোট বোনকে একটি হার দিবে রমা প্রতিশ্রুত ছিল, সুতরাং তাহার গলার হারটি যেন ছোট বোনকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় অনুরোধ—যত শীঘ্র সম্ভব শরৎবাবু যেন গয়ায় রমার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করেন। পুলীশ যথারীতি তদন্ত শেষ করিল, অর্দ্ধদগ্ধ শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল, বন্ধুবান্ধবগণ একে একে চলিয়া গেলেন, বাড়ী অন্ধকারে পড়িয়া রহিল।

দিন যায়, রাত্রির অবসরকালে টুকরা স্মৃতির খণ্ডগুলি ক্বচিৎ কখনও শরৎবাবুর মনের কোণে হঠাৎ আসিয়া পড়ে, দিনের বেলা কাজের সময় মনের সীমান্তরালে সমস্তই ঢাকা পড়িয়া যায়। এইরূপে এক বৎসর যখন কাটিয়া গেল তখন নিঃসঙ্গ জীবন অভ্যস্ত হইয়া আসিল, দাস-দাসীর সংসার নিরুপদ্রবে চলিতে লাগিল, বিবাহিত জীবনের স্মৃতি দূর হইতে আরও দূরে গিয়া পড়িল। বন্ধু-বান্ধবেরা মনে করিলেন যে, শরৎবাবুর জীবনে স্ত্রীর আত্মহত্যার গ্লানি আর কিছুই নাই, নাগপুরের লোক ও শরৎবাবু নিজে সেই ভীষণ রাত্রির কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এদিকে ঠিক বৎসর অতীত হইবার কিছুদিন পরে শরৎবাবু বড় করাইবার জন্য তাঁহার স্ত্রীর একখানি ছোট ফটোগ্রাফ অনেক খুঁজিয়াও বাক্সের ভিতর পাইলেন না। অথচ অনেকগুলি ছবির মধ্যে ভাল বলিয়া সেটীকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়াছিলেন। অনেক চিন্তা করিয়াও ফটোটী হারাইবার কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার পর অবসর মত অবশিষ্ট ফটোগুলির ভিতর হইতে একখানি বাছিয়া বাক্সের মধ্যে উপরেই রাখিয়া দিলেন। পরদিন ফটোগ্রাফার আসিলে তাঁহাকে দিবার জন্য ছবিখানি বাক্স হইতে আনিতে গিয়া সেটীকে খুঁজিয়া পাইলেন না। ইহা কোনও কৌতূহলী চাকরের কীর্ত্তি মনে করিয়া উকিল বাবু সন্দেহক্রমে একটি চাকরকে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এত দ্রুতগতিতে বাক্সের ভিতর হইতেই সমস্ত ফটোগ্রাফগুলি একে একে অন্তর্হিত হইল যে, শরৎবাবু যুগপৎ বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন।

দিন চলিয়াছে। কিন্তু যে নির্ভীক শরৎবাবু রমার আত্মহত্যার রাত্রিতেও শয্যাকক্ষে একাকী শয়ন করিয়াছিলেন, বন্ধুবান্ধবের উপদেশ মত রাত্রিতে বারান্দায় কোন চাকরকে রাখা যিনি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় মনে করিতেন, সেই শরৎবাবু ক্রমশঃ ঘটনাসংযোগে ভীত হইয়া উঠিলেন। মধ্যে মধ্যে বহু-পরিচিত চটীর শব্দ ত্রিতলের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচের তলায় সিঁড়ির নিকট আসিয়া থামিয়া যায়। এ পদধ্বনি রমার। শরৎবাবুর সমস্ত মন জমাট বাঁধিয়া সেই ধ্বনির প্রতি নিবিষ্ট হয়। বাহিরের ঘরে কাজ করিতে করিতে মক্কেলদের কিছু না বলিয়া হঠাৎ দ্রুতবেগে সিঁড়ির নিকটে আসেন কিন্তু সেই শূন্যস্থানে কাহাকেও দেখিতে পান না। ফিরিয়া আসিয়া কাজে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিতে না করিতে সেই পদধ্বনি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া যায়, রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ত্রিতলের কক্ষের ভিতর সেই শব্দ ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসে। রাত্রি অধিক হইলে মক্কেলদের বিদায় দিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিতে মনটা যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। অদূরে রান্নাঘরে ঠাকুর-চাকর জটলা করিতেছে দেখিতে পান, অথচ এই সামান্য পথটুকু অতিক্রম করিতে শরীরকে যেন টানিয়া লইয়া যাইতে হয়। অবশেষে সিঁড়ির কাছে তিনটী কুকুর সন্ধ্যা হইতেই বাঁধিয়া রাখিবার

ব্যবস্থা করিলেন। যাতায়াতের পথে ইহারা সাড়া দেয়, ইহাদের বলিষ্ঠ দেহ ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি শরৎবাবুর মনকে স্বচ্ছ ও সবল করিয়া তোলে। কিন্তু একদিন রাত্রিতে ইহারাই তাঁহাকে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। সে দিন মক্কেল ও মুহুরী চলিয়া যাইবার পর তিনি নিবিষ্টমনে কি একটা আইনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ সিঁড়ির উপর চটীজুতার শব্দ তাঁহাকে সচকিত করিয়া তুলিল। পদধ্বনি যেমন ধীরে ধীরে সিঁড়ির নীচে আসিয়া থামিল, শরৎবাবুও দ্রুতপদে ঘরের বাহিরে যাইয়া সিঁড়ির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অথচ তিনটী কুকুর একই সময়ে সিঁড়ির পার্শ্বে একদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে, আদরের নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিতেছে, ঘন ঘন লেজ নাড়িতেছে, অস্ফুটধ্বনির দ্বারা মনের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে। একমাত্র শরৎবাবু অথবা তাঁহার স্ত্রীকে দেখিয়া কুকুরেরা এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিত। তিনি কুকুরদের নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু যাহারা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিলেই খেলা ও খাওয়া ফেলিয়া তাঁহার স্নেহের একটা স্পর্শের জন্য অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিত, তাহারাই আজ তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, যেন তাঁহার কথা কাণে যাইতেছে না, অন্য কাহারও প্রতি তাহাদের দৃষ্টি ও মন সম্পূর্ণ নিবদ্ধ। শরৎবাবুর চোখের সম্মুখে সেই সীমাবদ্ধ স্থানটী যেন ক্রমশঃ ঘোলাটে হইয়া উঠিল, তিনি বসিবার ঘরে ফিরিয়া চাকরদের ডাকিয়া সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবিধ কথাবার্ত্তায় মনের ভার লঘু করিবার চেষ্টা করিলেন।

কিছুদিন নিরুপদ্রবে কাটিল। প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইবার পর একদিন গভীর রাত্রিতে শরৎবাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার শয্যাকক্ষটী দ্বিতলের এক প্রান্তে অবস্থিত, রাস্তার ইলেকট্রিক আলো ঘরের কিয়দংশে আসিয়া পড়ে। ঘুম ভাঙ্গিতেই নেটের মশারির ভিতর দিয়া দেখিলেন একটি লঘু দেহ ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চোখের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তি শয্যার একপ্রান্তে তাঁহার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি সভয়ে দেখিলেন রমা স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। প্রতি মুহূর্ত্ত যেন দুঃসহ মনে হইতে লাগিল, বিছানায় নিশ্চল হইয়া শরৎবাবু ঘামিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতে ভীতির অস্ফুট ধ্বনি মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র ছায়ামূর্ত্তি কোথায় মিলাইয়া গেল। সে রাত্রিতে তাঁহার সমস্ত সাহস লুপ্ত হইল, তিনি চাকরকে ডাকিয়া বারান্দায় শুইতে বলিলেন। সমস্ত রাত্রি ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিক বাতি জ্বালা রহিল, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রাকর্ষণ হইল না।

এইরূপে মধ্যে মধ্যে রমার অবস্থিতি বাড়ীর মধ্যে জানা যাইতে লাগিল। বহুদিন শরৎবাবু নীরবে একাকী দেখিলেন ও শুনিলেন, কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া সহরের মধ্যে জল্পনার সৃষ্টি করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অবশেষে প্রায় তিনমাস এইরূপ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মন যখন আপনার ভারে আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, তখন একদিন তাঁহার বাল্যবন্ধু অখিলবাবুকে গোপনে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। অখিলবাবু স্থানীয় একটি ব্যাঙ্কে চাকুরী করিতেন। ছুটির পর তিনি প্রতি সন্ধ্যাতেই আসিতে লাগিলেন, দুই বন্ধুতে অনেক পরামর্শ চলিল, ২।৩ দিন অখিলবাবু নিজে সিঁড়ির উপরের পদধ্বনি শুনিলেন, কুকুরদের অদ্ভুত আচরণও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি স্থির করিলেন যে, রমা ইচ্ছা করিয়াই তাহার অবস্থিতি শরৎবাবুকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিতেছে এবং গয়ায় পিণ্ডদানের শেষ অনুরোধ যতদিন কার্য্যে পরিণত না হয়, ততদিন হয় ত বাড়ীর উপদ্রব শেষ হইবে না। গয়ায় পিণ্ডদান করিলে প্রেতাত্মার শান্তি হয়—একথা শরৎবাবু কিছুতেই স্বীকার করিতেন না, ইহা হিন্দুসমাজের কুসংস্কার বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন, তথাপি যেদিন রাত্রিতে প্রেতের পদধ্বনি শুনা যাইত অথবা ছায়ামূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইত, তাহার পরদিন শরৎবাবু অখিলবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, টাইমটেবল লইয়া গয়া যাতায়াতের ট্রেন দেখিতেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিণ্ডদানের সঙ্কল্প করিতেন। তাহার পর যখন কয়েকটি রাত্রি সহজে কাটিয়া যাইত তখন গয়ার কথা ভুলিয়া যাইতেন, কখনও হঠাৎ মনে পড়িলে মনকে বুঝাইতেন যে রমার প্রেতাত্মা কালক্রমেই মুক্তিলাভ করিবে, গয়ায় যাইয়া মিথ্যা লোকাচারের আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই। এইরূপে নিজ কর্ম্মফল ও স্বামীর যুক্তিজালের আবেষ্টনে পড়িয়া অন্ধ প্রেতাত্মা বাহিরে যাইবার পথ খুঁজিয়া পাইল না, বাড়ীর বন্ধনের মধ্যে একাকী দীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কর্ম্মস্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া শরৎবাবু যে কথা ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, একদিন রোগশয্যার তটভূমিতে আবদ্ধ হইয়া সেই কথাই প্রবলবেগে তাঁহার সমস্ত শরীর ও মনকে নাড়া দিয়া উঠিল। দুইদিন ঈষৎ সর্দ্দিজ্বর হওয়ার পর তৃতীয় দিবসে কাচারি হইতে বুকে ব্যথা ও প্রবল মাথাধরা লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার আসিয়া নিমোনিয়া হইয়াছে বলিয়া গেলেন। সেই রাত্রিতে প্রতিবাসী দুইজন যুবক শরৎবাবুর শয্যাপ্রান্তে রাত্রি যাপন করিল। নিয়মমত ঔষধ সেবন ও শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। অখিলবাবু প্রত্যহ দেখিতে আসেন, কোন কোন দিন পালা করিয়া রোগীর কাছে রাত্রি জাগরণ করেন। তাঁহাকে কাছে পাইলেই শরৎবাবু গয়া যাইবার পরামর্শ করিতে থাকেন। অখিলবাবু হাসিয়া বলেন, দুর্ব্বল শরীর ও মন এখন যে সাধু অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে তাহা ব্যাধির অন্যতম লক্ষণ মাত্র, রোগমুক্ত হইলেই সুস্থ ও সবল মন হিন্দু ধর্ম্মের কুসংস্কার পুনরায় ধরিয়া ফেলিবে। শরৎবাবু ক্ষোভে মাথা নাড়িয়া সে কথার প্রতিবাদ করেন। এইরূপে প্রায় ৫।৬ দিন অতীত হইবার পর রোগ সহসা কঠিন আকার ধারণ করিল। জ্ঞানের কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ অসম্বদ্ধ প্রলাপ আরম্ভ হয়, কিছুক্ষণ মস্তিষ্কের সেই উত্তেজনা পূর্ণমাত্রায় থাকিবার পর ধীরে ধীরে রোগীর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। বিকারের সময় শরৎবাবু তাঁহার মা এবং ভাই কাছে আছে বলিয়া মনে করেন, রমার মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত কাল্পনিক কথাবার্ত্তাও বলিতে থাকেন। ক্রমশঃ উকিলবাবুর মন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, ঘরের চতুর্দ্দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, সব ছায়ায় রমার প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন, প্রতি শব্দই তাহার পদধ্বনি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। এইরূপ ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিবিভ্রমের সময়ে শরৎবাবুর মনের অবস্থা স্বাভাবিক অথবা বিকারগ্রস্ত কি না তাহা পরিচর্য্যাকারীরা দূরের কথা, ডাক্তারবাবুও সব সময় বুঝিতে পারিতেন না। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে চলিতেছিল।

নবমদিনে শরৎবাবুর মা ও ভাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সকাল, সূর্য্যের প্রথম কিরণজাল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সকলের মনেই আশার সঞ্চার করিতেছিল। শরৎবাবুকে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল মনে হইল, ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও মায়ের সহিত খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ তাঁহার বাক্‌রোধ হইল, ভিতরে যেন জ্ঞান রহিয়াছে, অথচ প্রকাশের শক্তি নাই। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নিবিড় অন্ধকারে পরিবেষ্টিত বাড়ীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ক্ষীণ দীপশিখাটি মায়ের প্রাণে ভয়ের মতই ঈষৎ কাঁপিতেছিল, শঙ্কিত মন লইয়া কয়েকটী বন্ধু ও আত্মীয় রোগীর প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন। ঘড়ির প্রতি মিনিটের গতি বাতাসে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছিল, রোগীর গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইলেও শুনা যাইতেছিল, অতিদূরে অন্ধকার বায়ুসমুদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অস্পষ্ট বাণীর চক্রলহরী রোগকক্ষের চারিদিকে ভাসিয়া আসিতেছিল। বাহিরে শব্দময়ী রজনীর পুঞ্জীভূত ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে যেন গুমরিয়া উঠিতেছিল। এক একবার শেষরাত্রির শীতল বাতাস হঠাৎ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল। এমন সময়ে নিশীথিনীর তপোভঙ্গ করিয়া সূক্ষ্ম অথচ তীব্র নারীকণ্ঠের কাতরধ্বনি শব্দের বিদ্যুতছটার মত মৃত্যুকবলিত বাড়ীর একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলিয়া গেল। রোগীর ঘরে সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন, উৎকর্ণ হইয়া আবার শুনিলেন, ত্রিতলের পরিত্যক্ত কক্ষ হইতে সেই মর্ম্মভেদী ক্রন্দন উত্থিত হইয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া নামিয়া আসিয়া সেই সুবৃহৎ বাড়ীর প্রতিরন্ধ্র প্রতিধ্বনিত করিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই সংজ্ঞাহীন শরৎবাবুর শুভ্রবস্ত্রাবৃত দেহ আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল। শব্দবিহ্বল রোগকক্ষের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি ৩টা ৫ মিনিটের সময় শরৎবাবু শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মাতার হাহাকার ধ্বনিতে সমস্ত পল্লী মুখরিত হইতে লাগিল।

শরৎবাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কেন সেই অশরীরী রোদনধ্বনি রমার স্বহস্তরচিত ত্রিতলের চিতা হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় শূন্যে মিলাইয়া গেল? ইহা কি স্বামীর আসন্ন মৃত্যুতে সংসারে বদ্ধ প্রেতাত্মার শোকের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, অথবা মুক্তির পথ খুলিয়া দিবার একমাত্র আত্মীয়ের বিয়োগে চিরবন্ধনের আশঙ্কায় নৈরাশ্যের মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস?

মহারাণা প্রতাপ সিংহ

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত এম-এ,

প্রথম প্রকরণ

মহারাণার বংশগৌরব

ভারতের পুণ্যভূমি রাজপুতনা বা রাজস্থান বহু শতাব্দী যাবত শৌর্য্য, বীর্য্য, আত্মত্যাগ ও মহাপ্রাণতার রঙ্গভূমি ছিল। মেবারের পুরাতন রাজধানী চিতোরগড় বা চিতোর রাজস্থানের মুকুটমণিস্বরূপ সহস্রাধিক বর্ষ যাবত বিরাজমান। চিতোরগড় অসংখ্য বীরপুরুষ ও বীররমণীর কেবল জন্মভূমি নহে, ইহা তাঁহাদের অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মহাযজ্ঞভূমি। শৈব ও বৈষ্ণবের নিকট যেমন কাশী এবং বৃন্দাবন মহাপুণ্যক্ষেত্র, স্বাধীনতার উপাসক এবং স্বদেশপ্রেমিকের নিকট চিতোরগড় সেইরূপ মহাতীর্থক্ষেত্র। এই পুণ্যক্ষেত্র চিতোরগড়ে ভারত-গৌরব মহারাণা প্রতাপ স্বদেশপ্রেমে প্রণোদিত হইয়া যে বীরত্ব, সাহস, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মত্যাগ ও আত্মসম্মানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা জগতে দুর্লভ। চিতোর উদ্ধার, ভারত উদ্ধার এবং হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য হিন্দুজাতির মহাদুর্দ্দিনে তিনি যে কঠোর দেশসেবা-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তপস্বীর তপস্যাকে হতশ্রী করিয়াছে। পৃথিবীর যে যে দেশে স্বদেশপ্রেমিকগণ দেশসেবা-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন মহারাণা প্রতাপ তাঁহাদের মহান্ আদর্শ।

রাজপুতগণ সূর্য্যবংশ এবং চন্দ্রবংশসম্ভূত। তাহাদের মধ্যে মেবারাধিপতিগণ সূর্য্যবংশ সম্ভূত। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদিগকে সিসোদিয়া কহে। রামায়ণে লিখিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র লবকে দক্ষিণকোশল এবং কুশকে উত্তর-কোশল রাজ্য দান করিয়াছিলেন। দক্ষিণকোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী ছিল। মেবারের রাজবংশ লবের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন। রামায়ণের পাঠক ও শ্রোতাগণ সকলেই জানেন যে, শ্রীরামচন্দ্র কিছুকাল সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন। যে পর্ব্বতের উপর চিতোর-দুর্গ প্রতিষ্ঠিত সেই পর্ব্বতেরই নাম চিত্রকূট। দুর্গের কোন স্থানে 'চিত্রকূট' নাম লিখা আছে।

চিতোর-দুর্গ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুদৃঢ়, সুপ্রতিষ্ঠিত, দুর্ভেদ্য দুর্গ। চারিশত ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা তিন মাইল দুই ফার্লং লম্বা এবং ১২০০ গজ প্রস্থ। এই কেল্লায় পাঁচটী দরজা। বড় দরজা চিতোরগড় রেলষ্টেশনের দিকে। আর তিনটী দরজার নাম যথাক্রমে সূর্য্যপোল, হনুমানপোল এবং রামপোল। বাকী দরজাটীর নাম রাণীভাণ্ডার। এই দরজার নিকট মহারাণী পদ্মিনী অন্যান্য সতীগণের সহিত আলাউদ্দীন খিলিজীর চিতোর আক্রমণের সময় জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন। এই পুণ্যভূমির সম্মানের জন্য ঐ সময় হইতে এই দরজা বন্ধ আছে। এই সুদৃঢ় কেল্লা সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণ-চাতুর্য্য দেখিয়া আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যান। উদয়পুরে প্রবাদ আছে যে, এই কেল্লা দেবতারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তত্রত্য লোকদের বিশ্বাস যে, মানুষের শক্তিতে এমন আশ্চর্য্য কেল্লা নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর নহে। আফগান ও মোগল বাদশাহের অসংখ্য গোলাবর্ষণেও এই কেল্লার একখণ্ড প্রস্তর স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। আকবর বাদশাহ তাঁহার ঘনীভূত শক্তি এই কেল্লার উপর নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুত চরিত্রের দৃঢ়তার সাক্ষী স্বরূপ এই কেল্লা অচল এবং অটল রহিল।

এই কেল্লার মধ্যে অনেক কূপ এবং জলাশয় আছে। হনুমানপোল নামক দরজার নিকট দেশভক্ত বীর জয়মল এবং ফত্তার প্রস্তরমূর্ত্তি বিদ্যমান। দুর্গরক্ষা করিতে গিয়া এই দুইজন বীর অত্যদ্ভুত বীরত্বের সহিত আকবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জয়মলকে একদিন দুর্গের উপর অবস্থান করিতে দেখিয়া আকবর স্বয়ং তাঁহার উপর তীর নিক্ষেপ করেন। সেই তীরের আঘাতে জয়মলের মৃত্যু হয়। জয়মলের মৃত্যুর পর তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফত্তা রাজপুতদিগকে ওজস্বিনী ভাষায় উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং এমন বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে স্বয়ং

আকবর বাদশাহ তাঁহার বিক্রম এবং যুদ্ধকৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। রাজপুতনার সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে এই দুইজনের বীরত্বকাহিনী বালক-বালিকাগণ উন্মাদনার সহিত গান করিয়া থাকে।

রামপোল নামক দরজার অনতিদূরে তুলসীভবানীর মন্দির। এই মন্দির মহারাণা কুম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তুলসী ভবানীর কৃপায় রাণা সংগ্রামসিংহ বাবরের সহিত ভীষণ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইহার নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকাণ্ড মন্দির আছে। এই মন্দির সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত রমণী মহারাণী মীরাবাই প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মীরাবাই বৃন্দাবন আসিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে সনাতন নারী দর্শন করিবেন না বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলেন। মীরাবাই বলিয়া পাঠাইলেন যে, "বৃন্দাবনে এক পুরুষ ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষ আছে বলিয়া ত' জানি না। এখানে এক পুরুষ আর সকলেই প্রকৃতি।" সনাতন গোস্বামী মীরাবাইর এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

ইহার নিকট রাণাকুম্ভের মালব এবং গুজরাট জয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ বা মীনার আছে। এই মীনার দিল্লীর কুতবমীনারের ন্যায়। রাণা কুম্ভ এই মীনার এক কোটী টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানে ইহার ন্যায় আর কোন মীনার নাই। আকবর যখন দীর্ঘকাল চিতোর অবরোধ করার পর দুর্গ দখল করেন, তখন তিনি চিতোরের প্রাচীন কীর্ত্তি সব ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মন্দির এবং রাজধানীর বহুমূল্য সুন্দর সুন্দর জিনিষ আগ্রাতে নিয়া যান। এই চিতোর গড় মহারাণা প্রতাপের পূর্ব্বপুরুষগণের লীলাভূমি। হৃতসর্ব্বস্ব চিতোর এখনও ভক্তের পদরেণু, সতীর চিতাভস্ম, বীরের শেষবায়ু শিরে ধারণ করিয়া শত সহস্র তীর্থযাত্রীকে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ দেখাইতেছে।

মেবারের রাজপুতগণকে গুহলীন বলে। টড্ সাহেব বলেন যে, কনকসেন নামক মেবারের একজন পূর্ব্বতন রাণা মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া সৌরাষ্ট্র এবং বলভীপুরে রাজ্য স্থাপন করেন। যখন শিলাদিত্য বলভীপুরে রাজত্ব করিতেন তখন তিনি শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। রাণী পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তিনি এক পুত্ররত্ন প্রসব করেন। তাহার নাম রাখা হয় গুহ। মেবারের রাজপুতগণ এই গুহের বংশধর বলিয়া তাহাদিগকে গুহলীন বলা হয়। রাণা গুহের বংশে নাগাদিত্য নামক একজন রাণা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নাগাদিত্যের পুত্র সুবিখ্যাত বাপ্পারাও। মহারাণা প্রতাপ বাপ্পারাও-এর বংশধর বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। বাপ্পারাও-এর পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁহার বয়স তিন বৎসর মাত্র। যখন তিনি চিতোর গড়ের গদীতে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ কি পনর বৎসর মাত্র। বাপ্পারাও-এর আসল নাম "ভোল"। কিন্তু প্রজাগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেন এইজন্য তিনি বাপ্পা নামে বিখ্যাত হন। বাপ্পারাও যে কেবল চিতোর গড়ে প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন তাহা নহে, তিনি অদ্বিতীয় বীরত্বের সহিত কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাক, ইরান, তহরান, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া নিজের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। বাপ্পারাও-এর অনেক পুত্র ছিল। তাহারাও বাহুবলে অতি দূরদেশে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিল। কথিত আছে যে, নেপালের রাজপুরুষ বাপ্পারাও-এর বংশধর।

বাপ্পারাও-এর পরবর্ত্তী রাণা সমরসিংহ বিখ্যাত রাণা ছিলেন। যখন রাজপুতকুলকলঙ্ক কনোজাধিপতি জয়চান্দ্রের সঙ্কেত অনুসারে শাহাবুদ্দীন ঘোরী দিল্লীর শেষরাজা পৃথ্বীরাজকে পদচ্যুত করার জন্য তাঁহার দিল্লীর রাজধানী আক্রমণ করেন, তখন রাণা সমরসিংহ হিন্দুজাতির গৌরব এবং স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের সহিত যোগদান করেন এবং শত্রুসৈন্যের সহিত ভীষণ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার পুত্র কল্যাণসিংহও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সাক্ষাতে এই দৃশ্য দেখিয়াও রাণা সমরসিংহ শোকের বিন্দুমাত্র চিহ্নও প্রকাশ করিলেন না। বরং প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, পৃথ্বীরাজ শত্রুকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি ক্ষিপ্রবেগে শত্রুসৈন্যমধ্যে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া শত্রুক্ষয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনিও

রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। হিন্দুর স্বাধীন-রবি পশ্চিম গগনে অস্তমিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রাণা সমরসিংহের শেষবায়ু অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল। যে-দিন ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত হয়, সে-দিন হইতেই চিতোরের রাণাগণ হিন্দুর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বদ্ধ-পরিকর।

যখন আলাউদ্দীন খিলিজী দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন চিতোরের গদীতে রাণা লক্ষ্মণসিংহ রাজা ছিলেন। তিনি নাবালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার খুল্লতাত মহারাণা ভীমসিংহ তাঁহার পরিবর্ত্তে রাজকার্য্য সমাধান করিতেন। ভীমসিংহের পদ্মিনী নামে পরম রূপবতী এক ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। আলাউদ্দীন পদ্মিনীর অসাধারণ রূপলাবণ্যের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার লালসায় অসংখ্য সৈন্যদলের সহিত চিতোরগড় আক্রমণ করে। কিন্তু রাজপুতগণ এইরূপ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন যে আলাউদ্দীন কিছুতেই চিতোর দখল করিতে সমর্থ হইলেন না। আলাউদ্দীন অবশেষে ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠান যে, তিনি একমাত্র পদ্মিনীকে দর্শন করিতে পারিলে সৈন্য সামন্ত সহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ভীমসিংহ উত্তর দিলেন যে, তিনি পদ্মিনীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। তবে তিনি তাঁহার চেহারা দর্পণের ভিতর দেখিতে পারেন। কিন্তু তিনি সৈন্যদলের সহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে দুই এক জন শরীর রক্ষকের সহিত আসিতে হইবে।

আলাউদ্দীন এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। তিনি জানেন যে, রাজপুতগণ প্রাণান্তেও বাক্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারে না। তিনি একজন সঙ্গী নিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আধুনিক জগতে কি এমন ব্যাপার কখনও সম্ভব হয়? রাজপুত-চরিত্রের কি অপার মহিমা!

রাজ্য, সিংহাসন, ধন-জন-সম্পত্তি, স্বাধীনতা একদিকে, বাক্যের গৌরব অন্যদিকে। বাক্যের গৌরবের নিকট সকল নগণ্য। আলাউদ্দীন অকুতোভয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া পদ্মিনীকে দর্পণের মধ্যে দর্শন করিলেন। ভীমসিংহ তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্যে যেই দুর্গের বাহির পর্য্যন্ত আসিলেন, অমনি একদল তুর্কী সৈন্য—যাহারা আলাউদ্দীনের আজ্ঞাক্রমে জঙ্গলের ভিতর লুক্কায়িত ছিল—হঠাৎ আসিয়া ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। আলাউদ্দীন ভীমসিংহের সৌজন্যের প্রতিদান স্বরূপ বিশ্বাসঘাতকতার একশেষ দেখাইলেন। আলাউদ্দীন বলিয়া পাঠাইলেন যে, পদ্মিনী যদি নিজে আসিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়, তবে তিনি ভীমসিংহকে ছাড়িয়া দিবেন, নচেৎ কিছুতেই তিনি তাঁহাকে ছাড়িবেন না। পদ্মিনী এই প্রস্তাব স্বীকার করিয়া আলাউদ্দীনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার সঙ্গে অনেক দাসী এবং বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি বস্ত্রাবৃত পাল্কীতে আনিতে হইবে, যেন এই সকল তুর্কী সৈন্যের দৃষ্টিগোচর না হয়।

আলাউদ্দীন এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। অসংখ্য পাল্কী সুসজ্জিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক পাল্কীতে এক এক জন সশস্ত্র রাজপুতবীর আরোহণ করিলেন। পদ্মিনীর পাল্কীতে বাদল নামক এক বীরপুরুষ বসিলেন। প্রত্যেক পাল্কীর বাহক ছয়জন কাহার ছদ্মবেশে ছয়জন রাজপুত সৈন্য। এই পাল্কী বাহিনীর সর্দ্দার পদ্মিনীর খুল্লতাত সুবিখ্যাত বীর গোরা আলাউদ্দীনের নিকট গিয়া নিবেদন করিল যে, পদ্মিনী পতির নিকট শেষ বিদায় চাহিবার জন্য সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। আলাউদ্দীন পদ্মিনীকে তাঁহার পতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিলেন কিন্তু বলিলেন যে, পাঁচ ঘণ্টার অধিক কিছুতেই তিনি পতির নিকট থাকিতে পারিবেন না। যেমনি পদ্মিনীর পাল্কী ভীমসিংহের নিকট পৌঁছিল, সেই পাল্কী হইতে বাদল বাহির হইয়া ভীমসিংহকে কবচ পরাইল। কিছুক্ষণ পর যেই আলাউদ্দীন সেখানে উপস্থিত হইল, অমনি পাল্কী হইতে সশস্ত্র রাজপুতগণ বীরদর্পে নির্গত হইল। পাল্কী-বাহকগণও স্ব স্ব অস্ত্র নিষ্কাষিত করিল। রাজপুতগণ বীরদর্পে তুর্কী সৈন্য আক্রমণ করিল। ইত্যবসরে ভীমসিংহ হঠাৎ একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া তীরবেগে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পদ্মিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয় সৈন্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। অনেক রাজপুত প্রাণত্যাগ করিল। আলাউদ্দীন দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সফল-মনোরথ না হইয়া দিল্লী ফিরিয়া গেলেন।

আলাউদ্দীন তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। দুই বৎসর পরে একদল প্রকাণ্ড আফগান ও তুর্কী সৈন্য একত্রিত করিয়া চিতোর আক্রমণ করেন। ছয়মাস পর্য্যন্ত দেশভক্ত রাজপুতগণ দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল। রাজপুত সৈন্যসংখ্যা

ক্রমেই কমিতে লাগিল। অপর পক্ষে দিল্লী হইতে অনবরত সৈন্য আসিয়া তুর্কী সৈন্যের কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

ভীমসিংহের দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একাদশ পুত্র একে একে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। ভীমসিংহ বড় বড় যোদ্ধা একত্রিত করিয়া একটী ক্ষুদ্র সৈন্যব্যূহ গঠন করিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ জীবিত পুত্রকে সেই ব্যূহের নায়ক করিলেন এবং তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে—"এই দুর্ভেদ্য তুর্কী সৈন্যদল ভেদ করিয়া চলিয়া যাও এবং চিতোরে রাজত্ব করিবার জন্য জীবন ধারণ কর।" পুত্র প্রথমতঃ রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন—"পিতঃ, আমিও আপনার সহিত সমরক্ষেত্রে শত্রু ধ্বংস করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিব।" ভীমসিংহ উত্তর করিলেন, "তুমি চিতোরের রাজবংশ লোপ করিতে চাও?" কুমার অগত্যা পিতার আজ্ঞা পালন করিলেন। তাঁহার সৈন্যব্যূহ তুর্কী সৈন্য ভেদ করিয়া নিরাপদে চলিয়া গেল। ইঁহারই পরিবারের কোন ব্যক্তি পুনরায় চিতোরের গদীতে আরোহণ করেন। যখন ভীমসিংহ দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র নিরাপদে তুর্কী সৈন্য দল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি রাজপুত-প্রথানুসারে কেসরিয়া জামা পরিধান করিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে শত্রুদলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত্রুধ্বংস করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া রাজপুত সৈন্যগণও কেসরিয়া জামা পরিধান করিয়া "মার মার" শব্দে তুর্কী সৈন্যদল মধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে পদ্মিনীর প্রাঙ্গণে এক প্রকাণ্ড চিতা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। পদ্মিনী তের সহস্র সাধ্বী রমণীর সহিত সেই জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। বীর রমণীগণ স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিলেন। রাজপুত নরনারী এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে মরণকে বরণ করিয়া হিন্দু জাতির চরিত্র-মহিমা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিলেন। এই মৃত্যুকাণ্ড শেষ হইলে দুর্গের দ্বার খোলা হইল। দেববালা নামক রাজপুতকে এই শেষ কার্য্য সমাধার জন্য রাণার পদে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। তিনি সকলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া স্বকীয় সৈন্যগণের সহিত শত্রুদলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত্রুধ্বংস করিতে করিতে রণকুণ্ডে আত্মোৎসর্গ করিলেন। সঙ্গীগণও অসংখ্য শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিতে করিতে বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন। আলাউদ্দীন যখন অসংখ্য মৃতদেহ অতিক্রম করিয়া পদ্মিনীর মহল্লায় প্রবেশ করিলেন, তখন মৃতদেহ এবং ভস্মস্তূপ ব্যতীত কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

কিছুদিন পর হাম্মিরা এবং তাঁহার পরবর্ত্তী দুইজন রাজা চিতোরের গৌরব এবং প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া চতুর্দ্দিকে রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহাদের পর এই বংশের প্রসিদ্ধ রাণা ছিলেন কুম্ভ। তিনি একজন বীর পুরুষ ছিলেন এবং অনেকবার মালবার, গুজরাট ও নগরের মুসলমান রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। মহারাণা কুম্ভের পৌত্র মহারাণা সংগ্রামসিংহ একজন অসাধারণ বীরপুরুষ এবং স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। ইনি মহারাণা প্রতাপের পিতামহ।

সংগ্রামসিংহ এবং প্রতাপসিংহ এই উভয়ের চরিত্রই এক উপাদানে গঠিত। উভয়েই বীর, স্বদেশপ্রেমিক এবং অধ্যবসায়ী। উভয়ের জীবনের ঘটনাবলী উপন্যাস হইতেও আশ্চর্য্যকর। উভয়েই বিপদসঙ্কুল জীবন যাপন করিয়াছেন এবং উভয়েই কৃচ্ছ্রসাধনে সিদ্ধ। উভয়ে স্বদেশ উদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সংগ্রামসিংহ অষ্টাদশবার মালবা এবং গুজরাটের মুসলমান রাজাদের এবং দিল্লীর লোদী-বাদশাহদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁহার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। বাল্যকালে ভ্রাতার সঙ্গে লড়াইতে একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। দিল্লীর লোদী বাদশাহদের সঙ্গে যুদ্ধে এক হাত নষ্ট হইয়াছিল। তোপের গুলিতে এক পা ভাঙ্গিয়াছিল এবং সর্ব্ব অবয়বে ৮০টী অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল। এই অবস্থায় সংগ্রামসিংহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, মুসলমান বাদশাহকে দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন। তিনি ইব্রাহিম লোদীকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, ইত্যবসরে দৌলতখাঁ লোদী এবং আলম খাঁ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ইব্রাহিম লোদীকে পাণিপথের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। সংগ্রামসিংহ অনতিবিলম্বে বাবরের বিরুদ্ধে মহা অভিযানের উদ্যোগ করিলেন। অধীনস্থ রাণা এবং মিত্র-রাণাদিগকে একত্র করিয়া প্রায় একলক্ষ সৈন্যের সহিত বাবর বাদশাহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযান মহারাণা সংগ্রামসিংহ ব্যতীত আর কোন হিন্দুনেতা কোন দিন করেন নাই। হিন্দুজাতির ভিতরে একতা ছিল না, স্বদেশপ্রেম ছিল না, স্বদেশরক্ষার অদম্য চেষ্টা ছিল না, এই

অপবাদ যে অমূলক হিন্দুজাতির তদানীন্তন নেতা মহারাণা সংগ্রামসিংহের দৃষ্টান্তে তাহা প্রতীয়মান হয়। সংগ্রামসিংহ একলক্ষ সৈন্যের সহিত ফতেপুরসিকড়ী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেখানে বাবর বাদশাহের মোগল সৈন্য স্বয়ং বাদশাহের নেতৃত্বে সংগ্রামসিংহের গতিরোধ করার জন্য উপস্থিত হইল। বাবরের সৈন্যগণ সংগ্রামসিংহের অগণিত সৈন্যসংখ্যা দেখিয়া আতঙ্কিত হইল। বাবর আসন্নবিপদ অনুমান করিয়া সাহসের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সৈন্যের সর্দারগণকে একত্রিত করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "হে শ্রদ্ধেয় সর্দ্দারগণ! আপনারা মহামহিমান্বিত চঙ্গীস খাঁ এবং তৈমুরের বংশধর। তাঁহাদের জন্মভূমির মর্য্যাদা আজ আপনাদের হাতে। আপনারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে কেমনে দেশবাসীদিগকে মুখ দেখাইবেন? মনে রাখিবেন যে, আমরা যে দেশ দখল করিয়াছি, জগতে এরূপ দেশ আর নাই। স্বর্গের দেবগণ (আসমান বা ফরিস্তা) এই দেশকে সম্মানের সহিত প্রণাম করেন। এই অমূল্য রত্ন খোদার ইচ্ছায় আপনাদের হস্তগত হইয়াছে। এই অমূল্য রত্ন রক্ষার ভার আপনাদের উপর। চঙ্গীস এবং তৈমুরের তলবার আপনাদের হাতে থাকিতে আপনারা কেন ভীত হইতেছেন? সাহসে ভর করিয়া দাঁড়ান। দেখিবেন যেন মোগলবংশের উপর কলঙ্কের টীকা না লাগে। আগেও মৃত্যু পাছেও মৃত্যু। তবে আর মৃত্যুর ভয় কি? (কোরাণসরীফ দেখাইয়া বলিলেন) ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। এই কোরাণ সরীফের নামে আমি আপনাদিগকে কঠোর কর্ত্তব্য সাধনের জন্য আহ্বান করিতেছি।" সর্দ্দারগণ কোরাণসরীফ দেখিয়া মস্তক অবনত করিলেন। পরে কোরাণের উপর মস্তক রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রাণ থাকিতে কেহ শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইবেন না।

তারপর ফতেপুরসীকড়ীর মাঠে উভয় সেনার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাঁধিল। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। সংগ্রামসিংহ যদিও একচক্ষু ও একহস্তহীন, এক পা ভাঙ্গা তথাপি অমিত-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হিন্দুজাতির ভাগ্যগৌরব এবং স্বাধীনতা আজ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি আঠারবার মুসলমানদিগকে যুদ্ধে হারাইয়াছেন। আজ এই যুদ্ধে তাঁহাদিগকে হারাইতে পারিলে হিন্দু-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার হয়। সংগ্রামসিংহ আজ আশায় বুক বাঁধিয়াছেন। কিন্তু কোন হিন্দুসৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতায় হঠাৎ আহত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। রাজপুতসৈন্য সংগ্রামসিংহকে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত দেখিয়া নিরুৎসাহ হইলেন। মোগল সৈন্য সুযোগ দেখিয়া দ্বিগুণ বেগে হিন্দু-সৈন্যকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনেক হিন্দুসৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। বীরশ্রেষ্ঠ সংগ্রামসিংহ আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মেবারের পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিজয়লক্ষ্মী বাবরের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করাতে বাবরের প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

বাবর এই বিষয়ে গৌরবের চিহ্নস্বরূপ ফতেপুরসীকড়ীর যুদ্ধক্ষেত্রে এক কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করেন। পরিব্রাজকদের ইহা এক বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ। সংগ্রামসিংহ হয় ত' ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণ একত্রিত করিয়া পুনরায় বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন কিন্তু পর্ব্বতে বাস করিবার সময় কোন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সামন্ত তাঁহাকে খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশাইয়া দেয়। এই বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হইল। ভারতের গৌরবরবি ঘন তমসাচ্ছন্ন হইল, ভারতের স্বাধীনতা উচ্চরবে আর্ত্তনাদ করিল।

[ক্রমশঃ

লণ্ডন-তীর্থে

শ্রীমতিলাল দাশ

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার। বৃটিশমিউজিয়ামে সারাদিন পড়িলাম। হরিহরদাদা সান্ধ্যভোজনের আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ড ভ্রমণের সম্বন্ধে উৎসাহ দিলেন। বলিলেন, "খুব সাবধানে যাবে—" গৃহহীন, স্বজনহীন এই আত্মীয়ের করুণ আন্তরিকতা হৃদয় স্পর্শ করে। ব্যক্তিকে আমরা সহসা বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ তাহার ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নয়। আলাপে, আচরণে ধীরে ধীরে আমরা মানুষের অন্তরতম জনকে চিনি। দিনে দিনে দাদাকে যত চিনিতেছি, ততই তাঁহার অন্তরের সুবিমল সৌন্দর্য্য হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতেছে। তাহার হৃদয়ের দারিদ্র্য ও অভাব বুঝি মানুষ জ্ঞান নিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। সে চায় মানুষের সঙ্গ। দাদা সংসারের প্রতিকূল রূপ অনেক দেখিয়াছেন তাই সহসা মানুষকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। কিন্তু অন্তরের অন্তরতলে তিনি চান একজন বন্ধু, একজন সাথী। খানিক রাত্রে বাসায় ফিরিলাম।

৫ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার। সকালে উঠিয়া King's Cross ষ্টেসনে গেলাম। তাহারা বলিল টিকিটের দাম ঠিক করিতে অনেক সময় লাগিবে। সেখান হইতে কুকের আফিসে গেলাম। তাহারা বলিল, এখন তাহারা পারিবে না। তাই অবশেষে L. M. S. Office-এ এলাম। টিকিট করিতে খানিক সময় লাগিল। এখান হইতে গাওয়ার ষ্ট্রীটে মিঃ সন্তোয়ানের নিকট। সন্তোয়ান মাদ্রাজী ভদ্রলোক, বিলাতে অনেক দিন আছেন। তাহার ছোট ছেলেটি কি চমৎকার ইংরাজী বলে। আলাপে ভদ্র, আচরণে নম্র, দেখিয়া খুব খুসী হইলাম। সন্তোয়ান কয়েক স্থলে পরিচয় পত্র দিলেন। তাঁহার পরিচয় পত্রের বলে গ্লাসগো, এডিনবরা ও বেলফাষ্টে অনেক সুবিধা হইয়াছিল। সেখান হইতে গ্রীণ্ডলের ওখানে গেলাম। তাহাদের ব্যাঙ্কের কাজ শনিবার বলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দশ পাউণ্ড Traveller's cheque পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। চিঠিপত্র কিছু আজ পাইলাম না। আমার ভ্রাম্যমান স্থানগুলিতে কি ভাবে কখন চিঠি পাঠাইবে তাহার নির্দ্দেশ দিয়া বাসায় ফিরিলাম।

আকাশের অবস্থা খারাপ, শরীরের অবস্থাও খারাপ। নিশ্চুপ ঔদাসীন্যে শয্যায় আশ্রয় লইলাম। রাজেনবাবুর চিঠি পাইলাম। যে চিন্তা সবল করে, এ সে চিন্তা নয়, ইহার ষোড়শোপচার পূজা ঠিক নয় জানি কিন্তু মানুষ কি নিজেকে এবং নিজের পরিবেশকে আয়ত্ব করিতে পারে? পারে না, তাই ত' প্রাত্যহিক সংঘর্ষ চলে। চিন্তার ও কর্ম্মের দ্রুতগতিই শুধু ভাল নয়, অবসরের নিবিড় আলস্যের প্রয়োজনও আছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার। আজ সারাদিন ঘরে বসিয়া কাটিল। আমার ঘরের সম্মুখে একটী ছোট তৃণভূমি, পিছনের বাড়ীর অংশ; এই তৃণখণ্ড আমার খুব ভাল লাগে। সে আমার দেশের শ্যামলশ্রীকে স্মরণে আনে। মোহনলাল সা বলে একটী গুজরাটি যুবক আমাদের বাড়ীতেই থাকিত। সে ব্যবসায় শিক্ষা করিতে আসিয়াছে। ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, আর্দ্র বাতাস বাহিরে, তাই আজ বাহির না হইয়া মোহনলালের ঘরে গল্প করিতে চলিলাম। মোহনলাল আমাকে একটা রেডিও কিনিতে বলিল। সে সম্বন্ধে পরে বিবেচনা করিব বলিলাম। ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি নানা দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলাম বলিয়া মোহনলালের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। মোহনলালের correspondence course এটা বিলাতী কায়দা। আমরা অনেক কিছু অনুকরণ করিয়াছি, এটা এখনও বোধ হয় করিতে পারি নাই। এই অধ্যাপনায় ছাত্র ও শিক্ষকের চাক্ষুষ আলাপ হয় না। ডাকে পাঠ আসে, সেটা কিছুদিন পরে ফেরত পাঠাইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন থাকে, সেটা পূর্ণ করিয়া ছাত্রকে পাঠাইতে হয়। বসিয়া বসিয়া মোহনলালের নিকট প্রেরিত ব্যবসায় শিক্ষা টাইপ করা লেকচার পড়িতে লাগিলাম। ঝরঝরে ভাষায় লেখা, মন্দ লাগিল না।

পণ্ডিত হৃষিরামের সঙ্গে কিছু শাস্ত্রালোচনা করিলাম। পণ্ডিতজীর মধ্যে বিশ্বাসের নির্ভরতা আছে। মোটের উপর ওঁকে খুব ভাল লাগিল। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, সংশয় নিরবলম্ব, তাই আমাদের শাশ্বত স্থান নাই—আমরা স্রোতের শৈবালের মত ভাসিয়া চলি, পদে পদে মত বদল করি, নূতন নূতন তর্কে নূতন নূতন সত্য দেখিবার ভাণ করি। কিন্তু আসলে অন্তরের দারিদ্র্য পীড়া দেয়।

লণ্ডনের প্রথম পর্ব্ব আজ শেষ। কাল স্কটল্যাণ্ড এবং আয়র্ল্যাণ্ড ভ্রমণে যাইব। লণ্ডন যেন পরিচিত বন্ধুর মত নির্ভরযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল, আবার অনিশ্চিত ভ্রমণ। হৃষিরামের কথা মনে পড়িল। মানুষ তাহার সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে যদি নিবেদন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার উদ্বেগের কারণ নাই। ত্বয়া হৃষিকেশেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—এ মন্ত্র জানি কিন্তু জীবনে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি নাই।

আজ বার বার মনে হয়, নিজেকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলিয়া যদি মিথ্যা অহঙ্কার না করি, যদি শিশুর মতন সরল বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে হয়ত’ নিশ্চিত শান্তি পাইতে পারি।

সমাপ্ত

কে রচিবে ভবিষ্যৎ !

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এ বিশ্বের জীবন-লতায়
মৃত্যুর নিঃশ্বাস বহে, বসুন্ধরা মরম-ব্যথায়—
মূর্চ্ছাহত। শতাব্দীর পরিভ্রষ্ট সভ্যতারে আজি
দগ্ধ করি’ দিবে বলে’ মহাকাল রুদ্ররূপে সাজি’
ধেয়ে আসে। রক্তের প্রবাহে মানবের মৃতদেহ
ভেসে যায় দিকে দিকে,—ভেঙ্গে যায় হৃদয়ের গেহ।
ঊর্ম্মি কাঁদে বালুতটে, সে কি মম মর্ম্মোত্থিত সুর ?
অন্তরের ধ্বনি কিম্বা জলধির ব্যথিত বিধুর—
অশ্রুগীতি ? সুপ্তি লাগি একি তার বিপুল রোদন।
বেদনার সাথে সাথে করে দুঃখে আত্ম-নিবেদন।
সারারাতি শর্ব্বরী ধরি’ শোনা যায় শোকোচ্ছ্বাস তার,
বিশ্রামের অবসর অন্বেষণ করে অনিবার।
চঞ্চল বিহ্বল সে যে—অসহায়,—কেহ তার পানে
চাহেনাক একবার, বহে ঊর্ম্মি উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে।
কেন কাঁদে ? আসিতেছে চিরসুপ্তি বিশ্রাম-লগন
অনন্তের কোলে। অন্ধকারে কাঁদে অদৃষ্টগগন।
বারে বারে বিভীষিকা ছলনার ছায়াপথে আসে,
কল্পনা কৌতুক যত কুঞ্জে মগ্ন নাহি পরকাশে।
ম্লানচ্ছবি জেগে আছে মেঘাচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন কুটিরে,
প্রসন্ন দিবস আর সংসারের এই শুষ্কতীরে
এলো না ক! অরণ্যের আর্ত্তনাদ কর্ণে আসে মম,
সহস্র ভাবনা মোরে করিয়াছে উন্মাদের সম।
শান্তি নাই, সুখ নাই, বিষণ্ণতা নিদ্রা-জাগরণে,
একে একে জীবনের তারকারা মৃত্যু-আবরণে
নয়নের অন্তরালে রহিল নীরব,
বহিছে কি কল্পবায়ু ? পথে ভেঙে পড়িল কি
কল্পতরু সব !
মল্লিকার মালাখানি দিয়ে যাব কার গলে,
নীড়ে আর ফিরিবে না পাখী,
কে রচিবে ভাবী যুগ ! এ-বিশ্বের অশ্রুজলে দেখা
দেয় দুরন্ত বৈশাখী।

ঈশ্বরগুপ্ত ও বাংলা কাব্য

শ্রীভবপতি মৈত্র

এক

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বঙ্গদেশেব আধুনিক যুগের প্রথম কবি। বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সাহিত্য-শিষ্য। বঙ্গদেশে তিনি এক নূতন ভাবধারার অগ্রদূত। ইংলণ্ডে যেমন Addison এবং Steel কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত Spectator এবং Tatler নামক পত্রিকাদ্বয় প্রথম বাহির হইয়া পাঠকদিগের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়াছিল, সেইরূপ তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত "প্রভাকর" পত্রিকা বঙ্গদেশে পত্রিকা-আকাশে প্রথম উদীয়মান হইয়া পাঠক-পাঠিকাদিগের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুব করিয়াছিল। ইংলণ্ডে Restoration যুগে Dryden, Pope, Swift বাদানুবাদযুক্ত, কুৎসা, পরনিন্দাজড়িত গদ্য ও কবিতা রচনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। Pope-এর মধ্যে যেরূপ আমরা Restoration যুগেব Critical spirit এবং Romantic Revivalএর Creative spiritও দেখিতে পাই, তদ্রূপ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উভয় প্রকার ভাবযুক্ত লেখক। কবি ভারতচন্দ্র ও মাইকেলের মধ্যবর্ত্তী যুগের কবিতাও সেই প্রকার। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার মধ্যে পারমার্থিক ও নৈতিক কবিতাও বিস্তর রহিয়াছে। রসিকতা, কৌতুক ও হাস্যরসের অবতারণা ও প্রাকৃতিক ঋতুবর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা অদ্ভুত। অনেক স্থলে তিনি তাঁহার সমাজ ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগী দেখাইয়াছেন। স্বধর্ম্মের অভ্যন্তরে কোনরূপ কদাচার প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে যেন নষ্ট না করিয়া ফেলে তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্নবান্। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতু বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি যেরূপ নিখুঁত বর্ণন করিয়াছেন তাহা অতি প্রশংসনীয়।

অনেক সময় বলিতে বলিতে অতিশয়োক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ কবিতা পয়ার ছন্দে লিখিয়াছেন। তৎকালে ঐরূপ ছন্দে কবিতা লেখা একটী প্রসিদ্ধ প্রথা ছিল। তিনি স্বদেশপ্রেমিকতার কবিতা এরূপ হৃদয়গ্রাহীভাবে লিখিয়াছেন যে, তাহার অদ্যাপি তুলনা হয় না।

আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ কবিতার অভ্যন্তরে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাব দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং অন্য কবিতা হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি ইংরাজী ভাষাতেও জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার অনেক আধ্যাত্মিক কবিতা তামাসা-চ্ছলে আরম্ভ করিয়া গুরুতর তথ্যে উপনীত হইয়াছেন, যথা, "কে তুমি", "সব হ্যার ফাঁক", "কিছু কিছু নয়"। তাঁহার সম্পূর্ণ হাস্যরসপূর্ণ কবিতা যথা, "পাঁঠা", "তপসী মাছ", "বুড়াশিবের স্তুতি", "আনারস"। তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখিতে পাই জগদীশ্বরের প্রতি "প্রণাম তোমায়"। এই কবিতায় সমুদয় দিবসেব, কালের ও মানবের অল্প অল্প করিয়া রূপান্তর ধারণ প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা বুঝিতে পারিয়া প্রণাম করিতেছেন। কবিতাটী ভক্তি-রসাত্মক। কবিতাটীর ভিতবে অনুপ্রাস অলঙ্কার যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। যদিও তাঁহার অধিকাংশ কবিতার ভিতর ঐ অলঙ্কার বর্ত্তমান এবং ঐ যুগের ইহা একটী পদ্ধতি ছিল। দিবসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"প্রভাকর-প্রভাতে প্রভাতে মনোলোভা
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা
আকাশের অকস্মাৎ আর এক ভাব
হয় দৃষ্ট নব স্পষ্ট সুখদ স্বভাব
তরুণ তপন হরে তরল তামস
লোহিত লাবণ্য হেরি মোহিত মানস"

তাহার প্রার্থনা-কবিতাটী "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। "বিনাশ্য শ্রীহরৌ কর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্যমধিগম্যতাম্"।

"এতদিন বেঁচে আছি তোমার কৃপায়
হৈ হৈ করিতেছি ভবের সভায়॥
যে পথে চালাও আমি সেই পথে চলি
যেরূপ বলাও তুমি, সেইরূপ বলি॥"

তাঁহার নিজের সম্বন্ধেও বলিতেছেন—মৃত্যুকাল উপস্থিত

হইলে কি হইবে। ঈশ্বর এই কথাটির উপর অনেক রূপ অর্থ রহিয়াছে—

"ঘুচিল নশ্বর দেহ ঈশ্বর তোমার
নশ্বর ঈশ্বর, আমি বুঝাইব কায,
ঈশ্বর যাবার নয়, ঈশ্বর কি যায়?
ছিল গুপ্ত, হলো গুপ্ত গুপ্ত কোথা আছে।
সকলি হইল গুপ্ত ঈশ্বরের কাছে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্ত কভু নও
কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত যদি হও॥"

বাহিরের ভাষায় আভ্যন্তরীণ পারমার্থিক অর্থ বিগুমান। দ্বিতীয় প্রার্থনা-কবিতায় তাঁহার "প্রভাকর" পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহার অন্য অর্থ হইবে। ইহাতেও ভগবানের মহিমা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে—

"ডাকে প্রভাকর-কর ওহে প্রভাকর-কর,
মনোময় হও দয়াময়।
কেহ নাহি জানে গুপ্ত বলে হে ঈশ্বর গুপ্ত,
তুমি ব্যক্ত চরাচরময়॥"

পরমার্থতত্ত্ব-নিরূপণ কিরূপ দুষ্কর তাহা কবি বলিয়াছেন তাঁহার "কে তুমি?" কবিতায়—

"তুমি আমি এই যদি হলো নিরূপণ।
তুমি আমি দুই ছাড়া কারে বলি মন?
কে মন?—কেমন সেই, সে মন কিরূপ?
কেমনে জানিব সেই মনের স্বরূপ?"

তাঁহার "সব হায় ফাঁক" কবিতা উপাধি হিসাবে মনে হয় লঘু কবিতা। কিন্তু ইহার বিপরীত। অহঙ্কারের তামস সম্পূর্ণরূপে মন হইতে অপসারিত হয়। নৈতিক হিসাবে ইহা অতি সুন্দর—

"দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাঁক,
বাবা সব হায় ফাঁক
ধনের গৌরবে কেন মিছে কর জাঁক
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর পুড়ে হবে খাক্।
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার
কোথায় রহিবে আর আমি আমি বাক্
দুনিয়ার মাঝে বাবা, সব হায় ফাঁক্॥"

অপর কবিতাটীতে ঐ অর্থ সুব্যক্তরূপে ফুটিয়াছে—

"দুনিয়ার মাঝে বাবা, কিছু কিছু নয়,
বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়,
বাবা অন্ধকারময়।"

তাঁহার "মায়া" কবিতাটীতে সংসারকে নাট্যশালারূপে পরিগণিত করা হইয়াছে। যাত্রাদলের অধিকারী হইতেছেন ভগবান্, মানবগণ যাত্রাব বালক, সংসার-ভূমি রঙ্গমঞ্চ; মানবের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা যেন যাত্রাদলে ক্রীড়াকারী ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তমান ভাবের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। শৈশবে, প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে বিভিন্ন অবস্থা। কবি বলিতেছেন—

"ওহে জীব ভাল তুমি রঙ করিয়াছ
তিন কালে তিন রূপী সঙ সাজিয়াছ,
কেবল কুহকে ভুলে কৌতুক দেখাও
ভাল করে যাত্রা কর বুঝে অভিপ্রায়।"

Tennyson-এর Passing of Arthur নামক কাব্যগ্রন্থে এই (Table-land of life) জীবনের উপত্যকাভূমিতে মানব কর্ম্মের জন্য আসিয়াছে, কর্ম্ম ফুরাইলে এই পৃথিবীতে থাকার আর প্রয়োজন হয় না, মানব মহাসমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। মধ্যস্থল সংসার-ক্ষেত্র। কবি ঈশ্বরচন্দ্রও তাই বলিতেছেন—

"যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাব চলে
এ যাত্রার শেষ হবে গঙ্গাযাত্রা হলে॥"

তাঁহার "মনের মানুষ" কবিতায় আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি পার্থিব জগতের সত্যবস্তুকে উপাদেয় বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। দার্শনিক তথ্য, ভগবানের কৃপা লাভে তিনি বিশেষ ব্যগ্র। জগতে মানবের কি নিমিত্ত আগমন, কি নিমিত্ত কার্য্যপ্রবৃত্তি, কোথায় জীবনের পরিসমাপ্তি—এই সমস্ত বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাহার সম্বন্ধেই বলিতেছেন—

বল দেখি কেন এলে ভবে?
এ ভাবেতে ক২দিন রবে?
কি ছিলে কি শেষে তুমি হবে?

আসিয়া জনমভূমি তোমায় চেন না তুমি.
আমায় চিনিবে তবে কবে ?
হৃদয়ে পরম ধন   কর মন দরশন
হও না কমলবনে ভেক্,
ছাড় ছাড় ছাড় মিছে ভেক্
তুমিত চকোর বটে মন
হয়েছে চাঁদের দরশন,
সুখে কর পীযূষ ভোজন।

"সব ভরপুর" কবিতায় ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মানবকে যোগতত্ত্ব ও পরমার্থ নিরূপণে উপদেশ দিতেছেন। অহঙ্কার, মোহ যেন মানবকে গর্ব্বিত না করে। ভোগ, ঐশ্বর্য্যের জাঁক-জমক মানবের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, কবি এই কবিতায় সাবধান করিয়া দিতেছেন। ধর্ম্মই মানবকে তাপত্রয় হইতে রক্ষা করে—

"পেয়েছ উত্তম দেহ যোগ-পথে মন দেহ
পরিহরি মোহ-স্নেহ, চল সুরপুর।
যোগযুক্ত অহঙ্কার   করি তাব অলঙ্কার
করহ ওঁকারে সার গর্ব্ব হবে চুর
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥"

তাহার "তত্ত্ব" কবিতাটী অতি বিস্তীর্ণ। ইহাতে যাবতীয় দার্শনিক তত্ত্ব উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিভিন্ন মত, মানুষের মৃত্যুর পর কি অবস্থা হয়, পরজন্ম ও পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন, ন্যায়শাস্ত্র ও বেদান্তের অনেক কথা তাঁহার কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে।

"নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস,
ঘটের হইলে নাশ, পাঁচ পাঁচ পায়।
অবিনাশী চিদাভাস, তার কভু নাহি নাশ,
দেহ-নাশে কেন লোক করে হায় হায় ?
কে মরে কে পায় মুক্তি, বুঝিতে না পারি যুক্তি
নানা জনে নানা উক্তি শুনে হাসি পায় ॥"

গীতার কথাও তাঁহার কবিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।" ইত্যাদি—
আত্মার শরীর ধরা, বস্ত্র ছেড়ে বস্ত্র পরা
জোঁক সব তৃণে তৃণে যেমন বেড়ায়
প্রবৃত্তির বশ হয়ে, প্রাক্তনের ক্রিয়াপরে
দেহঘরে ঢোকে জীব তোমার ইচ্ছায়।"

[ক্রমশঃ

যাত্রাশেষ

শ্রীসুধাংশু সেন

জীবন-সন্ধ্যা ঘনায়ে আসিছে দিক চক্রবালে,
তোমার যাবার সময় হ'ল।
তোমার পথের শেষ,
যে কথা ভেবেছ অনিমেষ,
আজ তোমার সুমুখে।
গাহিবে না পাখী আর প্রভাতের সুরে,
সে তো আজ তোমা হ'তে বহুদূরে।
নবীন সূর্য্যও আজ হ'য়েছে প্রবীণ
অবসর নেছে নীল সাগরের বুকে,
পথ তব অন্ধকারে ভরা,
পিচ্ছিল শুধু তব সহযাত্রীদের নীরে।

পথিক হারায়োনা আত্মবিশ্বাস,
তরণী রয়েছে বাঁধা তব তরে,
তোমার দেবতা ধরিয়া র'য়েছে হাল,
তুমি আর সে হবে মুখোমুখি,
কঠিন পরীক্ষা এ শুধু—;

* * *

ধরণীর ভালবাসা আনিবে তোমায়
পুনঃ ধরণীতে। তোমার দুঃখের
রাত্রি হইবে প্রভাত
পূবের সূর্য্যের সোনামাখা রোদে।

বন্ধন-মুক্তি

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

আঠার

গাড়ীতে উঠিয়াই অতি অবসন্নভাবে গার্গী মায়ের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। মা তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁধে মাথাটি রাখিয়া গার্গী কাঁদিতে লাগিল। মাতা প্রিয়ম্বদা গাঙ্গুলীও একখানি হাত তুলিয়া অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন। কহিলেন, "কাঁদিস নি কাঁদিস নি মা ? কাঁদবার সময় এ নয়। ভাবতে হবে—শক্ত হয়ে ভাবতে হবে —আজ যে এই অপমান ওরা করলে এর শোধ কিসে নিতে পাবি।"

ফুঁকরাইয়া গার্গী কাঁদিয়া উঠিল।

রুদ্ধরোষে বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল ; মুখ ভরিয়া ঘন ঘন বিকৃত কুঞ্চন দেখা দিতেছিল। রক্তবর্ণ চক্ষু ভরিয়া বিগলিত ধারে তপ্ত অশ্রুও ঝরিতেছিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ক্ষণকাল প্রিয়ম্বদা নীরব রহিলেন। তারপর অশ্রুধারা পুছিয়া আবার বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, শোধ নিতে হবে—শোধ নিতে হবে ? এর শোধ হবে—সুদে আসলে শোধ হবে—কবে জানিস ? ঐ ঘরে আপন অধিকারে ঢুকে মাগীর মাথায় যেদিন চাটি মারতে পারবি !"

গার্গী সোজা হইয়া তখন বসিল ; অশ্রু মুছিতে মুছিতে কহিল, "হাঁ, তাই যদি পারি মা, আজকার এই ব্যথা—উঃ ! কি অপমানটাই করলে—সহ্য করতে পারছি না—যদি তা পারি, এ জ্বালা সেই দিন জুড়োবে ! নইলে—নইলে—এ মুখ নিয়ে—কথাটা চাপা থাকবে না—লোকেব সামনে বেরোতেই পারব না ! ঐ ফ্যানী, লীলি, আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, মন্দা—জান না মা কি হিংসে আমাকে করে—কী টিট্‌কারীই না আমাকে দেবে, বাড়ী বাড়ী কি না বলে বেড়াবে ! না না, মা, সে মুখ নিয়ে বেঁচে থাকতেই পারব না। আত্মহত্যা আমাকে করতে হবে।"

বলিতে বলিতে আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল ; মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া ফুঁকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ড্রাইভার যে সম্মুখেই বসিয়াছিল, বাঙ্গালী না হইলেও মোটামুটি বাঙ্গলা কথা যে কিছু বুঝিতে পারে, সে দিকে লক্ষ্যও ইহাদের তখন ছিল না। যাহা হউক আর কোনও কথা তখন না বলিয়া দুইহাতে প্রিয়ম্বদা কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিলেন।

গাড়ী আসিয়া বাড়ীতে পৌছিল। কোনও মতে নামিয়া ঐ-ভাবেই অবসন্না ও রোরুদ্যমানা কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধবিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রিয়ম্বদা সম্মুখের গৃহে গিয়া উঠিলেন। সর্ব্বনাশ ! মন্দানিল ও তাহার সঙ্গে আত্রেয়ী ও মৈত্রেয়ী বসিয়া রহিয়াছে !

"এ কি ! কি হয়েছে মামীমা ? গার্গী—" (মন্দানিল ছিল গার্গীব পিসিমার মামা'ত দেবরের পুত্র ; সম্পর্কে ভাগ্নের ভাই ! সুতরাং মামী বলিয়াই প্রিয়ম্বদাকে ডাকিত।)

"এই যে, তোমরা এসেছ, তা, বসো একটুখানি, ব'সো। আমি আসছি।"

বলিয়াই অতি ত্রস্তভাবে কোনও মতে গার্গীকে টানিয়া লইয়া ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। বিছানায় তাহাকে শোয়াইয়া রাখিয়া, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়া মুখ পুছিতে পুছিতে বাহিরের দিকে সেই বসিবার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

মন্দানিল কহিল, "কি হয়েছে মামীমা ? পথে দুর্ঘটনা—কি আর কিছু—"

"না না, সে সব কিছু নয়। তবে কি জান বাবা, এই আজ ছুটির দিন—বেরিয়েছিলাম একটু ওকে নিয়ে। তা বুকে হঠাৎ কেমন একটা ফিক ব্যথা ধরল, কোনও মতে ঐ তো ঐ ভাবে ফিরিয়ে নীচে এসেছি। তা তোমরা—"

"আমরা এসেছিলাম, ঐ যে সে-দিন ঐ মিউজিক 'প্লে'টা হ'ল কি না, তা বড় একটা চ্যারিটী জলসা হ'চ্ছে, তাঁরা এসে ব'লছেন, ঐ 'প্লে'টা তার ভেতর জুড়ে দিতে হবে যদি দরকার হয় কিছু ছাট কাট ক'রে নিয়ে। তাই এসেছিলাম—"

"ও ! তা, আজ তো ওর সঙ্গে কোনও কথা হ'তে পারে না। বড্ড কাতর হ'য়ে প'ড়েছে কি না—"

আত্রেয়ী কহিল, "হাঁ, দেখলাম যেন খুব কাঁদছিল। আপনারও চোখে জল দেখলাম। মুখের ভাবেও মনে হ'চ্ছিল—"

"হাঁ, হঠাৎ ব্যথাটা উঠল—কি ভয়ঙ্কর ব্যথা! ছটফট্ ক'রে শেষে পায়ের নীচে গড়িয়ে প'ল। ধ'রে তুললাম, হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে সুরু ক'রলে। আমি তখন আর চোখের জল ছাই রাখতে পারি?"

মৈত্রেয়ী কহিল, "কিন্তু বুকে এ-রকম ব্যথা-ট্যাথার কথা, তো কই, আর কখনও ওর শুনি নি।"

"না হঠাৎ আজ এই নূতন দেখা দিল। তা' হ'লে—" বলিয়া মন্দানিলের দিকে চাহিলেন।

মন্দানিল কহিলেন, "তা হ'লে, হাঁ, আমরা আজ তবে উঠি। কাল—"

"দেখি, কাল যদি ভাল থাকে, খবর দেব আমি।"

আত্রেয়ী কহিল, "খবর আমরাই নেব। এমনি ধারা অসুস্থ আজ দেখে গেলাম, খবর একটা না নিয়ে পারি?"

বলিয়া তিন জনেই তখন উঠিল। প্রিয়ম্বদা কহিলেন, "হাঁ, এস তবে আজ তোমরা। কাল—সে ভাল হ'য়ে উঠবে বই কি? খবর—সে তোমাদের কষ্ট আর ক্লেশ ক'রে আসতে হবে না, আমিই ব'লে পাঠাব?"

তিন জনে তখন নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

"তাই ত! হঠাৎ বুকে কি এমন ব্যথাই ধ'রল যে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে কাঁদতে দু'জনে বাড়ীতে ফিরে এল—"

বিদ্রূপের একটা বক্র হাসি সহ আত্রেয়ী এই উক্তি করিল। মৈত্রেয়ীও তেমনই হাসিয়া কহিল, "ব্যথাটা বুকের ব্যথাই বটে, তবে ফিক ব্যথা নয়।"

"ঠিক, কোথাও কিছু একটা হ'য়েছে?"

"আর সেটা অতি গুরুতর একটা কিছু?"

"কিন্তু কোত্থেকে এল ওরা?"

গাড়ীটা গ্যারেজে রাখিয়া ড্রাইভার তখন বাহির হইয়া আসিল। মন্দানিল কহিল, "আচ্ছা, একটু দাঁড়াও তোমরা বাইরে গিয়ে; জেনে আসছি।" বলিয়াই মন্দানিল কাছে গিয়া একটি আধুলি বাহির করিয়া ড্রাইভারের হাতে দিল। ড্রাইভার সেলাম করিল। মন্দানিল এই সংবাদ লইয়া আসিল, উহারা মল্লিক সাহেবের কুঠি হইতে ফিরিতেছে।

"তারপর!"

"তার পর—শুনবে!" বলিয়া মন্দানিল ঠোঁট দু'খানি চাপিয়া একটু হাসিল।

"শুনবে? ভাল, শোনই তবে। সেখায় কি গানবাজনা হ'চ্ছিল। ওরা ঐ রাস্তায় কোত্থেকে আসছিল। সেই গান-বাজনা শুনেই গাড়ী থামিয়ে সরাসর গিয়ে বাড়ীতে ঢোকে। খানিক বাদে অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে বেরিয়ে আসে। গাড়ীতে উঠেই—সে regular একটা scene! কান্না-কাটি বকাবকি-হিষ্টিরিয়া? তার পর যে অবস্থায় গৃহে প্রবেশ হ'ল, সে ত চোখেই দেখে এলে।"

"বটে!"

"কে গাইছিল?"

"নিশ্চয়ই ঊর্ম্মি! শুনলি না সেদিন, কমলদা ব'লছিল, ঊর্ম্মির মা আর তার মা ছেলেবেলাকার বন্ধু।"

"বটে! বটে! দেখ্‌তে হবে গিয়ে? হাঁ, চলনা মন্দানিল দা, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চল না এখুনি মল্লিকদের বাড়ীতে যাওয়া যাক্!"

"এখনও কি তারা আছে ওখানে, সত্যি যদি গিয়েই থাকে?"

"দেখাই যাক না? থাকতেও পারে। না থাকে নেই, না হয় ঘুরেই একটিবার আসব। ঐ যে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছে—এই রোকে?"

ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ী ভিড়াইল। তিনজনে ত্রস্ত গিয়া উঠিল। মল্লিক সাহেবের বাড়ীর কাছাকাছি যাইতেই দেখিল, কমলের গাড়ীতে কমলের সঙ্গে ঊর্ম্মি ও ঊর্ম্মির মা কোথায় যাইতেছে?

মন্দানিল বলিয়া উঠিল, "Now there! The cat's out of the bag!"

আত্রেয়ী ও মৈত্রেয়ী হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"তা হ'লে আর কেন? চল, তোমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েই গাড়ীটা ছেড়ে দিই।"

"না, লীলিদের ওখানে চল। এমন খবরটা তাকে দেব না?"

"বেশ, তাই চল তবে, আমাদের এই প্লের প্রোগ্রামটাও discuss করা যাবে।"

"লীলিরও যদি আবার অমনি একটা ফিক ব্যথা না বুকে ওঠে।"

হো-হো করিয়া মন্দানিল হাসিয়া উঠিল।

উনিশ

তরুণী বন্ধু যাহাদের সঙ্গে কমল সর্ব্বদা মেলা-মেশা ঘোরা-ফেরা করিত,-তাহাদের মধ্যে ফ্যানী, গার্গী, লীলি, আত্রেয়ী আর মৈত্রেয়ী এই পঞ্চকাই ছিল প্রধানা। ফ্যানী, গার্গী, আর লীলি এই তিন জন ছিল অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পিতার কন্যা, আবার দেহসৌষ্ঠবে তত না হউক, গৌরবর্ণে রূপের গৌরবও কিছু করিতে পারিত। শ্যামলা আত্রেয়ী ও মৈত্রেয়ীর এ গৌরব কিছু ছিল না; পিতৃ গৃহেও রূপার জোর এমন কিছু ছিল না—রূপের এই অভাব যাহা পুরাইয়া তুলিতে পারে। কমলকামিনী রূপে কমলালয়ের কনকবেদীতে কখনও আরোহণ করিবে, এ আশা তাহারা বড় কিছু করিত না। সেটা করিত রূপ-রূপাভিমানিনী লীলি, গার্গী ফ্যানী এবং বেশ কিছু রেষারেষিও এই আশাপূরণে কমলকে আকর্ষণের নিয়ত প্রয়াসে ইহাদের মধ্যে দেখা যাইত। কমল নিজেও সেটা লক্ষ্য করিত; তিন জনকেই তুষ্ট রাখিবার চেষ্টাও যথাসাধ্য করিত। তবে ইহাদের কাহাকেও বাছিয়া লইয়া তাহার গৃহের কনকবেদীতে কখনও বসাইতে পারে, এরূপ কোনও আভাস বড় পাওয়া যাইত না, যদিও প্রত্যেকেরই ইহাদের এক এক সময়ে মনে হইত, কমল তাহারই প্রেম-জালে একদম বাঁধা পড়িয়াছে! আর সে জয়-গৌরবটা প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের দেখাইবার চেষ্টাও করিত। আত্রেয়ী আর মৈত্রেয়ী মনে মনে হাসিত; ইহাদের এই ঠোকাঠুকিতে বড় মজাও পাইত। এটা যাহাতে বাড়ে, বিশেষ কমলের সম্মুখেই যখন তখন লাগিয়া যায়, রেষারেষিটা বেশ ফুটিয়া বাহির হয়, বহু কৌশলে সে চেষ্টাও সর্ব্বদা করিত। রীতিমত একটা আর্ট (art) ই এই সব কৌশল তাহাদের কাছে হইয়া দাঁড়ায়। কমলকে তাহারা পাইবে না, কিন্তু ইহারা কেহ পায়, তাহাও চাহিত না। সেরূপ একটা সম্ভাবনার কথা সহ্যই করিতে পারিত না।

বড় ভাগ্য লাভের যোগ্যতা অযোগ্যতা যাহার যেরূপ থাক্, সমান সমান ভাবে যাহারা মেলে মেশে, একজন কেহ অতি উচ্চ ভাগ্য লাভ করিলে, অন্ত সকলে তাহাতে সুখী কখনও বড় হইতে পারে না, বিশেষ যদি সেরূপ ভাগ্য একেবারেই তাহাদের আশার অতীত হয়। মুখে সেই 'বন্ধু'কে যতই অভিনন্দিত করুক, মনে মনে পুড়িয়া মরে; অধঃপাতই কামনা করে। মনের বিষটা অনেক সময় এত প্রবলও হইয়া ওঠে, যে তাহা চাপিয়া এই অভিনন্দনটুকুও সকলে করিতে পারে না। বাহিরের অপ্রিয় জনও যদি কেহ এরূপ ভাগ্য লাভ করে, তাহাও বরং সহিতে পারে, উপেক্ষা করিয়াও চলিতে পারে, কিন্তু সমান 'কোর্টে'র সঙ্গী কেহ যে এত উপরে গিয়া উঠিবে আর সে সেই নীচেই ছোট হইয়া পড়িয়া রহিবে, অতি কম লোকেই ইহা শান্ত ভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে। সমান সমান যাহারা, সমান সমানই থাকিতে চায়, বড় ছোটর বড় একটা ব্যবধান বরদাস্ত করিতে পারে না। মানব-স্বভাবের সাধারণ একটা দুর্ব্বলতাই বোধ হয় ইহা।

উর্ম্মির সুকণ্ঠ সঙ্গীতে আর সত্যই অতি সুমোহন স্নিগ্ধ রূপে কমল কিছু আকৃষ্ট হইতেছে, যখনই আত্রেয়ী আর মৈত্রেয়ী ইহা লক্ষ্য করিল, মনে মনে যারপরনাই আনন্দিত হইল। এই কামনাই সর্ব্বদা তাহারা করিত, উর্ম্মির টানেই কমল গিয়া পড়ুক, গার্গী, ফ্যানী, লীলির দর্প চূর্ণ হউক, বিষের জ্বালায় তাহারা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরুক, ধুলায় গড়াইয়া বুক চাপড়াইয়া হাহাকার করুক, আর চারিদিকে লোকে তাহা দেখিয়া হাসিয়া টিটকারী দিক্! আজ যখন তাহারা বুঝিল, মল্লিকদের গৃহে গিয়া গার্গী কি দেখিয়া আসিয়াছে, আর তাহাতে কি ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, হাতে যেন তাহারা স্বর্গ পাইল। উর্ম্মির গানের সাড়া পাইয়া পাগলের মত মায়ে-ঝিয়ে নিশ্চয়ই ঘরে ঢুকিয়াছিল, আরও কী সেখানে হইয়াছে কে জানে? মল্লিকগৃহিণী হয় ত বেয়ারাকে দিয়া ঘাড়ে ধরিয়াই উহাদের বাহির করিয়া দিয়াছে। আহা, তাই যদি দিয়া থাকে! আহা-হা, সত্যই যদি দিয়া থাকে? তা—ঠিক, তাই না দিক,ঐরূপ কিছু একটা ঘটিয়াছে। নইলে কেবল উর্ম্মিকে ওখানে দেখিয়াই মায়ে-ঝিয়ে অমন 'পড়ি কি মরি' অবস্থায় বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিত না। গার্গী ত মুখ তুলিয়াই চাহিতে পারিল না। অমনি ভিতরে চলিয়া গেল। না হয় ফিক্ ব্যথাই বুকে

ধরিয়াছিল। তা' কি একটি কথাও বলিতে পারিত না? একটিবার মুখ তুলিয়াও চাহিতে পারিত না? আসল কথা, তুলিবার মত মুখই তাহার তখন ছিল না। কথা আর ফুটিবে কি ছাই? হাঁ, নিশ্চয়ই ঐরূপ কিছু একটা হইয়াছে। কিন্তু বড় আফশোষের কথা এমন মজাটা চক্ষে তাহারা দেখিল না। তবু ঠিক কি হইয়াছিল, কানেও যদি শুনিতে পাইত! কিন্তু কার কাছে শুনিবে? ঊর্দ্মি কিছু বলিবে না, সে ধাতুরই মেয়ে সে নয়। আর তার মা—ও বাবা! তার কাছে ঘেঁসিবে কে? কিন্তু তাও বলিতে হয়। কেবল বাহিরের ভঙ্গীতেই ভিতরের আসল মানুষটি ধরা পড়ে না। এই ত' সেদিন কত ঘটা করিয়া বাড়ীতে একটা পার্টী দিল। কিন্তু কমলদাকে তেমন করিয়া মজাইতে পারিল না। আজই তাই আবার মাগী ধাওয়া করিয়াছে, কমলদার বাড়ীতে মেয়েকে লইয়া? তরই আর সয় না। কে জানে কখন কোন দিক হইতে কোন চিল আসিয়া ছোঁ মারিয়া এমন মাছটা মুখে করিয়া লইয়া যাইবে? ঐ গার্গীর মাতে আর ওতে সত্যি এমন তফাৎ কি? ও সব সাধুই সমান! মুখে 'হরিনাম'ই করুক কি 'ব্রহ্মনাম'ই করুক, সবারই সমান ঐ এক নজর—কোথায় কি শিকার আছে, আর কেমন করিয়া থাবা মারিয়া তাই নিবে! ঐযে পুকুরের পাড়ের 'বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ' সবাই ঠিক তেমনই ধর্ম্মপুত্তলী। তা সে যাই হ'ক, যাই করুক, এই শিকারটা যদি ধরিতে পারে, তবেই মজা হয়। আর সেই মজাই না তাহারা দেখিতে চায়!

মজাটা আজ সুরু হইয়াছে, গার্গীদের গৃহে সেটা বেশ ফুটিয়াই উঠিয়াছে। কেমন ফুটিয়াছে সেটা অন্ততঃ দেখিতে হইবে। আরও ফুটাইয়া তুলিতে যদি পারে তাই বা ছাড়িবে কেন?

পরদিন সকালেই চা খাইয়া বেলা প্রায় সাড়ে আটটায় তাহারা গার্গীদের বাড়ীতে গেল। কাল অতটা অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছে, বন্ধুর খবর একটা লইতে হয় বই কি।

চা পানের পর গার্গী আবার গিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল।

ইহারা আবার এখনই আসিয়া জুটিল! তাই ত! মতলব খুব ভাল নয়। ফিক্ ব্যথার কথাটা যে ইহারা ঠিক বিশ্বাস করিতে পারে নাই, অন্য রকম কিছু একটা সন্দেহ করিয়াছে, ইহা প্রিয়ম্বদা বুঝিয়াছিলেন এবং ইহাও এখন বুঝিলেন যে, তাহারই কোন সন্ধান নিতে উহারা আসিয়াছে, ওজুহাতও বেশ একটা পাইয়াছে, গার্গী কেমন আছে খবর লইয়া যাইবে। কিন্তু কি সন্দেহ ইহারা করিতে পারে? এখন গার্গী সামলাইয়া চলিতে পারিলে হয়। কোনও ব্যবহারেও না আভাস একটু ইহারা পায়, এইরূপ কিছু একটা ঘটনা হইয়াছে। তবে কি না বড় মনভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছে। কোনও প্রবোধবাক্য, কোনও ভরসার কথাই, মনে তেমন ধরিয়া লইতে পারে নাই। আজ মানটাও মনে বড় দারুণ গিয়া লাগিয়াছে। ইহার পর কমলের কাছে সহজে সে ঘেঁসিতেও পারিবে না। তবে গার্গী তাহার বন্ধু, তাহারই গৃহে গিয়া অমন অপমানিত হইয়া আসিয়াছে, নিজে যাচিয়া আসিয়া দু'টি নরম কথা যদি তাহাকে বলে, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার মনের বেদনাটা দূর করিবার চেষ্টা যদি কিছু করে। এইরূপ ভরসাও তাঁহারা করিয়াছিলেন, হয় ত' রাত্রিবেলায়ই কমল একবার আসিবে। কিন্তু আসে নাই। আজ এতখানি বেলা হইল, কই, দেখাটিও নাই! সে আসিল না; আসিল কিনা হতভাগা শয়তান ঐ মেয়ে দুইটা! দেখিয়াই প্রিয়ম্বদার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল ঘাড়ে ধরিয়া ইহাদের বাহির করিয়া দেন, কিন্তু তাহা ত' সম্ভব নয়। মনে মনে মুণ্ডপাত করিয়া অগত্যা গার্গীর শয়নগৃহেই ইহাদের পাঠাইয়া দিলেন।

"এই যে কেমন আছ ভাই! কাল অমনিধারা একটা ভাব তোমার দেখে গেলাম, সকালে তাই ভাবলাম যাই একটিবার দেখে আসিগে গার্গী কেমন আছে।"

সঙ্গিনীদের দেখিয়া গার্গী যে বিশেষ সুখী হয় নাই, একথা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, মনের অপ্রসন্নতা কোনও মতে চাপিয়া কহিল, "বসো।"

"সে ব'সছি আমরা, এসেছি, একটুখানি বসবই ত। তা আগে বল কেমন আছ। কালকার চাইতে অনেকটা ভাল ব'লেই ত মনে হচ্ছে—নয়?" বলিতে বলিতে বিছানার এক পাশে আত্রেয়ী এবং মৈত্রেয়ী নিকটেই একখানা চেয়ারে বসিল।

গার্গী উত্তর করিল "হাঁ, অনেকটা ভাল বই কি?

ব্যথাটা ঠিক আর নেই, তবে বড্ড দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি কিনা—” বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

আত্রেয়ী কহিল, “তা উঠলে কেন, উঠলে কেন? শুয়েই থাক না? কে জানে আবার ভিরমী-টিরমী দিয়ে পড়বে। অত বড় ব্যথাটা ধরেছিল—ঘরে এসে যে ভাবে ঢুকলে, দেখে ত আমরা যেন নেই! মনে হ’ল ভয়ঙ্কর কি যেন একটা হয়েছে।”

“ব্যথাটা হঠাৎ যা ধ’রেছি। -” বলিতে বলিতে একটি নিশ্বাস গার্গী ছাড়িল।

একটু মুচকী হাসি উভয়ের মুখে ফুটিল। মৈত্রেয়ী কহিল, “কিন্তু বুকে এ রকম ফিক্ ব্যথার কথা-টথা ত’ তোমার আর কখনও শুনি নি ভাই?”

“না, কালই হঠাৎ এল, আগে কখনও টের পাই নি ত’।”

“কাল হঠাৎ কিসে এমন ব্যথাটা এল, বেরিয়ে গেলে বেড়াতে—”

গার্গী কহিল, “কদিন থেকেই বুকে কেমন একটা অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম—”

“ও!”

“হাঁ, কাল তোমরা এসেছিলে, মার কাছে শুনলাম—”

নূতন একটা ধারায় আলাপটা যাহাতে গিয়া পড়ে, তাই গার্গী তখন এই কথাটা তুলিল।

মৈত্রেয়ী কহিল, “হাঁ, শুনেছ ত’? একটা চ্যারিটী জলসায় আমাদের সেই মিউজিক প্লে’টা জুড়ে দিতে হবে—অবিশ্যি কিছু ছাট কাট ক’রে। মন্দানিলদাকে ওরা এসে বড্ড ধরে পড়েছে। তাই আমরা এসেছিলাম, তোমাকে নিয়ে লীলিদের ওখানে যাব, প্রোগ্রামটা যদি হয় কালই ঠিক করে ফেলব।”

মৈত্রেয়ী কহিল, “তা কাল ত তুমি যেতে পারলে না। আজ ওবেলা যদি—পারবে কি?”

“দেখি, কেমন থাকি, মা কি বলেন।”

আত্রেয়ী কহিল,” দেখ, আজ নেহাৎ না পার, অন্ততঃ কাল—বেশী দেরী করলে ত’ চলবে না। রিহার্সালও আবার গোটা দুই দিয়ে নিতে হবে, নতুন প্রোগ্রামটা।”

“হু,—তাই ত ভাবছি শরীরটা যদি শুধরে এর ভেতর না ওঠে, মা হয় ত’ বেরোতেই দেবেন না। আবার একটা strain-ও ত’ ওর কম নয়।”

মৈত্রেয়ী কহিল, “তা হ’লে ত বড় ভাবনার কথাই হ’ল ভাই। Leading role হ’ল তোমার।”

গার্গী উত্তর করিল, Under-study বরং কাউকে ঠিক করে রাখ।”

“হু, under-study কাউকে মন্দানিলদার মনেই ধরবে না। এক লীলি; তা সে হবে তার কাছে far under study. আণ্ডার ফাণ্ডার নয়, super study কাউকে পাওয়া গেলেই বরং খুসী হয়ে তাকে মাথায় তুলে নিত। কিন্তু পাওয়া কাকে যাচ্ছে?”

বলিতে বলিতে আত্রেয়ী একটু মুচকী হাসিল।

“কিলো, হাসছিস যে? ভাবছিস কি? মনে মনে কাউকে ঠাউরেছিস নাকি?”

হাসিয়া আত্রেয়ী কহিল, “ভাবছিলাম কি জানিস? ঐ super study-র কথা বল্লি কিনা? তা সেই super study সত্যি যদি কেউ হ’তে পারে, তবে সে ঊর্ম্মি। গানের ঝঙ্কারে audience-কে একদম মজিয়ে দিত।”

গার্গীর ললাটে একটু ভ্রূকুটি উঠিল। আত্রেয়ী আর মৈত্রেয়ী দুই জনেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মৈত্রেয়ী কহিল, “ঠিক বলেছিস ভাই। আর মন্দানিলদার জায়গায় কমলদা যদি এসে জুটত, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ হত! ভাবটাও দু’জনের খাসা জমে আসছে—নায়ক-নায়িকা হয়ে নামলে প্লে’টা আর কেবল প্লে থাকত না, সত্যিকার একটা প্রেমের লীলা হয়েই দাঁড়াত। হি হি হি।”

গার্গীর আঁধার মুখে ভ্রূকুটি কুটিলতর হইল।

হাসিয়া আত্রেয়ী কহিল, “যা বল্লি ভাই। আর আজ যা দেখে এলাম।”

কেমন একটা চমকিত দৃষ্টিতে গার্গী চাহিল।

“দেখে এলে! কি দেখে এলে? কোথায়?”

আত্রেয়ী কহিল, “এই ত’ ভাই, তোমাদের বাড়ী থেকে বেরোলাম, মন্দানিলদা’ বল্লে, চল একটি বার বেড়িয়ে আসা যাক মাঠের ওদিকে। একটা ট্যাক্সী নিয়ে কদ্দুর যেতেই দেখি কমলদা ঊর্ম্মিকে নিয়ে তাদের গাড়ী কোথায় যাচ্ছে—মনে হল তাদের বাড়ী থেকেই আসছে।”

"আর কে ছিল গাড়ীতে ?"

মৈত্রেয়ী বলিয়া উঠিল, "না, কই, আর কাউকে ত' দেখলাম না। কেবল ওরাই দুটিতে পাশাপাশি বসে, কমলদা যেন কি বলছিল, আর উর্ম্মি চেয়ে চেয়ে হাসছিল।"

বুক ভরিয়া গার্গীর আগুন জ্বলিয়া উঠিল; চক্ষু মুখ রক্তবর্ণ হইল, দাঁতে একটুকাল ঠোঁট চাপিয়া থাকিয়া বলিয়া ফেলিল, "কেন, তার মা"—বলিয়াই বেফাঁস কথায় জেরার সাক্ষীর মত জিভে কামড় দিয়া কেমন থতমত খাইয়া গেল।

সঙ্গিনীরা হাসিয়া উঠিল। আত্রেয়ী কহিল, "না! না, কই মা টা ত' কাউকে গাড়ীতে দেখলাম না। কেন মাও গিয়েছিলেন নাকি ওদের বাড়ীতে ?"

"সে আমি কি ক'রে বলব—"

"কেন, তোমরাও ত' গিয়েছিলে সেখানে, ফিক ব্যথা নিয়ে ত' সেখান থেকেই ফিরলে।"

বলিতে না বলিতে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া আগুনের একটা ঝড়ের মত ঝনাৎ করিয়া পাশের একটা দরজা খুলিয়া প্রিয়ম্বদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আড়ালেই তিনি ছিলেন; ভয় হইয়াছিল, কি জানি ইহাদের কথার ছলে বেসামাল হইয়া গার্গী পাছে ইহাদের হাতে ধরা পড়ে।

"এসব কি ব'লছ তোমরা! কে বলেছে তোমাদের, ওখানে আমরা গিয়েছিলাম ? কে বলেছে ফিক ব্যথা ওর সেখানে ধরেছে ?"

মৈত্রেয়ী কহিল, "শুনলাম—এই মন্দানিলদার একজন বন্ধুর সঙ্গে পথে দেখা হ'ল, সেই বললে, ওখান থেকে আপনারা বেরোলেন।"

"তা বেরিয়েই যদি থাকি, বেশ করেছি! চেনাশুনো লোক, তাদের বাড়ীতে যদি গিয়েই থাকি, গিয়েছি। কি হ'য়েছে তার ? তোমরা খোঁচা দিয়ে সেকথা ব'লবার কে ? তোমরা বেড়াতে যাও না কোথাও ? তোমাদের মায়েরা তোমাদের নিয়ে বেড়াতে যায় না কোথাও ?"

"যাবে না কেন, যায়। চেনাশুনো হ'লে সবার বাড়ীতেই সবাই যায়। তবে তা নিয়ে এতটা লুকোচুরীও কেউ খেলতে চায় না, আর ধরা পড়লে এমন ধারা চটেও ওঠে না। এতে এইটেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ওখানে যে আপনারা গিয়েছিলেন সেটা কেবল বন্ধুভাবে বেড়াতে যাওয়া নয়, আর যাওয়াতে এমন একটা কিছু ঘটেছে, যাতে ক'রেই গার্গীর বুকে ব্যথাটা ধ'রেছিল, আর সব আপনারা ঢাকা দিয়েই রাখতে চান।—আমরা যে জানতে পেরেছি, এটা সহ্যই ক'রতে পারছেন না। যা ঘটেছিল, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে এখন।"

মৈত্রেয়ীর এই উক্তির উপরে আত্রেয়ী ফোঁড়ন দিল, "তা ভয় নেই। আমরা কাউকে ব'লব না কিছু,—হাজার হ'ক, গার্গী আমাদের বন্ধু ত'—"

"বন্ধু! বন্ধু তোমরা কে কার কেমন—সব জানা আছে। ওর হিংসেয় তোমরা মর। হিংসেই কেবল পুড়ে পুড়ে ম'রবে। কি ক'রবে তোমরা তার ? ক'রতে পার কি ? তবু যদি ওর বাঁ পায়ের ক'ড়ে-আঙ্গুলের রূপও সাবাটি গায়ে তোমাদের কারও থাকৃত! বাপেরাও খায় কেরাণীগিরি মাষ্টারী ক'রে। ব্যাঙ্কের খাতায় শূন্তি! গার্গী যার ঘরে যাবে তার চাকরের ঘরেও তোরা যেতে পারলে ভাগ্যি মনে ক'রবি!"

"দেখা যাক, আজ ত' বড় এক ঘর থেকে ঘাড়ধাক্কা খেয়েই বেরিয়ে এলেন।"

"বটে! বেরো—বেরো ব'লছি এক্ষুণি আমার বাড়ী থেকে! যত বড় মুখ না তত বড় কথা! বেরো ব'লছি এক্ষুণি, নইলে—নইলে—ব'লছি, ঘাড় ধাক্কা দিয়েই বের ক'রে দেব!"

উভয়ে তখন উঠিল। গার্গীর দিকে ফিরিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে কি বল ভাই গার্গী, আমাদের প্লে'টাতে তবে উর্ম্মিকে আর কমলদাকেই তোমাদের যায়গায় আনবার চেষ্টা করা যাক্ ?"

প্রিয়ম্বদা কহিলেন, "হাঁ, তাই কর গিয়ে।—উর্ম্মির মা এখন খুসী হ'য়েই কমলের সঙ্গে ষ্টেজে উঠে গলাগলি ঢলাঢলি ক'রতে মেয়েকে ছেড়ে দেবে!"

"তিনি না দিন, আপনি এখনও দিতে পারলে হাতে স্বর্গ পেতেন।"

বলিয়াই দু'জনে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। প্রিয়ম্বদার বজ্রদৃষ্টি কেবল নয়, উত্তোলিত বজ্রমুষ্টির দিকেও উহাদের চক্ষু পড়িয়াছিল।

দরজা পার হইয়াই খিল খিল করিয়া দুইজনে হাসিয়া উঠিল। উদ্যত সেই বজ্রমুষ্টি তখন প্রিয়ম্বদার আপন শিরেই ভীম বেগে পড়িল। আঘাতের ব্যথায় জ্বলন্ত রোষে পূর্ণ ঘৃতাহুতি পড়িল,—ছুটিয়া তিনি যেমন বাহির হইবেন, চৌকাঠে হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "মাগো!"

সদর দরজার কাছে উচ্চতর রোলে আত্রেয়ী ও মৈত্রেয়ী হাসিয়া উঠিল।

প্রিয়ম্বদার বদনবিবর হইতে তখন যে শব্দাগ্নিস্রোত বিনিঃসৃত হইতে থাকিল, সেকালের গ্রাম্যতম্বী কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে পারিত না,—মুহূর্ত্তে উড়িয়া যাইত। [ক্রমশঃ

কন্যাদায়ে-বলিদান

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এল

বাঙ্গালাব গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর গিরিশচন্দ্র, বাঙ্গালীর নিকট ধরা পড়ে নাই। যদি তাঁহাকে আমরা বুঝিতে পারিতাম তবে বাঙ্গালার সমাজের রূপ বদলাইত। গিরিশ-প্রতিভা বহুমুখী। তাঁহার কাব্যপ্রতিভা নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমরা তাহার সামান্য আভাষ দিতে চেষ্টা করিব।

গিরিশচন্দ্র নাটকে সমাজের নানা রূপকে নগ্ন করিয়া সমাজের সম্মুখে ধরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কবিতার মধ্যেও তিনি সমাজপরিত্যক্ত 'বারাঙ্গনা'র অন্তর-ব্যথা উপলব্ধি করিযাছিলেন, তাই তিনি কবির হৃদয় দিয়া সমাজপরিত্যক্ত নারীর কথা বলিবার সময়ে বলিয়াছেন,—

বারাঙ্গনা-নারী মম অন্তর পাষাণ,
প্রেম কোথা পাবে স্থান,
শ্মশান আমার প্রাণ,
রমণী-হৃদয আমি দিছি বলিদান।

তাই কবি গিবিশচন্দ্র বলিয়াছেন,—অন্য নারীর মত আমার সকলই ছিল, কোমল সরল নারী-হৃদয়, অকপট হাসি, 'প্রেম অভিলাষ,'—কিন্তু আজি তাহা স্মরণ করিলে দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। অনুতপ্ত বারাঙ্গনার নিজ পূর্ব্ব জীবনের ইতিহাসের স্মৃতি কত ব্যথাভরা, তাহা কবি গিরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন!

গিরিশচন্দ্র যে ব্যথা সমাজের জন্য অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ হইয়াছে তাঁহাব নাটকে। আমরা সংক্ষেপে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালার নিশ্চল প্রাণহীন সমাজদেহ বহু আঘাত পাইয়াছে ও পাইতেছে; কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে না। যে সংস্কার, যে আচার, যে ব্যবহার একবার সমাজ-জীবনে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে তাহা যেন আমরা কিছুতেই বদলাইতে রাজী নহি। ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। বেন্টিঙ্ক সাহেব বলিয়াছিলেন, সতীদাহ হীনপ্রথা—তাহা আমরা মানিতে রাজী হই নাই। তারপর নানা শাসন, নানা আইন, নানা ব্যবস্থা, নানা কড়া পাহারা; তবে যেন আমাদের চেতনা ফিরিয়া আসিল—প্রথাটা ভাল নয়। চিরাচরিত প্রথা—সে আমাদের বিবেককে যতই আঘাত করুক না কেন, কিছুতেই ত্যাগ করিতে রাজী নহি। আমরা যেন বিবেক দিয়া যাচাই করিতেও প্রস্তুত নহি।

এমনি নিশ্চল সমাজ যখন "কন্যাদায় রূপ"—পাপে মগ্ন তখন গিরিশচন্দ্র এই সমাজ-ব্যাধিব উপর তাঁহার নির্ম্মম কষাঘাত চালাইলেন।

গিরিশচন্দ্র 'জ্যেঠি পাগলিনী'র মুখ দিয়ে সত্য সত্যই বলিয়াছেন, "ঘরে ঘবে দুঃখ, ঘরে ঘরে হাহাকার, ঘবে ঘরে পেটের ছেলেকে অন্ন দিতে পারি না; পোড়া বে' কি বাঙ্গালা দেশ থেকে উঠবে না!" কন্যাদায় লইয়া বহু সাহিত্য বহুভাবে বাঙ্গালার সমাজকে আঘাত করিয়াছে কিন্তু নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র যেমন করিয়া এই করুণ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, যেমন করিয়া সমাজের সমস্ত দুঃখ জমাট করিয়া নগ্ন করিয়া ধরিয়াছেন তাহা সত্যই অভিনব।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের মধ্যে নাটকের বক্তব্য সংক্ষেপে আভাষ দিয়াছেন। বিশ্বকবি সেক্সপীয়ার তাঁহার 'মার্চেন্ট অব্ ভেনিস' নাটকে যেমন অ্যান্টানিওর মুখ দিয়া প্রথমেই একটি দুঃখের অবতারণা ভূমিকারূপে দর্শকের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তেমনি গিরিশচন্দ্রও প্রথম দৃশ্যেই করুণাময়ের মুখ দিয়া বলিয়াছেন :—

"কিরণ আমায় বাতাস কচ্ছিল, আমি কি করেছি জান, আমি বাপ হয়ে তার মৃত্যু কামনা করেছি।"

এই একটি কথার মধ্যে যে বিয়োগান্ত নাটক দর্শকের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল, তাহার আভাষ দিয়া বলিয়াছেন 'দর্শক বিয়োগান্ত নাটকের জন্য প্রস্তুত হও'। এমনি প্রথমেই আভাষ দেওয়াব মধ্যে নাট্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' 'বলিদান' প্রভৃতি নাটকে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে একটি কেন্দ্রস্থিত ভাবকে পরিস্ফুট ও পরিশেষে সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থাপন করাই যেন সকল

নাটকখানির উদ্দেশ্য। সমাজচিত্রের স্তরের পর স্তর যতই অগ্রসর হইতে থাকি ততই যেন আরও জটিলতর পরিস্থিতি, সমস্যা ও নির্ম্মম পরিণতির সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। যেন আর একটু হইলেই আর সহ্য করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। এমনি সর্ব্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করা প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে।

তাই আমরা দেখিতে পাই, কন্যাদায় সমাজে আছে সত্য, তাহা নির্ম্মম হয় সত্য কিন্তু বলিদান নাটকে আমরা হিরণের বিবাহে বাস্তুভিটা বন্ধক দেওয়া হইতে হিরণের স্বামীর মৃত্যু, হিরণের খিড়কির পুকুরে মৃত্যুবরণ এবং পরিশেষে করুণাময়ের গোয়াল ঘরে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা প্রতিটি স্তর লক্ষ্য করিতে করিতে যেন সহ্য করিবার সীমা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলি। যেন এমনি অবস্থার পরে আর কিছু চিন্তা কবিবার পর্য্যন্ত শক্তি থাকে না। গল্প স্রোতের সঙ্গে দর্শককেও এমনি সহ্যের সীমার শেষ স্তরে লইয়া যাওয়া যে সে নাটকে পাওয়া সহজ নহে। শুধু গিরিশচন্দ্রের বলিদানে নহে, তাঁহার ‘প্রফুল্ল’ নাটকেও যোগেশ-চরিত্রের শেষ পরিণতি যেন দর্শকের সহ্য করিবার সীমার বাহিরে নীত হইয়াছে। দর্শক দেখিতে দেখিতে যেন সমবেদনায় শুধু যে সমাজ সমস্যা চিন্তায় ব্যস্ত তাহা নহে রুদ্ধশ্বাস হইয়া যেন গল্প শেষ হইলেই হাপ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে।

এখন “বলিদানের” এই যে গল্প ইহাতে কোন অবাস্তব “রোম্যান্স” নাই—বাঙ্গালার সমাজের নিত্য ঘটনা। বিবাহে সর্ব্বস্ব বিকাইয়া নিঃস্ব হইয়াছে এমন বাঙ্গালী পরিবার সর্ব্বত্র পাওয় যায়। কন্যার বিবাহের জন্য বাস্তুভিটাটুকু বন্ধক দিয়াছে ইহা আর বাঙ্গালার সমাজকে বেশী করিয়া বলিবার কিছু নাই, তারপর হিরণের বিধবা হইবার পবে আত্মহত্যা, ইহাও সমাজে বহু হইতেছে। একসঙ্গে চারিটি কন্যার আত্মহত্যা ও স্নেহলতার আত্মত্যাগ সমাজে অহরহঃ হইতেছে কিন্তু বাঙ্গালার সমাজ এমনি স্বপ্নাবিষ্ট যে তাহার কৌলীন্যের স্বপ্ন, তাহার আভিজাত্যের স্বপ্ন, তাহার বংশমর্য্যাদার স্বপ্ন, তাহার অর্থলোভ কিছুতেই যাইতেছে না। এমনি সব সহজ, নিত্য যাহা ঘটিতেছে তাহাই লইয়া বলিদান রচিত। তবুও বলিদান ব্যথার অমৃত-নির্ঝর। যখন আমরা বলিদান দেখি তখন যেন আমরা বাঙ্গালার সমাজে—আমাদের নিজেদের সংসারের ঘটনা দেখিতেছি, তবু তাহা নাট্যকারের অন্তরের ব্যথা-নিষিক্ত হওয়ায় অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের যে ব্যথা, যে দৈন্য আমরা দেখিয়াও দেখি নাই, তাহা যেন নাট্যকার আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছেন। সমাজের কন্যাদায়-ব্যাধির সর্ব্ববিষাক্ত স্থানে আঘাত করিতেছেন। যে বরের পিতা হিরণের শ্বশুরের মত পণ লইয়াছেন তিনি অজ্ঞাতে একটি নির্ম্মম কষাঘাতে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, এমনি সহজভাবে সমগ্র সমাজকে—কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ না করিয়া—চেতনা সঞ্চারের প্রয়াস আছে এই বলিদানে। তবু এত আঘাতেও আমাদের নির্লজ্জ সমাজের চেতনা ফিরে নাই। তাই বলিতেছিলাম—বাঙ্গালী এখনও গিরিশচন্দ্রকে চিনিতে পারে নাই।

গিরিশচন্দ্র নানাপ্রকারের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ভক্তিমূলক, সামাজিক নাটক ও নানাপ্রকারের প্রহসন রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার অশোক, গৃহলক্ষ্মী, জনা, চৈতন্যলীলা, তপোবল বাঙ্গালার নাট্যজগতে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তবুও তাঁহার “যোগেশ” তাঁহার “করুণাময়”এ যে একটি ভাবের ক্রমবিকাশকে পরিস্ফুট করিয়া বাঙ্গালার নাট্যজগতে ধ্রুবতারার মত উজ্জল রহিয়াছে—তাহার পার্শ্বে বাঙ্গালার নাট্যজগতে তেমন চরিত্রসৃষ্টি আব হইতেছে না। এত দীর্ঘ দিনের অবসর মধ্যেও নাট্যজগতের ইতিহাসে বহু পরগাছার আবির্ভাবের মধ্যেও এমনি বাস্তব চরিত্র একটিও ফুটিতেছে না—ইহাই যা দুঃখ।

তারপর তাঁহার দৃশ্য যোজনের কৃতিত্বও কম নহে। তিনি পর পর দৃশ্যগুলি এমন ভাবে সাজাইয়াছেন তাহাতেও আমরা প্রতিভার পরিচয় পাই। তিনি ‘একটি ভাবের’ শেষ হইয়া গেলেই একটি অঙ্ক পাত করিয়াছেন। যেমন হিরণ যখন খিড়কির পুকুরে ডুবিয়া মারা গেল তখন চতুর্থ অঙ্ক শেষ করিয়া ঐ ঘটনার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন এবং শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যেন তাঁহার বলিবার সবটুকু বলিয়া শেষ যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন, এবং সকল নাটকখানির প্রথম অঙ্কে যে ভাবের প্রারম্ভ, শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যেন তাহার চরম পরিণতি। শেষ দৃশ্যে নাট্যকার বলিয়াছেন “আমাদের সমাজে কন্যার পিতার এই পরিণাম। ঘরে ঘরেই শোচনীয় অবস্থা। সকলের বক্ষের উপর এই শোচনীয়

দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজমান। তথাপি আমরা পুত্রের শুভ-বিবাহে কন্যার পিতাকে পীড়ন করতে পরাঙ্মুখ হই না। পবিত্র উদ্বাহ আমাদের সমাজের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি, জগতে এক নূতন রহস্য। বাঙ্গালার কন্যা-সম্প্রদান্ নয়—বলিদান।"

সমস্ত নাটকখানির যেন সার সমষ্টি এই শেষ কথায় দর্শকের সম্মুখে, সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

কিন্তু বাঙ্গালার 'বেহায়া বেহাই' তবুও কন্যার পিতার সর্ব্বস্ব শুষিয়া লইতে লজ্জিত হয় নাই। কান্ত কবিও তাঁহার কষাঘাত সমানে সমাজের উপর চালাইয়াছেন, তবুও সে নিতান্ত নির্লজ্জের মত তাহার 'ফর্দ্দ সমাপন' করিয়াছে।

শুধু তাই নয়, পরবর্ত্তী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালও সমাজের এই উৎকট ক্যানসার রোগের বিরুদ্ধে কলম চালাইয়াছেন। ক্ষতস্থানে বহু ভাবে বহু অস্ত্রপোচার করা হইয়াছে কিন্তু তবু রোগের উপশম হয় নাই। আমরা অসহায়া কন্যাদের উপর সমাজের সর্ব্বদোষ চাপাইয়া নিজেকে দোষমুক্ত ভাবিতে চেষ্টা করি। নাটক দেখিবার সময় সমবেদনায় চোখের জল ফেলি, কবিতা পাঠ করিয়া বাহবা দেই কিন্তু যখন নিজের 'পালা' আসে তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করি। স্বদেশী করিবার সময় দেশের জন্য 'মায়াকান্না' কাঁদিয়া থাকি, সমাজসেবা বক্তৃতা করি—কার্য্যে চক্ষু বুজিয়া থাকি। এমনি আত্মবিস্মৃত না হইলে আমাদের সমাজের এত দুঃখ এত দৈন্য!

যদি আমরা গিরিশচন্দ্রকে বুঝিতে পারিতাম, যদি গিরিশচন্দ্রের অন্তরের ব্যথা অন্তর দিয়া অনুভব করিতে পারিতাম, যদি সত্য সত্যই 'বলিদান' নাটকের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা হৃদয়ে অনুভব করিতাম, তবে বাঙ্গালার এই সমাজব্যাধি চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া যাইত।

নাহফীরাৎ*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(মহাভারত হইতে)

কহিলা নারদ ঋষি: "হে শাল্মলী! দশদিশি কী প্রসার তব!
গিরি সম উচ্চ মাথা, কিশলয় শ্যাম ছাতা কী বা অভিনব!
খরতাপে কে না যাচে আতিথ্য তোমার কাছে? আসে দলে দলে
তীর্থযাত্রী ওগো শাখী! শাখে তব শোভে পাখি, পশু—ছায়াতলে।
তাপসের উপকারী সবুজের রূপঝারি তুমি ধরণীতে
কত বর্ষ বর্ষ ধরি' জীবন-ধারণ করি' আছ পরহিতে!"

প্রসন্ন শাল্মলী কহে: "সজ্জনেরই ভাষে বহে অমৃতের ধারা
তাহার উপরে গুণী তুমি—তাই সুরধুনী ঝরায় ফোয়ারা
রসনায় তব ঋষি! বোসো ছায়াতলে—নিশি নামে? ভয় নাই;
আমার নিকুঞ্জ মাঝে নিরাপদ শান্তি আছে, ভরসা বিলাই
আমি নিজে কি না। যদি প্রশ্ন থাকে হে সুমতি, শুধায়ো আমায়
আর শোনো পাতি কান পত্রে পত্রে মঞ্জু তান কত শোনা যায়।"

ঋষি সবিস্ময়ে কহে: "এতো শুধু দয়া নহে, ধন্য সদাশয়!
আরো গুণপনা কত বক্ষে তব হে সুব্রত পায় চিরাশ্রয়?"
তরু গর্ব্বে কহে হাসি: যত চাও বনবাসী, পাবে মোর কাছে
শুধু নয় দয়া, জ্ঞান—মোর তুল্য বলবান্ কে ভুবনে আছে?
ধরো, যবে বহে বায়ু, যারা ক্ষীণ, স্বল্প-আয়ু দণ্ডে ভূমিসাৎ:
শুধু আমি বীর্য্যবলে কখনো বা সুকৌশলে করি তারে মাৎ।"

---

* ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কাহিনী বলেন

নারদ কহিলা তবে : "কী বলিছ ? না না—ভবে এ কি কভু হয় ?
যত বলী হও—তবু প্রভঞ্জন কি গো কভু মানে পরাজয় ?
কামচারী নাম যার, উপাধিও দেবতার রটিল ভুবনে
সে তোমারে রাখে, তাই রয়েছ ভাই আজিও কাননে।
তব শাখাতলে শুনি একান্তে তপস্বী মুনি ব্রহ্মেরে ধেয়ায়
সে-সুকৃতি আছে ঘিরে তাই বন্ধু, ফিরে ফিরে বাঁচো ঝঞ্ঝাবায়।

শাল্মলী মর্ম্মরি শাখা কহে : "কেন বাঁকা বাঁকা কথা কহ ঋষি ?
পবনের বীর্য্য ফাঁকি, আমি কি দেখি না কি চেয়ে অহর্নিশি ?
কোথা তার ভার, জটা ? কোথা দেহ ? শাখা কটা ? প্রতিষ্ঠা কোথায় ?
আমারে আপন হাতে আকাশ নির্ম্মল—যাতে বিশাল কায়ায়
ভূমি গর্ভে মূল রোপি' অনন্তের মন্ত্র জপি গাই তারি গান !
বায়ু মোর সাথে পারে ? দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিত্য হারে—তবু অভিমান ?

"চক্ষু থেকে দেখে না যে তার সাথে বাদ সাজে ? দেবতার বাড়ি
উঞ্ছবৃত্তি, চাটুকার—প্রলাপই আলাপ যার—এক মুখ দাড়ি,
বীণা কেন হাতে তার ? নাই শ্রুতি সুর যার সে দেয় ঝঙ্কার ?
বুদ্ধি যার জরাজীর্ণ উপবাসে তনু শীর্ণ—কেনই বা তার
তর্ক ফেরি ক'রে ফেরা ? বিনা বুদ্ধি চুলচেরা কোথা জ্ঞান ভবে ?
বায়ু ! যার নাই গেহ সাপও যারে খায় সে-ও দেব হ'ল কবে ?"

নারদ ঋষির মতি রমণী সুলভ অতি, সকলেই জানে ;
এর কথা ওর কাছে ফাঁশ করি' হর্ষে নাচে হরিগুণগানে।
পরদিন সুপ্রভাতে বীণাখানি ল'য়ে হাতে অমর-সভায়
পবনের পায় নতি করি' কহে : "মহামতি ! ধরাতলে হায়,
শাল্মলী বিটপি বুড়া বলে কি না করে গুড় তোমারে সে রণে
প্রতিদিন ? তুমি তবু হেন দম্ভ তার [illegible] সহিছ কেমনে ?"

শুনি বায়ু রুষি' কহে : "অপযশ নাহি সহে, রহ ঋষি, সাজা
দিব মুড়ে রাতে আজি আমার প্রসাদে বাঁচি বলে সে-ই রাজা ?
এত বড় অহঙ্কার ? যত বড় মুখ তার চেয়ে বড় কথা ?
বাড়ে যার বড় বাড় সর্ব্বনাশ হয় তার জেনো হে সর্ব্বথা।
নারদ গোপনে আসি' বলে : "তরু ! বায়ু নাশি' সন্ধ্যায় তোমারে
রাখিবে আপন মান—বন্ধু হোয়ো সাবধান—দেখি কেবা হারে ?"

প্রমাদ গণিয়া, তবু শাল্মলী কহিলা : "প্রভু করো উপকার
কাঠুরিয়াদল পাশে, বলো যেন ত্বরা আসে লইয়া কুঠার।
দেখ শুধু বুদ্ধি মম কী অনিন্দ্য অনুপম—কাটো শাখা সব,
বায়ুর বেড়েছে বাড় লভিবে সে তিরস্কার ঘোর পরাভব।
দেখুক সে মূঢ় আসি' মোর শাখা রাশি রাশি নির্মূল সকলি ;
শুধু রিক্ত গুঁড়ি সনে দেখি সে কী করে রণে—যত হোক বলী।"

পবন যুঝিতে এসে দেখিয়া নিঃশ্বেরে হেসে বলে : "রে নির্ব্বোধ,
এর নাম দিব কী যে ভাবিয়া না পাই নিজে। বুঝি হয় শোধ
এই মতে দম্ভ-ঋণ। শুধু, এ বৈধব্যদীন দশা হেন তোর
হ'ত না আমার হাতে, পল্লব ঝরায়ে রাতে কৃপায় আমার
ভরসা শুনায়ে কানে দীনতার দীক্ষাদানে রিক্ত শাখাদলে
নবীন পল্লব-বাণী দিতাম বল্লভে আনি' জলদ সজলে।"

শাল্মলী কহিলা : "আমি দীনতা-পরাস্নকামী নহি ওগো, নহি
বুদ্ধি শৌর্য্যে আপনার তোমারে মানায়ে হার সগৌরবে বহি
জয়দীপ্তি উচ্চশির, তোমার প্রতাপ বীর, করেছ তো গুঁড়ো
রটিল কলঙ্ক তব—তরু পাশে পরাভব।" কহে বায়ু : "মূঢ় !
জয় কিরে এর নাম ? তবে বুঝি পরিণাম এমনিই হয়
অতিদর্পে শুধু নয় পরাভব, লোপ হয় বুদ্ধি মহাশয় !"

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে 'মা'

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

পরপারে

দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যে মা সম্বন্ধে অমর কবির সীতা, রাণা প্রতাপ, সোরাব রুস্তাম, সাজাহান ও চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক হইতে মায়ের প্রতি ভক্তির কথা "বঙ্গশ্রী"তে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটক পরপারে মা "করুণাময়ী"র চরিত্র লইয়া আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। করুণাময়ীর সহিত মহিম ও সরযূর চরিত্রও কিঞ্চিৎ বিবৃত হইবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল

পরপারে নাটক বিশেষ সাফল্যের সহিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও এবং টকীতেও আশ্চর্য্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিলেও কেহ কেহ বলেন যে, এ নাটকে দোষ-ত্রুটী আছে। যে-সব দোষ-ত্রুটীর কথা উল্লিখিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে (১) বিশ্বেশ্বরের ন্যায় আদর্শ-চরিত্র লোকের বৃদ্ধ বয়সে আত্মহত্যা করা সম্ভব কি না, (২) শান্তার ন্যায় গণিকা থাকা সম্ভব কি না, (৩) জেলেতে সরযূর মুখে Teleology সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব কি না?

এই সব দোষ-ত্রুটী সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিয়া যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তর। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখো, আত্মহত্যা সম্ভব কি না বা শান্তার ন্যায় গণিকা আছে কি না বা সরযূর বক্তৃতা স্বাভাবিক কিঁ না—এই সব প্রশ্ন কি যখন তোমরা নাটক দেখেছিলে তখন মনে হয়েছিল?" যখন তিনি শুনিলেন যে, উক্ত সমালোচকগণ একবার তিন টাকার টিকিট ক্রয় করিয়া অভিনয় দেখিয়াছেন এবং পুনর্ব্বার দেখিবেন—খুবই ভাল লাগিয়াছে, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন, "তা হ'লে আমার লেখা সার্থক হ'য়েছে—তুমি আনন্দে হাততালি দিয়েছো, দুঃখের সময় অশ্রু বিসর্জ্জন করেছো—সেইখানেই তো লেখকের কৃতিত্ব, magic of words—আর বক্তৃতা ইত্যাদি যা বল্‌ছো—তার উত্তর এই যে, নাটক শুধু থিয়েটারে play হ'লেই তো হ'লো না, সাহিত্যেও তার একটা স্থান দিতে হবে সুতরাং অনেক সৎ-সাহিত্যের খোরাকও দিতে হবে। তোমরা সম্ভব অসম্ভব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ—ধরো না Shakespeare-এর Merchant of Venice—তিনি আমাদের আদর্শ তো? কখন সম্ভব one pound of flesh শরীর থেকে কাটা, অথচ রক্ত পড়বে না? কখনও সম্ভব যে, Portia এসে সটাং বিচারকের আসনে ব'সে গেল বিচার করতে। এই ব্যাপার নিয়ে বিলেতের বড় বড় সমালোচক, বড় আইনজ্ঞ ব্যক্তি trial-এর নথী খুঁজে হায়রাণ এবং নিন্দাও করেছিলেন, কিন্তু সে সব চাপা প'ড়ে বিস্মৃতির গর্ভে চলে গেল। কিন্তু Merchant of Venice এখন প্রভাতের উষার মতন লোককে আনন্দ দিচ্ছে ও ভবিষ্যতেও দেবে—ঐ magic of words." দ্বিজেন্দ্রলালের এ উক্তির সার্থকতা যাঁহারা পরপারে টকীতেও দেখিয়াছেন তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিবেন। যাক্, এখন পরপারে মহিমের মাতা করুণাময়ীর ও তাহার পুত্র ও পুত্রবধূর চরিত্র আমাদের আলোচ্য বিষয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেন যে, আজকাল ছেলেরা মাকে সে রকম ভক্তি করে না এবং যাহাতে সেই মাতৃভক্তি দেশের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগ্রত হয়, সে চেষ্টা তাঁহার ছিল। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে মায়ের প্রতি পুত্রের স্নেহ—মাতৃস্নেহ শুধু তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে চিত্রিত করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই—সামাজিক নাটকে মাতার প্রতি যে বিবাহিত যুবক স্নেহ ও ভক্তি হারায়, তাহার জীবনের স্রোত যে কি পঙ্কিল ভাবে প্রবাহিত হয়, তাহাও পরপারে নাটকে মহিমের চরিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন।

মহিমের মাতা করুণাময়ী একমাত্র পুত্র মহিমের অতি সুন্দরী বধূ লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা কিন্তু তখন দয়াল তাঁহাকে সাবধান করিতেছে—"বৌ পেয়েছো, হয় তো ছেলে হারাবে।" (প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

মহিম মাতৃভক্ত সন্তান, তাহার মনেও সে দ্বিধা আসিয়াছে।

প্রথম অঙ্ক ; প্রথম দৃশ্য

মহিমের প্রবেশ

করুণা—মুখখানি শুক্নো শুক্নো দেখছি যে, কোন অসুখ করেনি তো ?

মহিম—না মা—তুমি এখনও খাওনি ?

করুণা—না বাবা—

মহিম—খাওগে যাও। তোমার অসুখ কর্ব্বে।

করুণা—এতো সুখের মধ্যে অসুখ আস্বে কোথা থেকে বাবা, মহিম, বৌ পছন্দ হয়েছে তো ?

মহিম—তুমি যাও আগে। নৈলে আমি তোমার কোন কথা শুন্বো না।

করুণা—এই যাচ্ছি—ও কি চোখে জল—! কি হয়েছে বাবা ?

মহিম—মা—

করুণা—কি বাবা—

মহিম—মা — (বক্ষে মুখ লুকাইলেন)

করুণা—(কম্পিত স্বরে) কি বাবা—! কাঁদ্‌ছিস কেন ?

মহিম—না মা—কিন্তু একি হ'ল মা। আজ প্রাণ এতো আকুল হয় কেন ? কে যেন আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। ঘরে চোর সেঁধিয়েছে। আমায় ছেড়ো না মা।

করুণা—সে কি বাছা! এ কি কাঁপছিস্ যে—

মহিম—জানি না—কেন! না মা খাবে এসো। আমি তোমার খাওয়া নিজে দেখবো—

করুণা—কেন ?

মহিম—আমার ইচ্ছা হয়েছে, এসো মা—

মহিমের বিবাহ হইয়াছে কলিকাতায় বিশেষ ধনী বিশ্বেশ্বরের একমাত্র নাতনী অসাধারণ সুন্দরী সরযূর সহিত। মহিম দরিদ্র। মহিম কলিকাতার কলেজে পাঠ করে, সরযূ আসিয়াছে মহিমের বাড়ীতে সামান্য কুটীরে।

এই সময়ের একটী দৃশ্য উদ্ধৃত হইল—

প্রথম অঙ্ক ; পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—করুণাময়ীর কুটীর (করুণাময়ী ও দয়াল দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন)

করুণা—আমার জীবনের সাধ মিটেছে, ছেলের বউ পেয়েছি। এখন মর্ত্তে পার্‌লেই হয়। তারা ব্রহ্মময়ী পার করো মা।

দয়াল—এত তাড়াতাড়ি কেন। আরও একটু দেখে যাও।

করুণা—আর দেখতে চাই না ভাই, এর পরে কি হবে কে জানে। দিন থাকতে সরে পড়া ভালো।

দয়াল—ঐ যে তোমার গোপাল আস্‌ছেন।

(মহিমের প্রবেশ)

মহিম—মা

করুণা—কি বাবা

দয়াল—কি ? আমার পানে চাইছ যে, ও বুঝেছি। আমি যাচ্ছি (প্রস্থান)

করুণা—(মহিমের স্কন্ধে হাত দিয়া) কি বাবা! মুখখানা ভার ভার দেখছি যে—(সাগ্রহে) কি হয়েছে বাবা ?

মহিম—মা, তুমি বৌ'কে বকেছ ?

করুণা—বৌমা কিছু বলেছে না কি ?

মহিম—না, তবে তুমি ব'কছিলে আমি শুনেছিলাম।

করুণা—নিজেই যখন শুনেছো, তখন জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন বকেছি কি না ? হ্যাঁ বাবা, আমি বৌমাকে বকেছি। সংসারের কাজকর্ম্ম শেখাতে হ'লে মাঝে মাঝে ধমক্ ধামক্ দুটো একটা দিতে হয়।

মহিম—তার কাজ শেখার দরকার কি ?

করুণা—ওমা, তা নৈলে চ'লে। আমি তো আর চিবকাল থাকবো না। একদিন এই সংসার তো তাকেই দেখতে হবে।

মহিম—যখন হবে, তখন দেখা যাবে। এখন কি ?

করুণা—মেয়ে মানুষেব ঘবের কাজকর্ম্ম শেখা দরকার ত', এখনই কি আর তখনই কি। আর আমি বুড়ো হয়েছি, একা সব পেরে উঠি না।

মহিম—এতদিন তো পারছিলে! মা, আমি ঘরে বৌ এনেছি, দাসী আনিনি। আমার মরা বৌ কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

করুণা—(সবিস্ময়ে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন ; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন) বেশ—তা—আচ্ছা। যতদিন বেঁচে থাকি আমিই কর্ব্ব—তোর বৌকে পুতুল সাজিয়া কোলঙ্গায় তুলে রেখে দিস্।

মহিম—না, বৌ এখানে আর থাক্‌তে পার্ব্বে না। ওর শরীর খারাপ হচ্ছে। তুমি ওকে কিছু দেখ না, তার উপব—

করুণা—থাম্‌লে কেন তার উপর—বলে যাও বাবা

মহিম—সত্যকথা ব'ল্‌বো, সত্যকথা বল্‌বো তাতে দোষ কি ? ও বড় মানুষের নাতনী, কারো চোখরাঙ্গানী কখনও সহ্য করে নি। তুমি যা পারো ও তা পারে না।

করুণা—ও বেশ! আমি আর তোর বৌকে একটা কথাও ব'ল্‌বো না

মহিম—না আর তা—ওর—না—ও তার দাদামশায়ের বাড়ী চ'লে যাবে।

করুণা—ও তোর দাদাশ্বশুরেব বাড়ী বুঝি ক'ল্‌কাতায়, আর তোর কালেজও ক'ল্‌কাতায়—তাই না ?

মহিম—না মা তার জন্য নয়। ও এ পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তে পার্ব্বে না। এ ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে ও থাক্‌তে পারে না। বিশেষতঃ তুমি ওকে কিছু দেখো না। ও নিজের বাড়ী চলে যাবে।

করুণা—আর এ-ত পরের বাড়ী! বেশ! তা ও যাবে কেন! আমিই যাচ্ছি! আমি কাশীবাস কর্ব্ব। এতদিন আমার তাই করা উচিত ছিল। তা হ'লে তোর ভালবাসা বুকে করে মর্ত্তে পার্ত্তাম। মা আমি—আজ একজন পরের মেয়ে এসে আমার মৌরুষী আস্তানা থেকে আমায় তাড়িয়ে দেয়, তাও দেখতে হ'ল। মা দুর্গা! আমি বুড়ো বয়সে সংসারে মজে আছি। সব ভুলেছি, তবু ছেলের চিন্তা ভুলতে পারি নি—যখন তোমার পায়ে সব ঢেলে দেওয়া উচিত ছিল—তার খুব শাস্তি দিলি মা! ঘাড় পেতে নিচ্ছি! আর না। মহিম, আমার কাশী যাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও।

মহিম—বেশ কালই দেবো।

করুণা—তোর বৌকে নিয়ে তুই সুখে ঘরকন্না কর্। আমি শুনেই সুখী হ'বো। তুই সুখে থাক্ বাছা। আর কিছু চাই না। তবে মায়ের চেয়ে তোর বৌ বড় হ'লো—এই কথাটা চিরদিন আমার বুকে কাঁটার মতন বিঁধে থাক্‌বে। কোথাকার এক বেহায়া হাঘার মেয়ে—

মহিম—মা, মুখ সামলে কথা কও। ও হাঘরে মেয়ে, না তুমি হাঘবে মেয়ে ?

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল—চোপ্ রাও বেয়াদব্! মায়ের কথার ওপর কথা। উচ্ছন্ন যেতে বসেছিস হতভাগা। বেরো বাড়ী থেকে!

মহিম—কার বাড়ী ?

দয়াল—দিদির বাড়ী,—এখনও তোর মা মরে নি, জানিস্ ? যা তুই তাঁর ত্যাজ্যপুত্র। মায়ের কথার উপর কথা! দিদি! তোমাব ও ত্যাজ্যপুত্র। বার করে দাও বাড়ী থেকে!—দিদি!

করুণা—না না—ও যে ছেলে—ও যে ছেলে! ছেলেকে কি তা ব'ল্‌তে পারি! ছেলেকে কি বল্‌তে পাবি "বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে"—তা কি পারি দয়াল। আমি যে মা—মা!—বাছা তোর বৌকে আর আমি একটা কথা বল্‌বো না। সে আমার বাড়ী রাজরাণী হ'য়ে থাকুক। আমি তাকে দেখবো, তার দাসীপনা কর্ব্ব। কেবল তুই আমায় তেমনি ভালোবাস্, যেমন একদিন বাসতিস্; আমার গলাটী জড়িয়ে তেমনি আদর ক'রে হেসে মা ব'লে ডাক্—যেমন ডাকতিস্। বুড়ো হয়েছি—আর ক'দিন! তারপর আমায় একেবারে ভুলে যাস্। আমি আর চাইতে আসবো না। তবে যে ক'দিন বেঁচে আছি—তোর মা যেন মা-ই থাকে—বাছা আমার (কাঁপিতে কাঁপিতে মহিমের পায়ের তলায় পড়িয়া গেলেন)

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ—ও কি কর্চ্ছ মা—ও কি কর্চ্ছ ! ছেলের পায়ের তলায় মা। ওঠো মা—নৈলে পৃথিবী উল্টে যাবে। সূর্য্য খ'সে প'ড়বে, আকাশ জমাট হয়ে যাবে। সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠবে। (মহিমকে) কি অবাক হয়ে আমার মুখের পানে চাইছ কি ! ওদিকে চেয়ে দেখো, দেখো তোমার পায়ের তলায় মা ! (করুণাময়ীকে) ওঠো মা (উঠাইলেন) অবোধ ছেলের অপরাধ নিও না। (মহিমকে) তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ! হাত জোড় ক'রো, পা জড়িয়ে ধরো—তোমার চোখের জলে পা দুখানি ধুইয়ে দাও। করেছো কি—

মহিম—মা, ক্ষমা ক'রো (পা জড়াইয়া ধরিলেন)

সরযূ—মা, তোমার ছেলেকে কোলে নাও। আর, আমি তোমার দাসী। ঘরের কাজ কর্ম্ম শিখি নি—শিখিয়ে নাও মা। আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রো (পদতলে পড়িলেন)

করুণা—ওঠ্ মা লক্ষ্মী ! যদি রাগের মাথায় কিছু ব'লে থাকি, কিছু মনে করিস না। বুড়ো হয়েছি—সব সময়ে সব কথা গুছিয়ে ঠিক বল্‌তে পারি না। বাছা আমার (এই বলিয়া করুণাময়ী মহিম ও সরযূকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন)

দয়াল—(চক্ষু মুছিতে মুছিতে) হায়রে মা ! ঈশ্বর কি দিয়ে তোমায় গড়েছিলেন। এই মানবজীবনের তপ্ত সৈকতে এই মাতৃস্নেহের অমৃত সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছে। মানুষ স্নান ক'রো, পান ক'রো, পবিত্র হও।

আমরা দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে পুনরায় করুণাময়ীর সাক্ষাৎ পাই—বড় দিনের ছুটীতে তাঁহার পুত্র মহিম আসিবে, এক বৎসর হইয়া গিয়াছে মহিম আসে নাই—এ দৃশ্যে মার ব্যাকুলতা পুত্রদর্শনের আশায় কবি অতি সুন্দর ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার পর—

দ্বিতীয় অঙ্ক ; তৃতীয় দৃশ্য

করুণাময়ীর কুটীরকক্ষ ; কাল—শেষরাত্রি

করুণাময়ী মৃত্যু-শয্যায়—পার্শ্বে দয়াল।

করুণাময়ী—দুর্গানাম ক'রো দুর্গা নাম করো। শুস্তে শুস্তে মরি।

দয়াল—কেন দিদি, কবিরাজ ব'লে গিয়েছে কোন ভয় নাই।

করুণা—কবিরাজ ঠিক বলে গিয়েছে, আমার কোন ভয় নাই। কারো অনিষ্ট করি নি। যা উচিত বুঝেছি ক'রে গিয়েছি—মা দুর্গা চরণে স্থান দেবেনই—আমার আবার ভয় !

দয়াল—না, আমি বলছি যে, তুমি সেরে উঠবে দিদি।

করুণা—আমি সেরে উঠতে আর চাই না ভাই। কিসের জন্য বাঁচতে চাইব। তিনকুড়ি বয়স হয়েছে। জীবনে দুঃখ বৈ আর কিছু পাইনি। পাঁচছেলের মা হয়েছিলাম ! চা'রটি গিয়েছে। একটি আছে ; তা সে থেকেও নেই। আর কি সুখে বেঁচে থাকতে চাইব !

দয়াল—মহিম আসবে। সে এতক্ষণ পথে।

করুণা—(দীর্ঘনিশ্বাস) আমিও পথে।

দয়াল—আমি বল্‌ছি যে, সে আসবে। আমি কি মিছে বল্‌ছি। সেদিন বলেছিলাম সে আসবে না, সে আসে নি। আজ বল্‌ছি সে আসবে, সে আসবেই। মায়ের পীড়া শুনে কি সে বসে থাকতে পাবে !

করুণা—আসবে ? আসবে ?—কখন ? আর কখন আসবে ? মরবার আগে একবার সেই চাঁদমুখখানি দেখতাম।—দেখতে পেলাম না।

দয়াল—ওসব কি কথা বল্‌ছ ! ছি দিদি !

করুণা—হায়রে ! মরবার সময়ও তারই কথা বারবার মনে হচ্ছে। কোথায় মায়ের নাম কর্ব্ব—দুর্গানাম কর, দুর্গানাম কর ! ছেলে কে ? কেউ না। আমার ছেলে নাই, কখনও ছিল না। দয়াময়ি ! এ অন্তিমকালে চরণে স্থান দিও মা। এ অন্ধকারে ছেড়ো না।—ভাই ! সত্যই কি মহিম আমার এলো না !

দয়াল—আসছে, ব্যস্ত হও কেন দিদি ! ঘুমোও !

করুণা—এই যে একেবারেই ঘুমোচ্ছি ! ভাই, আমি মরে যাওয়ার পর মহিম যদি আসে তাহ'লে তাকে বোলো যে, আমি সুখে মরেছি, কোন কষ্ট হয় নি। সে এসে যদি কাঁদে,ত' তাকে বুঝিও যে আমার মরবার সময় কোন কষ্ট হয় নি ! শুধু মরণকালে তাকে দেখতে চেয়েছিলাম। না সে কথা বলে' কাজ নেই। বাছা দুঃখ কর্ব্বে ! বোলো আমি সুখে মরেছি। আর কিছু না। আর যদি সে না আসে—(কণ্ঠ রুদ্ধ হইল)

দয়াল—হায়রে মা!—দিদি মহিম আসছে। আজ রাত্রের মধ্যেই আসবে। বোধ হয় প্রথম ট্রেণ ফেল হয়েছে।

করুণা—আসবে! আসবে? সত্য বল্‌ছ? সে আসবে? ভাই বল, সে আসবে। সেই বিশ্বাস নিয়ে আমি পরকালে যাই!—না, সে আস্‌বে না। (মুখ ফিরাইলেন)

দয়াল—ঘুমাও দিদি।

করুণা—এই যে ঘুমোচ্ছি।—তবে মহিম এলো না! আমি তার বৌকে বকেছিলাম, সেই অভিমানে বাছা চলে গিয়েছে; আর আস্‌বে না—ঐ পাখী ডাক্‌লো, না? ঐ যে!

দয়াল—হাঁ দিদি।

করুণা—তবে ভোর হয়েছে।

দয়াল—ভোর হ'ল বৈকি।

করুণা—তুমি সমস্ত রাত ঘুমোও নি?

দয়াল—ঘুমিয়েছি বৈ কি?

করুণা—না, ঘুমোওনি। তুমি সারারাত আমার শিয়রে বসে' আছো। আমি যখনই চোখ মেলেছি, দেখেছি যে, তোমার ঐ কালিবর্ণ মুখখানি—ঐ স্নেহময় চক্ষু দুটি আমার পানে চেয়ে আছে। দয়াল ঘুমো, ঘুমোওগে যাও।

দয়াল—আমি ঘুমিয়েছি দিদি।

করুণা—ঐ পাখী ডাক্‌ছে।—দয়াল! জানালাটা খুলে দাও তো ভাই, একবার আমার ধানভরা ক্ষেত, আমার গাছভরা বাগান, একবার—শেষবার প্রাণভরে দেখে নিই। আর তো দেখতে পাবো না। খুলে দাও।

(দয়াল জানালা খুলিয়া দিলেন)

করুণা—ঐ সেই সব! এখনও জাগে নি! সব ঘুমিয়ে আছে। ওরে তোরা জাগ্। চেয়ে দেখ আমি যাচ্ছি, জন্মের মত তোদের ছেড়ে যাচ্ছি। দেখ।—দয়াল!

দয়াল—দিদি!

করুণা—একবার বাইরে যাও তো ভাই, আমার গাইটাকে একবার দেখবে। তার বাছুর হয়েছে। আমি দেখবো।

দয়াল—পরে দেখো।

করুণা—না দয়াল! পরে দেখবার আর অবকাশ হবে না। যাও ভাই! (দয়ালের প্রস্থান)

করুণা—ঐ হাম্বারবে আমায় ডাকছে। রোজ নিজের হাতে করে' খাবার দিতাম। একদিন যদি দৈবাৎ না দিতে পার্ত্তাম, তো সে ভাল করে' খেত না; সারাদিন মুখ ভার করে' থাকতো। আমার মুখ ম্লান দেখলে তার চোখে জল আসতো।—ঐ আবার ডাক্‌ছে।—এই যে আমি—ধবলা! এই যে আমি!

দয়াল—(নেপথ্যে) এই যে দিদি এনেছি, দেখ।

করুণা—ঐ যে আমার গাই!—ধবলী! চল্লাম মা!—এখন থেকে দয়াল তোমায় দেখবে। দয়াল—ভাই—আর—শেষ হয়ে এলো! মা দুর্গা! মহিম তবে সত্যিই এলো না। দু—র্গা—(মৃত্যু)

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল—দিদি, দিদি—দীপ নিভে গিয়েছে!—একটা বুদবুদ সমুদ্রে মিশে গেল। একটা শিশিরবিন্দু পদ্মপত্র থেকে ঝরে পড়ে গেল। একটা সামগান উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল।—যাও দিদি, পরপারে, সেখানে সব 'মা' জগন্মাতার কোলে শুয়ে আছে। পুত্রকন্যা নিষ্ঠুর। তাদের ভুলে যাও, মায়ের গলা জড়িয়ে ধর। শান্তি পাবে।—মা! মেয়েকে কোলে তুলে নাও।—

চতুর্থ দৃশ্য

পট-পরিবর্ত্তন

মহিম—তোমার দাদামশাই তোমায় খুব ভালবাসেন?

সরযূ—হুঃ

মহিম—তুমি তাঁকে খুব ভালবাস?

সরযূ—তাকে?—জগতে আর কাউকে এত ভালবাসি না। আমি দাদামশাইর জন্য প্রাণ দিতে পারি।

মহিম—আচ্ছা বেশ!

সরযূ—অভিমান কর্লে (হাত ধরিয়া) ছিঃ।—চোটো না।—

মহিম—(হাত ছাড়াইয়া) যাও তুমি আমায় ভালবাস না।

সরযূ—বাসি। কারণ, তুমি আমার স্বামী। এ ভালবাসা

অভ্যাসগত—আর দাদামশায়কে ভালবাসি, সে ভালবাসা প্রকৃতিগত!

মহিম—সেইটেই বেশী!

সরযূ—নিশ্চয়। তাঁর আর তোমার মধ্যে তফাৎ অনেক।

মহিম—কি তফাৎ?

সরযূ—আমি যদি মরে' যাই তো দাদামশায় শোকে অন্ধ হয়ে যাবে; আর তুমি বৎসর না যেতেই একটা নূতন বিয়ে কর্ব্বে।

মহিম—কখনও কর্ব্ব না।

সরযূ—আচ্ছা দেখিয়ে দেবো।

মহিম—কি রকম করে'!

সরযূ—(সহাস্যে) সত্যই মরে' দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করে যে, তোমরা স্বামীর জাত কি ভণ্ড।

মহিম—কিসে?

সরযূ—প্রথম ভালবাসা দেখাও—সমুদ্রতরঙ্গের মত বেলার উপর বাহু তুলে যেন তাকে গ্রাস কর্ত্তে আসো।—তারপর তৃপ্তি হ'লে সেই সমুদ্রতরঙ্গের মত অবসাদে বেলা থেকে সরে' যাও।

মহিম—আমি তোমায় সেরকম ভালবাসি না।

সরযূ—কি রকম বাসো।

মহিম—এ ভালবাসা আকাশের মত অনন্ত, উদার স্বচ্ছ। এর শেষ নেই, তৃপ্তি নেই। এ ভালবাসা পর্ব্বতের মত অটল, ধ্রুবতারার মত স্থির।—হাস্‌ছো যে!—যাও, তুমি আমায় ভালবাস না।

সরযূ—তোমার কবিতা শুন্‌ছিলাম!—তোমার মা কেমন আছেন! কোন চিঠি পেয়েছো?

মহিম—এর মধ্যে সে কথা আসে কোথা থেকে?

সরযূ—কথাটা এর মধ্যে নয়, এর বাইরে।—আচ্ছা! 'মা' জিনিষটা বড় গদ্যময়। না?

মহিম—কেন?

সরযূ—নৈলে ছুটিটায় একবার তাঁর কাছে গেলেও না! দাদাশ্বশুরের বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলে! সেখানে যে তোমার মা শূন্যনয়নে তোমার পথ চেয়ে আছেন।

মহিম—কে বল্লে?

সরযূ—আমি জানি। সে কথা আবার কারো বল্‌তে হয়? হায় স্বামী! মা চিন্‌লে না। চিন্‌বে সেই দিন, যেদিন হারাবে।

মহিম—তুমি চিনেছো?

সরযূ—হাঁ, আমি যে হারিয়েছি। ও-রতন না হারালে ঠিক চেনা যায় না। তোমার বৃদ্ধা মা একাকিনী অশ্রুনয়নে পথের দিকে চেয়ে আছেন, আর তুমি এখানে একটা নগণ্য নারীর পায়ের তলায় পড়ে' আছো? যাকে এক বৎসর আগে চিন্‌তে না, যার একমাত্র গুণ আছে, সে গুণ—রূপ-যৌবন।

মহিম—তাহ'লে তোমার ইচ্ছা নয় যে, এখানে আমি থকি।

সরযূ—ইচ্ছা যে এখানে থাকো—কিন্তু মাকে ছেড়ে নয়। প্রেমের পায়ে নিজের স্বার্থ বলি দিতে পার—কিন্তু কর্ত্তব্য নয়, মাতৃভক্তি নয়।

মহিম—সে আমার বিচার্য্য। তোমার কি!—তোমার কাজ আমায় আদর, চুম্বন, আলিঙ্গন দেওয়া।

সরযূ—আমি তোমার গণিকা নই। আমি তোমার স্ত্রী।—তোমার জন্য আমার ভয় হয়।

মহিম—কেন?

সরযূ—তুমি কি পাপ কাজ না কর্ত্তে পার জানি না, যখন মায়ের প্রতি তোমার টান নেই। মাতৃভক্তি—যে কর্ত্তব্য সর্ব্ব কর্ত্তব্যের মূল; জীবনের প্রথম মহাশিক্ষা, মনুষ্যপ্রকৃতির মজ্জাগত সনাতন ধর্ম্ম; মাতৃভক্তি—যার কোমল করস্পর্শে কর্ত্তব্যের কাঠিন্য খসে পড়ে, ভক্তি প্রেম স্নেহে হাস্য করে—যে কর্ত্তব্য তর্কের ধার ধারে না, যুক্তির সাহায্য চায় না, বিধি ও বিধান জানে না; মাতৃভক্তি—যা একটি স্বর্গীয় অভিপ্রায়, মানবজীবনকে মণ্ডিত করে, সানন্দে প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করে, আত্মাকে দীপ্ত করে, অভ্যাসগত সংস্কারকে জীবনের মূলমন্ত্র করে, মানুষের সমস্ত কোমল প্রবৃত্তির উপর রাজত্ব করে, ঘটনার বিপর্য্যয়ের উপর ক্রীড়া করে, জরার ম্রিয়মাণ শক্তি সঞ্জীবিত করে, আর মৃত্যুর সেই ভয়ানক মুহূর্ত্ত আলোকিত করে, যে এই মাতৃভক্তির কাঙ্গাল, তার আর কি আছে! সে জীবনে কি পাপ কাজ না কর্ত্তে পারে! তাই বলছিলাম—সাবধান! সংসারে মায়ের বাড়া কেউ নেই, ভগ্নী নয়, কন্যা নয়, স্ত্রী নয়।—বল, তোমার মা ভাল আছেন?

মহিম—আ—ছেন।

সরযূ—মিথ্যা কথা। নিশ্চয়ই তিনি ভাল নাই। সত্য কথা বল। তাঁর অসুখ?

মহিম—বিশেষ কিছু নয়।

সবযূ—আবার মিথ্যা কথা! আমি তোমাব স্ত্রী, আমাব কাছে মিথ্যা কথা? না, মনে হচ্ছে যে, তোমাব মায়েব সাংঘাতিক পীড়া হয়েছে। না, কি? চুপ করে রৈলে যে! বুঝেছি। তোমাব মা এখন কোথায়? আমি তাঁর দাসীত্ব স্বীকার করেছি। আমি যাব, তাঁর সেবা করব। তাঁব কি হয়েছে বল।

মহিম—নিউমোনিয়া। বিশেষ কিছু নয়।

সরযূ—তবে আমি যা স্বপ্নে দেখেছি, তা মিথ্যা নয়? আমি যাব তাঁর কাছে। আজই যাবো। তুমি এখানে থাকো। শৈশবে মা হাবিয়েছি, সেবা করে সাধ মেটে নি। মা বলে’ সাধ মেটে নি। আর এক মা পেয়েছি, সেবাব সাধটা তাঁকে সেবা করে’ মেটাবো—আমি যাব।

মহিম—তোমার এ অবস্থায় কোন জায়গায় যাওয়া উচিত নয়।

সরযূ—উচিত নয়! তুমি তাঁর ছেলে হ’য়ে এই কথা বলছো। তোমার মা যিনি—তোমায় যিনি গর্ভে ধরেছিলেন, বল তোমার মা এখন কোথায়?

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল—স্বর্গে! উৎসব কর মহিম, আপদ দূব হয়েছে। তাঁর মৃতদেহের উপর তোমরা দু’জন তাণ্ডব-নৃত্য কর। তোমাদের বালাই গিয়েছে।

সরযূ—তাঁর মৃত্যু হয়েছে!

দয়াল—বৌমা! ধন্য তোমরা এই বৌজাতি! তোমরা স্বামীকে পশুর অধম ক’রে ফেল, ভাইকে ভাইয়েব শত্রু কর, পুত্রকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নাও! ধন্য জাতি! বলিহারি!—আর তুমি মহিম! নীচ, পাষণ্ড, মাতৃহন্তা! নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়! তোমাকে অভিশাপ দিই, যেন আহারে ভাতের মুঠো মুখে তুলতে তা ভস্ম হ’য়ে যায়;—আর সর্ব্ব সময়ে, তোমার মায়ের মরা মুখ দেখে যেন তুমি শিউরে ওঠো, আমি তোমায় এই অভিশাপ দিয়ে গেলাম।

সাহিত্যে কর্ত্তব্যের ভেরীতে জাগ্রত দাম্পত্য প্রেমের এমন মধুর অভিব্যক্তি অতি অল্পই আছে।

পরপারে সামাজিক নাটক। কিন্তু সামাজিক নাটক বলিলেই আমরা সাধারণতঃ বুঝি সরলা, প্রফুল্ল, বলিদান—কিন্তু পরপারে সে শ্রেণীর নাটক নহে। ইহা কবি-প্রতিভার বিভিন্ন নূতন মধুর সৃষ্টি। “শিল্পচাতুর্য্যে, সূক্ষ্ম চরিত্র-বিশ্লেষণে ও পরস্পর বিপরীত প্রবৃত্তির সংঘর্ষণে একখানি উৎকৃষ্ট নাট্য-কাব্য রচিত হইয়াছে। স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, ক্ষমা, ত্যাগ একদিকে, কৃতঘ্নতা, অত্যাচার, কপটতা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা অন্য-দিকে। স্বর্গ ও নরকের এরূপ তুমুল সংগ্রাম বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে ইতিপূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না।” *

মহিমের যদি মাতৃভক্তি থাকিত, তাহার সর্ব্বনাশ হইত না। যেই সে মাতৃভক্তি হারাইল, সেই সে পড়িতে আরম্ভ করিল। সে পতন দ্রুত ও গভীর। অমর নাট্যকার মহিমের চরিত্রে মাতৃভক্তিহীনতা ও কর্ত্তব্যহীন অন্ধ রূপজ লালসার ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছেন।

আমার মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল যে-সকল আধ্যাত্মিক শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত কালীভক্তের মুখে দিয়াছেন তাহা নাটকে রচিত কবিসুলভ বাক্‌পটুতা নহে—দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটক রচনার সময় আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল ও আমরা তাঁহাকে এইশ্রেণীর রচিত গীত গাহিতে, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছি - যাহা কেবল মাত্র ভক্ত সাধকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

আর কেন মা ডাকছ আমায
এই যে এইছি তোমার কাছে।
নাও মা কোলে দাও মা চুমা
এখন তোমায় যত আছে।
সাঙ্গ হ’ল ধূলা-খেলা
হ’যে এল সন্ধ্যা বেলা
ছুটে এলাম এই ভবে মা
এখন তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে
বাহু দিযে নাও মা ঘিরে
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—
মা তোমার ঐ বুকের মাঝে

---

* সাহিত্যরসিক শ্রীঅধরচন্দ্র মজুমদার।

এবার যদি পেয়েছি শ্যামা
আর তো তোমায় ছাড়বো না মা—
ওমা, ঘরের ছেলে পরের কাছে
মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।

এই গান গাহিতে তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া এতই আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, আমার মাতৃদেবী মোহিনীদেবী গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ছোট্‌ঠাকুরপো, আপনার কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হয়েছে"। দ্বিজেন্দ্রলাল তো "কুণ্ডলিনী শক্তি"র কি অর্থ তাহা জানিতে সমগ্র সুরধাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তৎপরে আমার পিতৃদেব অর্থ বলিয়া দেন—তখন দ্বিজেন্দ্রলাল নিশ্চিন্ত হন।

"বঙ্গশ্রী"তে আদর্শবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত-প্রবাস কালে প্রায়ই কবর-স্থানে গিয়া পিতামাতার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। সুরধামে যখন তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও মাঝে মাঝে একাকী তেতালার ছাদে অন্ধকারের মধ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন—এক রাত্রিতে আমি তাঁহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া পিছন হইতে গিয়া জড়াইয়া ধরি—তখনও তিনি আমাকে ধরিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। জিজ্ঞাসা করায় বলেন, "আমি কাঁদছি না—আমার মধ্যে যে মণ্টুর মা আছেন, তিনিই কাঁদছেন।" যে দুঃখে সাজাহান কাঁদিয়াছেন, নাটকের নাট্যকারও সেই একই কারণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন বাটীতে,—কী মধুর! কী মর্ম্মস্পর্শী!

কবি মেবার পতনের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, স্বদেশ-প্রেম লইয়া নাটক লিখিয়াছেন। বিশ্বপ্রেমকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া মেবার পতন লিখিলেন, পরে সর্ব্বোচ্চ প্রেম,—ঐশী প্রেম লইয়া নাটক রচনা করিবেন।

তিনি আমাকে সাধক রামপ্রসাদের ভাল জীবনী সংগ্রহের নিমিত্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী দ্বিজেন্দ্র-ভক্ত সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু কোথায়ও ভাল জীবনী ছিল না।

তিনি তখন ভীষ্মের মহৎ চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার শেষ পৌরাণিক নাটক লেখেন।

ভীষ্ম নাটক পাঠ করিলে বেশ সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলালের মনের মধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন দ্রুতভাবে আসিতেছিল। ভীষ্ম নাটকে সত্যবতীর চরিত্রকে হীন করিয়া অঙ্কিত করায় অনেকে নাটকের এই দোষের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু বোধহয় বেদব্যাসের চরিত্রকে বিশেষ রূপে মহৎ করিবার জন্যই সত্যবতীর চরিত্র হীনভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কারণ, ব্যাস বলিতেছেন যে তাঁহার পুণ্যবলে সত্যবতীর সব পাপ দূর হইয়া যাইবে—"ব্যাসের জননী তুমি দাও পদধূলি"

কক্ষ—তৃতীয় অঙ্ক - পঞ্চম দৃশ্য

[অম্বা শিবকে তপস্যা করিয়াও ভীষ্মকে বিবাহ করিবার অনুমতি পান নাই, গঙ্গা আসিয়া শিবকে অনুরোধ করিতেছেন]

গঙ্গা—ঐ দেখ মহেশ্বর,
কাশীরাজ কন্যা অম্বা, উপেক্ষিতা সতী ফিরে দ্বারে দ্বারে। তার পিতা অসম্মত করিতে আশ্রয় দান আপন সন্তানে; তাই উন্মাদিনী নারী ভিখারিনী আজি ভীষ্মের প্রেমের দ্বারে। মুক্তকর, নাথ, সত্যপাশ হ'তে এই মূঢ় দেবব্রতে।

শিব—না গঙ্গা। সংসার হইতে মুছিয়া দিব না এ মহা মহিমা। শূন্য হবে বসুমতী!

গঙ্গা—তবে দাও শান্তি এই নারীর হৃদয়ে।

শিব—দিব আমি তাহার যা প্রাপ্য সুরধনী, ফিরে যাও গঙ্গা, সাধ কর্ত্তব্য আপন।

তৃতীয় অঙ্ক; ষষ্ঠ দৃশ্য
হস্তিনার প্রাসাদ-অন্তঃপুরে ভীষ্মের কক্ষ
কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি

(ভীষ্মের প্রবেশ ও অম্বাকে দেখিয়া ভীষ্ম গমনোদ্যত)

অম্বা—কোথা যাও দেবব্রত দাঁড়াও,
কোন মহা অপরাধ?
ভালোবাসিয়াছি মাত্র—আর কিছু নহে।

ভীষ্ম--কাহিনী তোমার আমি শুনিয়াছি, দেবি—
কিন্তু ক্ষমা করো, দেবি। আমি ব্রহ্মচারী।

অম্বা—মিথ্যা কথা দেবব্রত। তুমি সুকুমার,
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর। কিন্তু তুমি নহ
ব্রহ্মচারী। কেন মিথ্যা বল দেবব্রত।

ভীষ্ম—ধরিয়াছি ব্রত।
অম্বা—ভঙ্গ কর, কত ঋষি
ব্রহ্মর্ষি যুগে যুগে, দেবব্রত,
ঢালিয়াছে নারীর চরণে অনায়াসে
অর্জ্জিত তপস্যা তার। তুমি ঋষি নহ।
মদন-বিজয়ী এক শিব শম্ভু—তিনি
মহেশ্বর। তুমি ত ঈশ্বর নহ প্রভু!
কেহ যাহা পারে নাই তুমি করিয়াছ?
কাম জয় করিয়াছ তুমি দেবব্রত?
ভীষ্ম—কাম জয় করি নাই। করিতাম যদি
তোমারে এতোই ভালবাসি, কামজয়ী
হইতাম যদি, তবে তোমারে সবলে
আঁকড়িয়া ধরিতাম নিজ বক্ষ মাঝে,
দুগ্ধপোষ্য শিশুসম নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে।
না, না। আমি নহি কামজয়ী। তাই ডরি
আপনারে, তাই ডরি রমণীরে, তাই
মা মা বলে' যার পানে ছুটে যেতে চাই,
স্নেহের পবিত্র তীর্থে তীর্থযাত্রী সম;
তাহা হ'তে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করি,
পলায় যেমতি নর অজগর হ'তে।
(প্রস্থানোদ্যত)
অম্বা—কোথা যাও প্রিয়তম! দিও না ভাসায়ে
আমারে অকূল জলে—
(জানু পাতিয়া উপবেশন)
ভীষ্ম—কাঁদিও না দেবি,
বক্ষপেতে নিতে পারি বজ্রের আঘাত,
তুচ্ছ করি ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের গর্জ্জন,
কিন্তু অশ্রুজলে আমি ডুবে গলে যাই।
অম্বা—একি! আবার হৃদয় চঞ্চল।
না, এ প্রবৃত্তিকে আজি করিব নিধন,
তবে আজি, ভগিনীরে বসায়ে আমার
হৃদয়ের সিংহাসনে—এ সুলগ্নে আজি
বরিব জননী পদে। উচ্চারিব আজি
মৃত্যুদণ্ড অন্ধ বাসনার; কামনার
করিব নিঃশ্বাস রোধ, আসক্তির শিখা
নির্ব্বাণ করিয়া দিব—করিব নির্ম্মূল
পাপের কণ্টক-তরু—জননী আমার!
অম্বা—(চমকিয়া) কি করিলে! কি করিলে!
নিষ্ঠুর! ঘাতক! না না, মানিব না আমি।
আমি মানিব না। আমি পড়ে যাই—
ধর ধর প্রিয়তম!
(পতনোন্মুখী অম্বাকে ধরিয়া)
ভীষ্ম—একি? কাশিরাজ-কন্যা তুমি, শিশু নহ,
তোমার কি সাজে এই হীন আচরণ।
ফিরে যাও প্রাণাধিকা দুহিতা আমার।
তোমারে জননীপদে করেছি বরণ।
করিও না কলুষিত হীন উচ্চারণে
সংসারের সব চেয়ে পবিত্র বন্ধন এই
জননী-সন্তান।
অম্বা—মিথ্যা কথা দেবব্রত,
আমি নহি মাতা তব। তব জননীর
কোন কার্য্য করি নাই আমি। উচ্চারণে
এমন কি মোহ আছে, যাহা শক্তিবলে
সত্যকে বিলুপ্ত করে?
ভীষ্ম—তুমি কি বুঝিবে?
মাতৃনামে কত শক্তি, তুমি কি বুঝিবে?
কত অর্থ · যাহা কোন অভিধানে নাই,
কত সুধা—যাহা নাই ইন্দ্রের ভাণ্ডারে;
কণ্টক-শয্যায় রোগী তীব্র যন্ত্রণায়
যবে "মা" বলিয়া ডাকে, অর্দ্ধেক যন্ত্রণা
যেন সে অমৃত-হ্রদে ডুবে গ'লে যায়।
মাতৃনামে পশু বশ হয়। মাতৃনাম
শোকতপ্ত বক্ষঃস্থল সুশীতল করে;
শ্রবণবিবরে বর্ষে স্বর্গের সঙ্গীত।
মাতৃনাম আনন্দে বিহ্বল রসনায়
জড়াইয়া যায়। ইহা তপ্ত ওষ্ঠাধরে
বিকম্পিত হয়। ইহা বাহুর উপরে
নৃত্য করে। মাতৃনামে ধন্যা হ'ন স্বয়ং ঈশ্বরী
মা, দমন কর আজি কামিনীত্ব তব,
দেবী হও। শৃঙ্খলিত কর, মা দুর্ব্বল

এই স্বেচ্ছাচার তব। ধরায় বরিষ
শান্তির পীযূষ ধারা। দেখ মা জননি
তোমার বক্ষের পরে জগৎ ঘুমায়॥

কবি তাঁহার শেষ নাটক সিংহলবিজয়ে বিজয় সিংহের উক্তিতে বঙ্গদেশকে জননীরূপেই দেখিয়াছেন। তাঁহার অমর সঙ্গীত—“বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ” বা “জননী ভারতবর্ষ” বা “জননী বঙ্গভাষা” প্রত্যেক সঙ্গীতেই তিনি ভারতবর্ষ বঙ্গভাষাকে মাতৃরূপেই বন্দনা করিয়াছিলেন, যেরূপ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র “বন্দেমাতরম” মহাস্তোত্রে দেশমাতৃকাকে অর্ঘ্য দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি ছিলেন না, শুধু নাট্যকারও ছিলেন না, তিনি বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচয়িতা ও composer বা “সুরকার” ছিলেন।

ভীষ্ম নাটকেও কবি ভীষ্ম ও পরশুরামের যুদ্ধের দৃশ্যে যে স্থলে ভীষ্ম গঙ্গাতটে পরশুরামের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সে স্থলেও দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গার স্তব করিয়াছেন,সেই অমর সঙ্গীতও নিম্নে প্রদত্ত হইল—

“পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।”
শ্যাম-বিটপি-ঘন তট-বিপ্লাবিনী, ধূসর তরঙ্গভঙ্গে !
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণ যুগ মাই,
কত নর নারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি,
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি,
করি সুশ্যামল কত মরু-প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।
নারদ কীর্ত্তন পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্ম কমণ্ডলু উচ্ছলি ধূর্জ্জটী-জটিল জটা পরে ঝরিয়া।
অম্বর হইতে সম শত-ধারা জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে—
নামি ধরায় হিমাচলমূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে।
পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথি জাহ্নবি। সুরধুনি ; কলকল্লোলিনি গঙ্গে।”

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-সাহিত্যের একটা অংশ মাত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। একজন অধ্যাপক একটী পুস্তকে (বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত) লিখিয়াছেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইলেও নাটকীয় উপাদানের অভাব লক্ষিত হয়। এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার কি যোগ্যতা উক্ত অধ্যাপকের আছে আমরা জ্ঞাত নহি, তবে এইরূপ irresponsible statement একজন বিখ্যাত নাট্যকারের সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকে লক্ষ্য করিয়া ইহাই মনে হয় যে, দেশবাসী এক দিন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি রক্ষার্থে ! বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত কবি নাট্য-কার হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ আর কেহ আছেন কি।

যেহেতু বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তাঁহার নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়, সেইকারণেই যে নাটকের স্থান নিম্নে এইরূপ চিন্তা করা ভ্রমাত্মক।

প্রতিভাশালী নাট্যকারের কাজ দর্শকবৃন্দের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত করা ও লোকশিক্ষার সহায়তায় সাহিত্যকে উন্নতির পথে অগ্রসর করা—এরূপ স্থলে দর্শকবৃন্দ কবিকে দলে না নামাইয়া কবিই আপনার কাছে তাঁহাদের টানিয়া তুলেন—এই তথ্য বোধ হয় ডাঃ সুশীলকুমার দে অবগত নহেন—পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক (Schtegel) উক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

“The Dramatic poet is more than any other, obliged to court external favour and wide applause. But of course, if it is only in appearance that he thus lowers himself to his hearers; while in reality, he is elevating them to himself.” (A. W. Schtegel's Dramatic Art and Literature”)

দ্বিজেন্দ্রলালও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকা শুধু সমালোচনা পাঠে ক্ষান্ত হইবেন না ; মূল নাটক পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের মাধুর্য্য ও বিরাটত্ব উপলব্ধি করিবেন, ইহাই লেখকের বিনীত নিবেদন।

বঙ্গশ্রীতে দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে “মা” সম্বন্ধে আলোচনা বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি মহোদয়ের আগ্রহে লিখিত হইয়াছে, লেখক এই কারণে তাঁহার নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

সমাপ্ত

জীবন

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

যেমনটী দেখিয়া গিয়াছিলাম, ঠিক তেমনটী রহিয়াছে। পৃথিবীতে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, প্রাকৃতিক বিপর্যায়ও যথেষ্ট হইয়াছে। আমাদের সামাজিক জীবনেও বহুতর অবস্থার বিচিত্র ঢেউ আসিয়াছে ও চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি যে গ্রামখানিকে আজ দীর্ঘ কুড়ি বৎসব পূর্ব্বে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, আজ দীর্ঘ দিন পর ফিরিয়া আসিয়া তদনুরূপ অবস্থায় দেখিতেছি। বাহিরের কোন বিপর্যায়, কোন চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি, এ গ্রামখানিকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। গ্রামটী যেন একটী ছিপছিপে নদী। প্রমত্ততা নাই, গতি নাই, বেগ নাই। আপন মনে সংসাববিরাগী, কোন ক্ষ্যাপা উদাসী যেমন কোথাও কোন তবঙ্গ না তুলিয়া, সংসার মাঝে ঘুরিয়া বেড়ায়, এও ঠিক তেমনি ভাবে চলিয়াছে। উদাস-নিশ্চিন্তে ও একান্ত নির্লিপ্ততায়, অতি মৃদু ঝিরঝিরে শব্দে হাল্‌কা একটি পাল তুলিয়া, মন্থবগতিতে চলিতেছে। আমাব জীবনের দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময়, দুরূহ দীক্ষা লইয়া কত দেশ-দেশান্তর, কত চেনা-অচেনার মাঝে ঘুরিলাম। একদা আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বিপুল ঝড় আসিয়াছিল, সেই ঝড়ে, আমার শান্ত জীবন-তরণীখানি নানাপথ ও বিপথের মাঝে,—কখন সোজা কখন বা বাঁকা বাস্তা দিয়া ছুটিয়াছিল। অবশেষে বৃটীশ সাম্রাজ্যের মহা-আকর্ষণ শক্তি, আমার টানিতে টানিতে আন্দামানের তীরভূমিতে আনিয়া ফেলিয়াছিল। একটী একটী দিন করিয়া আন্দামানে দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর তথা হইতে মুক্তি পাইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু যে আগুন দেহের মজ্জায় মজ্জায় জ্বলিতেছিল, তাহা আন্দামানের দশ বৎসর নির্ব্বাসনে নিভিয়া যায় নাই। তবে ইহাও বুঝিয়াছিলাম, আমরা যাহাকে আগুন মনে করিয়া, সেই আশ্বাসে দেশময় লঙ্কাদহনের আব এক পর্ব্ব করিব বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, তাহা মাত্র আতসবাজী। আর বুঝিয়াছিলাম, ও প্রণালীতে দেশে আগুণ জ্বলিবে না, শুধু মাত্র দগ্ধ কপাল আরও নূতন ভাবে পুড়িয়া, অবশেষে সমগ্র বদনমণ্ডলকে কুৎসিৎ কালিমাময় করিয়া শ্রীরাম-কিঙ্কর হনুমান করিয়া দিবে। এই পোড়াকপালকে আর নূতন করিয়া না পোড়াইয়া, কিছুদিন চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু প্রাণ-ঘন জীবনের দুরন্ত জেদ ও কর্ম্মশক্তি আমায় আবার পথে বাহির করিল। খিদিবপুব ডকের নানা জাতীয় গোরা, জাভানীজ, চীনা লস্কর ও মাল্লার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া একদিন এক আমেরিকাগামী জাহাজে উঠিয়া বসিলাম।

আমার জীবনে সে এক নূতন অধ্যায়। তাহার সুদীর্ঘ কাহিনী এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমেরিকায় দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। অচেনা জায়গায়, অচেনা লোকেব মাঝে, নূতন সমাজে, নানা কারখানায়, যন্ত্রবিদ্যার মাঝে, নিজের প্রাণশক্তিকে নিয়োজিত করিলাম। বহু চেষ্টায় হেনরী ফোর্ডের বিশ্ব-কর্ম্মশালায় ঢুকিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, যখন ফোর্ডের বিশ্ব-কর্ম্মশালায় ঢুকিয়াছি, তখন সমস্ত যন্ত্র-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া, সাগরপারের বন্দিনী লক্ষ্মীদেবীকে ভারতে প্রতিষ্ঠিত কবিতে পারিব।

দেশেব সর্ব্বনাশিনী, অলস মন্থর জীবনকে টুকরো টুকরো কবিয়া ভাঙ্গিয়া, ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, সমগ্র দেশবাসীকে বিজ্ঞানের এই দুরূহ দীক্ষা দিব। ঘুমন্ত বিশাল খণ্ড বিখণ্ড মাঠগুলি, যাহা আমাদের দেশে বিরাট অজগরের মত আফিঙেব নেশায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ঝিমাইতেছে, সেই সমস্ত মাঠগুলিকে আমার শিক্ষা-লব্ধ যন্ত্র-দৈত্যদ্বারা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিব।

আবার ফিরিলাম। জীবনের প্রবাহমাণ-তরঙ্গ সঙ্কুল স্রোতকে দুই হাতে ঠেলিতে ঠেলিতে একদিন দেশের তীবে উপস্থিত হইলাম। আমার মূর্ত্তি চিরন্তন পথিকের সেই ধূলি-ধূসরিত অশান্ত জীবন। আমি আজ ঘরে সুখের নীড় বাঁধিতে আসি নাই। যে বৃহৎ জগত মানুষকে চিরদিন দিগ্ দিগন্তে অহর্নিশি ডাকিতেছে,—নূতন জগত সৃষ্টি করিবার জন্য আমি তাহারই আহ্বানে দেশ-বিদেশে, ছুটিয়াছিলাম, আবার তাহারই আহ্বানে দেশের মাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছি, শান্তি বা সুখের জন্য নহে।

দুই একদিন কলিকাতায় থাকিয়া দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পর দেশের দিকে রওনা হইলাম। সেই ক্ষুদ্র রেলওয়ে ষ্টেশনটী ঠিক তেমনি আছে। কোথাও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ষ্টেশনের ধারে, সেই নিম গাছটী ও কৃষ্ণলতার গাছটী তেমনি রহিয়াছে। শুধু গেটের বাহিরে, সেই হেলা খেজুর গাছটী দেখিলাম না। আজ তাহার আসন শূন্য। রামপদর খাবারের দোকান রহিয়াছে, নাই কেবল রামপদ। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পর দেশের মাটীতে পা দিয়া আমার শৈশবের হারানো দিনগুলির ভিতর ফিরিয়া আসিলাম। সেই সুমধুর দিনগুলি কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, মহাকালের অন্ধকার-বক্ষে লুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া রহিয়াছে।

বিদেশে থাকিতেই সব খবর পাইয়াছিলাম। বাবা লিখিয়াছিলেন, "গ্রামে আর বাস করা সম্ভব নয়। ম্যালেরিয়া জঙ্গল, আর দিন দিন লোকশূন্য হয়ে যাচ্ছে। এখন এ-দেশ ত্যাগ করা উচিত।" আমিও সায় দিয়াছিলাম। দেশের বাড়ী বন্ধ থাকে—জমি-জমা ভাগে চাষ-বাস হয়। প্রয়োজনের সময়, আমার ভাইয়েরা দেশের বাড়ীতে দু'একদিন থাকিয়া আবার সহরে ফিরিয়া যায়।

বাড়ীর চারিদিকে জঙ্গল, নিস্তব্ধ, ম্রিয়মাণ ও প্রাণহীন। বড় বড় বট অশথ গাছ অনেকখানি স্থান ছায়াচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে, নানা আগাছার জঙ্গল জড়াজড়ি করিয়া তাহাদের শান্ত জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে। পুকুরগুলি পানা আর কলমি-শাকে ভরিয়া গিয়াছে। গ্রামের রাস্তা-ঘাট জার্ম্মাণী দামে, কাঁটাঝোপঝাড়ে, বিছুটী আর লতাপাতায় ছাইয়া গিয়াছে। আলোহীন-বাতাসহীন গ্রামের সীমানার মধ্যে এখানকার অধিবাসীরা পেটজোড়া প্লীহা ও লীভার লইয়া সারা বৎসর ম্যালেরিয়ায় কাঁপিতে কাঁপিতে যেন মৃত্যু-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছে। বংশ-পরম্পরায় দুঃসহ দৈন্য-দারিদ্র্য, রোগ শোক, নিরানন্দ লইয়া, উহারা প্রাণপণে পিতা-পিতামহের ভিটায় টিকিয়া থাকিবার জন্য সাধনা করিতেছে। কুসংস্কার ও অজ্ঞতা উহাদের জীবনে ক্রীতদাসের অভিশপ্ত জীবন বহন করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তবুও কোন পরিবর্ত্তনই উহাদের কাম্য নয়। ইহা কি পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য হইতে কম আশ্চর্য্যকর।

বৈকালে পর পর দুই কাপ কড়া চা খাইয়া, চুরুট ধরাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

মোটা লাঠিগাছটী ও টর্চ্চ লইতে ভুলিলাম না। রেল-লাইন পার হইয়া আমার পুরাতন আড্ডাখানার দিকে অগ্রসর হইলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম, আড্ডাখানা ঠিকই আছে। এই দীর্ঘ কুড়ি বৎসরেও আড্ডাখানার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। নৃপতিবাবুর চায়ের ও তামাকের আড্ডা আজও তেমনি আছে। এখানকার অধিবাসীগণের উহাই লোভনীয় আকর্ষণ। বিনাব্যায়ে চা, তামাক ও তৎসহ রসাল পরচর্চ্চা করিবার উহাই একমাত্র স্থান। নৃপতিবাবু, যদু সা, মাধব সা সুপতি ঘোষ ইহারা আড্ডাখানাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর বহু কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও, উহাদের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। চুরুট টানিতে টানিতে হাটিতে লাগিলাম। অনেকে সবিস্ময়ে আমায় দেখিতে লাগিল। আমি যেন নবাগত, যেন উহাদের শান্ত জীবনে উপগ্রহ-বিশেষ।

ধীরে ধীরে নৃপতিবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। সকলেই দেখিতেছি উপস্থিত আছেন। সমস্বরে সকলে বলিল, "আরে একে? এস, এস, আজ শুনছিলাম বটে যে এসেছ। তা বেশ, বেশ।"

নৃপতিবাবু বলিলেন, "শুনলাম, বিলেত টিলেত ঘুরে এলে। বহু দেশ-বিদেশ ঘুরলে তো, এবার বিয়ে টিয়ে করে ফেল। তোমরা সব দেশের মায়া কাটালে, এটা কি ভাল। হাজার হোক, এটা জন্মভূমি, নিজের দেশ।"

নৃপতিবাবুর চাকরটী একখানি থালায় পাঁচ ছয় কাপ চা লইয়া আসিল। সকলে এক এক কাপ তুলিয়া লইল। আমায় এক বাটী চা দিয়া যদু সা বলিল, "আর বাপু, কোথায় আর ঘুরে বেড়াবে। এখানে থাক, ইলশে মাছ খাও, আম, কাঁঠাল, এসব কিছুই অভাব নেই। দেশে থাক, বিয়ে কর, একদিন আমাদের একটা জুতসই খ্যাট দাও, বুঝলে।"

মাধব সা ক্যাঁৎ করিয়া, গরম চাটুকু গিলিয়া ফেলিয়া, সুপতি ঘোষের হাত হইতে কলিকাটী কাড়িয়া লইয়া তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "ঠিকই তো, বাইরে গিয়ে শুধু ছুটোছুটী, এই বেশ আছি বাবা,—"

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। দূরে দূরে দু'একটী বাড়ী হইতে

শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিল, অন্ধকার ভারী হইয়া চতুর্দ্দিকে ছাইয়া ফেলিল।

ইহাদের জীবন ধারণের প্রণালী দেখিয়া চমকাইতে হয়। আজ দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পর নানা দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সেই বিদেশ সম্বন্ধে উহাদের কোন প্রশ্ন নাই, ঔৎসুক্য নাই, কৌতূহল নাই। নৃপতি ঘোষের সেই ছোট্ট ছড়িগাছটী আজও রহিয়াছে। হ্যারিকেণ লণ্ঠনটীকে মাজিয়া ঘসিয়া চকচকে রাখিবার অভ্যাস তেমনই দেখিতেছি। নিজহাতে জামা কাপড় সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে, বৈকালে বাবু সাজিয়া বেড়াইবার ধারা পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মাধব সা ও যদু সা সমস্তদিন তাহাদের পচুই মদের দোকান লইয়া ব্যস্ত থাকে। মদ ও মাতাল লইয়া সারা সকাল-সন্ধ্যা কাটাইয়া দিয়া রাত্রে দিব্য ভদ্রবাবু সাজিয়া, এখানে হাজির হয়। উহাদেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। শুঁড়ী দোকানের তীব্র গন্ধকে চাপা দিবার জন্ম সস্তা এসেন্সের তীক্ষ্ণ গন্ধ নাকে আসিয়া মস্তিষ্ক ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। যদু সা ও মাধব সা এমন বাবু ও ভদ্রব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে।

যদু সা বলিল, "নৃপতি তোমার মোকর্দ্দমাটা কবে হে? আমাদের তো এবার যেতে হবে। বুঝলে, কাল সেই বেটা এসেছিল। সেই মুকুন্দ, ওদের সেই বাশ কাটা মোকর্দ্দমাটা হে। আমাকে খুব ছটে-পটে ধরেছে। ওদের মোকর্দ্দমাটার তদ্বির করতে হ'বে। কি বললে মাধব, অমনি করব, ভারী আমার দায় পড়েছে। যাতায়াত খরচ দেবে, খ্যাট দেবে, তারপর নগদ দশটাকা, শুধু শুধু অমনি খাটছি আর কি? আর খান কয় লাঙল দেবে, বুঝলে না, ভুইটা চষিয়ে নেব। সেও ওদের খরচ।"

মাধব সা বলিল, "বেশ দাদা, আমিও যে ওপক্ষে তদ্বির করছি। তবে আমিও দশটা টাকার কম ছাড়ছিনি। এস, দু'জনে দুয়ে নিই। করুক না বেটারা কত মামলা করতে পারে। বুঝলে, আর একটা মোকর্দ্দমা লাগল বলে। কাল বলাই স্যাকরার সঙ্গে কেষ্টা কলুর তুমুল ঝগড়া। কেষ্টাকে বেশ করে উস্কে দিয়ে এসেছি। তুমি কিন্তু যাবার সময় বলাই স্যাকরার ওখান দিয়ে হয়ে যাবে। যাতে বেশ জুত করে এক নম্বর হয় তার চেষ্টা করবে। বুঝলে, লেগে যাক না।"

অবাক হইয়া উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলাম। পৃথিবীতে আজ নূতন সমাজের সৃষ্টির জন্ম কতজন আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, দেশেব স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্ম লক্ষ লক্ষ লোক ত্যাগ স্বীকার করিতেছে, দুঃখ বরণের ভিতর দিয়া কোটী কোটী নরনারী স্বেচ্ছায় মৃত্যু-মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে। এক বিরাট আনন্দময় চেতনায় বৃহত্তর কল্যাণ কামনায় আজ দেশের যুবকবৃন্দ অসংখ্য বেদনা, অসংখ্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতেছে। কিন্তু এই সব ইতিহাস ইহাদের অজ্ঞাত! কতজন জীবনকে জানিবার জন্ম সাগর লঙ্ঘন করিতেছে, হিমালয়েব শিখরদেশে দুঃসাহসিক অভিযান করিতেছে, লাঙলের ফলায় পৃথিবীর অনুর্ব্বর জমিকে শস্য-শ্যামলা করিতেছে, নির্ভীক জীবন লইয়া তাহারা ক্ষত্রিয়ের মত বিপদের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। আর ইহারা, সেই গ্রামের সীমানায় ক্ষুধাতুব পুত্র-কন্যা লইয়া অপরের নিন্দা হিংসা করিয়া, অপরের সমূহ ক্ষতি করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে। কী ঘৃণিত কুৎসিত ইহাদের জীবন। আমার সমস্ত শরীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মাধব সা বলিল, "ভাই নৃপতি, তুমি তো ইউনিয়নবোর্ডের হাকিম। ভাই, ও বেটাকে মানে কালীদেকে জব্দ না করতে পারলে আর চলছে না। বুঝলে, সেই কাপড়ের দরুণ মাত্র দু'টো টাকা পাবে। তার জন্ম কাল হাটেব মাঝে অপমান করে দিল। বেটার এতবড় বুকের পাটা হয়েছে। দাওনা একটা রিপোর্ট দিয়ে, ব্যাটার ইনকম্ ট্যাক্সটা বসিয়ে দাওনা। বেশ মোটা রকমের যাতে হয় তার একটা ব্যবস্থা করে দাও। আর বুঝলে, স্যানিটারী ইনেস্‌পেক্টারকে একটা চিঠি দিয়ে দাও। বেটার তেল, ঘি, এসব একবার নিয়ে যাক। তারপব, যাতে মোটা রকমের কিছু হয়, তাব একটা ব্যবস্থা করে দাও।"

নৃপতিবাবু তামাক টানিতে টানিতে, ফোকলা দাঁতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাই আমি কি চুপ করে আছি।—ওকে নাজেহাল করে তবে ছাড়বো। হাতে যখন ক্ষমতা আছে, তখন ভাল করে না দেখে ছাড়ব ভেবেছ। মোটেই না—এ তুমি দেখে নিয়ো। সেবার আমার বাড়ী ও কিনা অস্থাবর ক্রোক নিয়ে আসে, বলি জানতো সবই। আমি

এই পনেরখানা গাঁয়ের হাকিম, আমি কি একটা হেঁজী-পেঁজী লোক, বল দেখি ভাই।"

মাধব সা আনন্দের সঙ্গে ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিল।

নৃপতিবাবু বলিলেন, "তুমি তো বহুদিন দেশছাড়া, এখানে দু'চার দিন থেকে দেখ। ঐ যে কালী দে, হাটের মাঝে মস্তবড় মুদীখানা আর কাপড়ের দোকান,—বুঝলে, বেটা ভারী পাজী, ভারী বদ। দুদিন থাক, সবই বুঝতে পারবে।"

আমি তাকাইয়া ঘরের চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম। ঘরের চারিদিকে জীর্ণ আসবাব-পত্র। ছাদের কড়ি বরগা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—একপাশের ছাদ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। দেওয়ালের বালি জমাট সব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নৃপতিবাবু এই ভাঙ্গা ঘরে, ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া, গুড় মিশ্রিত চা পান করিতে করিতে ভক্ত ও স্তাবকগণের প্রশংসা শুনিয়া নিজেকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়া আছেন। ভাবেন, এই জঙ্গলঘেরা শ্মশান-তুল্য গ্রামের বাহিরে বুঝি সমাজ নাই, দেশ নাই, মানুষ নাই।

*

দুই দিনেই হাঁপাইয়া উঠিলাম। কিন্তু উহারা বেশ আছে। সকাল সন্ধ্যা নানা ছোট ছোট সংসারের কাজ করিয়া ইহার উহার নিন্দা করিয়া, পরচর্চ্চা ও আজগুবি গুজবে বিশ্বাস করিয়া দিন কাটাইতেছে। ছোটখাট ঘরোয়া ঝগড়া, ছোটখাট নানা কথাবার্ত্তায় সমস্ত দিন মসগুল থাকিয়া, সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণের জন্য নৃপতিবাবুর বাড়ীতে চা, তামাক খাইয়া নির্ব্বিবাদে জীবনের এতগুলি বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছে। কোন বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ নাই। দেশ-বিদেশের ঘটনা, নূতন নূতন আবিষ্কার, ভাল সাহিত্য সঙ্গীত—এই সবের দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে পিঠ ফিরাইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত জীবন কাটাইতেছে।

উহাদের জীবনের এই কুৎসিৎ রূপ, ভীরুতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও দৈন্যের মাঝে, কোনরূপে টিকিয়া থাকিয়া চরম দুঃখের জীবন্মৃত জড়-জীবন লইয়া, অবশেষে মৃত্যুর মাঝে সব অবসান হয়। উহাতে যে ইহারা কি আনন্দ পায় বুঝিলাম না।

কিন্তু আমার দিন-রাত্রির প্রতিটি ক্ষণ দুর্ব্বহ পাষাণের মত বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে। উহারা সামান্য কলহ, মামলা-মোকর্দ্দমা এবং কোন কোন কালে এক আধ বেলা নিমন্ত্রণ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, উহাদের নাড়ীতে নাড়ীতে আনন্দের বন্যা বহে।

এক চরম মানসিক হীনতা উহাদের জীবনকে এক কাণা গলিতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, বারেকের তরে উহারা সূর্য্যকরোজ্জ্বল রাজপথে ফিরিয়া আসিতে ভয় পায়।

কিন্তু আমার প্রাণ সেইখানেই ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেখানে সীমাহীন বালুর সমুদ্র পার হইয়া বণিকের দল মরুভূমি পার হইতেছে, সেই দিগন্ত-বিস্তৃত তপ্ত বালুর অগ্নিশয্যায় মাঝে মাঝে ওয়েসিস্,—তাহাই আমায় সবলে টানিতেছে।

আমি চাই জীবন, যে জীবন স্মার্ণা হইতে ইস্পাহান, ইরাক্ হইতে প্যালেষ্টাইনে, এবং চীন, জাপান ও আমেরিকায় কাটাইয়াছি। আমার কাণে বাজিতেছে, টাইগ্রীস্ ও ইউ-ফ্রেটিসের কল্লোল-ধ্বনি। আমার চক্ষের উপর ভাসিতেছে নীল পাথরের গায়ে তাম্রাভ সূর্য্য। আমি দেখিতে[illegible] দিগন্তপ্রসারিত মরুভূমি, যেখানে বণিকের দল সারি স[illegible] উটের পৃষ্ঠে বাণিজ্যসম্ভার চাপাইয়া দীর্ঘ আল্‌থাল্লা[illegible] আচ্ছাদিত হইয়া তপ্ত মরুভূমি পার হইতেছে। কোথায় সেই বন্ধুর পথ, সেই আন্দামানের তীরভূমি, আমেরিকার জলন্ত জীবন, আর বিসুবিয়াসের পিঙ্গল গহ্বর! দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথ, নূতন নূতন অজানা লোক, নূতন নূতন সমাজ-ব্যবস্থা, আর হেনরী ফোর্ডের বিশ্ব-কর্ম্মশালা। আমি উহাদের চাই। আমি চাই বেগময় জীবনের তপ্ত আস্বাদ। এই স্তিমিত, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ গ্রাম্য-জীবনকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি; আর ঘৃণা করি, এই সব পরশ্রীকাতর, নীচমনা, অর্দ্ধ-শিক্ষিত ভদ্র অধিবাসীদের।

বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা

শ্রীকানু

ইউরোপের যুদ্ধ বহ্নি ক্রমশঃ সুদূর প্রাচ্যে ছড়াইয়া পড়িল। এ যুদ্ধের যে শেষ কবে তাহা লইয়া বহু জল্পনা-কল্পনা—পরিশেষে ভবিষ্যত বাণীও করা হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধটা এমনি বেয়াড়া হইয়া উঠিয়াছে যে, কাহারও কোন কথারই ধার ধারিতেছে না। মহা মুস্কিল! এই মুস্কিল যে কবে আসান হইবে, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিতেছেন না। বৈজ্ঞানিকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম কবিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। রাজনীতিকগণ ঘন ঘন গোপন বৈঠক বসাইতেছেন কিন্তু কোন সমাধানে আসিতে পারিতেছেন না। বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা,—গোলা বারুদের আওয়াজ ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। কোথাও শান্তি নাই! সর্ব্বত্র হাহাকার!! বর্ত্তমানে এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে ধরণীর বক্ষে কোনরূপে প্রাণটুকু লইয়া ব্লাক আউটের অন্ধকারে বাঁচিয়া আছি বলিলেই চলে। এ বাঁচার যে কি সুখ, কি আনন্দ তাহা বোধ করি পৃথিবীর লোকদের বলিতে হইবে না।

এ যুদ্ধ যে শুধু আমাদেরই ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে—স্বর্গেও প্রভুত ক্ষতি হইতেছে। এ দিকে মা কালী মহাদেবের ঘর সামাল দিতে পারিতেছেন না। ঘরে আহার নাই তবুও তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে হইবে, কিন্তু কি যে রাঁধিবেন তাহারও কোন ব্যবস্থা মহাদেব করেন নাই। এই লইয়া স্বামী স্ত্রীতে তুমুল দন্দ্ব সুরু হইল। হিটলার জার্ম্মানীকে খাওয়াইতে পারিতেছেন না তাই তিনি যাহাব কাছে খাদ্য দেখিতেছেন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু মহাদেব কাড়িবেন কাহার কাছ হইতে? কলহেরও কোন সমাধান মহাদেবের গেঁজোলো মাথায় ঢুকিতেছে না। উপায়! উপায় মা কালী স্বয়ং ঠিক করিলেন। খাওয়ার জন্য যদি কলহ করিতে হয় তাহা হইলে মর্ত্তে গিয়া করাই ভাল কিন্তু মুস্কিল হইতেছে কালিঘাটের পাণ্ডাদের হাত হইতে রেহাই পাইবেন কি করিয়া? এমন সময় দূত আসিয়া জানাইলেন, মহারাজ ইন্দ্র সভা আহ্বান করিয়াছেন—বিশেষ জরুরী সভা। অতএব তাহাদের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়।

অগত্যা তাঁহাদের কলহ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখিয়া দু'জনেই সভাভিমুখে রওনা হইলেন। যমরাজ পদত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে স্বর্গে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। এই পদত্যাগ হইতেছে সভার আলোচ্য বিষয়। এই জন্যই সভামণ্ডলে গম্ভীরভাব বিরাজ করিতেছিল। সভাপতির আসন সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহারাজ ইন্দ্রই গ্রহণ করিলেন। মহাদেব স্থান কাল ভুলিয়া গিয়া তাহার চির অভ্যস্ত নেশার আয়োজন কবিতেছিলেন এক কোণে বসিয়া। আর তাঁহারই পাশে বসিয়া আছেন পৃথিবীর একজন প্রতিনিধি।

মহারাজ ইন্দ্র কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই যমবাজকে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনার পদত্যাগের কারণ বিশ্লেষণ করুন?"

যমরাজ ধীর স্থির ভাবে, সাধারণ ভদ্রতা বজায় রাখিয়া করজোড়ে কহিলেন, "আমার পদত্যাগের কারণ আর কিছুই নয়—মর্ত্তে এত যে লোক ক্ষয় হইতেছে তাহার হিসাব রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। চিত্রগুপ্ত জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাহার পেন্‌সন্ লইবার বয়স অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সেই কারণেই তিনি খাতার মধ্যে নাম রেজিষ্ট্রি করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় লোক পাইতেছি না যে তাহার পরিবর্ত্তে কাজ করে। তবুও চালাইয়া লইতে পারিতাম কিন্তু আজ কাল 'জোর যার মল্লুক তার'-এর যুগ। জার্ম্মানী দাবী করিতেছে তাহারা এত সৈন্য নিহত করিয়াছেন ব্রিটেন তাহা অস্বীকার করিতেছে। এখন কাহাকে বিশ্বাস করিব?"

যমরাজের কথা শেষ হইলে পর মহারাজ ইন্দ্র বলেন, "তাহা হইলে মর্ত্ত হইতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসুন যাহার দ্বারা এ কাজ করানো যাইবে!"

উত্তরে যমরাজ বলিলেন, মর্ত্তের খবর বোধ করি আপনি অনেক দিন অবগত নহেন। যে সকল লোক বর্ত্তমানে মর্ত্ত্য হইতে আসিতেছে তাহাদের মিলিটারি মেজাজের সাথে তাল দিয়া কাজ করা অসম্ভব। অতএব আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যের জার্ম্মানী নামক স্থান হইতে

হিটলারকে ধরিয়া আনিয়া যমরাজের পদে নিযুক্ত করুন। ইহাতে যুদ্ধও থামিবে, লোকক্ষয়ও কমিবে।”

সভাস্থ সকলেই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, “ইহা হইতে পারে না! তাহা হইলে স্বর্গের মান থাকিবে না।”

একমাত্র মর্ত্ত প্রতিনিধি এই কথা শুনিয়া একটু মুচকিয়া হাসিলেন। মহাদেব এতক্ষণ নেশায় অভিভূত ছিলেন। মর্ত্ত্য প্রতিনিধিকে হাসিতে দেখিয়া কিছু না শুনিয়া না বুঝিয়া ধাক্কা দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে,ইহা হাসির স্থান নয়—জটীল সমস্যার সমাধান হইতেছে।

অবশেষে পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইল না বলিয়া যমরাজ বিষণ্ণ বদনে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় স্বর্গের প্রধান দূত আসিয়া সভায় সংবাদ জানাইল—মর্ত্ত হইতে এরোপ্লেনে করিয়া একজন ব্রিটিশ রাজদূত মহারাজ ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে চান। এরোপ্লেনের নাম শুনিয়া সবাই চমকাইয়া উঠিলেন। বিশেষ করিয়া সর্ব্ব পরিচিত নারদমুনি। তিনি একবার ভ্রমনকালে এক মর্ত্ত্যবাসীর গুলিতে আহত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে ভ্রমন করা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমতাবস্থায় চমকাইল না একমাত্র মর্ত্ত্য-প্রতিনিধি। ব্রিটিশ রাজদূতকে নিয়া আসিতে আদেশ দেওয়া হইল কিন্তু ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল যে, এরোপ্লেন যেন বাহিরে থাকে।

ব্রিটিশ রাজদূতের আগমনের কারণ না বলিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। তাই একটু বলা প্রয়োজন বোধ করি। মর্ত্তে যে সকল দেশ বা সাম্রাজ্য আছে তাহার মধ্যে একমাত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। বোধ করি এই ধারণা মনে পোষন করিয়াই ব্রিটিশ রাজদূত তাহাদের আর্জ্জি পেশ করিতে স্বর্গের দরবারে গিয়াছিলেন। প্রথমে কিন্তু তিনি একটু ভুল করিয়াছিলেন এবং পরে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ব্রিটিশ রাজদূত সভায় প্রবেশ করিয়াই প্রথমে মহারাজ ইন্দ্রকে পরে সভাস্থ সকল দেব দেবীকে মিলিটারী কায়দায় সেলুট করিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার বুটের শব্দ শুনিয়াই যাহারা একটু অন্যমনস্ক বা প্রেমালাপ করিতেছিলেন তাহারা চমকাইয়া গেলেন। তারপরে ব্রিটিশ দূত বলিলেন, “মহারাজ, বিশ্বশান্তির ভার এতদিন আমাদের উপরেই ছিল এবং সেই দাবী নিয়াই আজ আমাকে আপনাদের কাছে আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে কয়েকটি সংবাদ দিবার জন্য।”

মহারাজ একটু কাশির শব্দ করিয়া বলিলেন—“কি সংবাদ?”

ব্রিটিশদূত বলিলেন—“মর্ত্ত্যে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপান—এদের কিছুতেই বাগে আনা যাইতেছে না। এতদিন জার্ম্মানী ও ইতালীকে শায়েস্তা করিয়া আনিয়াছিলাম—এমন সময় জাপান ঐ শয়তানদের দলে যোগ দিয়া আমাদের বড়ই বিপদে ফেলিয়াছে। আবার তার উপরে ভারতবর্ষে সুভাষ বোস, গান্ধী, জওহরলাল এরা বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। আমরা কোন দিক যে সামাল দিব তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই অবস্থায় একটি মাত্র উপায় আছে এবং তাহার সমাধানের উপায়ও আপনার হাতে।”

“কি উপায়?” মহারাজ ইন্দ্র বলিলেন।

ব্রিটিশ দূত—“বর্ত্তমানে আমাদের যুদ্ধ পরিচালনা করিবার লোকের অভাব হইয়া পড়িয়াছে উপযুক্ত লোকই পাওয়া যাইতেছে না। যদি স্বর্গ হইতে এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কাহাকেও পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বিশ্বশান্তি অনিবার্য্য।”

সভাস্থ সবাই এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন বিশ্বশান্তি হইবে এই আশায়। এখন সমস্যা হইল, কে যাইবে এ যুদ্ধে মহারাজ প্রত্যেককে অনুরোধ করিলেন কিন্তু কেহই রাজী হইলেন না। নারদমুনি মর্ত্তের নব আবিষ্কৃত বোমা প্রভৃতির যে বর্ণনা করিয়াছেন ইহার পরে যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে কাহারও যাওয়া উচিত হইবে না। মহারাজ ইন্দ্র অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া স্বর্গের মান রক্ষা করিবার জন্য নিজেই যাইবেন স্থির করিলেন।

মা কালী এই রকমই একটি সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। রোজ রোজ মহাদেবের সাথে ঝগড়া করিয়া দিনাতিপাত করার চেয়ে মর্ত্তের সেনাপতিত্বটা যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে মন্দ কি? ইহাতে মহাদেবও জব্দ হইবেন। মহাদেবকে জব্দ করিবার জন্যই হোক আর মহারাজ ইন্দ্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই হোক অথবা নিজের কোন গোপন উদ্দেশ্য সফলের জন্যই হোক, মা কালী যুদ্ধে যাইতে রাজী

হইলেন। তবে তাহার একটি সর্ত্ত আছে। উৎসুক হইয়া সবাই প্রশ্ন করিলেন, "কি সর্ত্ত ?" সায় দিলেন না শুধু মহাদেব। তিনি একবার তীব্র দৃষ্টিতে মা কালীর পানে চাহিলেন।

মা কালী বলিলেন, "কালিঘাটের মন্দিরে আমি পাণ্ডাদের দ্বারা আবদ্ধ আছি এবং সেই বন্ধন হইতে আমাকে মুক্তি দিতে হইবে। আমার নাম করিয়া যে ব্যবসা চলিতেছে তাহাও বন্ধ করিতে হইবে।"

ব্রিটিশ রাজদূত তৎক্ষণাৎ বেতারে বড় কর্ত্তাদের নিকট অনুমতি চাহিলেন। উত্তরে শুধু তিনি বলিলেন, "এ সর্ত্ত মানিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজী আছেন।"

মর্ত্তে এ সংবাদটী গোপন রাখিবার চেষ্টা করা হইলেও কালীঘাটের যাত্রীদের কাছে অজানা রইল না। এ দিকে মা কালী এতদিনের সম্বন্ধ একদিনেই কাটিয়া ফেলিবেন—তাই তিনি তাহার এক প্রিয় শিষ্যকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই হোক বা নিজের দুর্ব্বলতার জন্যই হোক স্বপ্নে জানাইলেন তিনি যুদ্ধে যাইতেছেন।

ব্রিটিশ রাজদূত এইখানেই ভুল করিয়াছিলেন যে জার্ম্মানদের স্পাই শুধু মর্ত্তে নাই স্বর্গেও আছেন, ঐ যে মর্ত্ত-প্রতিনিধি যাহাকে আপনারা সভায় দেখিয়াছিলেন—তিনিই [illegible]তেছেন হিটলারের মাসতুতো ভাই। তিনি এই সংবাদের সময় বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া হিটলারকে নিজ [illegible] সম্বন্ধে বেতার করিয়া জানাইলেন।

উত্তরে হিটলার বলিলেন, "এই বিপদের একমাত্র [illegible]তিষেধক হইতেছেন দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি যাহাতে [illegible]র্ম্মানের পক্ষে যুদ্ধ করেন তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।"

হিটলারের মাসতুতো ভাই বা মর্ত্ত-প্রতিনিধি এ সব ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী। সুতরাং মহাদেবকে ভুলাইতে বা দলে টানিতে বিলম্ব হইল না। মহাদেবও মা কালীর উপর চটিয়াই ছিলেন। কেবলমাত্র একটা কেলেঙ্কারী হইয়া যাইবে এ জন্য এতদিন তিনি চুপ করিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুযোগ উপস্থিত। তাই তিনি সম্মত হইয়া গেলেন তবে তাহারও একটি সর্ত্ত আছে। সর্ত্তটি এই যে তাহাকে নিয়মিতভাবে নেশার সর্ব্ববিধ জিনিষ সর্ব্বদা সরবরাহ করিতে হইবে। জার্ম্মান স্পাই তখনি রাজী হইলেন এবং বলিলেন জাপানে আপনার জন্য একটি কারখানা খুলিয়া দিব আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।

সংবাদ পাওয়া গেল, মা কালী সিঙ্গাপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। অতএব মহাদেবও সেই স্থানেই যুদ্ধ করিতে যাইবেন। ঘোরতর যুদ্ধের সূচনা দুই দলই দর্শাইতে লাগিলেন। দুই দলই ভাবিতেছেন, এবার আর আমাদের সাথে কে পারিবে ? আরও জানা গেল এবার আকাশ যুদ্ধই হইবে।

মা কালীর দুই পাশে বসিয়াছেন জেনারেল ওয়াভেল ও ডাফকুপার আর চালাইতেছেন একজন সুদক্ষ ভারতীয় বৈমানিক এবং পিছনে আসিতেছেন সদলবলে চার্চ্চিল সাহেব কাগজপত্র লইয়া। তিনি জানেন যে মা কালী যখন স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন তখন শত্রুরা নিশ্চয়ই সন্ধি করিতে আসিবে সুতরাং কাগজপত্রের প্রয়োজন আছে। কারণ, শুভস্য শীঘ্রম্।

মহাদেবের দুই পাশে বসিয়াছেন গোয়েবল্‌স ও তোজো এবং চালক স্বয়ং গোয়েরিং। হিটলার পিছনে সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিতেছেন। মহাদেবের এরোপ্লেনে বোমার চেয়ে 'ব্যোম'-এর নেশার সরঞ্জামই বেশী আছে।

দু'খানা এরোপ্লেনেই একটু অদ্ভুত রকম ছিল। মা কালীর খানি ছিল একদম কালো আর মহাদেবের খানা ছিল ধবধবে সাদা—সম্মুখে ধুতুরা ফুল আঁকা। দুই দলই এই অদ্ভুত প্লেন দু'খানা দেখিয়া লইলেন। কেহই ঠিক করিতে পারিলেন না যে কোন দেশী বিমান। দুই দলই দুই দলকে বেতারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"Who are you ?" কোন উত্তর নাই। ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল নিকটবর্ত্তী আসিলে মহাদেবের প্লেন হইতে বোমার বদলে গ্যাসের সাথে তীব্র মদিরার গন্ধ ছাড়িতে লাগিলেন। ইহাতে মা কালীর মনে খটকা লাগিল কারণ এরূপ গন্ধ পাওয়া যাইত শুধু মহাদেবের গৃহে। তাই তিনি নিজে দূরবীণ দিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ বড় হইয়া গেল। মা কালীর অবস্থা দেখিয়া ডাফকুপার বলিয়া উঠিলেন—"What has happened Goddess Kali ?"

মা কালী বলিলেন—"Don't you see that my husbend is coming, so there cannot be any fight. There must be peace. Do please send a message for peace."

এতগুলি কথা মা কালী কোন দিনই ইংরেজীতে বলেন নাই। তাই তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন। এতদিনের বিরহটা যেন যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রবল হইয়া উঠিল। অগত্যা শান্তির বাণী প্রেরণ করা হইল। যখন তাঁহারা কাছাকাছি আসিলেন তখন তাঁহারা যুদ্ধ ভুলিয়া প্রেমালাপ সুরু করিয়া দিলেন এবং পরস্পর পরস্পরে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। ঠিক হইল, মহাদেব সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষ আনিয়া দেবেন এবং মা কালী নির্ব্বিঘ্নে গৃহস্থালীর কাজ সম্পন্ন করিবেন। সুতরাং যুদ্ধ থামিয়া গেল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তির বাণী প্রচার করা হইল।

ব্যাপার দেখিয়া মার্শাল গোয়েরিং, তোজো ও গোয়েবল্‌স্ প্যারাসুটে নামিয়া পড়িলেন। দেখাদেখি ওয়েভেল ও ডাফকূপারও প্যারাসুটে ঝাঁপ দিয়া অনভ্যাস বশতঃ পা ভাঙ্গিয়া বসিলেন।

দুই পক্ষেরই সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল—শান্তির জন্য নয়। সুতরাং প্রথমে বেশ হাতাহাতি আরম্ভ হইয়া গেল এবং থামিল তখন—যখন মহাদেব জানাইলেন যে, "যুদ্ধ যদি সুখ-শান্তিতে বাস করিবার জন্যই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি সকলকে বলিতেছি যে, যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। মা কালী তাঁহার রণমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া সংসারকার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন। অতএব আমার গৃহে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তখন বিশ্বের সকল গৃহেই শান্তি হইবে—কেবল তাঁহাদেরই হইবে না, যাহারা এতদিন ধরিয়া মিথ্যা একটা লোভ দেখাইয়া তোমাদের হিংস্র দন্ত করিয়া তুলিয়াছে। দেশের স্বাধীনতার নাম করিয়া তোমাদের রক্তের আস্বাদ পাইতে শিখাইয়াছে, আর তোমাদের মতো কোটি কোটি হতভাগার গৃহে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। অতএব তোমরা যুদ্ধ না করিয়া সেই সকল শয়তানদের শাস্তির ব্যবস্থা কর—তাহাদের ক্ষমা করিলে তোমাদের পাপ হইবে। আমার আর কিছু বলিবার নাই—কেবলমাত্র অনুরোধ করিতেছি, মিথ্যা লোভের বশবর্ত্তী হইও না।" এই বলিয়া মহাদেব মা কালী সহ চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাঁহারা যুদ্ধের ভয় দেখাইতেছিলেন তাঁহারা মহাদেবের বক্তৃতা শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাঁহারা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই যে মহাদেব এরূপ ভাবে তাঁহাদের পথে বসাইবেন। এখন তাঁহাদের এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, যদি কেহ তাঁহাদের দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহাদের পৈতৃক প্রাণ লইয়া বাঁচা দুষ্কর হইবে। সুতরাং শত্রু-মিত্রের, দুই দলেরই নেতারা এক হইয়া গেলেন এবং "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই নীতির অনুসরণ করিলেন।

এদিকে শত্রু ও মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিল। তাহারা দেখিল যে যেজন্য এত লোক ক্ষয়, তাহার ভার যখন স্বয়ং মহাদেবই গ্রহণ করিলেন, তখন এই যুদ্ধের আর প্রয়োজন কি? যদি সকলে মিলিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া শান্তিতে বসবাস করিতে পারে তাহা হই[illegible] এত হাঙ্গামা তাহারা কেন করিবে? অতএব যুদ্ধ থামি[illegible] গেল এবং বিশ্বশান্তির বাণী একই সময়ে নেতারে সকল দেশে প্রচারিত হইল।*

---

* কলিকাতায় একটা গুজব যে মা কালী নাকি যুদ্ধে গিয়াছেন—এই গুজবে অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিত

দেশের সেবা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তিন

সুব্রত তাহার কর্ম্মকেন্দ্র মূলগ্রামে এক অপরাহ্ণে আসিয়া পৌঁছিল। সে যে পথে আসিয়াছিল সেই পথটুকুর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাহার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। একটি খালের মধ্যদিয়া তাহাকে আসিতে হইয়াছে। খালের দক্ষিণ দিকে জলমগ্ন চর। তার পরেই বিশাল পদ্মা। চরের মধ্যে কৃষক পল্লী! কৃষকেরা সেখানে স্ত্রী-পুত্র, গরু-বাছুর লইয়া বাস করে, কি দুঃসাহসিক তাদের জীবন!

খালের উত্তর দিকে গ্রামের পর গ্রাম। কোথাও হিজল গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়া আছে। মৃদু সৌরভ ছড়াইয়া দিয়া ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে। আমের বন, বাঁশের ঝোপ, কলাগাছ, ছাতিয়ান বা সপ্তপর্ণী গাছ সব দেখা যাইতেছে। লোকজন ছোট ছোট নৌকায় করিয়া খালের জলে ভর্ ভর্ শব্দ করিতে করিতে যাইতেছে। কোন নৌকায় ধান বোঝাই, কোন নৌকা হাটের- নানা বেসাতি লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। দক্ষিণে অদূরে পদ্মা তার বিরাট সলিল স্রোত লইয়া বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। ষ্টীমারগুলি ধোঁয়া উড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে চাঁদপুর, গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জের অভিমুখে।

মূলগ্রামে যে বাড়ীতে সুব্রতের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সে বাড়ীর কর্ত্তা শিবানন্দ সেনের নাম দেশের সকলেরই পরিচিত। বিচক্ষণ চিকিৎসক হিসাবেও যেমন তিনি যশস্বী ছিলেন, তেমনই একজন দেশ সেবক এবং দানশীল ও পরোপকারী ব্যক্তি বলিয়াও সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। গ্রামের দীন-দুঃখী, স্ত্রী-পুরুষ দুইবেলা তাঁহার কাছে ঔষধ লইতে আসিত। শুধু ঔষধ দিয়াই তাঁহার অবসর ছিল না, পথ্য জোগানো এমন কি তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থাও করিতে হইত এই কবিরাজ মহাশয়কে।

কবিরাজ মহাশয় একালের লোক না হইলেও, একালের লোকদেরই মত গ্রামের ও সমাজের নানা কথা ভাবিতেন। তাঁহার ভাবনাটা শুধু বাক্যের মধ্যে নিহিত ছিল না, কার্য্যের মধ্য দিয়াই তাঁহার আদর্শ ফুটিয়া উঠিত। গ্রামের কতলোক যে তাঁহাকে ছলনা করিত, কিন্তু সে ছলনায় তাঁহাকে বিচলিত করে নাই কোনদিন। বাঙ্গালাদেশে যখন প্রথম স্বদেশীর বন্যা আসিয়াছিল সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তরুণ বয়সে শিবানন্দ সেন গ্রামে গ্রামে, বাড়ী বাড়ী বোম্বাই মিলের কাপড় মাথায় করিয়া ফেরী করিতেন এবং বাড়ী বাড়ী কার্পাস গাছ পুতিয়া এবং চরকা বিলাইয়া স্ত্রী পুরুষ সকলকে চরকা কাটিয়া দৈন্য ঘুচাইবার জন্য ডাকিতেন। আজ বৃদ্ধ হইয়াও তাঁহার সেই উৎসাহ ও কর্ম্মক্ষমতা ছিল আগের মত তীব্র, কিন্তু দেহ হইয়া আসিয়াছিল অপটু। এ বয়সে সময়ে সময়ে নিরাশ হইতে হইত তাঁহাকে, কেন না যাহাদের জন্য কাজ করা তাহারাই যে নিজেদের ভাল মন্দ বুঝিতে চাহে না। গ্রামের জেলেরা, চাষারা, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা কেহই যে কাজ করিতে চায় না—চায় শুধু ভিক্ষা। গ্রামের পথ-ঘাট জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, পুকুর কচুরিপানায় ঢাকা পড়িয়াছে, সেদিকে কাহারও যত্ন নাই এমনই অলস ও অকর্ম্মণ্যদিগকে লইয়াই তাঁহার কাজ।

শিবানন্দ সেন মহাশয়ের আত্মীয়েরা বলিতেন, কলিকাতা, ঢাকা বা অন্য কোনও বড় সহরে যদি ব্যবসা করিতেন তবে আপনার পসার যেমন বাড়িত তেমনি দেশের লোকও জানিতে পারিত আপনার মহত্ত্বের কথা। কিন্তু তিনি বলিতেন, "গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাব না।" মনের মধ্যে বর্ত্তমান অগ্রগতির সহিত সংযোগ রাখিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল ছিল, তাই ভাবিয়াছিলেন যদি বাহিরের কেহ আসিয়া নূতন একটা প্রেরণা জাগাইয়া দেয় তবে হয় ত' দেশের কল্যাণ হইতে পারে। তাই তিনি প্রায়ই প্রসিদ্ধ বক্তা ও কর্ম্মীদিগকে আহ্বান করিতেন। কিন্তু তাঁহারা গ্রামে আসিবার জন্য যে রাজসিক ব্যয়ের বরাদ্দ উপস্থিত করিতেন তাহাতেই তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইত। আর দেখিতেন, ইঁহারা প্রকৃতভাবে দেশের কাজকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে চান না। তাই ওসব দিকে বড় একটা মন দিতেন না। সুব্রত কয়েকটি গ্রাম ঘুরিয়া তাঁহারই অনুরোধে মূলগ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া কাজ করিতে আসিয়াছিল।

সে মূলগ্রামে আসিয়া দেখিল শিবানন্দ কবিরাজ মহাশয়ের বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপটিতে গ্রামের লোকের একটি সভা বসিয়াছে। শতরঞ্চের উপর পরিষ্কার চাদর পাতা। কয়েকটি তাকিয়াও আছে। যাহারা বসিয়াছিলেন তাহাদের অনেকেরই গায়ে সামান্য একখানি উত্তরীয়, মলিন, বিবর্ণ পৈতা ঝুলিতেছে। আর অদূরে চণ্ডীমণ্ডপের এককোণে একটি সুন্দরী তরুণী নম্রভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সুব্রতকে দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় উঠিলেন এবং সাগ্রহে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একজন ভৃত্যকে সুব্রতের জিনিষ-পত্র ইত্যাদি আনিয়া বৈঠকখানা ঘরের পাশের অতিথিদের থাকিবার নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে রাখিবার সব ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, "আমরা আজ একটা গ্রাম্য বিচারে ব্যস্ত আছি। আপনি বিশ্রাম করুন। পরে কথা হবে। আমি রাত্রিতে আপনার সঙ্গে আলাপ ও আলোচনা করবো।" সুব্রত কহিল, 'আপনি যেমন অনুমতি করবেন তাই হবে। সুব্রত তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে চলিয়া গেল।

সুব্রতের ঘরখানি ছোট হইলেও বেশ সুন্দর করিয়া সাজানো ছিল। করোগেটেড টিনের ছাওয়া। বেড়া কাঠের। ঘরের মেজটা ইট দিয়া বাঁধানো, সিমেণ্ট করা। একপাশে একখানি ছোট খাট। মাঝখানে একটি ছোট টেবিল, টেবিলের সম্মুখে একখানি চেয়ার। ঘরের আর একদিকে জামা কাপড় রাখিবার আলনা। বেড়ার গায়ে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্যার আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের বড় রঙিন ছবি টাঙানো। এক কোণে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার ঘটি, কুজো ও গ্লাস, ধোয়া তোয়ালে সযত্নে পাট করিয়া সাজানো। টেবিলের উপর ছোট একটি মোরাদবাসী ফুলদানির মধ্যে যুঁই ফুলের স্তবক। ঘরটি ক্ষুদ্র, যুঁইয়ের মধুর সুরভিতে সৌরভময় হইয়াছে। ভিতরে চারি দিকেই জানালা। জানালার মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছিল নদী। এই নদীর নাম মানচিত্রে পুরাণো ব্রহ্মপুত্রের খাত বলিয়া লিখিত, কিন্তু গ্রামের কবি নাম দিয়াছেন রাতরেখা। সুব্রতের কাছে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরখানি বেশ ভাল লাগিয়াছিল। সে জামা ছাড়িয়া শুধু গেঞ্জি গায়ে বসিয়া পড়িল চেয়ারখানির উপর। মুক্ত জানালা-পথে পশ্চিম দিক্ হইতে শরতের রবির দীপ্তি আসিয়া ঘরখানিকে সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল। সে অপলকে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল পল্লীর অপরূপ সৃষ্টি-মহিমা।

নদীর বুকে কত নৌকা চলিয়া যাইতেছে। কেহ স্রোতের দিকে, কেহ উজান ঠেলিয়া। কোনটি বা পাল তুলিয়া যাইতেছে তর্ তর্ বেগে। এ বাড়ীখানি হইতে নদীর তীর পর্য্যন্ত ব্যবধান মাত্র দুইখানি মাঠ। মাঠের জল তখনও শুকায় নাই। পাকা ধানের শিষগুলি চামরের মত একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। বাতাসে দুলিতেছে। মাঠের পরেই নদী। নদীর জলে কচুরিপানার গুচ্ছ ভাসিয়া চলিয়াছে। এই কচুরীপানাকে ধ্বংস করে কে? বৈজ্ঞানিক হার মানিয়াছে এই কচুরীপানার কাছে। কবির কবিতায়ও কচুরীপানা স্থান লাভ করিয়াছে। রাসায়নিক এই কচুরীপানা হইতে কাগজ প্রস্তুতের সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিতেছেন। কৃষিবিদ্ পণ্ডিত কচুরীপানাকে সারে পরিণত করিয়া ফসল বাড়াইবার জন্য যত্নবান্। আর ইহার ধ্বংসের জন্য সরকার, ব্রতচারী সম্প্রদায় ও স্কাউটের দলেরও চেষ্টার ত্রুটি নাই। তবু কচুরী মরে না। অক্ষয় পরমায়ু লইয়া কচুরীপানা বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছে। বাঙ্গলার মাটির একটা প্রধান গুণ এই যে, সে সকলকেই ভালবাসিতে জানে এবং আপনার বুকে দৃঢ় আকর্ষণে টানিয়া লইতে চাহে, যেমন সে একদিন ম্যালেরিয়া বিষকে সাদরে বরণ করিয়াছে, কলেরাকে ভালবাসিয়াছে, কচুরীপানাও তেমনি আজ বাঙ্গালার নদীর বুকে, খালের জলে ও বিল পুকুরে গর্ব্বভরে আপনাকে বিস্তার করিতেছে রক্তবীজের মত। সুব্রত কচুরীপানার বিক্রম বিক্রমপুরে আসিয়া প্রত্যক্ষ করিল বিশেষ ভাবে। পূর্ব্বে ইহার নামই শুধু শুনিয়াছে, এমন ভাবে দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই।

নদীর অপর পাড়ে বিস্তৃত মাঠ। সে মাঠ যোজনবিস্তৃত। মাঠ কিন্তু উষর নহে। সে মাঠে ফলিয়াছে সুপ্রচুর ধান। তারপর মাঠের শেষে পল্লী। সেই সুদূরবর্ত্তী পল্লীর গাছপালাগুলি দেখাইতেছে মসীরেখার মত। ঐ সব গ্রামের পর মেঘনা নদী। মূলগ্রামের লোকেরা প্রত্যুষে সূর্য্যোদয় দেখিতে পান সুদূর পূর্ব্ব সীমান্তে সমুজ্জ্বল রক্তাভা বিমিশ্রিত জবাকুসুম সদৃশ বৃহত্তম আকারে। কলিকাতার ছেলে সুব্রতের কাছে নদীমাতৃক দেশের এই অপূর্ব্বশ্রীর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না—

তাই সে পরম হৃষ্ট মনে দু'নয়ন ভরিয়া বাহিরের এই রূপ দেখিতেছিল। এমন সময় একজন ভৃত্য তামাক ভরিয়া আনিয়া কহিল, "তামাক পিয়েন কর্ত্তাবাবু," কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে হুকাটি বাড়াইয়া দিল। সুব্রত হাসিয়া কহিল, "আমি ত' তামাক খাই না!" লোকটা "যে আজ্ঞা" বলিয় চলিয়া যাইবার সময় কহিল—"আপনার যখন কুছু দরকার হোবেক, হামকো বোলবেন। হামার নাম আছে লালাজী। হামি বাঙ্গালা মুলুকে আছে তিরিশ বছব।" "সে হবে" বলিয় সুব্রত তাহাকে বিদায় করিল।

সুব্রত প্রথমে বুঝিতে পারিল যে, গ্রামের ভদ্রতার একটি প্রধান অঙ্গ হইতেছে, তামাক খাওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। এবং তামাক খায় না এমন লোক কেহ আছে তাহা তাহাদের ধারণাই হয় না। একটু পরেই একটি আট বছরের মেয়ে এক হাতে একখানি শ্বেত পাথরের ছোট রেকাবীতে করিয়া নারকেলের সন্দেশ, রসগোল্লা, মুড়ি ও নারকেল, তিলের নাড়ু ও অন্য হাতে এক পেয়ালা চা আনিয়া কহিল,—"আপনি ক'লকাতার লোক, চায়ের সময় হয়েছে, এই চাটুকু খেয়ে ফেলুন ত!" একথা বলিয়াই সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

সুব্রত কহিল, "তুমি কি করে জানলে আমি চা খাই? আর এমন সময়েই খাই।"

"হুঁ, তা আব জানিনে বুঝি? আমার বাবা, কাকা, মা, কাকীমারা সব্বাই চা খান। মা জানেন কখন চা খেতে হয়। চা খান, নইলে যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে! জলখাবারটুকুও খান!"

"তাই ত' খুকি! এই আমি খাচ্ছি। তুমি চা খেয়েছ?"

"আমি ত' দু'বেলা চা খাইনি। সকালে মা আমায় চা দেন, আর বিকেল বেলা দুধ খাই। বুঝলেন মস্ত বড় এক বাটি দুধ খাই।"

"বেশ ত'! দিব্যি লক্ষ্মী মেয়ে তুমি?"

"হুঁ লক্ষ্মী। আমি মোটেই লক্ষ্মী নই। আমাকে মা বলেন পাড়া কুঁদুলনি। বলুন ত' কি অন্যায়। পাড়াই বা কোথায়, আর কোঁদলই বা করি কার সঙ্গে। আর এদের কথা আমি কিছু বুঝিই না। জানেন, এবা পুকুরকে বলে 'পুকৈর', পেয়ারাকে বলে 'গইয়া', বেরালকে বলে 'মেকুর'। আপনি বুঝলেন কিছু!"

"কেন বুঝবো না!"

"ছাই বুঝলেন! কিছু বুঝলেন না। আচ্ছা আপনি চা খান! লালাজীকে পাঠিয়ে দোব সব নিয়ে যাবে। যখন যা দরকার বলে পাঠাবেন।"

"কাকে বলে পাঠাবো?"

"কেন, আমাকে?"

"আমি ত' তোমার নাম জানিনে লক্ষ্মীটি!"

"আবার লক্ষ্মী? বলুন পাড়া কুঁদুলনি! মা শুনে খুব খুশি হবেন। দেশে দেশে সুনাম রটবে, কেউ আমার সঙ্গে ভয়ে ভাবই করতে আসবে না।"

"তাই যেন মেনে নিলাম। আমি ত' আব তোমার কোঁদল শুনিনি। তোমার সঙ্গে আমি ভাব করবো?"

"তাই নাকি? তবে বলুন ডার।"

বললুম ত' ডাব!

"তবে আমার সঙ্গে হল আপনার ভাব।"

"এইবার নাম বল।"

"আমাব নাম দীপ্তি। আমাকে কিন্তু সকলে ডাকে 'খুকু'।"

"আমিও তোমায় খুকু ডাকবো।"

"তাই ডাকবেন।"

"আমি আপানাকে কি বলে ডাকবো?"

"কাকাবাবু।"

"ধ্যাৎ! কাকা নয়। ডাকবো নূতনদাদা। আপনি নূতন দাদা হলেন কিনা! আমার ত' আরও দাদা আছে।"

"বেশ। আচ্ছা খুকু, তোমরা কোথায় থাক?"

"আমরা কৃষ্ণনগরে থাকি। বাবা সেখানে থাকেন কিনা!"

"তোমার বাবা কি করেন?"

"ডেপুটিগিরি করেন। মার খুব অসুখ কিনা, তাই মামা বাড়ী এসেছি। হাঁ নূতনদাদা, তুমি কখনও কেষ্টনগর গিয়েছ? যদি যাও আমাদের বাড়ী যেও, কত সুন্দর সুন্দর পুতুল যে আমার আছে! পাশের বাড়ীর মিলিদির ছেলের সঙ্গে সেদিন আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে এসেছি। কি বলবো দাদা একেবারে চামার! বরপণ দিলুম, ফুলশয্যায় কত খরচ করলুম, তবু কিনা কর্ত্তা-গিন্নির মন উঠলো না। আমার

মেয়েকে দিতেই চায় না—বলে গয়নার নাকি ওজন কম হয়েছে। বুঝলে নূতন দাদা, একেবারে কসাই গো! একেবারে কসাই।"

বাহির হইতে কর্কশ কণ্ঠে কে বলিল—"হারে থুকু! কি বকর বকর কচ্ছিস্। ভদ্রলোকের ছেলেকে খেতে দিবিনে রাক্ষুসি!"

থুকু হাসিয়া কহিল, "শুনলে নতুন দা, দাদার কথা! আমি বুঝি তোমাকে খেতে দিচ্ছি নে!"

সুব্রত হাসিয়া কহিল, "তুমি ত আমাকে খুব যত্ন করে খাওয়াচ্ছ। কেমন তোমার যত্ন।"

"বলগো, দাদাকে ওকথা বলো। আর মামাবাবুকে বলো। মামাবাবু মাকে চিকিচ্ছে করে ভাল করবেন বলেই ত' এখানে নিয়ে এসেছেন। নইলে কি আসতুম নাকি পড়াশুনা ছেড়ে। কত ক্ষেতি হবে বল ত' ?"

"তোমার মার কি অসুখ!"

"বুকে ব্যথা। হাঁটতে পারেন না। শরীর ভাল নেই—তবে এখানে এসে একটু ভাল আছেন।"

"কি করে বুঝলে ?"

"আমায় বেশ বক্‌তে পারেন কি না, তাই!" একথা বলিয়াই থুকু হাসিল।

সুব্রতও না হাসিয়া পারিল না।

"তবে আসি ভাই নূতনদাদা"—বলিয়া দীপ্তি চলিয়া গেল।

সুব্রতের কাছে এই চপল মেয়েটিকে বেশ লাগিল। দীপ্তি দেখিতে যেমন ফর্সা, তেমনি তার সুগোল সুঠাম গঠন। মাথাভরা কালো চুল। গুচ্ছে গুচ্ছে দুই কাঁধের পাশ দিয়া ঝুকিয়া পড়িয়াছে। মুখে ফুলের মতন সুন্দর হাসিটি। চোখ দুইটি বেশ বড় এবং চোখের তারা খুবই কালো। ভ্রূ দুইটি ধনুকের মত বাঁকা। নাকটি যেমন সূক্ষ্ম তেমনই সুগঠিত। পরণে তার বাসন্তী রঙের সাড়ী। হাতে দু'গাছি করিয়া সোনার চুড়ি। গলায় ছোট একটি হার। যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীটির মত সে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

দীপ্তি চলিয়া গেলে সুব্রত মনে মনে ভাবিল, সে এইবার গ্রামের সংস্কার করিতে আসিয়া নানাদিক দিয়াই যে আনন্দ লাভ করিতেছে এবং গ্রাম্য জীবনের যে সত্যকার পরিচয় পাইতেছে তাহা কি আগ্রা, অযোধ্যা, বা দিল্লীতে মিলিবে? বাঙ্গালার সত্যিকার সমাজ ও রূপ এই পল্লীকে আশ্রয় করিয়াই বাঁচিয়া আছে।

চার

শ্রাবণের মেঘ যেন ঘন বরিষণ
তেমতি গোপীর আঁখি ঝুরে অনুক্ষণ।

কৃষ্ণমঙ্গল—কৃষ্ণদাস

যে নারীকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামে বিচার ও বিতর্ক চলিয়াছিল, অমন একটা ঘটনা কোনদিন মূলগ্রামে ঘটে নাই। এমন কি দশ গ্রামের মধ্যে ঘটিয়াছে কিনা তাহাই সন্দেহজনক অন্ততঃ, এমন অন্যায় সামাজিক বিপ্লব। গ্রামের বৃদ্ধ, প্রৌঢ় পুরুষ ও মহিলারা নিন্দায় হইয়াছিলেন শতমুখ। আর বর্ষীয়সী বিধবা ও সধবা মহিলাদের কলগুঞ্জন ব্যাপারটি অতি বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন কি, পাশের পঞ্চাশখানি গ্রামের লোকেরাও নাকি ছিঃ ছিঃ করিতেছিল। মূলগ্রাম কি হইল? একেবারে যে সংসার-ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার অন্যায়কে প্রশ্রয় করিয়া সমাজে বিপ্লব উপস্থিত করিতেছে!

এইরূপ অপমান মূলগ্রামের অধিবাসীরা সহিবে কেন? তাই বিচার-সভা বসিয়াছিল। যাহাকে লইয়া বিচার-সভা বসিয়াছিল, সে একটি তরুণী। বয়স আঠারো উনিশের মধ্যে। দীর্ঘ দেহ, একহারা গঠন। গৌরাঙ্গী। মুখে-চোখে একটা দৃপ্ত মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে যেন তাহার প্রতি সমাজের এই উপেক্ষা, এই নিন্দা ও গ্লানি সব কিছু উপেক্ষা করিবার মত সাহসিকা। তরুণীর নাম উমা। উমার পরণে খদ্দরের মোটা সাড়ী। দুই হাতে দুইটি লাল মোটা শাঁখা। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া ঋজুভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সভাস্থলে উপবিষ্ট লোকজনের প্রতি কোন লক্ষ্যই তাহার ছিল না।

ঘটনাটি এই। উমা রাঢ়ীশ্রেণী কুলীনের মেয়ে। গ্রামের বালিকাবিদ্যালয় হইতে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে। শিল্পকার্য্যে সে সুনিপুণা। তাঁতের কাজে সে দক্ষ। পাটি বুনিতে, সতরঞ্চ বুনিতে এমন কি কাপড়,

শাল সব সে বুনিতে পারে। সে তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া বাড়িতেছিল পল্লীর নিভৃত বন-ভবনে পাতার আড়ালে ঢাকা কামিনী-স্তবকের মত। উমার বাবা মেয়ের সম্বন্ধের জন্ম গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, কিন্তু কুল ও মেলের বন্ধন মিলাইতে গিয়া কোথাও সম্বন্ধ ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না।

রামগতি মুখোপাধ্যায় একবার একটি বৃদ্ধ বিপত্নীকের সহিত সম্বন্ধ অনেকটা প্রায় স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, তখন উমা বিদ্রোহ করিয়া বসিল, সে পিতাকে কহিল, 'বিবাহ করিব না।'

উমার বর্ষীয়সী দিদিমা গর্জ্জিয়া কহিলেন, "কেন লো পোড়ারমুখী?"

উমার মা ছিলেন না। উমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন উমার মা মারা গিয়াছিলেন, কাজেই এই বিধবা নিঃসন্তান পিসীমা উমাকে তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়া পালন করিয়াছিলেন। পিসীমার কথায় উমা শান্তভাবে কহিল, 'তুমি কি যে বলো পিসীমা, একটা ষাট বছরের বুড়োকে যার পাঁচ ছয়টা ছেলেমেয়ে তাকে কিনা আমি বিয়ে করবো। আমি বিয়ে করবো না—করবো না।"

পিসীমা আগেরই মত রুষ্টা হইয়া কহিলেন, "কুলীনের কুল রক্ষা করা ত' চাই। এমন বরের সেবা যত্ন করতে পারলে বেঁচে যাবি পোড়ারমুখী।"

"পিসীমা, তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, বার বার আমায় পোড়ারমুখী পোড়ারমুখী করো না।"

"কেন করবো না শুনি?' এইবার তাঁহার স্বর পঞ্চমে উঠিয়াছিল।

রামগতি ধীরভাবে কহিলেন, "উমাকে গাল দিয়ে কি কিছু ফল হবে? বুঝিয়ে বলো প্রবাসিনী।"

প্রবাসিনী গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল গৃহস্থালীর কাজে। রামগতি নিজের হাতে তামাক সাজিয়া মাথার ভিতর হইতে না না দুশ্চিন্তাকে ধূম্রজালের মধ্য দিয়া ধূমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

এ ঘটনার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে।

রামগতি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর পাশে ছিল ছোট একটি খাল। খালের ওপারে ছিল রামেন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের বাড়ী। সান্যাল মহাশয়েরা গ্রামের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু লোক। বারেন্দ্র শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কুলীন। রামেন্দ্র সান্যাল কয়েক বৎসর হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী ছিলেন উত্তর-বঙ্গের কোন এক প্রসিদ্ধ জমিদারের মেয়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনিও বেশীদিন জীবিতা ছিলেন না। দুই পুত্র ও দুই কন্যা মাত্র ইঁহাদের সন্তান। কন্যা দুইটির বিবাহ হইয়াছে বাঙ্গালার দুই বিখ্যাত জমিদারের সহিত। দুই পুত্রের মধ্যে বড়টি তেমন লেখাপড়া শিখেন নাই, তাই এক ভগ্নীপতির বাড়ীতে জমিদারী সেরেস্তায় এক মহালের নায়েবী করিতেন। ছোট ছেলে অতীন্দ্র এম-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় আইন পড়িতেছিল। জমিদারীর আয় এবং নগদ সম্পত্তিতে ইঁহাদের বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু ইঁহাদের সংসারের কর্ত্তা ছিলেন মাধব আচার্য্য। মাধব বৎসরের প্রায় দশমাস কাল এখানেই থাকিতেন। এই মাধব ছিলেন রামেন্দ্র সান্যালের দূর সম্পর্কীয় শ্যালক। গ্রামে সেই সুবাদে ইহাকে সকলে ডাকিত মাধবমামা। মাধবমামা এমন ভাবে এই পরিবারের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, লোকে ঠাট্টা করিয়া রামেন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের বাড়ীর নাম দিয়াছিল মাধব-নিবাস।

মাধব আচার্য্য দেখিতে ছিলেন কৃষ্ণকায়, হৃষ্টপুষ্ট। বুকের উপর মস্তবড় একটা কাটা দাগ। বেঁটে খাটো মানুষ। মাথার মাঝখানে একটি টাক। টাক বেড়িয়া মাথার চারি পাশে কাঁচা-পাকা চুল। গোঁফ-দাড়ি কামান। চক্ষু দুইটি বাজপাখীর মত তীক্ষ্ণ। চারিটি দাঁত মুখ হইতে বাহির হইয়াই থাকিত। গ্রামের লোকদের মধ্যে মোকদ্দমা বাধাইতে, দলাদলি করিতে এই বিদেশী আচার্য্য মহাশয় মূলগ্রামে এমনি প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিলেন যে, ছেলে বুড়ো সকলেই তাহাকে দূর হইতে দেখিলেই বলিত—মাধব মামা আসছে রে—যেন একটা মস্ত বড় ভয়ের জিনিষ।

মাধব মামার ভাগিনেয়েরাও মামাকে ভক্তি করিয়া চলিত। তাহার কারণও ছিল। প্রথম কথা, বড় ভাগিনেয় যতীন্দ্র জমিদারী কার্য্যে যে মহলে থাকিতেন, সেখানেই সপরিবারে প্রাসাদোপম বাড়ীতে বাস করিতেন। আমলা-মুহুরীরা তাঁহাকে জমিদারের শ্যালক বলিয়া ভয়ও করিত

শ্রদ্ধাও করিত, কেননা যতীন্দ্র ছিল সরল প্রকৃতির মানুষ। সে জমিদারীর ঘোর-প্যাঁচ অতটা বুঝিত না, কাজেই তাঁহাকে মধ্যে রাখিয়া আমলাদের কোনও অসুবিধা ছিল না। যতীন্দ্রের স্ত্রীকে শ্বশুরের ঘর করিতে পাঠাইবার ইচ্ছা তাঁহার বাবা মায়ের ছিল না। কাজেই যতীন্দ্রের স্ত্রী সুরবালা কখনও পিত্রালয়ে কখনও বা কাছারী বাড়ীতে আসিয়া বাস করিত। তবে বেশীর ভাগই থাকিত পিত্রালয়ে। বিবাহের পর সে একবার মাত্র নূতন বধূরূপে মূলগ্রামে আসিয়াছিল। আর অতীন্দ্র সে ত' কলেজের ছেলে, সে সংসারের কিই বা ধার ধারে।

উমা ও অতীন্দ্রের ছেলেবেলা হইতেই ছিল বড় ভাব। পাশাপাশি বাড়ী, বিশেষ, বর্ষার পর খালের জল শুকাইয়া গেলে যাতায়াতের কোন বাধাই থাকিত না। অতীন ও উমা পরস্পর পরস্পরকে একান্ত আপনার জনই মনে করিত। অতীন যখন গ্রামের স্কুল হইতে কলিকাতা পড়িতে গেল, তখন সে ছুটিতে উমার জন্য ছবির বই আনিত, সেলাইয়ের জিনিষ আনিত এবং ছবি আঁকিবার জন্য রঙের বাক্স আনিতেও ভুলিত না। সঙ্গে সঙ্গে গল্প ও উপন্যাসের বইও আসিত প্রচুর, গল্প ও উপন্যাস দুই জনে পড়িত এক সঙ্গে। থিয়েটার বায়োস্কোপের নানা গল্প বলিয়াও অতীন্দ্র এই পল্লীবাসিনী তরুণীর মনের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছিল। লোকে এ ব্যাপারটা তেমন ভাবে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পায় নাই। পাইলে হয় ত' ব্যতিক্রম ঘটিতেও পারিত।

যৌবন ধর্ম্ম ও সমাজের বিচার করে না। উমা অতীন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল, অতীন্দ্রও উমাকে যে ভাল না বাসিয়াছিল তাহা নহে। তবে কতটা অকৃত্রিম তাহা উমার বুঝিবার শক্তি ছিল না।

উমার বয়স বাড়িতেছিল, যৌবন তাহার দেহে আসিয়া পুষ্পিতা লতার মত শোভন রূপ ফুটাইয়া তুলিল। যে দেখিত সেই বলিত, সত্যই যেন গিরিরাজ-কন্যা উমা সে।

অতীন্দ্র একদিন মামার কাছে সাহস করিয়া বলিয়াছিল, "মামা, আমি উমাকে বিয়ে করবো।"

মাধব মামা অতীন্দ্রের কথায় রাগ না করিয়া শান্তভাবে বলিয়াছিলেন, "সে হয় না বাবা, সমাজে বাধবে। রাঢ়ী বারেন্দ্রীতে কি বিয়ে চলে? তারপর একটা ভিখেরীর মেয়ে এনে কি হবে বল ত? আমি তোমার জন্য রাজার মেয়ে এনে দেবো, বিশ হাজার টাকা পণ, পঞ্চাশ হাজার টাকার যৌতুক।' কথাটা অসম্ভব নয়। কেন না বারেন্দ্র শ্রেণীর বিবাহে অমন পণ বা যৌতুক বেশী কথা নহে। রামেন্দ্র সান্যাল পণে ও যৌতুকে প্রায় লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। আর অতীন্দ্র ত' এ কালের পাশ করা ছেলে। সুশ্রী অবস্থাপন্ন যুবককে জামাতা করিতে ধনী বারেন্দ্র সমাজের লোকেরা চাহিবে না কেন?

অতীন্দ্র আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল কলিকাতা কলেজ খোলার জন্য, আর মাধব মামা চলিলেন পাত্রীর সন্ধানে। মাধব মামার অনুপস্থিতিতে পঞ্চশর এক অঘটন ঘটাইয়া ফেলিলেন।

একদিন সকাল বেলা দেখা গেল, উমা বাড়ী নাই। কলঙ্কের কথা, তাই রামগতি মুখোপাধ্যায় গোপনে কবিরাজ মহাশয়কে আসিয়া উমার অন্তর্দ্ধানের কথা বলিলেন। কবিরাজ মহাশয় সব শুনিয়া কহিলেন, "অতীন কোথায়?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "সে কয়েকদিন হ'ল কলকাতা চলে গেছে।"

বুদ্ধিমান্ শিবানন্দ সেনের কাছে সব জিনিষটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "মুখুয্যে মশায়, এ অতীনেরই কাজ। মাধবমামা বাড়ী নেই, সে এই সুযোগে এই দুষ্কার্য্য করেছে।"

রামগতি পৈতা দিয়া দুই হাতে কবিরাজ মহাশয়কে হাত জড়াইয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণের জাত-মান বাঁচান।"

শিবানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "আর জাত-মান। আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।" তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার ভাই-পো এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্রকে উমা ও অতীনের খোঁজে পাঠাইয়া দিলেন।

মূলগ্রাম হইতে দশ মাইল দূরে একটি ষ্টীমার-ষ্টেশনে উমা ও অতীন যখন ষ্টীমারের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তখন অনুসন্ধানকারী দল তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল এবং এক রকম জোর করিয়া দুই জনকেই নৌকায় তুলিয়া লইল। অতীন পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারিল না।

ক্রুদ্ধ হইয়া এই অনুসন্ধানকারীরা যখন অতীন্দ্রকে

প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছিল, তখন উমা ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় অতীন্দ্রকে বাহু বান্ধনে আবদ্ধ করিয়া সদর্পে বলিয়াছিল, "মের না, অতীন্দ্র আমার স্বামী।" তাহার এই সদর্প উক্তিতে অনুসন্ধানকারীরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। অতীনকে আর কিছু বলে নাই।

কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে অতীন্দ্র ও উমাকে আনা হইলে পর বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয় গ্রামের সকলকে ডাকাইলেন এবং অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন, "এখন কি করা কর্ত্তব্য ?" অতীন্দ্র কহিল, "আমি উমাকে বিয়ে করবো। আপনারা বিয়ে দিবার ব্যবস্থা করুন।"

শিবানন্দ কহিলেন, "উমা কি বল ?"

উমা সদর্পে অতীন্দ্রকে দেখাইয়া কহিল, "এ আমার স্বামী।"

রামগতি কহিল, "গ্রামের দশ জন যাহা করবেন আমি তার বিরোধী হই কি করে ? হতভাগী আমাকে মানুষের কাছে একেবারে হেয় করলে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কবিরাজ মহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তবু তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কয়েকজন পণ্ডিতকে আহ্বান করিলেন। সকলেই বলিলেন, "পাত্র ও পাত্রী উভয়েই যখন ব্রাহ্মণ, তখন বিয়েতে কোন বাধা হ'তে পাবে না। রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিয়ে হয় না ও একটা লোকাচার মাত্র। একদিন সমাজ এই সব কৃত্রিম বন্ধনকে ভেঙ্গে দিবে। বিয়ে দিতে পারেন।

তরুণেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অতীন কহিল, "আমি সাবালক হয়েছি। মাধবমামা কে ? তাঁর কথা কেন শুনবো ?" কাজেই গ্রামের ছেলেরা যে ব্যাপারটাকে একান্ত বিশ্রী ও অপমানজনক মনে করিয়াছিল তাহারাই আবার এই বিবাহের আয়োজনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। অতীন্দ্রের ও উমার এক শুভদিনে বাদ্যবাজনা ও ভূরি ভোজনের সহিত বিবাহ হইল। এই নূতন সমাজ-সংস্কার ও বিবাহের ঘটনা গ্রামের সংবাদদাতা নানা সংবাদপত্রে প্রচার করিয়া দিলেন। বিদেশে মাধব মামা এ সংবাদ পড়িলেন কিন্তু কথাটা বুদ্ধিমানের মত চাপিয়া গেলেন এবং চুপি চুপি একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিলেন।

কয়েক মাস পরের কথা। মাধব মামা বাড়ী আসিলেন ভাগিনেয় অতীন্দ্রের একজন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদারের একমাত্র শিক্ষিতা ও সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া। এ সময়ে অতীন্দ্র কলিকাতায় ছিল। মাধবমামা সহজেই অতীন্দ্রকে নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া জমিদারের কন্যাটিকে দেখাইলেন। অতীন্দ্র দেখিল নানা অলঙ্কার পরিশোভিতা শ্যামাঙ্গী মাধবী উমার অপেক্ষাও লাবণ্যযুক্তা। তারপর ভবিষ্যতে একলক্ষ টাকা আয়ের এক জমিদারীও তাহার হাতে আসিবে। তরুণ চপল যুবক মাধবমামাকে সম্বন্ধ স্থির করিতে অভিমত দিল। মাধবমামা ভাগিনেয়কে বলিলেন, "তুমি চল আমার সঙ্গে দেশে।" অতীন্দ্র প্রথমে অস্বীকার করিলেও পরে রাজী হইল।

মাধব গ্রামের সামাজিকদের বশীভূত করিয়াছিলেন যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যে। বিচার-সভায় অতীন্দ্রও মাধব মামার পাশে আসিয়া বসিল। মাধবমামা বলিলেন, "কবিরাজ ম'শায়, আপনি আমার ভাগিনেয়কে তার অমতে একটা কুলটার সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কেন ? এই কুলটার সঙ্গে ? এ বিচার আপনাদের দশজনকে করতে হবে ?"

সামাজিকরা নস্য নাকে টিপিতে টিপিতে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—'ঘোরতর অন্যায়! ঘোরতর অন্যায়!' এই সব সামাজিক পণ্ডিতেরা কিন্তু কবিরাজ মহাশয়কে সমর্থন করিয়াছিল। কবিরাজ মহাশয় ব্যাপারটা বুঝিলেন।

তরুণেরা গর্জ্জিয়া বলিল—'মিথ্যা কথা। হিন্দু বিবাহ। চালাকি চলবে না।' সামাজিকেরা চীৎকার করিয়া কহিলেন, "বিবাহ! কোথায় বিবাহ! জানি না ত' !"

তরুণেরা কহিল—"সেই যে দিস্তা দিস্তা খুব লুচি মিষ্টান্ন উড়ালেন! দক্ষিণার টাকাটা দশবার করে বাজিয়ে দেখলেন! মনে পড়ে ?"

"মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!"

কবিরাজ মহাশয় নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। এত মিথ্যার অভিনয় কেমন করিয়া হইতে পারে ? মিথ্যাই হইল সত্য, সত্যই হইল মিথ্যা!

অতীন্দ্র সর্ব্বপ্রকার বন্ধন অম্লানবদনে অস্বীকার করিল।

কবিরাজ মহাশয় গর্জ্জিয়া কহিলেন—"এতবড় মিথ্যাবাদী! তুমি উমাকে বিয়ে করো নি নারায়ণ সাক্ষী করে, গ্রামের দশজন লোকের সম্মুখে ? বল।"

মাধব হাসিয়া বলিলেন—"কবরেজ ম'শায় কি পাগল

হ'লেন নাকি? ওর বিয়ের সঙ্গে অতীনের কি সম্বন্ধ?" এ কথা বলিয়া মাধব হা-হা করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিল।

"আমি পাগল? তা বেশ।" গ্রামের তরুণেরা মাধবের এই উক্তিতে হল্লা করিয়া উঠিল এমন কি মাধবকে মারিতে উদ্যত হইল। তাহারা বলিল—সয়তান কোথাকার!

অতীন্দ্র কহিল, "চলুন মামা! এমন অভদ্র সভায় থাকতে নেই। অবাক কাণ্ড!"

মাধবমামা ও অতীন্দ্র সদর্পে গ্রামের অন্যান্য সামাজিকদের সহিত চলিয়া গেল।

উমার বাবা রামগতি মুখোপাধ্যায় সভাস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

উমা সাশ্রুনয়নে একবার অতীন্দ্রের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল।

অতীন্দ্র হাসিয়া কহিল, "মামা, তুমি আমাকে বাঁচালে! কি বেড়াজালেই না জড়িয়েছিলে! উঃ ধন্যি মেয়ে মানুষ! কলঙ্কের বোঝা বুকে টেনে নিতে ভয় পায় না!"

মামা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বুঝলে বাবাজী বুদ্ধি চাই!"

উমা নিস্পন্দ নিষ্প্রভ ভাবে দাবাহত তরুর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। শুধু চোখ বহিয়া অশ্রুজল শ্রাবণের ধারার ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছিল।

[ক্রমশঃ

প্রলয়

শ্রীধর্ম্মদাস কুণ্ডু

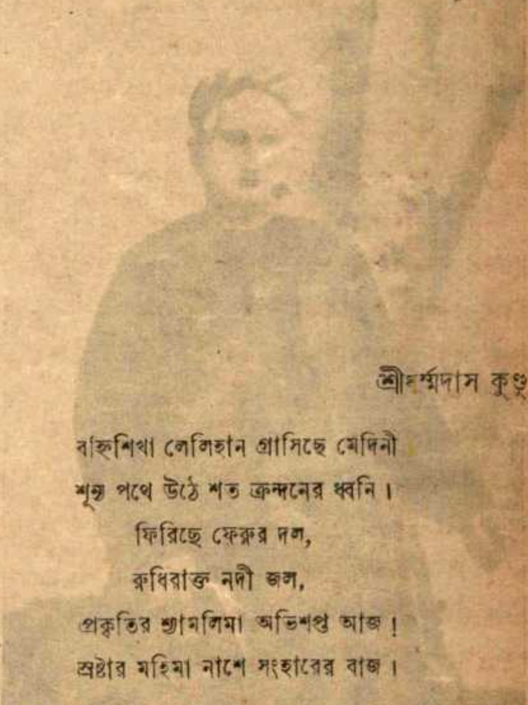

হে নিষ্ঠুর মহাকাল! একি লীলা তব?
রক্তাপ্লুতা বসুন্ধরা একি এ আহব?
দিকে দিকে চক্রবালে
নৃত্য তব তালে তালে
চলিয়াছে অবিরাম, উদ্দাম ভীষণ।
ধরণী শুনিছে ঘন প্রলয় গর্জ্জন।

বহ্নিশিখা লেলিহান গ্রাসিছে মেদিনী
শূন্য পথে উঠে শত ক্রন্দনের ধ্বনি।
ফিরিছে ফেরুর দল,
রুধিরাক্ত নদী জল,
প্রকৃতির শ্যামলিমা অভিশপ্ত আজ!
স্রষ্টার মহিমা নাশে সংহারের বাজ।

ধ্বংসের দেবতা, ওগো! তিষ্ঠ ক্ষণকাল।
সম্বর ও রুদ্র মূর্ত্তি বাঁধ জটাজাল।
বিজয় গৌরব তব
নহে আজ অভিনব,
শোনায়েছ যুগে যুগে, প্রলয়ের বাঁশী।
দুর্ব্বার নিয়তি শুধু ফিরেছে যে হাসি!

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

ঊর্দ্ধে সীমাহীন নীলাম্বর, নিম্নে অসীম উর্ম্মি-মুখর পারাবার হঠাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, মানবের মন যেরূপ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয় আলোচনা করিতে তদ্রূপ ভাবের সমাবেশ হয়, আর তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বে আমাদের মন অভিভূত হইয়া পড়ে বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অজস্র দান পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। আমরা তাঁহাকে সাহিত্য-সম্রাট্, যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ দেশাত্মবোধের কবি, নবজাগরণের অগ্রদূত প্রভৃতি নানারূপে বন্দনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। সর্ব্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি। এই এক কথায় তাঁহার স্বরূপ যেরূপ ফুটিয়া] উঠে আর কিছুতে সেরূপ হয় না। ঋষি বলিতেই আমাদের মনে তপোবনবাসী মুনির কথা জাগ্রত হয়। কিন্তু ঋষির একটি ব্যাপক অর্থ আছে। কেবল ভগবৎ প্রেম নহে, বিশ্বপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতে পারিলে, ঋষিত্ব লাভ হয়। ধ্যানে ঋষিরা মন্ত্র দেখিতে পান, অর্থাৎ উহার জীবিতরূপ ও কার্য্যশক্তি প্রত্যক্ষ করেন। দেশের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সমাহিত চিত্তে ঐরূপ এক মন্ত্র আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। ঐ মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'। আসমুদ্র হিমাচল ঐ মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিবেকানন্দ একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক জাতিরও এক বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ। উহাই যেন জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর। অন্যান্য সুর সেই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গত হইয়া ঐক্যতান উৎপাদন করিতেছে। ভারতে ধর্ম্মজীবনই জাতীয় জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ।" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের সম্বন্ধে উহা প্রয়োগ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল লেখার মধ্যে যে ভাবটি ধরা পড়ে, তাহার বিষয়, বোধ হয়, কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না—সেটা তাঁহার গভীর স্বদেশ প্রীতি। কেবল উপন্যাসে নহে, কমলাকান্তে ও অন্যান্য প্রবন্ধাদিতে ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত, লোক রহস্য প্রভৃতি রহস্যাত্মক রচনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আনন্দমঠে ইহার পূর্ণ পরিণতি এবং 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে ইহার অপূর্ব্ব প্রকাশ।

আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সাধকরূপী বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন, "একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার, কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরের তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।"

"সেই অনন্ত শূন্য অরণ্য মধ্যে সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?" … … এইরূপ

তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?" প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।" প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" "আর কি আছে? আর কি দিব।" তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, এই কামনাবিহীন অচল ভক্তি ঈপ্সিতকে মিলাইবে। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের উৎপত্তি এইরূপেই হয়। আনন্দমঠের দশম পরিচ্ছেদে, ভবানন্দ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন বলিয়া মহেন্দ্রকে গান শুনাইবার জন্য আরম্ভ করিলেন,

বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না—সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা মাতা কে? জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতা কে?" উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাহিতে লাগিলেন,

"শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "ও ত' দেশ, এ ত' মা নয়।" ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জ-সমীরণ শীতলা শস্য শ্যামলা—'" তখন মহেন্দ্র বুঝিয়া বলিলেন, "তবে আবার গাও"—ভবানন্দ আবার গাহিলেন,

বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
সপ্তকোটি কণ্ঠ কল-কল নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃ্তখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম, ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশ-প্রহরণধারিণী কমলা কমল-দল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্, সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দেমাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

ভবানন্দ মহেন্দ্রকে মাতার সন্ধান দিলেন কিন্তু সত্যানন্দ মাতার ত্রিবিধ মূর্ত্তি মহেন্দ্রকে দেখাইলেন।

১ম। অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা। বালার্ক-বর্ণাভা সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি—মা যা ছিলেন।

২য়। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে—কালী অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃত-সর্ব্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান তাই মা কঙ্কাল-মালিনী। আপনার শিব পদতলে দলিতেছেন—মা যাহা হইয়াছেন।

৩য়। দশভুজা দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত—দিগভুজা—নানা-প্রহরণধারিণী—শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী; বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান দায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—এই মা, যা হইবেন।

নব্য বাঙ্গালার শুধু নব্য বাঙ্গালার কেন নব্য ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহার জাগরণী বাণী বক্ষে বক্ষে স্পন্দিত হইয়া আশার আলোকে মাতার ভবিষ্যৎ রাজলক্ষ্মীরূপ দেখিবার জন্য অধীর আগ্রহে ভারতবাসী অপেক্ষা করিতেছে। সে সুদিন আসিবার আর বিলম্ব নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম উচ্চস্তরের। উহা পাশ্চাত্ত্য Patriotism-এর সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মের সহিত উহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। দেশ বড় হউক, কিন্তু অপর দেশ লুণ্ঠনে নহে, স্বার্থের সহিত পরার্থের সঙ্গতি রাখিয়া দেশ সমৃদ্ধিশালী

করিতে হইবে, ন্যায্যাধিকারে বাধা দিলে শত্রু দমন করিতে হইবে। ইহাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের আদর্শ। পাশ্চাত্ত্যের এমন কি প্রাচ্যে জাপানের হীন-স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে Patriotism তাহা লোভেরই নামান্তর। এই লোভ বর্জ্জন করিবার জন্য উপনিষদ্-রচয়িতারা নানা শ্লোকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্য, সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে নিখিল-জগতকে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। সে সভ্যতার বীজ এখনও ভারতে বর্ত্তমান আছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই পুরাতন ধারার পক্ষপাতী ছিলেন। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সকল রচনার মধ্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানকালে যে সকল ভাবধারায় আমাদের জাতীয় জীবন উদ্বেলিত হইয়াছে—কি শিক্ষা-দীক্ষায়, কি ধর্ম্মসমাজ সংস্কারে, কি সাহিত্যগঠনে ও পরিপুষ্টি সাধনে, বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র সে সকল উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ লেখকেরা দেশের ভবিষ্যৎ-নিয়ন্তা। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন, দেশ তাঁহার সময়ে তাঁহার প্রচারিত ভাব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। এ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্পের উল্লেখ করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে তদানীন্তন সাহিত্য-রথীরা মধ্যে মধ্যে সমবেত হইতেন এবং সাহিত্যের মজলিস বসিত। একবার কবি হেমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি বৃথাই 'ভারতে সঙ্গীত' লিখিলাম, আপনার বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত লেখা বৃথা হইল।" ইহার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "এখনও সময় হয় নাই, নিশ্চয় জানিও, কিছুকাল পরে লোকে যখন বুঝিবে তখন একেবারে মাতিয়া উঠিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বাণী যে অক্ষরে, অক্ষরে সফল হইয়াছে তাহা কে না জানে?

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ শুনা যায়,—

(১) তিনি প্রাদেশিক ভাবাপন্ন ও (২) তিনি মুসলমান-বিদ্বেষী। এই দুইটি অভিযোগের মূলে কোন সত্য নাই। সত্য বটে, বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গালাদেশের প্রতি তাঁহার দরদ অধিক ছিল, কিন্তু সেজন্য তাঁহার প্রীতি সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কি পৃথিবীতে বিস্তার পাইবার কোন বাধা পায় নাই। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ঐরূপ সংকীর্ণতা দোষ আরোপ করেন তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেমের গভীরতা সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন নাই। যে নিজের মাকে ভালবাসে না, সে দেশকে ভালবাসিবে কি করিয়া? বাঙ্গালাকে ভালবাসিতে না শিখিলে, ভারতবর্ষকে ভালবাসা অসম্ভব। মুখ্যতঃ বাঙ্গালাদেশ তাঁহার চিন্তা ও সাধনার বস্তু হইলেও সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল না।

হিন্দু বলিয়াই তাহাকে ভালবাসিতে হইবে এবং মুসলমান বলিয়াই তাহাকে ঘৃণা করিতে হইবে দোষী হউক কি নির্দ্দোষী হউক, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ইহা বলিয়া গিয়াছেন, এ কথা অশ্রদ্ধেয় এবং তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলীতেও ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা এ প্রবন্ধের বহির্ভূত, সুতরাং তাহা করিতে এক্ষণে নিরস্ত হইলাম। গত বঙ্কিমচন্দ্রের শত বার্ষিকী সভায় রেজাউল করিম এম, এ, বি-এল মহাশয় "অ-হিন্দুর দৃষ্টিতে বঙ্কিম-প্রতিভা" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে বঙ্কিম-প্রতিভার সার্ব্বভৌম দিকটা যেরূপ সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার পরিচয় নিম্নোক্ত অংশে সকলেই পাইবেন।

"হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বড়। মানুষ বঙ্কিমে দেখি মানবতার প্রতি তাঁহার একটা অকৃত্রিম ভালবাসা, ব্যথিত, প্রপীড়িত ও অত্যাচারিত জনের প্রতি দরদ, প্রপীড়িত কৃষক তাঁহার অবহেলার পাত্র নহে। নারী-জাতির দুঃখ বেদনার প্রতি তিনি উদাসীন নহেন। অত্যাচারী শাসককে তিনি কষাঘাত করিতে কাতর হন না। আর পদানত জাতির মুক্তি প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তিনি সদা সচেষ্ট। নাস্তিকতা তিনি যেমন সমর্থন করেন না, তেমনি আনুষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক দিকও সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন না। ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহারই তিনি ধারক ও বাহক। গোটা মানুষকে বিশ্লেষণ করা তাঁহার কাজ। তাহার দোষ, গুণ, হাসি কান্না, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য মনের দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ এইগুলিকে নিপুণ ভাষায় সকলের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তাই তাঁহার লেখায় প্রকটিত হইয়াছে একটা অনবদ্য আর্ট, একটা অপূর্ব্ব ছন্দ। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন

আনন্দের একটা অনাবিল প্রস্রবণ, একটা অনুপম সৌন্দর্য্য, তাঁহার তুলিকায় রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অপূর্ব্ব ভাষা ও অনুপম সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রধান বস্তু নহে। তাহার উপর আছে অপরের উপর অপূর্ব্ব প্রভাব। পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য ও শিল্পের তিনি নির্ম্মাতা ও পথপ্রদর্শক। যেমন সেক্সপিয়ারকে বাদ দিলে গোটা ইংরাজী সাহিত্যটাই বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে, বঙ্কিম-বিহীন বাংলা সাহিত্যের দশাও তদনুরূপ হইবার সম্ভাবনা অধিক। বঙ্কিম না থাকিলে বাংলা সাহিত্যের কি অবস্থা হইত তাহা বলা কঠিন, কিন্তু তিনি সাহিত্য-ভাণ্ডারে যাহা দিয়াছেন, তাহা তুলিয়া লইলে বাংলা-সাহিত্য যে অঙ্গহীন হইয়া পড়িবে এ কথা নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের কালে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব সংঘর্ষের বিষম দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সনাতনপন্থীরা পুরাতন ভাবনারা আঁকড়াইয়া রহিলেন, নব্যপন্থীরা পুরাতন যাহা কিছু সমুদয় ধূলিসাৎ করিয়া যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের ও স্বজাতির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া, পাশ্চাত্যভাব হইতে যাহা গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ করিয়া অপরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিলেন। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি কুশলতা। ভাষার দিক দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ঐরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। তখন একদিকে সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষা এবং অপরদিকে অবিশুদ্ধ গ্রাম্য বাংলা ভাষা, এতদুভয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এমন এক নূতন ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার সৌন্দর্য্য এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং তাহা আদর্শ ভাষা বলিয়া এখনও পরিগৃহীত হইতেছে। সকল দিকেই বঙ্কিমচন্দ্রের এইরূপ সৃষ্টি-কুশলতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তৎকালের সামাজিক ইতিহাস জানা আবশ্যক। জমীর সহিত বীজেরও মূলান্বেষণ করিতে হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও বাদ দেওয়া চলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের নানা বিষয়িণী প্রতিভার উৎস হইতে বঙ্গভাষা শত ধারায় স্নাত হইয়া দিব্যকান্তি ধারণ করিয়াছে এবং তাহারই উজ্জ্বল আলোকে ভাবকুসুমচয় শতদলে প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকিরণ করিতেছে। ইহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইলে বিশেষ শ্রম ও সময় সাপেক্ষ।

রত্নাকরের অগাধ জলে কত শত মণি মুক্তা রহিয়াছে ভিতরে ডুব না দিলে কি তাহার সন্ধান মিলে? বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যও অনন্ত ও সুগভীর, উহার কিছু কিছু আস্বাদ পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে ক্রমশঃ দিবার ইচ্ছা রহিল।

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

এগার

মাত্র এক গ্লাস জল দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখা নিভাতে গিয়ে গণেশ ঘোষাল শুধু বিব্রত নয়, বিপন্ন হ'য়ে পড়ল। অতটুকু জলে কোন কাজই হ'ল না এবং ঘরেও আর জল ছিল না। সুতরাং আগুন দ্রুত বেড়েই চল্‌লো। অন্য কোন উপায় না দেখে গণেশ তাড়াতাড়ি বিছানার এক প্রান্ত ধ'রে টেনে মেজের এক ধারে ফেলে দিলো কিন্তু ফেল্‌বার সময় বিছানার একটা কোণা পড়লো ছিপি-খোলা হ্যারিকেন লণ্ঠনের উপর, ঐ ধাক্কায় লণ্ঠনটা উল্টে গিয়ে তার ভিতরকার বাকী কেরোসিন টুকুর কিছু গড়িয়ে পড়লো মেজেয়, আর কিছু ঐ বিছানারই উপর। উপযুক্ত আহুতি পেয়ে বৈশ্বানরের লোলুপ জিহ্বা ত্বরিতে শতমুখ হ'য়ে লক্ লক্ ক'রে উঠলো। গণেশ তখন নিরুপায় বুঝে ঘর থেকে বেরুবার জন্য দরজার কাছে গেল কিন্তু দেখ্‌লো ওটা বাহির থেকে বন্ধ। অনেক টানাটানি ক'রেও খোলা গেল না। তখন সে প্রথমতঃ অশোকার ও তারপর বাড়ীর ঝির নাম ধ'রে ডাক-হাঁক করতে লাগলো কিন্তু কারো সাড়া পাওয়া গেল না। গণেশ সত্য সত্যই পাড়াতে প্রচার ক'রে দিয়েছিল, এই বাড়ীতে তার পাগল স্ত্রীকে শীগ্‌গিরই আনা হবে, কাজেই তার চেঁচামিচি প্রতিবেশীদের কানে পৌঁছে থাক্‌লেও কেউ তা গ্রাহ্য করে নাই। ঘর থেকে বেরুতে অসমর্থ হ'য়ে গণেশ তাড়াতাড়ি টেবিলটা টেনে আগুনের ধারে নিয়ে এলো এবং তারপর ওটাকে উল্টে ফেলে আগুনের উপর চাপা দিলো। ফলে, যতটুকু জায়গার উপর টেবিলের চাপ পড়লো, সেই জায়গার শিখাগুলির উর্দ্ধগতি প্রতিহত হ'য়ে চারপাশে ছড়িয়ে গেল—নির্ব্বাপিত হ'ল না। এমন সময় গণেশ দেখলো, পাশের ঘরে যাবার দরজার ফাঁক দিয়ে আগুনের শিখা প্রবেশ কচ্চে এবং কবাটের খানিকটা জ্বলে উঠেচে। এখন ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'তে না পারলে প্রাণ-রক্ষার সম্ভাবনা নেই বুঝে, গণেশ পুনরায় ছুটে গেল দরজার কাছে এবং কবাট ভেঙে ফেলার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলো কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হ'ল না, তখন সে টেবিলের একটা পা ভেঙে তার সাহায্যে দরজা খোল্‌বার আশায় ফিরে গেল টেবিলের কাছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘরের ভিতর থেকে গর্জ্জে উঠলো কর্ণবধিরকারী তোপ-ধ্বনির মতো এক ভীষণ শব্দ আকাশ-পৃথ্বী এক সঙ্গে কাঁপিয়ে তুলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্তটা ঘর ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল।

এর পর অতি অল্প সময় মধ্যে বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তায় প্রকাণ্ড জনতা সমবেত হ'ল। বাড়ীর দোর জানালার ভিতর দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া বেরুতে দেখে সকলে মনে করলো, বোমা ফেটে ঘরে আগুন ধ'রেচে এবং এই ব্যাপারের সহিত নিশ্চয়ই বিপ্লববাদীদের সম্পর্ক আছে। পাছে কোন ফ্যাসাদে পড়তে হয় এই ভয়ে দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করতে কারো সাহস হচ্ছিল না। এমন সময় একজন পাহারাওয়ালা এসে হাজির হ'ল। সমস্ত শুনে সে তখনই দরজার কড়ার রুমালের বাঁধন খুলে কবাট ঠেলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলো। তখন তার পেছনে গেল জন কয়েক লোক। রাশীকৃত ঘন ধোঁয়ার গন্ধে সকলের শ্বাসরোধ হবার মতো অবস্থা হ'ল, বিশেষতঃ ঐ ধোঁয়াতে গন্ধকের তীব্র গন্ধ থাকাতে। চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, তবুও তারা আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে চল্‌লো। সকলের অগ্রবর্ত্তী পাহারাওয়ালার পায়ে তখন একটা পদার্থ ঠেক্‌তেই সে তার হাতের টর্চ্চ বাতিটা নীচু ক'রে ধরলো এবং দেখে বিস্মিত হ'ল, ঐ পদার্থ একজন লোকের দেহ। বাতিটা খুব কাছে নিয়ে সে দেখলো, লোকটির সমস্ত মুখ-মণ্ডল ও গায়ের জামা ইত্যাদি রক্তে রঞ্জিত—তারপর তার নাকের কাছে হাত দিয়ে বুঝতে পারলো শ্বাস প্রশ্বাস বইছে। ঐ লোকটি ছাড়া অপর কোনো লোক দেখতে পাওয়া গেল না। আগুনের অসহ্য উত্তাপে আর অগ্রসর হ'তে না পেরে বিশেষতঃ ভগ্নস্তূপে ঘরের ভেতর-ভাগ প্রায় অবরুদ্ধ থাকায়, পাহারাওয়ালা তার সঙ্গী লোকদের সাহায্যে আহত ব্যক্তিকে সন্তর্পণে তুলে বাইরে রাস্তার উপর নিয়ে এলো এবং সমবেত লোকদের

বল্‌লো, সকলে চেষ্টা করলে বাড়ীটাকে হয়তো তখনও রক্ষা করা যেতে পারে।

আগুনটা না নিভাতে পারলে পাছে একটা লঙ্কাকাণ্ডের সৃষ্টি হয় এই আশঙ্কায় সকলেই তখন বালতি, কলসী প্রভৃতি নিয়ে এসে নিকটবর্ত্তী পুকুর থেকে জল তুলে আগুন নিভানোর কাজে লেগে গেল।

বৃদ্ধ প্রতিবেশী জয়হরি ঘোষ আহত লোকটিকে দেখে উত্তেজিত ভাবে ব'লে উঠলেন :—

"এ যে আমাদের নূতন ভাড়াটে শ্যামলাল বাবু! এ কি, এঁর একটা চোখ তো দেখচি একদম উড়ে গেচে, আবার গালে, মুখে, হাতে ভয়ানক রকম জখম। কি সর্ব্বনাশ, ম'রে গেচে নাকি? কি ক'রে জানবো, লোকটা বোমা নিয়ে এসে এখানে আড্ডা বসাবে। তা যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হ'য়েচে। বাড়ী ভাড়া নিতে এসে বল্‌লে, তার স্ত্রীর মাথা খারাপ, কিছুদিন গঙ্গার ধারে খোলা হাওয়ায় থাক্‌লে পর সে ভালো হ'তে পারে, তাই মাস দু'একের জন্যে বাড়ীটে ভাড়া চায়। তাই বিশ্বেস ক'রে ভাড়া দিলুম। আজ অনেক রাতে মোটরে তাকেই বুঝি নিয়ে এসেছিল কিন্তু সে গেল কোথায়? তবে কি সেও পুড়ে ম'লো ঐ ঘরেতেই? আমার ভাড়া চুলোয় যাক, বাড়ীটেও যে গেল ধ্বংস হ'য়ে।"

ঘোষজা ম'শায় প্রাচীন লোক, বয়স সত্তর পার হ'লেও বেশ চলা-ফিরা করতে পারেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ব'লে সবাই তাঁকে মেনে চলে। তাঁর কথা শুনে সবাই আতঙ্কপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘরের দিকে তাকালো। কালীপদ নামে একজন যুবক তখনি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লো সেই স্ত্রীলোকটিকে খোঁজবার জন্য কিন্তু তার কোনো চিহ্নই দেখতে পাওয়া গেল না।

বহু লোকের সমবেত চেষ্টায় প্রচুর পরিমাণ জল নিক্ষেপের ফলে আগুনের বিস্তৃতি ক্রমে কমে গিয়ে এক ঘণ্টার ভিতর সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এলো। এই বাড়ীর দোর-জানালা ও জিনিসপত্রের অধিকাংশ ধ্বংস হ'লেও আগুন আর অপর কোনো বাড়ী পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারে নি।

আহত শ্যামলালকে (তার প্রকৃত নাম যে গণেশ, এখানের কেউ তা জানতো না) দেখবার জন্য এরই মধ্যে একজন ডাক্তার ডেকে আনা হ'য়েচে। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, রোগীর প্রাণ আছে, তবে সে অজ্ঞান এবং তার দেহে অনেকগুলো জখম—বাঁ চোখ, বাঁ কান ও বাঁ হাতের তিনটে আঙুল একদম উড়ে গিয়েচে।

এই সময় একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী এসে আহত শ্যামলালকে অবিলম্বে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে এই ব্যাপারের তদন্তে প্রবৃত্ত হ'লেন।

তদন্তের প্রারম্ভেই পুলিশ কর্ম্মচারী জানতে পারলেন, ঘরে প্রবেশ করবার দরজার বাইরের দিকের কড়ায় একটা বড় আলগা তালা ছিল এবং ঐ তালা সমেত কড়া দু'টি একটা রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল। এ থেকে অনুমান করা গেল, শ্যামলালের সঙ্গে অন্ততঃ একজন লোক ছিল, যে তাকে ঘরের ভিতর রেখে যে কারণেই হো'ক বাইরে থেকে দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে গিয়েচে। তবে কি এটা তার পাগল স্ত্রীর কাজ? অন্য প্রমাণাভাবে তদন্তকারী অফিসার তা-ই মনে করলেন এবং একটু পরে এর সমর্থনসূচক প্রমাণও পাওয়া গেল ঘরের ভিতরে প্রাপ্ত অর্দ্ধদগ্ধ এক টুকরো কাগজে লিখিত দু'টি ছত্রের শেষাংশে :—

……—……আমার বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র
………ডুবিয়া মরিতে চলিলাম।
পাগলি মেয়ে।

ঐ মেয়েটা বেরিয়ে গিয়ে হয় ত' ডুবেই ম'রেচে, কিন্তু ঘরের ভিতর বোমা এলো কি ক'রে? এর প্রকৃত উত্তর দিতে পারে একমাত্র শ্যামলাল কিন্তু তার অবস্থা এখন এমন নয় যে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, সে সেরে উঠ্‌লে হয় তো অনেক কথাই প্রকাশ পাবে। এ দিকে ঘরের দগ্ধাবশিষ্ট জিনিসপত্র অনুসন্ধানের ফলে একটা কাঠের বাক্সের কৃত্রিম তলার নীচে থেকে প্রায় পাঁচ সের পরিমাণ আফিম্ বেরিয়ে পড়লো। এতে ব্যাপারটা আরো জটিল হ'য়ে দাঁড়ালো।

সামান্য একটু আগুন নিভাতে গিয়ে যে গণেশের এমন দুর্দ্দশা হবে অশোকা তা ভাবতেই পারে নি। সে গণেশের কবল থেকে শুধু মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই আগুনের সৃষ্টি ক'রেছিল, তাকে শাস্তি দেবার জন্য নয়। তা ছাড়া, সে ভাবতেই পারে নি, ঐ আগুন এতোটা বেড়ে যাবে।

মুক্তি পেয়ে অশোকা শুধু আঁধারময় অলি-গলি পথে ছুটে চল্‌লো ব্যাধ-তাড়িতা হরিণীর মতো। সে জানতো না,

কোন্ জায়গা থেকে সে পালাচ্ছে কিংবা কোথায় যাচ্ছে। তার একমাত্র লক্ষ্য, আবার যেন গণেশ বা তারই মতো অন্য কোনো লোকের হাতে আর পড়তে না হয়। গলি-পথ শেষ হ'য়ে যেতেই সে পড়লো এসে বেশ একটা বড় রাস্তার উপর। অতিমাত্র শঙ্কার সহিত সে ঐ পথ ধ'রেই তখন চল্‌তে লাগলো। ঐ রাস্তায় অনবরত মোটরগাড়ীর যাতায়াত দেখে—প্রথমতঃ তার আশঙ্কা খুবই বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু অতো রাত্রে গ্রামের সঙ্কীর্ণ রাস্তায় একেলা চলা যে আরো বিপজ্জনক এটা উপলব্ধি ক'রে সে সাহসের সহিত ঐ বড় রাস্তা ধ'রেই চল্‌লো। মোটরের বাতি দেখলেই সে রাস্তার পার্শ্বস্থ কোনো গাছের বা ঐ রকম কিছুর আড়ালে লুকিয়ে থেকে পরে আবার পথ চল্‌তে লাগলো। এই ভাবে প্রায় তিন ঘণ্টায় চার মাইল পথ; গিয়ে উৎকণ্ঠা, অনিদ্রা ও অনাহারে সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো এবং অবশেষে পথের নিকট একখানি ছোট পরিচ্ছন্ন ঠাকুরবাড়ী দেখতে পেয়ে সেই বাড়ীর সিঁড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রামের জন্য বস্‌লো।

কতক্ষণ যে ব'সেছিল অশোকার খেয়াল ছিল না—হয় ত' ব'সে থাকার পরে একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছিল। হঠাৎ এক ব্যক্তির সম্বোধনে সে চম্‌কে উঠলো এবং দেখলো গেরুয়া কাপড় পরা এক বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়ে আছেন। অশোকা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে আর্ত্তস্বরে বল্‌লো, "বাবা, এই বিপন্ন মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করুন।"

সৌভাগ্যক্রমে অশোকা যাঁর আশ্রয় প্রার্থিনী হ'ল, তিনি ছিলেন সাধু সন্তদাস বাবাজীর একজন পরমভক্ত গৃহী শিষ্য—নাম সত্যশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উচ্চ-শিক্ষিত, উদার-চরিত, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে যাবার সময় অশোকাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়েছিলেন। তারপর তার বিপদের কথা শুনে তিনি তখনই তাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন এবং নিজ বর্ষীয়সী বিধবা কন্যা সুকুমারীর হাতে সঁপে দিলেন।

পিতা ও কন্যার অকৃত্রিম সহানুভূতি লাভ ক'রে অশোকা অকপটে তার ও তার বন্ধু মন্দিরার সকল অবস্থা তাঁদের জানালো এবং এখন বাড়ীতে ফিরে গেলে তার ও তার পিতার উপর জমিদারের অত্যাচার ও সামাজিক নির্য্যাতন কি প্রকার ভীষণ হবে তারও আভাস দিলো। নানাদিক ভেবে অশোকার আপাততঃ এই আশ্রয়ে বাস করাই সঙ্গত বোধ হ'ল। যাতে পুনরায় গণেশ ও প্যারীলালের মতো দুষ্ট লোকের হাতে অশোকার আর পড়তে না হয়, সাধু সত্যশরণ সত্বর সেরূপ কোনো উপায় নির্ণয়ের জন্য চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন।

বার

সন্ধ্যার আঁধার নিবিড় হ'য়ে আসবার একটু পরে এক-খানি সুসজ্জিত বজরা গঙ্গার উজান বেয়ে চন্দননগর "নারী রক্ষাশ্রম" বাড়ীর ঘাটে ভিড়লো এবং তার পর বজরা থেকে অবতরণ করলেন একজন স্থূলোদর মাড়োয়ারি ভদ্রলোক। পণ্ডিতজী ও প্যারীলাল তাঁরই আগমন-প্রতীক্ষায় ঘাটের সিঁড়িতে ব'সে ছিল। আগন্তুককে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে আপিস ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

দু' ঘণ্টা কাল নানাবিধ প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তার পর "সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ-হিতসাধনী" সভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ধর্ম্মপ্রাণ লছমী নারায়ণ শেঠ মহোদয় "নারী-রক্ষাশ্রমের" সাহায্য ও উন্নতি কল্পে পাঁচ হাজার টাকা দান করলেন। অশেষ ধন্যবাদ সহকারে ঐ দান গৃহীত হ'লে, শেঠজী আরও সহানুভূতি দেখাবার উদ্দেশ্যে বজরা থেকে একটি ছোট বাক্স আনিয়ে ঐটি পণ্ডিতজীর হাতে দিয়ে বল্‌লেন, ঐ বাক্সের ভিতরে যৎসামান্য বস্ত্রালঙ্কার র'য়েছে, আশ্রমবাসিনী মন্দিরা দেবীর জন্য। শেঠজী আশা করেন, মন্দিরা দেবী সে সব পরে একটিবার তাঁর বজরায় শুভাগমন করবেন। শেঠজীর নিষ্কাম দানের এমন সুন্দর নিদর্শন দেখে আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর প্রশংসা না ক'রে পারলো না। বাক্সটি তখনই যথাযথ উপদেশ সহকারে দেবীর নিকট পাঠানো হ'ল। তারপর যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ গ্রহণে আপ্যায়িত হ'য়ে শেঠজী তাঁর বজরায় ফিরবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন এবং ঘাটে গিয়ে দেবীর শুভাগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ঘাট ও আশ্রম-বাড়ীর মাঝখানে ছিল খানিকটা আঙ্গিনা। পায়ে হেঁটে নৌকায় গেলে অপর লোক দেবী দর্শন ক'রে ফেল্‌বে, এটা শেঠজী বা আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ আদৌ বাঞ্ছনীয় বোধ করেন নাই, সুতরাং এই আঙ্গিনা-বৈতরণী পার হবার জন্য একখানা পাল্কীর বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল। দেবীকে অভ্যর্থনা

সহকারে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শেঠজী পাল্কীর নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অতঃপর শেঠজীর প্রদত্ত মূল্যবান বেনারসী সাড়ি, গহনা ও সেন্ট্ ইত্যাদি প'রে মন্দিরা যখন পাল্কীর নিকট উপস্থিত হ'ল, শেঠজী সহাস্যমুখে তাকে অভিবাদনের অভিনয় করলেন ও মেহেরবাণী ক'রে পাল্কীতে উঠবার কষ্টটুকু করবার জন্য অনুরোধ করলেন। মন্দিরা সেই অনুরোধ রক্ষার্থ এক পা অগ্রসর হ'য়েই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো এবং কিছু না ব'লে দ্রুত বাড়ীর ভিতর ফিরে গেল। পণ্ডিতজী এতে বিরক্ত হ'য়ে বাড়ীর ভিতর দিকে গেলেন এবং সেখানে কমলাকে প্রশ্ন ক'রে জানলেন, কি একটা জিনিস সঙ্গে নিতে মন্দিরার ভুল হ'য়ে গিয়েছিল, ঐটি নিয়ে এখনই সে ফিরে আসবে। পণ্ডিতজী ঐ কথা শেঠজীকে বল্‌বার কিয়ৎক্ষণ পরেই মন্দিরা ফিরে এসে পাল্কীতে গিয়ে বসলো এবং পর মুহূর্ত্তে বেহারারা পাল্কী ব'য়ে বজরার উপর নিয়ে গেল। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই আশঙ্কায় মুখ সম্পূর্ণ বস্ত্রাবৃত ক'রে মন্দিরাকে পাল্কী থেকে বজরার কামরায় প্রবেশ করতে হ'ল।

মাঝি-মাল্লারা বজরা ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিল সুতরাং পাল্কী নিয়ে বেহারারা তীরে নামা মাত্র শেঠজীর ইঙ্গিতানুসারে বজরা ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তখন জোয়ার মাত্র আরম্ভ হ'য়েচে, সুতরাং প্রতিকূল স্রোত হ'লেও দু'খানা দাঁড়ের টানে অল্পক্ষণ মধ্যেই নৌকা অনেক দূর অগ্রসর হ'তে পারলো।

শেঠজী বজরার কামরায় ঢুকে দেখলেন, অবগুণ্ঠনাবৃতা মন্দিরা এক কোনে জড়সড় হ'য়ে ব'সে আছে। তিনি তার সঙ্গে ভাঙা বাংলায় আলাপ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন জবাব পেলেন না, তবুও তাঁর আলাপ করবার চেষ্টা অবিরত চলতেই লাগলো।

ইত্যবসরে পেছনের দিক থেকে একখানা ছোট নৌকা দ্রুতবেগে বজরার দিকে ছুটে এসে তার নিকটবর্ত্তী হ'ল এবং গেরুয়া কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি ঐ নৌকার সম্মুখ ভাগে দাঁড়িয়ে বজরার মাঝিকে বল্‌লেন, তিনি চন্দননগরের আশ্রম থেকে এসেচেন একটা খুব জরুরী কথার জন্য। মাঝি তখনই বজরা থামালো এবং ছোট নৌকাও তখনই এসে বজরার গায়ে ভিড়লো। শেঠজীর একজন দেহ-রক্ষক পালোয়ান আশ্রম থেকে আগত সাধুর কথা শেঠজীকে জানালে তিনি তাঁকে বজরার কামরায় আহ্বান করলেন। সাধু সেই অনুসারে বজরায় উঠে ঐ কামরায় ঢুকলেন এবং শেঠজীকে নমস্কার ক'রে বল্‌লেন, আশ্রমের পণ্ডিতজী একটা জরুরী কথার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছেন—ঐ কথা ব'লেই তিনি পকেট থেকে একটা রুমাল বের ক'রে ঐ রুমাল শেঠজীর নাকের উপর চেপে ধরলেন। শেঠজী কথা বলার আর সুযোগ পেলেন না, ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাবে অতি অল্প সময় মধ্যেই সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়লেন। সাধুজী তখন অবগুণ্ঠনাবৃতা রমণীকে সম্বোধন ক'রে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "মন্দিরা, আর ভয় নেই, আমি দুলাল, তোমার উদ্ধারের জন্য নৌকা নিয়ে এসেচি। এখান থেকে বেরুতে একটু গোল বাঁধতে পারে কিন্তু তোমার দুলালদাকে কারো সাধ্যি নেই আটকে রাখে।"

অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে রমণী দুলালের দিকে চেয়ে অনুচ্চস্বরে বললো, "আপনি চম্‌কাবেন না, আমি মন্দিরা নই, আমি তার হিতাকাঙ্ক্ষিনী বন্ধু। তাকে বাঁচাবার জন্য আমি তার নাম নিয়ে ওদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এই শয়তানের কাছে এসেচি, সবাইকে পুলিশে ধরিয়ে দেবো ব'লে। মন্দিরাকে নিরাপদ জায়গায় পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে এসেচি, আপনি ভাববেন না।"

দুলাল অপ্রতিভের মতো কিয়ৎক্ষণ রমণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। রমণী পুনরায় বল্‌লো, "আমার কথায় সন্দেহ হওয়া আপনার মোটেই অন্যায় নয় এবং অস্বাভাবিকও নয়। আশ্রমের লোকদের কেউ জানে না, মন্দিরার পরিবর্ত্তে আমি কমলা এসেচি শেঠজীর কাছে। শেঠজীও এখন পর্য্যন্ত তা ধরতে পারেন নি।"

দুলাল তখন লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লো, "এরূপ ঘটনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তাই একটু হতবুদ্ধি হ'য়ে প'ড়েছিলাম। আপনি মন্দিরার বন্ধু এই যথেষ্ট। আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস কচ্চি। এখন মিনিট দুই চার অপেক্ষা করুন, বেরুবার ব্যবস্থা ক'রে নি, একটু হাতাহাতি হ'লে ভয় পান না যেন।"

শেঠজীর পালোয়ান কামরার বাইরে দাঁড়িয়েছিল। ভিতরের কথাবার্ত্তা বোঝবার মতো বুদ্ধি বা ক্ষমতা কোনোটাই

তার ছিল না। দুলাল কামরা থেকে বের হ'য়েই পালোয়ানকে সজোরে এক ধাক্কা মারলো। এই আকস্মিক ধাক্কা সাম্‌লাতে না পেরে সে একেবারে গাঙের উপর ছিট্‌কিয়ে পড়লো। দাঁড়ি দু'জন তখন চেঁচিয়ে উঠলে দুলাল তাদের ভয় দেখিয়ে বল্‌লো, "বেশী গোলমাল করবে তো জল-পুলিশ ডেকে সবাইকে ধরিয়ে দেবো, ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোক চুরি ক'রে পালাচ্চো, এ কি মগের মুল্লুক ?"

মাঝির ইঙ্গিত ক্রমে দু'জন দাঁড়ি এক সঙ্গে দুলালকে মারবার জন্য উদ্যত হ'ল। দুলাল হাতের আস্তিন গুটিয়ে এক মুষ্টি প্রহারে একজনকে এক দম বসিয়ে দিলে, দ্বিতীয় লোকটা তখন একখণ্ড বাঁশ তুলে দুলালের মাথা লক্ষ্য ক'রে আঘাত করলো। দুলাল চকিতে বাঁ হাতে বাঁশটা ধ'রে ফেলে ডান পা দিয়ে এক লাথি মারলো দাঁড়ির হাঁটুর উপর। লোকটা চিৎ হ'য়ে সটান প'ড়ে গেল। এখন বাকি রইলো শুধু মাঝি, সে পালোয়ান ও দাঁড়িদের দুরবস্থা দেখে সুবোধ ছেলের মতো একদম চুপ ক'রে রইলো। দাঁড়ি দু'জনও আর উঠবার চেষ্টা করলো না। পালোয়ান জলে প'ড়ে জোয়ারের টানে অনেক দূর পিছিয়ে গিয়েছিল, ভাগ্যক্রমে সে সাঁতার কাটতে জান্‌তো, তাই তার ডুবে মরবার আশঙ্কা ছিল না। বজরায় ফিরবার জন্য সে তখন বৃথাই চেষ্টা ক'রছিল।

দুলাল মুহূর্ত্তে সমস্ত অবস্থা উপলব্ধি ক'রে কমলাকে বেরিয়ে আসতে বল্‌লো এবং পরক্ষণে তাকে ছোট নৌকায় তুলে নিয়ে জোয়ারের মুখে উত্তর দিকে রওনা হ'ল।

কিয়দ্দূর চ'লে আশার পর কমলা বল্‌লো, "মন্দিরার কাছে আপনাদের সব কথাই শুনেচি। তাকে চুরি ক'রে নিয়ে আসবার সময়ে পথে মোটর-দুর্ঘটনা হয়, তাতে তার মাথায় খুব আঘাত লাগে। বাঁচবার সম্ভাবনা মোটেই ছিল না, এখন সে অনেকটা সেরে উঠেচে বটে তবুও ডাক্তার আশঙ্কা করেন, কোনো রকম উত্তেজনা হ'লে অবস্থা আবার খারাপ হ'তে পারে। আমার উপরে তার দেখা-শুনার ভার ছিল। আমি এই আশ্রমে থেকে এদের অনেক অনাচার অত্যাচার দেখে, এদের শাস্তি দেবার চেষ্টায় আছি। শুনে আশ্চর্য্যি হবেন, পাঁচ হাজার টাকায় মন্দিরাকে এই শেঠজীর কাছে বিক্রী করা হ'য়েচে। তাকে বাঁচাবার জন্য আমিই মন্দিরা সেজে কৌশল ক'রে তাঁর নৌকায় এসেছিলাম। আমার নির্দ্দেশমত মন্দিরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই আশ্রমবাড়ী থেকে পালাতে পেরেচে। চন্দননগরের উত্তর-প্রান্তে উমা গোয়ালিনীর বাড়ীতে সে যাবে এবং সেখানে আপাততঃ সে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকৃতে পারবে। আপনি আমায় একটি বার পুলিশের থানায় পৌঁছে দেবেন; আমি ওদের আড্ডার সবাইকে ধরিয়ে দেবো।"

দুলাল নীরবে সব কথা শুনে যাচ্ছিল। কমলার কথা শেষ হ'লে সে বল্‌লো :—

"মন্দিরার জন্য আপনি যা ক'রেচেন সেজন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিন। কিন্তু আপনি এতটা কচ্চেন কেন ? এতে আপনার কি স্বার্থ আছে ?"

"মানুষ কি সব সময়ই শুধু স্বার্থ নিয়েই কাজ করে ? মন্দিরার সরল ও পবিত্র মুখ খানা দেখে অবধি তার প্রতি কেমন একটা স্নেহ জন্মে এবং সেই অবধি মনে মনে সঙ্কল্প করি, যে ক'রেই হো'ক, একে বাঁচাতে হবে, এর ধর্ম্মরক্ষা করতে হবে। তার মাথায় যে গুরু আঘাত লেগেছিল, এখন দেখচি সেটা তার মঙ্গলের জন্যই। ওরূপ আঘাতে সে কাতর না থাকৃলে, তাকে আশ্রমের পিশাচদের হাত থেকে রক্ষা করা কঠিন হ'তো। আপনি আমার উদ্দেশ্য জান্‌তে চাচ্ছেন, হাঁ সত্যিই একটা উদ্দেশ্য আছে, যে আমার জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ক'রে দিয়েচে, গৃহস্থ-ঘরের কুলবধূকে প্রলোভন দেখিয়ে এনে তার সর্ব্বনাশ ক'রেচে, তাকে দেবো নিশ্চিন্তে থাকৃতে ? কখ্‌খনো না, তার সর্ব্বনাশ না ক'রে আমি ম'রেও শান্তি পাবো না।"

"এ লোকটি কে ?"

"তা কি এখনো বুঝতে পারেন নি ? প্যারীলাল ছাড়া আর কে হবে ?"

"একদিন তাকে শুধু জুতো-পেটা ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলাম, তখন তার ঘাড়টা মটকিয়ে দিলেই বোধ করি ঠিক হ'তো।"

"সে কাজটা র'য়েচে আমার জন্যে, আমিই সে ব্যবস্থা করবো। স্ত্রীলোক হ'য়েও আমার সে শক্তি ও সাহস আছে। এদের আড্ডার কোকেন ও আফিম চালানির গুপ্ত ব্যবসায়ের খবরটা পুলিশে দিলে নিশ্চয়ই তারা চুপ ক'রে থাকবে না।"

"বেশ, আপনাকে তা হ'লে এমন জায়গায় পৌঁছে দেবো সেখান থেকে আপনি সহজে থানায় যেতে পারেন, কিন্তু তাতে আপনার কোনো বিপদ হবে না তো ?"

"আমার বিপদের জন্য মোটেই ভাববেন না, কারণ আমার কাছে বিপদ ব'লে কোনো কিছু নেই, সব অবস্থায় আত্ম-রক্ষা করবার ক্ষমতা এখন আমার যথেষ্ট আছে।"

"নারী-রক্ষাশ্রমে"র প্রায় এক মাইল উত্তরে এক জায়গায় নৌকা ভিড়ানো হ'লে কমলা ও দুলাল তীরে অবতরণ করলো। নৌকার মাঝি নিতাই বাগ্দীকে সেখানে অপেক্ষা করতে ব'লে তারা দু'জনে মন্দিরার সন্ধানে গেল।

উমা গোয়ালিনী আশ্রমের দুধ যোগাতো, তাইতে কমলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। উমার মনটি বেশ ভালো ছিল। কমলা মাঝে মাঝে জামা কাপড় দিয়ে ও আরো অনেক প্রকারে উমার সাহায্য করতো, এ সব কারণে সে কমলার খুব অনুগত হ'য়ে প'ড়েছিল। মন্দিরার উদ্ধারের জন্য উমার সম্পূর্ণ সাহায্য ও সহানুভূতি পাবে বুঝতে পেরে কমলা তার সঙ্গে এ বিষয়ে গোপনে পরামর্শ করে এবং উমা আহ্লাদের সহিত মন্দিরাকে তার গৃহে স্থান দিতে সম্মত হয়।

আশ্রম বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগের একটা দরজা বাইরের দিকে তালাবদ্ধ ছিল। কমলার উপদেশে উমা ঐ দিন সন্ধ্যার পর লুকিয়ে সেখানে এসে তালাটা ভেঙে ফেলে এবং রাত প্রায় এগারোটার সময় ওখানে মন্দিরার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

মন্দিরার সহিত তাড়াতাড়ি সাড়ি বদল ক'রে কমলা যখন পাল্কীতে গিয়ে বসলো, মন্দিরা তখন বাড়ীর পেছনের দরজা খুলে চুপি চুপি বের হ'য়ে উমার অনুবর্ত্তিনী হ'ল। আশ্রমের কেউ কোন রকম সন্দেহ করতে পারলো না।

মন্দিরা তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। তাকে মাড়োয়ারির নিকট বিক্রীর প্রস্তাবের কথা সে সেই দিনই কমলার কাছে শুনতে পায়। মানুষ যে মানুষের প্রতি এমন পশুর মতো আচরণ করতে পারে, এটা তার ধারণার মধ্যেই ছিল না সুতরাং এই সংবাদে সে বেশ উত্তেজিত হ'য়েই প'ড়েছিল। কমলা স্থির ভাবে তাকে বুঝিয়ে দেয়, এই নরক থেকে উদ্ধার পেতে হ'লে একটু চতুরতার আশ্রয় নিতে হবে এবং তখন সে তার প্ল্যানটা জানিয়ে দেয়। মন্দিরা প্রথমতঃ কিছুতেই রাজী হ'তে চায় নি, কমলা মন্দিরা সেজে মাড়োয়ারির কাছে যাবে,— কিন্তু কমলা যখন বল্‌লো, এ পন্থাতে কমলার নিজের কোন ভয় নেই,—তখন আর আপত্তি করতে পারলো না। উমার সঙ্গে পথ চল্‌তে চল্‌তে প্রতিমুহূর্ত্তে মন্দিরার আশঙ্কা হচ্ছিল, ঐ বুঝি আশ্রমের লোক তাকে ধ'রে নিতে আসচে। উমার বাড়ীটা ছিল শহরের প্রান্তভাগে অন্ধকার এক গলির ভেতর। মিনিট পনেরো চলার পর তারা ঐ গলিতে পৌঁছলো। তাদের সাড়া পেয়ে গলির পার্শ্ববর্ত্তী এক বাড়ীর একটা কুকুর হঠাৎ ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলো। মন্দিরা ঐ শব্দে চমকে উঠে হ'চোট খেয়ে রাস্তার উপর প'ড়ে গেল। উমা অনেক কষ্টে তাকে ধ'রে তুলে নিজ ঘরে নিয়ে গেল এবং তার পর আলো জেলে দেখলো, মন্দিরার মাথার পুরাণো আঘাতের স্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়চে এবং তার সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হ'য়ে গেচে। উমা ভয়ানক বিপন্ন হ'য়ে পড়লো। ঘরে তার বুড়ো কাকা ও নয় বছরের ছেলে গোপাল ছাড়া অপর লোক ছিল না। তার বাড়ীতে মন্দিরার উপস্থিতির কথা বিশেষ জানাজানি হয়, এটা তার ইচ্ছা ছিল না, কারণ কমলা বারণ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু মন্দিরার জন্য এক্ষুনি ডাক্তার আনা দরকার বুঝে উমা তার বুড়ো কাকাকেই ডাক্তারের জন্য পাঠালো।

ডাক্তারবাবু এসে রোগীর মাথার আঘাত ধুইয়ে দিয়ে তার জ্ঞান-সঞ্চারের চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায়ও কোনো ফল পাওয়া গেলো না দেখে ডাক্তার খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন।

এমন সময় কমলা ও দুলাল এসে দরজায় ঘা দিলো। দরজা খুলে কমলাকে দেখতে পেয়ে উমা কেঁদে ফেললো, বল্‌লো, "এসেচো মা, এসো, তোমার বোন্‌টিকে বুঝি বাঁচাতে পারলাম না, হ'চোট খেয়ে প'ড়ে গিয়ে তার মাথায় চোট লেগেচে, থেকে থেকে রক্ত উঠচে, একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে আছে। নন্দ ডাক্তারকে ডেকে এনেছি, তিনি দেখচেন কিন্তু কিছু করতে পাচ্চেন না। এ পোড়ামুখীর উপর ভার না দিলে কখখনো এ রকমটা হ'তো না।" ব'লে বেচারি আকুল ভাবে কেঁদে উঠলো।

কমলা ব্যস্ত ভাবে বল্‌লো, "সে তোমার দোষ নয় উমা, যাক, এখন জল্‌দি আমাদের নিয়ে চলো মন্দিরার কাছে।"

পাশের ঘরেই একখানা তক্তাপোষের উপর উমার বিছানায় মন্দিরা শায়িতা ছিল। ডাক্তারবাবু তার মাথায় জলধারা দিচ্ছিলেন। মন্দিরার চক্ষু মুদ্রিত, ক্ষতস্থানের ক্ষরিত রক্তে তার পরিধেয় সাড়ির অনেকাংশ রঞ্জিত, শ্বাস-প্রবাহ মৃদু। দুলাল স্নেহস্বরে মন্দিরার নাম ধ'রে ডাক্‌লো, কোনো সাড়া এলো না।

কমলা তখনই মন্দিরার শুশ্রূষায় লেগে গেল এবং ডাক্তার বাবুকে সকল অবস্থা মোটর-দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে কিরূপ আঘাত লেগেছিল এবং তার কি রকম চিকিৎসা হ'য়েছিল, এই সমস্ত সংক্ষেপে জানালো। সব শুনে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "রোগিণীর বর্ত্তমান অবস্থা আগেকার আঘাতেরই ফল এবং সেটা হ'য়েচে মানসিক উত্তেজনা থেকে। রক্ত পড়া হয় তো আপাততঃ বন্ধ করা যেতে পারে কিন্তু মস্তিষ্ক ও হার্ট ঠিক রাখা সম্ভবপর হ'বে ব'লে মনে হয় না। বেঁচে থাক্‌লেও যে কোনো মুহূর্ত্তে এঁর হার্ট-ফেল হবার আশঙ্কা থাকবে।"

"তবে কি প্রতীকারের কোনো উপায়ই নেই?" দুলাল ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন, "প্রতীকারের মালিক ভগবান্। মানুষের শক্তি আর কতটুকু। আপনি অস্থির হবেন না, ভগবানের দয়া হ'লে, অবস্থা এখনো ভালোর দিকে যেতে পারে।"

মন্দিরার অবস্থা যে চিকিৎসার সম্পূর্ণ বাইবে ডাক্তার বাবুর কথা থেকে সেটা বুঝে নিতে দুলালের মোটেই ভুল হ'ল না। অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত দুলাল ও কমলা মন্দিরার পরিচর্য্যা করতে লাগলো। উমা গোয়ালিনীও তার যথাশক্তি করতে ত্রুটি করলো না।

বাকী রাত ও তার পরবর্ত্তী সাবাটা দিন এক ভাবেই কেটে গেল। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পর অল্প সময়ের জন্য মন্দিরার সংজ্ঞা ফিরে এলো। দুলালকে চিন্‌তে পেরে একটি বার "দাদা" ব'লে ডাক দিয়ে পরক্ষণেই আবার তার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হ'ল এবং চোখের কোণ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। দুপুর রাত্রিতে পাশ ফিরবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরার পবিত্র আত্মা দেহমুক্ত হ'ল।

উমা চীৎকার ক'রে উঠলো কমলা তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লো, "কাঁদিস্ নি উমা, কেঁদে আর চোখের জল ফেলে ওর আত্মার অকল্যাণ করিস্ নে। আমি পাষাণে বুক বেঁধেচি, জোর ক'রে চোখের জল শুকিয়ে ফেলেচি, কেন জানিস্? মন্দিরার এই অকাল-মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো ব'লে—অত্যাচারী পিশাচের শাস্তির ব্যবস্থা ক'রবো ব'লে।"

কমলা কাঁদলো না বটে কিন্তু তার দুই চোখ ও কান রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠলো। সে বুঝেছিল, শোকগ্রস্ত দুলালকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে ভিন্ন আর কেউ ছিল না। সুতরাং শোকে গা ভাসিয়ে দিলে তার চলবে না। মন্দিরাকে সে অন্তরের সহিত ভালবেসেছিল এবং ইচ্ছা ক'রেছিল তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। কমলা তখনও জান্‌তো না, মন্দিরার মা বেঁচে নেই। তার আশঙ্কা ছিল, দুলাল হয় ত' এই শোকে ভয়ানক মুস্‌ড়ে যাবে। কিন্তু দুলাল কোনো অস্থিরতা না দেখিয়ে স্থির পাহাড়ের মতো সব নীরবে স'য়ে গেল। কমলা দুলালের দু'টি হাত নিজ হাতের মধ্যে নিয়ে গভীর স্নেহের স্বরে বল্‌লো, "ভাই, তোমার মন্দিরা বোন্‌টি ছিল স্বর্গের পারিজাত, তাই পূজোর জন্যে দেবতা তাকে কুড়িয়ে নিয়েচেন। কিন্তু দেব-পূজার অযোগ্য এই যে আর একটি বোন র'য়ে গেল, তাকে কি 'দিদি' ব'লে গ্রহণ করতে পারবে না?"

এবার দুলালের দুই চোখ দিয়ে অজস্র অশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগলো। নিজেকে দ্রুত সাম্‌লে নিয়ে দুলাল কমলার মুখের দিকে চেয়ে জড়িত কণ্ঠে শুধু বল্‌লো, "দিদি, নিশ্চয় পারবো, মন্দিরার জন্য তুমি যা ক'রেচো, কোনো আপন 'দিদি' এর চেয়ে বেশী করতে পারতো না।"

পবিত্র জাহ্নবীতীরে মন্দিরার পার্থিব দেহের শেষকার্য্য সমাধা করা হ'ল। নিতাই এসেছিল হরিরামপুব থেকে মন্দিরার উদ্ধারের সহায়তা করবার জন্য দুলালের সহকারী রূপে, কিন্তু ভগবানের বিধানে তার উপস্থিত থাক্‌তে হ'ল মন্দিরার শ্মশানবন্ধু রূপে!

চুঁচুড়ার সরকারি হাঁসপাতালে গণেশ ঘোষাল শ্যামলাল নামে স্থানপ্রাপ্ত হবার কয়েক ঘণ্টা পরেই জ্ঞান লাভ করেছিল, কিন্তু কথা বল্‌তে সক্ষম হয় নি। তার চার দিন পর অবস্থা একটু ভালো হ'লে সে বুঝতে পারে—তার একটা চোখ সম্পূর্ণ

নষ্ট, মুখাকৃতি অসম্ভব বিকৃত ও একটা হাত একেবারেই অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গিয়েচে এবং তার জীবনের আশাও খুব কম।

সেই দিনই কমলা চুঁচুড়ায় এসে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট চন্দননগরের "নারী-রক্ষাশ্রম" সম্পর্কিত সকল ব্যাপার খুলে বলে। সেই আশ্রমের অন্তরালে যে সব ব্যভিচার, অত্যাচার হ'য়ে থাকে, নারী-চুরি ও নারী-বিক্রয়ের যে বিরাট সমিতি সুশৃঙ্খল প্রণালীতে পাঞ্জাব থেকে বাঙ্গালাদেশ পর্য্যন্ত কাজ ক'রে আসচে এবং এই জঘন্য ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে কোকেন ও আফিম্ আমদানি-রপ্তানির একটা গোপন ব্যবসায় বহুকাল যাবৎ অবাধে চলচে, এই সকলের মোটামুটি বিবরণ ত' সে দিলই, তা ছাড়া যারা এই সবের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে ব'লে সে জানে, তাদের নাম-ধামও ব'লে দিলো। কিছুদিন পূর্ব্বে পুলিশের ভয়ে যে অনেক জিনিসপত্র চুঁচুড়ায় স্থানান্তরিত করা হ'য়েচে এবং সেগুলো যে গণেশ ঘোষাল ওরফে শ্যামলালের তত্ত্বাবধানে আছে তাও সে বল্‌লো। শ্যামলালের চুঁচুড়ার ঠিকানাটা কমলার জানা ছিল না।

পুলিশ কর্ম্মচারী কমলার বর্ণিত বিবরণ বিস্তৃত ভাবে লিখে নিলেন এবং তার পর তাকে স্থানীয় হাঁসপাতালে নিয়ে শ্যামলালকে দেখালেন। তার ক্ষত-বিক্ষত ও এক-চক্ষু বিহীন বিকৃত চেহারা দেখে কমলা প্রথমতঃ তাকে চিন্‌তে পারে নাই কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাকে গণেশ ঘোষাল ব'লে সনাক্ত করলো।

গণেশ যখন জান্‌তে পারলো কমলা তাদের সকল কথা পুলিশকে ব'লে দিয়েচে, তখন সে বুঝলো তার প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হ'য়েচে। সে তখন পুলিশের নিকট এক বিস্তৃত স্বীকারোক্তিতে কমলার উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করলো, উপরন্তু অশোকাকে চুরি ক'রে চুচুড়ার বাড়ীতে আনার পরবর্ত্তী অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারও যথাযথ প্রকাশ ক'রে বললো।

"পাগলি মেয়ে"র লিখিত অর্দ্ধদগ্ধ কাগজখণ্ড দেখে গণেশ তা চিন্‌তে পারলো না, কারণ অশোকার হাতের লেখা চিন্‌বার তার সুযোগ ঘটে নি, তবে তার বিশ্বাস, ঐ লেখা সম্ভবতঃ অশোকারই এবং ঐ মেয়েটা হয় তো গঙ্গায় ডুবেই ম'রেচে।

ঐ বাড়ীতে কি ক'রে বোমা এলো, এই প্রশ্নের উত্তরে গণেশ ব'লেছিল, হঠাৎ বিনা সংবাদে পুলিশ এসে হানা দিলে অপরাধ-জনক অনেক কিছু বের হবার সম্ভাবনা ছিল ব'লে পুলিশকে জখম ক'রে তাড়িয়ে দেবার জন্য তারই পরামর্শে বাজার থেকে কতকগুলো বোমা কিনে আনা হয় কিন্তু সেই বোমা যে ঘটনাচক্রে তারই উপর ফাটবে, সে তা কল্পনায়ও আন্‌তে পারে নি।

এর পর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ প্রথমতঃ চন্দননগরের নারী-রক্ষাশ্রম বাড়ীতে গিয়ে পণ্ডিতজী ও তার কয়েক জন কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করে। প্যারীলাল কোনো কৌশলে পালিয়ে যায়। এখানে খানাতল্লাসীতে পুলিশ অনেক কাগজপত্র হস্তগত করে। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই বাঙ্গালাদেশ হ'তে লাহোর পর্য্যন্ত নানা স্থানে পুলিশ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত প্রায় দেড়শো লোক গ্রেপ্তার ক'রে ফেলে। মেয়ে চুরি ও বিক্রয়ের এ রকম বিরাট Organisationএর কথা পর পর যখন সংবাদপত্রে বেরুলো, তখন সমস্ত দেশে একটা তুমুল হৈ চৈ প'ড়ে গেল। পুলিশ-তদন্ত শেষ হ'তে ছয় মাসেরও অধিক সময় লাগে। তার পর প্রায় এক বৎসরব্যাপী বিচারের পর আসামিগণের প্রায় সকলেরই দীর্ঘ কারাবাসের আদেশ হয়।

গবর্ণমেণ্ট পক্ষ থেকে কমলাকে একটা বিশেষ পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, কিন্তু মোকদ্দমার শেষে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

গণেশ সরকারী সাক্ষী হ'য়েছিল ব'লে তার অপরাধ মার্জ্জনা করা হয় কিন্তু বিকলাঙ্গ হ'য়ে জীবন্মৃতাবস্থায় সে বাঙ্গালার বাইরে সুদূরে গিয়ে বাস করতে থাকে।

নিরুদ্দেশ প্যারীলালের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। কিন্তু বহুকাল তার কোনো খবরই কেউ পায় নি। তবে একবার জনরব উঠেছিল, সে কাণপুরে আত্মহত্যা ক'রে তার পাপ-জীবনের অবসান ক'রেচে। [ক্রমশঃ

রামপ্রসাদ

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী কুমারহট্ট হালিসহর গ্রামে আনুঃ ১৭২৩ খৃঃ অব্দে বৈদ্যবংশে সাধক রামপ্রসাদের জন্ম হয়। কুমারহট্ট গ্রাম ভাগীরথীতীরের সভ্যতা ও সংস্কৃতানুশীলনের অন্যতম কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বসবাস ছিল এবং বহু চতুষ্পাঠী ছিল। শ্রীচৈতন্যের গুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি এই গ্রাম। রামপ্রসাদ এই সংস্কৃত শিক্ষাদীক্ষার পরিবেষ্টনীর মধ্যে একটি সংস্কৃতজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবি নিজের জীবনকথা নিজের গ্রন্থে এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।

ধনবন্ত মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্টশান্ত গুণানন্ত প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশ সম্ভূত ধীর সর্ব্বগুণ-যুত ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর দেবীপুত্র সরল-হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম সদা যারে সদয়া-অভয়া।
প্রসাদতনয় তাঁর কহে পদে কালিকার কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া॥

রামপ্রসাদের পিতামহের নাম রামেশ্বর, পিতার নাম রামরাম সেন। তাঁহার ভ্রাতা-ভগিনীদের পরিচয় তিনি এই ভাবে দিয়াছেন—

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী।
যাঁর পাদপদ্ম আমি দিবারাত্রি সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয় যুগল জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণ-ধাম॥
সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তাঁরে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমাত্মজ বিশ্বনাথে দেহ পদচ্ছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥

সাধক কবি নিজবংশের পরিচয়চ্ছলেও কৃপাময়ীর নিকট তাঁহার পরিজনগণের কল্যাণকামনা করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ নিজগ্রামের এইভাবে পরিচয় দিয়াছেন—

ধরাতলে ধন্য সেই কুমারহট্টগ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম॥
শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥

রামপ্রসাদের পৈতৃক ভিটা ও তাঁহার সাধনপীঠ পঞ্চমুণ্ডী আসনের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে—সেখানে একটি স্মৃতিমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের বংশধারা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কুলপ্রথামত রামপ্রসাদ সংস্কৃত টোলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া চিকিৎসাবৃত্তি শিক্ষা করিবেন ইহাই স্থির ছিল। রামপ্রসাদ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন—অল্পকালের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শনাদি পাঠ সমাপ্ত করিলেন, কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত দৈহিক রোগের চিকিৎসার জন্য প্রবর্ত্তিত হইবে কেন? পিতা তখন রামপ্রসাদকে আরবী পারশী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। সেকালে এই দুই ভাষা শিক্ষা করিলে রাজসরকারে ভাল চাকুরী মিলিত। রামপ্রসাদ যে আরবী পারশী মন দিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিদ্যাসুন্দর পুস্তকের কোন কোন স্থান হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

অল্পবয়সে রামপ্রসাদের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগে সংসারের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তখন তিনি চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় নানাস্থানে তিনি সামান্য বেতনে চাকুরী করেন—কোথায় কোথায় চাকুরী করেন তাহা লইয়া মতভেদ আছে— অতএব সে সকল স্থানের কথা বলিয়া লাভ নাই। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি মহামায়ার পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ভক্তি সঙ্গীত-রচনায় রূপলাভ করিত। সেই সঙ্গীত গাহিয়া তিনি জগজ্জননীর চরণে হৃদয়ের আবেদন জানাইতেন। ইহাই ছিল তাঁহার

উপাসনা। সঙ্গীত-রচনায় তিনি এমনই তন্মাত হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। এইরূপ ভাবে-ভোলা ভক্তশ্রেণীর লোকের দ্বারা মনিবের কাজ ভালরূপ হইত না। তিনি তাঁহার হিসাবের খাতায় ও বোকড় বইএর আষ্টেপৃষ্ঠে কালী নাম লিখিতেন। কাজ করিতে করিতে ভাবাবেগ আসিলে গুণগুণ করিয়া কালীনাম গান করিতেন এবং পদ রচনা করিতেন। ভুলিয়া যাইবেন বলিয়া হিসাবের খাতায় সেই গান টুকিয়া রাখিতেন। এই ভাবে "আমায় দে মা তবিলদারি" বলিয়া একটি পদ তিনি হিসাবের খাতায় লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের উপরওয়ালা হিসাব পরীক্ষা করিতে গিয়া এই গানটি দেখিতে পান। তিনি তাঁহার মনিবের গোচরে আনেন। মনিব গানটি আগাগোড়া পড়িয়া বুঝিলেন—রামপ্রসাদ সত্যই সাধক ভক্ত। তিনি তাঁহার কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হইলেন এবং বুঝিলেন এই সাধকের দ্বারা বৈষয়িক কার্য্য সাধিত হইবে না। কথিত আছে, সেই মনিব তখন রামপ্রসাদকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়া একটি বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রামপ্রসাদ নিজ গ্রামে বসিয়া মাসে মাসে সেই বৃত্তি লাভ করিতেন। এই বৃত্তি সামন্ত কিন্তু রামপ্রসাদেরও কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, সামান্তেই তাঁহার সংসার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। তিনি গ্রামে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেন এবং জাহ্নবীতীরে ভক্তি-গদগদকণ্ঠে স্বরচিত গান গাহিয়া দিন কাটাইয়া দিতেন।

কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদিন বজরায় চড়িয়া গঙ্গাবক্ষে চলিতেছিলেন। মহারাজ নিজে গুণী ও গুণজ্ঞ ছিলেন। তিনি গান শুনিয়া মুগ্ধ হন। এই সূত্রে মহারাজের সহিত রামপ্রসাদের পরিচয় ঘটে; এই পরিচয়ের ফলে রামপ্রসাদ কৃষ্ণনগরের রাজসভায় যাতায়াত করিতেন। মহারাজ সে-যুগের ক্ষুদ্র বিক্রমাদিত্য ছিলেন—তাঁহার সভায় অনেক গুণী জ্ঞানীর সমাবেশ হইয়াছিল। মহারাজের ইচ্ছা ছিল—রামপ্রসাদও তাঁহার সভার অন্যতর সভাকবি হইয়া বিরাজ করেন। ভারতচন্দ্রকে তিনি রায়গুণাকর উপাধি দান করিয়া নিজ সভায় সসম্মানে রাখিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র নিজে ছিলেন জমিদারের পুত্র—দশা-বিপর্য্যয়ে তিনি পথের ভিখারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণনাথের সভায় আশ্রয় পাইয়া তিনি নিজের বিষয়সম্পত্তির উদ্ধার করেন। ভারতচন্দ্র নিজে কবি হইলেও বিষয়ী লোক ছিলেন এবং ধনী হইয়া সম্মানে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল রামপ্রসাদ ঠিক বিপরীত প্রকৃতির লোক, তিনি সাধনভজন লইয়া জীবন যাপনকেই প্রধান ব্রত মনে করিতেন। তাঁহার কবিত্ব সাধন-ভজনেরই অঙ্গ—রাজসভার জন্য নহে, গঙ্গাতীরেরই উপযুক্ত। তিনি রাজসভায় থাকিতে স্বীকৃত হন নাই—তবে মহারাজের গুণজ্ঞতার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে কৃষ্ণনগরে আসিতেন।

কথিত আছে, মহারাজ তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি দান করেন এবং তাঁহার বিদ্যাসুন্দর মহারাজের উৎসাহেই রচিত হয়। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর রচনার পরে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কবিত্বের কাছে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ম্লান হইয়া গেল। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর চলিল না—তাঁহার যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ—যে সম্পদে ভারতচন্দ্র তাঁহাকে অতিক্রম করিবার কোনদিন চেষ্টাও করেন নাই,—সেই সম্পদই দেশে অক্ষয় হইয়া আছে। রামপ্রসাদের পদাবলীই এই অমূল্য সম্পদ্।

বিদ্যাসুন্দরে রামপ্রসাদের কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যেরই অধিকতর পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, এই পুস্তক আদিরসাত্মক;—ভক্তিরসে যাঁহার লেখনী অভিষিক্ত—যাঁহার জীবন ভক্তির অমৃত দিয়া গড়া, তাঁহার হাতে আদিরসের কাব্য ভাল জমিবার কথা নয়। তবু কেন যে তিনি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন—তাহা ভাবিবার কথা. বোধ হয়, মহারাজের আদেশেই এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল। বরাতী কাব্য বলিয়া ইহা কবির প্রাণের সাড়া ও অন্তরাত্মার সম্মতি লাভ করে নাই। মহারাজের আদেশ ছাড়াও ইহা রচিত হইতে পারে—কারণ, বইখানি আদিরসাত্মক হইলেও শেষ পর্য্যন্ত কালীমাহাত্ম্যই ইহা প্রচার করিতেছে। আরাধ্যা দেবীর মহিমা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের জন্যই কবি হয় ত' আদিরসাত্মক আখ্যান-বস্তু গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহা ছাড়া, ইহাকে অনেকে রূপক কাব্য বলেন। এই রূপক সম্পূর্ণ তন্ত্রসম্মত। তান্ত্রিক সাধক রামপ্রসাদ সম্ভবতঃ পুরুষ-প্রকৃতির রূপককেই লক্ষ্য করিয়া ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন।

বিদ্যাসুন্দরের কালীবন্দনায় কবি আভাষ দিয়াছেন—এই

গ্রন্থ রচনায় তাঁহার পত্নী মা-কালীর প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন—

অখিল-জননী তব চরিত্র কেমন।
হেদেগো করুণাময়ি এ আর কেমন॥
ধন্ত দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ করে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥

যাহা হউক, বিদ্যাসুন্দর পাঠে মহারাজ প্রীত হইয়া রামপ্রসাদকে কয়েক বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। এই নিষ্কর ভূমি প্রাপ্তির পর রামপ্রসাদের সংসারে আর অন্নবস্ত্রের কোন অভাব ছিল না।

রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই

কুমারহট্ট যেমন শাক্তপ্রধান স্থান ছিল—তেমনি বৈষ্ণবপ্রধান স্থানও ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এখানে ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া একবার আসেন এবং ইহার মৃত্তিকাকে পরম দুর্ল্লভ সামগ্রী মনে করিয়া তিনি বহির্ব্বাসের অঞ্চলে করিয়া খানিকটা মাটি লইয়া গিয়াছিলেন।

প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবন-মন-প্রাণ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন ইত্যাদি বহু ভক্ত এই অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন। ফলে এখানে বৈষ্ণবদের প্রধান্য কম ছিল না। শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই দলই যেখানে প্রবল, সেখানে নিরন্তর দ্বন্দ্ব ঘটা খুবই স্বাভাবিক। পরবর্ত্তী যুগে সাহিত্যের মধ্যে উভয় দলের দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। রামপ্রসাদের সময় এ দ্বন্দ্ব খুবই চলিত। সেই দ্বন্দ্বের কিছু কিছু পরিচয় সাহিত্যেও পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ ও শাক্তগণ নিজ নিজ ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য গান ও ছড়া লিখিতেন। রামপ্রসাদের সময়ে কুমারহট্টে আজু গোঁসাই নামে একজন রসিক বৈষ্ণব-কবি ছিলেন। তাঁহার সহিত রামপ্রসাদের রস-কলহ হইত। তখন রসকলহের যুগ চলিতেছিল—কবির গানে ও পাঁচালির গানে এই রস-কলহই ছিল প্রধান উপজীব্য। সকল সম্প্রদায়ের লোক এই রস-কলহ উপভোগ করিত।

আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের বহু গানের উত্তরচ্ছলে গান ছড়া বাঁধিতেন। আজু গোঁসাইএর কবিত্বের পরিচয় আমরা এই 'উত্তোর গানেই' পাই—তাঁহার রচিত অন্য কোন সঙ্গীতের পরিচয় পাওয়া যায় না। রামপ্রসাদই আজু গোঁসাইকে অমর করিয়াছেন। রামপ্রসাদ তাঁহার কোন গানের 'উত্তোর' দিয়াছেন কিনা আমরা জানিতে পারি না। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

এ সংসার ধোকার টাটি

আজু গোঁসাই উত্তোর দিয়াছেন—

এ সংসার রসের কুটি
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি।
ওরে যার যেমন মন   তার তেমন ধন
মন কররে পরিপাটী।
ওহে সেন নাই জ্ঞান তুমি বোঝ মোটামুটি।
ওরে ভাই বন্ধু দারাসুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি।
রমণীরে বিষ জেনেছ তাতেও ত না দেখি ত্রুটি।
তুমি ইচ্ছাসুখে খেলে পাশা কাঁচিয়েছ পাকা ঘুঁটি।
মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া ভাবছ মায়ার বেড়ি টুটি
তবে শ্যামের পদে অভেদ যেন শ্যামামায়ের চরণ দুটি।

রামপ্রসাদ সাধক হইলেও সন্ন্যাসী ছিলেন না—গৃহীই ছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার একটি সন্তানও হইয়াছিল। এই গানে তাহার শ্লিষ্টাভাস আছে। রামপ্রসাদের মায়াবাদের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব রসবাদের ইঙ্গিত ইহাতে আছে। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

ডুব দেরে মন কালি ব'লে।

আজু উত্তোর দিয়াছেন—

ভুলিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি।
একে তোমার কফো নাড়ী ডুব দিও না তাড়াতাড়ি,
তোমার হলে পরে জ্বরজ্বাড়ি মন যেতে হবে যমের বাড়ী।
অতি লোভে তাঁতী নষ্ট মিছে কষ্ট কেন করি
ও তুই ডুবিস্ নে মন ধরগে ভেসে শ্যাম কি শ্যামার চরণতরী।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরু-তলে গিয়ে চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।

আজুর উত্তোর—

কেন মন বেড়াতে যাবি
কারো কথায় কোথাও যাস্না রে মন মাঠের মাঝে মারা যাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরে মন নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে করতে পারিস্ মাঝ গাঙেতে ভরা ডুবি
বাঁশবনে যে ডোম কানা হয় এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি।
শেষে কল্পতরুর তলায় গিয়ে কি ফল নিতে কি ফল নিবি।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ সুরাপান করিতেন। এই গানে তাহার শ্লিষ্টাভাস আছে। বোধ হয় ইহারই উত্তরে প্রসাদ গাহিয়াছেন—

মন ভুল না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে।
সুরাপান করিনে রে   সুধা খাই রে কুতূহলে,
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদমত্তালে মাতাল বলে।

রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তনে ব্রজলীলার সহিত কালীলীলার সমন্বয় সাধনের জন্য মায়ের গোষ্ঠগমন নামে কয়েকটি ভজন গান লিখিয়াছিলেন। কাশীনাথের আদেশ পাইয়া জগদম্বা এক আম্রকাননে গোধন চরাইতেছেন—রামপ্রসাদ এইরূপ একটি লীলার বর্ণনা করিয়াছেন। আজু গোঁসাই তাহা পাঠ করিয়া গাহিয়াছেন :

না জানে পরম তত্ত্ব   কাঁটালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে কি ধেনু চরায় রে।
তা যদি হইত   যশোদা যাইত
গোপালে কি বনে পাঠায় রে।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন ;

"মুক্ত কর মা মায়াজালে।"

আজু উত্তোর দিয়াছেন :

বদ্ধ কর মা ক্ষেপলা জালে
যাতে চুনো পুঁটি পালাবে না মজা মারব ঝোলে-ঝালে।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন :

এবার কালী তোমায় খাব।
তেরি মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব।

আজু গোঁসাই উত্তোর দিলেন :

সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি।
সর্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে ভুষা কালী মেখে যাবি
আর কালেরে দেখাতে কলা নিজে যে কলা দেখিবি॥

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন :

মন রে আমার এ মিনতি।
তুমি পড়া-পাখী হও করি স্তুতি।

আজু উত্তোর দিয়াছেন :

হয়ো না মন পড়া-পাখী
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী।
পাখী হলে তত্ত্ব ভুলে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বলবে পরের বুলি পরম তত্ত্বের জানিবে কি ?
ভক্তিগাছে মুক্তি ফলে সে ফল উড়ে খাওগে দেখি।
খেলে মাথায় ফাঁদে পড়বে না আর শমন-ব্যাধে দিবে ফাঁকি।

বলা বাহুল্য এসমস্ত রসকলহের উত্তর মাত্র। রামপ্রসাদকে এ-বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আজুগোঁসাই-এর ছিল না। রামপ্রসাদের মন কোন দিনই পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিল না—কখনও তাহা পড়া বুলি বলে নাই। ভক্তিগাছে যে মুক্তি ফলে এবং সে ফলের সন্ধান রাখিলে যে শমন-ব্যাধকে ফাঁকি দেওয়া যায় এ-কথা রামপ্রসাদের চেয়ে কে আর জানিতেন ?

আজুগোঁসাইকে লোকে পাগল বলিত—রামপ্রসাদ এক সময় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাই বলিয়াছিলেন—

'কর্ম্মের ঘাট, তৈলের কা'ট, আর পাগলের ছাট' মলেও যায় না।'

ইহার উত্তরে আজুগোঁসাই বলিয়াছিলেন—

কর্ম্মভোর, স্বভাবচোর, মদের খোর, মলেও যায় না।

প্রসাদ বলিলেন—পাগল। আজু বলিলেন—মাতাল। অর্থাৎ আমরা দুই-ই সমান।

আজু ও প্রসাদের রসকলহ বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের একটি অপূর্ব্বসম্পদ। ইহাতে যেমন সে-কালের পল্লীজীবনের একটি দিকের চমৎকার ইতিহাস পাওয়া যায়—তেমনি রসকলহের মাধুর্য্য উপভোগ করা যায়।

কথিত আছে, একবার নবাব সিরাজউদ্দৌল গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে যাইবার সময় প্রসাদের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কূলে নৌকা ভিড়াইয়া প্রসাদের গান বহুক্ষণ ধরিয়া শুনিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া যান। ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। অকৃত্রিম ভক্তি ও তদ্গত-ভাব হিন্দুরই হউক আর মুসলমানেরই হউক যে সঙ্গীতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া থাকে—তাহা বনের পশুপাখীকেও মুগ্ধ করে—মানুষের ত কথাই নাই। সঙ্গীতের কলাকৌশল বিশেষজ্ঞেরাই বুঝে—কিন্তু গভীর অনুভূতি সঙ্গীতের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহা সকল কলাশিল্পকে ছাড়াইয়া একটা সার্ব্বজনীনতা, অতীন্দ্রিয়তা ও অনির্ব্বচনীয়তা লাভ করে—ইহা দরদী কণ্ঠে যাহারা গান শুনিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন।

রামপ্রসাদের জীবনের সহিত কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা জড়িত আছে। কথিত আছে—ব্রহ্মময়ী একবার কন্যার রূপ ধরিয়া রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন—রামপ্রসাদ তাঁহার একটি গানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কাশীর অন্নপূর্ণা তাঁহার সঙ্গীত শুনিতে চাহিয়াছিলেন

—রামপ্রসাদ গান শুনাইবার জন্য কাশীযাত্রা করিয়াছিলেন—পথে প্রত্যাদেশ পান—তাঁহাকে কাশী যাইতে হইবে না। পথে গান গাহিলেই তিনি শুনিয়া আপ্যায়িত হইবেন।

রামপ্রসাদের মৃত্যুও অলৌকিক। কালীপ্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে গিয়া তিনি গঙ্গাজলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া ৪টি গান করেন—শেষ গান যখন করেন তখন তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার জীবাত্মা কৈবল্যধামে প্রস্থান করে। রামপ্রসাদের মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল ৫০ বৎসর। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন।

বিদ্যাসুন্দর—অনেকে ভাবিয়া ঠিক পান না—ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ কি করিয়া বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় শ্লীলতাবর্জ্জিত কাব্য রচনা করিলেন। ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানপ্রভাবে আজ আমরা যাহাকে অশ্লীল বলিয়া মনে করি—পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোক তাহাকে অশ্লীল মনে করিত না। অশ্লীল মনে করিলেও লোকে সাহিত্যে বর্জ্জনীয় মনে করিত না। বরং পূর্ব্বকালের কবিরা ঐ প্রকারের অশ্লীলতাকে বড় কাব্যের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপই মনে করিতেন।

বিদ্যাসুন্দর সে-কালের মামুলী প্রথামত রচিত কাব্য—ইহাতে রামপ্রসাদের নিজস্বতা অতি সামান্য। মামুলী ধরণের রচিত কাব্যে যে যে অঙ্গ থাকা উচিত, কবি তাহার সবগুলিরই ইহাতে সমাবেশ করিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দর প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ইহা কালিকামঙ্গল। চণ্ডীর পূজা জগতে প্রচারের জন্য যেমন কালকেতু ও শ্রীমন্তের জন্ম—মনসা পূজা প্রচারের জন্য যেমন চাঁদ সদাগর, বেহুলা ইত্যাদির জন্ম—তেমনি মা কালীর পূজার জন্য বিদ্যা ও সুন্দরের জন্ম। সুন্দর যখন বিদ্যাকে পাইয়া শ্বশুরালয়ে ভোগসুখে মত্ত আছেন, তখন মা কালী স্বপ্নে বলিতেছেন—

শাপভ্রষ্ট জন্ম ধর আবার সুন্দর।
মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর॥
কামিনী পাইয়া সুখে ভুলিলে কুমার।
তবে ত আমার পূজা হবে না প্রচার॥

সুন্দরের বিদ্যালাভই কাব্যের প্রধান উপজীব্য নয়—কালীপূজা-প্রচারই প্রধান উপজীব্য।

মালাধর হারাবতী সাপে জন্ম বসুমতী
ব্রতকথা করিতে প্রচার

যখন এই ব্রত সমাপ্ত হইল—তখন মা কালী বলিতেছেন—

সাবধানে শুন বৎস সর্ব্বকথা কহি।
শাপভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জন্ম নহি॥
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর॥
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল।
পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল॥

এই কালীমাহাত্ম্য প্রচারই কাব্যের মেরুদণ্ড।

মাধব ভাটের মুখে সুন্দর বিদ্যার পরিচয় পাইলেন—সেই রাত্রেই কালী স্বপ্নে আদেশ দিলেন—

আর কেন ওরে ভক্ত আমি তব অনুরক্ত
সেও ত আমারি দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই একান্ত জানিবে এই
তরুণী তোমার তরে ঘটে॥

কেবল স্বপ্ন দেওয়া নয়—কালী বলিলেন—তুমি বর্দ্ধমান যাত্রা কর। তারপর সুন্দর—

ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি চলে রাত্রিদিবা।
কি ভয় সঙ্কটে সদা সঙ্গে সঙ্গে শিবা॥

কালী ভক্তকে পথে পরীক্ষা করিলেন—

ভক্তে ভয় দর্শাইতে মাতা ভগবতী।
মায়ায় সৃজিলা নদী বেগবতী অতি॥

এই সময়ে অকস্মাৎ মহাযোগী উপস্থিত তথা। তিনি ছদ্মবেশে শিব। তিনি বলিলেন—শিবপদ ভজ—

স্নান কর শুচি হও দণ্ড দুই রহ।
কালীমন্ত্র পরিহর হরমন্ত্র লহ॥

তাহা হইলে এই বিপদে ত্রাণ পাইবে। ইহাতে সুন্দর অগ্নিশর্ম্মা হইলেন—তিনি বলিলেন—

দনুজদলনী শ্যামা জননী যাহার।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার?

ভক্তের পরীক্ষা হইয়া গেল।

ঘুচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে।

ছয় মাসের পথ সুন্দর দশ দিনে অতিক্রম করিলেন।

কেমনে কালীর কৃপা কি কব বিশেষ।
দশম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ॥

সুন্দর মালিনীর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছেন। মালিনী বলিল—তোমার কি গুণ আছে বাছা—তুমি বিদ্যা লাভ কি করিয়া করিবে? বিদ্যাকে বিচারে জয়লাভ করিতে পারিলে তবে তাহাকে পাইবে।

সুন্দর উত্তর করিল—

কালী পাদপদ্মেতে যদ্যপি মন রহে।
অবলা বিচারে জিনা বড় কার্য্য নহে ॥

সুন্দর শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ। তিনি মালিনীর গৃহে আসিবামাত্র—শুষ্ক মালঞ্চ ফুলে ভরিয়া গেল।

এদিকে বিদ্যা মালার মধ্যে কৌশলে সুন্দরের আত্মনিবেদন পাইয়া বলিতেছে—

বিরহিণী দেখি আমা   প্রসন্না হইলা শ্যামা
বিধু মিলাইল করতলে ॥

তারপর বিদ্যা মা কালীকে স্তবস্তুতি করিয়া নিবেদন করিতেছে—

কৃপা কর কৃপাময়ী   কেহ নাহি তোমা বই
শঙ্করী কিঙ্করী তব ডাকে।
সুন্দর সুন্দর-তনু   অভিন্ন কুসুম-ধনু
সেই পতি দেহি মা আমাকে ॥

স্বপ্নাদেশ হইল—নিশিযোগে হবে দেখা।

এদিকে সুন্দর বিদ্যার রূপ দেখিয়া মোহিত। কি করিয়া মিলন হইবে ভাবিয়া আকুল হইয়া মা-কালীকে স্তব করিতে লাগিল—'মা, উপায় কর'। মায়ের কৃপা হইল—
সুন্দরকে সুড়ঙ্গ খুঁড়িতেও হইল না।

সুন্দর ও বিদ্যার মিলন হইয়াছে। সুন্দর মোহমুগ্ধ হইয়া উপাস্যা দেবীকে ভোলে নাই।
দিবাভাগে—

স্নান করি পূজে কবি শঙ্কর-ঘরণী।
যে পদ-পঙ্কজ ভবসাগর তরণী ॥

বিদ্যার বিদ্যা ধরা পড়িয়াছে—সখীরা মহাচিন্তায় পড়িয়াছে, কিন্তু তাহারাও বলিতেছে—

লয়েছি সবাই শিরে কলঙ্কের ডালি।
কেহ বলে চারা নাই যা করেন কালী ॥

কোটালকে রাজা হুকুম দিয়াছেন সাত দিনের মধ্যে চোর ধরিতে না পারিলে প্রাণদণ্ড। কোটালও মা-কালীকেই ডাকিতেছে—

যদ্যপি না মিলে চোর রাজা প্রাণ লবে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নাম কেন তবে ॥

কোটাল যখন মালিনীর গৃহে আসিয়া তাহার লাঞ্ছনা করিতেছে—চারিদিকে কলরব—গণ্ডগোল। বাড়ীঘর সব তছনছ করিতেছে।—মালিনীর ঘরে বসিয়া সুন্দর তখন কালীনাম জপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

সুন্দর সানন্দে জপে কালীনাম-মন্ত্র।
কোনকিছু নাহি জানে কোটালের তন্ত্র ॥

মা-কালীর উপর অগাধ বিশ্বাসের ফলে সুন্দর সাধ করিয়া ধরা দিলেন।

সুন্দরকে মশানে লইয়া যাওয়া হইল, সুন্দর বিন্দুমাত্র হতাশ হন নাই। সে কালীমাতার স্তব করিতে লাগিল। মা কালী ভক্তকে আশ্বাস দিলেন। নিজেই ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন না—

কিরূপ কালীর কৃপা কওয়া নাহি যায়।
মাধব নামেতে ভট্ট মিলিল তথায় ॥

সুন্দরের দশদিন লাগিয়াছিল—কিন্তু মাধবকে কাঞ্চীপুর হইতে আসিতে ছয় মাস লাগিয়াছে। সে এই সময় আসিয়া মশানে উপস্থিত হইল। তাহার মুখে সুন্দরের পিতৃপরিচয় পাওয়া গেল এবং মাধব এই সুন্দরের জন্যই কাঞ্চীপুর গিয়াছিল। তাহার মুখেই সুন্দর বিদ্যার পরিচয় পাইয়াছে—এসব কথা প্রকাশ পাইল। সুন্দর বাঁচিয়া গেল এবং জামাতৃ-পদে বৃত হইলেন।

সুন্দর জামাই-আদরে নিজের ব্রতের কথা ভুলিয়া গেলেন। মা কালী সুন্দরের জননীর রূপ ধরিয়া সুন্দরকে স্বপ্ন দিয়া বলিলেন, 'বাবা, মাকে ভুলিয়া গেলে ?'

সুন্দরের চৈতন্য হইল। সুন্দর বিদ্যাকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। তারপর তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইল।

বেশীদিন রাজ্য ভোগ করিতে হইল না—কারণ, রাজ্যভোগের জন্য বা সুখসম্ভোগের জন্য সুন্দরের সৃষ্টি নয়। সুন্দর দক্ষিণা কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, তাঁহার পূজা প্রচার করিলেন—শবসাধনা করিলেন, সিদ্ধিলাভ করিলেন, তাঁহার কর্ত্তব্য ফুরাইয়া গেল। মা কালীর আদেশে সুন্দর বিদ্যাসহ স্বর্গারোহণ করিলেন। কাব্যও সমাপ্ত হইল। অতএব দেখা যাইতেছে মূল আখ্যানবস্তু কালীমহিমা প্রচার। এই প্রচারের জন্য সুন্দরের সহিত বিদ্যার মিলন ঘটিবার প্রয়োজন ছিল। পতিপত্নী দুইজনেই শাপভ্রষ্ট, একই উদ্দেশ্যে দুইজনের মর্ত্ত্যে অবতরণ। এই মিলন-প্রসঙ্গে যে রামকেলির বর্ণনা আছে—তাহা সেকালের কাব্যের একটা অপরিহার্য্য প্রথা। কবি সেই প্রথারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যগুলির মূলে আছে দেবতার স্বপ্নাদেশ। এক্ষেত্রে কবি নিজে স্বপ্নাদেশ পান নাই—পাইয়াছিলেন কবি-জায়া। তাই কবি বলিয়াছেন—

ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ করে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর

প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত কালিকামঙ্গল নামক গ্রন্থে আছে—

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যাঁর বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥

ইহা হইতে মনে হয় নিমতা নিবাসী কৃষ্ণরাম কালিকামঙ্গল গ্রন্থে প্রথম বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান কবিতায় রচনা করেন—তাহার পর রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর—তাহার পর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর—তাহারপর প্রাণরামের কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর।

কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরের আগেও এদেশে অনেক বিদ্যাসুন্দর ছিল। তন্মধ্যে বলরামের কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য পরিষদ্ হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বলরাম মৈমনসিংহের লোক—সেজন্য তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের খবর প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী জানিতেন না। বলরামের আগে কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল—তাহার পুঁথি এখনও পাওয়া যায় নাই। কঙ্ক শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

বিদ্যাসুন্দরের গল্পটি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে—সংস্কৃত চৌরপঞ্চাশিকার সহিত গল্পটির মিশ্রণ হইয়া ভারতের নানা প্রদেশে ইহা নানা রূপ ধরিয়াছে। বঙ্গদেশে ইহা বর্দ্ধমানকে আশ্রয় করিয়াছে এবং বাঙ্গালীভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ভাবভঙ্গী ও চিত্র ইহার সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া ইহা সম্পূর্ণ বাঙ্গালীজাতির নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

এ দেশের লোকের পক্ষে আখ্যায়িকা বা গল্পের আবিষ্ক্রিয়া কোনদিনই সহজ ছিল না। এ দেশের কবিরা নূতন কাহিনীর সৃষ্টি করিতে পারিত না—পুরাতন বা চিরপ্রচলিত কাহিনী লইয়াই আপন আপন কবিত্ব দেখাইত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী, শিবদুর্গার বিবাহ, চাঁদসদাগরের গল্প, শ্রীমন্ত সদাগরের গল্প এবং পুরাণের কতকগুলি গল্পই ছিল এ দেশের কবিদের প্রধান উপজীব্য। নূতন কাহিনীর সৃষ্টি না করিয়া কবিরা ঐগুলি লইয়া আপন আপন রুচি ও আদর্শ অনুসারে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে যাহার রচনা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার রচনাই যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের নিয়মানুসারে টিকিয়া গিয়াছে—একই কাহিনী লইয়া রচিত বাকি কাব্যগুলি বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন। বর্ত্তমান যুগের তন্ন-তন্ন অনুসন্ধানের ফলে সেই সকল পুস্তকের দুই একখানির উদ্ধার হইতেছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে সাহিত্যের যাদুঘরেই রাখা চলিবে। মহাকাল যাহাকে একবার উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর অন্যভাবে বাঁচাইবার উপায় নাই।

অনেক বিদ্যাসুন্দরই এ দেশে রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরই মাৎস্য ন্যায়ানুসারে যোগ্যতম বলিয়া সগৌরবে বাঁচিয়া আছে। আর রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরও একেবারে মরে নাই। রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের জন্য বরেণ্য কবি নহেন, তাঁহার পদাবলীর জন্য তিনি দেশপূজ্য। তাঁহার পদাবলীই বিদ্যাসুন্দরকেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে কবিত্ব-কৌশল বড় অল্প নাই—ইহার যে নিজগুণে বাঁচিবার সামর্থ্য নাই তাহাও নয়। কিন্তু ভারতের বিদ্যাসুন্দর থাকিতে আর ঐ বিদ্যাসুন্দরের কেহ প্রয়োজন ও মনে করে নাই। তাহা ছাড়া, সাধক কবির কাছে কেহ বিদ্যাসুন্দর প্রত্যাশাও করে নাই। তাঁহার পদাবলীর মাধুর্য্যে এ দেশের লোক এমনই পরিতৃপ্ত যে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের সন্ধান করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই।

বর্দ্ধমানের রাজা বীরসিংহের বিদুষী কন্যা বিদ্যা পণ করিয়াছিলেন, যে তাঁহাকে বিচারে জিনিতে পারিবে তাহাকেই তিনি স্বামী বলিয়া বরণ করিবেন। কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধুর বিদগ্ধ পুত্র সুন্দর হীরামালিনীর সাহায্যে বিদ্যার সহিত পরিচিত হন এবং সুড়ঙ্গ কাটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিদ্যাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করেন। তাহাতে বিদ্যার গর্ভ হয়। গর্ভসঞ্চারের সংবাদে রাজা-রাণীর চৈতন্য হইল। তারপর নগর-কোটালের চেষ্টায় সুন্দর ধরা পড়েন, তাঁহাকে দক্ষিণ মশানে লইয়া যাওয়া হয়—কালীর কৃপায় তিনি রক্ষা পান। তাঁহার পরিচয় পাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাজা তাঁহাকে কন্যা দান করেন। এই মূল আখ্যানে দুই বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যাহা কিছু পার্থক্য গৌণ ব্যাপারে।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে আছে—মাধবভাট কাঞ্চীপুরে বিদ্যার সংবাদ সুন্দরকে দিল—সুন্দর স্বপ্নে কালীর আদেশ পাইয়া পথে শিবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছয় মাসের পথ দশ দিনে অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধমানে পৌছিলেন। তিনি হীরার বাড়ীতে আশ্রয় পাইলেন। সুন্দর বিনা সূতায় একটি মালা গাঁথিলেন, সেই মালার মধ্যে আপনার পরিচয় ও প্রেমনিবেদন জানাইলেন। হীরা সেই মালা বিদ্যার হাতে দিল, বিদ্যা সেই মালা পাইয়া সুন্দরের অনুরাগিণী হইল। হীরার চেষ্টায় বিদ্যা বাতায়ন হইতে সুন্দরকে দেখিল।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে গঙ্গাভাট কাঞ্চীপুরে গিয়া সুন্দরের বিদ্যার গুণগান করিল। সুন্দর আকাশবাণী শুনিয়া বগলে খুঞিপুঁথি লইয়া বিদ্যার্থীর সাজে সঙ্গে একটি শুকপক্ষীকে দোসর করিয়া ছয় মাসের পথ ছয় দিনে উত্তীর্ণ

করিয়া বর্দ্ধমানে পৌঁছিল। নগরে প্রবেশ করিতে সুন্দরকে বেগ পাইতে হইল—ঘোড়া যোড়া ছাড়িয়া ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া সুন্দর হীরার গৃহে আশ্রয় পাইল। তার পর একই ভাবে বিদ্যার সহিত পরিচিত হইল। মালার সহিত একটি পত্রের কৌটা তাহাতে কামরতির পুষ্পময়ী মূর্ত্তি ও একটি সংস্কৃত শ্লোক নিজের পরিচয়স্বরূপ পাঠাইল। কৌটা খুলিবামাত্র পুষ্পময় কামের ফুলধনু হইতে একটি ফুল ছুটিয়া আসিয়া বিদ্যার বুকে লাগিল। এই ব্যাপারে ভারতচন্দ্র অনেক কৌশল খেলিয়াছেন।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে—সুন্দর মা কালীর স্তব করিবা মাত্র সম্মুখে সুড়ঙ্গ জাগিয়া উঠিল। সেই সুড়ঙ্গপথে সুন্দর বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিল। সেখানে প্রথমে বিচার হইল—বিচারে সুন্দর জয়ী হইল। বিচারের শ্লোকগুলি দুই বিদ্যাসুন্দরেই এক। তারপর গন্ধর্ব্ব-বিবাহ ও সম্ভোগ-লীলা। সুন্দর প্রভাতে ফিরিয়া হীরার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিল।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে সুন্দর মা কালীর স্তব করিবা মাত্র মা কালী—

তাম্রপাত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ দেখিয়া।
শূন্য হ'তে সিঁধকাটি দিল ফেলাইয়া॥

সুন্দর তাহাই হাতে করিয়া 'মন্ত্রপড়ি ফুক দিয়া মাটিতে ভেজায়' অমনি সুড়ঙ্গের পথ তৈয়ারী হইল। কাটামাটি বাতাসে উড়িয়া গেল। তারপর সুন্দর বিদ্যার মিলন দুই পুস্তকে প্রায়ই একভাবেই হইল। তারপর সুন্দর-বিদ্যার-অনুরোধে মিলনের কথাটা হীরাকে বলিল না। ঘরে সুড়ঙ্গ খোঁড়া হইয়াছে, মালিনীকে কি বলিয়া বুঝানো হইবে? মালিনীকে বলা হইল, কুণ্ড রচনা করিয়া কালী সাধনা করিব। সারারাত্রি ঘর বন্ধ থাকিবে, সাধনায় যেন ব্যাঘাত না হয়। আমাকে যেন ডাকাডাকি করিও না। হীরা সুন্দরকে বারবার বলিল, গোপনে কিছু করিও না, মহাবিপদ ঘটিবে, তুমিও যাবে, আমিও যাব। তুমি রাজা-রাণীকে সমস্ত খুলিয়া বল। আমি এই ব্যাপারে নাই। হীরা ভয় পাইতেছে দেখিয়া সুন্দর আগাগোড়া সমস্ত গোপন করিল।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার গর্ভসঞ্চারের সংবাদ পাইয়া রাজা কোতোয়ালকে তিরস্কার করিয়া চোর ধরিবার জন্য আদেশ দিলেন। কোতোয়াল নানাজনের পরামর্শ লইয়া সাঙ্গোপাঙ্গকে ছদ্মবেশ পরাইয়া নগরের দ্বারে দ্বারে পথে পথে প্রেরণ করিল। একজনের পরামর্শে বিদ্যার ঘরে পালঙ্কে সিন্দুর মাখাইয়া আসিল। রাত্রিকালে সুন্দর আসিল—তাহার কাপড়চোপড়ে সিঁদুর লাগিয়া গেল। সুন্দর রজকের বাড়ীতে রাতারাতি কাপড় কাচাইবার জন্য পাঠাইল। কোটালের লোক সেই কাপড় দেখিয়া রজককে ধরিল। রজকের লাঞ্ছনার পর হীরার লাঞ্ছনা—তারপর সুন্দরের গৃহে প্রবেশ—সুন্দর সুড়ঙ্গ-পথে বিদ্যার মন্দিরে পলাইল। বিদ্যার সখীরা সুন্দরকে স্ত্রীবেশে সাজাইল। কোটাল আর সুন্দরকে চিনিতে পারে না—নারীদের মধ্যে কে পুরুষ তাহা নির্ব্বাচন করিবার জন্য সকলকে একটি খন্দক উল্লঙ্ঘন করিতে বলা হইল। যে দক্ষিণ পদে উল্লঙ্ঘন করিবে সেই হইবে পুরুষ। বিদ্যা সুন্দরকে বামপদে উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য অনুরোধ করিল, অনেক পুরাণপ্রসঙ্গ তুলিয়া আপৎকালে পৌরুষ গোপন করা যে অন্যায় নহে তাহা বুঝাইতে লাগিল। সুন্দর তাহাতে স্বীকৃত হইল না। সুন্দর বলিল—'ধরা দিতেই হইবে—ভয় নাই। মা-কালী রক্ষা করিবেন।' সুন্দর যেমন দক্ষিণপদে খন্দক উল্লঙ্ঘন ক'রল, অমনি ধরা পড়িয়া গেল।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে সুন্দর দিনের বেলায় সন্ন্যাসী সাজিয়া রাজার সভায় গিয়া বিচারের জন্য বিদ্যাকে আহ্বান করিল। রাজা দেখিলেন,—মহাবিপদ! সন্ন্যাসীর বিদ্যার পরিচয় পাইয়া রাজার ভয় হইয়া গেল—রাজা নানা ছলনা করিয়া সন্ন্যাসীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী মজা দেখিতে লাগিল। বিদ্যাকেও সে এ সংবাদ দিল না। এই ব্যাপার লইয়া বিদ্যার সঙ্গেও রসিকতা চলিতে লাগিল। সুন্দর যে শুকপাখী সঙ্গে আনিয়াছিল তাহার সঙ্গে বিদ্যার সারীর বিবাহ দিল। তারপর বিদ্যার পুনর্ব্বিবাহ, গর্ভসঞ্চার, রাণীর তিরস্কার, রাজার ক্রোধ, কোতোয়ালের সাজ-সাজ রব। কোতোয়ালরা আট ভাই স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে বিদ্যার মন্দিরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সুন্দর আসিয়া ধরা পড়িল। হীরার অযথা লাঞ্ছনা হইল।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে সুন্দর বন্দী হইলে বিদ্যা কালীর স্তব করিতে লাগিল—দৈববাণী হইল,—"ভয় নাই।

'সুন্দর সামান্য নহে বর-পুত্র মোর।'

বর্ম্মার কথা

দুই

ঢাকার খ্যাতনাম্না উকীল শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লিখিত

প্রিয় রোহিণী,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি "বঙ্গশ্রী"তে বর্ম্মার কথা পড়িয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলে তাহা পাইয়াছি। ভূপেন্দ্রনাথও তাঁহার পরিবারের অন্যান্য সকলের জন্য তোমার ব্যস্ততা স্বাভাবিক। তুমি, ভূপেন্দ্র ও আমি একই শ্রেণীতে পড়াশুনা করিতাম। ক্লাশের এত ছাত্র ছিল, কিন্তু আমরা তিনজন সর্ব্বদাই সম্প্রীতিতে আবদ্ধ ছিলাম। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল আমরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হই, কিন্তু আজও আমাদের সম্বন্ধ অটুটই রহিয়াছে। যে বাড়ীতে থাকিয়া তুমি পড়াশুনা করিতে, আজও সেইখানেই তুমি বাস করিয়া ব্যবসা চালাইতেছ, আর আমি যেখানে ছিলাম সে বাড়ীও অক্ষতাবস্থায়ই রহিয়াছে। কিন্তু আজ আর সেই বাড়ীর সেই বিভব নাই, সেই গাম্ভীর্য্য নাই, সেই সমারোহ নাই। আমরা যখন ছিলাম, সেই বিরাট আবাস ছাত্র, কেরাণী, মক্কেল, ঠাকুর, চাকরের কল-কোলাহলে সর্ব্বদাই ঝঙ্কৃত থাকিত। আর আজ দেখি যেন দূর হইতে উহা খাঁ খাঁ করিতেছে। উভয় বাসাই ছিল শঙ্কর তোমার খুব কাছাকাছি। তুমি ও আমি সর্ব্বদা পরস্পরের বাসায় যাতায়াত করিতাম। ভাবও ছিল যেমন বেশী ঝগড়াও করিতাম সেইরূপ, ভূপেন্দ্র কখনও তাহার গ্রামের বাড়ী শুভাড্যা হইতে আসিত, কখনও বা পটুয়াটোলী হইতে আসিত। চারিবৎসর একত্র কি সুখেই গিয়াছে। সেই বাল্যের প্রণয়, পাঠ্যাবস্থার চিন্তাশূন্যতা, তথাকার উন্মত্তা, নদীতীরে ভ্রমণ, ডিবেটিং ক্লাবের বক্তৃতা, যাত্রা থিয়েটার Baptist মিশনের সাহেবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কত কথাই মনে পড়িতেছে। হায়, সেই দিন যদি আবার ফিরিয়া আসিত। কিন্তু তাহা তো হইবার নয়, বোধ হয় তখন ছিলাম আমরা বালক, আজি আমরা বার্দ্ধক্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, কি পরিবর্ত্তন আমাদের চেহারার কিন্তু মন বোধ হয় সেইরূপ তরুণই আছে। এখনও বুঝি জীবনের মধ্যাহ্ন আসে নাই, কিন্তু ভয় হয় কবে ভাটা পড়ে। এই ভাটা ঐ অপরাহ্ণ, ঐ সেই সন্ধ্যা ঐ অস্ত, ওঃ ভাবিলেও শিহরিয়া উঠি।

কেন উঠি? কোন পুঁজি নাই—না অর্থের, না পুণ্যের না কর্ম্মের না সেবার। তিনিই জানেন কিছু সঞ্চয় হইবে কিনা।

ওঃ, বর্ম্মার কথা আত্মকথায় আবার ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি তো কাগজে দেখিতেছ, আর আমরা কাগজও পড়ি সেই স্থান হইতে যে সমস্ত লোকজন আসে তাহাদের কাছেও শুনি। জাপানীরা সেলুইন নদী পার হইয়া স্নীন নদীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। অনেক ধস্তাধস্তি হয়, পরে স্নীনও পার হইয়া আসে, তারপরে হাঙ্গামা হয় সিটাং নদী লইয়া। সিটাংও পার হইয়া এখন পেগুর কাছে আসিয়াছে।

এই পেগু এখনও অধিকৃত হয় নাই। তাহারই ৪৭ মাইল দক্ষিণে রেঙ্গুন সহর। পেগু হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত রাস্তা খুব সমতল; জাপানীদের অসুবিধা অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু রেঙ্গুন সহরও সুরক্ষিত। অনেক ট্যাঙ্কও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই রেঙ্গুনের যুদ্ধ খুব প্রচণ্ড হইবে বলিয়া মনে হয়। যদি মিত্রশক্তি রেঙ্গুন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তবে ভারতবর্ষও রক্ষা পাইতে পারে। নতুবা সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গোপসাগর ও ভারতমহাসাগর একেবারে জাপানীদের করায়ত্ত হইয়া পড়িবে, তবেই ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরস্থ কলিকাতা, চট্টগ্রাম, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, সুরাট প্রভৃতি সহরের উপর আক্রমণের আশঙ্কা আছে।

এদিকে আবার বসন্তসমাগমে জার্ম্মানী যদি ককেশাশের মধ্য দিয়া বাটু, বাকম অধিকার করিয়া পূর্ব্বাভিমুখী হয়,

তবে ভারতবর্ষ দুই শক্তির প্রবল চাপে পড়িয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ভরসা, ইংরাজ-শক্তি ও আমেরিকার সহায়তা। যদি রুষিয়া এই দুই শক্তির সহযোগিতায় জার্ম্মানীকে বিধ্বস্ত করিতে পারে তবে আর সেই ভয় নাই। এখন দেখা যাউক কতদূর কি হয়।

জাপানীরা টঙ্গু সহরেও বোমাবর্ষণ করিয়াছে। সেখানকার বাজারটী একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় লোক চলিয়া গিয়াছে। টঙ্গু হইতে মান্দালায় সহর প্রায় দুইশত মাইল উপর উত্তরে। মান্দালয়তে নাকি বোমাবর্ষণ হইয়াছিল। মোট কথা নিম্ন বর্ম্মা উত্তর বর্ম্মা উভয়ই আক্রান্ত।

ও, তোমায় বলি নাই যে, প্রায় দশবার দিন হইল ভূপেন্দ্র তাহার স্ত্রী, দুইটী ছেলে, পুত্রবধূ ও পৌত্রকে লইয়া কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জানুয়ারী মাস হইতে চেষ্টা করিয়া মার্চ্চে আসিয়া পঁহুছিল। দেখ কি দুর্দ্দৈব।

২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুনে যখন বোমাবর্ষণ হয় ভূপেন্দ্র তখন তাহার চতুর্থ সহোদর হেমেন্দ্রকে লইয়া রেঙ্গুনে ছিল। অনেক কষ্টে তাহারা রক্ষা পায়। হেমেন্দ্র তখন অসুস্থ ছিল। বেসিন গিয়া ভূপেন্দ্র রেঙ্গুনের পথে না আসিয়া বড় একখানি সামপান (নৌকা) ভাড়া করিয়া তাহারা নৌকাপথে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়। তাহারা নাকি একটী গুজব শুনিয়াছিল যে, বঙ্গোপসাগরে বেসিনের মুখে দুইখানা জাহাজ ডুবিয়াছে। বেসিন হইতে সেই সামপানে মর্ত্তাবান উপসাগরে আসিয়া পড়ে। তারপর Cape Negrais পার হইয়া তাহারা বঙ্গোপসাগরে পড়ে। ভূপেন্দ্রের পরিবার ছিল এবং হেমেন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীও সামপানে ছিল। হেমেন্দ্রকে অসুস্থাবস্থায়ই নৌকায় করিয়া আনা হইয়াছিল।

বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াই প্রচণ্ড সমুদ্র দিয়া ইহারা চলিতে থাকে। কিন্তু এমন ঝড় তুফান হইতে থাকে আর নৌকাও এমন টলিতে থাকে যে অতঃপরে নৌকায় চলাই অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠে। এদিকে তাহারা ৩৬ ঘণ্টায় ৩০ মাইলের বেশী আর অগ্রসর হইতে পারে না। যদি তাহারা কোন রকমে সেণ্ডোই নামক স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারিত ও কয়ুকপায়ো দ্বীপে পঁহুছিতে পারিত তবে কতক দূর আসিয়া গাড়ীতে আকিয়াব আসিয়া পঁহুছিতে পারিত। আকিয়াব আসিলে সেখান হইতে কক্সবাজার হইয়া স্থলপথে চট্টগ্রাম পৌছিতে পারা যায়। এখন দেখ কিরূপ ভয়াবহ পথে তাহারা পদবিক্ষেপ করিয়াছিল। ঐরূপ বাত্যাতাড়িত হইয়া সেণ্ডোই পৌছান অসম্ভব মনে করিয়া আবার তাহারা সমুদ্রপথেই বেসিনের দিকেই রওনা হয়। যে পথ যাইতে ৩৬ ঘণ্টা লাগিয়াছিল, দুই ঘণ্টায় তাহারা ফিরিয়া Cape Negrais-এ আসে, অতঃপরে মার্ত্তাবান উপসাগর হইয়া বেসিন নদী দিয়া বাসায় গিয়া পৌছে। এইরূপে জানুয়ারী গেল।

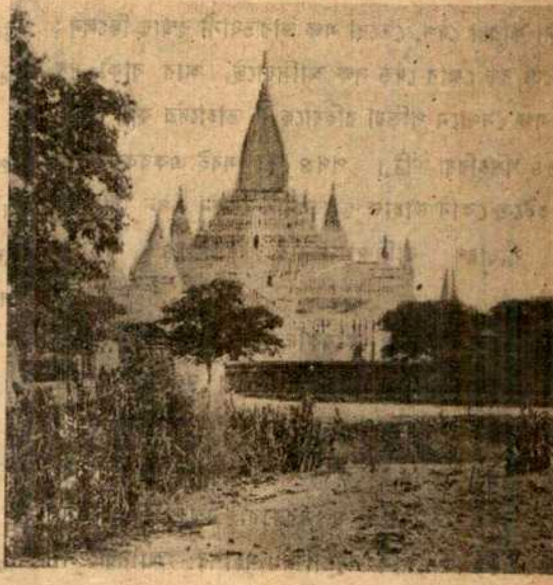

আনন্দ পেগোডা

বেসিন পৌছিয়াই ভূপেন্দ্র পরে রেঙ্গুনের রাস্তায়ই আসে। কিন্তু টিকেট সংগ্রহ করিতেই ৭।৮ দিন লাগে। ভূপেন্দ্র তো কাউন্সিলের মেম্বর, প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত টিকেট পাইতে তাহাকে সহায়তা করিয়াছে, তবু এত বিলম্ব হইয়াছে। এখন দেখ সাধারণ লোকের কত অসুবিধা।

ইতিমধ্যে বেসিনে হেমেন্দ্রের অসুখ এতই বাড়িয়া যায় যে ক্রমে তাহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া আসে। হেমেন্দ্রকে বিদায় দিয়াই ইহারা রেঙ্গুনের পথে মান্দ্রাজ হইয়া কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছে। হেমেন্দ্রকে তোমার শেষ

মনে আছে, আমরা সেই ছোট ছেলেটীকে ঢাকায় দেখতাম। চোখের উপরই তাহার শ্রাদ্ধ হইবে ইহা কখনও কল্পনাও করি নাই। ভ্রাতৃশোকে ভূপেন্দ্র একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

কল্পনা করিয়া দেখ, তেরো লক্ষ ভারতবাসী বর্ম্মায় ছিলেন;—তন্মধ্যে বড় জোর দেড় লক্ষ আসিয়াছে, আর বাকী দশ এগার লক্ষ সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের কথা কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠি। পথও তো সবই একরকম রুদ্ধ। রেঙ্গুন হইতে কোন জাহাজ ছাড়ে না—রেঙ্গুন এখন সামরিক সহর। সাধারণ বাসিন্দা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভূপেন্দ্রের আসিবার কয়েকদিন পরেই বেসিনে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হইয়াছে। ভগবান ভূপেন্দ্রদের রক্ষা করিয়াছেন, ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহাদের প্রাণ বাঁচিয়াছে। বেসিনের এখন ভয়ানক অবস্থা, সেখান হইতে অনেক লোক চলিয়া আসিয়াছেন। কয়েকজন অফিসার ও সরকারী কর্ম্মচারী আছেন। ব্যারিষ্টার কেশব লাল মুখার্জ্জি মহাশয় আসিয়াছেন। মিস্ হেমন্ত সেনের মা ও ভাইরা আসিয়াছেন। বেসিনে লুঠও কিছু হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ রক্ষীবর্গ লুণ্ঠনকারীদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং বেসিন হইতে জলপথে আসিবার রাস্তাও প্রায় রুদ্ধ হইল। এদিকে রেঙ্গুন, বেসিন, পেগু হইতে স্থলপথে অনেকে হাটিয়া প্রোম হইয়া আসিতেছিল কিন্তু প্রোমেও বোমাবর্ষণ হইয়াছে, বহুলোক প্রোম হইতে হাটিয়া টাঙ্গুপ্ আসিত, সেখানে আরাকান পাহাড় (বর্ম্মা ভাষায় ইয়োমা) পার হইয়া জাডাব্রিলে আসিত। সেস্থান আকিয়াং পর্য্যন্ত ভাল মোটর রাস্তা আছে। এক রহিয়াছে ইম্ফল হইয়া মনিপুর দিয়া আসা। জাপানীরা উত্তর বর্ম্মায় গেলে এই পথও সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িবে।

কিছুদিন আগে চীনের অধ্যক্ষ চিয়াং-কাই-শেক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। চীন ও ভারত উভয়েই প্রাচীন সভ্যতায় গরীয়ান্। যদি চীন ও ভারত উভয় দেশের সম্পূর্ণ সহায়তা লইয়া মিত্রশক্তি অক্ষশক্তির সম্মুখীন হয়, তবে মিত্রশক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী। ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ কি সেরূপ দূরদর্শিতা দেখাইতে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন? দেখি কি হয়।

মহাত্মাজী বলেন 'আমি যুদ্ধবিরোধী'—আমরাও বলি বিনা যুদ্ধে ভারতবর্ষের মত উর্ব্বর দেশের সহায়তায় ইংলণ্ড জগতের অভাব দূর করিয়া শান্তি সংস্থাপন করিতে পারেন। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ চিন্তা করিয়া উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কি এইরূপ বিচক্ষণ ব্যক্তির সহায়তা লইবেন না?

আজ সিঙ্গাপুর গিয়াছে, মালয় গিয়াছে, দক্ষিণ বর্ম্মা প্রায় গিয়াছে, রেঙ্গুন, পেগু, টাঙ্গু, মান্দালয় বিপন্ন। ভারত মহাসাগরে শত্রুর আনাগোনা চলিতেছে, বর্ম্মায় যাইবার পথও দেখিতেছি না। ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ কি এখনও ভারতের সহায়তা লইতে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন?

তোমার হেমেন্দ্র

২য় পত্র

প্রিয় রোহিণী,

গত পত্রে তোমাকে রেঙ্গুনের অবস্থা লিখিয়াছি। অদ্য জানিলাম যে রেঙ্গুন হইতে সমস্ত মিত্রবাহিনী অপসারিত হইয়াছে। রেঙ্গুনের অবস্থা অতীব শোচনীয় হওয়ায় মার্ত্তাবান উপসাগর ও বঙ্গোপসাগরে জাপানের ক্ষমতা দৃঢ় হইল। এখন নৌযুদ্ধে যদি জাপানীকে পর্য্যদস্ত করা যায় তবেই রক্ষা। যাক্ সেকথা।

তোমাকে সেলুইন, ব্রীন ও সিটাং নদীর কথা বলিয়াছি। কিন্তু বর্ম্মাদেশের প্রসিদ্ধ নদী ইরাবতী। ইহার জল বড় স্বচ্ছ ও সুস্বাদ। ইহারই তীরে মান্দালয়, মিঙ্গজাম, প্রোম, হেনজাডা, ইহারই তীরে প্রসিদ্ধ তেলের খনি ইনানজাঙ্গ, আর ইহারই তীরে দাঁড়াইয়া আছে ব্রহ্মদেশের বারাণসী প্যাগান নগর।

প্যাগান বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ। এখানে না আসিলে বর্ম্মা আসাই ব্যর্থ হয়। ইরাবতী তীরে অগণিত মন্দির। গঙ্গারই ন্যায় ইহা কল-কলবাহিনী, কল্যাণদায়িনী পবিত্রতোয়া। কাশীতে যেমন গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, অসংখ্য শিবমন্দির ধৌত করিয়া প্রবাহিত, ইরাবতী সেইরূপ পশ্চিম-দক্ষিণে কোণাকুণি ভাবে প্রবাহিত হইয়া মন্দিরাবলীর অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। পার্থক্য এই, কাশীতে গঙ্গা যেন চন্দ্রের মধ্যভাগের আকার ধারণ করিয়াছে আর এখানে

বাহিরের দিক অর্দ্ধচন্দ্রাকর। বস্তুতঃ ইরাবতীবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে এই পর্ব্বত-চূড়াবলম্বী মন্দিরমালা দর্শনে হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাতে অপূর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়। পূর্ব্বে মন্দিরের সংখ্যা গণনাতীত ছিল, আজও এখানে ৫ হাজার মন্দিরের কম নাই। ইহার মধ্যে হিন্দু-মন্দিরও অনেক আছে।

এখানকার মন্দিরের মধ্যে সোয়েডেগন প্যাগোডা, আনন্দ প্যাগোডা, থাবিমিউ, সোয়েমেগুা প্রভৃতিই প্রধান।

এই সমস্ত মন্দির বা প্যাগোডা কিন্তু হিন্দুকীর্ত্তিই ঘোষণা করে। যে মহাত্মা কনিষ্ঠ আনন্দ প্যাগোডা নির্ম্মাণ করান, তিনি মিথিলার রাজকন্যা কল্যাণীর পুত্র। পেগানের রাজা অনুরথ তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিবার পরে এক দুষ্ট মন্ত্রী কল্যাণীর বংশ সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করায় তিনি রাণীকে 'পরিণমা' নামক স্থানে নির্ব্বাসিত করেন এবং এইখানেই কনিষ্ঠের জন্ম হয়। যেদিন কনিষ্ঠ ভূমিষ্ঠ হয়, এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সমগ্র রাজ্য স্পন্দিত হইয়া উঠে। এই শিশুকে রাজ্যের শত্রু মনে করিয়া অনুরথ দুরন্ত কংসের ন্যায় রাজ্যের সমস্ত শিশুর প্রাণনাশের আদেশ দেন। কিন্তু কল্যাণী ইহা জানিতে পারিয়া পুত্রসহ ফুঙ্গীচকে আশ্রয় লয়। একদিন রাজা জ্যোতির্ব্বিদের নিকট শুনিলেন যে এমন কোন ভিক্ষু শিশু যদি থাকে যে তাহার মুখে একটা আলোরশ্মি দেখা যায় তবে তাহার দ্বারাই রাজ্যরক্ষা হইবে। রাজা প্রতিদিন ভিক্ষুক বালকগণকে ভোজন করাইতে লাগিলেন এবং একদিন দেখা গেল যে একটী শিশুর মুখ হইতে সত্যই আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছে। অনুসন্ধানে জানিলেন এই দেবশিশুই তাঁহার ঔরসজাত পুত্র। তিনি তৎক্ষণাৎ রাণী ও কুমারকে মহাসমারোহে রাজধানীতে লইয়া আসেন। এই পুত্র উত্তরকালে খুব ধর্ম্মশীল প্রজাপালক হইয়াছিলেন এবং 'আনন্দ প্যাগোডা' তাঁহারই কীর্ত্তি-সৌধ।

কথিত আছে হিমালয় হইতে কোন সময়ে পাঁচজন সন্ন্যাসী তাঁহার রাজধানীতে সমাগত হইয়া তত্রস্থ আনন্দ গুহা ও তন্মধ্যস্থ মন্দিরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি সেইরূপ এক পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার মানস করেন ও ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু শিল্পী আহ্বান করিয়া তাহাদের সহায়তায় ১০৯১ খৃঃ অব্দে এক জগদ্বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চারিটী তোরণ আছে। মন্দিরের ঠিক পূর্ব্ব-উত্তর দিকে ৫।৬ খানি বিশ্রাম স্থান (বর্ম্মা ভাষায় 'জিয়া') আছে। যাত্রীগণ সেখানে বসিয়া পথশ্রান্তি অপনোদন ও বিশ্রম্ভালাপ করে। জিয়াতে সর্ব্বদাই সুপেয় জলে কুম্ভগুলি পরিপূর্ণ থাকে।

গতবারে দেখিয়াছি, আমি বন্ধুবর বঙ্কিম গুহের মিংজামের বাড়ীতে গিয়া তাঁহারই একটী মক্কেলের সঙ্গে পেগান যাই। ইহার নাম বাখিল, ইনি সঙ্গে করিয়া আমায় সমস্ত প্যাগোডা দর্শন করাইয়াছেন। ইহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সকালে ইহার বাড়ী হইয়া রওনা হইয়া প্যাগোডা দেখিয়া ফিরিতে প্রায় ৫টা হইয়াছিল।

প্রায় ৩টার সময় আনন্দ প্যাগোডার পবিত্র সংস্পর্শে দেহ, মন, প্রাণ পবিত্র হইয়া গিয়াছিল। প্রবেশ করিয়াই দণ্ডায়মান চারিটী বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিয়া "কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর" বলিয়া প্রণাম করিলাম। সমস্ত বর্ম্মায় এমন প্রশান্ত স্বরূপ মূর্ত্তি আর দেখি নাই। চারিটী মূর্ত্তিই প্রায় এক আকারের—স্বর্ণমণ্ডিত। প্রাচীরগাত্রে জাতক ও বা বুদ্ধদেবের বিভিন্ন পূর্ব্বজন্মের অবস্থা খোদিত দেখিলাম। মন্দিরের প্রান্তরও খুব প্রশস্ত এবং পশ্চিমদিকে সযত্ন-রক্ষিত একটী বৃহৎ ছত্রতলে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন দেখিলাম, আর সেই স্থান সর্ব্বদাই ফুল, চন্দন ও মস্তক স্পর্শে পূজিত দেখিলাম।

বর্ম্মাদেশের অন্যান্য স্থানের ফায়া দেখিয়াই মনে হয় বৌদ্ধশিল্পীর নির্ম্মিত থাঁদা নাক, চেপটা মুখ। কিন্তু এখানকার বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, বুদ্ধদেব বর্ম্মাদেশবাসী ছিলেন না তিনি হিন্দুস্থানের আর্য্য সন্তানই বটেন। যেমন কাব্য ও নাটকে কবির পরিচয় হয় সেইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াও ভাস্করকে চেনা যায়। আপনার আদর্শকে কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন সিংহ বা অশ্বের হস্ত থাকিলেও তাহারা তাহাদের অনুরূপ মূর্ত্তি ভিন্ন ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিতে পারিত না।

আর একটী কথা মনে রাখিবে যে ব্রহ্মদেশে মূল্যবান্ কাষ্ঠের প্রাচুর্য্য হেতু প্রতি মন্দিরেই কোন কোন কোনরকমে তাহার ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু এই মন্দিরের কোন অংশেই কোনরূপ কাঠ ব্যবহৃত হয় নাই। কর্ণেল Y[illegible]u

তাহার Mission to the "Court of Avo"-তে লিখিয়াছেন—

"Much of its ornamental detail has been found in buildings on the continent of India. No timber is used in any part of it."

প্রত্নতত্ত্ববিৎ Oldham'ও লিখিয়াছেন, "There is in it actual sublimity of architectural effect which excites wonder almost awe. I cannot think any Burman planned or designed such building পাগানের প্রসিদ্ধ মন্দির সোফেজেয়ন বোগোডা সম্বন্ধেও প্রসিদ্ধ পর্য্যটক স্কট ওকনরও বলেন, The details suggest a Hindu origin : বস্তুতঃ পূর্ব্বে বর্ম্মা ও ভারতের সঙ্গে অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ ছিল। পরস্পরে বিবাহাদি আদান-প্রদান হইত, উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিত। হিন্দু জ্যোতিষের সহায়তায়ই ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের শক নিরূপিত হয়।

আমাদের এই নিকট সম্বন্ধ কিছুদিন পূর্ব্বে রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য রাজপুরুষগণ হরণ করিয়াছেন। বর্ম্মীরা আজ ভারতীয়গণকে শত্রুর ন্যায় মনে করে। ভারতীয়গণের সম্পত্তি এবার তাহারা অনেকে লুঠ করিয়াছে।

ব্রহ্ম-ভারত সংস্রব সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে হইল, মান্দালাযের ১৬০ মাইল উত্তরে তাঁগাও নামক একটি স্থান আছে। এই স্থানেরও প্রস্তর খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি ভারতীয় বুদ্ধের অনুরূপ। শিলালিপি গুপ্তবংশীয় রাজাভাষা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়" মনে হয় এখানেও সেইরূপ হইয়াছিল। কথিত আছে হস্তিনাপুরস্থ জনৈক রাজা ব্রহ্মদেশস্থ ম্লেচ্ছাদিগকে পরাভূত করিয়া ইরাবতী তীরে তাঁগাওতে নূতন হস্তিনাপুর সংস্থাপন করেন। তাঁগাও ও প্যাগন প্রভৃতি স্থানের ব্রহ্মদেশবাসী হিন্দু ও আদিম অধিবাসীদের সংমিশ্রণে সমুদ্ভূত সুন্দর, সরল ও ধর্ম্মপ্রাণ জাতি বলিয়াই মনে হয়। ভারত সমরে ব্রহ্মদেশের রাজা ময়ূরধ্বজ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যা প্রমীলা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের সহিত পরিণীতা হন। আর মন্দনপুরী তারাবতী, বেরতী সুবর্ণপুরী প্রভৃতি আর্য্যনামই ক্রমে মান্দালয়, থারাউডী, থেটন ও সোয়েবু প্রভৃতি বিকৃত নাম ধারণ করিয়াছে। আরও সংস্রবের কথা বলি।

রেঙ্গুনের বিখ্যাত সোয়েডেগণ পেগোডাটী বুদ্ধের আটগাছি কেশরক্ষার্থ প্রথমে নির্ম্মিত হয়। ব্রহ্মদেশের পো ও ত্বাঘু নামে দুই ভ্রাতা বুদ্ধদেবের দর্শন মানসে সমুদ্র পার হইয়া ক্রমে ত্রিবেণীতীরস্থ পাণ্ডুয়ায় উপস্থিত হয়েন। সেখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে অসংখ্য লোকের দুঃসহ ক্লেশ দেখিয়া তাহারা রেঙ্গুন হইতে নৌকাযোগে বস্তায় বস্তায় তণ্ডুল আনাইয়া তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণ করেন। ইহার পর তাহারা পদব্রজে যাত্রা করিয়া কাশীর নিকট বুদ্ধদেবের দর্শন করিয়া তাঁহাকে বর্ম্মায় লইয়া যাইবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। বুদ্ধদেব তখন সেখানে পদার্পণ করিতে অস্বীকার করিলেও তাহাদের ভক্তি ও সেবাগুণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তক হইতে আটগাছি কেশ প্রদান করিয়া পরে সেই স্থানে আসিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। গুরুদেবের উপদেশ মত ভ্রাতৃদ্বয় ত্রিগোত্র পাহাড়ে কেশগুচ্ছ প্রোথিত করিয়া এইখানেই এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

পেগুর সোয়েমৌঠ পেগোডা সম্বন্ধেও ফুঙ্গীরা বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধত্ব লাভ করিবার আটবৎসর পরে শাক্যমুনি পর্য্যটন করিতে আসিয়া এই মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্বদিকস্থ একটী পাহাড়ে আবতরণ করেন। পেগুর দক্ষিণদিকে আজকাল যথায় দিগন্তপ্রসারিত হরিদ্বর্ণ শস্যসম্ভার দর্শকের নয়নে অপার তৃপ্তি সঞ্চার করে, সেই স্থান তখন সমুদ্রগর্ভে ছিল। ঠিক এই সময়ে জলমধ্য হইতে দুইটী রাজহংস নিকটে আসিয়া বুদ্ধদেবের চরণ স্পর্শ করে। তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া শিষ্যগণকে দেখাইলেন, "আমার লোকান্তরের ১১১৬ বৎসর পরে ঐ স্থানে ব্রহ্মদেশীয় রাজন্যবর্গের দীর্ঘকালস্থায়ী এক রাজধানী নির্ম্মিত হইবে।" প্রত্যুতঃ, ৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণভূমির (বর্ত্তমান থাটন দুইরাজকুমার) থমল, বিমল,—"হংসবতী" নগর স্থাপন করেন এবং বহুবর্ষাবধি এই স্থান ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। এই সহরের নাম হান্তাওয়াডী, তেলাইঙ্গ ভাষায় রাজহংস অর্থে পাগু শব্দ ব্যবহৃত হয় বলিয়া উহা পাগু নামেও অভিহিত হইত। এই স্থানের পেগোডার সহিত ভারতের এক নিকট সম্বন্ধ।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বর্ম্মীয়গণ ধর্ম্মের জন্য যে ভারতবর্ষের নিকট

ঋণী, সে কথা ত কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেদিনও কেনিয়া সমস্থায়ে রেঙ্গুনের এক বিরাট জনসঙ্ঘে বৌদ্ধসভাপতি বলেন, যে ভূমির ধর্ম্ম আমাদের অজ্ঞানতা দূর করিয়াছে, ভারতের সহিত সে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কিছুতেই লোপ পাইতে পারে না, তবে আজ কেন ভারত ও ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন? আবার কি ব্রহ্মদেশ ভারতভূমিরই অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইবে না?

আজ শুনিলাম রেঙ্গুন সহর জাপানী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, আর তাহারা বেসিনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই বেসিনই ভূপেন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। হায়, প্রায় চল্লিশ বৎসর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা কিছু করিয়াছিল, আজ তাহা শত্রুর অধিকারে চলিয়াছে। ভূপেন্দ্র সপরিবারে আজ ডিব্রুগড় রওনা হইল।

তোমার হেমেন্দ্র

৩য় পত্র

প্রিয় রোহিণী,

গতবার তোমাকে পেগানের ইরাবতীতীরস্থ মন্দিরগুলির কথা বলিয়াছি। পেগানের মন্দির দেখিয়া অপরাহ্ণে যখন বাখিলের সঙ্গে তাহার বাড়ী ফিরি, দেখিলাম, তাঁহার স্ত্রী রান্না করিয়া রাখিয়াছেন। একেবারে সত্য বর্ম্মাপল্লীতে আসিয়াছি! এখানকার চালচলনও একটু পৃথক্ দেখিলাম। অপরাহ্ণে তখন বাখিলের ছেলে ও আমি ইরাবতীতে স্নান করিতে গেলাম। বাখিলের ছেলেটীর বয়স প্রায় ২২।২৩ হইবে, ভারতীয় মাতার গর্ভজাত সন্তান বলিয়া সেদিক হইতে আমার উপর তাহার একটু বেশ টান দেখিলাম। কিন্তু তাহার মা নাই। বর্ম্মী-বিমাতার কাছেই পালিত হইতেছে। আমরা উভয়ে স্নান করিতে গিয়া দেখিলাম ইরাবতীর দুইকূল ভাসাইয়া জল আসিয়াছে। অবগাহন স্নান করিতেই এবার শরীরের সমস্ত গ্লানি যেন দূর হইয়া গেল। জল কি শীতল! কি তৃপ্তিকর! নদীতে দেখিলাম অসংখ্য ছোটবড় শামপান রহিয়াছে আর চলাচল করিতেছে। আর দেখিলাম পারে ব্রহ্মরমণীগণ জল ভরিয়া যাইতেছে আর আসিতেছে। রমণীগণের বুক পর্য্যন্ত একটা বড় গামছায়,—আচ্ছাদিত উপরে অনাবৃত। জল লইয়া যাইবার সময়ে তাহারা এই পোষাকেই আসে;

রাত্রি ৮ টার সময়ে খাইলাম, কিন্তু কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারিলাম না। বাখিলের স্ত্রী প্রতিব্যঞ্জনে এমন নাপ্পির সম্ভার দিয়াছে যে দুর্গন্ধে বমি আসিতে লাগিল। নাপ্পি শুক্‌না মাছের গুঁড়া বিশেষ। আমাদের দেশের সোড়া মাছ হইতে স্বতন্ত্র। ইহারা মাছ পচাইয়া মাটীতে পুঁতিয়া রাখে, তারপরে শুকাইয়া গুঁড়া করে। কোন রকমে কিছু মুখে দিয়া বাখিলের ছেলের সঙ্গে উকীলের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে আমাদের বিছানা রচিত হইয়াছিল। উকীলের স্ত্রী বিদুষী (অবশ্য বর্ম্মী ভাষায়) এবং মার্জ্জিত রুচি-বিশিষ্ট। খুব ভদ্রভাবে আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিল। তাহার বাড়ীর নিকটে বর্ম্মী ভাষায় থিয়েটার হইতেছিল। থিয়েটার দেখিবার সুযোগও হইল। সিনগুলি প্রায় আমাদের সিনের রকমই। একটী মেয়ের পার্ট ও নাচ খুব ভাল হইয়াছিল।

থিয়েটার দেখিয়া আসিয়াই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শুইয়া পড়িলাম, বেশ ঘুম হইল। বাখিল আমার অসুবিধা দেখিয়া ভারতীয় চেট্টিদের ওখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। চেট্টিরা মান্দ্রাজবাসী। বর্ম্মাদেশের মহাজনই ইহারা। ইহারা খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইল। ইহাদের বাসন টাসন মাজিয়া খুব পরিষ্কারভাবে রান্না করিয়া দিল। কিন্তু উহারা নিরামিষাশী। আমরাও তাহাই ভাল লাগিল। খাওয়ার পরে উহাদের সকলের নিকট বিদায় নিয়া ট্রেনে মিক্‌টিলা যাই। মিক্‌টিলার লেকের দৃশ্য বড় চমৎকার। একদিন থাকিয়া পেগু হইয়া রেঙ্গুনে আসি।

একটী কথা বলি নাই। পেগানের বোথপায়া পেগোডা ঠিক যেন আমাদের বুদ্ধগয়ার মন্দির। আর পেগানে লাক্ষার বড় সুন্দর কারুকার্য্য হয়। আমি কয়েকটী বড় কৌটা কিনিলাম। এগুলি বড় সুন্দর, এখনও আমার অনেকগুলি আছে।

রেঙ্গুনে আসিয়া ১০।১৫ দিন থাকিবার পরে চট্টগ্রাম রওনা হই। গিয়াছিলাম B. I. S. N এর জাহাজে। কি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল তাহাতে। একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ রাঁধিয়া দিত। যাত্রীদের মধ্যে সাহেব, মেম, চীনা, জাপানী, শিখ, রাজপুত বাঙ্গালী নানারকমের লোক ছিল, অনেক বৈচিত্র্য ছিল। কিন্তু এবার সম্পূর্ণ বিপরীত। সমস্ত ষ্টীমার চট্টগ্রামবাসী ভরা। তন্মধ্যে মুসলমানই বেশী। আমি একখানি স্বতন্ত্র কেবিনে

ছিলাম, আরও তিনজন বাঙ্গালী ছিলেন। তন্মধ্যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হেমেন্দ্র দত্তও ছিলেন। ইনিও চট্টগ্রামবাসী কিন্তু আমার পূর্ব্ব-পরিচিত। তিন দিন তিন রাত্রি ষ্টীমারে ছিলাম কিন্তু চা ও রুটী ভিন্ন আর কিছু খাই নাই। কেন খাই নাই তাহার কারণ আশঙ্কা হইল এত মুসলমান যাত্রীর জন্য রন্ধন যেখানে হয়, সেখানে গোমাংসের সংস্রব থাকা অসম্ভব নয়,—এই ভয়ে। যাহা হউক, তিন দিন কেবিনে বড় নির্ঝঞ্ঝাটে অনেক জিনিষ লিখিয়া ফেলিলাম। এরূপ নিরালা জায়গা জীবনে কখনও পাই নাই। কেবিনের দরজা বন্ধ করিলেই নূতন জগৎ!

রাত্রি কাটাইয়া সকালে আসিয়া কর্ণফুলী নদীতে পড়িলাম। দূর হইতে চট্টগ্রাম সহর দেখিয়া হেমেন্দ্রবাবুর কি আনন্দ হইল। স্বদেশের কথা মনে করিয়া তিনি কবিবর নবীন সেন মহাশয়ের কবিতা কেবল আওড়াইতে লাগিলেন—

মা, মা, মা, কত কাল পরে
ডাকিলাম মাগো পরাণ ভ'রে
শৈলকিরীটিনী, সাগর-কুন্তলা
সরিৎ মালিনী দেখিলাম তোরে।
বসি সিন্ধুকূলে, বিন্ধ্যাচল-শিরে
যমুনার তটে, জাহ্নবীর তীরে
ভাবিয়াছি তোরে ভাসি অশ্রুনীরে
ডাকিয়াছি ওমা! দেশ দেশান্তরে।

হেমেন্দ্রবাবু প্রভৃতি বন্ধু কয়জনের সঙ্গীলাভে বেশ সুখেই কয়টী দিন কাটিয়াছিল।

যাহাহউক চট্টগ্রাম হোয়াপে আসিবার পরে একখানি গাড়ী করিয়া আমার বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাস-স্থানে গেলাম। তিনি রায়বাবুদের শিক্ষক ও ম্যানেজার ছিলেন! জেলে তিনি ও আমি পাশাপাশি ঘরে (Cell) এ থাকিতাম। আর আমাদের মধ্যে খুব সৌহৃদ্য হইয়াছিল। ইনি এবং বাবু মহিম দাস মহাশয় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় সেনগুপ্ত মহাশয়কেও সেখানে দেখিয়াছিলাম। তখন কাউন্সিলের (অবশ্য কংগ্রেস দল স্বরাজ হইতে) ভাবী সংগ্রামের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন।

শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা বাবু সীতাকুণ্ড এবং চন্দ্রনাথ দেখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য একজন অধিকারীর কাছে চিঠি পাঠাইয়া দিলেন। সীতাকুণ্ডের ফোয়ারার গরম জল ও চন্দ্রশেখর দর্শন প্রভৃতির সৌভাগ্য যে হইয়াছিল সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে জানাইব। এবার ব্যস্ততা সহকারে চাঁদপুর হইয়া শীঘ্র রাজাবাড়ী ষ্টেশনে (পদ্মার পার) চলিয়া আসিলাম। আসিয়াই শুনিলাম রাজাবাড়ীর মঠ নাই। নিকটস্থ গ্রাম, আর আমার সাধের জন্মভূমি বিদগাঁও ও নাই, সবই পদ্মা গ্রাস করিয়া নিয়াছেন। বড় কষ্ট হইল, চক্ষে জল আসিল, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল যে জননী জন্মভূমি চিরকালের জন্য হারাইলাম। এই জন্মভূমির বক্ষে শৈশব, বাল্য যৌবনকালে খেলিয়াছি। ইহারই কোলে লালিত হইয়াছি। এখানে আসিতে কত আনন্দে বুক ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু হায় সেই আমার জন্মভূমি আজ আর নাই। আর বাড়ী দেখিব না, বাড়ীর খেলা খেলিব না, বাড়ীতে বন্ধুদের সঙ্গে আর মিশিতে পারিব না। আর আত্মীয়দের দেখিব না, গ্রামবাসীদের দেখিব না, গৃহদেবতা নারায়ণের ঘরের সম্মুখে প্রণাম করিতে পারিব না, মাগো বলিয়া আর বাড়ীঘরে মাতৃ সম্বোধন করিতে পারিব না। অশ্রু আসিল, বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলাম, আর সেই কবিতা আপনি আসিয়া পড়িল—

"ভাবিয়াছি তোরে ভাসি অশ্রুনীরে
ডাকিয়াছি ওমা! দেশ দেশান্তরে।

বিষণ্ণ বদনে, বুক ভাঙ্গা হতাশা লইয়া নয়না গ্রামে গেলাম। নয়না যাইবেন বলিয়া মা পত্র লিখিয়াছিলেন, দেখিলাম বাড়ীর একখানি ঘর নয়নায় আমার ভাগিনেয়ীর বাড়ীতে আনীত হইয়াছে। শুনিলাম একমাস হইতে মায়ের পরিশ্রম, চিন্তা ও ক্লেশের আর পরিসীমা ছিল না। সব ব্যবস্থা করিয়া যাহা যাহা দরকার সব বিক্রী সিক্রি করিয়া ঘর স্থিতি করিয়া তিনি দুই দিন পূর্ব্বে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। দিনে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সবে রাত্রিতেই একবার নদী প্রবাহিত জন্মভূমির শূন্য স্থান আর হাস্যময়ী চঞ্চলা পদ্মামাতাকে দেখিতে দেখিতে শূন্য মন লইয়া চলিয়া আসিয়া কলিকাতায় মায়ের পদতলে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম মায়ের আনন্দ ও অশ্রু এক সঙ্গে আসিয়া মায়ের মুখখানা স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত করিয়াছে। এইভাবে গেল আবার নয়টী বৎসর। তারপরে মাও আমাকে রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। জননী ও জন্মভূমি দুইই হারাইয়া এখন আমি ইতঃভ্রষ্টস্ততো নষ্ট। সকলেই বাড়ীর কোলে আশ্রয় নিয়াছে, কিন্তু আমরা আজ গৃহহীন! আজ আর লিখিতে পারি না, রোহিণী!

তোমারই হেমেন্দ্র

পুস্তক-পরিচয়

গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা"

সকলেই জানেন প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল গিরিশচন্দ্রের তিনখানি প্রসিদ্ধ নাটক—সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম ও ছত্রপতি নাটকের প্রচার ও অভিনয় গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এক সময়ে এই তিনখানি নাটকই নাট্য-জগতে যুগান্তর আনায়ন করিয়াছিল, কিন্তু নাটক কয়খানি বন্ধ হওয়ায় ঝাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের যে অবর্ণনীয় ক্ষতি হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। অনেকের নিকট শুনিয়াছি এবং আমরা স্বচক্ষেও দেখিয়াছি যে, সহস্র উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা যাহা করিতে পারে নাই, সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ বিপিনচন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে যাহা সাধিত হয় নাই, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্তের সঙ্গীত যে শক্তি সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হয় নাই, এই তিনখানি নাটক তাহা করিয়াছিল। সিরাজদ্দৌলা অভিনীত হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, মিরকাশিম ১৯০৬ আর ছত্রপতি শিবাজী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে।

তখন সভা হইত, বক্তৃতা হইত এবং আন্দোলন চলিত, আর বুঝিয়া না বুঝিয়া সকলেই যোগ দান করিত। কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ আন্দোলন হুজুগেই পর্য্যবসিত হয়, অনেকে আশঙ্কাও সেইরূপ করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত তিনখানি নাটক তাহা করিতে দেয় নাই।

লোকের মনোভাব আমূল পরিবর্ত্তিত না হইলেই আন্দোলন ভাসা ভাসা হইয়া থাকে এবং ক্রমে তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। আন্দোলন স্থায়ী এবং দৃঢ় করিতে হইলেই মূল শক্ত করা চাই। সেই মূল শক্ত করিয়াছিলেন নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র।

ইংরাজ লেখক অথবা ইংরাজ প্রসাদভোজী ব্যক্তিগণ প্রণীত ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা মনে করিতাম, বাঙ্গালার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা হীন-চিত্ত, মদ্যপ, কামাশক্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি ছিলেন। তাই তাহার বিতাড়ন খুব যোগ্য কার্য্যই হইয়াছিল। এই মনোভাবেই আমরা তাহার পরাজয় ও নিধন এবং ইংরাজ শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার মূলে ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্তের সন্ধান পাইয়াছিলাম। ভগবান সর্ব্বদাই মঙ্গলময় একথা সুনিশ্চিত হইলেও, নবাব সিরাজ যে প্রকৃতই নিষ্ঠুর ও পাপাসক্ত ছিলেন না, সে সন্দেহ প্রথমে ভঞ্জন করেন স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। কিন্তু এরূপ গবেষণামূলক ইতিহাস একশত পাঠকের মধ্যে একজন পড়ে কিনা সন্দেহ। নাট্যকার গিরিশ এমনি হৃদয়গ্রাহী করিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন যে, উক্ত নাটক বন্ধ না থাকিলে এ যাবৎ বোধ হয় পঞ্চাশ সংস্করণ হইয়া যাইত।

আমরাও সিরাজের প্রতি অতীব বীতশ্রদ্ধ ছিলাম। কিন্তু নাট্যকার গিরিশচন্দ্রই আমাদের সেই বদ্ধমূল সংস্কারের মূলোৎপাটন করিয়া আমাদের ভাবধারা বদলাইয়া দিয়াছেন। অতঃপরে স্বদেশের প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং আমরা বুঝিলাম যে সিরাজ সত্যই স্বদেশের হিতৈষী ছিলেন, হিন্দু মুসলমান তিনি সমান জ্ঞান করিতেন এবং তাহার নিকটে প্রজার মঙ্গল একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সিরাজের যে সমস্ত দোষ ছিল তাহাও গিরিশচন্দ্র উল্লেখ করিতে ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু সে দোষ ছিল সিংহাসন লাভ করিবার পূর্ব্ব সময়কার। সিরাজকে গিরিশ এইভাবে প্রথমে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিয়াছেন—

স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন, হিতাহিত হয়নি বিচার
মদ্যপানে করিয়াছি শত শত দুর্নীত ব্যাভার
কিন্তু বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ-শয্যায়,
শেষবাক্যে তাঁর জন্মিয়াছে প্রত্যয় আমার,
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার ;
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে
প্রজার মঙ্গল সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।

বঙ্গবাসী যদি এই কয়েকটী ছত্র অনুধাবন করেন, তবেই সিরাজ-চরিত্র তাহার নিকট প্রকৃতভাবে প্রতিভাত হইবে।

সিরাজ রাজবল্লভ, রায় দুর্লভ, মিরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতিকে বলিতেন—

ওহে হিন্দু মুসলমান
এসো করি পরস্পরে মার্জ্জনা এখন
হই বিস্মরণ
পূর্ব্ব বিবরণ

"হে অমাত্যবর্গ, আমায় শত্রু বিবেচনা করবেন না। আর যদি আমি শত্রু হই তবে আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্গালার শত্রু নই। যদি আমায় আপনারা অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন বাঙ্গালার সিংহাসনে হিন্দু কি মুসলমান অপর কাহাকেও উপবেশন করান, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন বিদেশী বাঙ্গালার দুষ্‌মন।"

হিন্দু মুসলমানের একতা সম্বন্ধে এই নাটকে যেমন সুন্দর সুন্দর কথা আছে 'মিরকাশিমে'ও তদ্রূপ আছে। একস্থানে হে সাহেব বলিতেছেন,

"আমরা ঘরোয়া ঝগড়া করে, এমন ঝগড়া করে যে duel লড়ে, কিন্তু দোসরা দুস্‌মন যত খাড়া হইবে আমাদের ঘড়োয়া ঝগড়া মিটিয়া যাইবে। জাতের দুষমন সবার দুষমন এইটা ইণ্ডিয়ান লোক সম্‌ঝিবে না, আমাদের সব শিখিতে পারিবে কিন্তু এইটা কখনও পারিবে না।"

ছত্রপতিতেও স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে আছে, "হিন্দুর জাতীয়তা নাই, হিন্দুর হিন্দু পরিচ্ছদ নাই, হিন্দুর হিন্দু অভিবাদন নাই।"

সম্প্রতি এই কয়খানি যুগান্তরকারী নাটক যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে, তজ্জন্য গিরিশসঙ্ঘ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা জানি, গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় গিরিশ প্রতিভা লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষ অধ্যাপক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে এই ভার দিয়াছিলেন। তিনি চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু দানীবাবুর মৃত্যুর পরে আর কোনও চেষ্টা হয় নাই। বর্ত্তমানে গিরিশ-সঙ্ঘের প্রচেষ্টা আমরা খুবই সময়োপযোগী এবং সাধু বলিয়া মনে করি। বর্ত্তমান মন্ত্রী সঙ্ঘের মধ্যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মৌলবী ফজলুল হক্‌ বিশিষ্ট গিরিশ ভক্ত। মৌলবী সাহেব সেদিন গিরিশ সাম্বাৎসরিক অনুধাবনের প্রধানাচার্য্যরূপে শ্রীরঙ্গমে যে হৃদয়গ্রাহী, যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও সহানুভূতি সম্পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন আর তাঁহার বিশেষ আশা আছে যে, তাহার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিতও হইবে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের এই সাধু প্রচেষ্টায় তাঁহাকে আমাদের ধন্যবাদ ও আনন্দ ভিন্ন আর কি দেওয়া যাইতে পারে? আমরা ভরসা করি তিনি শীঘ্রই এই প্রলয়কারী নাটক তিনখানি উদ্ধার করিয়া দিবেন। যদি বা কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তন করা সমীচীন মনে হয় তাহাও করা সুকঠিন হইবে না। এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান নাটকানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই সহযোগিতা করিতে যে অগ্রণী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে-দিনকার সভায় প্রখ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় যে সিরাজদ্দৌলা হইতে দুই একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন তাহা সভায় যেরূপ সাদরে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের নিশ্চয়ই বিশ্বাস আছে যে সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি নাটক খুবই সাদরে গৃহীত হইবে। যখন শিশিরবাবু আবৃত্তি করেন

সিংহাসনে হয় যদি সৌকত স্থাপিত
বাঙ্গলার ক্ষতি নাহি তাহে
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গালায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব। কিন্তু সাবধান,
নাহি দিব "ফিরিঙ্গিরে সূচ্যগ্র স্থান"

সভায় বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় প্রমুখ সকলেই ইহা উপভোগ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণও যে এ বিষয়ে খুব প্রতিবন্ধক হইবেন আমাদের তাহা মনে হয় না। আমরা জানি গত ১৯২৬ সালে 'গিরিশ প্রতিভা' লিখিবার সময় ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত গভর্ণমেণ্টের কাছে সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিমের সমালোচনা বাহির করিবার অনুমতি চাহিলে Mr. Tufnel Barret সানন্দে সেই অনুমতি দিয়াছিলেন। এমনও লিখিয়াছিলেন—"যদিও কোন কোন উদ্ধৃত উক্তি অনুমতিযোগ্য নয়, তথাপি লেখকের সমস্ত সমালোচনা প্রকাশ করিতেই সম্মতি দেওয়া হইল" "Although some of the passages are not free from incision, they are however allowed to pass" ভরসা করি এ ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ এরূপ বাধাপ্রদান না করিয়া উদারতার

পরিচয়ই দিবেন। আমরা আবার মৌলবী ফজলুল হক সাহেব ও ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে যত্নবান্ হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

*

'রাণী ভবানী'—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম-এ প্রণীত।

সম্প্রতি এই নাটকখানি ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। এই নাটকখানির রচয়িতা একজন উদীয়মান যশস্বী নাট্যকার। বস্তুতঃ আমাদের বিশ্বাস যে মহেন্দ্রবাবু আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। আর এই নাটকখানি বেশ নিপুণতার সহিত রচিত হইয়াছে। যেভাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সিরাজ-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন মহেন্দ্রবাবু সেই ভাব ভঙ্গ না করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সিরাজ যে বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গের ষড়্যন্ত্রে রাজ্যভ্রষ্ট হন মহেন্দ্রবাবু সিরাজকে সেই ভাবেই চিত্রিত করিয়া গিরিশচন্দ্রের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মোহনলাল, দানশা, বেশ ফকির আর পরিবর্ত্তনকারী হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ছায়াও আছে। বেশী না থাকায় ভাল হইয়াছে, কারণ নাটকখানি মূলতঃ নাটোরের রাজপরিবারের ঘটনাবলম্বনে রচিত। রাণী ভবানী এবং দয়ারাম চরিত্র উৎকৃষ্টভাবে রচিত হইয়াছে। ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করায় মস্তরাম সাধুও অশোভন না হইয়া সময়োপযোগীই হইয়াছে। রাণী ভবানী দানশীলা পরদুঃখ-কাতরা, ধর্ম্মশীলা আদর্শ হিন্দু-রমণী। এ ক্ষেত্রে আবার তাঁহাকে প্রকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞাও করা হইয়াছে। মিরজাফর প্রভৃতিকে তিনি যে তিরস্কার করিয়াছেন ও সিরাজকে বাঁচাইতে যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন তাহা তাঁহার চরিত্রোপযোগী তো বটেই। আর ইহা একেবারে অনৈতিহাসিকও বলা যায় না। নবীনচন্দ্র "পলাশীর যুদ্ধে" রাণী ভবানীকে মন্ত্রণা-সভায়ও আনিয়াছিলেন। নাটকখানি বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে আর ইহাতে স্বাদেশিকতাও যথেষ্ট আছে। বিদেশীর কৌশলের কথাও আছে আবার ইংরাজের উদারতার কথাও রাণী উল্লেখ করিয়াছেন। আজকাল এইরূপ নাটকের যত সমাদর হয়, দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল, সমাজের কল্যাণকর। অভিনয়েরও প্রকৃষ্ট সাফল্য হইয়াছে। এই নাটকখানি পাইয়া আমরা প্রকৃতই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। মনে হইতেছে যেন সেই যুগ-পরিবর্ত্তনকারী ইতিহাস আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে। নাটকের অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালার অবস্থা স্মরণ করিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ চিত্তে বাড়ী ফিরিয়াছি। নাটকের টেক্‌নিক্ এবং অন্যান্য দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় এখন নাই তবে এই বলিতে পারি যে এইরূপ শিক্ষাদানই রঙ্গমঞ্চের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যেই অভিপ্রায়ে গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

*

ব্যাথার পূজা—শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসু রচিত।

৺সুধীন্দ্র বসু

একখানি ক্ষুদ্র কবিতার বহি। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও ইহার প্রতিছত্রে বিরাট পুত্র-স্নেহ প্রতিভাত আছে। গ্রন্থকারের এই পুত্রটী ১৬ বৎসরের বয়সে অকালে শুকাইয়া যায়, তাহারই উদ্দেশ্যে তাহার প্রাণের ব্যথা ছন্দে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রহারা জনক জননী তাহাদের অঞ্চলের নিধি হারাইয়াছে—কিন্তু এই কবিতা ও ছন্দে তাহাদের খোকন অমর হইয়া থাকিবে এবং তাহাদের প্রাণেও সান্ত্বনা আসিবে।

গ্রন্থকার পুত্রের জন্য শোকে বিহ্বল হইয়া কাঁদিয়াছেন—

মর্ম্ম ছেঁড়া আর্ত্তনাদে, প্রাণপণ জোরে
ডেকে যদি পারিতাম ফিরাইতে তোরে
যেতে কি পারিতি তবে আমাদের ছেড়ে
মরণের সাথে যুঝি' রাখিতাম কেড়ে।

কখনও সংশয় চিত্ত হইতেছেন

কেন এ রহস্যজাল, কেন প্রহেলিকা ?
আলোরে ঢাকিয়া রাখে কেন কুজ্ঝটিকা ?
তোমারে পাই না দেখা কেন মুখোমুখি
সংশয় আড়ালে ঢেকে কেন উঁকি-ঝুঁকি ?

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সার বুঝিয়া সর্ব্বশোকহরা ভগবানের চরণে পুত্রটীকে স্থাপন করিয়া নিজে যে নিমিত্তমাত্র তাহাই সার ধারণা করিয়াছেন। পুত্র-কন্যা ভগবানই দেন। যতদিন ইচ্ছা তিনি তাঁহার ধন পিতামাতার কাছে রাখেন, ইচ্ছামত নিজের ক্রোড়ে লইয়া যান। গ্রন্থকার তাই সর্ব্বহারা হইয়া ভগবানের ক্রোড়ে রাখিয়া শান্তি পাইতেছেন—

তাহারে রাখিও সুখে—বৃথা আমি মাগি ;
আমি ত জগতে শুধু নিমিত্তের ভাগী॥
তোমারি সে চিরদিন—দিয়াছিলে মোরে,
দুদিন আমার বক্ষ উঠেছিল ভরে।
তুলে নিলে—ত্রুটী বুঝি ছিল কোন কাজে।
তার লাগি' অভিযোগ আমারে না সাজে !
কে আছে তোমার মত, কে রাখিবে ঘুমে ?
তাহারে দিয়েছ স্থান স্নিগ্ধ তব বুকে।
কিন্তু আমি ছাড়িব না মোর অধিকার—
অযাচিত একদিন দিয়েছিলে ভার,
তোমার কর্ত্তব্যে ভাগ দিয়েছিলে মোরে,
তা হতে বঞ্চিত আজ করিবে কি করে !
থাক্ না তোমারি কাছে, তাতে নাহি ভাবি,
সে আছে—আমারো আছে, এই শুধু দাবী ?

কবিতা কয়টী এমন স্নেহবাৎসল্য, ও ভাব নির্ভরতা মিশ্রিত যে পাঠ করিয়া আমরাও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। সেই অশ্রুই শোক সন্তপ্ত পিতামাতার সান্ত্বনা হউক।

রাজসিংহের ভূমিকা

'বঙ্গশ্রী'তে গত ৭।৮ মাস হইতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ও নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্রের জীবনীলেখক ও সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবীজীবনী লেখক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রাজসিংহের ভূমিকা অবলম্বনে ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বহু যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি সেই সম্বন্ধে আরও ৩।৪ টী প্রবন্ধ লিখিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিবেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আগামী বৈশাখ হইতে 'বঙ্গশ্রী'র কলেবরে সেই কয়টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, আমাদিগকে এই অনুরোধ জানাইয়া তিনি আগামী মাসের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শুনিতেছি, শীঘ্রই তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। যদি কোন লেখক এই সমস্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদমূলক বা পোষণকল্পে অন্যান্য যুক্তি-সমন্বিত কোন প্রবন্ধ লিখিতে চাহেন, তবে "বঙ্গশ্রীতে" তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। আমাদের সন্দেহ নাই যে, জাতীয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহা ধ্রুব সত্য। ইতিহাস-তত্ত্ববিদ্ স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দ্দেশ কিরূপ মানিয়া চলিতেন আমরা শুনিয়াছি সে সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। যদিও অনেক অর্ব্বাচীন লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমের ব্যর্থতা দেখাইতে চাহিয়াছেন, আর ডাক্তার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ঐতিহাসিকতার আলোচনা করিতে গিয়া অন্যান্য আবশ্যকীয় সমস্ত দিকেই নির্ব্বাক থাকিয়া "আরংজীবের কুটিল, ভাবগোপন-দক্ষ হাসির আবরণের মধ্যে বজ্র-কঠিন প্রকৃতিটিকেই" কেবল মাত্র ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন, তথাপি বঙ্কিমের ছত্রে ছত্রে যে ইতিহাস, ডাঃ দাশ গুপ্তের নিকট হইতে তাহারই আভাষ পাইতে আমরা চাই। ভরসা করি তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে আর কালবিলম্ব করিবেন না। অনেক পাঠক এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

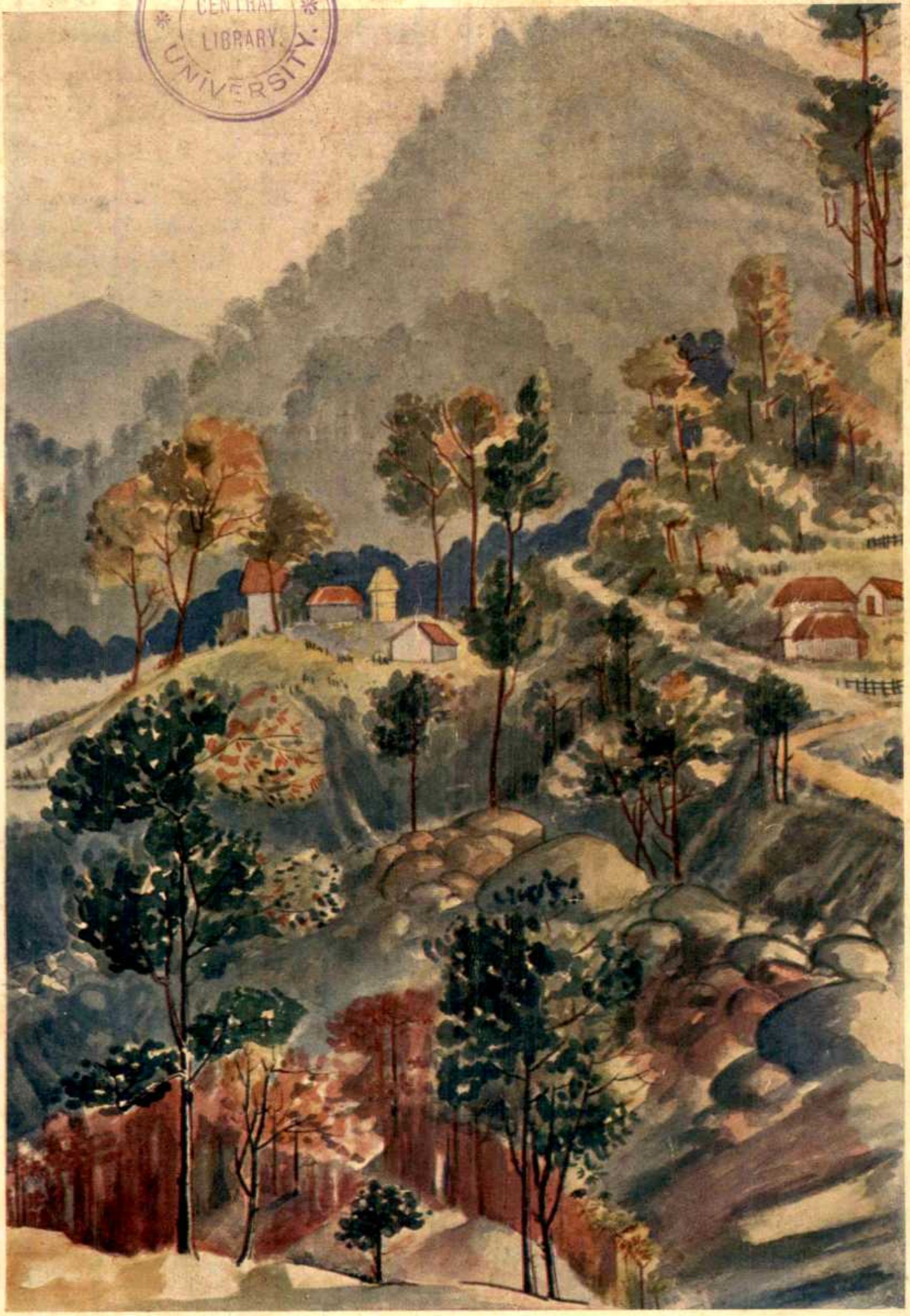

পার্ব্বত্য দৃশ্য (বক্সার বন্দী শিবির হইতে) [শিল্পী—শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

বঙ্গশ্রী

বৈশাখ—১৩৪৯

৯ম বর্ষ—২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

ভারতবাসীগণের রক্ষার উপায়

উদ্বেগ ও হাহাকার প্রায় সকলেরই হৃদয় আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়াছে। যতটুকু ধৈর্য্য থাকিলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে চলিতে পারে তাহা প্রায়শঃ বিকল হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতার যে রাজপথগুলি মানুষের কোলাহলে প্রায় সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত সেই রাজপথগুলি প্রায়শঃ নীরব হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রী যেন চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। সহরের কত দোকান যে বন্ধ হইয়া আসিতেছে তাহা গণনা করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এখনও ভারতের কোন স্থান আক্রান্ত হয় নাই। অথচ এত লণ্ড-ভণ্ড হয় কেন? ইহার মূলে আছে প্রধানতঃ অধৈর্য্য।

এই অধৈর্য্য যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। আমরা এক্ষণে এই আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিব।

আমাদিগের প্রথম নজর থাকিবে ভারতবর্ষের দিকে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ (Burma)। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণভাগ সর্ব্বতোভাবে জাপানের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। উত্তরে আকায়াব ও ম্যাণ্ডালে মিলাইয়া দিলে যে সরলরেখা হয়, তাহার প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত জাপান বাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের এই অংশের সহিত জাপানাধিকৃত শ্যানকিংএর মিলন আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং তাহার দক্ষিণে ভারত মহাসাগর (Indian Ocean)। এই দুইটী জলভাগই একদিন সর্ব্বতোভাবে সাগর-সম্রাজ্ঞী (Mistress of the Sea) ব্রিটেনের অধিকৃত ছিল। একদিন জগতের কোন শক্তিই ব্রিটেনের সহিত সৌখ্য স্থাপন না করিয়া ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে গমনাগমন করিতে পারিত না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখনও ভারত মহাসাগর সম্পূর্ণ ভাবে শত্রুর করতলগত হয় নাই বটে কিন্তু যে ব্রিটেন একদিন বঙ্গোপসাগরের সম্রাজ্ঞী ছিলেন, সেই ব্রিটেনের পক্ষেও এখন আর বঙ্গোপসাগর নিরাপদ নহে। সে দিন জাপান বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ব্রিটেনের একাধিক জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। এক কথায় বঙ্গোপসাগরের রাস্তায় ব্রিটেনের ও তাঁহার বন্ধুরাজ্যগণের ভারতে প্রবেশ করা এক্ষণে জাপানের শত্রুতার জন্য অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের পশ্চিমে এক দিকে আরব্য-সাগর ও অন্য দিকে পারস্য, পারস্যের পশ্চিমে তুরস্ক ও তাহার উত্তর-পশ্চিমে বুলগেরিয়া।

বুলগেরিয়ায় জার্ম্মাণ বাহিনী সজ্জিত হইয়াছে। তুরস্কের সহিত সৌখ্য স্থাপিত হইলে এই বাহিনী সরাসর পারস্যে আসিয়া উপস্থিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা আছে। এবং জার্ম্মাণ বাহিনীকে তখন পারস্য দেশে ব্রিটিশ বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইবে। একদিকে ব্রিটিশ বাহিনী এবং অপর দিকে জার্ম্মাণ বাহিনীর সমর হইতে থাকিলে জয়লক্ষ্মী ব্রিটেনের করতলগত

হইতে পারেন এইরূপ আশা করা চলে বটে কিন্তু আরব্য সাগরে যদ্যপি জাপান প্রবেশ লাভ করিতে পারে তাহা হইলে ব্রিটেনের জয়ের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িবে।

ভূমধ্য সাগরে ব্রিটেনের যে রণতরীসমূহ বিদ্যমান আছে, তাহা অবাধে কার্য্য করিতে পারিলে জাপানের পক্ষে আরব্য-সাগরে প্রবেশ করা অসম্ভব, ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইত বটে কিন্তু দুষ্ট জার্ম্মাণ-বাহিনীর বাতাস-বিভাগ যেরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়াছে তাহাতে ভূমধ্য সাগরের কোন ব্রিটিশ রণতরী জাপানকে যথাযথ ভাবে বাধা দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। অন্য দিকে তুরস্কের সহিত জার্ম্মাণীর যেরূপ ব্যবহার চলিতেছে তাহাতে তুরস্ক যে বহুদিন আর তাহার নিরপেক্ষ ভাব রক্ষা করিতে পারিবে ইহা মনে করা যায় না।

মোটের উপর যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের চারিদিকেই অর্থাৎ পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও আংশিক পরিমাণে উত্তর, শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িবে। জার্ম্মাণ জাতি বর্ত্তমান যুদ্ধ গত দুই বৎসর কাল যেরূপ ভাবে চালাইয়া আসিতেছে তাহাতে এই পরিবেষ্টনকার্য্য যতদিন পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতভাবে ভারতের অভ্যন্তরে কোন আক্রমণের কার্য্য আরম্ভ করিবে বলিয়া মনে হয় না। ততদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে শত্রুপক্ষের ভারত আক্রমণ-প্রণালী যথাযথ ভাবে না বুঝিতে পারেন তাহার জন্য স্থানে স্থানে আক্রমণের অভিনয় করিবে বলিয়া মনে হয়। রাশিয়ার রণাঙ্গণে, গ্রেটব্রিটেনের অভিমুখে এবং লিবিয়ার রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ ও ইটালী বাহিনী সজ্জিত থাকিবে বটে কিন্তু ঐ সকল রণাঙ্গনের তুলনায় ভারত আক্রমণের দিকেই যে শত্রুপক্ষ অধিকতর অবহিত হইবে ইহা আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষ যখন সর্ব্বতোভাবে আক্রান্ত হইবে তখন শত্রুকে বাধা দিবার জন্য ভারতের বাহির হইতে কোনরূপ সহায়তা পাইবার কোন আশা থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের আভ্যন্তরীণ সমরোপকরণ প্রচুর না হইলে ভারত যে কি করিয়া শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আক্রমণের আয়োজন যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ভারত যে একযোগে অন্ততঃ পাঁচটী অথবা ছয়টী রেখায় আক্রান্ত হইবে তাহা আশঙ্কা করা যাইতে পারে। ভারত যখন আক্রান্ত হইবে তখন ভারতের কোন স্থানই আক্রমণকারীদিগের হাত হইতে নিরাপদ থাকিবে বলিয়া মনে করা যায় না। যদি ভারত আক্রান্তই হয়, তাহা হইলে যাঁহারা এক সহর ছাড়িয়া নিরাপদ হইবার জন্য স্থানান্তরে যাইতেছেন তাঁহারা রক্ষা পাইবেন বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে যাঁহারা বাড়ী-ঘর-দুয়ার ছাড়িয়া সহর হইতে অন্যত্র যাইবার পরামর্শ দিতেছেন তাঁহারা অদূরদর্শী, ইহা আমাদিগের অভিমত। উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশ অত্যন্ত তমসাচ্ছন্ন। ছুটা-ছুটী করিয়া সমস্ত লণ্ড-ভণ্ড করিলে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না। পরন্তু বিপদ আরও ঘনাইয়া আসিবে। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় আছে। রক্ষা পাইবার পন্থা সম্বন্ধে আমরা আগেও আলোচনা করিয়াছি, এখনও আবার ঐ আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিব।

আমাদিগের কথিত উপায় যাহাতে কর্ত্তৃপক্ষগণের দ্বারা অবলম্বিত হয় তাহা যদি ভারতবাসীগণ এখনও করিতে পারেন, তাহা হইলে শুধু ভারতবর্ষ কেন সমস্ত জগৎ রক্ষা পাইতে পারে।

বঙ্গশ্রীর যাঁহারা নিয়মিত পাঠক তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, এখন যে চিত্র বাস্তবতঃ দেখা যাইতেছে তাহা হুবহু বঙ্গশ্রীতে ৭।৮ বৎসর আগে অঙ্কিত হইয়াছিল। বঙ্গশ্রী কোন দলের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে বলিয়া বঙ্গশ্রীর কথা কেহ চিন্তার যোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। প্রকৃতি ও বিকৃতির নিয়মানুসারে কখন কি হইতে পারে তাহা অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গশ্রী কথা কহিতেছে। মানুষ বুঝুক আর না বুঝুক, বঙ্গশ্রীর কথা প্রায়শঃ অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবাসীগণ, আপনারা এখনও বঙ্গশ্রীর কথায় অবহিত হউন।

বর্ত্তমান যুদ্ধের বিপদ্‌সঙ্কুলতা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি ?

বর্ত্তমান যুদ্ধের বিপদ্-সঙ্কুলতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম ভারতের জনসাধারণ কি করিতে পারেন আমরা এই প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ম কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ঐ পন্থায় কি কি ত্রুটী আছে তাহা না জানা থাকিলে আমাদিগের কথিত পন্থার উৎকর্ষ কি কি তাহা বুঝা যাইবে না। কাজেই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষ ভারতকে রক্ষা করিবার জন্ম কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্ম যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার নাম Policy of total warfare অথবা সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধায়োজনের নীতি।

এই নীতি অনুসরণ করিলে সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করিতে হইবে শত্রুপক্ষ যাহাতে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আক্রমণ না করিতে পারে। এই চেষ্টা সত্ত্বেও যদি শত্রুপক্ষ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে উপনীত হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে শত্রুবাহিনীর প্রত্যেকেই যাহাতে হত অথবা আহত হয় তাহার জন্ম দ্বিতীয়তঃ প্রস্তুত হইতে হইবে।

বলা বাহুল্য যে, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের উপরোক্ত নীতি অনুসরণ করিয়া বিজয়ী হইতে হইলে শত্রুবাহিনী অপেক্ষা ভারতবাহিনী যাহাতে সংখ্যায় অধিকতর হয় এবং যুদ্ধ-নিপুণতায় অধিকতর সুদক্ষ হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম অর্থাৎ অস্ত্র-শস্ত্র, গুলি-গোলা ট্যাঙ্ক, অ্যারোপ্লেন, যুদ্ধের জাহাজ যাহাতে সংখ্যায় অধিকতর ও গুণে উৎকৃষ্টতর হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শত্রুবাহিনী ও শত্রুপক্ষের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের তুলনায় ভারতবাহিনী ও ভারতপক্ষের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কতদূর উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, তাহার সংবাদ একমাত্র ইংরাজকর্ত্তৃপক্ষই বলিতে পারেন। জনসাধারণের পক্ষে উহা জানা সম্ভবযোগ্য নহে। তবে আমরা যুক্তির দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে বলিতে হয় যে, ইংরাজপক্ষের বাহিনী ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম শত্রুপক্ষের তুলনায় উৎকৃষ্টতর হইবার আশা করা যায় না। অভাব মানুষকে দ্বন্দ্ব-কলহের আয়োজনে অনুপ্রাণিত করে, আর সম্পদ্ মানুষকে শান্তিপ্রিয় করিয়া তোলে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে চলিলে কোনরূপ অভাবের কারণ বিদ্যমান ছিল না। পরন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নানারূপ সম্পদের আধার। বাসেই ব্রিটিশ প্রজাগণ শান্তিপ্রিয় ও উদার হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্যপক্ষে জার্ম্মানী, জাপান ও ইটালী সর্ব্বদাই অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠেকিয়া জার্ম্মাণ, জাপানী ও ইটালীর প্রজাগণকে ক্লেশসহিষ্ণু হইতে হইয়াছে।

কাজেই আমাদিগের মতে জার্ম্মাণ, জাপান ও ইটালীর অধিবাসীগণের পক্ষে যেরূপ যুদ্ধ-প্রিয়তা ও যুদ্ধনৈপুণ্য লাভ করা সম্ভব, ব্রিটিশ প্রজাগণের তাদৃশ যুদ্ধ-প্রিয়তা ও যুদ্ধ-নৈপুণ্য লাভ করা সম্ভব নহে।

ফলেও দেখা যাইতেছে যে, শত্রুপক্ষ প্রায়শঃ বিজয়ী হইতেছে, আর ব্রিটিশ পক্ষকে প্রায়ই পরাজিত হইতে হইতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ এতাবৎ যাহা ঘটিয়া আসিতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধায়োজনের নীতি (Policy of total-warfare) সাফল্য লাভ করিবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে। এবং ঐ নীতি অনুসরণ করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের আশঙ্কায় ভীতিগ্রস্ত হইবারও কারণ আছে। যদি তাহা নাও হয়, তথাপি ঐ নীতিতে যে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইবে এবং ঐ নীতি অনুসরণ করিলে প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজাকে যে সর্ব্বদা সন্ত্রাসগ্রস্ত হইয়া নানা রকমের অসুবিধায় কালাতিপাত করিতে হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অবশ্য যদ্যপি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্ম কোন উপায় বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধায়োজনের নীতি (Policy of total warfare) অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

আমাদিগের মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্ম আর একটী নীতি আছে। এই নীতি আমরা ভারতীয় ঋষিগণ রাজসিকতা ও তামসিকতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন সেই সমস্ত কথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এই নীতি অবলম্বন করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ত'

রক্ষা পাইবেই, পরন্তু কোন মনুষ্যজীবন হত্যা করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং কোন ব্রিটিশ প্রজাকে আদৌ বিপন্ন হইতে হইবে না। অধিকন্তু সারা জগৎ হইতে যাহাতে যুদ্ধ-কলহের প্রবৃত্তি হাজার হাজার বৎসরের জন্ম সর্ব্বতোভাবে উৎপাটিত হয় তাহার ব্যবস্থা হইবে।

আমাদিগের কথিত এই নীতি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে,

সর্ব্বপ্রথমে, ভারত-প্রতিনিধিগণ যাহাতে শত্রুপক্ষের সহিত ব্রিটিশপক্ষের সম্মান বজায় রাখিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন তাহার অধিকার লাভ করিতে হইবে। এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে,—

ভারত-প্রতিনিধিগণ যাহাতে ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে ভারতবর্ষের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরী ও শিক্ষার ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারেন তাহার অধিকার লাভ করিতে হইবে।

উপরোক্ত দুইটী অধিকার পাইলেই ভারতবর্ষের পক্ষে কোন মনুষ্যজীবন কোনরূপ বিপন্ন না করিয়া ব্রিটিশসাম্রাজ্য রক্ষা করা ও জগৎ হইতে যুদ্ধ-কলহের প্রবৃত্তি দূর করা অনায়াসে সম্ভব হইবে। কি করিয়া উহা সম্ভব হইবে তাহা আমরা একণে আলোচনা করিব।

ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে ভারতবর্ষের কৃষি-ব্যবস্থা সংগঠিত হইলে আগামী সাত বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক কৃষি-যোগ্য ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি অন্ততঃ পক্ষে চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ভারতীয় কৃষকগণের মধ্যে কাহারও একান্ত প্রয়োজনীয় বস্ত্রহীন, অথবা একান্ত প্রয়োজনীয় অন্নহীন, অথবা একান্ত প্রয়োজনীয় গৃহহীন, অথবা একান্ত প্রয়োজনীয় আসবাব হীন, অথবা ঋণগ্রস্ত থাকিতে হইবে না। প্রত্যেক কৃষক প্রত্যেক রকমের কর প্রদানের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবেন এবং বৎসরের মধ্যে স্বাধীনভাবে মাত্র পাঁচ মাস খাটিয়া সারাবৎসরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান করিতে পারিবেন।

ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থা সংগঠিত হইলে কৃষকগণই অবসর সময়ে কুটীর-শিল্পের সহায়তায় প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রত্যেক একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবেন এবং তখন কুটীর-শিল্পের সহিত কোন যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করা অসম্ভব হইবে। ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থা সংগঠিত হইলে, যন্ত্র-শিল্পের দ্বারা বাতাস ও জল কলুষিত হইয়া যে সমস্ত রোগ-কীটাণু জন্ম ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে তাহা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। তখন স্বতঃই সারা দেশে রোগের সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং রোগের কারণ নিস্তেজ প্রাপ্ত হইবে। তখন কোন শিল্পীকে কোন কর-প্রদান করিতে হইবে না।

ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে বাণিজ্যের ব্যবস্থা সংগঠিত হইলে একদিকে বণিক্‌গণকে কখনও লোক্‌সানগ্রস্ত হইয়া দেউলিয়া হইতে হইবে না। অন্যদিকে বণিক্‌গণ কখনও জনসাধারণের নিকট হইতে কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য আদায় করিতে পারিবেন না। যিনি যে বাণিজ্যে লিপ্ত হইবেন সেই বাণিজ্যের দ্বারাই উত্তরোত্তর তিনি তাঁহার পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবেন। বণিক্‌গণকেও কোন কর প্রদান করিতে হইবে না। এখন যেরূপ চেষ্টা করিয়াও বাণিজ্যকার্য্য সর্ব্বতোভাবের সততার সহিত পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে বাণিজ্যের ব্যবস্থা সংগঠিত হইলে প্রত্যেক বণিকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবের সততার সহিত বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব হইবে।

ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে চাকুরীর ব্যবস্থা সংগঠিত হইলে চাকুরীজীবন অধিকতর সুশৃঙ্খলা লাভ করিবে। এখন যেরকম এক একজন অফিসারের খামখেয়ালের উপর অনেকের চাকুরীর রক্ষা ও বেতনবৃদ্ধি নির্ভরশীল হইয়া থাকে, তখন আর তাহা থাকিবে না। খামখেয়ালী আপনা হইতেই সুশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হইবে।

ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা সংগঠিত হইলে কোন শিক্ষিত লোককে বেকার থাকিতে হইবে না। শিক্ষা লাভ করিয়াও এখন যেরূপ অশান্তির আধার হইয়া থাকিতে হয়, তখন আর তাহা হইতে হইবে না। শিক্ষার জন্ম জনসাধারণের কোন ব্যয় বহন করিতে হইবে না। সকলেই বিনা খরচে শিক্ষা পাইতে পারিবেন।

যাহাতে ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে ভারতবর্ষে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরী ও শিক্ষার ব্যবস্থা সংগঠিত করা যায়

তাহার অধিকার ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে দান করিলে এবং এই প্রতিনিধিগণ যাহাতে শত্রুপক্ষের সহিত ব্রিটিশ পক্ষের সম্মান বজায় রাখিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন তাহার ক্ষমতা পাইলে সন্ধি স্থাপন করা অনায়াসসাধ্য হইবে।

আমরা কেন এই কথা বলিতেছি তাহা বুঝাইতে হইলে, শত্রুগণ কোন্ কারণে এবং কি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

খাদ্যদ্রব্যের, কাঁচামালের ও বাসস্থানের অভাবে বিব্রত হইয়া শত্রুগণ যে হিংস্র জন্তুর ন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। তাহারা মনে করে যে সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ঐ খাদ্যদ্রব্যের ও কাঁচামালের প্রাচুর্য্য আছে। তাহাদিগের উদ্দেশ্য ব্রিটেনের হাত হইতে ভারতবর্ষকে এবং সম্ভব হয় ত' অন্যান্য দেশও ছিনাইয়া লওয়া।

এই অবস্থায় যদি ভারত প্রতিনিধিগণকে ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে ভারতবর্ষের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরী ও শিক্ষার ব্যবস্থা স্থাপন করিবার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইংরাজ অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, এখন আর ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের অধিকারে নাই। এবং তখন আর ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার কোন কথা থাকিতে পারে না।

তাহার পর আবার যদি ভারতীয় প্রতিনিধিগণ বলিয়া বসেন যে, জগতের প্রত্যেক জাতির যাহার যে খাদ্য-শস্য ও কাঁচামালের অভাব আছে তাহা তাঁহারা বিনামূল্যে প্রতিবৎসর সরবরাহ করিবেন, তাহা হইলে খাদ্য-শস্য ও কাঁচামালের অভাবের জন্য এতাদৃশ নবরক্ত-প্রবাহক কোন যুদ্ধের কথা আসিতে পারে না। আমাদিগের মতে মানুষ যত ঘৃণ্যই হউক না কেন, সে যদি তাহার অভাব পূরণের প্রতিশ্রুতি পায় এবং ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইবে ইহা যদি সে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে পদানত না হইয়া পারে না। এই সত্যানুসারে উপরোক্ত সর্ত্তে শত্রুপক্ষ সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইবেন, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে ভারতবর্ষের কৃষি-ব্যবস্থা সংগঠিত হইলে আগামী সাতবৎসরের মধ্যে প্রত্যেক কৃষি-যোগ্য ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি অন্ততঃপক্ষে চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক কৃষি-যোগ্য ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইলে, ভারতবর্ষ যে নিজের দেশের অভাব পূরণ করিয়াও জগতের প্রত্যেক দেশের খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের অভাব পূরণ করিতে সক্ষম, তাহা Agricultural Statistics-এর সহায়তায় সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে।

ভারতীয় ঋষির নীতি অনুযায়ী কৃষিব্যবস্থা যে কি তাহা জানিতে পারিলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে ঐ কৃষি-ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করিলে সাতবৎসরের মধ্যে জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে বাধ্য।

একে ত' এই কৃষি-ব্যবস্থা সকলের বোধগম্য হইবে না, তাহার পর আবার প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে এই আশঙ্কায় এই কৃষি-ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম না।

ভারতীয় ঋষির কৃষি-ব্যবস্থায় যে প্রত্যেক জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য তদ্বিষয়ে যদি দুইপক্ষের কাহারও কোন সন্দেহ থাকে তাহা হইলে আমরা দুইপক্ষকেই সাতবৎসরের জন্য সমরায়োজন প্রতিষ্ঠিত রাখিতে বলিব। এবং সাতবৎসর পরে ভারতবর্ষ যখন কার্য্যতঃ তাহার কথার সত্যতা প্রমাণিত করিবে তখন ঐ সমরায়োজন স্থাপিত হইবে।

স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইবার আগেও ভারতবর্ষে ভারতীয় ঋষির কৃষিব্যবস্থা পরিচালিত হইলে প্রথম বৎসরেই ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, জাপান ও ইটালীর খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের অভাব পূরণ করিতে অনেক পরিমাণে সক্ষম হইবে।

ভারতীয় প্রতিনিধিগণ উপরোক্ত যে দুইটী অধিকার পাইলে জগতের শান্তি স্থাপিত হইতে পারে সেই দুইটী অধিকার দেওয়া অথবা না দেওয়া ইংরাজ-কর্তৃপক্ষের করায়ত্ত।

উপরোক্ত দুইটী অধিকার ভারতবর্ষকে দিলে ইংরাজ জাতির কোন ক্ষতি নাই, বরং লাভ আছে।

প্রথমতঃ জাপান, জার্ম্মানী ও ইটালীর সহিত যুদ্ধ চলিতে,

থাকিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যে যে কি হইবে তাহা বলা চলে না। কিন্তু জাপান, জার্ম্মানী ও ইটালীর সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যাইবে। ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত পূর্ণ মিত্রতা রক্ষিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটেন এতদিন পর্য্যন্ত যাহা লাভ করিয়া আসিতেছিলেন তদপেক্ষা অনেক বেশী লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। ভারত ব্রিটেনের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন থাকা সত্ত্বেও ব্রিটেনের অন্নাভাব ও বেকার সমস্যা বিদ্যমান ছিল। ব্রিটেনের তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষের কৃষিজাত শস্যের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ব্রিটেন যদ্যপি ভারতবাসীকে ভারতীয় ঋষির কৃষি-পদ্ধতি অনুসরণ করিবার অধিকার প্রদান করেন, তাহা হইলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইবে যে শত্রুপক্ষের খাদ্য ও কাঁচামালের অভাব পূরণ করিয়াও ব্রিটেনের খাদ্য ও কাঁচামালের অভাব পূরণ করা সম্ভব হইবে। সর্ব্বোপরি জগতের সকল দেশের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব দূরীভূত হইবে।

তৃতীয়তঃ নরহত্যার আশঙ্কা ও সর্ব্বসাধারণের অশান্তি সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইবে।

ভারত-প্রতিনিধিগণ যাহাতে শত্রুপক্ষের সহিত ব্রিটিশ পক্ষের সম্মান বজায় রাখিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন এবং তাঁহারা যাহাতে ভারতীয় ঋষির নীতি অনুসারে ভারতবর্ষের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরী ও শিক্ষার ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারেন এই দুইটী অধিকার পাইলে জনসাধারণের পক্ষে বর্ত্তমান যুদ্ধের বিপদ্-সঙ্কুলতা হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় বটে, কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন ঐ দুইটী অধিকার ইংরাজের নিকট হইতে লাভ করা যায় কি করিয়া?

আমাদিগের মতে প্রত্যেক প্রদেশের অ্যাসেম্ব্লিতে ও কাউন্সিলে জনসাধারণের যে সমস্ত প্রতিনিধি আছেন, তাঁহারা যদি উপরোক্ত দুইটী অধিকার লাভ করিতে বদ্ধপরিকর হন, অথবা জনসাধারণ যদ্যপি এতদর্থে পুনরায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, তাহা হইলে ঐ অধিকার দুইটী লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয়গণকে উপরোক্ত দুইটী অধিকার প্রদান করিতে এবং Policy of total war-fare পরিহার করিতে, সম্মত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে সমরায়োজনের সহায়তা করা। মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরাজের জয়েই ভারতবর্ষের জয় এবং ইংরাজের পরাজয়ে ভারতবর্ষের পরাজয়।

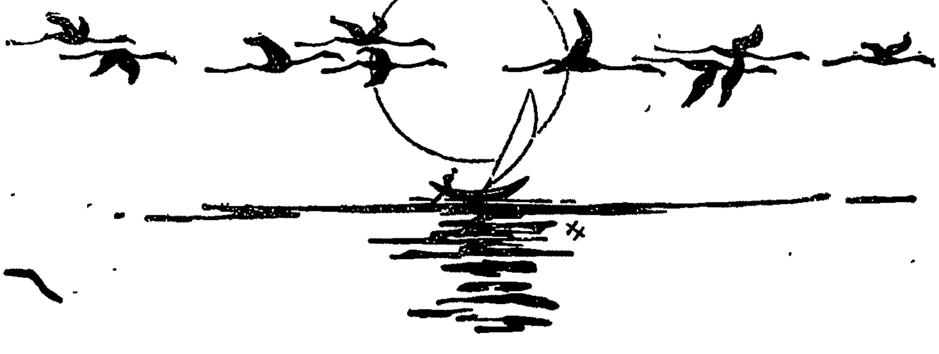

সম্পাদকীয়

সমর প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করণার্থে শাসন-ব্যবস্থার ভার ভারতীয়দের হস্তে সমর্পণ করিলেই কি ব্রিটেনের পক্ষে জয় সুনিশ্চিত হইবে?

কতিপয় ব্রিটীশ রাজনীতিক মনে করেন যে, আত্মরক্ষাকল্পে ভারতীয়দের মধ্যে যুদ্ধ প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিতে পারিলেই বৃটেন এই যুদ্ধে জয়ী হইবার সুনিশ্চিৎ সম্ভাবনা লাভ করিবে এবং এখন হইতেই যদি কোনরূপ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার ছল প্রদর্শনে সম্মিলিত ভারতকে বশীভূত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেই বৃটেন ভারতবাসীদের যুদ্ধে লিপ্ত করাইতে কৃতকার্য্য হইবে।

সম্ভবতঃ অধিকাংশ ভারতীয় রাজনীতিকই ব্রিটীশ রাজনীতিকদের এই ধারণা পরিপূর্ণরূপে সমর্থন করেন না। তাঁহাদের ধারণা বোধ হয় এই যে, ভারতের হাতে যদি সত্যকার আসল স্বায়ত্তশাসন সমর্পিত হয়, তবেই ভারতের সন্তানগণ সমরপ্রচেষ্টা বৃদ্ধিকরণে আত্মনিয়োগ করতঃ নিশ্চিত জয়লাভে বৃটেনকে সহায়তা করিবে, কোনরূপ ছল বা ছেলে ভুলানো জিনিষ দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়।

কিন্তু আমাদের অভিমত ইহাপেক্ষাও বিভিন্নতর।

আমাদের বিশ্বাস এই যে, কেবলমাত্র শক্তির ছল কেন, এমন কি সত্যকার কোন শক্তি বা অধিকারও যদি সম্মিলিত ভারতীয় নেতৃকুলের হস্তে সমর্পিত হয় এবং উক্ত নেতৃসম্মেলন যে নামেই না কেন পরিচিত হউক ভারতীয় জনসাধারণকে কোন প্রকারেই তাহারা চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করিতে কৃতকার্য্য হইবেন না। আর যদিও বা কোনপ্রকারে ভারতবাসীকে যুদ্ধে নামানো সম্ভব হয়, তবু ইহা সুনিশ্চিত যে, এত অল্প সময়ে যুদ্ধে নিযুক্ত এই বিপুল জনতাকে যথোপযুক্ত ভাবে সমরের জন্য সুসজ্জিত করা নিতান্তই অসম্ভব।

আমাদের মনে হয় যে, যুদ্ধ প্রচেষ্টার বৃদ্ধি করণার্থে সমগ্র ভারতকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে শক্তি হস্তান্তর কালেই সবচেয়ে বড় বিঘ্ন ঘটিবে। জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করাই জনতাকে সন্তুষ্ট করার প্রধান পথ। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবাসীর মধ্যে এই ঐক্য সংস্থাপন মোটেই সম্ভবপর নহে। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে. সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অবসান ঘটিলেই ভারতবাসীরা অচিরে ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠিবে। অবশ্য একথা যদি সত্য হইত যে, পূর্ব্বে বাঁটোয়ারার অস্তিত্ব ছিল না বলিয়াই ভারত সর্ব্বদা অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা বলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না যে, বাঁটোয়ারার অবসানেই ভারতে একতার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রত্যুতপক্ষে, কার্য্যক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রস্তাবিত হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও যখন ছিল না, তখনও পর্য্যন্ত ভারতবাসী মারাত্মক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত ছিল।

অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে, এই কলহের মূলে রাজনৈতিক কারণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণই বেশী প্রকট। ভারতের অবস্থা অনেকটা আরোহীবহুল একটি অতি ক্ষুদ্র ট্রেনের কামরার মত। এই কামরায় ত্রিশকেটী লোকের স্থান সঙ্কুলান হয়, কিন্তু কামরাব যাত্রীসংখ্যা নত্তর কোটী সুতরাং যতদিন এই সঙ্কীর্ণ স্থানকে উপযুক্তরূপে প্রসারিত করা না হইবে ততদিন পারস্পরিক বিবাদের কটু মনোভাব পরিহার করা যাইবে না।

তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া নেওয়া যাক যে, ভারতীয় রাজনীতিকগণ একতাবদ্ধ হইতে কৃতকার্য্য হইবেন এবং তাহাদের হস্তেই দেশের যথার্থ শাসন-ব্যবস্থার ভারও সমর্পন করা হইবে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহাতেই কি সম্মিলিত ভারতীয় রাজনীতিকগণ প্রার্থিত বিজয়লাভের জন্য জনসাধারণকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিতে আন্তরিক প্রয়াস পাইবেন? সত্য বলিতে কি, আমরা ভারতীয় রাজনীতিকগণের আন্তরিকতায় যথার্থ সন্দিহান। ইহার যথাযথ কারণ আমরা দর্শাইতে চাই না. কারণ আমাদের মতে, ইংরেজ মনোভাবাপন্ন

ভারতীয়দের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করা আর আস্তাকুঁড় ঘাঁটা একই কথা।

তর্কের খাতিরে আবার স্বীকার করিয়া নেওয়া যাক্ যে, জনসাধারণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করণে ভারতীয় রাজনীতিকগণ যথার্থ প্রয়াসী হইবেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই ফাঁকা প্রয়াসের ফলেই কি গরিষ্ঠ সংখ্যক জনসাধারণ যুদ্ধার্থে ধন ও প্রাণ পণ করিতে সক্ষম হইবে?

উত্তরে আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি—কখনই নহে। কারণ, সাধারণ গণগোষ্ঠি রাজনীতিকদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে মোটেই উৎসাহী নহে। সাধারণ গণগোষ্ঠি বুভুক্ষু—দু'মুঠা অন্নের জন্ত তাহারা লালায়িত। তাহাদিগকে এই ক্ষুধায় যে ব্যক্তি অন্ন দিতে পারিবেন, তিনিই হইবেন তাহাদের প্রভু, জনসাধারণ তাঁহারই আদেশে ধন-প্রাণ পণ করিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অন্ন না দিয়া ক্রমাগত কেবল শ্রুতি-মধুর প্রতিশ্রুতিই দিয়া চলিবে, গণগোষ্ঠি তাহাদের উপরোধ গ্রাহ্যও করিবে না। আমাদের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ এই শেষোক্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দলে। জনসাধারণকে তাঁহারা কোন দিনও এক কণা অন্ন দেন নাই, কি উপায়ে অন্ন দেওয়া যাইবে, সে কথাও তাঁহারা অবগত নহেন। তদুপরি জনসাধারণ ও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে উপলব্ধি করারও কোন গরজ নাই। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, আমাদের দেশে নেতৃগোষ্ঠির ও গণগোষ্ঠির চিন্তাধারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। ইঁহাদের একব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এতটুকুও বুঝিতে পারেন না।

জনসাধারণ প্রার্থিত জয়লাভের জন্ত যুদ্ধার্থে কেন ধন প্রাণ-সম্পত্তি পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবে না, সে সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলিবার আছে। মানুষ সর্ব্বোচ্চ ত্যাগ করে কেন? প্রেমের অনুপ্রেরণায় এবং বৃহত্তম স্বার্থলাভের আশাতেই মানুষ সাধারণতঃ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়। কাজেই বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়লাভের পর ভারতবাসীদের ভাগে যদি বড় একটা লাভের সম্ভাবনা থাকিত, অথবা তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতা-প্রেমিক হইত, তৎক্ষেত্রে হয় তো আশা করা যাইত যে, ভারতবাসী নির্ব্বিচারে যুদ্ধে আত্মপণ করিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, যুদ্ধে জয়ী হইলেও বৃটিশপক্ষ লুটের ভাগ হিসাবে চক্রশক্তির নিকটে কিছুই পাইবে না। তদুপরি ভারতবাসীগণ ব্রিটিশ জনসাধারণের স্তায় স্বাধীনতা-প্রেমিক নহে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, জনসাধারণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করণে নেতৃকুলের প্রয়াস শত আন্তরিক হইলেও কার্য্যতঃ জনসাধারণ সে প্রয়াসে সাড়া দিবে না।

গায়ের জোরে অথবা ছলে কৌশলে সম্ভবতঃ ভারতীয় জনসাধারণকে সৈন্ত-বিভাগে এবং নৌ ও বিমান-বাহিনীতে যোগদান করিতে প্ররোচিত করা যাইতে পারিবে, কিন্তু যে প্রেরণায় শক্তিমান্ শত্রুর পরাজয় ঘটিবে, ভারতবাসী সেই প্রেরণায় কখনই অনুপ্রাণিত হইবে না।

আর এ কথা কেবল ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষেই সত্য নহে, ব্রিটীশ জনসাধারণের পক্ষেও ইহা অমোঘ। সত্যকে অস্বীকার না করিলে এ কথাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রারব্ধ যুদ্ধের প্রথম হইতেই বৃটেনের সৈন্ত, নৌ ও বিমান বাহিনী চক্রশক্তি-বাহিনীর স্তায় যুদ্ধ-প্রেরণার পরিচয় দিতে সক্ষম হয় নাই। তাহা না হইলে, মিত্রশক্তি আজ আর পুনঃ পুনঃ এমন পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করিত না। এতদ্ব্যতীত বিরাট ব্রিটীশ সাম্রাজ্য রত্নের আকর; পক্ষান্তরে চক্রশক্তির রাজ্য মরুভূমির স্তায় ঊষর; তাই মনে হয় যুদ্ধে জিত লুটের মালের আশাতে বৃটেন এই যুদ্ধে লিপ্ত নয়।

তর্কের খাতিরে এ কথাও মানিয়া লওয়া যায় যে, ভারতবাসী চক্রশক্তির মতই যুদ্ধ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবে, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে চক্রশক্তির স্তায় শক্তিমান্ প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার উপযুক্ত সমর-শিক্ষায় ভারতবাসী প্রস্তুত হইবে, এ কথা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মনেও স্থান দিতে পারিবেন না। ইহার উপর, গোলা-বারুদ প্রভৃতি সমরোপকরণ সরবরাহের প্রশ্নও উপেক্ষণীয় নহে।

সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত যে, সমর-প্রচেষ্টা বৃদ্ধিকরণার্থে ভারতীয় নেতৃকুলের হাতে শাসন-ব্যবস্থা তুলিয়া দিলেই ইংলণ্ডের জয়ের সম্ভাবনা সুদৃঢ় হইবে না। তবে যে-সকল ভারতবাসী ভারতের প্রাচুর্য্য বৃদ্ধিকরণে প্রয়াসী, একমাত্র তাঁহাদেরই দায়িত্বে যদি ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ভার সমর্পণ করিয়া ইংল্যাণ্ড দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, তবেই বৃটেনের জয় সুনিশ্চিত হইতে পারে, নতুবা আর কিছুতেই নহে।

এ সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তী নিবন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করিতেছি।

ধৈর্য্যনীতির অনুসরণ করিলেই কি ব্রিটেন এই যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবে ?

পূর্ব্ব নিবন্ধে আমরা বলিয়াছি, ব্রিটীশ সাম্রাজ্য রত্নের আকর; এই বিশাল রাজত্বে কদাপি সূর্য্য অস্ত যায় না। এই রাজ্যের তুলনায় চক্রশক্তির রাজ্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর;—একেবারে ঊষর মরুভূমি বলিলেও বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তদুপরি অফুরন্ত প্রাকৃতিক বিত্তবশালী আমেরিকাও ব্রিটেনের সহায়। কাজেই এতদুভয়ের এই বিরাট বৈভবের দিকে চাহিয়া সাধারণ দৃষ্টিকোণ হইতে এই ধারণা পোষণ করা মোটেই অন্যায় নহে যে, বার বার জয়লাভ সত্ত্বেও দরিদ্র চক্রশক্তি কালক্রমে স্বতঃই যেদিন অনিবার্য্যরূপে নিঃস্ব হইয়া পড়িবে, অফুরান সম্পদশালী মিত্রশক্তির ভাণ্ডার বহুপরাজয়ের পর সেদিনও এতটুকু শূন্য রহিবে না; মিত্রশক্তির সেদিনও খাড়া হইয়া থাকিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতাই থাকিবে। সুতরাং এই ধারণা হইতে সহজেই বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ব্রিটেনের পক্ষে অটুট ধৈর্য্যের সহিত এই দিনটির অপেক্ষা করাই সব চেয়ে বিচক্ষণতার পরিচায়ক; অন্ততঃ আমাদের ব্রিটীশ রাষ্ট্রনীতিধুরন্ধরগণ যুদ্ধের গোড়া হইতে এই ধৈর্য্যনীতিরই পরিপুষ্টি সাধন করিয়া আসিতেছেন।

একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা বলিয়াছিলাম, একমাত্র সাধারণ দৃষ্টিকোণ হইতেই উক্ত ধৈর্য্য-নীতি পোষণ করা ভ্রান্তি-দুষ্ট নহে। কিন্তু সময়ের পদক্ষেপে আজ অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এতদিনে চক্রশক্তি বহু প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ স্থান অধিকার করতঃ শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যেও বিপরীত পরিস্থিতির সূচনা হইয়েছে। সুতরাং আজিকার এই ভিন্নতর পরিস্থিতিতে পূর্ব্বের সাধারণ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার-করা অনুমানগুলি অভ্রান্ত না হইবারই সম্ভাবনা সর্ব্বাধিক। সেই কারণে ব্রিটীশ রাষ্ট্রনীতিকদের ধৈর্য্য-নীতিও অভ্রান্ত নহে। বরঞ্চ উহা পরিহার করাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

ব্রিটেনের পূর্ব্বতন গভর্ণমেন্টের শৈথিল্যই কি বর্ত্তমান সামরিক দুরবস্থার জন্য দায়ী ?

বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল মহোদয়ের অনুগামীগণ অভিযোগ করেন যে, পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রীগণ যথাকালে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের যথোপযুক্ত সমরসজ্জা বৃদ্ধি করেন নাই বলিয়াই আজ সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া, বিশেষতঃ সুদূর প্রাচ্যখণ্ডে এই সামরিক দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

আমাদেরও মত ইহাই যে, পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রীগণ স্ব স্ব পদোচিত যথার্থ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না। উক্ত পূর্ব্বতনদের যথার্থ দূরদৃষ্টি থাকিলে হয় ত' তাঁহারা সত্যই এমন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইতেন, যার ফলে দরিদ্র চক্রশক্তি আজ কখনই প্রবল ব্রিটীশ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচারী হইতে সাহসী হইত না। পক্ষান্তরে এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, কার্য্যতঃ চার্চ্চিল ও তাঁহার অনুগামীদের পরিকল্পনানুসারে আজ যদি ব্রিটেন সত্যই বিপুল সমরোপকরণে সজ্জিত হইত তবুও তাহাতে বৃটেনের বর্ত্তমান ভাগ্যের কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিত না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃটীশ সাম্রাজ্য বিপুল সম্পদশালী এবং রত্নের ভাণ্ডার। বস্তুতঃ, আজ যে ব্রিটেন অন্যান্য শক্তির তুলনায় সমরসজ্জিত নয়, ইহার একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক কারনই হইল বৃটেনের এবম্বিধ প্রাচুর্য্য। বলা বাহুল্য, এই প্রাচুর্য্য প্রাকৃতিক হইলেও ইহা সর্ব্ববিধ অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্যেরও বৃদ্ধি সাধন করে। কাজেই অতিরিক্ত লোভপরায়ণ না হইলে পরের প্রাচুর্য্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া তাহার সাজে না। সব কিছুই আছে বলিয়াই পরের নিকটে কিছু পাইবার আশায়ও সে লালায়িত হইবে না। সুতরাং অপরের বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে কোনরূপ বিপদেও লিপ্ত হইতে হইবে না। তাই স্বভাবতই সে শান্তি-প্রিয় ও বদান্য হইয়া নিরুদ্বেগ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইবে।

বস্তুতঃ এই নিরুদ্বেগ শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের আকর্ষণ ও কলহের মনোবৃত্তি কখনও পাশাপাশি বাসা বাঁধিতে পারে না। যে রাজ্য অর্থনৈতিক বৈভববিহীন এবং সাম্রাজ্যশূন্য সেই রাজ্যই স্বভাবতঃ লোভার্ত্ত, এবং সে রাজ্যের সৈন্যবাহিনীই নিষ্ঠুর, শ্রমপরায়ণ ও একগুঁয়ে বাহিনীতে পরিণত হইতে পারে—যে-রাজ্য বিপুল বিভবের অধিকারী সে-রাজ্য নহে। যেদিন ইংল্যাণ্ডের এরূপ কোন সম্পদ বা সাম্রাজ্য ছিল না ব্রিটীশ সৈন্যগণও সেদিন এমনই শ্রমপরায়ণ ও একগুঁয়ে ছিল; কিন্তু আজ সুখপূর্ণ জীবনের মাঝে আবার সে এরূপভাবে সৈন্যদল গঠন করিতে সক্ষম হইবে, এই পরিকল্পনা প্রকাশ-

কুসুম মাত্র। জার্ম্মানী, জাপান ও ইটালী নিঃস্ব বলিয়াই আজ এরূপ নিষ্ঠুর ও একগুঁয়ে সৈন্য-বাহিনী গঠন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। সুতরাং এই নিঃস্ব জাতিগণ যে-যুদ্ধ জোর করিয়া ব্রিটেনের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই যুদ্ধে ব্রিটেনই সামরিকবিজয়লাভ করিবে, এই চিন্তা অত্যন্ত অলস ও অদূরদৃষ্টি সম্পন্ন। এই কারণেই, উপযুক্ত সমরসজ্জা প্রস্তুত করেন নাই বলিয়া, চার্চ্চিলের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান মন্ত্রীদের আমরা অভিযুক্ত করিতে পারি না। বরঞ্চ আমাদের মনে হয় যে, এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মিঃ চার্চ্চিলই ইংলণ্ডের পক্ষে নব নব দুর্ভাগ্যের সূচনা করিতেছেন। ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষ যদি এখনও তাহাদের প্রধান মন্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ মতবাদের পরিবর্ত্তন না ঘটান, অথবা স্বয়ং চার্চ্চিলকেই অপসারিত না করেন, তবে ব্রিটেনকে অদূরভবিষ্যতে গ্রীসের ন্যায় চতুর্থ শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইতে দেখিলেও আমরা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইব না।

সুতরাং ব্যয়বহুল সমরোপকরণ প্রস্তুত করেন নাই বলিয়াই যে চার্চ্চিলের পূর্ব্ববর্ত্তীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে হইবে, ইহাতে আমরা কোন যৌক্তিকতা দেখি না। তথাপি এই পূর্ব্ববর্ত্তীদের আচরণ আমরা অসমর্থন করি, এই কারণে যে, তাঁহারা মানুষের অন্তস্থিত বিবাদ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি কল্পে শৈথিল্য করিয়াছেন। পরস্পর কলহের বাসনা যদি তাঁহারা আজ মানুষের মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইতেন, তবে আজ আর কখনই বৃটেনের সামরিক অভাবের জন্য নিরন্তর আপশোষ করিতে হইত না।

মানুষেরএই পরস্পর কলহ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, অর্থনৈতিক অপ্রাচুর্য্য হইতে, নতুবা মানসিক উন্মাদনা ও উত্তেজনা হইতে। কাজেই কোনক্রমে যদি এই অর্থনৈতিক অপ্রাচুর্য্য এবং মানসিক উন্মাদনা-উত্তেজনার অবসান ঘটে, তবেই মানুষের মন হইতে পরস্পরকে আঘাত করিবার হীন মনোভাব আপনিই মুছিয়া যাইবে।

উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা আজও যদি ভূমির উৎকর্ষসাধন-কল্পে ব্রিটেন যথার্থই প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞানের সন্ধান পায় তাহা হইলে অচিরেই সে স্বকীয় ভারত-সাম্রাজ্যের সহায়তায় পাপী ব্যক্তি ব্যতীত সমগ্র জগতবাসীরই ন্যূনতম অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে কৃতকার্য্য হইবে। এই কার্য্য বৃটেনের পক্ষে দরিদ্রের প্রতি ধনী প্রতিবেশীর বদন্যতার ন্যায়। আর যদি উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা বৃটেন প্রকৃত শিক্ষার মর্ম্মোদ্ধার করিতে সফলকাম হয় তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যে মানুষের মনে উন্মাদনা-উত্তেজনার কোন চিহ্ন থাকিবেনা।

সম্ভবতঃ চার্চ্চিল-জাতীয় রাষ্ট্রনীতিকরা আমাদের এই প্রস্তাব-নির্দ্দেশকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু এই অতিবুদ্ধি রাষ্ট্রনীতি-ধুরন্ধরদের আমরা শুধু এইকথাই মনে রাখিতে বলি যে, যে-বিষয় তাঁহাদের সংকীর্ণ জ্ঞানের অগোচরে, সে বিষয়ে অন্যেরও সবিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে।

বস্তুতঃ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান-উপায় সত্যই বিদ্যমান এবং আমরা স্বয়ং সেই উপায় অবগত। ব্রিটেন যদি উপযুক্ত সময়ে এই উপযুক্ত উপায়টির প্রবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে বোমার আঘাত হইতে ব্রিটীশ শিশু ও নারীগণ রক্ষা পাইবে। যথার্থ আন্তরিকতা সহকারে কার্য্যে সযত্ন হইলে, আজও সে উক্ত সমস্যার সমাধান উপায় আবিষ্কার করিতে পারে।

সামরিক বৈপরিত্য সত্ত্বেও ইংলণ্ড কিরূপে নিশ্চিত বিজয়লাভ করিবে এবং ভারতে ইংরেজ স্বার্থ বজায় রাখিবে?

ইংল্যাণ্ড যে আজ বিজয়লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, সে কথা মাননীয় চার্চ্চিল মহোদয়ের 'ভি' ক্যাম্পেন ('V' campaign) এবং যত্র তত্র ইংরেজী 'V' অক্ষরের ছড়াছড়ি দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই উৎকণ্ঠিত বিজয় লাভের জন্য ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি-ধুরন্ধরবর্গ যে এতাবৎ কোন পথ গ্রহণ করিতেছেন, সে বিষয় অদ্যাপি জনসাধারণের বুদ্ধির গোচরীভূত হইল না।

আমাদের মনে হয়, ব্রিটীশ রাজনীতিকগণ প্রার্থিত বিজয়-লাভের জন্য সম্ভবতঃ দুইটি পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রথম পথ;—ধৈর্য্যনীতির; যতদিনে না অস্ত্র-সম্পদশালী চক্রশক্তি নিঃস্ব হইয়া পড়ে ততদিন ব্রিটীশ জনসাধারণ শত্রুদত্ত সমুদয় দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া যাউক, ইহাই হইল উক্ত অতি-পণ্ডিত রাজনীতিকদের নির্দ্দেশ।

দ্বিতীয় পন্থা, যথাসম্ভব সৈন্য, নৌশক্তি বিমানবাহিনী বৃদ্ধি। এককথায় সমুদয় সমরোপকরণের যথাসম্ভব স্ফীতি সাধন।

এই সমরোপকরণের বৃদ্ধি-সাধন কল্পে ভারতের সহযোগিতা লাভের আশায় তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বায়ত্বশাসন দিতেও নাকি পশ্চাৎপদ নহেন।

কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী নিবন্ধগুলির আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রিটীশ রাজনীতিকদের অবলম্বিত পন্থাদ্বয়ের কোনটাতেই শান্তিকামী মানবের প্রার্থিত ‘বিজয়ের’ সমাগম ঘটিবে না।

সুতরাং, স্বভাবতই এই সমস্যাটা আসিয়া এক্ষনে দাঁড়ায় যে, তবে এই সামরিক বৈক্লব্য সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড কি উপায়ে নিশ্চিত বিজয় লাভ করিবে এবং ভারতেও কিভাবে ইংরেজ স্বার্থ বজায় রাখিবে ?—প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে প্রথমেই আমাদের জানিতে হইবে, কেন এই বর্ত্তমানে বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে ?—কেন জার্ম্মানজাতি তাহাদের সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এই সর্ব্বঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে ?—নানা ব্যক্তি নানাভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন। কাহারও সহিত কাহারও মতের ঐক্য থাকিবে না। বর্ত্তমান নিবন্ধে এই মতানৈক্য নিয়া আলোচনা করিতে বসি নাই। ইহাতে আমাদের আলোচনা অকারণ বর্দ্ধিত কলেবরে পাঠকদের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটাইতে পারে। আমাদের মতে বর্ত্তমান যুদ্ধ বাধিয়াছে প্রধানতঃ জার্ম্মেনী ও ইংল্যাণ্ড এই দুই দেশের মধ্যে—অন্যান্য যুযুধান দেশ বা জাতি এতদুভয়ের সাঙ্গ-পাঙ্গের দল।

অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে আমরা জানিয়াছি যে, যে সময় হইতে জার্ম্মানীর আধুনিক নৌবহরের সৃষ্টির প্রথম সূত্রপাত সেই সময় অর্থাৎ ১৮৯৭ সাল হইতেই জার্ম্মানী ইংল্যাণ্ডকে পৃথিবীব্যাপী অর্থ-নৈতিক প্রতিপত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে সারা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিবার পরিকল্পনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে। জার্ম্মানীর পরবর্ত্তী উদ্দেশ্য, যত বেশী পারা যায় কাঁচমাল সরবরাহকারী দেশসমূহ অধিকার করা এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বীয় শিল্পের বাজার প্রতিষ্ঠা করা।

বলাই বাহুল্য ভারতবর্ষই সমগ্র ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি। ইংল্যাণ্ডকে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে হইলে এই ভারতবর্ষকেই ব্রিটীশসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। সুতরাং যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে, ইংল্যাণ্ডের পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বিনষ্ট করাই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর যুদ্ধযাত্রার প্রধানতম উদ্দেশ্য, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রিটীশ সাম্রাজ্য হইতে প্রধানতঃ ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়েই জার্ম্মানী ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদের আসল সমস্যার সমাধানে নামা যাক, কি উপায়ে ব্রিটেন জার্ম্মানীর ও বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে এবং ভারতেও ইংরেজ স্বার্থ বজায় থাকে।

প্রথমতঃ দেখা যাক্ যে, বর্ত্তমানের ভ্রান্ত সমর-নীতি অবিলম্বে ব্রিটিশ-রাজনীতিকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত না হইলে অদূরভবিষ্যতে বিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনে কিরূপ অবস্থা সূচিত হইবে ?

এই সমস্যার সম্যক্ আলোচনা করিলে প্রত্যেকেই নিশ্চয় স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধ যে গতিতে চলিতেছে, সেই গতিতে চলিতে থাকিলে শীঘ্রই অষ্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড, মিশর, ভারতবর্ষ, এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। নিশ্চিতরূপে যুদ্ধের সঠিক ফলাফল নিরূপণ দুঃসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু ব্রিটেনের এই বিরাট সাম্রাজ্য পতনের যে একটা বিপুল আশঙ্কা রহিয়াছে, সে কথা অনুমান করা কঠিন নহে। অন্য কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্ষতি যদি ইত্যবসরে সংঘটিত না হয় তবে অবশ্যই যে সাম্রাজ্য হারাইবার এই আশঙ্কাকে সর্ব্বতোভাবে এড়াইতে হইবে, এ কথা অনস্বীকার্য্য। সুতরাং ব্রিটেনের প্রচলিত সমরনীতির পরিবর্ত্তনই এক্ষনে সর্ব্বাধিক কাম্য।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, ভারতকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করার সঙ্কল্পেই জার্ম্মানী ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। এক্ষনে, জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বলপ্রয়োগে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যদি ইংল্যাণ্ড স্বীয় ইচ্ছানুসারেই ভারতের সহিত সাম্রাজ্য-বন্ধন ছিন্ন করিয়া মিত্রন সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে, হয়-ত’ আশা করা যাইতে পারে যে, চক্রশক্তি অনুষ্ঠিত আজিকার যুদ্ধের ভীষণতা বুঝি বা ইহার ফলে প্রশমিত হইবে। অনেকে তর্ক করিতে পারেন যে, ভারতের সহিত এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সাম্রাজ্য-বন্ধন ছিন্ন করণ ত ব্রিটেনের পক্ষে পরাজয়েরই নামান্তর। সত্য বটে এই কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু স্বয়ং ব্রিটেন যদি স্বেচ্ছায়ই এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভারতবাসীর হস্তে ভারতের স্বেচ্ছাপরিকল্পিত শাসন ব্যবস্থা সমর্পণ করে, সে ক্ষেত্রে আর এ কার্য্যকে পরাজয় বলা চলে কোন যুক্তি [illegible] ?

এবার সমস্যার দ্বিতীয় প্রতিপাদ্যটি আলোচনা করা যাক্। ধরিয়া লওয়া যাক্ যে, ব্রিটেন স্বেচ্ছায় ভারতের সহিত মিলন-সূত্রে আবদ্ধ হইলে চক্রশক্তির আক্রমণের প্রাবল্য বহুলাংশে প্রশমিত হইবে কিন্তু চক্রশক্তির আক্রমণের উগ্রতা কি একেবারে নিবারিত হইবে? এ সম্বন্ধে আমরাও খুব নিশ্চিৎ করিয়া বলিতে পারি না যে, ব্রিটেন শুধু ভারতের সম্পর্ক ছিন্ন করিলেই শত্রুপক্ষ ভারত আক্রমণে বিরত হইবে। তবে একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, ভারতবর্ষ এক্সিস্ প্রজাবর্গের প্রত্যেককে তাহাদের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিলে, চক্রশক্তির পক্ষে ভারত-আক্রমণের আর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না।

সমস্যার তৃতীয় প্রতিপাদ্য, ভারতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলে ইংল্যাণ্ড কি উপায়ে ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বের মতই সুবিধা ভোগ করিবে।

এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার পূর্ব্বে প্রথমে আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, এতাবৎ ইংল্যাণ্ড ভারত হইতে কি কি সুবিধা ভোগ করিয়াছে? এই পরীক্ষায় সঠিক দাম কসিলে দেখা যাইবে, ইংল্যাণ্ড এতাবৎ কাল ভারতবর্ষ হইতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রধানতঃ এই দুই দফা সুবিধাই ভোগ করিয়া আসিতেছে।

প্রথমোক্ত রাজনৈতিক সম্বন্ধ-জনিত সমুদয় সুবিধার লাভ লোকসানের নিরপেক্ষ হিসাব করিলে দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ড ভারতে যে রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করিয়াছে, অধুনা সেই সুবিধা হইতে সে অনেকখানিই বঞ্চিত। ১৯০৬ সাল হইতে ইংল্যাণ্ড প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে নিয়মিত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই আসিতেছে। অতএব ভারত হইতে ইংরেজের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইলে ক্ষতির প্রশ্নই আর উত্থাপিত হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত ইংল্যাণ্ড নিজেই ত' ভারতকে স্বাধীনতা দানে সম্মত হইয়াছে! বস্তুতঃ ইংল্যাণ্ড যদি প্রকৃতই এইভাবে সমুদয় ভারতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ভারতে স্বায়ত্তশাসন অধিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দেয়, তবে ভবিষ্যতে চিরদিন ভারতবাসীগণ অন্তরে অন্তরে ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে একটি বিশেষ সশ্রদ্ধ সমবেদনা পোষণ করিবে। আজ অবশ্য [illegible] এই সমবেদনার মূল্য নিরূপণ করিতে চাহি না, তবে এমন একটি দিনের আবির্ভাব নিশ্চয়ই ঘটিবে, যেদিন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান সামগ্রী আর কিছুই রহিবে না।

আর ভারতের সহিত ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ-জনিত লাভ লোকসানের সঠিক খতিয়ান করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্বে বৎসরে বৎসরে ইংল্যাণ্ডের লাভের যে অঙ্কটা অত্যন্ত স্ফীতকায় ছিল, ১৯০৬ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই অঙ্কটা প্রায় একচতুর্থাংশে নামিয়া আসিয়াছে। এই স্বল্প লাভে যে কখনই সমগ্র ব্রিটেনবাসী ন্যূনতম প্রয়োজন লাভে সক্ষম হইবে না, ইহা সহজে অনুমেয়। কাজেই ইংরেজ-হস্তক্ষেপ-মুক্ত স্বাধীন ভারত যদি ইংল্যাণ্ডকে এমন প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ প্রত্যেক ব্রিটেনবাসীরই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে বোধ করি ইংল্যাণ্ডের ভারতকে হারাইবার লোকসানটা আর অনুভূত হইবে না।

এবার সমস্যার চতুর্থ প্রতিপাদ্য বিষয়—ইংল্যাণ্ড যদি সত্যসত্যই ভারতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিতে মনস্থ করে তবে ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থাভার কাহাদের দায়িত্বে পরিচালিত হইবে।

পর্য্যবেক্ষন সঠিক হইলে বুঝা যাইবে, এ প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন নহে। ভারতভূমির সহায়তায় যাহারা সমগ্র মানব-সমাজের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইবেন, ভারতের শাসনব্যবস্থাভার সমর্পণ করিবার জন্ম এইসব কর্ম্মীকেই সর্ব্বাগ্রে খুজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু শুধু উপায় উদ্ভাবন করিলেই হইবে না, উপায়কে কার্যে পরিণত করিবার উপায়ও সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে হইবে, নতুবা ভারতের শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব বহনের কোনই অর্থ নাই। উপায়কে সর্ব্বতোভাবে কাযে লাগাইতে হইলে দেশের মুসলমান ও তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিকদের আন্তরিক সহযোগীতা প্রয়োজন; সুতরাং প্রকৃত কর্ম্মীকে এই দুই সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগীতা আদায় করিবার তথ্য অর্জ্জন করিতে হইবে। এই সমস্ত সর্ত্ত মিলাইয়া এক কথায় বলা যায় যে, যাঁহারা দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিবিধান করিতে পারিবেন; শুধু পুঁজিদারদের নয়, যাঁহারা মুসলমান এবং তপশীল সম্প্রদায়ের স্বার্থ রাখিয়া এতদুভয়ের

প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন—দেশের রক্ষা, শাসন ও ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের তাঁহারাই হইবেন ন্যায্য অধিকারী।

মোটামুটি আমাদের স্থূল বক্তব্যটা হইল এই :—

(১) যথাশীঘ্র স্বেচ্ছায় ইংল্যাণ্ডকে ভারতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইবে।

(২) ইংল্যাণ্ডকে মুসলমান ও তপশীল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এই নেতৃবৃন্দ ভারতের প্রতি জেলা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করতঃ একটি সাধারণ পরিষদ গঠন করিবেন। কৃষি, শিল্প অথবা বাণিজ্য যাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের অবলম্বন নহে, এবং ইংরাজি ভাষায় যাঁহারা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে না, তাহারা উক্ত সাধারণ-পরিষদে প্রবেশাধিকার পাইবে না। এই পরিষদের সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব থাকিবে, ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশার অনুসন্ধান করা এবং সর্ব্ববিধ দুরবস্থার উন্নতি বিধানের উপায় নির্দ্ধারণ করা। পাঁচজন সভ্য; একজন সভাপতি, একজন সহসভাপতি এবং একজন সম্পাদক নিয়া গঠিত একটি সাধারণ কমিটি এই পরিষদের পরিচালনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

(৩). ইহার পর ব্রিটীশ রাজনীতিকগণ ভারতের সমগ্র নেতৃসম্প্রদায়ের সহায়তায় একটি ব্যবস্থা-পরিষদ গঠন করিবেন। সাধারণ পরিষদের যে সদস্য ভারতের উন্নতি সম্পাদন করিয়া সমগ্র মানবসমাজের দুঃখ মোচন করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন, এবং যিনি এই প্রস্তাব সরল ভাষায় পরিষদে ব্যক্ত করিয়া অবশিষ্ট সদস্যদের সর্ব্বাধিক সমর্থন পাইবেন তিনিই পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন। সাধারণ পরিষদের সদস্য কর্ত্তৃক যাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ, আর্থিক ব্যাপারে অসৎ, দ্বৈতপন্থী এবং ধাপ্পা-বাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহারা ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ লাভের অযোগ্য। ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যসংখ্যা কুড়ি জনের অধিক হইবে না। দেশের প্রচলিত ভ্রান্ত শাসনব্যবস্থার সংশোধনের দায়িত্ব ব্যবস্থা পরিষদই গ্রহণ করিবেন। এই পরিষদ দুইটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে—একটি ব্যবস্থা-কমিটি, অপরটি শিক্ষা কমিটি। ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক মনোনীত পাঁচজন, পাঁচজন সদস্য লইয়া এই দুইটি কমিটি গঠিত হইবে।

শিক্ষার্থীগণ যাহাতে অন্তঃস্থিত আবেগ-উত্তেজনা দমন করিতে পারেন, এবং যাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত শিক্ষার্থীগণকে দাসত্বের শরণ নিতে না হয়—শিক্ষা-কমিটি দেশবাসীকে সেই শিক্ষাই দান করিবেন।

(৪) ইংল্যাণ্ড এই নবগঠিত ব্যবস্থা কমিটীকে পরীক্ষা করিবে। কোন বহির্জ্জাতির সহিত কোনরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার পক্ষে কমিটি নির্ভরযোগ্য কিনা অথবা কমিটি এই সন্ধি রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে কি না, বা কমিটির পক্ষে এই সন্ধিকরা উচিত হইবে কি না—ইংল্যাণ্ড এই সমস্তই বিবেচনা করিবে।

(৫) নবগঠিত ব্যবস্থা-কমিটি চক্রশক্তিকে ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য যুযুধান জাতির সহিত সম্মানজনক উপায়ে যুদ্ধে বিরত হইতে রাজী করাইতে কৃতকার্য্য হইবে কিনা, ইংল্যাণ্ড সে বিষয়েও পরীক্ষা করিবে।

(৬) উক্ত ব্যবস্থা-কমিটি যদি উপরোক্ত উপায়ে বহিঃর্জাতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে এবং চক্রশক্তিকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিতে সফলকাম হয়, তবে ইংল্যাণ্ডকেও ভারতের সহিত এই সর্ত্তানুসারে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে যে, ভারতে চিরকাল ইংরেজের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় থাকিবে—কিন্তু তজ্জন্য ইংল্যাণ্ডকেও সমরায়োজন বন্ধ করিতে হইবে।

আমরা জানি যে, অনেকেই মনে করিবেন, আমাদের এইরূপ কর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব। এই মনে করার উত্তরে এইটুকু আমরা বলিতে পারি যে, আর কেহ না পারিলেও, আমরা এই কর্ম্মপদ্ধতির সন্ধান জানি। আমরা কেবল উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আছি।

গান্ধিজী প্রবর্ত্তিত সরল-সাধারণ অহিংসা নীতি কি ভারতীয় সমস্যাবলীর সমাধান করিতে পারিবে?

কতিপয় ভারতবাসী মনে করেন যে, গান্ধিজী যে সরল-সাধারণ অহিংসা নীতির পরিকল্পনা করিয়াছেন, সেই অহিংসার জোরেই, ভারতের সমুদয় সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

অবশ্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রতিকার্য্যেই যে সর্ব্বথা অহিংস-নীতি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় একথা আমরাও স্বীকার করি;

কিন্তু তাই বলিয়া গান্ধিজীর সরল সাধারণ অহিংসনীতিকে আমরা মোটেই সমর্থন করি না। আমাদের মনে হয় এই নীতি কার্য্যতঃ অ-ক্রিয়ারই (no-action) পরিপোষক। ইহা শরীরধর্ম্মের স্থবিরতা। জগতে চলিতে হইলে বহুপ্রকারে নিজেকে ক্রিয়াশীল রাখিতে হয়। এই ক্রিয়াশীলতা হিংসাত্মকও হইতে পারে, আবার অহিংসও হইতে পারে। হিংসাত্মক ক্রিয়াশীলতা অবিমৃষ্য ও অসংযত, পক্ষান্তরে অহিংস ক্রিয়াশীলতা ধীর ও সুবিবেচিত। ক্রিয়ায় অহিংস হইতে হইলে আবেগ ও প্রবৃত্তিকে দমন করিতে হয়। তাই সকলের পক্ষেই জীবনের সমুদয় ক্রিয়াশীলতাতে অহিংস হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণই জীবনের সমুদয় ক্রিয়াশীলতাকে অহিংস হইবার প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়াছেন। গান্ধিজীর সরল-সাধারণ অহিংসা নীতিটা পরিপূর্ণ মানসিক। এই মানসিকতার সহিত যদি শরীরধর্ম্মের সংযোগ ঘটে তবেই অহিংসা মানবের পক্ষে কল্যাণকর নতুবা ক্রিয়াকে বাদ দিয়া যদি কেবল মনে মনেই অসিংসার অনুশীলন হয়, তবে সেই অনুশীলন স্থবিরতা ও লঘুচিত্ততারই পর্য্যবসিত হইবে।

বস্তুতঃ সরল-সাধারণ অহিংসানীতির যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইলে প্রতিয়মান হইবে যে, এতাদৃশ অহিংসা নীতির বলে বিশ্বজগতের কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না।

মনে করুন, কোন ব্যক্তি বন্তব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কোন কিছু না করিয়া এই ব্যক্তি যদি কেবল অ-ক্রিয়াশীল অহিংসাই প্রয়োগ করে, তবে ফলে কি এই ব্যক্তি নিহত হইবে না? কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সেই ব্যক্তি মানসিক শক্তির বলে যদি ব্যাঘ্রটিকে সম্মোহিত করিয়া ফেলে-তবে তার আত্মরক্ষা হয়। অর্থাৎ ব্যাঘ্রকে হত্যা না করিয়াও আক্রান্ত ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম। কিন্তু এই সম্মোহনের জন্ত শারীরিক, মানসিক—কোন ক্রিয়াশীলতাকেই বাদ দেওয়া চলে না। কাজেই সরল-সাধারণ অ-ক্রিয় অহিংসা নীতি দ্বারা হিংস্র প্রাণীর কবল হইতে আত্মরক্ষা করা গেল না। হিংস্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ চালাইতে হইতেছে এবং এই প্রতি-আক্রমণ হিংসাত্মক ও অহিংসাত্মক দুইপ্রকারেই হইতে পারে। প্রতি-অক্রমণ হিংসাত্মক হইলে আক্রমণকারী প্রাণী নিহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, পক্ষান্তরে প্রতি-আক্রমণ যদি অহিংস হয় তবে আক্রমণকারীকে আঘাত না করিয়াও মানুষ জয়ী হইতে পারিবে। যাহাহউক, আসল কথা হইল, আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে আঘাতকারীর বিরুদ্ধে পাণ্টা আক্রমণ চালাইতে হইবে।

কিন্তু এই অহিংস আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের নিয়ম আয়ত্ত করা অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য। আধুনিক বিজ্ঞান ইহার সন্ধান জানে না। জগতের পুঁথি-জগত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ভারতীয় ঋষিগণ স্বরচিত বহুবিধ তন্ত্রশাস্ত্রে এই অহিংস আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

জানি না গান্ধিজীর মনে কিভাবে অহিংসার উন্মেষ হইয়াছিল, কিন্তু এইটুকু বলিতে পারি, এই নীতির গূঢ়ার্থ তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই।

ভারতীয় সমস্যার-সমাধানকল্পে এই নীতি একমাত্র পথ, এই ভাবেই গান্ধিজী অহিংসার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু যথার্থ কোনরূপ অহিংস কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দেন নাই। জনসাধারণ অনুসৃত অহিংস অসহযোগের কথাও গান্ধিজী বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেন না যে, অসহযোগের মনোবৃত্তিতে হিংসার পুষ্টি হয়। তাছাড়া, জনসাধারণও মনে মনে হিংসাবৃত্তি পোষণ না করিয়া কার্য্যতঃ অসহযোগে লিপ্ত হইতে পারে না।

বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে, গান্ধিজীকে কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করা আমাদের এই আলোচনার লক্ষ্য নয়; গান্ধিজীর অহিংসা কি ভাবে কার্য্যকরী হইবে, এবং কি উপায়ে ইহা কোন সমস্যার মীমাংসা করিবে একথা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়াই আমরা একথার অবতারণা করিয়াছি।

সর্ব্বমানবের কল্যাণে ভারতের তথা সর্ব্ব জগতের সমুদয় সমস্যার সমাধান হইবে কি উপায়ে?

সাধারণতঃ অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, সকলের মন রাখিয়া জগতের সকল সমস্তার মীমাংসা সম্ভবপর নহে। সত্য বটে যে, গোভী ও পাপী স্বভাবের সকল ব্যক্তির সন্তুষ্টি বিনোদন করিতে গেলে সমুদয় সমস্তার সমাধান লাভ হইতে

পারে না, কিন্তু ন্যায়-পরায়ণ পুরুষদের কল্যানে জাগতিক সকল সমস্যার সমাধান করিলে যে চেষ্টার এতটুকুও অপব্যায় হইবে না, একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

ভারতীয় সমস্যার সমাধান প্রয়াসে উদ্যোগী হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেখিতে হইবে, ভারতবাসীর প্রকৃত সমস্যা কী?

সাধারণতঃ সকলেরই ধারণা যে, স্বাধীনতা অর্জ্জনই ভারতের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। স্বাধীনতা অর্জ্জনের সমস্যাকে আমরাও অস্বীকার করি না, তবে আমাদের মনে হয়, একমাত্র ইহাই ভারতের আসল সমস্যা নহে। ভারতের আসল সমস্যাগুলি প্রধানতঃ এইরূপ :—

(১) দারিদ্র্য.
(২) অস্বাস্থ্য
(৩) মানসিক অশান্তি
(৪) অকাল বার্দ্ধক্য
(৫) অকাল মৃত্যু

এই সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে ভারতের পক্ষে স্বাধীনতার মূল্য যে অপরিমেয় একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ভারতীয়কে সন্তুষ্ট করিয়া, ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষ নিজেই যদি উক্ত সমস্যাবলীর সুচারু মীমাংসা করিতে সক্ষম হইতেন, তবে আর বোধ করি 'স্বাধীনতা'র প্রয়োজন ততটা অনুভূত হইত না। বস্তুতঃ আজও যদি ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষ উপরোক্ত পঞ্চবিধ ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা সাধনে সচেষ্ট হন, সাধারণ গণগোষ্ঠির নিকট স্বাধীনতা প্রয়োজনীয়তা তাহাতে বোধ হয় অনেকাংশে প্রশমিত হইয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ঐ কার্য্য ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতার বহির্ভূত; তাই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন এতখানি।

কেবল ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষ কেন এতাবৎ নানাবিধ চেষ্টা করিয়া ভারতের নেতৃগোষ্ঠিও উক্ত সমস্যাবলীর যথোচিত মীমাংসা খুঁজিয়া পান নাই।

অর্থনীতিক, শিল্পজ্ঞ ও ব্যবসায়ী ভারতের দারিদ্র্য মোচনের বহুবিধ পন্থা অনুমোদন করিয়াছেন, চিকিৎসক ও রাসায়নিক অস্বাস্থ্য ও অকাল-বার্দ্ধক্যের মীমাংসার পথ খুঁজিয়াছেন, ধর্ম্মনীতিক মানসিক অশান্তি এবং অকালমৃত্যু বিমোচনে প্রয়াসী হইয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের কাহারও প্রচেষ্টা পরিপূর্ণ ফলবতী হয় নাই। অর্থনীতিক, শিল্পজ্ঞ ও ব্যবসায়ীগণ ভারতের দারিদ্র্য বিমোচনে যে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সে পথে কতিপয়ের দারিদ্র্য দূরীভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতের বৃহত্তর অংশের বিন্দুমাত্র অভাব পূরণ হয় নাই। উপরন্তু অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকাল বার্দ্ধক্য এবং অকাল মৃত্যুর বোঝা অধিকতর দুঃসহ হইয়াছে।

অস্বাস্থ্য ও অকাল মৃত্যু দূরীকরণে চিকিৎসক ও রাসায়নিক যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সে উপায়ে কতিপয় ব্যক্তির কতিপয় রোগের আরোগ্যলাভ হইতে পারে, কিন্তু জনসমাজের বৃহত্তর অংশের তাহাতে কোন লাভ হয় নাই। বরঞ্চ এরূপ আরোগ্য লাভের আশায় ব্যয়বাহুল্য হেতু দারিদ্র্য অধিকতর প্রকট হইয়াছে। মানসিক অশান্তি এবং অকালমৃত্যুর মীমাংসার্থে ধর্ম্মনীতি যে পথের ইঙ্গিত করিয়াছেন, সে পথও ফলপ্রসূ হয় নাই। এই নির্দ্দিষ্ট পথে কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের প্রার্থিত বস্তুর হয়ত সন্ধান পাইয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি এই পথের অনুসরণে আহ্নিক সমস্যাকে অবহেলা করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ফলে দারিদ্র্য-সমস্যা প্রবলতর হইয়াছে।

সুতরাং সমস্যার যথার্থ সমাধান সাধনকল্পে এই সমস্ত ভ্রান্ত পথের আমূল সংস্কার এক্ষনে প্রধানতম প্রয়োজন।

একটি বিষয় বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল ভারতের দারিদ্র্যের মোচন হইলেই চলিবে না, অভাবের অঙ্কুর সমস্ত পৃথিবী হইতে উৎপাটিত করিতে হইবে। কারণ আজ যদি ব্রিটেন, জার্ম্মানী অথবা জাপান অভুক্তই থাকিয়া যায় তাহা হইলে ক্ষুধার তাড়নায় অবশ্যই ইহারা কালক্রমে পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গ করিবে। অতএব, যে দেশের যে সমস্যাই হোক্, উহার মীমাংসা করিতে হইলে সমগ্র মানব সমাজের উক্ত নির্দ্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। নতুবা মানবসমাজের একাংশের এক সমস্যার সমাধান হইলে অন্য বৃহত্তর অংশের বৃহত্তর সমস্যাগুলিরও কোন কিনারা হইবে না। সুতরাং একযোগে ও ব্যাপকভাবে উক্ত পঞ্চবিধ সমস্যারই সমাধানসাধনে সচেষ্ট হইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, গান্ধিজী প্রবর্ত্তিত অহিংসাও এই সমাধান কার্য্যে কার্য্যকরী নহে।

তথাপি যে পথে এই সমস্যাবলীর প্রার্থিত সমাধান মিলিবে সেই পথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। প্রয়োজন হইলে

বারান্তরে আমরা এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনায় অবতীর্ণ হইব।

অর্থনৈতিক সমস্যার মীমাংসা

এই সমস্যার সুচারু মীমাংসা সাধনকল্পে এমন সুপ্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যেন, সমগ্র মানব সমাজের একজনও স্বীয় জীবনধারণের নূনতম প্রয়োজনীয় উপাদান লাভে এতটুকু বঞ্চিত না হয়। এইভাবে প্রত্যেকের অপরিহার্য্য প্রয়োজন পূরণের পর যাহা উদ্বৃত্ত রহিবে, তাহা যেন আবার কর্ম্মের ফলপ্রসূতা এবং কর্ম্মীর গুণানুসারে বণ্টিত হয়। যে-প্রতিষ্ঠান গুণাগুণ নির্ব্বিশেষে সমবণ্টনের নির্দ্দেশ দেন, কার্য্যতঃ সেই প্রতিষ্ঠান কর্ম্মের ফলপ্রসূতা ও কর্ম্মীর গুণের উন্নয়নেই বাধা সৃষ্টি করেন। একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, সম-বণ্টন ন্যায়সঙ্গত নহে। কেননা, সকলের গুণ সমান নহে, একের সামর্থ্যের সহিত অপরের সামর্থ্যের তারতম্য আছে। কাজেই বিভিন্ন পরিমাণ গুণের পারিশ্রমিক বিভিন্ন না হইলে, কর্ম্মীদলের মধ্যে পারস্পারিক অসন্তুষ্টি সঞ্চারিত হইবারই সম্ভাবনা।

সমাধানব্রতীদের দুইদলে বিভক্ত হইতে হইবে—একদল বুদ্ধিজীবি অপরদল শ্রমিক। বুদ্ধিজীবিকে নিঃস্বার্থ হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবে; পারিশ্রমিক লাভের অন্যায় লোভকে সম্বরণ করিবার শিক্ষা বুদ্ধিজীবি অর্জ্জন করিবেন। অতঃপরে লোভকে সম্বরিত করিয়া বুদ্ধিজীবি-কর্ম্মী দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে প্রয়াসী হইবেন। এই প্রয়াসের ফলে কদাপি তাহারা যদি শ্রমিকদের এমন এক পথের সন্ধান দানে কৃতকার্য্য হন, যে পথ অনুসরণ করিয়া শ্রমিককুল অনায়াসেই বিপুল পরিমাণ খাদ্যোৎপাদন লাভে সফলকাম হয়, তাহা হইলে সেদিন কোন সমস্যাই আর সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কৃতজ্ঞ শ্রমিককুল অযাচিত হইয়াই বুদ্ধিজীবিকে আপন পরিশ্রমের ফল প্রদান করিবে।

কিন্তু এই ব্যবস্থা আজই প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না, ইহা উত্তমরূপে অবলম্বিত হইতে বহুদিন অতিবাহিত হইবে। এই ব্যবস্থা সমাজনীতি ও অর্থনীতির সংমিশ্রণে প্রসূত। যেদিন [illegible]সংযত চিত্ত, ইন্দ্রিয়জয়ী এবং সৃষ্টি-রহস্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিমণ্ডলীর হস্তে ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইবে যেদিন সরকারী দপ্তর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, দ্বৈতপন্থা, লোভ, ধাপ্পাবাজী, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা প্রভৃতি ঘৃণ্যবস্তুর প্রবেশ নিষিদ্ধ হইবে,—সেদিন, একমাত্র সেইদিনই দেশে পূর্ব্বোক্ত সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজই এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে না। তবুও এখন হইতে এই ব্যবস্থার শুভাগমনের দিনটিরই প্রতি আমাদের একাগ্র লক্ষ্য ন্যস্ত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, একযোগে দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—অর্থাৎ প্রতি দেশে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের উৎপাদনও বাড়াইতে হইবে, আবার ন্যায়সঙ্গতরূপে বণ্টন ব্যবস্থাও সম্পন্ন করিতে হইবে। কেননা, অচিরে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক গ্রামই যদি স্ব স্ব প্রয়োজন পূরণে কার্য্যক্ষম হয় তবে আন্তর্প্রাদেশিক অথবা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের আর কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কেবল তাই নহে, এইভাবে ক্রমশঃ সমগ্র মানব সমাজেরই অভাবের অবসান ঘটে—মানুষকে বেতনভুক চাকুরীও অবলম্বন করিতে হয় না। আর কালক্রমে যদি আন্তর্প্রাদেশিক এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তাই দূরীভূত হয়, তবে এইসঙ্গে মুদ্রা প্রচলন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও অর্হিত হইবে। কিন্তু যতদিন না গ্রামগুলিতে পর্য্যাপ্ত উপাদান উৎপন্ন হয় ততদিন, বহির্বাণিজ্যও থাকিবে, মুদ্রাপ্রচলনও বন্ধ হইবে না।

কাজেই এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য, কি উপায়ে এই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতেও বণ্টনব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত হয় তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করা। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, বর্ত্তমান মুদ্রাপ্রচলন বিধিতে নিরপেক্ষরূপে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য।

তথাপি বর্ত্তমানের মুদ্রাপ্রচলনানুসারেই ন্যায়সঙ্গত বণ্টনব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে বিভিন্ন শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি-প্রধান, শ্রম-প্রধান ও পুঁজি-প্রধান কার্য্যের পারিশ্রমিককে বিধি-নির্দ্ধারিত (standardise) করিতে হইবে।

সর্ব্বদেশের সমুদয় প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তিদের একটি

সুসম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। নারীগণকে কোনরূপ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য অথবা কোন বেতনভুক কার্য্যে গ্রহণ করা হইবে না। নারীগণ কেবল গৃহকর্ম্মেই নিযুক্তা থাকিবেন। পুরুষ কর্ম্মীবৃন্দকে নিম্নলিখিত চারিভাগে বিভক্ত হইতে হইবে :—

১। প্রথম দল :—

(ক) কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও উন্নয়নের সর্ব্বোত্তম পন্থা নিরূপণের গবেষণা করিবেন।

(খ) মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পরিচয়, এবং মানুষের চিন্তাশক্তি বিশ্লেষণ ক্ষমতা, এবং কর্ম্মের মূলে আঙ্গিক প্রভাব—এই দুই বিষয়ের স্বরূপ সর্ব্বমানবের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিবেন।

(গ) মানুষের চিন্তাশক্তি বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং কর্ম্মশক্তির বৃদ্ধিক্ষয়ের অনুপাতে ভূমির বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের নৈসর্গিক শক্তির ও ক্ষয়বৃদ্ধি নিরূপণের গবেষণা করিবেন।

(ঘ) ব্যষ্টি কি উপায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্লেষক সর্ব্বোত্তম বুদ্ধিশীল ও শ্রমশীল কর্ম্মীতে পরিণত হইতে পারে—তাহা নির্দ্ধারিত করিবেন।

(ঙ) পরস্পরের মধ্যে যাহাতে গভীরতম পারস্পরিক প্রীতি সঞ্জাত হয়, তাহার ব্যবস্থা নির্ণয় করিবেন।

(চ) আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জ্জাতিক উভয় প্রকার শ্রেষ্ঠ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সম্পাদনে গভর্ণমেণ্ট-পরিচালনায় সুচারু ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন।

(ছ) নিম্নোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলভুক্ত কর্ম্মীকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিবেন।

২। দ্বিতীয়দল—এই দল প্রথমোক্ত দলের নির্দ্ধারিত ব্যষ্টি ও সমাজের সমুদয় কর্ম্মপন্থা ও ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলিবেন।

৩। তৃতীয় দল—এই দল সাধারণ শ্রমিককে শিক্ষাদান করিবেন এবং সাধ্যমত শ্রমিককে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যাপারে সহায়তা করিবেন।

৪। চতুর্থ দল—কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়নে সাধারণ শ্রমিকগোষ্ঠি।

কর্ম্মীবৃন্দ এইভাবে চারিভাগে বিভক্ত হইলে তাহাদের বেতনও ক্রমোন্নতি গুণানুসারে স্থিরীকৃত হইবে।

কর্ম্মীদের বেতন ক্রমোন্নতি অনুসারে স্থির হইলে, বাজারের বিভিন্ন পণ্যবস্তুর মূল্যও কর্ম্মীদের শ্রম ও বেতনের হার অনুসারেই নির্দ্ধারিত হইবে। এইভাবে বিভিন্ন পণ্যবস্তুর যথোচিত মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে দেশের বর্ত্তমান বৎসরের সমুদয় প্রাপ্ত পণ্যের এবং আগামী বৎসরের সমুদয় উৎপন্ন পণ্যের মূল্যও যথোপযুক্ত ভাবে নিরূপিত হইবে। বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের পণ্যের মূল্য এই উপায়েই যদি স্থির করা সম্ভব হয় তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বার্থের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না করিয়াও দেশের প্রয়োজনীয় মোট প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ নিরূপণও কঠিন হইবে না।

উপরোক্ত উপায়ে পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ ও প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ নিরূপণ-কার্য্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে ‘অবশ্য-প্রয়োজনীয়’ এবং ‘বিলাস-দ্রব্য’ এই দুইভাগে সমস্ত পণ্যবস্তুকে শ্রেণী-বিভক্ত করিতে হইবে।

মোট প্রচলিত মুদ্রার গতি নির্ণয়ে নিম্নোক্ত প্রতিপাদ্যগুলিই প্রধান :—

(১) বর্ত্তমান বৎসরে প্রাপ্ত সমুদয় অতি-প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য,

(২) বর্ত্তমান বৎসরে প্রাপ্ত সমুদয় বিলাস-পণ্যের মূল্য,

(৩) আগামী বৎসরের সম্ভাব্য অতি প্রয়োজনীয় মূল্য,

(৪) আগামী বৎসরের সম্ভাব্য বিলাস-দ্রব্যের মূল্য,

(৫) আগামী কালে প্রয়োজন হইতে পারে এরূপ পণ্যবস্তুর মূল্য।

এইভাবে বৎসর হইতে বৎসরান্তরে যখন মোট প্রচলিত মুদ্রার পরিমান নিরূপণ সম্ভব হইবে, তখন ন্যায়যুক্ত বণ্টন-ব্যবস্থাও সহজ হইবে, নতুবা নহে। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পণ্যের ন্যায় সঙ্গত বণ্টন না হইলে প্রত্যেক দেশেই গভর্ণমেণ্টের প্রতি জনসাধারণ দিন দিন বিরূপ হইয়া উঠিবে।

পক্ষান্তরে গভর্ণমেণ্ট যদি প্রচলিত মুদ্রার হিসাব রাখিয়া বণ্টন ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ ও ন্যায় সঙ্গত করেন, তবে অচিরে জনসাধারণের স্কন্ধ হইতে করভার নামিয়া যাইবে। পূর্ব্ববর্ণিত প্রথম তিন শ্রেণীর কর্ম্মীদ্বারা প্রতিদেশের গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং গভর্ণমেণ্টের ব্যয় ও উক্ত কর্ম্মীগণের বেতনের

পরিমাণ অনুসারেই পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। ফলে গভর্ণমেন্টের সমুদয় ব্যয়ও মোট মুদ্রাপ্রচলনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কর দানপ্রথা রহিত হইবে।

এই ভাবে গভর্ণমেন্ট সত্যকার জনপ্রিয় গভর্ণমেন্টে পরিণত হইবে। এবং পুঁজিদার ও শ্রমিকের পরস্পর সম্বন্ধও অতি আন্তরিক হইয়া উঠিবে, কেন না কার্য্যতঃ পূর্ব্ববর্ণিত প্রথম তিন শ্রেণীর কর্ম্মী পুঁজিদারদের পর্য্যায়ে পড়েন। ইঁহারা নির্দ্ধারিত বেতনে সরকারের তরফে কার্য্য করিবেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন ভার পুঁজিদারদের পরিচালনায় শ্রমিক কর্ম্মীর হস্তেই সমর্পিত হইবে।

গভর্ণমেন্ট এই কর্ম্মপদ্ধতিতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে জনসাধারণের পরস্পর কলহ-বিবাদেরও কোন কারণ রহিবে না। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, এই কর্ম্মপদ্ধতি দারিদ্র্য-সমস্যার মীমাংসা সাধনে কার্য্যকরী নহে। যতদিন না জমিতে সমগ্র মনুষ্যসমাজের উপযোগী অতি প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়, ততদিন আমাদের অভাবেরও শেষ নাই। প্রচলিত সমাজ-বিধির বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, এতাবৎকাল কোন দেশই সমগ্র জনসংখ্যার অবশ্য প্রয়োজনীয় সমুদয় সামগ্রী উৎপাদনে কৃতকার্য্য হয় নাই। প্রতিদেশেই ধনবাদের বেদীমূলে পুঁজিদারেরা নানাপ্রকার বিলাস-উপাচার অর্ঘ্য দিয়াছে, কিন্তু দরিদ্র শ্রমিকদের প্রয়োজন পূরণে কেহই যথোচিত চেষ্টা করে নাই।

প্রতিদেশেই সাধারণত কাঁচামাল এবং খাদ্যশস্য উৎপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। উৎপাদনের প্রাচুর্য্য বৃদ্ধির জন্য জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির পুনরুদ্ধার একান্ত প্রয়োজন। স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির অর্থ অকৃত্রিম জল ও তাপকে মাটিতে অকৃত্রিম উপায়ে সঞ্চালিত করা। কোনরূপ কৃত্রিম সার, বা সেচকার্য্যে জমির স্বভাবজ শক্তি বিনষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভাল যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় একমাত্র ভারতের মাটিতেই এতশীঘ্র এই স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর। অন্যান্য দেশেও এই স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি পুনর্জীবিত হইবে কিন্তু ভারতের ন্যায় এত শীঘ্র নহে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যতদিন না এই স্বাভাবিকতা একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরে আসিয়া পৌঁছায় ততদিনে উক্ত দেশগুলিতে কিছুকালের জন্য খাদ্যাভাব আরও বর্দ্ধিত হইবে। সেই সময় জগতের এই খাদ্যাভাব দূর করিবে ভারত—অবশ্য ইতিমধ্যে যদি প্রকৃষ্ট উপায়ে ভারতের স্বাভাবিক শক্তির পুনরুদ্ধার হয়,—তবেই।

প্রশ্ন হইতে পারে, জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদিকার পুনরুদ্ধার কি উপায়ে সম্ভব।" বঙ্গশ্রীর নিয়মিত পাঠকবর্গ জানেন, এই প্রশ্নের উত্তর বহুবার আমরা দিয়াছি। বর্ত্তমান নিবন্ধে পুনরায় ইহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে; তথাপি সংক্ষেপেই আমরা এই উত্তর দিতেছি। জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইলেই, প্রথমে জমির প্রাণরূপিনী নৈসর্গিক জলধারাকে অবাধগতির সুবিধা দিতে হইবে। খনিজ সম্পদেও হাত দেওয়া চলিবে না। কেন না অবাধগতি জলধারা খনিজ সম্পদকে বিপুল পরিমাণে পরিপুষ্ট করে।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা যখন উপযুক্ত পরিমাণে উন্নত হইবে, তখন কৃষককুল পাঁচ মাসের পরিশ্রমেই এক বৎসরের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ শস্য উৎপাদনে সক্ষম হইবে। আর এইভাবে পাঁচ মাসে এক বৎসরের শস্য উৎপাদিত হইলে কৃষককুল অবসর প্রাপ্ত বাকী সাতমাসে কুটীর শিল্প উন্নয়নে মনোসন্নিবেশ করিয়া সমাজ সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবে।

এখন এই সকল শিল্পপণ্য অবসর কালে তৈয়ারী বলিয়া ঐ পণ্যাদির উপর নির্ম্মাতার পারিশ্রমিক ধার্য্য না হইলেও কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না—এবং এইভাবে পণ্যের উপর পারিশ্রমিক মূল্য ধার্য্য না করিলে যন্ত্রজাত শিল্প কৃষকদের কুটীর শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবে না। ফলে কালক্রমে মনুষ্যসমাজ সমুদয় অকল্যানকর যন্ত্র-প্রতিষ্ঠান হইতে মুক্ত হইবে।

যন্ত্রের পতন হইলে যন্ত্রপতিগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই, কেননা অনতিকাল মধ্যে উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে সর্ব্বশ্রেণীর যন্ত্র-শ্রমিকগণও নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

সরকারী কর্ম্মনিরত অভিজ্ঞ পুঁজিদারদের পরিচালনায় শ্রমিক কর্ম্মীবৃন্দের হস্তেই বাণিজ্য-চালনা ভার ন্যস্ত হইবে।

ক্ষতিকর পণ্যের শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি আইনের দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

সমুদয় জুয়াখেলাও আইনের দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

যাহা হোক্ আমাদের প্রস্তাব যে কতদূর কার্য্যকরী, তাহা আমরা পাঠকগণকেই বিচার করিতে অনুরোধ করি।

তবে এটুকু বিশ্বাস আমাদের আছে যে; আমাদের প্রস্তাব মত সমুদয় কর্ম্ম-পদ্ধতি যথাযথ অনুসৃত হইলে অচিরেই পৃথিবী হইতে অ-স্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকাল বার্দ্ধক্য, অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি সামাজিক উপসর্গ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে।

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

তের

অত্যাচার ও পীড়নে কংগ্রেস ক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। প্রতি বৎসরই কংগ্রেস সভাপতি যাবতীয় ঘটনাবলীর এক জলন্ত ছবি দিয়া লোকের মনে জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধি করিতেন। বরাবর এরূপ চলিয়াছে কিন্তু ১৯০০ সালে লাহোরে Bradlough Memorial Hall-এ যে ষোড়শ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে স্যার চন্দ্রভারকার একটু নরম সুর ধরিয়াছিলেন। ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন কিন্তু অধিবেশনের পূর্ব্বে হাইকোর্টে জজয়তি করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তাই বোধ হয় দেশবাসীর প্রতি তাঁহার আহ্বান বড় জোড়ালো হয় নাই। কলিকাতায় ফিরোজসা মেট (১৮৯৬), অমরাবতীতে শঙ্কর নায়ার (১৮৯৭) মান্দ্রাজে আনন্দমোহন বসু (১৮৯৮) ও লাক্ষ্ণৌতে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৯৯) মহোদয়গণের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার পরে স্যার চন্দ্রভারকারের অভিভাষণে কেহ বড় সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অভাবপূর্ণ হয় ১৯০১ এর কলিকাতার কংগ্রেসে। কলিকাতায় অধিবেশন বলিয়াই যে উহার সার্থকতা তাহা নয়। নানারূপ ঘটনা বিপর্য্যয়ে বাঙ্গালীর মন তখন বিষাদ ও তিক্ততায় এমনি বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল যে উহা প্রকট হয় কলিকাতা কংগ্রেসে। এই কংগ্রেসের কর্তৃত্বভার ডিনসা ওয়াচার ন্যায় যোগ্যহস্তেই নিয়োজিত হইয়াছিল। এই বৎসরের ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে না বুঝিলে কলিকাতা কংগ্রেসের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে না।

১৯০১ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রাণে গভীর বেদনার উদ্রেক করিয়া ৮৩ বৎসর বয়সে মহাপ্রস্থান করেন। ৬৪ বৎসর ব্যাপী তাঁহার দীর্ঘকাল রাজত্বকালে তিনি প্রাণে প্রাণে প্রজাগণের যে হিতসাধন করিতে চাহিতেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কাহারও কোন কারণই ছিল না। ১৮৫৮ সালে তিনি সমগ্র প্রজাগণের প্রতি জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে সাম্যভাব প্রদর্শন করিয়া যে ঘোষণা প্রকাশিত করেন তাহাতে প্রজাকুল শান্ত হয় ও আশান্বিত হইয়া উঠে। এই ঘোষণাই ভারতের ম্যাগ্নাকার্টা, এবং উহা Queen's Proclamation নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ভারতীয়গণ মহারাণীকে দেবতার ন্যায় মনে করিত, মাতৃবৎ ভক্তি করিত এবং জগন্মাতার প্রতীকস্বরূপ জ্ঞান করিত—

"মহতি দেবতাহোষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"।

তাই ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার মৃত্যুতে বড়ই শোকাকুল হইয়াছিল। ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে সভা, ও শোভাযাত্রা ও বিবিধ অনুষ্ঠানে ভারতীয়গণের রাজভক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়। জাতির এরূপ সুদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধতায় আমলাতন্ত্র চকিত হইল। লর্ড কার্জ্জনও বলিয়া উঠিলেন, সত্যই কি ইহা খাঁটি ? আর এর অর্থ কি ?

স্যার চন্দ্রভারকর

Is this real ! If so, what it means ?

গিরিশচন্দ্র তাঁহার "অশ্রুধারা" নাটিকায় বাঙ্গালীর প্রাণের ব্যথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন "মহারাণী ঈশ্বরের প্রিয় দুহিতা পৃথিবীর মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবৎ প্রেরিতা।" আর সন্তানগণ ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাস করিয়া মনে করিতেন "মহারাণীর মহিমায় ধনী নিঃশঙ্কচিত্তে দস্যু-ভয় উপেক্ষা ক'রে নিদ্রা যেতে সক্ষম ; পথিক পথে দস্যু-ভয় করে না ; বিদ্যার্থীর নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় ; জেলায় জেলায় পল্লীতে পল্লীতে রাজ-সাহায্যকৃত বিদ্যালয়, অনাথ রুগ্নের নিমিত্ত হাঁসপাতাল ; চিকিৎসা শাস্ত্র প্রচারের নিমিত্ত বিদ্যালয় ; ভারতবর্ষের এক অংশ হতে অপর অংশ পর্য্যন্ত এক পয়সার ডাকপত্র বাহক, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি—বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী ও বাঙ্গালার পুস্তক প্রকাশকের•

সম্মান ; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান, যোগ্যব্যক্তির রাজসম্মান, স্বায়ত্তশাসন স্থাপনে রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রদান, দেশীয় শিল্পোন্নতিতে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি মহারাণীর তিরোভাবে কি বিলুপ্ত হবে।"

গিরিশচন্দ্র আরও দেখাইয়াছেন দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও অরাজকতা মহারাণীর মৃত্যুতে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিবে—

সোনার ভারত শ্মশান হবে, কি আমোদের দিন
ভয় কি ভাই ভিক্টোরিয়া নাই
আয় নরক থেকে হেঁকে ডেকে দত্যি দানা জিন
আছিস কে কোথায়—চলে আয়
আদাঁড়ে পাঁদাড়ে চলে আয় আছিস যে যেথায়
হিঃ-হিঃ, হাঃ-হাঃ, হাসির হর্‌-রা তোল
আয় রে গণ্ডগোল, বাজারে ঢোল
হাত তালি দে নাচি সবে ধিনাক্ ধিনাক্ ধিন্।

তবে গিরিশচন্দ্র শেষে আবার সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া গাহিতেছেন—

"জয় রাজ্যেশ্বর করুণা আকর
নরশ্রেষ্ঠ নর নরের সম্মান—"

দ্বিতীয় রোমাঞ্চকর ব্যাপার পেনেল সাহেবের দুইটী রায় উপলক্ষে। এ তাবৎ ১৮৮৬ (দ্বিতীয় অধিবেশন) হইতে প্রতি বৎসরই ম্যাজিষ্ট্রেটদের বিচার ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপার যাহাতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, এই লইয়া কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন শাসনকর্ত্তাই উহা কাণে তুলেন নাই। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণের বৈষম্যমূলক আচরণে সংবাদপত্রে আন্দোলন হইত বটে, কিন্তু গতানুগতিক ধারার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, এই ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গরা কোনরূপ উচ্চবাচ্যও করে নাই। কিন্তু পেনেল সাহেব ভিন্ন উপাদানে গঠিত, তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া শাসকগণের অনাচার, সকলের চক্ষুতে আঙ্গুল দিয়া স্পষ্টতর ভাবে দেখাইয়া দেন।

পেনেল সাহেব (A. P. Pennell) আয়র্ল্যাণ্ডবাসী এবং আই-সি-এস পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া এই দেশে আসিয়া ময়মনসিংহ, বরিশাল, প্রভৃতি অনেক স্থানে জজিয়তি করেন। ১৮৯৯ সালে ইনি যখন ছাপড়ার জজ, টুইডেল সাহেব ছিলেন সেখানে অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট (স্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্ফারসন তখন বিদায় লইয়া অন্তত্র ছিলেন) মিঃ ব্রাড্‌লি (Bradley) পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, Captain Maddox সিভিল সার্জ্জন ও মিঃ সিমকিন্স ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। এত বড় সহরে মুষ্টিমেয় ইংরাজ, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের দিক হইতে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই ছিল। এখানে তাঁহাদের একটি ক্লাবও ছিল।

ঘটনা এইরূপ হয় যে সারণ জিলার একটী বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে ম্যাজিষ্ট্রেট টুইডেল সাহেব জমিদারবর্গকে মাটী ভরাট করিয়া বাঁধটী বাঁধিয়া দিতে বলেন। কিন্তু এরূপ আদেশ আইন সম্মত নয় মনে করিয়া তাঁহারা উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। একদিন (১৯ আগষ্ট ১৮৯৯), করবেট ও সিমসন ফুলওয়ারী গ্রামে গিয়া নরসিং সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে মাটী তুলিতে বলে। নরসিং জাতিতে ছত্রী (রাজপুত), জলপাইগুড়ি পুলিশে সে কাজ করিত এবং অসুস্থতা নিবন্ধন তখন তাহাকে বাড়ীতে বাস করিতে হইতেছিল। নরসিং উচ্চ জাতীয় বলিয়া বাঁধ বাঁধিতে অস্বীকার করে এবং তাহাতে করবেট সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। করবেট সাহেব জিজ্ঞাসা করেন—

ডিনসা ওয়াচা

"তোম ক্যা কাম্ করতা হ্যায়"

নরসিং—হাম্ পুলিস মে নৌকরি করতা

করবেট—তব, তোমকো হুকুম তামিল করনেই হোগা।

নরসিং—হাম ইহাঁকা পুলিশ নেহি, জলপাইগুড়িমে নৌকরি করতা।

করবেট—তোম যাওগে কি নেহি ?

নরসিং—(বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া) তোম্হারা হুকুম হাম নেহি মানেঙ্গে।

ইহাতে মিঃ করবেট তাহাকে লাথি মারে, নরসিংহ একটু পশ্চাতে হটিয়া পুনরায় সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। করবেট তাহাকে আবার লাথি মারে এবং মার খাইয়া সে আবার সম্মুখের দিকে আসিতে চেষ্টা করে। এইরূপ তিনবার হয় এবং অবশেষে সাহেব নরসিংহকে ভূপাতিত

করিয়া ফেলিয়া বুকের উপরে উঠিয়া বসিয়া মারিতে থাকে ও সিমসন সাহেব লাঠি দিয়া (baton) তাহাকে গায়ে মাথায় মারিয়া রক্ত বাহির করে। অদূরে সীতা চামার কাজ করিতেছিল। সে ইহা দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া সাহেবদের উপরে লাঠি উঠাইলে, সিমসন তাহার লাঠি কাড়িয়া নেয় এবং তাহাকেও মারে। ইত্যবসরে নরসিং একটু ছাড়ান পাইলে সে পলাইয়া গ্রামের ভিতরে চলিয়া যায়। ইহার পরে গ্রামবাসীগণ ভয়ে আসিয়া কাজ করিতে থাকে, এমন কি নরসিংও কাজ করিতে বাধ্য হয়। তবে অসুস্থ বলিয়া সে অল্পক্ষণ পরেই চলিয়া যায়।

পরদিন আঘাত একটু গুরুতর রকমের হওয়ায় নরসিংহ সপাতালে আসে। জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে সিভিল সার্জ্জন ম্যাডক্সের সন্দেহ হইল যে অভিযোগ দুইজন শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে উপস্থিত হওয়া সম্ভব। সে তখন ছাপড়া ক্লাবে গিয়া করবেটকে এবং ব্রাডলীর বাড়ীতে গিয়া তাহার কাছে সংবাদ দিল। করবেট হাসপাতালে গিয়া নরসিংকে নিয়া ব্রাডলীর বাড়ী আসে। ব্রাডলী নরসিংকে বলে—

"তুম্ নৌকরি ছোড় দাও, হাম কুছ নেহি করেগা"

সে চাকুরী ছাড়িতে অস্বীকার করিলে, তাহাকে মিঃ টুইডেলের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। তিন জনের কথাবার্ত্তা হইলে করবেট একখানা রিপোর্ট লেখে এবং টুইডেল দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৩, ১৮৬ (সরকারী কর্ম্মচারীর কার্য্যে বাধা প্রদান ও প্রহার) প্রভৃতি ধারায় অভিযুক্ত করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জাকির হোসেনের এজলাসে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কোথায় সাহেবরা মারিল, আর বিচারে শাস্তি পাইল নরসিংহ! তাহাও আবার দুই মাসের কঠোর সাজা—কারাবাস। বেচারা নরসিং জেলে গেল, কিন্তু তাহার উকীল জগন্নাথ সহায় নিজেই সমস্ত ঘটনার অবলম্বনে একখানি আফিডাভিট করিয়া জজ সাহেবের কাছে আপিল করিয়া পাঠাইলেন। জজ সাহেব মেসার্স টুইডেল সিমকিন্স, করবেট, ম্যাডক্স, জাকির হোসেন ও জগন্নাথ সাহার জবানবন্দী লইয়া ঘোর অবিচার হইয়াছে সাব্যস্থ করিয়া নরসিংকে অব্যাহতি দেন।

এই মোকদ্দমায় কেবল ছাপড়ায় নয়, সমগ্র শাসন বিভাগে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ছোট লাট, বড়লাট সকলেই বিচলিত হইয়া উঠেন। পেনেল সাহেব উপরোক্ত সাক্ষীদের ডাকিলেন সুবিচারের জন্য, কারণ তাহার বিশ্বাস হয়, ২৭ বৎসর হাকিমি করিয়াও জকির হোসেন বিচারের প্রহসন করিয়াছেন এবং এরূপ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিচার কার্য্য সম্পাদন কেলেঙ্কারী ভিন্ন আর কিছুই নহে। It will be a grave scandal if he be retained as a magistrate. একথা বলিয়া রাখি যে, আইনের এরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণ লওয়ার বিধি আছে। আর পেনেল সাহেব প্রথমেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন। কমিশনার বোর্ডিলান সাহেব নাকি তাহা দিতে নিষেধ করেন, তাই এরূপ সাক্ষী নেওয়ার দরকার হইয়াছিল। ইহাতে নাকি স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর লিগাল রিমেমব্রেন্সার মিঃ Handley কে consult করেন। হ্যাণ্ডলে বলেন, নিশ্চয়ই সাক্ষী দিতে হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে শাসন বিভাগই মিঃ পেনেলের বিচার-কর্য্যে বাধা প্রদান করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন।

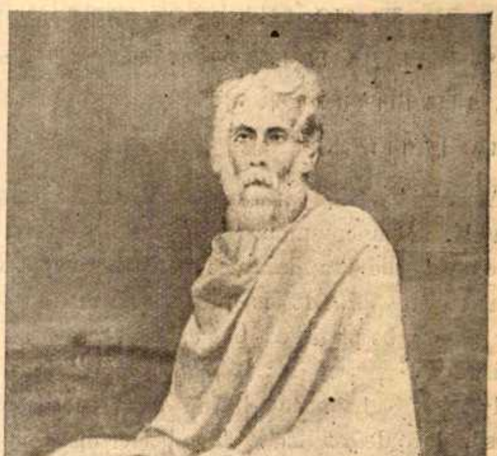

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

পেনেল সাহেবের রায় একটু বড় হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে সমস্ত ঘটনা বিষদ্‌ভাবে বিবৃত আছে। রায়ে একটিও অবান্তর কথার উল্লেখ নাই। কিন্তু এই রায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িলে

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবাসীর প্রতি সুবিচার করিতে এরূপ ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতি ইতিপূর্ব্বে হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ব্রিটিশ জাষ্টিসের সর্ব্বত্র সুযশ, কিন্তু এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতবাসী ও ভারতবাসীর মধ্যে বিচারের সমস্যা উপস্থিত হইলে ইংরাজ বাস্তবিকই সুবিচার করেন, কিন্তু যদি একপক্ষ ইংরাজ হয়, তবে সর্ব্বত্র ন্যায়নিষ্ঠা রক্ষিত হয় না। এ ধারণা প্রায় অধিকাংশ লোকের মনেই বিরাজ করে। তাই যদি এরূপ কোন নিরপেক্ষ ধর্ম্মশীল বিচারক কদাপি দৃষ্ট হয় তবে তিনি যে সকলের হৃদয় জয় করিতেই সমর্থ, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পেনেল সাহেব এরূপ বিচারকই ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

Assaults by Europeans upon natives are unfortunately not uncommon. They are not likely to cease until the disappearance of real or supposed racial superiority. It is proper, no doubt, that they should be punished but excessive severity in punishing them, so far from improving is more likely to exacerbate the relations between the two races, and to defeat itself. The better men among the native community are themselves disposed to make allowances for the irritability which this climate has a tendency to produce in the European character and the occasional acts of violence in which that irritability vents itself.

পেনেল সাহেব ঠিক বলিয়াছেন যে পর্য্যন্ত "ইংরাজ বড় (রাজার জাতি), দেশবাসী (দাস জাতি) ছোট" ভাব না বিদূরীত হইবে, সে পর্য্যন্ত ভারতীয়গণের প্রতি ইংরাজের এরূপ প্রহারাদির ব্যাপার লোপ পাইবে না। আজ যে কারণেই হউক ভারতবাসী আপনাকে দাসজাতি বলিয়া ভাবে না; বোধ হয় সেই কারণেই এইরূপ মারধর অনেকটা কমিয়াছে।

যাহাইউক এইবার এই রায়ের ফলাফলের কথা বলিব। ১৮৯৯ সালের ৭ই অক্টোবর রায় বাহির হইবার পরেই শাসক-মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। স্যার জন উডবার্ণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লর্ড কার্জ্জনও নাকি বলেন, "এইরূপ কার্য এনকোয়ারী করিবার স্বাধীনতার অপব্যবহার—"abuse of the liberty of enquiry." অবশ্য পেনেল সাহেবের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কোন আপিল হয় নাই, এবং হাইকোর্ট কোন মন্তব্যও প্রকাশ করে নাই।

কেবল তাহাই নয়। ইহার সপ্তাহের পরেই পেনেল সাহেবকে ১৬ই তারিখে তারযোগে নোয়াখালীর মত একটী অস্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

পেনেল সাহেব পরে বলিয়াছিলেন, "আমি ৯ই অক্টোবর তারিখে চীফ সেক্রেটারীর কাছে রায়ের নকল পাঠাইয়া দিই,

লর্ড কার্জ্জন

তথাপি মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ এই রায়ের সঙ্গে নোয়াখালী বদলী হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, ছোটলাট যে উত্তর করেন,

"Mr. Pennell was transferred in the course of the official changes and the order appointing him to Noakhaly was passed before Government saw his judgment."—

তাহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

নোয়াখালী যাইবার পেনেলের খুবই অনিচ্ছা ছিল কিন্তু গত্যন্তর নাই। অতঃপরে ১০ই ডিসেম্বর (১৮৯৯) ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ বাহাদুর চীফ সেক্রেটারী বোল্টন সহ নোয়াখালী যান। সেখানে নাকি জেলের অবস্থার উন্নতি করার দরকার হইয়াছিল। পেনেল সাহেব বলেন,

নোয়াখালীতে হঠাৎ জেলের অবস্থার উন্নতির কোন কারণ হইয়া উঠে নাই।

সেখানে তিনি নিজের Private room-এ পেনেল সাহেবকে বলেন, "তোমার রায় পড়িয়া মনে হয় ইহাতে নিরপেক্ষতার অভাব আছে। মনে হয় যেন পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে জিলার অন্য অফিসারদের সঙ্গে বিবাদ ছিল"

Seeing your judgment I have grave doubts whether you are fit for judicial employment. The judicial officers are my officers just as much as the executive and I want them to do well. Mind, I am speaking for your benifit and guidance. Reading your judgment leads me to doubt whether you were really so impartial as you should have been. The vindictive rancour with which you pursued the policemen and the District officer makes me think you must had some quarrel with them.

পেনেল—"আপনি তা মনে করতে পারেন কিন্তু অনেকে বলেন আমার রায়ে জাতীয় মহাসমিতির অপেক্ষাও বেশী কাজ হ'য়েছে।

"A judgment like that was worth two National Congresses.:'

ছোটলাট—As impartial man I pass my opinion.

পেনেল—I know your Government had done all they could to prevent truth coming out.

ছোটলাট একটু উত্তেজিত হইলেন, বলিলেন—

"My Government ! Be careful Pennell, you had better be careful what you are saying .

Pennel—You Consulted L. R. whether witnesses need appear before me and it was when Handley told you "of course they must" you gave way.

স্যারজন (আরও রাগিয়া)—

Yes, I had every right to consult L. R. It was a trumpery case.

"তুচ্ছ মামলা—"

Pennel—Should I have any reference about this matter to the High-Court ?

W.—No. Penell I am not going to enter into any discussion with High-Court. The judical officers are my officers and not those of the High-Court. I am speaking to you privately.

তারপর রায় সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। ছোটলাট বাহাদুর বলিলেন "তোমার রায় খুব বড় হইয়াছে—"

Any other judge could have disposed of it in two pages.

Pennell—My judgment was full of facts and there was very little comment on it.

এই সমস্ত কথোপকথন হইতে প্রকৃতই ধারণা হইবে যে, শ্বেতাঙ্গই হউন, কৃষ্ণকায়ই হউন, যদি কোন বিচারক শ্বেতাঙ্গসংক্রান্ত মোকদ্দমায় সদ্‌বিচার করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তবে তাহার লাঞ্ছনা বড় সামান্য হয় না। নতুবা স্যার জন উডবার্ণ স্বয়ং আসিয়া পেনেল জজকে এইরূপ তীব্র তিরস্কার করিতেন না।

বিপিনচন্দ্র পাল

শ্বেতাঙ্গ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় 'নেটিভের' সাক্ষ্য দেওয়াও যে কম বিপদজনক নয়, এ সম্বন্ধেও পেনেল সাহেব অন্য একটী মোকদ্দমার রায়ে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন—

"In this country the only people who will come forward to give evidence against officers in the case of this kind are those who do not mind their houses being burnt, their shops looted, their relations turned out of Government employ and themselves and members of their families dragged up on false charges and sent to jail."

এমতাবস্থায় সব সত্য কথা বাহির করিবার জন্য (to elicit truth) পেনেল সাহেব সাক্ষীদের ডাকিয়া যে ন্যায়-নিষ্ঠতা দেখাইয়াছেন, লর্ড কার্জ্জন এবং স্যার জন উডবার্ণ তাহাতে আপত্তি করিলেও পেনেল সাহেবের নিরপেক্ষতায় প্রকৃত British Justice এর উপরে শ্রদ্ধায় ভারতীয় মন যে চিরকাল মুগ্ধ হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু বাস্তবিকই কি ঐ মোকদ্দমাটীর রায় দুই কথায় হইতে পারিত? নিশ্চয়ই নয়। কি ভাবে বাদী নরসিংহ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া দুইমাস কারাবাসের দণ্ডলাভ করিল, কি ভাবে তাহার দরখাস্ত না মঞ্জুর হয়, কি ভাবে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং পুলিশ সাহেব বিচারককে, নরসিংহের প্রতি শাস্তি দিতে প্ররোচিত করিয়াছেন, তাহা দুই এক কথায় কিছুতেই সম্ভব নয়।

২০শে আগষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক নরসিংহকে বিচারাধীন করিবার আদেশ হয়।

২১শে—বিচার আরম্ভ হয়—

২রা সেপ্টেম্বর সাক্ষ্য শেষ হয়। কোন ছাপাই সাক্ষী (defence witnesses) না দেওয়া হইলেও, defence উকীলকেই পূর্ব্বে সওয়াল জবাব করিতে বলা হয়। ইহা আইনতঃ অবৈধ।

৪ঠা সেপ্টেম্বর পুলিস সুপারেন্টেণ্ডেণ্ট আদালতে হাজির হন, ম্যাজিষ্ট্রেটের পার্শ্বে চেয়ারে বসেন ও ঘটনা ও আইন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তারপর পুলিস সাহেব ও বিচারক জাকির হোসেন উভয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব টুইডেলের বাড়ী যান। সেথানে কোর্ট দারোগাবাবুও উপস্থিত ছিলেন।

বিচারক জাকির হোসেন অবশ্য মোকদ্দমার নথিটী সঙ্গে করিয়া নিয়াছিলেন।

এবার ব্যতীত অন্য একবারও ট্রেণে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে জাকির হোসেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে করবেটকে মারিবার উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই ছিল (Previous intention). তিনি আরও বলেন "আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি ভবিষ্যতের গোলমাল বন্ধ করিবার জন্য (to avoid troubles). What I mean is that sometimes when cases are disposed of and magistrates do not like it that they find fault and so I settled it before hand.

উব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট টুইডেল নিজেও এ বিষয়ে স্বীকার করেন। তিনি বলেন—

"It is difficult for me to say that I did not give Moulavi Zakir any advice."

এই সমস্ত দেখিয়া পেনেল কি মিথ্যা বলিয়াছেন যে

"Mr. Twidell has prostituted his high office of District Magestrate to screen his friend from justice.—"

"তাহার বিবেক elastic দোদুল্যমাণগুণসম্পন্ন" আর—

"Zakir Hossen a man without conscience with no fear of God before his eyes."

এখন পাঠক দেখুন কৃষ্ণকায় ভারতীয়গণের প্রতি সুবিচারে ছোটলাট বাহাদুর motive attribute করিতেও (উদ্দেশ্যমূলক মনে করিতে) দ্বিধা করেন নাই। এইরূপ কার্য্য যাহাদিগের বিরুদ্ধে গিয়াছে তাহারা পেনেল সাহেবকে যাহা ইচ্ছা মনে করিতে পারে কিন্তু ভগবানের বিচারে যাহারা শ্রদ্ধাবান তাহারা তাঁহাকে প্রকৃত 'ধর্ম্মাবতার' আখ্যা না দিয়া কিছুতেই পারে না।

যাহাহউক নোয়াখালী গিয়াও পেনেল সাহেবকে এরূপ বিচার বিভ্রাটই দেখিতে হইল। সেখানে কার্গিল সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ রেলি পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ওসমান আলি সাহেব দারোগা এবং পুলিশের হেড-ক্লার্ক কৈলাশ দে। এক নোট চুরির মোকদ্দমায়

পেনেল সাহেব Executive অফিসারদিগের দলবদ্ধতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান।

এই কারগিল সাহেব যে কিরূপ বিচারপরায়ণ ছিলেন, তৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (পরবর্ত্তী ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট,) যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমি নোয়াখালীতে থাকিবার সময় Seperation of Judicial and Executive functions, সম্বন্ধে একটী কৌতুক-রচনা লিখিয়াছিলাম। প্রসিদ্ধ সমালোচক ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে তাহা দেখিবার জন্য পাঠাইলে তিনি পড়িয়া লিখিয়াছিলেন, "খবরদার, উহা ছাপিও না, তুমি বেনামিতে ছাপিলেও গভর্ণমেণ্ট অনায়াসেই তোমার নাম জানিতে পারিবেন এবং লাভের মধ্যে তোমার ভবিষ্যৎ পদোন্নতি বোধ হয় বন্ধ হইবে।...

"নোয়াখালীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ (C. Cargill) প্রতিমাসের শেষে ডেপুটীদের ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের ফল অর্থাৎ সাজা এবং খালাসের সংখ্যা দেখিয়া বিচারকের সম্বন্ধে good, better, best, bad, worse, worst ইত্যাদি মন্তব্য করিতেন। যাঁহার সাজা দেওয়ার পরিমাণ (percentage) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইত, তিনিই best হইতেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের এই অদ্ভুত বিচার প্রণালী আমার নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় গায়ের ঝাল মিটাইবার জন্য আমি সেই রচনাটী লিখিয়াছিলাম।"*

এই মোকদ্দমা পেনেল সাহেবের কাছে আপিলে আসে এবং তিনি আপিলে আসামীদের ছাড়িয়া দিয়া পুনর্ব্বিচারের হুকুম দেন ও রেলি ও কার্গিল সাহেব যে ওসমান আলি, দারোগার উপর পক্ষপাত করিয়াছেন, সেই অভিমত প্রকাশ করেন।

ইহারই পরে নোয়াখালীতে একটী অদ্ভুত মোকদ্দমা হয়। ইসমাইল জায়গীরদার নামে এক ব্যক্তির সহিত সাদেক আলি প্রভৃতির খুব শত্রুতা চলিতেছিল। ১৯০০ সালের এক বর্ষার রাত্রিতে ইস্মাইল একটী মোকদ্দমা জিতিয়া বাড়ী যাইতেছিল ইতিমধ্যে কে তাহাকে হত্যা করে। পরদিন প্রাতে তাহার পুত্র ইদ্রিস্ পিতার মৃতদেহ এক পুষ্করিণীতে ভাসিতে দেখিয়া থানায় সাদেক প্রভৃতি আসামীদের বিরুদ্ধে নালিস করে। ওসমান আলী তদন্ত করে কিন্তু প্রমাণাভাবে আসামীদের ছাড়িয়া দেয়। অতঃপরে বাদী ইদ্রিস্ নোয়াখালীর তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ইজিকেল সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত দেয় যে, দারোগা ওসমান আলী আসামীদের আত্মীয়, বিধায় সাক্ষীগণের জবানবন্দী না লইয়া ও তদন্ত না করিয়া আসামীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেলির উপর তদন্তের ভার দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওসমান আলি রেলির বিশেষ অনুগত লোক, তিনি ওসমান আলির মতই সমর্থন করেন। ইজিকাল সাহেব পুনরায় ইন্‌স্পেক্টর মথুরানাথ বাবুর উপর ভার দেন। মথুরবাবু সাদেক আলি প্রভৃতি তিনজনকে খুনী মোকদ্দমায় চালান দেন।

যথাসময়ে দায়রায় যখন মোকদ্দমার বিচার হয় পেনেল সাহেব সাদেক আলিকে ফাঁসির এবং অন্য দুইজনকে দ্বীপান্তরের আদেশ প্রদান করেন। রেলি সাহেব, ওসমান আলি প্রভৃতি আসামীর দিকে সাক্ষ্য দিয়াছিল।

এই মোকদ্দমায় নোয়াখালীর জনসাধারণের মধ্যে এমনই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে প্রায় ছয় হাজার লোক রায় দেওয়ার পরে পেনেল সাহেবের অনুবর্ত্তী হইয়া 'ধর্ম্মাবতার' বলিতে বলিতে তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করে। মোকদ্দমার রায় বাহির হইয়া গেলে পেনেল সাহেব রেলি সাহেবকে ১৯৩,৩৬৭ দঃ বিঃ ধারার অপরাধে বিনা জামিনের আদেশে মুন্সেফ নবীন বাবুকে দিয়া গ্রেপ্তার করান। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯০১) মোকদ্দমার রায় হয়।

এই মোকদ্দমার বিচার প্রসঙ্গে ছোটলাট বাহাদুর, বোল্টন সাহেব (চীফ সেক্রেটারী) বোডিলন (পাটনার কমিশনার) প্রভৃতির সঙ্গে ছাপড়া মোকদ্দমার পরে আনুসঙ্গিক যেরূপ চিঠিপত্র চলে ও কথাবার্ত্তা হয় তাঁহাও উল্লেখ করিয়া শাসন বিভাগের দোষ-ত্রুটী সব দেখাইয়া রায় লেখেন। রায়সহ ইনি নিজেই কলিকাতা চলিয়া গিয়া চীফ জাষ্টিস ষ্টার চার্লস ম্যাক্‌লিনের কুঠীতে যান। কিন্তু চীফ জষ্টিস দেখা না করিয়া লিখিয়া দেন "অসমর্থ"।

অতঃপর আমিরালি ও প্রেট জাষ্টিসদ্বয়ের নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে রেজিষ্ট্রার Chapman সাহেবের কাছে নথী না দেওয়ায় হাইকোর্টের সুপারিশে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পেনেল সাহেব সসপেণ্ড হন। মোকদ্দমার রেজি

---

*মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩৩২, ভাদ্র পৃঃ ৩।

সাহেবকে টেলিগ্রামে জামিন দেওয়া হয় এবং পরে তাহার বিরুদ্ধে চার্জ্জ ও উক্ত জষ্টিস্ নাকচ্ করেন।

সাদেকআলি প্রভৃতির আপালের শুনানীর সময় উক্ত জষ্টিস্-দ্বয় অপর দুইজন আসামীকে অব্যাহতি দিয়া সাদেকআলির পুনর্ব্বিচারের আদেশ দেন। এবার বিচার হয় জজ গিড্‌ট্ (Geidt) সাহেবের আদালতে। তিনি এবারও সাদেকআলিকে ৩০২ ধারা (খুনের) চার্জ্জে দোষী সাব্যস্থ করিয়া দ্বীপান্তর দেন। তাঁহার রায়ে বলেন আসামীরা কয়জনই লিপ্ত ছিল তবে কাহার আঘাতে জীবনান্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হওয়ায় তাহাকে দ্বীপান্তর দিয়াছেন। খুনের চার্জ্জে ফাঁসি অথবা দ্বীপান্তর দুই শাস্তিরই বিধান আছে, তবে দ্বীপান্তর দেওয়াও অন্যায় হয় নাই। গিডট সাহেবের সুবিচারেও সকলেই আনন্দিত হয় এবং তাঁহারও নির্ভীকতা কম উল্লেখনীয় নয়।

মোকদ্দমার এই অবস্থা। আর আনুসঙ্গিক অন্যান্য অনেক রোমাঞ্চকর ব্যাপারও ঘটে, কিন্তু সেগুলি উল্লেখ করিব না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি অল্পদিন মধ্যেই মেদিনীপুর যে প্রাদেশিক সম্মিলনী হয় তাহাতে সভাপতি বিখ্যাত ইংরাজী সাহিত্য বিশারদ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বার-এট্-ল মহোদয় পেনেল সাহেবের খুব প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করেন—

The suspension was not only wrong on merits but illegal and that Pannell has a very good cause of action against local Government.

সেই প্রাদেশিক সম্মিলনীতে শাসন ও বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বার-এট-ল স্পষ্ট বলেন যে, যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও বিচারবুদ্ধি দেখাইয়া পেনেল সাহেব আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—

J. Chowdhury—The Noakhaly case was more than scandalous. The people could not forget the act that it was for the sake of justice that Pennell sacrified his own prospects and it was the cause of justice which had alone actuated him to act up to the dictates of his own conscience.

মিঃ চৌধুরী একথাও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই যে চীফ জাষ্টিস পেনেল সাহেবকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন acted indiscreetly. আর ইহাতে পুলিসের বেআইনী কার্য্য ও শাসন সম্প্রদায়ের (executive-এর) উহা সমর্থন করার জিদই বরং সমর্থন লাভ করিতেছে।

সে সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী পেনেল সাহেবকে দেবতার ন্যায় দেখিতনে—Mr. Penell was the Idol of the educated classes. কেবল কি শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটই পেনেল সাহেব পূজা পাইয়াছেন? সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয় তিনি তখন জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একটী ঘটনার কথা বলিতেছি।

মোকদ্দমার প্রায় দুইমাস পরে পেনেল সাহেব কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন করিবার জন্য সমস্ত বাঙ্গালী যেন ঝুঁকিয়া পড়িল। ষ্টেসনে ষ্টেসনে এত হর্ষধ্বনি, এত জয়োল্লাস, এত কাতর আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বে আর কখনও কাহারও জন্য হইয়াছে কি না সন্দেহ। রাজপ্রতিনিধি লর্ড রীপনের বিদায়কালে সহরে সহরে অপরিমিত লোক সমাগম হইয়াছিল। এবার সাড়া দিয়া উঠিল গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়, দোকানদার, মজুর, শিক্ষক, উকীল, ছাত্র, কেরাণী, তালুকদার, জমিদার দেশের যাবতীয় লোক। এইরূপ জনজাগরণ (mass awakening) পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সকলের একধ্বনি—সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার পেনেল! পেনেল সাহেব নিজে ভুগিলেন বটে কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয় তিনি জয় করিয়া ফেলিলেন।

এই যে হিন্দু-মুসলমান জন-জাগরণ, এত যে উদ্দীপনা, এত যে কাতর প্রার্থনা কখনও নিস্ফল হয় নাই। অতঃপরে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের ইহাই পূর্ব্ব সূচনা। কার্জ্জন সাহেব শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্যের যৌক্তিকতা বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই ব্যাপারে তিনিও স্থির থাকিতে পারিলেন না। নোয়াখালীতে সমগ্র জিলা হইতে লোক যেন আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সহরস্থ সকলে অভ্যর্থনা করিবার জন্য টাউন হল ঠিক করিলেন। কিন্তু সাধারণের অর্থে নির্ম্মিত হইলেও কারগিল সাহেব উহা দিলেন না। অতঃপরে বড় দিঘীর পশ্চিম পারে বিরাট সভা হইল, আনন্দোৎসব হইল, অভিনয় হইল। অভিনয়ের বিষয়—"জ্ঞান ও বিবেক পেনেলের পক্ষে বৃটোনিয়াকে বন্দনা করিতেছে।"

স্বর্গ হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া আবির্ভূতা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ঐ আমার পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড পেনেলকে সেই অভয় দিবে।" ৩।৪ দিন থাকিয়া পেনেল নোয়াখালী সহর পরিত্যাগ করিয়া যান। সেই বিরাট শোভাযাত্রা নির্ব্বাকভাবে চলিয়াছিল। দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ জনসঙ্ঘ, মধ্যে পেনেলের গাড়ী। তাহারা মাঝে মাঝে গাহিতেছে আর অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। পেনেল বিদায় হইলেন। সকলে নির্ব্বাকভাবে তাহা দেখিল। আর সেই বিরাট জনসঙ্ঘ বিরস বদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

বড়লাট বাহাদুর তখন লেডী কার্জ্জনের মৃত্যুতে, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ছুটী লইয়া ভারত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু খবরের কাগজে এই 'জন-জাগরণের সংবাদ পাইলেন। সংবাদ পড়িয়া তাঁহারও বিস্ময় জন্মিল। ভাবিলেন বটে, "এও সম্ভব ?"

'If this is real, then what does it mean ?'

নোয়াখালী হইতে পেনেল সাহেব যখন বরিশাল যান সেখানেও তাহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। ছাত্র ও উকীল হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলেই সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করেন। ছাত্ররা নিশান লইয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান এবং স্বর্গত জননায়ক অশ্বিনী দত্ত মহাশয় পেনেল সাহেবের নির্ভীকতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৯০১ সালের এই দুইটী ঘটনায় ভাবী জন-জাগরণের সূচনা আনয়ন করিয়া দেয় বলিয়া এস্থানে বিস্তৃতালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

এবার কলিকাতায় কংগ্রেস হয় এবং সুপ্তোত্থিত বাঙ্গালা সম্পূর্ণভাবে মনে প্রাণে উহার সাফল্য আনিতে ত্রুটী করে নাই। বোম্বাই প্রদেশের মাননীয় ডিনসা ওয়াচা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নাটোরের মহারাজা স্যার জগদীন্দ্র নাথ রায় অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হন। কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বে ডাক্তার শরৎ কুমার মল্লিক বিলাত হইতে আসিয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন।

অধিবেশনের ৩।৪ মাস পূর্ব্ব হইতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঁকীপুর, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া লোকদিগের শিক্ষার পথ প্রসার করেন। যে-দিন তিনি বাঁকীপুরে এ্যাংলো সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ওজস্বিনী ভাষায় কংগ্রেসের কয়েকটী প্রধান প্রধান বিষয় (boon) বুঝাইয়া দেন (Seperation of Judical and Executive, Simultaneous Civil service Examinations প্রভৃতি) তখন এই প্রবন্ধলেখক সেই সভায় উপস্থিত ছিল। মাননীয় খোঁদাবকস খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ব্যারিষ্টার আলিম ইমাম সাহেব সভার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি বলেন মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগদান করিলে তাহাদের সম্প্রদায়ের ক্ষতি হইবে।

ইহার সাতাইশ বৎসর পরে স্যার আলিম ইমামকে দেখিয়াছি আবার অন্যভাবে—হিন্দু-মুসলমানের তুল্য স্বার্থ সংরক্ষণকারী হিসাবে। সেই বিষয়ে পরে বলিব। সুরেন্দ্রনাথ ও মিঃ যোগেশ চৌধুরী পাটনায় যান ১৯০২ এর নভেম্বর মাসে। পাটনা কলেজেও বক্তৃতা হয়। কমিশনার হ্যারিস সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ সেখানে শিক্ষা সম্বন্ধে খুব ওজস্বিনীভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লেখকের শিক্ষাগুরু প্রিন্সিপাল সি, আর উইল্সন সাহেবও বক্তৃতা দেন।

এবার কংগ্রেসে খুব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়—বিশেষতঃ প্রারম্ভিক সঙ্গীতটীতে। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত পঞ্চাশ জন গায়ক লইয়া স্বরচিত গানটী ধরেন—

"গাহ হিন্দুস্থান"
অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী
গাহ আজি হিন্দুস্থান
মহাসভা উন্মাদিনী মম বাণী
গাহ, আজি গাহ, আজি হিন্দুস্থান।
কর বিক্রম বিভব যশঃ সৌরভ পূরিত
সেই নাম গান।
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ
গুর্জ্জর, নেপাল, পাঞ্জাব, রাজপুতান
হিন্দু, পার্শী, জৈন, ইসাহী, শিখ, মুসলমান
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান।
হর হর হর জয় হিন্দুস্থান
দাদার হরমজদ হিন্দুস্থান

ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান
নমো হিন্দুস্থান
সকল জন উৎসাহিনী মমবাণী
গাহ আজি নূতন তান।
মহাজাতি সংগঠনি মম বাণী
গাহ, আজি গাহ, আজি নূতন তান।
উড়াও কর্ম্ম নিশাণ ধর্ম্ম বিষাণ
জাগাও চেতায়ে প্রাণ
বঙ্গ বিহার·········
·········
·········
হয়ে মুরারে হিন্দুস্থান
জয় জয় ব্রহ্ম, হিন্দুস্থান
অলখ্ নিরঞ্জন হিন্দুস্থান
নমো হিন্দুস্থান।

সভায় বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়।

সমগ্র গানটী এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

সভাপতি ওয়াচা সাহেবও বেশ তেজস্বিতার সহিত সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে বলেন—

Insane imperialism, to use Mr. Morley's phrase, with its mischievous policy of retrogression and repression is in it's ascendant for the moment. No doubt we have good government, but it is not unmixed with many an evil".

দ্বিতীয় দিনেও আর একটি সুন্দর ভারত সঙ্গীতের 'কোরাসে' গান হয়। এই গানটীতে তুল্যরূপ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। গানটী স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর মহাশয় রচিত—

চল্‌রে চল সবে ভারত সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান
বীরদর্পে পৌরুষ গর্ব্বে
সাধ্‌রে সাধ সবে দেশের কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন
উঠো জাগো সবে বল—"মাগো
তব পদে সঁপিনু পরাণ"
একতন্ত্রে কর তপ এক মন্ত্রে জপ
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক
এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাও রে আনতে
নব নব জ্ঞান।
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো
উঠাওরে নবতর গান।
লোক রঞ্জন লোক গঞ্জন
না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়,
তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান।
এক পথে এক সাথে চল
উড়াইয়া একতা নিশান।

মহামতি তিলক প্রথম দিন কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই; দ্বিতীয় দিন হইতে তিনি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকল লোকের হর্ষধ্বনিতে সভা পূর্ণ হইয়া গেল।

মিঃ গান্ধি লক্ষাধিক দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় ব্যক্তির স্বপক্ষে কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিঃ Smedley নামক একজন সাহেব বলেন, "আপনারা অন্য সব প্রস্তাব রাখিয়া কেবল হোমরুলের জন্যই উঠিয়া পড়িয়া লাগুন—My last word is,—Go in for Home Rule for India and the blessings of God rest on your efforts.

শাসন ও বিচার বিভাগ সম্বন্ধে প্রস্তাব হয় এবং এখানেও পেনেল সাহেবের সৎসাহস, তেজস্বিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা উঠে। অম্বিকা মজুমদার মহাশয় পেনেল সাহেবের বিচারের ফল ও তাহার সস্‌পেন্‌সন উল্লেখ করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রতিবাদ করেন তখন শ্রোতৃবর্গ চতুর্দ্দিক হইতে Shame, Shame করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, কিন্তু তখন মজুমদার মহাশয় উৎসাহিত হইয়া বলেন—

"Gentlemen, you cry shame, but shame is ashamed to sit on such a case."

সুরেন্দ্রবাবু স্বাভাবিক জলদগম্ভীর স্বরে বলেন—

"We are veterans of Waterloo, we never confess to a defeat.

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক, বিপিন পাল, ফেরজশা মেটা প্রভৃতিও বক্তৃতা দেন এবং সেই সব বক্তৃতা প্রাণস্পর্শী হয়।

কলিকাতার এই সপ্তদশ অধিবেশনের আর একটী প্রয়োজনীয় অঙ্গ নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনী (All-India Industrial Exhibition). বাঙ্গালা হইতেই প্রথম এই কথা উঠে এবং প্রথম প্রদর্শনীও বাঙ্গালায়ই অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপরে বাঙ্গালার প্রতি অধিবেশনে ১৯০৬, ১৯১৭, ১৯২৮শে প্রদর্শনী খুব জমকালো রকম হয়। ১৯০১-এর পর অন্যান্য অধিবেশনের সঙ্গেও শিল্প প্রদর্শনী হয়। আমাদের দেশের শিল্প আমাদের আদরের হইবে, এইজন্যই শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন। স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত স্পষ্টই বুঝাইতে লাগিলেন—দেশের দুর্ভিক্ষ কেবল শাসননীতির শোষণেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—

"আমাদের সমগ্র রাজস্বের অর্দ্ধেকই অর্থাৎ প্রায় দুই তিন কোটি টাকা বিদেশী শিল্পে বাহিরে যায়—ইহাতে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার আর কোনই উপায় নাই—

"Something like 20 to 30 millions—half the entire revenue went out of India every year. Was it possible for India or any other country to allow a drain like this to go on without poverty, starvation and frequent famins ?" *

লোকে তখন শোষণের কথা মনে ভাবিল এবং এই শোষণের নিবারণ কল্পে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইল। স্বর্গীয় ময়মনসিংহ মুক্তাগাছির মহারাজা স্যার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের উহা উদ্বোধন করিবার কথা ছিল কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে বদান্যপ্রবর কাশিমবাজারের মহারাজা স্বর্গীয় মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের যোগ্য হাতে আসিয়া উহা পড়ে। স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় রচিত নিম্নলিখিত গানটীও সরলাদেবী পরিচালিত সঙ্গীত-সঙ্ঘই গান করিয়াছিল—

"উঠগো ভারতলক্ষ্মী উঠ আদি জগৎজন পূজ্যা
দুঃখ দৈন্য সব নাশি কর দূরীত ভারত লজ্জা
ছাড়গো ছাড় শোক শয্যা কর সজ্জা
পুন কমল কনক-ধন-ধান্যে
জননি গো লহ তুমি বক্ষে
অন্নদানে কর সবে রক্ষে
কাঁদিছে তব চরণ তলে
বিংশতি কোটী নরনারী গো
কাণ্ডারী নাহিক কমলা, দুঃখ লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল-সাগর-কম্পনদর্শে
তোমার অভয় পদ স্পর্শে
নব হর্ষে
পুন চলিবে তরণী সুখ-লক্ষ্যে
(জননী গো লহ তুমি বক্ষে—ইত্যাদি)
ভারতবাসীদের কর আবার সদা ব্যাপৃত শিল্প-বাণিজ্যে
ঘোর নিদ্রা করি ভঙ্গ কর পূরীত উত্তম বীর্য্যে
সবারে রত কর কার্য্যে, ওগো আর যে দেখিতে পারি নে
দুঃখ তব রাজ্যে
জননি গো লহ তুমি বক্ষে—"

সাতানব্বই সালের কাল্ বৎসর ও উনবিংশ শতাব্দীর তামসী রজনী পোহাইতেই বিংশ শতাব্দীর অরুণাভা সূচিত হইল। পেনেলের মোকদ্দমা হইতেই ন্যায় বিচারের সূত্র ধরিয়া ভারতবাসী সঙ্ঘবদ্ধ হইতে শিখিল। স্বদেশজাত শিল্পের প্রতিও তাহার আগ্রহ হইল। এখন কার্য্যকরীভাবে এই দুইটি সম্মিলিত করিয়া দিতে বাকী রহিল একটা প্রচণ্ড বাঁধ। সেই বাঁধ ভাঙ্গিলেন সাম্রাজ্যমদগর্ব্ব দর্পী কার্জ্জন। ইনিই সেই প্রবল বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া বন্যা প্রবাহিত করেন। আগামীতে আমরা সেই সমস্ত অধ্যায়ের সূচনা করিব।

যদি কোন মহানুভব ব্যক্তি পেনেল সাহেবের ফটো দিতে পারেন, বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

সম্পাদক সঙ্ঘ "বঙ্গশ্রী"
১১ ক্লাইভ রো, কলিকাতা

---

* R. C. Dutt on fammine in India—a speech in England on 11th January 1901 at Swimming Baths' Hall. President—Sir. John B. B. Phear, Late Judge Calcutta High Court.

একটী দিনের কথা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু এম-এ

রোজ রোজ দিনরাত অভাবের কচ-কচানিতে লক্ষ্মীছাড়া শ্রীহীন খোড়ো মেটে-ঘরগুলো অবধি যখন কঙ্কালের মুখের মত সবাইকে উঠল দাঁত খিঁচিয়ে, তখন অতিষ্ঠ হ'য়ে রাগে গর্ গর্ ক'রতে ক'রতে একদিন তার বুড়ো ঠাকুরদাদার কাছে ছুটে গিয়ে অনন্ত যেন ফেটে উঠল বোমার মত দম্ ক'রে, "কারো কোন কথা আর আমি শুনবো না, এবার ক'লকাতায় আমি যাবই যাবো।"

"কেন ?"

"চাকরী ক'রতে।"

"ঘটে নেই বিদ্যে, কি চাকরী ক'রবি ?"

ব্যথা পেয়ে অনন্ত তার সুন্দর, সুডোউল, সতেজ হাত দু'টাকে বোঝা তোলবারি নকল ক'রে ব'ল্লে, "মোট বইতে পারব ত' ?"

কথাটা তীরের মতন যেন সোজা ছুটে গিয়ে বুড়োর বুকে বিঁধলো খ্যাঁচ-ক'রে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে দু'জনেই মনে মনে যেন গজরাতে লাগল। একটু সাম্‌লে বুড়ো ব'ল্লে, "এ বংশে কুলি কেউ হয় নি—"

"এত দুঃখুও কেউ পায় নি। আমাদের বাঁচতে হবে ত' ?"

বুড়ো আর জবাব দিল না, শুধু তার ঝাপসা চোখ দু'টো একবার যেন দপ ক'রে জ্বলে উঠেই, আশীর্ব্বাদের মত ঝরে প'ড়লো জল হয়ে। অনন্তের চোখও শুকনো ছিল না। তার সাধের এ জন্মস্থান ছেড়ে বাইরে সে কখনও একটী পা'ও বাড়ায় নি। এই মাটি-ঝরে পড়া, খড়-ওঠা মেটে ঘর, পাশের ঐ বাঁশবন—কত ছায়া, কত মায়া তার বুকে, সব ছেড়ে সে চ'ল্লো সহরে। এমনি করে তার বাপও একদিন গেছলো ছুটে সহরের পানে, তারপর আর ফিরে আসে নি। অনন্তর বিধবা-মায়ের প্রাণটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো কিন্তু অনন্ত তখন মার নিকট বিদায় নিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে প'ড়েছে।

অনেক কষ্টের পর, অনন্ত প্রথম পেল চাকরী এক গোয়ালার কাছে। চাবি-আঁটা বড় একটা ডোল মাথায় নিয়ে সকাল-সন্ধ্যে দু'বেলা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে, বাড়ী বাড়ী দুধ জোগাতে হ'ত। ক'লকাতায় রিপন ষ্ট্রীটের একটি বাঙ্গালী খৃষ্টান ডাক্তারের বাড়ীতে অনন্তকে দুধ জোগাতে হ'ত দু'বেলা।

অনন্ত তখন চব্বিশ ছাড়িয়ে পঁচিশে প'ড়বো প'ড়বো ক'রছে। তার বুড়ো ঠাকুরদাদা তাকে চিঠি দিয়ে দেশে আনিয়ে চেপে ধোরলো বিয়ে করবার জন্তে। মেয়ে আগেই দেখে রাখা হ'য়েছে, এমন কি কথা পর্য্যন্ত দিয়ে ফেলা হ'য়েছে মেয়ের বাপকে। এ অবস্থায় অনন্ত মত না ক'রলে তাদের মুখ পোড়ে। কালী পাত্তরের সেজ মেয়ে হিমি, এখন বেশ ডাগোর ডোগোর হ'য়েছে, দেখতে শুনতে—তা এমন কিছু কুচ্ছিৎ নয়, পাঁচ-পাঁচি বলা চলে। হিমিকে অনন্ত বেশ ভালই জানে, তার জবুথবু কুমড়োর মত চেহারাখানি মনে উঠতেই সে শিউরে উঠলো। সে ভাবলে—কি আশ্চর্য্য, যাকে চির-জীবন ঘর ক'রতে হবে, তাকে পছন্দ ক'রে দেবার ভার থাকবে অপরের হাতে ; তারা পছন্দ ক'রে যা দেবে, তাকেই ওষুধ-গেলা ক'রে চিরকাল গিল্‌তে হবে আমাকে। এ বিয়ে আমি ক'রবো না কিছুতেই।

এর একটু কারণ ছিল। রিপণ ষ্ট্রীটের ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে শোভা বলে একটী মেয়ে ডাক্তারবাবুর ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা ক'রতো। অনন্ত যখন সকাল সন্ধ্যায় এ-বাড়ীতে দুধ নিয়ে আস্‌তো, শোভা তখন বাড়ীর সামনেকার ছোট্ট বাগানটীতে ছেলেদের ঠেলা গাড়িতে ডাক্তারবাবুর ছোট মেয়ে খুকুকে বসিয়ে বেড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যেন শোভাকে নিয়েই, যত খেলা, যত আহ্লাদ। শোভার মুখখানিতে সব সময়ই যেন কেমন একটা মিষ্টি হাসি চাঁদের আলোর মত লেগে থাকতো, আর সে হাসলেই তার নরম গাল দু'টীতে দু'টী টোল পোড়ে তার সেই সুন্দর মুখখানির চটক যেন আরও দিত বাড়িয়ে। সে মুখখানি সহজে ভোলবার নয়। অনন্তর বুকে শোভার

মুখখানি আঁকা হয়ে-গেছে। বয়স তার সতেরো কি আঠারো হবে, বেশ বাড়ন্ত গড়ন, যৌবন যেন উথলে উঠছে সারা গায়ে। জামা-কাপড় সব সময়ই সে রাখতো যেন বেশ একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাকে হঠাৎ ঝি ব'লতে কেমন মুখে যেন একটু বাধে। অনন্ত দুধ নিয়ে এলে শোভা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ীর ভেতর যায়, রান্নাঘর থেকে বড় গামলাটা বার ক'রে অনন্তর সামনে ধরে, অনন্ত কলের মুখ খুলে দুধ ঢেলে দেয় ডোল থেকে। শোভা অনন্তকে দেখে কোন সঙ্কোচ করে না, দিব্যি চটপট ক'রে কথা কয় তার সঙ্গে। অনন্তর বেশ লাগে শোভাকে কিন্তু তার সঙ্গে কথা ব'লতে হ'লেই অনন্তর যত কথা সব যায় যেন গুলিয়ে।

রাত্তির বেলায় কাজ থেকে ফিরে, খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে, সে যখন তার বস্তীর ছোট ঘরখানিতে ভাঙ্গা তক্তাপোষের উপর ছেঁড়া-মাদুরখানা বিছিয়ে, তেল-ধরা মাথার বালিশটায় মুখ গুঁজে, কেরোসিনের ডিবেটা নিবিয়ে, চোখ-বুজে শুয়ে পড়ে। তখন যেন তার চোখের সামনে রিপন ষ্ট্রীটের ডাক্তার বাবুর চিলে কোঠায় শোভার শোবার ঘরখানি আস্তে আস্তে ভেসে উঠে। মনে হয়—একটী দুধের মত শাদা ধবধবে বিছানায় একটী ঝালর দেওয়া শাদা নরম বালিশের এক পাশে মাথা রেখে শোভা শুয়ে ঘুমুচ্ছে একা। খোলা জানলাটা দিয়ে চাঁদের আলো এসে তার ঘুমন্ত মুখের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে শোভার মুখখানিকে যেন দেবীর চেয়েও সুন্দর ক'রে তুলেছে। অনন্ত একবার ভাবলে ঐ চাঁদের আলোর মত সেও যেন লুকিয়ে শোভার জানালার ভেতর দিয়ে এসে, তার ঝালর-দেওয়া নরম মাথার বালিশের উপর তার উস্‌কো-খুস্কো ধূলো ভরা মাথাটী একটীবার রাখলো যেন। তারপরেই তার মনে হ'ল, শোভা যেন শুয়ে আছে, এই বস্তীর ঘরখানিতে, তার তেলধরা মাথার বালিশে মাথা রেখে, তারই পাশে। শোভার মাথার চুলের মিষ্টি গন্ধ, যেন তার নাকে এলো, অনন্তর গা শির্‌-শির্‌ ক'রে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। নিউ মার্কেটের বড় ঘড়িটায় তখন দু'টো বাজলো। গলির মোড়ে টিন্‌-মিস্ত্রী মাতাল হয়ে পুঁটির মাকে ধরে মার দিচ্ছে, আর গাল দিচ্ছে। কুকুরগুলো বিয়ে বাড়ীর এ'টো-পাতা নিয়ে জঞ্জালের টবের কাছে খেও-খেয়ি ক'রছে। পাহারা-ওয়ালা ইট-বাঁধানো গলির উপর তার নাল-বাঁধানো ভারী নাগরাটার খট্‌খট্‌ ক'রতে ক'রতে চ'লেছে ঘুরে…এইসব শুনতে শুনতে অনন্তর নাক আবার ডাকতে থাকে।

ক্রমে ক্রমে অনন্ত তার আড়ষ্ট-ভাবটাকে কাটিয়ে ফেল্‌লে। এখন শোভাকে দেখলেই সে হাসে, শোভাও হাসে অনন্তকে দেখলেই। কাছে কেউ না থাকলে, তারা দু'টীতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেক কথা কয়—দুঃখের সুখের।

একদিন রাস্তায় আলো জ্বল্‌লে, অনন্ত যখন ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে দুধ দিয়ে রাস্তার ফুটপাত দিয়ে যাচ্ছিল, সে বেশ বুঝতে পারলে ডাক্তারবাবুর বাড়ী থেকে কে যেন বেরিয়ে তার পেছনে পেছনে আসছে। মাথাটাকে একটু হেলিয়ে সে আড়-চোখে চেয়ে দেখলে—শোভা। আনন্দে তার বুকটা ধড়াস ধড়াস ক'রে লাফাতে লাগলো। সে যেন শোভাকে মোটেই দেখতে পায় নি, শোভা যে তার পেছন পেছন আসছে অনন্ত যেন তা জানে না, এমনি ভাব দেখিয়ে সে তাড়াতাড়ি তার বস্তীর গলির মধ্যে ঢুকে পোড়লো। একটু ভেতরে গিয়ে অনন্ত আবার ঘাড় বেঁকিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলে শোভা আসছে এই গলিতেই। অনন্ত তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে, দুধের ডোলটা নামিয়ে রেখে, তার ভেজানো জানালার ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইলো রাস্তার উপর। দেখলে—শোভা হাতে সৌখিন একটা বাজারের ছোট থলে নিয়ে তার দরজার ঠিক উল্টোদিকে চিনেবাদামওয়ালার দোকান থেকে চিনেবাদাম কিন্‌ছে। মার্কেটে যেতে হ'লে এই গলি দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, বোধ হয় সেই জন্যেই শোভা এপথে এসেছে। একটা কেরোসিনের বড় টিনে জল রাখা ছিল, তাইতে যাহোক ক'রে মুখ-হাত-পা ধুয়ে, অনন্ত না খেয়েই বেরিয়ে পোড়লো তার ঘর থেকে।

উত্তেজনায় ক্ষিদে তখন তার মরে গেছে। অনন্তর মনে হ'ল শোভা যেন তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে পথে। ছুটে দরজা থেকে বেরিয়েই অনন্ত দেখলে—শোভা ত' চিনেবাদাম-ওয়ালার দোকানে নেই। কোথায় গেল? একবার এদিক্‌-ওদিক্‌ চেয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে চ'ল্‌লো হন্‌ হন্‌ ক'রে। ঐ যে শোভা যাচ্ছে একটু আগেই। অনন্ত সত্যি যেন ছুটলো এবার। তাড়াতাড়ি শোভার গা-ঘেঁ'সে শোভাকে ছাড়িয়ে চ'লে গেল। যাবার সময় ইচ্ছা হ'ল শোভার হাতটী একটু নেড়ে দিয়ে তাকে জানান্‌ দিয়ে যায়—

কিন্তু সাহস হ'ল না তার। যাই হ'ক, শোভার মতলবটা কি, তাই দেখবার জন্তে অনন্ত ডান-হাতি রাস্তাটা ধরে বাজারের দিকে না গিয়ে সোজা রাস্তাটা ধরে চ'ল্লো মাঠের দিকে। দেখলে শোভাও বাজারের দিকে না গিয়ে, সোজা রাস্তাটা ধরে আসছে তার পেছন-পেছন। হল এণ্ড এ্যাণ্ডারসনের দোকানের পাশ দিয়ে অনন্ত চৌমাথাটা পার হ'য়ে মাঠের ভেতর দিয়ে চ'ল্লো। শোভাও তার পেছন পেছন ঢুক্লো মাঠে এসে। খানিক দূর গিয়ে অনন্ত পুকুরের ধারে একখানা খালি বেঞ্চে গিয়ে ব'স্লো। শোভা অনেকটা কাছাকাছি এসে, বেঞ্চে না ব'সে পুকুরপাড়ে গিয়ে ব'স্লো যেন জলের কোল ঘে'সে। অনন্ত পকেট থেকে একটা বিড়ি বার ক'রে, ধরিয়ে টান্তে লাগ্‌লো। এমনি ভাবে শোভা আর অনন্ত দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে একটু তফাতে থেকে; দু'জনেই চেয়ে রইলো আকাশের ঐ দূরের চাঁদটার দিকে অন্তমনস্কভাবে।

শেষ-চৈত্রের বাত্তির। উদাসী হাওয়া যেন মনটাকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চায়। শোভা হঠাৎ উঠে, মাঠের যে দিকটায় ঐ গাছগুলোর তলাটা ছায়ায় অন্ধকার হ'য়ে আছে, তার ভেতরে গিয়ে ঢুক্লো। অনন্তও আর চুপ ক'রে যেন ব'সে থাকতে পারলে না, মুখ থেকে বিড়িটাকে ফেলে দিয়ে সেও উঠে গেল শোভার সন্ধানে—ঐ অন্ধকারের পানে। ঝাপসা-অন্ধকারে অনন্ত দেখলে—ঘাসের উপর পা-ছড়িয়ে, হাঁটু দুটী উঁচু ক'রে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে, হেলে পোড়ে আস্তে আস্তে দোল খাচ্ছে শোভা যেন কার অপেক্ষায়। নিঃশব্দে যেন পা-টিপে টিপে শোভার গা-ঘেঁসিয়ে এসে ব'স্লো অনন্ত। তারপর আর একটি কথা না বোলে শোভার একখানি হাত অনন্ত যেন চুপি চুপি নিজের বুকে তুলে নিলে। শোভা বোঝে, আবার বুঝেও বোঝে না যেন। অনন্ত তার যে হাতখানি বুকের উপর তার হাত দিয়ে মুঠো ক'রে চেপে ধরে আছে, সে-হাতখানি সরিয়ে আন্তে শোভার যেন মন সরে না। এই রকম ক'রে শোভার হাতখানি বুকে নিয়ে অনন্তর মনে হ'চ্ছিল—রাজপ্রাসাদ থেকে গরীব কুলির কুঁড়ে-ঘরে, জগতের যেখানে যত সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি আছে—বিশ্বের সবার সেই সুখের-সুরের সঙ্গে আজ যেন তাদের দু'টী প্রাণের সুর এক-হ'য়ে সব বাজছে, তাদের রক্ত যেন মেতে উঠেছে আজ সেই সুরে। শোভার ঘাড়ের চুলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে অনন্ত মধুমাখা স্বরে ডাক্‌লে—"শোভা!" শোভা ঘাড় ফিরিয়ে, তার দিকে নুয়ে পড়া অনন্তর মুখের পানে চাইলো একবার, তার চোখের দু'টী কালো তারা যেন কোন সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে আবেশে বড় হ'য়ে উঠে ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠলো সেই অন্ধকারে। অনন্তর বুকের মধ্যে রক্ত যেন লাফিয়ে উঠলো। শোভা শান্ত ভাবে অনন্তর বুকের উপর তার মাথাটী রাখলো, আস্তে আস্তে অনন্তর সব কেমন গেল গুলিয়ে। শোভাকে জিজ্ঞাসা করবার জন্তে যত কথা অনন্তর বুকের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রছিল, তারা যেন তাদের সব কথার সব উত্তর একসঙ্গে পেয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে—শোভার ছোট্ট সুগন্ধী-মাথাটী বুকের মধ্যে পেয়ে। কিছুক্ষণ তারা চুপ ক'রে রইলো সেই ভাবে। একজনের বুকের স্পন্দন যেন গানের মত ভেসে আসতে লাগলো আর একজনের প্রাণে। অনন্তর কাণে বেজে উঠলো শোভার জীবন-রাগিণী, তার জীবনের সুখ-দুঃখের কথা; শোভা যেন গেয়ে চ'লেছে মৃদু কলতানে—

"শোভা গরীব। তার বাবা, মা যে কে আজও সে তা জানে না। অনাথ-আশ্রমে সে মানুষ হয়েছে। নার্সিং শেখবার জন্ত ডাক্তারবাবু তাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসেন। হাঁসপাতালের কাজ তার ভাল লাগ্‌লো না। ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে সেই থেকে আছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা ক'রে। আপনার জন ব'ল্‌তে কেউ তার নেই।"

শোভার দুঃখের রাগিণী অনন্তর বুকের তারে তারে একটা ব্যথার ঝঙ্কার তুলে বেজে উঠলো। শোভা শোনে মৃদু গুঞ্জনে অনন্ত গাইছে তার জীবনের ব্রত অশ্রুগলা গান—"অনন্তও গরীব। দেশের জমি-জমা সব বাঁধা প'ড়েছে। পয়সা রোজগারের চেষ্টায় ক'ল্‌কাতায় এসেছে। দেশে মা আছে, দাদু আছে। বস্তীতে থাকে, একখানা ঘর নিয়ে। দু'বেলা দুধের মোট বয়, সে এখন একজন মুটে, সামান্ত কুলি।"

একটু আগে রাস্তার ঐ বাঁক্‌টা থেকে একটা মোটরের হেড্-লাইটের তেজালো আলো যেন হঠাৎ ঠিক্‌রে এসে

তাদের মুখের ওপর পড়লো ক্ষণেকের জন্যে। দু'জনে দু'জনের মুখের পানে চেয়ে দেখলে, দু'জনেরই গালের উপর চোখের জল চিক্ চিক্ ক'রে উঠলো একবার। তারপর আবার যেমন অন্ধকার তেমনি। কিন্তু দুঃখের গভীর অনুভূতিতে, গাছের ছায়ার সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে ব'সে একজন তার একজনকে চিনে নিলে আপনার জন ব'লে। দূরের সাহেবী হোটেল থেকে বেহালার একটা মন-গলানো মধুর আলাপ চৈত্রের এই স্বপন-জাগানো, ফুল-ফুটানো হাওয়ায় যেন কা'কে হারিয়ে খুঁজে ফিরছে ভেসে ভেসে। অনন্ত শোভার মুখখানি তুলে ধ'রে তার ফুলের মত ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখে, এই সর্ব্বহারা অনাথ মেয়েটীকে—চাঁদ, আকাশ আর পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে—তার জীবনের চির-সাথী ব'লে নীরবে যেন স্বীকার করে নিলে।

কেল্লার ব্যাণ্ড বাজিয়ে, অনেক রোশনাই, আতসবাজী আর গোলাপ ফুলে ছেয়ে কত মানুষের জীবনে বিচ্ছেদের চির-দুঃখ এসে দেখা দেয় মিলনের ওড়নায় মুখ ঢেকে। অনন্ত আর শোভার জীবনে চির-মিলন ঘটে গেল দুঃখের অন্ধকারে, বিনা আড়ম্বরে। বিয়েটা হ'ল পুঁটীর মার ঘরে, অল্প ক'দিন পরেই। সেই ক'রলে শোভাকে দান অনন্তর হাতে। সীঁথিতে সিঁদুর ঢেলে অনন্ত শোভাকে বরণ ক'রে বুকে তুলে নিলে তার ধর্ম্মপত্নী বলে। বস্তীর ভেতর রাত বারটার সময় বেজে উঠলো শাঁখ। সেই রাত্তির থেকে ডাক্তারবাবুর বাড়ীর শোভা-ঝি হ'ল নিরুদ্দেশ।

(২)

অনন্তর বস্তীর ঘরে শোভা এসে পাতলো তাদের সাধের সংসার। নবীন যৌবনের উৎসাহে, আশায়; আনন্দে তারা কোন দুঃখকেই দুঃখ ব'লে মনে করে নি প্রথম প্রথম। তারপর আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে অনন্ত গোয়ালার চাকরী ছেড়ে রিক্স টানতে লাগলো। কত আশায় অনন্ত ছোটে—এতখানি বুক নিয়ে; তারপর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, মালিকের পয়সা চুকিয়ে, রিক্স জমা দিয়ে, আধ-মরা ক্লান্ত দেহটা নিয়ে ধুকতে ধুকতে যখন অনন্ত ঘরে ফিরতো রাত বারটার পর সামান্য কয়েকআনা মাত্র হাতে নিয়ে, তখন তার সেই এতখানি বুকের ছাতি যেন শুকিয়ে হ'য়ে যেত এতটুকু। একদিন সে মনের দুঃখে শোভাকে ব'ললে—

"সহরে এলুম টাকা রোজগার ক'রতে," অভাব মেটাতে মেটাতেই দিন কাটছে, টাকার মুখ দেখলুম না আজও — মাঝখান থেকে হ'য়ে গেলুম একটা রিক্স-টানা কুলি।"

শোভা স্বামীর পায়ে গরম সরষের তেল মালিশ ক'রে দিতে দিতে অনন্তকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"যে রিক্সর উপরে চ'ড়ে যায় সেও মানুষ, আর যে তাকে টানে সেও তার মতই মানুষ। তুমি এত কষ্ট ক'রছো, ভেব না—। ভগবান তোমার আশা পূর্ণ ক'রবেনই একদিন।"

অনন্তর চোখের সামনে যেন ভেসে উঠে—তার সেই মাটি ঝড়ে-পড়া পোড়ো-চালা, ছায়া-ঘেরা বাঁশবন, ধানের-শীষে-ঢেউ-খেলানো মাঠ। বুকটা হু-হু ক'রে উঠে, এ-সব কি সে পাবে কখনও এ-জীবনে? শোভার পাশে শুয়ে ছটফট ক'রতে থাকে অনন্ত। এমনি ক'রে দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে কেটে গেল একটা বছর।

হাঁসপাতালে গিয়ে শোভার হ'ল একটী ছেলে। আর একটী সুখের খবর—এই হাঁসপাতালে এসে রিপন ষ্ট্রীটের সেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে শোভার হ'ল দেখা। লজ্জায় শোভা এতটুকু হ'য়ে গেল প্রথমটা। তারপর ডাক্তারবাবু সস্নেহ মধুর ব্যবহারে শোভার যেন আনন্দে চোখে জল এলো। দু'এক কথায় ডাক্তারবাবুকে শোভা নিজের সব কথাই খুলে ব'ললে। অনন্ত রোজ বিকেলে শোভাকে দেখতে আসতো। ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে দেখা করে অনন্তকে বেশ করে বুঝিয়ে দিলেন, যে এ অবস্থায় শোভাকে বিশেষ দেখা-শুনা করা দরকার। অনন্তর যদি আপত্তি না থাকে, তা'হলে শোভাকে তিনি তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারেন এখন। অনন্ত যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো তার বুক। শোভা আবার ঠাঁই পেল ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে।

অল্পদিনেই শোভা শরীরে একটু বল পেল। তারপর থেকে রোজ রাত্তিরে ছোট্ট ছেলেটীকে কোলে নিয়ে সে বস্তীর ছোট ঘরখানিতে চ'লে আসতো তার স্বামীর কাছে। আবার রাত থাকতে উঠে, উনুন ধরিয়ে রেঁধে-বেড়ে রাখতো সে অনন্তর জন্যে। কাক ডাকতো। পরিষ্কার সাড়ী ব্লাউজ পরে ডাক্তারবাবুর বাড়ী যাবার জন্যে শোভা যখন

তার স্বামীর মাথার শিয়রে একবারটী এসে দাঁড়াতো খোকাকে বুকে নিয়ে, তখন আদরে আদরে তাকে অস্থির করে তুলে অনন্ত তার এই অবুঝ ছেলেটার চোখে মুখে অজস্র চুমু খেতে খেতে তাকে তার জীবনের কত আশা, আনন্দ, সুখ-স্বপ্নের কত কথা শোনাতো, তার সে কথা যেন আর ফুরুতে চাইতো না কিছুতেই। শুনতে শুনতে মায়ের কোলে হেসে উঠতো ছেলেটী—রাঙা হয়ে উঠতো আকাশ। সেই রংয়ে লাল হয়ে উঠতো মায়ের মুখ। বাপও উঠতো হেসে মা ও ছেলের সে হাসি দেখে—পৃথিবীটা অমনি সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠতো যেন হাজার পাখীর আনন্দ গানে। তাদের তিনজনের সেই মধুর হাসিতে বস্তীর সে অন্ধকার ঘরখানি যেন আলোয় আলো হয়ে ঝলমল্ করে উঠতো। এইভাবে চ'লতে লাগলো তাদের সুখের দিনগুলি।

কিন্তু কোথা থেকে কখন হঠাৎ আকাশে মেঘ উঠে, সোণার আলো ফেললে ঢেকে। হাঁসপাতালের কাজ থেকে ডাক্তারবাবু নিলেন অবসর। তাঁর আয় গেল কমে। তাই তিনি ঠিক ক'রলেন তাঁর দেওঘরের বাড়ীতে গিয়ে তাঁরা থাকবেন এবার থেকে। আকাশ ভেঙে পড়লো শোভার মাথায়। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন—যদি শোভার সেখানে যাবার ইচ্ছে থাকে। রাত্তিরে স্বামী-স্ত্রীতে অনেক কথা হ'ল এই নিয়ে। শেষে অনন্ত ব'ল্লে—

"যত কষ্টই হোক না কেন, আমার বুকে সবই সইবে, তুমিও সইতে পারবে সব জানি, কিন্তু যাকে পাঠিয়েছেন ভগবান এই গরীবের ঘরে, আমার খোকার এই ফুলের মত নরম গায়ে দুঃখের আঁচ আমি এতটুকু লাগতে দেবো না।"

"তাহ'লে খোকা কি এইখানে থাকবে, তোমার কাছে?"

"না, তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি কুলি। কুলির ছেলেটাকে মানুষ ক'রে তোলবার ভার দিলুম আমি তার মায়ের হাতে। ওর মুখ চেয়ে আমাদের এটুকু দুঃখ বুক পেতে নিতে হবে শোভা!"

ব'লতে ব'লতে তাদের স্বামী-স্ত্রীর বুকে ব্যথার সাগর যেন আছড়ে কেঁদে উঠলো। তারপর অনন্তর বুক থেকে তার স্ত্রী-পুত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে একটা বিরাট দৈত্যের মত যেন রেলগাড়িটা ছুটে মিশে গেল একদিন কোন অন্ধকারে।

(৩)

ঠুং ঠুং করে রিক্স টেনে বেড়ায় অনন্ত পথে পথে। বয়স যত বাড়তে থাকে ভবিষ্যতের ছবি যেন ততই ঝাপসা হয়ে আসে অনন্তর চোখে। গাড়ি টানতে টানতে মোষ-গুলোর যেমন নাক মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসে, অনন্তর তেমনি জিবটাকে যেন কে ভেতরদিকে টানতে থাকে, তখন সে রিক্সাখানি রেখে, ঘাম মুছে, একটু ব'সে জিরোয়। মনের মধ্যে ভেসে উঠতে থাকে—তার সেই মাটী-ঝরে পড়া খোড়ো-চালা, ছায়াঘেরা বাঁশবন, ধানের শীষে ঢেউ খেলানো মাঠ, তার মা, তার দাদু। কারো কিছুই সে ক'রতে পারলে না। জমিগুলো খালাস হ'ল না, মাথা গুঁজে থাকবার জায়গাটা পর্য্যন্ত গেল। শেষ অবধি এরা মরে বাঁচলো। রিক্স টানতে টানতে সেও ত' মরতে ব'সেছে। কি চেহারা ছিল তার, আর এখন কি হয়েছে! এত খেটে মরছে সে কার জন্যে?

অমনি শোভার মুখখানি জেগে উঠে তার বুকের মধ্যে। নিজেকে শত ধিক্কার দেয় সে। এমন স্ত্রী ক'জনের ভাগ্যে হয়। এমন লক্ষ্মীর মত স্ত্রী পেয়েও সে মনের মতন করে সংসার ক'রতে পারলে না তাকে নিয়ে। তার পাঁজড়া-গুলোকে নাড়া দিয়ে একটা বুকফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। জীবনে যেন আর কোন আশাই নেই, কোন আনন্দ নেই। হাজার লোকের পায়ের তলায় প'ড়ে সে যেন তার সামনের এই পিচঢালা কালো রাস্তাটার মত মুখ বুজে প'ড়ে প'ড়ে সবার মারই কেবল খাচ্ছে। হাত-পাগুলো অবস হয়ে যায়, দেহটা যেন ঝিমিয়ে আসতে থাকে।

তখুনি তার মনে পড়ে—তার ছেলেটার হাসি সেই কচি মুখখানি, তার ভবিষ্যতের আশা-ভরসা, তার এই খোকা। নিরাশার ক্ষীণ ভাঁটার স্রোতে যেন আবার আশার জোয়ার বইতে থাকে। খোকার মুখ তার বুক ভ'রে উঠে। অনন্ত ভাবে—ওরই জন্যে বেঁচে থাকা। তার নিজের জীবনটা ত' কেবল কষ্ট করেই কেটে গেল, যাক, তাতে

দুঃখ নেই। খোকা যেন তার মানুষের মত মানুষ হয়। তার মা তাকে মানুষ ক'রেছে, আর সে তার বাপ হয়ে তার ছেলের কি ক'রলে? মাসে পাঁচটী ক'রে টাকা, তাও সে সব মাসে ঠিক মত পাঠাতে পারে না। খোকার বয়স বাড়ছে, সে বড় হচ্ছে, স্কুলে যায়; বই, জামা, কাপড়, জুতা আছে, পাঁচটাকায় কি হয় তার! শোভা কিন্তু বেশী টাকা পাঠাবার জন্যে কৈ কখনও ত' লেখে না তাকে! বোধ হয় সে জানে, কত কষ্টের রোজগার এই পাঁচটা টাকা। তাই শোভা তাকে আর বেশী কষ্ট দিতে চায় না। শোভা না চাইলেও, সে ত' বেটাছেলে, তার ত' নিজের বোঝা উচিৎ, কি ব্যবস্থা ক'রেছে তার নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্যে? কিছুই না, কিছুই যে ক'রতে পারে নি সে।

ভাবতে ভাবতে তার মাথায় জ্বলে উঠে আগুন। নিজের উপরই নিজের হয় বিষম রাগ। থার্ডক্লাস গাড়িটার বুড়ো, বেতো ঘোঁড়াটাকে ছুট কারাবার জন্যে গাড়োয়ানটা যে ভাবে মরিয়া হয়ে তার পিঠে বেদম ছিপটি হাঁকড়াচ্ছে, তেমনি করে সেও তার এই খেটে খেটে এলিয়ে-পড়া ক্লান্ত দেহটাকে যেন চাব্‌কে চাব্‌কে ছোটাতে চায়। ধড়ফড় ক'রে উঠে রিক্সখানা নিয়ে ছুটতে থাকে অনন্ত, যেন ভূতে পেয়েছে তাকে।

রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বালা হ'লে অনন্তর রিক্সখানি রোজ এসে দাঁড়ায় পুঁটীর মার দোর গোড়ায়। আজও ঠুং করে অনন্তর রিক্সা এসে দাঁড়'তেই, লণ্ঠন হাতে করে পুঁটীর মা কপাট খুলে দিলে। গলির ধার ঘেঁসিয়ে জঞ্জালের গাদার এক পাশে রিক্সাখানা সরিয়ে রেখে অনন্ত পুঁটীর মার পেছন পেছন ভেতরে ঢোকে। দরজায় আবার খিল এঁটে পুঁটীর মা অনন্তকে আলো দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে টিন্-মিস্ত্রীর ঘরে পৌছে দিলে।

ভেজানো দরজাটা ঠেলে খুলতেই ভক্ করে একটা ঝাঝালো গন্ধের সঙ্গে বিড়ির ধোয়া উড়ে এলো। ঘরের মেঝেতে দু'খানা চেটাই পেতে জন কতক মাঝারি বয়সী লোক বসে আছে। তাদের কারও সামনে, কারও হাতে, কারও বা মুখে সস্তার মোটা কাচের নীল গেলাস। ঘরের মাঝখানে দাউ-দাউ করে যেন একটা কেরোসিনের বড় ডিবে জ্বলছে, তাতে ঘরে যতটা না আলো হোক, তারচেয়ে ঢের বেশী কালি ছড়াচ্ছে চারদিকে। অনন্ত তাদেরই একপাশে গিয়ে ব'সলো। টিন্-মিস্ত্রী মেঝেতে বসে পেছনকার তক্তাপোষে। তার প্রকাণ্ড ভুঁড়িওয়ালা দেহটা ঠেস্ দিয়ে ছোট তক্তাপোষটাকে যেন আড়াল করে রেখেছে। অনন্তকে দেখে মিস্ত্রী তার পানের ছোপধরা কালো দাঁতগুলো বার ক'রে একটু হেসে, তক্তাপোষের তলায় হাত সেধিয়ে, সাপুড়ে যেমন তার হাঁড়ির ভেতর থেকে হাস্‌তে হাস্‌তে কেউটে সাপ টেনে বের ক'রে আনে, তেমনি ক'রে গলাটা ধ'রে টেনে বার ক'রে আনে একটা কালো বোতল। টিন-মিস্ত্রী খুব লুকিয়ে করে চোলাই মদের কারবার। অনন্তকে মদ খেতে সেই শিখিয়েছে। মিস্ত্রীর নেশা জমলে ভাব আসে, যাকে সামনে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরে জড়ানো সুরে বলে—

"মাইরি, ফুরিয়ে যাবে ত' সব-বাবা দাঁত ছিরকুটে মারবি যেদিন। মুখের রক্ত তুলে এমনি হাড়ভাঙ্গা খাট্‌নি, এক পাত্তর না টানলে কি গায়ের ব্যথা মরবে? মাগ ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে শেষে কি একটা রোগ ধরাবি—এক চুমক টান, প্রাণ একেবারে তর হয়ে যাবে। আমাদের মত গরীব গুর্বো—যাদের না আছে কেউ সামনে চাইবার, না আছে পেছনে চাইবার, কেবল দুঃখু আর দুঃখু, তাদের বাবা এই মদই হ'ল ওষুধ। বোঝ না কেন বাবা, একটা স্বপ্ন, একটা খেয়াল, একটা নেশা না থাকলে, মানুষগুলো দুঃখু কষ্ট, পাঁচ ভাবনা ভাবতে ভাবতে এতদিনে সব পাগল হয়ে নাচতো ধেই ধেই ক'রে। নে ধর, কি ব'সে ব'সে এত ভাবিস মিছিমিছি।" বলে টিন-মিস্ত্রী যখন বোতল থেকে মদ ঢেলে গেলাসটী সামনে এগিয়ে ধরে তখন তাকে এড়ায় কার সাধ্য।

শোভা ক'লকাতা থেকে দেওঘরে চলে যাবার পর এমনি ক'রে ভারটানা জানোয়ারের মত কুলি অনন্তর আধ-জাগা আধ-ঘুমন্ত জীবনটার উপর দিয়ে এক এক করে বারটা বছর এলো আর চলে গেল। অনন্ত যেন বেহুঁশ হয়ে গেছলো, মানুষ বলে কোন সাড়াই ছিল না তার। খানিকটা রক্ত-বমি ক'রে যখন সে তার তক্তাপোষের উপর ছেড়া র‍্যাপারখানা মুড়ি দিয়ে গুড়ি-গুড়ি মেরে পড়েছিল এক কোণে, তখন

ডাকঘরের পিয়ন এসে তার তক্তার উপর একখানা খাম ছুড়ে ফেলে দিয়ে ব'লে গেল "চিঠি।" ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে সে তক্তার উপর সন্ধ্যের আলো আঁধারিতে হাতড়াতে লাগলো চিঠিখানার জন্যে। হাতে যখন চিঠিখানা ঠেকলো, তখন তাব সমস্ত দেহটা কেঁপে উঠলো কোন সুখের ছোঁওয়া পেয়ে। সে টলতে টলতে ঘব থেকে বেরিয়ে ছুটলো পুঁটীর মার ঘবে টিন-মিস্ত্রীব কাছে চিঠি পড়াতে।

পুঁটীর মা দরজা খুলে দিতেই অনন্ত যেন ছুটে টিন্‌-মিস্ত্রীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। অনন্তর মড়ার মত ফ্যাকাশে মুখের চেহারা দেখে মিস্ত্রীর হাতের গেলাস আর মুখে উঠলো না, জিজ্ঞাসা করলে—"অন্তা, কেমন আছিস্ আজ?"

"খুব খানিকটা রক্ত উঠলো এই মাত্তর।" হাঁফাতে হাঁফাতে অনন্ত বলে।

"পুঁটীর মাকে দিয়ে আজও পাঠিয়ে দিতুম, উঠে আসবার কি দরকার ছিল।" অনন্ত কিছু জবাব না দিয়ে মিস্ত্রীর দিকে খামখানি এগিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে, "চিঠি।"

"কে দিয়েছে?" বলেই খামখানা ছিঁড়ে, চিঠিখানা বার করে আলোর কাছে ধরে পড়ে ব'ল্‌লে "তোর ছেলে চিঠি লিখেছে রে অন্তা।"

"খোকা লিখেছে! কি লিখেছে?"

ঘরের আশ-পাশ থেকে অনেকগুলো চোখ চক্‌চক্ করে উঠে মিস্ত্রী আর অনন্তকে যেন গিল্‌তে লাগলো। মিস্ত্রী যখন তার সেই জড়ানো সুরে চিঠিখানি পড়ে শোনাচ্ছিল, অনন্তর তখন তার ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে আনন্দে চোখের কোল বেয়ে টস্ টস্ করে জল প'ড়ছিল। মিস্ত্রী পড়া শেষ ক'রতেই একজন ব'ল্‌লে—

"অন্তার ছেলে আসছে। আশ্রমের আর আর সব ছেলেরা আসছে। কংগ্রেসে 'বন্দেমাতরম্' গাইবে। বারে অন্তা, ছেলে ত' তোর বড় গাইয়ে হ'য়েছে, তোর-আর ভাবনা কি?" অনন্ত দুঃখের সুরে ব'ললে—

"তাই ত' আমার আর ভাবনা কি! ছেলে এলে তাকে ব'সতে দেবো, শুতে দেবো কোথায়? কি খাওয়াবো? আমার না আছে ঘব, না আছে দোর, না আছে একটা বিছনা। একখানা এমন আস্ত কাপড় নেই, জামা নেই, যা পরে তার সামনে বেরুই। এই ভিখিরীর ছেঁড়া, ময়লা, ন্যাকড়া পরে তার সামনে দাঁড়াবো কেমন করে। ভাই মিস্ত্রী, আমায় এই বিপদ থেকে বাঁচাও ভাই। আমার মান বাঁচাও। কিছু টাকা আমায় ধার দাও, বিশ্বাস না করো ভিক্ষা দাও। আমার ছেলে এসে না দেখতে পায় আমি আধ পেটা খেয়ে কুলিগিরি করি। আমার ছেলে না জানতে পারে যে সে একটা রিক্সা-টানা-কুলির ছেলে। তোমরা আমায় ধার দাও, বিশ্বাস না করো—ভিক্ষা দাও। আমি তোমাদের সবার হাতে-পায়ে ধরছি, এ বিপদ থেকে আমায় বাঁচাও তোমরা।" ব'লে অনন্ত মনের আবেগে টিন্‌-মিস্ত্রীর দু'টো পা জড়িয়ে ধ'রলো।

পায়ের তলায় তখুনি তুলে অনন্তকে বসিয়ে তার পিঠ চাপড়ে মিস্ত্রী বললে—

"কিছু ভাবিস নি অন্তা, আমরা ত' সব মরে যাই নি এখনও। তোর ছেলে আসুক না, সে ত' আহ্লাদের কথা রে! আমরা সব বন্দোবস্ত করে দোবো। তুই যা চাস্ তাই হবে। কিছু ভাবিস নি বুঝলি, আমি কথা দিচ্ছি।"

মদের মুখে অনেকেই কল্পতরু হয়, তবু মিস্ত্রীর শুধু এই মুখের আশ্বাসে অনন্তর ঝিরঝিরে বুকটা একবার যেন দশ হাত হয়ে ফুলে উঠলো। সে চোখের জল মুছতে মুছতে মনে মনে ব'ল্‌তে লাগলো, "নূতন কাপড় আর পুরাণো বন্ধু, সত্যই সবার সেরা দুনিয়ায়।"

শুধু যে মিস্ত্রী খরচ করলে সব পয়সাটা তা নয়, তার আড্ডায় মানুষের খাতা থেকে নাম কাটানো যে ক'জন আড্ডাধারি ছিল—চোর, গাঁটকাটা, জোচ্চর বদমাস—কি জানি কেন, তারাও মিস্ত্রীর হাতে দিয়ে ফেললে ঘড়ি, আংটি, মাকড়ী, ফাউন্টেন পেন, সিগারেট কেস—তাদের একটি দিনের রোজগার। মিস্ত্রী তাই দিয়ে অনন্তর পছন্দ মত সব জিনিষ কিনে দিলে। অনন্তর জামা হল, কাপড় হল, জুতা হল। এক জনের ভাড়াটে উঠে যাওয়া ফাঁকা বাড়ীটা অনেক ব'লে কয়ে মিস্ত্রী জোগাড় ক'রলে। ভাড়া করা খাট, বিছানা, আসবাব-পত্তর এল সব ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

অনন্তর আজ আর আনন্দ ধরে না। সেই দিনটার আসার আনন্দে সে যেন তার ক্ষিদে তেষ্টা আজ সব ভুলে গেল। মদ সে কাল থেকে ছোঁয়নি, পাছে ছেলে গন্ধ পায় তার মুখে। সকালে কলে জল আসতেই মনের আনন্দে অনন্ত বেশ করে সাবান মেখে চান করে ফেললে। তারপর

নূতন কালো পেড়ে দেশী ধূতী পড়ে, নূতন গেঞ্জির উপর ভায়েলা ফ্লানেলের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে, চুল আঁচড়ে, রুমালে এসেন্স ঢেলে, নূতন পামসু পায়ে দিয়ে, তার মনে হতে লাগলো আজ আর সে যেন রিক্স-টানা কুলি নয়, আজ সে সহরের আর পাঁচ জনের মত একজন মানুষ। নূতন পাম্প-সু মস্‌মস্‌ ক'রতে ক'রতে সে ভোর হতে না হতেই পুঁটীর-মার দোরের কড়া নেড়ে ডাকলে—"মিস্‌তিরি।"

যাদের সামনে চাইবারও কেউ নেই, পেছনে চাইবারও নেই তাদের কাছেও সংসার যখন তার এমনি সব দাবী জানায়, তখন তারা যেমন মড়িয়া হয়ে সাড়া দেয়, তেমন সাড়া যাদের সামনে চাইবার আছে, পেছনে চাইবারও আছে, তারা দিতে পারে না কেউ। তাই একজন খরচ-লেখা-মানুষের ডাকে, আর একজন জাহান্নমে-যাবার মানুষ সাড়া দেবার জন্যে যেন আগে থেকেই তৈরী হয়ে বসেছিল। মিস্ত্রীর আজকের ভাবখানা, যেন কি করে তার এই রুগ্ন, বেচার বন্ধুর আধ-মরা, ঘুমিয়ে-পড়া শুকনো মনটার ভেতর আশা-আনন্দের যে বান ডেকেছে, তার ছেলে আজ আসবে ব'লে—তার সব ক'টা ঢেউয়ের ধাক্কা যেন সে ঝাঁপিয়ে পোড়ে নিজের বুক পেতে নিতে চায় বুঝে। আজ অনন্তকে সুখী করবার জন্যে যেন সে মরিয়া, এক নিমেষে দেউলে হয়ে যেতে পারে অন্তার জন্যে। অনন্তকে দেখে মিস্ত্রী পুঁটীর মাকে ব'ললে, "আমার শাদা শালখানা বের করে দেতো তোরঙ্গের ভেতর থেকে, অন্তা গায়ে দিয়ে যাবে।"

মিস্ত্রী যখন অনন্তকে নিয়ে দেশবন্ধু-নগরে, লোক-জন, গাড়ী-ঘোড়া, মোটরের ভীড় ঠেলতে ঠেলতে অতি কষ্টে টিকিট কিনে কংগ্রেসের প্রকাণ্ড আটচালার ভেতরে গিয়ে ঢুকলো, তখন অনন্তর মনে হচ্ছিল সে বেঁচে এ সব দেখছে, না মরে ভূত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে এ যেন কোন একটা নূতন রাজ্যে, এক জায়গায়। এক সঙ্গে এত লোকের এমনি ভীড় জীবনে সে কখনও আর দেখে নি। যেমন পুরুষের ঠেলা তেমনি মেয়েদের রঙ্গ, কত ছেলে, কত মেয়ে, কি ঠেলাঠেলি। এই এদেরই মধ্যে তার ছেলেটীও কোথায় মিশে আছে। ঐ যে হাজার হাজার ছেলে এক সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে ফেলে মাঠের ঐ দিকে যাচ্ছে ঢাক বাজাতে বাজাতে, ওরা কারা? নিশ্চয় ওদেরই মধ্যে তার খোকাও কোথায় আছে। এই কথা ভাবতেই যেন অনন্তর বুকখানা গর্ব্ব আর আনন্দে ভরে উঠলো। এমন সময় কামানের গোলা ছোঁড়ার মত গুড়ুম করে একটা আওয়াজ হল, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকের লাউডস্পিকারে কোথা থেকে উঠলো বেজে 'বন্দেমাতরম্' গান। এক সঙ্গে সমস্ত রক্ত যেন লাফিয়ে উঠলো অনন্তর বুকের মধ্যে। মিস্ত্রীর একখানি হাত ধরে সে ভীড়ের মধ্যে এদিক ওদিকে চেয়ে চেয়ে খুজতে লাগল তার খোকাকে। লোকদের জিজ্ঞাসা করে করে মিস্ত্রী অনন্তকে ভিড়ের ধাক্কা থেকে বাঁচাতে বাঁচাতে এগুতে লাগল মাঠের দিকে।

মাঠের মাঝখানে একটা সাজানো বেদী। তার উপরে একটা রূপালী কাঠের উঁচু ডাণ্ডায় উড়ছে—ভারতের কোটি কোটি স্ত্রী-পুরুষের আশা, আনন্দ, সুখ-সৌভাগ্যের গৌরব নিশান ভারতের জাতীয় পতাকা। আর তার তলায় দাঁড়িয়ে সোনার ভারতের সোনার ছেলেমেয়েরা হাত জোড় করে, ভক্তি ভরে গাইছে—সারা হিন্দুস্থানের কথা, বাঙ্গালীর কবির বুকের রক্তে লেখা মহাসঙ্গীত বন্দেমাতরম্। অনন্তর বুক আনন্দে দুলে দুলে উঠেছিল। তার খোকাও এই গান গাইছে ঐ সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কিন্তু কোথায় তার খোকা? সে কই? কোন ছেলেটী সে? অনন্ত কিছুই ঠিক ক'রতে না পেরে যেন সবাইকেই ভালবাসতে লাগলো তার খোকার মতন করে।

থেমে গেল গান। মিস্ত্রী, খোকা চিঠিতে যেমন লিখেছিল, তখুনি ভীড় ঠেলে আশ্রমের মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে, খোকাকে সন্ধ্যের আগে তাঁর বাসায় পৌছে দিয়ে আসবার কড়ার নিয়ে, যখন খোকাকে সঙ্গে করে হাসি হাসি মুখে অনন্তর সামনে এসে হাজির হল—তখন অনন্ত দেখলে, যতগুলি ছেলে সে দেখেছে আজ, তার ছেলেটীই যেন সবার চেয়ে সুন্দর বেশী। তার চোখ দুটী ভাষা-ভাষা, মুখখানি সুন্দর ঠিক তার মায়ের মত, হাসলে তার গাল দুটীতে তার মায়ের মতই সুন্দর দুটী টোল পড়ে। "বাবা" বলে খোকা অনন্তর পায়ের ধুলো যখন নিলে, তখন অনন্তর চোখ দুটী জলে টল্‌-টল্‌ করে উঠলো।

টিন্‌-মিস্ত্রী তাদের একটা ট্যাক্সি করে সেই ভারাটে-উঠে-যাওয়া খালি বাড়ীটার সাজানো ঘরখানিতে পৌছে দিয়ে

যাবার সময় ব'ললে, "সন্ধ্যার সময় খোকাকে আবার মাষ্টারমশাইয়ের কাছে পৌছে দিতে হবে।" শুনে খোকা মনে মনে ভাবল 'এখন থেকে সন্ধ্যে, আঃ কতখানি,' অনন্তর মন ব'ললে 'উঃ কতটুকু।' অনন্ত খোকাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই দেখলে টেবিলের উপর কতকগুলি কাঁচের বড় ডিসে করে নানারকমের খাবার রয়েছে সাজানো। অনন্ত প্রথমেই খোকাকে ব'ললে, "খোকা, বেলা হয়ে গেছে অনেক তোমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে খুব বোধ হয়, আগে খেতে বসা যাক্ এসো খেতে খেতে গল্প করা যাবে এখন।" মা যেমন করে ছেলেকে খাওয়ায়, অনন্ত তেমনি করে খোকাকে এটা, ওটা, সেটা, খাওয়াতে খাওয়াতে গল্প করতে লাগলো কত। খোকা খেতে খেতে ব'ললে "ছবিতে আপনার চেহারা যেমন দেখেছি, তার চেয়ে চেহারা আপনার অনেক খারাপ হয়ে গেছে বাবা!"

"ছবিতে! কোন ছবিতে তুমি আমায় দেখেছো খোকা?"

"আপনার একখানা ফটো মার কাছে আছে, তাতে আপনার চেহারা খুব সুন্দর দেখেছি।"

"সহরের হাওয়া বড় খারাপ, এখানে ভাল মানুষ বদলে যায় রাতারাতি।"

"তবে, আপনি এখানে কেন?"

"কোথায় থাকবো তবে?"

"আপনি মার কাছে চলুন। মা আপনাকে জানাতে বলেছেন—আপনি তাঁর কাছে যেতে পারেন না এই এক দুঃখ ছাড়া, তাঁর আর কোন দুঃখ নেই। আপনি কবে যাবেন মার কাছে বাবা, বলুন।"

"এইবার যাব একদিন—।" ব'লতে ব'লতে অনন্ত রুমালে মুখ দিয়ে কাশতে লাগলো। ভয়ঙ্কর কাশতে কাশতে তার রুমালখানা রাঙ্গা হ'য়ে উঠলো। হঠাৎ তার বাবার মুখ থেকে রক্ত উঠতে দেখে খোকা যেন কেমন এক রকম হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো ভয়ে ভয়ে—"বাবা আপনার কি অসুখ করেছে?"

"অসুখ? না বাবা, তোমার বাবা একসঙ্গে দু'দিন কখন বিছনায় প'ড়ে থাকে নি।" ব'লতে ব'লতে আবার কাশি, আবার রক্ত—

"নিশ্চয়ই আপনার অসুখ করেছে বাবা। কি কষ্ট হচ্ছে, আমায় ব'লুন? বিছানায় শোবেন কি? ডাক্তার ডাকবো?"

"কাউকে ডাকতে হবে না, কিছু ক'রতে হবে না বাবা। এরকম রক্ত আমার ক'বছর ধরেই বেরুচ্ছে। একটু শুলেই সেরে যাবে। তুমি খেয়ে নাও।" গেলাসে হাত ডুবিয়ে হাত ধুয়ে, অনন্ত খাটে গিয়ে শুলো। খোকাও তাড়াতাড়ি করে খাওয়াটা সেরে, বিছানায় গিয়ে তার বাবার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে একটু পরে ব'ললে—

"এখানে আর কাউকে ত' দেখতে পাচ্ছি না, এখানে কি আপনি একাই থাকেন বাবা?"

"হুঁ।"

"আপনার চাকর-বাকরেরা সব গেল কোথায়—বাইরে গেছে বুঝি?"

"হুঁ।"

"একখানা হাত-পাখা পেলে, আপনার মাথাটায় একটু বাতাস ক'রতে পারতুম বাবা, একখানা পাখা আছে?"

অনন্ত ভাবছিল তখন—'বার বছর যাকে দূরে রেখে, বুকের মাঝে রোজ চেয়েছি পেতে দিনরাত' আমার অসুখ দেখে যার প্রাণ কেঁদে উঠেছে আমার সেবা ক'রবে বোলে, আমার মাথায় বাতাস দেবার জন্যে যে একখানি হাত-পাখা চাইছে আমার কাছে—তাকে বার বছর ধরে ঠকিয়ে এসেছি এতদিন আজ এখনও ঠকাচ্ছি। তার সকল কথার উত্তর ত' আমি সরলভাবে ব'লতে পারছি না—মিথ্যা ব'লেছি নিজের ছেলেকে। না, না, মিছিমিছি এ ভাণ কেন? ওর কাছে এ সং সেজে আছি কোন লজ্জায়? আমি গরীব, পথের ভিখারী, একথা জানলে, খোকা আমায় ঘেন্না ক'রবে? করুক। মুখ ফেরাবে? ফেরাক। গায়ে থুতু দেবে? দিক। তবু সত্যি ওর বাপ যা তাই ও জেনে যাক। অনন্ত নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলে না, ঝর ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে খোকাকে সব ব'লে ফেললে—

"খোকা, এ বাড়ী, এ ঘর, এই পোষাক, এই আসবাব এর কোনটা আমার নয়—সব পরের দয়ায় পাওয়া। আমার ছেলে আসবে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে—আমার কিছু নেই—তাই তারা এসব আমায় ভিক্ষে দিয়েছে। আমি গরীব, ক'লকাতার পথে পথে রিক্সা টেনে বেড়াতুম, রিক্সা-টানা-কুলি। এখন সে ক্ষমতাও আমার গিয়েছে—এখন আমি পথের ভিখারী।"

তখন তার ধারকরা দামী সাজ-গোজের ভেতর থেকে খোকার চোখে তার বাবার কঠোর পরিশ্রমের মহিমাময় করুণ মূর্ত্তিখানি ফুটে উঠলো—সে ভাবল এই অদ্ভুত লোকটী কি কষ্টে নিজের জীবন কাটিয়ে, ছেলের লেখাপড়া, শিক্ষার জন্য, কি দরাজ হাতে মাসের পর মাস এতদিন টাকা জুগিয়ে এয়েছে, নিজের জীবন এমনিভাবে ক্ষয় ক'রে। শ্রদ্ধায় তার মাথা তার বাবার পায়ের তলায় যেন লুটিয়ে পড়লো। তার মা তাকে যতগুলি টাকা দিয়েছিল ক'লকাতাতে তার ইচ্ছামত খরচ করবার জন্যে, তাছাড়া তার আশ্রমের পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার বৃত্তির টাকা সব সে পকেট থেকে বের করে ব'ললে—"বাবা, এগুলো এখন রাখুন আপনার কাছে, এগুলি আপনার ছেলের।"

"না, না, ওসব আর এখন আমার দরকার নেই—ও তোমার কাছেই থাক বাবা। শুধু আমি তোমাকে চাই বাবা. আর কিছু চাই না—ওরে তুই আমার কাছে আয় খোকা, একবার আমার-বুকে আয়।" খোকা তার বাবার বুকে তার মাথাটি রাখলে। অনন্ত খোকার পিটে কত যত্নে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তার জীবনের কত স্বপ্ন, কত সাধ তার ছেলেটীকে এমনি ক'রে একদিন বিছনায় তার বুকে পাবার জন্যে, অনন্ত যেন সবাইকে লুকিয়ে এতদিন ধরে কত আশার জাল বুনতো রোজ রাত্তিরে। আজ তার খোকা তার বুকে। নিজের ছেলেকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে যে সুখ, তা বাপ নহ'লে অপরে কেউ বুঝবে না। আমারই রক্তে মাংসে গড়ে উঠেছে ওর এই সুন্দর দেহখানি। কেমন নরম, কেমন গরম। মাথার চুলগুলি যেন ওর মায়ের মতই নরম, রেশমের মত চক্চকে।

এদিকে অনন্তর সেই আড্ডার বন্ধুরা রাস্তার ওধার থেকে বাপ আর ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝে মাঝে দেখে যাচ্ছিল দূর থেকে খোলা দরজাটার ভেতর দিয়ে, আর মনে মনে অনন্তর সুখের কথা ভেবে তাদের বুকটাও যেন ফুলে ফুলে উঠছিল সেই সঙ্গে। কিন্তু তাদের কেউই বাপ-ছেলের এ সুখের ঘোর ভাঙ্গাতে ঘরে এসে ঢোকেনি। হয় ত' তারা মনে ক'রেছিল, তাদের চেহারায় তাদের চরিত্রের এমনি একটা উৎকট ছাপ পড়ে গেছে যে হাজার চেষ্টা ক'রলেও চোদ্দবছরের এই ছেলেটার চোখ এড়িয়ে যেতে পারবে না কিছুতেই। তার বাপের সম্বন্ধে ছেলেটীর মনের ছবিটীকে তাদের এই সব দুশমন চেহারার ছায়া ফেলে ঢেকে কালো ক'রে দিতে চায় না বলেই তারা অতটা দূরে সরে আছে আজ।

এতদিন অনন্তর একমাত্র ভাবনা ছিল তার এই খোকা, শোভার কথা মনে প'ড়তো তার মাঝে মাঝে। কিন্তু এখন খোকাকে বুকে পেয়ে অনেক দিনের লুকানো-ব্যথা হঠাৎ উঠলো টন্ টন্ ক'রে। তখুনি উঠে তাড়াতাড়ি টেবিলের ভেতর থেকে শোভার একটি নূতন সাড়ী আর খোকার জন্যে তার কেনা একটা মাউথ অর্গ্যান বার ক'রে খোকাকে ব'ল্লে অনন্ত—

"এ সাড়ীখানি তোমার মাকে দিও, আর বাঁশীটী তোমার জন্যে কিনেছি খোকা, নাও ধরো—।"

খোকা যেন এক পা পিছিয়ে গিয়ে ব'ল্লে—

"দুঃখু ক'রো না বাবা, আমি ও দু'টীর কোনটাই নিতে পারবো না।"

আশ্চর্য্য হয়ে অনন্ত খোকার মুখের পানে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে ব'ল্লে—"কেন বাবা?"

শান্ত ভাবে খোকা বলে—

"ও দু'টোর কোনটাই ত' দিশী নয় বাবা। মা আমার খদ্দর পরেন, ঢের বাঁশী ত' এদেশে হয় বাবা।"

মিস্ত্রী এসে ঘরে ঢুকলো ঠিক এই সময় খোকাকে মাষ্টার ম'শাইর কাছে পৌঁছে দেবে ব'লে। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বাপ আর ছেলের শেষের এই কথাগুলো মিস্ত্রী শুনছিল, তাই অনন্তর হয়ে খোকাকে বুঝিয়ে ব'ল্লে—

"তোমার বাবা জানতেন না, তাই কিনেছেন বিদেশী জিনিস। আর কখনও কিন্বেন না। তুমি বাঁশী আর সাড়ী নাও, না নিলে তোমার বাবার মনে কত দুঃখু হবে।"

অনন্তর ভারি ভাল লাগছিল—ছেলেটীর এই দেশভক্তি। সে খোকার সেই তেজস্বী মুখের পানে তাকিয়ে যেন দেখতে পেলে—হাজার হাজার লোকের ভীড়—কত মেয়ে, কত পুরুষ। মাঠের মাঝখানে সেই রূপালী উঁচু ডাণ্ডাটির উপর ভারতের জাতীয় পতাকা উড়ছে, আর তার তলায় দাঁড়িয়ে নির্ভিক বীরের মত অন্য অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে খোকা গাইছে 'বন্দেমাতরম্' গান। তার

খোকার মুখ যেন স্বর্গের আলোয় জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে। তার বুক ভরে উঠে আনন্দে। সে সস্নেহে খোকাকে বলে—

"খোকা, যাবার আগে সেই গানটা আর একবার আমাকে গেয়ে শুনিয়ে যাও।"

"কি গান বাবা ?"

"বন্দে মাতরম্— ।"

খোকা গাইতে থাকে, শুনতে শুনতে অনন্তর সারা গায়ের রোম উঠে খাড়া হ'য়ে। যখন সে গান থামলো, অনন্ত তার কাশি আর চেপে রাখতে পারলে না। কাশতে কাশতে অনন্তর আবার রক্ত বেরুতে লাগলো। খোকা যেতে যেতে আবার ফিরলো। অনন্ত তাকে হাত নেড়ে যেতে ইসারা ক'রে ব'ললে—

"এ কিছু নয়—এমনি আমার রোজ হয়। তুমি যাও, মিস্ত্রী খোকাকে নিয়ে যাও—নিয়ে যাও ওকে এখান থেকে, শীগ্‌গির—"

মিস্ত্রী খোকাকে নিয়ে চ'লে গেল। তার সেই মিষ্টি কচি গলার বন্দেমাতরম্-গান যেন তখনও অনন্তর বুকের মধ্যে বাজতে লাগলো। তখন তার চোখের উপর ভেসে উঠলো—তার সেই মাটি-ঝরে-পড়া খোড়ো-চালা, ছায়া-ঘেরা বাঁশবন, ধানের-শীষে-ঢেউ-খেলানো মাঠ, আর তার মাঝে শোভার সেই হাসি মুখ, সে খোকাকে বুকে নিয়ে সোনার ধানের ফসল কাটছে মনের আনন্দে, অনন্ত তাদের যেন দেখছে আর হাসছে—অনন্ত বিছানায় প'ড়ে চোখ বুজলো—কত তৃপ্তি, কত শান্তি ফুটে উঠেছে আজ তার মুখখানিকে ঘিরে।

সহরের রাস্তায় ঠুং ঠুং ক'রে কত রিক্সা চলে যায় অনন্তর খোলা দরজাটার সামনে দিয়ে, অনন্তর সে ঘুম আর ভাঙে না।

করালবদনী কালী

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার এট্-ল

মদমত্ত মাতঙ্গিনী ঘোরা রুদ্ররূপা
করালবদনী কালী রণমূর্ত্তি বেশী
দাঁড়ালি শ্মশানে এসে কৃতান্ত স্বরূপা
নরমুণ্ড মালা গলে এলি এলোকেশী ?
দিগম্বরী পতিবক্ষে রাখিয়া চরণ
লজ্জা-ঘৃণা-ভয় দূরে দিলি জলাঞ্জলি,
বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ তোর সঘন নিশ্বাসে
বিঘূর্ণিত রক্তচক্ষু ক্ষণে ওঠে জ্বলি' ।
ধ্বনিত শৃগাল-সঙ্গে সরন্ধ্র কঙ্কালে
কালান্তক ঝঞ্ঝা তোলে তীব্র আর্ত্তনাদ,
ক্লান্তিহীন কলরোলে শীতার্ত্ত-নীশীথে
শকুনী চিৎকার শুনি' বাড়িছে আহ্লাদ ?
পদভরে কাঁপে পৃথ্বি, জলধি উথলে,
হুঙ্কারে মূর্চ্ছিত হয় ভয়ার্ত্ত মানব,
তীব্রদংষ্ট্রা পশুকুল মাতে মহোল্লাসে—
কাড়াকাড়ি করে লয়ে পূতিগন্ধ শব ।
শ্মশানে তমিস্রা রাত্রে কেন এলি শ্যামা,
শ্যামলী ধরণী চাস্ বিচূর্ণ করিতে ?
প্রলয় হুঙ্কারে তোর কম্পিতা মেদিনী
ভুজে কি কৃপাণ তোর ভূ-ভার হরিতে ?
স্বার্থে স্বার্থে নিত্য দ্বন্দ্ব নিরত সংগ্রাম,
দরিদ্রের অশ্রুজলে ব্যথিতা জননী ?
অন্ধ অহংকারাচ্ছন্ন অজ্ঞ মূঢ় নর,
বিপুল মেদের ভারে গর্ব্বোদ্ধত ধনী ।
ফুৎকারে উড়ায়ে দিস্ অসম বণ্টন,
ব্যাভিচারী পশু যেন প্রচণ্ড তাড়নে
অবলারে নাহি করে পুনঃ অপমান ;
সমতা আনিয়া দিক্ অন্ন জনে জনে ।
রুদ্রা, তবে মেতে ওঠ্ প্রলয়-নিনাদে
ধিকি ধিকি প্রজ্জ্বলিত হউক নয়ন,
লেলিহান অগ্নি জিহ্বা উষ্ণ রক্ত মাখা
শঙ্করী শ্মশানে হোক্ প্রলয়-নর্ত্তন ।
আয় তুই চিত্তদলে নৃত্যময়ী শ্যামা,
উঠুক্ বিকট রুদ্র অট্ট অট্ট হাস,
নূতন সৃজন মত্তা, অয়ি প্রজ্ঞাময়ী—
ধ্বংসের ফাটলে জাগে নবাঙ্কুরাভাস ।

বাংলা গান ও উমা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ব্যথারে আড়ালে রাখি' আনন্দ যে বিলাত উছলি' :
সুন্দরের মন্ত্র যার প্রাণে নিত্য তুলিত ঝঙ্কার :
বসন্তের মন্দাকিনী ছিল যার হাসির উৎসার :
সুখ যে বাসেনি ভালো সুধা ভালোবেসেছিল বলি' :
টুটিল বীণার তন্ত্রী কেন তার সুর না বাঁধিতে ?
অকালে ঝরিল কেন অবিকচ আলোক-কলিকা ?
গীতির তারকা যার চিত্তাকাশে জ্বালিত দীপিকা
অবেলায় নিভিল সে কোন্ নব প্রদীপ্তি সাধিতে ?
জানি না—কেবল জানি : ক্ষণদ্যুতি ব্যর্থ কভু নয় :
অন্ধকারে অবসান কোথা তার যে শুভ্র চিন্ময় ?

আট বৎসর প্রবাসবাসের পর যখন প্রথমবার বাঙ্গালাদেশে ফিরি ১৯৩৭ সালে তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ লোকপ্রিয় গায়ক বন্ধুবর শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হাজির। বললেন, "আমার একটী ছাত্রী আছে, তার কোকিলকণ্ঠ শুনলে খুসি না হ'য়ে পারবে না। তোমারি দু'একটা গান শিখতে ভারি উৎসুক। দু'একটা গান শেখাবে তাকে ? ভালো বাংলা গান ?"

সে সময়ে অনেকদিন বাদে ক'লকাতা ফিরেই গানবাজনার আবর্ত্তে প'ড়ে গেছি। ব'ললাম তাই আমতা আমতা ক'রে, "আচ্ছা মেয়েটির গান একদিন আগে শুনি ত'—কী নাম বললে ?"

"হাসি—ভালো নাম উমা। বাবা মা দু'জনই কী যে ভালো লোক! চমৎকার পরিবার! ওর গ্রামোফোনেও কয়েকটা গান আছে।"

কথাগুলো মন দিয়ে শুনি নি। সেবার এত বেশী চমৎকার পরিবার ও সুকণ্ঠী মেয়ের গান শুনেছিলাম—(কয়েকজনকে বাধ্য হয়ে শিখাচ্ছিলামও ঠিক সেই সময়ে)—যে ফের নূতন একটি "কোকিলকণ্ঠী"র গুরুভার বহন ক'রতে মন ভরসা পায় নি। আরও এই জন্যে যে, যে-ধরণের বাংলা গানের প্রভাব আমার কাছে বাঞ্ছনীয় মনে হ'ত সে-ধরণের বাংলা গান গাইতে হ'লে কোকিলকণ্ঠী হওয়াই যথেষ্ট নয়—সেই সঙ্গে চাই প্রতিভা তথা শ্রমস্বীকার ক'রবার ঐকান্তিক আগ্রহ। আরও মুস্কিল এই যে প্রতিভা যদি বা কচিৎ মেলে সেই সঙ্গে আগ্রহের মণিকাঞ্চন যোগ মেলে না। আমি ইতিপূর্ব্বে বহুবার ঠেকে শিখেছিলাম কি না যে, বিবাহযোগ্যা মেয়েরা গানে দীক্ষা নেয় (সাড়ে পনর আনা ক্ষেত্রে) গানের মন্ত্র জপ ক'রতে ক'রতে বিবাহের মালা ফেরানো একটু সহজ হয় ব'লে। এ উদ্দেশ্য অসাধু এমন কথা বলি না, কিন্তু গানের একটা নব আদর্শ আমার মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা

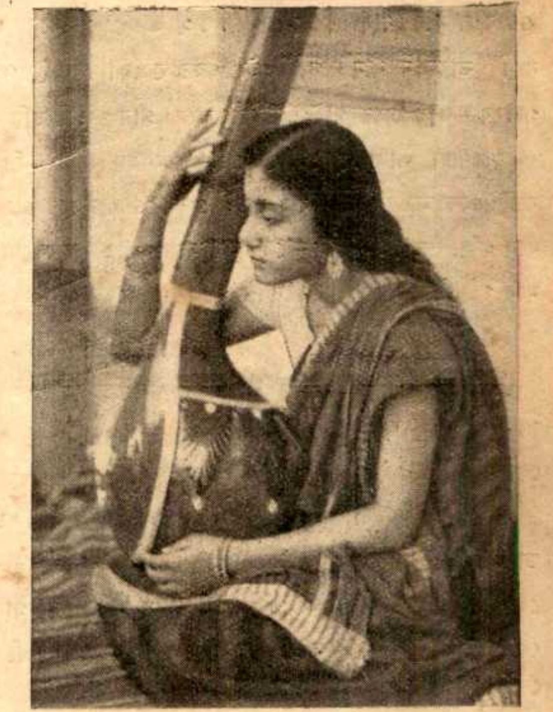

৺কুমারী উমা বসু (হাসি)

জন্ম—২২ জানুয়ারী, ১৯২১, অবসান—২২ জানুয়ারী, ১৯৪২

পেয়েছিল আট বৎসর শ্রীঅরবিন্দের চরণচ্ছায়ায় থেকে। এ আদর্শ বরণ করার পরে আর শুধু কাব্যের জন্যে লিখতে বা সুরের জন্য গান গাইতে বা শেখাতে আর প্রবৃত্তি ছিল না। গানের মধ্যে দিয়ে আত্মনিবেদনের আত্মউন্মোচনের প্রেরণা না পেলে কী হবে গান গেয়ে—গুরুর কাছে এইটাই আমি শিখেছিলাম। অথচ গানকে, বিশেষ করে আত্মনিবেদনের গানকে, যে কোনো আধুনিক কুমারী ঐভাবে অস্বীকার

ক'রতে পারবেন এ দুরাশা আমি মনে স্থান দিই নি। কাজেই না করি নি।

তারপর হঠাৎ একদিন থিয়েটার রোডের বাড়ীতে এলেন ৺ধরণীকুমার বসু, লীলা ও ৺হাসি। লীলার সঙ্গে আগে দেখাশুনো হ'ত, কিন্তু ধরণীদাদাকে পূর্ব্বে দেখি নি কখনো।

প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো লেগে গেল। প্রিয়দর্শন, শান্ত অথচ বলিষ্ঠ দৃঢ়কায় মানুষটি—স্পষ্ট কণ্ঠ, মিষ্ট ব্যবহার অথচ এতটুকু জাহিরিপনা নেই কোথাও। হাসিকে ফরমাস্ করলেন, "গা না একটা গান—অমন জড়োসড়ো কেন?"

হাসি ভয়ে আরও যেন মাটিতে মিশিয়ে গেল। তখন ওর বয়স সবে ষোল—কিন্তু দেখলে ১৩।১৪র বেশী মনে হয় না। ভাবলাম মনে মনে, এই একরত্তি কোকিলকণ্ঠী গান গাইবে—তার উপর গাইবে ভালো বাংলা গান? হরি হরি!"

ধরণীদা লীলা দুজনেই ফের হাসিকে ধম্‌কালেন—কিন্তু যতই ওকে অভয় দেওয়া যায় ততই ও আরও ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মনে হ'ল, ভালোই হ'ল—কে আর সাধ ক'রে নাহক খেটে মরে? কিন্তু কৃশকায়া বালিকার মুখচোখে কী একটা আলো ছিল।

শ্যামলী মেয়ে—অসামান্য সুন্দরীও নয়—তবু সুশ্রী মুখখানিতে একটি অনির্ব্বচনীয় কিছুর আভা ছিল। "মায়া হয় দেখলে" ব'লে একটা ঘরোয়া কথা আছে না?

ব'ললাম ভরসা দিয়ে, "গাও না হাসি!" নাম ধরে ডাকতে বোধ হয় একটু ভরসা পেল। গাইল সকুণ্ঠে—কোন মতে দায়সারা ক'রে—খালি গলায় কি একটা গান, যেমন গান কুমারীরা সবাই-ই গায় অথচ কেন গায় ঠিক বোঝা যায় না।

হোক্, কিন্তু কণ্ঠ? সে তো কণ্ঠ নয়, আলো। সুর ধরতে না ধরতে চম্‌কে গেলাম। বইয়ে পড়েছিলাম প্রায় শতাব্দী আগে, আফ্রিকার কোন ওলন্দাজ কৃষাণ কয়েকটি ছেলেকে মার্ব্বেল খেলতে দেখেন। তাদের মধ্যে একটি 'মার্ব্বেল' ছিল হীরে, সেটি জহুরীকে দেখাতে জহুরী তার মূল্য ধরে পাঁচশো পাউণ্ড, সাড়ে সাত হাজার টাকা। এই নাকি ও দেশে হীরের খনি আবিষ্কারের সুরু।*

হাসির কণ্ঠ পরে যত শুনতাম তত মনে পড়ত এ কাহিনী। ওর আশে পাশে যারা থাকত তারা শুধু জানত ও কণ্ঠ অন্য পাঁচটা কণ্ঠেরই মতন, ছেলেমেয়েরা যা নিয়ে সুরের মার্ব্বেল খেলে, কোরাস গায়, চা-পার্টিতে যা শুনে আনমনারা বলেন—বাঃ। কিন্তু জহুরীর চোখে (থুড়ি কানে) এ কণ্ঠ মার্ব্বেল নয় হীরেই বটে, আর যে সে হীরে নয়, একেবারে কোহিনূর। অন্য পাঁচটার সঙ্গে যাকে এক আসনে বসানো যায়, খাপ খাওয়ানো যায় না।

কাছে ডেকে আদর ক'রে ব'ললাম, "ভগবান তোমাকে যে গলা দিয়েছেন তার মূল্য যেন তুমি বুঝতে পারো হাসি। এ গলা যার, তার আবার গাইতে ভয়?"

ও ব'লল না কোন কথা। কিন্তু মুখচোখে খুসির দীপ্তি উঠল ঝলমল ক'রে; যদিও ভাবল আমি মামুলি প্রশংসাই করছি। নিজের শক্তি ও প্রতিভা সম্বন্ধে এমন নিরীহ অবিশ্বাস (বিনয় বললে ভুল হবে কেন না বিনয় আত্মসচেতন) কোনো প্রতিভায় আমি দেখি নি। এমন কোনো সম্পদ্ নেই যা ওর কণ্ঠের ছিল না, অথচ ও সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত জানত না কি জিনিষ ও না চাইতে পেয়েছে, জন্ম থেকে—বিনা সাধনায়। এই আত্মসচেতনতার অভাব ওর মুখশ্রীকেও মণ্ডিত করেছিল এক অপরূপ মাধুর্য্যে। বলতে কি, ওর মুখশ্রীর লাবণ্য ছিল সেই শ্রেণীর যাকে যত দেখা যায় ততই ভালো লাগে, কেন না ততই চোখ খোলে, দেখতে শিখি সে শ্রীর মধ্যে নব নব দ্যুতির আবির্ভাব, ততই বুঝি যে ওর মুখের আলো, বাইরের রূপের আলো নয় (সেভাবে রূপসী ও ছিল না) অন্তরের আভাই ওর মুখশ্রীকে স্বয়ংপ্রভ ক'রে তুলেছিল। শুধু রূপ কেন, ওর হাসি, সম্ভাষণ, আদর যত্ন সব কিছু সম্বন্ধেই একথা বলা যায়। কোনো কিছু দেখানেপনা, জাহিরিপনা, ঠাট-ঠমক ও জানত না, ভিতর থেকে যা আসত সেই ঝোঁকেই ও চলত সর্ব্বদা। তাই লোকে অনেক সময়েই ওকে ভুল বুঝত। কারণ সামাজিকতা ওর রপ্ত ছিল না, শেখা ভদ্রতায়ও না ছিল ওর রুচি না সাধ। ওর মনের প্রাণের ছাঁচটা ডেমোক্রাটিক ছিল না, আরিষ্টক্রাটিক; তবে ঐ যে ব'ললাম সদা-অপ্রভিত আরিষ্টক্রাট।

যা হোক্ বললাম ওকে, "যাব তোমাদের বাড়ি তোমাকে

---

* Freedom and Organization—Chapter 31—Bertrand Russell.

ত্ত একটা গান শেখাতে। কেমন?" যেন একটা শিশুর সঙ্গে কথা কইছি। শিশুই ত'।

ওর মুখে লজ্জা ও সঙ্কোচের আর চিহ্নও রইল না, ও ভেবেছিল ওকেই আসতে হবে বুঝি। চমকে হাসিভরা মুখে বলল, "আমাদের বাড়ী? আসবেন সত্যি?" শিশু নয়?

ধরণীদা খুসী হ'য়ে বললেন, "গাড়ী পাঠাব, কখন আসবেন জানালে।"

এমন স্নিগ্ধ সৌজন্য। লীলাও খুসী হ'য়ে উঠল। ব'লল, "আপনার কথা হরেন্ বাবুর মুখে আগে শুনেছি ইত্যাদি ইত্যাদি, সেদিন টিকিট ক'রে আপনার গান্ শুনতেও গিয়েছিলাম। হাসি আপনার কথা গেলে যেমন শিশুরা রূপকথা গেলে।"

*

গেলাম পরদিনই, বোধ হয় জুন মাস তখন, কিম্বা মে মাস মনে নেই। সকাল বেলা, মনে আছে।

হাসি এল। ওদের টেবিল হারমোনিয়ামে সুরু ক'রলাম ওকে একটা সহজ ভাটিয়ালি গান শেখাতে, অবশ্য সাদামাঠা ভাটিয়ালি নয়, যে ধরণের ভাটিয়ালি আমি রচনা করতাম সেই ধরণেরই ভাটিয়ালি, "যখন গাহে নীল পরী।" এ গানটি পরে ও গ্রামোফোনে দিয়েছিল।

অবাক হ'য়ে গেলাম ওর আশ্চর্য্য দ্রুত শেখার ক্ষমতায়। ছোট ছোট তান, মিড়, গমক মোচড় প্রভৃতির অলঙ্করণ ওর কাছে কী যে সহজ ছিল! অথচ এ-ঢঙের গান ও ত' শেখে নি কখনো! ও জানতও না ও কি আশ্চর্য্য নিখুঁৎ শিখছে, সঙ্গীত পরিভাষায় "গলায় তুলছে"—কিন্তু আমি জানতাম ত'।

সপ্তাহে দুদিন সময় ক'রে আসব বললাম।

কিন্তু ক্রমশঃ একদিন অন্তর আসতে বাধ্য হ'লাম। পরে প্রায় রোজই, শেষের দিকে রোজই দুবেলা। দুল ও কণ্ঠ যে—[illegible] সব ছাত্র ছাত্রীকে ছেড়ে আসতে হ'ল, নিরুপায়।

এমনি ক'রে গুরুশিষ্যার অপরূপ সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ এ ভাবে আমার জীবনে আর কখনো গ'ড়ে উঠে নি, এই বিশুদ্ধ আনন্দের বীজ বুনে আশা-পূরণের ফসল ফলানো। আর কোনোদিন অমন ক'রে উপলব্ধি করি নি যে শিষ্যার কাছে গুরু নিজেও দীক্ষা পান—আত্ম-আবিষ্কারের দীক্ষা। আমার যা শ্রেষ্ঠ দেয় তা আমার ওর পরম স্নেহের পাত্রী স্নেহভরে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করছে আর গ্রহণ করার উদ্দীপনায় আমার দেওয়ার শক্তিকে, সৃজনী প্রতিভাকেও উসকে দিচ্ছে—এ-ধরনের অনুভব অবশ্য আগেও হ'য়েছে। কিন্তু এমন গভীর ভাবে, সমগ্র ভাবে নয়। কেন না এর আগে যাদের শিখিয়েছি তাদের কেউই যে ধরণের বাংলা গান আমার আদর্শ তাকে এমন সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নি, বরণ করে নি এমন অকুণ্ঠ শিশু-সরল অহেতুক আনন্দ-অভিনন্দনে। এ অহৈতুকী প্রতিশ্রুতির ক্ষমতায়ও হাসির জুড়ি আমি এযাবৎ আর দেখি নি। ওর আগে অবশ্য অন্য ছাত্র ছাত্রীরা অনেকেই শিখেছিল, সাগ্রহেই শিখেছিল, অনেকে খুব ভালোই শিখেছিল যেমন ঢাকায় ১৯২৭ সালে শ্রীমতী রেণুকা সেনগুপ্ত। কিন্তু এমন ক'রে নয়, এ ভাবে বাংলা গানকে প্রাণ দিয়ে বরণ করতে আমি আর কাউকে দেখি নি কখনো। যতক্ষণ আমি গান ক'রতাম হাসি শুনত শুধু কান দিয়ে নয়, প্রাণ দিয়ে। বাংলা গানে শ্রদ্ধার এহেন অসামান্য ক্ষমতা ও ওস্তাদি-টংকৃত কনফারেন্স-মুখরিত যুগে আমার ত' অন্তত আর চোখে পড়ে নি এ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের মধ্যে। কেবল সম্প্রতি মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠ তামিল গায়িকা শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী দেবীকে বাংলা গান শেখাবার সময়ে খানিকটা পেয়েছিলাম হাসির শ্রদ্ধার স্বকীয় ছন্দ না হোক সাদৃশ্য। তাকে দিয়ে গ্রামোফোনে যখন বাংলা গান দেওয়াতাম মনে হ'ত আরো বেশি ক'রে হাসির কথা। সত্যি এ দুই অসামান্য তরুণী প্রতিভাকে মনে হ'ত জুড়ি। কিন্তু সে কথা যাক। শুভলক্ষ্মীর প্রসঙ্গ এখানে তুললাম শুধু জানাতে যে বাংলা গান এমন যত্ন ক'রে, শ্রদ্ধা ক'রে শিখতে আর কোনো মেয়েকে দেখি নি হাসির পর। অবশ্য শেখার উৎসাহ অনেকের মধ্যেই দেখেছি, কিন্তু নিজের সমস্ত শক্তি, আগ্রহ ও প্রতিভাকে বাংলা গান শেখার কাজে এ ভাবে নিয়োগ করতে দেখা এ যে একটা কত বড় সৌভাগ্য!

সৌভাগ্য বলছি আরও হাসির বাংলা গানে দ্রুত উন্নতির কথা স্মরণ ক'রে। প্রতি সপ্তাহে এগিয়ে চলত ওর কণ্ঠ-সাধনা কি ভাবে, সে লিখে বর্ণনা করা অসম্ভব—স্বকর্ণে

শুনতে হয়। ওর অসামান্য ছন্দজ্ঞান, শ্রুতিবোধ, ধীশক্তি, কঠিন কঠিন তান গমক মূর্চ্ছনাকেও শুনতে না শুনতে আয়ত্ত করার আশ্চর্য্য প্রতিভা—সর্ব্বোপরি, প্রতি সুরের মর্ম্মকোষে ওর পুষ্পল প্রাণটির মধু নিংড়ে সজীব সরস সুগন্ধী ক'রে তোলা, ওর হৃদয়ের সমস্ত কুমারী শুভ্রতা ও মাধুরীর সঞ্চারে জীবন্ত ক'রে তোলা, শেখা জিনিষকে, কণ্ঠস্থ বিদ্যাকে অন্তরাত্মার ঐশ্বর্য্যরূপে পরিণত করতে পারা—এ স্বকর্ণে না শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত, বর্ণনা করতে গেলে পাঠকের মনে হওয়া বিচিত্র নয়—এ আতিশয্য।

কবির একটি কথা মনে পড়ে, "How rarely comest thou O Spirit of delight!" এ দুঃখময়, ঈর্ষাবহুল, হিংসাজর্জ্জর জীবনে আনন্দের দেবতা এলেও তাকে ঠাঁই দেব কোথায়? তবুও তিনি যে দেখা দেন আজও, এ জগতেও এ আর এক আশ্চর্য্য! অনেকের জীবনেই হাসি-র গান শোনা ছিল এই শ্রেণীর অভিজ্ঞতা এটা প্রমাণ করা খুবই সহজ। তবে এ-হেন রসজ্ঞও খুব সংখ্যাবহুল নয়। এ সংসারে ক্রিটিক মেলে অজস্র কিন্তু দরদী মেলে কালে ভদ্রে। আর ক্রিটিকরা ক্রিটিক ব'লেই আশ্চর্য্য আনন্দের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে যাঁরা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেন তাঁদেরকে বুঝতে পারেন না, ক্রমাগতই "সংযম" "সংযম" ক'রে আসর জমৃকে রাখেন, নৈলে পাছে কেউ কারুর বেশী সুখ্যাতি ক'রে ফেলে। কিন্তু আর্টে সংযমের যথেষ্ট মূল্য থাকলেও আসল সমস্যাটা ত' সংযম নিয়ে নয়, সত্য নিয়ে। অর্থাৎ যা দেখছি সেটা উচ্ছ্বাসের যোগ্য কি না? যদি হয় তাহ'লে উচ্ছ্বাস না করাটাই হবে কৃপণতা পূজ্যাপূজ্যাব্যতিক্রম। কারণ সংযমের অজুহাতে প্রশংসার কার্পণ্যের নাম কি দেব—এক অনুদারতা বা সঙ্কীর্ণতা ছাড়া? হাসির গানের প্রতিভা সম্বন্ধে সংযত হ'য়ে কথা বলাটাই তাই আমার কাছে অশোভন ব'লে মনে হয়। যার প্রাপ্য কণ্ঠের মালা তাকে হাতি ঘোড়া উপঢৌকন দিলেও অমর্য্যাদা করাই হয় না কি? কিন্তু যাঁরা ওজনদরে মূল্য কষেন তাঁরা একথা বোঝেন কবে? মনে আছে এক বিজ্ঞ ওস্তাদিপন্থী আমাকে একদিন গম্ভীরমুখে বলেছিলেন, যে বেশী বললে এফেক্ট হয় না ব'লেই তিনি অতি সতর্ক হ'য়ে কম কম ক'রে ব'লে থাকেন। অর্থাৎ হাততালি দেন তখনই যখন জানেন অন্যে তাতে সায় দেবে, নইলে হাত থাকেন মুঠো ক'রে। পরমহংসদেবের কথা মনে পড়ে, "মূলো খেলে মূলোরই ঢেঁকুর ওঠে।" পরিণামদর্শিতা যার মজ্জাগত বেপরোয়া স্বীকৃতি তার কাছে ভয়াবহ হ'য়ে দাঁড়ায়—দাঁড়াতে বাধ্য। তাই ক্রিটিকবরের সঙ্গে বৃথা বচসা রেখে শুধু বলেছিলাম, "আপনার ভাবে আপনি চলুন। আমার ভাব ও নয়, কেন না আমার আদর্শ এফেক্ট নয়—সত্যভাষণ, যার বর্ণপরিচয় হয় না বিচক্ষণতার অতিসংযমে সাবধানতার পরমুখাপেক্ষিতায়। আমার প্রার্থনা এই যে যাতে আমার হৃদয় দুলে উঠে তাকে যেন হৃদয়ের ভাষাতেই স্বীকার করতে পারি চিরদিন, অন্যের মনে তাতে এফেক্ট হবে কি না সে চিন্তা ছেড়ে।" হাসির গীতিপ্রতিভার সম্বন্ধে একথা বললাম আরও এই জন্যে যে আমার অনেক উন্নাসিক বন্ধু এই সমজদারটির মতনই ওর বাংলা গান শুনে বলতেন, এমন আর কি? সার্গম নেই, না তবলার মাতামাতি, কণ্ঠ প্রবল নয়, না আছে হাঁকডাকের জৌলুষ, শোম নিয়ে জলন্ত হৈ চৈ নেই, আরো কত ওস্তাদি নৈপুণ্যের অভাব, সে এক সাড়ে তিন গজী ফিরিস্তি! কিন্তু এঁদের বোঝানো যাবে কি ক'রে যে হীরের টুকরো আয়তনে কম ব'লেই উজ্জ্বলতায় কম নয়, তবে কি না হীরেকে যে চেনে তারই নাম জহুরী, আর জগতে জহুরী বড় বেশী মেলে না। তাই বাংলা গানে হাসির কণ্ঠে বাঙ্গালীর ভাবসাধনার যে আলোটি ফুটে উঠত ওস্তাদিপন্থীরা তাকে বুঝবেন এমন আশা রাখি না, সে কণ্ঠ ছিল মাধুর্য্যের খনি, প্রতিভায় স্বয়ংপ্রভ, আশ্চর্য্য সৌকুমার্য্যের লীলাভূমি, সব চেয়ে বড় কথা—ওর অনুপম নির্ম্মল কুমারী অন্তরের অসামান্যতায় জ্যোতির্ম্ময়। ওর মুখের প্রতি ভঙ্গীতে, সুরের প্রতি দোলায়, ছন্দের তালের প্রতি ঝোঁকে ওর হৃদয়ের আলো ঢেউ হ'য়ে এসে লাগত, বিশেষ ক'রে ওর বাংলা গানে, তানে মিড়ে গমকে আখরে। She touched nothing which she did not adorn—একথা ও সম্বন্ধে অসঙ্কোচেই বলা যেত।

ওর জীবনের দুঃখের কথা বলবার স্থান এ নয়। দু'ক সে-দুঃখ বলাও যাবে না। কচিৎ ও প্রকাশ করত এ দুঃখী ওর সবচেয়ে দুঃখ ছিল মানুষ স্বভাবত অনুদার ও সঙ্কীর্ণ। কেন লোকে ভণ্ডামি করে সুবিধের জন্যে? মিথ্যা বলে কাজ আদায় করতে? কিন্তু এ ছাড়া ওর পারিবারিক জীবনে

যে-দুঃখ ওকে সবচেয়ে বেজেছিল সে ওর স্নেহময় পিতার ও ভাইয়ের অকাল মৃত্যু।* কিন্তু সে কথা ও বলত না কাউকেই। ওর স্বভাব ছিল দীনধর্ম্মা—প্রতিগ্রহে ওর সঙ্কোচের অবধি ছিল না। তাই কেউ ওর দুঃখে আহা উহু করুক, এ ও চাইত না একেবারেই। ওর জীবনের মন্ত্র ছিল যেন—

আনন্দ মোর সকলের তরে
বিষাদ—সে থাক আমারি সাথা
বোবা বেদনার অশ্রুর ডোরে
হাসি-গান-স্নেহ-মালিকা গাঁথি।

তবু একথার উল্লেখ করলাম শুধু বোঝাতে কেন গানকে ও সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ করতে পেরেছিল। জীবনে ও যে-সত্য, যে-সৌন্দর্য্য, যে-সরল শোভা নিরন্তর চেয়েও পায় নি তারই ক্ষতিপূরণের কিছু অঙ্গীকার পেয়েছিল ও গানে। তাই ত' এখানে ওর নিভৃত কুমারী হৃদয়ের স্বপ্ন খানিকটা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল সুরের লাবণ্যে। ওর গানের প্রসঙ্গে এসব বলা একটু অবান্তর মতন শোনালেও আসলে অবান্তর নয়—কেন না ওর চরিত্রের তেজস্বিতা, ঋজুতা, সত্যপরতা, অকৃত্রিমতা সবই যে ওর গানে আভাময় হয়ে উঠেছিল একথা না বললে ওর গান সম্বন্ধেও একটা মস্ত কথা না-বলাই থেকে যাবে। গান ওর কাছে ছিল একটা সখ নয়—সাধনা। আর কি নিষ্ঠার সঙ্গে যে ও এ-সাধনা ক'রত তা ওকে যে দেখেনি সে কল্পনাও করতে পারবে না কোনদিন। আর যারা দেখেছে তারা কৃতজ্ঞ থাকবে ওর কাছে, কারণ এ তেল-নুন-লকড়ির রাজ্যে ভাবসঙ্গীতের মতন অকেজো সৌন্দর্য্য যে কারুর জীবনের মুখ্য সাধনা হ'তে পারে, এ মহৎ চাক্ষুষ করাটাও কম কথা নয়। বলতে কি, ও বহু গীতি-রসিককে, ভাবুককে, ভক্তকে গভীর আনন্দ দিতে পেরেছে এই জন্যেই যে ভাবসঙ্গীত ওর কাছে ছিল বিলাস নয়, প্রসাধন নয়, ছিল জীবনের উপজীব্য অন্তরের আরতি।

ভাবসঙ্গীত গান—বলছি এত ক'রে এই জন্যে যে এদিকটার উপর জোর না দিলে ও গীতিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশটির কথাই না-বলা থেকে যাবে। কারণ যদিও ও সব গানই ভাল গাইতো কিন্তু নিখুঁত গাইত ভাবপ্রবণ বাংলা গান। ওর মুখে "নির্ঝরধারা" "পূজা আমার সাঙ্গ হ'ল" "তব চিরচরণে" "শ্রীচরণে নিবেদনে" "আজি তোমারি কাছে ভাসিয়া যায়" "আধফোটা ছোট তারা" "আঁধারের এই ধরণী" "যখন গাহে নীল-পরী"—জাতীয় বাংলা গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন বাংলা গানের একটা নূতন বিকাশের ক্ষেত্রে ও অদ্বিতীয়া ছিল কোন্‌খানে ও কী কী গুণে। এ-সব গানের যে-ভঙ্গীতেই ও ছুঁ'ত সে-ভঙ্গীতেই দুলে উঠত প্রাণতরঙ্গ, ভাবের দোলা। এ না হ'য়েই পারে না—কারণ সুরে বাঙ্গালী নিপুণ হ'লেও স্বভাবে সে ভাবপ্রবণ জাতিই বটে—তাই বাঙ্গালীর স্বধর্ম্ম নয় শুধু ভাবহীন সুরবিহার। সে সবচেয়ে নিজেকে খুঁজে পায় যখন সে ভাবের তরী বায় সুরের পালে। হাসির হিন্দুস্থানি গানের পাশে ওর বাংলা গান শুনলে এ-কথা মনে না হয়ে উপায় ছিল না। একটা ছিল ওর শেখা, অন্যটা নিজস্ব।

কথাটা হয় ত' ওস্তাদি-পন্থী বাঙ্গালীদের কাছে একটু ঝাপসা লাগবে—যদিও আমার মনে হয় সহজ সরল ভাবে ভাবতে গেলে চিন্তাশীল ভাবুক বাঙালীর কাছে একথা দুর্ব্বোধ্য হবার কথা নয় যে বাঙ্গালী তরুণী "পিয়া"র তানে কখনই সে রং জাগাতে পারবে না যে-রং জাগাতে পারবে "বঁধুয়া"র তানে। এই কথাটিই হঠাৎ সে-দিন বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রবন্ধে প'ড়ে সে-দিন চমকে উঠেছিলাম তাই উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। সাহিত্য সম্রাট বলছেন :

"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিশালিনী—মৃদুপবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিভিতেছিল। যে-বারান্দায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকার আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজী কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজীর সঙ্গে এ ভাগীরথীর তো কিছুও মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও

---

* ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ধরণীপ মারা যান বাস উল্টে পড়ায়, যে কাহিনী আমার "ভূস্বর্গ চঞ্চল" বইটিতে লিখেছি, ১৯৪০-এ ওর একমাত্র ভাই (১৪ বৎসরের) মারা যায় টাইফয়েডে।

অনেক দূরে।…এমনি সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শোনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

সাধ আছে মা মনে
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী জীবনে।

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে তাহা বুঝিলাম।"

হাসির মুখে "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে," "রাঙা জবায় কাজ কি মা তোর," "মন তুমি কৃষি কাজ জানো না," "বঁধু কি আর কহিব আমি" শ্রেণীর ভক্তিসঙ্গীত যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বুঝবেন দাদুর একটি বিখ্যাত বাণীর মর্ম্ম যে :

"এমন ভাবে গান করবে যেন তোমাকে না প্রকাশ ক'রে ভগবানকে প্রকাশ করা হয়। নৈলে এই গান এই কলা সবই ব্যর্থ।"*

ওঁর ভক্তির গানে যে-আত্মভোলা আলো ফুটে উঠত সে-আলো ফুটে উঠতে পারে না যদি না আত্মাদরকে ছাপিয়ে প্রকাশ হয় সেই প্রেমময়ের জ্যোতি "যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। কারণ ওঁর অপরূপ কণ্ঠে এ-শিখা ও জ্বালত ত' ওঁর মনের বাতি দিয়ে নয়—ওঁর গভীর প্রাণের অতলে লুকোনো প্রেমের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে, ভক্তির উদ্দীপনা দিয়ে। গানে ওর চেয়ে বড় সার্থকতার কথা আমি জানি না।

---

* দাদু—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন—৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নববর্ষে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

যাঁরে নামে গোষ্ঠ পথে তারা-পথ হ'তে বাবা প্রভাতের খেয়া নিয়ে স্নিগ্ধ সমীরণে
আলোর মেখলা পরি' প্রেরণার প্রদীপন জাগাইয়া মনোমাঝে গন্ধ বিকীরণে—
তারা যে তোমারি কথা করে নিতি কাণাকাণি, কিশলয়ে কিশলয়ে ওঠে শিহরণ ;
ধেনুচরা নদীচরে ছায়াঘন নদীতটে চকরী বিহগশ্রেণী করে বিচরণ—
আশা সাধ কামনায়,—যেথা মাঠে বনতলে তরুর আতিথ্য লভি প্রজাপতি আসে,
রাজে যেথা রজনীর স্খলিত কুসুম-স্রজ, রাখালের বেণু বাজে, তুমি পরবাসে—
রয়েছ কি সুখে আজ ? ভুলে গেছ জীবনের পূর্ব্বাচল, ছিল যাহা স্নেহ মধু মাখা ;
কুটির পড়েছে ভাঙ্গি ধূলির প্রাঙ্গন পরে বিরহজ বেদনার আলিপনা আঁকা।

দুপুরের বটছায়ে করে গেছ' কত খেলা, গোধূলির রঙে রঙে এঁকে গেছ ছবি,
সকরুণ সুরে সুরে পাখাদের ডাক শুনি দিবসের শেষে বসি' গেয়েছ পূরবী।
নীরব সম্ভ্রমে তুমি দিগন্তের পরপারে সত্যের অমৃতরূপ লুকানো যেথায়,
সন্ধ্যার তিমির তটে দাঁড়াইয়া নতশিরে তোমার প্রাণাম দিতে ধ্যান-মমতায়।
চিত্তের নৈবেদ্য নিয়া নিশারে অর্চ্চনা করি' আরত্রিক-দীপমালা দিতে দেবালয়ে ;
তারা হারা স্তব্ধরাতে প্রান্তরের পানে চাহি' স্বপনপসারী ছিলে গোপন সঞ্চয়ে।
তব মনোহরণের মাধবী কুঞ্জের গীতি রাত্রির প্রতিমা পাশে হইত যে গাওয়া,
তাহারি সম্মুখে ছিল কৃষাণ কুটিরগুলি কৃষাণীর সরমের আবরণে ছাওয়া।

যাপিতে চন্দ্রমারাত্তি তন্দ্রালস সাথে লয়ে মুক্ত তব বাতায়নে নভোপানে চাহি,
দিন ভেবে কত পাখী করিত যে কলরব রাতের বাউল যেত পথ দিয়ে গাহি,
কল্পনার সমারোহে প্রতিটি অয়ন-গ্রন্থি প্রহরের জাল হ'তে করেছ স্খলিত,
স্বদেশের রাজপথে পাতাঘেরা বনানীর কোলে বসি ভাবোচ্ছ্বাসে ছিলে উছলিত।
আজ তুমি দূরে গেছ সকল বন্ধন খুলি' মায়ের অঞ্চল নিধি প্রবাসী পথিক!
তোমারে স্মরণ করি এই নব বর্ষদিনে—তুমি ছিলে স্বদেশের আশার প্রতীক।
ছিলে তুমি শ্যামায়িত মৃত্তিকার মর্ম্মমূলে পল্লীর প্রদীপসম আলো করে দেশ,
চলে গেছ অগোচরে, জননী জীবনের সকল সৌন্দর্য্য বন্ধু! হয়েছে নিঃশেষ।

পাড়ার কুটির দ্বারে শ্যামা মেয়ে চেয়ে আছে তুমি যদি এস কভু স্বদেশে আবার,
রোগে শোকে অনশনে অত্যাচারে দেশমাতা কুটির দুয়ারে কাঁদে—ঘনায় আঁধার,
ভ্রমিতেছ জনপদে গিরিদরী মরুভূমে, বিদেশীর বেশে হেরি তোমারি সন্তানে
সহোদর স্নেহডোর ছিন্ন করে চলে গেছ মায়াময় জীবনের পাথেয় সন্ধানে।
মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড বিন্ধ্যাচল বারাণসী কেদার বদরীতীর্থ কন্যা কুমারিকা—
পবিত্র সুন্দর হোক, তবু কেহ তুলনায় স্বদেশের সম নহে,—জ্বলে স্মৃতিশিখা,
ফিরে এস পরবাসী পল্লীবন-বিহঙ্গম তোমারে ডাকিছে কত লভিতে অন্তরে,
নব নব কিশলয় তোমারি সন্ধানে রহে উদার আকাশতলে শ্যামল প্রান্তরে।

স্মৃতির শিশিরবিন্দু এখনো সজল তব শৈশবের মালঞ্চের জীবন-কুসুমে,
প্রোষিত পথিক বন্ধু! ভুলেছ কি গোষ্ঠগৃহ প্রবাসের নির্ঝরের রূপ সুধা চুমে'!
স্বদেশের দেবালয়ে জীবন-বিগ্রহ যত ভগ্ন হোলো নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে
পৈশাচিক লীলা চলে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব মরণেরে আনে ডাকি দুর্যোগের ঝঞ্ঝাতে।
ভুলেছ কি বঙ্গদেশ বীরত্বের জন্মভূমি মহিমার তীর্থক্ষেত্র পুণ্যপীঠ স্থান,
যশোরের ধূমঘাট রায়-বাঘিনীর পড়া ভুলুয়ার বালুতট শ্রীপুর প্রধান,
গৌড়ের সিংহদ্বার ভূষণার বালুচর স্বর্ণগ্রাম চন্দ্রদ্বীপ পবিত্র নদীয়া,
সমতট সপ্তগ্রাম বাঙ্গালীর ইতিহাসে সোণার অক্ষরে লেখা কীর্ত্তিকাব্য নিয়া।

তুমি কি ভুলেছ বন্ধু! সাহিত্যে বীরত্বে ধর্ম্মে দুরূহ কর্ত্তব্যভারে রাষ্ট্র চালনায়
চির ভারতের গুরু বিশ্বের বিস্ময়রূপে পার্থসারথীর সম কর্ম্ম সাধনায়
অমর বাঙ্গালী জাতি, তোমার শোণিতে বহে, তোমার হৃদয়ে রহে আর্য্য ভাবধারা
বন্ধু! তুমি ফিরে এস, দুর্য্যোগের অন্ধকারে এ জাতির ভাগ্যাকাশে জাগাইবে তারা।
জীবনের উপত্যকা আজিকে শ্যামল নহে, হৃদয়ের প্রবাহিনী প্রবাহ বিহীন,
মানুষ বিপথে চলে, জাতীয় বৈশিষ্ট্য তার হারায়েছে—দিনে দিনে হইয়াছে দীন!
জাগাও জাগাও বন্ধু! স্বদেশের মহাশক্তি অমারাত্রে, শ্মশানের চিতাভস্ম মাঝে,
'নিঃশ্রেয়স' লভিবার কর তুমি আয়োজন, হে প্রবাসী ফিরে এস জননীর কাছে।

বংশ-ধারা

শ্রীপরিমলরাণী রায়

দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা—গোবিন্দ, গোবিন্দ—

ধড়ফড় করিয়া সতীপতি সহসা বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন, ভয়াকুলভাবে বারবার চারিদিকে তাকাইয়া কি যেন অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মনের সন্দিগ্ধতা ক্রমেই সন্ত্রস্ততা বাড়াইতে লাগিল, গা কাঁপিয়া উঠিল। স্বপ্ন—ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন তিনি।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সতীপতি জাগিয়াইছিলেন। ঘুম হয় নাই, প্রথম রাত্রে ভয়ানক গরম পড়িয়াছিল। বয়সও বার্দ্ধক্যের দিকে প্রায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। শরীরের অস্বস্তি মাথার উকুনের মত ঘিন ঘিন করে, চোখ আর সহসা বুজিতে দেয় না! চিন্তাও আছে, অবশ্য ভবিষ্যতের নহে। তেমন কিছু অভাব অনটন বা অশান্তি তাঁহার নাই। নিজে এতাবৎ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটাইলেন। আর সামান্য কয়টা দিন বাকী, তাহাও অচল হইবার কোন কারণ নাই। ছেলে চাকরী করে, ভাল রোজগার; এবং এই একটী মাত্র ছেলে তাঁহার। পুত্র-বধূ আর তাঁহারই একটি মাত্র কন্যা সতীপতির শেষ বয়সের অবলম্বন। সকল জড়াইয়া দিব্যি একটি নির্ঝঞ্ঝাট ক্ষুদ্র সুখের সংসার। সেজন্য সতীপতির চিন্তা আসে না। আসিলেও তাহা নির্ব্বিকার, তাহাতে ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায় না।

কিন্তু চিন্তা আসিয়াছিল অতীতের। বিছানায় শয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যতের সীমাবদ্ধ দিন কয়টির দিকে তাকাইয়াই বোধ করি প্রাণ ছুটিয়া গিয়াছিল পিছন পানে।

সতীপতি কয়দিনকার মানুষ? এই ত' যেন সেদিন তিনি দিগম্বর বেশে এই গ্রাম ভরিয়া খেলা করিয়া বেড়াইয়াছেন, জঙ্গলে জঙ্গলে পাখীর ছানা ধরা, ক্রমে পাঠশালা ছাড়াইয়া কৈশোরে বিবাহ, এবং বয়সের মাধুর্য্যে কিশোর স্ত্রীর সঙ্গে কত প্রণয় অভিনয়, তারপর পুত্র লাভ, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, নিজের চাকুরী প্রাপ্তি; দেখিতে দেখিতে সেই পুত্র কত বড়টি হইয়া উঠিল, তাহার বিবাহ দিলেন, চাকুরী হইল, সেও সন্তানের বাপ হইল, নিজের স্ত্রী বিয়োগ হইল, সর্ব্বশেষে একদিন নিজেরও চাকুরীর কাল শেষ হইল। সংসারের সকল দায়ীত্ব ঘাড় হইতে নামাইয়া দিলেন।

এসব যেন ঝড়ো হাওয়ার মত দুরন্ত বেগে শেষ হইয়া গেল। আর ত' বড় বেশী দিন নাই! এইবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেই হইবে। কিন্তু, সেই মৃত্যু কেমন ভাবে আসিবে? জরা, ব্যাধি, অপঘাত, আত্মহত্যা, অপমৃত্যু! না, আর কোনরূপে সে আসিয়া দেখা দিবে? ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এত শীঘ্র অতীত হারাইবার দুঃখের সঙ্গে অদৃশ্য মৃত্যু বিভীষিকায় তাঁহাকে দুবস্তভাবে মুসড়াইয়া দিল। কিন্তু, ফাঁকে ফাঁকে অতীতের একটানা বিস্তৃত এবং নিশ্চিন্ত দিনগুলির চিন্তায় সুখের আবেশও ছিল এবং তাহারই সম্মোহন হাতছানিতে সতীপতির চোখ দুইটি আপনা হইতে বুজিয়া আসিল। ক্রমে ঘুম গাঢ় হইয়া জাঁটিয়া বসিল।

সতীপতি স্বপ্ন দেখিলেন—বিভীষিকাময়ী মৃত্যু নারীর রূপ ধরিয়া শাণিত খড়্গ হস্তে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ধাইয়া আসিতেছে।

নারী যে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, কে সে, চিনিবার উপায় নাই। গাঢ় অন্ধকারে ঘরের কিছুই দেখা যায় না। দেখা যাইতেছে শুধু—অবগুণ্ঠনবতী একটী নারী-মূর্ত্তি, আর তাহার হাতের ক্ষুরধার খড়্গ, অন্ধকারেও বিদ্যুতের মত ঝলসাইতে। আত্মরক্ষার জন্য সতীপতি প্রথমে অনুনয় বিনয় করিলেন। নিষ্ফল হইল। তারপর উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণপণে ছুটিলেন। মাঠ-ঘাট ঝোপ-জঙ্গল চিরিয়া দৌড়াইলেন। সেও উল্কার মত তাঁহার পিছনে ধাইল। সতীপতি আর পারে না, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, পায়ের সাথে পা জড়াইয়া যায়, নিঃশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া প্রশ্বাস বহে ঘন ঘন, সর্ব্বাঙ্গ গলদ্‌ঘর্ম্ম; ক্লান্তি ও অবসাদে নিস্তেজ হইয়া সতীপতি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। মুখ দিয়া লালা পড়িতে লাগিল। রণচণ্ডী পিশাচী তাহাকে হত্যা করিবার জন্য খড়্গ উদ্যত করিল।

দুঃস্বপ্নভয়ে সতীপতি আকুলকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও ভাঙ্গিয়া গেল। তখন পূর্ব্ব আকাশ পরিষ্কার হইয়া ভোর হইয়া গিয়াছে।

দুঃস্বপ্নে গোবিন্দ নাম স্মরণ করিতে করিতে সতীপতি নদীতে চলিলেন। অত সকালে পল্লীপথে লোক চলাচলের কথা নহে। কিন্তু, কিছুদূর যাইতেই দেখিলেন—লোক ত' চলিতে সুরু করিয়াছেই, অধিকন্তু পুরুষ ত' নহে, স্ত্রী-লোক। সতীপতির অন্তরাত্মা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। স্বপ্ন-রাত্রির প্রথম প্রভাতে প্রথম দর্শনেই সেই তাঁহার ঘাতিনী? সন্তর্পণে সতীপতি তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া রাস্তার ঝোপের আড়াল দিয়া আত্মগোপন করিয়া নদীমুখে চলিলেন।

প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া সূর্য্যস্তব পাঠ করিলেন। তারপর, অঞ্জলী ভরিয়া জল লইয়া পরম ভক্তি গদ্‌গদ্ চিত্তে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া এই অখ্যাত নদীতেই পবিত্র গঙ্গামাতৃকার রূপ ধ্যান করিয়া স্বপ্নতত্ত্ব নিবেদন করিলেন।···দুঃস্বপ্নের কাহিনী জলে বলিলে নাকি স্বপ্ন নিষ্ফল হয়।—কিন্তু···

সতীপতি প্রৌঢ়। দেহে আজিও যৌবনের অমিতবল না থাকিলেও, প্রৌঢ়ত্বের জীর্ণতায় একেবারে দুর্ব্বল হইয়াও পড়েন নাই। মনে সাহস আছে দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের। বয়সের ধর্ম্মে কিন্তু মানসিক অবসাদ আনিয়া পারমার্থিক সংস্কারে অন্ধ করিয়া ছাড়িয়াছে। সেইজন্য—জলে বসিয়াও সতীপতি সম্পূর্ণ সুস্থির হইতে পারিলেন না। বাড়ী আসিয়া 'পাঁজী' খুলিয়া বসিলেন। পাতার পর পাতা উল্টাইয়া চলিলেন। হঠাৎ পুত্রবধূ তাঁহার সামনে আসিয়া সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে বড় সকাল সকাল স্নানাহ্নিক সেরে এলেন বাবা? রাত্রে কি ভাল ঘুম হয় নি?"

···আবার স্ত্রীলোক···উঃ; যাহাদের সংস্রব প্রাণপণে পরিহার করিবার জন্য তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই স্ত্রীলোকেরাই যেন ষড় করিয়া তাঁহার পিছনে লাগিয়াছে!··· স্বপ্ন যদি মিথ্যাই হইবে, তবে নিদ্রার ঘোরে যাহা তাঁহার অচেতন মনের কোনে দেখা দিয়াছে, জাগরণের বাস্তবেই বা ঠিক সেই স্ত্রীমূর্ত্তি বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া পড়িবে কেন? নাঃ, তাঁহাকে কিছুতেই নিষ্কৃতি দিবে না। কিন্তু, তিনিও কিছুতেই তাঁহার কাছে আসিতে দিবেন না। কোন মতলব তাঁহার কাছে খাটিবে না। তাড়াইয়াই ছাড়িবেন। রূঢ় কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করিয়াই সতীপতি বলিয়া উঠিলেন—"আমার ঘুম হোক, না হোক, সে খোঁজে তোমার দরকারটা কি? যাও, যাও বলছি এখান থেকে"···হউন পুত্রবধূ—বিশ্বাস কাহাকেও নাই। উনিও কি তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট সেই নবঘাতিনী শয়তানীর অভিনয় করিতে পারেন না? অসম্ভব কি? সুতরাং—তাঁহাকেও আর তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে দিবেন না। রাগে ভয়ে সতীপতি আরও চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও—এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে স'রে পড়—পড় বলছি—"তর্জ্জনী নির্দ্দেশে তাহার পথ দেখাইয়া দিলেন।

পুত্রবধূ বিমূঢ়ের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিতৃতুল্য স্নেহময় শ্বশুর—জীবনে তাঁহার স্নেহের এতটুকু অভাব কখনও হয় নাই। তাঁহারই কাছে হঠাৎ এবং অহেতুক এতখানি রূঢ় আচরণ! সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করিবার সাহস পাইল না। নীরব ব্যথায় ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

স্বপ্নফল বিচারের পৃষ্ঠা বাহির করিয়াই সতীপতি চমকাইয়া উঠিলেন—শুক্লা একাদশীর স্বপ্ন নিষ্ফল হয় না। অধিকন্তু ভোররাত্রে স্বপ্নদর্শনের পর যদি পুনরায় নিদ্রাকর্ষণ না হয়, তবে অচিরেই তাহা সিদ্ধ হইবার পক্ষে কোন বিঘ্ন দেখা যায় না। সতীপতির অবস হাত হইতে 'পাঁজী' খসিয়া পড়িল। নির্ঘাৎ অপমৃত্যুর সাংঘাতিক ভয়াবহতায় তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু কবে, কি ভাবে সে মৃত্যু আসিতে পারে? কোন্ স্ত্রী-পিশাচীর খড়্গাঘাতে কোথায় তাঁহার জীবনলীলার অবসান ঘটিবে? এবং আর কয়দিন পরেই বা! সব দুর্ভেদ্য অন্ধকারে, রহস্যাবৃত! দুর্ভাবনায় সতীপতির সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসিল।

কতক্ষণ এইভাবে ছিলেন তাহার ঠিক নাই। পুত্রবধূর সাড়ায় হঠাৎ কাণ খাড়া করিলেন। কোথায় কোন্ ঘরের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়াই সে, বলিল, "বেলা যে অনেকখানি হ'য়ে গেল বাবা? খাওয়া-দাওয়া ক'রবেন; আসুন।"

—"না, না, না"—উগ্রকণ্ঠে সতিপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কক্ষণো না, আমি খাবো না।" তন্মুহূর্ত্তে উঠিয়া পড়িলেন। এবং বিস্ময়-স্তব্ধ পুত্রবধূর সামনের উপর দিয়াই দ্রুতপদে কোথায় ছুটিলেন।

বেলা তখন দুপুর হইয়া উঠিয়াছে, সূর্য্যের তেজ আগুনের হল্কা ছুটাইতেছে ; অভুক্তাবস্থায় এবং অমনই অসহ্য অস্থিরতায় এই তাপ-দগ্ধ দুপুর বেলায় সতীপতিকে ছুটিতে দেখিয়া পুত্রবধূও এক নিদারুণ শঙ্কায় আঁৎকাইয়া উঠিল। সতীপতি হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়েন নাই তো ? কিন্তু তাঁহাকে বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টাই করিতে পারিল না। তিনি তখন অনেক দূরে ছুটিয়া গিয়াছেন। কোনদিকে সতীপতির দৃক্‌পাত নাই ; সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, খেয়াল নাই। নিদারুণ পরিশ্রমও তুচ্ছ করিয়া সতীপতি ছুটিতে ছুটিতে গ্রাম ছাড়িয়া একেবারে পাশের গ্রামে তাঁহার কুলগুরুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

গুরুদেব বাড়ীতেই ছিলেন। সতীপতি প্রণাম করিতেই তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর, তাঁহার কুশল কামনা করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। এমন অসময়ে শিষ্যের অকস্মাৎ আগমনে বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁহার একটু আশঙ্কাও জাগিয়াছিল।

সজোরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া সতীপতি বলিলেন, "বড় বিপদে পড়েই আপনার শ্রীচরণে স্মরণ নিয়েছি গুরুদেব।"

"কারও কোন মারাত্মক অসুখ-বিসুখ," গুরুদেবের জিজ্ঞাসায় বাধা দিয়া সতীপতি জানাইলেন, "না, অসুখ-বিসুখ কাহারও নহে। তাঁহার নিজেরও নহে। বিপদ অন্য-প্রকারের।"

ওঃ, তাহা হইলে একটু বিলম্বে শুনিলে ক্ষতি নাই। বলিলেন, "তুমি ব'সো সতীপতি, একটু ঠাণ্ডা হও, বড্ড ক্লান্ত হয়েছ, আগে বিশ্রাম কর। তোমার মায়ের সঙ্গেও একবার দেখা ক'রে এসো, আমিও তোমার জন্যে প্রসাদের কথা ব'লে আসছি, দুপুরে এখানেই দু'টী—"

না, না, না—মা গুরুপত্নীই হউন, আর গর্ভধারিণীই হউন, বিশ্বাস নাই, বিশ্বাস নাই ; স্ত্রীলোক বলিয়া সাহস তাঁহার একবিন্দু নাই। তাঁহাদের সামনে পড়িবার দুঃসাহস তাঁহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনের বিভ্রান্ত অবস্থা বুঝিয়া যেন গুরুপত্নী তাঁহাকে ক্ষমা এবং আশীর্ব্বাদ করেন। প্রকাশ্যে সবিনয়ে গুরুদেবকে জানাইলেন, প্রসাদের প্রয়োজন তাঁহার নাই। মনের অবস্থা তাঁহার তেমন নয়। বুক তাঁহার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, জলও বাধিয়া যাইবে।

কৌতূহল অসম্বরণীয় হইয়া গুরুদেবকে শিষ্যের সংবাদ জানিতে উৎসুক করিয়া তুলিল। অতঃপর তাঁহার প্রশ্নে রুদ্ধনিঃশ্বাসে সতীপতি তাঁহার স্বপ্নতত্ত্ব নিবেদন করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, "এর বিহিত করুন গুরুদেব, সন্তানকে রক্ষা করুন।" গুরুদেবের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন।

সস্নেহে সতীপতিকে পদপ্রান্ত হইতে উঠাইলেন। কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে শুধু আদেশ জানাইলেন, "স্থির হও সতীপতি, ব'সো।" দুশ্চিন্তা প্রপীড়িত গৌরবর্ণ মুখখানা তাঁহার গভীর বিষাদে কালো হইয়া উঠিল। সেদিকে চাহিবার সাহস সতীপতির হইল না। কি জানি, স্বপ্নতত্ত্বের ব্যাখ্যায় কি ভীষণ কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

নিরুপায় গুরুদেব শিষ্যের মনস্তুষ্টিতে সত্যের অপলাপ তাঁহার দ্বারা সম্ভব নহে। প্রত্যাশিত যা-টাই দিলেন নির্দ্দয়-ভাবে। "কর্ম্মফল, সতীপতি, এড়াবার সাধ্য কারও নেই। নইলে, আমারই বা এ দুর্ম্মতি হবে কেন ? আগেই যদি তোমায় সাবধান ক'রতাম ! কিন্তু, তোমারই বুকভরা আশা এবং যথেষ্ট প্রাপ্তিযোগে বিঘ্ন হ'তে আমার প্রবৃত্তি হয় নি, কষ্টবোধও ক'রেছি। আর সত্য কথা বলতে কি, আমি এতদূর ভবিষ্যৎ সূক্ষ্মদর্শীও নই, যাতে ক'রে আশঙ্কার নিতান্ত একটা হাল্কা ছায়া সত্য ব'লে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবো। আজ বুঝতে পারছি, কতখানি ভুলের প্রশ্রয় দিয়ে তোমার সর্ব্বনাশের কারণ হয়েছি সতীপতি," ক্ষুব্ধকণ্ঠে গুরুদেব কহিলেন।

"কি সে ভুল গুরুদেব, দয়া ক'রে বিবৃত করুন। আমারই বা কোন্ দুরাশা আর প্রাপ্তিযোগের লোভ থেকে আমার এই সর্ব্বনাশের সূচনা ?" আকুলকণ্ঠে সতীপতি বলিয়া উঠিলেন।

"স্থির হও সতীপতি," বলিয়া গুরুদেব একটুক্ষণ কি যেন ভাবিলেন। তারপর বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

তাঁহারা শুধু সতীপতিরই কুলগুরু নহেন। এতদ্দেশের এমন কি বহু দেশ বিদেশেও তাঁহাদের বহু শিষ্যবর্গ আছেন। এখন অবশ্য তিনি বিদেশের শিষ্যমহলে যাতায়াত প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছেন। আগে কিন্তু, তাঁহার বাপ পিতামহের আমলে এমন ছিল না। সম্বৎসরে অন্ততঃ দুইবার তাঁহারা চাকর ও লোকজন সঙ্গে লইয়া শিষ্যগৃহে পদার্পণ করিতেন। গুরুদেবকে তখনকার দিনে শিষ্যেরাও স্বয়ং ভগবানের মত

ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। গুরুদেবের আগমন তাঁহারা অত্যন্ত শুভ এবং অনুগ্রহ বলিয়াই ধারণা করিতেন। এবং তাঁহার অযাচিত আগমনে ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হইয়া তাঁহার চরণ সেবা করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেন।

শুধু সাধারণ শিষ্যেরাই নহেন, মহাসম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন, প্রতিপত্তিশালী শিষ্যেরাও অখণ্ড গুরুভক্তির উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজেদের পরমসৌভাগ্যবান বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন। এমন কি এই রতনপুরের রায়বংশেরা পর্যান্ত।

রতনপুর সর্ব্বজনবিদিত বিখ্যাত গ্রাম, এই রায়বংশেরই বাসস্থান বলিয়া। রায়বংশ দেশবিখ্যাত জমিদার। লক্ষ টাকা আয়ের সুবিশাল জমিদারীর একচ্ছত্র মালিক।

সেই বংশের জমিদার রাধারমণ রায়, দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী জমিদার। লক্ষলোকের দণ্ডমুণ্ডের বিধানদাতা, ভয়ঙ্কর কঠোর, জেদী প্রকৃতির পুরুষসিংহ। ধীর, স্থির, শান্ত মূর্ত্তি, ন্যায়নিষ্ঠ, কিন্তু জিদ্ চড়িলে না করিতে পারিতেন তিনি এমন কঠিন কাজ সংসারে নাই। দুর্দ্দান্ত রাধারমণের শাসনে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত। কাহারো বুক ফুলাইয়া স্পর্দ্ধা দেখাইবার উপায় ছিল না, ভক্তি শ্রদ্ধায় প্রজারা আপনা হইতেই তাঁহার পায়ের তলায় মাথাও নোয়াইত।

সেই রাধারমণ, জমিদার দুর্দ্ধর্ষ রাধারমণও তাঁহার পিতৃপুরুষের পায়ের তলায় অত্যন্ত দীনভাবে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতেন; বৎসরে দুই তিনবার করিয়া সাদরে ও সশ্রদ্ধায় কুলগুরুকে তাঁহার গৃহে লইয়া স্বহস্তে পদসেবা করিয়া ধন্য হইতেন।

এই রকম একবার গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া পুরীতে লইয়া গেলেন। ঠিক সেই সময় রাধারমণের বৈবাহিক—পুত্রবধূর পিতাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বোধ করি, স্বয়ং তাঁহার কন্যাকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য। গুরুদেবের শয়ন ও উপবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল মহাসমাদরে অন্দরমহলের নিভৃত প্রকোষ্ঠে। দুগ্ধ-শুভ্রশয্যার দাস-দাসী এবং পৌরজন পরিবেষ্টিত হইয়া সেবা-শুশ্রূষা চলিতে লাগিল মহাআড়ম্বরে। কিন্তু, পরমাত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেওয়ার অধিকার যাঁহার, তাঁহার বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল বাহিরের বৈঠকখানায়,—অবশ্য তাহার কারণ ছিল।

রাধারমণ একটি ভুল করিয়াছিলেন—সাংঘাতিক ভুল, পুত্রের বিবাহে পাত্রীপক্ষ নির্ব্বাচনে। একমাত্র পুত্র তাঁহার, নিজে তিনি অর্থে-সামর্থ্যে, শক্তিতে ও সম্ভ্রমে দেশে এবং সমাজে একজন শীর্ষস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু, পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেন তাঁহার অপেক্ষা এমনই এক অসমকক্ষ ঘরে, যাহার সঙ্গে আত্মীয়তার পরিচয় দিতেও তাঁহার অমন সম্ভ্রমদীপ্ত উঁচু মাথা গ্লানির ভারে আপনিই অবনত হইয়া পড়ে। তাঁহার বৈবাহিকত্বের দাবী করেন তুচ্ছ একজন রায়সাহেব। রাজশক্তির কাছে যতই অনুগৃহীত হউন তিনি, সমাজে কিইবা ব্যক্তিত্ব তাঁহার, কিইবা সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা, আর কতটুকুই বা আর্থিক সঙ্গতি? রাধারমণের বেতনভোগী কর্ম্মচারীর অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার যাহার কিছুমাত্র যোগ্যতা নাই, তেমনই একজন নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি জমিদার রাধারমণের বৈবাহিক!

কিন্তু—

বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া কাহারও স্বেচ্ছাধীন নহে। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—বিধির বিধান। রদ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। রাধারমণেরও হয় নাই। বজরা সাজাইয়া রাধারমণ স্বয়ং গিয়াছিলেন জমিদারী পরিদর্শন করিতে। তাঁহারই জমিদারীর এলাকায় এক যায়গায় বজরা বাঁধিতে হুকুম দিলেন। মাঝি-মাল্লা এবং সঙ্গের পাইক বরকন্দাজেরা রান্না করিয়া খাওয়া দাওয়া করিবে। আর স্বয়ং তিনিও আহারান্তে বিশ্রাম করিবেন। তাঁহার আহার্য্য বাড়ী হইতেই বজরায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সঙ্গে একজন পরিবেশনকারী ব্রাহ্মণ পাচকও ছিল।

আহারান্তে রাধারমণ আলবোলায় সুগন্ধি তামাক টানিতেছিলেন। লক্ষ্য পড়িল অদূরবর্ত্তী ইষ্টক নির্ম্মিত বাঁধা ঘাটের দিকে। গাঢ় স্বচ্ছ নীল জলে যেন একটী সদ্য ফোটা পদ্ম পাঁপড়ী মেলিয়া টলমল করিতেছে। কচি দুর্ব্বাদলের গাঢ় সবুজ শোভা মিশিয়াছে নীলের কোলে। স্নিগ্ধ কমনীয় মুখশ্রী অঙ্গ-সৌষ্ঠবের নিখুঁত গঠনে ধারণ করিয়াছে সৌন্দর্য্যের অনন্ত সুষমা।

সুন্দরী রাধারমণ অনেক দেখিয়াছেন, মেঘের কোলে বিদ্যুদ্বিকাশের মত রূপের অগ্নিশিখায় চোখ অনেক ঝলসাইয়াছে, কিন্তু বনফুলের মত এমন নবনীত শ্যাম-

লতায় চোখ স্নিগ্ধ হয় নাই কখনও। এমন স্নিগ্ধ মাধুরী সত্যই দুর্লভ, অন্ততঃ তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

অর্থ-বিত্তের আকাশ-ছোঁওয়া আত্ম-অভিমান আহত করিয়াই রাধারমণ অনুসন্ধান করাইলেন এবং অনেকখানি হীনতা স্বীকার করিয়াই স্বয়ং লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন, "জমিদার রাধারমণ রায় রায়সাহেব দুহিতাকে তাঁহার পুত্র-বধূ করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তার আশাতীত সৌভাগ্য! প্রতিপক্ষ তন্মুহূর্ত্তেই সানন্দে ও সগর্ব্বে সম্মত হইলেন।

মহাসমারোহে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

কিন্তু, কয়লার কালো কদর্য্যতায়ই লুকান থাকে হীরকের সুউজ্জ্বল দ্যুতি। হীরক সংগ্রাহক তাহার ঈপ্সিত বস্তুই সযত্নে কুড়াইয়া আনে। আবর্জ্জনার মত নিষ্প্রয়োজনীয় কয়লারাশীর দিকে ফিরিয়াও চাহে না। তেমনই রাধারমণের ইচ্ছাকৃত ভুল সংশোধনের আর উপায় রহিল না, কিন্তু, আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন। আত্মীয়তা আবর্জ্জনার মতই দূরে ঠেলিয়া দিয়া তাহার মধ্য হইতে রত্নটি কুড়াইয়া আনিলেন। অধিকন্তু এই গ্লানির বোঝাটা হাল্কা করিবার জন্য আত্মীয়তা অস্বীকার করিয়া অসৌজন্য প্রদর্শন করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না।

যাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তার অধিকার পাওয়া যায়, তাঁহারই বাড়ীতে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ শূন্য এবং অসম্বন্ধ পরের মত বাহিরের বৈঠকখানায় স্থান পাইবার মত অবহেলায় কাহার না ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে? রায় সাহেব আইনজ্ঞ লোক, রাজশক্তি পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মান করে। অথচ—

রাগে, অপমানে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আগুনের মত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু, সুযোগের অপেক্ষা করিতেই হইবে।

পিতার উপস্থিতি এবং অপমানের বার্ত্তা অন্দরের নিভৃত কক্ষে কন্যার কানে পৌঁছিল না। কন্যার সংথে পিতাও দেখা করিলেন না, করিতে উদ্‌গ্রীব হইলেও, তাহা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। অপমানে ক্ষিপ্ত হইয়া রায় সাহেব সদর্পে প্রস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ জমিদার বাড়ীর সিংহদরজায় প্রচণ্ড গণ্ডগোলের শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইলেন। বিরাটকায় দুইটী হিন্দুস্থানী দরোয়ানের গলা ধাক্কা এবং দুর্ব্বোধ্য নিষেধের ভাষা অগ্রাহ্য করিয়া একটা কাবুলীওয়ালা ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। এবং হিন্দুস্থানী দারোয়ান দ্বয়ের বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে নিজের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার দুঃসাহসে চড়া গলায় হিন্দি বাংলায় মিশাইয়া বলিতেছে—"বোলাও তোমার জমিদার বাবুকো, হাম দেখ্‌লেগা উস্কো, রুপেয়া লেনে কো আস্তে তো হামারা তোয়াজ করিয়ে করিয়ে দিল্ খুশী করিয়ে দিয়েছে, আউর আবি দেনে কো আস্তে হ্যায়সা শয়তানী করিতেছে—বুড়বাক্ কাঁহেকা।"

অন্দরের কোন দ্বিতলের জনালাপথে সমস্তই রাধারমণের চোখে পড়িতেছিল। সেখান হইতে হুকুম করিলেন—"পাহাড়ী সিং হ্যায়, ছোড় দেও উস্কো।" রাধারমণ নীচে নামিয়া একেবারে সদরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

স্বয়ং হুজুরের হুকুম—সিংহ-নন্দনদ্বয় কাবুলীওয়ালাকে পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু, একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিল।

রাধারমণ বলিলেন কাবুলিওয়ালাকে "কেত্তনা রুপেয়া তোম্ ধার দেয়া?"

কাবুলীওয়ালার বোধকরি বাঙ্গালার জমিদারের মর্য্যাদা এবং দাপট, কোনটাই বুঝিবার শক্তি ছিল না। সেই অজ্ঞতায় সদর্পে বলিল—হাজার রুপেয়া…যথাবিহিত সম্মান সম্বোধন পর্য্যন্ত করিবার দরকার বোধ করিল না। মহা অনর্থের আশঙ্কায় কিন্তু দারোয়ানরাও কাঁপিয়া উঠিল।

রাধারমণ এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান কাবুলীওয়ালার বিশাল দেহটার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন, "পাহাড়ী সিং, ভকত সিং, উল্লুককো পচিশ জুতি লাগাও…আউর গারদখানামে আটক রাখ, এক মাহিনা বাদ হাজার টাকা দেকে গর্দ্দান পাকড়সে নিকাল দেনে হোগা।"

"জী হুজুর" হুকুম তামিল করিতে তাহারা তৎক্ষণাৎ কাবুলীওয়ালাকে পিছমোড়া দিয়া বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

সদরের বৈঠকখানায় ঢুকিতে ঢুকিতে রাধারমণ হুকুম দিলেন—"কোন হায়? বিরাজমোহন বাবুকো বোলাও—"

বিরাজমোহন তাঁহারই একমাত্র পুত্র, কুলের কলঙ্ক, অপদার্থ…ঐ জ্বলন্ত অপকীর্ত্তি তাঁহারই। কাবুলীওয়ালার নিকট হইতে টাকা ধার লইয়াছে সেই নিশ্চয়ই! রাধারমণের মান-সম্ভ্রম খোয়াইয়া—উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী পুত্র তাঁহার না করিতে পারে এমন অপকর্ম্ম নাই?

বিরাজমোহন আসিলেন। নীরবে, নতমুখে পিতার সামনে দাঁড়াইলেন। তাহারও দিকে একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া ধীরে গম্ভীরভাবে রাধারমণ বলিলেন, "তোমার জন্য আমার মান-সম্ভ্রম সব যেতে বসেছে, আমার মাথা হেঁট হচ্ছে। তোমায় আমি সাবধান করে দিচ্ছি—ভবিষ্যতে তোমার কোন অন্যায়ই আর আমার আশ্রয় পাবে না।… সাবধান, অন্যায়ের প্রতিকারে রাধারমণের কাছে আত্মীয় পুত্র বিভেদ নাই।" বিরাজমোহন কি ভাবিলেন, তাহা তিনিই জানেন। মুখে কিন্তু টু শব্দটিও করিবার সাহস পাইলেন না। উচ্ছৃঙ্খল যতই হউন, রাধারমণের সম্মুখে মুখ তুলিয়া কথা কহিবার স্পর্দ্ধা কাহারও নাই। ধীরে ধীরে তিনি পিতার সম্মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

অলক্ষ্যে রায় সাহেবের মুখে একটু ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিল।…বাড়ী পৌঁছিয়াই রায়সাহেব পত্রদ্বারা জামাতাকে সাদর আহ্লাদ জানাইলেন। অধিকন্তু সাবধান করিয়া দিলেন—তাঁহার পত্র অথবা তাঁহার ওখানে বিরাজমোহনের যাওয়া সম্বন্ধে তাঁহার পিতা, এমন কি তাঁহার স্ত্রী, রায় সাহেবেরই কন্যা পর্য্যন্ত যেন কিছু জানিতে না পারেন। সকলের কাছে সযত্নে গোপন করিয়াই যেন বিরাজমোহন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উদ্দেশ্য—পরস্পর সাক্ষাতে আলোচনা হইবে।

শ্বশুরের উপর পিতার মনোভাব বিরাজমোহনের অজানা ছিল না। তুচ্ছ একটা হাজার টাকার দেনার জন্য পিতার তিরস্কারে তিনি ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। কাজেই পত্রের ব্যাপার সম্পূর্ণ গোপন করিয়াই তিনি শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করিলেন।

শ্বশুর জানাইলেন, আইনের চক্রে তিনি রাধারমণকে নিষ্পেষণ করিয়া তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। বিরাজমোহনও বাপের কাছে যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকেও তাঁহার নিজের মনের জ্বালা জুড়াইতে উৎসাহিত করিলেন। পুত্রের সাক্ষী পিতার বিপক্ষে ব্রহ্মাস্ত্রের মতই কার্য্যকরী হইবে। উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র যুবক, একমাত্র কন্যা সর্ব্বস্ব পিতার পক্ষে, টাকার লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে বশীভূত করিতে একটুও বেগ পাইতে হইল না। ফলে—বে-আইনী আটকের অপরাধে অচিরেই রাধারমণের বাড়ী খানাতল্লাসী করিবার জন্য পরোয়ানা বাহির করিবার আবেদন পেশ হইল। কিন্তু রায় সাহেব কি একটা আশঙ্কা করিতেছিলেন। চিন্তাযুক্তভাবে বলিলেন, "বিরাজমোহন শোন…আমার সাথে তোমার বাপের মনোমালিন্য গোপন থাকিবে না। বিশেষতঃ যতই ঘোরতর হয়ে উঠবে, ততই আমার মেয়ের অমঙ্গলের আশঙ্কাও বেশী হবে। এমন কি তার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হতে পারে। তোমার বাপের জেদী প্রকৃতি তুমিই ভাল জান। অনেকক্ষেত্রে দেখছেও পেয়েছ। তাঁর অকরণীয় কিছু আছে বলে মনে হয় না।"

"বাবাকে আমি জানি, তাঁর দ্বারা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু, আমার দ্বারা কি কোন প্রতিকার হওয়া সম্ভব?" সবিনয়ে বিরাজমোহন শ্বশুরের কাছে অনুমতি চাহিলেন। রায় সাহেব পুনরায় বলিলেন, "তোমার দ্বারাই সম্ভব, আমি আমার মেয়েকে এখানে নিয়ে আসতে চাই। কিন্তু আমার পক্ষে ত' সেটা সম্ভব নয়? সে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তুমি তাকে তোমার বাপের অনিচ্ছায়ও নিয়ে আসতে পারো। আইনতও তাতে বাধা দেবার অধিকার তাঁর নেই। সুতরাং এ কাজটি তোমাকে করতেই হবে।"

টাকার লোভে বিরাজমোহনকে বোধ করি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করিয়া শ্বশুরের আদেশ বা উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে অক্ষম করিয়া তুলিল। সেই রাত্রেই অন্ধকারে লুকাইয়া বাড়ী ফিরিলেন, এবং চোরের মত সন্তর্পণে নিজেরই স্ত্রীর ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে সকল ব্যাপার কহিয়া উপসংহারে কহিলেন, "আমার সঙ্গে তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে যেতে হবে।"

"অসম্ভব, আমি কোথাও যেতে পারবো না, যাবো না। তোমার এমন যোগ্যতা নেই, যাতে করে স্বাধীনভাবে

তুমি আমার উপযুক্ত মর্য্যাদায় রাখতে পারবে। মনে রেখো, আমি রায় বংশের কুলবধূ। যেখানে সেখানে গিয়ে হীনভাবে বাস করে বংশের মুখ নীচু করতে পারি নে।" রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে উমাশঙ্করীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল।...এই তাঁহার স্বামী এবং এই তাঁহার পিতা! সম্মিলিত হইয়া অপকীর্ত্তির চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মর্ম্মব্যথা তিনি সহিতে পারিতেছিলেন না। আরও রুদ্ধকণ্ঠে জানাইয়া দিলেন—যে বাপ তাঁর জামাইকে তাঁর বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করতে পারেন, আর নিজের মেয়ের শ্বশুর পরমাত্মীয়, তাঁকেই বিপদে ফেলে মেয়ের সর্ব্বনাশ করতেও দ্বিধা করেন না, তেমন বাপের মুখও আমি দেখতে চাইনে, তুমি তাঁকে বলে দিও—তিনি তাঁর মেয়েরও হিতাকাঙ্ক্ষী নন, তা হলে মেয়ের বাপ হয়ে অতটুকুতে অপমান বোধ করতেন না।

"উত্তম, তা হলে তুমিও তোমার শ্বশুরের সাথে ফলভোগ কর।" অবাধ্য স্ত্রী, বিরাজমোহনের ক্রোধ অসংযত হইয়া উঠিল। তন্মুহূর্ত্তে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

উমাশঙ্করী সুস্থির হইতে পারিলেন না। বিপদের বার্ত্তা সেই রাত্রেই শ্বশুরের কাছে বলিবার দরকার। তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিলেন, তখনও তিনি জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কাছে গিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও জেগে আছেন বাবা? ঘুম হচ্ছে না?"

"না মা, শুতেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু—" একটু থামিয়া বলিলেন, "বড় সুখী হলাম মা, তোমার কর্ত্তব্য আর বংশ-মর্য্যাদা জ্ঞানের পরিচয়ে। বংশের সম্ভ্রম রাখতে তুমি স্বামী এবং পিতাকেও ত্যাগ করতে দ্বিধা কর নি, এর চেয়ে আমার গৌরবের আর কি আছে? আজ আমি কুপুত্র হারিয়েও তোমাকে পেয়েছি সুপুত্রের মত। আশীর্ব্বাদ করি, মনের এতখানি সাহসই যেন চিরদিন অটুট থাকে।"

গলায় আঁচল দিয়া উমাশঙ্করী রাধারমণকে প্রণাম করিলেন। স্বামী প্রসঙ্গের লজ্জাটা কাটাইয়া বলিলেন, "আপনি ত' তা হলে বিপদের কথা সবই শুনেছেন বাবা।’

"হ্যাঁ মা···কিন্তু ভয় করো না। আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ কোন চিন্তা নেই।" উমাশঙ্করী বোধ করি তাঁহার মত অতখানি বেপরোয়া হইতে পারিলেন না; বলিলেন—"বন্দীকে মুক্ত করে দিন না কেন, বাবা; কোন ঝঞ্ঝাটই থাকবে না, তাহলে—

"একটা মানুষকে বন্দী করাতেই তুমি ঝঞ্ঝাটের আশঙ্কা ক'রছ মা;" হাঃ-হাঃ-হাঃ, উচ্চশব্দে যেন বেপরোয়া অব-হেলায় হাসিয়া উঠিয়া রাধারমণ বলিতে লাগিলেন—"আমার বাপ-পিতামহের আমলে ঐ গারদখানা বোঝাই হ'য়ে উঠতো মানুষে মানুষে, অকুলান হ'লে নিজেরাই তাঁরা কমিয়ে দিতেন।" সহসা রাধারমণের চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলিয়া উঠিল; কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীর হইয়া যেন তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ব্যক্ত করিল—দু'টো চারটে খুন মাসে মাসেই হ'তো; তার জন্যে রতনপুরের জমিদার বংশকে কখনও কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।"

উমাশঙ্করীর অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি এই বন্দী হতভাগাকেও—। ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"একে মুক্তি দিন বাবা, ওর যেখানে খুশী চলে যাক্—"

"দেখি—গম্ভীর কণ্ঠে শুধু জানাইয়া দিলেন—যাও, শুতে যাও; রাত অনেক হ'য়েছে—"

পুত্রবধূর অনুরোধ রাধারমণ উপেক্ষা করেন নাই কোনদিনও, কিন্তু তিনি চিন্তিত হইলেন। বে-আইনী বন্দীকে মুক্তি দিলে বিপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়া সে আবার তাঁহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং—

রাত্রি গভীর, চারি দিক নিস্তব্ধ। অতবড় পুরী, দিন ভরিয়া লোকজন জমজম করে, কাণ পর্য্যন্ত ঝালাপালা হইয়া যায়। কিন্তু রাত্রির গভীরতায় তাহাও একেবারে স্তব্ধতায় নিঃসাড় হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারের কালোরাশী যেন নিশীথিনীর কেশরাশীর মত কুণ্ডলী পাকাইয়া থম্‌থম্ করিতেছে। রাধারমণ শয্যাত্যাগ করিলেন। পদশব্দ সংযত করিয়া নিঃসাড়ে অন্দর অতিক্রম করিয়া সদরের দরোয়ানখানার দিকে অগ্রসর হইলেন। এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন। চোখের কালো তারা দুইটি অন্ধকারেও জ্বল-জ্বল করিতে লাগিল। লক্ষ্য স্থির করিয়া দরোয়ান খানার একটী গরাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "পাহাড়ী···পাহাড়ী সিং—"

কোন্ হ্যায়—অর্দ্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরী সন্ত্রস্ত ভাবে খবরদারী করিল।

রাধারমণ ধমক দিয়া উঠিলেন—"চোপ···ইধার আও··বাহার মে···"

পাহাড়ী আর উচ্চবাচ্য করিল না। মনিবের সাড়ায় সে রীতিমত অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে রাত্রির এমনই নিস্তব্ধ গভীর যামে মনিবের হুকুম তামিল করিতে তাহাকেই হয়। পুরীর অসংখ্য দরোয়ানের মধ্যে সেই একমাত্র যোগ্যতম এবং বিশ্বাসী···আর তেমনই সাহসী, বলশালী ও কর্ম্মিষ্ঠ। দৈত্যের মত বিরাটকায় চেহারা, পাহাড়ের মত বুক তাহার নির্দ্দয়তার পাথর দিয়া গড়া, নির্ম্মম হিংস্রতা ঠিক্‌রাইয়া পড়ে বড় বড় গোলাকার চোখ দুটী দিয়া—

সর্ব্ব রকমের সাংঘাতিক এবং নিষ্ঠুর কার্য্যের সে যোগ্যতম ব্যক্তি, সে জন্য মনিবের 'নেকনজর'ও তাহার উপর। নিঃশব্দে পাহাড়ী আসিয়া সসম্ভ্রমে রাধারমণকে সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। রাধারমণ অগ্রগামী হইয়া আদেশ করিলেন—আও—।

পাহাড়ী নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস বা দরকার বোধ করিল না। কিয়দ্দূর আসিয়া তাহারা ভবানী মন্দিরের সম্মুখে থামিলেন। পাহাড়ীকে মন্দির-দ্বারে প্রহরায় রাখিয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বহস্তে ভবানীর হাতের খাঁড়া ছিনাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া আদেশ করিলেন—গারদখানা···

বায়ুলেশহীন গারদখানার অন্ধতম কক্ষের মেঝেয় পড়িয়া হতভাগ্য কাবুলীওয়ালা অকাতরে ঘুমাইতেছে। হস্তদ্বয় বদ্ধ করিয়া সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল প্রাচীরে প্রোথিত গরাদের সঙ্গে আটকান। গাঢ় ঘুমের আয়াসেই হয় ত' তাহার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সশব্দে বাহির হইয়া গেল। রাধারমণ ইঙ্গিত করিলেন। উন্মত্তের মত খড়্গের একটি আঘাতে পাহাড়ী সিং তাহার বাহুবলের পরীক্ষা দিল। হতভাগ্য বন্দীর দ্বিখণ্ডিত দেহটা একবার মাত্র ভীষণ ভাবে আন্দোলিত হইয়াই ঠাণ্ডা হইয়া গেল। পাহাড়ীকে পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যের আদেশ জানাইয়া রাধারমণ অন্দরে ফিরিলেন—

·········পরদিন—

দিন ভরিয়া চলিল চণ্ডীমণ্ডপের ধ্বংস···

আকাশ-ছোঁওয়া সু-উচ্চ ইমারত, চূণ-সুরকীর পাকা আস্তরণ দিয়া গাঁথা প্রাসাদ-পুরী বহু প্রাচীন হইলেও, চণ্ডীমণ্ডপের গাঁথনী যেন অনেকটা নূতন; এক একখানি করিয়া ইট খসাইয়া তাহার বিরাট একটা স্তূপ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

সারারাত ভরিয়া আবার সেই ভগ্ন স্তূপের মেরামত চলিল। অসংখ্য রাজ-মজুর রাত্রির মধ্যে আবার তাহা খাড়া করিল। জমিদারের খেয়াল—মণ্ডপের সংস্কার হইল। মাঝে মাঝে বোধ করি এমনি ভাঙ্গাগড়াই চলে—

···তারও পরদিন—

সদর প্রাঙ্গন ভরিয়া পুলিশের অসংখ্য পাগড়ীতে লাল হইয়া উঠিয়াছে। প্রবেশাধিকার লইয়া দরোয়ানের সঙ্গে তাহাদের রীতিমত কলহ লাগিয়া গিয়াছে পুলিশের অধিনায়ক আগাইয়া আসিয়া তাঁহার পদোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে আইনের ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিরস্ত করিলেন। হুড়মুড় করিয়া তাহারা পুরী মধ্যে প্রবেশ করিল।

অন্দর মহলের দ্বিতলে দাঁড়াইয়া উমাশঙ্করী সমস্ত দেখিতেছিলেন। ব্যাপার বুঝিলেন না।

অধিনায়ক জনকয়েক অনুচর সহ সরাসরি চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। অবশিষ্ট পুলিশবাহিনী পুরী আবেষ্টন করিয়া প্রতি দরজায় পাহারায় রহিল। একটুক্ষণ পরেই মণ্ডপের মধ্য হইতে গণ্ডগোল উঠিল—লাস··লাস···লাস···দেওয়ালের ভিত্তির সঙ্গে বেমালুম গাঁথা···ভাঙ্গিয়া বাহির করা হইল। পরক্ষণেই, সকলে ধরাধরি করিয় প্রকাণ্ডকায় একটি পুরুষের মৃতদেহ আনিয়া উঠানে ফেলিল।

মস্তকশূন্য দেহ। সেই কাবুলীওয়ালা খুন হইয়াছে—

উমাশঙ্করী মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না। ত্রস্ত ও কম্পিত পদে দোতলার সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়াই ভবানী-মন্দিরে ছুটিলেন।

দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়···

অভুক্ত রাধারমণ স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে আহ্নিকে বসিয়াছেন। সৌম্য, প্রশান্ত, স্থির মূর্ত্তি, একাগ্রতায় যেন মায়ের চরণ তলে সমাধি-নিমগ্ন; আত্মহারা—বাহ্যিক চেতনা বিলুপ্ত প্রায়—

ব্যাকুলকণ্ঠে উমাশঙ্করী বলিয়া উঠিলেন—পালান, পালান বাবা; পুলিশের লোক চণ্ডীমণ্ডপ ভেঙ্গে লাস বার ক'রেছে; শীগ্‌গীর পালিয়ে যান···

হঁ্যা…কি ব'ল্লে? দাস—মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মদমন করিয়া বলিলেন—রতনপুরের রায় বংশের বংশধর পুলিশের ভয়ে পালায় না। ভীরুতার অপবাদ মাথায় নেওয়ার চাইতে তারা মরতে পারে—

"কিন্তু, তারা যে আপনাকে অপমান ক'রবে…লাঞ্ছনা দেবে বাবা?"

"তাও পারবে না মা", ভবানীর হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার খড়্গের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মায়ের ঐ খড়্গ সহস্র নররক্ত পান ক'রেছে, আর আমার—" রাধারমণ খড়্গের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ক্ষিপ্রহস্তে উমাশঙ্করী ভবানীর খড়্গ কাড়িয়া লইলেন।

রাধারমণের বিশাল বুকখানা সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িল। পুত্র, তাঁহারই পুত্র পিতার সঙ্গে শত্রুতা সাধিল। শুধু তাঁহারই শত্রুতা নহে, তাঁহার বংশেরও; রায়বংশের সম্ভ্রমদীপ্ত উঁচু মাথায় পিতৃশত্রুতার কলঙ্কবোঝা তুলিয়া দিল। অপমান, ঘোর অপমান, তাঁহার এবং তাঁহার বংশের; আর তাঁহার অদৃষ্টে পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা; হয় তো তাঁহাকে ধরিতে পারিলে শৃঙ্খলিত করিতেও ইতস্ততঃ করিবে না।… পুলিশকে বাধা দেওয়া তাঁহার পক্ষে আপাততঃ অসম্ভব নহে কিন্তু তাহাতে পার পাওয়া সুকঠিন। পলাইয়া আত্মরক্ষা, তাঁহার এবং তাঁহাদের বংশের রীতিবিরুদ্ধ। আত্মঘাতী হওয়াও মহাপাপ। তার চেয়ে,—"শঙ্করী, তুই-ই তো মা ভবানী; তুই আমায় হত্যা কর। আমার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দে, বংশের মান রক্ষা কর। সেদিন যেমন বংশের সম্ভ্রম বজায় রেখেছিলি স্বামী এবং পিতাকে ত্যাগ ক'রে, ঠিক তেমনি ভাবে কঠোর হ'য়ে এই বৃদ্ধকে আজ হত্যা কর্।"

"আমি তোকে অনুমতি দিচ্ছি, আশীর্ব্বাদ ক'রছি, তোকে এতটুকুও পাপ স্পর্শ ক'রবে না; তোর দ্বারাই বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে—"

পুত্র-ব্যথা, লাঞ্ছনা, ভয়, অপমান আর আত্মহত্যার মহাপাপ হইতে রাধারমণের নিষ্কৃতি একমাত্র তাঁহারই হাতে। কিন্তু, পিতৃহত্যা, "না, না, বংশের মুখ উজ্জ্বল ক'রতে আমি চাইনে বাবা; আপনার অসম্ভব আদেশ প্রত্যাহার করুন।"

"কক্ষণো নয়! রাধারমণ তা কখনও করে না। আমি তোকে অভিশাপ দেবো, পায়ে প'ড়ে তোর অকল্যাণ ক'রবো—"

"উঃ, হোক্ পিতৃহত্যা, বংশের সম্ভ্রম চাই"—উমাশঙ্করীর হস্তচ্যুত হইয়া খড়্গ রাধারমণের স্কন্ধে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ভগ্নকণ্ঠের আকুল আহ্বান একবার মাত্র তাঁহার বুক চিরিয়া বাহির হইল, উঃ, বাবাগো—উমাশঙ্করীর মূর্চ্ছিত দেহটা রাধারমণের সন্তকর্ত্তিত টাট্‌কা রক্তে ভিজিয়া গেল।

কাহিনী শেষ করিয়া গুরুদেব কহিলেন, সেই বংশের মেয়ে তোমার পুত্র-বধূ। ওরই প্রপিতামহী তাঁর শ্বশুরকে স্বহস্তে হত্যা করেছিলেন। আমার পিতামহ ছিলেন তাঁদের কুলগুরু। তাঁরই মুখে আমি সব শুনেছিলাম"—কিন্তু বাধা দিলেন সতীপতি, "এর কি কোন বিহিত নেই গুরুদেব" শঙ্কাকুল কণ্ঠের কাতরতায় কান্না উছলাইয়া উঠিল।

কঠিন কণ্ঠে গুরুদেব তাঁহার শেষ মতটা ব্যক্ত করিলেন, "না, সতীপতি, বংশগত কুপ্রথা কখনও ব্যর্থ হয় না, সংস্কারের মত রক্তমজ্জায় মিশে বংশধারায় সংক্রামিত হয়, তোমার পুত্র-বধূর দেহে তার নর-ঘাতিনী প্রপিতামহীর রক্তের সংস্রব আছে—"

উঃ, কি সাংঘাতিক! সতীপতির রক্ষা নাই; নারীহস্তে শোচনীয় অপমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় তাঁহার নাই। নরঘাতিনীর রক্তের সংস্রবে যে অমঙ্গলময়ী নারীর সৃষ্টি হইয়াছে, পিশাচীর মত রুধীর তৃষ্ণায় সেও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কুল-ভাঙ্গা নদীর মত যে কুলে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া প্রলয়ের মত ধ্বংস করিয়া ছুটিতে চাহিতেছে, উদ্দাম গতিতে—

শঙ্কিত সতীপতি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় উৎকট পৈশাচিক উল্লাসে রামদা লইয়া ছুটিয়া চলিলেন পুত্র-বধূর শয়ন ঘরে। বধূ ঘুমাইতেছে শিশুকন্যাটিকে বুকের সাথে জড়াইয়া। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাত্রের নিকর্ম্মা অলসতায়ও ঘুম তাঁহার গাঢ় হইয়া আঁটিয়া বসিতেছে না। শ্বশুরের গুরুগৃহে গমন সংবাদ সে ঠিক সময়েই সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার অজ্ঞাত কারণে, এবং তাঁহার মস্তিষ্কের অকস্মাৎ উদ্‌ভ্রান্তির সন্দেহে মন তাহার অনেকটা দুশ্চিন্তা পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। আধতন্দ্রাচ্ছন্নতায় চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। নিষ্প্রভ আলোর অনুজ্জ্বল

রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছিল তাহার আধঘুমন্ত মুখখানির উপর।

উত্তেজিত সতীপতির অনবধানতায় দরজায় রামদা লাগিয়া খট্ করিয়া একটি শব্দ হইল। বধূর পাতলা ঘুম সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। সন্ত্রস্তভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিতেই দৃষ্টি পড়িল—আবছা মনুষ্যাকৃতির দিকে। ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। গভীর রাত্রের নির্জ্জন অন্ধকারে পর-পুরুষের গোপন উপস্থিতি কুসন্দেহ জাগাইয়া অন্তরাত্মা কাঁপাইয়া তুলিল। নিকটে মানুষের তেমন বসতি নাই; একটু দূরে অবশ্য আছে। চীৎকারের সাড়া পাইয়া সেখান হইতে পৌঁছিতে সময় লাগে সুতরাং নিজেকেই নিজের রক্ষা করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আত্মরক্ষার মত কোন কিছুই আপাততঃ হাতের কাছে না পাইয়া তীব্রকণ্ঠে অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় বলিয়া উঠিল, "খবরদার; একপা এগিয়ো না; খুন ক'রবো।"

উঃ, আবার সেই খুনের কথা? খুন—খুন—সতীপতি শিহরিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ জাগিল—বধূ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে নিশ্চয়ই কিন্তু— তিনি যে তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছেন, তাহা তো মানিবে না, স্বপ্নে নিহত হইবার আশঙ্কাও তাঁহার আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাও বিশ্বাস করিবে না, ইহা ছাড়া যে বিশ্রী ব্যাপারটার সন্দেহ স্বতঃই আসিয়া পড়িবে, তাহাতে পুত্রবধূর কাছে মুখ দেখান দূরের কথা, নিজের কাছেই তাঁহাকে জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিতে হইবে। সুতরাং কার্য্যোদ্ধার চাই—তাহাকে হত্যা করিতেই হইবে। নিজের লজ্জা ঢাকিয়া তাঁহাকে জীবন বাঁচাইতেই হইবে। মরিয়া সতীপতি উন্মত্তের মত বধূর দিকে ধাওয়া করিলেন।

...উগ্র পাশবিকতায় শয়তান আসিতেছে তাহার সতীত্ব ধ্বংশ করিতে, নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি? বধূ ক্ষিপ্তা হইয়া উঠিল। দুর্জ্জয় সাহসিকতায় নীচে লাফাইয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে রামদাখানা ছিনাইয়া লইয়া দেহের সবটুকু শক্তি প্রয়োগে সতীপতির ঘাড়ে আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল। হতভাগ্য সতীপতির রক্তমাংসের দেহটা খণ্ডখণ্ড হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

শতাব্দীর সম্মান

শ্রীপরিতোষ রায়

আদিম পৃথিবী প্রান্তে ঘুরে এল বসন্ত রঙীন,
শীতের বিধবা বনানী ফিরে পেল নূতন উচ্ছ্বাস :
সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে তবু ঝরে পড়ে মৃত্যুনীল দিন।
ধ্বংসের প্রচ্ছন্ন ধূমে ভিন্ন হয় আকাশ বাতাস।
কামান গর্জ্জন শুনি, চারি দিকে ধ্বংসের ইঙ্গিত,
প্রাগৈতিহাসিক বনে (সেখানেও স্বপ্ন খেলা করে)
একটি চাষার ছেলে মৃত্যুতে হয়েছে ম্লান, পীত :
বুলেটের স্পর্শ তার অগ্নিজ্বালে বুকের পাঁজরে।
একাহারে গেছে দিন, অনাদৃত সমস্ত কৈশোর,
কলের বাঁশী ত' তাকে কোনদিন ডাকে নি আদরে
সভ্যতার অভিশাপ পড়েছিল তাহারো ওপর,
বঞ্চিত সে যাযনিক কোনদিন আলোর প্রান্তবে।
আমাদের এ পৃথিবী কোনদিন দেয় নিত দাম
ওসব জীবন শুধু আসে আর ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাবে :
তাই ত' নিস্পৃহ মোরা, হোক তার এই পরিণাম,
ইতিহাসে তবু তারা এতটুকু স্থান নাহি পাবে।
হাজারো বুলেট এসে ব্যর্থ হয়ে যায় তারপর,
লক্ষ্যে গিয়ে বেঁধে এক, যে বুলেট অতি মূল্যবান,
ছেলেটীর মূল্যহীন জীবনেও দেখি সন্ধানর
হেনেছে বুলেট তীক্ষ্ণ ; দেয় নি কি সম্মান মহান ?

সিঙ্গাপুর

লিখিত ও চিত্রিত

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে সিঙ্গাপুর একটী অরণ্য সমাকুল ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। তখন ইহা ভীষণ ব্যাঘ্র ও বিপুলকায় অজগর সর্পের আবাসস্থল ছিল। ইহার ভয়াবহ অন্ধকার অরণ্যে জনমানব প্রবেশ করতেই সাহস করতো না। ষ্টাম্‌ফোর্ড র‍্যাফেল্‌স্ নামক একজন ইংরেজ হঠাৎ এখানে এসে পড়েন। তিনিই 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র একটী ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জোহরের সুলতানের নিকট হইতে এই দ্বীপটী ক্রয় করেন। ইংরেজ বাহাদুর বিশেষ কোন আকর্ষণের জন্য ইহা অধিকার করেন নি বা যুদ্ধ করেও দ্বীপটী তাঁকে অধিকার করতে হয় নি।

মালাক্কা উপদ্বীপের উপকণ্ঠস্থ এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যটীতে তখন কায়ক্লেশে অতি অল্প সংখ্যক মালয় ধীবর বসবাস ক'রতো। পৃথিবীর অন্যতম বন্দর হওয়া ত' বহু দূরের কথা, বহির্জ্জগতের কোন সভ্যজাতির সঙ্গেই সিঙ্গাপুরের কিছুমাত্র

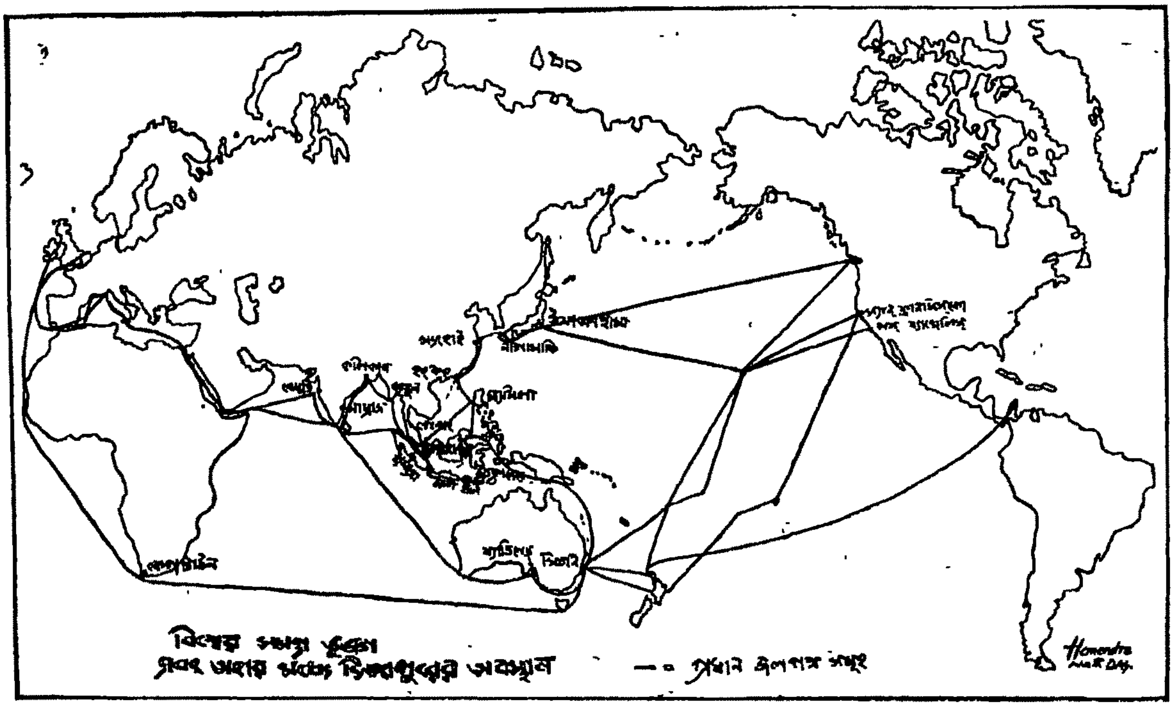

তখন সম্বন্ধ ছিল না। এখন সিঙ্গাপুর পৃথিবীর দশটী শ্রেষ্ঠ বন্দরের মধ্যে অন্যতম। সিঙ্গাপুর এখন একটী জনবহুল উদ্যান ও প্রাসাদ শোভিত নগরে পরিণত হয়েছে। যেথানে দিবাভাগে ব্যাঘ্র, শার্দ্দূল স্বাধীনভাবে বিচরণ করে বেড়াত, সেথানে এখন বিরাট বিরাট হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়েছে। বিরাট মর্ম্মর নির্ম্মিত আদালত, বড় বড় ব্যবসায় কেন্দ্র, 'জেটী', চীনাদের বিচিত্র গৃহ, মালয়দের মসজিদ, হিন্দুদের উপাসনা-মন্দির, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দিবাভাগে সহরের জনপথের অতি ব্যস্ত দৃশ্য, মানুষটানা রিক্সা, গো-জান, অশ্ব-জান, মোটরকার, মোটর-লরী ও শ্রমিকদের তুমুল কোলাহলে ধূলি-জাল সমাকীর্ণ নগরটীকে অতি বিচিত্র দেখায়। এখন সিঙ্গাপুরের বন্দরে, বৎসরে সহস্র সহস্র বাণিজ্যপোত ইউরোপ, আমেরিকা আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি হতে বাণিজ্য-সম্ভার বহন করে নিয়ে আসে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সিঙ্গাপুর হতে ইহার পণ্যদ্রব্য নিয়ে যায়।

মানচিত্র দেখলেই বোঝা যায়, ইহা মালাক্কা-উপদ্বীপের উপকণ্ঠেই অবস্থিত, ইহার ভৌগলিক অবস্থিতি অনেকটা জিব্রাল্টারের মত। প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রবেশপথের মুখেই পড়ে সিঙ্গাপুর, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে গেলে, সিঙ্গাপুরকে স্পর্শ করতেই হবে। এখন সিঙ্গাপুরে বহু বর্দ্ধিষ্ণু জাহাজ-পরিচালক কোম্পানী আফিস খুলেছে। এখানে এখন বহু তড়িৎ-বার্ত্তা, বেতার-বার্ত্তা-কেন্দ্র, বিমান-ঘাঁটী, নৌ-ঘাঁটী প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে। এখন এখানে সকল দেশ ও সকল ধর্ম্মের লোকেরই সাক্ষাৎ মেলে, ইহাদের অধিকাংশই এসেছে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে। এখানের অধিবাসীর সংখ্যা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। অধিবাসীদের মধ্যে চীনা এবং মালয় অধিক, তন্মধ্যে চীনারাই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাছাড়া, কোরিয়ান, জাপানী বর্ম্মী, সিংহলী, তামিল, দক্ষিণ-ভারতীয়, ইউরোপীয় লোকও এখানে যথেষ্ট আছে।

বহুকাল হতে মালাক্কা উপদ্বীপে মালয়দিগের বসবাস। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে তারা মালভূমি প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করে এবং ঐ ভূভাগের নাম দেয় মালয়প্রদেশ। মালয়ের শাসক ছিল সুলতানরা। ইহার পর প্রবল পরাক্রান্ত পর্ত্তুগীজ্‌রা ঐ প্রদেশ আক্রমণ করে' দুর্গগুলি ধ্বংস করে দেয়। পরে ওলন্দাজগণ মালক্কা হতে ম্যানিলা পর্য্যন্ত দখল করে। অবশেষে ইংরেজের হাতে ঐ দ্বীপপুঞ্জ এসে পড়ে। প্রায় একশত বৎসরের পর সিঙ্গাপুর আজ প্রাচ্যের অতি শক্তিশালী জাতি, জাপানের কবলে পতিত হলো।

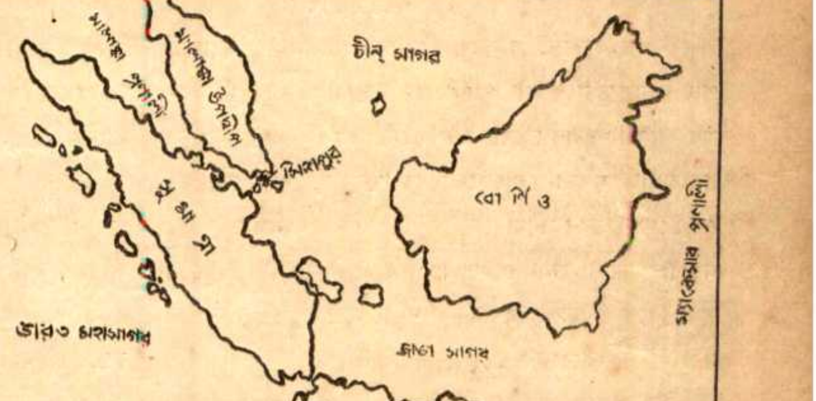

ক্ষুদ্র দ্বীপ সিঙ্গাপুরের নামানুসারেই এই বন্দরের নামকরণ হয়েছে। কুয়ালালাম্‌পুর ইহার রাজধানী। 'Strait Settlements-এর রাজধানী সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের শাসক (Governor) মালয় রাজ্য সমূহের হাই-কমিশনার। সিঙ্গাপুরের অপর পাড়ে জোহর একটী বড় স্বাধীন রাজ্য। ইহার শাসনকর্ত্তা হলো স্থানীয় সুলতান। পেরাক, পাহাং, নেগ্রি ও সেলাঙ্গার হলো মালয় ষ্টেটের অন্তর্গত। শ্যামদেশের প্রান্ত পর্য্যন্ত মালয়ের বিস্তৃতি। এখনও এখানে বহু মাইল ব্যাপী গভীর অরণ্য আছে। বন্য-হস্তী, বড় বড় অজগর সর্প ও উলঙ্গ মানুষ উহার মধ্যে বাস করে এখানে প্রচুর রবার গাছ আছে। এই অঞ্চলে টিন্ ও দস্তার খনি হতে প্রচুর অর্থাগম হয়। মালয়ের শস্যক্ষেত্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে, ব্রেজিল হতে, গোপনে কতক-

গুলি রবার চারা এনে এই অঞ্চলে রোপন করা হয়। রবার চাষের জন্য এখানের জলবায়ু ও মাটী বিশেষ অনুকূল। মাত্র এই ৬০ বৎসরের মধ্যেই এই অঞ্চলে রবারের চাষ এত প্রসার লাভ করেছে, যে সমগ্র জগতের প্রয়োজনীয় রবারের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এই প্রদেশ হতে রপ্তানী হয়। মার্কিনদের প্রচেষ্টায় রবার চাষের এত উন্নতি হয়। এখানে প্রচুর ধান হয়। অসভ্য লোকেদের বিষাক্ত বাণ, সাপ ও বাঘের ভয় উপেক্ষা করে চীনারাই প্রথম, এই অঞ্চলের গভীর অরণ্যের মধ্যে টিন ও দস্তার খনি আবিষ্কার করে। সিঙ্গাপুরকে একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করতে যারা সাহায্য করেছে তন্মধ্যে চীনারাই প্রধান।

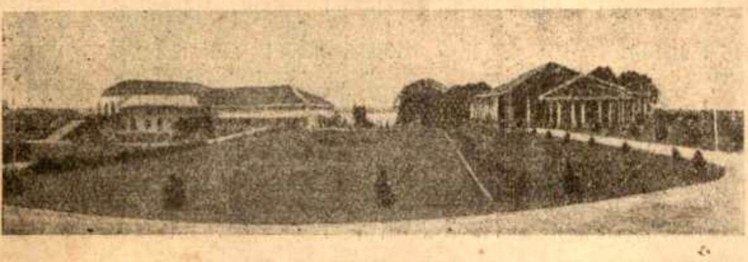

প্রশস্ত রাজপথ

মৎস্য-শিকার, ধান-চাষ, নারিকেলের আবাদ প্রভৃতি হ'লো এই অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা। মালয়-দ্বীপ-পুঞ্জের আশে-পাশে প্রচুর সামুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায়, সেগুলি ধরে অধুনা, যন্ত্র-পাতির সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে তৈল প্রস্তুত হচ্ছে। এই অঞ্চলে ঝাঁক ঝাঁক উড্ডীয়মান-মৎস্য দেখা যায়।

মালয়বাসীরা অত্যন্ত অলস; তাদের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই বেশী কাজ করে। পুরুষেরা নেশা করে বসে থাকতেই বেশী ভালবাসে। তারা অত্যন্ত বদ্-মেজাজী—সামান্য উত্তেজনাতেই নর-হত্যা করতে অভ্যস্ত—বোধ হয় সেটার জন্য তাদের ধর্ম্মই দায়ী। মালয়বাসীরা কোরান ছুঁয়ে শপথ ক'রে নাকি টাকা ধার নেয়, কিন্তু মহাজন টাকা চাইলেই তাকে ছোরার ভয় দেখায় এবং সুযোগ পেলে মহাজন মশায়ের প্রাণনাশ করতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং প্রকৃতির অতি রম্যস্থল সুন্দর সুদূর প্রাচ্যের এই অঞ্চলের মুস্লিমরাও দেখা যাচ্ছে, তাদের কলকাতার গোঁড়াতলার ভায়েদের পন্থাটায় সবিশেষ পটু। স্যার সোয়েটেনহাম্‌ দীর্ঘকাল 'Strait Settlements'এর গবর্ণর ছিলেন। তিনি বলেন, মালয়গণ অস্ত্র চালনায় বিশেষ সুদক্ষ। ইহারা বিশেষ রাজভক্ত। বুকে ছোড়া বসালেও এরা একটু সভ্য। কোন ব্যক্তি, কোন মালয়ের নাম বা গন্তব্য স্থানের সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে ইহারা তাকে অত্যন্ত অসভ্য বলে মনে করে। বুদ্ধির দিক থেকে মালয়-পুরুষগণ বেশ নিরেট নির্ব্বোধ; নেশা, নৃত্য, নারীই হলো তাদের বিশেষ কাম্য। যখন, নিতান্ত কাজ না করলে আর চলে না, জঠরাগ্নি জ্বলে ওঠে, তখনই কেবল তারা বল্লম হাতে মৎস্য-শিকারে বাহির হয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যা' মৎস্য শিকার হয়, তাতেই তাদের সংসার চলে যায়। নিজের প্রশংসা শুনতে তারা বড় ভালবাসে। তাই মহাজনেরা তাদের একটু নেশা করিয়ে প্রশংসা ক'রে কৌশলে কাজে লাগিয়ে দেয়। প্রশংসার আশায়, তখন তারা বেশ মন দিয়ে কাজ করে থাকে। কিন্তু একবার ক্ষেপলে, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের প্রাণ নিতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না।

পূর্ব্বে, বহু শত বৎসর হতে মালয়রা জল-দস্যুতার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে আসে। বাণিজ্য-জাহাজ দেখলেই তারা বড় বড় দল বেঁধে বিচিত্র নৌকার সাহায্যে জাহাজে এসে উঠতো এবং জাহাজের সমস্ত পণ্য-দ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠন করে নিয়ে চলে যেত। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি কাছের বন্দর সমূহে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জ্জন করতো। কিন্তু 'Strait Settlements' উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পর হতে তাদের উপর কড়া নজর রাখা হত, জলের ধারের ডাকাতদের ঘাঁটিগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়; পুলিশের তৎপরতায় এখন মলয়বাসীদের বাধ্য হয়ে ভালমানুষ হতে হয়েছে। এখন শ্রমজীবীর কাজই হলো তাদের প্রধান উপজীবিকা। তেলে ভেজান ঘাসের টুপি ও নিল পায়জামা পরে তাদের বহুসংখ্যক এখন রিক্‌স গাড়ী টেনে বেড়ায়।

মালয় স্ত্রীলোকগণ সব কাজই করে থাকে। ধান-ভানা, চাল-কোটা থেকে আরম্ভ করে—মৎস্য-শিকার, গৃহ-নির্ম্মান প্রভৃতি সব কাজই তারা জানে। অবস্থাপন্ন লোকেদের স্ত্রীলোকদের অবশ্য কাজ করতে হয় না। বহুসংখ্যক নরনারী

আজকাল রবারের কারখানায় কাজ করে। রবার গাছের চারা পোঁতা, বড় বড় গাছের গা কেটে আঠা বাহির করা, বাল্‌তিতে করে ক্ষারিত রবার সংগ্রহ করা, কলে তৈরী কাপড়ের মত বড় বড় রবারের টুকরা চালানের জন্য ভাঁজ করা প্রভৃতি কাজ তাদের করতে হয়।

শ্রমজীবীরা, বেতের তন্তু হতে নানারূপ সৌখিন মাদুর, পাটী, মোড়া প্রভৃতি তৈরি করে। ঘাস হতে টুপী, জুতা প্রভৃতি অনেক জিনিষ এবং কারুকার্য্যখচিত আবলুস ও হস্তিদন্তের কাজও তারা করতে পারে। বিচিত্র কোমর-বন্ধ, ছোরার-খাপ, কেশ-সজ্জার নানারূপ সৌখিন সামগ্রী, হাতে বোনা শাল, রুমাল প্রভৃতি নানারূপ জিনিষ তারা তৈরী করতে পারে। মোটের উপর জাভা, বালি, সুমাত্রার সঙ্গে তুলনা না হলেও মালয়বাসীরা গৃহ-শিল্পে বিশেষ হীন নহে। কচ্ছপের খোলা হতে তারা অতি সুন্দররূপ বিচিত্র জিনিষ নির্ম্মাণ করে থাকে। সদ্য ডিম্ব হতে বহির্গত কচ্ছপ বালু হতে জলে নাবামাত্র মালয়েরা কৌশলে তার খোলা ছাড়িয়ে নেয় এবং ঐ কচি খোলা হতে চিরুণী ও অন্যান্য নানারূপ সুদৃশ্য কেশ-প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুত করে। খোলা ছাড়িয়ে নিলেও কচ্ছপ মরে যায় না। জলে কিছুকাল থাকার পর তাদের দেহে নাকি আবার নূতন খোলা জন্মায়। প্রবাদ আছে, অতি প্রাচীন কাল হতে পেরাকের সুলতানরা কচ্ছপের ডিম্ব শিকার (আহরণ) করতে ভালবাসতেন।

কজওয়ে সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের একটি দৃশ্য

সিঙ্গাপুরে বহু দেখবার জিনিষ আছে। একদিকে সুদৃশ্য অতি বিরাট সৌধ-শ্রেণী, বিপনি, বন্দর, আলোকোজ্জ্বল প্রশস্ত রাজপথ অপরদিকে প্রকৃতির রম্যস্থল বিরাট সেগুণ গাছের অরণ্য, ঘন সুপারি-বন, রবার-বন, আনারস ও পাদপাদপের সুন্দর বাগান। এখানের কারুকার্য্য শোভিত বৌদ্ধমন্দির একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য। পথের মধ্যে অরচার্ড রোড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিঙ্গাপুরের বাজারই একটী বিচিত্র দেখবার জায়গা; এখানের মত এত অদ্ভুত রকমের সামুদ্রিক মাছ, এত অধিক পরিমাণে পৃথিবীর আর কোন বাজারে নাকি দেখা যায় না। বাজারে মাছ ছাড়া নানারকমের শাকশব্জী ও ফলমূল পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুরের 'ম্যাঙ্গাষ্টীণ' একটি নাম করা ফল। ইহার স্বাদ অতি চমৎকার, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা সত্ত্বেও ভাল অবস্থায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে একটি ফল পৌঁছে দিতে কেহই সমর্থ হয় নি।

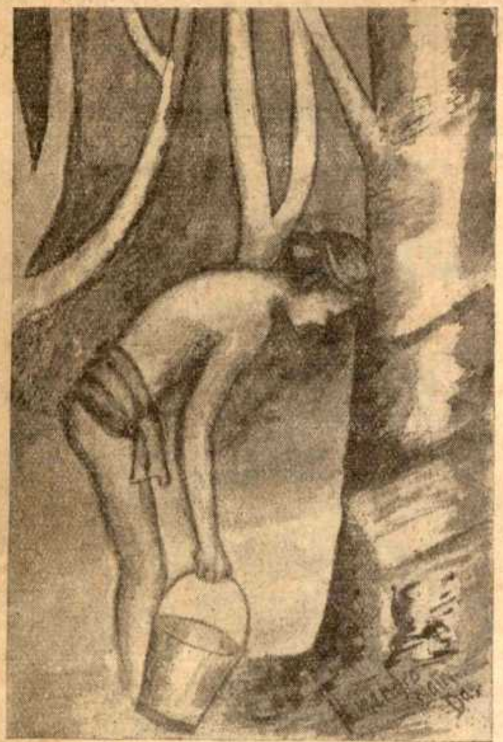

ক্ষরিত রবার সংগ্রহ

সিঙ্গাপুরের লোকেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাঁশ ও পাতা দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঘর করতে পারে। বাঁশের একটি ঝুড়ি ঝুলিয়ে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুজন কুলী জাহাজে অবিশ্বাস্যরকম ওজনের কয়লা বোঝাই করতে পারে। সিঙ্গাপুরে মদ ও আফিং ছাড়া অপর কোন জিনিষের উপর কর নেই। এখানের দিবা ও রাত্রি সমান। এখানের জলবায়ু শিশুদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হওয়ায় শিশুমৃত্যুর হার এখানে খুব কম, তাই সিঙ্গাপুরকে "শিশুদের স্বর্গ" বলা হয়।

এখন এখানের লোকেরা পূর্ব্বের মত অসভ্য নেই। মালয়রা ছেলেমেয়েদেয় বিদ্যালয়ে পাঠাতে আরম্ভ করেছে, নিজেরা, শ্বেতাঙ্গদের অনুকরণে, 'হ্যাট্-কোট্' পর্‌তে সুরু করেছে, তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বল্‌তে শিখ্‌ছে। এখানে বহু-বিবাহের প্রথার প্রচলন আছে। মালয়রা নব বিবাহিত দম্পতির উপর চাল ও কমলা পুষ্প নিক্ষেপ করে—তাতে নাকি দম্পতির মঙ্গল হয় এবং তাদের সুসন্তান লাভ ঘটে। পূর্ব্বে মালয় নারীরা চুল কাটতো, তাতে তাদের ভারী বিশ্রী দেখাতো, এখন তাদের অনেকে দীর্ঘ কেশ রাখ্‌ছে, তাতে তাদের নারীসুলভ সৌন্দর্য্য অনেকখানি বেড়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ম্মীদের মত এখানে মেয়েরা রঙ্গিন লুঙ্গী পরে। নৃত্য-কলায় মালয় প্রদেশের সভ্য নারীরা বেশ পারদর্শী। এবং এই চারু-কলাটিকে মালয়ের লোকেরা বেশ সম্ভ্রমের চোখে দেখে। মালয়রা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। খৃষ্টান যাযকরা অনেক চেষ্টাতেও তাদের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করতে সমর্থ হয় নি। তারা পরধর্ম্মের নিন্দা করে না। মালয়রা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী।

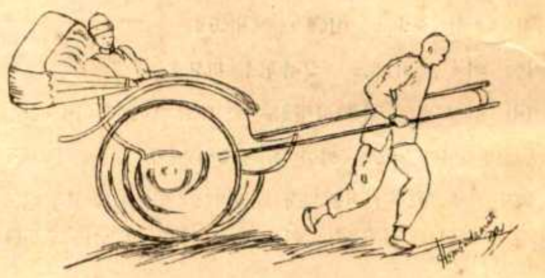

পায়জামা পরিহিত রিক্সওয়ালা

সিঙ্গাপুর

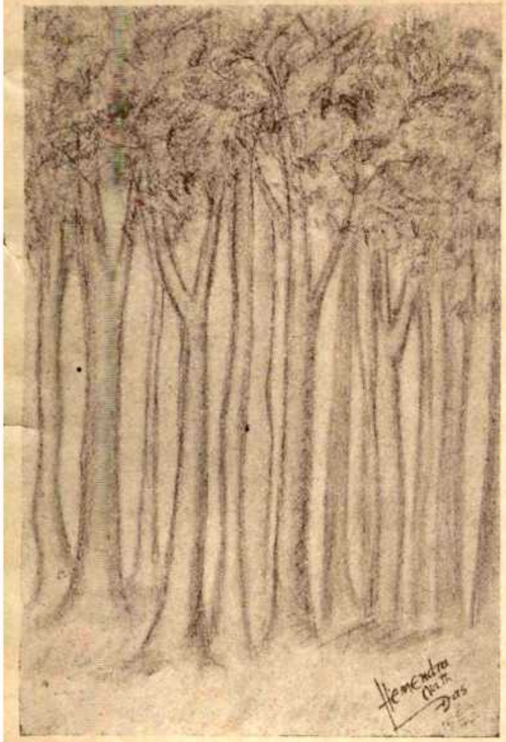

রবার বৃক্ষের অরণ্য

রবারক্ষেত্রের শ্রমিকদের আবাস-গৃহ

সুপারি-বৃক্ষ বিথীকা

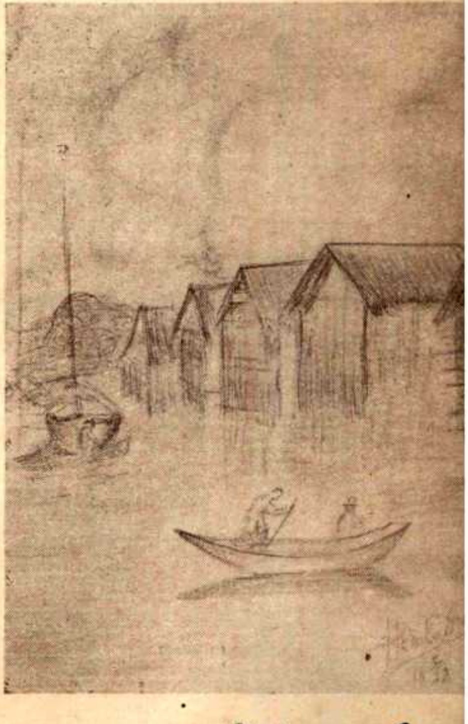

ভাসমান গৃহ

শোক

শ্রীলতিকা সেন এম-এ, বি-টী

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র আর্ত্তনাদ কানে এল। শরৎকালের স্নিগ্ধ প্রভাত, দিবারম্ভেই অসন্তোষ,—মনটা বাস্তবিকই খারাপ হ'য়ে রইল। সারাদিনই হয় ত' চল্‌বে এর জের।

প্রতিবেশী মিষ্টার দাস মারা গেলেন, এ খবরটা ছড়িয়ে প'ড়ল অতি অল্প সময়ে এবং অনেক জায়গা নিয়ে, যেমন ক'রে কারু কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে পড়ে। সরল নির্ম্মল শরতের সকালে মৃত্যুর ম্লানছায়া যে বাড়ীতে বিস্তৃত হ'য়েছে তার পরিজনদের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে আমার খিঁচড়ে-যাওয়া মনকে শান্ত ক'রলাম।

ধূমায়িত সোনালী চা পানের সময়ে মিষ্টার দাসের কাহিনীই চ'লল। সহরের নাম করা লোক, অর্থবান; যক্ষ্মাব্যাধিগ্রস্থ হ'য়েছিলেন, গত চার বৎসর। আজ সমাপ্তি হ'ল তার যন্ত্রনার, মিসেস দাসের উদ্বেগের এবং নার্স-ডাক্তারদের আসা-যাওয়ার।

মিষ্টার দাসের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল—বেশ ঘনিষ্ট-পরিচয়ই। বছর তিন হ'ল মাত্র তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাঁর রোগ শয্যাকে আমার মনে হ'ত কয়েদখানা। ধব্‌ধবে বকের পালকের মত সাদা বিছানায় রাত্রি দিন প'ড়ে থাকতেন ছোট্ট শিশুর মত। কী আকাঙ্ক্ষা বাঁচবার—কী উৎসাহ নিয়ে প্রকাশ ক'র্‌তেন জীবনটা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ ক'রবার ইচ্ছা—কী স্পষ্ট, নির্লজ্জ ও নির্ম্মমভাবে বলতেন তাঁর যৌবনের উদ্দাম খেলার কথা। বিলেতে থাক্‌তে তাঁর দৈনন্দিন জীবন কাহিনীগুলো বল্‌তেন আমাকে অত্যন্ত সরল ভাবে। জানি না কি মায়া, কি মন্ত্র ছিল তাঁর কণ্ঠস্বরে যাতে তাঁর পাপের স্পষ্ট স্বীকারোক্তিগুলোকে নীচ, হীন ব'লে ভাবতে পারি নি। সে সব পাপের কাহিনী থেকে তিনি নিজেই ফুটিয়ে তুল্‌তেন নূতন বিচিত্র সুর,—ব'লতেন তিনি একটু জোর পেলেই লিখবেন নিজের হাতে সব অভিজ্ঞতার কথা।

শবযাত্রার আগে তাঁকে একবার দেখতে ইচ্ছে হ'ল। আমার সঙ্গে দাস পরিবারের প্রতিটি পরিজনের আলাপ ছিল। মিসেস দাসের ছিলাম আমি "ঠাকুর-পো ভাই"।

যতটুকু মিসেস্ দাসকে জানতে পেরেছিলাম, মনে হ'ত তাঁর জীবনে একটা মস্ত ফাঁক র'য়ে গ্যাছে। সাড়ী, গহনার প্রাচুর্য্যে ও বৈচিত্র্যে, রিফ্রেজেরিটারের ঐশ্বর্য্যে সে ফাঁক পূর্ণ হয় নি। স্বামীর সঙ্গে মনান্তর বিশেষ বোঝা যেত না—তবে ছিল মনান্তর। তথাকথিত সমাজে তাঁরা হ'লেন আদর্শ দম্পতী।

সে যাক, আমার সঙ্গে তাঁদের দাম্পত্যজীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

চা পান করেই দাস পরিবারের গৃহে উপস্থিত হ'লাম। আপনারা ব'লবেন এ কেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এত বড় শোকের সময়েও লোকে চায়ের জন্য অপেক্ষা করে? উত্তরে আমি বলব' যে, স্বভাবতঃই আমি "পিপু-ফিশু"র দলে। নিদ্রার চাইতে আরামের বস্তু সংসারে নেই, ছিল না এবং কোন দিন হবে না—এ আমি সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করি। সহধর্ম্মিণীর পাতিব্রত্যে খুসী না হয়ে পারি না—দৈনিক কাজের উপযোগী ক'রে তুলবার জন্য যখন তিনি শয্যাপার্শ্বে চা, চামচ-ও চায়ের কাপ সহযোগে বৈতালিকের কাজ করেন। এ হ'ল প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায় চা-এর টেবিল-দ্বিতীয় পেয়ালা আমার কাছে আরেকটি "সোনালী মুহূর্ত্ত।"

মিষ্টার দাসের মৃত্যুসংবাদ আমি গভীর ভাবে অনুভব ক'রেছি, শোক অত্যন্ত গভীর হ'ল আমার। আবার চা পান ক'রে গভীর তৃপ্তিও লাভ ক'রলাম। শোক যতই গভীর হোক্ চা না খেয়ে বাইরে বেরুবার কথা অনেকে ভাবতে পারেন অন্ততঃ আমি ত' পারি না। উপবাসী থেকে কান্নাকাটি ক'রে আবার তিন চার ঘণ্টা পরে অন্যদের সাধাসাধি ক'রে খাওয়ানোর থেকে মুক্তি দেওয়াটাকে আমি পুণ্যের কাজ মনে করি।

তিনখানা বাড়ী অতিক্রম ক'রেই মিষ্টার দাসের গৃহ। শুধু গৃহ বললে তার কৌলিন্য খর্ব্ব হয়—বিরাট, সুদৃশ্য প্রাঙ্গণযুক্ত ত্রিতল গৃহ।

সদরদরজায় লোকারণ্য। মিষ্টার দাসের এত বন্ধু আগে ত' জানতাম না! অত্যন্ত কোলাহলপূর্ণ দাসভবনের প্রাঙ্গণ। চারিদিকে যে সব মুখ দেখলাম তাতে শোকের চাইতে উদ্বেগের চিহ্নই বেশী পরিস্ফুট।

মৃতের কক্ষে উপস্থিত হ'লাম। মিসেস দাস ভূলুণ্ঠিতা। মিনতি—মিষ্টার দাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী সরবে ক্রন্দনরতা। কয়েকজন মহিলা এঁদের দু'জনকে সান্ত্বনা দানে ব্যস্ত। মিনতিকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন একজন, "ছি মা কেঁদো না, ধৈর্য্য ধর সংসারে আরও কত পরীক্ষা আছে। রোগ শোক সবই ভগবানের দান—মাথা পেতেই যে নিতে হবে সব। এত কাতর হতে নেই—দেখ দেখি তোমার কাকীমাকে, কি ধৈর্য্যশীলা।"

নিকটেই আরেকজন মিসেস্ দাসকে বোঝাচ্ছিলেন, "তোমার দুঃখের অন্ত নেই বুঝি মা, কি করবে বল? আমরাই বা কি সান্ত্বনা দিতে পারি। তুমি এমন ক'রে কান্না চেপে রেখো না, ওতে আরও খারাপ হয়। কেঁদে তোমার বুক হাল্কা ক'র—নয় ত' তুমিও একটা অসুখ বাধিয়ে বস্‌বে।"

মিষ্টার দাসের পাণ্ডুর মুখমণ্ডল স্মিতহাস্তে উদ্ভাসিত। এত সুন্দর সে মুখ! মৃতের পার্শ্বকক্ষে মিষ্টার দাসের দুই ভ্রাতা ও তিন ভ্রাতুষ্পুত্র বসে নানান্ আলোচনায় ব্যস্ত। কোন্ কোন্ রাস্তায় শব-যাত্রা নেওয়া যেতে পারে। চার পাঁচটা প্রয়োজনীয় ফোন্ হ'য়ে গেল চটাপট্ ফুলওয়ালা, ফার্ণিচারওয়ালা প্রভৃতির কাছে—রীতিমত দরদস্তুর করা হ'ল এদের সঙ্গে। শোকের এতটুকু বাষ্প নাই এদের কণ্ঠস্বরে। পিক্‌নিকে যাবার মত, অতি সাধারণ ব্যাপারের মত বিধি-ব্যবস্থা হ'ল যেন।

শবদেহকে সাজান হ'ল অতি সুন্দর ভাবে। ভাইদের কাছ থেকে এত স্নেহ বোধ হয় মিষ্টার দাস জীবিতাবস্থায় কখনও কল্পনাও করেন নি। শ্বেতপুষ্পের কোরকে নূতন মেহেগনির খাট আচ্ছাদিত হ'ল। আদরে সন্তর্পনে ভাইয়েরা শোয়ালেন মিষ্টার দাসকে সেই পুষ্পশয্যায়। তাঁদের ভ্রাতৃপ্রীতিকে ধন্য ধন্য ক'রল মনে মনে বাইরের লোকেরা।

অনেক কষ্টে মিসেস্ দাসকে কুশানে হেলান দিয়ে তুলে বসান হল। এবারে তোলা হ'লো একটি শোকের বিজ্ঞাপন। একটি মামুলি প্রার্থনা করলেন মিষ্টার দাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, আর একটি মেয়েও গাইল একটি মহাযাত্রার গান বেশ শান্তভাবে।

খাট তুলবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার তীব্র আর্ত্তনাদ শোনা গেল শোকের ঘোষণা তীব্রতর হ'তে লাগল ক্রমশঃ।

চারিদিকে শোনা যেতে লাগল, মিষ্টার দাস অতি চমৎকার লোক ছিলেন। এমন অমায়িক, দানবীর, নিঃস্বার্থ, প্রাণখোলা লোক এ সংসারে বিরল।

এ সবই ঠিক সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি জানি কী নিঃসঙ্গ অলস জীবন যাপন ক'রেছেন রোগশয্যায়। নার্স ডাক্তার ছাড়া যাঁরা তাঁর কাছে দিনে তিন মিনিটের বেশী থেকেছে তাঁদের গুণতে দু'-সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগে না। মিসেস্ দাসের মিটিং, ক্লাব ইত্যাদি চ'লেছে সাবলীল গতিতে। স্বামীর দুরন্ত রোগ বাধা দিতে পারে নি একদিনের জন্যও। মিসেস্ দাসের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় ক্লাব সমিতি মুগ্ধ। ক্লাবের প্রতি তার একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা কুন্ত-জর্জেট মহলে আলোচিত হয় একাধিক বার।

'দাস ভবনে' যথাসময়ে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ছড়িয়ে গেলে কয়েকটি আত্মীয়া অনেক সাধ্য সাধনার পর মিসেস দাসকে চা, ফল ইত্যাদি ভোজন করালেন। শ্মশান প্রত্যাগতদের শ্রমাপনয়ন হ'ল দ্বারিকের সরবত ও সন্দেশে।

ঝি, চাকরের অতিরিক্ত ব্যস্ততা, হুড়ো হুড়ি দাসভবনের শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হ'তে লাগল। নিত্য নৈমিত্তিক কলহ আজ শোকের দিনে বন্ধ থাকলেও হঠাৎ শোনা গেল, পাঁচুর মা অনুপস্থিত। পাঁচুরমার কাজ কে করে? গিন্নির পা-টেপা, তেল-মাখানো ইত্যাদি কাজ কে ক'রবে যদি পাঁচুর মা থাকে অনুপস্থিত? এ নিয়ে পরিচারক মহলে বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হ'ল।

যথাসময়ে কথাটা মিসেস দাসের কক্ষে পৌঁছিল। একত্রে দু'টো তিনটে মিহিগলার প্রশ্ন, "কেন আসে নি? কি বে-আক্কেলে, বাড়ীতে এতবড় শোক—এ বিপদে সে কি ব'লে এলোনা? How irresponsible! She deserves .."

বুঝি বাধা পেয়ে গেল বয়ের কথায়, "পাঁচুর মা আমাকে বলে দিয়েছে এখানে বলতে যে পাঁচুর কাল রাত থেকে ভেদবমি হচ্ছে তাই আজ সে আসতে পারবে না—পাঁচু ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে ছুটি দিতে হবে।"

মিসেস্ দাসের আত্মীয়া সহানুভূতিতে গ'লে বল্লেন, "ছুটি দিতে হবে মানে? তার ইচ্ছামত সব হবে নাকি? ও সব অসুখ বিসুখের কথা সব মিছে। এখন কাজের বাড়ী—খাটুনি বেশী—ফাঁকি দেবার মতলব। ও সব হবে না—তাকে আসতে বল্ শীগ্‌গীর। আর নিরু—ভালকথা—তুমি এসব একেবারে প্রশ্রয় দেবে না—তোমার মন আবার যেরকম নরম কারু অসুখ বিসুখের কথা শুন্‌লেই তুমি দরদে গলে যাও। আমি এমন ঢের দেখেছি, কাজে ফাঁকি বুঝতে পারি। ওর Fine ক'রে দিও এরকম বেয়াদপির জন্ত, কি বল?"

কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে উত্তর দিলেন মিসেস্ দাস, "আমি আর কি ব'লব দিদি। আমার এ বিপদের সময়—তোমরা যা ভাল বোঝ কর।" "বেশ—তাই করব" ব'লে উঠলেন মিসেস্ দাসের সহৃদয়া আত্মীয়াটি।

দুই

অল্প পরিসর ঘরের মাঝে পাঁচুর মায়ের কাতরোক্তি গুমরে গুমরে উঠছে। পাঁচুর বাবা হরিপদ বুঝি বা পাগলই হয়। পাঁচুর মত আজ সেও কলেরায় আক্রান্ত। একে কঠিন ব্যাধির তাড়না তদুপরি পুত্রশোক। এই ক্ষুদ্র কুটিরে যে শান্তি বিরাজ ক'রত তা গত দু'দিনে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। পাঁচুর মা নির্ম্মলার উপর দিয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ বিপদের ঝড়। নিয়মিত ঔষধ সেবন করানো, পথ্য তৈরী, মল বমি ইত্যাদি পরিষ্কার করা সবই এক হাতে ক'রছে নির্ম্মলা। এ সবের পরেও মাঝে মাঝে ছুটে যায় বেড়ার গায়ে টাঙ্গানো কালীর ছবির কাছে। "মা তোর মনে কি আছে জানি না তুই আমায় শক্তি দে মা। আমার এই দুখের বাচ্চাকে নিয়ে কি করবি তুই? ওকে দে তুই ভাল করে।" বড় বড় ফোঁটায় নেমে আসে নির্ম্মলার বেদনার অশ্রু। মায়ের বুঝি বা পাঁচুকেই দরকার হয়েছিল আগে।

এক পাঁচুর চিকিৎসাতে নির্ম্মলা হয়ে গিয়েছে নিঃস্ব। স্বামীর চিকিৎসাতে অর্থব্যয় করার সঙ্গতি নেই। চিকিৎসা দূরের কথা উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা হওয়াই দুরূহ।

"বৌ তোকে বুঝি একলা রেখেই গেলাম রে—" হরিপদর কথা কানে আসতে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নির্ম্মলা বলে, "তুমি একথা বোল না, আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি।"

"ডাক্তার ত' পাঁচুকেও অসুধ দিয়েছিল বৌ, কৈ সে ত'—" হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে হরিপদ।

নির্ম্মলার মাথার শিরাগুলি দপ্ দপ্ ক'রতে থাকে। "তুমি দশ মিনিট একলা থাক ওঘরের দুলালের বৌকে না হয় রেখে যাচ্ছি। আমি যাব আর আসব।"

দুই হাতে মাথা চেপে বেরিয়ে আসে নির্ম্মলা। মনে মনে বলতে থাকে, "সাহস দে মা, শান্তি দে মা।" আর হন্ হন্ করে চলতে থাকে। দুলালের বৌকে পাঠিয়ে দিয়ে চলতে থাকে আরও দ্রুতপদক্ষেপে। পথে দেখা হয়ে যায় দাস-ভবনের বয়ের সাথে।

"আরে পাঁচুর মা যে, শীগ্‌গীর যা বাবু কাল মারা গেলেন, আর তুই যাস নি? সবাই খুব রাগ ক'রছেন ওখানে। যা যা শীগ্‌গীর যা। আরে ভাল পাঁচু আজ আছে কেমন?"

"সে ত' নেই"—আরও জোরে চলতে থাকে নির্ম্মলা। বিনা চিকিৎসায় স্বামী মারা যাবেন? এ অসম্ভব। টাকা চাই-ই। গিন্নির কাছে না হোক কর্ত্তার ভাইদের কাছ থেকেও কিছু অগ্রিম চেয়ে নিতে হবে। তাঁদের বুঝিয়ে বল্লে কি আর দয়া হবে না। কর্ত্তারই ত' ভাই সব।

ভাবতে ভাবতে সে এক সময়ে দাসভবনে পৌঁছায়। অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে প্রবেশ করে দাসভবনে। বারান্দায় দেখা হয় দাসী বিমলার সঙ্গে, সে বলে, "ওদিক্ যা মেমসাহেব আছেন কোনের ঘরে।"

দোর গোড়ায় পৌঁছে নির্ম্মলা থমকে দাঁড়ায়। মিসেস্ দাসের ঘরে বহু লোকের আগমন। তাঁরা জানাতে এসেছেন সহানুভূতি। মিসেস্ দাসের দুঃখে তাঁদেরও দুঃখ, মিসেস্ দাসের সুখে তাঁদেরও সুখ।

মিসেস্ দাস কার্পেটে শুয়ে আছেন—চক্ষু নিমীলিত বন্ধু আত্মীয়াতে পরিবৃতা।

মিসেস্ দাসের সেই আত্মীয়া পাঁচুর মাকে দেখতে পেয়ে বল্লেন, "এই যে এসেছ দেখছি এমন কেআক্কেলে, আগে আসতে কি হয়েছিল? হ্যাঁ? কাজে ফাঁকি দিতে কি আর অন্ত সময় পেতিস না। নে ভাল করে এবারে তেল মালিশ কর।"

"কিন্তু মা আমিও যে আজ বড় বিপদে পড়েছি, কি বলব মা আমাকে দয়া করুন। আপনাদের ছাড়া আর কাকেইবা

বলব। আমার স্বামীর চিকিৎসার জন্য ৮।১০টি টাকা যদি দিতে পারেন আজ—"

"কি বল্লি? তাই বল, উনি এসেছেন টাকা চাইতে, এই না ছেলের অসুখের কথা বলে কাল আসা হয় নি আজ আবার স্বামীর অসুখের বায়না। এই বিপদের সময়ে উনি এলেন মিথ্যে বায়না নিয়ে—"

"মিথ্যে নয় মা—সত্যি আমার—"

"খবরদার বলছি, দূর হ' সামনের থেকে, আয়া, আয়া, একে নিয়ে যা সাম্‌নে থেকে। জ্বালাতন একেবারে। আর ব'লে দে ওর এখানে কাজ করার দরকার নেই। আমরা অন্যলোক দেখব, ও যেন আর বিরক্ত করতে আসে না।"

"মেমসাহেব, আমার এ মাসের এই বারোদিনের মাইনেটা যদি দয়া ক'রে দেন এখন। আমি আমার স্বামী ভাল হ'য়ে গেলে বিনি মাইনের খেটে দেব অনেক দিন। দিন মা, আমার বড় বিপদ।"

একসঙ্গে এতগুলো কথা ব'লে হাঁপাতে থাকে পাঁচুর মা।

"তোমার বিপদটাই বড় দেখছ, আর আমাদের বিপদ, বিপদ নয়? এখন কে যাবে তোমার ঐ বারোদিনের হিসেব ক'রতে? দু'দিন বাদে এসে নিয়ে যেও, টাকা তো আর পালাচ্ছে না?"

"তা নয় মা, আমার যে—"

"কি, তর্ক?" হুঙ্কার ছাড়েন মহিলা। "বেরো, এই মুহূর্ত্তে, বেয়াদপির জন্য দু'টাকা জরিমানা হ'ল তোর।"

কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসে নির্ম্মলা। বাবুর ভাইদের সাথে দেখা ক'রতে চায় একবার। বাইরে বসবার ঘরে তাঁরা সব অনেক কাগজ পত্র নিয়ে ব্যস্ত। মিষ্টার দাস উইল ক'রে যান্ নি, উকিলবাবুর সঙ্গে তাই এ নিয়ে আলোচনা।

ভাইদের মধ্যে একজনের হঠাৎ চোখ পড়ে বারান্দায়। নির্ম্মলার রুক্ষ কেশ, সজল চক্ষু তাঁকে এতটুকু বিচলিত ক'রল না। চোখে মুখে অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে সশব্দে দরজা দিলেন বন্ধ ক'রে।

আশাভঙ্গের বেদনায় মুসড়ে প'ড়ল বিমলার কাছে গিয়ে। বিমলা বল্লে, "আজ ত' হাতে নেই ভাই, কাল তুই ভোরে যাস আমার বাড়ী। গোটা পাঁচেক টাকা যোগাড় ক'রতে পারব বোধ হয়। মিনতিদিদির কাছে দেখব একবার চেয়ে, যাই বলিস মিনতিদিদির মনটা বেশ নরম।"

"তবে আমিই যাই না কেন তার কাছে?"

"তাঁর সঙ্গে ত' এখন দেখা হবে না। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাল থেকে কিচ্ছু খান নি—আমিই বলবখ'ন পরে।"

নির্ম্মলা খালি হাতে ফিরে আসে। দশ মিনিটের জায়গায় বোধ করি এক ঘণ্টার উপর হয়ে গেছে এই দরবারে। ফিরে এসে দেখতে পায় তার স্বামী বমিতে মলেতে মেঝের উপর লুটোপুটি কর্চ্ছে আর অদূরে দুলালের বৌ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে।

হরিপদকে মুক্ত করল নির্ম্মলা। যত্নে শুইয়ে দিল পরিষ্কার বিছানায়। হরিপদর সমস্ত হাত পা ঠাণ্ডা—নির্ম্মলা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাকে সুস্থ ক'রবার চেষ্টা ক'রতে লাগল।

ভোরের দিকে হরিপদর স্বর অস্বাভাবিক হয়ে এল। সকাল আটটায় হঠাৎ একবার অনুনাসিক স্বরে বল্ল "বৌ তোকে একলা ফেলেই গেলাম রে!"

আর কোন কথা বলতে পারে নি হরিপদ। এর পরে একবার জলের জন্য হা করেছিল, এক ঢোক জল পান করার সঙ্গে সঙ্গে হেঁচকি উঠে হরিপদ প্রাণত্যাগ করল। হিমশীতল দেহের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল নির্ম্মলা।

বিমলা দুর্ভাগিনী নির্ম্মলার কথা ভোলে নি। সকাল নয়টায় নির্ম্মলার দরজায় এসে দাঁড়াল মিনতি, ডাক্তার প্রবোধ বসু ও বিমলা।

বংলার জাতীয় জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

দুই

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের উপরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রভাব যে কতখানি ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে পূর্ব্ব প্রসঙ্গে তাহার কিছু কিছু আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৈষ্ণবের গীতি-কবিতা বা প্রেম-সঙ্গীতের দ্বারাই বাঙ্গালার সাহিত্যকে অমর করিয়াছে। শুধু বৈষ্ণব গীতি-কবিতার কথাই বা কেন, বাঙ্গালার সকল গীতিই ঐ প্রেমের সুরে অনুপ্রাণিত। বৃন্দাবন লীলার সুমধুর সঙ্গীত বাঙ্গালার জনগণের চিত্ত জয় করিয়া তাহার স্বতোৎসারিত লোক সঙ্গীতকে বৈষ্ণবীয় প্রেমরসে অভিষিক্ত করিয়াছে। প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সমুদয় প্রেম-কাব্য রাধাকৃষ্ণ প্রেম-প্রভাবে প্রভাবান্বিত। উনবিংশ শতকে দেবলীলা ছাড়িয়া দিয়া লৌকিক প্রেম প্রণয় কাহিনী যখন সাহিত্যের উপজীব্য হইতে সুরু হইল তখনও এই সুগভীর রাধাপ্রেমের প্রভাবেই তাহা এমন সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

পূজিব পিরীতি প্রেম, প্রতিমা করে নির্ম্মাণ
অলঙ্কার দিব তাহে যত আছে অপমান
যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পূরি অঞ্জলী
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ।

অথবা—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানি নে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখিতে বড়ই ভালবাসি।
তাই তোমায় দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসি নে॥

প্রেমের এই অতীন্দ্রিয়তা ও গভীরতা যে কোথা হইতে আসিল তাহার মূল অনুসন্ধান করা কঠিন নহে। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ইয়োরোপীয় ভাবধারার প্রবল আলোড়নে বাঙ্গালার চিরাচরিত চিন্তাধারার উজান বহিল। বাঙ্গালার শান্ত গৃহকোণ নিরুদ্ধ স্নিগ্ধ দৃষ্টি বিপুল পৃথিবীর বৈচিত্র্যের সন্ধান পাইয়া সার্থক হইল। সাহিত্যের নানা দিকে ব্যাপকতা ও প্রসারতা আসিল। আপাতঃদৃষ্টিতে এই ইয়োরোপীয় প্রভাবান্বিত সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণবের অতীন্দ্রিয় প্রেমের সূক্ষ্মদৃষ্টির সন্ধান না পাওয়া গেলেও ইহার অন্তর্নিহিত মর্ম্মস্থলে বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারার পরোক্ষ প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা ইয়োরোপীয়-ভাব-সংপৃক্ত উনবিংশ শতকের সাহিত্য-মহারথগণের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু ইঙ্গিত করিয়া আমার বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। বাঙ্গালার সাহিত্যে ইঁহারাই নবযুগ প্রবর্ত্তক। ইঁহারাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার গঙ্গা যমুনায় বাঙ্গালা-সাহিত্যকে প্লাবিত করিয়া উর্ব্বর করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের বিপুল চিন্তাক্ষেত্র ও বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর হইতেও বাঙ্গালার নিজস্ব সামগ্রী বৈষ্ণবীয় প্রেমানুরাগের সন্ধান করিয়া লওয়া কঠিন নহে।

প্রথমেই ইঙ্গ-বঙ্গ যুগের প্রথম সার্থক-কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা দিয়াই আরম্ভ করি। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় আকণ্ঠ নিমজ্জমান হইয়াও রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর সুমধুর সঙ্গীত লহরী তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাই এই কান্তকোমল পদাবলী সাহিত্যের উদ্বোধক কবি জয়দেবকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

চল যাই, জয়দেব! গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীতধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধাসৌদামিনী ঘনে।

লঙ্কার বৈভব ও লঙ্কাকাণ্ডের ভয়ঙ্কর ও বীর রসের বর্ণনায় যাঁহার লেখনী পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সুগম্ভীর কল্লোল ধ্বনি তুলিয়াছে, তিনিই ব্রজগোপীকার মধুর প্রেমে মজিয়া প্রাণের আবেগে ব্রজাঙ্গনায় গাহিয়াছেন—

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ।
চল সখি ত্বরা করি দেখিগে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন।

চাতকী আমি, স্বজনি। শুনি জলধর ধ্বনি,
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকিলো এখন ?
যাক্ মান যাক কুল, মন-তরী পাবে কূল
চল ভাসি প্রেম-নীরে ভেবে ও চরণ।

উৎকট সাহেবীয়ানায় ছাঁটা পোষাকের ভিতর হইতে প্রেমিক বাঙ্গালীর কান্ত কোমল হৃদয়ের কতখানি পরশ ইহাতে আছে তাহা আর বিচার করিয়া বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্য রসকে জ্ঞানযুক্তির কৌশলে অস্বীকার করিলেও অজ্ঞাতসারে মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত অহৈতুকী পরাভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় তিনি তাহার মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়াছেন, "আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্য কণ্ঠ ধ্বনিত হইল—আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?"

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার-সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি ?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে ? আর কি দিব ?"

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি"।

এই ভক্তির স্থান জীবন হইতেও উচ্চে। যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে এই ভক্তি অর্জ্জন করিতে হয়, এই পরাভক্তি সাধনই বৈষ্ণব সাধকগণের সাধনা। ধন-জন, জীবন-যৌবন এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত এই জাতীয় অহৈতুকী ভক্তির তুলনায় নগণ্য।

দেবী চৌধুরাণীতেও তিনি মূলপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বামীত্ব স্বীকার করিয়া রূপ-যৌবন প্রাণপতিবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণৈক প্রাণ হইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"বয়স্তা—তিনি একপ্রকার আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্রফুল্ল—একপ্রকার কি ?

বয়স্তা—সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে—

প্রফুল্ল—সে কি রকম ?

বয়স্তা—রূপ যৌবন প্রাণ—

প্রফুল্ল—তিনিই তোমার স্বামী ?

বয়স্তা—হ্যাঁ, কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী তিনিই আমার স্বামী……শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে, কেন না তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।……কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়ের পিঞ্জরে পুরিতে পারি না সান্তকে পারি, তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ—"

এমন ভাবে বর্ত্তমান যুগের সকল সাহিত্যিকের ভিতরেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অলৌকিক প্রেমের আদর্শ ও অতীন্দ্রিয় প্রেমোল্লাস গূঢ়ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মরমী কবি রবীন্দ্রনাথের ভাবঘন কাব্য সাহিত্যে এই বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারার প্রভাব যে কত বেশী তাহা আজিও সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই কবির মরমী হৃদয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য লীলার প্রভাব পড়িয়াছিল।

কবির কিশোর বয়সে লেখা 'ভানুসিংহের পদাবলী' হইতেই আমরা জানিতে পারি বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের অনুপম ব্রজবুলি ভাষা ও অনবদ্য বৃন্দাবন লীলা তাঁহার তরুণ-হৃদয়ে কতখানি সাড়া দিয়াছিল, কত গভীর ভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর সাগরে এত অল্প বয়সেই তিনি ডুবিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাব বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য হয় অসীম ও সসীমের অলজ্য্য বিবর্ত্তনের উল্লাস।

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

বৈষ্ণব সাধকগণও বলেন, অসীম অনির্ব্বচনীয় অলজ্য্য তত্ত্ববস্তু প্রেমে সসীম হইয়া ধরা দিয়াছেন আমাদের কাছে। শ্রুতি যাহাকে 'রসো বৈ সঃ' বলিয়া আভাস দিয়াছেন তিনিই ত' বৈষ্ণবের কাছে নিখিল রসামৃত সিন্ধু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

আমাদের অন্তরের নির্ব্বাসিতা 'সীম ডোরে বাঁধা' চির বিরহিনীর কাছে যখন অসীমের বংশীধ্বনি বাজিয়া উঠে তখনই ত' সমস্ত সীমার বন্ধন শেষ হইয়া যায়, তখনই ত' আমাদের যত কিছু অতৃপ্ত বাসনা, সকল আকুলতা, সকল উৎকণ্ঠা বিদুরিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় মধুর আহ্বানে দেহ-মন-হৃদয় আবিষ্ট হইয়া যায়—

রূপে ভরল দিঠি　　সোঙরে পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ
মোহন মুরলী রবে　　শ্রুতি পরিপুরিত
না শুনে আন পর সঙ্গ।
সজনি অব কি করব উপদেশ,
কানু অনুরাগে মোর　　তনু মন মাতল
না শুনে ধরম লবলেশ
নাসিকা সে অঙ্গের　　সৌরভে উনমত
কানে না লয় আন নাম পরাণ
নব নব গুণ শুনে　　ঝুরিল মধু মনে
ধরম রহবে কোন ধাম।

মানুষের অন্তরের সেই শুভক্ষণে নৈমিত্তিকের ধর্ম্ম,কর্ম্ম, সমাজ, সংসার সমস্ত যেন মিথ্যা হইয়া যায়—

ঘরে আমায় রাখতে যে হয়
বহু লোকের মন।
অনেক বাঁশী অনেক কাঁশি
অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়,
গানটি শুধু নিলাম গলায়
তারি গলার মাল্য ক'রে
করব মূল্যবান্
রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী
বেলাশেষের গান।

রাধাকৃষ্ণের নিত্য প্রেমলীলা জীব ও পরব্রহ্মের নিত্য আকর্ষণ বিকর্ষণ মূলক লীলাবৈচিত্র্যরূপ বর্ণনা করিয়াছি বলিয়া আমাকে এখানে ভুল বুঝিবার আশঙ্কা আছে। বৈষ্ণব সাধকগণের শ্রীরাধা জীবকোটির অন্তর্ভুক্ত নহেন, শ্রীকৃষ্ণের তিনি হ্লাদিনী শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের আনন্দ আস্বাদন রূপ লীলাই সুমধুর বৃন্দাবনলীলা,—

…　　…　　…

কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিদান।
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করয়ে উন্মত্ত।'
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
সে প্রেমে আমাকে করে সর্ব্বদা বিহ্বল।

কিন্তু এই অনন্ত বিশ্বব্যাপী প্রেমের খেলায় জীবেরও ত' স্থান আছে। সামান্য কুশাঙ্কুর অবধি যে ভাবে রহে তাঁহার লীলার পরিপোষক। তটস্থা শক্তি ত' সচ্চিদানন্দ 'স্বরূপ ছাড়া নয়, অণুচিৎকে লইয়াই ত' বিভুচিৎ সম্পূর্ণ। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই যে মঞ্জরী স্বরূপা কৃষ্ণ প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী গোপিনী সংসারের মায়ার বন্ধনে বাঁধা আছে। কবে কোন শুভমুহূর্ত্তে তাঁহার মুরলীর আকর্ষণে প্রেমময়ের আনন্দ-রাস-রঙ্গে মিলিত হইয়া জীবন যৌবন সফল করিবার ইঙ্গিত আসিবে কে জানে?

কি শুনি সুধা মুরলীরব।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব॥
করে তুলি পরে কেহ পদ-আভরণ।
কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন॥
সদন ছাড়িয়া কেহ কাননে ধায়।
পয়ো পানে শিশু ছাড়ি কেহ যায়।
এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যাম-অনুরাগে দেহ তনু তেয়াগিল॥
সকল গোপীর আগে পাইল সে শ্যামা।
গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা॥

এমন করিয়াই সেদিন সংসারের সকল বন্ধন আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া প্রেমময়ের সুধা-মুরলীর আহ্বানে সাড়া দিতে পারিব।

সেই শুভক্ষণ যে জনমে যেদিন আসিবে বাহিরের জড় জগতের বন্ধন বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের ব্যাকুল আকাঙ্খা উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে, সমাজ সংসার মায়া মোহের জটিলা কুটিলা আর বিধিনিষেধের 'ডোর' দিয়া তাহাকে ঠেকাইতে পারিবে না।

রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা ও জীবজগতের বা জড় জগতের কেবলমাত্র বহিরাবরণের স্বপ্রকাশ সৌন্দর্য্য লইয়াই তৃপ্ত হইতে পারে নাই, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে অনির্ব্বচনীয় রূপ লোকচক্ষুর অন্তরালে নানা ছন্দের অশান্ত হিল্লোলে নিয়ত হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে তাহারই সন্ধান পাইবার জন্য সে ব্যাকুল। মানবজীবনের সর্ব্ববিধ চেতনা,

কামনা, আশা, আকাঙ্খার দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মূলে যে প্রকাশ-ভীরু সুগভীর অনুভূতি রাজ্য বিরাজ করিতেছে রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্ত কেবল তাহার প্রবেশ দ্বারে ফিরে।

আমাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না,
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।

অথবা—

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু॥

(জীবনকে ও জগৎকে নানা দিক দিয়া নিগূঢ়ভাবে ও সমগ্রভাবে অনুভব করিবার ব্যাকুলতা হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ছন্দায়িত। প্রেমিকের যে প্রেমোৎকণ্ঠায় —'দু'হু কোরে দু'হু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া—', বিশ্ব প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য তাহার জড়ত্বের জটিল জাল বন্ধন হইতে ক্রমশঃ তাহার অন্তরের অতলগর্ভস্থ অনুভূতিগ্রাহ্য অরূপের মধ্যে নিমগ্ন করাইয়া দেয় সেই অন্তর্লীন অরূপ সৌন্দর্য্য-সাধনই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি-চিত্তকে যেন ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে।

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরি।
সময় যেন হয় রে-এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি॥

অন্তর্লোকের সহিত বহির্জগতের, রূপের সহিত ভাবের, জীবনের সঙ্গে মরণের এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যযোগের অভাব এই চিরবিরহ ইহাই কবি-চিত্তকে নিরন্তর দুর্গম পথে অভিসারিকার বেশে বাহির করিয়া তাঁহার শত দুঃখ, শত আনন্দ ছন্দে ছন্দে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে। এই অভিসারের বিচিত্র কাহিনীই আমরা পাই তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীতে।

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে॥
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হোতে অসীমের মাঝে হারা॥
প্রলয় সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা॥

ইহাই রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিসিজমের মূল কথা এবং এইখানেই বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ, কোন যুগযুগান্তর ধরিয়া আকাঙ্খা ও আকাঙ্খিত চলিয়াছে মিলনের আশায়। কবে আমাদের সকল অপূর্ণতা, সকল অতৃপ্তি-তাহার শেষ পরিপূর্ণতায় পরিণতি লাভ করিবে কে জানে?

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়॥
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমা চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়॥
কতই নামে ডেকেছি যে
কতই ছবি এঁকেছি যে
কোন্ আনন্দে চলেছি, তার
ঠিকানা না পেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

প্রিয়তম যে বাঁশীর সুরে আমাদের ডাকিতেছেন সমাজ সংসারের সকল অন্ধকার মায়ামোহের সকল কণ্টক উপেক্ষা করিয়া আমরা চলিব সেই পরমানন্দের আকর্ষণে,

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূরত পন্থ গমনে ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

এই তত্ত্বই বৈষ্ণব সাধনার মর্ম্মকথা। মানুষের বুভুক্ষু প্রাণের চিরন্তন কামনা অতৃপ্ত পিপাসার উৎকণ্ঠা যে পরম অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল বৈষ্ণব সাধকগণ তাহারই সার্থক সন্ধান পাইলেন অনন্ত রসময় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। কত ত্রুটি বিচ্যুতি মানুষের, কত অপূর্ণতার দুঃখ তাহার বুকে, কত বাধা নিষেধ, কত সীমার বন্ধনে তাহার অন্তর জর্জ্জরিত, তাই তাহার অশান্ত হৃদয়ের চির আকুলতা, চিরপূর্ণ, চিরসুন্দর, চির রসময়ের জন্য। নিখিলরসামৃত সিন্ধুর মধ্যে আপনাকে একেবারে ডুবাইয়া দিতে না পারিলে কেমন করিয়া আমাদের এই চির অপূর্ণতার বেদনা দূর হইবে, কেমন করিয়া আমরা অনাদি অনন্ত আনন্দ-রসধারায় অভিষিক্ত হইয়া ধন্য হইব।

অখিল জীবের এ শোক-সায়র
শোষয়ে নয়ান নিমিষে।
ও প্রেম-লবলেশ পরশ না পাইলে
পরাণ জুড়াইবে কিসে॥

যতক্ষণ সেই পরিপূর্ণের পরম পরশ লাভ করা না যায় ততক্ষণ তো জীবের প্রাণের পিপাসা মিটে না। সংসারের মিথ্যা ধন-জন, বিলাস বৈভবের মোহে মিছামিছি ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ি তখন আপনি কণ্ঠ হইতে বাহির হয়—

যা হারিবে যায় তা আগলে বসে
রইব কত আর
আর পারিনে রাত জাগতে, হে নাথ
ভাবতে অনিবার॥
আছি রাত্রি দিবস ধরে
দুয়ার আমার বন্ধ করে
আসতে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বার॥

যাহাকে পাইলে আমার সকল পাওয়ার শেষ হয়, সকল আশা, আকাঙ্খা, বাসনা, সাধনার চরম সার্থকতা হয় তাহারই জন্য আমরা পাগল করা অতৃপ্তি বুকে লইয়া বাহির হইয়াছি। কত দুঃখ বেদনার কাঁটাকে রঙীণ করিয়া তিনি গোলাপ ফুটাইবেন, বিরহ বিচ্ছেদকে সার্থক করিয়া তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে।

দুঃখের বরষায় চক্ষের জলয়েই নামল।
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল॥
মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদে বেদনায়।
অর্পিনু হাতে তাঁর খেদ নাই আর মোর খেদ নাই॥

এমনি করিয়া দুঃখ, বেদনা, বিরহের কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়া একটু একটু জীবকে তিনি খাঁটি করিয়া তুলেন।

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
তুমি আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ॥
দুঃখ-রথের তুমি রথী
তুমিই আমার বন্ধু।
তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ॥

বৈষ্ণব সাধকরাও বলেন এমনি করিয়াই ধীরে ধীরে বহির্ম্মুখী জীবের মায়াশক্তির আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাকে আপন করিয়া লন।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়॥
সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বার্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্তে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হইতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ প্রীত্যঙ্কুর।
সেই ভাব হৈলে ধরে প্রেমনাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥

—চৈঃ চঃ

এই পূর্ণতা লাভের সাধনা জীবের সহজাত, মায়া শক্তির আবরণে তাহা ভুলিয়াছি মাত্র। তাই এই দেহের মধ্য দিয়াই দেহাতীদের সাধনা, ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ অনুভূতির ভিতর দিয়া অতীন্দ্রিয়ের পরশ লাভের কথা বৈষ্ণব সাধকগণ বলিয়াছেন।

প্রাণনাথ কবে মোর হইবে সুদিন।
রাধাকৃষ্ণ রাত্রিকালে নানাক্রীড়া কুতুহলে
পরিশ্রমে করিবে শয়ান॥
সুবাসিত জলে চরণ ধোয়াইব
পুন খাওয়াইব আর জল॥
তাম্বুল কর্পূর যুত যোগাই অভিমত
সাধাইব ও পদ কমল॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপন করিব রঙ্গে
বীজন করব নানা ভাতি।
দুই জন নিদ্রা যাব পরম আনন্দ পাব
পুন জাগরণ হবে নিতি॥

রবীন্দ্রনাথ কহিলেন—

"আমার এই দেহখানি তুলে ধর।
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ কর।"

সাধকের দেহ তাই কৃষ্ণসেবার দেহ।

শুধু তাই নয় আমরা যেমন আমাদের পরম প্রিয়, চির বাঞ্ছিত পরমধনের আকাঙ্খায় চির অতৃপ্তি বুকে লইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি তিনিও যে তেমনি আমার সঙ্গে মিলনের জন্ত যুগযুগান্ত ধরিয়া অধীর আগ্রহে পথ চাহিয়া আছেন।

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে॥
কত কালের সকাল সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।

বৈষ্ণব কবিরাও বলেন তিনি যে আমাদের জন্ত অধীর হইয়া—

পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পারল থেহ॥

আমিও তাঁহার লীলার সহায়ক, যত ক্ষুদ্রই আমি হই না কেন আমাকে লইয়াই ত' তিনি পূর্ণ। পরিপূর্ণ লীলা বিলাসে আমি ত' তিনি ছাড়া নই। শত বাধা জর্জ্জরিত জীবের এত বড় আশার বাণী বোধ হয় আর কেহই শুনায় নাই। আমাকে তিনি দয়া করিয়া উদ্ধার করিবেন না, অনুপম কান্ত প্রেমে তিনি আমাকে একান্ত আপনার করিয়া লইবেন।

রাই তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুখন সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥

নিত্য প্রেমস্বরূপিনী রাধার নিত্য মনোবৃত্তিরূপিনী মঞ্জরী-স্বরূপা জীবের জন্ত নিত্য প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠার অন্ত নাই।

তাই ত' তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি
তাই ত প্রভু যেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

আমার জন্ত তিনি যে ঝড়ের রাতে অভিসার করিয়াছেন। শত সুখদুঃখের শঙ্কট মৃত্যুর মধ্য দিয়া নিবিড় সংশয়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই চির আনন্দের জ্যোতিরালোক প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এই ত' বৈষ্ণব সাধকগণের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির চরম বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব পদাবলীর সকল মাধুর্য্যই প্রেমের এইরূপ আদান প্রদানের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে।

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে
আপন জেনে আদর করিলে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে
বন্ধু বলে দু'হাত ধরিলে।
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে এনে
সঙ্গী বলে তোমায় বরিলে।

এই ত প্রাপ্তি। (ভগবানকে বৈষ্ণব সাধকগণ ত' দেবতা করিয়া মন্দিরের ভিতরে ধূপ-ধূনার অন্ধকারে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই, তিনি আমাদের পর্ণকুটিরের আদরের জন, পরম প্রেমাস্পদ। প্রেম সার্থক হয় শুধু গ্রহণে নয় দানেও। তাই তাঁহার জন্ত যে সকল দুঃখ সকল কলঙ্ক পশরা মাথায় লইয়াও সুখ।)

ছাড়িয়া সকল কাজ,
জাতিকুলশীল লাজ
মরিব কাদিয়া অনুরাগে

রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

আমি তোমার প্রেমে হবো সবার
কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগী॥

তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন।
যেথা তোমার ধূলার শয়ন,
সেথা আঁচল পাতব আমার
তোমার রাগে অনুরাগী।

সেই এক প্রিয়তম ছাড়া প্রেমিকের আর ত' কিছু থাকিতে পারে না—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। এই ত' অতীন্দ্রিয় পরম প্রেম, বৈষ্ণব সাধকগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির ভিতর দিয়া সেই অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধির সাধনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই চির আনন্দঘন রসরাজ বিগ্রহের সেবা করিয়াই আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের লৌকিক সীমা পার হইয়া অলৌকিক রূপ-রস-গন্ধের অনুভূতি লাভ করে। এই গোপী-ভাবই প্রেম সাধনার চরমোৎকর্ষ। শ্রীচৈতন্যদেব এই পরম গৌরবময় সাধ্য প্রেমের সঙ্কেত দিয়া গিয়াছেন।

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম সমর্পণ॥
শরণ লঞা কৃষ্ণে করে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করেন আত্মসম॥

এইরূপে কৃষ্ণৈকপ্রাণা শরণাগত যেখানে পৌঁছায় শত জপ-তপ, ধ্যান-ধারণার পক্ষেও তাহা সম্ভব নহে।

তোমার পূজার　ছলে তোমায়　ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি　কখন তুমি　দাও যে ফাঁকি॥
ফুলের মালা　দীপের আলো　ধূপের ধোঁয়ায়।
পিছন হতে　পাইনে সুযোগ　চরণ ছোঁয়ার॥
স্তবের বাণীর　আড়াল টানি　তোমায় ঢাকি।
তোমার পূজার　ছলে তোমায়　ভুলেই থাকি॥
কাজ কি আমার　মন্দিরেতে　আনাগোনায়।
পাতব আসন　আপন মনের　একটি কোণায়॥
সরল প্রাণে　নীরব হয়ে　তোমায় ডাকি।
তোমার পূজার　ছলে তোমায়　ভুলেই থাকি॥

বৈষ্ণব কবিদের এই অপরূপ প্রেমতত্ত্ব সকল বিধিমার্গ পূজাসাধন তত্ত্বের উপরে গেল। জীবের সকল বন্ধন, সকল ক্ষুদ্রতা হীনতা, শত অক্ষমতা মুহূর্ত্তে সার্থক হইয়া গেল, সকল ব্যথিত পীড়িত নিরাশকে সান্ত্বনা দিয়া বহিল—

ভেবেছিল চির কাঙাল সে এই ভুবনে,
কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজ বড় ভয়ে ভয়ে
দিনশেষে এল তোমার আলয়ে
আধেক আসনে তারে ডেকে ল'য়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে।

এত বড় আশা সান্ত্বনার কথা আর কে শুনাইবে। বৈষ্ণব সাধকগণের এই অপরূপ প্রেমসাধনের রস-ধারায় অভিষিক্ত হইয়া বাঙ্গালী ধন্য হইয়াছে।

এই প্রেম পিপাসাই বাঙ্গালার সকল মরমী মনকে চাতকের মত শ্যাম-নব-জলধরের প্রেমধারার জন্য ঊর্দ্ধমুখ করিয়াছে। এই গৌড়ীয় প্রেমধারাই বাঙ্গালীজাতিকে প্রেমিক করিয়াছে, রসিক করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মরমী কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত করিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালার মূল চিন্তাধারায় ইহার সূক্ষ্মপ্রভাব ইঙ্গিত করিলাম। বৈষ্ণবতত্ত্বের এই আনন্দঘন বিগ্রহই বাঙ্গালীর সমগ্র চিন্তাক্ষেত্রে আনন্দ রসধারা বর্ষণ করিয়াছে।

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে—
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
গাছেরা ভ'রে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায়।
সে যে ঐ দুঃখ শিখায় উঠলো জ্বলে।
সে যে ঐ অশ্রুধারায় পড়লো গলে।
সে যে ঐ বিদীর্ণ বীর হৃদয় হ'তে
বহিল মরণরূপী জীবনস্রোতে।
সে যে ঐ ভাঙাগড়ার তালে তালে।
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে।

সুরুচির অপমৃত্যু

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

ডালি ভয়ানক সৌখীন মেয়ে। দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই তার বাগান পরিচর্য্যায়, গৃহ ও দেহ সজ্জায় অতিবাহিত হয়ে থাকে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বধূ সে। কিন্তু এর মধ্যেই তার সৌখীনতা ও সুরুচিটুকু বাঁচিয়ে রাখার অপূর্ব্ব কারু কৌশল দেখে সকলেই মুগ্ধ। গৃহের পিছনে খানিকটা পরিত্যক্ত জমী। তার অর্দ্ধেকভাগ গরু, গোয়াল, খড়-বিচালী, গোবর ইত্যাদিতে পূর্ণ; আর অর্দ্ধেকভাগের মধ্যে খানিকটা অংশ নিয়ে ঘুটে কয়লা রাখা হয়; তারপাশে পুরানো ডালা, ঝুড়ি, কোদালি, ভাঙ্গা চৌকী, চেয়ার ইত্যাদি বোঝাই থাকে গুদাম ঘরের মত। সব শেষের বাকী অংশটুকু ডালির বাগান। কঞ্চিব বেড়া দিয়ে স্থানটী ঘিরে নিয়ে তাব মধ্যে নানাবিধ ফুল ও তরী-তরকারীর গাছ লাগানো হয়েছে। বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ডালির সৌন্দর্য্যবোধ এই বাগানের পরিকল্পনাটীর মধ্যে স্থায়ীত্ব লাভ করেছে। গোপনে সে বাপের বাড়ীর মালীকে দিয়ে নানাবিধ ফুল, শাক, তরকারীর বীজ ও সারমাটী প্রভৃতি আনিয়ে বাগানের উন্নতি সাধন বরেছে।

পূব আকাশে আলো ছায়ার খেলা সুরু হবার সাথে সাথেই জল সিঞ্চনের ঝারি ও কাঁচি হাতে নিয়ে ডালি তার পুষ্পোদ্যানে আসে। শাশুড়ীর নিদ্রাভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত সে বাগানের কাজ করে। সেদিন সে বাগানের কাজ শেষ করে হাতে একটী শ্বেত করবীর গুচ্ছ ও আঁচলে অজস্র ঝরা শিউলী নিয়ে যেই বাড়ীর আঙ্গিনায় এসেছে অমনি সেখানে কলতলায় তার শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি বধূব সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "ঠাকুব ঘরে কিছু ফুল রেখে যেও ত' বৌমা, আমার আজ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত আছে।"

ডালি নীরবে আদেশ পালন করে উপরে নিজের ঘরে এসে দাঁড়াল। প্রথমে ঘরের সমস্ত দরজা জানালাগুলি খুলে অগোছাল পর্দ্দাগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে দিল। তারপর টিপয়ের উপরকার জয়পুরী পুষ্পাধার থেকে বাসি ফুলগুলি ফেলে দিয়ে, সেখানে সদ্য তোলা শ্বেত করবীর স্তবকটী রাখল। ছোট্ট একটী কাশীর পিতলের বেকাবীতে ঝরা শিউলীগুলি রেখে যেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, অমনি পিছন থেকে তার আঁচলে পড়ল টান। ডালি চমকে পিছন ফিবে দেখল, খাটে মশারীর মধ্যে বসে আছে তাব স্বামী পরাগ। "ওমা, তুমি বুঝি এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলে? আমি ভেবেছিলুম উঠে গেছ।"

ওকে পাশে বসিয়ে পরাগ বললে, "সেই অর্দ্ধেক রাত্তির থাকতে উঠে যাওয়ার ফল হচ্ছে এই, বুঝলে?"

ডালি মিনতি করে বললে, "এখন ছেড়ে দাও; মা কি মনে ক'রছেন বল ত'? কাল আর যাবো না"—

পবাগ ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বললে, "মনে থাকে যেন—"

দরজার কাছে গিয়ে ফিবে দাঁড়িয়ে অপরূপ ভ্রূভঙ্গী করে ডালি বললে, "ইস্, মনে রাখবে না কাঁচকলা?"

পবাগ খেতে বসেছে। লীলাবতী সামনে বসে খাওয়াচ্ছেন। রান্নাঘর থেকে ডালি শুনল তিনি বলছেন, "ঘণ্ট সবটুকু খেয়ে নে পরাগ; এ লাউ বৌমাব গাছে ফলেছে। আর এই ঢ্যাড়সগুলোও ওর হাতের ফসল। কাল টগর ফুলের বড়া ক'রবো, দেখিস কেমন সুন্দব খেতে হয়।"—ঘরের মধ্যে ডালি ভীষণভাবে আঁৎকে উঠল। অত সাধের তার জোড়া টগর ফুলের গাছ। গাছ আলো করে থরে থরে ফুটে রয়েছে অজস্র ফুল; কাল ভোরে কেউ আর তার চিহ্নও দেখতে পাবে না।

পরাগ বললে, "সে কি মা, ফুল আবার খায় নাকি?"

লীলাবতী বললেন, "হ্যাঁরে খায়, তোরা এখন সব সহুরে হয়ে ওসবকে অখাদ্য বলে মনে করিস"—

পরাগ মনে মনে ভাবল, নূতন জিনিষ খাওয়ার লোভ আমার খুব আছে। কিন্তু ডালির অত সাধের গাছের ফুল, তার মনে যদি ব্যথা লাগে? নীরবে সে হেসে মায়ের কথার সমর্থন ক'রল।

পরাগ অফিসের পোষাক পরছে। এমন সময় পান হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল ডালি। স্বামীর হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে সে বললে, “আজ বাড়ী ফেরবার সময় বেশ ভালো দেখে কিছু পর্দ্দার কাপড় কিনে এনো—”

কয়েক মিনিট নীরব থেকে পরাগ বললে, “মা আবার কিছু মনে ক’রবেন না ত’ ডালি। এই সেদিন তোমার টেবিল-ক্লথের অত কাপড় এনে দিলুম, তারপর তোমার রঙ্গীনশাড়ী এনে দিলুম। কিছু মনে করো না তুমি, ওরা এগুলোকে বাজে খরচ বলে মনে করেন কিনা, তাই বলছি।”

মুখ ভাঁর করিয়া ডালি বললে, “তোমার টাকা নিয়ে ত’ আমি বাজে খরচ করছি না। এ টাকা আমি হাঁস পুষে, তার ডিম বিক্রী করে জমিয়েছি।”

পরাগ বললে, “মা জানেন ত’ সে কথা?”

ডালি বললে, “নিশ্চয় জানেন—”

বাস্তবিক ডালির ঘরের দিকে তাকালে ঠিক মনে হয় যেন কোন নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা সুন্দর একখানি ছবি। দরজা জানালার পর্দ্দা, বিছানার সুজনী, চেয়ারের কুশান, মেঝের কার্পেট প্রভৃতি প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের রংএর এত সুন্দর সামঞ্জস্য সচারাচর বড় একটা চোখে পড়ে না। তারপর নটবাজ, বুদ্ধ প্রভৃতির মূর্ত্তি, পুষ্পাধার, দোয়াতদান, এইরকম আরও বহু জিনিষের মধ্য দিয়ে নানা দেশের কারু-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। আনন্দের উচ্ছল মদিরায় তার প্রাণের পেয়ালা উচ্ছ্বসিত। তাই এত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও সে পূর্ণ।

হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত একদিন খবর এল পরাগের ছোট বোন বিধবা হয়েছে। শীঘ্রই সে মায়ের কাছে আসছে।

যথাসময় বীথি এল। সঙ্গে তার চারিটী বাচ্চা ছেলে-মেয়ে। ডালি সব সময় তাদের তত্ত্বাবধান ক’রতো। বিকেলে রোজ সাজিয়ে গুজিয়ে বেড়াতে পাঠিয়ে দিত। শোকের বেগ কিছু উপশম হলে, একদিন বীথি বললে, “দেখ বৌদি, ওদের এখন থেকে অত ঘটা করে বাবুগিরি ক’রতে শিখিও না, তা হলে বড় হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।”

ডালি বললে, “আমি ভাই নোংড়াপনা দেখতে পারি না। তাই ওদের একটু পরিষ্কার করে দিই—”

বীথি বললে, “সকলে যদি তোমার মত সব সময় পটের বিবি সেজে থাকতে না পারে তাই বলে কি তাদের যা তা বলা উচিৎ?” সে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ ক’রল। বধূকে লীলাবতী বলিলেন, “বীথি এতবড় শোক পেয়েছে, তোমার একটু ওর সঙ্গে বুঝে-সুঝে কথা বলা উচিত বৌমা”—

ঠোঁট উল্টে বীথি বললে, “হ্যাঁ, উনি আবার বুঝবেন, তা হলেই হয়েছে?” ডালি নীরবে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জায় ঘৃণায় তাব সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো।

লীলাবতী গোপনে মেয়েকে বললেন, “দেখ বীথি, তুই বউর পেছনে অত সকল সময় লাগিস নি। এটা ভালো দেখায় না”—

বীথি বললে, “তুমি ত’ কিছু দেখতে পাও না মা। তোমার বউর বিবিয়ানার মাত্রা দিনে বেড়েই চলেছে। আমাদের যেখানে একটা কাপড় লাগে, ওর সেখানে লাগে শাড়ী, পেটিকোট, বডিস, ব্লাউস, তাও আবার সৌখীন। তারপর নিত্য নূতন ফ্যাসানে ঘর সাজানো, গাছে ফুল ফুটানোর হল্লা ত লেগেই আছে। আমার এই মেয়ে দুটোকে বিয়ে ত’ দাদাকেই দিতে হবে? এখন থেকে একটু সামলে না চললে তখন টাকা আসবে কোত্থেকে শুনি?”

এমন যুক্তিপূর্ণ উত্তরের কাছে লীলাবতী হার মেনে গেলেন।

সেদিন ছিল দ্বাদশী তিথি। পূর্ব্বদিনের নির্জ্জলা উপবাসের পর বীথি আজ খেতে বসেছে। ডালি ধরে ধরে তার সম্মুখে অন্ন-ব্যাঞ্জনের পাত্র এনে সাজিয়ে দিচ্ছে। বীথি বললে, “বউ, তুমি দীঘি থেকে স্নান করে এসে তবে ত’ আমার হবিষ্য রেঁধেছ?”

ডালি বললে, “না ভাই, সময় পাই নি। বাড়ীতেই স্নান করেছি—”

সামনে থেকে ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে বীথি বললে, “তবে ত’ আমার আজকের খাওয়া নষ্ট হয়ে গেল। বাড়ীর জলে আমার প্রবৃত্তি হয় না। তাই বলি, সারাদিন বিবিয়ানা করার সময় হয়, পঞ্চাশবার বাগানে যাওয়ার সময় হয়, আর একবার দীঘিতে যেতে হলেই পা ভেঙ্গে যায়?”

হঠাৎ ডালি বারুদের মত দপ করে জ্বলে উঠল। তার

কণ্ঠে বললে, "বেশ করি বিবিয়ানা করি—তাতে তোমার কি ? তোমার যদি ইচ্ছে হয় করো না ?"

"কি এতবড় কথা ?" বীথি চেঁচিয়ে মহাকাণ্ড বাঁধিয়ে বললে, "আমার শাখা সিঁদুরের খোঁটা দেওয়া ? এতবড় তেজ ? আমি এই বাঁসি হাতে বাঁসি মুখে বলছি তোমার কখনই ভালো হবে না—"

ডালি বললে, "মন যাদের অত খল কপটতায় ভরা তাদের মুখের কথা মুখেই শেষ হয়ে যায়—"

লীলাবতী এসে ডালিকে তিরস্কার করে সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন। কন্যাকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে পরাগ হতভম্ব হয়ে গেল। বোনের সমস্ত কথা শুনে সে কিছুতেই ডালিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারছিল না। কিন্তু ডালি যখন স্পষ্ট বলল, সকালে দীঘিতে স্নান করে পথের জনতার সামনে দিয়ে সে ভিজা কাপড়ে যাতায়াত করতে পারবে না, তখন কর্ম্মক্লান্ত পরাগের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল নির্দ্দোষী বধূর উপর। অতি নিষ্ঠুরের মত সে সকলের সামনে বললে, "নেহাৎ ভাগ্যের দোষে, ও তোমাদের এখানে এসেছে বলে কি তোমরা ওকে অপমান ক'রবে ?" উঃ কি অপমান, ধরিত্রীদেবী দ্বিধা হও। ডালি কোনও রকমে নিজের কলঙ্কপসরা মাথায় করে নিজের ঘরে গেল।

রাত্রিতে শুতে এসে পরাগ বল্ল, "দেখো, রোজ রোজ এরকম অশান্তি আমার ভালো লাগে না। তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উদয়াস্ত খেটে মরি, বাড়ীতে যেটুকু সময় থাকি, তাও যদি শান্তিতে তোমরা থাকতে না দাও, তা'হলে আমার ত' বাড়ী ছাড়তে হয়।"

ডালির বুকে অভিমানের সপ্তসিন্ধু গর্জ্জিয়া উঠিল। সে বলতে চাইল অনেক কিছু কিন্তু গলায় বেধে গেল সমস্ত কথা। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে পরাগ বললে, "ওরা যা বলে সেই মত চললেই ত সব গোল মিটে যায়।"

উত্তপ্ত কণ্ঠে ডালি বললে, "এবার থেকে তোমার কথাই থাকবে।"

আনন্দিত হয়ে পরাগ বললে, "হ্যাঁ, এই ত' লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা হোল।"

নির্ব্বিঘ্নে দিন কেটে যায়।

কিছুদিন পরে ডালি কোলে পেলো ফুটফুটে একটী সুন্দর শিশু। যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদী ফুল। তাকে নিয়ে সে অতীতের সব ব্যথা, সব স্মৃতি ভুলে থাকতে চায়। নিজের সমস্ত সৌখীন শাড়ী, ব্লাউস সে বিলিয়ে দিয়েছে। অবশিষ্ট যে কয়খানি ছিল তাই দিয়ে খোকার কাঁথা তৈরী করে ফেলেছে। মাঝে মাঝে শাশুড়ী বলেন, "বউমা, চুলগুলোর কি ছিরি করে রেখেছ, এস তেল দিয়ে ভালো করে বেধে দিই।"

নানা ছল-ছুতায় সে শাশুড়ীর অনুরোধ এড়িয়ে যায়। তার এত সাধের ফুলবাগান এখন বীথির ছাগলের বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে! দরজা জানালার পর্দ্দাগুলি ছিড়ে নিয়ে ভাগ্নীরা পুতুলের কাপড় তৈরী করে। ডালি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে, কোনও কথা বলে না। মাঝে মাঝে তার অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কখনও বা অবার আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে, পরাগ নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত ক'রবে। এত অন্যায় সে কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারবে না। কারণ স্বামীর নিবিড় সহযোগিতাতেই ত' সে এতদিন নির্ব্বিঘ্নে করেছিল সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর সাধনা। ও কি করে প্রাণের দেবতার এই নিষ্ঠুর অপমান সহ্য ক'রবে ? কিন্তু পরাগের দিক থেকে কোনও সাড়া আসে না। বাড়ীতে এখন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে। কলহ-বিবাদের কোনও ছায়াপাত নেই। তাইতে পরাগ পরম সুখী। নূতন ছেলে নিয়েই সে মহাব্যস্ত। কিন্তু মাঝে মাঝে ডালির দৈহিক সজ্জা সম্বন্ধে নির্লিপ্ততা ওর নিজের অন্তরকেই বড় পীড়া দেয়। সে সম্বন্ধে কোনও কথা উঠলেই ডালি বলে, "মেয়ে মানুষের আবার অত সখ কিসের ? বিবিয়ানা ক'রলে সংসারে আবার যদি কোনও রকম অশান্তির সৃষ্টি হয় ?"

পরাগের চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই কলহের বিভীষিকাপূর্ণ দিনগুলির ছবি। মনে মনে সে আঁৎকে উঠে। মুখে বলে, "হ্যাঁ, সেই ভালো ডালি, সেই ভালো"—ডালির প্রাণের শত আশা আকাঙ্ক্ষাময় নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপটী সহসা এক দমকা বাতাসে নিভে যায়। একটু তেল পেলে সে হয় ত' জ্বলে উঠত, হয় ত' আবার পূর্ব্বেকার মত গৃহ ও অন্তরের সকল অন্ধকার বিদূরিত ক'রত, কিন্তু তা আর হোল না। এমনি করেই অবহেলার সংসারে নিত্য কত ফুল ঝরে যায়, কত দীপ নিভে যায়, কে তার খবর রাখে ? ছেলেকে বুকে চেপে ধরে ডালি মনে মনে বলে, "ভগবান, আমার ছেলে যেন বড় হয়ে সত্য ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত মর্য্যাদা দিতে শেখে—"

ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাশ

উপক্রমণিকা

দাম্পত্য সম্বন্ধ অতি পবিত্র ও মধুর। প্রায় সকল স্বামী ও স্ত্রীই একে অন্যকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। স্ত্রী স্বামীর সেবায় প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য এবং তাহার সুখসাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করে। তথাপি গৃহে গৃহে দম্পতির মধ্যে এত দ্বন্দ্ব, কলহ, এত মতান্তর, মনান্তর হয় কেন?

দেবর্ষি নারদ বহু গবেষণা করিয়া তাহার যথার্থ কারণ নির্ণয় করিয়াছেন এবং উপস্থিত নাটিকায় তাঁহার গবেষণার এবং গভীর অভিজ্ঞতার ফল যথাসম্ভব সন্নিবেশিত করিয়াছি।

স্থান—ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মারচিত তাঁহার সুরম্য হর্ম্ম্যের বহিরাঙ্গণে
পদ্মাসনে সমাসীন। দেবর্ষি নারদ তাঁহার বীণাটী
সযত্নে ঢেঁকিবাহনের উপর স্থাপন করিয়া
অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে ব্রহ্মার নিকটে
আসিলেন ও বলিলেন :—

নারদ। ভগবান চতুর্ম্মুখ! নারদের বিনীত প্রণাম গ্রহণ করুন। কোনও বিশেষ কারণে কি আজ প্রভো! নারদকে আহ্বান করিয়াছেন? মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

ব্রহ্মা। নারদ! তোমার বিনয় শোভা পায় না। তুমি আমার সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতেছ। সেই জন্যই তোমাকে তিরস্কার করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে সাবধান করিয়া দিবার জন্য আজ আহ্বান করিয়াছি।

নারদ। (সহাস্যে) আমি আপনার সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতেছি! শুনিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলাম। প্রভো! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দাসের অবগতির জন্য ব্যাপারটী সম্যক্ বিবৃত করিয়া বলুন।

ব্রহ্মা। ব্যাপারটী তুমি সম্যক্ অবগত আছ। প্রথমতঃ, তুমি নিজে বিবাহ কর নাই। এখন মর্ত্ত্যের যুবকবৃন্দ তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে এমন দিন ছিল যখন যুবকেরা বহু বিবাহ করিত। এখন একটী বিবাহও করিতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ, তুমি বিবাহিত দম্পতির মধ্যে সর্ব্বদা কোন্দল বাঁধাইতে সুপটু। এমন কি, লক্ষ্মীনারায়ণ, হরপার্ব্বতী তোমার এই প্রচেষ্টা হইতে অব্যাহতি পায় না। ইহাতে আমার সৃষ্টিকার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন হইতেছে।

নারদ। ভগবান্ চতুর্ম্মুখ! আমি বিবাহ করি নাই, তাহার কারণ আপনার নারী-সৃষ্টিতে বিষম ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই যুবকেরাও এখন আর বিবাহ করিতে চায় না—আমার দৃষ্টান্তে নহে। এবং সেই ত্রুটীর জন্যই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন্দল বাঁধে। প্রভো! আমার উপর কুপিত হইবেন না। নারদ সহজ, সরল, স্পষ্ট কথা কহিতে কখনও ভীত নহে।

ব্রহ্মা। (ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া) আমার নারী-সৃষ্টিতে বিষম ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, তুমি আমাকে এরূপ গভীর অপবাদ দিতে সাহসী হইয়াছ? তোমার প্রমাণ করিতে হইবে, কি সেই সকল ত্রুটী।

নারদ। ভগবান্, ধৈর্য্য ধরুন। আমি যাহার প্রমাণ দিতে পারি না, সেরূপ অভিযোগ কখনও করি না।

প্রথমতঃ আপনার সৃষ্ট মর্ত্ত্যের নারীগণ, এমন কি স্বর্গের দেবীগণ, বিবাহটা একবার হইয়া গেলে, স্বামীর কোন অপরাধ ক্ষমা করে না, সে অপরাধ বড়ই হউক, মাঝারিই হউক অথবা ছোটই হউক। চিত্রগুপ্তের খাতার মত, নারীগণের মনের মধ্যে একটী খাতা আছে। সেই খাতায় স্বামীর প্রত্যেকটী অপরাধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। একটী সামান্য, ক্ষুদ্রতম অপরাধও বাদ পড়ে না। চিত্রগুপ্তের খাতায় পাপের সংখ্যা সুদে বাড়ে কি না জানি না। কিন্তু নারীদের মনের খাতায় স্বামীর অপরাধের সংখ্যা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদসহ বাড়িয়া যায়। ধরুণ, স্বামী কোন বিশেষ কারণে এক বা দুই রাত্রি ক্লাব হইতে ৯টার সময় বাড়ী না ফিরিয়া সওয়া ৯টা বা সাড়ে ৯টায় বাড়ী ফিরিল। নারীদের মনের খাতায় এই তুচ্ছ অপরাধটী নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হইল—"তুমি রোজ রাত্রি ১১টা, ১২টার সময় ক্লাব হইতে ফিরিতে এবং আমাকে সে পর্য্যন্ত না খাইয়া রাত্রি জাগিয়া বসিয়া

থাকিতে হইত।” আবার ধরুন ধোপাকে কাপড় কাঁচিতে দিবার সময় স্ত্রী স্বামীর সার্ট ও কোট ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়াই ধোপার সামনেই ফেলিয়া দিল। হঠাৎ স্বামী আসিয়া দেখিল, সার্টের সোণার বোতাম খোলা হয় নাই। কোটের পকেটে দরকারী কাগজ ও চিঠিপত্র রহিয়াছে। স্বামী যথাসম্ভব সংযতভাবে স্ত্রীকে বলিল, “ধোপাকে কাপড় দিবার পূর্ব্বে সার্ট; কোটগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে এবিষয়ে সাবধান হইও। অমনি স্ত্রীর মনের খাতায় এই উপদেশ বা অপরাধটী নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ হইল—“তুমি ধোপা, নাপিত, চাকর, চাকরাণী, দুধ-ওয়ালা, কয়লা-ওয়ালা প্রভৃতির সম্মুখে আমাকে কটুকথা কহিতে ও অপমান করিতে। স্বামীর অপরাধ দ্বিবিধ—তুমি ইহা করিয়াছ এবং তুমি ইহা কর নাই—ইংরেজীতে যাহাকে Acts of Commission and Ommission বলে। আজ বড় খোকার শ্লেট্ পেন্সিল আন নাই, কাল ছোট খোকার জন্ত লজেঞ্চুস্ আন নাই, আর একদিন লিচু, পটল বা কমলালেবু আন নাই, ইত্যাদি অপরাধ সর্ব্বদা লিপিবদ্ধ হইতেছে। অবশেষে চক্রবৃদ্ধিহারে স্বদশুদ্ধ এরূপ দাঁড়ায়—“তুমি ছেলেমেয়ের জন্ত কোন দিন একটি তৃণও আন নাই।” মোটের উপরে মর্ত্ত্যের নারীগণ অপর সকলের অপরাধ ক্ষমা করে—দাস, দাসী, দেবর, ননদ, জায়, শ্বশুর, শাশুড়ী, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, দেশবাসী সমস্তের অপরাধ ক্ষমা করে কেবল স্বামীর অপরাধের বিন্দুমাত্র ক্ষমা নাই। ভগবান্ আপনার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য নারীগণের, স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করিতে সমর্থ, এরূপ হৃদয় ও মন সৃষ্টি করা।

দ্বিতীয়তঃ আপনারই সৃষ্টির দোষে, নারীগণের মনের খাতায় লিপিবদ্ধ, উপরোক্ত কুসীদবর্দ্ধিত অপরাধগুলি, অল্পকালের মধ্যেই নারীদের বচন সমূহকে বারুদ অথবা বিস্ফোরকে পরিণত করে এবং সময়ে, অসময়ে তুঁবড়ী বাজির মত বা আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত, সেগুলি প্রচণ্ডবেগে মুখ-গহ্বর হইতে বাহির হইয়া আইসে। সঙ্গে সঙ্গে নয়নদ্বয়ও অগ্নিবর্ষণ করিতে থাকে। তখন বেচারা স্বামী, সন্তানবর্গ ও দাসদাসীগণ প্রমাদ গণে। চলতি কথায় এরূপ বিস্ফোরণ বা অগ্ন্যুৎপাতকে “খোঁটা দেওয়া” কেহ ইংরেজীতে বলে Nagging, এই খোঁটা মর্ত্ত্যের নারীগণের অগ্নিবাণ অথবা (আগ্নেয়াস্ত্র)। বর্ত্তমান কালের স্বামীগণ এরূপ বিস্ফোরণকে বিস্ফোরকগুলি (Explosive bullet) অপেক্ষা অধিক ভয় করে।

তৃতীয়তঃ, আপনি মর্ত্ত্যের নারীগণকে অনর্গল, অবারিত ভাবে, স্বামীকে গালি দিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি দিয়াছেন। নারীগণ শ্লীলতাবর্জ্জিত ভাষায় স্বামীকে গালি দেয়, আমি এরূপ বলিতেছি না। তবে কথায় কথায় স্বামীকে স্বার্থপর, আত্মসুখী, অভদ্র, বর্ব্বর, পাষণ্ড, হীনচেতা, নীচ প্রকৃতি প্রভৃতি সযত্ন নির্ব্বাচিত বিশুদ্ধ ভাষায় গালি দিয়া থাকেন। খোঁটারূপ অস্ত্র ব্যর্থ হইলে, অথবা আশানুরূপ ফলপ্রদান না করিলে, এই অস্ত্রটীর সমধিক ব্যবহার হয়। কখনও কখনও স্বামীর মাতা ভগিনীগণও গালির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, যথা তোমার মা ছেলের বউদিগকে যা ভালবাসেন আর যত্ন করেন, তা আমি খুব জানি। তোমার বোন্দের বিদ্যা আর মিষ্টস্বভাবের কথা, আমার অজানা নয়। এই প্রকার গালি নারীদের বায়ব্যাস্ত্র বা বায়ুবাণ।

চতুর্থতঃ, প্রভো! আপনি মর্ত্ত্যের নারীদের নয়ন সৃষ্টি করিতে এত শ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। কবি, সাহিত্যিক, এমন কি দার্শনিকগণ পর্য্যন্ত, এই নয়নের সৌন্দর্য্য, কার্য্যতৎপরতা, কর্ম্মকুশলতা সতত পরিবর্ত্তনশীল অদ্ভুতভাব ও ভঙ্গী বর্ণনা করিবার ভাষা খুজিয়া পান না। কিন্তু আপনি এমন অপূর্ব্ব নয়নের অন্তরালে বহির্ম্মুখী, সহজে বহমান, অপরিমেয় অশ্রুবারির সমাবেশ করিয়া, সমস্ত নষ্ট করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছেন আপনার এরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টি ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কবি গাহিয়াছেন। “এমন মোহন নয়নেরি জল কোথা হতে তুমি আন?” আমি নারীগণের উদ্দেশ্যে বলিতে চাই, “এমন সহজে নয়নেরি জল কোথা হতে তুমি আন?” ইচ্ছা করিবামাত্র মর্ত্ত্যের নারীগণ মুহূর্ত্তমধ্যে যত ইচ্ছা অশ্রু আহ্বান ও বিসর্জ্জন করিতে পারে। অশ্রু-প্লাবনে স্বামী বেচারার ভাসিয়া যাইবার ভয় হয়। খোঁটা এবং গালি-ব্যর্থ হইলে এই ভীষণ বরুণাস্ত্রের ব্যবহার হয়।

পঞ্চমতঃ, সর্ব্বশেষ ব্যবহারের জন্ত আপনি আপনার নামানুযায়ী (“সত্যাগ্রহ” বা “অনশন”) নিম্নলিখিত ব্রহ্মাস্ত্র নারীগণকে প্রদান করিয়াছেন। সেটী হচ্ছে সত্যাগ্রহ বা অনশন “আমি খাব না-না-না, আমাকে কেহই কিছু

খাওয়াইতে পারিবে না, এ বাড়ীতে আমি আর জল স্পর্শ করিব না।” মর্ত্ত্যে এমন স্বামী খুব কমই আছে যে এই ভক্ষাস্ত্র প্রয়োগ করিলে কাবু না হইয়া পড়ে এবং সত্বর স্ত্রীর নিকট নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা না করে।

দেব! মনসিজের পঞ্চশর মর্ত্ত্যের যুবকগণকে যতই বিবাহে উন্মুখ করে, আপনার সৃষ্টির মৎ-কথিত পঞ্চক্রটী ততই উহাদিগকে বিবাহ বিমুখ করে। বাল্যকালে নিজ পিতা এবং প্রতিবেশী পিতাদের অবস্থা দেখিয়া, যুবকগণ বিবাহকার্য্যে অগ্রসর হইতে ভীত হয় হওয়াও খুব স্বাভাবিক। পিতামহ! অচিরাৎ আপনি আপনার নারীসৃষ্টির ক্রটী বিদূরীত করুন এবং মর্ত্তের নারীগণের নিকট হইতে মৎ-বর্ণিত অস্ত্রগুলি প্রত্যাহার করুণ। করিলেই দেখিবেন আপনার সৃষ্টি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। শেষে হয় ত' আমারও বিবাহে প্রবৃত্তি হইতে পারে।

ব্রহ্মা। বৎস নারদ! অতিশয় মনোযোগের সহিত তোমার সমগ্র উক্তি শ্রবণ করিলাম। তুমি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছ। আমি শুধু মর্ত্ত্যের নর-নারীর স্থূল দেহ সৃষ্টি করি। আত্মার সৃষ্টি করেন স্বয়ং নারায়ণ এবং হৃদয়, মন ও মানসিক বৃত্তিগুলি সৃষ্টি করেন তদীয় পত্নীদ্বয় লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তুমি যাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলে, এই সকল নিশ্চয়ই সেই অপরিণাম দ্রশীণী, অর্ব্বাচীনা, চঞ্চল স্বভাবা, দুষ্টা সরস্বতীর কার্য্য। আমি সেই অবিমৃষ্যকারিণীর বিরুদ্ধে শীঘ্রই নারায়ণের দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি। আমার অভিযোগের বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিও না। তোমার ঢেঁকি বাহনে তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র চিন্তার বেগে পরিভ্রমণ করিতে পার। সদয় অপেক্ষা অন্দরে তোমার অধিক গতি! এই দণ্ডে মর্ত্তে গমন কর এবং মর্ত্তের নারীগণকে বুঝাইয়া দেও তাহারা যেন তোমার বর্ণিত মনোবৃত্তি এবং অস্ত্রগুলি, নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য পরিত্যাগ ও প্রত্যাহার করে। করিলেই দেখিতে পাইবে অবিবাহিতগণ উৎসাহের সহিত বিবাহে উৎসুক হইবে এবং বিবাহিতগণ স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া আমার সহায়তা করিবে। মর্ত্ত্যে স্বর্গের আবির্ভাব হইবে।

নারদ। আপনার বচনামৃত পানে আমার মহাভ্রম বিদূরীত হইল। আমি এখনই মর্ত্তাধামে গমন করিয়া আপনার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেছি। ভগবান্! নারদের কোটী কোটী বিনীত প্রণাম গ্রহণ করুন।

ব্রহ্মা। চীরংজীব। আশীর্ব্বাদ করি নারায়ণ তোমার সহায় হউন্। তুমি অবিলম্বে নিজে বিবাহ করিয়া আমার সৃষ্টিকার্য্যে সহায় হও। এখন আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের সমীপে চলিলাম। (প্রস্থান)

নারদ। পিতামহ! সে ভরসা বেশী করিবেন না। আমি বিবাহ করিলে আমার অন্যান্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য, যথা স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কোঁদল বাধান প্রভৃতি কে করিবে? সৃষ্টির বৈচিত্র্য কে রক্ষা করিবে। কার্ত্তিক! কার্ত্তিক!

উপসংহার

আপনারা দেখিতে পাইলেন, নারদ ব্রহ্মার উপর দোষ চাপাইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা সরস্বতীর উপর দোষ চাপাইয়া নিজে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মা এবং নারদ উভয়েই পুরুষ। হয়তো উঁহাদের যুক্তি পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। স্ত্রীদের পক্ষ হইতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আশা করি সে বক্তব্য অতঃপর আমরা শুনিতে পাইব। আরও আশা করি ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ শ্রবণের ফলে মর্ত্ত্যের গৃহে গৃহে অধিকতর শান্তি বিরাজমান হইবে এবং মর্ত্ত্যের নারীগণ স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করিতে শিখিবে।

মনের বাঘ

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

চক্ষু-রোগীর হয় Photo-phobia বা আলোকাতঙ্ক। কুকুরের কামড়ে হয় Hydro-phobia বা জলাতঙ্ক। নূতন রোগ দেখা দিয়েছে Yellow-phobia বা পীতাতঙ্ক। অবশ্য এ গুলো বনের বাঘ—ভয় করে এদের চলতেই হবে।

কিন্তু আর একরকমের Phobia বা আতঙ্ক দেখা যায়—ভয় ক'রে চলা যাকে নিতান্ত বিড়ম্বনা, কেন না সেটা মনের বাঘ মাত্র। তা হ'লেই কি শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও সে বাঘের প্রভাব এত বেশী যে বনের বাঘকে মনে হয় মেনি বেড়াল। সে বাঘের নাম দেওয়া যায়—Anato-physio-phobia বা শরীরতত্ত্বাতঙ্ক। এই আতঙ্কে পড়ে যে-সব মানুষ জ্ঞানের ক্ষুধায় ক্ষেতে উল্লালোদীর উর্দ্ধতন পঞ্চদশ এবং নিম্নতম সপ্তদশ পুরুষের কুলুজি মুখস্থ কর্ত্তে ভয় পায় না, সাহারার মরুভূমির বালুকাকণার সংখ্যা নির্ণয় কর্ত্তে অবসাদ বোধ করে না, কোথায় হনলুলু, কোথায় কামস্কাট্‌কা, উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর কোন্ পাহাড়টা কতখানি উঁচু বা সমুদ্রের কোন্ স্থানটার কতখানি গভীরতা মাপ-জোখ ক'রে রাখাটা নিতান্তই দরকার মনে করে, তারও নিজের দেহের গঠন কিরূপ, স্বাস্থ্যে তার কোন যন্ত্রটা কোথায় কি ভাবে কাজ করে, রোগেই বা তার কি পরিবর্ত্তন ঘটে, বিশুদ্ধ বায়ু শরীরের মধ্যে কোথায় কি কাজ করে, অবিশুদ্ধ বায়ুই বা কি অনিষ্ট ঘটায়; যে খাদ্য সে খায় স্বাস্থ্যে কি ভাবে তা রস, রক্ত অস্থি, মজ্জায় পরিণত হয়, রোগেই বা কিরকম বিকৃতি তার ঘটে—এই সব interesting এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়েও একটা সাধারণ ধারণা পর্য্যন্ত নিতে সাহস করে না।

দেখা যাক, কোথায় এর মূল। কেমন ক'রে এই মনের বাঘটা মনের মধ্যে এমন চিরস্থায়ী বাসা বেঁধে রয়েচে।

বিশেষজ্ঞদের কথা ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের যখন কৌতূহলের অন্ত নেই তখন এ বিষয়েও কিছুমাত্র কৌতূহল বা ঔৎসুক্য তার নেই এবং সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ কর্ত্তে একটী বারও এগিয়ে যে যায় নি এমনটা মনে করে তার উপর অবিচার কেন করব? কাজেই এই মনে করি যে, এগিয়ে সে গেছে, বহু চেষ্টাও সে কিছুটা কর্ত্তে চেয়েছে কিন্তু বইগুলোর বিপুল কলেবর, পাঁচরঙা, সাতরঙা ছবিগুলির অক্টোপাসের মত বীভৎস আকার, সকলের উপর শব্দগুলোর দাঁতভাঙা, জিব আড়ষ্ট করা দুঃসহ উচ্চারণ তার আক্কেল গুড়ুম ক'রে দিয়েছে। তাই সভয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ভাল মন্দ শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মফল ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে চম্পট দিয়েছে।

আশ্চর্য্য এই যাঁরা সব বিষয়ে "সবজানতা" হন এবং এদেশের সবচেয়ে বড় ভয় পুলিশের ভয়েও মোটেই কাবু নন, সেই ধুরন্ধর সংবাদপত্র-সেবকমহাশয়গণও এই জুজুর ভয়ে মেঘের ডাকে দুরন্ত ছেলেরই মত "একেবারে চুপ!"

তাঁদের এই শম্বুকমুখ বা কূর্ম্মগুপ্ততার জন্তে পাঠক সাধারণের হয় মুস্কিলের একশেষ—যখনই কোন মনীষী অসুস্থ হ'য়ে পড়েন বা জীবনলীলা সাঙ্গ করেন।

সেবার কাগজে বেরুল, "দেশবন্ধু অত্যন্ত অসুস্থ—ডাঃ ডি, এল, রায় বলেন রোগ শিবের অসাধ্য!"

ব্যাস, ঐ পর্য্যন্ত, কি রোগ, কোথায় রোগ তা নাকি খুলে বলা তিথি বিশেষে অলাবু বা বার্ত্তাকু ভক্ষণেরই মত কাগজীয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ!

স্যার আশুতোষ পাটনায় তাঁর এক দারোয়ানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কি অসুখ, কোথায় অসুখ তা ভেঙ্গে বলবার ধার কাগজওয়ালারা ধারেন নি। অত যে সাধের রবীন্দ্রনাথ, তাঁর বেলাও ঐ একই কথা। কি রোগ তাঁর, কেন তাঁর জীবনসংশয় কাগজের মারফতে এসব কিছুই লোকে জানতে পায় নি। এসব ব্যাপারে এই হল সাধারণ নিয়ম, এর ব্যত্যয় নিয়মকেই বিশেষ ভাবে প্রমাণ করে মাত্র। আমাদের এ তবু মন্দের ভাল, বিলেতের অবস্থা আরও গুরুতর। এখানকার কাগজগুলো তবু ধরা পড়বার ভয়ে বিষয়টা চোখ ইসারায় এড়িয়ে চলে, বিলিতি কাগজগুলো কিন্তু তা না ক'রে অতিচালাকের মত গম্ভীর ভাবে বিদ্যে জাহির কর্ত্তে সুরু করে। ফলে অবস্থা দাঁড়ায় অনেক বিশ্রী!

কিছুদিন আগে ইংলণ্ডের বিখ্যাত মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন্ সাহেবের ছানির জন্ত চোখ অপারেশন হয়। এত বড় ব্যাপার! কাজেই সেখানকার কাগজগুলো উঠে পড়ে লেগে যায় আপন আপন বিশেষজ্ঞতার পরিচয় দিতে। কেউ বলে, মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের চোখে ছানি হয়েছিল, কাল তা অপারেশন হয়ে গেল। ছানি অপারেশন ব্যাপারটা আর কিছু নয়, চোখের কর্ণিয়া থেকে একটা film বা পর্দ্দাময় পদার্থ ছুরি দিয়ে চেচে তুলে ফেলা, এ ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে।

আর এক কাগজ লিখেন,—না, তা নয় "ছানি অপারেশন অর্থ চোখ থেকে একপ্রকার opaque humour বা অস্বচ্ছ তরল পদার্থ ছুরির সাহায্যে চুয়িয়ে ফেলে দেওয়া?"

প্রায় কুড়িখানা কাগজ এর চেয়ে আরও অদ্ভুত অদ্ভুত যে সব মত প্রকাশ করেছিল পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে সেগুলো আর দিলাম না।

বলাবাহুল্য—চোখে ছানি পড়ার অর্থ যে চোখের crystal lens বা স্বচ্ছ কাচের উপর একরকম স্তর কিম্ভুত মাংসল পদার্থের উদ্ভবে ঐ স্বচ্ছ কাচের সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ অবস্থায় পরিণত হওয়া এবং তার অপারেশন মানে কর্ণিয়ার মধ্যে দিয়ে ছুরি বসিয়ে ছানি শুদ্ধ ঐ অস্বচ্ছ কাচকে সম্পূর্ণ কেটে বাদ দেওয়া, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই এদের কারও নেই।

যা হোক, তাদের চিন্তার ভার তাদের উপরে দিয়ে আমাদের নিজেদের চড়কায় নিজেরা একটু তেল দিয়ে দেখতে চাই, তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

দেখা যাক সাধারণের দুর্ব্বোধ্য, জটিল, বৈজ্ঞানিক রীতি এবং শব্দাড়ম্বর ছেড়ে, সহজ সরল সুখবোধ্য রীতিতে, এবং গৃহস্থালীর কথায় ধারাবাহিক ভাবে কিছুদিন আলোচনা ক'রে এই Phobia বা শরীরতত্ত্ব সংক্রান্ত অথবা আতঙ্কের কোন আতঙ্কনিগ্রহ বটিকার ব্যবস্থা করা যায় কি না।

রেলগাড়ীতে কে না চড়েছেন? "বাপ বাপ" শব্দে হাঁপাতে হাঁপাতে বন, জঙ্গল, গাছ, পাথর ভেঙ্গে ইঞ্জিনটার সেই যে বিদ্যুৎবেগে হুড়মুড়িয়ে চলা তাই বা কে না দেখেছেন? বাস্তবিক তখন ওটাকে একটা দত্যি দানা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। না হলেও শুনে হয় ত' চ'টে যাবেন—আপনার এই যে সুন্দর সুঠাম মসৃন দেহটী তারও ঐ একই গোত্র।

আঁতকে উঠলেন যে? বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখুন অকাট্য প্রমান দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।

প্রথমতঃ দেখুন—আপনি খান, ইঞ্জিনও খায়। কি, মুখ অমন কর্চ্ছেন কেন? হ্যাঁ খায়—ক্রমে দেখাচ্ছি। আপনিও কিছুদিন খেতে না পেলে অসাড় অচল হয়ে পড়েন, ইঞ্জিনের সেই একই দশা হয়। ইঞ্জিন খায় তেল, কয়লা (আসাম অঞ্চলে কাঠ) অপর্য্যাপ্ত জল বাতাস। আপনি খান—ছাতুর দেশের আদমি হন ত'—ছাতু লঙ্কা। বাঙ্গালী হন ত' দুটী ডাল ভাত। আর বড়মানুষ হন ত' লুচি, কচুড়ি, কালিয়া, পোলোয়া। এবং জাতিটীরই মতন বিশুদ্ধ কখনও বা অতি অবিশুদ্ধ জলবায়ু। তবে সব কিছুই পরিমাণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কম। তাই ত' আপনি এত দুর্ব্বল। যদি জুড়িদারের মতন গ্যালন গ্যালন এবং ওয়াগন ওয়াগন খেতে পার্ত্তেন আপনিই কোন্ একটা বোম্বাই ট্রেণ টেনে নিয়ে যেতে না পার্ত্তেন?

দ্বিতীয়তঃ, ইঞ্জিনও খেয়ে নিয়ে ছিবড়েগুলো ফেলে দেয়, আপনিও কি তাহাই করেন না? ইঞ্জিনের পরিত্যক্ত ছিবড়ে বা আবর্জ্জনা, ধোঁয়া ছাই, অদাহ্য কয়লার খণ্ড। আপনার পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা—চামড়ার পথে ঘাম, নিঃশ্বাসের পথে একরকম বিষাক্ত গ্যাস এবং বিভিন্ন পথে মল-মূত্র।

তৃতীয়তঃ, আপনার শরীর এবং ইঞ্জিন দুইই মেজে-ঘসে বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। ময়লাপড়া অপরিস্কার ইঞ্জিন ঘস্-ঘস্ ভস্-ভস্ করে কায়ক্লেশে দিন ক'এক চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ একদিন অচল হয়ে পড়ে। আর অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন তেল চিটচিটে মানুষের দেহ হাজার রোগের বাসা হয়ে শেষে অকালে মৃত্যু ডেকে আনে।

চতুর্থতঃ, ইঞ্জিন এবং মানুষের দেহ দুই ব্যবহারে ভাল থাকে। "In disuse there is death!" এই সুন্দর কথাটী দুয়ের বেলাই খাটে। ফেলে রাখলে ইঞ্জিনের লোহায় ধরে জং, স্ক্রুগুলো হয়ে যায় ঢিলে। এমনই ক'রে শেষে চুচ্চুরে, ঝর্‌ঝরে হয়ে একেবারে হয়ে যায় কাজের-বার। মানুষের বেলাও সেই একই কথা? আপনার চোখ দুটি যদি কিছুকাল

শক্ত ক'রে বেঁধে রাখি, শেষে দেখবেন আপনি একেবারে অন্ধ হয়ে গেছেন। অব্যবহারে চোখ তার কাজ হারিয়েছে। অলস মানুষ এমনি করেই সমস্ত কাজের ক্ষমতা হারিয়ে একটা "জরদ্গব" হয়ে পড়ে।

পঞ্চমতঃ; ইঞ্জিনেরও যেমন আপনার দেহেরও তেমন এক অংশ অপরের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এক অংশ বিকল হ'লে অপর অংশ কম বেশী তার ফলভাগী হয়। সেই মনে পড়ে পাঠশালায় বইয়ে পড়া সেই—"উদর ও অবয়বের ঝগড়া।" মানুষের পেটে ভাত না পড়লে যেমন তার অবয়বগুলো শুষ্ক, অসাড়, দুর্ব্বল এবং অচল হয়ে পড়ে, ইঞ্জিনেরও বয়লার যদি জল না পায়, ষ্টিমও তৈরী হয় না তার পা-কি না চাকাগুলোও আর নড়তে চায় না।

ইঞ্জিন আপনার জ্ঞাতি বটে, কিন্তু তা বলে কিছুই কি তফাৎ নেই? রবীন্দ্রনাথের জ্ঞাতিরা সবাই কি এক একজন রবীন্দ্রনাথ? শিবাজীর জ্ঞাতিরা সবাই কি এক একটা শিবাজী? তা নয়—জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে তফাৎ থাকেই; আপনার বেলাও তাই আছে? আপনাকে সৃষ্টি করেছেন যে ইঞ্জিনিয়ার, এবং ইঞ্জিন তৈরী করেচে যে ইঞ্জিনিয়ার এই দু'য়ের মধ্যে একটুখানি তারতম্য আছে।

বলে নটো যত বড়ো নাচনেওয়ালাই হোক্ নিজের কাঁধে চড়ে নাচবার ক্ষমতা তার হয় না, ইঞ্জিনওয়ালাও যত ওস্তাদই হোক আপনার সৃষ্টিকর্ত্তা ইঞ্জিনয়ারের কাছে পৌঁছুবার ক্ষমতা তার হয় না। আপনি ছিলেন শিশু, হলেন বালক, তারপর কিশোর, এখন পূর্ণাঙ্গ যুবা—অথবা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, ঠিক ত' জানি নে, আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য ত' আমার হবে না। এই যে দিনে দিনে, মাসে মাসে, বছরে বছরে ছোট থেকে ক্রমে বড়ো আরো বড়ো, প্রথমে নবনীত কোমল কচি মুখখানি, ক্রমে বেদানার দানার মত মনোহর দন্তোদ্গম, তারপর নন্দদুলাল কিশোরটী। শেষে অপূর্ব্ব যৌবনশ্রী? এগুলো ইঞ্জিনের হয় কি? তার ইঞ্জিনিয়ার তাকে যতটুকু বা যত বড়ো করে গড়েছেন তাকে সেখানেই থাকতে হয়।

তা ছাড়া আপনি যখন আফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে হাঁপিয়ে পড়েন, মনে হ'তে থাকে কাল বুঝি আর পারব না এ খাটুনি খাটতে; কিন্তু রাত্রির নিদ্রালস মধুর বিশ্রামের পরে সকালে উঠে দেখেন সমস্ত শ্রান্তি কোথায় চলে গেছে, পরিশ্রমের পূর্ণ শক্তি আবার আপনি ফিরিয়ে পেয়েছেন। বহু মাইল ভ্রমণের পরে ইঞ্জিনের যখন এ অবস্থা হয়, স্ক্রুগুলো তার ঢিলে হয়ে যায়, চাকাগুলোয় ফাটল ধরে, দশরাত্রি বিশ্রামের পরেও কি সে আর নিজে নিজে সেরে উঠতে পারে? বাইরের সাহায্য তাকে নিতেই হয়।

এইখানেই দু'য়ের তফাৎ। এই যে তফাৎ এরই নাম জীবন, যেখানেই জীবন সেই খানেই এই বেড়ে যাওয়া এবং নিজেকে নিজে শুধরে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে। কোন কোন জীবের এ শক্তি মানুষের চেয়েও বেশী আছে? আপনার হাত বা আমার পা যদি কেটে ফেলি, আর গজায় কি? কিন্তু গলদা চিংড়ির ঠ্যাং দুটো ছিড়ে নিয়ে যদি জলে ছেড়ে দেন, দেখবেন অবশ্য তখনি নয়, কিছুদিন বাদে, আর দুটো নূতন ঠ্যাং তার গজিয়েছে? এই রকম টিকটিকীর ছেড়া ল্যাজ আবার গজায়।

রাক্ চিংড়ির কথা—খাবার বেলায় হবে, এখন যে কথা বলতে বসেচি, সে কথাই বলি। বাড়বার এবং শোধরাবার এই যে দু'টো কাজ এরই নাম growth বা বৃদ্ধি।

ভাববার কথা, কেমন করে এ বৃদ্ধি হয়। একসের দুধে তিন সের দুধ মেশালে চার সের দুধ হয়, এটা ঠিক। একমণ চালে তিন মণ চাল মেশালে চার মণ চাল হয় এটাও ঠিক, ওজনেও ভারী হয়, আকারটাও বেড়ে যায়।

কিন্তু মানুষটা বা ছাগলটা যখন ওজনে এবং আকারে বেড়ে উঠে আর একটা মানুষ বা আর একটা ছাগল ত' তাতে জুড়ে দি না, দি দুধ, ভাত, মাছ, তরকারি কিম্বা খোল-ভুষি, ঘাস-খড়। অথচ তারা বেড়ে উঠে ঐ দুধ বা চালের মতন। এ অদ্ভুত ব্যাপার কেমন ক'রে, কোন্ সে যাদুকরের কি যাদুদণ্ডের প্রভাবে ঘটে মানুষের বুদ্ধিতে আসে কি? বর্ত্তমান যুগের যান্ত্রিক মানুষ দু' একটা যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে অহঙ্কারে আত্মহারা হয়েছে। বিজ্ঞানের ভোজবাজীতে অন্ধ হ'য়ে ভগবানকে উড়িয়ে দিতে চাইছে? কিন্তু তার নিজের দেহের অপূর্ব্ব কলা-কৌশলের মধ্যে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সে যাদুকর যে ইন্দ্রজাল গড়ে রেখেছেন মানুষ-কল্পিত কোন যন্ত্র তার সহস্র ক্রোশের মধ্যেও পৌঁছুতে পারে কি? কি কৌশল বা কোন্ যন্ত্রের অব্যর্থ সঙ্কেতে এই মাত্র খেলেন যে খাবারগুলো ৪ থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যে বদলে গেল লুচি, কচুড়ি, মণ্ডা, মিহিদানা থেকে একেবারে রস, রক্ত, মাংস, অস্থি মজ্জায়? মানুষের বুদ্ধির অগম্য এই যে Process বা প্রক্রিয়া মানুষ এর নাম দিয়েছে—Assimilation, (To assimilate = To make similar) বা সমান ক'রে নেওয়া পেট এবং নাড়ী ভুড়ীর প্রক্রিয়া খাদ্যগুলোকে সেই ভাবেই থাকতে না দিয়ে, সমান কি না রস রক্ত মাংসে রূপান্তরিত ক'রে নেয়। তাই মানুষ খেতে—খেতে—খেতে একটা পুঞ্জীভূত খাদ্যের ভাণ্ডার বা Store room-এ পরিণত না হ'য়ে দিনে দিনে রস রক্ত মাংসেই বেড়ে উঠতে থাকে।

[ক্রমশঃ

বন্ধন-মুক্তি

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

কুড়ি

কয়েক দিনের মধ্যেই অনেক কথার রটনা হইল এবং ডালপালায় বাড়িয়া লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। কথাগুলি মোটের উপর ছিল এইরূপ :—

ব্রাহ্ম শুচিতার সমুচ্চধ্বজাধারিণী সুকল্যাণী মোকার্জ্জিও কমল মল্লিককে পাকড়াইবার উদ্দেশ্যে লম্বা জাল ফেলিয়াছেন। সেদিন বাড়ীতে জাঁকাল একটা গানের মজলিস বসাইল; যাহার সঙ্গীতনায়িকা হইল তাঁহারই কন্যা উর্ম্মি। পর পরই আবার কন্যাকে লইয়া কমলদের বাড়ীতে গিয়াই উপস্থিত হইল, বাছা বাছা প্রেম-সঙ্গীতে যদি একদম তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে। কমলের মাতা চিন্ময়ী মল্লিক নাকি তাঁহার সহপাঠিনী বাল্যবন্ধু!—তা এ বন্ধুত্বের সংবাদ এতদিন কেহই ত' পায় নাই। হইতে পারে কবে এক সময়ে উভয়ে এক স্কুলে বা কলেজে পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ কোথায় চিন্ময়ী মল্লিক আর কোথায় সুকল্যাণী মোকার্জ্জি! গরজে সুকল্যাণী মোকার্জ্জি বন্ধুত্বের এই দাবী করিয়াছে, ভদ্রতার খাতিরে চিন্ময়ী মল্লিক বাল্য পরিচয়টা অস্বীকার করেন নাই; বন্ধুত্ব নামেও একটা মর্য্যাদা ইঁহাকে হয় ত' দিয়াছেন। প্রিয়ম্বদা গাঙ্গুলী এবং গার্গীও ছিল তাকে তাকে। হঠাৎ গিয়া মল্লিকগৃহের নিভৃত সঙ্গীত-বাসরে হানা দিল। তখন সে যে এক কাণ্ড উপস্থিত হইল!—প্রতিদ্বন্দ্বিনী দুই মায়ে প্রায় হাতাহাতি চুলাচুলি আর কি! চিন্ময়ী মল্লিক তখন বেয়ারা ডাকিয়া ঘাড়ে ধরিয়া প্রিয়ম্বদাকে বাহির করিয়া দেন। গার্গীর হিষ্টিরিয়া সুরু হয়, তাহাকেও কোনও মতে টানিয়া হিঁচড়াইয়া আনিয়া গাড়ীতে পুরিয়া দেওয়া হয়। তার কিছুকাল পরেই আবার দেখা যায় কমল উর্ম্মিকে লইয়া তাহার গাড়ীতে সিনেমায় যাইতেছে। সিনেমার নামে মূর্চ্ছা যায়, সেই সুকল্যাণী মোকার্জ্জির কন্যা যায় সিনেমায়—আবার ঐ কমলের সঙ্গে, যে নাকি একদল মেয়ে লইয়া সিনেমায় সিনেমায় রেঁস্তরায় রেঁস্তরায় রাত্রি ন'টা দশটা পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ায়! তারপরেও আবার দুই তিন দিন সন্ধ্যাবেলায় এক গাড়ীতে কমলকে আর উর্ম্মিকে বেড়াইতে কে কে দেখিয়াছে। নিশ্চয়ই উহারা কোনও সিনেমায়, কি রেঁস্তরায় অথবা লেকেই যাইতেছিল। আবার কি একটা গীতি-নাট্য হইবে, নায়ক নায়িকার ভূমিকায় মঞ্চে উঠিবে কমল আর উর্ম্মি! ঘন ঘন মহল্লাও চলিতেছে। উর্ম্মি গায় ভাল, কিন্তু নাচিতে পারে না। পাকা একজন নৃত্য শিক্ষয়িত্রীও মোটা বেতনে রাখা হইয়াছে। বেতনটা কমলই দিবে বলিয়াছে।

যে-দিন এই ঘটনা হয়, তার পর দিন সন্ধ্যাবেলায় কমল গার্গীদের গৃহেও গিয়াছিল, গিয়া মাতার দুর্ব্যবহারের জন্য নাকি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আইসে। পরদিন হইতেই গার্গীর বুকের ব্যথা ভাল হইয়া গিয়াছে; হাসিমুখে আবার বাহিরে হইতেও তাকে দেখা যায়। হাঁ, কমল গিয়াছিল একথা সত্য তা—কিন্তু নিজে যাচিয়া যায় নাই। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, গার্গী অনেক দুঃখ করিয়া কমলকে একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল; ভদ্রতার খাতিরে তাই একটিবার গিয়া দুইটি মিঠা কথা বলিয়া আইসে। তবে তাকেও একদিন সন্ধ্যাবেলায় কমলের গাড়ীতে দেখা যায়; বোধ হয় লেকের ওদিকে বেড়াইতে যাইতেছিল।

শেষের এই কথাটা মোটের উপর সত্যই বটে। মূলে দোষ যে পক্ষের যাহাই হউক, এবং ঘটনাটা যে ভাবেই ঘটুক, গার্গী তাহার বন্ধু, তাহার গৃহে আসিয়া বেশ কিছু অপমানিত হইয়াই গিয়াছে এবং মনে বড় একটা ব্যথাও পাইয়াছে। মনে মনে সত্যই বড় দুঃখ কমলের হইতেছিল। পরদিনই সন্ধ্যায় সে গার্গীদের গৃহে যায় এবং অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলে, যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য সে এতটুকুও দায়ী নয়। এরূপ একটা অপ্রিয় ঘটনা যে ঘটিতে পারে, মনেও তাহা ভাবিতে পারে নাই। যারপরনাই দুঃখ সে পাইয়াছে এবং লজ্জায় মরিয়া আছে। কেবল ভদ্রতায় ক্ষমা মাত্র চাহে না, বন্ধুভাবে আবার সেই প্রীতির সম্বন্ধেই গার্গীর সঙ্গে মিলিতে চাহে। যাহা হইয়াছে তাহা যেন হয় নাই, যেমন বন্ধু তাহারা ছিল তেমনই আছে, কোনও ব্যবধান মাঝে আসিয়া পড়ে নাই, এমনভাবে গার্গী কি তাহাকে গ্রহণ

করিতে পারিবে? যদি পারে তবেই সে মনে একটা শান্তি ও স্বস্তি বোধ করিতে পারে। নতুবা এই বন্ধুত্ববিচ্ছেদ বরদাস্তই করিতে পারিবে না। গার্গী আর তার বন্ধু নয়, মুখ দেখা-দেখিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এইরূপ একটা অবস্থা কল্পনাও সে করিতে পারে না। তারপর এটা একটা public scandal—প্রকাশ্য কেলেঙ্কারীর একটা ব্যাপারই হইয়া দাঁড়াইবে, যাহা কাহারও পক্ষেই প্রীতিকর হইতে পারে না। অবশ্য বন্ধুভাবে গার্গী তাহার গৃহে শীঘ্র আর যাইতে পারে না, তবে সে ত' যখনই অবসর হয় আসিতে পারিবে, গার্গীকে লইয়া বেড়াইতেও বাহির হইতে পারিবে যদি তাহার পিতামাতা অনুমোদন করেন। এই ভাবে যদি তাহারা চলিতে পারে, বাহিরে একটা scandal এর সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ একটা ঘটনা যে ঘটিয়াছে, মনেই কাহারও উঠিবে না। বাহিরে কোনও কথা কোনও মতে যদি যায়ও, বিশ্বাসও কেহ করিবে না।

মাতাও ছিলেন, পিতাও ছিলেন। বলা বাহুল্য, যেন হারাধন তাঁহারা ফিরিয়া পাইলেন এবং অতি আনন্দেই পুরাতন সেই বন্ধুত্ব ধারার অব্যাহত গতি অনুমোদন করিলেন। কথা দিয়া কমল কথা লইয়া গেল এবং পরদিনই আসিয়া গার্গীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল।

পিতা মাতা ও কন্যা তিন জনেরই দৃঢ় একটা সংকল্প এই হইল, কমল এই যে আসিয়া আবার এত নরম হইয়া ধরা দিল; ধরিয়াই তাহাকে রাখিতে হইবে। সুযোগটা আগে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াই গেল। অভিশাপটা আশীর্ব্বাদ হইল। সেদিনকার সেই অপমানটা অতি আকাঙ্ক্ষিত, বড় এই মানটাই যেন হাতের মুঠায় আনিয়া ফেলিল।

ফ্যানী; লীলি—উহারা আর আমলই পাইবে না। উর্ম্মি? উর্ম্মি আর কি? যন্ত্র মাত্র; যা করিবে তার মা। তা তাঁতে যে ঘা সেদিন প্রিয়ম্বদা দিয়া আসিয়াছেন, তাহার পর আর সে এ পথে পা দিবে না, সত্য যদি ভদ্রমহিলার যোগ্য এতটুকুও লজ্জাবোধ তাহার থাকে, আর তাহার সেই ঢাকপিটান ব্রাহ্মশুচিবাদ সত্যই যদি না ভণ্ডামী মাত্র হয়। তবে কি না কমল নিজে গিয়া ঘেঁসিতে পারে। উর্ম্মির উপরে মনের সত্যকার একটা টান যে গিয়া তাহার পড়িয়াছে বা পড়িতেছে, ইহা কেবল গার্গী নহে তাহার অন্যান্য সঙ্গিনীরাও কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছিল। ইহাও তাহারা অনুভব করিত, বন্ধু ভাবেও আদর আপ্যায়ন যতই করুক, যতই তাহাদের সঙ্গ প্রীতিকর তাহার পক্ষে হউক, ঠিক যেরূপ একটা টানে টানিতে না চাহিয়াও, দুই চারিদিনে মৌনপ্রায় উর্ম্মি তাহাকে টানিতেছে, এতদিনকার এত রসমধুর মিত্রতার আদান-প্রদান সত্বেও সেরূপ একটা টানে তাহারা কেহ টানিতে পারে নাই। কথাটা সত্য। লজ্জানত, সম্ভ্রমসংযত, সঙ্কোচশিষ্ট, স্বভাবমিষ্ট সত্যকার যে নারীত্ব, তাহার কান্তমোহন শ্রীই পুরুষের চিত্তকে জয় করিতে পারে। এ যাবৎ তরুণী যে সব বান্ধবীদের সঙ্গ লাভ করিয়াছে, সঙ্গে চিত্ত বিনোদনেরও অজস্র অবারিত সুযোগ পাইয়াছে, তাহাদের কাহারও মধ্যে এ শ্রী কমল কখনও দেখে নাই। বস্তুতঃ এরূপ কোনও শ্রী এসব বান্ধবীদের মধ্যে দেখাই যায় না। ইহার অধিকারিণী কাহারও পক্ষে এরূপ বান্ধবীত্বের ভূমিকায় এসব লীলা মঞ্চেও অবতীর্ণ হওয়াই সম্ভব হয় না।

উর্ম্মির দিক হইতে আশঙ্কার যে একটা কারণ আছে একথা গার্গী তাহার মাতাকেও বলিয়াছিল? উভয়ে বেশ একটু উদ্বিগ্নও তাহাতে হইয়া উঠিতেছিলেন। সহসা উর্ম্মির গান শুনিয়া উভয়ে অতি ত্রস্তভাবে যে মল্লিকগৃহে গিয়া উঠেন, আর ঈর্ষারোষে আত্মহারা হইয়া যে কলহের সৃষ্টি করেন, তাহা যেরূপ চাপা এই মনোভাবের আকস্মিক একটা বিস্ফোরণ, ইহা বলাই বাহুল্য।

আশঙ্কাটা—হাঁ, এখনও বেশ কিছু আছে বটে। তবে পরিতপ্ত কমল আসিয়া যে হাতে আবার ধরা দিল, এটা বড় একটা আশার কথাও বটে। ওদিকের ও টানটা—হাঁ, তেমন জমিয়া উঠিতে কিছু সময় লাগিবে। সুকল্যাণীর শয়তানী হাজার হইলেও কাঁচা শয়তানী। মেয়েটাও অতি আনাড়ী একটা কাঁচা মেয়ে—ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়। সেদিন শক্ত যে ঘাটা খাইয়াছে, তাহাতে ভড়কাইয়াও দু'জনে বেশ গিয়াছে নিশ্চয়। সামলাইয়া উঠিয়া তাহাদের সেই কাঁচা চালে টানটা যতদিনে জমাইয়া উঠিতে পারিবে, তার আগেই পাকা কোনও চালে কমলকে একরম পাকড়াইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু সে চালটা কি হইতে পারে? দেখা যাউক—যত্নে কি না সিদ্ধ হয়।

সত্যই সুকল্যাণী বড় ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন। আঁতে গিয়া সত্যই বড় তীব্র একটা ঘা তাঁহার লাগিয়াছিল। ঠিক ধরাপড়া চোরের মতই একটা অবস্থা সেদিন তাঁহার হয়। প্রিয়ম্বদা যে অভিযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করেন, তাহা যে সত্য। সত্যই যে সে অপরাধে তিনি অপরাধিনী। চিন্ময়ী জানে সত্য, কমল বুঝিয়াছে সত্য; উর্ম্মিও বুঝিয়াছে সত্য। ধিক্, এ লজ্জা কিসের বলে আর তিনি চাপিয়া রাখিতে পারেন, রাখিয়া আবার মুখ তুলিয়া ইহাদের দিকে চাহিতে পারেন?

ক্রমে যে সব কথার রটনা হইতেছিল, তাহাও কতক কতক তাঁহার কানে আসিল। পরিচিত কেহ কেহ আসিয়া, কেহ বেশ স্পষ্ট, কেহ বা কিছু প্রচ্ছন্ন শ্লেষের ভঙ্গীতে অনেক কথা শুনাইয়াও তাহাকে যাইত। ছি-ছি-ছি! এতবড় একটা কেলেঙ্কারীতে তাঁহারও নাম জড়িত হইয়া পড়িল! ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার মর্য্যাদা, সুনাম, সবই যে একেবারে গেল!

কমলের ব্যবহারেও বিশেষ প্রীতিকর সেদিন তাঁহার হয় নাই। গার্গী যে সব কথা শেষে বলিয়া গেল, তাহাও ত' একেবারে মিথ্যা নাও হইতে পারে! তবে চিন্ময়ী বলিয়াছিল আজ কালকার ছেলেরা না কি এই সব মজলিসা মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশা সর্ব্বদা করে। ইহা একটা রেওয়াজই হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইউরোপেও ছেলেমেয়েরা নাকি এইরূপ মেলা-মেশা করে, এবং তাহা হইতেই ক্রমে প্রেমসঞ্চার ও বিবাহ হয়। মাতাদের এরূপ সব ছল-কৌশল সর্ব্বদা অবলম্বন করিতে হয় না, যাহার ফলে এত বড় একটা কেলেঙ্কারী তাঁহার হইল। মেলা-মেশাটা ভাল, পরস্পরের মন বুঝিয়া লইবার সুযোগ তাহাতেই ঘটে। তবে ইহাতে একটা seriousness (গুরুত্বভাব) থাকা চাই। কিন্তু ইহারা যে এই মেলা-মেশা করিতেছে; তাহাতে এরূপ কোনও seriousness কিছু আছে বলিয়া ত' মনে হয় না। সবই যেন কেমন অতি লঘু একটা খেলার মত। কমল নিজেও স্বভাবে অতি লঘু বলিয়াই মনে হয়।

যাহা হউক, যতদূর যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। পরিচয় এমন প্রীতিকর কিছু হয় নাই; তার উপরে এত বড় একটা কেলেঙ্কারী আবার হইয়া গেল। এই বিবাহ সম্বন্ধের ব্যাপারে আর অগ্রসর হওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ে বেশ একটা দ্বিধাই তাঁহার মনে দেখা দিয়াছিল, বড় বিক্ষুব্ধ করিয়াও তাঁহাকে তুলিয়াছিল। নিজে যাচিয়া হয় ত' অগ্রসর আর হইতেনই না। কিন্তু কমল যখন তখন আসিত, 'মাসীমা' 'মাসীমা' বলিয়া এমন একটা আপন আপন ভাব দেখাইত, যে মনটা তাঁহার নরম হইয়াই পড়িল, ধারণাও ক্রমে এইরূপ জন্মিল, ব্যবহারে লঘু হইলেও, স্বভাবে কমল অতি সরল ও সহৃদয় একটি যুবা। সঙ্গে সঙ্গে লোভটাও আবার মনের তল হইতে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। দেখা যাউক, সত্য সত্যই পবিত্র প্রেমসঞ্চার যদি ইহাদের হয়, কমল প্রস্তাব করে, আর উর্ম্মি আনন্দে তাহা গ্রহণ করে, ভগবানের বড় আশীর্ব্বাদ বলিয়াই সেই শুভযোগকে বরণ করিয়া তিনি লইবেন। কুকথা আজ যেই যাহা বলুক, সব তখন বন্ধ হইবে। করুণাময় যদি এ করুণা করেন, উহাদের engagement (উদ্বাহপণ বন্ধন) উপলক্ষে আর একটি পার্টি তিনি দিবেন; শ্লেষ-বিদ্রূপ আজ যাহার করিতেছে, তাহারাই আসিয়া তখন অভিনন্দন তাঁহাকে ও তাঁহার কন্যাকে করিয়া যাইবে।

তবে কিনা, মিষ্টার মোকার্জ্জি এই সম্বন্ধের প্রস্তাবটা তেমন ভাল মনে গ্রহণ করিতেছেন না, চেষ্টায় কোনও সহায়তা তাঁহাকে করিতেও একান্ত অনিচ্ছুক। কমল যে আসে যায়, ভদ্রতার ত্রুটি কিছু না করিলেও তেমন একটা প্রাণঢালা আপন আপন ভাবে আদর আপ্যায়নও তাহাকে করেন না, কেমন একটু দূর দূর ভাবই রাখিয়া চলেন। সেদিনকার ঘটনাটায় বেশ আবার একটু তিক্তও হইয়া উঠিয়াছেন। তার যেন—মনে হয় অন্যরকম কি একটা অভিপ্রায় আছে। সেটার কিছু আভাসও যে তিনি না পাইয়াছেন তাহাও নয়। কিন্তু না, আপাততঃ ওসব কিছু ভাবিবার কথাই হইতে পারে না। কমল—তাহার তুলনা আর কাহার সঙ্গে হইতে পারে? তবে উর্ম্মি কি করিবে? মনটা তাহার বুঝাই যাইতেছে না। কমল যখন আসে, "উর্ম্মি" বলিয়া গলা তুলিয়া হাসি মুখে ডাকে, বেশ একটা হাসিখুসী ভাবই ত' তার দেখা যায়, হাসি-গল্পও বেশ করে। গান গাহিতে বলিলে অমনই গিয়া অর্গানটির কাছে বসে,

আপত্তি কখনও কিছু করে না। তবে কিনা তার স্বভাবেরই ধরণ এই। কোনও কিছুতেই জিদ তাহার দেখা যায় না, নিজের মতলবেও কেবল চলিতে চায় না, ব্যবহারে সকলকেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে চায়। আর ঐ যে হাসিখুসী ভাব, ওটাও তার স্বভাবেরই বড় একটা বিশিষ্টতা। ইহাতে এটা ঠিক এখনও ধরিয়া লওয়া যায় না যে কমলের প্রতি একটা অনুরাগ তাহার জন্মিয়াছে, তবে বিরাগও কিছু নাই। আবার এত বড় একটা উচ্চগৌরব লাভ করিবে—যাহা বহুকন্যাই এ সমাজে কামনা করিতেছে—তাহাও কি তার মনকে একটু টানিবে না? সবই নির্ভর করিতেছে তাহার উপরে। কমল প্রস্তাব আজ না হয় কাল করিবেই। সে যদি তাহা গ্রহণ করে, মহীনের কোনও আপত্তিই তখন চলিবে না। অন্য যে অভিপ্রায় মনে থাক, সবই মনেই বিলীন হইয়া যাইবে।

একুশ

রাম রাম সত্য হ্যায়!

রাম রাম সত্য হ্যায়!

নীচে রাস্তায় কতিপয় কণ্ঠে ধ্বনি হইল,

রাম রাম সত্য হ্যায়!

সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চরবে বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠিল,—

রাম রাম সত্য হ্যায়!

রাস্তার ঠিক উপরেই একটা ঘরে উর্ম্মি তখন কি করিতেছিল। সহসা এই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি সে শুনিল—

রাম রাম সত্য হ্যায়!

রাম রাম সত্য হ্যায়!

চমকিয়া সে উৎকর্ণ হইল; শুনিল, এই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি করিতে করিতে রাস্তা দিয়া কারা যেন কোথায় যাইতেছে। কেন অবিরত এই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি করিতেছে?—

রাম রাম সত্য হ্যায়!

রাম রাম সত্য হ্যায়!

ত্রস্ত ছুটিয়া সে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কৃষ্ণবর্ণ, কুদর্শন, দীনমলিনবেশ বহুলোক এই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি করিতে করিতে কোথায় যাইতেছে। সকলের আগে চারিজন বাহকের স্কন্ধে একখানি খাটিয়া, খাটিয়ার উপরে নূতন শুভ্র বসনে আবৃত একটি শবদেহ। লোকগুলিকে দেখিলে মনে হইবে, ইহারা কুলি-মজুর কি ঝাড়ুদার ভিন্ন উচ্চতর আর কোন শ্রেণীর লোক হইতে পারে না। কিন্তু সকলের মুখেই ধীর গম্ভীর একটা ভাব—যেন স্বজনের এই মহাপ্রয়াণের গুরু সত্যকে প্রত্যেকেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে। "ক্ষুদ্র এই ঐহিক জীবন নশ্বর একটা মায়ার খেলা—তার সুখ-দুঃখ ভোগাড়ম্বর, বিষয়সর্ব্বস্বতা সব অসার, অসত্য, আর সত্য কেবল 'রাম রাম'? ঐহিক জীবনের বন্ধন-হইতে মুক্ত জীবের সম্বলও এই সত্য, এই সারবস্তু।" এই সম্বলকে ধরিতে পারিলেই মহাপ্রয়াণের এই পথ তাহার সুগম হইবে, অপূর্ণ কোনও কামনার দুঃখে পিছনে আর সে ফিরিয়া চাহিবে না। অনাবিল আনন্দে সম্মুখে, ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধতর লোকে অবাধে আরোহণ করিবে। এই কথাগুলিই প্রত্যেকে তাহার যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে, আর সেই অনুভূতির প্রেরণায় ধীরগম্ভীর কণ্ঠে সকলে এই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি করিতেছে—

রাম রাম সত্য হ্যায়!

রাম রাম সত্য হ্যায়!

বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্তব্ধ ভাবে উর্ম্মি দাঁড়াইয়া রহিল। শ্মশানযাত্রীরা ক্রমে দূরে—আরও দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আকাশ ও বাতাস ভরিয়া ঐ এক ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি লহরে লহরে ভাসিতে লাগিল—

রাম রাম সত্য হ্যায়!

রাম রাম সত্য হ্যায়!

রাস্তায় ঘড় ঘড় গাড়ী চলিতেছিল, ট্রাম চলিতেছিল, কত মোটর ফস-ফস ভস-ভস শব্দে ছুটিতেছিল, ফিরিওয়ালারা কত সুরে হাঁকিয়া যাইতেছিল, পথযাত্রীদের আরও কত বিচিত্র কলরব উঠিতেছিল। কিন্তু কোন শব্দই উর্ম্মির কানে গেল না, কেবল এই ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতেই তাহার শ্রুতি পরিপূর্ণ হইয়া রহিল—

রাম রাম সত্য হ্যায়!

রাম রাম সত্য হ্যায়!

"কি দেখছ ওখানে দাঁড়িয়ে উর্ম্মি?"

চমকিয়া উর্ম্মি ফিরিয়া চাহিল।

"কে, অরুণ দা! আসুন! কখন এলেন আপনি?"

"এই ত' খানিকটা আগে; নীচে কাকাবাবুর সঙ্গে কথা ব'লছিলাম। তা তুমি কি দেখছিলে দাঁড়িয়ে ওখানে অমন নিবিষ্ট হ'য়ে?

"কি দেখছিলাম! কেন, আপনি কি দেখেন নি?"

"কি? এমন আশ্চর্য্য রকম নূতন কিছু—কই, চোখে ত' পড়ে নি?"

"চোখে পড়ে নি! বলেন কি? কানেও কি শোনেন নি?"

"কি উর্ম্মি; কানে এমন বিশেষ করে শুনবার মত—"

উর্ম্মি যারপর নাই বিস্মিত হইয়া কহিল, "ঐ যে কতকগুলি লোক বল্‌তে বল্‌তে গেল—

'রাম রাম সত্য হ্যায়
রাম রাম সত্য হ্যায়—'

"ওহো, ও ত' মড়া নিয়ে গেল কতকগুলো খোট্টা লোক। তা—"

"তাই আমি দেখছিলাম, ওদের ঐ ধ্বনিই শুনছিলাম। কেন, আপনারা কি এটা—"

হাসিয়া অরুণ কহিল, "ও ত' যখন তখন দেখছি, যখন তখনই শুনছি। ওদের কায়দাই হ'ল ওই। মড়া কেবল নিজেরা নেবার বেলায় নয়, যে কোনও জাতির মড়া দেখলেই ওরা ব'লে ওঠে, রাম রাম সত্য হ্যায়!"

"বটে!"

"তুমি এমন আশ্চর্য্য হচ্ছ এতে! কেন আর কখনও কি খোট্টাদের মড়া নিয়ে শ্মশানে যেতে দেখ নি?"

"মড়া! না না, অরুণদা, ও কথাটা বলবেন না! কানে কেমন বাধে। মড়া? ছি, কথাটায় মৃতদেহসম্বন্ধে একটা অবজ্ঞা বোঝায় না?"

"হাঁ, সেটা বলেছ ঠিক। একটু বিবেচক যারা, তারা ও কথাটা বড় মুখে আনে না। শব, শবদেহ—এই কথাগুলোই ব্যবহার করে।"

"তাই উচিত! একটা শ্রদ্ধার ভাব এতে প্রকাশ পায়।"

অরুণ কহিল, "তা তুমি কি শবদাহ ক'রতে ওদের শ্মশানে যেতে আর কখনও দেখ নি?"

"না, চোখে ত পড়ে নি। বাঙ্গালীদের শব নিয়ে যেতে অনেক দেখেছি। অনেকে বেশ ফুল-টুল দিয়েও সাজিয়ে নিয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে হরিবোলও বলে। কিন্তু সেটা, কই, এমন ভাবে ত' বলে না? এমন লাগেও নি কখনও। মধ্যে মধ্যে সেই 'বল হরি হরিবোল,' আর সবারই এক গলায় অবিরত এই "রামরাম সত্য হ্যায়"—অনেক তফাৎ যে! এতে যেমন একটা প্রাণের সাড়া পাওয়া গেল, সেই 'হরিবোলে' কখনও সেটা পাইনি। তেমন চেঁচিয়ে যখন বলে, প্রাণটা কেমন একটা ভয়েই বরং আঁৎকে ওঠে। আগে আমরা একটা গলিতে ছিলাম, এই ত' কেবল বছরখানেক হ'ল, বড় রাস্তায় এই বাড়ীতে এসেছি। এর ভেতর—না, এরকম দৃশ্য চোখে আর কখনও পড়ে নি। আজ এই নূতন নূতন এই ধ্বনি শুনলাম। ও কারা অরুণদা?"

অরুণ কহিল, "চেহারা দেখে ত' দোসাদ কি মুচি, কি ঐরকম কোনও ছোট জাত ব'লেই মনে হ'ল।"

"খুব ছোটজাত ওরা? যাদের লোকে ছোঁয় না, হাতের জল খায় না?"

"হাঁ, সেইরকম একটা জাতই ওরা।"

"এদেরই Depressed class বলে, যাদের চেপে সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে মানবোচিত সকল অধিকারে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে?"

উর্ম্মির প্রশ্নের ভঙ্গীতে অরুণের মুখে একটু হাসি ফুটিল; কহিল, "হাঁ এরা সেই Depressed class-এর লোকই বটে!"

"কিন্তু এত বড় কথাটা—রাম রাম সত্য হায়—কোথায় ওরা শিখল? এই 'রাম রাম সত্য হ্যায়' মন্ত্র যে শব নিয়ে শ্মশানে যাবার সময় এমনি করে উচ্চারণ করতে হয়, তাই বা কে এদের শেখাল অরুণদা?"

"কে কবে ঠিক কথাটা ওদের শিখিয়েছে জানি না। তবে বহু দিনের প্রচলিত নিয়ম ওদের এটা। হিন্দুস্থানী সকল জাত বামুন, শূদ্র, শূদ্রেরও ছোট এই যে সব অস্পৃশ্য অনাচরনীয় জাত—সবাই শব-যাত্রার সময়, এমন কি যে কোনও জাতের শব চোখে পড়লেও, বলে, 'রাম রাম সত্য হ্যায়।'

"কথাটার অর্থ ওরা বোঝে?"

হাসিয়া অরুণ কহিল, "সেটা এত সহজ যে ওদের ভাষা যে বোঝে, সেই তা বুঝবে। আর এটা ছোট বড় এ দেশে সবাই জানে 'রাম রাম' সত্য বুঝলেই জীবের মুক্তি হয়।"

"ছোট বড়! কিন্তু যারা এটা বোঝে, জানে, আর তাই বুঝে জেনে এই সময়ে এইভাবে বলতে পারে, 'রাম রাম সত্য হ্যায়'—তারা কিসে ছোট? কিসে চাপা? কিসের অধিকারে বঞ্চিত? বামুন টামুন বড় জাতের লোক কেউ ওদের ছোট না, হাতের জল খায় না? অবশ্যি সেটা উচিত নয়। কিন্তু তাতে ওদের কি এমন এসে যায়? মানবের সব চাইতে বড় অধিকার যা, রাম রাম সত্য এই তত্ত্বটা বুঝতে পারা আর এইভাবে জীবের মুক্তির উপায় জেনে এই সময়ে এইভাবে তাই বলতে পারা, এতে ত' ওরা বঞ্চিত নয়? ধরুন, এ অধিকারে যদি ওরা বঞ্চিত থাকত, আর বামুনরা ওদের ছুঁত, হাতের জল খেত, কি এমন বড় ভাগ্য ওদের তাতে হ'ত? তবে ওরা বড় দুঃখী—"

"দুঃখী—হাঁ, তা সে দুঃখী কেবল ওরাই নয়, দৈহিক শ্রমে যারা জীবিকা অর্জ্জন করে এমন লোক সব দেশেই অনেক আছে, আর তারা সবাই ঠিক দুঃখীই না হ'ক, গরীব বটে। মানসিক শক্তিতে আর শিক্ষায় উন্নত যে সব লোক, অর্থ উপার্জ্জন সব দেশেই তারা কিছু বেশী করে, আর বেশী সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকে। তবে এ দেশের ভদ্রলোকেরা বেশীর ভাগই মোটা খায় মোটা পরে, চাপা ঘরে থাকে। বড়লোকদের বাদ দিলে সাধারণ ভদ্রলোকের তুলনায় এরা যে খুব বেশী দুরবস্থায় থাকে, তা মনে হয় না; অন্ততঃ অন্যান্য দেশে সাধারণ ভদ্রলোক আর শ্রমজীবীদের মধ্যে যে তফাৎ আমাদের দেশে সে তফাৎ অনেক কম বই বেশী নয়।"

"হুঁ—! কিন্তু ঠিক ওসব কথা আমি ভাবছিনি অরুণদা। মানুষ যদি খাওয়া পরার অভাবে বড় ক্লেশ না পায়, তবে কে একটু কম খায় কম পরে, আর কে একটু বেশী খায় বেশী পরে, তাতে এমন কিছু এসে যায় না। তা, এরা খাওয়া-পরার দুঃখ কি খুব বেশী পায়?"

অরুণ কহিল, "ওদের ঘরের খবর তেমন রাখি না উর্ম্মি। তবে পেট ভরে খায় ওরা। পরণ—তা সেটা এদেশে অতি অল্পেই চলে, আর সেই অল্পেই ওরা চালিয়ে নেয়। খাওয়ার দুঃখ যে ওরা বড় পায় না, সেটা ওদের চেহারা দেখলেই বেশ মালুম হবে। অমন খাসা শরীরের বাঁধ ভদ্রলোকদের ভেতরই বা ক'টির দেখা যায়?"

"হুঁ!—সবাই ওরা কাজ কর্ম্ম করে খেতে পায়?"

"কাজের অভাবে খেতে পায় না, এটা ত' বড় দেখা যায় না। সেটা বরং ভদ্রলোকদের ঘরেই বেশী দেখা দিয়েছে। অনেক রকম কাজ এদের আছে, যা ওরা ছাড়া ভদ্রলোকের ছেলে কেউ করতেই পারে না। তারপর গ্রাম অঞ্চলে যারা থাকে, জমি-টমি অনেকেই কিছু ক'রে নেয়, চাষবাস করে; কেউ কেউ গরু, মোষ, ছাগল, শুয়োরও পালে; বনের কাঠ কুড়িয়ে এনেও কেউ কেউ বেচে; গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেয়। মোটা ভাত তাতেও এক রকম চ'লে যায়।"

"তাই ত'! মুখের গ্রাসও কেউ ওদের কেড়ে নেয় নি; ধর্ম্মবুদ্ধিতেও খাটো ক'রে রাখে নি। তবে ঘৃণা করে ওদের সবাই। তা করুক, যারা করে তারাই বরং মানবকে প্রেমদানের অধিকারে বঞ্চিত। ওদের কি?"

"ঠিক বলেছ উর্ম্মি! ওদের আমোদ-প্রমোদ অনেক দেখেছি। দেখলে মনে হয় না, দুনিয়ার কোনও দুঃখ, ওদের সরল আনন্দময় প্রাণকে একটুকুও চেপে রাখতে পেরেছে। তবে ঐ যে ঘৃণার কথাটা বল্লে, ওটা সাধারণ মানুষ মাত্রেরই একটা দুর্ব্বলতা। যারা যে কোনও বিষয়ে বড়, তারা তাদের ছোট যারা তাদের অবজ্ঞা করে। সব দেশেই করে। তবে সবাই করে না। ভালবেসে এই সব ছোট জাতের লোকদের হিত চান, ভাল করেন, এমন লোকও ঢের আছেন। সব দেশেই আছেন। বাবার কাছে শুনেছি, ছোঁয়া-ছুয়ি নিয়ে খুঁটি-নাটি বাচ-বিচার যাই করুক, পাড়াগাঁয়ে বামুন চাঁড়াল বাগ্দীতেও মমতার টান বেশ একটা আছে। নানা রকম ধর্ম্ম উৎসবে সবাই সমান আনন্দে মেলামেশা করে, অনেক রকম কাজ কর্ম্মে ঘনিষ্ঠ একটা বান্ধবতার ভাবও অনেকের ভেতর দেখা যায়। অনেক ভদ্রলোকও পাড়াগাঁয়ে একখানা মোটা ধুতি প'রে গামছা কাঁধে করে বেড়ায়; যেখানে সেখানে মাটিতে ব'সেই সবার সঙ্গে হাসি গল্প করে, ডাবা হুঁকোয় তামাক খায়, খালি পায়ে খালি গায়ে হাটে বাজারে যায়, চাল, ডাল, মাছ, তরকারী হাতে ব'য়েই বাড়ীতে আনে। নমো বাগ্দী যে সব জাত আছে, তারাও তাই করে। জীবন-

মানুষ বড় একটা তফাৎ তফাৎ ভাব এতে থাক্‌তেই পারে না।"

"হুঁ।"

অরুণ বলিতে লাগিল, "ছেলে বেলায় যখন আমরা দেশে থাক্‌তাম, নমঃশূদ্র জাতের এক বুড়ো আমাদের বাড়ীতে চাকর ছিল। সবাই তাকে মেনে চ'লত, ভয় ক'রত। ঠাকুরদা' তাকে 'বিশুদা' ব'লে ডাকতেন, বাবা ডাকতেন জ্যাঠা। সে ভেতরের কোনও ঘরে আস্‌ত না, হাতে ক'রে কাউকে জল দিত না, হুঁকোও ছুঁত না। কিন্তু এমন একটা আপনা আপনি ভাব তার সঙ্গে সবার ছিল, যা আজকাল সহরে মনিব-চাকরে কখনও দেখা যায় না, হ'ক না সে চাকর জেতে বামুন। যখন সে ম'ল, ঠাকুরদাদা, বাবা, পাড়ার আরও কত লোক কাঁধে ক'রে তাকে শ্মশানে নিয়ে গেলেন, দাহ ক'রে এলেন। আর সহরে আজকাল বাসার রাঁধুনে বামুনও যদি মরে, ডোম ডেকে তাদের হাতে দিয়ে দেয়।"

একটু হাসিয়া ঊর্ম্মি বলিয়া উঠিল, "বাসায় ম'লে ত? ব্যামো হ'লেই যে তাকে হাসপাতালে বিদেয় ক'রে দেওয়া হয়। সে যাই হ'ক অরুণদা, এই সব ব্যাপার যত পড়ছি, যত দেখছি, শুনছি, অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি। কেন যে সবাই হিন্দু ধর্ম্মের, হিন্দু সমাজের এত নিন্দা করে, আর কেন যে আমরা তাদের ছেড়ে আলাদা এক সমাজ হ'য়ে আছি, বাস্তবিক বুঝতেই পারি না। আলাদা যে হয়েছি, কি এমন ভাল হ'য়েছি, ভাল ক'রছি, তাও ত' দেখতে পাই না। আমার দিদিমার মত কত এমন দিদিমা হিন্দু সমাজে আছেন। কিন্তু আমাদের ভেতর ক'টি অমন ধারা মানুষ দেখতে পাই? জাত বিচার জানি না, সবাই আমরা সমান—ঢাক পিটিয়ে বলি। কিন্তু বাড়ীর ঝি, চাকর, বামুন এদের দেখি ঠিক আলাদা এক শ্রেণীর জীবের মত। ঐ যে জ্যাঠার কথা আপনি ব'ল্লেন, অনেক অমন জ্যাঠা খুড়ো দাদা গাঁয়ে গাঁয়ে কত হয় ত' আছে। কিন্তু সহরে আমাদের ভেতর, কই, অমন একজন জ্যাঠা কি খুড়ো কি দাদা ত' দেখতে পাই না। সত্যি কী এমন ভাল হয়েছি আমরা? কী এমন ভাল করছি?"

অরুণ কহিল, "তোমরা কি হ'য়েছ, কি ক'রছ, কেন আলাদা হ'য়েছ, তার সম্বন্ধে কিছু ব'লতে চাইনে ঊর্ম্মি। তবে হিন্দুর ধর্ম্মকে আর সমাজকে যে লোকে গাল দেয়—অনেকটা না বুঝেই দেয়। ভুল একটা ধারণা, যে ক'রেই হ'ক, সহরের শিক্ষিত সব লোকদের ভেতর হ'য়ে গেছে, তাই দেয়। কেবল তোমরাই দেও না, আমরাও দিই। আমার বড় দুঃখ হয় ঊর্ম্মি। এত নিন্দে, এত গালাগাল, বোধ হয় এ পৃথিবীতে আর কোনও ধর্ম্মকে, আর কোনও সমাজকে, কেউ কখনও দেয়নি। আরও দুঃখ হয়, আমরা নিজেরাই গালাগাল দিই সব চাইতে বেশী। অথচ ছেড়েও বাইরে কোথাও যাচ্ছি না; এইটে ধ'রে এর ভেতরই রয়েছি। রয়েছি, কিন্তু থেকেও ভেতরটা যে কি, কই তেমন ক'রে চেয়েও ত' দেখছি না। আমার ব'লে, কই, তেমন একটা দরদও কেউ তেমন অনুভব ক'রছি না, ইজ্জৎ বোধও একটা নেই। বাইরের লোকে না বুঝে নিন্দে ক'রছে; নিজেরাও আমরা গোলামের মত সেই বুলিই আওড়াচ্ছি।"

অরুণের চক্ষে জল আসিল, ঊর্ম্মিও আঁচলে তার চক্ষু দু'টি পুছিল।

একটু দম নিয়া অরুণ আবার বলিতে লাগিল, "অবিশ্যি দোষ অনেক আছে। কোন্ ধর্ম্মে, কোন্ সমাজে না আছে? কালে নানারকম 'দোষ-ত্রুটি' সব ধর্ম্মে, সব সমাজেই, দেখা দেয়। কিন্তু ভেতরের সব অবস্থা পরীক্ষা ক'রে তুলনা ক'রে যদি দেখি, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ, মোটের উপর আর কোনও ধর্ম্ম আর কোনও সমাজের চাইতে বড় বই ছোট ব'লে মনে হবে না। দোষ যা আছে, নিজেরই দেহের কোনও রোগের মত তা দেখতে হয়। যাতে সারে তার চেষ্টা ক'রতে হয়। দেহটাকে ত্যাগ করা ত' তাই ব'লে চলে না। সে যখন করে, তখন ত' মানুষ মরে। কিন্তু ইচ্ছে ক'রে ত' কেউ মরে না।"

ঊর্ম্মি কহিল, "সমাজের অবস্থাটা এখনও ভাল ক'রে কিছু বুঝতে পারি নি অরুণদা। কিন্তু ধর্ম্মটা—না, তাকে ছোট কি হীন ব'লতে আমি কিছুতেই পারি না। যে ধর্ম্মে আমার দিদিমা ঐ দিদিমা হ'তে পেয়েছেন, যে ধর্ম্ম এই সকল মুজুর দোসাদ মুচিরাও শব-যাত্রায় 'রাম রাম সত্য হ্যায়' ব'লতে শিখিয়েছে, সে ধর্ম্ম যদি হীন হয়, তবে বড় ধর্ম্ম আর কি হ'তে পারে জানি না।"

"আর যে সব সমাজ-নায়ক ব্রাহ্মণের ব্যবস্থায় এই সব

নীচ জাতিও সেটা শিখেছে; মানবত্বের এই সর্ব্বোচ্চ অধিকার লাভ ক'রেছে, সে সমাজকেই বা হীন কি ক'রে ব'লবে উর্ম্মি? ধর্ম্মতত্ত্বের বড় বড় সব কথা, কি ভাবে সকল শ্রেণীর লোকের ভিতর প্রচারিত হ'য়ে এসেছে, পুরুষানুক্রমে কি সব শিক্ষাদীক্ষার ফলে সবার ভেতরই এই সব ভাব একেবারে সহজ ধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছে, জান উর্ম্মি? কত অনুষ্ঠান কত উৎসব, কত পাল পার্ব্বণ, কীর্ত্তন-ভজন, যাত্রা কবি পাঁচালী, কত ব্রত, দেব-সেবা, তীর্থ-যাত্রা, আরও কত কি যে ব্যবস্থা র'য়েছে, ব'লে শেষ করা যায় না। সবারই এক লক্ষ্য এই, ধর্ম্মের সব মূল-তত্ত্ব, মূল সব নীতি, সকল শ্রেণীর লোকের জীবন যাত্রায় নিয়ত আদর্শ হ'য়ে উঠে, খাওয়া পরার মতই নিত্যকার অভ্যাস হ'য়ে দাঁড়ায়। এটা যেমন এর ফলে এই সমাজে হ'য়েছে, এমন আর কোনও সমাজে, যতদূর জানি, হয় নাই। তুলনা যদি আর কোনও সমাজে মেলে, মিলবে এই ভারতেরই মুসলমান সমাজে। ভারতের মাটির গুণ, জলবায়ুর গুণ এটা। ভারতের প্রাণই এই ধর্ম্মের প্রাণ। হাজার হাজার বছরের সাধনা এমনই এক মহা-পুণ্য তীর্থে ভারতকে পরিণত ক'রেছে।"

উর্ম্মির চক্ষে জল আসিল। গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "বড় ইচ্ছা হয় অরুণদা, ঠিক ভারতের মেয়ে হ'য়ে ভারতের এই হিন্দু সমাজে আবার ফিরে যাই। ভারতের খাঁটি সন্তান যারা, তাদেরই সঙ্গে এক হ'য়ে মিলে থাকি। আমরা—আমরা—ভারতের মাটিতে বিদেশী একটা গাছ রুয়ে তার আশ্রয় নিয়েছি। এ মাটিতে এ গাছ জিয়ে উঠবে না।"

"ফিরে যাবে উর্ম্মি?"

"পথ পেলে যাই। কিন্তু কোথায় পথ?"

"পথ—যদি চাও পাবে। পথ কঠিন নয়, দূরেও নয়, তোমার সামনেই খোলা র'য়েছে। আসবে উর্ম্মি?"

হাতখানি একটু বাড়াইয়া কয়েক পা অরুণ অগ্রসর হইল। কথার ভঙ্গী, চোখের দৃষ্টি, দেহের এই গতি, মুখের সামান্য এই কয়েকটি কথা অপেক্ষা অনেক স্পষ্ট ভাবেই বুঝি উর্ম্মিকে বুঝাইল, এ পথ কি, আর কোথায়? আরক্ত মুখখানি তার নত হইয়া পড়িল, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। জানালাটির প্রান্ত ধরিয়া স্থির হইয়া সে দাঁড়াইল। তার পিতার সেই কথা মনে পড়িল। আর মনে পড়িল, বিদায় কালে দিদিমার সেই আশীর্ব্বাদ, 'ভক্তি ক'রে শিবের পূজো করিস্, মা ভগবতী শিবকে পতি পেয়েছিলেন তুইও শিবের মত পতি পাবি। মেয়ে জন্মে তার বড় ভাগ্য আর নাই।'

অরুণ আর একটু কাছে আসিয়া কহিল, "কথাটা বুঝতে পারলে না উর্ম্মি? এস, আমরা দু'জনে ভারত দেবতার আশীর্ব্বাদে এক হয়ে মিলে ভারতের মহাতীর্থে ভারত সন্তানের ধর্ম্ম পালন ক'রব।"

"বাবাকে বলুন।"

বলিতে বলিতে মুখখানি উর্ম্মি ফিরাইয়া নিল, বাহিরে রাস্তার দিকে তার দৃষ্টি পড়িল, দেখিল একটি লোক হরগৌরীর একখানি মূর্ত্তি মাথায় করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে। সে দিন চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বাহ নীলব্রতের দিন।

অরুণ কহিল, "তাঁকে ত বলবই। কিন্তু তোমার নিজের উত্তরটা কি ব'লবে না?"

"তাঁকেই বলুন। উত্তর তিনিই দেবেন।—ঐ দেখুন।"

রাস্তায় সেই হরগৌরীর প্রতিমাখানির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই উর্ম্মি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। অরুণ চাহিয়া দেখিল মূর্ত্তির মুখ তখন ঠিক তাহারই সম্মুখে—যেন তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

যুক্তকরে প্রণাম করিয়া মনে মনে অরুণ কহিল, "মহাদেব! মহাদেবী গৌরী! তোমাদের এই দর্শন আমাদের শুভ হ'ক। তোমাদের সন্তান আমাদের দু'টিকেও এমনি ক'রে তোমাদের পায়ে মিলিয়ে রাখ!"

বাইশ

"অরুণ!"

চমকিয়া অরুণ ফিরিয়া চাহিল। দেখিল রুষ্টনয়না আরক্তবদনা স্বয়ং সুকল্যাণী দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা।

লজ্জায় সে মরিয়া গেল। যেন হাতে হাতে চোর ধরা পড়িল। সুকল্যাণী কহিলেন, "ওকি হচ্ছিল অরুণ? কি বলছিলে তুমি উর্ম্মিকে?"

অরুণ নীরব।—বস্তুতঃ সহসা এই আক্রমণে একেবারে স্তব্ধ হইয়া সে গিয়াছিল। কি করিবে কিভাবে কি উত্তর

দিবে ভাবিয়াই পাইল না। উর্ম্মিকে বরাবরই তার বড় ভাল লাগিত। সম্প্রতি একই ভাবের টানে দুইজনের প্রাণ একই পথে চলিতেছিল; গভীর একটা সমপ্রাণতা উর্ম্মির সঙ্গে সে অনুভব করিত। আপনা হইতে ইহাও তার মনে হইত, উর্ম্মিও সেইরূপ অনুভব করে। এ অবস্থায় তার মত একটি যুবকের প্রাণ যে উর্ম্মির প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। আর এই প্রেমেই সে অনুভব করিত উর্ম্মির প্রেমও সে লাভ করিয়াছে। কাহাকেও এযাবৎ কিছু সে বলে নাই। কিন্তু কিছুদিন ধরিয়া বিবাহের সম্ভাবনা সে চিন্তা করিতেছিল। ব্রাহ্ম হিন্দু বলিয়া অলঙ্ঘনীয় কোনও বাধা হইতে পারে ঐ কথা তাহার মনে উদিত হয় নাই। উভয়ের পক্ষের সম্মতি যদি হয় ব্যবস্থা যাহা হয় একটা হইবেই। মনে করিয়াছিল, মাতাকে ও পিতাকে তার অভিপ্রায়ের কথা সে জানাইবে এবং তাঁহাদের দ্বারা মহীন্দ্রনাথের নিকটে প্রস্তাব পাঠাইবে। কিন্তু আজ কথায় কথায় ভাবের আবেগে সে একেবারে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। উর্ম্মি যখন কহিল, পথ পাইলে ফিরিয়া যাই, আত্মসম্বরণ আর করিতে পারিল না। তাহার যে প্রয়োজন একটা থাকিতে পারে, একথাও তার মনে হইল না। সমস্ত প্রাণের কামনা উদ্দাম উচ্ছ্বাসে সকল সঙ্কোচের ও বিবেচনার আলি ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িল। যখন সে আসিয়াছিল, এরূপ একটা কিছুর সম্ভাবনা হইতে পারে, মনের কোণেও তার উঠে নাই। সহসা সুকল্যাণীর এই আক্রমণে সে বুঝিতে পারিল, কত বড় গর্হিত একটা কাজ সে করিয়াছে। কি উত্তর দিবে, কি বলিয়া আত্মসমর্থন করিবে, ভাবিয়াই কুল পাইতেছিল না। যারপরনাই অপ্রতিভ ভাবেই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুকল্যাণী কহিলেন, "অরুণ! ঘরের ছেলের মত তোমাকে দেখি। আসছ, যাচ্ছ, ওদের সঙ্গে ব'সে হাসি গল্প ক'রছ, ভাল বই মন্দ কিছু কখনও ভাবি নি। বড় আপন জনের মতই বিশ্বাস তোমাকে ক'রেছি। কিন্তু আজ এ কী ব্যবহার তোমার?"

"কি, কি হ'য়েছে, সুকু? অরুণ কি ক'রেছে?" মহীন্দ্রনাথ নীচে ছিলেন, সহধর্ম্মিণীর এই তীব্র উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া ত্রস্তে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

"কি ক'রেছে! শুনবে? উনি তোমার কন্যাকে বিবাহ ক'রতে চান, হিন্দুসমাজের পৌত্তলিক পঙ্কে ডুববার পথটা তার অতি সরল ক'রে দেবেন বলে, বুঝ্‌ছ? নিজেও হয় ত' খুসী হ'চ্ছ কথাটা শুনে? সেই পথেই ত' হতভাগীকে ঠেলে দিচ্ছিলে!"

ব্যাপার কি? অরুণ কি উর্ম্মির কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে? সেটা—কিছু অসঙ্গত হইলেও—মনে মনে মহীন্দ্রনাথ সত্যই বড় সুখী হইলেন, কারণ অন্তরের বাসনাই তাঁহার ছিল ইহা। তাহা যুবকের উদ্দাম চিত্ত—বড় বেশী ভালবাসিয়াছে বুঝি, বাসিবারই ত' কথা। সহসা হয় ত' ভাবের বড় একটা উদ্বেল উচ্ছ্বাসে মনের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তা এমন দোষই বা কি ইহাতে দেওয়া যায়? মুখে একটু হাসি ফুটিতে ফুটিতে চাপিয়া ফেলিলেন। অরুণের দিকে চাহিলেন।—আহা! হাতে হাতে ধরাপড় চোরের মত কি হতভম্ব হইয়াই বেচারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! দেখিয়া দুঃখও হইল। আবার হাসিও বেশ একটু পাইল। কহিলেন, "কি অরুণ, কি হ'য়েছে? উর্ম্মিকে—

"আজ্ঞে, আর লজ্জা দেবেন না আমাকে কাকাবাবু। বুঝতে পারি নি—বড্ড বেয়াদবীই একটা ক'রে ফেলেছি।"

"কথাটা আগে আপনাকেই আমার বলা উচিত ছিল। তা যে ভাবেই হক, যা ব'লেছি আমার মনের কথাই ব'লেছি। আপনাদের অনুমতি হ'লে আমার মা বাবা কেউ আপত্তি করবেন না। তবে জানি না—উর্ম্মির সঙ্গে আমার বিবাহে কি বড় বাধা কিছু আছে?"

মহীন্দ্রনাথ কিছু বলিতে পারিবার আগেই সুকল্যাণী বলিয়া উঠিলেন, "আছে! অনেক আছে, যথেষ্ট আছে। তোমার এই আচরণই বড় একটা বাধা হ'তে পারে! সেটা—হাঁ, তোমাকে জানি, অসচ্চরিত্র নও তুমি, বন্ধুর পুত্র, স্নেহও যথেষ্ট করি—হাঁ, স্বীকার ক'রে নিতে পারি হঠাৎ ভুলই একটা ক'রে ফেলেছ—কু-অভিসন্ধি কিছু ছিল না। সুতরাং ক্ষমা ক'রতে এটা পারি সত্য যদি ভুল বুঝে অনুতপ্ত হ'য়ে থাক।"

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "আহা, আর কেন সুকু? অরুণ ত' ব'লছেই আমাদের না জানিয়ে আগে উর্ম্মিকে এটা বলা তার উচিত হয় নি।"

"বেশ কথা। ছেড়ে দিচ্ছি ওটা? কিন্তু আরও বাধা আছে, গুরুতর বাধা।"

"উর্ম্মির যে অধঃপতন সুরু হ'য়েছে, তারই পিছল পথে টেনে নাবিয়ে ও কোথায় যে নিয়ে ফেলবে তাকে, ভাবতেও আমার প্রাণ শিউরে উঠছে। এতদিন আমার ধারণা ছিল, দীক্ষিত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম না হ'লেও ওরা উদার, উন্নত, পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত একটি পরিবার। কিন্তু আজ শেষের দুই চারটে কথা যা আমার কাণে গেল, তাতে বুঝতে পারছি, রীতিমত পৌত্তলিক মতিগতি ওর হ'য়েছে। আর উর্ম্মির সেই মতি-গতি দেখেই বিবাহ তাকে ক'রতে চাইছে। বেশ বুঝতে পারছি, ঐ বুড়ী তোমার সেই পিসি—ক'দিন এসে এখানে থেকে যেমন উর্ম্মির তেমন ওর মাথাটাও খেয়ে গেছেন। A regular witch যাদুবিদ্যে জানে।"

"থাম সুকু! মনে রেখো, আমার পিসিমা তিনি, মায়ের মত!"

"যাই হ'ন, যার মতই হ'ন,—সর্ব্বনাশটা তিনিই ক'রে গেছেন। কতদূর হয়েছে জান? চোখে দেখলাম, রাস্তায় একটা পুতুলের দিকে চেয়ে নমস্কার করলে। আর উর্ম্মি—উর্ম্মি তাই আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে গেল!"

"পুতুল! কি পুতুল?"

অরুণের দিকে মহীন্দ্রনাথ চাহিলেন, অরুণ কহিল, "হরগৌরী।"

একটু হাসি মহীন্দ্রনাথ চাপিয়া গেলেন।

সুকল্যাণী কহিলেন, "আর তুমি চাও, ঐ হরগৌরীর মত হ'য়ে হরগৌরীর পূজো দু'জনে ক'রবে। এ ভরসাও বোধ হয় ক'রছ, পৌত্তলিক মতে মন্তর প'ড়ে পাথর আগুনের পূজো ক'রে উর্ম্মিকে বিবাহ তুমি ক'রবে।"

অরুণ উত্তর করিল, "ও কথাগুলো—না, এখনও কিছু ভাবি নি কাকীমা, মনেও হয় নি। তবে—"

"তবে—কি তবে? তাই ক'রতে হবে, নয়?"

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন "কি ক'রতে হবে না হবে, সেটা পরে ভাবা যাবে, যদি এই সম্বন্ধটা দুই পক্ষের সম্মতিতে স্থিরই হ'য়ে দাঁড়ায়। ভাল, আগে ওর বাবার সঙ্গে আলাপ ত' একবার করে দেখি। তার পর—"

"তারপর কি ক'রবে? ব্রাহ্মমতে ছেলে বিয়ে দিতে তিনি রাজি হবেন? হ'লেও তিনি হ'তে পারেন। অরুণ হবে না, উর্ম্মি হবে না।"

"আহা, আগেই অতটা মনে ক'রে নিচ্ছ কেন? এসব আনুষ্ঠানিক বাধার কথা এখন নাই ধরলে। এমনিই বল না, অরুণ কি উর্ম্মির অযোগ্য পাত্র?"

একটু কি ভাবিয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "অযোগ্য এটা বলতে পারি না। তবে ওর চাইতেও যোগ্য পাত্র আর কেউ যে হ'তে পারে না এমন কথাও বলি না। অরুণের সঙ্গে উর্ম্মির বিবাহ হতে পারে, কখনও এটা আমি ভাবি নি। আজ হঠাৎ উর্ম্মির কাছেই এই প্রস্তাব ও করে ফেলে আমাদের একটি কথাও আগে না বলে, আমরা সেটা চাই কি না চাই, একটু সেটা না বুঝে, এতে—এতে—মনে বড় আঘাত পেয়েছি আমি, অপমানিতও বড় বোধ ক'রছি। তা কিছু মনে করো না অরুণ, অযোগ্য তোমাকে মনে করি না। তবে যোগ্য অযোগ্য বিবেচনা অনেক দিক থেকে করতে হয়। তা সে যাই হ'ক, তোমার সঙ্গে উর্ম্মির বিবাহ অনুমোদন ক'রতে পারি কি না, পরে ভাবব। কিন্তু তার আগে দেখতে চাই, তুমি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়েছ, পরিস্কার এটা বুঝতে চাই, বিবাহ যদি সম্ভব হয় পবিত্র ব্রাহ্ম-অনুষ্ঠানে হবে। আর, এর ভেতর—কি আর বলব, মনে তোমার ব্যথা দিতে চাই না, তবে নিজেই বুঝতে পারবে, অনুচিত কথা আমি ব'লছি না। হাঁ, এর ভেতর—অর্থাৎ অনুমোদন যতদিন আমরা না ক'রতে পারি, এ বাড়ীতে আসবে না তুমি, উর্ম্মির সঙ্গেও দেখা ক'রবে না।"

বলিয়াই গম্ভীরভাবে সুকল্যাণী বাহির হইয়া গেলেন।

স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ ভয়ে ভয়েই দাঁড়াইয়া রহিল। গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া অরুণ অবশেষে কহিল, "আসি তবে কাকাবাবু। আমার বেয়াদবী মাফ করবেন।"

স্নেহে অরুণের কাঁধে হাতখানি রাখিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "বেয়াদবী—না বাবা, ওসব কথা কিছু মনেই এনো না। জান, আমি নিজেও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম। হাঁ, সত্য ব'লছি অরুণ, বড় আনন্দিতই হ'য়েছি আমি। যাও, এখন ঘরে যাও। কিছু ভেবো না, উর্ম্মি তোমারই হবে। আমি ব'লছি কোনও বাধায় আটকাবে না, উর্ম্মিকে তোমার হাতেই দেব—যদি, হাঁ, তোমার বাবা মা অনুমোদন করেন। তবে এ ভরসাও বেশ আমার আছে, তাঁরা তা ক'রবেন।"

ভূমিষ্ঠ হইয়া অরুণ মহীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিল, পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। দুইফোটা অশ্রু মাত্র তার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা মহীন্দ্রনাথের চরণে নিবেদন করিল।

অরুণকে দুইহাতে তুলিয়া বক্ষে ধরিয়া সাশ্রু নয়নে মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "সুখে থাক বাবা। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক।" [ক্রমশঃ

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

রামপ্রসাদ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

দুই

সুন্দর রাজসভায় নীত হইল। রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, সুন্দর পরিচয় দিল না, কয়েকটি শ্লোকে বিদ্যার রূপ ও গুণের বর্ণনা করিয়া তাহার সম্ভোগলীলায় আনন্দের অভিব্যক্তি করিল। রাজা রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন বিদ্যার পরিচয় পাইয়া আরও মুগ্ধ হইলেন। সুন্দর রাজার প্রত্যেক কথা লইয়া বিদ্যার নাম করিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন, রাজার তাহাতে ক্রোধ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন অসামান্য এই যুবক। রাজা কোটালকে বলিলেন, "দক্ষিণ মশানে লইয়া যাও, বধ করিও না ইহাকেই কন্যাদান করিব। ভয় দেখাইয়া পরিচয় আদায় কর।" সুন্দর মশানে গিয়া চৌত্রিশ অক্ষরে মা কালীর গুণ গান করিল। মা আশ্বাস দিলেন। এমন সময় মাধব ভাট কাঞ্চীপুর হইতে ফিরিয়া একেবারে মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাধবের মুখে কোটাল ও রাজা পরিচয় পাইলেন। রাজা তারপর ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে মালিনী-নিগ্রহটার খুব ফলাও করিয়া বর্ণনা আছে। সুন্দর রাজার দরবারে নীত হইলে হীরা পরিচয় দিল, শুকও পরিচয় দিল। রাজা তাহা বিশ্বাস করিলেন না। সুন্দর নিজ পরিচয় না দিয়া রহস্য করিতে লাগিল। সুন্দর তারপর পঞ্চাশটি শ্লোক আবৃত্তি করিল। ইহাই চৌরপঞ্চাশিকা। ভারতচন্দ্র অন্যত্র এই পঞ্চাশ শ্লোকের একটি বিদ্যা পক্ষে, একটি কালী পক্ষে অর্থ করিয়াছেন। পুস্তকে ৪।৫ টির বেশী শ্লোক তোলা হয় নাই। দুই বিদ্যাসুন্দরেই এই শ্লোক কয়টি অভিন্ন। রাজা সুন্দরকে মশানে পাঠাইলেন। সেখানে সুন্দর পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে মা কালীর স্তব করিল। মা কালী তুষ্ট হইয়া আকাশে আবির্ভূতা হইলেন। কোটালও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ অদৃশ্য হস্তে বাঁধা পড়িল।

এদিকে শুকের উপদেশে গঙ্গা ভাটকে আনিতে পাঠানো হইল। সে আসিয়া পরিচয় দিল। রাজা তখন গলে কুঠার বাঁধিয়া মশানে আসিলেন। অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সুন্দরের কাছে তিনি ক্ষমা চাহিলেন—সুন্দরের অনুগ্রহে রাজা মা কালীকে দেখিতে পাইলেন—কোটালেরও বন্ধন মোচন হইল।

কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরের বিবাহের পর সুন্দর বিদ্যাকে লইয়া দেশে গেলেন। সেখানে তাঁহার পুত্রসন্তান জন্মিল। পুত্রের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ণ হইলে তাহার বিবাহ দিলেন। পরে তিনি দক্ষিণা কালীমূর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন—কালীপূজা প্রচার করিলেন, শব সাধনা করিলেন, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বিদ্যাসহ শাপমুক্ত হইলেন। সুন্দর ছিলেন শাপভ্রষ্ট মালাধর আর বিদ্যা ছিলেন শাপভ্রষ্টা হীরাবতী। তাঁহারা ব্রত সমাপ্ত করিয়া মায়াময় সংসার ত্যাগ করিয়া আবার স্বস্থান লাভ করিলেন।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার সন্তান হইল বর্দ্ধমানেই। তাহার পুত্র একবৎসরের হইলে সুন্দর বিদ্যাকে লইয়া দেশে গেলেন। তারপর অল্পদিন পরেই তাঁহাদের দিব্য জ্ঞান জন্মিলে তাঁহাদের শাপমুক্তি হইল। সুন্দরের মুক্তির পর অবশিষ্ট অংশ ভারতচন্দ্র অতি সংক্ষেপেই সারিয়াছেন।

পুস্তক দুইখানি পড়িলে মনে হয়, রামপ্রসাদের উদ্দেশ্য কালীমহিমাপ্রচার—মধ্যে যে সম্ভোগলীলা আসিয়া পড়িয়াছে তাহা সেকালের কাব্যের বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে অবান্তর ভাবে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়িলে মনে হয় কবির প্রকৃত উদ্দেশ্য আদিরসাত্মক কাব্য রচনা। উপাখ্যানের অপরিহার্য্য অঙ্গ কালীমহিমাপ্রচার—তাই গৌণভাবে তাহা আসিয়া পড়িয়াছে। কবিত্বই মুখ্য, ধর্ম্মপ্রচার গৌণ। ভারতচন্দ্র সম্ভোগ লীলাকে যেরূপ সর্ব্বোপ্রিয় দিয়া উপভোগ করিয়াছেন রামপ্রসাদ তাহা পারেন নাই। রামপ্রসাদ কূটস্থভাবে গতানুগতিক বর্ণনা মাত্র করিয়াছেন—ভারতচন্দ্র রীতিমত মগ্ন হইয়াছেন এবং আপনার নিজস্ব মাধুর্য্যের সংযোগে উহাতে

বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার কবিত্বের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন পুষ্পশরে। যাহাতে ঐ শর মর্ম্মের অন্তস্থলে গিয়া প্রবেশ করে তাহার জন্য তাঁহার আয়োজনের ত্রুটী নাই। সুরুচির কথা যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতমন্ত্রের কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকটিত হইয়াছে আদিরসের রচনায়। ভারতচন্দ্রের কালীস্তব প্রাণহীন—কেবল কতকগুলি শব্দের আনুপ্রাসিক সমাবেশ মাত্র—আখ্যায়িকার অন্যান্য অংশে কবির অন্তরের দরদ নাই,—কোন কোন অংশকে দুই চার কথায় বিদায় দিয়াছেন, কিন্তু সম্ভোগলীলাংশকে তিনি রসাইয়া রসাইয়া নিজে উপভোগ করিয়া অপরের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। কবির রসাবিষ্ট অন্তরের পরিচয় সেইখানেই। রামপ্রসাদের কাব্যে তাহা নহে—রামপ্রসাদের কাব্যে মাঝে মাঝে নৈতিক উপদেশ আছে—শবসাধনা ও দক্ষিণা কালীর বর্ণনায় তিনি মুক্ত কণ্ঠ। আখ্যায়িকার সর্ব্বাংশেই তাঁহার সমান দৃষ্টি। চোর চিনিবার আয়োজন ও আড়ম্বরে তিনি যতটা সময় দিয়াছেন, সম্ভোগলীলার বর্ণনাতেও তিনি ততটা সময় দিয়াছেন। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে কথাপ্রসঙ্গে অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানও আসিয়া পড়িয়াছে।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের ভাষায় সংস্কৃত ও হিন্দীর প্রাবল্য বড় বেশী--ভাষায় স্থলে স্থলে বড়ই কষ্ট-কল্পনা আছে। ভারতচন্দ্রের ভাষা খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা। সে ভাষা ঝরঝরে তক্‌তকে ও **idiomatic.**

রামপ্রসাদের আলঙ্কারিকতা বড় জটিল,—ভারতচন্দ্রের আলঙ্কারিকতা অপেক্ষাকৃত সরল। অলঙ্করণে দুই জনেই প্রচলিত প্রথার অনুবর্ত্তী। দুই জনেরই মৌলিকতা কিছু নাই।

রামপ্রসাদ যমকের উদাহরণের জন্য পৃথক একটি কবিতা লিখিয়াছেন, ভারতচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন। অনুপ্রাসের প্রতি দুই জনেরই লোভ ছিল। রামপ্রসাদেরই লোভ ছিল বেশী।

দুই জনের কাব্যেই ছন্দোবৈচিত্র্য আছে। ভাবতচন্দ্রের ছন্দোবৈচিত্র্য অপূর্ব্বতর। ভারতচন্দ্র ছন্দোবন্ধে অধিকতর বিশুদ্ধি রাখিয়াছেন।

পুরবর্ণনায় দুই জনেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভারতের বিদ্যাসুন্দরে তালিকার মাত্রা বেশী। নারীগণের পতিনিন্দা দুই কাব্যেই আছে—রামপ্রসাদের কাব্যের ইহা প্রথার অনুবর্ত্তন মাত্র এবং সুরুচিসঙ্গত। ভারতচন্দ্র এই অংশকে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে লিখিয়াছেন। ইহাতে রঙ্গরসিকতার সৃষ্টি করিতে গিয়া ভারতচন্দ্র অতি নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়াছেন। সে-কালের রসিকতার অর্থই ছিল কুরুচি। কেবল রসিকতা সৃষ্টিই ভারতচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না—সমসাময়িক রাজকর্ম্মচারীদের ব্যঙ্গ করাও উদ্দেশ্য ছিল। ভারতচন্দ্র রাজসভাকবি ছিলেন—তিনি রাজবাড়ীর অমাত্য কর্ম্মচারীদিগকে এই ছলে এক হাত লইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের ঐরূপ গায়ের ঝাল ঝাড়িবার প্রয়োজন হয় নাই।

রূপবর্ণনা দুই কাব্যেই প্রাণহীন, অলঙ্কারের মালামাত্র, অনেকক্ষেত্রে বৈচিত্র্যহীন উপমার তালিকা মাত্র। সে-কালের কাব্যের উহাই ছিল একটা গতানুগতিক প্রথা।

হীরার চরিত্রটিকে ভারতচন্দ্র খুব ভাল করিয়া ফুটাইয়াছেন—হীরা ভারতের হাতে হীরার টুকরা হইয়া উঠিয়াছে। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরেও হীরার ঔজ্জ্বল্য কম ফুটে নাই। রামপ্রসাদের হীরা ভিতরকার কথা সব জানিত—সেজন্য তাহার চরিত্রের রসবত্তা যেন বাড়িয়া গিয়াছে।

রাণীর সহিত বিদ্যার বাক্‌চাতুরী রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে একটা রসিকতার দৃষ্টান্ত। কিন্তু সকল রসিকতার সে-কালে যে দশা হইত ইহারও সেই দশা হইয়াছে।

রামপ্রসাদের কোটাল ভারতের কোটালের চেয়ে ঢের বেশী জীবন্ত ও জলন্ত। কোটালের আড়ম্বর ও আয়োজনের ঘটা রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে একটা চমৎকার নাটকীয় ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে একটা রসান্তর লাভ করিয়া মন যেন অনেকটা বিশ্রাম পায়। বিষ্ণুব্রাহ্মণীর উপাখ্যানটা শেষ পর্য্যন্ত করুণ হইলেও বেশ কৌতুকময়। সমাজের এক দিকের একটি চিত্র ইহাতে উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

চোর ধরার কৌশল রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে অনেকটা কলাসম্মত। ইহাতে আখ্যায়িকার শ্রীসৌষ্ঠব বাড়িয়াছে। ভারতের বিদ্যাসুন্দরের এই কৌশল সুরুচির গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং উহাতে নায়কের মর্য্যাদা রক্ষা পায় নাই। কিন্তু সুন্দরের বামপদে খন্দক উল্লঙ্ঘন করিতে অস্বীকৃতি নায়ক চরিত্রের গরিমা বৃদ্ধি করিয়াছে। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে

রাজার সহিত সুন্দরের কথোপকথনে যথেষ্ট কৌশল দেখানো হইয়াছে এবং নায়কের পরিত্রাণের মধ্যে মৌলিকতার মর্য্যাদা রক্ষিত হওয়ায় কাব্যাংশের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে সুন্দর ধরা পড়ার পর কবির লেখনী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—কবি অলৌকিকতার আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে কঠোর উপসংহার করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে রাণীর নিকট বিদ্যার বিদায় গ্রহণের চিত্রটি অতি সুন্দর—এখানে কারুণ্যের সহিত কিছু উপদেশাদি আছে তাহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে নাই, কাব্যের পক্ষে তাহা সুষ্ঠুই হইয়াছে।

বারমাস্যা বর্ণনা কাব্যের একটা গতানুগতিক প্রথা। এ প্রথার মর্য্যাদা দুই জনেই রাখিয়াছেন। রামপ্রসাদের বিদ্যা বলিতেছে—তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে মাসে মাসে আমার কি দশা হইবে শুন। তুমি নিকটে থাকিলে তোমাকে কত সেবাই না করিতে পারিব। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা সুন্দরকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বলিতেছে—"এদেশে মাসে মাসে কত আনন্দ—দুইজনে কত সুখই ভোগ করিব। শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া কি কেহ যায়?" ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের বারমাস্যাই কাব্যাংশে উৎকৃষ্টতর। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে শুকসারীর অবতারণা ও সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণে বেশ বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে। ইহাতে মাধুর্য্যই বাড়িয়াছে।

রামপ্রসাদ বার বার বলিয়াছেন—সংসার মায়াময়, স্নেহ প্রেম ভালবাসা সব মায়া, একমাত্র কালীপদই সার। সাধক কবির কাব্যে এরূপ কথা না থাকিলে বড়ই অশোভন হইত।

বিদ্যাসুন্দরের গল্প—৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—বিদ্যাসুন্দরের মুখ্য গল্পাংশ কাশ্মীরের কবি বিহ্লনের চৌর পঞ্চাশিকা হইতে গৃহীত। এই কবিকে চোর-কবিও বলা হয়—বোধ হয় চুরি করিয়া প্রণয় করার জন্য। গুজরাটের অনহিল পত্তনের রাজা কবি বিহ্লনকে তাঁহার কন্যার অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত করেন। বিহ্লন ছিলেন তরুণ পণ্ডিত। রাজকন্যার সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে। সেই প্রণয়ের ফলে তাহার গর্ভসঞ্চার হয়। রাজা যখন গর্ভসঞ্চারের কথা শুনিলেন—তখন তিনি বিহ্লনকে বধ্যভূমিতে প্রেরণ করিলেন। বিহ্লন প্রার্থনা করিয়াছিলেন—মৃত্যুর আগে তিনি ৫০টি শ্লোক রাজাকে শুনাইবেন। রাজা ধৈর্য্য ধরিয়া সেই শ্লোকগুলি শুনিলেন—ইহাই চৌর পঞ্চাশিকা। চৌর পঞ্চাশিকা শুনিয়া রাজা বিহ্লনের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে কন্যাদান করিলেন।

ইহা ইংরাজী ১১ শতকের ব্যাপার। ইহাই বিদ্যাসুন্দরের মূল গল্প, বাঙ্গালাদেশে উহার সহিত কালী মাহাত্ম্যের যোগ হইয়াছে এবং উহা কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। চৌর পঞ্চাশিকার শ্লোকগুলির মধ্যে কয়েকটি শ্লোক বিদ্যাসুন্দরেই পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র ৫০টি শ্লোকেরই অনুবাদ করিয়াছেন এবং শ্লোকগুলির কালীপক্ষেও ব্যাখ্যা করিয়া পৃথক পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

দীনেশবাবু বলেন,—ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান আছে। তিনি এই উপাখ্যান গ্রন্থখানি কাশি কেওড়াবেও দেখিয়াছেন।

আর একজন সমালোচক বলেন—বররুচিই প্রথম বিদ্যাসুন্দর লিখেন—তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। বহুপূর্ব্বে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে কাশীনাথ নামে এক কবি মৈথিলী মিশ্রিত বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দরের গল্প নাট্যাকারে রচনা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাদেশে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি কঙ্কের রচিত বিদ্যাসুন্দরই সম্ভবতঃ প্রথম। কঙ্ক বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটিকে সত্যপীরের পাঁচালীর অন্তর্গত করিয়াছেন এবং বিদ্যাসুন্দরে সত্যপীরের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিয়াছেন। কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরে সুরঙ্গের কথা নাই—সুন্দর নারীবেশে বিদ্যার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন—সিন্দূর লেপনের সাহায্যেই ধৃত হ'ন এবং সত্যপীরের কৃপায় বাঁচিয়া যান। তাঁহার কাব্যে বর্দ্ধমানের বদলে চম্পানগরের রাজকন্যা বিদ্যা, কাঞ্চণপুরের বদলে পূর্ব্বদেশের রাজা মালাধরের পুত্র সুন্দর।

১৫৯৫ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রামের গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক রচিত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান সর্ব্বপ্রথম বোধ হয় কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত হয়। ইহার পর কৃষ্ণরামদাসের কালিকামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান স্থান পাইয়াছে। ইঁহার কাব্যে রাজা

বীর সিংহের নামোল্লেখ আছে—কিন্তু বর্দ্ধমানের নাম নাই। ইনি বিনয় করিয়া বলিয়াছেন—

মহা মহা কবি যথা তথায় আমার কথা কোকিলেরে ভ্যাঙ্গায় বায়সে।
যেন মুকুতার সাথে শঙ্খ কাটি হার গাঁথে জউপালা প্রবালের পাশে॥

ইঁহার পর সম্ভবতঃ মধুসূদন, কবীন্দ্রের ও ক্ষেমানন্দের বিদ্যাসুন্দর। ইঁহাদের গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলের সম্পাদকের মতে রামপ্রসাদের আগে এবং ক্ষেমানন্দের পর বলরামের কালিকামঙ্গল রচিত হইয়াছে। কালিকামঙ্গলের ভাষা এত বেশী নব্যগন্ধী যে ইহা রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া আদৌ মনে হয় না।

চৌর পঞ্চাশিকার নানা সংস্করণে রাজা, রাজকন্যা, নায়ক ও রাজধানীর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তন্মধ্যে কাশ্মীরী সংস্করণের পুস্তকে রাজার নাম বীরসিংহ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ ও শশীনাথের বিদ্যাসুন্দর ছাড়া সকল বিদ্যাসুন্দরেই চৌর পঞ্চাশিকার শ্লোক উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়। চৌর পঞ্চাশিকার অনুকরণে সুন্দরকে সকলেই কবি আখ্যা দিয়াছেন।

নায়ককে কবি বলার একটা সার্থকতা এই—কবি না হইলে তাহার সহিত বিদ্যার কাব্য বিচারই বা কি করিয়া হইবে? পঞ্চাশটি শ্লোকই বা তিনি কি করিয়া রচনা করিয়া রাজাকে শুনাইবেন এবং চৌত্রিশাই বা কি করিয়া রাজাকে শুনাইবেন এবং চৌতিশাই বা কি করিয়া রচনা করিবেন? ইহার গভীরতর অর্থ এই—সুন্দরের সহিত বিদ্যার মিলনে কাব্যের সহিত পাণ্ডিত্যেরই মিলন সূচিত হইয়েছে। সুন্দর কথাটির অর্থ ধরিলে বলিতে হয়—সৌন্দর্য্যের সহিত জ্ঞানের মিলন—রসবোধের সহিত বিদ্যাবত্তার মিলন—Aesthetic sentiment-এর সঙ্গে Wisdom বা Intellectual attainment-এর মিলন। ভারতচন্দ্রের ইংরাজী অনুবাদক গৌরদাসবাবু বলিয়াছেন—

The union of the hero and the heroine represents the union of Beauty and Wisdom—a union constituting an excellent ideal of human perfection—the Greek ideal embodied in Plato's Charmides of a beautiful mind in a beautiful body.

১। বিদ্যা ও সুন্দর এই নাম করণের সার্থকতা ইহাতে প্রতিপাদিত হয়, তাই বলিয়া ইহাকে রূপক কাব্য বলা যায় না। এইরূপ রূপককে কাব্যে আগাগোড়া চালানো যায় না। যে প্রেম-লীলা বা কাম-লীলার বর্ণনা গ্রন্থের প্রাণস্বরূপ তাহা যে কোন তরুণ তরুণীর পক্ষেই সমভাবেই প্রযোজ্য। বিদ্যা ও সুন্দরের মিলনের ফলেই কাব্যের রূপকতা সার্থক হইতে পারিত—কিন্তু কোন বিদ্যাসুন্দরে মিলনের ফলে কোন বৈশিষ্ট্যই দেখানো হয় নাই। কালিকা মঙ্গলে সুন্দরই কালী-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন; তাঁহাদের সন্তান কিছুই করেন নাই। আর কালী-মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সৌন্দর্য্যবোধের সহিত পাণ্ডিত্যের মিলনেরও কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না।

বলরামের কালিকামঙ্গলের ভাষা দেখিয়া মনে হয়, বলরাম রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী লোক ও তাঁহার নিবাস পশ্চিম বঙ্গে। প্রথমতঃ—ভাষাকে প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ—ভাষার মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গীয় লক্ষণ কিছুই বড় দেখা যায় না। প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর সাক্ষ্য এ বিষয়ে কতকটা সাহায্য করে। যাহাই হউক কালিকামঙ্গলের সঙ্গে প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের পার্থক্য কোথায় দেখা যাক।

বলরাম কাঞ্চীর স্থলে মাণিক্যনগরের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তিনি লোকমুখে বিদ্যার রূপগুণের খ্যাতি শুনিয়া কালীর পূজা করিলেন এবং বর চাহিলেন বিদ্যার সহিত মিলন। কালী আবির্ভূত হইয়া বর দিলেন তোমার আশা পূর্ণ হইবে।—এই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শুকপক্ষী দিতেছি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও—এই শুক তোমার সাহায্য করিবে। সুন্দর বর্দ্ধমানে আসিলেন—শুক বিদ্যার মন্দিরে গিয়া সুন্দরের রূপগুণের বর্ণনা করিল এবং পরে বিদ্যার রূপগুণের কথা সুন্দরকে জ্ঞাপন করিল। সুন্দর মালিনীর কাছে বিদ্যার পণের কথা শুনিলেন। মালিনী বলিল—হরগৌরী বিদ্যাকে স্বপ্ন দিয়াছেন—মাণিক্যনগরের রাজপুত্র তোমার যোগ্য বর। বিদ্যার পিতা সেই বরের উদ্দেশে মাধব ভাটকে পাঠাইয়াছেন, মাধবভাট এখনও ফিরে নাই। ইহা শুনিয়া সুন্দরের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। ইহার পর মোটামুটি গল্প প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের সহিত মিলে।

বলরাম বলেন,—মা কালীর আদেশে এক দৈত্য বিদ্যার উদরে প্রবেশ করিল। সুন্দর যখন ধৃত, তখন

ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত মাধবভাটের বেশে আসিয়া সুন্দরের পরিচয় দিল এবং বলিল—মা কালীর আদেশেই এই মিলন ঘটিয়াছে। রাজা বলিলেন, সুন্দর যদি আমাকে কালী দেখাইতে পারে তবে বিশ্বাস করিব। তখন সুন্দরের প্রার্থনায় কালী আবির্ভূতা হইলেন। রাজা মা কালীর সম্মুখেই কন্যাদান করিলেন। এই কথাগুলি বলরামের পুস্তকে আছে—প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরে নাই।

প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরে অলৌকিকতার মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। বলরামের বিদ্যাসুন্দরে মা কালী নিজ মাহাত্ম্য প্রচারের দেরী হইতেছে বলিয়া সুন্দরের পুত্রের প্রাণহরণ করেন, পূজা লাভ করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়া দেন, গ্রন্থশেষে মা কালীর প্রসঙ্গে অনেক অলৌকিক কথা আছে। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে এ সকল কিছুই নাই। মা কালীর কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা, অধৈর্য্য, পূজা লোলুপতা ইত্যাদির কথা প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরে নাই।

বলরামের পুস্তকের নাম কালিকামঙ্গল। কালিকা-মাহাত্ম্য প্রচারই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য—কাব্য একেবারে অবান্তর। সে জন্য তিনি কাব্যের জন্য মাথা ঘামান নাই। সে কালে কাব্য বলিতে প্রধানতঃ আদিরসাত্মক রচনাই বুঝাইত। কাব্যের প্রতি বলরামের ঔদাসীন্যের ফলে তাঁহার কাব্যে কোন প্রকার অশ্লীলতা আসে নাই। বলরাম বিদ্যার রূপ বর্ণনা দু'কথায় সারিয়া দিয়াছেন—তাঁহার কাব্যের সম্ভোগ-লীলার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও সংযত—নারীগণের পতি নিন্দার মামুলী প্রথা বলরাম রক্ষা করিয়াছেন মাত্র—কোন প্রকার অশ্লীলতা বা কুরুচির পরিচয় দেন নাই। বলরামের বিদ্যার সজ্জা বর্ণনাতে একটা সমারোহ আছে—আর কুত্রাপি কবিত্বের বালাই নাই।—ছন্দে কোন বৈচিত্র্য নাই, একটানা পয়ার আর ত্রিপদী—আলঙ্কারিকতা একেবারে নাই বলিলেই হয়। বলরাম বিদ্যার গর্ভসঞ্চারের সংবাদে রাজা ও রাণীর মূর্চ্ছাপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন—তাহাতে রাজমর্য্যাদার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে।

কবি বীরসিংহ রায়ের রাজসভার একটা বর্ণনা দিয়াছেন—ইহা রাজা রাজবল্লভ কিংবা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা বলিলেই চলে। সভায় পুরোহিত, ভাট, পুরাণপাঠক, মহাপাত্র, মন্ত্রী, চোপদার, নকীব, কোতোয়াল ইত্যাদি উপস্থিত আছেন।

সেকালের অর্দ্ধস্বাধীন রাজারা অপরাধীর প্রাণদণ্ড দিতে পারিতেন—স্বাধীন রাজাদের ত' কথাই নাই। প্রত্যেক রাজার একটা করিয়া বধ্যভূমি ছিল—তাহাকে দক্ষিণ মশান বলা হইত।

রামপ্রসাদ যেরূপ শবসাধনার খুটিনাটি বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় সেকালে বঙ্গদেশের অঘোর পন্থী কাপালিক বা কৌলাচারীগণ শ্মশানে শবসাধনা করিত এবং এই সাধনা রামপ্রসাদের ও অজ্ঞাত ছিল না।

বিদ্যাসুন্দরের মূল আখ্যানবস্তু অলৌকিক। সুন্দর শাপভ্রষ্ট দেবীভক্ত—দেবীর স্বপ্নাদেশে সে দশমাসের পথ দশদিনে অতিক্রম করিতেছে। দেবীর কৃপায় সুরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে—তাহার আগমনে মালিনীর শুষ্ক মালঞ্চে ফুল ফুটিতেছে। দেবীর কৃপায় সে আত্মরক্ষা করিতেছে। কবির বর্দ্ধমাননগরও কতকটা স্বপ্ন দিয়া রচিত। আখ্যানবস্তু অলৌকিক হইলেও লৌকিক আশ্রয় ছাড়া কাব্য জমে না। আজকাল কাব্যে বা উপন্যাসে লৌকিকতার সহিত অলৌকিকতার মিশ্রণ ঘটিলে আমরা বলি রসাভাস বা অসামঞ্জস্য। সেকালে এ বালাই ছিল না—এইরূপ মিশ্রণে পাঠকের চিত্তের প্রসাদ ক্ষুণ্ণ হইত না।

রামপ্রসাদ অলৌকিকতাকে কাব্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ গ্রহণ করিলেও লৌকিক উপকরণে ও উপাদানের দ্বারাই কাব্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এ কথা বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য—বাঙ্গালার সকল প্রাচীন কাব্য সম্বন্ধেও তেমনি প্রযোজ্য।

কবি যখন লৌকিকতার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন তখন লৌকিক পরিবেষ্টনী রচনায় বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নাই। এ ক্ষেত্রে কবি কল্পনার উপর নির্ভর না করিয়া স্বকীয় অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করিয়াছেন বেশি বেশি। লৌকিক অবিকলতাই কাব্যটিতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। লৌকিক চিত্র, চরিত্র ও পরিবেষ্টনীর যথাযথ বর্ণনা না করিলে ইহা সাহিত্য হইত না—পৌরাণিক বিবৃতি মাত্র হইত।

কবির সরোবর বর্ণনা প্রাণহীন—কিন্তু বর্দ্ধমান শহরের হাট-বাজারে পথে-ঘাটে তিনি প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। বর্দ্ধমান শহরের বর্ণনা কবি স্বপ্ন দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সত্যেই তাহার পরিণতি দেখাইয়াছেন। হয় ত' কবি মুর্শিদাবাদ শহরটাকেই বর্দ্ধমানের উপর বসাইয়াছেন, কিন্তু শহরটি কবির ভাঙ্গাভঙ্গী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র পরম্পরার গুণে সমৃদ্ধ কোলাহল-মুখরিত নগরে সত্যরূপ ধরিয়াছে।

সুন্দরের রূপ দেখিয়া নাগরীগণের যে চিত্ত চাঞ্চল্যের বিবৃতি—তাহা গতানুগতিক ধারার অনুসরণ মাত্র। তাহা যতই সত্য হউক—লৌকিকতা-বর্জ্জিত। কিন্তু হীরা মালিনীর হাবভাব, আচরণ ও গতিবিধির মধ্যে লৌকিক সত্য পুরাদস্তুর বর্ত্তমান। হীরা চরিত্রটি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাসুন্দরের পক্ষে মামুলী ও বৈচিত্র্যহীন হইলেও সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের দিক হইতে বিচিত্র ও বাস্তব। হীরা চরিত্রের মধ্যে যে নাটকীয় ভাবটি আছে তাহা নৈতিক সাহিত্যের দিক হইতে দূষণ হইলেও রস সাহিত্যের দিক হইতে ভূষণ স্বরূপ। হীরার মুখের কথা সর্ব্বত্র লৌকিক সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই—সেজন্য স্থলে স্থলে রসভঙ্গ ঘটিয়াছে। হীরার মুখে—

বালাই যেটের বাছা কেন দাও কিরা যতটা শোভন,
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।
তাহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর

এসকল কথা ততটা শোভন নয়। ইহাতে লৌকিক সত্যের হানি হইয়াছে।

সুন্দর ও বিদ্যার সম্ভোগলীলা যত সত্যই হউক উহাতে লৌকিকতা বা বাস্তবতা নাই। উহা কল্পনার লীলামাত্র—এবং প্রাচীন কবিদের গতানুগতিক অনুসৃতি মাত্র। ইহা লৌকিক সত্যকে অনুসরণ করিলে এতটা অসংযত হইতে পারিত না—কাল্পনিক সত্যকে অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া অবারিত হইতে পারিয়াছে এবং রসের গণ্ডী ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে।

বিদ্যার গর্ভসঞ্চারে কবি লৌকিক সত্যকে অনুসরণ করিয়াছেন। গর্ভসঞ্চারের আবিষ্কারের পর রাণীর আত্মধিক্কার, তিরস্কার, কোপ ইত্যাদিতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তগৃহের জননীর চিত্রই ফুটিয়াছে। এখানে কবি রাজকুমারী বা রাজমহিষীর রাজকীয় মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। উহাদিগকে সাধারণ গৃহস্থের পর্য্যায়েই নামাইয়া আনিয়াছেন। এখানে কবি লৌকিক সত্যকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়াছেন। বিদ্যা যে আদর্শের উচ্চগ্রামে পরিকল্পিত, তাহার পক্ষে একটু অসঙ্গতই হইয়াছে। কবি দেখাইয়াছেন—স্বপ্নময় প্রেমলীলার এমন একটা বাস্তব পরিণতি আছে—যেখানে আর কল্পনার চলে না। সেখানে কঠোর লৌকিক সত্যের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সেই সংগ্রামে আর মানুষের উচ্চ নীচ ভেদ থাকে না। সেই স্বপ্নভঙ্গের বিড়ম্বনা রাজার পক্ষেও যাহা, ভিখারীর পক্ষেও তাহা। একমুহূর্ত্তে রাজা, রাণী, রাজকুমারী সকলেই আপামর সাধারণের কৃপার পাত্র হইয়া গেল।

সম্ভোগলীলার কল্পনা-স্বপ্ন হইতে এই যে লৌকিক জগতের কঠোর বাস্তবসত্যে অবতরণ ইহা কাব্যের বৈচিত্র্য ও অপূর্ব্বতার সৃষ্টি করিয়াছে। এ জগতে আর কল্পনার লেশ মাত্র নাই। কবি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ লৌকিক জগতের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। বীরসিংহের কোপ, কোতওয়ালের আবির্ভাব ও চোর ধরার চেষ্টা, তাহার বিড়ম্বনা ও নিরুপায়তা, বিপ্রব্রাহ্মণীর আবির্ভাব, তাহার উপদেশ ও লাঞ্ছনা, চোর ধরিবার জন্য সহকারীদের নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধারণ, রজকের লাঞ্ছনা, হীরার লাঞ্ছনা ইত্যাদি প্রত্যেক চিত্রটি বাস্তবসত্যসম্মত। এইগুলির মধ্যে কোন অলৌকিকতা নাই—কোন কল্পনার লীলা নাই—কোন ভাবাত্মকতা নাই। ইহা সম্পূর্ণ বস্তুতন্ত্রীয়। এই চিত্রগুলি খুব উচ্চশ্রেণীর না হইলেও কাব্যের সরসাংশ এইগুলিকেই আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে। কাব্যের এই অংশই সম্পূর্ণ জীবন্ত। নাটকীয় ভাব ও তদুপযোগী ভাষা এই অংশের জীবনসঞ্চার করিয়াছে। যে অলৌকিক ভিত্তির উপর কাব্যখানির প্রতিষ্ঠা, তাহাতে এতটা লৌকিক রূঢ়তার মধ্যে আখ্যান বস্তুকে না নামাইলে বরং কাব্যের রসসঙ্গতি অক্ষুণ্ণ থাকিত। জীবনসঞ্চারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লৌকিকতাই শোভন তাহার অধিক হইলে অসঙ্গতি দোষ ঘটে।

মশানে সুন্দর মা কালীর স্তব করিলেন। মা কালী ভক্তকে আশ্বাস দান করিলেন—কিন্তু নিজে আবির্ভূতা হইয়া ভক্তকে

যদি রক্ষা করিতেন অথবা একটা অতিলৌকিক ঘটনা ঘটাইতেন তাহা হইলে কাব্যের দিক হইতে বিদ্যাসুন্দরের মর্য্যাদা নষ্ট হইত। তাহা না করিয়া কবি মাধবভাটকে সেখানে আবির্ভূত করিয়াছেন। মাধবভাটের মুখে পরিচয় পাইয়া রাজা সুন্দরকে জামাতা বলিয়া স্বীকার করিল। এই ভাবে কবি কাব্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

সুন্দর এই পরিচয় পূর্ব্বে দিলেই রক্ষা পাইতেন কিন্তু সুন্দর কিছুতেই আত্মপরিচয় দিলেন না, তিনি বলিলেন—

জনম মানবকুলে শম্ভুধাম ধাম
পিতামাতা শিবশিবা কালিদাস নাম।

কিন্তু ইহাতেও সুন্দরের প্রাণদণ্ডের কারণ ছিল না। কারণ, রাজা সুন্দরের রূপ, বিদগ্ধতা ও বিদ্যাবত্তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন নিশ্চয়ই কোন রাজবংশে ইহার জন্ম এবং ইহার চেয়ে সুপাত্র বিদ্যার ভাগ্যে ঘটিতে পারে না। তাহা ছাড়া, রাজার অন্য উপায়ই বা কি ছিল? বিদ্যা গর্ভবতী আর ত' তাহার বিবাহ হইতে পারে না—গান্ধর্ব্বমতে উভয়েরই বিবাহ হইয়াছে—সুন্দরের বংশধর বিদ্যার জঠরে—তাঁহারও বংশধর সে। এক্ষেত্রে সুন্দরকে জামাতৃপদে বরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কাজেই রাজা কোতওয়ালকে বলিলেন—

"এমন সুপাত্র বহুভাগ্য হেতু ঘটে
বধ করা মত নহে দিব কন্যাদান।
কিন্তু তুমি নিয়া যাও দক্ষিণ মশান।"

প্রাণের ভয়ে নিশ্চয়ই সুন্দর আপন পরিচয় দিবে, তখন তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেই হইবে। তাই—

কৌশলে কোটালে রাজা কহে কটু উক্তি
পুনঃ পুনঃ কহি যবে কাটিবারে চোর
বেয়াত্তি বন্দিস্ বেটা ওকি বাপ তোর।

এইভাবে কবি আখ্যানবস্তুর চমৎকার লৌকিকতা রক্ষা করিয়াছেন। সুন্দরের মুখ দিয়া আত্মপরিচয় ব্যক্ত না করিয়া মাধবভাটের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে লৌকিকসত্যের মর্য্যাদা ও মা কালীর মর্য্যাদা দুই-ই রক্ষিত হইয়াছে। সুন্দর প্রাণের ভয়েও আত্মপরিচয় দিল না এবং বিদ্যার বহু অনুরোধেও বাম পদ প্রসারণ করিয়া খন্দক লঙ্ঘন করিল না। অর্থাৎ সাধ করিয়া ধরা দিল ইহাতে সুন্দরের চরিত্রের শৌর্য্য ও দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু কবির কাছে বীর অপেক্ষা ভক্তের মর্য্যাদা বেশী। তাই তিনি সুন্দরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—মা কালী যাহার সহায় তাহার মৃত্যুভয় কি?

"কোন চিন্তা নাহি মত্ত কুঞ্জরগামিনী
দুঃখ দূর করিবেন পুরারি-কামিনী।
ভক্তিভাবে ভাব ভয় ভাঙ্গা রাঙ্গাপদ।
শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ।

কবি এক্ষেত্রে লৌকিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই —কালীভক্তের মর্য্যাদার কথাই ভাবিয়াছেন। যেখানে কালীমাহাত্ম্যের সহিত লৌকিকসত্যের দ্বন্দ্ব হইয়াছে সেখানে কবি কালীমাহাত্ম্যকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন—অন্যত্র লৌকিক সত্যের সম্মানই রক্ষা করিয়াছেন। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের তুলনায় রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে অলৌকিকতা ঢের অল্প আছে এবং কবি কেবল দেবতার মহিমা প্রচার নয়, যাহাতে ইহা একখানি পরিপূর্ণাঙ্গ কাব্য হইয়া উঠে সেদিকেও দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

কবি বিদুষী বিদ্যাকে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে পাইয়াছেন। তাহার সখীগণকে পাইয়াছেন বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে। রাণী বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত সংসার হইতে পরিকল্পিত। নাগরীগণ যাঁহারা সুন্দরের রূপ দেখিয়া স্মরাতুরা হইতেছে তাঁহাদের আমদানী হইয়াছে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীনতর বঙ্গ-সাহিত্য হইতে। যে সকল নাগরীগণ সুন্দরের বন্ধনদশা দেখিয়া ব্যথিত এবং বিদ্যা শ্বশুরালয় গেলে যাহারা বধূদর্শনে আসিয়াছিল তাহাদিগকে কবি আপনার সমাজেই পাইয়াছিলেন। বিদু ব্রাহ্মণী আজিও প্রত্যেক গ্রামেই বর্ত্তমান আছে, কবি তাহাকে স্বগ্রামেই পাইয়াছিলেন। কেবল হীরাই কবির সৃষ্টি। হীরাকে প্রথম কে আবিষ্কার করিয়াছিল জানি না, পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দরগুলিতে এই চরিত্র আছে কি না জানি না, হীরা চরিত্রটি বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব। এই চরিত্রটিকে বঙ্গ-সাহিত্যের অন্য পুস্তকে দেখা যায় নাই—পরবর্ত্তী সাহিত্যে বরং হীরার অনেক অনুলিপি বা প্রতিলিপি দেখা গিয়াছে।

রামপ্রসাদের পদাবলীতে মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, বিদ্যাসুন্দরেও একেবারে বাদ দেন নাই। বিদ্যা শ্বশুরালয় যাইবেন—মা কাঁদিয়া আকুল। বিদ্যা মাকে বুঝাইতেছেন—

কার পুত্র কার কন্যা কার মাতা পিতা
সর্ব্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্র দুহিতা।

বিস্ময় যাঁহার মায়া সংসারব্যাপিনী।
কৌতুক দেখেন কর্ম্মভোগ করে প্রাণী॥

তারপর বিদ্যা, ব্যাস ও শুকদেবের কাহিনী বিবৃত করিয়া বলিলেন—বেদে বিদ্বান্ বেদব্যাসও মায়া কাটাইতে পারেন নাই—মা তুমি ত' ছার। আবার সুন্দর পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া বিদায় লইবার সময় বলিতেছেন—

পুনঃ কহে সুন্দর-নৃপতি বিচক্ষণ
অন্ত বাক্যশতান্তোন্তে নিতান্ত মরণ।
কার মাতা কার পিতা কার অধিকার
ঘেদিয়ার বাজিপ্রায় সমস্ত সংসার।

কবি তাই ব্রত পূর্ণ হওয়ার পর সুন্দর ও বিদ্যাকে এই মায়াময় সংসারে রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

বিদ্যাসুন্দরে কবি প্রাচীন কাব্যের নির্দ্দিষ্ট ধারা মানিয়া চলিয়াছেন এবং কতকগুলি প্রথাগত বৈচিত্র্যকেও অনুসরণ করিয়াছেন। যেমন—অলঙ্কারের চাতুর্য্যের দ্বারা নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণনা, গ্রন্থারম্ভে নানা দেবদেবী স্তবস্তুতি, (গণেশ বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, ইত্যাদি), নায়কের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া নাগরীগণের স্ব স্ব পতিভাগ্যের নিন্দা ও আত্মধিক্কার, তালিকা দেওয়ার প্রথা (যেমন পক্ষীর তালিকা, ফুলের তালিকা), বারমাস্যার বর্ণনা (সাধারণতঃ বিরহিনীর বারোমাসে যে দুর্দ্দশা হয় তাহারই বর্ণনার প্রথা প্রাচীন কাব্যে চলিয়া আসিতেছে—এখানে বিদ্যা আশঙ্কিত বিরহে বারোমাসের প্রত্যেক মাসে তাহার কি দুর্দ্দশা হইবে তাহারই কথা বলিতেছে)।

বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকামূলক কাব্য, ইহাতে আখ্যায়িকার ক্রমোন্মেষ সাধনের দিকেই কবি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন, কবিত্ব প্রকাশের জন্ত বিশেষ প্রয়াস পান নাই। খুব উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব এই কাব্যে প্রত্যাশা করা যায় না—কবি যেথানেই কবিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন সেখানেই আলঙ্কারিক চাতুর্য্যের আশ্রয় লইয়াছেন। কেবলমাত্র আলঙ্কারিক চাতুর্য্যকে পূর্ব্বে উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব মনে করা যে হইত না তাহা নয়। বর্ত্তমান কালের বিচারে উহা এক প্রকারের শিল্পকলা, প্রকৃত কবিত্ব নয়। আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশের দিক হইতে কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কোথাও কোন অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য নাই।

উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব নাই বলিয়া কোথাও কবিত্ব ফুটে নাই একথা বলা যায় না।

বিদ্যার চিত্তের চাঞ্চল্য দেখাইবার আগে কবি যে আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সুকবিরই উপযুক্ত—

ধন্য সে যামিনী মধু   কুহরে কোকিল বধূ
পূর্ণ বিধু উদয় গগনে।
মত্ত মধুকর বৃন্দ   ফুলে পিয়ে মকরন্দ
মুখরিত কুসুম কাননে।
গগনেতে মেঘ দেখি   অপার-আনন্দ শিখী
মন্দ মন্দ মলয় সমীর।
সুচারু কুসুম প্রাণ   স্মর শরে দহে প্রাণ
বিদ্যাবিনোদিনী নহে স্থির।

বারমাস্যা বর্ণনে কবিত্বের আমেজ বেশ পাওয়া যায়—

বুঝে বিষ তুল্য কর   বপূদহে নিরন্তর
নিদাঘে শরীর যাব দহি।
সুনবীন তরু ছায়   সুখে শিখী নিদ্রা যায়
তরুদঙ্গে নিঃশঙ্কে রহে অহি।
শুন শুন গুণরাশি   আমি তুয়া প্রিয় দাসী
আমার তোমার বড় কেবা।
মলযজ পঙ্ক রঙ্গে   চর্চ্চিত করিব অঙ্গে
ইচ্ছা আছে সেইরূপ সেবা।

সুন্দরের রূপ দেখিয়া সরোবরের ঘাটে নাগরীদের মোহমুগ্ধতা দুই পংক্তিতে কেমন ফুটিয়াছে!

কত কুলদারা চকোরীর পারা নিরখিছে তারা সে মুখশশী।
কে ভরে জল সে ভাসায়ে কলসে অতনু অলসে রহিল বসি।

মালিনীর শুষ্ক মালঞ্চ সুন্দরের আবির্ভাবে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতে ফুলের গন্ধে হীরা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—কবি হীরার যৌবন-মালঞ্চের কথাও মনে জাগাইয়া দিলেন।

বিদ্যাসুন্দরে কতকগুলি চিত্র বেশ রসময় হইয়া ফুটিয়াছে তন্মধ্যে সরোবরের চিত্রটিকে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বলা যাইতে পারে। কোতওয়ালের দলবলের ছদ্মবেশের চিত্রটি বেশ। মাল্য প্রাপ্তির পর হীরা ও বিদ্যার আলাপের চিত্রটিকে উপেক্ষা করা যায় না। বর্দ্ধমানের বর্ণনাচ্ছলে কবি যে সমসাময়িক নগরের চিত্রটি দিয়াছেন তাহার আর কিছু না হউক ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

শবসাধনার চিত্রটি বীভৎস হইলেও এই কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছে।

যে বচন-চাতুর্য্য কাব্য অপেক্ষা নাটকের পক্ষে অধিকতর উপযোগী তাহা প্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে যথেষ্টই আছে। হীরা বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুন্দরকে হিসাব দিতেছে—সুন্দরের সেদিকে কান নাই কিন্তু হীরা তাহার প্রবঞ্চনা ও চুরি ঢাকিবার জন্য বাক্যজাল বিস্তার করিতেছে। এই বাক্‌জাল বিস্তারে কবির কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়

বিদ্যার গর্ভাবিষ্কারের পর বিদ্যার সহিত রাণীর যে মেয়ের কলহ তাহাতে প্রসাদ বেশ রচনা-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। একালের বিচারে তাহা বেশ রুচি-সম্মত নয়, সুরুচির কথা বাদ দিলে বাক্‌বিনিময়ের ভঙ্গীটিতে যে চাতুরী আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

রাজার সহিত সুন্দরের ব্যঙ্গোক্তি-বিনিময়ে চমৎকার চাতুর্য্য আছে। সুন্দরের মৃত্যুভয় নাই, সে প্রাণভিক্ষাও করিতেছে না, আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টাও করিতেছে না। সে একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিয়া বিদ্যার সহিত প্রেমসম্ভোগের আভাস দিতেছে আর রাজা—

থর থর কাঁপে ভূপ ক্রোধভরে চায়।
রাজা বলে কাট চোরে থর খড়্গ যায়।

সুন্দর নিঃসঙ্কোচে বলিতেছে—

কন্যা তব পরম রূপসী।
তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খরতর অসি॥
পুনঃ পুনঃ হানে প্রাণে বক্র নিরখিয়া
জীয়ায় যুবতী বিম্বাধরামৃত দিয়া।

*

রাজা—

ঘূর্ণিত লোচন বীরসিংহ কহে রাগে,
এ বেটাকে ধর শীঘ্র কামানের আগে।

কবি—

কবি কহে কামান বিদ্যার জোড়া ভুরু,
সতত নিকটে ধরা বটি কল্পতরু॥
তাহাতে নয়ন বাণ বিষম সন্ধান,
শশিমুখী হাসি ভস্মরাশি করে প্রাণ॥
কি জানি কি মন্ত্র জানে বিদ্যাগুণবতী,
পুনরপি প্রাণদান পাই নরপতি॥

রাজা—

বাক্যপীড়া মহাব্রীড়া, বীরসিংহ বলে,
এ বেটাকে ফেল নিয়া কবিপদতলে।

কবি—

মনোমত্ত কুঞ্জর মাহুত পুষ্পধনু,
সতত হুলায় হাতী কমলিনী অনু॥
তার তলে পড়ে রাজ প্রাণ যায় মোর,
চোর চোর বলে তুমি মিছা কর সোর॥

রাজ—

রাজা বলে মিথ্যাবাক্য ছলে কাজ নাই।
মশানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই।

কবি—

অদ্যাপিও হলাহল ন মুক্তি হর,
অদ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কূর্ম্মবর।
অদ্যাপিও বাড়বাগ্নি জলনিধি বহে,
সাধুর বচন কদাচিৎ মিথ্যা নহে।
রাজ চক্রবর্ত্তী কিন্তু রীতি কদাচার,
লোকভয় ধর্ম্মভয় না দেখি তোমার।
জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল,
তথাপিও সাম্য নহ একি ঠাকুরাল।
একান্ত লজ্জিত রাজা কুমার বচনে,
অধোমুখে রহে বাক্য না সরে বদনে।

রাজার সহিত সুন্দরের উক্তিবিনিময়ের দৃশ্যটি কাব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রসালো। এ যুগেও এই দৃশ্যের সরসতা উপভোগ করা চলে।

বিদ্যাসুন্দরের আলঙ্কারিকত্ব—বিদ্যাসুন্দরে মঙ্গল কাব্যের রচনা ভঙ্গীর সহিত অর্বাচীন সংস্কৃত কাব্যের আলঙ্কারিকতার মিলন ঘটিয়াছে। এই আলঙ্কারিকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দগত—যেখানে অর্থগত আলঙ্কারিকতা আছে সেখানে অর্থের মণ্ডন ও প্রসাধনই বর্দ্ধিত হইয়াছে, অর্থের গৌরব কিছুই বাড়ে নাই, রসোদ্বোধনে বিশেষ কোন সহায়তাও করে নাই। বিদ্যাসুন্দরের আলঙ্কারিকতা সম্পূর্ণ বহিরঙ্গীয়।

মিল সম্বন্ধে কবি খুবই সতর্ক, তৃতীয় শ্রেণীর মিল যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়াছেন—স্থলে স্থলে মিলে চাতুর্য্যও লক্ষিত হয়—

১। তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার
বিদেশী ব্যাপারী বৈসে হাজার হাজার।

২। কি রূপসী অঙ্গে বসি অঙ্গ খসি পড়ে,
প্রাণ দহে কত সহে নাহি রহে ধড়ে।
মধ্য ক্ষীণ কুচ পীন শাশহীন শশী,
আশুধর হাস্তোদর বিম্বাধর রাশি।
দন্তাবলী শিশুঅলি কুন্দকলী মাঝে,
ভুরু অনু কামধনু হেমতনু সাজে।

৩। বিভুষ্টা জননী কালী খেদমত্ত কোতোয়ালী,
গালাগালি লতাব জুতায়।
নাহি গণে আগাপাছা যায় যায় খড়পাছা,
প্রথমেতে আমার গুঁতায়।

৪। কত কুলদারা চাতকীর পারা নিরখিছে তারা সে মুখ শশী
কে ভরে জল সে ভাসায়ে কলসে অতনু অলসে রহিল বসি

৫। ভূতলে আছাড়ে গা কপালে কঙ্কন ঘা,
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভা চমৎকার অশোক কিংশুক হার,
গাঁথা চাঁদে মিল যেন ভক্ত।

এই প্রকার মিলই কাব্যের সর্ব্বত্র। ভিন্নাক্ষর হইলেও একাক্ষর শব্দের মিল যে উৎকৃষ্ট কবি তাহা বুঝিতেন।

ভুলিলা সেকাল এবে ঠাকুরাল পরবে উলসে গা,
কানে দোলে পেঁটে পথে যাও হেঁটে ঠাহরে না পড়ে পা।

অনুপ্রাস প্রয়োগে কোথাও কবির ক্লান্তি দেখা যায় না। আখ্যায়িকা বিবৃতির ভাষা অনেক স্থলে নীরস হইবার কথা। কবি অনুপ্রাসের মাধুরী যোগ করিয়া তাহার সরসতা সম্পাদন করিয়াছেন।

অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু,
গুঞ্জরে মঞ্জীর রব পরভূত বধু।

* *

নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব
কাম পারাবার পার সার অবলম্ব।

* *

বিদ্যাবিনোদিনী বসি বাতায়নে ছলে,
বিদগ্ধ বিনোদ চলে বকুলের তলে।

* *

মোহিতা মহীতে পড়ে মহীপাল বালা
শান্তি নাই বিষম কুসুম শর জ্বালা

*

সখী কহে সুবদনী সাবধান হও,
হীরা ডেকে কীরা দিয়া ফিরা তত্ত্ব লও।

নিভৃতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে,
চন্দনেচর্চ্চিত চারু চামীকর অঙ্গে।
কম্বুকণ্ঠে কলিত কাঞ্চন কণ্ঠ মাল,
মস্তকে মুকুটমণি মুকুতা মিশাল।
মোহন মুকুরে মঞ্জু মুখ নিরখিয়া,
উথলে অমিয়া সিন্ধু উল্লাসিত হিয়া।
যামিনী যামার্দ্ধে যায় জায়া হেতু কবি,
আলো করে আঁধারে আপন অঙ্গ ছবি।
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাগে,
চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে।

সুন্দরের ৩৪ অক্ষরের কালী-স্তুতি অনুপ্রাস প্রয়োগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ কিন্তু ইহা কষ্টকল্পিত এবং অধিকাংশস্থলে ভগবতীর নাম মালা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনুপ্রাসের অতিশয্যে রচনা কোন কোন স্থলে বিরসও হইয়াছে—

পথ্য দেখি পথ্যকথা বস্তুপিহ করে,
বৈদ্যগ্রন্থে সদ্য ফল বৈদ্যক হা করে।
নব্যলোক ভব্য হয় সভ্যসঙ্গে বটে,
গুণ যেন দ্রব্য যোগ দিব্য গুণ ঘটে।

ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ একটি কবিতায় কেবল যমকের উদাহরণ দিয়াছেন—

সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখ কমলজ,
কিরূপ কিরূপ করি কৈল কমলজ।
তনু তনু চিন্তাব কেমনে জ্বালা সই,
জীবন জীবন মধ্যে ত্যজি মেনে সই।
বারণ বারণ মন কদাচ না মানে,
ক্ষপা ক্ষপাদিবা ছোটে কি করিবে মানে।
তারা তারাপতি যদি মিলাইলা করে
ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে। ইত্যাদি

এই অংশে কবি দুইভাবে যমক ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেক ছত্রের ১ম দুটি শব্দে যেমন যমক আছে—মিলের শব্দ দুইটিতেও তেমনি যমক আছে। ইহা শব্দশিল্প মাত্র। উপরের ছত্রগুলিতে ঐ শিল্পেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে মাত্র—কাব্যের পক্ষ হইতে আর কোন লাভ হয় নাই।

কবি সাধারণতঃ রূপবর্ণনায়, রাজার গুণবর্ণনায় ও শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন।

যে অর্থালঙ্কারের তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বরাবরই ঐ সকল প্রসঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে। ঐ অলঙ্কারগুলির প্রয়োগে কবি নিজস্ব চাতুর্য্য যোগ দিয়াছেন মাত্র। কতকগুলির উদাহরণ দিই—

ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু সুধায়।
লুপ্ত গাত্র ভত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়।

নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মত বিদ্যার মুখ, তাহার চক্ষু দুইটি কুরঙ্গের চোখের ন্যায়। কবি কৌশলে দুইটি উপমাকে একটি উৎপ্রেক্ষায় গাঁথিয়াছেন।

যৌবন জলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত গজ।
উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল নহে সে উরোজ।

অপহ্নুতি অলঙ্কারের সাহায্যে কবি কৌশলে বিদ্যার উরোজ যুগলকে করিকুম্ভের সহিত উপমিত করিলেন।

কোন সে বড়াই তার পঞ্চশর তূণে।
কতকোটি খরশর সে নয়ন কোণে।

অর্থাপত্তি অলঙ্কারের সাহায্যে বিদ্যার কটাক্ষের সম্মোহনতা এখানে কবি বর্ণনা করিয়াছেন।

কবি ব্যাতিরেক ও প্রতীপ অলঙ্কারের সাহায্যে রাজা গুণ সিন্ধুর গুণ বর্ণনা করিয়াছেন—

নির্ম্মল সুযশ দশদিক্ করে আলো।
সেই অভিমানে চন্দ্র অন্তরেতে কালো।
সে তেজ তুলনা হেতু ক্রোধযুক্ত রবি।
উদয় কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি।
রত্নাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র
নৃপ রত্নাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র।
অধিকন্তু দোষ তাহে অপেয় সে নীর
ক্ষণ জন্মা ক্ষিতিপতি নির্দ্দোষ শরীর।

কবি রূপকের সাহায্যে বিদ্যাসুন্দরের বিবাহের বর্ণনা করিয়াছেন—

কান্তাকুচে জলদগ্নি বিচারিয়া কবি।
করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি।
উভয়তঃ কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর।
পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর।

কবি যেখানে গতানুগতিক আলঙ্কারিক ধারা ত্যাগ করিয়াছেন সেখানে তাঁহার অলঙ্কৃতি রসেরই পোষকতা করিয়াছে। যেমন বিদ্যার জননী বিদ্যাকে বিদায় সময় বলিতেছে—

অপরাহ্নে তরুছায় অতিদূরতর যায়
যে যেমত ছাড়া নহে মূল।
অন্ততম ভাব পাছে মানস তোমার কাছে
থাকিতে গমন সেই ভুল।

সমাসোক্তি অলঙ্কারের সাহায্যে কবি বিদ্যার জন্য সুন্দরের যে আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন—তহাতে কৃতিত্ব আছে। সুন্দরের সর্ব্বেন্দ্রিয় বিদ্যার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, সুন্দর সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া বিদ্যার সঙ্গ চাহিতেছে—কবি কৌশলে তাহার আভাস দিয়াছেন।

শ্রুতমাত্র প্রাণপণ হেতু সে তোমার।
প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ সকলি আমার॥
কর্ণ কহে প্রথমে জন্মিল মম সুখ।
চক্ষু কহে দর্শন কর্ত্তব্য বিধুমুখ।
কাতর রসনা কহে চিরদিন ক্ষুধা।
বাসনা বড়ই বিধু বদনের সুধা।
নাসা কহে পদ্মিনী সে তদঙ্গ সুঘ্রাণ।
প্রাপ্তি মাত্র যাবতীয় দুঃখ পরিত্রাণ॥
মন বলে মিথ্যা নহে সত্য কহি আমি
তোমরা পশ্চাতে রও হই অগ্রগামী।
দেহ রাজ্যে রাজা সেই কমলিনী শুন।
রহিল নিকটে তব না বাহুড়ে পুন।
নপুংসক মন তবু সুখে করে ক্রীড়া।
পাণিনি ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া।

অর্থান্তরন্যাসের রূপে ও আভাণকের রূপে অনেকগুলি সুভাষিত পংক্তি বিদ্যাসুন্দরে আছে—সেগুলি প্রবচন-হিসাবে চলিয়া গিয়াছে, আবার অনেক স্থলে প্রচলিত প্রবচনই কাব্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে—যেমন—

'আধার সহিত সুধা পান ভাল নয়।'
'খুঁড়িতে কেঁচুয়া বুঝি উঠে কাল সাপ।'
'কোথা বাঁধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত।'
'কুকুরে প্রশ্রয় দিলে কাঁধে চড়ে একতিলে।'
'লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়া ঢাকি।'
'আকাশে ফেলিলে থুথু এসে গায়ে পড়ে।'
'পর্ব্বত চালিতে পুত্র পারে কি পতঙ্গ?'
'কত না সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত।'
'ঘৃতের সুস্বাদ কোথা ঘোলে?'

বিদ্যাসুন্দরে বহু প্রকারের রচনারীতি দৃষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন রচনারীতির ভাষাবিন্যাসও ভিন্ন ভিন্ন।

(১) সংস্কৃতশব্দ বহুল (২) আরবী পার্শী মিশ্রিত (৩) হিন্দী বুলি মিশানো (৪) ব্রজবুলি (৫) প্রচলিত সাহিত্যের

ভাষা (৬) চল্‌তি ভাষা। যেখানে যে ধরণের ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজন কবি সেখানে সেই ধরণের ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন যাহার মুখে যে ভাষা শোভা পায়—তাহার মুখে সেই ভাষাই বসাইয়াছেন।

(১) সংস্কৃতশব্দ বহুল—

পুন কহে সুন্দর নৃপতি বিচক্ষণ।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা নিতান্ত মরণ।

*

ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন।
সেই মত চন্দনাদি করিয়া লেপন।
অদ্যাপি সে শশিমুখী সুলভ যৌবনা।
পীনপয়োধরা বালকুরঙ্গ নয়না।
তদঙ্গ পরশে অঙ্গ সদা সুশীতল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল।

*

প্রচণ্ড চণ্ডার্চ্চিচয় চতুর্দ্দিকে দ্বিজ।
পুরোহিত বেষ্টিত যেমন মখভুজ।

(২) আরবী পার্শী মিশ্রিত—

তার আগে বড় দড় পাঠানের চৌকি বড়
কাটকে আটক আঁটা আঁটি।
বিদেশীর নয় ঝাড়া সেপাই আছয়ে খাড়া
হুজ্জতে কেল্লায় মাথা কাটি।
আফিঙে হামেশা মস্ত হুসিয়ার দরবস্ত
ঘুমে আঁখি কুমারের চাক
যাত্রিতুল্য বসে আছে গোলাম দাঁড়ায়ে কাছে
দেমাকেতে গোঁপে দেয় পাক।

(৩) হিন্দী বাত—

কহো কোতোয়াল রে হুকুম কৈসে দিয়া।
তয়ানী ছেবক কো এত্তরে হাল কিয়া।
মহারাজকে বেটা বিদ্যা পূজকে মহাদেও।
সুন্দর কো খসম পায়া মেরে বাত লেও।

(৪) ব্রজবুলি—হিন্দী মিশ্রিত—

পবমনর বর তুহ বি মুরখ বুঝা
হাম বতেমে ছাত মেরা আও।
রাজাকি পাছ খালাস করো যা কর
সুন্দরকো গজরাজ ঠাওরাও।

ব্রজবুলি—

কাতর কামিনী বদন যামিনী নাথ মলিন হি ভেল
মুকুতা বৈছন সোহত ঐছন নয়ন জল উপজেল।

প্রচলিত সাহিত্যের ভাষা

শীঘ্রগতি নৃপবর ধরে জামাতার কর মুক্ত কৈল নিগড় বন্ধন।
গলে বস্ত্র ত্রস্ত উঠে নিকটে অঞ্জলিপুটে সবিনয় কহে সুবচন।
যেমন গোকুলপুরী কৌতুকে নবনী চুরি কৈলা প্রভু ত্রিভুবন পতি।
গোপীমুখে শুনি বাণী রজ্জু বান্ধে যুগ্মপাণি তমোগুণে রাণী যশোমতী।

চল্‌তি ভাষা

(১) হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো ঘরে
কোঁথাইয়া বসিল কবির বরাবরে।
হারামের হাড় মাগী কথা কয় ঠাটে
মাটি খেয়ে বাপু আজ গিয়েছিনু হাটে।
প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা
টঙ্কারিয়া হাতে নিতে মুখ করে বাঁকা।
ছটা ছিল গরসিল ছটা ছিল মেকী
হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি।

*

উপহার দ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই।
হাতকর্জ্জা লইলাম জেলিনির ঠাঁই।
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত।
খুজরার লেখা জোকা বড়ই উৎপাত।
পাঁচকড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই।
প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছুঁই।

(২) কাছে আসি হাসি আলি শিরে তেল দিল ঢালি
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ।
কত ঠাট জানে হীরা পুনরপি কহে ফিরা
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ।
বিদ্যা কহে নহ বুড়ী মাসাস রসের গুঁড়ী
মর মাগী এত এসে তোরে।
ছাই কথা কি কহিস্ পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিস্
পায় পড়ি ক্ষমা কর মোরে।
যেতে হবে ঠাঁই ঠাঁই ভুলিয়াছি মনে নাই
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি।
হইল স্নানের কাল মিছা করি গণ্ডগোল
সকলি শুনিব কালি আসি।

হীরার প্রসঙ্গে কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে চল্‌তি ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন—কোতওয়াল ও ভাটের প্রসঙ্গে হিন্দী বা হিন্দী মিশ্রিত বাঙ্গালা, শাস্ত্রীয় বা সাহিত্য সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষা ও সাধারণ বর্ণনায় প্রচলিত সাহিত্যের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দরে সে-কালের সামাজিক জীবনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের সময় নবাবী আমল, তখন পাঠান ও পশ্চিমা সিপাই বরকন্দাজ ইত্যাদিতে বাঙ্গালার শহর ভরিয়া গিয়াছে। সুন্দর বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছে,—

বিদেশী ব্যাপারী বৈসে হাজার হাজার। মনে হয় বাঙ্গালার বাজার সে-কালেই বিদেশী বণিকেরা দখল করিয়াছিল এবং তখনি 'বিলাতি বহুৎ চিজ বেস কিম্মতে'র বাজারে বিরাজ করিত।

সে-কালের বিচারে সুখাদ্যের একটা তালিকা পাওয়া যায় বিদ্যার বাসর কক্ষে—

ভক্ষ্য দ্রব্য নানা জাতি মণ্ডা মনোহরা,
সরভাজা নিখতি বাতাসা রসকরা।
অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা,
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা।

বিলাসদ্রব্যের একটা তালিকা পাওয়া যায়—

কৌটাভরা ছাঁকা চুণ কর্পূরের সঙ্গ,
এলাইচ জায়ফল জয়িত্রী লবঙ্গ।
কালাগুরু মৃগমদ কুঙ্কুম কস্তুরী,
সুগন্ধ চন্দন গন্ধে আমোদিত পুরী।

বাঙ্গালার অর্দ্ধ স্বাধীন জমিদারগণ মুসলমান ও পশ্চিমাদের পাইক, সেপাই, বরকন্দাজ ইত্যাদি রূপে নিয়োজিত করিতেন। তাঁহাদের প্রভাবে বাঙ্গালাদেশের হিন্দী বাত চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাঙ্গালীরা হিন্দী বেশ বুঝিত, অনেকে হিন্দী বেশ বলিতে পারিত। বিদ্যাসুন্দরের বর্দ্ধমান কাল্পনিক হইলেও বর্দ্ধমানের বর্ণনা হইতে সেকালের শহরের একটা চিত্রাভাষ পাওয়া যায়। মালিনীর বেসাতি হইতে সে-কালের বাজারের একটা মোটামুটি ধারণা হয়। এখনকার মত বাজারে টাকা চালানো তখন বেশ সোজা ছিল না—তখন বাজারের পোদ্দারেরা ও সদাগরেরা টাকার মূল্য নিরূপণ করিত

বাঙ্গালাদেশের চতুষ্পাঠীতে পড়িবার জন্য উৎকল, কাশী, ত্রিহুত, মিথিলা ইত্যাদি বহির্বঙ্গের প্রদেশ হইতে ছাত্রগণ তখনও আসিত। তখনকার দিনে নামজাদা মল্লদের অনেক আখড়া ছিল এবং ধনী লোকেরা তাহাদের প্রতিপালন করিত। রাঁয়বেঁশেদের খুব আদর ছিল। হাবশী গোলাম পোষার রেওয়াজ ছিল।

সে-কালের কোতওয়ালের পরিচয় ভাল করিয়াই পাওয়া যায়। কবি গোড়াতেই সহর কোতোয়ালের ভীষণ চেহারার একটা বর্ণনা দিয়াছেন, পরে তাহার উপদ্রবের কথাও লিখিয়াছেন। পুলিশের উপদ্রব চিরকালই ছিল, একজন অপরাধীকে ধরিবার জন্য একশত জন নিরপরাধের লাঞ্ছনা সে-কালে বেশ ছিল। শ্রমজীবীদের মজুরী না দিয়া খাটাইয়া লওয়া এদেশে একটি জমিদারি উপদ্রব। ইহাকে বেগার ধরা বলে। সে-কালে কোতওয়ালরা এইরূপ বেগার ধরিত।

খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম।
সহরে পড়িয়া গেল বেগারের ধুম।
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়।
পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড়।

অপরাধী ধরার জন্য ছদ্মবেশ ধারণের প্রথা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবি এই ছদ্মবেশের কথা বলিতে গিয়া নানাপ্রকারের ভণ্ডসন্ন্যাসীর পরিচয় দিয়াছেন। সে-কালের বাবাজীরা কি ভাবে লোক ঠকাইয়া সেবা আদায় করিত কবি তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন—

গোষ্ঠিশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে,
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে।
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে,
শেষে সেষে পুরুষেতে পাত্র শেষ চাটে।
বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থ সবলে পড়ায়,
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়।
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি,
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝি।

শাক্তকবি হয় ত' একটু অতিরঞ্জিত করিয়াই বৈষ্ণব বাবাজীদের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সে-কালের সরল বিশ্বাসী গৃহস্থদেরও ত' ইহাতে কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

দেশের সেবা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পাঁচ

প্রেম করা হইল না,
মনের মানুষ খুজে পেলাম না।

সুচিত্রার কাছে এই নৌকা-যাত্রা অতি সুন্দর লাগিতেছিল। কলিকাতা সহরের ট্রাম, ঘোড়ার-গাড়ী ও মোটরকারের দিবারাত্রি ঘড় ঘড় ধ্বনি ও কোলাহলের বাহিরে এই যে শ্যামল সবুজশ্রী মণ্ডিত প্রকৃতির শোভা তাহার বৈচিত্র এবং নূতন দেশ দেখার আগ্রহ তাহার চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল।

মাঠের পর মাঠ—এখন সব মাঠ জলে ভরা। ধানক্ষেত, পাটক্ষেত আর তাহার মধ্যদিয়া একটি খাল চলিয়া গিয়াছে—পদ্মার মুখ হইতে ধলেশ্বরীর দিকে। খালের পাড়ে, মাঠের ধারে, কাছে ও দূরে পল্লীর পর পল্লী। মাঠের মধ্য দিয়াও নৌকার পথ আছে, তাহার নাম 'দারা'। বিক্রমপুর অঞ্চলে এই শ্রেণীর জলপথকে বলে দারা। সুচিত্রা ছইয়ের বাহিরে বসিয়া দেখিতেছিল মাঠ, জল ও গ্রামের শোভা। সে কুন্তলাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল, আর পরম আগ্রহে সপলা ও সুঁদিফুল তুলিতেছিল জলের মধ্য হইতে হাত বাড়াইয়া। একখানি ছোট নৌকাতে করিয়া দুইজন বৈষ্ণবী ও একজন বৈষ্ণব যাইতেছিল। নৌকাখানি এত ছোট যে সুচিত্রার ভয় হইয়াছিল বুঝিবা নৌকাখানি ডুবিয়া যায়। বৈষ্ণবী দুইজন খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতেছিল—

প্রেম করা হইল না,
মনের মানুষ খুজে পেলাম না।
মানুষ মানুষ অনেক আছে,
প্রেম কি মিলে যার তার কাছে,
মানুষ বিনে মানুষ রতন
কখন মিলে না;
ওরে যদি মিলে দুই এক জনা,
মন ত মিলে না।
আমার প্রেম করা হইল না॥

নৌকাখানি স্রোতের গতিতে বেগে চলিয়া গেল। কুন্তলা বৈষ্ণবী-দের কণ্ঠে শ্রুত ভাটিয়ালী সুরের অনুকরণ করিয়া গাহিল—'প্রেম করা হইল না।'

সুচিত্রা চুপি চুপি কহিল, "বয়স এখনও যায় নাই ভাই কুন্তলা।"

কুন্তলা হাসিয়া কহিল—"মনের মানুষ খুজে পেলুম না।"

এমন সময় দেখা গেল—ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের মধ্য দিয়া একটি মঠের চূড়া। চূড়াটি একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। সুচিত্রা কৌতূহলি বালিকার মত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বল্‌না ভাই এটা কি?"

কুন্তলা গম্ভীর ভাবে বলিল—

"মাঠের পর মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায়ে ঘেঁসে।
বাঁধের জল রেখা ঝলসে যায় দেখা
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলিছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কতশত নূতন দেশে॥"

"তা ত' বুঝলাম—এগুলো কি?"

কুন্তলা কহিল—"মঠ আমরা বলি 'মোঠ্'।"

"কিসের জন্য এগুলি তৈরী হয়েছে?"

"আমার ত' ভাই প্রত্নতত্ত্বের ব্যাধি নেই। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি এই সব মঠ। ছোড়দাদা জানেন এ সকলের ইতিহাস।"

কৌতূহলি সুচিত্রা মিনতির সুরে বলিল, "মিঃ মুখার্জ্জি, বলুন না এইসব মঠ কিসের জন্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।"

ত্রিবিক্রম মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একটা বালিসে হেলান দিয়া পড়িতেছিল Katherine Heywood-এর লেখা The child Learning and Living. শিশুদের শিক্ষা ব্যতীত যে একটা জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না এবং কি ভাবে সে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচার করা যায় তাহাই ছিল ত্রিবিক্রমের একান্ত কামনা। গ্রন্থকর্ত্রী প্রথম অধ্যায়টি কি

সুন্দর ভাবেই না আরম্ভ করিয়াছেন—The child is an eternal interest. The great science of psychology has its roots in the child--কি সুন্দর কথা। রবীন্দ্রনাথ কি মধুর ভাবেই না বলিয়াছেন—

সব দেবতার আদরের ধন' নিত্যকালে তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,
তুই জগতের স্বপ্ন হতে এসেছিস আনন্দ স্রোতে
নূতন হ'য়ে আমার বুকে বিলসি ॥

ত্রিবিক্রম যখন বইখানার ভাবধারার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে সুচিত্রার প্রশ্ন শুনিতে পাইয়া উৎসুক হইয়া কহিল, "কি বলছিলেন মিস্ ব্যানার্জ্জি ?"

কুন্তলা বলিল,—"সুচিত্রা জিজ্ঞাসা করছিল এই মঠগুলি মানুষ টাকা ব্যয় করে কেন তৈরী করেছিল একদিন এবং এখনই বা করে কেন ?

ত্রিবিক্রম বইখানি বালিসের এক পাশে সযত্নে রাখিয়া বলিল, "আপনি বোধ হয় কবি গোবিন্দদাসের নাম শুনেছেন।"

"হাঁ শুনেছি। তবে তাঁর কোন বই পড়ি নি।"

কবি গোবিন্দদাস অনাহারে, নির্য্যাতনে এবং দারিদ্র্যভারে প্রপীড়িত হয়ে বলেছিলেন :

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে পড়ে
আমার চিতায় দিবে মঠ।

চিতায় বা শ্মশানে দেওয়া মঠ পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন রীতি। পদ্মার বুকে কত গ্রাম, কত মঠ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে কে তার খবর রাখে! একদিন এ অঞ্চলে একটি প্রসিদ্ধ মঠ ছিল, সে মঠটি রাজাবাড়ীর মঠ নামে পরিচিত ছিল। সেই মঠ বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বীর কেদাররায়ের মাতার শ্মশানোপরি প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমরা ছেলেবেলা দুর হ'তে সে মঠ দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হ'তাম এই বুঝি বাড়ী এসেছি! পদ্মার বিস্তীর্ণ বুকের উপর মঠের চূড়ার শ্বেতচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়ে কি অপূর্ব্ব শোভাই না হ'ত!"

সুচিত্রা ত্রিবিক্রমের মুখে পরম আগ্রহের সহিত অতীতের ইতিহাস শুনিতেছিল।

ত্রিবিক্রম বলিল, "আমার মনে হয় বৌদ্ধদের কাছথেকে আমরা এই মঠ স্থাপনার বিষয় শিখেছি। বৌদ্ধস্তূপ, বৌদ্ধ চৈত্য ওসব হ'তেই এ আদর্শ নিয়েছি। বিক্রমপুরে যে একদিন বৌদ্ধদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। এ অঞ্চলে পাল, চন্দ্র সব বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করেছেন কি না! এসব তারই প্রভাব। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রেও মৃতের শ্মশানে দেবায়তন প্রতিষ্ঠার নিয়ম রয়েছে। আপনাকে একদিন কোন একটি বড় মঠের কাছে নিয়ে যাব।"

নৌকা একটা বাঁক ফিরিতেই দেখা গেল বট, অশ্বত্থ আর পাকুড় গাছের ছায়ায় ঢাকা দ্বীপের মত একটি উচু জায়গা। সেখানে কয়েকখানি টিনের ঘর, ছোট ছোট চালা ঘর, উচু বেদী প'ড়িয়া আছে। স্থানটি বেশ মনোরম।

সুচিত্রা বলিল, "এখানে কি হয় ?"

ত্রিবিক্রম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"একদিন এখানে বড় হাট মিলিত, দোকান বসিত, কত ধান চালের নৌকা আসিত, কিন্তু একদিন এই হাট নিয়ে বাঁধলো হাঙ্গামা দুই সড়িকের মধ্যে! খুনা-খুনি হল, ফৌজদারী মোকদ্দমা বাধলো! তারপর এই হাট আর মিলে না। পারবেন এর প্রতিবিধান করতে ? পারবেন দেশের লোকদের ছোট মনকে বড় করতে ?"

সুচিত্রা বলিল, "আমার কতটুকুই বা ক্ষমতা ?"

"তবে এলেন কেন গ্রামের কাজে ? শুধু কষ্ট পেতে! আমার ভয় হয়, সহরের বিলাসী কবিরা গ্রামের যে মধুর চিত্র এঁকে আপনাদের মন ভোলান—সত্যিকার ছবি ত' আপনারা দেখেন নি, তাই অনভিজ্ঞ বক্তাদের বক্তৃতা শুনে ঐ সব কবিদের কাব্য শুনে ছুটে এসেছেন গ্রামের দিকে। পারবেন কাজ করতে গ্রামের কল্যাণে ?"

সুচিত্রা বিষণ্ণ মনে কহিল, "অতটা ত' ভাবি নি।"

"ভাবেন নি! চমৎকার ত'!" এমন সময় টুলু কহিল, "স্যার, নৌকা স্যার আটকে গেছে স্যার, কচুরিপানাতে!"

ত্রিবিক্রম উদগ্রীব হইয়া কহিল, "কতটা যায়গা জুড়েরে ?"

"এক মাইলের কম নয় স্যার।"

ত্রিবিক্রম হাসিয়া বলিল, "তাই ত', মিস্ ব্যানার্জ্জি আপনার দেশ উদ্ধার করা আর হ'ল না। বাইরে এসে দেখুন ত' একবার।"

সুচিত্রা ও কুন্তলা বাহিরে আসিয়া নৌকার সম্মুখভাগে

দাঁড়াইল। তাঁহারা দেখিল—ধানের ক্ষেত ও নৌকার পথ ব্যাপিয়া ঘন কচুরিপানা এমনভাবে জড় হইয়া আছে যে, সেখান দিয়ে নৌকা চালানো অসম্ভব!

কুন্তলা ভীত-চকিতভাবে ত্রিবিক্রমের দিকে চাহিয়া কহিল, "ছোড়দা!"

ত্রিবিক্রম গম্ভীরভাবে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, "কি ভাই! এই দেখ্ আমাদের জন্মভূমির প্রত্যক্ষ রূপ!"

পচা জলের দুর্গন্ধে সে সময়ে সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

কুন্তলা কহিল, "ছোড়দা, জল এমন পচে গেছে! উঃ এমন জানলে কক্ষনো বাড়ী আসতুম না, কক্ষনো সুচিত্রাকে আস্‌তে দিতাম না! মানুষ কি করে বাঁচে?"

ত্রিবিক্রম গম্ভীর ভাবে কহিল, "তবু কুন্তলা! এই আমাদের মাতৃভূমি! এদেশের মাটিতেই মানুষ হয়েছি! এ দেশের দুর্গতি দেখে কি প্রাণ না কেঁদে পারে? ফসল ফলতে পারে না, নৌকা চলতে পারে না! কত বড় দুর্দ্দশা একবার ভাব দেখি! বলুন মিস্ ব্যানার্জ্জি—এই দেশের রূপ বর্ণনা করে যখন আপনারা গেয়ে উঠেন—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।"

তখন আমার চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কি মিথ্যা ছলনা অমরা করি!"

সূর্য্য পশ্চিমে একটা দূর গ্রামের গাছের ঘন আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছিল। ত্রিবিক্রম ও টুনু দুইজনে দুইখানি বৈঠা হাতে লইয়া কচুরিপানা দুইদিকে সরাইয় নৌকার পথ করিয়া দিতেছিল। নৌকা দুলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল।

সুচিত্রা সবিস্ময়ে দেখিল,—শুভ্র সুন্দর পেশীবহুল বলিষ্ঠ বাহু দু'টি ত্রিবিক্রমের কিরূপ ত্রস্তভাবে কচুরিপানা দুই দিকে সরাইয়া ফেলিতেছিল। সে বিমুগ্ধভাবে সেদিকে চাহিল। তাহার মনে হইল মিনিটে একটা করিয়া সিগারেট ধ্বংস দক্ষ, নারীজনোচিত কোমল দেহ, ততোধিক নারীজনোচিত দেহসজ্জা এ যুবকের নয়। হাঁ, মানুষ বটে, পুরুষ বটে, যাহার দেহ ও মন সমান ভাবে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সুচিত্রা প্রশংসমান চোখে ত্রিবিক্রমের দিকে চাহিয়া দেখিতে ছিল তাহার কর্ম্মনিপুণতা।

ঘণ্টাখানেক পরে তাহারা খালে আসিয়া পড়িল। সেখানে কচুরিপানা ছিল না। কালো জল কল্-কল্ ছল্-ছল্ করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছিল। কখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কখন অষ্টমীর চাঁদ আকাশে ভাসিয়া উঠিয়াছে সেদিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। দূরে গ্রামে সন্ধ্যারতির বাজনা বাজিয়া উঠিতেছিল।

সুচিত্রা ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "আর কত দূর আপনাদের গ্রাম! আর কতটা সময় লাগবে বলুন না!"

ত্রিবিক্রম প্রফুল্লমুখে বলিল, "তাইত, কি বিপদেই না আপনাকে ফেললুম! কতকগুলো রূঢ় কথাও বলে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না যেন। সহরে থাকি না, তাই 'এটিকেট'টা তেমন বরদাস্ত হয় নি।"

সুচিত্রা মন খোলা হাসিয়া বলিল, "কি যে বলেন আপনি! অপনি ত' আর অযথা কিছু বলেন নি।"

কুন্তলাও তাহার বন্ধুকে লইয়া এমন দুরবস্থার মধ্য দিয়া আসিতে হইবে তাহা মনে করে নাই, সে তাহার সহরবাসিনী বন্ধুকে দেখাইতে চাহিয়াছিল শুধু পল্লীর কবিজনোচিত বর্ণনা-বহুল সোনার বাঙ্গালার রূপ। কিন্তু কত প্রভেদ সত্যে ও কল্পনায়!

রাত্রি প্রায় আটটার সময় নৌকা আসিয়া তাহাদের বাড়ীর ঘাটে ভিড়িল। আমগাছে ঢাকা বড় খালটির মধ্য দিয়া নৌকাখানি পাড়ে ভিড়িবামাত্রই শোনা গেল আনন্দের কলরব—ছোট ছোট বালক বালিকাগণের নৃত্য ও প্রফুল্ল চীৎকার—দাদা এসেছে রে, দিদি এসেছে রে।

দুইটি বড় বকুল গাছ যেখানে একটি মনোরম কুঞ্জ রচনা করিয়া শোভা পাইতেছিল,—বকুল ফুলবাসে সুরভিত সেই কুঞ্জতলে বাঁধান ঘাটে কুন্তলার বাবা ও মা ছিলেন তাহাদের প্রতীক্ষায়। দুইটি ভৃত্য লণ্ঠন হাতে দাঁড়াইয়াছিল। একে একে ত্রিবিক্রম, কুন্তলা ও সকলের শেষে সুচিত্রা নামিয়া আসিল এবং কুন্তলা সুচিত্রাকে তাহার পিতা ও মাতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। যদিও পূর্ব্বেই তাঁহাদের কাছে সুচিত্রার আগমন-বার্ত্তা জানান হইয়াছিল।

সুচিত্রা মাথা নত করিয়া উভয়কে প্রণাম করিল। কুন্তলার মাতা রাজেশ্বরী তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন, "এস মা! পথে বড় কষ্ট পেয়েছ। চল

মণ্ডপে মাকে প্রণাম করে বাড়ীর ভিতর যাই।" তাহার মুখের প্রফুল্ল হাসিটুকু সুচিত্রাকে বিমুগ্ধ করিল।

আর কুন্তলার বাবা কুন্তলার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "হ্যাঁরে পথে এত দেরী হল কেন বল্‌ত? আমরা দু'জনে যে দু'ঘণ্টা ঠায়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়ের ঝপ্‌ ঝপ্‌ শব্দ শুনলেই ভাবি এই বুঝি তোরা এলি?"

কুন্তলা কহিল, "বাবা এমন সোনার দেশ আর কোথায় আছে বল! যে কচুরিপানা! ভাগ্যিস্‌ ছোড়দা ছিলেন, নইলে আজ ঐ মাঠের ভিতরই পড়ে থাক্‌তে হ'ত। বেচারা ছোড়দার জন্য দুঃখ হয়।"

"তাই নাকিরে ত্রিবিক্রম!" ত্রিবিক্রমকে সেখানে দেখা গেল না।

"আমরা মাঠে দাঁড়িয়ে কেবল কথাই বল্‌ছি। এস মা!" কুন্তলা ও সুচিত্রাকে লইয়া কুন্তলার বাবা ও মা অঙ্গনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সুচিত্রার পথে যে সঙ্কোচটা ছিল না এইবার সে সঙ্কোচ আসিয়া তাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। মণ্ডপের কাছে আসিয়া তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া কুন্তলা ও সুচিত্রা উভয়ে দশপ্রহরণধারিণী দেবীকে প্রণাম করিল। দীপালোকে সমুজ্জ্বল দেবীর মূর্ত্তিখানি সুচিত্রার কাছে মনে হইতেছিল যেন সত্য সত্য প্রাণময়ী মূর্ত্তি! কি দীপ্তিময় চক্ষু, কি বীরব্যঞ্জনাসূচক, দশবাহুতে দশ প্রহরণ, পদতলে মহিষাসুর দলিত। দুইপাশে শ্রী ও সরস্বতী, কার্ত্তিকেয় ও গণেশ! কি পবিত্র ভাবই না মণ্ডপের চারিদিক বেড়িয়া বিরাজ করিতেছিল। অপলক ভাববিহ্বলভাবে সুচিত্রা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল—কুন্তলা মধুর কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণধারিণী।
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী নমামি ত্বাং।

[ক্রমশঃ

ফাল্গুন নাই

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য

আমার জীবনে কোথাও ফাগুন নাই
আছে মরা তৃণ পদরেখাহীন পথে
মরু-গৃহ হতে বৃথাই মেঘেরে চাই
হাহাকার নামে হৃদয় উৎস হতে।
কতবার কত বহুজনতার মাঝে
নিজেরে হারায়ে নিজেরে খুঁজিয়া মরি
ছিন্ন বীণায় সকরুণ ব্যথা বাজে
অতীতের কোন ক্লান্ত গানেরে স্মরি'।

জীবন-প্রাসাদে যতগুলি আছে দ্বার
হৃদয় খুলিয়া আজিও দাঁড়ায়ে রহে
জানিনা তাহারা পথ চেয়ে আছে কার?
শূণ্য কোঠায় আঁধারের স্রোত বহে।
কামনার তরু কিশলয়গুলি যত
প্রবাসী বায়ের মর্ম্ম বেদনা কয়
ঝরিছে পাখীর বৃদ্ধ পাখার মত
ফাগুনের স্রোত জানিনা কোথায় বয়?

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল

(এক)

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-রসাস্বাদন করিবার পূর্ব্বে কিরূপে ইহার জন্ম, কোন্ পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে ইহা গড়িয়া উঠে এবং নানারূপ প্রতিকূল স্রোতের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও বঙ্কিমচন্দ্র আত্মস্থ হইয়া সুনিপুণ কর্ণধারের ন্যায় কিরূপে ইহার গতি নিয়ন্ত্রিত করেন, সর্ব্বাগ্রে উহার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের সকল লেখার মধ্যে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দৃঢ়তা, পবিত্রতা ও মধুর ভাবসমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার বীজ তাঁহার পিতা মাতা হইতে উদ্ভূত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র সুলেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্কিম জীবনী"তে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা মাতার রূপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা (যাদবচন্দ্র) তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মহিমামণ্ডিত তেজঃপুঞ্জ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মাতা সাতিশয় স্থূলাঙ্গী ও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। কিন্তু এমন মাধুর্য্যময়ী শান্তিমূর্ত্তি জগতে অল্পই দৃষ্ট হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র অতি সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের জনক-জননীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যাদবচন্দ্রের মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র অপবিত্র ভাব দেখি নাই; কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর বদনে যা কিছু দেখিয়াছি. সমস্তই পবিত্র।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পাঠারম্ভ হয় কাঁঠালপাড়ায় গ্রাম্য পাঠশালায়। গুরু মহাশয় ছিলেন রামপ্রাণ সরকার। শুনা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচ বৎসর বয়সে একদিনে বর্ণমালা শিক্ষা করেন। গুরু মহাশয় দেখিলেন যে পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিতে ইহার আর কয়েক দিন লাগিবে এবং বুঝিতে পারিলেন এই ছাত্র ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হইবে। ইহার ৮।৯ মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার কার্য্যস্থল মেদিনীপুরে আসিয়া তথাকার ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি বৎসর পরে তিনি হুগলি কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানতৃষ্ণা এতই প্রবল ছিল যে, পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না। হুগলি কলেজে একটি সুবৃহৎ পাঠাগার ছিল। তিনি তথায় কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি পড়িতে লাগিলেন এবং এইরূপে তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। ১০।১১ বৎসর কাল ঐ স্থানে শিক্ষা লাভ করিয়া এবং উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া আইন পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে তিনি আইন ছাড়িয়া বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন পরীক্ষার মাত্র দুই মাস সময় ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া পরীক্ষা দিলেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। ঐ পরীক্ষায় তেরজন ছাত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন কেবল আর একজন ছাত্র উত্তীর্ণ হন তাঁহার নাম হরনাথ বসু। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন এবং উপযাচক হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু পিতৃভক্ত বঙ্কিম তাঁহার পিতার আদেশ ব্যতীত ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন না, পরে পিতার আদেশে কার্য্য গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু চাকুরী গ্রহণ করিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল না। ১৮৫৮ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর দুই মাস। পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের পাঠ সমাপ্ত পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ও মেধাবী ছাত্র কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলি কলেজে পড়িতেন সেই সময়ে তাঁহার সাহিত্য রচনায় হাতে খড়ি হয়। তখন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্য-ক্ষেত্রে একাধিপত্য করিতেন। তাঁহার প্রভাকর পত্র তৎকালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গুপ্ত কবি কিঞ্চিৎ শ্লাঘাভরে ও ইঙ্গিতে উহা নিজ পত্রিকায় স্বয়ং দুই ছাত্র কবিতায় এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করিতেন।

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।"

তখনকার সময়ে দ্ব্যর্থবোধক কবিতা লিখিবার একটা রীতি ছিল, এবং তখনকার পাঠক সমাজে উহা উপভোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্য-রসিক, জ্ঞান-বৃদ্ধ ও খাঁটি বাঙ্গালার কবি ছিলেন। প্রভাকরে তাঁহার নিজের লেখা বাহির হইত অপর লেখকদের লেখাও তিনি বাহির করিতেন। বিশেষতঃ ছাত্রদের লেখা সাদরে প্রকাশ করিতেন। তিনি তাহাদের উৎসাহদাতা ও গুরু ছিলেন, তন্মধ্যে তিনজন ছাত্র তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ অধিকারী ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ইঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গুণগ্রাহী ছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই তিনজন কালক্রমে শক্তিশালী লেখক হইতে পারিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বারকানাথের অকালে মৃত্যু হওয়ায় তিনি সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে সফল হয়। এ কথা নিশ্চিন্তরূপে বলা যায় যে, ঈশ্বরচন্দ্রই বঙ্কিমবাবুর সাহিত্য-রচনার প্রথম পথ প্রদর্শক, উপদেষ্টা ও উৎসাহদাতা ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার ঋণ চিরদিন স্মরণ করিতেন এবং গুপ্ত কবির গ্রন্থাবলীর প্রস্তাবনায় বঙ্কিমচন্দ্র যথোচিতভাবে উহা স্বীকার করিতে কার্পণ্য করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'প্রভাকরে'র লেখক তখন তাঁহার বয়স ১৪ কি ১৫ বৎসর। ঐ তরুণ বয়সের লেখা দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, সেইরূপ ত্রুটী দেখাইতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতার সুবঙ্কিম ভাব-কৌশল অতিশয় সন্তোষজনক। ...ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীণ সুরসিক জনের ন্যায় মন হইতে নূতন নূতন ভাব সকল উদ্ভূত করিতেছেন। এ অংশে ইহার প্রশংসা বর্ণনে বর্ণাবলী বলহীনা, ফলে একটি অনুরোধ এই যে বঙ্কিম পদ রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাব গুলীন প্রকাশার্থে যেন বঙ্কিম-ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্দে পদ বিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেক।" নিম্নোদ্ধৃত অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের তরুণ বয়সের গদ্য ও পদ্য রচনা দেখিলে, গুপ্ত কবির ঐরূপ মন্তব্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

গদ্য—"গগন মণ্ডলে বিরাজিত কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শস্প সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বু বিম্বুপম জীবনে চন্দ্রকে সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না, যে সে সব উৎসব করে হইলে কি হইবে এবং পরমনিধি প্রিয় পিতা পরাৎপরের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে তাঁহার সমীপে উত্তর কালে কি উত্তর করিবে। কদাপিও মূঢ় মানবমণ্ডলী মনোমধ্যে মুহূর্ত্তেকও বিবেচনা করে না যে তাহার কি অনিত্য পদার্থ প্রযত্ন পুরঃসর প্রতিপালন করিতেছি॥"

এই লেখার উপরও গুপ্ত কবির টিপ্পনী এইরূপ:—

"ইহার লিপি নৈপুণ্যের জন্য সন্তুষ্ট হইলাম কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন এবং অক্ষরগুলীন্ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।"

পদ্য—

হইয়াছে জল, বড়ই শীতল
ছুঁইলে বিকল হইতে হয়।

আগে যে জীবন, জুড়াও জীবন
সে বন এখন নাহিক সয়।

জীবন ও বন জালয় দুইটি আভিধানিক অর্থ।

"বর্ষার পল্লব নব, তা হ'তে অধর তব,
শত গুণে সুকোমল শোভা।
নদ নদী জলে টলে, তা হ'তে যৌবন জলে,
তব দেহ কিবা মনোলোভা ॥"
বুঝি মোর দুখে দুখী, নাহি দেখি বিধুমুখী,
বুঝি চাঁদ করেহ রোদন।
হৃদয়েরি রেখা ভয়, আঁখি ধারা চিহ্ন রয়,
ও যে নহে কলঙ্ক কখন।
বুঁঝি তারি দেখা তরে, আকাশ রোদন করে
তার রূপে সহস্র নয়নে।
নীহার নয়ন ধারা ফেলিছে যতেক তারা,
শতে শতে বিন্দু বরিষণে ॥
তাই বলি নিশাপতি, রতনে যতনে অতি
ঝটিতি করহে দরশন।
এই ভাষা কহ গিয়ে, আশা বিনা ফাটে হিয়ে,
তার লাগি মলো একজন।"

গুরুর উপদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার ভাষা অলঙ্কারপূর্ণ হইলেও ভাষা ক্রমশঃ সরল হইতে লাগিল। "মানস ও ললিতা"য় ঝড়ের বর্ণনায় একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাই।

"গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাঁদ,
থেকে থেকে উচ্চতর ধ্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর
পুত্রকারে গরজে প্রাণপণে।
বারেক চঞ্চল তায় দেখি নীলমেঘ গায়
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্তবন
পাতা উড়ে ঢাকে বনে, পড়িতেছে ঘোরস্বনে
বড় বড় মহীরুহগণ।"

ইহার বর্ণনা আরও স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল। কবি ঈশ্বরগুপ্তের সময়ে বাংলায় কবি, তর্জ্জা, জারি, আকড়াই ও পাঁচালীর প্রচলন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রও ছড়া ও গান বাঁধিতেন। উহাতে একপক্ষ অপর পক্ষকে গালি দিয়া জয়লাভের চেষ্টা চলিত। দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর অনুকরণে কবির লড়াই চালাইতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বড় একটা ইহাতে যোগ দিতেন না।

প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব সম্যক এড়াইতে না পারিলেও অল্পকাল মধ্যে স্বকীয় প্রতিভায় নিজের স্বতন্ত্র পথ নির্ম্মাণ করিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে হিন্দু কলেজ হিন্দু যুবকগণের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তথায় ছাত্রেরা ইংরাজী শিক্ষার প্রথম রসস্বাদে নূতন স্বাধীন চিন্তা ও নূতন স্বাধীন ভাবের প্রেরণায় বিপ্লব ঘটাইল। তাহারা পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম্ম অসার ও হিন্দুশাস্ত্র অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য করিতে লাগিল। সর্ব্ববিষয়ে পাশ্চাত্যজাতি শ্রেষ্ঠ, এইরূপ হীনবুদ্ধি তাহাদের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেশের সে বড় দুর্দ্দিন! হিন্দু কলেজে ডিরোজিও নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্বাধীন মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন, নির্ব্বিচারে কিছুই গ্রহনীয় নহে এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যান্ত। তাঁহার শিক্ষায় আস্তিক্য বুদ্ধি অনেক ছাত্রের মন হইতে তিরোহিত হইতে লাগিল।

হিন্দুধর্ম্মের উপর অনেক ছাত্রের এরূপ অনাস্থা জন্মল যে তাহারা বিজাতীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহাদের অন্যতম। এ বিপ্লবের যুগে যে কয়জন নিজেদের বৈশিষ্ট্য রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তন্মধ্যে মনস্বী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় ঐরূপ প্লাবনের বেলা মন্দীভূত হইলেও একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। তখনও ইংরাজীতে বলা ও ইংরাজীতে লেখা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের গৌরবের বস্তু ছিল। বাংলাভাষা তখন উপেক্ষিত ও অনাদৃত। মইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথমতঃ "Captive Lady" নামে ইংরাজী কাব্য লিখেন। মহামতি বেথুন মাইকেলকে বলিয়াছিলেন, বিদেশীভাষায় যশস্বী লেখক হইতে পারিলেও দেশের কোন স্থায়ী উপকার হইবে না। মাইকেল সে উপদেশ গ্রাহ্য করিলেন এবং 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক কবিতায় নিজের অতুলনীয় ভাষায় তাহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর ধন লোভে মত্ত! করিনু ভ্রমণ,
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

* * * *

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে
ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি;
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে;
পালিলাম আজ্ঞাসুখে পাইলাম কালে,
মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মনিজালে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেলের ন্যায় Rajmohan's wife নামে প্রথমে ইংরাজী উপন্যাসই রচনা করেন। যতদূর জানা যায় মহামতি বেথুনের ন্যায় কেহ বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলাভাষায় লিখিবার জন্য পথ নির্দ্দেশ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্নিহিত স্বদেশ-প্রীতিই তাঁহাকে বাহির হইতে ঘরে ফিরাইয়া আনে এবং ইংরাজীর মোহ অচিরে ত্যাগ করিয়া তিনি মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। [ক্রমশঃ

বর্ম্মার কথা

তিন

প্রিয় ভূপেন্দ্র,

ভরসা করি তোমরা ডিব্রুগর হইয়া শিলং আসিয়াছ। ডিব্রুগর সম্বন্ধে আমার কিন্তু বড়ই আশঙ্কা হইয়াছিল কারণ উত্তর বর্ম্মার ঠিক পশ্চিমেই শিবসাগর ও ডিব্রুগর জেলা। জাপানীদের উদ্দেশ্য যে চীনকে সর্ব্ববিষয়ে ব্রিটেনের সহায়তা হইতে বঞ্চিত করা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ হইতে ইতিপূর্ব্বে মাল যাইত বর্ম্মার রাজধানী রেঙ্গুনে, সেস্থান হইতে যাইত লাসিও পর্য্যন্ত ট্রেণে, এবং লাসিও হইতে মোটরের রাস্তায় সেই মাল চীনদেশে সরবরাহ হইত। কিন্তু রেঙ্গুন, পেগু প্রভৃতি স্থান জাপানীরা অধিকার করিয়া ফেলায় এই রাস্তাটী একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে। এদিক দিয়া কোন মালপত্রাদি যাইতে আসিতে পারে না। বর্ম্মা হইতে এই রাস্তায় কোনও লোকও একা বাঙ্গালায় আসিতে পারে না। অথচ এই রাস্তাটীই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সোজা। বি, আই, এস, এন্ কোম্পানীর ষ্টীমারে যাতায়াতের খুব সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এখন নিম্ন-বর্ম্মা জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় শীঘ্র যে এই রাস্তায় কোন যাতায়াতের সুবিধা হইবে তাহাও মনে হয় না।

দ্বিতীয় রাস্তাটীও এখন রুদ্ধ। তুমি যে সমগ্র পরিবারটী সহ শামপানে করিয়া বেসিন হইতে মার্ত্তাবান সাগর হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছিলে, এবং সে রাস্তায় Sandway-সেণ্ডোয়ে হইয়া জলপথেই একেবারে আকিয়াব গিয়া পহুছিতে চাহিয়াছিলে, এটী সেই পথ আর খুব দুর্গম এবং ভয়সঙ্কুল হইলেও রাস্তা বলিয়া নাম করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এখন আর সে রাস্তায় যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, কেন না বেসিন এখন জাপানীদের হস্তগত। বেসিনের দুর্দ্দশার অবধি নাই। সহর পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভারতীয়গণ স্থানত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আর এতদিনে বর্ম্মীরা তাহাদের জিনিষপত্র বোধ হয় সব লুটতরাজ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বেসিন শত্রুর হাতে, আবার শুনিতেছি আকিয়াবও শত্রুর হাতে। এক্ষণে শুনিলাম আকিয়াবে বোমাবর্ষণ হইয়াছে এবং সহরটী পরিত্যক্ত হইয়াছে। তারপরে শুনিলাম জাপানীরা আকিয়াবে পদার্পণ করিয়াছে। অবশ্য একথার প্রতিবাদ হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গোপসাগর যখন জাপানীদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন, তখন আকিয়াবের বিশ্বাস কি? যে কারণেই হউক এই দুর্গম বিপদসঙ্কুল রাস্তাটী পর্য্যন্ত আজ অবরুদ্ধ। যদি বেসিন ও আকিয়াব নিরাপদ থাকিত অনেকেই যে এই রাস্তায় আসিত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ১২ লক্ষ ভারতীয় সমস্ত বর্ম্মায় আটকা ছিল। দুই লক্ষ লোকও এপর্য্যন্ত আসিতে পারে নাই। সুতরাং এখন দেখ, এই দশ এগার লক্ষ লোকের মধ্যে অনেকেই কি মরিয়া হইয়া এই রাস্তায় আসিত না? কিন্তু এদিক একেবারে বন্ধ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

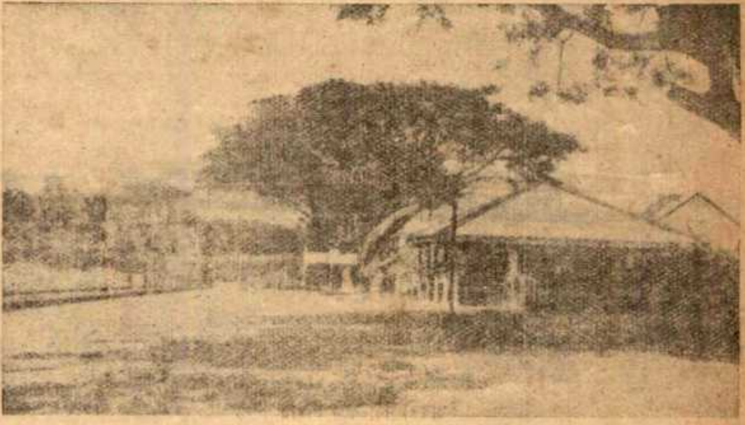

লাসিও ষ্টেশন

তৃতীয় রাস্তা—প্রোম পর্য্যন্ত রেলে আশা যায়। বলিতে পারি না রেঙ্গুন হইতে প্রোম পর্য্যন্ত রেল লাইনটী জাপানীরা হস্তগত করিয়াছে কিনা। এই প্রোম হইতে টঙ্গুপের স্থলপথ ১১৭ মাইল। রাস্তাটীও মন্দ নয়। পাবলিক ওয়ার্কস্

ডিপার্টমেণ্টের রাস্তা। কিন্তু টঙ্গু হইতে আরাকান ইউমা (পাহাড়াবলী) পার হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য, চন্দ্রনাথ কেদারনাথের পথ অপেক্ষাও দুরারোহ। এই আরাকানের ইউমা পার হইতে গিয়া যে কত লোক অনাহারে, আয়াসে, পানীয়ের-অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই ইউমা পার হইয়া লোকে 'জাবাদিন' নামক স্থানে আসিত। সেখান হইতে আকিয়াব ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী। সেখান হইতে ষ্টীমারে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী মকুইতে যাওয়া যায়, মকুই হইতে কাক্সবাজার একশত মাইল দূরে এবং 'বাসে' এখানে আসা যায়। কাক্সবাজার হইতে চট্টগ্রাম ষ্টীমারে আসিলেই বাঙ্গালায় পৌঁছা যায়। এই রাস্তাতেও কতদিন যাইতে পারা যাইবে তাহা সন্দেহের কথা। যতদিন চলে উত্তর ও দক্ষিণবর্ম্মা হইতে প্রোমে নৌকাযোগে আসিলে চলিতে পারিবে। প্রোম সহর ইরাবতীর তীরে অবস্থিত, সুতরাং নৌকাযোগে অনেক লোক আসিতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আকিয়াব হাত-ছাড়া হইলে এই রাস্তার কোন সুবিধা পাওয়ারই সম্ভাবনা নাই। দেখি, এখন ভগবান্ কি করেন।

ইরাবতী নদী-বক্ষে ষ্টীমার

চতুর্থ রাস্তা—মানিয়া-মণিপুরের পথ। মান্দালয় ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লোক এই পথেই সাধারণতঃ যাইতে আসিতে চাহিবে। বিশেষতঃ মান্দালয়ের অবস্থা তুমি সবই শুনিয়াছ। মান্দালয়ই পূর্ব্বে বর্ম্মার রাজধানী ছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ থিবো এই স্থান হইতেই বিতাড়িত হন। অর্দ্ধশতাব্দি যাইতে না যাইতে ইংরাজ-কবলিত তাঁহার রাজধানী ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। জাপানীরা গত গুড-ফ্রাইডের দিনে (৩রা এপ্রিল) মান্দালয় সহরের উপরে এমন নৃশংসভাবে বোমা বর্ষণ করিয়াছে যে, অসংখ্য বাসগৃহ, গির্জ্জা, হাসপাতাল একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। তুমি ত' জান এই-স্থানের ক্ষুদ্র কি বৃহদায়তন সব আবাসই কাষ্ঠনির্ম্মিত। এক সঙ্গে সহরের কাঠের ঘরগুলি জ্বলিয়া উঠায় যে বিরাট দাবানল সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা নির্ব্বাপিত করিতে দমকলের কর্ম্মচারীগণ (শত্রু বিমান চলিয়া যাইবার পরেও) কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত যে বিপুল চেষ্টা করিয়াছিল তাহা বিফল হইয়া যায়। অনেক খ্রীষ্টান মিশনারী না কি বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত হাসপাতাল হইতে রোগীদিগকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

এই বিমান আক্রমণের অল্পকাল পরেই গৃহহারা বিপদ্‌গ্রস্ত নরনারী কেহ বা মোটরে, কেহ বা গরুর গাড়ীতে বা পদব্রজে যে যেরূপে পারিয়াছে গৃহের বাহিরে রাজপথে আসিয়া আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটিয়াছিল। তাহাদের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম। আহা! একদিনে সব মান্দালয় সহরটী যেন জতুগৃহদাহের অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কিপলিং মান্দালয়ের 'অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে'র কত প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাহার চিহ্নও নাই। এরূপ বিপদে কে আর সহরে থাকিতে সাহস পায়। ভারতীয়গণের ত' কথাই নাই, বর্ম্মী, চীনা প্রভৃতি জাতির লোকও দূরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। একে মান্দালয় সহরটী জনাকীর্ণ, তদুপরি নিম্ন বর্ম্মার বহু স্থান ধ্বংস হইয়া যাইবার পরে আশ্রয়ের আশায় অসংখ্য লোক এখানে আসিয়া ভীড় করিয়াছিল। আজ আবার তাহারা এখান হইতে ছন্নছাড়া হইল। জাঙ্গালের ন্যায় মান্দালয় ছাড়িয়া সবই চলিয়া গিয়াছে। ইংরাজদের 'উত্তর ব্রহ্ম ক্লাব'টী কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই ভস্মীভূত হইয়াছিল, এবারও তাহাদের অনেক বাড়ী ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য তাহারাও গৃহহীন হইয়াছে। তাহাদের জন্যও আমাদের সহানুভূতি হওয়া উচিত বটে।

মান্দালয় হইতে মনিয়া ট্রেনে আসিতে দুই ঘণ্টার মত সময় লাগে—উহার দূরত্ব প্রায় ৫০।৬০ মাইল। মনিয়া চিন্দুইন নদীতীরে অবস্থিত এবং এখানে একটী বাণিজ্য-স্থান আছে। চিন্দুইন নদী ইরাবতীতেই আসিয়া পড়িয়াছে। মনিয়া হইতে কালেওয়া পর্য্যন্ত ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজে যাইতে হয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় সপ্তাহে এক হাজার লোকের অধিক এই রাস্তায় স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। হাটিয়া যাইতে খুবই কষ্ট, রাস্তা বড় উচু নীচু। পার্ব্বত্য পথই বেশী।

কালেওয়া হইতে টামু পর্য্যন্ত গাড়ীর রাস্তা আছে। কিন্তু এই রাস্তায় আজকাল মাত্র তিনখানা বাস্ চলে, অন্ততঃ ২০।২৫ খানি বাসের বন্দোবস্ত না হইলে লোকজনের অপসারণ এক রকম অসম্ভব হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই রাস্তায় জিনিষ-পত্রের মূল্যও প্রচুর বাড়িয়াছে। অসুবিধার কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও।

তৎপরে টামু হইতে পালাল পর্য্যন্ত ৩৬ মাইল রাস্তা,কোন বাস নাই, পদব্রজেই আসিতে হয়। রাস্তায় খাদ্য পাওয়া যায় না। বিশ্রামের স্থান নাই।

গরুর গাড়ী অথবা পাল্কীতে আসা যায় পালান হইতে ইম্ফল এবং ইম্ফল হইতে মণিপুরে বাসে আসিতে পারা যায় বটে কিন্তু বাসের সংখ্যা অত্যন্ত কম। মণিপুর হইতে পরে দিনাজপুর হইয়া ক্রমে দেশে আসিয়া পৌছান যায়।

আমরা যে ইম্ফল-মণিপুরের রাস্তার এত ব্যাখ্যা করি, এখন দেখ, ইম্ফল আসা কতদূর শ্রম ও আয়াস-সাধ্য। মণিপুর পৌছিলে নিরাপদ হওয়া গেল বটে, কিন্তু মণিপুর হইতে বাঙ্গালা দেশে আসাও কম শ্রম ও অর্থসাধ্য নহে। তোমরা সকলে অর্থের অনুসন্ধানে সহস্র সহস্র লোক বাহিরে গিয়াছিলা। বাহির হইতে টাকা আনিয়া নিজের এবং দশের উপকারে আসিতেছিলা। কিন্তু এই দুর্ঘটনায় প্রবাসী বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর একেবারে যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতের দুর্গতির পরিণাম আরও বাড়িয়াই চলিল।

তোমাকে একটী বিক্ষোভের কথা জানাইতেছি। এই রাস্তাটী গত দুই সপ্তাহ হইতে খোলা হইয়াছে তাহাতে সুবিধা হইবারই কথা। কিন্তু তাহাতেও বর্ণভেদ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। বর্ম্মার নূতন লাইন খুলিবার কারণই এই যে মান্দালয় এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে এত লোক সরিয়া যাইতেছে যে এই লাইন না খুলিলে তাহারা একেবারে আটকা পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু রাস্তা খোলা হইয়াছে বটে, তবে শ্বেতাঙ্গ পুরুষগণেরই নাকি বেশী সুবিধা হইয়াছে। আগে তাঁহাদিগকে পৌছাইয়া ভারতীয়গণের জন্য নাকি পরে ব্যবস্থা হইতেছে। এইরূপ পার্থক্য খুবই দোষের কথা, এবং যদি সত্য হইয়া থাকে তবে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রশংসা করিতে পারি না। আসাম গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপিনাথ বরদোলই মহাশয় উপরোক্ত পার্থক্য ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছেন। বর্ম্মা ভারতীয় এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে প্রেসিডেণ্ট সর্দ্দার বাহাদুর ডুলাল এবং সেক্রেটারী ডোডাচাঞ্জিও এই বিষয়ে বরদোলই মহাশয়কে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মেজর জেনারেল উড্ সাহেব বলেন অন্যরূপ। তিনি বলেন বৃদ্ধ, অশক্ত এবং শিশু (aged young, infirm) এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ব্যতীত ব্যবহারের অন্য কোন বৈষম্য নাই। বরদোলই মহাশয়ের উক্তি আরও কয়েকজন ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদোলই একজন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন সত্যপ্রিয় ব্যক্তি। তিনি যে যথেষ্ট প্রমাণ না পাইয়া এইরূপ বর্ণপার্থক্যের প্রতিবাদ করিতে অগ্রণী হইবেন তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। যাহাহউক, দুই পক্ষের মতের মধ্যে যখন ঐক্য নাই, তখন আনে সাহেব নাকি প্রকৃতপক্ষে এইরূপ বৈষম্য হয় কি না, মনিপুরের রাস্তাটী কি রকম, আরও বাস্ ও খাদ্য সরবরাহের স্থান করা সমীচীন কি না তাহা দেখিবার জন্য শীঘ্রই মনিপুর যাইতেছেন। যত সত্বর হউক তিনি আসামের দিকে গেলেই খুব ভাল হইবে। ইনি (M. S. Aney) গভর্ণমেণ্ট

যমুনাদাস বিশ্রামভবন—মান্দালয়

অব্ ইণ্ডিয়ার সমুদ্রান্তর দেশ প্রভৃতির জন্য ভারপ্রাপ্ত সভ্য (Member in charge of the Overseas Department of the Government of India).

ইরাবতী নদীর একাংশের দৃশ্য

এই আনে সাহেব পূর্ব্বে একজন কংগ্রেসের নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার বাড়ী মধ্যপ্রদেশের অমরাবতীতে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে ইনি সহায়তা দিতেন। তবে এখন যে গভর্ণমেণ্ট মেম্বর হইয়াছেন তাহাতে সকলেই বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। এমন অনেকেই হইয়াছেন। বাঙ্গালায়ও যাঁহারা নামকরা কংগ্রেসের লোক ছিলেন, এরূপ কেহ কেহ এখন মন্ত্রী হইয়াছেন অথবা মন্ত্রীসভা গঠনে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য এরূপ করা আবশ্যক হইয়াছে।" এই উক্তি আমার কাছে যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না। বাঙ্গালার লোক হিন্দু মুসলমান এক মায়ের সন্তান—তাহা কার্য্যকালে না হইয়া পারে না।

গতকল্য দেখিলাম তিন চারিহাজার লোক ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলের উস্থি, দেউলে, প্রভৃতি স্থানের দুই দিনের মধ্যে গ্রাম পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইয়া "বাঁচিতে চাই, বাঁচিতে চাই" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ীর দিকে যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে দেখিলাম অনেকেই আমার মক্কেল ছিল। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, "হিন্দু মুসলমান আমরা সবাই এক"। এইদেশে হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া আটশত বৎসর যাবৎ বাস করিতেছি। উভয় জাতি এক সূর্য্যের আলো ও তেজেই বর্দ্ধিত হয়, উভয়েই এক নদীর জলই পান করে, একরকম ট্যাক্সই দেয়, রাস্তাঘাটও সমভাবেই উভয়ে ব্যবহার করে। তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ বা অনৈক্য হওয়াটাই কাল্পনিক। এখন যাহা হইতেছে তাহা স্বরূপ অবস্থা নয়, ঐক্যই স্বরূপ অবস্থা। সুতরাং মৈত্রী আসিবেই আসিবে। যখন সকলে পেট পুরিয়া খাইতে পারিতে পারিবে, তখনই মৈত্রি আসিবে। যাহা হউক, এক সময়ে যাঁহারা কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উপরোক্ত ব্যক্তিরা মনে করেন উচ্চ উদ্দেশ্যেই তাহারা মন্ত্রীত্বাদি গ্রহণ করিতেছেন। যতটুকু পারেন কাজ করুন, তাহাতে আপত্তি কি? কেহ কেহ কাজ করিতেছেনও। যাহা হউক আসল কথা আনে সাহেব যেন ঠিক খাঁটি বুরোক্রেসীর প্রতিনিধি না হইয়া ভারতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সদা কালায় বৈষম্য, আর উহাতে ইন্ধন না পায় সেদিকে খুব লক্ষ্য করেন। একে বর্ম্মা হইতে দেশবাসীরা সমস্ত ছাড়িয়া অতিকষ্টে চলিয়া আসিতেছেন, সাদার প্রতি পক্ষপাত বশতঃ রাস্তায় যদি তাঁহারা তারপর রাস্তায় পড়িয়া থাকেন তবে ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। আনে সাহেবকে পূর্ব্বে খুব তেজস্বী লোক বলিয়া জানিতাম। ভরসাকরি তিনি চাকুরীর মোহে পূর্ব্বের জাতীয়ভাব রক্ষা করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

হাঁ, যে ডিব্রুগরের কথা প্রথমে বলিতেছিলাম তাহাই যে ভুলিয়া গিয়াছি। এই যে চারিটী রাস্তার কথা বলিলাম, এই সব রাস্তায় চীনদেশ পর্য্যন্ত কোন মাল সরবরাহ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অথচ চীনকে সাহায্য করা বিশেষ দরকার। জাপান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, মালয় ও ব্রহ্মদেশে যখন প্রবলভাবে আক্রমণ চালাইতেছিল তখন চীন ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াই সস্ত্রীক মার্শাল চিয়াং-কাইশেককে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। মার্শাল এবং তাঁহার বিদুষী পত্নী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মপথ রুদ্ধ হওয়ায় চীনদেশে ভারত হইতে

মাল যাইতে না পারিলে চীন খাদ্যাভাবে খুবই অসুবিধায় পড়িবে। একে চীনের পার্শ্বে সমুদ্র নাই, বাহির হইতে মাল আসিবার সম্ভাবনা নাই! পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত হইতে রুশিয়াও তাহাকে সম্ভবতঃ সাহায্য করিতে পারিবে না, রুশিয়া এখন জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে অত্যন্ত বিব্রত, এখন চীনের উপায়? তাই বলি, এখন যদি ভারতবর্ষ সাহায্য পাঠাইতে না পারে, তবে চীনের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ডিব্রুগর রাস্তায় 'সদীয়া' দিয়া চীনে মাল পাঠাইবার জন্য নাকি একটা রাস্তা খুলিবার কথা আছে। সদীয়ার পশ্চিমে ভূটান, পূর্ব্বে চীন। এইস্থান দিয়া যাতায়াত কিন্তু বড় দুর্গম। পাতকাই পাহাড় ও লামকিউ পাহাড়ের গিরিবর্ত্ম (?) হইয়া আসিতে হয়। অনেক স্থানে পাহাড় দুরারূহ।

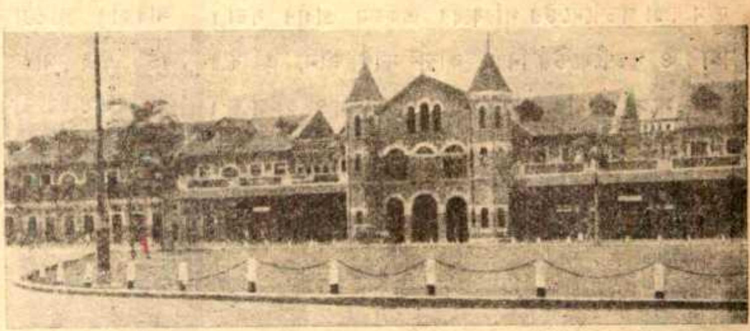

রেঙ্গুন রেলষ্টেসনে প্রবেশ পথ

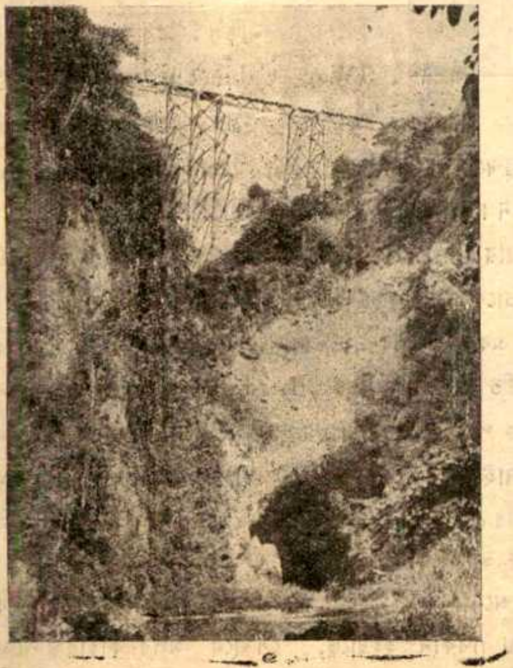

দড়ির সেতু ও গেজেট গহ্বর

এই রাস্তায় কিন্তু মান্দালয়, মেমিও, ভামো প্রভৃতি স্থানের সুবিধা হইবে না, কারণ সদীয়া মান্দালয় হইতে প্রায় ছয়শত মাইল উত্তরে। সদীয়ার পূর্ব্বে উপরোক্ত পাহাড় দুইটীর সীমানা পড়িয়াছে, তার পূর্ব্বেই চীনদেশ আরম্ভ হইয়াছে। যদি এই দিকের রাস্তাটী খোলা হয়, তবে ডিব্রুগর, শিবসাগর প্রভৃতি স্থানের সমূহ বিপদ। বিশেষতঃ পূর্ব্ব হইতেই জাপানের শ্যেনদৃষ্টি ডিব্রুগর অঞ্চলের ডিগবয় স্থানটীর উপরে রহিয়াছে, কারণ জাপানীরা বর্ম্মার ইনানজাঙ্গের তৈলের খনি লইয়াই কেবল সন্তুষ্ট থাকিবেন না, তাহারা ডিগবয় হইতেও তৈল সংগ্রহ করিতে চাহিবে। তাই আমি ডিব্রুগরের জন্য বিশেষ চিন্তিত আছি। আমাদের দেশের অনেকে, আমাদের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবও সেখানে আছেন। ভগবান সর্ব্বদা তাহাদিগকে মঙ্গলে রাখুন। আমরা ভাল আছি। কলিকাতায় বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কলিকাতা নিরাপদ তো?" আমি বলি নিরাপদ থাকুক আর না থাকুক আমি শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতাতেই থাকিব। এই বৃদ্ধ বয়সেও যদি দেশবাসীর সামান্য সেবায়ও দেহ নিয়োজিত করিতে পারি, তবে বেশ সুখেই থাকিতে পারিব। দেখি, ভগবান কি করেন। আগামীবারে তোমাকে মেমিও, গেজেট গহ্বর, লাসিও প্রভৃতির ও রেলপথের কথা লিখিব। তোমাদের মঙ্গল চাই। ইতি,

হেমেন্দ্র

কলিকাতা, ১২ এপ্রিল

প্রিয় ভূপেন্দ্র,

বর্ম্মার কথা ভাবিতে ভাবিতে অদ্য তোমাকে একটী দরকারী বিষয়ে পত্র লিখিতে বসিয়াছি। কিছুদিন হইতে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস এখানে আসিয়া বসিয়াছেন। আমাদের দেশের সব নায়কের সঙ্গেই প্রায় তাঁহারি আলাপ হইয়াছে।

পার্লামেণ্টের তরফ হইতে ভারতীয় নেতাদের সহিত একটা আপোষ মীমাংসা হইতে পারে কি না তাহা বুঝিবার জন্তই তিনি প্রধানতঃ দিল্লী আসেন। প্রস্তাবও হইয়াছিল, অনেক দিন পর্য্যন্ত পরামর্শ হইতেছিল কিন্তু অবশেষে সব প্রস্তাবই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

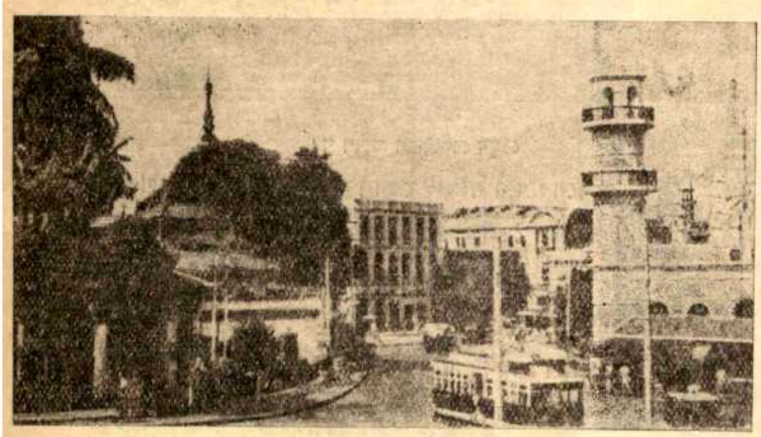
রেঙ্গুন সহরের একাংশ

তুমি বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের পরিষদের একজন প্রবীণ সভ্য। কাউন্সিল ও গভর্ণমেণ্টের নিয়ম কানুন সবই জান, এবিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার অনেকটা আলোচনাও হইয়াছে। তাই তোমার কাছে লিখিতেছি। বিশেষতঃ বর্ম্মার ঘটনাবলীর সঙ্গে এই ব্যাপারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। তোমার মনে আছে, ১৯৩৯ সালে প্রথমে যখন জার্ম্মানীর সঙ্গে ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ বাধে, বড়লাট বাহাদুর ভারতীয়গণ যাহাতে যুদ্ধে অর্থ ও সৈন্তের সহায়তায় মিত্রশক্তিকে সাহায্য করে এই সম্বন্ধে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। তখন কংগ্রেস ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটী প্রস্তাব পাশ করিয়া নির্দ্দেশ দেন, যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যুদ্ধ এবং সন্ধির কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা বুঝিবার অধিকার না পাওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না, সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয় থাকিবে এবং লোকদিগকে বলিবে, "কেহ যুদ্ধে যাইও না"। এইভাবে অনেকদিন চলে। তারপরে পুনার ও বর্দ্দোলীর প্রস্তাবে স্থির হয় যে, আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারি। কিন্তু সে স্বাধীনতা কেবল কথায় মিটিবে না—এখনি এমনি ভাবে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে যে আমরা যেন তাহাতে বুঝিতে পারি যে আমরা যথাসময়ে স্বাধীনতা নিশ্চয় পাইব। তাহাতেও কিছু হইল না। অতঃপর জাপান যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়, অল্পদিনের মধ্যেই তড়িৎ গতিতে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, পার্ল দ্বীপ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, পূর্ব্ব ভারতীয় সুমত্রা, যাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলে, এমন কি, মালয় অধিকার করে এবং আরও বিস্ময়ের বিষয় যে সিঙ্গাপুরেরও পতন হয়, তখন বোধ হয় ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ সচকিত হন। কিন্তু তথাপি কিছু হয় না, প্রধানমন্ত্রী মহাশয় (মিঃ চার্চ্চিল) পার্লেমেণ্টের সভ্যগণকে একরকম ধমক দিয়াই নিজের কার্য্যাবলীর অনুমোদন করাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপরে আবার যখন সংবাদ আসিল জাপানীরা বর্ম্মাদেশের মৌলমিন ও টেনাসিরিম বিভাগ অধিকার করিয়া লইয়াছে। রেঙ্গুন ও প্রায় হস্তগত করিয়াছে, এবং বর্ম্মার অন্তান্ত সহরের দিকেও তাহারা ধাবমান হইয়াছে তখন প্রকৃতই সরকারের সিংহাসন নড়িল। ব্রিটিশ সমর-সভা (War Cabinet) স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে পাঠাইয়া দেন যেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া তিনি একটা আপোষ রফা করিয়া ফেলিতে পারেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দূরদর্শিতা রুশিয়ার ব্যাপারে বেশ প্রমাণিত হইয়াছে। স্তার ষ্ট্যাফোর্ড রুশিয়াকে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাইতে সক্ষম হইয়াছেন। ইনি একজন বিশেষ প্রতিভাবান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যারেষ্টার। সম্প্রতি ইনি পার্লেমেণ্টের Lord Privy Seal-এর সম্মানজনক পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন সুতরাং ইনি কৃতকার্য্য হইবেন বলিয়াই সকলের বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার চেষ্টা সাফল্যলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি নাকি ভগ্নহৃদয়ে শীঘ্রই স্বদেশ যাত্রা করিবেন।

অনেকে মনে করেন যে, এতবড় রাজনীতি বিশারদ যে কার্য্যে ব্যর্থকাম হইয়াছে, সেখানে অপর কাহারও পক্ষে আপোষ রফা করা সম্ভব হইবে না। কতবড় রাজনীতিতত্ত্ব তাহা আমি জানি না, তবে বর্ত্তমান ব্যাপার সূক্ষ্ম নীতিজ্ঞানের

পরিচয় পাই নাই, পরিচয় পাইয়াছি আইন ব্যবসায়ীর ধাপ্পাবাজীর কুশলতার। আর রুশিয়াকে যুদ্ধে নামাইয়া কাহারও উপকার করিয়াছেন বলিয়া তিনি মনে করিয়া থাকিতে পারেন, আমার কিন্তু তাহা মোটেই মনে হয় না। এই ভীষণ ও আত্মঘাতী যুদ্ধে রুশিয়া যদি না নামিয়া কোনপ্রকারে সরিয়া থাকিয়া মীমাংসা করিতে পারিত, তবে ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত বলিয়া ষ্টালিন পূজা পাইতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া ষ্টালিন যে বিশেষ বুদ্ধির কাজ করিয়াছে, আমার মনে হয় না। আর ক্রীপ্স্ও প্রকৃতপক্ষে জগতের হিতসাধন করিয়াছেন, আমার তাহা মনে হয় না। এই সমস্ত প্রাণঘাতী Ismএর বিরুদ্ধে তুমি আমার নিজের ব্যক্তিগত মত জান। Fascism বা Nazism আর ঘোর বিরোধী Communism বা Socialism ও চাই না, কিন্তু তাই বলিয়া ইংরাজ যে Imperialism-এর চূড়ান্ত দেখাইতেছে তাহা কখনও পোষকতা করি নাই, করিবও না। আমরা কাহারও অধীন থাকিতে চাহি না। আমরা খাইয়া পরিয়া থাকিতে চাই। অন্নাভাব, খাদ্যের অল্পতা দূর হউক, দেশে প্রচুর শস্য সম্ভার হউক, লোকের অসন্তুষ্টি দূর হউক, দেশে চুরি, ডাকাতি, বিশ্বাসঘাতকতা, মারা-মারি খুনোখুনী, প্রভৃতি নির্ম্মূলিত হউক, সকলে সুস্থ, সবল হইয়া উঠুক, অকালবার্দ্ধক্যে লোক যেন নিস্তেজ, কর্ম্মে অযোগ্য না হইয়া পড়ে আর দেশ হইতে আকালমৃত্যু লুপ্ত হউক—ইহাই আমাদের কাম্য, ইহাই আমরা চাই। আমরা নিজেও এইরূপ প্রাচুর্য্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারি এবং ক্রমে জগতের অন্যান্য দেশেরও অভাব দূর করিতে পারি। ইহাই আমাদের সাধনা হউক। সমগ্রভারত নূতন বৎসরে এইভাবে যদি গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি সঙ্কলিত করিতে পারে, ভারত আবার সমগ্র জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এ বিষয়ে আমি তোমাকে কিছু বলিয়াছি, আরও বলিব। ইতি—

হেমেন্দ্র

প্রিয় ভূপেন্দ্র,

গতকল্য তোমাকে Sir Stafford Cripps এর কথা কিছু বলিয়াছিলাম। দূর হইতে রাজনৈতিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার আগ্রহ স্বাভাবিক মনে করিয়া অদ্য তাহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব। তিনি করাচি চলিয়া গিয়াছেন, এবং করাচি হইতে দুই এক দিন মধ্যেই নাকি সদলবলে লণ্ডন প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ব্রিটিশ সমর সভা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড মার্চ্চ মাসের শেষভাগে দিল্লী আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি প্রস্তাবের একখানি খসরা নিয়া আসেন। প্রথম দুইএকদিন সাংবাদিকগণকে খুব অপ্যায়িতও করিলেন।

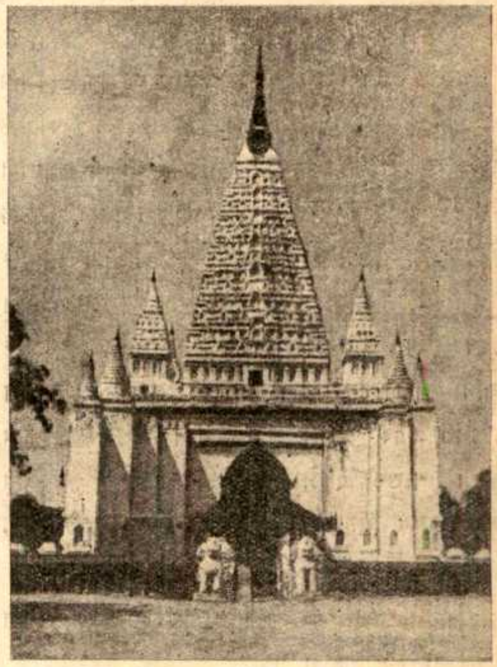

মহাবোধী মন্দির—প্যাগান

তাহাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে হাসিতে লাগিলেন, তাহারা হাসিল, তিনিও হাসিলেন এবং যে সকল নেতৃবৃন্দ তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইত, সকলকেই নাকি ফিরিয়া যাইবার সময় হাসিমুখে যাইতে বলিতেন। কিন্তু যে ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত হাসিতে পারে, তাঁর হাসিই খাঁটি হাসি (He laughs best who laughs last).

দেখিলাম মৌলানা আজাদ, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট গম্ভীর ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বুঝা গেল তিনি বড়ই চিন্তাকুলচিত্ত, মোটকথা তিনি খসরাখানি পড়িয়া মোটেই খুসী হইতে পারেন নাই। ইহার ২।৩ দিন পরে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের হাসির মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। এব

কিছুদিন পরের ছবিতে তাহার মুখে আর হাসিই দেখিলাম না। শুনিলাম কাল নাকি তিনি কংগ্রেসীয় নেতৃবৃন্দকে একটু অসন্তোষ ভাবেই বলিয়াছেন, "আপনারা বড় দর কষাকষি কচ্ছেন, একি মাছ বিক্রয়, না গাছতলার উকীলের সওয়াল জবাব, যা দিচ্ছি, তাই নিন্!"

স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্

আজ আবার শুনিলাম তিনি কিছু করিতে পারিলেন না পারিলেন না বলিয়া অসন্তোষ চিত্তে একেবারে করাচী ধাওয়া করিয়াছেন। যাওয়ার সময় নাকি বলিয়া গিয়াছেন, "আচ্ছা, আপনারা সম্মত হলেন না। আমি যে অমৃত ফলটী দেবার জন্য বড় আগ্রহে এনেছিলাম সেইটী ফিরিয়ে নিলাম!" আজ একটী গল্প মনে পড়িল। এক জামাই শ্বশুর বাড়ী গিয়া কয়েকদিন রহিয়াছেন। শাশুড়ী একটী কাঁঠাল ভাঙ্গিয়াছেন। একবার ভদ্রতার অনুরোধে জামাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জামাই, কাঁঠাল কি খাবে?"

অনুরোধটা খুব আন্তরিক মনে না করিয়া জামাই উত্তর করিল, "কে বা দেয়, কে বা খায়?"

শাশুড়ীও বলিলে, "খেলে খেলে, না খেলে না খেলে, আমি তো খেতে অনুরোধ কল্লাম!"

এ ক্ষেত্রেও তাই হইয়াছে। প্রায় দুই সপ্তাহ আলোচনার পর কংগ্রেস যখন অসমর্থতা জ্ঞাপন করিয়া গত ১০ই এপ্রিল ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে একখানি সুদীর্ঘ পত্রে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া দেয়, স্তার ষ্ট্যাফোর্ড তার উত্তরে লেখেন—

"যে সমস্ত সর্ত্তে সমস্ত দল একত্রীভূত হইয়া ভারতীয় রক্ষণব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, তাহা প্রতিপালন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিল।"

The Working Committee has not seen its way to join in the war-effort upon the conditions which could have brought together all the different Communities and sections of the Indian people.

ইহার উত্তরে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদও ধীর নির্ভীকভাবে উত্তর দিয়াছেন, "ম'শায়গো, আমরা দেশরক্ষাই চাই, কিন্তু আপনারা চান আমাদের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি ও রেষারেষির শক্ত বাঁধন রাখিয়া আপনাদের শাসনরজ্জু চিরস্থায়ী ও দৃঢ় করিয়া রাখিতে।"

You want to hold on as long as you can by promoting discord and disruption.

এই দর কষাকষি সম্বন্ধেও জওহরলাল বলেন, "বা বেশ কথা, আপনারা আপনাদের কোন দোষ আর দেখচেন না। আপনি প্রথমে আসিয়া বলেন India House থাক্‌বে না— আর আপনি প্রথমে বলেন, আপনি এসেছেন এই উদ্দেশ্যে, যে আমরা এখন "জাতীয় গভর্ণমেণ্ট" চালাব এবং আমাদের বাদ বিসম্বাদ সব নিজেরা মিটিয়ে নেব। এই সব বিষয়ে আপনি আমাদিগকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু এখন দেখছি আপনি আপনার কথা সব ফিরিয়ে নিচ্ছেন নূতন কথা বলছেন।"

জওহরলাল সম্প্রতি একটু তীব্রভাবেই কথাটার উত্তর দিয়া বলিয়াছেন—

"বিশ্বসংসারে দেখিতে পাই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে। একমাত্র ব্রিটিশেরাই মনে করে, তাহারা যাহা কিছু করে তৎসমস্তই ঠিক এবং তাহাদের যাহারা বিরোধিতা করে তাহারা যে কেবল ভুলই করে তাহা নয়, ব্রিটিশদের মতে তাহারা মারাত্মক ভুল করিয়া থাকে।"

এখন তোমার জানিবার স্বতঃই ইচ্ছা হইবে যে কি লইয়া এই সমস্ত গোলমাল হয়। ষ্ট্যাফোর্ড যে খস্‌ড়াখানি আনেন, তাহাতে বলা হয়—

(১) ভারতবর্ষ যুদ্ধান্তে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়া একটী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন। সুবিধা হইলে ইহা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে।

(২) প্রত্যেক প্রদেশ এইরূপ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবে এবং ইচ্ছামত মূল ভারতীয় গঠনতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে।

(৩) সমস্ত প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদ মিলিয়া নিয়মাবলী গঠন করিবেন। (Constitution making body)

(৪) করদরাজ্যগুলিও নিয়মাবলী গঠন সভায় প্রতিনিধি পাঠাইবেন। ইচ্ছা হইলে তাহারাও মূল গঠনতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবেন।

এই নবসংস্কারে অখণ্ড ভারতের সমস্যা মিটে না। ভারতীয় করদরাজ্যগুলি যদি বিচ্ছিন্ন হয়, আর প্রদেশগুলিতে যদি হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান গঠিত হয় তবে অখণ্ডভারতের প্রশ্ন স্বপ্ন মাত্র।

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভা এই খস্‌ড়া অগ্রাহ্য করিয়া স্যার ষ্টাফোর্ডকে জানাইয়া দেয় যে, ইহা তাহারা গ্রহণীয় মনে করিতে পারে না। মহাত্মাজীও তাঁহাকে বলেন, "আপনি দিচ্ছেন একখানি Post-dated চেক"—অর্থাৎ পরে কি হবে না হবে জানা নাই, সেইরূপ তাই দিচ্ছেন।

যাহাহউক, ইহার পরে ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত ঘন ঘন স্যার ষ্ট্যাফোর্ড কংগ্রেসের প্রসিডেণ্ট আজাদ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেন। দুইটী বিষয়েই সমস্যা আসে—

(১) যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট হইবে, তাহাতে মন্ত্রী-সভাই (Cabinet) কাজ করিবেন গভর্ণর জেনারেল, ঐ সভার সভাপতি থাকিবেন।

(২) ঐ সভার একজন সভ্যের উপরে দেশরক্ষার ভার নিয়োজিত থাকিবে। তবে যুদ্ধের সময় যিনি কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ থাকিবেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম চালাইবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সবই করিবেন।

মৌলানা আজাদ

কংগ্রেস সভাপতি স্পষ্ট করিয়া বলেন, "দেখুন, করদরাজ্য, হিন্দুসভা, লীগ, কংগ্রেস কোন প্রতিষ্ঠানের মুখ চাহিয়া আমরা কিছু বলিতে চাই না। কে বা কয়জন কোন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধি হইবে তাহাও আমরা বলিতে চাই না। কেবিনেট বা মন্ত্রীসভা হইলে যে সম্প্রদায় হইতে যত জন প্রতিনিধি হউক না কেন আপত্তি নাই। ঐ দুইটী হইলে আমাদের গোল আমরা মিটাইয়া লইতে পারিব। দেশরক্ষার জন্য যদি আমরা সকলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হই এবং প্রাণ দিব তথাপি আত্মসমর্পণ করিব না, এই যদি আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প হয় তবে আমরা সামান্য সামান্য বিষয়ে কোন মতপার্থক্য দেখাইতে চাই না।

ক্রীপস্ বলেন, "তাহাতে যে দলের মেজরিটি হইবে, তাহাতেই একতন্ত্র শাসনই প্রমাণিত হইবে।"

পণ্ডিত জওহরলাল

কংগ্রেস বলেন, "তাহা কেন হইবে, আমরা তো কংগ্রেস বা লীগ বলিয়া কিছু বলিতে চাই না। আমরা চাই সমগ্র দেশ।"

কিন্তু ক্রীপস বলেন, "না, গভর্ণমেণ্ট এখন পরিবর্ত্তিত হইবে না। পূর্ব্বে যেরূপ ভাইসরয়ের কাউন্সিল ছিল, এখনও তাহাই থাকিবে, তবে আপনাদের ক্ষমতা বাড়িবে।"

এই দেশরক্ষা সম্বন্ধে কংগ্রেস জানিতে চাহিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ ক্ষমতা দেশরক্ষা-সভ্যের থাকিবে, কোন্ কোন্ ক্ষমতা প্রধান সেনাপতির থাকিবে। কিন্তু ক্রীপস্ সাহেব তাহা বলেন নাই, পরে জানান যে, এখানকার সমরাদি পরিচালিত হয় ব্রিটেনের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে। সুতরাং ডিফেন্স সভাকে নূতন কিছু দেওয়া হইবে না, পূর্ব্বের নিয়মই চলিবে।

সুতরাং সবই ফাঁসিয়া গেল। ব্রিটেন কিছু দিবে না। তবে দেশরক্ষা হয় কিরূপে? আমাদের কি উচিৎ নয় আমাদের দেশরক্ষা করা? জওহরলালজী বলেন, "আমরা প্রাণ দিয়াও পরস্পরকে সাহায্য করিব। ট্রেণ, জাহাজ বন্ধ হইলে সকলের সাহায্য করিব। যুদ্ধ করিবনা কিন্তু শত্রুর সঙ্গে অসহযোগিতা করিব।"

আমরা বলি বিনা যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তি নিজের সম্মান রক্ষা করিয়াও আবার জগতে একচ্ছত্রতা বিস্তার করিতে পারে। কিরূপে হয় তাহা তুমি যাহাতে ভাল বুঝিতে পার তজ্জন্য

আমি তোমাকে দুইখানি পুস্তক পাঠাইলাম। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এবিষয়ে আমাকে লিখিবে। আমি তোমাকে এই বিষয়ে আরও লিখিব। ফাঁসিয়া গিয়া খুব ভালই হইয়াছে। এই শেষ মুহূর্ত্তে যুদ্ধে যাইবার জন্য মনোবৃত্তি গঠন করা সহজ নয়। আর ইহাতে অসংখ্য লোকের প্রাণ যাইত। জওহরলালজীর দেশভক্তির প্রশংসা করি, কিন্তু তিনি যে পোড়ামাটীর কথা বলিয়াছেন তাহা ভাল লাগিল না। আজাদ সাহেব খুব গাম্ভীর্য্য ও নির্ভীকতার সহিত সমস্ত কার্য্য চালাইয়াছেন। তিনি আরও ২।১ বার প্রেসিডেণ্ট থাকিলে ভাল হয়। তিনি যে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাকে সাধুবাদ ছাড়া আর কি দেওয়ার আছে ?

তোমার হেমেন্দ্র

[ক্রমশঃ

ছিন্ন-কোরক

শ্রীমতী শোভা দেবী

কন্যারূপে এসেছিলে অলকার আসন ত্যজিয়া
শাপভ্রষ্টা ওগো পদ্মালয়:—
এসেছিলে বাৎসল্যের ক্ষীরোদ মথিয়া
নন্দনের পারিজাতকলি
মাতৃক্রোড়ে করেছিলে খেলা।

* * *

মেনকা জননী সম তোমার জননী
'আশুতোষ-যোগমায়া' পৌত্রী তুমি ওগো কমলিনী,
ভবানীর বরপুত্র তাতগণ তব
অস্ফুটন্ত কলিদল ভাই-বোন সকল বিভব
দুদিনের তরে শুধু আসি'
ফিরে নিয়ে চলে গেলে আনন্দের সবটুকু হাসি –
কেটে গেল বেলা ॥

* * *

স্নেহরত তোমার স্বজন
তোমারে ঘিরিয়া তারা আত্মহারা
দেখেছিল সোনার স্বপন,
সব সাধে বজ্র হানি হাহাকারে ভরি প্রাণ
কোন স্বর্গে করিলে গমন ?

সর্ব্বগুণে গুণময়ী দেবী রূপে
গৃহে এসেছিলে,
পদ্ম-কর পরশনে সব ঠাঁই অমৃতে ভরিলে,
সুললিত সুধাকণ্ঠে
মাধুর্য্যের মৃদু মধু সুর
ও প্রাণের পরিচয়ে এনেছিলে আপনার
নিকটে সুদূর।

কে জানিত অপূর্ব্ব মায়ায় ভরা মনে
হৃদয় ভরিয়া দিয়া সকলের প্রতি জনে জনে
আপন বৈকুণ্ঠে যাবে ফিরে,
ওগো বাণী, ওগো লক্ষ্মী
দিবসে' করিয়া বিভাবরী,
শূন্য করি এ সংসারে
যাবে চলে যাঁর অন্বেষণে
তাঁর পায়ে দিতে অর্ঘ্য আপনারে
প্রাণের ঠাকুরে
সুন্দর জীবনে।
তা কি মোরা জানি!
ক্ষণে ক্ষণে 'নীলিমার' নীল নেত্রে
নীলিমা আবিল হয়ে আসে,
তাকি মোরা জানি!
'নীলিমার' প্রাণ-পদ্মে ব্রজের সে নীলমণি হাসে,
সে বাঁশীতে শুনেছে সে সুর
চিরন্তন অতীতের রূপলীলা
অপূর্ব্ব মধুর,
ডাকে কৃষ্ণ বাঁশরীর তানে
শ্রীরাধিকা মুক্তি নিল' "নীলিমার" আত্মদরশনে।

অনন্ত মিলন তরে
অন্তহীন নীলিমার পথে
যাত্রী হল অনন্তের রথে
দেবতার প্রীতিভরা পুষ্পবৃষ্টি ঝরে
তব শির পরে।

হারাইয়া জীবন সম্বল
অশ্রুর সায়র মাঝে
স্মৃতির তরণী বাহি
মোরা খুঁজি সে নীল কমল

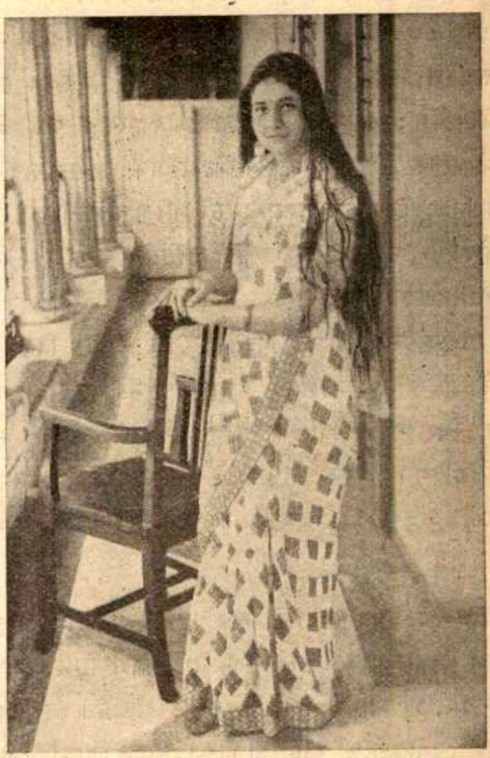

নীলিমা মুখার্জ্জি *

যুগে যুগে হে চির-কিশোরী
অনন্ত কালের বক্ষে এঁকে যাও পদচিহ্ন তব,
নিত্য নব নব—
হেথা স্নেহ সরোবর কোলে
ছিন্ন-কোরকের মত লুলিত মৃণালখানি তব
তব প্রিয়জন বুকে পূর্ণস্ফুট হেম শত দল
জেগে রবে নয়নের জলে।
তোমার মধুর স্মৃতি
মানস ভরিয়া রবে জাগি
নীলিমায় হয়ে ধ্রুবতারা॥

---

* শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা।

মাটির বাঁধন

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

ইছামতী নদীর তেঁতুল তলার ঘাটে চৌকা একটি কাঁচের লণ্ঠন এক একবার উঁচু করিয়া ধরিয়া শ্রীমন্ত চক্ষু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নদীর অপর তীর পর্য্যন্ত এক একবার দেখিয়া লইতেছিল; ঐ বুঝি একখানা নৌকা দেখা যায়, হাঁ, ঐ নৌকাতেই তাহার মনিব আসিতেছেন। তাহার সারা দেহে অমনি একটা স্বচ্ছন্দ পুলকের ঢেউ বহিয়া যাইতেছিল। কিন্তু নৌকাখানা ঘাট অতিক্রম করিয়া যাইতেই সে আবার নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল।

একে ত' সূচিভেদ্য অন্ধকার, বড় একটা কিছু দেখা যাইতেছিল না; তাহাতে আবার লণ্ঠনের মধ্যকার ল্যাম্পটি ধূম উদ্গীরণ করিয়া কাঁচগুলি মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে সত্যই একখানা নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল এবং তাহার মধ্য হইতে সুনীল বাহির হইয়া আসিল।

সুনীল ঈশ্বরপুরের জমিদার দক্ষিণারঞ্জন রায় চৌধুরীর পুত্র; বিলাত হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া সপ্তাহকাল হইল কলিকাতায় আসিয়া এখন দেশে ফিরিতেছে। অধিকাংশ পথই রেলগাড়ীতে কাটাইয়া মাইল ছয়েক রাস্তা নৌকায় আসিতে হইতেছে।

সুনীলের জন্য শ্রীমন্ত সর্ব্বপ্রথমে ঘাটে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে কেহ পাঠায় নাই, ঔৎসুক্যবশতঃ নিজেই উদ্যোগী হইয়া আসিয়াছিল। পরে জমিদার বাড়ীর লোকজনও ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুনীল তীরে নামিবামাত্র যুক্ত করে সকলে তাহাকে নমস্কার করিল।

শ্রীমন্ত একেবারে কাছে আগাইয়া গিয়াই নমস্কার করিল। কিন্তু সুনীল তাহার দিকে তেমন লক্ষ্যই করিল না। তোরঙ্গ, বিছানাপত্র সমস্ত ঠিকমত নামান হইল কিনা এক নজর দেখিয়া লইয়া পাইক বরকন্দাজদিগের আগে আগে সে চলিয়া গেল।

শ্রীমন্ত প্রাণে বিলক্ষণ আঘাত পাইল। কারণ ইহার পিতা দক্ষিণারঞ্জণের সহিত তাহার সম্পর্কটা ঠিক এ ধরণের ছিল না। দক্ষিণারঞ্জনের রাজপ্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড সৌধের ঠিক পশ্চিমের গায়েই তাহার গোলপাতার কুঁড়ে ঘর। দক্ষিণদিকে উভয় বাড়ীর সদর এবং বাড়ীর সীমানা দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে একটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

বালককাল হইতেই শ্রীমন্ত জমিদার বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিত। দক্ষিণারঞ্জন তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সে সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁহার সাথে সাথে বিচরণ করিত। বাহিরে যাইতে হইলে অন্যান্য লোক লস্কর বিস্তর সঙ্গে থাকিলেও শ্রীমন্তকে না লইলে তাঁহার চলিত না। তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছল্য এবং আপদ-বিপদের প্রতি এরূপ প্রখর দৃষ্টি আর কেহ বড় রাখিতে পারিত না। শীকারে বাহির হইয়া কয়েকবার দস্যু তস্কর এবং হিংস্র বন্য জন্তুর কবলে তিনি পড়িয়াছেন, শ্রীমন্তই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। বন্দুকের গুলী ছুঁড়িতে তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। আবার শ্রীমন্ত কোনরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছে শ্রুতিগোচর হইবামাত্র দক্ষিণারঞ্জন খোঁজখবর লইতেন এবং প্রতিকারের উপায় করিয়া দিতেন। গিন্নীমাতাও তাহাকে সন্তানের মতই দেখিতেন। সে খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া আহারে বসিলে তিনি নিজেই পাতের গোড়ায় উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত দ্রব্য পাইল কিনা তদারক করিয়া দেখিতেন। ইহাই ছিল প্রজা মনিবের সম্পর্ক।

শ্রীমন্তর প্রাণে আঘাত লাগিবার দ্বিতীয় কারণ হইল, সুনীলকে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। ছোটবেলায় কাঁধে চড়াইয়া সে তাঁহাকে হাটে বাজারে লইয়া যাইত। তাহার বাড়ীর বুড়া নিমগাছতলায় ছায়ায় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সেখানে বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত সে কত খেলাই করিত। শ্রীমন্ত ঘোড়া হইত সুনীল সোয়ার হইয়া তাহার পিঠের উপর চড়িত এবং চাবুক মারিয়া 'হট্-হট্' করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিত। চাবুক খাইয়া শ্রীমন্ত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কৃত্রিম ক্রন্দন করিত, সুনীল তাহার মুখের হাত সরাইয়া দিয়া আদর করিয়া তাহার ক্রন্দন থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিত; এবার সত্য সত্যই শ্রীমন্তর

চক্ষে জল আসিয়া পড়িত। এইরূপে বৃদ্ধ ও বালকের সঙ্গে একটা মায়ার বন্ধন দিন দিন দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর সেয়ানা হইলে সুনীল কলিকাতায় গিয়া বহুকাল যাবত পড়াশুনা করিল, পরে বিলাত চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে উভয় সংসারের মধ্যেই বহু ভাঙ্গাচুর আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণারঞ্জন একদিন সংসারের পরপারে যাত্রা করিলেন, গিন্নিমাতাও তাঁহার অনুগামী হইলেন। আর শ্রীমন্তর দুরদৃষ্টের কথা মুখে বলিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। প্রায় বৎসর খানেকের মধ্যেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা একে একে সকলই সে হারাইল, সংসারের সহিত সকল বন্ধনই তাহার চুকিয়া গেল। তাহার শ্মশান-গৃহ হইল স্তব্ধ, জীবন হইল লক্ষ্যভ্রষ্ট, কর্ম্ম হইল উদ্দেশ্যহীন। জমিদার বাড়ীর কার্য্য সে ছাড়িয়া দিল। সে বুঝিয়াছিল, অতঃপর এ ভগ্নহৃদয় লইয়া অপরের কার্য্য সুচারুরূপে তাহার দ্বারা সম্ভব হইবে না।

দীর্ঘদিনের অদর্শনহেতু সুনীলের সঙ্গে স্নেহের সম্পর্কটি তাহার কিছু ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিয়াছিল সত্য। এক্ষণে সে দেশে আসিতেছে খবর পাওয়ায় তাহা আবার উচ্চকিত হইয়া উঠিল। সে দেখিল একে একে সমস্ত বন্ধনই তাহার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু একটি শ্লথ-গ্রন্থির আনন্দ-পীড়নে এখনও তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। রেল হইতে নামিয়া নৌকাযোগে সন্ধ্যার কিছু পরেই সুনীল বাড়ী আসিয়া পৌছিতেছে সংবাদ পাইয়া গৃহে সাঁঝ-বাতি জ্বালিয়াই লণ্ঠনটি পরিস্কার করিয়া লইয়া তেঁতুলতলার ঘাটে আসিয়া সে অপেক্ষা করিতেছিল। যাহার জন্য তাহার শোকার্ত্ত হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা সে কিন্তু ঘাটে নামিয়া তাহাকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। শ্রীমন্ত একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

জমিদার বাড়ীটা প্রাচীন—'সেকেলে' ঢংএ নির্ম্মিত। সুনীলের চক্ষে এবার ইহা বেশ ঠেকিতেছিল। সে ইহার কোন কোন অংশ বিশেষ করিয়া সদরের অংশটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ফ্যাসানে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা করিল। আবার বাড়ীর গায়েই একঘর তিলির বাস এ দৃশ্যটিও তাহার এবারকার চক্ষে আদৌ ভাল দেখাইতেছিল না। শ্রীমন্তকে সে ডাকিয়া পাঠাইল।

খোকাবাবুর আহ্বান পাইয়া একটা নূতনতর উৎসাহে শ্রীমন্তর প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে হৃষ্টমনে জমিদার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল, গ্রামের ক'টি যুবকের সহিত বাহিরের ঘরেই সে উপবিষ্ট আছে।

সে আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলে সুনীল তাহাকে বসিতে বলিয়া কিছুক্ষণ ছেলেদের সঙ্গে গল্প-গাছা করিল তারপর তাহার দিকে মুখ করিয়া বসিল। কহিল, "একটা বিশেষ দরকারে তোমাকে ডেকেছি, শ্রীমন্ত! তোমার বাড়ীটা আমাকে ছেড়ে দিতে হ'বে।"

শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সুনীল বলিল, "আমার এ বাড়ীটা বড্ড সেকেলে ধরণের; শ্রীছাঁদ কিছুই নেই; আমি এটাকে ভেঙ্গে নূতন ভাবে গড়বার মনস্থ করেছি। সদরের দিকটায় প্রথমে হাত দেব। বাড়ীটা আর একটু বাড়াতেও হ'বে। সে কারণে তোমার ঐ জমিটুকু আমার দরকার। তোমাকে আমি অন্যত্র বাড়ী ঘর করে দেব।"

ইহার প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীমন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে কহিল, "ওটা যে আমার পিতি-পিতেমোর ভিটে, খোকাবাবু!"

"তাতে আর কি হয়েছে? পৈত্রিক ভিটে কামড়ে চিরকাল পড়ে থাক্‌তে হ'বে বলে শাস্ত্রে লেখা নেই। আর তোমার আছে বা কে? চোখ বুঝলেই ত' ফর্সা।"

শেষের কথা ক'টি শ্রীমন্তর কর্ণে অত্যন্ত আঘাত করিল। সে কহিল, "জমি-জায়গা আমি এক ছটাক বাড়াতে পারি নি, যা' কিছু বাপ ঠাকুর্দ্দারাই করে রেখে গেছে। কর্‌তি না পারি ঘুচুতি আমি পারব না। লোকে বলবে,—হতভাগা ভিটেটাও ঘুচুলে। চোখ বুজলি ফর্সা, সে কথাটা অবিশ্যি সত্য বলেছ। তখন তোমার সুবিধে মত যা পার কোর, আমি দেখতি আসব না। যে ক'টা দিন পরাণে বেঁচে আছি ভিটেটার উপর থাক্‌তি দাও। মরে গেলি জমি-জাগা তোমারই হ'বে; আমি তোমার কোন অহিত করে যাব না।"

সুনীল বলিল,—"সে ত' পরের কথা। এখনকার কথাই বল। আমি আর দেরী ক'রতে পারব না। মিস্ত্রীকে আমি ডেকে আনতে পাঠিয়েছি। দু'একদিনের মধ্যেই কাজ আরম্ভ করে দেব।"

শ্রীমন্ত কহিল,—"তোমার মত করে আমি ভাবতি পারছি নে. খোকাবাবু। নূতন করে গড়তে হয় গড়। তোমার ত' এক-আধটু বাড়ী না—হাতীর মত বাড়ী। অকারণ আমাকে কেন ভিটে-ছাড়া করতে চাচ্ছ? আমার মুনিবির মুখিই শুনিছি তোমাদের বংশের লোকে যখন এসে গাঁয়ের প্রথম পত্তন করল তখন তাহারাই এই তেলি ঘরকে কাছে এনে বসিয়েছেলেন। সেই যুগ হ'তি তোমাদের পায়ের গোড়ায় পড়ে রইছি। আর সেই যুগ হতি আমার বংশের লোকের হাতে ভিটের উপর স াঁঝ-বাতি জল্‌ছে। আমি আজ কি করে সেই বাতি নিবিয়ে দি?"

জনৈক বন্ধু বলিলেন,—"তুমি না পার, তোমার মনিবই দেবেন নিবিয়ে।"

শ্রীমন্ত ইহার দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি উন্নত করিয়া ধরিল। কহিল,—"আমি ইতর লোক বলে আপনারা একথা বল্‌তি পারলে। যদি ওখানে এক ঘর ভদ্দর লোকের বাস থাকৃত?"

বন্ধুটি বলিলেন,—"ভদ্রলোকের বাস থাক্‌লে সকালে উঠে তার মুখখানা দেখলেও দিনটা শুভ যেত।"

শ্রীমন্ত এবার মাথা উচু করিয়া চক্ষু দু'টি পাকাইয়া ধরিল। তাহার স্মরণ হইল, কর্ত্তাই ত' কতদিন সকালে আসিয়া তাহাকে ঘুম থেকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন; তাঁহার মুখে ত' কোনদিন শুনা যায় নাই যে, শ্রীমন্তর মুখ দেখিয়া তাঁহার এই অশুভ ঘটিল। কিন্তু সে কথা ইহাদের শুনাইয়া দিতেও সে বিরক্তি বোধ করিল।

সুনীল বলিল,—"তোমার কোন অসুবিধা হবে না শ্রীমন্ত! ভাল জায়গা ঠাঁই দেখে আমিই তোমাকে বড়ো ঘর করে দেব। ইটখোলার ধারে যে পতিত জমিটা আছে, সেইখানে গিয়ে তুমি বাস কর। তোমার ঘর বাঁধার ব্যয় আমি দেব।"

এ সকল প্রলোভনেও শ্রীমন্তর মন ভিজিল না। সে আর বাদানুবাদও করিল না। উঠিয়া আসিবার সময় শুধু বলিয়া গেল,—"চিরদিন তোমার আঁস্তাকুঁড়ে পরে আছি, আমাকে ভিটে-ছাড়া কোর না খোকাবাবু!"

সুনীল এইখানেই থামিল না। ইহার পরেও তাহাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাঠাইয়া উঠিয়া যাইবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিল। বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া অবশ্য সহজ কথা ছিল না, কিন্তু সুনীল তাহার পুত্রাধিক প্রিয়। সে বলিতেছে জমিটা তাহার একান্তই প্রয়োজন। আর সে যদি তাহাকে তথায় মাথা গুজিয়া থাকিতে না দেয় মনিবের সহিত বিরোধ করিয়াও বা কি করিয়া সে টিকিয়া থাকিবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ পর্য্যন্ত সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াই সাব্যস্ত করিল। কিন্তু ইটখোলার মাঠে কেন—গ্রামের মধ্যে সে আর বাস করিবে না। দূরের কোন স্থানে সে চলিয়া যাইবে।

পরদিন সকালে দেখা গেল শ্রীমন্ত স্কন্ধে একটা চাদর ফেলিয়া একবস্ত্রে গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইল। একটা বাঁশের লাঠি ঘরের কোন হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাত্রার জন্য সে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং দৃষ্টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাড়ীটার সর্ব্বত্র একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। দেখিল, উঠানে মাচার উপর লাউ কুমরা ঝুলিতেছে, লতার আমগাছটিতে অজস্র ফল ধরিয়াছে। ফলভারে উহার শাখাগুলি ভূয়ে নোঙাইয়া পড়িয়াছে। মিনি বিড়ালটি আবার ঠিক এই সময় কোথা হইতে আসিয়া পায়ের উপর লেজ নাড়িতে লাগিল এবং 'মিউ' 'মিউ' শব্দে ডাকিতে লাগিল। সে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মুখে মুখ ঠেকাইল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল গোয়াল ঘরে ধবলী গাইটা বাঁধা রহিয়াছে; তাহার শিংএর দড়ি খুলিয়া দেওয়া হয় নাই। সে গিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে ধবলী তাহার গা ঘেসিয়া দাঁড়াইল এবং অভ্যাসমত গলাটা বাড়াইয়া দিল। শ্রীমন্ত তাহার গলদেশে হাত বুলাইয়া দিলে চক্ষু বুজিয়া সে কত সুখই অনুভব করে। মিনিকে সে এক হাতে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া অপর হস্তে তাহার গলদেশে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে সে আবার অষ্ট বন্ধনে পড়িয়া গেল। গোয়াল হইতে বাহিরে আসিতেই গ্রামের দিগম্বর ঘোষালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত সকালে চাদর কাঁধে করে কোথায় চলেছ, শ্রীমন্ত?

শ্রীমন্ত কহিল, "তা'র কিছুই ঠিক নেই দাদাঠাকুর! যাই—দু'চোখ যেদিকে যায়।"

দিগম্বর ব্যাপারটা শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, "আমি

সমস্ত শুনেছি। সুনীল বিলেত থেকে ফিরে এসে তোমার উপর খুব উপদ্রব জুড়ে দিয়েছে।”

শ্রীমন্ত যেন কেমন জড়সড় হইয়া কহিল, “উপদ্রব আর কি? তানারই ত’ মাটি, দরকার পড়েছে তাই।”

“তাই কাকেও ভিটে-ছাড়া করতে হ’বে? ও-সব চোখ রাঙানীতে তুমি ভড়কে যেও না। যেদিকে দু’চোখ যায় সেইদিকে ত’ চলে গেলে, তারপরে? দাঁড়াবে কোথায়? মাথা ঠিক রাখ। আমি বলি, তুমি আদালত কর। আজকালকার যে আইন-কানুন, হাকিম দেবে ঠাণ্ডা করে। তোমার হ’ল গিয়ে কায়েমী মৌরশী সত্ত্ব—হুঁ।”

শ্রীমন্ত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, “আদালত করব কার সঙ্গে? খোকাবাবুকে কোলে পিঠে ক’রে মানুষ করলাম—দেখেন নি?”

দিগম্বর বলিলেন, “তা’র ব্যঙ্গটাও আজ আবার দেখ্‌তে পাচ্ছি। ডেকে পাঠায়, আর মাথা চুলকিয়ে বাড়ী এস, তাই ত’ সাহস এতটা বেড়ে গেছে।”

শ্রীমন্ত দিগম্বরের দিকে ক্লান্তস্বরে কহিল, “আদালত করা, ওতে ন্যাটা অনেক। আমার মনিব ছিলেন আমার মা বাপ, তাঁর নুন খেয়েই আমি মানুষ। তাঁনার ছেলের সঙ্গে লাঠালাঠি জুড়ে দিয়ে সে ঋণ শুধতে বলছ ঠাকুর? তার চেয়ে আমার মরণ ভাল।”

দিগম্বর এক বিকট হাস্য করিলেন। বলিলেন, “মরেই ত’ রয়েছ তোমরা। নোতুন করে আবার কি মরবে। দরকার মত এক-আধটু গা ঝাড়া না দিলে সংসারে টেঁকা যায় না। আমার কথা টক্ লাগল; কিন্তু তোমার ভালর জন্যই বলছি, আদালতে ন্যায্য বিচার প্রার্থনা কর্‌লে তা’তে আর এমন কি অন্যায় হ’বে?”

শ্রীমন্ত কহিল, “সকলি বুঝি ঠাকুর! আমার মনিবকে ভুল্‌তি পারলি, সে সমস্ত হতি পার্‌ত।”

দিগম্বর বলিলেন, “নিজ স্বার্থ রক্ষার খাতিরে অনেক কিছুই ভুল্‌তে হয়রে শ্রীমন্ত; বাপ বেটাকে ভুল্‌ছে—বেটা বাপকে ভুল্‌ছে; এমন নিরেট রক্তের সম্বন্ধ তা’রই গতি দাঁড়িয়েছে এই।”

ইঁহাদের মত জ্ঞান শ্রীমন্তর ছিল না। সে বলিল, “আর যাই বল, কর্ত্তার সম্বন্ধে এমন কথা ব’ল না।” বলিয়া মনিবের উদ্দেশ্যে যুক্তকরে উপরের দিকে সে একটা নমস্কার করিল।

দিগম্বর দেখিলেন ইহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। তত্ত্বজ্ঞান ইহার টন্‌টনে। বলিলেন, “যা ভাল বোঝ কর, বাপু! যদি মামলার পথে যাও আমাকে খবর দিও, সহরে নিয়ে যাব সঙ্গে করে আমার জামায়ের ঠেঁয়ে। উকীল বটে। পয়সাকড়ি যতটা সাশ্রয়ে হয় সে ব্যবস্থা আমি করে দেব।”

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। শ্রীমন্তর যাত্রায় এই যে বাধা পড়িল ইহার পর গায়ের চাদরটি দাওয়ার উপর ফেলিয়া রাখিয়া সে এক ছিলিম তামাক সাজিল এবং চক্ষু বুজিয়া আরাম করিয়া সেবন করিতে লাগিল।

২

মানদার মৃত্যুর পর শ্রীমন্তকেই হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে হইতেছিল। গৃহের কাজকর্ম্ম কিছু কিছু সারিয়া সে রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া লইতেছে এই সময় জমিদার বাড়ী হইতে তাহার আবার তলব আসিল। শ্রীমন্ত হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইলে সুনীল জানাইয়া দিল, তাহার আর দেরী করিবার উপায় নাই। কালই সে ভিত কাটাইতে প্রবৃত্ত হইবে।

শ্রীমন্ত গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরে আর ঢুকিল না। খালি পেটে ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটী জলপান করিয়া মাটির উপর মাদুর বিছাইয়া সে শুইয়া পরিল। তাহার মাথাটা অত্যন্ত গরম বোধ হইতে লাগিল। উঠিয়া গিয়া সে জলে ভিজাইয়া আসিল।

বাপ ঠাকুরদাদার বাস্তুভিটা, ইহার উপর কাহারও দরদের অন্ত নাই। গরীবের অন্তর বলিয়া হয় ত’ তাহাকে আঘাত করিতে পারিবে না। আর গরীবের কুঁড়ে বলিয়া ঘরখানাও হয় ত’ শীঘ্র ভাঙ্গিতে পারা যাইবে কিন্তু আভিজাত্যসম্পন্ন কোন লোকের ভিটা ছাড়িতে যে দুঃখ—ইহার দুঃখ তাহা হইতে কম হইবে কেন?

সমস্ত দিনটাই তাহার শুইয়া শুইয়া, গড়াইয়া গড়াইয়া কাটিল। এবং সেই একই শয্যার উপর রাত্রির অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার যেন কেমন শয্যা-কণ্টক উপস্থিত হইল। প্রত্যুষেই সুনীল আসিবে গৃহের ভিত কাটাইতে। সে আর বিছানায় শুইয়া

থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বসিল এবং দাওয়ায় আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

দাওয়ার এক পার্শ্বে বেড়ার দিকে একখানা বেঞ্চি পাতা। তাহার নীচে একটা আগুনের মালসা—ভাঙ্গা কুলায় একরাশ মাখা তামাক ও কাঠ-কয়লা সর্ব্বদা জোগান থাকিত। সে নিজে তামাক একটু বেশী খাইত। আবার পথের লোককে ডাকিয়া ডাকিয়া খাওয়াইত। সেই যে সে আসিয়া বসিল অবশিষ্ট রাত্রিটা বিনিদ্র চোখে সেইখানে বসিয়া বসিয়া শুধু তামাক পোড়াইয়া ছাই করিতে লাগিল।

প্রত্যুষে একবার উঠিয়া গিয়া ধবলী গাইটার শিং-এর দড়ি খুলিয়া দিয়া আবার সেইখানে আসিয়া সে হুঁকা-কলিকা লইয়া বসিল। আম কাঁঠালের বাগান ভেদ করিয়া সূর্য্যটা ক্রমশঃ আরও কিছু উপরে উঠিল। যুগীপাড়ার বসন্ত তাহার গৃহের সম্মুখ দিয়া নিত্যকার মত গরুগুলি লইয়া মাঠে চলিয়া গেল। মুড়ীওয়ালী মাথায় ঝাঁকা লইয়া ফেরি করিতে বাহির হইল। একটু পরেই দেখা গেল সুনীল লোকজন লইয়া তাহার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মজুরেরা ছাড়া তাহার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও সঙ্গে ছিল। শ্রীমন্ত কয়েকখানি জল-চৌকী বসিবার জন্য ইহাদের বাহির করিয়া দিল। কিন্তু তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না করিয়া তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সত্য সত্যই বহুকালের বাস্তভিটাটি এবার ত্যাগ করিতে হইল, এ বিষয়ে এক্ষণে তাহার মনে আর কোন সন্দেহই রহিল না। কিন্তু সে ত' বড় সহজ কথা নয়। এই সেদিনও ত' গৃহত্যাগের জন্য সে পা বাড়াইয়াছিল—পারিল কই? স্থানটিতে কি যাদু আছে। ঘরের বেড়াগুলির উপর তাহার স্ত্রী মানদার হস্তের মাটির মসৃণ প্রলেপ এখনও ম্লান হইয়া পড়ে নাই। পাটের সূতায় নানা রং-এর ছোপ ধরাইয়া কত রকমের সুদৃশ্য সিকা বুনিয়া রান্নাঘরে সে হাঁড়ি-কুড়ি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া গিয়াছে সেগুলি তেমনই রহিয়াছে। ভিতরের বাড়ীর এক পার্শ্বে মানদার হাতের তুলসী পিঁড়িটা কত কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মানদা সকাল বিকাল স্নান সারিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে সর্ব্বাগ্রে এই স্থানটিতে প্রণতা হইত। সন্ধ্যাদীপ দেখাইত। উহার দুই পার্শ্বে দুইটি হেনার ঝাড় মনিব বাড়ী হইতে আনাইয়া নিজের হাতে সে লাগাইয়াছিল। গাছ দুটিতে অজস্র ফুল ফুটিয়া গন্ধ বিতরণ করে। পুত্র কন্যারা পূর্ব্বদিক্‌কার লাউ-মাচার নীচে বসিয়া খেলা ধুলা করিত, তাহাদের পদরেণু ঐখানকার মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। তাহার মাতা যে স্থানটিতে বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছিলেন সে স্থানটি আজিও চোখের সম্মুখে এক বিচিত্র রূপ ধরিয়া আছে। বধূ যে-দিন শেষ বিদায় লইল, আত্মীয় স্বজনেরা যে স্থানটিতে নামাইয়া তাহার কর্ণে হরিনাম শুনাইল, সে স্থানটি হইয়া রহিয়াছে মুক্তির মিলন-তীর্থ। তাহার এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে অতীত জীবনের সকল সুখ দুঃখ কেবল এই জায়গাটি জুড়িয়া ভরিয়া আছে।

শয়ন-ঘরের উত্তরের দিকে ক্যাওড়া কাঠের বড় একখানি খাট। দেশে সাপ-কোপের যে অত্যাচার দক্ষিণারঞ্জন তাহাকে ছেলেপিলে লইয়া মাটীতে শুইতে নিষেধ করিতেন। তাঁহার আদেশক্রমেই খাটখানা সে প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিল। ঐ খাটের উপর প্রতি রাত্রি তাহাদের সুখ-শয্যা পড়িত। তাহার অসুখের সময় মানদা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ঐ খাটের উপর কখনও শিয়রে কখনও বা পদপ্রান্তে বসিয়া কত রকমে যে তাহার সেবা করিত! গৃহের চারিদিকেই এই মায়াজাল বিস্তৃত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহারা এখনও তাহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে নাচিয়া খেলিয়া বেড়ায়। এ দৃশ্য কেবল এইখানেই দেখা যায়, অন্য কোন স্থানের মৃত্তিকার উপর উহা রূপ গ্রহণ করে না। এই তীর্থ-ভূমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

এ দিকে সুনীল তাহার নিজের গৃহ হইতে সরাসরি শ্রীমন্তর বাহিরের উঠানের শেষ পর্য্যন্ত ভিত কাটাইবার জন্য আপততঃ কিছুটা দড়ি খাটাইয়া দিলে মজুরেরা মাটী কাটিতে প্রবৃত্ত হইল। সঙ্গীগণ সহ সুনীল কিছু পরেই চলিয়া গেল। সমস্ত দিন কার্য্য করিয়া বেলা পড়িয়া আসিলে মজুরেরাও সেদিনের মত প্রস্থান করিল। জাগরণ-ক্লান্ত রক্তচক্ষু এবং এক মাথা উস্ক খুস্ক ঝাঁকড়া চুল লইয়া শ্রীমন্ত শুধু একাকী দাওয়ার উপর একই স্থানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ইহারা চলিয়া গেলে তাহার অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ হইতে লাগিল। বাড়ী-ঘর, ক্ষেত-খামার, পুকুর-বাগিচা

সমস্তই আজ যেন তাহার পর হইয়া গিয়াছে। কেহই যেন আর আপনার নাই। সে চিরপরিচিত শয়নকক্ষ, পথ-ঘাট, অন্দরাঙ্গন সবই যেন তাহার জড়চিত্তকে ডাকিয়া ডাকিয়া কহিতেছে,—এ পুণ্যভূমিতে তোমার আর স্থান হইবে না, শ্রীমন্ত !

পেটে ক্ষুধার অগ্নি জ্বালিয়া একই ভাবে দাওয়ার উপর বেড়া ঠেস্ দিয়া আবিষ্টের মত সমস্ত দিনটাই সে বসিয়া কাটাইল। একটিবারের জন্যও ঘরে ঢুকিল না। রাত্রি অধিক হইলে এক সময় একটু তন্দ্রার ভাব তাহার আসিল। সে শুনিল, ভিতরের বাড়ীতে যেন মানদার হাতের কঙ্কণ বাজিতেছে। পুত্র কন্যার সচল পদধ্বনি তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া যেন শব্দিত হইয়া উঠিতেছে।

এ শব্দ আজ নূতন নহে। জাগ্রত অবস্থায়ও তাহার কর্ণে নিত্য ইহা বাজে। শুধু এই বাড়ীটার মধ্যেই বাজিয়া থাকে। ইঁটখোলায় ইহা বাজিবে না। দুনিয়ার অন্য কোনও মৃত্তিকার উপর এ ধ্বনি উঠিবে না। এই স্নেহ—এই স্মৃতি দিয়া ঘেরা ঘনিষ্ঠ তাহার এই গৃহটি।

শিবাগণ এই সময় রাত্রি তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করিতে সে সচেতন হইল এবং গা-ঝাড়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল। গত কাল মজুরেরা বাহিরে বাহিরে কাজ করিয়া গিয়াছে আজ আসিয়া যখন ঘরে হাত দিবে তখন মানদার হস্তের বেড়ায় প্রলেপ, সিকা, ঝাঁপি প্রভৃতি শিল্প বস্তু যাহা সারা গৃহ ছাইয়া আছে, একে একে সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে থাকিবে। ইহা সে দেখিতে পারিবে না।

রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তরল দিবালোকে চতুর্দ্দিক শুভ্র হইয়া উঠিতেছিল। একটু পরেই মজুরেরা আসিয়া পড়িবে। শ্রীমন্ত আর স্থির থাকিতে পারিল না। মনের মধ্যে তাহার একটা সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হইতেছিল বটে কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের কথা স্মরণ হইতে তাহা আবার থামিয়া গেল এবং মায়ার এই দুশ্ছেদ্য বাধা ও বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়া এক বস্ত্রে সে পথে গিয়া উঠিল।

বঞ্চনা

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ওরে অবোধ খুঁজিস কি তুই মন্দিরে,
দেবতা তোর মনের সীমায় বন্দীরে।
ন্যাস্-প্রাণায়াম যতই নাড়িস অঙ্গুলী,
পাষাণ স্তূপে ঢালিস ফুলের অঞ্জলী,
প্রাণের ঠাকুর আসবে নারে আসবে না
কয়লা-প্রাণে তড়িৎ রেখা ভাসবেনা।
ওই যে পথে খুঁড়িয়ে চলে খঞ্জ রে,
আঘাতে আর আঘাতে ওর পঞ্জরে
যে বেদনা নীরবে তা'র নগ্নতা
রেখেছিলো আনমনে—আজ ভগ্ন তা,
ফিরিয়ে দিলি,—এক মুঠো চাল নেই কি রে?
এই দুনিয়ায় সবার সেরা সেই কি রে?
আন ডেকে আন, থাক প্রাণায়াম সঞ্চিত
দীনের ঠাকুর রইবে সে কি বঞ্চিত?
ধর্ম্ম তোমার স্পর্শে হলো নষ্ট কি?
বলিস নে আর ইতর জাতিভ্রষ্ট, ছিঃ।

লুটোপুটি খাচ্ছে চিতা-ভস্মতে
তীর্থ এ যে সবার দেহ স্পর্শতে।
ন্যাস-প্রাণায়াম দেবার্চ্চনার ফুলগুলি,
পাষাণ স্তূপে ফেলিস নে আর,—রাখ তুলি।
ফুলগুলি সব ফেলে দিলি রাস্তাতে,
ঘুণ ধরেছে তোর ধরমের বস্তাতে।
পরশ যেদিন সরস হয়ে লাগবে রে,
প্রাণের ঠাকুর প্রাণ-দেউলে জাগবে রে।
ধর্ম্ম ছলে নিত্য নূতন সয়তানী
দীন দুনিয়ায় করছো কেবল আমদানী।
হিংসাকপট মুখটি ঢাকি গুণ্ঠনে,
ব্যস্ত অসহায়ের জীবন লুণ্ঠনে,
রক্তপায়ী দেখ রে শ্মশান প্রান্তরে,
মহাকালের কিঙ্করেরা গান ধরে।
এখানে তোর নয়কো আসন ভিন্ন রে,
অহঙ্কারের সকল বাঁধন ছিন্ন রে।
রাজাউজীর দীন ভিখারী সকলে,
ঘুমিয়ে আছে—ছিন্ন কাঁথা, মকমলে।

মানুষ শরৎচন্দ্র

শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা

একদিন শরৎচন্দ্রের প্রতিভা অশ্রুসরোবরে শতদল পদ্মের মত সহসা বিকশিত হইয়া উঠিল। আমরা জন্মস্থানের সংবাদ রাখি না—কোথা হইতে তাহা পুষ্টি, শ্রী, মাধুরী ও রসসম্পদ লাভ করিল তাহা জানিতে পারি নাই—উহার মৃণালটি পর্য্যন্ত আমাদের চোখের অন্তরালে। আমরা কেবল জানি রবির কিরণ স্পর্শেই শরতের কোরকটি শতদলে বিকশিত হইয়াছে।

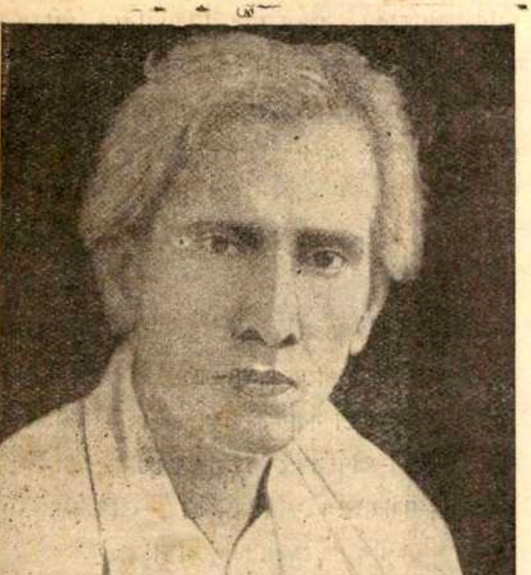

শরৎচন্দ্রের মনের মধ্যে একটা studio নিশ্চয়ই ছিল—তাহার খবর আমরা জানি না, পরিপূর্ণ সৃষ্টিটিই আমরা পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্র যদি সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিতেন, তাহা হইলে সে studioর খবর হয়ত আমরা পাইতাম। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করিয়াও সে studioর খবর আমরা জানিতে পারি নাই।

শরৎচন্দ্রের কৈশোর যৌবনের জীবন আমাদের কাছে রহস্যাবৃত। সেই অজ্ঞাত জীবনের পরিসরটিকে লোকে কতক সত্য, কতক অর্দ্ধসত্য, কতক কল্পনায় ভরিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার রচনার কোন কোন চিত্র-বৈচিত্র্যকে লোকে তাঁহার জীবনেই আরোপ করিয়াছে। তাঁহার জীবনের কোন কোন অস্পষ্ট ঘটনার কথা লোকমুখে প্রচারিত হইয়াছে—কোনটি অতিরঞ্জিত, কোনটি অসম্যক, কোনটি বিকৃত। তিনি আত্মজীবনচরিত লেখেন নাই—কথা প্রসঙ্গে তিনি জীবনের কোন কোন ঘটনার ও বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—সেগুলি কথা-সাহিত্যের পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া গল্পের টেকনিকে বিবৃত। সেগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটা আছে তাহা বিবেচ্য। সমস্ত মিলিয়া শরৎচন্দ্রের একটা মোটামুটি জীবনী আমাদের মনে গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই জীবনীর উপর তাঁহার সাহিত্যবন্ধুগণ সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই—জীবনের প্রকৃত ইতিহাসটি জানিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ ও কৌতূহলের অবধি নাই। এ কৌতূহল অহৈতুক নয়। যাঁহার সাহিত্য এত জীবন্ত, তাঁহার জীবন-কথা না জানিলে তৃপ্তি হয় না। জীবনের সহিত গভীর যোগ না থাকিলে রচিত সাহিত্য এমন জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে না। এ সাহিত্য যে-জীবনের জলন্ত প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি সে-জীবনের কথা জানিতে কৌতূহল হইবারই কথা।

সত্যই শরৎচন্দ্র তাঁহার জীবন দিয়াই তাঁহার সাহিত্য গড়িয়াছিলেন—নির্জীব প্রতিমায় তিনি চেষ্টা করিয়া প্রাণ সঞ্চার করেন নাই। তিনি নিজের চারিপার্শ্বে যাহা দেখিয়াছেন, নিজের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে—তিনি যাহা জীবনের নানাক্ষেত্রে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন, যাহা নিত্যই চোখের সম্মুখে ঘটিতেছে—তাহাই সাহিত্যে রূপদান করিয়াছেন। তাঁহার রচনার চরিত্রগুলিকে 'সৃষ্ট' না বলিয়া 'দৃষ্ট' বলিলেই ঠিক হয়। এই চরিত্রগুলি জীবন্ত মানুষ—এইগুলি Ideas personified নয়, বরং Persons idealised বলা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্রের জীবনচরিত তাঁহার রচনায়

অনুস্যূত হইয়া আছে—কোন একটি চরিত্রে সম্পূর্ণ শরৎচন্দ্রকে সন্ধান করা বাতুলতা, কোন একটি উপন্যাসে তাঁহার জীবনের খোঁজ করা মূঢ়তা। বহু চরিত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্র বিকীর্ণ হইয়া আছেন—বহু চরিত্রের মধ্যে তাঁহার জীবনের রঙ প্রতিফলিত হইয়া আছে—বহু আখ্যানবস্তুর মধ্যে তাঁহার প্রকৃতিটি ওতঃপ্রোত হইয়া আছে। আপন জীবনকে তিনি রূপে রসে ভাববৈচিত্র্যে সম্পূর্ণাঙ্গ ও অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এই জীবনচরিতেই আমাদের তুষ্ট থাকা উচিত, রহস্যময়তার স্বপ্নমাধুরী হরণ করিয়া লাভ কি? সাহিত্যে তাঁহার জীবনের যতটা রসরূপ লাভ করিয়াছে, তাহাই তাঁহার প্রকৃত জীবন, বাকী যাহা তাহা অসার স্থূলাংশ, তাহাকে তিনি নিজেই আবর্জ্জনা বোধে বর্জ্জন করিয়াছেন—তাহার সন্ধান করা প্রাকৃতজনের কাজ। রক্তমাংসের যে স্থূল জীবন তিনি যাপন করিয়াছিলেন তাহার অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য পরিণতিই যদি হইত এই সাহিত্য, যদি কেহ সেই জীবন যাপন করিলেই শরৎচন্দ্র হইতে পারিতেন তাহা হইলে তাহার সন্ধান দেওয়ার সার্থকতা থাকিত। জীবন শুধু উপাদান উপকরণ যোগায়—বিধিদত্ত অনন্যসাধারণ প্রতিভা না থাকিলে রাশীকৃত উপাদান উপকরণ পাইয়াই বা লাভ কি? শরৎচন্দ্র যে প্রতিভার বলে অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন—সেই সাহিত্যেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। তাহার ক্রমোন্মেষ জানিতে পারিলে আমাদের অন্য লাভ না হউক—জ্ঞানতৃষ্ণার তৃপ্তি হইত। কিন্তু তাহারও ত উপায় নাই। শরৎচন্দ্র যখনই উদিত হইলেন তখনই পূর্ণচন্দ্ররূপে—তাঁহার প্রতিপদ্‌, দ্বিতীয়া চতুর্থী এমন কি দ্বাদশীর সংবাদও আমরা জানিতে পারি নাই।

আমি কৌতূহলী পাঠকদের জন্য তাঁহার সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত জীবনের চরিত্রাংশ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। তাঁহার জীবনের শেষ কয় বৎসর তাঁহার সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমি তাঁহার সায়াহ্ন জীবনের ছায়াচ্ছন্ন চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহাই এই প্রবন্ধে বলিতে চাই।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য পড়িয়া কেহ যদি তাঁহাকে আত্মীয়বৎসল, সেবালুব্ধ, দরদী, ক্ষমাশীল, নির্ভীক, উদাসী পুরুষ মনে করিয়া থাকেন তবে তিনি কিছুমাত্র ভুল করেন নাই।

তাঁহার আর্থিক অবস্থার যতই উন্নতি হইতে লাগিল, ততই তিনি আত্মীয়গণকে স্নেহচ্ছায়ায় টানিতে লাগিলেন। যে সকল আত্মীয় দূরে—বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রীতির টানে আবার নিকটে আসিল। বহু দরিদ্র আত্মীয়কে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন। ভ্রাতার প্রতি তাঁহার স্নেহের তুলনা ছিল না, ভ্রাতার পুত্র কন্যাকে তিনি যেরূপ স্নেহ করিতেন, আপন পিতাও তাহা করে না। ভ্রাতুষ্কন্যার বিবাহের জন্য তিনি ব্যাঙ্কে কয়েক সহস্র টাকা জমা রাখিয়া গিয়াছেন, অত্যন্ত অর্থকষ্টের সময়ও তাহা স্পর্শ করেন নাই। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, অসুখের সঙ্গে আচরণটা একটু রূঢ় হ'য়ে গেছে, সেজন্য আমি বড় দুঃখিত। বংশের একমাত্র সন্তান, আমার ভাইপোটির খুব ব্যারাম, সে সময় আমার মাথার ঠিক ছিল না, একজন সাহিত্যিক একটা লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। বড় কড়া কথা বলে দিয়েছি।" বাড়ীর কাহারও কোন অসুখ বিসুখ হইলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন তাঁহার লেখা বন্ধ হইয়া যাইত, রোগীর শিয়রেই সারাদিন বসিয়া থাকিতেন। দূর আত্মীয়ের ব্যারামের সময়ও তাঁহাকে হাসপাতালে ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছি।

সেবাপরায়ণা নিষ্ঠাবতী পরিচর্য্যারতা হিন্দুরমণীর চিত্র তাঁহার সাহিত্যে অনেক স্থলেই আছে। হিন্দুরমণীর এই সেবাধর্ম্মের মহিমা তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। তিনি নিজে এই সেবাপরিচর্য্যার ভিখারী ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ কালই হয়ত তিনি রোগে শোকে কোন পরিচর্য্যা লাভ করেন নাই। এই সেবার প্রতি তাঁহার নিজের বড় লোভ ছিল। জীবনে দৈন্য দূর হওয়ার পর তাঁহার গৃহে দাস দাসীর অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি আত্মীয়জনের বিশেষতঃ গৃহলক্ষ্মীদের হাতের যত্ন-আদর সেবা-চর্য্যা পাইয়াই তৃপ্ত হইতেন। সেবা মাধুরীর লোভেই তিনি আপন গৃহ হইতে ইদানীং আর দূরে যাইতে চাহিতেন না, বাহিরে কোথাও আহারাদি করিতে চাহিতেন না। গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি তাঁহার আসক্তি ও মমতা বাড়িয়া গিয়াছিল। হায় এই শরৎচন্দ্রকে জীবনের শেষ কয়দিন Nursing Home-এ কাটাইতে হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের বন্ধুপ্রীতি ছিল অতুলনীয়। সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহার অনেক বন্ধু ছিল, কিন্তু সে বন্ধুত্ব সাহিত্য-সূত্রে নয়, মনের মিল হওয়ার জন্যই। সাহিত্যপ্রীতি বা সাহিত্য

রচনার শক্তির চেয়ে মনুষ্যত্বকে তিনি অনেক বড় মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, "সাহিত্যিক বড় হও বা না হও মানুষ বড় হও।" সাহিত্যসমাজের বাহিরে তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা ছিল ঢের বেশী। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। একবার যাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইত, চিরদিন তাহার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা থাকিয়া যাইত। পরিচিতদের মধ্যে যাহার ভিতরে কোনপ্রকার মনুষ্যত্বের পরিচয় পাইতেন—সে যতই অধম, যতই অশিক্ষিত, যতই নগণ্য হউক তাহার সঙ্গেই বান্ধবতা জন্মিয়া যাইত। তিনি তাঁহার পল্লীজীবনের বন্ধুদের কথা লইয়া গভীর প্রীতির সহিত গল্প করিতেন। ভাগলপুরের বন্ধু, ব্রহ্মদেশের বন্ধু হাওড়া শিবপুরের বন্ধু—এমন কি পথঘাটের বন্ধু সকলেই চিরদিন তাঁহার স্নিগ্ধমধুর প্রীতির অধিকারী ছিলেন। সকলেই মনে করিতেন, "আমাকে শরৎবাবু যেমন ভাল বাসেন—তেমন ভাল বুঝি আর কাহাকেও বাসেন না।" তাঁহার স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠের আপ্যায়নে সকলেই তুষ্ট হইতেন।

বন্ধুদের জন্য তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। অনেক অর্থই তাঁহাদের জন্য গিয়াছে। নানাশ্রেণীর লোককে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করার যে দণ্ড সে দণ্ড তাঁহাকে ভুগিতে হইয়াছিল। মানুষের মান যশঃ প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক উন্নতি হইলে অনেকেই বান্ধবতা করিতে আসে, কিন্তু তাহাদের বন্ধু বলিয়া স্বীকার করে কয়জন?

বন্ধুদের সহিত মিলিতে মিলিতে গল্প করিতে হাসিতে খেলিতে রঙ্গরসিকতা করিতে ও উৎসবে মাতিতে তিনি ভাল বাসিতেন। সভাসমিতি তিনি এড়াইয়া চলিতেন। সভায় উপস্থিত হইব বলিয়া কথা দিয়া তিনি কথা রাখিতে পারিতেন না। সভাপতিত্ব স্বীকার করিয়াও তিনি অনেক সময় সভায় যাইতেন না। কিন্তু কখনও আত্মীয়-বন্ধুর অথবা বন্ধুগোষ্ঠীর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন নাই। ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনের সংসর্গ ও সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া অনেক সময় তাঁহার সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইত না। বন্ধুগণকে তিনি অনেক সময় নিজের বাড়ীতেই পাইতেন। যখন পাইতেন না তখন নিজেই তাহাদের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইতেন। দরিদ্র বলিয়া কখনও কোন বন্ধুজনকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই। যে কুটীরে কখনও কোন বড় লোকের পদার্পণ হয় নাই সে কুটীরের বেঞ্চিতে বসিয়া ৩ ঘণ্টা ধরিয়া তিনি গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতেন।

বন্ধু ও অনুরক্তগণের সহিত মিশিয়া তিনি শুধু আনন্দই উপভোগ করিতেন না,তাহাদের দুঃখ জ্বালারও ভাগ লইতেন। বিপদে আপদে তিনি সর্ব্বাগ্রে গিয়া দাঁড়াইতেন, তাহাদের সাংসারিক সুখ-দুঃখের খোঁজ লইতেন—তাহারা বিপন্ন হইলে তাঁহার উদ্বেগের অবধি থাকিত না,—যতদিন বিপদ কাটিয়া না যাইত ততদিন তিনি অস্বস্তি অনুভব করিতেন; তাহাদের বাড়ীর কাহারও ব্যারাম পীড়া হইলে নিজে আসিয়া খোঁজ খবর লইতেন, চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেই শুশ্রূষা করিতে লাগিয়া যাইতেন।

অনুরক্ত বন্ধুগণের যাহাতে মান মর্য্যাদা বাড়ে, সাহিত্যিক বন্ধুর যাহাতে প্রতিষ্ঠা বাড়ে সে জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। মুক্তকণ্ঠে তাহাদের গুণকীর্ত্তন করিতেন, তাহাদের কৃতিত্বে গৌরব অনুভব করিতেন, কখন কখন নিজের মান খর্ব্ব করিয়াও তাহাদের মান বাড়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। যাহারা তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছে—এ সকল কথা তাহারা ভাল করিয়াই জানে।

যাহারা তাঁহার সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন মানুষের প্রতি তাঁহার কত দরদ ছিল। এ দরদ তাঁহার সাহিত্য রচনাতেই ফুরাইয়া যায় নাই—এ দরদ তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির জন্য একটা উপাদান মাত্র নয়। তাঁহার লৌকিক ও ব্যবহারিক জীবনেও এই দরদের পরিচয় পাওয়া যাইত। লাঞ্ছিতের প্রতি দরদের জন্যই তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দেশের জন্য যাহারা নানা নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল—তাহাদের জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয়ও করিয়াছিলেন এবং নিজেও কঠোর নিগ্রহের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। যে শরৎচন্দ্র বিনা পারিশ্রমিকে লেখনী ধরিতেন না—অগ্রিম অর্থ লইয়াও সময়মত লেখা দিতে পারিতেন না—সেই শরৎচন্দ্র তাহারা অনুরোধ করিলেই বিনা পারিশ্রমিকে অবিলম্বে লেখা দিতেন। তিনি তাহাদের জন্য যে কতপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার রাজনীতি ক্ষেত্রের সহযোগিগণ জানেন।

দুঃখী দরিদ্রের কথা লইয়া তিনি আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন—তাহাদের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ

ছলছল করিয়া উঠিত—তাঁহার কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া উঠিত। শরৎচন্দ্র যখন সাংসারিক সুখে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতেছিলেন—তখনও তাঁহার বেদনার অবধি ছিল না। অনেক সময় তাঁহাকে বিষণ্ণ হইয়া বসিতে থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছি "আপনার কি শরীর অসুস্থ? এমন মুখ ভার ক'রে ব'সে আছেন কেন?" শরৎচন্দ্র তখন একটা করুণ চিত্রের কথা অথবা কোন কোন দুঃস্থ পরিবারের দুর্গতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন—"এই ব্যাপারটার জন্য কাল থেকে মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে আছে। কি করা যায় ভেবে পাচ্ছি না। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করছি—কিন্তু তাতে কি হবে? মরুভূমিতে অশ্রুপাত। চিরদিনের দুঃখী এরা, মুষ্টিভিক্ষায় এদের হবে কি?"

এক এক সময় তিনি বলিতেন—"আমাদের এই বাংলাদেশ যে কত দুঃখী, কত দুর্গত, তা আমাদের দেশের শাসকরা জানে না, দেশের বড় বড় পণ্ডিত, কবি, জন নেতারাও জানে না। এ কি শুধু উদরান্নের অভাব? কত অভাব, কত দুঃখ, কত জ্বালা যে তার হিসাব কি কেউ রাখে? পল্লীগ্রামে বাস না করলে তা কেউ জানতে পারে না। আবার পল্লীতে যারা স্বচ্ছন্দ বাস করে—তাদের দেখে দেখে স'য়ে গেছে—অস্বাভাবিক বলে একটুও মনে হয় না তারা অনুভবই করে না। নগরে যারা সুখের জীবন যাপন করছে, তারা যদি কিছুকাল পল্লীগ্রামে গিয়ে থাকে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মেশে—তা হলে বুঝতে পারবে, তাদের ব্যথা কত বিচিত্র, কত গভীর, কত দুর্বিষহ। তাদের অন্নকষ্ট হয়ত কোনদিন ঘুচলেও ঘুচতে পারে—কিন্তু তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে সব দারুণতর দুঃখ, সেগুলো কেউ কখন ঘুচাতে পারবে ব'লে মনে হয় না। চিতার বড় মিতা তাদের কেউ নেই।"

এই বলিয়া তিনি একের পর এক বিচিত্রধরণের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া যাইতেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষণভঙ্গীতে। একটা অপূর্ব্ব বেদনাবিলাস তাঁহার মধ্যে আমরা দেখিয়াছি। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঙ্গালীজীবনের বিচিত্র দুঃখের কাহিনী তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না—হৃদয়ের গভীর বেদনানুভূতির প্রকাশ করিয়া তিনি কি আত্মপ্রসাদ, কি তৃপ্তি লাভ করিতেন তিনিই জানেন। তাঁহার কাছ হইতে কখনও উল্লসিত হৃদয়ে ফিরিতে পারি নাই—বেদনাভারাক্রান্ত চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহে ফিরিতে হইয়াছে। ভাণ্ডার ভরা সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরামবিলাসকে এমন করিয়া সাধে-সাধে-বেদনার অশ্রুধারায় ধৌত করিয়া ভোগ করিতে কাহাকেও দেখি নাই। ভগবান্ যেন শরৎচন্দ্রকে বেদনার নবনী দিয়া গড়িয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন, চিরদিন দুঃখীদের মধ্যেই কাটাইয়াছিলেন, দুঃখ দিয়া তিনি তাঁহার সাহিত্য গড়িয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পিত চরিত্রগুলির বেদনাঘন জীবনে তাঁহার নিজের জীবন ও চরিত্রের আংশিক অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি মান যশঃ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সীমায় উঠিলেন, কমলার কৃপাও লাভ করিলেন—সাংসারিক দুঃখ কষ্ট তাঁহার কিছুই থাকিল না। সন্তানসন্ততির দল আসিয়া তাঁহার কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ ঘটাইল না—নিশ্চিন্ত জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার জীবনের সকল অঙ্গেরই পরিবর্ত্তন হইল। কেবল দরদী হৃদয়টি অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া গেল!

দরদের দণ্ড হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন না। জীবনের উৎসবক্ষেত্রেও তিনি দুঃখের স্মৃতি, দুঃখের স্বপ্ন, দুঃখের চিন্তায় অন্যমনা ও উদাসী হইয়া রহিলেন। কারুণ্যঘন হৃদয়ে তাঁহাকে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে হইল। বালিগঞ্জের আত্মসুখসর্ব্বস্ব ভোগপিপাসাময় পরিবেষ্টনীর মধ্যে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তিনি বাস করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া থাকিল রূপনারায়ণের কূলে দুঃখী কাঙ্গালদের কুটীরে। তাই বারবারই তিনি সেখানে ছুটিয়া যাইতেন—দুর্গত বঙ্গদেশ হইতে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই।

এই রূপনারায়ণ নদের তীরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবারও একটু ইতিহাস আছে। যখন তিনি শিবপুর ছাড়িয়া সামতাবেড়ে বাস করিতে যান—তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো। তখন তিনি শিবপুরেই গৃহনির্ম্মাণের সংকল্প করিয়াছিলেন। সহসা একদিন শুনিলেন তাঁহার ভগিনীর গ্রাম সামতাবেড়ে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইতেছে। তিনি তখনই ভাবিলেন,

এই সময়ে এই গ্রামে একটি বাড়ী করিলে গ্রামের লোক খাটিয়া তাহাদের অন্নোপার্জ্জন করিতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি প্রায় বিশহাজার টাকা খরচ করিয়া ঐ গ্রামে একখানি বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বাস করিতে গেলেন। যে গ্রামে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হয়, বাছিয়া বাছিয়া শরৎচন্দ্র সেই গ্রামেই বাস করিতে গেলেন। লোকের যেরূপ আর্থিক অবস্থা হইলে লোকে দুঃখী কাঙালদের কাছ হইতে দূরে থাকিতে চায় শরৎচন্দ্র সেই অবস্থায় তাহাদের মধ্যেই বাস করিতে গেলেন। গ্রামের বহু লোক তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল—সকলেই অল্পবিস্তর তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল।

বাঙ্গালী নারীর দুঃখ শরৎচন্দ্রকে বড়ই বিচলিত করিত। তাঁহার সাহিত্যে তাহাদের বেদনাই সব চেয়ে বেশি করিয়া ফুটিয়াছে। জীবনে তিনি বহু অসহায়া বিপন্না নারীর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ২,৪টি দৃষ্টান্ত জানি। তিনি বলিতেন—"বাঙ্গালী নারীর মত দুঃখিনী জগতে নেই—এদের কোন সহায় নেই—পুরুষরা নয়, সমাজ নয়, লৌকিক ধর্ম্ম নয়, শাস্ত্র নয়, দেশের আইন পর্য্যন্ত এদের সহায় নয়—এমন কি বাঙ্গালী নারীও বাঙ্গালী নারীর সহায় নয়। বরং নারীই নারীর পরম শত্রু। যারা নিজে লাঞ্ছিতা তারাই অত্যাচার করে বেশি। তারা যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে বাধ্য হয়—সেই লাঞ্ছনা তারা অপরের উপর চালিয়ে মনে করে প্রতিশোধ নেওয়া হ'ল—প্রতিকার হ'লো। জীবনে যে কখনো করুণা পায় নি—সে অপরকে করুণা করবে কি ক'রে?" কোন অভাগিনী শরৎচন্দ্রের কাছে সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়া কখনও ব্যর্থ মনোরথ হয় নাই।

পতিত, উপেক্ষিত, ভ্রান্ত, পাপসন্তপ্ত যাহারা তাহাদের প্রতিও শরৎচন্দ্রের দরদ ছিল খুব বেশি। পথভ্রষ্ট ও অপরাধী বলিয়া কেহ শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি হারায় নাই। শরৎচন্দ্র বলিতেন—"দেখ, কেউ জীবনে ভুল করেছে বা অপরাধ করেছে বলে তাকে ঘৃণা করা মহাপাপ বলে মনে করি। আমরা নিজেরা এত ভুল করি, এত অপরাধ করি যে আমাদের ঘৃণা করবার অধিকারই নেই। অনেক সময় বিচারক ও আসামীর মধ্যে তফাৎ অতি সামান্য। একই পাপ ক'রে একজন ধরা পড়েছে ব'লে আসামী, আর একজন ধরা পড়েনি ব'লেই বিচারাসনে বসে তার বিচার করছে। তারপর, যাদের আর্থিক দৈন্য, তোমরা তাদেরই করুণাপাত্র মনে কর, যারা morally poor বা intellectually poor তাদের কর ঘৃণা। কেন? সকল শ্রেণীর দরিদ্রই সমান করুণার পাত্র। কাউকে দিতে হবে ভিক্ষা; কাউকে দিতে হবে শিক্ষা, কাউকে দিতে হবে সৎপথে দীক্ষা—কিন্তু সহানুভূতি দিতে হবে সকলকেই।"

আমি শরৎচন্দ্রকে একজন Philanthrophist বানাইতে চাহি না,—তিনি জীবনে দুঃখ দূর করিবার ব্রত গ্রহণ করেন নাই। কি করিয়া দেশের দুঃখ নিবারিত হইতে পারে সে জন্য হয়ত তিনি মাঝে মাঝে চিন্তা করিতেন, কিন্তু সে চিন্তাকে কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে রূপ দান করিতে চেষ্টা করেন নাই। আমার প্রতিপাদ্য—তাঁহার হৃদয়টি ছিল কারুণ্যঘন। এই হৃদয়ে তিনি নিজে যে বেদনা ও অস্বস্তি অনুভব করিতেন—সেই বেদনা ও অস্বস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই তিনি ব্যস্ত হইতেন।

একদিনের কথা মনে পড়ে—বালিগঞ্জের রাস্তার ধারে কে একজন সদ্যঃপ্রসূত জীবন্ত শিশুকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। কতজন সে পথ দিয়া আহা বলিয়া যে চলিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। শরৎচন্দ্র সংবাদ পাইয়া আসিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া নানাস্থানে Phone করিয়া নিজে থানায় গিয়া শিশুর গতি করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন।

মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার যে দরদ ছিল—পশুপক্ষীর সম্বন্ধেও সেই দরদ ছিল। তাঁহার বাড়ীর নিকটে একটা জায়গায় এক গোয়ালা পা ভাঙা রুগ্ন একটি গাভীকে ফেলিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। গাভীটির আর্ত্তনাদ শরৎচন্দ্রের কর্ণগোচর হইলে তিনি গোয়ালাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। গোয়ালা তাহাকে কিছুতেই গৃহে লইয়া যাইতে চাহিল না—তখন শরৎচন্দ্র Ambulance গাড়ী ডাকিয়া গরুটিকে নিজ ব্যয়ে পশু হাঁসপাতালে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। উলুবেড়িয়া মহকুমার এক পুকুরে এমনি একটি গরু পড়িয়া জীবন্ত অবস্থায় তিলে তিলে পচিতেছিল, গ্রামবাসীরা নাকে কাপড় দিয়া পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। শরৎচন্দ্র সংবাদ পাইয়া বহু লোকজনের সাহায্যে সেটিকে তোলাইলেন। গোরুটিকে অবশ্য বাঁচাইতে পারেন নাই, কিন্তু বাঁচাইতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।

কাহারও বাড়ীতে গিয়া শীর্ণ জীবজন্তু দেখিলে তিনি গৃহস্বামীর উপর কুপিত হইতেন, তিরস্কার করিতেন। যতক্ষণ গৃহস্বামী লজ্জিত হইয়া তাহাদের আহার ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার না করিতেন, ততক্ষণ তিনি শান্ত হইতেন না, অন্য কোন প্রসঙ্গে মন দিতেন না, বসিতেন না বা জল গ্রহণ করিতেন না। যাহারা পালিত পশুকে পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না বা সেবা যত্ন করে না তাহাদের প্রতি তাঁহার দারুণ অশ্রদ্ধা জন্মিত। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সান্যাল একবার শরৎচন্দ্রকে লইয়া কোন নগরে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে উঠেন। সেই বাড়ীতে পৌঁছিয়া রাত্রিকালে ভোজনের সময় শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন একটি শীর্ণকায় ক্ষুধার্ত্ত রোগগ্রস্ত পালিত কুকুর দুয়ারের কাছে বসিয়া হাঁপাইতেছে। কুকুরটিকে দেখিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন, "গিরিজা, তুমি বলেছিলে এরা খুব সজ্জন সহৃদয় লোক। মিথ্যা কথা কেন বল্লে! যাদের বাড়ীর পোষাকুকুরের এমন দশা, পেট ভরে খেতে পায় না, তারা কখনও সজ্জন হতে পারে? না, আমি এক্ষণি এ বাড়ী হ'তে চলে যাব। তুমি আজ রাত্রে না হোক—কাল সকালে আমাকে হোটেলে নিয়ে যেও।" এই বলিয়া তিনি একে একে পাত্রের সমস্ত লুচি ও মিষ্টান্নগুলি কুকুরটির মুখে দিলেন,—"আহা, দেখ দেখি জীবটি কতকাল খেতে পায় নি।"

তিনি বলিতেন, "দেখ হিন্দুরা গোরুকে বলে মা ভগবতী। হিন্দুর ঘরে আজকাল গর্ভধারিণী মায়ের যেমন দশা দুগ্ধদায়িনী মায়েরও তেমনি দশা। মুসলমান, খৃষ্টানে গোহত্যা করে—একেবারেই সাবাড় করে। আর হিন্দুরা গোহত্যা করে তিলে তিলে। আমাদের দেশের গোয়ালাদের মত পাষণ্ড বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। তাদের অত্যাচারে এদেশে গোদুগ্ধ গোরক্তে পরিণত হয়েছে।"

শরৎচন্দ্রের ভেলি বলিয়া একটি আদরের কুকুর ছিল—তাহার জন। তাঁহার দুর্ভোগ কম হয় নাই। ভেলি ক্ষেপিয়া শরৎচন্দ্রকে দংশনে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছিল। এই ভেলিকে তিনি চপ-কাটলেট রাজভোগ খাওয়াইতেন। কেহ যদি শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধাভরে কোন উৎকৃষ্ট খাদ্য উপহার দিয়া আসিত তবে তাহা অনেক সময় ভেলিরই ভোগে লাগিত। একদিন বলিয়াছিলাম, "আপনার কাছে যা সুখাদ্য ভেলির কাছে তাই সুখাদ্য হবে এটা মনে করেন কেন? ওর হয় ত' পচা মাংস, মাছের কাঁটা ইত্যাদিই রাজভোগ। চপকাটলেট সন্দেশের মর্য্যাদা ও কি বুঝবে?"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "ঠাকুরকে তোমরা কি খেতে দাও? ঠাকুর কি খাদ্য ভালবাসে তা কি তোমরা জান?' ঠাকুর কি তোমাদের তা বলেছেন? তিনি খান কি না খান সে কথা ছেড়েই দিলাম। তোমার কাছে যে খাদ্য উৎকৃষ্ট তাই ত' তুমি দাও। কুকুরকে যদি ঘেন্না না করতে তবে বলতাম ঠাকুর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা তাঁর সৃষ্ট জীব কুকুর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। কুকুরও মুখ ফুটে বলতে পারে না, আমার যা প্রিয় খাদ্য তাই ওকে দিয়ে আমি তৃপ্তি পাই। আমার ত' মনে হয় না, ভেলি সুখাদ্যগুলোকে appreciate করে না। তা না করলে ও এত আগ্রহের সঙ্গে খেত না।"

এই ভেলি কুকুরটি মরিয়া গেলে শরৎচন্দ্র পুত্রশোক পাইয়াছিলেন। সে যে তাঁহাকে কামড়াইয়া তাঁহার প্রাণ সংশয় ঘটাইয়াছিল, সে কথা তিনি এক বারও ভাবিতেন না।

"একে অবোলা জীব, তাতে তার মৃত্যুরোগ, তার কোন অপরাধই নেই। আমার ত' Injection নিয়ে প্রাণ বেঁচে গেল, তাকে ত' বাঁচাতে পারলাম না।" এই বলিয়া কত আক্ষেপ করিতেন। তিনি ভেলির মৃত দেহের উপরে একটি সমাধি রচনা করিয়াছিলেন।

জীবজগতের প্রতি এই অপরিমেয় মমতা লইয়াই তিনি চন্দ্রনাথের শেষে ভরতের মৃগশিশুর উপাখ্যানটি লিখিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের রচনায় যে দরদ ফুটিয়াছিল, তাহা সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য মর্ম্মের বাহির হইতে আমদানি করা নয়, তাহা তাঁহার মর্ম্মের গভীর স্তরের গূঢ়তম সম্পদ।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রে উদারতা ও ক্ষমাশীলতা যথেষ্টই ছিল। কোন প্রকারের দুর্ব্বলতার জন্য তিনি কখনও মানুষকে ঘৃণা করিতেন না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মানব-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার বিচার ছিল বড়ই উদার। তিনি মানুষের জীবনকে কখনও খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচার করিতেন না, তাহাকে সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিয়াই বিচার করিতেন। তিনি বলিতেন, "মনুষ্যত্ব সোনার মতই দুর্লভ সামগ্রী। তোমরা যত সস্তা মনে কর তত সস্তা নয়। যতটুকু পাও ততটুকুই লাভ। সোনার মতনই মনুষ্যত্ব কোথাও

অবিমিশ্র ভাবে থাকতে পারে না —তার সঙ্গে খাদ থাকে। খাদ বাদ দিয়ে সোনাটুকুই নিতে হবে। বিধাতা মানুষকে এমন করেই গড়েছেন যে তার বিচিত্র জীবনে নানা দুর্ব্বলতা, নানা দৈন্য, নানা অঙ্গহানি না থেকেই পারে না। এটাই স্বাভাবিক। অসত্য ও অস্বাভাবিকের প্রতি আমাদের এতই ভক্তি যে, স্বাভাবিক সত্যটাকে সহ্য করতে পারি না। কত বিচিত্র দশা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে যে পার হ'তে হয়—অচল নিশ্চিন্ত একঘেয়ে জীবন যাদের, তারা তা জানেও না।"

একদিন কথাচ্ছলে বলিলেন, "দেখ, এ সংসারে দেবতাও দুর্ল্ভ, দানবও দুর্ল্ভ,—প্রায় কল্পনার সামগ্রী বললেই হয়। সবাই মানুষ—দোষে-গুণে, সুখে-দুখে, সত্যে-স্বপ্নে, পাপে-অনুতাপে গড়া মানুষ। এই মানুষ নিয়েই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে—এই মানুষকেই ভালবাসতেও হবে। যে অপরাধ করে, ভুল করে, বিপথে যায়—সে যা দুঃখ দেয়, তার চেয়ে ঢের বেশী দুঃখ সে নিজে পায়। সে যতটা পরের অনিষ্ট করে—তার ঢের বেশী অনিষ্ট করে নিজের। অপরাধ করার কুফল সে যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, তেমনটি অন্য কেউ করে না। তাই মনে হয় নীতিকথা শুনিয়ে উপদেশ দিয়ে রাগ-রোষ ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রকাশ করেই বা লাভ কি? ক'জনার ভারই বা তুমি নিতে পার—আর ভার নেবার অধিকারই বা তোমার কি আছে?" আর একদিন ব্রহ্মদেশের প্রসঙ্গে বলিলেন, "একটি নিম্নশ্রেণীর নারীকে দেখেয়াছি স্বামী সেবা করতে। একবৎসর ধ'রে স্বামীটা ভুগল—সর্ব্বাঙ্গ তার গলে খসে গেল। স্ত্রীলোকটা একহাতে তার সেবা করেছে—আর হাতে তার পথ্য সংগ্রহ করেছে ভিক্ষা ক'রে।

তার স্বামীভক্তি দেখে অবাক হ'য়ে আমরা তাকে কিছু কিছু সাহায্য করতাম। স্বামী মরে গেল—উপায় থাকলে সহমরণে যেত, শোকে সে পাগলিনী হয়ে গেল। তারপর সে কোথায় গেল জানি না। একবৎসর পরে তাকে দেখলাম একটা বাড়ীর দেওয়ালে ঘুঁটে ভাঙছে। তার বর্ত্তমান অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে জানলাম, সে আর একজনের সঙ্গে সংসার পেতেছে,—সে এখন তার ঘরের গৃহিনীপনা করছে—তার নূতন প্রতিপালকের দু'টি সন্তানকে প্রতিপালন করছে—বেশ আছে। ভাবলাম এই সেই নারী যে একবৎসর স্বামীর রোগশয্যার শিয়রে অনিদ্রায় অনাহারে বসেছিল। ভাবলাম তাও যেমন স্বাভাবিক, সত্য—এও তেমনি স্বাভাবিক সত্য। মানুষ অবস্থার দাস—আমাদের বিচারের দাস নয়।"

এই উদার মন লইয়াই তিনি তাঁহার সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যসেবার বিরুদ্ধে এদেশে কত অভিযানই না হইয়াছিল! চারিদিক হইতে কত নিন্দাবাণই না বর্ষিত হইয়াছিল! তাহাতে তিনি কোন বেদনা যে পান নাই তাহা আমি বলিতেছি না। তবে সকল ক্ষেত্রেই তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। মহাকালের ও মহামানবের বিচারের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিচলিত হইয়া তিনি কখনও অতিরিক্ত উষ্মা প্রকাশ করেন নাই—উত্তর দেওয়ার জন্য অথবা আত্মসমর্থনের জন্য কখনও লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার অনুরাগী ভক্তের অভাব ছিল না—কখনও তাহাদিগকে জবাব দিবার জন্য বা প্রত্যাঘাত করিবার জন্য আদেশ বা অনুরোধ করেন নাই। আমরা অনেক সময় বলিয়াছি—"এই আক্রমণের কি আমরা একটা জবাব দেব?" তিনি উত্তর করিয়াছেন—"পাগল নাকি, জবাব দিয়ে তুমি ঐ আক্রমণকে importance দিয়ে আমারই অপমান করবে? এ সকল দোষারোপের কোন জবাব দিলে তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ থাকবে না। এরা একটু ব্যস্তবাগীশ, মহাকাল কবে বিচার করবেন তার ভরসায় থাকতে চায় না। এরা চায় এদের বিচারটাই মহাকাল মাথা পেতে নিক।"

যাহারা একদিন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল—তাহাদের অনেককেই তাঁহার গৃহে বসিয়া তাঁহার স্নেহ ও বান্ধবতা লাভ করতে দেখেছি। ক্ষমাশীল শরৎচন্দ্র সবাই ভুলিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন, "ক'দিনের জীবন ভাই, এই স্বল্পায়তন জীবনে লোকের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ কি রাখতে আছে!"

যাঁহাদের শরৎচন্দ্রের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিবার কথা এমনও কেহ কেহ তাঁহার রচনার গ্লানি প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলিতেন, "দেখ, কৃতজ্ঞতা

মনুষ্যত্বের একটা প্রধান অঙ্গ। কৃতজ্ঞতা বিধাতার একটা খুব বড় দান। বিধাতা যাকে সকল দান হ'তে বঞ্চিত করেছেন—তাকে অত বড় দানটা কি ক'রে দেবেন, বল।"

আমি বলিলাম, "যারা আপনার লেখার উপর দশবছর ধ'রে দাগ বুলিয়ে লিখতে শিখেছে, আর যেই হোক তাদের উচিত নয় আপনাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "আরে তুমি যে উল্টা বুঝলে। তারাই ত' ব্যঙ্গ করবে—তাদের ত' প্রচার করতে হবে যে ঋণী নই, পাছে ঋণ ধরা পড়ে।

আমি বলিলাম, "ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে। পাছে ধরা পড়ে যে সে ধ্বনির কাছে ঋণী।

শরৎচন্দ্র বলিলেন, বাঃ বাঃ বেশ কথাটি ত'। এ কার লেখা? এত রবীন্দ্রনাথের না হ'য়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের ত'?

আমি 'হাঁ' বলিলে তিনি বলিলেন, অনেক দুঃখেই লিখেছেন হে।

বিরুদ্ধবাদীদের লইয়া ইহার বেশি কথা তাঁহার মুখে কখনও শুনি নাই। আমরা অনেক সময় তাঁহার সঙ্গে সমান ভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়াছি। অন্য কেহ হইলে বিমুখ হইতেন। তিনি আমাদের সকল ধৃষ্টতা, সকল প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিতেন।

কোন একজন প্রতিবেশী সাহিত্যিকের সহিত কোন কারণে তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। ইহা এত দূর গড়াইয়াছিল যে পরস্পরের বাড়ী আসা-যাওয়া, মুখ দেখা-দেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শরৎচন্দ্র যেদিন শুনিলেন—প্রতিবেশী সাহিত্যিকটির কন্যার মৃত্যু হইয়াছে—সেদিন তিনি সব অমর্য্যাদার কথা ভুলিয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্বেও তাঁহার সহিত একবার মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল—শরৎচন্দ্র তাঁহার জন্মোৎসব-বাসরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মেজাজ ছিল খুবই ঠাণ্ডা। কখনও তাঁহাকে কুপিত হইয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই, গৃহের ভৃত্যগণের প্রতিও নয়। ভৃত্যগণকে তিনি পরিজনের মত মনে করিতেন এবং সস্নেহ কণ্ঠে নাম ধরিয়া ডাকিতেন।

কেহ কেহ মনে করিতেন—শরৎচন্দ্র বুঝি বালীগঞ্জে বাড়ী করিয়া মোটর চড়িয়া aristocratic হইয়া গিয়াছিলেন। এ ধারণা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাঁহার আহারে-বিহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে আসবাবপত্রে, চালচলনে কথায় বার্ত্তায় বিন্দুমাত্র বড়মানুষির ভাব ছিল না। তাঁহার গৃহ গরীব আত্মীয়গণের আশ্রয় ছিল, তাঁহার গৃহে সকলেরই দ্বার অবারিত ছিল—একটা ইস্কুল কলেজের ছেলে গেলেও তিনি তার সঙ্গে দুইঘণ্টা আলাপ করিতেন। শরৎচন্দ্র বাড়ীতে আছেন অথচ দেখা হইল না, এইরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই।

দরিদ্র বন্ধুদের গৃহে তিনি ভাঙা চেয়ারে অথবা ধূলিমলিন সতরঞ্চের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতেন। মোটরে তিনি চড়িতেন বটে—কিন্তু পাশে দরিদ্র প্রতিবেশীদের কাহাকেও বসাইয়া বাহির হইতেন। অনেক সময় শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়াই পাড়ার মজলিসে আসিতেন। সব চেয়ে বড় কথা, দাদা বলিবার অধিকার দান। দেশের অনেক গণ্যমান্য বর্ষীয়ান লোকের সঙ্গেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দাদা বলিয়া ডাকিতে কখনও সাহস করি নাই। তাঁহারাও 'আপনি' না বলিয়া 'তুমি' সম্বোধন করিয়াও সে অধিকার দেন নাই। শরৎচন্দ্র ছিলেন সকল পরিচিত বয়ঃকনিষ্ঠ লোকের দাদা। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "দাদাই যদি বল তবে নাম ধ'রে দাদা বল-কেন। আমি যে দাদা সে বিষয়ে সন্দেহ ত' একেবারেই নেই—এক মায়ের পেটে জন্মালেই শুধু দাদা হয় না। সরস্বতী যদি মা হ'ন তবে আমরা ত' এক মায়েরই ছেলে। বিধাতা আমাকে দাদা করেই যে পাঠিয়েছেন।"

বালীগঞ্জে তাঁহার মন টিকিত না—গ্রামের বাড়ীর জন্য ছটফট করিতেন। সুযোগ পাইলেই সেখানে যাইতেন—গেলে আর আসিতে চাহিতেন না। গ্রাম্য জীবনের প্রতি কি গভীর মমতাই না তাঁহার ছিল। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "গ্রামে আপনার দিন কেমন ক'রে কাটে?" তিনি বলিয়াছিলেন, "গ্রামে সময় কাটাবার অসুবিধা কি? জেলেরা মাছ ধরছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম,—ছেলেরা তাস

খেলছে খানিকক্ষণ সেখানে ব'সলাম, বুড়োরা দাবা খেলছে ব'সে ২।৪টা উপরচাল বলে দিলাম। নিজেও দু'বাজি খেল্‌লাম। "কৈবর্ত্তবুড়ী মুড়ি ভাজছে, তার সঙ্গে দু'টো গল্প কর্‌লাম, কামাররা লোহা পিটুচ্ছে; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগুনের ফিন্‌কি ছড়ানো দেখলাম। এই ভাবে সময় কাটে। গাঁয়ের দা'ঠাকুর আমি, কত যে সালিশি মধ্যস্থতা করতে হয়, কত যে মামলা মেটাতে হয়, কত যে গৃহকলহ মেটাতে হয়, তা তোমরা কি ক'রে জানবে। এ ছাড়া বারোয়ারির চাঁদা তুলতে হয়, ঘরে আগুন লাগলে নেভাবার ব্যবস্থা কর্‌তে হয়, বিয়ের ঘটকালি করতে হয়, এমনি কত কাজ।"

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যে গ্রাম্যজীবনের প্রতি মমতা ফুটিয়াছে তাহা আদৌ পোষাকী ধরণের নয়। শরৎচন্দ্রের পল্লীশ্রী ত' ছিল আন্তরিক ও অকৃত্রিম। বালীগঞ্জ প্রবাসী শরৎচন্দ্র একটি দিনের জন্যও পল্লীকে ভুলিতে পারেন নাই।

এমন যে দরদী শরৎচন্দ্র তিনি নির্ভীক কম ছিলেন না। ইন্দ্রনাথ জীবন্ত মানুষ, শরৎচন্দ্র সত্যই তাহার দুঃসাহসের সাক্ষী ছিলেন। বাল্য-যৌবনে শরৎচন্দ্র ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তাঁহার কাছে শ্মশানে ও নাটমন্দিরে কোন তফাৎ ছিল না। কোন বিভীষিকাই তাঁহাকে কোন দিন বিহ্বল করে নাই। বর্ষার বড় গঙ্গা পার হইতে যেমন তিনি ভীত হইতেন না, সাপ লইয়া খেলা করিতে তেমনি তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না। ভূতের সন্ধানে অন্ধকারে বন-বাদাড়ে বেড়াইতে যেমন তাঁহার সাহসের অভাব হয় নাই, মহামারীর ধ্বংসলীলার মধ্যে বিচরণ করিতেও তেমনি তাঁহার ভয় করিত না। এসব গেল বহিরঙ্গের সাহসের কথা। তাঁহার অন্তরঙ্গের সাহস বা moral courage ছিল অসীম। সাহিত্যে তিনি যে অন্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়াছেন, লৌকিক আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে সার্ব্বজনীন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, মিথ্যাচারী ভণ্ড কপট সমাজকে কশাঘাত করিয়াছেন—প্রচলিত গার্হস্থ্য ও সামাজিক প্রথাপদ্ধতির অসারতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে শুধু সাহিত্যিক সাহসই প্রকাশ পায় নাই—তাঁহার চরিত্রের নির্ভীকতাও পরিস্ফুট। চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা না থাকিলে আর যাহাই হউক সাহিত্যে বিদ্রোহী হওয়া যায় না। কারণ, এই সাহিত্যের জন্ত সমাজের কাছে সাহিত্যিককে জবাব দিহি করিতে হয়।

পথের দাবীর লেখককে কতটা সাহস দেখাইতে হইয়াছে তাহা আর নাই বলিলাম। সামাজিক জীবনেও তাঁহাকে যথেষ্ট সাহস দেখাইতে হইয়াছে। সব দিক হইতে বিচার করিলে শরৎচন্দ্রকে একজন বীরপুরুষই বলিতে হয়। বীরের মতই তিনি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মরণকে বরণ করিয়াছেন। তিন মাস আগে হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন, মৃত্যু আসন্ন। আমরা প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। কোনি দিন তাঁহার কথাবার্ত্তায় মৃত্যুভীতি লক্ষ্য করি নাই, কোনি ব্যাকুলতা বা অস্থিরতা লক্ষ্য করি নাই। মৃত্যুর কথা তুলিয়া তিনি বরং হাস্যপরিহাসই করিয়াছেন। চূড়ান্ত মান, গৌরব ও পরিপূর্ণ সৌভাগ্য-ভাণ্ডার ছাড়িয়া তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল, কিন্তু পিছু পানে চাহিয়া কোন দিন হাহাকার করেন নাই। সব চেয়ে বড় কথা—যে অজ্ঞাত রহস্যময় দৈবশক্তিকে তিনি কোন দিন মানেন নাই, প্রাণের ভয়ে তিনি তাহার শরণ গ্রহণ করেন নাই। অন্ততঃ বাহিরে তাহার পরিচয় আমরা কোন দিন পাই নাই। ইহাতে তাঁহাকে নিরীশ্বর বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু নির্ভীকতার চূড়ান্তই সূচিত হয়। মৃত্যুকে ভৌতিক দেহটার অনিবার্য্য পরিণতি বলিয়া মনে করিয়াই তিনি অনাকুল-চিত্তে মৃত্যু বরণ করিয়া গিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে বাল্যকাল হইতেই একটি উদাসী বাউল নিভৃতে সাধনা করিয়াছে। সে গোপীযন্ত্র বাজাইয়া সমাজ সংসারকে উড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে। সেই বাউলই শরৎচন্দ্রকে ভবঘুরে করিয়া ঘুরাইয়াছে—সে-ই তাঁহাকে চিরদিন দেহের প্রতি উদাসীন করিয়া রাখিয়াছিল, উত্তর জীবনে সেই বাউলটাকে মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চলিয়া যাইবার লোক নয়। কারণ সেই তাঁহার 'মনের মানুষ'। সর্ব্বস্ব ত্যাগের পথে সে শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের রোগ ভোগ একে একে সকল বন্ধন-মুক্তিরই নিভৃত সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানুষটিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝাইতে হইলে আরও দুই-চারিটি কথা বলার প্রয়োজন মনে করি। অনেকের বিশ্বাস

শরৎচন্দ্রের পড়াশুনা বিশেষ কিছুই ছিল না। পক্ষান্তরে আবার অনেকের বিশ্বাস তিনি continental কথা-সাহিত্য রাশি রাশি পড়িয়া নব সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। দুই পক্ষের বিশ্বাসই ভ্রান্ত। শরৎচন্দ্র একেবারে পড়াশুনা কিছু করেন নাই, তাহা সত্য নয়। তবে তিনি গ্রন্থাসক্ত ব্যক্তি ছিলেন না। বিজ্ঞান; অর্থনীতি; সমাজতত্ত্ব, যৌনতত্ত্ব, ত্য-বিদ্যা এবং বিলাতী দর্শন শাস্ত্রের পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার আলাপ আলোচনা চয় আমরা পাইয়াছি। Herbert Spencer তিনি যত্ন সহকারে পড়িয়াছিলেন। Herber এর মতবাদের দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি কি Spencer-এর মতবাদই তিনি জীবনে অনুসরণ করিতেন বলিয়াই মনে হয়। ইহা ছাড়া Heconistic Philosoply-র কোন কোন বই তিনি পড়িয়াছিলেন তাহার প্রমাণ, তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও কোন কোন গ্রন্থেও পাওয়া যায়। বিলাতী কাব্য তাঁহার পড়া ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য তিনি অভিনিবিষ্ট ছাত্রের মত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা তাঁহার মুখস্থ ছিল। বলাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কবিতা তিনি আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। ইউরোপীয় উপন্যাস-সাহিত্য তিনি কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অনেক-পরে। অর্থাৎ তাঁহার প্রতিভার পূর্ণোদয়ের পরে। বিলাতী কথা-সাহিত্যের নিকট তিনি ঋণী নহেন। একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"আমি ধ'রে ফেলেছি, আপনার সাহিত্য-দীক্ষা রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে।" উত্তরে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"ঠিক ধরেছ, ভাই। আমি চোখের বালিখানা ২৫ বার পড়েছি এবং ওর উপরই দাগা বুলিয়েছি। তবে তুমি আর একখানার নাম করলে না কেন? আমি নষ্টনীড়ের কথা বলছি। ওখানাকেও বার ত্রিশেক পড়েছি।"

মোট কথা, শরৎচন্দ্র পড়িয়া শুনিয়া যাহা পাইয়াছেন, তাহার চেয়ে ঢের বেশী পাইয়াছেন হৃদয় দিয়া ভাবিয়া, তাহার চেয়ে ঢের বেশি পাইয়াছেন চোখে দেখিয়া। তিনি এই দুনিয়াকে দেখিয়াছিলেন হাজারটা চোখ দিয়া। রবীন্দ্রনাথ দুনিয়াকে দেখিয়াছিলেন বাতায়ন হইতে। দুনিয়ার যাহা কিছু তিনি দেখিয়াছেন—তাহাই তাঁহার কাছে জানালার ফ্রেমে আঁটা ছবি হইয়া উঠিয়াছিল আমাদের অতি সাধারণ চিরপরিচিত দৃশ্যগুলাও তাঁহার কাছে তাই অপূর্ব্ব লাগিয়াছে। যাহা কিছু কদর্য্য কুৎসিত তাহাও তাঁহার চোখে চিত্র মাধুরী লাভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্র এই দুনিয়াকে দেখিয়াছেন মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া। মানবসমাজকে দেখিয়াছেন সমাজ সংসারের বাহির হইতে। বাহির হইতে দেখিয়াছেন বলিয়াই পরিপূর্ণভাবে চমৎকারভাবে দেখিয়াছেন, ভিতর হইতে দেখিলে সমস্তটুকু চোখে পড়িত না, অতি পরিচয়ের গ্লানি দৃষ্টিকে ম্লান করিয়া দিত। লোকচক্ষুর অন্তরালে যাহা কিছু কদর্য্য, কুৎসিত তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাঁহার হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি লাভ করিয়া তাহা সাহিত্যে কারুণ্য রসেরই সৃষ্টি করিয়াছে, বীভৎস রসের নয়। এই দুনিয়ার নাট্যমঞ্চে নিজে একজন অভিনেতা হইলে তিনি রঙ্গলীলাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারিতেন না, তাহাকে আমাদের কাছে উপভোগ্য করিয়াও তুলিতে পারিতেন না। ভাগ্যে তিনি সংসারী ছিলেন না এবং সংসাররসে মগ্ন হন নাই—তাই আমরা সংসারকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া এমন করিয়া পাইলাম। ভাগ্যে তিনি গ্রন্থাসক্ত ছিলেন না, ভাগ্যে তিনি বই বুলাইয়া মানব সংসারটিকে ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, তাই এতগুলি চমৎকার পুস্তক আমরা পাইয়াছি।

ইদানীং তিনি একেবারেই পুস্তক পড়িতে পারিতেন না, মাঝে মাঝে চেষ্টা করিতেন দুই চার পাতার বেশী আগাইতে পারিতেন না। তরুণ লেখকগণ তাঁহাকে রাশি রাশি পুস্তক উপহার দিত তিনি সহজে মতামত দিতেন না। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার পুস্তকগুলি পড়াই হইত না। না পড়িয়া মত কি করিয়া দিবেন? তাই তরুণ লেখকদের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলিতেন, "হাঁ। অমুক বেশ লোকটি। অমুক ছেলেটি বড় ভালো।" অমুক লেখে ভালো অথবা অমুক কিছুই লিখিতে পারে না এ কথা তাঁহার মুখে শুনি নাই। ইদানীং কাহারও বই আমাদের পড়িয়া দেখার ধৈর্য্য তাঁহার ছিল না। শুধু বই পড়া কেন? তাঁহার সঙ্গে চিত্র প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছি তিন চারি খানি ছবি দেখিয়াই তিনি অধীর হইয়া উঠিতেন, হয় চেয়ারে বসিয়া পড়িতেন, নয় ত' বাহিরে যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইতেন। নিজে এক সময়-

সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন, সঙ্গীতে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তবু একখানার বেশী গান এক বৈঠকে তিনি শুনিতে পারিতেন না। কেহ ভালো গায় বলিয়া তাহার গান শুনাইবার জন্ত তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, "গায় ত' ভালো, বলছ যখন তখন বিশ্বাস করছি, কিন্তু থামে ত'।"

তিনি নিজেই বিনয় করিয়া সভাসমিতিতে বৈঠক মজলিসে বলিতেন, "আমি মুক্ষু সুক্ষু পাড়া গেঁয়ে লোক। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছু নেই।" ইহা হইতে অনেকের ধারণা হইয়াছিল সত্যই শরৎচন্দ্রের বুঝি বিদ্যাবুদ্ধি কিছু নাই। একদিন শরৎচন্দ্র কথায় কথায় বলিলেন, "ওহে লোকে মনে করে আমি বুঝি একটা মূর্খ—লেখাপড়া কিছু জানি না।" আমি উত্তর করিলাম, "তাই যদি লোকে মনে করে, করুক না। তাতে আপনাব কৃতিত্ব বাড়বে বই কম কমবে না। আপনি যা দিয়েছেন তা যে বই পড়ে নয়, আপনি যে এই দুনিয়ায় কারো কাছে ঋণী ন'ন—সবই যে নিজের প্রতিভার বলেই হয়েছে এর চেয়ে গৌরবের কথা কি আছে? আপনার বইগুলো নিয়ে Research করে এই বাঙ্গালা দেশে কত Ph. D., D. Lit হবে।"

শরৎচন্দ্র উত্তর করিলেন, "তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তা' সত্যি নয়। লোকের এরূপ অসত্য ধারণা হয় কেন? এই দেখ না একজন লিখেছে—"শরৎচন্দ্র অভিজাত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেশেন নি, তাদের কথা তাঁর সাহিত্যে নেই। আরে বাপু তুই জানলি কি ক'রে আমি কার সঙ্গে মিশেছি। এ সব কি সাহিত্য-সমালোচনা?" আমি বলিলাম "এতে ত' অগৌরবের কথা দেখছি না। আপনি বাঙ্গালী জাতির প্রধান সাহিত্যিক, আপনি বাঙ্গালা মাটির খাঁটি মালিকদের সঙ্গে খাঁটি বাঙ্গালীদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছেন। এত ভালো কথা। অভিজাতদের সঙ্গে মিশতে হলে ত' মোসাহেব হয়ে মিশতে হত। ও কথা বলে লেখক আপনাকে মর্য্যাদাই দিয়েছেন।" শরৎচন্দ্র উত্তরে বলিলেন, "তুমি ত বেশ interpretation দিলে। কথাটা ও ভাবেরই নয়।"

ইদানীং এই সকল মন্তব্যে একটু ক্ষুন্নই হইতেন। তাঁহার সাহিত্যই সাক্ষ্য দেয়, তথাকথিত অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না, তাহাদের ভোগসর্ব্বস্বতা, অহঙ্কার ও হৃদয়হীনতার জন্ত। তাঁহাদের সমাজ লইয়া তিনি যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহা তেমন জমে নাই। তাহা তাঁহার হৃদয়ের রঙে রঙিন হয় নাই, তাঁহার গভীর সহানুভূতি লাভ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। ধনের আভিজাত্য, বিদ্যার আভিজাত্য, কালচারের আভিজাত্য, রক্তের আভিজাত্য কোনটার প্রতি তাঁহার সাহিত্যেও শ্রদ্ধা ছিল না, জীবনেও শ্রদ্ধা ছিল না। কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ছিল বলিয়া লোকে রটায়, তাহা নিতান্ত অমূলক নয়। তাহার মূল ঐ অশ্রদ্ধায়। ভণ্ডামি ও কপটতা, নিষ্ঠুরতা ও ভোগসর্ব্বস্বতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। এই গুলি যে সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে খুব বেশী, সে সম্প্রদায়কে তিনি কোন দিন সহ্য করতে পারেন নাই।

প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দন-লাভ তিনি ভালই বাসিতেন এবং অপরকে প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দিত করিতেও তিনি ভালবাসিতেন।

দেশের পক্ষ হইতে তিনি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন—সাহিত্যিকগণ তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বিদ্বৎসমাজের একটা Recognition না পাওয়ায় তাঁহার একটু ক্ষোভ ছিল। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত সম্মান লাভ করিয়া তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। এই গৌরব লাভে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার একটা কৃতজ্ঞতার ভাব আসিয়াছিল।

তাঁহার আর একটা ক্ষোভ ছিল—রবীন্দ্রনাথ কখনও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সাহিত্যসাধনার মূল্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, তাঁহার গৃহে রবীন্দ্রনাথের পদধূলি পড়ে।

তাঁহার আমন্ত্রিত রবিবাসরের এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন। ইহাতে শরৎচন্দ্রের এতই আনন্দ হইয়াছিল যে তিনি জীবন ধন্য মনে করিয়াছিলেন। একমাস পর্য্যন্ত সেই আনন্দের রেশ তাঁহার দেহে মনে বর্ত্তমান ছিল। রবিবাসরের আর এক বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে প্রাণ খুলিয়া মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দিত করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন-পত্রখানি লইয়া তিনি পরদিন আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "জোরে জোরে এটা পড়। এতদিনে আমার সাহিত্য-সেবা সার্থক হ'লো।

এটা পাওয়ার জন্যই আজও বেঁচে আছি। ওহে যে যতই বাহবা দিক রবীন্দ্রনাথ স্বীকার না করলে সবই ব্যর্থ। বই বিক্রী ক'রে টাকা পাঁচকড়ি দেও পেয়েছে। সেটা ত' Test নয়। জনতার জয়ধ্বনিও Test নয়। খাঁটি Test ঐ কাগজখানায় আছে।" এরূপ উল্লাস শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

শরৎচন্দ্র অনেক সময় সভাপতিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াও আসিতেন না। এজন্য তাঁহার একটা দুর্নাম হইয়াছিল। একদিন বলিয়াছিলাম, "আপনি এরকম করেন কেন? সভাপতিত্ব স্বীকার না করলেই হয়। এতে বড় নিন্দা হয়।" তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ এটা আমার অন্যায় হয়—আমি বড় গেঁয়ো মানুষ। থাকি এক অজ পাড়াগাঁয়ে, আমাকে ধ'রে না আনলে আমার বেরোনই হয় না। তা ছাড়া, তোমাকে একটা কথা বলি, যারা সভাসমিতির উদ্যোক্তা তাদের অধিকাংশই বড় দেমাকে, পদগৌরবে তারা সাহিত্যিকদের অবজ্ঞা করে। আমরাও যে দুর্লভ হ'তে পারি এটা মাঝে মাঝে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আমি না গেলেই আর একজন সাহিত্যিককে সম্মানিত করতে হবে। আমার ইচ্ছা, সাধ ক'রে না হোক অন্ততঃ বাধ্য হ'য়ে অন্য একজন সাহিত্যিককে তারা সম্মানিত করুক।"

একদিন শরৎচন্দ্রকে বলিয়াছিলাম, "আপনার মধ্যে কোথায় একটা দুর্ব্বলতা আছে। সংস্কার-মুক্তির বাণী আপনি প্রচার করেছেন—সমাজশাসনকে আবার আপনি মেনেছেন বড় বেশী। সবার উপরে মানুষ সত্য, মানবধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের চেয়ে বড়,—এটা আপনার সাহিত্যের মূলমন্ত্র—অথচ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দিকে আপনার ঝোঁকও খুব বেশী। চাঁদসদাগরের মত আপনার উপন্যাসের বিদ্রোহী চরিত্রগুলি সমাজ-শাসন ও শাস্ত্রশাসনের কাছে শেষ পর্য্যন্ত মাথা নত করেছে। আপনার উপন্যাসের সংস্কার-মুক্ত চরিত্রগুলো শেষ কালে সংস্কারের-শাসন মেনে নিচ্ছে—অসত্যের সঙ্গে সংগ্রামে সত্যের পরাজয় হচ্ছে বার বার।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "বাঙ্গালী সমাজটাই ওই। বাঙ্গালী চরিত্র যা আমি ঠিক তাই এঁকেছি। বাঙ্গালীর মনে সংস্কার মুক্তির বাণী এসেছে—কিন্তু জীবনে আসে নি, ব্যক্তিতে এসেছে, সমাজে আসে নি। এটা বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের Transition period. এই period-এর সাহিত্যে ঐরূপ অসামঞ্জস্য দেখবেই। বঙ্কিমের উপন্যাসেও যা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও তাই—আমার লেখাতেও তাই। যতদিন না একটা আদর্শ সমাজ গড়ে উঠছে, ততদিন বর্ত্তমান সমাজকে উপেক্ষা করবার উপায় নেই। এই দেখ না আমি নিজে একজন বাঙ্গালী। জান ত' আমি কিছুই মানি না—শাস্ত্র-শাসন, সমাজশাসন, ধর্ম্মের শাসন, গুরু পুরোহিতের শাসন কোনটাই মানি না মনে মনে। তবু আচারআচরণে কিছু কি বুঝতে পার? যাদের নিয়ে এ সংসারে আছি, যাদের ভালবাসি, যারা আমাকে ভালবাসে, তারাও যদি না মান ত' তা'হলে কোন গোল হ'ত না। কিন্তু যারা মানে তাদের মনে ব্যথা দিয়ে তাদের উপেক্ষা করে, বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে আমি সংস্কারক হ'তে চাই না। তাই তাদের খুসী করে, পল্লী জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজ মেনেই চলি। একে দুর্ব্বলতা বলতে পার, ভীরুতা বলতে পার, কপটতা বলতে পার, এটাই খাঁটি বাঙ্গালীর স্বভাব। এর দ্বারাই তারা জাতীয় স্বাতন্ত্র্যটা এখনো রক্ষা করেছে।"

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

দ্বিতীয় পর্ব্ব

এক

শ্মশান ঘাটে ব'সে মন্দিরার শোচনীয় পরিণামের কথা ভাবতে ভাবতে দুলাল ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠ্‌ছিল। তার মনে শুধুই প্রশ্ন হচ্ছিল, সে এমন কি পাপ ক'রেছে যার জন্ম ভগবান এমন কঠিন শাস্তির বিধান ক'রলেন? তাব ধর্ম্ম-পরায়ণা মা কেন এতো কষ্ট পেয়ে দেহত্যাগ করলেন? শেষ মুহূর্ত্তে তাঁর মুখে এক ফোঁটা জল দেবারও কেউ রইলো না কেন? ফুলের মতো পবিত্র মন্দিরার ভাগ্যে এতো নির্য্যাতন, এমন মৃত্যুর বিধান কোন্ বিচারে হ'ল? ভগবান যে ন্যায়বান ও পবম দয়ালু এই কি তার প্রমাণ? দুলাল কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারলো না। এতকালের বদ্ধমূল ধারণা ও ধর্ম্মমতসমূহের বিরুদ্ধে তার চিত্তে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হ'ল। অন্যায় অধর্ম্মের বিচার যখন ভগবান ক'র্চ্ছেন না, তখন সে ভার নিতে হবে মানুষেরই এবং এইটিই তাঁর ইচ্ছা। দুলাল বুঝলো, নীরবে সকল অত্যাচার অবিচার স'য়ে থাকাটাই হ'ল পাপ এবং তারই ফলে তার জীবনটা ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। তখন তার মনে হ'ল, প্যারীলালকে শুধু জুতো-পেটা ক'রে ছেড়ে দেবার কথা—সেই দিনের শাস্তিটা এতো লঘু না হ'লে, পরের ব্যাপারগুলো হয় ত' ঘট্‌তো না এবং তা হ'লে আজ তার স্নেহময়ী মা ও আদরের বোন উভয়েই হয় তো বেঁচে থাকতো। এই ভাবের চিন্তা তাকে অতীতের দিকে টেনে নিয়ে গেল, তখন তার মনে জাগলো নিজ পারিবারিক ইতিহাসের কথা, নিজের বাল্য-জীবনের কথা। তার পিতা ত' দরিদ্র ছিলেন না, অধর্ম্মাচারীও ছিলেন না, যথেষ্ট অর্থশালী লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর অর্থ-সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত করলো কে? সেই বঞ্চনার ফলেই ত' পিতার অকাল-মৃত্যু ও পরিবারের নিষ্ঠুর দারিদ্র্য এবং তার পরবর্ত্তী যাবতীয় লাঞ্ছনার ইতিহাস। সুতরাং দুলালের হাতে শাস্তি পাবার উপযুক্ত যদি কেউ থাকে, হবে সে হচ্ছে তার পিতার সেই প্রবঞ্চক অংশীদার হরবিলাস, যিনি এই সকলের মূল কারণ।

গঙ্গার তীরে মন্দিরার দেহ ভস্মীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে দুলালের সঙ্কল্প স্থির হ'য়ে গেল। তার পিতার যে সম্পত্তি আজ হরবিলাস ভোগ কর্চ্ছে, ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ হরবিলাসের তাতে কোনো অধিকারই নেই, সুতবাং সেই অনধিকারীকে তার প্রবঞ্চনা-লব্ধ সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত করায় কোনো পাপ হ'তে পারে না বরং তা না করাটাই হবে দুলালের পক্ষে ভয়ানক অধর্ম্ম।

নিতাই চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ী ফিরে গেল। তার গভীর দুঃখ, মন্দিরাকে বাঁচাতে পারলো না, দুলাল দেশে গেল না। এই দুঃখেব মধ্যেও তার মনে সান্ত্বনা এলো এই ভেবে, জমিদারবাড়ীর যে দারোয়ানেবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে দুলালকে জেলে দিয়েছিল, দুলালের অজ্ঞাতে ও বিনানুমতিতে তাদের জিভ পুড়িয়ে দেবার কথাটা শুনেও যখন দুলাল তাতে দোষ ধরলো না বরং ব'লে দিলো, দুর্ব্বল যেন প্রবলের অত্যাচার আর নীরবে সহ্য না করে—যেন দল বেঁধে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়।

কমলাকে চুঁচুড়ায় পৌছে দিয়েই দুলাল বিদায় গ্রহণ করলো এবং বরাবর কলকাতায় ফিরে এলো। কমলার কাছে বিদায় নেবার আগে তার কাছে বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে দুলাল জান্‌তে পেরেছিল, অশোকা বা তার মতো চেহারার কোনো মেয়ে নারী-রক্ষাশ্রমে ছিল না।

ক'লকাতায় সেণ্ট্রাল এভিনিউর উপর দুলালের পৈত্রিক বাড়ী ছিল, দুলাল তা জান্‌তো এবং হরবিলাস যে ঐ বাড়ীতেই বর্ত্তমানে বাস করেন এ সংবাদটিও সে এর পূর্ব্বেই সংগ্রহ ক'বে রেখেছিল। সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত সে এই বাড়ীতেই মানুষ হ'য়েছিল সুতরাং বাড়ীর বিভিন্ন ঘরের অবস্থান সম্বন্ধে তার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল।

এক দিন সন্ধ্যার সময় দরোয়ানের অলক্ষিতে এক সুযোগে দুলাল ঐ বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়লো ও একটা নিভৃত জায়গায় লুকিয়ে রইলো। সে সঙ্কল্প ক'রে এসেছিল, আজ

যেমন ক'রে হোক, হরবিলাস তাঁর টাকাকড়ি ও মূল্যবান দলিল এবং জিনিষ-পত্রাদি কোথায় রাখেন তা সে জেনে নেবে এবং সম্ভব হ'লে সেগুলো আত্মসাৎ করবে কিম্বা ধ্বংস ক'রে দেবে। মোটের উপর, হরবিলাস যাতে অন্যায় ভাবে প্রাপ্ত ধনসম্পত্তি আর ভোগ করতে না পারেন, সেই ব্যবস্থা তার করতেই হবে।

বিপত্নীক হরবিলাস তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নিয়ে এই ত্রিতল বাড়ীতে বাস করতেন। নীচ তলায় ছিল আফিস ঘর ও কর্ম্মচারীদের থাকবার স্থান, দো-তলায় তাঁর নিজের শয়নকক্ষ, ড্রয়িং রুম, প্রাইভেট আফিসঘর, লাইব্রেরী, ড্রেসিং রুম ইত্যাদি। তেতলার ঘরগুলি মূল্যবান আসবাবে সুসজ্জিত অবস্থায় বিশিষ্ট অতিথির জন্য নিয়ত প্রস্তুত থাকতো।

বাড়ীর বর্ত্তমান ব্যবস্থা দুলালের জানা ছিল না। তবুও নীচ তলার ঘরগুলো যে কর্ম্মচারীদের জন্য অভিপ্রেত তা বুঝতে তার অনেকক্ষণ লাগলো না। উপরে উঠবার জন্য সামনের দিকে ও পশ্চাদ্ভাগে দুই সারি পৃথক্ সিঁড়ি ছিল। দুলালের তা মনে হ'ল এবং এক ফাঁকে পেছনের দিকে গিয়ে সেই দিকের সিঁড়ি বেয়ে সে দোতলায় উঠলো। তারপর একে একে সবগুলি ঘর, এমন কি তেতলার ঘরগুলিও পরীক্ষা করতে তার অসুবিধা হ'ল না। দুলাল যখন ঘর পরীক্ষায় ব্যস্ত তখন হরবিলাস বাড়ীতে ছিলেন না। রাত আটটার সময় ভৃত্যদের ব্যস্ততা লক্ষ্য ক'রে দুলাল বুঝতে পারলো, হরবিলাস বাড়ী ফিরেছেন। তখন সে বিশেষ সতর্কতার সহিত হরবিলাসের কার্য্য-প্রণালী লক্ষ্য ক'রবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। হরবিলাসের চেহারা তার স্পষ্ট মনে ছিল না, অন্ততঃ যেটুকু মনে ছিল তার সহিত এই গৃহস্বামীর চেহারার কোনো সাদৃশ্যই সে লক্ষ্য করতে পারলো না, শুধু উন্নত ও সূক্ষ্মাগ্র নাসিকাটি ছাড়া।

দুলাল অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করলো, হরবিলাস দোতলায় এসেই প্রথমতঃ তাঁর প্রাইভেট আফিস ঘরে গেলেন এবং পকেট থেকে একটি চাবি বের ক'রে সেই চাবি দিয়ে ঐ কামরার দেয়ালে গাঁথা একটা লোহার আলমারি খুললেন, তারপর জামার ভিতর দিকের পকেট থেকে কতগুলো কাগজ-পত্র বের ক'রে সেগুলো ঐ আলমারিতে রেখে দিলেন, অবশেষে একটা টর্চ্চের সাহায্যে অভ্যন্তর-ভাগ ভালরকম পরীক্ষা ক'রে আলমারির চাবিটা হরবিলাস কোথায় রাখলেন, দুলাল জানতে পারলো না।

পোষাক পরিবর্ত্তন ক'রে হরবিলাস তারপর আহারে বসলেন এবং আহারান্তে লাইব্রেরী ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। এই লোকটি দোতলার উপর সম্পূর্ণ একলা কি ক'রে বাস করেন তা ভেবে দুলাল মনে মনে বিস্ময় বোধ কচ্ছিল। বস্তুতঃ প্রভূত অর্থশালী ব্যক্তি হলেও হরবিলাস ছিলেন কৃপণপ্রকৃতি ও সন্দেহাকুলচিত্ত লোক। তাঁর ধারণা ছিল, মানুষমাত্রেই লোভী এবং কেউ সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন নয়। এই জন্য নিকটবর্ত্তী আত্মীয়ের ভিতরে অনেক যোগ্য এবং দুঃস্থ লোক থাকলেও তাদের কাউকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়ে নিজেকে বিপন্ন করতে হরবিলাসের সাহস হয় নি। ভৃত্যদের ভিতর একমাত্র বলরাম নামে একজন বৃদ্ধ উড়েকে হরবিলাস কতকটা বিশ্বাস করতেন। এই বলরাম ছাড়া অপর কোনো ভৃত্যের তাঁর শয়ন-কক্ষে কিম্বা প্রাইভেট আফিসঘরে যাবার আদেশ ছিল না।

বলরাম সব কাজ শেষ ক'রে চ'লে গেলে পর হরবিলাস ঘরের সব দোর বন্ধ ক'রে শয়ন ক'রতেন। অন্য দিনের ন্যায় আজও তিনি তাই ক'রলেন।

গভীর রাত্রে যখন বাড়ীর সমস্ত লোক ঘুমে বিভোর, দুলাল তখন তার লুক্কায়িত স্থান হইতে আস্তে আস্তে বের হ'য়ে হরবিলাসের প্রাইভেট আফিস ঘরে গেল এবং টর্চ্চের সাহায্যে সকল স্থান তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলো কিন্তু আলমারির চাবির সন্ধান পেল না। তার তখন বিশ্বাস হ'ল, হরবিলাস নিশ্চয়ই তাঁর শোবার ঘরে চাবি নিয়ে গিয়েছেন। ঐ ঘরের দোর ভিতর দিক থেকে বন্ধ ছিল ব'লে দুলাল সেখানে প্রবেশ করতে পারলো না। বিফল প্রযত্ন হ'য়ে তাকে সেই রাত্রি চুপি চুপি একটা দরজা খুলে ও অবশেষে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে আসতে হ'ল।

এর তিন দিন পর দুলাল আগের মতো আবার সেই বাড়ীতে সন্ধ্যার পর অলক্ষিতে ঢুকে পড়লো এবং এক সুযোগে হরবিলাসের শোবার ঘরে গিয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে রইলো।

হরবিলাস যথাসময়ে আহারাদি সম্পন্ন ক'রে রাত্রি এগারটার সময় শয্যা গ্রহণ ক'রলেন এবং আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। আরো আধ ঘণ্টা অতীত হ'লে দুলাল অতি সন্তর্পণে খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে হরবিলাসের আল্‌নায় ঝুলানো জামার পকেট থেকে চাবি বের ক'রে নিজ পকেটে রাখলো এবং তারপর ঘরের খিল খুব আস্তে আস্তে খুলে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাইভেট আফিস ঘরে ঢুকলো। টর্চ্চের সাহায্যে আল্‌মারিতে চাবি লাগিয়ে তার কবাট খুলতে দুলালের খুব অল্প সময়ই লাগলো এবং অল্পক্ষণের অনুসন্ধানেই অনেক দলিল-পত্র ও কিছু নোটের তাড়া তার হস্তগত হ'ল। দুলাল সেগুলো তার পকেটে রাখবার জন্ত মাত্র উদ্যত হ'য়েছে, এম্‌নি সময় অকস্মাৎ সমস্তটা ঘর একটা বড় আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। দুলাল মুখ ঘুরিয়ে দেখলো ঘরের মাঝখানে হরবিলাস এক হাতে একটা টর্চ্চ ও অপর হাতে একটা পিস্তল নিয়ে তাকে লক্ষ্য ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। দুলালের কম্পিত হাত থেকে অমনি সব কাগজ পত্র ও নোটের তাড়া খ'সে প'ড়ে গেল। মুক্ত হাতে তখনি সে একখানা চেয়ার তুলে হরবিলাসের দিকে ছুঁড়ে মারলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মেজেতে শুয়ে পড়লো। চেয়ার নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলের আওয়াজ হ'ল এবং পর মুহূর্ত্তে 'দুম্' ক'রে একটা শব্দ হ'য়েই সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেল।

পিস্তল লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়েছিল কিন্তু দুলালের মনে হ'ল তার নিক্ষিপ্ত চেয়ারের আঘাতে হরবিলাস যেন প'ড়ে গিয়েছেন। একটুখানি গোঙানি শব্দ হ'য়েই তা আবার বন্ধ হ'য়ে গেল। ঐ শব্দটা কে করলো? সেই শব্দ আবার হঠাৎ বন্ধই বা হ'ল কেন? তবে কি হরবিলাসকে সে গুরুতর ভাবে আহত ক'রেছে? হরবিলাস বেঁচে আছেন তো? এই প্রশ্নগুলি উপর্য্যুপরি এসে দুলালকে অস্থির ক'রে তুললো। তাড়াতাড়ি সে তার টর্চ্চটা খুঁজে বার করলো, তারপর ঐ আলোর সাহায্যে সে দেখলো, হরবিলাস মেজের উপর চিৎ হ'য়ে প'ড়ে আছেন। চট্ ক'রে কাছে গিয়ে দুলাল পরীক্ষা ক'রে দেখলো, তার পারিবারিক সমস্ত আপদ বিপদের মূলীভূত কারণ হরবিলাসের প্রাণবায়ু বিনির্গত হ'য়ে গেছে। দুলাল শিউরে উঠলো,—সে এসেছিল চুরি করতে, খুন করবার জন্ত নয়। শত্রুতা সাধনের জন্ত সে কি অবশেষে খুন ক'রে ব'সলো? সে আর চিন্তা করতে পারলো না। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো, ও ঘরের জানালার দিকে, দুলাল দেখলো, জানালা দিয়ে যেন একটা লোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ও লোকটা যেই হো'ক, সে নিশ্চয়ই এই খুনের ব্যাপারটা দেখেছে এবং সম্ভবতঃ দুলালকেও চিনে রেখেচে। পাছে দুলাল তাকেও খুন ক'রে বসে, সেই ভয়েই হয় তো লোকটা জানালা দিয়ে পালিয়ে গেল। এখন অবিলম্বে এই স্থান থেকে বেরুতে না পারলে তাকে নিশ্চয়ই খুনের দায়ে পড়তে হবে এবং তার পরিণাম হবে ফাঁসি! কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু সে পালাবে কোথায়? পিস্তলের শব্দে এরই মধ্যে নীচ তলার সব-লোক জেগে উঠেছে এবং জনকয়েক লোক চেঁচামেচি ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ ক'রেছে, আবার পাশের রাস্তা থেকেও লোক জনের ছুটোছুটির শব্দ শোনা যাচ্ছে। না, ঘরে দাঁড়িয়ে থাকলে তার চলবে না। দুলাল আর এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট না ক'রে পেছনের দিকের সিঁড়ির কাছে একটু আড়ালে লুকিয়ে রইলো।

সামনের দিকের বড় সিড়ি দিয়ে এসে কর্ম্মচারীরা দেখলো, দরজা ভিতর দিক দিয়ে বন্ধ! তারা দরজায় তখন জোরে আঘাত করতে লাগলো। বৃদ্ধ বলরাম বরাবর পিছনের সিড়ি ব্যবহার করতো এবং কাজ শেষে বাইরের দিকে তালা বন্ধ ক'রে নিজ ঘরে শুতে যেতো। গোলমাল শু'নে সেও সিড়ি বেয়ে উপরে উঠলো এবং চাবির সাহায্যে তালা খুলে হরবিলাসের শয়ন-কক্ষের দিকে গেল। বলরামের পশ্চাতে অপর কোনো লোক ছিল না বুঝতে পেরে দুলাল ত্বরিতে সেই সিড়ি পথে নীচে নেমে গেল এবং বাড়ী থেকে বেরুবার সুযোগ প্রতীক্ষায় এক জায়গায় লুকিয়ে রইলো। তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। একটু পরেই হরবিলাসের মৃতদেহ আবিষ্কারের পর উপরে ভয়ানক সোরগোল উপস্থিত হ'ল এবং সেই সংবাদ মুহূর্ত্তে বাড়ীর সর্ব্বত্র ছ'ড়িয়ে পড়লো। সমস্ত লোক তখন গৃহস্বামীকে দেখবার জন্ত উপর তলায় জড় হ'ল, সেই সুযোগে দুলাল সকলের অগোচরে বাড়ী থেকে নির্ব্বিঘ্নে বেরিয়ে পড়লো।

হরবিলাসের খাটের মাথায় একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বসানো ছিল। তাঁর প্রাইভেট ঘরে অবস্থিত লোহার

লমারি খুলতে গেলেই ওই ঘণ্টা বেজে উঠতো। সুতরাং াল যখন আলমারি খোলে, তখনই ঘণ্টা বেজে উঠে বিলাসকে জাগিয়ে দিয়েছিল। হরবিলাস অমনি বালিশের চ থেকে পিস্তল ও টেবিলের উপর থেকে টর্চ্চ নিয়ে ক্সিস ঘরের দিকে যান কিন্তু তাঁর পরমায়ু যে এমন কঠোর আকস্মিক ভাবে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে তা মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তার ভিতরে আসে নি।

দুই

আত্মগোপন ও দেশত্যাগ করা ভিন্ন দুলালের আর অন্য ইলো না। জেল খেটে এসে সমাজে মুখ দেখানো তার পক্ষে অসম্ভব, খুনের অপরাধে প্রতিমুহূর্ত্তে ধরা ার মতো বিপদ মাথায় নিয়ে দেশে বাস করাও তেমনি ভব হ'য়ে দাঁড়ালো। কাজেই ছদ্মবেশী দুলাল একদিন খ' নাম গ্রহণ ক'রে বাঙ্গালার বাইরে রওনা হ'য়ে গেল।

দেশ ছাড়বার সময় দেশের অনেক স্মৃতিই তার মনে ছিল। সংসারে বেঁচে থাকবার আকর্ষণ বা প্রয়োজনীয়তা আর তার কিছুই ছিল না, আবার আত্মহত্যা ক'রে ফাঁসি কাঠে ঝুলে জীবনান্ত করার পক্ষেও সে কোনো খুঁজে পেলো না। অপহৃতা অশোকার কথা সে যায় নি। মন্দিরার অনুসন্ধানের সময় অশোকার ও সে খোঁজ নিয়েছিল। তার বিশ্বাস ছিল, মন্দিরার শোকার অপহারক একই ব্যক্তি এবং তাদের একই য়েই হয় ত' রাখা হ'য়েছে কিন্তু কমলা ব'লেছিল, কা নামে কোনো মেয়েকে "নারী-রক্ষাশ্রমে" আনা হয় তারপর চুচুড়ায় গণেশ ঘোষালের স্বীকারোক্তির যে বিবরণ সংবাদ পত্রে বের হ'য়েছিল তা থেকে এবং ও প্রকাশ পেয়েছিল, অশোকা অত্যাচারের ভয়ে ডুবে আত্মহত্যা ক'রেছে। কিন্তু অশোকার প্রকৃতি দুলালের যতটা জ্ঞান ছিল, তাতে সে কিছুতেই বিশ্বাস পারে নি, দৃঢ়চিত্ত অশোকা অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তির না ক'রেই আত্মহত্যা ক'রে বসবে। তবে গণেশের মূলে অশোকা থাকলেও সেটা তার ইচ্ছাকৃত ছিল গণেশকে ঘরে আবদ্ধ ক'রে পালাবার সময় অশোকা করতে পারে নি, ওই ঘরেই তার চূড়ান্ত শাস্তির ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। দুলাল জানতো, অশোকা সাধারণ মেয়ের মতো ছিল না এবং তার আত্মরক্ষার শক্তি ও সাহস যথেষ্ট ছিল, তা ছাড়া, গণেশের কবল থেকে বেরিয়ে আসবার পর তার গঙ্গায় ডুবে মরবার কোনো উপযুক্ত কারণই থাকতে পারে না। দুলালের ধারণা, অশোকা কখনও আত্মহত্যা করে নাই এবং দুর্ব্বৃত্তদের হাতেও সে আর পড়ে নি। ডুবে মরার কথাটা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমতী অশোকার একটা ছলনা মাত্র। দুলাল এইরূপ ভেবে তার সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছিল এবং তার ভরসা ছিল, হয় ত' কোনো না কোনো জায়গায় তার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

পরিব্রাজক সুরথ নানাদেশ ঘুরে অবশেষে বেনারসে উপস্থিত হ'ল এবং বাঙ্গালীটোলায় চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহে সাময়িক ভাবে আশ্রয় লাভ করলো। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিহার প্রদেশে জজিয়তি করতেন, পেন্সন নিয়ে তিন চার বছর হ'ল এখানে সস্ত্রীক বাস কর্চ্ছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ধর্ম্মকার্য্যে ও সকল প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য ক'রে তিনি তাঁর অর্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতেন। ধর্ম্মপ্রাণ সাত্ত্বিক-প্রকৃতি সদাশয় হিন্দু ব'লে তাঁর খ্যাতি ছিল এবং এই জন্য তাঁর গৃহে প্রায়ই সাধু সন্ন্যাসীদের শুভাগমন ও সেই উপলক্ষ্যে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ হ'তো।

সুরথ এখানে আসবার কয়েকদিন পরে ভারত রাষ্ট্রীয় থিয়োসোফিকেল সোসাইটির একটা অধিবেশন হয় এই বেনারসে এবং সেই উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে ঐ সম্প্রদায় ভুক্ত বহুলোকের এখানে সমাগম হয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোনো রকম গোঁড়ামি ছিল না। এই জন্য ধর্ম্ম প্রসঙ্গ হ'লেই সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তিনি তাতে যোগদান করতেন এবং যথাসম্ভব অর্থ-সাহায্য ক'রে উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করতেন। তাঁর উৎসাহ ও অনুরোধে সুরথ একদিন বক্তৃতা শোনবার জন্য সেই সভায় উপস্থিত হ'য়েছিল। শ্রীযুক্তা আনি বেশান্তের হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা যেমন তাকে বিমুগ্ধ করলো, একটি বাঙ্গালী রমণীর ইংরেজী বক্তৃতাও তেমনি বিস্মিত করলো। এই রমণীকে দেখেই দুলাল চিনতে পারলো, ইনি লীলাবতী রায় যাঁর অযাচিত করুণা একদিন একান্ত আকস্মিক ভাবে লাভ ক'রে সে ধন্য হ'য়ে গিয়েছিল

এবং যাঁকে তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ সে এ পর্য্যন্ত আর পায় নি। তার ইচ্ছা হচ্ছিল, তখনই সে উঠে গিয়ে সেই কর্ত্তব্যটুকু সম্পন্ন করে কিন্তু তিনি এখন তাকে এই ছদ্মবেশে চিন্‌বেন কি? এটা তার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে না তো? তিনি হয় ত' তার নামটি পর্য্যন্ত জানেন না, এই অবস্থায় এরূপ একটা বিরাট সভাস্থলে পরিচয় দিতে বা পরিচয় করতে যাওয়া শুধু একটা কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হবে না কি? তা ছাড়া, সে একজন জেলখাটা লোক, খুনী ফেরারি আসামী,—তার পক্ষে এমন সম্ভ্রান্ত মহিলার নিকট পূর্ব্ব-পরিচয়ের দাবী নিয়ে উপস্থিত হওয়াটাই হবে তাঁকে অবমাননা করা, তাঁকে হীন করা। হৃদয়ের আবেগ সবলে সংবরণ ক'রে সে নিজ আসনেই ব'সে রইলো কিন্তু তার দৃষ্টি রইলো লীলাবতীর প্রতিভাদীপ্ত সুকুমার মুখখানার উপর। আরো অনেক বক্তৃতা হ'ল কিন্তু সে সব দুলালের কানে প্রবেশ করলো না।

সভা ভঙ্গের পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুরথকে নিয়ে নিজ গাড়ীতে গৃহের দিকে রওনা হ'লেন এবং বক্তৃতার বিষয়গুলি যে কোনো ধর্ম্ম-মতের বিরোধী নয় এবং বেশ নিরপেক্ষ বিচারের সহিত উপস্থাপিত করা হ'য়েছে সেজন্য আনন্দ প্রকাশ করলেন; তারপর, শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের বক্তৃতা সম্বন্ধে বললেন, "যে দেশে এমন উচ্চ-শ্রেণীর মহিলা জন্মগ্রহণ ক'রেছেন সে দেশ ধন্য। ভারতবর্ষকে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র ক'রে এ দেশকেও তিনি ধন্য ক'রেছেন। তাঁর প্রেরণা ভারতের নারীগণ মধ্যেও যে বেশ প্রসার লাভ ক'রেছে, অ প্রতিপন্ন হ'ল ঐ বাঙ্গালী মেয়েটির উদ্দীপনা-পূর্ণ ব থেকে।"

সুরথ সোৎসাহে জিজ্ঞেস করলো, সেই মেয়েটিকে জানেন কি না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বললেন, "না জানি না, তবে শুনেছি, তিনি না কি খুব ধনী লোকের নামটা বোধ করি, প্রোগ্রামে ছাপানো আছে। বা মেয়ের ইংরেজীতে এমন সুন্দর বক্তৃতা সরোজিনী না পরে আর কারো মুখে শুনি নি।"

—"ইনি কি শুধু বক্তৃতা ক'রেই বেড়ান, না আর করবেন?"

—"শুনেছি, প্রচার কার্য্যে তাঁকে নানা স্থানে যেতে এবং শীগ্‌গিরই তাঁর আসাম অঞ্চলে যাবার কথা ত প্রচার কার্য্য ছাড়া তিনি আর কিছু করবেন কি না জানি যে দিন তাঁর দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবন প্রকৃত জন-সে নিয়োজিত হচ্ছে ব'লে শুনবো সেই দিন মনে করবো তি এ দেশকে ধন্য ক'রেছেন।"

সুরথ আর কিছু না ব'লে চুপ ক'রে গেল এবং যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে পড়লো। তার মনের কেউ জানলো না এবং জানাবার ইচ্ছা থাকলেও জানাতে পারলো না খুনী পলাতক আসামীর এ দুরবস্থা।

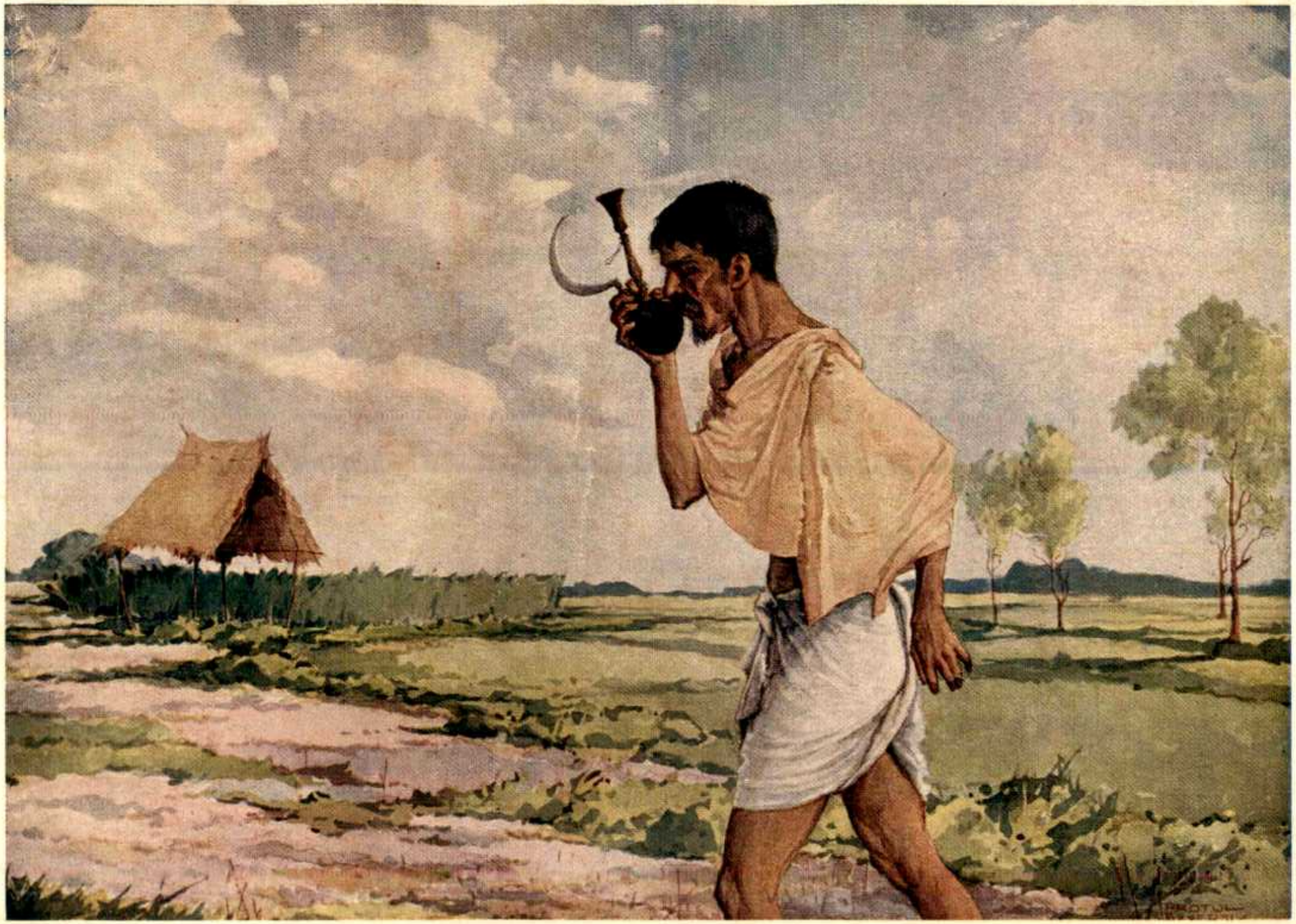

তৃপ্তি

শিল্পী—শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY.

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৯

৯ম বর্ষ—২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা

সমগ্র জগৎ যুদ্ধের তাণ্ডবনৃত্যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বংস-রাক্ষসী লেলিহান রসনায় বিশ্ব-সংসার গ্রাস করিতে সমুদ্যত। ধরণী-বক্ষ সর্ব্বদাই ত্রাস-বিকম্পিত। আজ জগতের রক্ষা-বিধানে শান্তি ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। কিন্তু কোন্ শান্তি? আশু শান্তি? তাহা তো ক্ষণস্থায়ী। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আবার যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিবে। তাই আবার প্রশ্ন জাগে,—কে জগৎকে অক্ষয় শান্তি দিতে পারে, কেহ পারে কি? হাঁ পারে, একমাত্র ভারতই এই সর্ব্বকাম্য চিরশান্তির সন্ধান দিতে পারে।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতের সমস্যাবলীর সমাধান করিতে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করিতে সক্ষম হইলেন না—ভগ্ন হৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু আমরা জানি, আশা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। পুনরায় তিনি এদেশে আসিতে পারেন, নতুবা তাঁহার স্থলে অন্য কেহ প্রতিনিধি হইয়া আসিবেন। কিন্তু যিনিই আসুন পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত শিক্ষা হেতু, কেহই ভারতের তথা জগতের আসল সমস্যার কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন না। যথার্থই যে উপায়ে চিরশান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে একজন ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি একটি প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। যতদূর অনুধাবন করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, জগতের শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ইহাই একমাত্র পথ।

বৃটীশ প্রতিনিধির সহিত একটি কল্পিত কথোপকথনের ছাঁচে উক্ত ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিটির আবিষ্কৃত তথ্যগুলি আমরা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

জগতের ভাবী নববিধানে এই পন্থাটি কতদূর গ্রহণযোগ্য, তাহা স্থির করিবেন সাধারণ জনমণ্ডলী। ভরসা করি, ভারতের তথা নিখিল-জগতের উপলব্ধি-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই এই উক্তিগুলি প্রণিধান করিয়া সমস্বরে শান্তির জন্য মুখর হইয়া উঠিবেন।

সম্পাদক, বঙ্গশ্রী।

ভারতের মুক্তি তথা জগতের কল্যাণ

[ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং বৃটীশ প্রতিনিধিকে আমরা সংক্ষেপে যথাক্রম 'চি' এবং 'প্র' বলিয়া অভিহিত করিব।]

ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি।—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। জার্ম্মানী ও জাপানের সম্ভবিত ভারত আক্রমণের আশঙ্কায় দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আপনি নিশ্চয়ই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন ?

[প্রতিনিধি জিজ্ঞাসু নেত্রে চিন্তাশীল ব্যক্তির দিকে চাহিলেন]

চি—এই অবস্থায় দেশবাসীকে আত্মরক্ষার জন্ত আপনি সাহায্য করিবেন না ?

প্র—নিশ্চয়ই! এই উদ্দেশ্বেই তো আমি ভারতে আসিয়াছি! তাই তো, বৃটীশ মন্ত্রীসভার একান্ত কাম্য যে, ভারত সর্ব্বান্তঃকরণে একযোগে যুদ্ধে যোগদান করুক। সত্যই, বর্ব্বর হুন ও জাপ শত্রুদের আজ যদি ভারতবাসী সমস্ত জীবন পণ করিয়া পাল্টা আঘাত দিতে থাকে, তবে ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না।

চি—মানিলাম; কিন্তু ধরুন সমগ্র ভারতবাসী সর্ব্বান্তঃকরণে যুদ্ধে যোগ দিল না; এক্ষেত্রে ফলটা কিরূপ হইবে ?

প্র—এক্ষেত্রে প্রথমতঃ অমন হইতে পারে যে শত্রুকে উপযুক্ত ভাবে বাধা না দওয়ায় শত্রুকে পরাজিত করা অসম্ভব হইবে, আবার এমনও ঘটিতে পারে যে, ভারতবাসীরা যুদ্ধে সদলবলে যোগদান না দেওয়াতেও শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা অসম্ভব হইবেনা। কিন্তু ফল যাই হোক,—ভারতকে যে ইহার পরিণাম ভোগ করিতে হইবে ইহা সুনিশ্চিৎ।

চি—কিন্তু ইহার ফলে কি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হাতছাড়া হইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই ?

প্র—বাজে বকিবেন না। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং বৃটীশ কমনওয়েল্‌থের সম্মিলিত বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে আপনার কি কিছু ধারণা আছে ? স্থির জানিবেন, একদিন না একদিন এই বিপুল সম্পদের কাছে অক্ষশক্তির তৃণাদপি ক্ষুদ্র ভাণ্ডার অচিরেই নিঃশেষিত হইবে এবং তাহাদিগকেও পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে! আমরা অটুট ধৈর্য্যের সহিত সেই সুদিনের অপেক্ষা করিতেছি।

চি—প্রার্থনা করি, আপনার কথাই যেন সত্য হয়! কিন্তু বেশী অপেক্ষা করিতে গেলে তো মিত্রপক্ষের জনসাধারণকে বহুদিন পর্য্যন্ত বহু দুঃখ-দুর্দ্দশা ও অভাব দৈন্তের মধ্যেই দিন কাটাইতে হইবে!

প্র—তাহা হইলে আর কি করা যাইবে বলুন! যাহার কোন প্রতীকার নাই, তাহা তো সহ্য করিতেই হইবে। আমরা তো আর সাধিয়া এই যুদ্ধ ডাকিয়া আনিতে যাই নাই ? আক্রমণকারী শত্রুই প্রথমে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তদের এই কৃতকর্ম্মের জন্ত কঠিন শাস্তি দিতে হইবে। এমন শিক্ষা তাহাদের দিতে হইবে, যেন ভবিষ্যতে কোনদিন তাহারা যুদ্ধের নাম পর্য্যন্ত মুখে না আনিতে সাহসী হয়।

চি—কিন্তু, মিত্রশক্তির যদি পরাজয় ঘটে ?

প্র—দেখুন, আপনার মন বড় পরাজয়বাতিকসন্ত্রস্ত! আপনার সঙ্গে বাক্যালাপ করাও বৃথা! আপনাকে তো বলিলাম যে মিত্রশক্তির প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার অফুরন্ত! তদুপরি ঈশ্বর মিত্রশক্তির সহায়, মিত্রশক্তি কি কখনও হারিতে পারে ? ঐরূপ অসম্ভব কথা মুখেও আনিবেন না।

চি—আপনাদের নীতি ও পন্থার মূল কথাটা বুঝিতে পারিলাম যে, বর্ত্তমানের সর্ব্বাঙ্গীন সমরসজ্জা দ্বারাই আপনারা বিজয়মাল্য লাভ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আচ্ছা আমি যদি বলি, আরেকটি উপায়ে সম্পূর্ণ শান্তি-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে, আর সেই উপায়ে কেবল আজিকার জন্ত নহে; চিরদিনের জন্ত সর্ব্বমানব অটুট শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করিবে, তবে সমরসজ্জার পরিবর্ত্তে কি এই উপায়ই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয় নয় ?

প্র—পক্ষান্তরে, ইংল্যাণ্ড মিত্রপক্ষের বিন্দুমাত্র সম্ভ্রমহানি বা রাজ্যহানির সম্ভাবনা থাকিলে এই উপায় আমরা সর্ব্বান্তকরণে পরিহার করিবারই চেষ্টা করিব।

চি—না, না, রাজ্য বা সম্ভ্রমহানি হইবে কেন? সেইরূপ কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু মিত্রপক্ষের সম্মান যদি এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়, বা মিত্রপক্ষকে একতিল ভূমি হারাইতে না হয়, তাহা হইলেও কি এই উপায় গ্রহণ করিতে আপনারা আপত্তি করিবেন?

প্র—তা' অবশ্যই করিব না! কিন্তু আপনি যে উপায়ের কথা বলিলেন, সেইরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন সম্ভব বলিয়া তো বিশ্বাস হয় না।

চি—বিশ্বাস না হইতে পারে; সেজন্য আপনাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি বলিতেছি, এই উপায় অসম্ভবও নহে, উদ্ভটও নহে। যথার্থ ই এই উপায়ে পৃথিবীতে চিরন্তন শান্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতা অদ্যপি ইহার সন্ধান পায় নায় বলিয়াই আপনারাও ইহাকে অবিশ্বাস্য মনে করিতেছেন। কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে আমি এই চিরন্তন শান্তি-উৎসের সন্ধান পাইয়াছি। আমার কথা শুনিবার ধৈর্য্য থাকিলে, আপনার অনুমতিক্রমে আপনাকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, আপনাদেরই সহায়তায় কি ভাবে জগতে এই অক্ষয় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে, একসময় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ উপরোক্ত ঋষিরচিত ভারতীয় শাস্ত্রাদির মর্ম্মোদ্ঘাটনের সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ ভারতের আর্ষ-বচনা বলিয়া বর্ত্তমানে যাহা প্রচলিত, সেই রচনা প্রত্যুতপক্ষে ঋষিগণের নহে, ঋষিগণের পরবর্ত্তী ভাষ্য ও টীকাকারগণই এই সকল শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে-ভাষায় ঋষিগণ স্ব স্ব চিন্তাধারা ব্যক্ত করিয়াছেন, অধুনা সেই ভাষা সাধারণের অনুধাবন-যোগ্য নহে। এই ভাষা একপ্রকার বিস্মৃতির গর্ভেই অবলুপ্ত। কিন্তু আজও যদি সঠিক পথে এই ভাষার পুনরুদ্ধার সাধন সম্ভব হয়, দেখা যাইবে, ভারতীয় ঋষিগণ-রচিত শাস্ত্র গ্রন্থাদি অমূল্য রত্নের আকর। যাক্, এসব অন্য কথা মূল প্রসঙ্গেরই আলোচনা চলুক।

আমি বলিতেছিলাম যে, অবিলম্বে যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া সর্ব্বজগতের সন্তুষ্টি বিনোদন করা যাইবে যে উপায়ে সেই কার্য্যকরী উপায়ের অস্তিত্ব আমরা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি। বস্তুতঃ এই উপায় গৃহীত হইলে মানুষ কেবল বিভীষিকা এবং গোপনচরিতের কবল হইতেই পরিত্রান পাইবে না, আগামী সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ আর্থিক প্রাচুর্য্যেও পরিপূর্ণ থাকিবে। কোনও দেশ খাদ্য শষ্য ও কাঁচামালের অভাব এতটুকুও অনুভব করিবে না। পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও জাতিই অবিমিশ্র রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হইবে। পঁচিশ বৎসর পরে অর্থনৈতিক অধিকার স্বাতন্ত্র্যও সারা পৃথিবীর বুকে অধিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ভারতের সহায়তায় একমাত্র ইংলণ্ডই জগৎবাসীর সমক্ষে এই উপায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে,—ইংলণ্ডদেশ ব্যতীত আর কেহ নহে।

অচিরে ইংলণ্ড যদি উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া জগতের সমস্যাসাধনে সচেষ্ট হয় তাহা হইলে রাজ্য বা সম্ভ্রমহানির কথা দূরে থাক্ শত্রুপক্ষেরও প্রশংসাভাজন হইতে ইংরেজসরকার সমর্থ হইবেন। ইংল্যাণ্ড ক্রমেই অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হইবে, আর তাহার নৈতিক বলও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রথা অবলম্বিত হইলে চিরদিন ইংরেজগণ সমগ্রমানবসমাজের অন্তরে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন। বৃটীশ প্রজামণ্ডলী যেটুকু সুখ-সুবিধা এতাবৎ পাইয়াছে, তত্তুলনায় এই প্রস্তাবিত অবস্থা কত সুখকর!

প্র—(হাসিয়া) মনে হয়, আপনি আকাশকুসুম রচনা করিতেছেন। তবু বলুন তো, এই পন্থা অবলম্বনে স্বীকৃত হইলে বৃটীশসরকার কিভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইবেন?

চি—শুনুন; সর্ব্বপ্রথমেই বৃটীশরাজকে ভারতের পূর্ণস্বরাজ

ঘোষণা করিতে হইবে। ভাইসরয়পদ বিলোপ করিয়া একজন ভারতীয় ব্যক্তিকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদে নিয়োগ করিতে হইবে। এই নবনিযুক্ত ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল কোধাবে সম্রাট, পার্লামেণ্ট, ভারতসচিব এবং পুরাতন ভাইসরয়ের ভারতের শাসন সম্বন্ধীয় সমুদয় ক্ষমতাই লাভ করিবেন।

প্র- বা, ভাবী মজার লোক তো আপনি? এই মাত্র আপনি বলিলেন যে, আপনার পরিকল্পনায় ইংল্যাণ্ড ও মিত্রশক্তির রাজ্য বা সম্ভ্রমহানির কোন আশঙ্কা নাই, আর পরমুহূর্ত্তেই এখন বলিতেছেন যে ইংরেজরাজ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষনা করুক? ভারতের স্বাধীনতায় ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যহানি হইবে না? ভারতের অভাবে ইংল্যাণ্ড অনতিকাল মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর একটি নগণ্য শক্তিতে পরিণত হইবে না? আর বৃটেনের সম্মান-সম্ভ্রমই তাহাতে কি করিয়া অব্যাহত থাকিবে?, দেখিতেছি, আপনি উন্মাদ! যাক্ মিছামিছি আর আমার সময় নষ্ট করিবেন না।

চি—হাঁ, যদি আমি শুধু এই কথাই বলিতাম যে, আপনি বিনাসর্ত্তে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করুন, ভারত সম্পর্কে ভাইসরয়, ভারতসচিব, পার্লামেণ্ট এবং সম্রাটের সমস্ত অধিকার লুপ্ত হোক, অথবা, ভারতবাসী কর্ত্তৃক মনোনীত বা নির্ব্বাচিত ভারতীয় গভর্ণর জেনারেলই ভারতের শাসন-সম্বন্ধে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়ুন,—তাহা হইলে অবশ্যই আপনি আমাকে উন্মাদ ঠাওরাইতে পারিতেন। কিন্তু বস্তুতঃ আমি তো তাহা বলি নাই, আর আমার প্রস্তাবটি আমি শেষও করি নাই। আমি সবে আরম্ভ করিয়াছি মাত্র। ধৈর্য্য ধরিয়া একটু শুনুনই না আমার বক্তব্যটা। অবশ্য যে স্থলে আপনার মনে সন্দেহ জাগিবে বা আমার কথায় সামঞ্জস্যের অভাব হইবে, সেখানে আপনি বাধা দিতে পারেন। নতুবা অযথা প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন না। এখন দয়া করিয়া আমার সব কথাটুকু শুনুন।

সম্রাট, পার্লামেণ্ট, ভারত-সচিব এবং ভাইসরয়ের সম্মিলিত অধিকার-মণ্ডিত হইয়া যে-ভারতীয়টি ভারতের নব গভর্ণর জেনারেলরূপে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে মনোনীত করিবেন বৃটীশ মন্ত্রীভাবই নিয়োজিত একটি বিশেষ কমিটি।

মনোনয়নের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ যত্ন সহকারে লক্ষ্য করিতে হইবে :—

(১) যে-যে কারণে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভারতবাসীর আর্থিক দৈন্য ও অসন্তোষের উদ্ভব হইয়াছে, গভর্ণর জেনারেল-পদপ্রার্থী ব্যক্তিটি এই দৈন্য ও অসন্তোষের কারণ সম্যক্ অনুধাবন ও উপলব্ধি করিয়াছেন কি না?

(২) এই দৈন্য ও অসন্তোষের প্রতিকার সম্বন্ধে এই ব্যক্তি বিশেষ অনুসন্ধান মূলক কোন গবেষণা করিয়াছেন কি না?

(৩) পরস্পরের প্রতি পরিপোষিত মানবজাতির ঈর্ষা, বিদ্বেষ প্রভৃতি হীন মনোভাবের মূল কারণ এই ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না?

(৪) উক্ত হীন মনোভাবের প্রশমন হয় কি উপায়ে, সে সম্বন্ধে এই ব্যক্তি সবিশেষ চিন্তা করিয়াছেন কিনা?

(৫) ভারতের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক হেতু ইংলণ্ডবাসীগণ ভারত হইতে যে যে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আহরণ করিয়াছেন, গভর্ণর জেনারেল-পদপ্রার্থী ব্যক্তিটি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত কিনা?

(৬) ভারতের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলে ভারতে ইংরেজের পূর্ব্বেকার সমস্ত স্বার্থই বজায় থাকিবে যে-উপায়ে এই ব্যক্তি সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুপরিক্ষিত পন্থার সন্ধান জানেন কিনা?

(৭) সম্রাট পার্লামেণ্ট এবং ভারত-সচীবের মধ্যস্থতায় ইংরেজ রাজসরকার কোন শাসন-প্রণালী দ্বারা ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ও ভাইসরয়কে পরিচালিত করেন, এই ব্যক্তি সেই শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কিনা?

(৮) সম্রাট পার্লামেণ্ট এবং ভারত সচীবের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেও এই ব্যক্তি ভারতগভর্ণমেণ্ট এবং ভাইসরয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালীর সন্ধান দিতে সক্ষম হইবেন কি না? এবং অক্ষশক্তির

সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তির নির্ব্বাহিত কার্য্যধারা অব্যাহত থাকিবে কি না ?

(৯) অক্ষশক্তির সহিত মৈত্রীবন্ধন সত্ত্বেও ভারতীয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বৃটীশ কর্ম্মচারীদের চাকুরী ও পেনসন্ বজায় রাখিবার উপায় এই ব্যক্তি জানেন কিনা, আর জানিলে তিনি এই সব অকপটে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবেন কি না ?

(১০) এইরূপ অক্ষশক্তির মৈত্রী অমান্য না করিয়াও ভারতে বৃটেনের বাণিজ্যস্বার্থ বজায় রাখিবার উপায় তিনি অবহিত কি না,—আর জানিলে তিনি আন্তরিকভাবে এই উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে প্রযত্ন হইবেন কিনা ?

(১১) ভারতের গভর্ণর জেনারেল-পদপ্রার্থী এই ব্যক্তির যথার্থ-ই ভারতভূমির প্রকৃত উৎপাদিকাশক্তির সুনির্দ্ধারণের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে কিনা ?

(১২) ভূমির সম্ভাব্য উৎপাদিকার সুনির্দ্ধারণের উপায় দ্বারা এই ব্যক্তি ভারতভূমির হৃত স্বাভাবিক উর্ব্বরতা পুনর্জ্জীবিত করিয়া এরূপ উপযুক্ত খাদ্যশস্য আহরণে সক্ষম হইবেন কি না, যাহাতে সমগ্র পৃথিবীবাসীর সমুদয় ন্যূনতম, প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে ?

(১৩) যে শিক্ষায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী চিত্তের আবেগ ও উত্তেজনা দমনে, এবং বৈতানিক দাসত্ব ব্যতীত স্বীয় পরিবারের ভরণপোষণে অভ্যস্ত হইতে পারিবে, এরূপ কোন সুসম্পূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তনে এই ব্যক্তি সক্ষম হইবেন কি না ?

(১৪) ভারতের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সমন্বয়সাধন, এবং একাধারে বৃটীশ ও ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে প্রকৃতই এই ব্যক্তি উপযুক্ত কি না ?

(১৫) প্রত্যেক ভারতীয়, প্রত্যেক বৃটীশ এবং প্রত্যেকটি এক্সিস প্রজার সঙ্গত স্বার্থরক্ষা করিয়া সন্ধির সর্ত্ত পালন করিবার সদুপায় এই ব্যক্তির পরিজ্ঞাত কি না ?

প্র—দেখুন, যথার্থই কি যে আপনি বলিতে চান তাহার মাথামুণ্ড কিছুই আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনার কথায় যথোচিত মনোযোগ দিবার ধৈর্য্যটুকু রক্ষা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

চি তাহা জানি। কিন্তু একথা আপনার ভুলিলে চলিবে না যে আপনি এক বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই দায়িত্বের গুরুত্ব সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ভারতের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করিতেই আপনি এদেশে আসিয়াছেন। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যিনি ভারতীয় সমস্যাবলীর সত্যকার ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করিবেন, প্রত্যুতপক্ষে, তিনি কেবল ভারতকে নয়, সমগ্র বিশ্বকেই ভবিষ্যৎ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবেন! যুগ যুগ ব্যাপিয়া আগামী সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার নাম মানবজাতির স্মরণপটে চিরদিন অক্ষয় হইয়া রহিবে। বর্ত্তমান পৃথিবীর ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠায় তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়া বসিবেন।

প্র—কিন্তু, ভারতের সমস্যাবলীর সমাধানকেই আপনি পৃথিবীর পক্ষে প্রধানতম প্রয়োজন বলিয়া অভিহিত করিতেছেন কেন, একথা আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন ?

চি—এ তো অত্যন্ত সহজ কথা! বর্ত্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহ সর্ব্বদেশে অর্থ-নৈতিক স্বাধিকার বিস্তারকল্পে পরস্পরের প্রতি যে হিংসাকুটিল মনোবৃত্তি পোষণ করিতেছে, সেই মনোবৃত্তির মূলানুসন্ধানে যদি আপনি সচেষ্ট হন, তবে অবশ্যই আপনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন, কেন আজ ভারতের সমস্যাবলীর সমাধান সাধনই বিশ্ববাসীর পক্ষে সর্ব্বাধিক প্রয়োজন ?

নিম্নোক্ত প্রতিপাদ্যগুলি পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে যে :—

(ক) যদি প্রতি দেশই সমগ্র অধিবাসীদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান উৎপাদনে সক্ষম হইত ;

(খ) যদি প্রতি দেশই কাঁচামালকে প্রয়োজনমত সুসম্পূর্ণ শিল্পপণ্যে (finished products) পরিণত করিবার উপযুক্ত জ্ঞান অর্জ্জনে সফলকাম হইত ;

(গ) যদি প্রতি দেশেরই অধিবাসীবৃন্দ জীবনযাত্রার যাবতীয় ন্যূনতম প্রয়োজন-সামগ্রী (minimum requirements of life) লাভে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিত;

(ঘ) যদি প্রতি দেশই এইভাবে প্রত্যেক অধিবাসীর অপরিহার্য্য ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের পর উদ্বৃত্তাংশ যোগ্যব্যক্তিদের মধ্যে গুণানুসারে ভাগ করিয়া দিতে কার্য্যক্ষম হইত,

(ঙ) যদি প্রত্যেক দেশ উহার সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে এমন শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে পারিত, যদ্দ্বারা তাহারা অতিশয় লোভ ও কৃত্রিম সম্ভ্রমের বালাই বিসর্জ্জন দিতে পারে –

তাহা হইলে কোন দেশকেই আর অপরের রাজ্যমধ্যে অর্থ নৈতিক স্বাধিকার বিস্তারের জন্য ব্যাকুল হইতে হইত না। জগতে এমন দিন একদিন ছিল, যে দিন কোনদেশকেই অপরের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। এই কারণেই সে-সময় একদেশ হইতে অন্যদেশে মাল আমদানি-রপ্তানি, বা বহির্ব্বাণিজ্যের কোনরূপ ব্যবস্থা অনুসৃত হইত না। যাহাদের ধারণা উক্ত যুগের লোক একেবারে আদিম যুগের অধিবাসী, অথবা যাহারা মনে করিবেন, পণ্যবস্তুর আমদানি-রপ্তানির কোন ব্যবস্থাই এই যুগে পরিজ্ঞাত ছিল না, তাহারা, **'সমস্ত আবিষ্ক্রিয়ার মূলেই প্রয়োজন'** এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটিই সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবেন। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আসলে এই কালে প্রত্যেকটি দেশেরই পরিপূর্ণ আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল; স্বদেশবাসীর সমস্ত প্রয়োজন পূরণে কোন দেশের এতটুকু অভাব ছিল না; তাই এযুগে বাহিরে পণ্য আদানপ্রদানে কোন প্রয়োজন অনুভূত হইত না বলিয়াই বহির্ব্বাণিজ্যের কোন ব্যবস্থা অনুসৃত হয় নাই। কাজেই বহির্ব্বাণিজ্যের অনস্তিত্বকে আদিমতা বা অজ্ঞতার পরিচায়ক মনে করা সঙ্গত নহে; বস্তুতঃ ইহা প্রাচুর্য্যেরই লক্ষণ। অধিকন্তু ভারতীয় ঋষিগণ-রচিত শাস্ত্রাদি হইতে এই তথ্য প্রমাণ করা খুব কঠিন নহে যে, সেই তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও বর্ত্তমান কালের ন্যায় জল, স্থল ও অন্তরীক্ষপথে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াতের সমুদয় উপায়ই অবগত ছিল। অধিকন্তু এমন কয়েকটি যান-বাহনের তথ্য তাঁহাদের জানা ছিল, যে-তথ্য সম্বন্ধে আধুনিক জগৎ আজও এতটুকু অবগত নহে। উদাহরণ স্বরূপ, তেল কয়লা ব্যতীত কেবল বায়ুমণ্ডল হইতে বিশেষ প্রক্রিয়াজাত শক্তি চালিত যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানের বিজ্ঞানকে এই 'বায়ুযান' সম্বন্ধে এখনও বহুদিন অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে।

ভারতীয় ঋষিগণ স্বরচিত শাস্ত্রাদির বহু অধ্যায়ে অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রত্যেকেরই আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রধানতঃ এই বিষয়ে সূক্ষ্মতত্ত্বগুলিরই আলোচনা করিয়াছেন; সাধারণ-বুদ্ধি লোকের পক্ষে এই তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ধার একান্তই দুঃসাধ্য।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও দেখা যাইবে, ভারতের গ্রামগুলি তখনও কতখানি আত্মপ্রতিষ্ঠ ছিল। এই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হইলে বায়ু, জল ও ভূমির বিশিষ্ট ব্যবহারগুলি আয়ত্ব করিতে হইবে। নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়, প্রাচীন কালে একদা পৃথিবীবাসী বায়ু, জল ও ভূমির এতদুল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল।

যে কারণেই হোক, জগৎবাসী এই বিশেষ ব্যবহার আজ বিস্মৃত হইয়াছে, এবং ফলে প্রত্যেক দেশের প্রতিষ্ঠাও বিলুপ্ত হইয়াছে। অবশেষে ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি এতদূর হ্রাস পাইয়াছে যে আজ আর কোন দেশের পক্ষেই অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত আবশ্যকমত খাদ্য ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এই যুদ্ধপ্রবৃত্তির প্রতিকারের একমাত্র উপায়, পুনরায় পৃথিবীর প্রত্যেক অংশকে স্বপ্রতিষ্ঠ ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা। কিন্তু ভারতবর্ষ

ব্যতীত অন্য কোন দেশই অতিশীঘ্র পৃথিবীর বুকে এই আত্মনির্ভরতা ফিরাইয়া আনিতে কার্য্যক্ষম হইবে না।

কেন না, ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আধুনিক যন্ত্র শিল্প এবং কৃত্রিম সার ও জলসেচের ব্যবস্থায় ভূমির উৎপাদিকাশক্তি দূষিত হইয়াছে। পর্য্যাপ্ত খাদ্যশস্য ও কাঁচা-মাল উৎপাদনের নিমিত্ত যে ন্যূনতম পরিমাণ উর্ব্বরাশক্তি একান্ত প্রয়োজন, ভারতবর্ষের তুলনায় অন্য কোন দেশেই এত অল্পকাল মধ্যে এই শক্তি পুনর্জ্জীবিত করা সম্ভব নহে।

কিন্তু একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতীয়দের সহযোগিতা এবং খাঁটি ভারতীয় কর্ম্মীর নির্দ্দেশ অনুসরণ না করা পর্য্যন্ত বিদেশী গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ভারতের হৃত উৎপাদিকা শক্তির পুনরুদ্ধার সাধন অসাধ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের সকল নেতাই খাঁটি ভারতীয় নহেন; কতিপয় মাননীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রধানতঃ পশ্চিমের ধার-করা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেই কথায় ও কার্য্যে ব্যবহার করিতে উৎসুক।

তাই বলিতেছিলাম যে, সমগ্র বিশ্বের সমস্যা পূরণ করিতে চাহিলে সর্ব্বাগ্রে ভারতের সমস্যারই মীমাংসা অনুসন্ধান করিতে হইবে।

প্র—বায়ু, জল ও ভূমির বিশেষ ব্যবহার বলিতে আপনি কি ইঙ্গিত করিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না। এই বিশেষ ব্যবহারটি কী, এবং কি উপায়েই বা ইহা অবলম্বিত হইতে পারে, সে-কথা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন কি?

চি—জল, বায়ু হইতে সমুদয় দূষিত পদার্থের নিষ্কাষণ পূর্ব্বক যথাসম্ভব উহার বিশুদ্ধি বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াকেই জল ও বায়ুর বিশেষ ব্যবহার বলে। আর ভূগর্ভস্থ উত্তাপ ও আর্দ্রতা যাহাতে অবাধ ও সাবলীল গতিযুক্ত হয় সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারিলেই ভূমির বিশেষ ব্যবহার অনুসৃত হইল। ভূমির প্রাণস্বরূপ নদীনালা প্রভৃতি জলস্রোতের সমস্ত কৃত্রিম প্রতিবন্ধকগুলির অপসারণ এবং ভূগর্ভ হইতে কয়লা, সোণা, রূপা প্রভৃতি খনিজদ্রব্যের উত্তোলনের নিয়ন্ত্রণ-সাধন সম্ভব হইলেই, ভূমির উন্নতিবিধানও অতি সহজেই সম্পাদিত হইবে। উপরে আমরা যে-উপায়ের আলোচনা করিলাম, সর্ব্বাগ্রে এই উপায়ে ভূমির বিশেষ ব্যবহার না হইলে জল-বায়ুর শুদ্ধি-সম্পাদন সম্ভবপর হইবে না।

জল-বায়ু ও ভূমির বিশেষ ব্যবহার যথাযথ অনুসৃত হইলে কোন দেশই অপ্রাকৃত ভাবে উষ্ণ বা শীতল থাকিবে না। সর্ব্বদাই পৃথিবীর সর্ব্বত্র নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করিবে। আর, সর্ব্বদেশেই খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের উৎপাদন অধিবাসীগণের প্রয়োজনের তিনগুণ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে; অথচ সাধারণ উৎপাদনে বর্ত্তমানে যে শ্রমের দরকার উক্ত উৎপাদনে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ শ্রমও ব্যয়িত হইবে না। কল-কারখানার ধূম ও কোলাহল অতীতের ইতিবৃত্তে পরিণত হইবে। এবং অচিরে যন্ত্রভারমুক্ত প্রত্যেকটি রাষ্ট্র কুটীর-শিল্প উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করিবে।

আজকাল যে-সমস্ত শত শত ক্রোশব্যাপী পথ দেশকে নাগপাশে বাঁধিয়াছে, আপনাকে মানিতেই হইবে যে দুই শতাব্দী পূর্ব্বেও এই সমস্ত পথের শতাংশও বিদ্যমান ছিল না। কোনরূপ বাষ্পীয়পোত বা বিমানের কথাও তখন কেহ জানিত না। কাজেই আন্তর্দ্দেশিক চলাচলের কোন অস্তিত্বও যে সে সময় ছিল না, একথা বুঝাইবার জন্য অন্য কোন প্রমাণের অবশ্যই কোন আবশ্যক নাই। তাছাড়া, তখন যে লোকসংখ্যাও বিপুল ছিল, ইহাও অনস্বীকার্য্য। এক্ষণে, উপরোক্ত বিষয় দুইটি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সে-যুগে সমুদয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী যার যার নিজের দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত; এতটুকুও প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত অপরের দ্বারস্থ হইতে হইত না। আজও জল-বায়ু ও ভূমির বিশেষ ব্যবহার পদ্ধতি অবিলম্বিত হইলে পুনরায় উক্ত পূর্ব্বাবস্থাই যে ফিরিয়া আসিবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্র—অনেক কথাই বলিলেন, তবুও এই কথাটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, কেন বৃটিশ সরকার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবেন, আর কেনই বা

সম্রাট পার্লিয়ামেণ্ট এবং ভারতসচিবের সম্মিলিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ভারতীয় গভর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইবেন ? এই ব্যবস্থায় কার্য্যতঃ ভারতবর্ষ তো ইংল্যাণ্ডের হাতছাড়াই হইয়া যাইবে !

চি - কেন হাতছাড়া হইবে ? পরন্তু ইংল্যাণ্ড সত্যই যদি এমন একজন ভারতীয় গভর্ণর-জেনারেলের সন্ধান পান, যিনি ভারতের ভূমির প্রভূত উন্নতিবিধান করিতে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা হইলে কেবল ভারত বা ইংল্যাণ্ড নহে, ভারতের সাহায্যে এই ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীবাসীরই সমুদয় অর্থনৈতিক সমস্যার স্থায়ী মীমাংসা সাধনে সমর্থ হইবেন। আর এইভাবে যদি ভারত সকল জাতিরই অর্থনৈতিক সমস্যার পূরণ করতঃ যুদ্ধনিবারণে সচেষ্ট হয় তাহা হইলে কোন জাতিই ন্যায়তঃ অপর জাতিকে আর আঘাত করিতে উদ্যত হইবে না। ফলে সম্ভবতঃ জাতিসমূহের পারস্পরিক সমুদয় যুদ্ধবিগ্রহই প্রশমিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যনাশের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহাও বিদূরিত হইবে। বর্ত্তমানে যে-পরিমাণ অর্থসম্পদ ভারত হইতে অপহৃত হয়, পূর্ব্বোক্ত ভারতীয় ব্যবস্থার ফলে ইংল্যাণ্ড ভারত হইতে তদপেক্ষা অনেক বেশী সম্পদ লাভ করিবে। অধিকন্তু যুদ্ধবিরতি-কার্য্যে ভারতীয় গভর্ণর জেনারেলের সহায় হইলে অচিরে ইংল্যাণ্ড মানব হৃদয়ে অক্ষয় নৈতিক রাজত্ব স্থাপনে সক্ষম হইবে।

প্র —যত সব অর্থহীন প্রলাপ ! ইংল্যাণ্ড কেন ভারতের হাতে তাহার রাজনৈতিক অধিকার ত্যাগ করিবে ?

চি —এখনও ইংল্যাণ্ড যদি এই ভুয়া অধিকার মোহ ত্যাগ না করে, তবে ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ আপনিই ইংল্যাণ্ডের অধিকারচ্যুত হইয়া পড়িবে আর ভারতের পক্ষেও প্রকৃত স্বরাজ লাভের সকল সম্ভাবনা বহুদিনের জন্য লুপ্ত হইবে। আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, জাপান ও জার্ম্মাণী ক্রমে ক্রমে কিরূপে ভারতকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে, এবং ভারত-রক্ষায় বৃটেনের সমুদয় সাহায্যদান কি ভাবে প্রায় নিষ্ফল হইতে চলিয়াছে ? জাপান আকিয়াব ও মৌলমিন সীমান্ত হইতে এবং জার্ম্মাণী বুলগেরিয়া সীমান্ত হইতে যে ক্রমশই ভারতাভিমুখে আগাইয়া আসিতেছে, একথা কি আপনি অস্বীকার করিতে পারেন ?

আমাদের সামনে একটি এশিয়া এবং একটি ইয়োরোপের মানচিত্র থাকিলে বুঝিতে পারিতেন, অক্ষশক্তি তাহাদের পূর্ব্ব-পরিকল্পিত পথেই আক্রমণ কার্য্য চালাইতেছে, অথচ মিত্রশক্তি কাজের সময় এ পথের কোন সন্ধান পান নাই। কেবল তাহাই নহে, অধিকন্তু একথাও বর্ত্তমানে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, অক্ষশক্তি এতখানি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে যে, আজ অক্ষশক্তির এই অগ্রগতিকে কেবলমাত্র সাধারণ সামরিক অস্ত্রে ব্যাহত করা ইংলণ্ডের পক্ষে সম্ভব নহে।

আর বৃটীশ সৈনাধ্যক্ষগণ যে ভারতে শত্রু-আক্রমণ উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া ভারতরক্ষার সর্ব্ববিধ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সে ব্যাপারেও বিরাট সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করি।

প্র —আপনি কিন্তু আপনার ধারণাতীত ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। সমর ব্যবস্থার রহস্য উপলব্ধি করা আপনার সাধ্য নয়। সত্য বটে, ইংল্যাণ্ড পূর্ব্বের মত আর বাহির হইতে সমর-সম্ভার যোগাইয়া ভারতকে আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী সাহায্য করিতে পারিবে না। কিন্তু আপনি নিশ্চিৎ জানিবেন, ভারতে এখনও কুড়ি কোটির অধিক সক্ষম-দেহ নরনারীর বাস ; জাপ ও হূনদের সম্মিলিত শক্তি এই বিরাট গণ-শক্তির সমকক্ষ নহে।

চি প্রার্থনা করি, আপনার কথাই সত্য হোক, এবং ভারতে বৃটীশ অধিকারও অক্ষত থাকুক। কিন্তু আমি মনে করি, ভারত সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা ভ্রান্ত ; কাজেই ভারতবাসীগণ যে আপনাদের পরিকল্পনানুযায়ী ভারতরক্ষায় কোন কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে, ইহা মনে হয়না।

প্র বলেন কী ? ভারতবাসীরা কি তাহাদের নেতৃবৃন্দের কথারও অবাধ্য হইবে ?

চি—আমার তো তাহাই মনে হয়। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, ইংরেজদের উপরে মিঃ চার্চ্চিল ও স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ যে প্রভাবের অধিকারী, ভারতীয় নেতৃগোষ্ঠি ভারতীয় গণ-গোষ্ঠির উপর অদ্যাপি সে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই। ভারতবাসীদিগকে যদি ভারতরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে সদলবলে যোগদান করিতে বাধ্য করাও হয় তথাপি অক্ষশক্তির ন্যায় ক্ষমতাশালী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যে সমরকুশলতা ও যুদ্ধে অনুপ্রেরণার (war urge) প্রয়োজন, তাহা ভারতবাসী কখনও সম্যকরূপে অর্জ্জন করিতে পারিবে না। সম্ভবতঃ এই এক-তরফা যুদ্ধে কতকগুলি নরহত্যা হইবে মাত্র। সকল অবস্থায়ই ভারত ও অন্যান্য সাম্রাজ্য হারানোর আশঙ্কা বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু এখন হইতেই আমাদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা গৃহীত হইলে এই আশঙ্কা অচিরেই সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে; সাধারণ আক্রমণ ও ধ্বংসের সম্ভাবিত সকল বিপদেরও অবসান ঘটিবে।

প্র—আপনার এত যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও, ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করার সার্থকতা যে কি, সে বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। ভারতবাসীগণ ভারতীয় বড়লাট হইতে যে সব কাজ আশা করেন, বৃটীশ-ভাইসরয় কি সে কার্য্যে একেবারেই অচল?

চি—বৃটীশ-ভাইসরয় অচল, কি সচল, সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলিতে চাই যে, ভারতের সহিত ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কহীনতা সম্বন্ধে যতদিন না অক্ষশক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতেছে, ততদিন তাহাদের আক্রমণ ও ধ্বংসলীলার তীব্রতা, এবং যুদ্ধস্পৃহার প্রাবল্য এতটুকু নিবৃত্ত হইবে না। কারণ একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ভারতই হইল শত্রুদের প্রধানতম লক্ষ্যকেন্দ্র। কাজেই, ভারতকে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কচ্যুত না করা পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিরতির কোন প্রস্তাবই অক্ষশক্তির নিকটে পেশকরা সম্ভব নহে।

আমাদের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই হইল, একযোগে অক্ষশক্তিরও সন্তুষ্টি বিনোদন করা, এবং ভারত হইতে এতাবৎ ইংল্যাণ্ড যে বৈষয়িক সুবিধা পাইয়াছে, সেই সুবিধাও যাহাতে বজায় থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথম উদ্দেশ্য সাধনে ইংল্যাণ্ড কর্ত্তৃক ভারতের সম্পর্কচ্ছেদ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু যতদিন না ভারতের ভাইসরয় পদে ইংরেজ নিয়োগপ্রথা রহিত করিয়া একজন নির্দ্দিষ্ট ভারতীযের হস্তে-সম্রাট, ভারতসচিব ও পার্লিয়ামেণ্টের যাবতীয় ক্ষমতা প্রত্যর্পন করা হইতেছে, ততদিন ইংরেজ কর্ত্তৃক ভারতের সম্পর্কচ্ছেদের কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। তাই ভারতের বড়লাট পদে আমরা একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিযাছিলাম।

আজও যদি বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষ বিচক্ষণ রাজনীতিকের ন্যায় আন্তরিকভাবে সমগ্র মানবসমাজের সেবার ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হন, তবে যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরেই যে তাঁহারা বৃটীশসাম্রাজ্যের হৃত মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি পুণরায় ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইবেন, এ বিশ্বাস অদ্যাপি আমরা হারাই নাই। পক্ষান্তরে একথাও দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান-অনুষ্ঠিত বিরোধের আশু-অবসান না ঘটাইয়া বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষ যদি জাতির ব্যপক সমর-স্পৃহায় ক্রমাগত ইন্ধনই যোগাইয়া চলেন, তবে তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের সমূলপতনই হইবে তাহাদের পাপের সমুচিত শাস্তি।

আমাদের মনে হয়, পৃথিবীব্যাপি সাম্রাজ্য-বিস্তারের ফলে ইংরেজ সমগ্র মানবসমাজের এক প্রকার অভিভাবকের আসন পূরণ করিয়াছেন। নিখিল জগতের একজন অধিবাসীও যেন কোনরূপ প্রতিকূল সমস্যায় পীড়িত না হয় তৎপ্রতি একাগ্র দৃষ্টি-রাখা ইংলাণ্ডবাসীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু আসল অবস্থাটা আজ সম্পূর্ণ-ই বিপরীত। জগতের প্রায় প্রত্যেক গৃহেই আজ দুঃখ-দুর্দ্দশার হাহাকার।

তাই মনে হয়, বৃটীশ রাজনীতিকদের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ মানসেই বুঝি প্রকৃতিদেবী এই যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন।

এই কারণেই, বৃটীশকর্ত্তৃপক্ষেব এই ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধনার্থে আমরা আপনাদিগকে কতিপয় উপাযের নির্দ্দেশ দিতে'ছি।

প্র—দিন শুনি, কিন্তু যতশীঘ্র পারেন, আপনার বক্তব্য শেষ করিবেন।

চি—(১) গভর্ণর জেনারেলের যোগ্যতা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, বৃটীশ মন্ত্রীসভা তদনুযায়ী একজন উপযুক্ত ভারতীয়কে গভর্ণর জেলারেল নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি সাব-কমিটি গঠন করিয়া ভারতে প্রেরণ করিবেন।

(২) নূতন শাসনতন্ত্র গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির বিধানানুসারেই উক্ত অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ভারতের শাসনকার্য্য চালনায় নিযুক্ত থাকিবেন।

(৩) যথোচিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত সাবকমিটি নবনিয়োজিত ভারতীয় গভর্ণর জেনারেলের সহিত এই মর্ম্মে এক সাময়িক চুক্তিপত্র সম্পাদন করিবেন যে, এখন হইতে উক্ত গভর্ণর জেনারেল নিম্নোক্ত সর্ত্তানুসারে সম্রাট পার্লিয়ামেণ্ট ও ভারত-স'চবের সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হইবেন—

(ক) তিনি ভারতের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতাপন্ন-দলের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেকে মনে করিবেন।

(খ) বৃটীশ মন্ত্রীসভা নিয়োজিত সাব-কমিটির সম্মানের হানি না হয়, এইরূপ সর্ত্ত উত্থাপন করিয়া তিনি অক্ষশক্তির সন্তুষ্টি বিধান পূর্ব্বক যুদ্ধের স্থায়ী বিরতি ঘটাইবেন।

(গ) যতদিন না ইংল্যাণ্ড পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, ততদিন ভারতেব এই নবনিযুক্ত গভর্ণর জেনাবেল সমস্ত ইংল্যাণ্ডবাসীকে তাহাদের সমুদয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগাইবার সর্ত্তে ইংল্যাণ্ডের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবেন। এবং সমুদয় ক্ষতিপূবণ সহ ভারতে ইংরেজস্বার্থ পূর্ব্বের মতই বজায় থাকিবে, এবং কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারী দপ্তবের কোন বৃটীশ কর্ম্মচারীর স্বার্থ কুত্রাপি এতটুকু আহত হইবে না—ভারতীয় গভর্ণব জেনারেল এবং বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে এই মর্ম্মেও এক সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইবে।

(৪) ভারতীয় গভর্ণব জেনারেল তাঁহার প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন দলীয় নেতৃবর্গের সম্মিলিত সমর্থন গ্রহণ করিবেন, অথবা একটি কার্য্যনির্ব্বাহক্ষম কমিটির সহায়তা লইবেন।

(৫) যুদ্ধ বির'তিকল্পে অক্ষশক্তির সহিত যে-সন্ধি হইবে তাহার সর্ত্তাবলী যেন মিত্রপক্ষের সকলেরই সম্মানজনক হইতে পারে।

(৬) সকল পক্ষীয় স্বার্থের আনুকুল্যে যুদ্ধ বিরতি সমাধা হইলে উক্ত ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল ভাবত ও বৈদেশিক জগতের পরস্পর সম্পর্ক নিরূপনের নিমিত্ত বৃটীশ শাসিত ভারতবর্ষ ও করদ রাজ্য সমূহের জনসাধারণের সর্ব্বাধিক সমর্থন অনুযায়ী একজন প্রতিনিধি বা একটি প্রতিনিধি-সঙ্ঘ নিযুক্ত করিবেন।

(৭) এইরূপে সর্ব্বসাধারণের ভোটদ্বারা প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি-সঙ্ঘ নির্ব্বাচিত হইলে অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল তাঁহার কাজ হইতে অবসর লইবেন। এবং পূর্ব্বোক্ত বৃটীশ মন্ত্রীসভা নির্ব্বাচিত সাবকমিটি এই ভারতীয় জণগননির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি-সঙ্ঘের সহিত পূর্ব্বকথিত সাময়িক চুক্তিপত্রের সর্ত্তানুযায়ী একটি স্থায়ী সন্ধিতে আবদ্ধ হইবেন। উভয় পক্ষের স্বীকৃত সর্ত্তমত ইহাও স্থির হইবে যে, এখন হইতে ভারতের শাসনভাব পরিপূর্ণভাবে উক্ত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিসঙ্ঘ দ্বারাই পরিচালিত হইবে।

(৮) ইংলণ্ডের স২িত নিস্পত্তিমূলক সন্ধিচুক্তি সমাধা হইবার পর এই ভারতীয় প্রতিনিধিসঙ্ঘ পরিশেষে অক্ষশক্তির সহিতও এক সন্ধিযোগ স্থাপন করিবেন।

(৯) এই ভারতীয় প্রতিনিধি-সঙ্ঘ ভারতের কবদ-রাজ্যগুলিব সহিতও উভয়ের স্বীকৃত সর্ত্তানুসারে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবেন।

প্র—ভারতীয গভর্ণর জেনারেল হইবার উপযুক্ত যেসব গুণের ফিরিস্তি দিলেন সেইরূপ সর্ব্বগুণাধার ব্যক্তি আপনি ভারতে পাইবেন কোথায় ?

চি—কেন; অভাব কি? যথোচিত পরীক্ষা ও প্রয়োগ করিলে আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, গান্ধিজী, জিন্না, সাভারকর, ডাঃ আম্বেদকার, জওহরলাল, রাজাগোপালাচারিয়া প্রভৃতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যথার্থ নেতৃজনোচিত সমুদয় গুণেরই অধিকারী। কিন্তু মনে রাখিবেন, অপব্যবহারে এইসব গুণ উক্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; যথোপযুক্ত ব্যবহার হইলে তবেই এই অন্তর্নিহিত গুণাবলী উদ্ঘাটিত হইবে। বৃটীশ-মন্ত্রীসভা নিয়োজিত সাবকমিটি যদি দৃঢ়তা সহকারে মাত্র একজনকেই ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন বলিয়া দাবী করিয়া বসেন, তাহা হইলে দেখিবেন, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কালবিলম্ব না করিয়া মাত্র একজন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকেই স্বীয় প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত করিয়াছেন। এই নেতৃগনমনোনীত প্রতিনিধি ভারতীয় গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্বপূর্ণ পদের এতটুকুও অমর্য্যাদা ঘটিতে দিবেন না।

প্র—নয়, তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়াই লইলাম যে, ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত এইরূপ বহু সর্ব্বগুণাধার ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে; কিন্তু এই গভর্ণর জেনারেল ক্ষমতা পাইয়া ইংল্যাণ্ডের সহিত সন্ধির সমস্ত সর্ত্তই সততা সহকারে মানিয়া লইবেন, তাহার প্রমাণ কি?

চি—আইনের প্রমাণ হয়তো কিছু থাকিবে না, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক তথ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকিলে অবশ্যই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আপনি পাইবেন। জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের মহান ব্রত যে-ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যক্তির পক্ষে কোনক্রমে সততা রক্ষা না করাটাই যে একান্ত অসম্ভব ইহা মনোবিজ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা। মানব মনের এই অতিসহজ বিষয়টি অনুধাবন করিতে কোনরূপ প্রমাণের আবশ্যক নাই।

অতএব, ভারতের নবনিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল যদি সমগ্র মানব-সমাজকে যথার্থই অক্ষত শান্তির সত্যকার পথের সন্ধান দিতে সক্ষম হন, এবং প্রকৃতই যদি সেই পথ যথার্থ কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে এই ব্যক্তিকে সর্ব্বাঙ্গীন আস্থার পাত্র এবং নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিতে বাধা কি?

উক্ত মনস্তাত্ত্বিক সত্য ছাড়াও ভারতের বৃটীশ স্বার্থ বজায় রাখিবার আরও একটি প্রমাণ-প্রতিভূ সম্বন্ধে বৃটীশরাজ সুনিশ্চিত হইতে পারিবেন। কেননা, ভারত যে চিরকালই বৃটেনের সন্ধির সর্ত্ত মানিয়া চলিবে, না চলিলে ভারতকে কৃতকর্ম্মের জন্য সমুচিত শাস্তি বিধানের তুল্য অধিকার বৃটেনের থাকিবে,—ভারতের নব নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল অন্যতম কর্ত্তব্য হিসাবে এই কথাটিও বৃটীশ মন্ত্রীসভা-নিয়োজিত সাবকমিটিকে বুঝাইয়া দিবেন। যদি না এই দুই বিষয়ে গভর্ণর জেনারেল সাবকমিটির নিঃসন্দেহ বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ায় আর কোন লাভ নাই। এইখানেই জল্পনা-কল্পনার যবনিকা পতন হইবে।

শান্তিকামীদের পক্ষে এই সকল গুরুতর বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনা না করাই সম্ভবতঃ সমীচীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একথা সুনিশ্চিৎ যে, এবিষয়ে বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষের অসন্তোষের এতটুকুও কারণ থাকিবে না।

সত্য বটে, আমাদের নেতৃবৃন্দের কার্য্যকলাপে বহু ত্রুটি ও শৈথিল্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ ও অকপট, তৎসম্বন্ধে কোন অবস্থাতেই সন্দেহের কোন অবকাশ নাই গান্ধিজী, পণ্ডিত জওহর, রাজাগোপাল, মৌলানা আজাদ, জিন্না, সাভারকর, ফজলুল হক্ বা গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রভৃতির সদুদ্দেশ্যে কেহ কি বিন্দুমাত্র সংশয়ও প্রকাশ করিতে পারেন?

প্র—আচ্ছা, আপনি যে স্থায়ী শান্তি বিধানের প্রস্তাব করিতেছেন, এই শান্তি-প্রতিষ্ঠার উপায় সম্বন্ধে আপনার মত ও ব্যাখ্যা (theory) কিরূপ?

চি—আমার চিন্তাধারা ও ব্যাখ্যানুসারে 'কলহ ও সংগ্রাম'কেই আমি শান্তির বিপরীত বলিয়া মনে করি। বিক্ষুব্ধ শান্তির ফলেই কলহের উদ্ভব। এই তথ্যকে 'ন্যায়শাস্ত্রের' বিচার-কাঠামোতে বিন্যস্ত করিলে নিম্নোক্ত সত্যদ্বয় উদ্ঘাটিত হইবে :—

১। ব্যষ্টির শান্তি ব্যাহত হইলে ব্যষ্টিক কলহের উৎপত্তি হয়। আন্তর্জাতিক বা সমষ্টিগত যুদ্ধ, ব্যষ্টিক যুদ্ধেরই অভিন্ন বৃহত্তর প্রকাশ।

২। ব্যক্তিগত কলহের কারণ অপসৃত করিলে আন্তর্জ্জাতিক দ্বন্দ্ব-স্পৃহারও স্বতঃই অবসান ঘটিবে। অচিরে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আর উপরোক্ত তথ্য দুইটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া ব্যক্তিগত অশান্তির কারণ নির্দ্দেশে প্রয়াসী হইয়া আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আর্থিক অভাব এবং প্রবৃত্তির অসংযমই সমুদয় ব্যক্তিগত অশান্তির কারণ।

এই কারণেই আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে যে,

অনতিকাল মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান যদি সংসার হইতে এই আর্থিক দুর্গতি ও প্রবৃত্তির অসংযম দূরীকরণে মানুষের সত্যকার পথ প্রদর্শক হয়, তবে ভবিষ্যতে অন্ততঃ সহস্রবৎসরের মধ্যে আর কোনরূপ যুদ্ধোন্মাদনা মনুষ্যসমাজে অনুভূত হইবে না। মর্ত্ত্যে স্বর্গ রচনা করিতে যে সকলসুকুমার শক্তির আবশ্যক মানুষ এই সুদীর্ঘ নির্বিরোধকালের মধ্যে সে সমস্তই আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারিবে।

আমরা বহু পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছি, একমাত্র ভারতবর্ষই সমগ্র মানব সমাজের আর্থিক দুরবস্থার সমাধান করিতে সক্ষম।

আমাদের মতে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের শতকরা ৯৭টি পরিবারই ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার উপযুক্ত সুবিধা ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত। ইহারা অভাবগ্রস্ত, তাই ভোগ-বিলাস ইহাদের নিকট স্বপ্নবিলাসেরই সামিল। একশতের অবশিষ্ট তিনটি পরিবারের ন্যূনতম প্রয়োজনের দিক দিয়া একটুও অভাব নাই বটে, কিন্তু উচ্চাশী বিলাসের ফাঁদে পড়িয়া কার্যতঃ তাহারাও অভাবের জীবনই যাপন করে।

ফলে, কম বেশী সকলকেই দারিদ্র্য-নিপিষ্ট অবস্থায় দিন গুজরান করিতে হইতেছে।

মূলতঃ নিম্নলিখিত তিনটি কারণেই বর্ত্তমান পৃথিবীর সমুদয় আর্থিক অভাবের উৎপত্তি হইয়াছে :

(১) পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য-শস্যের অভাব
(২) ন্যায়সঙ্গত ধন বণ্টনের অনস্তিত্ব
(৩ খাদ্য ও পানীয় বিচারে কুশিক্ষার প্রভাব।

অস্বাস্থ্য ও উত্তেজনা নিবারণ কল্পে এবং নিরুদ্বেগ সুস্থ জীবন যাপনার্থ কিরূপ খাদ্যাখাদ্যের প্রয়োজন ও অ-প্রয়োজন, উক্ত কুশিক্ষার ফলে মানুষ এ বিষয়ে অদ্যাবধি একেবারে নিরন্ধ্র অন্ধকারেই বিচরণ করিতেছে।

আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হইলে একমাত্র ভারতই মানবের অভাবের উক্ত ত্রিবিধ কারণের মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম। তন্মধ্যে মনে রাখিতে হইবে যে, পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের মীমাংসাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ; কেননা কার্য্যতঃ কোনক্রমেই এই সমস্যার সমাধান না হইলে অপর সমস্যাদ্বয়ের কোনরূপ কিনারাই সম্ভব হইবে না। ন্যায়সঙ্গত বণ্টন প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে গেলেই সর্ব্বপ্রথমে প্রচলিত মুদ্রাচলন-বিধি রহিত করিতে হয় ; পরন্তু পর্য্যাপ্ত খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন দেশেই মুদ্রা-চলন-বিধি বন্ধ হইতে পারেনা। আর ক্ষুধার্ত্ত ও দারিদ্র্য-জনসমাজের পীড়িত ক্ষুধা নিবৃত্ত না করিয়া আগেই উহাদের মাঝে শিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তো বাতুলতারই নামান্তর।

তাই বলিতেছিলাম যে, পুষ্টিকর খাদ্যশস্যের পর্য্যাপ্ত উৎপাদনই মানবের সর্ব্বকাম্য শান্তি-সৌখ্যের প্রথম সোপান।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও পর্য্যন্ত কেহ মানবের দুঃখ মোচনকল্পে পর্য্যাপ্ত উৎপাদনের আসল পথটির সন্ধান দিতে পারিলেন না। প্রায় এক শতাব্দী অতিবাহিত হইল, বহু পণ্ডিত ও সংস্কারক বণ্টন বিধির সংস্কার বা সামান্য উন্নতি বিধানের সাহায্যেই এই পথের সন্ধান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ভূমির হৃত স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির উন্নতি বিধানের কথা এতাবৎ কেহ কিছু বলেন নাই।

এবিষয়ে আমরা অধিক কিছু চর্ব্বিত চর্ব্বন করিতে চাই না। শতাধিক পৃষ্ঠাতেও এই সুদীর্ঘ আলোচনার স্থান সঙ্কুলান হইবে না।

উপসংহারে এইটুকু বলি যে, আমাদের প্রথম পরিকল্পনাই হইল, ভারতীয় ভূমির হৃত স্বাভাবিক উর্ব্বরতা পুনর্জীবিত করিয়া সাতবৎসর কালের মধ্যেই বর্ত্তমানের চারিগুণ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করতঃ সমস্ত অভাবগ্রস্ত দেশের অভাব মোচন করা।

এই উৎপাদনের ইতিবৃত্তও সুদীর্ঘ। বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইবে না, ৭৫ বৎসর পূর্ব্বের সরকারী রিপোর্ট পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, শুধু সেই সময়েই বর্ত্তমানের চারিগুণ কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হইত। এই পরিমাণ শস্য আজও পুনরায় পাওয়া যাইতে পারে, আর পারেই বা বলি কেন, পূর্ব্ব কথিত জল-বায়ু ও ভূমির বিশেষ ব্যবহার অনুসৃত হইলে অচিরেই ভারতের ভূমি হইতে এই চতুর্গুণ আহৃত শস্য হইবে।

প্র—একমাত্র ভারত ভিন্ন আর কেহই সর্ব্বজগতের আর্থিক অভাব দূরীকরণে সাহায্য করিতে পারিবে না, আপনি একথা বলিতেছেন কেন ?

চি—কেন বলিতেছি, শুনুন। আচ্ছা আপনি কি জানেন যে, ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ উত্তাপ ও আর্দ্রতার প্রবাহ নির্ভর করে চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত উক্ত ভূমির বিশিষ্ট সম্পর্কজনিত বিশিষ্ট ভৌগলিক অবস্থানের উপর ? আর একথা তো আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, সকল দেশের ভৌগলিক অবস্থান সমান নহে। আমরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ভারতবর্ষই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম ভৌগলিক কেন্দ্রে অবস্থিত। বল্‌কান রাজ্য ও উহার

উপকণ্ঠস্থ ভূমি এবং ইন্দোচীন ও উহার উপকণ্ঠস্থ ভূমি এবিষয়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারে। তাই উপযুক্ত উপায় অবলম্বিত হইলে ভারতীয় ভূমির উর্ব্বরতা সাতবৎসরের মধ্যে যে পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইবে, সত্য বলিতে কি, এই বৃদ্ধি পৃথিবীর অন্যত্র আগামী পঁচিশ বৎসরের মধ্যেও সম্ভব হইবে না।

প্র—আপনি বলিলেন যে, ভারত ব্যতীত কোন দেশেই প্রয়োজনের উপযুক্ত যথেষ্ট খাদ্য শস্য ও কাঁচা মাল উৎপন্ন হয় না। তাই যতদিনে এই সকল দেশ পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ না হয়, ততদিন ভারত ইহাদিগের অভাব মোচনের সহায় হইবে। কিন্তু কি উপায়ে ইংল্যাণ্ড ও অক্ষশক্তির ক্ষেত্রে এই সাহায্য দান সম্ভবপর হইবে?

চি—কেন হইবে না? ইংল্যাণ্ড এবং অক্ষশক্তি ক্ষুৎনিবৃত্তির নিমিত্ত যে পরিমাণ শস্য দরকার, তাহা পূর্ব্বেই সঞ্চিত রাখিয়া, অবশিষ্টাংশ ভারতীয় পরিবার-বর্গের মধ্যে তাহাদের প্রয়োজনানুযায়ী ভাগ করিয়া দিলেই অতি সহজে ব্যাপারটার সমাধান হইয়া যাইবে?

প্র—প্রত্যেক ভারতীয়কে তাহার ন্যূনতম প্রয়োজন-সামগ্রী বণ্টনে আপনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন?

চি—প্রত্যেক ভারতীয়কে কেবলমাত্র স্বীয় বরাদ্দের পরিমাণ অনুসারে বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি বণ্টন করিয়া দিলে, দ্রব্যের অপচয় নিবারিত হইবে। আর অপচয় না থাকিলেই অভাবও থাকিবে না, ইংল্যাণ্ড ও অক্ষশক্তির খাদ্য সরবরাহ সত্ত্বেও কোনরূপ খাদ্যাল্পতা অনুভূত হইবে না। যদিও বা প্রথম কয়েক বৎসরে কোন কোন দ্রব্যের টান পড়ে, ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু উৎপাদনে শীঘ্রই এই অভাব চাপা পড়িবে।

প্রয়োজনীয় উৎপাদনের ভাগ বাঁটোয়ারা সকলের সঠিক বরাদ্দ মত নির্দ্ধারিত হইলেই ন্যায়সঙ্গত বণ্টন বিধিও সুনিয়ন্ত্রিত হইবে। বেতনের হার নির্দ্দেশ, বেকার সমস্যার সমাধান, সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পাইকারী ও খুচরা মূল্য নির্দ্ধারণ, মোট বার্ষিক উৎপাদনের মূল্যের ভিত্তির উপর মুদ্রা প্রচলনের সীমা নির্দ্ধারণ ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিয়ন্ত্রণ কার্য্যকরী করিতে গেলে এ সমস্ত ব্যবস্থাকেই সুচারুভাবে প্রথমে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, পর্য্যাপ্ত উৎপাদন এবং অর্থের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের যদি সুনিয়ন্ত্রিত কোন ব্যবস্থা হয়, কোন দেশেই আর অধিবাসীদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কোন সামগ্রী লাভে এতটুকুও বঞ্চিত হইতে হইবে না।

প্র বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত সমস্ত মুদ্রাদি এবং কোম্পানীর কাগজপত্র সম্বন্ধে আপনার মত কি?

চি—আপাততঃ যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। বিলাস উপকরণের ক্রয়-বিক্রয়ে এই মুদ্রাদির প্রচলনে কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া যে পর্য্যন্ত না উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট স্ফীত হয়, সে পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ে উক্ত কারেন্সি ও সিকিউরিটি চালান চলিবে না।

প্র কর আদায় সম্বন্ধে আপনি কিরূপ পন্থা গ্রহণ করিবেন?

চি—দেশে কোনরূপ করেরই অস্তিত্ব থাকিবে না।

প্র—কোন প্রকার কর না আদায় হইলে গভর্ণমেণ্ট চলিবে কিরূপে?

চি—প্রয়োজনীয় এবং বিলাসী সমস্ত পণ্যেরই মূল্য-নির্দ্ধারণ কালে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের খরচের ব্যবস্থা রাখিয়া মূল্য-নির্দ্ধারণ করা হইবে। কাজেই প্রচলিত মুদ্রা জাতেরই উপরে গভর্ণমেণ্টের একটা অংশ থাকিবে; তদ্বারাই অনায়াসে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সমুদয় ব্যয়-নির্ব্বাহ হইবে।

প্র—কিন্তু এই ব্যবস্থায় পণ্যের মূল্য কি অত্যধিক চড়িয়া যাইবে না?

চি—যাইতেও পারে, আবার নাও যাইতে পারে। তবে ভুলিবেন না যে, প্রত্যহের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতেই বেতনের হারও নির্দ্ধারিত হইবে। সুতরাং পণ্যের মূল্য অধিক হইলে কিছু আসিয়া যাইবে না, কেননা পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতনের হারও স্বতঃই বৃদ্ধি পাইবে।

অতএব বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদের প্রস্তাবিত বিধি অনুসৃত হইলে মানব সমাজে যথার্থই স্বর্গীয় ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইবে?

আপনি কি আমাদিগকে বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসান করিবার এই ক্ষমতা দিবেন না?

প্র—মনে রাখিবেন, আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; আগে মন্ত্রীসভার সহিত আমার পরামর্শ করিতে হইবে।

চি—ঈশ্বরের দোহাই, যথাশীঘ্র হয় পরামর্শটা সারিয়া ফেলুন। মানবের হস্ত আজ মানবেরই রক্তে কলঙ্কিত, পাশব প্রবৃত্তি তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে—এই সর্ব্বনাশা অভিশাপ হইতে মানব-সমাজকে আপনারা আজ মুক্তি দিন।

ভুলভাঙ্গা

শ্রীমতী লতিকা-সেন এম. এ. বি. টী.

এক

সুরেখা শেষ পর্য্যন্ত ১৫০৲ টাকার কাজটাই পাইল। মেয়েদের চাকুরি সাধারণতঃ শিক্ষয়িত্রীর কাজ-ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বন্ধু বান্ধব আসিয়া সুরেখাকে অভিনন্দন জানাইল। হউক না বঙ্গের বাহিরে; চাকুরি যদি করিতেই হয় তবে এ চাকুরি নেওয়াই উচিত। বিশেষ যখন উন্নতির আশা আছে। বলা বাহুল্য, সুরেখার "হৃদয়" কাজের সংবাদে একেবারে "ময়ূরের মত নাচিয়া" না উঠিলেও মোটামুটি নিশ্চিন্ত সুর গাহিতেছিল। বহু দরখাস্ত সে পাঠাইয়াছে। আজ সেই একঘেয়ে নিজের গুণাবলীর তালিকা লিখার সমাপ্তি হইল, ইহাও মস্ত সান্ত্বনা। বিধবা মাতার ব্যথাকাতর দৃষ্টি, অপোগণ্ড একপাল ভ্রাতা-ভগিনীর বুভূক্ষা, চারিদিকের দৈন্তদশা, সবই দূর হইবার বার্ত্তা নিয়া আসিয়াছে আজ বিকালের ডাক।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ শেষ হইয়াছে। দুই চারিদিনের মধ্যেই সুরেখা যুক্তপ্রদেশে কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিবে। যথাসময়ে সুরেখার কলিকাতা ত্যাগের কল্পনা অমরের কানে পৌঁছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাপ উভয়ের সহপাঠী হিসাবে। মাত্র দেড়মাস আগে উভয়ের মতভেদে দেখা-সাক্ষাতে ছেদ পড়িয়াছে। মতভেদের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—অমরের সুরেখার প্রতি আসক্তি এবং বিবাহেচ্ছা। সুরেখার আসক্তি মন্দ নহে, কিন্তু বিবাহে অনিচ্ছা। "কারণ" এর গভীর স্তর খুঁজিলে দেখা যায়, সেই বিধবা মাতার ব্যথাকাতর দৃষ্টি, অভাব, অনটন। অমর জানে সবই। উপায়হীন সে। বলে অসবর্ণ বিবাহে পিতার অসম্মতি, তাই তাহাকে কালি-কলমে বিবাহ করিতে হইবে। সুরেখার পরিবারের ভার নিতে সানন্দে রাজী, কিন্তু তাহার আয় অতি সামান্য—তাহাতে সুরেখার পরিবারের ক্ষুধা মিটান অসম্ভব। সুরেখার সহিত বিবাহ এবং পৈতৃক সম্পত্তি ও পিতৃস্নেহ হইতে চ্যুতি, ইহাদের মধ্যে কর্য্যকারণ সম্বন্ধ। অমর প্রকৃত পুরুষ। সে ভীত হইবার নহে; বলে "সে যা ক'রে হোক্, আমরা চালিয়ে নেব। তুমি আমি দু'জনে খাটব, এতেও কি সংসার চল্‌বে না? তুমি আমার পাশে থাক্‌লে আমি কিই না কর্‌তে পারি বল?"

মৃদু হাস্যের সঙ্গে সুরেখা জবাব দিয়াছিল, "তুমি, এখনও ছেলেমানুষের মত কথা বল্‌ছ। তুমি তোমার বাবার একমাত্র ছেলে—আমি কেন বাধা হ'তে যাব? তুমি বুঝতে পারছ না—এ সব ব্যাপারে গুরুজনের আশীর্ব্বাদ মস্ত জিনিষ। আর তা ছাড়া আমাকে বিয়ে ক'রে শেষকালে পস্তাতে না হয়! বিয়ে করলে আমি চাইব তোমাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে, যেমন আরও দশজন স্ত্রী চায়। বাইরে রাতদিন ছুটতে হ'লে আমার কর্ত্তব্যে অনেক ত্রুটি র'য়ে যাবে। প্রথম প্রথম এ নিয়ে তুমি হাসবে, পরে হবে বিরক্ত। তাই বলি, এ জন্মটাকে আমার এমনি ক'রেই কেটে যেতে দাও। ভাইরা একটু বড় হোক্, আমারও যে এদিকে অনেক কর্ত্তব্য বাকী।"

"ভাইরা বড় হ'লে তারপর? তারপরও কি তোমার অসম্মতির কোনও কারণ থাক্‌বে? বল সুরেখা জবাব দাও।"

"তখন যে আমার বয়স অনেক হয়ে যাবে—তখন দেখো, তুমিই আমাকে আর চাইবে না।"

"তুমি কি আজ আমাকে আঘাত দেবে বলেই এসেছ? আমার চাওয়া অনন্ত। বরাবরই আমি তোমাকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আকাঙ্ক্ষা করব। চাওয়ার আমার কখনও পরিবর্ত্তন হবে না সুরেখা।"

"তোমাকে আমি ইচ্ছে করে আঘাত দিই নি, বিশ্বাস ক'র। কি ক'রব বল! এই বাইশ বছর পর্য্যন্ত কত যে ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেছি! তার ফলে আমি নিজেও হয়েছি নীরস। অথচ আমি চাই না যে আমার কথায় বা ব্যবহারে কেউ এতটুকু দুঃখ পায়। তুমি জান, আজ তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমারও দুঃখের পরিমাণ কতখানি

রইল। তুমি আমার জন্য বৃথা অপেক্ষা ক'র না। ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে কর'। আমার কর্ত্তব্যের শেষ হ'লে অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ করব' নিশ্চয়ই, তখন তুমি আমায় আশ্রয় দিতে কার্পণ্য ক'রো না।"

চক্ষুর জলে কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল সুরেখার। দেখা-সাক্ষাৎ সে ইচ্ছা করিয়াই বন্ধ করিয়া দিল।

দুই

ট্রেণ ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে। শেষ-পর্য্যন্ত অমর আসিয়া পৌছিয়াছে। আবেগে সুরেখার হস্ত নিজহস্ত দিয়া ধরিয়াছিল। ষ্টেশনে সুরেখা একাই আসিয়াছে—আর কেই বা আসিবে? সুরেখা ক্রন্দন রোধ করিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। অমর রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "পৌছে চিঠি দিও তুমি। এই ক'মাস তুমি কি ক'রে আমাকে ভুলে থাক্‌লে রেখা?"

ব্যাথয় বিবর্ণ সুবেখা উত্তর দিল "ভুলিনি, কিন্তু আমার স্মৃতি নিয়ে জীবন নষ্ট কর না। মূল্যবান্ তোমার জীবন। তোমাব সঙ্গে আব দেখা হবে কিনা কে জানে? জীবনটা অত্যন্ত ভারী মনে হলে, আর আমার কর্ত্তব্য শেষ হলে, যদি তোমার কাছে বিশ্রাম চাইতে যাই, আমায় জায়গা দিও। তুমি এত মহৎ, তোমার স্ত্রী যিনি হবেন, তাঁর এতে কি সহানুভূতি থাকিবে না?"

"যাবার সময়ও তুমি আমায় আঘাত দিচ্ছ? আমি আ-মরণ তোমার অপেক্ষায় থাকব।"

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

তিন

সুরেখার বয়স সাঁইত্রিশ। যৌবন তাহার শেষ হইয়াছে। কঠোর নীরস জীবন যাপনের চিহ্ন তাহার সমস্ত মুখমণ্ডলে। চক্ষুর তীক্ষ্ণতা ভিন্ন মুখের দ্রষ্টব্য এমন কিছুই নাই। কুঞ্চিত রেখা কোথাও বক্র, কোথাও বা সমান্তরাল। সমস্ত অঙ্গে অবিশ্রান্ত ভাব। ভাইদের মানুষ করিতে হয় নাই। দুইটি ভাই অকালে 'টাইফয়েডে' মারা গিয়াছে। বোনদের বিবাহে সুরেখাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। পাত্রপক্ষের দাবী মিটাইতে তাহার সঞ্চিত অর্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়াছে। 'তলানি' দিয়া হইয়াছে মাতার শ্রাদ্ধ। এই সকল আনুক্রমিক ঘটনাগুলি সুরেখা অবিশ্রান্ত করিয়াছে। অর্থোপায়ের কারণই যে উঠিয়া গেল! মনের সোপান বাহিয়া সে জীবনের প্রতিটি 'তলা' গভীর রাত্রে খুঁজিয়া বেড়ায়, অমরের প্রতি তাহার প্রেম এখনও অম্লান। ষোড়শীর মত নানা কল্পনা মাঝে মাঝে তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে। কত সাময়িক অতৃপ্তি দূর হইয়াছে, একমাত্র অমরের কথা সুরেখার চেতনার অণুতে অণুতে অনুরণিত হইতে থাকে। প্রভাতে রাত্রির মাদকতার কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হয়। ছি ছি। তাহার কত ছাত্রী। তাঁহারা যে তাহাকে দেবীব ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করে। সে যাইবে উপযাচিকা হইয়া, আব বলিবে "অমর, তুমি আমায় গ্রহণ কর?" দিনের আলোয় তাহাব নির্লজ্জতা তাহাকে 'ধিক্কার' দিতে থাকে। মনের রশি টানিয়া রুটিন-বাঁধা কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে।

চার

বোর্ডিং-এর দ্বিতলের ক্ষুদ্রকক্ষে অকস্মাৎ জ্যোৎস্নার প্লাবন আসিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে সুরেখার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, নিজকে অত্যন্ত অসহায় মনে হইতে লাগিল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সহসা অত্যন্ত দ্রুত অনুভূত হইল। উন্মত্তের ন্যায় সুরেখা ট্রাঙ্ক, বেডিং বাঁধিয়া খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অত্যন্ত ক্লান্ত সুরেখা আজ। চাকুরি ত্যাগের একটি দবখাস্ত যথাস্থানে পাঠাইয়া দিল। সহকর্ম্মীদিগের নিকট হইতে বিদায় নিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল। মুখের ভাব দেখিয়া প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। নিজেই সুবেখা বলিল, "আমি যাচ্ছি বাড়ী, ফিরব না আব, তোমরা সবাই ভাল হয়ে থেক।" আর কিছু বলিতে পারিল না, উদ্গত অশ্রু চাপিতে চাপিতে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তাহার দেহে রক্ত নাই, শিরায় শিরায় তাহার আগুনের হল্কা বহিতেছে। আর নয়, অত্যন্ত ক্লান্ত আজি সুরেখা।

পাঁচ

বেলা প্রায় এগারটা। ছুটির দিনেও শান্তি নাই। "এন্‌গেজমেণ্ট রক্ষা করিতে বাহিরে যাইতে হইবে। প্রফেসব অমব বোস 'টাই' বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ী বাহির করিতে শোফারকে হুকুম দিল। পূরা ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ,

তেজোব্যঞ্জক দৃষ্টি, শরীর সুগঠিত। সাঁইত্রিশ বৎসরের পরিপূর্ণ যুবক, গৌরাঙ্গ সে। স্বাস্থ্যের উত্তপ্ত দীপ্তি সর্ব্বাঙ্গে। আধুনিক রুচিসঙ্গত বিলম্বিত দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইল, আর তাহার পাশে মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল জলভরা এক জোড়া চোখ। চোখের অধিকারিণীর মুখও অল্পে অল্পে স্পষ্ট হয়। শ্যামাঙ্গী হইলেও দীপ্তি তাহার কম নহে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল অমর বোস। অমর প্রতিজ্ঞা রাখিয়াছে, সে আজও অবিবাহিত

সে বাহির হইবার উদ্দেশে বারান্দায় পৌছিয়া অকস্মাৎ সম্মুখে এক বর্ষীয়সী মহিলা দেখিয়া পিছু হটিয়া গেল। যৌবনের শেষ সীমান্তে পৌঁছিয়াছে সুরেখা—তাই অমর প্রথম তাহাকে চিনিতে পারে নাই। সুরেখা চিনিল ঠিকই, দেখিয়া প্রথমতঃ একবার তাহার চক্ষের দিকে তাকাইয়া বলিল "আমি এসেছি—আমায় কি তুমি চিন্‌তে পারছ না?" উত্তেজনায় ও আবেগে তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল।

অমর "সুরেখা - তুমি? তুমি এমন হ'য়ে গ্যাছ?" বলিয়া তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া আসিল। সুরেখা কোনও কথা বলিতে পারিল না, আর—নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। অমর সুরেখাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিয়া নিজ শয্যা দেখাইয়া বলিল "তুমি বিশ্রাম কর—তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। চাকরদের ডেকে সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

কোন অনাদর সে করিল না—কিন্তু তাহার ব্যবহারে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ পাইল না। ভৃত্যবর্গের উপর কিছু উপদেশ বর্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল "আমাকে ক্ষমা কর সুরেখা, আমাকে এক্ষুণি বাইরে যেতে হবে বিশেষ দরকারে। বিকেল চারটে নাগাদ ফিরে আসব। তখন সব কথাবার্ত্তা হবে'খন।"

কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে প্রফেসর বোস্ বাহির হইয়া গেল।

বৈকাল তিনটায় সুরেখা শয্যাত্যাগ করিল। উঠিয়াই চোখে পড়িল সম্মুখের দর্পন। তাহার কুঞ্চিত কপোল, শুষ্ক অধর, অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টি—এ সকল তাহাকে সজোরে আঘাত করিল। Dressing Table-এর উপর রক্ষিত অমরের Photo এবং তৎসন্নিহিত তাহার বাইশ বৎসর বয়সের Photo-র প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সুরেখা চমকিত হইল। পুনরায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিল। বাস্তবিকই তাহার যৌবন গত হইয়াছে। সে বর্ত্তমানে বৃদ্ধা প্রায়। তবু বিশ্বাস হইতে চাহে না। সুট্‌কেস হইতে তাহার মাসখানেক পূর্ব্বের তোলা একটি card size-এর Photo বাহির করিয়া বাইশ বৎসরের প্রতিকৃতির সহিত বদল করিল। বহুক্ষণ তাহার ও অমরের ছবি পাশাপাশি রাখিয়া সুরেখা তাকাইয়া রহিল। অকস্মাৎ মনে হইল তাহার শিরায় পুনরায় রক্ত বহিতেছে—আগুনের হল্কা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ছাত্রীদের মুখ স্মরণ হইল—সহকর্ম্মীদের শ্লেষ। ছি-ছি সুরেখা কি করিতে যাইতেছিল! শতবার ধিক্কার দিল সুরেখা নিজেকে। পুনরায় সে চড়িয়া বসিল ট্রেনে এবং ফিরিয়া আসিল কলিকাতায় তাহার ছোটবোনের শ্বশুরবাড়ী।

৬

প্রফেসর ফিরিয়া আসিয়া সুরেখার অন্তর্দ্ধানের সংবাদ পাইল। শয়নকক্ষে প্রতিকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। একটা গভীর নিঃশ্বাস প্রশস্ত বক্ষ মন্থন করিয়া বাহির হইল। নিঃশ্বাসটি দায়মুক্তির। সত্যি—এই বিগত যৌবনাকে লইয়া সংসার করা! পাগল আর কি! মুক্তি দিয়াছে সুরেখা!

সুরেখা ছোট বোনের শ্বশুরালয়ে বসিয়া দিনের পর দিন দরখাস্ত পাঠাইতেছে বহুস্থানে, নিজের গুণাবলীর ব্যাখ্যা করিয়া। সে ইংরাজী, গণিত, বাংলা, সংস্কৃত, সেলাই, গান, ড্রইং ইত্যাদি সকলই নিপুণতার সহিত শিখাইতে পারিবে।

আর অমর? অমর নিজের ভুল সংশোধন করিতেছে। সে বুঝিয়াছে, এতদিন প্রিন্সিপালের কন্যা অরুণার প্রেম অগ্রাহ্য করিয়া সে নিছক বোকামী করিয়াছে। গত তিন সপ্তাহ যাবৎ অমর বোস কলেজ হইতে সোজা প্রিন্সিপালের বাড়ী চলিয়া যায়। বৈকালিক আহার ঐখানেই হয়। আমরা একটি শুভসংবাদের অপেক্ষা করিতেছি।

ননীমাধব

কানাই বসু বি-এল

গল্প বলিতে বসিলে ননীমাধবের কথা উঠা উচিত নয়। গল্পের নায়ক হইবার যোগ্যতা তাহার কিছুই ছিল না। তৎাপি তাহাকে আমার প্রায়ই মনে পড়ে। তাই তাহার কথাই বলি।

প্রথম দিনে তাহার আবির্ভাবের ইতিবৃত্ত আমার বেশ মনে আছে। চলন্ত ট্রামে উঠিয়াছিল ননীমাধব ভিক্ষা চাহিতে। ট্রেণে ভিখারীর অবাধ রাজত্ব বহুদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ট্রামে ইহাদের অভিযান পূর্ব্বে কখনো চোখে পড়ে নাই। যাত্রীরা বিস্মিত হইল, হইবারই কথা। যাঁহার সম্মুখে ননীমাধব প্রথমে হাত পাতিয়াছিল তিনি ত' ক্ষেপিয়া উঠিলেন। স্পষ্ট ও উচ্চ স্বরে ঘোষণা করিলেন, জুয়াচোর চিনিতে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই আছে। বেশী চালাকি করিলে যে তিনি পুলিশের হাতে সমর্পণ করিতে দ্বিধা করিবেন না ইহাও বাবুটী ননীমাধবকে জানাইয়া দিলেন।

যেমন হইয়া থাকে। নানা ব্যক্তি নানা কথা কহিলেন। ভিখারীর অত্যাচারে ভদ্রলোকের সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিল এ দুঃখও এক বাবু করিলেন। কিছু দূরে একটী সৌখীন ছোক্‌রা বলিল, "পসা-টসা হবে না বাপু, একটা বিঁড়ি চাও ত' দিতে পারি। এই নিয়ে যাও।" বলিয়া একটী বিঁড়ি উচু করিয়া দেখাইয়া নিজেই দাঁতে চাপিয়া দেশলাই জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল।

ননীমাধব বোধকরি রসিকতা বোঝে না। সে জবাব দিল, "আজ্ঞে না বাবু, বিঁড়ি আমি খাই না।"

কে একজন বলিল, "সতী সাবিত্তির। দাও ত' বেটাকে ধ্বা দিয়ে গাড়ী থেকে ফেলে।"

বহু ব্যক্তি মিলিয়া একজনকে তিরস্কার ও বিদ্রূপ করার একটা নেশা আছে। তাহা সহজে থামিতে চায় না। প্রথম বাবুটি ননীমাধবের সবল, দীর্ঘ দেহ দেখাইয়া প্রবলভাবে ননীমাধবের অসাধুতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। যদি গলার জোর ও বারম্বার এককথা বলাই যুক্তি বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তবে ননীমাধবের চৌর্য্যাপরাধ তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে বাকী রাখেন নাই। আরও অনেকে অনেক কথাই বলিল। ননীমাধবের মুখে বাক্য সরিল না।

কিন্তু জিত হইল ননীমাধবেরই। কে একজন বলিলেন, "কেন, খেটে খেতে পার না? ভিক্ষে? এতখানি শরীর নিয়ে যোয়ান বয়সে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করে না? যাও যাও খেটে—"

ব্যস্। আর বলিতে হইল না। ননীমাধবের শুধু শরীরটাই 'এতখানি' ছিল না। অহঙ্কারী লোক হইলে সে তাহার গলার অহঙ্কারও করিতে পারিত। উচ্চকণ্ঠে সকলের কণ্ঠ চাপিয়া দিয়া সে প্রতিপ্রশ্ন করিল, "আর এটা বুঝি খাটুনি নয়? সকাল থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত দৌড়-ঝাঁপ, ছুটো-ছুটি, হুঁ! বলে সারাদিনে চারগণ্ডা পয়সা রোজগার করতে জিব্ বেরিয়ে যায়!"

এবারে অবাক্ হইবার পালা বাবুদের। ননীমাধব দম লইয়া বলিল, "বাবুরা গরীব দেখে পয়সা দেবেন, না শরীর দেখে পয়সা দেবেন? ভিক্ষেও দেবেন না, কাজও দেবেন না ত' গরীব লোকের চলবে কি করে তা বলুন?" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই যেমন অকস্মাৎ উঠিয়াছিল তেমনি অকস্মাৎ নামিয়া পড়িল।

ট্রামের গতি কমিয়া আসিয়াছিল। আমারও গন্তব্যস্থান নিকটবর্ত্তী হওয়াতে প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমিও নামিলাম।

আগে আগে ননীমাধব চলিতেছিল। কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া তাহার পাশে চলিতে সুরু করিয়া দিলাম। বছর ৪৫।৪৬ এর বেশী বয়স হইবে বলিয়া বোধ হইল না। ভাল করিয়া দেখিলে দারিদ্র্যের আবরণের নীচে মুখের একটা সহজ ও সরল শ্রী যেন চোখে পড়ে, যাহার জন্য তাহাকে চোর, জুয়াচোরের পর্য্যায়ে ফেলিতে মন চাহে না।

আলাপটা আমিই করিলাম। নাম ও পরিচয় দিয়া ননীমাধব বলিল, "বাবু, জাতে মাহিষ্য, লেখাপড়া বেশী শিখি

নি। আপিসের কাজে অনেক বিদ্যে, আর তার চেয়ে অনেক সুপারিশ চাই। সে আমার নেই; কিন্তু লোকের বাড়ীর চাকরের কাজ একটা পেলেও ত' নিজের ভাতটা কাপড়টা আর ভাইটার বই-পত্তরের খরচটা জুটে যায়। কিন্তু এই চওড়া বুকখানা আর শক্ত হাত দুটো দেখলে কোন গেরস্তই রাখতে চান না, বলেন বেটা ডাকাত, কোন্‌দিন গলা টিপে মেরে দিয়ে পালাবে। অথচ শরীর যোয়ান দেখে সব বাবুরাই আমাকে খেটে খেতে বলেন বাবু, এমনি পোড়া কপাল।"

ভাবিলাম 'গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।' দুঃখ যখন আসিবার হয় তখন কত অপ্রত্যাশিত-পথেই তাহা আসিয়া থাকে।

আরও অনেক কথা ননীমাধব বলিয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রধান তাহার ভাইয়ের কথা। এক ভাই ছাড়া সংসারে তাহার আর কেহ নাই। পিতৃমাতৃহীন ছোট ভাইটীকে স্কুলে পড়াইয়া মানুষ করার আশাই তাহার জীবনের একমাত্র আশা। এবং কলিকাতায় আসিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা তাহার প্রধানতঃ সেই কারণেই। কয়েকটা পয়সা তাহাকে দিয়া আমি ভিন্ন পথ ধরিলাম।

কয়েকদিন পরে পথে ননীমাধবের সঙ্গে দেখা হইল। দেখিলাম সেও আমাকে চিনিতে পারিয়াছে। সে ভিখারীর বেশ নাই। কাঁধে প্রকাণ্ড একটা বাজারের ঝুড়ি, ডানহাতে তারে ঝোলানো একটা মাছের টিন। দুইই পূর্ণ। এসব দ্রব্যসম্ভার যে তাহার ভিখারীর সংসারের জন্য নয়, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি আমার ছিল। কিন্তু যদিই ভুল বুঝি বোধকরি এই ভয়ে ননীমাধব টিনশুদ্ধ ডান হাতটা কপালের কাছে উঠাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "নমস্কার বাবু, এসব আমার নয়। ঐ ওঁর। মানে,—আমি একটা চাকরী পেয়েছি বাবু। এতদিনে বোধ হয় ভগবানের দয়া হয়েছে।"

বলিলাম, "বেশ, বেশ, মন দিয়ে কাজকর্ম্ম কর। তা হলেই—" তাহা হইলেই যে কী অপূর্ব্ব উন্নতি তাহার হইবে তাহা মনে করিয়া বলিতে পারিলাম না। কিন্তু ননীমাধব তাহাতেই খুশী হইয়া আমার কথা মানিয়া লইল। বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, তা বই কি। চাকরীটা যদি বজায় রাখতে পারি তাহলে ইস্কুলের খরচটা চালাতে পারব নিশ্চয়। আপনার আশীর্ব্বাদে আর ভিক্ষে করে খেতে হবে না। ভিক্ষা করায় বড় কষ্ট বাবু। আর দিন কতক ভিক্ষে করলে আমি সত্যি সত্যি ভিখিরী হয়ে যেতুম। যাই, দাদাবাবু এগিয়ে গেছেন।" বলিয়া আর একবার মাছের টিনটা মাথার কাছে তুলিয়া ননীমাধব পা চালাইয়া দিল।

যদিচ ননীমাধবের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কখনো নিজের মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাই নাই, তথাপি তাহার চাকরী হইয়াছে জানিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ বোধ করিলাম। লোকে বলে, না খাটিয়া চাহিলেই যদি খাদ্য পাওয়া যায়, তবে কে আর কষ্ট করিয়া উপার্জ্জন করিতে চায়? হয় ত' কথাটা অনেক ভিখারীর পক্ষেই খাটে। কিন্তু ননীমাধব যে সেই আলস্যধর্ম্মী দলের বাহিরে, তাহার আত্মমর্য্যাদা যে ভিক্ষার গ্লানিতে ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা জানিয়া মনটা খুসী হইয়া উঠিল।

এরপর ননীমাধবের সহিত মধ্যে মধ্যে আমার দেখা হইতে লাগিল। তাহার মনিব বাড়ী আমার বাড়ী হইতে বেশী দূরে নয়। দেখা হইলেই ননীমাধব নমস্কার করিয়া কুশল প্রশ্ন করিতে ভুলিত না। প্রথম দিনেই জানিয়াছিলাম বাল্যে সে কিছু লেখাপড়া করিয়াছিল। একদিন পথে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "Keep to the left" মানে কি?

এই বাক্যটী রাস্তায় প্রায়ই তাহার চোখে পড়ে। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় তাহার যেটুকু জ্ঞান, তাহার সাহায্যে ইহার কোন সঙ্গত অর্থ বাহির করিতে পারে নাই।

অর্থ বলিয়া ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলে ননীমাধব অত্যন্ত খুসী হইল এবং ইংরাজ রাজত্বের সুশৃঙ্খলার প্রশংসা করিয়া গেল। যাইবার সময় একথাও বলিল, "সরকারের নিয়ম যা সব বাঁধা আছে তা যে লোকে কেন মানে না তাই ভাবি আমি। আর শুধু গাড়ী, ঘোড়া কেন, পায়ে হাঁটা লোকেরাও এই নিয়ম মানলে কত সুবিধে বলুন ত'? আর কেমন চমৎকার দেখায় তাও বলুন। এক সার লোক এমুখো চলেছে তো আর এক সার লোক ওমুখো চলেছে।"

পথের দুইদিকে দুইটি সারিবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত নরনারীর

মিছিল মানস নেত্রে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে ননীমাধব প্রস্থান করিল।

ভিক্ষা করার পরিশ্রমের স্বপক্ষে তাহার যুক্তি শুনিয়া তাহাকে যতটা চতুর মনে হইয়াছিল, এখন তাহার কথাবার্ত্তাতে সে ধারণার পরিবর্ত্তন হইতেছে। যাহা চতুরতা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল তাহা আসলে সরল সহজবুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। সংসারে যাহা হওয়া উচিত তাহা না হওয়া ঠিক নয়, ইহাই তাহার মত। এবং যে বস্তু বা ঘটনার যে রূপ তাহার চোখে ধরা পড়িয়াছে তাহা ব্যতীত তাহার যে অপর কোন রূপ থাকিতে পারে ইহা সে ভাবিতে পারে না। তাই ভিখারী হইয়া লোকের মুখের উপর পরিশ্রমের তর্ক করিতে তাহার বাধে নাই। Keep to the left লেখা থাকার পর ও তাহার সুস্পষ্ট সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, নরসমাজে সেই অত্যুৎকৃষ্ট নিয়ম-পালনের অভাব দেখিলে সে বিস্ময় ও দুঃখ বোধ করে।

কিন্তু কাল হইল তাহার এই নিয়মানুবর্ত্তিতার স্পৃহা। ইতিমধ্যে আমার বাসা সে চিনিয়া লইয়াছিল। সময় পাইলেই আসিয়া গল্প করিতে বসিত। শুধু গল্প নয়, মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার মায়ের প্রসাদ পাইয়া যাইত। স্ত্রী পুরুষ, ছোট বড় নির্ব্বিশেষে, সকলেরই সহিত তাহার ভাব। তবে বন্ধুত্ব তাহার ছোট ছেলে মেয়েদের সহিতই কিছু বেশী এবং সে জাতীয় বন্ধুর সঙ্গ আমাদের বাটীতে ও পাড়াতে প্রচুর মেলে।

একদিন অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম বাহিরের রকে বসিয়া ননীমাধব পরমোৎসাহে গল্প বলিতেছে ও গুটী তিন চার ছেলে মেয়ে হাঁ করিয়া শুনিতেছে। এ দৃশ্য মধ্যাহ্নের দৃশ্য, সন্ধ্যায় ইহা নূতন। তাই তাহার নমস্কারের পর বলিলাম, "কি হে এখনো বসে আছো? কাজে যাবে কখন?"

ননীমাধব বলিল, "আজ্ঞে না বাবু, সে কাজে আমার জবাব হয়ে গেছে।"

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "জবাব হয়ে গেছে? সে কি হে? কি করেছিলে?"

উত্তরে ননীমাধব যাহা বলিল তাহাতে তাহার মৌলিক মনের আর একটা অদ্ভুত পরিচয় পাইলাম। ব্যাপার এই: ও বাটীর বড়বাবু, অর্থাৎ কর্ত্তার বড় ছেলে, সস্ত্রীক ট্রেনে কোথায় যাইবেন, ননীমাধবকে পাঠাইয়াছিলেন একটা ট্যাক্সি ডাকিতে। বড় রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সির আড্ডা তাহা সে জানিত। ইংরাজী পড়া ননীমাধব যখন সেখানে পৌঁছিল তখন পরপর চারখানি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। উহাদের একখানিকে সে নিশ্চয়ই তখনি ডাকিয়া আনিত, যদি না ল্যাম্প-পোষ্টে ঝুলানো একখণ্ড কাঠের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িত। প্রখর দিবালোকে, বড় বড় অক্ষরে লেখা, পড়িতে ননীমাধবের কোন অসুবিধা হয় নাই। সে পড়িল "Stand for 6 Taxis। অর্থও অতি সোজা, বুঝিতে তাহার দেরী হইল না। সরকার বাহাদুর বলিতেছেন,—ইংরাজী অক্ষরে লেখা সরকার বাহাদুর ভিন্ন আর কাহার হইবে?—"ছয়খানি ট্যাক্সির জন্য দাঁড়াও।" ছয়খানি ট্যাক্সি আসিলে কি সুবিধা হইবে তাহা সে ভাবে নাই, ভাবিবার প্রয়োজনও তাহার হয় নাই। সরকার বাহাদুরের সুবুদ্ধির উপর তাহার নিঃসংশয় শ্রদ্ধা।

অতএব ননীমাধব দাঁড়াইয়াছিল। ট্যাক্সি আসে ও যায়। কিন্তু এক সঙ্গে ছয় খানি আর হয় না। অবশেষে প্রায় এক ঘণ্টা পরে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ও তদধিক বিরক্ত হইয়া সে যখন ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। ছয়খানি গাড়ীর মধ্যে একখানি লইয়া ননীমাধব অতি হৃষ্ট চিত্তে মনিব বাড়ী ফিরিয়া দেখিল বড়বাবু বহুক্ষণ পূর্ব্বে অন্য কাহাকে দিয়া ট্যাক্সি ডাকাইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু মেজ ও ছোটবাবুরা বাড়ীতে ছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা তাহার 'গাঁজাখুরি' গল্প বিশ্বাস করেন নাই। এরকম মিথ্যাবাদী ও অলস লোককে যে তাঁহারা আর এক মুহূর্ত্ত বাড়ীতে রাখিতে পারেন না তাহা তখনই জানাইয়া দেন।

ননীমাধবের চাকরী গিয়াছে শুনিয়া আমার দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল। হয় ত' দুঃখিত হইয়াও ছিলাম। কিন্তু হাসি চাপিতে পারি নাই। পরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া হাসি পাওয়া যে শোভন নয় সে জ্ঞান আমার আছে। সুতরাং অপ্রস্তুত হইয়া সময়োপযোগী কিছু একটা বলিবার জন্য মুখ ফিরাইতে দেখি ননীমাধবও হাসিতেছে। পরে শুনিয়াছিলাম এ অপরাধ শুধু আমি নয়, বাড়ীর সকলেই করিয়াছে। এবং

সরকার বাহাদুরের নির্দ্দেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য যখন এ বাড়ীর ছেলেরা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল তখন আপন নির্ব্বুদ্ধিতায় সে-ই সবার চেয়ে বেশী হাসিয়াছিল।

এ কথা তখন জানিতাম না। তাড়াতাড়ি যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তার সুর আনিয়া বলিলাম, "আহা, এত কষ্টে চাকরীটা পেলে তাও টিকলো না। তাই তো, যে দিনকাল পড়েছে—"

ননীমাধব হাসি মুখেই আমার কথা সমর্থন করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বলিলাম, "আবার কতদিনে যে চাকরী জুটবে কে জানে। তা মধ্যে মধ্যে এস। দেখব যদি কোথাও বলে টলে দিতে পারি। গেরস্ত বাড়ীর কাজ কর্ম্ম সব শিখেছ ত' ?"

ননীমাধব কহিল, "আজ্ঞে না।" সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা পরিস্কার করিয়া বলিল, "মানে কাজ শেখার কথা বলছি না, সে যা হয় হবে। বলছি আমার জন্যে আর চাকরী দেখতে হবে না। চাকরী আমি আর করব না।"

মনে করিলাম তাহার ভূতপূর্ব্ব মনিবের ব্যবহার দেখিয়া সহরের সমস্ত অধিবাসীর উপরই তাহার অভিমান হইয়াছে। বলিলাম, "তা বল্লে কি হয় ? সব বাড়ীতেই কি আর ওরকম হবে। আর তা ছাড়া চাকরী না করে করবে কি ? ভিক্ষে ?"

তাড়াতাড়ি হাত-জোড় করিয়া সে বলিল, "রক্ষে করুন বাবু। ও আশীর্ব্বাদ আর করবেন না, ভিক্ষে করার সখ আমার মিটে গেছে।"

এবার তাহার উদ্দেশ্যটা যেন অনুমান করিলাম। আশ্বাস দিয়া বলিলাম, "তা, সেই ভাল। দেশে গিয়েই দেখ, চাষ বাস, ক্ষেত খামার—"

ননীমাধব কথা শেষ করিতে দিল না। বলিল, "না বাবু, দেশে গেলে খাব কি ? ক্ষেত খামারই যদি থাকবে তাহলে আর দেশ ছেড়ে আসবই বা কেন বলুন ?

যদিও জানি সে ইচ্ছা করিয়া আমাকে ধাঁধায় ফেলিতেছে না, এবং আমার সহিত তামাসা করিবার মত বুদ্ধিভ্রংশও তাহার হয় নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "চাকরীও করবে না, ভিক্ষেও করবে না, দেশেও যাবে না। তবে কি করবে শুনি ? খাবে কি ?"

ননীমাধব আমার বিরক্তি গায়ে মাখিল না। প্রফুল্লমুখে ইঙ্গিতে বাড়ীর ভিতর নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে বাড়ীতেই খাব। মা বলেছেন 'তোকে আর চাকরী করতে হবে না, ও তুই পেরে উঠবি না।' দেখুন মার মন কি না, ঠিক জানতে পেরেছেন। সত্যিই ওরকম পরের বাড়ী চাকরী আমি পেরে উঠব না।"

পরের বাড়ী চাকরী করিতে পারিবে না বলিয়া সে নিজের বাড়ীতেই চাকরী করিবে ঠিক করিয়াছে। আমার মা তাহারও মা হইয়াছেন, সুতরাং বুঝিলাম এ বাড়ী তাহার পরের বাড়ী নয়। বুঝিয়া খুব যে খুশী হইলাম তাহা বলিতে পারি না। তবে মিথ্যা দুশ্চিন্তার চেষ্টা ছাড়িয়া দিলাম। মার কৃপাদৃষ্টি যদি লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সত্য দুশ্চিন্তার সময় আসিয়াছে।

বলিবার মত কিছু ভাবিয়া না পাইয়া তাহারই কথা আবৃত্তি করিলাম, "মা বল্লেন ও তুই পারবি না, চাকরী করা পেরে উঠবি না ?"

ননীমাধব কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মাকে বল্লুম কিনা, বলি মাগো, ভাইটাকে নিয়েই ত' হয়েছে আমার জ্বালা। নইলে নিজের পেটের জন্যে ভাবি না। আর তাই বা বলি কি করে। যে যতই বলুক পেটের জ্বালার চেয়ে আর জ্বালা নেই। ছোটবেলা থেকে আমি একবেলা উপোস সহ্য করতে পারি না, আর এখানে তিন দিন খালি কলের জল খেয়ে কাটিয়েছি। কি কষ্ট যে হ'ত, পেটের মধ্যে নাড়ীগুলো বুঝি কে কুচি কুচি করে কাটছে, এমনি মনে হ'ত। তাইত' শেষে পথে এসে হাত পাতলুম। খালি পেটে কলের জল খেয়ে দিন কাটানো—উঃ, অতি বড় শত্রুরও যেন কখনো সে কষ্ট না পেতে হয়। তাই ত' মা শুনে বল্লেন, 'খালি পেটে কলের জল আর তোকে খেতে হবে না। যা তুই হাতমুখ ধুইয়ে এসে ভাত খেতে বোস', মানে—তাঁদের বাড়ী আজ ভাত খাওয়ার সময় পর্য্যন্ত আর টিকতে হয় নি কি না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল। যেন বড় কৌতুকের কথাই বলিয়াছে।

রাত্রে আহারে বসিয়া মাকে বলিলাম, "হ্যাঁ মা, আবার একটা পুষ্যিপুত্তুর নেবার কি দরকার পড়েছিল ? শরীর আমাদের তোমার ননীমাধবের মতন বলবান না হতে পারে,

কিন্তু এতদিন ত' টিকে আছি, আর তুমি যাওয়া পর্য্যন্ত টিকে থাকব।"

মা বলিলেন, "ষাট ষাট! কথার ছিরি দেখো ছেলের। পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া আবার কি? কি করবে কোথায় যাবে বলে ভেবে সারা হচ্ছিল। চাকরী ওর দ্বারা হবে না। ভিক্ষেও করতে পারবে না। আর আছে এক চুরি; সেও শেখে নি। তাই বললুম, বসি থাক বাবু এখানেই। এক মুঠো করে ভাত খাবে বইত নয়।"

ছোট বোন সুসি পাশেই খেতে বসেছিল। বলিল, "একমুঠো বোলো না মা। তোমার মাধবকে খাওয়াতে মা দশভুজা যদি সবগুলো হাত বার করেন তাঁকেও তিনবার ভাত পরিবেশন করতে হবে।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "আহা, তা খাবে না? যোয়ান বয়স, এসে এই ত' খাবার সময়। তোরা যেমন সব ফ্যাসান করে ফুল শোঁকা হচ্ছিস, খাবার সময় খাবি, খাটবার সময় খাটবি, এই তো জানি।"

অনুমান করিলাম মায়ের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছে ননীমাধব শুধু না খাইতে পাওয়ার গুণে নয়, প্রচুর খাইতে পারার গুণেও বটে।

ননীমাধবের সম্বন্ধে আর বৃথা বাক্যব্যয় করিলাম না। অন্তঃপর ননীমাধব রহিয়া গেল। শরীরে শক্তির অভাব নাই, পরিশ্রম করিতে কাতর নয়, পরন্তু কাজের হুকুম পাইলে খুসী হয়, এরূপ লোক বাড়ীতে থাকিলে তাহার কাজের অভাব হয় না। বাড়ীর গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া সদ্যভাষাপ্রাপ্ত শিশুটীর পর্য্যন্ত হুকুমের চাকর ননীমাধব, কাজের তাহার অন্ত নাই। সুতরাং 'অধিকন্তু'রূপে আসিয়া অচিরে ননীমাধব 'অত্যাবশ্যকে' পরিণত হইল।

তাহার পর প্রায় এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। দেশে ননীমাধবের ভাই সুস্থ ও সুখে আছে, তাহার বিদ্যাশিক্ষাও ভালই চলিতেছে। সুতরাং ননীমাধবও সুখে আছে। দ্বিধাহীন অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা সে সকলেরই প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছে, এমন কি সুসিরও।

তথাপি ননীমাধবকে রাগাইতে সুসির ভাল লাগিত। বলিত, "মাধব, তোমার ভাই ত' ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট হবে, তখন তোমার আর কি আমাদের মনে থাকবে? দেখা করতে গেলে দরোয়ান হাঁকিয়ে দেবে। বলবে 'বড়বাবু এখন বড্ড ব্যস্ত হায় দেখাটেখা নেই হোগা'। তুমি তেতালার বারান্দা থেকে হুকুম দেবে 'নিকাল দেও উসকো'। কেমন, বলবে ত'?"

এতবড় বদনাম মাধবের সহ্য করা শক্ত হইত। সে রাগ করিত। স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠ উচ্চতর করিয়া বলিত, "অমন বাজে কথা বোলো না বলছি। খোকা হাকিম হোক, দারোগা হোক, তাতে আমার কি? আমি ওর বাড়ীতে থাকতে যাব কোন্ দুঃখে? বুড়ো বয়সে কি শেষে ভাইয়ের অন্নদাস থাকব নাকি? আমার মার বাড়ী থাকতে আমার আবার থাকবার ভাবনা?"

সুসি বলিত, "তা তো বটেই। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার খোকা যদি খুব রাগ করে, মনে কষ্ট করে, তখন তুমি কি আর স্থির থাকতে পারবে। তখন তুমি না শেষে ভাইয়ের বাড়ী ছোটো, আমি শুধু তাই ভাবছি।"

আবার ননীমাধবের কণ্ঠ চড়িত। আমার মায়ের অপেক্ষা তাহার নিজের ভাইয়ের আকর্ষণ যে বেশী প্রবল হইতেও পারে, এরূপ লজ্জাকর সম্ভাবনার ইঙ্গিতও তাহার অসহ্য। চিৎকার করিয়া বলিত, "তুমি বড় অবাধ্য মেয়ে দিদিমণি। পাঁচশোবার বলছি তা আমি ছুটব না, ছুটব না, ছুটব না। তবু ঐ এক কথা? সোজা কথাটা তোমরা বুঝতে পার না, কি করতে যে একরাশ টাকা খরচ করে লেখাপড়া কর, তা বুঝি না।"

মাধব যত রাগিত সুসি তত হাসিত। মাও হাসিতেন। সুসিকে ভৎসনা করিয়া বলিতেন, "কেন মাধবকে ক্ষ্যাপাস? ওটাও যেমন পাগল আর তোরাও তেমনি হয়েছিস।"

ভাল ভাল কেতাবে পড়িয়াছি বিধাতাপুরুষ বলিয়া একব্যক্তি আছেন, তিনি মধ্যে মধ্যে অলক্ষ্যে বসিয়া হাস্য করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে কোন নরনারী যদি তাহার ঐকান্তিক সাধ, সুদৃঢ় সংকল্প বা সুনিশ্চিত কোন আশার কথা তাবায় প্রকাশ করে, তাহা হইলেই বিধাতাপুরুষের কৌতুক বোধ হয়। তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, সে হাসি নাকি অতীব বিপর্য্যয়কারী।

দরিদ্র হইলেও ননীমাধবকে বিধাতা পুরুষ নিশ্চয় অবহেলা করিতেন না। তাঁহার বিরাট কর্ণে ননীমাধবের উচ্চ কণ্ঠ ধরা পড়িয়া থাকিবে। বারম্বার তাহার মুখে মার বাড়ী কদাচ ত্যাগ না করিবার সঙ্কল্প শুনিয়া একদা বিধাতা পুরুষ নিশ্চয়ই ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সে দিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিবামাত্র ছেলেদের মধ্যে কে একজন সংবাদ দিল মাধব চলিয়া গিয়াছে। চাঞ্চল্যকর নূতন সংবাদ প্রথম দিবার লোভ শুধু "বিশেষ সংবাদদাতা"দের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। মানব মনের ইহা একটী অন্যতম সাধারণ দুর্ব্বলতা। চলিয়া যাইবার কারণও শুনিলাম।

দিন চারেক পূর্ব্বে তাহার জ্বর হয়। অতি সাধারণ জ্বর, কাহারও উদ্বেগের উদ্রেক করে নাই। কিন্তু উদ্বেগের কারণ ঘটিল জ্বর ছাড়ার ফলে। সকালে জ্বর ছাড়িয়াছিল। যথারীতি একবাটি সাবু সিদ্ধ করিয়া তাহার আহারের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। কিন্তু তিন দিন সাবু খাইয়া ক্ষুধাঅসহিষ্ণু ননীমাধব বিদ্রোহ করিল, সাবু সে আর খাইবে না, তাহাকে ভাত দিতে হইবে। জ্বরগ্রস্ত অবস্থাতেও এ ইচ্ছা সে প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু জ্বর ছাড়িলেই ভাত পাইবে এই আশ্বাসে তাহাকে শান্ত রাখা হইয়াছিল।

ননীমাধবের অভিধানে প্রতিবাক্যের মাত্র একটী করিয়া অর্থ আছে। এবং পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাওয়ার অপেক্ষা বড় বিলাস তাহার কাছে আর নাই। জ্বর ছাড়িলে ভাত দেওয়া হইবে ইহা সে প্রাণপণে বিশ্বাস করিয়া এই তিন দিন কাটাইয়াছে। সুতরাং আজও তাহাকে ভাত হইতে বঞ্চিত করিবার কোন যুক্তি সে খুঁজিয়া পাইল না। অপর সকলের নিকট ব্যর্থকাম হইয়া অবশেষে মাধব পরিপূর্ণ আশায় মায়ের নিকট আসিয়া আপীল করিল। কিন্তু তাহার বিদ্রোহের সংবাদ পূর্ব্বেই মায়ের নিকট পৌঁছিয়াছিল। বয়স্কব্যক্তির এই যুক্তিহীন আব্দারে তিনি বিরক্ত হইয়াই ছিলেন। সুতরাং মাধবের আপীলই শুধু নামঞ্জুর হইল না এই অন্যায় আব্দারের জন্য সে মায়ের নিকট তিরস্কারও পাইল প্রচুর।

মায়ের মুখেই শুনিলাম তিরস্কৃত ননীমাধবের ক্রোধের কাহিনী। "সে কি রাগ বাপু, এমন ছিষ্টি ছাড়া রাগ কোথাও দেখি নি। চারদিন ধরে জ্বরে ভুগছিস, আজই না হয় জ্বরটা ছেড়েছে, তাই বলে তোকে এককাঁসি ভাত দিতে হবে নাকি? তারপর ঘাড়গুঁজে পড় আবার জ্বরে। কোন আক্কেলে বল্লি একথা? আর একটা দিন ভাত না খেলে আর প্রাণ বাঁচে না? এই যেই বলেছি, আর রাগ দেখে কে বাবুর। দুম দুম করে বাড়ী কাঁপিয়ে ঘরে গেলেন। চিৎকার করে বল্লেন, চাইনে আমি তোমাদের ভাত, আমি কিচ্ছু খাবো না, ভাতও চাই না, সাবুও চাই না, কিচ্ছু চাই না।"

অতঃপর রাগ জানাইতে ননীমাধব সাবুর বাটী নর্দ্দমায় উপুড় করিয়া দিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। বেলা একটা বাজিয়া গেলেও জলস্পর্শ করে নাই। দুসি আসিয়া গোপনে একটা পাউরুটির লোভ দেখাইয়াও তাহার প্রায়োপবেশন ভাঙ্গিতে পারে নাই। সকলের সব অনুরোধ আদেশ ব্যর্থ হইলে মা স্বয়ং মাধবের ঘরের সামনে আসিয়া আর একদফা ভৎসনার সহিত আদেশ করিয়া গেলেন সাবু খাইতে।

কিন্তু, কী যে তাহার গ্রহের ফের, যে ননীমাধব মার একটী ইঙ্গিত পাইলে বোধ করি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করিত না, সে একটাদিন ভাতের পরিবর্ত্তে এক বাটী সাবু খাইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিল না। কে জানে বাল্যে ননীমাধব হয় ত' এমনি অন্যায় আব্দারই করিত তাহার জননীর কাছে। হয় ত' রোগ দুর্ব্বল মস্তিষ্কে আমার মায়ের সঙ্গে তাহার প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ ভুলিয়া মাতাপুত্র সম্পর্ককেই সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার অবাধ্যতা যতই দৃঢ় হইতে থাকিল, মায়ের ক্রোধও ততই কঠিন হইয়া উঠিল।

অবশেষে বেলা যখন অপরাহ্নের কোলে নামিয়া আসিয়াছে তখন বামুনঠাকুরকে ডাকিয়া মা বলিলেন, "দাও বামুনঠাকুর রাক্ষসটাকে ভাতই দাও, খেয়ে মরুক। আর বলে দাও বামুনঠাকুর, যেন ভাত গিলে উঠেই হতভাগা রাক্ষস আমার বাড়ী থেকে বিদেয় হয়ে যায়। আর আমার দরকার নেই ওকে। মরতে হয় রাস্তায় গিয়ে মরুক। বৌমা, ওর মাইনেপত্তর হিসেব করে রেখে দাও, ভাত খেয়ে উঠলেই সেই দণ্ডেই ওকে চুকিয়ে বিদেয় করে দেবে।"

বামুনঠাকুরকে আর বলিতে হয় নাই। ক্রোধের সময় কথা উচ্চ কণ্ঠেই হইয়া থাকে। মায়ের আদেশ বাড়ীশুদ্ধ

সবাই শুনিয়াছিল, ননীমাধবও নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবে। কয়েক মিনিট পরে ভাত দিতে গিয়া বামুনঠাকুর দেখিল ননীমাধব ঘরে নাই। তাহাকে বাড়ীর কোথাও পাওয়া গেল না, সে চলিয়া গিয়াছে।

রুগ্ন অবস্থায় ভাত খাইবার জন্য অসঙ্গত আব্দার করিয়া ননীমাধব অন্যায় করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা অপেক্ষা বড় অপরাধ সে করিয়া গিয়াছে, মাকে সে ভাত খাইতে দেয় নাই। বাড়ীর পাখীটা পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিতে যার মুখে অন্ন উঠিত না, একথা এতদিন এ বাড়ীতে বাস করিয়াও যে ননীমাধব কি করিয়া ভুলিতে পারিল তাহার কারণ ভাবিতে গেলে বিধাতা পুরুষের হাসির-কথাই মনে হয়। সে হাসির বিপর্য্যয় একদিনেই শেষ হইল না। ননীমাধবের অপরাধ দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিল। সে চলিয়া যাইবার পর দুই সপ্তাহ অতীত হইয়াছে, এই দুই সপ্তাহকাল মায়ের অদৃষ্টে অন্ন জুটে নাই।

তাহার দেশে সংবাদ লইয়াছি। সেখানে সে যায় নাই, কোন সংবাদও পাঠায় নাই। সহরের ও আশেপাশের থানা হাসপাতালগুলিতে তাহার কোন উদ্দেশ মিলে নাই। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও এ পর্য্যন্ত সমান নিষ্ফল হইয়াছে। মায়ের ধারণা মাধব গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এবং মায়ের কাছে ভাত চাহিয়া পায় নাই, ইহাই স্মরণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মায়ের মুখে অন্ন উঠিল না।

বিচিত্র যুক্তি এই মায়েদের! ভৃত্যের স্পর্দ্ধা, অবাধ্যতা ও অসঙ্গত আব্দার, সব ছাপাইয়া একটিমাত্র কথাই মার মনে বড় হইয়া জাগিয়া আছে—'মাধব ভাত চাহিয়া পায় নাই। মাধব দিনের শেষে অনাহারে গৃহ ত্যাগ করিয়াছে। ভাত তাহার পাওয়া উচিত হইত না, অনাহার তাহার ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা মাত্র, এবং ননীমাধবের মত সবল, সুস্থ মস্তিষ্কের পুরুষ এত অল্প কারণে আত্মহত্যা করিতে পারে না, এ সকল যুক্তির সারবত্তা মা অস্বীকার করেন না; কিন্তু তথাপি তাঁহার মায়ের মন হইতে অন্ন-গ্রহণের দ্বিধা দূর করিতে পারিলাম না।

বাড়ীতে কাহারও মনে শান্তি নাই। মা বলিতেন, "তোরা কেন মিছে ভাবিস বল ত'? নাই বা ভাত খেলুম তাতে কি হয়েছে? উপোস ত' করে নেই আমি। ভাত খেতে যদি আমার প্রবৃত্তি না হয়, ত' কি করব? রাক্ষসটা 'মা' 'মা' করে আমাকে যেন পাগল করে দিত। যেখানেই থাকুক, হতভাগা বেঁচে আছে এইটুকু জানতে পারলেই আমি নিশ্চিন্দি হই। এমন জ্বালাতেও মানুষে পড়ে গা!"

কিন্তু মা যাহাই বলুন, বাড়ীর গৃহিণী যে কারণেই হোক অন্ন ত্যাগ করিয়া থাকিবেন ও অপর সকলের সংসারযাত্রা নিশ্চিন্তে যথারীতি চলিতে থাকিবে, এ ব্যবস্থা স্বাভাবিক নয়, স্বাচ্ছন্দ্য-জনকও নয়। ইহার উপর আবার ননীমাধবের ছোট ভাইয়ের পর পর দুইখানি চিঠি আসিয়াছে। সে আজকাল লিখিতে শিখিয়াছে। বহুদিন পত্র না দেওয়ায় অনুযোগ করিয়া, পত্রপাঠ উত্তর দিবার জন্য বড় বড় আঁকা বাঁকা অক্ষরে বার বার অনুরোধ করিয়াছে। তাহাকেই বা কী সংবাদ দেওয়া যায়? বিষাদ ও দুশ্চিন্তার মেঘ এবাড়ীর আকাশে ক্রমেই ঘন হইয়া উঠিল।

এমনি সময়, এক সজল মধ্যাহ্নে, অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ননীমাধবের জন্য সকল উদ্বেগের নিবৃত্তি হইল।

ভাগ্যবান লেখক হইলে আমার অদৃষ্টে এই সুযোগে ননীমাধবের কী না হইতে পারিত! সুদূর তীর্থের পথে, তাহার মৃত না হোক মুমূর্ষু দেহের চারিধারে সদলবলে উপস্থিত হইয়া চোখের জলে নিজেদের ও পাঠকদের কত ব্যাকুলিতই না করা যাইত। অথবা দশ বিশ বৎসর পরে একদা বিপুল অর্থশালী বিখ্যাত ব্যবসায়ী কিম্বা বিশাল জটাজালশোভিত, তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী রূপেও ত' সে ফিরিতে পারিত। তাহাতেও পাঠক সমাজে হর্ষের সীমা থাকিত না। কিন্তু একান্ত অবিবেচক, নির্ব্বোধ ননীমাধবের দৌরাত্ম্যে ঐ সকল শাস্ত্র-সম্মত ভাল ভাল উপসংহারের একটীও হইতে পারিল না। পরিবর্ত্তে কি হইল তাহাই বলি।

কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে সেদিন অফিস বন্ধ ছিল। মধ্যাহ্নে আহারের পর বাহিরের ঘরে শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি। অর্থাৎ কাগজ মুখে চাপা দিয়া তন্দ্রা উপভোগ

করিতেছি। সকাল হইতে রহিয়া রহিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিছুক্ষণ হইল বর্ষণ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু ছেলেদের বর্ষার তৃষ্ণা এত শীঘ্র মেটে নাই। ওদিকের ঘর হইতে তাহাদের মিলিত কণ্ঠের বর্ষামঙ্গল গান আসিতেছে—"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে……"

হঠাৎ যেন কাহার ডাক কানে আসিয়া তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। মুখের উপর হইতে কাগজ সরাইয়া নিদ্রাবিল চোখে যাহার দিকে চাহিলাম, তাহার মুখ না দেখা গেলেও আকৃতি যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। দেখিলাম এক ব্যক্তি দ্বারের চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেছে। ধূসর সিক্ত চুল মাথার দুইপাশ হইতে নামিয়া ভূমিতে ঠেকিতেছে। অনাবৃত পিঠ ও দুইটী দীর্ঘ বাহু স্মৃতির সাহায্য করিল। ভাল করিয়া দেখিলাম, ভুল করি নাই, ননীমাধবই বটে। প্রণাম করিবার পূর্ব্বে সে-ই 'বাবু' বলিয়া ডাকিয়া থাকিবে। তাহার পরিচিত কণ্ঠের সুপরিচিত ডাক আমার উদ্বিগ্ন অবচেতন মনে একবার প্রবেশ করিয়াই জাগাইয়া দিয়াছে।

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ডাকিলাম, "মাধব'? মাধব মুখ তুলিল না, প্রণাম তাহার তখনও শেষ হয় নাই। উঠিয়া আসিয়া তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া কহিলাম, "কিরে মাধব এলি?"

আস্তে ঘাড় নাড়িয়া ননীমাধব জানাইল সে আসিয়াছে। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখ দেখিয়া চমকিত হইলাম। দীর্ঘ রুক্ষ কেশ, কণ্টকিত শ্মশ্রুগুম্ফ ও কোটরগত চক্ষু তাহার মুখের যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, তাহাতে পথে তাহাকে দেখিলে নিশ্চয় পাগল ভাবিয়া এড়াইয়া যাইতাম।

দেখিলাম দুটী চোখ দিয়া তাহার ধারা নামিয়াছে। বোধকরি ইহারই আবেগে সে এতক্ষণ মাথা তুলিতে পারে নাই।

ননীমাধব চলিয়া যাইবার পর তাহার প্রতি ক্রোধ করিয়াছি। কিন্তু তাহার অপমৃত্যু আশঙ্কা করিয়া উদ্বেগ ও দুঃখ বোধ করি নাই একথা বলিলে মিথ্যা দম্ভ করা হইবে। আজ প্রত্যাগত ননীমাধবকে দেখিয়া সত্যই আনন্দিত হইলাম। বলিলাম, "আয়, আয়, ঘরে আয় মাধব, বোস। আচ্ছা লোক ত' তুই! কোথায় ছিলি এতদিন বল্ ত'?"

ময়লা কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিয়া মাধব বলিল, "সে শাস্তির কথা পরে বলব বাবু, আগে বলুন মা কেমন আছেন, ভাল আছেন ত'?"

বলিলাম—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা ভালই আছেন। সবাই ভাল আছে। আয় বোস।"

মাধব বসিল না, বলিল, "না বাবু আগে মাকে পেন্নাম করে আসি। তাঁর মার্জ্জনা না পেলে আমি বসতে পারব না।"

"সেই ভালো, চল্ মার কাছেই চল। যা ভাবিয়ে তুলেছিলি তুই মাকে।" বলিয়া তাহাকে লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিলাম।

ওপাশের ঘর হইতে ছেলেরা দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "মাধব এসেছে, ওরে মাধব এসেছে।" বাড়ীতে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। ননীমাধব ও আমি ছেলেদের দলে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম, তখন উপরের বারান্দায় অনেকগুলি কৌতূহলী চোখের সাগ্রহ দৃষ্টি আমাদের অভ্যর্থনা করিল।

মায়ের ঘরের কোলে এক টুকরা ছাঁদ আছে। বড়ী দেওয়া, আচার শুকানো ইত্যাদিতে বিশেষ করিয়া এই ছাদটী মায়ের ব্যবহারেই লাগিত বলিয়া এটী 'মার ছাদ' নামে পরিচিত। সেই মার ছাদেই ননীমাধবের অভ্যর্থনা সভা বসিল।

মাকে প্রণাম করিতে গিয়া ননীমাধবের চোখ আর এক দফা বর্ষাইল। চোখের বর্ষা বড় সংক্রামক ব্যাধি। মার চোখও ছলছল হইয়া উঠিল।

মা বলিলেন, "এ কি চেহারা হয়েছে রে তোর মাধব, দেখে যে চেনবার জো নেই। এ কদিন খাওয়া দাওয়া জোটে নি বুঝি, হ্যাঁরে?"

অপরাধীর হাসি হাসিয়া মাধব ঘাড় নাড়িয়া জানাইল জোটে নাই। তারপর একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "কোত্থেকে জুটবে মা? অন্নপূর্ণার আশ্রয় যে ত্যাগ করে যায় সে হতভাগার কি আর কোথাও আহার জোটে?"

"তবে কি করে কাটালিরে এতদিন? খুব কষ্ট হয়েছে, নালে?"

দিন যে তাহার অতি কষ্টে কাটিয়াছে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মাধব রাখিয়া ঢাকিয়া কথা কহিতে জানে না। সোজা কথায় উত্তর দিল, "হ্যাঁ মা, বড় কষ্ট হয়েছে। কোথায় কি করে যে দিন কেটেছে তা মনেই পড়ে না। মানে আবার জ্বরে পড়েছিলুম কিনা। তবে খুব কষ্ট হয়েছে তা মনে আছে মা।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মাধব হঠাৎ বলিল, "আর কখনো আপনার কথার অবাধ্য হব না মা, দেখবেন। কি যে ভূতে পেয়েছিল আমাকে, দুর্গতির চরম হয়েছে।"

শুনিয়া মা চোখ মুছিলেন।

স্থসি বলিল, "তা সে ভূত ছেড়েছে তো মাধব?'

"ছেড়েছে বই কি দিদি, নইলে, কি আর ফিরতে পারতুম? ঐ পথে পড়েই মরে থাকতুম কোনদিন।"

পুনরায় স্থসির প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "কি করে ছাড়ল তা জানি না দিদি। সকালে ঘুম ভাঙ্গতে দেখলুম বাবুঘাটের চাতালে শুয়ে আছি। উঠতে গেলুম, মাথাটা ঘুরে গেল. উঠতে পারলুম না। শুয়ে শুয়ে মনে হল, কি বোকা আমি, মিছি মিছি কেন কষ্ট পাচ্ছি; মা কি কখনো তাড়িয়ে দিতে পারেন, মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ত' সব ল্যাটা চুকে যায়!"

মা বলিলেন, "তা তক্ষুনি এলি না কেন মাধব? বাবুঘাট ত' বেশী দূরে নয়, আসতে তোর এই তিন পর বেলা হল কেন?"

মাধব কহিল, "বড্ড কাহিল মনে হল মা। শরীর যেন আর বইতে পাল্লুম না। বসে বসে আবার বোধ হয় একটু ঘুমের মতন এসেছিল। স্বপ্ন দেখলুম যেন বাড়ীতে এসেছি, যেন আপনি আমার ভাত বেড়ে দিয়ে নিজের ভাত কোলে করে বসে আছেন। আমায় খেতে ডাকছেন, আমি যত সাড়া দিতে যাচ্ছি, কিছুতেই গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। আপনিও খেতে বসতে পারছেন না। চট্ করে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখলুম পাশে গোটা তুত্তিন পয়সা পড়ে আছে। বোধ হয় গঙ্গা নাইতে এসে কারা দিয়ে গেছে। পয়সা গুলো একটা ভিখিরীকে দিয়ে জোর করে উঠে পড়লুম। ভাবলুম মার কাছে যাচ্ছি, আর ভিক্ষের পয়সায় আমার দরকার নেই।"

তাহার স্বপ্নকথা শুনিয়া সমবেত ভদ্রমহিলারা 'অ-হা' বলিলেন। মা চোখ মুছিয়া ব্যস্তভাবে কহিলেন, "সকাল থেকে কিছু খাস নি? সে কি রে?"

ম্লান হাসিয়া মাধব বলিল, "কই আর খেলুম মা? খেতে গেলে ত' সেই ভিক্ষে করে খেতে হবে। সে আমার আর সহ্য হবে না। আর এক মজার কথা বলি শুনুন মা, যেমন ভাত ভাত করে আপনার চরণ ছেড়ে পালিয়েছিলুম, তেমনি একটা দিনের জন্তে ভাত বলে জিনিষের মুখ দেখতে হয় নি। যেমন রাক্কুসে পানা করে আপনার অবাধ্য হয়েছিলাম, তেমনি উচিত-শাস্তিই হয়েছে মা, বুঝেছেন?"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি, উপোষ করে রোগা শরীরে তুই আর বকিস নি। তোর গল্প পরে শুনব, এখন কিছু মুখে দে। স্থসি দেখ্ তো, বামুন ঠাকুর বোধ হয় ঘুমোচ্ছে, কারুকে বল ডেকে দিতে। হাঁড়ীতে ভাত আছে একমুঠো দিতে বল। কাহিল শরীরে অবেলায় আর বেশী খেয়ে কাজ নেই।"

স্থসি বামুন ঠাকুরকে ডাকিতে যাইতেছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "উনুনে বোধ হয় এখনো আগুন আছে, এক মুঠো আলোচাল সেদ্ধ হতে বেশী দেরি হবে না মা। দেব চড়িয়ে?"

মা বলিলেন, "কি দরকার মা, আজ থাক।"

না বুঝিয়া মাধব বলিল, "না না আবার আলোচালের দরকার কি? বেশী খেতে ত' পারব না দিদি। ঐ মা যা বল্লেন হাঁড়ীতে যা আছে তাইতেই হবে।"

বলিলাম, "তোমার জন্তে নয় মাধব, মার জন্তে।"

বিস্মিত হইয়া মাধব বলিল, "সে কি, এত বেলা পর্যন্ত মার ভাত খাওয়া হয় নি?"

বলিলাম, "এত বেলা পর্য্যন্ত নয়, এতদিন পর্য্যন্ত। আজ দিন পনের হল মার ভাত রান্না হয় নি।"

"দিন পনের? ভাত খান নি মা? কেন?"

স্থসি ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "কেন আবার? রাক্ষসের অত্যাচারে, আবার কেন?"

ননীমাধব হেঁয়ালি বোঝে না, রসিকতাও বোঝে না।

বিস্মিত দৃষ্টিতে সুসির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাক্কস? সে আবার কি?

মা, বলিলেন, "আঃ তুই থাম না সুসি।"

কিন্তু সুসি থামিল না, মাধবের দিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এই যে রাক্কস, দেখতে পাচ্ছ না?"

ননীমাধব তথাপি বুঝিল না। বলিল, "আমি রাক্কস? আমার জন্মে ভাত খেতে পান নি মা? হ্যাঁ মা?"

মা স্মিত মুখে বলিলেন, "তুই ওর কথা শুনিস কেন? ও তোকে ক্ষ্যাপাচ্ছে।"

কিন্তু মাধব ক্ষেপিল না। আবার বলিল, "পনের দিন আপনি ভাত খান নি? আমার জন্মে?" তারপর অকস্মাৎ বোধ করি সে বুঝিল। ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মৃদুস্বরে বলিল, "পনের দিন। পনের দিনই বটে।" আর কিছু বলিল না। নীরবে মার পায়ের দিকে চাহিয়া চোখ দুইটী তাহার জলে ভরিয়া আসিল। তারপর আর একবার মার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া উঠিয়া বলিল, "উনুনের ব্যবস্থা আমি করছি দিদি, তুমি ভাই চালটা ধুয়ে দেবে চলো।"

মা বলিলেন, "নারে না, তোকে আর রোগা শরীরে কিছু করতে হবে না। তুই বোস মাধব, ওরাই করবে অখন।" মাধব শুনিল না, উঠিয়া গেল।

বহুদিন হইল মাধব আর নাই। কিন্তু বহুদিনই সে ছিল ও আমাদের পরিবারের একজন হইয়াই ছিল। এখনও তাই তাহার কথা কারণে অকারণে প্রায়ই আমার মনে পড়ে।

পণ্ডিত-মুর্খের প্রতি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বিদ্যার চাষ ক'রে ক'রে তুমি হোলে বিদ্বান চাষা,
আজিকে তোমার হারায়েছে সব আশা।
ভাষা-জননীর অভিসম্পাতে ফসলে আগুন লাগে,
সংস্কৃতির সর্ব্বনাশের কালবৈশাখী ডাকে।
উধাও হয়েছে সকল চিন্তা, উড়িছে পুঁথির পাতা,
হিংসা-দর্প দেখায়েছ' সদা দলিয়া দেশের মাতা,
প্রভু যে তোমার পশ্চাচারের নিতে চাহে প্রতিশোধ,
প্রবাহিত করে নর-শোণিতের স্রোত।
পণ্ডিত তুমি এই হিসাবেই—পণ্ড করেছ সবি
ভাগ্যগগনে বধিলে প্রাণের রবি।
ক'র নি সাধনা, তরুণ হৃদয়ে ঢেলেছ জ্ঞানের বিষ,
স্নাতক তোমার অন্ধকারেই কাঁদিছে অহর্নিশ।
সান্ত্বনা-সুধা নাহিক কোথাও, নাহিক সখ্যপ্রীতি,
রাসভ-কণ্ঠে শোনা যায় এবে গণতন্ত্রের গীতি—
এই গান তুমি শিখায়েছ কত মনোমত সুর দিয়া,
এর পরিণাম—ভ্রষ্ট তরুণ হিয়া।
ধরণীর শত দুঃখ বেদনা এনেছ তোমরা এবে,
অক্ষর কভু দেওনি শিক্ষা ভেবে।
প্রথম পাঠের রয়েছে গলদ,—কি হ'বে ডিগ্রী ধরে'
গ্রাজুয়েটেরই গরিমা গিয়েছে' পেটের জ্বালায় মরে'
শূদ্র সেবক হয়েছে যে জাতি বিদ্যা শিক্ষা পেয়ে,
আদিম যুগের মানবেরা ভালো; ভাবি আমি তার চেয়ে।
সদ্ভাবে আর সদ্‌চিন্তায়' জ্ঞানের ফসল করি'
মৃত্যু বিহীন হয়েছে বিশ্বোপরি।
মঙ্গলধ্বনি যদি নাহি বাজে জ্ঞান বিজ্ঞান মাঝে
দেবতার দেখা নাহি পাওয়া যায় কাছে,
এই সংসারে নাহি থাকে কোন সাধনার অবদান,
'পোড়া মাটি নীতি, করে দেয় যেন এ যুগের অবসান।
লোকালয় সব পুড়ে ছাই হোক্,—কি হবে এ যুগ রেখে!
পেটের জ্বালায় আধ্‌মরা হয়ে পাপের পঙ্ক মেখে'
মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে হয় নাকি নত শির?
ওকি বিদ্বান! নয়নে কেন গো নীর?

গিরিশ-প্রসঙ্গ*

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

দুই

প্রথম দেখার তিন দিন পরে আর এক দিন বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় আমরা গিরিশবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন ছিল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। সঙ্গী বিধুমৌলিবাবু বলিতেছিলেন, "আজ অনেক গল্প ক'রতে পারবেন যোগীন্‌বাবু, এমন দিনে কেইবা আসবে।"

তাঁহার অনুমান কিন্তু ঠিক হইল না। আমরা গিয়া দেখিলাম সেখানে চারি পাঁচ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। একজন স্বনামধন্য 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিতীয় বিখ্যাত সাংবাদিক ও 'নায়ক' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, আর একজন মাথায় কাঁচাপাকা চুল, তবে পাকাই বেশী, বলিষ্ঠ চেহারা, পরে নাম শুনিলাম 'নবযুগ' সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত। পূর্ণবাবুর 'নবযুগ' পত্রে আমি অনেক ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছিলাম। 'নবযুগ' পত্রের কোন ফাইলও এখন আর কোথাও দেখিতে পাই না। সে সময়ে কত যায়গায় যে ঘুরিয়াছি তাহার অন্ত নাই। সেই সব লেখাগুলি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ণবাবুর সহিত সহজেই পরিচিত হইলাম। তিনি আমার সঙ্গে বেশ প্রীতি ও স্নেহের সহিত আলাপ করিলেন। গিরিশবাবু আমাদিগকে দেখিয়া পরম আদরে পূর্ব্ব দিনের ন্যায় 'এস, বিধুমৌলি, এস বাবা!' বলিয়া আহ্বান করিলেন ও বসিতে বলিলেন। আমরাও সুরেশবাবুর পাশে বসিলাম। সুরেশবাবু, পাঁচকড়িবাবু প্রভৃতির সহিত আমার পূর্ব্ব হইতেই ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল।

সুরেশবাবু বিশেষ সুরসিক লোক ছিলেন, তিনি বিধুমৌলিবাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'তালগাছসম দীর্ঘ কে বটে হে তুমি!' সুরেশ সমাজপতিকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে সুরেশবাবু যেমন দীর্ঘাকায় ছিলেন, তেমনি ছিলেন স্থূল কলেবর, কিন্তু তাঁহাকে দৈর্ঘের জন্য তেমন স্থূল বলিয়া মনে হইত না। বিধুমৌলিবাবু নাটকীয় সুরে কহিলেন,—

'তুলনায় ক্ষীণকায় হার মানি আমি!'

গিরিশবাবু হাসিয়া কহিলেন, "সুরেশ, ওঁর নাম হচ্ছে বিধুমৌলি বাগচী। পলাশীর কাছে বাড়ী। আমাদের পুরাণো একজন 'এক্টার'—ম্যাকবেথে উইচ্ সাজতেন চমৎকার!"

সুরেশবাবু আবার বিধুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'গিরিশবাবু, আপনার পছন্দ ভাল!' তার পর গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'ম্যাকবেথ্ translation অপূর্ব্ব!' এই কথা বলিয়াই আবৃত্তি করিলেন,—

"দিদিলো, বল্‌না আবার,
মিলব কবে তিন বোনে,
যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর
চক্-চকাচক্ হানবে চিকুর,
কড়-কড়া-কড় কড়াৎ কড়াৎ
ডাক্‌বে যখন ঝন্‌ঝনে"

তারপর ম্যাকবেথের প্রতি লেডী ম্যাক্‌বেথের উত্তেজনাপূর্ণ বাণী বলিতে আরম্ভ করিলেন—

কোন্ বস্তু জন্তু তবে আমার নিকটে
ক'রেছিল উত্থাপন এ কঠিন পণ?
মানব নামের যোগ্য আছিলে তখন
সাহস বান্ধিলে যবে এই উচ্চ ব্রতে?
উচ্চতর পদ যদি করহ গ্রহণ
মনুষ্যত্ব পুরুষার্থ অধিক তাহার।
সময়, সুযোগ, স্থান আছিল অভাব।
ক'রেছিলে পণ, সুযোগ খুজিয়া লবে।
সে সুযোগ এবে উপস্থিত।
সুযোগ হেরিয়া তুমি পুরুষার্থহারা?
স্তন্যপায়ী শিশুরে যে দিয়েছি এ স্তন,
সস্নেহে ধ'রেছি যারে হৃদয় উপরে!
হেন শিশু এবে যদি হাসে মম বুকে,
দন্তহীন মুখ হ'তে স্তনাগ্র ছিনায়ে
আছাড়িয়া মস্তিষ্ক বিদারি তার
প্রতিজ্ঞা যদ্যপি করি তোমার সমান।"

---

* গিরিশ-প্রসঙ্গ অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

সং, বঙ্গশ্রী

সুরেশবাবুর বক্তৃতা কিংবা আবৃত্তি যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন তাঁহার বাগ্মীতা ও আবৃত্তি বীরকণ্ঠে উচ্চারিত হইত, বর্ত্তমান যুগের ন্যায় অনুনাসিক সুর তাহাতে থাকিত না।

সুরেশবাবু গিরিশবাবুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন, তাঁহার লিখিত নাটকের অনেক বিশিষ্ট ভূমিকা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সমাজপতি মহাশয় যখন সাপ্তাহিক "বসুমতী"র সম্পাদক ছিলেন, তখন প্রায়ই সম্পাদকীয় স্তম্ভে কোন বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে গিরিশবাবুর নাটকের দুই একটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেন। যেমন "উজ্জলার সকলি সম্ভব", এমন অনেক। একবার একখানি নাটক লিখিবার সময়ও তিনি গিরিশবাবুর গণেশের কাজ করিয়াছিলেন, এরূপও শুনিয়াছি।

সে সময়ে রামধন মিত্রের লেনে "সাহিত্য" কার্য্যালয় ছিল। আমরা যখন কলিকাতা আসিতাম, তখন সুরেশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সেখানে যাইতাম। তিনি সমাগত সাহিত্য-সেবীগণকে অর্থাৎ যে যখন সেখানে যাইত তাঁহাকেই চা দানে পরিতৃপ্ত করিতেন। তখন নানা বিষয়ে গল্প গুজব চলিত। এখানে আমার সঙ্গে সে কালের বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, নগেন্দ্র নাথ সোম, নিখিল নাথ রায়, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলাল বন্দোপাধ্যায়, দেবকুমার রায় চৌধুরী এমন আরও অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গেই সেখানে আলাপ হইয়াছিল। আজ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রীতি ও স্নেহ পূর্ণ ব্যবহারের কথা আজ মনে হইতেছে।

সেদিন সুরেশ বাবু আসরটি বেশ জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। পাঁচকড়ি বাবু, পূর্ণবাবু এবং আমরা পরম আনন্দের সহিত সেই আবৃত্তি উপভোগ করিতেছিলাম।

গিরিশ বাবু কহিলেন, "হাঁ হে সুরেশ, তোমার এতও মনে থাকে! আমার এক্টার মশাইরা ত' কেবলই ষ্টেজে গিয়ে পার্ট ভুলে যান।"

সুরেশ বাবু হাসিয়া কহিলেন, "সেটা কি জানেন, ও হচ্ছে স্কুলের পড়ুয়াদের মত। বইয়ের পড়া মুখস্থ থাকে না। আপনার এক্টারদেরও পার্ট শেখা অনেকটা স্কুলের ছেলেদেরই মত, তারপর দেখেছি ত' আপনি যে কড়া মাষ্টার।"

গিরিশ বাবু হো হো করিয়া হাসিলেন।

সমাজপতি মহাশয় একবার আসর জমাইয়া বসিলে অন্য কাহারও বড় একটা কথা বলার সুযোগ মিলিত না।

সুরেশ বাবু বলিলেন, "আপনার 'হলদিঘাটের যুদ্ধ' কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগে। অনেক সময় আবৃত্তি করে আনন্দ পাই।" তারপর একটু বসিয়া সমাজপতি মহাশয় বলিলেন, "আপনার পরমহংস রামকৃষ্ণের উৎসব উপলক্ষ্যে বিরচিত গানটি আমার এত ভাল লেগেছে যে আমি মুখস্থ করে ফেলেছি।" একথা বলিয়া সুরেশ বাবু বলিতে লাগিলেন—

"দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছে আলো ক'রে
কেরে ওরে দিগম্বর, এসেছ কুটীর ঘরে।
মরি মরি মুখ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয় সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদি 'পরে।
ভূতলে অতুল মণি, কে এলিরে যাদুমণি
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।
কলিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা হাস কাঁদ কার তরে।"

আরও খানিকক্ষণ সাহিত্য-আলোচনা চলিল। সেখানে বক্তা ছিলেন সুরেশ বাবু। গিরিশ বাবু মাঝে মাঝে দুই একটি মাত্র কথা বলিয়াছিলেন। পরে বুঝিলাম কোন একটা মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসার ব্যাপারে ইহারা তিন জন গিরিশ বাবুর নিকট আসিয়াছিলেন। সে সময়ে পাঁচকড়ি বাবু ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'রঙ্গভূমি' পত্রিকার সম্পাদক। আর 'নবযুগের' পূর্ণচন্দ্র মহাশয়ও গাল-মন্দ করিতে বড় কম ছিলেন না। বোধ হয় এরূপই কোন একটা বিষয়ের জন্যই তাঁহারা আসিয়াছিলেন।

গিরিশ বাবু কহিলেন, "দেখুন পূর্ণবাবু, ব্যাপারটা আপনারা দু'জনে মিটিয়ে ফেলুন। গলায় কাঁটা ফুটলে বেড়ালেরও পা ধরতে হয়।"

তারপর আরও দুই চারিটি কথা হইল, আমি সেদিকে লক্ষ্য করিলাম না। অবশেষে সুরেশ বাবু, পাঁচকড়ি বাবু ও পূর্ণ বাবু তিনজনে চলিয়া গেলেন।

গিরিশ বাবু স্মিত হাস্যে বিধুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বাগচী থিয়েটার করে জানিস্ ত' কি Company-র ভিতর

আমাদের থাকতে হয়। কিন্তু দেখ্‌ছি থিয়েটারের গণ্ডীর যারা বাইরে থাকেন তারাও ত' দেখছি সহজ সরল মনে চলেন না। বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে মানুষের ঝকমারি। কত রকমের character-ই দেখা যায়।

আমি বলিলাম, "বেলা হয়ে যাচ্ছে আপনাকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা হয় না। আমরা আজ বরং যাই।"

গিরিশ বাবু কহিলেন, "বিরক্ত মোটেই নয় বরং তোমাদের মত youngman-দের সঙ্গে আলাপ করলে আনন্দ হয়। আমি বারোটার আগে বড় একটা উঠ্‌তে পারি না। তুমি স্বচ্ছন্দে আলাপ করতে পারো।"

আমাকে এখানে একটু আগের কথা বলিতে হইতেছে।

আমার সন তারিখ ঠিক্ মনে নাই। তখন আমরা ঢাকা সহরে থাকিয়া পড়াশুনা করিতাম। নবাববাড়ীর কোনও একটি বিবাহ বা ঐরূপ কোনও উৎসব উপলক্ষ্যে ষ্টার থিয়েটার কয়েকদিন নবাববাড়ীতে অভিনয় করেন। সে সময়ে ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার অমৃতলাল বসু মহাশয় তৎকালীন ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল (গভর্ণমেণ্ট প্লীডার) ত্রৈলোক্যনাথ বসু মহাশয়ের বাসায় অতিথি হইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্য বাবুর পুত্র নৃপেন্, বর্ত্তমানে Mr. N. C. Bose, Bar-at-law ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে আমাদের সহপাঠি। তার ডাকনাম ছিল টোনা। নৃপেন্ অমৃতবাবুর সম্বন্ধে নানা গল্প বলিত। ষ্টার থিয়েটার নবাববাড়ীতে অভিনয় করিবার পর সেকালের স্থানীয় ক্রাউন থিয়েটার ভাড়া করিয়া কয়েকদিন অভিনয় করেন। সেবার ষ্টার থিয়েটার ঢাকাতে বিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিল। অমৃতলাল বসু মহাশয় চন্দ্রশেখরে স্বয়ং লরেন্স ফষ্টার এবং 'রাজাবাহাদুরে' ব্যকম্যান স্মিথ সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া অসাধারণ যশঃ লাভ করেন।

নৃপেন তাঁহাদের বাড়ীর মাননীয় অতিথির সঙ্গে এবং তাঁহার পিতার সহিত নবাব বাড়ী যে কয়দিন অভিনয় হইয়াছিল, প্রত্যহই অভিনয় দেখিতে যাইত। আর আমাদের কাছে অবসর মত গল্প ও অভিনয়ের দুই একটি চরিত্রের বিষয়ে আলোচনা করিয়া উৎসাহিত করিত। কিন্তু আমাদের থিয়েটার দেখিবার সুযোগ ছিল না।

আমরা তখন মালিটোলা রাজচন্দ্র হিন্দুহোষ্টেলে থাকিতাম। আমাদের সে সময়ে হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ঢাকা কলেজের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দে। বিনোদ বাবু নিশ্চয়ই এতদিন আর বাঁচিয়া নাই। তাঁহার বাড়ী কৃষ্ণনগরে ছিল বলিয়া মনে পড়ে। বিনোদ বাবু কড়া লোক ছিলেন। হোষ্টেল হইতে রাত্রি আটটার পর কাহারও বাহিরে যাইবার হুকুম ছিল না। কিন্তু হোষ্টেলে এমন দুই একজন সাহসী ছাত্রও ছিলেন যে তাঁহারা কলিকাতা হইতে ষ্টার থিয়েটার আসিয়াছে অথচ তাহা দেখিতে পাইবেন না, তাহা কি হয়? তাঁহারা সন্ধ্যা ৬॥০টায় ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় দেখিতেন, বিকেলে বেড়াইতে বাহির হইয়া থিয়েটার দেখিয়া অবশেষে দেওয়াল টপ্‌কাইয়া এবং সেকালের নগরবাসী নামক দারোয়ানের সহযোগীতায় গেটের কপাটের মধ্যস্থ ছোট কপাটটির মধ্য দিয়া হোষ্টেলে প্রবেশ করিতেন। এই অভিনয় দেখিবার মধ্যে প্রধান ছিলেন—চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রকাশ বাবু নামে একজন ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্র। চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখিয়া আসিয়া আমাদের ছাত্রদের নিকট তাঁহারা লরেন্স ফষ্টারের ভূমিকা প্রভৃতি আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার বক্তৃতায় অনেকেই থিয়েটার দেখিবার জন্য প্রলুব্ধ হন। একদিন বেলা সাড়ে চারিটা কি পাঁচটা হইতে অভিনয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় চিন্তাহরণ বাবুর সহযোগীতায় আমি "চৈতন্যলীলা" ও "রাজাবাহাদুর" অভিনয় দেখিয়াছিলাম।

একবার কোনও কার্য্যোপলক্ষে জলপাইগুড়ি গিয়াছিলাম, সেই স্থানে বহুকাল পরে চিন্তাহরণ বাবুর সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে কাজ করিতেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। চিন্তাহরণ বাবু জলপাইগুড়ি আর্য্যনাট্য সমাজের একজন স্রষ্টা। এই সেদিনও অভিনয় করিয়াছেন। এই পক্ককেশ বৃদ্ধ সেকালের ঢাকার রঙ্গালয়ের অনেক সংবাদ রাখেন। তবে দেখিলাম স্মৃতিশক্তি তাঁহার অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। বৃদ্ধ চিন্তাহরণ বাবুর সহিত দেখা হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম। গিরিশ বাবুর নাটকের সহিত সেই আমার প্রথম পরিচয়। "চৈতন্যলীলার" চৈতন্যের অভিনয়, জগাই-মাধাই, ও নাটকস্থিত মনোরম সঙ্গীতগুলি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিছুদিন আমাদের হোষ্টেলের অনেক বয়স্ক ছাত্রের মুখেই

শুনিতে পাইতাম, "কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।' কিংবা "এল কৃষ্ণ এল অই বাজেলো বাঁশরী" অথবা—

'রাই কালো ভালবাসে না,
কালো দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন আসে না!' ইত্যাদি।

আমাদের এক বন্ধু ছিলেন তাঁহার নাম ছিল প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ বাবু এখন কোথায় আছেন জানি না। তিনি অতি সুন্দর গাহিতে পারিতেন। এমন কি বিনোদ বাবুর ন্যায় নীরস প্রকৃতির লোকও প্রমথের মুখে গান শুনিতেন। সে সময়ে গিরিশ বাবুর নাম আমাদের তেমন ভাবে জানা ছিল না। আমার সেই তরুণ মনে তাঁহার নাটকের প্রথম অভিনয় দর্শনেই যে আনন্দ হইয়াছিল, আজিও বিস্মৃত হই নাই।

ঢাকার নাট্যশালার ইতিহাস যদি কখনও লিখিত হয়, তবে স্বর্গত রাখালচন্দ্র বসাকের নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। রাখাল বাবু নবাবপুরের বসাক পরিবারের মধ্যে একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মনে ও প্রাণে সম্পূর্ণভাবে নাট্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন, ঢাকার "ক্রাউন থিয়েটার" তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ও অর্থব্যয়ে পরিচালিত হইত। নাটক করিতে যাইয়া তিনি শেষ জীবনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

রাখাল বাবুর ক্রাউন থিয়েটার সেকালের ঢাকা কলেজের কাছ হইতে অবশেষে ইসলামপুরে স্থানান্তরিত হয়। সে সময়ে সম্ভবতঃ ১৯০০ কি ১৯০১ সালে কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী ও কয়েকজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে লইয়া যাইয়া রাখাল বাবু ক্রাউন থিয়েটারের উন্নতি বিধান করিতে যত্নবান হন। অর্দ্ধেন্দু বাবুর ঢাকা যাওয়ার পূর্ব্বে ক্রাউনে রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করিয়া বিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু, প্রিয়নাথ ঘোষ, অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত প্রভৃতি সেখানে "কপালকুণ্ডলা" ও "বিষাদ" অভিনয় করেন। আমি এ সময়ে অনেকটা নাট্যামোদী হইয়া উঠিয়াছিলাম, কাজেই একদিন 'বিষাদ' অভিনয় দেখিয়াছিলাম। আমি হোষ্টেলের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া "কপালকুণ্ডলা"র অভিনয় দেখিতে পারি নাই। সে সাহস ছিল চিন্তাহরণ বাবুর। একবার বিনোদ বাবুর নিকট ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। লাফাইয়া পড়িবার শব্দে বিনোদ বাবু সচকিত ভাবে দারোয়ান, দারোয়ান, বলিয়া চীৎকার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাহরণবাবু কৃত দুই বিড়ালের ঝগড়ার অভিনয় শুনিয়া বৃদ্ধ বিনোদ বাবু চিন্তাহরণ বাবুকে আর ধরিতে পারেন নাই। চিন্তাহরণ বাবুর এসব কথা এখনও বেশ মনে আছে।

আমার মনে পড়ে "বিষাদ" নাটকের ন্যায় সুন্দর অভিনয় কখনও দেখি নাই। 'বিষাদ' নাটক আজকাল আর অভিনয় হয় না। কেন হয় না জানি না, বোধ হয় মানুষের রুচি ও প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে বলিয়া। প্রিয়নাথবাবু অলকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি ছিলেন যুবক—সেই মধুর কণ্ঠস্বর, বিষাদের মৃত্যুতে করুণ হাহাকার, আজিও আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। বিষাদের বা রাণী সরস্বতীর অভিনয় যে অভিনেত্রী করিয়াছিলেন, তাহার সুন্দর সুস্পষ্ট উচ্চারণ, ভাব বিকাশ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। উজ্জ্বলার ভূমিকায় সুকুমারী দত্ত অতি চমৎকার অভিনয় করেন। তাঁহার সেই সুমধুর সঙ্গীত,

"হেরি চম্পক কলি পড়ে ঢলি ঢলি
আমা বিনা সেকি জানে!
চাঁদ নিরখি ভাসে দু'টি আঁখি
ফিরে ফিরে চাই
চাঁদেরি পানে॥"

এখনও যেন শুনিতে পাই। এই 'বিষাদ' অভিনয় দেখিয়া গিরিশবাবু যে কতবড় শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও চরিত্রস্রষ্ঠা ছিলেন তাহা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। সেই একবার মাত্র দেখিয়াই আমার উক্ত নাটকের অনেক অংশ মনে রহিয়া গিয়াছে। সেদিন সে অভিনয় দেখিতে ঢাকা কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয়কেও দেখিয়াছিলাম। সত্যেন্দ্রবাবু তখন যুবক, কিন্তু বেশ নাট্যামোদী ছিলেন।

অর্দ্ধেন্দুবাবু ঢাকাতে আসিয়া 'মুকুল-মুঞ্জরা' অভিনয় করেন। তখন ক্রাউন থিয়েটার ইসলামপুরে উঠিয়া আসিয়াছে। সম্ভবতঃ ১৯০১ সালে অর্দ্ধেন্দুবাবু ঢাকা যান। কেননা সে বৎসর আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলাম। পরীক্ষার পরে বাড়ী যাওয়ার পূর্ব্বে 'মুকুল-মুঞ্জরা' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম।

'মুকুল-মুঞ্জরা' অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব কল্পনাশক্তি,

চরিত্র সৃষ্টি এবং কবিত্ব পূর্ণভাবে অনুভব করি। নাটকের আখ্যানভাগও যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য একান্ত উপভোগ্য। সেদিন 'মুকুল-মুঞ্জরায়' বরুণচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর আর মুকুলের ভূমিকা লইয়াছিলেন জীবনচন্দ্র কর্ম্মকার নামে একটি যুবক। তারা, মুঞ্জরা, ভজনরাম প্রভৃতির ভূমিকা কে কে গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর বরুণচন্দ্রের যে অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহার সেই হাব ভাব-ভঙ্গী বাক্‌বিন্যাস ও চাহনি আমি ভুলিতে পারিব না। দি মিনার্ভা থিয়েটারে যখন 'মুকুল-মুঞ্জরা' প্রথম অভিনীত হয়, তখন অর্দ্ধেন্দুবাবুই বরুণচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কিংবা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবিষয়ে সঠিক খবর বলিতে পারেন। আমার মনে পড়ে অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে যুবরাজ চন্দ্রধ্বজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ঢাকার সুপরিচিত অভিনেতা ব্রজেন্দ্রকুমার বসাক। ব্রজেন্দ্রবাবু লায়লা মজনুতে 'মজনুর' ভূমিকায়ও বিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আমি 'মুকুল-মুঞ্জরা' বই একখানি সংগ্রহ করিয়া অবসর সময়ে উহার অনেক অংশই মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, এবং আমাদের গ্রামে উহা অভিনয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই।

আর সেই সময়েই ঢাকা ক্রাউন থিয়েটারেই গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় দেখি। যোগেশের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর। এই ভাবে আমার নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের এক একটি প্রসিদ্ধ নাটকের সহিত পরিচয় হইতে থাকে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁহারা অভিনয় করেন তাঁহাদের কয়েক জনের নাম আমার মনে আছে। যোগেশ—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী, রমেশ—অতুলচন্দ্র হালদার, সুরেশ—জীবনচন্দ্র কর্ম্মকার, মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া—চুনীলাল কর্ম্মকার, শিবনাথ—ননী বাগচী। ইনি পরে ঢাকার রঙ্গালয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় সুনাম অর্জ্জন করেন। বিশেষ করিয়া গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজের ভূমিকায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ঢাকার রঙ্গালয় দুইটির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার বাড়ী ছিল রাজসাহী জেলায়। সাহেবের অভিনয়েও তাঁহার কৃতিত্ব ছিল দেখিয়া ঢাকার লোকে তাঁহাকে 'বাগচী সাহেব' বলিত।

এইবার সেদিনকার সাক্ষাৎকারের কথা বলিতেছি। গিরিশবাবুকে আমি বলিলাম যে আমি আপনার যে কয়েকখানি নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি, সে সব নাটকই আমার মনের মধ্যে আপনার নাটকীয় চরিত্রের ছাপ পড়িয়াছে—বিশেষ করিয়া, 'মুকুল-মুঞ্জরা' 'বিষাদ' ও 'প্রফুল্ল' নাটকের।

গিরিশবাবু বলিলেন, "'মুকুল-মুঞ্জরা' তোমার ভাল লাগল কেন?"

আমি বলিলাম, "উহাতে বেশ Romance আছে।"

গিরিশবাবু বলিলেন, "উঃ, তাই।"

আমি বলিলাম, "'মুকুল-মুঞ্জরার' আখ্যানভাগ যেমন মনোরম, তেমনি উহা কবিত্ব সম্পদে সমৃদ্ধ। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে আমি 'মুকুল-মুঞ্জরার' দুই একটি অংশ আবৃত্তি করিয়া আপনাকে শুনাইতে চাই।"

গিরিশবাবু বলিলেন, "তুমি স্বচ্ছন্দে বল।"

আমি তখন যুবরাজ চন্দ্রধ্বজ তারাকে রাজা জয়ধ্বজের নিকট লইয়া গিয়া বাক্‌হীনা মনে করিয়া যে উক্তি গ্রহণ করেন, তাহা আবৃত্তি করিলাম।

"হে রাজন্! নেহার বদন সরলতা ময়;
যদি রসনায় নাহি ধরে ভাষ,
হৃদিভাব সুপ্রকাশ কমল-নয়নে!
যেন ভরি মিথ্যায় সংসার কৃশোদরী
আবদ্ধ ক'রেছে দুটি ওষ্ঠ কিশলয়।
হের গণ্ড গোলাপ নিচয় পরিচয়
করিছে প্রদান রমণীর সহজাত
লাজ নম্রমুখী হয়ে মৃত্তিকায় চায়।
জানায় রাজায়,—নাহি স্থল ত্রিভুবনে;
আমি অভাগিনী; রুক্ষকেশে আচ্ছাদিত কায়,
যেন শৈবাল-বেষ্টিত কমলিনী.

তারপর যুবরাজ ভগিনী মুঞ্জরার নিকট মূক তরুণী তারার কথা বলিতে যাইয়া বলিতেছেন:

হের বামা নিরুপমা! মদন-বিরহে
রতি যেন ধরাতলে। বিধাতার ছলে

বাক্ শক্তিহীন ! : সিংহাসন সুশোভন
হয় যার রূপে, হের দশা তা'র ; পথে পথে
ভ্রমে অনাথিনী। চিত্রকর অতি
স্বভাবে নিপুণ ; কীট কুসুম মাঝারে,
কলঙ্ক চন্দ্রের হৃদে যার কল্পনায়,
সে বিধি কঠিন প্রাণে গড়েছে বালায় !

গিরিশবাবু আমার আবৃত্তি শুনিয়া বলিলেন, "তুমি ত' বেশ বল। দেখ, আমি 'মুকুল-মুঞ্জরা' যাকে আমাদের দেশের অলঙ্কারিকদের মতে আদিরসাত্মক নাটক বলে তাই লিখেছিলাম। এবং সে ভাবেই মুকুল, মুঞ্জরা, তারা, চন্দ্রধ্বজ এঁকেছিলাম। কিন্তু বইখানা লোকে তেমন নিলে না। জান ত' থিয়েটার চালানো, অনেক সময় Drama-র শ্রেষ্ঠত্বের দিক্ দিয়ে যাচাই হয় না—পয়সা কেমন দেয় সেটাই হচ্ছে main problem, তাই মুকুল-মুঞ্জরা চললো না।"

আমি বলিলাম, "মুকুল-মুঞ্জরা" নাটকখানিকে একখানি গীতি-কাব্য বললে অত্যুক্তি হয় না। কি সুন্দর dialogue অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ।"

গিরিশবাবু বলিলেন, "দেখ, নাটক দেখে কারা ? নাটক দেখে বুঝতে চায় কয়জন ? আমাদের দেশে খুব High class audience কোথায় ? একটু চটুল নাচ দেখতেই তারা চায়। জান আমরা সব জিনিষেরই নিন্দা করতে জানি, মুখ ফুটে প্রশংসা করতে আমরা জানি না, মন এমনি ছোট হয়ে গেছে আমাদের। তোমার 'মুকুল-মুঞ্জরা' ভাল লেগেছে শুনে আমি খুসী হয়েছি। আমিও একটা নূতন ভাব নিয়ে বইখানি লিখেছিলাম। অভিনয়ও খুব ভাল হয়েছিল—তবে public নিলে না।" এই বলিয়া একটু হাসিলেন।

আমার একটু সাহস হইয়াছিল তাঁহার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে, তাই বলিতে লাগিলাম,

"ভালবাসা
লতায়, লতায়, পাখী গায় ভালবাসা-
গান ; ভালবেসে দোলে ফুল, ভালবাসা
ধীর সমীরণে, নাহি আর ভালবাসা
বিনে ; সে আমার, সে আমার, আমি তার,
ভালবাসা পরিপূর্ণ জগৎ সংসার।"

তারপর বলিলাম, "আপনার এ কয়টি লাইন আমি সর্ব্বদা আওড়াই—

"আশা মায়াবিনী ! কেন শুনি সে মোহিনী
বাণী, আসে ভাসে প্রাণ আশায় পাগল ?
সকলই গিয়াছে আশা র'য়েছে কেবল।
উপহাস করে আশা তবু তার দাসী,
আশায় যাতনা তবু আশা ভালবাসি।"

গিরিশবাবু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমি দেখছি তুমি 'মুকুল-মুঞ্জরা' বেশ মন দিয়ে পড়েছ। আমি ভাবি, এদেশে নাটক কেউ পড়ে না, দেখছি তুমি শুধু মন দিয়ে পড় নি মনে গেঁথেও রেখেছ।"

আমি আনন্দিত হইয়া বলিলাম, "'মুকুল-মুঞ্জরা' আবার অভিনয় করেন না কেন ?"

গিরিশবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যুগধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ আছে। এখন দেশে যে প্রবল দেশ-হিতৈষণার বন্যা ছুটে আস্ছে আমাদের রঙ্গালয়কেও সেই ভাবে টেনে নিতে হবে। আমার মনে হচ্ছে নাটকের ভিতর দিয়ে দেশ-হিতৈষণা preach করি। রঙ্গালয়কে powerful করবার এই একটা মস্ত সুযোগ। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস পড়লেই একটা বিশেষ সত্য দেখতে পাবে—রঙ্গালয় কতখানি সাহায্য করেছে দেশের লোকদের প্রাণে একটা নূতন প্রেরণা জাগাতে। আমার ইচ্ছা আমাদের বাঙ্গালার, ভারতের এমন কতকগুলি মহাপুরুষের চরিত্র নিয়ে নাটক লিখি যে নাটক পড়ে, যে নাটকের অভিনয় দেখে, মানুষ সত্যিকার দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। যে জাতি আপনার ধর্ম্ম, জাতি, মানুষ ও মাটীকে ভালবাসতে শেখেনি, সে কি করে বড় কাজ করবে। আমার মনে হচ্ছে—রঙ্গালয়কে নূতন করে গড়ে, জাতির কাছে তার যে একটা খুব বড় স্থান আছে তা বোঝাবার সুযোগ এবার বিধাতা এনে দিয়েছেন। আমাদের এই সুযোগকে আঁকড়ে ধরতে হবে। This is my idea."

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশবাবুর মুখে একটা অপূর্ব্ব উত্তেজনার ভাব দেখিয়াছিলাম।

গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন, "জান, আমরা মরে যাব, কিন্তু এমন একদিন হয় ত' আসবে যখন লোকে জানবে—আমরা রঙ্গালয়ের ভিতর দিয়ে দেশের সব বিভেদ বুদ্ধি ভুলিয়ে,

হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সব জাতি এক করে—দেশের কল্যাণের জন্য কি করেছি। জান—গিরিশ ঘোষকে যদি কেউ বলে, মশাই, সভায় এসে বক্তৃতা করুন, সভাপতি হ'ন। আমি বলবো—No—Never. আমি ওসব বক্তৃতার হাঙ্গামা ভালবাসি না। কাজ চাই। Not in words but in deeds."

সকলেই জানেন যে গিরিশবাবু তাঁহার এই মানোভাব সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন সিরাজৌদ্দৌলা (১৯০৫ খ্রীঃ), মীরকাশিম (১৯০৬), ছত্রপতি (১৯০৭) প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দ্বারা।

বিধুমৌলি বাগচী মহাশয় আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'অনেক বেলা হল এইবার চলুন।'

সত্যিই ত' বেলা বারোটা বাজিয়াছে।

আমরা নমস্কার করিয়া বলিলাম, "আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। হয় ত' এ সময়ে একটা নাটক লিখতেন।'

গিরিশবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ওসব কিছু নয়। দেখ, আমি কেন বিরক্ত হব বল ত'? তোমরা দশজন ভালবাস বলেই ত' আমার এখানে আসছো। পরমহংসদেব বলছেন—ওরে গিরিশ, লোকজন এলে কখনও যেন বিরক্ত হস্ নি। ঈশ্বরের বিভূতি যাঁর উপর বেশী, তাঁর কাছেই ত' লোকজন আসে। আসছে বুধবার বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অভিনয় হবে। আমি সাধক সাজব। যদি ইচ্ছে হয় থিয়েটারে যেও, তোমাদের দেখার ব্যবস্থা করে দেব।"

তাঁহার কাছে এতটা আশা করি নাই। তাই পরম প্রসন্ন মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বিধুমৌলিবাবুকে বলিলাম, "বিধুবাবু আপনি সত্য সত্যই একটা মানুষের মত মানুষের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন।"

বিধুবাবু হাসিয়া সুর ধরিলেন,—

"মরালগামিনী নিবিড় নিতম্বিনী…"

সম্বর' সম্বর' মহাকাল

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

ভার্য্যা কাঁদে অভিমানে, পুত্র কাঁদে স্তনদুগ্ধ বিনা,
ভয়ার্ত্ত জীবাত্মা কাঁদে, বহ্নিশিখা হেরি' বর্দ্ধমান্—
সমগ্র জগৎ কাঁদে অশরীরী প্রেতমূর্ত্তি হেরি'
সমুদ্র সৈকতে শোনো উত্তাল-তরঙ্গে ডাকে বান।

ক্ষান্ত কর' হে ভৈরব, রুদ্রলীলা অপূর্ব্ব ভীষণ,
অপরূপ নৃত্য তব সম্বর' সম্বর' মহাকাল।

ধূর্জ্জটীর স্কন্ধ পরে কে দিল রে আনি মৃতা সতী?
খসি' পড়ে নভস্তলে ঘূর্ণ্যমান্ দীর্ঘ জটাজাল।

ভীত নরনারী কাঁদে, বিকলাঙ্গ পঙ্গু স্তব্ধবাক্
ক্লীবতা জড়ত্ব আসি' আচ্ছন্ন করিছে দেহ মন;
মুক্তি দাও বিশ্বনাথ, শান্ত করো ঝঞ্ঝা, ভগবন্—
তোমার অভয়-কর পরশে জগৎ শান্তি পাক্।

শান্ত করো ক্ষুব্ধ আত্মা, ক্ষান্ত করো হিংসালোলুপতা
নির্ম্মেঘ আকাশ পুনঃ দিকে দিকে দিক্ প্রসন্নতা।

জটিল

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

ব্রজেন্দ্রনাথের এবার ওকালতি ছাড়িয়া অন্য কিছুর পথ অবলম্বন করিতে হইবে। পশার জমিতেছে না ওকালতিতে, ট্রামে চীপ মিড-ডে লাগিলে বাহির হয় কোর্টে বৌদির আঁচল হইতে তিনটা পয়সা লইয়া। বটতলায় ঘুরিয়া, বারলাইব্রেরীতে তাস খেলিয়া, বিকালে রোদ পড়িলে হাঁটিয়া হাঁটিয়া বাসায় ফিরিতে হয়। একদা কলেজে সিগারেটের অভ্যাসে সে পোক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বাধ্য হইয়া এখন খাঁকীতে নামিতে হইয়াছে। দেশের যা দিনকাল এই পৃথিবীব্যাপী ঘোর দুর্দ্দিন, এ সময় প্রত্যেক লোক মাত্রেরই দেশভক্ত হওয়া উচিত। অন্ততঃ বিলাতী সিগারেট বর্জ্জন করিয়া দেশীয় খাঁকীবর্ণ বিঁড়ি সে স্থান দখল করুক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্ধুমহলে এই কথা জাহির করিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু এই ব্রজেন্দ্রনাথকেই আমরা এক সময় বলিতে শুনিয়াছিলাম, দেশী মাল কেনা মানে পয়সাগুলো স্রেফ নষ্ট; ওতে না থাকে রূপ না গন্ধ, না কিছু। বিঁড়িটানা মানে হার্টকে নষ্ট করা।

বিবাহ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথের পরিবর্ত্তন হইয়াছে যথেষ্ট। দেশ-প্রেমিক হইয়া উঠিয়াছে পুরাদস্তুর। ইতিমধ্যে পিতৃদেব স্বর্গত হওয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পৈত্রিক ভিটাও ঋণদায়ে বিক্রীত হইয়া যাওয়ায় বেচারী আমাদের একেবারে পুরাদমে মিতব্যয়ী হইয়া উঠিয়াছে। মা নাই সংসারে, বিধবা ভ্রাতৃ-বধূ আছেন গিন্নীর মত মাথাধরা হইয়া। মহা উৎসাহে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি ছোট খাটো দেখিয়া বাসা ভাড়া করিয়া রহিয়াছে। সংসারে মন আসিয়াছে বটে, কিন্তু অর্থোপার্জ্জন নাই বলিলেই চলে। বৌদির যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিতধন আছে। তাহা ভাঙাইয়াই এতদিন চলিয়াছিল, এখন আর চলিবার গতি নাই; বহুদিনকার চলমানতার জন্যই এখন টুক টুক করিয়া চলিয়া থামিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্রজেন্দ্রের ভাবনা ধরিয়া গেল।

বিবাহ না করিলেই হইত। বৌদিরই দোষ। বধূকে বাপের বাড়ী না হয় পাঠানো গেল, কিন্তু বৌদির কি ব্যবস্থা করা যায়? কাশীতে ধাপ্পা দিয়া সরাইয়া নিজে সাধু সন্ন্যাসী বনিয়া গেলে চলিতে পারে বোধ হয়। কিন্তু সে কেমন ধারা? বধূ প্রমদাসুন্দরী ভাবিবে কি? এ ক'দিন তাহার শক্তি সম্বন্ধে বড় বড় কথা না সে শুনাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু, কি করা যায়? বৌদিকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে বৌদি বলিলেন, "তাই দাও ব্রজেন, কাশীতেই পাঠিয়ে দাও আমাকে। অনেক দিন ধরে আমারও ইচ্ছে হচ্ছে। আর বাপু সহ্য হয় না। বৌকে নিয়ে তুমি খুব সংসার কর। তোমাদেব সংসারে কেন আমি কাঁটা হব?"

সুবিধা কিছুই হইল না, বৌদি মনে করিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনাথ তাহাকে কৌশলে তাড়াইয়া দিতে চায়, এত দিন তাহার অর্থে সংসার চলিয়াছে, আজ অর্থ ফুরাইয়াছে, তাই ও সরিয়া যাইতে বলিল। বৌদি ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা ঠুকিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমদার কাছে ছুটিল।

প্রমদা রান্না করিতেছিল। মুখখানি ক্ষুব্ধ। প্রতিবেশী হীরু চক্রবর্ত্তীব পুত্র-বধূর নূতন গহনা হইয়াছে; আজ সকালে আসিয়া দেখাইয়া গেল, দেড় ভরি সোনার হার এবং একটি সুন্দর নাকছাবি। প্রমদার মনে মনে স্বামীর প্রতি রাগ হইল। এমন অক্ষম তাহার স্বামী, সামান্য একটি নাকছাবি নির্ম্মাণ করাইয়া দিবার সামর্থ্য নাই।

ব্রজেন্দ্রনাথ বধূকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। ব্রজেন্দ্রনাথের এই একটা মহাদোষ। বিবাহ করা অবধি সে নিজেও লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে বধূকে দেখিবামাত্রই ফিক্ করিয়া হাসি বাহির হইয়া পড়ে। প্রমদা ইহাতে রাগ করিয়াছে বহুবার; কিন্তু রাগিলে কি হইবে, ব্রজেন্দ্রের হাসি তাহাতে কমে নাই; সচকিত কল্ কল্ হইয়াই উঠিয়াছে ববং। প্রমদার ইদানীং সহ্য হইয়া গিয়াছিল কতকটা। আজ কিন্তু প্রমদা জ্বলিয়া উঠিল, "কি, বিঁড়ির আগুন দিতে হবে উনুন থেকে?"

আর এক দফা হাসিয়া ব্রজেন্দ্র বলিল, "না, মানে; বৌদিকে বললুম এক, বৌদি ভাবলেন অন্য। তুমি একটু বুঝিয়ে বোলো।"

প্রমদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "পারবো না আমি টাকা চাইতে, লজ্জা করে না; বিধবা মানুষ তিনি। সংসার তোমার, উপায়ের সামর্থ্য নেই ত' বিয়ে করেছিলে কেন? কেবল টাকা চাইবো আমি দিদির কাছে, না? তা পারবো না বলে দিচ্ছি।"

নাক নাড়া খাইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ সরিয়া আসিল। বড় দুঃখ বাজিল মনে। তিনমাস কোর্টে ঘুরিতেছে, তিন পয়সা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারে নাই। আগে বরং টিউশনী করিয়া গোটা কুড়ি টাকা আনিত ঘরে। কোর্টে ঢুকিয়া সে সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়াছিল। সে যা হোক, বর্ত্তমান সমস্যার কোন হদিস মিলিল না। বৌদি ভুল বুঝিয়া কি ভাবিতেছেন, তাহার উপর পত্নীও বাম হইল, ভুল বুঝিয়া যা নয় তাই শুনাইয়া দিল। ব্রজেন্দ্রনাথের এতক্ষণে মনে পড়িল কোন কবি না লেখক বলিয়াছেন, এ পৃথিবী ভুলে ভরা, পৃথিবী ভুলেরই বীজ শুধু উপ্ত হইতেছে অহর্নিশি।

সেদিন আহার করিবার সময়। পত্নী জ্বলিতেছিল গহনা সংক্রান্ত ব্যাপারের হিংসার আগুনে। সে স্বামীর উপর বাক্য বর্ষণ করিল, "ভাত-গিলতে লজ্জা করে না তোমার? উনুনের ছাইও যে জুটবে না এবারে। দিদিকে তুমি বলেছ, চলে যেতে; টাকা ফুরিয়েছে বলে, এমন কথা বললে কি করে? গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে পার না।"

প্রমদার প্রতি চাহিয়া সেদিনও ব্রজেন্দ্রনাথের হাসি আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু মনটা বড় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। পত্নীর কোন দোষ নাই। স্ত্রীর হাতে দু'চারিটা পয়সা না দিলে তাহারা মানিবে কেন। আধুনিক কালের স্ত্রী। বাড়ীতে কাঁচের চুড়িওয়ালা আসিবে দুপুরে; চীনার সিঁদুর, সাবান তরল আলতা, শান্তিপুরের কাপড়, ব্লাউস বুনিবার ছিট, এই সকলের দাম কিছু কিছু তাহাদের দিতে হয়। নইলে স্বামীকে তাহারা মানিবে কেন? পয়সার সঙ্গে স্বামীত্বের সংযোগ আছে বৈ কি। ব্রজেন্দ্রনাথ বোঝে সব, কিন্তু উপায়-বিহীন বলিয়াই না তাহার এই দুর্দ্দশা। মনে বড় খেদ হইল। কিন্তু স্বামী হিসাবে কি প্রমদার নিকট হইতে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রাপ্য কিছু নাই? একদিন এই প্রমদাই কত হাসিত, মৃদু গান করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথকে জয় করিবার চেষ্টা করিত; আজ সে সব কথা পথের ধূলায় মিলাইয়া গিয়াছে, সত্য স্বপ্নের পর্য্যায়ে নামিয়াছে। অর্থের সঙ্গে আধুনিক জগতের মানুষের মনের বৃত্তিগুলাও মিশিয়া গিয়াছে। ছোট একটি ছেলেকে একটি পয়সা দাও, হাসিবে; আনি একটি দাও, কোলে আসিতে চাহিবে; আর একটি টাকা দাও, তোমাকে নিয়া মাতিয়া থাকিবে সর্ব্বদা, মারিলে কাঁদিবে না, বরং হাসিবে। আর প্রমদা ত' বয়স্ক। এই প্রমদাই ইয়ার্কী মারিত কত। বলিত, "তোমার আর কেস জুটেছে! দেখো, সারা জীবনে একটার বেশী জুটবেও না।”

ব্রজেন্দ্রের সেই হাসি, বলিত, "তার মানে?"

দুই চোখে দুষ্ট হাসি আনিয়া প্রমদা ব্রজেন্দ্রের কথার জবাব দিত, "এই জন্যেই তোমার কেস জোটে না মোটে। তুমি একটুও চালাক নও। এই সামান্য কথাটার মানে বুঝলে না?"

ব্রজেন্দ্রনাথ তথাপি অর্থ আহরণ করিতে পারিল না। আরও হেঁয়ালীর মধ্যে পড়িয়া গেল যেন। বোকা বলিয়া অখ্যাতি তাহার পাঠশালার যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে। পত্নী এতদিন পরে আবিষ্কার করিবে তাহার বুদ্ধি কম রীতিমত ভাবে, তাহাতে বিস্ময়ের এবং লজ্জার কিছু নাই। সে অল্প হাসিয়া জিজ্ঞাসু চোখে চাহিল প্রমদার দিকে।

প্রমদা কহিল, "মানে আমি তোমার মক্কেল হব।"

এইবার ব্রজেন্দ্রনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "বেশ, বেশ, মিথ্যে যা শেখাবো, তাই বলতে হবে কিন্তু।

প্রমদা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া কহিল, "না, না, হাসি নয়। সত্যি, তোমার বিরুদ্ধে খোর-পোষের মামলা আনবার সময় আমার ত' একজন উকীল লাগবেই।"

এবার স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই হাসিবার পালা। কিন্তু সে-সব দিন চলিয়া গিয়াছে। বিবাহিত জীবনের প্রপাঠ শেষ হইয়া অন্য অধ্যায় সুরু হইয়াছে। আজ যা প্রমদা শুনাইয়া দিয়াছে, এর বিরুদ্ধে একটা কিছু করা দরকার। পয়সাই না হয় উপার্জ্জন করিতে পারে না ব্রজেন্দ্রনাথ, কিন্তু পৌরুষত্ব বিহীন নয় সে, অন্ততঃ সত্যকার রাগ করিতে না পারুক, রাগ দেখাইতে পারা চাই নিশ্চয়।

আহার অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়াই ব্রজেন্দ্রনাথ উঠিয়া গেল।

প্রমদা বুঝুক, ব্রজেন্দ্রনাথ চটিয়াছে। উপার্জ্জনক্ষম নয় বলিয়া যে সে একেবারে পুরুষ মানুষ নয়, তাহা নহে। শুধু এই টুকুই প্রমদাকে বুঝাইবে। হাত মুখ ধুইয়া পান এবং পয়সা না লইয়াই ব্রজেন্দ্রনাথ কোর্টের পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া গেল।

বৌদি প্রমদার নিকট জানিতে চাহিলেন কি হইয়াছে। প্রমদা কহিল, "এমন কিছু নয়। আপনাকে কি সব বলেছে, তাই বকেছিলুম একটু। দিন দিন যত বুড়ো হচ্ছে, বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাচ্ছে।"

বৈশাখ মাসের চড়া রৌদ্র। বাড়ী হইতে আলিপুর কোর্ট আড়াই মাইল পথ। হাঁটিয়া যাইতে হইবে। তবে একটা সুবিধা আছে, আজ অনেক সকাল সকাল। অন্তদিন চীপ মিড-ডে লাগিলে বাড়ী হইতে বাহির হয়; এখন সবে দশটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট। ব্রজেন্দ্রনাথ ভাবিতেছে যদি একটা কেস মিলিয়া যায় আজ, সামান্ত কেস; নিতান্ত কেস না জোটে, যদি জামিনও কাহাকে করাইতে পারা যায়, তাহা হইলেও মন্দ নয়। চারিটা টাকা মিলিলেই হইবে। ধানবাদে সোজা চলিয়া যাইবে পিসীমার বাড়ী; আদর করিয়া রাখিবেন তিনি। সাতটা পাঁচটা নয়, একটি ভাইপো। তিনি ত' প্রত্যেক পত্রেই যাইতে আহ্বান জানান।

হাজরা রোড়ের মোড়ের নিকট বন্ধু সুরেশের সঙ্গে দেখা। "কি রে ব্যাপার কি? দেখি, একটা সিগারেট দে," বলিয়া সুরেশ ব্রজেনের কাঁধে হাত রাখিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ নীরস কণ্ঠে কহিল, "সিগারেট নেই, বিঁড়ি আছে।"

সুরেশ আশ্চর্য্য হইল।

সাংসারিক নানা কথার পরে ব্রজেন্দ্রনাথ দুঃখের কথা খুলিয়া বলিল। বলিল, "একটাও কেস-টেস পাচ্ছি না, সংসার একেবারে অচল হয়ে গেছে, ভাই। তোকে বলা রইল, কেস-টেস হাতে এলে আমাকে রেফার করিস। আর বিশেষ সময়ও নেই, চললুম। কোর্টের বেলা হয়ে যাচ্ছে। এতটা পথ আবার যেতে ত' হবে।"

"কেন ট্রামে যাবি না?"

ব্রজেন্দ্রনাথ ম্লান ভাবে হাসিল, "এতক্ষণে তবে কি ছাই শুনলি? বললুম যে অচল।"

সুরেশ কহিল, "এক কাজ কর ব্রজেন, দেবেন বাবুর সঙ্গে কোর্টে তুই আজ একবার দেখা করিস; আমি জানি, তাঁর আজ বহু কেস, অন্ত একজন য়্যাসিষ্ট্যান্ট দরকার হবে।"

আচ্ছা বলিয়া ব্রজেন্দ্র কোর্টের পথ ধরিল। সুরেশের মাথাটা খারাপ হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়ই, নইলে দেবেনের সহকারী হইতে বলে। দেবেন, মানে প্রমদার বাল্য সখা। প্রমদাকে বিবাহ করিবার পথে মহা অন্তরায় হইয়াছিল না? সর্ব্ববিষয়েই প্রতিদ্বন্দী তাহার। প্রমদাকে সে ভালবাসিত। সেখানে ব্রজেন্দ্র জয়ী হইতে পারিয়াছে বলিয়া জয়ের গর্ব্বে মহীয়ান ভাব জাগে মনের মধ্যে। আর ব্রজেন্দ্রনাথ ওকালতিতেও দেবেনকে হারাইয়া দিবে নিশ্চয়ই—মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছে। আর সুরেশ বলে তাহারই সহকারী হইতে, মাথা নত করিয়া হার স্বীকার করা?

কোর্টে কিন্তু দেবেনই যাচিয়া ব্রজেনকে কাজ দিল; কহিল—"কোর্টে আসার পথে সুরেশ বললে, তোমার আজ কেস-টেস বিশেষ নেই, তা আমার সঙ্গে একবার চল না। এস, ডিও-র ঘরে আজ ফাইন্যাল হিয়ারিং আছে। শর্ট নোট নেবে; ফুল ফীজ্ দেবে ক্লায়েণ্ট।

ব্রজেন্দ্র রাজী হইয়া গেল। বার টাকা ফিস্ হাঁকিয়া বসিবে আজ। ধানবাদ যাইবার খরচ মিলিয়া গেল। ব্রজেন্দ্রনাথ জানে ভগবান আছেনই। তবে বার্দ্ধক্যহেতু তিনি আংশিকভাবে কালা হইয়া পড়িয়াছেন, তাই সকল সময় শুনিতে পান না। পিসীমার একটি ভাল কাপড় কিনিতে হইবে, পিসেমহাশয়ের জন্ত ভাল খাবার আর জলযোগের দুই এক হাঁড়ি। বেশ জব্দ করা যাইবে প্রমদাকে। বৌদিকে গোপনে একটি সংবাদ দিতে পারিলেই—ব্যাস।

আট টাকা হাতে আসিল অবশেষে। জীবনে এই প্রথম। শত্রু হইলেও দেবেনকে ধন্তবাদ না দিয়া সে পারিল না। দেবেন বলিল, "তোমার মহা একটা দোষ, নূতন বেরোচ্ছি কোর্টে; কারুর আণ্ডারে কাজ করো; নইলে প্রস্‌পার করতে পারবে কেন?"

পূর্ব্বাপর ভুলিয়া ব্রজেনই বলিয়া ফেলিল, "মানে আমাকে তুমিই রাখো না কেন দেবেন, দেখলে কত সুইফ্‌টলি শর্ট

নোটস্ নিলাম, আর আমার রেডি উইট্ কি-রকম! মানে আমাকে স্কোপ দাও, আমি শাইন করবো।"

কাঁধ চাপড়াইয়া দেবেন 'তাই হবে' বলিয়া চলিয়া গেল। ব্রজেন্দ্র পথে বাহির হইয়া পড়িল। বেলা তখন দুইটা। পথে রৌদ্র, আগুনের হল্কা দিতেছে মাঝে মাঝে। হাজরা রোডের মোড়ে ধানবাদ যাইবার গাড়ী ক'টায় দেখিতে হইবে। লাষ্ট ট্রেণে চাপিলেই চলিবে। এ ধারেও বহু কাজ বাকী। কালীঘাটের কালীকে কিছু ঘুষ দিয়া আসিতে হইবে আট টাকা হইতে—অন্ততঃ সওয়া পাঁচ আনা। ভালো কাপড় কিনিতে হইবে পিসীমার জন্য, খাবার, নিজের জন্য টুথ ব্রাস, টুথ পেষ্ট, ব্লেড,—প্রমদার স্নো ফুরাইয়া গেছে—না প্রমদার কিছুই হইবে না। আর বাড়ীতে ত' সে যাইতেছে না।

পূজা দিয়া সে নিজে কিছু খাইয়া নিল পেট ভরিয়া, বাড়ীতে আজ খাওয়া হয় নাই ভাল করিয়া, ক্ষুধা পাইয়াছিল প্রচুর; এদিকে ধানবাদে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত কিছু খাওয়াও যাইবে না। ট্রেণের খাবার সব বাসী, নয় ত বাদাম তেলে ভাজা; ওসব লাইনে ব্রজেন্দ্রের সহ্য হয় না। রাত্রে আর একবার দ্বারিকের দোকান হইতে কিছু খাইয়া নিলেই চলিবে।

আচ্ছা প্রমদা কি ভাবিবে? সন্ধ্যায় নিত্যকার মত বাড়ী হাজির না হইলে মনে ভাবিবে কোথাও আড্ডা মারিতে গিয়াছে। মনে মনে বিরক্ত হইবে, মুখে কিছু বলিবে না, রাত্রি নয়টায় একটু ভাবিবে। দশটা বাজিয়া গেলে বৌদি জিজ্ঞাসা করিবেন,—"ব্রজেনের কি হল বল ত'? এখনও ফিরল না, না খেয়ে গেছে একে—"

প্রমদা মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া জবাব দিবে, "কি জানি দিদি, রাগ করে কোথায় যে গেল!" কিংবা হয় ত' দিদির কাছে মনের জোর দেখাইবার জন্য বলিবে—"কি আবার হবে, তেজ দেখিয়ে গেছে, একটু পরেই ঘুরে আসবেখ'ন।"

কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ ত' যাইবে না তখন! একটুখানি জ্বর নিয়া কোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিয়াছিল একদিন, তাহাতে প্রমদার ভাবনার অন্ত ছিল না; সাত দিন আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভালভাবে হয় নাই বেচারীর, আর না ফিরিলেই প্রমদা ত' দম ফাটিয়া মরিয়া যাইবে। মরিয়া অবশ্য যাইবে না, খুব কষ্ট হইবে কিন্তু। বেশ হইবে—স্বামীকে দুর্ব্বাক্য বলিবার ধৃষ্টতার শিক্ষা হইয়া যাক্ ভবিষ্যতের জন্য। জীবনের পটভূমিকায় একদা প্রমদাকে যে আসনে বসাইয়াছিল সে, আজ প্রমদা স্বেচ্ছায় সেখান হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথের দোষ নাই একটুকু।

জীবন ব্রজেন্দ্রনাথের একঘেয়ে লাগিতেছিল, ধানবাদে গিয়া মন্দ লাগিবে না, চারিদিকে খোলা জমি, দূরে দূরে পাহাড়, শীতল বাতাস, কয়লার খনি, সাঁওতালদের সারল্য, পিসীমার স্নেহ, সব কিছু মিলিয়া স্বর্গের আনন্দ মিলিয়া যাইতে পারে। অন্ততঃ সেখানে প্রমদার স্কুনি নাই, পাশের বাড়ীর কোন বধুর কি গহনা হইয়াছে বলিয়া অনুযোগও শুনতে হইবে না বারবার।

কাপড়ের দোকানে যাইবার আগে নিজের প্রয়োজনীয় প্রসাধনগুলি কিনিয়া লইতে দোষ কি! আর স্নো এক কৌটা কিনিলে চলিতেও পারে, পিসীমার ছোট মেয়ে নাই কি? আর নিজেও ত' সেখানে মাখিতে পারে—পাহাড়ী দেশ, মুখ হাত পা ফাটিলে।

সাবান, স্নো, ব্লেড, টুথব্রাস প্রভৃতি কিনিতেই বেলা পাঁচটা গেল; কাপড়ের দোকানের সামনে গিয়া শো-কেস দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথের মন একটু আর্দ্র হইল। পিসীমার জন্য শাড়ী কিনিবেন ত' ঠিকই, কিন্তু চুপি চুপি প্রমদাকে ঐ রকমের শাড়ী কিনিয়া দিলে ক্ষতি কি, চলিয়াই যখন যাইতেছে, আর ট্রেণের journey-র কথা বলা কী যায়, কোথা দিয়া ফস্ করিয়া কি হইয়া যাইতে পারে! তখন? সে বিবাহের পর হইতে তাহাকে ত' একখানিও কাপড় কেন, একটি রুমাল পর্য্যন্ত দিতে পারে নাই, ভবিষ্যতের জন্য সম্বন্ধ শেষ করিয়া দিবে সে কাপড়খানি দিয়া। আর প্রমদাকে কাপড় দিতে গেলেই বৌদির ভাল থানও একখানি কিনিতে হইবে। তবে আর পিসীমার কাপড় হয় না। তা না হইলে আর কি যায়? পূজার সময় ব্রজেন্দ্রনাথ পিসীমাকে কস্তা পাড় গরদের শাড়ী কিনিয়া দিবে মোটা দাম দিয়া; ব্রজেন্দ্রনাথ তাহাই করিল। বৌদির থান এবং প্রমদার ধূপছায়া শাড়ী কিনিয়া ফেলিল।

এই সব কেনা জিনিষ মিলিয়া ছোট খাট বেশ একটি

মোট হইয়া উঠিল। বড় একখানি তোয়ালে কিনিয়া সব বাঁধিল একত্রে, কেবল কালীমায়ের প্রসাদের সরাখানি তাহার বাম হস্তে রইল। বাড়ীতে হাঁটিয়া ফিরিবার সাধ্য নাই, রিক্সা ডাকিতে হইল একখানি, এই দ্যাখ্‌, মুদিয়ালী যেতে হবে জলদি যাবি। 'জী বাবু' বলিয়া রিক্সাওয়ালা ছুটিল; সময় হাতে আর বেশী নাই লাষ্ট ট্রেনটা এখনও পাইতে পারে, দশটা চুয়াল্লিশের গাড়ী, হাওড়া যাইতে বাসে এক ঘণ্টাই লাগুক। কিন্তু যদি প্রমদা স্ব-কৃত অপরাধের ক্ষমা চাহে, বৌদি হাত দুখানি ধরিয়া বকিয়া দেয় আচ্ছা করিয়া? এই সব ভাবিয়াই সে অগ্রিম টিকিট ক্রয় করিয়া বসে নাই। ভবিষ্যত ভাবিবার বুদ্ধি তার তবে নাকি নাই? ব্রজেন্দ্রনাথ মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করিল।

বাড়ীতে কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। প্রমদা ঘরে শুইয়া শুইয়া বটতলার নভেল পড়িতেছে, বৌদি কি যেন সেলাই করিতেছেন। এই ত' কতক্ষণ মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে—ইহার মধ্যেই প্রমদা শুইয়া পড়িল যে। ব্রজেন্দ্রনাথকে নিজে গলা খাঁকারি দিয়া উপস্থিতি জানাইতে হইল, হাতে পোঁটলা, বৌদির কাছে সব জিনিষ-পত্র দেখাইয়া শাড়ী, স্নো আর তরল আলতার শিশি লইয়া সে প্রমদার কাছে গেল। প্রমদা ঈষৎ গম্ভীরস্বরে কহিল, "দেবেনদা এসেছিল, সব শুনেছি।"

ব্রজেন্দ্রনাথ যেন দোতলা বাস হইতে ঝুম করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, দেবেন আসিয়াছিল এখানে, কি প্রয়োজনে এবং কোন অধিকারে? মুখে বলিল, "তার মানে?"

প্রমদা কহিল, "তিনি তোমায় টাকা পাইয়ে দিয়েছেন দয়া করে।"

দয়া করিয়া? ব্রজেন্দ্রনাথ যে দেড় ঘণ্টা ধরিয়া শর্টনোট লইল তার বুঝি মূল্য নাই। সে চটিয়া গেল, দেবেনের উপর এবং পত্নীর উপরও। মিথ্যা করিয়া স্ত্রীলোকের নিকট আজে বাজে কথা বলিয়া সস্তা জোলো প্রশংসা লাভ করার অর্থ কি হইতে পারে? আর প্রমদাই বা কেমন, চট্‌ করিয়া বিশ্বাসও তাই করিয়া গেল! করিবেই ত' অন্য কেহ আর নয় ত', স্বয়ং দেবেন, তাহার সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা প্রমদার এখনও আছে। ব্রজেন্দ্রনাথের হাসি আসিতেছিল পত্নীকে দেখিয়া, তথাপি কিন্তু সে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়া কহিল, "তার কাজ যে দেড় ঘণ্টা ধরে করে দিলাম, সে বলে কি না দয়া করে? অল্‌ রাইট, আমি দেখাচ্ছি দেবেনকে, কালই এক নম্বর ঠুকে দেব। অনধিকার প্রবেশ করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতালাপ এবং আমার নামে নিন্দাবাদ। আর তোমাকেও বলি প্রমদা, যদি এখনও মোহ কাটাতে না পেরে থাক, তুমি নির্ব্বিবাদে আমার বাড়ী থেকে চলে যেতে পার।"

প্রমদা নির্ব্বিকারভাবে সহিয়া গেল, ব্রজেনের একটু মায়া হইল প্রমদার উপর। এমন কিছুই ব্যাপার নয়, যাহার জন্য প্রমদা এরূপ উগ্র তিরস্কার পাইতে পারে। কোথায় সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া আসিল ব্রজেন—একটু সেবা, একটু যত্নের পরিবর্ত্তে সে যত বাজে প্রসঙ্গের অবতারনাই বা করিল কেন? দশটা চুয়াল্লিশ মিনিটের গাড়ী মিলিবে নিশ্চয়ই কিন্তু গাড়ী ভাড়া কম পড়িবে কয়েক আনা পয়সা। কি আর করা যায়—উইদাউট টিকিটেই শেষের কয়েক মাইল ট্রাভেল করিতে হইবে। যাক, ব্রজেন্দ্রনাথ কহিল, "এই চললাম আমি বাড়ী থেকে।"

প্রমদা টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "তার আগে তুমি জেনে যাও আজ রাত্রেই আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে। ও-বাড়ীর ট্যাপাকে দিয়ে আমি আফিং আনিয়ে রেখেছি।"

ব্রজেন্দ্রনাথ সে কথায় কাণ দিল না। হন্‌ হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল বারান্দায়। সেখানে বৌদির সহিত দেখা। তিনি কোথাও যাইতেছেন বোধ হয়। ব্রজেনকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "চললি কোথায় ব্রজেন? সুরেশ এসেছিল, প্রমদাকে বলে গেল তুই দেবেনের সহকারী হয়ে কাজ কর না কেন, তাতে নাকি তোর সুবিধে হবে। বললে যে নূতন বেরিয়েই পসার হয় না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্যবোধ করিতে লাগিল, কহিল, "তবে যে শুনলাম দেবেন নিজে এসেছিল—"

বৌদি মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, "দূর পাগল, প্রমদা তোকে ক্ষেপিয়েছে। দেবেন ত' আমাদের বাড়ী আর আসে না।"

পয়লা এপ্রিলের দিনেও ব্রজেন্দ্রনাথকে এইরূপ বোকা বনিতে হইয়াছিল। অন্য কাহারও চিঠিকে দেবেনের পত্র

বলিয়া এক মহাসমস্যায় ফেলিয়াছিল। মার-ধোর ছাড়া আর সকল নির্য্যাতন সহিতে হইয়াছিল প্রমদাকে; আজ আদরে ঠকাইয়াছে কিন্তু বিনা দোষে ব্রজেন্দ্রনাথ যে ভাবে তাহাকে নির্য্যাতন করিয়াছে কথার বাণে, তাহাতে প্রমদা যদি তাহাকে মার্জ্জনা না করে? সে যদি সত্য সত্যই তাহার কথামত কাজ করিয়া বসে? না—ধানবাদ গিয়া কাজ নাই। সেখানে অন্যদিন গেলে চলিবে, কিন্তু আজিকার এই কালরাত্রি পোহাইবে কি করিয়া? সে ফিরিয়া গিয়া প্রমদার ঘরের দিকে গেল। কিন্তু ভিতর হইতে ঘরের দুয়ার বন্ধ। ব্রজেন্দ্রনাথ ডাকিল, "প্রমদা দরজা খোল, আমার বিশেষ দরকারী কাগজ ফেলে গেছি, কেসের নথিপত্র।"

ঘর অন্ধকার, দরজা বন্ধ, প্রমদার মনে কি আছে কে জানে? সংসারে একি বিপর্য্যয় আসিয়া ঢুকিল। জীবন কেমন স্বচ্ছ এবং সুন্দর ছিল, হঠাৎ বৈশাখের কালো মেঘ আসিয়া আকাশের প্রশান্তি বিনষ্ট করিয়া দিতেছে। কি যে করা যায়? দেবেনকে ডাকিয়া আনিয়া প্রমদাকে এই কার্য্য হইতে নিবারণ করাইবে? অনুরোধ জানাইয়া, মিনতি-ভরা কণ্ঠে কাতরভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ ডাকিল,—"প্রমদা, লক্ষ্মীটি, দরজা খোল, মানে আমার—"

কোন শব্দ পর্য্যন্ত নাই; আফিং খাইয়াছে নাকি? সর্ব্বনাশ। ডাক্তারই ডাকিতে হইবে অবশেষে; থানা পুলিশ করোনার্স—কত কি হাঙ্গামা। এই সব নভেল পড়ার কুফল। বটতলার বই পড়িয়া পড়িয়া মাথা গিয়াছে বিগড়াইয়া; ব্রজেন্দ্রনাথ হাঁপাইতে লাগিল। রাত্রি মন্দ হয় নাই। দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ডাক্তার পরে পাওয়া দুষ্কর হইবে; আবার সংস্কার আছে ডাক্তারেরা ঘুমাইলে নাকি ডাকিতে নাই। চারিদিক হইতে ফ্যাসাদ বাধিয়া উঠিতেছে; বৌদিকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেই হইবে। লজ্জা করিলে চলিবে না আর। দশটা চুয়াল্লিশের গাড়ীর প্যাসেঞ্জার সব উঠিয়া পড়িয়াছে এতক্ষণে; ট্রেণে ইঞ্জিনও জুড়িয়াছে নিশ্চয়; কয়েক মিনিট মাত্র আর বাকী। প্রমদার জীবনও হয় ত' আর কয়েক মিনিট। তারপর ট্রেণের গতিতে পাল্লা দিবে তাহার আত্মা; আচ্ছা মেল ট্রেণের সঙ্গে কি আত্মা দৌড়াইতে পারে? তা পারে বৈকি। ট্রেণের যে থামিতে হয় ষ্টেশনে ষ্টেশনে, আত্মা কেবল স্বর্গের পানে ছোটে অবিরামভাবে। আবার উপরের বাত্যা অপেক্ষাকৃত লঘু, গতি আরো বাড়ে। এসব কি যা-তা সে ভাবিতেছে? বৌদিকে বলিতে হবে সকল কথা খুলিয়া, এখুনিই; বিলম্বে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যাইতে পারে; সে অধীরভাবে কহিল, "প্রমদা, বৌদি ডাকছেন, দরজা খোল; আর কি যে করো ছেলেমানুষি।"

ব্রজেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি বৌদির সন্ধানে ছুটিল; কিন্তু কোথায় বৌদি? এইবার মনে পড়িল, প্রতিবেশী হীরু চক্রবর্ত্তীর গৃহে পৌত্রের উপনয়নোৎসব। বৌদি সেখানে গিয়াছেন নিমন্ত্রণ রাখতে। কিন্তু ঘরে যে সর্ব্বনাশ। ওখানে নিমন্ত্রণ বাড়ীর ভিড়ের মধ্যে বৌদিকে ডাকিয়া আনা অসম্ভব। আর এদিকে প্রমদার জিভ বাহির হইয়া যাইতেছে হয় ত', মুখ দিয়া গাঁজা বাহির হইয়া অমন স্মিত মুখখানি বিবর্ণ হইয়া যাইবে। ব্রজেন্দ্রনাথের কান্না পর্য্যন্ত আসিল। বেচারী কি যে করে—ধানবাদের গাড়ীও আর নাই। দশটা চুয়াল্লিশের গাড়ী ছাড়িয়া গেছে সে ডাকিল, প্রমদা।

◆

বাঙ্গালার বাঁইচ গান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম-এ,

বাঙ্গালা ভূমির নিজস্ব প্রকৃতিকে ও বাঙ্গালা ভূমির নিজস্ব সংস্কৃতি ধারাকে সত্যকার চিনিতে না পারিলে, বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর সত্যকাব পরিচয় পাওয়া যাইবে না। আমরা বাঙ্গালী জাতি যদি বাঙ্গালাভূমির প্রকৃতি ও বাঙ্গালা-ভূমির সাহিত্য, শিল্প, নৃত্যানুষ্ঠান প্রভৃতি সংস্কৃতি-ধারাগুলিকে সত্যকার চিনিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে স্ব-ভূমির প্রতি একটা গভীর গৌরব ও মমত্ব জন্মিবে। ইহার ফলে, আমরা আমাদের সোনার বাঙ্গালা-ভূমির প্রকৃতি ও ইহার ছন্দধারার গরিমা ও মহিমার সংস্পর্শ লাভ করিবার সুযোগ পাইতে পারিব। যে সব উৎস-ধারার স্রোতে বাঙ্গালা ভূমির প্রকৃতি ও সংস্কৃতি-ধারা গঠিত, সেই উৎস ধারাগুলির অনুসন্ধান পাইলে আমরা আমাদের স্ব-ভূমির পূর্ণ রূপকে উপলব্ধি করিতে পারিব।

নদী মেখলা, নদীবহুলা বঙ্গভূমি। নদীমাতৃক বাঙ্গালা-ভূমি গঙ্গা, যমুনা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীগুলির স্রোতধারায় অনুছন্দিত। আমাদের সোনার বাঙ্গালাভূমির গঠন ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গাধারার মহামিলনে। মানস সরোবর হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের ধারা আসিয়াছে বাঙ্গালা ভূমিকে অনুছন্দিত ও অনুপ্রাণিত করিতে। অপর দিকে, গঙ্গা সুদুর গঙ্গোত্রিশিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভূমির প্রকৃতিকে অনুছন্দিত করিতেছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ছাড়াও বহু নদ-নদী বাঙ্গালাভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, যেমন—ত্রিস্রোতা, আত্রেয়ী, সুবর্ণরেখা, রূপনারায়ণ, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, মেঘনা, কর্ণফুলী, ফেণী প্রভৃতি। নদীমাতৃক বাঙ্গালাভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনা অন্য কোনও ভূমিতে সম্ভব নয়। বহু নদ-নদীর তরঙ্গছন্দে অনুছন্দিত এই বাঙ্গালা ভূমির মানুষেব অন্তরে অন্তবেও একটা অতুলনীয় ছন্দ-ধারা প্রবাহিত হয়; তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বাঙ্গালার শৌর্য্যবীর্য্যপূর্ণ ঐতিহাসিক কাহিনীর ভিতর, বাঙ্গালার সঙ্গীতধারায়, বাঙ্গালার সাহিত্য-শিল্পধারায়, বাঙ্গালার আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে। নদীমাতৃক বাঙ্গালা ভূমির প্রকৃতিই অধিবাসীদের অন্তরে অন্তরে ছন্দ-শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব যুগ হইতেই নদীমাতৃক বাঙ্গালা ভূমির নৌকাই প্রধানতম যানবাহন। বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যখন ভারতবর্ষের অপরাপর দেশে নৌকার ব্যবহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল, তখন বাঙ্গালীরা বেঁতে বাঁধা নৌকায় দেশ-দেশান্তরে ধান্য-চাউল লইয়া বাণিজ্য করিতে যাইত। বাঙ্গালীরা সেই নৌকার নাম দিয়াছিল "বালাম"। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাঙ্গালার বীর সন্তান বিজয় সিংহ নৌ-জাহাজের সাহায্যে লঙ্কাদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। পৌষ সংক্রান্তি দিবসে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সহস্র সহস্র "ময়ূরপঙ্খী" নৌকা বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হইয়া শ্যাম, কাম্বোডিয়া মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি দূরদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে যাত্রা করিত। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত মহাকবি কালিদাসেব "রঘুবংশে" বাঙ্গালী নাবিকদের নৌ-চালনা দক্ষতা সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত রহিয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে বরেন্দ্রের (বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গ) বীরকেশরী দিব্যের ইতিহাস হইতেও আমরা বাঙ্গালীর অসাধারণ নৌ-শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। সামন্তরাজ দিব্য পাল সম্রাট তৃতীয় বিগ্রহ পালের "নাবাধ্যক্ষ" অর্থাৎ নৌ-সেনাপতি ছিলেন। পাল নৃপতিগণের "শিলা নৌকা" সমূহ যেমন যুদ্ধার্থ সমুদ্রবক্ষে শোভা পাইত, তেমনই রণবীর দিব্যের 'ভীমা', 'পত্রপূতা', 'গম্বরা' প্রভৃতি রণপোত সমূহ গঙ্গা, করতোয়া বক্ষ সর্ব্বদা পরিশোভিত রাখিত। তাঁহার রাজ্য মধ্যে "নাবতাক্ষেণী" বা 'পোত নির্ম্মাণ-স্থান' বিদ্যমান ছিল। "দেবী চৌধুরাণী"তে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তব বঙ্গের (অষ্টাদশ শতকের) নদী-পথে নৌ-যুদ্ধের চিত্র আঁকিয়াছেন। ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের পল্লী-গীতিকায় ('পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) নৌ-যুদ্ধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালী নৌ-যুদ্ধ ও নৌ-চালনায় অসাধারণ পারদর্শিতা

লুপ্ত করিয়াছিল। কোনও শত্রুপক্ষ বহু নৌ-সাহায্যে কোনও রণবীরের নৌকা বেড়িয়া ফেলিলে কি কৌশলে শত্রুপক্ষীয় নৌ-সৈন্য দলের হাত হইতে জীবন রক্ষা করা যায়, তাহাতে বাঙ্গালী বীর সুশিক্ষিত ছিল। বাইচ নৃত্য বোধ হয় অদ্যাপি সেই স্মৃতি বহন করিতেছে। এই বাইচ নৃত্য নৌক্রিয়া যে জলপথে বাঙ্গালীর শক্তি-চর্চ্চার পরিচায়ক, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের নদীগুলির অধিকাংশ বর্ত্তমানে মরণোন্মুখ হইলেও বর্ষাকালে পরিপ্লাবিত হইয়া স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করে। এই সব স্থানে দুর্গোৎসবের বিজয়ার উৎসব উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান যুবকগণ কর্ত্তৃক বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মহা ধুমধামে বাইচ-প্রতিযোগিতা হয়।

নৌকা বাইচের সময়ে যুবকগণ সুমধুর ছড়া গান গায়। নদীবক্ষে "ছিপ" ও "পানসী" নৌকার তরঙ্গাঘাতে দাঁড় ও বৈঠার তালে তালে নাবিকগণের সঙ্গীতের সুর আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। বাইচগানগুলির সুর-রীতি সাধারণতঃ 'ভাটিয়ালী'

বাইচ গানগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন—(ক) বিরহ-গীতিকা, (খ) ভাবের গান, (গ) পাল্লা গান।

(ক) বিরহ-গীতিকা

বাইচের প্রারম্ভে যুবকগণ সাধারণতঃ এই শ্রেণীর গান গাহিয়া থাকে। এই গানগুলিতে নায়ক নায়িকার বিরহ কথা বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে এই শ্রেণীর কয়টি গান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(১)

তোর পতি গেছে রণে
শুন লো যুবতী।
কইলা বলে আর আসবে না
তোমার প্রাণপতি॥
তুমি গো তোজ যুবতী,
কুইলা পাখী বলে কি?
নিদ্রাগত শুন যুবতী,
কুইলা পাখী বলে কি?
বাইচের সময় উড়িয়ে পড়ে
ঝলকে ঝলকে চিঠি-মারে।
উড়িয়ে যাইয়ে রইল কোথায়,
চরণ ভক্তির চরণ তলে॥
আর পাখী, তুমি যাইবে কোথায়
ধরিয়া রাখিব হেথায়।
স্বামীর গুণ মন্তর দিয়া
রাখিব তোমারে সামাল কইরা॥
বিচ্ছেদে তুমি যাবা কোথায়।
অন্তদিন তোমার মন ত না হয়।
ছাড় এ বেলা জবের খেলা
ওলো রসবতি।
হইল তোর সাঙ্গ গার
শুন লো যুবতী॥

(২)

ও বিদাশী বন্ধুরে
তোর জন্ত প্রাণ কাঁদে।
তোর জন্ত প্রাণ কাঁদে লো সই
তোর জন্য প্রাণ কাঁদে॥
সমুদ্দুরে উঠে ঢেউ
কূলে আইসা লাগে।
আমার দেহের মাঝে উঠে ঢেউ
কেহ নাহি দেখে॥
তুমি হইলে বট বিরিক্ষি
আমি তরু লতা।
তোমার মনের কথা দেখ
আমার মনে গাঁথা॥
(ফরিদপুর জেলার গ্রাম্য গান)

(৩)

পার কর পার কর কানু বেলার দিকে চায়া।
দৈ দুধ নষ্ট হলো দিন গেল বয়া॥
সকল সখি পার করতে নিব কড়ি এক পণা।
রাধারে পার করতে নিব তার কানের সোনা॥
তুমি সুন্দর কানু, ভাঙ্গা কেন তোমার নাও।
কোথা থুব দুধের ভাঁড় কানু কোথা থুব পাও॥
আধা গাঙে যায়া কানু নায়ে দিল নাচাড়ী।
উড়্যা উঠে রাধার পরাণ নায়ের ভাঙ্গে পাছাড়ী॥
নাও চালাও ওরে কানু
বায়ে ধর কূল।
এ ধন যৈবন দিমু
গাঙে দিমু যৈবন ফুল॥*

---

* শব্দার্থ :—নাও—নৌকা। থুব—থুইব, রাখিব। পাছাড়ী—পশ্চাৎ ভাগ। দিমু—দিব।

বাহুল্যভয়ে বিরহ-গীতিকা শ্রেণীর বাঁইচগান আর উদ্ধৃত করিলাম না।

(খ) ভাবের গান

এই শ্রেণীর বাঁইচগানগুলি ভাবপ্রধান। এইগুলিতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলির উপর বাউল গানের দেহতত্ত্বের প্রভাব বর্ত্তমান।

(১)

সুন্দর রাধিকা রে
চড় আইসা প্রাণ বন্ধুর লাযে।
তোর হাতের হাত ভাবিয়া
উড়ায়ে দিব রে॥
এখনেতে লীলা খেলা।
বুঝ্যাছি ভাবের বেলা॥
ভাব কৌশলে ওরে ভোলা।
কর আইসা দিনের খেলা॥
দিন গুণিয়া দিন ভাব
ও মন ভোলা।
তুমি কর কিসের খেলা
ও খেল দিনের খেলা॥

(২)

ও মন ভাইয়া।
কেমনে যাইবে তুমি ভব-নদী বাইয়া॥
আগার মাঝি পাছায় গেলে
গলৈ পড়ে খুইয়া।
দীক্ষা শিক্ষা না কর্যা
আগে করি এক বিয়া॥
নারীর হাতে দান হৈলে
ঘরের টাকা দিয়া।
ভব-নদীর এমনি ধারা
সে না দিবে ধরা।
সে ঘাটে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব
নিয়া যায় পারে॥
দাঁড়ি মাঝি ঠিক না কর্যা, মন
কিসে যাবি পারে।
ঠিকের ঘরে বেঠিক হৈলে
কাণ্ডু পার করে না তারে॥
(রাজসাহী জেলার পল্লী-গীতি)

(গ) পাল্লা গান

বাঁইচ প্রতিযোগিতা যখন তুমুল আকার ধারণ করে, তখন যুবকগণ এই শ্রেণীর গানগুলি গাহিয়া থাকে।

(১)

এক পানসী হইতে যুবকেরা গান ধরে—

জোনাকী পোকার আলো দেখি চন্দ্র গেল দূরে।
কাল মুরগী হৈয়া দেখ হংসকে নিন্দা করে॥
কোকিলের শব্দ শুনি ঘুঘু-এ সাজায় বাসা।
ময়ূরের নৃত্য দেখি ফ্যাকম্ ধরে প্যাঁচা॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখি তেঁতুল হৈল বঙ্ক।
শামুক সমুদ্রে যায়্যা হৈতে চায় শঙ্খ॥

অপর নৌকা হইতে যুবকেরা প্রত্যুত্তরে গাহিতে থাকে--

অনায়াসে মুখে বল কথা অসম্ভব।
কে কেমন লোক তাহা বুঝহ সকল॥
শিশু যেমন ইচ্ছা করে চন্দ্রিমা ধরিতে।
কায়মনে সাধ যেমন ছুঁইতে অম্বরে॥
পর্ব্বত লঙ্ঘিতে যেমন পঙ্গুর বাসনা।
দরিদ্রের সাধ যেমন গলে দিতে সোনা॥
পদ্মমধু খেতে যেমন ভেকের ইচ্ছা হয়।
বাঁদরের সাধ যেমন মকরধ্বজ খায়॥
বৃদ্ধার যেমন সাধ হৈতে যুবতী।
রাখালের সাধ যেমন হৈতে নৃপতি॥
চোরের সাধ যেমন সদা অন্ধকার।
রমণার পণ যেমন বাড়ে অহঙ্কার॥
তেমনি তোমার মুখে বলতে চাও তাই।
বাঁইচ হৈতে উঠ্যা যাও মুখে দিয়া ছাই॥

(২)

তারপর প্রথম নৌকা হইতে যুবকেরা উত্তর দেয়—

গাড়ার মধ্যে থাক্যা শামুক
শঙ্খ-হৈতে চায়।
হনুমানের লম্ফ দেখ্যা
বিলি তাকায় লঙ্কায়॥
আম দেখ্যা আমড়া কর্যা গেল রোষ।
ভাইয়া হৈয়া নিন্দা করে কাঁঠালের কোষ॥

দ্বিতীয় নৌকা হইতে যুবকেরা উত্তর দেয়—

গর্জ্জে ইন্দ্র আর গর্জ্জে ব্যাঙ্।
সমুদ্রের ইল্সা আর গাড়ার চ্যাঙ্॥
ইট মাটির ঘর আর পাট কাঠির বেড়া।
হস্তী গজমতির নিন্দা করে কাসকাটা ভেড়া॥
(রাজসাহী জেলার গ্রাম্য-গাতি)

বাঙ্গালার ভূমি রসধারায় পরিপূর্ণ। এইজন্য অধিবাসীরাও সঙ্গীত, সাহিত্য শিল্পরসে ভরপুর। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী পল্লী-কবির গীতিগুলির ভিতর অপরূপ রসধারা প্রবাহিত হইয়াছে। এখনও কোনও কোনও পল্লীপ্রদেশ গ্রাম্য গীতির সুরে মুখরিত হইয়া উঠে। এই লোক-সঙ্গীতগুলি গ্রাম্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রচারের কাজ করে। বর্ত্তমান যান্ত্রিকতা ও অর্থ-দাসত্বের ফলে বাঙ্গালার মূল্যবান গ্রাম্য সংস্কৃতি-সম্পদ বিলয় প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাঙ্গালার স্বভাবজাত কবিত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপ যে সব লোক-গীতি এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান আছে, সেগুলির সংরক্ষণ ও অনুশীলন একান্ত কর্ত্তব্য।

মৃত নক্ষত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

পদ্মার বুকচিরে চলেছে ষ্টীমার।

দূরে শ্যামল বনশ্রী, তীর ঘেঁষে ঘেঁষে কয়েকটী বাদাম দেওয়া নৌকা চলেছে। অশান্ত জলরাশি আছড়ে এসে পড়ছে যন্ত্রদানবের পদতলে। অসংখ্য জনতা যেন এসে জমেছে এক বিরাট প্রতিভার সন্নিকটে, অবনত মস্তকে স্বীকার করে তার অধীনতা। ছোট ছোট ষ্টীমার ষ্টেসন, কয়েক জন লোক উঠছে আবার জনকয়েক নেমে পড়ছে। চুপচাপ বসে আছি দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে, আমার ডাক বোধ হয় সকলের শেষেই হবে।

“শোন” এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। উঠে তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

“দূরে যে গাঁ’টী দেখা যাচ্ছে ওর নাম জান ?” অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দূরচক্রবাল সীমান্তে এক অনির্দ্দিষ্ট গ্রামের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক’রলেন।

“এদিকের রাস্তায় ত’ আমার কোনদিন যাতায়াত ছিল না, এইবারই প্রথম চলেছি, তাও কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গায় নয় সুতরাং এখানকার রাস্তাঘাট বা গ্রামও আমার চেনা নেই।”

“ওই গাঁ’র নাম কাজলডাঙ্গা” বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, “অন্যে লোকে ওর নাম আর কি বলে জানি না তবে আমি জানি ঐ নাম।” অবাক হয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকি তখন তিনি বলে চলেছেন :—

“কাজল, ছোট্ট একটী মেয়ে, সুন্দর চপল তার ভঙ্গী, মিষ্টি কথাবার্ত্তায় সে গ্রামের লোকের মন কেড়ে নিয়েছিল। তার সমবয়সীরা তাকে ঈর্ষা করত যেমন ভালবাসত ঠিক তেমনি। সেবার পূজায় ছোট নীলাম্বরী সাড়ী একখানা নয়নপুরের হাট থেকে কিনে এনেছিলাম। কি মানানসই হয়েছিল তা বলা যায় না, মা যেন সাক্ষাৎ প্রতিমা। ঘোষেদের মালতীকে দিয়ে দিল, সে নাকি বায়না ধরেছিল, আর তার অসমর্থ বাপ সে বায়না মেটাতে পারে নি। তখনই বুঝেছিলাম এতটুকু মেয়ের এত ব্যথা কেন পরের জন্য, ও নিশ্চয়ই আমাকে ফাঁকি দেবে। তারপর ও আস্তে আস্তে বড় হ’ল। ওর রূপের আগুনে চারিদিক ঝলসে গেল। গরীবের ঘরে অত রূপ শোভা পায় না।” বৃদ্ধের দৃষ্টি তখন দূরে নিবদ্ধ।

“মা-মরা মেয়ে আমার সব কাজকর্ম্ম শেষ করে আবার আমার সেবা করতে ব’সত। কত বাধা দিতাম কিন্তু সবই নিস্ফল হ’ত। সকাল হতে মা আমার খাটতে সুরু ক’রত, খেয়াল থাকত না খাবার পর্য্যন্ত। দুপুর গড়িয়ে যেত, বিকেলের দিকে হয় ত’ অবসর মত দু’চারটে মুখে গুজে দিত। কত বকাবকি করতাম কিন্তু মা আমার হেসে ফেলত। গরীবের সংসার, মা আমার লক্ষ্মীর মত চালিয়ে নিত, আঁচও লাগতে দিত না। এত কষ্ট, এত অযত্ন তবু আর রূপ যেন ভুবনজয়ী হয়ে উঠল। মনে মনে আহ্লাদ হলেও শিউরে উঠতাম মাকে দেখে।”

“শীতের সময় জমীদার পুত্র সুনির্ম্মল গ্রামে এল। গ্রামের অদূরেই তাঁবু ফেলা হয়েছে। কৌতুহলী শিশুদল ঘিরে দাঁড়ায় তাঁবুর চারিপাশে। নানারকম বিস্কুট ও খেলনা পেয়ে তারা ফিরে যায়। বড় বড় মাতব্বর প্রজার অনুরোধ সত্বেও তিনি কাহারও বাড়ীতেই উঠেন নাই।”

“নিজের সব দুঃখের কথা তাকে ব’ললাম, অনূঢ়া কন্যা, সংসারে অনটন সুতরাং নিয়মিত খাজনা দিতে পারি না। অনুনয়ের সহিত জানালাম—গরীব ব্রাহ্মণ, যদি আপনারা দয়া না করেন তাহলে আর কোন উপায়ই নেই, এবারকার মত খাজনা মাপ করুন, পরের বার দিতে পারবো।”

“কত দিনের খাজনা বাকী পড়েছে আপনার ?”

“বছর তিনেক।”

“আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন ;” অন্যান্য প্রজাদের দুঃখের কাহিনী শুনতে লাগলেন। সবাই যখন অল্প বিস্তর খুসী হ’য়ে প্রস্থান ক’রল তিনি আমাকে ডেকে বললেন—“আপনার খাজনা এবারকার মত মাপ করা হ’ল কিন্তু সামনের বার দিতে চেষ্টা করবেন।”

নত হয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে চলে আসছি, তিনি ডাকলেন, “দেখুন আপনার মেয়ে অবিবাহিতা বললেন না ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

"তার পাত্রের সন্ধান করে আমাকে খবর জানাবেন।" আকাশের দিকে তাকিয়ে জানালাম, ভগবান তুমি নিশ্চয়ই আছ, তা' না হলে অমন্ অত্যাচারী জমিদারের ছেলে এত বিনয়ী আর এত ভাল হয়। দেবতুল্য চেহারা, বিনয়ী স্বভাব, কি সুন্দর ভদ্র।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম মনে হ'ল হয় ত' বা তিনি এখনই তার উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে মিনতি জানাচ্ছেন।

"সেদিন বিকালেই দেখি ছেলেটী এসেছে, সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ। ধনীর দুলালের চিহ্নমাত্রও তাতে নেই। এসেই আমাকে প্রণাম ক'রল। অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম তার দিকে। সেও বিনা দ্বিধায় আস্তে আস্তে উঠে বসল আমার কুঁড়ে ঘরের বারান্দায়। বিপদে পড়লাম, কি করব, কি না করব কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।"

"সে আমার ব্যস্তভাব দেখে হেসে বলল, "আপনি অত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন? গ্রামের এদিকটায় বেড়াতে এসেছিলাম, যাবার সময় তাই আপনাদের বাড়ীটাও ঘুড়ে গেলাম। তাছাড়া আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথাও ছিল। আমার এক সহপাঠী কিছুদিন যাবৎ আমাদের গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারী করছে। খুব ভাল ছেলে, সচ্চরিত্র, নিতান্ত সরল। যদি তার সঙ্গে আপনার মেয়েটার বিবাহ দিতে রাজী থাকেন তাহলে আমি কথা বলে দেখতে পারি।"

"রাজরাণীর মত মেয়ে আমার সামান্ত স্কুল মাষ্টারের পত্নী হবে শুনে মনটা সড়ল না। আমাকে নিরুত্তর দেখে সে বোধ হয় বুঝেছিল আমার মনের কথা, তাই সে মৃদু হেসে জানাল, "দেখুন আমি হয় ত না জেনে অন্তায় করে ফেলেছি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

'না, না সে কি কথা আপনার—তবে কিনা মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।'

'বেশ ত' আপনি ভাল পাত্রেব সন্ধান করুন। আর একটি অনুরোধ আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন। আজ তা'হলে উঠি।'

'এস বাবা, মনে কিছু কর না।'

'না, না, আমি মনে কিছুই করি নি আর এতে মনে ক'রবার কি যে আছে তাও জানি না', বলে সে হেসে উঠে দাঁড়াল।

'একটু বসে যান' কাজল মা ব'লল।

কাজলের এক হাতে একটা রেকাবীতে কয়েকটা মিষ্টি আর কিছু ফল, অন্ত হাতে এক গ্লাস জল।

'বাড়ীতে এসেছেন, অতিথি তায় আবার রাজঅতিথি, একটু মিষ্টি মুখ করে যান।'

বেশ সপ্রতিভভাব। সুনির্ম্মল বসে পড়ল পূর্ব্বের জায়গায়। আর বেশ জোড় করেই আমাকে শোনাল 'এর মধ্যে একটি চেষ্টা লুকানো আছে,-সেটা বলব?' বলে কাজলের দিকে তাকায়। কাজল-মা তখন আরও রাঙা হয়ে উঠেছে। সুনির্ম্মল বলে 'এটা হল নূতন দাদাকে প্রাথমিক ঘুস্ দেওয়া। এরপর পাকাপাকি মিষ্টির ব্যবস্থা হতে পাবে, যদি দিদির একটি ঠিক মত টুক্‌টুকে বর জোগাড় করে দিতে পারি' বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কাজলের দিকে তাকিয়ে রইল।

সে দিনই সন্ধ্যার সময় দত্ত বাড়ীর বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম মুখুজ্জ্যে মশাই চিৎকার করে বলছেন, 'ও সব ঢলাঢলি আর বলী কি, কোনদিন শুনবে ছুড়ি ভেগেছে ওই জমীদার ছোক্‌রার সাথে, তা না হলে ছোক্‌রার এত দরদ: খাজনা মাপ, সামনের বার দিতে চেষ্টা করবেন।' ঘরের মধ্যকার অট্টহাসিতে চমকে উঠলাম। মাথার মধ্যেও যেন শিরগুলি অবশ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফিরে এলাম। মনে হল এ সব শোনাও পাপ। ভগবান একদল লোক সৃষ্টি কবেছেন যারা পরনিন্দায় যতটা সুখ পায় তত সুখ বোধ হয় আর কিছুতেই পায় না। অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে চুপে চুপে চোরের মত বাড়ীতে এসে ঢুকলাম।

কয়েক দিন পর।

"ইতিমধ্যে সুনির্ম্মল কয়েকদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। কাজল আর সুনির্ম্মল দেখলে ভাই বোন বলেই বোধ হত।"

"সন্ধ্যার আঁধাব পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে…"

"ক্লান্ত আর অবসন্ন পা দুটীকে কোন রকম চালিয়ে বাড়ী ফিরছি। হাট থেকে বাড়ী প্রায় মাইল দু'য়েকের কিছু উপর। বাড়ীর দরজায় পা না দিয়েই মনে হল ঘরের ভিতর কারা যেন কথা বলছে। অস্থির পদে এগিয়ে গেলাম ঘরের দিকে। মুখুজ্জ্যেরই মধ্যম পুত্র জাড়া, দিব্য আরামে আমার

চৌকির উপর ঝেঁকে বসেছে, আর কি যেন জিহ্বার সাহায্যে সশব্দে আস্বাদন করছে। জ্বলে গেলাম, চীৎকার করে বললাম, 'কিরে হাড়া, কি খাচ্ছিস? লজ্জা করে না এখানে খেতে। তোর বাপ ঢোল পিটে বেড়াচ্ছে তুই সঙ্গে কাশি নিয়ে পিটুতে যাস নি, নইলে মানাবে কেন?

"মুহূর্ত্তের মধ্যে হাড়া বাটীর থেকে অবশিষ্ট খাবারটুকু তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে লাফিয়ে পড়ল এবং মুখ নেড়ে বলল, 'লোকে বললেই দোষ, অত বড় মেয়ে, যার তার সাথে চলাচলি করবে লোকে বলবে না।' অন্ধকারের মধ্যে দৌড়ে চলে গেল। সামান্ত পনের ষোল বছরের ছেলের মুখে ঠিক তার বাপের কথারই উদ্গিরণ হল। সামান্ত কয়েক মিনিটের মধ্যে কিসের যেন ওলটপালট হয়ে গেল। কাজল-মার সাদা মুখে কে যেন কাজল লেপে দিল।

"সকাল হ'তেই দুর্য্যোগ চলছিল। পথ ঘাট সব কাদায় ভরে গেছে। বেলা একটু বাড়লে গেলাম জমীদারের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। দেখলাম বিলাসের নানা আয়োজনের মধ্যেও একটু স্বাতন্ত্র আছে যা' সাধারণতঃ দেখা যায় না। সব কথা তাকে জানালেম না, শুধু তার বন্ধু মাষ্টারটীর সঙ্গেই কাজল-মার বিবাহের জন্ত অনুরোধ করে এলাম।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ নিজেকে সামলে রাখতে পেরেছিল কিন্তু মনে হল চোখ দুটী তার ঝাপসা হয়ে গেছে। কয়েক ফোঁটা জল তার চোখের কোটর বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। বেলা শেষের সুর তখন পৃথিবী গাইছে, সঙ্গে সঙ্গে করুণ আলোতে ভরে উঠেছে। বৃদ্ধ তার কম্পিত হাত দু'টী তুলে অস্তোন্মুখ সূর্য্যকে প্রণাম জানাল। একটু ধরা গলায় বৃদ্ধ আবার বলতে সুরু করল—

"তারপর একদিন সুনির্ম্মল এর চেষ্টায়ই কাজল-মার বিয়ে হয়ে গেল। সরল গ্রামের মাষ্টার প্রকাশকে মার পাশে দেখে সেদিন আনন্দই পেয়েছিলাম। চলে গেল শশুর বাড়ী, যাবার সময় কত কেঁদেছিল। বাদলাকে বলে গেল আমার দেখা শুনা করতে। বাদল তখন ছেলে মানুষ।"

এতক্ষণে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল দূরে একটী সতের-আঠার বছরের কিশোরের দিকে। পদ্মার দিকে চেয়ে বসে আছে। তার নাম শুনে একবার সে এদিকে তাকাল মাত্র, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে আবার সে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। তার চোখের কোণেও জল দেখলাম। মনে হ'ল কিসের যেন এক গোপন ব্যথা বাপ আর ছেলেকে কাঁদায়, হয় ত' বা এ রকম কত অব্যক্ত ব্যথায় বাপ, মা, ছেলে, মেয়ের কান্না এক সুরে ভরে তুলছে আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী।

"কয়েক মাস যেতে না যেতেই সুনির্ম্মলের চেষ্টায় প্রকাশের পদোন্নতি হ'ল। কিন্তু এর মূলে লোকেরা এমন হীন মন্তব্য করল যার তার প্রকাশের মত দুর্ব্বলচিত্ত লোকের সহ্য করা কঠিন। সুনির্ম্মলের বন্ধু-প্রীতি আর কাজল-মার প্রতি স্নেহ তাদের ছোট্ট সংসারকে ঘিরে রাখল। কিন্তু তার যাতায়াতের এবং তার প্রতি কাজল-মার আদর-যত্নের এমন ব্যাখ্যা সমাজের লোকেরা ক'রল যার আঘাত প্রকাশকে ভেঙ্গে ফেলল। সমাজের চোখ খুব তীক্ষ্ণ। ঘরে বাস ক'রে যেমন সেই ঘরে আগুন দেওয়া যায় না, সমাজের মধ্যে চলাফেরা করতে হ'লেও ঠিক সেই রকমই সমাজকে না মেনে চলার উপায় নেই। এতে যার ত্রুটী বা বিচ্যুতি ঘটল তাকে জাতি-ভ্রষ্ট, একঘরে, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি নানারূপ আইনের কবলে পড়তে হবে। তারপর উপযুক্ত ব্যবস্থাদি এবং শুদ্ধি ও শোধন ক'রে সমাজ তাকে আবার তুলে নিতে পারে। কাজল-মা আমার শিউরে উঠেছিল, স্বামীর গোপন অত্যাচার, প্রতিবেশীর শ্লেষযুক্ত বিদ্রূপ তাকে আস্তে আস্তে পরিসমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে গেল।"

"প্রকৃতি সেদিন উতলা হ'য়ে উঠল। মা আমার বিদায় নিল। সমাজ তাকে তিলে তিলে মেরে ফেলল, অপরাধ নিছক কৃতজ্ঞতা। সমাজের কাছে এই কৃতজ্ঞতা ভয়াবহ ও অবৈধ। সমাজের বুকে প্রকাশ আবার স্থান পেল, কিন্তু মা আমার সেই সম্বর্দ্ধনার অংশ পেল না। সুনির্ম্মল এ কথা কোনদিন ভাবতেও পারল না, শুধু মাত্র তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে একজন এত হেয় হ'ল। সে টেরও পেল না তারই জন্ত একজন অত্যাচার ভোগ করতে করতে শেষ হ'ল। যখন সে বুঝতে পারল তখন মা আমার অভিমানে চলে গেছে। তাই ত' মাকে খুঁজে বেড়াই পথে পথে। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন খুঁজে চলেছি। পথে ঘাটেও অনেকের দেখা পাই, তাদের ম্লান মুখ, মার কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাদের নিস্তেজ চোখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে—প্রতিকার চায় প্রতিশোধ চায়। সাহস হয় না, দুর্ব্বল মন কোথায় যেন আঘাত লাগলেই ভেঙ্গে পড়ে।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাক্‌লেন, তারপর দেখলাম সে চোখে জল নেই—আছে উত্তাপ, শ্মশানের আগুন। কপালের শিরা উপশিরাগুলি স্ফীত হয়ে উঠেছে। তার সেই রক্তচক্ষু আমাকে জানাল—ভাঙ্গব আমি সমাজের জীর্ণ কঙ্কালকে, গড়ব আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্থি একত্র ক'রে।

"বাদলকে বাঁচিয়ে রেখেছি, ও সমাজের সংস্কার কর্‌বে ব'লে, নচেৎ কবে ওকে গলা টিপে মেরে ফেলে দিতাম, ওকে এই সমাজের নিঃশ্বাসে জাগতে দিতাম না। ওকে আমি গড়ে তুল্‌বোই।" তাঁর মুখে চোখে এক ভীষণ ক্রুরতার ছবি। ছেলেটীর দিকে নজর পড়ল—সমাজবিপ্লবীর প্রতীক।

"মা আমার তারাদের সাথে চেয়ে দেখবে পৃথিবীর দিকে। তার বুড়ো বাপ চেষ্টা করছে, তার আদুরে ভাই বাদল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সমাজের বিরুদ্ধে। সত্যি বা মিথ্যার হুঙ্কারে তা যেন ভয় না পায়। জীর্ণ সমাজের পাঁজরে আবার তরুণ রক্তের জোয়ার আনবে। ভাঙ্গবে সব কুসংস্কারের স্তূপ। মা আমার হাসবে।" বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীর গলা হ'তে আর কোন আওয়াজ বেরুল না। অন্তরের কান্নায় তা রুদ্ধ হ'য়ে গেছে।

বাদল দূরে ব'সে আছে। মাথাটী দুই হাটুর মধ্যে গোঁজা রয়েছে, শুধু মাঝে মাঝে কাঁধের বিশিষ্ট অংশ ফুলে উঠছে মাত্র। বৃদ্ধটী উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে পদ্মার বিশালতার দিকে তাকিয়ে আছেন। ধ্বংসের রুদ্র রূপ নিয়ে এক হাতে এক কূল ভাঙ্গছেন আর অন্য হাতে স্নেহময়ী রূপে গড়ে তুলছেন।

ছেলেটীর দিকে এগিয়ে গেলাম। তার পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'ভাই বাদল, তোমার এ ভাবে ভেঙ্গে পড়া চলবে না। তুমি যদি না দাঁড়াও, তোমার বাবাও যে খুব ভেঙ্গে পড়বেন। কত আশা বুকে নিয়ে আজ বিপুল শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। তুমি যদি না তাঁর সহায় হও কে তবে তাঁর পাশে দাঁড়াবে? ওরকম ভাবে মুষড়ে পড়া চলবে না। এই সমাজ আজ তোমাদের মত কত ঘরের বুকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তাদের সবার হ'য়েই তোমার দাঁড়াতে হবে; বুঝিয়ে দিতে হবে সমাজকে, কোথায় তাদের গলদ। শুধু আভিজাত্যের গৌরব নিয়ে সবার উপর অত্যাচার করবে আর নিরীহ ভীরু পশুর মত তা সহ্য করবে, তাদের ইন্ধনে ইন্ধন জোগাবে—তা চল্‌বে না। যাও, দেখ গিয়ে সমাজের অবস্থা, দেখ গিয়ে তার গলদ, তাকে গড়ে তোল। ভাঙ্গলেই শুধু হবে না, তার আবার প্রাণ দিতে হবে। নূতন চেতনায় তাকে সংস্কার ক'রে তুলতে হবে। বাঙ্গালার কিশোর জগতের শিরে গৌরবের মুকুট পরিয়ে দাও। স্বর্গগতা দিদি দেখে ভাবতে পারবে, ভাই আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারল। তোমার এ রকম ভাবে ব'সে থাকা ত চলে না, ভাই।'

প্রাণ যেখানে ভেঙ্গে যায়, ভাষা সেখানে মূক। সে সরল শিশুর মত আমার বুকের উপর মাথা রেখে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বল্‌ল—

"দিদি আজ বছর সাত মারা গেছেন। বাবাও সেই অবধি যেন কেমন হয়ে গেছেন। এদিকের যাত্রীরা প্রায় সকলেই বাবাকে চেনেন। দিনের পর দিন বাবা এই কাহিনীই লোকের কাছে বলে চলেছেন। বুঝতে পারি না এর কারণ।" কথার শেষে বাদল আবার অবুঝ শিশুর মত কেঁদে ফেলে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী তখন পর্য্যন্ত এক তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে বসে আছেন। শুধু দু'চোখ দিয়ে জল বেয়ে পড়ছে। একটু আগে যেখানে শ্মশানের আগুন দেখেছিলাম এখন সেখানে চিতাভস্ম মাত্র।

"বাদল চুপ কর ভাই, অবুঝ হ'লে ত' চলবে না।"

বাদল সোজা হয়ে বসে তার শিশুর মত সরল চোখ দু'টী আমার দিকে তুলে ধ'রল, দেখলাম, বিদ্রোহীর আগুন তার বুকে ঘুমিয়ে আছে, তার দৃষ্টিই যেন আমাকে জানিয়ে দিল, প্রতিশোধ সে নেবেই।

ষ্টীমার তখন তার যাত্রা শেষ করে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্লান্ত পথিকের মত তার অবস্থা। হাত পা শিথিল হয়ে গেছে। বিরাট যন্ত্রদানবের বিশ্রাম।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী ব্যস্ত হয়ে বাদলের হাত ধরে এগিয়ে গেলেন। এতক্ষণ যে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তার আচরণে বিন্দুমাত্রও তা' প্রকাশ পেল না। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবি, যা আজ উনি হয়েছেন তাই তাঁর স্বাভাবিক। কত বড় ব্যথায় তার বুক ভেঙ্গে গেছে। কত কঠিন ব্রত তিনি পালন করছেন দিনের পর দিন। মানুষকে তিনি ঘা' মেরে শেখাতে চেষ্টা করছেন, মানুষ মানুষের ব্যথা বুঝবেই আর বোঝা তার চা-ই।

অন্ধকারের মায়া তখন পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে। গ্রামের মধ্য হতে দু'একটী ক্ষীণ শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। হয় ত' কাজলের মত কোন বাঙ্গালার বৌ তুলসী মঞ্চে আলো জ্বালিয়ে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি করছে।

জীবনে শুধু এ ঘাট থেকে ও ঘাটে নোঙর ফেলে বেড়িয়েছি। কোন ঘাটের সঙ্গেই পরিচয় হয় নাই। যাদের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে তা শুধু বাহ্য আবরণের কিন্তু অন্তর রইল অজানা। একদিন চল্‌তে চল্‌তে হয় ত' পথ শেষ হয়ে যাবে, পথ চল্‌তে আমার শেষ হবে এমন কি পথের কথাও হয় ত' ভুলে যাব কিন্তু আজিকার এই সান্ধ্য-কাহিনী চিরন্তন সঙ্গীতের মত প্রাণের তারে ঝঙ্কার দিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠদ্দশায় 'Indian Field' নামক মাসিক পত্রে "Raj Mohon's Wife" নামে যে ইংরাজী উপন্যাস প্রকাশ করেন সে কতকটা খেয়াল বশতঃ কিন্তু স্বদেশ-সেবা মাতৃভাষার সাহায্যে করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক কামনা। বাঙ্গালী জাতিকে উন্নত করিতে হইলে, জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে, মাতৃভাষা অবলম্বন না করিলে কি কখনও ফলপ্রসূ হইতে পারে। বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজীতে সুলেখক হইতে পারিলেই বা লাভ কি? সকল ধর্ম্মের উপর স্বদেশ-প্রীতি। দেশমাতার প্রতি স্নেহের অভাব, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে সমবেদনার অভাব এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের অভাব বঙ্কিমচন্দ্রকে মর্ম্মপীড়িত করিতে লাগিল, সেই মর্ম্মকথা উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য তিনি উন্মুখ হইয়া উঠিলেন।

গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে তরুণ বয়সে সাহিত্যে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং প্রথমতঃ কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে খড়ি হইলেও গদ্য লিখিবার জন্য গুপ্ত কবিই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম উৎসাহিত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অবস্থা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

পৃথিবীর মানবসমাজের প্রথম যুগে গদ্যরচনা দুর্লভ; সর্ব্বত্রই কাব্যের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এদেশে সর্ব্বপ্রথমে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, অন্যান্য শাস্ত্রাদি সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইত। তৎপরে গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়। বাঙ্গালাদেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। বৌদ্ধযুগের পর হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থরাজির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই পদ্যে রচিত হয়। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী, কবিগান, পাঁচালী, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি ঐ কালের রচনা। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, দাশরথি, হরঠাকুর, গোবিন্দ অধিকারী, রামনিধি (নিধুবাবু) আন্টুনি সাহেব, গোপাল উড়ে প্রভৃতির নাম ঐকালের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন গদ্যের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, বৈষ্ণবগণের 'সহজিয়া সাহিত্যে।' উহার ভাষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। তৎপরে রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সঙ্কলিত যে প্রাচীন পত্র, আদালতের আরজি, প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত বৃন্দাবন পরিক্রমাৎ নিবদ্ধ আছে, উহাদের ভাষাও সহজগম্য নহে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে পাদ্রী কেরিসাহেব কৃত কথোপকথনের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল হইলেও উহার মধ্যে মধ্যে অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। উহা বুঝিবার জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ঘটকালী প্রসঙ্গে ইহা লিখিত। লঘু বিষয়, ভাষাও লঘু।

"ঘটক মহাশয় আমার বড় পুত্রটির বিবাহ দিব। আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আসুন-বিহের দিবস গৌণ না হয়, বৈশাখ কিম্বা আষাঢ় হইতে চাই। আমি বিবাহ দিয়া কার্য্যস্থলে যাব, এখন না হইলে যে খরচ পত্র আনিয়াছি সে ফুরিয়া যাবে।"

ঘটক কহিলেন, "ভাল মহাশয়, তাহার ঠেক্ কি?" ইত্যাদি।

কেরি সাহেবের সমসাময়িক রামবসু রচিত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" গ্রন্থের বাংলা গদ্যের নমুনা এইরূপ,— "এ বঙ্গভূমিতে রাজা চন্দ্রকেও প্রভৃতি আরও অনেক অনেক রাজাগণ উদ্ভব হইয়াছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহাদের কেবল নাম মাত্র শুনা যায় তদব্যতিরেক তাহারদের বিশেষ বিশেষণ, কিমতে বৃদ্ধি কিমতে পতন, নিবাকরণ কিছুই উপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রসঙ্গ শ্রবণ করে, আনপূর্ব্বক না জানানতে ক্ষোভিত হয়।"

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের "প্রবোধ চন্দ্রিকা"

প্রকাশিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকট আপনারা পণ্ডিতি ভাষাই পাইবেন।

“দূরবর্ত্তী হট্টগামী লোকদের শ্রবণবিষয়ীভূত হট্টাগত ধ্বনিমাত্রাত্মক সমনস্ক শ্রবণেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বশতঃ বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। তদুত্তর বসনভূষণ কদলীমূলক ইত্যাদি পদমাত্র শ্রবণ হয়।”

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে পাদ্রী মার্সমেন সাহেবের প্রকাশিত “ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয়দের রাজবিচরণে”র ভাষা এইরূপ,—

“এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হওন সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ও গভর্ণমেণ্টেতে যে বৈরভাচরণ ছিল তাহা নিবৃত্তি করণাভিপ্রায়ে হেষ্টিংস সাহেব চিপ জুষ্টিস সাহেবের নিমিত্ত একটা নূতন আদালত সৃষ্টি করেন এবং ঐ জাষ্টিস সাহেবকে অতি ভারী বেতন এবং অতি বাহুল্যরূপ পরাক্রম প্রদান করেন।”

১৭৭৪-১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহামণীষী রাজা রামমোহন রায় সাধারণ পাঠের উপযোগী বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে অনুমান বত্রিশখানি পুস্তক লিখেন। রাজা রামমোহনের ন্যায় বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত লোক অল্পই জন্মিয়াছেন। একদিকে সুগভীর পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে অধীয়ান ঐরূপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে কি না সন্দেহ। যদিও রাজা রামমোহন রায়ের প্রযত্নে এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তথাপি বাংলা ভাষার উন্নতির দিকে তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। গভীর দার্শনিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ সহজ ভাবে লেখা কিরূপ কঠিন ছিল তাহা চিন্তা করিলে রাজা রামমোহন রায়ের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় বাংলা গদ্যের বহুল উন্নতি সাধিত হয়। কিরূপ সরল ভাবে তিনি বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেখুন।

“অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।”

১। চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয়, এই হেতু তখন ব্রহ্মবিচারের ইচ্ছা জন্মে।

২। ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন, তবে কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার হইতে পারে? এই সন্দেহ পর সূত্রে দূর করিতেছেন। “জন্মাদ্যস্য যতঃ”।

৩। এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি, নাশ যাঁহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয়, তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়।”

কেবল বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতির অনুবাদ করিয়াই রাজা রামমোহন রায় নিরস্ত ছিলেন না, তিনি সমাজ-নীতি ও রাজনীতি, বাংলা ব্যাকরণ, জ্যামিতি, ভূগোল ও খগোল প্রভৃতি এমন বিষয় নাই যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে গদ্য পাঠের প্রচলন ছিল না। এ জন্য রাজা রামমোহন রায় কিরূপ প্রণালীতে গদ্য পাঠ করিতে হয় তাহার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেন। “সংবাদ-কৌমুদী” সর্ব্বপ্রথম দেশীয় সংবাদ-পত্র রাজা রামমোহন রায়ই প্রকাশ করেন এবং উহাতে সকল বিষয়ের আলোচনা থাকিত এবং তাঁহার নানাবিধ রচনায় বঙ্গভাষা সমৃদ্ধ হয়। এ কথা সম্ভবতঃ অনেকের অবিদিত যে, রাজা রামমোহন রায়ই বাংলা গদ্যে সর্ব্বপ্রথম কমা, সেমিকোলন, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি বিরাম চিহ্নগুলি প্রচলন করেন। তৎকালে ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক, বর্ণাশুদ্ধি-জ্ঞানও ছিল না। বিষয়-কর্ম্মের উপযোগী কোনরূপে পত্র লেখাই পর্য্যাপ্ত ছিল।

কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে নহে, সামাজিক বিষয়েও রাজা রামমোহন রায়ের রচনা কিরূপ মনোরম ছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। সতীদাহ নিবারণকল্পে এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের স্বপক্ষে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ উক্তি পাঠে আপনারা চমৎকৃত হইবেন।

প্রথমতঃ—বুদ্ধির বিষয়—স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন।…… আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?

দ্বিতীয়তঃ—তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি; কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্যদ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন অথচ কহেন যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

তৃতীয়তঃ—বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়—এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্ট করিলে বিদিত হইবেক।

চতুর্থতঃ—যে সানুরাগা কহিলেন উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে।…

পঞ্চমতঃ—তাহাদের ধর্ম্মভাব অল্প। এ অতি অধর্ম্মের কথা। দেখ, কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা তাহারা কেবল ধর্ম্মভাবে সহিষ্ণুতা করে।…… বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্দ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন।…

আমি একটু বিশদভাবেই রামমোহন রায়ের রচনা আলোচনা করিলাম। রামমোহন রায়ই বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যের জনক। তৎপূর্ব্বকার গদ্য-রচনার সহিত তুলনা করিলে ইহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইবে। গদ্য-সাহিত্য ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাজা রামমোহন রায়ের রচনা শত বৎসরেও পূর্ব্বে লিখিত। ঐ সকল রচনা সুখপাঠ্য ও প্রাঞ্জল। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের যুগ নির্ণয় করিতে হইলে (১) রাজা রামমোহন রায়ের যুগ (২) বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ (৩) রবীন্দ্রনাথের যুগ বলা চলে। রাজা রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যে সকল মনস্বী বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তৎপরে অক্ষয়কুমার দত্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যের প্রথম সৃষ্টিকুশল শিল্পী। তাঁহার ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও অনর্থক সমাসাড়ম্বরে শৃঙ্খলিত নহে। উহা সরল, সুন্দর, সুসম্বদ্ধ ও সুসংযত। তাঁহার রচনায় অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় একটি অপূর্ব্ব ছন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত, তজ্জন্য পাঠে মন আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হয়। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের কথা দূরে থাকুক, বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কর রস পাতা নড়ে নূতন ঘটি
খল শঠ জল পড়ে পুরান বাটি

ইত্যাদি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যূন ৩০।৩২ খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তকরূপে লিখিত। বেতাল পঞ্চবিংশতি, বোধোদয়, আখ্যান মঞ্জরী, চরিতাবলী, শকুন্তলা, সীতার বনবাস অনেকেরই সুপরিচিত। তিনি জগৎ বিখ্যাত মহাকবি Shakespeare-এর Comedy of Errors অবলম্বনে ভ্রান্তিবিলাস এবং সামাজিক বিষয়ে বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ সম্বন্ধেও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধিকাংশ পুস্তকগুলি ইংরাজী বা সংস্কৃত হইতে অনূদিত। কিন্তু অনুবাদে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অনুবাদ মাত্রই উপেক্ষনীয় নহে। কেবল আক্ষরিক অনুবাদের বিশেষ কোন মূল্য নাই বটে, কিন্তু মূলের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনুবাদ বড় সহজ সাধ্য নহে। মূলের ভাব সৌন্দর্য্য অব্যাহতভাবে রক্ষা করা এমন কি স্থলে স্থলে উহার উৎকর্ষ সাধন অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ব প্রচলিত ভাষার পারিপাট্য সাধন করিয়া ইহাকে শোভন ও সুন্দর করিয়াছেন। সুবিন্যস্ত পদাবলী প্রয়োগে, সুনির্দ্দিষ্ট বিরাম চিহ্ন ব্যবহারে ও ভাষার লালিত্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা মনোরম ও শ্রুতি সুখকর।

মৌলিক গ্রন্থ রচনা না করিয়াও সৃজন প্রতিভা ও সূক্ষ্ম রসানুভূতিতে অনুবাদও কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বক্ষ্যমান রচনাগুলিতে সুপ্রকাশিত।

"রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে

লাগিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে স্বল্প সময়েই সমস্ত কোশল রাজ্য সর্ব্বত্র সুখ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ তদীয় অধিকার কালে প্রজা লোকের যাদৃশ সৌভাগ্য সঞ্চার ঘটিয়াছিল, ভূমণ্ডলে কোনও কালে কোন রাজার শাসন সময়ে সেরূপ লক্ষিত হয় নাই।"

—সীতার বনবাস

"প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে। পরের পুত্র দেখিলে, মনে এত স্নেহোদয় হয়, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আর যাহার এই পুত্র, সে ইহারে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখ চুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অর্দ্ধ বিনির্গত কুন্দসম দন্তগুলি অবলোকন করে; যখন ইহার মৃদুমধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। আমি অতি হতভাগ্য, সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম।

—শকুন্তলা

"চন্দ্রভাগা শুনিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, ভগিনি, যত অভ্যাস কর না কেন, কখনই অবিরক্ত চিত্তে সংসার ধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবে না। পুরুষের পদে পদে অত্যাচার; কত সহ্য করিবে বল। তুমি পুরুষের আচরণের বিষয় সবিশেষে জান না, এজন্য ওরূপ বলিতেছ, যখন ঠেকিবে তখন শিখিবে; এখন মুখে ওরূপ বলিলে, কি হইবেক। বিশেষতঃ পরের বেলায় আমরা উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু; আপনার বেলায় বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে; তখন বিবেচনাও থাকে না, সহিষ্ণুতাও থাকে না।"

—ভ্রান্তিবিলাস

অনুবাদ ভিন্নও রচনা মাধুর্য্যের নিদর্শন।

"কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমার ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ফলকথা এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সৎগুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি আমার হৃদয় মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগ্য হইয়াছে সে যদি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

—বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের শক্তিশালী লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা আলোচনা করিব। বঙ্কিমচন্দ্র ও নাট্যকার দীনবন্ধু বাংলা লিখিবার জন্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট যেরূপ ঋণী, অক্ষয়কুমার দত্তও তদ্রূপ ঋণী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অক্ষয়কুমার দত্তকে বাংলা-রচনা সম্বন্ধে প্রথমদিকে নানাবিধ সহায়তা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য-রচনা ছিল অক্ষয়কুমার দত্তের আদর্শ। তাঁহার রচনার ভাষা গুরু ঈশ্বরচন্দ্রেরই অনুরূপ—স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও মনোহর। যদিও প্রধানতঃ ইংরাজী সাহিত্যের রচনাভাণ্ডার হইতে অক্ষয়কুমারের অনেক রচনা আহরিত, তথাপি অনুবাদের দোষ তাহাতে স্পর্শ করে নাই। অক্ষয়কুমারের রচনা প্রণালীর অনুকরণে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকে গ্রন্থ রচনা করেন। অক্ষয়কুমার প্রকৃতই জ্ঞানযোগী ছিলেন। ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, শরীরবিধান, তাড়িত-বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ের আলোচনা তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যায়। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের বিবিধ গ্রন্থ পাঠে তিনি তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা দ্বারা বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে কয়েকটী রচনা সংগৃহীত হইল।

(ক) "জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট,

জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষায় কত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্ল যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশায় যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোকসম্পন্ন সুচারু চিত্তপ্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটিরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়।"

(খ) "এখন আমাদের মানস-বিহঙ্গ সৌরজগতের পরিজ্ঞাত ভাগের প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছে। আর তাহাকে ক্ষান্ত করা যায় না। তাহার অপরিশ্রান্ত পক্ষসকল আর নিরস্ত হইবার নয়। অখিল বিশ্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, এমন অচিন্ত্য অননুভবনীয় সৌরজগৎকেও বৎসামান্য ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া বোধ হয়। অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডল তৃণক্ষেত্রস্থিত তৃণ ও বালুকা ক্ষেত্রস্থিত বালুকার ন্যায় অপরিসীম আকাশ ক্ষেত্রে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।"

(গ) ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, কতকগুলি পরম পবিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা সরোবরতটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপলাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী, সারল্য, বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া অপরিমেয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন আনন্দ প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইহারা দেবকন্যা হইবেন সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পাপুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ—ইঁহারা দেবকন্যাই বটেন এবং এই ধর্ম্মাচল ইঁহাদের বাসভূমি। ইঁহাদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি।"

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়চন্দ্র দত্তের গদ্য-সাহিত্যের ভাষা বহুকাল পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী লেখকগণের রচনার আদর্শ ছিল। এ কথাও সত্য যে, তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃতের মোহপাশ হইতে সম্পূর্ণ বিনির্ম্মুক্ত নহে। ঐ ভাষার নাম ছিল বিদ্যাসাগরী ভাষা। তখন সাধু ভাষা কেবল লেখায় নহে, কথোপকথনেও ব্যবহৃত হইত। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র একটি হৃদয়গ্রাহী সরস বর্ণনায় এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,

"তখন পণ্ডিতেরা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না, 'খদির' বলিতেন। কদাচ 'চিনি' বলিতেন না 'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য' বলিতেন। কদাচিৎ কেহ কেহ 'ঘৃত' নাগিতেন। 'কলা' বলা হইবে না, 'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। পণ্ডিতগণের কথোপকথনের ভাষা যেখানে এইরূপ হইয়াছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাংলা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য।" ঐরূপ ভয়ঙ্কর পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশ করেন। ইহার পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতুম পেঁচার নক্সা' উহার অনুকরণে রচিত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্র সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি শিক্ষা, সমাজ সংস্কার বিষয়ে 'অভেদী' 'আধ্যাত্মিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে সাধুভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন।

চলতি কথায় বাংলা সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি "আলালের ঘরের দুলাল"। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা আদর্শ ভাষা না হইলেও, গাম্ভীর্য্য ও বিশুদ্ধির অভাব থাকিলেও প্যারীচাঁদ দেখাইয়াছেন, যে বাংলা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায় এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুসারিণী ভাষায় দুর্লভ, এ ভাষায় তাহা সহজ গুণ। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত প্রথম তিনি তাহা এই গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করেন এবং তিনি প্রথম ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্বগামী লোকদের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্তভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। তিনিই দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে। তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন, যে সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়। তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।

"আলালের ঘরের দুলালে"র ভাষা আপনার স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। উহা সরল, স্বাভাবিক কথোপকথনের ভাষায় এরূপ সুন্দরভাবে রচিত যে পাঠমাত্রেই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ

করে। ঐ গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় এরূপ নিপুণতার সহিত বর্ণিত যে পড়িতে পড়িতে মনে হইবে যে উহার বিষয়বস্তু যেন জীবন্তভাবে চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। উহার প্রমাণের জন্য "আলালের ঘরের দুলালে"র কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

(ক) "রবিবারে কুঠীওয়ালারা বড় ঢিলে দেন। হচ্ছে হবে, খাচ্ছি খাব বলিয়া অনেক বেলায় স্নান আহার করেন। তাঁহার পরে কেহ বা ব'ড়ে টেপেন, কেহ বা তাস পেটেন, কেহ বা মাছ ধরেন, কেহ বা তবলায় চাটি দেন, কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন, কেহ বা শয়নে পদ্মলাভঃ ভাল বুঝেন, কেহ বা বেড়াতে যান, কেহ বা বই পড়েন, কিন্তু পড়াশুনা অথবা সৎকথার আলোচনা অতি অল্প হইয়া থাকে। হয় ত' মিথ্যা গাল-গল্প কিম্বা দলাদলির ঘোঁট, কি সাম্ভু তিনটা কাঁঠাল খাইয়াছে, এই প্রকার কথাতেই কাল ক্ষেপণ হয়।…ইতিমধ্যে চৌদ্দ বৎসরের একটি বালক গলায় মাদুলী, কানে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু সম্মুখে আসিয়া টিপ করিয়া গড় করিল। বেনুবাবু একমনে পুস্তক দেখিতেছিলেন, বালকের জুতার শব্দে চম্‌কিয়া উঠিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এসো বাবা মতিলাল এস, বাটীর সব ভালতো?"

(খ) "শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই। ওগো মরমেতে মরে রই"—টক্-টক্ পটার-পটার মিয়াজান গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে, টিটকারি দিতেছে ও 'শালার গরু চল্‌তে পারে না' বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। গরু দু'টা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছ্যাকড়া গাড়ীকে পিছু ফেলিয়া গেল। সেই ছ্যাকড়ায় প্রেম নারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন। গাড়ীখানা বাতাসে দোলে। ঘোড়া দু'টা বেটো ঘোড়ার, বাবা পক্ষিরাজের বংশ, টংয়স, টংয়স, ডংয়স ডংয়স করিয়া চলিতেছে, পটা-পট পটা-পট চাবুক পাড়তেছে, কিন্তু কোন ক্রমেই চাল বেগড়ায় না। প্রেম নারায়ণ দু'টা ভাত মুখে দিয়া সওয়ার হইয়াছেন। গাড়ীর হেঁকোচ হেঁকোচ শব্দে প্রাণ ওষ্ঠাগত। গরুর গাড়ী এগিয়ে গেল, তাহাতে আরও বিরক্ত হইলেন। …প্রেম নারায়ণ বিরক্ত হইয়া আপন মনের কথা আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন। চাকরি করা ঝকমারি, চাকরে কুকুরে সমান, হুকুম করলেই দৌড়তে হয়। মতে, হলা, গদার জ্বালায় চিরকালটা জ্বলে মরছি, আমাকে খেতে দেয় নাই। আমার নামে গান বাঁধিত, আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তায় ছোড়াদের টুইয়ে দিত ও মধ্যে মধ্যে আপনারাও আমার পেছনে হাততালি দিয়া হো হো করিত।"

(গ) "বৃষ্টি খুব এক পসলা হইয়া গিয়াছে, পথ-ঘাট পেঁচ পেঁচ সেঁত সেঁত করিতেছে। আকাশ নীল মেঘে ভরা মধ্যে হড়-মড় হড়-মড় শব্দ হইতেছে, বেঙগুলা আশে পাশে যাঁওকো যাঁওকো করিয়া ডাকিতেছে। দোকান পসারীর, ঝাপ খুলিয়া তামাক খাইতেছে। বাদলার জন্যে লোকের গমনাগমন প্রায় বন্ধ—কেবল গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া গায়িতে গায়িতে যাইতেছে ও দামো কাঁদে ভার লইয়া 'জাংপো বিসখা সে ফিরে মথুরা, পানে মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বৈদ্য বাটীর বাজারের পশ্চিমে কয়েকঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একজন বৃষ্টির জন্য আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। এক একবার আকাশের দিকে দেখিতেছে ও এক একবার গুন গুন করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল, 'ঘরকন্নার কর্ম্ম কিছু না পাইলে, হেদে ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর—ওদিকে বাসন মাজা হয় নি—ওদিকে ঘর নিকোন হয় নি, তারপর রাঁদাবাড়া আছে—আমি একলা মেয়েমানুষ, এ সব কি করে করব, আর কোন দিকে যাব আমার কি চাট্টে হাত চাট্টে পা?"

নাপিত অমনি খুরভাড় বগলদাবা করিয়া বলিল, "এখন ছেলে কোলে করবার সময় নয়—কাল বাবুরাম বাবুর বিয়ে, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।"

নাপতানী চমকিয়া বলিল, "ও মা আমি কোজ্জাব? বুড়ো ঢোম্না আবার বে করবে। আহা! এমন গিন্নি—এমন সতীলক্ষ্মী—তার গলায় আবার একটা সতীন গেঁথে দেবে—মরণ আর কি? ওমা, পুরুষজাত সব করতে পারে।" নাপিত আশা বায়ুতে মুগ্ধ হইয়াছে—ও সব কথা না শুনিয়া একটা টোকা মাথায় দিয়া সা সা করিয়া চলিয়া গেল।

'আলালের ঘরের দুলালে' অনেক অপ্রচলিত গ্রাম্য শব্দের, আরবি ও ফার্সী কথার অনেক প্রয়োগ আছে।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়চন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রধানতঃ সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা হইতে অনুবাদ। উহাতে উদ্ভাবনী শক্তির বিশেষ পরিচয় নাই। আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া কল্পনা-কুশলতা "আলালের ঘরের দুলালে" পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, সংস্কৃত ভাষাকে দূরে পরিহার করিয়া খাঁটি বাংলায় গ্রাম্য ভাষায় ভাব প্রকাশ।

যখন কেহ একটা নূতন সংস্কার করিতে চাহেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে একটা প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়। প্যারীচাঁদ ইহা ভালরূপেই জানিতেন এবং তজ্জন্য "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশের সময় "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই ছদ্মনাম তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে আলাপী ভাষার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নিশিতসার অজস্রধারে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। একদিকে সংস্কৃতভাষার বাহুল্য, অন্যদিকে গ্রাম্য ভাষার প্রাচুর্য্য, ইহার কোনটি লোকের রুচিকর হইল না। এই সন্ধিক্ষণে মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় আলোক অপরূপ ভাবে প্রকাশিত হইবার অবকাশ লাভ করিল। [ক্রমশঃ

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীমোহিনী চৌধুরী

তাড়ির ভাঁড়টা যে ছিদাম হঠাৎ ময়নার কপালে ছুঁড়িয়া মারিবে একথা কেহ ভাবিতে পারে নাই।

কি আর এমন দোষ করিয়াছে ময়না?

সারাটা মাস পরের বাড়ীতে ঝি-গিরি করিয়া যে তিনটা টাকা সে রোজগার করিয়াছে তাহা যদি ঘরের মানুষ তিন দণ্ডের নেশায় উড়াইয়া দেয়, কাহার না তাহাতে রাগ হয়? একে ত' ও-বাড়ীর মেজ-গিন্নী আজ মিছামিছি ময়নাকে কয়টা কড়া কথা শুনাইয়াছে, তাহার উপরে ঘরে আসিয়া দেখে এই কাণ্ড! ছিদাম তাহার পেয়ারের বন্ধুদের লইয়া তাড়ি খাইয়া ফূর্ত্তি করিতেছে। রাগে ময়নার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছিল। ছিদাম নিজে একটা পয়সা উপায় করিতে পারে না—বউয়ের তোরঙ্গের তালা ভাঙ্গিয়া টাকা চুরি করিয়া সে ঘরে বসিয়া হল্লা করে কোন্ আক্কেলে? বন্ধুগুলাও জুটিয়াছে তেম্নি—জুয়াড়ী আর গুণ্ডার দল। তাহারাই ত' মতলব দিয়া দিয়া ছিদামের মাথাটা খাইয়াছে। ঐ যে বাব্‌রীচুলওয়ালা লোকটা—নেহ্‌লা না কি যেন নাম—ওইটাই হইতেছে সকলের চাইতে পাজী। কত আস্পর্দ্ধা বদমায়েসের! ময়নার আঁচল টানিয়া ধরিয়া বলে কি না: 'মাইরি বৌদি, তুমি যেন ঠিক স্বর্গের অপ্সরী, এসো না—একভাড় অম্রেত মুখে দাও।' ময়নার ইচ্ছা হইয়াছিল লাথি মারিয়া মুখপোড়ার মুখ ভাঙ্গিয়া দেয়। তবু সে সোয়ামীর খাতিরে তাহারি গালে শুধু একটা চড় মারিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু ছিদাম যখন সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বোকার মত হি-হি করিয়া হাসিতে সুরু করিল তখন আর ময়নার সহ্য হইল না। টান মারিয়া সে ছিদামের সুমুখ হইতে মাংসের চাট আর পিঁয়াজবড়ার ঠোঙাটা বাহিরের নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিয়াছিল। ইহাতেই ছিদাম ক্ষেপিয়া গেল। তাড়ির ভাঁড়টা এমনভাবে ময়নার কপালে ছুঁড়িয়া মারিল যে আর একটু হইলেই বাঁ' চক্ষুটা গিয়াছিল আর কি! ময়নার ভুরু কাটিয়া কানের পাশ দিয়া দরদর্ করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

যন্ত্রণায় ময়নার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল, তবু সে একটি টুঁ শব্দও করিল না। দুইহাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া পাশের খুপরীতে ঢুকিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল। ঘরে চূণও নাই, চিনিও নাই—কি দিয়া আর রক্ত বন্ধ করিবে? একখণ্ড ময়লা ন্যাকড়া কপালে জড়াইয়া স্যাৎসেঁতে মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোর যখন কাটিল তখন বড় বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিতেছে। ময়না অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া খুপরীর দরজা খুলিয়া দেখিল পাশের ঘরের দরজাটা হা-হা করিতেছে খোলা। এত রাত্তির হইয়াছে এখনও ছিদাম আড্ডা হইতে ফেরে নাই। বস্তিটার এদিকে একটা তেলের পিদীমও নাই। গলির মোড়ে যেখানে জঞ্জাল ফেলিবার টিনটা আছে সেখানে একটা গ্যাসের বাতি আলোদানার মত দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর তাহারই নীচে বসিয়া মূর্ত্তিমানেরা দল পাকাইয়া জটলা করিতেছে। জুয়া-খেলা চলিতেছে বোধ হয়। ভারী বিচ্ছিরী লাগে ময়নার উহাদের এই সব সর্ব্বনাশা স্বভাব! বাজী রাখিয়া পাল্লা দিয়া চতুর হওয়ার মধ্যে কি যে বাহাদুরী আছে কে জানে? কিন্তু রাত্রির পর রাত্রি পাহারাওয়ালার চোখ এড়াইয়া মরণ-খেলা উহাদের না খেলিলেই নয়। যে হারে তাহার তবু কিছু ভরসা আছে কিন্তু যে জেতে তাহার আর রক্ষা নাই। লোভের খানায় পড়িয়া খাবি খাইতে খাইতে সে ডুবিয়া মরিবেই।

ময়না খানিকক্ষণ বাহিরের অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—অন্ধ ভবিষ্যতের বীভৎস মূর্ত্তিটা একবার দেখিয়া লইল হয় ত'। তারপর কপাট দুইটা বন্ধ করিয়া দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বুকের হাঁপর হইতে ঝড়ের মত বাহির হইয়া আসিল। মাটির কলসী হইতে একঘটি জল গড়াইয়া সে চক্ চক্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। তারপর মাটির দেয়ালে ঠেস্ দিয়া সে চক্ষু চিরিয়া দেখিতে লাগিল কাঙালের ঠাকুর তাহার অন্ধকার ঘরের এক কোণে লুকাইয়া আছেন কি না।

*

সত্যসত্যই ভগবান আছেন কি না কে জানে? কিন্তু শয়তান যে সহরের পথে ঘাটে মুখোস পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এমনই এক শয়তানের পাল্লায় এক দিন শেষে পড়িতে হইল ময়নাকে। ও বাড়ীর মেজ-কর্ত্তা যখন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ ময়না, কাল বাগানবাড়ীটায় আমার চেনাশুনা কয়েকজন ভদ্রলোক আসছেন—একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি তাদের জন্য, তোমাকে সারাদিন সেখানে থেকে সমস্ত কাজকর্ম্মের যোগার করে দিতে হবে।" তখন সে সরল বিশ্বাসেই তাহাতে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু বাগানবাড়ীতে মেজ-কর্ত্তা ও তাঁহার বন্ধুরা তাহাকে লইয়া যে বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ডটা শেষ পর্য্যন্ত করিলেন তাহা ভাবিতেও লজ্জায় ও ঘেন্নায় ময়নার সারা শরীর রী-রী করিয়া ওঠে। ইঁহারাই নাকি সহুরে ভদ্রলোক! নচ্ছার মেঘলাটাও যে ইঁহাদের চেয়ে অনেক বেশী সভ্য। আর যাই হউক, পরের বৌয়ের ইজ্জৎ লইয়া এমন ছেলেখেলা ত' সে কখনো করে না।

ঝি-গিরি ময়না ছাড়িয়া দিল। এতসব কেলেঙ্কারীর পরে আর ও বাড়ীতে তাহার কাজ করা চলে না। টগর বলিয়াছিল পান বেচিতে। কিন্তু গেরস্থঘরের বউ কি কখনো পান-উলী হতে পারে? ময়না ত' দেখিয়াছে—কি বেহায়ার মত টগর পানের চুবরী লইয়া বসিয়া থাকে সেই বায়স্কোপ-বাড়ীটার সুমুখে। দারোয়ান, বিড়িওলা হইতে সুরু করিয়া ইস্কুল-কলেজের বাবুরা পর্য্যন্ত একটা পান কিনিবার ছুতায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত হাঁ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকে—সুবিধা পাইলে দুই একটা ঠাট্টা-তামাসা করিতেও ছাড়ে না। পান বেচিবার নামে অমন করিয়া নিজের মান সম্ভ্রম বেচিতে ময়না পারিবে না। তাহার চাইতে বরং এই-ই ভাল। পুরানো খবরের কাগজ দিয়া ঘরে বসিয়া ঠোঙা তৈয়ারী করিতে এমন কিছু হাঙ্গামা নাই। বাতাসী তাহাকে কায়দাটা শিখাইয়া দিয়াছে। আয় অবশ্য ইহাতে খুব বেশী হয় না; তবু মাঝে মাঝে রাস্তা হইতে গোবর কুড়াইয়া যদি কয়েকগণ্ডা ঘুঁটে তৈয়ারী করা যায়, তবে একবেলার খোরাকীটা কোন রকমে জুটিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ফ্যাসাদ বাধিয়াছে ছিদামকে লইয়া। তেলকলের চাকুরীটা যাওয়ার পর আর একটা কাজকর্ম্মের যোগারও সে করিল না। মরদলোক—ইচ্ছা করিলে তাহারা কি না করিতে পারে? আর কিছু না হউক, মোট বহিয়াও ত' দুইটা পয়সা ঘরে আনিতে পারে। ময়নার কথায় অতিষ্ঠ হইয়া ছিদাম অবশ্য একবার গিয়াছিল রিক্সা টানিতে। কিন্তু অমন বদ-মেজাজী লোকের এসব কাজ পোষাইবে কেন? প্রথম দিনেই কোথায় কোন্ এক সওয়ারীর সহিত ঝগড়া-মারামারি করিয়া একরাত্তির হাজতঘরে কাটাইয়া ফিরিয়াছে। তারপর আর কখনও কাজের দিকে ঘেঁসে নাই। কেবল তাস খেলিয়া, তাড়ি খাইয়া আর ময়নাকে গালি-মন্দ ও মার-ধর ক'রয়া দিন কাটাইতেছে। কিন্তু এমন করিলে সংসার চলিবে কিসে? বাড়ীউলী মাসী ত' দুইবেলা নথ নাড়িয়া শাসাইয়া যাইতেছে। মাসে দুইটাকা করিয়া ঘরভাড়া দেওয়ার কথা—তিন মাস হইল একটা আধলাও তাকে দিতে পারে নাই। ভাগ্যে বাতাসী বাসনপত্তর বেচিয়া যে পুরাণো কাপর-চোপর পায় তাহা হইতে ছেঁড়াফোঁড়া দুই একখানা ময়নাকে পরিতে দেয়, নইলে লজ্জাটুকু ঢাকাও যে তাহার অসাধ্য হইয়া পড়িত। তাহার নিজের পেটের কথা একেবারেই সে ভাবে না—একগাল মুড়ী আর একঘটি জল খাইয়াই মেয়েমানুষ দুইদিন কাটাইয়া দিতে পারে। কিন্তু ছিদাম? পেট ভরিয়া ডালভাত না খাইলে সে যে দিনকে দিন নেহাৎ কাহিল হইয়া পড়িবে।

ছিদামও যে এসব কথা একেবারে ভাবে না তাহা নয়। কিন্তু কি করিবে সে? ক্ষিদায় পেটটা যখন চোঁ-চোঁ করিয়া উঠে, ঘরে আসিয়া দেখে একমুঠা ছাতুও কোথাও নাই। দুই একটা লাথি-ঝাঁটা খাইলে ময়না তবু তাহার পাঁচ-ফোড়নের কৌটাটা হইতে গোটা কতক পয়সা বাহির করিয়া দেয়, এক চুমুক তাড়ির দামও তাহাতে হয় না, শেষ পর্য্যন্ত এক কল্কি গাঁজা বা এক ছিলিম তামাক খাইয়াই কোনরকমে দিনটা কাটাইতে হয়। মেঘলা ব্যাটা কিন্তু বেশ আছে! কোথা হইতে পয়সা পায় ভগবান্ জানেন। ছাঁচি পানে ঠোঁট রাঙাইয়া, বাবরীচুলে টেরি কাটিয়া, রেশমী গেঞ্জী গায়ে পরিয়া নবাব পুত্তুরের মত দিন-রাত্তির আড্ডা মারিয়া বেড়ায়। ছিদাম তাহাকে ধরিয়াছিল। রোজগারের একটা উপায় বাতলাইবার জন্য। মেঘলা তাহাকে একটা ভালো

বুদ্ধিই দিয়াছে। সারে তেরোগণ্ডা পয়সা মুখের মধ্যে রাখিয়া একটা লেংটি পরিয়া ভোর হইতে না হইতে "স্বপ্নপুরী" সিনেমার লোহার দরজার সুমুখে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দারুণ ভীড় জমিয়া উঠে। সারে আটটার সময়ে টিকিট-ঘর যখন খোলে, তখন পাশের লোকের কাঁধে ভর দিয়া সকলের মাথার উপর চড়িয়া বসিতে হয়। তারপর লোকগুলার কিল-ঘুষো সহ্য করিয়া, পুলিশের চাবুক খাইয়া, দরোয়ানের লাঠি হইতে মাথা বাচাইয়া কোন-রকমে মাথার উপর দিয়া বাঁদরের মত হামাগুড়ি দিতে দিতে টিকিট বিক্রীর গর্ত্তটার কাছে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতে হয়। পাঁচসাতবার এরকম করিতে পাড়িলেই খান পঁচিশেক টিকিট কেনা যায়। তারপর বিকাল বেলায় কিছুক্ষণ "ফোর্থ-কেলাস ছে' আনা," "থার্ড কেলাস এগার আনা" করিতে পারিলেই সুদে আসলে মজুরী উঠিয়া আসে। দরোয়ানের হৈনীখরচ, লালপাগরীর প্রণামী যোগাইয়াও প্রায় পাঁচসাত-সিকা মুনাফা থাকে। তাহা দিয়া তাড়ি খাও, জুয়া খেল, এমন কি পটলীর ঘরে গিয়া তবলা বাজাইয়া খেমটা গান শোন—কুছ্ পরোয়া নাই। মেঘলার কাছেই ছিদাম গুণ্ডাগিরির হাতে খড়ি লইল। মেঘলা ভরসা দিল যে, সাতদিনের মধ্যেই সে ছিদামকে শিখাইয়া পড়াইয়া লায়েক করিয়া দিবে।

এসব কথার কিছুই ময়না জানিত না। টগরই আসিয়া প্রথমে তাহাকে খবরটা দিল। পান বেচিতে গিয়া সে দেখিয়াছে ছিদাম কেমন মারামারি করিয়া সিনেমার টিকিট যোগাড় করিয়াছে। 'স্বপ্নপুরী' সিনেমায় "কলঙ্কিনী" বইটা নাকি খুব ভাল হইয়াছে। তাই গুণ্ডাদের মধ্যে পর্য্যন্ত টিকিটের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেকেই সামনের লোকের গায়ে পিন্ ফুটাইয়া, কাহারও বা কাছা টানিয়া ধরিয়া নিজের নিজের সুবিধা করিয়া লইয়াছে। ছিদাম ত' একটা লোকের কানই কামড়াইয়া ছিড়িয়া নিয়াছে।

ছিদামের কীর্ত্তি শুনিয়া লজ্জায় ময়নার মাথা কাটা যাইতেছিল। রোজ সকালে খবরের কাগজ বিক্রী না করিয়া কেন যে ছিদাম ওরকম ছোটলোকের কাজ করিতে যায় ময়না তাহা ভাবিয়া পায় না। শরীরটা ভাল থাকিলে সে ইহা লইয়া ছিদামের সহিত তুমুল বাধাইত। কিন্তু আজ কয়দিন হইল ময়নার সব সময়ে কেমন যেন গা বমি-বমি করিতেছে, রোজ বিকালে একটু করিয়া জ্বরও হয় বোধ হয়। সেদিন ত' ঘুঁটে দিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। বাতাসী তাই আজকাল আর তাহাকে কোন কাজে হাত দিতে দেয় না। বাতাসী নিজে কত কাজ করে। ঠোঙ্গা-তৈরী, ঘুঁটে দেওয়া, বাসন-বিক্রী এসব ত' আছেই, তাছাড়া আবার মাঝে মাঝে দোকানে দোকানে গিয়া খৈ-মুড়ী ভাজিয়া দিয়া আসে। সংসারে তাহার আপনার বলিতে ত' আর কেহ নাই। তবু পাড়া-পরসীর জন্যেই তাহার এত মাথা ব্যথা। ফুরসুৎ পাইলেই সে ময়নার ঘরে আসিয়া তাহাকে সাবধান থাকিতে বলিয়া যায়। বলে, "ময়নাদি, তুমি মরো তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু তোমার ঘরে যে রাজপুত্তুর না রাজ-কন্তে আসছেন তাকে যেন একটুও কষ্ট দিও না।" ময়নার যে শীগ্গির ছেলে-পুলে হইবে একথা বাতাসী কেমন করিয়া টের পাইল কে জানে? টগর আবার সেদিন বলিয়া গেল যে বাতাসী নাকি আজকাল পুরানো কাপড় দিয়া ছোট ছোট কাঁথা বুনিতে সুরু করিয়াছে, শুধাইলে বলে, "আমার বোন-পো কিম্বা বোনঝি শীগ্গিরই আসছে যে—তাদেরকে শোয়াতে হবে তো।" আচ্ছা, পাগলীই বটে! কবে কি হইবে তাহার ঠিক নাই, আগে হইতেই পাড়াময় সোর তুলিয়া দিয়াছে।

ছিদাম কিন্তু ঘর-সংসারের কোন খোঁজই রাখে না। ময়না বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে সে-খবর সে জানে কিনা সন্দেহ। কখন্ সে ঘরে আসে আর কখনই বা বাহিরে যায় তাহার কিছুই ঠিক নাই। রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় হয় ত' একদিন ঘরে ফিরিল—ময়নার শিয়র হইতে তেলসিটা বালিশটা টানিয়া লইয়া ময়নারই পাশে ছেঁড়া চাটাইটার উপর শুইয়া পড়িল, আবার কোনদিন বা সারারাত্তির বাহিরেই কাটাইয়া আসিল। কখন্ যে সে কোথায় থাকে তাহার পাত্তা মেলাই ভার। ময়নার ভয় হয়, হয় ত' বা ছিদাম সত্যসত্যই চোর-ডাকাতের দলে ভিড়িয়াছে। তাই যদি না হইবে, তাহা হইলে ছিদামের কাছে অমন চক্চকে ছোরাখানাই বা আসিল কোথা হইতে? সেদিন ভোররাত্তিরে বাড়ী ফিরিয়া ছিদাম কি একটা জিনিষ তাড়াতাড়ি ছাইগাদায়

নীচে লুকাইয়া রাখে। ময়না শেষে গিয়া দেখে একখানা ধারালো ছোরা, তাহা দিয়া মুরগী-জবাই কেন, মানুষ-খুন পর্য্যন্ত করা চলে। অবশ্য এসম্বন্ধে কোন কথা ছিদামকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ময়নার সাহসে কুলায় নাই। যা বদরাগী ছিদাম, রাগিয়া গিয়া হয় ত' ঐ ছোরাখানা ময়নার বুকেই বসাইয়া দিবে।

কিন্তু সত্যকথা নাকি কখনো চাপা থাকিতে পারে না। ছিদামও শেষে একদিন ধরা পড়িয়া গেল। কয়দিন ধরিয়া ময়না পেটের যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইতেছিল। তলপেটে হঠাৎ এমন একটা ফিক্‌ব্যথা উঠে যে শুইয়া বসিয়া কিছুতেই আর শান্তি পাওয়া যায় না। ব্যথাটা যতক্ষণ না মরিয়া যায় ততক্ষণ কেবলি ছটফট করিতে হয়। বাতাসী আসিয়া তেল-মালিশ করিয়া দেয়, গরম জলের সেক দেয় তবে ব্যথাটার একটু আরাম হয়। সেদিন রাত্তিরেও বাতাসী ময়নার তলপেটে গরমজলের সেক দিতেছিল। ময়না মাঝে মাঝে অসহ্য যাতনায় কোঁকাইয়া উঠিতেছিল। এপাড়ার দাই পাঁচির মা ঘরে নাই—ও-বাড়ীর মেজ-গিন্নিকে সে খালাস করিতে গিয়াছে। এত রাত্তিরে নিবারণ ডাক্তারকে ডাকিতে গেলেও সে ডবল ভিজিট চাহিবে। আর ডাকিতেই বা যাইবে কে? বাতাসী নিজে ত' এক মুহূর্ত্তও পোয়াতির কাছ ছাড়িয়া নড়িতে পারে না। ময়না যে-রকম করিতেছে, তাহাতে কখন কি একটা আপদ বিপদ ঘটে তাহার ঠিক নাই। ছিদাম বাড়ীতে থাকিলে তবু একটা ব্যবস্থা করা যাইত কিন্তু মেঘলা, ছিদাম সকলে মিলিয়া সেই সাজরাত্রে কোথায় যে বাহির হইয়াছে কে জানে? ডাকিয়া ডাকিয়া বাতাসী টগরেরও সাড়া পাইল না। ঘুমাইয়া পড়িয়াছে হয় ত'। কাজেই কি আর করা যাইবে? সেক দিতে দিতে একমনে বাতাসী কেবল মা-কালীর নাম করিতে লাগিল।

শেষ রাত্তিরে পোয়াতির ব্যথা একটু নরম পড়িল। ময়না একটু ঠাণ্ডা হইয়া ঘুমাইতেছে—সারারাত্তির জাগিয়া বাতাসীর চোখেও একটু ঝিম্ ধরিয়াছে—এমন সময়ে টলিতে টলিতে ঘরে ফিরিল ছিদাম। ছিদাম আজ বেশী তাড়ি খায় নাই, কিন্তু বেদম মার খাইয়াছে। একখানা লাঠি এমন বে-কায়দায় তাহার মাথায় পড়িয়াছে যে মাথাটা এখনও বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। অনেক মেহনৎ করিয়া চোরাই মাল লইয়া সে পলাইতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু গা-গতরে এখন আর তাহার কোন পদার্থ নাই। সে ঘরে ঢুকিয়াই মেঝেতে গড়াইয়া পড়িল। ঘুম কিন্তু কিছুতেই তাহার চোখে আসিল না। চোরাই মাল ঠিকমত সামলাইয়া রাখিতে না পারিলে তাহার সোয়াস্তি নাই। ছিদাম চাহিয়া দেখিল ময়নার মাথাটা বালিশ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। বালিশটাকে সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া টানিয়া লইল। বালিশটাকে আড়ালে রাখিয়া সে কি যেন খানিকক্ষণ ধরিয়া টুকিটাকি করিল। তারপর বালিশটাকে আবার সে ময়নার মাথার নীচে ঠেলিয়া দিল।

ভোরবেলায় একটা সিটির আওয়াজ শুনিয়া বাতাসীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ময়না আর ছিদাম তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে। বাতাসী চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া দেখিল একপাল পুলিশ তাহাদের ঘর ঘেরাও করিয়াছে। ঘরের ভিতরেও কয়েকটা জমাদার আসিয়া চড়াও হইয়া ঢুকিয়াছে। বাতাসী ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছিদামকে ডাকিতে যাইবে এমন সময়ে এক লালমুখো সাহেব ছিদামের পেটে পায়ের বুট দিয়া এক গুঁতা লাগাইল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল ছিদাম। বসিবামাত্রই একটা জমাদার তাহার হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিল। তারপর সুরু হইল খানাতল্লাসী। এটা টানিয়া, ওটা ফেলিয়া, সেটা ভাঙ্গিয়া জমাদারেরা সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। ময়না ত' জাগিয়া উঠিয়া সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে-ভাবনায় হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিয়া কত যে আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সাহেব ত' আর ময়নার কান্না শুনিতে আসে নাই। এক ঝটকা মারিয়া সে ময়নার হাত হইতে নিজের পা ছাড়াইয়া লইল। তারপর হঠাৎ ময়নার বালিশটা তুলিয়া ধরিয়াই সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। দেখা গেল, বালিশটার একপাশে একটা ছেঁদার মুখ সেফটিপিন দিয়া আটকানো রহিয়াছে। সেফটিপিন খুলিয়া সাহেব বালিশের তুলার মধ্য হইতে একছড়া সোনার হার, দু'গাছা সোনার বালা আরও কি কি যেন টানিয়া বাহির করিল। বাতাসী ও ময়নার শত মিনতিতেও আর কোন ফল হইল না। পুলিশের লোক ছিদামের কোমড়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে

থানার দিকে লইয়া চলিল। বুক-ফাটা চীৎকার করিয়া ময়না পাগলীর মত উঠি-পড়ি করিতে করিতে গলিটার মোড় পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেল। সেখানে হঠাৎ সে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া ছিদামের পা হইতে খানিক ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল। তারপর তীব্র একটা আর্ত্তনাদ করিয়া সেখানেই সে বেঁহুস হইয়া পড়িয়া গেল।

ছিদামকে শেষ পর্য্যন্ত যাইতে হইল জেলে। ডাকাতির দায়ে তাহার সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হইল। গারদখানায় কোথাও একটা দরদী লোক নাই। পুলিশগুলা যেন মানুষকে পিষিয়া মারিবার এক একটা যাঁতাকল। জেলে গিয়া সারাদিন ঘানি টানো, পাথরভাঙ্গো, লোহা পিটাও—একটু যদি গাফিলতি হইয়াছে তাহা হইলে আর শাস্তির হাত হইতে নিস্তার নাই। মুখ বুজিয়া সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, একটি টুঁ শব্দও কেহ করিতে পারিবে না। ছিদামের মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে পাথরের দেয়ালে মাথা খুড়িয়া মরিতে। জীবনের হাসি-খেলা আনন্দের পুঁজি তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন কেবল দুঃখ কষ্টের বোঝা বহিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? লোহার গারদের ফাঁক দিয়া সে ফাঁকা আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। দেখে, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী মনের সুখে ডানা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, মেঘগুলা দুরন্ত ছেলের মত এদিকে-ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। ছিদাম ভাবে দরজা ভাঙিয়া, পাঁচিল ডিঙাইয়া সে যদি কোন রকমে জেলখানা হইতে বাহির হইতে পারিত, তবে আবার হয় ত' সে স্বর্গের মুখ দেখিতে পাইত। জেলখানার বাহিরের আলো-বাতাস সকল কিছুই এখন তাহার কাছে পরম লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ছিদামের মনে হয় সে যেন নরকে আসিয়াছে। সহরের কুৎসিৎ আবহাওয়ায় পড়িয়া এতকাল সে মহাপাপ করিয়াছে—নিজের জীবন, ময়নার জীবন আরও কতজনের জীবনের যে সে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ত'। তাই জেলখানার সমস্ত লাঞ্ছনা মাথা পাতিয়া ছিদাম নরকবাসেই একযুগ কাটাইয়া দিল।

* * *

জেলখানা হইতে যেদিন ছিদাম খালাস পাইল, সেদিন সে যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। পুরানো সহরটা যেন তাহার চোখে একেবারে নূতনতর লাগিতেছে। নূতন রাস্তাঘাট, নূতন বাড়ী-গাড়ী সমস্ত কিছু যেন নূতন সাজ পরিয়া তাহার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। পটলীর কথা ছিদামের মনে পড়িয়া গেল। সেও রোজ সন্ধ্যায় গা-ধুইয়া, মুখখানাকে ঘসিয়া মাজিয়া, রঙীন সাড়ী পরিয়া মাঠকোঠার দরজায় দাঁড়াইয়া পথের লোকের মন ভুলাইবার চেষ্টা করে। যে-বাবুটি সিল্কের জামা, সোনার বোতাম, ঘড়ি ও ঘড়ির-চেন লইয়া সন্ধ্যাবেলায় তাহার ঘরে ঢোকে, পরের দিন সকালে তাহাকে খালি গায়ে খালি পায়ে টলিতে টলিতে ঘরের বাহিরে আসিতে দেখা যায়—একটা কাণা কড়িও তাহার হাতে থাকে না। তবুও লোকের আক্কেল হয় না। পটলীর ঘরে যেমন রোজ রাত্তিরে একটির পর একটি 'বাবু' আসিয়া জোটে, তেমনি সহরের বিজলী-বাতি দেখিয়া দেওয়ালী পোকার মতো গাঁয়ের লোকগুলা মরণনেশায় ছুটিয়া আসে—পায়রার খোপের মত ছোট ছোট ঘরে ভীড় করিয়া বাসা বাঁধিয়া থাকে।

কেবল ভীড় আর ভীড়। কোথাও রেডিও বাজিতেছে একদল লোক হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই শুনিতেছে, কোথাও ডুগ্‌ডুগি বাজাইয়া বাঁদর নাচ চলিতেছে—তাই দেখিবার জন্য ছেলে-বুড়ো চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। ট্রামে-বাসে, সিনেমা-রেষ্টুরেণ্টে ঘেসাঘেসি ঠেসাঠেসি করিয়া মানুষের আনাগোনা চলিতেছে। ছিদামের ভয় হইল এই ভীড়ের মধ্যে সে তাহার চলার পথ না হারাইয়া ফেলে সাত বছর পরে সে তাহাদের সেই পুরাণ বস্তির পাড়াটাকে খুজিয়া বাহির করিতে পারিবে ত'? হয় ত' এতদিনে সেখানে নূতন নূতন দালান উঠিয়াছে···মেঘলা-ওরা হয় ত' পাড়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ময়নাকে বাড়ীউলী মাসী তাহার ঘর হইতে উঠাইয়া দিয়াছে নিশ্চয়···বাতাসী যদি থাকে তবে তাহার কাছে ময়নার হদিস্ পাওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু সাত বছর পরে ময়না আবার ছিদামকে চিনিতে পারিবে কি না কে জানে?

নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে ছিদাম অনেক রাস্তা ঘুরিয়া বেলা দুপুরের সময় তাহাদের পুরানো পাড়ায় আসিয়া পৌছাইল। দেখিল, বস্তিটার বেশী কিছু অদল বদল হয় নাই। সেই গলিটা তেমনই আছে। তাহার সেই পুরানো

ঘরখানা খুঁজিয়া বাহির করিতে ছিদামের দেরী হইল না। দরজায় ধাক্কা দিতেই একটী ছোট মেয়ে আসিয়া কবাট খুলিয়া দিল। ছিদাম তাহাকে বলিল, "ময়নাকে ডাকো ত' খুকী, বলো ছিদাম এসেছে।" মেয়েটী কিছুক্ষণ ছিদামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ছিদামের কথাগুলি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যেন। তারপর কি মনে করিয়া ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। কাহাকে যেন ডাকিয়া বলিল, "মাসি, মাসি, কে একজন লোক এয়েছে দেখে যাও।"

বাতাসী বাহিরে আসিয়া ছিদামকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল। বাতাসীকে দেখিয়াই ছিদাম সুধাইল, "ময়না কোথায়?" বাতাসী কোন কথা না বলিয়াই তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া বসাইল। তারপর নিজেও তাহার পাশে বসিয়া ছোট মেয়েটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল। কাঁপড়ের আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ময়না'টা তোমার উড়ে গেছে ছিদামদা, তাই এই টুনটুনিটাকে পুষেছি।" কথা বলিতে গিয়া চাপাকান্নায় বাতাসীর গলা ভারী হইয়া আসিল।

বাতাসীর কাছে একটু একটু করিয়া ছিদাম ময়নার মরণের সমস্ত কাহিনীই শুনিল। কেমন করিয়া বাতাসী অসুস্থ ময়নাকে লইয়া হাঁসপাতালের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, টাকাপয়সা নাই বলিয়া বড় কর্ত্তারা কেমন করিয়া তাহাদের কুকুর বিড়ালের মত ফিরাইয়া দিয়াছে। রাস্তার প্রস্রাবখানায় "টুনটুনি"কে প্রসব করিয়া ময়নার যখন ধনুষ্টঙ্কারের মতন অবস্থা তখন রাস্তার লোক পুলিশ ডাকিয়া তাহাদের কত হেনস্তা করিয়াছে; ময়নার মরা লইয়া শেষ পর্য্যন্ত বাতাসীকে কত দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে, টুনটুনিকে বাঁচাইবার জন্ত বাতাসী প্রাণপণে কত চেষ্টা করিয়াছে—একের পর এক করিয়া সমস্ত কথাই ছিদাম রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিয়া গেল। রাগে দুঃখে তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। তবু সে কোন কথা বলিল না, একফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না। কি ভাবিয়া হঠাৎ সে বাতাসীর কোল হইতে টুনটুনিকে ছিনাইয়া লইল। মেয়েটাকে দুইহাতে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া সে পাগলের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বাতাসী কত ডাকিল, "ছিদামদা, আমার মাথা খাও অমন ক'রে তুমি চ'লে যেও না। তোমার পায় পড়ি, একবারটি ফিরে এসো।" ছিদাম তাহাতে সাড়া দিল না, একবার পিছন দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। চোর যেমন পরের সম্পত্তি চুরি করিয়া ছুটিয়া পালায়, সেও তেমনি তাড়াতাড়ি দিশাহারা হইয়া চলিতে লাগিল।

একখানা গাড়ী আর একটু হইলেই ছিদামের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল আর কি। একরাশ ধুলা আসিয়া তাহার নাকে-মুখে ঢুকিল। কাশিতে কাশিতে ছিদামের দম বন্ধ হইয়া আসিল—হঠাৎ তাহার গলা চিড়িয়া বাহির হইয়া আসিল এক ঝলক রক্ত। ছিদাম প্রথমে ভাবিয়াছিল পানের পিক্, কিন্তু একটু পরেই তাহার খেয়াল হইল 'স্বপ্নপুরী' সিনেমার সুমুখে টগর তাহাকে একটা পান খাইবার জন্ত সাধিয়াছিল বটে কিন্তু সে ত' তাহার কথায় কান না দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। গলা হইতে রক্ত উঠিতে দেখিয়া ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিল—সে যেন দিনেদুপুরে ভূত দেখিয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মুখচোখের চেহারা মড়ার মত ফ্যাকাসে হইয়া গেল। টুনটুনিকে সে প্রাণপণে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। তারপর যে রাস্তাটা সহর হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া সহরতলী পার হইয়া পাড়াগাঁয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে সেই পথ ধরিয়াই সে পাগলের মত ছুটিতে সুরু করিল।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে এমন সময়ে ছিদাম আসিয়া পৌঁছিল একটা গ্রামের শেষ সীমানায় ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে। পানাপুকুর হইতে এক আঁজলা জল খাইয়া টুনটুনি তাহার কোলে ঘুমে এলাইয়া পড়িয়াছে। সারাদিন হাঁটিতে হাঁটিতে ছিদামও একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মন্দিরের সিঁড়িটার উপর সে একটু মাথা কাৎ করিল। চোখের পাতা দুইটা তাহার ধীরে ধীরে বুজিয়া আসিল। তবু সে যেন দেখিতে পাইল, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। একখানি কুঁড়ে ঘরের-দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে শাঁখে-ফুঁ দিতেছে। শাঁখ বাজানো শেষ হইলে একটী মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়া তুলসীমঞ্চে রাখিয়া সে গলায় কাপড় দিয়া জোড়হাতে প্রণাম করিল। তারপর ঘরের মধ্যে আসিয়া আল্পনা-আঁকা পিঁড়ির উপর ছোট্ট প্রতিমাখানি বসাইয়া, তাহাকে ফুল-পাতা দিয়া সাজাইয়া, লক্ষ্মীর পাঁচালীখানি খুলিয়া সুর করিয়া পড়িতে সুরু করিল। ধূপের ধোঁয়ায়, দীপের আলোয় কি সুন্দর দেখাইতেছিল মেয়েটিকে—মেয়েটির মুখখানি যেন অবিকল তাহার টুনটুনির মুখের মত।

ছিদাম চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, টুনটুনি তাহার কোলেই মাথা রাখিয়া পরম নিশ্চিন্দিতে ঘুমাইতেছে। একটা স্নিগ্ধ শান্তিতে ছিদামের সমস্ত জ্বালা যেন ধীরে ধীরে জুড়াইয়া গেল।

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

মহারাণা প্রতাপসিংহ*

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত এম-এ

দ্বিতীয় প্রকরণ

রাণী করুণাবতী

মহারাণা সংগ্রামসিংহের ছয় সাত রাণী ছিল। সর্ব্বকনিষ্ঠা করুণাবতী পতির অতিপ্রিয় ও উপযুক্ত রাণী ছিলেন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর কিছুদিন পর করুণাবতীর একটি পুত্র জন্মে। এই শিশুপুত্র উদয়সিংহ মহারাণা প্রতাপসিংহের পিতা। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার অন্য কোন এক রাণীর গর্ভজাত পুত্র রতনা চিতোরের গদীতে আরোহণ করেন। তিনিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, রণভূমিকে রাজধানী করিবেন। কিন্তু বুঁদীর রাজার সহিত তাঁহার হঠাৎ যুদ্ধ বাঁধিল। অম্বরের রাজকন্যার সহিত রতনার গুপ্ত বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু চিতোরের গদীতে আরোহণ করিয়া তাহাকে বিধি অনুসারে বিবাহ করিতে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এদিকে বুঁদীর রাজার সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ হয়। এই জন্য বুঁদীর রাজার সহিত রতনার যুদ্ধ বাঁধিল। যুদ্ধে উভয়েই প্রাণত্যাগ করিল।

রতনার মৃত্যুর পর বিক্রমজীৎ নামক সংগ্রামসিংহের অন্য এক পুত্র চিতোরের গদীতে আরোহণ করেন। ইনি অতি বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে রাজপুত সর্দ্দারগণ ও অন্যান্য সকলেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। এইজন্য তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রস্তাব হয়। এই সুযোগে গুজরাটের মুসলমান শাসনকর্ত্তা বাহাদুরশাহ চিতোর আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। গুজরাটের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা মুজাফরজঙ্গ চিতোরের রাজপুত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাহাদের হাতে বন্দী হইয়াছিল। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বাহাদুরশাহ অসংখ্য সৈন্য এবং অনেক কামান লইয়া চিতোরের দিকে যাত্রা করিল। এই সব কামানের মধ্যে ইয়োরোপ হইতে আমদানী নূতন নূতন কামান ছিল। বিক্রমজীৎ এই সময় বুঁদীর এলাকায় সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বাহাদুরশাহের গতিরোধ করার চেষ্টা করিলেন। তিনি বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন কিন্তু বাহাদুরশাহের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। কারণ তাহার একদল অসন্তুষ্ট সৈন্য তাহাকে ছাড়িয়া চিতোরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া বলিল যে, কুমার উদয়সিংহ এবং রাণী করুণাবতীর রক্ষার জন্য তাহারা চিতোরে আসিয়াছে। করুণাবতী তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন যে, "আসল রাজাকে শত্রুর হস্তে রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছ।" কিন্তু তিনি শেষে বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ সৈন্যদল আসাতে চিতোর রক্ষার উপায় হইবে। বাহাদুরশাহের সৈন্য আসিয়া চিতোর অবরোধ করিল। রাণী করুণাবতীর আহ্বানে রাজপুত সর্দ্দার ও সামন্তগণ চিতোর রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাণী করুণাবতী মন্ত্রণা ও আলোচনার জন্য প্রায়ই তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতেন। তিনি বীরের বর্ম্ম পরিধান করিয়া কখনও দুর্গের উপর কখনও বিপদসঙ্কুল স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। রাজপুতগণ অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাদের জয়ধ্বনি এবং উৎসাহসূচক শব্দে গগন নিনাদিত হইতে লাগিল। কয়েক মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। বাহাদুরশাহ কিছুতেই দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। তারপর তিনি আরও অনেক সৈন্য আমদানী করিতে লাগিলেন। সৈন্যসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কিন্তু রাজপুতসৈন্য অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে বাহাদুরশাহ বিলাতি ইঞ্জীন ও কামানের সাহায্যে কোন পাহাড়ের মধ্যে সুড়ঙ্গ করিল, কোথাও পাহাড়ের নীচে সুড়ঙ্গ করিয়া বারুদ লাগাইয়া দিল, প্রাকারের কোন এক স্থানে বিলাতী তোপের সাহায্যে এক ছিদ্র করিল। রাজপুত সৈন্যগণ আতঙ্কিত হইলেন। মুখ্য মুখ্য স্থান তাহাদের অধিকার হইতে চলিয়া গেল। নিরুপায় দেখিয়া রাণী করুণাবতী হুমায়ুন বাদশাহের নিকট রাখী পাঠাইলেন। হুমায়ুন অত্যন্ত আনন্দের সহিত রাখী গ্রহণ করিলেন।

তিনি তখন বাঙ্গালাদেশে বিদ্রোহী সর্দ্দারদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। রাখী পাঠানর অর্থ ভ্রাতৃত্বে

---

*প্রথম প্রকরণ চৈত্রসংখ্যায় দ্রষ্টব্য—সঃ, বঙ্গশ্রী

বরণ করা। রাখী গ্রহণ করার অর্থ পবিত্র বন্ধন স্বীকার করিয়া ভ্রাতৃত্বের কর্ত্তব্য পালন করা। হুমায়ুন বাঙ্গালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সৈন্যদল সহ চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু হুমায়ুন আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় তিনি চিতোর রক্ষার সাহায্য করিতে পারিলেন না।

যখন রাজপুত বীরগণ দেখিলেন যে, দুর্গ রক্ষার আর কোনও উপায় নাই এবং শত্রু-হস্তে বন্দী হইবার সম্ভাবনা তখন তাঁহারা কেসরিয়া পোষাক পরিধান করিয়া তলবার-হস্তে সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রু সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে আত্মোৎসর্গ করিলেন। এদিকে রাণী করুণাবতী সকল সখীগণ, দাসীগণ এবং নগরের রমণীগণ একত্রিত করিয়া জৌহরের আয়োজন করিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহার শিশুপুত্র উদয়সিংহকে মহারাণার বংশ রক্ষা করার জন্য বুঁদীর রাজা শিবরতনের নিকট পাঠাইয়াদিলেন। তারপর সমবেত রমণীগণকে আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মুসলমানের দাসী ও সেবিকা হওয়া অপেক্ষা ভাইবন্ধুদের সহিত প্রাণত্যাগও শ্রেয়স্কর। তোমরা সাহসের উপর ভর করিয়া দাঁড়াও।" তৎপর সমবেত রমণীগণ আত্মবলিদানের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিলেন। পূর্ব্বের ব্যবস্থা অনুসারে সেখানে বারুদ জমা করা হইয়াছিল। বারুদে অগ্নি সংযোগ করা হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তের হাজার রাজপুত রমণী অমরধামে চলিয়া গেলেন।

যখন বাহাদুরশাহ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বাহাদুরশাহের সৈন্যগণ দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হুমায়ুনের সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। হুমায়ুন চিতোরের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং করুণাবতীর জন্য শোক প্রকাশ করিলেন।

ধাত্রীপান্না

বাহাদুরশাহের সৈন্য চলিয়া গেলে বিক্রমাজীৎ পুনরায় চিতোরের গদী আরোহণ করেন। এবারও সর্দ্দারগণ তাহার বিরোধী হন। তাঁহারা পরামর্শ করিলেন যে, বিক্রমাজীৎকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বালক উদয়সিংহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু বনবীর নামক জনৈক সর্দ্দার তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিবেন। বিক্রমাজীৎ এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু বনবীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াই রাজত্ব সুখের নেশায় অন্ধ হইয়া রাজ্যের উত্তরাধিকারীদিগকে বধ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ ভোগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে বনবীর শাণিত তলবার হস্তে অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া বিক্রমাজীতের শিরচ্ছেদ করিল। ইহাতে অন্দরমহলে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কুমার উদয়সিংহের ধাত্রী পান্না জনৈক ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত হৈ-চৈ কিসের?" ভৃত্য উত্তর করিল, "বনবীর বিক্রমাজীৎকে বধ করিয়াছে।" পান্না অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে বিক্রমাজীৎকে বধ করিলে উদয়সিংহকে ছাড়িবে কেন। এই বিবেচনা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তা করিবার বেশী অবসর নাই। নরপিশাচ বনবীর শীঘ্রই কুমারকে বধ করিবার জন্য উপস্থিত হইবে। দেখিলেন কুমার উদয়সিংহ আহারের পর নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তিনি কুমারকে অতি ধীরে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তৎপর একটা ফলের খালী টুকরীর মধ্যে শোয়াইয়া পাতাদ্বারা ঢাকিলেন। তারপর একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যের হস্তে এই টুকরী দিয়া বলিলেন যে, "এখনই টুকরী লইয়া কেল্লার বাহিরে গিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে থাক।" কুমারকে এইরূপে পাঠাইয়া দিয়া পান্না উদয়সিংহের শয্যায় নিজ পুত্রকে শোয়াইলেন। দুইজনই সমবয়স্ক ছিল। পাষাণ্ড বনবীর বিক্রমাজীতের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া উদয়সিংহের ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই পান্নাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়সিংহ কোথায়?" পান্না অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া নিজ পুত্রকে দেখাইয়া দিলেন। দুরাত্মা বনবীর উদয়সিংহ ভাবিয়া পান্নার পুত্রটিকে জননীর সমক্ষে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিলেন। রহস্যভেদের ভয়ে পান্না পাষাণের ন্যায় রহিলেন। তাহার মুখে উঃ শব্দটী নাই। চক্ষে একবিন্দু জল নাই। প্রভুভক্তির এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলিবে! এ দৃষ্টান্তের তুলনা নাই। এমন আশ্চর্য্য বলিদান আশ্চর্য্য উৎসর্গ এমন

পরোপকারীতা কেহ কোনদিন ইতিহাস, পুরাণ অথবা উপন্যাসে শোনে নাই। ধন্ত চিতোর! ধন্ত রাজস্থান!! ধন্ত ভারতবর্ষ!!!

অন্দর মধ্যে রব উঠিল যে দুষ্ট বনবীর কুমার উদয়সিংহকে হত্যা করিয়াছে। এদিকে পান্নার প্রেরিত ভৃত্য টুকরী লইয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইল। তখনও উদয়সিংহ নিদ্রিত ছিলেন। পান্না আসিয়া সেখানে পৌঁছিলেন এবং কুমারকে লইয়া প্রথমতঃ দেওলী তারপর ডোঙ্গরপুর গেলেন।

কিন্তু সে স্থানও নিরাপদ মনে না করিয়া আরাবলী পর্ব্বতের ভয়ঙ্কর পথে প্রবেশ করিলেন এবং ভীলদের সহায়তায় কৌশল পূর্ব্বক কোমলমীর পৌঁছিলেন। কোমলমীরে আশাশাহ নামক এক জৈনধর্ম্মাবলম্বী শেঠ ছিলেন। পান্না উদয়সিংহকে কোল হইতে নামাইয়া বলিলেন যে, ইনি চিতোরের রাজসিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। তোমারই শরণাগত। ইহার প্রাণরক্ষার ভার তোমারই হাতে। আশাশাহ প্রথমতঃ আশঙ্কিত হইলেন। কিন্তু তাহার জননী বলিলেন, "বাবা, কেন ভীত হচ্ছ? আজ নিমকের প্রতিদান করিবার সময় উপস্থিত। পরীক্ষার দিন উপস্থিত। দেখ যেন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও। জান না কি, ইনি তোমারই প্রভু প্রসিদ্ধ বীর রাণা সংগ্রামসিংহের কুলদীপক। ইনিও তোমারই প্রভু। প্রভুর সহায়তা কর, ফল পাইবে।"

জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আশাশাহ উদয়সিংহকে আশ্রয় দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। আশাশাহ তাহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। পান্না উদয়সিংহকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই রহস্ত প্রকাশিত হইল না। তারপর এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইল যে, চিতোর কুলদীপক রাণা সংগ্রামসিংহের একমাত্র উত্তরাধিকারী উদয়সিংহ এখনও জীবিত আছেন। যিনি আশাশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচিত, তিনিই মেবারের যুবরাজ। এই সংবাদ শুনিয়া প্রভুভক্ত বীর রাজপুতগণ দলে দলে একত্রিত হইয়া উদয়সিংহকে চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্ত লালায়িত হইয়া উঠিলেন। আশাশাহ নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া উদয়সিংহকে সর্দ্দারগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সর্দ্দারগণ কোমলমীর দুর্গে উদয়সিংহকে রাজ-তিলক পরাইলেন এবং পাপাত্মা বনবীরকে বাপ্পারাওর সিংহাসন হইতে অপসারিত করার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নরপিশাচ বনবীরের পাপের ফল পরিপক্ক হইল। মেবারের সেনা-সামন্তদের ভয়ে দুরাচার বনবীর সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিল এবং সেখানে তাহার স্বাভাবিক সহচর ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর সহিত বাস করিতে লাগিল।

উদয়সিংহ ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে মেবারের রাজধানী চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর মাত্র। যে সকল সর্দ্দারগণ উদয়সিংহকে রাজ তিলক পরাইয়াছিল তিনি তাহাদের মধ্যে জনৈক ঐশ্বর্য্যশালী ও শক্তিশালী সর্দ্দারের কন্তার পাণি গ্রহণ করেন। এই রাণীর গর্ভে মহারাণা প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন।

মহারাণা উদয়সিংহের চব্বিশটী পুত্র ছিল। মহারাণা প্রতাপ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। প্রতাপ বাল্যাবধি অশেষ গুণের আকর ছিলেন। তিনি যে কেবল অসাধারণ শক্তিশালী বীরপুরুষ ছিলেন তাহা নহে তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, গম্ভীর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, উদার, সদাশয় এবং স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি তনু, মন, অর্থ মাতৃভূমির কল্যাণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উদয়সিংহের শক্তিসিংহ নামে আর একটী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কনিষ্ঠ পুত্র ছিল। তাহার প্রতাপের ন্তায় অদ্ভুত সাহস ও বীরত্ব ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সাহস ও বীরত্ব অন্তান্ত গুণের অভাবে গৌরবের পথে চালিত হয় নাই। তিনি ক্রমান্বয়ে পিতা ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সৈন্ত মধ্যে উচ্চ পদে আরোহণ করেন। কিন্তু শক্তিসিংহ তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

যখন হলদীঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাণা প্রতাপের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, যখন তিনি দেখিলেন যে চিতোরের গৌরবরবি অস্তমিত প্রায় তখন তাঁহার কঠোর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে রুদ্ধ ভ্রাতৃস্নেহ ও স্বদেশপ্রেমের উৎস উদ্বেলিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেলিমের সৈন্তদল হইতে নির্গত হইয়া মহারাণার পশ্চাতে ধাবমান দুই জন আততায়ীর পশ্চাতে ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া মহারাণার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। বোধ হয় ভগবানের বিধান

অনুসারে ভারতের গৌরবরবি মহারাণার জীবন রক্ষার জন্য শক্তিসিংহ শত্রুসৈন্য ভুক্ত হইয়াছিলেন। মহারাণা উদয়সিংহ শক্তিসিংহকে তাহার বাল্যকালেও ভালবাসিতেন না। তাহার অসমসাহসিকতা ও বীরত্ব দেখিয়া শান্ত রাণা উদয়সিংহ অতিশয় রুষ্ট হইতেন। জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহার কুষ্ঠী দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, শক্তিসিংহ হইতে চিতোরের অনেক অনর্থ ঘটিবে। এই জন্যও উদয়সিংহ আশঙ্কিত ছিলেন। শক্তিসিংহের বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন একদিন তিনি পিতার দরবারে উপস্থিত। উদয়সিংহ অনেক সর্দ্দার-সামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়াছেন। বালক শক্তিসিংহ পিতার পার্শ্বে চলাফেরা করিতেছিলেন। এমন সময় এক সস্ত্রকার এক নূতন তলবার নিয়া তথায় উপস্থিত। তলবাব ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। সকলেই তলবারের প্রশংসা করিতে লাগিল। উদয়সিংহ বলিলেন যে তলবার ত' দেখিতে খুবই সুন্দব, ইহার ধার পবীক্ষা চাই তো। ইহা শুনিয়া শস্ত্রাগারের দারোগা কোমল কোমল জিনিষ তলবার দিয়া কাটিতে লাগিলেন। বালক শক্তিসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "এই রকমে কি তলবারের ধার পরীক্ষা করতে হয়? তলবার তো নরম জিনিষ কাটবার জন্য নয়; তলবার শত্রুর মাংস কাটবার জন্য।" এই বলিয়া শক্তিসিংহ দৌড়াইয়া গিয়া দক্ষিণ হস্তে তলবার উত্তোলন করিলেন এবং বাম হস্তের একটী অঙ্গুলীপর তলবার নিক্ষেপ করিয়া অঙ্গুলী ছিন্ন করিলেন। রুধিরের ধারায় ভূমিতল সিক্ত হইল। শক্তিসিংহ এমন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন যেন তিনি কোনই বেদনা অনুভব করেন নাই। বালকের চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু নাই, মুখে উঃ শব্দটী নাই। সভাসদ্ বালকের সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিন্তু উদয়সিংহ বালকের এই অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়া গৌরব বোধ না করিয়া এই মনে করিলেন যে, এই বালক যখন নিজের শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত করে না তখন অন্যের প্রতি সদয় কেন হইবে? না জানি ভবিষ্যতে এই বালকের জন্য রাজধানীতে কি বিবাদের সূচনা হয়। এই মনে করিয়া তিনি বালককে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। সভাসদগণ মহারাণার এই আজ্ঞা শ্রবণ কবিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। কেহই এই আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না।

ঘাতক শক্তিসিংহকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। শক্তিসিংহ সহাস্যবদনে অকুতোভয়ে চলিতে লাগিলেন। এই সময় সালুম্ব রায় বৃদ্ধ সর্দ্দার শক্তিসিংহের রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া মহারাণাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনি কয়েকবার আমার কার্য্যে প্রসন্ন হইয়া আমাকে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি এখন পর্য্যন্ত আপনার নিকট কোন প্রার্থনা কবি নাই, আশা করি উদারতার সহিত আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া সেবককে অনুগৃহীত কবিবেন।"

মহারাণা উত্তর করিলেন, "হে আমার প্রিয় হিতৈষী সর্দ্দার! আমি আপনার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি। আপনার বাসনা প্রকাশ করিয়া বলুন্। আপনি যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন!"

বৃদ্ধ সর্দ্দার উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমার ধন সম্পত্তির অভাব নাই। আমার কোন সন্তান নাই এই দুঃখ। আপনি যদি শক্তিসিংহকে মুক্তি দেন ত' আমি তাহাকে পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিব।"

মহারাণা বিশেষ সমস্যার মধ্যে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সর্দ্দারজী! আপনার এই প্রার্থনাটী সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু আমি আপনাকে পূর্ব্বেই কথা দিয়াছি। এই জন্য আমি কুমারকে খালাস দিচ্ছি। আপনি তাহাকে সন্তোষের সহিত ঘরে লইয়া যান্।"

বৃদ্ধ সর্দ্দার বালক শক্তিসিংহকে পাইয়া অতি আনন্দের সহিত ঘরে চলিয়া গেলেন।

উদয়সিংহ ও আকবর

যে সময় উদয়সিংহ মেবারে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন আকবর বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভারত বর্ষের চতুর্দ্দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। আকবর অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, রাজস্থানের রাজপুত রাজাগণ মুসলমান রাজ্যের চিরন্তন শত্রু। রাজপুতনা অধিকার করিতে না পারিলে নিষ্কণ্টকে দিল্লীতে রাজত্ব করা অসম্ভব। আকবর শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। আফগানগণ সুন্নী ধর্ম্মাবলম্বী। এই জন্য আফগানগণ মোগল সাম্রাজ্যেরও চিরশত্রু ছিল। তিনি মনে করিলেন

যে রাজপুতনার রাজেন্দ্রবর্গকে ছলে, বলে, কৌশলে বশীভূত করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে সম্রাজ্য দৃঢ়ীভূত করিবেন। এই জন্য তিনি রাজন্যবর্গের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাজপুতগণ এই প্রস্তাব অতি ঘৃণার সহিত অস্বীকার করিলেন।

আকবর প্রথমতঃ জয়পুরের রাজা বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করিলেন। বিহারীমল এই প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন। কিন্তু অবশেষে লুঠ-পাট ও যুদ্ধের ভয়ে এবং আকবরের অসীম প্রতাপ ও প্রভুত্ব দেখিয়া কেবল তাঁহার অধীনতাই স্বীকার করিলেন না আকবরের সহিত নিজ কন্যার বিবাহও দিলেন। আকবর বিহারীমলের পুত্র ভগবানদাসকে তাঁহার দরবারে অতি উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন এবং সেনাপতিত্বেও বরণ করিলেন। ভগবানদাসের আকবরের দরবারে অসীম প্রতিপত্তি ছিল। অধীনস্থ রাজগণ ভগবানদাসের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মানসিংহ প্রধান সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষের অনেক হিন্দু রাজত্ব জয় করিয়াছিলেন। মানসিংহের সহায়তা ব্যতিরেকে আকবর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেন না।

বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আকবর মারবাড়ের রাণার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। মারবাড়ের রাণা এই প্রস্তাব অস্বীকার করিলে, মোগল সৈন্য মারবাড় আক্রমণ করিয়া তাহার সুদৃঢ় দুর্গ জয় করিল। তার পর মারবাড়ের রাণা আকবরকে নিজ কন্যা দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার পর বিকানীরের রাজা আকবরকে নিজ কন্যা দান করেন। যোধপুরের রাজাও আকবরকে উপঢৌকন দিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আকবরের আশা বাড়িতে লাগিল। তিনি যখন দেখিলেন যে, রাজস্থানের বড় বড় রাজাগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে তখন তিনি মেবারের মহারাণার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে চাহিলেন। মহারাণা উদয়সিংহ, পিতা সংগ্রামসিংহ এবং পুত্র প্রতাপসিংহের ন্যায় সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন না বরং তিনি বিলাসী, শান্তিপ্রিয় এবং কোমল হৃদয় ছিলেন। তথাপি তাঁহার বংশমর্য্যাদা ও গৌরববোধ সম্পূর্ণরূপে ছিল। তিনি অতি দৃঢ়তা ও ঘৃণার সহিত আকবরের প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন। মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ ব্যতিরেকে আকবরের আর অন্য কোন উপায় রহিল না। আকবর অসংখ্য মোগল সেনার সহিত চিতোর দুর্গ অবরোধ করিলেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এইযুদ্ধে আকবরকে পরাস্ত করার গৌরব উদয়সিংহের রাণী প্রতাপসিংহের জননীর প্রাপ্য। তিনি বীরপুরুষের বেশ ধারণ করিয়া অসিহস্তে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া মোগল সৈন্য ভেদ করিয়া আকবরের সম্মুখীন হইলেন। আকবর ভীত হইলেন। মোগলসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল। চিতোরের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল।

যখন রাজপুতগণ জানিতে পারিলেন যে রাণী বীরবেশে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন তখন তাহারা উদয়সিংহকে কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন।

আকবর পুনরায় ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে অনেক সৈন্য লইয়া চিতোর আক্রমণ করেন। তাঁহার সহিত রাণার ভ্রাতা শক্তসিংহ ছিল। নিহালসিংহ নামক জনৈক রাজপুত সর্দ্দার ছিল। চিতোরের সেনাপতি জয়মল্ল তাহাকে কন্যা দিতে অস্বীকার করিলে সে আকবরের সহিত যোগদান করে। রাজা ভগবান দাস ও আকবরের সঙ্গে ছিলেন। ইহা ব্যতীত অনেক রাজপুত সৈন্য আকবরের সঙ্গে ছিল। আকবর তাহার কুটনীতির বলে অনেক দেশদ্রোহীর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।

উদয়সিংহ আকবরের এই বিপুল আয়োজন দেখিয়া চিতোর পরিত্যাগ করিতে প্রস্তাব করিলেন। রাজপুত সৈন্য ও সেনাপতিগণ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেনাপতি জয়মল্ল অমিত বিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ছয়মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু আকবর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই যুদ্ধে জয়মল্লের স্ত্রী তারাবাই অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। ইনি দুইবার স্বয়ং আকবরকে ভীষণবেগে আক্রমণ করেন। আকবর ভাগ্যবশতঃ প্রাণরক্ষা করেন। একদিন জয়মল্লকে দুর্গের উপর অবস্থান করিতে দেখিয়া আকবর স্বয়ং তাঁহার উপর তীর নিক্ষেপ করেন, সেই তীরের আঘাতে জয়মল্লের মৃত্যু হয়। রাজপুত সৈন্য জয়মল্লের মৃত্যুতে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। তখন জয়মল্লের ষোড়শবর্ষীয় ভ্রাতা ফত্তা রাজপুতগণকে ওজস্বিনী

ভাষায় উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং এমন বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে শত্রু মিত্র সকলেই তাঁহার বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। কিন্তু অবশেষে ফত্তাও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। তারপর সালুম্বরার রাজা খামদাস সূর্য্যমুখী দরগায় অনেকদিন পর্য্যন্ত বীরত্বের সহিত দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনিও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তারপর দুর্জ্জয়সিংহ নামক এক সর্দ্দার বিশেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। রাজপুত বীরের সংখ্যা কমিতে লাগিল। আকবর রাজপুতগণকে বারংবার অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য বলিলেন কিন্তু রাজপুতগণ ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন। তারপর রাজপুত পুরুষ ও রমণীগণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পুরুষগণ কেসরিয়ানামা পরিধান করিয়া অসিহস্তে রণভূমিতে প্রবেশ করিয়া একে একে আত্মবলিদান করিলেন। অপরদিকে রমণীগণ বালক বালিকার সহিত অগ্নি কুণ্ডে ঝাপ দিলেন। শেষ দিন ত্রিশ হাজার রাজপুত কেসরিয়ানামা পরিধান করিয়া আত্মবলিদান করিয়াছিলেন। যে সকল রাজপুত রাজা ও সর্দ্দারগণ ও মহারাণার বন্ধু বান্ধবগণ চিতোর রক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন তাঁহারাও ঐ সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেন। জৌহরে নয়জন রাণী, পাঁচজন রাজকুমারী, দুই জন অবোধি রাজকুমার আর রাজপুত সর্দ্দারগণের স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন। এত নরবলিদানেও আকবর তৃপ্ত হইলেন না। তিনি রাজপুরী ও মন্দির ভূমিস্মাৎ করিলেন। দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস করিলেন। লুঠ-পাট পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। রাজকীয় সুন্দর সুন্দর বস্তু ও অমূল্য পদার্থ, বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ আকবর লইয়া গেলেন। তিনি চিতোরের নক্কারা যাহার শব্দ কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত শুনা যায় আগ্রায় নৌবতখানায় শোভার জন্য রাখিয়াছিলেন, রাজপুতনার পবিত্র মন্দির বড় মা'র মন্দিরের কবাট উঠাইয়া অকরাবাদ লইয়া গিয়াছিলেন। আর একখানা অতি পবিত্র তলবার যাহা বড়মা সদয় হইয়া নিজ হস্তে বাপ্পারাওর কটিদেশে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন তাহাও আকবর লইয়া যান। চিতোরের প্রতি আকবর নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা ও পাশববৃত্তির একশেষ দেখাইয়া ছিলেন। আর রাজপুতকুলকলঙ্ক ভগবান্ দাস অম্লান বদনে সেই ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলেন। উদয়সিংহ চিতোর হইতে পলায়ন করিয়া আরাবলী পর্ব্বতের গোহেলী জাতির শরণাপন্ন হন্। কয়েক বৎসর পরে তিনি পাহাড়ের মধ্যে এক সুন্দর শহর প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম উদয়পুর রাখেন। ইহার চার বৎসর পরে ৪২ বর্ষ বয়ক্রম কালে ২৪টী পুত্র রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

মহারাণা প্রতাপের রাজ্যাভিষেক

উদয়সিংহের চব্বিশ পুত্রের মধ্যে প্রতাপসিংহ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। উদয়সিংহ সর্ব্বকনিষ্ঠ রাণীকে অন্য সকল রাণী অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। মৃত্যু সময় উদয়সিংহ সেই রাণীর পুত্র জগমলকে আপনার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া গেলেন। উদয়সিংহের এই নির্ব্বাচন রীতিও আইন বিরুদ্ধ ছিল। প্রাচীন প্রথানুসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

যখন সকলে উদয়সিংহের মৃতদেহ শ্মশান ঘাটে লইয়া যায়, প্রতাপসিংহও তাঁহাদের সহিত ছিলেন। কিন্তু জগমল রাজপুরীর মধ্যেই রহিলেন এবং সুযোগ দেখিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। জগমলের এই অসঙ্গত চেষ্টা দেখিয়া লোকেরা তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। যখন উদয়সিংহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান হইল তখন সকলেই ভাবিতে লাগিল, কি প্রকারে প্রতাপসিংহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কারণ উদয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া প্রতাপসিংহ সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী। ইহা ব্যতীত তিনি অতি সাহসী বীর, যোদ্ধা এবং চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ঐ সময় সলুম্বরার রাজা কিশনসিংহ উদয়পুর আসিয়াছিলেন। তিনি উদয়পুরের মন্ত্রিদিগকে একত্র করিয়া বলিলেন, "উদয়সিংহের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহ থাকিতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জগমল কি প্রকারে সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারে।"

গালার রাজা বলিলেন, "প্রতাপসিংহ যে উদয়সিংহের সর্ব্বজ্যেষ্ঠপুত্র কেবল তাহা নহে, বস্তুতঃ তিনি রাণা সংগ্রাম সিংহের ন্যায় অত্যন্ত বীরপুরুষ এবং পরাক্রমশালী। যখন এই বিপদের সময় আকবরের মেবাড় আক্রমণের সম্ভাবনা আছে তখন প্রতাপসিংহকে মহারাণার পদে অধিষ্ঠিত করা চাই।

অবশেষে সর্দ্দারগণ ঠিক করিলেন যে, জগমলকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রতাপসিংহকে সিংহাসনে বসাইবেন। সর্দ্দারগণের এই সিদ্ধান্ত জানিতে পারিয়া প্রতাপসিংহ উদয়পুর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার কল্পনা করিলেন। কারণ তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। প্রতাপসিংহ অশ্বারোহণ করিয়া উদয়পুর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণসিংহ বলিলেন, "আমরা চাই যে আপনি চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বাপ্পারাওর এবং রাণা সংগ্রাম সিংহের নাম, যশ ও সম্মান রক্ষা করুন। চিতোর উদ্ধারের ভার সম্পূর্ণ আপনার উপর।"

প্রতাপ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনারা যদি সকলে মনে করেন যে, আমি আমার জাতি এবং জন্মভূমির সেবা করিতে সক্ষম এবং আপনারা সকলে যদি আমার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হন, তবে আমি আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত আছি।"

রাজপুত সর্দ্দারগণ প্রতাপসিংহকে লইয়া দরবারে জগমলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, সিংহাসনে বসিবার অধিকার তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপসিংহের। এই সময় মহামন্ত্রী প্রতাপসিংহকে রাজপোষাক পরিধান করাইয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। তারপর প্রতাপসিংহ প্রাচীন প্রথানুসারে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া তিন বার প্রণাম করিলেন। চতুর্দ্দিকে "স্বাগতম্, মহারাণা প্রতাপসিংহকী জয়!" প্রভৃতি হর্ষধ্বনিতে আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তোপধ্বনি হইতে লাগিল, ভেরী বাজিতে লাগিল, রাজপুতদের বিজয়ধ্বজা রাজপ্রাসাদের উপর উড্ডীয়মান হইল। কৃষ্ণসিংহ মহারাণার মস্তকোপরি রাজছত্র ধরিলেন, অন্য কোন সর্দ্দার চামর দুলাইতে লাগিলেন। এই মহোৎসব দেখিয়া জগমল চুপ করিয়া রহিলেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাণা প্রতাপসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহারাণা ও শক্তিসিংহের যুদ্ধ

রাজ্যাভিষেকের পর প্রতাপসিংহ ভ্রাতা শক্তিসিংহকে আনিতে পাঠাইলেন। সালুম্ব রায় সর্দ্দার শক্তিসিংহকে লইয়া যাইবার পর তাঁহার একটী পুত্র জন্মে। সুতরাং তিনি বিনা আপত্তিতে শক্তিসিংহকে ছাড়িয়া দিলেন। শক্তিসিংহকে পাইয়া প্রতাপসিংহ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু এই দুই ভাইয়ের মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না যে সময় প্রতাপসিংহ সিংহাসনারূঢ় হইলেন, সে সময় বসন্ত কাল। কিছুদিনের মধ্যে অহেরিয়া উৎসব উপস্থিত হইল। এই উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য প্রতাপসিংহ সর্দ্দার ও সামন্তদিগকে আজ্ঞা দিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে রাজপুতগণ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বন্য পশু শিকার করেন এবং দেবীর নিকট বলিদান দেন। এই শিকারের সফলতায় বর্ষের সফলতা অনুমান করা যায়।

রাজপুতগণ অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মহারাণার পশ্চাতে অশ্বারোহণ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। রাজপুতগণ বন্য-শূকর শিকার করিতে ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিলেন অনেক শূকর শিকার করা হইল। কিন্তু প্রতাপ ও শক্তিসিংহ এই দুইজনের সম্মুখে এক শূকর উপস্থিত হইল। দুই দিকে দুই অশ্বারোহী দেখিয়া শূকর পলাইতে সুযোগ পাইল না। দুইজনেই এক সময়ে শূকরের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। একটা বাণ শূকরের ললাট ভেদ করিয়া চলিয়া গেল শূকর বেদনায় ভূমিতলে পতিত হইল। প্রতাপ সিংহ বলিলেন যে "আমার বাণে শূকর মরিয়াছে।" শক্তি সিংহ বলিলেন, "না, আমার বাণে শূকর মরিয়াছে।" এই কথা লইয়া দুইজনের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত হইল। অবশেষে দুইজনেই তলোয়ার নিষ্কোষিত করিয়া বলিল, "আচ্ছা, মীমাংসা করা যাক্ যে কাহার বাণে শূকর আহত হইয়া পড়িয়াছে।" এইরূপে দুইজনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিল। উভয়ে উভয়কে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া রাজপুত সর্দ্দারগণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাহারও মুখে একটী বাক্যও ফুটিল না। রাজপুরোহিত দূর হইতে এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া দৌড়াইয়া নিকটে আসিলেন এবং উভয়কে এই ভীষণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না তিনি উন্মত্তের ন্যায় কখনো মহারাণাকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কখনো শক্তিসিংহকে সম্বোধন করিয়া যুদ্ধে বিরত হইতে বলিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে পরমহিতৈষী পুরোহিত রাণাবংশের মঙ্গলের জন্য আত্মবলিদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি দুইজনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। [ক্রমশঃ

বন্ধন-মুক্তি

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

(তেইশ)

"মহীন আছ ?"

পক্ককেশ, লম্বিত-পক্কশ্মশ্রু, প্রশান্তস্মিতানন, সৌম্যদর্শন একজন বৃদ্ধ বাহিরে মহীন্দ্রনাথের বসিবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরল বিশ্বাসে ও আন্তরিক শ্রদ্ধায় চিত্ত উন্নত ও নির্ম্মল, ভক্তিভরে ভগবদুপাসনায় তৎপর, ভগবৎকৃপালাভে নিয়ত ব্যাকুল, মানবপ্রীতিতে প্রাণ মধুময়, সেই প্রীতির প্রেরণায় সেবাব্রতপরায়ণ, কায়মনোবাক্যে সুনীতির আদর্শানুবর্ত্তী জীবনযাত্রায় অনাড়ম্বর, সরল শিষ্ট মিষ্টভাষী এবং চরিত্রের এই বিশেষত্ব মুখের ভাবে, চোখের দৃষ্টিতে এমনই ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে যে, দর্শনমাত্র শ্রদ্ধায় লোকের চিত্ত নত হইয়া পড়ে, এইরূপ একশ্রেণীর সাধু ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বে অনেক দেখা যাইত। কিন্তু অধুনা অতি বিরল হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, আগন্তুক এই বৃদ্ধ তাঁহাদেরই ন্যায় একজন। ছাতাটি বন্ধ করিয়া বৃদ্ধ ডাকিলেন, "মহীন্ আছ ?"

বেলা তখন প্রায় আটটা। সকালে চা-পানের পর প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া আসিয়া মহীন্দ্রনাথ কাপড়চোপড় ছাড়িয়া কেবল নীচে নামিয়াছেন। ত্রস্তভাবে গৃহমধ্যে আসিয়া বৃদ্ধের চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "আসুন আচার্য্য মশাই, বসুন। ভাল আছেন ত ?"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মসমাজের একজন আচার্য্য; নাম গৌরীচরণ রায়। মহীন্দ্রনাথকে স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "কল্যাণ হ'ক বাবা, সুখে থাক। বস, বস।"

মহীন্দ্রনাথের হাতখানি ধরিয়া গৌরীচরণ টেবিলের কাছে আসিলেন, তাঁহাকে তঁহার আসনে বসাইয়া দিয়া নিজে সম্মুখে আর একখানি আসনে বসিলেন।

"তা তোমরা সব ভাল আছ ত' বাবা ?"

"হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে আছি একরকম।"

হাসিয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "এই দেখ, এসব ত্রুটি তোমাদের আর দূর হ'ল না। আমার আশীর্ব্বাদে কি ? ভগবানের আশীর্ব্বাদে বল। তাঁর আশীর্ব্বাদ ব্যতীত মানব কেউ মঙ্গলে কখনও থাক্‌তে পারে ?"

মহীন্দ্রনাথও হাসিয়া উত্তরে কহিলেন, 'আপনার আশীর্ব্বাদেই তাঁর আশীর্বাদ আমরা পাই।"

গম্ভীরভাবে গৌরীচরণ কহিলেন "অত বড় গৌরব আমাকে দিও না মহীন। যাদের হৃদয়ের বাসনায়, মুখের কথায়, ভগবানের ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তাঁরাই ধন্য। আমি অতি দীন হীন, অতি অধম।"

হাসিমুখে মহীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সেটা আপনি ব'লছেন, ব'লেও থাকেন, শেষদিন অবধি ব'লবেন, তবে আমরা অন্যরকম ভাবি, তাই ভাব্‌ব। যাক, সে বাদ-প্রতিবাদ আপনার সঙ্গে এখন আর করব না। তা—চা এক পেয়ালা—"

"চা ত খেয়েই বেরিয়েছি! আবার হাঙ্গামা করাবে ওদের ? থাক ?"

"বিলক্ষণ! হাঙ্গামা আর কি ?"

উঠিয়া মহীন্দ্রনাথ দরজার কাছে গিয়া ডাকিলেন, "ও ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মি! ওরে, আচার্যিমশাই এয়েছেন। চট ক'রে এক পেয়ালা চা ক'রে আন ত ? আর খানকত বিস্কুট—"

"না, না, বিস্কুট থাক! ওসব আর এখন খাব না। তবে চা টা—তা কি জান মহীন, এমনি একটা দুর্ব্বলতা হয়েছে—কেউ দিতে চাইলে আর না বলতে পারি না। বুড়ো বয়েসের অভ্যেসের দোষই এগুলো—"

"তা শরীরে যদি সহ্য হয়, এমন দোষই বা কি এতে ? প্রাচীন বয়েসে একটু আরাম—"

"আরামের অভ্যাসটা বাবা, কোনও বয়েসেই ভাল নয়। বুড়ো বয়েসে, আমার মনে হয়, আরাম-বিরেম যত ছেড়ে কঠোর নিয়মে থাকা যায়, কর্ম্মক্ষমতা তত বেশী দিন লোকের থাকে। তবে ঐ চা টা—ওটা কি জান, বড় একটা লোভ—হাসছ বাবা ? তা বুড়ো বয়সের দুর্ব্বলতা এটা—সব বুড়োরই খাবার লোভটা বেশী হয়। আমার ঐ চা টাতেও তেমনি

একটা লোভ। তবে অসুখ কিছু করে না, এই যা ভরসার কথা।"

"নমস্কার, আচার্য্য মশাই।"

সুকল্যাণী আসিয়া যুক্তকরে একটু শির নত করিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য গৌরীচরণকে অভিবাদন করিলেন। কাহারও চরণপ্রান্তে ভূনত হইয়া প্রণিপাত ও পদধূলি গ্রহণ করাকে সুকল্যাণী একরূপ পৌত্তলিকতা বলিয়া মনে করিতেন। নিজে কখনও করিতেন না, আর কেহ করে তাহাও পছন্দ করিতেন না। তবে ইহার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া সংগ্রামেও কখনও নামেন নাই।

প্রত্যভিবাদন করিয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "এই যে মা সুকল্যাণী। এস, সুখে থাক। তা ভাল আছ ত মা?"

গম্ভীরভাবে সুকল্যাণী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, শরীর গতিক ভালই আছি এক রকম। তবে সে ভাল অতি তুচ্ছ ভাল। মন ভাল নেই। ঘরে এই সব অশুভ-সূচনা, আর তা থেকে দারুণ অশান্তি—সব ত জানেন—"

"হুঁ, শুনেছি সব। তাই ত এলাম মহীনের সঙ্গে একটিবার আলাপ করব বলে। তা একটু নিরিবিলি ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে পারলেই ভাল হত। তুমি বরং উপরে গিয়ে একটু চা আমাকে পাঠিয়ে দিতে বল।"

"চা উর্ম্মি তৈরী করে আনছে। আচ্ছা, আপনার যদি ইচ্ছে না হয় আমি নাই থাকলাম এখানে।"

ঈষৎ নতশিরে ছোট্ট একটু নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া সুকল্যাণী ফিরিলেন। ললাটে কিঞ্চিৎ ভ্রূকুটিবিকাশ লক্ষ্য করিয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "তা ক্ষুণ্ণ হয়ো না মা, কি জান, তোমার কথা ত সব শুনেছি, এখন ও কি বলে তাও শান্ত হয়ে শুনতে হবে। বাদপ্রতিবাদ যদি একটা ঘটে—"

সুকল্যাণী উত্তর করিলেন "তা বেশ, তাই শুনুন আপনি। আমি থাকলে যদি বাদপ্রতিবাদের আশঙ্কা করেন, কেন থাকব? তবে এটা অবশ্য আশা করতে পারি, আমার অভিযোগের সুবিচার আপনারা ক'রবেন।"

"যদি সে অধিকার আমাদের থাকে, কেন ক'রব না মা?"

"অধিকার অবশ্য আপনাদের আছে। নইলে এ সব পাপের, এ সব কদাচারের, প্রতিকার কি ক'রে হ'তে পারে?"

গৌরীচরণ কহিলেন "সেইটেই আগে বুঝতে হবে মা, কি পাপ, কি কদাচার হয়েছে, আর তাতে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আমাদের আছে কি না?"

"পাপ কদাচার কি হ'য়েছে! না হ'য়েছে কি? আর তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার আপনাদের আছে কি না!—সমাজের নেতা আপনারা, আপনাদের সে অধিকার আছে কি না—বলেন কি আচার্য্য মশাই? ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা—"

মৃদু একটু হাসিয়া ধীর স্বরে গৌরীচরণ কহিলেন, "বিচার যদি আমাকেই করতে হয়, তবে দুই পক্ষের কথাই শুনতে হবে। তাই ত বলছিলাম মা, বাদ-প্রতিবাদ এখুনি একটা উপস্থিত হ'লে, মহীন কি বলতে চায় সেটা—"

"ও, মাফ ক'রবেন আমাকে। আপনাদের কথার ভেতর ইণ্টারফিয়ার (বাধাদান) আমি ক'রতে চাই না। নমস্কার।"

উর্ম্মি এক পেয়ালা চা আর একখানি রেকাবে কিছু বিস্কুট ও সন্দেশ লইয়া আসিল। সুকল্যাণী স্বামীর ও কন্যার প্রতি দুইটি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

"এই দেখ? নিষেধ করলাম, তবু আবার খাবার নিয়ে এনেছে! নিয়ে যা, সরিয়ে নিয়ে যা ওগুলো, তোরা খাবি—নিয়ে যা।"

টেবিলে খাবার ও চা রাখিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য মহাশয়কে স্মিতমুখে উর্ম্মি প্রণাম করিল। স্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "ওরে নিয়ে যা, খাবারটা নিয়ে যা! তোরা খাবি। বুড়োর দুর্ব্বলতা জানে কি না, তাই লোভ দেখাচ্ছে। যা, যা, নিয়ে যা!"

"সে হবে না, আচার্য্য মশাই, ও খেতেই হবে। ভারী ত জিনিষ!"

"ওরে, বুড়োর কাছে ওই অতি ভারী। আচ্ছা, তুই ব'লছিস, এই সন্দেশ একটুখানি তুলে মুখে দিলাম। যা, এখন নিয়ে যা। নিয়ে বরং পেসাদ পাবি; যা।"

রেকাবখানি বৃদ্ধ সরাইয়া দিলেন। মহীন্দ্রনাথ হাসিয়া

কহিলেন, "উনি ব'ললেন, নিয়েই যাও ঊর্ম্মি। তোমরা খেয়ে ফেল গে।"

হাসিয়া ঊর্ম্মি রেকাবখানি তুলিয়া লইয়া গেল। চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "তা হ'লে বুঝতে পারছ ত' মহীন' কেন আমি এসেছি?"

"হাঁ, তা পেরেছি বই কি—"

"কি হ'য়েছে আমাকে সব খুলে বল ত বাবা?"

মহীন্দ্রনাথ ঊর্ম্মির সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন। গৌরীচরণ ধীরভাবে সব শুনিয়া শেষে কহিলেন, "হুঁ। শুধুই জানবার একটা আগ্রহ? অনুষ্ঠান কিছু করতে চায় নি?"

"না, এখনও ত চায় নি।"

"তবে চাইতে পারে?"

"এখনও চাইছে না, এর পর—"

"হুঁ, কি জান বাবা, যতটা বুঝতে পারছি, নিরপেক্ষ ভাবে যে জ্ঞানানুসন্ধান আর তাতে করে ভিন্ন ধর্ম্মের তত্ত্বের আলোচনা লোকে করে, এটা—ঠিক সে রকম একটা ভাব ওর নয়। পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের দিকে চিত্তের একটা আকর্ষণই ওর জন্মেছে।"

"হাঁ, আমারও তাই মনে হয় বটে।"

একটু কি ভাবিয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "তা হ'লে এ ক্ষেত্রে তোমার পিতার কর্ত্তব্য কি তুমি মনে কর?"

মহীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "যে ভাব থেকেই হ'ক, সে জানতে চায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ভেতর কোন সত্য আছে কি না, আর তার সাধনপ্রণালীও এমন কি না, উন্নত-বুদ্ধি বিচারশীল কোনও সাধক যা শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই সে হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব আর অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বন্ধে বই টই যা পাওয়া যায় পড়ছে। কি ব'লে এতে বাধা তাকে আমি দিতে পারি?"

"না, বাধা তাতে কেউ কাউকে দিতে পারে না। মানবের ন্যায্য স্বাধীনতার উপরেই হস্তক্ষেপ এতে করা হয়। তবে ভাবনার কথা হচ্ছে এই যে, তার মনটাও এদিকে ঝুঁকে প'ড়েছে—"

"হাঁ, তা প'ড়েছে। কিন্তু তাই বা আমি উল্টে দেব কি ক'রে?"

"কিন্তু ধর, এইদিকে ঝুঁকেছে, বই টইও সব প'ড়ছে, যদি হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক তত্ত্বই সে সত্য ব'লে বোঝে, আর তার সব অনুষ্ঠানই শ্রদ্ধায় পালন করবার যোগ্য মনে করে, তখন কি ক'রবে?"

"কঠিন সমস্যা বটে! কিন্তু ঊর্ম্মি এখন আর নিতান্ত বালিকাটিও নয়। সত্য আর শ্রদ্ধেয় ব'লে যা বুঝবে, তাই যদি সে গ্রহণ ক'রতে চায়—"

"ভুল বুঝতেও ত পারে।"

"তা পারে। কিন্তু কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা ভুল, তা নির্ণয় ক'রবে কে?"

"বিবেক।"

"কার বিবেক আচার্য্য মশাই?"

"কার বিবেক? একি কথা বলছ মহীন! বিবেক যে মানবহৃদয়ে নিহিত ভগবদ্‌বাণী। তা কি আর ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রকম হ'তে পারে?"

একটু হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, এই কথাটা বরাবর শুনে আসছি। শুনে শুনে এমন ধারণাও হ'য়ে গিয়েছিল, এটা এমনই একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, যার উপরে আর কোনও কথাই চ'লতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি বড় একটা খটকা আমার মনে দেখা দিয়েছে; এই ধরুন, আমার পিসীমার কথা। শুনেছেন বোধ হয়, তিনি এখানে এসেছিলেন কিছুদিন আগে, আর ঊর্ম্মির এই পরিবর্ত্তনটা তাঁর প্রভাবেই ঘটেছে। তা তাঁর ধর্ম্মকেই তিনি মনেপ্রাণে সত্য ব'লে বিশ্বাস করেন, আর সরল ভক্তিতে তাঁর দেবতার পূজোও করেন। বিবেক কথাটা কাণেও কখনও তিনি বোধ হয় শোনেন নি। কিন্তু মানুষ ত' তিনি। এই বিবেক যাকে ব'লছেন, তাঁর অন্তরেও আছে, আর তাতে করেই না তাঁর ধর্ম্মকে তিনি সত্য ব'লে অনুভব করেন?"

গৌরীচরণ কহিলেন, "সেটা সত্যের অনুভূতি না হ'য়ে কুসংস্কারের প্রভাবও ত হ'তে পারে।"

মহীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আমরা তাই বলি বটে। কিন্তু তিনি, কি আর যাঁরা সেই ধর্ম্ম মেনে চ'লছেন, সেটা স্বীকার ক'রবেন না।"

"তিনি কি শিক্ষালাভ ক'রেছেন কিছু ?"

"আমরা যাকে শিক্ষা বলি, ইস্কুল কলেজে প'ড়ে যেটা লোকে লাভ করে, তা করেন নি। তবে যেভাবে জীবন যাপন ক'রেছেন, তাতে কিছুই শেখেন নি এটা ব'লতে পারি না । আর বিবেক হ'ল অন্তরের স্বাভাবিক একটা দৃষ্টি, শিক্ষার অপেক্ষা ত' সে কিছু রাখে না ।"

"তা রাখে না । তবে কুশিক্ষায় সে দৃষ্টি নষ্ট কি কলুষিত হ'য়ে যেতে ত পারে ।"

"তা পারে । কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে আমাদের এই শিক্ষাই যে সুশিক্ষা, আর তাঁরা যা শিখেছেন সেটা কুশিক্ষা, তাই কি জোর ক'রে ব'লতে পারেন আচার্য্য মশাই ?"

"হুঁ । তাই ত । তুমি—ভাবালে মহীন্ ! চিন্তার ধারা অত্যন্ত এক পথে এতদিন চলেছে, এসব প্রশ্নও কখনও মনের ভেতর আসে নি । তাই ত, কথাগুলো—ভাববার কথাই বটে । কিন্তু এও কি সম্ভব ? ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকলের বিবেকানুমত নয়, বিপরীত কোনও ধর্ম্মমতকেও উন্নত-বুদ্ধি কোনও লোক বিবেক-বাণীতে সত্য ব'লে অনুভব ক'রতে পারে, পৌত্তলিকতার ভেতরেও আধ্যাত্মিক সত্য কিছু থাকতে পারে, এও কি সম্ভব ব'লে মনে কর মহীন্ ?"

মহীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, দেখুন, হঠাৎ কথাটা কেউ তুল্লে আমাদের সামনে, সম্ভব বলে হয় ত মনে হবে না । কিন্তু তলিয়ে একটু ভেবে দেখলে আর নিরপেক্ষভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে পরীক্ষা করলে, আমরা বোধ হয় বুঝতে পারব অসম্ভব বলে একেবারে উড়িয়ে দেবার কথাও নয় এটা । এই ধরুন, হিন্দুসমাজে আধুনিক শিক্ষায় উন্নত বহু লোক আছেন । সত্তর আশী বছর ধ'রে ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব কত রকমে দেশে প্রচার করা হ'য়েছে । প্রচার যাঁরা ক'রেছেন, বিদ্যায়, জ্ঞানে, প্রতিভায় তাঁদের তুলনা মেলে না । কিন্তু এই শিক্ষিত হিন্দুর ভেতরই বা কয়জনে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন ? বরং হিন্দুধর্ম্মের প্রতিই এঁদের শ্রদ্ধা বাড়ছে ব'লেই মনে হয় । তার সব তত্ত্বও এঁরা প্রচার করেছেন । তারপর খৃষ্টান-মুসলমানদের কথা ধরুন, তাঁরাও আমাদের মত একেশ্বরবাদী আর পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী । কিন্তু অন্য অনেক বিষয়ে মতের পার্থক্যও আবার কত আছে । তাঁরা শাস্ত্র মানেন, অবতার মানেন, পয়গম্বর মানেন, যা না কি ব্রাহ্ম কেউ মানতেই পারেন না ।"

"তাই ত, তাই ত বাবা ! কথাগুলো যা বল্লে ঠিকই ত বটে ! হুঁ, এ ভাবে এ সব কথা ত ভাবিওনি কখনও । এসব প্রশ্নও কেউ কখনও তোলেন নি । একটা গণ্ডী নিজেরা তৈরী ক'রে নিয়েছি, আর তার ভেতরটাই সত্যের একমাত্র ভূমি ব'লে আত্মপ্রসাদে মুগ্ধ হ'য়ে রয়েছি বাইরে কে কি ভাবছে, কে কি ক'রছে, সেদিকে চোখ খুলেও কখনও দেখি নি ।"

"কিন্তু দেখাটা উচিত নয় কি ?"

"উচিত ত বটেই বাবা, অতি উচিত । অনুচিত ত ব'লতেই পারি না । সত্যের অনুসন্ধান কখনও অনুচিত হ'তে পারে ?"

"ঊর্ম্মি তাই ক'রছে । যে ভাবেই হ'ক, আমাদের এই গণ্ডীর বাইরে তার দৃষ্টি পড়েছে । অনুসন্ধান ক'রে সে দেখতে চায়, সত্য কিছু সেথায় আছে কি না, আর সেটা কি রকম ? অনুচিত ব'লে কি তাকে বাধা কিছু আমি দিতে পারি ?

"না, তা পার না, কি বলেই বা দেবে ? কিন্তু—ধর, যদি সে এটা অনুভব করে, বাইরে—অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের ভেতর এমন কোন সত্য আছে, আর তার দিকে তার চিত্ত বড় আকৃষ্ট হ'য়ে প'ড়েছে, তা হ'লে—"

"কি ক'রতে বলেন আপনি ?"

গম্ভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "বড় শক্ত সমস্যা, বাবা, বড় শক্ত সমস্যা । কি জান, ধর্ম্মতত্ত্বটা যত সহজ ব'লে আমরা ধারণা করে নিয়েছি, মনে হ'চ্ছে তত সহজ সেটা নয় । হয় ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে জটিল এই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ প্রকাশ পেয়েছে, যার কোনওটাকেও অসার ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না । তবে আমরা একটা মত অবলম্বন ক'রেছি । দীক্ষার সময় কতকগুলি নীতিকে সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রেছি । সহজে সে সব ত্যাগ করা কি আমাদের পক্ষে উচিত হবে বাবা ?"

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "সহজে কারও ধর্ম্মমত কি অন্য

কোনও মতই ত্যাগ করা উচিত নয়। তবে পরীক্ষা আর বিচার করে অন্য মত যদি কেউ সত্য বলে অনুভব করে, কিম্বা সত্যের যে দিকটা তাতে প্রকাশ পেয়েছে তাই যদি তার বেশী ভাল লাগে, সেইটে ধরে চলতেই যদি মনে বড় একটা আগ্রহ জন্মে, আর তাতেই তার সাধনার সার্থকতা হবে বলে সে বোঝে, তবে তা না করে পুরোণো মতটার দাস হয়ে থাকাই কি তার পক্ষে ভাল কখনও হতে পারে? অন্ততঃ এ দাসত্ব বর্জ্জনের অধিকার কি মানুষ মাত্রেরই নাই?"

গৌরীচরণ কহিলেন, "ব্রাহ্ম আমরা মানব মাত্রেরই স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বিচারে আর বিবেকে যা সত্য বলে মনে হবে, সেই অনুসারে চলবার অবাধ অধিকার মানব মাত্রেরই আছে আমরা মানি, আর সেই অধিকারের গৌরবও সর্ব্বদা ঘোষণা করে থাকি। ব্রাহ্মধর্ম্মে যে লোকে দীক্ষিত হয়, সেই অধিকারেই ত হয়। কিন্তু দীক্ষার একটা সত্য রক্ষার চেষ্টাও ত সবার থাকা উচিত।

"স্বেচ্ছায় যারা দীক্ষিত হয় তাদের সেটা উচিতই বটে। কিন্তু যারা হয় তারা হয়। তাদের ছেলেমেয়েরা ত কেউ দীক্ষিত হয় না।"

কথাটা শুনিয়া গৌরীচরণ যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন।

"দীক্ষিত হয় না। হাঁ, তাই ত। দীক্ষিত ত তারা হয়ই না। হুঁ—এটা বড় ত্রুটিই আমাদের হচ্ছে। ভাবিওনি কখনও। ব্রাহ্ম পিতামাতার সন্তান, সুতরাং সে ব্রাহ্মই হবে, সোজা একটা সত্য বলেই এটা আমরা ধরে নিই। কিন্তু সেও ত একজন মানুষ, তারও বিচার আছে, বিবেক আছে। এটা তার পৈতৃক ধর্ম্ম হলেও তার নিজেরও এর তত্ত্বটা বুঝে নেওয়া উচিত, নিজের দীক্ষাও গ্রহণ করা উচিত। তাই ত। এ সব প্রশ্নই কখনও আমাদের ভেতর ওঠে নি।—হুঁ। তুলতে হবে প্রশ্নটা। আগামী মাঘোৎসবে আমাদের ব্রাহ্ম-সম্মিলনে কথাটা আমি তুলব। সবার পক্ষেই দীক্ষার নিয়ম সব ধর্ম্মেই আছে?"

"হাঁ, যতদূর জানা আছে। হিন্দুর ভেতর যারা দ্বিজ, তাদের সবারই পৈতে হয়। সেটাও বৈদিক ধর্ম্মে একটা দীক্ষা। তার পর প্রত্যেকেরই সন্ধ্যা-আহ্নিক করবার বিধি আছে। তার পর দ্বিজ অদ্বিজ সবাই আবার তান্ত্রিক দীক্ষা নেয়, তাদের যেমন পৈতৃক নিয়ম আছে, সেই রকম সাজো করে, তবে আজকাল অনেকেই এই দীক্ষাটা আর নেয় না। সমাজেরও কোনও তাড়া নেই। তবে খৃষ্টান মুসলমান এদের সবাইর দীক্ষা একটা হয়।"

"হুঁ আমাদেরও হওয়া উচিত। কি আশ্চর্য্য? এতবড় একটা দরকারী কথা কারও আমাদের মনেও কখনও হয় নি।"

মহীন্দ্রনাথ তখন কহিলেন, "কিন্তু দীক্ষা হলেও পরে যদি অন্য রকম ধর্ম্ম কারও ভাল লাগে, তার দিকে মনটা বেশী টানে, তা গ্রহণ করতে কি সে পারে না? ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ত হামেশায় হচ্ছে। হিন্দুরাও ইচ্ছা করলে কুলদেবতার মন্ত্র-পূজা ত্যাগ করে অন্য রকম সাধনা গ্রহণ করতে পারে। কোনও বাধা তাতে নাই। ব্রাহ্ম যদি কেউ চায়, তা কি পাবে না?"

"পারে না, এমন কথাও কি বলতে পারি বাবা? বিবেকের আর বিচারের স্বাধীনতা সবারই আছে।" সেটা যে তার স্বয়ং ভগবানের দেওয়া অধিকার।"

"তা হলে ব্রাহ্ম যদি কেউ ধরুন, কোনও দেবমূর্ত্তির পূজো করতে চায় কি কোনও অবতার মানে—"

সেটা যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলনীতির বিরুদ্ধ।"

"বিবেকের আর বিচারের স্বাধীনতাও কি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল একটা নীতিসূত্র নয়?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে গৌরীচরণ তখন কহিলেন, "তাই ত বাবা, তাই ত বাবা, আবার ত বড় একটা সমস্যার কথাই তুল্লে বটে। বিশেষ কোনও ধর্ম্মমতের আশ্রয়ে একটা সমাজকে যদি গড়ে তুলতে হয়, তবে কতকগুলি মূল নীতি মেনে সবাইকে চলতেই হবে। আর তা যদি হয়, তবে সব বিষয়ে নিজের বিবেক কি বিচার অনুসারে চলবার সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেওয়া যায় না।—তাই ত। দেখছি কি কঠিন সব সমস্যাই উপস্থিত হচ্ছে। এ যাবৎ এ সব প্রশ্নও কখনও ওঠে নি, ভাবিও নি আমরা কিছু, কিন্তু এখন দেখছি ভাবতে হবে। প্রশ্ন তুলেছ, উত্তর ত কিছুই দিতে পারছি নি। না বাবা, উর্ম্মির সম্বন্ধে কিছুই এখন বলতে পারব না। ভাবতে হবে, ভাবতে হবে। ব্রাহ্ম কি ব্রাহ্মিকা কারও নিরাকার একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধ মত অবলম্বন

করবার অধিকার কতটা আছে, আর তাদের সেই অধিকার যদি কিছু থাকে, তা'হলে ব্রাহ্মসমাজ বলে কোনও সমাজেরই অস্তিত্ব থাকতে পারে কি না—হাঁ, অতি বড় ভাববার কথাই বটে এ গুলো! আবার আর একটা কথারও কিছু ইঙ্গিত মা সুকল্যাণীর কাছে পেলাম। কোনও হিন্দু যুবকের প্রতিও না কি উর্ম্মির একটা আকর্ষণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সত্যি যদি হয়ে দাঁড়ায়, তা'হলে—হাঁ, সেও ত ঠিক তেমনি আর একটা সমস্যা উপস্থিত হবে। না বাবা, ভেবে কুলই পাচ্ছি নি কিছু। কুলে যে কি তাও বুঝতে পারছি নি। ভাবতে হবে, অতি ধীরভাবে সব ভাবতে হবে। তা'হলে—আমি আজ উঠি এখন বাবা? আজ কিছুই বলতে পারব না। দেখি, ভগবান্‌কে মনে-প্রাণে ডেকে দেখি, সমাধানের সূত্র কিছু করুণাময় তাঁর এ অধম সন্তানকে দেখান কি না?"

গৌরীচরণ উঠিলেন।'—মহীন্দ্রনাথ উঠিয়া প্রণাম করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া অতি চিন্তাকুলভাবে ধীরে ধীরে গৌরীচরণ বাহির হইয়া গেলেন।

(চব্বিশ)

"আচার্য্য মশাই বেরিয়ে গেলেন?"

সহসা সুকল্যাণী গৃহে প্রবেশ করিয়া এই প্রশ্ন করিলেন। ইহাদের আলোচনায় যোগ দিবার অর্থাৎ অনভিপ্রেত প্রতি কথায় বাধা দিয়া তাঁহারই মতানুযায়ী একটা মীমাংসায় ইহাঁদিগকে উপনীত করিবার সুযোগ না পাইয়া যারপরনাই অসন্তুষ্ট তিনি হইয়াছিলেন এবং অতি অধীর ভাবে উপরে ছটফট করিতেছিলেন।

আড়ালে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথা কিছু শোনা সুনীতি-সঙ্গত কাজ হয় না বলিয়া সে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু কাণ খাড়া করিয়া ঘন ঘন বাহিরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছিলেন; ঘরটাও ছিল নীচেকার বসিবার ঘরের কেবল উপরে। তবে অস্পষ্ট একটা শব্দ ব্যতীত যথেষ্ট কোনও কথাই তাঁহার কাণে গেল না। হঠাৎ চক্ষে পড়িল, আচার্য্য মহাশয় বাহির হইয়া যাইতেছেন। এ কি! একটিবার তাঁহাকে ডাকিয়া মীমাংসা কি হইল, তাহা না জানাইয়া অমনই চলিয়া যাইতেছেন! ত্রস্ত সুকল্যাণী নীচে নামিয়া আসিলেন। অতি উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য মশাই বেরিয়ে গেলেন?"

"হাঁ।"

"কি বলে গেলেন?

"কথাটা ভেবে দেখতে হবে?"

"ভেবে দেখতে হবে! কি ভেবে দেখতে হবে?"

"হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝবার চেষ্টায় তার বই টই পড়বার অধিকার সবারই আছে, এটা তিনি স্বীকার করেন। স্বীকার সবাইকে করতেই হবে। তবে তিনি দেখতে চান এই যে, ব্রাহ্ম কেউ যদি হিন্দুধর্ম্মের সেই তত্ত্ব ভাল বলে বোঝে, তার সব সাধনার প্রণালী যদি ভাল কারও লাগে, তবে তাই গ্রহণ করবার অধিকার তার আছে কি না।"

অতি কঠোর তীব্রস্বরে সুকল্যাণী বলিয়া উঠিলেন, "না, তা নাই? ব্রাহ্ম কারও সে অধিকার থাকতেই পারে না। কেউ যদি তা করে, ব্রাহ্মসমাজে তার স্থান হতে পারে না।"

"তা হ'লে বল ব্রাহ্মসমাজেও লোকের জাত যায়?"

"জাত যায়! জাত যাওয়া মানে কি? আমরা কি জাত মানি যে জাত যাবে।"

"যে ভাষাতেই বল, কথাটা আসলে একই গিয়ে দাঁড়ায়, ব্রাহ্মসমাজে যদি ব্রাহ্ম কারও স্থান না হয়, সম্প্রদায়ের গণ্ডী থেকে বহিষ্কার যদি কাউকে করে দেওয়া হয়, তবে হিন্দুরা যাকে জাত যাওয়া বলে, শাস্তিটা তার ঠিক তাই হয় না?"

"হয় হ'ল। হলেই বা কি? ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কাজ যদি কেউ করে সাধুসমাজে তার স্থান হতে পারে না, এখন তাকে জাত যাওয়াই বল, আর যাই বল।"

কথাটা—আর একটু তলিয়ে ভেবে দেখ সুকু। সাধারণ ভাবে ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে যে চলে, অসাধু যে, সাধুসমাজে তার স্থান হতে পারে না। সেটা হ'ল এক রকম কথা। জীবনের মরাল (moral) বা যাকে আমরা নৈতিক দিক বলি, সেইদিকের কথা। কিন্তু religious দিক্ একটা আছে, সেটা আলাদা রকম একটা দিক্। সেই দিক থেকে অন্য রকম ধর্ম্মমত কি সাধনার নিয়ম, ব্রাহ্ম যদি কেউ ভাল মনে করে—আর গ্রহণ করতে চায়—"

"তা হ'লে সোজা কথা, ব্রাহ্মসমাজে তার স্থান হ'তে পারে না। বিশেষ একটা ধর্ম্মমত ধ'রেই এই সমাজ গ'ড়ে

উঠেছে, সেই মত ধ'রেই চ'লছে। সেই মত ছেড়ে বিপরীত কি ভিন্ন রকম যার যেমন খুশী মত নিয়ে লোকে যদি চ'লতে থাকে, তবে সমাজ কি ক'রে থাকে ?"

"হুঁ। তা হ'লে ব'লতে হবে, বিবেকের কি বিচারের স্বাধীনতা ব্রাহ্মেরও নাই। অন্য কারও বুদ্ধিতে স্থির করা নির্দ্দিষ্ট একটা মত ধরেই তাকে চলতে হবে।"

সুকল্যাণী উত্তর করিলেন, "যাদের বুদ্ধিতেই যতটা স্থির হ'য়ে যাক, নির্দ্দেশ যারাই করে থাকুন, ঠিক সত্য যা, তাই নির্দ্দেশ ক'রেছেন। যারা তা স্বীকার না ক'রবে তারা ভুল বুঝছে। ভুল বুদ্ধিতে পাপের পথে কাউকে চ'লতে দেওয়া যেতে পারে না। ব'ল্লে যদি না শোনে, বোঝালে যদি না বোঝে, শাসনে তাকে দমন রাখতে হবে, দরকার হ'লে সমাজ থেকে বের করেও দিতে হবে।"

"উর্ম্মিকে বোঝাবার চেষ্টা কিছু ক'রেছ ?"

"বোঝাব ! ঐ এক রত্তি মেয়ে, আমি মা, বোঝাব আবার কি ? আমাদের মতে তাকে চ'লতেই হবে। ধমকে ওকে দু' দিনেই ফিরিয়ে আনতে পারতাম। কিন্তু তুমিই পাপ বুদ্ধিতে প্রশ্রয় দিয়ে ওর সর্ব্বনাশ ক'রে দিচ্ছ।"

একটু হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সুকু, উর্ম্মি নেহাৎ এক রত্তি মেয়েটি আর নেই। মনে ওর প্রশ্ন উঠেছে, বই-টই পড়ছে, ও জানতে চায়, বুঝতে চায়—"

"কেবল তাই নয়। মতি গতিও ওর ঐদিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছে, সেটা সেদিন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। আবার —আবার লুকিয়ে কি মন্ত্র জপও করে।"

"মন্ত্র জপ করে—সে কি ? কিসের মন্ত্র ?"

"নিশ্চয়ই কোন পৌত্তলিক মন্ত্র। মন্ত্র আবার কি হবে ? মন্ত্র ব'লে শব্দের কোনও মাহাত্ম্য আমরা জানি না, মুখেও কেবল তাই আওড়াই না। কোনও শব্দকে এইভাবে দেবতা ক'রে নেওয়া সেও একরকম পৌত্তলিকতা।"

"হুঁ। মন্ত্র জপ করে—কি ক'রে জানলে ? দেখেছ ?"

"হাঁ, এই ত আজই ভোরবেলায়। ওদের শোবার ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম নির্ম্মলাকে ডেকে তুলে দেব ব'লে, দেখলাম উর্ম্মি বিছনার নীচে আসন পেড়ে বসে রয়েছে।"

"হয় ত প্রার্থনা ক'রছিল ব'সে।"

"না ! বুকের কাছে হাত, আঙ্গুলের ওপর আঙ্গুল—পৌত্তলিক হিন্দুরা জপের সময় ঠিক যেমন করে, তাই করছিল।"

"হুঁ। জানি না ত, হয় ত তাই কিছু ক'রছিল। তা বেশ ত, যদি পার যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ওকে ফেরাও না ? কোনও আপত্তি আমার নেই। কিন্তু পড়াশুনো ও যা করছে, কি ক'রতে চাইছে—"

সুকল্যাণী বলিয়া উঠিলেন, "যে পাপ বুদ্ধি ওর মাথায় ঢুকেছে, এই সব অপধর্ম্মের সব বই যদি অবাধে পড়তে থাকে, মনের এমন অধোগতি ওর হবে যে কোনও যুক্তি দিয়ে তা থেকে ফেরাতে আমি ওকে পারব না। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে শাসন দরকার, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে কিছু হবে, সে সময় আর নেই।"

"সেটা আমি মেনে নিতে রাজি নই সুকু। উর্ম্মি কুবুদ্ধির মেয়ে নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মও ত্যাগ এখনও ক'রে নাই। হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা ক'রছে। হয় ত মনের ঝোঁকও সেদিকে গিয়ে কিছু প'ড়েছে। তা যুক্তির বলে ফেরাতে যদি তাকে না পার, বুঝতে হবে যুক্তি তোমার অসার।"

"না, যুক্তি অসার নয়, মনটাই তার অসার, অসার হ'য়ে প'ড়েছে, সার যুক্তি আর গ্রহণই ক'রতে পারে না। তুমি প্রশ্রয় দিয়ে তার পথ আরও কঠিন ক'রে দিচ্ছ। শাসনেও বাধা দিচ্ছ। আচার্য্য মশাইএর কাছে আমার অভিযোগ ছিল উর্ম্মির বিরুদ্ধে তত নয়, যত তোমার বিরুদ্ধে। পিতার কর্ত্তব্য তুমি বিস্মৃত হ'চ্ছ, প্রশ্রয় দিয়ে পাপের পথে ওকে নাবিয়ে দিচ্ছ।"

"আমি সেটা মনে করি না সুকু। আচার্য্য মশাইও করেন না।"

সুকল্যাণী বলিয়া উঠিলেন, "সাদাসিধে ভালমানুষ তিনি – ভুল বুঝিয়ে দিয়েছে, নইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য হ'য়ে তিনি বলেন কি না ভেবে দেখতে হবে। ভেবে ত দেখতে হবে এই যে ব্রাহ্ম কেউ পৌত্তলিক হ'তে পারে কি না ?"

মহীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "কথাটা ঠিক ওভাবে ব'ল্লে ঠিক বলা হয় না সুকু। ব্রাহ্মসমাজ স্বীকার করেন বিবেকে ও বিচারে যা ভাল মনে হবে, সেই অনুসারে স্বাধীন ভাবে চ'লবার অধিকার প্রত্যেকটি ব্রাহ্মের আছে। এখন প্রশ্ন এই

যে, কোনও ব্যক্তিবিশেষের যা ভাল মনে হবে তা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচলিত নীতির বিরোধী হয়,তবে তার সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার অধিকার ব্রাহ্মসমাজের আছে কি না, এইটেই তিনি—"

"নিশ্চয়ই আছে। নইলে ব্রাহ্মসমাজ থাকে কি ক'রে? আর যে কোনও বিষয়েই লোকের স্বাধীনতা মানা যাক, মূল যেসব নীতি ধ'রে এই সমাজটা দাঁড়িয়েছে তা নিয়ে কোনও ব্যাপারে যে যা খুসী ক'রে বেড়াতে পারে না। এক কথায় আর যে যাই করুক, ব্রাহ্ম কেউ পৌত্তলিক হ'তে পারে না।"

"সেইটে পারে কি না, কেউ তা হ'লে ব্রাহ্মসমাজ কোনও শাসনে তাকে বাধ্য ক'রতে পারে কিনা, ক'রলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হয় কি না, এই কথাগুলিই তিনি ভেবে দেখতে চান।"

একটু কাল কি ভাবিয়া সুকল্যাণী কহিলেন, "তা হ'লে —দেখছি, এর কোনও প্রতিকার তাঁর দ্বারা হবে না।"

"নাও হ'তে পারে।"

"তুমিই তবে এই খটকা তাঁর মনে ঢুকিয়েছ? নইলে—"

"হাঁ, কথাগুলো তাঁর কাছে উপস্থিত আগে আমিই ক'রেছি। তবে তার যুক্তিযুক্ততা তিনি শেষে স্বীকার ক'রেছেন।"

"যুক্তিযুক্ততা ত এই যে, ব্রাহ্ম-পরিবারের কোনও মেয়ে ফুল-পাতা নিয়ে মন্তর আউড়ে পুতুল-পূজো ক'রতে পারে, আঙুলের কর গ'ণে মন্তর জপও করতে পারে?"

"না, ঠিক তা নয় সুকু! তবে কেউ যদি তা ক'রে, তবে ব্রাহ্মসমাজ তাকে বাধা দিতে পারে কিনা।"

"কত বড় গুরুতর একটা অন্যায় তুমি ক'রেছ বুঝতে পারছ না মিষ্টার মোকার্জ্জি?"

"না, কি?"

"মেয়ের মাথাটা খেয়েছ, আচার্য্যমশাইএরও মাথাটা খাবার যোগাড় ক'রেছ? কত বড় অনর্থ এতে হবে বুঝতে পারছ? বুঝতে পারছ তার জন্য দায়ী তুমি?"

"না, সেটা ঠিক বুঝতে পারছিনি সুকু! হাঁ, গোলমাল তুমি একটা ক'রছ, আরও ক'রবে। কিন্তু তার জন্যে আমিই যে দায়ী, সেটা ত মনে হচ্ছে না।"

"হচ্ছে না! মিছে কথা ব'লছ, তুমিই দায়ী—তুমিই দায়ী। দু'শো বার তুমি দায়ী। কেন এই কুকাণ্ডটা ঘটল? সুরুতেই কোন প্রতিকার ক'রলে না? কেন আমাকেও করতে দিলে না? এখনও—এখনও যে প্রতিকার হ'তে পারে, তাতেও আবার এত কৌশল ক'রে বাধা দিচ্ছ?"

"সুকু। বেলা হ'য়ে গেল। স্নানাহার ক'রে এখন আফিসে আমাকে যেতে হবে।" বলিয়া মহীন্দ্রনাথ উঠিলেন।

"পালাতে চাইছ? পালাও। আমি কিছু তোমায় ধরে রাখতে পারব না। কিন্তু জেনো, সহজে আমি ছাড়ব না। আচার্য্য মশাই সাদাসিধে বুড়ো মানুষ, দুটো কথার ছলে ভুল বুঝিয়েছ তাঁকে, কিন্তু সবাইকে পারবে না। উনি ভেবে দেখবেন? বেশ ভাবুন। দেখি ভেবে কি বলেন? কি আর ব'লবেন? যা ব'লবেন, বেশ বুঝতেই পারছি। তা মনে করো না, এক ওঁর কথাই—আমি অমনি মাথা পেতে নেব। ব্রাহ্মসমাজের কাছে আমি 'আপীল' করব, দেখব, সুবিচার সেখানে এর হয় কি না।"

"বেশ, তাই ক'রো।"

"তাঁদের বিচার তখন মেনে নেবে?"

"সেটা তখন বুঝব। তারা ত একতরফা রায় দেবেন না? আমার কথাটাও অবশ্য শুনবেন।"

সুকল্যাণী কেমন থমকিয়া স্বামীর মুখের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ চমৎকার হবে! স্বামী স্ত্রী দু'জনে যখন আদালতে মামলা করতে গিয়ে সমাজের সভায় দাঁড়াব! মহীন্ কি করে এটা ভাবতেই পারলে? কতবড় একটা বিশ্রী কাণ্ড হবে সেটা বুঝতে পারছ না? কি ব'লবে লোকে? কি ক'রে—কি ক'রে—।"

সুকল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। মহীন্দ্রনাথ স্নেহে তাঁহার কাঁধে হাতখানি রাখিয়া কহিলেন, "কেঁদো না সুকু! ছিঃ, কাঁদতে আছে? কিন্তু কি ক'রব বল? নিজের কোনও সুখ-সুবিধা নিয়ে কথা হ'লে আমি ছেড়ে দিতাম তোমার মত যা, তাই মেনেই চ'লতাম।"

কাঁদিতে কাঁদিতেই সুকল্যাণী কহিলেন, "আমিও ত নিজের সুখ সুবিধা ভেবে কিছু ক'রতে চাইছি নি, ঊর্ম্মির যাতে মঙ্গল হয়—"

"আমিও ঠিক তাই চাইছি। তবে এ বিষয়ে একমত

দু'জনে হ'তে পারছি নি। তুমি মা, আমি বাবা। তুমি মার কর্ত্তব্য পালন ক'রতে চাইছ, আমিও পিতার কর্ত্তব্য পালন ক'রতে চাইছি। তবে এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মস্ত একটা মত-বিরোধ আমাদের হ'চ্ছে। এখন—"

"তুমি ভুল বুঝছ, নিশ্চয়ই ভুল বুঝছ। কেবল—"

"না! অন্ততঃ আমি তা মনে করি না। ভুল হয় ত তোমারও হ'তে পারে। তা যখন দুজনের দুই মত হ'চ্ছে, আর তুমি তোমার মতে আমাকে বাধ্য ক'রবার জন্যে সমাজের কাছে আপীল ক'রবে ব'লছ, আমাকেও আমার কথাটা সেখানে ব'লতে হবে। এ সব গুরু বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর যদি দুই মত হয়; আর ঘরে তারা মীমাংসা করতে না পারে, আর তাতে ক'রে এক পক্ষ যদি তার অভিযোগ নিয়ে সমাজের দরবারে উপস্থিত হয়, আর এক পক্ষকে একটা জবাব তার দিতেই হবে।"

"কেন, ঘরে কি মীমাংসা হ'তে পারে না?"

"হ'চ্ছে কই সুকু? হ'ল না ব'লেই না আচার্য্য মশাইএর কাছে তুমি অভিযোগ জানিয়েছ। তা বেশ, দেখই না? আচার্য্য কি বলেন শোন। তখন যা হয় দেখব কি করা যায়।"

"ঊর্ম্মিকে তুমি কেন ভাল ক'রে বুঝিয়ে একটু বল না? তোমার কথা ও শোনে—"

"বোঝাতে পারছি কই? ও যা ব'লে, তার জবাব যে সব দিয়ে উঠতে পারি না। তা দেখই না, এখনও ত সে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত হয় নি। তবে মনটা সে দিকে কিছু ঝুঁকেছে ঠিক। কিন্তু কি ক'রব? জোর ক'রে ত ব'লতে পারি নে কিছু।"

"পারলে ভাল হ'ত। তোমার কথা হয় ত সে মানত।"

"সেটা—উচিত মনে করি না সুকু। কারও বুদ্ধিকে আর চিন্তাকে একটা গণ্ডীর ভেতর জোর ক'রে বেঁধে রাখতে চাওয়া—সেটা তার চক্ষু দু'টিকে অন্ধ ক'রে কারাগারে বেঁধে রাখবার চাইতেও খারাপ। স্বধর্ম্মে কারও মনকে স্থির রাখতে যদি হয়, তার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির টান—প্রাণের দরদ—স্বাভাবিক সংস্কারেব মতই যাতে হ'য়ে ওঠে, ছেলে বেলা থেকে তেমনি ভাবে তাকে তৈরী ক'রে তুলতে হবে। তা যদি হয়, কোনও যুক্তি সহজে সে সংস্কারকে টলাতে পারে না। কিন্তু তার কোনও ব্যবস্থাই আমাদের সমাজে নেই। এখন এক উপায় দুই পক্ষেব যুক্তির লড়াই। তোমার যুক্তি দিয়ে তার যুক্তিকে যদি হাবাতে পাব, হয় ত মনের গতি তার ফিরবে। কিন্তু তার যুক্তির জোরও বড় কম নয় সুকু।"

মুখখানি সুকল্যাণীর কিছু কঠোর হইয়া উঠিল।

"তা হ'লে—পৌত্তলিক ধর্ম্মেই তাকে ছেড়ে দেবে?"

"ছেড়েও দিতে চাই না, বেঁধেও রাখতে চাই না। সে যা ভাল বোঝে, ক'রবে। বুঝিয়ে তাকে ফেরাতে পার বেশ, দেখ।"

"তুমি সেটা দেখবে না?"

"না, সুবিধা হবে না সুকু।" বলিতে বলিতে ঘড়ীর দিকে একবার চাহিলেন। সুকল্যাণীও সেই দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তার মানে, সে ইচ্ছেই তোমার নেই। সেটা আরও এক দিক থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই যে কমলের সঙ্গে বিয়ের একটা কথা হ'চ্ছে—"

"কথা হ'য়েছে তোমাতে আর তার মাতে।—কিন্তু কমল নিজে—"

"সে ত আসা যাওয়া ক'রছে, ঊর্ম্মিকে 'কোর্ট' ক'রতেও চাইছে—"

"চাইছে, করুক না? আর 'কোর্টটা' এ দেশে যতদুর হ'তে পাবে, সেটা ত সে একরকম ক'রছেই। তবে সে যদি চায়, একলা ওকে নিয়ে বেড়াতে টেড়াতে বোরোবে—না, সুকু, সেটা আমি অনুমোদন ক'রতে পারব না।"

"সেটা, আমিও—না, পছন্দ করি না।

"'কোর্টসিপ' আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও একটা হয়। কিন্তু মেয়েকে ছেলের সঙ্গে একা বেরুতে ত কেউ বড় দেয় না।"

"না, তা, বড় কেউ দেয় না। তবে—"

"কি?"

"তোমার কাছে তেমন একটা welcome (আদর-আপ্যায়ন) সে যেন পাচ্ছে না। এটা সে feel ক'রে ব'লেও মনে হয়। নইলে—নইলে—এ কয়দিনে প্রস্তাবই হয় ত ক'রত। আর তা যদি ক'রত, বিয়েটা হ'য়ে যেত, সব সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গেই হ'ত। কিন্তু মনে হয়, এই সম্বন্ধটা তুমি যেন পছন্দই তেমন কর না।"

"না, তা করি না।—তবে, সে যদি প্রস্তাব ক'রে, আর

উর্ম্মি সন্তুষ্ট হ'য়ে গ্রহণ সেটা করে, বাধাও কিছু আমি—না, দিতে পারি না।"

"প্রস্তাব যদি সে করে, উর্ম্মি—কেন রাজি হবে না। রাজিও তাকে বুঝিয়ে করতে হবে। এমন একটা brilliant match !"

"হ'তে পাবে brilliant, কিন্তু match brilliant হ'লেই happy সর্ব্বদা হয় না।"

"সর্ব্বদা না হ'তে পারে। কিন্তু এটা যে হবে না, তাও ত ব'লতে পার না। এই ত আলাপ সালাপ ক'রছি, হাঁ, একটু, হালকা হ'লেও বেশ সবল সহৃদয় ছেলে ব'লে মনে হয়, আর এমন আপন একটা ভাব দেখতে পাই—যেন আমি সত্যিকাব আপন মাসীমাই তার।—তা তোমার কাছ থেকে—একটু encouragement যদি পেত—"

"Encouragement—কি দেব? কি ক'রে দেব? আজ কাল এই রকম brilliant একটা match ঘটাতে মেয়ের বাপ-মায়েরা যা সব কাণ্ড ক'বে, আর যা ক'রতে গিয়ে নিজেও যথেষ্ট অপদস্থ লোকসমাজে হ'য়েছে—না, সুকু, সে সব আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।"

মনে মনে লজ্জা পাইলেও বেশ একটু রাগও সুকল্যাণীর হইল। বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু অরুণের সঙ্গেও বিয়ে হ'তে পারে না! মনে মনে সেইটে যে তুমি চাও, তাও বেশ জানি। কিন্তু তা হ'তে পারে না, হ'তে পাবেই না। সে হিন্দুর ছেলে।"

"কিন্তু উর্ম্মি যদি তাকেই পছন্দ করে?"

"করলে তোমার encouragement পেয়েই এই করবে। সে encouragementও দিচ্ছ ওদের তুমি।—আর কমলের বেলায়—"

ঘড়ির দিকে আবার চাহিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "আর দেরী করতে পারছি নি সুকু। এখন থাক্ ওসব কথা। মীমাংসা কিছু একটা ক'রে ফেলবার এমন তাগিদও কিছু দেখছি না। যা হবার হবে, তোমার আমার হাত এতে কিছু নেই।"

বলিয়াই মহীন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলেন।

সুকল্যাণীও ঘড়ির দিকে চাহিয়া বুঝিলেন, মহীনকে আর ditain করা চলে না। আর সত্য এমন তাগিদও কিছু নাই যে, এখনই একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে। কমলও ত, প্রস্তাব এখনও করে নাই? আর অরুণ—তাকেও বেশ safe detainceএ আপাততঃ রাখা হইয়াছে।

[ক্রমশঃ]

এপার ওপার

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ধূসর চৈতালী সন্ধ্যা রাঙা সূর্য্য ডুবে যায় তামসীর পার,
উদাস শ্মশান মাঝে একাকী বসিয়া রই, ধূ ধূ করে চর—
ওপারের জ্বলিছে চিতা, ঘনীভূত নীলধূমে আকাশ আঁধার
আর সেথা পতি লাগি কাঁদিছে তরুণী এক ব্যথা-জরজর।
রজনী ঘনায় ধীরে, পৃথিবী ঘুমায়ে যায় শুধু জাগে চাঁদ—
শ্মশানেতে সাথীহারা তখনো বসিয়া রই আর নাই কেউ,
ওপারের অরণ্য হতে ফুলেলা বাতাস আনে স্বপনের স্বাদ।
আনমনে বসে রই; বালু তটে ভাঙে শুধু তামসীর ঢেউ।
সহসা মধুর স্বরে কে যেন গাহিয়া ওঠে অদূরে আমার—
চমকিত চেয়ে দেখি : হীরা-জ্বলা বালুচরে জাগে দু'টী প্রাণ,
নবীন দম্পতি এক হাসি গানে মাতিয়েছে নিশার পাথর
দোঁহারি হৃদয়বীণে একই সুরে বেজে চলে জীবনের গান।
ওপারে দুখের দেশ, বেদনার নীল ধূমে আকাশ আঁধার
এপারে রূপালী নভ, চাঁদ তারা ঝলোমলো স্বপ্ন পারাবার।

গোবিন্দদাস*

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(এক)

গোবিন্দদাসের পরিচয় নরহরিদাসের পদের দ্বারাই দেওয়া যাইতে পারে।

রামচন্দ্র কবিরাজ বিখ্যাত ধরণী মাঝ
তাহার কনিষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ।
চিরঞ্জীব সেন পুত্র কবিরাজ নামে খ্যাত
শ্রীনিবাস শিষ্য কবিচন্দ ॥
তেলিয়া বুধরি গ্রামে জন্মিলেন শুভক্ষণে
মহাশাক্ত বংশে দুই ভাই।
পরে পিতৃধর্ম্ম-ত্যাগী ঘোরতর পীড়া লাগি
বৈষ্ণব হইলা দোঁহে তাই ॥
হইল আকাশ বাণী করিলেন কাত্যায়নী
গোবিন্দ গোবিন্দপদ ভজ ॥
বিপত্তে মধুসূদন বিনে নাই অন্যজন
সার কর তাঁর পদরজ ॥
শ্রীখণ্ডের দামোদর কবিকুলে শ্রেষ্ঠতর
গোবিন্দের হন মাতামহ।
সুরগুরু সঙ্গে যার তুলনায় বার বার
লোকে যশ গায় অহরহ ॥
বুঝি মাতামহ হৈতে কবিকীর্ত্তি বিধিমতে
পাইলা গোবিন্দ কবিরাজ ॥
কহে দীন নরহরি তাই ধন্য ধন্য করি
গায় গুণ পণ্ডিত সমাজ ॥

অন্যান্য প্রাচীনগ্রন্থ হইতেও বুঝা যায়—শ্রীখণ্ডেই গোবিন্দদাসের জন্ম, বাড়ী কুমারনগর, তেলিয়া বুধরি গ্রামে পরে বাস করেন।

গোবিন্দদাস তিনজন। একজন গোবিন্দদাস ঝা ইনি মিথিলার কবি। বিদ্যাপতির অনুসরণে ইঁহার লিখিত মৈথিলী ভাষার কয়েকটি পদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। আর একজন গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী। ইনিও পদকর্ত্তাদের মধ্যে বিখ্যাত। ইঁহার রচিত পদগুলি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। তৃতীয় গোবিন্দদাস তেলিয়া বুধরি (মুর্শিদাবাদ) গ্রামনিবাসী ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা।* শ্রীখণ্ডের মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম ও প্রতিপালন। গোবিন্দদাস বাঙ্গালায় ২।৪টি ও ব্রজবুলিতে বহু পদরচনা করিয়াছেন। এই গোবিন্দদাস বঙ্গের একজন মহাকবি। ইঁহার পদাবলীর কবিত্ব ভক্তির আতিশয্যে অভিভূত হয় নাই। নিজে ইনি বড় ভক্ত ছিলেন বটে কিন্তু ইনি ভক্তির ভাবাকুলতা সম্বরণ করিতে পারিতেন। ফলে, ইঁহার পদে কবিত্বের অবাধ স্ফুরণ হইয়াছে। গোবিন্দদাসের কবিত্ব প্রাণের গভীর আকূতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ নয়—সেজন্য বিরহের কবি চণ্ডীদাসের কবিত্ব-মহিমা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। গোবিন্দদাসের কবিতায় ভাবানন্দের সহিত বোধানন্দের মিলন ঘটিয়াছে। পদরচনাকে ইনি আর্টের পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ করেন। কবিতার বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব সাধনে কবির কোথাও বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি হয় নাই। যেমন ছন্দের বৈচিত্র্য তেমনি পদবিন্যাসের চাতুর্য্য, তেমনি ভাব প্রকাশের কৌশল, তেমনই আলঙ্কারিকতা। কোথাও কোথাও অনুপ্রাস যমক ইত্যাদি শব্দালঙ্কারের আতিশয্যে ও অর্থালঙ্কারের জটিলতায় তাঁহার পদগুলি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। স্থলে স্থলে strained Metaphorও আছে। গোবিন্দদাস তাঁহার পদে অর্থশ্লেষ, রূপক কাব্যলিঙ্গ, মালারূপক, অতিশয়োক্তি,

---

* গোবিন্দ দাস যে প্রথমজীবনে শাক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ একটি পদ হরেকৃষ্ণ বাবু বৃন্দাবন দাসের রস নির্য্যাস হইতে উৎকলিত করিয়াছেন।

হেমহিম গিরি দুই তনুছিরি আধনর আধনারী।
আধেক উজর আধ কাজর তিনই লোচন ধারী ॥
না দেব কামিনী না দেব কামুক কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরী শঙ্কর চরণে কিঙ্কর কহই গোবিন্দ দাস ॥

এই পদ হইতে গোবিন্দ দাসের পরিকল্পিত কামগন্ধ হীন বিশুদ্ধ প্রেমের একটি মনোরম চিত্র পাওয়া যায়। গোবিন্দ দাস যে ব্রজলীলা বর্ণনার আগেই ব্রজ বুলিতে গৌরীশঙ্করের মহিমা গান করিতেন তাহারও প্রমাণ পাই। সে কালে ব্রজবুলিই সকল প্রকার কবিতা রচনার ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল।

* গোবিন্দ দাসের মাতামহ দামোদর একজন বড় কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। “পাতালে বাসুকির্বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ।” জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ ও একজন ভক্ত ও পণ্ডিত লোক ছিলেন।

বিভ্রম, সূক্ষ্ম, সন্দেহ, মীলিত লুপ্তোৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের ভূরি ভূরি প্রয়োগ করিয়াছেন। উপমা যদি কালির সম্পদ হয়, তবে উৎপ্রেক্ষা গোবিন্দদাসস্য বলিতে হয়।

গোবিন্দদাসের কবিতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংস্কৃত কবিদের প্রভাব দৃষ্ট হয়। তিনি বহু সংস্কৃত শ্লোককে ব্রজবুলির পদে নব রূপ দান করিয়াছিলেন—বহু সংস্কৃত কবির ব্যবহৃত অলঙ্কার তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বহু সংস্কৃত কবিপ্রৌঢ়োক্তি তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। বিদ্যাপতির কাছেও গোবিন্দদাস ঋণী, শুধু ভাষা ও ছন্দের জন্য নয়। বিদ্যাপতির রচনাভঙ্গী ও পদবিন্যাস-চাতুর্য্যও তিনি অধিগত করিয়াছিলেন, অবশ্য বহুস্থলেই শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ছন্দ ও পদলালিত্যের জন্য গোবিন্দদাস জয়দেবের কাছেও ঋণী। বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাস সম্ভোগের কবি, উল্লাসরসের কবি। রাসারম্ভের "শরদচন্দ্র পবনমন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ ফুল্লমল্লিকা মালতীযূথী মত্তমধুকর ভোরণি" ইত্যাদি পদের মত উল্লাসরসের পদ পদাবলী-সাহিত্যেও নাই। "বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ" আর একটি উল্লাসের পদ। গোবিন্দদাস অভিসারের কবি। জ্যোৎস্নাভিসার, দিবাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, তিমিরাভিসার ইত্যাদি অভিসারের এত বৈচিত্র্য কাহারও পদে দেখা যায় না। বঙ্গীয় পদকর্ত্তাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের মত 'বাৎসায়নী স্বাধীনতা' কাহারও পদে দেখা যায় না, প্রকাশের ভাষার আলঙ্কারিকতা ও মণ্ডনকলার গুণে অশ্লীলতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। (গোবিন্দদাসের রূপানুরাগ রূপোল্লাস, রসালস, প্রেমবিহ্বলতা, মোহমাদকতা, মিলনাকুলতা ও স্বপ্নমাধুর্য্যের পদগুলি জগতের সাহিত্যভাণ্ডারের পরম সম্পদ্।) কবির গোষ্ঠবিহারের পদও চমৎকার। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকা গানে যে ছন্দ, অলঙ্কার ও পদবিন্যাসের ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তনীয়ার মৃদঙ্গে নানা বর্ণচ্ছটায় যেন পল্লবিত হইয়া উঠে। চাতুর্য্যের দ্বারা যে কতটা মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারা যায়—তাহা গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের মত পাষাণও যে এই গানে গলিয়া যাইত—তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

প্রতাপ আদিত এ রসে ভাসিত দাসগোবিন্দ গান।

গোবিন্দদাসের কবিতা যে তাঁহার জীবদ্দশাতেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে—

আমরা ভক্তি রত্নাকর ও অনুরাগ-বল্লীতে দেখিতে পাই—

বড় কবিরাজ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ নাম।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাঁর গুণগ্রাম॥
তিহোঁ গীত পাঠাইলা শ্রীজীব গোসাঞির স্থান।
তাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় পরাণ॥
গোসাঞি সগণ তাহা কৈল আস্বাদন।
বিচারিয়া দেখ হিয়া নিজ নিজ মন॥
গোবিন্দ শ্রীরাম চন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ কবি সবে প্রশংসয়॥
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যাঁর গীতামৃত পানে॥
কবিরাজ খ্যাতি যবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোঁসাই॥

সেই শ্লোকটি এই—

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র চন্দন গিরেশ্চঞ্চৎসমীরানিলে
না নীতঃ কবিতাবলী পরিমল কুঞ্জেষু সম্বন্ধ ভাক্।
শ্রীমজ্জীব সুরাব্ধি পারীন্দ্র জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্।
সর্ব্বস্তাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমদ্ভুৎ পরম্॥

কবি নরহরি বলিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র কৃপানিধি যাঁর মহামন গৌর চরিত্র।
নির্ম্মল প্রেম প্রচার চারুগুণ যাক কার্য্য করু ভুবন পবিত্র।

কবিবল্লভ একটি পদে তাঁহাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ   বন্দিত কবিসমাজ
কাব্যরস অমৃতের খনি।
বাগ্দেবী যাহার দ্বারে   দাসী ভাবে সদা ফিরে
অলৌকিক কবি শিরোমণি।
ব্রজের মধুর লীলা   যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হতে নহে ন্যূন   গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।
অসম্পূর্ণ পদ বহু   রাখি বিদ্যাপতি পঁহু
পরলোক করিলা গমন।
গুরুর আদেশ ক্রমে   শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিল পূরণ।
এমন সুন্দর তাহা   আচার্য্য প্রভু শুনি যাহা
চমৎকার ভাবে মনে মনে।
তাই গুরু মহানন্দে   কবিরাজ শ্রীগোবিন্দে
উপাধিটি করিলা প্রদানে।

গোবিন্দের কবিত্ব শক্তি সাধন ভজন ভক্তি
অতুলন এ মহীমণ্ডলে।
ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি কবিকুলে যেন রবি
এ বচন দঢ় করি বলে।

আলঙ্কারিকতার জন্য গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্যে অপরাজেয়। অলঙ্কৃত করিয়া না বলিলে কোন বক্তব্য কাব্য হইয়া উঠে না তাহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। বঙ্গ-ভাষাকে তিনি অতি দুর্লভ অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া রাজ রাজেশ্বরী রূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই আলঙ্কারিকতা কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের মত স্বাভাবিক ভাবে প্রবুদ্ধ হয় নাই। মনে হয়, তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রের পুস্তক বিশেষতঃ উজ্জ্বল নীলমণি, রসমঞ্জরী, অলঙ্কার কৌস্তভ ইত্যাদি রসশাস্ত্রের পুস্তক মন দিয়া অধ্যয়ন করিয়া অলঙ্কার-প্রয়োগে পারদর্শী হ'ন। অনেক সময় মনে হয়, অলঙ্কার প্রয়োগের কৃতিত্ব প্রকাশের জন্যই তিনি কোন কোন পদ রচনা করিয়াছেন। অনলঙ্কৃত সরল ভাষায় বৃন্দাবন লীলার কোন কোন অঙ্গকে প্রকাশ করিলে তাহা অশ্লীল হইয়া উঠে। বৃন্দাবন লীলার অতি গুহ্যতম অংশকেও বাণীরূপ দিয়াছেন। কিন্তু আভরণেব আবরণে সে সমস্ত অশ্লীল হইয়া উঠিতে পারে নাই।

গোবিন্দদাসের অলঙ্কার কঠোর স্বর্ণ-হীরকের অলঙ্কার নয়—ফুলের অলঙ্কার। তাই ইহাব সৌরভ আছে। এই সৌরভ অলঙ্কারগুলির ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি। কবির একটি ব্যঞ্জনাগর্ভ পদের এখানে উদাহরণ দিই। এখানে সুরভিত অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যাইবে—

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কতশত কোটি কুসুম শরে জর জর,
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি, জানলুঁ বিধি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই,
তছু পায়ে মঝু পরনাম॥
সুনয়নী কহত কানু ঘন শ্যামর,
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশ রসে ভাসত,
হামারি হৃদয়ে জলু আগি॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত,
চপল জিবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে,
রসবতি রস মরিযাদ॥

(ভাবাকুলতার সংযমের সহিত অলঙ্কার প্রয়োগের ফলে গোবিন্দদাসের পদে যেরূপ পারিপাটা ও পরিচ্ছন্নতা এরূপ কোন বৈষ্ণব কবির কাব্যে দৃষ্ট হয় না।) গোবিন্দদাসের অনেক পদে অলঙ্কার প্রয়োগেরও ক্রম শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়।

১। ভীতক চিত্ত ভুজগ হেরি যো ধনি,
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আঁধিয়ারে আপন তনু ছাপই,
কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ।
মাধব, কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরি,
জীবই বহু পুন ভাগ॥
যে পদতল থলকমল সুকোমল,
ধরণি পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি,
আবত যায়ত নিঃশঙ্ক॥
মন্দির মাঝ সাজ নাহি তেজত,
দেহলি মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনি চলয়ে একাকিনি,
গোবিন্দদাস কহ ঝুর॥
২। যো মুখ চান্দ নয়নে নাহি হেরলুঁ,
নয়ন দহন ভেল চন্দ।
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলুঁ,
মধুকর ধনি ভেল দন্দ॥
সো কর কিসলয় পরশ উপেখলুঁ,
অব কিসলয়ে তনু কোর।
নব নব নেহ সুধারস নিয়সলুঁ
গরলে ভরল তনু মোর॥
সো কর বিরচিত হার উপেখলুঁ,
হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দদাস কহ সো অতি দুরগহ,
যো ঐছন মতি দেল॥

এই দুইটি পদের পংক্তি-পরম্পরা সম্পূর্ণ আলঙ্কারিক ক্রম (Rhetorical Sequence) অবলম্বনে রচিত। একই অলঙ্কারেব মালিকা। অলঙ্কারও শেষ হইল, পদও শেষ হইল। এখানে আবেগাত্মক (Emotional Sequence) ক্রম আলঙ্কারিক ক্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কবি এই

ক্রম শৃঙ্খলা সংজ্ঞাবাচক শব্দের বিশিষ্টার্থক সুপ্রয়োগেও রক্ষা করিয়াছেন। নামহি অক্রুব ক্রুর নাহি বা সম সো আগুল ব্রজমাঝ' এই পদটি তাহার দৃষ্টান্ত। গোবিন্দদাসের অধিকাংশ রচনার sequence Emotional নয়, intellectualও নয়, Rhetorical. অলঙ্কৃত বাক্যধারায় নিজস্ব একটা ক্রম আছে—গোবিন্দদাস সেই ক্রমই অনুসরণ করিয়াছেন—আলঙ্কারিক ভঙ্গী যেভাবে কবিকে পরিচালিত করিয়াছে কবির লেখনী সেই ভাবেই চলিয়াছে। অলঙ্কারের দিক হইতেই ইহাদের উৎকর্ষের সন্ধান করিতে হইবে।

গোবিন্দদাসের আলঙ্কারিকতার কতকগুলি উদাহরণ—

রূপক মূলক কাব্যলিঙ্গ—

(১) যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম জলদরস আশে।
সো অব নয়ন নীর দেই সীচহ
কহতহিঁ গোবিন্দ দাসে॥

(২) তব অগেয়ানে কয়লি তুহু ঐছন
অব সুপুরুষ বধ জান।
উচকুচ চুম্বক সরস পরশ দেই
উদঘাটহ দিঠিবাণ॥

শ্লেষ—

(১) কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি···
পূজহ পশুপতি নিজ তনুদান।

ইত্যাদি পদটী শ্লেষের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।

(২) সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি
কনক লতা সম সাজ।
হরিচন্দন বলি কোলে আগোরল
কুঞ্জে ভুজঙ্গম রাজ॥

আর একটি দৃষ্টান্ত।

অতিশয়োক্তি—

এ সখি শ্যামসিন্ধু করি চোর,
কৈছে ধয়লি কুচ কনয় কটোর।

মালারূপক—

অধর পঙার-দশন মণি জ্যোতি,
রোচন তিলক মৈনাকক ভাতি।

শ্লেষমূলক বিষমালঙ্কার—

যো গিরি গোচর বিপিনহি সঙ্কয়
কৃশকটী কয় অবগাহ।
চম্পক চারু শটা পরিমণ্ডিত
অরুণ কুটীর দিঠি চাহ।
সুন্দরি, ভালে তুহুঁ হরিণ নয়ানি,
সো চঞ্চল হরি হিয়া-পিঞ্জর ভরি
কৈছনে ধয়লি সেয়ানি।

সূক্ষ্ম অলঙ্কার—

বিঘটি মনোরথ আন চপল হি
তাহিঁ ভূহুঁ সঙ্কেত রাখি,
কুসুমহার অরু মুকুলিত সরসিহ
গোবিন্দদাস এক সাখী।

মালোপমা—

তনু তনু মীলনে উপজল প্রেম,
মরকত যৈছন বেড়ল হেম।
কনক লতায় জনু তরুণ তমাল,
নব জলধরে জনু বিজুরি রসাল।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ,
দুহু তনু পুলকিত প্রেম তরঙ্গ।

সামান্য—

চান্দ নিরঞ্জনি উজোরোসি গোরি।
হরি অভিসার রভস রস-ভোরি।
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই,
ধবলিম কৌমুদি মিলিত তনু চলই।
হেরইতে পরিজন লোচন ভূর,
রঙ্গ পুতলি কিয়ে রস মাহা বুর।

[জ্যোৎস্নার মধ্যে ধবল বসনা গৌরাঙ্গী রাধিকাকে দেখা যাইতেছে না, যেন রাঙের পুতুল পারদের মধ্যে ডুবিয়াছে।]

শ্লিষ্ট রূপক—

কিসলয় দহন শেজ অব সাজহ
আহুতি-চন্দন পঙ্কা,
দ্বিজকুলনাদ মন্ত্রে তনু জারব
দূরে যাউ প্রেম কলঙ্ক।

পরম্পরিত রূপক—

অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু,
উছলল মনহিঁ মনোভবসিন্ধু।

সমুচ্চয়—

কামিনি করি কোন বিহি নিরমায়ল,
তাহে পুন কুল মরিযাদ।
তাহে পুন হরি সঙ্গে নেহ ঘটায়ল,
তাহে বিঘটিল পরমাদ।

পর্য্যায়োক্ত—

এতহুঁ বিপদে হিউ-রহয়ে একান্ত,
বুঝলুঁ নেহারত লাজক পন্থ।

বিশেষোক্তি—

হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ,
কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম।
অতু বিরহানল মন মাহা গোয়,
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়॥

ব্যাজস্তুতি—

(১) পুর নাগরি সঙ্গে রসিক শিরোমণি
পূরহ মনমথ কেলি,
বনচরি নারি তোহারি গুণ গাওব
পূতনিক সঙ্গে মেলি।
(২) ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহ দূর,
অযতনে ধনিক মনোরথ পূর।
ইত্যাদি।

সন্দেহ—

সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত চরীত॥
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ সংবাদ।
তনু জিবন দুহুঁ ধনিক বিবাদ।

মালিত—

কুন্দকুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার।
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই॥

সন্দেহালঙ্কার—

ঘন ঘন চুম্বনে লুবধ বদন দুঁহ
বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু।
হেরি হেরি মরম ভরম পরিপূরল
কো বিধুমনি কো-ইন্দু॥

উৎপ্রেক্ষামূলক ব্যতিরেক—

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনীমোহন ফান্দ
আন্ধারে করিয়া আছে আল।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোল কলা।

রূপক —

(১) যেণুক ফুকে বুকে মদনানল
কুল ইন্ধন মাহা জারি
দরশ পানি দুহুঁ পরশে সোহাগল
প্রেমজল জ্যারণ বারি॥
(২) কি রে করব কুল দিবসদীপ তুল-
প্রেম পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দ দাস বচস করি রাখত
লাজক জালে আগোল॥
(৩) নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব॥

*

চঞ্চল চরণ কমলদলে ঝঙ্কর
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।

সাঙ্গরূপক—

মাধব মনমথ ফিরত অহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুলশরে জরজর
পন্থ নেহারত তেরা।
ইত্যাদি পদ।

বিনোক্ত—

তনুমন জোরি গোরি তোহে সোঁপল
কনয়া জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দ দাস ভণে কনয়া বিহনে মণি
কবহুঁ হৃদয়ে নাহি সাজ॥

ধ্বনিগর্ভ সামান্য অলঙ্কার—

যাবক চীত চরণ পর লীখই
মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দ দাস কহই ভালে হোয়ল
কামুক আরকত হাত॥

[রক্তবর্ণ হস্তে আলতার দাগ বুঝা যাইবে না।]

নিদর্শনা—

রসিক শিরোমণি নাগর নাগরী
লীলা স্ফুরণ কি মোয়।
অম্বু বাওন করে ধরব সুধাকর
পঙ্গু চঢ়ব কিয়ে শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিশ খোঁজব
মিলব কল্পতরু নিকরে।

ব্যতিরেক—

(১) জলদহি জলদ বিজুরি দিঠিতাপক
মরকত কনয় কঠোর।

এ দুহুঁ তনু মন নয়ন রসায়ন।
নিরুপম নওল কিশোর।

(২) চল চল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন অভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি
দগধল কুলবতি লাজ।

পরিণাম—

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই মঝু গাত।
সো দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হই তছু মাহ।

ইত্যাদি

পর্য্যায় (রূপকাত্মক)—

মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর
মঝু মানস ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার তটিনী কুচ ঘট
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ।
পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল
নাভি সরোবর মাহ।
তাহিঁ লোমাবলী ভুজগি সঙ্গ ভয়ে
ত্রিবলি বেনি অবগাহ।

ইত্যাদি।

মীলিত—

নীল অলকাকুল অনিলে হিলোলত।
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শামর সায়রে
লখই না পারই কোই।

শ্লিষ্ট বিরোধাভাস—

তৈখনে দখিণ পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম।

সংসৃষ্টি—

অব কিয় করব উপায়।
কাল ভুজগ কোরে ছোড়ি মুগধি সখি
গমন যুগতি না যুয়ায়।
চম্পক চারু ফণাগণ মণ্ডিত
বিষ বিষমাকণ দীঠ।
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে
দশনক দংশন মীঠ।

[বিশেষোক্তি, বিভাবনা, অপহ্নুতি ইত্যাদি অলঙ্কারের মিশ্রণ]

পুনরুক্তবদাভাসযুক্ত বিরোধাভাস—

বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী,
মুকুতা স্রবে নয়নে।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল,
সোই নয়ন বর বয়নে।

উৎপ্রেক্ষা—

ঘন ঘন আঁচর কুচগিরি কাঁচর,
হাসি হাসি তহি পুন হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি,
মুহুরি রাখিল কত বেরি।

ধ্বনিগর্ভ অতিশয়োক্তি—

(১) কোমল চরণ চলত অতি মন্থর,
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ,
দুঁহু পাদুক করি দেল।

(২) আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে,
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম শরে জর জর,
রহতকি যাত পরাণ।

বিষমালঙ্কার—

(১) চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপই,
তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই না পারই,
কৈছে করব অভিসার।
কতনহি মেঘমল্লার আলাপই,
তিমির পয়ান গতি আশে
আওত জলদ তভহিঁ উড়ি যাওত
উতপত দীর্ঘ নিশাসে।

(২) সো কর বিরচিত হার উপেখলুঁ
হার ভুজঙ্গম ভেল।

অসঙ্গতি—

পদ নখ হৃদয়ে তোহারি
অন্তর জ্বলত হামারি।
অধরহিঁ কাজর তোর,
বদন মলিন ভেল মোর।
হাম উজাগরি রাতি,
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি।
হামারি রোদন অভিলাষ,
তুহুঁ কহ গদগদ ভাষ।

একাবলী—

কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই,
হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই,
প্রেম করই জনি মান॥

রূপকাতিশয়োক্তিমূলক—

উৎপ্রেক্ষা—

সো মুখ চন্দ নয়নে নাহি হেরলু নয়ন দহন ভেল চন্দ

ইত্যাদি পদটি আগাগোড়া উৎপ্রেক্ষার দৃষ্টান্ত।

ভ্রান্তি—

(১) হরি হরি বোলি ধরনি ধরি উঠই
বোলত গদগদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে,
বিহি সঞে মাগয়ে পাখ॥

(২) সুন্দরি জানলি তুয়া দুরভান।
হরি উর মুকুরে হেরি নিজ ছাহরি,
তাহে সৌতিনি করিমান॥ *

(দুই)

(রচনার উপাদান উপকরণ, পদ্ধতিরীতি ইত্যাদি বিষয়ে গোবিন্দদাস যে প্রচলিত সংস্কার অনুসরণ করেন নাই তাহা নয়।—রূপবর্ণনায় তিনি প্রচলিত উপমানগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন—বাসক সজ্জার ও অভিসারের আয়োজন-উপকরণ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনা হইতেই লইয়াছেন, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ইত্যাদি নায়িকার রীতি প্রকৃতি বিষয়েও নূতনত্ব কিছুই দেখান নাই, মানভঞ্জন, সম্ভোগ ও বিরহের বর্ণনায় যে মামুলি রীতি আছে তাঁহার রচনায় তাহার বৈতথ্য দেখি না। গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব এই যে পুরাতন উপাদান উপকরণ লইয়া তিনি যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নূতন বস্তু।) অধিকাংশ পদেই তাঁহার নিজস্ব শক্তির একটা মুদ্রাঙ্ক আছে। তিনি অন্যান্য অনেক কবির মত অনুসারক বা অনুকারক নহেন—তিনি একজন স্রষ্টা, পুরাতন উপকরণে তিনি অভিনব সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে পড়িলে চিরপুরাতন বিষয়বস্তু ও উপাদান যে কি রমণীয় রসঘন রূপ ধরিতে পারে, তাহা গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে উপমানগুলি সংস্কৃত কবিরা প্রয়োগ করিয়াছেন, গোবিন্দদাস সেই উপমানগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা যে মামুলী ব্যতিরেক, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দ্বারা রূপবর্ণনা করিতেন, গোবিন্দদাস তাহা না করিয়া ঐগুলি লইয়া নানা কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন বিরহিণী রাধার প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

এতদিনে গগনে অখিল রহ হিমকর,
জলদে বিজুরি রহ থীর।
চামরি চমরু নগরে পৈরবেশত,
মদন ধনুয়া ধরু ফীর॥
মাধব বুঝলুঁ তোহে অবগাই।
এক বিয়োগে বহুত সিধি সাধলি,
অন্তরে উপেখলি রাই।
কুমুদিনি বৃন্দ দিনহি অবহাসউ,
বিজুলি ধরু নব রঙ্গ॥
মোতিম পাঁতি কাঁতি ধরু উজর,
কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ।

ইহা অভিনব কৌশলে রূপ বর্ণনা সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতি এখানে বিরহিণী রাধিকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কান্তি শোকে দুঃখে ম্লান হইয়া গিয়াছে এই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া উপমেয় অপেক্ষা উপমানের প্রাধান্য-জনিত ব্যতিরেক অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা শিষ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

শরদক শশধর মুখরুচি সোঁপলক হরিণক লোচন লীলা।
কেশ পাশ লয়ে চমরীকে সোঁপল···ইত্যাদি।
চিকুরে চোরয়সি চামর কাঁতি।
দশনে চোরয়সি মোতিম পাঁতি॥

ইত্যাদি পদে বিদ্যাপতির অনুসরণে গোবিন্দদাস একটি অভিনব কৌশলের প্রয়োগ করিয়াছেন। রূপকাত্মক পর্য্যায় অলঙ্কারের সাহায্যে মনমথ-শর-ডর হিঁ-ডর-কাতর

---

* এই সঙ্গে আছে 'কাহে মিনতি কর কান তুহু হাম এক পরাণ' শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সম্ভোগ-চিহ্ন দেখিয়া শ্রীরাধার রোষের অবধি নাই। এই দুই চরণে কি দারুণ শ্লেষই না ব্যক্ত হইয়াছে। কাব্যপ্রকাশে এই অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ আছে। গোবিন্দদাস তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন—

অন্নস্স বণো অন্নস্স বেঅনা ভণই তং জণো অলিঅম্
দন্তকুখঅং কবোলে বহূএ বেঅনা সবত্তীণম্॥

[লোকে বলে যার ব্রণ তাহারি বেদনা কাজে দেখি ইহা মিথ্যাকথা
বধুর অধরে হেরি দশনের ক্ষত তবে কেন সপত্নীর ব্যথা ?]

ইত্যাদি পদটিতে কৌশলে মনোমীনের নানা অঙ্গে আশ্রয়ের উল্লেখচ্ছলে রূপবর্ণনার একটি কৌশল দেখাইয়াছেন। ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন। নিমগন কত হিঁ রসনিমনোমীন এই রূপকাত্মক পদে কৌশলে কবি কতকগুলি উপমাকে একসূত্রে গাঁথিয়াছেন।

গোবিন্দদাস অনেক সময় বক্তব্যকে জোরালো ও রসালো করিবার জন্য Anthithesisএর প্রয়োগ করিয়া Emphasis দিয়াছেন। বিদ্যাপতির অনুকরণ হইলেও এই ধরণের রচনারীতি তাঁহার-নিজস্ব। (১) ভীতক চীত ভুজগ হেরি, (২) কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ ইত্যাদি পদ ইহার দৃষ্টান্ত।

১। যাহে বিনু নিমিখ আধ কত যুগ সম,
সো অব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অবহুঁ নাহি নিকসবে,
পুন কিবে দরশন পাব॥
২। আনন্দ নীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে,
তবহি পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন,
সুরত জলধি অবগাহ॥

ইত্যাদি নব নব কলা-কৌশলের দৃষ্টান্ত।

কবি প্রত্যেক পংক্তিকে অলঙ্কৃত ও ভাবগর্ভ করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনা রসঘন হইয়াছে, অবান্তর কথা একে বারে নাই, তরল সুলভ বাক্যের স্থান হয় নাই—নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যান বা বিশদ বিবৃতি পদের মধ্যে নাই—চরণগুলির ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন আছে—বাগ্‌বিন্যাসে আতিশয্য নাই—দীনতাও নাই। ইহাতে প্রসাদগুণের অভাব হয়ত হইয়াছে—কিন্তু রচনা হইয়াছে গাঢ়বন্ধ,—শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবির ঘন গুম্ফিত শ্লোকের ন্যায়।

কবি চাতুর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়ও ঘটাইয়াছেন। এই শ্রেণীর পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতার সহিত মাধুর্য্য সৃষ্টি এক সংস্কৃত কবিদের মধ্যেই দেখা যায়। এখানে দুই তিনটি পদের উল্লেখ করি।

১। কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ,
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙরলু,
তাহে কি তটিনি অগাধা।
সহচরি, মঝু পরিখন কর দূর।
যৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি,
সোঙরি সোঙরি মনঝুর।
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছুপর,
তাহে কি জলদজাল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ,
তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোপলুঁ,
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসার,
সহচরি পাওল বোধ॥
২। কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল,
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি কর পীছল,
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে,
মন্দিরে যামিনি জাগি।
কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভাবিনি,
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণিমুখ বন্ধন,
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই,
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচন মুগধি সম হাসই,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥
৩। পদনখ হৃদয়ে তোহারি,
অন্তর জ্বলত হামারি।

* * *

কাহে মিনতি কর কান,
তুহুঁ হাম একই পরাণ।
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ,
হাম গোরি তুহু শ্যাম অঙ্গ।
অতবে চলহ নিজবাস,
কহতহি গোবিন্দদাস।

যে সকল পদে কবি চাতুর্য্য ভুলিয়া কেবল মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহাদের দুই চারিটির উদাহরণ দিই—

১। দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন,
তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরষে দুহুঁ দিঠি পূরল,
কৈসে হেরব মুখ চাই।

তাহে গুরু দুরজন লোচন কণ্টক,
সঙ্কট বতহুঁ বিথার।
কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত,
ধৈরজ লাজ বিচার॥

২। মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে,
যদি হয় মুখ লাখে লাখ।
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ,
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে,
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ।
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী,
ঘোর গহন অতিদূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর,
হাম যাওব কোন পুর।
একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত,
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ,
চির দুখ অব দূর গেল।
তোহারি মুরলি রব শ্রবণে প্রবেশল,
ছোড়লুঁ গৃহ সুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলুঁ,
কহতহি গোবিন্দদাস।

৩। ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি,
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে,
মদন মুরছা পায়।
কিবা সে নাগর কি খেন দেখিলুঁ,
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল,
কেন বা সদাই ঝুরে। ইত্যাদি।

(১) মোহে উপেখি রাই কৈসে জীয়ব,
সে দুখ করি অনুমান।
রসবতি হৃদয় বিরহ জরে জরব,
ইথে লাগি বিদরে পরাণ।

(৪) নবনব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন,
নয়ন রসায়ন অঙ্গ।

(৩) এইত মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া যোগী যেন সদাই ধেয়ায় ইত্যাদি পদ অবিমিশ্র মাধুর্য্য সৃষ্টির দৃষ্টান্ত।

অনেক স্থলে অলঙ্কৃতির মধ্যেও কেবল চাতুর্য্য নয়—নিবিড় মাধুর্য্যও আছে। এগুলি বর্ত্তমান যুগের বিচারেও রসগর্ভ। এগুলি আদৌ মামুলী ধরণের নয়।

১। চন্দন কেশর মাখা তনু,
রঙ্গিণীর প্রাণ বাঁটি লেপিয়াছে জনু।
২। ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি,
পিবইতে জিউ করে সাধ।
৩। বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে,
মোচত উতপত বারি।
৪। অধর সুধাকর মুরলি তরঙ্গিনি,
বিগলিত রঙ্গিনি হৃদয় দুকূল।
৫। খরতর লোরহি লোলিত কাজর,
বিগলিত লোচন নিন্দ।

৬। রূপকে কূপে মগন ভেল কাম,
৭। মুরলি নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।

গোবিন্দদাস প্রধানতঃ চাতুর্য্যের কবি। এই চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া তিনি অনেক সময় কৃচ্ছ্রকল্পিত অলঙ্কারের জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেক সময় শ্লিষ্ট রূপক ক্লিষ্ট রূপকে (Strained metaphor) পরিণত হইয়াছে।

১। ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন,
নিমগন কতহুঁ রমণী মনোমীন।
২। কাজর ভমর তিমির জনু তনুরুচি,
নিবসই কুঞ্জ কুটীর।
বাঁশি নিশাসে মধুর বিষ উগরই,
অতি অতি কুটিল সুধীর।
৩। যো গিরিগোচর বিপিনহি সঞ্চর,
কুশকটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক চারু শটা পরিমণ্ডিত,
অরুণ ফুটিল দিঠি চাহ।
৪। বেণুক ফুকে ফুকে মদনানল,
কুল ইন্ধন মাহা জারি।
পরশ পাণি তুহুঁ পরশে সোহাগল,
শ্রমজল জোরন বারি।
৫। আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক,
ভালহি সিন্দূর দহনা।
চান্দন চাঁদ মাহা মৃগমদ লাগল,
তাহে বেকত তিন নয়ন।

৬। সহজই গোরি রোখে তিন লোচন,
কেশরি জিনি মাহা খীণ।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে,
শৈলসুতাকার চীন।
৭। মনমথ মকর ডরহি ডরকাতর,
মঝু মানস ঋষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার তটিনি তট কুচ,
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ।

গোবিন্দদাসের ভণিতাতেও বেশ চাতুর্য্য আছে।

১। সুনিক পুতলি তনু মহিতলে শুতলি,
দারুণ বিরহ হুতাশে।
জীবন আশে শ্বাস বহ না বহ,
পরিখত গোবিন্দদাসে॥
২। তনুমন জোরি গোরি তোহে সোঁপল
কনয়া জড়িত মনিরাজ।
গোবিন্দদাস ভনে কনয়া বিহনে মণি,
কবহুঁ হৃদয়ে নাহি সাজ।
৩। চরণে বেঢ়ি চারু অরুণ সরোরুহ,
মধুকর গোবিন্দদাস।
৪। বিহি পায়ে লাগি মাগি লিব এক বর,
চেতন রহু মঝু দেহ।
গোবিন্দদাস কহই হরি পরশ হি,
সো পুন হোত সন্দেহ॥
৫। গোবিন্দদাস বহ ইথে কি সন্দেহ,
কিয়ে বিঘিনি যাহা নূতন নেহ।
৬। কি করব চন্দ চন্দন ঘন লেপন
কিসলয় কুসুম শয়ান।
আন বেয়াধি আন পথে ঔখদ,
গোবিন্দদাস নাহি মান॥
৭। অব রূপ লালস কিয়ে দরশায়সি,
নীলজ দেহ মৈলান।
গোবিন্দদাস কহ আপন পরশ দেহ,
হেম ধরউ নিজ বান॥
৮। করইতে কোরে পশে জড়ে জানল,
কামুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত,
হেরত গোবিন্দদাস॥
৯। গোবিন্দদাস দেখব সাঁচ,
কাকর অঙ্গনে কোপুন নাচ।
১০। যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি
শ্যাম জলদ রস আশে।
সো অব নয়ন নীর দেই সীচহ
কহতঁহি গোবিন্দদাসে॥
১১। সো মুখ চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দি বিষ হ্রদনীরে।
পামরি গোবিন্দদাস মরি যায়ব
সান্ত্রি আনল তনু তীরে।
১২। ইথে কিয়ু নাগদমন রস পান
গোবিন্দদাস মনিমন্ত্র না জান॥

এইগুলি হইতে লক্ষ্য করিতে হইবে—মূল পদের মাধুর্য্য ও ভাবের কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণতা না ঘটাইয়া গোবিন্দদাস কত কৌশলে ভণিতাগুলি দিয়াছেন। মূল ভাবের সহিত কবির ভনিতার কি করিয়া সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে? কবি যদি বর্ণিত-লীলার কোন অংশ গ্রহণ না করেন—তবে সামঞ্জস্য কি করিয়া হইবে? কবি সকল সময়ই শ্রীমতীর সখীস্থানীয়—কেবল তিনি লীলার বর্ণনা করিতেছেন না—তিনি লীলা সঙ্গিনী, যেন নিজের চোখে দেখিয়া লীলারস উপভোগ করিতেছেন—তিনি শ্রীমতীর ব্যথার ব্যথী—সাথের সাথী—সুখে সুখী। কবি লীলার মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিতেছেন। এই সখ্য ভাবটি গোবিন্দদাসের ভণিতা প্রসঙ্গে যেরূপ চমৎকার ফুটিয়াছে এমন আর কোন কবির পদে নয়।

গোবিন্দদাসের পদগুলির মধ্যে কোথাও লোকোত্তর ব্যঞ্জনা নাই। ভণিতার চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য গুণেই পদগুলি আর সাধারণ লৌকিক গণ্ডীতে পরিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে নাই। ভণিতার দ্বারা যে লোকোত্তর বিচ্ছিত্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভাগবতী লীলার দিব্যলোকে পঁহুছিতেছে। এই সখীত্বের আকুতি, আর্ত্তি ও রসানুভূতি সাধনার সেই আনন্দ-লোকেরই ইঙ্গিত করিতেছে—সখ্যরস যাহার একটি বিশিষ্ট সোপান। ইহার বেশি পরমার্থতার অন্য ইঙ্গিত বৃন্দাবনলীলার পদে দিবার উপায় নাই—তাহাতে রসাভাস হয়। গোবিন্দদাসের মত সে তত্ত্ব অতি অল্প কবিই বুঝিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসের কথা আর কি বলিব? গোবিন্দদাসের রচনা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার দুইয়েতেই ঋদ্ধ। গোবিন্দদাস পদের প্রত্যেক শব্দের আদিতে একবর্ণ বসাইয়া

কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক চরণের আদিতে একবর্ণ বসাইয়াও কতকগুলি পদ যেমন—

১। শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরি,
শোহন সুরত সন্দেশে।
২। মদনমোহন মূরতি মাধব,
মধুর মধুপুর তোই।
৩। পরখি পেখলুঁ পুরুষ-উত্তম,
পুরুষ পাহন জাতি।
৪। কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমল মুখি,
কুসুমিত কানন জোই।
৫। যামিনি জাগি জাগি জগ জীবন,
জপতহি যদুপতি নাম।
৬। তাপনি তীর তীরতরু তরুতল,
তরল তরলতর ছায়।
তরুণ তমাল তরকি তোহে তরখিত,
তরুণী তোহারি পথ চায়।

এইগুলিকে অনুপ্রাস না বলিয়া অনুপ্রয়াসই বলিব। এগুলি জগদানন্দের উপযুক্ত, গোবিন্দদাসের নয়।

গোবিন্দদাসের অধিকাংশ পদে অনুপ্রাস ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত, অনেকস্থলে দুই একটি জোবালো অনুপ্রাসের প্রয়োগে রচনা ললিত মধুর। আবার ছন্দোহিল্লোলের সহিত সুবিবেচিত অনুপ্রাস প্রয়োগ অনেকস্থলে রচনার আবৃত্তিকেই সঙ্গীত করিয়া তুলিয়াছে। যেমন—

১। মেঘ-যামিনি চল বিলাসিনি,
পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম শায়ক,
ছোড়ি মঞ্জীর লোল রে।
গুরুয়া কুচভরে চলিতে পদ টলে,
পীন জঘনক ভার রে।
হেরি দামিনি ফটিক তরু জানি,
চমকি ধরু নীরধার রে।

(২) কঞ্জচরণ যুগ যাবক রঞ্জন,
খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।
নীল বসন মণি কিঙ্কিনি রণরনি,
কুঞ্জর গমন দমন খিন মাঝে।
কনক কটোর চোর কুচ কোরক,
জোরে উজোরল মোতিক দাম।
ভুজ যুগ শীর বিজুরি পরি মণিময়,
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম।

(৩) নব যৌবনি ধনি জগ জিনি লাবণি,
মোহিনী বেশ বনায়লি তাই।
মনমথ চীত ভীত নাহি মানত,
কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই।
নয়নে নয়নে বান ভুজে ভুজে সন্ধান,
তনু তনু পরশে নাহি রয় ভঙ্গ।
গোবিন্দদাস চিতে অব নাহি সমুঝল,
বাজত কিঙ্কিনি কোন তরঙ্গ।

(৪) কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
কামিনি মনহি মূরতি ময় মনসিজ,
জগজন নয়ন আনন্দ।
তনু তনু অনু লে·পন ঘন চন্দন,
মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত শ্রবনি বিলম্বিত।
বনি বনমাল বি-টঙ্ক।
অতি সুকুমার চরণ তলশীতল,
জীতল শরদরবিন্দ।
রাব সন্তোষ মধুপ অনুসঙ্গিত,
নন্দিত দাস গোবিন্দ।

গোবিন্দদাসের বারমাসিয়া পদটি হিল্লোলিত অনুপ্রাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পদে দীর্ঘস্বরগুলিই অনুপ্রাসের কাজ করিয়াছে। পদটি অন্যত্র তুলিয়া দেওয়া হইল। অনেক সময় কবি যমকমূলক অনুপ্রাসের প্রয়োগে লালিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—

(ক) পাঁতর সে ভেল আঁতর বারি।
(খ) নিজকুল দূষণ ভূষণ করি মানলুঁ।
তেজি ভেল ঐছন শাতি।
(গ) মরমহি শ্যামর পরিজন পামর
ঝামর মুখ অরবিন্দ।
ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর।
বিগলিত লোচন নিন্দ।
(ঘ) মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা।
(ঙ) নয়ন পঙ্কজ জোরে ঝর ঝর লোরে মহি করু পঙ্ক।
(চ) কর তলে বয়ন নয়ন ঝরু নীঝর কুচযুগে কাজর হারা।
(ছ) চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত।

---

* পদুমিনি পুন পরবোধত মোয়। পীতাম্বর পদ পঙ্কজ পরিহরি পামরি পীতরে রোয় এইরূপ পংক্তি রচনায় কবির কোন প্রয়াস হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

গোপনে বহে অনুরাগ।
তুয়ারূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর।
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ।
(জ) কহব-মান মধু বিদগধ মাধব।
রোখে বৈমুখী গেল।
(ঝ) ঝলকত দামিনি যামিনি ঘোর।
কামিনি কি তেজই কান্তক কোর।

গোবিন্দদাসের পদের চরণে চরণে এবং পর্ব্বে পর্ব্বে মিলগুলি অনবদ্য। দোহা চর্চরী, বৃত্তনরেন্দ্র, ভরহট্টা ইত্যাদি ছন্দে পর্ব্বে পর্ব্বে মিল দেওয়ার প্রথা বলবতী ছিল না। গোবিন্দদাস এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন অধিকাংশস্থলে। গোবিন্দদাসের মিল শুধু অনবদ্য নয়, কৃতিত্বেরও পরিচায়ক।

১। ধরলি শয়ন করি সঘন নয়ন করি,
সহচরি রহত অগোরি।
২। কি রসে রিঝায়ব কৈসে নিবারব,
বিষম কুসুম শর জ্বালা।
৩। অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন,
জলদপুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ থল কমল দলারুণ,
মঞ্জির রঞ্জিত চরণা।
৪। ভ্রমর করম্বিত জানু বিলম্বিত,
কেলি কদম্বক মাল।
৫। গ্রীম বিভঙ্গিম নয়ন তরঙ্গিম,
কত কুলবতি মতি মাতি।

গোবিন্দদাসের কোন কোন পদে অনুপ্রাস—যমকাদি শব্দালঙ্কারই অর্থালঙ্কারের নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে এবং রচনার পংক্তিবিন্যাসের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহাতে যুগপৎ পদের বহিরঙ্গে মাধুর্য্যের এবং অন্তরঙ্গে চাতুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। দৃষ্টান্ত—

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল বৃন্দাবন বনদাব,
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন মারুত মারত ধাব।
কতএ আরাধব মাধব তোহে বিনু বাধামধি ভেল রাধা,
কঙ্কণ বঙ্কণ কিঙ্কিণী শঙ্কিনী কুণ্ডল কুণ্ডলি ভান।
যাবক পাবক কাজর আগর মৃগমদ মদকরি মান,
মনমথ মনমথে চড়ল মনোরথে বিষম কুসুম শর জোরি;
গোবিন্দ দাস কহয়ে পুন এতি-খণে না জানিয়ে কিয়ে গোরি।

একই শব্দের কলাসঙ্গত পুনরাবৃত্তির দ্বারা গোবিন্দদাস অনেক স্থলে পদলালিত্য ও রসমাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—

নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন নয়ন রসায়ন অঙ্গ,
রভস সম্ভাষণ হৃদয় রসায়ন পরশ রসায়ন সঙ্গ।

ছন্দোহিল্লোল গোবিন্দদাসের পদাবলীর একটি বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘহ্রস্ব উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য স্বভাবতই ব্রজবুলির পদে ছন্দোহিল্লোলের সৃষ্টি হয়। গোবিন্দদাস এই হিল্লোলকে নিয়মিত এবং অধিকতর নর্ত্তনপর করিবার জন্য কোন কোন পদ রচনা করিয়াছেন। এসকল পদের অন্য ঐশ্বর্য্য না থাকিলেও হিল্লোলিত প্রবাহের জন্য উপাদেয়।

নন্দনন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ,
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ।
প্রেম আকুল গোপ গোকুল কুলজ কামিনী কন্ত,
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল কুঞ্জ মন্দির সন্ত।
গণ্ড মণ্ডল বিলোল কুণ্ডল উড়ে চুড়ে শিখণ্ড;
কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত বাহু দণ্ডিত দণ্ড।
কঞ্জ লোচন কলুষ মোচন শ্রবণ রোচন ভাষ,
অমল কোমল চরণ কিশলয় নিলয় গোবিন্দ দাস।

সাধারণ পজ্ঝটিকা ছন্দও কবির হস্তে হিল্লোলিত হইয়াছে।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট,
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল,
বারি কি বারই নীল নিচোল।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার,
হরি রহু মানস সুরধুনি পার।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির প্রধান শিষ্য। তিনি গুরুর উদ্দেশে বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতিপদ যুগল সরোরুহ নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পিবইতে করু অনুবন্ধে।
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমণি নাগর নাগরি লীলা স্ফুরব কি মোয়।
জনু বাঙন করে ধরব সুধাকর পঙ্গু চড়ব কিয়ে শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিশ খোঁজব মিলব কলপতরু নিকরে।
সোঙরি অন্ধ-করত অনুবন্ধহি ভকত নখর মণি ইন্দু।
কিরণ ছটায় উদিত ভেল দশদিশ হাম কি না পায়ব বিন্দু।
সোই বিন্দু হাম যৈখনে পায়ব তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দ দাস অন্তরে অবধারল ভকত কৃপা বলবান।

গোবিন্দদাস স্বভাবসিদ্ধ বৈষ্ণবোচিত বিনয় বশতঃ একথা

লিখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দদাস গুরুর অনুপযুক্ত শিষ্য নহেন এবং স্থলে স্থলে ভাবের গূঢ়তায় ও অলঙ্করণের চাতুর্য্যে গুরুকেও অতিক্রম করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কোন কোন পদের কতকটা এদেশে প্রচলিত ছিল—তিনি সেগুলিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি পদের উল্লেখ করিলাম—

(১) প্রেমক অঙ্কুর জাত-আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা,

(২) মুদিত নয়ানে হিয়া ভুজ যুগ চাপি
শুতি রহল হরি কছু না আলাপি।

(৩) বেলল সঙ্গে সব বসন উতারলুঁ
লাজে লাজায়লি গোরি,

(৪) পরাণ পিয় সখি হামারি পিয়া
অবহুঁ না আওল কুলিশ হিয়া।

বিদ্যাপতির বারমাস্যা পদের দুই মাসের বর্ণনা গোবিন্দদাসের রচিত। বিদ্যাপতির ভাব ও ভঙ্গী লইয়াও তিনি বহু পদ রচনা করিয়াছেন।

১। আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
ভালহি সিন্দুর দহনা—

এই পদটি বিদ্যাপতির কতহু মদন তনু দহসি হামারি—পদের অনুকৃতি।

২। অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ,
কঙ্কণ গীমক হার।

৩। যো থন মান তো বিহু যুগ লাথ,
অন্তরে উথলল মনোভব সিন্ধু।

৪। বৃন্দাবন বন ভেল—ইত্যাদি পদাংশ বিদ্যাপতি হইতেই রূপান্তরিত।

৫। যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি—ইত্যাদি পদ বিদ্যাপতির যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই তঁহিতঁহি সরোরুহ ভরই—পদেরই প্রতিধ্বনি।

৬। ভজহুঁ রে মন নন্দ নন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে—পদটি বিদ্যাপতির প্রার্থনারই প্রতিধ্বনি।

৭। গোবিন্দদাসের এ ধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাউ—পদটি বিদ্যাপতির আঁচরে বদন ঝাঁপাবহ গোরি—পদটির প্রতিধ্বনি।

৮। কুচযুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে তাপর ধরি হাম পানি ইত্যাদি পদের শপথের ছল গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি হইতে পাইয়াছেন।

৯। মাধবহি তপন তপত ভেল বালুক আতপ দহন বিথার—ইত্যাদি দ্বিপ্রহরীয় অভিসারের পদ বিদ্যাপতির তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল ইত্যাদি পদের রূপান্তর মাত্র।

১০। দুরজন বচন শ্রবণে তুহুঁ ধায়লি কোপহি বোধলি মোর মানের এই পদটি বিদ্যাপতির অনুরূপ-পদের প্রতিধ্বনি।

১১। বিদ্যাপতির—ঋতুপতি রাতি রসিকবর রাজ, রসময় রাস রভসময় মাঝ—ইত্যাদি একই অক্ষরের অনুপ্রাসে পদ রচনা গোবিন্দদাস অনুকরণ করেন।

গোবিন্দদাস বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কোন কোন শ্লোককেও সুললিত পদে পরিণত করিয়াছেন—দুই একস্থলে অনুবাদ; অধিকাংশ স্থলে মর্ম্মানুবাদ।

১। যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত পদটী উজ্জ্বল নীলমণির পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তি স্ফুটাঃ ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

২। ঋতুপতি রচিত বিরহ জ্বরে জাগরি দোতি উপেখলি রাধা—এই পদটি উজ্জ্বল নীলমণির দূত্যোনাত্র সুহৃজ্জনস্ত ……প্রাণানর্পয়িতাস্মি সম্প্রতি……তনুম্ ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

৩। মঝু মুখ বিমল কমলবর পরিমলে জানলুঁ তুহুঁ অতি ভোর—এই পদটি উদ্ধব সন্দেশের সখক্ত্বাম্ভোরুহ পরিমলোন্মত্ত সেবানুবন্ধে ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

৪। সজনি কি কহব রাইক সোহাগি পদটি উজ্জ্বল নীলমণির একটি শ্লোকের তাৎপর্য্যানুবাদ। কবি তাহাতে একটি সূক্ষ্ম অলঙ্কারের নিজস্ব চারি চরণ যোগ দিয়া কাব্যাংশে উন্নত করিয়াছেন।

৫। সজনি, মরণ মানিয়ে বহুভাগি। কুলবতী ভিন পুরুখে ভেল আরতি জীবন কিয়ে সুখ লাগি—পদটি রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের একস্ত শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণস্ত নামাক্ষরং ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

৬। দরশনে লোর নয়ন যুগ ঝাঁপি ইত্যাদি পদটি কাব্যপ্রকাশের ধন্যাসি যা কথয়সি প্রিয় সঙ্গমেঽপি ইত্যাদি শ্লোকের প্রতিধ্বনি।

৭। কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি এনহ কুঙ্কুমরেহ পদটি উজ্জ্বল নীল মণির একটি শ্লোকের ভবানুবাদ।

৮। গোবিন্দদাসের রাসলীলার দুইটি পদ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবে অনুপ্রাণিত। গোবিন্দদাস রাধার রূপের লাবণ্যদ্যুতি অবশিষ্ঠ রাখিয়া স্থূলাংশ দেহাশ্রয় হইতে হরণ করিয়া লইয়াছেন। এই নিরবলম্ব সৌন্দর্য্যের ভাবপ্রতিমার সহিত কোন শরীরীর প্রণয় সম্ভব নয়। এই সৌন্দর্য্য স্তম্ভিত করে—দিশেহারা করে, প্রেমমুগ্ধ করে না। এসৌন্দর্য্য

মানব চক্ষুকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলে—বিশ্বপ্রকৃতি এই সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টনী মাত্র নয়—পরিবেষমণ্ডলে পরিণত হয়।

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
যাঁহা তাঁহা তাঁহা থল কমকদল খলই॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নিলউ তপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ॥

এই সৌন্দর্য্য কোন রক্তমাংসের দেহে সম্ভব নয়। এই সৌন্দর্য্য ছিল কবির মানস-লোকে। গোবিন্দদাস তাঁহার মানসলোকের সৌন্দর্য্যই রাধাকে অবলম্বন করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস রাধাপ্রেমের স্বরূপ বড় কৌশলেই প্রকাশ করিয়াছেন। পিশুনগণের জন্ত দক্ষিণ নয়নে দেখিতে পাই না, পরিজনগণের জন্ত বামনয়নের অর্দ্ধেক দৃষ্টিও দিতে পারি না।

আধ আধ আধ দিঠি অঞ্চলে   যব হরি পেখলুঁ কান
কত শত কোটি কুসুমশরে জরজর,   রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি জানলুঁ বিহি মোহে বাম
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই,   তছু পায়ে মঝু পরণাম॥
সুলবনি কহত কানু ঘন শ্যামর,   মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশ রসে ভাসত,   হামারি হৃদয়ে জলু আগি॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত,   চপল জীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভনে শ্রীবল্লভ জানে,   রসবতি রস মরিযাদ॥

এই পদটির দ্বারা গোবিন্দদাস অন্ত গোপীগণ হইতে, শ্রীকৃষ্ণের অন্ত বল্লভগণ হইতে এমন কি জগতের সকল শ্রেণীর প্রণয়িনীমণ্ডলী হইতে শ্রীরাধাকে অপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন। এমন কোন প্রেমিকা আছে যে প্রিয়জনের 'পরশরসে' ভাসে না? কিন্তু রাধার হৃদয়ে জ্বলে আগুন। অন্তে দেখে ঘনশ্যাম—রাধা দেখে বিদ্যুন্ময়। কবিরাজ গোস্বামীর কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপের কথা মনে পড়ে। প্রিয়ের জন্ত প্রিয়ার প্রাণ দেওয়া জগতের সাহিত্যে চরম কথা। শ্রীরাধা প্রাণোৎসর্গের বিচ্ছেদ বরণ করিতে চাহেন না।

সেই এক শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীদেরই বংশী-তানে চঞ্চল করিয়েছেন—রাধার অন্তরে এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার কেন? ইহার কারণ শ্রীকৃষ্ণের নয়—রাধারই ব্যক্তিগত চরিত্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কবি এই চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য বেশ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনায় গোবিন্দদাসের সমকক্ষ কেহ নাই। যাঁহারা শ্রীচৈতন্তদেবের সমসাময়িক তাঁহারা স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্তের লীলা, তাঁহার ভাববিহ্বলতা, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা গৌরাঙ্গের লীলাবিলাসের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রেমভক্তির গভীরতা, সরলতা, ভাবাকুলতা, মাধুর্য্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই কবিতার পদবীতে উঠে নাই। রসসাহিত্যের দিক হইতে সেগুলির অধিকাংশেরই কোন মূল্য নাই। সেগুলির তুলনায় শ্রীচৈতন্তের পরবর্ত্তী যুগের লোচন দাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ও বলরাম দাসের গৌরচন্দ্রিকা পদাবলী সাহিত্যের দিক হইতে উৎকৃষ্টতর। ইঁহাদের মধ্যে আবার গোবিন্দদাসের পদগুলি রূপে, রসে, ছন্দে, ঝঙ্কারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গোবিন্দদাস আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবমূর্ত্তিকে যে রূপ দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট রূপের চেয়ে ঢের বেশী উজ্জ্বল ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ অপূর্ব্ব রূপসৃষ্টি কেবল কল্পনার সরসতার জন্যই সম্ভব হয় নাই, তাহার সহিত অগাধ ভক্তিরও যোগ আছে। তাহাতেই যথেষ্ট হয় নাই। তাঁহার মত অপূর্ব্ব নির্ম্মল অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি আর কাহারও ছিল না। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকা পদাবলী শিবজটা হইতে বিমুক্ত সুরধুনীধারার ন্যায় শুচিস্বচ্ছ নির্ম্মল ও কলতরঙ্গময়। জটা হইতে বলিলাম অলঙ্কারের জটিলতা এইগুলিতে নাই বলিয়া। যে অলঙ্কারের দ্বারা মহাপুরুষের ঐশ্বর্য্য বাণীরূপ ধরে সেই উদার সরল উদাত্ত অলঙ্কারই এক্ষেত্রে কবির রচনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

মহাপ্রভুর প্রেমের ঐশ্বর্য্য কবি একদিকে যেমন অত্যুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন—নিজের বৈষ্ণবোচিত দীনতা ও

আকিঞ্চন তেমনি গভীর আন্তরিকতার সহিত প্রকল করিয়াছেন—

ভাবগজেন্দ্রে চড়াযল অকিঞ্চনে, ঐছন পহুঁক বিলাস।
সংসার-কালকূট বিষে তনু দগধল, একলি গোবিন্দ দাস।

(গোবিন্দদাস পরম ভক্ত কবি ছিলেন—তাঁহার প্রার্থনা-সঙ্গীত ও গৌরচন্দ্রিকায় তাঁহার ভক্তির গভীরতা পরিস্ফুট। কিন্তু পদাবলীর মধ্যে তিনি প্রেম-মাধুর্য্যের মধ্যে কোথাও ভক্তির ঐশ্বর্য্যের মিশ্রণ ঘটান নাই।) তাঁহার রাধা-বিরহের যে কবিতাগুলি আছে, সেগুলির মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক ভাবের দ্যোতনা নাই। সেগুলি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত উৎকৃষ্ট শ্রেণীরও নয়। বিদ্যাপতি অলঙ্কার প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু মাথুর বিরহের পদাবলীতে তিনি অলঙ্করণের লোভ অনেকটা সংবরণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাস তাহা করেন নাই। গোবিন্দদাসের মাথুর বিরহের সুর দেশকালের সীমা উত্তরণ করিতে পারে নাই। তবু গোবিন্দ দাসের পদের অনেকস্থলে আধ্যাত্মিক অর্থ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। যাঁহারা বৈষ্ণব ভক্ত তাঁহাদের কাছে সমস্তটাই আধ্যাত্মিক। তাঁহাদের পক্ষ হইতে বলিতেছি না।

সজনি, কি ফল বেশ বনান।
কানু পরশমণি পরশক বাধন, অন্তরণ সৌতিনি মান।

ইহার একটা আধ্যাত্মিক অর্থ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ভাবই রসমঞ্জরীতেও আছে—সেখানে কেহ আধ্যাত্মিক অর্থ সন্ধান করে না। গোবিন্দদাসের পদের আধ্যাত্মিক গৌরব অন্তর্নিহিত নয়—তিনি যে সমাজে লালিত পালিত হইয়া, সে সমাজের "রস-তরখিত" মুখের পানে চাহিয়া এই পদগুলি লিখিয়াছেন—সেই সমাজের দ্বারাই ইহা আরোপিত।

আধ্যাত্মিক গৌরবের কথা বাদ দিলেও গোবিন্দদাসের মত শ্রেষ্ঠ কবি শুধু বাঙ্গালায় কেন, ভারতবর্ষেও দুর্লভ।

গোবিন্দদাসের কবিতায় প্রকৃতির সহিত মুখ্যভাবে না হউক, গৌণভাবে মানবহৃদয়ের সংযোগ দেখানো রহিয়াছে। প্রকৃতি শ্রীমতীর উল্লাসে উল্লাসিত হইয়াছে, বিরহে সহধর্ম্মিতা করিয়াছে। অভিসারের পথে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে রাধার প্রেমের দুর্নিবারতাই বাড়াইয়াছে। অভিসার পক্ষে সহায়তাও করিয়াছে। প্রকৃতি রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় যে নব নব উপমান যোগাইয়াছে—তাহা সকল বৈষ্ণব কবির সম্পর্কেই খাটে। মাসে মাসে প্রকৃতির প্রভাবে বেদনার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, কবি তাহা বুঝিতেন। তাঁহার বারমাস্যাব কবিতাটি প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের গভীর সংযোগের নিদর্শন।

আঘন মাস রাস রস সায়র,   নাগর মাথুর গেল।
পুর-রঙ্গিণীগণ পূরল মনোরথ-   বৃন্দাবন বন ভেল॥
আওল পৌষ তুষার সমীরণ,   হিমকর হিম অনিবার।
নাগরিকোরে ভোরি রহু নাগর   করব কোন পরকার॥
মাঘে নিদাঘ করল পতিয়ায়ব,   আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণি তাপ নিশাপতি চোরল,   কানু বিনু সঘন হুতাশ॥
ফাগুনে গুনিগুনি গুণমণি গুণগণ,   ফাগুয়া খেলন রঙ্গ।
বিরহ পয়োধি অবধি না পাইয়ে.   দুরন্তর মদন-তরঙ্গ॥
আওত চৈত চীত কত বারব,   ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ ফুলশরে হানই,   কানু রহল কোন দেশ॥
মাধবি মাস সাধ বিধি বাধল,   পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দখিন পবন নহি ভায়ত,   ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
জেঠহি মীঠ কহত সব রঙ্গিনি,   চন্দন চান্দনি রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত.   দারুণ মনমথ শাতি॥
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল,   হেরি নব নীরদ পাঁতি।
নীরদ মুরতি নয়নে যব লাগয়ে,   নিঝরে ঝরয়ে দিনরাতি॥
শাওনে সঘন গগনে ঘন গরজন,   উন মত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগয়ে কামিনি,   জীবন কণ্ঠ হিলোল॥
ভাদরে দরদর দারুণ দুরদিন,   ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর নিকরে থীর নহ অম্বর.   দহই মনোভব মন্দ॥
আশিন মাসে বিকশিত পদ্মিনি,   মানস হংস নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর,   ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ।
কাতিক মাস বিরাশ করল বিধি,   লীলাময় রসরাস।
নিকরুণ কান কোন পাতিয়ায়ব,   কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির প্রবর্ত্তিত ছন্দই অনুসরণ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের ছন্দ একেবারে নিষ্কলঙ্ক। কয়েকটির দৃষ্টান্ত দিই—

পজ্ঝটিকা—

৪ + ৪ + ৪ + ৪

(১) চলু গজগামিনি।হরি অভিসার।গমন নিরঙ্কুশ।আরতি বিথার
(২) চৌদিশে ঝাম্পির পাবন দেই।দোলা।জগজন্নি।শাকর।নিকর হিলোল

পজ্ঝটিকার এক চরণে ১২ মাত্রা অন্য চরণে ১৬ মাত্রাও দেখা যায়।

৪+৪+৪—

৪+৪+৪+৪

বিপুল পু। লক অব। লম্বে।
বিকশিত। ভেল তহি। ভাব ক। দম্বে॥

বৃত্তনরেন্দ্র

৭+৯+৮+৪—

যো তুহুঁ হৃদয়ে। প্রেমতরু রোপলি। শ্যাম জলদ রস। আশে।
সো অব নয়ন। নীর দেই সীঁচহ। কহতহি। গোবিন্দ। দাসে॥

মরহট্টা—

৮+৮+৮+৩—

যো পদতল থল। কমল সুকোমল। ধরনি পরশে উপ চঙ্ক।
অব কণ্টকময়। সঙ্কট বাটহি। আযত যায়ত নিঃ। শঙ্ক॥
নীরদ নয়ানে ।।নবঘন সিঞ্চনে। পুলক মুকুল অব। লম্ব।
স্বেদ মকরন্দ। বিন্দু বিন্দু চুয়ত। বিকশিত ভাব ক। দম্ব॥

৮+৮+৮+৬—

কুঞ্চিত কেশিনি। নিরুপম বেশিনি। রস আবেশিনি। ভঙ্গিনিরে।
অধর সুরঙ্গিনি। অঙ্গতরঙ্গিনি। সাঙ্গনি নব নব। রঙ্গিনিরে॥

৬ মাত্রার স্থলে ৫ মাত্রাও হইতে পারে। যেমন—

চরণকমল তলে। অরুণ বিরাজিত। মঞ্জীর রঞ্জিত। মধুর ধনি

চর্চরী—

(৩+৪)+(৩+)+৩

মন্দ নন্দন। গন্ধ চন্দন। গন্ধ নিন্দিত। অঙ্গ।
জলদ সুন্দর। কম্বু কন্ধর। নিন্দি সিন্ধুর। ভঙ্গি॥

(৩+৪)+(৩+৪)+(৩+৪)+৫

জয়তি জয় বৃষ। ভানু নন্দিনি। শ্যাম মোহিনি। রাধিকে।
কনয় শতবাণ। কান্তিকলেবর। কিরণ জিত কম। লাধিকে॥

শুধু ৮ মাত্রার চরণেও ছন্দ বাঁধা হইয়াছে।

৮+২—

ছুরে কর বিরহিণী। সুখ। নিয়ড়ে হেরিবি। পিয়া মুখ

৮+৩

অতমিত কামিনী। কান্ত বিকল ভেল মনি। মন্ত॥

প্রাকৃত ছয় মাত্রার ছন্দের স্তবকবন্ধ দৃষ্টান্ত গোবিন্দদাসে একাধিক আছে। জগদানন্দ, বলরাম ও ঘনশ্যাম ইহার অনুকরণ করিয়াছিলেন।

ছয় মাত্রার পর্ব্বের স্তবক—

(১) ৬+৬, ৬+৬—

চীত চোর। গৌর অঙ্গ। রঙ্গে ফিরত। ভকত সঙ্গ
মদনমোহন। ছন্দুধা

৬—৪ (৫)

৬+৬, ৬+৬

হেমবরণ। হরণ দেহ। পুরল তরুণ। করুণ স্নেহ
তপত জগতাবন্ধুয়া

৬+৪ (৫)

(২) ৬+৬, ৬+৬ ৬+৬+৪

শরদ চন্দ। পবন মন্দ। বিপিনে ভরল। কুসুমগন্ধ।
ফুল্লমল্লী। মালতীযুথী। মত্তমধুপ্যভোরানি।

৬+৩, ৬+৬ ৬+৬

হেরত রাতি। ঐছনভাতি। শ্যামমোহন। মদনে মাতি।
মুরলি গান। পঞ্চম তান। কুলবতি চিত। চোরনি।

প্রাকৃত চৌপদী

৮+৮+৮+৭—

গদগদ ভাষম। মধুর বচনামৃত। লহ লহ হাসবি। কাশিত গণ্ড।
পাষণ্ড খণ্ডন। শ্রীভুজমণ্ডন। কনক খচিত অব। লম্বন দণ্ড॥

৮+৮+৮+৮—

গতি অতি মন্থর। নবযৌবনভর। নীলবসনমণি। কিঙ্কিনি বোলে।
গজ্জরি ঝাঝরি। উপরেবনধা পিরি। বীচাহি সুর ধুনি। মুকুতা হিলোলে।

সাধারণ দীর্ঘ ত্রিপদীরও উদাহরণ গোবিন্দ দাসের বাংলা পদে আছে। ইহাতে দীর্ঘ হ্রস্বের উচ্চারণ পার্থক্য ধরা হয় নাই—

৮+৮+১০ (৮+২)

এইত মধবীতলে। আমার লাগিয়া পিয়া। যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনা হিয়া ফেটে। ফুটিয়া না পড়েগো। নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥

প্রচলিত লঘু-ত্রিপদী ছন্দে গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ও বাঙ্গলা পদ লিখিয়াছেন।

৬+৬+৬+২

প্রাণ সহচরি চরণে সাধই, কানু মাধবি তোহি।
আঁখি মুদি কহে অবহুঁ মাধব, কহে না মিলল মোহি॥

কবি স্থানে স্থানে দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রাতেও ধরিয়াছেন।

প্রাচীন লঘু-ত্রিপদীর পদও আছে। ইহাতে প্রত্যেক অক্ষরে একমাত্রা ধরা হইত।

গলায় রঞ্জন। কলিকার মালা। নারীমন বান্ধা। ফাঁদে।
বাহুর বলনি। অঙ্গের হেলনি। মযুকচলন ছান্দে॥

বোমার আতঙ্ক

শ্রীরাধাকিঙ্কর রায় চৌধুরী

আমি ছোটবেলা থেকেই একটু মুখর। যাহা মনে আসে তাহাই বলিয়া ফেলি। এই দুর্ব্বুদ্ধিতার জন্য কতবার যে ঠকিতে হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ঠাকুরমা বলিতেন, "কয়লার রং যায় না ধুলে, আর স্বভাব যায় না মলে।" বাস্তবিক এখন দেখিতেছি মেয়েদের অনেক কথাই ঠিক; তা না হলে আমার স্বভাবটাকে আজও কোনমতে ফেরাতে পারলাম না!

ধরুন, সকালবেলায় বাজার করিয়া ফিরিতেছি। এক হাতে মাছ আর অপর হাতে আলু-পটলের থলে। কুমড়োর ফালিটা আর লাউ-এর ডগাটা থলের ভিতর হইতে বেশ উঁকি মারিতে দেখা যাইতেছে, এমন সময় কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইতে তিনি এক দৃষ্টিতে আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দাদা, কোত্থেকে?" উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিয়া ফেলিলাম—"এই ভাই বিলেত থেকে।"

বাহিরের ঘরে বসিয়া আনন্দবাজারখানি খুলিয়া যুদ্ধের ফলাফল পড়িতেছি, পাশের বাড়ীর কবিরাজমশাই বেশ করিয়া হেডিং ক'টি পড়িয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভায়া, কি পড়া হচ্ছে?" মুখ না তুলিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "আজ্ঞে চণ্ডীপাঠ ক'রছি।" আবার কোনদিন হয় ত' অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর একটি চায়ের দোকানে ঢুকিয়া সবেমাত্র চায়ের পেয়ালাটিতে চুমুক দিতে সুরু করিয়াছি, এমন সময় কোন বন্ধুবরের সহিত চোখাচোখি হইতেই তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "কি হে, চা খাচ্ছ না কি?" বলিলাম, "পাগল না ক্ষ্যাপা। চায়ের দোকানে বসে কেউ চা খায়? ভীম নাগের দোকান থেকে একপো সন্দেশ এনে চায়ের পেয়ালাতে ঢেলে খাচ্ছি।"

সন্ধ্যাবেলা গা-হাত-পা ধুইয়া বাড়ীর সুমুখে পায়চারী করিতেছি, তাসের আড্ডার হরিবাবুর সঙ্গে দেখা হইতেই একগাল হাসিয়া একটা হাত আমার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিলেন, "কি ভায়া, বেড়ান হচ্ছে?"

বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও হরিবাবুর মানটা না রাখিতে পারিয়া সটাং বলিয়া ফেলিলাম, "কেন ডিগবাজী খাচ্ছি বলে সন্দেহ হয় না কি?"

যাক্ উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলি না হয় ধাতে কতকটা সহ্য হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ এ কি বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল? এখন যাহার সহিত দেখা হয় তিনিই জিজ্ঞাসা করেন,—"কি পাঠিয়েছেন ত'? কোথায় পাঠালেন?"

উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে। মানে ধরিলে তাঁহাদের প্রশ্নগুলির এইরূপ ধরা যাইতে পারে যে, কলিকাতায় বোমার আক্রমণের ভয়ে যাঁহারা তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ কোন দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠাইতে পারিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহাদের একটা কিনারা করিয়া দিয়াছেন, আর যাঁহারা পারেন নাই তাঁহাদের সপরিবারে বোমার মুখে যাইবার বিলম্ব নিতান্তই অল্প।

সমস্ত শুনিয়া চুপচাপ বাড়ী চলিয়া আসি, আর গৃহিণীর মুখে নিত্য নূতন সংবাদ শুনিয়া মনে মনে প্রমাদ গুনি।

কোনদিন শুনি—"ঝি কাল থেকে দেশে চলে যাবে বলে সমস্ত মাইনে চুকিয়ে দিতে বলেছে, মুদী তার দোকানে যে বাকী জিনিষগুলি আছে তাহা বিক্রয় হইয়া যাইলেই দোকানের তালাচাবি বন্ধ করিয়া দিবে, ধোপা গত হপ্তায় যে কাপড় জামাগুলি লইয়া গিয়াছে সেগুলি বাড়ীতে পুনরায় ফিরিবার আশা খুবই অল্প, আর গয়লা আজ সকালে গরু বেচিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে।" আবার কোনদিন শুনি ইন্দুবাবুর স্ত্রী, একতলার নূতন ভাড়াটের বৌ, পাশের বাড়ীর তাঁতি গিন্নি, যদু মাষ্টারের প্রথম পক্ষের শালী শৈল, সব কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—শুধু তাহারাই বাকী। শেষের কথাগুলি এমন ভাবে গৃহিণী বলিয়া যান যে, চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়ে। মনে মনে বলি, হা ভগবান! কোনরূপে দিনগুলি দুঃখে-কষ্টে কাটাইতেছিলাম, তাও তোমার সহ্য হইল না?

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম—কোথায় যাইব ?—কি করিব ?···

দেশ ! দেশ বলিতে যতটুকু মনে পড়ে, তা বছর দশেক পূর্ব্বে একবার খুড়ীমা জমীদারের খাজনা দিতে হইবে বলিয়া দশটাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। তাঁহাকে টাকা ত' পাঠান হয় নাই, উপরন্তু তিনি এতদিন বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়া গিয়াছেন তাহারও কোন সংবাদ জানা নাই। মামার বাড়ী মামারা ত কেউ নেই। মামাতো ভাঁয়েরা বিদেশে কে কোথায় চাকুরী করে তাহারও ত' খবর রাখা এতদিন উচিত বলিয়া মনে হয় নাই। সুতরাং কাহার কাছে চিঠি লিখিব ? পিসিমা ! গত অর্দ্ধোদয়যোগে মা-ভাগীরথীর গর্ভে ডুব দিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের মানসে একবার আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহাতে তিনি তার পরদিনই চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। সুতরাং তাঁহাকে পোষ্টকার্ড দেওয়াও যা, আর নগদ তিন্‌টে পয়সা কলিকাতা কর্পোরেশনের ড্রেনে ফেলিয়া দেওয়াও তা। শ্বশুরবাড়ী ! গত বছরে শ্বশুরম'শাই মারা যাইবার পর শালায় শালায় যুদ্ধ বাধিয়া সে বাড়ীর দুর্দ্দশা এমন হইয়াছে, তাহাকে যদি শ্বশুরবাড়ী না বলিয়া যমের বাড়ী বলা যায় তা হইলে হয় ত' বা অতিরঞ্জিত কথা হইবে না। নানারূপ ভাবিয়া যখন কোন কূল-কিনারা পাইলাম না, তখন মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিলাম আপাততঃ শ'দুই টাকা অফিসের "কো-অপারেটিভ" হইতে ধার লইয়া বহরমপুর কি নদীয়া কি দেওঘর এই তিনটীর ভেতর যে কোন একটী জায়গায় পরিবারবর্গ পাঠাইয়া দিব ; তারপর কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে। একটা কিনারা যখন হইল তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা আপনা হইতেই বুজিয়া আসিল।

*

হঠাৎ সাইরেন বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিয়া একটী কাছাকাছি বাড়ীর ভিতর সবে মাত্র ঢুকিতে যাইব, এমন সময় ভিতর হইতে দরজা বন্ধ হইয়া গেল। উপায়হীন হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটী পার্কের ভিতর ঢুকিয়া একটী গর্ত্তের ভিতর (শ্লিট্‌ট্রেঞ্চ) সবে মাত্র পা বাড়াইয়াছি—এমন সময় ভিতর হইতে একটী হিন্দুস্থানী ছোক্‌রা এমন ভাবে ধাক্কা মারিল যে হাড় ক'খানা ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। প্রাণ বাঁচাইতেই হইবে, সুতরাং বাক্যব্যয় না করিয়া অপর একটী গর্ত্তে উবু হইয়া কানে আঙ্গুল দিয়া শুইয়া পড়িলাম। হঠাৎ এক গুরুগম্ভীর আওয়াজ আর তার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ত' হারাইয়া ফেলিলামই, এমন কি দৃষ্টিশক্তিও চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইতে বাকী রহিল না।

*

যমরাজের নিকট করজোড়ে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পৃথিবীতে গিয়ে কি কি করলে ?"

হঠাৎ উত্তর খুজিয়া পাইলাম না। পরে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে দশটা পাঁচটা বেশ ভালভাবেই কাজ করেছি। ছোট সাহেবের সার্টিফিকেট আছে, বলেন ত' দেখাতে পারি।"

"কি কি খেয়েছ ?"

"আজ্ঞে সত্যি কথা বলতে কি, নিজের পয়সায় শুধু আলুভাতে ভাত, আর পরের পয়সায় অর্থাৎ কেউ খাওয়ালে বা নিমন্ত্রণ টিমন্ত্রণ হলে ; গুণে কুড়িখানা লুচি, দই, রাবড়ী, লেডীকেনী ইত্যাদি এত খেয়েছি স্যার, যে গলায় আঙ্গুল দিয়ে এক একদিন বমি পর্য্যন্ত ক'রতে হয়েছে।"

যমরাজ গম্ভীর মুখে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দেখেছ ?"

আমতা আমতা করিয়া বলিলাম "আজ্ঞে দেখবার-মধ্যে গৃহিণীর মুখ ভার, আর সাহেবের রাঙ্গা চোখ, আর পাস-টাস পেলে সিনেমা যে দেখি নি এমন নয়।"

"কি শুনেছ ?"

"পাওনাদারদের গালাগালি, পরনিন্দা, রাস্তায় চল্‌তে রেডিওর গান···" আরও অনেক কিছু বলিতে যাইতেছিলাম হঠাৎ যমরাজ ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ, বেয়াদব। এই সমস্ত করবার জন্যে তোমাকে পৃথিবীতে কষ্ট করে পাঠান হয়েছিল ?" পরে আমাকে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া পাশের একটী দূতকে আদেশ কহিলেন, "এই লোকটিকে আপাতত ২০ নং ঘরে আটক করে রেখে দাও, পরে জল্লাদকে দিয়ে ওর মাথাটা করাৎ দিয়ে চিরে দু' আধখানা করে দিও। লোকটা মহাপাপী, পৃথিবীতে

গিয়ে এত জিনিষ থাকতে খালি দশটা পাঁচটা করেছে, আর আলুভাতে ভর্ত্তি খেয়েছে।”

যমরাজের রায় শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। হাঁটু গাড়িয়া করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম “হুজুর মদ খাই নি, খুন করি নি, ডাকাতি করি নি, বাঈজীর গান্ শুনি নি, তবে আমার এ শাস্তি কেন?” যমরাজ মুখ ভ্যাংচাইয়া এবং আমার স্বরটীর অনুকরণ করিয়া উত্তর দিলেন, “ওঃ! তবে ত দেখ্ছি তুমি সাধু পুরুষ। মদ খাও নি কেন? কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছিল? আলুভাতে ভাত হজম হয় না, আবার মদ খান্‌নি বলে সাধুতা প্রকাশ করা হচ্ছে।…ওরে হারামজাদা তুই ডাকাতি কি ইচ্ছে করে করিস নি, পারিস নি তাই ওদিকে যাস নি। দশ ক্রোশের ভিতর ডাকাতি হয়েছে শুনলে যার হাত পা পেটের ভেতর ঢুকে যায়, তিনি আবার মুখে সাধুতা করে বলছেন—ডাকাতি করি নি।”

নিরুপায় হইয়া ২০ নং ঘরে চলিয়া আসিলাম। পরে একদিন জহ্লাদ ঘর খুলিয়া আমাকে এমন একটী যায়গায় লইয়া আসিলেন যেখানকার দৃশ্য দেখিয়া একদিকে যেমন কষ্ট হইতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি আনন্দেরও সীমা রহিল না। দেখিলাম নানাবিধ চেনা-অচেনা লোক নানারূপ শাস্তি ভোগ করিতেছে।

খদ্দর-পরিহিত মাথায় গান্ধীর টুপি দেওয়া একটী ভদ্রলোকের সারা গায়ে ছুঁচ ফোটাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা জহ্লাদ দাদা, কমরেড মধুসূদন দা’কে এমনভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কেন?

“লোকটী খদ্দর পরে চিরকাল দেশের শত্রুতা করে এসেছে বলে।”

শুদ্ধাচারী মশাই অমন করে লোহার সিন্দুকের তালায় থেকে জল জল করে চীৎকার করছে কেন?”

“লোকটী কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও কেবল যক্ষের ধনের মত সেগুলো আগলে এসেছিল। এমন কৃপণ ছিল যে লোককে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত খেতে দেয় নি,—তাই ওর এই দুর্দ্দশা।”

“আচ্ছা, রামেশ্বর ঝুনঝুনওয়ালা ত’ মর্ত্ত্যে অনেক টাকা পিঞ্জরাপোলে দান করেছিল, তবে ওকে কেউটে সাপে কামড়াচ্ছে কেন?”

“লোকটী পিঁপড়েদের চিনি খাইয়েছিল, আর মানুষকে সাপের চর্ব্বি খাইয়েছিল, তাই তার এই শাস্তি।”

“ডাঃ ঘোষাল ত’ বেশ ভাললোক ছিলেন—তবে ওঁকে ওরকম করে কুণ্ডে ফেলে দেওয়া হ’ল কেন?”

“ও শ্বশুরের পয়সা পেয়ে নিজের গরীব মা-বাপ, যারা একদিন তাদের সর্ব্বস্ব খুইয়ে ওকে মানুষ করে তুলেছিল, তাদের ভুলে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আলাদা হয়েছিল, তাই তার এই ফলভোগ।”

পিছনে দারুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাকাইয়া দেখি—স্নইন-ডলিং কোম্পানীর বড় বাবুর বুকে চার পাঁচজনে মিলে বাঁশ ডল্‌ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, “জহ্লাদ দাদা, ব্যাপার কি?”

জহ্লাদ দাদা বল্লেন, “ও লোকটা অফিসে থাকতে কেরাণীদের অনেকের বুকে যে বাঁশ ডলেছে তারই ওকে একটু নমুনা দেখানো হচ্ছে।” আরও অনেক কিছু দেখিলাম কিন্তু সব খুটিয়া খুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। কি জানি, জহ্লাদ দাদা আবার যদি রাগিয়া যান। পরে জহ্লাদ দাদা একটী উচু পাহাড়ের মত জায়গায় লইয়া গিয়া আমাকে বলিলেন, “এইখানে তোমার মাথাটী দু’আধখানা করে কাটা হবে, আর তার পূর্ব্বে তোমার যদি কোন প্রাণে সাধ থাকে ত’ তুমি বললেই আমি তা পূরণ করে দেবো।” শুনে হাত জোড় করিয়া বলিলাম, “দোহাই দাদা, যদি এতটাই কৃপা ক’রলেন তা হলে আমার স্ত্রী পুত্র কি করছে সেটুকু একটু দেখিয়ে দিয়ে আমার শেষ সাধটুকু মিটিয়ে দিন। এর বেশী আর আপনাকে কোন কথা বলে বিরক্ত করতে চাই না।”

শুনিয়াই জহ্লাদ দাদা রাজী হইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে একটী রামধনু রংএর চশমা দিয়া বলিলেন, “এইটী চোখের পরে ফেল, তা’ হলেই সব দেখতে পাবে।” তাড়াতাড়ি চশমাটা নাকের উপর লাগাইয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

আমার বড় সাধের তরঙ্গিণী দেবী অর্থাৎ সেকেলে নামটা ছাড়িয়া দিয়া আধুনিকতার একটু পক্ষপাতিত্ব করিয়া

যাহাকে দু'অক্ষরে "তরু" বলিয়া ডাকিয়া থাকি, তিনি বহরমপুরে দিনের পর দিন আমার প্রেরিত মনি-অর্ডারের আশায় থাকিয়া যখন নিরাশ হইয়া পড়িলেন তখন পাশের বাড়ীতে দু'টি চাল ধার করিতে যাওয়া ছাড়া আর তাঁর কোন উপায়ই রহিল না। প্রথম দিন দয়া করিয়া কেহ কিছু দিল, দ্বিতীয় দিনও কিছু মিলিল, কিন্তু তৃতীয় দিন সকলেই মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "আমরাই গেরস্ত লোক, রোজ রোজ বাছা তোমাকে দিতে পেরে উঠব কেন?" কথাটা সত্য, কেন না যা দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে যার যার নিজের সংসার চালানই ভার, অপরের কথা কে ভাবিবে? ক্রমে প্রায় সকলকারই এক অবস্থা হইয়া গেল এবং সারা সহরের রূপ এমন ভয়ঙ্কর আকারে পরিবর্ত্তিত হইল, যা সাধারণে কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। যাহাদের কিছু চাল-ডাল ছিল, তাহাদের বাড়ীতে লুটপাট আরম্ভ হইল। দিনে-দুপুরে পথে-ঘাটে খুন রাহাজানি দেখা দিল। ক্ষুধানিবৃত্তির আশায় গাছের পাতা প্রভৃতি খাইবার ফলে মহামারী দেখা দিল। শ্রীমতী তরু নিরুপায় হইয়া ছেলেটীর হাত ধরিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আসিয়া একটী প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতর আশ্রয়ের আশায় ঢুকিয়া পড়িল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?"

"আপাততঃ দু'টী খেতে চাই।"

দুই দিন উপবাসের পর ভাত খাইয়া আঁচাইতে যাইয়া তরুর চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল আপনা হইতে পড়িয়া গেল। গৃহিণী বলিলেন, "সোমত্ত বয়েস, একা এই রাহাজানির বাজারে যাবে কোথায়?"

উত্তর হইল, "কিছুই জানা নাই।"

দয়াপরবশ হইয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "চাকরী করবে?"

যেন হাতে স্বর্গ মিলিয়া গেল, বলিল, "করব।" গৃহিণী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, সুতরাং রান্নাঘরের ভার তোমার উপরই রইল।" ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিল। তরুর আশ্রয় মিলিল।

যাক্! দিন এক রকম কাটিয়া যাইতেছিল কিন্তু আবার এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ তরু বাড়ীর বড়কর্ত্তার একটু সুনজরে পড়িয়া গেল। একদিন তিনি একটু রঙ্গীন নেশায় ছিলেন, হঠাৎ সেই সময় তরুকে দেখিতে পাইয়া কথাগুলা একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, "যা-চ্ছো-কো-থা-য়? দাঁ-ড়া-ও-না?

তরু ভয়ে ভয়ে বাড়ীর ভিতর চলিয়া যাইতেছিল, বড় কর্ত্তার তা সহ্য হইল না। তিনি তাড়াতাড়ি তার পিছন হইতে আঁচলটী ধরিয়া বলিলেন, "মাইরি তোমার···।"

আর চুপ করিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল বলিয়া বড় কর্ত্তাকে এক লাথি মারতেই সঙ্গে সঙ্গে গা-টা ভিজা ভিজা ঠেকিতে লাগিল। ভাবিলাম বুঝি ব্যাটা মাতাল আমার গায়ে বমি করিয়া দিল। কিন্তু পরক্ষণেই তরুর চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে যাহা দেখিলাম তাহাতে একদিকে যেমন লজ্জার পরিসীমা রহিল না, অপর দিকে তেমনি কি করিয়া বাকী রাতটুকু এই স্যাৎ-স্যাতে একতলার ড্যাম্প ঘরে ভিজে বিছানায় শুইয়া কাটাইয়া দিব তাহা ভাবিয়াই দিশেহারা হইয়া পড়িলাম। পরে উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাঙ্গা কুঁজাটা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া আলনা হইতে র‍্যাপারটী গায়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া শুইয়া পড়িলাম।

*

পরের দিন রাত্রিবেলায় ঘরে ঢুকতেই একটা কচি ডাব আমার হাতে দিয়া তরু বলিল, "এইটী খেয়ে ফেল।"

বলিলাম, "কেন?"

"জিজ্ঞাসা আবার করছো কেন? সমস্ত রাত বিড় বিড় করে বকো, আর হাত পা ছোঁড়। ও সব পেট গরমের লক্ষণ।" এই বলিয়া তরু এক রকম জোর করিয়াই আমাকে ডাবটা খাওয়াইয়া দিল এবং পরে সাবধান করিয়া দিয়া বলিল, "আজ যেন আবার লাথি টাথি মেরে নূতন কুঁজোটাকে ভেঙ্গে ফেলো না, বুঝলে?"

বলিলাম, "তরু, সাধে কি আর কাল লাথি ছুঁড়েছি। তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই না ঐ কু-কাজটা করতে হ'ল।"

"আমাকে বাঁচাবার জন্যে কি রকম?"

*

ঘটনাটা আগা গোড়া শুনে তরু এক গাল হাসিয়া বলিল, "তা হলে সত্যিই তুমি আমায় ভালবাস?" কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলাম, "মিথ্যে বলছি, এ ধারণা তোমার কোত্থেকে হ'ল?

মুখখানা লাল হইয়া গেল। বলিল "আঃ—কি যে কর?" বলিলাম, "সব কথা শুনলে ত'। যা বাজার পড়েছে তাতে কবে আছি, কবে নেই।"

*

সে রাত্রে ঘুমের কোন ব্যাঘাতই ঘটে নাই।

হিটলার ও নাৎসীদল

শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ

হিটলার জার্ম্মাণীর ডিক্টেটর বা একনায়ক। সময় বিশেষে একনায়কত্বের প্রকাশ অনেক দেশেই দেখা দিয়াছে। তবে ইহা বর্ত্তমানে ইউরোপে যেরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে একনায়কত্বের ঠিক সেইরূপ রূপ পূর্ব্বে কখনও দেখা গিয়াছিল কি না সে বিষয়ে সংশয় আছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি বিচিত্র-চরিত্র অদ্ভুতকর্ম্মা প্রবর্ত্তক ও প্রচারকগণ একনায়কত্ব করিয়াছেন বলিলে ভুল হয় না। তবে তাঁহারা মানবদেহ পরিগ্রহ করিলেও তাঁহাদিগকে অতিমানব বা মানবাতীত তত্ত্ববস্তু বলিয়া মনে করা হয়। ভারতবর্ষের ন্যায় অসংখ্য-সম্প্রদায়-অধ্যুষিত অতি বিশাল দেশে একনায়কত্ব করা সহজ ত' নহেই পরন্তু প্রায়ই অসম্ভব। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এক সময় সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া একনায়ক ছিলেন, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অসহযোগ-আন্দোলনের যুগে তিনি যে অপূর্ব্ব প্রভাব প্রসারিত করিয়াছিলেন, তাহাকে ঐন্দ্রজালিক বলা চলে। তখন যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই মুগ্ধ বা বশীভূত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বীকেও কয়েক ঘণ্টার ভিতর স্বকীয় মতবাদে দীক্ষিত করিয়া তিনি সত্য সত্যই বিস্ময়কর প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজির প্রভাব আর কি নাই? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, আছে, কিন্তু কয়েকটি কারণে সেই প্রভাবের গণ্ডী ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ প্রভাব কতকটা পারিপার্শ্বিকের উপরেও নির্ভর করে এ বিষয়ে সংশয় নাই। সংগ্রামের সময় যে উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্ট হয়, তাহা এইরূপ প্রভাব প্রসারিত করার পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

হের হিটলার

আলেকজেণ্ডার এবং নেপোলিয়ান এই অদ্ভুতকর্ম্মা দিগ্বিজয়ী বীরদ্বয় একনায়ক ছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নাই। রাষ্ট্রনৈতিক একনায়কদের প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় না, ইহাও সত্য। জ্যোতির্ব্বিদ বলিলেন, যতদিন অনুকূল নক্ষত্রদলের দ্বারা তাঁহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় ততদিন তাঁহারা প্রভাবশালী থাকেন। তাঁহাদের জীবনকালে যেমন প্রতিকূল নক্ষত্রদিগের আধিপত্য আরম্ভ হয়, অমনিই সেই প্রভাবের প্রবাহে ভাটা পড়িতে আরম্ভ করে।

সংখ্যাধিক দলের মতামত লইয়া কার্য্য করিতে হইবে, ইহাই গণতন্ত্রের নির্দ্দেশ। কিন্তু একনায়ক-পরিচালিত রাষ্ট্রে জনমত বা গণ-বাণীর বিশেষ কোন মূল্য নাই। তথায় একনায়কের ইচ্ছা বা খেয়ালের যূপকাষ্ঠে গণ-দেবতাকে বলি দেওয়া হয় বলিলে ভুল হয় না। ইংলণ্ডের সিংহাসনে রাজা আজিও বিরাজিত বটে কিন্তু তবুও গণতন্ত্র এখানে যেরূপ সুপ্রতিষ্ঠ ও সুপরিণত, ইউরোপের অন্য কোন দেশে তাহা দৃষ্ট হয় না। বেন্থাম, মিল প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিতগণ ইংলণ্ডে গণতন্ত্র-মন্ত্রই প্রচার করেন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী শাসন-প্রণালী বেন্থামের হিতবাদ নামক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে ভুল হয় না। ওয়েষ্টমিনিষ্টারে গণ-দেবতার যে বিরাট মন্দির ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদিন এই প্রবল প্রভাবশালী

দেবতার বেদীমূলে রাজা প্রথম চার্লস্ কি ভাবে বলিপ্রদত্ত হইয়াছিলেন প্রত্যেক ইতিহাসপাঠক তাহা অবগত আছেন। ক্রমওয়েল ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কত্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। ইংরেজজাতির জন্মভূমি এই দ্বৈপায়ন দেশের মাটিতে একনায়কবাদের বৃক্ষ বাড়িয়া উঠা অসম্ভব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। চেম্বারলেন বা চার্চ্চিল একনায়কত্ব করিয়াছিল, এরূপ কথা কেহ বলিবেন না। অথচ হিটলার, মুসোলিনী ও ষ্টালিন এই তিনজনের একনায়কত্ব সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।

ইউরোপের রাজনৈতিক চিন্তাজগতে দুইজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত বিস্ময়কর প্রভাব প্রসারিত করিয়াছেন। একজনের নাম কার্ল মার্কস্ এবং অপর ব্যক্তি নিট্জে। কার্ল মার্কসের ধনসাম্যবাদকে ভিত্তি করিয়াই সোভিয়েট রুশিয়ার শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সাম্যমন্ত্রমূলক শাসনতন্ত্র একনায়কবাদের বিরোধী হইলেও রুশিয়ায় বরাবরই একনায়কত্ব চলিতেছে। জার্ম্মাণ দার্শনিক নিট্জের অতিমানব-বাদ কার্লমার্কসের সাম্যবাদের বিপরীত বলিলে ভুল হয় না। জার্ম্মাণীর একনায়ক হিটলারের জীবনকে নিট্জের মতবাদের পরিণতি বলিলে ভুল হয় না। নিট্জের মতবাদ জার্ম্মাণ জাতির জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। এই জাতি নাৎসী-নেতা হিটলারের মধ্যে নিট্জের পরিকল্পিত অতিমানব বা সুপারম্যানকে আবিষ্কার করিয়াছে কি না তাহাও চিন্তা করিবার যোগ্য। হিটলার প্রকৃতপক্ষে বা যথার্থতঃ যাহাই হউন জার্ম্মাণজাতির ধারণা বা কল্পনার উপরেই তাঁহার বিস্ময়কর প্রভাবের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত এই সত্যে সন্দেহের অবকাশ নাই।

যে লোকটি সমস্ত জগৎ জুড়িয়া অভূতপূর্ব্ব চিন্তা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ সৈন্য রণরঙ্গে মত্ত হইয়া মৃত্যু তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লেশমাত্র সঙ্কোচ বা শঙ্কা অনুভব করিতেছে না, ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্র আজ যাহার পদতলে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বিলুণ্ঠিত, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিত্রয় যাহার বিরুদ্ধে সমর সাজে সজ্জিত হইয়া প্রচণ্ড আক্রোশে মেঘ-নির্ঘোষে গর্জ্জিতেছে সে কে—এই জিজ্ঞাসা আমাদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব এক নায়কদের প্রায় প্রত্যেকেই নগণ্য বা সামান্য অবস্থা হইতে সম্ভূত। সঙ্গতিশালী সংসারে ঐশ্বর্য্যের ভিতর (দুই একজন ছাড়া) কেহই জন্মান নাই। সকলেই আত্মশক্তি বলে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিককে পরাজয় করিয়া বড় হইয়াছেন। আর একটি বিচিত্র ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব। যিনি জার্ম্মানজাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তিনি জার্ম্মানীতে জন্মান নাই। হিটলারের জন্মভূমি অষ্ট্রিয়া, এই সত্য অনেকেই অবগত। রুশিয়ার একনায়ক ষ্টালিন জর্জ্জিয়ায় জন্মান। সুতরাং তিনি খাস রুশিয় নহেন এবং এমন কি তাঁহাকে ইউরোপিয়ানও বলা চলে না। তরুণ তুরস্কের স্রষ্টা মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক গ্রীসের অন্তর্গত স্যালনিকায় জন্মগ্রহণ করেন। পোল্যাণ্ডের একনায়ক পিলসুদস্কি লিথুয়ানিয়ান, পোল নহেন। অষ্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ (একনায়ক না হইলেও) জননায়ক সুশনিগ ইটালীতে জন্মিয়াছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডের এক নায়ক ডি-ভ্যালেরার পিতা স্পেনিশ।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

হিটলার অষ্ট্রিয়ার যে জায়গায় জন্মান তাহার নাম ব্রাউনাউ। হিটলার প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবার পর অনেকে তাঁহার জন্মস্থান দেখিবার জন্য ব্রাউনাউ-এ গমন করেন এবং স্থানটি এখন নাৎসী মতবাদী জার্ম্মানীর পুণ্যতীর্থে পরিণত।

একটি গ্রাম্যভাবাপন্ন সামান্ত কুটিরে এই যুগান্তর আনয়নকারী জননায়ক জন্মান বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল কিন্তু পরে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় সেই জনশ্রুতি অসত্য বলিয়া জানা গিয়াছে। বাড়ীটি ত্রিতল এবং ব্রাউনাউ-এর প্রধান পথটির পার্শ্বে অবস্থিত। বিশ বৎসর ব্যাপিয়া ঐ বাড়ীটি 'গাসথাউস' (Gasthous) বা গ্রাম্য পানশালা ছিল। জোসেফ পমার নামক এক ব্যক্তি সেই পানাগারের অধিকারী ছিলেন। বর্ত্তমানে বাড়ীটিকে উজ্জ্বল বাদামী বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে। বাদামী নাৎসী ইউনিফর্ম্মের বর্ণ বলিয়াই এইরূপ করা হয়। গৃহটি স্থানীয় নাৎসীদিগের কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া অষ্ট্রিয়ার নাৎসীবিরোধী কর্ত্তৃপক্ষ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উহা তালা লাগাইয়া বন্ধ করিয়া রাখেন। নাৎসীরা অষ্ট্রিয়ার তৎকালীন ডিক্টেটর ডক্টর ডলফাস পরিচালিত শাসন যন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তথায় আপনাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত শুধু প্রকাশ্যে চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, গোপনে ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। নাৎসী ঘাতকের হস্তে ডক্টর ডল্‌ফাসের নির্ম্মমভাবে নিহত হইবার কাহিনী অনেকেই জানেন।

কার্ল মার্ক্স

উপরোক্ত গৃহটি গৃহের অধিকারীর নিকট হইতে ভাড়া লইয়া হিটলারের পিতামাতা উহাতে অবস্থান করিতেন বলিয়া জানা যায়। হিটলারের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, বালক হিটলারকে মধ্যে মধ্যে অনাহারে থাকিতে হইত এ জনশ্রুতিও যথার্থ নহে। তবে তাঁহারা সঙ্গতিশালী ছিলেন না, ইহাও সত্য। যে বংশে বা পরিবারে হিটলারের জন্ম তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি অষ্ট্রিয়ার ওয়ালদভিয়েরটেল নামক অংশ বিশেষ ইহাদের আদিম বাসস্থান। দানিউব অভিষিক্ত এই অংশটি চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। এই প্রদেশটি দারিদ্র্যপীড়িত, শিক্ষাশূন্ত কর্ম্মক্লান্ত কৃষককুলের বাসস্থলী। ইহারা সরলহৃদয় এবং ধর্ম্মভীরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী বলিয়া বিদিত। কেহ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করে, কেহ নিকটবর্ত্তী কল বা কারখানায় কাজ করে। কেহ বা সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পীর কার্য্য সামান্ত আকারে করিয়া কোনরূপে জীবিকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই ওয়ালদভিয়েরটেল আখ্যায় অভিহিত সীমান্ত-প্রদেশের স্পিটাল নামক পল্লীগ্রামে জোহান জর্জ্জ হিদলার নামক এক ব্যক্তি ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মান। জার্ম্মানীর এক নায়ক এডলফ হিটলারের পিতামহ ইনি। ইনি জনৈক মিলার বা কলওয়ালার সহকারী বা সাহায্যকারীর কায করিতেন। হিটলারকে নানাস্থানে ঘুরিয়া কায করিতে হইত। ইঁহার ঔরসে এবং মেরিয়া এনা শিকল গ্রুবার নামক নারীর গর্ভে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে একটি পুত্রের জন্ম হয়। এই বালকের জন্মকাল পর্য্যন্ত তাহার পিতা পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয় নাই এই সত্য আমাদের পক্ষে বিস্ময়কর হইলেও ইউরোপে এইরূপ ঘটনা একান্ত বিরল নহে। বালকের জন্মের পাঁচ বৎসর পরে এই নর-নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই বালক পিতৃনাম গ্রহণ না করিয়া আপনাকে মাতৃনামে পরিচিত করিতেন। অবশেষে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিবার পর (৪০ বৎসর বয়সে) তিনি মাতৃবংশের নাম ('শকল গ্রুবার) পরিত্যাগ করিয়া পিতৃনাম গ্রহণ করেন। এইবার ইনি 'এলোয়িস হিটলার' হ'ন। বলা বাহুল্য ইনিই এডলফ হিটলারের পিতা।

অনেকে মনে করিতে পারেন, হিদলার নাম হিটলারে রূপান্তরিত হইল কেন? প্রকৃতকথা সীমান্তবাসী এই অশিক্ষিত কৃষককুল লেখাপড়া জানিত না বলিয়া নিজ নিজ নাম কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ জীবনে ঘটিত না বলিলেও চলিতে পারে। শুধু জন্ম ও মৃত্যুর সময় গ্রাম্য গীর্জ্জাগৃহের খাতায় তাহাদের নাম লিখিত হইত। গীর্জ্জার খাতায় হিটলারের পিতার হিউটলার আখ্যা লিখিত রহিয়াছে। অথচ জার্ম্মাণীর জন-নায়ক এডলফ হিটলারের ভগিনী পলা স্বাক্ষর করিবার সময় এখনও 'হিদলার' আখ্যা ব্যবহার করেন।

এডলফের পিতা এলোয়িস হিটলার পৈত্রিক বৃত্তির দিক দিয়া চর্ম্মকারের কার্য্য করিতেন বলা চলে। তিনি ছিলেন কবলার বা জুতা মেরামতকারী। তিনি তিনবার বিবাহ

করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী এনাগ্লেসল হোরার ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ালদভিয়ের তৈল প্রদেশের অন্তর্গত থেরোসিয়েন-ফস্‌ড নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। এই রমণী হিটলারের পিতা এলোয়িস অপেক্ষা ১৪ বৎসর বয়ঃজ্যেষ্ঠা ছিলেন। পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে ইনি কিছু অর্থপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বয়স্কা নারী তদপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ তরুণ এলোয়িসের পক্ষে একাধারে পত্নী ও জননী ছিলেন বলিলে ভুল হয় না। মাতা যেমন সন্তানকে সস্নেহে পালন করেন ইনি কতকটা সেইরূপ স্বামীকে পালন করিয়াছিলেন। হিটলারের পিতা তৎকালে (মাতৃনামে) শিকল গ্রুবার নামে পরিচিত ছিলেন। যেমন মাতা পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠান তেমনই এনা স্বল্পবয়স্ক স্বামীকে স্কুলে পাঠাইয়া দিতেন। অবশেষে এই রমণী অর্থের জোরে স্বামীর জন্য অষ্ট্রিয়ান সিভিল সার্ভিসে একটি চাকরি যোগাড় করিয়া দেন বলিয়া জানা যায়। এই অর্থশালিনী পত্নীর প্রভাবেই এলোয়িস 'সিটিজেন' বা নাগরিক হইতে সমর্থ হন। এই নারীর প্রভাব হিটলারের জীবনেও রহিয়াছে, পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে এই সত্য আমরা উপলব্ধি করিব। এনার গর্ভে (এলোয়িসের ঔরসে) একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে (হিটলারের জন্মস্থান) ব্রাউনাউতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

এই পরম হিতকারিণী ও একান্ত অনুরক্তা পত্নীর পরলোকপ্রয়াণের পর মাত্র ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়া এলোয়িস ফ্রানজিস্কা ম্যাটজেলস বার্জ্জার নামক নারীর সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এইরূপ পতিপরায়ণা পত্নীর মহাপ্রয়াণের পর যে এত শীঘ্র পুনরায় পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয় সে যে তরলচিত্ত ও হৃদয়হীন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ফ্রানজিস্কা বিবাহের পর একবৎসর মাত্র বাঁচিয়া ছিলেন। সুতরাং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুর মাত্র তিনমাস পরে এলোয়িস আবার বিবাহ করেন। এবার বিবাহ হয় দূরসম্পর্কীয়া এক কাজিনের সহিত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তারিখে এই পরিণয় সঙ্ঘটিত হয়। বিবাহ হইবার চারিবৎসর পরে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল উপরোক্ত ব্রাউনাউতে নাৎসীদলের নিয়ন্তা, তৃতীয় রাইকের স্রষ্টা এডলফ্ হিটলার মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর আলোক প্রথম দর্শন করেন। এই সময় হিটলারের পিতার বয়স ৫১ এবং মাতার বয়স ২৯ বৎসর।

এডলফ্ হিটলারের মাতার নাম ক্লারা পোয়েজল্। এই রমণী উদ্যমশীলা ও সাহসশালিনী সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। ইঁহার পিতা স্পিটাল গ্রামের এক কৃষক। ইঁহার মাতাই এলোয়িস হিটলারের জ্ঞাতি কন্যা। এডলফ্ হিটলারের মাতামহীর নাম জোহানা হিউটলার। যখন এডলফ্ হিটলারের মাতা ক্লারার বয়স দশ বৎসর তখন তিনি এলিয়স হিটলারের প্রথমা পত্নী এনা গ্লেসল হোরারের অধীনে পরিচারিকার কার্য্য করিতেন। সুতরাং এডলফ্ হিটলারের মাতামহ দরিদ্র ছিলেন সন্দেহ নাই। প্রথমা পত্নী এনার গৃহে ভাবী তৃতীয়া পত্নী ক্লারার সহিত এলোয়িসের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই প্রথম সাক্ষাতের পঞ্চদশ বৎসর পরে প্রথমা পত্নীর পরিচারিকার সহিত তিনি পুনরায় পরিণয়পাশে আবদ্ধ হন।

হিটলারের পিতা-মাতা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত ঘটনাবলীর কিছু কিছু অনুসন্ধানের সাহায্যে জানা গিয়াছে। এনার পরিচারিকার কার্য্য করিতে করিতে ক্লারা অকস্মাৎ একদিন ভিয়েনায় পলাইয়া যান। এরূপ পলায়ন একজন দরিদ্র কৃষক-কন্যার পক্ষে অসমসাহসিক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। ওয়ালদভিয়েরটেলের কোন বালিকা পূর্ব্বে এইরূপ দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

হিণ্ডেনবার্গ ও হিটলার

ইহাতে প্রমাণিত হয় ক্লারা নির্ভীকা ছিলেন এবং এডলফ্ মাতার নিকট হইতে সেই নির্ভীকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পলায়নের প্রকৃত কারণ আজিও জানা যায় নাই। কোন কোন লেখক পরে ক্লারার ভগিনীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পান নাই। ক্লারা দশ বৎসর ভিয়েনায় বাস করেন। তাঁহার এই দশ বৎসরের জীবনেতিহাস নিবিড় রহস্যাবৃত। পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মপল্লী স্পিটালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন দশ বৎসর পূর্ব্বের বালিকা দীর্ঘাকৃতি তরুণীতে পরিণত। অপর কৃষক-কন্যাদের মত শারীরিক শক্তি তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে স্নায়বিক প্রকৃতি বিশিষ্টা বলা চলে। ক্লারা ফিরিয়া আসিয়া পিতা-মাতার সহিত যে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বিপত্নীক এলোয়িস বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে অবস্থান করিতেন। যতই হৃদয়হীন হউক পরলোকগত পত্নীদ্বয়ের স্মৃতি এই ব্যক্তির অন্তরে একপ্রকার বেদনার সঞ্চার করা অসম্ভব নহে। অন্ততঃ তিনি একরকম শূন্যতা বা অভাব অনুভব করিতেছিলেন সে বিষয় সংশয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমা পত্নী এনার বালিকা-পরিচারিকার স্মৃতি তাঁহার বিরহাতুর অন্তরে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয়। একদিন সেই বালিকাকে তন্বী তরুণীরূপে দর্শন করিয়া প্রৌঢ় এলোয়িসের মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণের ফলে উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এনার ন্যায় ক্লারাও একটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করেন। কন্যাটীর নাম পলা। পলা হিটলার অপেক্ষা আট বৎসরের ছোট। এই নারী (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায়) আজিও অবিবাহিতা। যাহার ভ্রাতার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ও বিস্ময়কর সে আজ ভিয়েনার একটি কোনে খ্যাতিহীন নামহীন জীবনযাপন করিতেছে। এলোয়িসের প্রথমা পত্নী এনার পুত্রটী 'এলোয়িস জুনিয়র' আখ্যায় অভিহিত। এডলফ হিটলারের এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতাটি কিছুদিন ওয়েটারের কাজ করিবার পর বর্ত্তমানে বার্লিনে একটি রেস্তোরাঁ বা ভোজনালয় খুলিয়া তথায় বাস করিতেছেন বলিয়া শুনা যায়। এনার কন্যা হিটলারের বৈমাত্রেয় ভগিনী এঞ্জেলা ভিয়েনানগরীতে গিয়া তথার রাওপেল নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। ভিয়েনায় তিনি 'ষ্টুডেণ্টস্ চ্যারিটি হল' নামক দাতব্য ছাত্রাবাসে পরিচারিকার কার্য্য করিতেন। এডলফ হিটলার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে তথা হইতে জার্ম্মানীতে আনিয়া তাঁহার "বার্চ্চতেস গার্ড্দেন ভিলা" নামক বাসভবনে রাখিয়া তাঁহাকে গৃহকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং ভ্রাতা-ভগিনীদিগের মধ্যে হিটলার একমাত্র এই বৈমাত্রেয় ভগিনীটী সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছেন। আর কাহাকেও সাহায্য করা দূরের কথা, তাহারা মরিল কি বাঁচিল সে খবরও তিনি রাখেন না। হিটলারের সহোদর ভ্রাতা (নাম এডওয়ার্ড) শৈশবেই মারা যায়।

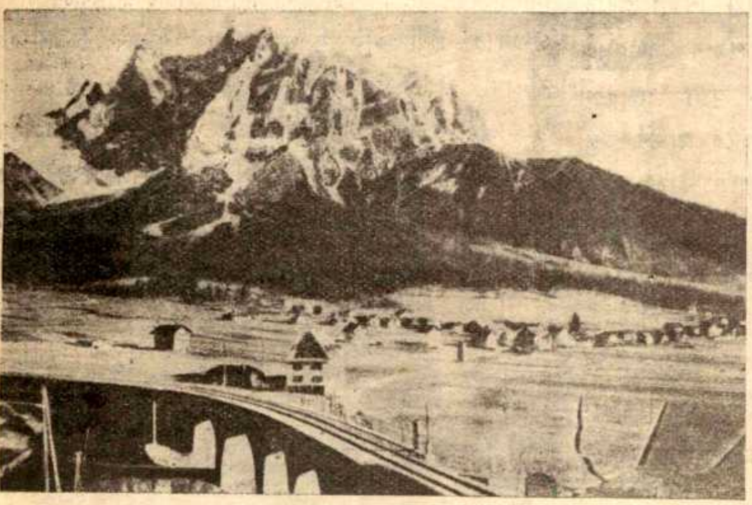

হিটলারের জন্মভূমি পর্ব্বত বন্ধুর অষ্ট্রিয়া

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিটলারের পিতা এলোয়িস (কবলার হইয়াও) তাঁহার প্রথমা পত্নী এনার অর্থের জোরে সরকারী চাকরি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পরে কাষ্টমস্ ইন্সপেক্টর পদ পাইয়াছিলেন। সুতরাং এডলফ হিটলার দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মান, একথা সত্য নহে। হিটলার বাল্যকালে পিতামাতার সহিত উপরোক্ত ব্রাউনাউ নামক সীমান্তবর্ত্তী সহরেই থাকিতেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এলোয়িস সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া লিয়ণ্ডিং নামক

গ্রামে গিয়া পত্নী ও পুত্রসহ বাস করেন। সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া মাসে মাসে কিছু পেন্সন তিনি পাইতেন। এই স্থানেই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর জগদ্বিখ্যাত জন-নায়ক হিটলারের জনক এলোয়িস পরজগতে প্রবেশ করেন। হিটলারের পিতার সমাধি অনেকে দেখিয়াছেন। সমাধিতে লিখিত রহিয়াছে—

হিয়ের রুহেট ইন গট হের
এলোয়িস হিটলার
কে কে জোলামৎস ওবার অফিজিয়াল আই পি
উণ্ড হাউসবিসিৎজার
গেষ্ট ৩ জানের ১৯০৩ ইন লেবেন্সজাহরে

ইহা হইতে মৃতের নাম, পেশা ও মৃত্যুর সময় তিনই জানা যায়। অষ্ট্রিয়ায় সমাধিপ্রস্তরের গাত্রে মৃতের একটি ক্ষুদ্র আলোকচিত্র সংলগ্ন করার প্রথা প্রচলিত। সমাধি-শিলার সহিত সংলগ্ন এই চিত্র কোন কোন লেখক দেখিয়া হিটলারের পিতার আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিয়াছেন। একজন লেখক বলিয়াছেন—"কেশ-বিরহিত বৃহৎ ও বর্ত্তুল মাথাটি ঠিক যেন একটি তরমুজের মত। ক্ষুদ্র, তীক্ষ্ণ, দুষ্টবুদ্ধির পরিচায়ক চক্ষুর্দ্বয়। বাই-সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মত যুগ্ম-গুম্ফ গুরু চিবুক যেন বলিয়া দেয় অধিকারী অত্যাচারী।" এই লেখকই হিটলারের কোন আত্মীয়ের গৃহে তাঁহার মাতার চিত্র দেখিয়া লিখিয়াছেন—"এই রমণীর আকৃতি দীর্ঘ। সহজেই উত্তেজনাপ্রবণ প্রকৃতির পরিচায়ক সঙ্কীর্ণ মুখমণ্ডল! গণ্ডাস্থি কোটরগত। পীতাভ কেশ-কলাপ ধূসর আস্তরণে পরিণত হইয়া কণ্ঠের পশ্চাতে লুণ্ঠিত। আয়তোজ্জ্বল বঙ্কিম নেত্র।"

বালক এডলফ তাহার মাতাকে যেমন গভীরভাবে ভালবাসিত, তেমনই অত্যাচারী পিতার প্রতি ছিল তাহার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা, যাহাকে ঘৃণা আখ্যায় অভিহিত করিলেও ভুল হয় না। হিটলারের পিতা একে অতিশয় উদ্ধত প্রকৃতির লোক, তাহার উপর মদ্যপ বলিয়া সেই স্বভাব ক্রমশঃ ভীষণতর হইয়া পড়িয়াছিল। পতি-পত্নীতে প্রায়ই কলহ হইত। এই সকল কলহে বালক হিটলার পিতার বিরুদ্ধে মাতার পক্ষ সাগ্রহে গ্রহণ করিত। পিতাও পুত্রকে দেখিতে পারিতেন না। তিনি এডলফকে দুর্ব্বল, অসার, অকর্ম্মা এবং অলস স্বপ্নবিলাসী বলিয়া মনে করিতেন। মধ্যে মধ্যে পুত্রকে 'পাগল' বলিয়াও সম্বোধন করিতেন। বালক হিটলার পিতার দ্বারা প্রায়ই তিরস্কৃত ও প্রহৃত হইতেন। হিটলারের পিতার মৃত্যু হয় পানশালায়। তথায় তিনি অত্যধিক মদ্যপানের ফলে অকস্মাৎ হতচেতন হইয়া পড়েন এবং সম্ভবতঃ তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। মদ্যপ পিতার জীবন ও মৃত্যুর শোচনীয় চিত্র এডলফ হিটলারের অন্তরে মদ্যপানের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা বাল্যকালেই সঞ্চারিত করে।

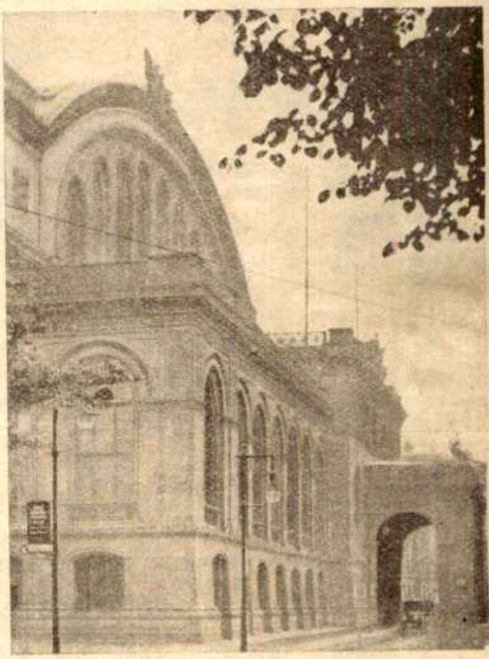

জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিনের রেল-ষ্টেশন

সেই ঘৃণা বয়সের সহিত বৃদ্ধিই পাইয়াছে। হিটলার মদ্যপান করা দূরের কথা, ইহা স্পর্শও করেন না। মদ্যপ উদ্ধত পিতার হস্তে মাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া দাম্পত্য জীবনের প্রতিও তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায় ইহাও সত্য। এই বিতৃষ্ণাই তাঁহার বিবাহিত জীবনে প্রবেশ না করিবার কারণ কি না কে বলিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিটলার মাতাকে খুবই ভালবাসিতেন। পুত্রের প্রতি মাতারও স্নেহ ছিল অসীম। হিটলারের পিতা পুত্রকে অলস ও অকর্ম্মা এমন কি উন্মাদ বলিয়া মনে করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না, অথচ পুত্র

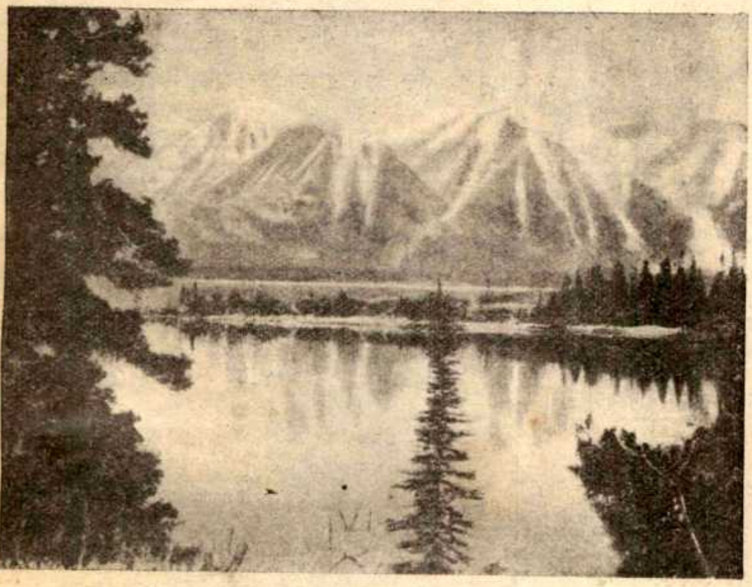

আটলিন হ্রদ—আলাস্কা

তুষার শুভ্র পর্ব্বতপুঞ্জের পার্শ্বে প্রসারিত এই হ্রদের দৃশ্য অতিশয় নেত্র-তর্পণ।

সম্বন্ধে মাতার উচ্চ ধারণা বা উচ্চাশা ছিল। হিটলার উত্তেজনাপ্রবণ স্নায়বিক প্রকৃতি ও উচ্চাশা-পরায়ণতা মাতার নিকট হইতে পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। পুত্র পিতার মত হইবে না, ক্লারা শুধু এইরূপ আশা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার পুত্র এডলফ কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জনের জন্য সংসারে আসিয়াছেন এইরূপ উচ্চাশাও তিনি পোষণ করিতেন। তবে পুত্র জার্ম্মানীর রাজনীতিক জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে এরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই। তাঁহার পুত্র শিল্প-সাধনায় সাফল্য লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। তিনি পুত্রকে শিল্পী হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। এডলফের বয়স যখন প্রায় ছয় বৎসর সেই সময় হইতে তাঁহার মাতার দেহে দুরারোগ্য ক্যানসার বা কর্কটিকা রোগ দেখা দেয়। এই দুঃসাধ্য রোগ দীর্ঘ দশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া ভোগ করিবার পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। পতির সমাধি-স্থানেই পত্নীকেও সমাহিত করা হইয়াছিল। পতির সমাধি-ফলকের নীচে পত্নীর নাম ও মৃত্যু-কাল লিখিত রহিয়াছে। এডলফ হিটলারের জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, মাতা ব্যতিরেকে অপর কোন নারীকে তিনি কোন দিন ভালবাসেন নাই এবং তাঁহার বিচিত্র জীবনে মাতার জীবনের বিচিত্র প্রভাব অপরিসীম। ক্লারা হিটলারের ভিতর যাহা বীজাকারে বিরাজিত ছিল এডলফ হিটলারের চিন্তা ও কার্য্যাবলী তাহারই পরিণতি।

পূর্ব্বোক্ত স্পিটাল নামক গ্রামে ক্লারার ভগিনী হিটলারের মাসী থেরেসা এবং তাঁহার পুত্র-কন্যারা বাস করেন। এই সকল কুটীরবাসী অতি দরিদ্র আত্মীয়ের প্রতি হিটলার কখনও এক কণাও করুণা দেখান নাই। সাহায্য দূরের কথা, তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তিনি উদাসীন। এ বিষয়ে ইটালীর এক-নায়ক মুসোলিনীকে সহৃদয় বলিতে হইবে। উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও দরিদ্র আত্মীয়দের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আছে।

আমরা এইবার এডলফ হিটলার নামক অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তিটির দিকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। এক একটি লোক বিস্ময়কর প্রকৃতি ও নিয়তি লইয়া সংসারে আসে। জার্ম্মানীর এক-নায়ক এডলফ হিটলার সেইরূপ লোক সন্দেহ নাই। কুৎসিত না হইলেও লোকটির আকৃতিকে চিত্তাকর্ষক বলা যায় না। চাহিলেই চার্লি-চ্যাপলেন জাতীয় গুম্ফগুচ্ছ দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। লোকটিকে বিবেকী বা বিবেচক বলা চলে না। মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত স্নায়বিক প্রকৃতি তাহাকে ভাবপ্রবণ করিয়াছে। পরাপর বিপরীত গুণান্বিত ভাবসমূহের সমবায়ে লোকটির মন অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব বিস্ময়কর বস্তুতে পরিণতি পাইয়াছে বলিলে ভুল হয় না। এই অদ্ভুত ব্যক্তির মন কখন আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে, কখন জলের ন্যায় গলিয়া যায়, কখন বায়ুর ন্যায় বেগে বহিয়া চলে, কখন স্থাণুর ন্যায় স্থির থাকে। তবে তাহার মনে স্থৈর্য্য অপেক্ষা চাঞ্চল্য অনেক বেশী। জার্ম্মানীর এক দল লোক লোকটীকে দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চনা করে বলিলেও

চলিতে পারে। হিটলারকে দেখিলে, হিটলারের কথা ভাবিলে, ইহাদের অন্তর আনন্দ-আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ইহারা ঈশ্বর মানে না, মানে এডল্ফ হিটলারকে— ধর্ম্ম মানে না, মানে শুধু ফুয়েরারকে। (জার্ম্মানীর) আর এক দল লোক হিটলারকে উদ্দেশ করিয়া বলে— বদ্ধ পাগল, তবে ভাগ্য ভাল। তাহাদের নিকট এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, জাতির অশেষ অনিষ্টসাধক। তবে বর্ত্তমানে শেষোক্ত দলের সংখ্যা অল্প বলিয়া হিটলারের পক্ষে এক-নায়কত্ব করা সম্ভব হইতেছে। অনেকে গোয়েন্দাগণের ভয়ে হিটলার-ভক্তির ভাণ করিয়া থাকে ইহাও সত্য।

জার্ম্মানী যাঁহার জন্মভূমি নহে, সেই ব্যক্তির পক্ষে জার্ম্মানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন-নায়কে পরিণত হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নাই। হিটলার জন্মস্থানেরদিক দিয়া জার্ম্মান নহেন বলিয়াই তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার অন্তরে খাস জার্ম্মান বলিয়া গণ্য হইবার জন্য প্রচণ্ড প্রবৃত্তি বা পিপাসা জন্মিয়াছিল। এই প্রবল পিপাসাকে তাঁহার জলন্ত জাতীয় ভাবের জনক বলিলে ভুল বলা হয় না। সীমান্তবাসীরা স্বভাবতঃ দুর্দ্দান্ত হয় এবং তাহাদের দেশানুরাগ উগ্র প্রকৃতির হইয়া থাকে, আমরা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলেই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি। যাহারা দণ্ডাদেশ পাইয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয় তাহাদের দেশানুরাগের তীব্রতাও স্বীকার্য্য। জার্ম্মানী হিটলারের জন্মভূমি এইরূপ হইলে অত্যন্ত প্রবল বা জলন্ত জার্ম্মানী-প্রেম তাঁহার জীবনে জাগ্রত হইত না, এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন।

জার্ম্মানীর পিতৃস্বরূপ রাইন-নদ—কলোনে রাইন-নদের বক্ষে সুদৃশ্য সেতু

যাঁহার কার্য্যকলাপ জগৎ জুড়িয়া বিরাট ও বিচিত্র চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছে তাঁহার বিদ্যার দৌড় কতদূর— এইরূপ জিজ্ঞাসা অনেকের মনে জাগিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের দ্বারা লব্ধ শিক্ষা বা একাডেমিক কেরিয়ার যাহাকে বলা হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই বা অতি অল্পই হইয়াছিল বলা চলে। তিনি কিছুদিন স্কুলে পড়িয়া পড়া ছাড়িয়া কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই জন্য উচ্চশিক্ষাসঞ্জাত পাণ্ডিত্য বা সমুচ্চ সুরুচির পরিচয় তাঁহার কার্য্যাবলীর ভিতর আমরা কোনদিনই পাই না। ইটালীর এক-নায়ক মুসোলিনী হিটলার অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক শিক্ষিত। মধ্যে মধ্যে কিছু লিখিতেও পড়ার অভ্যাস হিটলারের একেবারেই নাই। পাণ্ডিত্য এবং পণ্ডিত উভয়কেই তিনি পছন্দ করেন না। নানাদেশ ভ্রমণের সহায়ে যে শিল্প ও অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তিনি তাহাও পান নাই। প্রথম যৌবনে অষ্ট্রিয়া হইতে জার্ম্মানীতে আসার পর তিনি জার্ম্মানীর বাহিরে কখন যান নাই বলিলেও চলিতে পারে। বিগত মহাসংগ্রামের সময় যোদ্ধারূপে ফ্লাণ্ডার্সে এবং পরে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাতের জন্য ভেনিস নগরে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অতীত জীবনের একমাত্র দেশ-ভ্রমণ। তিনি বিদেশীয় ভাষা জানেন না বলিলেই হয়, শুধু ফরাসী ভাষার কয়েকটি শব্দ তাঁহার জানা আছে। এ বিষয়েও মুসোলিনীর শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা অনেক অধিক। হিটলারের চিন্তা বা কল্পনা রাজনৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার মাতার আকাঙ্ক্ষা ও আশা ছিল, পুত্র

শিল্পীরূপেখ্যাতি লাভ করিবে। তিনি চিত্র-শিল্পের সাধনা আরম্ভও করেন বটে কিন্তু সেই ব্যাপারে সাফল্য লাভ সম্ভবপর হয় নাই। হইবেই বা কেন? বিধাতাপুরুষ তাঁহাকে শিল্পানুশীলনের জন্য সংসারে আনেন নাই। হিটলারের অঙ্কিত চিত্র যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—উহা রসশূন্য, ছন্দবিহীন, বর্ণ-বৈচিত্র্যবিরহিত—উহা দর্শকের মনে কোন গভীর অনুভূতি বা আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত করে না। সুদক্ষ চিত্রশিল্পীর রচনায় যে সকল চিত্তাকর্ষক চিহ্ন আশা করা যায়, ইহাতে তাহা নাই। পরন্তু স্থপতির প্রস্তুত স্কেচ বা নক্সার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। যখন বালক হিটলার ভিয়েনার আর্ট-একাডেমি বা শিল্পশিক্ষা-নিকেতনের শিক্ষকদিগের নিকট তাঁহার প্রথম জীবনে অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখান তখন তাঁহারা তাঁহাকে চিত্রশিল্প সাধনা পরিত্যাগ করিয়া স্থাপত্য-শিল্প শিক্ষার স্কুলে যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

হিটলার ও মুসোলিনী

এডলফ হিটলারকে সামাজিক লোক আদৌ বলা চলে না। কাহারও সংসর্গ তিনি পছন্দ করেন না। কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে শুনিলে তিনি বিরক্ত হন। অপরের বিশেষ বাহিরের লোকদের সহিত কথাবার্ত্তার সময় তিনি যেন একটা অপ্রতিভ ভাব বা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। এ বিষয়ে মুসোলিনী বিপরীত। সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে সপ্রতিভভাবে ও প্রীতির সহিত বাক্যালাপ মুসোলিনী-চরিত্রের একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য। স্নায়বিক প্রকৃতির বলিয়া স্থির ধীরভাবে কথা কহিতে হিটলার জানেন না। কথা বলিতে বলিতে তিনি সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তখন তিনি বক্তব্য বুঝাইবার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন, যেন কোন বিশাল সভায় বক্তৃতা করিতেছেন। স্থিরভাবে যুক্তিসহকারে কাহারও প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন না, বলিলেও চলিতে পারে। ইহা সহজেই উত্তেজিত হওয়ার লক্ষণ। সময়ে সময়ে আবেগের বশে তিনি কাঁদিয়া ফেলেন।

পূর্ব্বে সকলে মনে করিতেন অনুগত অনুচরগণের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ হিটলার-চরিত্রের একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যগুলি দেখিয়া সাধারণের সেই ধারণা আর নাই। যতদিন কাহারও সাহায্যে সঙ্কল্পসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে ততদিন তিনি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকেন কিন্তু যখন বুঝিতে পারেন সেই ব্যক্তি সকল বিষয়ে অন্ধভাবে তাঁহাকে সমর্থন করিতেছে না, তখন তিনি তাহাকে শুধু দেশ হইতে নয়, সংসার হইতে সরাইতে চেষ্টা করেন। এডলফ হিটলারের মনে মায়া-মমতা, স্নেহ-বাৎসল্য, বন্ধু-প্রীতি প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তির স্থান নাই। আপনার সুবিরাট, সুকঠোর সঙ্কল্প যে কোনপ্রকারে সাধন—ইহাই তাঁহার জাগ্রতের চিন্তা, নিদ্রার স্বপ্ন; অন্য কাহারও সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার নাই। রোহম, ড্রেক্সলার, ফেডার, গ্রেগর ষ্ট্রাসের প্রভৃতি পূর্ব্বের সহকারী বা সহায়কদিগকে সংসার হইতে সরাইতে তিনি কণামাত্রও কুণ্ঠা বা করুণা অনুভব করেন নাই। সর্ব্বতোভাবে সমর্থক সহকারীদের প্রতি তাঁহার একপ্রকার সৌহার্দ্দ্য বা সদ্ভাব দেখা যায় বটে কিন্তু এই স্বার্থমূলক ভাবকে প্রকৃত সদ্ভাব বলা চলে না। সত্য কথা বলিতে হইলে এই বিশাল বিশ্বে এডলফ হিটলারের প্রকৃত বন্ধু একটিও নাই। জার্ম্মাণীর এই একনায়ক সংসারে একক।

হিটলারের শরীরকে বিশেষ স্বাস্থ্যশালী বলা চলে না। বর্ত্তমানে তিনি ৫৩ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরে তাঁহার ওজন ১২ পাউণ্ড বাড়িয়াছিল জানা যায়। তাঁহার স্কন্ধদেশ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু মাংসল হইয়াছে। বাহুর কনুইএর উর্দ্ধস্থ অংশ তিনি সহজে সঞ্চালিত করিতে পারেন না বলিয়া তিনি হাত তুলিয়া কাহাকেও স্বাভাবিক ভাবে অভিবাদন করিতে অসমর্থ। তাঁহার অদ্ভুত অভিবাদন-প্রণালী ইউরোপের রাজনীতিক মহলে কুখ্যাত বলিলে ভুল হয় না। বাল্যকালে তাঁহাকে শ্বাসযন্ত্রের রোগে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল এবং বিগত মহাযুদ্ধের সময় বিষ-বাষ্পের দ্বারা তিনি প্রায় অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাক্‌যন্ত্রে অস্ত্রোপচার করার কথা অনেকেই জানিতেন না। অস্ত্রোপচারের পর ইহা তাঁহার অনুচর মহলে প্রকাশিত হয়। সেই অস্ত্রোপচার বিশেষ সাফল্য লাভ করে। এই ব্যাপারের এক মাস পরে হিটলার তাঁহার অনুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া আবেগের সহিত বলিয়াছিলেন —"জানি না, কবে আমি চিরনিদ্রায় চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিব, তবে ইহা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, আমার অবর্ত্তমানেও নাৎসীদল আধিপত্য করিবে। জন-নায়করা জন্মিবে ও মরিবে কিন্তু জার্ম্মাণী চিরজীবী।" এই বক্তৃতা শুনিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন হিটলারের কণ্ঠনালীতে ক্যান্‌সার বা কর্কটিকা নামক দুঃসাধ্য ক্ষত জন্মিয়াছে। ক্যান্‌সার রোগে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় সুতরাং তাঁহার এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। রোগ যেরূপ বা যাহাই হউক, অস্ত্রোপচারের ফলে তাহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

হিটলার অবসর সময়ে ব্যায়াম-চর্চ্চা করেন না। তাঁহার অবকাশও খুব কম। তবে যে যৎসামান্য অবসর তিনি পান, তাহাও কোন আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, রণতাণ্ডবের পক্ষপাতী এই রুক্ষ বা কঠোর প্রকৃতির লোকটি সঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরক্ত ভক্ত। অবকাশকালে গান শোনা ছাড়া অন্য কোন আমোদ ইঁহাকে কখনও করিতে দেখা যায় না। এই গভীর ও ব্যগ্র সঙ্গীতানুরাগ দেখিলে মনে হয়, মানুষটির ভ্রূকুটি-কুটিল মুখমণ্ডল দেখিয়া যতখানি নীরস বলিয়া মনে হয় তাঁহার অন্তরতল হয় ত' ততখানি রসবিরহিত নহে। জার্ম্মানীর সুবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ওয়াগনারের রচনা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ওয়াগনারের সঙ্গীত এডলফ হিটলারের জীবনে প্রবল প্রভাব প্রসারিত করিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। হিটলারের ন্যায় স্নায়ুপ্রধান ভাবপ্রবণ লোকের পক্ষে সঙ্গীত শুনিয়া উত্তেজিত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ, অনেকে ইহাও মনে করেন। ওয়াগনারের সঙ্গীত শুনিলে হিটলার আত্মহারা হইয়া পড়েন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুযোগ পাইলেই তিনি গান শুনিবার জন্য অপেরায় যান। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই যখন তিনি (বীরুথ) পর্ব্বোপলক্ষ্যে অপেরায় গান শুনিতেছিলেন, তখন ভিয়েনায় ষড়্‌যন্ত্রকারী নাৎসী সৈন্যদলের দ্বারা অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডলফাস নিহত হন। নাৎসী নেতা যখন সুললিত সঙ্গীত-সুধায় সিক্ত হইয়া আত্মহারা, তখন তাঁহারই অনুচরবর্গ তাঁহারই প্রেরণায় এবং তাঁহারই নাম মুখে লইয়া প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ডে উন্মত্ত! জার্ম্মানীর রাষ্ট্রসভা রীকস্তাগের অধিবেশন 'ক্রল অপেরা হাউসে' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষভাগে ওয়াগনার-রচিত কোন কোন অপেরার সমগ্রাংশ সঙ্গীতশিল্পীদের দ্বারা গীত হওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। রীকের যে সকল সদস্য গান ভালবাসেন না, তাঁহারা এই সময় বিশেষ বিরক্তি বোধ করেন। হিটলারের দেশাত্মবোধে দীপ্ত উচ্চাশা, উৎসাহ

ব্রিগেড-জেনারেল হের রোয়েমের সহিত
রাজনৈতিক আলোচনারত হিটলার

ও অনুপ্রেরণাসমূহের মূলে ওয়াগনারের অপেরার প্রভাব কতখানি কাজ করিতেছে তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। পূর্ব্বে কঠোর কর্ম্মজনিত ক্লান্তি অপনোদনপূর্ব্বক চিন্তা-চঞ্চল মস্তিষ্কে সুপ্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য এডলফ হিটলার প্রতি রাত্রিতে সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু হ্যানকস্তায়েঙ্গলকে আহ্বান করিতেন। ইনি সাধারণতঃ সঙ্গীত-সম্রাট বীঠোভেন বা সঙ্গীত বিশারদ পয়াগনারের গান (কখন কখন স্কুমান বা ভার্দ্দি) গাহিয়া কর্ম্মক্লিষ্ট হিটলারের নেত্রে নিদ্রা আনিতে চেষ্টা করিতেন। যেমন আফিংখোরের আফিং এবং মদ্যপের মদ না হইলে ঘুম হয় না, তেমনই হিটলারের চাই চিত্ততর্পণ কর্ণ-রসায়ন সঙ্গীত।

প্রাচীন বা আধুনিক কোন প্রকার পুস্তকের প্রতি হিটলারের অনুরাগ নাই। পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতিও তাঁহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দেখা যায় না। তাঁহার দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত দলের বৈশিষ্ট্য বা নিদর্শন ব্রাউনশার্ট ইউনিফর্ম্ম তিনিও পরিয়া থাকেন। বাদামী শার্টের উপর একটি নীল সার্জ্জের ডবল ব্রেষ্টেড সুট থাকে। সুটের উপর রেণকোট বা বর্ষাতি। মাথায় শ্লাউচ হ্যাট। এই স্থানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, মুসোলিনীর পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে লক্ষ্য আছে। হিটলারের মিতাহারের কথা অনেকেই জানেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তিনি মদ্য স্পর্শ করেন না। মাংসও খান না। তাম্রকুট ধূম্রপানের অভ্যাসও তাঁহার নাই। তিনি প্রায়ই নিরামিষাশী। মধ্যে মধ্যে ডিম খান বলিয়াই 'প্রায়' বলিলাম। অল্পদিন পূর্ব্বে মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে মুসোলিনী কর্ত্তৃক প্রচুর ভোজ বা ভোজ্যের আয়োজন হইয়াছিল, তিনি তাহা হইতে ডিম্ব খাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহাকে কখন কখন কাফি পান করিতে দেখা যায়। তবে কফি পানের অভ্যাস তাঁহার নাই। সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন চ্যান্সেলারী হইতে কাইসরহফ হোটেলে গিয়া তাঁহাকে কোকো বা চোকোলেট ধীরে ধীরে পান করিতে দেখা যায়। অনেকের বিশ্বাস আহার সম্বন্ধে তিনি কঠোর তাপস জীবন যাপন করেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। তিনি বিশেষ ভাল ভাবে বা অতি যত্ন সহকারে এবং পারদর্শী পাচকের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যসমূহই আহার করিয়া থাকেন। শাক-সব্জী ভালবাসেন বটে কিন্তু স্বল্পাহারী নহেন।

সিনিয়র মুসোলিনী

হিটলারের বার্লিনের উপর বিতৃষ্ণা আছে। তিনি মিউনিকে থাকিতে ভালবাসেন। বার্লিনে থাকিলে রিক্সক্যাঞ্জলার নামক প্রাসাদে বাস করেন। উইলহেলমষ্ট্রাস নামক রাস্তায় ইহা অবস্থিত। হিণ্ডেনবার্গের স্মৃতি তাঁহার পক্ষে দুঃখদায়ক বলিয়া তিনি (ঐ রাস্তাতেই বিরাজিত) রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ ব্যবহার করেন না। রিক্সক্যাঞ্জলার প্রাসাদের ঊর্দ্ধতলে এমন একটি বারান্দা আছে, যেখানে দাঁড়াইলে তিনি রাস্তায় সমবেত অনুচরবর্গকে দেখা দিতে এবং উৎসাহিত করিতে পারেন। হলের নিম্নে একটি বম্ব-প্রুফ সেলার আছে। সুযোগ পাইলেই তিনি দক্ষিণ বাভেরিয়ার বার্চ্চতেসগ্যাদেন নামক গ্রামে গিয়া কয়েকদিবস তথায় নির্জ্জন বাস করেন। এখানে পর্ব্বতপার্শ্বে প্রস্তুত 'হাউস-ওয়াচেন-ফেল্ড' নামক গৃহে তিনি অবস্থান করেন। এই শৈলাবাসটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। এই অনুরাগের নিগূঢ় কারণ আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই গিরি-গৃহের সম্মুখস্থ ছাদে দাঁড়াইলে অষ্ট্রিয়ার সেই সীমান্ত-প্রদেশ দিগন্ত কোলে দেখা যায়, এডলফ হিটলারের প্রিয় জন্মভূমি তাহার বক্ষে বিরাজিত। নিস্তব্ধ নিশীথে যখন চতুর্দ্দিকের পার্ব্বত্য প্রকৃতি সুপ্তিঘোরে মগ্ন থাকে, তখন জন্মস্থানের করুণ আহ্বান এডলফ হিটলার যেন শুনিতে পান।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহাকে প্রকৃত বন্ধু বলা যায় হিটলারের তাহা নাই। তবে এমন কয়েকজন শক্তিশালী

সহকারী বা অনুগত অনুচর লাভ করিয়াছেন, যাহারা না থাকিলে তাঁহার পক্ষে সাফল্য লাভ কখনও সম্ভব হইত না। সন্নিকট সহকারীরাও সংবাদ না দিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে না। স্বল্পকাল পূর্ব্বের কথা। তৎকালে শুধু স্বাকত (অর্থাৎ বিভাগের নায়ক) এবং রিবেনট্রপের সংবাদ না দিয়াও সাক্ষাতের অধিকার ছিল। গোয়েরিং ও গোয়েবলসের মত লোককেও দেখা করিবার পূর্ব্বে খবর দিতে হয়। হিটলারের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ অনুচর বা সহকারী ছিলেন স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন আর্ণষ্ট রোহম। ইনি ছিলেন ব্রাউন শার্টদলের অধ্যক্ষ। রোহমের মৃত্যুর পর লেফটেনাণ্ট ব্রিউকনার সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকট সহচর হইয়াছেন। ইনি হিটলারের প্রধান শরীর-রক্ষীর পদে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ বিশ্বাসী না হইলে এই পদ কাহাকেও প্রদত্ত হইতে পারে না। প্রেস সেক্রেটারী ডিরেটিচ এবং নাৎসীদের ডেপুটি নেতা রুডলফ হেসের প্রত্যেকদিন দেখা করিবার অধিকার আছে।

ট্রট্স্কী

নূতন লোকের সহিত কথা কহা বা আলাপ করা হিটলার আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি নিজের সমুদ্র-সদৃশ বিরাট চিন্তার মধ্যে এমন ভাবে মগ্ন থাকেন যে, অনেক সময় পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোন অনুভূতি তাঁহার থাকে না। সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন—আমার এক সহকর্ম্মী হিটলারের সহিত একই এরোপ্লেনে দুইমাস ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তখন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব চলিতেছে। আমার বন্ধু দুইমাসকালব্যাপী নভোভ্রমণে জার্ম্মানীর এই একনায়ককে কহারও সহিত (এমন কি নিজের সেক্রেটারীর সঙ্গেও) কথা কহিতে দেখেন নাই। তিনি একবারও তাঁহাকে হাসিতে বা নড়িতে চড়িতেও দেখেন নাই। হিটলার তাম্রকূটের ধূম্র সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া বন্ধুটিকে বিমান আসিলে দূরে গিয়া সিগারেট সেবন করিতে হইত। বন্ধু বলেন, "তিনি দৈনিক পাঁচ ছয়ঘণ্টা হিটলারকে দেখিয়াছেন কিন্তু সেই সময় যদি বিমানপোতের বাহিরে তাঁহার সহিত কখন মুখোমুখী হইতাম, তাহা হইলেও বিমান-সঙ্গী বলিয়া আমাকে চেনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না।" কি চিন্তার হিমাদ্রি হিটলারের মাথায় তাহা এই উক্তি হইতে কতকটা উপলব্ধি করা যায়।

অথচ এই হিটলার সময়বিশেষে অনুচর বা অনুগামী-দিগের মন ভিজাইবার জন্য কিম্বা তাহাদিগকে স্বীয় মতবাদে দীক্ষিত করিবার জন্য চরম উচ্ছ্বাস বা আবেগের পরিচয় দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। তখন রমণীর ন্যায় রোদন করিতেও তাঁহার কুণ্ঠা হয় না। যখন সকল প্রকার যুক্তিতর্ক ব্যর্থ হয়, তখন রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের এই অদ্ভুত অভিনেতা নেত্রনীর রূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। চোখের জলে মানুষের মন সহজেই ভিজিয়া যায়, মানব-জাতির এই স্বভাবগত শাশ্বত দৌর্ব্বল্যের কথা এডলফ হিটলারের জানা আছে। যখন অটো ষ্ট্রাসার নাৎসীদল পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তখন তাঁহাকে সেই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য হিটলার স্বল্পকালের ভিতর তিনবার ক্রন্দন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। তবে ক্রন্দনের সাহায্যে কাজ হাঁসিল করিবার অভ্যাস ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, সন্দেহ নাই। নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রথম প্রচেষ্টার সময়ে এই অভ্যাস অধিক ছিল। এই স্থানে রুশ জননায়ক ষ্টালিনের সহিত তাঁহার তুলনা করা চলে। ষ্টালিন কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য ক্রন্দন করিবেন বা সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে সুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িবেন,

ইহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না। হিটলারের (মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত) স্নায়ু জালের প্রকৃতি বা গঠন এইরূপ যে উহা সহজেই উত্তেজিত বা চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু ষ্টালিন বজ্রবৎ দৃঢ় স্নায়ুমণ্ডলের অধিকারী।

হিটলার নিজের কোন দৌর্ব্বল্য একান্ত অনুগত অনুচরকেও জানাইতে চাহেন না বলিয়া তাহাদের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা কখনও করেন না। তিনি দেববিগ্রহের ন্যায় দূরে থাকিবেন এবং অনুচরগণ উপাসকদিগের ন্যায় দূর হইতে সসম্ভ্রমে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। ইহাতে প্রমাণিত হয় নাৎসীদলের ভিতর অকৃত্রিম প্রীতির স্থান নাই, সেখানে শুধুই কৃত্রিমতা। হিটলারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কোন নাৎসী একজন লেখককে বলিয়াছিলেন—দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ আছি, কিন্তু কখনও তাঁহাকে হের হিটলার বা হের রিক্সক্যাঞ্জলার ছাড়া অন্য কোন সম্বোধন ব্যবহার করি নাই এবং হিটলারও কখনও আদর করিয়া আমাকে ক্রিশ্চিয়ান নামে সম্বোধন করেন নাই। বর্ত্তমান দলের পুরাতন সদস্যরা হিটলারকে "মীন ফুরের" বলিয়া সম্বোধন করেন এবং নূতন সদস্যগণ "হের রিক্সক্যাঞ্জলার" বলিয়া ডাকে। "হীল হিটলার" বলিয়া কেহ নাৎসীপদ্ধতিতে তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনিও 'হীল হিটলার' উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই অভিবাদনের উত্তর প্রদান করেন। বক্তৃতার সময় তিনি তাঁহার অনুচরবর্গকে "আমার জার্ম্মাণ জাতি!" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ও ঘোষণায়—জার্ম্মাণ পুরুষ এবং জার্ম্মাণ নারী, এইরূপ সম্বোধন থাকে। যেন হিটলারের নিকট ব্যক্তি বলিয়া কিছুই নাই, তিনি জানেন শুধু জার্ম্মাণ জাতিকে। ব্যক্তিকে তিনি জাতির প্রতীক বলিয়া মনে করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এডলফ হিটলার তাঁহার জননী ব্যতিরেকে অন্যকোন রমণীকে ভালবাসেন নাই। যৌন মিলনাকাঙ্ক্ষা জীবমাত্রেরই স্বভাবধর্ম্ম। এই আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়াই সৃষ্টি-স্রোত যুগের পর যুগ অবিরাম অবাধে বহিয়া চলিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার কোন প্রকাশ জার্ম্মানীর এই অদ্ভুতকর্ম্মা এক নায়কের জীবনে দেখা যায় নাই। যদি তাঁহার অন্তর-কন্দরের কোন অন্ধকার কোণে এই আকাঙ্ক্ষা কখনও দেখা দিয়া থাকে, আমরা তাহার কথা কিছুই জানি না। নারী তাঁহার নিকট শুধু গৃহকর্ত্রী এবং বীরসন্তান প্রসূতি মাতা মাত্র। নারীকে প্রণয়িনীরূপে দেখিতে তিনি কখনও অভ্যস্ত নহেন। তিনি চান জার্ম্মাণ নারী মহিয়সী মাতৃরূপে শত শত শৌর্য্যশীল সন্তান প্রসব করুন এবং সেই সন্তানগণ বীরমদে মত্ত হইয়া জার্ম্মাণীর জন্য রণ-ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করুক বা জয়ী হইয়া সগর্ব্বে গৃহে ফিরিয়া আসুক। কিন্তু যে দাম্পত্যপ্রীতির ফলে তাঁহার সেই সুখ-স্বপ্ন সত্য হইতে পারে, তাহার স্থান তাঁহার জীবনে নাই।

তবে কি হিটলার নারী-বিদ্বেষী? না, তিনি নারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না। স্নেহময়ী মাতার স্মৃতি নারী-জাতির প্রতি তাঁহার অন্তরে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাবই জাগাইয়া তোলে। তবে তিনি নারীগণ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। বহু নারী তাঁহাকে যৌনভাবে আকৃষ্ট করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়া অবশেষে অসম্ভব বুঝিয়া সেই প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডক্টর গোয়েবেলসের পত্নী পূর্ব্বে সান্ধ্য-সম্মিলনে সুন্দরী তরুণীদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, যদি এডলফ হিটলারের মন অকস্মাৎ কাহারও রূপের জালে জড়াইয়া যায়, তাহা হইলে তিনি ফুরেরের বিবাহের ঘটকালী করিয়া শুধু জার্ম্মাণজাতি নয়, বিশ্ববাসীর নিকট বাহাদুর বলিয়া বিখ্যাত হইবেন। তৎকালে কিছুদিন জনরব শুনা গিয়াছিল জার্ম্মাণী (যৌন ব্যাপারে) লাজুক জননায়ক রিচার্ড ওয়াগনারের বিধবা পুত্রবধূ বা ঐরূপ কোন আত্মীয়ার সহিত প্রণয়জালে জড়িত হইয়াছেন এবং শীঘ্রই তাঁহারা পরিণয়পাশেও আবদ্ধ হইবেন। পরে জানা গেল, সেই জনরব ভিত্তিহীন। সময় সময় ইংরেজ, আমেরিকান প্রভৃতি বিশুদ্ধ আর্য্যরক্তযুক্ত তরুণী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসেন। হিটলার কখন কখন তাঁহাদের সহিত দেখা করেন, কখন বা দেখা হইবে না বলিয়া স্পষ্ট জবাব দেন। সাক্ষাতের সময় অনাসক্তভাবে কয়েকটি কথা কহিয়া থাকেন। সাক্ষাৎকারিণী বিশেষ সৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও হিটলার তাহার প্রতি সমান ঔদাসীন্যই দেখান। অনেকে বলেন—ডাক্তার গোয়েবেলসের ক্ষুদ্রকায় কন্যাটীকে হিটলার ভালবাসেন। প্রায়ই হিটলারের কক্ষে এই বালিকাকে দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, হিটলারের

হাঁটুর উপর বালিকাটি বসিয়া আছেন। এই বালিকার প্রতি হিটলারের মনোভাবকে বাৎসল্য ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না।

হিটলারের পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবন নাই বলিয়া তাঁহার অর্থের প্রয়োজনীয়তাও খুব কম। শুধু রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা সাধনের জন্য অর্থ তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বতঃই পূর্ণ হইতেছে বলিয়া অর্থচিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় না। আর্থিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাও অত্যন্ত অল্প। রাষ্ট্র বা ষ্টেট তাঁহাকে বাড়ী, গাড়ী, পরিচারক প্রভৃতি সমস্তই সসম্ভ্রমে সযত্নে যোগাইতেছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় তিনি নিজে একটি রেণ-কোট বা বর্ষাতি কিনিয়াছিলেন। ইহার পর ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে আর কোন জিনিষ কিনিতে দেখা যায় নাই।

হিটলার ষ্টেট হইতে বেতনরূপে কিছু ল'ন না। ইচ্ছা করিলে প্রচুর সম্পদ্ তিনি সঞ্চয় করিতে পারিতেন, কিন্তু অর্থ-পিপাসা তাঁহার আদৌ নাই। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজেই প্রকাশ করেন—রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কোন ব্যাঙ্কে একাউণ্ট বা হিসাব অথবা কোন কোম্পানীতে শেয়ার বা অংশ নাই। তাঁহার এই উক্তির পূর্ব্বে লোকে ভাবিত তিনি মিউনিকের 'ফ্রাঞ্জ ইথার কোং' নামক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। নাৎসী বা নাজী দলের প্রধান কাগজ বা পত্রিকাগুলি এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই কাগজগুলির মধ্যে "ভোলকিপটে বিয়োব্যাবতার' এবং 'য়্যাগ্রিফ' বিশেষ বিখ্যাত। এই কোম্পানিটি ইউরোপের বৃহত্তর পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ম্যাক্স এম্মান বিগত মহাসমরের সময় হিটলারের সৈন্যদলের সার্জ্জাণ্ট মেজর ছিলেন। হিটলার এই কোম্পানীর অংশীদার নহেন, ইহা তাঁহার কথা হইতেই জানা যায়। 'মীন ক্যাম্ফ' নামক আত্মজীবনী বিক্রয় করিয়া তিনি যাহা পান, তাহা তিনি নিজের দলকেই দিয়া থাকেন। প্রত্যেক জার্ম্মানের পক্ষে এই পুস্তক প্রায়ই অবশ্য পঠনীয় বলিয়া বিবেচিত এবং পুস্তকখানির মূল্যও অল্প নহে (প্রত্যেকখানির দাম প্রায় ১২শিলিং)। সুতরাং ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের সংখ্যাও কম নয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩০ হাজার বই বিক্রীত হইয়াছে। ঐ সময় পর্য্যন্ত তিনি এই পুস্তক হইতে ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছেন।

রোম্যান ক্যাথলিক পরিবারে হিটলারের জন্ম। কিন্তু তিনি এখন ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন্ মতাবলম্বী ইহা জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না। রোম্যান-ক্যাথলিক তিনি নন। যিনি আপনাকে একেশ্বর প্রতিষ্ঠিত করিতে চান এবং অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ, তাঁহার পক্ষে রোমের পোপের প্রাধান্য মানিয়া লওয়া অসম্ভব। তিনি প্রোটেষ্টাণ্ট ও নহেন। তিনি বক্তৃতায় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের নাম প্রায়ই উল্লেখ করেন বটে কিন্তু ঐ উল্লেখ কোন আন্তরিক প্রীতি বা অনুভূতির অভিব্যক্তি বলিয়া আমাদের মনে হয় না. তবে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী একথাও বলা যায় না। নাৎসীরা যেসুয়িট ধর্ম্মযাজকদিগকে "কৃষ্ণকায় ছুছুন্দর" আখ্যায় অভিহিত করে। প্রকৃত কথা জার্ম্মাণীই হিটলারের ধর্ম্ম বা ঈশ্বর। জার্ম্মাণ জাতিকে প্রাচীন রোম্যানদিগের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধ বিশ্ববিজয়ী বিশাল শক্তিতে পরিণত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। যদি ঈশ্বরের নামোল্লেখে এই ব্রত উদ্‌যাপনের পথে তাঁহার সহায় হয় তাহা হইলে তিনি বার বার 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' বলিয়া চীৎকার করিবেন। জার্ম্মাণীর একদল নর-নারীর নিকট তিনিই ঈশ্বর।

বাইবেল বা ইশা প্রচারিত ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগ না থাকার প্রধান কারণ ইশা ইহুদী—বাইবেল ইহুদীদিগের রচনা। ইহুদীদিগের সম্বন্ধে তাঁহার প্রচণ্ড বিদ্বেষের কথা সকলেই অবগত। বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ ইহুদী জাতি, এই বিশ্বাস সেই বিদ্বেষের প্রধান কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'মীন ক্যাম্ফ' গ্রন্থে ইহুদীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী তিনি লিখিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর এবং একা ভিয়েনা নগরীতে বাস করিতেছেন। ইহুদীটি পোল্যাণ্ড বা উক্রাইণ হইতে আসিয়াছিল। সে তখন তাহার জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক পরিচ্ছদ পরিয়াছিল। তখন হইতেই ইহুদী-দিগের প্রতি একপ্রকার অশ্রদ্ধা হিটলারের মনে সঞ্চারিত

হয়। সেই অশ্রদ্ধাই মহাযুদ্ধের পর প্রবল বিদ্বেষে পরিণতি পায়। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মধ্য ইউরোপে ও বল্কানের সমস্ত বড় বড় ব্যাপার বা ব্যবসা ইহুদীদের দ্বারা পরিচালিত হইত। হিটলার দেখিতেন বার্লিনের প্রেস বা সংবাদপত্রসমূহ, বার্লিনের রঙ্গমঞ্চগুলি, বার্লিনের শিল্পসম্ভার সমস্তই ইহুদীদের হাতে। নগরে নগরে বহু ইহুদী ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক। তাহারা জার্ম্মাণদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য কাড়িয়া লইতেছে। সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস, জার্ম্মাণ জাতির আর্থিক অবনতির ও অন্যান্য দুর্দ্দশার কারণ ইহুদীরাই। ইহুদীদিগকে না তাড়াইলে জার্ম্মাণীর উন্নতির কোন আশা নাই। তিনি ইহুদীদিগকে প্রাণান্তকর মহামারী অপেক্ষাও ভীষণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহুদী লেখকের লেখা কোন নাটকের অভিনয় তিনি দেখেন না। চ্যান্সেলার হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি টেলিফোনেও কোন ইহুদীর সহিত কথা কহিতে রাজি হইতেন না। ইহুদী বলিয়া ওয়াণ্টার লিপম্যান এবং লর্ড রেডিং এর মত লোককেও ‘ব্রাউন হাউসে’ অভ্যর্থনা করিতেও সম্মতি জানান।

এতদসত্ত্বেও হিটলারের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বহু অনন্যসাধারণ গুণেরও অধিকারী। প্রধানতঃ এই গুণগুলির দ্বারাই তিনি বড় হইয়াছেন। তাঁহার একটি বড় গুণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা। এই লক্ষ্য-লাভের প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে কিন্তু লক্ষ্যের পরিবর্ত্তন অসম্ভব। তাঁহার লক্ষ্য জার্ম্মানীকে জাতীয় চেতনায় পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত প্রবল-প্রভাবশালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং সেই রাষ্ট্রতরীর কর্ণধার নিজে হওয়া। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন অন্যায় উপায় অবলম্বন করিতেও তিনি কণামাত্রও কুণ্ঠা অনুভব করিবেন না। কিন্তু যতদিন জীবিত রহিবেন ততদিন এই উদ্দেশ্য সাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য রহিবে। পুত্র পরিবার, আত্মীয়-বন্ধু, ঘর-সংসার তাঁহার এই সকল কিছুই নাই।—অর্থ; সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ-প্রমোদ কিছুই তিনি চান না। এইখানেই অন্যান্য জননায়কের সহিত তাঁহার পার্থক্য।

হিটলারের শারীরিক শক্তি খুব বেশী না হইলেও এবং তিনি উত্তেজনাপ্রবণ স্নায়বিক প্রকৃতির অধিকারী এবিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও তিনি অবস্থাবিশেষে বিস্ময়কর শক্তি ও সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। গত নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তিনি প্রতিদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করিলেও (প্রত্যহ নানাস্থানে বক্তৃতা করিতে হইত) ক্লান্তির কোন চিহ্ন তাঁহার মুখমণ্ডলে দেখা যাইত না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—যখন আমাকে কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়, তখন সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত শক্তিও আমি প্রাপ্ত হই। তবে ইহা সত্য যে, ষ্টালিনের ন্যায় কঠোর কর্ম্ম-শক্তিও তাঁহার নাই। কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত তিনি খুব সত্বর করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার সম্মুখের ডেস্কটি সর্ব্বদা কাগজপত্রে পরিপূর্ণ থাকে। তবুও দৈনিক তাঁহাকে অনেক কাজই করিতে হয়। তবে সেই কাজের অধিকাংশ কাগজপত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ। সংবাদ শোনা ও রিপোর্ট পড়া এবং অবশেষে আদেশ বা উপদেশ দেওয়া—প্রধানতঃ ইহাই কাজ। হিটলারের রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতি বা বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ ও বিশেষ বিকশিত। তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখে এবং কিছুই উপেক্ষা করে না। প্রত্যেক বিভাগ পরিচালনের জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। অনেক সময় তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক জল্পনা-কল্পনা, হিসাব-নিকাশ সত্যে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। পরিস্থিতি দেখিয়া পরিণতির কথা তিনি অনেক সময় বুঝিতে পারেন। ইহা কোন দৈব বা অপ্রাকৃত শক্তির অভিব্যক্তি নহে। ইহাকে রাষ্ট্রনৈতিক সূক্ষ্ম বা দূরদৃষ্টি বলা চলে। ইহা অনুশীলনের ফল। ইহা কর্ত্তব্যের প্রতি একান্ত অবিচলিত নিষ্ঠার ফলও হইতে পারে। তাঁহার আত্মাভিমান আছে কিন্তু এই অভিমান ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত। তাঁহার জীবনধারণ নিজের জন্য নয়, জার্ম্মাণ জাতির জন্য। তিনি বিশ্বনিয়ন্তার হস্তে জার্ম্মাণ জাতির উন্নতি বা উদ্ধারের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র স্বরূপ—এইরূপ ধারণা তাঁহার অন্তরে আধিপত্য করে। এইরূপ ভাবের উক্তিই তাঁহার কণ্ঠে মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। যেন বিশ্ববিধাতা তাঁহাকেই জাতির মুক্তিদাতা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি আপনাকে আদিষ্ট বা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ভাবেন বলা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশের শিবজী এবং ফ্রান্সের জোয়ান অফ আর্ক বা মেড অফ অর্লিয়ান্স নামক কৃষক-বালিকার নাম করা চলে। উভয়েই নিজেকে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বলিয়া মনে করিতেন।

কত গুপ্তঘাতক হিটলারকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু অদৃশ্য অপ্রাকৃত শক্তি সহায়ক হইয়া এই প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রত্যেকবার বাঁচাইয়াছে, এইরূপ ধারণা কাহারও কাহারও আছে এবং জার্ম্মাণীর জনসাধারণের মনে এইরূপ বিশ্বাস জাগাইবার জন্য হিটলার প্রয়াস করেন।

সকল দেশের রাজনীতিক অবস্থার সংবাদ হিটলার রাখেন। এণ্টনি ইডেন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর বলেন—বিদেশ-সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহকে তিনি পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ হিটলারের এই অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেন না। তবে অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক অবস্থা জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ আছে। কিন্তু এই আগ্রহ সেই সকল দেশের প্রতি অনুরাগের জন্য নহে, জার্ম্মাণীর প্রতি গভীর ভালবাসা ও তাঁহার কল্যাণ করিবার কামনাই ঐ ইচ্ছা ও আগ্রহের একমাত্র কারণ। জনৈক প্রসিদ্ধ লেখক কহিয়াছেন—"হিটলার যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোন কাজ করেন না, করেন ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া। তাঁহার অবস্থা কতকটা বুভুক্ষু ব্যাঘ্রের ন্যায়। ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল যুক্তির ধার ধারে না—যেমন করিয়া হোক খাদ্য তাহার চাইই। হিটলার প্রায় তেমনই জার্ম্মাণীকে বলবান্ ও বিজয়ী করিবার জন্য উগ্র আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত।"

হিটলারের বক্তৃতা বেতারের কৃপায় সকলেই শুনিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন—কথার জোরে হিটলার বড় হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা হিটলারকে প্রত্যক্ষভাবে বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, তিনি ভাল বক্তা নহেন। নানা-রকম মুদ্রাদোষ তাঁহার আছে। তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর নহে। তিনি উচ্ছ্বাসের ভাবের প্রবাহে এমনভাবে ভাসিয়া যান যে কখন থামিতে হইবে তাহা তাঁহার জ্ঞান থাকে না। গোয়েবেলস হিটলার অপেক্ষা অনেক ভাল বক্তা। কিন্তু তবুও হিটলারের বলিবার এমন একটি অদ্ভুত শক্তি আছে যাহা অতি অল্প লোকের থাকে। কয়েকটী লোকের মধ্যে বসিয়া বলিবার সময় হিটলার শ্রোতাদের মনের মধ্যে যে প্রভাব প্রসারিত করেন, বিরাট জনতার সম্মুখে তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রভাব তিনি সঞ্চারিত করিতে পারেন। যত লোক বেশী হইবে হিটলার ততবেশী আবেগময়ী বাণী উচ্চারণ করিতে পারিবেন। বিপুল জনতাকে ভাবে উন্মত্ত করিতে তিনি অদ্বিতীয়। জনতাকে মাতাইবার কৌশল তিনি জানেন। তাঁহার প্রত্যেক উক্তি দেশ বা জাতির প্রতি তাঁহার অতুলনীয় ভক্তির অভিব্যক্তিরূপে এমন ভাবে শ্রোতার মনের উপর আঘাত করে যে, সময়ে সময়ে জার্ম্মাণ জনতা উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়ে। সেই জন্যই বলা হয়, হিটলার বাক্যের জোরে বড় হইয়াছেন। অধিকাংশ অনুগত অনুচর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল। অনেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহার শিষ্যত্ব বরণ করেন, এই সংবাদ আমরা জানি। গোয়েবেলস, রিবেণ্ট্রপ, গোয়েরিং ও হেস এই প্রসিদ্ধনামা নেতারা বক্তৃতা শুনিয়াই হিটলারের চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

নাৎসীদল গঠনে ভক্তি অপেক্ষা ভীতি অধিক কার্য্য করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল উপায়ে এই দল প্রাধান্য লাভে বা সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে সমর্থ হইয়াছে তাহাদের ভিতর এমন কতকগুলি জঘন্য কার্য্য আছে, যাহা গোপন করিতে চেষ্টা করা হইলেও গুপ্ত থাকে নাই। জার্ম্মাণ জাতির প্রকৃতি হিটলারের এক নায়কত্ব ও নাৎসীদলের প্রাধান্যের পক্ষে অনুকূলতা করিয়াছে, ইহাও সত্য। জার্ম্মাণ জনসাধারণ দেশভক্ত ও শক্তিশালী নেতার আদেশ যেরূপ অন্ধভাবে অনুবর্ত্তন করিতে পারে, ইংরেজ জাতির পক্ষে সেরূপ সম্ভব নহে। সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস, যেরূপ অপ্রতিহত একনায়কত্ব জার্ম্মাণীতে চলিতেছে, ইংলণ্ডে সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নাৎসীরা হিটলারের বশ্যতা যেরূপ ভাবে স্বীকার করিয়াছে, ইংলণ্ডের কোন সম্প্রদায় চার্চ্চিল বা অন্য কোন নেতার সেইরূপ বশীভূত হইবে, ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

হিটলার স্পাই বা গুপ্তচররূপে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবজনক নহে। হিটলার প্রথম জীবনে জার্ম্মাণ-বাহিনীর নন-কমিশন্‌ড্‌ অফিসর ছিলেন। ১৯১৯ তিনি 'ইণ্টেলিজেন্স অফিসার' বা সংবাদ-সংগ্রহকারী কর্ম্মচারীরূপে কাজ করেন। শ্রমিক-দের সভায় যোগ দিয়া তাহার কার্য্যবিবরণী সংগ্রহ করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে এই সকল বিবরণ ও লোকমত তিনি জানাইতেন। এইরূপ কোন

সভায় গট্‌ফ্রিদ ফেদার নামক এক ব্যক্তিকে তিনি বক্তৃতা করিতে দেখেন। ফেদারের অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রচণ্ড প্রকৃতির মতবাদ তাঁহার মনে নানাপ্রকার চিন্তা জাগাইয়া তুলে। ফেদার ও এণ্টন ড্রেক্সলার নামক একজন (ভূতপূর্ব্ব কুলুপ-প্রস্তুতকারক কর্ম্মকার) লোক স্বল্প কয়েকজনসহ "জার্ম্মাণ ওয়ার্কাস´ পার্টি" নামক ক্ষুদ্র একটি দল গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহারা হিটলারকে এই দলে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করে। সম্মতি দিবার পূর্ব্বে তিনি দুই দিন ধরিয়া গভীর চিন্তা এবং মনে মনে বহু বিচার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। চিন্তা ও বিচারের পর তিনি ঐ দলে যোগ দেওয়াই সিদ্ধান্ত করেন। দলে যোগ দিয়া তিনি ৭ নম্বরের সদস্য বলিয়া গণ্য হন। তৎকালে ৬০টির বেশী সভ্য ঐ সভায় ছিল না। ইহা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের কথা। পরবর্ত্তী জুন মাস পর্য্যন্ত হিটলার সৈন্যদলে ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ইহার পর এই দল হিটলারের নেতৃত্বে কিরূপভাবে দ্রুত-বেগে উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা অনেকেই অবগত। হিটলারই ইহার নামকরণ করেন এন্, এস, ডি, এ, পি, অর্থাৎ নেশনাল সোস্তিয়ালিষ্টিসটে ডিয়াধে আবিটার পার্টি। ইহার সংক্ষিপ্ত নাম নাজি বা নাৎসী। তিনি প্রথমে ২০ জন সদস্যকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতেন। পরে তাহার শ্রোতৃসদস্যের সংখ্যা বিশ হাজারে পরিণতি পাইয়া এই দলটির বিস্ময়কর বিকাশের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল। 'ব্রাউন সার্টস' নামক (বাদামী সার্টপরিহিত) সৈন্যদল হিটলারেরই সৃষ্টি। বর্ত্তমানে এই সৈন্যদলের পরিচালক হিমলার। বিগত মহাসমর সমাপ্ত হওয়ার কয়েক বৎসর পরে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে হিটলার ব্রাউন সার্টস দলের সাহায্যে মিউনিক নগরে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করিতে চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ হন। কারার অন্ধকার হইতে যখন বাহির হন, তখন তিনি জার্ম্মানীতে যুগান্তর আনয়নকারী জন-নায়কে রূপান্তরিত। তখন তিনি অধঃপতিত জাতিকে গভীর কলঙ্ক পঙ্কের অঙ্ক হইতে উদ্ধারকর্ত্তা অদ্ভুতকর্ম্মা এক-নায়ক। ড্রেক্সলার এবং ফেদার ইঁহারা নাৎসীদলের মূল প্রবর্ত্তক হইলেও দলটি হিটলারেরই কীর্ত্তি বা সৃষ্টি সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। হিটলার হৃদয়ের রক্তে অভিষিক্ত করিয়া এই দলকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মুখপত্র না থাকিলে প্রচারকার্য্য চলে না। প্রচারকার্য্য ব্যতিরেকে দল পরাক্রান্ত হয় না। সেই জন্য হিটলার ভোলকিসটে বিয়োব্যাচতার কাগজখানিকে করায়ত্ত করিয়া উহাকে নাৎসী-দলের মুখপত্রে পরিবর্ত্তন করেন। বহু ব্যক্তির নিকট হইতে নানাপ্রকার সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু দলটিকে গঠন এবং উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা তিনিই করেন, সে বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না। 'স্বস্তিক' পতাকা তাঁহারই পরিকল্পনা। কি প্রকারে প্রোপাগ্যাণ্ডা বা প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে তাহা তিনিই স্থির করেন। নাৎসী প্রভাব এই প্রোপাগ্যাণ্ডার উপর দণ্ডায়মান বলিলে ভুল হয় না। এইরূপ প্রোপাগ্যাণ্ডা শুধু জার্ম্মাণীতে নয়, জগতের অন্য কোথাও কখনও দেখা গিয়াছে কি না সে বিষয় সংশয় জাগে।

অষ্ট্রিয়ায় জন্ম বলিয়া হিটলার জার্ম্মান নাগরিক রূপে গণ্য ছিলেন না। তাঁহাকে অনেক কলে কৌশলে জার্ম্মান নাগরিকে পরিণত করা হয়। অষ্ট্রিয়ানের পক্ষে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রপতি হওয়া আইন-বিরুদ্ধ ব্যাপার; সুতরাং জন হিণ্ডেনবার্গের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাঁহাকে ঐ পদের প্রার্থীরূপে দাঁড় করান সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে। নাৎসীরা কুটিল কৌশলে ঐ সমস্যা সমাধান করে। হিটলারকে কোন প্রকারে কোন জার্ম্মান অফিসিয়ালে পরিণত করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ স্বতঃই জার্ম্মান নাগরিকে পরিণতি পাইবেন— নাৎসীরা এই সত্য আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে জার্ম্মান অফিসিয়ালে পরিণত করার পন্থা খুঁজিতে থাকে। ডিয়েট্রিব ক্লাবগস্ নামক একজন নাৎসী ব্রান্সউইকের মিনিষ্টার অফ জাষ্টিস্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি হিটলারকে বার্লিনস্থ ব্রান্সউইক লিগেশনের কাউন্সেলর নিযুক্ত করেন। এই পদ পূর্ব্বে কখন ছিল কি না, সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন। সে যাহা হউক, শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক হিটলার এই পদে অধিষ্ঠিত হইবামাত্র তিনি জার্ম্মান নাগরিকে পরিণত হইলেন। এইরূপে অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত পল্লীগ্রামের এক কৃষক বালক খাস জার্ম্মানে রূপান্তরিত হইয়া তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিল। অন্যান্য নাৎসী নেতা বা অনুচরবর্গের মধ্যে জার্ম্মানীর এই একনায়ক আনষ্ট

রোহমের নিকট যত ঋণী তত আর কাহারও নিকট নহেন। ব্রাউন শার্টদলের স্রষ্টা হিটলার হইলেও রোহমই তাহার ব্যবস্থাপক পরিচালক। নাৎসী নেতৃবর্গের মধ্যে হিটলারের নীচেই রোহম। যদি এই বন্ধুহীন ব্যক্তির বন্ধু কেহ থাকে, তবে সে রোহম। কোন দলকে সঙ্ঘবদ্ধ বা সুব্যবস্থিত করিবার শক্তিতে ইঁহার সমকক্ষ সমগ্র জার্ম্মানীতে আর কেহই ছিলেন না। ইনি ক্রমশঃ বাম-পন্থীদলের দলপতিতে পরিণত হন এবং জার্ম্মান-বাহিনী বা রিক্সস্বেহর ইঁহার বিরোধী হইয়া পড়ে। একদিকে রিক্সস্বেহর অন্যদিকে রোহম, হিটলার কাহাকে গ্রহণ করিবেন? অবশেষে বন্ধুকে বলিদান দেওয়াই স্থিরীকৃত হয়। বিদ্রোহী হইয়াছেন এই অজুহাতে রোহম এবং অন্যান্য কয়েকজন বামপন্থীকে কারাবন্দী করা হয়। হিটলারের আদেশেই বন্দী রোহমকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। প্রথমে তাঁহাকে আত্মহত্যা করিবার জন্য বলা হয় কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হন। তিনি বলেন—এডলফ ছাড়া অন্য কাহারও হাতে আমি মরিতে সম্মত নহি। হিটলারকে ইহা জানান হইলে, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলেন—যেরূপে হউক উহাকে মারিয়া ফেল। ৩৬ ঘণ্টা বন্দী থাকিবার পর হিটলারের ইচ্ছায় তাঁহার এই একমাত্র মিত্রকে হত্যা করা হয়। ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে রোহম বিবাহিত হন এবং সেই বিবাহে 'বেষ্টম্যান' সাজেন হিটলার। রোহম মধুযামিনী যাপনের জন্য মেদিরা দ্বীপে যাইতেছিলেন, পথে জেজেলে তাঁহাকে ধরা হয়। কি আশ্চর্য্য মানুষের নিয়তি। কি সঙ্কট-সঙ্কুল এই কণ্টকাকীর্ণ রাজনীতির রাস্তা! এই রাস্তায় প্রীতি বা মমতার কণামাত্রও স্থান নাই।

গোয়েরিং গোয়েবল্‌স্ প্রভৃতি নাৎসী নেতাকে ছোট ছোট হিটলার বলিলে ভুল হয় না। তাঁহার কোন অনুচর অতিরিক্ত শক্তিশালী হইয়া পড়ে, ইহা হিটলার পছন্দ করেন না। যখন গোয়েরিং অতিরিক্ত প্রভাবশালী হইয়া পড়েন, তখন তিনি গোয়েন্দা-বিভাগের ভার হিমলারকে প্রদান করেন। গোয়েরিং এবং গোয়েবল্‌স্ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। গোয়েরিং বাভেরিয়ার লোক। ইনি তথাকার রোজেনহিম নামক স্থানে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্মান। সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিশালী পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা জার্ম্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শাসন-কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গোয়েরিং সুশিক্ষিত। শিক্ষার্থী অবস্থা হইতেই অস্ট্রিয়ার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। সুতরাং হিটলার ও গোয়েরিং উভয়ই অস্ট্রিয়া-প্রেমিক। ২১ বৎসর বয়সে গোয়েরিং জার্ম্মান বৈমানিক বাহিনীর কাযে নিযুক্ত হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বাহিনীর একাংশের পরিচালক পদপ্রাপ্ত হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান-চিহ্ন 'পৌর-লে মেরিট' (ভিক্টোরিয়া ক্রসের অনুরূপ) লাভ করেন। ঐ সালেই তিনি রিক্‌থোফেন স্কোয়াড্রন নামক বাহিনীর অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। বিগত মহাসমরের পর তাঁহাকে এই পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। তখন জার্ম্মানীতে গণতন্ত্রের প্রাধান্য, সেই সময় হইতেই গণতন্ত্রের প্রতি গোয়েরিং-এর প্রবল অসন্তোষ।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গোয়েরিং সুইডেনে যান এবং বাণিজ্য-বিষয়ক বৈমানিকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে (সুইডেনে) ব্যারনেস ক্যারিণ কক নামক রমণীর সহিত তাঁহার প্রণয় হয়। তাঁহার জীবনে এই রমণীর প্রভাব অপরিসীম। প্রণয়-পাত্রীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাতের ইতিহাস রোমান্সের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। ব্যারনেসের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানে গোয়েরিং বিমান লইয়া অবতরণ করিলে এই প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। পরে উভয়ে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে গোয়েরিং হিটলারের অন্যতম প্রধান অনুচরে পরিণত হইয়া পরবর্ত্তী বৎসরে মিউনিক বিয়ার-হল সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি ইটালীতে পলাইয়া যান এবং পরে পুনরায় সুইডেনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গোয়েরিং-পত্নী কারিণ পরলোকে গমন করেন। স্বামীর পদোন্নতি (রিক্সতাগের প্রেসিডেন্ট) দর্শনের পূর্ব্বেই (অব্যবহিত পূর্ব্বে) তাঁহার মৃত্যু ঘটে। রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় পরলোকগত পত্নীর স্মৃতি গোয়েরিংএর মনে বিশেষ বেদনা জাগাইয়া তুলে। কারিণ সুইডেনে মারা যান কিন্তু তাঁহার পার্থিব দেহ গোয়েরিংএর ইচ্ছায় জার্ম্মানীতে আনীত হয়। বার্লিনস্থ গৃহে গোয়েরিং স্বর্গীয় সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করান। এই মন্দিরে পত্নীর প্রতিকৃতি স্থাপন করেন।

যেমন আমাদের দেশে দীপাদির দ্বারা দেব-বিগ্রহের পূজা করা হয়, তেমনই মোমবাতি জ্বালিয়া সেই প্রতিকৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। এই মন্দিরে গোয়েরিং নতজানু হইয়া প্রার্থনা ও উপাসনা করিতেন। এম্মি সন্নেমানের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ চলিয়াছিল। এম্মি গোয়েরিংএর দ্বিতীয়া পত্নী।

বিপুলবপু এম্মি সন্নেমান অভিনেত্রী ছিলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহাঁর সহিত গোয়েরিংএর বিবাহ হয়। বিবাহে অত্যন্ত সমারোহ হইয়াছিল। যিনি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় প্রিয়তমা পত্নীর প্রতিকৃতি স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিতেন তাঁহার পক্ষে অপর এক রমণীর সহিত প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইতে বিলম্ব হইল না। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে মানুষের প্রীতি-ভালবাসা কত তরল, কত চঞ্চল, কত অগভীর। এই বিবাহে বেষ্টম্যান হন হিটলার। নব-পরিণীত দম্পতি বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে যে সকল বিবাহোপহার প্রাপ্ত হন, তাহাদের মূল্য ৮০ হাজার পাউণ্ড। যেদিন বিবাহের আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেইদিনই এপ্টিন ও জিগলর এই দুইজন প্রাণদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কমিউনিষ্টকে কুঠারাঘাতে বধ করা হয়। শুনা যায়, বহুসংখ্যক নাৎসী বিবাহদিবসে সম্পাদিত এই নরবলিদানকে নব দম্পতির পক্ষে কল্যাণপ্রদ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মানুষ এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই নরবলি দিত, সন্দেহ নাই। বলিপ্রদত্ত প্রাণীর রক্ত উর্ব্বরতা বা জনশক্তি বর্দ্ধন করে, এই বিশ্বাস মানুষের মনে একসময় বদ্ধমূল ছিল এবং এখনও হয়তো আছে।

গোয়েরিং অনেকগুলি বড় বড় পদে যুগপৎ অধিষ্ঠিত হইয়া প্রবল প্রভাবের বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি বা রিক্সতাগের সভাপতি, সেনাধ্যক্ষ, জার্ম্মান বাহিনী রিক্স-ঘেহরের জেনারাল, জার্ম্মান বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষ, পুলিশ বিভাগের অধিনায়ক, রিক্সের বিমান-সচিব, প্রুসিয়ার প্রিমিয়ার, মাষ্টার অফ দি হাণ্ট, রিকের চিফ-ফরেষ্টার এবং ডিরেক্টর অফ টেলিভিশন। তিনি নানাপ্রকার বিচিত্র ইউনিফর্ম্ম পরিধান করেন। ইঁহার ইউনিফর্ম্ম বৈচিত্র্য সম্বন্ধে নানারকম কৌতুকজনক কাহিনী শুনা যায়। ইনি জাঁকজমক প্রিয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। সাদাসিধা সৈনিকের পোষাক পরিহিত হিটলারের পার্শ্বে এই আড়ম্বর স্বতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। শুধু পোষাক-পরিচ্ছদ নয়, বড় বড় বাড়ীর অধিকারী হইবার ইচ্ছাও গোয়েরিংএর মনে প্রবল। লিপজিগলার প্লাজ নামক প্রকাণ্ড প্রাসাদে ইনি বাস করেন। সৌধ-শীর্ষে টালির গায়ে স্বস্তিক চিহ্ন রচিত রহিয়াছে। এই সৌধের একটি কক্ষের প্রাচীরগুলি গাঢ় রক্তবর্ণ কাগজে মণ্ডিত এবং কতকগুলি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কার্পেটে আচ্ছাদিত। হিটলারের একটি আ-বক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি বেদীর উপর স্থাপিত। মূর্ত্তিটি স্পটলাইটে উদ্ভাসিত হইয়া দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। বাভেরিয়ায় তাঁহার একটি পল্লীনিবাস আছে। বাড়ীটি ৫ হাজার একর জমির উপর নির্ম্মিত। জমিটি স্থানীয় সরকার তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। এই গৃহের অনতিদূরে হিটলারের কুটির। বার্লিনের বিমান-সচিবাবাস ইহাঁর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বাসগৃহ। এই প্রাসাদে ২ হাজার ৫ শত ঘর আছে। এমন বড় ঘর আছে, যথায় বিমানপোতে অবতরণ করিতে পারে এবং উড়িবার সময় উহা কক্ষ হইতে সরাসরি আকাশে উত্তোলিত করা চলে।

ইহাঁর উচ্চাশা ও আত্মাভিমানের অন্ত নাই। নির্ব্বাচনের ফলে হিটলারের একনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরদিন ইনি নিজের একটি আলোকচিত্র তোলান্। চিত্রে দেখা যায়, ইঁহার কোলের উপর নেপোলিয়নের জীবনী। গোয়েরিং সিংহশাবক পুষিতে ভালবাসেন। শাবকগুলি পুরুষ বা স্ত্রী যাহাই হউক তিনি প্রত্যেকের নাম রাখেন সীজার। যেমন হিটলার মিতভোজী, নিরামিষাশী, তেমনই গোয়েরিং সর্ব্বভুক্। ইনি অত্যন্ত নির্ম্মম। অনেক সময় বিপক্ষের বন্দীদিগকে অতি নিষ্ঠুরভাবে মারিয়া ফেলিবার আদেশ ইনি দিয়াছেন। তবে ইহার কার্য্যকরী দক্ষতা বা পরিচালন-নৈপুণ্য এত বেশী যে, বহু দোষ সত্ত্বেও ইনি প্রবল প্রভাব প্রসারিত করিয়াছেন। বৈমানিক ব্যাপারে যে নৈপুণ্য জার্ম্মানরা দেখাইতেছে, তাহা গোয়েরিংএর সুদক্ষতার ফল, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইনি দক্ষিণপন্থী এবং অনেক বিষয়ে ইঁহাকে হিটলারের দক্ষিণ হস্ত বলিলে ভুল হয় না।

গোয়েরিংএর (বিপুল বপু) আকৃতি সম্বন্ধেও নানারকম কৌতুকজনক কাহিনী প্রচারিত রহিয়াছে। ইনি মোটা

বটেন কিন্তু ইঁহার পৈশিক শক্তিও বিস্ময়কর। সেই জন্ত শরীরের স্থূলত্ব সত্বেও ইনি লঘুভার লোকের মতই অনায়াসে চলাফেরা করিতে পারেন। ইঁহার দেহ-মনের কোথাও জড়তার লেশমাত্রও নাই। ইঁহার কর্ম্মশক্তি প্রচণ্ড। ইঁহার শিরায় বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিত প্রবাহিত বলিয়া ইনি গর্ব্ব করেন বটে, কিন্তু ইনি হিটলার ও গোয়েবেল্‌সের মত এন্টি-সেমাইট বা ইহুদী-বিদ্বেষী নহেন।

ডক্টর জোসেফ পল গোয়েবেলস্ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রাইনল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জন্ম হইতেই বিকৃতপদ। এই আকৃতিগত বিকৃতির প্রভাব ইঁহার জীবনে বিশেষভাবে দৃষ্ট হইয়াছে। যখন ইঁহার সকল সতীর্থ বিগত মহা সংগ্রামে যোগদান করেন, তখন অঙ্গহানির জন্ত ইঁহাকে গৃহেই থাকিতে হয়। তবে এই অঙ্গহানির ক্ষতিপূরণ অন্তদিক হইতে হইয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ বিশেষ তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার অদ্ভুত উচ্চাশা তাঁহার অন্তরে প্রভাব বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করে। বিকৃতাঙ্গ ও দুর্ব্বলদেহ বলিয়া সুগঠিত ও সুস্থ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে একপ্রকার ঈর্ষ্যা তাঁহার অন্তরে বিদ্যমান বলিয়া অনেকে মনে করেন। অনেকের মতে নাৎসীদলের মধ্যে সয়তানী বুদ্ধিতে ইনি অদ্বিতীয়। নির্দ্দয় গোয়েরিংএর ভিতর-বাহির সমান। কিন্তু ইঁহার মুখে মধু অন্তরে হলাহল। নাৎসী-নেতাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত। হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি প্রাপ্ত হন।

গোয়েবেলস-বংশ নিষ্ঠাবান্ রোম্যান ক্যাথলিক, কিন্তু ইনি ভীষণ পাদরী-বিদ্বেষী। ইঁহার পিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। পিতামহ কৃষক। দরিদ্র কারিগর বংশে মাতার জন্ম। সুতরাং দরিদ্র পরিবারেই উদ্ভব। তিনি কায়রা চাকরি করিতে করিতে শিক্ষার পথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়েন। সাহিত্যিক হইবার কামনা ছাত্রজীবন হইতেই তাঁহার ছিল। তিনি লিখিয়াছেনও অনেক। তাঁহার রচনাগুলি একত্রিত হইয়া ১৪ খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থাবলীতে পরিণত হইয়াছে। যে নারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তিনি পূর্ব্বস্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া ইঁহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রথম পতিটি ইহুদী ছিলেন বলিয়া কথিত, কিন্তু তিনি আদৌ ইহুদী নহেন। হিটলার গোয়েবেল্‌স্-গৃহিণীকে বিশেষ পছন্দ করিতেন। হিটলারের এই অনুরাগ ডক্টর গোয়েবল্‌সের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছিল। গোয়েবল্‌স-গৃহিণীর গানের মজলিসে সঙ্গীতানুরাগী হিটলার প্রায়ই যোগ দিতেন। কিছুদিনের জন্ত গোয়েবল্‌স্-গৃহিণী 'ডেয়াচে মোডেন এমট' নামক প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকারূপে জার্ম্মানীর নারীসমাজের নেত্রী হইয়াছিলেন।

ক্ষুদ্রকায় ডক্টর গোয়েবেল্‌স্ আকৃতির দিক দিয়া গোয়েরিংএর প্রায় বিপরীত। তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্য ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি হইবে কিনা সন্দেহ। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মিউনিকের একটি সভায় গমন করিয়া গোয়েবেল্‌স্ হিটলারের বক্তৃতা সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ করেন। তিনি কোন উদ্দেশ্ত লইয়া সভায় আসেন নাই। সুতরাং নিয়তি তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছিল বলিলে ভুল হয় না। হিটলারের বক্তৃতা শুনিবামাত্র ডক্টর গোয়েবেল্‌স্ নাৎসীবাদে দীক্ষিত হইলেন। ইহার পর দল গঠনের জন্ত তাঁহাকে রাইনল্যাণ্ডে পাঠান হইল। হিটলার এই ক্ষুদ্রকায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বক্তৃতা শক্তি দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার দ্বারা অনেক কাজ সম্পাদিত হইবে। বাক্‌জাল বিস্তার করিতে, উচ্ছ্বসিত ভাষার প্রবাহ বহাইতে ডক্টর গোয়েবেল্‌সের শক্তি অসাধারণ। নাৎসীদের মধ্যে বাক্‌চাতুর্য্যে হিটলারের নিম্নেই ইঁহার স্থান। ইহার বাগ্মিতা বা বাক্‌কৌশল নাৎসীবাদ প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

গোয়েবেলস্ য়্যাংগ্রিফ নামক সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তক। চার বৎসরের ভিতর এই কাগজের সাহায্যে ইনি যে প্রচার-কার্য্য চালান, তাহা ইঁহার সাংবাদিক প্রতিভার পরিচায়ক বটে। পারদর্শী পরিচালকের হস্তে পড়িলে সংবাদপত্র কিরূপ শক্তিশালী হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই য়্যাংগ্রিফ। একাধারে সুদক্ষ সাংবাদিক ও শক্তিশালী বক্তা গোয়েবেলসকে না পাইলে হিটলারের পক্ষে নাৎসীবাদকে এত শীঘ্র সুপ্রতিষ্ঠ করা কখনও সম্ভব হইত না। গোয়েবেলস সংযতভাবে লিখিতে বা বলিতে জানেন না। বন্তার উদ্দাম প্রবাহের ন্তায় (কণ্ঠে ও কাগজের পৃষ্ঠায়) তাঁহার ভাষা বহিয়া যায় বলিলে ভুল হয় না। অসংযত ভাবে লেখনী চালনের জন্ত এক সময় ১ শত ২৬টি মানহানির মামলা তাঁহার বিরুদ্ধে

চলিতেছিল। অনেকদিন পূর্ব্বে (হিণ্ডেনবার্গ জীবিত থাকার কালে) হিণ্ডেনবার্গ কি জীবিত ? এইরূপ (বড় বড় অক্ষরে) শিরোনাম-যুক্ত সংবাদ তিনি মুদ্রিত করেন। হিণ্ডেনবার্গ তাঁহার উপর নালিশ করিয়া ৮ শত মার্ক ক্ষতিপূরকরূপে প্রাপ্ত হন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে গোয়েবেল্‌স্ রিকের প্রচার বিভাগের সচিব-পদ প্রাপ্ত হন। প্রচার-সচিবরূপে ইনি জার্ম্মান প্রেস বা জার্ম্মানীর সংবাদ ও সাময়িক পত্র সংক্রান্ত সকল ব্যাপারের উপর অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সময় তিনি জার্ম্মানীর বেতার ব্যাপারেরও অধিপতি ছিলেন বলা চলে। শুধু তাহাই নহে, থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমা বা-সবাক চিত্রাগার এবং সঙ্গীত ও অন্যান্য সুকুমার শিল্প-সাধনা-সংক্রান্ত ব্যাপারেরও তিনি নিয়ামক ছিলেন। প্রচার-সচিব থাকিবার সময় তাঁহার অধিকার এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের উপরেও তাঁহার প্রভাব ছিল। তিনি এইরূপ কঠোরভাবে এই সকল বিভাগের উপর প্রাধান্য বা শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যে, ৬ কোটি ৫০ লক্ষ নর-নারীর ইচ্ছামত কিছু বলিবার বা লিখিবার কণা মাত্রও স্বাধীনতা ছিল না। সে জন্য কোন লেখক বলিয়াছেন, গোয়েবেলস সমগ্র জার্ম্মানীকে এক প্রকার কারাগারে পরিণত করিয়াছিলেন। একদিকে বিমানবীর ও মহাযোদ্ধা বিপুল-বপু গুরুগম্ভীর গোয়েরিং, অন্যদিকে এই ক্ষুদ্র, খর্ব্ব ও খঞ্জ-তনু কূট-কৌশলী মহাযোদ্ধা ডক্টর গোয়বল্‌স্—মধ্যে চার্লি চ্যাপলেন জাতীয়-গুম্ফমণ্ডিত-মুখমণ্ডল ভ্রূকুটি-কুটিল-দৃষ্টি একনায়ক এডলফ হিটলার। এই ত্রিমূর্ত্তির দ্বারা জার্ম্মাণী শাসিত।

সভা, সমিতি, সংবাদপত্র, বেতারযন্ত্র প্রভৃতি প্রচারের সব উপায়গুলিই গোয়েবেল্‌সের দ্বারা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত, যেন হিটলারবিরোধী কোন ভাব কোথাও কণামাত্রও প্রশ্রয় না পায়। ইহার জন্য কত ছলনা, কত মিথ্যা, কত কৃত্রিমতার আশ্রয় লইতে হয়। নির্ব্বাচনের সময় হিটলারকে ভোটযুদ্ধে জয়ী করিবার জন্য গোয়েবলস যে কুটিল কৌশলের জাল সমগ্র জার্ম্মাণী জুড়িয়া প্রসারিত করেন, তাহা করা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। গোয়েরিং হিটলারের বাহু, গোয়েবল্‌স্ তাঁহার মস্তিষ্ক। উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বী, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অবশ্য বাহির হইতে দেখিলে বুঝা যায় না। এমন কি, গোয়েরিং-গৃহিণী ও গোয়েবেল্‌স্-গৃহিণী উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা পরস্পর ঈর্ষ্যাভাব কম নয়। একজন চান আর একজনকে হটাইয়া বড় হইতে।

হিটলার সমগ্র জার্ম্মাণীর একনায়ক, আর সমগ্র জার্ম্মাণ প্রেসের একনায়ক গোয়েবেল্‌স্। একটা বিরাট জাতির বিবেকবাণীকে রুদ্ধ করিয়া রাখা—কণ্ঠকে চাপিয়া ধরা; তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কিছু ছাপার অক্ষরে বাহির হইতে পারিবে না। এমন কি ইচ্ছা করিলে সহসচিবদের বাক্য বা লেখার উপরেও তিনি ছুরি চালাইতে পারিবেন। ছাপিবার বা বেতারে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সকল ভাষণ বা নিবন্ধ তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। তাঁহার সম্মতি না থাকিলে, কোন সাংবাদিক জার্ম্মাণীর কোন জায়গায় চাকরি পাইতে পারেন না। প্রচারব্যাপারে সংবাদপত্রের প্রভাব কতখানি, তাহা হিটলার জানেন বলিয়াই এইরূপ কঠোরতা। ক্ষুদ্র একটি অগ্নিকণা হইতে প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁহার অনুমতি না লইয়া জার্ম্মাণীর কোন সংবাদপত্র কিছু মুদ্রিত করিতে পারে না। এই কঠোরতার এই কণ্ঠরোধের ফলে ১৯৩৩ সাল হইতে জার্ম্মাণীর প্রায় তৃতীয়াংশ (১৪শত) সংবাদপত্র উঠিয়া গিয়াছে। এই কঠোরতা ইঁহারা ধনসাম্যবাদী সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে শিখিয়াছেন, অথচ ধনসাম্যবাদের আশঙ্কাই এইরূপ কঠোরতা অবলম্বনের কারণ। নাৎসীবাদ কম্যিউনিজমের বিদ্বেষী হইলেও বহুবিষয়ে উভয়ের কার্য্যধারা অভিন্ন। উভয়েই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের ইষ্টের নামে স্বাধীনভাবে পদে পদে পিষ্ট করে।

গোয়েবল্‌সের ইহুদী-বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল বা প্রচণ্ড। ইহুদীদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"ইহুদী আমার নিকট একান্ত ঘৃণার বস্তু। আমি যখন কোন ইহুদীকে দেখি আমার বিবমিষা বা বমনেচ্ছা জাগে। যিশুখৃষ্ট ইহুদী হইতে পারেন না বলিয়া আমার বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না পাইলেও এ কথা সত্য। আমার কাছে একজন পরিণীতা ইহুদী নারী অপেক্ষা সাধারণ বেশ্যা বড়। কি ভীষণ ইহুদী-বিদ্বেষ। সমগ্র জাতির অন্তর এই বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত করি-

বার জন্য অসংখ্য ঘৃণ্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল। জনসাধারণকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য গোয়েবেলস কর্ত্তৃক সংবাদপত্রের সাহায্যে তাহাদের অত্যাচারের যে তালিকা প্রদত্ত হইত, তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য।

এত বড় ইহুদীবিদ্বেষীকেও তাহার শত্রুদল অনার্য্যসুলভ আকৃতিধারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য খর্ব্বত্ব ও খঞ্জত্বের জন্যই এরূপ করার সুবিধা হইয়াছে। কূটবুদ্ধি গোয়েবেলস খুঁজিয়া খুঁজিয়া এমন একজন নৃতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত আবিষ্কার করেন, যিনি প্রমাণ করেন—বিশুদ্ধ আর্য্যের পক্ষেও এইরূপ খর্ব্ব ও খঞ্জ হওয়া অসম্ভব নয়। গোয়েবেলসের অন্যান্য অঙ্গ যাহাই হউক, নাসিকার আর্য্যোচিত উচ্চতা অস্বীকার করা যায় না। আর্য্য সাজিবার জন্য এই অদ্ভুত আগ্রহের পশ্চাতে রহিয়াছে জার্ম্মান দার্শনিক নিট্‌জের মতবাদের প্রভাব।

জার্ম্মানীর ডেপুটি-লিডার রুডলফ হেস ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মিশর দেশের আলেকজেন্দ্রিয়ায় জন্মান। সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রই জানেন, বর্ত্তমানে ইনি বৃটেনে বন্দীরূপে বাস করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, এই বন্দী প্রকৃত হেস নহেন। এই রহস্য এখন উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব নহে। রুডলফ হেস গোয়েরিং ও গোয়েবেলসের মত প্রচণ্ড প্রকৃতির লোক নহেন। ইনি মোলায়েম মেজাজের মানুষ। এরূপ না হইলে ইনি হয়তো আজ গোয়েরিং-এর স্থান অধিকার করিতেন।

গোয়েবেলসের মত হেসও হিটলারের বক্তৃতা শুনিয়াই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন। গোয়েরিং-এর ন্যায় তিনি বিগত মহাসমরের সময় বিমানবিহারী কর্ম্মচারী ছিলেন। একজন লেখক বলেন—ভদ্রলোকের ভিতর হেসই প্রথম নাৎসীদলে প্রবেশ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি হিটলারের সেক্রেটারী হন। প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে তাঁহাকে সর্ব্বদা হিটলারের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইত। হেসের অনুগ্রহ বা সহায়তা ভিন্ন হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। সেই জন্য তাঁহার অফিসটি সর্ব্বদা কর্ম্মপ্রার্থী হিটলার-দর্শনার্থী ব্যক্তিবর্গে পূর্ণ থাকিত। করুণ কণ্ঠস্বরে মুখরিত হইত। এই অফিসটির নাম দেওয়া হইয়াছিল তৃতীয় রিকের ক্লাসে মাউয়ের অর্থাৎ ক্রন্দনকারী প্রাচীর (ওয়েলিং ওয়াল)।

রুডলফ হেস নম্র ও লাজুক স্বভাবের লোক। কাহারও সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা তিনি ভালবাসেন না। হিটলার শক্তিশালী সহকারী অনেকগুলি পাইয়াছেন কিন্তু এমন অনুগত অনুচর আর পান নাই। নাৎসীদলের মধ্যে হিটলারের পরেই হেস সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বা সকলের প্রশংসাভাজন। ফেথ-হীলিং বা বিশ্বাসের সাহায্যে রোগ আরোগ্য করার উপর হেসের সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে। তিনি এইরূপ উপায়ে রোগ আরোগ্য করিবার জন্য ড্রেসডেন নগরে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। যিনি বর্ত্তমানে বৃটেনে বন্দী, তিনি প্রকৃত হেস হইলে ভাবিবার বিষয়, হিটলারের এই সর্ব্বাপেক্ষা অনুগত ও বশীভূত অনুচরটী অকস্মাৎ প্রভুর নিকট হইতে পলায়ন করিল কেন? ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যে সকল ব্যক্তি ট্রট্‌স্কির সহকারী বা সহায়কারীরূপে সোভিয়েট-যুক্তরাষ্ট্রকে বিনষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, রুডলফ হেস তাহাদের অন্যতম এমন কথা অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য বা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নাৎসীরা বহু ঘৃণ্য ও জঘন্য উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী (৫ই মার্চের নির্ব্বাচন-ব্যাপারের অব্যবহিত পূর্ব্বে) বার্লিনের রিক্সতাগ আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী রিপাবলিক বা গণতন্ত্রের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই অগ্নিকাণ্ডে তাহার সমস্তই ভস্মীভূত হয়। পরে জানা যায়, নাৎসীরাই নির্ব্বাচন-যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য রিক্সতাগে আগুন লাগাইয়াছিল। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২০ লক্ষ মার্ক মূল্যের আসবাব-পত্র পুড়িয়া গিয়াছিল। ইহার জন্য কয়েক সহস্র ব্যক্তিকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। অন্যদিকে ৫ই মার্চ যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর বিজয় নাৎসীরা লাভ করিয়াছিল, তাহা এই অগ্নিকাণ্ড ব্যতিরেকে কখনও সম্ভব হইত না। যদি বলা যায়, সেই অগ্নির লেলিহান শিখাতেই ইহুদীরা মরিয়াছে, অষ্ট্রিয়া পুড়িয়াছে তাহা হইলে বোধ হয় ভুল হইবে না। সেই অগ্নিশিখা হইতে নাৎসীতন্ত্র নামক যে বিরাট পেষণযন্ত্র সঞ্জাত হইল, তাহা আজ শুধু সমগ্র জার্ম্মাণীর বুকের উপর দিয়া নয়, অধিকাংশ ইউরোপের উপর দিয়া বজ্র-নির্ঘোষে আগাইয়া চলিয়াছে।

ঐ অগ্নি শুধু একটি নেত্রতর্পণ সুদৃশ্য প্রাসাদকে ভস্মীভূত করিল, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র-সহস্র শান্তিকামী গণতন্ত্রবাদীর সমগ্র জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল ধূলি বা ভস্মে পরিণত হইল। ঐ আগুনে বিসমার্ক ও দ্বিতীয় উইলিয়মের জার্ম্মানী পুড়িয়া ছাই হইতে ধূসর ধূম্রবাশি ঠেলিয়া বাহির হইল হিটলারের তৃতীয় রিক্। প্রশ্ন হইতে পারে—আগুন লাগাইল কে? ইহা নাৎসীদের কীর্ত্তি সে সম্বন্ধে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। অথচ শত শত নিরপরাধ কমিউনিষ্ট বা ধনসাম্যবাদী ও ডিমোক্রাট বা গণতান্ত্রিককে প্রাণ দিতে হইল। ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে রিক্সতাগে আগুন লাগে। আগুন নিভাইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টাও অনুষ্ঠিত হয়। গোয়েরিং ও হিটলার এক ঘণ্টার ভিতরেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সমবেত জনগণকে উচ্চকণ্ঠে বলেন, ইহা কমিউনিষ্টদের কুকীর্ত্তি। হিটলার অগ্নির ধ্বংসলীলা দেখিতে দেখিতে গোয়েরিংকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম ভগবানের ইহাই ইচ্ছা—তিনি এই ধ্বংসলীলার নিশান তুলিয়া আমাদের ভাবী জয়লাভের বার্ত্তাই জানাইতেছেন—এই বহ্নি ঘোষণা করিতেছে—স্বয়ং বিধাতাপুরুষ আমাদের পক্ষে! অগ্নিশিখারূপে তাঁহার আশীষকর প্রসারিত হইয়াছে আমাদের দিকে। নির্ব্বাচনে জয়লাভের বাধা-বিপত্তিগুলি পুড়িয়া গেল, রিক্সতাগে লাগান আগুনে। একশত কমিউনিষ্ট ডেপুটিকে অগ্নিকাণ্ডে সাহায্যকারী বলিয়া তৎক্ষণাৎ বন্দী করার ফলে সহজেই নাৎসীরা সংখ্যাধিক্য দল হইয়া পড়িল। কেবিনেটে মাত্র তিনজন নাৎসী সদস্য অথচ হিটলারের বিরোধীদলের সদস্য সংখ্যা আট। হিটলার ৫ই মার্চ্চের নির্ব্বাচনে অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া সংখ্যাধিক হইতে চান। যখন দেখা গেল, সংখ্যাধিক ভোট পাইবার উপায় একেবারেই নাই, তখন রিক্সতাগের বক্ষ হইতে উত্থিত হইল অম্বরচুম্বী অগ্নিশিখা।

প্রথমে আগুন লাগাইয়াছিল মেরিনাস ভ্যান দার লুবে নামক একটা অর্দ্ধোন্মাদ ওলন্দাজ কমিউনিষ্ট। নাৎসীরা ইহাকে আগুন লাগাইতে বলে নাই, তবে তাহাদের গোয়েন্দারা তাহার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়াছিল। সে পূর্ব্বে বহুবার এইরূপ কাণ্ড করিয়াছিল এবং সেজন্য সে গর্ব্বও অনুভব করিত। সে কোন আড্ডায় আপনার অভিপ্রায় সগর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিল এবং সেই উক্তি প্রবেশ করিয়াছিল কোন নাৎসী গুপ্তচর বা গোয়েন্দার কানে। নাৎসীরাও ইহাই চাহে। তবে তাহারা লুবেকে কোন কথাই বলে নাই। লুবে আড্ডা হইতে বাহির হইয়া রিক্সতাগে প্রবেশ করে এবং নিজের কামিজটি খুলিয়া প্রথমে তাহাতেই আগুন লাগায়। তারপর সে সেই জ্বলন্ত কামিজটির সাহায্যে জানালা বা দরজায় লম্বিত পর্দ্দায় অগ্নি সংযুক্ত করে। পরে লুবে বিচারকের সম্মুখে এই সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছিল।

প্রকৃত ব্যাপার বলিতে লুবের আগুনে রিক্সতাগ পুড়ে নাই। ঠিক সেই সময়েই নাৎসীরাও এই সৌধের অন্য অংশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অগ্নিসংযোগ করে। অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার উপকরণগুলি গোয়েরিং টানেল নামক সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাগান আগুনের লেলিহান আলিঙ্গনে যখন রিক্সতাগ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন উহাকে, নিজেরই কীর্ত্তি ভাবিয়া উন্মাদ লুবে গর্ব্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। যখন সানন্দ সগর্ব্ব দৃষ্টিতে সে অগ্নিকাণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে তখন পুলিশ আসিয়া তাহাকে ধরিল। তাহার পকেটস্থ কাগজ-পত্র প্রমাণিত করিল সে ওলন্দাজ কমিউনিষ্ট তরুণ-সঙ্ঘ নামক দলের সদস্য। সে আগুন লাগানোর কথা অস্বীকার করিল না। বিচারে তাহার প্রতি প্রাণ-দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইল। লোকটি শুধু অর্দ্ধোন্মাদ নহে, অর্দ্ধান্ধও বটে। সুতরাং তাহার পক্ষে অন্ধকার রাত্রিতে একা আগুন লাগান এবং সেই কার্য্যের ফলে রিক্সতাগের ন্যায় একটি সৌধ ভস্মীভূত হওয়া অসম্ভব বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাহা ছাড়া ফসফরাস, সালফার, পেট্রল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকে এই কার্য্য কখন সম্ভব হইতে পারে না। কিছুদিন পরে কার্ল আর্ণষ্ট নামক নাৎসী দলভুক্ত জনৈক ব্যক্তির লিখিত একখানি পত্র পাওয়া যায়। এই পত্র ১৯৩৪ সালের ৩রা জুনের লেখা। এই পত্রে রিক্সতাগে অগ্নিসংযোগ সম্পর্কীয় ষড়্‌যন্ত্রের সম্পূর্ণ বর্ণনা রহিয়াছে। অগ্নিকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে নাৎসী নেতারা যেরূপ ভাব-ভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার ভৈরব ও বিচিত্র চিত্র এই পত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। হিটলার ব্যতিরেকে আর সকলকে

সাহসী কিন্তু লোভী, নিষ্ঠুর, বর্ব্বর প্রভৃতি বলা হইয়াছে। আর্নষ্ট নিজে আগুন লাগাইয়াছে বলিয়া পত্রে প্রকাশ। ফিডলার এবং ভন-মহরেন্সচাইল্ড্ এই দুই ব্যক্তি তাহার সঙ্গে ছিল। পত্রখানি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেই উক্ত তিনজন ৩০ জুনের হত্যাকাণ্ডে হত হয়। সুতরাং নাৎসীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার মত আর কেহই বাঁচিয়া ছিল না। উক্ত হত্যাকাণ্ডে বহু বিশিষ্ট ও বিখ্যাত নাৎসী নেতাও নিহত হন। কয়েকটি পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী দল নাৎসীদের মধ্যে ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছিল। হিটলার দুইটি প্রধান দলের টানাটানিতে প্রমাদ গণিতেছিলেন। একদিকে রিভ্রস্বেহর বা (নিয়মিত) জার্ম্মানবাহিনী, অন্যদিকে আর্ণষ্ট রোহম পরিচালিত ব্রাউন শার্টদল। একটি দলের উচ্ছেদ সাধন ভিন্ন হিটলার নাৎসীতন্ত্রের অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। এই উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টাই ৩০ জুনের হত্যাকাণ্ড। হায় রাষ্ট্রনীতি! হায় রাষ্ট্রনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা!

রিক্সতাগের সেই আগুন বাহ্যতঃ নিভিয়াছে বটে, কিন্তু যে সমরাগ্নি আজ প্রতীচী ও প্রাচী উভয় ভূখণ্ড ব্যাপিয়া প্রচণ্ড তেজে প্রজ্বলিত, উহা কি সেই আগুনের পরিণতি নহে? যে প্রাধান্য অগ্নিশিখা ও রক্তধারার উপর দাঁড়াইয়া, তাহা যে কোন মুহূর্ত্তে রক্তসিক্ত ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে, —ইহা সত্য নহে কি?

দুইদিকে রুদ্রের রোষাগ্নির ন্যায় যুদ্ধাগ্নি জ্বলিতেছে! মধ্যে আমরা মুক্তি-অভিলাষী, কিন্তু শান্তি-প্রয়াসী ভারতবাসী করুণ কণ্ঠে করযোড়ে করুণাময়ের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতেছি—

নিভাও দাবাগ্নি এই শান্তিবারি করিয়া বর্ষণ।
উপ্ত কর তত্ত্ববীজ, চিত্তক্ষেত্র করিয়া কর্ষণ।
দম্ভ-দৃপ্ত দৈত্যদল বাজায় যে বিদ্বেষ-দুন্দুভি
প্রীতি-মুরলীর মন্ত্রে, হে গোবিন্দ, যাক্ তাহা ডুবি!
রক্তলুব্ধ রাক্ষসের ক্ষান্ত হোক্ তাণ্ডব নর্ত্তন।
চলুক ব্যাপিয়া বিশ্ব শান্ত শুদ্ধ প্রেমের কীর্ত্তন!

যাযাবর

শ্রীমতী রাধারানী দেবী

সাহারার মরু মাঝে, যেথা সেথা থাকি;
সঙ্গীহারা, সাথীহারা, নিঃসঙ্গ একাকী।
সামাজ, সংসার, হীন—আত্মীয়, স্বজন,
কেহ নাই আজ মোর বলিতে আপন।
তাই আমি দিশেহারা, দিকদিগন্তরে;
ছুটে চলি অবিরাম—স্বাধীন অন্তরে।
মুক্ত বিহঙ্গম সম মোর এ জীবন
কোনদিন মানে নাই সমাজ শাসন।
তীক্ষ্ণধার বর্শাহাতে ছুটী উর্দ্ধশ্বাসে,
যে পথে পথিকগণ আসে—
মুহূর্ত্তে ছিনিয়ে আনি ধন রত্নভার;
বক্ষে হানি তীক্ষ্ণধার মোর তরবার।

কাতর ক্রন্দনধ্বনি কভু আমি পাই না শুনিতে;
আত্মার আনন্দ দেই মানবের উষ্ণ রক্তস্রোতে;

মরুভূর তপ্ত বালি মোর চারি পাশে,
মিটি মিটি হাসে।

বক্ষে তারে লই তুলে, করি আলিঙ্গন,
ভালে তার এঁকে দেই সহস্র চুম্বন।

ধরণীর শ্যামাঞ্চল, মোর তরে করিল না দান
ঘর দোর বাঁধিবার এতটুকু স্থান!
উত্তপ্ত সাহারা বুকে তাই আমি ঘুরি নিরন্তর;
নামহীন, গোত্রহীন, আজন্ম বর্ব্বর;
আমি যাযাবর।

প্রতিশোধ

ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

"এই ধর ! যা ফেলে দিলি।"

খুংড়ী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে, বলে, "তোর হাতের ঠিক সই ; তা আমি কি করব।"

লালা গাছ হইতে আর একটা পেয়ারা ছিঁড়িয়া লয়, বলে, "এইবার ধরিস্ কিন্তু!" কিন্তু এইবারও খুংড়ী পেয়ারাটা ধরিতে পারিল না। সেটা পাহাড়ের গা বাহিয়া নীচে পড়িয়া গেল। গারো পাহাড়ের টিলার উপর পেয়ারা গাছ। তাহার উপর দাঁড়াইয়া লালা পেয়ারা ছিঁড়িয়া, ছিঁড়িয়া খুংড়ীকে দিতেছিল।

খুংড়ী পেয়ারাটা ধরিতে-না পারায় লালা মনে মনে বিরক্ত হইয়া ওঠে, বলে, "তুই কোন কাজের নস্ খুংড়ী। একটাও পেয়ারা তুই ধরতে পারিস্ নে।"

খুংড়ী শুধু হাসে। মনে হয়, হাসিতে হাসিতে এক্ষুণি মাটীতে গড়াইয়া পড়িবে। লালার রাগ তাহাতে বাড়ে বই কমে না। সে বলে, "মর্ মর্ পোড়ামুখী কেবল ঢং, নে।" এইবারও খুংড়ী ফলটা ধরিতে পারিল না। কেবল হাসি আর হাসি।

এতক্ষণে লালা বুঝিল, খুংড়ী ইচ্ছা করিয়া এইরূপ করিতেছে। এ কেবল তাহাকে জব্দ করা। লালা রাগিয়া ওঠে, বলে, "তবে রে ছুঁচো ; ইয়ার্কী করা হচ্ছে। দেব তোর মাথাটা ঐ গাছের সঙ্গে ঠুকে, তখন বুঝবি মজাটা।"

হাসিতে হাসিতে খুংড়ী জবাব দেয়, "হু! দাও না। নিজের হাত সই নেই ; কেবল রাগ।"

ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। লালা সে সীমা অতিক্রম করিয়াছে। রাগে তাহার সব দেহ জ্বলিয়া যাইতেছিল, বলে, "পোড়ামুখী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।" কথার শেষে লালা গাছ হইতে লাফ দিয়া পড়িল।

খুংড়ীও দুষ্টামিতে ওস্তাদ। সে হাসিতে হাসিতে ছুটিল। সে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দেখিল, লালা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতেছে। খুংড়ীর মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলিয়া গেল। সে লালাকে আরো রাগাইবার জন্য বলিয়া বসে "আমায় মারবি লালা! ধর ত!"

একটা মেয়ে বার বার তাকে অপমান করিবে, এ তার সহ্য হয় না। সে খুংড়ীর পিছন লইল। দুই জনে ছুটাছুটি করিয়া টিলার প্রান্তে এক জঙ্গলের নিকট আসিয়া পড়িল। সম্মুখে ঘন ঘন বন, তাহাকে বাধা দিল। খুংড়ী সেখানে হাসিয়া লুটিয়া পড়িল। মিনতি-মাখা কণ্ঠে বলে, "তোর পায় পড়ি লালা, এবারটির মতন ছেড়ে দে।"

ততক্ষণে লালা ছুটিয়া আসিয়া খুংড়ীর ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠে, "এইবার।"

"আঃ! আঃ লাগে, উঃ, উঃ।" খুংড়ী বেদনায় কাতরাইয়া ওঠে।

লালা, অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে। সে খুংড়ীকে ছাড়িয়া দেয়।

ছাড়া পাইয়া খুংড়ী হাসিতে হাসিতে ছুটিল, বলে, "আমার লাগে নি ; কেমন জব্দ।" সে জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

লালার ভয় হয়, বলে, "যাস্‌নে খুংড়ী। সত্যি বলছি, তোকে আর কিছু বলব না। চলে আয়।"

কিন্তু লালার কথায় কোন ফল হইল না। খুংড়ী জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। লালা কি করিবে, তাহা ভাবিতেছিল। এমন সময় খুংড়ীর বিকট চীৎকার লালার কানে প্রবেশ করিল। একবার, দুইবার, তিনবার শব্দ শ্রুত হইল। লালার সমস্ত দেহ টান হইয়া উঠিল। হাতের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল। সে দ্রুত পেয়ারা গাছের নিকট ছুটিল। তাহার বল্লম সেখানে পড়িয়াছিল। তাহা সে তুলিয়া লইয়া বিদ্যুত গতিতে শব্দ লক্ষ্য করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

একটা ভাল্লুক জঙ্গলের মধ্যে পাতার বিছানা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। লালাদের কলরবে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বিরক্ত মনে চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু তাহার পথের সম্মুখে পড়িয়া গেল খুংড়ী।

খুংড়ীকে দেখিয়া ভাল্লুকটা বেজায় রাগিয়া উঠিল। সে রাগে গর্জ্জন করিয়া খুংড়ীকে তাড়া করিল। খুংড়ী পাহাড়ী মেয়ে, এমন বিপদে তাহারা হামাসা পড়ে। কিন্তু আজ সে

সম্পূর্ণ খালি হাত। সে কি ভাবে ভল্লুকটার সাথে লড়িবে। তাড়া করিতে করিতে ভাল্লুকটা এমন এক জায়গায় খুংড়ীকে আনিয়া উপস্থিত করিল, সেখান হইতে খুংড়ীর পালাইবার পথ নাই। সম্মুখে একটা কপিল গাছ। সে আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল। মৃত্যু তাহার অনিবার্য্য। পশ্চাতে প্রকাণ্ড খাদ, সম্মুখে কালান্তক যম সম ভাল্লুক ছুটিয়া আসিতেছে। ভয়ে তাহার হাত-পা অবশ হইয়া পড়িল। আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহাকে ভল্লুকের অঙ্কশায়িনী হইতে হইবে। সে ভয়ে দুই হাতে চোখ ঢাকিল।

সহসা ভাল্লুকের গর্জ্জন ও মানুষের হুঙ্কারে সচেতন হইয়া খুংড়ী চোখ খুলিয়া দেখিল, লালা তাহার বল্লম দিয়া ভাল্লুকটাকে আক্রমণ করিয়াছে। ভল্লুকটা যতবার গর্জ্জন করিয়া লালাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। লালা প্রতি বার অপূর্ব্ব কৌশলে পায়-তারা করিয়া তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

লালার সাহস ও বীরত্বে খুংড়ী মুগ্ধ হইল। তাহার ভয় দূর হইল। তাহার পাংশু বদনে ধীরে ধীরে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে নানা প্রকারে লালাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ এই প্রকারে যুদ্ধ করার পর লালা তাহার বল্লমের আগাটা ভল্লুকের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিল। ভল্লুকটার সে কি মর্ম্মভেদী চীৎকার, ছুট্-ফটানী, গোঙানী—তারপর সব শেষ।

ভল্লুকটাকে পড়িতে দেখিয়া খুংড়ী ছুটিয়া লালার নিকট আসিল। সে তাহার সবল বাহু নিজের দুর্ব্বল হস্তে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "সাবাস লালা। হাঁ মরদ বটে। এত বড় ভাল্লুকটা তুই কিনা মেরে ফেল্লি?"

খুংড়ীর পিঠের উপর একটা মৃদু কিল্ দিয়া লালা হাসিয়া বলে, "তোর জন্যই ত খুংড়ী, নে চল, আবার কে কোথা হতে এসে পড়বে,—চল—দেরী করিসনে।"

পাহাড়ের নিবিড় প্রান্তে ছোট একটি গোলপাতার ঘর। রাত্রে লালা ও তাহার দুই সহচর লইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। গভীর রজনী। চারিদিক্ নিস্তব্ধতায় ছম্ ছম্ করিতেছে। সারা বন পাহাড় ঘুমন্ত। কেবল মাঝে মাঝে বহু দূর হইতে হিংস্র জানোয়ারের বিকট চীৎকার ভাসিয়া আসিতেছে। এই রকম ভীষণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া খুংড়ী আসিয়া নীরবে লালার ঘরে মৃদু আঘাত করিল। কয়েকবার আঘাতের পর লালার সহকারি সহচর মাংলু আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

খুংড়ী তাহাকে ইঙ্গিতে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

লালা পূর্ব্বেই বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিল, খুংড়ী দরজা বন্ধ করিয়া নিকটে আসিলে সে বলিয়া ওঠে, "এত রাতে যে, ব্যাপার কি?"

ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে, "সর্দ্দারের লোক গো, লোক; তোদের ধরতে এসেছে।"

"তা তুমি কি প্রকারে জানলে।"

বেঙ্গুর চোখে তখন ঘুম জড়াইয়া রহিয়াছে, সে চোখ মুছিয়া বলে, "সর্দ্দারের লোক এসেছে, তা তুমি কি প্রকার জানলে।"

খুংড়ী তাহাকে জিব দেখাইয়া বলে, "আহা আমি যেন কিছু জানি নে। তোরা সর্দ্দারকে তাড়িয়ে লালাকে সর্দ্দার করতে চাস। সে জন্যই ত তারা তোদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা এসে আমার বাবার সাথে পরামর্শ করছে। তোরা নাকি সর্দ্দারের বিরুদ্ধে লোকদের সব ক্ষেপিয়ে দিয়েছিস। তাই তারা বাবার সাহায্যে তোদের ধরে হত্যা করে তাদের সর্দ্দারের আসন ঠিক রাখতে চায়।"

মাংলু বলে, "তোর বাবা, আমাদের ধরে দেবেন? আমরা ত তাঁরই আশ্রয়ে আছি।"

"বাবা কি করবেন, তারা বাবাকে এই এতগুলো টাকা দিয়েছে। বাবাও তাতেই রাজি। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সব শুনে ছুটে এলুম, যা পালা"—খুংড়ী বলিয়া ওঠে।

লালা আর কাহাকেও কথা বলিতে অবসর দিল না। তাহারা যত পারিল, তীর, ধনুক, বল্লম ইত্যাদি সঙ্গে করিয়া লইল এবং আর এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করিয়া তাহারা এই গভীর রাত্রে সঙ্গীদের সহিত বাহির হইয়া পড়িল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, তাহারা দেখিল খুংড়ী তাহাদের পশ্চাতে আসিতেছে।

লালা মৃদু তিরস্কারের সহিত বলে, "তুই এলি যে। যা বাড়ী যা।"

খুংড়ীর মুখে মৃদু হাসি। সে বলে, "না। আমি তোর সাথে যাব।"

লালা ধমক দিয়ে ওঠে, বলে, "কেন?"

খুংড়ীর মুখে সেই অপূর্ব্ব হাসির লেশ। সে বলে, "সর্দ্দারনী হব বলে।"

লালা হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল, বলে, "তোর সখ ত কম নয়।" কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল, পুনরায় বলে, "যদি মরি। তা হ'লে।"

খুংড়ী দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করে, "আমিও মরবো।"

লালা কিছুক্ষণ কি ভাবিল, তারপর সে বলিয়া উঠে, "বেশ, চল।"

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে লালা বুঝিল, সর্দ্দারের লোকেরা তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। তাহারা দ্রুত তুঙ্গি পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেখানে তাহাদের রাজা আছেন। একবার তাঁহার নিকট পড়িতে পারিলে আর ভয়ের কোন কারণ থাকিবে না।

সাঁ করিয়া একটা তীর লালার কাণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। উপস্থিত সকলে একসঙ্গে চমকিয়া উঠিল। লালা তাহার সঙ্গীদের কথা বলিতে অবসর না দিয়া গম্ভীব গলায় আদেশ করিল, "সর্দ্দারের লোকেরা আমাদের আক্রমণ করেছে, তোমরা প্রস্তুত হও।"

বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষণ হইল। এমন সময় একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। লালা গাছের আড়াল হইতে অন্য গাছের আড়ালে যাইতেছিল। এমন সময় বিপক্ষের দলের তীরের আঘাতে বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল।

খুংড়ী সর্ব্বক্ষণ লালার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে উৎসাহ দিতেছিল। লালাকে পড়িতে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

মাংলু দূর হইতে তাহাদের ভাবী সর্দ্দারকে পড়িতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। তখন বিপক্ষদল হইতে ঝলকে ঝলকে তীর আসিয়া পড়িতেছিল। খুংড়ী তাহার মধ্যে নির্ভয়ে লালাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল।

মাংলু আসিয়া লালাকে পরীক্ষা করিল। তখন তাহার শেষ নিঃশ্বাস পড়িয়া গিয়াছে। মাংলু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে কি করিবে। তাহার মনে হইল তাহার সমস্ত ক্ষমতা কে যেন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। পরে বেঙ্গুও আসিল। সে তাহার সর্দ্দারের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

খুংড়ী একটুও কাঁদিল না। কথাও বলিল না। সে লালাকে কোলে করিয়া পাষাণ-প্রতিমার মত বসিয়া রহিল। খুংড়ীর পানে চাহিয়া মাংলু অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিয়া ওঠে, "চল বোন। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। শত্রুপক্ষ যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে।"

খুংড়ী তাহার ম্লান-শোকার্ত্ত মুখখানি ধীরে ধীরে মাংলুর পানে তুলিয়া ধরিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলে, "তোরা যা, আমি আমার লালাকে ফেলে কোথাও যাব না।"

সর্দ্দারের লোকদের কোলাহল ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মাংলু ততই চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ কি ভাবিল, তারপর খুংড়ীর পানে চাহিয়া বলিয়া উঠল, "এভাবে বসে থাকলে চলবে না বোন। আমরা প্রতিশোধ চাই।"

এই কথায় সুন্দব কাজ হইল। খুংড়ী সযত্নে লালার মৃতদেহ মাটিতে রাখিয়া দিল। তাবপব তাহার কোমরে বাঁধা কাপড় দিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ করুণ ভাবে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠলো, "প্রতিশোধ চাই। প্রতিশোধ চাই।" সে ঝড়ের বেগে ছুটিল।

পরদিন তাহারা তুঙ্গী পাহাড়েব পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই ধারে বড় বড় পাহাড়। তাহাবই মধ্যে দিয়া একটা সরু পথ তুঙ্গীর দিকে গিয়াছে। মাংলুব দল সেখানে আসিয়া আস্তানা গাড়িল।

আজ তাহারা নিঃস্ব। গতকল্যের সংঘর্ষণে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। হাতে যে কয়টি তীর আছে, তাহা শত্রুকে বাধা দিবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাহার উপর দুইদিন হইতে উপবাস। শরীর মন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। মাংলু ও বেঙ্গু উভয়েই হতাশ হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় অগ্রসর হওয়া বৃথা। হাতে উপযুক্ত অস্ত্র নাই। পেটে অন্ন নাই, শরীরে বল নাই। এই অবস্থায় তাহারা কি করিবে। ইহা হইতে সর্দ্দারের হাতে ধরা দেওয়াও ভাল।

মাংলুকে হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া খুংড়ী ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। খুংড়ীর বিষাদ মাখা মুখটা দেখিয়া মাংলু চমকিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। খুংড়ী বলে, "এমন করে বসে যে। এ ত বিশ্রামের সময় নয়। শত্রু যে-কোন সময় এসে পড়তে পারে।"

মাংলু হতাশাব্যাঞ্জক কণ্ঠে বলে, "আসুক।"

খুংড়ী এই কথায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে বলে, "তার মানে? তোমরা ধরা দিতে চাও?"

বেঙ্গু একটু রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল, "যদি ধরে ধরুক। আমাদের আর পালাবার ক্ষমতা নেই।"

খুংড়ী একটু ম্লান হাসি হাসিল। পরে ধীরে ধীরে বলে, "খুব আছে। আমি জানি বেঙ্গু, লালা তোমাদের এত দুর্ব্বল করে তৈরী করে নি।"

মাংলু কাতর কণ্ঠে বলে, "কিন্তু বোন, আজ আমরা নিঃস্ব। পেটে একটিও দানা নেই। বাধা দেবার উপযুক্ত অস্ত্রও নেই। এখন না হোক, তুঙ্গীর পথেই আমরা ধরা পড়ব। তার চেয়ে যেচেই ধরা দেওয়া ভাল নয় কি?"

বেঙ্গু রুক্ষ কথা বলিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়াছিল। মাংলু থামিলে সে স্নেহমাখা সুরে বলিয়া উঠিল, "যতদিন লালা ছিল, ততদিন তার জন্ত প্রাণ দিয়ে কাজ করেছি। আজ লালা নেই, কার জন্তে বাঁচতে চেষ্টা করব।" বেঙ্গুর চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

খুংড়ীর বেদনা-ভরা মুখ আরো ম্লান হইয়া গেল। সে কাতরকণ্ঠে বলিল, "কেন? তার আদর্শের জন্ত। তার আদর্শ ত মরে নি, ভাই।"

নত মুখে মাংলু বলে, "উপায় নেই বোন।"

এইবার খুংড়ী উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "উপায় আছে। আমি বলছি আছে।" পরে একটু দম লইয়া আদেশপূর্ণ কণ্ঠে বলে, "শোন তোমরা? এখান থেকে তুঙ্গী চার ঘণ্টার পথ। তোমরা চলে যাও। আমি রইলুম এখানে। শত্রু এলে আমি একাই তাদের বাধা দেব। এই সরু পথে তারা সহজে ঢুকতে পারবে না। বুঝলে—"

এই কথা শ্রবণ করিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল। তাহারা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তা হয় না বোন। তোমাকে ফেলে আমরা বাঁচতে চাই নে।" মাংলু একটু দম লইয়া পুনরায় বলে, "এক কাজ কর। আমরা সবাই তুঙ্গীর দিকে অগ্রসর হই। বরাতে যা আছে হবে।"

খুংড়ী বাধা দিয়া বলে, "তা হবে না। সবাই একসঙ্গে পালালে ধরা পড়ে যাব। তা হ'লে আমার লালার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। তোরা যা—"

"তোমায় ফেলে?" মাংলু কাতর কণ্ঠে বলে।

দৃঢ় কণ্ঠে খুংড়ী বলে, "হ্যাঁ। আমায় ফেলে আমি চাই লালার ইচ্ছা পূর্ণ করতে।"

বেঙ্গু এতক্ষণ চুপ করিয়া তাহাদের আলোচনা শুনিতেছিল। তারা থামিলে সে বলিয়া উঠিল, "তা হ'লে তোমরা যাও; আমি থাকি।"

কৃতজ্ঞতা পূর্ণ নয়নে মাংলু তার দিকে চাহিল।

মাথা নাড়িতে নাড়িতে খুংড়ী বলে, "সে হয় না বেঙ্গু। লালা নেই, তার অভাবে আমার জীবন বৃথা। আমি না থাকলেও তোদের কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তোরা গেলে তোদের দলের যথেষ্ট ক্ষতি হবে।"

বেঙ্গু বিশ্বাসী হইলেও সে একটু গোঁয়ার। সে খুংড়ীর কথা অত বুঝিল না। বার বার একজন স্ত্রীলোকের জিদ দেখিয়া তাহার পুরুষকারের উপর আঘাত লাগিল। সে আর থাকিতে না পারিয়া অশ্লীল ভাবে বলে বসলো, "তুমি ত আর লালার বিবাহিতা স্ত্রী নও, যে তার অভাব।"

"বেঙ্গু!" মাংলু ভীষণভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল। বেঙ্গুর আর বলা হইল না। সে ভয়ে চুপ করিয়া গেল।

বেঙ্গুর পানে চাহিয়া খুংড়ী আস্তে আস্তে বলে, "সে ঠিক কথা ভাই। কিন্তু আমি মনে প্রাণে তাকেই ত স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছি।"

বেঙ্গু আর কোন কথা বলিল না। সে মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল। খুংড়ী উদাস নয়নে মাংলুর পানে চাহিয়া রহিল।

মাংলু তাহার অর্থ বুঝিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তোমায় একা ফেলে কি করে যাই, তুমিই বল বোন।"

খুংড়ীর মলিন মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে

কি মধুর হাসি! মাংলু বিস্ময়ে তার পানে চাহিল। খুংড়ীর মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, কণ্ঠ ভারী হইল, সে বলিয়া উঠিল, "শোন! মাংলু; শোন! বেঙ্গু, তোরা জোর করে আমায় ধরে রাখতে পারবি নে। তোরা যদি আমার কথা না শুনিস, ঐ খাদে পড়ে আমি আত্মহত্যা করব।" এমন সময় শত্রুর আগমনের আভাস ভাসিয়া আসিল। খুংড়ী ততই উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া বলে, "যা! যা! আর দেরী করিস নে। ওরে তোরা আমার লালার বাসনা পূর্ণ কর।"

কেহই নড়িল না। সবাই ধীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। খুংড়ী গম্ভীর গলায় বলে, "বেশ! আমি চল্লুম, তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোনের মৃত্যু দেখ্।" সে খাদের দিকে ছুটিল।

মাংলু তাকে বাধা দিল। সে কাতর কণ্ঠে বলে, "থাম বোন, আমরা সব সইব, কিন্তু এ পারিনে। আমরা চল্লুম, ভগবান তোমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" তারা চোখ মুছিতে মুছিতে তুঙ্গীর দিকে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিল, আহা যদি তুঙ্গী গিয়াও রাজার নিকট হইতে সৈন্য লইয়া ফিরিতে পারে, হয় ত খুংড়ীকে বাঁচাইতেও বা পারে।

সর্দ্দারের লোকেরা অবাক হইয়া গেল। কোথা হইতে তীর আসিতেছে, তাহা তাহারা ধরিতে পারিতেছে না। তাহারা গিরির সঙ্কীর্ণ পথে যতবার অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছিল, ততবারই তাহারা তীরের আঘাতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

অনেক চেষ্টার পর তাহারা যখন গিরির সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিল, তখন তাহারা একটিও লোককে দেখিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল কত লোকরাই না তাহাদের বাধা দিয়াছিল। লোক না দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। দলপতির আদেশে তাহারা খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কিছুদুর অগ্রসর হইয়া তাহারা বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহারা দেখিল একটি যুবতী হাতে বল্লম লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলগুলি বায়ু ভরে দুলিতেছে। কপালের স্থানে স্থানে মুক্তার মতন ঘর্ম্ম-বিন্দু। ঘন ঘন নিশ্বাসে বক্ষস্থল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া সর্দ্দারের লোকেরা ধীরভাবে তার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যুবতী তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। দলপতি ইহা দেখিয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল। যুবতী পথ ছাড়িল না, কোন কথাও বলিল না।

অগত্যা দলপতি বাধ্য হইয়া যুবতীকে বন্দী করিতে হুকুম দিল।

দলের লোকেরা হৈ, হৈ করিয়া ছুটিল। কিন্তু যুবতীকে বন্দী করিবার পূর্ব্বেই তাহার হস্তস্থিত বল্লমের আঘাতে একটি লোক পড়িয়া গেল।

যুবতী বন্দী হইল। দলপতি তাহাকে ধমক দিয়া বলে, "এই তুই কে, কেনই বা আমাদের তুই বাধা দিলি।"

"আমি লালার স্ত্রী।" দৃঢ় স্বরে খুংড়ী বলে।

"তোর দলের লোক সব কোথায়।" দলপতি জিজ্ঞাসা করে।

"মরেছে। ঐ খাদে পড়ে।" খুংড়ী তাচ্ছিল্য সহকারে উত্তর করিল।

দলপতি উত্তমরূপে সেই স্থান পরীক্ষা করিল। তারপর খুংড়ীকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের লোক ফিরিয়া আসিল।

সর্দ্দার একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। দলপতি সেইখানে খুংড়ীকে আনিয়া উপস্থিত করিল। দলপতি সকল ঘটনা সর্দ্দারকে খুলিয়া বলিল।

তারপর খুংড়ীকে দেখাইয়া দলপতি বলিয়া ওঠে, "এই লালার স্ত্রী, এই একা আমাদের তিন ঘণ্টা বাধা দিয়ে রেখেছে।"

সর্দ্দার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতেছিল। দলপতির কথা শুনিয়া হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল, বলে, "লালার বিয়েই হয় নি; তার আবার স্ত্রী।" তারপর সহসা দুই হাতে খুংড়ীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর বলে, এত আমাদের ডাংরুর মেয়ে।" বলিয়া হোঃ হোঃ শব্দে হাসিল।

হাসি থামলে সর্দ্দার বলিয়া গেল, "এর বাপ আমার বন্ধু; একে ছেড়ে দাও।" দলপতি তৎক্ষণাৎ খুংড়ীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। কিন্তু খুংড়ী চিৎকার করিয়া উঠিয়া বলে, "আমায় খুন কর সর্দ্দার, আমি মুক্তি চাইনে।"

সর্দ্দার ফিরিয়া আসিল ; সস্নেহে খুংড়ীর পিঠের উপর হাত বুলাইয়া বলিয়া উঠিল, "তোর বীরত্বের কথা শুনে আমি মুগ্ধ ; তোর মত মেয়ে এই গ্রামে নেই। তোকে খুন করব না খুংড়ী। তোর বাবাকে বলে, আমি তোকে সর্দ্দারণী করে নেব। কেমন রাজি ?" সর্দ্দারের চোখে লালসার দৃষ্টি।

খুংড়ী উন্মাদের মত হাসিয়া উঠিল, বলে, "কি বল্লে, আবার সর্দ্দারণী করবে ? আঃ কি মজা। কি মজা। আমি সর্দ্দারণী হব।" খুংড়ী কয়েক পা সর্দ্দারের দিকে অগ্রসর হইল।

সর্দ্দারের মন এই কথায় খুসীতে ভরিয়া গেল। সে খুংড়ীর চিবুক স্পর্শ করিয়া বলে, "সত্যি বলছি, তোকে স-র্-দ্দা—"

সর্দ্দারের মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল। সে আর কথা বলিতে পারিল না, বিকট একটা শব্দ করিয়া ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। খুংড়ী তাহার লুক্কায়িত ছোরাখানি সর্দ্দারের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "প্রতিশোধ। প্রতিশোধ। লালা তোর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছি।"

সকলেই এই ব্যাপারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে উপস্থিত সকলে খুংড়ীকে ধরিতে ছুটিল। কিন্তু তাহাকে ধরিবার পূর্ব্বেই খুংড়ী তাহার হস্তস্থিত ছোরাখানি নিজের বক্ষে বসাইয়া দিল।

ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল। সকলে যখন তাহাকে ধরা ধরি করিয়া তুলিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। শত্রু হইলেও এই দৃশ্য তাহারা সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা চোখ বুজিল। কিন্তু তবুও থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের কাণে বাজিতে লাগিল—

"প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ নিয়েছি লালা, প্রতিশোধ।"

স্বপন

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

উঠিছে ফুটি মাধবীফুল আজিকে মধু প্রত্যুষে,
অকারণেই ওষ্ঠে তাহার হাসিটি মৃদু উচ্ছ্বসে।
জুটিয়া আসে ভ্রমরদল
লুটিতে মধু গীতোচ্ছল
মাধব ডাকে মাধবী আজি আপনা বিলায় নিঃশেষে,
রূপে ও রসে গন্ধে ডালি ভরিয়া এলো প্রত্যুষে।
তবুও ঘন সুখের মাঝে বেদনা বাজে অন্তরে,
আজিকার এই কুসুমগুলি টুটিবে কালই বৃন্তরে।
আসিবে পুনঃ মাধব কত
ফুটায়ে তুলে মাধবী শত
আর তো তবু এ ফুলগুলি দিবেনা কভু গন্ধরে,
নিবীড় সরস হরষ মাঝে বেদনা প্রাণে সঞ্চরে।
আজিকে যারা রয়েছে তারা কালই যে হবে অদৃশ্য,
ফিরে না কভু আসিবে যবে মরণ বঁধু অধৃষ্য।
উদাস হিয়া বসিয়া ভাবি
সম্মুখে মোর যা দেখি সবই
সত্য না এ মিথ্যাভরা মোহন স্বপন সুদৃশ্য,
রয়েছে যারা মরণ বঁধু আসিলে হবে অদৃশ্য।

বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের অভিযান

শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে,—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজী, ফার্সী, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না; তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে। লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী।"

(বঙ্গদর্শন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৮৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ)।

বিভিন্ন ভাষাভাষী মনুষ্যসমাজ নানা কারণে পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য হয়। এই সংস্পর্শ ভাষার উপরেও ছাপ রাখিয়া যায়। বিদেশী শব্দ গ্রহণ করিলেই ভাষার জাত যায় না। অনেকে ঐ সকল শব্দকে অনুবাদ করিয়া স্বকীয় ভাষায় 'জল চল' করিবার চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রভৃতি প্রণয়নে অনুরূপ চেষ্টার স্থান থাকিলেও সব সময়েই অনুবাদ করিবার প্রয়োজন থাকে না। বরং স্বাভাবিক ভাবে যে কথাটি চলিয়াছে, তাহাকে অনুবাদ করিলে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে।

বাংলায় প্রায় ৩০০০ শব্দ বিদেশী ভাষা হইতে আসিয়াছে। তন্মধ্যে আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী শব্দের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পর্ত্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালীয়, রুশীয়, স্পেনীয় ভাষার শব্দও বাংলাতে দেখা যায়। হিব্রু, গ্রীক, লাতিন ভাষার শব্দও বাংলাতে কয়েকটি আছে। জাপানী, চীনা, তিব্বতী, মালয়ী, বর্ম্মী ভাষার কথাও বাংলাতে কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে। তুর্কী শব্দও কতকগুলি দেখা যায়। তাছাড়া তামিল, তেলেগু, গুজরাতী, হিন্দী, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাও কিছু কিছু শব্দ বাংলা ভাষাকে দিয়াছে। সংস্কৃত হইতে বিভক্তি-প্রত্যয়যুক্ত যে সমস্ত কথা বাংলায় চলিয়াছে, সেগুলিকেও ঠিক বিদেশী না বলিলেও বাংলা ভাষায় অন্য ভাষাগত শব্দসমূহের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

বাংলায় দীর্ঘকাল মুসলমান রাজত্বের ফলে আরবী ও ফার্সী শব্দের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি জাতি আসিয়া বাংলা ভাষায় স্বকীয় শব্দ-সম্পদের একাংশ দান করিয়া গিয়াছে। ইংরেজী আমলে নদীর স্রোতের মত ইংরেজী শব্দ বাংলা ভাষায় চলিয়াছে এবং আজও চলিতেছে।

কিন্তু এই সমস্ত শব্দ প্রচলিত বাংলা অভিধানসমূহে এখনও স্থান পায় নাই। অথচ বাংলায় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের যে কোনো বই পড়িতে গেলেই এই সমস্ত কথার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বিদেশী শব্দ মুখে মুখে চলিয়াছে, কিন্তু আজও রেকর্ড হয় নাই।

সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ফলে বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় আরবী ফার্সী শব্দের প্রয়োগবাহুল্য দেখা দিয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান কম নয়। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতমূলক ভাষাই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সেকালে হিন্দুরাও আরবী, ফার্সীতে পণ্ডিত ছিলেন। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি হিন্দু লেখকগণের ভাষায় আরবী, ফার্সী শব্দ কম ব্যবহার হয় নাই।

নূতন যুগে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষিগণ বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে নবীন মুসলমান সাহিত্যিকগণ যেন ইহার প্রতিবাদস্বরূপ বাংলায় আরবী ফার্সী শব্দ অপরিমিত সংখ্যায় ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বতন মুসলমান সাহিত্যিকগণ সংস্কৃতমূলক ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মীর মোশাররফ হোসেন, ফজলুল করীম সাহিত্যবিশারদ, ওয়াজেদ আলি প্রভৃতি লেখকগণের ভাষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রতিভাবান্ কবি কাজি

নজরুল ইসলাম বাংলায় বহু আরবী ফার্সী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। দৈনিক "আজাদ" পত্রিকা আরবী-ফার্সীবহুল এক প্রকার নূতন বাংলা ষ্টাইলের অবতারণা করিয়াছেন। অগণ্য মুসলমান পাঠ্যপুস্তক লেখকও এরূপ ভাষার প্রচলনে স্বকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন।

পাঠ্যপুস্তকের মারফৎ এই সমস্ত শব্দের অর্থ বুঝিতে ছাত্রগণ বাধ্য হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলার অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমান শিক্ষক বা গার্জিয়ান এই সকল শব্দের অর্থ জানেন না। এমন কোনও অভিধানও নাই, যাহাতে এই সকল শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। এই অভাব দূর করিবার জন্ত আমি বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের একখানি অভিধান সঙ্কলন করিতেছি। গত বৎসর সত্যাগ্রহী বন্দীরূপে জেলে থাকার সময় আমি অভিধানখানির মাল-মসলা সংগ্রহে মনোনিবেশ করি। জেলে কাগজ-কলম-বই পাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। তবুও চেষ্টা করিয়া আমি প্রায় ৭০০০ বৈদেশিক শব্দ ও তাহাদের অনেকগুলির বাংলাভাষায় প্রয়োগ-স্থল উদ্ধার করিয়াছি। "চৈতন্তচরিতামৃত" হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের প্রসিদ্ধ লেখকগণের পুস্তক হইতে এই সমস্ত শব্দ আহরণ করিয়াছি। জেলে আমাদের শ্রেণীর বন্দীদিগকে "আজাদ" কাগজ পড়িতে দেওয়া হইত। ইহাতেও বহু নূতন শব্দের সংগ্রহ সম্ভবপর হইয়াছিল। বাঙ্গালী শিক্ষিত মুসলমান সমাজে এই সকল শব্দের কতক প্রচলন থাকিলেও, বহু শব্দই বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সাধারণের অপরিচিত। এ দিকে এইরূপ আরবী ফার্সী শব্দের স্রোত চলিয়াছে, অপর দিকে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় ও দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি নবীন লেখকগণের ভাষায় অপরিচিত ইংরেজী শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এমন কি, ফরাসী শব্দের ব্যবহারও দেখা যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য শব্দসমূহের গঙ্গা-যমুনা ধারা বহিয়াছে। শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দুএক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রয়োগ কিছু কম দেখা যায়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াও নিজের রচনাবলী অকারণ বিদেশী শব্দপ্রয়োগে ভারবহুল করিয়া তোলেন নাই।

বাঙ্গালী মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বটতলার পুঁথিসমূহে আরবী ফার্সী শব্দ কম চলে নাই। শুধু লজ্জান বিবির কেচ্ছা হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—

"এলাহি আলমামীন আল্লা গোণ কর মাপ,
আর না সহিতে পারি সাদোয়ানের তাপ।
মাপ কর আল্লাতালা আমার খছবির,
খোড়াখানা দিলাও আল্লা আমার খাতির।"

কবি নজরুলের 'জিঞ্জীর' নামক কবিতা পুস্তকের অধিকাংশ লেখাতেই আরবী ফার্সী শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। 'খালেদ' নামক কবিতাটি পাঠ করিলেই ইহা উপলব্ধি হইবে।

রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি", "গোরা", শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত", প্রমথ চৌধুরীর "চার ইয়ারী কথা", দিলীপ রায়ের "দোলা", অন্নদাশঙ্করের "পথে প্রবাসে", কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আই হ্যাজ", বুদ্ধদেব বসুর "অনেক বয়স", "বনফুলের", "শ্রীমধুসূদন", অচিন্ত্য সেনগুপ্তের "প্রচ্ছদ-পট", বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালি", মীর মবারক হোসেনের "বিষাদ-সিন্ধু", কায়কোবাদের "মহাশ্মশান কাব্য", ওয়াজেদ আলির "মহামানুষ মহসিন্", মোজাম্মেল হকের "মহর্ষি মনসুর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আমার উদ্ধৃত বিদেশী শব্দসমূহ পূর্ব্ব-উপস্থাপিত বক্তব্য প্রমাণ করিবে।

দিলীপ রায় ও বুদ্ধদেব বসু "মনানি", "কারোমিয়ো" এবং অন্নদাশঙ্কর রায় অচিন্ত্য সেন "বুদোয়ার" প্রভৃতি কয়েকটি ফরাসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বসু বহু ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা বাংলা অক্ষরে লেখা হইলেও, বাংলা ভাষায় আজিও চলে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ "কোসটিক" কথাটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক হইতেও অনুরূপ ইংরেজী শব্দের ব্যবহার এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে—যেমন "ফোরক্লোজ" শব্দটি। চৈতন্ত চরিতামৃতের ন্তায় প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থেও অনেকগুলি ফার্সী আরবী শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত কতকগুলি বিদেশী শব্দের তালিকা দিতেছি :—

১। আরবী—আইন, আদালত, আদত, আদব, আদাব, সেলাম, জবাই, জবাব, জমা, জমি, জাহাজ

২। ফার্সী—অক্কা, অছি, অছিলা, অজুহাৎ, আওয়াজ, আবরু, আবাদ

৩। উর্দ্দু—আপস, উরুদ্দু, চাচা, ভাবা

৪। তুর্কী—আগা, তোপ, কুর্ত্তা, কুলী, কোঁৎকা, কোর্ম্মা, খান, উজবুক, চিলমচি, চাকু, চিক

৫। হিন্দী—অটুট, অচ্ছুৎ, আখড়া, আওয়ান, আটা,

৬। গুজরাটী—খদ্দর, খাদি, গরবা।

৭। উড়িয়া—বটুয়া, মণিমা (মণিব)।

৮। আসামী—মুগা, এণ্ডি।

৯। তেলেগু—চিকণ (সুন্দর, চিকণবরণী)।

১০। তামিল—খোকা, মলয় (পাহাড়), মুড়ি (cover) মোটা (ভোতা) চুরুট (সুরুট্ট)।

১১। সংস্কৃত—কিন্তু, এবং, তথাস্তু, অপিচ, কিংবদন্তী, গয়াংগচ্ছ, কৃতার্থম্মন্য, গললগ্নীকৃতবাসার।

১২। হিব্রু—যবন, যীশু।

১৩। গ্রীক—হোরা, খ্রীষ্ট।

১৪। লাতিন—এক হক।

১৫। ডাচ—ইস্কাপন, হরতন, তুরুপ।

১৬। পর্ত্তুগীজ—বালতি, পেরেক, আলমারি, আলকাতরা, আতা, আনারস, নোনা, কামরা, কামিজ, তোয়ালে।

১৭। স্পেনীয়—হরমাদ, আলপাকা।

১৮। ফরাসী—মসিয়ে, তুজুং, কাফে, রেস্তোরাঁ, অডিকলোন, এডিকং, সোফার, কুপে, কুপন, শ্যাম্পেন, শেরী, এমেচার, প্রেরী।

১৯। ইংরেজী—কেয়ার, কলেজ, অর্ডার, অপেরা, অর্ডার, আপ, সিক্ ইয়ারিং, উইল, অন্তরীণ, আড়কাটি, আড়দালি, কেলেঙ্কোরিয়াস, ডোণ্টোকেয়ার।

২০। জার্ম্মাণ—হের, কাইজার, নাজি, রয়টার, গেষ্টাপো।

২১। ইতালীয়—সিনর, ফাসিষ্ট, সগাটেল।

২২। রুশীয়—জার, সোভিয়েট, কুলাক, অগপু, তুন্দ্রা।

২৩। জাপানী—রিক্সা, জুজুৎসু, হারিকিরি, মিকাডো, হাসনুহানা।

২৪। চীনা—লিচু, চিনি, চা, লকেট, সাম্পান, কুওমিণ্টাং, মান্দারিণ, মাঞ্চুকুও।

২৫। তিব্বতী—লামা।

২৬। বর্মী—লুঙ্গি, ফুঙ্গি, কয়া, মগ, ভাপ্পি।

২৭। মালয়—কাকাতুয়া, মুরী (পাখী)।

উপরোক্ত তালিকায় মাত্র কয়েকটি প্রচলিত শব্দ উল্লেখ করা হইল। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, কত ভাষা হইতে বাংলায় শব্দসমূহ আসিয়াছে। বিদেশী শব্দের এই অভিযান এখনও শেষ হয় নাই। এই সমস্ত শব্দ গৃহীত হওয়ায় বাংলা ভাষার সম্পদ বাড়িয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। ভাষাতাত্ত্বিকের চোখ না থাকিলে ইহাদের মূল-উৎপত্তি কোথা হইতে, ধরা সহজ নহে। তবে যেমন দেহতত্ত্ব না জানিয়াও মানুষ ভাত হজম করিয়া থাকে, সেইরূপ সাধারণ মানুষ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট বিদেশী শব্দের আকারগত ও অর্থগত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গবেষণা এক পরম লোভনীয় ব্যাপার। আমা অপেক্ষা সুযোগ্য এবং অধিক অবসরযুক্ত পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আশাকরি সুধীগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

[নাটিকা]

প্রথম দৃশ্য

(স্থান : কলিকাতার মেসের একটি বড় ঘড়, এই ঘরে যোগেশ ও তাহার বন্ধু উপেন ও নরেন উপবিষ্ট। উপেন ও নরেন প্রশান্তভাবে সিগারেটের ধুঁয়ো মাঝে মাঝে বহির্গত কচ্ছেন ; যোগেশ একটা সিগার ধরাতে ব্যস্ত। যোগেশের বয়স ত্রিশ অতিক্রম করেছে, দোহারা চেহারা দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ কোন আফিসে কাজ করেন, মাসিক বেতন একশত টাকা। সকলেই কথোপকথনে ব্যস্ত)।

যোগেশ—ভাই যুদ্ধের জন্য কাপড়ের দাম অত্যন্ত বেশী হয়ে পড়েছে, তাই ভাবছিলাম যে খদ্দরের কাপড় কিনলে কী রকম হয়।

নরেন। আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ, মিলের কাপড়ের দাম বাড়লেও এখন খদ্দরের কপড়ের দাম বেশী। সে দিন ভাই খদ্দরের মেলায় গিয়েছিলাম, একে মোটা তার ওপরে দামও প্রচুর, একবার পড়লে প্রাণ বহির্গত হবার যোগাড় হয়।

উপেন। (চায়ের কাপে একটা বড় চুমুক দিয়া) খদ্দর, খদ্দর কখনও চলতে পাবে না, বাঙ্গালী intellectual ভাবে কাব্য নাটক উপন্যাস পড়বে না সময় পেলেই চরকা কাটবে। যাঁরা খদ্দর প্রচার কর্ব্বার চেষ্টা করছেন তাঁদের এ চেষ্টা কখনও সফল হবে না, কি বল যোগেশ ?

যোগেশ। যখন ভাই চরকায় সুতো কাটার ঢেউ উঠলো তখন স্ত্রীর অনুরোধে একটা চরকা কিনে দিয়েছিলাম। ঠিক সুতো টুতো আর কাটে না, অতো মোটা সুতো কী চ'লে। খাদী প্রচার কর্ত্তে যাওয়া মস্ত বোকামী (হঠাৎ একজন খদ্দরধারী যুবকের প্রবেশ)।

নরেন। কি মশায়, এখানে কি মনে করে ?

যুবক। আজ্ঞে আমি কংগ্রেস কমিটিব লোক। আমার দাদা নিরাপদ দস্তিদার কর্পোরেশনের কংগ্রেসগ্রুপের কাউন্সিলার।

নরেন্দ্র। ও বাবা কংগ্রেস কাউন্সিলারের ভাই, তা'হলে বোধ হয় দাদার জন্যে এখন থেকেই ঘাঁটী তৈরী করে রাখছেন—

যুবক। না মশায়—সে উদ্দেশ্য নয়—

উপেন। তবে চাঁদা নাকী মশায় ? ও সব হবে টবে না—

যুবক। না মশায় চাঁদা নয়—দু'একটা কাজের কথা বলে চলে যাবো।

যোগেশ। (একটা টুল এগিয়ে দিয়ে) বসুন বসুন, ঘেমে অস্থির হয়ে প'ড়েছেন—

যুবক। ধন্যবাদ। শুনুন, এই ছুটী আসছে আপনারা সকলেই বাড়ী যাচ্ছেন, আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে যাতে খাদীর প্রচার হয় তার চেষ্টা কর্ব্বেন। যুদ্ধের ব্যাপাবে ক্রমশঃ মিলের কাপড়ের দাম চড়বে অথচ দেখুন খদ্দরের কাপড়ের দাম বাড়েনি।

উপেন। হাঃ হাঃ হাঃ—দেখছো নরেন, কী পাগলামী। খদ্দর এই কাপড়ের কষ্ট ঘোচাবে ?

নরেন। পাগলামী ব'লে পাগলামী, মস্ত পাগলামী। ও সব চলবে না—কেন কষ্ট করে খাদির মহিমা প্রচার কর্চ্ছেন।

যুবক। আপনারা কেউ যদি খাদির জন্য কিছু কর্ত্তে না চান্ তা হলে আর কি হবে ? একবার চেষ্টা করে দেখুন। কোন রকম চেষ্টা না করেই অম্লান বদনে বলবেন সেও ত চলে না।

যোগেশ। আপনি কি বলেন ?

যুবক। আপনাদের সকলেরই কংগ্রেস কমিটির কাছ থেকে—

উপেন। (উত্তেজিত হয়ে) কংগ্রেস কমিটি ? বাংলা কংগ্রেস আছে মশায় ? কোথায় তার অস্তিত্ব আজ বলুন তো ? দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় গত ; সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশ— বাংলার কংগ্রেস অরাজক।

যোগেশ। এ কথা তোমার বলা ঠিক হবে না উপেন। কংগ্রেস আছে বৈকী তার যা দোষ থাক্ তবু সে কংগ্রেস।

উপেন। নামে ভুললে চল্‌বেনা আজ যোগেশ, যে কংগ্রেসে এতো দলাদলি রেষা-রেষি যেখানে ঐক্যের—

যোগেশ। তা হোক তবু সে কংগ্রেস। যাক (যুবককে) আপনি কি বলছিলেন।

যুবক। আপনাদের সকলেরই কংগ্রেস কমিটির কাছ থেকে তুলোর বীজ চাওয়া উচিত, চাইলেই পাবেন, তুলোর বীজ নিয়ে গ্রামে সব লোকদের দেবেন, যাতে তারা নিজের জমীতে তুলোর গাছ করে তার জন্য তাদের উৎসাহিত কর্ব্বেন। তুলোর গাছ বাড়ীতেই হোল, তারপর গ্রামের অন্ততঃ নারীরা নিজের নিজের জমী থেকে তুলো নিয়ে চরকা কাটেন, তা হ'লে কী আর ভাবনা থাকে।

উপেন। কিন্তু যোগেশের মত সকলের তো মাথা নয় যে এই একশো টাকা মাসিক মাইনে পেয়েও স্ত্রীকে গ্রামে রেখে দেবে?

যুবক। ওর মাথা খারাপ এখনও আছে বলেই ওর কাছেই এসেছিলাম, আপনাদের কাছে তো ঠিক যাই নি। নিজের বাসভূমি, দেশের প্রাণ পল্লীকে ছেড়ে কলকাতায় এসে যারা অল্প আয়ে স্ত্রীও মেয়েদেব চিঠিখানা লিখিয়ে সমগ্র বাঙ্গালী জাতটাকে নিঃস্ব কর্ত্তে বসেছেন তাঁদের কাছে নিশ্চয় যোগেশ বাবুর মাথা খারাপ, আমার তো বটেই। দেশের কাটুনী তাঁতীদের কথা একবার ভাবুন—যাক যোগেশ বাবু আপনার জন্তে তুলোর বীজ রেখে গেলাম, নিয়ে যাবেন দয়া করে—

(বিরক্ত হইয়া প্রস্থান)

উপেন—বৃথা বকে গেল—আবাব একটু শ্লেষও করে গেল। যাক্, এখন কাজের কথা। ওহে যোগেশ আজ টকীতে যাচ্ছো তো?

যোগেশ—না ভাই আজ আর যাবোনা, পাঁচবার গিয়েছি।

নরেন—গিয়েছো তো কী? এরকম ছবি আসে নি।

যোগেশ—বল কী, তবে চল। টিকিটের টাকাটা দি টিকিট কিনে রেখ। তোমরা এগও—আমার একটু দেরী হবে—

নরেন—দাও তা হ'লে টিকিটের টাকাটা—আমরা যাই, তুমি বেশী দেরী কর না—

যোগেশ—এই নাও টাকা—

(টাকা লইয়া উপেন ও নরেনের প্রস্থান)

(যোগেশ একটা আয়নার সম্মুখে তাড়াতাড়ি চুল ঠিক করে স্নো মাখতে ব্যস্ত)

(রামা চাকরের প্রবেশ)

রামা—বাবু এই চিঠিটা এসেছে—

(যোগেশ বিরক্ত হ'য়ে পত্র গ্রহণ করলে—চাকরের প্রস্থান)

যোগেশ—(স্বগতঃ) আঃ চিঠি আসবার আর সময় পেলে না? একে তাড়াতাড়ি তার ওপরে চিঠি (বিরক্ত হ'য়ে পত্র নিয়ে পাঠ)। কেবল টাকার কথা, কুড়ী টাকায় চলে না, এর বেশী আমি কোথায় পাব? স্ত্রীজাতি জানে কেবল টাকা-টাকা-টাকা। (পত্র পড়ে আবার) ও বাবা আবার কাপড় জামার ফর্দ্দ, আর সব খদ্দরের। (বিরক্ত হয়ে পত্র দেরাজে রেখে আবার চুল ঠিক করে) যাই বায়োস্কোপে যাই—

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(স্থান : দরিয়াপুর গ্রাম—সামান্ত একতালা বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় যোগেশের স্ত্রী সরলা একটা চবকা ঘুবিয়ে সুতো কাটছেন। সরলার পার্শ্বে তুলোর গাছ সব হেলে দুলে যেন আনন্দ প্রকাশ করছে—দূরে পাখীব মধুব কলরব শ্রুত হচ্ছে, দূরে আকাশে একখানা ছোট মেব এদিক ওদিক ভেসে বেড়াচ্ছে। সরলার সৌন্দর্য্য অনবদ্য, গায়ের রং প্রায় ইহুদীদের মত, ঘন কুঞ্চিত কেশ, বেণীবদ্ধ না হওয়াতে বাতাসে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। সুন্দর ওষ্ঠাধর মাঝে মাঝে বিকম্পিত হচ্ছে, যদিও বয়স প্রায় পঁচিশ হবে তবু যৌবনের রেশ আজও বর্ত্তমান সুন্দর মুখে, বড় বড় দোসে অন্তরের গভীর ব্যথা যেন মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে)।

সরলা—আনন্দময়ী আসছেন কী না তাই আজ আনন্দে সকলেই উৎসব কচ্ছে। আমার সংসার চলে না, ওঁকে পত্র লিখলাম তারও উত্তর আজও পেলেম না। কিন্তু তবু, তবুও আনন্দময়ীর দয়াতে আজ আমারও মন যেন আনন্দে ভরে উঠেছে, মা এসো—কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীর মুখে হাঁসি ফোটাও মা, (চরকার প্রতি) তোমাকে নিয়ে যখন বসি তখন সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যাই—

(এই সময়ে সরলার পাঁচ বছরের মেয়ে তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে প্রবেশ করলে) (মেয়ের নাম সুরমা)

সুরমা—মা বড় খিদে পেয়েছে—

সরলা—সুরু ভাত ত ঢাকাছিল খাস্‌নি কেন ?

সুরমা—মা আজকে খোকার বড় খিদে পেয়েছিল তাকে ঐ ভাত খাইয়ে দিয়েছি।

সরলা—ওঃ ভগবান! দেখ সুরু ফেন আছে তাই একটু নুন দিয়ে খা—কি করব, ঠাকুরপোকে বলেছিলাম মুড়ী কিনে আনতে সে ভুলে গিয়েছে। ঠাকুরপো আর কত খাটবে, যা ফেন্ একটু নুন দিয়ে খা।

সুরমা—না মা আমি ফেন্ খাব না—ফেন খাই—কিন্তু ফেন খেতে খারাপ লাগে—পয়সা দাও—

সরলা—তুই ফেন খাস খোকাও ফেন খায়, কেমন সুন্দর গোলগাল চেহারা তোদের, কোন অসুখ হয় না।

সুরমা—না মা পয়সা দাও—জিলিপী কিনে আনি—

সরলা—সুরু হাতে একটাও পয়সা নেই—সত্যি বলছি। যা মা লক্ষ্মী, ফেন নুন দিয়ে খা, উনি কাল পরশু আসবেনই—এক টিন বিস্কুট পাবি।

খোকা—মা, বাবা বিকু

সরলা—হ্যা খোকা বিস্কুট (সরলার হাস্য)

সুরমা—(সহাস্যে) ঠিক—(খোকার হাস্য) বিস্কুট পাব তো মা? মা বাবা কবে আস্‌বেন।

সরলা—কাল পরশুই আসবেন বোধ হয়—বিস্কুট নিশ্চয়ই পাবি—

সুরমা—(হাস্য—মুখেতে এমনি ভাব যেন সে কোন মধুর স্বপ্ন রাজ্যে চলে গিয়েছে সেখানে তার বাবা শুধু বিস্কুট নয় আরও প্রচুর খেলনা জামা ইত্যাদি এনেছেন আর সে যেন সেই সব নিয়ে ব্যস্ত) আচ্ছা মা তা হ'লে খেতে যাচ্ছি (সহাস্যে প্রস্থান)

সরলা—(সুতা কাটিতে কাটিতে) খোকা চুপ করে বস।

খোকা—মা, বাবা বিকু (হাস্য)

সরলা—হ্যা, বাবা বিকু (হাস্য)

(গোয়ালিনীর দুধের ঘটী নিয়ে প্রবেশ)

গয়লানী—মা ঠাকরুণ প্রায় ৬টা টাকা বাকী হোল আমি কাল থেকে দুধ দিতে পারব না।

সরলা—না গয়লানী, আমি তাঁকে টাকার জন্য লিখেছি, টাকা এলেই পাবি—খোকার দুধটা আর বন্ধ করিস নে।

গয়লানি—না মা ঠাকরুণ আর চলছে না, কাপড়ের দাম বেড়ে গিয়েছে, খড় টড় সব দাম চড়ে গিয়েছে—বাকী—।

সরলা—তুই তো কথা শুনবি না, বললাম চরকা কেটে সুতো কর—সুরেন বাবুর তাঁতের কলে দিলে অতি সস্তায় কাপড় পাবি তা তো শুন্‌বি না।

গয়লানী—হ্যা মা, কালু মেথর, জুগী চাষা সব বলছিলো বটে সে তোমার কথা শুনে সুতো কেটে সুবিধে হয়েছে।

সরলা—তুইও তাই কর, উনি এলেই টাকা পাবি—খোকার দুধটা আর বন্ধ করিস নে—

গয়লানী—মা গয়লা আজ দুধ আনতে দিচ্ছিল না আমি জোর করে দুধ এনেছি, তোমাকে মা ভক্তি করি তাই এনেছি।

সরলা—আমি দেখছি অন্ততঃ একটা টাকা দেবো এখন দয়া করে খোকার দুধ বন্ধ করিস নে।

গয়লানী—আচ্ছা দুধ দেবো মা, প্রণাম হই মা ঠাকরুণ।

(দুধ বাটীতে ঢালিয়া প্রস্থান)

সরলা—(দুধ উঠিয়ে ছেলেকে বুকের ওপর রেখে চুম্বন করে) খোকা, খোকা তোর দুধ বন্ধ করে দেবে, বাবা আমার—আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো)।

(গোলাপ ফুলের মতন শিশু মার গলা জড়িয়ে চুম্বন করে)।

(ধোপার প্রবেশ)

সরলা—দেখ তোকে একবার ডেকেছিলাম।

ধোপা—মা তোমার কাপড় বলে এতোদিন কেচেছি দাম অনেক জমে গিয়েছে—কি করে কাপড় কাচি বলো মা, তোমাকে—

সরলা—ওরে দেখ উনি কাল পড়শুর মধ্যেই আসবেন, শিগ্‌গীর এ সব ময়লা কাপড় চোপড় কেচে দে, টাকা পাবি।

ধোপা—মা মা, তুমি ঐ রকম বলো বাবু আসেন, তারপর টাকা না দিয়েই চলে যান্। মা তোমাকে আমরা ভক্তি করি তাই কথা ঠেল্‌তে পারি না।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা—(ধোপার হাত ধরে)—দেখ বাবা আসছেন

দেখতো আমাদের সব কাপড় কি ময়লা হয়েছে, শিগগীর কেচে দে।

ধোপা—(আদরে সুরমাকে জড়িয়ে) মা ঠাকরুণ, তোমার মেয়েকে দেখলে টাকা কড়ির সব কথা ভুলে যাই। মা আমারও ঠিক ঐ রকম ৫, ৬ বছরের মেয়ে ছিল, দু'দিনের জ্বরে মরে গেল, সে আমায় বড় ভালবাসতো মা ঠাক্‌রুণ। (সুরমাকে) আজ কাপড় ওবেলা নিয়ে যাব বেটী।

সরলা—আহা, অমন মেয়ে দু'দিনের জ্বরে মরে গেল—তোমার ছেলেপিলে কি?

ধোপা—মা আর একটা ছেলে আছে বছর পনের হবে—বেটা ভারি পাজি। ছেলের মার কথায় ইস্কুলে দিলাম, কিছুদিন বেশ পড়লো, তারপর পড়া শুনোতো ছেড়ে দিল। আর কাপড় কাচতে চায় না, বেটা ভারী শয়তান। যাক ওবেলা কাপড় নিয়ে যাব মা। প্রণাম হই। (ধোপার প্রস্থান)

সুরমা। মা আমি নরেশ বাবুর বাড়ী যাব। ওদের মেয়েরা আমায় খেলতে ডাকছে বলেছে। যে মোটর গাড়ী করে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবে।

সরলা—আচ্ছা মা (খোকাকে কোল থেকে নাবিয়া) (খোকাকে)"বস খোকা" (স্বগতঃ) তাই তো এখন কি করি? কুড়ী টাকায় আর চলে না, তবুও তো চরকা কেটে সুতো করে কাপড় চোপড়ের খরচ যতদূর সম্ভব কমিয়েছি। ঝি ছাড়িয়ে দিয়েছি। উনি বরাবরই ভাল অবস্থায় থেকে এসেছেন, সে অবস্থায় থাকতে হলে সত্তর আশী টাকার কমে হয় না, কল্‌কাতায় উনিই বাকী কর্ব্বেন?

(সুরমার হাত ধ'রে দেবর বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়—বৌদি, সুরু জমীদার নরেশবাবুর বাড়ী যাচ্ছে কেন? আর তুমিই বা ওকে যেতে দাও কেন?

সরলা—কেন ঠাকুরপো, তাতে দোষ কী—খেলতে যায়—

বিনয়—না জমীদারের বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। (সুরমাকে) সুরু আমি যে কাঠের খেলনা করে দিয়েছি ও তুই টিনের যে এনজিন তৈরী করেছিস তাই নিয়ে খোকার সঙ্গে খেলা করগে।

(সুরমার বিষণ্ণ মনে খোকাকে লইয়া প্রস্থান)

সরলা—কেন ঠাকুরপো—কী দোষ।

বিনয়—দোষ আছে বৈ কী বৌদি। সুরু তার ভাঙ্গা টীনের বাক্সতে কাঠের পুতুল টীনের অপূর্ব্ব ইঞ্জিন তাই নিয়ে খোকার সঙ্গে মনের আনন্দে খেলা করে—জমীদার বাড়ীর মেয়ের ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে খেলনা ভাল ভাল বাক্সতে দেখতে পেয়ে সুরুর নিজের খেল্‌নার উপর অভক্তি হবে—তার মনে যে পবিত্র আনন্দ আছে তা লোপে পাবে আমাদের বাড়ীর ভাঙ্গা তক্তাপোষ, ভাঙ্গা টেবিল সুরু দেখে আর ভাবে এই কতো ভাল, তার কাছে এই প্রিয়, কিন্তু যে দিন ওদের বাড়ীতে পাথরের টেবিল, বড় বড় দামী আলমারী ড্রেসিং টেবিল দেখবে সেই দিনই মনে ভাববে যে আমরা কত গরীব—হীন অবস্থা ভেবে বাড়ীর ওপর ভক্তি হারিয়ে ফেলবে। তার তো আর বোঝবার শক্তি নেই যে নিজের ভাঙ্গা ফুটো জিনিষই ভাল।

সরলা—ঠাকুরপো ঠিকই বলেছো—আমি এত তলিয়ে বুঝি নি, যেতে দেবো না। (সরলা অগ্রসর হয়ে দেবরের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে) ঠাকুরপো এখন একটা উপায় করতে হবে যে ভাই।

বিনয়—(হাঁসিয়া) কিসের উপায়?

সরলা—ঠাকুরপো, গয়লানী আজ বলে গেল, টাকা না পেলে গয়লা আর তাকে দুধ আন্‌তে দেবে না। তবে কী হবে? দেখে আমার এ বালা নিয়ে গিয়ে কারুর কাছে বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা আন, তা নইলে অন্য কোন উপায় দেখছিনে।

বিনয়—(বৌদির হাত ছেড়ে) না না সে আমি পারব না—এই পূজোর দিনে এমন সময়ে তুমি হাত খালি করবে বৌদি? ছিঃ ছিঃ তা হতে পারে না।

সরলা—ঠাকুরপো তোমারই কী কম কষ্ট? নিজে টিউশনি করে ম্যাট্রিক পড়ছো যখন দরকার দিচ্ছই, লক্ষ্মী ভাই আমার (সান্থনয়ে হাত ধরে) নিয়ে যাও বালাটা।

বিনয়—সে কথা যাক বৌদি ছেলে বয়সে আমি মা হারিয়েছি, বাবা আগেই গিয়েছেন তুমি এসে কেবল কষ্টই পেলে, তুমি শুধু আমার বৌদি নয় আমায় মানুষ করছো বল কত টাকার দরকার?

সরলা—ভাই টাকা পাঁচেকের দরকার চারটাকা গোয়ালা আর একটাকা ধোপাকে দিয়ে থামান দরকার।

বিনয়—এই কথা। এর জন্যে বালা বাঁধা দিয়ে...টাকা আমি এখনই এনে দিচ্ছি, ভেবো না তুমি। দাদার কাপড় ও আমার কাপড় কাল সকালে পাওয়া যাবে তাঁতের কল থেকে, এতো সুতোই কাটতে পারো বৌদি—

সরলা—কৈ খোকা বড় বিরক্ত করে যে মাঝে মাঝে, ওকে আবার থামাতে হয়।

বিনয়—যুদ্ধ বেধে কাপড়ের দাম দ্বিগুন হয়ে গিয়েছে এখন বোধ হয় দেশের লোক বুঝবে বৌদি যে "চরকা কাটো" শুধু ভুয়ো কথা নয়। আচ্ছা আমি টাকা নিয়ে আসি

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(স্থান কলিকাতা যোগেশের মেসের ঘর যোগেশ
উপেন, নরেন সকলেই চা পান করছেন.
উপেনের মুখে চুরুট, নরেনের মুখে
সিগারেট)

নরেন—যোগেশ আজ তো বাড়ী যাবি কিন্তু শুধু চা, একটু চপ ক্যাটলেট আনা ভাই। হোটেল তো নীচেই।

উপেন—হ্যাঁ হ্যাঁ যোগেশটা দিন দিন কঞ্জুষ হয়ে পড়ছে, এই গরম তাতে আবার আগেই ঘরের ফ্যানটা ফেরত দিয়েছে।

যোগেশ—ফ্যানটার সে এ কয়দিনের জন্ত পুরো মাসের ভাড়া নিত—ওরে রামা যা চারটে চপ চারটে মাটন্ ক্যাটলেট নিয়ে আয়।

উপেন—(সোৎসাহে) এই বার জম্‌বে ভাল—এখন কথাটা হচ্ছে কে সত্যিকারের বড় অভিনেত্রী, টকীতে দেখছি তিনজনকে কানন, সাধনা, লীলা দেশাই।

নরেন—কানন—কাননের মত অভিনেত্রী, যেমন গান করে তেমনি অভিনয় করে—Expression-এর রাণী।

উপেন—দেখ্, নরেন, গান সম্বন্ধে আমি ভাল বুঝি, অভিনয় না হয় তুই ভাল বুঝিস্—কানন মোটেই এমন কিছু গায় না—গলায় কাজ নেই।

নরেন—আমি যে গান সম্বন্ধে কিছু বুঝিনা তা নয় উপেন, গলার কাজের যায়গা বাংলা গান নয়—আগে কথা তারপর সুর—সুরের কাজ হচ্ছে কথাকে ফোটান। তা যদি কানন বেশী গলার কাজ না জেনেও পারে, আর তার গান যখন বাংলা গান তখন সে বেশ কিছুই গায়—তারপর গহনা বল, শাড়ী বল সব নূতন design বার করে ফেল্‌লে। কানন ginius—

(চপ কাটলেট ইত্যাদি এলো, সকলে সোৎসাহে আহারে প্রবৃত্ত)

উপেন—যাক ও কথা যাক্, এখন কথা হচ্ছে যোগেশ আজ গম্ভীর কেন।

যোগেশ—বড়ই বিপদ ভাই, স্ত্রীর বিরাট ফর্দ্দ অথচ হাতে বিশেষ কিছু নেই।

উপেন—তা ভাববার কথা বটে।

নরেন—কিসের ভাববার কথা, পূজোর সময় বেশী দাম দিয়ে কাপড় কেনাটা একটা মহা বোকামী কুসংস্কার—যোগেশ কিছু কিনিস্ নে।

যোগেশ—তাও কী হয় চ'ল্ ভাই বেরোবে।

উপেন—তাই ভাল—তা হ'লে আমরা উঠি—Wish you good luck. (উভয়ের প্রস্থান)

যোগেশ—তাই তো এখন করি কি। মোট চল্লিশটী টাকা হাতে আছে, তার মধ্যে যাতায়াতের খরচ, সংসারের খরচ, পূজোর কাপড়—কুলিয়ে উঠি কেমন ক'রে—অনবরত থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখা। (রামা চাকরের প্রবেশ)

রামা—বাবু চিঠি—(পত্র দিয়া প্রস্থান)।

যোগেশ—(পত্র খুলে) ওঃ (সহাস্তে) সুরু চিঠি লিখেছে, বাঃ বেশ হাতের লেখা হয়েছে তো! খেল্‌না আর বিস্কুট আন্‌তে লিখেছে, সুরু—সুরু যাই দেখি এরই মধ্যে যা পারি নিয়ে যাই (প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য

(মহাসপ্তমীর প্রভাত, গ্রাম দরিয়াপুর, যোগেশের বাড়ীর একটা ঘর, দরজা উন্মুক্ত, বাড়ীর পুষ্করিণীর কিঞ্চিৎ দেখা যাচ্ছে…দূরে দুই তিনটী নারিকেল গাছের উপর সূর্য্যের রশ্মি এসে প'ড়েছে, খানিকটা রৌদ্র দরজার মধ্য দিয়ে ঘরে এসেছে, দূরে পূজোর বাজনা মাঝে মাঝে বেজে থেমে যাচ্ছে। যোগেশ তক্তাপোষে ব'সে সিগারেট টান্‌ছে ব্যস্ত ও তার বাল্যবন্ধু শশধর (ওকালতী করেন) চা ও কিঞ্চিৎ জলযোগে ব্যস্ত।

যোগেশ—তুই তো একজন বেশ বড় পশারে উকীল হয়েছিস্ কী বলিস।

শশধর—তোদের আশীর্ব্বাদে ভাই বেশ ভাল চ'লছে।

যোগেশ—(সহাস্তে) তুই যে ভারী দেশভক্ত দেখছি। একেবারে খদ্দরের কাপড় জামা—এ পরতে তোর কষ্ট হয় না।

শশধর—যদি কষ্টই হয় তবুও সে কষ্ট আমাদের করা উচিত ভাই—মিল সব অচল, সুতোর অভাব কলকব্জা খারাপ হয়ে গেলে ত আবার বদ্‌লান কঠিন। সুতোর সমস্তা একমাত্র চরকাই সমাধান কর্ত্তে পারে। যুদ্ধের বাজারে খদ্দড়ের কাপড় আর মিলের কাপড়ের দর প্রায় সমান্‌ই দাঁড়িয়েছে—এখনও বোধ খদ্দরের দাম বাড়েনি—

যোগেশ। চরকা কেটে কেমন করে, দুর্দ্দশা দেশের ঘুচবে তা বুঝতে পাচ্ছিনা।

শশধর—চোখটা বদ্‌লাতে হবে, তা নইলে কী করে দেখবি (হঠাৎ তক্তাপোষের ঠিক চাদরের দিকে লক্ষ্য করে) যোগেশ তুই ও যে কম দেশ ভক্ত তাতো বুঝতে পাচ্ছিনা। খদ্দরের চাদরটা কত দিয়ে নিয়ে এলি ?

যোগেশ—এ খদ্দরের চাদর নাকী ? তাই তো, এ চাদর তো আমি আনিনি।

শশধর—তোর স্ত্রী তো চরকা কাটতেন।

যোগেশ—ভাই নতুন যখন ঐ চরকার ঢেউ উঠলো তখন স্ত্রীর কথায় একটা ভাল চরকা কিনে দিয়েছিলাম—সে আর বোধ হয় তেমন চরকা কাটেনা।

শশধর—তুই বাড়ীর সব খবরই সমান রাখিস্ দেখতে পাচ্ছি তা হ'লে। এ চাদরটা কোত্থেকে এলো ?

যোগেশ—কি জানি ?

শশধর—বিনয়, বিনয় (যোগেশের একমাত্র ছোট ভাই বিনয়ের প্রবেশ) বিনয়, এ চাদরটা কোত্থেকে এলো ?

বিনয়—বৌদি কী রকম সুতো হবে তাই খানিকটা কেটে কাটুনীর কাছে দিয়েছেন, তারা তুলো নিয়ে গিয়েছিলো সুতো কেটে সেই সুতো তাঁতীদের কাছে দিয়েছিল, তাঁতীরা বুনে দিয়েছে।

যোগেশ—তাই নাকি ?

শশধর—এইবার বুঝতে পেরেছিস্।

যোগেশ—খদ্দড় প'র্‌লে কাটুনী ও তাঁতী দু'জনেই খেতে পাবে।

যোগেশ—হাঁরে খোকা, তোর বৌদি এখনও সুতো কাটে ?

বিনয়—(সহাস্তে) কাটেন বৈ কী। (প্রস্থান)

শশধর—যোগেশ, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

যোগেশ—কী কথা ভাই।

শশধর—বৌমা নাকী ঝি ছাড়িয়ে দিয়েছেন, ছেলে মেয়েদের খাবার টাবার যা কেনা, বৌমা নিজে বাসন মাজেন একশত-টাকা তো পাস্ কত টাকা পাঠাস্ ?

যোগেশ—সে কী ? ঝি টি নেই, সরলা বাসন মাজে—এ সব তো কিছুই জানিনা আমি, তোকে কে ব'ল্‌লে ?

শশধর—কে আবার বল্‌বে—পাতার মাকে জিজ্ঞাসা কর্চ্চি সেই বল্‌বে, অমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে পেয়ে কদর বুঝলি নে—যে স্ত্রী সংসারের সব কাজ মাথায় পেতে নেয়, সংসারের কাজ কর্ম্মে একজনের সহায়তা না নিয়ে সব কাজ করে, চরকা কেটে সুতো কেটে দেশের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, অমন স্ত্রীকে তুই দেখিস্ না ?

যোগেশ—সত্যি তোকে ব'লছি, ভাই আমি এসব বিষয়ে কিছুই জানি না।

শশধর—শোন্, কিছু টাকা হাতে আছে না সব থিয়েটারে না হয় তো বায়োস্কোপ আর চার দোকানে হোটেলে দিয়ে এসেছিস—কলেজে প'ড়বার সময় দেখেছিলাম যে তোর বায়স্কোপের ওপর ভয়ানক টান ছিল। সেটা গিয়েছে না পূর্ণমাত্রায় আছে—আমি ব'ল্‌ছিনে যে বায়স্কোপ দেখা খারাপ, তবে নিজের স্ত্রী ছেলে পিলেকে খেতে দিয়ে আর্টের cultureটা কর্‌লে ভাল হয়—সত্যি বল, টাকাকড়ি হাতে আছে কি না।

যোগেশ—চ'লে যাবে।

শশধর—বৌমাকে আর কষ্ট দিস নে, ঝি রাখিয়ে দে, খাবার-দাবারের যেন কোন কষ্ট না হয়।

যোগেশ—শশধর, সত্যি বল্‌ছি সরলা আমাকে কিছু বলেনি।

শশধর—যে স্বামী স্ত্রীকে সত্যিকারের ভালবাসে তা'র স্ত্রীর আর কিছু ব'ল্‌তে হয় না—ক্রমশঃ—

(সুরমার দ্রুত প্রবেশ)

সুরমা—কী কাকাবাবু (শশধরকে প্রণাম)

শশধর—আরে এবেটী যে খদ্দরের শাড়ী প'ড়ে এসেছে, এশাড়ী কোথায় পেলি ?

সুরমা—মা সুতো কেটে রেখেছিলেন—তাই দিয়ে শাড়ী হয়েছে।

যোগেশ—তাই ত।

শশধর—তাইত কীরে দেখ্, দেখ্—সুরু এই নে দুটো পুতুল—তোর আর খোকার (দুইটী বড় পুতুল দিলেন)

সুরমা—কাকাবাবু পুতুলের গায়ে খদ্দরের জামা।

শশধর—অ্যাঁ—

সুরমা—কাকাবাবু বেশ সুন্দর পুতুল—মা, মা (সোল্লাসে প্রস্থান)

শশধর—ভাই, এখন উঠি, সন্ধ্যার সময় আস্‌ব।

যোগেশ—এস ভাই (শশধরের প্রস্থান)

যোগেশ—(গম্ভীর ভাবে ব'সে বিষণ্ণমুখে দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) তাইত এত কষ্ট সরলার। যার ছেলে মেয়ের খাবার জোটে না, স্ত্রী পয়সার অভাবে দাসী রাখেনা, নিজে বাসন মাজে, আর এত কাজের মধ্যেও চরকা কেটে মহাত্মার বাণীকে পূজা করে, আর আমি তার স্বামী হ'য়ে কলকাতায় থিয়েটার, বায়োস্কোপে টাকা উড়িয়ে ভেড়ী ফিরিয়ে আদ্ধীর পাঞ্জাবী পরে স্নো মেখে সকালে চা খ'বার টেবিলে বসে গম্ভীর ভাবে তর্ক করি খাদির প্রচার করা মস্ত বোকামী ; আর এমন স্ত্রীর চিঠিটা পর্য্যন্ত পড়ি না। ওঃ।

সরলার এক খদ্দরের কাপড় নিয়ে প্রবেশ)

সরলা—(প্রণাম করে) এই কাপড় তোমার জন্যে বুনিয়ে রেখেছি।

যোগেশ—(স্ত্রীর হাত ধরে) তোমার দান সাদরে গ্রহণ কর্‌লাম—সরলা তোমার এতো কষ্ট আর আমি কিছুই জানি না।

সরলা—তুমি আছ, আমার কী কষ্ট গো ? এসো

(স্বামীকে নিয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ)

পঞ্চম দৃশ্য

(স্থান—যোগেশের বহির্ব্বাটীর মাঠ দলে দলে চাষী তাঁতী আস্‌ছে। সরলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকেই "প্রণাম হই মা ঠাকরুণ" ব'ল্‌ছে। দলে দলে চাষী তাঁতীরা প্রণাম করে যাচ্ছে। সূর্য্যের শেষ কনকরশ্মি সরলার হাস্যোজ্জ্বল পবিত্র আননে এসে প'ড়েছে—সুন্দর মুখ যেন এক দেবী দাঁড়িয়ে আছেন)।

যোগেশ দূর থেকে দেখছে নির্ব্বাক বিস্ময়ে বাংলার জাগ্রত দেবীকে—যাঁর মুখ চোখ সমস্বরে ব'ল্‌ছে "ওরে চাষী, ওরে তাঁতী, ওরে কাটুনী ভয় নেই, ভয় নেই তোদের মা বোন সব জাগ্রত হয়েছে তোদের বাঁচাতে"। যোগেশ অবাক্ হয়ে দেখছিল হঠাৎ তার পরিচিত এক তাঁতী ব'লে উঠ্‌লো "বাবা প্রণাম হই" সে যেন চমক ভেঙ্গে চেয়ে দেখ্‌লো। পরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে।

যোগেশ—কী ব্যাপার ব'ল্‌তো ? গতবার পূজোর সময় বাড়ী আসিনি। গতবারেও কী এই রকম ব্যাপার ঘটেছিল ওরা সব সরলাকে প্রণাম কর্চ্ছে কেন ?

নীলু—বাবা জানেন মার দয়াতে আজ এই দরিয়াপুর গ্রামের চতুর্দ্দিকে যত গরীব তাঁতী কাটুনি খেতে পাচ্ছে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের জন্য এত কষ্ট হ'লেও এখানকার তাঁতী চাষী কাটুনীর তত কষ্ট হয়নি।

যোগেশ—কী ব'ল্‌ছিস্।

নীলু—ব'লবো আর কী বাবু, বাংলার ঘরে ঘরে যদি চরকা চ'লে, সকলে যদি খাদি পরে আমাদের কী ভাবনা থাকে ?

(ধীরে ধীরে জনতা কমে গেল—সন্ধ্যার অন্ধকার
ঘনিয়ে এসেছে—যোগেশ ঘরের মধ্যে
প্রবেশ করেছে।
সরলাও এসে উপস্থিত হয়েছেন)

যোগেশ—সরলা তুমি সাক্ষাৎ দেবী, সরলা—

সরলা—কী যে বল তার ঠিক নেই—তুমিই আমার জাগ্রত দেবতা, তুমি।

যোগেশ—না না তোমার যোগ্য আমি নই সরলা—

সরলা—কী যে বল (স্বামীকে কাছে টানিয়া লইলেন)—

যবনিকা

মনের বাঘ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

মান্দ্রাজের কাবেরী নদীর তীরস্থিত শ্রীরঙ্গম্ সহরের শ্রীরঙ্গনাথজীর মূল মন্দিরে প্রবেশ কত্তে হ'লে পরের পর সাতটা দেয়ালের বেষ্টন পার হয়ে যেতে হয়। আপনার ঐ যে বহির্ম্মনোহর নয়ন-তৃপ্তিকর নশ্বর দেহটী, তারও ঠিক মধ্যখানে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিমঠামে দাঁড়িয়ে আচেন যে ভক্তমন-মনোহর নবনটবর কঙ্কালমূর্ত্তি—তাঁরও চরণ-পদ্মে পৌছুতে হ'লে সাতটা না হোক্—অন্ততঃ পাঁচটা বিভিন্ন প্রকৃতির স্তর ভেদ ক'রে যেতে হয়।

রঙ্গনাথজীর মন্দির বেষ্টিত এই সপ্ত দেয়ালের প্রত্যেক-টীতেই দোর আচে—সুতরাং প্রবেশ সহজ। কিন্তু আপনার দেহ-মন্দিরে অধিষ্ঠিত এই দেবতাকে বেষ্টন করে রয়েচে যে পঞ্চস্তর,—তার কোনটীতেই প্রবেশের কোনও পথ নেই, কাজেই প্রবেশ অত্যন্ত কঠিন। শাস্ত্র বলে, যে তীর্থের মাহাত্ম্য যত বেশী যাত্রাপথ তার তত দুর্গম। এ মহাতীর্থের পথ যখন এত সঙ্কট-সঙ্কুল, মহিমা যে এ দেবাদিদেবের কি অপার, কী অসীম, কার সাধ্য ইয়ত্তা করে?

আপনি বুদ্ধিমতী বুঝতেই পাচ্ছেন, কাঁটার আঁচড়টী গায়ে লাগবে না এমন ক'রে কি এতবড়ো কঠিন কাজ হয়। অতএব প্রস্তুত হোন কাঁটার আঁচড়ের চেয়েও বড়ো আঁচড় অর্থাৎ একটী সূচের ফোড় খাবার জন্যে।

ছেলে বেলায় উড়ে পাণ্ডার গান শুনেছিলাম—

"জগন্নাথের পথে যেতে
পায় ফোটে কাঁটা".

আপনি জগন্নাথের চেয়েও বড়ো দেবতার কাছে চলেছেন—তাই পায়ে ফুটলো না—ফুটলো আপনার গায়ে। আর কাঁটা নয়—একেবারে একটা আসল দশ নম্বরী সূচ। নিন ঠিক হয়ে বসুন—সূচটা আপনার ঐ ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-বেদনা-ভীতি চঞ্চল অমল ধবল দেহে ফুটিয়ে দিচ্চি। চমকাবেন না—এক্ষনি কিছুই লাগবে না—সূচের ডগাটী এখন চামড়ার যে পাতলা চিক্কণ অংশটীতে ফুটে বসল, এই হলো এই দেব-দেউলের প্রথম স্তর। একে বলে epedermis (এপিডারমিজ) বা উপচামড়া। সূচটা চামড়া ভেদ ক'রে গেল—আপনার লাগলও না—রক্তও বেরুল না—অদ্ভুত মনে হচ্চে না কি? কারণ জানতে আপনার ইচ্ছে হচ্চে না? অবশ্যই হচ্ছে—কি জানেন, nerve (নার্ভ) বা স্নায়ুতে লাগলেই মানুষের লাগে, রক্তের নাড়ী শিরা বা ধমনী জখম হলেই রক্ত বেরোয়। শরীরের এত ওপরে ওরা কেউ এসে পৌছুতে পায় নি—কাজেই লাগবে কেমন করে? রক্তই বা আসবে কোত্থেকে?

বগদাদী কথায় আপনি "পুছ" কত্তে পারেন—"আমার এই উপচামড়াটা কতটা পুরু?" সব জায়গায় সমান নয়, হাতের ও পায়ের তলার মত কড়কড়ে জায়গায় এক ইঞ্চির কুড়ি ভাগের একভাগ, নরম জায়গায় এক ইঞ্চির দু' শ'ভাগের একভাগ।

দাঁড়ান সূচটা আর একটু চেপে বসাচ্চি। কি অমন কচ্ছেন কেন? আপনার এখনও কৈ লাগে নি—এবার সূচটা ঢুকলো গিয়ে দ্বিতীয় স্তরে—এটা রংএর স্তর। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষের গায়ে বিভিন্ন রংএব cell (সেল) বা কোষ সাজিয়ে দেয়া থাকে। নিগ্রোরা যে কাল, আমেরিকার আদিম নিবাসীরা যে তামাটে, জাপানীরা হ'লদে, আমরা যে বিচিত্র বর্ণের, এই সেল বা বর্ণ-কোষই তার কারণ।

এই স্তরটা যদি শরীর থেকে বাদ দেয়া যেত, পৃথিবীর সব মানুষই শাদা হয়ে যেত। দেশে বিদেশে বর্ণ-বৈষম্যের এই যে বিশ্রী রোগ, একদিনে আরাম হ'য়ে যেত। কালো মেয়েটীকে নিয়ে রামবাবুরও এমন নাকানি-চুবোনি খেতে হতো না।

এইবার সূচটা আর একটু চাপচি—"উঃ বাপরে বাপরে!" বুঝেচি, একটু লেগেচে। কিন্তু যেরকম চেঁচিয়ে উঠলেন লোকে মনে করবে বুঝি বোমা পড়ল? "উঃ আঃ" অত কি, শুনুন—এবার যেখানে সূঁচটা গিয়ে ঢুকল সেটা

তৃতীয় স্তর—এখানে আছেন dermis (ডারমিজ্) বা সত্যিকার চামড়া। এটার সঙ্গে মাংসপেশী—আর চুলের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু এবং রক্তের নাড়ীগুলো চিদম্বরমের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির মত গায়ে গায়ে মিশে আছে। চামড়াটার গায়ে খোঁচা পড়তেই ওদেরও গায়ে গিয়ে লেগেছে। আর আপনি ব্যথা পেয়েছেন, পেতেই যে হবে, এই যে শিশির-বিন্দুর মত (অবশ্য সাদা নয়) বিন্দু বিন্দু রক্তও দেখা দিয়েছে। দেবেই যে। এইবার সূচটা আর একটু বসে চামড়ার রাজ্য ছেড়ে চতুর্থ স্তরে fat (ফ্যাট) বা চরবির রাজ্যে গিয়ে হাজির হ'ল। এখানে আছে বর্ণকোষের মতন অসংখ্য কোষ সারা স্তরটা জুড়ে। অবশ্য বর্ণের বদলে এ কোষগুলোতে আছে ফ্যাট বা চরবি। আঙ্গুর যেমন রসে ফুলে টুস্ টুস্ কত্তে থাকে, মোটা লোকদের একোষগুলোও তেমনি চরবিতে ভর্ ভর্ কত্তে থাকে। তাই তার পেটটা হয় ভুরো। দেখায় তাকে গোলগাল নাদুস্ নুদুস্টী।

শীতে শীতকাপড়ের দরকার তার কম হয়—কেননা অমন একটা মোটা তুলোর জামা সর্ব্বক্ষণ গায়ে জড়ান থাকে যে।

তেম্নি আবার গরমে তার মরণ। আই ঢাই হাঁপুস্ হুপুস্। বলে—পাখা লেআও, বরফ লেআও, দার্জ্জিলিং চলো, সিমলে।

রোগা লোকের এসব বালাই নেই। মাঠ ফাটা, কাঠ ফাটা, ছাতি ফাটা গরম, গুদামের মত airproof ঘর, কিন্তু সাংখ্য-পুরুষের মত সে নিষ্পন্দ নির্ব্বিকার। বলে—কৈ গরম। তেম্নি আবার শীতে তার দাঁতকপাটী। উহু গেলুম মলুম। কাঁথা দাও, লেপ দাও, কম্বল দাও, আগুনের কুণ্ডু জ্বাল। কেন না, তার চরবির কোষগুলো যে শূন্য, এক বিন্দু চরবিও যদি তাতে থাকে। তাই তাকে দেখায় অস্থিচর্ম্ম-সার—কাল্ পুরুষ কঙ্কাল। আপনি রেগে উঠে বলবেন—"থান মশায়, আপনি—'মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি'র দল।" খালি লোকের ছিদ্র খুঁজে বেড়ান মোটাকে বলেন "নাদুস-নুদুস" রোগাকে বলেন "কাল পুরুষ!" কোনটা ভাল তবে শুনি? ভাল—অতি রোগাটাও না, অতি মোটাটাও না, ভাল মাঝামাঝিটা—The golden mean; বলে "দুষ্টলোক সূচ হ'য়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।" আমাদের সূচটী অবশ্য দুষ্টু মোটেই নয়—কাজেই ফাল হবার কোনই সম্ভাবনা নেই—আপনি নির্ভয়ে তাকে ঢুকতে দিতে পারেন। তাই হল, আপনার অনুমতি নিয়ে সে চরবির সীমানা ছেড়ে পঞ্চম স্তরে sweat gland (সোয়েট গ্ল্যাণ্ড) বা ঘর্ম্মগ্রন্থির মহল্লায় গিয়ে নূতন কিছু দেখতে পেলে। দেখলে কোষের বদলে এ স্তরটা ছেয়ে আছে অসংখ্য গ্রন্থি বা গাঁট। এ গাঁট গুলোর চারিধারে চলেছে রক্তের স্রোত। বকগুলো যেমন নির্জ্জন পুকুরপাড়ে বা খালের ধারে ধ্যান স্তিমিত নেত্রে তাপসটীর মত নিশ্চল নিষ্পন্দ বসে থাকে, অথচ আড় চোখে সবই দেখে, চুনোটী পুঁটিটি অবধি সুমুখ দিয়ে পাস্ করবার জো নেই, এয়েছে কি ঠোঁটের সাঁড়াসীর তলায় পড়েছে। এই গাঁটগুলোও তেমনি ঐ বকধার্ম্মিকটীরই মত চুপচাপ বসে রাতদিন সজাগ পাহারা দিচ্ছে—রক্তের ভেতর দিয়ে যেই কোন চোর পালাতে চাইছে পাকড়ো পাকড়ো বলে অমনি ল্যাজদিয়ে আঁকড়ে ধচ্চে। এই যে পাকড়ান চোর, গুণ্ডা, বদমাসগুলো এদেরই নাম sweat (সোয়েট) বা ঘর্ম্ম, ঘাম।

টিউবওয়েলের পাইপ যেমন মাটীর বুক ফুঁড়ে তলার দিকে নেবে গিয়ে একটা গভীর স্তর স্পর্শ করে—শরীরের উপর থেকে তেম্নি চুলের মত সরু সরু পাইপ নেবে গিয়ে ঘামের এই গ্রন্থি গাঁটগুলোর সঙ্গে মেশে।

একটা গোটা মানুষের দেহে কি পরিমাণ এই পাইপ থাকে শুনে' বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে যাবেন। পাইপগুলোকে সূতোর মত মুখে মুখে জুড়ে টেনে দিলে তিরিশ মাইল পর্য্যন্ত লম্বা হ'তে পারে। বুঝলেন ব্যাপারটা।

গাঁটগুলোতে ঘাম জমলেই পাইপেরা উপরে টেনে তুলে নিয়ে আসে এবং নিজেদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রমুখে বার ক'রে দেয়। এই ছিদ্রমুখগুলোকে বলে pores of the skin (পোরস্ অব দি স্কীন্) বা রোমকূপ।

গায়ে ময়লা জমে এই রোমকূপগুলো বন্ধ হয়ে গেলে ঘাম বেরুতে পায় না, রক্তের ময়লা রক্তেই আবার ফিরে যায়—শরীর নানা রোগের আকর হয়ে পড়ে।

এইবার বুঝুন গা-মাজা মাথা-ঘষা কেন এত দরকার। অনেকে কিন্তু আবার গা মাজলেও মাথাটাকে স্রেফ্ বাদ দেন, জানেন না যে, রোমকূপ মাথায়ও সেই একই রকম

আচে, এবং ময়লা তাতেই বেশী জমবার সম্ভাবনা রয়েচে। কেন না—একরাশ চুল, তাতে রোজ পড়চে গুচ্ছের তেল, রাস্তার ধুলো অনবরত উড়ে উড়ে তাতে গিয়ে পড়চে আঁটাল তেল তাকে বুভুক্ষিত বন্ধুর মত বুকে আঁকড়ে ধচ্চে, ("অত্যাগ-সহনো বন্ধুঃ") তারপর দু'য়ে মিলে চুলের গোড়ায় গোড়ায়—অর্থাৎ মাথার প্রত্যেকটী রোমকূপের মুখে মুখে একটী আদি অকৃত্রিম প্রলেপ হ'য়ে সেঁটে বসচে। ফলে হচ্চে মাথায় খুসকী, মাথায় ঘা, চুল উঠে যাওয়া—এই সব।

ওঃ। আপনি দেখি হাঁপাচ্চেন—তা হাঁপাবারই তো কথা। কমতো নয় পাঁচ পাঁচটা রাজ্য পার হ'য়ে এসেছেন তো—এইবার আপনার কুশাগ্রবুদ্ধি expert guide (নিপুণ পথপ্রদর্শক) সুচীরাম পাণ্ডেজীকে ধন্যবাদ দিন,—কেন না তারই অনুগ্রহে আপনি বহুবাঞ্ছিত দেবাদিদেব—কঙ্কালদেবের বরাভয়দমূর্ত্তির সুমুখে এসে উপস্থিত হয়েচেন।

আহা কি রূপ ? শ্রীমুখের কী অপূর্ব্ব লাবণ্য! হাত পা বুকপেটের কি সুডৌল গঠন। দেখামাত্র প্রেমভক্তিতে প্রাণ গদ্‌গদ্ হয়ে ওঠে।

আঃ এ কি! "রাম রাম" বলে ছুটে পালাচ্চেন কি ? ভূত নয়—ভূত নয়—skeleton—skeleton (স্কেলিটন) এটাকে বলে স্কেলিটন—বা কঙ্কাল। অর্থাৎ হাড়ের কাঠামো। এই কাঠামোটা না থাকলে শরীরটা হতো আপনার কেঁচোর মত লিক্‌লিকে, চলতে হতো আপনাকে জলকাদা ঘেঁটে, বুকে হেঁটে—আর একে আপনার এতো হেনেস্তা ? ছিঃ ছিঃ। বুঝলাম এত যখন আপনার ভয়, জোয়ান্ অব আর্কের দেশের মেয়ে আপনি একেবারেই নন, জহর-ব্রতধারিণী রাজপুতবালাও না, আপনি নিতান্তই কেরোসিন আবিষ্কারিণী বঙ্গললনা।

হ্যাঁ বঙ্গবালার মত পরিধানে আপনার ঐ যে জীবন-মরণ শাড়ী। সুবলিত-প্রকোষ্ঠে আপনার ঐ যে উজ্জ্বল চুড়ি। ওর শেষে চুড়িটী যে জায়গাটিকে ঘিরে আচে তাকে বলে wrist (রিষ্ট) বা মণিবন্ধ। মণিবন্ধ থেকে দু'খানা হাড় পাশাপাশি হয়ে কনুই পর্য্যন্ত চলে গেছে। এদের ওপরের কিনা বুড়ো আঙুলের দিকের খানাকে বলে radius (রেডিয়াস) আর নীচের অর্থাৎ ক'ড়ে আঙুলের দিকের খানাকে বলে ulna (আল্‌না)। কনুই থেকে আবার একখানা মোটা হাড় বগলের কাছে কণ্ঠার হাড়ের সঙ্গে গিয়ে জোড় খেয়ে বসেচে।

যখন আপনি শোনেন—"আহা, ভুগে ভুগে ছেলেটার কণ্ঠার হাড় দু'টো জেগে গেছে!" তখন কি আপনার বুঝতে বাকী থাকে কাকে বলে কণ্ঠার হাড় ? এই কণ্ঠার হাড়ের ইংরিজি নাম clavicle (ক্ল্যাভিক্‌ল্) অন্য নাম collar-bone (কলারবোন্)। মেয়েরা বলেন—"ওগো শুন্‌ছ ? খোকার বুকের কড়াটা বেড়েছে—শীগ্‌গিরই একটা অসুখ করবে, আজই ডাক্তার বাড়ী নিয়ে যাও।"

এই বুকের কড়া থেকে বুকের মাঝখান দিয়ে বরাবর দুটো কলারবোনের ঠিক মধ্যখানটীতে গিয়ে দাঁড়ান—এই সব জায়গাটা জুড়ে নেপালীদের কুকরীর মত একখানা হাড় লম্বা ভাবে শক্ত হ'য়ে বসে আছে—এর নাম sternum (ষ্টারনাম্)। এই ষ্টারনামের উপর প্রান্তের দুই ধারের সঙ্গে কণ্ঠার হাড়ের দুটী ধার গিয়ে এঁটে বসেছে।

সংযমে নিষ্ঠায় স্বাস্থ্যের দিকে সতত সজাগ দৃষ্টি রাখায় শরীরটী যদি থাকে বেশ সুস্থ, কণ্ঠার হাড় দুটো থাকে ঢাকা। গলায় হার পরলে কেমন আপনাকে মানায়! পাঞ্জাবীর গলার বোতামটী খুলে দিলে কেমন আপনার স্বামীটীকে দেখায়! আর অনাচারে, অসংযমে, অবিরত স্বাস্থ্যের নিয়ম লঙ্ঘনে শরীর যাদের পড়ে ভেঙ্গে, হাড়গিলের মত কণ্ঠার এই হাড় দুটো ওঠে জেগে, হাড় না গিললেও লোকে তাদেরই বলে হাড়গিলে। বলবেই ত'।

আপনি কাব্যে পড়েছেন, নাটক অভিনয়ে দেখেছেন, প্রিয়জনের সঙ্গে অনতিক্রমণীয় বিচ্ছেদ-ব্যথায় নিজেও কতবার অনুভব করেছেন—"শূন্যপ্রাণ পড়ে আছে পঞ্জর-পিঞ্জরে!"—কি না পাঁজরায় গড়া খাঁচায়। সত্যিই ত'—খাঁচাই ত' বটে। চলতি কথায় বুকের খাঁচাই ত' একে বলে।

এই খাঁচার দুটো মাত্র দাঁড়া, পিছনে শিরদাঁড়া, সুমুখে ঐ ষ্টারনাম। বুকের দুটো পাশ ফাঁক ফাঁক ক'রে ঘিরে ডাইনে বারো বাঁয়ে বারো—এই চব্বিশখানা rib (রিব) বা পাঁজরা এই দু' দাঁড়ায় দু'মুখ এঁটে নিয়ে প্রায় একটা পাখীর খাঁচাই তৈরী করেছে। এই খাঁচায় বাস করে—

"সদা ভয়ে ধুক্ ধুক্" প্রাণপাখী।"

বিরহিণী যখন বলে—

"মনের মানুষ বিনে সখী
মন হয়েছে উড়ো পাখী।"

সে বলে। কেন না, এই বিশাল বিশ্বের হাটে, কাটী মানুষের মধ্যে, মনের মানুষটী যে খুঁজে পেলে না ম্বা পেয়েও হারালে,—মন-বিহঙ্গ যে তার উড়ো পাখীরই জানার সন্ধানে উড়ে যেতে চাইবে, শূন্ত প্রাণ যে তার া-বদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত বুকের খাঁচায় আটকা প'ড়ে ছটফট্ ব. তার কি আব কথা আছে? হাতের মণিবন্ধ থেকে ং পর্য্যন্ত যেমন দু'খানা হাড়, পায়ের গোঁড়ালী থেকে হাঁটু স্তত্র তেমনি দু'খানি হাড়; সুমুখের দিকের খানাকে বলে ia (টিবিয়া), পেছনের খানাকে fibula (ফিবুলা)। তেও যেমন কনুই থেকে বাহুমূল অবধি একখানি মোটা , পায়েরও তেম্নি হাঁটু থেকে কুচকী অবধি একখানি মোটা ', এর নাম femur (ফেমার), এটি গিয়ে hipbone ইপ্‌বোন্) বা দাবনার হাড়ের সঙ্গে মিশেচে।

মাথার খুলিটা skull (স্কাল) নানা আকারে আটখানা পটা হাড় জুড়ে জুড়ে তৈরী।

প, হাত এবং পা ও হাতের আঙুলগুলোও টুক্রো রো হাড় জুড়ে জুড়ে তৈরী। আপনার চাঁপার কলির অঙ্গুল ক'টী মুড়ে মুড়ে দেখুন না—দেখবেন সব আঙুলে ন তিনটে,—খালি বুড়ো আঙুলে আছে দুটো ভাঙ্গন। এই নগুলোই এক একখানি টুক্রো হাড়ের জোড়। এই াড় অর্থাৎ ভাঙ্গনগুলো যদি না থাকতো, লম্বা লম্বা এক খানা হাড় দিয়ে আঙুলগুলো তৈরী হতো—আপনি আঙুল ড়তে পারতেন না—মুঠো করে কিছুই ধরতে পাত্তেন না— ঠের পুতুলের অঙ্গুলের মত অঙ্গুলগুলো আপনার টান ্র থাকতো। শরীরের যেখানেই ভাঙ্গন সেখানেই জোড় ছে জানবেন। হাত ও পায়ের আঙুলে, মনিবন্ধ ও গোড়ালিতে, কনুই ও বগলে, হাঁটু ও কুচকীতে, neck (নেক) ঘাড়ে, backbone (ব্যাক্‌বোন্) বা শিরদাঁড়ায়।

ঘাড় থেকে সমস্ত শিরদাঁড়াটা যেন নিপুণ হাতে গাঁথা কুরো টুক্রো হাড়ের অপরূপ একগাছি মালা—দরকার মত ঘোরান ফেরান, উঁচু-নীচু করুন।

এমনটী না হয়ে মাথার পেছন থেকে সমস্ত পিঠটা যদি আস্ত একখানা একটানা হাড় দিয়ে তৈরী হতো, ঘাড় ফিরিয়ে বা পিঠ বাঁকিয়ে আপনি কিছুই দেখতে পাত্তেন না। আপনার বন্ধু বা বান্ধবীর গাড়ীটা হুস ক'রে আপনার পাশ দিয়ে চলে যেতো—তাঁদের মন-মাতান কণ্ঠস্বর আপনার কাণে এসে পৌঁছুতো—আপনি চকিত হয়ে উঠতেন—ঘাড়ের সঙ্গে আপনার বিপুল কলেবরটি শুদ্ধ ফিরিয়ে দেখতে দেখতে কোথায় তাঁরা মিলিয়ে যেতেন। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁদেরও আপনাকে আর দেখবার জো থাকতো না। এরোপ্লেনের কর্কশ-কঠোর একটানা উঁ-অঁ-অঁ-অঁ-অঁ শব্দই শুনতে পেতেন, প্রাণটা আপনার আঁতকে উঠতো! পেছনে ঘাড় হেলিয়ে দেখবার তো আর জো থাকতো না। দেখতে হ'লে যেখানে সেখানে, নর্দ্দমার পচা পাঁক-ভরা কিম্বা ফুটন্ত পিচ দেয়া রাস্তায় চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হতো। দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান-শূন্য হয়ে কখনও বা এক দল পুরুষ বা মহিলার গায়েই ঢ'লে পড়তেন। বিনয়-নম্রতা জগৎ থেকে উঠে যেত. গুরুজন যখন অবিনয়ের জন্য আপনাকে তিরস্কার কত্তেন, আরো অবিনয় দেখিয়ে ঘাড় উঁচু করেই আপনি তাঁর সুমুখে গিয়ে দাঁড়াতেন—পিত্তি তাঁর জ্ব'লে যেতো, হয়তো মেনেই বলতেন, আপনার শক্ত ঘাড় তবু নরম হতো না। লজ্জানম্রা নববধূ ঈষৎ ঘোমটাটী টেনে, ঘাড়টি নীচু করে যখন দাঁড়ায় কেমন দেখায়। সে অনুপম দৃশ্য কারো ভাগ্যে ঘটতো না—সটান পিঠ, শক্ত-ঘাড়, প্রফুল্লর জগমণির মাথায় ঘোমটা টেনে দিলে যেমনতর দেখায় তেম্নি দেখাতো! ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, এই বিপদ বাঁচিয়ে গায় গায় জুড়ে জুড়ে ঘাড়ে দিয়েছেন সাত টুক্রো, সমস্ত মেরুদণ্ডটায় দিয়েছেন ছাব্বিশ টুকরো হাড়।

এক এক জগতের এক এক রকমের কথার ছাঁদ—আপনি বলবেন খাবার, আর একজন বলবে খানা। ভেঙ্গে যাওয়ার ইংরিজি তরজমা করে আপনি বলবেন breaking (ব্রেকিং), ডাক্তারেরা বলবেন fracture (ফ্র্যাক্‌চার)। আপনি এখন জানেন কাকে বলে radius, কাকে বলে ulna, কাকে বলে tibia, কাকে বলে fibula। পড়ে গিয়ে অনেক সময় এসব হাড় ভেঙ্গে যায়—কখনও একখানা কখনও বা জোড়াটাই। এদের বিশেষ কোন একখানা ভাঙ্গলে ডাক্তারেরা বলবেন Radius বা Ulnar Fracture হয়েচে, দু'খানা ভাঙ্গলে বলবেন compound (কম্পাউণ্ড) Fracture হয়েচে, অর্থাৎ জোড়া ভাঙ্গন ভেঙ্গেচে।

[ক্রমশঃ

খেয়ালী

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য

কোন রূপে তুমি আসিবে খেয়ালী
আমার বিজন ঘরে ?
সকরুণ আঁখি রয়েছে জাগিয়া
উদ্বেগতায় ভ’রে ।
শাখাপ্রসারিত তটতরু ছায়ে
বনফুল বাসে সুবাসিত বায়ে
বরষায় ভরা গ্রাম্য যে নদী
মৃদু কলতানে বহে নিরবধি
তুমি কি খেয়ালী সেইরূপ ধরি’
দুয়ারে দাঁড়াবে আসি ?
নব আষাঢ়ের সজল ছায়াতে
নয়নে উঠিবে ভাসি’ ।
স্নান সমাপনে ঘন এলো চুলে
সাজায়ে কবরী পারিজাত ফুলে
লীলায়িত হেসে নূতন ধাঁধায়
বাঁধিবে কি মোরে স্নিগ্ধ বাধায় ?
আনত আঁখির চাহনির তলে
রচিবে শারদ মায়া ?
আমারে ঘিরিয়া ঘনাবে কি তব
করুণ কামনা ছায়া ?
গোধূলী লগনে আমারে স্মরিয়া
আনিবে কি তব বক্ষে ধরিয়া
পাহাড়ী স্রোতের মৃদু শিহরণী ?
সচকিত শিখা নব জাগরণী ?
গাঁথিবে কি মম নন্দিত বুকে
তোমার ছন্দখানি ?
শুভ্র কমল কলিকার রূপে
ফোটাবে সুপ্ত বানী ?
কালো মেঘ সম গ্লানিভরা মুখে ।
আসিবে কি তুমি মোর পানে রুখে ?
বৈশাখী রাতে দুর্য্যোগ সম
জাগাবে কি বুকে উদ্বেগ মম ?
কুণ্ঠিত ভীরু করিবে কি মোরে
বিষাদেতে বিহ্বল ?
শঙ্কিত চোখে আনিবে কি হায়
বেদনা-অশ্রুজল ?
শারদ উষার নব তৃণদলে
যে মায়া জড়ানো শিশিরের জলে
পলাশ কাননে সন্ধ্যা সকালে
নিত্য যে লীলা আপন খেয়ালে
সেই রূপে তুমি আসিয়া সমুখে
মেলিও অলস পাখা
তোমার স্নিগ্ধ মায়াবী আলোয়
আলিপনা হবে আঁকা ।
লুকায়ে রেখোনা নয়নের বানী
অবগুণ্ঠন দিও না গো টানি’
ঘুচায়ে তোমাব ছলনার সীমা
বাহিরে আনিও অরূপ মহিমা
আকাশে আমার দুটি চোখে তব
শত কোটি দীপ জ্বালি’
হয় যেন ওগো নানা বরণের
উৎসব দেওয়ালী ।
আমাব বিজন বিলাস বিপিনে
বিভাব বিহীন রহিব যে দিনে
কৌতুকী তুমি এসো মোর প্রাণে
মৌমাছিদের গুঞ্জন গানে
মহুয়া বঁধুর রূপে দিও ভরে
দীনতার অঞ্জলি
বুভুক্ষু আমি আকণ্ঠ পানে
উঠিব গো চঞ্চলি ।’

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

তিন

শহরের উপকণ্ঠে ছবির মতো একখানা বাড়ী, তার তিন দিকে ফুলের বাগান। সীমানা ঘিরে প্রাচীরের পরিবর্ত্তে কাঁটা তারের বেড়া থাকায় বাগানের সৌন্দর্য্য বাইরের লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রং বেরং এর নানা জাতীয় ফুল স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠে বাড়ীটিকে বাস্তবিকই মনোলোভা ক'রে তুলেচে। অদূরে ছোট একটি টিলা এবং তার পশ্চাতেই পূর্ব্ব-পশ্চিম দিগন্ত প্রসারী অভ্রভেদী সুনীল পাহাড়। টিলার উপরিস্থিত শাদা রঙের বাড়ীখানা পশ্চাদ্বর্ত্তী নীল পাহাড়ের গায়ে যেন স্বচ্ছ মর্ম্মরের মতো ঝলমল কচ্ছিল। ফুলবাগানের এক কোণে চেয়ারে উপবিষ্টা একজন মহিলা নিবিষ্ট-চিত্তে সেই মনোরম দৃশ্যটিকে রং ও তুলির সাহায্যে কাগজের উপর ফুটিয়ে তুলছিলেন। ঐ কার্য্যে তাঁর দক্ষতা থাক্ আর না-ই থাক্, তিনি যে তাতে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব কচ্ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

সকালবেলা সাড়ে সাতটায় তিনি চিত্রাঙ্কনে ব'সেছিলেন, একাগ্রমনে দেড়ঘণ্টা কাজ ক'রে উঠলেন এবং তারপর চিত্রখানা easel এ খাড়াভাবে রেখে কয়েক পা পিছনে এসে আসলের সহিত নকলের তুলনা করতে লাগলেন। একটুখানি তৃপ্তির হাসি তাঁর অধর-প্রান্তে ফুটে উঠলো। তারপর বাঁ হাতে চিত্র ও ডান হাতে রং তুলি প্রভৃতি উঠিয়ে নিয়ে তিনি ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন তাঁর দৃষ্টি পড়লো বাইরে রাস্তার ধারে একজন শ্মশ্রুধারী সুগঠিত দেহ বলিষ্ঠ যুবকের উপর। ঐ লোকটি রাস্তার পার্শ্বস্থিত একখণ্ড বড় পাথরের উপর ব'সেছিল এবং হয় তো এই বাড়ীর দিকেই তাকিয়েছিল।

এই রাস্তায় বহু লোকের যাতায়াত না থাকলেও এই পথেই স্থানীয় দুর্গা বাড়ীতে যেতে হয়, সুতরাং এখানে একেবারেই লোক চলাচল নেই এমন কথা বলা চলে না। তা ছাড়া, রাস্তার অপর পার্শ্বে যুবকটি যেখানে ব'সেছিল তার সন্নিকটে তখন একখানা বাংলো ধরণের বাড়ী তৈরি হচ্ছিল; এই জন্য কিয়দ্দিন যাবৎ এখানের নির্জ্জনতা বহুল পরিমাণে ক'মে গিয়েছিল। এই কারণে ঐ যুবককে সেখানে দেখতে পেয়ে মহিলাটি মোটেই বিস্মিত হন নি, বরং মনে করলেন লোকটি সম্ভবতঃ ঐ বাংলো নির্ম্মাণের কাজ পর্য্যবেক্ষণ ক'রে থাকে। উপর্য্যুপরি ৪।৫ দিন যুবকটিকে সেখানে ব'সে থাকতে দেখেই তাঁর ঐ প্রকারের ধারণা হ'য়েছিল। বিকেল বেলাও ঐ যুবককে ব'সে থাকতে বা নিকটে পায়চারি করতে দেখা যেতো।

মহিলাটি যে বাড়ীতে থাকতেন সেখানে ঐ মহিলা ছাড়া আর কে কে থাকেন কিংবা অপর কেউ থাকেন কি না যুবকটি তা জানতো না, তবে সে দেখতে পেতো, একজন সম্ভ্রান্ত ধরণের লোক মোটরে ক'রে প্রায় প্রতিদিনই এ বাড়ীতে এসে থাকেন ও ঐ মহিলার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পসল্প ক'রে চ'লে যান। লোকটির চালচলন যুবকের চোখে ভালো লাগে নি। ছদ্মবেশী এই যুবককে মহিলা দুলাল ব'লে চিনতে না পারলেও, দুলাল সেই মহিলাকে লীলাবতী রায় ব'লে প্রথমাবধিই চিনতে পেরেছিল। যে কারণে দুলাল বেনারসে এঁর কাছে নিজ পরিচয় দিয়ে উপস্থিত হতে পারে নি, এখানেও সেই কারণেই সে আত্ম-প্রকাশ করতে পারলো না। তারপর যে দিন সে মোটর-বিহারী লোকটিকে এ বাড়ীতে আসতে প্রথম দেখলো, সেইদিন অবধি লোকটার উপর তার কেমন একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাস এলো। দুলালের ধারণা হ'ল, লোকটা যেন কোনপ্রকার দুরভিসন্ধি নিয়ে এ বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ ক'রচে।

বস্তুতঃ দুলালের ধারণা ভুল ছিল না। কেদারনাথ ছিল স্থানীয় এক লম্পট জমিদার। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার মুখোস প'রে ও সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানে অর্থ-সাহায্যাদি ক'রে বিশিষ্ট সমাজে বিচরণ করবার তার অবাধ ছাড়পত্র লাভ হ'য়েছিল। এই ছাড়-পত্রের অন্তরালে যতো সব ব্যাপার ঘটতো সেগুলো বাইরে প্রকাশ পেতো না। লীলাবতী রায় এই নগরে এসে টাউন হলে দু'দিন বক্তৃতা করেন এবং

তারপর এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হ'য়ে এখানে কিছুদিন বাস করবার অভিপ্রায়ে পাহাড়ের নিকটে একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে অবস্থিতি কচ্চিলেন।

কেদারনাথ থিয়োলোজিকেল সোসাইটির প্রচার ফণ্ডে পাঁচশো টাকা দান ক'রে অতি সহজেই লীলাবতীর সহিত পরিচিত হ'তে পারলো। সেই পরিচয়ের সুযোগে এই বাড়ীতে এসে লীলাবতীর সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করতো। চিত্র-শিল্পে লীলাবতীর আগ্রহ ও নৈপুণ্য লক্ষ্য ক'রে কেদারনাথ বর্ত্তমান ও অতীতের, ভারতীয় ও ইউরোপীয় কলা-শিল্পের আদর্শের তুলনামূলক সমীচীন সমালোচনার পর লীলাবতীর অঙ্কিত চিত্রের বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা ক'রে তাঁকে উল্লসিত করতে প্রয়াস পেতো। বস্তুতঃ কেদারনাথে সকল বিষয়ের সুন্দর সমালোচনা করতে পারে দেখে লীলাবতী তাকে শ্রদ্ধার সহিত দেখ্‌তে আরম্ভ করলেন এবং মাঝে মাঝে তার মোটরে বেড়াতে যেতেও দ্বিধা বা শঙ্কা বোধ করিতেন না।

লীলাবতী নিজেও একখানা মোটর গাড়ী ভাড়া ক'রে এনে এই বাড়ীতে রেখেছিলেন এবং সময় সময় নিজেই ঐ গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতেন। একদিন অপরাহ্নে তিনি বেড়াতে বেরুতে ছিলেন এমন সময় কেদারনাথ এসে উপস্থিত হ'ল এবং দু'এক কথার পর কেদারনাথ নিজ গাড়ী রেখে লীলাবতীর গাড়ীতেই তাঁর সঙ্গে বেড়িয়ে গেল। সন্ধ্যার কিছুকাল পরে উভয়ে প্রত্যাগমন করলে, লীলাবতী কেদারনাথকে চা খেয়ে যাবার জন্তে অনুরোধ করলেন। কেদারনাথ রাজী হ'ল।

চা-পানান্তে ড্রয়িং রুমে ব'সে আমিষ ও নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে উভয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। কেদারনাথ বল্‌লো :—"আমিও নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী কিন্তু লজ্জার সহিত স্বীকার করতে বাধ্য যে নিজ জীবনে তা সম্পূর্ণ পালন করতে পারি নি।"

লীলাবতী প্রশ্ন করলেন :—"কেন পারেন নি? যা সঙ্গত ব'লে স্বীকার কচ্চেন, তা কার্য্যতঃ পালন করতে আপনার মতো জ্ঞানী লোকের পক্ষে কেন সম্ভবপর হ'ল না, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।"

—"জ্ঞানী লোক ব'লে আমায় আর আর লজ্জা দেবেন না। সামান্য একটু লেখাপড়া ক'রেচি ব'লেই বল্‌তে হবে, বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার সব পেটে পুরে রেখেচি? বস্তুতঃ প্রকৃত জ্ঞানী হ'তে গেলে সকল প্রকার কামনা বাসনা ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মচারী হ'তে হয়,—কিন্তু তাতো হ'তে পারি নি, বোধ করি হ'তে পারবোও না।"

—"আপনার এই থিওরির সঙ্গে আমার মতের মিল হ'ল না। প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হ'লেই যে ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী হ'তে হবে, আমি তা স্বীকার করি না। সংসারী লোকও জ্ঞানী হয়, আবার জ্ঞানী লোকও সংসারী হ'তে পারে।"

—"তা হ'লে আমার আশা একান্তই দুরাশা নয়।"

—"আপনার আশা? আপনি কি আশা কচ্চেন?"

—"আশা কচ্চি বলা ঠিক হবে না, যাচ্ঞা কচ্চি আপনার প্রীতিও করুণা। কথাটা উঠেচে, তখন না ব'লে পাচ্চি না, আপনাকে দেখে অবধি আমি আমায় সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেচি—আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালোবেসে ফেলেচি।"

লীলাবতী গম্ভীর ভাবে বললেন,—"আপনি ভয়ানক ভুল করেচেন কিংবা আমায় সম্পূর্ণ ভুল বুঝেচেন। আমি একজনের কাছে বিবাহ-প্রস্তাবে আবদ্ধা সুতরাং অপর কারো ভালোবাসা গ্রহণে আমি একেবারেই অক্ষম।"

—"আকাশে চাঁদ ওঠে, বাগানে ফুল ফোটে, সর্ব্বসাধারণ তাদের ভালোবাসে, তাদের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে। প্রকৃতির এইতো সনাতন রীতি। এই শাশ্বত সত্যকে আপনি উপেক্ষা করতে পারেন না। রূপ-যৌবনাদি প্রকৃতির সে সম্পদে আপনি ধন্তা, সে সবের অধিকারিণীকে ভালোবাসবার এবং সে সব সম্পদ উপভোগ করবার অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের আছে। এমন উচ্চ শিক্ষিতা হ'য়েও আপনি এখনও কুসংস্কার ত্যাগ করতে পারেন নি দেখে বাস্তবিক অবাক হ'য়ে যাচ্ছি।"

—"কুসংস্কার বল্‌চেন কাকে?"

—"আপনার ভীরুতাকে—এ আপনার ভীরুতা ভিন্ন আর কিছু নয়। ন'দের নিমাই নির্ব্বিচারে প্রেম বিতরণ ক'রে অবতার হ'য়েছিলেন, তাঁর সেই ভীরুতা ছিল না ব'লেই তো? তাই আজ তাঁর নাম ধন্ত হ'য়ে আছে। আপনি এখনও বিবাহিতা হন নি, কিন্তু নিমাই বিবাহিত

প্রেম-বিতরণে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। তা ছাড়া । বোধকরি তেমন অপাত্র নই যে আমার ভালোবাসা পার গ্রহণ-যোগ্য হ'তে পারবে না। কুণ্ঠা, কুসংস্কার আমার বাসনা পূর্ণ করুন।" এই কথা ব'লেই রনাথ চট্ ক'রে চেয়ার থেকে উঠে লীলাবতীর ডান তখানা চেপে ধরলো।

এরূপ একটা ব্যাপারের জন্য লীলাবতী মোটেই প্রস্তুত ন না। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে তিনি ক্রুদ্ধ বললেন :—

"আপনি এমন ইতর শ্রেণীর লোক তা জানতুম না। গর হাত ছাড়ুন, নয়তো এক্ষুণি চাকরদের ডেকে নাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেবো।"

—"জমিদার কেদারনাথকে সংকল্পচ্যুত করতে পারে লোক আজও জন্মায় নি, মিস্ রায়। আমন্ত্রণ ক'রে প্রলোভন দেখিয়ে আপনিই আমায় পাপ-পথে টেনে চেষ্টা কচ্ছেন, একথা আপনার অনুচরেরা বিশ্বাস না ও বাইরের যে কোনো লোক বিশ্বাস করবে—প্রমাণ, নার নিজ গাড়ীতে আমায় নিয়ে হাওয়া খেতে ।"

কেদারনাথের বাক্য শেষ হ'তে না হ'তেই তী কোনরূপে তাঁর হাতখানা মুক্ত ক'রে কয়েক পা পড়লেন এবং সামনের টেবিলের উপর থেকে একটা গ্লাস তুলে Scoundrel' ব'লে সেটা কেদারনাথের উপর জোরে ছুঁড়ে মারলেন। গ্লাসটা কেদারনাথের কে মেঝেয় প'ড়ে ভেঙে গেল।

যেখানে গ্লাসটা লেগেছিল সে স্থানের কিয়দংশ রক্ত বেরুলেও বিদ্রূপের হাসি হেসে কেদারনাথ ; "সাবাস্ মিস্ রায়, বলিহারি এই আস্ফালন। কাঁচ বিরাট অস্ত্রদ্বারা যে অসুর নিপাত হয় না তাতো তেই পেলেন, এখন এই অভিনয় ছেড়ে তার প্রতি প্রসন্ন ।" ব'লেই কেদারনাথ একটু অগ্রসর হ'য়ে লীলাবতীকে ত জড়িয়ে ধরলো। পাষণ্ডের হাত থেকে মুক্তি পাবার বতী প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন এবং "কে এদিকে এসো" ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেন। কেদারনাথ চেপে ধরবার চেষ্টা কচ্ছিল কিন্তু সফল হয় লীলাবতীর আর্ত্তস্বর তাঁর মুখথেকে বেরুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একব্যক্তি দোর ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলো এবং কেদারনাথের মাথায় এক প্রচণ্ড মুষ্টি বসিয়ে দিলো। ঐ আঘাতের ফলে দুর্বৃত্তের মাথা ঘুরে হাতের বন্ধন শিথিল হ'য়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তেই লীলাবতী সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে স'রে দাঁড়ালেন। কেদারনাথের শক্তি আবার ফিরে এলো এবং যখন সে দেখলো, লীলাবতী আর তার বাহু-বন্ধনের ভিতর নেই এবং সম্মুখে এক তৃতীয় ব্যক্তি তাকে আঘাত করবার জন্য উদ্যত, তখন সে ক্রোধে যেন উন্মত্ত হ'য়ে গেল। পরমুহূর্ত্তে কেদারনাথ ও ঐ তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কেদারনাথ শক্তিশালী লোক হ'লেও প্রতিপক্ষের সঙ্গে পেরে উঠলো না। দু'মিনিটের মধ্যে সেই লোকটি কেদারনাথকে দু'হাতে তুলে ঘরের দেয়ালের গায়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেললো। দারুণ আঘাতে কেদারনাথ সংজ্ঞাহীন হ'য়ে জড়-পিণ্ডের মতো মেঝেয় প'ড়ে রইলো।

অপরিচিত আগন্তুকের আকস্মিক আবির্ভাবে লীলাবতী বিস্মিত হ'য়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর পক্ষ অবলম্বন ক'রে কেদারনাথের সঙ্গে লড়াইতে প্রবৃত্ত হ'তে মনে মনে ভাবছিলেন দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ভগবান্ই এই ব্যক্তিকে ঠিক সময়ে পাঠিয়েছেন। কেদারনাথের পতন দেখে লীলাবতী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন এবং তারপর বিজেতাকে সম্বোধন ক'রে বললেন,—"আপনি কে জানি না কিন্তু শয়তানের হাত থেকে আমায় রক্ষা ক'রে আজ যে উপকার করলেন, তার তুলনা নেই—সে জন্য আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

আগন্তুক বিনীতভাবে বললো,—"আমি এমন কিছু করি নি যে জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। অতি তুচ্ছ কাজকে মিছিমিছি বড় ক'রে দেখবেন না। আপনার লোকজন সব এখন আসচে; আমি তবে যাই।"

—"না, না, যাবেন না, একটু অপেক্ষা করুন—এই শয়তানটার একটু ব্যবস্থা ক'রে নিই।"

ইত্যবসরে দু'জন ভৃত্য ব্যস্ততার সহিত ঘরে প্রবেশ ক'রে জিজ্ঞেস্ করলো, "কি হ'য়েছে মাই জি ?" লীলাবতী উত্তর দেবার পূর্ব্বেই তাদের দৃষ্টি পড়লো, ভূলুণ্ঠিত

কেদারনাথের উপর। তারা প্রায় সমস্বরে ব'লে উঠলো, "এ কি, জমিদারবাবু মাটিতে প'ড়ে কেন? তাঁর হ'য়েচে কি?"

লীলাবতী বললেন, "বিশেষ কিছু হয় নি, একটু অজ্ঞান হ'য়েছে মাত্র। মাথায় জল ঢাললেই জ্ঞান হবে। আগে নিয়ে যাও ওকে ওর গাড়ীতে—তারপর ওর মাথায় জল ঢালতে থাকো। জ্ঞান ফিরে এলে গাড়ীশুদ্ধ ওকে রাস্তায় রেখে চ'লে আসবে আর শাসিয়ে দেবে, এ বাড়ীতে যেন আর কদাচ না আসে।"

ভৃত্য দু'জন কর্ত্রীর আদেশ পালনে তৎপর হ'লে লীলাবতী আগন্তুককে আসন গ্রহণ করতে আহ্বান ক'রে বললেন, "আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?"

—"আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির পরিচয় দেবার মতো কিছু নেই।"

"পরিচয় দিতে আপত্তি থাকলে তার জন্যে পীড়াপীড়ি করবো না, তবে আজকার এই ব্যাপারে আমার এই মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কার কাছে ঋণী রইলাম, শুধু সেইটুকু জানতে পারলেই সুখী হ'তাম।"

—"আপনি অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর কাজটাকে অনর্থক বড়ো ক'রে তুলচেন এবং সেজন্য নিজেকে ঋণী মনে কচ্চেন। বস্তুতঃ আমি যা ক'রেচি ওরূপ অবস্থায় যে কোনো লোকই তা করতো। সুতরাং এতে আমার কোনো কৃতিত্বই নেই।

—"যে কোনো লোক এমন দুর্ব্বৃত্তকে এতো সহজে কাবু করতে পারতো না।"

—"জাপানী-কুস্তি আমার একটু জানা ছিল ব'লেই হয়তো কাণ্ডটা একটু সহজ হ'য়েচে।"

—"আমার যেন মনে হয়, আপনাকে এই রাস্তার ধারে কয়েক দিন দেখেচি।"

—"তা অসম্ভব নয়, কারণ দিন কয়েক যাবৎ আমি এই দিকেই বেড়াচ্ছিলাম। এদিককার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আমায় অনবরত এদিকে টেনে এনেচে।"

—"আমিও অই আকর্ষণেই এখানে কিছুদিন যাবৎ বাস কচ্চি। আপনি এই টাউনের কোথায় থাকেন, তা বল কি বাধা আছে?"

—"বাধা তেমন কিছু নেই। আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তি থাকার স্থানও নগণ্য। সত্যি কথা বলতে কি, অ থাকার কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই—যখন যেখানে সুবি থাকি—তা কখন হয় ঘর, কখন হয় গাছের ছায়া, আ কখনো বা রাস্তার ধারের শিলাখণ্ড। ভবঘুরে লোকের এতেই তৃপ্তি।"

—"সংসারে আপনার আপন জন বুঝি কেউ নেই—তাই এই ভব-ঘুরে বৃত্তি নিয়েচেন?"

আগন্তুক হঠাৎ আসন ত্যাগ ক'রে উঠলো এবং লীলাবতীর দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললো,—"আপনার diagnosis হয়তো ভুল হয়নি কিন্তু সে কথা থাক। লোকটাকে বাইরে নেওয়া হ'য়েচে। আমি এখন যেতে পারি?"

—"আমার নমস্কার নিন। আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানা সম্ভবপর নয়?"

—"আমি 'সুরথ' নামে পরিচিত এইটুকু জানতে পা এর বেশি পরিচয় আমার নেই। নমস্কার।"

আর কিছু না ব'লে সুরথ ঘর থেকে বের হ'য়ে

সুরথ চ'লে যাবার পর লীলাবতী কিয়ৎক্ষ ভাবলেন। তাঁর যেন মনে হ'ল, এই ব্যক্তিকে রাস্তার ধারে ছাড়াও অন্য কোথাও দেখেচেন কি কোথায়, কখন এবং কি অবস্থায় দেখেচেন, তা স্মর পারলেন না। এই শক্তিশালী ব্যক্তি তাঁর সাহায্যার্থে যথাসময়ে উপস্থিত না হ'লে আজ কেদারনাথের হাতে তাঁর কিরূপ লাঞ্ছনা পেতে হ'তো, তাই ভেবে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য শিউরে উঠলেন।

কেদারনাথকে ধরাধরি ক'রে মোটরে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সংজ্ঞা ফিরে এসেছিল। নিকটে ভৃত্যদের দেখে তাঁর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে তার মুখোস খ'সে প'ড়েচে। আস্তে আস্তে নীরবে ড্রাইভারের আসন গ্রহণ ক'রে সে তখনই মোটর নিয়ে চ'লে গেল। তখন তার দুই চোখ থেকে প্রতিশোধের বহ্নি যেন ঠিকরিয়ে পড়ছিল।"

[ক্রমশঃ